সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে মাসিক বসুমতীর চাঁদা

বাৎসরিক	—	১৮৲ টাকা
সডাক	—	২০৲ টাকা
ষাণ্মাসিক	—	৯৲ টাকা
সডাক	—	১০৲ টাকা

ভারতবর্ষে ও পাকিস্থানে রেজেস্ট্রী ডাকে

বাৎসরিক	২৭৲ টাকা
ষাণ্মাসিক (ভারতীয় মুদ্রায়)	১৩·৫০ পয়সা

ভারতবর্ষের বাহিরে বাৎসরিক রেজেস্ট্রী ডাকে ৩৩৲ টাকা

পত্রিকা ছয় মাসের কম লইলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। গ্রাহক হইতে হইলে পত্রিকা প্রাপকের নাম, ঠিকানাসহ আমাদের কার্যালয়ে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হইবে কিম্বা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১২ ❖ কর্মাধ্যক্ষ—মাসিক বসুমতী

★ মাসিক বসুমতী বাঙলার সর্বাধিক পঠিত একমাত্র মুখপত্র ★

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের শ্রাবণের (১৩৭৫) সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'পাকিস্তানের বর্তমান ক্রিয়াকলাপ'---বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানকে সমর অস্ত্রশস্ত্র দানের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে করে সম্পূর্ণ জটিলতর ও নূতন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে---এ বিষয়ে আজ আর কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবার কারণ দেখা যাচ্ছে না। শুধু এই ভেবেই বিশেষ চিন্তিত হচ্ছি ও আশ্চর্য বোধ করছি যে, আন্তর্জাতিক কূটনীতি আজ যে-পর্যায়ে নেমে গেছে ও যাচ্ছে তাতে করে কোন সুদৃঢ় নীতির উপর দাঁড়িয়ে আজ আর আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে বিচরণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। আজ এটাই দেখা যাচ্ছে যে, পলিটিক্যাল, এক্সপিডিয়েন্সি ও রিয়েল পলিটিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাকিয়াভিলিয়ান রাজনীতিই একমাত্র নীতি হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দী-চীনী ভাই ভাই-এর চরম পরিসমাপ্তি আমরা ১৯৬২ সালে দেখিয়াছি। রাশিয়ার উপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সামগ্রিক নির্ভর করার যে রীতি আমরা আজও পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলাম তার মূলে কুঠারাঘাত হোল এতে আর সন্দেহ নাই। ক্রেমলিনের কর্ণধাররা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিন এই বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে যে [illegible] দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত তার কোন মূল্য থাকবে বলে মনে হয় না। ঐ পর্যায়ের আশ্বাস ও আপ্তবাক্য যে কতখানি মূল্যহীন তা আমরা ১৯৬৫ সালে দেখেছি।

পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বিনা দ্বিধায় ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিলো। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাসবাণী ফলবতী হয় নাই। একদিন ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক যে পাকিস্তান তোষণ নীতি লইয়াছিল---সেই ভুলই করিয়া বসিল। পাকিস্তান আজ আন্তর্জাতিক কূটনীতি ক্ষেত্রে সর্বজয়ী হইয়াছে---পাকিস্তান আজ চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হইতে সমানভাবে অস্ত্রশস্ত্র পাইতেছে। আজ ক্রেমলিনের নীতির গভীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্রুশ্চেভের নীতি আজ আর বর্তমান রাশিয়ার কর্ণধাররা মানিয়া লইতেছেন না। ভারতের জনমত আজ গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছে। রাশিয়ার এই বর্তমান নীতিতে আজ পঞ্চশীলের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ফ্রেণ্ডশিপ, পীস, কো-এক্‌জিস্‌টেন্স এ্যাণ্ড নন-এ্যালাইনমেণ্ট-এর আজ পুনরায় মৃত্যু ঘটলো। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের রণ হুঙ্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ করে আজ আমাদের সোভিয়েট রাশিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার বা নির্ভর করিবার দিন শেষ হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ দেখা যাইতেছে যে, শুধু মুখের বন্ধুত্বের কোন দাম বা বিশেষ মূল্য নাই। সোভিয়েট রাশিয়া যে উদ্দেশ্য লইয়া পাকিস্তানকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র দিতে যাইতেছে তাহা তো সফল হইবেই না, উপরন্তু সমস্ত এশিয়াখণ্ডে সোভিয়েট রাশিয়ার এই নীতির ফলে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যনীতির গান গাহিবার দিন আজ নির্বিচারে ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন নীতি ও নূতন বন্ধু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতকে পরনির্ভরশীল হইয়া থাকিলে চলিবে না।

---শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮সি, সি, এন রায় রোড, কলিকাতা-৩৯।

মহাশয়,

প্রথমেই পত্রিকা সমালোচনা বিভাগটির কথা উল্লেখ করি। পাঠকরা কী ধরণের কেমন লেখা চান, পত্রিকা সম্পাদকের তা জানা একান্ত দরকার। এই বিভাগে পাঠকরা লেখা, লেখক এবং সম্পাদনার ব্যাপারে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেন। যার সঙ্গে পত্রিকার অগ্রগতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাই এই বিভাগটি উপস্থিত পাঠকদের কাছেও খুব প্রিয়।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে শ্রীদীপঙ্কর নন্দীর লেখা 'বাঙালীর লেখা প্রথম ইংরাজী কাব্য' পড়ে প্রভূত আনন্দ পেলাম। আমরা প্রথম বাংলা গদ্য রচনাকার খৃস্টান পাদ্রী দোম আন্তোনিওর লেখা 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামক লেখাটির কথা বিস্মৃত হই নি; কিন্তু প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালী কাশীপ্রসাদ ঘোষ যিনি প্রথম ইংরাজী কাব্য লিখে প্রচুর সুনাম এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁকে জানি না বা জানবার চেষ্টা করি নি। এটা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। লেখক তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে আমাদের লজ্জার অপনোদন করেছেন---এ জন্য তাঁর কাছে আমরা ঋণী রইলাম।

ঐ সংখ্যাতেই সুলিখিত ঐতিহাসিক কাহিনী 'নেপথ্য নায়িকা' উপহার দেওয়ার জন্য লেখিকা শ্রীমতীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কল্পিত কাহিনীর চেয়ে ঐতিহাসিক কাহিনী পাঠকদের কাছে যে সবদিক থেকেই আকর্ষণীয় হয় একথা অস্বীকার করা যায় না।

উক্ত সংখ্যায় নিখিল সেনের লেখা 'ভিয়েৎনামের সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখ্য আলোচনা। সংগ্রামী ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা শুধু লজ্জার কথাই নয়---কলঙ্কজনকও বলা চলে। যাদের সংগ্রামী জীবনসাধনা আমাদের সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টির দাবী রাখে তাদের সম্বন্ধেই আমাদের সাহিত্যিকরা আজ

আশ্চর্য রকমের উদাসীন। তাই উক্ত লেখাটির জন্য লেখক এবং সম্পাদক উভয়কেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আর একটি নিবন্ধের উপস্থিতি শুধু আনন্দজনকই নয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তন্ত্রের পীঠস্থান এই বাংলা দেশেই তন্ত্র সম্বন্ধে সীমাহীন অজ্ঞতা, অস্পষ্ট ধারণা এবং অবহেলা বিরাজমান। এর কারণ, মনে হয়—তন্ত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধানী এবং বিশ্লেষণী সাহিত্যের অপ্রাচুর্যতা। সে জন্য লেখক সত্যব্রানকে তাঁর 'তন্ত্র পরিচয়' লেখাটির জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

কিছুদিন আগে মাসিক বসুমতীতে একাঙ্কিকা দেবার জন্য অনু । করেছিলাম এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় শিবরাম চক্রবর্তীর 'প্রাণকেষ্টর প্রাণান্ত'র আবির্ভাব দেখে খুব খুশি হলাম।

পত্রিকার যৌন-জ্ঞান বিভাগে কামলালসায় সুড়সুড়ি দেখার মত কোন সস্তা কামগন্ধী লেখা না দেখে এবং সে জায়গায় মানুষ তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কীভাবে সুস্থ সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে সেইরূপ শিক্ষা-মূলক প্রকাশিত হয়, দেখে যথার্থ আনন্দিত হলাম। আজকের জটিল জীবনে যৌন সমস্যাও একটা অপরিহার্য সমস্যা, তাই এই বিভাগটির জন্য সম্পাদককে স্বাগত জানাই।

এবার সম্পাদকের নিকট সবিনয়ে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি। বসুমতীর প্রথম পাতায় 'কথামৃত' লেখাটির উপরে যেখানে দশাবতার, খৃস্ট, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের ছবি থাকে সেখানে যদি শুধু অবতারবরিষ্ঠ রামকৃষ্ণেরই ছবি থাকে তাহলে সেটা দেখতেও ভাল লাগে এবং যুক্তিযুক্তও হয়। কারণ অবতারবরিষ্ঠের মধ্যেই সমস্ত ঐতিহ্য বিধৃত হয়ে আছে এবং তাঁর মধ্যেই আমরা অতীতকে সনাক্ত করতে পেরেছি বর্তমানকে উপলব্ধি করতে পারছি এবং ভবিষ্যতের চলার লক্ষ্যকে দেখতে পাচ্ছি।

ষাণ্মাসিক সূচী বৈশাখ এবং কার্তিক সংখ্যার পরিবর্তে যদি চৈত্রে এবং আশ্বিনে ছাপান যায় তবে বই বাঁধার পক্ষে আমাদের খুব সুবিধা হয়। এ সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বেশী ক্রমশ লেখা না দিয়ে যদি সংখ্যায় তা অর্ধেক করা যায় এবং ৩।৪ পাতার জায়গায় ক্রমশ লেখাগুলি দ্বিগুণ পাতায় ছাপান হয়, তবে সেগুলি পড়ে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। নচেৎ অতি সামান্য অংশগুলি পড়ে কেমন একটা অতৃপ্তি অনুভব করি। সম্পাদক মহাশয়কে এ বিষয়ে একটু বিবেচনা করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রাঃ, ও পোঃ বান্দোয়ান, জেলা—পুরুলিয়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● ৭৩ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, কদমতলা, পঃ বঃ ● ৭৪ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ব্যারাকপুর, পঃ বঃ ● ৭৫ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, কদমতলা, পঃ বঙ্গ ● ৭৬ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ব্যারাকপুর পঃ বঙ্গ ● ৭৭ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, রায়গঞ্জ, পঃ বঙ্গ ● ৭৮ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, কদমতলা, পঃ বঙ্গ ● ৮০ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স নাসিমপুর, জেলা কাছাড়, আসাম ● ৮১ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স শিলং আসাম ● ৮২ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তুরা, গারো হিলস, আসাম।

মাসিক বসুমতীর ভাদ্র সংখ্যা থেকে এক বৎসরের জন্য বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠিয়ে ধন্য করবেন। শ্রীকল্যাণী রায় চৌধুরী, কাণপুর।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮৲ টাকা পাঠাইলাম। যথারীতি পত্রিকা পাঠিয়ে গ্রন্থাগারের পাঠকবৃন্দের আনন্দবর্ধন করিবেন। সুদেব চন্দ্র সাঙ্গুই, চিনচুরিয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগার বর্ধমান

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য ১৮৲ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করে আপনার বহুল প্রচারিত মাসিক বসুমতীর গ্রাহক করে নেবেন। কমলা দাসগুপ্ত, বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি।

I am sending the subscription for one year, on behalf of our club from the month of Aswin--kindly acknowledge the same. Secy, Staff Club. Central Jail, Buxar.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮৲ টাকা পাঠালাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাইবেন। এল বি ঘোষ, পাটনা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা
চারুজন—	(বাঙালী পরিচিতি)			
(ক) ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		...	...	৬৭৯
(খ) ডাঃ সুধীরকুমার মজুমদার	...	...	...	৬৮০
(গ) শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ		...	...	৬৮১
(ঘ) শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		...	...	৬৮২
স্বীকারোক্তি	(সংগ্রহ)	...	...	৬৮৩
খেলাধুলা	...	ক্রীড়ারসিক	...	৬৮৪
কলা কাকলি—		...	...	
(ক) প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী জুলি এ্যান্ড্রুস	(জীবনী-কথা)	চিত্রপ্রিয়	...	৬৮৬
(খ) নাট্যলোক		...	...	৬৮৭
(গ) মোহময়ী এলিজাবেথ টেলর	(জীবনী-কথা)...	চিত্রপ্রিয়	...	৬৯১
(ঘ) নির্মীয়মাণ ছবি		...	...	৬৯২
(ঙ) বাংলা ছায়াছবি		জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬৯৪
(চ) সাগরপারের মায়ালোক		রমেন চৌধুরী	...	৬৯৬
সম্পাদকীয়—		...	...	৭০০
শোক-সংবাদ		...	...	৭০৩

॥ সূচীপত্র ॥

বৈশাখ থেকে পত্রিকার বর্ষারম্ভ

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে মাসিক বসুমতীর চাঁদা

বাৎসরিক	—	১৮৲ টাকা
সডাক	—	২০৲ টাকা
ষাণ্মাসিক	—	৯৲ টাকা
সডাক	—	১০৲ টাকা

ভারতবর্ষে ও পাকিস্থানে রেজেস্ট্রী ডাকে

বাৎসরিক	২৭৲ টাকা
ষাণ্মাসিক (ভারতীয় মুদ্রায়)	১৩·৫০ পয়সা

ভারতবর্ষের বাহিরে বাৎসরিক রেজেস্ট্রী ডাকে ৩৬৲ টাকা

পত্রিকা ছয় মাসের কম লইলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। গ্রাহক হইতে হইলে পত্রিকা প্রাপকের নাম, ঠিকানাসহ আমাদের কার্যালয়ে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হইবে কিম্বা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১২। [ফোন নং ৩৪-৭৭৭১—৩] কর্মাধ্যক্ষ—মাসিক বসুমতী

★ মাসিক বসুমতী বাঙলার সর্বাধিক পঠিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা ★

॥ সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র

মাসিক বসুমতী

॥ কার্তিক, ১৩৭৫ ॥

নৃত্যের তালে তালে

—শ্রীসুধীর খাস্তগীর অঙ্কিত

বাসনা

বাসনা জীবের বুদ্ধিতে বাস করে—স্বরূপে কোন বাসনাই নাই। জীবের বাসনা সাধারণত চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(১) অতি মলিন বাসনা—যাকে গীতা বলেছেন আসুরী সম্পদ (গীতা—১৬।৪, ৭-২৪;)।

(২) অল্প মলিন বাসনা—যাতে কারু অনিষ্ট হয় না এমন বিষয় বাসনা; যেমন ভোগসুখ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, লোকমান, মোড়লী ইত্যাদি।

এই উভয় প্রকার মলিন বাসনাকেই (৩) শুভ বাসনা দিয়ে, র নিত্যানিত্য বিচার ও বিষয়ের দোষদর্শন ইত্যাদি দ্বারা জয় করতে হয়। এই শুভ বাসনকেই গীতা বলেছেন দৈবী সম্পদ (গীতা—১৬।১-৩) এবং জ্ঞানের সাধন (গীতা—১৩।৮।১২;)।

তারপর এই শুভ বাসনাও ত্যাগ ক'রে (৪) শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রে বাসনা করতে হয়। এই চিন্মাত্র বাসনাও বুদ্ধিনিষ্ঠ বটে, কিন্তু তা দ্বারা জীবন্মুক্তি সুখাস্বাদ পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ চিত্ত-শুদ্ধি। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে, ততক্ষণ মা আসে না। বিশ্রান্তিতে চিন্মাত্র বাসনাও ত্যাজ্য। যতক্ষণ কামনা বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"নানা রকম বাসনা আছে—ভোগের বাসনা, লোক-মান, বিদ্যা, মোড়লীর বাসনা। এগুলি যেন ছেলের হাতে লাল চুষি। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে, ততক্ষণ মা আসে না। মা ভাবে, ছেল ত' চুষি নিয়ে বেশ আছে আছে। আছে তো থাক।

"শম্ভু বলেছিল, হাসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারি করবো। লোকটা ভক্ত ছিল। তাই বললুম, ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি হাসপাতাল ডিস্‌পেনসারি চাইবে?

"ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি থাকলে তীব্র বৈরাগ্য হয় না। ও দেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারদিকে আল দেওয়া আছে; পাছে জল বেরিয়ে যায়। প্রাণপণে তো জল আনছে; কিন্তু যেখানেই আলের মাঝে মাঝে ঘোগ (গর্ত) আছে, সেখানেই ঘোগ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। বাসনাও তেমনি ঘোগ। জপ, তপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

"মাছ ধরে শট্‌কা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোয়ান রয়েছে কেন? মাছ ধরবে ব'লে। বাসনা মাছ; তাই মন সংসারে নোয়ানো রয়েছে। বাসনা না থাকলে মনের সহজে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হয়—ঈশ্বরের দিকে।

"বাসনা থাকলে—বিষয়াসক্তি একেবারে না গেলে যোগ হয়

"দীপশিখা দেখ নাই। একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার মত—বাসনার হাওয়া লাগবে না তবে নিষ্কম্প হবে।

"বাসনার মূল কিন্তু মহামায়া। এ তাঁরি খেলা। তাঁরই লীলা। সংসারে বন্ধ ক'রে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা। লক্ষের মধ্যে দু-একজন মুক্ত হয়। বাকী সবাই তাঁরই ইচ্ছায় বন্ধ হ'য়ে আছে।

"ভোগাকাঙ্ক্ষার অনেক জ্বালা। কর্ম ত' আছেই, তা ছাড়া ভাবনা চিন্তা, কামড়া-কামড়ি, অনর্থ; ভাইয়ে ভাইয়ে বিষয় নিয়ে ঝগড়া। অবধূত চিলের কাছে শিখেছিলেন, যতক্ষণ মাছ থাকে, অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম থাকে, আর কর্মের দরুণ ভাবনা-চিন্তা অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্মক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।"

বাসুদেব ও তাঁর লীলা ইত্যাদির ব্যাখ্যা

আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন—"মহাদেবকে পার্বতী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'নাথ, ভগবান অনন্ত, পূর্ণ; তিনি কেমন ক'রে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে বাসুদেব নামে জন্মগ্রহণ করলেন?' মহাদেব বললেন,—'দেবি! এর গূঢ় মর্ম আছে, শ্রবণ কর। বাসুদেব শব্দের অর্থ যিনি জগতের সর্বত্র আছেন, আবার সমস্ত জগৎ যাতে বাস করছে, অর্থাৎ পরমেশ্বর, বা পরমাত্মা (বাসু=পরমাত্মা; দেব=পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সাধারণত দেব বলা হয়, যেমন ভূদেব, নরদেব, ইত্যাদি)। বসুদেব শব্দের অর্থ শুদ্ধান্তঃকরণ; দেবকী শব্দে ভক্তি বুঝায়। যখন মানবাত্মা পবিত্র হয় এবং তাতে ভক্তি জন্মে, তখনই সেই আত্মাতে ভগবান প্রকাশিত হন। এই যে পবিত্র ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ, একেই বসুদেব ও দেবকীর সহবাসে বাসুদেবের জন্ম বলা হয়। যে হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হয়, তাহা আনন্দে নৃত্য করতে থাকে, তাকে নন্দালয় বলা যায়—ভগবানের বিচরণস্থান নন্দালয়। যশোদা কি? না, ভক্তের সাধুকার্য সকল। যতই ভক্ত আনন্দে ভেসে ভেসে পরোপকারাদি সাধুকার্য করেন, ততই তাঁর হৃদয়ে ভগবান সুরক্ষিত হন। গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ভগবানই ইন্দ্রিয় সকলের রক্ষক, তাই তিনি গোপাল; ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি গোষ্ঠ; অন্তরের সদ্ভাবগুলি গোপালের সখা—রাখালগণ; প্রেমই শ্রীরাধা; আত্মার অন্যান্য বৃত্তিগুলি প্রেমের সঙ্গিনী—শ্রীরাধার সখীগণ।

নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে চায় না। কোন ইন্দ্রিয়ই আর তখন রিপু থাকে না—সকলেই বন্ধু হয়ে যায়। তখনই ভাল করে বুঝা যায় ইন্দ্রিয়গুলি মানবের কত উপকারী বন্ধু। এদের সাহায্যে মানব শ্রীভগবানের সেবা করে ধন্য হয়।

"অঘাসুর বকাসুর কি? না, কুপ্রবৃত্তিসমূহ। কংস হচ্ছে সংসার। ভগবান এই সংসাররূপে কংস ও কুপ্রবৃত্তি অসুরদের বিনাশ করে থাকেন। ভগবানের পূজা করলে মানবের প্রাণ পবিত্র হয়,—প্রেমে ভাসে, আর আসক্তি চিরদিনের মত পালিয়ে যায়। আমরা ভগবানের পূজা করি না—কেউ কামের পূজা করি, কেউ যশের পূজা করি, কেউ ঐশ্বর্য ও স্বার্থের পূজা করি—তাই এত দুর্দশা। ভক্তেরা বলেন, 'অন্য দেব-দেবীর পূজা করো না'। তার মানে কি? না, ঈশ্বর ছাড়া কোন বাসনা কামনাকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করো না।

"আত্মচেষ্টায় প্রেম ভক্তি, ঈশ্বর পূজা হয় না; শুধু চেষ্টা দ্বারা চিত্তকে শান্ত সমাহিত করা যায় না। কাতর প্রাণে, ব্যাকুলতার সঙ্গে ভগবানের কৃপাভিখারী না হলে উপায় নাই। একবার দীনভাবে তাঁর শরণাপন্ন হলে, তবে তিনি প্রকাশিত হন—তবে প্রাণ পবিত্র হয়, প্রেমে বিভোর হয়। তখন ইন্দ্রিয়গণ ভগবানের বংশীরব শুনে প্রবৃত্তির সঙ্গ ছেড়ে, নিবৃত্তির অনুগত হয়। চক্ষু তাঁর সচ্চিদানন্দ রূপ দেখে বিভোর হয়, কর্ণ বংশীরবে বিমোহিত হয়, মন সচ্চিদানন্দ রসে বিগলিত হয়—ভগবান স্বয়ং ভক্ত হৃদয়ে নানা প্রকারে লীলা করতে থাকেন। বিচার করে এর তুমি কি বুঝবে? এর সম্ভোগই জ্ঞান। শাস্ত্র পড়ে এর কি বুঝবে? বেদ বেদান্তে কি পাবে? সেই জঙ্গলময় শাস্ত্র অরণ্যানীতে যত অন্বেষণ কর, কেবল 'নেতি' 'নেতি' দেখবে। তিনি যখন হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখনই হৃদয় বৃন্দাবন—বৈকুণ্ঠ, গোলোক, ব্রহ্মলোক হয়; তখন চন্দ্র সূর্য, জল স্থল, মানুষ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সকলই 'পরিপূর্ণমানন্দম্' বোধ হয়। তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভগবানের পদচিহ্ন দর্শন করে, সকলের মাথায়ই সাপের মাথায় পদ্মের মত ভগবানের পদচিহ্ন দেখে, কাকেও—কোন পদার্থকেই—'পর' বলতে পারা যায় না; বিশ্বের সব কিছুই 'আপন' হয়ে যায়। ইহা কল্পনা বা রূপক নয়; সত্য সত্যই পরমেশ্বরকে এভাবে দেখা যায়।"

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেছেন—"শ্বাসের গতি ধরে, কর্ণবৃত্তি নিরোধপূর্বক অনাহত চক্রে গিয়ে কিছুকাল থাকলেই নানাপ্রকার ধ্বনি (পটহ, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, বংশী ইত্যাদি) শুনতে পাওয়া যায়। এই নাদ যখন প্রকাশ পায়, তখন একটা অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়। সাধককে উন্মাদের মত ছুটিয়ে নিয়ে চলে। কোথাও কিছু নাই অনবরত মৃদঙ্গ ধ্বনি বংশীধ্বনি। সে ধ্বনি কি আকর্ষণময়! যেন প্রাণটিকে টেনে নিয়ে চলে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি—যার আকর্ষণে গোপিকাগণ কূল ছেড়ে অকূলে ভেসেছিল, সত্যই গো সে ধ্বনি কুলনাশক—মানুষকে পাগল করে তোলে। বংশী, পটহ, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, এর যে কোন ধ্বনি প্রকৃতিগত হলে সাধক একটা অভূতপূর্ব আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। ঐ নাদের সঙ্গে প্রণবাদি মন্ত্র যোগ করে নিলে চিত্ত আপনা থেকেই প্রশান্ত হয়; বৈষয়িক চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়; সুতরাং আন্তরিক অত্যাচার বিদূরিত হয়ে যায়।"

বিচার কাকে বলে? বিশেষ বিবেচনা দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় বা মীমাংসায় উপনীত হওয়া। ন্যায়শাস্ত্রমতে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি বা তর্কের সাহায্যে কোন তত্ত্বের মীমাংসাজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর নাম বিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সৎ অসৎ বিচার। একমাত্র সৎ বা নিত্যবস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য। বাজিকরই সত্য, বাজিকরের ভেল্কি মিথ্যা—এইটি বিচার।

"বৃথা তর্কবিচার করবে না; বৃথা তর্কবিচারে বস্তুলাভ হয় না—শুধু সময় নষ্ট হয়। তবে সদসৎ বিচার করবে। কোনটা সত্য, কোনটা অনিত্য বিচার করে দেখবে—বিশেষ করে কাম ক্রোধাদির বা শোকের সময়। এই সদসৎ বিচারকেই বিবেকাত্মক বিচার বলে।

"বিচার এক রকম দেখা যায়—আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর এক রকম দেখা যায়। তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন। তার পর বিচার—শাস্ত্র, জগৎ। তাই তোমাকে বলছি, আর বিচার করো না—ওতে শেষে হানি হয়। পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে তাঁকে জানা যায় না। আমি জানবার চেষ্টাও করি না; আমি কেবল মাকে ডাকি। তাঁর ইচ্ছে হয় জানাবেন—না ইচ্ছে হয় না-ই বা জানাবেন।

"বিচার (জ্ঞান) পুরুষমানুষ—বারবাড়ী পর্যন্ত যায়—অন্দরে যেতে পারে না। ভক্তি মেয়েমানুষ—অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়। তাই শুধু বিচার করলে কি হবে? তাঁর জন্য ব্যাকুল হও—তাঁকে ভালবাসতে শিখ। তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে, তাঁকে ডাকো। ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁতে ভক্তি, আর শরণাগতি থাকলেই হবে।

"যতক্ষণ বিকার থাকে, ততক্ষণ বিচারও থাকে। বিকার গেলেই জ্ঞান হয়; জ্ঞান হলেই বিচার বন্ধ হয়ে যায়। যার যেমন মন ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে। যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ ঈশ্বরকে পায় নাই। ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কমবে। লাভ হলে আর শব্দ-বিচার থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি! সমাধি হলেই বিচার বন্ধ হয়ে যায়—জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক হয়ে যায়। বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড় ফড় করে তর্ক করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়।

"কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল আর পুকুরের জল এক হলে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

"ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তনপান করতে পায়। তার পর কেবল আনন্দ। আনন্দে মা'র দুধ খায়—খেলা করে, হাসে!

"ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে, ততক্ষণ কল কল করে—পাকা ঘিয়ে কোন শব্দ থাকে না।

"মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসলে মধুপানের [illegible]

"বেদান্তমতে বিচারে রূপটূপ উড়ে যায়; শেষ সিদ্ধান্ত হয়, ব্রহ্ম সত্য—আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। তখন আমি টামি আর কিছুই থাকে না। তখন দেখবে, যাকে আমি আমি করছ, তিনি আত্মা বই আর কিছুই নয়। বিচার কর—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে তুমি এসব কিছুই নও; তোমার কোন উপাধি নাই। একেই বলে বিচার পথ। আর একটি পথ আছে—ভক্তিপথ। ভক্ত যদি ব্যাকুল হয়ে কাঁদে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, সে তা-ও পায়।"

বিজ্ঞান

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭ম প্রপাঠক, ৭ম খন্ড) বর্ণিত আছে, ঋষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে বলেছেন—"বিজ্ঞান দ্বারা চতুর্বেদ, ইতিহাস পুরাণাদি পঞ্চম বেদ, শ্রাদ্ধ কল্প, রাশি বিজ্ঞান, উৎপাত-বিজ্ঞান, মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, গারুড় সর্পবিদ্যা, গান্ধর্ববিদ্যা, নৃত্যগীতাদি কলাশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্র, স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জল, তেজঃ, দেব, মনুষ্য, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, শ্বাপদ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিথ্যা, সাধু-অসাধু, প্রিয় অপ্রিয়, অন্ন, রস, ইহলোক, পরলোক—এ সমস্তই জানিতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানী সকলই জানে—সকল পদার্থই বিজ্ঞানগোচর হয়। আর বিজ্ঞানোপাসনা প্রভাবে সে ব্যক্তি কামাচারী হইতে পারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—" 'নেতি' 'নেতি' করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে সমাধিস্থ হলে আত্মাকে ধরা যায়।

"বিজ্ঞান, কিনা, বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দেখেছে সে জ্ঞানী, যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান (বিশেষরূপে জানা) হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন করে তাঁর সহিত আলাপ—যেন তিনি পরমাত্মীয়—এরই নাম বিজ্ঞান।

"কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে—এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া—খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।

"আবার যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা এনে পায়ের কাঁটাটি তুলে দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়; তেমনি অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা যোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়; তখন বিজ্ঞান। জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে গেলে তখন বিজ্ঞান হয়। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানলে সে অবস্থা হয়।

"ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। যিনিই গুণাতীত তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।

"এই বিজ্ঞান লাভ করার জন্য বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার অর্থাৎ বিবেক-বৈরাগ্য। আবার তাঁর নামগুণ কীর্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, এ সব বিদ্যামায়ার ভিতর। বিদ্যামায়া যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পৈঠা; আর এক-ধাপ উঠলেই ছাদ। ছাদে উঠা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ।

"বিজ্ঞান হলে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। তিনি সংসার ছাড়া নন।"

বিজ্ঞানময় কোষ

বিজ্ঞানময় কোষ মনোময় কোষের অন্তরস্থ। বিজ্ঞান অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

বিজ্ঞানময় পুরুষকার। বিজ্ঞানময়ের শ্রদ্ধাই শির। ঋত (শাস্ত্রার্থ বিষয়ে মানসী চিন্তা) দক্ষিণ বাহু; সত্য (সমদর্শন) বাম বাহু; যোগ তার আত্মা বা দেহমধ্যভাগ; মহঃ (মহত্তত্ত্ব) তার পুচ্ছ।

বেদার্থ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিজ্ঞান। নিশ্চয় বিজ্ঞানবান পুরুষের কর্তব্য বিষয়ে প্রথমেই শ্রদ্ধা হয়; শ্রদ্ধা-কর্মও কর্তব্যের প্রথম—তাই শির।

বিজ্ঞানময় কোষের অনেক বিভিন্ন প্রকার শক্তি আছে; যেমন—(১) অহং বোধ; (২) বিচারণা শক্তি (reasoning power); (৩) একাগ্রতা বা ধ্যানশক্তি; (৪) স্মৃতিশক্তি; (৫) জ্ঞান-শক্তি—ইত্যাদি।

জীবের অহঙ্কার কোষ (অহং বোধের স্থান) এবং বিবেক বা হিতাহিত বোধ সহ সদ্বিচার শক্তি (চিত্তকোষ), এই দুটি বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যেই স্থিত আছে। চিত্তের একাগ্রতা শক্তি (ধ্যান ও ধারণার বীজ), স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানশক্তি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ! এগুলিও বিজ্ঞানময় কোষ আশ্রয় করে থাকে।

বিজ্ঞানময় কোষই আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ও সংস্কারাদির আধার। মৃত্যুর পর উর্ধ্বলোকে উঠলে মনোময় কোষ পড়ে থাকে, তখন তার সকল বাসনা, সঙ্কল্প, সংস্কারাদি বীজ আকারে এই বিজ্ঞানময় কোষ আশ্রয় করে থাকে এবং তা থেকেই আবার সময় ও সুযোগমত উৎপন্ন হয়। বীজসহ বাসনাদি নাশ করতে পারলেই আত্মোপলব্ধি হয়।

বিদ্যা-অবিদ্যা

আত্মজ্ঞানই বিদ্যা; ইহা মানবের সংসারে গতাগতি-নিবারক। দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিই অবিদ্যা—যা মানবকে বিষয়-ভোগে আসক্ত করে। ভোগাসক্তিই কর্মফল সৃষ্টি করে মানবকে সংসারে আবদ্ধ করে। বিদ্যা ও অবিদ্যা জগদম্বার দ্বিবিধ প্রকৃতি—উহার বিশুদ্ধ ভাগ বিদ্যা বা পরা (মায়া); আর মলিন ভাগ অবিদ্যা বা অপরা (অজ্ঞান)। বদ্ধ জীবাত্মা ও মুক্ত পরমাত্মা

সমধর্মী হয়ে নিয়ম্য ও নিয়ন্তারূপে দেহবৃক্ষে হৃদয়-কূপে নীড়ে বাস করছেন; অবিদ্যাধীন মানব প্রকৃতিজাত কর্মকে 'আমি করছি' মনে করে বদ্ধ হচ্ছে; আর বিদ্যাধীন মানব কর্মের স্বরূপ জেনে অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্য করে বন্ধন এড়িয়ে যাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা-অবিদ্যা দুই-ই আছে। বিদ্যা থেকে দয়া, ভক্তি, প্রেম, বিবেক বৈরাগ্য ইত্যাদি ঐশ্বর্য লাভ করে ঈশ্বরের পথে গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, এ সব বিদ্যার খেলা—বিদ্যার ঐশ্বর্য।

"অবিদ্যার সংসার অশান্তিময়। অবিদ্যা থেকেই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি। মুগ্ধ করে, সংসারে অজ্ঞান করে রেখে দেন অবিদ্যারূপিণী মহামায়া। সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি। তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্যই নানাভাবে পূজা—দাসীভাব, বীরভাব, সন্তানভাব। মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে গিয়ে ভিতরের জিনিষ দেখা যায়। বাইরে পড়ে থাকলে কেবল বাইরের জিনিষ দেখা যায়—সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না।

—শ্রীহেমেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

এ মাসের প্রচ্ছদপট

হেনরী ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো

মার্কিন সাহিত্যের উন্নতিতে অগ্রণী হেনরী ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো দীর্ঘ এক শতাব্দীর অধিককাল আমেরিকার প্রথম জাতীয়-কবি বলে খ্যাত ছিলেন। ওয়াশিংটন আরভিং, ন্যাথানিয়েল হথর্ন প্রমুখ লেখক তাঁর পূর্বসূরী। এঁরা দেশের প্রাকৃতিক শোভা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছিলেন গদ্যে, আর লংফেলো মার্কিন সাহিত্যে এনেছিলেন গীতিকবিতার ছন্দ।

লংফেলো সে যুগের প্রথম মার্কিন কবি যিনি এমন একটা বাস্তবতার সুরে কাব্য রচনা করেছিলেন যে, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে আমেরিকার প্রতিটি সাধারণ মানুষই তাঁর কবিতা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছে। সমকালীন কোন কবিই তাঁর মত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। ওয়াল্ট হুইটম্যান বলেছিলেন: 'লংফেলো সহৃদয়তা ও সজ্জনতার কবি। —তিনি বিশ্বজনীন কবি।'

সালে তাঁর 'পোয়েমস অন স্লেভারী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি দাসপ্রথা বিলোপের অনুকূলে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখবার চেষ্টা করেছেন।

কবি লংফেলো ১৮০৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। লংফেলোর সাহিত্যক্ষেত্রে আগমন ঘটে হথর্নের প্রভাবে। তিনি কলেজে হথর্নের সতীর্থ ছিলেন। ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি সাড়ে তিন বছর ধরে জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স ও স্পেনে অবস্থান করেন। ১৮২৯ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি বোডোইন কলেজে ও ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত হার্ভার্ড কলেজে আধুনিক ভাষা শিক্ষাদান করেছিলেন। তারপর তিনি পুরোপুরি কবিতা লেখায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৩৯ সালে তাঁর গদ্যে লেখা কাহিনী 'Hyperion' ও প্রথম কবিতা-সংগ্রহ 'Voices in the Night' কাব্যগ্রন্থ 'Evangeline : A Tale of Acadio' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'The Song of Hiawatha' রেড ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে লেখা প্রথম বর্ণনামূলক কাব্য।

এর তিনবছর পরে প্রকাশিত হয় 'The Courtship of Miles Standish.' এই সময়ে লংফেলো এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার প্রথম দিনেই আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে এর ১৫ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। 'Tales of Wayside Inn' তাঁর আর একটি বিখ্যাত কাব্যকাহিনী।

লংফেলোর বই ২৪টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি নিজেও অন্যান্য বহু ইউরোপীয় ভাষায় লেখা বিশিষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অনুবাদ তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

১৮৮২ সালে ৭৫ বছর বয়সে

গীতা-জিজ্ঞাসা

শ্রীভূতনাথ সরকার

অর্জুন উবাচ—সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।

সেই কথা শুনে ভগবান পার্থ-সারথি উভয় সেনার মধ্যস্থলে অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় অর্জুনের রথ নিয়ে দাঁড় করালেন। এখন উভয়-পক্ষের বিশাল বাহিনী সমাবেশ এবং মরণপণে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত গুরু, আত্মীয়স্বজন এবং ভারতের তাবৎ বীরকুলকে দেখে অর্জুন 'কৃপয়া-পরয়াবিষ্ট' ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর অঙ্গ অবশ হয়ে এল, মুখ শুকিয়ে গেল, শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ উপস্থিত হল, হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ে গেল, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এ যেন একটা সাময়িক কিন্তু সম্পূর্ণ নার্ভাস ব্রেকডাউন।

১৯৪১ সালে ঠিক পূজার আগেই দিল্লীতে একটা মিটিং-এ যেতে হয়েছিল এবং সেই সুযোগে পূজার ছুটিটা পেয়ে ইচ্ছাধীন সময় ও নিজস্ব যানে কুরুক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম অর্থাৎ তীর্থদর্শনের মত কোন তাড়াহুড়া ছিল না। শরৎকালের রৌদ্র ওখানে বেশ প্রখর। ঘুরে ঘুরে যখন সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় (সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ নিশ্চয়ই নয়, তবে একটি অশ্বত্থ গাছ আছে এবং তার তলাটি বেশ বাঁধান এবং ঠাকুর আছে) এসে বসলাম তখন প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। সেই বৃক্ষ-হীন বিশাল উষর প্রান্তরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে নানা ভাবের উদয় হতে লাগল। প্রথমেই মনে হল এইখানেই বহুবার ভারতের ভাগ্যনির্ণয় হয়েছে (একটু আগেই—দিল্লী ও কুরুক্ষেত্রের মাঝপথে—পাণিপথ পার হয়ে এসেছি)। এই-খানেই পরশুরাম একুশবার ভারত নিঃক্ষত্রিয় করেন। এইখানেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভারত প্রায় বীরশূন্য হয়। এই-খানেই পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর কয়েকবার যুদ্ধ হয়। তারপর বার বার এইখানেই ভারতের অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছে। কোন্ কারণে ইতিহাসের এত পুনরাবৃত্তি ঘটেছে

অর্জুন যে যুদ্ধ করব না বলে গাণ্ডীব ত্যাগ করেছিলেন, যদি যুদ্ধ না করতেন তা হলে ভারতের ইতিহাস কেমন হতো? তারপরেই মনে হলো অর্জুন এত নার্ভাস হয়ে পড়লেন কেন? উভয়-পক্ষের মধ্যে আর কেউ নার্ভাস হলেন না আর মহাবীর অর্জুনই নার্ভাস হয়ে পড়লেন? কেন?

তারপর সাতাশ বৎসর কেটে গেছে, কিন্তু এ প্রশ্ন মন থেকে যায় নাই। নানা গ্রন্থে, নানা ভাবে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগমত অনুসন্ধান ও চিন্তা করতে করতে আর একটি প্রশ্ন এসে এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে, সেটা পরে বলছি। এই দুটি প্রশ্নের সমাধান আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও উপলব্ধিতে যা পেয়েছি তা এই সুযোগে বলে রাখলাম, কারণ এখন না বললে আর হয়ত বলা হবে না।

হঠাৎ অর্জুনের কেন এমন হল? এরই কিছু আগে যখন যুধিষ্ঠির দুর্যো-ধনের বৃহতী সেনা ভীষ্ম কর্তৃক ব্যূহিত দেখে জয়লাভ বিষয়ে সংশয়াপন্ন ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন তখন অর্জুনই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের নামে অভয় দিয়ে জয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করেছিলেন। তার এখন উভয় সৈন্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পাশে বসে এত নার্ভাস হবার কারণ কি হতে পারে? এই নার্ভাসনেস্ নিশ্চয়ই উত্তর গোগৃহে রাজকুমার উত্তরের মত কৌরব সৈন্যসমুদ্র দেখে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে নয়। পরাজয়ের ভয়ে ত' নয়ই, কারণ সে যুগে কোন ক্ষত্রিয়ই পরাজয়ের ভয়ে রণে পরাঙ্মুখ হত না, অর্জুনের ত' কথাই নাই। রথী মহারথী নির্ণয়প্রসঙ্গে রণপ্রবীণ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনকে নিজেই বলেছেন:

তুল্য বীর ও রথী আর নাই। অধিক কি পূর্বে দেবতা, উরগ, রাক্ষস এবং যক্ষগণ মধ্যেও তাঁহার তুল্য রথী আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই, পরেও হইবে না, নরলোকের ত' কথাই নাই। অর্জুনের রথ সুসজ্জিত, বাসুদেব সারথি, অর্জুন স্বয়ং রথী, গাণ্ডীব শরাসন, অশ্বসকল বায়ুবেগগামী, কবচ অভেদ্য, তূণীরদ্বয় অক্ষয়, মাহেন্দ্র, পাশুপত, কৌবের, যাম্য, বারুণ অস্ত্র তাঁহার অধিকৃত হয় আমি না হয় আচার্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম—অর্জুন যুবা, আমরা উভয়ই বৃদ্ধ।

—উদ্যোগ পর্ব—১৬২ অধ্যায়।

উত্তর গোগৃহে গোহরণ যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃপাচার্য বলেছেন—'ঐ বীর একাকী কুরু দেশ রক্ষা, অগ্নির তৃপ্তিসাধন ও পঞ্চবৎসর ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ বীর একাকী সুভদ্রা হরণ করিয়া রথে আরোহণপূর্বক দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার মানসে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া-ছিল। ঐ মহাবীর একাকী কিরাত-রূপী মহাদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী সংগ্রামে নিবাত কবচগণ ও কালকঞ্জ দানবগণকে সংহার করিয়াছেন।'

—বিরাট পর্ব, ৪৯ অধ্যায়।

অতএব প্রাণের ভয় বা পরাজয়ের ভয়ের প্রশ্নই ওঠে না। গুরু, জ্ঞাতি, স্বজন বধজনিত পাপের ভয়ে বা তজ্জনিত অনাগত শোকের জন্য? হতে পারে, কিন্তু সে ভয় বা শোক অর্জুনের চেয়ে যুধিষ্ঠিরেরই বেশী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হয় নাই। ভগবান বলে-ছেন, অহংকারের জন্য 'যদহঙ্কার-মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে'। কিসের অহংকার আর এত বিষাদ-গ্রস্ত? এর কারণ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের

মহাভারতে দেখা যায় যে, যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া অর্জুন অর্থশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শান্তিপর্ব ১৬৭ অধ্যায়ে আছে যে, ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুর যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে ধর্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান এবং অর্থ ধর্মেরই অনুগত এই কথা বলায় ধর্মতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবিশারদ মহামতি অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্। এই কর্মভূমিতে কর্মই সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। অর্থ আবার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদায় কর্মের কারণ---অতএব আমার মতে অর্থই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, তখনকার দিনে (এবং এখনও) সমাজবিজ্ঞান অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উভয় বাহিনীর মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে অর্জুন দেখলেন যে, ভারতের অধিকাংশ রণদক্ষ লোকই যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে সমবেত হয়েছে। তাতে শুধু যে ক্ষত্রিয়রাই আছে তা নয়, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই সেই সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া একত্র হইয়া শৈল, কানন, দেশ ও নদীসকল আক্রমণপূর্বক বহু যোজন বিস্তৃত এক মণ্ডল প্রস্তুতকরত অবস্থান করিতে লাগিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ম্লেচ্ছদিগের সহিত সেই সকল বর্ণকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদানের আদেশ করিয়া বিশেষরূপে পাণ্ডবগণের সৈন্যকে অবগত হইবার নিমিত্ত বিবিধ আখ্যা (রাজপুত রেজিমেণ্ট, বেঙ্গল ল্যান্সার্স-এর মত?) প্রদান করিলেন।

---ভীষ্মপর্ব, ১ অধ্যায়।

[illegible] ও সমাজনীতিবিৎ অর্জুন দেখলেন যে, বাসুদেব সহায়ে জয় তাঁদের সুনিশ্চিত, কিন্তু সেই জয় লাভ করতে হলে এই সমস্ত লোককে হত্যা করতে হবে। তাতে সমাজের কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। যে বর্ণাশ্রম ধর্মকে ভিত্তি করে কুলধর্ম গড়ে উঠেছিল এবং যার প্রভাবে ভারতে শিল্পে, বাণিজ্যে, পূর্তকার্যে, অস্ত্রনির্মাণে, চারুকলা ইত্যাদিতে তদানীন্তন সভ্য জগতের শীর্ষে উঠেছিল, তা একেবারে লোপ পাবে। হয়ত একটা অন্ধকার যুগ ভারতকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সুতরাং এ কথা মনে করা বোধ হয় ভুল হবে না যে জয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জেনেই অর্জুন এত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অর্জুনেরই নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক। কারণ বিখ্যাত সেনাপতিদের মধ্যে অর্জুনকেই অর্থশাস্ত্রবিশারদ বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে, অন্য কারো সম্বন্ধে সে রকম কোন উল্লেখ নাই, শুধু সহদেব সম্বন্ধে বলা আছে যে, তিনি উশনা প্রণীত নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

বিষাদগ্রস্ত অর্জুন যে প্রশ্নগুলি করেছেন তার মধ্যেও সামাজিক বিশৃংখলার আতঙ্কই বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। সামাজিক অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন শিথিল হলেই শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ে, ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাঁর ভয় হল যে, ঐরূপ অবস্থায় বর্ণসংকরে দেশ ছেয়ে যাবে, কুলধর্ম লোপ পাবে, পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি ও সংস্কৃতি সমূলে বিনষ্ট হবে, মাৎস্যন্যায় প্রবল হয়ে সমাজের কর্মপ্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দেবে যার ফলে দেশ আর্থিক দুরবস্থার চরমে নেমে যাবে। এবং এই মহাযুদ্ধের প্রধান হোতা হিসাবে এ সবের নৈতিক দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হবে। জয়ের পরিণামে দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবেই তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন বলে আমার ধারণা।

এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে পুরাণ-ইতিহাসে এর তুলনা নাই। এরূপ দেশপ্রেম, দেশের সংস্কৃতি ও আভ্যুদয়িক উন্নতির উপর এরূপ নিষ্ঠা অতুলনীয়। ইতিহাসে শোনা যায় যে, পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ক্লাইভ খুব নার্ভাস হয়ে তিনবার গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন এবং একরাত্রে তাঁর চুল সব পেকে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর নার্ভাস হবার কারণ পরাজয়ের ভয়। সম্ভবত তাঁর ভয় ছিল যে, ঐ যুদ্ধে যদি তাঁর হার হয় তবে ইংরেজের আর ভারতে কোথাও স্থান হবে না, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম পর্যন্ত মুছে যাবে। এ নার্ভাসনেস্‌ও দেশপ্রেমজনিত, প্রাণভয়ে নয় তবে পরাজয়ের ভয়ে; জয়ের পরিণাম চিন্তায় নয়। হিটলার ত' সদম্ভে যুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক দুর্যোধনের মত। চার্চিলের জয় সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় অসীম, কিন্তু তিনি জয়ের পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করে কখনো যে নার্ভাস হয়েছিলেন এরূপ উল্লেখ কোথাও নাই। বরং আমার বরাবর মনে হয়েছে যে, ইতিহাসে উপেক্ষিত এবং অল্পবিস্তর ধিককৃত চেম্বারলেনই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জয়-পরাজয়ের পরিণাম চিন্তা করে দ্বিধাগ্রস্ত (মহাভারতের ভাষায় দুর্মনায়মান) হয়েছিলেন এবং যুদ্ধ ঘোষণার অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভবিষ্যতে যদি কেউ চেম্বারলেনের জীবনী লেখেন তাঁকে এই বিষয়টি ভেবে দেখতে অনুরোধ জানিয়ে রাখলাম।

সে যাই হোক অর্জুন যে দুটি প্রশ্ন তুলে যুদ্ধ করবো না বলে গাণ্ডীব ত্যাগ করেছিলেন তা হল (১) বর্ণসঙ্করের প্রাবল্যে জাতিধর্ম, কুলধর্ম উৎসন্ন যাবে এবং (২) উৎসন্ন কুলধর্ম মানুষের নিয়ত নরকে বাস হয় বলে তাঁর শোনা আছে। অর্জুন বলেন নাই যে তাঁর নিজেকে নরকে বাস করতে হবে। তিনি বলেছেন যুদ্ধের ফলে সব উৎসন্ন যাবে এবং সেই অরাজক বিশৃংখল অবস্থায় ভবিষ্যৎ ভারতে যারা থাকবে তারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে।

অর্থশাস্ত্রজ্ঞ অর্জুনের নরকের ধারণা কিরূপ ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর প্রিয়সখা বাসুদেবের ধারণার আভাস পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান-উদ্ধব সংবাদে। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেছেন, সত্ত্বগুণের উদয়ের নাম স্বর্গ (ইন্দ্রাদি লোক নহে), আর তমোগুণের উদয়ের নাম নরক। সুতরাং অর্জুনেরও অনুরূপ ধারণা থাকা সম্ভব।

এই অর্থে এবং এই ধারায় চিন্তা করলে অর্জুনের 'কৃপয়া পরয়াবিষ্ট' 'শোকসংবিগ্ন মানস' ও 'ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ' এই বাক্য ও কার্যের তাৎপর্য বোঝা যায়। কৃপা, কৃপণ, বিনয়, পাষণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের কালক্রমে পরিবর্তন ঘটেছে। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী কৃপয়া পরয়াবিষ্ট' শব্দের অর্থ দিয়েছেন, 'কৃপামহত্যাবিষ্টো আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ'।

আনন্দগিরি বলেছেন, 'পরমকৃপা পরবশসন্'। প্রমথনাথ তর্কভূষণ তার বাঙ্গলা করেছেন 'অত্যন্ত করুণাবিষ্ট'। যোগিরাজ লাহিড়ী মশায় তাঁর যৌগিক ব্যাখ্যায় বলেছেন, মায়াবৃত হইয়া ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া।

কিন্তু অর্জুনের গাণ্ডীব ত্যাগ এমনি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যে অতি গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে তার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না---অর্জুন একবার গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেই বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কৃষ্ণের প্রতিবাদে ও প্রবোধবাক্যে বলেছিলেন, তুমি অন্যকে গাণ্ডীব সমর্পণ কর এই কথা যিনি আমাকে বলিবেন আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব---এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন। অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতিকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভকরত নিশ্চিন্ত হইব।

---কর্ণপর্ব, ৭০ অধ্যায়।

আমার মনে হয় যে, 'কৃপয়াপরাবিষ্ট' মানে দীনতার ভাবে তন্ময় হওয়া---

নিজেরে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকি দীনহীন মন।

দুঃখীর দুঃখ অনুভব করে দুঃখীর মনোভাবের সঙ্গে একীভূত হওয়া। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিণামে ভারতের অবস্থার কথা ভেবে তন্ময় হয়ে তিনি এরূপ বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন বা মোহপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যে সত্ত্বেও ভিক্ষা করে খাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন।

সেই জন্যই সঞ্জয় যিনি ব্যাসদেবের বরে দিব্যজ্ঞান, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, পরচিত্ত বিজ্ঞান ইত্যাদি অলৌকিক শক্তি লাভ করেছিলেন, 'কৃপয়া পরয়াবিষ্ট' শব্দ ব্যবহার করেছেন, ভয়, আর্ত, অনুকম্পা, করুণা, মোহ বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। এরই প্রতিধ্বনি ভগবদ্বাক্যে পাওয়া যায় 'ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহরথা'---অর্থাৎ তুমিও ভারতের ভবিষ্যৎ ভেবে যুদ্ধ করব না বলছ কিন্তু দুর্যোধনাদি মহারথগণ মনে করবেন যে, ভয় পেয়েই তুমি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হচ্চ।

সুতরাং এটা মনে করা বোধ হয় ভুল হবে না যে, অর্থশাস্ত্র বিশারদ সমাজতত্ত্ববিৎ অর্জুনের দেশপ্রেম ও জাতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধ তাঁর বীরত্ব ও আত্মমর্যাদা জ্ঞানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

এই সূত্রে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্ভব। অর্জুনের যা প্রশ্ন ভগবান তার সোজা কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিত্বের কথা তুলে উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন কেন?

এর উত্তর যোগী, সন্ন্যাসী, মহামনীষীরা যা বলেছেন তার সারমর্ম হল---'শোক ও মোহাদির উদয়ে বিবেক-বিজ্ঞান অভিভূত হইয়াছিল, এই জন্যই অর্জুন স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং পরধর্ম ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার স্বভাবত শোক ও মোহে আবিষ্ট হৃদয় প্রাণিমাত্রেরই স্বধর্ম পরিত্যাগ এবং প্রতিষিদ্ধ সেবা হইয়া থাকে।------এই প্রকার সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিকেই সংসার কহে। এই প্রকার সুখদুঃখময় সংসার নিবৃত্তি হয় না। এই কারণেই শোক ও মোহ সংসারের নিমিত্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বক আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সেই অন্য কোন উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এই কারণে সর্বলোকের অনুগ্রহার্থে সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ করিবার অভিলাষে ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে উপলক্ষমাত্র করিয়া 'অশোচ্যান' ইত্যাদি শ্লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (শঙ্কর ভাষ্য ও আনন্দগিরি কৃত টীকার প্রমথনাথ তর্কভূষণকৃত বঙ্গানুবাদ)।

কিন্তু এ হ'ল মোক্ষাভিলাষী সাধুসন্তদের জন্য, যাঁরা সর্বকর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। আমাদের মত সুখ-দুঃখময় সাংসারিক অভ্যুদয়ের পথিক গৃহস্থদের কি গীতার উপদেশামৃত থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে? নানা সমস্যায় দিশাহারা আধুনিক মানুষের কোন পথনির্দেশ, কোন সাধনার স্পষ্ট কি গীতায় নাই? পরমহংসদেব কেন তবে বলেছেন 'ফোর্টে থেকে যুদ্ধ করাই ভাল?' আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় নিজেই বলেছেন, 'দ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্ম: প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ। জগতঃ স্থিতিকারণঃ প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স হেতুয স ধর্মো ---- তদিদং গীতা শাস্ত্রং সমস্ত বেদার্থ-সার-সংগ্রহ ভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম্।' সুতরাং গীতায় মোক্ষাভিলাষীর জন্য যেমন উপদেশ আছে তেমনি আছে আপামর জনসাধারণের জন্যও পথনির্দেশ ও সৃষ্টি আছে। জিজ্ঞাসুকে খুঁজে নিতে হবে।

আর একটি কথা মহামনীষীদের চরণে মাথা নত করে বলতে চাই যে অর্জুন যখন তাঁর বিরাট কর্মজীবনের সম্মুখে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেই সময় ভগবান তাঁর উপর গীতামৃত বর্ষণ করেছেন, বাল্যের শিক্ষাজীবনেও নয় এবং বার্ধক্যের বানপ্রস্থেও নয়। আর তাঁর উদ্দেশ্য অর্জুনকে অভ্যুদয়ের পথে নিয়ে যাওয়া ---তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্।

জিজ্ঞাসুর এই অনুসন্ধিৎসায় ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনি, ব্যাখ্যার মহা-

ঘুরপাক খেয়ে শেষে ব্যাসদেবকে অনুসরণ করে যা পেয়েছি তা নিবেদন করলাম, এর মূল্য কিছু আছে কিনা তা পাঠক বিবেচনা করবেন।

অর্জুনের এই প্রকার মানসিক অবস্থা দেখে ভগবান যা করলেন তা তাঁরই উপযুক্ত। তিনি দেখলেন যে প্লেনে বা স্তরে অর্জুনের চিন্তাধারা বয়ে চলেছে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন শিক্ষিত লোকের চিন্তাধারা সেই স্তরেই বয়ে থাকে। চিন্তামণি এই চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করেন আর নাই করেন গীতায় প্রায়ই 'বেদে লোকে চ' দেখা যায়। কিন্তু ঐ স্তরের ভিত্তিমূলে আর একটা স্তর আছে, সে স্তর হল ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা। ভারতের অর্থনীতি, সামাজিক অনুশাসন, এমন কি রাজনীতি পর্যন্ত চিরদিন অনুপ্রাণিত, নিয়ন্ত্রিত ও যুগধর্মের সঙ্গে সমন্বয় করে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে ভারতের সাধনাকে কেন্দ্র করে। তাই তিনি একটু মুচকি হেসে—প্রহসন্নিব বললেন, বন্ধু, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে বিজ্ঞের মত কথা বলছ বটে কিন্তু তা সবার মূলে যা রয়েছে তা দেখছ না। এর পর যে ডায়ালগ সুরু হল ব্যাসদেব তাকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা আখ্যা দিয়েছেন এবং মহারাজ জনমেজয়কে মহাভারত শোনাবার সময় বৈশম্পায়ন বলেছেন:

মহারাজ: কুরু-পাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যেরূপ ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন আমি পূর্বে আপনার নিকট তাহা কহিয়াছি। ঐ ধর্ম অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সত্যযুগে ভগবান নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিক ধর্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া আছেন।

তারপর ঐ ধর্ম কেমন করে ফেনপাদি ঋষিপরম্পরায় বার বার প্রচারিত ও লুপ্ত হয়ে যায় তার বিবরণ দিয়ে বলেছেন:

অনন্তর এখানে ব্রহ্মা নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম তাঁহার নিকট কীর্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বানকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম সমর্পণ করিলে তিনি ত্রিলোক মধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন।

---গীতা, চতুর্থ অধ্যায় তুলনীয়।

হে মহারাজ। এই আমি আচার্য ব্যাসদেবের প্রসাদ বলে তোমার নিকট দুজ্ঞেয় ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিলাম। ইহলোকে ঐকান্তিক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। - - - - - দেবর্ষি নারদ আমার গুরু বেদব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিক ধর্মের বিষয় এইরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন।

শান্তি। ৩৪৯।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

জন্মান্তরের সূত্র সন্ধানে

॥ বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ॥

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

জন্মান্তরের ঘটনা বাস্তব না কল্পনা?

পূর্বজন্মের ঘটনার বিভিন্ন কাহিনী জনসাধারণের মনে সম্প্রতি গভীর রেখাপাত করেছে। আমরা এখানে ইটালী ও জাপানের দুটি ঘটনা উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করবো। ইটালীর ঘটনার সঙ্গে মানসিক হাসপাতালের একজন অধ্যক্ষ যুক্ত রয়েছেন। তিনি অন্তত বিষয়টি আজগুবী সত্য না কল্পনা তা বলতে পারবেন। তাছাড়া ঘটনাটি অন্য একটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ---ইটালীতে জন্মান্তরবাদকে 'বুজরুকী' বলে মনে করা হয় এবং কোন মূল্যই দেওয়া হয় না।

ইটালীর কাহিনী

ডাঃ গ্যাসটোন উগুকৈনি ইটালীর ফ্লোরেন্স শহরে এক মানসিক হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করার পর নিজের একটি ক্লিনিক খুলেছেন। তিনি জানালেন যে তাঁর ধারণা তিনি মাদ্রাজের কাছে মহাবলীপুরমে কোন মন্দিরের পরোহিত ছিলেন বিগত জীবনে।

সাত-আট বছর বয়সের সময় তিনি বেশ পরিষ্কারভাবে স্বপ্ন দেখেন যে তিনি পৌরোহিত্যের কাজ করছেন। সেই স্বপ্ন পরে আরো দু-তিন বার দেখেছেন। সে সময়ে তিনি মহাবলীপুরম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এবং তাঁর সে সময়ের পরিচিতরাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন কিছু জানতো না।

ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ ও শ্রদ্ধা অনুভব করতেন বলে তিনি ভারতীয় দর্শন নিয়ে পড়াশোনা সুরু করেন। যুবক বয়সে তিনি ভারতবর্ষে আসবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। অবসর গ্রহণের ছ' বছর আগে তিনি ভারতে আসার প্রথম সুযোগ পান। সে সময়ে তিনি মহাবলীপরমে (দাক্ষিণাত্যে) বেড়াতে যান। কয়েকটি অতি পুরানো মন্দির তিনি চিনতে পারেন এবং জানান যে আরো অনেক গুলি মন্দির নাকি ছিল। সেগুলি হয়তো সমুদ্রস্রোতে ক্রমশ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তিনি বললেন---সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমার আগ্রহ এরপরে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। বছরের পর বছর তা আরো বেড়ে চলে।

গভীর ভক্তি

ডাঃ উগুকৈনি জানান---আমি যখন মহাবলীপুরমে বেড়াতে যাই তখন সেখানের মন্দিরের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুভব করতে পারি। আজ সেই ছেলেবেলার স্বপ্নকে খুব বেশী আমল না দিলেও ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ থেকে আমার দৃঢ় ধারণা আমি বিগত জীবনে এখানকার কোন একটি মন্দিরের পূজারী ছিলাম। আমি অজন্তার গুহা ও ভারতের অন্যান্য বহু স্থানের বিখ্যাত মন্দিরগুলি দেখেছি কিন্তু মহাবলীপুরমের মত মনের অবস্থা কখনও আমার হয়নি।

ডাঃ উগুকৈনির কাহিনীর মতই বহু কাহিনী আছে কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পর্যন্ত এই বিচিত্র পরা-স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের বিষয়ে পুরোদমে গবেষণায় আগ্রহ বোধ করেন না। ঘটনাটি থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তা পুনর্জন্ম বাস্তব না কল্পনা এ প্রশ্নের উত্তরের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়টি রীতিমত গবেষণার দাবী রাখে।
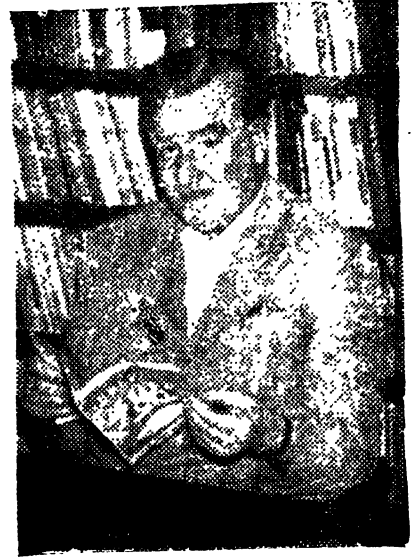
ডঃ গ্যাসটোন উগুকৈনি ভারতবর্ষের তাঁর অতীত জীবনকে স্মরণ করেন

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশ জাপান জন্মান্তরবাদে গভীর আস্থা রাখে এবং সেখান থেকে বহু ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। জাপানের একটি কাহিনী উল্লেখ এখানে করা চলতে পারে।

জাপানী পুনর্জন্মের কাহিনী

জাপানের নাকানোমুরা গ্রামে গেজনো নামে এক চাষী পরিবারে ১৮১৫ খৃঃ ১০ই অক্টোবর বালক কাটসুগুরোর জন্ম হয়। তার বয়স যখন সাত-আট বছর সে জানায় অতীত জীবনে তার নাম ছিল 'তোজো' এবং পিতা-মাতার নাম যথাক্রমে কুব্যেই ও শিড্জু। তারা হোডোকুবোতে থাকতো। পাঁচ বছর বয়সের সময় তার পিতার মৃত্যু হয় এবং হাউশিরো নামে এক ভদ্রলোককে তার মা পুনরায় বিয়ে করে।

কাটস্বুগুরো আরো জানায় গত জীবনে ছ' বছর বয়সের সময় বসন্ত রোগে তার মৃত্যু হয়। সে তার আগের বাবার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হোডোকুবোতে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে।

কাটস্বুগুরোর ঠাকুমা তাকে হোডোকুবো শহরে নিয়ে যায়। ঘটনায় প্রকাশ যে, শহরে যাবার পর কাটস্বুগুরো পথ দেখিয়ে আগে আগে যেতে থাকে এবং একটি বাড়ীর সামনে এসে জানায় সেটা তাদের বাড়ী। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে বাড়ীতে হাউশিরো ও শিডজু নামে এক দম্পতি বাস করে এবং তাদের মৃত সন্তানের নাম তোজো। কাটস্বুগুরো ও তার ঠাকুমার এখানে বেড়াতে আসার প্রায় তেরো বছর আগে বসন্তরোগে ছ' বছর বয়সে তোজোর মৃত্যু হয়েছিল।

কাটস্বুগুরো শহরের বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা বলে এবং পরীক্ষান্তে সেগুলি সঠিক বলে জানা যায়। এই সমস্ত প্রমাণ থেকে বিশ্বাস করা যায় কাটিস্বুগুরো পূর্ববর্তী জীবনে তোজো ছিল।

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী জনসাধারণদের দেখা গেছে অত্যন্ত দুর্বল ঘটনাগুলিকেও পুনর্জন্মের ব্যাপার বলে মেনে নেন সহজেই। পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি ও বাস্তবাদিতা সম্প্রতি মানবমনে আধিপত্য বিস্তার করেছে, সে কারণে আবার বহু সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনাও অবাস্তব বলে পরিত্যাজ্য হয়েছে। এর অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে। লোকে এখন প্রবল বিশ্বাসযোগ্য তথ্য না পেলে এবং ব্যক্তিগতভাবে চোখে না দেখলে ও শুনলে কোন কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না। তবুও আজকের দিনেও জন্মান্তরের ঘটনাবলীর প্রতি সারা বিশ্বের মানুষেরা এখন আকৃষ্ট হয়েছে এবং কিছু বিজ্ঞানীরাও এদিকে ভেবে দেখতে শুরু করেছেন।

জন্মান্তরের ঘটনা বাস্তব

বিগত কয়েক বছর আন্তর্জাতিক পরিধিতে গবেষণা করার সময়ে যে প্রচুর ঘটনার ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়---জন্মান্তরবাদ একটি বাস্তব বিষয়। যে সমস্ত পরিসংখ্যান এ যাবৎ যোগাড় করা গেছে তা থেকে পুনর্জন্মের সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

আজ একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে পরামনোবিজ্ঞানীর গবেষণা জন্মান্তরের সিদ্ধান্তকে আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে গ্রহণীয় করে তুলছে। কিন্তু এর প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্য আরো অনেক গবেষণা করার দরকার আছে।

অতীতের কয়েকজন দিকপাল বৈজ্ঞানিক পুনর্জন্মের বিষয়টি সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন। টমাস হাক্সলে ও টমাস এডিসন এঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানী টমাস হাক্সলে বিবর্তন সংজ্ঞার (Theory of Evolution) আবিষ্কর্তা চার্লস ডারউইনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। টমাস হাক্সলের মতে---

'The doctrine of reincurnation has its roots in reality. None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inhernct absurdity.'

(পুনর্জন্মের সূত্রটি বাস্তবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র অস্থির-চিত্তের ভাবুকরাই এটিকে অতীতের অবাস্তবরূপে পরিচিতির যুক্তিতে বাতিল করবেন।)

॥ চার ॥

পুনর্জন্মের স্মৃতির অধিকারীরা দুই জীবনে নিকটতম অঞ্চলে কেন জন্মগ্রহণ করে থাকে?

পুনর্জন্মের যে সকল ঘটনার খবর সচরাচর পাওয়া যায় তাতে দেখা গেছে যে গবেষণাধীন ব্যক্তি এবং পূর্ব-জীবনে যে ব্যক্তির কথা সে উল্লেখ করছে উভয়েই নিকটবর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গটি বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রকাশের কাহিনী

'তুমি তো অন্য দেশের মেয়ে—তুমি আমার মা নও। আমি আমার আসল মায়ের কাছে চলে যাবো।'

মথুরা জেলার কোশিকালান গ্রামের শ্রীভোলানাথ জৈনের ছেলে নির্মল একদিন একথা তার মাকে বলেছিল। বসন্তরোগে শয্যাশায়ী নির্মল তখন মৃত্যুপথযাত্রী। কথা বলার সময় ছাট্টা নামে একটি গ্রামের দিকে সে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ দেয়। কোশিকালান থেকে মথুরা যাবার পথে মাত্র ছ' মাইল দূরে ছোট্ট গ্রাম হল ছাট্টা। ঘটনাটি ১৯৫০ খৃঃ এপ্রিলের কথা।

১৯৫১ সালের আগস্টে ছাট্টায় শ্রী বি এল ভার্সানের এক পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। ছেলের নাম রাখা হল প্রকাশ। চার বছর বয়সে প্রকাশ একদিন বলে---আমার বাড়ী কোশিকালান গ্রামে। আমার নাম নির্মল। আমি আমার পুরোনো বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই।

রাত্রিবেলা সে ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতো। চার-পাঁচ দিন একাদিক্রমে এই ভাব থাকতো। তারপর কিছুদিন শান্ত থাকবার পর আবার পালাবার চেষ্টা শুরু হতো। ছেলের বাসনা শান্ত করার জন্য তার কাকা একদিন কোশিকালান যাবার নামে মিথ্যে করে উল্টোদিকের বাসে চাপবার জন্যে প্রকাশকে নিয়ে যায়। কিন্তু সে ভুল ধরে দেয় এবং কাকাকে তখন বাধ্য হয়েই কোশিকালান রওনা হতে হয়। এটা ১৯৫৬ সালের কথা।

সেই প্রথম পাঁচ বছরের প্রকাশ কোশিকালানে যায়। প্রথম যাত্রায় অবশ্য কিছুই ফল হয়নি, কারণ নির্মলের বাবা ভোলানাথ জৈন না থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এই সময়ে কিন্তু নির্মলের জীবনের বহু কথাই প্রকাশ মনে করতে বা বলতে পারতো। ক্রমশ সময়ের ব্যবধান বাড়তে থাকায় স্মৃতি ম্লান হয়ে আসতে থাকে কিন্তু কোন সময়েই সে নির্মলের কথা একেবারে ভুলে যায়নি। অবশ্য অন্য আর একটি কারণও ছিল। কিছুটা

কুসংস্কার ও ভয়ের জন্য শ্রীভার্গেনেই প্রকাশকে নির্মলের প্রসঙ্গে কথাবার্তা বললে শাস্তি দিতেন এবং এ ব্যাপারে ভুলে থাকার জন্য প্রকাশের ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কালক্রমে এমন মনে হতে লাগল যে প্রকাশ হয়তো নির্মলের কথা একেবারেই ভুলে গেছে। অন্তত তার মুখে নির্মলের বা কোশি-কালানে যাবার কোন কথা আর শোনা যায়নি।

১৯৬১ সালে শ্রীভোলানাথ জৈন, ছাট্টার প্রকাশ তাঁর মৃতপুত্র নির্মলের কথা বলতে পারে জানতে পারায়, প্রকাশকে দেখতে আসেন। শ্রীজৈনকে দেখামাত্র প্রকাশ 'বাবা' বলে চিনতে পারে। কিছুকাল পরে নির্মলের মা ও নির্মলের ভাই দেবেন্দ্র এবং বোন তারা প্রকাশকে দেখতে আসে। তাদের দেখে প্রকাশ ভীষণ কান্নাকাটি সুরু করে দেয় কোশিকালান যাবার জন্য। শ্রীমতী জৈনের সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রকাশের বাবা যাবার অনুমতি দিলেন।

বাস থেকে নামার পর প্রকাশ পথ দেখিয়ে সকলকে নির্মলের বাড়ীতে আনে। পরিবারের অন্য সকলকে সনাক্ত করে সে এবং বাড়ীর অনেক কিছু ঠিক ঠিক বলে। এই দ্বিতীয়বার কোশিকালান আসার ফলে প্রকাশ আবার নির্মলের কথায় মত্ত হয়ে ওঠে এবং পুনরায় রাত্রে ঘুম থেকে উঠে পালাবার চেষ্টা করে।

এই ঘটনায় দুটি চরিত্রের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ অতীত জীবনের স্মৃতি স্মরণে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলেও প্রতি ক্ষেত্রের স্থান ও কালের এই নৈকট্য থাকে না। এমন অনেক ঘটনা জানতে পারা গেছে যাঁরা দুই জন্মে পৃথিবীর দুই বিভিন্ন প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেছেন।

কিউবার কাহিনী

শ্রীমতী র‍্যাচেল গ্রাণ্ড আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে বর্তমানে বাস করেন। তাঁর বয়স প্রায় ২৬ বছর এবং জন্মস্থান কিউবা। তাঁর প্রায়ই মনে হত তিনি ইউরোপের কোন দেশে আগের জীবনে নর্তকী ছিলেন। একসময়ে তিনি অতীত জীবনের নামও মনে করতে পারলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল সেই নামে এক নর্তকী প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্পেনের থিয়েটারে নাচতো।

শ্রীমতী র‍্যাচেলের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল---তিনি প্রায় জন্মনর্তকী। কারোর কাছে নাচ না শিখেই তিনি নৃত্যকুশলী ছিলেন।

সুইজারল্যাণ্ডের ঘটনা

বত্রিশ বছর বয়সের সুইজারল্যাণ্ড-বাসী গ্যাব্রিয়েল উরিবের জীবনকথা বেশ বিচিত্র। নিজের দেশের জীবন-

সুইজারল্যাণ্ড থেকে

গ্যাব্রিয়েল উরিবে কলম্বিয়ার তাঁর অতীত জীবনকে স্মরণ করেন

নির্বাহ প্রণালী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি বহুকাল থেকেই তার এক ধরণের বিরক্তি ও অসন্তোষ ছিল। পক্ষান্তরে অশ্বেতকায় দেশবাসীদের ওপর তার বিশেষ একটু দুর্বলতা ছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াবার সময় গ্যাব্রিয়েল স্পেন দেশেও যায়। সেই দেশ ভ্রমণের সময় হঠাৎ সে তার পূর্বজীবনের সব কথা মনে করতে পারে। সে জানায় যে পূর্ব-জীবনে সে কলম্বিয়ায় রাজনীতি করতো। তার নাম ছিল টি বার্টিফল এবং জীবনে নাম হল সিস্টা টুলিয়া। জুলিয়াম ও মারিয়া নামে তার দুই সন্তান বিগত জীবনে ছিল।

১৯১৪ খৃঃ কলম্বিয়ায় আততায়ীর কুঠারের আঘাতে সে মারা যায়। আক্রমণকারী কুঠার দিয়ে তার কপালে আঘাত করে। আশ্চর্যের বিষয় এ জন্মে গ্যাব্রিয়েলের কপালে ঠিক সেই জায়গায় এক বিকৃত ক্ষতের দাগ আছে। এ জীবনে সে কোন ভাবেই মাথায় আহত হয়নি।

ওপরের ঘটনাগুলিতে দেখা যায় পুনর্জন্মের ঘটনা দুই জন্মে বিভিন্ন দেশে হয়েছে। সুতরাং এই প্রবন্ধের সুরুতে যে প্রশ্ন আমরা উল্লেখ করেছি তা অংশত ঠিক নয়।

অবশ্য পরিবেশ ও পরিস্থিতির সমধর্মিতা স্মৃতিকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। সমগোত্রীয় ও সমান্তরাল বিষয়বস্তু অতীত স্মৃতি জাগরিত করতে সহজাত সুযোগ এনে দেয়।

'ল অফ এ্যাসোসিয়েশন' অনুভাবীর অতীত জন্মের ইতিকথা স্মরণে বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। আমেরিকার একটি শিশু ভারতবর্ষে অতীতে জন্মগ্রহণ করে থাকলেও আজ তার এ দেশের বিশেষ কোন খাদ্যবস্তুর বর্ণনা করতে পারবে না---যদি না সে সেই খাদ্যবস্তুটি আবার খ...

এই দেশ... যাবার সময় 'ল' অফ এ্যাসোসিয়েশন এর কার্যকারিতায় তার বিগত জীবনের স্মৃতি জাগরিত হতে পারে। এই নীতি অনুকূল পরিবেশে বেশি কার্যকর বলে আমরা দূর দেশের চেয়ে কাছাকাছি স্থানে এ ধরণের ঘটনার বেশি খবর পাই, কিন্তু সব সময় তা প্রযোজ্য হতে পারে না।

পুনর্জন্মের অনুভাবীরা কেবলমাত্র অতীতের একটি জন্মের কথা অথবা অনেক জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে? এ প্রশ্ন আমরা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করবো।

[...শ।

শারদোৎসব ও মাতৃপূজার আধ্যাত্মিকতা

শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ

শারতের প্রথম শিশিরস্নাত আলো-কোজ্জ্বল প্রভাতে প্রকৃতির এক অপূর্ব রূপবিলাস। শেফালী-জবা-কাশ-কুসুম এবং নববিকশিত অতসী-পদ্মের রূপচ্ছটাও দিগন্তব্যাপী শ্যামলশস্প প্রান্তরে কোন্ এক দিব্য সুষমা ফুটিয়া উঠে। গিরি-নির্ঝরবিগলিত রজতধারার মন্দপ্রবাহ ও বনবিহগের কলসঙ্গীতে চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। নিখিলজীবজগতে তাহারই হিল্লোল কুসুমগন্ধবাহী মলয়ানিলের সুরভিস্নেহস্পর্শে এক মাধুর্যের সমারোহ সৃষ্টি করে। এই পরিব্যাপ্ত আনন্দ স্পন্দনের মধ্যে জীবনদেবতা যেন অমৃতের অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছেন। শারদোৎসব ঐ আনন্দের শুভ আহ্বান। চৈতন্যময়ী বিশ্বজননীর চরণবন্দনায় তাই সন্তানগণ এই সময় তৎপর হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস সলিল মৃত্তিকা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। তপঃ-সিদ্ধ পূর্বতন মহর্ষিগণ এই সর্ববিধ বৈচিত্র্যের অন্তরালে লীলাময়ী মহা-শক্তির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ধ্যান-সমাধিযোগে সর্বানুভূত ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিতে তাঁহারা দেখিলেন শক্ত্যাশ্রিত অর্থাৎ শক্তিসমন্বিত এক ব্রহ্মচৈতন্যই নিখিল প্রপঞ্চের আধার এবং লীলাচ্ছলে রূপায়িত। তিনি মহাশক্তি জগন্মাতা, সর্বজননিয়ন্ত্রী জগদ্ধাত্রী এবং শুভাশুভ কর্মফলে বিধাত্রী প্রাণময়ী বিশ্বদেবতা। দুর্গা, কালী, চণ্ডিকা, কাত্যায়নী ইত্যাদি নামে এবং রূপে তিনি বিগ্র-হায়িতা আরাধিতা এবং আখ্যাতা হন। শারদোৎসবে তাঁহারই বন্দনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রানুসারে এই ভারতভূমি সতীর পুণ্যদেহাংশসমূহ ধারণে মহাপীঠরূপে পরিগণিত। উত্তর-পশ্চিমে মরুতীর্থ হিংলাজ, কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী ও পূর্বপ্রান্তীয় কামাখ্যা, চট্টলের চন্দ্রনাথ ও ভবানী, উৎকলে বিমলা এবং বিন্ধ্যাচল-বিন্ধ্যবাসিনী ইত্যাদি তীর্থ-সমন্বিত আকুমারিকাতটান্ত এবং আ-সমুদ্রহিমাচল এই বিশালভূমি মাতৃ-বন্দনার মহাতীর্থরূপে পরিণত। নানা বিপর্যয়ে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন বহুবার ছিন্ন ও সীমিত হইলেও বর্তমান সীমান্ত বহির্ভাগে এবং অভ্যন্তরে বিচিত্ররূপে মাতৃ-আরাধনার এই শুভ-সংস্কৃতি ও নিদর্শন বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। আজিকার খণ্ডিতভারত বিষাদময় ইতিহাসের পুনরাবর্তন করিলেও এই পবিত্র স্বপ্নস্মৃতি মাতৃ-পূজার মাধ্যমে আমাদের নিরানন্দ-প্রাণে চেতনা ও শক্তিসঞ্চার করে।

ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডল দেবীবন্দনা বা মাতৃপূজার সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত। মহেঞ্জো-দরো এবং হরপ্পায় যে সকল মাতৃ-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়---প্রাগ্-আর্যযুগহইতে এদেশে প্রচলিত শক্তিপূজার সাক্ষ্য বহন করে।

চণ্ডীর দেবীসূক্তের অন্তর্গত 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাম্' ইত্যাদি শ্লোক বা মন্ত্র চিরপ্রসিদ্ধ। তৎক্রমে রাত্রিসূক্তের ---এই মন্ত্রটিও প্রত্যক্ষভাবে দুর্গা-নামোল্লেখে জগজ্জননীর মহিমা ঘোষণা করে।

'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্ ।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ।'

ইহার অর্থ---যিনি অগ্নিবর্ণা, স্বকীয় তেজচ্ছটায় সমুজ্জ্বল এবং তৎসম্ভূত তাপরাশিতে শত্রুদিগকে দগ্ধ করেন, যিনি বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক পরিদৃষ্টা এবং যিনি উপাসকগণের কর্ম-ফল বিধান করেন, আমরা সেই দুর্গাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে সংসার-তারিণী, তুমি আমাদের পরিত্রাণ কর। (১) এরূপ অন্যান্য মন্ত্রও আছে।

শুক্লযজুর্বেদ---বাজসেনের সংহিতা ঋগ্‌বেদ রাত্রি-পরিশিষ্ট এবং তৎপর তবলকার উপনিষদ, নারায়ণোপনিষদ্, কেনোপনিষদ্ এবং দেব্যুপনিষদ্ প্রভৃতি বিভিন্ন আর্ষগ্রন্থে বিভিন্ন নাম ও আখ্যানের মাধ্যমে মহাশক্তি দুর্গার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। উপনিষদ বেদেরই শেষাংশ, জ্ঞানকাণ্ড। এই সকল শাস্ত্র ঋষিদের সাধনালব্ধ জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভূত। তৎসমুদয়ে মহাশক্তি---'দেবী, দুর্গা, ভগবতী, অম্বিকা, উমা, হৈমবতী, পার্বতী'---ইত্যাদি বহুনামে আখ্যাতা হইয়াছেন।

তবলকার উপনিষদে মন্ত্রাংশ ---'স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্'---সেই ব্রহ্ম আকাশে বহু শোভমানা উমা হৈমবতী রূপে আবির্ভূতা হইলেন; কৈবল্যোপনিষদ---'উমা সহায়ং পরমে-শ্বরং বিভুং---' ; নারায়ণোপনিষদ--- 'কাত্যায়নায়ৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ' ; তৈত্তিরীয় ভাষ্যে---অম্বিকা জগন্মাতা পার্বতী' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ বহু মন্ত্রে এই নাম বিঘোষিত।

'স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াম্ । সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্' এই মন্ত্র বিশেষ প্রমাণসিদ্ধ। বহ্বৃচোপনিষদের একটি মন্ত্র বিশেষ তত্ত্বপূর্ণ ও আধ্যাত্মিকতা ময়, যথা---'দেবী হ্যেকাগ্র আসীৎ,

---

১। সায়নভাষ্যম্---বিশেষেণ রোচতে, স্বয়মেব প্রকাশতে ইতি বিরোচনঃ পরমাত্মা, তেন দৃষ্টত্বাদ্ বৈরোচনী-ত্যাদি।

সৈব জগদণ্ডমসৃজত - - - - - তস্যা এব ব্রহ্ম অজীজনৎ'। বহিরন্তরমনুপ্রবিশ্য স্বয়মেবৈকৈব বিভাতি'—ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ ভাবদ্যোতনায় এবং তত্ত্ব-প্রেরণায় অতুলনীয়।

উপনিষদের একটি মন্ত্র—

'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধি তিষ্ঠত্যে কঃ।

---শ্বেতাশ্বেতর।

ইহার অপূর্ব অর্থ---সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ধ্যানসমাহিতদৃষ্টিতে দেখিলেন যে সেই এক পরমাত্মা ব্রহ্মই গুণময়ী শক্তির অভিন্ন আশ্রয়। তিনিই শক্ত্যাশ্রয়ে সকল সৃষ্টি স্থিতি ও কালাদির পরম কারণ।

দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, মৎস্যপুরাণ ও কাশীখণ্ড প্রভৃতি এবং মহাভারতে দুর্গারাধনার আখ্যান, বিধান ও উপদেশাদি রহিয়াছে। ইহার মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্য অতুলনীয় এবং কাব্য, আধ্যাত্মিকতা ও তত্ত্বসমন্বয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য দুর্গাপূজার একান্ত অঙ্গস্বরূপে চণ্ডী-পাঠ অবশ্য করণীয় ও উপদিষ্ট আছে।

'তস্মান্ মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং
সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যং চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং
হি তৎ।'

---ইত্যাদি।

রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ, স্বজনপরিত্যক্ত সমাধিনামক বৈশ্যের সহিত মিলিত হইয়া শান্তিলাভের আশায় তপোবনে মহামুনি মেধসের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে মহর্ষি তাঁহাদের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে মহা-শক্তি মহামায়ার তত্ত্ব ব্যাখ্যানপূর্বক তাঁহারই চরণপদ্মে শরণ লইবার উপ-দেশ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন যে—'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্; তিনি চরম সমাধানার্থে উপদেশ করিলেন,---

'তামুপৈহি মহারাজ, শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।।'

সুরথ নদীতটে প্রস্থানপূর্বক তিন বৎসর ব্রতাবলম্বী হইয়া দুর্গার আরাধনায় মাতৃদর্শন ও বাঞ্ছিতলাভে ধন্য হইলেন। আর সমাধিও বর্ষত্রয় ভগবতীধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া তপস্যায় সিদ্ধি এবং পরম জ্ঞানলাভে মুক্তিলাভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, সুরথ বসন্তকালেই মাতার অর্চনা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনটি বৎসর একান্ত-ভাবে তপস্যায় তিনি নিশ্চয় শারদীয় অনুষ্ঠানে বিরত হন নাই। যাঁহার করুণা লাভার্থ এই উপাসনা, তাহাতে বিচ্ছেদ পড়িবে কেন? তবে তো ব্রতভঙ্গ হয়। বিশেষত কোথাও একমাত্র বসন্তকালীন অনুষ্ঠানের পৃথক উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, নৃপতি ও বৈশ্য-দ্বারা উভয়কালেই জগন্মাতার পূজা সম্পন্ন হইয়াছিল। অধিকন্তু, মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে শারদীয়া মহাপূজার সবিশেষ উল্লেখ হইয়াছে ---'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী' ইত্যাদি। কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহে শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্রের মাতৃপূজানুষ্ঠানসংবাদ বর্ণিত আছে। সকল কথা সকল গ্রন্থে থাকে না, প্রয়োজনও নাই। রামায়ণে মহানায়ক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মুখ্য জীবনবৃত্তই উপজীব্য। সুতরাং বিশেষ করিয়া মহাবতারের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধ ও বিজয়লাভান্তে তদীয় শেষ বিসর্জনলীলাই এই মহাকাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রঘুনাথের শারদীয়া মাতৃপূজার অনুষ্ঠানবৃত্তান্ত পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত এবং পূজার বিধান উপদিষ্ট হইয়াছে।

বিজয়াদশমীতে মাতৃপূজার নির্মাল্য কুসুম চন্দনাদি ধারণপূর্বক সংবৎসর-ব্যাপী বিজয়লাভ এবং নৃপতিবর্গের এই দিনেই অরাতি দমনার্থে জয়যাত্রার বিধানও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহাতেও শ্রীরামচন্দ্রের শারদানুষ্ঠানের স্মৃতি ধ্বনিত হয়।

শক্তিসাধনার পুণ্যপীঠ বঙ্গপ্রদেশ মাতৃবন্দনার মঙ্গলগীতিতে চিরমুখর। শস্যশ্যামলা গিরিপ্রান্তর—নির্ঝরময়ী চিরসুষমালংকৃতা বাংলার প্রাকৃতিক রূপনিচয়ে করুণাভয়মঙ্গলময়ী আনন্দ-ময়ী বিশ্বজননীর বাৎসল্যমধুর রূপটিই সহজে ফুটিয়া উঠে। তাই 'এই দেশ তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ, সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষ্যাপা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, নিগমানন্দ, মহর্ষি সত্যদেব ও আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা মাতৃকরুণাভিষিক্ত সাধক শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর প্রমুখ মহাপুরুষগণের তপস্যায় কীর্তিমুখর ও মহিমোজ্জ্বল। তাঁহাদের উত্তরপুরুষ আমরা—শত বিপর্যয়, বিভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব ও নৈতিক দুর্বলতার মধ্যেও আত্মরক্ষার্থ স্বকীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মঙ্গলদীপ অনির্বাণ রাখিয়া মাতৃপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকিব। আসুন, আজ আমরা সকল মলিনতা, পরানুকার, অসংহতি ও নাস্তিক্য এবং ভ্রান্তবাদ পরিহার করিয়া বৈদেশিক কাপট্যকলুষ ও দীন অসহায়তা হইতে মুক্তিলাভ করি এবং শৌর্যবীর্যজ্ঞানতপঃ সমাশ্রয়ে শক্তিমান হইয়া মহাশক্তির চরণে প্রার্থনা করি—

ওঁ সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি
নমোঽস্তুতে।। ওঁ তৎসৎ।

স্তুতি-কুশলতা

স্তুতি বা প্রশংসায় তুষ্ট হয় না, এমন লোক বিরল, 'ত্বং অমুক, ত্বং তমুক, ত্বং হি---' বিশেষণবহুল এই ধরণের স্তব আউড়ে এবং পরিশেষে 'প্রসীদ! প্রসীদ!'---বলে আকুল নিবেদন জানিয়ে, সে কালের দানব, মানব অনেকেই দেবতাদের কাছ থেকে ইচ্ছেমত বর আদায় করেছেন,---পুরাণে এ-ধরণের দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

ওপরওয়ালা বা 'বসে'র মনোরঞ্জনের জন্য, আপিসে-আপিসে অধস্তন কর্মচারীরা, সুযোগমত তাঁর প্রতি গুণমুগ্ধতার ভাব দেখিয়ে, চাটুগুঞ্জন করে চলেছেন। যেমন---

---স্যার, আপনার শরীর কি খারাপ হয়েছে ?

---না, তেমন কিছু নয়। একটু সর্দি-সর্দি ভাব হয়েছে।

---তা স্যার, আপিসে না এলেই ত' পারতেন। ছুটি ত' আপনার বহু পাওনা আছে। পচেও গেছে অনেক।

আর একজন এই সুযোগে টেক্কা মারল,---আরে স্যার কি তোমার-আমার মত ছুৎছাত ছুটি নেবার তালে থাকেন? চিরটাকাল কাজ-কাজ করেই গেলেন। নিত্যকার কর্মযোগী হচ্ছেন এঁরাই।

●

বসের প্রশংসা নানাজনে নানাভাবে করে থাকেন। কিন্তু ক্রমাগত অনেকদিন খোসামোদ চালিয়েও যে ফল পাওয়া যায় না, হয়ত একদিনের একটা কথায় লক্ষ্যভেদ হয়। সময়োচিত সামান্য স্তুতিই সেদিন অসামান্য কার্যকরী হয়ে ওঠে।

লণ্ডনের পি-এইচ-ডি জনৈক অধ্যাপক, শেষ বয়সে আই-এ-এস্ হয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন।

বন-মহোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে উঠেছেন ভদ্রলোক। জনসমাবেশ ভালই হয়েছে। কালেক্টরীর লোকেরা ত' আছেই, বাইরেরও অনেক উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী মিটিং-এ উপস্থিত হয়েছেন। ডি-এম সাহেব বন-সংরক্ষণের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয় উত্থাপন করলেন এবং তাঁর সুগভীর অর্থনীতি জ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে সুরু করলেন। সময়ের দিকে খেয়াল নেই। তত্ত্ব ও তথ্যসম্বলিত সারগর্ভ ভাষণ দিয়েই চলেছেন।

জুলফিকার

ওদিকে অধৈর্য শ্রোতাদের অনেকেই চুপিসাড়ে সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। -----

শ্রোতাদের সংখ্যা তখন রীতিমত কম হয়ে এসেছে। অনেক আসনই শূন্য। এখানে ওখানে গুটিকত সরকারী কর্মচারী ও প্রসাদকামী ধানকল কিংবা বাসের মালিক অথবা ফৌজদারী কোর্টের কয়েকজ উকিল মোক্তার।

বক্তার দৃষ্টি হঠাৎ সামনের ফাঁকা আসনগুলোর ওপর পড়তেই, তাঁর মুখের ভাবটা থমথমে হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার প্রতি এবম্প্রকার ঔদাসীন্যে তিনি যৎপরোনাস্তি মর্মাহত হলেন এবং দু-চারটে কথায় বক্তব্যের উপসংহার শেষ করে, বসে পড়লেন।

হাততালি পড়ল ঠিকই, তবে শব্দটা মোটেই 'কান ধরানো নয়। ঠিক এমন সময় জনৈক অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়-নম্র কণ্ঠে বলে উঠলেন ---স্যার যখনই আপনার মুখ থেকে আমরা কিছু শুনি, অনেক নতুন জিনিষ শিখি। ই ওয়াইডেন্স আওয়ার মেণ্টাল হোরাইজন।

ভদ্রলোকটি তাঁর সময়ে য়ুনিভার্সিটির একজন নামকরা ছাত্র ছিলেন। ডি-এম সাহেবের সেটা অজানা ছিল না। এহেন ব্যক্তির সোচ্চার প্রশংসা ভূতপূর্ব অধ্যাপকের অন্তর নিমেষেই জুড়িয়ে যায়। সারা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য অফিসারটির সে বছরকার কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট অবিশ্বাস্য রকমের ভাল গিয়েছিল। অনেক আই-সি-এসেরও নাকি ওঁর মত কর্মদক্ষতা নেই। কর্তব্যনিষ্ঠ, নিরলস, বিবেচক, স্থিতধী এবং আরও অনেক চোখা-চোখা বিশেষণে এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক কর্মচারীদের যা সর্বোত্তম ও বিরল গুণ (এবং যে শব্দটির সঠিক প্রতিশব্দ (বাংলা ও হিন্দীতে) অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া যায় নি) সেই 'ট্যাক্টফুল' শব্দটির দ্বারা ওঁকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যদি মামুলী পরিস্থিতিতে অফিসার ভদ্রলোকটি অনুরূপ মন্তব্য করতেন, তবে হয়ত 'বসে'র মনে সেটা ততখানি গভীর রেখাপাত করত না এবং কলমটাও তাঁর ওঁর গুণপনা ব্যাখানে অতটা সচল হয়ে উঠত না।

কাজেই, প্রশংসার কার্যকারিতায় উপযুক্ত পরিবেশ বা লগ্ন একটা মুখ্য নিয়ামক।

●

সময় নির্বাচন ছাড়াও, বাচনভঙ্গী ও শব্দের ব্যবহারের ওপর প্রশংসার কার্যকারিতা অনেকখানি নির্ভর করে থাকে। কারো কাছ থেকে কোন প্রশস্তিবাক্য শুনে মনটা যদি আমাদের যথার্থই উল্লসিত হয়ে ওঠে, তবে সেই প্রশংসার কথাটা আমরা সহজে ভুলি না এবং যার মুখ থেকে কথাটা শুনি, তাকেও না।

কুমিল্লার মালু মিয়ার কথা মনে পড়ে। লোকটা অফিসার মহালে একখানা খাতা নিয়ে ঘোরাফেরা করত। কথাবার্তা বেশ সরস, তবে খানিকটা

ভাঁড়ামি-ঘেঁষা। একরকম নিরক্ষরই তবুও অফিসারদের সাথে ইংরাজী ছাড়া কথাই বলত না। অবিশ্যি উচ্চারণ ও বলার ঢং দুইই বিচিত্র।

ও বলত,---আই য়্যাম দি থার্ড কিং অফ টিপারা। দি ফার্স্ট কিং ইজ দি কিং জর্জ (যদিও পঞ্চম জর্জ বহুদিন আগেই মারা গেছেন), দি সেকেণ্ড ইজ দি মহারাজা অব টিপারা, এ্যাণ্ড দি থার্ড ইজ আই,---মালু মিয়া।

এই বলে খাতাখানা এগিয়ে ধরত।

খাজনা চাই।

মাসে মাসে কিছু দিতে হবে তাকে, রাজকর। জোর-জুলুম নেই, যার যা খুসী দিতে পারেন। অবিশ্যি অফিসারেরা এর বিনিময়ে মালু মিয়ার কাছ থেকে বহু রকমের সাহায্য পেতেন।

বদলীর সময়ে মালপত্র গোছগাছ, বাঁধাছাঁদা করা, রেলে বুকিং করা, যাত্রার দিনে গাড়ীতে ঠিকঠাক সব কিছু তুলে দেওয়া, নবাগতদের জন্যে সস্তায় ভাল বাড়ী জোগাড় করে দেওয়া অথবা ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে বাজার ঘুরে সওদা করা,---সবই সে অকুণ্ঠ-চিত্তে এবং পরিপাটি ভাবেই করত।

সবে বদলী হয়ে এসেছি কুমিল্লায়। আরও একজন অফিসার এসেছেন, আমারই পিঠ-পিঠি। দু'জনেই উঠেছি ছোকরা অফিসারদের মেসে। বাড়ী ঠিক হলেই ফ্যামিলী নিয়ে আসব।

একদিন সকালে মালু মিয়া এসে হাজির। হাতে খাজনার খাতা।

আমরা এসেই ওর কথা শুনেছি।

অন্য অফিসারটি ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে কাগজ পড়ছিলেন। ওঁর চেহারায় বেশ একটু মুরুব্বি-মুরুব্বি ভাব। মালু মিয়া ওর দিকেই প্রথম খাতাখানা এগিয়ে ধরল। ভদ্রলোকটি ওর দিকে ভ্রূকুটিকুটিল চোখে চাইলেন। মালু গড় গড় করে তার বক্তব্য বলে গেল। ভদ্রলোকটি ওর খাতায় কিছুতেই নাম লিখবেন না। মালুও নাছোড়।

যাক্, শেষটায় রেগে-মেগে নাম লিখলেন বটে, কিন্তু খাজনার বহর লিখে দিলেন এক পয়সা। ভদ্র-লোকটির ব্যয়কুণ্ঠতার কথা অফিসার মহলে অনেকেরই জানা ছিল। মেসে যে কয় মাস ছিলেন, তেল, সাবান, টুথপেস্ট, জুতোর কালি কিছুই কেনেন নি। পরস্মৈপদীতেই চালিয়ে দিয়েছেন।

খাতাখানা আমায় দিতে আমি মাসিক আট আনা কর দেবার স্বীকৃতিতে নাম লিখলুম।

১৯৩৮ সালের কথা। টাকার মূল্য এখনকার চেয়ে তখন ঢের বেশী। ----

মালু মিয়ার ঘনকৃষ্ণ দাড়ির ফাঁকে সাদা দাঁতে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল। বলল,---স্যর, ইওর হার্ট ইজ লাইক ম্যাপ অব রাশিয়া।

অপর ভদ্রলোকটির উদ্দেশে অনুচ্চ কণ্ঠে মন্তব্য করল, ---হিজ হার্ট ইজ জাস্ট লাইক এ মাস্টার্ড সীড।

বহুদিন আগের ব্যাপার, কিন্তু কথা দুটো আজও মনে আছে। উপমা দুটো সত্যিই অভিনব। ----

কাব্যের মত সরস শব্দ প্রয়োগে প্রশংসাও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। এক ভদ্রলোকের গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা। বড় বড় জটিল অঙ্ক চটপট মুখে মুখে কষে ফেলতে পারেন, এক সভায় তাঁর পরিচয় দিতে উঠে, ওঁরই এক অধ্যাপক বন্ধু বললেন, 'ইনি হচ্ছেন মিঃ---, অঙ্কের যাদুকর। এ রিয়াল ম্যাথেম্যাজিশিয়ান।'

অধ্যাপকের কথায় ঘরশুদ্ধ লোক হেসে উঠল, গণিতজ্ঞ ভদ্রলোকটিও মহাখুসী।

চিন্মোহন দুর্দান্ত তাস প্লেয়ার।

কোন এক ক্লাবে টুর্নামেণ্ট খেলতে গিয়ে, বিপক্ষদের ডাউনের পর ডাউন দিচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে ওর এক বন্ধু হঠাৎ সেখানে গিয়ে হাজির।

চিন্মোহনের প্রতিপক্ষের একজন ছিল তার ছেলেবেলার সহপাঠী। তাকেই উদ্দেশ করে বন্ধুটি বলে উঠল---কার সাথে তাস খেলতে বসেছিস খেয়াল আছে? প্রাণটাকে ও এখুনি য্যাঁ-ঘাঁসিয়ে (ঘ্যাঁচা ঘাঁসিয়ে) ছাড়বে।

যদিও বুদ্ধিমানদের চেয়ে বোকা লোকেরাই খোসামোদে বেশী ভোলে, তবুও দেখা যায় অসম্ভব তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরাও অনেক সময় স্তাবকতায় প্রসন্ন হয়ে, অনেককে অনেক রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন।

স্যর আশুতোষ, ডঃ বিধান রায়, জওহরলাল---এঁরা সবাই অনন্যসাধারণ মেধার অধিকারী, কিন্তু আত্মতুষ্টি অনেক সময় ওঁদের স্বাভাবিক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। যাকে নেক-নজরে দেখতেন, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি-অপরাধ সবই ওঁরা উপেক্ষা করতেন, আর এই পছন্দ করার পেছনে ছিল স্তাবকতার মোহ। স্তাবকতা ওঁদের কাছে সর্বদাই হৃদ্য বলে মনে হয়েছে।

স্যর আশুতোষের ক্রোধ ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু স্তুতিতে সে রাগ মুহূর্তেই জল হয়ে যেত। তাঁর নামের সঙ্গে চরিত্রের চমৎকার সঙ্গতি ছিল।

খোদাবক্স ছিলেন ব্যারিস্টার, বিদগ্ধ ব্যক্তি। পৃথিবীর বহু দেশ পর্যটন করেছেন। প্রায় সব দেশেরই সুরা ও নারীর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। ক্লাশে ভদ্রলোক প্রায়ই মদে চুর হয়ে আসতেন।

ল' কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল স্যর আশুতোষের অনুগৃহীত ব্যক্তি, কিন্তু খোদাবক্স সাহেব তাঁকে আদৌ দেখতে পারতেন না। ক্লাশে ছেলেদের সামনে তাঁর সম্বন্ধে যথেচ্ছ কটূক্তি করতেন। ছেলেদের কেউ কেউ ভাইস-প্রিন্সিপালের কানে কথাটা তুলল। তিনিও রেগে-মেগে আশুতোষের কাছে নালিশ করলেন। প্রথমে আশুতোষ কথাটায় তেমন গুরুত্ব দেন নি। শেষে বারবার নালিশ শুনতে শুনতে মেজাজটা খাপ্পা হয়ে উঠল। ভাবলেন খোদাবক্স সত্যিই বাড়াবাড়ি করছে, ওকে কড়কে দেওয়া দরকার। হি নিডস্ এ স্নাবিং।

সেদিন খোদাবক্স দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস থেকে নীচে নামছিলেন, স্যর আশুতোষ উঠছেন উপরে। সিঁড়ির ওপর দু'জনের দেখা।

---খোদাবক্স।

গর্জন শুনে সচকিত খোদাবক্স অর্ধ-নিমীলিত আঁখি দুটি টান করে দেখেন, সামনেই বাঘ---বাংলার বাঘ আশুতোষ, য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর তথা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস্। ওঁর দ্বিবিধ পেশারই সর্বোচ্চ মুরুব্বি।

বিনীত ভঙ্গীতে খোদাবক্স বলেন, ---ইয়েস স্যর, এ্যাট ইওর সারভিস।

---ওয়েল, আর ইউ দ্য কিং হিয়ার?

সাথে সাথে উত্তর দেন খোদাবক্স, ---হোয়াইল আই য়্যাম দ্য কিং, ইউ আর দ্য কিং-মেকার স্যর।

---আই হিয়ার ইউ অফন্ স্পীক ইল অফ বি---। দ্যাটস্ অফুলী ব্যাড অফ ইউ।

---স্যর, হোয়েনেভার এনি অকেশান অ্যারাইজেস ফর টকিং অফ সাম রিয়ালী গ্রেট পারসোনালিটী, লাম টাওয়ারিং ইনটেলেক্ট লাইক স্যর রাসবিহারী অর স্যর আশুতোষ, আই য়্যাম এ্যাবসলিউটলী কন্‌শাস্ অফ হোয়াট আই সে, ইভন্ ইন এ স্টেট অফ আটার ইনিব্রেয়েটী; বাট হোয়েন ইট রিলেটস্ টু সামওয়ান হু ভেরী লিট্‌ল ইম্প্রেসেস্ মি, আই মে সে এনিথিং,---ইল অর ওয়েল, হার্ডলী নোথিং হোয়াট।

আশুতোষের গোঁপের নীচে একটু হাসির আভাস জেগে ওঠে। খোদাবক্সের পিঠ চাপড়ে বললেন---নটী চ্যাপ্ ইউ মাস্ট নট ড্রিঙ্ক সো মাচ।

●

সফল চাটু-ভাষণে প্রায়ই বুদ্ধি ও রসিকতার স্পর্শ থাকে। নির্জলা ও নির্লজ্জ স্তাবকতা অনেক সময় নিষ্ফল হয় (ইংরাজীতে যাকে বলে 'ফলস্ ফ্ল্যাট'), অবশ্য প্রশংসার পাত্রটি যদি নিতান্ত নির্বোধ না হন। নির্লজ্জ স্তুতিবাদ অনেক সময় কৃতপ্রশংসের বিরক্তি উদ্রেক করে থাকে। খোসামোদ করা একটা আর্ট। বাবুর মেজাজ বুঝে কথা ছাড়তে হবে এবং দরকার-মত নিজের উক্তির পিছনে যুক্তির কথাটাও ভেবে রাখতে হবে, যাতে বেফাঁস কথা বলে শেষটায় উজবুক

গল্পটা হয়ত অনেকেই শুনেছেন, তবু যুৎসই উদাহরণ হিসাবে এই প্রসঙ্গে সেটার উল্লেখ করছি।

রাজবয়স্য সেদিন মহারাজের গুণকীর্তন করতে করতে দারুণ একটা অতিশয়োক্তি করে বসলেন। কথাটার নির্গলিতার্থ হচ্ছে যে, মহারাজা (কোন কোন ব্যাপারে) ঈশ্বরের চেয়েও ক্ষমতাশালী। ভগবদ্ভক্ত রাজা কথাটা শুনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হলেন। কুপিত কণ্ঠে বললেন,---ছিঃ ছিঃ, তোমার কথা শুনলেও পাপ। এত বড় কথা তুমি বলছ কোন সাহসে। প্রমাণ দিতে পার? প্রমাণ করতে না পারলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করব।

বয়স্য প্রথমটায় বেশ একটু ঘাবড়ে গেছলেন। শেষে একটা আকস্মিক ভাব-তরঙ্গ খেলে যায় মাথায়।

---নিশ্চয়ই মহারাজ, প্রমাণ করতে না পারলে অবশ্যই গর্দান নেবেন। আমি আবার বলছি, আপনি যা পারেন, ভগবান তা পারেন না।

---কেমন?

---ইচ্ছে করলে আপনি কাউকে আপনার রাজ্য থেকে নির্বাসিত ও বহিষ্কৃত করতে পারেন, কিন্তু ভগবান কি তাঁর রাজ্য থেকে কাউকে নির্বাসিত করতে পারেন? পারেন না। কেন না এই বিরাট বিশ্বে এমন কোন স্থান নেই, যা তাঁর রাজ্যের বাইরে। কাজেই আপনি যা পারেন, ভগবান তা পারেন না।

বয়স্যের কথা শুনে রাজা ও সভার আর সবাই হেসে উঠলেন।

সপ্রতিভতা চাটুকারদের একটি বিশেষ গুণ।

মোসাহেবী করতে গিয়ে যদি অপ্রস্তুতই হতে হয়, তবে সে রকম লোককে দিয়ে মোসাহেবী চলে না

একটা গল্প মনে পড়ছে। হয়ত এটাও অনেক পাঠক-পাঠিকার জানা। গল্পটার পুনরুল্লেখে আশা করি তাঁরা বিরক্ত হবেন না।

কুমার বাহাদুর সম্প্রতি পিতার

পেয়েছেন (রাজা খেতাবটি অবিশ্যি পান নি, সেটা ব্যক্তিগত হিসাবে ওর বাবাকে দিয়েছিলেন গভর্নমেণ্ট)।

সেদিন বৈঠকখানার সান্ধ্য আড্ডায় সিদ্ধির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন কুমার বাহাদুর---দেখ হে সিদ্ধি অতি উপাদেয় জিনিষ। মন মেজাজ ফূর্তিতে রাখে, অবসাদ দূর করে, পরি-পাকের সহায়তা করে, শরীরেরও পুষ্টিসাধন করে।

একজন মোসাহেব অমনি বলে উঠলেন,---যা বলেছেন স্যর। এর নাম হচ্ছে সবুজ সুধা। এ-নেশায় আনন্দ আছে, অথচ সুরার মত্ততা নেই। সিদ্ধি খেয়ে কেউ হৈ-চৈ, হৈ-হল্লা করে না। সাধে কি মহাদেব ওটা নিত্য পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতেন। সিদ্ধি দেবভোগ্য জিনিষ।

কয়েকদিন পর কুমার বাহাদুরের পিসেমশাই, নামকরা বিলেত ফেরত ডাক্তার ওঁর ওখানে বেড়াতে এসে ওঁর সিদ্ধি খাওয়ার কথা শুনে ওঁকে বোঝালেন,---বেশীদিন ধরে সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়, নার্ভের সেনসেটিভনেস নষ্ট হয়, ব্যক্তিত্ব হ্রাস পায়---ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে দুইদিন পিশেমশাই ছিলেন, বাড়ীতে আড্ডা বসেনি। তিনি চলে যাবার পর আবার বৈঠকখানায় সান্ধ্য মজলিস বসেছে। ইয়ার-বক্সীরা সিদ্ধির সরবতের ফরমাইজ করলে কুমার সাহেব মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন,---না হে, সিদ্ধি জিনিষটা খাওয়া ঠিক নয়। বড্ড লক্ষ্মীছাড়া নেশা। মানুষকে আস্তে আস্তে অমানুষ করে তোলে। বুঝতেই দেয় না। বহুদিন পরে হয়ত ওর ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ----বলতে গেলে ওটা স্লো পয়জনেরই সামিল।

সেদিনকার সেই মোসাহেবটি চট করে বলে ওঠেন---ঠিক বলেছেন হুজুর বাহাদুর। সিদ্ধির প্রভাবে বুদ্ধিও শেষটায় সিদ্ধিদাতার মতই হয়ে পড়ে। সিদ্ধিদাতা গণেশের মস্তকটা হস্তীর, মস্তিষ্কটাও নিশ্চয় হাতীরই হবে। আর

হাতী সম্বন্ধে লোকে কথায় বলে হস্তিমূর্খ।

কুমার বাহাদুর একটু চটেই বললে, ---আচ্ছা লোক ত' তুমি! এই না সেদিন বললে সিদ্ধির মত জিনিষ হয় না, দেবভোগ্য পানীয়।

মোসাহেবটি বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন,---হুজুর, আমাদের মনিব আপনি, না সিদ্ধি? আপনার নিন্দে প্রাণ গেলেও করব না, কিন্তু সিদ্ধির নিন্দেয় বাধা কি?

●

প্রশংসাই আবার ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতনের মত হয়ে দাঁড়ায়, যদি প্রশংসিত লোকটির মাত্রাজ্ঞানের অভাব না থাকে। অনেক দিন আগের কথা বলছি।

একজন সদ্যাগত আই-সি-এস (ইনি অক্সফোর্ডে বাংলা শিখেছিলেন) বড়াতে গিয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক পাহাড়ী সহরে। ভদ্রলোকটির খুব বাংগালী প্রীতি। তিনি একদিন হঠাৎ বাংগালীদের ক্লাবে এসে হাজির। মিলিটারী এ্যাকাউণ্টসের একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক (ধরুন তাঁর নাম 'ক' বাবু) সাহেবকে সাথে করে এনেছেন।

সাহেবের সাথে ক বাবুর আলাপ, দিন দুই আগে, ওঁরই বাড়ীর সামনে রাস্তায়। রাস্তায় একজন বাংগালীর দেখা পেয়ে সাহেব মহাখুসী। অনেকক্ষণ ধরে কথা কইলেন। বাংলা ভালই বলেন সাহেব। ক বাবু সাহেবকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে, বেলের পানা, চিঁড়েভাজা আর তিলের নাড়ু দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। এ সব বাংগালী খাবার সাহেবের বড্ড পছন্দ। সাহেবের কথাবার্তা শুনে ক বাবু বেশ বুঝতে পারলেন, সাহেব বাংগালী কৃষ্টি ও ভাবধারার বিশেষ অনুরাগী।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন অনেক নন-ম্যাট্রিকও বহু সরকারী দপ্তরে কাজ করতেন। ক বাবুও ওঁদের একজন। বিদ্যের দৌড় তাঁর সেকেণ্ড ক্লাশ। ইংরাজী জ্ঞান যতই কম হোক, ইংরাজীতে কথা বলবার ঝোঁক ছিল তাঁর অদম্য।

ক্লাবে সবাই বাংগালী।

সাহেবের পরিচয় বাংলায় দিলে কোন ক্ষতিই ছিল না। সাহেবও আশা করেছিলেন তাই।

কিন্তু ক বাবু ভাবলেন---খাস বিলেতীসাহেব, তাঁর পরিচয় কি বাংলায় দেওয়া চলে?

কাজেই, অনর্গল অশুদ্ধ ইংরাজীতে ক বাবু সাহেবের পরিচয় দিতে গিয়ে ওঁর বঙ্গ-প্রীতি ব্যাখ্যান করে চললেন, ---দিস ইজ মিঃ এ, এইচ,---আই-সি-এস। ফরমারলী অক্সফোর্ড বয়। হি হ্যাজ পেরিউজড এ্যাবাউট অল বেংগলী লিটারেচার---ফ্রম বঙ্কিম-চন্দ্র টু রবীন্দ্রনাথ, হি ক্যান গিভ টু মেনী কোটেশানস অফ ট্যাগোর। হি লাভস বেংগল টু মাচ এক্সটেণ্ট। হি লাইকস্ বেংগলী পিপ্ল, বেংগলী সংস, বেংগলী যাত্রা পারফরমেন্স এ্যাণ্ড বেংগলী ফুড্স্ লাইক মাছ চচ্চড়ি মোচাঘণ্ট এ্যাণ্ড কুলের অম্বল। আমসত্ত্ব, আচার, বড়ি আর ভেরী ভেরী ডিয়ার উইথ হিম। মিঃ এ, এইচ পুটস্ ধোতি এ্যাণ্ড লুজ পাঞ্জাবী ইন হোম হোয়েন সামার। সাচ এ মোষ্ট ট্রুলী ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড ওয়েলউইশার টু বেংগলীজ এ্যাজ ওয়েল এ্যাজ টু ইণ্ডিয়ান্স্ হ্যাজ নেভার সীন বাই মি। নো ইংলিশম্যানস্ এ্যাফেক্শেন ফর পুওর ইণ্ডিয়ানস্ ক্যান বি সাচ স্ট্রং লাইক হিজ। হি এব্রি মান্থ কন্ট্রিবিউটস্ হাণ্ড্রেড রুপীস হেল্প ফর রামকৃষ্ণ মিশন, হিজ বার্থ বিফোর দিস প্রেজেণ্ট বার্থ মাস্ট টুক প্লেস অন দি ল্যাপ অফ আওয়ার মাদার বেংগল, অর হাউ ক্যান হি হ্যাজ লাভলী ফিলিংস ফর বেংগলীজ এ্যাজ ইফ লাইক হিজ ওন ব্রাদার্স। ইট ইজ পুল অব পালস্---দ্যাট ইজ নাড়ীর টান---

সাহেব বহুক্ষণ চুপ করে ক বাবুর কথা শুনে আসছিলেন। শ্রোতাদের কারো কারো মুখে চাপা হাসির ইসারা দেখে রীতিমত বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করছিলেন। শেষে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন,---স্টপ প্রোজিং মিঃ ক, অর আই শ্যাল প্রোজ ইওর ইংলিশ।

●

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরা অহরহ নিজেদের প্রশংসা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত কাজেই এইসব স্তুত-প্রশংস লোকদের কাছে সরাসরি প্রশংসা নিবেদন করলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের মনে কোন সাড়া জাগায় না। বরঞ্চ ওঁদের বাগানের নিজের হাতে ফোটানো ফুলটির তারিফ করে, অথবা ওঁদের বাড়ীর ছবি বা শিল্প সংগ্রহে ওঁদের সূক্ষ্ম রুচিবোধের উল্লেখ করে ওঁদের মনকে প্রসন্ন করে তোলাটা অনেক সহজসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাছে কোন সাধারণ লোক গিয়ে যদি বলত, 'আপনার মত কবি হয় না' কিংবা আইনস্টাইনকে বলত, 'আপনিই এ-যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক', সেটা তাহলে তাঁদের কাছে ধৃষ্টতা বলেই মনে হত।

বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও দিক্পাল বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে ওঁরা ওঁদের অসাধারণ প্রতিভার স্বীকৃতি বহু পূর্বেই পেয়েছিলেন।

তবে ওঁদের কাব্য বা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রশংসা না জানিয়ে কেউ যদি রবীন্দ্রনাথের ছবির ও আইনস্টাইন সাহেবের বেহালা বাজানোর সুখ্যাতি করত, তবে বোধ হয় ওঁরা অল্পবিস্তর খুসীই হতেন।

তসকানিনী (Toscanini) ছিলেন একজন প্রখ্যাত সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক।

একবার এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে তসকানিনীর বাজনা শুনতে গেছেন অভিনেত্রী জুডিথ এ্যাণ্ডারসন, তসকানিনী মোটেই সুশ্রী ছিলেন না দেখতে। গানের পালা শেষ হলে জুডিথকে জিজ্ঞেস করলেন তসকানিনী, ---কেমন শুনলেন?

সাথে সাথে জুডিথ জবাব দেন, ---আপনি যখন বাজাচ্ছিলেন, আপনাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল।

অপূর্ব সুর রচনার জন্য জীবনে

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অনেক মিলেছে তসকানিনীর, কিন্তু সেদিন অভিনেত্রী জুডিথের মুখে যে প্রশস্তি শুনেছিলেন, বোধ করি তার চেয়ে হৃদ্যতম প্রশংসার কথা তাঁকে আর কেউ শোনায় নি কোনদিন। অনেক সময় মুখে প্রশংসা জ্ঞাপন না করে, কার্য বা আচরণের মাধ্যমে গুণগ্রাহিতার প্রকাশ অধিকতর কার্যকরী হয়ে থাকে।

লেখিকা মার্জারি উইলসনের একজন শিল্পানুরাগী বাটলার ছিল। ভাস্কর্য সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান ছিল লোকটার। ওর আদর্শ শিল্পী ছিলেন বর্গলাম (Gutzon Borglum), যিনি দক্ষিণ দাকোটার পর্বতগাত্রে ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, জেফারসন, রুজভেল্ট প্রমুখ প্রেসিডেণ্টদের বিরাট বিরাট আবক্ষ মূর্তি খোদাই করে রেখেছেন।

একদিন বর্গলাম মার্জারী উইলসনের বাড়ীতে এলেন, বাটলারটি তার প্রিয় শিল্পীর উপস্থিতিতে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে সুরা পরিবেশনের সময় খানিকটা মদ ছলকে গুটজনের গায়ে পড়ল। অপ্রস্তুত বাটলারটি তাড়াতাড়ি একখান তোয়ালে দিয়ে শিল্পীর পোষাকের ভিজে জায়গাটা ভাল করে মুছতে মুছতে, বিনম্রকণ্ঠে বলল---দেখুন স্যার, আপনার মত এমন একজন নামজাদা লোককে মদ্য পরিবেশনের সৌভাগ্য এর আগে আমার জীবনে হয় নি কখনও। আই কুড হ্যাভ সার্ভড্ এ লেসার ম্যান পারফেক্টলী। -----আমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম।

ওর কথা শুনে ওকে চমকিত ও পুলকিত করে শিল্পী বর্গলাম জানালেন, ---আই য়্যাম নেভার কমপ্লিমেণ্টেড লাস, ইন মাই লাইফ।

●

সামাজিক ব্যাপারে সময় সময় এমন সব বিশ্রী ও বেখাপ্পা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় আমাদের, যে স্তুতিবাদের কৌশলটা ঠিকমত জানা না থাকলে রীতিমত বে-অকুফ বনে যেতে হয়।

হ্যারি ফার্নিস ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য কার্টুনিস্ট। লণ্ডনের অনেকগুলি বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় ফার্নিস সাহেবের ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। বিখ্যাত কৌতুক পত্রিকা পাঞ্চের সঙ্গে তিনি বহুদিন যুক্ত ছিলেন। ফার্নিসের অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা শুধু ব্রিটেনেই নয়, অ্যামেরিকায়ও নেহাৎ কম ছিল না। মার্কিন মুলুকে সফরে এসে ভদ্রলোক আদর-আপ্যায়নের চোটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। আজ এখানে ডিনার পার্টি, কাল সেখানে চায়ের আসর, পরশু অমুক ক্লাবে লাঞ্চের নেমন্তন্ন। ---- দু'দিন হল ন্যু ইয়র্কে এসেছেন ফার্নিস। এরই মধ্যে সভা, সমিতি, পার্টিতে কমসে কম দু'শ লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। সবার নাম মনে রাখা কি সম্ভব? হয়ত মুখ দেখলে বা কথাবার্তা শুনলে, তাঁদের মনে পড়বে। সকালে ফার্নিস তাঁর হোটেলের ডাইনিং টেবিল থেকে সবে ব্রেকফাস্ট শেষ করে উঠেছেন, এমন সময় একজন ভিজিটার এসে উপস্থিত।

---নমস্কার মিঃ ফার্নিস। আপনার সাথে ব্রাউনের আলাপ হয়েছে? জেমস্ বি ব্রাউন, রসরচনায় সিদ্ধহস্ত। নামটা শুনেছেন নিশ্চয়ই।

---ব্রাউন, ব্রাউন ---- নামটা খুবই জানা মনে হচ্ছে কিন্তু তার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য এখনও হয়ে ওঠে নি।

---বলেন কি মিঃ ফার্নিস! এখনও ব্রাউনের সঙ্গে আপনার আলাপ হয় নি। আপনি ত' কাল সকালে ন্যু ইয়র্ক ছাড়ছেন। বেশ আজ দুপুরে---ক্লাবে লাঞ্চ খাবেন আমার সঙ্গে, কেমন? ব্রাউনকেও বলেছি লাঞ্চে, আলাপ করিয়ে দেব। আগে থাকতেও কিছু বলি নি। একটু আশ্চর্য করে দিতে চাই।

ফার্নিস অনেক রকম অসুবিধার কথা তুলে নেমন্তন্নের হাত থেকে রেহাই পেতে চাইলেন। ভদ্রলোকটি নাছোড়। কোন কথাই কানে নিলেন না।

অগত্যা লাঞ্চের নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করতে হল।

বেলা ঠিক একটার সময় ফার্নিস নির্দিষ্ট ক্লাবে এসে হাজির হলেন। পিঠ-পিঠ নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক এলেন, সাথে আর একজন। ফার্নিস দেখেন সর্বনাশ! পরশু বিকেলে যাঁর ওখানে চায়ের নেমন্তন্নে গেছলেন, তিনিই হচ্ছেন ব্রাউন। নামটাও মনে পড়ে গেল। ওঁদের যখন পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছিল, ব্রাউনের মুখটা তখন গম্ভীর। তিনি নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করছিলেন। একেই ভদ্রলোক দীর্ঘকায়, তারপর মর্যাদাহত হয়ে বুক টান করে দাঁড়িয়েছিলেন। খর্বাকৃতি ফার্নিসের ওর কাছে নিজেকে বড়ই ছোট মনে হচ্ছিল।

ফার্নিস ব্রাউনের করমর্দন করলেন। কিন্তু ব্রাউনের তরফ থেকে কোন সাড়া এল না। তিনি যে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন, ফার্নিস সেটা বুঝতে পেরে বললেন,

---দিস ইজ এ গ্রেট অনার এ্যাণ্ড প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ।

তারপর হতবুদ্ধি ব্রাউন সাহেবকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললেন,---কিপ্ আপ্ দ্য জোক মিঃ ব্রাউন, কিপ ইট আপ। ফ্যাক্ট ইজ আই ওয়াজ সো ডিলাইটেড এ্যাট মিটিং ইউ ডে বিফোর ইয়েসটারডে ইভনিং এ্যাণ্ড সো চার্মড্ উইথ ইউ দ্যাট হোয়েন আই ওয়াজ আস্কড্ ইফ আই হ্যাড মেট বিফোর, আই সেড নো, সো দ্যাট আই মাইট হ্যাভ দ্য প্লেজার অফ মিটিং ইউ এগেন। ----ফরগিভ মি, মিঃ ব্রাউন! এইবার জেমস বি ব্রাউন সাগ্রহে ফার্নিসের হাত চেপে ধরলেন।

---স্যার, দিস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট কমপ্লিমেণ্ট আই হ্যাভ এভার রিসিভড্। ইওর সিন উইল বি ফরগিভিন ফর ইওর সিনসিয়ার ফ্লাটারী অব সো আম্বল এ্যাডমায়ারার এ্যাজ মিসেলফ্।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা খুবই নিবিড় এবং ঘরকন্নার ব্যাপারে দুই পক্ষের মনের মিল অত্যাবশ্যক। স্ত্রীর মনোরঞ্জনে বা মান-ভঞ্জনের কৌশলটা যে স্বামী আয়ত্ত করতে পারেন নি, তিনি

বাস্তবিকই দুর্ভাগা। আর যাঁরা পত্নীর রাগ ও অভিমান দূর করবার কায়দাটা ভালভাবে রপ্ত করে ফেলেছেন, দাম্পত্য-জীবনে তাঁদের অশান্তির আশঙ্কা নেই। আপিসের বসকে খুশী করার চেয়ে ঘরের স্ত্রীকে সুখী করা অনেক কঠিন।

অনেক স্ত্রী আছেন স্বামীর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পাওয়ার চেয়ে তার মুখ থেকে দু চারটে মিষ্টি কথা ও সুখ্যাতি শুনে অনেক বেশী প্রীত হন।

তবে স্ত্রী সম্বন্ধে কমপ্লিমেণ্টটা যতটা ইনডিরেক্ট হয় ততই ভাল।

এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে শুনলেন যে, স্বামী নাকি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—'মীনা আমার সমস্ত উন্নতির মূলে। আমার ঘরে ও এসেছিল বলেই না লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে আমার ওপর।'

ভদ্রলোক তাঁর এই বিশ্বাসের কথা স্ত্রীকে কোনদিন জানান নি। কাজেই বন্ধুটির কথায় ভদ্রমহিলা যে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করেছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা বিস্মৃত হন নি। এক স্বল্প শিক্ষিতা মহিলা এক নামকরা এ্যাডভোকেটের গৃহিণী। এ্যাডভোকেট একটি জটিল সেশনস কেস জিতে বাড়ী ফিরলেন। সেদিন রাত্রে তার বৈঠকখানায় কয়েকজন উকিল বন্ধু এসে তার উপস্থিত বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে, তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। বন্ধুদের প্রশংসায় ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে বললেন,—যতই বুদ্ধির তারিফ কর না তোমরা, যে বুদ্ধিমতীটি ঘরে আছেন তিনি আমাকে একহাটে কিনে, আর একহাটে বেচতে পারেন।

আড়াল থেকে কথাটা গৃহিণীর কানে গেল। ভদ্রমহিলা ঈষৎ রুক্ষ স্বভাবের। কিন্তু সে রাত্তিরে তাঁর মেজাজটা অসম্ভব রকম মোলায়েম মনে হল এ্যাডভোকেটের কাছে। হঠাৎ কেন এমন হল বুঝতে না পেরে, তিনি আশ্চর্য হয়ে গেছলেন।

চাটুকারিতা বা স্তুতিবাদের কলা-কৌশল ঠিক বলে শেখানো যায় না। জাত-শিল্পীর মত জাত-চাটুকারও জন্মে স্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়ে। বিধিদত্ত গুণ ছাড়া চাটুভাষণে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব নয়। মনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞান ও প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি ছাড়া এতে সাফল্য আশা করা যায় না।

দৃষ্টান্ত হিসাবে একটা মোগল যুগের গল্পের অবতারণা করছি।

সম্রাট আকবরের সভায় ইরাণের যুবরাজ এসেছেন পিতার দৌত্য নিয়ে। সম্রাট তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর ও সৌজন্য প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে এক মস্ত ভোজসভার আয়োজন করলেন। আমির, ওমরাহ ও দেশের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকদের নিমন্ত্রণ করা হল। সেই ভোজের টেবিলে পরিবেশনরত বাবুর্চিখানার এক খানসামার অসাবধানতাবশত মাংসের ঝোলের একটি ফোঁটা যুবরাজের শুভ্র রেশমী আচকানে এসে পড়ল। ব্যাপারটা আকবরের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি ভ্রুকুটিকুটিল নেত্রে লোকটার দিকে তাকালেন এবং পার্শ্বরক্ষীকে (সেকালকার এডিকং) ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, ভোজ শেষ হলে লোকটাকে যেন কোতল করা হয়।

সম্রাটের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হঠাৎ মরীয়া হয়ে একহাতা ঝোল তুলে ঢেলে দিল যুবরাজের গায়ে।

মহা কেলেঙ্কারী ব্যাপার, হৈ-চৈ হুলুস্থুল কাণ্ড। পারস্যের রাজপুত্র নিদারুণ অপমানিত হয়ে পিতৃরাজ্যে তক্ষুণি রওনা দেন আর কি। যাক্ অতি কষ্টে বারবার ক্ষমা চেয়ে শেষ পর্যন্ত আকবর শাহ তাঁকে নিরস্ত করতে পারলেন। পরিবেশক ভৃত্যটিকে পরদিন প্রত্যুষে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। সম্রাটের আদেশ হয়েছে কোমর পর্যন্ত পুঁতে ওকে যেন ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হয়।

সম্রাটের মনে কিন্তু সংশয় জাগছিল। লোকটাকে তিনি বহুদিন ধরেই দেখে আসছেন। বেশ নম্র, বিনয়ী, উদ্ধত আদৌ নয়। তবে তার এই দুঃসাহসিক অভদ্র আচরণের হেতু কি? ভয়ে কি হঠাৎ লোকটার বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছল? কিন্তু যখন ওকে বন্দী করা হল, তখন ত' ওকে বেশ শান্ত নির্বিকারই মনে হল। চেঁচামেচি, দাপাদাপি কিছুই করেনি। ওর বেয়াদপির কারণটা জানবার জন্য সম্রাটের মনে কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে চলল।

আকটি প্রোথিত হতভাগ্য ভৃত্যটি বিভীষিকাময় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। সারা গায়ে তার পুরু করে চর্বি মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুকুরগুলোকে শিকল খুলে তার ওপর লেলিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে সম্রাট সেখানে উপস্থিত হলেন। আকবর লোকটার সম্মুখে এসে তার গতরাত্রের উদ্ধত আচরণের কারণ জানতে চাইলেন।

লোকটি নিষ্কম্প কণ্ঠে উত্তর দিল, —গরীব পরবর মহামান্য সম্রাটের সুনাম যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্যেই আমি ঐ দুষ্কার্য করেছিলুম।

এই অদ্ভুত উত্তর শুনে বাদশা থ হয়ে যান।

লোকটা ধীরভাবে বলে চলে, —যে অতি সামান্য ঝোলের ফোঁটাটুকু বেখেয়ালে যুবরাজের পোষাকে ছিটকে পড়েছিল, তার জন্যে আমার মৃত্যু ঘটালে, ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক হিসাবে জাঁহাপনার যে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি তা অক্ষুণ্ণ থাকত না। সবাই বলাবলি করত আকবর বাদশা নেহাৎ একটা তুচ্ছ কারণে একজন হতভাগ্য ব্যক্তির প্রাণনাশ করেছেন। শাহানশাহর সেবা আমি বহুদিন ধরে করে আসছি। হুজুরের পরম অনুগত, গুণমুগ্ধ দাসানুদাস আমি। আপনার নামে কেউ দোষারোপ করবে, এটা আমার অসহ্য। মরে গিয়েও আমি শান্তি পেতুম না। তাই অপরাধের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিলুম। এখন আমার অপরাধ সত্যিই গুরুতর, এর জন্য আমার প্রাণ নিলে কেউ আপনার অপযশ করবে না।

ওর কথা শুনে সম্রাট কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। শেষে ওকে মুক্ত করবার আদেশ দিলেন।

বাদশার হুকুমে হাজার আশরফি বকশিসও মিলল লোকটার।

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বাংলা দেশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নবজাগরণের কাল। এই নবজাগরণ সর্বাধিক পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছিল জাতির স্বাদেশিক চেতনাকে আশ্রয় করে। ইংরাজী শিক্ষা একদিকে যেমন ভারতবাসীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করেছিল, অন্যদিকে ইংরাজশাসন তেমনি তার অধীনতা বোধের বিক্ষোভকেও বাড়িয়ে তুলছিল। এই উভয় বোধের অন্বয় জাতির জীবনে পারবশ্যের যন্ত্রণার সঙ্গে স্বদেশ-ভাবনাকে একটা ভাবমূর্তি দান করেছিল।

অখণ্ড ভারতবোধ তখন পর্যন্ত না জাগলেও স্বদেশ সম্পর্কে একটা চেতনা ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করছিল রাজা রামমোহন রায়ের কর্মাবলীর মধ্য দিয়ে। স্বদেশচিন্তার এই প্রাথমিক অধ্যায়ে স্বাধিকারচৈতন্য ভারতবাসী শাসক-ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ, ভারতের গৌরবময় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে গর্ববোধ ও সর্বশেষে আত্মশক্তির উদ্বোধন---এই কয়টি বিষয়কে ভিত্তি করে জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক সমাবেশের আয়োজন করেন চৈত্রমেলা (১৮৬৭ খৃঃ : পরে হিন্দুমেলা) প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে মহান জাতীয় দায়িত্ব ছিল---তা সম্পূর্ণতই বহন করেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। পারবশ্যের গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য যে রাষ্ট্রবিমোথনকারী বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থানের প্রয়োজন থাকে সে কথা ইতিহাস-স্বীকৃত। এই বিপ্লবের পশ্চাতে থাকে বহু মানুষের দীর্ঘদিনের স্বার্থশূন্য, সম্মিলিত নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনা। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনুরূপ সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল। হিন্দুমেলার মাধ্যমে মেলার পরিচালকবর্গ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ভারতমুক্তিযজ্ঞের সেই সাধনার উষালগ্নে কায়মনে সঁপে দিয়েছিলেন। সেই কারণে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ঠাকুর পরিবার ও হিন্দুমেলার স্বদেশচর্চার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শতবর্ষ পূর্বে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে জাতীয় জীবনে স্বাদেশিক চেতনা জন্মলাভের একটি ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস কখনও ইংরাজ-

রাজা রামমোহন রায়
—রবীন্দ্র সদনের সৌজন্যে

শাসনের বিরুদ্ধে অস্ফুট জাতীয় সংগ্রামের, কখনও শিক্ষিত সামাজিক মানুষের রাজনৈতিক সমাবেশের, আর কখনও স্বদেশীয় শিল্পোন্নয়নপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতির জীবনে স্বাবলম্বনভাব জাগিয়ে তোলার। লক্ষ্য করার বিষয় হল, জাতীয় ইতিহাসের রাজনৈতিক আন্দোলনের অস্ফুটতার সময় থেকেই অন্যান্য জননায়কগণের সঙ্গে বিশেষ করে এই আন্দোলনকে যাঁরা ধারাবাহিকভাবে পালন-পোষণ করে সুস্পষ্ট রূপ দিতে চেয়েছেন তাঁরা ছিলেন ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন মানুষ। রামমোহন রায়ের সার্থক অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুরের কর্মজীবন থেকে যে স্বাদেশিকতার শুরু হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের জীবনে তা সযত্নে লালিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের শতবর্ষ পূর্ব হতে স্বাধীনতালাভের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘকাল অব্যাহত থেকে জাতির স্বদেশ-চেতনায় শক্তি সঞ্চার করেছে। সুতরাং হিন্দুমেলার আলোচনা প্রসঙ্গে ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

নবযুগের প্রথম পূজারী রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত কুসংস্কারাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 'ব্রাহ্মণ সেবধি'---পত্রিকাদির মাধ্যমে মিশনারিদের বিরোধিতা, ব্রাহ্মণবাদের প্রচার ইত্যাদি বহুবিধ জাতীয় মঙ্গলকর কর্মের দ্বারা জাতির জীবনে এক বৈপ্লবিক মানসপরিবর্তনের সূত্রপাত করেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে রামমোহনের আদর্শ এবং চিন্তা নানাভাবে অনুশীলিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের শিক্ষা তথাকার কিছুসংখ্যক ছাত্রকে দেশীয় সংস্কারের বিরোধী করে তোলার নামে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল সত্য, কিন্তু অধিকাংশের মনে এক আশ্চর্য প্রভাবসম্পন্ন নবচেতনাও জাগ্রত করেছিল। এর পশ্চাতে ছিল হিন্দুকলেজের তরুণ অধ্যাপক ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রভাব। ডিরোজিও হিন্দুকলেজের তৎকালীন ছাত্রদের সমাজ-বিপ্লব ও স্বাদেশিকতার নবমন্ত্রে দীক্ষা

দিয়েছিলেন। অমিত প্রতিভাধর ডিরোজিও সেই তরুণ বয়সেই স্বদেশ-প্রেম অনুভব করেছিলেন তীব্রভাবে। জন্মসূত্রে বিদেশী হলেও ভারতবর্ষকেই তিনি মাতৃভূমিরূপে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'ফকীর অব জঙ্গীরা'---নামক বিখ্যাত ইংরাজী কবিতাটি ইংরাজ শাসনের মধ্যযুগে ভারত-চিন্তার এক অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তি। 'To India --My native land' কবিতায় ডিরোজিও মাতৃভূমির জন্য যে হৃদয়স্পর্শী ক্রন্দন করেছেন, তা সর্বকালীন স্বদেশসঙ্গীতের মূল সুর :

My Country : in thy days
of glory past
A beauteous halo circled
round thy brow,
And worshipped as a deity
thou wast—
Where is that glory, where
that reverence now ?
—To my Fallen, Country

পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেন। ('স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির্মণ্ডলী---' ইত্যাদি।)

ডিরোজিওর আদর্শপ্রাণিত হিন্দু-কলেজের প্রতিভাধর ছাত্ররা রামমোহন রায়ের মধ্য জাতীয়তাবাদের উত্তর-সাধকরূপে নানান কর্মে অতিনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এঁদেরই সাধনার ফলরূপে বাংলা দেশে জাতীয় চেতনার তিনটি বৈশিষ্ট্যর জন্ম হয় 'দেশ হিতৈষণা' (Phitanthropy), স্বদেশ-প্রেম (Patriotism) ও জাতীয়তাবোধ (National Spirit).

হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রামমোহন বা দ্বারকানাথের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ লক্ষ্য করা যায় নি। তবে উভয়ের সংস্কারমুক্ত কর্মাবলীর প্রভাব হিন্দুকলেজের ছাত্রদের প্রথমাবধিই প্রভাবিত করেছিল। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে বাংলা দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রকে অধিক প্রসারণকর্মে ব্যাপৃত হয়েছিলেন (১৮৩৩ খৃ:)।

দ্বারকানাথের (১৭৯৪-১৮৪৬) জীবন ও কর্মে যে স্বদেশ-চিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল, তা অস্ফুট হলেও বিচারে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিহিসাবে বিচার্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীকে বঙ্গের স্বদেশ ও সংস্কৃতিচর্চার ভিত্তি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। রামমোহনের সুযোগ্য সহযোগী দ্বারকানাথ স্বদেশ-উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে কর্তব্যকর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অধুনাতন ভারতচিন্তার সঙ্গে তৎকালীন বোধের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ইংরাজ সরকার গোষ্ঠী এবং 'তথাকথিত বুর্জোয়া' জমিদার শ্রেণীই ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের অগণিত দরিদ্র মানুষের ভাগ্যবিধাতা। সেই কালে সাধারণ ভারতবাসীর সর্বজনীন ভাগ্য-ভাবনাকে আত্মবোধে গ্রহণ করেছিলেন যে কয়জন মুষ্টিমেয় জননেতা, রামমোহন, দ্বারকানাথ-রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

দ্বারকানাথের নানাবিধ কর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর সর্বজনীন স্বদেশ-চর্চাই প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। নানান সামাজিক-সংস্কার ছাড়াও দ্বারকানাথের স্বদেশবোধ কতকগুলি উল্লেখ্য জাতীয় মঙ্গলকর ঘটনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। রামমোহন রায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহযোগে দ্বারকানাথ সর্বপ্রথম রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরাজগণের দোষ ত্রুটির সমালোচনা শুরু করেন।

১৮২৩ খৃস্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচন নীতির প্রতিবাদে সুপ্রীম কোর্টে এবং বিলাতে প্রেরিত আবেদন-পত্রে তাঁর সেই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল। রামমোহনের সহায়তায় দ্বারকানাথ 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি সংবাদ-পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বাদেশিক-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ দ্বারকানাথ আরও একটি মহৎ কর্ম করেন। 'বেঙ্গল হরকরা' এবং ভারতবিদ্বেষী সংবাদ-পত্র 'জনবুল'-এর মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করে নেন। রামগোপাল ঘোষের সহযোগিতায় ও কব হ্যারীর সম্পাদনায় 'জনবুল' পত্রিকা 'The English-man' নামে শোষিত অবহেলিত ভারতবাসীর মুখপত্র রূপে প্রকাশ পেতে থাকে।

কলকাতায় ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটিতে দান, 'ভ্যাগ্রান্ট এ্যাক্ট' (১৮৪০) বলবৎ করার বিষয়ে সরকার সহযোগিতা, মেডিকেল কলেজে ছাত্র-বৃত্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলবার প্রচেষ্টা, হিন্দু কলেজের অধীনে 'বাংলা পাঠশালা'র উদ্বোধন প্রভৃতি বহুবিধ জাতীয় কল্যাণকর কর্মে দ্বারকানাথের জীবনের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছিল। ১৮৪২ খৃস্টাব্দে বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,---

"আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশের উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট উপায়স্বরূপ গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সামাজিক আচার-আচরণ আমি লক্ষ্য করিতেছি।"

----দ্র: উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। যোগেশচন্দ্র বাগল।

দ্বারকানাথের এই উক্তি, তাঁর বিলাত গমন এবং বিলাতে জর্জ টমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতীয় জাতীয় চিন্তার আলোচনায় নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

ইংলণ্ড প্রবাসকালে দ্বারকানাথের সঙ্গে উইলিয়ম এ্যাডামের মাধ্যমে ভারত-প্রেমিক টমসনের সাক্ষাৎ হয়। দ্বারকানাথ বিলাত থেকে ফেরার সময় ভারতবাসীর রাজনৈতিক এবং আর্থিক উন্নয়ন-স্বার্থে টমসনকে এদেশে নিয়ে আসেন। টমসনের ভারতে আগমনই দ্বারকানাথের ভারত-চিন্তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ অধ্যায়। উপযুক্ত প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তৎপূর্বে দ্বারকানাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সংগঠন 'ভূম্যধিকারী সভা' বা জমিদার সভার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দে দেশবাসীর নানাবিধ মঙ্গলকর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ, কিশোরীচাঁদ

মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুখ তৎকালীন বঙ্গের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ। প্রসন্নকুমার সম্পাদক থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথই ছিলেন জমিদার সভার প্রধান পুরুষ। জমিদারী সভা, ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নামে 'ভূম্যধিকারী সভা' হলেও এই সভায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সদস্য হবার পূর্ণ অধিকার ছিল।

প্রাসঙ্গিক বোধে এই সভার উদ্দেশ্য-ধ্বণিত মুখপত্রটি তৎকালীন জাতীয়-চেতনার একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে---

"The Zamindary Association is intended to embrace people of all descriptions, without reference to caste, country or complexion, and rejecting all exclusiveness, is to be based, on the most universal and liberal principles, the only qualification to become its member being the possession of interest in the soil of the country."

পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিতব্য হিন্দুমেলা স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা সংক্রান্ত ন্যাশনাল পেপারের প্রতিবেদনের সহিত দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত এই সভার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ বিষয়ের একটি প্রভাব সূত্র লক্ষ্য করা যায়। নামে 'হিন্দুমেলা' হলেও সর্বাংশে জাতিগত ভেদবুদ্ধির দ্বারা তার প্রতিষ্ঠা হয়নি। সর্ব-জাতীয়তাবোধের যে আদর্শে হিন্দুমেলার কর্মকর্তাগণ প্রাণিত হয়েছিলেন ভূম্যধিকারী সভার উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব তাতে ছিল না বলা যায় না। হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জমিদার সভার উদ্দেশ্যই যেন ভাষান্তরে ধ্বনিত হয়েছে---

"We despise race distinctions. It should be owo object to raise up a vast Nationality in India composed of Christian Hindoo, Parsee and Mohamedan governed by our interest, and our faith viz faith in the supremacy of human love and charity." (The National paper, 1st April, 1868).

দ্বারকানাথ ঠাকুর

—রবীন্দ্র সদনের সৌজন্যে

স্পষ্টতই উভয় সভার উদ্দেশ্য বিষয়ের আদর্শগত ঐক্য সন্ধানের অবকাশে ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার একটি অনুক্রম লক্ষ করা যায়। উভয় সভায় স্থাপয়িতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন যথাক্রমে দ্বারকানাথ ও পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। দ্বারকানাথের ধর্ম ও কর্মবহুল জীবনে যে স্বদেশচর্চার প্রকাশ ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করছিল, দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় তা পূর্ণাবয়ব লাভ করে।

স্বদেশচিন্তা অর্থে কেবলমাত্র পরাধীনতার ক্ষোভ হৃদয়ের মধ্যে পালন করা নয়---শিক্ষায়, শিল্পে, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে স্বদেশের সার্বিক উন্নয়ন চিন্তা থেকেই আসে স্বদেশ-চিন্তা। এর থেকে পরাধীনতার গ্লানি দূরীকরণের সামর্থ্য অর্জন সম্ভব হয়। দ্বারকানাথের সুযোগ্য পুত্র দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশচর্চার অনুশীলন শুরু হয়েছিল এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আশ্রয় করে। রামমোহনের উদ্ভাবিত ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের সর্বসার সন্ধান করেছিলেন তিনি। সেই নবলব্ধ ধর্মমতের পতাকাতলে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং জনচিত্তে স্বাজাত্যবোধ জাগিয়ে তোলার প্রেরণা নিয়েই তাঁর তত্ত্বরঞ্জিনী সভার (পরে তত্ত্ববোধিনী সভা) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপনের পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশানুশীলন নানাভাবে নানান সংস্থাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পাচ্ছিল। হিন্দু কলেজের ইংরাজী শিক্ষা

যে কেবলমাত্র ভারত-চিন্তার পথ প্রস্তুত করেছিল তা নয়, ইংরাজী শিক্ষার বিপরীত প্রভাবের ফলে প্রতীচ্য ভাবধারার অন্ধ অনুকরণের মোহ তৎকালীন শিক্ষিত মানুষের একটি বিশেষ শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এই উৎকট প্রতীচ্যানুকরণের প্রতিক্রিয়ার ফলে জাতির স্বাজাত্যবোধ এবং দেশানুরাগের সঞ্চার ঘটেছিল সর্বপ্রথম দুটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। একটির নাম 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' (১৮৩২); এর সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি ছিলেন রামমোহনের পুত্র রামপ্রসাদ। আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮)। এটির পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ তৎকালীন চিন্তানায়কগণ। দেবেন্দ্রনাথ সভারও একজন সক্রিয় নিয়মিত সদস্য ছিলেন।

উভয় সভারই মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার উন্নতি এবং পারস্পরিক জ্ঞানবিনিময়ের মাধ্যমে জাতি-চেতনা ও স্বদেশানুরাগ সঞ্চার করা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কর্ম-জীবনের সঙ্গে একটি অধ্যাত্ম-ভাবনাও নিয়ত সঞ্চরমাণ ছিল। এবং সেই অধ্যাত্ম-চিন্তার দ্বারা প্রাণিত হয়েই দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩৯ খৃ: অক্টোবর মাসে তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপন করলেন। আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে দ্বিতীয় সভা থেকে নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা।'

সভার প্রথম অধিবেশন বসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন---

'বস্তুত তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি প্রধান কীর্তি। ইহা তাঁহার ধর্মজীবনেরও একটি মস্তবড় অধ্যায়। আধ্যাত্মিক প্রেরণাবশে তিনি এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু ইহার জন্য সমসাময়িক অন্য কতকগুলি ব্যাপারও সমধিক দায়ী ছিল। তখনকার শিক্ষিত সমাজের স্ব-ধর্মে পরানুচিকীর্ষার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান শুরু করলেন---'

---দ্র: সাহিত্যে সাধক চরিতমালা।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন,---

'যেমন দূরদর্শিতাসহকারে এই সভার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভফল সমস্ত তেমনি দূরতর পরবর্তী পুরুষগণের ভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।'

এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরকাল মধ্যেই সার্থক হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় রাজনীতি চর্চা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যে ঐক্যের প্রয়োজন ছিল তত্ত্ববোধিনী সভা, তদন্তর্গত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০) এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) সেই জাতীয় প্রয়োজন সম্পাদনে সাধ্যমত সাফল্য অর্জন করেছিল।

উল্লেখযোগ্য যে সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারক মনীষীরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সম্পাদকরূপে এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র 'পেপার কমিটি'র সদস্য হিসাবে দেবেন্দ্র-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখা হয়েছিল,- - -

"ফলত তত্ত্ববোধিনী দ্বারা একসময় যে বঙ্গভাষার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে বিদ্যাসাগরের অনেকটা সহায়তা ছিল।"

---দ্র: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ভাদ্র, ১৮১৩ শক।

দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশচর্চার সাধন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগরও আপন স্বদেশ-ভাবনাকে পরিণতি দিতে চেয়েছিলেন। তার প্রধান কারণ, দেশমঙ্গলকর কতকগুলি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মনোভাবের যথেষ্ট মিল ছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মূলত ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হলেও দলের পৃষ্ঠভূমি থেকে তত্ত্ববোধিনীর জন্য তা দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের স্বদেশচর্চার এক বিশেষ মাধ্যম রূপেই গৃহীত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন,---

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।"

স্বদেশচিন্তা বা স্বদেশচর্চা ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ স্বদেশবোধ প্রকাশ পেল তত্ত্ববোধিনীকে আশ্রয় করেই। পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি মাত্র বিষয়ের নাম-সূচী উদ্ধার করলেই তত্ত্ববোধিনীর স্বদেশানুশীলনের স্বরূপ উপলব্ধ হবে। যেমন,---

(ক) মুখ্য এবং গৌণ---কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৭৯৭ শক।

(খ) স্বদেশানুরাগ---আশ্বিন, ১৭৯৮ শক।

(গ) ভারতের প্রাচীন কীর্তি---কার্তিক, ১৭৯৮ শক।

(ঘ) বর্তমান হিন্দু সমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ---বৈশাখ - আষাঢ় - শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

(ঙ) সমাজসংস্কার ও জাতীয় ভাব---ভাদ্র, ১৮১১ শক।

(চ) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা ও দুঃখের কথা---জ্যৈষ্ঠ, ১৮১২ শক।

অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা করতেন, কিন্তু নীতি নির্দেশ করতেন দেবেন্দ্রনাথ। উভয়ের স্বদেশ-চিন্তার একটি সুপরিকল্পিত পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল তত্ত্ববোধিনীর মাধ্যমে। পূর্বোক্ত নিবন্ধগুলিই তার প্রমাণ।

তত্ত্ববোধিনী প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পূর্বে ইংলণ্ডে বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশচর্চার এ হলো প্রাথমিক

রাজনৈতিক জগতে বিচরণ করছেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে ভারতবর্ষেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ঠাকুরবাড়ীর এই দুই পিতা-পুত্রকে পরবর্তী আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পাওয়া যাবে।

রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ তৎকালীন সমাজপতিগণের অনুরোধে রামমোহনের বিশেষ সুহৃদ ভারতহিতার্থী অ্যাডাম সাহেব ভারতবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' স্থাপন করলেন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। ভারত-বন্ধু জর্জ টমসন, ঐতিহাসিক ব্রিগস্ প্রমুখ ইংরাজগণের সহায়তায় তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং নানাভাবে ভারতবাসীর বহুতর দাবী-দাওয়া পার্লিয়ামেণ্টের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে থাকেন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে দ্বারকানাথের প্রথমবারের বিলাত প্রবাসকালে এ্যাডাম সাহেব জর্জের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। নিগ্রো-মুক্তি ও দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনে জর্জের মহান অবদানের কথা স্মরণ করে দ্বারকানাথ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে সহায়তা করার জন্য তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ করেন এবং ১৯৪২-এর শেষের দিকে জর্জ এবং তাঁর সহকর্মী ফবহ্যারীকে নিজ ব্যয়ে ভারতে নিয়ে আসেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতে জর্জকে আনয়নের মধ্যে দিয়ে দ্বারকানাথ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার (দেবেন্দ্রনাথ এর সদস্য ছিলেন) অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে টমসন ভারতবর্ষে একটি সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান---

"Fulfil your duty to your country, sympathise with the victims of oppression, send in your representation on their behalf. Knock at the door for justice. Knock again and again, harder and harder."

—দ্র: Speeches by George Thomson : Edited by R. J. Mitra.

অবহেলিত ভারতবাসীর অন্তরে সেই অশ্রুতপূর্ব বৈপ্লবিক আহ্বান গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলস্বরূপ, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল ইংলণ্ডের এ্যাসোসিয়েশনের আদর্শে 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয়। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এবং দ্বারকানাথের চিন্তায় যে অস্পষ্ট ভারতবোধ জেগে উঠেছিল তা সফল হতে দেখা যায়।

এই ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংরাজ ও ভারতীয়গণের বিচার ব্যবস্থায় অসাম্য দূরীকরণের দাবীসম্বলিত আইনের একটি খসড়া (১৮৪৯ খৃ:) বেথুন সাহেব তৎকালীন গভর্নর জেনেরালের নিকট উপস্থাপিত করেন। ইংরাজগণ এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং খসড়াটির নাম দেন 'কালা-কানুন'। এই 'কালা-কানুন'-সংক্রান্ত সংঘর্ষের সময় থেকেই প্রত্যক্ষভাবে উভয় জাতির মধ্যে একটা জাতি-বৈর মনোভাবের জন্ম হয়। এই পরিস্থিতিতে রামগোপাল ঘোষ, রাধাকান্ত দেব, দিগম্বর মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজের প্রগতিশীল শিক্ষিত জননায়কগণ ব্যাপকতর রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের জন্য তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সংস্থাগুলিকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন।

১৮৫১ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভূম্যধিকারী সভা ও 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে' একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে নামকরণ করা হল 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান' বা 'ভারতবর্ষীয় সভা'। সভাপতি হলেন শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক মনোনীত হলেন তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইতিমধ্যে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কর্মধারা শুধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলনের সীমায় সীমিত ছিল না, ১৮৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর পাইকপাড়ার রাজবাটিতে প্রতিষ্ঠিত 'দেশহিতার্থী সভা'র (The National Association) সম্পাদক রূপে ইংরাজ সরকারের নিকট জাতীয় দাবী-দাওয়া উপস্থাপনের চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। এ সভার উদ্দেশ্য বিচার করলে দেবেন্দ্রনাথের সমকালীন রাজনীতি-চিন্তার আভাস পাওয়া যাবে। দেশহিতার্থী সভার বহুবিধ উদ্দেশ্যর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল---

"...in order to carry out the views of the society a fund be raised by subscription,...to support an agent in England to act for this association before the Imperial Parliament of Great Britain."

'দেশহিতার্থী সভার' প্রথম অধিবেশনের একমাসের মধ্যেই 'ভারতবর্ষীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রমঙ্গলকর উদ্দেশ্যসমূহ কাজে পরিণত করার বিষয়ে সমষ্টিগত সমর্থন লাভ করলেন এবং শেষোক্ত সভার সম্পাদকরূপে বাংলার রাজনীতি তথা স্বদেশচর্চাকে সর্বভারতীয় রূপদানের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং অযোধ্যায় শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৫১ খৃস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর একটি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি। অনতিকালের মধ্যেই পূর্বোক্ত তিনটি প্রদেশেই ভারতবর্ষীয় সভার শাখা স্থাপিত হয় এবং একটি যুক্ত দাবীসম্বলিত আবেদনপত্র বৃটিশ পালিয়ামেণ্টে প্রেরিত হয়।

বৃটিশ শাসনের ফলে এদেশে শিক্ষিত মানুষের মনে ভারতবর্ষের সর্ববিধ উন্নতি এবং মঙ্গলময়

ভবিষ্যতের যে আশা সযত্নে লালিত হয়েছিল; শাসকগোষ্ঠীর কুশাসন এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষক মনোবৃত্তির ফলে সেই আশা সম্পূর্ণ-রূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দাবী-পত্রের মুখ্য বক্তব্য ছিল এই। দুঃখের সঙ্গে জানানো হয়, ভারতবর্ষের শোষিত ও নিগৃহীত জনগণ "---can not but feel that they have not profited by their connection with Great Britain to the extent which they had a right to look for.

--দ্রঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের : প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়ের খসড়া।

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই দাবীপত্রের মূল্য অনেক। লক্ষ্য করার বিষয় এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়েই দেবেন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছিল।

এর পরের কয়েকটি বছর ধরে বাঙলা দেশের সমাজ-জীবনে সংঘটিত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেশের জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,–

১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গ সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি (সিপাহী বিদ্রোহ), নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্ম সমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গ সমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।"

—দ্রঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

বিশেষ করে 'ব্ল্যাক বিলের' পরাজয় (১৮৫০), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) এবং নীল বিদ্রোহ (১৮৬০) প্রভৃতি রাষ্ট্র বিমোথনকারী ঘটনা বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধের উদ্যমকে প্রতিহত করার পরিবর্তে নবপ্রেরণাই দান করেছিল। ইতিমধ্যে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের(১৮৫৭) প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনার সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই সময় ইতালির রাষ্ট্র বিপ্লবের সংবাদ এদেশের চিন্তাশীল মানুষের স্বাধীনতা কামনাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনির জীবনাদর্শ এবং কর্মাবলীর অনুসরণও সেই আদর্শে প্রাণিত হয়ে অধীনতাপাশ মুক্তির একটা সার্বিক প্রয়াস ভারতে বিশেষ করে বাংলা দেশে নানাভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যেতে লাগল।

অপর দিকে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মুখে দেশাত্ম ভাবনার যে নব আদর্শ তুলে ধরেছিল তারই প্রত্যক্ষ প্রেরণায় কয়েক বছরের মধ্যে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' (১৮৫৩), সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), ইণ্ডিয়ান মিরর (১৮৬২) এবং দি ন্যাশনাল পেপার (১৮৬৫) নামে চারটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। নীল আন্দো-লনের পটভূমিকায় 'প্যাট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্রের নির্ভীক দেশপ্রেম স্মরণীয়। নীলকর সাহেবদের ষড়যন্ত্রে হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর ফলে জনগণের মুখপত্র 'প্যাট্রিয়ট'-এরও মৃত্যু হল। দেবেন্দ্রনাথ সে সময় একই সঙ্গে ধর্মসংস্কার ও জাতির নিয়ত রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতনের ঘটনা-বলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

'প্যাট্রিয়টে'র তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনগণ পক্ষপাতী সংবাদ-পত্রের অভাব অনুভব করলেন গভীর-ভাবে। সেই কারণে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসাবে রেখে তিনি জনগণের স্বার্থে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রকাশ করলেন। কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই ধর্মবিষয়ে মত-বিরোধের ফলে 'মিরর' পত্রিকা কেশবচন্দ্রের হাতে চলে যায়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাত্যবোধ নিবারিত হয়নি। সেকালের 'জাতীয় মানুষ নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় ও সহযোগিতায় দেবেন্দ্রনাথ 'জাতীয় পত্রিকা' 'দি ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশ করলেন। আলোচ্য হিন্দুমেলার মুখপত্ররূপে এই 'ন্যাশনাল পেপার' দীর্ঘদিন জাতির জীবনে স্বাদেশিকতার প্রেরণা জুগিয়েছে।

এ সময় বাংলা দেশের রাজনৈতিক জগৎ থেকে দ্বারকানাথ বিদায় নিয়ে-ছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তখন ধর্মীয় ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক শক্তিমান পুরুষরূপে বিরাজমান।

[ক্রমশ]

বিষণ্ণ বুকের মধ্যে

আনন্দ বাগচী

সমস্ত তোমারই জন্যে ফিরে আসা ফিরে চলে যাওয়া,
কদম ফুলের মত বুকে কাঁপে যে ঋতুসংহার
মেঘের গহন ঘন চিত্রনাট্য, রৌদ্রের সানাই
আশ্বিনে আকাশ জুড়ে, ত্রিভুবন জুড়ে বেজে বাজে,
[illegible]

সমস্ত তোমারই জন্যে, অই তুমি ফেলে চলে যাও
চোখের পলকে আরো অন্ধকারে, গভীর আলোকে
সকল স্বপ্নের অগোচরে আরো দূরের ভুবনে,
পাখি উড়ে গেলে তার ছায়া ফুল ঝরে গেলে ঘ্রাণ
[illegible]

॥ বার ॥

ভূতনাথবাবু ডাঃ বোসকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বললেন। বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ডাঃ বোস বললেন,---ভাই ভূতি, এতে অবাক হচ্চ কেন। যে ওষুধে একজনের ম্যালেরিয়া সারে, তাতে আর একজনের ম্যালেরিয়াও সারতে পারে ---যদি তার সব সিম্‌টম্‌ এক থাকে। তা এটি নিয়ে তুমি কি করতে চাও।

ভূতনাথবাবু বললেন---আমি এটি পেটেণ্ট করতে চাই। বিলিতি পেটেণ্ট ওষুধের মত বোতল ভর্তি করে একটা বিশেষ নামে বাজারে ছাড়তে চাই। সারা দেশে বিক্রি করতে চাই। তুমি এর স্রষ্টা, তুমি এর নাম দাও একটা।

ডাঃ বোস বললেন, ইউনিভার্সাল ইউজ-এর উপযোগী করতে হলে এতে আরও দু'একটি ওষুধ যোগ করে দিতে হবে। নইলে জ্বরের সঙ্গে যাদের কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকবে তারা এতে তেমন উপকার পাবে না।

ভূতনাথবাবু বললেন---যা যা বাড়াবার কমাবার প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে ঠিক করে দাও। ওটাই হবে আমাদের ফরমূলা। দেখি না একটা চান্স নিয়ে। ওষুধটির নাম দাও একটা।

ভূতনাথবাবুর টেবিলে সেদিনকার অমৃতবাজার পত্রিকাখানি পড়েছিল, তার পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ল সপ্তম এডওয়ার্ডের বিষয় বড় বড় অক্ষরে কিছু লেখা। তখন রাজভক্তির দিন। তাতে বিলাতি ওষুধের দোকান থেকে তৈরী ওষুধে একটু বিলাতি নাম না হলেই বা মানাবে কেন। ডাঃ বোস এই ওষুধটির নাম দিলেন---'এডওয়ার্ডস্‌ টনিক।'

ভূতনাথবাবুর পছন্দ হল নামটি। বেশ বিলাতি নাম তাতে রাজার নাম। দুর্গা বলে ঝুলে পড়বার জন্য আগ্রহী হলেন তিনি। তবু বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে ভুললেন না; বললেন---কার্তিক,

যদি এ ওষুধ বাজারে ধরে তবে তার কৃতিত্ব তোমার। এ জন্য এ হিসাবে যা লাভ হবে তার চার আনা তোমার।

ডাঃ বোস বললেন---তথাস্তু।

অচিরেই এডওয়ার্ডস্‌ টনিক বাজারে বেরুল। ওষুধের পেটেণ্ট রেজিস্ট্রি করা হল এবং কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল---'বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ডস্‌ টনিক।' ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত বাংলা দেশে নতুন আশার বাণী নিয়ে এলো এডওয়ার্ডস টনিক।

এইভাবে বাংলা দেশ হতে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ পেটেণ্ট মেডিসিন বের হল এবং তার ফরমূলা করে দিলেন ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু।

॥ তেরো ॥

বেঙ্গল কেমিক্যালকে বড় করতে হলে একদিকে যেমন তার মালের চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে, অপর দিকে সেই মাল যাতে প্রচুর পরিমাণে তৈরী হতে পারে তার জন্যও চাই উ ঘরদোর, লোকজন, যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল। আর সব কিছুর জন্যেই চাই আরো বেশী মূলধন।

পরামর্শ সভা বসল। ডাঃ বোস বললের, তিনি বন্ধুবান্ধবদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে টাকা তুলবেন। তার জন্য কোম্পানীটি রেজিস্ট্রি করে যৌথ কারবারে পরিণত করা দরকার।

পি, সি, রায় বললেন---আমি এক সর্তে রাজি আছি, অংশীদারদের সব বাঙ্গালী হতে হবে।

কার্তিক বললেন---বেশ, তাই হবে।

পি, সি, রায় তখন প্রেসিডেন্‌সি কলেজে অধ্যাপক; সরকারি চাকুরে। সুতরাং তাঁর পক্ষে এ কারবারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করা চলবে না, তাই ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবেন স্থির হল। আর্টিকেলস এণ্ড মেমোরেণ্ডাম তৈরী হতে লাগল।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে পি, সি, রায় দেখলেন---কার্তিক সেই আর্টিকল্‌স্‌-এর মুসাবিদা পাঠ করছেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে কার্তিক কাগজের তাড়া তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

তিনি তো কাগজের উপরেই প্রথমে কোম্পানীর নাম পড়ে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। এ করেছ কি কে সি, কোম্পানীর নাম দিয়েছ বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড। বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীজ হল যে। নাম ছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

তার অর্থটা সুস্পষ্ট। কিন্তু আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালসই বা কৈ, আর ওয়ার্কস্ই বা কৈ?

কার্তিক বললেন—এখন নেই কিছুই, তবে হবে দাদা ক্রমে ক্রমে সবই হবে।

সহাধ্যায়ীরা সবাই কার্তিককে সাহায্য করলেন। কবিরাজ উপেন সেন, নগেন সেন, বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানীর কর্ণধার এবং স্বত্বাধিকারী ভূতনাথ পাল, সবাই সহযোগিতা করলেন। কার্তিক সকাল বিকাল ডাক্তারী করেন আর দুপুর বেলায় কোম্পানীর কাজ দেখেন, তিনিই হলেন যৌথ কোম্পানীর প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রথম বছরেই সামান্য উপকরণে কাজ করে যাতে লাভ করা যায় তাই ডাক্তার বোস 'র-মিট-জুস' বের করলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল হতে। নিজের অগণিত রোগীকে সস্তা দামে মাংসের যুশ খাইয়ে শরীরে তাগদ আনিয়ে তাক লাগাতে লাগলেন। অন্য ডাক্তারেরাও ক্রমে 'র মিট জুস' প্রেসক্রাইব করতে লাগলেন। রোজকার যা মিট জুস তৈরী হত রোজ তাই বিক্রি করা হত। তখন ফ্রিজ আবিষ্কৃত হয়নি, এক দিনের জিনিস অন্য দিন পর্যন্ত টাটকা থাকত না, তাই চেষ্টা করে মাল বিভিন্ন ডাক্তারখানায় পৌঁছে দিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হত।

ডাক্তার বোসের মুখে বহুবার শুনেছি যে ঐ কাঁচা মাংসের রস বিক্রি করেই প্রথম নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল।

কলকাতায় যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন রোগীদের চিকিৎসার জন্য শহরের হাসপাতালে না পাঠিয়ে তাদের পাঠানো হত মাণিকতলার খাল পেরিয়ে যে বড় জলা ছিল সেই অঞ্চলে। সেখানে কয়েকটি সাময়িক চিকিৎসা শিবির খোলা হয়েছিল।

ঐ অঞ্চলে তখন বিশেষ জনবসতি ছিল না, রাস্তাঘাটও তেমন ছিল না।

প্লেগের হাসপাতাল যখন উঠে গেল তখন ঐ জলাঅঞ্চলে অনেকখানি জমি নিজের টাকায় কার্তিক কিনে ফেললেন, তাঁর ইচ্ছা, ওখানে কোম্পানীর কারখানা করবেন।

বলাবাহুল্য জনবসতিহীন পথঘাট সংযোগশূন্য অমন জলাবেষ্টিত জায়গা কারো সহজে পছন্দ হল না। কার্তিকের বাবা তখন বেঁচে ছিলেন। তিনি তো পুত্রের এই হঠকারিতায় রীতিমত তিরস্কারই করলেন।

কার্তিক বললেন, কোম্পানীর এখন এমন আর্থিক অবস্থা হয়নি যে নগদ টাকা দিয়ে এই সস্তা জমিও কিনতে পারে। আপাতত আমার জমিতেই কারখানা বসুক। টাকাটা কোম্পানী পরে শোধ করবে।

কারখানা তো বসবে, কিন্তু ওখানে যাওয়ার পথ কৈ?

তখনও মাণিকতলা কলকাতা করপোরেশনের মধ্যে আসেনি। ওখানে ছিল মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটি। তার চেয়ারম্যানকে বললেন কার্তিক, দেশী ওষুধের কারখানা করব, একটা পাকা রাস্তা তৈরী করে দিন।

চেয়ারম্যান বললেন—মিউনিসি-প্যালিটির সামান্য আয়, অত দূর পর্যন্ত পাকা রাস্তা করবার পয়সা নেই।

অগত্যা ডাঃ বোস মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়-সর্দারকে খুঁজে বের করলেন এবং তার বউ ছেলে মেয়ে, সহকর্মী সকলকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে সুরু করলেন, নিজের ডিস্-পেনসারি থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ দিতে লাগলেন। তার সঙ্গে যখন বেশ হৃদ্যতা জন্মাল তখন তাকে বললেন—গোটা মিউনিসিপ্যালিটির যাবতীয় জঞ্জালবহা গাড়িগুলি খালপার হতে সোজা পায়ে হাঁটা পথ ধরে তাঁর জমি পর্যন্ত রোজ ময়লা জঞ্জালগুলি ফেলতে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এই ভাবে ঐ পথ চওড়া হল, উঁচু হল। তারপর পড়ল ইট চুণ সুরকির

হয়ে উঠল। এছাড়া এখন মাণিকতলা মেইন রোড নামে পরিচিত হয়েছে এবং গিয়েছে বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিক-তলার কারখানা পর্যন্ত।

এদিকে তখনও কারখানা চলছে উক্টর রায়ের সার্কুলার রোডের আবাস সংলগ্ন ঘরে। সেখানে আর কিছুতেই স্থান সংকুলান হয় না। অথচ মাণিক-তলার মাঠে কারখানা গড়ে তুলবার ব্যবস্থাও কিছু করে ওঠা যায়নি।

ঈশ্বরই যেন উপায় জুটিয়ে দিলেন।

একদিন ডাঃ বোস কলুটোলা দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বড়বাজার যাচ্ছেন। সি, কে, সেন এণ্ড কোম্পানীর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একজন কর্মচারী দৌড়ে এসে তাঁর গাড়ি থামিয়ে খবর দিল—কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন তাঁকে ডাকছেন।

কার্তিক গাড়ী থেকে নেমে কবিরাজ-খানায় ঢুকতেই দেখতে পেলেন, কবিরাজ মশাই একজন কালোয়ার শ্রেণীর রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই উপেন্দ্রনাথ বললেন—কার্তিক তোমার কথাই এই লোকটিকে বলছিলাম। এ একজন ধনী মাড়োয়ারী, পুরোনো লোহার কারবারি, চালতা বাগানে গদি। আর ইনিই ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বোস। বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কালোয়ারটি নমস্কার করলে, ডাঃ বোসও প্রতিনমস্কার করলেন।

উপেনবাবু তখন বললেন—পার্কের মাঠে ট্রাম কোম্পানীর ঘোড়ার আস্তাবল উঠে গেল। সেই বড় শেড্টি এ কিনেছে। কিন্তু এখনও ডিসম্যান্টল্ করেনি। ওই শেড্টা পেলে তোমার কারখানা তৈরী করে চালু করা কঠিন হবে না। আর এর পক্ষেও কোন ঝঞ্ঝাট না নিয়েই আসল টাকাটা উসুল হয়ে গেল। দশটা কাজে ভালো লাভ করে একটা কাজে না হয় লাভ বেশী নাই নিল। একটা দেশী ওষুধের কারখানা হলে দেশের কত বড় একটা কাজ হবে,

তত বড় একজন কবিরাজ একটা অনুরোধ করছেন, তাও কিনা একটা দেশের কাজের জন্য; তা কি অস্বীকার করা যায়?

বেশ সস্তায় পাওয়া গেল শেড্‌টি। তখন সবে কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামের বদলে বিদ্যুৎচালিত ট্রাম বসেছে, অগত্যা বেকার হয়েছে ঘোড়াগুলি আর বাতিল হয়েছে শহরের মাঝে মাঝে যে ঘোড়ার আস্তাবলগুলি ছিল সেই সব শেড।

পান্তির মাঠটি ছিল এখনকার বিধান সরণীতে (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইএর দোকানের কাছে যেখানে বিদ্যাসাগর হোস্টেলটি হয়েছে ওই অঞ্চলে। ওখানে ছিল ট্রাম কোম্পানীর একটি ঘোড়ার বড় আস্তাবল। সেই আস্তাবলের শেডটি খুলে নিয়ে তোলা হল মাণিকতলার মাঠে। সেই হল বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার যাত্রা সুরু।

অনেক দিন পরে একদিন মাণিকতলার কারখানায় বিশ্বকর্মা পূজায় নিমন্ত্রিত হয়ে ডাঃ বোসের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। তিনি সেদিন দেখালেন সেই পান্তির মাঠের শেডখানি।

বেঙ্গল কেমিক্যাল শুধু কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল তৈরী করেই ক্ষান্ত হবে তা চাননি ডাঃ বোস। তিনি চেয়েছিলেন সার্জিকাল ড্রেসিং এবং সার্জিকাল অ্যাপারেটাসও তৈরী হবে সেখানে। অ্যাবজরবেণ্ট কটন, লিণ্ট, গজ, ব্যাণ্ডেজ-উপকরণসমূহ তো হতই, শল্য চিকিৎসার অস্ত্রপাতি এবং টেবিল প্রভৃতিও তৈরীর ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে একটি লেদ যন্ত্রও বসানো হয়েছিল মাণিকতলার কারখানায়।

সেদিন ডাঃ বোসকে মাণিকতলা কারখানা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রাক্তন ম্যানেজার এবং ডিরেক্টর রাজশেখর বসু। দেখাতে দেখাতে বললেন—এই সেই লেদ্‌ মেসিনটি, যা আপনি এখানে প্রথম বসিয়েছিলেন, আজও প্রতি বৎসর বিশ্বকর্মাপূজার দিন আমরা এটিকে পরিষ্কার করে তেল সিঁদুর মাখাই।

●

বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে স্যার পি সি রায়, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী প্রভৃতির মত আর একটি নামও একান্তভাবে জড়িয়ে আছে, সে নামটি হল—রাজশেখর বসু। তিনি 'পরশুরাম' ছদ্মনামে যে সব রসরচনা লিখেছিলেন তার তুলনা হয় না। স্বনামেও অনেক অমূল্য প্রবন্ধ অনুবাদগ্রন্থ তিনি লিখেছেন এবং 'চলন্তিকা'র মত একখানি সহজবোধ্য প্রামাণ্য অভিধানও সংকলন করেছিলেন—যার জন্য রাজশেখর বসুকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, হিতোপদেশ অতুলনীয় কীর্তি।

এই রাজশেখরকেও বেঙ্গল কেমিক্যালে এনেছিলেন ডাঃ বোস। এবার বলি সেই কাহিনী।

রাজশেখরের বাবা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গার একজন খ্যাতনামা প্রবাসী ধনী রাজকর্মচারী। দ্বারভাঙ্গার মহারাজের ম্যানেজারের পদ থেকে অবসর নিয়ে তিনি শেষ জীবনে স্থায়িভাবে কলকাতায় বাস করছিলেন। তাঁর সব কটি পুত্রই যশস্বী ও কৃতী হয়েছিলেন। শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর এবং গিরীন্দ্রশেখর এই চার ভ্রাতারই মধ্যে বড় মেজ এবং ছোট এই তিনজন বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। জ্যেষ্ঠ শশিশেখর ইংরাজি রচনাতেও ছিলেন সবিশেষ দক্ষ।

চন্দ্রশেখর যখন কলকাতায় এলেন তখন ডাঃ বোস তাঁর গৃহ চিকিৎসক নিযুক্ত হন। শেষ বয়সে তিনি মূত্রকৃচ্ছ্রতায় কষ্ট পেতেন, যার জন্য প্রত্যহ দেখতে যেতেন। তাঁরই পরামর্শ নিয়ে গিরীন্দ্রশেখরকে ডাক্তারি পড়াতে বলেন। গিরীন্দ্রশেখর কালক্রমে এম-বি পাশ করেন এবং মানসিক পীড়ায় বিশেষজ্ঞ হন। তিনি ডি-এস-সি উপাধিও পেয়েছিলেন। মানসিক রোগগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য তিনি 'লুম্বিনী' হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জীবনে গিরীন্দ্রশেখর ডাঃ বোসের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতেও কাজ করেছিলেন এবং তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে এশিয়ার প্রথম এক্স্‌-রে যন্ত্র বসাবার কালেও গিরীন্দ্রশেখর সেখানে কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতের ঐ প্রথম এক্স্‌-রে যন্ত্রটি একবার বিকল হলে সেটিকে সারাবার জন্য কলকাতায় কোনও এক্স্‌রে যন্ত্রে অভিজ্ঞ এনজিনিয়ার না পাওয়ায় যন্ত্রনির্মাতাদের কারখানায় জার্মানীতে পত্র লেখা হয়। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে, সুতরাং জার্মানী থেকে কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব হল না। ডাঃ বোস তাই গিরীন্দ্রশেখরকে বললেন—দেখ, তুমি যদি কিছু করতে পার।

গিরীন্দ্রশেখর এত বড় দায়িত্ব নিতে ইতস্তত করছিলেন।

ডাঃ বোস বললেন—মেসিনটা এমনিই তো ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তোমার হাতে যদি আরও বেগড়ায় তাতে নতুন কোন অসুবিধা হবে না।

গিরীন্দ্রশেখর বললেন—কিন্তু—মেসিনটা একেবারেই অকেজো হয়ে যেতে পারে।

ডাঃ বোস বললেন—যায় যাবে আমার মেসিন যাবে। তুমি সারাবার চেষ্টা কর।

অগত্যা গিরীন্দ্রশেখর মেসিনটি মেরামতের জন্য চেষ্টিত হলেন এবং কয়েক দিন চেষ্টা করে আবার চালু করলেন। সেই মেসিন আজও চলছে।

ডাঃ বোসের মুখে শুনেছি, তাঁর বড় ছেলে ডাঃ পঞ্চানন বোস যখন জার্মানীতে এম-ডি পড়তে গিয়েছিলেন

আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে যখন 'শরীরের ভিতরের ছবি তুলিবার যন্ত্র' ---(এই ভাবেই তখন তিনি এক্স্-রে যন্ত্রটির বিজ্ঞাপন দিতেন) বসানো হয়েছিল তখনও মেডিক্যাল কলেজে এক্স্-রে যন্ত্র আসেনি। এমন কি শুধু ভারতে নয়, এটি এশিয়াতেই সর্বপ্রথম এক্স্-রে যন্ত্র আমদানি বলে খবর বেরিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকার এই মেসিনের সহায়তায় সৈন্যদের চিকিৎসা করিয়েছেন।

১৯০৩ সালের কথা। ডাঃ বোস তখন চন্দ্রশেখর বসুর গৃহ চিকিৎসক। চন্দ্রশেখরের মধ্যম পুত্র রাজশেখর রসায়নে এম-এ পাশ করে, ল' পাশ করে বসে আছেন। চন্দ্রশেখর ডাঃ বোসকে ধরলেন, বেঙ্গল কেমিক্যালে যদি রাজশেখরকে কোন কাজ দেওয়া সম্ভব হয়।

ডাঃ বোস তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি বললেন,---আচ্ছা দেখি দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে।

দাদা মানে ডক্টর রায়। তিনি তো রাজশেখরের কেমিস্ট্রির পরীক্ষার ফল শুনেই আগ্রহী হলেন। যদিও রাজশেখর তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন না তবু ভালো ছাত্রের প্রতি তাঁর বরাবরই আগ্রহ ছিল। সামান্য বেতনে রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিলেন।

রাজশেখরের চরিত্রে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। মিতাচারী, মিতালাপী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। ফলে তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ বোস এবং সর্বময় কর্তা ডক্টর রায় উভয়েরই বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন।

একবার ডক্টর রায় তাঁর আর্তত্রাণ সমিতির কাজে রাজশেখরের সহায়তা চাইলে রাজশেখর বলেছিলেন---আমি ত্রাণ সমিতির কাজ করতে সম্মত আছি যদি ওর হিসাবপত্র নিয়মিত রাখা হয়।

তিনি বললেন---বেশ তো, সেই ভারটাই তুমি নাও না।

সেবার ত্রাণ সমিতির আয়-ব্যয়ের পাই-পয়সাটিরও হিসাব ছিল, যা কিনা এই জাতীয় ব্যাপারে প্রায়ই থাকে না।

বৎসর ঘুরতেই ডাঃ বোস রাজশেখরকে বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার নিযুক্ত করলেন এবং যখন তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ত্যাগ করে আসেন তখন কার্যত কোম্পানীর পরিচালনার গুরু-দায়িত্ব রাজশেখরকেই দিয়ে আসেন।

প্রথম জীবনে কোম্পানীর সবরকম কাজে ডাঃ বোসের কাছে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন বলে রাজশেখর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁকে গুরুর সম্মান দিতেন। রাজশেখর ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, নিস্পৃহ, ভাববিলাসহীন ও উচ্ছ্বাসবর্জিত সত্যিকারের কর্মী মানুষ। সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী এবং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু সেই মানুষটিও তাঁর অনূদিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ যখন ডাঃ বোসকে উপহার পাঠালেন তাতে তাঁর সশ্রদ্ধ মনের পরিচয়টুকু বাহুল্যবর্জিত সুস্পষ্ট অক্ষরে নিজ হাতে লিখে দিয়েছিলেন---

'আমার গুরু ডাক্তার শ্রীকার্তিকচন্দ্র বসুর করকমলে---

---রাজশেখর।'

ঠিক এই রকম ভাষায় তিনি আর কারো কাছে তাঁর নিজের রচিত গ্রন্থ পাঠাতেন বলে শুনিনি।

লক্ষ্য করবার বিষয়, গ্রন্থ উপহারে এই ভাষা যখন রাজশেখর প্রয়োগ করছেন, ডাঃ বোস তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের কোন সম্পর্কে আর ছিলেন না বরং তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রদ্ধা স্নেহের এই সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে বরাবরই ছিল। একটি ঘটনায় তা আরও পরিষ্কারভাবে জানতে পেরেছিলাম। পরে বলছি সেই কাহিনী।

[ক্রমশ।

জ্যোৎস্নায় চোর

গৌতম গুহ

নীল জ্যোৎস্নায়
ধরা পড়ে গেল চোর—সে প্রেমিক, প্রেমিকের প্রাণ;
বেগুনী ফুলের ভার যামিনীর ঘ্রাণ
বুকে নিয়ে সেই চোর হেঁটে যায় অন্ধকার পাহাড়ের দিক

মহিষের মতো সে নিজেও যে পাহাড়
যেতে পারে ছুটে দিগ্বিদিক
জ্ঞানহারা। বুকে নিয়ে আগুনের স্রোত
সেই চোর পৃথিবীর দিকে রেখেছিল অভিশাপ অর্ণবপোত।

মুখোমুখি সুহাসিনী একবার এসেছিল যদি
রাতভাঙা ডাকাতের জেগেছিল চিরায়ত বোধি

মা দুর্গার আসা আর যাওয়া

মা'র আগমনে আমাদের গোষ্ঠী জীবন হয়ে উঠেছিল উৎসব মুখর, মাত্র তিনটি দিনের জন্যে। দীর্ঘ এক বছর ছিলাম মা'র আসার প্রতীক্ষায়। মা এসেছিলেন, তাঁর সন্তানদের কোলে নিতে; কিন্তু মাকে দেবার মত আমাদের যে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু আমাদের কাতর চোখের জল, আর নিঃস্ব জীবনের বুকভরা হাহাকার। এই দিয়েই সুরু করেছিলাম মায়ের বোধনধারা, সাজিয়েছিলাম তাঁর চরণ-নৈবিদ্য। এইটুকু পেয়েই মা আমাদের খুসী হয়েছিলেন, তাঁর হাসি দিয়ে দীন হীন সন্তানদের মুখেও হাসি ফুটিয়েছিলেন। তাই না বলি, মার আসা আর যাওয়া, এইটেই হল আমাদের কাছে সব থেকে বড় জিনিষ---বছরান্তে একবার, শরতের সমাগমে।

ঠিক এমনি ভাবেই, সুদূর অতীতের কোন এক শরতের মহা আনন্দের লগ্নে গিরিরাজের ঘরেও শারদীয়ার আহ্বান এসেছিল। সেদিনের সেই ছবিখানিই আজ আর একবার নতুন করে তুলে ধরছি। তাহলেই বুঝতে পারব যে, মা'র এই আসা যাওয়া আমাদেরই বাঙালী ঘরের মা ও মেয়ের এক অতি মনোরম কাহিনী। এ যে আমাদেরই জীবনের একখানি প্রাণবন্ত ছবি, কতকালের বুক চিরে আজো চলে আসছে।

তাই না বলে পারছি না;—বাঙালীর আদর্শ মা হলেন মেনকা, আর উমা হলেন তাঁরই আদর্শে গড়া মেয়ে। দীর্ঘ এক বছর পর মেয়ে আসবে বাপের বাড়ী। তাই মেয়ের আসাপথ চেয়ে রয়েছেন মা। আর আসতে যত দেরী হচ্ছে, মা'র মন যে ততই অধীর হয়ে উঠছে। এই রকম হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তা না হলে মা কিসের? জন্যে মা'র প্রাণ যে কেমন করে তা মায়েরাই জানে; এমন কি বাপেও তা বোঝে না। তাই মা'র মনের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কিছুর তুলনা চলে না। মা চিরকালই মা! রাজরাণী মা'র অন্তরেও সন্তানের প্রতি যে মমতা, ভিখারিণী মা'র অন্তরেও ঠিক তাই। সুতরাং গিরিরাণী যে উমার আগমন-প্রতীক্ষায় থেকে থেকে অধীর হয়ে উঠছেন, তাতে তো বলার কিছু নেই। এ ছবি যে আমাদেরই ঘরের ছবি। যদিও এ ছবি কবির মানস-পটেই আঁকা, তথাপি

সুরেখা দে

এ যে একেবারে বাস্তব, এ যে আমাদেরই ঘরের কথা, যাকে কবি বাণীরূপ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর কাব্য-জগতে।

এই কাব্য জগতে রয়েছে ভাবের এক ঘনীভূত অবস্থা, সেখানে দেখছি, শরতের মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে নীল আকাশের কোলে। মাঝে মাঝে আলো আঁধারের খেলা। ময়ূর-ময়ূরীর ডাক আর আনন্দের নাচ। সমগ্র প্রকৃতি রাজ্যে আগমনীর সাড়া জেগেছে। এত সব দেখে মায়ের মন কি আর স্থির থাকতে পারে? না, তা পারে না বলেই গিরিরাণী, একবার ঘরে, একবার বাইরে, আসছেন আর যাচ্ছেন, নিজের মনেই ডাক দিচ্ছেন;---

'এলি কি রে উমা'?

কিন্তু না---উমা তাঁর এখনো এসে পৌঁছল না, অথচ তার আসার লগ্ন তো পড়ে গেছে। ব্যাকুল হৃদয়া মেনকা যে কি করবেন, তা ঠিক করে উঠতে পারছেন না। তার উপর আবার পাড়ার দিচ্ছে। তাদের সকলের মুখেই এক কথা,---কি গো গিরিরাণী, মেয়েকে কি আনবে না? এখনো কি তাকে আনার সময় হয় নি?—ইত্যাদি ইত্যাদি---বলি, মা-গো-মা---তুমি কেমন ধারা মা তা জানি না। শরৎ এসে গেল, অথচ উমাকে আনার সময় হল না। বলে হারি যাই---।

'ধন্য তুমি ওগো রাণী,
কঠিন তব মন
মায়েরে আনিতে নাম
নাই মা মুখেতে
উদরেতে অন্নরাণী,
দেও কি সুখেতে।'

ইত্যাদি কত কথা।

আবার কেউ কেউ বলে, আহা গো, উমার দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। ফাটবার তো কথাই। সোনার বরণী উমার অঙ্গে একটা বাঘ ছাল ছাড়া কোন বস্ত্র নেই। মাথায় তার এক ফোঁটা তেল জোটে না। তাই বাছার মাথাভরা জটা। তার সোনার অঙ্গে এক রতি সোনার অলংকার নেই, একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা সম্বল। এমন কি দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও জোটে না। মা তার পাষাণী বলেই এমন করে মেয়েকে ভুলে থাকতে পারে। অন্য কোন মা হলে মেয়ের এমন দুঃখ শুনে নিজের জীবন বিসর্জন করত।

এই সমস্ত শাক্ত কবিদের কল্পনা প্রসূত বটে; কিন্তু এ কোন ইন্দ্রপুরীর কাহিনী নয়---আমাদের সংসারের কথা।

যাই হোক, লোকের মুখে এই সব কথা শুনে গিরিরাণী কাঁদতে কাঁদতে গিরিরাজকে বললেন---

'আশ্বাসি রেখেছ মোরে,
শরতে আনবে মারে
সে কোথায় বিশ্বাস করে,

তাই বলি হে নিলাজ!
কর হে যাত্রার সাজ।'

কিন্তু এততেও 'নিলাজ' স্বামীর মুখে লজ্জার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। গিরিরাণী তখন কটু কথা বললেন---

'তুমি তো পাষাণ-রাজ কঠিনের শেষ
তোমার শরীরে তো কভু নাহি দয়ার লেশ।

কিন্তু এতেও কোন ফল না দেখে গিরিরাণী রাগে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে বললেন---

'উমা ভাবে মা পাষাণী---
লোকেও কয় পাষাণী রাণী।
আমি যে পাষাণ-অধিনী,
এ কাহিনী কেউ না জানে।
কায়া তব পাষাণ বলে,
অন্তরেও কি পাষাণ হলে
অমন মেয়ের মায়া ভুলে,
নাহিলে গিরি কেমনে।'

এতক্ষণে বোধহয় গিরিরাজের প্রাণে একটু দয়ার উদ্রেক হল। তাই রাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন বা জানালেন যে---

'যার নাম ভবের ভাবনা দূরে যায়
তার জন্য ভাব রাণী, এ ত বড় দায়।
কহিলে যে অন্ন নাই, জামাতার ঘরে
সে কথা কেবল কথা জানিও অন্তরে।
উমারূপে অন্নপূর্ণা গৃহেতে যাহার
অন্নের অভাব রাণী হয় কি তাহার?

শেষে বললেন---

'আমাদের জন্ম কর্ম সফল করিতে
জন্মেছেন মহামায়া তোমার গর্ভেতে।
জেনে শুনে সকলি কি ভুলিলে হে রাণী
শিব সে পুরুষোত্তম প্রকৃতি শিবানী।'

শেষের এই দুই ছত্রে শাক্ত কবি কি সুন্দর ও সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টি-তত্ত্ব। কিন্তু মায়ের মন এসব বুঝতে চায় না, সে চায় সন্তানকে কাছে পেতে। তাই গিরিরাণীকে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে বাধ্য হয়ে বললেন---

'এই চলিলাম আমি কৈলাস শিখরে
এনে দেব উমারে আর জামাই শঙ্করে।'

গিরিরাণী তখন আনন্দে আট-খানা হয়ে নানারকমের মিষ্টি বেঁধে দিলেন জামাই খাবে বলে, বিশেষ করে ভাং-এর লাড্ডু ও বেশ কিছু পরিমাণ সিদ্ধি দিয়ে দিলেন। যথা সময়ে গিরি-রাজ গিয়ে উপস্থিত হন কৈলাসে। বাবাকে দেখামাত্র উমা ছুটে এসে প্রণাম করে বলে;---বাবা, বছর কাটতে চলল---আমায় কি নিয়ে যেতে তোমার ইচ্ছে করে না? বলতে বলতে উমা-রাণীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। গিরি রাজ আদর করে মাথায় হাত রেখে বলেন---মা, তুমি যে আমাদের চোখের মণি ইত্যাদি বলে মেয়েকে ভোলাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর জামাই এসে উপস্থিত হলেন সিদ্ধির ঘোরে বিভোর হয়ে। তারপর মেজাজের মাথায় জানা-লেন যে, শিবানীকে পাঠান সম্ভব নয়, কারণ শিবানী বিনে শিবের যে একপও চলে না। তখন গিরিরাজ নরম স্বরে জামাইকে বললেন---

'আশুতোষ কর অবধান
তিন দিন জন্যে মোরে উমা দেহ দান
সপ্তমী, অষ্টমী, আর নবমী রাখিব
দশমীর দিনে পুনঃ উমা পাঠাইব।'

এতো আমাদেরই ঘরের কথা। জামাইকে অনুরোধ বৈ জোর করা চলে না। পরের দিন সকালে উমাকে নিয়ে রওনা দিলেন, এবং উমার সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। উমা আসতেই গিরিরাণী পাগলিনী প্রায় ছুটে এসে---কই, উমা কই?

'আয় মা একবার করি কোলে।'

অভিমানে মেয়ে মার গলা জড়িয়ে কেঁদে পড়ল। তারপর কত সুখ-দুঃখের গল্প হতে লাগল মা-মেয়েতে। পাগল স্বামী নিয়ে উমার যে কত কষ্ট তাও মাকে বলতে শুনি; এবং সে কথা শুনে মা'র বুক ফেটে যায় সত্যি, কিন্তু কি আর করবেন, জামাইকে তো আর কিছু বলা যায় না।

উমা মাকে বলছেন:---

'আমায় বড় দেয় দাগা
সারা রাতি পাগল নিয়ে
যায় না গো মা জাগা।
দিনে রেতে সিদ্ধি বাটি
ভূতে খায় মা বাটি বাটি
বললে পরে শোনে না মা
তার উপরে মিছে রাগা।'

দেখতে দেখতে মহা অষ্টমী কেটে গেল। 'মহা নবমীর রাতি পোহালে উমা আবার যাবে চলে'। এই এক চিন্তা মেনকার মাতৃ-হৃদয়ে। এ বেদনা শুধু গৌরীর মায়ের বুকেই নয় এবং এ হচ্ছে আমাদের প্রতি ঘরের মাতৃ-হৃদয়ের অপত্য-স্নেহের বেদনা। মেয়েকে বিদায় দিতে হবে, মা তাই কাঁদেন। মা তাকে কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। হায়, তবু যেতে দিতে হয়। 'যেতে নাহি দিব' বলার উপায় নেই। 'যাক না মা দিন কত'। বললেও মেয়ে আর থাকতে পারে না। তাই মেয়ে শুধু একটা কথা বলেই কাঁদতে কাঁদতে মার কাছ থেকে বিদায় নেয়---

'তোর কাছে প্রাণ পড়ে রৈল,
মা গো।'

এইটুকুই মা'র অন্তরে ব্যথার প্রলেপ। মা তখন মেয়ের ঐ মলিন মুখে মিষ্টি দিয়ে চুমু খেয়ে বলেন---আবার এসো। চোখের জল মুছতে মুছতে মেয়ে তার উত্তরে বলে---আসব মা। মা'র চোখে শুধু মেয়ের মলিন মুখখানিই ভাসতে থাকে।

[ছবি মার্জিত আকারে ও পালিশ কাগজে পাঠাবেন]

দ্বারপাল (ভেলোর মন্দির)
—অরূপ ঠাকুর
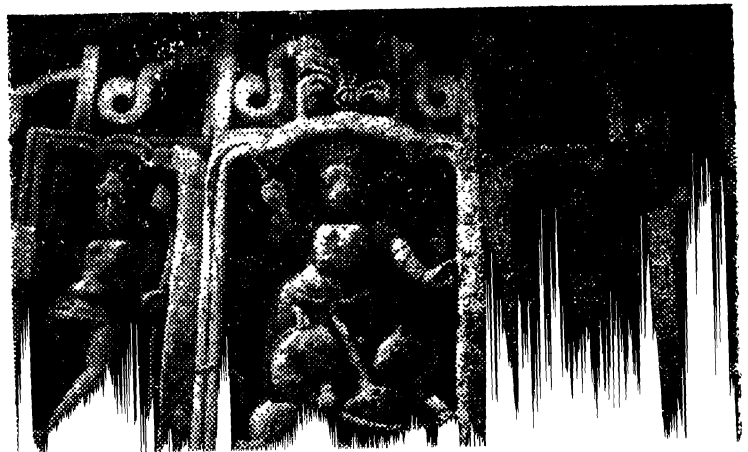
শ্রীশ্রীদুর্গা (পোড়ামাটি, বাঙলা)
—জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

—আলোকচিত্র—

১ম পুরস্কার	২০ টাকা	
২য়	"	১৫ "
৩য়	"	১০ "

বিষয়বস্তু

অগ্রহায়ণ : উঁচু থেকে নীচু

পৌষ : যাত্রীর যাত্রা

মাঘ : ফ্যাক্টরী

—প্রতিযোগিতা—

খাজুরাহো

—অজিত গোস্বামী

দুর্গ
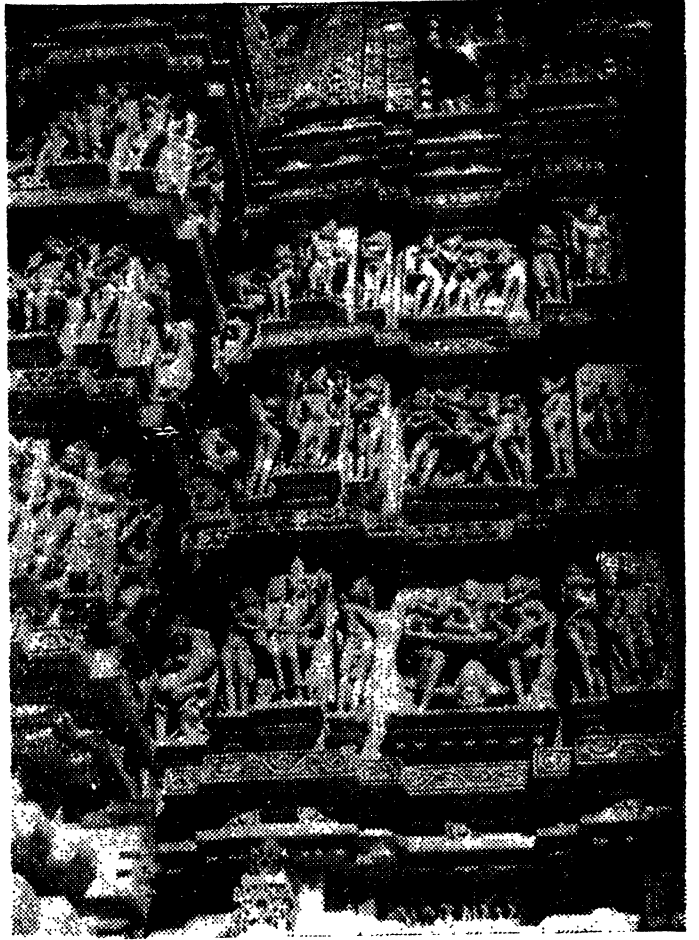
—বিজয়কুমার আচার্য

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির (নেপাল)

—সমীরকুমার বসু

ইঞ্জিনের খাদ্য
—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্লীল ও অশ্লীল এবং সাহিত্য

॥ এক ॥

১৮৬১ খৃস্টাব্দে মধুসূদন দত্ত যখন লিখলেন 'প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী', তাঁর বিরুদ্ধে দেবচরিত্রের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল (আজও তিনি নিঃশর্ত মুক্তি পান নি !)। অথচ, সামনেই ছিল কালিদাসের কুমারসম্ভব, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন—যেখানে শিবের কামাতুর ও অবলুণ্ঠিত চরিত্র আরও বিস্তৃত, আরও গাঢ়তর ! এবং সেকালের কলকাতার অন্যতম উত্তম আমোদ-উপকরণ ছিল দেহলীলায়িত বিদ্যাসুন্দর যাত্রা !

এই পরস্পর-বিরোধী তথ্যটা, আমার মনে হয়েছে, একটা বিরাট প্যারাডক্স্, বিস্ময়কর বিরোধাভাস।

কিছুদিন আগে, শহর-কলকাতায় সাহিত্য ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গে বাদানুবাদ লক্ষ্য করে মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ইতিহাসটা বারবার মনে পড়েছে। বর্তমান স্বদেশী নাটকে অশ্লীলতা, স্বদেশী চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা, চোদ্দটি রাষ্ট্রভাষার পত্র-পত্রিকায় সমাজচিত্র ও যৌনচর্চার নামে অসভ্যরকম রুচিবিকৃতি—এসবের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদও না। ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজসেবা, পৌরশাসন, চাকরী ইত্যাদির নামে অহরহ দুর্নীতি ঘটে চলেছে— তার বিরুদ্ধেও একটা প্রতিবাদ না। অশ্লীলতা যেখানে যেখানে জমাট আবর্জনা-স্তূপ, তাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়ে, শুধু সাহিত্যের স্কন্ধে শ্লীলতার কোপ—এও একটা বিরাট পরিহাসবিজল্পিত বিরোধাভাস। সম্ভবত, প্যারাডক্স্ আমাদের মজ্জাগত। একশো বছর আগেও যেমন, তেমনি আজও, অজর অমর অক্ষয়, হয়তো অব্যয়ও !

এই প্রসঙ্গে যৌনচিত্র অশ্লীল কিনা, সে বিষয়ে শিল্পতাত্ত্বিক বিচার অনেকে করেছেন। ইতিপূর্বে 'অভিযুক্ত' গ্রন্থাবলীর উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন আরও অনেক। পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যাও বাদ যায় নি। তবু, শেষ সিদ্ধান্ত মেলে নি। কারণ, এ-তর্কের শেষ নেই। এবং এসব যুক্তি-

॥ দুই ॥

প্যারাডক্স্ রয়েছে এই আবর্তিত আলোচনা-তর্কের মধ্যেও। যাঁরা অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিলঃ যৌন বর্ণনা অশ্লীল, এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী। যাঁরা অস্বীকার বা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের বক্তব্য : যৌনতা একটি বাস্তব ব্যাপার, এবং তার ছবি যথার্থ সত্যের প্রতিলিপি, সুতরাং শ্লীল।

প্রথমে ঐতিহ্যের কথা ধরা যাক।

কামশাস্ত্রের প্রবক্তা বাৎস্যায়ন, বাৎস্যায়নের দেশ ভারত। যেখানে একদা কামকলা ছিল অবশ্য-শিক্ষণীয়, সেখানে যৌনচর্চা একটি উচ্চস্তরের আর্ট ছিল। যে-দেশের পথে-প্রান্তরে উপাস্য লিঙ্গ-যোনি-গৌরীপট্ট, সাধ্য ভৈরবীচক্র-মহারাস-

গুরুদাস ভট্টাচার্য

পঞ্চরস, সম্প্রদায় লিঙ্গায়েৎ-সহজিয়া-রসেশ্বর, সে দেশে যৌন-অনুশীলন ঐতিহ্য-বিরোধী—এটা একটা নতুন তথ্য বটে !

বস্তুত, ভারতীয় সংস্কৃতির এ বিষয়ে একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় গ্রীক সংস্কৃতি, যার সাহায্যে এখানে যৌন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ধর্মসাধনা ও শিল্পসাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। ভারতীয় ঋষি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : আদিতে ছিলেন প্রজাপতি, দ্বিতীয়া ছিলেন বাক্ ; (তিনি ভাবলেন) এক আছি, বহু হব ; জাগল জ্যেষ্ঠ "কাম" ; (প্রথম ও দ্বিতীয়ার) তাং মিথুনাং সমভবৎ, গর্ভী অভবৎ (শতপথ ব্রা)। সৃষ্টির সূচনা কামে, বহুলত্ব মৈথুনে। সৃষ্টির লীলাও তদ্বৎঃ বাহুপ্রসার পরিরম্ভকরালকোরু নীবীস্তনালম্ভননর্মনখাগ্রপাতৈঃ। ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)।

মরমীয়া সাধন-সাহিত্যের অন্যতম উৎস 'সলোমনের গান'-এ যৌনক্রিয়া সন্ধাভাষার উপকরণ :

His left hand is under my head and his right hand doth swords, being expert in war : every man hath his sword upon his thigh because of fear in the night. O prince's daughter ! the joints of thy thighs are like jewels. Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled. My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels were moved for him. I rose up to open to my beloved (Old Testament).

ভারতের মরমীয়া সাহিত্যেও অনুরূপ চিত্রকল্প প্রচুর : যবু শোয়ে তবু দুই জনা, যবু জাগে তবু এক...সুরতী শিলাপর ধোইয়ে, নিকুলে জ্যোতি অপার (কবীর)। এই মরমীয়া ভাষার নিদর্শন আধুনিক কালেও, যেমন রবীন্দ্রনাথেঃ 'নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম' !

হোমরের কাব্যে ইন্দ্রিয়বোধ, ওভিদ হোরেসে চতুর সম্ভোগ। সংস্কৃত সাহিত্যে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ। সর্বত্র সেই 'তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো'। বা, ঋতুসংহারের 'নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাং, অলংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি। কাম-মদালসাঙ্গঃ'—নর-নারীরাই ধ্রুপদী সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা। ত্যাগ-বিরতির ধ্রুব স্বর্গে যখন উত্তরণ ঘটেছে, ভোগের চূড়ান্ততার পরেই। এ দেশের মন্দিরদেহে মিথুন-মূর্তি তাই আকস্মিক নয়, বিস্ময়-উৎপাদকও নয় ; বরং নানাভাবে তাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলেছে বারেবারে। শুধু মন্দিরগাত্রে কেন, ভারতীয় শাস্ত্রে-সাহিত্যে-মূর্তিকলায় দেব-দেবীর মিথুন-প্রতিমা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

সমালোচকগণ পণ্ডিত ব্যক্তি। এসব তথ্যই তাঁদের জ্ঞাতবিষয়। তবে, যৌনচিত্রকে অভারতীয় বলেছেন কেন ? যাঁরা বিদ্যা-সুন্দরের রমণলীলায়, বিপরীত বিহারে লীলারস আস্বাদ করতেন, তাঁরা মধুসূদনের তিনটি শব্দকে আক্রমণ করেছিলেন কেন ? তার কারণ, ঊনবিংশ শতকের শহর-কলকাতায় ইংলণ্ড থেকে নবাগত একটি আদর্শ : পিউরিট্যানিজ্‌ম্।

যুগে—রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে প্রুপদীয়ানার পুনরাবির্ভাব। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পায়। পাঠকদের সংখ্যা বেড়ে যায় কল্পনাতীতভাবে। সাহিত্যে এর প্রভাব পড়ে। যেহেতু, মধ্যবিত্তরা সাধারণত সনাতনপন্থী, নীতিবাগীশ, কিছুটা বিরসও। এরা চায় ঐতিহ্যে আশ্রিত হয়ে শুচি থাকতে। এই "অস্বচ্ছ শুচিতার বোধ"ই ভিক্টোরীয় পিউরিট্যানিজ্‌ম্‌। এই পিউরিট্যান শুচিজ্ঞান উনবিংশ শতকের বঙ্গসংস্কৃতিতে ওতপ্রোত হয়ে যায় ; এবং তখনই প্রেমামোদে মাতিলা বিদ্যুলীকে অশ্লীল মনে হয়। দিনে-দিনে এই বোধ আজও পরিপুষ্ট ; এবং তারই ফল : সাম্প্রতিক সাহিত্যিক যৌন-চর্চার বিরোধিতা।

একইভাবে, এঁরা অতীতের যৌন চিত্রলিপির বিরোধিতা করেন না কেন ? কেউ কেউ অবশ্য করেন, অনেকে করেন না। তার কারণ : ঐ ঐতিহ্যবোধ। তার কারণ : (প্রুপদীয়ানা ও রোমান্টিকতার সংঘাত, এবং অন্যান্য কার্যকারণে) ভিক্টোরীয় যুগও একটা প্রচণ্ড প্যারাডক্‌স্‌।' ম্যাথু আরনল্ড ইংরেজ-চরিত্র বিচার করে তাই বলেছিলেন : 'ইংরেজ অভিজাতরা বর্বর, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইতর, জনগণ বোধবুদ্ধিহীন।' এবং আরনল্ড হাউসার ভিক্টোরীয় শুচিতার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন : বেদীর সামনে নগ্ন নতজানু এক তরুণী নান যাজকদের সামনে দেহদেউলের প্রদর্শনী মেলে ধরেছে। হাউসারের ভাষায় : 'এক ধর্ষণের পর্নোগ্র্যাফী।'

॥ তিন ॥

একদিকে বর্বরতা-ইতরতা-নির্বুদ্ধি, অন্যদিকে ঐতিহ্য-আশ্রয়ী শুচিজ্ঞান—দুই প্রান্তের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত ইংরেজী রক্ষণশীলতা সেদিন ফরাসী কলাকৈবল্যবাদকে 'কামগন্ধী সাহিত্যায়ন' বলে চিহ্নিত করেছিল। ওয়াইলড্‌-সুইনবার্নের রচনায় তার গন্ধ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়েছিল। পোষাকী শুচিতার মনে হয়েছিল : 'ভিক্টোরীয় ড্রয়িং রুমে অকস্মাৎ তৃষিত মদনের আবির্ভাব' (এতদ্দেশীয় পিউরিট্যানদের এখনও এই ধারণারই চর্বিত চর্বণ!) অথচ 'কলাকৈবল্যবাদ' তৎকালীন ফ্রান্সের পরিবেশজাত একটি বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শন। গতিয়ে-মেরিমে-ফ্লবেয়ার-উগোর রচনায় এই দর্শনের বিবিধ ও বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে। এমন কি, বোদলেয়র-এর 'অসুন্দরের সামঞ্জস্য' তত্ত্বও এই জাতীয় দর্শনের একটি স্তর। এবং ইমেজিস্ট্‌ কবিদেরও। এবং ন্যাচেরালিস্ট ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদেরও।

ইংলণ্ডীয় প্রভুদের দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে আমরা আজও দুনিয়াকে দেখি' ফরাসী জীবনাদর্শ ও শিল্পতত্ত্ব বিচারকালে ফরাসী জীবন ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না, ইংরেজ সমালোচকের উক্তিকেই বেদবাক্য বলে মনে করি। অথচ, ফরাসীদের চোখ দিয়ে ফরাসী সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে : কলাকৈবল্যবাদ আদৌ তথাকথিত 'কামায়ন' নয়। বরং যৌনতাকে এখানে আর্টের জগতে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে প্রায় ধর্মসাধনার মতো নিরলস তপস্যায়—গল্পে-নাটকে-কবিতায়-ভাস্কর্যে-চিত্রকলায়, নানাভাবে। এবং এই সূত্রে 'মেডুসা-সৌন্দর্য' ও 'ফাম্‌ ফাতাল' বা 'চিরন্তনী নারী'র এক বিশিষ্ট জাতীয় রূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে। যৌনক্রিয়া এর অঙ্গীভূত—পর্নোগ্র্যাফী নয়, আর্ট রূপে।

অবশ্য 'বটি-সাহিত্য'ও য়োরোপের দান, যা অতলান্তিক পেরিয়ে আমেরিকার ছত্রাকের মতো বিস্তারকামী। উইমেন, মেন, ইত্যাদি গ্রন্থাবলী, নাইট অ্যান্ড ডে, পিগাল, দ্য ন্যুড, ট্যাবু, ইত্যাদি পত্রিকাও সাগরপারাগত। কিন্তু কোন বয়স্ক জাতিই আগাছাকে ফসল বলে ভুল করে না।

কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা গতিয়েরের 'ক্লিওপেট্রার এক রাত্রি' ইংরেজের মতে অশ্লীল সাহিত্য, ফরাসীদের মতে নয়। আমরা কাকে গুরু বলে মানব ? ভারতীয় ঐতিহ্যও এ বিষয়ে পিউরিট্যানিজ্‌ম্‌-এর বিপক্ষ ! এবং য়োরোপের অন্যান্য দেশে, এমন কি রাশিয়ার পুশকিনের রচনায়ও ক্লিওপেট্রা-কাহিনী গৃহীত হয়েছে। এই ক্লিওপেট্রা য়োরোপীয় 'ফ্যাটাল উওম্যান'-এর এক আদি রূপ। যে রাত্তর শয্যাসঙ্গীকে পরদিনের আলোয় ঠাণ্ডা রক্তে হত্যা করত ; এমনই প্রত্যহ। এইরকম এক রাত্রির বর্ণনা করেছেন গতিয়ের তাঁর গল্পে এবং ক্লিওপেট্রাকে পরিণত করেছেন চিরন্তনী নারীতে—দেহ-বিলাসিনী, রহস্যময়ী, প্রেমিকা, নিষ্ঠুরা, রুচিসম্পন্না, উদাসিনী, লালসাময়ী, শক্তিময়ী, লীলাবতী স্ত্রী-মাকড়সা !

শুধু নারী নয়, রহস্যময় হিংস্র পুরুষ 'ওম্‌ ফাতাল' (ফ্যাটাল ম্যান) ও ফরাসী সাহিত্যে লক্ষণীয়। গতিয়েরের নায়ক আলবার্ত স্বপ্ন দেখে—এক বিরাট প্রাসাদ; অলিন্দে চন্দ্রাতপের নীচে বসে সে লম্বা পাইপ টানছে, আর পা রেখেছে এক নব-যৌবনা ক্রীতদাসীর নগ্ন বুকের ওপর !

মার্কুইস দ্য সাদের প্রভাবে ধর্ষণ ও মর্ষণকাম এই সাহিত্যের অঙ্গীভূত। শুধু ফ্রান্সে নয়, ইতালীতেও। ডি আনুনজিও, যাঁর নায়িকা ঘোষণা করে—

It is not true that the perfection of love lies in the joining of two persons এবং Nothing ... সংগমের বর্ণনায় সাদিজমের আশ্রয় নিয়েছেন—

And in the vivid twilight took place the fierce wrestling of two enemies joined together by the middle of their bodies, the growing anguish of the neck with its arteries swallon and crying out to be severed.... The man cried out as though his virility were being torn from him with the utmost cruelty ; he raised himself, and then fell back. The woman quivered, with a rattling sound which broke into a moan even more inhuman than the man's cry. And both remained exhausted on the floor (Forse che. si).

ডস্টয়েভস্কী লিখেছেন : রাশিয়ান চরিত্রে 'সাদিজ্‌ম' সবচেয়ে উপযোগী বৃত্তি। এবং তাঁর রচনাতেও (যেমন 'ইডিয়ট'-এর উপসংহারে) এই বৃত্তির অভিব্যক্তি। অন্যত্র :

Beauty is mysterious as well as terrible. I loved vice, I loved the ignominy of vice. I loved cruelty : am I not a bug, am I not a noxious insect ? In fact, a Karamazov!

এবং 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'-এ সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত :

He pulled the axe quite out, swung it with both arms, scarcely conscious of himself, and almost without effort, almost mechanically, brought the blunt side down on her head ; পুনশ্চ : The axe fell with the sharp edge just on the skull and split at one blow all the top of the head. She fell heavily at once.

স্ট্রিণ্ডবার্গের 'মিস জুলী'তে এই ধারা অব্যাহত, এবং এডগার অ্যালান পো-র রচনাতেও—

To know a living thing is to kill it. You know your woman darkly, in the blood.

—(লরেন্সের ভাষ্য)।

অন্যতম কলাকৈবল্যবাদী মেরিমের কণ-দেশে প্রবেশের বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভিক্টোরীয় শুচিতাবোধে নয়; যেহেতু এই লেখকে তিনি উন্নীত করেছিলেন

চেতনায়। তথাপি তাঁর রচনায় বোদলেয়রীয় অসুন্দরতাতত্ত্ব দুর্লভ নয় ; যেমন দুর্লভ নয় ফরাসিনী 'ফাম ফাতাল'। 'উর্বশী' কবিতাটি তারই নিদর্শন— (সুইনবার্ন-মাধ্যমে সম্ভবত অনুপ্রাণিত)। এমন কি, তাঁর, 'জীবনদেবতার' রূপ-পরিকল্পনাও রহস্যময়ী 'ফাটাল উওম্যানের' মৌলিক চিত্রকল্প। এবং সন্দীপ 'স্যাটান্'-উপম 'ফ্যাটাল ম্যান'-এর প্রতিকল্প। এবং রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে আকস্মিক বা অসচেতন নয় এই বর্ণনাটি : 'সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো— যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু। ...আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা ! সেই ক্ষুধার পুঞ্জ ! আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম' (চতুরঙ্গ) ; এবং সেই বর্ণনাটি : (এলা) 'মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বারবার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে,"মারো এইবার মারো"। ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা' (চার অধ্যায়)।

মেড ইন ইংলন্ড চশমাটা খুলে ফেলে প্রাচীন ভারত এবং আধুনিক কন্টিনেন্টের দিকে মুক্ত দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে : যৌনতামাত্রেই অশ্লীল নয়; যৌনক্রিয়া ও চিত্রকল্পও আর্ট হতে পারে ; এবং উচ্চচিন্ত দার্শনিকতাও ; এবং বিজ্ঞানসম্মত।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে যৌনতার প্রভাব এসেছে মুখ্যত দুটি অববাহিকায় : ফ্রএড-এলিসের যৌন-মনস্তত্ত্ব, এবং সমকালীন সাহিত্য। দ্বিতীয় অববাহিকাটিই প্রবলতর— এর দুটি ভাগ।

এক : অ্যাংগরী জেনারেশন ও বীট্নিক রচনার সংস্পর্শ। এ প্রভাব অবশ্য ইদানীন্তন। কিন্তু অল্প সময়েই পরিপার্শ্বকে আন্দোলিত করে তুলেছে। এজাতীয় রচনার সর্বাধুনিক পরিণতি 'ধ্বংসকালীন কবিতা'য়, যেখানে কবি কল্পনা করেন 'যোনির দেয়াল ধরে ঝুলে আছি চামচিকের মতো' এবং যোনি-নিঃসৃত রস পান করেন সসুখে।

দুই : কল্লোল যুগ ও তার উত্তরাধিকার। যখন বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন : 'নির্বোধ নারীর পাল, স্থূল মাংস-স্তূপ। শরীরসর্বস্ব, মূঢ়। চর্ম-সাথে চর্মের ঘর্ষণ একমাত্র সুখ যাহাদের,' বা 'জানি তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক, যবে চক্ষু নির্মীল' পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি' (বন্দীর বন্দনা)।

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক বাঙালী লরেন্স, সকা, জেমস জয়েস, জেমস মিলার, কল্ড্ওয়েল, সার্ত্র, কাম্যু, কাফ্কা, মোরা-ভিয়া, সাস, জাঁদ, সাদ প্রমুখ (এবং পেপারব্যাকে ছাপা বেশ কিছু দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর 'জনপ্রিয়' লেখক-লেখিকাও)।

এইসব রচনা কতোটা প্রভাবিত, কতোটা অনুবাদ/অনুসরণ/বিকৃতি, অথবা পরস্ব-হরণ, তার ঐতিহাসিক আলোচনা অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক। তার চেয়েও বড়ো কথা— এতো গ্রহণ-বরণ সত্ত্বেও বিদেশী ও স্বদেশী সাহিত্যের মহাসাগর-প্রমাণ ব্যবধান। আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতি প্রাচীন ভারতের শিল্প-ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেছে, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতেও অধিকার লাভ করতে পারে নি। আত্মনেপদীও হতে পারে নি। তবু চলছে, বেশ ধাক্কা দিয়েই চলছে—প্রকাশকের আনু-কূল্যে, বিজ্ঞাপনের চাতুর্যে, অনগ্রসর দেশের জটিল পরিপার্শ্বের সুযোগে, এবং অসচেতন অর্ধ-চেতন পাঠকসমাজের অসতর্কতায়।

লেখক দেখলেন বা দেখলেন না, ভাবলেন আর লিখলেন—ইউরোপের সাহিত্য-সৃষ্টি এই জাতের বা ধরনের নয়। সেখানে জীবন-মানুষ-মানস নিয়ে প্রত্যহ ও প্রত্যক্ষ নিরীক্ষা চলছে ; অণু থেকে অনন্ত পর্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ-গবেষণা এবং বাস্তবে তাদের পুনশ্চ প্রয়োগ। জীববিদ্যা থেকে প্রজননতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা থেকে সাইবার-নেটিক্স, সমাজতত্ত্ব থেকে কারিগরীবিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির বিশ্লেষণ, মনোজগতে অবগাহন, ভূবিদ্যা, মহাকাশ-চারণ—অস্তিত্বের সমস্ত দিকে কর্মতৎপরতার ও মননশীলতার ব্যাপক বিপুল আয়োজন। নিত্য নতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ব্যবহার ; নিত্য নতুন দর্শনের সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষা ; নিত্য নতুন শিল্পতত্ত্বের চর্চা ও উপস্থাপনা ; প্রেমের-সৌন্দর্যের-যৌনতার বিচার-বিশ্লেষণ এবং উপলব্ধি এবং উপভোগ। সমাজসমীক্ষা ও আত্মনিরীক্ষণ। এবং এই সমস্ত বিষয় শুধুমাত্র একমুঠো পণ্ডিতে-বিশেষজ্ঞে সীমাবদ্ধ নয়, জনগণের ঘনিষ্ঠও—রচনা বক্তৃতা-বেতার-চলচ্চিত্র-টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে। পূর্ব ও পশ্চিম, উভয় য়োরোপেই। পথ-মত আলাদা, কিন্তু অগ্রগতির মৌল চরিত্র অভিন্ন।

সুতরাং পাশ্চাত্যের রসবান সাহিত্য স্বয়ম্ভূ নয়, তার ভিত্তিমূলে রয়েছে বিপুল সারবান সাহিত্য। শুধু সাহিত্য নয়, তার যাবতীয় শিল্প-সৃষ্টির পটভূমিকায় উপস্থিত বাস্তব-অনুশীলন, দার্শনিক বিচারণা, বিজ্ঞানমনস্কতা। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ জীবন-দর্শনেরও। যৌনতা নিয়ে যারা তথ্যসম্মত শাস্ত্র রচনা করেছে, কামশাস্ত্রকেও চলচ্চিত্রে রূপদানের সাহস তারা রাখে।

আর, আমাদের দেশে?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'যথার্থভাবে রসগ্রহণের অধিকারী হইতে গেলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই দরকার। জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত, আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত।' এখানে সংস্কৃতির 'কঠিন চাষ' নেই, জ্ঞানের 'শক্ত ভিত' নেই, তাই আনন্দও নেই। শুধু আছে— 'রসের পথে পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ' (সৌন্দর্যবোধ)।

বাৎস্যায়ন কবে কামশাস্ত্র লিখে গেছেন। তারপরে লিখলেন স্তেদাঁল, মরোয়া—ফ্রএড, ইয়ুং, নিউম্যান, রাইলদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু ভারতে তার পুনরাবৃত্তি হল না। প্রেম-দাম্পত্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পর আর কোন সাহিত্যিককে এ-বিষয়ে উদ্যোগী প্রবন্ধ লিখতে দেখা যায় না।

মার্গারেট মীডের সংস্কৃতি-বিচার, বা সিমঁ দ বোভোয়ার 'হিস্ট্রী অফ সেক্স,' বা কেনেথ ক্লার্কের 'দ্য নুড,' বা হার্বার্ট রীডের শিল্পচর্চা—এদেশে অভাবনীয়। দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে, তারও যোগ্য সমাদর হয় না। যতোটা লেখা হয়, তার বেশির ভাগই সাংবাদিকসুলভ লঘু ভঙ্গিতে এবং পরস্মৈপদী। এবং বিদেশ থেকে যতোখানি গ্রহণ করা হয়, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ হয় না, হলেও বিকৃতভাবে। এখানে সাড়ম্বরে বাঁধের উদ্বোধন হয় ; দুমাস পরেই তার দেহে ফাটল দেখা দেয়। এখানে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং জীবন-চর্চারও সেই একই দশা।

(ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, সেটুকু বাদ দিলে) বাঙালী জাতির মৌলিকতা নেই, স্বনির্ভরতা নেই বাস্তবজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্কতা নেই। শুধু সেন্টিমেন্ট আর কল্পনা আর অলৌকিক রোমান্টিকতা। নতুন জেনারেশন কিশোর-কিশোরীরা তামাম দুনিয়ায় দুশ্চিন্তার উৎস ; এদের নিয়ে দেশে-দেশে কতো ভাবনা-গবেষণা-গল্প-নাটক-চলচ্চিত্র। এদেশে এদের সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণ-চেষ্টা তো বহুৎ দূরে অস্ত, একটা সৎ ও সত্য গল্প পর্যন্ত লেখা হয় না। বাঙালী সাহিত্যিক দেখেন বা দেখেন না, ভাবেন এবং লেখেন। মননশীলতা অসূর্যম্পশ্যা। সম্ভবত ভারতীয় কালিতে বস্তু থাকে না, থাকে শুধু ইমোশন এবং ইদানীং—এরস্।

প্রজ্ঞার পটভূমিকাই যেখানে নেই, তার জীবনে প্রয়োগ নেই, সেখানে বাস্তবতা, মনোবিশ্লেষণ, যৌনায়নের যথার্থ—কোন

প্রাণের মতোই—চিরন্তন আলো বা দীপ্ত আগুনও নয়—ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গ।

॥ পাঁচ ॥

যৌনতা পাপ নয়, যৌনাবেগ ব্যাধি নয়, যৌনক্রিয়া অপরাধ নয়, এবং তার শৈল্পিক রূপায়ণও অশ্লীল নয়। কিন্তু তার প্রয়োজন থাকা চাই, কাহিনী, চরিত্র, বক্তব্যের সঙ্গে তার যোগ থাকা চাই, জীবন ও জীবনদর্শনের প্রকটনের পক্ষে অনিবার্য হওয়া চাই। যেমন আছে বোভোয়ার উপন্যাসে, জেনের নাটকে, বা সার্ত্রর মহাকাব্যে :

Lola was outstretched on the bed, completely naked. It was another Lola, sluggish and menacing, watching him from beneath her eyelids. Her body, on the blue counterpane, was silvery-white, like the belly of a fish, and on it a triangular tuft of reddish hair. She was beautiful... she looked as though she was in pain, and her eyes were hard. Boris felt oppressed with the sense of tragedy to come, something is going to happen, something inevitable, awesome and yet rather tedious... She was beginning to moan, and Boris thought, 'Now I am for it', A clammy thrill ran up his body from waist to neck, 'I won't', said Boris, and he clenched his teeth. But then he had a sudden sense of being picked up by the neck, like a rabbit, and he sank upon Lola's body, lost in a red, voluptuous dazzlement of passion. (The Age of Reason.)

সংগমের বিস্তৃত খুঁটিনাটি বর্ণনা। তবু একমাত্র গোঁড়া অন্ধ পিউরিটান ছাড়া, একে কেউ অশ্লীল বলে চিহ্নিত করবে না। যেহেতু, সার্ত্র ব্যাখ্যাত জীবনদর্শন অস্তিত্ববাদের সংগে এর যোগ ঘনিষ্ঠ। যেহেতু, যৌনক্রিয়ার চটুল বর্ণনা করে পাঠকের কামোত্তেজনা জাগিয়ে 'বেস্ট-সেলার' হবার নিম্নগামী বাসনা তাঁর নয়।

নানা বাদ-বিতর্ক-মতান্তরের মধ্যে দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট যে, বাস্তব জীবন বিজ্ঞানদৃষ্টি, সমাজচেতনা এবং জীবনদার্শনিকতা বাদ দিয়ে যৌনচিত্রের

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো সামাজিক, পারিবারিক প্রবন্ধ একালে কেউ লেখে না। তেমনি, কোন সাহিত্যিকের লেখনী থেকে নিঃসৃত হয় না, লরেন্সের মতো মননশীল প্রবন্ধ :

Sex and beauty are inseparable, like life and consciousness. The great disaster of our civilization is the morbid hatred of sex. Sex is the root of which intuition is the foliage and beauty the flower ... sex-appeal is only a dirty name for a bit of life-flame. If only our civilization had taught us how to let sex appeal flow properly and subtly, how to keep the fire of sex clear and alive (Sex versus Loveliness).

ইংরেজী সংস্কৃতির পক্ষে লরেন্স-এর আদিম রক্তের দর্শন অবশ্যই অসহ্য ছিল, এবং বাঙালী সাহিত্যিকদের পক্ষে দুষ্পাচ্য। তাঁরা পাশ্চাত্ত্য যৌন সাহিত্যের বহিরঙ্গটাই গ্রহণ করেছেন, তার আন্তর স্বরূপে প্রবেশ করতে পারেন নি। অন্যতম ব্যতিক্রম: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ এই পটভূমিকতেই আলোচ্য; পটভূমি বাদ দিয়ে শুধু যৌনচিত্রের স্কন্ধে সমালোচনার খড়্গ রেখে নয়।

কামকলা বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নবজাতক উপাদান নয়। কিন্তু কী সেকালে, কী একালে, তাঁর (এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'অভিযুক্ত') উপন্যাসের জনৈক পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের রচনাবলীর সংগে কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না—একমাত্র ভাষার কারুকাজ ছাড়া। কোনটাতেই কোন গভীর বক্তব্য বা জীবনের স্পন্দন নেই। অথচ, শ্রীবসুর সাম্প্রতিক নাটকগুলির মধ্যে একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য রূপ নিতে চাইছে! আঙ্গিকটা এখনও তাঁর করতলগত নয়, তাই বিদেশীয়ানার ঝাঁঝ এখনও প্রখর। নইলে, এগুলিকে ইদানীন্তন কালের প্রথমশ্রেণীর 'মাইথোপিয়িক' বা উপকথাবৃত্তিক সৃষ্টি বলতে পারতাম।

'উত্তরা'য় যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, অজিতকৃষ্ণ বসুর 'ম্যারিনা ক্যান্টিন' তখনই পড়েছি। শেষ পরিচ্ছেদগুলো অবশ্য আজও পড়া হয় নি, লেখক পড়তে দেন নি—সম্ভবত গ্রন্থ-প্রকাশের আগ্রহে শেষ কয়েক শো পৃষ্ঠার এক তালগোল পাকানো

পাঠকসমাজের প্রতি এমন নিদারুণ অবহেলা, তাঁর উপন্যাসে পতিতালয়ের বর্ণনা—মতো অভিজাত পতিতালয়ই হোক না কেন—কুপ্রিনের 'ইয়ামা দ্য পিট'কে'ও কোনদিন অতিক্রম করতে পারবে না, এটা বোধ হয় স্বতঃসিদ্ধ। ক্রোধ থেকে এ সিদ্ধান্ত জাত নয়, লেখকের ত্বরিত ব্যাকুলতাই এর পশ্চাদ্ভূমি। এবং গ্রন্থটিতে বিভিন্ন টাইপের দেহজীবিনীদের ভাবাবেগ ব্যাখ্যায় অধিক জীবনের কোন চিহ্ন নেই। অন্তত আমি পাই নি। অথচ প্রত্যাশায় ছিলাম।

'বিবর' পুরাতন প্রসংগ। 'এপার ওপার' ডস্টয়েভস্কীর 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট'-এর উপসংহারকে স্মরণে রেখে লেখা—সেই এক দৃশ্য। কিন্তু সেই অজ্ঞাত নতুন জীবন,' 'নতুন কাহিনীর সূচনা', কিংবা

What terrible suffering and what infinite happiness before them—

এই বাক্যের যে অসীম ব্যঞ্জনা—এই বইয়ে তার কণামাত্র নেই। মনে হয়েছে : একটা লঘু চতুর কাহিনী মাত্র! তবু, সমরেশ বসু আজও 'ভগবতী'র মতো আশ্চর্য গল্প লিখছেন, যেখানে মাটির গন্ধ, জীবনের রক্ত, হৃদয়ের স্পন্দন স্বত অন্তর স্পর্শ করে। অতএব, তাঁর 'প্রজাপতি'কে একবার পড়েই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যৌনচিত্র আছে বলেই এই একমাত্র কারণেই নস্যাৎ করা চলে না। সমালোচনাকে আরও ব্যাপক ও গভীর হতে হয়।

'প্রজাপতি'র কথাবস্তু অত্যন্ত সরল : একদিকে ভদ্র অভিজাত সমাজের নোংরামি উদ্ঘাটন; অন্যদিকে 'মস্তান'-মানসিকতার বিশ্লেষণ। মৌলিক বিষয় হিসেবে বাস্তব; যেহেতু আমাদের চারপাশেই এই দুই পক্ষ নিত্যবর্তমান, এবং আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। লেখক গতানুগতিক সরল ভঙ্গিতে কাহিনী বর্ণনা করেন নি; নায়ক-নায়িকার কয়েক ঘণ্টার যৌনক্রিয়াকে কেন্দ্রে রেখে বিবিধ বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে বুনে গেছেন। শুধু উপসংহারটি বিচ্ছিন্ন। যাবতীয় আপত্তি উঠেছে এই কেন্দ্রভূমি প্রসঙ্গেই।

এখন বিচার্য :

১। এই কাহিনীর মাধ্যমে লেখক কোন্ বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন? 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়োরোপের চরিত্র উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিকোণ থেকে; 'তথাকথিত কুকের' উজ্জয়িনীকে উপভোগের চেষ্টা সেখানে স্থান পেয়েছে ঘটনা, চরিত্র ও বক্তব্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনে। 'প্রজাপতি'তে বর্ণিত যৌন-দৃশ্যগুলি কি ঘটনা ও চরিত্রের

[illegible] [illegible] পড়িয়ে কি কামনা ও [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] পুরাতন সাহিত্যিক উপাদান, নতুন পরিবেশে ও পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সমাজ প্রসংগে নতুন কোন তথ্য ও তত্ত্ব লেখক দিতে পেরেছেন কি? বহিরংগ অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও মস্তান-মানসিকতায় এক ধরণের অন্তঃশায়ী সত্তা বা শৃংখলা আছে; ঐসব দৃশ্যের এবং সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এই চরিত্র-চিত্র কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সেই বাসনা ও তার প্রয়াস আছে?

২। সমাজচেতনার ভঙ্গিটা কি লেখকের পোজ মাত্র? দুটি নর-নারীর শৃংগার সংগমের পরিকল্পিত বর্ণনা দ্বারা পাঠক-পাঠিকার উত্তেজিত স্নায়ুকে আকর্ষণ করাই তাঁর মৌল লক্ষ্য? এবং সমাজবাস্তবতার ইংগিতগুলিকে তিনি ক্যামোফ্লাজ হিসেবে ব্যবহার করেছেন?

৩। এই দুই প্রশ্নের জবাব মিলবে 'প্রজাপতি'র কথাবস্তু বাস্তব, এই দাবির যাথার্থ্য বিশ্লেষণে। আগেই বলেছি : সাহিত্যে অভিজাত সমাজের ছবি অতিশয় জীর্ণ ক্লিশে। তবু এবং সেই জন্যেই বাস্তববাদী লেখকের কাছে জিজ্ঞাসা : এই সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কতোদূর প্রত্যক্ষ? একইভাবে, মস্তান-সমাজ সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতা কতোটা গভীর, সে-জিজ্ঞাসাও প্রাসংগিক।

৪। আধুনিক শহুরে সভ্যতার অন্যতম অবদান : মস্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতায়, পরিপার্শ্বের অভিঘাতে, এদের জন্ম, শিল্পাঞ্চলে ও মফস্বল শহরে ক্রমশ প্রসার, এবং নানাবিধ জটিলতার বৃদ্ধি। এর কোনটাই অকারণ নয়, সামাজিক কার্য-কারণ বিধৃত। পাশ্চাত্য দেশের সমাজবিজ্ঞানিগণ এই নবজাতকদের ইতিহাসের বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছেন, আজও করছেন। এদেশে, ইতি-উতি সাংবাদিক নিবন্ধ ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। অথচ এই সমাজদৃষ্টি না থাকলে সামগ্রিক দৃষ্টিও আসে না। শুধু দেখলাম আর অনুভব করলাম—এর সাহায্যে কোন-কিছুর গভীরেই প্রবেশ করা যায় না। সমরেশ বসু কি এই পর্যবেক্ষণ এবং সামগ্রিক দৃষ্টির অধিকারী এই সমাজ প্রসংগে? তাঁর উপন্যাসে তার প্রশ্নাতীত পরিচয় কি তিনি দিতে পেরেছেন?

৫। এই সামগ্রিক দৃষ্টিপাত এবং বিজ্ঞানমনস্কতাই বাস্তবতার প্রস্থানভূমি। এবং এই তিনে মিলেই গড়ে ওঠে এক-একটি জীবনদর্শন, যা মাটিঘেঁষা, জীবনসংলগ্ন। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সৃষ্টির মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি লক্ষণীয়। শুধু সাহিত্য কেন, যাবতীয় শিল্পকর্মেই। অ্যাবসার্ড নাটক, [illegible]

রিয়েলিজম্ ইত্যাদি [illegible]-হঠাৎ অথবা শূন্য অনুভবের লতায়-পাতায় জাত হয় নি।

'প্রজাপতি'তে প্রস্থানভূমি সম্বলিত কঠিন বাস্তবতা এবং স্বচ্ছ জীবনদর্শন অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে কি? দুই পক্ষের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের আশপাশের মানুষের কাম-ক্রোধ-লোভ অসংগতি, দলাদলি-অসহায়তা, এবং চরিত্র ও চরিত্রহীনতা, ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধ ইত্যাদি নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে? ক্লিষ্ট যৌনতার সংগে যে সাদিজমকে লেখক মিশিয়ে দিয়েছেন, এই প্রতিপাদনকে তা কি সাহায্য করেছে? অথবা, সমস্তই তাঁর খণ্ডিত ভাবনার ফল? বিশেষ উদ্দেশ্যে আরোপিত? অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট? অথবা লক্ষ্যভেদী?

৬। শেষ তিনটি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে প্রকাশক্ষমতার বিশ্লেষণে। তদ্দ্বারাই লেখকের আন্তরিকতা অথবা চতুরতা স্বত স্বাক্ষরিত হয়।

লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে; কিন্তু তিনি সিদ্ধি লাভ করেন সেই উদ্দেশ্যের যথাযথ ও সমন্বিত উপস্থাপনায়। সমরেশ বসু এখানে একটি বিস্ফোরক বিষয় গ্রহণ করেছেন; বিষয়টিকে সুষ্ঠু ও সামগ্রিকভাবে রূপদানের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্র্যাফট্‌স্‌-ম্যানশিপ বা ভাষা ও আংগিক-দক্ষতার পরিচয় তিনি কি রাখতে পেরেছেন? এই গুণের অভাবে তাঁর 'এপার-ওপার', শুভারম্ভ সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত বোম্বাই চিত্র-কাহিনী হয়ে গেছে। তাঁর কোন বক্তব্য যদি থেকে থাকে, 'প্রজাপতি'তে তা কি চরিত্র-পরিস্থিতি-সংলাপ-ভাষ্য ইত্যাদির সাহায্যে অভ্রান্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে?

৭। কতোটা, এবং কিভাবে?

৮। উপন্যাসের গুণ কী কী? নিগুর্ণত্বই বা কোথায়?

৯। এবং বিষয়-বক্তব্য-আংগিক মিলিয়ে 'প্রজাপতি'তে সময়ের একটা সমগ্র রূপ কি ফুটে উঠেছে? লেখকের সমাজবোধের, জীবনচেতনার, মানবমমতার স্বরূপ কি ব্যক্ত হয়েছে? অথবা, সব মিলিয়ে বা বাদ দিয়ে যৌন বর্ণনাদিই সবেগে [illegible] ফুটে উঠেছে?

১০। সামাজিকভাবে 'প্রজাপতি' পাঠের স্বাদ কি? প্রতিক্রিয়া কি? ফলশ্রুতিই বা কি?

আধুনিক শহুরে-সভ্যতার, এবং অন্তত এদেশেও পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা যেমন বেড়ে গেছে, তেমনি তাদের বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তর—অপরিণত কিশোর-হৃদয় থেকে অতি-পরিণত বৃদ্ধ-মন পর্যন্ত। এই জটিল স্তর-বিন্যাসের জন্যে বেতার-টি, ভি, র অনু-

মার্কা চলচ্চিত্রই তার প্রমাণ—এ ছবি যাদের দেখার কথা নয়, তারাও দেখে; সম্ভবত তারাই অধিক সংখ্যায় দেখে। এ-সমস্যা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। বস্তুত, এটাও নব্য সভ্যতার অন্যতম প্যারাডক্স। এই পটভূমিকায় প্রশ্ন : 'প্রজাপতি' কাদের জন্যে লেখা? অস্থির কিশোর-কিশোরী? অশান্ত প্রৌঢ়া-বৃদ্ধ? অথবা, আত্মসচেতন মননশীল বুদ্ধিজীবী হৃদয় এই উপন্যাস-পাঠে সমুন্নয়নের তৃপ্তি লাভ করে? অথবা তার বিপরীত? কিংবা, যার যেমন অভিরুচি?

তাই বলছিলাম : বাস্তবতা ও শ্লীলতার দাবি 'শক্ত ভিত্তি'র ওপর হওয়া দরকার। পক্ষ বা বিপক্ষ সমালোচকদের বিশ্লেষণও তেমনই 'শক্ত ভিত্তি'র ওপর হওয়া চাই। নতুবা, সবই স্বার্থপ্রণোদিত উক্তি, বা সেন্টিমেন্টাল বচন, বা হাস্যকর আচরণ, বা প্রলাপবাক্য।

প্রসংগত, অনেকে 'অবক্ষয়', 'ভেঙে-পড়া মূল্যবোধ' ইত্যাদি ব্যবহার করেন। শব্দগুলি অর্থযুক্ত এবং অমোঘ। তবু, এতদ্দেশীয় ব্যবহারকে কেমন-যেন যান্ত্রিক মনে হয়। আসলে, সমস্যাটা আরও গভীরে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্তঃকরণে নিহিত।

য়োরোপের অনেক অভাব-ত্রুটি-বিরোধ আছে। তবু, তাদের আছে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানবান সাহিত্য, যেখানে পিঠ রেখে সৃষ্ট হয় নান্দনিক শিল্প-সাহিত্য। আমরা ওদেশ থেকে সাহিত্যের তালিম নিয়ে থাকি, বিজ্ঞানের দিকে ফিরেও তাকাই না। নিজেরাও কোন মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করি না। ঊনবিংশ শতকে একটা চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু নানা কারণে সে-প্রয়াস আজ অবসিত।

ফলে, বিরোধাভাস সত্ত্বেও য়োরোপ আজ সংস্কৃতির অদ্বিতীয় দিশারী। আর, পর-নির্ভরতায় আমরা তলিয়ে যাচ্ছি ঐ প্যারাডক্স-এর মধ্যে! তারই একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত করেছিলাম; শেষ করি আর একটা দিয়ে। এটি অতি-সাম্প্রতিক নিদর্শন।

ঝড় তখন মধ্যগগনে। শহর-কলকাতার একটি বাংলা চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিকীর সম্পাদকীয় কলামে সাহিত্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছিল। আর, তারই প্রথম পাতার বাঁদিকের ওপরে মুদ্রিত ছিল একটি স্টিল—বোম্বাইয়ের এক অল্পবয়স্কা চিত্রনটীর ছবি : পরণে স্কার্ট, পৃষ্ঠদেশ,—দৃষ্টিতে দেহ-ভরণ লালসা-ভাব। ছবির ওপরে বড়ো অক্ষরের ক্যাপশন : 'বিস্ফোরক যৌবন'। ছবির নীচে ক্যাপশনের দীর্ঘ ভাষ্য, যার অর্থ—আশা করি, বর্ণনার প্রয়োজন হবে না।

সাম্প্রতিক ভারতীয় চরিত্রের-সংস্কৃতির-

(শেষাংশ)

পীর বহরম সমাধি-মন্দির

হজরত হাজি বহরম সেক্কা তুর্কিস্থানের লোক। অক্‌বরের সময় দিল্লীতে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ধর্মপ্রবণতা ও মহত্ত্বের কথা শুনে অক্‌বর তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানান। তাতে সম্রাটের সভাসদেরা আবুল ফজল, ফৈজি প্রভৃতি তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। বহরম এতে মর্মাহত ও বিরক্ত হয়ে রাজধানী ত্যাগ করে বর্ধমানে আসেন। বর্ধমানের জয়পাল সন্ন্যাসী তাঁকে তাঁর নিজের আশ্রমে নিয়ে যান ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি এখানে মাত্র তিন দিন বেঁচে থাকেন। এই স্থানেই তাঁর সমাধি-মন্দির বা পীর বহরম স্থাপিত হয়।

শের আফগান ও কুতুবউদ্দীনের সমাধি-মন্দির

অক্‌বরের সময় তিহ্‌রাণ থেকে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক ভারতে আসেন। পথে তাঁর স্ত্রী এক কন্যা প্রসব করেন। এক সওদাগর এই দরিদ্র দম্পতিকে যথেষ্ট সাহায্য করেন ও দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে এক কাজে নিযুক্ত করেন। ভদ্রলোকের কন্যা পরমাসুন্দরী কিশোরী। নাম মেহেরুন্নিসা। মায়ের সঙ্গে অন্তঃপুরে যাতায়াত ছিল। যুবরাজ সেলিম কিশোরীর রূপে

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

মুগ্ধ হন ও তাঁকে বিয়ে করতে চান। অক্‌বর বিয়েতে আপত্তি জানিয়ে শের আফগানের সঙ্গে উক্ত কিশোরীর বিয়ে দিয়ে তাঁকে বর্ধমানের জায়গীর দান করেন ও তাঁরা সেখানে বসবাস করেন। যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধরে সিংহাসনে বসলে মেহেরুন্নিসাকে তিনি ভুলতে পারেন নি। তিনি অচিরে কুতুবুদ্দীনকে বাঙলার সুবেদার করে পাঠান ও তাঁকে আদেশ দেন মেহেরুন্নিসাকে সম্রাটের অন্তঃপুরে পাঠাতে। কুতুবুদ্দীন কালবিলম্ব না করে শের আফগানকে পত্নীত্যাগ করতে বলেন। শের আফগান সম্মত না হলে উভয়ে উভয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে দেন। উভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মেহেরুন্নিসাকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জাহাঙ্গীর তাঁকে বিয়ে করলে তিনি নূরজাহান নামে সম্রাজ্ঞী হন। শের আফগান ও কুতুবের সমাধি বর্ধমানে রয়েছে—তার প্রস্তরফলকে লেখা আছে ১৬১০ খৃঃ এই ঘটনা ঘটে।

বেড়ের খাজা আন্‌ওয়ার সমাধিস্থান

জগৎরামের সাহায্যার্থে দিল্লী থেকে ইনি আসেন। এঁরই সমাধি।

কৃষ্ণসায়র

এটি একটি বিরাট হ্রদ। বর্ধমান শহরের মধ্যেই। ১৭শ শতাব্দীর বাঙলা দেশে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সময় কৃষ্ণরাম দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের কাজ দিয়ে ভরণ-পোষণ করবার জন্য এই বৃহৎ সায়র খনন করেন।

স্টার অফ ইণ্ডিয়া গেট বা সিংহদ্বার

১৯০৪ খৃঃ ২রা এপ্রিল বড়লাট লর্ড কার্জনের বর্ধমানে আগমনে স্যার বিজয়চাঁদ কর্তৃক এই সিংহদ্বার তৈরি হয়।

বর্ধমান শহরের আরও দ্রষ্টব্য স্থান

বর্ধমানের রাজবাটি (বর্তমানে বিশ্ব-বিদ্যালয়), মোবারক মঞ্জিল, মহতাব মঞ্জিল, রাজকাছারী আঞ্জুমান, দেলখুশ বাগ ইত্যাদি।

মেলা

পূর্বস্থলীর অন্তর্গত জামালপুরে 'বুড়ো শিবে'র পুজো উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমায় বিখ্যাত মেলা।

কেতুগ্রামের অধীনে দরিয়া গ্রামে মাঘ মাসে ১ মাস যাবৎ মেলা।

বর্ধমান হয়ে সরস্বতী পুজোর পরদিন থেকে উদয়বাড়ীতে হুদির মেলা। ১ মাস থাকে। এতে রামায়ণ

[illegible] ও কুতুবউদ্দীনের সমাধি

বড় বড় মূর্তি দেখান হয়। ইহা শিবরাত্রি পর্যন্ত থাকে।

কালনা মহকুমায় মহিষমর্দিনীর পূজো উপলক্ষে গঙ্গার তীরে ৪ দিন বিরাট মেলা।

কুড়মুড়ের গাজনের মেলা।

তকিপুর গ্রামে শ্রীলক্ষ্মী-জনার্দন ও জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

জেলার কিছু গ্রামে ভাদু উৎসব ও টুসুর গান।

অগ্রদ্বীপে---গোপীনাথ ঠাকুরের মহোৎসব ও চৈত্রমাসে কৃষ্ণা-একাদশী হতে সপ্তাহব্যাপী মেলা হয়ে থাকে।

বর্ধমানের পাঁচজন মহারাজাধিরাজ বাহাদুর। উপরে : তিলকচাঁদ বাহাদুর, তেজচাঁদ বাহাদুর, মহতাবচাঁদ বাহাদুর। নীচে : আফতবচাঁদ বাহাদুর, বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর

শিল্পনগর ও ব্যবসায়স্থল

দুর্গাপুর, বার্নপুর -- শিল্পনগর। দুর্গাপুর পাওয়ার স্টেশন, কোক ওভেন ইত্যাদি।

রাণীগঞ্জ---প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়।

বরাকর---লৌহখনি।

কালনা---ব্যবসাস্থল, বিশেষত ধান ও চাউলের।

আসানসোল---রেলওয়ে জংশন। গ্লাস ফ্যাক্টরী। কাঞ্চননগর--পূর্বে ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি লৌহ-শিল্পদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। বর্ধমানের মিহিদানা, সীতাভোগ, ওলা, খাজা প্রভৃতি দেশবিখ্যাত।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

অম্বিকা কালনা---কালীভক্ত কমলাকান্তের জন্মস্থান।

অণ্ডাল---শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

আমাইপুরা---চৈতন্য মঙ্গলকার কবি জয়ানন্দের জন্মস্থান।

ইছানি, ইচ্ছানি---সদাগর শ্রীমন্ত-পতির গ্রাম।

ইলসরা (মেমারির কাছে)--যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্মস্থান।

কাঁদড়া---(কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে)---কবি জ্ঞানদাসের জন্মস্থান।

কাঞ্চননগর---কড়চা-লেখক গোবিন্দ দাসের জন্মস্থান।

কুলীন গ্রাম---কবি পরমানন্দ সেন, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসুর জন্মস্থান।

কৃষ্ণপুর---(খণ্ডঘোষ থানার অধীন) ---ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান।

কোগ্রাম---কবি লোচনদাস ঠাকুর, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক-এর জন্মস্থান।

দামুন্যা---(রায়না থানার অধীন) ---কবিকঙ্কণ মুকুন্দদাস-এর জন্মস্থান।

পড়ান---কবি রায়শেখর-এর জন্মস্থান।

পাণ্ডুগ্রাম---(কাটোয়ার কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম)---ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ)-এর জন্মস্থান।

শ্রীখণ্ড---কবি বলরাম দাস, কবি জগদানন্দ, কবি নরহরি দাস, কবি আত্মারাম, কবি গোবিন্দ দাস, কবিরাজ ভক্তিরত্নাকর, ঘনশ্যাম দাস-এর জন্মস্থান।

সিঙ্গী গ্রাম---কাশীরাম দাস-এর জন্মস্থান।

কাটোয়া---কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর জন্মস্থান।

কুড়মুল---হরিদাস পালিত-এর জন্মস্থান।

চুরুলিয়া---কবি নজরুল ইসলাম-এর জন্মস্থান।

চকব্রাহ্মণ গ্রামে---দুর্গাদাস লাহিড়ী।

তোলা গ্রামে---(কালনা)---আবদুস সত্তার (প্রাক্তন মন্ত্রী) জন্মগ্রহণ করেন।

পাটুলিগ্রামে---নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

(পৌরাণ

তেরকোনা গ্রামে---আইনবিদ্ রাসবিহারী ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

ভাতশালা---কবি মতিলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন।

বুড়া গ্রামে---নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ছদ্মনাম ভুবনমোহিনী) জন্মান।

বাঁধমুড়া (কাটোয়ার কাছে)—দাশরথি রায়ের জন্মভূমি।

বিদ্যাপতি গ্রামে---ঐতিহাসিক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

বাইতিপাড়া---চরণদাস ঘোষ-এর জন্মস্থান।

বোড়াল গ্রামে---রাজনারায়ণ বসু জন্মগ্রহণ করেন।

মেজেদিহী---গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ জন্মগ্রহণ করেন।

মোয়াইল---(কালনা)---বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর জন্মস্থান।

মাড়োগ্রামে---রঘুনন্দন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন।

রামচন্দ্রপুরে--- রাজকৃষ্ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন।

রামেশ্বরপুর---রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জন্মস্থান।

শাকনাড়া---(রায়না থানা)---প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, মুনিরাম তর্করত্ন-এর জন্মস্থান।

সাঁকোগ্রামে---মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদক প্রতাপচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন।

চান্নাগ্রামে — সাধক কমলাকান্ত সিদ্ধিলাভ করেন।

কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে এই স্থানকে অমর করে রেখে দিয়েছেন।

তামিলের চোখে : প্রকৃতি

কৃষ্ণ ধর

রূপসী তরুণী যেন অবাধ উজ্জ্বল
দীপ্ত তুমি স্রোতস্বিনী দেখি ওই রঙীন
সন্ধ্যার আকাশতলে, রোদ তার কমলা রঙীন
সোনালী তনুর রেখা নেচে ফেরে প্রতি
চোখে চোখে॥

কখনো বঙ্কিমরেখা কখনো বা ও দেহের
ভাঁজ
নৃত্যরতা রূপসীর সরু কটি বাঁকায়
ইঙ্গিতে
বহে যায় এঁকেবেঁকে কলস্বনা নদী অবিরাম
স্রোতে তার রোমাঞ্চিত ধানচারা কোমল
শরীর॥

হাওয়া বহে স্পর্শ তার জাদু দিয়ে মোড়া
ওঠে স্বর সুমধুর নর্তকীর নূপুরের মতো
তীরে তার পরিকীর্ণ কালো বালু দেখে
মনে হয়
কুঞ্চিত কেশদাম তারই যেন শায়িত
বিস্তার।

ফেন-ধোয়া সাদা কড়ি দন্তরুচি তার
অমলিন শুভ্রতায় হার মানে নিশীথের
নক্ষত্রের বীথি
জলতলে খেলারত মাছগুলি তারই
চঞ্চল চোখ আহা সে কি আনন্দিত

কিন্তু কোথায় সেই প্রস্ফুটিত রক্তশতদল
তরুণীর মুখের মতো আলোকিত যাহা
না না, তা তো নয়—নদীজলে পদ্ম কেন
হবে?
সৌন্দর্যের মূল্য কি বা, যদি তার মুখশ্রী
না থাকে?

সব আছে শুধু নাই স্মিত মুখ তার
নম্র নদী খরবেগ করেছে শিথিল
গৌরব গরিমা সব গেছে চলে, আনন্দ
যে নাই
শুধু যায় ঢেলে দিতে সব কিছু সমুদ্রের
কাছে।
প্রকৃতি জননী আমার স্নেহশীলা
প্রিয়তমা মাতা
আমাকে পাড়ান ঘুম দোলা দিয়ে দক্ষিণ
হাওয়ায়
ভ্রমর গুঞ্জন করে মধুস্বরে তারই প্রেরণায়
ঘুমপাড়ানিয়া গানে, শুনি যেন তামিলের
মতো।

সত্য ও সুন্দর স্বর শ্রবণ মধুর
হৃদয় দু'কূল ভরা, ধুয়ে যায় আকাশের
নীল
তন্দ্রা ভেঙে জেগে উঠে কেঁদে উঠি আমি
আমাকে দেখান তিনি পাহাড়ের গায়ে

সমতলে বহে নদী ধীর লয়ে বহে
দুধারে বিকচ ফুল, উজ্জ্বলতা পূর্ণ ও
সুন্দর
তখনও আচ্ছন্ন আমি ঘুমঘোরে থাকি
বহুক্ষণ
সূর্যের নরম রোদে, উঁকি দেন তিনি
তারপর।

জাগান আমাকে তিনি বিরক্তিতে সেই
নিদ্রা হতে
রাগ করি ঘুম ভেঙে করি তিরস্কার
তবুও প্রকৃতি মাতা স্নেহাতুর হৃদয়
তাহার
তেমনি সদয় দৃষ্টি, উদারতা হয় নি
ব্যাহত।

আশীর্বাদ নাই তার এ সুন্দর তামিলের
তরে
নিন্দা বা প্রশংসা কি না, সেই দিকে
ভ্রূক্ষেপবিহীন
নিবন্ধন তামিলের সুভাষিত আনন্দ
পূর্ণতা
মধুরতা দিয়ে সত্তা পরিপূর্ণ রহে
চিরকাল।

চলন্ত ট্রেনে হত্যাকাণ্ড

বিশু মুখোপাধ্যায়

[ট্রেনে হরেকরকম ভয়াবহ খুন, ডাকাতি, রাহাজানি ও লুণ্ঠন সব দেশেই কিছু কিছু ঘটে থাকে। এ কাহিনীটি বিলেতের একটি সত্য খুনের ঘটনা অবলম্বনে লেখা। ঘটনাটি ঘটেছিল ট্রেনে এবং ওদেশে ট্রেন-চলাচল হওয়ার প্রায় গোড়ার দিকেই।]

মানবের আদালতে জুরিদের বিচারে একদিন জন এলেকজেণ্ডার ডিকম্যান দোষী প্রমাণিত হন এবং হত্যা-কাণ্ডের অভিযোগে ফাঁসির হুকুম হয়ে যায় তাঁর। কিন্তু মিসেস ডিকম্যান যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন কোনমতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁর স্বামী একজন খুনী, তাঁর দ্বারা কোন খুন হতে পারে। আর ফাঁসির আগে বিচারালয়ে ডিকম্যানের নিজের শেষ কথা ছিল, 'সমস্ত মানবের মনুষ্যত্বের দরবারে আমি ঘোষণা করছি যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, নিরপরাধ!'

এখন এই কাহিনীটি পড়ে আপনারাই বিচার করুন ডিকম্যান সত্যিকার দোষী, না বিনা দোষেই বিচারের ভুলে তাঁর জীবনান্ত ঘটান হয়েছে।

প্রায় একশো-সওয়া শো বছর পূর্বে যখন বিলেতে রেলপথ খোলা ও রেলে করে চলা-ফেরার বিষয় নিয়ে নানা-রূপ আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, তখন এর বিরুদ্ধে প্রথমেই এই আপত্তি উঠে ছিল যে, ট্রেন চলাচল ব্যাপক-ভাবে আরম্ভ হলে দুর্বৃত্তদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রকেই প্রশস্ত ও ব্যাপকতর করা হবে এবং ঘণ্টায় ৩০-৪০ মাইল বেগে অন্ধকারে নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেনগুলি যখন যাতায়াত করবে, তখন ট্রেনের সেই বন্ধ ছোট কামরায় স্বল্প কয়েকজন যাত্রীর জিনিসপত্র লট, রাহাজানি ও যাত্রীদের খুনখারাপি করার সুযোগই এর দ্বারা বেশী করে পাবে লুণ্ঠনকারী ও খুনীরা।

ভীরু প্রকৃতির বয়স্ক লোকদের মনে প্রধানত এই ধরণের ভয়ই ছিল বেশী। তাছাড়া 'এলার্ম চেন'-এর ব্যবস্থাও তখন ছিল না, এবং সেটা আবিষ্কৃত হয়েছিল ট্রেন-চলাচলের অনেক পরে। লণ্ডনের ট্রেন-চলাচলের ইতিহাসে বহুদিন পর্যন্ত উল্লেখ-যোগ্য কোন খুনখারাপির কথা শোনা যায়নি বটে, তবে ১৮৬৪ সালে নর্থ লণ্ডন রেলওয়েতে মিঃ ব্রিগস্-এর হত্যা ট্রেনের যাত্রীদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে প্রথম সজাগ করে দেয়।

এই ঘটনার পর ট্রেনে আরও অনেকগুলি হত্যাকাণ্ডের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হত্যা-কাণ্ডের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তা হলেও মিস্ মনির হত্যা রহস্য হাউনস্লো ও ওয়াটার্লু স্টেশনের মধ্যে মিস্ ক্যাম্পকে হত্যা করে হত্যা-কারীর নিমেষে উধাও হওয়া, মিঃ ব্রিগস্-এর হত্যাকারী ফ্রাঞ্জ মুলারের ফাঁসি, ১৮৮১ সালে ব্রাইটন রেলওয়ের ট্রেনে পার্সি লেফ্রয় মেপলটন কর্তৃক মিঃ গোল্ডকে হত্যা ও তার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন, এবং তার কিছুকাল পরেই পার্কার নামক একজন ধনী যাত্রীকে অন্যান্য সহ-যাত্রীদের সামনে গুলিবিদ্ধ করা, ট্রেনে হত্যার ইতিহাসে চাঞ্চল্যকর ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের বাদ দিয়ে, সবচেয়ে অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর ঘটনা হ'ল জন এলেকজেণ্ডার ডিকম্যানকে

কেন্দ্র করে। এই ঘটনাটিকে প্রাধান্য দিতে হয় নানা কারণে। ১৯১০ সালে এই ঘটনাটি ঘটে নিউক্যাসল ও এলেনমাউথ স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায়। নিউক্যাসলের জন্ জেমস নেসবিট নামক একজন কোলিয়ারির কেশিয়ার খুন হওয়ার ব্যাপারে জন্ এলেকজেণ্ডার ডিকম্যানকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়।

উপর্যুক্ত হত্যাকাণ্ডগুলির পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঘটনাগুলির মধ্যে অনেক দিক থেকে অনেক প্রকার মিল আছে। মুলার ও লেফ্রয় তাদের শিকারকে কামরা থেকে ছুঁড়ে রেল লাইনের উপর নিক্ষেপ করে---পরে তাদের মৃতদেহ দুটি রেল লাইনের উপর পাওয়া যায়। মিস্ এলিজাবেথ ক্যাম্পের অজ্ঞাত হত্যাকারী এবং ডিকম্যান রেলের কামরায় বেঞ্চের নিচে মৃতদেহটিকে ফেলে রেখে যায়। যে লোক সেই কামরায় প্রথম ঢোকে, তার দ্বারাই লাশ আবিষ্কৃত হয়।

মুলার ও লেফ্রয় আদালতে অভিযুক্ত হবার পূর্বেই পুলিশের কাছে তাদের অপরাধ স্বীকার করেছিল। কিন্তু আমাদের এই কাহিনীর নায়ক এলেকজেণ্ডার ডিকম্যানের ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি ঠিক সাধারণ খুনে-ডাকাতের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল, তিনি ভাল লেখাপড়া জানতেন এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি ছিল যে-কোন খুনী, দস্যু বা ঐ ধরণের লোকের চেয়ে অনেক বেশী। তাছাড়া তাঁর চাল-চলন ও ব্যবহার এতই উঁচু ধরণের ছিল যে, সত্যিকারের তিনি দোষী না নির্দোষ তা নিরূপণ করা ছিল যেমন দুরূহ, তেমনি তা নিয়ে মতবিরোধেরও অন্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিচারে ডিকম্যান দোষীই সাব্যস্ত হন, কারণ পরিবেশ ও সাক্ষ্য গিয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধেই।

নিউক্যাসেলের কেশিয়ার নেসবিটকে তিনি যে হত্যা করেছিলেন সে কথা মনে করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সম্ভাব্য বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একজন আসামীকে কখনই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না---সামান্যতম সন্দেহ থাকলে অথবা করুণা-প্রদর্শনের ন্যূনতম সুবিধা থাকলে তা দেখানোই উচিত। সিটনি মরিসন ও অস্কার স্লাটারের বিচার যেভাবে মুলতুবী রাখা হয়েছিল, ডিকম্যানের সম্পর্কে সেটা করাই ভাল ছিল এবং তাতে বিজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হ'ত---এমন ধারা কথাও এই বিচার সম্বন্ধে বলেছিলেন অনেকে।

এখন এই কাহিনীর নিহত নায়ক নেসবিটের একটু পরিচয় দিই। নর্দাম্বারল্যাণ্ডের অন্তর্গত উইডরিংটনের কাছাকাছি স্টবস্উড কোলিয়ারির কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানী ও বিশ্বস্ত লোক ছিলেন মিঃ জন্ জেমস নেসবিট। এই কোলিয়ারি কোম্পানীর সদর কার্যালয় ছিল নিউক্যাসল-অন-টাইনের বেকনস্ফিল্ড চেম্বারস-এ। নেসবিট সেখানে একটানা সতের বছর ধরে সততার সঙ্গে কেশিয়ারের কাজ করে আসছিলেন। তাঁকে যখন হত্যা করা হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছরের কিছু বেশী। এই বয়স থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, কত অল্পবয়সে তিনি কোম্পানীর এই দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ সতের বছর ধরে প্রচুর টাকা সঙ্গে নিয়ে প্রতি শুক্রবার তাঁকে যেতে হ'ত উইডরিংটনে কয়লা খনির শ্রমিকদের সপ্তাহের মাহিনা দেবার জন্য। প্রতি সপ্তাহের এই নির্দিষ্ট দিনটিতে তিনি যে ঐ কাজের জন্য যেতেন তা স্থানীয় বহুলোক জানত। তাছাড়া নেসবিটের ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহারের জন্যও নিউক্যাসলে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছিল প্রচুর। এ ছাড়া তাঁর বন্ধু-বান্ধবের আর একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল রেল লাইনে। আপ্ ও ডাউন সব স্টেশনের কর্মচারীরাও তাঁকে জানত তাঁর চেহারা, মিষ্টি ব্যবহার ও কাজের জন্য। প্রকৃতপক্ষে যারাই একবার মেসার্স মেইন অ্যাণ্ড বার্নের কয়লার খনিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরাই তাঁকে মনে রেখেছেন।

বেঁটে-খাটো ধরণের মানুষ ছিলেন নেসবিট। বেঁটে হলেও, তাঁর দেহের গড়ন ছিল যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি দেখবার মত ছিল তাঁর নাকের নিচে দু'পাশে মোম দিয়ে সোজা করে রাখা গোঁফের বাহার। এই গোঁফজোড়ার জন্যে সহজেই মুখটা তাঁর নজরে পড়ত লোকের। সাহসী ও নীরোগ স্বাস্থ্যের অধিকারী নেসবিটের চলাফেরার মধ্যে ছিল মুক্ত বিহঙ্গের ভাব। বিবাহিত জীবনও ছিল তাঁর খুব সুখের এবং তাঁকে দেখলে মনেই হ'ত না যে দুনিয়ার কোন কিছুকে তিনি গ্রাহ্য করেন।

১৯১০ সালের ১৮ই মার্চ, শুক্রবার এই মিঃ নেসবিট যথারীতি ৯-৩০ মিনিটের সময় হেড অফিস থেকে সাপ্তাহিক মাহিনা দেবার চেক নিয়ে বেরিয়ে শহরের লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক থেকে চেকটি ক্যাশ করেন। সবসুদ্ধ ৩৭০ পাউণ্ড ৯ শিলিং ৬ পেন্সের খুচরো, যা তিনি ২১৯ পাউণ্ডের সভারেন, ২ শোর হাফ-সভারেন, আর বাকীটা রূপো ও তামার ভাঙ্গানি করে তাঁর কালো ব্যাগটার মধ্যে ভরে নেন। এই ধরণের খুচরো টাকা-পয়সা প্রত্যেকবারই তাঁকে করে নিতে হ'ত, মাহিনা দেবার সুবিধার জন্যে। এই সব খুচরো ভাঙানির সবসুদ্ধ ওজন ছিল প্রায় ১৪॥ পাউণ্ডের মত।

বছরের মধ্যে এই শুক্রবারের দিনটি ছিল সবচেয়ে সুন্দর-পরিষ্কার ও নির্মেঘ। নেসবিটের হাতেও সেদিন প্রচুর সময় ছিল। কারণ তিনি একটু সময় হাতে রেখেই অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন সেদিন। কাজেই নিউক্যাসেল সদর স্টেশন পেঁছিবার জন্য তাঁর খুব তাড়া ছিল না। পথিমধ্যে দু'তিনজন ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি তাদের শুধু শুভ-সম্ভাষণ জানিয়ে দশটা বেজে কয়েক মিনিটের সময় স্টেশনে এসে পৌছেন। গেটেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় একজন কনেস্টবলের। খুব উঁচু একটা বাড়ির বাইরের জানালা মেরামত করছিল এমন কয়েকজন লোকের

কাজের তদারক করছিল সে। নেসবিট তার সঙ্গে দু'একটা মিষ্টি কথার সঙ্গে ঠাট্টা করে বললেন, এ কাজ করতে তিনি কিছুতেই রাজি হতেন না, কারণ এ ধরণের কাজ খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু তিনি নিজেই কি জানতেন, যে তাঁর এ ধরণের টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করার কাজেও যথেষ্ট বিপদ ও ঝুঁকি আছে!---নির্মেঘ আকাশে সেদিনই ঘনিয়ে আসবে ঘনান্ধকার!

টিকিট কেটে নেসবিট সোজা প্ল্যাটফর্মে গেলেন। সেখানেও আবার কয়েকজন চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। কথা বললেন তাঁদের সঙ্গে। নেদারটন কোলিয়ারির দু'জন পে-ক্লার্ক সেই একই গাড়িতে যাচ্ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, নেসবিট আগে প্রথম শ্রেণীর কামরায় যাতায়াত করতেন কিন্তু এখন যাওয়া-আসা করেন তৃতীয় শ্রেণীতে। তিনি বোধহয় মনে মনে এইটাই ভেবে নিয়েছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীতে চলাফেরা করাটাই কম বিপজ্জনক---তাছাড়া তাঁর সঙ্গে যখন এতগুলো টাকা থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীতে অবশ্য যাত্রীও থাকে বেশী; কিন্তু তাহলেও নেসবিট সম্ভবত এ সব কিছু না ভেবেই একটা তৃতীয় শ্রেণীর খালি কামরা সেদিন খুঁজতে লাগলেন, উঠবার জন্য। পে-ক্লার্ক দু'জন সেই মোটা বেঁটে লোকটিকে গাড়ির প্রত্যেকটি কামরা দেখতে-দেখতে যেতে দেখলেন। তাঁরা এটাও লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গে আরও যেন একজন লোক রয়েছে, সম্ভবত তাঁরই পরিচিত কেউ হবে---লোকটির চেহারা অবশ্য তারা ভাল করে লক্ষ্য করে নি।

এ-কামরা সে-কামরা করতে করতে ট্রেনের সামনের দিকে ইঞ্জিনের কাছাকাছি ছোট একটি কামরায় নেসবিট সেদিন উঠে পড়লেন---দরজা খুলেই তিনি তাঁর সঙ্গীটিকে ডাকলেন। বললেন, আরে চলে আসুন, এটাই ভাল। একটা লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন তিনি এবং সঙ্গীটিও তাঁর অনুসরণ করলে। দরজা বন্ধ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ইঞ্জিনখানি এগিয়ে চলল। গার্ডের হুইসিলের রেশ মিলিয়ে গেল হাওয়ার সঙ্গে।

এটা একটা ছোট লোক্যাল লাইন। নিউক্যাসল থেকে এলেনমাউথ পর্যন্ত এই লাইনে ট্রেনের গতিবিধি। মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট স্টেশন আছে।

১০-২৭ মিনিটে প্রধান সদর স্টেশন থেকে ছেড়ে দু মিনিট পরেই গাড়িখানি এল নিউক্যাসল মেনের ইস্ট-এ। তারপরের স্টপেজই হ'ল 'হিনর'। এখানে গাড়িখানি যখন এসে পৌঁছল, তখন সময় ১০-৩৪ মিনিট। এখানে প্রতি শুক্রবারই নেসবিট তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। দু'জনের দু'চারটি কথাবার্তা হয়। সেদিনও তাই হ'ল। গাড়ি স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গে নেসবিট নেমে পড়লেন, আর তাঁকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলেন মিসেস নেসবিট। হাসিখুশি মুখে কথা হ'ল দু'জনের। এই এতটুকু ছোঁয়া, দেখা আর কথার মূল্য ছিল তাঁদের কাছে অনেকখানি। এখানকার স্টেশনের লোকেরা তা নিয়ে হাসাহাসি করত, কিন্তু ত'তে তাঁদের কিছু এসে যেত না। এই হাসাহাসির একমাত্র কারণ অবশ্য তাঁদের এই প্রেমের আকর্ষণই ছিল না, তাঁদের দু'জনের বিপরীত ধরণের আকৃতিই লোকের হাসির খোরাক যোগাত নেসবিট ছিলেন যেমন বেঁটে ও মোটা, তাঁর স্ত্রী ছিলেন তেমনি রোগা ও লম্বা। স্টেশনে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হবার সময় মিসেস্ নেসবিটকে বেশ খানিকটা নীচু হয়েই চুমু নিতে হ'ত নেসবিটের কাছে এবং এই দৃশ্যই ছিল দর্শকদের হাসির প্রধান উৎস।

সেদিন মিসেস নেসবিট তাঁর স্বামী যে কামরায় যাচ্ছিলেন, সেখানে মাত্র আর একজনকে বসে থাকতে দেখেন। লোকটি ইঞ্জিনের দিকে মুখ করে বেঁকে বসেছিল। নেসবিটের স্ত্রী তার মুখটা ভাল করে দেখতে পাননি। তাঁর ধারণা ছিল ঐ কামরায় হয়ত আরও লোক আছে, কিন্তু দূর থেকে তিনি যখন দেখলেন যে ঐ কামরায় মাত্র আর একজন যাত্রী, তখন তাঁর ভাল লাগেনি।

এই লাইনে পরের স্টেশনগুলি হ'ল যথাক্রমে---ফরেস্ট হিল, কিলিংওয়ার্থ, এ্যানিটস্‌ফোর্ড, ক্রামলিংটন, প্লিসে ও স্ট্যানিংটন। এই স্ট্যানিটংন স্টেশনে পার্সিভাল হার্ডিং এবং জেমস স্পিংক নামক নেদারটন কোলিয়ারীর দু'জন কর্মচারী গাড়ি থেকে নেমে যায়। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাবার সময় তারা নেসবিটকে হাত তুলে সম্ভাষণ জানায়।

এই দু'জনই পরে অর্থাৎ নেসবিটের হত্যাকাণ্ডের পরে, পুলিশের কাছে বলেছিল যে, তারা নিশ্চিত করে বলতে পাবে না যে, ঐ কামরায় তাঁর সঙ্গে আর কোন ব্যক্তি ছিল কি না।

স্ট্যানিংটনের পরের স্টেশন হ'ল মরপেথ। এখানে আসা আগে পর্যন্ত নেসবিট যে জীবিত ও সুস্থ ছিলেন তা ঐ দু'জন কোলিয়ারির কর্মচারীদের কথা থেকেই জানা যায়। স্টানিংটন থেকে মরপেথ-এ ট্রেন আসতে সময় লাগে মাত্র ছ' মিনিট। কিন্তু এই ছ'মিনিট পরে মরপেথ-এ ট্রেন এসে যখন পৌঁছল, তখন নেসবিটকে কোথাও আর দেখা গেল না। ওখানকার স্টেশন-মাস্টারের নাম মিঃ হল। তাঁর সঙ্গে নেসবিটের খুবই হৃদ্যতা ছিল। প্রতি শুক্রবারই ঐ সময় নেসবিট এসে তাঁর সঙ্গে দু'চার মিনিট হাসি-ঠাট্টা করে যেতেন। কিন্তু সেদিন তাঁর কোন সন্ধান না পেয়ে মিঃ হল মনে করলেন যে, নেসবিট নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই সেদিন আর আসতে পারেন নি।

স্ট্যানিংটন ছেড়ে ট্রেনখানা যখন মরপেথ স্টেশনে গিয়ে থামল, তখন সবার আগে দ্রুত একজন যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে, বাইরে বেরুবার ফটকের সামনে গিয়ে একজন টিকেট কালেক্টারের সঙ্গে কথা বলতে

লাগলেন। তিনি বললেন, তাঁর কাছে নিউক্যাসল থেকে স্ট্যানিংটন পর্যন্ত একটা রিটার্ন টিকেট আছে, কিন্তু কাগজ দেখতে-দেখতে তিনি এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন যে, একটা স্টেশন পেরিয়ে এসেছেন। এই একটা স্টেশনের ভাড়া আড়াই পেনি অতিরিক্ত বার করে দিয়ে টিকেট কালেক্টারকে তিনি একথাও বললেন যে, স্ট্যানিংটন তো এখান থেকে মাত্র দু' মাইল, কাজেই এই রাস্তাটুকু এখন তিনি পায়ে হেঁটেই চলে যাবেন।

লোকটির পোষাক-পরিচ্ছদ দেখলে বেশ ভদ্র এবং কোন নামকরা অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলেই মনে হয়। বয়স আন্দাজ ৩৬ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সুন্দর সুঠাম চেহারা এবং উচ্চতা মাঝারি ধরণের। একনজরে দেখলে বেশ ভালই লাগে লোকটিকে। মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া একমাথা চুল আর নাকের নিচে সুন্দর করে ছাঁটা হাল্‌কা ধরণের একফালি গোঁফ। সবদিক থেকে এত ভব্যযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আরো একটু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে, তার ধূসর রঙের চোখের চাউনির মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রকমের কঠোরতা ও ঠোঁটের মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

টিকিট কালেক্টার ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন, লোকটির কাঁধের উপর ঝুলছে হাল্‌কা রঙের একটা 'ম্যাকিনটশ' এবং তার চালচলনের মধ্যে কোন ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়োর কোন ভাবই ছিল না। এই হাল্‌কা ধরণের ম্যাকিনটশ বা বর্ষাতির সঙ্গে এই কাহিনীর পরবর্তী ঘটনার একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশ জড়িত আছে।

লোকটি স্টেশন থেকে স্ট্যানিংটন যাব বলে বেরিয়ে যান বটে, কিন্তু প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আবার মরপেথ স্টেশনে ফিরে আসেন এবং স্ট্যানিংটনের একখানা সিঙ্গল টিকেট কাটেন। এ থেকে এটাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি হেঁটে সেখানে যান নি, বা টিকেট কালেক্টারের কাছে দু'ঘণ্টা আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য এই ঘটনাটিই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে রহস্যজনক, অর্থাৎ কেন তিনি এই মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং এতক্ষণ কোথায় থেকে কি করছিলেন—তাই নিয়ে।

ট্রেনখানি ইতিমধ্যে পেগসউড, লংহার্স্ট হয়ে উইডরিংটন-এ গিয়ে পৌছে যায়। আসলে এখানেই নেসবিটের নামবার কথা। সেখানকার স্টেশনের প্রত্যেকটি রেলওয়ে কর্মচারীই তাঁকে চিনতো। কিন্তু সেদিন তারা তাঁকে ঐ ট্রেন থেকে নামতে না দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। এরপর এই রেল লাইনের আর ছিল মাত্র তিনটি স্টেশন---চেরিংটন, আর্কলিংটন ও ওয়ারমস্‌ফোর্থ---তারপরই এলেনমাউথে এই লাইনের সমাপ্তি।

এলেনমাউথে যথাসময়ে গাড়িটা আস্তে আস্তে এসে থামল। এই থামবার মুখে একজন পোর্টার লক্ষ্য করল যে, ইঞ্জিনের পরেই যে কামরাটি তার দরজাটা হাট করে খোলা। সে দরজাটি বন্ধ করার জন্য এগিয়ে যেতেই তার নজরে পড়ল বেঞ্চের মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক আর কামরার সে দিকটা জমাট কালো ও তাজা লাল রক্তে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে কর্মচারীদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল---স্টেশনের উচ্চপদস্থ অফিসাররা তখুনই ছুটে এলেন। স্টেশন মাস্টার রেলওয়ের ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এসে তৎক্ষণাৎ তাকে পরীক্ষা করে বললেন, লোকটিকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেছে। তার মাথা লক্ষ্য করে কমপক্ষে ছ'টা গুলি ছোঁড়া হয়েছে এবং সে নিজে তা কখনই ছুঁড়তে পারে না। কাজেই এটা যে আত্মহত্যার ব্যাপার নয়, কোন আততায়ীর হাতে যে সে নিহত হয়েছে তা প্রাথমিক ডাক্তারী পরীক্ষা থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

মৃত ব্যক্তির পকেট থেকে যে কাগজপত্র পাওয়া গেল, তা থেকেই লোকটির নাম যে জন্‌ জেমস্‌ নেসবিট তা প্রমাণিত হ'ল। তাঁর পকেটে রাখা পয়সাকড়ি বা হাতের রিস্টওয়াচটিতে হত্যাকারী হাত দেয়নি, কিন্তু তাঁর সঙ্গের সেই কোম্পানীর মাইনের টাকাভর্তি থলিটি একেবারে উধাও।

কয়েকটি বিষয় অনুসন্ধানের পর এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, স্ট্যানিংটন ও মরপেথ স্টেশনের কোন একটি জায়গায় মিনিট ছয়েকের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং ঐ টাকার থলিটি লুঠ করাই ছিল হত্যাকারীর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ দুটি স্টেশনের মাঝামাঝি লোকালয় শূন্য জায়গা ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনুসন্ধান করেও ঐ ব্যাগ বা রিভালবারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

পুলিশের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, এই হত্যাকাণ্ড পূর্ব-কল্পিত এবং লাইনের যে অংশটায় বনজঙ্গল আছে, হত্যাকারী সেই অংশটাই বেছে নিয়েছিল হত্যা করার জন্য। গাড়িখানি তখন ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলছিল। অবশ্য এও হতে পারে যে, হত্যাকারী লোকটির সঙ্গে রাখা টাকার থলিটি নিজের হাতে নিয়ে নামেনি। সে সেটিকে বাইরে গাড়ি থেকে তার সঙ্গীদের কাছে ছুঁড়ে দিয়েছিল---যাতে তারা সেটি যথাস্থান থেকে তুলে নিতে পারে। আবার এও হতে পারে যে, হত্যাকারী একাই একাজ করেছিল কোন সঙ্গী সঙ্গে না নিয়েই।

এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের গোড়ার দিকেই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ একটি চাঞ্চল্যকর বিবৃতি সংগ্রহ করেন অল্ডারম্যান গ্রে নামক মরপেথের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে। এই উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'এই হত্যাকাণ্ডের রিহার্সাল দেওয়া হয়েছিল ১৫ দিন পূর্বে। একজন ব্যবসায়ী ৪ঠা মার্চ তাঁর কাছে একটা কাজের জন্য এসেছিলেন ; ঐ লোকটি তাঁর ছেলের কাছে বলেছিলেন যে, ১০-২৭-এর গাড়িতে তিনি স্ট্যানিংটন

থেকে মরপেথ স্টেশনের মধ্যে দুটি গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ পান। কিন্তু এর জন্যে কোন বিপদের সঙ্কেত, কোন দুর্ঘটনার খবর রেলের অফিসে পেশ করা হয়নি।'

এ থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে, ঐদিন হত্যাকারী সম্ভবত পরীক্ষা করে দেখছিল যে, গুলির আওয়াজ শুনে কোন যাত্রী বিপদের শিকল টানে কি না বা এ সম্বন্ধে রেল-অফিসে কোন রিপোর্ট পেশ করে কিনা। পরবর্তী নাটকীয় হত্যাকাণ্ডের এটাই ছিল পূর্ণাঙ্গ রিহার্সাল এবং যখন সে বা তারা দেখল যে, চলন্ত গাড়ির মধ্যে এ ধরণের আওয়াজ অন্য কামরার যাত্রীদের কানে আসে না বা ঐ নিয়ে কেউ কোন হৈ-চৈও করে না—তখনই হত্যাকারী এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেটের এই বিবৃতিটি পাওয়ার পর, স্বভাবতই ট্রেনের সেই যাত্রীটির যে, স্ট্যানিংটনের টিকিট কেটে মরপেথ-এ এসে নেমেছিল, তার উপর পুলিশের নজর গিয়ে পড়ে। কয়েক দিনের মধ্যেই নানা সূত্র থেকে ঐ লোকটির সন্ধান বার করে ফেলে পুলিশ। আপাত-দৃষ্টিতে অতি ভদ্র ও নিবিরোধ এই লোকটির নাম যে জন্ এলেকজেণ্ডার ডিকম্যান তা জানতে পুলিশের মোটেই সময় লাগেনি। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে ও দু'বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে লিলি এ্যাভিনিউর জেসমণ্ড ডেন-এ বসবাস করতেন।

কথাবার্তায় মার্জিত, সাজ-পোশাকে সাতিশয় সুরুচিসম্পন্ন, আচার-ব্যবহারে ভদ্র এবং স্ত্রী ও সংসারের প্রতি একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ হিসাবেই তিনি পরিচিত ছিলেন তাঁর পড়শীদের কাছে। কিন্তু তাহলেও বাইরে নিজের এই ভদ্রতা ও সুনামের মুখোস ঢেকে রাখার জন্য তিনি সর্বদাই তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তফাৎ করে রাখতেন। ছেলেমেয়েকে তিনি পড়াতে চাইতেন অভিজাত স্কুলে, কিন্তু অবস্থার গতিকে তা পেরে উঠতেন না। নিজের এই অলীক মর্যাদা ও জীবনযাত্রার উচ্চ মানকে যথাসাধ্য বজায় রাখার জন্য এক এক সময় এমনও হ'ত যে, রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে চোরের মত তাঁকে বেরিয়ে যেতে হ'ত শহরের বন্ধকী-দোকানে—সামান্য টাকার জন্য ছোটখাটো জিনিস, যেমন সিগারেট কেস, রূপো-বাঁধান লাঠি ও দূরবীন প্রভৃতি বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে আসতে হ'ত।

ভদ্রলোক চাকরি যে করেন নি এমন নয়। ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি একটি নামকরা কোলিয়ারি কোম্পানীর সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে চাকরি যাওয়ার পর তিনি বেকার হয়ে যান এবং জুয়া খেলে, চাপা-দারিদ্র্যের মধ্যে কোন রকমে দিন কাটাতে থাকেন। এরপরও কিছুদিন রেসের বই ছাপা, রুটির কারখানা প্রভৃতি করেন বটে, কিন্তু কোনরকমেই নিজেকে আর দাঁড় করাতে পারেন নি। ক্রমশ অবস্থাটা তাঁর এমনই একটা জায়গায় এসে পৌঁছায় যে, নিজের যথেষ্ট মর্যাদাবোধ ও গাম্ভীর্য থাকা সত্ত্বেও ছোটোখাটো ব্যবসায়ী ও বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে সামান্য টাকা ধার করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু তা' হলেও, এই মর্যাদা ও রুচিবোধ তাঁর মধ্যে এমনই মজ্জাগত ছিল যে, শেষ পর্যন্ত আদালতে বিচারক ও জুরিদের সামনে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পাওয়া পর্যন্ত তাঁর এই মর্যাদা ও রুচিবোধকে তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেননি—পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-চ্ছেদের শেষ রাত্রিটিতে অভিশপ্ত কারা-কক্ষেও এতটুকু টলেন নি।

এই ধরণের আত্মশক্তির পরিচয় শেষ পর্যন্ত জন্ ডিকম্যান দিয়ে গেলেও আসলে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাপারে তিনি ছিলেন যেমন সচেতন, তেমনি তার সঙ্গে ছিল তাঁর দুর্বার ইচ্ছাশক্তি। যে অপরাধের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, সেই অপরাধ সম্পর্কে প্রথমে নিশ্চয়ই তিনি ভেবেছেন, পরে মনে মনে একটা পরিকল্পনা করেছেন, তারপর রিহার্সাল দিয়ে সুনিশ্চিত হয়েছেন যে, এ কাজ যত শক্তই হোক তা তিনি নিরাপদে এবং সাফল্যের সঙ্গেই করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে যে কাজ তিনি শান্ত ও সহজভাবে করতে পারতেন, অপরের পক্ষে তা করা ছিল কল্পনাতীত। তাছাড়া যা তিনি করতেন তা যত বড় গুরুতর অপরাধই হোক না কেন, সে বিষয় তাঁর কোন অনুশোচনা হ'ত না। তাঁর এই ধরণের কৃতকর্মের জন্য তিনি এক-এক সময় এমনই নিরুদ্বিগ্ন থাকতেন যে, যে-রাত্রে তিনি কোন দুঃসাহসিক কাজ করতেন, সেই রাত্রেই নাচ-গান শুনে এমনই শান্ত, গম্ভীর ও স্বাভাবিকভাবে বাড়ি ফিরতেন, যেন মনেই হ'ত না যে তাঁর কিছু ঘটেছে।

ডিকম্যানের জীবনের সঙ্গে আরও এমন অনেক গভীর গোপন রহস্য জড়িয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়, যার অনেকটাই হয়ত অপ্রকাশিত থেকে গেছে। নিউক্যাসলের একজন কুসীদ-জীবীর সঙ্গে তাঁর কিছু কাজ-কারবার ছিল। এই তেজারতির কারবারিও রহস্যজনকভাবে তাঁর নিজের অফিসের মধ্যে, মিঃ নেসবিটের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের আসল আসামী বহু চেষ্টা করেও বার করা যায়নি বটে, কিন্তু এর সঙ্গে মিঃ ডিকম্যানের নাম সন্দেহক্রমে জড়িত হয়েছিল। এছাড়া ডিকম্যানের গ্রেপ্তারের কয়েক মাস পূর্ব থেকেই নিউক্যাসলের বাইরে, বিশেষ করে জেসমণ্ড ডেন-এর চারিদিকে এমন কয়েক জনের উপর কয়েকটি নৃশংস রাহাজানি ও টাকা-কড়ি কেড়েকুড়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারা। এই সব ঘটনার সঙ্গে ডিকম্যানের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ ছিল কিনা যদিও পুলিশের তদন্তে তা জানা যায় না, কিন্তু সেই সময় ডিকম্যানের বাড়ি তল্লাস করা হয়েছিল, এবং তা করে, একটা অদ্ভুত ধরণের মোটা বেঁটে গুপ্তির মত লাঠি পাওয়া গিয়েছিল বাড়ির একটি ঘর থেকে। এই লাঠি সম্বন্ধে ডিকম্যান বলেছিলেন

যে, এটা তিনি তাঁর নিজের বিপদের সময় আত্মরক্ষার জন্য রেখেছেন।

ইতিমধ্যে নিউক্যাসলের পুলিশের কাছে এমন কতকগুলি সংবাদ এসে পৌঁছয় যে, পুলিশ ডিকম্যানকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। তাঁকে এই সময় এর প্রতিবাদে তাঁর কিছু বলবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটা শুধু অযৌক্তিকই নয়, হাস্যকরও। আমি এ সব সম্পর্কে কিছুই জানি না।

ডিকম্যানকে ট্রেনে নেসবিট হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করার মূলে প্রধানত যে কারণগুলি ছিল, তা হ'ল : এই হত্যাকাণ্ডের পূর্বে তাঁর অর্থের অভাব এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁচেছিল যে, তাঁর মাথার ঠিক ছিল না। অবশ্য তাঁকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তাঁর জামার পকেট থেকে প্রায় সতের পাউণ্ডের মত পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি একথা অস্বীকার করেন নি যে, যেদিন নেসবিট নিহত হয়েছিলেন, সেদিন তিনি ঐ একই গাড়িতে মরপেথ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি আরও বলেছিলেন, নেসবিটের সঙ্গে তাঁর সামান্য পরিচয় ছিল এবং সেদিন প্ল্যাটফর্মে তাঁর সঙ্গে দু'একটা কথাও বলেছিলেন; তবে তিনি তাঁর সঙ্গে এক কামরায় ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে সেদিন যে একটা রিভালবার ছিল এটা তিনি অস্বীকার না করলেও কেন ছিল সেটার ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। এ ছাড়া সেদিন মরপেথ পেরিয়ে তিনি যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন, একথাও তিনি অস্বীকার করেন নি।

ডিকম্যানের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেগুলি যে অত্যন্ত গুরুতর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তাহলেও তা থেকে এমন কোন সত্যে উপনীত হওয়া যায়নি যে ডিকম্যানই নিসবেটের হত্যাকারী। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে যা সহজেই প্রমাণ করতে পারে, এমন কোন কথাই যেমন তিনি অস্বীকার করেন নি, তেমনি এমন কথাও অসতর্কভাবে বা ভুলক্রমে বলেন নি, যা তাঁর নিরাপত্তাকে ব্যাহত করতে পারে। মূলত ডিকম্যান তাঁর জবানবন্দীতে এমন সব সত্যই বলেছিলেন, যা তাঁকে বিপদ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে এবং এমন সব জিনিস অস্বীকার করেছিলেন, যাতে সহজে তাঁকে হত্যাকারী হিসাবে অভিযুক্ত করা না যায়।

কারু কারু মতে এই মামলার বিচারকালে ডিকম্যানকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটা যেন একটু অবিচারই করা হয়েছে। নিজের সাক্ষী হিসাবে নিজেই তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন না করলে এই মামলার রায় হয়ত অন্যরকম হতে পারত।

নিম্ন বিচারালয়ে কেস উঠলে জেরার সময়, ডিকম্যান সব সময়েই ছিলেন ধীর-স্থির ও অবিচলিত। কড়া জেরার মুখেও তাঁকে কখনও উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় নি। দীর্ঘদিনের বিচারের মধ্যে তিনি তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও বিচারালয়ের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করে চলেছিলেন। তাঁর প্রধান অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একটি বিষয়ে কি-ভাবে তিনি জুরীদের খুশি করবেন তাই নিয়ে। সে বিষয়টি হচ্ছে : মরপেথ স্টেশন ত্যাগ করা এবং দু'ঘণ্টা পরে আবার সেখানে ফিরে আসার ঘটনাটি। এটি তিনি পূর্বেই পুলিশের কাছে তাঁর জবানবন্দীতে স্বীকার করেছিলেন। এই দুটি ঘণ্টাই ছিল মকদ্দমার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনার এই অংশটিতেই তিনি একটু বেকায়দায় পড়ে যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাক্ষী হিসাবে তাঁকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। শান্ত, সজাগ মন নিয়ে তিনি সব সময়েই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন। ভাবটা এই রকমই ছিল যে, তাঁর যেমন কোন কিছুই লুকোবারও নেই, তেমনি আবার কোন কিছু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন নেই।

এরপর প্রশ্ন উঠেছিল রিভালবার সম্পর্কে। নিউক্যাসলের এক বন্দুক-বিক্রেতার কর্মচারী মিঃ এনড্রু কর্কউড তাঁদের দোকানের খাতাপত্তর দেখিয়ে বলেছিলেন যে, গত নভেম্বর মাসে তাঁদের কোম্পানী একটি লোককে অটোমেটিক একটি পিস্তল বিক্রি করে। সে লোকটি তার নাম বলেছিল, জন্ ডিকিনসন এবং ঠিকানা দিয়েছিল, লিলি এ্যাভিনিউ, জেসমণ্ডেন। কিন্তু ডিকম্যানই যে সেই লোক তা তিনি সনাক্ত করতে পারেন নি।

কোর্টে মিস্ হাইম্যান নামে একজন মহিলা ডিকম্যানের নাম স্বাক্ষরিত একটি চিঠি উপস্থিত করে বলেন যে, তাঁর নামে এই চিঠি অনুযায়ী তাঁদের ফার্ম থেকে একটি বন্দুকের বদলে ভুল করে একটি রিভালবার পাঠান হয়। কিন্তু সেটা ফেরত দেবার অনুরোধ জানালে, তিনি সেটা সঙ্গে সঙ্গেই ফেরত পাঠান। এ সকল ঘটনা অবশ্য ঘটেছিল নেসবিট হত্যার বহু পূর্বে, তারপর এই বন্দুক সম্পর্কে ঐ মহিলা আর কিছুই জানেন না।

ডিকম্যানের পোশাক-পরিচ্ছদ পরীক্ষার বিষয়ও কোর্টে পুলিশ পেশ করে। কিন্তু সেখানেও এমন বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। সামান্য একটু রক্তের ছিটে তাঁর কোন একটি দস্তানার উপর পাওয়া গিয়েছিল আর তাঁর ট্রাউজারের পকেটের মধ্যে একটা রক্তের দাগের মত ছিল। কিন্তু এ সব বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে উড়িয়ে দেবার জন্য তাঁর হাতে যে ক্ষত পাওয়া যায়, সেটাই ছিল যথেষ্ট।

সেই অভিশপ্ত ট্রেনে যাওয়া সম্পর্কে ডিকম্যান পূর্বাপর একই কথা বলেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল : সেদিনের সেই শুক্রবার সকালবেলা, অর্থাৎ যেদিন ট্রেনে নেসবিট নিহত হয়েছিলেন, সেদিন ডিকম্যান স্ট্যানিংটনে তাঁর বন্ধু মিঃ উইলিয়াম হেগ-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য নিউক্যাসলের সদর স্টেশনে গিয়েছিলেন। এই হেগ ছিলেন ডিকম্যানের বহুকালের বন্ধু এবং তিনি বহু বিপদে-আপদে

তাঁকে সাহায্য করতেন। এই স্ট্যানিংটন যাবার সময় প্ল্যাটফর্মে মিঃ নেসবিটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। নেসবিটকে তিনি অল্পস্বল্পই চিনতেন; কিন্তু ঐ প্ল্যাটফর্মে দেখার পর নেসবিটের সঙ্গে তাঁর আর কোনদিনই দেখা হয়নি। গাড়িতে নেসবিট যে কামরায় উঠেছিলেন, সে কামরায় তিনি ওঠেন নি; তিনি উঠেছিলেন একটি ভিন্ন কামরায়। ট্রেনে উঠেই তিনি তাঁর প্রিয় খেলার খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দেন। কাগজের বিভিন্ন সংবাদ পড়তে-পড়তে, লিভারপুল গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালের খবর নিয়ে তিনি এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, নির্দিষ্ট স্টেশন ছাড়িয়ে তিনি পরের স্টেশন মরপেথ-এ চলে যান। সেখানে নেমে তিনি টিকিট কালেক্টারকে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে দেন এবং সেখান থেকে স্ট্যানিংটন পর্যন্ত দু'মাইল রাস্তা হেঁটেই চলে যাবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু কিছুটা পথ যাবার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে রাস্তায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কোন জায়গায় তিনি অপেক্ষা করেছিলেন, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পরে যখন তিনি একটু সুস্থ বোধ করেছিলেন, তখনই তাঁর নিউক্যাসলে যাবার জন্য একটা গাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। আর অপেক্ষা না করে, তিনি তখুনই স্টেশনে এসে হাজির হন এবং সেই ট্রেনেই বাড়িতে এসে যখন উপস্থিত হন তখন ঘড়িতে একটা বেজে দশ মিনিট।

এই সময়ের ব্যাপারটাই ছিল আসামী হিসাবে ডিকম্যানের সবচেয়ে দুর্বল দিক। সরকার পক্ষের উকিল এই অংশটার উপরই জোর দিয়েছিলেন বেশী করে। অর্থাৎ ট্রেন থেকে নেমে ডিকম্যান যে অস্বস্তিকর মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে ঐ সময়টা কাটিয়েছিলেন এবং শারীরিক অসুস্থতাটা যে তাঁর ঠিক কি হয়েছিল, তা ধরা যায়নি, তবে এইটুকু জানা গিয়েছিল ফিরে এসে ডিকম্যান যে সব কথা বলেছিলেন, তা খুবই অস্পষ্ট ছিল এবং তখন তাঁর জিবটা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এই দু'ঘণ্টার যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন তা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। মরপেথ স্টেশনে ফিরে আসার সময় যে লোকটির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল, তার সাক্ষ্য থেকেও এ কথা জানা যায়নি যে, তিনি কোন রাস্তা ধরে গিয়ে কোন মাঠের মধ্যে অসুস্থ হয়ে বসেছিলেন ঐ দুঘণ্টা সময়।

মামলার শেষ শুনানির দিন ডিকম্যানের সলিসিটার আবেগপূর্ণ ভাষায় ডিকম্যানের মুক্তির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঐ দু'ঘণ্টা সময় সম্পর্কে তিনি কোন সন্তোষজনক যুক্তি দেখাতে পারেন নি বলে বিচারক পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে দেন।

ডিকম্যান যখন হাজতে তখন নাটকীয়ভাবে সেই হারানো ব্যাগটি আবিষ্কৃত হয়—মরপেথ স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দু'য়েক হবে, সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে, 'হ্যাগসক্ল' কোলিয়ারির একটা সামান্য উচু হাওয়া বেরুবার গুমটির কাছে। রাস্তা থেকে এই গুমটিটি ভাল করে দেখা যায় না। কিন্তু যারা স্থানীয় বাসিন্দা তারা জায়গাটি জানে। উঁচু একটা ঢিবি আচ্ছাদন হিসাবে যেমন ঐ স্থানটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছিল তেমনি বিপদ এড়াবার জন্যে ঘিরে রেখে দেওয়া হয়েছে উঁচু বেড়া দিয়ে।

কয়লার খনির ম্যানেজার মিঃ পীটার স্পুনার একদিন বিকালের দিকে ওদিকে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর পায়ের নিচে কি যেন একটা ঠেকে যায়। সেটাকে তুলে নিয়ে তিনি দেখেন একটা কাল রঙের বড় ধরণের ব্যাগ, ধারাল ছুরি দিয়ে কাটা, আর ব্যাগটার মধ্যে কয়েকটা তামার পয়সা পড়ে আছে। তিনি ওটি দেখেই সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করে নেন যে, এটি সেই ব্যাগ। কাজেই দেরি না করে তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশের কাছে খবর দেন।

ব্যাগটির ভিতরে হাত দিয়ে সর্বসমেত উনিশ শিলিং ন' পেন্সের মত পাওয়া যায়। বিচারের সময় এই আবিষ্কারটিরও একটি বিশেষ মূল্য ছিল। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, হত্যাকারী ঐ অঞ্চলটিকে ভালভাবে জানত। সে এই ধরণের একটা অন্ধকার নির্জন জায়গা বেছে নেয় এবং সেখানেই থলিটিকে কেটে ভিতরের সোনা-রূপোর কয়েনগুলি সরিয়ে ফেলে, ছ'ফুট উঁচু বেড়ার উপর দিয়ে ব্যাগটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। তাড়াতাড়িতে ভিতরের কয়েকটি পয়সা থেকে যায় মাত্র।

সরকারী উকিল বিচারের সময় কায়দা করে এই কথাগুলিই বলেছিলেন, এবং কি ভাবে ও কি জন্য যে ডিকম্যান দু'ঘণ্টা সময় পথে কাটিয়েছিলেন, এর মধ্যেই তার উত্তর বিচারক খুঁজে পাবেন বলেও ইঙ্গিত করেছিলেন।

ডিকম্যান অবশ্য তার স্বপক্ষ সমর্থনের সময় বলেছিলেন যে, তিনি কখনও এ ধরণের হাওয়া বেরুবার গুমটির (air-shaft) কথা শোনেন নি এবং এ সম্পর্কে কোন কিছুই জানেন না।

টাকার থলিটা আবিষ্কার হওয়ায় বোঝা গেল, ডিকম্যান বা যে-কোন ব্যক্তিই দোষী হোক না কেন থলিটাকে সে ট্রেনের কামরার জানালা থেকে ফেলে দিয়েছিল এমন জায়গায়, যেখানে তার কোন ভাগীদার থাকলে সেটা তাদের হাতে যাবে, আর যদি কেউই না থাকে তাহলে নিজের হাতে আসবে। এ সম্বন্ধে এই কথাই বলা যেতে পারে যে, হত্যাকারী এ ক্ষেত্রে খুবই একটা ঝুঁকি নিয়েছিল টাকার থলিটা এইভাবে হাতছাড়া করে। এই সব কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তেও আসা যায় যে, ডিকম্যান যখন গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, ব্যাগটি তখন তাঁর নিজের কাছেই

স্কোলান ম্যাকিনটস বা স্নেন-কোনটি ছিল, হয়ত থলিটি লুকোন ছিল তার নিচেই। এর বিরুদ্ধে অবশ্য একথাও উঠেছিল যে, ব্যাগটি এতই বড় ছিল যে সেটিকে ওভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখানেও একথা মনে রাখতে হবে যে, টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে ডিকম্যানের যে সময় কথাবার্তা হয়েছিল, সে সময় তিনি ডিকম্যানকে অত ভাল করে লক্ষ্য করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আবার টাকা-পয়সা সরিয়ে ফেলার মত কোন ব্যাগও যে তাঁর কাছে ছিল, সে কথাও বলা যায় না। তবে এমনও হতে পারে যে, ঐ ধরণের কোন ব্যাগ তিনি ঐ কোলিয়ারির 'এয়ার-স্যাফট্'-এর কাছাকাছি কোন জায়গায় আগে থেকেই লুকিয়ে রেখেছিলেন, কারণ সে জায়গাটি ছিল খুবই নির্জন---মানুষের যাতায়াত সেখানে ছিল না বললেই হয় এবং সেখানেই, তিনি টাকাটা ঐ ব্যাগ থেকে বার করে অন্য কোন কিছুর মধ্যে পুরে নিয়েছিলেন।

নগদ টাকাটার কোন হদিশ অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ডিকম্যানকে গ্রেপ্তার করার সময় সার্চ করে তাঁর পকেট থেকে ঐ যা সত্তর পাউণ্ড পাওয়া গিয়েছিল, আর তাঁর বাড়িতে ছিল মাত্র কয়েকটি শিলিং।

মিসেস ডিকম্যান অবশ্য পূর্বাপর তাঁর স্বামীকে নিরপরাধ বলেই জেনে এসেছেন। তিনি তাঁর স্বামী সম্পর্কে সেই কথাই আদালতে বলেছিলেন। এ থেকে এটাই স্পষ্টত বোঝা যায় যে, ডিকম্যান তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এ সব বিষয় কখনও কোন আলোচনা বা শলা-পরামর্শ করেন নি। জন্ ডিকম্যানেরও জীবনযাত্রার একটা প্রধান লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে, তিনি কোন অবস্থাতেই যেন তাঁর স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের কাছে কোন অবিশ্বাসের কাজ না করেন সে-দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন। এ সম্বন্ধে আরও একটা বিষয় সত্য ছিল যে, তিনি যদি ঐ টাকাটা আত্মসাৎও করে তিনি ঐ টাকা নিয়ে কখনও বাড়িতে আসতেন না। কারণ তিনি জানতেন তাহলেই তাঁকে এই বিষয় নিয়ে নানা অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

●

আদালতের এই চাঞ্চল্যকর হত্যা-কাণ্ডের বিচারের ভার যাঁর উপর ছিল তিনি হলেন বিচারপতি মাননীয় মিঃ কোলরিজ। অত্যন্ত যত্নসহকারে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি তাঁর বিচার-কার্য সমাধা করেছিলেন। আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছিল তা থেকে বলা যায় যে, ঘটনাটি তার কোন ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল না। আবার অন্য একটি কয়লার খনির দু'জন হিসাব বিভাগের কর্মচারী মিঃ হার্ডিং ও মিঃ স্মিথ সাক্ষী হিসাবে বলেছিলেন যে, তাঁরা ডিকম্যানকে নেসবিটের সঙ্গে যে কথা বলতে দেখে-ছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত। মিঃ চার্লস র‍্যাভেন নামক অপর একজন তাঁর এজাহারে বলেছিলেন, তিনিও দু'জন লোককে প্ল্যাটফর্মের উপর কথা বলতে বলতে যেতে দেখেছিলেন।

উইলসন হিপ্‌লি নামে একজন নামকরা আর্টিস্টও সাক্ষী দিয়েছিলেন এই মামলায়। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বিচারালয়ে এই কথা বলেছিলেন যে, তিনি ইঞ্জিনের কাছাকাছি একটি কামরায় মৃতব্যক্তিকে অপর একজন লোকের সঙ্গে উঠতে দেখেছিলেন। তবে ডিকম্যানই যে সেই ব্যক্তি একথা যেমন তিনি জোর করে বলতে পারেন নি, তেমনি ডিকম্যানের সঙ্গে ঐ লোকের চেহারার যে বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে তাও বলতে দ্বিধা করেন নি।

পুলিস কোর্টে করোনারের জেরার মুখে মিসেস্ নেসবিট বলেছিলেন যে, 'তিনি যখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে 'হিলর' স্টেশনে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর স্বামীর কামরার মধ্যে অপর একজন লোককে পাশ থেকে দেখেছিলেন. কিন্তু চেহারাটা দেখলে চিনতেও পারবেন না।' কিন্তু উচ্চ আদালতে বিচারের সময় তাঁকে যখন ডিকম্যানকে সনাক্ত করার জন্য পাশ থেকে তাঁর মুখটা দেখান হয়েছিল, তখন তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে কাঁদতে-কাঁদতে বলে উঠেছিলেন, 'হ্যাঁ, একেই নেসবিটের কামরায় আমি দেখেছি!' কিন্তু তাঁর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ ডিকম্যানের কৌঁসুলি বিচারকের সামনে আপত্তি তুলে বলেছিলেন, মিসেস্ নেসবিটের পূর্বের উক্তির সঙ্গে বর্তমানের উক্তি সামঞ্জস্যহীন। তিনি পুলিস কোর্টে বলেছিলেন যে. 'তিনি চেহারাটা ভাল করে দেখেন নি, এখন দেখলে চিনতেও পারবেন না।' কিন্তু এখন মহামান্য বিচারকের কাছে তিনি মিথ্যেকথা বলছেন, এবং বলছেন যে, এই লোকটিকেই নেসবিটের কামরায় দেখেছিলেন। এরপর জনাকীর্ণ আদালতে নাটকীয়ভাবে যখন কাঁদতে-কাঁদতে তিনি বলে-ছিলেন, 'এই লোকটিই আমার স্বামীকে হত্যা করেছে, আমি আর ওকে দেখতে চাই না।' তখন চারিদিক থেকেই জনসমাবেশের মধ্যে একটা চাপা কান্নার রোল উদ্বেল হয়ে উঠেছিল---রুমাল দিয়ে ফ্যাঁস-ফোঁস নাক-চোখ মুছতে দেখা গিয়েছিল মেয়েদের অনেককেই।

এই বিচার আদালতে চলতে থাকাকালীন এমন একজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যে তার বক্তব্যের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের প্রায় দু সপ্তাহ পূর্বে ডিকম্যান যে তাঁর বন্ধু মিঃ হেগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ১০-২৭ মিনিটের গাড়িতে স্ট্যানিংটন গিয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে বলেন। এঁর সাক্ষ্য হয়ে যাবার পর, এটার উপর বিশেষ জোর দিয়েই সরকারী কৌঁসুলি বলেছিলেন, আসলে ডিকম্যান ঐ দিনটিতেই তাঁর পরবর্তী হত্যা-কাণ্ডের স্টেজ-রিহার্সাল দিয়ে আসেন।

সরকারী কৌঁসুলি এরপর

ঘটনাটি সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করে বলেন---

সেই বিশেষ শুক্রবার, হতভাগ্য নেসবিটের হত্যার দিনটিতে আসামী তার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে কথা বলেছিল এবং ইঞ্জিনের পাশেই একটি কামরায় দু'জনে একসঙ্গেই উঠেছিল। স্ট্যানিংটন ও মরপেথ রেল স্টেশনের মাঝামাঝি কোন একটি জায়গায় এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে, কারণ এই দুই স্টেশনের মধ্যেই গতায়াতের ব্যবধান ছিল সবচেয়ে বেশী---প্রায় ছ'মিনিট। গাড়ির জানালা দিয়ে হত্যাকারী ব্যাগটি বাইরে ছুঁড়ে দেয়। তারপর বাইরে যেখানে ব্যাগটি পড়েছিল, মরপেথ থেকে সে সেখানে হেঁটে আসে। হয় সে নিজেই ব্যাগটি তুলে নেয়, না হয় তার সঙ্গীদের সঙ্গে, অর্থাৎ যাদের সঙ্গে তার আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, ছুরি দিয়ে ব্যাগটিকে কেটে, নগদ টাকাটা বার করে নিয়ে তারপর ব্যাগটিকে ফেলে দেয় বেড়া দিয়ে ঘেরা কোলিয়ারির এয়ার-স্যাফট্-এর কাছে। ফেলে দিয়েই পরের গাড়িতে মরপেথ থেকে বাড়ি ফিরে আসে আসামী।

সমস্ত ঘটনাটি এইভাবে এদিক থেকে দেখলে অবশ্য জন্ ডিকম্যানের বিরুদ্ধে মকদ্দমাটি খুবই জোরদার হয় বটে, কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে আসামীর স্বপক্ষেও অনেক কথা বলবার থাকে। মামলার শেষের দিকে ডিকম্যান যে ধুরন্ধর কৌঁসুলি দিয়েছিলেন, তিনি কোর্টকে সে কথাগুলি শোনাতে কসুর করেন নি। সে কথাগুলি হচ্ছে: মিঃ নেসবিটকে হত্যা করার ইচ্ছা যদি ডিকম্যানের পূর্বকল্পিতই থেকে থাকে, তাহলে তিনি কিভাবে এমন একটা অসম্ভব আন্দাজ করতে পারেন যে, স্ট্যানিংটন ও মরপেথ স্টেশনের মধ্যে ঐ বিশেষ কামরায় তিনি একাই নেসবিটের সঙ্গে থাকবেন---অপর কেউ সেখানে থাকবে না? তাছাড়া, কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা যদি মানুষের মনে থাকে, তাহলে সাধারণত সে তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে এবং সাধারণের সামনে তার সঙ্গে কখনই এক কামরায় উঠবে না। এক্ষেত্রেও তেমনি, যদি ডিকম্যানের মনে নেসবিটকে হত্যা করার বাসনাই থাকত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নেসবিট থেকে দূরে-দূরেই থাকতেন, তারপর যেন কোন উপায় নেই এমনি-ভাব দেখিয়ে, ছুটে, নেসবিট যে কামরায় যাচ্ছিলেন সেই কামরায় উঠে পড়তেন। নেসবিটের সঙ্গে দেখা হওয়া যেন একটা আকস্মিক ব্যাপার এমনভাবেই তিনি চলাফেরা করতেন। তাছাড়া এটাও ভাববার বিষয় যে, স্ট্যানিংটনের টিকিটই বা তিনি করতে যাবেন কেন এবং এক স্টেশন এগিয়ে গিয়ে, বাড়তি ভাড়া দিয়ে, আবার বিপরীত দিকেই বা যাবেন কেন?

আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গাড়ির দরজাটা খোলা ছিল। এটাই বা কি করে সম্ভব যে, যতক্ষণ গাড়িখানা এলেনমাউথ পর্যন্ত না পৌঁচেছিল, ততক্ষণ কেউই লক্ষ্য করেনি যে, কামরার দরজাটা খোলা আছে। অথচ মরপেথ থেকে এলেনমাউথ চারটে স্টেশন। তারপর প্রকৃতপক্ষে নেসবিটের হত্যাকারী যদি ডিকম্যানই হতেন, তাহলে হত্যার পর তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু রক্তের দাগ পাওয়া যেত। কিন্তু ডিকম্যানের যে পোশাক পাওয়া গিয়েছিল এবং তাতে যে ছিটে-ফোঁটা রক্তের চিহ্ন ছিল, তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয়নি। এছাড়া আরও একটি কথা হচ্ছে, লুণ্ঠিত অর্থ বা রিভালবারটি গেল কোথায়? ডিকম্যানের স্টেশন ত্যাগ এবং পুনরায় ফিরে আসার মধ্যে যে দু ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়েছিল, এবং সে সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন, তা কি প্রমাণিত হয়েছে? তাঁর যে অর্শ ছিল এবং রাস্তায় যেতে যেতে তাঁর শরীর যে খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল, এ কথাগুলিও কি একেবারে অবিশ্বাস্য?

এই সব বিতর্কমূলক কথাই ডিকম্যানের স্বপক্ষে তাঁর বিজ্ঞ কৌঁসুলি জুড়ি ও জজের সামনে যুক্তি ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সোচ্চারে বলেছিলেন। কিন্তু তা কোন কাজেই আসেনি।

দুর্ভাগ্যক্রমে জুরিরা সেই তাৎপর্য-পূর্ণ দু ঘণ্টা' সম্পর্কে ডিকম্যান যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা মোটেই বিশ্বাস করেন নি। নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর, লোকে লোকারণ্য, উদ্বিগ্ন জনতার সামনে আদালতের মধ্যে তাঁরা ঘোষণা করলেন:

আসামী ডিকম্যান হত্যার অপরাধে অপরাধী।

এই কথা শোনামাত্রই মুহূর্তের জন্য ডিকম্যান যেন বিবর্ণ হয়ে যান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেকে সংযত করে নিয়ে শান্ত হয়ে সোজা-ভাবে দাঁড়ালেন এবং যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল : তাঁকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে না, সে সম্বন্ধে তাঁর কি কিছু বলবার আছে?

উত্তরে ডিকম্যান স্পষ্টই বলেছিলেন, দুনিয়ার সব মানুষের দরবারে আমি শুধু দৃপ্তকণ্ঠে এই কথাই ঘোষণা করছি যে আমি নিরপরাধ।

ডিকম্যানের সাধ্বী-স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বাঁচানোর জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টাই করেছিলেন। জনমতের এক অংশও তাঁর পক্ষে গিয়েছিল। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তো খোলাখুলি-ভাবেই বলেছিলেন, ডিকম্যানের বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে যে সাক্ষী পাওয়া গেছে, তার জোরে একটা কুকুরকেও ফাঁসি দেওয়া যায় না।

ডিকম্যানের পক্ষে একটি বিস্তারিত আবেদনও শেষের দিকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। সংক্ষেপে তার মূল কথাগুলি এই ছিল যে, আসামী এমন একজন লোকই নয় যে, হিসেব করে শান্তভাবে এমন নৃশংস হত্যা করতে পারে। ডিকম্যানের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই সন্দেহাতীতভাবে একই ধারণা পোষণ করেন।

কিন্তু এই সমূহ প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন আসামী ডিকম্যানের এক ভাই। স্থানীয় খবরের কাগজে প্রমাণসহ ডিকম্যানের বিরুদ্ধে এমন একখানি চিঠি তিনি ছাপিয়েছিলেন, যাকে সমস্ত অপরাধমূলক মামলার ইতিহাসে অভাবনীয় বলা যায়। লেখক অশঙ্কচিত্তে স্পষ্ট ভাষায় আদালতের ন্যায়বিচারের কথা উল্লেখ করে আসামী যে সত্যিকারের দোষী সেই কথাই প্রমাণ করেছিলেন ঐ চিঠির মধ্যে। তিনি সেই সঙ্গে আরও বলেছিলেন যে, আসামী যদি সহজ, স্বাভাবিক পথে চলত তাহলে তার আজ এই দুরবস্থা হ'ত না।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের চিঠি ছাপা হওয়ার পর, আদালতে ডিকম্যানের করুণা লাভের শেষ আশাটুকু পর্যন্ত সমূলে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। কেন যে ডিকম্যানের ভাই এই ধরণের মারাত্মক পত্র লিখে তার ভাইয়ের জীবনের শেষ যবনিকাপাত করে দিতে চেয়েছিল, সে কথা আজও রহস্যাবৃত।

মিসেস্ ডিকম্যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। শেষবার দেখা করার জন্য মিসেস ডিকম্যান যখন রুদ্ধ কারাকক্ষে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট মেয়ে ও ছেলে। কিন্তু তখনও দেখা গিয়েছিল হতভাগ্য ডিকম্যানের অসাধারণ সহনশীলতা, যা তাঁকে নিদারুণ বিপদের মধ্যেও স্থির রেখেছিল। সেদিন তিনি শুধু তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, এই কথাটিই জগৎমুদ্ধ লোককে বলে দিয়ো যে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, নিরপরাধ। চিরতরে শেষ বিদায়ের ক্ষণেও এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত ব্যক্তিটি ছিলেন স্থির, ধীর। তিনি অপলকদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, ছেলে-মেয়ে দুটির হাত ধরে স্ত্রীকে যতদূর দেখা যায় সেই পথের দিকে। কিন্তু তারা পিছন ফিরে দেখতে-দেখতে যখন দৃষ্টির বাইরে যায়, তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন ডিকম্যান---ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত ফাঁসির হুকুমের সেই চরম ক্ষণটি এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু তখনও ডিকম্যান শান্ত ও প্রস্তুত। তিনি ভালভাবেই তাঁর প্রাতরাশ খান, তারপর বাইবেল থেকে এক অধ্যায় ভক্তিসহকারে পাঠ করেন। ধর্মযাজকের কাছেও তিনি যা শেষ কথা বলেন, তা হ'ল, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তারপর মাথা উঁচু করে ৬০ গজ হেঁটে রুদ্ধ কারাকক্ষ থেকে তিনি যান বধ্যভূমিতে।

জন এলেকজেণ্ডার ডিকম্যানের ফাঁসির পরও মিসেস্ ডিকম্যান তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে নিউক্যাসলেই মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে থাকতেন--চলাফেরা করতেন। তাঁর এটাই দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, অবস্থার চাপে ডিকম্যান অন্য যে-কোন অপরাধই করুক, কিন্তু সে কোন অবস্থাতেই এভাবে মানুষ খুন করতে পারে না। স্বামীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ছিল অটুট ও অপরিসীম।

বন্দর

অশোক নস্কর

মোহমুগ্ধ চেতনা,
প্রাণের উত্তাপে যদি অশান্ত ঘূর্ণির স্রোত
তবু প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাঁধ
ঐ পশারিণী জীবনের মোহানায়,
তুমি দূরে সরে যাও অর্ণব তরংগ।
সর্পিল মাটির ফাটলে
বেয়ে আসা জলীয় বন্যা
ও তো ভাঙা বাঁধ, ভাঙা জীবনের জল্পনা।

জাগো মোহোত্তার্ণ---
জোয়ার অনেক বাকী
আরো দেরী পলিমাটি ঢেকে দেওয়া প্লাবন,
অবাঞ্ছিত শ্যাওলার ভিড় ভাঙা বন্দরে
এখনও স্থান দাও,
ঐ তো আগন্তুক ঢেউ ভাঙা পান্থের অভিসার।

তাজমহলের নীলাম
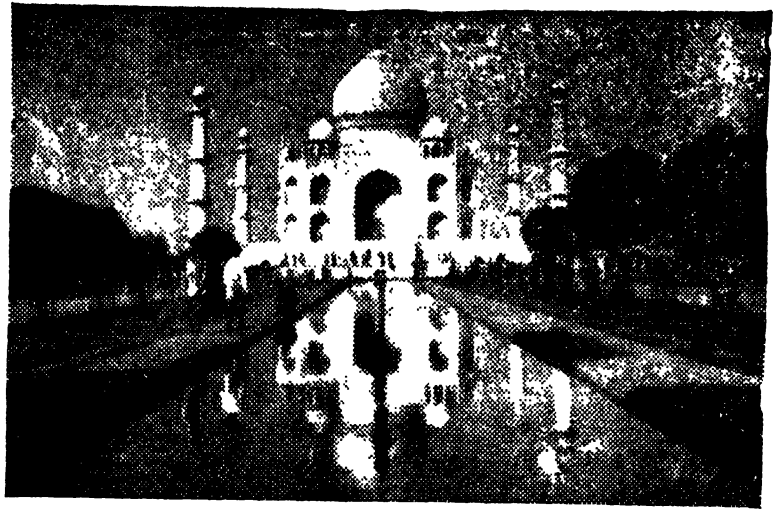
মোগল-সূর্য অস্তমিত হবার পর ব্রিটিশ বণিকদল ভারতবর্ষে এসে রত্ন আহরণে গোটা দেশ তোলপাড় করতে লাগল। এই সকল ইংরেজ বেনেদের একদলের নজর পড়ল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাজমহলের উপর। তাঁদের মতে মর্মর প্রস্তরের এত অন্যায় ব্যবহার আর কোথাও হয়নি। তাঁদের সিদ্ধান্ত হল ভারতের কালা-আদমিরা মার্বেল পাথরের সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি। তাই ঠিক হল এই বস্তুটিকে নীলামে চড়িয়ে কিনে নেওয়া এবং তারপর তাজমহলকে ভেঙ্গে পাথরগুলো সৎকাজে লাগান।

লাটসাহেবের দরবারে বিদেশী বণিকদল হাজির হল তাদের আবদার নিয়ে। ইংরেজ কর্তারা বিজ্ঞ-মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক কথা মার্বেল পাথরের যে অপব্যবহার করা হয়েছে তার একটা প্রতিবিধান করা চাই।'

তাই হুকুম হল তাজমহলকে ভেঙ্গে পাথরগুলোর সদ্‌ব্যবহার করতে পারেন।

তারপর একদিন তাজমহল সত্যি সত্যি নীলামে উঠল। নীলামে দাম উঠল---এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। ব্যাপারটি গোপনেই সারবার চেষ্টা হয়েছিল---কিন্তু গোপন থাকল না। ভারতের কালা আদমিরা তাজমহলকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র টের পেয়ে গেল। নিরীহ মানুষগুলি প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ইংরেজ বেনেরা আর বেশীদূর অগ্রসর হতে সাহস পেল না। সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও বিদেশী সাহেবদের মাথা থেকে একেবারে গেল না।

১৮২৮ খৃস্টাব্দে লর্ড বেণ্টিকের আমলে তাজমহলের সংস্কার করার বিষয়টি আবার নূতনভাবে দেখা দিল। প্রায় সাত বছর ধরে এ নিয়ে পরীক্ষা-

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী

নিরীক্ষা চলল। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ-পুঙ্গবদের তাজমহল ভাঙ্গতে আর সাহস হল না।

ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তির কথা চিন্তা করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এ যেন আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের সৃষ্টি। কোন মানুষের তৈরী---একথা যেন ভাবাই যায় না। শ্বেতমর্মরের অপূর্ব সৌধটি এক প্রেমিক সম্রাটের ভারতের সমগ্র নারী-সমাজের প্রতি যেন সশ্রদ্ধ নিবেদন, স্বর্গীয়-প্রেম মর্মর প্রস্তরে তার শেষ স্বাক্ষর খোদিত করে গেছে।

তাজমহলে প্রবেশ করলেই মনে হয় প্রতিটি মর্মর প্রস্তরে শাহজাহান-প্রেয়সী আরজুমন্দ বানু বেগম---পরে যিনি মমতাজ মহল (অর্থাৎ প্রাসাদের মুকুট) নামে খ্যাতি লাভ

তাজমহলের প্রস্তরগাত্রে কান পাতলে যেন আজও বিরহী শাহজাহানের হাহাকার শোনা যায়। যমুনা-বিধৌত তাজমহলের মর্মর সৌধ---বাগান এবং পরিবেশ---এক অপূর্ব রাজকীয় রুচির পরিচয়।

সম্রাট শাহজাহান ১৬১২ খৃস্টাব্দে ২১ বছর বয়সে আরজুমন্দ বানুর পাণিগ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯। মমতাজ কেবল শাহজাহানের হৃদয়ের গভীর ভালবাসার অধিকারী হন নি---ভারতের রাজ্য শাসনেও নূরজাহানের মতন অধিকারী হয়েছিলেন। চতুর্দশ সন্তানের জননী মমতাজ ১৬৩০ বুরহানপুরে সূতিকাগৃহেই মারা যান।

মমতাজের মৃত্যুর পর শোক-বিহ্বল শাহজাহান অমাত্য-পরিষদ লোকজন সকলের সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন। সরকারী কাজ অচল হয়ে উঠল। এক সপ্তাহকাল শাহজাহান নিজের প্রাসাদ থেকে আর বের হলেন না। তিনি এমন পর্যন্ত ঠিক করেছিলেন যে সিংহাসন পরিত্যাগ করে রাজকুমারদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেবেন। দু বছর ধরে রাজদরবার সরকারিভাবে শোক পালন করে। সঙ্গীত স্তব্ধ হয়ে গেল। নূপুরের আওয়াজ আর শোনা গেল না বহুদিন। রূপসীদের রত্নাভরণ, আতর, সুবাস ব্যবহার করা বন্ধ রইল, রাজ

মৃত্যু হয় সেই মাসটিকে বহুদিন পর্যন্ত শোকের মাস হিসাবে পালন করা হত।

সম্রাট তাঁর শোকের ভাষা দিতে চাইলেন বিশ্বের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করে। তিনি তাজমহলের স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর স্বপ্ন রূপায়িত করার জন্য সমগ্র রাজকোষ খুলে দিলেন। যত অর্থের প্রয়োজন হোক না কেন তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌধ নির্মাণ করতেই হবে, যত শ্রেষ্ঠ শিল্পী---তাঁরা এলেন সৌধের পরিকল্পনা নিয়ে। রাজদরবারে প্রত্যেকটি পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিচার চলতে লাগল। অবশেষে ওস্তাদ আহমদের পরিকল্পনা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হল।

ইংরেজরা যে সৌধটির মূল্য দেড় লক্ষ টাকা ঠিক করেছিল, তার কত খরচ পড়েছিল তার আলোচনা করলে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়।

প্রথমেই স্থান নির্বাচন। মোগলদের রীতি অনুসারে সেই সৌধ-নির্মাণের জন্য বাগানের অনুসন্ধান চলল। অনেক অনুসন্ধানের পর নীল যমুনার তীরে রাজা মানসিংহের এক আদর্শ প্রমোদ উদ্যানই সৌধের স্থান হিসাবে নির্বাচিত হল। সেই বাগান বিশ্বের সেরা ফুল ও ফলে ভরে আছে। ফুল হল মানুষের জীবন ও আনন্দের প্রতীক। এই বাগান ও প্রমোদ-ভবনের মালিক ছিলেন রাজা মানসিংহের বংশধর রাজা জয়সিংহ। সম্রাটের দূত জয়সিংহের রাজদরবারে যেয়ে হাজির হল।

শাহজাহানের অনুরোধ এই বাগান তাঁর চাই। এই অপূর্ব বাগানে, যমুনার ধারে, তাঁর স্বপ্নের প্রেমের সমাধি রূপায়িত হবে। জয়সিংহ সম্রাটের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না---মেনে নিলেন। পরিবর্তে পেলেন এক বিরাট প্রাসাদ ও প্রচুর জায়গা-জমি।

মর্মর-শিল্পীদের মেলা বসে গেল। বাগদাদ, দিল্লী ও মুলতান থেকে এল সবার সেরা রাজমিস্ত্রী মোজেকের কাজ করার জন্য, বাগদাদ ও কনৌজ থেকে মিস্ত্রী এল। মর্মরগাত্রে কোরানের অমর বাণী লেখার জন্য সিরাজ থেকে লোক এল। সৌধ নির্মাণের জন্য পাথর মণি-মুক্তা বিশ্বের সকল স্থান থেকে আহরণ করা হল। রাজপুতানার থেকে এল মর্মর পাথর। লাল পাথর এল ফতেপুর সিক্রী থেকে। তাছাড়া অন্যান্য পাথর---প্রবাল-মণি-মুক্তা এল চীন, তিব্বত, সিংহল, আরব ও পারস্য থেকে, বুন্দেল খণ্ড থেকে এল শ্রেষ্ঠ হীরক।

বিশ হাজার লোক প্রত্যহ এই সৌধ নির্মাণের কাজে লেগে গেল। ---চলল একটানা কাজ ২২ বছর। খরচের তালিকা নানা রকমের। বিভিন্ন মতামত এই সম্পর্কে---কোন প্রামাণ্য কিছু পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা আংশিক হিসাব। শাহজাহানের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত লেখক মুল্লা আবদুল হামিদ লাহোরি তাজমহলের বিবরণ প্রসঙ্গে বলছেন---

"The cost of building the several edifices which are detailed above, and which were completed in nearly twelve years under the supervision Makramat Khan and Mir Abdul Karim, amounted to 50 lakhs of rupees."

খরচের এই হিসাব প্রামাণ্য বলে মনে হয় না। কারণ সাধারণভাবে খরচের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়---তাজের খরচ লাহোরির হিসাবের বহুগুণ। মনে হয় সাধারণ বেতন ও মজুরীতেই এই খরচ হয়েছে।

মাসিক বেতনের তালিকা দেখলে বোঝা যায়---তখন বেতনের অঙ্কও বেশ ভালই ছিল। প্রধান নক্শানবীশ ওস্তাদ ইসা, প্রধান স্থপতিবিদ্ আমানত খান সিরাজীর মাইনে ছিল মাসে এক হাজার টাকা। মর্মরগাত্রে পবিত্র কোরানের বাণী যিনি খোদিত করেছেন তাঁর মাইনেও এক হাজার টাকা ছিল। প্রধান রাজমজুর মহম্মদ হানিফের বেতনও ঐ একই ছিল। শ্রেষ্ঠ কারিগর ও শিল্পীর তালিকায় প্রায় ৩৮ জন ছিলেন---যাঁরা এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন।

এবার মাল-মশলা খরচের একটা আন্দাজ করা যাক্। মহামূল্য পাথরগুলি এসেছে সরকারী রাজকোষ থেকে। মর্মর পাথরের বেশী অংশ আসে ভারতের বিভিন্ন রাজাদের কাছ থেকে---আসে নজরানা রূপে। লাল পাথর আসে ফতেপুর সিক্রী থেকে। সাদা ও হলদে শ্বেতপাথরের দাম ছিল ৫০ টাকা প্রতি বর্গগজ। কালো মার্বেলের দাম ছিল ৯০ টাকা প্রতি বর্গগজ। লাল পাথরের যে খরচা হয়েছে তা ভাবলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। এক লক্ষ ১৪ হাজার গরুর গাড়ী ভরতি লাল-পাথর ফতেপুর সিক্রী থেকে আমদানী হয়েছে। এই গরুর গাড়ীর খরচাই কয়েক লক্ষ টাকা লেগেছে। স্বর্ণ ও রত্নের হিসাব করলে দেখা যায় তার মূল্যের অঙ্কও কম নয়।

লাহোরি এর বর্ণনায় বলছেন মর্মর প্রস্তরের শবাধারের চারিদিকে সোনার রেলিং দিয়ে ঘেরা ছিল। তাতে ছিল অসংখ্য মণিমুক্তা ও মহামূল্য পাথর। ভারতীয় স্বর্ণ-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। সোনার ওজন ছিল চল্লিশ হাজার তোলা। প্রধান হলটি দামী পারস্য দেশের কার্পেট দিয়ে মোড়া ছিল। হলের মধ্যে যে অংশটি মার্বেল পাথরের জালি দিয়ে ঘেরা---যেটা মোগল শিল্পের এক অপূর্ব সম্পদ---যা করতে প্রায় দশ বছর লেগেছে। মাত্র মজুরী প্রায় ৫০,০০০ টাকা লেগেছে। কবরটি ঢাকা দেবার জন্যে মুক্তাখচিত চাদরটির দামও কয়েক লক্ষ টাকা। তাজের রূপোর তৈরী দরজার খরচ পড়েছিল ১,২৭,০০০৲। জাঠদের আক্রমণের সময় এই দরজা দুটো তারা নিয়ে যায়---এবং আগুনে গলিয়ে রূপো বের করে নেয়।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এবং লেখকেরা এই হিসাব নিয়ে অনেক

গবেষণা করেছেন। হাভেল বলেন, তাজমহলের খরচ অন্তত দু কোটি টাকা পড়েছে। সম্প্রতি ফার্সীতে লেখা এক দলিল পাওয়া গেছে, দলিলটি আগ্রার মহম্মদ মৈনুদ্দিনের কাছে রক্ষিত আছে। তাতে তাজের বিভিন্ন অংশের খরচের এক তালিকা আছে। সেই তালিকার হিসাব করলে দেখা যায় তাজের খরচ দু'-কোটি থেকে তিন কোটি টাকা পড়েছে।

এই তাজমহলটিকে ইংরেজ বণিকেরা নিলাম করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন---অর্থাৎ নিলাম করে ভেঙ্গে ফেলতে সাহস করে নি।

তাজমহলের খরচ নিয়ে আলোচনা অনেক সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবেন, এই স্বপ্নসৌধের খরচ খুব বেশী হয়ে থাকলেও টাকার অঙ্কে এই সৌন্দর্যের পরিমাপ হয় না। সম্রাট কবি যেন তাঁর কাব্যকে মর্মর প্রস্তরে রূপায়িত করে গেছেন।

স্যার Edwin Arnold তাঁর এক কবিতায় তাজমহলের শাশ্বত সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"Not architecture
as all others are,
But the proud passion of an
Emperor's love
Wrought into living stone,
which gleans and soars,
With body of beauty shining
soul and thought;
—As when some face
Divinely fair unveils
before our eyes—
Some women beautiful
unsparkably—
And the blood quickens,
and the spirit leaps
And will to worship bend
the half-yielded knees,
While breath forgets
to breathe, so is the Taj."

শালীবাহন

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীপদ ঢালী—তা'র বাড়ী ছিল 'বালি'তে;
হাতখালি বেচারার সাতশালী পালিতে।
আসলের চেয়ে বেশী ফাউ দেছে মা-কালী,
শালিমারে খেটে তাই করে শালী-রাখালী।
গে'য়োখালি, ধনেখালি হ'তে হালিশহরে
ঘুরে বহু পাত্তর দেখে আড়ে-বহরে—
আলিপুরে ধনশালী বনমালী ঢালীকে
বিয়ে দিয়ে পার করেছিল এক শালীকে;
সেই সাথে এক শালী দিল টালিগঞ্জে
মালীগ্রামে, বিধি তারে অনুকূল ন'ন যে!
বনমালী কারবারে বেশী চাল চালিয়া
সহসা ফেরার হ'ল লাল বাতি জ্বালিয়া।
মালীগ্রামে 'জালিয়াতি কেস্'-এ দিল জেলে কে!
দুই শালী এল ফিরি ল'য়ে চার ছেলেকে।
কালীপদ হালে পানি না পেয়ে অগত্যা—
ডালি নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে দেয় হত্যা।
বড়োশালী দেয় গালি খসলেই পানে চুন;
মেজশালী হাতে ডালি দিয়া গায় রামধুন;
সেজশালী উমাকালী দেয় তালি বালিসে;
ফুলশালী বামাকালী পটু জুতা-পালিশে;
রাঙাশালী রমাকালী—গাল তার লালচে,—
গালচের ব'সে গায়ে পাউডার ঢালছে।
ন'শালী ও ছোটোশালী দম দেয় ঘড়িতে
বিস্কুট খেয়ে যায় ইস্কুলে পড়িতে।
বউ তার রণকালী ছিল ভারী রুগ্‌নী।
পেট ছেড়ে ম'রে গেল খেয়ে কাল ঘুগ্‌নি!
কালীপদ মরে কেঁদে বউটার খেদে সে.
ধরে বেঁধে রাখা তারে গেল নাকো এ দেশে!
হাতে নিয়ে [illegible]তো, পাঁচসিকে খুচরো।
বাড়ি ছেড়ে খালি পায়ে চলে গেল চুঁচড়ো!

বাঁকটার কাছে এসে কিছুক্ষণের জন্য থামে বাসটা, দম নেয়।

দম নেয় রতন হাজরাও।

একটানা অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ী পথের উঁচুনীচু খাড়াই উৎরাই ভেঙে যাত্রীভর্তি বাসটাকে টেনে আনতে একটু ক্লান্তই হয়ে পড়ে রতন, তাই যে অল্পক্ষণ কনডাক্টার হিসাবে মিলোয়, পথের ধারে গাছের তলায় টুল পেতে বসা চেকারের সংগে, ততটুকু সময়ই যা হাঁফ ফেলে বাঁচে রতন। পা-দুটো ছড়িয়ে দেয় সামনে, কল-কব্জা বাঁচিয়ে ঘাড় নীচু করে হেলান দিয়ে বসে। যদিও বাস চলে না এ সময়, কিন্তু স্টার্ট বন্ধ করে না। তাই বলে রতন,—নিয়ম নেই।

এটা তো আর স্টপেজ নয়, রতন হেলিয়ে বসতে পারে, কিন্তু তাই বলে স্টিয়ারিং ছেড়ে উঠতে তো আর পারে না।

তবে, বাসের মৃদু গর্জনের সংগে থিরথিরে কাঁপা সিটে পা ছড়িয়ে, ঘাড় এলিয়ে বসে থেকেই বেশ আরাম পায় রতন।

কিন্তু কতক্ষণই-বা। চোখ বুজে মনে মনে একটু পেছনে চাইতে না-চাইতেই খট্ করে পাশের ছোট কাচের দরজাটা খুলে যায়, লাফ দিয়ে এসে ওঠে কনডাক্টার ভীম সিং, আর তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে ওঠে রতন, বুট পরা পায়ে চাপ দেয় ক্লাচে, চাপ দেয় এক্‌সেলেটারে,—গোঁ-ও-ও আওয়াজ করে ভরা বাস চলতে থাকে হেলে দুলে।

এরপর, অনেকক্ষণের মধ্যে স্টপেজ নেই আর, কারণ গ্রামের শেষ এইখানেই।

এরপর খালি বাঁকের পর বাঁক, উঁচুতে উঠেই হঠাৎ আবার নেমে যাওয়া, উজ্জ্বল লাল ফুল কি সাবানের ফেনার মত ছোট-ছোট ঝরনা।

কতদিন, কতদিন ইচ্ছে করে রতনের, ঐ ঝরঝর ঝরনার তলায় মাথা পেতে দাঁড়ায়; উঁচু কালো পাথরটার ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নীচের সরু সাদা নদীটাতে, ঠিক যেমন দেশে করত।

দেশে! ফু! দেশ আর কোথায়? দেশ তো এখন বিদেশ,—পাকিস্তান।

মোটেই কয়েকটা মাইলের জন্য 'বর্ডারে' পড়ার জন্য দেশটা গেল রতনের।

দেশ গেল, আর গেল রতনের ফরসা সুন্দর হাসি-খুসী মা'টাও।

রতনকে কোলে তুলে, পুঁটলি-মাথায় বাবা পালিয়ে এল এপারে, আর মা যে কেন রয়েই গেল পাকিস্তানে—তখন মা বুঝলেও এখন তা বেশ বুঝতে পারে

সুজাতা

রতন। আর সেই দুঃখে, সেই লজ্জাতেই তো চোদ্দ বছরের রতন পালিয়ে গেল কলকাতায়।

মা নাকি হানিফ চাচার সংগে নিকেয় বসেছে পাকিস্তানে।

বসুক! তবুও মাকে ভালবাসে রতন। যখন তখন মনে পড়ে মা'র ভরাট সাদা গালে সেই কালো বড় তিলটা, মনে পড়ে মার কালো চোখের ওপর উড়ে-উড়ে আসা-সেই কোঁকড়া কালো চুলের গোছা।

থার্ড গিয়ারে গাড়ী দিয়ে স্টিয়ারিং-এর ওপর হাত রেখেই একটু আনমনা হোল রতন।

সামনে এখন অনেকটা সোজা পথ, চড়াই আসতে দেরী আছে, ইচ্ছে করলে অনায়াসেই একটা সিগারেটও টেনে নেওয়া যায় এই ফাঁকে। কিন্তু, সে সুখ কি রতনের কপালে আছে? শা-ল-লা! নিয়ম করেছেন যে! নি-য়-ম্!

হুঁঃ। হোত নিজের গাড়ী,...এক হাতে সিগারেট টানতে টানতে আর এক হাতে গাড়ী চালাত অবহেলায় কিংবা...... কিংবা হাতটা সটান ছড়িয়ে দিত পাশে, কখনও রাখত পাশে বসা সুন্দরী মেয়েটির ঘাড়ে কি গলায়। যেমন সবাই রাখে,...আর সেই তো আসল নিয়ম গাড়ী চালানর।

রতন কি দেখে নি কলকাতায়,...পথে ঘাটে...আর, আর সে বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার সাহেবের গাড়ী ঝাড়া-মোছার কাজ করতে করতেই ড্রাইভিং ইস্কুলে ভরতি হয়েছিল রতন, সেই বাড়ীর দাদাবাবু-ও-তো,...যখন তখন।—যখনই বেরুত গাড়ীতে বৌদিমণি-কে সংগে নিয়ে।

বৌদিমণির চেহারাটা কিন্তু সত্যি ভাল ছিল, আর কি সে হাসতো রং-করা ঠোঁট টিপে টিপে। অনেকটা যেন রতনের সেই হারিয়ে যাওয়া মায়ের মতন। হাঁ, অনেকটাই। বোধহয় সব সুন্দরী মেয়েদেরই এক রকম দেখায় হাসলে।

হ্যাঁ তাই-ই। আর কলকাতার সব মেয়েগুলোই যেন এক-একটা ফুরফুরে পরজাপতি। শা-ল-লা। আর এখানে দেখ, কতকগুলো জংলী মেয়ে-পুরুষকে নিয়ে দিনে দু'বার করে এই পাহাড়ী পথ ভেঙে ছুটোছুটি করছে রতন। সংগী কে? না জগদ্দল পাথরের মত এক বুক দাড়ি-ওলা ভীম সিং। ফুঃ। মুখ বাড়িয়ে পথের ওপরই রতন থুথু ফেলল আবার। শা-ল-লা। বাঁক এসে গেছে আবার।

আবার দু'চোখের সবটুকু দৃষ্টি দাও পথের ওপরে, মন প্রাণ সব ঢেলে দাও গাড়ী চালানোয়।

ঝুঁকে পড়ে, খাড়া পথের দিকে চোখ রেখে গাড়ী চালাচ্ছে রতন, রাগী বাঘের মত গোঁ গোঁ আওয়াজ করে মানুষবোঝাই বাসটা ধীরে ধীরে উঠছে ওপর দিকে এমন সময়, ওকি। পথের মধ্যে বাঁকের ঠিক সামনেই কে বা কারা হাত নেড়ে বাস থামাতে ইসারা করছে না? তাইতো মনে হচ্ছে;...কিন্তু, এখানে ত' কোন স্টপেজ নেই। বাস রতন থামায় কি করে?

নিয়ম নেই তো।

কিন্তু মানুষগুলো যে রাস্তার ঠিক মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়েছে একেবারে, দাঁড়িয়েছে পথ আটকেই।

অগত্যা 'ইসপীড' কমাতে হোল রতনকে আর সামনে এসে গাড়ী থামিয়ে কষে একটা গালাগালি দিতে গিয়েই থমকে থেমে গেল রতন ইস্ রে। পাকা করমচার

ট্স্টপে অ্যাকেবারে মেয়ে যে একটাও
পাশেই অবশ্য সুন্দরপানা পুরুষও
একজন। আর হাত নেড়ে চেঁচামিচি
সেই তো থামিয়েছে বাসটা। ভীম সিং
নাকটার নেমে দাঁড়ালো বাস থেকে,
পা নেড়ে গরম গলায় খুব একটা
মিচি করল এমন বে-আইনিভাবে বাস
ার জন্য। তাছাড়া গাড়ীতে জায়গাও

ভীম সিংয়ের পিঠে হাত রেখে হেসে
ব বোঝাল ছেলেটা, আর গোল গোল
া চশমা চোখে টুকুটুকে মেয়েটা
িপি ঠোঁটে ফিক্ ফিক্ করে হেসে,
একটা স্যুটকেশ আর সাদা ছোট্ট
ের মত একটুখানি কুকুর কোলে
া আরো কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।
স্টয়ারিং ছেড়ে স্টার্ট বন্ধ করে ঘাড়
য়ে দেখছিল রতন।

সারে। মেয়েটা কেমন পেঁচিয়ে
য়ে ফেরতা দিয়ে শাড়ীটা পরেছে
ঠিক কলকাতার সেই বৌদিমণির
আর কি হাসছে-রে বাবা! ঝরনার
যেন নূড়ি বাজছে। হাঃ হাঃ!
া ইস্। হাসি যে আর থামতেই

পিকনিক করতে এসে গাড়ী খারাপ
গেছে, দু-দুটো টায়ার পাংচার
স্টেপনিও খতম,...তাতে এত
কি আছে?
জনে মিলে বনের মধ্যে ফিস্টি
এসেছেন? ওঃ সখ কত! আর এতই
খ বাপু কলকাতার বাবুদের মত, তাহলে
দাদাবাবুর মতন সংগে আর একটা
মানুষ, একটা ডেরাইভার কি
ি গোছের কাউকে সংগে আনলে না
এইসব উড়ো আপদ সামলাবার জন্য!
বাঝ এখন ঠ্যালা।
একা একা কুকুর কোলে নিয়ে উনি
শহরে যাবেন মিস্তিরি ডাকতে, রতনের
চড়ে। হুঁঃ। চাবী ঘুরিয়ে রতন আবার
দিল গাড়ীর, আর গাড়ী গর্জন
না ছাড়তেই একি! ভীম সিং আবার
ন করে বেল মারে কেন? আবার
াল?
গে মেগে রতন এবার লোহার
া ভেতর দিয়েই ভীম সিংকে দেখবার
করল। দিল্লাগী হচ্ছে? না?
ারে নেহি! পাশের ছোট কাঠের
া খুলে ভীম সিং এসে উঁকি দিল
।
মম সাহাব হিঁয়াই বৈঠেগী।
হাঁ্যা!
ক রতন আর কিছু বলার আগেই
কোলে ফুরফুরে আঁচল উড়িয়ে

মেয়েটা বসল এসে একেবারে রতনের পাশেই
ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলল ভেতরে বড়
ভীড়, কোনও জায়গা নেই বসার, আর
এই খাড়া পথ ঝুলতে ঝুলতে দাঁড়িয়ে
যাওয়া কি সম্ভব? তাই...! রতনের পাশে
একটুখানি জায়গা যখন খালিই আছে।

অবশ্য! অবশ্য। রতন মাথা নীচু
করে মেমসাহেবের ইচ্ছা শিরোধার্য করল।
ক্লাচ ছেড়ে সাবধানে চাপ দিল
একসেলেটারে।

গোঁ গোঁ আওয়াজ করে ধীরে ধীরে
গাড়ী উঠছে ওপর দিকে, সমস্ত চোখ,
কান মেলে পথের ওপরই দৃষ্টি মেলে
দিয়েছে রতন তবু চোখের কোণ
দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভয়
পাওয়া মেয়েটির ফ্যাকাসে মুখ।

মেমসাহেবের ফুরফুরে শাড়ীর আঁচল হাওয়ায়
উড়ে বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছে রতনের ওপর
কাঁধ ঘাড়।

আর, এইবার, এইবার রতন বুঝতে
পেরেছে, মেমসাহেবের ফুরফুরে শাড়ীর আঁচল
থেকেই: তুলতুলে গোলাপী গা থেকেই
আসছে সেই ঘন নরম গন্ধটা। আর মিষ্টি
গন্ধটা আবার বুক ভরে নিতে গিয়েই মনে
পড়ে গেল রতনের।

ঠিক! কলকাতার সেই বৌদিমণির গা
থেকেও ঠিক এমনি গন্ধই তো পেত রতন,
যখন গাড়ীর পেছনের সিটে বসত ও, আর
বৌদিমণি বসত সামনের সিটে স্বামীর পাশ
ঘেঁষে।

হ্যাঁ! দেখেছে রতন। দিনের পর দিন,
মাসের পর মাস দেখেছে, বৌদি গন্ধ টন্ধ

আরে! এত ভয় পেয়েছে কেন মেমসাহেব!
দু' হাত দিয়ে চামড়ার গদিটা কেমন চেপে
ধরেছে দেখ। আর কুকুরটা অবধি ছোট ছোট
ভয় পাওয়া চোখে কেমন চেয়ে আছে
মেমসাহেবেরই দিকে, আঁকড়ে ধরেছে তারই
নরম সাদা সোয়েটার চার পা দিয়ে।

আরে, মেমসাহেব কি করতে পারে?
সাহস দেনাওলা তো এই বসে আছে রতন
মাস্টার। হুঁঃ। ভয় কি তোমাদের! ভয়
কি! মনে মনেই বলল রতন। আমিই তো
আছি আর খাড়াই পথও শেষ হোল এবার,
আবার সমতল। গাড়ীর আওয়াজও শান্ত
হয়ে এসেছে এখন, সোহাগী বেড়ালের মত
গরগর করতে করতে গাড়ী ছুটেছে জোরে।

গাড়ী ছুটেছে, আর কি একটা মিঠে
মিঠে, চেনা চেনা গন্ধ লাগছে যেন নাকে!

না, ফুল তো এ পথটায় নেই। খালি
বুনো ঝোপ আর কাঁটা গাছ।

আর ঠিক ফুলের গন্ধ ও তো নয়;
গন্ধটা... গন্ধটা...! পিঠের কাছে ঘাড়ের
ওপর শিরশির করে উঠল রতনের ...

মেখে, কোলে কুকুর নিয়ে হেসে হেসে
দাদাবাবুর পাশে বসেছে, আর তার স্বামী,
দাদাবাবু একহাতে স্টিয়ারিং ধরে আর এক
হাত ছড়িয়ে দিয়েছে পাশে বসা স্ত্রীর কাঁধের
ওপর।

আবার শাড়ীর আঁচলটা এসে পড়ল
ঘাড়ে; শিরশির করে উঠলো রতনের সারা
শরীর। শা-ল্-লা। গিয়ার বদলে আড়চোখে
পাশের দিকে একবার চাইল রতন। আরে!
ভয় পেয়ে মেয়েটা যে আরো ঘেঁষে এসেছে
রতনের দিকে, ওর কাঁধ প্রায় ঠেকে যাচ্ছে
রতনের কাঁধের সঙ্গে। সাঁ সাঁ করে নীচের
দিকে নামছে গাড়ী, আর মেয়েটা দেখ, চলে
এসেছে রতনের বুকের কাছে, এইটুকুন একটা
রঙীন পাখী যেন।

গিয়ার বদলে মুখ তুলে চেয়ে হাসল
রতন। এখন আবার কিছুটা সোজা পথ।

মেয়েটাও সোজা হয়ে বসল, লম্বা একটা
নিঃশ্বাস ফেলে হাসি হাসি মুখে চাইল
রতনের দিকে, তারপর খটাস করে কোলে

চকোলেট বের করে ভেঙে, আধখানা দিল রতনকে, বাকিটা মুখে ফেলে দিব্যি আবার তেমনি হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইল সামনের পথের দিকে।

আর হঠাৎ রতনের মনে হোল এই মুখ, এই হাসি, এই টোল খাওয়া গাল ও আগেও দেখেছে, —এ মুখ ওর চেনা। কিন্তু কোথায় ? সেই হারিয়ে যাওয়া দেশে, ... কলকাতায়। কোথায় কোথায় !

আবার ফিরে দেখল রতন, আর ওর হঠাৎ মনে হোল, চেনা বইকি! এই টোল খাওয়া ভরাট গাল, এই ঘাড় অবধি ছাঁটা চুল, কোলের ওপর রাখা লাল ব্যাগের গায়ে চকচকে পালিশ করা নখ আর সাদা কুকুর,... এই সব, এই সব নিয়েই ত কতদিন কতবার,... কলকাতার সেই পথে পথে... কিন্তু মুখের মধ্যেটা এমন শুকনো লাগছে কেন রতনের ? এক গ্লাস জল পেলে যেন ভাল হোত।

আবার, সেই চেনা গন্ধভরা শাড়ীর আঁচল উড়ে উড়ে এসে লাগছে রতনের ঘাড়ে, পিঠে, গলায়।

আড়চোখে দেখছে রতন পাশেই সেই চিরদিনের চেনা মুখ, সেই রঙ করা ঠোঁটের ফাঁকে ঝিকিমিকি দাঁত আর...আর...কত কি যে।

চোখের সামনে ধোঁয়া, ধোঁয়া, বুকের মধ্যে কি যেন, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, কে যেন, কারা যেন ফিস্‌ফিস করছে রতনের কানের কাছে।

কি বলছে? কি বলছে ওরা?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না গাড়ীর আওয়াজে। গাড়ী দুলছে ? দুলছেই তো? বড় জোর ছুটছে? ছুটবেই তো। গন্ধমাখা শরীর পাশে নিয়ে এমনি জোরে ছোটাই তো নিয়ম। ...

কারা যেন আবার চেঁচামিচি সুরু করেছে।

পাশে বসে কে যেন ভয় পাচ্ছে ! বলছে গাড়ী থামাতে, 'ইসপীড' কমাতে বলছে।

পাগল। হেসে রতন একসেলেটারে আরো একটু চাপ দিল ; মনে নেই বুঝি তোমার সেবার ডায়মন্ড হারবার রোডেও তো ঠিক এমনিই ভয় পেয়েছিলে, গাড়ীর কাঁটা যখন আশি ছুঁই ছুঁই করছিল, ঘন হয়ে এসেছিলে পাশে, আর সেই যে ঘড়ি পরা হাতটা দিয়ে দাদাবাবু...দেখ দেখ, রতনেরও বাঁ হাতে তেমনি জ্বলজ্বলে বড় গোল ঘড়ি। ও-ও তো দাদাবাবুর মত বাঁ হাতেই ঘড়ি পরে। আর সেই হাতটা বাড়িয়েই তো...

ভয় কি ! ভয় কি গো ! ভয় কিসের ? বলল রতন ঠিক সেই সুরে এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে, আর তারপর অভয় দিতেই তো বাড়িয়ে দিয়েছিল হাতটা, কিন্তু হঠাৎ কি যে হোল,....।

ঝাঁপিয়ে পড়ল কে স্টিয়ারিং-এর ওপর, নাকি ব্রেক কষল ? এত জোর হয় নরম হাতের চড় ?

কিন্তু ভীম সিং ওকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে কেন পাথরের রাস্তায়। লোকগুলো সবাই মিলে এমন পাগলের মত মারছে কেন রতনকে!

কপাল থেকে ছুটে আসা গরম রক্তে অন্ধ দু'চোখ খুলে কার নিটোল মুখের চেনা হাসিটা একবার দেখতে চাইল রতন, বলতে চাইল ভয় কি ! আমিই তো আছি তোমার পাশে, হাতটা বাড়াতে চাইল শেষবারের মতো।

স্মৃতি থাকে থেমে

.ইন্দু চট্টোপাধ্যায়

কত কর্ম কত কাণ্ড, কত বাদ্য কত ভাণ্ড,
সরব ঘোষণা আর দুরন্ত মিছিল।
অবশেষে কিবা হল,
সেই তো জনম নিল মৃত এক চিল
সোনালী ডানার নয়, নয় কোন সোনালী সকালে,
অপাপবিদ্ধা মাতা প্রসবিল বস্তুত অকালে—
পর্বত সন্তান সেই মূষিকের মত।
ছন্ন-ছিন্ন ঘৃণ্য জীব দন্ত শত শত,
যা কিছু সামনে পায় ধ্বংস করে চলে
মাতা-পিতা-পরিজনে। হয়ত বা কলে
ধৃত হবে কোনদিন বিধাতার ফাঁদে।
সেই শোকে আত্মা তার ফুলে ফুলে কাঁদে।
পরিত্রাণ নাহি তবু, বিরাটের আবিল সন্তান।
ধ্বংস যজ্ঞে অট্টহেসে গেয়ে যায় বীভৎস সে গান।

আবার ঘোষণা আর নীরব মিছিল।
শবাধারে শুয়ে চলে মৃত সেই চিল।
শুরু-শেষ এক হল দুদিনের খেলা—
চিতাগ্নির লেলিহানে জ্বলে যায় বেলা,
জ্বলে মোহ জ্বলে মায়া, কাঁপে লালসার ছায়া।
রুদ্ররোষ স্তব্ধ হয়, ক্লান্তি আসে নেমে,
কাল নিরবধি চলে; স্মৃতি থাকে থেমে।

॥ এগার ॥

অসুস্থ হয়েছেন সুরেশ্বর। স্নায়বিক দুর্বলতা। কাজের জন্য কলকাতা থেকে ডাক আসছে, সীতারাম দাসও এলেন দু' তিন বার কিন্তু সুরেশ্বরের তেমন চেতনা নেই। হঠাৎ যেন বুড়ো হয়ে পড়েছেন তিনি। কবিরাজ-মশাইকে ডাকিয়ে ওষুধখাচ্ছেন, ডাক্তার এসে দু'বেলা ব্লাডপ্রেসার মাপছে। বিশেষ অসুখ কিছু নয়, বলে গেলেন কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এসে। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। সর্বদা এক কথা---ভয়ানক শরীর খারাপ হয়েছে, ছিড়ে গিয়েছে মাথার শিরা।

বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। অলকও চিন্তা করছিল। একদিন চোখে পড়ল লাল বাড়ীর নতুন আয়া বুঝি গুমরে গুমরে কাঁদছে ওখানে পড়ে। দোতলার একটি ঘরে দেখা মিলল ম্লানমুখী মেয়েটির। এর আগে আশ্বাস দিয়েছিল অলক, সে কথা রাখতে পারে নি। আশ্বাসের কথা আর বলতে চাইল না। কিন্তু এসেছে যখন, একেবারে চুপ করেও থাকা যায় না। তা' ছাড়া হিমিকাকে এখান থেকে সরাবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। যে কারণেই হ'ক ওর জন্যই সুরেশ্বরের একটা মানসিক অস্বস্তি ঘটেছে। ডাক্তার বলছেন এটা বাড়ার দিকে যাবার সম্ভাবনা। সে রকম কিছু হলে পারিবারিক বিপদ ঘনাবে। জমিদারীর কমপেনসেশন কবে পাওয়া যাবে তার কিছু ঠিক নেই, অমর নামে ম্যানেজার হলেও, বাবাই ব্যবসার মাথা। তাঁর কিছু হলে আর্থিক ব্যবস্থা এই মেয়েটার প্রতি কেবল দুর্বলই হয় নি অনল, তাকে বুঝতেও দিয়েছে সে কথা। বুঝতে পারে নি ওদের কাছে স্নেহ প্রেমের কোনো মর্যাদা নেই। ওরা জানে কেবল হীরা-জহরৎ, গাড়ী-বাড়ী-টাকা, যার দাম আছে, যা ঝলমল করে আলো ছিটিয়ে দেয়, ব্যাঙ্কে থেকে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বাড়ায়। সুরেশ্বরের বিছানায় শুয়ে, হাতের নতুন জড়োয়া বালা দেখতে দেখতে কত যেন হেসেছে হিমিকা অনলের দুর্বলতার কথা মনে করে। ছি-ছি! সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ উঠে যায়, সেকথা ভাবলে।

অনলের কথার ভাব বুঝে থেমে যেতে হ'ল অলককে। এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা চলবে না। কিন্তু অলকইবা কি করে।--- সুরেশ্বরের

ধারাবাহিক উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

দরওয়ান চিন্তিত মুখে কলকাতা ফিরে যাচ্ছে। অলক তাকে ধরল, জানতে চাইল---কি হয়েছে।

সেলাম দিয়ে দরওয়ান জানাল---বহুৎ মুস্কিলে পড়েছে সে। রাজাবাবু একটা লেড়কি বাড়ীতে এনেছিলেন, এখন হুকুম হয়েছে তাকে ছেড়ে দিতে।

দরওয়ানের বাত মানছে না লেড়কিটা, বাড়ী থেকে যাচ্ছে না। বাবুজী গোস্‌সা করছেন জগজীবনের উপর। নোকরী খতম হো যায়গা। দুঃখী দুঃখী মুখ করল দরওয়ান।

অলক এ সুযোগ ছাড়ল না। মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেবে এই আশ্বাস দিয়ে দরওয়ানের পিছু পিছু ঢুকল এসে লাল বাড়ীতে।

এই প্রথম লাল বাড়ীতে ঢুকল অলক। থমথম করছে বাড়ী। যূথিকার একেবারে ভেঙে পড়বে। কিন্তু হিমিকাকে সরাবেই বা কোথায়। একটি মেয়েকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা যে একটা বিরাট সমস্যা একথা আগে বোঝে নি অলক।

দু' একটি অবান্তর কথা বলে অলক ফিরে এল। দেখা করল অনলের সঙ্গে।

---অনু, সেই মেয়েটি, তোমাদের কাছে এসেছিল যে---।

---হিমিকা? তোমার বাবার কাছেই তো ফিরে গিয়েছে সে। কঠিন নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল অনল। হিমিকা চলে যাবার পরে পাগলের মত তাকে খুঁজেছে অনল। তারপর জেনেছিল, সুরেশ্বরের আশ্রয়ে চলে গিয়েছে হিমিকা। ঘৃণায় তার মন পাথর হয়ে গিয়েছিল। কটু ধিক্কার দিয়েছিল নিজেকে বার বার। অস্থিরতা প্রায় ব্যাধির কাছে পৌঁচেছে। রোজ সকালে ছবিঘরে গিয়ে হৈমন্তী দেবীর চিত্রের কাছে উবুর হয়ে পড়ে কি অপরাধের জন্য যেন ক্ষমা চাইতে থাকেন। অলককে ডেকে বা[illegible]র লাল বাড়ীটা ভেঙে ফেলবার আদেশ দেন। সবাই ভয় পেয়েছে। ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন কোনো ঠাণ্ডা জায়গাতে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কোনো পরামর্শই কানে তোলেন না সুরেশ্বর। রাত হবার আগেই বিছানায় আশ্রয় নেন। ভয়ার্ত চোখে চারদিকে চাইতে থাকেন। ছেলেদের ডেকে বলেন---কারখানার কুলি, যাকে লাথি মেরে একদিন শেষ করেছিলেন, তার আর যূথিকার উদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ডি দিতে।

সব চেয়ে মুস্কিল হচ্ছে, সুরেশ্বরের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তিলকেশ্বর লাল বাড়ীতে আধিপত্য বিস্তার করছে। হিমিকার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। কে

জানে, ওকে কি উত্তর দিয়েছে হিমিকা।

উত্তর দেবে হিমিকা? কি উত্তর দেবার আছে ওর? পতিতার মেয়ে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাতিত্য হবে তার বৃত্তি। দেবে কেন মানুষ তাকে নিজ বৃত্তি ত্যাগ করতে? তাঁতি নিজস্ব বৃত্তি ছেড়ে হতে পারে অধ্যাপক, কামার বসতে পারে গিয়ে বিচারক হয়ে। ক্ষমতা থাকলেই পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি বদলাতে পারে সবাই কিন্তু পতিতা পারবে না। ওরা বৃত্তি বদলে শান্ত সংযত ভদ্র হলে, আনন্দ যখন গেঁজে উঠে তীব্র মদে পরিণত হবে, তখন মত্ত তাণ্ডব নাচবার জন্য একটা বেওয়ারিশ মেয়ে-শরীর কোথায় পাবে পুরুষ? বিজয়ীকে নজরানা দিতে, ধ্যান ভাঙতে ঋষ্যশৃঙ্গদের বারে বারে দরকার হয় পতিতা মেয়েকে।

আজ তো সেই দরকার আরো বেড়েছে। পারমিট বের করতে, কণ্ট্রাক্ট পেতে, জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য, ওপরওলাকে খুশী করবার জন্য দরকার হয় না বুঝি শিক্ষিতা সুন্দরী সুকুমারী পতিতা মেয়ে? বৃত্তি ছেড়ে দিলেই হ'ল। সবার কি তেমন বউ-মেয়ে-বোন আছে যে, শরীরে ঢেউ তুলে, মদির চোখে চেয়ে, কথা বলে আধো আধো গলায়, অপ্রাপ্য জিনিষগুলো একেবারে হাতের কাছে এনে দেবে। তারপর সমাজ-সংস্কার বলে একটা মহৎ ব্যাপার আছে না। ঢেকে চকে চললেও ভদ্রলোক ঘরের মেয়েদের দিয়ে তুলব ক... করালে, বড়চোখে চাইবে সবাই, সেটিম ও থাকবে না। সুতরাং পতিতাবৃত্তি ছাড়া কক্ষণো চলবে না হিমিকাদের। যতই আইন কর, বক্তৃতা কর সভা ডেকে—আরো, আরো গভীরে ঢুকে যাবে পতিতারা।

এত কথা না বললেও দু'বছরের কঠিন অভিজ্ঞতা অনেকটাই বুঝিয়েছিল হিমিকাকে। আর বুঝিয়েছিল সহজে মরা যায় না চলন্ত গাড়ীর নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিমিকা বুঝেছে খিদে পেলে ভীষণ কষ্ট হয়, খাবার জন্য একটা আচ্ছাদন চাই মাথার উপরে, আর বুঝেছে বাঁচবার জন্য ওকে খারাপ মেয়ে হতেই হবে। মিশনারী আশ্রয়ে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিপালিতা মেয়ে প্রথমে বুঝতে পারে নি সে খারাপ হওয়াটার স্বরূপ কেমন।

ও জানত যারা 'সাম' মুখস্থ করে না, 'বাইবেল' পড়ে না, মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে তারাই খারাপ মেয়ে। পথভ্রষ্ট মেষ শাবক তারা। কিন্তু খারাপ হ'লেও একেবারে নষ্ট হবার ভয় নেই। সদাপ্রভু বসে থাকেন তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য।

মায়ের কাছে এলে, তার মরবার পর প্রথম জানল খারাপ মেয়ে হবার ভীষণতা। এখানে মাদার অ্যানি, ফাদার যোসেফ নেই ভাল করবার জন্য। একবার খারাপ হ'লে আর উদ্ধার নেই। চিরজীবনই তাকে খারাপ হয়ে থাকতে হবে। তাইতো হিমি মরিয়া হয়ে পালিয়েছিল। অসুখ না হ'লে ঠিক চলে যেত মাদার অ্যানের কাছে। অবগাহিত হয়ে মিশে যেত মিশনের সঙ্গে। ভীষণ গরমেও ভেল পরে থাকতে হ'ত, খেত মোটা ভাত-রুটি। কিন্তু নরক নেই, খারাপ হবার জন্য নির্যাতন নেই। মামলা না হলে মাদার তাকে ঠিক রাখতেন। মায়ের সঙ্গে তো ছাড়তেই চান নি।

এখন? এখন আর হয় না। খারাপ না হলে বাঁচতে পারবে না হিমিকা। কিন্তু কেমন করে খারাপ হবে হিমিকা। ওকে যে ছুঁয়ে দিয়েছে সূর্যকান্তমণি। হিমিকার সমস্ত শরীর ভরে যে সেই স্পর্শ। সেই ছোঁয়াকে কেমন ক'রে খারাপ করবে? ওর বুকের মধ্যে যে শতদলে দল মেলেছে ভালবাসা, সে কুঁকড়ে কালো দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। কক্ষণো না। হীন মৃত্যু হিমিকার ভাগ্যে নেই, তা'হলে দু'-দুবার সে সুরেশ্বরের গ্রাস হতে অব্যাহতি পেত না, সুরেশ্বর গিয়েছে, কিন্তু তিলকেশ্বর আসছে। তেমনি অশুচি তবে তেমন দুর্দান্ত নয়। তাকে বিশ্বাস নেই।

অলক? অলকের চোখ হতে একটা কুৎসিত দৃষ্টি ছুটে এসে হিমিকাকে বিদ্ধ করে না। তাই কিছু দিন পর অলক এলে হিমিকা বলল:

—আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবেন?

হিমিকার কথা শুনে আশ্চর্য হ'ল অলক।

—চাকরি? তুমি কি চাকরি করতে পারবে?

—পারব। ব্যগ্র হ'ল হিমিকা।

—আমি তো পাশ করেছি ফার্স্ট ডিভিশনে, অঙ্কে লেটার ছিল।

—তা'হলেও মাত্র স্কুলের পড়া শেষ করে চাকরি—।

হঠাৎ অলকের মনে হল হিমিকা মিশনারী বোর্ডিং-এ প্রতিপালিত হয়েছে।

—ইংরেজী বলতে পার?

—পারি কাজ চালাবার মত।

—আচ্ছা, চেষ্টা করছি।

দু'সপ্তাহ পরে এল অলক। সুরেশ্বরের অস্থিরতা আরো বেড়েছে। মুখে এক কথা—লাল বাড়ীটা ভেঙে দাও। হিমিকাকে সরানো একান্ত দরকার। ঠাকুমা উগ্র হয়ে উঠেছেন। বলছেন দরোয়ান দিয়ে ওকে বাড়ীর বের করে দিতে।

তিনটে অফিসে ইণ্টারভিউ দিল হিমিকা কিন্তু সুবিধে হ'ল না। অফিসগুলো সত্যি সত্যি কাজের জায়গা। টাইপ, স্টেনোগ্রাফী জানা না থাকলে কাজ হয় না সেখানে। প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছে হিমিকা, এমন সময় তিলক এল একদিন হাসতে-হাসতে।

—খুব তো জমিয়েছ, খুরছ মেজকর্তার সঙ্গে। আমিই কেবল বিষনজরে পড়ে রইলাম?

মুখ লাল হ'ল হিমিকার।

—আমি অফিসে ইণ্টারভিউ দিচ্ছি চাকরির জন্য।

—ইণ্টারভিউ। চাকরি। হায় হায় কলি যুগে উর্বশীদের কি দুর্দশা। কোন্ দুঃখে চাকরি করতে চাও তুমি?

সিনেমায় নাম, একুণি চান্স করে দিচ্ছি।

-- সিনেমা করব না আমি।

---সিনেমা করবে না? কত নাম, টাকা—কিছু চাওনা? মর তবে। কাল কিন্তু এ বাড়ী হতে নিশ্চয়ই চলে যেতে হবে তোমাকে। ফাইনাল নোটিশ দিয়ে গেলাম। এখানে অফিস খুলব আমি। তবে ইচ্ছে করলে এই অফিসেই বড় বাবু, খুড়ি, বড়গিন্নি হতে পার তুমি।

বিশ্রী ভঙ্গীতে চোখ টিপল তিলকেশ্বর।

ভারি ভয় পেল হিমিকা। ঝুমরাকে ডেকে বলল---কাল থেকে এ-বাড়ীতে আর থাকতে দেবে না। কোথায় যাব আমি ঝুমরা?

হিমির অসহায় মুখের দিকে চেয়ে রইল ঝুমরা। একটু ভাবল।

---কুছ ডর নাই তুর বিটিয়া। এ বাবুদের কোঠিতে থাকতে না দিল, তো ভালাই হোলো। বড় বদমাস আছে বাবুঠো। তু জলদার ঘরে থাকবি। পারবি না থাকতে?

---পারব। খুব পারব। পায়ের নীচে মাটি পেল হিমিকা। জলদ রিক্সাওয়ালার ঘর। ভাঙা, খোলা নর্দমার মুখে ঘর। তবু তো সেটা রাস্তা নয়, মানুষের আশ্রয়।

জলদের ঘরে কিন্তু যেতে হ'ল না হিমিকাকে। পরদিন সকাল-বেলা আবার এল তিলক।

---চল, তোমার জন্য একটা চাকরি ঠিক করেছি। সুখে থাকতে যখন ভূতে কিলোচ্ছে তোমাকে, তখন চাকরি করবার সুখটা একবার দেখেই এস।

---চাকরি।

---হ্যাঁ, হ্যাঁ। চাকরি। এ তোমার প্যানপেনে, মেনিমুখো মেজকর্তা নয়। আমি তিলক বাড়ুজ্যে। মেয়েমানুষকে পুষতেও পারি, চাকরিও দিতে পারি। তোমার যখন চাকরিই পছন্দ, চল চাকরি করবে। নেয়ে খেয়ে তৈরী হয়ে নাও আধ ঘণ্টার মধ্যে।

যত শীঘ্র পারে, তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল হিমিকা। চাকরি হ'ল। অনেক টাকা, একশো টাকা মাইনেতে চাকরি হ'ল হিমিকার। হোটেলে পরিবেশনের কাজ। কাজের ধরণ যাই হোক, পেয়ে বেঁচে গেল হিমিকা। শুধু চাকরি নয়, থাকবার জায়গাও ঠিক ক'রে দিল তিলক। এখানে কাজ করে আরো অনেক মেয়ে, তারা এবং বাইরের কয়েকটি মেয়ে একটা হোস্টেল মত করে থাকে, সেখানে পঁচাত্তর টাকায় থাকা এবং দু'বেলার খাওয়া। টিফিন তো হোটেলেই মিলবে। সেদিন বিকেল বেলাই চলে এল হিমিকা। ম্যানেজার সাহেব তিরিশ টাকা এডভ্যান্স করলেন তাকে তিলকের অনুরোধে।

●

দু' মাস পরে হোটেলেই একদিন

জিজ্ঞেস করল তিলক---কিগো, চাকরিটা কেমন লাগছে?

---ভাল, খুব ভাল। উচ্ছ্বসিত হ'ল হিমিকা। সত্যি সত্যি ভাল লাগছে তার। ষোল বছর বয়েস তার কেটেছে মিশনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাঝে। তার পরের ক'বছর তো কাঁটার বিছানায়। জীবনে এই প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে হিমি। ছোট্ট বিছানায় গুটিশুটি মেরে নিটোল ঘুম। নিজের পয়সায় কেনা ভাত, শাড়ী। সিনেমাও দেখেছে দুটো। বন্ধুত্ব হয়েছে এখানকার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে।

হিমিকার কথা শুনে হাসল তিলক।

---একেবারে খুব ভাল? আরে শোনো শোনো ইলারাণী, তোমাদের নতুন মেয়ে বলছে কি। খুব নাকি ভাল লাগছে। স্বাদগন্ধ পায় নি এখনো? নাকি বেড়ালের জিভ মাছে মজেছে?

বড়গড় মেয়ে ইলা ভঙ্গীভরে চোখ টানল---

স্বাদ পাবে কি। বড়বাবু তো ওকে নীচের ঘরের ডিউটি দিয়েছে ছ' মাসের জন্য। তাও সকালবেলায় করবে।

---একেবারে ছ' মাস? তা একটু লোন-ট্যান দাও ওকে। ফালতু রোজগার করুক কিছু, একেবারে তো দেউলে।

---আচ্ছা দেখব।

তিলকের কথায় কান দিল না হিমিকা। অর্ধেক কথাই ওর স্ল্যাং। কিন্তু ভারি উপকার করেছে চাকরি দিয়ে।

হিমিকা ইংরেজী বলতে পারে, তাই প্রথম থেকেই সে ননবেঙ্গলীদের সার্ভ করে আসছে। চাকরির তৃতীয় মাসের মাঝামাঝি একজন ভদ্রলোক পর পর কয়েক দিন খেতে এলেন হোটেলে। হিমিকার উপর খুশী তিনি ভাল টিপ্‌স দিচ্ছেন। একদিন বললেন ---ইউ আর চারমিং।

কফির পট রাখতে গিয়ে চমকে উঠল হিমিকা। তবু শিষ্টাচার বজায়

---উইল ইউ শেয়ার [illegible] এ কাপ্‌ল অব আওয়ার্স?

ভদ্রলোকের কথা বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল হিমিকা।

---হ্যালো ম্যানেজার! জোর গলায় ডাকলেন ভদ্রলোক ম্যানেজারকে।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ম্যানেজার সাহেব।

---আই লাইক টু হ্যাভ হার ফর ফোর আওয়ার্স।

বিড়্ বিড়্ ক'রে উত্তরে কিছু বললেন ম্যানেজার। হাত নেড়ে হিমিকাকে ইঙ্গিত করলেন চলে যেতে।

আশ্চর্য হ'ল হিমিকা। ভদ্রলোক তাকে চান। চার ঘণ্টার জন্য তাকে চাইবার মানে কি? বেলা একটার পর হোস্টেলে ফিরেও ভাবনা গেল না তার। শেফালী ওকে খুব ভালবাসে। তার জ্বর হয়েছে বলে কাজে যায় নি আজ। হিমিকা এসে শেফালীর কাছে বসল।

---কেমন আছ এখন? নাঃ, জ্বর নেই, বেশ ঠাণ্ডা কপাল। শোনো শেফালীদি! আজ একটা ভারি অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে। নন-বেঙ্গলী এক ভদ্রলোক, তিনি বললেন আমাকে চার ঘণ্টার জন্য চান। কেন চান, কি দরকার কিছুই বুঝলাম না। আর বুঝলে, অত রাগী ম্যানেজার সাহেব একেবারে জুজু যেন সেই ভদ্রলোকের কাছে।

---নন-বেঙ্গলী ভদ্রলোক। খুব ফর্সা, লম্বা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে? আরে সর্বনাশ ওঁকে চিনিস না? উনিই তো ব্রিজমোহন সাউ, মস্ত বড় বিজনেসম্যান।

---তা আমাকে দিয়ে কি দরকার ওঁর?

---দরকার? একটা নিশ্বাস ফেলল শেফালী।

---নতুন মেয়ে দেখলেই দরকার হয় ওঁর। আমাকে, রাণুকেও দরকার হয়েছিল একদিন। তারপর দরকার মিটতে দেরি হয় না। তুই খেয়ে ঘুমোগে যা এখন। চোখ-কান-খোলা রেখে চল্, অনেক জিনিসই বুঝতে

চোখ বুজে পাশ ফিরল শেফালী। রোগা মানুষটাকে আর ব্যস্ত না ক'রে হিমিকা চলে এল। তিনমাসের মধ্যে এই প্রথম তার মনের সুর বিঘ্নিত হ'ল বারে বারে।---দরকার! তাকে দিয়ে কি দরকার অত বড়লোক সাউ সাহেবের!

পরের দিন হোটেল হতে স্লিপ নিয়ে এল বেয়ারা। হিমিকার ডিউটি বদল হয়েছে। হিমিকা ডিউটি করবে উপরের ঘরে।

হোটেলে আসতে ডেকে পাঠালেন ম্যানেজার: এখন থেকে উপরের ঘরেই ডিউটি করবে তুমি। বুঝেছ?

মাথা নেড়ে হিমিকা জানাল বুঝেছে। তার মনে হ'ল ব্রিজমোহনের সঙ্গে ডিউটি বদলের যেন একটা সম্পর্ক আছে। তবু আরাম পেল সে। উপরের ডিউটি হালকা। বেশী গোলমাল তাড়াহুড়ো নেই। উপরের ঘরগুলো এক রাতের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। সকালে তাদের ব্রেকফাস্ট দেওয়া। অনেকে তাও খায় না। বেড-টি'র পরই চলে যায়।

ইলা জিজ্ঞেস করলো: ডিউটি বদলে নিলে কেন বোকা মেয়ে?

হিমিকা ইলাকে ভয় পায়। মেয়েদের হেড সে। তার মুখেই ম্যানেজারের নির্দেশ পায় মেয়েরা। এবার ইলাকে না বলে হিমিকাকে নিজে ডেকে বলেছেন ম্যানেজার। ইলা হয়তো রাগ করেছে। তাড়াতাড়ি উত্তর দিল হিমিকা---আমি বদলে নেব কেন, ম্যানেজারসাহেব নিজেই ডেকে বললেন আমাকে উপরে যেতে।

---ম্যানেজার বদলে দিল? তোমার জায়গায় গেল কে তবে? ও, মীনা। ভুরু কুঁচকে লিস্ট দেখল ইলা। মীনা যে, দেখছি খুব পেয়ারের হয়ে উঠেছে আজকাল। আভা এসে কাছে দাঁড়াল।

---কি হয়েছে ইলাদি।

---নতুন আবার হবে কি। বরাবরের যে পাশিয়ালিটি, তাই।

হিমিকে উপরের ঘরে ডিউটি দিয়েছে। গরীব বেচারী। পরে বেরুবার মত একটা শাড়ী-ব্লাউজ পর্যন্ত নেই। তাকে ঠেলে দিলে উপরে।

একে তো সকালে ডিউটি ক'রে মরছে, সেই থেকে, এখন একেবারে শেষ।

---ওঃ। তাই হিমিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তা, ওতো আমার মত ধূঁদুলে নয়, ওকে শাস্তি দিল কেন ভাই? ম্যানেজারের মুখে মুখে উত্তর দিয়েছিলি নাকি?

হতভম্ব হ'য়ে মাথা নাড়ল হিমিকা। গ্রীক না ল্যাটিন বলছে ইলা-আভা; একবর্ণও বুঝতে পারছে না সে।

বুঝতে অনেক দিন দেরী হল না। ব্রিজমোহন সকালবেলাই একদিন উপরের হলে চলে এলেন। হিমিকা সার্ভ করল পোচ্, কফি আর ঠাণ্ডা বেকন।

ব্রিজমোহন হাসলেন---টেক এ চেয়ার, আই অ্যাম অ-ফুলি টায়ার্ড, হেলপ মি টু বি চিয়ারফুল।

মুখ কান গলা টুকটুকে হয়ে গেল হিমিকার তবু উত্তর দিল: দ্যাটস নট মাই ডিউটি, আই অ্যাম অ্যান ওয়েটেস মাই ডিউটি ইজ টু সার্ভ ইউ।

---ও। হ্যাং ইয়োর ডিউটি। হাউ মাচ্ ইউ ওয়াণ্ট ফর ফোর আওয়ার্স বেল টিপলেন সাউ সাহেব। ম্যানেজারের ঘরে সেই বেল বাজল। উপরে উঠে এলেন ম্যানেজার।

ঘরের বাইরে যেতে যেতে হিমিকা শুনল ব্রিজমোহন বলছেন: আই মাস্ট হ্যাভ হার টুডে।

ওকে, হিমিকাকে চান ব্রিজ-মোহন? যেমন চেয়েছিলেন সুরেশ্বর? যেমন করে খারাপ মেয়েদের চায় পুরুষেরা?

নিজের ঘরে বসে হাঁপাচ্ছিল হিমিকা। গম্ভীর মুখে ইলা সেখানে এল।

---কেমন মেয়ে তুই হিমি? কত কাণ্ড করে আমি সাউ সাহেবকে উপরে পাঠালাম, আর তুই চলে এলি?

---উনি, উনি বলছেন---আমাকে চান। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে এল হিমিকার।

---ইস্, বোকারে বোকা। সাউ খেতে চান? একটু বেড়াতে যাবেন তোকে নিয়ে। আদর-টাদর করবেন এই আর কি। তা তোর ভয় নেই, উনি একটুও ক্রুয়েল নন।

ওমা। প্রায় কেঁদে ফেলল হিমিকা।

---যাঃ, কাঁদিস না। এতো ভাগ্য যে লাটসাহেব তোকে চেয়েছেন। ও রকম আমরাও কত যাই।

---না না। বেড়াতে যেতে পারব না আমি। প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠল হিমিকা।

---পারতেই হবে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ম্যানেজার।

---না পারলে হোস্টেলে চাকরি করতে এসেছ কেন? এটা ন্যাকামি করবার জায়গা নয়। এখন যাও। পাঁচটার সময় একেবারে রেডি হয়ে আসবে।

ম্যানেজার চলে গেলেন। ভয়ে কাঁপতে লাগল হিমিকা। হোস্টেলে ফিরে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়।

মেট্রন মাসী এসে ডাকল: একি, অসময়ে শুয়ে কেন? ওঠো, স্নান করে খেয়ে তারপর গড়াও। এমনিতেই বেলা গিয়েছে, আর শোয় না।

মেট্রন মাসী ভালবাসে নিরীহ মেয়েটাকে। গায়ে হাত দিল হিমিকার না:, জ্বরজারি হয়নি, দিব্বি ঠাণ্ডা গা।

---কি হয়েছে হিমি, শুয়ে কেন? ওঠো ওঠো।

শেফালী এসে কাছে বসল। এবার হিমিকা মুখ তুলল।

---শেফালীদি, ম্যানেজার বলছে: চাকরি করতে হলে আমাকে নাকি সাউ সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে যেতেই হবে।

---তাতো যেতেই হবে। মাথা দুলালো শেফালী। কিন্তু বেড়াতে যাবার অফার পাওয়াতো ভাগ্যের কথা। হোটেলে চাকরি করে আর কত টাকা রোজগার করি আমরা। কালতু রোজ-গারেই তো পয়সা। শাড়ী, জুতো-জামা আরো কত কি প্রেজেণ্ট পাওয়া যায়। আর তোর তো বরাত খুলেছে, সাউ সাহেব পছন্দ করেছে তোকে। ঠিক বলিনি মাসীমা?

---একেবারে ঠিক কথা। মাসী বলল।

---তা তুই এমন হেদিয়ে পড়লি কেন বাছা? কত ভাল বড়ঘরের কলেজে পড়া মেয়েরা হপ্তাতে দু'তিন দিন ভাড়া খেটে টাকা কামিয়ে নিচ্ছে হরদম। চেহারা আর বয়স থাকলে কেউ তা আজকাল আর অমনি বইয়ে দেয়? বোকামি করিসনে, উঠে পড়। ও প্রথম প্রথম একটু ভয় সঙ্কোচ থাকবেই, তারপর দেখবি দিন পাবার জন্য ঝগড়া সুরু করবি নিজেদের মধ্যে। দেখলাম তো এত বছর ধরে অনেক। ওঠ, ভাল করে সাজ-গোজ কর। আর সাজবি বা কি দিয়ে। তিন খানা রংওঠা শাড়ীতো সম্বল। তুই দিবি নাকি শেফালী তোর ধানী রংয়ের শাড়ীখানা আজকের জন্য হিমিকে?

---দিতে পারি। ভাড়া লাগবে দু' টাকা, আর ধোয়াবার খরচা। কিন্তু আমার ব্লাউজতো ওর গায়ে হবে না মাসীমা। যে হাড় জিরজিরে শরীর হিমির। আর সাউ সাহেবের পছন্দকেও বলিহারি যাই। মিস চৌধুরির মত মেয়েকে ফেলে নাকি--- ঠোঁট কামড়ে অসমাপ্ত কথায় ছেদ টানল শেফালী।
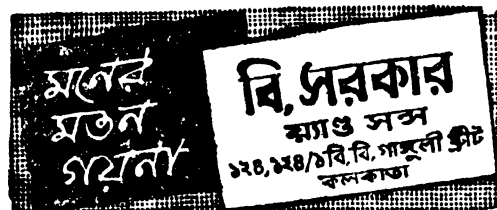
সব উপদেশ অনুরোধ নিষ্ফল হ'ল। বিকেলে হোটেলে গেল না হিমিকা। ডাকতে এসেও ফিরে গেল লোক। পরদিন হোটেলে ম্যানেজারের গম্ভীর মুখ দেখল হিমিকা। বুঝল চাকরি থাকবে না। এক্ষুণি নোটিশ আসবে। আসুক, আজ আর নিজেকে তেমন অসহায় লাগল না তার। হোস্টেলে থাকে আরো দু'টি মেয়ে, তারা চাকরি করে গেঞ্জির কলে। তারা বলেছে—কিছু ভয় নেই, অনেক চাকরির হদিশ জানা আছে, যোগাড় করে দেবে একটা। হিমিকা ইংরেজী জানে, একটা পাশ দিয়েছে, খুব ভাল না হলেও মাঝামাঝি রকমের একটা কাজ পাবেই সে।

যথাসময়ে নির্দেশ পেয়ে ট্রে-হাতে দশ নম্বর কেবিনে গেল হিমিকা।

টেবিলে পা তুলে অলসভাবে বসে সিগারেট টানছেন ব্রিজমোহন। হিমিকাকে দেখে হাসলেন।

—ও, নটি গার্ল। কাল আমাকে ভারি ডিসাপয়েণ্ট করেছ। ভারি অবস্টিনেট তুমি, কম্পানী দিতে চাও না কেন?

হিমিকা ভেবেছিল চুপ করেই থাকবে কিন্তু সাউসাহেব তার উত্তরের প্রতীক্ষায় আছেন বুঝে বলল—আমি এখানে চাকরি করতে এসেছি। কম্পানী দিতে নয় মিস্টার সাউ।

—ওয়েল, ওয়েল। কিন্তু এখানের চাকরিটাইতো আমাদের কম্পানী দেওয়া। তুমি কি বলতে চাও, এর আগে কারো সঙ্গে ডেট করনি, বের হও নি তুমি?

—কখনো না।

—না? স্ট্রেঞ্জ। দর বাড়াচ্ছ নাকি? কিন্তু আমি তো তোমাকে খুব বেশী দামই দেব। ইলা আভা নোজ মি। আস্ক দেম।

—আমার জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। দৃঢ়গলা হিমিকার। —চাকরি করতে এসেছি, তাই করব।

—গুড গুড। হাসলেন ব্রিজমোহন—কিন্তু এই তো চাকরি তোমাদের এ কেয়ার টাইপ অব প্রস্টিটিউশন।

—কি বললেন? প্রায় চেঁচাল হিমিকা।

—ডোণ্ট বি স্যাউটি। ইউ বেঙ্গলী গার্লস, ভেরি, ভেরি চীপ। কাম, কাম, ম্যানেজার। ইয়োর গার্ল ইজ টু মাচ্ রেসপেক্টেবল। আই থিঙ্ক, শী উইল নট স্যুট ইউ।

—ইয়েস স্যার। সামনের মাস হতে ওকে ছাড়িয়ে দেব।

—ছাড়াবে? রাদার লেট হার স্টে, শী ইজ অ্যাট্রাকটিভ ইন হার প্রাইড। সিগারেট ধরালেন ব্রিজমোহন। —ইউ গো, লুক আফটার ইয়োর ডিউটি।

ম্যানেজার চলে যেতে দরজার কাছে দাঁড়ানো হিমিকার দিকে চাইলেন সাউসাহেব।

—টেক এ চেয়ার, সিট ডাউন ফর এ মিনিট। উইল ইউ?

একটু ইতস্তত করে হিমিকা বসল। তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসলেন ব্রিজমোহন।

—কম্পানী যদি দেবে না, এখানে এলে কেন চাকরি নিয়ে?

হঠাৎ হিমিকার চোখে জল এল, প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল সে।

—আর কে আছে তোমার? কেউ নেই? বাবা-মা, ভাই-বোন, কাজিন-রিলেটিভ? কেউ নেই। স্ট্রেঞ্জ। হিমিকার দিকে চেয়ে রইলেন সাউসাহেব। চোখে ঢাকা হাত ভিজিয়ে অশ্রু ঝরছে। কুড়ি বছরের জীবন এসে সামনে দাঁড়িয়েছে হিমিকার। নিরাশ্রয়, সঙ্গতি-স্বজন হীন জীবন। অবহেলিত লাঞ্ছিত জীবনের দুঃখে কাঁদতে লাগল হিমিকা।

একটা মমতা এল ব্রিজমোহনের মনে। কেউ নেই, পুওর গার্ল।

ধীরে ধীরে হোটেলের রহস্য জেনে স্তম্ভিত হ'ল হিমিকা। মিথ্যে কথা বলেন নি সাউ। খাওয়া একটা ছলমাত্র। মানুষ এখানে আসে অন্য সন্ধানে। দুর্নামী পাড়াতে যেতে রুচিতে বাঁধে, একটা মামুলী চরিত্রহীনতা আছে সেখানে। ওখানকার মেয়েগুলো পতিতা। সমাজের অপাংক্তেয় বলে মার্কা দেওয়া আছে তাদের কপালে। হোটেলের মেয়েরা সবাই ভাল। বাবা-মা পরিবারের ভদ্র প্রচ্ছদপটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা। এদের প্রমোদ-সঙ্গিনী করলে ঠিক বেশ্যাসক্ত হওয়া হবে না।

সে ছিল আগের দিনের মানুষ। বাইজী রক্ষিতা, বাগানবাড়ী, ভয়ানক বিশ্রী ব্যাপার। এখন সবটাতে ভদ্র সম্ভ্রান্ত হবার যুগ এসেছে। রক্ষিতার বদলে বান্ধবী। শব্দটাই কি সংযত আর সুন্দর। এবং এতে নিরাপত্তাও প্রচুর। মাসে মাসে মাসোহারা, বাড়ী, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি—কিছুরই দরকার নেই।

পকেটে টাকা থাকলে চলে এসো হ্যাপি নুকে। মুখরোচক খাদ্য, পানীয় মেলে বিশেষ ব্যবস্থায়। বেছে নাও একটি সুন্দরী মেয়ে। অবশ্য সুন্দরী বলে এখন আর কিছু নেই। ওটা পুরোপুরি প্রসাধনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্মার্ট একটি মেয়ে নিয়ে আনন্দে কাটবে কয়েকটি ঘণ্টা। একঘেয়ে জীবনের স্বাদ বদলাবে।

উপরের ঘরগুলোর রহস্য আরো গভীর। ওখানে আসে সব অভিজাত ঘরের মেয়ে, কলেজে-পড়া আধুনিক তরুণী। চোখে গগলস্ লাগিয়ে, মাথায় ভেল জড়িয়ে পিছনের সিড়ি দিয়ে উঠে আসে তারা। চড়া তাদের দর। অতিরিক্ত মেজাজী আর রেস্তওয়ালারা ছাড়া সে সব মেয়েদের ছুঁতেও পারে না কেউ।

গরীব? টাকার জন্য এই কাজে নেমেছে? দূর, দূর! হেসে ভেঙ্গে পড়ে শেফালী আভারা।

—আরে বোকা! পেটের দায়ে, বাড়ীর দায়ে আসি তো আমরা। ঘণ্টা পিছু দশটাকা হিসেবে ভাড়া খাটি। উপরে-আসা মেয়েরা মস্ত বড়লোক। মিস চৌধুরী, মিসেস সারখেল তো গাড়ী হাঁকিয়ে আসে। ওদের রেট হাজার টাকা। কেন আসে? আমাদের মতই টাকার জন্য আসে। টাকা রোজগার

করবার পক্ষে এমন সহজ ব্যবসা আর কি আছে বল? এত বেশী টাকা দিয়ে কি হবে বলছিস? তুই একটা হাবলি হিমি। দেখতে পাসনে টাকার জন্য ক্ষেপে উঠেছে পৃথিবী। ভেজাল, পচা দূষিত সব জিনিষের গণ্ডা করে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে সক্কলে, আমরাই বুঝি কেবল ভাল থেকে, গরীব হয়ে থাকব?

গরীব হয়ে থাকবে না আর কোনো মানুষ। এখন যে টাকার যুগ চলছে। টাকা, রাশি রাশি টাকা চাই। তাই মনকে বিক্রী করে, শরীর ভাড়া খাটিয়ে, বুদ্ধি ধার দিয়ে মানুষ টাকা রোজগার করছে, আবার ফু দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে সেই টাকা। টাকা দিয়ে বানানো হচ্ছে মানুষ খুন করবার তীক্ষ্ণতম অস্ত্র, শূন্যে উড়ে পৃথিবীকে তাজ্জব লাগাবার যন্ত্র। ভাল থাকবার কথা শুনে হেসে আটখানা হয় সবাই। আগের সেই ভাল থাকবার দিনের কথা শুনলে নাক কুঁচকে যায়। নিজের খাবার ক্ষুধার্তের মুখে তুলে দেওয়া, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া মান রাখবার জন্য আরো কত আজগুবি কাণ্ডকারখানা ভরা সেকালটাই তো মানুষকে প্রগতিহীন করে রেখেছিল। ভাল হয়ে লাভ নেই। শেফালী-আভারা তাই আর ভাল থাকবে না।

হিমিকা ওদের ধারালো কথার সামনে চুপ করে গেল, কিন্তু ওর বুকের মধ্যে গুমরে কাঁদতে লাগল নির্বাক ভাষা। খারাপ হবার জন্য তো আছে কত খারাপ মেয়ে। ওরা খারাপ হচ্ছে কেন। ওদের যে বাবা-মা, ভদ্র সুন্দর শুদ্ধ জীবন সব আছে। বেশী টাকা দিয়ে দরকার কি। টাকা হলেই তো কিনবে স্বচ্ছ সূক্ষ্ম শাড়ী, তাতে লুব্ধ হবে, মত্ত হবে পুরুষ। বাড়ী বানাবে, সেই তিনতলাকে জায়গা দেবার জন্য বস্তি ছেড়ে ফুটপাতে উঠবে ঝুমরারা। গাড়ী কিনবে, তার তলায় চাপা পড়বে মানুষ। কেবল আণবিক বোমা ফাটানোর ভয়ে ব্যাকুল হচ্ছেন পৃথিবীর জ্ঞানী-বুদ্ধিমানের দল। এদিকে যে টাকা দিয়ে মানুষ মারবার কত বিষাক্ত উপায় বানানো হচ্ছে সে কথা ভাবছে না কেউ।

---তোমার ভয় করে না? জিজ্ঞেস করল হিমিকা।

---ভয় কিসের? হেসে অস্থির হল দুই মেয়ে।

---ভয়ের দিন কবে কেটে গিয়েছে। মেয়েদের তো এক মহা ভয় আটকে পড়বার। সাবধান হলে আটকাবার প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া কাস্টমাররাও ভো চালাক। ওরাও প্রটেকশন নেয়। বাচ্চা এলে তো মুস্কিল ওদেরই বেশী। দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

---কিন্তু কি সুন্দর বাচ্চারা।

---তুই বড় বোকা হিমি। আভা বলল।

---বাচ্চা সুন্দর হ'লে কি হবে, ওদের কি এখন আসতে দিতে আছে। ফিগার খারাপ হবে, দর কমবে। সব চেয়ে বড় কথা জানাজানি হতে পারে।

সে যখন একটু বয়েস হবে, টাকা পয়সা জমিয়ে যখন বিয়ে করব, তখন বাচ্চা তো আসবেই। মোটা-সোটা একটি ছেলে, মিষ্টি একটি মেয়ে। বেশী আবার ভাল নয়।

আভার কথা শুনে শিউরে উঠল হিমিকা।

---এর পরে তোমরা আবার বিয়ে করবে নাকি?

---করব না কেন? একসঙ্গে ঝলসে উঠল আভা-শেফালী।

---এ কাজ তো ছেড়ে দেব। তখন তো কাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে খেয়ে পান মুখে, সারা মেজেতে গড়িয়ে দুপুরের ঘুম দেব। লক্ষ্মীপুজো, ষষ্ঠী পূজো করব। লক্ষ্মী বউ হয়ে ঘুরব স্বামীর পিছু পিছু।

আভা-শেফালী-ইলা---ওদের সবার বিয়ে হবে। এ জীবনের পাট তুলে দিয়ে ওরা ঘরে ফিরে যাবে। সেখানে থাকবে সুখ-শান্তি, স্বামী-সন্তান। তবে কি দোষ করেছিল হিমিকার মা, যে পতিতা হয়েই থাকতে হ'ল তাকে। পতিতা সভ্যসমাজের গ্লানি, আবার সভ্য মানুষরাই তৈরী করেছে তাকে। অসভ্য বর্বর যুগে ছিল কি গণিকা-বৃত্তি? আজ তাই মেয়েরা আর সভ্যতার দাম মেটাতে পতিতা হয়ে থাকবে না। যারা তাদের পতিতা করল, তাদের ঘরণী হবে, তুলে দেবে বিশ্রী শব্দটা অভিধান থেকে।

পতিতা বৃত্তি নিরোধ করবার জন্য কত সভা-সমিতি, কত আন্দোলন হচ্ছে। পৃথিবীর কুৎসিত ব্যাধি পতিতা মেয়ে। পতিতা মেয়ে কলঙ্কের চিহ্ন কপালে নিয়ে লুপ্ত হবে অন্ধকারের অতলে। কিন্তু সাহিত্য? মনের কলুষ-কামনা মেটাতে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হ'ল, আদিম প্রবৃত্তির কত রং, কি বিচিত্র ভঙ্গী, সে খবর পুংখানুপুংখ করে লেখা হ'ল যে বইয়ের পাতা যাতে কাম-বিলাসের নিখুঁত ছবি আঁকা হ'ল কথা দিয়ে, তাকে তো পতিত সাহিত্য বলে ঘৃণায় অপাংক্তেয় করে রাখা হ'ল না সাহিত্যের দরবারে। বরং বাস্তববাদী সেই বর্ণনা সম্মান-স্বীকৃতি পেল যুগসাহিত্য বলে। সে সব বইতে ব্যভিচারের কি অপূর্ব স্বাদ দেহের প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ের কি শরীর উত্তপ্ত করা কথা-চিত্র। ভাই-বোন-বাপ-মা---সব সম্পর্কের পবিত্রতা দাঁত বের করে ভ্যাংচাচ্ছে। পৃথিবীতে আর কিছু নেই, আছে কেবল একদল নরনারী। তাদের দেহে আবরণ নেই, নেই চক্ষে এক বিন্দু লজ্জা। কেবল এক তৃষ্ণা। গং গং গং বাজছে বাজনা, তার বিকট শব্দে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, বধির হয়ে গিয়েছে মানুষ। বিপুল তৃষ্ণায় গ্রাস করছে একে অন্যকে নর-নারী। সেই দৃশ্যের কথাছবি হ'ল। যুগসাহিত্য। পুরস্কার পেল, একদল মেয়েকে পতিতা হবার পথে লুব্ধ করবার জন্য পুরস্কার। কথা বলে, লোভ দেখিয়ে মেয়েদের আনা হ'ল পতিতা বানাবার জন্য। বইতে যে সব থিয়োরিটিক্যাল বিষয় আছে, তার প্রাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন আর কি। কিন্তু একটা মানুষের শরীর, হ'লইবা সেটা মেয়ে-শরীর---তাকে নিরাবরণ করে এমন উন্মত্ত হয়ে উঠবার কি আছে। জীবনে কুড়ি বছর বয়সে, নিজের শরীর সম্বন্ধে আগ্রহ জাগল হিমিকার। হোটেলের টয়লেট-রুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী চোখ ফেলে হিমিকা দেখল নিজের নিরাবরণ দেহকে। হাতীর দাঁতের মত রং, নরম মাংস দিয়ে গড়া শরীর। একটু উঁচু কণ্ঠা, নিটোল দু'টি বুক, ক্ষীণ কটি, সোনার থালার মত পেট, বুদ্বুদের মত উঠছে নাভি-কুণ্ডলী। নিজেকে আবরণে জড়াতে জড়াতে ভেবে পেল না কি আছে এই শরীরে, যার জন্য মানুষ পাগল হয়ে ওঠে। ভাবল এবার আর ব্রিজ-মোহনের সঙ্গে বেড়াতে যেতে আপত্তি করবে না। চুরি করলে, মিথ্যেকথা বললে পাপ হয় না, পাপ হবে ব্রিজ-মোহনের সঙ্গে গেলে? সেই পাপের চেহারাটা কেমন? হিমিকা ব্রিজমোহনের সঙ্গে ঘুরে এসে আবার আয়নার কাছে দাঁড়াবে, দেখবে পাপের জ্বালায় কতটা পুড়ে গিয়েছে শরীরটা।

দু'সপ্তাহ ব্রিজমোহন হোটেলে এলেন না। তৃতীয় সপ্তাহে হিমিকা দেখল তিনি এসেছেন। জানত এক্ষুণি ডাক পড়বে। কফির পট, চিপ্স নিয়ে হিমিকা চলে এল তিন নম্বর কেবিনে। কফি ঢেলে দিল, অনুরোধ না করতেই বসে পড়ল একটি চেয়ারে। আস্তে আস্তে বলল:

---আমি যাব।

ব্রিজমোহন সিগারেট টানতে টানতে কিছু ভাবছিলেন। হিমিকার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখলেন একটু।

---যাবে? কোথায় যাবে?

---আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব।

---বেড়াতে যাবে? গুড গার্ল! কিন্তু হঠাৎ মত বদলালে কেন? টাকার দরকার হয়েছে বুঝি?

টাকা। হিমিকার মনে পড়ল---পাপ করবার জন্যই মেয়েদের টাকা দেয় ওরা। কি আশ্চর্য কাণ্ড। ভাল থাকলে উপোস ক'রে মরে মানুষ, আর খারাপ হবার জন্য দাম মেলে ভারী হাতে। ভাল আছে বলে ঝুমরা-জলদ পেট ভরে খেতে পায় না, মাথা গুঁজবার আশ্রয় নেই। মেয়েকে ভাল রাখবে বলে মরতে হ'ল হিমিকার মাকে। অথচ হিমিকা খারাপ হলে কত সুখ পাবে। বাড়ী-গাড়ী টাকা সব হবে তার।

হিমিকাকে নীরব দেখে ব্যাগ খুললেন ব্রিজমোহন। তাঁর চোখে বিরাগ দেখা দিল। মেয়েটাকে একটু অন্যরকম ভেবেছিলেন।

টাকা। কত টাকা দরকার হিমিকার? রাশি রাশি টাকা চাই। টাকার জন্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা জেগেছে চারদিকে। টাকা লুটবার জন্য এ ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাগলের মত। মায়ের বুকের স্নেহ, বাবার মমতা, সন্তানের শ্রদ্ধা, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম সব পুড়ে যাচ্ছে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠেছে আকাশকে অন্ধ করে। কাকে

মাদ্রাজের ভবনে ব্রিটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে গান্ধীজী

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

কার্তিক / '৭৫

তিনজন বিখ্যাত ভাস্করের গড়া গান্ধীমূর্তি

ডাণ্ডি অভিযানে মহাত্মা গান্ধী ও সরোজিনী নাইডু

১৯২৪ সালে বাপুজীর অনশন করার সময় তাঁর পার্শ্বে ছ' বছরের শিশু ইন্দিরা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর ব্যবহৃত চশমা, খড়ম ও বই প্রভৃতি

শিশুপ্রিয় মহাত্মা গান্ধী
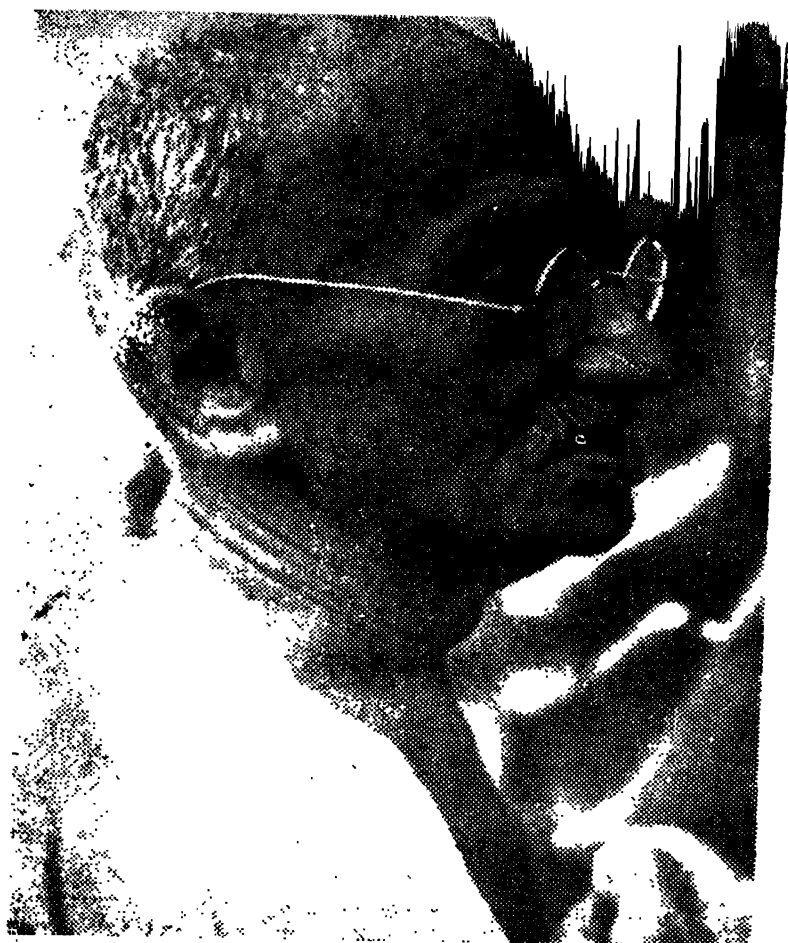
জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
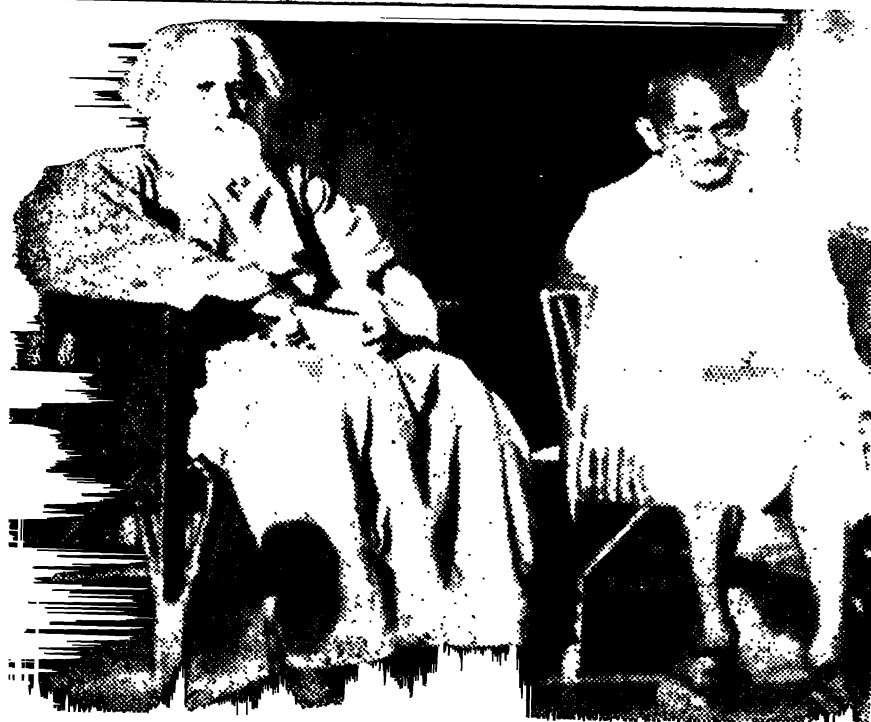
বাজছে টাকার ঝন্‌ঝন্‌, চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠেছে লোভে। টাকা চাই, অনেক, আরো অনেক টাকা। সেই টাকা দিয়ে মানুষ বুক জ্বলে যাওয়া পানীয় খাবে, নরম আর গরম মেয়ে-শরীর থেতলে মুচড়ে-যাকে বলে ভোগ, তাই করবে। নিঃশ্বাসের ঝড় উঠবে, হৃদস্পন্দন দ্রুত, আকাশ-পাতাল এক হয়ে যাচ্ছে। দ্বিজমোহন জোরে তাঁর গাড়ী হাকিয়ে হিমিকাকে ইন্দ্রভুবনে নিয়ে যাবেন। সেখানে হাজার পাওয়ার টিউবের আলোতে রাত হয়ে উঠেছে নকল মধ্যাহ্ন। সেখানে হিমিকার শরীরটা ভোগ করবেন তিনি নিরাবরণ করে।

কিন্তু তন্তুজ আবরণ উন্মোচন করলেই কি নিরাবরণ হবে হিমিকা? যে চামড়ার কাপড় পরিয়ে বিধাতা তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাতো থাকবে তখনো। দ্বিজমোহনের কি মিটবে হিমিকাকে নিরাবরণ করে সম্পূর্ণ ভোগ করবার তৃষ্ণা? তখন কি হিমিকার শরীরের সোনালী চামড়া ছড়িয়ে, রক্ত-মাংস-মজ্জা-মেদ দিয়ে তৈরী শরীরটার স্বরূপ দেখবার ইচ্ছা হবে না?

নারীকে পেষণ ক'রে শোষণ করেই কি ভোগের শেষ হয়? মাত্র এই টুকুতেই থেমে যায় বলেই তো মানুষের ভোগের কামনা আর শেষ হচ্ছে না। একরাত্রির পিছনে ছুটছে আর একরাত্রির কামনা। কিন্তু রাত্রির উপভোগের পর ভোর বেলা যদি ভোগ্যপণ্যটাকে পাঠানো হ'ত কসাই খানায়, যদি বানানো হ'ত কানের চোখ, বাঁকানো অধর-ওষ্ঠের রোস্ট, স্তনের কাটলেট, নরম-মাংসের ফ্রাই, পেয়ালা উপচে পড়ত রক্ত আর মজ্জা দিয়ে বানানো সুরুয়া। সেই অতি মনোরম ব্রেকফাস্ট, ডিনার হয়ে নারীদেহটা ঢুকে যেত শরীরের মধ্যে। তখন শরীরের মধ্যে শরীর হজম ক'রে, অণুতে অণুতে শিরায় তাকে অনুভব ক'রে, একেবারে চূড়ান্ত ভোগের শেষে তুরিয়ানন্দে বিভোর হ'ত দ্বিজমোহনরা।
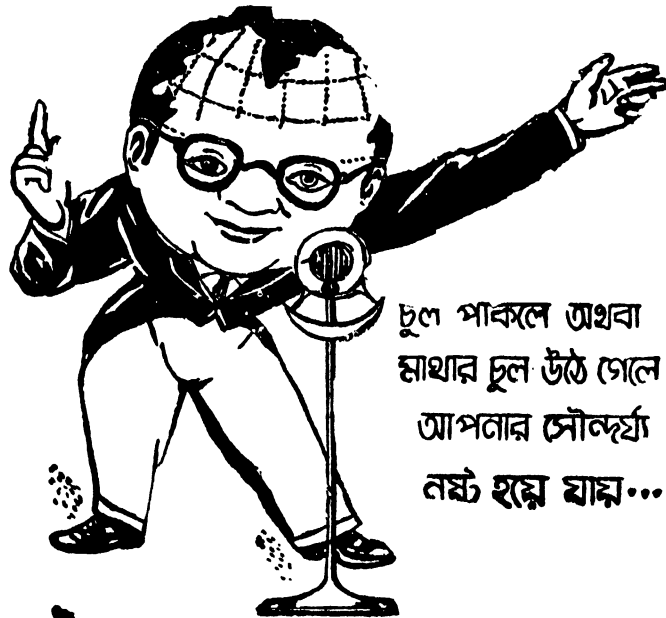
[ক্রমশ।

হয়তো তাই

মনোরঞ্জন হাজরা

বিদীর্ণ করা ধরিত্রীর বুক থেকে ঝুরঝুরে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে জগন্নাথ বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে আপন মনেই যেন হেসে উঠল---এই না হলে মাটি। অর্ধশতাব্দী কেটে গেছে তার চাষ করতে করতে, তাই কি করে মাটি তৈরী করতে হয় তা সে জানে। এরপর কিছু টাকা, কিছু বীজ আর কিছু সার। তারপর জল তো আছেই, কানা নদীর মরা সোঁতায় অন্তত চৈত্র মাস পর্যন্ত টলটল করবে কাকচক্ষু স্বচ্ছ জলের ধারা। সোনা ফলাবে সে এই জমিতে---এই তার স্বপ্ন।

কালো মিশমিশে, কদাকার বললেও অত্যুক্তি হয় না, লম্বাটে ধরণের চেহারা জগন্নাথের। লম্বাটে বলে কিছুটা রোগাও বটে। হাসলে তাকে ফোকলা বলে মনে হয় কারণ পান ও তামাকের ছোপ-ধরা দাঁতগুলো সহজে চোখে পড়ে না। চওড়া কপালের নিচে বড় বড় দুটো চোখ। দৃষ্টিটা প্রখরই। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ও গোঁফ। এইমাত্র ক্ষেতে মাটি তৈরীর কাজ শেষ করল সে। এখন মাথার বাঁধা গামছাটা খুলে খানিকটা হাওয়া খেতে লাগল।

পাশের ক্ষেতে কাজ করছিল জগন্নাথের প্রতিবেশী উপেন। লাঙল দেবার পর্ব তার শেষ হয়ে গেছে। এখন মই দেয়ার পালা। গরু দুটোকে ছুট করিয়ে মই-এর ওপর দাঁড়িয়ে থেকে ছুটছিল। জগন্নাথ আপন জমির গৌরবে খুশি হয়ে উপেনের দিকে তাকালো। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'উপীন তোর কদ্দুর রে?'

গোল-গাল বেঁটে-সেঁটে রোদে পোড়া চেহারা উপেনের। সে গরু দুটোকে একটু থামিয়ে বললে, 'কোন রকমে তো চষা-ভাঙার পালা শুরু করিচি খুড়ো।'

'তাহলে তো হার হারি করে এনিচিস পেরায়।'

'হ্যাঁ---এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি।'

মাথার ওপর হেমন্তের ম্রিয়মাণ আকাশ। রোদ কখনও চড়া, কখনও নরম। চড়া হলে পিঠে বেশ টের পাওয়া যায়। নরম হলে আরামদায়ক বলে মনে হয়। তবু ঘাম ঝরছে জগন্নাথেরও, ঘাম ঝরছে উপেনেরও। চড়া রোদে জ্বালা করা পিঠটায় বাঁ হাতখানা ঘুরিয়ে একটা চাপড় মেরে জগন্নাথ বললে, 'এত করেও যদি ফসলের দর না পাই তাহ'লে মনটা কেমন হয় বল তো উপীন?'

উপেন হেসে বললে, 'তুমি যে আবার উল্টো শাস্তর আওড়াচ্ছো খুড়ো?'

'কেন?'

'ফসলের দর পাবে তো নাটকের শেষ অঙ্কের একেবারে শেষ সিনে। আগে তোমার আসরে যন্তর পড়ুক।'

'হেঁ-হেঁ তা যা বলিচিস।'

আসরে যন্ত্র পড়ুক কথাটা গ্রাম্য জীবনে বড় লাগ-সৈ কথা। কথাটার মানে 'শুরু' হওয়া আর এ শুরু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাদের খুবই তিক্ত। মনে পড়ে জীপ চড়ে আসা বি ডি ও অফিসের সাহেব-মেমেদের কথা। এই সেদিনেও সব কত লেকচার দিয়ে গেল। কোন একটা দেশ---কি যেন নাম---রায়দে জানোয়ার (রায়ো-ডি-জেনারো) না কি, সেখানে আলু ফলে পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে বেশি। তারপরেই কিন্তু ফলন হচ্ছে তাদের এই অঞ্চলে সিঙ্গুর, নালিকুল,

তারকেশ্বরে। বি ডি ও সাহেব তো অনেকদিন আগে থাকতেই খুব উৎসাহ দিয়ে আসছেন ভালভাবে চাষ করতে। তা ছাড়া একথাও তিনি বার বার করে বলে গেছেন, চাষের টাকা না থাকলে টাকা দেবেন, বীজ না থাকলে বীজ দেবেন। সার না থাকলে তা-ও দেবেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, বি ডি ওর এই কথার ওপর নির্ভর করে কিছু করা চলে না। তার কারণ অবিশ্যি এই নয় যে তিনি টাকা বীজ আর সার প্রভৃতি দেন না---বরং দেন ঠিকই কিন্তু যখন দেন তখন মাটির নিচে আলু কদমফুলের মত বড় হয়ে ওঠে। তাই তখন আর ওসবের প্রয়োজন হয় না। প্রতি বছরই এই এক অবস্থা---ব্যতিক্রম বলে কিছু ঘটে না। সেজন্য উপেনের 'আসরে যন্তর পড়ুক' কথাতে এই সব কথাই মনে পড়ে গেল। এসব হলে তবে তো ফসল, তারপর তো দর। সত্যিই সেটা নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মতই।

কাজ শেষ করে জগন্নাথ ইতিপূর্বে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিল। তারা অদূরে একটা ঝোপের পাশে ঘাস খাচ্ছিলো। সে ক্ষেত থেকে মইখানা তুলে নিয়ে গরুগুলোর উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়ে উপেনকে বললে, 'আমি এগুই উপীন---আমার আবার আসরে যন্তর দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'চলো---আমিও যাচ্ছি একটু পরে।'

সূর্য তখন মধ্য গগন পার হয়েছে।

॥ দুই ॥

খিড়কীর পথে গরুগুলোকে তুলে আর মইখানা গোয়ালের পাশে রেখে সবে জগন্নাথ পুকুরে গা-হাত-পা ধুতে নেমেছে এমন সময় তার ছোট ছেলে প্রদ্যুম্ন ওরফে পদু এসে খবর দিলে, 'সা-বাবু এসেছেন সিঙ্গুর থেকে। তাঁকে সদরে বসানো হয়েছে।'

'বলিস্ কিরে,' জগন্নাথ খুশি হয়ে বল্‌লে, 'এ যে মেঘ না চাইতেই জল রে।'

তাড়াতাড়ি পুকুরের কাজ সেরে ভিজে গামছায় পা-হাত মুছে নিয়ে সে একেবারে হাজির হল সা-বাবুর সামনে। তারপর যুক্তকর প্রসারিত করে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে নমস্কার করে বললে, 'কতক্ষণ এয়েচেন?'

'বেশিক্ষণ না।'

সুন্দর চেহারা সা-বাবুর। মাথার চুলগুলো ওলটানো। চোখে রোল-গোল্ডের চশমা, পরনে ফরাসডাঙার ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর ভিতরে অর্ধবৃত্ত গেঞ্জিটার মধ্যে সোনার একটা হার আধখানা ঢুকে আছে---বাকি আধখানা গলায় চিক্-চিক্ করছে।

জগন্নাথ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ডাকল, 'পদু, অ-পদু?'

প্রদ্যুম্ন এসে পড়ল। উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে প্রদ্যুম্ন। যেমনি নিটোল স্বাস্থ্য তেমনি কালো। মনে হয় যেন একখানা পাথরের চাঙড়। জগন্নাথ বললে, 'বাবুকে জলটল দিয়িছিস্?' তারপর পুত্র কিছু বলবার আগেই সে নিজে বলে উঠল, 'দাদাকে শীগ্‌গির ডাব পাড়তে বল দিকি।'

সা-বাবু বল্‌লে, 'না না ডাব-টাবে দরকার নেই। আমি এখুনি উঠব। শুধু তোমার জন্যেই এসেছিলুম।'

'সে কি হয়?'

প্রদ্যুম্ন দাদাকে বল্‌তে গেল। দাদা পরমেশ তখন বাড়ীর ভিতর ফুঁসছিল বাপের বিরুদ্ধে। বাইশ-তেইশ বছরের জোয়ান ছেলে পরমেশ। বাপের মতই লম্বাটে। মুখখানা মায়ের মত। রংটা কালো, তবে রংটা বাবা বা ছোট ভায়ের মত নয়। তার ধারণা আলু চাষ করতে গিয়ে বাবা তাদের সর্বনাশ করছে জোচ্চরদের পাল্লায় পড়ে। সা-বাবুকে তাদের বাড়ী আসতে দেখেই সে তেলে-বেগুনে জলে উঠেছে। বাপকে সামনে না পেয়ে মাকেই সে এতক্ষণ রাগ করে বোঝাচ্ছিলো এসব লোকগুলোর প্রকৃতি। বাবা সরল মানুষ এসব ধরতে পারে না। আগেকার দিনে আলু ফলিয়েছে প্রচুর। তখন বীজ খোল সব সস্তা ছিল। অন্য জিনিস, পত্রের এত দাম ছিল না। আলু বিক্রী করে অনেক টাকা পাওয়া যেত এবং তাতে সংসারের সচ্ছলতা বজায় রাখা যেত। কিন্তু এখন চাষ করাই দুষ্কর বীজ সারের দর আকাশছোঁয়া। তাছাড় আবার আছে ব্ল্যাক মার্কেট আর ভেজাল। নৈনীতাল বীজে দিশী এক-রকম আলুর বীজ ভেজাল দেয়া হয়। আর সারের তো কথাই নেই---যেমনি বালি তেমনি গুঁড়োনো ইটের সংমিশ্রণ। সরেস জমিও সারের গুণে বন্ধ্যা হয়ে উঠছে। তারপর যা-ও বা ফসল হয় তারও দর থাকে না। অথচ দালালেরা চাষীদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে কোল্ড স্টোরেজে রেখে মণকরা ছ-সাত গুণ লাভ করে। দরকার কি অমন চাষের? চাষের দেনা শুধতে গিয়ে শেষকালে কি ভিটেমাটি সব কিছু গিয়ে উঠবে সা-বাবুর হাতে?

এসব শুনে মা বল্‌লে, 'তা আমি কি করব বল? তোরা বোঝা তোর ছেলেকে---'

পরমেশ বল্‌লে, 'বাবা কি বোঝবার লোক। এদিকে সরল হলে কি হবে---ওদের যে গোঁয়ারের বংশ। দ্যাখো না---একেবারে কাঠ-গোঁয়ার? নিজে যেটি ভাল বুঝবে, সেটি করবেই---তুমি হাজার বলো।'

এমন সময় প্রদ্যুম্ন ডাব পাড়ার কথা বলতে এলে পরমেশ আরও একমাত্রা জলে উঠে বললে, 'ডাব পাড়বে না আরো কিছু---একগ্লাস জল দিয়ে বিদেয় করে দিগে যা---'

মা বল্‌লে, 'না না বাবা সেটা কোন কথা নয়। মানুষজন বাড়ী এলে তাকে অপগেরাহ্যি করতে নেই। তুই ঘরকে যা। তা না হলে হয়ত তোর ছেলে নিজেই গাছে উঠে পড়বে। তোরা থাকতে সেটা কি ভাল দেখাবে?'

অগত্যা পরমেশকে ডাব পাড়তেই হল এবং সা-বাবুকে খাওয়াতেও হল।

সা-বাবু যাবার সময় আড়াই শো টাকা জগন্নাথের হাতে দিয়ে বলে গেল, 'আরও দরকার হলে আমার কাছে যেও---বি ডি ও-র ভরসায় থেকো না যেন।'

পরমেশ বাবার এই সমস্ত কার্য-কলাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু প্রত্যক্ষই করল না, সা-বাবু চলে যেতে একেবারে ফেটে পড়ল রাগে। জগন্নাথ সা-বাবুর দেয়া আড়াই শো টাকার নোটগুলো উঠোনে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে বল্লে, 'নে তোরা যা পারিস করগে যা---আমি শালার চাষই আর করব না।'

শেষ পর্যন্ত মা মধ্যস্থতা করে দিলে। টাকা যখন সা-বাবু দিয়েইছে, তখন ওটা ফেরৎ দিলেই হবে কিন্তু আর তার কাছ থেকে কখনো নেওয়া হবে না।

এই মধ্যস্থতা সবাই মেনে নিলে।

॥ তিন ॥

মধ্যস্থতা তো মেনে নিলে জগন্নাথ। কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে চাষের? দিনের পর দিন যায়। কিছুই করা যায় না। সুমুখে দিগন্তবিস্তৃত কার্তিকের শিশির-ভেজা মাঠ। ক'দিন আগেও জগন্নাথ ঝুরঝুরে মাটি বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে গর্ব অনুভব করেছে। শুধু কি সেই? না---এমনিতরো হাজার হাজার কৃষক। যে মাঠে মাটির প্রতিটি রেণুতে সোনালি স্বপন মিশিয়ে থাকার কথা---সে মাঠ যেন রিক্ততার হাহাকারে খাঁ-খাঁ করছে। উত্তীর্ণ-বয়স্কা অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে যে বেদনা বেজে ওঠে মা-বাপের বুকে, তেমনি বেদনা বেজে ওঠে এই তৈরী করা মাঠে বীজ বপন করতে না পেরে কৃষকের বুকে।

জগন্নাথ একবার ভাবল, হোক আড়াই শো টাকা। তবু এতে যা বীজ দার হয় তাই সে কিনে আনবে। এনে যতটুকু জমিতে তা দেয়া যায় তাই দেবে। কিন্তু তারপর? তারপর না হয় সবাইকে গোপন করে একদিন চুপিচুপি গিয়ে উঠবে সা-বাবুর কাছে। তিনি তো বলেই গিয়েছিলেন।

কথাটা কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করা যায়? বাড়ীতে সবাই তার বিরুদ্ধে হয়ে গেছে। অথচ একথা কেউ ভাবছে না যে তৈরী জমি দিনের পর দিন পড়ে থাকছে। তার মনে হল একবার উপেনের সঙ্গে পরামর্শ করলে কেমন হয়? মন্দ হয় না তো। তাই করল সে।

উপেন সব শুনে বললে, 'বাড়ীতে যখন চাইছে না কেউ তা চল না একবার বি ডি ওর কাছেই ঘুরে আসি খুড়ো।'

'তুই যাবি?'

'আমি ক'দিন সেইরকমই ভাবছিনু।

'তবে তাই চ। জমির হাহাকার আমি আর সইতে পারছি না উপীন।'

দরখাস্ত নিয়ে ওরা বি ডি ও অফিসেই গেল। বি ডি ও বেশ আশার কথাই ওদের শোনালেন। তবে তিনি জানালেন, এনকোয়ারি না করে টাকা দেয়া যাবে না। তাছাড়া এগ্রিকালচার অফিসার যাবেন, গ্রামসেবক যাবেন, তাঁরা আপনাদের দলিল পরচা সব দেখবেন, আপনার ডিফল্টার কিনা তার রিপোর্ট নেবেন---সে সবের পর কোন বাধা না থাকলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে।'

জগন্নাথ বল্লে, 'শিগ্গির পাবার কোন ব্যবস্থা নেই?'

'আর কি শীগ্গির হবে বলুন,' বি ডি ও বল্লেন, 'এইসব কাজগুলো না সেরে তো দেয়া যাবে না।'

'তবু যাতে শীগ্গির শীগ্গির হয় একটু দেখবেন।'

'দেখব।'

সেদিন ফিরে আসবার সময় নেহাৎ অঘটনের মতই ঘটনাটা ঘটে গেল। ওরা যেই আপিস থেকে বেরুতে যাবে কি একেবারে সা-বাবুর সঙ্গে মুখো-মুখি দেখা।

সা-বাবু বি ডি ওর কাছেই যাচ্ছিলো। জগন্নাথকে দেখে বলে উঠল, 'আরে! তুমি যে! কি ব্যাপার?'

জগন্নাথ যুক্তকরে নমস্কার করে বললে, 'চাষ তো আর হয় না---তা এসেছিনু---'

সা-বাবু বললে, 'আমি তো তোমা বলেছিলুম। এদের ভরসায় মানু থাকে?'

'তা'লে কি আপনার কাছে যাব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ এ বিষয়ে কোন দ্বি কোরো না। আমি তোমায় টাক দোবো---তুমি আমায় আলু দিয়ে শো দেবে। আর যদি---'

জগন্নাথ বললে, 'যদি আর কি বাবু?'

সা-বাবু জানে কি করে কি করতে হয়। জগন্নাথকে এখানে দেখেই সে বুঝে নিয়েছে যে, তাকে লোকটা পুরো পুরি বিশ্বাস করতে পারেনি আ সেই জন্যেই এখানে এসেছে। কাজে সেই কাজটা তাকে করে নিতে হবে তাই সে বললে, 'যদি তোমার মনে হ দামের দিক থেকে তোমার লোকসা হচ্ছে তাহ'লে তুমি আমাদের হিম ঘ আলু জমা রেখে দিতে পারো, তারপ দর উঠলে বেচে টাকা দিও।'

'তা'লে তো বাবু বেঁচে যা আমরা। কি বল উপীন?'

'বটেই তো', উপেন আশা উদ্বেলিত হয়ে বললে, 'আচ্ছা আ টাকা চাইলে আমাকেও দেবেন?'

'আমাদের কোন ধরাবাঁধা নিয় নেই। তবে এগ্রিমেণ্ট করতে হবে।'

'হ্যাঁ গিরিমেণ্টো তো নিশ্চ করতে হবে।'

সা-বাবু বললে, 'কি জানো বা এটা আমরা চাষীদের ভালর জন্যে করি। তাছাড়া দেশ বলেও তো একটা কথা আছে। দেশ এখন আমাদে স্বাধীন। স্বাধীন দেশে টাকার অভা চাষী চাষ করতে পারবে না তার ফ কি শুধু চাষীরই ক্ষতি হবে? দেশে ক্ষতি হবে না? এত আলু ফলে---সময় মত চাষ না করলে এই পর্বতপ্রমা আলু থেকে দেশ তো বঞ্চিত হবে।'

'তা হবে বাবু।'

'কাজেই এক দিক ভেবেই এটা আমরা করি।'

জগন্নাথ বললে, 'তাহলে কি আমরা কাল যাব?'

'নিশ্চয়ই যাবে। সে কি কথা—আমরা থাকতে চাষ হবে না তোমাদের?'

পথে আসতে আসতে জগন্নাথ বললে, 'জানিস উপীন পরমেশ আমার কিছুতেই বুঝবে না যে সা-বাবু আমাদের কতখানি উপকার করছেন।'

'হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো।'

'এর চেয়ে ভাল কথা কি হবে বল তো? যদি টাকার বদলে আলু দিতে গিয়ে লোকসান হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে হিমঘরে আলু রেখে দিয়ে দরটা উঠলে তারপর বেচে টাকা দিলেই চলবে। এ কি কম স্নবিধের কথা?'

'তাই তো।'

॥ চার ॥

সেই স্নবিধার জন্যই সোনা ফলবে এবার মাঠে মাঠে।

বাড়ীতেও আর বিরোধ নেই জগন্নাথের। সবাই যখন শুনল টাকার বদলে আলু দিতে হবে না, হিমঘরে আলু ধরে রেখে দর উঠলে বেচে তারপর টাকা শোধ দিতে হবে তখন সবাই প্রায় শান্ত হয়ে গেল। এমন কি কাজে উৎসাহও বোধ করল সবাই। পরমেশ আর প্রদ্যুম্ন তো বাবার সঙ্গে মাটি কামড়ে পড়ে রইল মাঠে।

কানা নদীর মরা সোঁতার ধারে খাল তৈরী হ'ল। সেখান থেকে সরু নালা কেটে নিয়ে এল পরমেশ আর প্রদ্যুম্ন, একেবারে তাদের ক্ষেতের বুকে। তারপর ঢেঁকিকল করে লোহার ডোঙায় অজস্র জল তুলে তুলে পাঠাতে লাগল তারা সেই নালা দিয়ে। মাসখানেকও হয়নি এই তো সেদিন দাঁড়া কাটা হল—এখন দাঁড়ার ওপরে সতেজ সবুজ গাছগুলো সারি সারি বাতাসে আন্দোলিত হয়ে উঠছে। চেয়ে চেয়ে দেখতে ভারি ভাল লাগে। গর্বে যেন বুকও ভরে ওঠে।

সেদিন সকালে ক্ষেতের আলে বসে বসে জগন্নাথ হুঁকো টানছিল।

পরমেশ আর প্রদ্যুম্ন ক্ষেতে ইঁদুর মারার ওষুধ দিচ্ছিলো। এ সময়টা ভয়ানক ইঁদুরের উৎপাত হয়। গর্তে গর্তে শাবলের চাড়া দিতে বেশ কয়েকটা ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর বেরিয়ে পড়ল। প্রদ্যুম্ন তাদের পিছনে তাড়া করল, কয়েকটাকে মারলও।

জগন্নাথ বললে, 'ও পোষ মাসের ইঁদুর। সাঙ্ঘাতিক বে করে ব্যাটারা। ফসল তোলা হয়ে গেলে দেয় তাদের দূর করে।

প্রদ্যুম্ন বললে: 'বিয়ে করা ইঁদুরগুলো তাহলে বিনি-মাইনের কিষেণ?'

'আমি কি মিথ্যে বলছি?'

প্রদ্যুম্ন হেসে উঠল।

ইঁদুর মারা শেষ করে পরমেশ ও

প্রদ্যুম্ন বাবার পাশে এসে বসল। জগন্নাথ আশায় উদ্বেল হয়ে বলে উঠল, 'আর গোটা চারেক ছেঁচ।'

পরমেশ বললে, 'তারমানেই একটা মাস।'

'হ্যাঁ।'

'এক মাসেই হয়ে যাবে,' প্রদ্যুম্ন অনুসন্ধিৎসুর মত জিজ্ঞাসা করল। পরমেশ ভায়ের অনুসন্ধিৎসা মেটাবার উদ্দেশ্যে বললে, 'তা হয়ে যাবে।'

ওদের পিতাপুত্রের মধ্যে পাশের ক্ষেত থেকে উপেন এসে বললে, 'কিন্তু যাই যা বলো বাপু---সা-বাবু না থাকলে এবার এ তল্লাটে চাষই হত না।'

জগন্নাথ হাসিমুখে পরমেশের দিকে তাকালো। পরমেশ সলজ্জভাবে বলে উঠল, 'আগে তো এ সব কথা কেউ বলনি, তাই আমি রাগ করতুম।'

উপেন আবার বললে, 'ভাগ্যিস আমরা বি-ডি-ওর ভরসায় থাকি নি?'

'তাহ'লে সব বরবাদ হয়ে যেত।'

'কিন্তু তেমনি অপমানও হয়েছে বি-ডি-ও।'

পরমেশ জিজ্ঞাসা করলে, 'কি রকম?'

সেই সেদিনকার কথা---যেদিন ওরা হিমঘরে সা-বাবুর কাছ থেকে এগ্রিমেণ্ট করে টাকা আনতে গিয়েছিল। সেদিন ওরা গিয়ে দেখল হিমঘরের মালিক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের ঘরে বি-ডি-ও আর দারোগা বসে। বি-ডি-ওর সামনেই সা-বাবু ওদের টাকা দিলেন। কাজেই বি-ডি-ও ওদের যে টাকা দিতে পারেন নি---সে টাকা সা-বাবু ওদের যখন দিলেন, তখন কি সেটা বি-ডি-ও'র কম অপমানের কথা?

সব শুনে পরমেশ বললে, 'বি-ডি-ও সেখানে কি করতে গেসল?'

'বোধহয় কোন কাজে।'

'আর দারোগা?'

'তিনিও বোধ হয় কাজে---'

'কিন্তু সকলেই হিমঘরের মাড়োয়ারীর কাছে একসঙ্গে কাজে গেল---এটা তো বাপু তেমন ভাল কথা নয়।'

উপেন বলে উঠল, 'ধ্যাৎ পরমেশ তোর মনটাই কেমন যেন বেঁকা।'

'না না অতো সহজে কথাটা নাকচ করে দিও না', পরমেশ দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করলে, 'গরমেণ্ট চাষের জন্যে টাকা দেয় তো?'

'হ্যাঁ।'

'বি-ডি-ও সে টাকা এনকোয়ারি-মেনকোয়ারি, বারো-সতেরো ফ্যাচাং তুলে দিতে দেরী করলে ধরো---'

'বেশ।'

'তখন মাড়োয়ারী সা-বাবুকে দিয়ে তোমাদের টাকা দিলে---'

'তা না হয় হল কিন্তু তারপর?

'তারপর তোমরা এবার মাড়োয়ারীর হাতে পড়ে গেলে।'

উপেন বললে, 'তাতে কি হল?'

'হবেটা তো পরে কিন্তু তার আগে বি-ডি-ও, দারোগা, মাড়োয়ারী বেশ একটা যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছো না কি?'

'কিন্তু তাতে আমাদের কি', উপেন সহজভাবেই বললে, 'আমরা তো ফসল ধরে রেখে দর উঠলে বেচে ওদের টাকা দিয়ে দোব।'

পরমেশ আর তর্ক বাড়ালো না। এরা কিছুতেই বুঝতে চাইবে না কেন সরকারী ঋণ দিতে দেরী করা হল, কেনই বা সা-বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে হিমঘরের মাড়োয়ারীর খপ্পরে পড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হল। একথা সবাই জানে, চাষীর ফসল ধরে রাখার ক্ষমতা কতখানি। পনেরো দিন পরে যেখানে আলু খুললে বিঘে করা পনেরো-কুড়ি মণ আলু বেশি পাওয়া যায় সেখানে সংসারের জ্বালায় পনেরো দিন আগেই আলু খুলে তারা বাজারে নিয়ে যায়। চাষীর এই শোচনীয় দুর্দশার কথা কি বি-ডি-ও জানেন না, না সা-বাবু বা হিমঘরের মাড়োয়ারী এ সব অবগত নয়? কাজেই এইভাবে তারা সবাই মিলে জোট বেঁধে চাষীকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা ভেবে দেখতে হবে বৈ কি।

কিন্তু কে শোনে সে কথা।

॥ পাঁচ ॥

তবু অনেক বাধা-বিপত্তি ঠেলেই এবারের চাষ।

জগন্নাথের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক রঙীন ছবি। একমাস পরে আলুর দাঁড়া ভাঙা হচ্ছে। ভুসভুসে ভুষোর মত হালকা মাটি থেকে অজস্র বড় বড় আলু বেরিয়ে আসছে। সাধারণত এদিককার মাটিতে বিঘে করা একশো মণ আলু হয়ই। দশ বিঘা আলু চাষ জগন্নাথের। হাজার মণ আলু উঠবে তার নিঃসন্দেহে। সেই আলু বোঝাই করবে সে বস্তায়, সে আর তার দুই জোয়ান ছেলে---পরমেশ আর প্রদ্যুম্ন। তারপর তুলবে গরুর গাড়ীতে। পাড়া-গাঁয়ের উঁচুনিচু পথে সশব্দে গড়িয়ে চলবে গাড়ীর চাকা। গাড়ী যাবে সিঙ্গুরের হিমঘরে। মণকরা যদি দশটাকাও পায় সে তবে সে আলুর দাম হবে দশ হাজার টাকা। দেনা দিতে হবে হাজার টাকা। বাকি ন' হাজার টাকা থোক আসবে তার হাতে। কত তার স্বপ্ন। কত তার আশা। ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের মাথায় জল দিতে হবে নইলে কোথায় কি হয়ে যাবে কে জানে। অন্তত পরমেশের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে আসবে সে ঘরে। পয়সার জন্যই এতদিন সে পারেনি এ সব করতে। দুখানা ঘর তুলবে সে দুই ছেলের জন্য। বিঘে-দুচার জমিও কিনতে হবে। সংসারটাকে ভরিয়ে তুলবে সে সকল দিক থেকে। পঞ্চাশটা বছর সে চাষই করেছে সেই দশ বছর বয়স থেকে। আজ বয়স তার ষাট কে জানে আর কতদিন সে বাঁচবে। দিন তার ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে কাজেই যত তাড়াতাড়ি সে পারে তাকে সব কিছু সেরে নিতে হবে।

●

এরপর একদিন সত্যিই গরুর গাড়ীর চাকা গড়াতে লাগল গ্রামের উঁচু নিচু পথে।

গাড়ীর সারি চলেছে তো চলেইছে কয়েকদিন শুধু গাড়ী বোঝাই আলু আর আলু। শুধু জগন্নাথের নয়, হাজারো কৃষকের। হিমঘর ভরে উঠছে আলুতে। অনেক আশা অনেক স্বপ্নমাখা এ আলু। এ আলু ধরে রাখবে তারা। তারপর দর উঠলে বেচবে। বেচে দেনা শুধবে। ছেলের বিয়ে দেবে, ঘর তুলবে, জমিও কিনবে বিঘে-দুচ্চার।

সমস্ত আলু যখন হিম-ঘরে জমা হয়ে গেল তখন জগন্নাথ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। সন্ধ্যার সময় সকলে এসে বসল দাওয়ায়---পরমেশ, প্রদ্যুম্ন, বিধবা পিসী আর তার একমাত্র সন্তান পাঁচ বছরের নিতাই। জগন্নাথ একদিকে বসল হুঁকো নিয়ে।

ছেলেদের খেতে দিতে এল মা। হাতে গুড়-মুড়ির কাঁসি। দাওয়ার দৃশ্যটা দেখে তার বড় ভাল লাগল। খুশি মনে বলে উঠল, 'হ্যাঁরে তোরা সব তোদের ছেলের ওপর রাগ করিস---দ্যাখদিকি বুড়ো মানুষ বেয়ে চেয়ে ঠিক তো ঘাটে নৌকো ভিড়ুলো বাপু।'

পরমেশ হাসল একটু। দাদার হাসি দেখে প্রদ্যুম্ন বললে, 'দাদার কিন্তু খটকা একটা মনে রয়েই গ্যাছে।'

হুঁকোয় টান মেরে ভুস করে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিয়ে জগন্নাথ বললে, 'এবার সব খটকার অবসান হয়ে যাবে বাবা---সব খটকার অবসান হবে।'

তাই হল। কিন্তু বড় বেশি মূল্য দিয়ে।

শীতের সমাপ্তির পর বসন্তের বার্তা নিয়ে এসেছিল ফাল্গুন। সেও চলে গেছে। এসেছে চৈত্র মাস তার প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে। রাতে অবিশ্যি কিছুটা ঠাণ্ডার আমেজ। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে ছিল সবাই। হঠাৎ গোয়াল-ঘরে যেন শব্দ শোনা গেল। প্রথমে উঠল পরমেশের মা। তারপর একে একে সবাই। লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল একটা গরু ছট্‌ফট্ করতে করতে মারা গেল। চাষের গরুর জুটি ওটা।

হঠাৎ কেন এ ঘটনা? এ কি তবে কোন দুর্লক্ষণ?

দুর্লক্ষণ তো বটেই।

পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠল। মুহূর্তের চাকায় গড়িয়ে যেতে লাগল বেলা। আকাশে কি যেন এক অশুভ সংকেত। শকুনি উড়ছে দলবেঁধে। পেঁচা ডেকে উঠছে দিনের বেলাতেই। সকলের মনেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা। গরুটা অমন ধড়ফড় করে মরে যাবে, একথা কি কেউ ভেবে ছিল আগে? কে জানে ভাগ্যে আরও কি আছে।

হিমঘরে গোড়া থেকেই আলু ধরে রাখার দরুণ এবার দরটা উঠে গিয়েছিল খুবই। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল---সেই হিমঘরে লেগে গেল আগুন। গতকাল সারারাত ধরেও সে আগুন নেভানো যায়নি। এ খবর যখন গ্রামে এসে পৌঁছুল তখন গ্রামের অন্যান্যদের মত জগন্নাথের গোটা বাড়ীটা একেবারে ভেঙে পড়ল।

আর জগন্নাথ?

জগন্নাথ উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল, 'ওরে পরমেশ আমি তোর কথা শুনিনি রে বাবা---চেয়ে দ্যাখ আগুন লেগেছে আগুন। দাউ দাউ করে সব জ্বলছে। খালি আগুন আর আগুন।'

পরমেশ বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বাবা তুমি শান্ত হও---শান্ত হও।'

কিন্তু প্রদ্যুম্ন? সে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলছে, 'আমি বিশ্বাস করি না এসব। দর পেয়ে আলু বেচে দিয়েছে ওরা। এখন এ শুধু পাপ লুকোনোর চেষ্টা।'

কে জানে, হয়তো তাই।

বৈজয়িক

রাণা বসু

কেউটের ছোবলে
আমার বিষজর্জর শরীর যখন ঘুমিয়ে পড়ে
বাতাসে গাছের পাতাগুলো নড়ে
চাঁদ জ্বলে
তারাগুলো মিটমিট করে
কিন্তু আমার আত্মীয়তা ছিন্ন হয়॥

অথর্ব পৃথিবী যেদিন ঘুমুবে
কারোরই ডাকে যেদিন মহাপৃথিবীর ঘুম ভাঙবে না
গাছের পাতারা নড়বে না, তারারা জ্বলবে না, চাঁদ উঠবে না
সেই অনাহত স্তব্ধতার মধ্যেও
আমি কিন্তু থাকব॥

আমার মৃত্যু নেই॥

স্বর্গভূমি

মৈত্রী গুপ্ত

আজ আমি যে বিষয়টি নিয়ে লিখতে বসেছি, সেটি কোন কোন লোকের কাছে বেশ কৌতুকময় বলে মনে হবে, আবার কেউ কেউ হয়ত দুঃখে শোকোচ্ছ্বাস চাপবে, আবার কেউ বা হয়ত হাজার রকম অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করবে। এই ত স্বাভাবিক যে কোন বিষয় বা বস্তু কারুর কাছে প্রিয় আবার কারুর কাছে অপ্রিয় বলে গণ্য করা। তাই আমার এ-লেখার উপলক্ষকেও নানারকম দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে এরও প্রিয়, অপ্রিয় অনেক দিকই বেরিয়ে পড়বে।

তবে তর্ক করার মনোবৃত্তি নিয়ে কিছু বলব না। শুধু আমার লেখা, আমার ভাষায়, আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে লিখে যাব। তাই বলছি এর বিপক্ষে কারুর কিছু বলার থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

তবে হ্যাঁ, 'সত্য' কে সামনে রেখে যা বলার বলতে হবে, মিথ্যাকে নয়।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম! একটা ছোট্ট কলোনী। সীমিত পাঁচিল দিয়ে সীমাবদ্ধ। হরেকরকম লোকের বাস। নানা জাতি, নানা মত, নানা ভাষার এক ক্ষুদ্র সংকলন। হ্যাঁ, কলোনী-বাসীরা সবাই মোটামুটি শিক্ষিত, বিদ্বান ও বিদুষী বলা চলে এ-রকম মানুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এ হেন এক কলোনীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, আর সেগুলিই আমার লেখার বিষয়বস্তু, এই যা----শুধু ত লিখব লিখবই বলছি। অথচ এখনও আরম্ভই হল না।

আচ্ছা, এক মিনিট----। এবার আমার সূচনা শেষ করছি। শুধু একটু অনুরোধ না করে পারছি না যে, পাঠক-পাঠিকারা এ লেখা পড়ার পর আমাকে যেন 'নিন্দুক' আখ্যা দেবেন না। কারণ নিন্দে করার মনোবৃত্তি নিয়ে আমি লিখতে বসিনি। শুধু যা সত্য, তাই বলব বলেই আজকের এ প্রস্তুতি। আর সত্য যে অপ্রিয়ও হয়। একথা ত সবাই জানে। তাই---।

●

---হ্যাঁ ভাই, জানিস্। পলির না বোধ হয় শীঘ্রই বিয়ে।

দ্বিতীয় মেয়েটির উৎসাহপূর্ণ জিজ্ঞসা---তাই বুঝিরে? কবে? কোথায়? কার সঙ্গে?

প্রথম জনের উত্তর---জানিস, ও বোধ হয় নিজেই বিয়ে করছে, মানে মা, বাবার অমতে।

ইস্ কাকে বিয়ে করছে রে? এখানকারই ছেলে ত? কি করে? কেমন দেখতে?---

হ্যাঁরে, এখানকারই মলির দাদার সঙ্গে বোধ হয়।

---ওমা, তাই বুঝি? দাঁড়া খবরটা গীতা, সীতাদের দিয়ে আসি। তুই একটু বোস্ কেমন?

কিছুক্ষণ পরে---বাব্বা, সবাইকে খবরটা দিয়ে এলাম। এবার বল্, তুই কোথা থেকে খবর পেলি?

---ও, আমি, মানে, ঠিক খবর পাইনি। নিজেই দেখেছি।

---কি বললি? নি---জে দেখেছিস?

হ্যাঁরে। সকালে দেখলাম, পলি যাচ্ছে, আর ঠিক তার পিছনেই মলির দাদাও রয়েছে। তখনই আমার কেমন সন্দেহ হল, তারপর জানিস ত পলিদের পাশের ফ্ল্যাটেই আমরা থাকি। তাই দুপুরে হঠাৎ শুনলাম---পলিকে ওর মা খুব বকছেন। বলছেন: তোমাকে হাজার দিন বারণ করেছি, তাও শোননি। এবার যা হবার হোক্ আমি কিছু জানি না, নিজে যা হয় করো। আমাকে জ্বালিয়ে না।

তারপর বুঝলি? আমিও কম যাইনি চালাকীতে। বাকীটা তাই অনুমান করে নিলাম। মানে

সকালেই দেখলাম মলির দাদাকে ওর সঙ্গে সঙ্গে যেতে, আবার দুপুরেই এই ব্যাপার। এই বকুনি। বুঝে দেখ্, এছাড়া আর কি হতে পারে?

ঠিক্ বলেছিস্, ত!---

এরপর দুই বান্ধবীতে মিলে এই অনুমেয় খবরটিকে রং ফলিয়ে আরও বিস্তারিত করে পরিবেশন করলেম। ফলে পলি নাম্নী 'বেচারী'র অবস্থা শোচনীয়। 'নিন্দে'র চোটে সে বাড়ীর বার হওয়া থেকেও বঞ্চিত হল। অথচ তার কোন দোষই ছিল না। এসব কল্পিত কাহিনীর নায়িকা হলেও সে নিজে কিছুই জানে না। আসলে এই কল্পিত অনুমানটি যে কতটা মিথ্যা, তা পলির মা'র বকুনির কারণ শুনলেই বোঝা যাবে।

●

পলি সখ করে মায়ের অমতে একটি নতুন স্টাইলের পয়েণ্টেড হিলের জুতো কিনেছিল। জুতোটা পরার পর পায়ে ঘা মত হয়। ফলে মা তাকে জুতোটা পড়তে বারণ করেন। কিন্তু পলি তা না শুনে আবার সেটা পরে। ফলে ঘাটা বেড়ে যায় ও পলির খুব যন্ত্রণা হতে থাকে। তাই তার মা সেদিন দুপুরে মেয়েকে রাগ্ করে বক্‌ছিলেন। ----এবার বুঝাতে পারছেন ত---কি সাংঘাতিক জায়গা এই কলোনী? ডিটেক্‌টিভগিরীতে শার্লক হোমসকেও হার মানায় এর বাসিন্দারা। একেই বোধ হয় বলে, তিলকে তাল করা, তাই না? না, তারও বেশী। কারণ, এখানকার লোকেরা তিল ছাড়াই তাল বানিয়ে ফেলতে পারে। তিলেরও প্রয়োজন হয় না বোধ হয়। শুধু অনুমান আর কল্পনাই যথেষ্ট।

হ্যাঁ, এবার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে আসি। এই কলোনীবাসীদের প্রাণ-মন সমস্তই এই কলোনীর সংকীর্ণ, সীমিত জীবনে সমর্পিত। এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ স্থান-এর মোহ নাকি এত বেশী যে, কোন বড় শহরেও পারে না এর বাসিন্দাদের মনোতৃপ্তি বা সন্তুষ্ট ঘটাতে। তাই তারা ঘুরে ফিরে চলে আসে তাদের এই 'স্বর্গে', যা বুঝি ইন্দ্রপুরীকেও হার মানায়।

এখানকার লোকেদের কিন্তু সারাদিনে অনেক কাজ। প্রথম ধরণের কাজের কথা ত প্রথমেই উল্লেখ করেছি। খবর রটানো। সে খবরের সত্য, মিথ্যা বিচার করার দায় অবশ্য তাদের নেই। আর দ্বিতীয় ধরণের কাজ হল---খবর সংগ্রহ করা। এ-বিদ্যায় এখানকার একশ্রেণীর লোক বড় বড় সাংবাদিকদেরও হার মানায়। অবশ্যই তাঁরা মহিলা।

আপনার বাড়ীর খবর হয়ত আপনি জানেন না, কিন্তু উৎসুক প্রতিবেশীরা সবাই জানেন। আপনার পারিবারিক সমস্ত খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পেয়ে যাবেন এদের কাছে। যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়কে আপনি প্রাধান্য দেননি, বিশেষ, সেই বিষয়ই কলোনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে 'বিশেষ প্রধান' হয়ে ঢুকে পড়বে রীতিমত পার্মানেণ্ট টপিক্স হয়ে।

তাই যখন নিজের কথা অন্যের মুখে শুনবেন তখন মোটেই অবাক হবেন না। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ এখানের বৈশিষ্ট্যের ই একটি অঙ্গস্বরূপ এটাও যে। কিন্তু সব থেকে মজার কথা কি জানেন? নিজেদের দোষ,- ত্রুটিগুলি মানুষ দেখতে পায় না। দেখতে পেলেও দেখতে দেয় না, স্বীকার করে না। দোকানের গরম গরম ঝাল-নুন দেওয়া তেলেভাজা, চপ্ কাট্‌লেট যেমন রসনার তৃপ্তিসাধনে পটু, তেমন বাড়ীর তৈরী খাবারগুলি কখনই নয়।

সে ত সবাই জানে। সে খাবার দোকানের পদ্ধতিতে প্রস্তুত হলেও নয়। বাইরের খবর, অন্যের নিন্দা যেমন রসিয়ে রসিয়ে তাড়িয়ে আলোচনা করাতে সুখ পাওয়া যায়, তেমন কি নিজস্ব বাড়ীর খবরে হয়? কখনই না।

আচ্ছা এবার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যে আসি কেমন? এটাকে হয়ত শুধু কলোনীর বৈশিষ্ট্য বলা চলে না। কারণ, পৃথিবীর সর্বত্রই বোধ হয় এক ধরণের প্রাণী দেখা যায়, (এই প্রাণীরা অবশ্যই মনুষ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত) যারা মেয়েদের দেখলেই খুব পুলকিত হয়ে ওঠেন। তাদের মুখে সাপের মত হিস্---হিস্---শব্দ প্রায়ই শুনতে পাবেন। সার্কাসের ক্লাউনের মত হরেক-রকম্ অঙ্গভঙ্গীও তাদের রপ্ত আছে।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সার্কাসের ক্লাউনের কপালে খেলার শেষে হাততালি অন্তত জোটে, কিন্তু এদের কপালে যে কি জোটে তা ভগবানই জানেন। আর যাই জুটুক্ হাততালি নয়। তবু আশ্চর্য। এদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না কখনও। আর কাছেই যদি মেয়েদের স্কুল, কনভেণ্ট ইত্যাদি থাকে, তাহলে ত কথাই নেই। যাওয়া-আসার পথের ধারে কনভেণ্টস্থিত মেয়েদের উদ্দেশ্যে নানা 'সুন্দর' 'সুন্দর' মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে কত বড় বীরত্বের কাজ যে তাঁরা করেন তা বলবার নয়। যাক্---। এ হেন প্রাণীদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু লেখার রুচি নেই।

আশা করি আমাদের এই ক্ষুদ্র কলোনীর বিশাল বিশাল বৈশিষ্ট্যের কথা শুনে আপনারা খুব অবাক্ হয়েছেন। তবে আর কিছু আজ লিখব না। কারণ তাহলে এই কলোনী প্রেমিক্‌রা আমাকে কলোনী-ছাড়া করে ছাড়বে। তখন আবার কোথায় যাব বলুন ত?

আচ্ছা, এরপর যদি চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে জানতে চান, তাহলে আসুন না, কিছুদিন আমাদের 'স্বর্গভূমি'তে এসে বাস করে যাবেন। কি, আসবেন ত?

অন্ধকার থেকে মুক্তি পেলো পৃথিবী। আর জননী-জঠরের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেলো নবপ্রসূত শিশু-কন্যা।

ধরিত্রীর রূপ বদলে গেল, আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো চারিদিক।

প্রসব-গৃহের দরজায় উঁকি দিলেন ঘর্ষীয়সীরা: কি হলো গো বউ? ওমা, মেয়ের ঢিবি।

---তাই নাকি? একটা ছেলে জল-পিণ্ডি দেয়---বংশের নাম রাখে শুধু তাই নয়---ধড়াস করে এক মেয়ে বিইয়ে বসলো? উক্তি করলেন পাড়ার পিসিমা জগন্মোহিনী।

বোসবাড়ীর গিন্নি এলেন: দেখি দেখি কি হলো করুণাময়ীর? মেয়ে? ঢোক গিললেন তারপর বললেন: তাতে কি হয়েছে সন্তান সবই সমান। ছেলে আর মেয়ে যাই হোক লক্ষ টাকা দিলেও তো কিনতে পাওয়া যায় না। বেঁচে থাক, নাড়ী ঠাণ্ডা থাক।

নিতান্তই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে করুণাময়ী, তাই বোসগিন্নি ঠাস ঠাস করে অন্যের মত বলতে পারলেন না; তারও ছেলেমেয়ের সংখ্যা আটটি, আর মেয়ের সংখ্যাই বেশী।

এবার এলেন সোনা ঠাকুরঝি: কিলো বউ, সাপ ব্যাঙ কিছুই পারলি না, মেয়ে একটা? মরলে জল পাওয়া যাবে না।

---তা পাওয়া যাবে না বলছো কেন গো সোনা ঠাকুরঝি? পরের ঘরে গেলেও মেয়েই তো আগে জল দেয় চারদিনে। প্রতিবেশিনী মনোরমা খুড়ী বললেন।

সোনাঠাকুরঝি যেন গর্জন করে উঠলেন: থাম্ থাম তোদের আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে মেয়ের ঢিবি নিয়ে আর ন্যাকামি করিসনি।

এই সবের অন্তরালে দুটি মন কখন কাছাকাছি এসে পড়েছে। নতুন জননী যেন কার স্পর্শ, কার একটু বাণীর জন্য মনে মনে আকুল হয়েছিল ---তারপর অন্যের ঝগড়া-দ্বন্দ্বের কোন ফাঁকে এসে দাঁড়ালেন নতুন কন্যার পিতা, কণ্ঠস্বরকে খাটো করে সান্ত্বনার সুরে করুণাময়ীকে বললেন: আমি কিন্তু চেয়েছিলাম মেয়ে হোক, তাই আনন্দ হচ্ছে খুব। তুমি ওদের সমালোচনা শুনো না, এই বেশ ভাল হয়েছে।
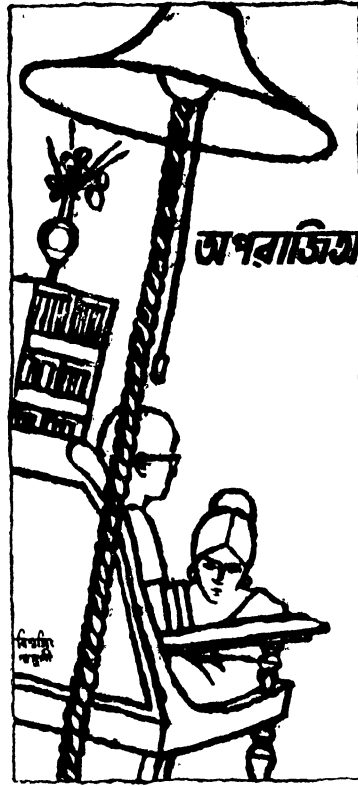
ইন্দিরা দেবী

পাশের বিছানায় কুঁকড়ে ওঠা সদ্যোজাত ছোট্ট প্রাণী। বাবার স্নেহঝরা চোখ, সন্তর্পণে এগিয়ে এসে বললেন: কি খাবে খুকনু? তারপর হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন: খাবে তো তোমার কাছে, তুলে নাও।

সলজ্জ দৃষ্টিতে একবার তাকালো করুণাময়ী স্বামীর দিকে তারপর বললেন: এখান থেকে যাও, ছোঁয়াছুঁয়ি করো না। এখনি কথা শুনতে হবে।

গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন একবার নতুন পিতা। এগিয়ে আসছিলেন, থেমে গেলেন। পৃথিবীতে অন্য কেউ আছে সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ভাবলেন: সকলকেই তুষ্ট রাখতে হবে তা না হলে তার জ্বালা সহ্য করতে হবে করুণাকে।

তিনতলার ঠাকুরঘরের জানলা থেকে দেখলেন নতুন কন্যার ঠাকুরমা ভবতারিণী। গালে হাত দিয়ে আত্মগত-ভাবে বললেন, নাঃ জাতধর্ম আর রাখলে না। আজকালকার ছেলেপুলেদের লজ্জাসরম বলে কিছু নেই। তারপর নিজ অতীতের কথা মনে করলেন, সন্তান হওয়ার পর কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে। ছেঁচা বেড়ার ঘরে শুয়ে, দরমা চ্যাটাইএর উপর ময়লা ন্যাকরার মধ্যে দুঃসহ বেদনা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। অশিক্ষিতা গ্রাম্য-ধাত্রীর হাতে সন্তান প্রসব হয়েছে, তারপর বিধি-নিষেধের সহস্র বেড়াজাল এবং নিয়মকানুন। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়েও চাইবার মত সাহস হয় নি। আঁতুর-পর্ব শেষ হতেই বৃহৎ সংসারের ও রান্নাঘরের দায়-দায়িত্ব এসে পড়েছে। যার কাছে থেকে একটু আদর সোহাগ পেলে দুঃখ-কষ্ট তুচ্ছ মনে হতো---সেই মানুষটির সঙ্গে তিন মাসের আগে সাক্ষাৎপর্বের নিদারুণ নিষেধ।

ভবতারিণী যেন অতীতের গহ্বর থেকে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন: আর এরা?

শয্যার উপরে নতুন জননী ক্ষুদ্র প্রাণীটুকুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

পৃথিবীর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ছোট্ট খুকনু ছয়টি বছর প্রদক্ষিণ করে সাত বছরকে স্পর্শ করলো।

খুকনুর মনে হয় অনেক ছোট্ট-বেলায় ভোরে যখন ঘুম ভাঙতো তখন মায়ের নরম-গরম বুকের মধ্যে তার নিবিড় স্পর্শ পেতে ইচ্ছা করতো আর বলতো---না মা তুমি উঠো না, আর একটু শুয়ে থাক আমার কাছে।

করুণাময়ী বলতেন: সংসারে কত কাজ আছে খুকনু, ঠাকুমা রাগ করবেন, জানো তো উনি নিজে হাতে কাজ করা পছন্দ করেন। দুপুরবেলা তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

অভিমানে খুকনুর চোখে জল আসতো। মা গালে একটা আলতো চুমু দিয়ে বলতেন---আমার সোনা মেয়ে,

বাচ্চা তুমি বাবার কাছে একটু শোও---

বাবার কাছে মায়ের স্পর্শ পাওয়া যায় না---তবু ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বাবা বলতেন : এসো খুকনু, তোমার জন্য আজ কি আনব বলো।

●

করুণাময়ীর কাজ আরম্ভ হতো সেই ভোর না-হওয়া কাক না-ডাকার সময় থেকে। অনেক বেলায় উঠে মাকে কত ক্ষিপ্র হাতে কাজ করতে দেখেছে খুকনু, তবুও ঠাকুরঘর থেকে ভবতারিণীর কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়েছে: 'এত বেলায় উঠলে কি আর কাজ হয়। আমাদের উঠতে হতো ভোর চারটেয়, ছড়া ঝাঁট দিতে হতো তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার---আর এখনকার মেয়েরা, কখন সুরেশ্বর অফিস যাবে, ভাত পায় কি---না পায়।

এ সব কথা যখন উপরতলা থেকে শোনা যেত, একতলার রান্নাঘরের পর্ব প্রায় তৈরী হয়ে গেছে। এইবার যাঁরা উঠবেন---তাঁদের চা, দুধ, ছোলাভিজে ভবতারিণীর চিরতার জল ও আনুষঙ্গিকও প্রায় প্রস্তুত। তবুও করুণাময়ী দিনের পর দিন একই কথা শুনে যান। ভবতারিণীর ভাষা মন মেজাজ সবই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, ক্ষুদ্র কারণ-অকারণে অপবাদ ধরবার কি প্রচেষ্টা।

কিন্তু সুনাম আছে সুগৃহিণী নামে ভবতারিণীর। আজ দেহে বার্ধক্যের ভার, কিন্তু একদিন বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের মেরুদণ্ড ছিলেন। তাঁর সুপরিচালনায় যন্ত্রের মত দিনের কাজ সম্পূর্ণ হতো, একটুও ব্যাহত না হয়ে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলেও নিজে হাতে কাজ করবে, থাকুক পাঁচটা দাস-দাসী। নিজের বিছানা কাপড়-চোপড় সব নিজে হাতে গুছোবে, একেবারে রুটিনবাঁধা। গৃহস্থালির কাজ চুকিয়ে মেয়েদের জন্য অবসর বিনোদনের ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না, কার্পেটের আসন বোনা, কাপড়ে ফুল তোলা, বিচিত্র কবরী-বন্ধনের নতুন নতুন পন্থা থেকে বাঘবন্দী ও খুঁটি খেলার ব্যবস্থা অব্যাহত ; কিন্তু সবই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

এখন বয়সের ভারে অক্ষমতার আক্ষেপ এমন জিহ্বা জুড়ে বসেছে ভবতারিণীর।

করুণাময়ী একেবারে সব শেষে এ বাড়ীতে এসেছেন---বড় ভাসুরদের মেয়ের সমান প্রায়---তেমনি শান্ত সুধীরা। বিনা বাক্যব্যয়ে নিঃশব্দে সব করে চলেন---মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন করুণাময়ী আর ভাবেন, যদি ঐ মানুষটি না থাকতো তাহলে কি করে এখানে বাস করতাম। বৃহৎ সংসারকে করুণা দেখেন নি, তবু আরো যাঁরা ছিলেন ভবতারিণীর মতকে অস্বীকার করে বিভক্ত হয়ে গেলেন সংসার নিয়ে। সুরেশ্বর আর করুণা সংসারে এই তার রইল অবলম্বন।

খুকনু মাকে বুঝতে শিখছে। সে মায়ের প্রথম সন্তান ও 'মেয়ের ঢিবি' আখ্যা একাধিকবার শুনে মুখস্থ করে ফেলেছে। মেয়ে হয়ে জন্মানো নিতান্ত অপরাধ। কেবল মা-বাবার নিভৃত আলাপে তাকে মাঝে মাঝে ভিন্ন রূপ দেখায়।

করুণাময়ী খুকনুর বালিশের পাশে মাথা রেখে স্বামীকে বলেন : তোমাদের বাড়ী যে রকমই হোক। খুকনু কিন্তু পড়াশুনো করে বড় হবে। গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছিলেন সুরেশ্বর---উত্তর দিলেন নিশ্চয়, নিশ্চয়, শুধু বড় হবে আবিষ্কারক হবে। কত দেশ মহাদেশে---

নরম গলায় করুণা বললেন---ভাবতে ভরসাও পাইনে।

খুকনু বলে কোথায় যাবো বাবা, তুমি যাবে না ?---মা ?

সুরেশ্বর হেসে বলেন, আমরা যাবো কেন? তুমি কত দেশে যাবে, কত শিখবে, আবিষ্কার করবে---

বাধা দিল খুকনু : দূর, তা কি করে হবে। ঠাকুমা বলে কি শোন নি? বলে ওতো মেয়ের ঢিবি---পরের ঘরে যাবে ---যখন মন ভাল থাকে বলে---মুক্ত ! শোন তুই বড় হয়ে যাচ্ছিস---খুকনু আবার কি---তোর নাম মুক্ত, মুক্তকেশী।

বেনারসী শাড়ী আর গয়না পরি গায়
মুক্তোকেশী গাড়ী চড়ি---শ্বশুরবাড়ী যায়।

আমি শ্বশুরবাড়ী যাবো যে। তোমরাই তো বল ঠাকুরমার কথা শুনতে হয়, উনি গুরুজন।

---হ্যাঁ যাবে বৈকি, কিন্তু বড় হয়ে এখন স্কুলে যাবে।

তারপর একদিন খুকনু স্কুলে গেল আর মেধাবী ছাত্রী বলে সুনাম অর্জন করলো।

ভবতারিণী একদিন বললেন : শোনো সুরেশ। তোমার তো একটি ছেলেও হলো না, ঐ একটা মেয়ে---ওর কি ভরসা। সবাই বলে বউ-এর

সময় তো চলে যায়নি। তা হয়তো সত্যি, কিন্তু আমার সময় হয়ে গিয়েছে। তুমি আমার শেষ বয়সের সন্তান---আমি মুক্তোর বিয়ে দেবো।

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল, সুরেশ্বর বললেন: বিয়ে? কার? খুকনুর? তুমি কি বলছো মা? ওর বয়স এই সবে পূর্ণ হয়ে সাতে পড়েছে। বড়দা, মেজদা---

বাধা দিলেন ভবতারিণী: মহেশ্বর আর যোগেশ্বরের কথা ছেড়ে দাও---তাদের মেয়েরা কলেজে পড়ছে, পড়াচ্ছে এ সব কথা কখনও শুনিনি---তাদের বিয়ে কোনোকালে হবে না। তা ছাড়া বিজয়ার প্রণাম করতে আসা ছাড়া তাদের সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে আমার?

---তুমি কি বলছ মা, খুকনু আমার একমাত্র সন্তান তাকে ভালো করে মানুষ করবো।

---একমাত্র সন্তান, দ্বিতীয় হতে কতক্ষণ? আমার সময় হয়ে এসেছে আমার সাধ পূর্ণ করতে হবে। লেখাপড়া করতে হয় করিও। ওরা বাধা দেবে না। আমার সই-এর নাতি, সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। আমরা তো আট নয় বছরে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলাম।

---সেদিন কি আর আছে মা?

রন্ধনশালা থেকে করুণাময়ী আঁতকে উঠে সব শুনলেন---কোনো আপত্তি যে টিকবে না, তা তিনি জানতেন।

খেতে বসে করুণার দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললেন: দেখছি।

দু'দিন পরে খবর এলো করুণাময়ীর মায়ের অসুখ।

ভবতারিণী বললেন: মুক্ত আমার কাছে থাকুক।

খুকনু বলে উঠলো: না, না আমি যাবই। দি'মার কি হয়েছে মা?

মামার বাড়ীর চিত্রটি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। মা'র মধ্যে দি'মার অনেক কিছু পাওয়া যায়। সন্ধ্যেবেলা মামাতভাই-বোনদের নিয়ে দি'মা বসেন কাউকে পড়া বলে দেন, আরো ছোটদের জন্য খাবার তাগাদা দেন বড় মামীমাকে। একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলে উনানের পাশে, বড় মামীমা রান্না করেন, ঝোল ফুটছে---কি সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। একটু পরেই বড় মামীমা ছোটদের জন্য পাঁচ-ছয়খানি ছোট থালায় ভাত আলুভাতে আর বাটিতে সেই গরম ঝোল দিয়ে যান। দি'মা খাওয়াতে বসে রূপকথা বলেন। ঝোলটার কি চমৎকার স্বাদ---আর একটু চাইতে লজ্জা করে।

খুকনু জোর দিয়ে বলে উঠলো: মা আমি যাবই।

ভবতারিণী বললেন---যেতে হয় যাও কিন্তু তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

---ওমা কি মজা, কবে ঠাকুমা কবে গো?

ঠাকুমা এবার হেসে বললেন---এই হলো বলে, রাঙা টুকটুকে বর।

দৌড়ে গিয়ে একটা মা-দুর্গার ছবি এনে ঠাকুমার হাতে দিয়ে খুকনু বললে: এই গয়নাগুলো চাই কিন্তু, তুমি বলেছিলে এই যে সাতটা গোছা হার।

---সব দেবো। সাতনরী, বাউটি সবই আমার আছে তোমার জন্য, গায়ে ধরবে না এত গয়না।

---ওমা মাগো কি মজা। দি'মাও বলেছিল রূপকথার রাজকন্যার মত মাথার মুকুট দেবে।

মার ঘরে দুমদাম করে এসে দেখে খাটের বাজু ধরে মা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

খুকনু মামার বাড়ী থেকে ফিরে এলো করুণাময়ীর সঙ্গে। দি'মা কোথায় চলে গেলেন আর আসবেন না।

ক'দিন পরে সুরেশ্বরকে ডেকে ভবতারিণী বললেন: শোনো সুরেশ মুক্তোর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে, তারপর আমি কাশী যাবো তার দিনও ঠিক হয়ে গেছে।

আর্তনাদ করে উঠলেন সুরেশ্বর: খুকনুকে এমন করে মেরে ফেলবে?

---তোমাদের চেয়ে আমি বেশী বুঝি। বিয়ের পর মেয়ে তোমাদের কাছে থাকবে তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট যা করার কর্মো। গোপালও লেখাপড়ায় ভালো।

---সে কে?

---তোমার হবু জামাই, আমার সই-এর নাতি।

বিয়ে হয়ে গেল।

উৎসব দেখে একবাক্যে সকলে বললো, বাবা কি জেদী মেয়েমানুষ---জীবনযাত্রা দেখে বোঝবার উপায় নেই এত টাকা সিন্দুকে ভরা ছিল।

কেবল দুটি প্রাণী নিঃশব্দ হয়ে গেছেন, সুরেশ্বর আর করুণাময়ী।

দু'দিন বাদে খুকনু ফিরে এলো---ওমা! ওখানে আর যাবো না। অনেক লোক কেবল বউ দেখো বলে---তবে গোপাল বলেছে, গাছের পেয়ারা পেড়ে দেবে।

ভবতারিণীর যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ---বিয়ের দশদিনের মধ্যেই তৈরী। খুকনু স্কুল থেকে এসে দেখলো, একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, ঠাকুমার হাতে একটা চিঠি'---খুকনুকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন---ওরে মুক্ত তোর কি সর্বনাশ করলাম।

---কি হলো ঠাকুমা?

লোকটি বললে: গাছে পেয়ারা পাড়তে উঠে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে গোপালবাবু মারা গেছেন।

---আহারে গোপাল মারা গেছে। মুখটা শুকনো করে খুকনু ঘরে ঢুকে দেখলো---মা বিছানায় শুয়ে আছেন। বললে: মাগো কি যে অসুখ করেছ একদম উঠছো না।

ওদিকে ঠাকুমা কাঁদছেন। গোপাল মারা গেছে।

করুণাময়ী উঠে বসে বললেন: কি হয়েছ? কে মারা গেছে?

---গোপাল গো, গোপাল।

---খুকনু! আর্ত চীৎকার করে করুণাময়ী অচেতন হয়ে পড়লেন।

---ঠাকুমা শীগগির এসো---মার কি হলো দেখ।

করুণাময়ী আর উঠলেন না।

কয়েকদিন পরে ভবতারিণী এসে বললেন, আমি চললাম সুরেশ। আজ পর্যন্ত তোমরা একটি শব্দও মুখ দিয়ে বার করলে না? আমাকে দিয়ে তোমাদের এই সর্বনাশ হলো। আমার বিছানার পাশে লোহার সিন্দুকে যা রইল এসব মুক্তর।

মাকে প্রণাম করতে এসে সুরেশ্বর কাউকে পেলেন না শুধু একটা ছ্যাকরা গাড়ী শব্দ করে চলে গেল।

এখন বিশ্ব-সংসারে সুরেশ্বরের একমাত্র বন্ধন খুকনু।

সন্ধ্যা হলেই মার খাটের কাছে এসে খুকনু বলে: মাকি আর আসবে না বাবা? হাসপাতালে যাও না নিয়ে এসো।

সুরেশ্বর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বেড়াতে যাবে খুকনু কোলকাতায়? সেখানে তোমার জেঠুরা আছেন, দিদিরা আছেন।

—তাই চলো বাবা, এখানে ভাল লাগে না, উপরে ঠাকুমা নেই মাও আসছে না। হাতের উল্টো পিঠ চোখে দিয়ে খুকনু ফোঁপাতে লাগলো।

সুরেশ্বর মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন: যশোদাকে বলো সব গুছিয়ে নিতে।

পৃথিবী দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে। পিছন ফিরে তাকাবার অবসর নেই দ্রুত থেকে দ্রুততর তার গতি। সারা পৃথিবী কত মিনিটে কত সেকেণ্ডে প্রদক্ষিণ করা যায় তারই প্রতিযোগিতা চলেছে—দ্রুত, দ্রুততর, দ্রুততম—অপেক্ষা করার সময় নেই। অভাবিতপূর্ব পরিবর্তনের স্রোত চলেছে। ভবতারিণীর যুগ পার হয়ে গেছে করুণাময়ীরও।

●

অর্হতী রায় শব্দটা কঠিন—কিন্তু নামের অধিকারিণী স্মিত হাসি-ভরা মুখ, সুশ্রী মেয়েটিকে মনে পরে। শিক্ষক মহল, সহপাঠী, পরিচিত সকলের স্নেহধন্যা।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে গবেষণা করছে।

তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক একদিন বললেন, এইবার চলে যাও অর্হতী, শিকাগো ইউনিভার্সিটি থেকে পি-এচ-ডি হয়ে এসো।

অর্হতী নিঃশব্দ।

—সেণ্টিমেণ্টের প্রশ্রয় দিও না, ফিরে এসে তারাই সবচেয়ে খুসী হবেন—আজ যাঁদের কথা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছো। তোমার প্রতিভাকে নষ্ট হতে দিও না। কে আপত্তি করবেন?

—কেউ না। কিন্তু একমাত্র বাবা আছেন। আমার বাবা—রুদ্ধকণ্ঠ অর্হতীর বাণী উচ্চারিত হলো না।

সস্নেহে তত্ত্বাবধায়ক বললেন: বাবাকে বুঝিয়ে বলো, তিনি সবই বুঝবেন।

সুরেশ্বরের কাছে কথাটা পৌঁছেছিল। কৌশিক ছেলেটিকে বড় ভাল লাগে। বললে: আপনি বলুন এ-সুযোগ কি হেলায় হারাতে আছে?

সুরেশ্বর বললেন: খুকনু। ছোট-বেলায় আমি বলতাম তোমার কথা। জানি না করুণা দেখতে পাচ্ছে কি না। আর আমার মার সেই কথাটিই মনে হয় 'মেয়ের ঢিবি'—মাতো এখনও আছেন। দাদা বলছিলেন খবরটা তাঁকে দেবেন।

—হ্যাঁ যা বলছিলাম তুমি প্রস্তুত হও মা। তুমি যতদিন না আসবে। এখানে এমনি করে বসে থাকবো আমি।

সুরেশ্বরের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা হ্রাস পেয়েছে—যদি তা না হতো মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারতেন না।

বাবাকেও মেয়ে জানে। সেই কবে দেশ থেকে চলে এসেছে, ভাবলে মনে হয় পূর্ব-জন্মের কথা। এমন বাবা ক'জন পায়—সংসারে থেকে সর্বত্যাগী বাবা, অসীম দুঃখ বুকে নিয়ে পাথর হয়ে আছেন। জ্যাঠারা মাঝে মাঝে আসেন। কত বাস্তববাদী তাঁরা কত স্থূল ব্যাপারে সর্বদা চিন্তিত।

বৃদ্ধা পরিচারিকা যশোদার কাছে মনের কথা জানিয়ে অনুরোধ রাখল ফিরে এসে বাবাকে দেখবার। বাবা ছাড়া সারা বিশ্বে আর কাউকে মনে পড়ে না।

অর্হতীকে দেখলে দুরন্ত খুকনুকে ভাবা যায় না, তবু সুরেশ্বর সেই খুকনুকে মনের মধ্যে সযত্নে লালন করে চলেছেন।

সুদূরে বসে আর একটি অশান্ত মন গবেষণার কাজে নিজেকে একান্ত-ভাবে সঁপে দেয়।

কৌশিক বললে: অর্হতী খুব পরিশ্রম করছে বিজ্ঞানের সাধনায়। বড় বড় বৈদেশিক পত্র-পত্রিকায় ওর গবেষণার পত্র প্রকাশ হচ্ছে। কিছু কাগজপত্র এসেছে। ওর ছবিসহ বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে, বহু বৈজ্ঞানিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই অজস্র প্রশংসা করেছেন।

সুরেশ্বরের নির্বাক মূর্তিটি কৌশিক দেখতে পায়—ভিতরের তুফান প্রত্যক্ষ করা সাধ্য কি।

কৌশিককে ভাল লাগে—দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা—এমন বিদ্বান ছেলেটি কি নিরহঙ্কার—সুরেশ্বরের মনে হয় ছোট বেলার পড়া সেই বাক্যটি—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম।

গভীর স্নেহভরে মনে মনে আশীর্বাদ করেন।

পাঁচ বছরের প্রতীক্ষা শেষ।

খুকনু ফিরছে। সুরেশ্বর ভাবছেন, মেয়ের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন করুণা কি দেখতে পাচ্ছে তাঁর কথা তিনি রেখেছেন—কাটল ধরা জীবনকে কি ভাবে মসৃণ করেছেন।

যোগেশ্বর এলেন, বললেন: সুরেশ, মার চিঠি এসেছে।

—ভাল আছেন?

আর ভাল কি থাকবেন খুকনুর সব খবর পেয়ে লিখেছেন—সুরেশের

কাছে কিছু বলার নেই, তবু যে মেয়ের জন্মের পর থেকে নিতান্ত মেয়ে বলে অবজ্ঞা করেছি আত্মম্ভরিতায় মর্মান্তিক ভুল করেছি আজ সেই অনুশোচনা-পূর্ণ মনের আশীর্বাদ---জানাচ্ছি। আরো যদি বাঁচি মুক্ত যেন একবার দেখা দেয়। যে মেয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে একবার তাকে দেখতে----।

---দাদা! কাতরকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন সুরেশ্বর---খুকনু আসছে। আমায় সেই সময়টুকু পর্যন্ত বাঁচতে দাও। এই পাঁচটি বছর ওকে ছেড়ে শুধু মুহূর্ত গুণে চলেছি। স্ত্রী, মা সব আমার কাছে তুচ্ছ। তুমি চুপ কর দাদা, চুপ কর।

---যোগেশ্বর সান্ত্বনার সুরে বললেন: তোমার কথা কেউ ভাবেনি সুরেশ সকলেই খুকনুর জন্য ব্যস্ত, সমস্ত জীবনের আশা আনন্দ সুখ দুঃখকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে নিজেকে একাগ্র সাধনায় উৎসর্গ করেছ তুমি ---তোমার পিতৃত্বের---

---দাদা। ওখান থেকেই খুকনু এখানকার গবেষক পদের প্রধান হয়ে আসছে শুনেছ তো?

---শুনেছি বৈকি। খুকনুর কাজের দক্ষিণার পরিমাণ শুনেছ?

---তার দরকার নেই।

ডঃ অর্হতী রায় পি, এচ, ডি, বাবার কোলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। সুরেশ্বর গভীর স্নেহে কন্যার মাথায় হাত দিয়ে বললেন: নিদারুণ পরীক্ষা শেষ হয়েছে আমাদের খুকনু---ওঠো।

যশোদা ঘরে ঢুকে বললে: কৌশিক বাবুর কাছ থেকে চিঠি এসেছে,--বলছে বখশিশ না নিয়ে যাবো না।

পাপের পরাজয়

গৌরী গুপ্তা

দিদিমণি ও দিদিমণি শুনছ?

কি বলছিস মানদা, আমায় কিছু বলছিস? ওঠো মুখে চোখে জল দাও, মুখে কিছু দাও। আজ দুদিন মুখে কিছু দাও নি রাত্রে ঘুমোও নি ওঠো শক্ত হও। বাঁচতে ত হবে?

হ্যাঁ উঠি। মানদা আমি তো কারুর কোন অনিষ্ঠ করি নি, তবে কেন আমার এত বড় শাস্তি? মা'র ত আরো চারটি মেয়ে আছে। তাদের ত এভাবে চালান দেন নি, আমার কেন এত বড় সর্বনাশ করলেন মা। বলতে পারিস মানদা? ওরে মা যে মা নামের উপর কালি ঢেলে দিলেন। আমার বয়সে কত মেয়ে ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমি? —আমায় কিনা ভুলিয়ে এনে শেষে এই পরিণতি করল?

কি করবে বল দিদিমণি? যার মা দুশমন হয় তার কথা কি বলব বল। মা যে মানুষের এত বড় শত্রু হয়, জানতাম না। আদিনাথ দাঁড়িয়েছিল—ওকে রতন মাস্টার ৫০০্ টাকায় চায়নাকে বেচে দিয়েছে। এখন চায়না আদিনাথের অবশ্য একমাসের জন্য।

কেন মানদা ওভাবে তোমরা কথা বলছ?

বলছি কি সাধে? শোন তবে। বলত দিদিমণি? কি বলব আমার ভাগ্য, সবই ভাগ্য আমার—বাবার পাঁচ মেয়ে দুই ছেলে। তার ভেতর আমি মেজ। বাবা আমায় খুব ভালবাসতেন, কারণ পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলাম বলে। মা কিন্তু মোটে পড়া দেখতে পারতেন না।

আমি যখন ক্লাশ নাইনে পড়ি মা হঠাৎ একদিন বললেন: রতন মাস্টার তোকে পড়াবে।

বাবা বললেন, মাস্টার রাখার মত আমার টাকা নেই ও নিজেই পড়ুক। পড়ায় আমার খুব ঝোঁক। মাকে তখন আমার খুব ভাল লাগল। কারণ মা আমার মাস্টার ঠিক করেছেন বলে।

রতন দেখতে ভারি সুন্দর আর সুপুরুষ। আমি তখন সবে যৌবনে পা দেব দেব করছি। বয়স ১৩।১৪, দিনরাত পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, আর মাস্টার মশায়ের পথ চেয়ে বসে থাকতাম। মাস্টার এলে আমার মনে খুব আনন্দ হত। মা কোনদিন মাইনে দিতেন না।

একমাস যাবার পর রতন আমায় একটা ফাউন্টেন পেন উপহার দিল। আমি মহাখুশী কারণ ভাল পড়ছি বলে মাস্টারমশাই উপহার দিলেন। প্রায়ই দেখতাম, রতন মার সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা বলে। আর আমি এলেই বলত এই যে মাসীমা বহু ভাগ্য করে এমন মেয়ে পেয়েছেন। দেখবেন ও ঠিক স্কুল ফাইন্যালে স্কলারশিপ পাবে। আমি রতনের সুখ্যাতি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম।

একদিন রতন বলল মাসীমা চায়নাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। আপনার অমত নেই ত?

মা বললেন—সেকি কথা বাবা! তুমি আমার ছেলের মত, তবে ও একেবারে ছেলেমানুষ বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যাও।

দিদি আমায় আড়ালে ডেকে বলল—চায়না যাসনারে যাস না ও তোর সর্বনাশ করবে।

দিদিকে তখন শত্রু মনে হয়েছে। কারণ রতন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় বলত—চায়না, তোমায় আমি ভালবাসি, তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারব না। আর আমি ওর রূপে মজে মরেছি।

সেই বেরোতে আরম্ভ করলাম। গাড়ীতে ওঠার সময় দেখি আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে চলে গেল। রতন মা'র হাতে কি দিল। মা আমরা সারা কলকাতা ঘুরে রেস্টুরেন্টে খেয়ে রাত প্রায় দশটার সময় বাড়ী গেলাম। খুব হৈ হৈ করলাম, তবে রতন দু-চারবার কাছে টেনেছে, আদর করেছে, কত কথা বলেছে, সত্যি বলছি আপত্তি করিনি। বরঞ্চ ভালই লেগেছে।

বাড়ীতে পৌছানোর পর দিদি বললেন, কি করছিস চায়না—মাস্টের সঙ্গে হাত মেলাস না, সাবধান?

কিন্তু তখন আমায় নেশায় পেয়েছে। বাবা বললেন—চীনামাটি বড় হচ্ছে, অন্য লোকের সঙ্গে বাইরে যেতে নেই। বাবা আদর করে আমায় চীনামাটি বলতেন। বাবা সামান্য রেলের কর্মচারী। মোটর—জীবনে চড়েছি দু-একবার আর কখনও রেস্টুরেন্টে খাবার কথাই কল্পনাই করতে পারি নি। কাজেই বুঝতেই পারছ আমার মনের অবস্থা।

এইভাবে দুদিন বেরোনোর পর বাবা একদিন মাকে খুব গালাগাল দিলেন। আমায় বললেন টাকা দিয়ে লোকে মাস্টার রাখতে পারে না। আর তোর মাস্টার টাকা নেয় না—উল্টে নিজেই খরচ করে; ওর উদ্দেশ্য ভাল নয়। আজ থেকে আর বেরোবে না।

কাজেই বেরোন ক'দিন বন্ধ। মাস্টার পড়াতে আসে না। দেখি স্কুল যাবার সময় রাস্তার মোড়ে মা রতনের সঙ্গে কথা বলছেন

আর রতন মা'র হাতে একতাড়া নোট দিল। মা আমায় দেখেই টাকাটা কাপড়ের তলায় লুকালেন।

আচ্ছা মাসীমা আমি চায়নাকে নিয়ে যাচ্ছি, যদি দেরী হয় ভাববেন না।

মা কথা বললেন না। মার চোখে জল দেখলাম। মা বললেন চায়না রতন তোকে বিয়ে করতে চায়। তোকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে। উনি রাগলে আমি সামলাব এখন।

তখন কি জানি মা আমায় টাকার বদলে জন্মের মত বিদায় করলেন। হাতে স্কুলের বই।

রতন গাড়ীর দরজা খুলে বলল উঠে এস।

গাড়ীতে উঠে বললাম—দেখুন আমার বড় ভয় করছে। বাবা যদি রাগ করেন ?

না না, যখন তোমার বাবার কাছে বিয়ে করে আমরা গিয়ে দাঁড়াব তখন বাবা আনন্দ করবেন দেখ।

সত্যি, রতন মাস্টার নয়। বিরাট বড়লোকের ছেলে। বাড়ী গাড়ী সব আছে। স্কুলে যাবার সময় আমায় দেখে আমার চেহারা দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাই মাস্টার সেজে আমায় হাত করল, মা'র সংগে পরামর্শ করে।

কদিন একটা ফ্ল্যাটে রাখল। আমায় ভোগ করতে লাগল। আমার কাছে একমাত্র মানদা থাকত। মাঝে মাঝে আমায় নিয়ে বেরোত। কাপড়, জামা, গহনায় ভরিয়ে দিত। বিয়ের কথা বললেই বলত, বিয়ে—হবে হবে, ব্যস্ত কেন ?

এইভাবে তিনমাস কেটে গেল। একদিন বলল, চল একটু বাইরে ঘুরে আসি। বলে এই বাড়ীতে নিয়ে এল।

বললাম এই বাড়ীতে কেন ?

বলল—এবার থেকে এইখানে থাকবে তুমি, আমি আসব।

আমি একা থাকব?

না না, একা কেন মানদা থাকবে।

ও চলে গেলেই মানদা বলল দিদিমণি বিয়েটা করে নাও।

বাড়ী আসতেই বললাম, এবার বিয়েটা করে ফেল।

আচ্ছা বলে গেল, তারপর সন্ধ্যের সময় আমায় নিয়ে বেরুল। রেস্টুরেন্টে অনেক খাওয়াল, খাওয়াব পর একটা কি ওষুধ খেতে দিল।

বললাম, এটা কি

বলল, হজম হয়ে যায়।

খেয়ে বাড়ীতে এসে খুব ঘুম পেয়েছে, ঘুমিয়েছি। উঠে দেখি আমার বিছানায় অন্য লোক। আমি চমকে উঠে যেই চেঁচাতে যাব, তখন লোকটা বলল, চেঁচাবে না। লোকে হাসবে আমি তোমার কাছে আসিই তা তুমি জান না ? তোমায় কি রতনবাবু বলেন নি যে, তিনি তোমায় খাটাবেন। তুমি কোথাকার ? নতুন বোধ হয় এই লাইনে তা তোমায় রতনবাবু কিছু দেয় না ?

কোন কথা না বলে বললাম, বেরিয়ে যাও বেয়াদপ।

লোকটা যাবার সময় মানদার হাতে নাকি একশো টাকার একটা নোট দিয়েছে।

আদিনাথবাবু আজ আমি রাস্তার মেয়ে আমি আর ভদ্রলোকের মেয়ে নই। আজ আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, মা, বাবা, ভাই, বোন আর কেউ নেই। উঃ ভগবান, এ তুমি কি করলে? আমার সব ছিল কেন এভাবে আমায় সব থেকে বঞ্চিত করলে? পথের আবর্জনায় ফেলে দিলে—কি পাপ করেছি ? আবার চায়না কান্নায় ভেঙে পড়ল। আদিনাথবাবু আমার জন্য কোথাও নিয়ে চলুন, আপনার পায়ে পড়ি—আমি পাগল হয়ে যাব।

দেখি কি করতে পারি। তবে জান তো আমি দুশ্চরিত্র, মাতাল নানান রোগের অধিকারী। তবে আমার টাকা আছে। কিন্তু একমাস পরে রতনবাবু আবার তোমায় চাইবে,—তখন ?

চায়না রুদ্রমূর্তি ধরে বলল—আসুক মাছ কাটার আঁশ বঁটি দিয়ে কেটে ফাঁসি যাব।

মানদা জিনিষপত্র সব গোছগাছ করে নাও এইবেলা, বেরিয়ে পড়ি, নইলে শেষে বেলা হলে রতনের গুণ্ডা যেতে দেবে না—এখন সব মদ খেয়ে ঘুমোচ্ছে।

ওঠো দিদিমণি, পরে কেঁদ সব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে সরে পড়ি চল। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে,বোল—দুদিন একটু ঘুরে আসি, বাড়ীতে জিনিষ আছে, নজর রেখ ভাই। তালাটা লাগিয়ে পানের দোকানে চাবিটা দিয়ে যাব। শিগগির দিদিমণি।

আদিনাথ ট্যাক্সি নিয়ে হাজির, এরই ভেতর এরা সব গুছিয়ে নিয়েছে। খাবার ভেতর কাপড়, জামা, বিছানা, বাসন। কাপড়, গয়না, টাকা স্যুটকেশে ভরে মানদাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। সংগে সংগে গাড়ী ছেড়ে দিল।

এটা আমার নিজস্ব বাড়ী। আমার মা আছেন। ছেলের স্বভাবের জন্য কাশীবাসী। তুমি আমার কাছে থাকতে পারবে ত। ছোট বয়সে বদ সংগে পড়ে জুয়া, মদ যতরকম গুণ আছে সব সদ্‌গুণে ভূষিত হয়েছি। পেটে বিদ্যে সেভেন পর্যন্ত। তুমি যদি ঘর করতে পার এই অপদার্থ দুশ্চরিত্র মাতালের সংগে—বল তাহলে সে কথা করি? পারবে না দেবী।

তুমি যদি আমায় তোমার পায়ে ঠাঁই দাও, ভদ্রভাবে বাঁচতে দাও—সারাজীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

তুমি ত খাওনি এখনও ? দাঁড়াও, রাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারবে ?

হ্যাঁ, কেন পারব না।

তবে কিছু খেও না, আজই তোমায় বিয়ে করব। একটু আসছি। বিশু এই বিশু শোন এদিকে।

কি বলছ দাদাবাবু ?

যা জগাকে ডেকে নিয়ে আয়—বলবি, সর্দার আজ বিয়ে করবে। প্রণাম কর, এই তোর বৌদি।

কেমন মাতাল স্বামী হল ত ? বোঝ কোথায় রতনবাবু আর কোথায় গুণ্ডা বদমাস আদিনাথ।

বেশ আমার স্বামী, যা আমি বুঝব তোমার কি ? তুমি যদি সব সময় ওরকম কর—যেদিকে দুচোক যায় চলে যাব।

বাবারে বাবা, আর বলছি না—কে বলে তোমার বর গুণ্ডা, বদমাস, মাতাল, দুশ্চরিত্র? যে বলে সেই, কি বল?

আবার ? বিয়ের পর একদিনও মদ খেতে দেখলাম না। তোমার মনের মত মন কজনকার। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করেছ, পায়ে ঠাঁই দিয়েছ, তুমি মানুষ নও তুমি.

হয়েছে হজম হবে না। জান, কাল রতনবাবুর সংগে দেখা। বললাম, চলুন চায়নার সংগে দেখা করবেন।

তাতে বললেন, তুমি আমায় ক্ষমা কর, চায়না যেন আমায় ক্ষমা করে, জানি এ পাপের ক্ষমা নেই।

জান গো ! তোমার পেয়ে সত্যি আজ আমার কারুর উপর রাগ ঘৃণা নেই, সকলেকে ক্ষমা করেছি। এমন কি মাকেও।

বারি দেবী

প্রথমে পাওয়ার সায়েব গাড়ী চালাতো, কিন্তু ক'দিন পরে সে বললো ---সেনসায়েব তো চমৎকার গাড়ী চালাতে পারেন, তাই রোজ রোজ কাজ-কর্ম ফেলে, আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না সিস্টার। কতকাল তো, দিনের আলোয় সহরের পথ-ঘাট দেখা হয় নি তোমার ; এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াও।

কি আর করা যায়। ওকে বাদ দিয়েই খাওয়া সেরে বেরিয়ে যাই আমরা।

কোনোদিন গিয়ে বসি, লেকের মাঝের দ্বীপের ভেতর। কোনোদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে, কোনোদিন বা কোনো পার্কের নির্জন কোণে। দুপুর বেলা তাই লোকের ভিড় থাকে না। তাই আমাদের আনন্দের ধারাটি নিরবচ্ছিন্ন উচ্ছ্বাসে, আপন খেয়াল-খুশিতে মুখর হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে যে আছে এত গল্প, আছে হাসি, আছে অফুরন্ত কথার সমুদ্র---তা, এমনভাবে এর আগে জানা হয় নি আমার। কারণ বিশু বোস যখন ছিল আমার জীবনে, তার সঙ্গে গল্প করার মত কোন কথা ছিল না আমার। তার রুচি, প্রকৃতি, চিন্তা ধারণা সবই ছিল আমার বিপরীত।

তারপরে এলো সূর্যকান্ত। ওর রুচি মন ছিল অনেকে উন্নত। আর ছিল অদম্য বিক্রম তেজ, আর বিরাট ব্যক্তিত্ব। তবুও স্বাভাবিকভাবে ওকে মেনে নিতে ছিল সংস্কারের বাধা, তার ওপর তখন ছিল মনে সব সময় এক আতঙ্কপূর্ণ অস্বস্তি, তাই বোধহয় পরিপূর্ণ আনন্দ পাই নি তার সাহচর্যে।

আজ যে এসেছে আমার জীবনে, সে যেন দু'হাত ভরে এনেছে আমার জন্য স্বস্তি, শান্তি, আর সম্মানজনক জীবনের প্রতিশ্রুতি। ওর উজ্জ্বল আবির্ভাবে কেটে গেছে আমার মনের বিষাদ আঁধার। তাই ওকে অবলম্বন করে আবার আমার মনটা সার্থক ও সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখছে।

আজ নেই সামাজিক বিধি-নিষেধের রক্ত চক্ষু, অথবা বিশু বোসের সহসা আবির্ভাবের আতঙ্ক, আর তার শয়তানী চক্রান্ত। তাই মনে হচ্ছে, যে অনেক কাঁটার বন পেরিয়ে এসে পড়েছি এক উপবনে, যেখানে আছে শুধু রংদার ফুলের সমারোহ! কাঁটার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত দেহ-মন জুড়িয়ে গেছে এখানে এসে।

●

আরেকটি আশ্চর্য ভাব লক্ষ্য করলাম রজত সেনের ভেতর, সেটি হচ্ছে যে---কোন প্রকার যৌন আবেদন বা দৈহিক আসক্তি ওর নেই।

বিশু বোসের ভেতর ছিল পশুদের মত প্রকট ও উগ্র দৈহিক ভোগবাসনা। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন মনোবৃত্তি বোধহয় তার ছিল না। সূর্যকান্তের ক্ষেত্রে দেহ-বিলাস কিছুটা ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল মার্জিত, উন্নত, আর প্রেমের উন্মাদনায় আচ্ছন্ন। কিন্তু রজত সেনের চরিত্র বা রুচি এদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। অতি মাত্রায় শান্ত ও সংযমী মানুষটির পবিত্র সাহচর্য আমাকে দান করেছিল এক দেহাতীত আনন্দময় সত্তা। বড় সুন্দর বড় মধুর ছিল তার হাসি। কথায় ছিল কাব্যময় সংলাপ যা শুনলে মণ-প্রাণ ভরে ওঠে। কখনও ক্লান্তি আসে না। সেদিন রজত কথার ফাঁকে আমাকে বলছিলো,,---আমাকে মহামানব, বৈরাগী বা, সাধু কিছু একটা যেন ধারণা করে বোস না নীল, ওর কোনটাই আমি নই। সাধারণ মানুষের সব প্রবৃত্তিগুলোই আমার ভেতর আছে। তবে একটা সঙ্কল্পের বেড়া দিয়ে আটকে রেখেছি ওদের। ঐ সঙ্কল্পটা যে কি তা তুমি জানো---

বিয়ে। হ্যাঁ বিয়ের আগে পাগলা ঘোড়ার মত প্রবৃত্তিগুলোকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া মানুষের কাজ নয়, এর ফল ভালো হয় না বলেই আমার মনে হয়।

আমি ওর কথার জবাবে বলেছিলাম,---তোমার সঙ্কল্পরক্ষার পেছনে আছে কত যে মনঃশক্তি, সংযম, আর সততা, তার পরিচয় পেয়ে তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে রজত।

তুমি যে সাধারণ মানুষ নও, একথা তুমি অস্বীকার করলেও আমি যে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, অনুভব করি।

একটু হেসেছিল সে, তারপর বলেছিল---জানি না কতকাল যে এমনভাবে চলবে, কারণ তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদ করার তো কোন উপায় নেই। একমাত্র উপায় হচ্ছে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, বিয়ের পর আবার ইচ্ছে হলে নিজের ধর্মে ফিরে আসা। তবে তার জন্যেও কিছুটা আমার সময় লাগবে। কারণ দেশে আমার বৃদ্ধ বাপ-মা আছেন,

নাবালক ভাই, আর অবিবাহিতা বোনও আছে। সেজন্য মনে করেছি আর দু-তিনটে ছবিতে কাজ করতে পারলে, কিছু মোটা টাকা ওঁদের ধরে দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে জন্যের মত তোমার কাছে এসে বাসা বাঁধবো নীল।

--তুমি যা ভালো বুঝবে তাই কোরো, আমার সব ভার তো এখন তোমারই হাতে। তবে একটা কথা---

আমি চোখ রাখলাম ওর চোখের ওপর। তখন আমরা বসেছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রাচীন বটগাছটার তলায়,---আমাদের চারিধারে ছায়া-ছায়া অন্ধকার,---আর তার বাইরে ছড়ানো শীতের সোনা-সোনা রোদ্দুর।

দুরন্ত উত্তুরে বাতাসের দোলা খেয়ে ঝর ঝর শব্দ তুলে উড়ে চলেছে ঝরা পাতার রাশ।

---কিছু বলবে আমায়? বলো বলো তোমার কথা। একটু হেসে বললো রজত।

---হ্যাঁ। ঐ যে বাড়ীতে টাকার কথাটা বললে না? ঐ বিষয় বলছিলাম যে, কত টাকা দিতে চাও তুমি? সে টাকাটা যদি এখন আমার কাছ থেকে নিয়ে তুমি দিয়ে দাও ওঁদের;---তাহলে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটাও তাড়াতাড়ি হতে পারে। কারণ, ছবির জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্যে হয়তো এখন দীর্ঘদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, তাই না? আমি জবাব দিলাম।

---তোমার প্রস্তাবটা খুবই সঙ্গত, আর ভালো, তা আমি স্বীকার করছি নীল, তবে কি-না,---আমি এখনই এখনই তোমার টাকা নিতে চাইছি না। আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চাই, আর সেটা চাই ঐ ছবির মাধ্যমে। কারণ বুঝতেই পারছো এই বয়সে, এ ছাড়া অন্য কাজে পয়সা, মানে প্রচুর পয়সা রোজগারের আর কোন পথ বা উপায় নেই। সেজন্য এখনই আমাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এখন তোমার টাকা দিয়ে যদি বৃহৎ সমস্যার সমাধান করে ফেলি, তবে হয়তো সেরকম জোরালো উদ্যম আর আমার ভেতর থাকবে না। কারণ তুমি জানো, যে জীবনের বড় বড় বাধা বিপত্তি, সমস্যা-গুলোই মানুষকে বড় হবার প্রেরণা জোগায়।

আশা করি তুমি বুঝবে আমার কথাগুলো। অবশ্য তেমন প্রয়োজন বোধ করলে, তখন তোমায় অবশ্যই বলবো, কথা দিলাম।---বললো রজত।

ওর নির্লোভ মনের পরিচয় পেয়ে ওর প্রতি শ্রদ্ধা জাগলো মনে। ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললাম---তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছো তুমি বন্ধু! তুমি সত্যই মহৎ, আর গুণী। তোমার গুণ, স্বীকৃতি অবশ্যই পাবে। তুমি অনেক বড় হবে। খ্যাতি যশ সম্পদ সবই পাবে তুমি, এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

শীতের বিদায়মুহূর্ত আসন্ন, শোনা যাচ্ছে বসন্তের পদধ্বনি। সেদিন সকালে বেরিয়ে, সারাটা দিনই বাইরে কাটালাম আমি আর রজত।

পার্ক স্ট্রীটে লাঞ্চ সেরে, গঙ্গার ধারে গাড়ী রেখে, নৌকো করে গঙ্গা-বক্ষে ঘুরে কাটালাম, সারা দুপুর-বেলাটা। দুজনে গলা মিলিয়ে গান গাইলাম। গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হল অন্তরের প্রেম-যমুনার কলধ্বনি। পুলকের নির্ঝর নামলো আমাদের সঙ্গীতধারায়। নৌকোর গহ্বরে যে মাঝি নামে এক বস্তু আছে, সে খেয়ালও তখন ছিল না আমাদের। খেয়াল ফিরলো তার ডাকে, ---

---আপনার ব্যাগটা যে পড়ে গেল দিদি! ---তাই তো। টলমলো নৌকোর ধারে, অন্যমনস্কভাবে কখন যে ফেলে রেখেছিলাম সদ্য কেনা দামী ভ্যানিটী ব্যাগটাকে, তার কথা মনেই ছিল না। শুধু ব্যাগ তো নয়, ওর ভেতরে ছিল শ' পাঁচেক টাকা। প্রচুর টাকা সঙ্গে রাখতে হয়। কখন কি দরকার পড়ে! মাঝি অবশ্য বললো, যে মোটা বকশিস পেলে, সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারে।

আনন্দের উদ্দাম জোয়ারে এলো ভাঁটার টান। কারণটা ঠিক টাকা, বা ব্যাগ নয়। যার টাকা আমার খাম-খেয়ালীপনার জন্য ভেসে গেল গঙ্গার জলে, বিদ্যুৎ-চমকের মত তার মুখটাই একবার জেগে উঠলো আমার মনে। একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ যেন শকু মারলো বুকের ভেতর। তবুও ঠোঁটে হাসি জাগিয়ে রেখে বললাম---মা, মা, কি আর এমন গেছে? তার জন্য জীবন বিপন্ন করবে একটা মানুষ---এ হতে পারে না। যাক্‌গে ব্যাগ।

মাঝিকে বললাম---আমাদের পাড়ে নামিয়ে দিয়ে, তারপর তোমার ইচ্ছে হয় তো জলে নেমো। আর ওটা যদি খুঁজে পাও তো, তুমিই নিও।

লোভে, আনন্দে জ্বলে উঠলো মাঝির চোখ দুটো। সে ঝপাঝপ দাঁড় ফেলে আমাদের পাড়ে নামিয়ে দিলো।

রজত বললো---এটা কি করলে? ওকে কিছু টাকা দিয়ে ব্যাগটা ফিরিয়ে নিলেই ভালো হয়। ব্যাটারা তো জলের জীব, এখুনি দেখো, ব্যাগটা তুলে আনবে। একটু অপেক্ষা করি আমরা এইখানে। গোলমাল করে যদি, ফেরৎ দিতে না চায়, তবে পুলিশের সাহায্যও নেয়া যাবে!

আমি একটু আশ্চর্য বোধ করলাম, ওর কথায়। চোখ তুলে ভালো করে দেখলাম ওকে। সহসা ওকে যেন আমার অচেনা বলে মনে হল। মনের সে ভাব গোপন করে বললাম, না, না, এখানে আর নয়। সিনেমার টিকিট কাটা আছে মনে নেই? আর গরীব লোকটার ভাগ্যে আজ যদি কিছু মিলে যায়, যাক্‌ না। তাতে আমার লোকসান বিশেষ হবে না। তবে আমি তো এখন রিক্তহস্ত। মানে যতক্ষণ না বাড়ী যাচ্ছি, ততক্ষণ। সেজন্যে আপাতত চায়ের বিলটা তোমার পকেট থেকেই যাবে।

কথা বলতে বলতে আমরা চলছিলাম গাড়ীর দিকে।

রজত বললো---যাক্ এ একদিক দিয়ে ভালোই হলো, তোমাকে চা খাওয়াবার একটা দুর্লভ সুযোগ লাভ হলো আজ অভাগার বরাতে।

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। উড়ে গেল মনের আকাশের ক্ষণিক মেঘ। খুশির ঝলমলে রোদ আবার ছড়িয়ে পড়লো সেখানে।

সিনেমার পর রাত প্রায় সাড়ে নটায় বাড়ী ফিরলাম। রজত গ্যারেজে গাড়ী তুলে দিয়ে চলে গেল।

খুশিভরা মন নিয়ে, আমি ছুটে উঠে এলাম ওপরে। হলে এসেই থমকে দাঁড়ালাম একটা দৃশ্য দেখে। সূর্যকান্তর বিরাট আকারের রঙিন ফটোতে ঝুলছে একছড়া টাটকা শাদা ফুলের মালা। রূপোর ধূপদানীতে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে কয়েকটি ধূপ, আর বাতিদানে জ্বলছে কিছু মোমবাতি।

পাওয়ার সায়েব হাঁটু মুড়ে চোখ বুজে বসে আছে ছবির সামনে।

আজ কত তারিখ? মনে পড়লো আজ সেই ভয়ঙ্কর দিন, যে দিনে অকালে, শোচনীয়ভাবে, প্রাণ হারিয়েছিল, সূর্যকান্ত।

বড় অপরাধী মনে হল নিজেকে।

সূর্যকান্ত। একটা প্রচণ্ড তেজ, শক্তি, দুঃসাহস, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা প্রভৃতি মিলিত এক দীপ্তরূপ। সে আজ ছবি হয়ে গেছে। সবাই ভুলেছে তাকে, এমন কি, আমিও। আমার জন্যই, সে বিসর্জন দিয়েছিল, তার মান, সম্মান, সামাজিক মর্যাদা, নিশ্চিন্ত গৃহসুখ, আর তার অমূল্য জীবন। আর তার পয়সাই আমাকে দিচ্ছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাস। অথচ তার প্রথম মৃত্যু-দিনটি আজ আমার স্মরণেই আসে নি, এসেছে তার একান্ত অনুগত পরম বিশ্বস্ত ভৃত্য ও প্রিয়বন্ধু, পাওয়ার সায়েবের মনে। জানি না, সূর্যকান্তর অতৃপ্ত আত্মা, আজ আমার এ-অপরাধ ক্ষমা করবে কি-না।

আমি নিঃশব্দে এসে হাঁটু মুড়ে বসলাম পাওয়ার সায়েবের পাশে। তারপর একাগ্রচিত্তে স্মরণ করলাম সূর্যকান্তকে, ক্ষমা চাইলাম তার কাছে। পরমেশ্বরের কাছে ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করলাম, তার আত্মার শান্তির জন্য। তখন আমার দুচোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরছিলো।

কতক্ষণ যে ছিলাম ঐ ভাবের মধ্যে তা আমার ঠিক খেয়াল ছিল না। পাওয়ার সায়েবের ডাকে চোখ চাইলাম।

স্থির হও সিস্টার। বললো পাওয়ার সায়েব।

পাওয়ার সায়েবের কথায় দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে, কান্নাভাঙা গলায় আমি বললাম---সায়েব, তুমি বলে দাও, আমি কি বড় অন্যায় পথে চলেছি?

আমার কথায় কয়েক মুহূর্ত নীরবে, সূর্যকান্তর ছবির দিকে চেয়ে থেকে, ভারি গলায় জবাব দিল সে---না, সিস্টার। অন্যায় দেখলে তোমাদের এ অধম দাসও চুপ করে সয়ে যাবে না। অন্যায় বলবো কেমন করে? সায়েব তো চলে গেল, কিন্তু তোমার যে সারা জীবনটা পড়ে আছে। একজন সঙ্গী ছাড়া তুমিই বা বাঁচবে কেমন করে? একজন সৎ বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য মানুষ তোমার জীবনের সঙ্গী হোক, উপযুক্ত মর্যাদা দিক্ তোমায়, আমি যে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনাই করছি সিস্টার। তবুও জানি না কেন যে ভয় করে। আর কোনো নতুন বিপত্তি যেন তোমার জীবনে না আসে!

কথা বলতে বলতে ধরে যাচ্ছিল ওর কণ্ঠস্বর।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললাম---যত বড় বিপত্তি আসুক না কেন, সব সহ্য হবে, শুধু তুমি আমায় কোনদিন ছেড়ে যেও না বন্ধু! আমি জানি তোমার মত পরম হিতৈষী, আপনজন এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।

জবাব দিল না পাওয়ার সায়েব, শুধু তার বুকে ঝোলানো ক্রশটিকে তুলে আমার মাথায় ছুঁইয়ে মৃদুকণ্ঠে বললো---গড ব্লেস্ ইউ।

●

আমার প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ানোর পালা শেষ হয়েছে। কারণ রজত এখন স্যুটিং-এ ব্যস্ত। অবশ্য প্রতিদিন একবার যে-কোন সময়ে সে আসতে ভোলে না।

আমার গাড়ীটা ওকে দিয়েছি, ব্যবহার করার জন্য। রজত প্রথমে ওটা নিতে রাজী হয় নি, তবে আমার আর পাওয়ার সায়েবের একান্ত অনুরোধে শেষে রাজী হল। গাড়ী তো আমার গ্যারেজে পড়ে থাকে, আর ওকে ট্রামে বাসে স্টুডিওতে যাতায়াত করতে হয়। গাড়ীটা পেয়ে রজত বেশ খুশি হয়েছে মনে হল। স্টুডিও'র শেষে গাড়ী নিয়ে রজত ফিরে আসে, আর সেই সময় আমরা দু'জনে বেড়াতে যাই, ঘণ্টাখানেকের জন্য।

রজতের সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, মুখশ্রী ভালো, বাচনভঙ্গীও চমৎকার, তবুও কেন যে ওকে নায়কের পার্ট দেওয়া হয় না, এটা আমার বেশ চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম একদিন।

জবাবে বলল রজত---কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। শুধু চেহারা বা প্রতিভা থাকলে হয় না নীল। তবে একটা নতুন কোম্পানী গড়ে উঠছে, তার মোটা ব্যয়ভার বহন করছেন মহাদেব সরকার। আর কিছু শেয়ারও অন্যদের দেওয়া হচ্ছে। এই সময় যদি হাজার কুড়ি টাকা দিয়ে কিছুটা মালিকানা সর্ত, মানে শেয়ার আমি নিতে পারতাম, তাহলে হয় তো নায়কের পদটাও পেতে অসুবিধা হত না।

ম্লান একটু হাসির সঙ্গে আবার বললো সে---মূলই নেই যখন,---তখন, তার ফুল-ফলের স্বপ্ন দেখা, ঠিক আকাশকুসুম,---আর কি।

কথাগুলো যেন বুকে বিঁধে গেল আমার। সামান্য টাকার অভাবে সম্মান, অর্থ, প্রতিষ্ঠা সব কিছু প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে ও? সে বঞ্চনার

ভাগ কি আমাকেও নিতে হচ্ছে না?

নিজের জীবনে উন্নতি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লাভ না-করা পর্যন্ত রজত যে আমার জীবনের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না, সে কথা সে আমায় জানিয়েছে। ওর আত্মসম্মান-জ্ঞানটা বেশ প্রবল। স্ত্রীর টাকায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা ওর পক্ষে অসম্ভব। সেজন্য রজতের কথায় হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলাম না।

পরদিন পাওয়ার সায়েবকে বললাম রজতের কথাগুলো। একটু চিন্তা করলো পাওয়ার সায়েব, তারপর আমার চোখের ওপর তার গভীর সন্ধানী দৃষ্টি রেখে বললো—

তোমার জীবনসাথী হিসাবে, রজত সেন সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ তো? কোনপ্রকার সন্দেহ, মানে, সে তোমায় কোনদিন ঠকাবে না, এ বিশ্বাস তোমার মনে আছে তো সিস্টার?

আমার বুদ্ধি, বিচার-শক্তি, বা অনুভূতি দ্বারা যতটুকু বুঝেছি ওকে,—তাতে মনে হয়, ওকে বিশ্বাস করা অনুচিত নয়।---তবুও----

কথা থামিয়ে নিজের অন্তরের অতল গভীরে মনটা আমার ডুব দিয়ে অনুসন্ধান করলো---যে কোথাও রজতের প্রতি সন্দেহের কণামাত্রও অস্তিত্ব আছে কি-না।

তবুও---। কি সিস্টার?

অস্বাভাবিক গম্ভীর পাওয়ার সায়েবের কণ্ঠস্বর।

---না,—ঠিক যে, কি—তা তোমায় এই মুহূর্তে বুঝিয়ে বলতে পারবো না সায়েব। কেমন যেন মাঝে মাঝে ভয় করে। যখন ওকে মিলিয়ে দেখি তোমার সঙ্গে; তখন কি মনে হয় জানো? মনে হয় যে, আমার প্রতি তোমার যত দরদ আর আন্তরিক স্নেহ-ভালোবাসা আছে, ঠিক তেমনটি ওর নেই। শুধু ওর কেন, মনে হয় এ পৃথিবীতে তার কোথাও বুঝি এর তুলনা আমি খুঁজে পাবো না সায়েব। তাই, ভয় করে। আমি জবাব দিলাম।

---ও কথা বাদ দাও সিস্টার। প্রত্যেকের অন্তরের ভাব প্রকাশের ভঙ্গীটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তবে সেটা খাঁটি কি ভেজাল তা নিজের মন দিয়ে বোঝা যায় বৈ কি। সেই দিকে তুমি একটু লক্ষ্য রেখ। তবে মোটামুটি ভাবে যখন বিশ্বাস করেছো ওকে, আর তোমাদের বিয়েটাও নির্ভর করছে ওর উন্নতির ওপর, তখন তোমার উচিত এ সময় ঐ টাকাটা ওকে সাহায্য করা। তোমার কর্তব্য তুমি পালন কোরো, তবে নেওয়া না-নেওয়া ওর ইচ্ছা।

সেদিন রাতে এলো রজত। ওকে ভারি ক্লান্ত লাগছিলো। পাওয়ার সায়েব কেক্ বিস্কুট কফি দিয়ে গেল। খাওয়ার পর সোফায় আধ-শোয়া দেহটা এলিয়ে দিয়ে, সিগারেট টানতে টানতে বললো সে---বড্ড খাটুনি বেড়েছে নীল। সে অনুপাতে টাকা তো আসছে না। সেজন্য ও লাইনটা আর যেন ভালো লাগছে না। তাই ভাবছি এবারে ছেড়ে দেব!

---তুমি আমার কথা শুনবে? তা'হলে খুব ভালো লাগবে। ওকে বললাম।

---তোমার কথা,---আমি শুনবো না তো কে শুনবে? বলো শুনি, তোমার কথা।

কৌতূহলী দৃষ্টি আমার চোখের ওপর রাখলো রজত।

---বলছি। আমার ওপর আবার রাগ কোরো না কিন্তু? বলছিলাম যে---ঐ ফিলম কোম্পানীর শেয়ার তোমায় নিতেই হবে, আর সে টাকা নেবে আমার কাছ থেকে। একটু হেসে আবার বললাম আমি---না গো, না। নিঃস্বার্থভাবে মোটেই টাকা দিচ্ছি না আমি, এতে আমার যথেষ্ট স্বার্থ আছে।

---স্বার্থ? তোমার?—বড্ড হেঁয়ালী লাগছে যে। বোকা-সোকা মানুষ, ধাঁধার অর্থ বুঝবো কেমন করে নীল? তুমি সিদে কথায় দাও বুঝিয়ে।

সোজা হয়ে বসে, আমার চোখের সঙ্গে মেলালো ওর দুষ্টুমিভরা চোখ দুটো।

---স্বার্থ? তা এটাকে স্বার্থ ছাড়া কি বলবো বলো? এই টাকায় কেনা হবে তোমার মালিকানার শেয়ার। আর তুমি পেতে পারো নায়কের রাজ-সিংহাসন। তার সঙ্গে প্রচুর সম্মান, অর্থ ইত্যাদি, যাকে বলে জীবনের প্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠা নিয়ে আসবে আমাদের মিলনের স্বর্ণসুযোগ। মানে বিয়ে। বললাম আমি।

---ঠিক। ঠিক। তুমি ঠিক বলেছো নীল। এখন তোমার-আমার জীবনের ভালো-মন্দ যে একসূত্রে বাঁধা, এ খেয়ালটা আমার ঠিকমত ছিল না। তবে ওরই মধ্যে আমায় একটু সুযোগ দাও কিছু প্রস্তাব রাখবার।

আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো রজত।

---বল না কি বলবে। এত সঙ্কোচ কিসের তোমার বলো তো? অভিযোগ করলাম আমি।

---সঙ্কোচ? না, না সঙ্কোচ নয়, মানে আমি বলছি যে, টাকাটা পেলে সত্যিই এখন আমার খুব ভালো হয়। তবে টাকা আমি নেব তোমার কাছে ধার হিসেবে। অবশ্য, কোনো লেখা-পড়া, দলিল, দস্তাবেজের কথা আমি বলছি না, শুধু পাওয়ার সায়েব, তুমি আর আমি থাকবো সাক্ষী, টাকা লেন-দেন ব্যাপারে। থাকবে আমার মুখের স্বীকারোক্তি---যে এই টাকা পরে আমি ফেরৎ দেব, আর তুমি ফেরৎ নেবে। এতে আমার কি উপকার হবে জানো? তোমার টাকায় কেনা মালিকানা যাতে সার্থক হয়, আর টাকাটা উপার্জন করে যাতে ঋণমুক্ত হতে পারি, সেদিকে আমার থাকবে বিপুল প্রচেষ্টা। মানে এতে আমার বড় হবার প্রেরণা অনেক বেড়ে যাবে। বলো নীল, আমি ঠিক বলছি কি-না!

—আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো রজত। আমার হাত ছিল ওর হাতের মুঠোর মধ্যে।

---তুমি যেটা ভালো বুঝেছো, সেইটাই ঠিক বন্ধু! জবাব দিলাম আমি।

●

পরদিন সকালে আমি রজতকে কুড়ি হাজার টাকার একখানি চেক দিলাম।

পাওয়ার সায়েব, কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো,---সাক্ষী থাকা বড় গোলমেলে ব্যাপার মিস্টার সেন, দেখবেন শেষ পর্যন্ত আমাকে আবার থানা পুলিশে ঘোরাবেন না। ওসবে আমার বড় ভয়, তা আগে থাকতেই বলে রাখছি কিন্তু।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম, ওর কথা শুনে।

রজত বললো---থানা পুলিশ তো আপনার জন্যে নয়, ওটা রইলো আমার জন্যে।

---আঃ! কি হচ্ছে বলো তো! তোমরা কি আর কথা খুঁজে পাচ্ছো না? শুভ কাজের গোড়াতেই এমন অলক্ষুণে কথা কেন? তার চেয়ে কথা বন্ধ করে চা খাও, কফি খাও, তাহলেই মগজে আবার অনেক ভালো কথা গজাবে।

বললাম আমি ওদের।

---ঠিক ঠিক। ভারি সাচ্চা বাৎ বাতলেছো মিস্টার। চা, কফি, কাজু, পেস্তা, আখরোট, আঙুর, আপেল, বিস্কিট কেক্ পেস্ট্রি। আনছি, আনছি। এসব অনেক আগে আনা উচিত ছিল, সেকথা এই গবেট মগজে এতক্ষণ আগে নি কেন?---না মাথাটা দিন দিন, বড় নেমকহারামী সুরু করেছে।

মাথায় দুম্ দুম্ করে কয়েকটা কিল দিয়ে ধুপ্‌ধাপ্ করে বড় বড় পা ফেলে ছুটে চলে গেল পাওয়ার সায়েব।

ওকে ঠিক আমার সেই মুহূর্তে সার্কাসের কোনো সুদক্ষ জোকার বলে মনে হল। যারা নিজেদের সব দুঃখকে ভেতরে চেপে রেখে, অপরকে হাসাবার জন্য, প্রাণান্তকর অধ্যবসায়ে নিজেকে সর্বদা নিযুক্ত রাখে, যারা নিজেরা হাসে না, কিন্তু হাসায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে, পাওয়ার সায়েব কি তাদেরই একজন?

[ক্রমশ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে

উমা দেবী

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"—প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তুমি।
আমি তাই তোমাকে হৃদয়ের পথে চেয়েছিলাম।
দেহ থেকে সমস্ত মেদ ঝরিয়ে দিয়ে
দেহকে করেছিলাম দেহলতা।
কণ্ঠ থেকে আড়ষ্ট পিচ্ছিলতাকে দূর ক'রে
স্বরকে করেছিলাম সুর।
দৃষ্টিকে করেছিলাম নিবু-নিবু দীপের আলো
যেন দুই প্রায়-অলক্ষ্য তারা।
যেমন করে তোমাকে পেতে চাই—
তেমনি করেই—তুমি খুশি হবে বলে
পরিমার্জিত করেছিলাম নিজেকে।

"তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এ কথা রাখলে না তুমি।
ভজনা করলে না আমাকে—যেমন করে আমি চাই।
তোমার শাণিত দ্যুতি যখন তোমার কর্মক্ষেত্রে
ঝলকে উঠেছিল শাণিত তলোয়ারের মতন
আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।
তোমার চিত্তসৌকুমার্যের বৃন্তকে কেন্দ্র ক'রে যখন
ফুটে উঠেছিল সুন্দরের রুচির পর্ণালি
আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।
নীল অপরাজিতার চক্ষে
রক্তগোলাপের অধরে
শ্বেতচম্পকের দুগ্ধফেননিভ কোমল ত্বকে
পীত মুচকুন্দের সুরভি ঘ্রাণে
আমি রেখেছিলাম তোমার প্রতিশ্রুতিকে।
কিন্তু চাওয়া আর পাওয়া—এ দুইকে কিছুতেই মেলাতে
পারলাম না,
আমার প্রতিশ্রুতিকে আমি ফিরিয়ে নিলাম—
বলো—আমার উপাসনার উপমা নিয়ে তুমি কি করবে!

একটি পাব্লিক পার্ক—সময় সন্ধ্যা

[ছিন্নভিন্ন পোষাক পরিহিত একটি যুবক—মাথার ওপরে একটি এরো-প্লেনের চালনা কৌশল লক্ষ্য করছে। সে পকেট থেকে একটি দড়ি বার করবে এবং চারিদিকে চেয়ে দেখবে। সে যখন সামনের দিকে একটি উইলো গাছের দিকে যেতে থাকবে, তখন দুজন স্বৈরিণী তার দিকে আসবে—এদের ভেতর একজনের বয়স হয়েছে। অন্য-জন যুবতী এবং পূর্ববর্ণিত আটজনের সংসারের ভাইঝি]

যুবতী। ওহে যুবক, তোমাকে শুভ-সন্ধ্যা জানাচ্ছি। চল, আমার বাড়িতে যাবে নাকি ?

যুবক। আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার রাত্রের খাবার বন্দোবস্ত করতে হবে তোমাদের।

বয়স্থা। (যুবতীকে) আরে কাকে কি বলছিস্—এ হচ্ছে সেই বেকার পাইলটটা।

যুবতী। সবাই পার্ক থেকে চ'লে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখুনি বৃষ্টি সুরু হবে।

বয়স্থা। হ্যাঁ, তা হতে পারে।

[তারা হেঁটে বেরিয়ে যাবে। সুন দড়িটা নিয়ে একটা উইলো গাছের দিকে একটা দিক ছুড়ে আটকে নেবে—স্বৈরিণী দুজন ফিরে আসবে, সুন ওদের নজরে পড়বে না]

যুবতী। মনে হচ্ছে খুব একপশলা বৃষ্টি হবে।

(শেন্‌টেকে এদিকে হেঁটে আসতে দেখা যাবে)

বয়স্থা। ওই দ্যাখো, সেই হতচ্ছাড়া মেয়েটা এদিকে আসছে। ওর জন্যেই তো তোমরা সবাই বিপদে পড়েছিলে ?

যুবতী। ওর জন্যে নয়, ওর কাজিনের শয়তানীতে। ওর বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই।

বয়স্থা। আমার আছে। (চিৎকার করে) এই হচ্ছে শেন্‌টে—স্বৈরিণীবৃত্তি
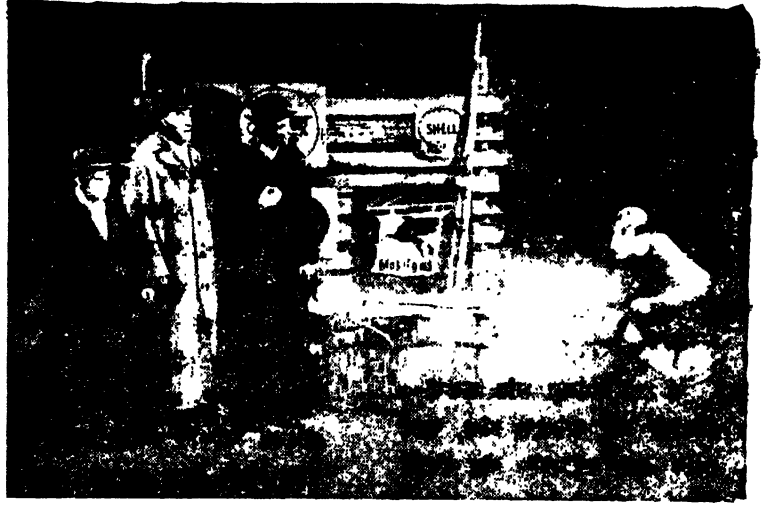
ওয়াং ও তিন-দেবতা

সেজুয়ানের মহৎ নারী

করতে করতে হঠাৎ কোথা থেকে টাকা পেয়ে দোকানের মালিক হয়ে বসল। কিন্তু কথায় বলে না, স্বভাব যায় না মলে। এখনও নিজের বৃত্তি ও ছাড়তে পারছে না। আমাদের শিকার ছিনিয়ে নেবার জন্যে এখানে ঘুর ঘুর করছে।

বের্টল্ট ব্রেশট

শেন্‌টে। কেন মিছিমিছি আমাকে গালাগাল করছ—আমি ওই লেকের ধারের চায়ের দোকানটায় যাচ্ছি।

যুবতী। (হাসতে হাসতে) শুনছি তুমি নাকি তিন ছেলের বাপ এক বিধবা পুরুষকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ ?

শেন্‌টে। ঠিকই শুনেছ ! চায়ের দোকানে তারই সঙ্গে দেখা করবার কথা।

সুন। তোমাদের বক্‌বকানি বন্ধ করবে ? কোনো জায়গায় গিয়ে এতটুকু শান্তি পাবার উপায় নেই।

বয়স্থা। চোপরাও হতভাগা।

(দুজনে চলে যেতে থাকবে)

সুন। (ওদের উদ্দেশ্যে) সমাজের সব আবর্জনা। (দর্শকদের প্রতি) যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো অবস্থায়, এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভেতরও দেখবেন এরা শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই হচ্ছে ওদের স্বভাব।

শেন্‌টে। (রাগতভাবে) কেন ওদের কেচ্ছা করছ ? শুনছ। ওই দড়িটা কিসের জন্য ?

সুন। সরে পড় তো এখান থেকে—আমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু নেই—আর থাকলেও খাবার জল কেনবার জন্যে সেটা খরচ করতাম, তোমার জন্য নয়।

শেন্‌টে। দড়িটা কিসের জন্যে ? ভেবো না আমি কিছু বুঝতে পারি নি।

সুন। নিজের চরকায় তেল দাও। ভালয় ভালয় এখান থেকে সরে পড় তো।

শেনটে। আমি এখান থেকে একপাও নড়ছি না।

সুন। কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছ বল তো। আমাকে কিছুতেই তোমার ফাঁদে ফেলতে পারবে না। সরে পড়ো।

শেন্‌টে। তুমি গলায় দড়ি দিতে চাও কেন বল দেখি?

সুন। এ তো আচ্ছা নাছোড়বন্দা---নেহাৎই যদি জানতে চাও, তবে শোন এবং শোনবার পর কেটে পড়ো। উড়োজাহাজের চালক-দের কথা শুনেছ কখনও?

শেন্‌টে। চায়ের দোকানে একবার কয়েকজন উড়োজাহাজের চালককে দেখেছিলাম।

সুন। তারা সত্যিকারের আকাশচারী নয়। ওপরওয়ালাদের ঘুস-ঘাস দিয়ে পাইলট সেজে বসেছে। আকাশযানের যন্ত্রপাতি এবং ইঞ্জিনকে অন্তর দিয়ে বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের নেই। কতক-গুলো বাঁধাধরা নিয়ম অনুসারে প্লেনকে চালাতে এবং নামাতে এবং ওঠাতে হয়ত পারে। আমি হচ্ছি সত্যিকার আকাশচারী---হাজার হাজার ফুট উঁচু থেকে প্লেনকে যখন মাটিতে নামাবো কেউ টের পাবে না। কিন্তু তবুও আমি স্বীকার করবো আমিই হচ্ছি সব থেকে বড় ইডিয়েট। পেকিং-এর ফ্লাইং স্কুলে আকাশবিহার সংক্রান্ত সবগুলো কেতাব আমার কণ্ঠস্থ। শুধু একটি বইয়ের একটি পাতা আমার নজর এড়িয়ে গেছে। যে পাতাটিতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, 'পাইলটদের কোন দরকার নেই।' ওই পাতাটা না পড়ার ফলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে জান? আমি আকাশ-চারী অথচ আমার কোন আকাশযান নেই। মেইল নেই অথচ মেইল---পাইলট-এর মানে বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই।

শেন্‌টে। যদি বলি আমি বুঝতে পারছি।

সুন। আমি বলছি তুমি বুঝবে না।

শেনটে। (হাসিকান্না মিশ্রিত কণ্ঠে) ছেলেবেলায় আমার একটা সারস পাখি ছিল। তার একটা ডানা ছিল ভাঙ্গা। ওর স্বভাব খুব শান্ত ছিল---আমরা ক্রমাগত বিরক্ত করলেও ও চটতো না। কিন্তু শরৎকালে বা বসন্তকালে আমাদের গ্রামের আকাশ দিয়ে যখন দলে দলে পাখি উড়ে যেতো, সারসটা তখন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠতো। আমি কিন্তু কিছুতেই ওর চাঞ্চল্যের কারণ বুঝতে পারতাম না।

সুন। তোমার চোখের জল ফেলাটা বন্ধ করবে?

শেন্‌টে। না, না, আর কাঁদবো না।

[জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছবে। ওর থুৎনিতে হাত দেবে সুন, তারপর নিজের রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছে দিতে দিতে বলবে]

সুন। ঠিকভাবে চোখমুখ মুছতেও জানো না তুমি? (কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকবে) আমি যাতে গলায় দড়ি দিতে না পাবি সেই জন্যেই তুমি এখানে অপেক্ষা করছ,---তাহলে চুপ করে না থেকে অন্তত কথাবার্তা বল।

শেন্‌টে। কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

সুন। তোমার কথা বল।

শেন্‌টে। ও বিষয়ে বলবার আছেই বা কি। আমি একটি ছোট্ট দোকানের মালিক। তার আগে আমি ছিলাম রাস্তার আবর্জনা।

সুন। দোকানটা কি তাহলে আসমান থেকে দেবতারা এসে উপহার দিয়ে গেল নাকি?

শেন্‌টে। ঠিক বলেছ।

সুন। একদিন সন্ধ্যায় বোধহয় দেবতারা তোমার সামনে এসে দাঁড়ালো, বলল এই নাও কিছু টাকা।

শেনটে। (হাসতে হাসতে) ঐভাবেই টাকাটা দিয়েছিল কিন্তু সকাল-বেলায়।

সুন। এইবার তাহলে একটা বিয়ে করে ফেল।

(যে লোকটা লেকের পাশে টি হাউসে এসে বসে---)

(শেন্‌টে চুপ করে থাকবে)

সুন। প্রেমের কথা কিছু বোঝ?

শেন্‌টে। ও সম্বন্ধে সব কিছুই আমার জানা আছে।

সুন। বটে! আচ্ছা ও ধরণের প্রেম ভাল লাগতো?

শেনটে। না।

(ওর গালে ঠোনা মেরে সুন জিজ্ঞেস করবে)

সুন। কেমন লাগলো?

শেন্‌টে। খুব মিষ্টি।

সুন। তোমাকে তো খুব সহজেই খুশি করা যায়। আমাদের এ শহরটার মতো হতভাগা জায়গা কোথাও দেখেছ?

শেন্‌টে। তোমার কোন বন্ধুবান্ধব নেই?

সুন। একদল বন্ধু আছে---কিন্তু তাদের ভেতর এমন কেউ নেই যে এখনও আমি বেকার আছি শুনতে চাইবে---যাক্‌গে তোমার কোন বন্ধু নেই?

শেন্‌টে। (ইতস্তত করে) একজন কাজিন আছেন।

সুন। তাকে বুঝি বিশ্বাস করো না?

শেন্‌টে। যে এ শহরে শুধু একবার এসেছিল---আর কখনও ফিরে আসবে না। কিন্তু তুমি এমন মনমরা হ'য়ে আছ কেন? মানুষের জীবন থেকে আশা চলে গেলে সেই সঙ্গে সমস্ত মহত্ত্ব চলে যায়।

সুন। তুমি বকর বকর করে চলো। তবু মনটা ভাল লাগবে এই ভেবে যে মানুষের গলা শুনতে পাচ্ছি।

শেন্‌টে। (আকুলভাবে) জীবনে যতই দুর্যোগ আসুক, কিছু ভাল বন্ধুর দেখা আমরা পাবোই পাবো। আমি যখন ছোট ছিলাম এক-বাণ্ডিল কাঠের টুকরো ব'য়ে নিয়ে যেতে গিয়ে পড়ে যাই। একটি বুড়োমতন লোক এসে আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন

---আমার দুরবস্থা দেখে কিছু পয়সাও তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। পরে এ ব্যাপারটা আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি---আসলে গরীবদের জন্যে গরীবদেরই প্রাণ কাঁদে---গরীবের দুঃখ গরীবেই বোঝে।

সুন। দু'দিন ধরে পানাহার কিছুই করতে পারিনি পয়সার অভাবে। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলা করবার সামর্থ্য আমার নেই।

[ভিস্তি ওয়াং গান গাইতে গাইতে তার জলপাত্র নিয়ে ঢুকবে---শেন্‌টে তাকে দেখে তার কাছে ছুটে যাবে।]

শেন্‌টে। এই যে ওয়াং তাহলে তুমি ফিরে এসেছ। তোমার জল বহন করার দণ্ডটা আমি যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছি।

ওয়াং। সত্যি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেনটে, তারপর আছ কেমন?

শেনটে। একজন খুব চালাক আর সাহসী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে ওয়াং-- আমি এক-কাপ জল কিনতে চাই তোমার থেকে। বেশ বুঝতে পেরেছি ও আমার মনের মানুষ।

[ওয়াং এককাপ জল দেবে এবং শেন্‌টে কাপটি নিয়ে সুনের কাছে এসে কাপটি দেবে---সুন জলপান করতে থাকবে---ধীরে ধীরে

যবনিকা]

।। মধ্যবর্তী দৃশ্য ।।

শহর প্রান্তের রাস্তা

[ওয়াং ঘুমিয়ে আছে---মিউজিক বাজ্‌ছে---হঠাৎ চারিদিক আলো করে দেবতাদের আবির্ভাব হবে---ওয়াং জেগে উঠে বিস্মিতভাবে দেবতাদের দিকে চেয়ে থাকবে---তাঁর মনে হবে সে স্বপ্ন দেখছে]

ওয়াং। উচ্ছ্বসিতভাবে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে দেবতাত্মার দল, শেন্‌টে একটুও বদলায় নি, সে ঠিক আগের মতই আছে।

১ম দেবতা। তোমার কথা শুনে সত্যিই আমরা প্রীত হলাম।

ওয়াং। ও একজন মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে। তাকে আমার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছে। সবদিক দিয়েই ওর খবর ভাল।

১ম দেবতা। তোমার খবরগুলো শুনে খুশি হ'লাম। আশা করি সততাকে মূলধন করে, ক্রমাগত মহৎ এবং ভাল কাজ করে চলবে।

ওয়াং। তা তো বটেই। ওর দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনো তুলনা হয় না। ওর---দাতব্যের কথা এখনও সকলের মুখে শোনা যাচ্ছে।

১ম দেবতা। তাই নাকি? আচ্ছা, কি ধরণের দয়া-দাক্ষিণ্যের কাজ ও করছে বল দেখি ওয়াং?

ওয়াং। সবার সঙ্গেই মধুরভাবে কথা বলে।

১ম দেবতা। আর কি করে?

ওয়াং। পয়সা নেই বলে কারোকে ওর দোকান থেকে ফিরে আসতে হয় না। কিছু না কিছু ধূমপানের জিনিষ ও তাদের দেবেই দেবে।

১ম দেবতা। খুব ভাল কথা। আরো কি বলতে পারো?

ওয়াং। আট জনের এক পরিবারকে শেন নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে

১ম দেবতা। (বিজয়গর্বে ২য় দেবতাকে) শুন্‌লে তো, আট জনের এক পরিবারকে শেনটে নিজের সংসারে গ্রহণ করেছে। ওহে ওয়াং, শেন্‌টে সম্বন্ধে আর কিছু তোমার জানা আছে?

ওয়াং। আমার কাছ থেকে সে এক-জনের জন্য একগ্লাস জল কিনে নিয়েছিল।

১ম দেবতা এটা অবশ্য খুচরো দাতব্যের মধ্যে পড়ে।

ওয়াং। কিন্তু তার জন্যে তাকে পয়সা [illegible] হয়েছিল। ব্যবসা বলতে তো ছোট্ট ওই দোকানটা। তা থেকে কতই বা আয় হয়। প্রত্যেক দিন সকালে ও গরীবদের চাল বিতরণ করে। দোকান থেকে যা আয় হয়, তার অর্ধেক এতেই খরচ হয়ে যায়। আর একটা কথা মনে রাখবেন---আজকাল দিনকাল বড় খারাপ। শেনটে নিজের ভালমানুষীর জন্য ক্রমশ বিপজ্জালে জড়িয়ে পড়ছিল। দোকানটারও যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল---শেষে বাধ্য হয়ে ও ওর কাজিনের সাহায্য চায়---অর্থাৎ ওই দোকানটা চালানো ওর ক্ষমতার অতিরিক্ত হ'য়ে পড়েছিল। সবাই এ কথা স্বীকার করে যে ওর মতো ভাল মেয়ে আর এ তল্লাটে নেই। ছুতোর লিংটো ওর নামে যত অপবাদই দিক কেউ তার কথায় কান দেবে না।

১ম দেবতা। লিন্‌টো ওর নিন্দা করে বুঝি?

ওয়াং। না তা নয়, সে বলে ঐ দোকানের কাজ করে সে ঠিক-মতো পাওনা টাকা আদায় করতে পারেনি।

২য় দেবতা। এ সব তুমি কি বলছ? কাজ করিয়ে নিয়ে শেন্‌টে ছুতোরের পাওনা টাকা দেয়নি?

ওয়াং। আমার মনে হয় তার হাতে টাকা ছিল না।

২য় দেবতা। এ তো আর কোনো যুক্তি হল না। পাওনা টাকা মানেই ঋণ---প্রত্যেক সৎলোকেরই ঋণের টাকা শোধ করা উচিত।

ওয়াং। কিন্তু প্রভু, এ কাজের জন্যে শেন্‌টে দায়ী নয়---দায়ী তার কাজিন।

২য় দেবতা। সে ক্ষেত্রে তার কাজিনকে আর শেন্‌টের বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া উচিত হবে না।

ওয়াং। (একটু মুসড়িয়ে গিয়ে) শেন্‌টের হ'য়ে আমি একটা কথা

নিবেদন করব প্রভু। তার কাজিন খুব নামডাকওয়ালা ব্যবসায়ী। এমন কি পুলিশের লোকেরাও তাকে সম্মান করে।

১ম দেবতা। ভালভাবে না শুনে আমরা এই কাজিনের বিচার করতে বসব না। ব্যবসার ব্যাপারে আমরা একেবারে অজ্ঞ। যাক্ গে, আগে ভালভাবে জেনে নিতে হবে ব্যবসার ব্যাপারে সৎ-অসৎ-এর পরিমাপ কিভাবে করা হয়। তোমাদের পৃথিবীতে এসে দেখছি লোকেরা আর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা নিয়েই সব সময় ব্যস্ত। আমি তো বুঝতে পারি না সৎ এবং সম্মানজনকভাবে জীবন কাটাতে হলে ব্যবসার সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক থাকতে পারে।

২য় দেবতা। যাক্ গে, শেনটেকে বোলো আর ওই ধরণের ঘটনা না ঘটলেই আমরা খুশি হব।

[দেবতারা অন্যদিকে ফিরবেন চলে যাবার জন্যে]

৩য় দেবতা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) আমাদের আজকের কড়াকড়া কথা শুনে তুমি কিছু মনে কোরো না ওয়াং। আমরা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—রাত্রে ভাল ঘুমও হয় না। রাত্রির কথা মনে হলেই শিউরে উঠি। বড়লোকেরা তো আমাদের আশ্রয় দিতে চায় না—বিশেষভাবে সুপারিশ করে দেয়। কোন কোন গরীব লোক খুব সৎ এবং আমাদের আশ্রয় দিতে পেরে তারা তাদের নিজেদের কি রকম ধন্য মনে করবে। সৎ গরীব লোকদের মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে আমরা মনে মনে খুবই গর্ববোধ করি। কিছু বেচারাদের গরীবখানার ঘরও কম আর সে ঘরে থাকাও মানে সারারাত্রি ধরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করা।

২য় দেবতা। (যেতে যেতে) জানলার পাল্লা ভাঙা। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে আমাদের শীতে কাঁপিয়ে তোলে। খাটগুলো ভাঙা—পাশ ফিরলেই মচ্ মচ্ শব্দ হয়, মনে হয় এই বুঝি সব ভেঙে পড়ল। ঘরভর্তি আবর্জনা। মাকড়সা, ইঁদুর, আরশোলার দৌরাত্ম্যে সারারাত চোখের দু' পাতা এক করা মুস্কিল। যাক্‌গে তবু স্বীকার করতে হবে গরীবদের অন্তরটা মহৎ—

১ম দেবতা। ওরাই পৃথিবীর খাঁটি লোক—

৩য় দেবতা। যা কিছু সৎ, তা শুধু ওদের ভেতরেই দেখা যায়।

(এরা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে)

॥ যবনিকা ॥

[ক্রমশ।

অনুবাদক—অশোক সেন

আসল·নকল

শ্রীঅতীন মজুমদার

আহা, কি রূপ এ-দেশটার!
মনে মনে জাগছে কেমন আজ সবার
 রামধনুর ঐ রং-বাহার!

গোলায় গোলায় ধান তো আছে—
 ভয় কিসের?
মিটে গেছে খাজনা দেয়ার কবেই জের।
 বুলবুলিতে খায় নি ধান,—
 লাউ-মাচাতে টুনটুনিরা ধরল গান!
হল নাত' কিস্তিমাৎ,
 হবু রাজা সেই দুঃখেই হলেন কাত।

মোদ্দা কথা: স্বপ্নে বেশি ঢালতে ঘি,
 ছেঁড়া-কাঁথায় শুয়ে শুয়ে লক্ষ টাকার
 স্বপ্ন দেখার
 দোষটা কি?

বাংলা-মায়ের কথা বই-এ লেখাই থাক,
পাতের পচা মাছটা বাপু
 শাকটা দিয়ে ঢেকেই রাখ।

অমরাবতী স্তূপ ভাস্কর্য

[illegible] দাস

খৃস্টপূর্ব ২০০ অব্দ—শতবাহন রাজত্ব

গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যে অবস্থিত অমরাবতী একটি প্রাচীন নগর। খৃস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খৃস্টাব্দের অন্তর্বর্তী সময়ে শতবাহন নৃপতিবৃন্দের অর্থানুকূল্যে ইহার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছিল এবং শের রাজা শিবশতকর্ণি ও শিবস্কন্ধ (১৬৭---১৭৪ খৃঃ) এবং জৈন শতকর্ণি (১৭৫---২০৩ খৃঃ) পর্যন্ত সুখ্যাতির সঙ্গে রাজত্ব করেন।

ভারহুত বা সাঁচীর শিল্প-কলায় যেমন ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য-কলায় ইতিহাস বিধৃত হয়েছে তেমনি দাক্ষিণাত্যের অমরাবতীর ভাস্কর্যে অপর কোন শিল্প-ধারা থেকে প্রক্ষিপ্ত বা অনুকৃত না হয়ে এক নবতম ভাস্কর্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

ইহার ভাস্কর্য কর্মে অন্য কোন স্থানের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে---কেহ এ-ভাবের মতামত প্রকাশ করেন নি। তবে ইহার নির্মাণকাল এখনও তর্কাতীত [illegible]

পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, ইহা ভারহুত বা সাঁচীর পরে বা সমসাময়িককালে নির্মিত হয়েছে।

স্তূপের একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায়, এক শত পঞ্চাশ খৃস্টাব্দে পুলুমায়ী বা শতপুত্র নামক কোন ধনী বা শ্রেষ্ঠী ইহার জীর্ণসংস্কার করেছিলেন রাজা চিন্তাপিল্লীর রাজ্য-মধ্যে অমরাবতী স্তূপটি অবস্থিত, ইহার অদূরে কৃষ্ণানদীর তীরে অমরা লিঙ্গে-শ্বর শিবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে।

মন্দিরের আকৃতি ও শিব-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু ভক্তজনমণ্ডলীর সমাগম হোত। স্তূপ ও শিব-মাহাত্ম্যের জন্য রাজা এই পবিত্র স্থানে একটি নগর পত্তন করার উদ্দেশ্য নিয়ে মূল স্তূপ এবং উহার নিকটবর্তী কিছু কিছু প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি ধ্বংস করে উহাদের উপকরণ নিয়ে নূতন নগরের স্থাপত্যকর্মে সন্নিবেশ করতে থাকেন।

[illegible] ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে ইহার আবিষ্কার করেন, পরে ১৮১৬ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজের সার্ভে জেনারেল রূপে পুনরায় মাদ্রাজে এসে তিনি এই নিষ্ঠুর কার্যের জন্য রাজাকে নানাভাবে নিবৃত্ত করেন এবং ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধেও রাজাকে বুঝিয়ে বলেন,---এভাবে স্তূপটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

ম্যাকিঞ্জী তাঁর সহকারীদের সাহায্যে শিল্পকর্মগুলির উৎকৃষ্ট নমুনা সংগ্রহ করেন, ঐ নমুনাগুলি অনুকৃতি হলেও উহাদের শিল্পকর্ম ও নিখুঁত অনুকৃতির জন্য ফার্গুসান প্রমুখ পণ্ডিতদের নিকট যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। এই উৎকৃষ্ট অনুকৃত নমুনা ও স্তূপের কিছু মূল নিদর্শন ম্যাকিঞ্জী মাদ্রাজে এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন।

ইহার পরবর্তীকালে ১৮৪০ খৃস্টাব্দে গুণ্টুরের কমিশনার ওয়ালটার ইলিয়ট স্তূপের নিকটবর্তী স্থানসমূহ খনন করে

অমরাবতী স্তূপ ভাস্কর্য
দাক্ষিণাপথে—শতবাহন রাজ্যে খৃঃ পূঃ—প্রথম শতাব্দীতে
নির্মিত হয়

আরো কিছু পুরাবস্তু আবিষ্কার করেন ঐসকল দ্রব্যাসামগ্রী তিনি মাদ্রাজ সরকারের নিকট প্রেরণ করেন কিন্তু ঐগুলি কর্তৃপক্ষের কোন কৌতূহল উৎপন্ন করতে পারে নি।

দুঃখের বিষয় প্রায় চোদ্দ বৎসর অরক্ষিত অবস্থায় রৌদ্রবৃষ্টির মধ্যে অনাদৃত অবস্থায় জিনিষগুলি পড়ে থেকে নষ্ট হতে থাকে।

অবশেষে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ঐগুলি লণ্ডনের ফিফেতে (Fife) প্রেরণ করা হয়, সেখানেও ঐগুলি দীর্ঘদিন আবর্জনাস্তূপে পড়ে থেকে নষ্ট হতে থাকে, পরে মহামতি ফার্গুসান ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে ঐগুলি উদ্ধার করেন। ভারত শিল্প নিয়ে এই মনীষী বহু আলোচনা করে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকলার গরিমাকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে যেভাবে উপস্থিত করেছেন, তাতে ভারতের তমসাচ্ছন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি আলোকিত হয়েছে। অমরাবতীর শিল্পকর্মগুলি অধ্যয়ন করে তিনি [illegible]

খৃস্টীয় যুগের বহু পূর্ববর্তী কাল থেকে ভারতবর্ষে বৃক্ষ ও নাগপূজার প্রচলন ছিল। তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিত্বপূর্ণ সৃষ্টি যদি কিছু থাকে, তবে উহা ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে নিহিত আছে।

কুমার স্বামী বলেছেন, অমরাবতীর সৃষ্টিগুলি ভারতীয় ভাস্কর্যে এক-একটি কুসুম-স্তবক। বিশেষভাবে ইহার অন্তর্গত পুষ্পপত্র ও অলঙ্করণ গুণিজনের প্রশংসা লাভ করেছে। এখানকার শিল্পকর্মগুলি শিল্পীদের পরিণত হস্তের সৃষ্টি---

ফার্গুসান বললেন, বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী নাগার্জুন যখন মহাযান মতের প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন এই ভাস্কর্যগুলি ঐ সময়ের সমকালীন সময়ে নির্মিত হয়েছিল। একটি প্রস্তরফলকে নাগার্জুন নাম ক্ষোদিত থাকায় এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। তিনি বলেন, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বহু তথ্য অমরাবতীর স্তূপে উৎকীর্ণ আছে।

এখানেও বুদ্ধ প্রতীকরূপে বৃক্ষ, চক্র, স্তূপ, ছত্র প্রভৃতি চিহ্নের মধ্যে উৎকীর্ণ হয়েছেন। বেষ্টনীবদ্ধ বুদ্ধ প্রতীকরূপী বৃক্ষসমূহের ছায়াতলে ভক্তগণের ভাস্কর্য-চিত্র সর্বত্র বিপুলভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। ভক্তগণের সুঠাম দেহ কটিবস্ত্র অলঙ্কার ও সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন আকৃতির শিরস্ত্রাণপরিহিত অবস্থায় চিত্রিত হয়েছে।

প্রভামণ্ডলযুক্ত স্তূপের উপর উৎকীর্ণ বুদ্ধের প্রতিমূর্তি এবং বোধিসত্ত্বের অশ্বারোহণে কপিলাবস্তুতে প্রবেশের চিত্র ক্ষোদিত আছে। বুদ্ধের চিত্রে বরাভয় মুদ্রায়ই অধিক প্রয়োগ দেখা যায়---এই মুদ্রা প্রাচীন হিন্দুমুদ্রা থেকে গৃহীত---পরবর্তীকালে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রা প্রভৃতি জটিল মুদ্রাগুলি বুদ্ধমূর্তিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল

বুদ্ধমূর্তির অন্তর্বাস ও বহির্বাসের সূক্ষ্ম ভাঁজগুলি সূক্ষ্ম রেখার টানে অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন---রেখাগুলির জীবন্ত গতিছন্দে কাপড়ের ওজন ও স্থূল-সূক্ষ্ম নির্ধারণ করার পদ্ধতিতে ভাস্কর্যের গভীর চিন্তা ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রের ন্যায় ভাস্কর্যের ও ভারতীয় শিল্পী রেখার উপর গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা রেখে কার্যসম্পন্ন করেছেন। বুদ্ধের মস্তকে উষ্ণীষ (উন্নত মাংসপিণ্ড) ও পদতলে পদ্মচিহ্ন অঙ্কন করা হয়েছে। ভাস্কর্য চিত্রগুলির মধ্যে তৎকালীন রাজন্যবর্গের ব্যবহার্য সিংহাসন, মোড়া, কৌচ ও অন্যান্য তৈজসপত্রের চিত্র এবং তৎকালীন যুগের ব্যবহার্য বসন-ভূষণ ও অলঙ্কার প্রভৃতির চিত্র সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ আছে। তৎকালীন যুগের একক উপবেশন উপযোগী সিংহাসন ব্যতীত একাধিক ব্যক্তির উপবেশন করার উপযুক্ত কৌচগুলির গঠনও সুন্দর। অমরাবতী-ভাস্কর্য চিত্রের প্রভাব পরবর্তী দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্যে---বিশেষভাবে মহাবলীপুরমে এবং সুদূর কম্বোজের আঙ্করবাটের ভাস্কর্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ভাস্কর্য চিত্রগুলির মধ্যে বুদ্ধের ঐশ্বরিক শক্তিজ্ঞাপক একখানি অতিসুন্দর চিত্র ক্ষোদিত আছে। বুদ্ধ শিষ্যসহ ভীক্ষা অন্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন-সময় এক মত্ত হস্তীর তাণ্ডবলীলার মধ্যে পতিত হন, হস্তী রাজপথে শুণ্ডাঘাতে ও পদপীড়নে বহুজনকে নিহত করে ছুটে চলেছে, ভীত পথচারী চতুর্দিকে আত্মরক্ষার জন্য পলায়নতৎপর—দুর্বল গৃহগুলিও মত্ত হস্তীর আক্রমণে ভূমি-সাৎ হয়েছে---প্রাসাদ বাতায়নে দর্শন-প্রার্থী ললনাকুল ভীতনেত্রে এ হত্যা-লীলা নিরীক্ষণ করে একে অন্যের কণ্ঠলগ্না হয়ে আছেন।

এই ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলার মধ্যে মহান বুদ্ধ স্থির ও নির্বিকার চিত্তে যখন ধীর পদক্ষেপে মত্তমাতঙ্গের সমীপবর্তী হলেন হস্তী তখন মত্ততামুক্ত হয়ে বুদ্ধের পদানত হয়ে গেল---গোলাকৃতি এই চিত্রখানির মধ্যে দুটি ঘটনাকে শিল্পী কৌশলে বিন্যাস করেছেন---চিত্রের দুটি হস্তীই এক হস্তীর দু'প্রকার অবস্থার চিত্র---প্রথম হস্তী মত্ত ও সংহারকার্যে রত---সেই দ্বিতীয় হস্তী বুদ্ধের পদানত। চিত্র বিশ্লেষণ ব্যতীত ইহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য। অল্প পরিসরের মধ্যে এত বড় একটি বৃহৎ ঘটনাকে কম্পোজ করা একমাত্র ভারতীয় শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। ইহা ভারতীয় ভাস্কর্যের অন্তর্গত একখানি বিখ্যাত চিত্র। স্তূপ গাত্রে বহু গোলাকৃতি ভাস্কর্যচিত্র ক্ষোদিত আছে। পরিসরের আকৃতি অনুসারে ভাস্কর বিষয় কম্পোজ করেছেন।

বিজোয়াদা থেকে গেণ্টুর হয়ে পশ্চিম দিকে ১৬ মাইল দূরে এই অমরাবতী স্তূপ অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যকলায় অন্যতম পীঠস্থানরূপে অমরাবতী একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে---ইহার নিকটে শতবাহন রাজন্যবর্গের রাজধানী ধন্য কটকের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত---দক্ষিণ ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধদের দক্ষিণ প্রান্তস্থ ইহাই শেষ বৌদ্ধস্তূপ। আকৃতিতে ইহা সাঁচীস্তূপ থেকে বৃহৎ ও বিখ্যাত। ভূমি থেকে গম্বুজ ৯৫ ফুট উচ্চ, বৃত্তাকার স্তূপের ব্যাস ১৬২ ফুট দীর্ঘ, প্রদক্ষিণ পথ ১৫' ফুট প্রশস্ত। চতুর্দিকের বেষ্টনী ১৪' ফুট উচ্চ সাঁচী স্তূপ ১২০', ফুট প্রশস্ত এবং ৫৪' ফুট উচ্চ। স্তূপের নিকট একটি বিহার গৃহ আছে---এখানে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করতেন এবং তীর্থযাত্রীরাও আশ্রয় পেতেন, চীন-দেশীয় ভ্রমণকারী হিউয়েন-সাং অমরাবতী স্তূপ সম্বন্ধে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন। স্তূপের নিকটে একটি মিউজিয়ামে অমরাবতীর অনেক পুরাবস্তু রক্ষিত আছে, স্তূপের সর্বদেহে প্রায় নীরন্ধ্র অলঙ্কার ও বুদ্ধ জাতক কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। অলঙ্করণে পদ্মলতা ও পদ্মের বিবিধ পরিকল্পনায় চিত্র অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন চিত্রে প্রমাণ আকৃতির বুদ্ধমূর্তি, বা সাত ফুট দীর্ঘ বুদ্ধ ও চিত্রিত হয়েছে। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে অমরাবতীর বিপরীত দিকে বিখ্যাত নাগার্জুন কুণ্ড---এখানেও বৌদ্ধদের এক ভাস্কর্য কীর্তির পরিচয় আছে।
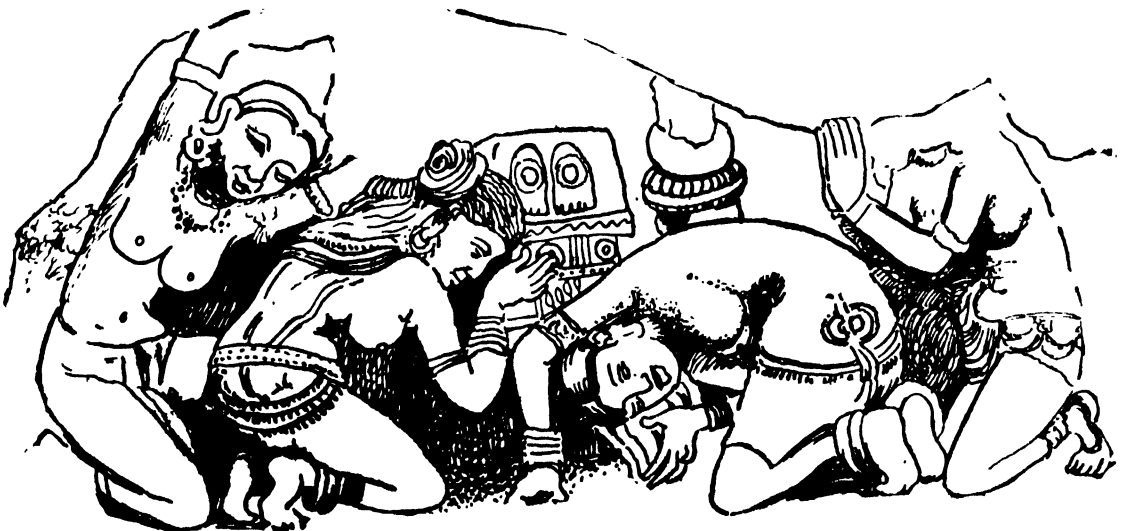
"শ্রীপাদ" (বুদ্ধের পদচিহ্ন)
অমরাবতী ২য় শতাব্দী A. D.

পীতাম্বরবাবুর সংসারে নিজের বলতে কেউ নেই। বিয়ে করেছিলেন কবে কেশবপুরের লোকের কেন পীতাম্বরবাবুর নিজেরই হয়তো আজ আর তা মনে নেই। বউ মরে গিয়েছে তাও আজ দশ-বারো বছর হল। পীতাম্বরবাবু হিসেব করেন, স্বাধীনতা তখনো পাইনি আমরা, যুদ্ধ শেষ হলো কেবল।

কিন্তু তা বলে পীতাম্বরবাবুকে খুব বেশী বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না। লম্বা ছ' ফুটেরও বেশী দোহারা কাঁচা সোনার মতো রঙ, খালি চামড়াটা মাঝে মাঝে ফাটা এই যা। পায়ে পাম্প-সু পরেন শুধু বর্ষার কটা মাস ছাড়া আর সব সময়। ধুতি, পাঞ্জাবী সব সময় ধোপার বাড়ীর পাট-ভাঙ্গা। শীতে গায়ে কাজ করা কাশ্মীরের শাল, গরমে মুর্শিদাবাদের সিল্কের চাদর। বয়স অনুমান করা শক্ত। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে কোথাও।

সব সময় হাসছেন তিনি কারণে-অকারণে। লোকে বলে পীতাম্বরবাবুর হাসি ছাড়া মুখ তারা কখনও দেখেনি।

সংসারে তাঁর আশ্রিতজন অনেক।

উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালের বন্যা পীতাম্বরবাবু দেখেছেন এই কেশবপুর গ্রামে বসেই।

পীতাম্বরবাবু কোথাকার লোক কেউ তা জানে না। উনিশ শ' বাহান্ন-তিপ্পান্ন সালের কোনও এক সময় এক টুপী কোম্পানীর এজেণ্ট হয়ে এসে তিনি বসলেন কেশবপুরে। দু-তিন বছর যেতে না যেতে এ গ্রামেই বাড়ী করলেন তিনি। দোতলা রীতি-মত ভিত পুঁতে পাকা দেওয়াল গেঁথে ছাদ পেটাই করে।

যে বছরে গৃহপ্রবেশ সেই বছরেই দেশজোড়া বন্যা এল।

নিজের পাকাবাড়ীর দোতলায় বসে মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখেছেন তিনি। দলে দলে সবাইকে ডেকে এনেছেন নিজের বাড়ীতে। আহার দিয়েছেন সাধ্যমত, বাসস্থান দিয়েছেন। রোগীকে ওষুধ দিয়েছেন নিজের হোমিওপ্যাথিক

আস্তে আস্তে বাড়লো জল। বাড়তে লাগলো তো লাগলোই। বাড়ির সবাই ঘুমে অচেতন। হঠাৎ এক জন কোথায় চেঁচিয়ে উঠলো, বন্যা আসছে! দেখা গেল পূবের মাঠে চিক-চিক করছে জলের রেখা পঞ্চমীর চাঁদের আলোয় ধাক্কা লেগে।

অমনি সচকিত হল সবাই। গরু-বাছুর গোয়াল থেকে আনা হল উঠোনে। সেখান থেকে বাইরের বারান্দায়।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

আশীষ বসু

চারদিকে সোরগোল। যে যার ধনসম্পত্তি সামলাচ্ছে।

গাছে মাচা বাঁধছে কেউ তাড়া-তাড়ি।

জল আরও এগিয়ে এলো। প্রথমে পায়ের পাতা পর্যন্ত জল, পরে গোড়ালী অবধি, শেষে হাঁটুপ্রমাণ জল।

আর সে জলে ভেসে আসছে কত কি। সাপখোপ, জন্তুজানোয়ারের হাড়, কচি বাচ্চার মুখে দিয়ে চুষবার লাল কাঠিটা থেকে কাঁথা, মাদুর সব। পাশের গঙ্গায় যেন আর ধরছে না

বাড়তেই লাগলো জল। ঝোঁকের [illegible] জলপোকে [illegible] উনুন ধরালো। [illegible] চিড়ে [illegible] আর [illegible] গুড় ব্যবস্থা।

নৌকো ছিল জনাকয়েকের তাই নিয়ে পানীয় জল আনা হতে লাগলো তিন-চার মাইল দূরে গিয়ে। এক নৌকায় চার টিন জল আর একজন মানুষ। একটিন জলের দাম দু' আনা থেকে বাড়তে বাড়তে এক টাকা।

গরু বাছুর সামলানো ক্রমে অসম্ভব হয়ে পড়লো।

দুধ পাওয়া যায় না একেবারেই। গরুতে ভয়ে দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে। আটার সঙ্গে জল মিশিয়ে গরম করে খাওয়াতে গিয়ে মারা গেল জগদীশ স্যাকরার বউয়ের দেড়মাসের বাচ্চাটা।

সেই সর্বনাশা বন্যায় এগিয়ে এসেছিলেন পীতাম্বরবাবু। সবাইকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের বাড়ীতে।

বন্যার জল নেমে গেল আস্তে আস্তে। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিন দিন গেল, সরতে লাগলো জল। তারপর একটু একটু করে কুঁড়েঘরের চালের মাথা জাগলো, জল দাঁড়ালো নেমে এক কোমরে। কোমর থেকে হাঁটু। তারপর মাঠে ঘাস দেখা গেল, দেখা গেল আগাছার মাথা।

তিন দিন তিন রাত্রি জল বেড়েছে ক্রমাগত। এদিকে জল বেড়েছে এক-নাগাড়ে আর ওদিক থেকে আকাশ ধরবার লক্ষণ নেই কোন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়েছে তোড়ে। বড় বড় ফোঁটায় পড়েছে জল যেন গায়ে ছুঁচ বিঁধছে, বাইরে কোথাও একমিনিট দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে সে যো নেই। জল কমলো অবশেষে, বর্ষা থামলো।

মানুষ এক এক করে ফিরে গেল ঘরে।

বন্যায় যতটুকু দুর্গতি হয়েছিল লোকের বন্যার পর তা আরও বাড়ল। গরু বাছুরগুলো কোথায় ছিটকে পড়ে, পাওয়া গেল না খুঁজে বেশীর ভাগই।

বেঁচেছিল যৎসামান্য তার দাম হোল তিন গুণ। সুযোগ বুঝে মহাজনেরাও দাম বাড়ালো জিনিষের। খাবার জল নেই কোথাও এ তল্লাটে, ও পাড়ার টিউবওয়েলটা অকেজো হয়ে আছে। গাঁয়ের পুকুরগুলোর জল ব্যবহার করা যাবে না। খড় বিচালী নেই যে মটকায় দেবে ক' গাছা, দিয়ে মা। গুঁজবে কোনওক্রমে।

রিলিফের ভিটামিন ট্যাবলেট আর গুঁড়ো দুধ, চিঁড়ে আর গুড় শেষ হয়ে গেল ক'দিনেই। স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলির উৎসাহে ভাঁটা পড়লো ক্রমে।

জল নেমে গেল। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর আস্তানা ছেড়ে এক এক করে সবাই ফিরে গেলো ঘরে। শুধু রয়ে গেল তিনজন। এক ভাই, দুই বোন। রতন, কামিনী আর কল্যাণী।

রতন, কামিনীর বাবা চরণ ঘোষকে একদিন এক ডাকে চিনতো সবাই। তার মতো বড় লেঠেল এ অঞ্চলে বড় একটা ছিল না। জমিদার শৈলেশ্বরবাবুদের বাড়ীতে একসময় পাকা চাকরী ছিল তার। কর্তারা মরে যাওয়াতে একসময় চাকরীতে জবাব হয়ে গেল। কেশবপুরের পালেদের অবস্থা তখন ক্রমেই খারাপ হচ্ছে বয়সও বাড়ছিল চরণ ঘোষের।

চাকরী যাওয়াতেও খুব বেশী কষ্ট হয়নি চরণ ঘোষের। বাবুদের দেওয়া জমি-জায়গা কিছু ছিল। গরুর গাড়ী করেছিল একখানা। দিন চলে যেতো একরকম করে।

ওই বড় মেয়ে কল্যাণী। তা বেশ ডাগরটিই হয়েছিল ততদিনে। বাড়ন্ত চেহারায় যেন বাপের মতোই দেখতে। তারপর কামিনী পিঠোপিঠি এক বছরের এধার ওধার। সবচেয়ে ছোট ওই ছেলেটা যখন কোলে এল পাঁচ ছ' বছর পরে তখন কামিনী-কল্যাণীর মা মারা গেল।

মা মারা যাবার পর বাপের ভার মায়ের দু জনের স্নেহ দিয়েই ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছিল চরণ ঘোষ।

বন্যার রাতে খবর পাওয়া গেল চরণ ঘোষ গরুর গাড়ী নিয়ে ফিরছিল কেশবপুরে। পথে গাড়ীসমেত ভেসে গেছে সে। পরে তার মরা দেহটা পাওয়া গেল আখের জঙ্গলে—গঙ্গার চরে—কিসে যেন ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে সারা দেহটা।

বন্যা দেখেই কামিনী, কল্যাণী, রতনকে সবাই ঘর থেকে টেনে এনেছিল পীতাম্বরবাবুর বাড়ীতে।

জল নেমে গেল। সবাইয়ের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করলেন পীতাম্বরবাবু। পুষবে কে।

কেশবপুর গ্রামে মাথা গুণতি কয়েকজন গঙ্গাধরবাবু, ত্রিলোচনবাবু, পীতাম্বরবাবু আর শৈলেশ্বরবাবু—যাঁরা নিজেদের সংসার নিশ্চিন্তভাবে চালিয়ে আরও দু একজনকে পুষতে পারেন বাড়ীতে অন্নবস্ত্র দিয়ে।

কিন্তু অত বড় সোমত্ত মেয়েদের নিয়ে ঘরে রাখতে সাহস করবে কে। পাল গিন্নী না, ত্রিলোচনবাবুর স্ত্রী সাধনা না, কেউ না। বরং সবাই পীতাম্বরবাবুকেই পরোক্ষভাবে বলে গেল, আপনার বাড়ীতেই রাখুন না গাঙ্গুলীমশাই। আপনার তো শুনেছি তিনকুলে কেউ নেই। বুড়োবয়সে একটু যত্নআত্তি হবে।

কথাটার মধ্যে কোথাও একটু খোঁচা ছিল হয়ত। বিদ্রূপ মেশানো ছিল রসনায় তবু পীতাম্বরবাবু ফেলতে পারলেন না তাদের। নিজের ঘরেই রাখলেন আগের মতো।

শোলার টুপীর কারবারে ঢুকলো রতন। রাতে পাহারা দিতে হবে অফিস ঘর। লেঠেল চরণ ঘোষের ছেলে, বললেন পীতাম্বরবাবু, হলেই বা বারো বছর বয়স, এই সামান্য কাজটুকু পারবে না তার।

কামিনী, কল্যাণী গেল হেঁসেলে।

●

রিহার্সাল রুমে চামেলীর জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই।

লায়নস রেঞ্জের বড় সওদাগরী অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের রিহার্সাল বসেছে ক্যানটিন হলে। সাময়িকভাবে ক্যান্টিনটাই ব্যবহার করা হচ্ছে রিহার্সাল রুমের কাজে। বিকেলে ওটা বন্ধই থাকে।

ছ'টা বাজতে এখনো বাকী কয়েক মিনিট। বড় সাহেবেরা এখন যে যার ব্যস্ত নিজের নিজের ঘরে। ডিরেক্টার রুমে মিটিং বসেছে জরুরী। বড়বাবুরা দিনের শেষে জমানো কাজ সারছেন এক এক করে। শীতের সন্ধ্যায় বেলা পড়ে এসেছে এর মধ্যেই। সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অফিসের ঘরগুলোর মধ্যে অন্ধকার জমে ওঠে। বড়বাবুদের টেবিলে বাতি জ্বলছে।

রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাতব্বর শ্রেণীর মেম্বারেরা মাঝে মাঝে এসে তাড়া লাগাচ্ছেন নিজের নিজের সেকসনের বড়বাবুদের, কই দাদা চলুন ওদিকে সবাই যে আপনাদের জন্যে বসে।

চামেলী বিবি এসেছে তোমাদের। বিল সেকসনের বড়বাবু হরিসাধন চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন।
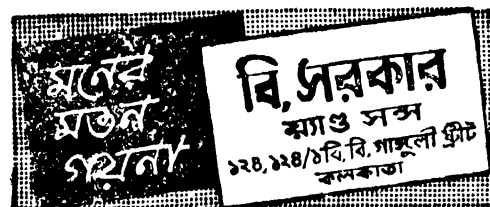
এই এসে পড়ল বলে।

এসে পড়লে ডেকো যাবো তখন। ওদিকে আবার আর্থার সাহেব গেছেন মিটিংএ এসেই হয়তো খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন।

আর একজন টিপ্পনী কাটলো, হরিদার বয়স যত বাড়ছে তত যেন বাড়ছে ঐ যে কি বলে---। বলে কি না চামেলী বিবি এলে তবে ডেকো যাবো।

কথাটা আস্তে বলা তাই রক্ষে, হরিসাধনবাবু শুনলে কি হোত বলা যায় না।

চামেলী এসে পড়লো অল্পক্ষণের মধ্যেই। সঙ্গে ইন্দ্রনাথ।

অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক কেরাণীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

খাঁটী টাকার এক পয়সা কমে রাজী হল না, জানিস। ঐ তো চেহারা, নেহাৎ হিরণ্ময়দার খাতিরে, নয়তো ওকে চান্স দিতো কোন আহাম্মক।

যাই বলিস টেস্ট আছে, ব্লু-শাড়ী-খানার সঙ্গে জামা আর ব্যাগটা ম্যাচ করেছে সুন্দর। গায়ের রঙটা চাপা হলেও মুখটায় শ্রী আছে। হিরণ্ময়বাবুর টেস্ট আছে।

অভিনয়ও ভালোই করে।

অভিনয় না ছাই পেটের দায়ে এসেছে।

হাফ-গেরস্থ আর কি।

হাফ নয়, হাফ নয় ফুল, দু'শো টাকা খরচা কর না।

এই আস্তে, সঙ্গের লোকটা আসছে।

লোকটার চেহারাটা কেমন চোয়াড়ে চোয়াড়ে দেখছিস, বোধহয় চামেলীর স্বামীও হতে পারে। দুঃখ হয় বেচারার জন্য।

দুঃখ হয়, বলিস কিরে। অমন একখানা স্ত্রী থাকলে কোন আহাম্মক বড়বাবুর খিঁচুনী খেতো অফিসে। লেজারে ফিগার কষতে কষতে জানটা খোয়াতো কোন গবেট। জানিস ও

[illegible]

অভিনয়---অভিনয় হলো একটা আর্ট। অভাবের তাড়ায় সে এসেছে, তার মধ্যে তা আসবে কোথা থেকে।

রেখে দে ওসব ছেঁদো কথা। এবারে কিন্তু থিয়েটারটা জমবে না তোকে বলে দিলাম। একটু নাচিয়ে মেয়ে না হলে।

ইন্দ্রনাথ এসে বসলো পাশের একটা খালি চেয়ারে।

রিহার্সাল শুরু হোলো।

৭

পুরোনো বই আর কাগজ জমা করে স্পিরিট জ্বালিয়ে পোড়াচ্ছিল মণিময়।

টেবিলে অনেক বই। অনেক মানুষের অনেক চিন্তাধারা জমা রয়েছে সেখানে। এত মানুষের এতো চিন্তা-ধারাকে যেন আর নিজের মধ্যে রাখতে পারছে না সে।

মকর গিয়েছিল বাজারে সিগারেট আনতে। ফিরে এসে দাদাবাবুর কাণ্ড দেখে অবাক। একি করছেন বাবু, ঘর-দোরে সব আগুন লাগিয়ে বসবেন যে শেষে।

ঘর-দোরে তো আগুনই লাগাতে চাই রে। হ্যাঁরে মকর, যখন রাত্তিরে ঘুমিয়ে থাকবো তখন ঘরে শিকল তুলে দিয়ে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দিতে পারিস না।

ওমা কি সব্বনেশে কথা, বাবু কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি। সরুন, সরুন।

ভাবছিল মণিময়, অমনি করে করে স্পিরিট মাখিয়ে দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলা যায় না অতীত। স্মৃতি-গুলোকে করা যায় না নিঃশেষ।

টেবিল থেকে আরও খানকয় বই নিয়ে এসে সে ফেলে দিল আগুনে। পুড়ে যাক, পুড়ে সব ছাই হয়ে যাক।

৮

রাত্রে পীতাম্বরবাবুর বাড়ীতে রোজই তাস খেলার আসর বসে। সে আসরে আসেন গঙ্গাধরবাবু, ত্রিলোচন-

[illegible]

আবদুল হোসেন। অরুণবাবু আসেন আর আসে মণিময়ও। মাঝে মাঝে আসেন সুধাংশুবাবুও। এই বিদেশে কোথায় আর যাবেন। সন্ধ্যেটা কাটে কি করে।

ফ্লাস খেলা হয় রোজ। সারা টেবিলে জমানো থাকে টাকা। রঙের সঙ্গে রঙ মেলে হাতে হাতে। মিল হয় নম্বরে নম্বরে ট্রায়ো, রানিং ফ্লাস, রান। টাকার স্তূপ জমা হয় ভাগ্যবানের দুয়ারে।

রাতের কাঁটা গড়ায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কাপের পর কাপ চা জোগায় কামিনী। কল্যাণী থাকে রান্নাঘরে।

বেশ ডাগর হয়েছে তো মেয়েটা পীতাম্বর। তা তুমি যদি বিয়ে-থাওয়ার চেষ্টা না দেখো তো বুড়োবয়সে বলো টোপর মাথায় আমিই না হয় চেষ্টা করি একবার। স্থূল রসিকতা করেন গঙ্গাধরবাবু।

সে পীতাম্বর কি আর নিজের জন্যেই ভাবছে না। রসিকতাটা আরও এক হাত এগিয়ে দেন শৈলেশ্বরবাবু। তা বলি পীতাম্বর, খুব সাবধান, ওরা কিন্তু জাত লেঠেলের বংশ। ওর বাবাকে এক লাঠির ঘায়ে পর পর সাজানো তিনটে ডাব ফাটাতে আমরাই দেখেছি।

আলোচনার মাঝে সাজা পানের ডিবেটা আর মশলার প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে ছুটে পালায় কামিনী।

মণিময় নিজেকে কোনও দিনই এ আড্ডায় খাপ খাওয়াতে পারে নি। তবু লোকের মুখ দেখতে গেলে এখানেই আসতে হবে। রেডিও, বই আর ম্যাগাজিন নিয়ে চালানো যায় আর কতদিন। দেখতে দেখতে দু' বছর তো কাটলো কেশবপুরে।

৯

সেদিন বিকেলে স্কুলের মাঠে সভা বসছে। সকাল থেকেই পীতাম্বর-বাবুর ছোটাছুটির বিরাম নেই।

বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে ঘেরা হচ্ছে মাঠ। তার মধ্যে বাঁখারির বেড়া দিয়ে দড়ি টেনে পৃথক করা

[illegible]

জায়গা। মাঝখানে রাস্তা বার করা হচ্ছে, সভাপতি আর মাননীয় অতিথিরা যাবেন সেখান দিয়ে।

মণ্ডপ বানানো হচ্ছে ঠিক মাঝখানে; উঁচু করে। চারদিকে ঘিরে সাজানো হচ্ছে তা ত্রিবর্ণ পতাকা দিয়ে। স্কুলের ছেলেরা রঙীন কাগজ কেটে কেটে শেকল বানাচ্ছে তিনরঙা তারপরই তাই সাজিয়ে দিচ্ছে চারধারে দড়ির মাথায় খাটিয়ে খাটিয়ে।

মাঝখানে মণ্ডপের সামনেই একটি লম্বা বাঁশের সঙ্গে কপিকল করে খাটানো একটা দড়িতে জাতীয় পতাকা। সভাপতি মশায় প্রথমে এসেই পতাকা তুলবেন।

যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরে আসতে বলা হয়েছে ছেলেদের। স্কুলের আজ পুরস্কার-বিতরণী সভা। কৃষ্ণনগর থেকে প্রবীণ দেশকর্মী শক্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায় আসছেন পারিতোষিক বিতরণ করতে।

ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন এগিয়ে আসছে ক্রমেই। রথ দেখা আর কলা বেচা দুই হবে ভেবে সভায় সভাপতিত্ব করতে রাজী হয়েছেন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীশক্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। স্কুলের চেয়ারম্যান পীতাম্বর অনুরোধটা উপেক্ষা করেন নি।

●

হেলথ ইনসপেক্টার ডি ডি টি ছড়াতে কেশবপুরে আসবেন আজই। যেদিনই আসেন সেদিন দুপুরে চান করা, খাওয়াটা পীতাম্বরবাবুর বাড়ীতেই বাঁধা তার।

শুধু হেলথ ইনসপেক্টার নয় সরকারী কর্মচারী, অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁরাই আসেন কেশবপুরে পীতাম্বরবাবুর আতিথ্য এড়িয়ে যাওয়ার শক্তি তাঁদের অধিকাংশেরই নেই।

কেশবপুর এমন একটা জায়গা যেখানে আসতে হলে সকালে আপনাকে বেরিয়ে পড়তে হবেই। যদি জীপ নিয়ে আসেন তো ফিরতে পারেন সন্ধ্যা আনবার। সরকারী ডাক-বাংলো আছে, দেড়মাইল দূরে গিয়ে থাকতে চান থাকুন কিন্তু নৈশ আহারটা পীতাম্বর-বাবুর বাড়ীতে সারতেই হবে আপনাকে।

কামিনী, কল্যাণীর আজ কাজের শেষ নেই। দুপুরে খেতে আসবেন হেলথ ইনসপেক্টার শ্যামাদাস সিদ্ধান্ত। বিকেলে স্কুলের মিটিঙের স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য তৈরী হবে লুচি আর আলুর দম। রাত্রে এখানে খেয়ে যাবেন স্কুল মাঠের মিটিঙের সভাপতি শক্তিভূষণবাবু আরও জনাকয়েক। সারা দিনটাই বাড়ীতে যেন হৈ-হৈ লেগে আছে।

●

সভায় যায় নি মণিময়। বাড়ীতে বসেছিল একাই। বসে বসে ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়েছিল। আঠাশে ডিসেম্বর, উনিশ শো আটান্ন সাল। আজ মেঘমালার জন্মদিন। সাতুই জানুয়ারীটায় দাগ দেওয়া আছে লাল গোল করে। মেঘমালাই দিয়েছিল ক্যালেণ্ডারটা। গোল লাল দাগটা তারই দেওয়া পাছে সে ভুলে যায় জন্মদিনের কথা।

মেঘমালার সমস্ত স্মৃতিচিহ্নগুলোকে আজ সে নিঃশেষে পুড়িয়ে দিয়েছে। একরাশ চিঠি, এ্যালবাম ভর্তি ফটো সব কিছু।

সিগারেটের গোটা টিনটা সামনে পড়ে তার। সেরামিকসের এ্যাসট্রেটা সিগারেটের পোড়া টুকরোয় যেন উপছে পড়ছে।

ক্যালেণ্ডারটাও টেনে নামালো মণিময়। ছিঁড়বে টেনে এমন সময় মকর এলো। জিজ্ঞাসা করলো, খাবার আনবো না খাবেন যেতে?

প্রথমে কোয়ার্টারেই রান্না করাতো মণিময়। সপ্তাহ দু'য়েক হোল রান্না-বান্নার পাট বন্ধ করেছে সে। পীতাম্বর-বাবু তাস খেলার আসরে নিজেই
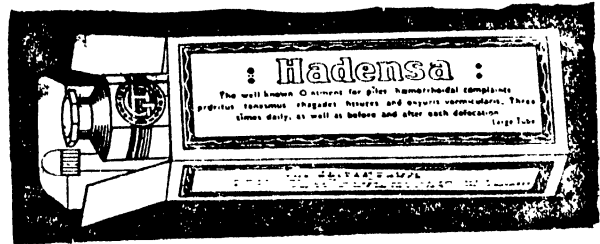
বললেন, কেন মিছে হাত পোড়াচ্ছেন মশাই বিদেশে এসে তার ওই মকরটা কি জানে রান্নাবান্নার।

কি করি তাহলে বলুন।

যদি খুব আপত্তি না থাকে তো গরীবের বাড়ীতে।

কিন্তু আপনার?

এসে খেতে অসুবিধে হয়তো লোকটাকে পাঠিয়ে দেবেন টিফিন ক্যারিয়ার দিয়ে।

রাজী হতে পারি যদি টাকা নেন তবেই।

টাকা ছাড়া আপনাকে খাওয়াবো এমনই বা ভাবলেন কেন?

তখন আর আপত্তি করলো না মণিময়।

মকরের কথার জবাব দিল মণিময়, না নিজেই যাবো খেতে। তুমি শুয়ে পড়ো।

●

তখনও সভার কাজ সেরে ফেরেন নি পীতাম্বরবাবু। খেতে এসে একাই বসেছিল মণিময়।

চাকরকে দিয়ে ভেতর থেকে খবর পাঠালো কল্যাণী, বাবু কি এখুনি খাবেন। তাহলে জায়গা করে দাও বাইরের দরদালানে।

পীতাম্বরবাবুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন একদিন, আপনি তো ঘরের ছেলের মতো। লজ্জা করে খাবেন না কিন্তু চেয়ে নেবেন যখন যা দরকার। দেখো কল্যাণী মণিময়বাবু যেন আধপেটা না খেয়ে যান।

কল্যাণীই খাবার দিল এনে।

দোতলা বাড়ী পীতাম্বরবাবুর। উপরে দু'খানা ঘর, নীচে দু'খানা। নীচের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বৈঠকখানা সেখানে বাইরের লোকজন এসে বসে। তলায় আর উপরে যে দু'খানা ঘর তার সঙ্গে ঘরজোড়া দরদালান। নতুন করেছেন বাড়ী।

বিজলী বাতির ওয়ারিং করা হয়ে গেছে সারা বাড়ীতে। শুধু কানেকসন আসে নি এখনো।

হ্যারিকেনটার পলতেটা আরও উসকে দিল কল্যাণী।

পাতে অন্ধকার হচ্ছিল আপনার কেন বলছিলেন না?

কই না তো।

প্রসঙ্গ পালটালো কল্যাণী, রাত্রে বোধহয় বাড়ীতে রুটি খাওয়া অভ্যাস আপনার। ভাত খেতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে খুব।

অভ্যাস বলে কিছু হয় নি কখনো। গরীবের বাড়ীর ছেলে যখন যা পেয়েছি খেয়েছি।

বাড়ীতে কে কে আছেন আপনার?

মা, বাবা।

মা আছেন। বাবা মারা গেছেন কিছুদিন আগে।

ভাইবোন?

দু' ভাই, দু' বোন।

তবু এই অল্প বয়সে বেরিয়েছেন চাকরীতে?

আমিই বাড়ীতে ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো।

এতক্ষণে মুখ তুলে কল্যাণীর দিকে তাকালো মণিময়। এ ক'দিন খেতে এসেছে মণিময় প্রায়ই সকালের দিকে। রাতের খাওয়াটা মকরই দেয় এনে। পীতাম্বরবাবুর সঙ্গে বসে খায়। চাকর পঞ্চানন থালা, বাটি এগিয়ে দেয়। ভিতরে বসে কল্যাণীই তদারক করে সব। বাইরে খেতে খেতে মণিময় বুঝতে পারে তা।

কল্যাণীর মুখটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে আলো-আঁধারে মিশে। টকটকে চওড়া একখানা লালপাড় শাড়ীতে তার সর্বাঙ্গ মোড়া। মাথায় ঘোমটা নেই। গায়ের রঙ মাঝামাঝি, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই, প্রমাণ সাইজের লম্বা। তার সম্পর্কে নানা কথা শুনেছে মণিময় নানা লোকের কাছে কিন্তু কখনো এমন করে একান্তে বসে তাকে দেখতে পাবে বোধহয় ভাবে নি।

কল্যাণীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মণিময়। সমস্ত মুখখানা যেন একটা সম্পূর্ণ কান্না।

কল্যাণীও বোধহয় তাকিয়েছিল তার দিকে। হঠাৎ কামিনীর ডাকে সচকিত হয়ে মণিময়কে ডেকে বললো যে, কই কিছুই খাচ্ছেন না যে? কামিনী শুধু দুধ আনলি যে নতুন গুড় আছে নাগরীতে এনে দে না তোর মণি-ময়দাকে।

নামটা মণিময়ের সামনে উচ্চারণ করে হঠাৎ লজ্জাই বোধহয় পেলো সে। তাড়াতাড়ি আঁচল সামলে উঠে গেল সেখান থেকে। [ক্রমশ।

বিষাদ

গোবিন্দ গোস্বামী

শোকাবহ দিন উদাসী বাউল হয়ে
বাতাসের কানে শোনালো ব্যথার সুর
অতল আলোয় বেদনা বাজিয়ে রেখে
পলাতক দিন পালিয়ে গেল যে দূর।

পায়ে চলা পথ বেলা অবেলার টানে
কোন আঘাটায় ভিড়েছে কখন এসে,
শেষ যদি শুরু শোকের বিষাদ কেন
বললো অনেকে বলার যা কিছু ছিল।

ভাঙা দোলনার শোলকে টাঙিয়ে স্মৃতি
বয়স কখন বিকেলের মুখোমুখি
দাঁড়িয়ে রয়েছে একেলা দিনের বাণী
করুণ কথাটি করুণায় লিখে রেখে।

জলের রেখায় ক্রমশ সুদূরে গতি
চোখের কাজলে সময় নামায় কালি
আয়নায় ভাসে দেয়ালের দেখা ছবি
বেদনার রেখা বেদনায় ঢেকে রাখি।

• হাতের কাজ •

মুখোস

—মিনতি চৌধুরী

(১ম পুরস্কার)

সীবন-শিল্প

—বিন্দুশেখর বিশ্বাস

(২য় পুরস্কার)
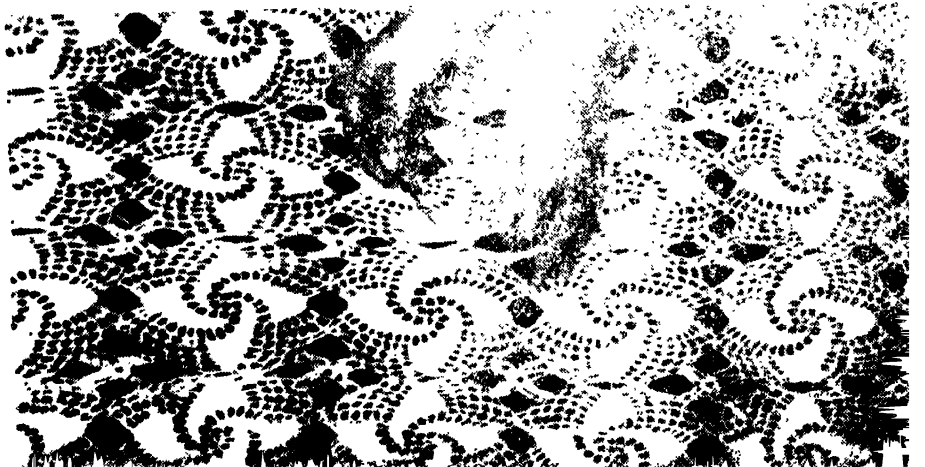
মাসিক বসুমতী কার্তিক

• হাতের কাজ •

মূর্তি-নির্মাণ

—প্রবোধকুমার ঘোষ

(৩য় পুরস্কার)

কুম্ভকারের চাকা

—বিশ্ববন্ধু বসাক

● হাতের কাজ ●

সেলাই-পর্ব

—দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক

বসুমতী

কার্তিক / '৭৫

উপজীবিকা

—শম্ভু মুখোপাধ্যায়

।। কিশোরী বেলায় ।।

—সুপর্ণা মিত্র

মাসিক বসুমতী। কার্তিক / '৭৫

—সুভাষ নন্দী

—এম আর দত্ত

—প্রশান্ত চৌধুরী

যৌন জ্ঞান

যৌনতা, রোমান্স ও বিবাহ

সার্থক দাম্পত্য মানে এক নিখুঁত শিল্পকর্ম। ধীরে ধীরে এবং কখনও যথেষ্ট সহনশীলতার মাধ্যমে একে গড়ে নিতে হয়।

কৌশল ও অতলান্ত সহানুভূতির প্রয়োজন দাম্পত্যকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য, সেই সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতারও।

আমার কাছে বিবাহেচ্ছু কোন যুগল উপদেশ নিতে এলে প্রথমেই আমি তাদের বলি---এ সম্বন্ধে বইটই বেশী পড়ো না যেন, কারণ দাম্পত্য সম্বন্ধীয় বইপত্রে একটা দিকই শুধু দেখানো হয়ে থাকে। তা হল যৌনসম্পর্ক ; অধিকাংশ লেখকের মতেই দাম্পত্যের প্রথম ও প্রধান সমস্যা যৌনতাভিত্তিক---যেন এ ছাড়া এ বিষয়ে আর কিছুই ভাববার নেই।

দাম্পত্য জীবনে যৌনসম্পর্ক যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য এবং বিবাহিত জীবনের আদিপর্বে এর প্রভাবই যে সবচেয়ে বেশী এ কথাও সত্য, কিন্তু তবু বলতেই হবে যে, এটাই সব নয়।

যৌন আবেগের তীব্রতা ক্রমেই মন্থর হয়ে আসে, আর সেজন্যই দাম্পত্যকে চিরস্থায়ী করতে হলে চাই পারস্পরিক সমঝোতা---যার মূলে থাকে স্নেহ-প্রীতির অচ্ছেদ্য মায়াডোর। এবং এ জন্যই প্রথম মিলনের উন্মাদনামুখর দিনগুলি কেটে যাওয়ার পর, দৈনন্দিন যুগল জীবনযাত্রার গতি মসৃণ রাখার পক্ষে সামঞ্জস্য এত প্রয়োজনীয়।

যৌন সম্পর্কীয় বইপত্র বেশী পড়াটাও মোটেই হিতকারী নয় দাম্পত্য জীবনের পক্ষে। এ ধরণের রচনাদির সংস্পর্শে এলে মাথা গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী কারণ যৌন সম্পর্ককে একটা বাঁধা ফর্মুলার মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে সচরাচর এই সব রচনার সাহায্যে। কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে দীর্ঘদিনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতেই জেনেছি যে, সব মানুষের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে এক ও বাঁধাধরা কোন নিয়ম থাকতেই পারে না।

যৌন ব্যাপারে প্রত্যেক দম্পতিরই নিজস্ব রুচি ও ভঙ্গীটি আছে, নিজের নিজের রুচিবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তৃপ্তিই খুঁজে থাকে এ ক্ষেত্রে সব মানুষ।

ধরুন বইপড়া ছকের ধাঁধায় বিভ্রান্ত হয়ে কোন দম্পতি যদি নিজের যৌনসম্পর্ককে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে বিচার করে নিতে চান ? তা হলে অবস্থাটা কি শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে না ?

বই পড়ে তাঁরা জানবেন যে এতদিন যেভাবে তাঁরা তৃপ্ত ও আনন্দিত হয়ে এসেছেন তার সবটাই ভুল, এখন থেকে বইয়ে লেখা ফর্মুলা অনুসারে তাঁদের তৃপ্তি ও আনন্দ খুঁজে নিতে হবে, না হলে সমূহ বিপদ।

এ ধরণের ধারণা মগজে একবার সেঁদুলে সমগ্র দাম্পত্যজীবনটারই ভিত আলগা হয়ে যেতে পারে।

কাজেই বিজ্ঞানভিত্তিক দেহবাদ থেকেই যে দাম্পত্য সম্বন্ধ সম্পর্কে সবকিছু সঠিকভাবে জানতে পারা যায় এ কথা ঠিক নয়।

আবার রোমান্টিক কল্পনা আশ্রয়ীও হতে পারে না দাম্পত্যজীবন, রোমান্টিক উপন্যাস বা প্রেমবহুল ছায়াছবি, নাটক ইত্যাদি থেকে যাঁরা সফল দাম্পত্যের প্রেরণা লাভে আগ্রহী তাঁরাও ভুল পথে চলেন, জীবনের সার্থকতা তাতেও মেলে না।

দৈনন্দিন যুগল জীবনের ছন্দ অব্যাহত থাকে কেবল প্রেমে নয়, সহৃদয় সমঝোতায়, প্রণয় ভাষণের চেয়ে স্নিগ্ধ সহমর্মিতাই দাম্পত্যকে অধিকতর সরস করে তোলে। জীবনের চলার পথে মনোমত সঙ্গীই সবচেয়ে দুর্লভ বস্তু, সব সময় মানুষের ভাগ্যে তা মেলে না, কিন্তু ধৈর্য সহানুভূতি ও সযত্ন পরিশীলনে প্রকৃতিগত বৈষম্যকেও জয় করা অসম্ভব নয় এবং তাতেই নিহিত রয়েছে সার্থক ও সফল দাম্পত্য-জীবনের সম্ভাবনা। জীবন আরম্ভের ঊষায় চোখে যতই না স্বপ্নের কাজল মাখা থাক, বাস্তবের রূঢ়স্পর্শে সে কাজল মুছে যেতেও বিলম্ব হয় না, কিন্তু তাই বলে কি জীবনকে মনে করতে হবে অসফল, অসার্থক, ব্যর্থ ?

ধীর-স্থির আবেগবর্জিত বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে বিশ্লেষণ করে দেখুন, দেখবেন একটু ধৈর্য একটু প্রীতির ছোঁয়ায় কেমন করে পালটে যেতে পারে সবকিছু ; পথচলার সঙ্গী হিসাবে যার হাত ধরেছেন একটু সহানুভূতির চোখে তার দিকে তাকান দেখবেন চলার পথে কোন বাধাই আর আপনার চলার ছন্দের তাল একেবারে কেটে দিতে পারছে না।

—বাৎস্যায়ন

দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বস্ততা

সবটাই যেন বাধা ছকে গাঁথা, রোজ কয়েকটি কাজ করতো আমার ল্যাবরেটরিতে, প্রায়ই গভীররাত পর্যন্ত কাজ করেছি আমরা পাশাপাশি। তার প্রতি যে বিশেষ একটা কোন আকর্ষণ অনুভব করেছি তাও তো নয়, তবু যা ঘটার তা তা ঘটলই, দেহসান্নিধ্যে ঘনিয়ে এলাম আমরা।

গত সপ্তাহে আমার স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে গেলাম একেবারে সোজাসুজি, অপ্রত্যাশিতভাবে ল্যাবরেটরিতে এসে পড়েছিলেন তিনি।

জানি না এখন কি করব।

নামকরা এক বৈজ্ঞানিকের খেদোক্তি এটি, ভদ্রলোক রিসার্চ করে এরই মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিন ছেলে-মেয়ের বাপ তিনি, বেশ সুখের সংসার, সে সংসারের প্রতি যথেষ্ট মমত্ব বোধ আছে তাঁর, তবু তো ভাঙ্গন এল।

কেন যে এমন হল জানি না, অসহায়ভাবে বললেন তিনি---এমনটি কি হতেই হবে?

দাম্পত্যজীবনে অবিশ্বস্ত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক এক ঘটনা, যদিও বেশীর ভাগ মানুষই এ কথা মানতে রাজী নন।

কিনসে-রিপোর্টে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশিত তাও কম বিস্ময়কর নয়।

প্রায় দশহাজার বিবাহিত নর-নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে জানা গিয়েছে যে, প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন পুরুষ ও বারজনের মধ্যে একজন নারী অন্তত চল্লিশোর্ধ্বে না পৌঁছনো পর্যন্ত অবৈধ যৌন-জীবন যাপন করেছে।

এমন অনেক সমাজ এখনও বর্তমান যেখানে পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণের অধিকার স্বীকৃতি পেয়ে আসছে বহুদিনাবধি, এমন কি রক্ষিতা বা উপপত্নী গ্রহণের অধিকারও সমাজ দিতে কুণ্ঠিত নয় যদি পুরুষ ঐশ্বর্যশালী হয়। অবশ্য এসবই চলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সমাজে আধুনিক সভ্য সমাজে এ প্রথা নেই, আমাদের সমাজ বহুচারিতা সমর্থন করে না।

যখন কোন পুরুষ বা নারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, বর্তমান সমাজের রীতি ও আইন অনুযায়ী তাকে পতি বা পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়।

অধিকাংশ সমাজেই একসঙ্গে একাধিক বিবাহ এখন আইনত নিষিদ্ধ।

তবু দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ততার দেখা মেলে না কেন প্রায়শ?

এ ব্যাপার নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, সেই সব পণ্ডিতদের মতে পুরুষমানুষ স্বভাবতই বহুচারী।

ডঃ কিনসে বলেন---বেশীর ভাগ পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্কের লিপ্সা জাগে, বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভের লোভে। বৈচিত্র্যের আস্বাদ গ্রহণ করতে পুরুষমাত্রই আগ্রহী, তা সঙ্গীত, সাহিত্য-শিল্পের মত ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই হোক, এবং এই বৈচিত্র্য-সন্ধানী মানসিকতাই নাকি পুরুষের বহুগামী প্রবৃত্তির মূল কারণ।

মেয়েরা আবার স্বভাবতই মনোগেমাস বা একমুখী, তবে এর কতটা দৈহিক কারণে এবং কতটা শিক্ষাদীক্ষার ফলে তা নির্ণয় করা একটু কঠিন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে স্বতন্ত্র শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ পেলে মেয়েরাও নাকি বৈচিত্র্য সন্ধানী হয়ে উঠতে পারে।

সি এস ফোর্ড ও এফ এ বীচ তাঁদের রচিত প্যাটার্নস অফ্ সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার নামক পুস্তকে বলেছেন যে, যে সব সমাজে যৌন স্বাধীনতা বর্তমান, সেখানে মেয়েরাও প্রচুর মাত্রায় বহুচারিতার প্রমাণ দিয়ে থাকে বিশেষ আগ্রহ ভরেই।

কিন্তু বৈচিত্র্যের পিপাসায় অবৈধ যৌনসংসর্গ ঘটলেও সেটা কি কল্যাণপ্রদ?

অপরাপর বিষয়ে মুখ বদলানো যত সহজ যৌনতার ক্ষেত্রেও কি তাই?

একজন বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে এ ব্যাপার ঘটলে অনেকেই এর ফলভাগী হয়, তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে এবং অপর নারী।

বহু মনস্তত্ত্ববিদ্ এই প্রবৃত্তিকে ভাবাবেগের বিপর্যয় বলে মনে করেন।

অনেকের মতে অসুখী শৈশবেই পরিণতকালে নাকি দানা বাঁধে প্রথম অসামাজিক প্রবৃত্তিপরায়ণতা।

কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে এই অভিমতকে সত্য বলে মেনে নিলেও সব ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া চলে না।

বিবাহিত জীবনে অবিশ্বস্ততার প্রধান কারণ হল পারস্পরিক সমঝোতা বা বোঝাপড়ার অভাব।

প্রেমহীন বিবাহ সর্বদাই বন্ধনহীন প্রেমে সার্থকতা খোঁজে---বলেছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

বিবাহের বাইরে যারা যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সেই ধরণের এক বিবাহিত পুরুষ সম্প্রতি আমার কাছে কিছু বলেছেন এ বিষয়ে, তিনি বলেন---আমি যা চাই সেটুকু পেলেই সম্পূর্ণ সুখী হতে পারতাম আমার স্ত্রীকে নিয়ে। আমি চাই ভালবাসা, মাঝে মাঝে একটু প্রশংসা ও সমর্থনসূচক কিছু উৎসাহ বাক্য কিন্তু দুঃখের বিষয় এর কিছুই পাই না স্ত্রীর কাছ থেকে।

আমাকে সে প্রয়োজনীয় মনে করুক, কামনা করুক এটা মনে প্রাণেই চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার স্ত্রী তা কোনদিনই বুঝতে চাইলো না।

বাধ্য হয়েই অন্যত্র সান্ত্বনা খুঁজে নিতে হয়েছে আমাকে।

এ কথাগুলো যে নিছক মিথ্যা নয় তাও সপ্রমাণিত হয়েছে পরে।

ভদ্রলোকের স্বীকারোক্তি শোনার পর তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমি, তিনিও পোষকতা করলেন স্বামীর কথার, বিষাদ করুণ কণ্ঠে বললেন---আমি অত্যন্ত নিরুত্তাপ ব্যবহার করেছি ওঁর সঙ্গে হয়ত তাই আজ অন্য নারীর বাহুবন্ধনে ওঁকে ঠেলে দিয়েছে।

ঠিক এইভাবেই স্ত্রীর মনও ক্রমে বিগড়ে যেতে পারে, ভালবাসায় উন্মুখ হৃদয় নিয়ে কোন স্ত্রী যদি স্বামীর ব্যবহারে দিনের পর দিন তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা ব্যতীত আর কিছু খুঁজে না পায় তবে সেও যে অপর পুরুষের কাছে সান্ত্বনার খোঁজে আত্মসমর্পণ করবে তাতে সন্দেহ কি।

কিন্তু এ ধারণা যে সঠিক তা নয় তার অনেক প্রমাণ আমি পেয়েছি।

দ্বিবিধ জীবনযাপনে স্থায়ী সুখের সন্ধান খুব কম লোককেই পেতে দেখেছি বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার ধাক্কায় সংসারে বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে।

দম্পতির মধ্যে একজন যদি অবিশ্বস্ত হয় এবং অপরজনের কাছ থেকে সে সত্য লুকিয়েও রাখতে পারে তা হলেও শান্তি বিঘ্নিত হয় ক্ষণে ক্ষণে।

স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যেই অপরাধী হোক না কেন, তার মনে সর্বদাই জেগে থাকে অপরাধবোধ, ধরা পড়ার আশঙ্কায় সতত উৎকণ্ঠিত থাকে সে এবং এর ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন একটা মিথ্যার প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়ায় যা সমস্ত সম্বন্ধটাকেই করে তোলে ভঙ্গুর ও কৃত্রিম।

সমুদ্রস্নানের কস্টিউম বা পোষাকের ফ্যাশানে সর্বশেষ সংযোজন। বস্ত্রখণ্ড নয়—শুধু জালের টুকরোয় তৈরী এই পোষাক। উদ্ভাবক জনৈক ফরাসী দর্জি

এসব ক্ষেত্রে দাম্পত্য শান্তি তো খণ্ডিত হয়ই কখনও কখনও গোটা দাম্পত্য জীবনটাই ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাজেই এ ধরণের পরিস্থিতি যাতে না হয় সেদিকে চোখ রেখে চলতে শেখা উচিত স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই।

কোন কোন মনস্তাত্ত্বিকের মতে সামান্য এক-আধটু চরিত্রস্খলন ঘটলে অনেক সময় দাম্পত্যের ভিত সুদৃঢ় হয়, ভেঙ্গে পড়ার বদলে, অর্থাৎ বাইরে একটা আনন্দের প্রতিশ্রুতি থাকলে ঘরের অনেক ঝড়-ঝাপটাকে অনায়াসে

গোপন তথ্য যদি কোনক্রমে ফাঁস হয়ে যায় তখনকার অবস্থা তো অকল্পনীয়। স্বামীর চরিত্রস্খলনকে মেনে নিয়ে অবিচলিতভাবে ঘর-সংসার করাটা বোধ হয় কোন স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব নয়, আবার এর উল্টোটা ঘটলে, অর্থাৎ স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে পুরুষের পক্ষেও মাথা ঠিক রাখা সম্ভব নয়।

এর পর আসে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গ।

লজ্জা, অপমান ও শূন্যতাবোধ এই তিনরকম বোধই জেগে ওঠে ছেলেমেয়েদের মনে [illegible]

দেখে। এবং বাল্যে এ ধরণের পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে, তার স্মৃতি আজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মানুষকে।

সুস্থ মানুষ গড়তে চাই স্বাভাবিক পরিবেশ ও বৈধ আশ্রয়, বিবাহের মূল উদ্দেশ্যও এটাই, বিবাহোত্তর প্রেমে মানুষ সবই পেতে পারে—পায় না শুধু মানসিক নিশ্চিন্ততা ও সন্তান পালনের উপযুক্ত পরিবেশ। বোধ হয় সে জন্যই যৌন-স্বাধীনতার এই স্বর্ণ যুগেও দাম্পত্য জীবনের সাফল্য এত ঈপ্সিত বস্তু।

ধারাবাহিক উপন্যাস

প্রফুল্ল রায়

॥ সাত ॥

দারোয়ানটা যেন অমোঘ নিয়তির মতন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্ধের মতন আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

সমস্ত বাড়িটাই বুঝি কার্পেটে মোড়া। নিঃশব্দে সন্তর্পণে আমি হেঁটে যাচ্ছি। ডিসটেম্পারকরা দেয়ালে কোথাও সুদর্শন ওয়াল-ক্লক, কোথাও চমৎকার নিসর্গ চিত্র, কোথাও নামকরা শিল্পীর আঁকা রহস্যময় মিথুনমূর্তি। লবীতে অসংখ্য মর্মর-নগ্নিকা; তাদের ফাঁকে ফাঁকে কারুকাজ-করা অগণিত টবে মরসুমী ফুল, বামনাবতার ক্যাকটাস, ছাতার আকারে পাইন গাছ।

হিরণ্ময় সোম দেশ-বিদেশের অরণ্যকে টবের ভেতর বন্দী করে রেখেছেন। তাঁকে আর বন দেখবার জন্য বাইরে ছুটতে হয় না। ঘরে বসেই হিরণ্ময় তরাই কি সুন্দরবন, আমাজন কি হুসোবেগিনের অরণ্যকে আস্বাদ করেন।

বেশি দূর যেতে হল না। দোতলায় আসতেই লাউঞ্জে হিরণ্ময়কে দেখতে পেলাম। গোলাকার বেতের চেয়ারে বসে সাদার্ন এ্যাভেনিউর দক্ষিণে লেকের দিকের অবারিত আকাশে তাকিয়ে আছেন।

এর ভেতর অন্ধকার নেমে গেছে—শীতের নিবিড় ঠাণ্ডা অন্ধকার। কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়ে তা দ্রুত গাঢ় হচ্ছে। এত গাঢ় এত জমাট যে, মনে হয়, ছুরি দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা যাবে। সাদার্ন অ্যাভেনিউর দু'ধারে কর্পোরেশনের লোকেরা আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু কুয়াশা আর অন্ধকার ঠেলে তাদের নির্জীব অস্তিত্ব খুব বেশি জায়গা আলোকিত করতে পারে নি। আকাশটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। আজ চাঁদ উঠেছে কি না, তারাদল ফুটেছে কি না—বুঝবার উপায় নেই। আকাশে কেউ নেই, কিছু নেই। শেষ পাখিটিও ঘরে ফিরে গেছে।

আমরা কাছাকাছি এসে পড়লাম। দারোয়ানটা ডাকল, 'সাব—'

হিরণ্ময় খুব তন্ময় হয়েছিলেন সম্ভবত, চমকে উঠলেন। লাউঞ্জের এই অংশটায় আলো জ্বালা হয় নি। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'কে?'

দারোয়ানটা জানাল, 'যে বাবুর আসবার কথা ছিল, তিনি এসে গেছেন।'

'আলোটা জ্বাল তো।'

দেয়ালে বোতাম টিপে আলো জ্বালল দারোয়ানটা; তারপর চলে গেল।

আমার দিকে তাকিয়ে উৎফুল্লস্বরে হিরণ্ময় এবার বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তবে এলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মৃদুস্বরে বললাম।

'বোসো, বোসো—'

পাশাপাশি আরেকটা চেয়ারে বসলাম।

'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু—'

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

হিরণ্ময় বললেন, 'তোমার তো আরো আগে আসবার কথা ছিল।'

আবছা গলায় এবার বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে এত দেরি করলে যে?'

চোখ-কান বুজে প্রায় মিথ্যেই বললাম, 'একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম।'

হিরণ্ময় এ কথার উত্তর দিলেন না।

দক্ষিণে লেকের দিক থেকে মাঘের শীতল বাতাস বইছিল। কনকনে হিম শরীরের অনাবৃত জায়গায় কেটে কেটে বসছে। হিরণ্ময় বললেন, 'আজ বড্ড ঠাণ্ডা, না?'

পাতলা মালদার চাদরের ভেতর কুঁকড়ে যেতে যেতে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দামী আরামদায়ক কাশ্মীরী শালের ওপর উষ্ণ বালাপোস রয়েছে; সেটাকে আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে নিয়ে হিরণ্ময় শুধোলেন, 'ঠাণ্ডাটা কিন্তু বেশ লাগছে।'

আমি উত্তর দিলাম না।

হিরণ্ময় আবার বললেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব, নেচারকে ভয় পেতে নেই। প্রকৃতির কাছ থেকে যত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে ততই সে তোমার পিছু নেবে। দেখবে, আজ জ্বর হচ্ছে, কাল মাথা টিপ-টিপ করছে, পরশু গা টিপ-টিপ করছে। যতখানি পারবে নেচারের কাছে নিজেকে এয়ারপ্রুফ করে রাখবে।'

আমি পূর্ব বাঙলার ছেলে। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী দিয়ে ঘেরা যে দেশ; তার অবারিত প্রান্তর, মুক্ত মাঠ, হু-হু বাতাস, অফুরন্ত রোদ আর অজস্র বর্ষণ থেকে কণা কণা প্রাণ শুষে নিজেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমাকেই কিনা কলকাতা নামে বিশাল নগরের এক কৃত্রিম হ্রদের ধারে মোজেক করা এক লাউঞ্জে বসে বালাপোস-মোড়া এক শহরে-পোকার কাছে প্রকৃতির পাঠ নিতে হচ্ছে! হাসব না কাঁদব, বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে অনুভব করতে লাগলাম, পাতলা জ্যালজেলে মলিন মাঘের বাতাসের বিরুদ্ধে আর দুর্গ খাড়া রাখতে পারছে না। আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে আমি যে একেবারে জমে যাব, তাতে সন্দেহ নেই।

এলোমেলো অসলংগ্ন দু-চারটে কথার পর আমার ওপর বুঝি করুণাই হল হিরণ্ময়ের। কিংবা এই উন্মুক্ত লাউঞ্জে বসে থাকতে তাঁর হয়ত কষ্টই হয়ে থাকবে। হিরণ্ময় বললেন, 'চল, ঘরে গিয়ে বসি।'

আমাকে ডানদিকের প্রকাণ্ড একখানা ঘরে নিয়ে এলেন তিনি।

সোফা, কার্পেট, দামী দামী সুদৃশ্য আসবাব, জানলার সার্সি আর মনোহর পর্দা—বড়লোকের রুচিশোভন গৃহসজ্জার জন্য যা-যা দরকার সবই এখানে আছে। সবার ওপরে যা আছে তা হল আরামপ্রদ উত্তাপ। এক কোণে ফায়ার প্লেসেরও ব্যবস্থা। মাঘের হিমের সাধ্য নেই, এই দুর্গে ঢুকতে পারে। বাইরের দেয়ালে মা খেয়ে পরাভূত হয়ে সে ফিরে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে হাতে পশমের দস্তানা পরে নিলেন হিরণ্ময়, কম্ফোর্টার দিয়ে গাল-গলা-কান জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব---'

আমি উন্মুখ হলাম, 'আজ্ঞে---'

হিরণ্ময় বললেন, 'বাইরে এত ঠাণ্ডা অথচ—অথচ তুমি জানো কি---' বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

তীক্ষ্ণ গলায় আবার বললাম, 'আজ্ঞে---'

'এই কলকাতা শহরে কত লক্ষ লোক রাস্তায় রাত কাটায়?'

আমি চুপ করে রইলাম।

হিরণ্ময়ের উত্তেজনা বাড়তে লাগল, 'অন্য লোকের কথা বাদ দাও; কত রেফিউজি যে হিমের ভেতর রাস্তায় পড়ে থাকে তার হিসেব নেই।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর অতল খাদে নেমে গেল, 'বড় কষ্ট ওদের চিরঞ্জীব। এত কষ্ট তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।'

উষ্ণ আরামদায়ক ঘরের ভেতর কম্ফোটার কাশ্মীরী শাল আর বালাপোশ জড়িয়ে হিরণ্ময় সোম শীতার্ত উদ্বাস্তুদের দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আমি বিহ্বলের মতন তাকিয়ে রইলাম।

হিরণ্ময় একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কী খাবে, বল। চা না কফি?'

চা বা কফি, কোন কিছুতেই আমি অভ্যস্ত না। বললাম, 'যা হয়—'

হিরণ্ময় ডাকলেন, 'পুনিয়া---পুনিয়া---'

পুনিয়া হিন্দুস্থানী চাকর। দরজার বাইরে সে দাঁড়িয়ে অথবা বসে ছিল। ডাকামাত্র ছুটে এল।

হিরণ্ময় বললেন, 'কফি আর কাটলেট টাটলেট যা আছে নিয়ে আয়।'

পুনিয়া চলে গেল। হিরণ্ময় এবার আমার দিকে ফিরলেন, 'এই শীতের রাত্তিরে গরম গরম কাটলেট বেশ ভালই লাগবে, না কি বল?'

আমি আর কি বলব, নীরবে বসে রইলাম।

যতক্ষণ না কফি আর কাটলেট এল, মাঘের হিমশীতল রাতে পূর্ব বাঙলার ছিন্নমূল মানুষদের কষ্টের কথা বলে বলে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে আবহাওয়াটাকে ভারাক্রান্ত করে রাখলেন হিরণ্ময়।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। কাঁটা চামচগুলো একধারে ছুঁড়ে দিয়ে মাস্টার্ডে কাটলেট ডুবিয়ে কামড় বসালেন; তারপর একমুঠো কাঁচা পেঁয়াজ, শশার কুচি আর টোমাটোর টুকরো মুখে পুরলেন। কয়েক কামড় খেয়ে কফিতে গলা ভিজিয়ে নিয়ে হিরণ্ময় বললেন, 'রিফিউজিদের কি যে ট্র্যাজেডি, কল্পনাও করা যায় না। সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কলকাতায় কি স্ট্রাগল্ যে তাদের করতে হচ্ছে, দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। মাথা গোঁজার জায়গা নেই, দু'বেলা দু'মুঠো —বুঝলে চিরঞ্জীব—'

আমি ধীরে ধীরে খাচ্ছিলাম; মুখ তুলে তাকালাম।

কাটলেটের বিরাট একটা অংশ দাঁতে কেটে নিয়ে স্যালাড দিয়ে চিবুতে চিবুতে অবরুদ্ধ গলায় হিরণ্ময় বললেন, 'দু'মুঠো খাবারও ওদের জোটে না। লঙ্গরখানা থেকে যে খিচুড়ি-টিচুড়ি দ্যায় তাতে কোন ফুডভ্যালু নেই। স্বাদও তেমনি; ঐ সব খেয়ে হেল্থের বারোটা বেজে যাবে। ঐ রকম যদি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খেতে হয়, ওদের আর আশা নেই। জেনারেসন কে জেনারেশন দুর্বল অসুস্থ পঙ্গু হয়ে পড়বে।'

দেশের মাটি থেকে যদিও আমি উন্মূল, মনে মনে উদ্বাস্তু হবার যন্ত্রণা যদিও বহন করে বেড়াই, তবু সীমান্তের এপারে এসে নিতান্ত প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্য প্রতি মুহূর্তের নিয়ত সংগ্রাম আমার নেই। বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছি। শীতের হিম বা সুস্বাদু হিতকর খাদ্যের অভাব আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। শীতের রাতে লোভনীয় খাদ্য এবং পানীয়ে পাকস্থলী পূর্ণ করে ভারী লেপের সুখদায়ক উত্তাপ গায়ে মেখে গাঢ় পরিতৃপ্ত ঘুমের ভেতর ডুবে যাই। আমার যন্ত্রণা আমার দুঃখ পুরোপুরি

হিরণ্ময় যা বলেছেন তার ষোল আনাই সত্যি। নিজের চোখে সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে লঙ্গরখানার সদাব্রত দেখে এসেছি। যে দেশ ফলে-ফসলে পরিপূর্ণ, যে দেশে দুধের স্রোত বয়ে যায়, যে দেশের বিলে আর নদীতে হাত দিলেই চকচকে রুপোর পাতের মতন মাছ---সেখানকার মানুষ দু'হাতা করে বিস্বাদ বিবর্ণ খিচুড়ির জন্য পশু হয়ে গেছে।

কাটলেট খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পুনিয়াকে ডেকে চপ আনালেন হিরণ্ময়, ফ্রাই আনালেন, পুডিং আনালেন। আমি অবশ্য কাটলেটেই থেমে গেছি।

খেতে খেতে উদ্বাস্তদের প্রসঙ্গই চলতে লাগল। বিশেষ করে তাদের খাবার ব্যাপারটা। তারা খেতে পাচ্ছে না, তাদের শিশুরা দুধ পাচ্ছে না, মাছ পাচ্ছে না, একটুকরো মাংস পাচ্ছে না। সবই ঠিক কিন্তু ফ্রাই-চপ মুখে পুরে সে কথা বললে আমার পক্ষে নির্বিকার বসে শুনে যাওয়া বুঝিবা অসম্ভব। নিজের সত্তার ভেতর নিদারুণ এক অস্বস্তি নিয়ে আমি ছটফট করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আপনি যে জন্যে আমাকে আসতে বলেছিলেন---'

হিরণ্ময় বললেন, 'তাড়ার কি আছে; ডেকেছি যখন বলব বৈকি।'

'আজ্ঞে---'

'কী হল আবার?'

'অনেক রাত হয়ে গেল। আমাকে আবার যাদবপুর ফিরতে হবে। দশটার পর ওখানকার বাস পাব না।'

'এমন কিছু রাত হয় নি।' কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে নিলেন হিরণ্ময়, 'মোটে ন'টা। রাত যদি বেশিই হয়, গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

কতক্ষণ এখানে আটকে থাকতে হবে, কে জানে। ক'দিন থেকেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে বিছানায় নিজেকে সঁপে দিতে পারলে আরাম বোধ করতাম। কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না।

হিরণ্ময় কি একটু ভাবলেন। আমার মনের কথা ইতিমধ্যে তিনি পড়ে নিতে পেরেছেন কি না জানি না। একসময় করুণার সুরে বললেন, 'ভয় নেই। বেশিক্ষণ তোমাকে আটকে রাখব না। তোমার তো এ বাড়িতে নেমন্তন্ন। আধ ঘণ্টাটাক বাদে আমরা খেতে বসব। সেদিন মোটামুটি আভাস তোমাকে দিয়ে এসেছি; বাকিটা খেতে খেতে বলব।'

মনে পড়ে গেল। উদ্বাস্তদের জীবন সম্বন্ধে ভদ্রলোকের প্রচণ্ড কৌতূহল। সেদিন এ ব্যাপারে কিছু কিছু প্রশ্নও করেছিলেন। কিন্তু শিশির মুখুটির স্ত্রীকে পুড়িয়ে সেইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছি। শরীর ছিল অস্বাভাবিক ক্লান্ত; মন বিষণ্ণ। কথা বলতে তখন ভাল লাগছিল না। হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আরেক দিন হিরণ্ময়ের সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

উদ্বাস্ত-জীবন চকিত ছায়া ফেলেই মিশিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা ভাবনা আমাকে চঞ্চল করে তুলল। আধঘণ্টা পর হিরণ্ময় আমাকে নিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিতে চাইছেন। অথচ এইমাত্র যে বিপুল পরিমাণ চপ-কাটলেট-ফ্রাই তিনি পাকস্থলীতে চালান করেছেন তাতে আধঘণ্টার ভেতর আবার তাঁর খিদে পেতে পারে কি না সে সম্বন্ধে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

আধঘণ্টা আর কতটুকু সময়। যুগ-যুগান্ত তো নয়। দেখতে দেখতে তা ফুরিয়ে গেল। ডানদিকের দেয়ালে যে চৌকো ঘড়িটা আটকানো তার কাঁটা দুটো অবিরাম দাঁড় বেয়ে বেয়ে সময় মাপছিল। হঠাৎ ঠুন্ করে একটা শব্দ হতেই ওয়াল-ক্লকটার দিকে তাকালেন হিরণ্ময়। বললেন, 'সাড়ে ন'টা বাজে। চল চিরঞ্জীব---' বলেই হাতের ভর দিয়ে সোফা থেকে উঠে পড়লেন।

দেখাদেখি আমিও উঠলাম।

ঘরের বাইরে আসতেই দেখা গে একটা টুলের ওপর শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুনিয়া বসে আছে। আমাদের দেখেই সে লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হিরণ্ময় তাকে বললেন, 'যা, টেবিল সাজাতে বল্ গিয়ে---'

ঊর্ধ্বশ্বাসে পুনিয়া ছুটে গেল।

হিরণ্ময়ের পিছু পিছু কতগুলো ঘর আর কতগুলো করিডর পেরুলাম, হিসেব নেই। একসময় বিশাল এক হলঘরে এসে পড়লাম। ঘরখানা যথা-রীতি দামী নক্সাকরা কার্পেটে মোড়া; দরজায়-জানালায় মনোরম পর্দা ঝুলছে। এই শীতের রাতে তাকে উষ্ণ আরামপ্রদ রাখার জন্য চার কোণে চারটে বৈদ্যুতিক উনুন জ্বলছে।

ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর ধবধবে চাদর পাতা। তার ওপর কাঁটা-চামচ-ফর্ক-ন্যাপকিন-গেলাস-প্লেট চমৎকার করে সাজানো। একধারে ঝকঝকে বেসিন, ট্যাপ, তোয়ালে আর সাবান রয়েছে। বেসিন-টার ঠিক ওপরে প্রকাণ্ড আয়না। আরেক ধারে রেডিওগ্রাম। ভেতর দিকের দরজার কাছে উর্দি-পরা দু-তিনটে বয় দাঁড়িয়ে আছে।

হিরণ্ময় বললেন, 'হাতমুখ ধুয়ে নেবে তো নাও; ঐ যে বেসিন।'

মুখটুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুছে নিলাম। হিরণ্ময়ও হাত-টাত ধুয়ে বললেন, 'এসো বসা যাক।'

আমরা গিয়ে টেবিলের কাছে গদিমোড়া চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ ঘরে যে এসে ঢুকল, এই মুহূর্তে সে ছিল অভাবনীয়া: আমার সুদূর কল্পনাতেও তার চিহ্নমাত্র ছিল না।

কত বয়েস হবে তার? কুড়ি-একুশের মধ্যেই। গায়ের রঙ আগুনের উপমা। সরু কোমরের তলার দিকে বিশাল অববাহিকা, ওপর দিকে সে উদ্ধত। চুল নামছে, কাঁধ পর্যন্ত বব্-করা; পেন্সিলে-আঁকা সরু ভুরু;

তীক্ষ্ণ ধারাল নাক একেবারে কপাল থেকে নেমে এসেছে ; তার দু-ধারে দীর্ঘ চোখ। মণিদুটো কিন্তু কালো না ; নীলাভ। চোখের ভেতর দু-বিন্দু সমুদ্রকে ধরে রেখেছে সে।

আশ্চর্য, মাঘের এই শীতে তার গায়ে না আছে স্কার্ফ, না কোট। শরীরের অনেকখানিই তার উন্মুক্ত। স্লীভলেশ জামা, ঝুলটা কোমর পর্যন্ত নামে নি। ফলে পেটের কাছটা এই রাত্রিবেলাতেও রৌদ্রঝলকের মতন দেখাচ্ছে। অনাবৃত মসৃণ বাহু যেন স্বর্ণময় ; লম্বা লম্বা নখগুলো গাঢ় রঙে রঞ্জিত। পরনের শাড়িটা ঝকমকে, স্বচ্ছ। ঠোঁটে এবং গালেও তার রঙ।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার স্নায়ু ঝিম ঝিম করতে লাগল।

হিরণ্ময় বললেন, 'আমার মেয়ে নির্মলি---ভাল নাম অবশ্য বিশাখা।'

আমার বিস্ময় বা আচ্ছন্নতার ঘোর তখনও কাটেনি। প্রথম পরিচয়ের পর নমস্কার জানানো যে ভদ্রতা সে কথা আমার খেয়াল রইল না। এই শীতের রাতে কেউ, (তা সে যে-ই হোক, শিরায় শিরায় যৌবনের উত্তাপে ফুটন্ত রক্ত যতই প্রবাহিত হোক) যে এভাবে শরীরের এতখানি অংশ অক্লেশে উন্মুক্ত রাখতে পারে, আমার তা ধারণা ছিল না।

বিশাখা বলল, 'এঁর কথাই তো তুমি বলেছিলে বাবা?'

'হ্যাঁ।' হিরণ্ময় ঘাড় কাত করলেন, 'তোর মা কোথায়?'

'ঘরে : এক্ষুণি আসছে---'

বিশাখার কথা শেষ হতে না-হতেই একটি মহিলা এ ঘরে এলেন। সাজসজ্জা আর প্রচুর প্রসাধনের তলা থেকে তাঁর আসল বয়েস অনুমান করা অসাধ্য ব্যাপার। তবে চল্লিশ যে পেরিয়ে গেছেন তাতে সংশয় নেই। চোখে-মুখে নাকে-চিবুকে আঙুলে পুরোপুরি বিশাখার আদল বসানো। বয়েস হলেও, বয়সের দিক-ভাসানো ঢল পেরিয়ে এসে সর্বাঙ্গে হেমন্তের টান ধরলেও অস্তগামী রূপের শেষ ছটাটি এখনও ঝিকিঝিকি জ্বলছে।

মহিলাটি কে? বিশাখার দিদি না মা?

যে প্রশ্নটা মনের ভেতর উঁকি দিয়েছে তার উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। বিশাখা মধ্যবয়সিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, তুমি কিন্তু আজ সাত মিনিট লেট। অলরেডি ন'টা সাঁইত্রিশ হয়ে গেছে। সাড়ে ন'টায় আমরা ডিনারে বসি।'

বুঝলাম, সাড়ে ন'টায় খেতে বসা এ বাড়ির নিয়ম এবং মহিলাটি বিশাখার দিদি নন, মা।

মহিলা বললেন, 'ক্লাব থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল তাই লেট হয়েছি। পরশুদিন তুমিও হাফ এন আওয়ার লেট ছিলে। সে যাক গে, সেই ছেলেটি এসেছে---সেই যে রিফিউজি?'

বিশাখার বদলে এবার হিরণ্ময়ই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, এই তো।'

এবার আর ভুল হল না। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালাম।

প্রতি-নমস্কার করে মধ্যবয়সিনী বললেন, 'বোস। 'তুমি' করেই কিন্তু বললাম।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ 'তুমি' করেই তো বলবেন। 'আপনি' করে বললে আমি অস্বস্তি বোধ করব।'

আমরা সবাই বসলাম। তারপর ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোমার নামটি কিন্তু জানা হয়নি---'

নাম বললাম।

'চিরঞ্জীব---চিরঞ্জীব---' বার দুই উচ্চারণ করে ভদ্রমহিলা বললেন, 'বেশ নাম, সুন্দর নাম---'

আরো দু-চারটে কথার পর মহিলা বেয়ারাদের উদ্দেশে বললেন, 'খাবার দাও---'

খাবার এল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়া চলল। তারপর হিরণ্ময় ডাকলেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব---'

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

হিরণ্ময় বললেন, 'এই যে, ইণ্ডিয়া পার্টিশান হল ; এত বড় ট্র্যাজেডি আমাদের দেশে আর কখনও হয়নি। তুমি যদি মাইনিউটলি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ো, তা সে হিন্দু পিরিয়ডই হোক আর মুসলিম পিরিয়ডই হোক, এমন মারাত্মক দুঃখের দিন আর কখনও আসে নি। সমস্ত জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে এ একটা কার্স---অভিশাপ।'

হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, আবেগপূর্ণ। বলার ভঙ্গিটি চমৎকার। নিমেষে আমাকে তা অভিভূত করে ফেলল। অস্ফুট গলায় বলতে চেষ্টা করলাম, 'আপনি যা বলেছেন তা ঠিক ; এমন অভিশাপ এমন বেদনা এদেশের মাথায় আর কখনও নেমে আসেনি।'

হিরণ্ময় আবার বললেন, 'জানো চিরঞ্জীব, পার্টিশানের কথা উদ্বাস্তুদের কথা ভাবতে ভাবতে এক-একদিন আমি কেঁদে ফেলি। কত রাত যে না ঘুমিয়ে ছটফট করে কাটিয়েছি তার হিসেব নেই।'

বিশাখা এই সময় বলে উঠল, 'বাবার মনটা বড্ড নরম ; অন্যের দুঃখে একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে।'

সেই মহিলাটি অর্থাৎ হিরণ্ময়ের স্ত্রী বললেন, 'টোটালি আনপ্র্যাকটিক্যাল এমন মানুষ নিয়ে ঘর করা কঠিন কাজ। পার্টিশানের পর থেকে ঘর-সংসার ভুলেছে ; ভাল করে খায় না পর্যন্ত ; এই ক' বছরে পনের-কুড়ি পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেলেছে---দিন রাত শুধু উদ্বাস্তু আর উদ্বাস্তু।'

শরীরের ওজন কমেছে কিনা, রাতের ঘুম ছুটেছে কিনা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। তবে খাওয়ার ব্যাপারে আমি একমত না। খানিক আগে অতগুলো চপ কাটলেট পাকস্থলিতে চালান করার পর এই মুহূর্তে হিরণ্ময় যে-পরিমাণ খাচ্ছেন তাতে আমার চোখের তারা স্থির হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক হিরণ্ময় এবার বললেন, 'কিছু একটা করা দরকার ; বুঝলে

চিরঞ্জীব---কিছু একটা না করলে চলবে না। ভাবছি---' বলে থেমে গেলেন।

আমি উন্মুখ হলাম।

হিরণ্ময় বললেন, 'ভাবছি পার্টিশান নিয়ে আমি একখানা বই লিখব। নাম দেব 'পার্টিশান এ্যাণ্ড ইটস পার্সপেক্টিভ' কিংবা পার্টিশান এ্যাণ্ড টিয়ার্স অফ বেঙ্গল।' কোন নামটা তোমার বেশি পছন্দ?'

'আজ্ঞে, দুটো নামই ভাল।'

'তবু?'

আমি চুপ করে থাকলাম।

হিরণ্ময় আবার বললেন, 'পার্টিশান এ্যাণ্ড টিয়ার্স অফ বেঙ্গলটা অনেক বেশি মীনিংফুল, না কি বল? একেবারে বুকের ভেতর ধাক্কা দ্যায়---'

আমাকে সায় দিতেই হল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।

'নাম দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ইংরেজিতেই লিখব। তারপর সেটা নিয়ে দিল্লীর কর্তাদের দেখিয়ে আসব। বলব লর্ড কার্জন বাঙলা দেশের যে সর্বনাশ করতে পারেনি স্বাধীনতা আনতে গিয়ে আজ তাই ঘটে গেছে। বইটা হবে পার্টিশানের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। আর এ ব্যাপারে---'

'এ ব্যাপারে কী?'

'আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে।

'কিভাবে?'

একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে হিরণ্ময় বললেন 'আমি কখনও পূর্ব-বাঙলায় যাইনি। দেশ তাদের আগে এবং পরে সেখানে যা-যা ঘটেছে, তুমি যা-যা দেখেছ, শুনেছ, অনুভব করেছ---সমস্ত খুঁটিনাটি সাজিয়ে গুছিয়ে একটা খাতায় লিখে ফেল। তুচ্ছ বলে আজেবাজে বলে কিছু বাদ দেবে না। কোনটা রাখব আর কোনটা ফেলে দেব তা আমি ঠিক করব।'

আমি উত্তর দিলাম না।

হিরণ্ময় বললেন, 'এমনি এমনি তোমাকে খাটাব না। এর জন্যে যা পারিশ্রমিক লাগে দেব। কত চাও, বল?

বিদ্যুৎ চমকের মতন সুরেশের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সুরেশের সঙ্গে তুলনা চলে না তবু তার মতন হিরণ্ময় সোম উদ্বাস্তু-প্রেমিক।

হিরণ্ময় আবার বললেন, 'চুপচাপ কেন? বল।'

'আজ্ঞে, এক্ষুণি কি করে বলি। একটু ভেবে পরে বলব।'

'এর ভেতর ভাবাভাবির কি আছে?'

আমি নিরুত্তর।

আমার মনোভাব বোধ হয় বুঝতে পারলেন হিরণ্ময়। বললেন, 'আচ্ছা ভেবেই বোলো; দু একদিনের ভেতরেই বলবে। কাজটা আমি তাড়াতাড়িই সুরু করতে চাই। তার---'

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

'দ্যাখো চিরঞ্জীব, ভাবাভাবিতে সময় নষ্ট করে কিছু লাভ নেই।' হিরণ্ময় বলতে লাগলেন, 'কাজটা করো, দেখবে খুব ভাল লাগছে।'

বিনীত সুরে আগের উত্তরটাই দিলাম, 'আজ্ঞে একটু না ভেবে—

'বেশ বেশ; না ভেবে যখন বলবে না তখন ভেবেই বোলো।'

কথায় কথায় একসময় খাওয়া শেষ হল।

●

সাড়ে ন'টায় খেতে বসেছিলাম। খাওয়া যখন শেষ হল তখন প্রায় এগারটা।

হিরণ্ময় বললেন, 'যাদবপুরের বাস কি এখন পাবে?'

জানালাম, সওয়া দশটার ভেতরেই ওদিকের বাস বন্ধ হয়ে যায়।

'তা হলে ড্রাইভারকে বলি; সে-ই তোমাকে দিয়ে আসুক।'

এই সময় বিশাখা বলে উঠল, 'ড্রাইভার তো নেই। ক'দিনের ছুটি দিয়ে সেদিন দেশে পাঠালে না?'

'তাই তো।' হিরণ্ময়কে চিন্তিত দেখাল, 'এই শীতের রাত্তিরে এখন কে ওকে দিয়ে আসে।

হঠাৎ বিশাখা বলে বসল, 'ড্রাইভার যখন নেই তখন আমিই দিয়ে আসি।'

হাতের কাছে সমস্যার সমাধানটা পেয়ে গেছেন। খুশী গলায় হিরণ্ময় বললেন, 'তা হলে তো ভালই হয়। যা, চিরঞ্জীবকে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

বিশাখা আমার সঙ্গিনী হয়ে যাদবপুর যাবে; ভাবতেই স্নায়ুর ভেতর দিয়ে এস্রাজে দ্রুত ছড় টানার ঝঙ্কার বয়ে যেতে লাগল। [ক্রমশ।

যুক্তি

শ্রীরবি গুপ্ত

নিবিড় নিশুত রাত—
নিশাপিশিয়ে উঠল বুঝি হাত।
চোরের দল বাড়ির ভেতর ঢুকে
না পেয়ে হায় কিছু সবাই
ফিরতে বিরস মুখে
দেখল হঠাৎ মুর্গীটিকেই......ক্ষেপে
ধরল সবাই চেপে :
"করব জবাই তোকে,
দেখি আজকে কোন শর্মা রোখে!'

"—মারছ কেন ভুলে.
গৃহস্থকে ঘুম থেকে রোজ
দিই যে আমি তুলে,
দেখছ কত কাজের আমি, ভাই!"

"যোকার যাশু, মরবি রে ঠিক তাই
শয়তানিতে দেখি না তোর জুড়ি.
জাগিয়ে দিয়ে গৃহস্থকে
পণ্ড করিস চুরি!"

বিদেশী সাহিত্যের দিক্‌পাল : চার্লস ডিকেন্স

শ্রীঅলোককুমার সেন

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্স এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, শুধু ইংরেজী ভাষাতেই নয় বিশ্ব-সাহিত্যেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের একটি দরিদ্র পরিবারে ডিকেন্স জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই অভাব আর দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে তাঁর দিন কাটে। কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য বা সহানুভূতিও তিনি পান নি, আর অপরিচিতদের কাছ থেকে পান শুধু অবজ্ঞা ও অবহেলা।

বাল্যের চরম দারিদ্র্য ও দৈন্যে ভরা দিনগুলির কথা তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই দেখা যায়, তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পের প্রধান চরিত্র, নিপীড়িত যুবক অথবা কিশোরের কাহিনী নিয়ে লেখা।

'ক্রিসমাস কেরল' বইটি লিখে চার্লস ডিকেন্স সাহিত্য-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বইখানি এত জনপ্রিয় যে কিছুদিন আগে জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক বইটির পাণ্ডুলিপি দু'লক্ষ টাকায় কিনে নেন।

তারপর, একে একে লিখলেন--- এ টেল অব টু সিটিজ, নিকোলাস নিকলবি, ডেভিড কপারফিল্ড, অলিভার টুইস্ট, পিকউইক পেপার্স প্রভৃতি। এদের মধ্যে 'ডেভিড কপারফিল্ড' সবচেয়ে জনপ্রিয় আর অনেকের মতে বইটি হলো ডিকেন্সের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন। এ বইটির মধ্যে তিনি যেন তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী শুনিয়েছেন। তাই বইখানি পড়লেই যে-কোন দরদী পাঠকের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাঁর লেখা বইগুলি এত জনপ্রিয় কেন?

এর উত্তরে বলতে হয়, দলিত ও দরিদ্রের প্রতি গভীর সমবেদনা থাকায় বইগুলি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

দরিদ্রের উপর ধনীর পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী তিনি শুনিয়েগেছেন আর ডিকেন্সের অমর লেখনীর মাধ্যমে সর্বহারার দল হয়েছে কালজয়ী।

তাঁর রচনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে, প্রতিটি গল্পেই হতভাগ্য ও নিপীড়িত যুবক অসাধারণ সাহস ও অসীম অধ্যবসায়ের সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

চার্লস ডিকেন্স যে অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, অতুলনীয় সাহস আর ধৈর্যের সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন, তা সকলেরই শিক্ষণীয়।

রাজ কাহিনী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

রাজার কাহিনী বলতে বসেছি, কিন্তু রাজা কোথায়? এক সময়,—এই বিশ বছর আগেও, ভারতবর্ষে রাজা-মহারাজার ছড়াছড়ি ছিল; কিন্তু তাঁদের সবারই রাজত্ব এখন লোপ পেয়েছে, আছে কেবল কিছু মোটা রকম মাসোহারা। তাও এবার কমাবার চেষ্টা হচ্ছে। এঁদের চাইতেও বড় রাজা যাঁরা ছিলেন—যেমন ইংল্যাণ্ডের রাজা, জাপানের রাজা, মিশরের রাজা, ইটালির রাজা, থাইল্যাণ্ডের রাজা,—তাঁদেরও অনেকেরই রাজত্ব একে একে কেড়ে নিচ্ছে প্রজারা, যাঁরা টিকে আছেন তাঁরা নামেই রাজা, ক্ষমতা বিশেষ কিছু নেই। একজন রাজা তো রাজ্য হারাবার সময় আক্ষেপ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শীগ্‌গিরই পৃথিবীতে সমস্ত রাজা লোপ পেয়ে, থাকবে মাত্র পাঁচজন রাজা। পাঁচজন কে কে? না, ইংল্যাণ্ডের রাজা আর তাসের চারটি রাজা—রুহিতন, চিড়িতন, হরতন আর ইস্কাবনের রাজা।

কিন্তু যাই বল, তবুও বলতে লজ্জা নেই, রাজার কথা উঠলে এখনও আমাদের মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে ওঠে। বহুদিনের অভ্যাস কি না। রাজারাণী ছাড়া আমরা রূপকথার রাজ্য যেন ভাবতেই পারি না। মন্ত্রি-পুত্র, কোটালপুত্র, এমন কি সওদাগর-পুত্রকে নিয়েও গল্প রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু রাজপুত্র (। রাজপুত্তুর) আর রাজকন্যা (বা রাজকন্যে) না থাকলে সে গল্প তেমন জমে না। রাজপুত্রই তো শেষে রাজা হবে—বাপের রাজত্ব না পেলেও শ্বশুরের অর্ধেক রাজত্ব তো আছেই। আর রাজপুত্র ছাড়া পক্ষিরাজ ঘোড়াতেই বা কে চড়বে?

কিন্তু আমার এ কাহিনী কোন বড় দরের রাজা-মহারাজাকে নিয়ে নয়, তাসের রাজাকে নিয়েও নয়, এমন কি রূপকথার রাজাকে নিয়েও নয়, এ গল্পের নায়ক হচ্ছে বনের রাজা। পশুরাজ।

সত্যি কথা বলতে, পশুরাজেরও কিন্তু কোন রাজত্ব নেই—কস্মিন্‌কালে ছিলও না। চেহারা আর চালচলন দেখেই তাকে ঐ রাজা উপাধিটি দেওয়া হয়েছে।

কে এই পশুরাজ?

তোমরা নিশ্চয়ই জান, এ পশুরাজ হচ্ছে সিংহ।

রাজা হলে তার শক্তি আর তেজ যেমন থাকবে, দয়ামায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিও তেমনি কিছুটা থাকা উচিত। পশুরাজ সিংহের কিন্তু এমন গুণগুলো থাকলেও শেষেরগুলোর বড়ই অভাব। ভীষণ হিংস্র সে। আমরা ছেলেবেলায় একটা ছড়া পড়তাম:

'সিংহ মশাই, সিংহ মশাই,
মাংস যদি চাও
রাজহংস খেতে দেব,
হিংসা ভুলে যাও।'

দেখ দেখি মজা। হিংসা ছাড়তে বলা হচ্ছে তাও হিংসার লোভ দেখিয়ে। রাজহাঁস মেরে খাওয়া নিশ্চয়ই খাওয়ার একটা অহিংসা-পদ্ধতি নয়!

কিন্তু যতই লোভ দেখাও, হিংসা না করে সিংহের উপায় নেই। তা হলে তাকে না-খেয়েই মরতে হবে। তার মুখের এবং দাঁতের যা গড়ন তাতে তার পক্ষে নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকার উপায় নেই। বাঁচতে হলে মাংস তাকে খেতেই হবে—এবং শুধু রাজহংসের মাংসই নয়—হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, মোষ, এমন কি বাগে পেলে মানুষের মাংসও। আমাদের সেকালকার মুনি-ঋষিরাও এ খবর জানতেন বলেই তার নামকরণও করেছেন সেই ভাবে। পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস কর সিংহ শব্দটির উৎপত্তি হ'ল কি করে। তিনি বলবেন, হিন্‌স্‌ ধাতুর (অর্থাৎ হিংসা করা) সঙ্গে অল্‌ প্রত্যয় যোগ করলে তবেই হবে সিংহ।

অবশ্য এই যে হিংসা করা, এর মধ্যেও বিধাতার খানিকটা হাত আছে। বিজ্ঞানে ভারসাম্য বলে যে একটা কথা আছে তা অন্য সব জায়গার মত প্রকৃতির রাজ্যেও মেনে চলতে হয়। পৃথিবীতে যদি কোনও হিংস্র জন্তু না থাকত, সবাই যদি নিরামিষ খেত তা হলে গাছপালাগুলির কি হাল হ'ত বল দেখি। খেয়ে-খেয়েই হয়তো ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিত প্রাণীরা।

আর গাছপালা—বনজঙ্গলে যে প্রাকৃতিক আবহাওয়া ঠিক রাখতে, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তা কে জানে? কোন জায়গায় গাছপালা যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তা হলে সেখানকার আবহাওয়াও শুকনো হয়ে যেতে বাধ্য। কালে সেটা মরুঅঞ্চল হবে

দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক যুগেই পৃথিবীর নানা জায়গায় এরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি কতকগুলি জায়গা এখন মরুভূমি হয়ে গেছে, কিন্তু কয়েকশ' বছর আগেও নাকি সেসব জায়গা ছিল ঘাসে-জঙ্গলে পূর্ণ। ওখানে ছিল যত রাজ্যের বুনো ছাগলের আড্ডা, আর তাদের মারতে পারে এমন কোন হিংস্র জন্তুও ছিল না আশেপাশে। ফলে ঐ ছাগলগুলোই বছরের পর বছর নির্বিবাদে সব গাছপালা খেয়ে খেয়ে উজাড় করে দিয়েছে, যার জন্য এখন আর সেখানে একটি গাছও জন্মায় না। চারদিকে ধূ-ধূ করছে কেবল বালি আর বালি। কী রুক্ষ তার চেহারা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওখানে যদি শুধু বুনো ছাগল না থেকে দু'-এক জাতের হিংস্র প্রাণীও থাকত, তা হলে জায়গাটার ও দশা হ'ত না। হিংস্র প্রাণীরাই নিরামিষাশী ছাগলগুলোকে খেয়ে খেয়ে গাছপালাগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারত।

আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। পৃথিবীতে যদি শুধু হিংস্র জন্তুই থাকত, তা হলে বনজঙ্গলে পৃথিবী ভরে যেত। তোমার-আমার পক্ষে সেখানে বাস করাই হ'ত দুরূহ। পশুদের জন্য বনজঙ্গল খানিকটা দরকার বটে, কিন্তু সকলের জন্য নয়। অবশ্য হিংস্র জন্তুরা নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে হয়তো ওদের সংখ্যা কিছুটা কমাত, কিন্তু তাতেও রক্ষা ছিল না।

পৃথিবীতে সবেরই কিছু কিছু দরকার। বনজঙ্গল খুব বেশী থাকাও যেমন ভাল নয়, তেমনি একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু সব মানুষ তা বোঝে কই? সভ্যতার খাতিরে তারা বনজঙ্গল এমন ভাবে ধ্বংস করে চলেছে যে, তার ফলে নানা জাতের পশুবংশ আজ পৃথিবী থেকে লোপ পেতে বসেছে।

কথাটা বলছি এই জন্য যে, পশুরাজ সিংহ নিজেও আজ এই বিপদের সম্মুখীন। আগে পৃথিবীর নানান্ জায়গায় সিংহ দেখা যেত—ইয়োরোপে, এশিয়ায়, আফ্রিকায়, কিন্তু এখন সিংহের নিবাস বলতে গেলে কেবল ঐ আফ্রিকাই বলতে হয়। আমাদের ভারতবর্ষেও এক সময়ে প্রচুর সিংহ দেখা যেত,—হিমালয়ে, মধ্য ভারতে, এমন কি বাংলা দেশের সুন্দরবনেও।

হিমালয়ের সিংহের বর্ণনা কবি কালিদাসের কাব্যে প্রচুর রয়েছে। শিকারীরা সিংহের খোঁজে চলেছে, কিন্তু কোথায় পাবে সিংহের পদচিহ্ন? তুষাররাজ্য হিমালয়, সেই বরফেই ধুয়ে গেছে সিংহের পায়ের দাগ। কিন্তু না, পদচিহ্ন না থাকলেও আর একটা চিহ্ন দেখে সিংহের হদিস মিলতে পারে। হিমালয়ের হাতীর মাথায় থাকে গজমুক্তা। সিংহ হাতীর সঙ্গে লড়াই করে তার মাথায় থাবা মেরেছে, সেই মুক্তো আটকে ছিল সিংহের নখে। পথ চলতে চলতে পথেই ছড়িয়ে পড়েছে সেই গজমুক্তা। পদচিহ্ন নাই বা থাকল, সেই গজমুক্তা দেখেই শিকারীরা খুঁজে বার করবে সিংহকে।

হাতীর মাথায় গজমুক্তা থাকে কি না জানি না, অন্তত আমাদের জানা-চেনা কোন হাতীর মাথায় আছে বলে তো শুনি নি, কিন্তু কাব্যের দিক্ থেকে বর্ণনাটা চমৎকার। আর হিমালয়ে যে এক সময়ে প্রচুর সিংহ ছিল তাও এ থেকে আন্দাজ করতে দোষ কি?

আমাদের সুন্দরবনের সিংহ লোপ পাবার যে কারণ প্রাণী-বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন তা কিন্তু সিংহের পক্ষে খুব গৌরবের নয়। বিশেষত পশুরাজের পক্ষে তা তো নয়ই। কারণটা নাকি সুন্দরবনের বাঘ—যাকে বলা হয় রয়াল বেঙ্গল টাইগার। এই বাঘের সংখ্যা সুন্দরবনে খুব বেশী ছিল এবং এখনও আছে। বাঘের তুলনায় সিংহ ছিল কম। ফলে বাঘেরাই নাকি লড়াই করে করে ঐ অঞ্চল থেকে সিংহকে একদম গতম করে দিয়েছে।

একশ দেড়শ' বছর আগেও ভারতবর্ষের নানান্ জায়গায় সিংহের বাস ছিল। এমন কি সিপাহী যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে খোদ দিল্লীর আশেপাশেও নাকি প্রায়ই সিংহ দেখা যেত। কিন্তু এখন আর দেখা যায় না। ভারতবর্ষে সিংহ এখন আছে একমাত্র জুনাগড় রাজ্যে,—সেখানকার গির্ জঙ্গলে। তাও হয় তো থাকত না, আইন করে ওখানকার সিংহ শিকার নিষেধ করে দিয়ে, নানা কৌশলে ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এখন ওই জঙ্গলটা বিশেষ করে সিংহের জন্যই সংরক্ষিত। সম্প্রতি সংখ্যায় নাকি ওরা কিছু বেড়েছেও। স্বাভাবিক পরিবেশে সিংহ দেখতে হলে ঐ জঙ্গলে বেড়াতে যেতে পার। সে ব্যবস্থাও আছে।

সিংহের চালচলন সম্বন্ধে অনেক গল্প হয় তো তোমরা শুনেছ। তার সব গল্পই সত্যি কি না বলা কঠিন, তবে সিংহ যে শিকার করে তা একা একা খায় না—সঙ্গীদের ডেকে এনে দলবদ্ধভাবে ভোজে বসে, এটা বোধহয় ঠিকই। তা ছাড়া একবার ভাল করে খেয়ে নিতে পারলে তখন ওরা শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতেই ভালবাসে। তখন ওদের কাছাকাছি কেউ গেলেও তাকে আক্রমণ করতে চায় না—অবশ্য যদি না তাকে উত্যক্ত করা হয়। খিদে না পেলে অকারণ জীবহত্যা করব না—এ মনোভাব রাজোচিত সন্দেহ নেই।

সিংহের চেহারাটা বেশ ডাকসাইটে। শরীরের তুলনায় মাথাটি মস্ত বড়। কেশরের গুণে সেটাকে আরও বড় লাগে। সিংহীর কেশর নেই, তাই তার মাথা কিন্তু অত বড় মনে হয় না। সিংহ আর বাঘ জাতের দিক্ দিয়ে কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ। বিড়ালও অবশ্য ঐ জাতেরই প্রাণী। বিড়ালকে আমরা বাঘের মাসী বলি। সেই সূত্রে সিংহেরও সে মাসীস্থানীয়! কিন্তু বোনপোর ঐ বিক্রমের কণামাত্র মাসীর মধ্যে নেই।

সিংহের গায়ে প্রচণ্ড শক্তি---বিশেষ করে সামনের পায়ের থাবায়। থাবা তো নয়, যেন একখানা ইস্পাতের মুগুড়। সময় সময় ঐ থাবার এক-একটা বেড় ১৯।২০ ইঞ্চিও হয়। মজবুৎ হাড়ের কাঠামোর ওপর মাংসপেশী-বহুল এই থাবা দিয়ে সে এত জোরে আঘাত করতে পারে যে, এক চড়েই মানুষের মুণ্ডু ধড় থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে আসে। বড় বড় ষাঁড়, বুনো মোষ, গণ্ডার সিংহের এক থাবার বাড়িতেই ঘায়েল হয়---হরিণ, জেব্রা প্রভৃতি দুর্বল প্রাণীদের তো কথাই নেই। থাবার আগায় বড় বড় ধারাল নখ। এই নখের সাহায্যে সে অবলীলাক্রমে জ্যান্ত প্রাণীর হাড় থেকে মাংস খুবলে নেয়---যেমন করে আমার কমলালেবু বা কলার খোসা ছাড়াই তেমনি সহজভাবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে---পশুরাজ্যে তিনটি জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। এ তিনটি হচ্ছে---তিমির লেজের ঝাপ্টা, জিরাফের লাথি, আর সিংহের থাবা। তবে শেষেরটির মত কোনটিই নয়।

গল্প হলেও সত্যি

পাঞ্জাবের শলাতুর গ্রামে খৃস্টপূর্বের ৩০০ অব্দে জন্ম। মনীষীরা বলেন, গুণই হচ্ছে পুরুষের রূপ। রূপ তো ভগবানের দেওয়া, কিন্তু গুণ--? এর উপর মানুষের নিশ্চয়ই কিছুটা হাত আছে। একে বলে পুরুষকার। তাই এই পৌরুষের সাফল্য সম্বন্ধে তোমাদের একটা গল্প বলবো। মানুষের উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকলে ভাগ্যকেও জয় করা যায়।

এক তেরো বছরের তরুণ কিশোর--পড়াশোনায় মোটেই মন নেই ছেলেটির। অন্য সব পড়াশোনায় এক প্রকার। কিন্তু ব্যাকরণ পড়বার বেলাতেই মুস্কিল। বিদঘুটে ব্যাকরণটা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না তার। একদিন পণ্ডিত মহাশয়ের বকুনি খেয়ে স্কুল থেকে পালিয়ে পথে পথে ঘুরছিল ছেলেটি। রাজপথের পাশে একটি ঘরে খেয়ালের বশেই ঢুকে পড়লো। বিখ্যাত এক জ্যোতিষীর ঘর। হাতের রেখা দেখে তিনি ভাগ্য-ফল বলে দিতে পারেন।

ছেলেটি সাহস করে ডান হাতটি বাড়িয়ে দিল বৃদ্ধ জ্যোতিষীর দিকে। জিজ্ঞেস করল---দেখুন তো, আমার ব্যাকরণ পড়া হবে কি না?

অভিজ্ঞ জ্যোতিষী ছেলেটির হাত দেখে বললেন---না, তোমার ভাগ্যে বিদ্যে নেই। হাতের তালুতে যে রেখাটি থাকা দরকার সেটা নেই তোমার।

ছেলেটি মনে দুঃখ ও হতাশা নিয়েই বাড়ী ফিরল। জ্যোতিষী যেখানে হাতের রেখার কথা বলেছিলেন, ধারাল ছুরির ফলা দিয়ে সেখানে টানল একটি রেখা।

হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল।

তার ফলে হাতে ঘা হল। অনেকদিন ভুগতে হল তাকে। পাড়ার

শ্রীমৃণালকান্তি বসু

সবাই তাকে বলতে লাগল পাগল। তারপর সত্যিই বুঝি পাগল হয়ে গেল ছেলেটি। হাতের ঘা শুকিয়ে গেল---

ভ্রমতের প্রহরী
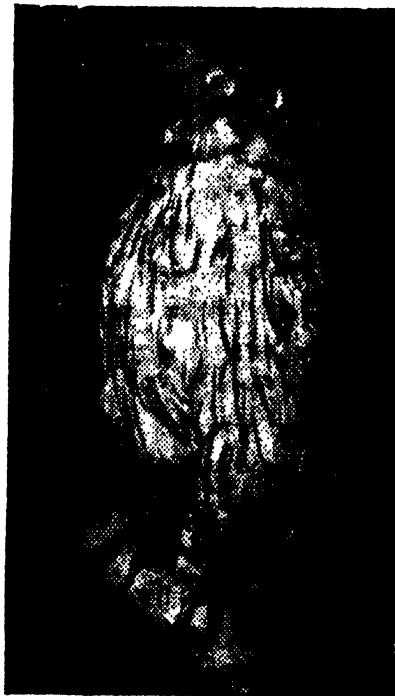
কিন্তু সেখানে রেখা উঠলো না। তাতে ভয়ানক জেদ বেড়ে গেল---ব্যাকরণ তাকে শিখতেই হবে।

তারপর সত্যি সে ব্যাকরণ শিখেছিল। শুধু শেখাই নয়, ব্যাকরণে সে হয়েছিল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এই ছেলেটি হচ্ছেন বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষার আদি ব্যাকরণ প্রণেতা---ঋষি পাণিনি। (অপর নাম দাক্ষেয়)।

চেষ্টার ফলে ভাগ্যরেখাকেও অতিক্রম করেছিলেন---এই পণ্ডিত। পাণিনি মুনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ এর কথা তোমরা শুনে থাকবে হয়ত? একে আবার 'পাণিনি-দর্শন' বলা হয়। শুধু পাণিনির ব্যাকরণ নয়, তাঁর আরও কয়েকটি গ্রন্থ যথা---পাণিনি প্রোক্ত, ভক্তিরসজ, ভক্তিযুক্ত, উপজ্ঞাত, গ্রন্থ পাঠক এবং জাম্বুবতী ও পাতাল বিজয় প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থও রচনার দ্বারা ভারতের ভাষা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

অবিরাম প্রচেষ্টায় জীবনে সাফল্য অর্জিত হয়।

"Try, Try, Try again—
You will Success at last".

* এই গল্পটি লিখতে--- নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বিশ্ব-কোষ" (১১ ভাগ) গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আমি

লীলা মজুমদার

আশা করি তোমরা কেউ মনে কর না যে আমি কোনো কিছুকে ভয় করি? জান, আমার সামনে এক্ষুণি একটি বাঘ এলে আমি পালাব না; বাঘের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকব। বাঘ-ই তখন পেছনের ঠ্যাং-এর ফাঁকে ল্যাজ গুঁজে গুটিগুটি পালাবে। সাপ এলেও ভয় পাব না। সোজা না ছুটে পাশ দিয়ে ছুটে পালাব। তা হলে সাপরা পাছু নিতে পারে না। আর যদি একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আসে, তা হলে আমার বেঁটে শান্তিনিকেতনী লাঠিটাকে কাঁধের উপর আড়ভাবে শক্ত করে ধরে রাখব। সাপ আমাকে গিলতে পারবে না।

বাজ পড়লেও আমি ভয় পাই না। উঁচু বাড়িতে কি গাছের নিচে না দাঁড়ালেই হল। চোরকে ভয় পাই না। আমার কতকগুলো বোতাম ছেঁড়া রঙ চটা কাপড়চোপড় আর বিশ্রী দেখতে জুতো ছাড়া কিছু নেইও যে চোরে নেবে। পুজোয় বা জন্মদিনে কেউ খেলনা দিলে ভেঙে যায়; বই দিলে পড়ে ফেলে একে ওকে দিয়ে দিই; টাকাপয়সা দিলে চকোলেট লজেঞ্চুস বিস্কুট আর গুজিয়া খেয়ে অমনি শেষ। গুজিয়া কাকে বলে জান? ক্ষীরের তৈরি, মুখে দিলেই গলে যায়, গোলাপ-ফুলের গন্ধ।

আমাকে ভয় দেখানো খুব শক্ত। ভূতকে আমি ভয় পাই না; মামু বলেছে ভূতকে কাঁচকলা দেখিয়ে বলতে হয় ভূত আমার পুত ইত্যাদি। প্যাঁচার ডাককে পর্যন্ত ভয় করি না। শিষ্য-গুরু প্যাঁচার ডাক শুনেছ কখনো? পিলে চমকে যায়। কিন্তু হাজারি-বাগে একবার বেঁটে খেজুর গাছে শিষ্য-গুরু প্যাঁচাকে বসে বসে ডাকতে দেখেছিলাম, তারপর থেকে প্যাঁচা-ট্যাঁচার ডাক শুনলে আমার হাসি পায়।

আমি স্কুলের হেডমাস্টার মশাইকে ভয় পাই না। মামুর বন্ধু। পড়া শিখে গেলে আর কোনো ভয় নেই। বাবাকে ভয় পাই না; বাবা মা দিল্লীতে থাকেন, এখানে এসে আমাকে খালি আদর করেন। ছোটবেলায় দিদিকে ভয় করতাম; কিন্তু এখন দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে, আমার জন্যে বরফি পাঠায়। ছেলেধরা ভয় পাই না, আমাকে ভরবে এত বড় ঝোলা কারো থাকতে পারে না। তার উপর আমি খুব কালো ও রাগী, ওরা নেবেই না।

আমাকে রোগা দেখে ভুল বুঝো না; সিংহের মতো মনের সাহস আমার। তবে আজ রাতে এই যে আধঘণ্টা পা গুটিয়ে খাটের উপর বসে আছি, যদিও একবার ওঠা দরকার, তার একমাত্র কারণ হল যে ধর পা দুটো যেই মাটিতে নামালাম, অমনি যদি খাটের তলা থেকে দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত বেরিয়ে এসে আমার পায়ের কব্জি দুটো ধরে টেনে নামিয়ে নেয়। তা হলে কি হবে।

ফসল তোলা — শিল্পী—সীতেশ রায়

বিনতা রায়
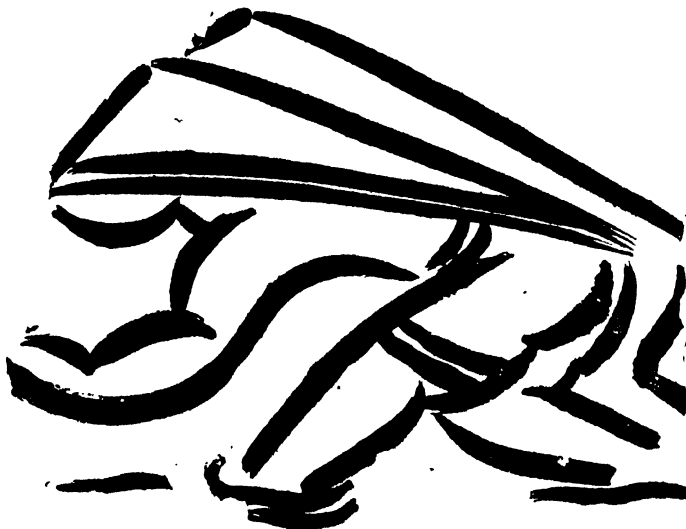
মাথার কাছে পড়ার আলোর সুইচটা অন করে, বড় উজ্জ্বল বাতিটা নিবিয়ে দিলেন। পেছনের উঁচু গদীর ওপর বালিশটা ঠেলে দিয়ে আধ-শোয়া ভাবে হেলান দিলেন অলকা সেন। হাতে একটা বই। পায়ের ওপর টেনে দিয়েছেন গোলাপী কম্বলটা। বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার নাবছে। হু-হু করে ছুটে চলেছে দিল্লী-পাঠানকোট।

পাঁচ বছর আগে ছেলে বিদেশে পড়তে গিয়ে একটি ফরাসী মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই বাসা বেঁধেছে। মাস ছয়েক হল মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন। এবার তাঁর সম্পূর্ণ ছুটি।

সারাদিন শুয়েই কাটল এখন একটু বইটই পড়লে ভাল লাগবে। বড়দি-জামাইবাবু দিল্লীতেই থাকেন। বহুবার ডেকেছেন তাঁদের ওখানে গিয়ে থাকবার জন্যে। ছেলেমেয়ে ছোট থাকতে ওদের নিয়ে গেছেনও বার-কয়েক। এবার লীনির বিয়ের সময় এসে বারবার করে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন, তাই অলকা চলেছেন কিছু-কাল সেখানে কাটিয়ে আসতে। প্লেনে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু দরকার কি? তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। পথেই যদি অনেকটা সময় কাটে ভালই তো।

বইটা কোলের ওপর খোলা। অনেকক্ষণ ধরে একটা পাতাই খোলা। উনি কি খুব মন দিয়ে কিছু ভাবছেন? তাই তো। গত পনেরোটা বছর নিজেকে নিয়ে একলা বসে ভাববার সময় পেলেন কোথায়? আজ তাই বোধহয় একবার পেছন দিকে চেয়ে দেখে নিতে চাই-ছেন—নিজেকে মনের ভেতর তলিয়ে দিয়ে।

বারো বছরের সপ্ত আর বছর ছয়েকের লীনিকে নিয়ে যেদিন পথে দাঁড়াতে হল—হ্যাঁ তাই—দুটি সন্তান ছাড়া স্ত্রীর জন্যে মানবেশ আর কিছুই রেখে যেতে পারেনি। সেই থেকে কি প্রচণ্ড পরিশ্রম আর দর্ভাবনার মধ্যে দিয়ে এদের পড়াশোনা করিয়ে, ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে একখানা ছোটখাট বাড়ীও করতে পেরেছেন—তার পুরো ইতিহাসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে মন চায় না। বসে বসে টুকরো নানা কথা ভাবেন। আজও এদেশে পুরুষের হাতে ক্ষমতা। কাজের চেষ্টায় ছুটোছুটি করতে যেখানে যেখানে যেতে হয়েছে, অধি-কাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে। অবশ্যি ব্যতিক্রম তো নিশ্চয়ই আছে—নইলে আর আজ তিনি এভাবে দাঁড়ালেন বা কি করে? একদিনের কথা মনে পড়ে। শান্তনু সোম। চিত্র-শিল্পী। বহুদিন বহু ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নানা কথায় এড়িয়ে চলেছেন অলকা। এককথায় দূরে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয় কারণ অলকা কাজ করেন একটা বিজ্ঞাপনের অফিসে। ছবি আঁকার ব্যাপারে এঁর সাহায্যের বড় দরকার হয়। সেদিন সন্ধ্যায় নানা ভূমিকার পর শান্তনু বিবাহের প্রস্তাব করে বসলে একটু ভেবে নিয়ে অলকা প্রস্তুত করে নিলেন নিজেকে। কথা-গুলো আজও মনে পড়ে।

আপনার রাজী না হওয়ার কোনো মানে হয় না, বললেন শান্তনু।

আমি রাজী, বলুন কি করতে হবে।

অলকা জানেন, শান্তনু সোমের আর যাই থাক, সাহস বস্তুটা একেবারেই নেই।

জবাব শুনে চেয়ারে খাড়া হয়ে বসল শান্তনু, আপনি সত্যি বলছেন তো?

এ বয়সে আর মিথ্যে বলব কেন বলুন—

কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ে?

সেটা না হয় আমিই ভাববো—

না না আমারও ওদের কথা ভাবা দরকার—ওদের মনে আঘাত দিয়ে কিছু করা ঠিক নয়।

অলকা কৌতুকবোধ করেন। আমি সুখী হলে ওরা আঘাত পাবে না। কিন্তু আপনার মেয়েটির কথা ভেবেছেন?

সে তো তার মার কাছেই থাকে।

তবে আর কি—নোটিশটা কবে দেবেন ভাবছেন?

না, মানে—এত তাড়া করার কিছু

নেই বুঝলেন ? আপনি আর একটু ভাববার সময় নিন—আজ আমি চলি—আর একদিন আসব।

শান্তনু প্রায় পালিয়ে বাঁচেন। আর হাসিতে ফেটে পড়েন অলকা সেন। হাসতে হাসতে ছুটে ঘরে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়েন। হ্যাঁ, অলকা সেনের গম্ভীর স্বভাবের মধ্যে এ ধরণের পাগলামী কিছু আছে। পাশের ঘরে মেয়ে বি-এ পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল। ঘরে এসে চোকে।

ব্যাপার কি ? আবার কি ঘটালে ?

অলকা তেমনি হাসতে হাসতেই ঘটনাটা বলেন।

লীনা বলে ওঠে, চেহারাটা তো সুন্দরই, তার ওপর দিনরাত নিজেকে যেমন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখো। ভদ্রলোকদের আর অপরাধ কি ? চলে যায় লীনা।

চাবুক দিয়ে যেন স্তব্ধ করে রেখে যায় অলকা সেনকে। অস্ফুট কণ্ঠ থেকে বেরোয়—দিনরাত নিজেকে সাজিয়ে রাখি। তাহলে কি—! হ্যাঁ, অলকা সেন স্বামীর মৃত্যুর পরে কোনোদিন বৈধব্যের বেশ পরেন নি। তাঁর ধারণা ওতে মনের ভেতর পর্যন্ত যেন শুকিয়ে রিক্ত করে দেয়। বাইরের পাঁচজনের সামনে ও বেশ যেন বড় লজ্জার। খুব একটা রঙচঙ না পরলেও মোটামুটি নিজেকে ছিমছাম রাখতে ভালবাসেন। কিন্তু মেয়ে—সে কি তাঁর এই পোশাক বরাবর অশ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে ? অবজ্ঞা করেছে মনে মনে ?

হঠাৎ যেন নিজেকে বড় অসহায় লাগে অলকার। কিন্তু তবু পারেন নি স্বভাব বদলাতে। মেয়ের ভাষায় একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেই চলেছেন। লীনার বিয়েতে বেড়াতে এসেছিল শান্তিদি। অলকার চেয়ে বছর সাতেকের বড় হবেন। চারটি ছেলেমেয়েকে একেবারে শিশু রেখে স্বামী মারা যান। টিচারি, টিউশনি করে ছেলে-মেয়েকে বড় করেছেন। তাদের নিজেদের পছন্দমতো বিয়েতে সাহায্য করেছেন, এখন ছেলে-বৌয়ের সংসার নিয়েই আছেন।

বিয়ের কাজে ব্যস্ত হ'য়ে হাসি-মুখে ঘোরাঘুরি করছেন অলকা। হঠাৎ শান্তিদি বলে উঠলেন, অলকা, তোর চেহারাটা দিন দিন আরও সুন্দর হোয়ে উঠছে কেন রে ? লীনার পাশে দাঁড় করালে বড় বোন ছেড়ে মা কেউ বলবে না।

অলকা কৌতুকের লোভ সামলাতে পারেন না। ফিসফিস করে গোপন কথা বলার মতো করে বলেন, কারণ কি জানো ? তুমি জীবনটা মেনে নিতে পেরেছ। আমার মনের কোণে বোধহয় এখনও নতুন করে ঘর বাঁধার আশা আছে।

পাশেই খাটের ওপর লীনা বসেছিল। ব্যঙ্গের ভাব ঠোঁটে ফুটে ওঠে। হেসেই বলে, আমারও তাই মনে হয় মা। তা এখন তো আর কোনো বাধাই রইল না, আশাটা মিটিয়ে ফেল।

আজ আর অলকা এ ব্যঙ্গের ভাব গায়ে মাখলেন না, জোরে হেসে উঠলেন। সবটাই একটা কৌতুক ধরে নিয়ে শান্তিদিও হাসতে থাকেন।

ট্রেন ছুটে চলেছে।

জানলার পর্দাটা টেনে সরিয়ে কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকায় অলকা সেন। দেখা যায় না কিছুই। শুধুই রাশি রাশি অন্ধকার পেরিয়ে চলেছেন। কোথায় ? আলোর রাজ্যে ? হাসি পায়। অলকা সেন ভাবেন, শুধুমাত্র একটি মানুষের অভাবে পৃথিবীটা এত শূন্য লাগে কেন ? আত্মীয় বন্ধু তো চারিদিকে ছড়ানো। কিন্তু তবু কি একা—একেবারে একা ! মনের একান্ত কাছাকাছি থাকবে একটি মানুষ। বয়স ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। শরীরে দেখা দেবে নানা উপসর্গ। যা না বলা যায় সন্তানকে, না যায় আত্মীয়, বন্ধুকে। সেই একজন—একটুখানি আচ্ছাদনের মতো একটা অস্তিত্ব। শুধু এর অভাবে জীবনটা এত রিক্ত এত ভিখারি হয়ে যায়। হঠাৎ বুকটায় কেমন ব্যথা করে ওঠে। কিছুকাল ধরে মাঝে মাঝেই ব্যথাটা হয়েছে। গ্রাহ্য করেন নি অলকা। মাথায় কেমন যেন একটা কষ্ট হচ্ছে, চিৎকার করে উঠতে চান অলকা সেন, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলেই সামনে তীব্র আলোটা দেখে চোখ বুজে ফেলেন। কিন্তু—আবার চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করেন। মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটি মুখ। স্নেহ-কোমল একটি দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে। মাথায় কপালে আস্তে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার বিভাসরঞ্জন, একটু ভাল লাগছে।

অলকা জবাব দিতে পারেন না। নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন ডাক্তারের মুখের দিকে।

অমন করে চেয়ে দেখছ কি ! চিনতে পারছ না ?

অলকা এবার নিশ্চিন্তে চোখ বোজেন আর বন্ধ চোখের দু পাশ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় অবিরল ধারা নেবে আসে। বিচলিত হন বিভাসরঞ্জন। চুয়ান্ন বছর বয়স। জীবনের অপরাহ্ন তাঁর আসন্ন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। নিজেকে স্থির করে নিয়ে পকেট থেকে রুমালটা বার করে সযত্নে চোখের জল মুছে দেন। বলেন, ছি, অলকা—অমন করে কাঁদতে নেই। তারপর নিজের মনেই বলেন, আশ্চর্য দৈবের ঘটনা—ঠিক সময় পাটনা থেকে এই কামরাতেই যদি আমি না উঠতাম তো কি যে হতো ?

অলকা সেন আস্তে উঠে বসেন। কম্বলটা একপাশে সরিয়ে বিছানায় জায়গা করে দেন বিভাসের বসার জন্যে। সিটের তলা থেকে বড় ট্রাঙ্কটা টেনে নিয়ে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারই ওপর বসে রুগীর আরোগ্যের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ডাক্তার বিভাসরঞ্জন বোস। এবার উঠে পা দিয়ে সেটা ভেতরে ঠেলে দি-

বসলেন অলকার বিছানায়। সিগারেট বার করে ধরাতে ধরাতে হেসে বললেন, এতক্ষণ এ বস্তুটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর ছেলেমেয়ের খবর কি?

সঞ্জু ফ্রান্সে আছে। ওখানেই বিয়ে করেছে। গত সেপ্টেম্বরে লীনির বিয়ে দিয়েছি। দিদিই ঠিক করেছিলেন দিল্লীর ছেলে। কলকাতায় বড় একা লাগছিল, তাই মাস ছয়েক দিদির কাছে কাটিয়ে আসতে চলেছি।

তারপর? গভীর স্বরে প্রশ্ন করেন ডাক্তার।

তারপর? হাসেন অলকা সেন। বাইরের শূন্য অন্ধকারের দিকে তাকায়।

আমি এখন দিল্লীতেই আছি।

জানি। দেশে ফেরার খবর কাগজে দেখেছিলাম।

অন্যমনস্কের মতো অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বলেন, একটা সিরিয়াস কেস-এর ব্যাপারে পাটনা যেতে হয়েছিল। সময়ের অভাবে প্লেন ছাড়া ট্রাভেল করাই সম্ভব হয় না। দুটো ভাল বই হাতে এসেছে তাই ভাবলাম ট্রেনে পড়া যাবে।

বাধা দিলাম? সুন্দর করে হাসলেন অলকা সেন। তেতাল্লিশ বছর বয়সে এখনও যাঁর গালে দুটি সুন্দর টোল পড়ে।

মুহূর্তকাল সেদিকে চেয়ে থেকে ডাক্তার বলেন, বাধা তো আমরা দুজনেই দুজনকে দিলাম। আমি ঠিক সময় গাড়ীতে উঠে বাধা না দিলে তোমাকে কি ধরে রাখতে পারতাম? কি রকম আশ্চর্য, না? হাতের সিগারেটটায় জোরে টান দিয়ে ছাইদানে টিপে নেবাতে নেবাতে বলেন, অলকা জীবনের দায়িত্ব তো চমৎকারভাবে শেষ করলে আর তোমার ভাবনার কি আছে?

যতক্ষণ অনেক কাজ ছিল, ভাববার সময় পাইনি। আজ সব দায়িত্ব শেষ হয়েছে, আর নিজেকে বড় ভার মনে হচ্ছে।

দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো না অলকা?

আনন্দের আঘাতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন অলকা। ছেলে মানুষের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকেন, না না না---

অবাক হন বিভাসরঞ্জন, আলতো হাতে অলকার চিবুকটা তুলে ধরে তাঁর ছেলেমানুষি আর কান্নাভরা মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন, কি হল বল তো? অমন জোরে মা-মা করে উঠলে কেন? তারপর একটু কি ভেবে নিয়ে বলেন, আঠারো বছরে মেয়েকে স্কলারশিপ আর পাঁচটা টিউশনির ওপর নির্ভর করা গরীব একটি ছেলের হাতে তোমার মা সেদিন দিতে রাজী হননি। কিন্তু আজ আমার অনেক আছে। নেই তা ব্যবহার করার কেউ।

সেই জন্যেই তো, সেই জন্যেই তো-প্রায় হিস্টিরিয়া রুগীর মতো বলতে থাকেন অলকা। সেইজন্যেই তো সম্ভব নয়, সম্পদে-স্বাস্থ্যে তুমি পরিপূর্ণ। আমি কি নিয়ে আজ আসব তোমার কাছে? এতটুকু আনন্দ যাকে দিতে পারিনি, শুধুমাত্র বোঝা হয়ে কি করে যাবো তোমার কাছে?

তুমি ভুল করছ অলকা। সেদিনের দেয়া-নেয়া, পাওয়া না-পাওয়ার সুখ দুঃখের স্বাদ ছিল এক রকম। আজকের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। তাছাড়া শুধু যে আমিই তোমার ভার নিতে চাইছি তা নয়। নিজেকে একা বয়ে নিয়ে চলতে বারবার ক্লান্ত বোধ করেছি। তাই তো কাজের মধ্যে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াই। কিন্তু এবার তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আমি বিশ্রাম নিতে চাই।

●

ট্রেন ছুটে চলে।

স্টেশনে বাড়ীর গাড়ী আসে। বিভাসরঞ্জনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যান অলকা সেন।

ডাক্তার বিভাস রঞ্জন বোস দিল্লীতে সুখ্যাত একটি নাম। দিদি-জামাইবাবু রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে পরে লীনাকে খবর দিলেই চলবে।

ওই ক্ষেত্রটির কথা ভেবেই বেশ শুকিয়ে উঠছিলেন অলকা সেন। সঞ্জুকে চিঠিতে খবরটা দেওয়া হল।

আয়োজনের প্রশ্ন ওঠে না। ডাক্তারের দু' জন বন্ধু আর দিদি-জামাইবাবুকে নিয়ে সই-সাবুদ শেষ হল। প্রবীণের গাম্ভীর্যের মধ্যে আনন্দ সারা। ফোনে লীনাকে খবরটা দেওয়া হ'ল। বাইরে থেকে কানে যাওয়ার থেকে নিজেরাই বলা ভাল। প্রথমটা প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কিছুটা কৌতূহলের বশেই বোধহয় একবার আসতে শেষ পর্যন্ত রাজী হল। ঘণ্টাখানেক পরে বাইরের বন্ধুরা শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুকল লীনা।

কাঠগড়ার আসামীর মতো মাথা নীচু করে বসে রইলেন অলকা সেন। সরু সুতোর মতো সিঁথিতে একটু সিঁদুর কপালে ছোট্ট একটি টিপ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক একবার জরিপ করে নিল লীনা। দাঁড়িয়ে রইল কাঠের মতো শক্ত হয়ে।

কারাগারের স্তব্ধতা ভাঙলেন জামাইবাবু। অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয় বোস।

না বসব না। স্পষ্ট উচ্চারণ লীনার। দাদা জানে?

জানে বৈকি? তাকে চিঠিতে সব লেখা হয়েছে। ও খুশীই হয়েছে। ওদের দেশে এ সব জিনিস খুবই স্বাভাবিক। এতদিন ওখানে রয়েছে, ওর দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে গেছে।

আমি এদেশের। আমার দৃষ্টিভঙ্গী এদেশের। তাছাড়া আজ আর শুধু আমার মতে কিছু এসে যায় না। আমার শাশুড়ী আর স্বামী চান না আর আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি।

এতক্ষণ ডাক্তারের দিকে সম্পূর্ণ পেছন ফিরেই কথা বলছিল, এবার

তাকালো সোজাসুজি, আপনি বোধহয় জানতেন না—কিছুকাল আগে এই দিল্লী সহরেই আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর আমাকে এখানেই থাকতে হবে। সম্ভব হলে এঁকে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেলে সুখী হব।

স্মিতহেসে প্রশান্তভঙ্গীতে বললেন ডাক্তার বোস, তোমার মার মনের শান্তির জন্যে সেই ব্যবস্থাই করব ভাবছি। লীনার ঔদ্ধত্যে উপস্থিত বড়রা কেউ যদি ধমকে উঠতেন তো সে যেন আর একটু জোর পেতো। কি একটা জালায় ছটফট কোরে মার দিকে চেয়ে বলে ওঠে, এ বয়সে এ সখটুকু না করলে এমন কি এসে যেত। আচ্ছা যাচ্ছি। গট গট করে বেরিয়ে যায়।

এ বয়সে!—এ সখটুকু!—অসহায় দৃষ্টি মেলে মেয়ের চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকেন অলকা। তাঁর বুকের ভেতর থেকে একটা আর্ত্ত চিৎকার বেরিয়ে আসতে চায়—এ সখ নয়—এ প্রয়োজন। শিশুর যেমন একটা অবলম্বন দরকার—জীবনের সায়াহ্নেও এমনি একটা অবলম্বন দরকার সখ নয়—প্রয়োজন।

নাকের নোলক হয়ে জ্বলে

শান্তনু দাস

যতটুকু আলো আসে
জানলা
গরাদ
পেরিয়ে
চোকাঠে
থেমে থাকে।
সাবাস পৃথিবী, যতদিন আছো, থাকো
অলিন্দ, গৃহকোণে ত্রিভঙ্গ দেয়ালে
অন্ধকার দুহাতে সরিয়ে হেঁটে আসা।

বেশ আছি, যোজন যোজন মাইল
দূরান্তরে
দূর...
ভালবাসা
নিমগ্ন পৃথিবী
সূর্যস্নানের কথা ভোরের শিশির
নাকের নোলক হয়ে জ্বলে।

বেশ আছি, সাপের মণির মতো চোখ দুটো জ্বেলে
অন্ধকার
গড়িয়ে
গড়িয়ে...
গড়িয়ে..
পথ হাঁটা
প্রপিতামহের পটে জেলে দিয়ে মাটির প্রদীপ।

যতটুকু আলো আসে
জানলা
গরাদ
পেরিয়ে
চোকাঠে

॥ অগ্রহায়ণ মাসের ফলাফল ॥

বর্তমান অগ্রহায়ণ মাস জনমনে একরূপ অদম্য হতাশার ভাব জাগাবে। আর অহং-মত্ত যারা, স্বার্থান্বেষী ধনলিপ্সু যারা, তাদের মনে জাগাবে এক ধরণের আতঙ্কের ভাব। মানুষ বে-পরোয়া হয়েও উঠতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তারই প্রতিফলন দেখা দিতে পারে। জিঘাংসা ও প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগাচ্ছে মঙ্গল আর রাহু আর বক্রী শনি তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। আরবীয় রাষ্ট্রগুলোর উপর আছে অশুভ ছায়াপাত। ইউরোপে কোনো নূতন ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে। রাশিয়ায় কোনো আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটার আভাস রয়েছে। আমেরিকার ক্ষতিকর নানা যোগ রয়েছে। যাক্, এবার জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। অগ্রহায়ণের জাতকের মধ্যে ইচ্ছার দৃঢ়তা থাকবে, তারা স্পষ্টবাদী, এবং খেয়ালী। তারা আশ্রিত বৎসল। খেয়ালকে মাশুল জোগাতে তাদের কোনো কোনো সময় হাতের লক্ষ্মীও পায়ে ঠেলতে হয়। এরূপ জাতকের তেরো বয়স থেকে উনিশ বর্ষ বয়স লক্ষণীয়। এর মধ্যে বাধা না পড়লে তাদের জীবন হবে বেশ উন্নত। অর্শ ও আন্ত্রিক রোগ সম্বন্ধে সাবধান থাকা এদের উচিত। অগ্রহায়ণের জাতিকা জেদী হলেও স্নেহ-কোমলা এবং সুকণ্ঠী হয়ে থাকেন। শিল্প, সাহিত্য-চর্চা ও অধ্যাপনায় এরা কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। এরূপ মহিলার দাম্পত্য-জীবন হয় সুখের। এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী অগ্রহায়ণ মাসের শুভাশুভ আভাস দেওয়া হল :---

ভৃগুজাতক

মেষ : গোড়ার দিক নানাভাবে ঝঞ্চাটসূচক। আর্থিক টানাটানি থাকবে। অনির্দিষ্ট আয় যাদের তাদের সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তিতে টান পড়তে পারে। নির্দিষ্ট আয় থাকলেও তাতে অকুলান হবে। মাসের তৃতীয় সপ্তাহে স্বাধীন প্রোফেশনে আয় বাড়তে পারে। ঝোলো সূত্রে প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা আছে। মাঝে মাঝে মানসিক অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য নতুন প্রার্থীদের চাকুরী হতে পারে। কারো চাকুরী ক্ষেত্রে দুর্ভাবনার কারণও রয়েছে। শত্রুবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের গোলমাল যেতে পারে। অবশ্য নতুন প্রার্থীদের চাকুরী হতে পারে। কারো সহায়তাও উপকার করবে। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ও স্বাস্থ্য এবং বয়স্কদের কাজকর্মের ব্যাপারেও উত্ত্যক্ত হবার সম্ভাবনা। মহিলা জাতকের মানসিক অপবাদ প্রায়ই উত্ত্যক্ত করবে। প্রিয়জনের জন্য উৎকণ্ঠা ভোগেরও আশঙ্কা। মেষ লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক ব্যাপারে কিছু আশাপ্রদ কিন্তু শত্রুতা ও বৈষয়িক ঝঞ্চাট উত্ত্যক্ত করবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত।

বৃষ : সাংসারিক ব্যাপার মাঝে মাঝে উত্ত্যক্ত করবে। জেদের ভাব ও আত্ম-সম্মান জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে শত্রুবৃদ্ধি ও উন্নতির পথে বাধা আনতে পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকা দরকার। পারিবারিক ক্ষেত্রে মত-বিরোধও অশান্তি আনতে পারে। ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। শিল্পী, গবেষক ও লেখকদের এ মাস বেশ সুযোগ দেবে। পরীক্ষার্থী-দের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। চাকুরী ক্ষেত্রে উন্নতির বা পরিবর্তনের আভাস রয়েছে। রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপে যারা যুক্ত, তাদের পক্ষে এ মাস অনুকূল নয়। দলাদলি ও উত্তেজনা-মূলক ব্যাপার থেকে নিজে সরে থাকা যুক্তিযুক্ত। মহিলা জাতকের কোনো ব্যাপারে হতাশ হবার আশঙ্কা থাকলেও শেষাংশে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির মত যোগ। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও সম্মানজনক কাজে সাফল্য বুঝায়। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুকূল হবে না। স্বাস্থ্যও কিছু উৎপাত করবে।

মিথুন : জমি-বাড়ির ব্যাপার নিয়ে যারা কাটান তাদের পক্ষে মাসের গোড়ার

দিক ঐ সব ব্যাপারে উৎপাতসূচক। ভাগাভাগির ব্যাপারেও গোলযোগ হতে পারে। সাধারণভাবে ব্যবসায়ে চলনসই অবস্থা। বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীদের আয়ের দিক থেকে আশানুরূপ হবে না। শরীর এ মাসে দুবার বেশ উৎপাত করবে। গলা ও উদর সংক্রান্ত কোনো গোলযোগ দেখা দিলে গোড়ায়ই সতর্ক হবেন। পারিবারিক ব্যাপারে মোটামুটি ভাল। শেষাংশে গুরুজনদের কারো সঙ্কট যেতে পারে। সন্তানদের কারো জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা রয়েছে। চাকুরী ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনাও আছে। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রিয়জন দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ও কর্মক্ষেত্রে অশান্তিকর অবস্থা উদ্ভূত করতে পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

কর্কট: শনি ও রাহুর কুপ্রভাব মানসিক স্থিরতা নষ্ট করতে পারে। অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝাট, গুরুজন-পীড়া ও ব্যয়-বাহুল্যের যোগ। জমি-বাড়ি ও ফসলাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিরোধও দেখা দিতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা কর্তব্য। নতুন কোনো ব্যবসায়ে কিংবা গঠনমূলক কোনো কাজে নামারও সম্ভাবনা। গচ্ছিত অর্থাদি সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। কাউকে কথা দিয়ে তা রাখতে গিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়তে পারেন। দাম্পত্য ক্ষেত্রেও দুর্ভাবনার কারণ রয়েছে। ব্যবসায়ে নতুন যোজনার সম্ভাবনা। চাকুরী ক্ষেত্রে আশানুরূপ হবে না। মহিলা জাতকের পক্ষে ভাবপ্রবণতা, অভিমান ও জেদের ভাব সংযত করে চলা উচিত। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে বাধা ও স্বাস্থ্যের গোলযোগ যাবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রু বৃদ্ধি ও পারিবারিক অশান্তি মনের উপর চাপ দেবে।

সিংহ: গোড়ার দিকে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবার মত যোগ রয়েছে। কিন্তু দলীয় ব্যাপার কিংবা রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকলে তাতে ঝঞ্ঝাট, অর্থহানি ও নৈরাশ্যের আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ে মোটামুটি চলনসই। নতুন কিছু করার আগে বিশেষ চিন্তা করে চলা উচিত। শত্রুর চাপজনিত কষ্ট কিংবা উদর-বায়ুর উৎপাত উত্ত্যক্ত করতে পারে। সামাজিক ব্যাপারে যোগাযোগ ও প্রীতির প্রসার হবে। প্রিয়জনদের মধ্যে কারো উন্নতি কিংবা তার শুভ কর্মের সম্ভাবনা। চাকুরী ক্ষেত্রে মর্যাদা বাড়বে। প্রেম-প্রণয়ে তরুণদের সতর্ক থাকা উচিত। মহিলা জাতকের পক্ষে কোনো সূত্রে লাভ এবং চাকুরে মেয়েদের উন্নতির সম্ভাবনা। কিন্তু শত্রুর মনের উপর চাপ দেবে। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে বৈষয়িক ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট এবং কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বাধা রয়েছে। আর্থিক সমস্যা উৎপাত করতে পারে।

কন্যা: মনের স্থৈর্য রাখুন। মাসের গোড়ার দিক হয়ত হতাশ করবে, কিন্তু যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। উত্তেজনা ও বিতর্কমূলক ব্যাপার থেকে দূরে থাকুন। নিজের কাজ শান্তভাবে করে যান। ব্যবসায়ে দুর্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তিন মাস বেশ উৎপাতসূচক। তবু কারো সহায়তা উপকার দেবে। চাকুরী ক্ষেত্রেও আশানুরূপ হবে না। যাদের চাকুরী মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাদের আবার

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সংগে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সংগে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সংগে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

কাজ পাবার পক্ষে বাধা আছে। শরীর মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। পারিবারিক ব্যাপারও ঠিক অনুকূল নয়। যে সূত্রে আয়ের আশা সেই সূত্রেও আশানুরূপ হবে না। মহিলা জাতকের অবশ্য প্রিয়জনের উন্নতির আশা কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের উৎপাত ও আর্থিক দুর্ভাবনা মনের উপর চাপ দেবে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও ছেলে-মেয়েদের কারো সম্বন্ধে শুভ ফল আশা করতে পারেন।

তুলা : আরব্ধ কাজে আশাপ্রদ। কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্রতিকূল হবার আশঙ্কা। চাকুরীক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুতা প্রকাশ পেতে পারে। বিভাগীয় কর্তা হলে পরিবর্তনের আভাস রয়েছে। নতুন প্রার্থীদের চাকুরী পাবার সম্ভাবনা। যারা বিভাগীয় পরীক্ষা কিংবা চাকুরী লাভের জন্য পরীক্ষা দেবেন, তাদের বিশেষ সতর্ক হয়ে পরীক্ষা দেওয়া উচিত। প্রায়ই মন বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত থাকতে পারে। পারিবারিক পরিবেশ মাঝে মাঝে শান্তির প্রতিকূল হবে। নিজের মনোমত কাজে বাধা এবং অন্যান্যদের অসন্তুষ্টভাব প্রকট হয়ে উঠতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন প্রচেষ্টা বুঝায়। আর্থিক দিক থেকে তেমন ভাল নয়। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রিয়সঙ্গ ও আপন জনের উন্নতিতে আনন্দ লাভের সম্ভাবনা। তুলা লগ্নে জন্ম হলে প্রীতির প্রভাব ও নতুন কোনো কাজে উদ্যোগী হবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্বাস্থ্যের উৎপাত ও আকস্মিক কোনো ব্যাপারে ক্ষতি হতে পারে।

বৃশ্চিক : কেমন যেন এক ধরণের অস্বস্তিকর অবস্থা চলবে। কাজে মন বসানো কঠিন হবে। অন্যকে সহ্য করাও সময় সময় বিরক্তি আনবে। বাঁধাধরা চাকুরীর ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে না থাকলে চাকুরী ছাড়তে হতে পারে। বাক্‌সংযম ও উত্তেজনা-মূলক কাজ থেকে দূরে থাকা অত্যাবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রেও অসুখ-বিসুখ এবং জমি-জমা নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে। কেনা-বেচার ব্যবসায়ে মন্দা চলবে। কণ্ট্রাক্টর ও ইঞ্জিনীয়ারদের হতাশ হবার সম্ভাবনা। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা আছে। লেখক ও শিল্পীদের কাজের নতন যোগাযোগ হতে পারে। মহিলা জাতকের দেহ-কষ্ট এবং পুরনো কোনো ব্যাপারের পুনরাবৃত্তিতে অশান্তি হতে পারে। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির আভাস কিন্তু শরীর খারাপ যাবে ও আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্যসূচক হবে। পারিবারিক কোনো ব্যাপার অশান্তি আনতে পারে।

ধনু : সাধারণভাবে ভাল গেলেও আগের কোনো কাজের জের মাঝে মাঝে উত্যক্ত করতে পারে। কারো মর্জিমত কাজ করতে গিয়ে নিজের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদায় আঘাতও পড়তে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে এরজন্য বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিতর্কমূলক ব্যাপার থেকে দূরে থাকাই ভাল। কোনো রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ না দেওয়াই ভাল। রাজনৈতিক ব্যাপার এমাসে অনুকূল না হতে পারে। ছেলেমেয়ে-দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার। তাদের কারো লেখাপড়ার ব্যাপারেও দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে। ব্যবসায়ে বিশেষ করে কেনা-বেচার দোকানদারদের পক্ষে এ মাস তত সুবিধার নয়। গৃহ তৈরীর কিংবা রঙের কারবারীদের পক্ষে এমাস মন্দা যেতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে সন্তানের জন্য দুর্ভাবনা কিন্তু চাকুরে মহিলাদের ভাল হতে পারে। ধনু লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট ও পরাবারিক ব্যাপারে নৈরাশ্য সূচিত হয়। কিন্তু মৌলিক কাজের স্বীকৃতি-লাভ ও সামাজিক যোগাযোগের দিক থেকে ভাল।

মকর : নতুন কোনো কাজ হাতে নিয়ে থাকলে তাতে সাফল্য বুঝায়। এখন কাজ করে যাবার সময় এসেছে। ফলা-ফলের দিকে না তাকিয়ে কাজ করে যান। মাসের মধ্যভাগ থেকেই আশার আলো দেখতে পাবেন। অবশ্য পারি-বারিক দায়িত্ব বাড়তে পারে। আত্মীয়ের বোঝা উত্যক্ত করতে পারে। এ নিয়ে গুরুজনদের ও অন্যান্যদের সঙ্গে মত-বিরোধ হতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন সম্ভাবনা দেখা যায়। অর্থাগমের দিক আগের চেয়ে ভাল। পুরনো ধার-দেনা নিয়েও উত্যক্ত হতে পারেন। বিশিষ্ট সাহায্যকারী কিংবা উপকারীদের মধ্যে কারো সঙ্কট-পীড়াদি উত্যক্ত করতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে কোনো সূত্রে লাভের আশা আছে। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। মকর লগ্নে জন্ম হলে অশান্তি ও আর্থিক দুর্ভাবনার আশঙ্কা। ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারেও উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাট হতে পারে। দূর ভ্রমণে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

কুম্ভ : বৈষয়িক ব্যাপারে কিছু ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। পুরনো ব্যাপার নিয়ে কয়েকদিন ব্যস্ত থাকারও সম্ভাবনা। আবার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও নতুন করে চিন্তার সময় এসেছে। মন্দা বাড়বে। জমি-বাড়ি ও ফসলাদি নিয়েও উত্যক্ত হবার সম্ভাবনা। লোহার কারবারী ও কণ্ট্রাক্টারদের পক্ষে এমাস নৈরাশ্য-সূচক। স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে। মূত্রাশয়ঘটিত কোনো উৎপাত দেখা দিলে সাবধান হবেন। দূরে কোথাও যাবার প্রয়োজন হলে সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক থাকা উচিত। নতুন কোনো কারবারেও উদ্যোগী হবার সম্ভাবনা। রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নির্লিপ্ত থাকাই যুক্তিযুক্ত। চাকুরীক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্তনের আভাস রয়েছে। মহিলা জাতকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল। বিবাহযোগ্যাদের মনোমত ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। কুম্ভলগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুর্ভাবনা এবং পারিবারিক পরিবেশ মাঝে মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে।

রবিঃ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির অন্তরায়গুলি কেটে যাবে। নতুন কোনো যোগাযোগ উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়াতে পারে। অবশ্য নানা কারণে মনের উপর চাপ পড়তে পারে। দলীয় ব্যাপার ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দলাদলি থেকে দূরে থাকাই যুক্তিযুক্ত। স্ত্রীরা কাজ করেন, তাঁদের বিশেষ কাজে সাফল্য ও স্বীকৃতিলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ে আগের চেয়ে ভাল। কিন্তু কোনোরূপ ঝুঁকির কাজ নেওয়া উচিত হবে না। চাকুরীক্ষেত্রে নতুন আভাস পেতে পারেন। নতুন প্রার্থীদের চাকুরীলাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্যের উৎপাত হলেও প্রিয়জনের উন্নতিতে আনন্দলাভের সম্ভাবনা। মীন লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। কিন্তু পারিবারিক পীড়াদিও বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট উৎপাত করতে পারে।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রী প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী (বেলতলা বাজার, হুগলী)—মাসিক বসুমতীতে মাসিক রাশিচক্র দেখুন। ● শ্রীলক্ষ্মী সেনগুপ্ত (বরাহনগর)—(১) আগামী পনেরো মাসের মধ্যে না হলে আর হওয়া কঠিন, (২) সম্ভাবনা, সময়টা দেখুন। ● শ্রীশশাঙ্কশেখর ব্যানার্জী (বেহালা)—দৈনিক বসুমতীর কুপনে মাসিকে উত্তর পাবেন না। মেষ রাশির পক্ষে দুই বৎসর অশুভ। ● শ্রীঅনঙ্গমোহন গুঁই (কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) বর্তমান ইংরেজী বর্ষে না হলে আরো দেড় বছর পরে, (২) আগামী পনেরো মাস দেখুন। ● শ্রীঅ-ন-রা (ধানবাদ)—(১) বাধা, (২) জনকক্ষেত্রে ব্যাটিসআই কমপক্ষে সাড়ে তিন রতি ধারণ করে দেখতে পারেন সোনার আংটিতে। ● শ্রীঅমিয়কুমার চ্যাটার্জী (হালদারপাড়া রোড, কলি)—(১) তিন বছর ঐ উৎপাত থাকবেই, (২) উন্নতি তিন বছর পরে। নয় রতি গাঢ় লাল প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ ক'রে দেখতে পারেন। ● শ্রীজীতেন মিত্র (জেসপ রোড, কলি)—(১) উন্নতি হবে, (২) ভাল হবে; কিন্তু দেড় বছর বিশেষ সাবধান। ● শ্রীজগন্নাথ বাগানি (মণ্ডলপাড়া, অনন্তপুর,)—দু'বছরমধ্যে বাধা আসতে পারে, (২) উক্ত বাধা অতিক্রম হলে ভালই হবে। চাকুরীর যোগ। ● শ্রীনবকুমার চ্যাটার্জী (বোলপুর, শান্তিনিকেতন)—(১) কর্মস্থানে অক্টোবরের মধ্যে পরিবর্তন হবে, এখন হবে না, (২) (২) পিতার স্বাস্থ্য উৎপাত করবে, (৩) নবগ্রহ কবচ ধারণ করে দেখতে পারেন। (৪) সন্তানভাব সাধারণ। দুখানি কুপন এক সঙ্গে পাঠানো ঠিক হয়নি।

● শ্রীব্যবহারজীবী রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা)—(১) শনি উৎপাতসূচক, তবু নয় মাস মধ্যে হতে পারে, (২) পেশায় বত্রিশ বর্ষ বয়সর পর উন্নতি ● শ্রীমতী মধুমতী রায় (শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) পড়াশোনায় মন্দ হবে না, কিন্তু দেড় বছর বিশেষ সাবধান, (২) সুখের হবে, (৩) উন্নতি হতে দেরী হবে, (৪) সময় এসেছে, কিন্তু সতর্কভাবে চলা দরকার, একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠান উচিত নয়; ● শ্রীমতী মধুচ্ছন্দা মুখার্জি (শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) এগারো মাস সাবধান, (২) ভাল হবে, (৩) বাইশ বর্ষ বয়সের কাছে, (৪) উক্ত সময়ের কার্যকারণের উপর নির্ভর করছে; ● শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী (বি, ই, কলেজ, শিবপুর)—(১) আগামী ইংরেজী সালের শেষাংশে, (২) চার-পাঁচ রতি সাদা মুক্তা সোনার আংটিতে। ● শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য (মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড, হাওড়া)—(১) এবার আশ্বিন থেকে তিন মাসের মধ্যে কোনো খবর পেতে পারেন, (২) সম্ভাবনা আছে; ● শ্রীঅসিত চ্যাটার্জী (বিরাটী)—(১) হবে, (২) ভাল চিকিৎসক দেখান; ● শ্রীবারিদ মুখার্জী (দক্ষিণ গড়িয়া)—মীন লগ্ন, (২) পরে সাফল্য। ● কুমারী পূর্ণিমা মুখার্জি (দক্ষিণ গড়িয়া)—তুলা লগ্ন, (২) নয় মাসের মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীকেদারনাথ (রাজা কী স্বাস্থ্য আগরা) (১) হবে, (২) কেতু-শনি কিংবা শুক্র-কেতুতে, (৩) এখন হবে না, (৪) রক্তমুখী প্রবাল নয় রতি; একসঙ্গে একটির বেশী হবে না, (৪) রক্তমুখী প্রবাল নয় রতি; একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠানো উচিত নয়; ● মিঃ বি, দত্ত (কান্দী, গোপীনাথপুর)—(১) অধ্যাপনা, (২) হবে না; ● শ্রীহরিবোল পাল (কলিটা, আটগ্রাম)—(১) হবে, (২) চেষ্টা করুন; ● শ্রীচঞ্চল মুখার্জি (প্যারীমোহন সুর গার্ডেন লেন, কলিকাতা) (১) চিত্রা নক্ষত্র, তুলা রাশি, দেবারিগণ, (২) তিন বছর সহ্য করতে হবে; ● কুমারী মালা রায়, (কলিকাতা-৩৫)—(১) তেইশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত সংসর্গ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান, (২) শ্বেত প্রবাল সোনার আংটিতে আট রতি; ● শ্রী এস গুপ্ত (চারু এভিনিউ, কলিকাতা)—(১) সময় গোলমেলে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান এবং গ্রহের প্রতিকার জন্য পীত পোখরাজ ছয় রতি, (২) উৎকৃষ্ট সিংহলী গোমেদ ছয় রতি ও রক্তমুখী প্রবাল আট রতি ধারণ করিয়ে দেখতে পারেন, পোখরাজ সোনার আংটিতে এবং অন্য রত্ন রূপার উপর, (২) আগামী ফাল্গুন পর্যন্ত সাবধান। ● শ্রী আর, বি, কে (হাজরা রোড, কলি)—(১) মীন লগ্ন, মীন রাশি ও দেবগণ, (২) চাকুরী পেতে দেরী। ● শ্রীমৃণাল রায়চৌধুরী (কপাটি, দরং), (১) আগামী মার্চ পর্যন্ত সময় বিরুদ্ধ, তবু এর মধ্যে সুযোগ আসতে পারে, (২) আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন,

আগামী মার্চের পর ধীরে ধীরে। ● শ্রীমতী জয়া দাশ (যশোর রোড, লেক টাউন)---(১) হবে, (২) বর্তমানের চেয়ে ভাল হবে, (৩) বাসগৃহ হবে, (৪) হবে না; ● শ্রীশান্তনু সিমলান্দি (অবধায়ক, শ্রীঅসিতকুমার ব্যানার্জী, শ্রীপল্লী, আসানসোল) (১) অধ্যাপনা হতে পারে, (২) ভালই হবে, কিন্তু বারো বছর বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান; ● শ্রীসিদ্ধার্থ চক্রবর্তী (রাজাবাগান লেন, কলিকাতা) (১) বিজ্ঞান সংক্রান্ত (২) মঙ্গলের প্রতিকার এখনই দরকার; গোড়ায় ছিদ্রযুক্ত পরে লাল প্রবাল ৪।৫ রতি ধারণ করান। ● শ্রীমতী গীতা চক্রবর্তী (রাজা বাগান লেন, কলিকাতা ---(১) ভাল সাদা মুক্তা চার-পাঁচ রতি পরিমাণ সোনার আংটিতে (২) আগামী মাসে কিছু ভাল হলেও চৌত্রিশ বর্ষ বয়সের পর প্রকৃত সমৃদ্ধি। ● শ্রীসুজিৎকুমার চক্রবর্তী (রাজাবাগান লেন, কলিকাতা---(১) কালচে আভার আটরতি গোমেদ এবং রক্তমুখী প্রবাল ন' থেকে বারো রতির মধ্যে রূপার আংটিতে, (২) ডিসেম্বরের মধ্যে না হলে আরো দু বছর দেরী, (৩) উক্ত সময়ে (৪) সাত বছর পর গৃহাদি, রাজনৈতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা বিধেয়। ● শ্রীমতী যূথিকা রায় (চড়কডাঙা রোড, শ্রীরামপুর---(১) হবে, (২) মনের মতন। ● শ্রীদিলীপকুমার নিয়োগী (গৌরমণ্ডল রোড, আসানসোল---(১) পরিবর্তন হবে, (২) হীরা কমপক্ষে এক রতির তিন ভাগের এক ভাগ ও পান্না পাঁচ রতি। সোনার আংটিতে ধারণ। ● শ্রীমতী মল্লিকা সেনগুপ্ত (যাদবপুর ইস্ট রোড, কলি---)যেখানেই হোক্ মনোজ্ঞ হবার সম্ভাবনা, (২) আগামী মার্চ পর্যন্ত দেখুন। ● শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত (নয়া সাইলী চা-বাগান, নাগরে কাট)---নিজের স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক পীড়াদি উত্ত্যক্ত করতে পারে এবং কর্মজীবনে পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা, (২) সদ্‌গুরু লাভের যোগ আছে। ● শ্রী এস কে ব (রসা রোড, সাউথ, কলিকাতা---(১) আগামী বছরই উন্নতির যোগাযোগ রয়েছে, (২) বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়সের পর। ● শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (গুপ্ত হাউস, কোচবিহার---ব্যক্তিগতভাবে কোন কাজ করা হয় না। আগামী মার্চের পর আপনার কিছু ভাল হতে পারে। ● শ্রী এ কে দাস (ডাঃ হাঃ রোড, কলি ---(১) বর্তমানে আড়াই বছর অত্যন্ত গোলমালে। কণ্ট্রাক্টের কিংবা সরবরাহের কাজে এপ্রিল পর্যন্ত সাবধান, (২) তিন বছর লাগবে। রক্তমুখী প্রবাল ন' রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● কুমারী সোমা দাস (ডাঃ হাঃ রোড, কলিকাতা---(১) আগে প্রথম আট বছর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। পরবর্তী জীবন মোটামুটি ভাল, (২) এখনি প্রতিকার প্রয়োজন। তারজন্য শ্বেত-প্রবাল ও গ্রহ কবচ ধারণীয়। ● শ্রীমতী শ্রীমা দাশ (মন্দির বাজার, চব্বিশ পরগণা)----আগামী বারে বাধা পড়তে পারে, (২) মোটামুটি ভাল। ● শ্রীমতী গীতা ভট্টাচার্য (কলিকাতা) ---(১) বর্তমানে তিন বছর একটু উৎপাত-সূচক, তার জন্মকুণ্ডলী ভাল করে বিচার করান (২) এরপর ভাল, এর জন্য রক্তমুখী প্রবাল আট রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রী এস কে দাশগুপ্ত (ডিষ্ট্রিক্ট হসপিটাল, গাজিপুর)---(১) আগামী মাসের মধ্যে, (২) বদলির সম্ভাবনা। কিন্তু তিন বছর সকল কাজে বিশেষ সাবধান। ●শ্রীডালিম বড়াল (স্যাকরাপাড়া লেন, কলিকাতা) ---(১) আগামী দেড় বছর লাগবে, (২) তেমন আশঙ্কা নেই। ● শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু (হেম ব্যানার্জি লেন, শিবপুর)---(১) নয় মাস দেখুন, (২) অযথা ঝঞ্ঝাট উত্ত্যক্ত করবে। শ্রীচিরপুন চক্রবর্তী (বেনেটোলা লেন, কলিকাতা)---শনি ও রাহু উৎপাত-সূচক। আগামী মার্চের পর কিছু ভাল। (২) আগামী বছর হতে পারে। ●শ্রীশিবপ্রসাদ সরকার (নারায়ণপুর, বনগাঁ) (১) মোটামুটি ভাল, (২) পাঁচ বছর পর মোটামুটি ভাল হবে। ● শ্রীরঞ্জন (কালীঘাট, কলিকাতা)---(১ বর্তমানে বাধা পড়তে পারে (২) পীত পোখরাজ আট রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমানস ঘোষ (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা---আগামী নয় মাস দেখুন, (২) উন্নতি হবে। ● শ্রীসুশীল কুমার বসু (হেম ব্যানার্জি লেন, শিবপুর)---(১) বর্ষকাল ধৈর্য ধরে থাকুন, (২) শরীরও মনের উপর মাঝে মাঝে চাপ পড়ে। ● শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ (রাখাল ঘোষ লেন, কলিকাতা)---(১) মিল হওয়া কঠিন, (২) তবু সেপ্টেম্বরের পর তিনমাস দেখুন। ● শ্রী এ দাস (বড়িষা, কলিকাতা ---(১) না, (২) দেরীতে হবে। শ্রী বি ঘোষ (গড়িয়াহাট, কলিকাতা)---(১ ভরণী-নক্ষত্র, মেষ রাশি ও মেষ লগ্ন, (২) আগে গোড়ার বারো বছর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। সরকারী চাকুরি হতে পারে। ● শ্রীঅমল মুখার্জী (কৃষ্ণনগর, চব্বিশ পরগণা ---(১) পরে ভাল ও স্বাধীন ব্যবসা হবে। (২) কমকক্ষেত্র ক্যাটস আই রত্ন আড়াই রতি ও গোমেদ ছয় রতি ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীমতী মনোরমা বিশ্বাস (ডাক্তার লেন, কলিকাতা ---(১) আগামী বছর না হলে, বেশ দেরী, (২) দু' বছর মধ্যে বাধা ● শ্রীমনা (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ---(১) সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন, ও পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র, এবং নর গণ। (২) চব্বিশ কিংবা বত্রিশ। ● শ্রীগোপীনাথ মিত্র (ব্যাণ্ডেল)---(১) আগের চেয়ে ভাল কিন্তু শত্রু বৃদ্ধি, (২) আগামী মার্চের পর অনেকাংশে ভাল। ●শ্রীমনোজ কুমার ভট্টাচার্য (চিরকুণ্ডা)---আগামী বর্ষেই হতে পারে। (২) প্রতিকার জন্য ছয় রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রী-না-সু (কলিকাতা,)---(১) ছক মোটামুটি ঠিক, (২) আগামী আঠারো মাসের মধ্যে হতে পারে, (৩) মঙ্গল ও শনি , (৪) এখন কোনো ক্ষেত্রেই সুবিধার নয়। এক সঙ্গে দু'খানি কুপন পাঠানো ঠিক নয়।

● শ্রীশঙ্কর মুখার্জী (কলিকাতা)—(১) শনি অশুভ, (২) দেড় বছর মধ্যে। ● শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস (আরামবাটি)---বৃশ্চিক লগ্ন ও মকর রাশি, (২) ক্ষতিকর নয়, (৩) হতে পারে, (৪) দেরী আছে। এক সঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠালে আমাদের অসুবিধা হয়। ● শ্রীমতী আরতি রায় (মহেন্দ্র রায় লেন, কলিকাতা ---(১) এখন সেটা উচিত হবে না। অশুভ যোগ আছে। (২) বত্রিশ বর্ষ বয়সের পর। ● শ্রীমতী আলপনা রায় (মহেন্দ্র রায় লেন, (কলিকাতা)---(১) কন্যা রাশি ও বৃশ্চিক লগ্ন. (২) আশানুরূপ হতে পারে। ● শ্রীকৃষ্ণ (রাধানগর)---কুম্ভ রাশি ও বৃশ্চিক লগ্ন (২) ব্যবসায়। ● শ্রীমালবিকা (হাইলাকান্দি)---(১) প্রতিকার জন্য আট রতি রক্তমুখী প্রবাল সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখুন। এখনো সম্ভাবনা আছে। (২) আঠারো মাস মধ্যে হতে পারে. (৩) পদস্থ হবে, প্রবালের সঙ্গে চার রতি সোনার আংটিতে। ● শ্রীবলরাম পাঠক (কসবা) চার রতি মুক্তা ও পাচ রতি ইন্দ্র নীল ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) আগামী তিন বর্ষপর সম্ভাবনা। ● শ্রীসুধীরকুমার মিত্র (কলিকাতা) ---[illegible] প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। নিয়মাবলী দেখুন। ● শ্রীমতী সন্ধ্যা ঘোষ (লেক রোড, কলকাতা)—আগামী বর্ষ মধ্যে, (২) মোটামুটি ভাল, (৩) উন্নতি হবে, (৪) সোনার আংটিতে আট রতি শ্বেত প্রবাল। ● শ্রীতারাদাস মুখার্জি (টিকডাদহ)---মাসিক বসুমতীতে প্রশ্নোত্তরের নিয়মাবলী দেখুন। ● শ্রীমতী বাণী মুখার্জী (করলবাগ)---দিল্লী)— (২) তিন বছর ধৈর্য ধরতে হবে। ● শ্রীশু সা (কালীকুণ্ড লেন, হাওড়া)---(১) অক্টোবরের মধ্যে না হলে দেরী হবে, (২) স্থায়ী কিছু হতে বেশ দেরী। ● শ্রীসমীরকুমার ভট্টাচার্য (মহাজাতি, কলিকাতা) ---(১) কৃষ্ণক্ষেত্র ক্যাটস আই রত্ন কমপক্ষে আড়াই রতি ধারণ করে দেখতে পারেন, এবং চার রতি মুক্তা। (২) ব্যবসায়ে, (৩) দেরীতে হবে, (৪) পঁচিশ পর্যন্ত হতে পারে। ● শ্রীডালিম বড়াল (সেকরাপাড়া লেন, কলি)---(১) আশঙ্কা নেই, (২) এভাবে রাশি চক্র জানানো সম্ভব নয়। শ্রীদামোদর সরকার (বারারী কলিয়ারী)---(১) রক্তমুখী প্রবাল ও মুক্তা ছাড়া কোনো রত্নই ধারণ করা ঠিক নয়, (২) প্রচুর হবে না, (৩) মোটামুটি ভাল, (৩) শুক্রের দশা বিশেষ ভাল নয়। ● শ্রীশরৎকুমার সাহা (চুঁচুড়া)---(১) দেরী হবে, (২) পড়াশোনা করুন, ভাল হবে। ● শ্রীনরেশ (বারাসাত)---(১) রয়েছে,

(২) আশানুরূপ না হতে পারে। ● শ্রীগৌতম দাস (কলি)---(১) বিশেষ চেষ্টা করুন, (২) কোনো রত্নেই বিশেষ ফল হবে না। তবু আট রতি রক্তমুখী প্রবাল ও চার রতি মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসুব্রত দাস (কুমারপাড়া, চুঁচুড়া)---আগামী বছর হতে পারে, (২) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ● শ্রীমতী অর্চনা মিত্র (বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি)---(১) সঙ্গীতে ভাল হবে, (২) তিন বছর ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।

পাথরের পুরী

সুশীলকুমার গুপ্ত

যেদিকে তাকাই শুধু চোখে পড়ে পাথর পাথর।
মাটি নেই, গাছ নেই, জল নেই, শুধু শুষ্কতার
ছদ্মবেশী প্রেতমূর্তি হিহি করে হাসে, অনুর্বর
রোদ নাচে, সরীসৃপ ঘোরে ফেরে, ফণিমনসার
হাতের ভয়াল মুদ্রা ব্যঙ্গ করে; বুভুক্ষিত জীব
চাটে পাথরের বুক, জিভ থেকে ঝরে অবিরল
তাজা রক্ত, পাখি মরে;—কার অভিশাপে হল ক্লীব
যা ছিল একদা গান-গন্ধ-রঙে উর্বর উজ্জ্বল!

হঠাৎ সূর্যের চোখ চমকে ওঠে। আকাশের কোণে
নোনা মেঘ জমা হয়,—জেগেছে কি স্মরণীয় ঝড়?
পাথর ভাঙার শব্দ, ট্রাক্টরের প্রসন্ন মর্মর
কানে আসে; কার পদপাতে বাজে অসহায় নুড়ি।
রকেটবোমার ধ্বনি মরে যায়; নির্বিবন্ধ গহনে
শস্যের সৈন্যেরা ঢোকে, জয় করে পাথরের পুরী।

বিজয়া ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'চাকরী খুঁজছে? সংসারের জন্যে', তাই বুঝিয়েছে বুঝি তোকে? ওই একখানা লোক। কী ঘুঘু, কী ঘুঘু! তোদের সবাইকে ও এক হাটে বেচে অন্য হাটে কিনতে পারে। রাতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে ও কেন জানিস? ওর সেই মস্ত দামী 'মহাভারত'খানি ছাপাবার তালে। সেই বই ছাপালেই না কি পৃথিবী জুড়ে ধন্যি ধন্যি পড়ে যাবে। সব বদমাইসী। ওই ছুল করে সারাজীবন শালার ঘাড় ভেঙে রাজার হালে কাটিয়ে এল, এখন দেখছে সেখানে মৌচাকের মধু শুকিয়ে এসেছে, তাই নিজের নেশার খরচটার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে।'

'নেশা? আরে দূর।' কমলাক্ষ বলে ওঠে 'ও অপবাদটি অন্তত ও ভদ্রলোককে দিও না।'

বলেই হঠাৎ চুপ করে যায়।

কমলাক্ষর মনে হয় জগতের কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

বিজয়া ছেলের এই ভাবান্তর দেখেন এবং তার কারণটাও অনুমান করতে পারেন।

তাই বিজয়া চাপা রোষের গলায় বলেন, 'সংসারসুদ্ধু সকলেরই তো ব্যাখ্যা করলি, বলি, বাড়ির বৌয়ের কথাটা বুঝি বলতে সাহস হল না?'

কমলাক্ষ একটু চুপ করে থাকে। তার পর আস্তে বলে, 'সাহস হল না নয় মা রুচি হল না।'

আস্তেই বলে।

কারণ সুনন্দা এখন বাড়ি আছে।

কেন কে জানে সুনন্দা এখন প্রায়ই বাড়ি থাকছে।

সুনন্দা বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করেছে।

সুনন্দা সন্ধ্যাবেলায় সেজে গুজে নীলাক্ষের সঙ্গে বেরোচ্ছে না।

কিন্তু কেন?

বিজয়া মনে মনেই প্রশ্ন করেন, কেন? হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন?

'চোরের মন ভাঙা বেড়ায়,' তাই বিজয়া তাঁর নিজের ভাঙা বেড়াটার দিকেই তাকান। বিজয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়, সুনন্দা মীনাক্ষীকে সন্দেহ করছে। সুনন্দা মীনাক্ষীকে 'লক্ষ্য' করবার জন্যেই বাড়িতে থাকছে।

সন্দেহ করতেই পারে।

মেয়েমানুষের চোখ। ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। মীনাক্ষীর যে কোনো 'অসুখ' করেনি, মীনাক্ষী যে শুধু মরমে মরে পড়ে আছে, এ কথা সুনন্দা বুঝতে পেরেছে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বিজয়া ভাবেন, আমি কি একদিন ওই পাজী বৌটার সঙ্গে কোনো উপলক্ষে ঝগড়া বাঁধিয়ে ওকে বাড়ি ছাড়া করবো?

তা' হলে হয়তো মীনাক্ষীর ব্যাপারটা লোক জানাজানি হয়ে যাবে না। তা' হলে হয়তো মীনাক্ষী আবে সামলে উঠবার সময় পাবে'। তারপরই ধরে বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দেবেন তার।

হয়তো সুনন্দার পরিবর্তনের মূলে অন্য কিছু।

হয়তো সুনন্দা তার ননদের দিকে তাকায়ওনি, তবু বিজয়া ওই কথাই ভাবছেন।

কিন্তু একদিন সত্যিই সুনন্দা তাকিয়ে দেখলো।

সুনন্দা লক্ষ্য করলো মীনাক্ষীর জন্যে কোনো ডাক্তার আসে না, মীনাক্ষী উঠে গিয়ে ভাতটাতও খায়, অথচ মীনাক্ষী কলেজ যায় না, রাতদিন ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে।

সুনন্দা ভাবে তবে কি মীনাক্ষী কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি? তাই লজ্জায় এরকম করছে?

হয়েছে ভাল।

বাবা বাড়ি থেকে বেরোনো ছেড়েছেন, বাবার মেয়েও তাই করছে।---আর বাবার পুত্রবধূও---সুনন্দা মনে মনে যেন নিজের জন্যেই ব্যঙ্গ হাসি হাসে, বাবার পুত্রবধূও বাইরের পৃথিবী থেকে ডানা গুটিয়ে নিয়ে এসে ঘরে বসতে চাইছে। এবার কি তবে---রূপকথার গল্পের মতো অতঃপর সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে?

না কি এ শুধু কোনো একটা ঝড়ের আগের গুমোট?

সুনন্দাও নিজের ঘরেই থাকতে ভালবাসে।

যেন এটা একটা হোটেল।

একই রান্নাঘরে রান্না হয় এদের, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের লোক, ঘরে ঘরে বাস করে।

একদা যে এরা একই পরিবারভুক্ত ছিল, এরা একই জায়গায় বসে গল্প করতো, খেতো, পরস্পরের দিকে তাকাতো, পরস্পরের কথা জানতো, তা আর যেন এখন কারুর মনে পড়ে না।

অথচ ছিল সে অবস্থা।

সরোজাক্ষ কখনোই বেশী কথা বলতেন না, তবু তাঁর আশে পাশে এসে বসতো সবাই।

সুনন্দা বলতো, 'বাবা এই বইটার এখানটা ঠিক বুঝতে পারছি না, বলুন তো লেখক এখানে কী বলতে চেয়েছেন?'

মীনাক্ষী বলতো, 'উঃ কী করে যে বৌদি অতো মোটা মোটা বইগুলো এক এক দিনে শেষ করে।'

কমলাক্ষ তখন তো বাড়িতেই।

কমলাক্ষ চাপা গলায় বলতো, মানুষ যে কেন পড়ার বইয়ের বোঝা টানার পরও আবার বই পড়তে বসে, তা আমার বুদ্ধির বাইরে। রেখে দাও বৌদি বই রেখে দাও, নইলে এ বাড়ির কর্তার হাওয়া গায়ে লাগবে। তার চেয়ে একহাত ক্যারাম হয়ে যাক।'

নীলাক্ষ বলতো, 'দ্যাখ কমল, লেখাপড়া শিখে টিকিয়ে টিকিয়ে চাকরী করে কিছু হয় না। যদি বড়লোক হতে চাসতো---ব্যবসা করতে হবে। 'বিজনেস' জিনিসটা কি সেটাই শিখতে চেষ্টা কর এখন থেকে।'

ময়ূরাক্ষীও তখন বাড়িতে।

ময়ূরাক্ষী তখন কুমারী।

ময়ূরাক্ষী বলতো, 'থামো তুমি দাদা। বাঙালীর মাথায় ওসব হয় না। যারা লোটা কম্বল সম্বল করে দু'পয়সার ছোলাভজা খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে পারে, তারাই পারে ওসব। বাঙালীর রুচি আলাদা।'

আর হঠাৎ হঠাৎ সেই আসরে পাগলা সারদাপ্রসাদ এসে পড়ে বলে উঠতো, 'তোরা এই সব বাজে কাজে মত্ত হয়ে সময় নষ্ট করছিস, অথচ আমার সেই নতুন চ্যাপ্টারটা শুনতে বলছি, সময়ই হচ্ছে না তোদের। অথচ শুনলে বুঝতিস কী ইন্টারেস্টিং। রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি গাঁথছিল, গাঁথতে গাঁথতে অসমাপ্ত রেখে মরে গেল। আসলে ব্যাপারটা কী? রাবণ দূর-পাল্লার রকেটের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। আরও কিছুদিন সে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারলে কাজটায় সফল হতে পারতো, চাঁদে মঙ্গলে শুক্রে যেতে পারতো। কিন্তু তার আগেই রাবণব্যাটা একটা পাপ যুদ্ধে নেমে ধ্বংস হল। যেমন এখন ভিয়েৎনামের যুদ্ধ স্নরু হয়েছে। কিন্তু কে বলতে পারে রাবণের সেই ফরমুলাটাই কোনো রকমে এ যুগে কারো হস্তগত হয়েছে কি না। সেকালে লোকে মন্ত্রগুপ্তি করতে ওইসব ফরমুলা তামার সিন্ধুকে পুরে জলে ভাসিয়ে দিতো। ---তা' সেই রাবণের ফরমুলাই পাক, কিম্বা নিজেরাই আবিষ্কার করুক, এ যুগ কিছু নতুন করছে না, সেটাই তোমাদের শোনাতাম।'

●

কিন্তু সারদাপ্রসাদের কথা কেউই শুনতে চাইত না। পাশ কাটাতো। কিন্তু তাকে অপমান করে নয়, কৌশল করে।

তারপর ওর আড়ালে হাসাহাসি করতো।

সেই পারিবারিক আসরে অনুপস্থিত থাকতেন শুধু বিজয়া। বিজয়া তাঁর ঠাকুরঘরের দুর্গে বসে থাকতেন।

কিন্তু আজকাল বিজয়া আর অষ্টপ্রহর সেই দুর্গে বসে থাকতে পাচ্ছেন না।

বিজয়া যেন ছটফটিয়ে নেমে আসছেন।

বিজয়ার গলা যখন তখনই দোতলায় একতলায় শোনা যাচ্ছে।

বিজয়ার কি হঠাৎ খেয়াল হয়েছে ---বাড়ির গিন্নী নিজেকে সংসার থেকে ভাসিয়ে রাখলে সংসারটা ভেসে যায়।

বিজয়ার কথা বিজয়াই জানেন, তবে সরোজাক্ষ মাঝে মাঝে বিস্মিত হন। সরোজাক্ষ জীবনে যা না করেছেন, তাই করেন এক এক সময়। বিজয়া কী বলছেন শুনতে চেষ্টা করেন।

বিজয়ার উচ্চ চীৎকার থেকেই সরোজাক্ষ একদিন টের পান, সারদাপ্রসাদ চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অথবা বেড়াচ্ছেন না, ছল করে রাস্তায় ঘুরছেন।

সরোজাক্ষ স্তব্ধ হয়ে যান।

সরোজাক্ষ নিজের কর্তব্য নির্ণয় করতে বসেন।

কিন্তু একদিন বিজয়ার আশঙ্কা সত্য হয়।

সুনন্দা তার ননদের দিকে তাকায়।

সুনন্দা একদিন তার ঘরে ঢুকে পড়ে বলে, 'তোর কী হয়েছে বল তো মীনা?'

[ক্রমশ।

হিন্দু ধর্ম

লেখক ডক্টর ক্লস ক্লোস্টারমেয়ার ৪৬৭ পৃষ্ঠায় এই জ্ঞানগর্ভ বইটিতে হিন্দুধর্মকে সর্বতোভাবে পরিচিত করতে চেষ্টা করেছেন। যে হিন্দুদর্শন বংশ-পরম্পরায় জার্মান পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ পেয়ে আসছে, সেই হিন্দুধর্মকে দিয়ে এই বইয়ে নিছক দার্শনিক আলোচনা করা হয় নি, পাশ্চাত্যের পাঠকদের জন্যে সহানুভূতিশীল উৎসাহের সঙ্গে হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডক্টর ক্লোস্টারমেয়ার ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান কালচারের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ শহরের সন্নিকটে অবস্থিত নৃত ও ভারতবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র অ্যানথ্রস---ইনস্টিটিউটের একটি শাখা। সহৃদয় বিচারশীলতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের বিশেষ আঙ্গিক আচার-বিচার সম্পর্কে মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমে হিন্দুধর্মের প্রধান অনুশাসনগুলি এবং তার দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে প্রাঞ্জল পর্যবেক্ষণ উপস্থিত করে তারপর হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিভিন্ন শাখা---প্রশাখা আছে, তার নানা রূপরেখার সঙ্গে ডঃ ক্লোস্টারমেয়ার পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যেমন আত্মোপলব্ধির দ্বারা আত্মার মুক্তি প্রাপ্তির ধারণা পরমপুরুষের অস্তিত্ববাদ, যোগসাধনার দ্বারা আত্মার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ইত্যাদি। আধুনিকতার ক্রমবর্ধমান চাপ সত্ত্বেও হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থায় হিন্দুধর্মের সনাতন ভিত্তিতে আঁচড় লাগে নি, ডঃ ক্লোস্টারমেয়ার দক্ষতার সঙ্গে নিপুণ ব্যাখ্যা সহযোগে এই কথাটি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

২

মারাত্মক ওষুধ

বিভা চৌধুরী

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কোকেন, মরফিন, হেরইন জাতীয় ওষুধের -ব্যবহার---গুপ্ত, কেন না এগুলোর যথেষ্ট ব্যবহার আইনবিরোধী—সব সুস্থ চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিয়েছে। এখন ভাবাচ্ছে আগের তুলনায় ঢের বেশি। অবশ্য এগুলোর বিরুদ্ধে সব দেশের আবগারী বিভাগ রীতিমত সক্রিয় থাকায় এগুলোর ব্যবহার মোটামুটি সীমিত। অন্তত: সমাজ-জীবনের আতঙ্ক হয়ে উঠতে পারে নি আজও।

ভাগ্যক্রমে উপর্যুক্ত 'হোয়াইট' ড্রাগ, আইনের ভাষায়, সম্বন্ধে এই মুহূর্তে অত্যধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ না থাকলেও 'ব্রাউন' ড্রাগ—অর্থাৎ, আফিম এবং ঐ জাতীয় ওষুধ সম্বন্ধে তা বলা চলে না। কারণ, এই সবের বেআইনী প্রস্তুতি আর অল্পমাত্রায় চোরাচালান বন্ধ করা ঢের বেশি কঠিন।

আমাদের দেশে আফিমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণে তা নির্ধারিত দোকান থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু বে-আইনী আফিম চালান একটা সমস্যা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ওয়কেফহাল মহলের মতে অবস্থা শংকাজনক

বৃটেন-এ চীনারাই প্রধানত আফিমসেবী; দু'-তিনজন চীনা সাধারণত একত্রে নির্ঝঞ্ঝাটে ধূমপান করে। নির্দিষ্ট জায়গায় ঢোকার অনুমতি মেলে একটা বিশেষ চীনা গুপ্তকথা বলতে পারলে। কোনও য়ুরোপীয়র পক্ষে বন্ধ দরজার বাইরে থেকে চীনা ভাষা সঠিক উচ্চারণ ক'রে ভেতরকার প্রহরীকে বিভ্রান্ত করা অসম্ভব সুতরাং পলিশী হানায় সাফল্য সুদুর্লভ।

সাধারণত ধারণা করা হয় আফিম পানের জায়গাটি নরকতুল্য এবং [illegible] জায়গায়। এ ধারণা ভুল। কারণ, আফিম পানের ঘর সব সময় ঝকঝকে বাসযোগ্য হয় এবং ধূমপায়ী নেশা করেন গদী বা কম্বলের ওপর লম্বা হয়ে; পরিবেশও অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ।

ফাঁপা বাঁশের দু' ফুট লম্বা নলের একপ্রান্ত বন্ধ ক'রে, ঐ প্রান্তে তিন-চার ইন্‌চি আধখানা কমলালেবুর আকারের একটা পাত্র নলসমেত আটকান থাকে। এর সঙ্গে একটা স্পিরিট ল্যাম্প আর দু' ইন্‌চিটেকে লম্বা একটা সূচ হলেই আফিম খোরের সরঞ্জাম প্রস্তুত।

চিনির সঙ্গে মিশিয়ে আফিম গরম করা হয় রংটা চিটেগুড়ের মত না হওয়া পর্যন্ত। সুঁচের তীক্ষ্ণ মুখ আফিমে ডুবিয়ে একফোঁটা কাল আফিম স্পিরিট ল্যাম্পে গরম করা হয়। তারপর নলমধ্যস্থ পাত্রটিতে জটা রেখে সূচের ভোঁতা দিক দিয়ে তামাক ঠাসার মত ঠাসা চলতে থাকে। বাঁশের নলের খোলা দিক দিয়ে নেশাখোর পুরো মুখে টেনে নেয়।

ন্যু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এর পুলিশ ল্যাবরেটারীর একজন প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর মতে আফিমসেবীরা অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী। তিনি কখনও এদের কাউকে উত্তেজিত হতে বা অভদ্রতা করতে দেখেন নি। অন্য কোনও রকমের অন্যায় এরা করেছে বলেও তাঁর জানা নেই।

কাঁচা আফিমের চেহারা তামাটে, ম্যাড়মেড়ে, মনে হয় পোড়ামাটি।

বাঁশ, শণজাতীয় গাছ শীতপ্রধান অঞ্চলে জন্মালে নিরাপদ। এই অর্থে যে, সে ক্ষেত্রে ওগুলো থেকে নেশা করার কোনও উপায় নেই।

কিন্তু ভারত, পারস্য, সিরিয়া, আরব দেশ ইত্যাদি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এগুলোর মাথার দিকে ধূনোজাতীয় পদার্থ জমে এবং এটি খেলে বা আফিমের মত ধূমপানে ব্যবহার করলে স্নায়ুতন্ত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভারতজাত পদার্থটি মিশরে প্রাচীন কাল থেকে নেশাদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর নামও নানা। মধ্যপ্রাচ্যে-হাশিশ; ভারতে বলে চরস বা ভাং, চরস তরল আর ভাং ঐ গাছেরই কোমল কাণ্ড, ডাল এবং ওপরকার ফুলেল অংশ একত্রিত চূর্ণ; মরক্কোয়---কিফ্; পশ্চিম আফ্রিকায়—ডাগা; গোটা আমেরিকা মহাদেশে এর নাম মারিজুনা।

বৃটেন-এ অনেক ওষুধ 'বিপজ্জনক' চিহ্নিত। ওগুলো যথাবিধি পাশকরা ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্‌শন ছাড়া মেলে না। কিন্তু চরস ভাং হাশিশ—যে নামেই ডাকা হোক, এই বস্তুটি ঐ আইনের মধ্যে না পড়ায় বিধিমতে কখনই মেলে না। কাজেই, এর চোরাচালান চলছে।

এই চোরাচালান অধিকাংশ ক্ষেত্রে য়ুরোপীয়রা সোজাসুজি না করায়, য়ুরোপীয় পুলিশ-এর পক্ষে চোরাকারবারীদের ধরা সুকঠিন। ওদের আশপাশে দেখলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে। ফলে, ধলোদের বাদ দিয়ে কালো সংবাদসংগ্রাহক আর নাচঘরে যারা প্রায়ই যাতায়াত করে তাদের দেওয়া খবর-ভিত্তিক পুলিশী অভিযান চলে।

এ জাতীয় বস্তু সাধারণত তামাকের সংগে মিশিয়ে হাতে পাকান সিগারেট হিসেবে বিক্রি হয়। এগুলোর নাম 'রীফার' বা 'স্টিক'। একটার দাম দু' শিলিং ছ' পেন্স থেকে পাঁচ শিলিং পর্যন্ত।

এই নেশাটা মারাত্মক। চরস বা হাশিশ সেবনের ফলে ঘৃণ্য অপরাধে

আবহাওয়ার খবর

পার্থিব হাওয়ার নিচের স্তরগুলো কৃচিৎ অনড় হয়ে থাকে। পৃথিবীর ওপর দিয়ে যাতায়াত করার সময় বাতাস উষ্ণতা এবং শৈত্য, বৃষ্টি-তুষার, মেঘ আর কুয়াশা সৃষ্টি করে। এর ফলে সৃষ্ট অবস্থার নামই আবহাওয়া।

আবহাওয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাবসঞ্চারী এবং কয়েক শ' বছর ধরে মানুষ এবং কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে চেষ্টারত।

হাজার দুই বছরেরও আগে গ্রীকরা বায়ুর গতি মাপত। আবহাওয়া-তত্ত্ব 'মেটিওরলজী' শব্দটি গ্রীক, মানে 'ঊর্ধ্বস্থ বস্তুপুঞ্জের সমীক্ষা।' কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনে সক্রিয় নানা খুঁটিনাটি সংঘটন মাপার যন্ত্র ছাড়া প্রকৃত সমীক্ষা ছিল অসম্ভব।

১৬৪৩ খৃস্টাব্দে গ্যালিলিও-র শিষ্য ইতালীয় বৈজ্ঞানিক টরিসেল্লি সর্বপ্রথম ব্যারোমিটার--বায়ুচাপমান যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। বছর চারেক আগে আর একজন ইতালীয় বেনেডেট্টো ক্যাস্টেল্লি 'রেনগজ', বৃষ্টি মাপার যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন।

টাস্কেনী-র গ্র্যাণ্ড ডিউক দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ এই সময়েই থার্মোমিটার সাধারণ্যে চালু করেন; ইনি আবহাওয়া সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে বেশ কয়েকটা আবহাওয়া দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। এই প্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-ভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাষ প্রচারিত হওয়ার ব্যবস্থা হল।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ আবহাওয়ার পরিবর্তনে সামগ্রিকভাবে একটা পশ্চাদপট তৈরী করতে সাহায্য করল। ঊর্ধ্ব বায়ুস্তরে এবং সমুদ্রতলে কী হচ্ছে না-হচ্ছে

সেই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকরা ক্রমেই বেশি মাত্রায় মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির সাহায্যে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছোন সম্ভব হয় নি।

বহুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত অনেক সংখ্যক 'স্টেশন' থেকে তথ্য পেলে তবেই আবহাওয়া তত্ত্ববিদ্ এ-সম্পর্কে বুঝতে পারেন। তা ছাড়া, প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণ একেবারে হুবহু এক সময়ে হওয়া অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

১৮২০ খৃস্টাব্দে জার্মান আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ ব্র্যান্ডেস্ প্রথমে এইভাবে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি প্রথম একটা ছক কাটলেন, তাতে চাপ, তাপ এবং একই সময়ে নানান জায়গা থেকে নেওয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু সেকালে যাতায়াত খুব সময়সাপেক্ষ হওয়ায় গোটা দেশের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ তথ্য সংকলন ছিল প্রায় অসম্ভব।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত হল ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ, অনেক দিনের অভাব এবার ঘুচল। ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন-এর সোয়ানসী মিটিং-এ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে যন্ত্রটির উপযোগিতা সম্পর্কে একজন একটা 'পেপার' পড়লেন। তারপর থেকে টেলিগ্রাফিক কম্যুনিকেশন আর মেটিওরলজী-র উন্নতি হয়ে চলেছে পাশাপাশি।

১৮৫০-এ বৃটিশ মেটিওরলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হলে আবহাওয়ার ব্যাপারে যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল না তা স্থাপন করা সম্ভব হল।

সেকালের অন্যতম প্রধান আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ অ্যাডমিরাল রবার্ট ফিট্জ্রয় টেলিগ্রাফ-এর সাহায্যে আবহাওয়ার খবর যোগাড় করা সুরু করলেন। এক বছর পরে তিনি জাহাজীদের ঝড়ের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী শোনালেন, প্রাত্যহিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিতেও সুরু

লিপ্ত হওয়া খুবই সম্ভব। হয়ও তাই।

এসব মারাত্মক 'ওষুধ' তৈরী এবং চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারের। বিশেষ কোন ব্যক্তির এ ব্যাপারে করণীয় কিছু আপাতদৃষ্টিতে নেই বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু ভাবলেই ধরা পড়ে দায়িত্ব প্রত্যেকেরই রয়েছে। নিজেরা নেশা-হীন হলে সেই প্রভাব আশপাশের পাঁচজনের ওপর পড়া সম্ভব। নেশাখোরদের সৎপথে ফেরানর সাধ্যমত চেষ্টা থাকলেও ভাল হয়। আর, মেয়েদের এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণত সুখী এবং সহানুভূতিপ্রবণ মায়ের সন্তান বদ্ নেশায় অভ্যস্ত হয় না। সুতরাং স্বামী বা পুত্রদের তাঁরা যদি স্নেহ আর [illegible] রাখেন ত' দুশ্চিন্তা করার কারণ ঘটার সম্ভাবনা স্বল্প। আর দরকার সুশিক্ষা। সন্তানের সেরা শিক্ষক জননী। তাঁর কর্তব্যে ত্রুটি না ঘটলে অবস্থা খুব একটা খারাপ হয়ে উঠতে পারে না।

চোরাচালান বন্ধ করতে না পারলেও, আমরা পরোক্ষে আমাদের প্রিয়জনদের ঐ চোরাচালানের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার [illegible]

করেছিলেন তিনি। তিনি কয়েকটা সাধারণ নিয়ম পূর্বাভাষ সম্পর্কে বেঁধে দেন, সেই নিয়মগুলো আজও আবহাওয়াতাত্ত্বিক জগতে চালু রয়েছে।

ফিট্জ্রয়-ই প্রথম বলেছিলেন, ব্যারোমিটার-এর পারদ ক্রমিক ঊর্ধ্ব চাপ দেখালে বুঝতে হবে আবহাওয়া শান্ত, পারদের আকস্মিক পতনমন ঝড়ের সঙ্কেতবহ।

১৮৬৭ খৃস্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটি মেটিওরলজিক্যাল ডিপারটমেণ্ট সোসাইটির অংশ হিসেবে নিয়ে প্রাত্যহিক পূর্বাভাষ প্রচার বন্ধ করে দেন। কিন্তু জনসাধারণের প্রবল চাপে আবার তা আরম্ভ হল, এবং সেই থেকে ইংলণ্ড-এ দৈনিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ প্রচারিত হয়ে আসছে। আজ অবশ্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই পূর্বাভাষ প্রচারিত হয়। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে 'দ্য টাইমস্' দৈনিক পত্রে ছাপা আবহাওয়া-মানচিত্র পৃথিবীর সব কাগজে ছাপা আবহাওয়া-মানচিত্রের মধ্যে প্রথম।

ক্রমেই বাড়তে লাগল আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থাপিত 'স্টেশন'-এর সংখ্যা।

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে ৩০শে আগস্ট উনত্রিশটা সহর থেকে টেলিগ্রাফ্‌যোগে লণ্ডন-এ আবহাওয়ার খবর পৌঁছোল। আঠাশটায় আবহাওয়া ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল কেবল ম্যানচেস্টার-এর আবহাওয়া বিপরীত।

আর এখন কেবল ইংলণ্ড-এই আছে দেড়শ'র বেশি সংখ্যক আবহাওয়া-কেন্দ্র, য়ুরোপে এর সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। এবং প্রতিটি দেশ অধুনা অন্যান্য দেশের আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরাখবর সযত্নে সংগ্রহ করে।

বেলুনে হাইড্রোজেন বাষ্প এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি পুরে ঊর্ধ্বাকাশে পাঠান হয়। নামার পর তা থেকে খবর মেলে। আজকাল স্যাটেলাইট (উপগ্রহ) থেকেও আবহাওয়ার খবর মিলছে।

এজন্য খবর যথেষ্ট। কিন্তু কৃষি, রেডিও, বিমান, রেল বা অন্যান্য যান চলাচল, শিল্প, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি শিল্প এ থেকে ঠিক কতখানি উপকৃত হয়, তা টাকার অঙ্কে মেপে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে উপকার যে পর্যাপ্ত হচ্ছে---তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সেই গল্পটা : জনৈক চাষী প্রতিদিন একেবারে নিখুঁত আবহাওয়ার খবর দিচ্ছে শুনে আবহাওয়া দপ্তরের বড়বাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—তার সাফল্যর হেতু কী। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তার দপ্তর উলটো খবর দিচ্ছে, অথচ মুখ্যু চাষী ঠিক ঠিক বলতে সক্ষম। তাজ্জব! একটু থেকে চাষী উত্তর দিলে রোজ সকালে দপ্তরের দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাষ সে উল্টে প্রচার করায় তার এই অভাবিত সাফল্য।---এটা গল্পই, যদিও ভিত্তিহীন নয়। তার কারণ নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ আজও সম্ভব হয় নি। তবে তা হবে। খুব শীগ্গির।

আজকের ভারত

'ভারত-এশিয়ার বিপজ্জনক বছরগুলি' বইটির উপসংহারে বলা হয়েছে যে, আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের ভাগ্য সম্পর্কে যে একটি বৃহৎ প্রশ্ন উদিত হয়েছে ভাবীকালের বিশ্ব ইতিহাস-প্রণেতাদের তার সমাধান নির্ণয় করতে হবে। এ বইটি লিখেছেন সুপরিচিত রাজনৈতিক লেখক ডঃ গিসেলহার ভারসিং। ডঃ ভারসিং 'ইন্দো-এশিয়া' নামক একটি ত্রৈমাসিক ও 'ক্রাইস্ট অ্যাণ্ড ভেল্ট' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তিনি ভারতে এসেছেন ন' বার এশিয়ার সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য কি ভাবে জড়িত ---এই হচ্ছে 'ভারত-এশিয়ার বিপজ্জনক বছরগুলি' বইটির মূল বক্তব্য।

১৯৬৪ সালের মে মাসে 'প্রধান-মন্ত্রী' পর থেকে ভারতে অনেক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হয়েছে। এমন কি মহান রাজনীতিজ্ঞ জওহরলাল তাঁর জীবনের শেষ ক'টা বছরে এই পরিবর্তনের সূচনাকে প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন। জার্মানীর পাঠককুলের সামনে ভারতের এই সব পরিবর্তনের চেহারাগুলি যথাযথভাবে ও সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যেই গিসেলহার ভারসিং এই বইটি রচনা করেছেন।

ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে, সরেজমিনে দেখে শুনে, মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মাধ্যমে ডঃ ভারসিং ভারতের আধুনিক সমাজ, তার সমস্যা, বিশের রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে তার বিজড়িত অবস্থা প্রভৃতি এই শতাব্দীর নানাবিধ সম্পর্কে

রামকৃষ্ণ-সারদামৃত / করুণা প্রকাশনী

পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদামণির পরম ভক্ত লেখক আলোচ্য গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করেছেন, দিনলিপি সমেত চৌদ্দটি প্রবন্ধ একত্র করা হয়েছে। পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবীর জীবনীতে যেসব কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার সরল সৌন্দর্য সহজেই মনকে স্পর্শ করে। লেখকের ভাবগ্রাহিতায়, পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদামণি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পেরেছে। রামকৃষ্ণ-ভক্তবর্গের কাছে এই গ্রন্থের সমাদর হবে বলেই মনে হয়। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। সুন্দর প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বামী নির্লেপানন্দ, প্রকাশক—করুণা প্রকাশনী, ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২. দাম—সাড়েসাতটাকা।

গোপাল দেবের স্বপ্ন / ডি এম লাইব্রেরী

শক্তিশালী সাহিত্যকারের সাম্প্রতিক এই রচনাটি এক নবীনত্বের স্বাদ বহন করে এনেছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় নরপতি গোপাল দেবকে যে ভাবে কাহিনীর মধ্যে মূর্ত করা হয়েছে, তা সত্যই অভিনব।

কাহিনীর গতি স্বচ্ছন্দ, লেখকের কল্পনা যেন স্বচ্ছন্দবিহারী নভোচারী বিহঙ্গমের মতই উড়ে বেড়িয়েছে কাহিনীর ছত্রে ছত্রে। বনফুল সাম্প্রতিককালে বহু বৈচিত্র্যের সন্ধান করার দিকে আগ্রহী হয়েছেন তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে, স্বভাবতঃই তাঁর সৃষ্ট রচনার স্বাদও তাই এত বিচিত্র। শক্তিশালী শৈলীর প্রসাদে প্রায় অবিশ্বাস্য বিষয়বস্তুও তাই এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বনফুল, প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬. দাম—ছয়টাকা।
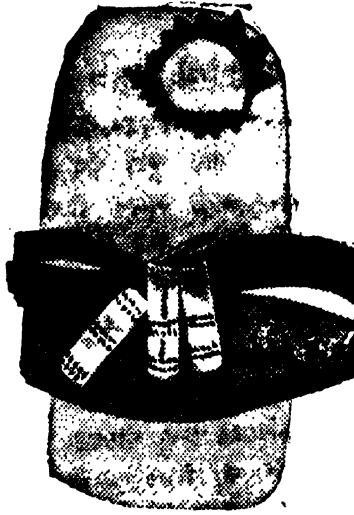
সাহিত্য পরিচয়

ভাসো আমার ভেলা / এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

সুবিখ্যাত কথাশিল্পীর বহুপরিচিত ও অনবদ্য কয়েকটি গল্পের এই সঙ্কলনগ্রন্থটি নানা কারণেই উল্লেখ্য। বুদ্ধদেব বসুর লেখনবৈশিষ্ট্য পুরোপুরি উপস্থিত আলোচ্য গল্পগুলির মাঝে। তীক্ষ্ণধী ও মননশীলতার স্পর্শে এরা উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র। মোট ত্রিশটি গল্প সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে, যার মধ্যে কয়েকটিকে অতুলনীয় বললেও বুঝি অত্যুক্তি করা হয় না। 'সবিতা দেবী' 'রাধারাণীর নিজের বাড়ি' 'অসমাপ্ত' ইত্যাদি গল্পগুলি পড়তে পড়তে সত্যই অভিভূত হতে হয়, কি সৌকর্যে কি ভাবগ্রাহিতায়, কি পরিশীলিত সৌন্দর্যে এরা সত্যই অনন্য, অচিন্ত্যপূর্ব। লেখকের তীব্র বেগবতী শৈলী বিষয়বস্তুকে দিয়েছে নতুন মর্যাদা। গল্পগুলির মাধ্যমে অতীতের সেই চমক জাগানো উন্মাদনাকে আবার নতুন করে উপলব্ধি করা যায় যেন, যেদিন 'বুদ্ধদেব বসু' এই নামটি মনে পড়লেই নতুন কিছু চমৎকারিত্বের আস্বাদ পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে বাঙালী পাঠকের মন। প্রচ্ছদশিল্প শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। লেখক—বুদ্ধদেব বসু, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—বারোটাকা।

ক্ষুর। প্রাইমা পাবলিকেশন্স

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে নতুনত্বের স্বাদ আছে। প্রধানত প্রথমপ্রেমের সমাধিই এই গল্পের উপজীব্য, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় নায়কের আচরণ, যার ফলে নায়িকা রূপান্তরিত হয়ে গেলো আশ্চর্যভাবে বিকৃত এক মানবসত্তায়, গল্পটিকে দিয়েছে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যের পরিচ্ছদ। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে মানসিক সংঘাতপূর্ণ এই কাহিনীকে খানিকটা ফ্যান্টাস্টিক বলা ছাড়া উপায় নেই। লেখকের মুন্সিয়ানায় প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনীও জোরালো দাগ কাটে পাঠকের মননে। প্রথম জেগেওঠা যৌবনের কামনাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তিনি, তাও যথেষ্ট উল্লেখ্য। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ বিশিষ্ট, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, প্রকাশনা—প্রাইমা পাবলিকেশন্স, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয়টাকা।

মহাপ্রেম / বিদ্যাভারতী

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনায়ন করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। হয়ত বা বলা উচিত শ্রীচৈতন্য নন, তৎপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবন ও প্রেমকে পরিস্ফুট করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। চৈতন্যদেবের সহধর্মিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, দেবতার মত স্বামী পেয়েও যিনি রইলেন চিরবিরহিণী, চিরবঞ্চিতা তাঁরই বেদনাবিধুর আলেখ্য যেন এই কাহিনীর মাধ্যমে সমুপস্থিত। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে আত্মহারা হয়েছিলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, সে প্রেম ভগবৎ প্রেম না

[illegible]কে গভীরভাবে ভালবেসেও চিরবিরহিণীর জীবন যাপন করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, তবু তাঁর অন্তরস্থ প্রেমের শিখাটি চিরদিনই ছিল অমলিন, নিষ্কম্প। অশ্রুজলে ভেজা এই প্রেমের গরিমা বুঝি ভগবৎ প্রেমকেও অতিক্রম করে যায় আপন দীপ্তিতে। মহিমময় এই মহাপ্রেমের কাহিনী যথাযথ আন্তরিকতার সঙ্গেই পরিবেশন করেছেন লেখক, তাঁর নিপুণ লেখনীর প্রসাদে তাঁর বক্তব্য হৃদ্য ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---শ্রীপারাবত, প্রকাশক---বিদ্যাভারতী, ৮সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা---৯, দাম---সাতটাকা।

আদিগঙ্গা / রূপরেখা

আলোচ্য গ্রন্থে আদি গঙ্গার কূলে যে নরনারীর সমাজ গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ শহর কলকাতায় কালিঘাটের খালপাড়ে যে জনজীবন স্পন্দিত হচ্ছে, তার নিপুণ ছবি এঁকেছেন লেখক। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় নবাগত, কিন্তু এই রচনায় তিনি যে শক্তির স্বাক্ষর এঁকেছেন, তা অবহেলা করার মত নয়।

জনজীবনের উল্লেখ্য এক অংশের বিচিত্র জীবনদর্শন তাঁর রচনায় পরিস্ফুট, যদিও তা হয়ত শালীন নয়, কিন্তু তা যে সত্য, এ কথা অনস্বীকার্য। চরিত্রচিত্রণেও যথেষ্ট পারদর্শী লেখক, সোহাগনা, রাঙাকালী, সুষমা, কিশোর কাব, সুফল ইত্যাদি চরিত্র যথেষ্ট প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল। অন্ধকারের জীবন যাপনে বাধ্য হলেও শাশ্বত মানুষের মনে আলোর পিপাসা যে চিরন্তন হয়ে জেগে থাকে, এ কথা কাহিনীর মাধ্যমে সোচ্চার। আমরা এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ ও অপরাপর আঙ্গিক ত্রুটিহীন। লেখক---আশুতোষ সরকার, প্রকাশক---রূপরেখা,

বিবর মন / ডিএম লাইব্রেরী

নানা রকম ইজম্‌-কণ্টকিত গল্প-উপন্যাস পাঠে ক্লান্ত মন সহজ ও স্বাভাবিক একটি কাহিনী হাতে পেলে সহজেই উৎসুক হয়ে ওঠে, কাজেই এ ধরণের কাহিনীর চাহিদাও যথেষ্ট। আলোচ্য উপন্যাসটিও এই জাতীয়। বেশ সহজ মুন্সীয়ানার সঙ্গে কাহিনীর জাল বুনেছেন লেখিকা, গ্রন্থোক্ত ঘটনা এবং চরিত্রের দেখা পাওয়াটা অবাস্তব মনে হয় না, অর্থাৎ এই স্বাভাবিকত্বটুকুই এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সম্পদ। লেখিকার শৈলীও বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে না পারলেও সহজ ও সাবলীল, পড়তে পড়তে পাঠককে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন, প্রচ্ছদ নয়নাভিরাম। লেখিকা---কৃষ্ণকলি, প্রকাশনা--- ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা---৬, দাম---সাড়ে তিনটাকা।

বঙ্গ আমার / বিদ্যাভারতী

সর্বভারতীয় হওয়ার অদম্য প্রচেষ্টায় মত্ত হয়ে আজ হয়ত আমরা ভুলতেই বসেছি যে, আমরা জন্মেছি বাংলা দেশেই, এবং সবার আগে আমরা বাঙ্গালী।

দুনিয়ার পরিচয় নেওয়ার আগে স্বজাতি ও স্বদেশের পরিচয় নেওয়াটা যে সমধিক প্রয়োজনীয় এ কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা চলে না, সেই প্রয়োজন মেটাতেই এসেছে এই গ্রন্থ। বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য মোটামুটি সব কিছুই সংক্ষিপ্ত অথচ সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা হয়েছে এই গ্রন্থের মাধ্যমে। সুতরাং এই রচনাকে প্রামাণ্য বললে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। লেখকের আন্তরিকতায় তাঁর বক্তব্য সহজেই পাঠকের মনে রেখাপাত করে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। লেখক---অমরনাথ রায়, প্রকাশনা---বিদ্যাভারতী, ৮ সি,

বাবরনামায় ভারতকথা / ডি.এম লাইব্রেরী

ইতিহাসোক্ত বাদশাহ বাবর যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা প্রায় সকলেরই জানা, কিন্তু তিনি যে একজন সাহিত্যপ্রাণ পুরুষও ছিলেন---সে তথ্য হয়ত আজও রয়ে গেছে অপরিচয়ের অন্তরালে। এই তীক্ষ্ণধী পুরুষ আত্মচরিত লিখেছিলেন তুর্কি ভাষায়। আত্মচরিতটির নাম বাবরনামা, প্রথমে ফারসি, তার পর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই মহতী গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পানিপথের যুদ্ধ পর্যন্ত বাবরনামার বঙ্গানুবাদ 'বাবরের আত্মকথা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তার পরের অংশের অনুবাদ এই গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করলো। তৎকালীন ভারত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক তথ্যই এতে সন্নিবিষ্ট, পাঠ করে বোদ্ধা পাঠকমাত্রেই যে আনন্দ লাভ করবেন একথা অনস্বীকার্য। প্রচ্ছদ শিল্পশোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক---শচীন্দ্রলাল রায়, প্রকাশক---ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা---৩, দাম---পাঁচটাকা।

দুঃখের বড় কাছে / সেকাল একাল

বেশ একটি ঝরঝরে গল্প পরিবেশন করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। নায়িকা শকুন্তলার চরিত্রটি যথেষ্ট দরদ দিয়েই এঁকেছেন লেখক, এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও জগৎনারায়ণকেও পাঠকের ভালই লাগে। মানুষ যে অবিমিশ্র শয়তান বা অবিমিশ্র সাধু নয়, সে সত্যিই যেন এই চরিত্রের মাধ্যমে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। লেখক ফিল্ম কাহিনী রচনাতে পটু মনে হয় এই কাহিনীতেও তার স্বাক্ষর বর্তমান। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক---শৈলেশ ভট্টাচার্য, প্রকাশনায়---

কালপুরুষ / বিদ্যাভারতী

দেশ ভাগের পর বিচ্ছিন্ন বাঙলার একটা বড় অংশের জীবনবোধ কেমন করে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো, তারই পরিচ্ছন্ন ছবি এঁকেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনীর মাধ্যমে। পূর্ব বাংলার অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্রমিক অবতরণের বেদনাবিধুর কাহিনী সহজেই পাঠকের মনে ছাপ এঁকে দেয়। লেখকের ভাষা সাবলীল, ভঙ্গী সংযত। মানবিক আবেদনে ভরা গ্রন্থটি পড়তে ভালই লাগে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---মিহির মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক---বিদ্যাভারতী, ৮সি ট্যামার লেন, কলিকাতা---৯, দাম---আটটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অন্তরঙ্গ / বিদ্যাভারতী

সাধারণ কাহিনী হলেও কিছুটা গতি আছে, লেখকের মানবিকতাবোধও প্রশংসনীয়, কিন্তু এর বেশী আর কিছু বোধ হয় বলা সম্ভব নয় আলোচ্য গ্রন্থ প্রসঙ্গে। লেখকের শৈলী পরিণত নয়। প্রচ্ছদ ভাল ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক---নিখিল চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক---বিদ্যাভারতী, ৮সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা---৯, দাম---আড়াইটাকা।

শেষ স্বাক্ষর / বাণী তীর্থ

স্বগত কবি অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের এই শেষ কাব্য-সংকলনটি নানা কারণেই উল্লেখ্য। কবিতাগুলি এক স্বাভাবিক মাধুর্যকে আশ্রয় করে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাব্যপ্রিয় পাঠকমাত্রই যে বর্তমান কবিতাগুচ্ছের সংগ্রহটি সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, এ আশা দুরাশা নয়। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, পরিবেশক---বাণীতীর্থ, ২৬-২বি বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা---৯, দাম দুইটাকা।

হিরোসিমা-কবিতা-সংকলন / মনীষা

জাপানী কবিতা সম্বন্ধে বাঙ্গালী কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ সমধিক, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি এক জাপানী কাব্য সংকলনের সরল বঙ্গানুবাদ। মোট একুশটি কবিতা আছে এতে। কবিতাগুলি পাঠ করে বাঙ্গালী পাঠক জাপানী কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুবাদক শুধু জ্ঞানীই নন, কাব্যমানসসম্পন্নও, সে জন্যই তাঁর অনুবাদকর্ম সহজেই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। অনুবাদ---জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক---মনীষা গ্রন্থালয়, প্রাঃ, লিঃ, ৪-৩বি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মূল্য---২'০০।

বিপুল সুদূর তুমি যে / মিত্র ও ঘোষ

সুদূর অতীতের আদি মানব-মানবী, এই বিচিত্র আখ্যানের নায়ক-নায়িকা। বস্তুত এ কাহিনীকে ফ্যানটাস্টিক বললেও ভুল করা হবে না। লেখকের কল্পনাশ্রয়ী লেখনীর প্রসাদে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষগুলিকেও জীবন্ত বলেই বোধ হয়; অপরিচিত পরিবেশ, অপরিচিত পাত্র-পাত্রী কিন্তু তাদের আশ্রয় করে যে প্রেম আত্মপ্রকাশ করেছে তা যে সকলেরই চিরপরিচিত। লেখকের মার্জিত সুষম শৈলী বিষয়বস্তুকে করে তুলেছে অধিকতর আকর্ষণীয়। আমরা বইটি পড়ে খুশী হয়েছি। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক---শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রকাশক---মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম---সাড়ে সাত টাকা।

মরণের পরে / শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

পারলৌকিক কথার পুস্তক। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন ইহকালের নশ্বর দেহ ত্যাগ করে আত্মা কোথায় যায় এবং কি হয়? দেহ একটি সাপের খোলসের মত। সেই খোলস ত্যাগ করে অপর একটি দেহধারণ। কিন্তু এই আত্মা কি আবার পরমুহূর্তে ফিরে আসে সেই আলয়েই? না, তার ঠিক নেই। তার কর্ম ও চিন্তা অনুসারে সে ফলভোগ করে থাকে এবং সেই সময় অতিবাহিত হলে তার পুনর্জন্ম ঘটে যে কোন দেশে যে কোন রূপে। আত্মা বিনাশ নেই। লেখকের সুন্দর বিশ্লেষণ যে কোন সাধারণ পাঠকচিত্তকেই বিমুগ্ধ করতে পারবে। লেখক---রাখালদাস সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ। প্রকাশক: শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা। দাম---দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অভিযান

পত্রিকাটির তৃতীয় খণ্ড শারদ-সংখ্যা প্রকাশ পেল। রায়গঞ্জের এই পত্রিকাটি দেখে আমরা খুশী হলাম। এই সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন শ্রীকান্ত। বড় গল্প লিখেছেন সুনীল গুহ, জনার্দন বর্মা ও তপনকিরণ রায়। ছোট গল্প লিখেছেন আরতি সেনগুপ্ত। একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। তা ছাড়া আছে কবিতাগুচ্ছ। লিখেছেন---সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কবিরুল ইসলাম, বিনোদ বেরা, সামসুল হক, রাণা চট্টোপাধ্যায়, নীরদ রায়, সুনীলকুমার চন্দ, অমল ভৌমিক প্রমুখ কবিগণ। পত্রিকাটি ভাল লাগলো। সম্পাদক: তপনকিরণ রায় ও জয়নারায়ণ সাহা, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। দাম---এক টাকা।

(জলরঙ)

সৈকত-সুন্দরী

—শ্রীকল্যাণ সেন অঙ্কিত

[সম্পূর্ণ রহস্য-উপন্যাস]

সুহাসিনী বোর্ডিং হোমের দোতলা থেকে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল নিখিলেশ। বেশ সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, বয়স বছর বত্রিশেক। কালো চুল পরিপাটি করে ব্রাশ করা। ঘন চুলের রাশি মাথার সামনের দিকটা থেকে একটু পিছন দিকে সরে গিয়ে কপালটাকে সুপ্রশস্ত করেছে। পরনে দামী সাহেবী পোষাক। চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্য মাখানো। একটি বিশিষ্ট ওষুধ কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী নিখিলেশ।

উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে নিখিলেশ একবার সোনার চেনওয়ালা দামী হাতঘড়িটার দিকে তাকাল। তারপর হাঁক পাড়লঃ 'মাসী, ও মাসি!'

শীত গিয়ে হাওয়ায় সবেমাত্র বসন্তের আমেজ লেগেছে। বেলা একটু বড় হয়েছে। কাজেই ছটার সময় এতটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু বসন্তের এই গোধূলিবেলায় চকমেলান এই বোর্ডিং বাড়ীর উঠোনটাতে অন্ধকার অনেকটা ঘন হয়ে বসবার উপক্রম করছে।

সুহাসিনী এককোণের একটা প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে ঠাহর করতে করতে এগিয়ে এলঃ 'কে বাবা নিখিল, বেরোচ্ছ তুমি? ও এই যে, একেবারে তৈরি হয়েই নেমে এসেছো দেখছি। তা চলেছো কোথায়?'

সুহাসিনী বাড়িওয়ালী এই বোর্ডিংটির একাধারে মালিক ও তত্ত্বাবধায়ক। এই প্রৌঢ়া রমণীটির ক্ষুরধার বুদ্ধির ফলেই এই বোর্ডিংটি এতটুকু থেকে এত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতগুলি বোর্ডারের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে চলেছে। সুহাসিনী সকলেরই মাসী। মাসীর শাসনে ও আদরে কেউ কোনদিন কোন অভাবই বোধ করার সুযোগ পায় নি।

'আজ রাতে আমার খাবার রেখো না, মাসী,' বলল নিখিলেশ।

'কেন আজ কোথায় যাবে বাবা?' মাসীর গলায় দরদের সুর। 'শুনলুম আবার নাকি আলোক চক্রের থিয়েটারে পার্ট করবে? তা, আজ বুঝি তার মহড়া টহড়া আছে?'

নিখিলেশের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ঝিলিক মেরে মিলিয়ে গেল। আবছা আলোয় মাসীর চোখের দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছল না।

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'মাসী, তুমি তো অনেক গোপন খবর জেনে ফেলেছো দেখছি', নিখিলেশের গলার স্বরে কৌতুক।

'কেন বাবা, আমি কিছু শুনিনি বুঝি? এই তো ক'মাস আগেই তুমি বোসেদের বাড়ীর সেজো ছেলের ক্লাবে গিয়ে পার্ট করে এলে। অত বড় আফিসের বড়বাবু হলে হবে কি, কী আমুদে লোক দেখেছো?' শেষের কথাগুলো পাশে দাঁড়ানো অপর বোর্ডার অজিতের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হল।

অন্ধকারেও মাসীর মুখের চেহারাটা নিখিলেশ স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। কিন্তু নিখিলেশের দিক থেকে কোন উত্তর আসে না।

একটু চুপ করে থেকে মাসী আবার বলতে শুরু করেঃ 'প্রথম যখন অজিতের কাছে শুনলুম বিশ্বাসই করতে পারি নি। এত বড় চাকরে! সে আবার পাড়ার ছেলেদের সংগে হৈ-হৈ করে থিয়েটার করবে! আর তাছাড়া, ক'দিনই বা হল এই শহরে এসেছে। না বাপু, আমার কিছুতেই বিশ্বাস হল না। জানো নিখিল, অজিতকে আমি পরিষ্কারই বলে দিলুম, এ হতেই পারে না।' একটু থেমে আবার বলে, 'কিন্তু কৈ বাবা, তুমি তো কিছুই উত্তর দিচ্ছো না। হ্যাঁ কি না, যা হোক একটা কিছু বল?' মাসীর গলার স্বর একটু সন্দিগ্ধ শোনায়।

নিখিলেশ কিন্তু সহজ উত্তর এড়িয়ে গিয়ে মাসীকে পাল্টা প্রশ্ন করে বসে। 'তুমিও তো বেশ অভিনয় করতে পার মাসী। কেমন সুরেলা গলা, কেমন হাত-মুখ ঘুরিয়ে সরস ভংগিতে কথা বলছো বল দিকি? হোটেল চালাতে না হলে হয়ত একটা বিনোদিনী বা তারাসুন্দরী হয়ে বসতে পারতে।'

'থাক আর ঠাট্টা করতে হবে না,' মাসী শাসন করে। 'তা যাই হোক বাবা, অত বেশি বাইরে বাইরে থাক, ঠিক নয়। ওতে শরীরের ওপর অত্যাচার হয়। প্রায়ই তো দেখি রাত করে বাড়ী ফেরো। না, না, এ ভাল নয়। আমার কাছে আছ, আমার একটা দায়িত্ব আছে তো?'

কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে রাস্তায় নেমে আসে নিখিলেশ।

ইণ্ডিয়ান ড্রাগস লিমিটেডের ম্যানেজার নিখিলেশ সেন ত্বরিতপদে এগিয়ে চলল গ্যারেজের দিকে। বোর্ডিং বাড়ীতে গ্যারেজ না থাকায় অন্যত্র গ্যারেজ ভাড়া করতে হয়েছে নিখিলেশকে। তবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকায় কাছেই একটা গ্যারেজ সে পেয়েছে। বোর্ডিং-এর সামনের এই রাস্তাটা ধরে পূর্বদিকে খান আষ্টেক বাড়ী পেরিয়ে গেলেই গ্যারেজটা। রাস্তাটার

গেছে। তারপর আর ওদিকে পথ নেই, কারণ এটা ব্লাইণ্ড লেন। সামনে যে দোতলা বাড়ীটা প্রহরীর মত পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেজটা ঐ বাড়ীতেই।

কান্তিনগর শহরটা বেশ সাজানো-গোছানো, ছিমছাম। এজন্যই বোধ করি নাম কান্তিনগর। কলকাতা থেকে মাইল তিরিশেক দূরে হলেও সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে অচিরেই বেশ একটি ভাল শহরে পরিণত হয়েছে। লোকসংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে শিল্প-ব্যবসা, স্কুল-কলেজ, আদালত-হাসপাতাল, হাট-বাজার সবকিছুই বেড়ে উঠেছে অভাবনীয়ভাবে। বড় শহরের সুযোগ-সুবিধা সবই হাতের মধ্যে পেয়ে কান্তিনগরের মানুষেরা বেশ শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছে।

ইণ্ডিয়ান ড্রাগস কোম্পানীর মালিকেরা দূরদর্শী। এই শহরের সূচনার সম্ভাবনাতেই তাঁরা এখানে একটা ওষুধের কারখানা খুলে বসলেন। স্বাভাবিকভাবেই কারখানার সংগে গড়ে উঠল অফিস। অতি দ্রুত উন্নতি করতে করতে আজ এটি দেশের প্রথম শ্রেণীর ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংগে এক সারিতে আসন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। আজ বহু একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এর কারখানা। তাছাড়া আছে বিরাট গবেষণাগার, বিশাল অফিস বাড়ী। বলতে গেলে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিয়ে একটি ছোটখাটো উপনিবেশই গড়ে উঠেছে এই শহরে। এই কোম্পানীর ম্যানেজার নিখিলেশ। খুব বেশী দিন হয় নি ও এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছে, কিন্তু ওর সংগঠন শক্তি ও কর্মকুশলতায় প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে অল্পদিনের মধ্যেই। এ শহরেও নিখিলেশ খুব বেশিদিন আসে নি। কিন্তু ছোট শহরে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয় নি তার।

গ্যারেজ থেকে মোটরগাড়ীটা বার করল নিখিলেশ। কান্তিনগর থেকে মাইল তিনেক দূরে প্রসাদপুরে এসে গাড়ীটা দম ফেলল। শহর থেকে খুব বেশি দূরে না হলেও এ অঞ্চলটা এখনও অবহেলিত রয়ে গেছে। এখনও এর আশেপাশের অনেক জায়গাই ঝোপ-জংগলে ভর্তি। প্রধান সড়কটি বাঁধানো। তাছাড়া আর সব রাস্তাই এখনও কাঁচা। এখানে-সেখানে দু'চারটে পুকুর নজরে পড়বে—সংস্কারের অভাবে কোনটা কচুরিপানা, কোনটা বা আগাছায় ভর্তি।

এ হেন জায়গায় কিন্তু দু'চারটি বেশ আধুনিক ধরণের বাড়ীও রয়েছে। বাড়ীগুলির কোনটা বাংলো ধরণের, আবার কোনটা বা সাধারণ বসতবাড়ীর মত। বাড়ীগুলি খুব মালিকেরা ধনী এবং রুচিসম্পন্ন। এগুলো যে ধনীদের অবসর বিনোদন ও অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যেই প্রধানত তৈরি হয়েছে তা আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয় না। প্রসাদপুরের স্থায়ী বাসিন্দারা জানে এই মনোবিমোহন বাড়ীগুলির বেশির ভাগই বছরের অধিকাংশ সময় খালি ও তালাবন্ধ থাকে। মাঝে মধ্যে এগুলির মালিকেরা এসে কিছুকাল করে হাওয়া বদলে যান।

নিখিলেশের গাড়ীখানা প্রধান সড়ক ধরে এসে একটা কাঁচা রাস্তায় বাঁক ঘুরে এমনি একটা বাড়ীর গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বাড়ীটা দোতলা, শোভন গঠন। সুচারু পরিবেশ তৈরি। তবে অযত্নের ছাপ আছে এর সর্বাংগে। কোথাও রঙচটা, কোথাও বা নোনাধরা, আবার কোনখানটায় হয়ত দেওয়ালের ইট বেরিয়ে পড়েছে। বাইরেটা রঙ করা হয় নি বহুকাল। দেওয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির জলের ফিকে সবুজ দাগ বাড়ীর বাইরের শোভা ক্ষুন্ন করেছে অনেকখানি। ধূলিমলিন জানালা-দরজা-গুলিও বিবর্ণ। নড়বড়ে কাঠের গেটের কাছ থেকে একটি কাঁকর বিছানো সরু রাস্তা সোজা চলে এসেছে বাড়ীটির সদর দরজা পর্যন্ত। তারপর এই রাস্তাটা বাড়ীর দু'পাশ দিয়ে দু'ভাগ হয়ে পেছন দিকে চলে গেছে। সামনের দিকটায় রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকেই সাজানো ফুলের বাগান—নানা রঙের ফুলগাছ, অপরাজিতা আর ডালিয়া। পরিচর্যার অভাবের ছাপ এগুলোও বহন করছে। কোথাও ফুলগুলি শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে রয়েছে, কোথাও কোনো গাছের অসংবৃত শাখা বিশৃংখলভাবে এগিয়ে এসে বাগানের সৌষ্ঠবহানি ঘটিয়েছে। ডালিয়া দু'চারটে যে প্রস্ফুটিত হয় নি তা নয়, তবে সেগুলো মানুষের চোখে আনন্দের নাচন জাগায় না। এগুলো আকারেও যেমন ছোট, তেমনি সজীব প্রাণের উচ্ছলতাও দেখা যায় না এগুলির মধ্যে। অযত্নলালিতা ষোড়শী তরুণীর মত বয়সে বাড়লেও রূপের জলুসে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না। বাড়ীর পেছন দিকটায় আম-কাঁঠালের বাগান। সমস্ত পরিবেশটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে দৈন্য সত্ত্বেও কিন্তু মালিকের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ করল নিখিলেশ। তারপর বাইরে নেমে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে নিল। গাড়ীর দরজাগুলো একটা একটা করে খুলে সে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে প্রত্যেকটির কাঁচ তুলে দিতে লাগল।

সামনের কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে, দুটি অপরিচিতা তরুণী পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। নিম্নস্বর সত্ত্বেও ওদের আলাপের কয়েকটা টুকরো নিখিলেশের কানে এসে ঢুকল।

'হ্যাঁ, এই বাড়ীটার কথাই তোকে বলছিলুম।'

'এই বাড়ীতেই উনি থাকেন?'

'হ্যাঁ, সেদিন ধর্মসংঘের সভায় ও'র বক্তৃতা কেমন শুনলি?'

'সত্যি, পণ্ডিত লোক। আর কতখানি উদার হলে তবে ধর্ম বড় হয়ে উঠতে পারে তা সেদিন ও'র বক্তৃতা শুনেছি বুঝেছি। কিন্তু ভাই, এত সুন্দর বাড়ীটার এ দশা কেন বল তো? মনে হয় যেন পোড়োবাড়ী।'

'হবে না? উনি তো ধর্মসাধনা নিয়েই আছেন। তাছাড়া, একখানা ধর্মগ্রন্থও লিখছেন শুনেছি। বাড়ীর মধ্যে বসে সারাদিন রাতই পুজো, ধর্মসাধনা আর বই লেখা নিয়েই আছেন। বাড়ীর তদারকি যে করবেন সে সময় কৈ ও'র? সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী কি না! ধর্মসভা থাকলে সেইদিনই যা একবার সন্ধ্যের দিকে বাইরে আসেন, তা না হলে বাড়ীর বাইরেই আসেন না। নির্জন বাসই ও'র পছন্দ, আর তা না হলে কি সাধনায় সিদ্ধি হয়?'

'যাই বল, সেই প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরাই এরকম সাধনা করতেন বলে শুনেছি। এ যুগে তো ভাই কোথাও এরকম দেখিনি—শুনিনি।'

'হ্যাঁ, এমন কি যতক্ষণ উনি বাড়ীতে থাকবেন কারুর ঢোকবার পর্যন্ত অনুমতি নেই।'

'কিন্তু তাহলে এই যে ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নামলেন, উনি কে?'

নিখিলেশ একবার পলকমাত্র দেখে নিল মেয়ে দু'টিকে, তারপর আপনমনে গাড়ীর কাঁচ তুলতে লাগল।

'ও, উনি? শুনেছি সন্ন্যাসীর ভাই। মাঝে মাঝে আসেন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। একমাত্র ওনারই ঢোকবার অধিকার আছে এ বাড়ীতে। শুনেছি উনি খুব বড়লোক, কান্তিনগরে থাকেন।'

'ও বাবা, এত খবরও জানা হয়ে গেছে তোর?'

দু'জনেরই হাসির শব্দ শোনা গেল।

মেয়ে দু'টি ক্রমেই দূরে চলে গেল। ওদের গলার আওয়াজ অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

এইবার ভাল করে মুখ তুলল নিখিলেশ। বাঁ দিকের ঠোঁটটা একটু কুঁচকে পড়ল। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। খুশির আবেগে সে একবার বেশ জোরে হাতে হাত ঘসে নিল। পরক্ষণেই পরম আত্মতৃপ্তির আনন্দে মুখখানা ওর ভরে উঠল।

আর একবার ভাল করে চারিদিকে দেখে নিল নিখিলেশ। না এখন আর কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যে উতরে গেছে অনেকক্ষণ। আধুনিক বিজ্ঞান এখনও এ অঞ্চলের মানুষের মাথায় আশীর্বাদ বর্ষণ করে নি। বিজলীর সুবিধা থেকে এখানকার অধিকাংশ মানুষই এখনও বঞ্চিত। একে তো ঘন বসতি এখানে নেই। কিছুটা দূরে দূরে যা দু'চারটি কুটির আছে, সেগুলির কুঠুরিতে কেরোসিন কুপির মিটমিটে আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু তা বাইরের অন্ধকারকে হার মানাতে পারে নি। ধনীদের বিলাসগৃহগুলিতে বিজলী আলো থাকলেও বেশিরভাগ বাড়ীই তো তালাবন্ধ। কাজেই চারপাশের অন্ধকার জমাট বেঁধে এসেছে। সামনের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অন্ধকারেই সে সাবধানে বাড়ীর পেছনদিকে চলে গেল। পেছনের দরজায় একটা তালা ঝুলছে। দরজার কাছে এসে এইবার টর্চের আলো ফেলে তালাটা দেখে নিল নিখিলেশ। তালা খুলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সোজা দোতলার ঘরে গিয়ে আলোটা জেলে সোফায় সে নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিল। গলার টাইটা আলগা করে দিয়ে অর্ধশায়িত দেহে চোখ বুজে মেয়ে দুটির কথাগুলি মনে মনে একবার পর্যালোচনা করল নিখিলেশ। মুখমণ্ডলের পেশীগুলো তার অজান্তেই যেন একটু কঠিন হয়ে উঠল।

॥ দুই ॥

রাত প্রায় পৌনে আটটা হবে। স্বামী অখিলানন্দ নীচে নেমে এলেন। দুটি চোখ ভাল করে একবার রগড়ে নিলেন। তারপর আড়ামোড়া ভেঙে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নিলেন। দীর্ঘ অধ্যয়নের ক্লান্তি তাঁর চোখে-মুখে। ধর্মশাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তির খ্যাতি প্রসাদপুরের পরিধি ছাড়িয়ে বাইরেও অনেক-দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

নিখিলেশের যমজ ভাই অখিলেশ সেন বহুদিন পূর্বেই সংসার ত্যাগ করেছেন। এখন তাঁর নাম হয়েছে স্বামী অখিলানন্দ। দু' ভাইয়ের চেহারায় আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য। প্রকৃতিতে অবশ্য দু'জনের মধ্যে প্রভেদ আকাশ-পাতাল। একজন আধুনিক কেতা-দুরস্ত, সাহেবিভাবাপন্ন, বিলাসভোগে মত্ত, অপরজন পার্থিব বিলাসিতা বর্জন ক'রে, ঐহিক সুখ বিসর্জন দিয়ে মোক্ষলাভের সাধনায় মগ্ন। এ কাহিনী এ অঞ্চলে অনেকেরই জানা।

স্বামী অখিলানন্দের পরিধানে গেরুয়া আলখাল্লা, লুঙ্গি, পায়ে গেরুয়া রঙের কাপড়ের জুতো আর মাথায় গেরুয়া কাপড়ের টুপী। চুলের মধ্যে থেকে অনেকগুলো পাক খাওয়া গোছা ঠিক বটের ঝুরির মত মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখে আবক্ষলম্বিত দাড়ি।

স্বামী অখিলানন্দ যখন ধর্মসংঘের সভাকক্ষে [illegible] নিকটজনের সমাবেশ হয়েছে। স্বামীজী এ অঞ্চলের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। ধর্মজ্ঞ, পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব নেই এই সংঘে, কিন্তু স্বামী অখিলানন্দকে যেন সকলেই একটু অন্য চোখে দেখেন। কি একটা অদৃশ্য অথচ অমোঘ আকর্ষণ আছে তাঁর যা বলে বোঝানো যায় না।

প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে ধর্মসংঘের সভা বসে। দু'দিনই স্বামী অখিলানন্দ এখানে বক্তৃতা দেন। আজও তিনি যথারীতি এসেছেন সভায়। আজ তিনি মানুষের পাপ নিয়ে বলতে গিয়ে বললেন, 'লোভ ও লালসাই পাপের মূল। যে কোন রকম পাপই হোক না কেন, তার কারণ যদি খুঁজতে যান দেখবেন তার মূলে আছে লালসা-কামনা, লোভ-বাসনা। এই লোভই একটা স্বাভাবিক-সুস্থ মানুষকেও নিয়ে যায় পাপের পঙ্কিল গহ্বরে, যেখান থেকে উদ্ধারের আশা তার আর থাকে না। তাই পাপের শাস্তি মৃত্যু। বাইবেলেও তাই বলা হয়েছে 'wages of sin is death'। আমাদেরও লৌকিক শাস্ত্র বলছে, 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।' এমনি অনেক যুক্তির অবতারণা করে তিনি শ্রোতাদের মনে পাপের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা জাগিয়ে তুললেন। প্রসঙ্গক্রমে নিজের ভায়ের কথাও তুললেন। নিখিলেশের জীবনাদর্শকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। তাঁর মতে পার্থিব ভোগ ও সুখই জীবনের শেষ কথা নয়। নিখিলেশের অর্থলালসা প্রবল; সে মদ খায়। যে সমাজে সে মেশে সেখানে নানান প্রলোভনের ফাঁদ পাতা আছে সর্বক্ষণ। পা পেছলাতে কতক্ষণ! স্বামীজী তাই তাঁর ভাইকে ভাল চোখে দেখেন না।

তথাকথিত অভিজাত সমাজের জীবনধারা ও ধর্মবুদ্ধিকে স্বামীজী আক্রমণ করে বক্তৃতা করলেও এই সংঘের বহু সভাই এসেছেন এই সমাজ থেকে। এই শ্রেণীর নরনারীরাই সাধারণত এই সমস্ত ধর্মসভা আলো করে বসে থাকেন। এখানেও তাঁদের অভাব নেই। নিখিলেশের অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ সানিয়েলও উপস্থিত ছিলেন এ সভায়। সভান্তে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ হল মিঃ সানিয়েলের। নিখিলেশের কথাও হল। মিঃ সানিয়েল স্বামীজীর কথা মন দিয়ে শুনলেন। দেখলেন ভায়ের জন্যে স্বামীজীর মনে বড়ই ব্যথা। তিনি স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর অফিসে। বললেন, 'সুবিধেমত একদিন আসুন না আমার অফিসে। আমার চেম্বারে নিভৃতে বসে একটু ধর্মালোচনা করা যাবে। সত্যিই আপনার কথাগুলো আমার বড় মনে লেগেছে।'

মিঃ সানিয়েলের চেহারা আভিজাত্য-ভরা। তিনি কেতাদুরস্ত ও সাহেবিভাবাপন্ন।

তিনি এত বড় একটা ব্যবসায়ের কর্ণধার হয়ে বসতে পেরেছেন। এ হেন মিঃ সানিয়েলও মুগ্ধ হয়েছেন স্বামীজীর কথা শুনে।

সেদিনকার মত সভা ভেঙে গেল। রাত প্রায় সাড়ে নটায় অখিলানন্দ ফিরে এলেন নিজের বাড়ীতে।

॥ তিন ॥

নিখিলেশ যখন প্রসাদপুরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। রাস্তায় নেমে একবার ওপরের দিকে চেয়ে দেখল। হ্যাঁ, দোতলার কোণের ঘরের আলোটা ঠিক জ্বলছে। ওটা সারারাতই জ্বলবে। স্বামীজীর অধ্যয়নের কথা এ অঞ্চলে কে না জানে? অধ্যয়নই তাঁর তপস্যা। দিন নেই রাত নেই, বই তাঁর নিত্য সঙ্গী।

স্বামীজীর কথা ভাবতে ভাবতে নিখিলেশ যখন কান্তিনগরে এসে পৌঁছল তখন রাত অনেকখানি গড়িয়ে গেছে।

মাসী দরজা খুলতে খুলতে বললে, 'এতক্ষণে থিয়েটারের মহড়া শেষ হল? না বাপু, এ রকম অত্যাচার করলে কখনও শরীর টেকে?'

নিখিলেশ হাসতে হাসতে বললে, 'কেন তুমি এত ভয় পাচ্ছো মাসী? জানো না, শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়?'

'জানি না বাপু কি তোমাদের মতিগতি?' বলতে বলতে মাসী নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

এর কয়েকদিন পরের কথা। নিখিলেশ অফিসে ঢুকেই মিঃ সানিয়েলের ঘরে এসে হাজির হল। যন্ত্রণাকাতর মুখে বলল: স্যার আজ আবার মাথার যন্ত্রণাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।'

মিঃ সানিয়েল সহানুভূতির স্বরে বললেন: 'মুখ দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। যন্ত্রণাটা খুব বেশি হচ্ছে, না?'

'হ্যাঁ স্যার, মাথার নার্ভগুলো সব ছিঁড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।'

'তা, অফিসে এলে কেন? বাড়ীতে একটু রেস্ট নিলেই তো পারতে?'

'উপায় নেই স্যার,' বেদনাকাতর মুখখানা মিঃ সানিয়েলের দিকে তুলে ধরে বলে নিখিলেশ, 'স্টেটমেন্টটা তৈরি করে বোম্বে অফিসকে আজ পাঠাতেই হবে। এটা না পাওয়া পর্যন্ত বোম্বে অফিসকে ধরুন প্রায় লাখখানেক টাকার মাল আটকে রেখে বসে থাকতে হবে। অথচ ভেবে দেখুন, আমাদের এই ইনজেকসনটা বাজারে একচেটে। কিন্তু বাজারে মাল নেই একেবারে। লাইসেন্সের রিনিউয়াল না পাওয়ায় ঐ ইনজেকশন তৈরি কতদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল বলুন তো? যাই হোক, এখন যখন লাইসেন্স আবার পাওয়া গেছে, মালটা তৈরিও হয়েছে, তখন কি আর তা আটকে রাখতে পারি? মানুষের জীবন নিয়ে তো আর খেলা করা যায় না, স্যার।'

মিঃ সানিয়েল এতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাকিয়েছিলেন নিখিলেশের মুখের দিকে। এবার বললেন, 'সাবাস নিখিল, সত্যিই তোমার কর্তব্যজ্ঞানের তুলনা নেই। যাই হোক, তোমার যুক্তি একেবারে অকাট্য, কাজেই আমি তা ঠেলতে পারি না। তবে দেখ, শরীরটার দিকেও তো নজর রাখতে হবে। দেখ, যতটা তাড়াতাড়ি পার ওটা শেষ করে বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম নাও।'

জরুরী কাজটা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই শেষ করে নিখিলেশ সেদিন বাড়ী চলে গেল।

বেলা তখন প্রায় তিনটে হবে। লাঞ্চ সেরে ফিরতে আজ মিঃ সানিয়েলের একটু দেরিই হয়েছে। এই কিছুক্ষণ মাত্র হল তিনি নিজের অফিস ঘরে ঢুকেছেন। নিখিলেশের টাইপ করা স্টেটমেন্টটাতেই তিনি সবেমাত্র মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর সই হলে এটা আজই তাঁদের বোম্বে অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে।

বেয়ারা এসে একটা শ্লিপ দিলে।

শ্লিপটা হাতে নিয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ সানিয়েল, তারপর সোজা চলে গেলেন ভিজিটারস্ রুমে। স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বামী অখিলানন্দ। মিঃ সানিয়েল হাত ধরে স্বামীজীকে নিয়ে এলেন নিজের কক্ষে। বললেন, 'আজ আমার কী সৌভাগ্য, আপনার মত সাধুব্যক্তির পদার্পণ হল আমার অফিসে।' স্বামীজীকে সসম্মানে বসালেন দেওয়ালের একধারে রাখা কৌচে। তারপর নিজে পাশটিতে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন স্বামীজীর দিকে।

'সত্যি, চেহারায় কী আশ্চর্য মিল! অথচ প্রকৃতিতে কত তফাৎ দুজনের মধ্যে,' খানিকটা যেন আপন মনেই বলে গেলেন মিঃ সানিয়েল।

মৃদু হাসি দেখা দিল ঠোঁটের কোণে।

মিঃ সানিয়েল বলে চলেন: 'আপনি সংসারত্যাগী মুক্ত পুরুষ। আর নিখিল কি ভাবে বিষয়ে লিপ্ত হয়ে আছে। আপনাকে টেনেছে ধর্ম, আর ওকে টেনেছে অর্থ। তবে হ্যাঁ, ওর কর্তব্যবোধের প্রশংসা না করে পারব না। এই আজই দেখুন না, প্রবল মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, অথচ কিছুতেই ওকে আমি বাড়ী পাঠাতে পারলাম না। অফিসে অত্যন্ত জরুরী কাজ ছিল, সেটা শেষ না করে ও কিছুতেই বাড়ী গেল না।'

আবার সেই হাসি স্বামীজীর ঠোঁটে।

মিঃ সানিয়েল সরলমনে বললেন: 'না, না, সে আপনি যাই মনে করুন। ওর এই মাথার যন্ত্রণাটা ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ধারণা ওর ঐ পিঠের ফোঁড়াটা সারাবার পর থেকেই যেন এই নতুন developmentটা দেখা দিয়েছে। ক'বছর হল ফোঁড়াটা হয়েছিল বলুন তো?'

'বছরখানেকের কিছু বেশি হবে মনে হয়,' স্বামীজী উত্তর দেন।

'তাহলেই দেখুন, ওর মাথার যন্ত্রণাটাও চলছে প্রায় ঐ সময় থেকেই। আচ্ছা, এতদিন তো হয়ে গেল, কিন্তু ওর পিঠের ক্ষতচিহ্নটা এখনও কত গভীর দেখেছেন। ঠিক এই ধরণের কেস আমি এর আগেও দেখেছি—একটা অসুখ সেরে গিয়ে আর একটা নতুন ailment দেখা দিয়েছে।'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

মিঃ সানিয়েল আবার মুখ খোলেন। নিখিলেশের প্রসঙ্গ তিনি যেন আর ছাড়তেই চাইছেন না। বলেন, 'আপনার কাছে কিছু ধর্মকথা শুনব বলেই আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কিন্তু মাপ করবেন স্বামীজী, আজ আমার মনটা সত্যিই বড় চঞ্চল হয়েছে। আজ যখন সকালে অফিসে এসে নিখিল ফের ঐ মাথাধরার অনুযোগ করল, তখন আমি উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি নি। ও আমার অফিসের প্রাণ। ওর কর্মদক্ষতায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার অফিস আজ এত বড় হতে পেরেছে। তাই তো ওর জন্যে আমার এত চিন্তা।'

একটু চুপ করে থেকে অনুনয়ের সুরে আবার বললেন, 'আপনি ওকে একটু বলতে পারেন না, স্বামীজী, যাতে ও একজন বড় ডাক্তার দেখায়। আমি অনেক বলেছি। কিন্তু এর ওপর ও কোন গুরুত্বই দিতে চায় না।'

স্বামীজী বললেন, 'দেখুন, আমি বললে কোন ফলই হবে না। আমার কোন কথাই ও শোনে না। কারণ, আমাকে ও উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। আমাদের দুজনের জীবনদর্শনই যে আলাদা। তবু যা হোক, ভাই বলে মাঝে-মধ্যে দু'একদিন দেখা করতে যায় আমার বাড়ীতে—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।'

'কিন্তু তাহলেও তো......'

মিঃ সানিয়েলকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে স্বামীজী বললেন, 'দেখুন ওর কোন ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না। ওর এই অর্থ লালসা, সুরাপ্রীতির জন্যে ওকে আমি, সত্যি বলতে কি,......নাঃ বলে লাভই বা কি! করুণা হয় ওর জন্যে। জীবনকে চূড়ান্ত ভোগ করাই ওর নীতি। কিন্তু জানেন তো, ভোগের পথ কী সর্বনাশা পথ। মানুষের ভোগস্পৃহা দিন দিন বেড়েই চলে। ভোগের মোহ ওকে এখন পেয়ে বসেছে কিনা। কোন সৎ পরামর্শই ওকে এখন পেছনে টানতে পারবে না।'

একটু চুপ করে থেকে স্বামীজী বললেন,

আর চেষ্টারও কি কোন ত্রুটি রেখেছি? কিন্তু ও বশ মানে না। ধর্মকথা শুনলে ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।'

আবার চুপ করেন স্বামীজী। মিঃ স্যানিয়েল ওর দিকে অসহায়দৃষ্টিতে তাকান।

স্বামীজী বললেন, 'তবে হ্যাঁ, ওর জন্যে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি বৈকি। বলি, ও অবুঝ। বয়সের দোষে নিজের হিতাহিত বুঝতে পারছে না। তুমি ওকে ক্ষমা কোরো ভগবান।'

সেদিনকার মত স্বামীজী বিদায় নিলেন।

॥ চার ॥

প্রায় সপ্তা' দুয়েক কেটে গেছে। সেদিন নিখিলেশ অফিসে আসতেই মিঃ স্যানিয়েল তলব করলেন। নিখিলেশ সামনে এসে দাঁড়াতেই গম্ভীর গলায় বললেন, 'ডাক্তার দেখিয়েছো?'

নিখিলেশ মাথা চুলকে বললে 'না।'

নিখিলেশের পদমর্যাদার কোন মূল্যই যেন নেই মিঃ স্যানিয়েলের কাছে। তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'বেশ সংক্ষেপে উত্তর দিতে শিখেছ দেখছি।' নিখিলেশ তাঁর স্নেহের পাত্র। বরাবরই তিনি নিখিলেশের ওপর খানিকটা জোর খাটিয়েই থাকেন। নিখিলেশও এতে কিছু মনে করে না, সে চুপ করে থাকে।

মিঃ স্যানিয়েল এইবার মুখ তুললেন। দেখলেন টেবিলের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে নিখিলেশ। ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো।'

পাইপটা দাঁতে চেপে ধরে গোটা কয়েক টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন মিঃ স্যানিয়েল। তারপর বললেন, 'দেখ নিখিল, তোমাকে বলা হয় নি, স্বামীজী এর মধ্যে আরও দু'দিন অফিসে এসেছিলেন, কিন্তু মুস্কিল হল কি, ঐ দু'দিনই তুমি ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিলে। স্বামীজীকে আমি অনেক করে অনুরোধ করেছি তোমাকে বুঝিয়ে বলার জন্যে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমার সঙ্গে এবিষয় তাঁর আলাপ হয়ে থাকবে। অথচ দেখ তুমি এখনও পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছ। তুমি ভেবে দেখছ না একবারও এই মাথা ধরার পরিণামটা কি হতে পারে।'

নিখিলেশ এইবার উত্তর দেয়, 'এই সামান্য অসুখটা নিয়ে আপনি কেন যে এত চিন্তা করছেন বুঝতে পারছি না।'

নিখিলেশের কথা মিঃ স্যানিয়েলের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। তিনি নিজের কথার সূত্র ধরেই বলতে লাগলেন, 'কিছুতেই তো তুমি কথা শুনতে চাও না। তাই চেয়েছিলাম আমার সামনে তোমাকে একবার স্বামীজীর মুখোমুখি দাঁড় করাতে। কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, তিন-তিনটে দিন উনি এখানে এলেন, অথচ সেই তিনদিনই তুমি অফিসে নেই।'

নিখিলেশ এইবার একবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল মিঃ স্যানিয়েলের মুখের দিকে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিখিলেশের চোখে। কি যেন সে বুঝে নিতে চায় মিঃ স্যানিয়েলের মুখের রেখা থেকে।

নিজের কথার জের টানেন মিঃ স্যানিয়েল, 'আর কিছুই তো আমি চাই না। আমি শুধু চাই আমার সামনে তিনি একটু বোঝাবেন তোমাকে।......না, না, তুমি বুঝতে পারছো না নিখিল, অন্তত অফিসের স্বার্থের কথা ভেবেও তোমার উচিত একটা কিছু ব্যবস্থা করা।'

ব্যাপারটাকে আর বেশিদূর গড়াতে দিল না নিখিলেশ। বললে, 'তাই হবে।'

আরও কয়েকটা সপ্তা' অতীত হয়েছে। সেদিন নিখিলেশকে খুব হাসিখুশি দেখা গেল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকেই সে বললে, 'স্যার, সামনের শনিবার আলোক-চক্রের অভিনয়। আপনাকে কিন্তু সেদিন যেতেই হবে।'

'নিশ্চয়ই তোমার একটা পার্ট আছে ওতে?' মিঃ স্যানিয়েল জানতে চান।

'আজ্ঞে হ্যাঁ?'

'এই থিয়েটারের নেশাই তোমার শরীরের এতখানি ক্ষতি করছে। সারাদিন অফিসে পরিশ্রমের পর নিয়মিত নাটকের রিহার্সাল। কত আর সইবে শরীরে?'

'যাই বলুন না কেন, আপনি না থাকলে চলবে না। এস-ডি-ও আসছেন, মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান থাকবেন, কান্তিনগর কলেজের প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী আর বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নাট্যকার সমীরবাবুও উপস্থিত থাকবেন। কলকাতা থেকেও কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি আসছেন। আপনি না থাকলে কি চলে?'

'স্বামীজী থাকবেন?' প্রশ্ন করেন মিঃ স্যানিয়েল।

'স্বামীজীর কথা স্বামীজীই জানেন।' নিখিলেশ বিরক্তির সুর ঢেলে দেয় কণ্ঠস্বরে।

দু'ভায়ের আড়াআড়ির কথা মিঃ স্যানিয়েলের অজানা নয়। তাই তিনি আর ঘাঁটালেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাটক করছ এবার?'

'এবারের নাটকে একটু অভিনবত্ব থাকবে। নাম 'একই অঙ্গে দুই রূপ।'

'পৌরাণিক, না সামাজিক?'

'ওটা ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড' উপন্যাসেরই বাংলা সংস্করণ আর কি। ঐ উপন্যাসের ছাঁচে নাটকটা লিখিয়ে নিয়েছি সমীর বোসকে দিয়ে। খাসা লিখেছে স্যার। কি অ্যাকসন। আর psychological effectটাও দিয়েছে ভাল। বেশ জমাটি হবে মনে হচ্ছে।'

'তুমি কোন ভূমিকা নিয়েছ?'

'প্রধান ভূমিকাটাই।'

'বড় শক্ত পার্ট। একেবারে ভিন্নধর্মী দুটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হবে এই দ্বৈত-ভূমিকায়। তা তুমি পারবে। তোমার মধ্যে পার্টস আছে।'

'কি জানেন স্যার, স্টিভেনসনের এই উপন্যাসটা আমার অপূর্ব লাগে। নতুন কলেজে ঢুকেই বইখানা যখন প্রথম পড়ি তখনই বইখানা আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করেছিল। তারপর থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছি বার বার পড়েছি, আর প্রতিবারই এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসে আমার মনটা আবিষ্ট হয়ে গেছে। আমার কাছে বইটার আকর্ষণ যে কি দুর্নিবার বলে বোঝাতে পারব না। তাই বহুকাল থেকেই মনে মনে ইচ্ছে ছিল বইটাকে স্টেজে নামানোর। মনে হয়েছিল, এই গল্পটাকে বাংলা দেশের সেটিং-এ ফেলে একটা নাটকে দাঁড় করাতে পারলে স্টেজে বেশ জুতসই হবে।'

শুধু ব্যবসা আর অর্থকেই জীবনের সার করেন নি মিঃ স্যানিয়েল। অর্থ সাধনার ফাঁকে ফাঁকে মনটাকে করে তুলেছেন মননশীল। রুজি-রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের রুচিকেও করে তুলেছেন উন্নত। তাই ধর্ম-সভাতেও তাঁর উপস্থিতি যেমন বিস্ময়োদ্রেক করে না, তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরেও তাঁর স্থানটি সবার আগে।

মিঃ স্যানিয়েল উত্তর দিলেনঃ 'যা বলেছ, মানুষের মধ্যে good আর evil-এর এমন সংঘর্ষের সুন্দর চিত্র আর কোথায় পাবে বল? মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ সমান মাত্রাতেই রয়েছে, কিন্তু মন্দটাকে জয় করে লোকচক্ষুর আড়ালে যে রাখতে পেরেছে সেই সমাজের চোখে হয়ে উঠেছে সৎ। আর এই ভালোয়-মন্দয় দ্বন্দ্ব তো মানুষের মধ্যে অহরহ চলছে। দমন করে রাখার ফলে মন্দ করার ইচ্ছেটা তো থেকেই যায় মানুষের অচেতন মনের তলায়। যদি কোনক্রমে একদিন সে বিজয়ী হয়ে মনের ওপরের তলায় উঠে আসে তখন সহজে আর তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। তখনই সে সর্ব-জনের সামনে তার বিকট, ঘৃণ্য রূপ নিয়ে এসে হাজির হয়। আর তখনই ঐ লোকটি অপরের ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে।.....কিন্তু মজা দেখ, সৎ আর অসৎ মানুষের মধ্যে তফাৎ কিন্তু কিছুই নেই। শুধু একটা অশুভ যোগাযোগই হয়ত একটা মানুষকে অসৎ করে তুলতে পারে। অন্তঃপ্রকৃতির এই দ্বৈত-সংগ্রামে মানুষ যে অবিরাম [illegible]

তো লেখকের মূল উদ্দেশ্য, তাই নয় কি? মানুষের প্রকৃতির এই জটিল চরিত্রের তত্ত্বই তিনি তুলে ধরেছেন একটি সুন্দর গল্পের মধ্যে দিয়ে।'

এতক্ষণ মিঃ সানিয়েল তন্ময় হয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন স্টিভেনসনের উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ভাবধারা। তিনি লক্ষ্যই করেন নি তাঁর শ্রোতা ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ তার দিকে লক্ষ্য পড়তেই বলে উঠলেন, 'একি নিখিল, কি ভাবছো তুমি? কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তোমাকে?'

অকস্মাৎ কোথা থেকে কি ঘটে গেল। নিখিলেশের মুখে-চোখে কেমন যেন একটা বিচলিত ভাব। মিঃ সানিয়েল উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিখিল, কি হল তোমার? শরীরটা কি আবার খারাপ লাগছে?'

নিখিলেশ ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কথা শেষ হওয়ার আগেই মিঃ সানিয়েল দেখলেন নিখিলেশ অন্তর্হিত হয়েছে।

মিঃ সানিয়েল অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন তিনি। নিখিলেশের এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ কি। তিনি তো উপন্যাসটির মূল ভাবটি বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছিলেন। আর বোঝানোটাই যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাও নয়। কথাচ্ছলে এগুলো মনে এল তাই বলে ফেললেন। তাছাড়া বইটা যে নিখিলেশের অতি প্রিয় তাও সে নিজের মুখে একটু আগেই স্বীকার করেছে। কাজেই বিরক্ত সে নিশ্চয়ই হয় নি। শরীর খারাপও খুব সম্ভব নয়, কারণ তাহলে তাঁর কাছে আগেই বলতো। তাহলে এরকমটা হওয়ার কারণ কি?

অনেক চিন্তা করেও এই কোন কারণের হদিস তিনি পেলেন না। একবার ভাবলেন ছুটে যাবেন কিনা নিখিলেশের কাছে। বেরুবেন বলে উঠেও ছিলেন। কিন্তু বসে পড়লেন আবার, ভাবলেন, না এখন ওর সামনে যাওয়া হয়ত ঠিক হবে না। যে কোন কারণেই হোক ওর মনটা যখন উত্তেজিত হয়েছে তখন ওকে এখন একলা থাকতে দেওয়াই উচিত। তাতে মনটা ওর শান্ত হবে।

॥ পাঁচ ॥

শনিবারটা সাধারণত ভ্রাতৃধর্মসংঘের সভায় থাকে খুব সরগরম। শনিবার বলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পদধূলিতে যেমন সভা ধন্য হয়, তেমনি সাধারণ স্তরের মানুষদেরও অভাব হয় না। শনিবার সাধারণত একটু বেশিক্ষণ ধরেই সভার কাজ চলে থাকে, কারণ পরের দিনটা রবিবার। কাজেই সকালের দিকটার কারুর আড্ডাহুড়োর কিছু থাকে না। রবিবারের মেজাজ একটু ঢিলে ঢালের মেজাজ। তাই শনিবারের ধর্মসভার বর্ষীয়সী মহিলারা তো আসেনই, কুলবতীদের শুভাগমন ঘটে থাকে। তাই সপ্তাহের এই দিনটার ধর্মসভার চেহারা অন্যরকম।

কিন্তু আজকের শনিবারটার সভার সে জমজমাট ভাব নেই। সভার অনেক পরিচিত মুখেরই অভাব দেখা যাচ্ছে। প্রসাদপুরের মেয়েরা অনেকেই আজ চলে গেছে কান্তিনগরে। সেখানে আজ আলোকচক্রের থিয়েটার। ধর্মসভার চেয়ে তাদের কাছে থিয়েটারের আকর্ষণ অনেক বেশি। তাছাড়া এই ধরণের আনন্দের সুযোগ কান্তিনগরের মত শহরে তো আর রোজ মেলে না।

কিন্তু আজ স্বামীজী এখনও সভায় এলেন না কেন! সপ্তাহের দু'টি দিন ধর্মসভায় তাঁর অনুপস্থিতি কখনও ঘটে নি। এই দু'টি দিনের সন্ধ্যেটা তাঁর কাটে এই সংঘেরই সভাকক্ষে। এই দু'টি দিনের কয়েকটা ঘণ্টা তাঁর শাস্ত্র অধ্যয়ন থেকে ছুটি। সমাজের মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যা কিছু তাও ঐ দু'টি দিনের দু'টি সন্ধ্যা। এছাড়া তিনি তো প্রায় বাড়ীর বাইরেই আসেন না। বিশেষ করে শনিবারটার তিনি বেশ কিছুক্ষণ আগেই সভায় আসেন। সমাজের উঁচু স্তরের মানুষেরা এইদিন সন্ধে আসেন, তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করতেই হয়।

আজকের সভায় আলোচনার বিষয় হল ধর্ম বনাম বিজ্ঞান। বিষয় ঠিক করেছেন স্বামী অখিলানন্দ স্বয়ং। এ সম্পর্কে নাকি তাঁর অনেক কিছু বলবার আছে। প্রায় মাসখানেক আগেই সভার বিষয় ও তারিখ ঠিক হয়ে রয়েছে।

তাহলে স্বামীজীর এই আকস্মিক অনুপস্থিতির কারণ কি? সভার সময় উৎরে গেল দেখে আর যাঁরা এসেছিলেন ক্ষুন্ন মনে তাঁরা নিজেরাই সভার কাজ শুরু করে দিলেন।

কান্তিনগর আজ প্রাণচঞ্চল। 'আনন্দ-মঞ্চের' প্রেক্ষাগৃহে আজ তিলধারণের জায়গা নেই। ছোটখাটো শহরে এরকম আমোদ-প্রমোদের সুযোগ নিত্য আসে না। তাই ছেলেমেয়ে-বুড়ো আজ সবাই এসে জুটেছে এখানে। প্রসাদপুর থেকে এবং কান্তিনগরের আশপাশ থেকেও বহু লোক এসেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তারা অতিথি-অভ্যাগতদের যথাস্থানে বসিয়ে দিচ্ছে।

অভিনয় আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে এসে ঢুকলেন মিঃ সানিয়েল। এসেই তিনি স্বামীজীর খবর নিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে প্রেক্ষাগৃহে কোথাও দেখা গেল না।

রামতারণবাবু বললেন, 'শনিবারের ধর্মসভা ছেড়ে স্বামীজী কি আর নাটক দেখতে আসবেন? তায় আবার নিখিলবাবুর নাটক। ভায়ের সঙ্গে তো সদ্ভাব কত!' কথাটা একটু ব্যঙ্গের সুরে বলা হলেও সত্যি। কাজেই মিঃ সানিয়েল চুপ করে গেলেন।

যথাসময়ে নাটক আরম্ভ হল। নিখিলেশ ঠিকমত অভিনয় করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে মিঃ সানিয়েলের বেশ সন্দেহ ছিল। নিখিলেশকে তিনি যতটুকু দেখেছেন তাতে সেদিনের সেই ব্যবহার তাঁর মনে কেমন একটা খটকা লাগিয়ে দিয়েছে। কোথায় যেন একটু অসামঞ্জস্যের গন্ধ তিনি পাচ্ছেন। নাহলে সেদিন ওর ঐরকম অস্বাভাবিক আচরণের কি কারণ থাকতে পারে। সেদিন থেকেই মিঃ সানিয়েল অনেক চিন্তা করেছেন। ক'দিন ধরে অফিসে ওর গতিবিধি তিনি লক্ষ্য করছিলেন দক্ষ মনস্তত্ত্ববিদের দৃষ্টি নিয়ে। খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য না করলেও ওর মনের মধ্যে একটা কিছুর দ্বন্দ্ব চলছে এটুকু তিনি বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি এ নিয়ে নিখিলেশকে সরাসরি কিছু বলেন নি। ভেবেছিলেন হয়ত এতে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

নাটক আরম্ভের সংকেত ধ্বনিতে মিঃ সানিয়েলের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। মঞ্চের কালো পর্দা সরে গেল। অভিনয় আরম্ভ হল। রুদ্ধনিশ্বাসে দর্শকেরা অভিনয় দেখলেন। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও প্রাণঢালা অভিনয়ের জন্যে নাটকটি এত চিত্তগ্রাহী হয়েছিল যে দর্শকেরা মনে করতেই পারে নি যে এটা অভিনয়। এমন একটা সৎলোকের অধঃপতন ও পরিণাম দেখে তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। এমন নিবিষ্ট-মনে তারা নাটক দেখেছে যে মাঝে মাঝে হাততালির শব্দ না হলে মনে হত প্রেক্ষাগৃহ বুঝি শূন্য।

সবচেয়ে ভাল অভিনয় করল নিখিলেশ। তার কাছ থেকে অবশ্য সকলে এই রকমটাই আশা করেছিল। কিন্তু ওর অভিনয় দেখে মিঃ সানিয়েল সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলেন। নিখিলেশের গত কদিনের মানসিক অবস্থা সু-অভিনয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে বলেই মিঃ সানিয়েল মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন নিখিলেশ দুটি বিপরীত চরিত্রেই আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করে গেল। সৎ-অসৎ দুটি চরিত্রের সঙ্গেই সে নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল

যে সে অভিনয় করছে বলে একবারও মনে হয় নি।

বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল মিঃ স্যানিয়েলের। এ ক'দিন তিনি যে নিখিলেশকে দেখেছিলেন এ যেন সে নয়। একে সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ বলে মনে হচ্ছে। যাদুদণ্ডের স্পর্শে যেন সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এ কি করে সম্ভব? শুধু অভিনয়ের নেশা কি এতখানি পরিবর্তন আনতে পারে? ভেবে তিনি কোন কূলকিনারা পেলেন না।

সেদিন অভিনয়ের শেষে খুব একটা অশান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন মিঃ স্যানিয়েল।

সোমবার মিঃ স্যানিয়েল অফিসে বসে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। নিখিলেশের ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ভাবছিলেন এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন নিখিলেশের। আজ সামনাসামনি কথাটা তুলতেই হবে। কিন্তু দশটা বাজল, তবু নিখিলেশের দেখা নেই। অন্যদিন সে সাড়ে ন'টার মধ্যেই এসে যায়। সওয়া দশটা হল, তখনও নিখিলেশ এল না, তার বদলে এল স্বামীজীর স্লিপ। স্লিপখানা হাতে নিয়ে মিঃ স্যানিয়েল ভাবলেন এ মন্দ নয়। তাঁর মাথায় একটা মতলব এল। দু'ভাইকে এক জায়গায় এনে ধীরে ধীরে কথাটা তুলতে হবে।

স্বামীজীকে তিনি সসম্মানে নিয়ে এলেন অফিস ঘরে। একথা-সেকথার পর বললেন, 'স্বামীজী, বলতে আমার খুবই সংকোচ হচ্ছে, আপনাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাওয়ার জন্যে মনটা আমার খুবই ব্যাকুল হয়েছে। যখন আমাকে এতই স্নেহ করেন চলুন না কাল রাত্রের দিকে আমার বাড়ীতে। সেখানে বেশ সুস্থ মনে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনব।'

'কিন্তু কাল তো হবে না। কাল যে মংগলবার, আমার ধর্মসভা আছে,' বললেন স্বামীজী।

'ও, তাও তো বটে', মিঃ স্যানিয়েল লজ্জিত হলেন, 'আমার মনেই ছিল না। তাহলে বুধবার সন্ধ্যায় আসুন।'

স্বামীজী রাজী হলেন। মিঃ স্যানিয়েল বললেন, 'আহারের ব্যবস্থাও কিন্তু আমি করব।'

স্বামীজী হেসে ঘাড় নাড়লেন। সেদিন নিখিলেশ আর অফিসে এল না। পরদিন মংগলবার অফিসে আসতেই নিখিলেশকে ডেকে পাঠালেন মিঃ স্যানিয়েল। বললেন, 'অভিনয় করলে শরীরের ওপর কত অত্যাচার হয় দেখলে তো? তবে ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে ভালই করেছ। তা এখন শরীরটা তো একটু সুস্থ হয়েছে, কাল সন্ধ্যের দিকে এস না আমার বাড়ীতে, একটু গল্পগুজব করা যাবে। বহুদিন তো আসনি।' স্বামীজীকেও যে নিমন্ত্রণ করেছেন সেটা অনুক্তই রাখলেন।

কিন্তু নিখিলেশ কিছুতেই সম্মত হল না। বললে, তার কি একটা জরুরী ব্যক্তিগত কাজে বুধবার সন্ধ্যায় এক জায়গায় যেতে হবে। সেখানে না গেলেই নয়।

বুধবার বিকেলেই সুহাসিনী বোর্ডিং হোমের উঠোনে নিখিলেশের গলা আবার শোনা গেল: 'মাসী, ও মাসী।'

সুহাসিনী ঘর থেকে বাইরে এসে বললেন, 'কি বাবা, এই তো আপিস থেকে এলে, আবার এখনি কোথায় চলেছো?'

'আর বল কেন মাসী, অফিসেরই কাজে আবার একটু বেরুতে হচ্ছে। ফিরতে হয়ত বেশ রাত হতে পারে। আজ রাত্রে আর আমার খাবার রেখো না। ঐদিকেই কোথাও খেয়ে নেব' খন।'

'আপিসের কাজ?' মাসীর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে, 'সে কি কথা নিখিল, আজ তো তোমার আপিসের সায়েবই তোমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। কিন্তু তুমি নিজের কাজ আছে বলে সে নেমন্তন্ন নাও নি, আর এখন কিনা বলছ আপিসের কাজ! তা বাবা, আপিসের কাজ হলে তোমার সায়েব জানবে না তা কি করে হয়?' বুদ্ধিমতীর মত যুক্তি দেয় মাসী।

'তুমি এত কথা জানলে কি করে মাসী?' বিব্রত বোধ করে নিখিলেশ।

'তা জান না বুঝি? কাল মংগলবার তো গিয়েছিলুম প্রসাদপুরে একটু ধর্মকথা শুনতে। ভাবলুম কি, হোটেলের ব্যবসা করে করে তো মনটা একেবারে জিরজিরে হয়ে গেল। তা এই বয়সে দুটো ধর্মকথা শোনাও তো পুণ্যের কাজ। তাই চলে গিয়েছিলুম আর কি। তা তুমিও তো কাল প্রসাদপুরে গিয়েছিলে। ভায়ের সংগে সম্পর্ক তো আদায়-কাঁচকলায়। এদিকে কিন্তু প্রতি মংগলবার আর শনিবার যাওয়া চাই ভাইকে দেখতে।'

'কে বললে মাসী? মাঝে-মধ্যে এক-আধটা শনি-মংগলবার ওখানে যাই বটে।'

'কেন বাবা, মংগলবার আর শনিবার হলেই তো দেখি আপিস থেকে এসে ধড়াচূড়ো না খুলেই আবার ছুটে যাও।'

'তাতেই বুঝে নিলে ওখানেই যাই', হেসে ওঠে নিখিলেশ। বলে, 'না, মাসী সবদিন ওখানে যাই না। কোনদিন হয়ত কলকাতার দিকে যাই, কোনদিন বা আর কোথাও। ভায়ের কাছে যেদিন যাই সেদিন গাড়ী নিয়েই যাই। কলকাতার দিকে গেলে ট্রেনেই যাই।'

'তা বাছা, এদিকে তো যানবাহন হয় না ভায়ের সংগে। দরকারই বা কি যাওয়ার?'

'কি জান মাসী, মায়ের পেটের ভাই তো বটে, তার আবার যমজ।'

'তা বাপু, বেছে বেছে ঐ দুটো দিনই বা কেন, আরও কটা দিনও তো রয়েছে। আর যাচ্ছই যখন তখন শুধু বাড়ীতে দেখা করে চলে আসা কেন? দুটো ধর্মকথাও তো শুনে আসতে পার।'

যুগপৎ এই আকস্মিক প্রশ্নে ও মন্তব্যে চমকে ওঠে নিখিলেশ। সে এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না আদৌ। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে পরক্ষণেই হেসে উত্তর দেয় নিখিলেশ: 'কি জান মাসী, এইমাত্র যা বললুম ওটা তো আর আমার মনের কথা নয়। আসলে জান তো তোমাদের ঐ স্বামীজীটিকে আমি মোটেই দেখতে পারি না। ওর ঐ ধর্মের ভেক আমি সইতে পারি না। ওসব আমার কাছে ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আজকের দিনে কি আর ঐরকম ঘরের কোণে বসে নির্জন সাধনার অবসর আছে না কেবল সভায় বসে ধর্মকথা আওড়ালেই চলবে? এটা হল বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান মানুষকে কর্মের মাঝখানে এনে ছেড়ে দেয়, মানুষকে কর্মশক্তিতে উদ্দীপিত করে। নির্লিপ্ত থেকে সাধনা করার সময় কই মানুষের? এই বিরাট-বিপুল পৃথিবীর বিশাল কর্মক্ষেত্রে নিজেকে মুক্ত করে দিতে হবে। পুরুষকারের ওপর আস্থা রেখে এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মের শাসন, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা এসব কোন কিছু মানলে চলবে না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে সম্পদ লুঠে নিতে হবে। ধর্ম-অধর্ম ও সব তো আসলে বাজে কথা। অক্ষমতা থেকেই ধর্মকথার সৃষ্টি। যে অক্ষম সে-ই ধর্মের অজুহাত দিয়ে নিজের অক্ষমতাকে ঢাকতে চেষ্টা করে। মানুষের কর্মশক্তিই তার আত্মোন্নতির মূল। এই কর্মশক্তি যখন উপযুক্ত ক্ষেত্রে ছাড়া পায় তখন সে অনেক সময় সমাজের অনুশাসন পর্যন্ত মানে না। মানবার দরকারও নেই। ওটাও তো মানুষের অক্ষমতারই একটা ফল। যখনই কোন কাজ মানুষের সহজ ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে তখনই সে নীতির শাসনের গণ্ডি দিয়ে তাকে বাঁধতে চেয়েছে, যেন ঐ কাজটি কতই অন্যায়, এতে কতই অন্যায়, এতে কতই না জানি পাপ। আরে পাপ-পুণ্য বলে কোন কিছু আছে না কি! নিজের মংগলের জন্যে দরকার হলে পাপ কাজ করতে হবে বৈ কি! পৃথিবীতে আজ যারা ওপরের সারিতে বসে আছে, তাদের পিছনের ইতিহাসটা একটু তলিয়ে দেখ দিকি। কি দেখবে জান? পাপের

চেপেই আজ তারা এত উঁচুতে এসে পৌঁছেছে।...

কি জান মাসী, সমাজের উন্নতিই যদি তোমার লক্ষ্য হয়, নিজের উন্নতি আগে করতে হবে। নিজে উন্নত না হলে অপরের উন্নতির কথা ভাববে কি করে ?... এই তো অজিতও এখানে রয়েছে। ওকে জিজ্ঞেস কর আমার কথাগুলো ঠিক কি না। কি অজিত বল না ?'

অজিত চুপ করে থাকে। নিখিলেশ আবার বলতে থাকে: 'ছেলেবেলায় একটা ইংরেজী কবিতা পড়েছিলুম। কবিতাটা সত্যিই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছিল। একটি লোক তার কিশোর পুত্রকে জাহাজের ডেকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে গেল, 'আমি না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না।' জাহাজে আগুন লেগে গেল। ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। লেলিহান অগ্নিশিখা ক্রমে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ছেলেটি স্থাণুবৎ নিশ্চল। অবশেষে সে অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হল। কিন্তু তবুও সে নির্বিকার। তার শেষ পরিণতি মৃত্যুতে। পিতৃআজ্ঞা পালন করতে গিয়ে একটি বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাণ অকালে ঝরে গেল। এতে কার কি মঙ্গল হল বলতে পার ? ছেলেটি কোথায় ভুল করল জান ? পিতৃআজ্ঞাকেই চরম ও পরম সত্য বলে মেনে নিয়ে সাধারণ বিবেচনাশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে বসেছিল। আসল কথা কি জান, সত্যের কোন নির্দিষ্ট চেহারা নেই। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর রূপ পাল্টায়। ঠিক তেমনি পাপ-পুণ্যও আপেক্ষিক। তুমি যেটা পাপ বলে মনে করছ, আমার প্রয়োজনে সেটাই পরম পুণ্য হয়ে আমার কাছে দেখা দিতে পারে। আজকের দিনে সত্য-মিথ্যা পাপ-পুণ্য সব কিছুরই নতুন করে মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

একটানা এতগুলো কথা বলে গিয়ে নিখিলেশ যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, 'অনেকগুলো আবোল-তাবোল বকে তোমার অনেকটা সময় নষ্ট করলুম মাসী। আচ্ছা, তাহলে চলি, আর ঐ কথা রইল।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল নিখিলেশ। মাসী অবাক-বিস্ময়ে ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। ওসব বড় বড় কথার সব যে মাসী বুঝতে পেরেছে তা নয়। তবে এটুকু বেশ বুঝেছে যে ওর কথায় কেমন যেন ঝাঁজ আছে; একটা নিন্দের সুর ওর কথাগুলোকে করে তুলেছে বাঁকা বাঁকা। এসব কথাগুলো খুব ভাল ঠেকল না মাসীর কাছে। এতদিন যে নিখিলেশকে দেখেছে এ কি তারই মুখের কথা ! ভাবতে ভাবতে মাসী আবার রান্নার জোগাড় করতে চলে যায়।

স্বামীজী যথাসময়ে এসে হাজির হলেন মিঃ সানিয়েলের বাড়ীতে।

মিঃ সানিয়েল বললেন, 'আজ আমার ইচ্ছে ছিল নিখিলকে আপনার সামনে একটা বোঝাপড়ায় বাধ্য করা। কিন্তু ওকে কিছুতে আনতে পারলাম না।'

'অন্য কারও উপস্থিতিতে ও আমার সামনে আসবে না', স্বামীজীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

'কিন্তু আপনি যে এখানে আসছেন সে কথা তো ওকে জানাই নি। না, সেজন্যে নয়, ও বললে খুব জরুরী একটা ব্যক্তিগত কাজে ওকে নাকি বাইরে যেতে হবে।'

একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল স্বামীজীর মুখে। মিঃ সানিয়েলের দৃষ্টি তা এড়ায় নি সত্য, কিন্তু তিনি সে হাসির অর্থ অনুধাবন করতে পারেন নি।

এই তো সেদিনও যখন স্বামীজীর সংগে কথা হচ্ছিল নিখিলের সম্পর্কে তখনও তিনি একেবারেই অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। নিখিলের নাম শুনলেই তাঁর মুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়ে যায়। সেদিন মিঃ সানিয়েল জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি নিখিলকে কেন ঘৃণা করেন ?'

উত্তরে স্বামীজী সেদিনও বলেছিলেন, 'ও পাপী। ওর মুখে-চোখে আমি পাপের ছায়া দেখতে পাই।'

মিঃ সানিয়েল প্রতিবাদ করেছিলেন, 'ওর পাপটা আপনি কোথায় দেখলেন ? যেটুকুর কথা আপনি মাঝে মাঝে বলেন তা ওর পদমর্যাদার কথা ভেবে আপনার ক্ষমা করা উচিত। দেখুন স্বামীজী, যে সমাজে ওকে মিশতে হয়, যে শ্রেণীর মানুষের সংগে ওকে বিচরণ করতে হয় তাতে নিজের মর্যাদা হারালে তো চলে না। তাছাড়া কার্যোদ্ধারের জন্যেও অনেক সময় এগুলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।'

স্বামীজীর উত্তরে দৃঢ়তা, 'শুধু ঐটুকুর জন্যে হলেও অবশ্য আমি ওকে ক্ষমা করতে পারতাম না। কিন্তু ঐটুকুই তো সব নয়।'

তড়িৎস্পৃষ্টের মত চীৎকার করে উঠেছিলেন মিঃ সানিয়েল, 'আর কী? বলুন আর কী জানেন ওর বিষয়ে ?'

কিন্তু সেদিনও স্বামীজী খুলে বলেন নি কিছু। এ প্রসংগ চাপা দিয়ে কৌশলে প্রসংগান্তরে চলে গিয়েছিলেন।

আর একদিনের কথাও মনে পড়ছে মিঃ সানিয়েলের। সেদিন কথাচ্ছলে তিনি বলেছিলেন স্বামীজীকে, 'পাপকে আপনি ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু পাপীকে তো ঘৃণা করা উচিত নয়।'

স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, 'পাপের তো কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। অবলম্বন ছাড়া তার প্রকাশ কোথায় ? পাপীকে যখন সে আশ্রয় করে তখনই তার স্বরূপটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে। কাজেই আমার কাছে ও দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।'

মিঃ সানিয়েল জানতে চেয়েছিলেন নিখিলের মধ্যে কোন পাপ আশ্রয় করেছে। কিন্তু সেদিনও স্বামীজী যথার্থ উত্তর দেন নি ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল তাঁর উত্তর।

এই সমস্ত দিনের কথা এক এক করে আজ ছায়াছবির মত মিঃ সানিয়েলের মনের পর্দার ওপর হাজির হতে লাগল। আর এই সংগে আর একটি দিনের কথাও বিদ্যুচ্চমকের মত খেলে গেল তাঁর মনের আকাশে। সেদিন তিনি নিখিলেশের নাটকের কথা আলোচনা করছিলেন ওর সংগে। নিখিলেশের সেদিনকার আচরণও ছিল কেমন যেন বিসদৃশ। এরপরে অফিসেও কদিন ওকে আনমনা দেখেছেন।

এতদিন এ সমস্ত ঘটনা মনে সংশয় জাগালেও মিঃ সানিয়েল এগুলোর ওপর খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। আজ এগুলোর সংগে স্বামীজীর কথাগুলি মিলিয়ে তিনি যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন। নিখিলেশ সম্পর্কে তাঁর যে অনেক উচ্চ আশা রয়েছে। এমন কি একটা মধুর কল্পনাও উঁকিঝুঁকি মারে তাঁর মনে। সে কি তাহলে অলীক হয়ে যাবে ? একথা চিন্তা করতেও মনটা তাঁর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু সন্দেহের দোলায় মন দুলতেই থাকে।...আর স্বামীজীকেও যেন এখনও পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। এতবড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, অথচ নিজের ভায়ের সামান্য কয়েকটা দোষ কিছুতেই ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন না ? এই কি মহান ব্যক্তির চরিত্র ? বিছানায় শুয়ে এইরকম সাত-পাঁচ চিন্তা করতে করতে একসময় মিঃ সানিয়েল ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

॥ ছয় ॥

সেদিন নিখিলেশ অফিসে এল জলুসহীন চেহারায়। আপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে মিঃ সানিয়েল বললেন, 'কিছুদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করছি তোমার শরীরটা কিছুতেই ভাল যাচ্ছে না। এক কাজ কর না কেন, দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে একটু বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে এস। তাতে একটা নতুন এনার্জি পাবে, কাজে আবার মন বসবে।'

'আমিও সেইরকম ভাবছিলুম স্যার', নিখিলেশ ভরসা পেয়ে বলে, 'কিন্তু এই সময়টায় অফিসের যেরকম কাজের চাপ আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছিলুম না মনে করছি, কাল থেকে দিন দশেকের ছুটী নেব।'

'খুব ভাল কথা। না, অফিসের জন্যে তুমি একটুও ভেব না নিখিল। দিগম্বরবাবু তো রয়েছেন, তুমি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিও, তাহলেই উনি ম্যানেজ করে নিতে পারবেন'খন। কয়েকটা দিন বৈ তো নয়।'

মিঃ সানিয়েল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন নিখিলেশকে। কিন্তু তার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন না দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

'কিন্তু একটা কথা, নিখিল', মিঃ সানিয়েল বললেন, 'পে-শীটটায় সই করে রেখে যেতে ভুল না যেন। তোমার ছুটির মধ্যেই তো মাইনের তারিখ পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিখিল, আরও একটা হাঙ্গামা যে রয়েছে এবার। এই মাইনের সঙ্গেই তো হাফ-ইয়ার্লি বোনাসটাও দিতে হবে।'

'আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। এদিককার সবকিছু ব্যবস্থা শেষ করে চেক ভাঙিয়ে পর্যন্ত আমি দিয়ে যাব।'

'জানি, নিখিল, জানি। তোমার কর্তব্যজ্ঞানের প্রশংসা আমি কোথায় না করি? আর তাছাড়া ঐ টাকার ব্যাপারটা আমি অন্য কারুর হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। বরাবরের মত এবারও তুমিই করবে এই আমার ইচ্ছে।'

নিখিলেশ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। বললে, 'কাল টাকা আপনার হাতে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি ছুটিতে যাব।'

নিখিলেশের বিশেষ আদেশবলে সেই-দিনই পে-শীট ও বোনাস পেমেন্টশীট তৈরি হয়ে গেল।

পরদিন ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের অবিনাশ-বাবু চেকটা লিখে দিয়ে গেলেন মিঃ সানিয়েলের টেবিলে, সঙ্গে পে-শীট আর বোনাস শীট। চেকটার ওপর একবার চোখ বোলালেন মিঃ সানিয়েল। এবার টাকার অঙ্কটা অনেক বেশি। বোনাসটা রয়েছে কিনা। মিঃ সানিয়েল চেকে সই করলেন।

নিখিলেশ অফিসে এল একটু দেরিতে। হাতে একটা বড় সুটকেশ। এসেই বলল, 'একেবারে রেডি হয়েই বেরিয়েছি কিনা, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।'

মিঃ সানিয়েল বললেন, 'এই নাও সব ঠিক করেই রেখেছি। তুমি সই করে নিয়ে বেরিয়ে পড়। আর দেরি কোর না, টাকা নিয়ে আবার তো তোমাকে অফিসে ফিরতে হবে। তারপর স্টার্ট করবে, কত দেরি হয়ে যাবে বল তো?'

নিখিলেশ হেসে বলে, 'ও ঠিক হবে'খন'। তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে নিয়ে বলে, 'সব তো গুছিয়েই এনেছি। বাকিটুকু সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে আর কতক্ষণ?'

কথাগুলো কেমন যেন বেসুরো শোনায় মিঃ সানিয়েলের কানে।

একটু পরেই তৈরি হয়ে আসে নিখিলেশ। 'তোমার সঙ্গে কি গাড়ী আছে?' জিজ্ঞেস করেন মিঃ সানিয়েল।

নিখিলেশ মাথা নেড়ে বলে হ্যাঁ।

গাড়ী থাকলে নিখিলেশ আর দারোয়ানকে সঙ্গে নেয় না। আজ গাড়ী আছে বলে মিঃ সানিয়েলের কোন দুশ্চিন্তা রইল না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, তবুও নিখিলেশ ফিরছে না দেখে মিঃ সানিয়েল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ভাবলেন আরও কিছু সময় দেখা যাক, হয়ত ব্যাঙ্কে বেশি ভিড় হয়ে থাকবে। মিঃ সানিয়েল পায়চারী করতে লাগলেন ঘরের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। না, আর চুপ করে থাকা চলে না। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন সজোরে।

'হ্যালো, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক?...আমি ইন্ডিয়ান ড্রাগস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সানিয়েল কথা বলছি।...আচ্ছা, আমাদের ম্যানেজার নিখিলেশ সেন চেক নিয়ে আপনাদের ওখানে গেছে না?... কি বললেন, টাকা নিয়ে চলে গেছে?... আচ্ছা, কতক্ষণ হল বলুন তো?...অনেকক্ষণ চলে এসেছে?'

'তাজ্জব ব্যাপার,' সশব্দে রিসিভারটা রেখে দিয়ে আপন মনেই বলে উঠলেন মিঃ সানিয়েল। এবারে তিনি সত্যিই রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সাড়ে তিন ঘন্টা কেটে গেছে। ঘরময় আবার পায়চারী শুরু করলেন মিঃ সানিয়েল। কপালের ওপর তিন-চারটে লম্বা রেখা তাঁর মনের উদ্বেগকে বাইরে প্রকাশ করছে। হাত দুটো তাঁর পিছন দিকে মোড়া। খট করে একটা শব্দ হল। ঘুরে দাঁড়ালেন মিঃ সানিয়েল। বেয়ারা দাঁড়িয়ে দরজার সামনে, হাতে একটা শিলপ। শিলপটা হাতে না নিয়েই বলে দিলেন, 'আজ দেখা হবে না, বলে দাও।' তাঁর মুখের চেহারা দেখে বেয়ারাও কেমন ভড়কে গেল।

আরও খানিকটা সময় কাটল। এইবার মিঃ সানিয়েল থানায় খবর না দিয়ে পারলেন না। কালবিলম্ব না করে থানা থেকে ইন্সপেক্টর রায় চলে এলেন ইন্ডিয়ান ড্রাগস লিমিটেডের অফিসে। মিঃ সানিয়েল সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করলেন। ইন্সপেক্টর রায় যা কিছু জানার দরকার মিঃ সানিয়েলকে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন। কেশিয়ার, দিগম্বরবাবু, অবিনাশবাবু এবং আর কয়েকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আধঘন্টা ধরে অনেক নোট নিয়ে রায় চলে গেলেন।

তিনদিন অনেক অনুসন্ধান করেও পুলিশ নিখিলেশের কোন হদিশ পেল না।

তিনদিন পরে পুলিশ জানাল নিখিলেশের গাড়ীটার সন্ধান পাওয়া গেছে শহর থেকে প্রায় মাইল আষ্টেক দূরে একটা মাঠের মধ্যে। কিন্তু গাড়ীর মালিকের কোনই সন্ধান নেই।

মিঃ সানিয়েল কিছুতেই ভেবে পেলেন না শহরের বাইরে উল্টোদিকে নিখিলেশ কেন গেল গাড়ী নিয়ে। এ তো হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ও গুন্ডার হাতে পড়েছিল। টাকা-কড়ি লুট করে তারা হয় গুম করে রেখেছে, আর না হয় পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দিয়েছে। শেষের সম্ভাবনার কথাটা মনে জাগতেই মিঃ সানিয়েল শিউরে ওঠেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ে, নিখিলেশের সাম্প্রতিক আচরণ কেমন যেন অসঙ্গতিতে ভরে উঠেছিল; তার চালচলন, ব্যবহার বেশ রহস্যময় ঠেকছিল তাঁর কাছে। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর মনে নিখিলেশ সম্পর্কে সন্দেহ জাগছে। আরও কত সময়ই তাঁর মনে এমনি সন্দেহের উদয় হয়েছিল, কিন্তু তিনি সন্দেহকে মনে স্থায়ী হতে দেন নি। নিখিলেশ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বরাবরই খুব উঁচু। তাই প্রতিবারই তিনি সন্দেহকে জোর করে মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ আর যেন মনে জোর পাচ্ছেন না। বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারটায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে এমনিভাবে চিন্তা করে চলেছেন মিঃ সানিয়েল।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন স্বামীজী। তেমনি হাসিখুশি মুখ।

মিঃ সানিয়েল কিন্তু আজ আর তাঁকে আগেকার মত হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতে পারলেন না। মুখ তুলে একবার তাকিয়ে শুধু বললেন, 'বসুন।'

মিঃ সানিয়েলের এত গম্ভীর মুখ স্বামীজী এর আগে আর কখনও দেখেন নি। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? এত গম্ভীর যে!'

'কেন, আপনি কিছু জানেন না?' পাল্টা প্রশ্ন করেন মিঃ সানিয়েল।

'কি করে জানব? সেই মঙ্গলবারের সভার পর আর তো বাইরে আসি নি। আজ শনিবার সন্ধ্যেয় অবশ্য আবার সভা আছে।'

'আমরাও অবশ্য আপনাকে ব্যস্ত করতে চাই নি। যদিও জানি ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না, তবুও হাজার হোক ভাই তো! কি করে আর আপনাকে খবরটা দিই বলুন না।'

স্বামীজীর শঙ্কা আরও বেড়ে গেল। 'ব্যাপারটা খুলেই বলুন না। বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি,' তিনি সানুনয়ে জানান।

মিঃ সানিয়েল দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'বলব আর কি, বুধবার থেকে আপনার

ড্রাইভারটি নিখোঁজ।' তারপর তিনি সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত জানালেন স্বামীজীকে।

কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন স্বামীজী। তারপর বললেন, 'আমার কিন্তু ঐ রাহাজানির সন্দেহ একেবারেই মনে জাগছে না। আমি তো আপনাকে বরাবরই বলে আসছি ওর মনে পাপ আছে। লোভ, বাসনা, ভোগাকাঙ্ক্ষা ওর দেহের প্রতি শিরা উপশিরা কলুষিত করে তুলেছিল। সেই লোভই ওকে এই পাপের নরকে টেনে নিয়ে গেছে। না হলে আপনার মত মনিবের এইরকম সর্বনাশ ও করে।...... আপনারা মনে করেছেন ও খুন হয়েছে? আমি কিন্তু আদৌ বিশ্বাস করি না।'

কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। মিঃ সানিয়েলও কতবার এইরকম ভাবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাবতে পেরেছিলেন কি? একটা অন্ধধারণা তাঁর সমস্ত সুস্থ চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছিল।

স্বামীজীর কথায় তাঁর মনটা অনেকটা জোর পায়। সমস্ত ঘটনা এইবার এক এক করে স্মরণ করে এই অভাবিতপূর্ব পরিণতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। হ্যাঁ, তাঁর দৃঢ় ধারণা হচ্ছে নিখিলেশ নিহত হয় নি। নিশ্চয়ই সে ফেরার হয়েছে। মিঃ সানিয়েল এখন বেশ বুঝতে পারছেন কেন সে স্বামীজীর নামটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না। স্বামীজী হচ্ছেন শুভ্র-নির্মল, ন্যায় ও ধর্মের পবিত্র প্রতিমূর্তি। আর নিখিলেশ মূর্তিমান পাপ। তার পঙ্কিল মন স্বামীজীকে বরদাস্ত করবে কি করে? আজ মিঃ সানিয়েলের মনে হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই নিখিলেশ এই পাপ পোষণ করে আসছিল, এবং একটা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাই তার আচরণ ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছিল।

স্বামীজী বিদায় নিয়ে চলে গেলে মিঃ সানিয়েল মনস্থির করে ফেললেন। নিখিলেশের সন্ধান তাঁর চাই-ই।...'এত বড় বেইমান,' দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠেন মিঃ সানিয়েল, 'এই বেইমানির উপযুক্ত শাস্তি ওকে দিতেই হবে।'

মৈনাক চৌধুরীকেই খবর দেবেন ঠিক করলেন মিঃ সানিয়েল।

শখের গোয়েন্দা মৈনাক চৌধুরী। দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি। পুলিশ যেখানে হার মানে, সেখানেই ডাক পড়ে মৈনাকের।

খরচ যা লাগে দেবেন, তাতে পেছপাও নন মিঃ সানিয়েল। নিখিলেশ তাঁর সম্মানে আঘাত হেনেছে, তাঁর বিশ্বাস চূর্ণ করেছে, তাঁর এত বড় ব্যবসার সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, স্বামীজীর মত উচ্চস্তরের মানুষের মনে চুণকালি মাখিয়েছে। নিখিলেশকে তিনি সহজে ছাড়বেন না। নিখিলেশের সন্ধান বার করতেই হবে।

॥ সাত ॥

'কল' পেয়ে কলকাতা থেকে মৈনাক চৌধুরী এলেন যথাসময়ে।

সুধারণভাবে মোটামুটি কাহিনীটি শুনে মৈনাক চৌধুরী বললেন, 'বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে তো কেসটা। তবে এর তদন্ত করতে হলে বেশ কয়েকটা দিন সময় লাগবে যে।'

মিঃ সানিয়েল বললেন, 'কোন অসুবিধে নেই। আপনি আমার বাড়ীতেই থাকবেন। আমার গেস্টরুম আছে, আপনার কোনই অসুবিধে হবে না। যখন যা দরকার বলবেন, সবই পাবেন হাতের কাছে। এই রহস্যের কিনারা আপনাকে করতেই হবে। আমার সমস্ত বিশ্বাস সে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। জানেন মিঃ চৌধুরী, আমি জীবনে কখনও মানুষ চিনতে ভুল করি নি। তা যদি হত তাহলে ইণ্ডিয়ান ড্রাগস লিমিটেডকে এই অবস্থায় আজ আর কেউ দেখতে পেত না। আজ না হয় এর এতগুলো ডিরেক্টর, ম্যানেজার, লিগ্যাল অ্যাডভাইসার, বিজনেস প্রোমোশন অফিসার, পাবলিসিটি অফিসার, আরও কত বড় বড় সব অফিসার হয়েছে। কিন্তু কোম্পানী যখন নিতান্তই শিশু ছিল, যখন তার নিজের শক্তিতে চলবার কোন ক্ষমতাই ছিল না, তখন বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে একে গড়ে তুলেছিল কে? কে এর ভিত্তিমূলে শক্ত করে দিয়েছিল? সে এই সানিয়েল।' বলে হাতের তর্জনীটি দিয়ে মিঃ সানিয়েল ইঙ্গিতে দেখান নিজেকে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে থাকেন মিঃ সানিয়েলঃ 'এই ব্যবসাটাকে গড়ে তুলতে গিয়ে জীবনে কত লোকের সংস্পর্শে যে এসেছি তার কোন হিসেব নেই। এদের কেউ ছিল ঠগ, কেউ প্রতারক, কেউ সাধু, কেউ বা অসৎ, কেউ বিশ্বাসী, কেউ বা অবিশ্বাসী। কিন্তু মিঃ চৌধুরী, কারুর দ্বারা প্রতারিত হই নি কখনও। আর আজ জীবনের অপরাহ্ণবেলায় এসে একটা অতি সাধারণ ছোকরার কাছে হেরে গেলাম নিদারুণভাবে? না, মিঃ চৌধুরী, এ অপমানের প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।'

আহত ফণীর মত রাগে-অপমানে ফুঁসতে থাকেন মিঃ সানিয়েল। তিনি একরকম ধরেই নিয়েছেন একাজ নিখিলেশেরই।

মিঃ চৌধুরী এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন মিঃ সানিয়েলকে। তিনি বুঝতে পারলেন, সানিয়েলের আত্মসম্মানবোধ খুব প্রখর এবং নিজের তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন। সেই আত্মসম্মানে এত সহজে আঘাত লেগেছে বলেই তিনি যেন দিশেহারা হয়ে গেছেন। এতগুলো টাকা যে গেছে সেটা যেন কিছুই নয়। আর যে তাকে এই আঘাতটা দিয়েছে, এতদিন এত কাছে থেকে দেখেও তার চরিত্র তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। এ পরাজয়ের গ্লানি সেইজন্যে তাঁর কাছে এত গভীর বলে মনে হয়েছে।

মিঃ চৌধুরী চিন্তা করতে লাগলেন, —তাহলে দেখা যাচ্ছে তাঁকে এমন একজন ক্রিমিনালের হদিস বার করতে হবে যাকে মিঃ সানিয়েলের মত অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ চোখও ক্রিমিনাল বলে সন্দেহ করতে পারে নি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মিঃ চৌধুরীর মুখখানা খুবই চিন্তাযুক্ত দেখাল। অবশেষে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, মিঃ সানিয়েল, তাহলে কাল আপনার অফিস থেকেই আমার তদন্ত প্রকৃত শুরু হবে।'

পরদিন সকালের দিকেই ইণ্ডিয়ান ড্রাগস লিমিটেডের অফিসে এসে হাজির হলেন মৈনাক চৌধুরী। প্রথমেই তিনি এসে ঢুকলেন মিঃ সানিয়েলের চেম্বারে।

সুপ্রশস্ত কক্ষ। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের উপযুক্তই বটে। ঘরের এককোণে কোণাকুণি-ভাবে রাখা একটি বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। অফিসের কাজে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সব কিছুই তার ওপর সাজানো রয়েছে পরিপাটি-রূপে। ঘরের একপাশে অতিথিদের জন্যে পাতা আছে পর পর কয়েকটি কোচ। টেবিলের সামনে খানকয়েক চেয়ার। ঘরে তিনটি বড় বড় জানালা, আলো-বাতাসের অভাব নেই।

'গুড মর্নিং, মিঃ সানিয়েল।' মুখ তুলে তাকালেন মিঃ সানিয়েল। পরিধানে নেভি ব্লু রঙের স্যুট, পায়ে কালো সু, গলায় মাখন রঙের টাই, আর হাতে রুপো দিয়ে মাথা বাঁধানো একটা উজ্জ্বল কালো রঙের ছোট ছড়ি ও মুখে পাইপ—দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ চৌধুরী।

মিঃ সানিয়েল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

'একেবারে নতুন সাজে দেখছি', বললেন মিঃ সানিয়েল।

'হ্যাঁ এইটাই আমার ইনভেস্টিগেশান ড্রেস।' মিঃ চৌধুরী ভাল করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ঘরের চারদিকে, তারপর মিঃ সানিয়েলকে সঙ্গে নিয়ে এলেন নিখিলেশের চেম্বারে। তারপর একে একে সব ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে দেখলেন।

মিঃ সানিয়েলের কক্ষে এক একজন করে অফিসের পদস্থ কর্মচারীদের অনেকেরই ডাক পড়ল। দিগম্বরবাবু, অবিনাশবাবু এবং নিখিলেশের নিজস্ব বেয়ারা গণেশকে তিনি অনেকক্ষণ ধরে জেরা করলেন। নিখিলেশ

কোন সময়ে সাধারণত অফিসে আসত, বাড়ী ফিরত কখন, অফিস ছাড়া আর কোথায় কোথায় তার যাতায়াত ছিল, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কে কে অফিসে আসত, ব্যক্তিগত জীবনের কথাবার্তা তাদের সঙ্গে কি হত, ইত্যাদি কত প্রশ্ন নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে করে প্রয়োজনমত নোট বইয়ে টুকে নিতে লাগলেন।

তারপর সকলকে বিদায় দিয়ে মিঃ সানিয়েলের সঙ্গে বসে তাঁর সমস্ত কথা আর একবার আদ্যন্ত শুনলেন মিঃ চৌধুরী। খুঁটিনাটি কোন কিছুই বাদ দিলেন না মিঃ সানিয়েল। সব শোনার পর মিঃ চৌধুরী বললেন, 'দেখুন মিঃ সানিয়েল। এ কেসে ক্লু তো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময়ই আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে তুলতে হয় অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে। তারপর তার সূত্র ধরে চলে আমাদের তদন্ত। আপনার এ ব্যাপারেও মনে হচ্ছে আমাকে সেই পদ্ধতিতেই এগোতে হবে। জানি না সফল হতে পারব কিনা।'

মিঃ চৌধুরীর কথা শুনে একটু দমে গেলেন মিঃ সানিয়েল। তবু মিঃ চৌধুরীর অন্তরে শক্তি সঞ্চারের জন্য বললেন, 'আপনার অসাধ্য কি আছে মিঃ চৌধুরী? বিশালগঞ্জের খুন, বাঁকিপুরের ব্যাঙ্ক ডাকাতি, অচলগড়ের দিন-দুপুরে রাহাজানি এ সবই তো আপনার বিরাট কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে, মিঃ চৌধুরী।'

এসব প্রশংসা কিন্তু মিঃ চৌধুরীর কানে গেল বলে আদৌ মনে হল না। তিনি তখন গভীর চিন্তামগ্ন। বোধ করি কোন পথে তদন্ত চালালে রহস্যের কিনারা করতে পারেন সেই চিন্তাতেই ডুবে ছিলেন। বললেন, 'এখন আমি প্রথমেই যাব থানার ইন্সপেক্টর রায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। তারপর যাব সুহাসিনী বোর্ডিং হোমে। আর সবশেষে যাব স্বামী অখিলানন্দের বাড়ীতে। মনে হয় স্বামীজীই আমাদের সাহায্য করতে পারবেন সবচেয়ে বেশি। যতই হোক, ভাই তো বটে। নিখিলেশ সেনের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথাই স্বামীজীর জানা থাকবার কথা। তবে স্বামীজীর বাড়ীতে যখন যাব আপনাকে তখন আমার সঙ্গে থাকতে হবে।

থানায় এসে মিঃ চৌধুরী ইন্সপেক্টর রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন।

মিঃ রায় হাসিমুখে স্বাগত জানালেন মিঃ চৌধুরীকে।

'এবারে অনেকদিন পরে এদিকে এলেন চৌধুরী—সেই বিশালগঞ্জের কেস আর এই।' খন মন এলে সেটা কি আপনাদের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক হবে?' বললেন মিঃ চৌধুরী।

'তা যা বলেছেন,' রায় বললেন। দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

'আচ্ছা, কাজের কথাটা আগে সেরে নেওয়া যাক, কি বলুন?' মিঃ চৌধুরী বললেন।

'অবশ্যই,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন মিঃ রায়।

মিঃ চৌধুরী বললেন, 'ও তরফের কাহিনী তো শুনে এলাম। এখন আমাদের অপরাধবিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতির দিক থেকে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনব।'

মিঃ রায় অকপটেই স্বীকার করলেন তিনি এ কেসে হার মেনেছেন। বললেন, 'নিখিলেশবাবুর গাড়িটা অবশ্য উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু আমার যেটুকু কৃতিত্ব তা ঐ পর্যন্তই। এরপর আর এগিয়ে যাওয়ার মত কোন মাল-মশলাই পেলাম না এতদিন তদন্তের পরেও। আমার ধারণা ভদ্রলোক খুন হয়েছেন নিশ্চয়ই। তিনি যে অত টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরবেন এ খবর খুনী আগে থেকেই রেখেছিল এবং সুযোগমত খুন করে ঐ গাড়ী করেই টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে আর গাড়ীটাকে ঐভাবে ফেলে রেখে পালিয়েছে। কিন্তু লাসটাকে যে কোথায় ফেলল তা কিছুই বুঝতে পারছি না......স্বামী অখিলানন্দ অবশ্য বলেন একাজ নিখিলেশবাবুরই। এটাকা তিনিই আত্মসাৎ করেছেন। মিঃ সানিয়েলের মনেও স্বামীজী এই ধারণাটাই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মিঃ সানিয়েলের তো এখন দৃঢ় ধারণা নিখিলেশই অপরাধী। আমার কিন্তু একথা আদৌ বিশ্বাস হয় না। নিখিলেশবাবুর মত একজন শিক্ষিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন লোক কি একাজ করতে পারে?'

বাধা দিলেন মিঃ চৌধুরী, 'আপনার একথাটা কিন্তু ঠিক আপনার পেশার লোকের মত হল না, মিঃ রায়। আমরা যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে কাজ শুরু করব তখন ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই সন্দেহ করব। সন্দেহই আমাদের পেশার মূলধন। তারপর তদন্ত যতই এগিয়ে যেতে থাকবে সন্দেহের বিষনজর থেকে এক একজন করে বাদ যেতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত থাকবে একজন বা একাধিক, যারা অপরাধ সংঘটনে সরাসরি যুক্ত। এই হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি, একথা ভুলে যাওয়া তো আপনার শোভা পায় না মিঃ রায়।'

ইন্সপেক্টর রায় লজ্জিত হলেন।

মিঃ চৌধুরী আবার বলেন, 'আর তাছাড়া শিক্ষিত-ভদ্র মানুষেরা অপরাধী হয় না, এই কি আপনার অভিজ্ঞতার বলে? কেন বাঁকিপুরের কেসটার কথা ভুলে গেলেন এর মধ্যে? সেও তো আপনি নিজে হাতেই তদন্ত করেছিলেন। ফয়সালাও তো প্রায় করেই এনেছিলেন। সব ধাপগুলো পেরিয়ে এসে তদন্তের শেষ ধাপটাতে এসে আটকে গিয়েছিলেন। আমি এসে শুধু ঐ শেষ জটটুকু খুলে দিয়েছিলাম। ও কেসে কৃতিত্বটা তো আপনারই। আমি আর কতটুকু করেছিলাম।'

মিঃ চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন মিঃ রায়, 'ও কথা বলবেন না, মিঃ চৌধুরী। ঐ শেষটুকুই তো আসল। কি জানেন, সত্যিকথা বলতে গেলে এ ব্যাপারে আপনার কাছে আমরা এখনও শিশু। ক্রিমিনোলজী আপনি যেভাবে স্টাডি করেছেন আর এর থিওরী যেভাবে প্র্যাকটিসে প্রয়োগ করেছেন তার তুলনা কোথায়?'

'অত বেশি বলবেন না, মিঃ রায়। দাঁড়ান আগে আপনাদের এই বিচিত্র কেসটার সমাধান করতে পারি কিনা দেখি। এতগুলো টাকা উধাও আর সেই সঙ্গে একটা জলজ্যান্ত লোকও। গাড়ীখানার পাত্তা যদিও মিলল, লাসটার কোন সন্ধানই নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গাতেই অনুসন্ধান চালিয়েছি। কিন্তু লাস কোথাও পাই নি।'

মিঃ চৌধুরী কিছুই বললেন না। এইটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তদন্তের কাজ আরম্ভ করলে কেস সম্পর্কে যার সঙ্গেই তিনি আলোচনা করুন না কেন এ বিষয়ে বেশি কিছু মন্তব্য তিনি করেন না। যার যা কিছু বলার তা তিনি মন দিয়ে শুনতে থাকেন। প্রশ্ন করে কিছু কিছু তথ্য জেনেও নেন। দরকারমত কিছু কিছু নোট অসাক্ষাতে। কিন্তু নিজে কোন মন্তব্য বড় একটা করেন না। বোধ করি, অপরের সামান্যতম অভিজ্ঞতাও কিভাবে নিজের প্রয়োজনে লাগিয়ে কাজ হাসিল করতে পারেন সেই চিন্তাই করতে থাকেন।

'আচ্ছা আজ চলি, মিঃ রায়। প্রয়োজন হলে আপনাকে ডাকব।'

মৈনাক চৌধুরী চলে গেলেন।

মৈনাক চৌধুরী যখন সুহাসিনী বোর্ডিং হোমে এসে হাজির হলেন তখন দিনশেষের দিনমণি পাটে নামার আগে হাতের শেষ কয়েক মুঠো সোনা বিলিয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। তেতলার চিলেকোঠার সামনে ছোট ছাদটার ইজিচেয়ারে বসে পশ্চিমাকাশে রঙের খেলা দেখতে দেখতে মৈনাক চৌধুরীর মত প্র্যাকটিকাল মানুষের মনেও বুঝি কবিত্বের ছোঁয়া লাগে।

মৈনাক চৌধুরী বলেন, 'দেখেছেন আকাশে কী বিচিত্র রঙের সমারোহ। এমন সময় আপনারা কোথায় বসে বসে প্রকৃতির লীলা উপভোগ করবেন, না তদন্তের জন্য

আমি এসে পড়েছি আপনাদের উপভোগে বাধা দিতে।'

সামনে চারখানা চেয়ারে বসেছিল মাসী, অজিত ও আর দু'জন বোর্ডার।

মাসী বললে, 'সে কি কথা বাবা! আপনি এসেছেন কত বড় একটা কাজে। আপনার দরকারটা সকলের আগে। আমি তো বাবা হতভম্ব হয়ে গেছি। ছেলেটা এতদিন আমার এখানে ছিল, আমার তো কৈ একদিনও মনে হয় নি ছেলেটো খারাপ।'

সকলে চুপ করে থাকে।

মাসী আবার বলে, 'না, না, ও আপিসের সায়েব যাই বলুক না কেন, আমার কিন্তু ঠিক বিশ্বাস ও খুন হয়েছে। আর ওর সায়েবেরও যেমন কান্ড, অতগুলো টাকা আনতে যাচ্ছে, ত' সংগে একটা দারোয়ান-টারোয়ান দিলে না। কেমন ধারা সায়েব গো? ছেলেটাকে একেবারে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হল গুন্ডার হাতে।'

মাসীর সংগে অনেক আলোচনা করলেন মিঃ চৌধুরী।

স্বামীজীর কথা উঠতে মাসী বললে সে স্বামীজীকে চেনে।

'আচ্ছা, আপনার বোর্ডিং-এ স্বামীজী কখনও এসেছেন?'

'না।'

'তাহলে আপনি স্বামীজীকে চিনলেন কি করে?'

'সে কথা আর বলবেন না। পাপী-তাপী মানুষ তো, তাই মাঝে-সাজে এক-আধদিন যাই প্রসাদপুরে ধর্মসভায় স্বামীজীর মুখের কথা শুনতে।'

'কোন কোন দিন সেখানে ধর্মসভা বসে?'

'শনিবার আর মংগলবার।'

'দাড়ান দাঁড়ান,' মিঃ চৌধুরী এমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন যে মনে হল তিনি একটা সূত্র পেয়ে গেছেন।

'আচ্ছা, আপনি তো একটু আগেই বলছিলেন নিখিলেশ প্রত্যেক শনি আর মংগলবারে অফিস থেকে এসেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেত?' মিঃ চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ,' মাসী উত্তর দেয়।

'কোথায় যেত?'

'প্রসাদপুরে ভায়ের কাছে যেত। তবে সবদিন অবশ্য ওখানে নয়। কোন কোনদিন যেত কলকাতার দিকে, আবার কোনদিন বা আর কোথাও কোন প্রয়োজনে।'

'সবদিন যে ভায়ের কাছে যেত না তাই বা আপনি জানলেন কি করে?' মিঃ চৌধুরী জেরা করেন।

'নিখিলেশের কাছে শুনেছি বাবা। ভায়ের কাছে যেদিন যেত সেদিন গাড়ী নিয়েই যেত। কাজেই যে শনিবার বা মংগলবার ওকে দেখতুম গাড়ী নিয়ে বেরোতে সেদিন বুঝতুম ও প্রসাদপুরে যাচ্ছে। গাড়ী রেখে গেলে বুঝতুম আর কোথাও যাচ্ছে। তাছাড়া, প্রসাদপুরে গিয়ে ওখানকার লোকের মুখেও শুনেছি নিখিলেশ মাঝে-মধ্যে ওখানে যেত, প্রতি শনি-মংগলবারে নয়। যেদিন যেত সেদিন ওখানকার লোকেরা তো দেখতেই পেত নিখিলেশের গাড়ীখানাকে স্বামীজীর বাগানবাড়ীর মধ্যে এসে দাঁড়াতে।'

'আপনার বোর্ডিং-এ তো গ্যারেজ নেই। ও তো গাড়ী রাখত অন্য জায়গায়। তাহলে আপনি টের পেতেন কি করে ও গাড়ীতে যাচ্ছে কিনা?'

'গ্যারেজ ওর কাছেই। পুবে ঐ যে দোতলা বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে ঐ বাড়ীতেই ওর গ্যারেজ। আর গাড়ী নিয়ে ওকে এই পথেই যেতে হত। ওদিকে তো আর রাস্তা নেই।'

একটু চুপ করে থেকে মিঃ চৌধুরী আবার প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা, প্রসাদপুরের ধর্মসভায় নিখিলেশকে কখনও ভায়ের সংগে ধর্ম নিয়ে তর্ক করতে দেখেছেন?'

মাসী বলে, 'তর্ক কি বাবা, নিখিলেশকে আমি কখনও ধর্মসভায় হাজির থাকতেই দেখিনি।'

'সে কি কথা? তাহলে প্রসাদপুরে ও যেত কেন? আর যদি ধর্মসভাতেই না যাবে— তাহলে বিশেষ করে শনি-মংগলবারেই বা যেত কেন প্রসাদপুরে? এ নিয়ে আপনি তাকে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?'

'জিজ্ঞেস করেছি বৈকি। বলত ধম্ম-টম্ম সব বাজে। ও সব বুজরুকি। সদ্ভাব না থাকলেও মায়ের পেটের ভাই বলেই মাঝে মাঝে দেখা করতে যেত। আর শনি-মংগলবার ছাড়া অন্য কোনদিন স্বামীজী সাধারণত বাড়ীর বাইরে আসেন না। অন্য দিনগুলোয় স্বামীজী একেবারে তপিস্যেয় ডুবে থাকেন কিনা। ও সময়ে তাঁর বাড়ীতে কারুর ঢোকাই একেবারে বারণ। কেবল শনি-মংগলবারেই স্বামীজী একটু খোস-মেজাজে থাকেন। তাই ওখানে গেলে নিখিলেশ ঐ দুদিনের মধ্যেই যেত। নিখিল বলত, যেদিনই ভায়ের কাছে যেত, ভাই সভায় চলে গেলে ও বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ওখানে বিশ্রাম করতে পারত।'

'হুম,' মিঃ চৌধুরীর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল।

আবার কিছুক্ষণ সকলে নিশ্চুপ। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে সমস্ত ছাদটা ঘিরে।

মাসী হ্যারিকেন আনতে চেয়েছিল। কিন্তু মিঃ চৌধুরীই বাধা দিয়ে বলছিলেন, 'থাক, আর দরকার হবে না। আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, তারপরই আপনাদের ছুটি।... আচ্ছা, এতদিন যে নিখিলেশবাবু আপনার এখানে ছিলেন, কোনদিন কোন অস্বাভাবিক কিছু ও'র মধ্যে দেখেন নি? মানে, এমন কিছু যা ও'র চরিত্রের সংগে বেখাপ্পা মনে হয়েছে, কোনরকম উত্তেজনার ভাব ও'র মনের মধ্যে?'

উপস্থিত আর তিনজন এতক্ষণ শ্রোতার ভূমিকায় ছিল। এইবার কথা বলল অজিত। বললে, 'হ্যাঁ একদিন নিখিলেশদাকে খুবই অস্থির দেখেছিলুম।'

মাসীও যোগ দেয়, 'হ্যাঁ বাবা, সেই একদিন ওকে কেমন অদ্ভুত লেগেছিল। ওর কথাবার্তা কেমন যেন বেসুরো, বেমানান মনে হয়েছিল। সে কী পণ্ডিতী ভাষা, সেসব কথার মানে বোঝা কি আমার কম্ম, বাবা? তবে হ্যাঁ, এটুকু বুঝেছিলুম যে ওর মনটা সুস্থ নেই, কিছু একটা গোলমাল হয়ে থাকবে।...তা অজিত তো ছিলে সামনে। বল না ও'কে একটু বুঝিয়ে বাবা।'

অজিত সব কথাই বলল। নিখিলেশদার মনটা যে সেদিন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল। তবে এর কারণ যে কি, কেনই বা এরকমটা ঘটল তা অজিত কিছুই বুঝতে পারে নি।

এইবার মিঃ চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনাদের অনেকটা সময় নষ্ট করলাম। ক্ষমা করবেন।'

মৈনাক চৌধুরী বিদায় নিলেন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মিঃ সান্যিয়েলের বাড়ীর পোর্টিকোয় বসে কথা হচ্ছিল দু'জনে। মিঃ চৌধুরী বললেন, 'আমার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কাল যাওয়া যাবে প্রসাদপুরে স্বামীজীর বাড়ীতে।'

মিঃ সান্যাল উৎসুক হয়ে উঠলেন, 'কি রকম বুঝছেন মিঃ চৌধুরী?'

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে মিঃ চৌধুরী বললেন, 'আপনার সংগে আরও কিছু আলোচনা করার আছে।'

'বলুন, মিঃ চৌধুরী।'

'আচ্ছা, আপনি প্রথম কবে যে নিখিলেশবাবুর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করলেন?'

'আমার যতদূর মনে পড়ে' মিঃ সান্যাল উত্তর দেন, 'যেদিন ওকে 'ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড' উপন্যাসের আণ্ডারলাইং আইডিয়াটা বিশ্লেষণ করে শোনাচ্ছিলুম। ঠিক যে ওকেই শোনাচ্ছিলুম তাও নয়। ওতো শিক্ষিত ছেলে, এটা যে না বুঝত তা তো নয়। আমি কতকটা নিজের মনের উচ্ছ্বাসেই বলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আমার কথা শেষ হতেই দেখি নিখিল ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।...সেই আমি প্রথম ধাক্কা খেলুম। এরপর বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত ওর আচরণ আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল।'

'আচ্ছা, বাংলা সাহিত্যে নাটকের তো অভাব নেই, গল্প-উপন্যাসেরও ছড়াছড়ি। অথচ নিখিলেশবাবু বেছে বেছে ঐ বইটাই

না অভিনয় করতে গেলেন কেন? এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কোন আলাপ হয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই, ও বলত এই বইখানা নাকি ওকে পাগল করে দেয়। কলেজ জীবনের শুরু থেকেই ওর কাছে এই বইখানার আকর্ষণ ছিল প্রবল। বইখানা ওর মনে জাগাত উন্মাদনা। অনেকদিন থেকেই ওর ইচ্ছে ছিল এই বইটা অভিনয় করার।'

'অভিনয় কেমন হয়েছিল?'

'Superb,' বলে ওঠেন মিঃ সানিয়েল, 'এমন প্রাণঢালা অভিনয় খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় মিঃ চৌধুরী। দুটো চরিত্রের সঙ্গেই ও নিজেকে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছিল যে বোঝা কঠিন ছিল অভিনয় হচ্ছে। তবে আমার বিচারে মিঃ হাইডের অংশেই ওর অভিনয় খুলে ছিল খুব ভাল।'

মিঃ চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে একটু পাতলা হাসি দেখা গেল। তিনি যখন কোন কেসের তদন্ত নিয়ে থাকেন তখন সাধারণত একটা দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্যের কঠিন আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখেন। এখন তাঁর এই হাসিটুকু মিঃ সানিয়েলেরও দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু মিঃ চৌধুরীকে তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাই কোন প্রশ্ন করলেন না।

মিঃ চৌধুরীকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনিও চুপ করলেন। কয়েকটা মিনিট কাটল এইভাবেই।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন মিঃ চৌধুরীই। 'আচ্ছা, মিঃ সানিয়েল, আপনার কাছ থেকে কদিন ধরে যা শুনলাম তাতে দেখতে পাচ্ছি নিখিলেশবাবু বেশ সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতেন স্বামীজীকে। অথচ তিনি ভায়ের সঙ্গে দেখা করতেন তাঁর বাড়ীতে।'

'হ্যাঁ মিঃ চৌধুরী, আপনি ঠিকই বলেছেন। স্বামীজীর বাড়ীতে সে যেত ঠিকই, তবে বাইরের কোন লোকের সামনে সে স্বামীজীর কাছে আসত না। অন্তত আমি তো শত চেষ্টাতেও পারি নি, আর কখনও দেখিনিও। স্বামীজী আসছেন শুনলে সে আর সেদিক মাড়াত না।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান,' সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন মিঃ চৌধুরী, 'কি বললেন? স্বামীজী আসছেন শুনলে...' বিড় বিড় করে আওড়ালেন তিনি। তারপর স্পষ্ট করেই বললেন, 'কিন্তু সেদিন না আপনি বলেছিলেন যে স্বামীজীকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছেন একথা না জানিয়েই ওকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, কিন্তু সে নেমন্তন্নও ও গ্রহণ করে নি?'

'হ্যাঁ, আপনার ঠিকই মনে আছে। অনেকদিন চেষ্টা করেও যখন ওকে স্বামীজীর সামনে আনতে পারলুম না, তখন প্ল্যান করলুম একই দিনে দুজনকেই আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করব। আর স্বামীজী যে নিমন্ত্রিত ওকে একথা একেবারেই জানাব না। স্বামীজীকে বললাম, উনি নেমন্তন্ন গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরদিন নিখিলকে বলতেই ও বলল একটা জরুরী ব্যক্তিগত কাজ আছে, আসতে পারবে না।'

মিঃ চৌধুরীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার কিছুক্ষণ কাটল নিস্তব্ধতার মধ্যে।

এবারেও আগে কথা বললেন মিঃ চৌধুরী। 'আচ্ছা, থিয়েটারটা কি বারে হয়েছিল?'

'শনিবারে।'

'স্বামীজী থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন?'

'না।'

'ও, ভুলে গিয়েছিলাম, শনিবার তো ও'র ধর্মসভা থাকে।'

'না, সেজন্যে নয়। ধর্মসভাতেও সেদিন উনি যান নি খবর পেয়েছি। এরকম বড় একটা ঘটে না অবশ্য। যে বইটা উনি লিখছেন তার এমন একটা দুরূহ তত্ত্বের কঠিন প্রশ্নে এসে সেদিন উনি ঠেকেছিলেন যে তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কলম ছাড়া ও'র পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই দুজায়গার কোনখানেই ও'র সেদিন আসা হয় নি। এজন্যে অবশ্য উনি পরে আমাদের কাছে খুবই দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন।'

আরও নানা কথার পর মিঃ চৌধুরী বললেন, 'আচ্ছা, আজ অনেক রাত হল, মিঃ সানিয়েল। আজ শুয়ে পড়া যাক। কাল তো মঙ্গলবার, বিকেলের দিকে স্বামীজীর বাড়ী একবার যাওয়া যাবে, কি বলেন? অবশ্য কাল ও'র ধর্মসভা আছে, কাজেই উনি বাড়ী থেকে বেরুবার আগেই আমাদের ওখানে পৌঁছতে হবে।'

পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে ও'রা যে যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন।

পরদিন মিঃ চৌধুরীকে আর বাড়ীর বাইরে আসতে দেখা গেল না। বিকেল পর্যন্ত নোটবই নিয়ে অনুশীলন করেছেন, গবেষণা করেছেন। একবার কেবল বেয়ারার তাগিদে উঠে স্নান করে খেয়ে এসেছেন।

বিকেলে যখন সানিয়েল অফিস থেকে ফিরলেন তখনও মিঃ চৌধুরী তাঁর নোট বইখানার মধ্যেই মুখ গুঁজে রয়েছেন। মিঃ সানিয়েল অবশ্য আজ একটু আগেই এসেছেন।

ও'কে দেখে মিঃ চৌধুরী বললেন, 'আচ্ছা এবার তাহলে আমরা রওনা হতে পারি?'

'আপনি তৈরি?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ সানিয়েল।

'হ্যাঁ, সব দিক থেকেই।'

বেশ খুশি দেখাচ্ছে মিঃ চৌধুরীকে। তাঁকে দেখে মিঃ সানিয়েল মনে মনে আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। মিঃ চৌধুরীকে তিনি ভালই চেনেন।

শুধু বললেন, 'চলুন তাহলে বেরিয়ে পড়ি।'

॥ আট ॥

মিঃ সানিয়েল আর মিঃ চৌধুরী যখন প্রসাদপুরে স্বামীজীর বাড়ী গিয়ে পৌঁছলেন স্বামীজী তখন দরজা খুলে সবে রাস্তায় নেমেছেন।

মিঃ সানিয়েলকে হঠাৎ এখানে এইভাবে দেখে একটু বিস্মিত হলেন স্বামীজী। বললেন, 'আপনি? নিশ্চয়ই নিখিলের সন্ধান পেয়েছেন। না হলে আর আমার এখানে ছুটে এসেছেন?'

মিঃ সানিয়েল বললেন, 'সে অদৃষ্ট আর কৈ হল স্বামীজী? তবে ইনি এসেছেন ঐ ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।'

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিঃ চৌধুরী বললেন, 'একটু যে কষ্ট দেব আপনাকে স্বামীজী। ভেতরে চলুন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আশা করি, আপনার সাহায্য থেকে আমি বঞ্চিত হব না। শুনেছি আপনি নাকি ওকে মোটেই পছন্দ করেন না। তাহলেও ও যখন আপনার ভাই তখন ওর মৃত্যু আপনি নিশ্চয়ই কামনা করবেন না।'

'দেখুন মিঃ চৌধুরী,' বললেন স্বামীজী, পাপীর বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই। তাতে পৃথিবীর অনিষ্ট হয়। যদি ওর মৃত্যুই হয়ে থাকে তো ভালই হয়েছে। ওকে আর কবর থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন কেন?'

বাগানের ফুলগুলো দেখছিলেন মিঃ চৌধুরী। স্বামীজীর উত্তরে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। সন্ধানী দৃষ্টি ফেললেন স্বামীজীর মুখে। তারপর বললেন, 'কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি, নিখিলেশ যে বেঁচে নেই সেরকম কোন প্রমাণ তো আমরা এখনও পাই নি। আর তা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা চুপ করে থাকতেও পারি না। আপনার সাহায্য না পেলে আমি কৃতকার্য হতে পারব না স্বামীজী।'

'কিন্তু আমাকে যে এখন ধর্মসভায় যেতে হবে,' বললেন স্বামীজী।

মিঃ চৌধুরী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'মোটেই বেশি সময় নেব না আপনার।'

অগত্যা স্বামীজীকে দরজা খুলতে হল। ও'র পেছন পেছন মিঃ চৌধুরী ও মিঃ সানিয়েলও ওপরে উঠে এলেন।

সুন্দর সাজানো প্রশস্ত ঘর। এটা

স্বামীজীর পড়বার ঘর। আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। মাঝখানে একটা লেখার টেবিল। বাঁদিকের কোণে দেয়াল ঘেঁষে একটা বুককেস। ছোট-বড়, সরু-মোটা বহু বই তাতে শৃংখলার সংগে সাজানো। ওপাশের এককোণে একটা দেরাজ, বুকসমান উঁচু।

তিনজনে চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। মিঃ চৌধুরী স্বামীজীকে নিখিলেশের অনেক কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

একসময় মিঃ চৌধুরী ও'দের বললেন, 'আচ্ছা আপনারা কথা বলুন, আমি ততক্ষণ একটু ঘুরে-ফিরে দেখি। ছবিগুলো বড় সুন্দর তো!'

মিঃ চৌধুরী দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ছবি পর পর টাঙানো। কিন্তু ওদিকে মা কালীর একখানা ছবি খুবই জীবন্ত। দেখতে দেখতে তিনি চলে এসেছেন বুককেসটার সামনে। দেখলেন তাতে নানা বই। বেশিরভাগই ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত, কিছু সাহিত্যও আছে। নাম দেখে দেখে এখান থেকে সেখান থেকে কয়েকখানা বই টেনে বার করে তিনি পাতা ওল্টালেন, আবার জায়গামত রেখে দিলেন। একখানা মোটা বাঁধানো বইয়ের গায়ে উজ্জ্বল সোনালী হরফে লেখা রয়েছে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা,' তলায় নাম লেখা অখিলানন্দ। মিঃ চৌধুরী বইটা টেনে নিলেন। খুলতেই চমকে উঠলেন তিনি। চকিতে ফিরে তাকালেন স্বামীজীর দিকে। না, স্বামীজী এদিকে লক্ষ্যই করেন নি, অন্যদিকে ফিরে তিনি কথা বলছেন মিঃ সানিয়েলের সংগে। মুহূর্তে বইখানা যথাস্থানে রেখে দিলেন মিঃ চৌধুরী।

'দেখলাম আপনার বইয়ের সংগ্রহ।' স্বামীজীর কাছে এসে বললেন মিঃ চৌধুরী।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ নিয়েই তো আছি। আমার আর কি বলুন না? সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহীদের মত প্রয়োজন তো আর আমার বেশি নয়। তাই ঐ বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকি আর কি।'

'আচ্ছা স্বামীজী, কিছু মনে করবেন না। কর্তব্যের খাতিরে আমাকে কিছু অপ্রিয় কাজ যে করতে হবে। আপনার দেরাজটা আমাকে একটু দেখতে হবে।'

'অবশ্যই,' ব'লে চাবি খুলে দিলেন স্বামীজী।

মিঃ চৌধুরী তন্ন তন্ন করে দেখলেন। জামাকাপড় সব ওলট-পালট করলেন। কাগজ যা চিঠিপত্র যা পেলেন সব ভাল করে দেখলেন। উল্লসিত হবার মত কিছুই পেলেন না। তিনি বহুদিনের অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে তিনি দেরাজটার বাইরে-ভেতর বার বার দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল দেরাজের পেছন দিকে। এটা কী? একটা বোতামের মত দেখাচ্ছে যেন। হাত দিয়ে অনুভব করলেন, একটু উঁচু গোলমত। চাপ দিতেই এক আশ্চর্য কান্ড ঘটল। মিঃ সানিয়েল সবিস্ময়ে দেখলেন দেরাজের ডানপাশের কাঠখানা আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠে গেল। দেখা গেল একটা চোরকুঠুরি। মিঃ চৌধুরী নীচু হয়ে দেখলেন তার মধ্যে একটা ছোট কাঠের বাক্স। বাক্সের ডালাটা খোলামাত্রই তাঁর মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

মিঃ চৌধুরীর মুখের ভাব দেখে মিঃ সানিয়েল আরও বিস্মিত হলেন। কি যে ঘটছে তিনি যেন কিছুই উপলব্ধি করতে পারছেন না। তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই পলকের মধ্যে আরও একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল।

মিঃ চৌধুরী যেইমাত্র কাঠের বাক্সটার ডালাটা খুলেছেন অমনি স্বামীজী ছুটে গেলেন বুককেসটার দিকে। স্বামীজী কেন অকস্মাৎ অমন জোরে ছুটলেন? ও'র গমনপথের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে মিঃ সানিয়েল একথা চিন্তা করার আগেই মিঃ চৌধুরীর জলদগম্ভীর কণ্ঠ তাঁর কানে এল: 'খবরদার, আর এক পা নড়েছো কি......'

মুখ ফিরিয়ে মিঃ সানিয়েল দেখলেন মিঃ চৌধুরীর বজ্রমুষ্টিতে রিভলভার। রিভলভারের নলটা স্বামীজীর দিকে। বুককেসের সামনে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে স্বামীজী।

মিঃ সানিয়েলের যেন বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। সত্যিই কি তিনি জেগে আছেন, না স্বপ্ন দেখছেন। ছায়াছবির মত একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। তিনি বিমূঢ়, বাক্‌স্ফূর্তিহীন।

রিভলভার বাগিয়ে ধরে স্বামীজীর দিকে এগিয়ে এলেন মিঃ চৌধুরী। তারপর মিঃ সানিয়েলের উদ্দেশে বললেন, 'আপনার নিখিলেশকে পাওয়া গেছে, মিঃ সানিয়েল। এই দেখুন।' নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি যুগপৎ স্বামীজীর মাথার চুল আর দাড়ি ধরে সজোরে টান মারলেন। স্বামীজীর মাথা থেকে খসে পড়ল পরচুলো, দাড়ি আশ্রয় নিল মিঃ চৌধুরীর হাতের মধ্যে।

মিঃ সানিয়েল দেখলেন সত্যিই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিখিলেশ, শুধু তফাৎ এই, পরনে তার গেরুয়া বেশ।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন মিঃ সানিয়েল। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, 'এও কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ এই সম্ভব, মিঃ সানিয়েল,' বললেন মিঃ চৌধুরী। 'তদন্ত করার সময় অনেক আগেই এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষায় ছিলাম। সেইটি মিলল আজ এখানে এসে। প্রথম প্রমাণ মিলল ঐ বুককেসের মধ্যে রাখা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধ্যে।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মিঃ সানিয়েল চেঁচিয়ে ওঠেন, 'সে কি?'

'হ্যাঁ,' বলতে বলতে এগিয়ে এসে মিঃ চৌধুরী বুককেসটা খুলে বইখানা টেনে বার করেন। তারপর মিঃ সানিয়েলের চোখের সামনে বইটা খুলে ধরেন। দেখেই এক পা পিছিয়ে যান মিঃ সানিয়েল। পাতাগুলোর মাঝখানটা কেটে সুন্দর খোপ তৈরি করা হয়েছে, আর সেই খোপের মধ্যে রয়েছে একটা রিভলভার।

'হ্যাঁ, নিখিলেশ জানত,' মিঃ চৌধুরী বলতে থাকেন, 'যে খেলা ও খেলছে তাতে একদিন ওর শেষ প্রয়োজন হবে এই রিভলভারটি। আর এই কারণেই বুককেসটির চাবি সব সময় খোলাই থাকত, যাতে প্রয়োজনের সময় কালবিলম্ব না করে ও রিভলভারটির সাহায্য নিতে পারে। এটি যে আমি আগেই দেখেছি তা ও টের পায় নি, আর আমিও ওকে জানতে দিই নি। এটি আবিষ্কার করামাত্র আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম যে এই ব্যক্তিটিই অপরাধী। তারপর আমি আরও প্রমাণের অন্বেষণ করতে লাগলাম। আমার ট্রেন্ড্‌ চোখ অচিরেই আবিষ্কার করল দেরাজের ঐ চোর কুঠুরিটি। ওর মধ্যে রাখা বাক্সটা খুলতেই দেখি একসেট পরচুলা, দাড়ি ইত্যাদি রয়েছে—ঠিক যেমনটি দেখেছেন এতদিন স্বামী অখিলানন্দের মাথায়, মুখে। সেই পাকানো পাকানো চুলের গুচ্ছ, সেই ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া দীর্ঘ দাড়ি। বুঝলাম এটা এক্সট্রা সেট। আমার আর কোন সন্দেহই রইল না।

আমি বাক্সটা খোলামাত্রই ও টের পেয়ে গেল যে ও ধরা পড়ে গেছে। তাই ও ছুটে গিয়েছিল বুককেসটার দিকে, আপনি তা দেখেছেন। ওর শেষ আশ্রয়টির সাহায্য নিতেই ও চেয়েছিল, কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, আমি যে ওর অস্ত্রটির সন্ধান অনেক আগেই পেয়ে গেছি তা ও ঘুণাক্ষরে জানতে পারে নি। তাই মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমার হাতের অস্ত্রটি দিয়ে ওকে নিশ্চল করে দিয়েছি।'

নিখিলেশকে চোখের সামনে দেখেও মিঃ সানিয়েল যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না ভাবছেন এই কি ওর প্রকৃত রূপ, না এ-ও একটা ছদ্মবেশ। না, এর শেষ না দেখে তিনি যেন আশ্বস্ত হতে পারছেন না। ওর লম্বা গেরুয়া আলখাল্লাটা পিঠের ওপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত উঁচু করে তুলে ধরলেন মিঃ সানিয়েল। সবিস্ময়ে দেখলেন পিঠের

[illegible] গভীর ক্ষতচিহ্ন, যা দিয়ে তাঁর সঙ্গে [illegible] কথা [illegible] হত নিখিলেশের।

এর পরের ইতিহাস অতি মর্মান্তিক। আপনারাও তা সহজেই অনুমান করতে পারছেন, সবিস্তারে তা বর্ণনা করা বাহুল্য-মাত্র।

পরদিন সকালে মিঃ স্যানিয়েলের বাড়ীর পোর্টিকোয় বসে মৈনাক চৌধুরী ও মিঃ স্যানিয়েল গল্প করছিলেন।

মিঃ স্যানিয়েল বললেন, 'কি করে যে আপনি এই অসাধ্যসাধন করলেন ভাবতেই পারছি না।'

'দেখুন মিঃ স্যানিয়েল,' বললেন মিঃ চৌধুরী, 'আমরা যারা এই crime psychology নিয়ে নাড়াচাড়া করি তাদের কাছে এটা নতুন কিছুই নয়। আমি তদন্ত করতে করতেই এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে নিখিলেশ আর স্বামীজী একই লোক। একই লোক একটা উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। আপনি হয়ত বলবেন নিখিলেশের মত সৎ ছেলে একাজ কেমন করে করল? এ পরিকল্পনা তার মাথায় এলই বা কি করে?'

'তাহলে একটু ভূমিকা দিয়েই আরম্ভ করতে হয়।'

'অপরাধ প্রবণতা মানুষের সহজাত। কৈশোর থেকে, এমন কি শৈশব থেকেই এই প্রবণতা মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। নানাভাবে, নানা ক্ষেত্রে, নানা রূপে এর বহিঃপ্রকাশ। যখন বয়স কম থাকে তখন বুদ্ধি থাকে অপরিণত, বিবেচনাশক্তিও থাকে খুবই পরিমিত। তাদের সেই অপরাধগুলোকে তখন কোথাও অত্যাচার, কোথাও বা দৌরাত্ম্য আবার কোথাও বা আত্মীয়-পরিজনের স্নেহের বিকৃত প্রকাশ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়, আগ্রাহ্য করা হয়। বয়স পরিণত হওয়ার সংগে সঙ্গে বুদ্ধি পরিপক্ক হলে কেউ কেউ এই সব অপরাধের কুশ্রীতা ও এর পরিণত রূপটির ভয়াবহতা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে এ থেকে চিরদিনের মত দূরে সরে আসে। এই উপলব্ধিই তাদের চলার স্রোতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দেয়। তাদের জীবনের গতি অত্যন্ত সৎপথেই পরিচালিত হয়। নিজেদের চরিত্রের ওপর তারা এমন একটা সংযমের নিয়ন্ত্রণ এনে ফেলে এবং এমন একটা বলিষ্ঠ ভিত্তির ওপর নিজেদের চরিত্রকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয় যে জীবনে তারা পথ-ভ্রষ্ট হয় কদাচিৎ।

'আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা অপরাধ প্রবণতাকে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন [illegible], [illegible] এর নিষ্ঠুর ভয়াবহ প্রকাশ হতে থাকে [illegible] মধ্যে। ক্রমে এরাই হয়ে ওঠে সিজ্‌ন্‌ড ক্রিমিনাল, জাত-অপরাধী।

'এই দু' শ্রেণীর মানুষের চরিত্রের কোন জটিলতা নেই। এদের আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু মুস্কিল হয় তাদের নিয়ে যারা শৈশবেই অপরাধ প্রবণতাকে ঘৃণার চোখে দেখেছে, অপরাধের পাপ উপলব্ধি করে এ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হতে পারে নি। একবার হয়ত একটা অপরাধ করার প্রলোভনকে কাটিয়ে উঠেছে, জীবন সহজভাবে চলেছে, আবার একসময় আর একটা প্রলোভন এসে ঘিরে ধরেছে। কখনও প্রলোভন প্রবল হয়ে উঠছে, কখনও বা তাকে দমনের ইচ্ছা বলবতী হচ্ছে। তাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ এই দুটো সত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলেছে। হয়ত কোন সময়ে অসত্যের পরাজয়ও ঘটে। কিন্তু অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যে নিঃশেষে নির্মূল হয় না। মনের অবচেতন স্তরে তা আত্মগোপন করে থাকে। উত্তরকালে অনুকূল পরিবেশ পেলেই আবার তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

'অপরাধবিজ্ঞানীদের কাছে এরাই হল 'প্রবলেম'। এদের নিয়েই তাঁদের দুশ্চিন্তার আর অবধি নেই।

'নিখিলেশ হল এই শ্রেণীর অপরাধী। জাত-ক্রিমিনাল সে নয়। তাহলে তার প্রকৃত চরিত্র মাঝে মাঝেই কোন-না-কোন ভাবে প্রকাশ পাওয়ার জন্য পথ খুঁজত। সত্যিই সে আর পাঁচজনের মতই সাধারণ একজন ভদ্র মানুষ। তা সত্ত্বেও সে এরকম সাংঘাতিক অপরাধ-মূলক কাজ করেছে। মনস্তত্ত্বের এ এক আশ্চর্য খেলা।

'সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব নিরন্তর চলেছিল নিখিলেশের মধ্যেও। স্টিভেনসনের 'ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড' তাই তার এত প্রিয় উপন্যাস। কারণ সে নিজের প্রতিরূপ দেখতে পেত ওর মধ্যে। আপনি যেদিন ঐ উপন্যাসের ব্যাখ্যা শোনালেন নিখিলেশকে সেদিন ওর অবচেতন মন থেকে মিঃ হাইড মাথা চাড়া দিয়ে মনের ওপরের তলায় উঠে এসেছিল। তাই ও অত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সেদিন।

'ওর নিজের চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল ছিল বলেই ঐ উপন্যাসটি ওকে এত আকর্ষণ করত। ওর মধ্যে ডাঃ জেকিল যতদিন প্রবল ছিল ততদিন আপনারা ওকে সৎ বলে জেনেছেন, দেখেছেন। যখনই ওর মধ্যে মিঃ হাইড প্রবল হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে তখনই আপনারা ওকে দেখেছেন বিদ্রোহী, উত্তেজিত। ওর মনে জেকিল আর হাইডের দ্বন্দ্বে হাইড জয়ী হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, আর শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেও। এই কারণেই হাইডের চরিত্র ওর অতিপ্রিয় এত বুঝেছিলেন।

পারেন, মিঃ স্যানিয়েল, নিখিলেশের মধ্যে দ্বৈত সত্তার লীলা। একদিকে তার অন্তরে প্রচণ্ড ধর্মবুদ্ধি, অন্যদিকে দীর্ঘকাল লালিত ভোগলালসা। একদিকে স্বামী অখিলেশরূপে সে ত্যাগী, অন্যদিকে নিখিলেশরূপে সে ভোগী। একটা সত্তা তার সৎ, অন্যটা অসৎ। একটা ডাঃ জেকিল, অপরটা মিঃ হাইড। এই দুয়ের নিরন্তর দ্বন্দ্বে যখনই তার মধ্যে মিঃ হাইড প্রবল হয়ে উঠতে চেয়েছে তখনই নিখিলেশের বিদ্রোহী রূপ বাইরে প্রকাশ পেয়েছে—যেটা লক্ষ্য করেছে তার বোর্ডিং-এর কর্ত্রী ও অন্যান্য বোর্ডাররা, আর আপনিও তার পরিচয় পেয়েছেন।

'ওর চরিত্রে শেষ পর্যন্ত হাইডেরই জয় হয়েছে, আর তার সেই জয়ের পথ প্রস্তুত করে দিতে গিয়েই নিখিলেশকে এত লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয়েছে।

'হ্যাঁ, লুকোচুরি আগাগোড়াই। বোর্ডিং-এর কর্ত্রীকে এড়িয়ে যাওয়া, মাথাধরার ছল করা—হ্যাঁ, ওটা ছল বৈকি—কারণ নিখিলেশ অফিস থেকে চলে না গেলে স্বামীজীর আগমন ঘটবে কি করে? দেখুন, যে কদিন স্বামীজী অফিসে এসেছে সেই কদিনই নিখিলেশ আগে-ভাগে চলে গেছে ছুটি নিয়ে। আপনি মনে করেছেন ওটা বুঝি কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু আমি তখনই একটা logical inference টেনে নিয়েছি।

'আরও দেখুন, লোকে জানত নিখিলেশ মাঝে মাঝে আসত প্রসাদপুরে। আসলে কিন্তু সে প্রতি শনি-মংগলবারই সেখানে যেত—কখনও নিজের গাড়ীতে, কখনও বা ট্রেনে। ওটা লোকের চোখে ধুলো দেওয়া আর কি। গাড়ীতে এলে স্থানীয় লোকে জানতে পারত। ট্রেনে এলে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসত, যাতে কেউ না টের পায়। আসতে তাকে হতই, না হলে স্বামীজী ধর্মসভায় আসবে কি করে?'

'আবার দেখুন, নিখিলেশ থিয়েটার করছে, কিন্তু স্বামীজী থিয়েটারের হলেও নেই, আবার ধর্মসভাতে নেই, দিনটা শনিবার হওয়া সত্ত্বেও। কি করবে, স্বামীজীর দুর্ভাগ্য! শনিবার না হলে তো আর থিয়েটার করা চলে না কাজেই স্বামীজী দু'জায়গাতেই অনুপস্থিত।

'অথচ দেখুন দু'জনে দু'জনের কথা উঠলেই বিরক্তি প্রকাশ করে। নেহাৎ লোক-ঠকানো ব্যাপার। এখন বুঝতে পারছেন কেন দু'জনকে এক জায়গায় দেখতে পেতেন না, কেন নিখিলেশ আপনার নেমন্তন্ন নেয় নি, কেন স্বামীজী থিয়েটার দেখতেও আসে নি আবার ধর্মসভাতেও যায় নি।

কৈকেয়ী

অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ

আমরা জানি দেবাসুর সংগ্রামে আহত দশরথকে কৈকেয়ী প্রাণপাত করিয়া শুশ্রূষা করেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। রামের রাজ্যাভিষেকের সময়ে কৈকেয়ী সেই প্রতিশ্রুত বর প্রার্থনা করেন। কৈকেয়ীর প্রার্থিত বর দুইটি হইল (১) রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে নির্বাসিত হইবেন, (২) ভরত রামের পরিবর্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। সত্যসন্ধ দশরথ এই মর্মান্তিক বর দুইটি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন কিন্তু এই নিদারুণ শেলাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া শোকজর্জর হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই বরপ্রদান কার্যে দশরথকে স্ত্রৈণ বা কাপুরুষ বলা বা তাঁর এই বরদান কার্যকে অন্যায় বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কারণ পত্নীর শুশ্রূষায় মুমূর্ষ স্বামীর নবজীবন লাভ এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেই পত্নীকে বরদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া কোন অপরাধ নয়। সেই অঙ্গীকার পালনের জন্য সর্ববিধ ক্ষতিবিরণ, তাদের দুঃখের ও শোকের কারণ যতই থাকুক, অন্যায় বিন্দুমাত্র নাই। বরং প্রবল বাধা ও আঘাত এই প্রতিশ্রুতি পালনকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু দশরথ কি বাস্তবিকই নির্দোষ? কৈকেয়ী বর প্রার্থনা করিলে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেন ও পরে রাজাসনে বসাইয়া বনে চলিয়া যাইতেন। এ-কাজ করাটা কি দশরথের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইত? কিছুতেই না। ইহাতে দশরথকে আর একটি প্রতিজ্ঞাভঙ্গস্বরূপ পাপে নিমজ্জিত হইতে হইত। কৈকেয়ী বর প্রার্থনা করিয়া দশরথকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তাই কৈকেয়ীর উপর সকলে অসন্তুষ্ট হইলেও রাম অসন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন, দশরথের কৈকেয়ীকে বিবাহের কাহিনী। সেই কাহিনীই বলিতেছি—দশরথ কুমারী কৈকেয়ীর রূপে মুগ্ধ হইয়া কেকয়রাজের কাছে তার পাণিপ্রার্থনা করেন। কিন্তু কেকয়রাজ শান্তনুর শ্বশুর ধীবররাজের চেয়ে কম বুদ্ধিমান ছিলেন না। তিনি দশরথকে কন্যা দিতে রাজী হইলেন এই সর্তে যে, কৈকেয়ীর গর্ভের সন্তানকে রাজ্য দিতে হইবে। কৈকেয়ীর রূপমুগ্ধ দশরথ তাহাতেই সম্মত হইয়া কৈকেয়ীকে বিবাহ করিলেন। তাই ভরত যখন রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নন্দীগ্রামে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, তখন রাম ভরতকে বলিলেন—

পুরা ভ্রাতা পিতা নঃ স মাতরম তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥
(অযোধ্যাকাণ্ড সপ্তাধিক শততম সর্গ)

অর্থাৎ—পূর্বকালে আমাদের পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন তখন মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁর এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাকেই রাজ্য দিবেন। বাস্তবিক বর প্রার্থনা করিয়া কৈকেয়ী দশরথকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত এক মহাপাপ থেকে রক্ষা করিলেন। কারণ কৈকেয়ী বর না চাইলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গেলে দশরথের ভরতকে রাজা করিতেই হইত। কাজেই এ-ব্যাপারে কৈকেয়ীর স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপানো তার প্রতি বড় রকমের অবিচার। বাল্মীকি মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ব্যতীতও 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামে আর একখানি রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণকে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পরিশিষ্ট বলা হয়। এখানে রামের বনগমনের কোন কারণই দেখানো হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে—

অথ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সহ কেনাপি হেতুনা।
জগামবিপিনং রামো দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥
(অদ্ভুত রামায়ণ, দশম সর্গ ১ম শ্লোক)

অর্থ—অতঃপর রামচন্দ্র কোন একটি বিশেষ কারণে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনগমনপূর্বক দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় নিলেন।

এখানে কৈকেয়ীর কোন নামগন্ধও নাই। বিমাতৃসুলভ ঈর্ষা এবং নিজের সন্তানের প্রতি অত্যধিক স্নেহ যে কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনার একমাত্র কারণ, রামের বনবাস এবং ভরতের রাজপ্রাপ্তিই যে তার জীবনের প্রধানতম কাম্য—এই অপ্রিয়-রূঢ় সত্য আমাদের মর্মে মর্মে গ্রথিত। কৈকেয়ীর এই প্রার্থনাপূরণের ফলে যে প্রচণ্ড বিপর্যয় সমস্ত অযোধ্যায় নামিয়া আসিল, নামিয়া আসিল রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার জীবনে, নামিয়া আসিল কৌশল্যা সুমিত্রা ও দশরথের অন্যান্য মহিষী ও পুরবাসীদের জীবনে, এই অদ্ভুত রামায়ণে তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় স্বতই মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, বিমাতা কৈকেয়ী রামের বনগমন ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির কারণ নাও হইতে পারে। বিশেষত মূল রামায়ণেই যখন ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির কারণ কৈকেয়ীর বিবাহের সময়েই নির্ণীত হইয়া আছে, তখন স্বভাবতই রামের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে কৈকেয়ীর কৃতকর্মের অপরাধ অনেকাংশে মূল্যহীন হইয়া যায় না কি? কৈকেয়ী-মন্থরা সংবাদ মূল রামায়ণে প্রক্ষিপ্তও তো হইতে পারে। বিমাতার ঈর্ষা ও সপত্নী-পুত্রের অনিষ্টচেষ্টার কিছু প্রচলিত কাহিনী এই কাহিনীর ইন্ধন যোগাইতে পারে।

যে, মানসিক অবস্থার মধ্যে নিখিলেশের দিন কাটছিল তাতে তাকে ওরকম সুন্দর অভিনয় করতে দেখে আপনি রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি বুঝতেই পারেন নি যে ঐ বিশেষ নাটকের ঐ বিশেষ চরিত্রে সার্থঅভিনয় করা তার পক্ষে সে সময় আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ তার মধ্যে তখন মিঃ হাইড প্রবল হয়ে উঠেছে।

'যে অসৎ সত্তা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল তার মধ্যে, সেই তাকে এত ছলনা ও ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। নিখিলেশ ছিল এর হাতের ক্রীড়নক মাত্র।'

অপরাধ বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ ছাত্র ও গবেষক মৈনাক চৌধুরী এতক্ষণে চুপ করলেন।*

॥ সমাপ্ত ॥

*একটি বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

॥ মহিলা মহল ॥

(পাঠকরা পড়বেন না)

● শ্রাবণী ঘোষ, বেলেঘাটা মেন রোড, কলি-১০---

প্রশ্ন ১ : আমার চোখের কোণে কালো ছোপ বহুদিন থেকেই ছিল, কিন্তু দিন দিন সেটা বাড়ছে এবং গালের দিকে ও মুখের নানাস্থানে এই ছোপ বিস্তার লাভ করছে।

উত্তর : বহুদিন ধরে যকৃতের দুর্বলতা থাকলে সাধারণত এই ধরণের ছোপ দেখা যায়। আপনি যকৃৎকে সবল করার চিকিৎসা করান, দেখবেন ছোপ কমে যাচ্ছে। যে-কোন ভাল ক্রীম মাখতে পারেন।

প্রশ্ন ২ : আমার চুল দিন দিন কমে যাচ্ছে।

উত্তর : একই কারণে।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈকা মহিলা, কলিকাতা ---

আপনিও ব্যবহার করে দেখতে পারেন। তবে খুব ঘন লোম কমবে বলে মনে হয় না।

● শ্রীমতী রমা, দমদম পার্ক, কলি-৫৫ (২টি কুপন)---

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ৪৪ বৎসর। আমার পিঠ, কোমর, কাঁধের মাংসপেশী সব সময়ে ব্যথা করে।

উত্তর : হয় বাতের জন্য ব্যথা করছে আর নইলে মাসিক বন্ধ হয়ে আসবার সময় হয়ে আসছে বলে ওই ধরণের উপসর্গ হচ্ছে। কি কারণে হচ্ছে চিকিৎসককে দেখিয়ে ঠিক করে নেবেন, এর মধ্যে নুন খাওয়া কমিয়ে দেবেন। এ ধরণের রোগের ওষুধ চিঠির মাধ্যমে দেওয়া ঠিক নয়। আপনি রোজ রাতে ত্রিফলার জল খাবেন। তাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে।

প্রশ্ন ২ : চান করবার পর আমার শরীর বড় চুলকায়।

উত্তর : এ ধরণের উপসর্গ দু কারণে ঘটে। প্রথমত এলার্জির জন্য। দ্বিতীয়ত মাসিক শেষ হয়ে আসবার সময়ের বয়সে হরমোনের অভাবের জন্য। কি কারণে ঘটছে ঠিক ধরতে পারলাম না, কারণ আপনি মাসিক সংক্রান্ত কোন আলোচনাই করেন নি। যাই হোক, আপনার রক্ত পরীক্ষা করে দেখবেন, Eosinophil বেড়েছে কি না। যদি বেড়ে থাকে তার চিকিৎসা করাবেন, যদি না বেড়ে থাকে, তাহলে পাঁচ থেকে সাত দিন Antistine বড়ি খাবেন, দিনে তিনটি করে।
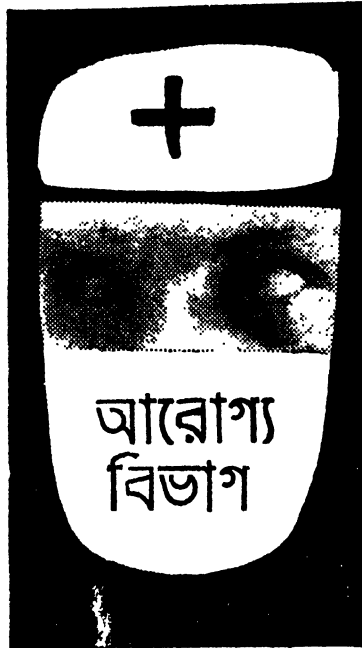
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

প্রশ্ন ৩ : ১৭ বছরের একটি মেয়ে। তার মাসিক সাড়ে তিন বৎসর যাবৎ হয়েছে। কিন্তু প্রতি মাসে হয় না। তিন-চার মাস পর পর হয়। তখন হয় খুব বেশি।

উত্তর : অল্পবয়সে কিছুদিন ধরে এই রকম গোলমাল হয়ে থাকে এ নিয়ে বেশী ভাবনার কিছু নেই। তবে অধিক রক্ত-ক্ষরণ হলে রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে। সেইজন্যে যাতে রক্তশূন্য না হয়ে পড়েন লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনি ওকে সকাল সন্ধ্যা জল-খাবারের পর 'প্যালিমিন' চা চামচের দু চামচ করে খেতে দেবেন, আর দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে সারকোফেরল খেতে দেবেন, অন্তত তিন মাস। দেখবেন, আপনা থেকেই উপসর্গ চলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ৪ : মেয়েটির টনসিল খুব বড়। গান শিখতে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। গাইতে গেলে স্বর ধরে যায়। অস্ত্রোপচার ছাড়া ভাল হয় কি না জানাবেন।

উত্তর : চিকিৎসককে দেখিয়ে নেবেন। যদি টনসিলে পুঁজ জমে থাকে তাহলে অপারেশন না করে সারাতে পারবেন না, আর যদি পুঁজ না হয়ে থাকে একবার অটোভ্যাকসিন করে দেখতে পারেন।

● শ্রীমতী ভবানী রায়, রায়পাড়া রোড, কলিকাতা---

প্রশ্ন : আমার হাত-পায়ে বড় বেশি চুল গজাচ্ছে,---এগুলোকে একেবারে নির্মূল করা যায় কি করে?

উত্তর : একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়। আপনি হাত-পায়ে Dienoestrol Cream মেখে দেখতে পারেন।

● শ্রীমতী সুজাতা গুহ, মানা রোড বার্মামাইনস্, টাটানগর---

আপনার দুটি প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে বলছি---

১। আপনি Liver Extract ইনজেকশন নেবেন কুড়িটি।

২। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাবেন এক মাস।

৩। রোজ রাতে ত্রিফলার জল খাবেন।

● শ্রীমতী রূপালী ব্যানার্জি, বালীগঞ্জ গার্ডেনস্, কলি-১৯---

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, সঠিক কোন উপায় নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ব্যায়াম করলেই ঠিক হয়ে যাবে। (প্রশ্ন ছাপাতে নিষেধ করেছেন)।

● শ্রীমতী মলি সেন, হাওড়া (পুরো ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক)---

আপনার প্রশ্নের উত্তর এর আগে মাসিক বসুমতীতে অনেকবার

আলোচিত হয়েছে। আর একবার বলছি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হলেই উপসর্গ চলে যাবে। (প্রশ্ন ছাপাতে নিষেধ করেছেন)।

● জনৈক জিজ্ঞাসু ছাত্রী, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলি-২৬—

(প্রশ্ন ছাপাতে নিষেধ করেছেন। ২টি কুপন আছে।)

১নং প্রশ্নের উত্তর: আপনি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে শক্ত বিছানায় বা মাটিতে চিৎ হয়ে শোবেন। তারপর হাত দুটি মাথার ওপর কানের পেছনে তুলে দেবেন। এবার হাত দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁবার চেষ্টা করবেন। হাত কানের সামনে আসবে না। হাঁটু ভাঁজ হবে না। হাতের সঙ্গে মাথা এবং শরীরের উপরিভাগ এগিয়ে আসবে। প্রথম প্রথম পারবেন না। কিছুদিন পরে দেখবেন পারছেন। এই ব্যায়াম পনেরো মিনিট থেকে আধঘণ্টা ধরে করবেন।

২নং: নিশ্চয়ই হবে; তবে কতটা হবে অঙ্ক করে বলা যায় না।

৩নং ও ১নং: এ বিষয়ে আপনার ধারণা ভুল। অস্থির কোষ স্বাভাবিকভাবেই দেহের অন্যান্য অংশের কোষের সঙ্গেই সমতালে বৃদ্ধি পায়। মানুষ লম্বা বেঁটে হয় বহু কারণে। আপাতদৃষ্টিতে অস্থির বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু হরমোনের প্রভাবও অনেকখানি দায়ী, তাছাড়া বংশগত প্রভাবও উপেক্ষার নয়। বংশের ধারায় যদি সবাই বেঁটে থাকে, তাহলে লম্বা হবার আশা কম থাকে। এটা জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম, বেটে হওয়া কোন লজ্জার বিষয় নয়, বা কোন রোগ নয়। তাই অহেতুক মানুষকে লম্বা করার জন্যে কোন স্ট্রিচ-এর প্রয়োজন নেই।

● শ্রীমতী চন্দ্রা—দাঁতন স্টেশন, মেদিনীপুর—

আপনি প্রত্যহ স্নানের পর Pragmatar মলম লাগাবেন। Liver Extract ইনজেকশন নেবেন এবং একমাস ভিটামিন বি কমপ্লেক্স

● শ্রীমতী চন্দনা ঘোষ, এস, পি, [illegible] রোড, কলি-৩০—

আপনাকে ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীমতী কল্পনা মল্লিক, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৬—

ব্রণতে কোন কিছু মাখার আমি পক্ষপাতী নই। রোজ রাতে ছেলেকে ত্রিফলার জল খাইয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন, দেখবেন ব্রণ সেরে গেছে।

● শ্রীমতী সুধারাণী সেন, চাকুলিয়া—

মৃগী রোগের খুব ভাল ওষুধ আমার জানা নেই। তবে চিকিৎসকের মত নিয়ে Dialantin Sodium ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

● অনামিকা, কলিকাতা—

এই সংখ্যাতে জনৈক জিজ্ঞাসু ছাত্রীর উত্তর পড়ুন। ওসব নিয়ে কেন চিন্তা করছেন? ও সব নিয়ে যত চিন্তা করবেন, শরীর তত খারাপ হয়ে পড়বে।

● শ্রীমতী স্বামিতারাণী দাশ, পুরুলিয়া—

প্রশ্ন ১: আমার ঋতুস্রাব অনিয়মিত এবং যন্ত্রণাদায়ক। কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়?

উত্তর: কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে হয়। শরীরে রক্তাল্পতা থাকলে তাও সারাতে হয়। শরীরকে স্নিগ্ধ করার জন্যে দৈনিক বেশি করে শাক খেতে হয়। দুবেলা খাঁটি মধু খেলে ঋতুস্রাবের উন্নতি হয়। তাছাড়া অশোক ফুলের রস নিয়মিত খেলে জরায়ু সবল হয় ও ঋতুর দোষ কেটে যায়। এতেও যদি না যায়, তাহলে ছোট্ট একটি অপারেশন করে জরায়ুর মুখ বড় করে দিতে হয়। সন্তান হলে জরায়ুর মুখ বড় হয়, আর তাতে এই ধরণের যন্ত্রণার উপশম হয়।

প্রশ্ন ২: মাথার চুলের গোড়াতে সাদা সাদা মাস মরে কেন?

উত্তর: এক ধরণের পরভৃতিকা-কীটাণু বাসা বাঁধে। ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি শরীর থেকে কমে গেলেও এই ধরণের মরা মাস ওঠে। খুশ্কি নষ্ট করার জন্য প্রতিদিন দুবেলা Pragmatar মলম মাথায় ঘষতে হয়। আর দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে ভিটামিন এ-ডি মিশ্রিত ওষুধ খেতে হয়।

● শ্রীমতী অঞ্জনা বিশ্বাস, বেহালা, কলি-৩৪—

প্রশ্ন: গত কয়েক মাস যাবৎ আমার মাথার চুল ভীষণভাবে উঠিতেছে।

উত্তর: আপনি কুড়িটা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নেবেন। প্রত্যেকটি ২ এম, এল, ইন্ট্রামাসকুলার করে। তারপর কেমন থাকেন জানাবেন।

● শ্রীমতী মণিকা ভট্টাচার্য, বেহালা, কলি-৩৪। (দুটি কুপন আছে)

প্রশ্ন ১: অনুগ্রহ করে জানাবেন কোনগুলি নিরাপদ সময় আর কোনগুলিতে সন্তান সম্ভাবনা থাকে?

উত্তর: পুস্তকে বর্ণিত আছে যেদিন মাসিক বন্ধ হয়, সেদিন থেকে সাতদিন নিরাপদ সময় অর্থাৎ এই সময়ে গর্ভসঞ্চার হয় না, কিন্তু মাসিকের সঠিক দিন নির্ধারিত না থাকার জন্য এই সময়কে সঠিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। মাসিক বন্ধ হবার পর প্রথম দু-তিন দিন নিরাপদ সময় বলা যেতে পারে, এরপর কোন সময়ই গর্ভসঞ্চারের পক্ষে নিরাপদ নয়।

প্রশ্ন ২: জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ট্যাবলেট ব্যবহার করলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় কি? এটা বারো মাস খেয়ে যেতে হয় অথবা মিলনের দিনগুলিতে খেলেই উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়।

উত্তর: বড়ি খেয়ে কোন ক্ষতির কথা এখনো শোনা যায় নি। Gynovular 21 বড়ি ব্যবহার করতে পারেন। যেদিন মাসিক আরম্ভ হবে, সেদিনকে একদিন ধরে পাঁচ দিনের দিন থেকে রোজ একটি করে একুশ দিন খাবেন। তারপর আর খাবেন না। মাসিক সুরু হলে আবার আগের হিসেবমতো খাবেন। যে মাসে খাবেন না, সেই মাসে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। বড়ি নিয়মিত

ভাবে খেলে যে কোনদিন মিলন হতে পারে। সন্তান হবার ভয় থাকে না।

প্রশ্ন ৩ঃ তিন মাস পূর্বে সন্তান হয়েছে কিন্তু একটুও চুল ওঠে নি। হঠাৎ অত্যন্ত চুল উঠছে।

উত্তর ঃ ও নিয়ে ভাববেন না। দেখবেন কিছুদিন পরে আবার ঘন চুল গজাচ্ছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই, এ-রোগে আপনার চিকিৎসক ঠিকই ওষুধ দিয়েছেন। এ রোগ সারা সময়-সাপেক্ষ।

● শ্রীমতী আরতি রায়, মহেন্দ্র রায় লেন, কলি-৪৬—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ১ চামচ করে 'নিয়োগাডাইন' খেয়ে দেখুন একমাস ধরে।

● শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্ত, বাঘা যতীন কলোনী, যাদবপুর—

আপনি নিয়মিতভাবে দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে 'সারকোফেরল্' খাবেন তিন মাস।

● শ্রীমতী শান্তা মুখার্জি, চারিচারা পাড়া, নবদ্বীপ—

আপনি রোজ রাতে ইসবগুলের ভুষি ভিজিয়ে খাবেন ১৫ দিন ধরে। তারপর একদিন অন্তর এক মাস, তারপর সপ্তাহে দু দিন এক মাস, তারপর প্রতি সপ্তাহে একদিন করে। দেখবেন আপনার উপসর্গ কমে গেছে।

চোখের জন্য আপনি 'অ্যারোভিট' ইনজেকশন নিন। অন্তত দশটি ইনজেকশন।

● শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া (ছদ্মনাম), বেহালা—

আপনার বিষয় নিয়ে এ সংখ্যাতেই বলেছি, তবে একটা বিষয় জেনে রাখুন। মাসিক হবার অব্যবহিতপূর্বে অথবা পরে জরায়ুর যন্ত্রণা হবেই, কম আর বেশি। এ নিয়ে যত ভয় পাবেন, যন্ত্রণা তারও বৃদ্ধি পাবে। পরিমাণের চেয়ে বেশি মাসিক অনেক সময়ে রক্তাল্পতার জন্যে হয়। আপনি 'ফেরাডল' অথবা 'সারকোফেরল' দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে তিন মাস খাবেন, তাতেও যদি না কমে জানাবেন। যথাযথ চিকিৎসার কথা বলে দেব।

পুরুষ মহল

(পাঠিকারা পড়বেন না)

● শ্রীবাসুদেব রায়, ঠাকরাণী চক্, বালি, হাওড়া—

আপনার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এ রোগ নয়। অভ্যাস না ছাড়লে সারবে না।

● শ্রীজয় গুপ্ত, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া—

প্রশ্ন ১ঃ আমার গলার আওয়াজ ভীষণ কর্কশ। গলার আওয়াজ পরিবর্তনের যদি কোন ওষুধ থাকে, তবে জানাবেন।

উত্তর ঃ দুঃখিত। আমার জানা কোন ওষুধ নেই। তবে, রোজ বাষ্পর সেঁক হাঁ করে নিয়ে দেখতে পারেন (Steam inhalation.)

প্রশ্ন ২ঃ মাথার চুল কোঁকড়া করবার কোন উপায় যদি থাকে জানাবেন।

উত্তর ঃ অনেক সেলুনে চুল কোঁকড়া করে দেয়।

● শ্রীপ্রভাতকুমার নাথ, নিউটন অ্যাভেন্যু, দুর্গাপুর-৫—

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

আরোগ্য বিভাগ

নাম- --

ঠিকানা- --

—মাসিক বসুমতী

আপনি নুন কম খাবেন। এ ছাড়া 'সায়োবিউটাজোন' বড়ি দিনে তিনটে করে দশদিন খাবেন, তারপরে সায়োসিলামাইড বড়ি দিনে তিনটে করে তিন মাস খাবেন।

● শ্রীতপন, কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া।

যে পদার্থ পরিয়েছেন, তার জন্যে অনেক সময়ে হতে পারে। এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে জেনে নিন। যদি তিনি বলেন, তাহলে আগের মতনই জীবনযাপন করুন। অন্য উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করবেন।

কড়াতে পেটসিডু লাগিয়ে দেখতে পারেন।

● শ্রীআদিত্যনাথ, শোভাবাজার স্ট্রীট, কলি-৫—

অভ্যাস না ছাড়লে কিছুই হবে না। অভ্যাস যেভাবেই হোক ছাড়তে হবে। ব্যায়াম করতে সুরু করুন। মাসিক বসুমতীতে বিশুশ্রী মনোতোষ রায় বিশেষভাবে ব্যায়ামের কথা বলছেন, আপনি তাই অনুসরণ করুন।

● শ্রীউদ্বিগ্ন ভট্টাচার্য, আগরতলা, ত্রিপুরা—

আপনিও ব্যায়ামের অভ্যাস করুন।

● শ্রীশান্তাপ্রসাদ, হাওড়া—

আপনি Antepar ওষুধ ½ আউন্স করে দুদিন রাত্রে শোবার সময় খাবেন।

● শ্রীকাশীনাথ ব্যানার্জি, বৈদ্যবাটি, হুগলী—

ও নিয়ে আপনি কিছু ভয় খাবেন না। ওটা কোন রোগ নয়। প্রত্যেক পুরুষের জীবনে ও জিনিস ঘটে।

● শ্রীলোকেশচন্দ্র উকিল, পর্বতপুর, আসাম—

আপনার কন্যাকে নিয়মিতভাবে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাওয়াবেন, দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ১ চামচ করে।

● শ্রীসন্দীপ রায়, নবদ্বীপ, নদীয়া—

নং। আপনি স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করুন।

● ছদ্মনাম, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯—

যে ধরণের ছদ্মনাম দিয়েছেন, তা পত্রিকায় ছাপা অসুবিধে আছে। আপনি আগে ব্যায়াম করে অভ্যাস দূর করুন, তারপর স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার ওষুধ বলে দেব।

● X, এস, টি, ব্যানার্জি রোড, কলি-৫৩—

আপনি সকালে ১টি রাতে শোবার সময় ১টি করে Nevro vitamin 4 (Adult) বড়ি এক মাস খাবেন।

● শ্রীঅশোককুমার বড়াল, সুর অ্যাভেন্যু, কলি-৪০—

কুপন-এর পেছনে কি থাকবে তা নির্ধারণ করেন সম্পাদক। এ বিষয়ে তাঁকেই জানাবেন। আপনি রাত না জেগে নিয়মিতভাবে সকালে তিন ঘণ্টা, সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা পড়বেন। তাতেই সুফল পাবেন।

● শ্রীঅজিত—বিষ্ণুপুর—

ডাক্তারবাবু আপনাকে যে ইনজেকশন দিয়েছিলেন, সেই ইনজেকশন আরও দু শিশি নেবেন।

● নাম ছাপতে নিষেধ করেছেন, শ্যামলাল রোড, বর্ধমান—

ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দিয়েছেন, সেটা আবার লাগান। জায়গাটিতে হাওয়া লাগাবেন, সমস্ত অন্তর্বাস কেচে পড়বেন।

● শ্রীমনোজকুমার মৈত্র, আনন্দমোহন রা. রোড, নাগের বাজার, দমদম, কলি-২৮—

১নং প্রশ্নের উত্তর: যে ওষুধ লাগাচ্ছেন সেটা আবার লাগান। জায়গাটিতে হাওয়া লাগাবেন। ভেতরের পোষাক কেচে পড়বেন।

প্রশ্ন ২: শরীরে যাতে একটু মাংস লাগে, তার জন্য কি কি করিতে হইবে?

উত্তর: দু' বেলা পেটভরে ভাত খাবেন আর বিশুশ্রী মনোতোষ রায়ের নির্দেশমত আসনগুলি অভ্যাস করবেন।

৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই, শরীর ভাল হলে ও উপসর্গগুলি চলে যাবে।

● শ্রী এস কে সরকার, রামগড়, হাজারীবাগ—

প্রশ্ন ১: পেট ব্যথা পেটে খুব বায়ু হয় ও পেট টিপলে ব্যথা বোঝা যায়।

উত্তর: হজমের জন্য দৈনিক কোন ভাল ওষুধ খান, দেখবেন, সেরে গেছেন।

প্রশ্ন ২: সমস্ত শরীরে ব্যথার মত একটা ভাব।

উত্তর: আপনি 'বেরিন' বড়ি সকালে ১টি, বিকেলে ১টি এক মাস খাবেন।

● শ্রীসুশান্ত চ্যাটার্জি, ও রোড, জামসেদপুর—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে 'অ্যামাইনোজাইম' খাবেন আর রাতে শোবার সময় ২টি করে 'নেভ্রোভিটামিন' ৪ (বয়স্ক) খাবেন এক মাস।

● শ্রীসুনীলকুমার মজুমদার, আমহার্স্ট রো, কলি-৯—

আপনি দুবেলা দু' কানে Chloromycetin Ear Drops দু ফোঁটা করে দেবেন। একবার টনসিল পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। যদি টনসিলে দোষ থাকে, তার চিকিৎসা করাবেন।

● শ্রীসুধীরচন্দ্র সাহা, দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড, কলি-১৫—

আপনাকে পরীক্ষা না করে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

● শ্রীবিভূতিভূষণ মিশ্র, নথরিয়া, মালদহ—

আপনি প্যারেণ্ডান জিজুয়েট ৫ মিলিগ্রাম সকালে ১টি, বিকালে ১টি খেয়ে যান। একবার রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়ে দেখে নেবেন আপনার ডায়াবেটিস মেলিটাস আছে কি না?

● শ্রীআশীষকুমার ভৌমিক, ও টি পাড়া, কাটিহার—

প্রশ্ন ১: জীবন বড় না কর্ম বড় এবং কেন?

উত্তর: জীবন ও কর্ম এক

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, একটা বাদ দিয়ে অন্যটার কথা বলা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

প্রশ্ন ২ : জীবন এবং প্রাণ কি ?

উত্তর : আপনি এমন এক প্রশ্ন করেছেন যা চিকিৎসকের আওতায় পড়ে না, তবু বোঝাবার চেষ্টা করছি। প্রদীপ জ্বালবার জন্য প্রদীপ, তেল এবং সলতের প্রয়োজন হয়। এগুলো হল দেহ। আগুনের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সেই স্ফুলিঙ্গ হল আত্মা। আর প্রদীপ যে আলো বিকিরণ করে তাই হল জীবন। প্রাণ ও দেহর সমন্বয়ে যে নশ্বর কীর্তি উদ্ভাসিত হয়, তাই হল জীবন।

● শ্রীবিদ্যুৎ---রামকুমার ভট্টাচার্য লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া-৪---

প্রশ্ন ১ : বুকে ও পিঠে প্রচুর ছুলি হইয়াছে।

উত্তর : Scabalcid অথবা Ascabiol স্নানের পর মাখতে পারেন। রোজ কাচা গেঞ্জি পরবেন।

২নং প্রশ্নের উত্তর : হ্যাঁ ওটাই মাখবেন।

● শ্রীফণিভূষণ মণ্ডল, মানা ক্যাম্প, রায়পুর ---

আপনার পুত্রকে সকাল বিকেল চা-চামচের ১ চামচ করে Pulmocod (Plain) খাওয়াবেন দু মাস ধরে।

● শ্রীসত্যনারায়ণ দাস, কামার-পুকুর, হুগলী---

আপনি কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করবেন এবং মখে Lactocalamine মাখবেন।

● শ্রী পি চ্যাটার্জি, শান্তিনিকেতন---

মাসিক বসুমতীতে যত তাড়াতাড়ি পত্রের উত্তর দেওয়া হয়, অন্য কোন পত্রিকাতে দেওয়া হয় বলে আমার জানা নেই। এর চেয়ে তাড়াতাড়ি পত্রিকা মারফৎ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ১ : পেটের গোলমাল প্রায়ই থাকে।

উত্তর : আপনি মাঝে মাঝে Amicline অথবা Davoquin বড়ি খাবেন, আপাতদৃষ্টিতে ভাল থাকলেও।

২নং প্রশ্নের উত্তর আনাই। ছেলেটিকে কোন ভাল বোর্ডিং-এ দিন। পরিবেশ বদলে গেলেই মানুষ হবে।

● সু, দ, আতপুর, ২৪ পরগণা---

আপনি পুরো শীতকাল দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে Haliborange খাবেন।

● শ্রীঅনিলকুমার সরকার, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২---

আপনি সমস্ত শীতকাল ধরে Waterburys Compound with vitamins দুবেলা চা চামচের ২ চামচ করে খাবেন, তাহলে দেখবেন বর্ষায় আর কষ্ট পাচ্ছেন না।

● শ্রী বি কে অধিকারী, ঋষি বঙ্কিম রোড, বারাসত---

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ৬৪। Chronic colitis আছে। হজমের ওষুধ চাই।

উত্তর : এ বয়সে হজমের একটু গোলমাল হবে। ওষুধ খাওয়ার চেয়ে সহজপাচ্য খাদ্য খাবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার Prostate Gland Enlarged অপারেশন ভিন্ন সারার কোন উপায় আছে কি ?

উত্তর : অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসা অনুসারে নেই।

● শ্রীসুকুমারচন্দ্র রায়, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়েছি। আমার মনে হয় আপনার পুরনো আমাশয় আছে। আপনি স্থানীয় চিকিৎসকের মত নিয়ে এমেটিন নিয়ে দেখুন উপকার পাবেন।

● শ্রীশম্ভুলাল বসাক, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯---

প্রশ্ন : গত ২।৩ বৎসর যাবৎ অম্বল রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতেছি।

উত্তর : আপনি প্রত্যহ খাবার পর দুবেলা চা-চামচের ২ চামচ করে Diapepsin ওষুধ খাবেন অন্তত তিন মাস।

● শ্রীঅসীম ঘোষ, রূপনগর, মধ্য-প্রদেশ---

হরমোনজনিত চিকিৎসা চিকিৎসকের মতামত না নিয়ে করাবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। যা করছেন তাই করুন, উতলা হলে কোন লাভ হবে না।

● শ্রীগোপাল রায়, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি---

আপনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নিয়ে দেখুন উপকার পাবেন।

● শ্রীবরুণ বোস, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলি-১০---

প্রশ্ন ১ : দাড়ি কামাবার পর ব্রণ হয়।

উত্তর : আপনি বোধহয় ভোঁতা ব্লেড বা ক্ষুর দিয়ে কামান। নতুন ব্লেডে কামাবেন আর উল্টো কামাবেন না।

প্রশ্ন ২ : আমার মাথায় খুব খুস্কি।

উত্তর : স্নানের পর রোজ Pragmatar মলম ঘষবেন আর Multivitamin বড়ি খাবেন।

● শ্রীতরুণ ভট্টাচার্য, অরুন্ধতীনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি কোন ভাল E. N. T. Specialist-কে দেখিয়ে তাঁর মতামত নিন। চিঠিতে এর সমাধান সম্ভব নয়।

● শ্রীকালীচরণ পাল, জাগুলগাছি বান্ধব সমিতি, ভাঙ্গড়---

আপনি সকাল বিকেল ব্যায়াম করুন, দেখবেন উপসর্গ দূর হয়ে গেছে।

● সেবাইত গুরুদাস মহারাজ, শ্রীমন্ত লেন, বেহালা---

প্রশ্ন : প্রায়ই আমাশয় ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে ভুগছি।

উত্তর : আপনি Amicline বড়ি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি ও সন্ধ্যায় ১টি ১০ দিন খাবেন। এ ছাড়া দুবেলা খাওয়ার পর Digeplex চা-চামচের দু চামচ করে খাবেন অন্তত দু মাস।

● শ্রীঅন্তরীণ চ্যাটার্জী, শ্রীমন্ত লেন, কলি-৮---

প্রশ্ন ১ : লো প্রেসার হেতু কি কি

উত্তর : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন, ছানা প্রভৃতি যা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ২ : ঋতু পরিবর্তনের সময় প্রায়ই সর্দি কাশিতে ভুগি।

উত্তর---আপনি দুবেলা চা-চামচের দু চামচ করে Pulmocod (plain) খাবেন।

●শ্রীশ্যামলকুমার রায়, জিনজিরাপুল, কলি-৬০---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর Sioplex Lysine চা-চামচের ২ চামচ করে খাবেন। তিন মাস।

●শ্রী এ কে সি, চাকদহ, নদীয়া---

আপনি দুবেলা ব্যায়াম করুন, দেখবেন অভ্যাস চলে গেছে।

●শ্রীনীলমণি খামারু, বারুইপাড়া, হুগলী---

আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি করে Davoquin বড়ি খাবেন ১৫ দিন।

●শ্রীকল্যাণকুমার রায়, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা---

প্রশ্ন ১ : দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া কি-ভাবে বন্ধ করা যায়?

উত্তর : মাড়ির দুর্বলতার জন্য দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। ভিটামিন সি এবং ক্যালসিয়াম বড়ি খাবেন। দাঁত আঙুল দিয়ে মাজবেন। শক্ত জিনিষ চিবিয়ে চিবিয়ে খাবেন। প্রথম প্রথম রক্ত পড়বে, তারপর দেখবেন সেরে গেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নয়।

●শ্রী বি পোদ্দার, গান্ধীনগর, কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা---

প্রশ্ন ১ : আমার চোখের পাতার ওপর আঁচিল হয়েছে।

উত্তর : ডাক্তার দেখিয়ে কাটিয়ে নিন। ও জায়গায় ওষুধ লাগানো উচিত নয়।

প্রশ্ন ২-এর উত্তর : আপনি দুবেলা একটি করে Eggluvite বড়ি খাবেন।

●শ্রীঅরূপ, পি ডবলিউ ডি রোড, কলি-৩৫---

আপনি নিয়মিতভাবে Liver Extract ইনজেকশন নিয়ে যান, তাতে উভয় সমস্যার সমাধান হবে।

●শ্রীদিলীপকুমার নন্দী, কাপাস-ডাঙ্গা লেন, হুগলী---

আপনি S. S. K. হাসপাতালের (P. G. Hospital) সার্জিকেল আউটডোরে দেখান। ওঁরা অপারেশন করে ঠিক করে দেবেন।

●শ্রী পি, জি ব্যানার্জী, অগস্ত্য কুণ্ডু, বারাণসী---

প্রশ্ন ১ : শ্বেতী হবার কারণ কি?

উত্তর : কুষ্ঠ থেকে হতে পারে, বহুদিনের পুরনো আমাশয় থেকে হতে পারে। যকৃতের দুর্বলতা থেকে হতে পারে। অনেক সময়ে কারণ বোঝা যায় না (Idiopathic)

প্রশ্ন ২ : কি প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার আক্রমণ হইতে মানুষ রক্ষা পায়।

উত্তর : কুষ্ঠ বা আমাশয় রোগ চিকিৎসায় সারানো যায়, কিন্তু Idio-pathic-এর কোন প্রতিষেধক জানা নেই।

●শ্রীকাজল---বার্নপুর, নর্থ রোড---

প্রশ্ন ১ : আমার ঠোঁটের নীচে জ্বর ঠোঁটুর মত হয়।

উত্তর : বোধ হয় Allergyর জন্য হচ্ছে। ডিম খাওয়া ছেড়ে দিয়ে দেখুন তো কেমন থাকেন?

প্রশ্ন ২ : আমার ছোট ভাই-এর সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসলেই ঘুম পায়।

উত্তর : দিনের বেলায় পরিশ্রম বেশি হয়ে যাচ্ছে। বিকেল বেলায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন, খেলতে দেবেন না।

●শ্রীসুধাংশুশেখর দত্ত, বালেশ্বর, উড়িষ্যা---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার আগে ১ চামচ করে Elixir Neoga-dine খাবেন; কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। ভাল মাজন দিয়ে দাঁত মাজবেন, ব্রাশ ব্যবহার করবেন না।

●শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্তী, সিমলাই পাড়া লেন, পাইকপাড়া---

আপনি এতদিন যখন অর্শরোগে ভুগেছেন, তখন ওষুধে কোন ফল হবে না। আপনার বাড়ির কাছেই R. G. Kar Medical College আউট-ডোরে দেখিয়ে অপারেশন করিয়ে নিন।

●শ্রীকিষেণচাঁদ লাল, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ---

আপনি ও নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। ওটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার।

●শ্রী এস ভট্টাচার্য, হালিসহর, ২৪ পরগণা---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ১ চামচ করে Ner-vigor with vitamins and Formats খাবেন এক মাস ধরে।

●শ্রীকমলকুমার মাইতি, গোপীনাথ-পুর, মেদিনীপুর---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে Sioplex Lysine খাবেন একমাস ধরে।

●শ্রীসুনীলবরণ রায়, সিমলা রোড, কলি-৬---

আপনি 'ফ্ল্যাজিল' বড়ি খেয়ে দেখতে পারেন, বোধহয় উপকার পাবেন।

●শ্রীমাধবচন্দ্র গোস্বামী, দেশবন্ধু-নগর, কলি-৩৫---

আপনি ও নিয়ে ভাববেন না। ওটা কোন রোগই নয়।

● শ্রী পি পাল, সিংভুম, বিহার---

এ উপসর্গ যৌনক্ষমতাস্বল্পতার জন্য ঘটে, তবে চিন্তার কিছু কারণ নেই। অনেকের দেরিতে হয়---

● শ্রীঅসীমকুমার মল্লিক, রায়বাহাদুর রোড, কলি-৩৪---

প্রশ্ন : আমি আরও লম্বা হতে চাই।

উত্তর : লম্বা হবার কোন ওষুধ আমার জানা নেই।

● শ্রীমঙ্গল মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলি-২৬---

প্রশ্ন ১ : অনেক লোকের খাইবার সময় জল খাওয়ার অভ্যাস আছে। ইহা কি হজমের পক্ষে ভাল না খারাপ?

উত্তর : আপনি বোধ হয় বেশি খাওয়ার কথা বলছেন। পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া হজমের পক্ষে খারাপ।

প্রশ্ন ২ : জাঙিয়া পরাব প্রয়োজনীয়তা কি? জাঙিয়া পরার দরকার আছে কি?

উত্তর : কাজকর্ম করার সুবিধে হয়। পরলেও দোষ নেই, না পরলেও ক্ষতি নেই।

● শ্রীবোকা---

অনেকক্ষণ দেরি করেন বলে। অত দেরি করবেন না। সপ্তাহে দুদিন।

● শ্রীকাশীনাথ ব্যানার্জি, আগরতলা, ত্রিপুরা---

প্রশ্ন ১ : কি করে শরীরের উচ্চতা বৃদ্ধি করব?

উত্তর : আপনার বয়সে আর উচ্চতা বাড়বে না।

প্রশ্ন ২ : কি করিলে এবং কি খাইলে খুব মোটা হইতে পারিব?

উত্তর : পেটভরে ডাল ভাত খেয়ে, ঘুমিয়ে আর ব্যায়াম করে।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কল্যাণী, নদীয়া---

আপনি এক মাস Elixir Neogadine ১ চামচ করে খাবার আর কর্টা আগে খাবেন দিনে দুবার।

● শ্রীঅমিতাভ মজুমদার, শান্তিনিকেতন, বীরভূম---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়েছি। ব্লাড-প্রেসারের বিষয় নিয়ে যত ভাববেন, তত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে। চিকিৎসার দায়িত্ব আপনার চিকিৎসককে দিয়ে আপনি সব দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিন। দেখবেন সুস্থ হয়ে উঠছেন।

● শ্রীঅনিলবরণ রায়, চিৎপুর ঘাট লেন, কলি-২ ---

ও নিয়ে ভাববেন না। ও জিনিষ যেমন বেরিয়ে যায়, তেমনি আবার তৈরি হয়।

শ্রীস্বপনকুমার পরাই, যোগীপাড়া, বাঁকুড়া---

আমার মনে হয় আপনার টনসিলের দোষ আছে। আপনি টনসিলের চিৎকিসা করান এবং দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Haliborange খাবেন।

● শ্রীবিশ্বনাথ দে, শ্রীরামপুর, হুগলী---

সামান্য ধরণের allergy থাকলে এই ধরণের উপসর্গ দেখা দেয়। কোন ভয় নেই।

● বাবলু রায়, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩---

আপনার মনের অহেতুক ভয় প্রকাশ করেছেন। ও জন্যে বিবাহে বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোন বাধা নেই।

● শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলি-১---

প্রশ্ন ১ : আমার মেয়ের বয়স ১২ বছর। বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ কিভাবে হবে?

উত্তর : যদি ক্রিমি থাকে, তার চিকিৎসা করিয়ে নেবেন। রোজ রাতে শোবার সময় উঠিয়ে প্রস্রাব করাবার অভ্যাস করাবেন। রাতে শোবার সময় ১টি করে Probanthine বড়ি খেতে দেবেন।

প্রশ্ন ২ : স্মরণশক্তি বৃদ্ধির কোন ওষুধ আছে কি?

উত্তর : ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া এবং মনে রাখার অভ্যাস তৈরি করে।

● শ্রীসৌমেন বসু, পশ্চিম কমলাপুর, দমদম---

খুব ধীরে ধীরে যাবে। একবার মিলিয়ে গেলে স্থায়িভাবেই মিলিয়ে যাবে।

হিমালয়

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হিন্দুদের কাছে দেবভূমি অর্থাৎ দেবতাদের পীঠস্থানতুল্য। তিব্বতীয় সংস্কৃতিতে হিমালয় এক আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও সাহিত্যিক কল্পনা উন্মেষের উৎসস্বরূপে পরিগণিত হয়। বিশ্বের ইতিহাসে, হিমালয়কে ভাগ্য-নির্ধারণের পর্বত বলে অভিহিত করা হয়। এই হিমালয়ে বিশ্বশক্তির কল্পনার উদ্ভব হয়েছে, দার্শনিকরা এখানে এসে প্রথম যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই প্রভাব ক্রমশ পশ্চিমী দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

বোম্বাইয়ের জার্মান কনস্যুলেট---জেনারেলের অ্যাটাচি ওয়ালটার লিফার লিখিত হিমালয়ের ভূগোল ও রাজনীতি নিয়ে লেখা এই বইটি পড়লে হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলের টাকাগুলির সঙ্গে পাঠকের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পর্যটনের অভিজ্ঞতা তৈরী হয়। হিমালয় সম্পর্কে ভক্তদের কথা উল্লেখ করে লেখক একটি পৌরাণিক প্রস্তাবনা দিয়ে বইটি শুরু করেছেন এবং তারপর তিনি ঐতিহাসিক মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে এসে ধর্মীয় অবতাররা এবং সাম্রাজ্য বিজেতারা কি করে হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন সে-কথা বিবৃত করেছেন। তিব্বত, নেপাল, ভুটান, সিকিম, ব্রহ্মদেশ, তুর্কীস্থান, আসাম ও কাশ্মীর এই সব অঞ্চলগুলি নিয়েই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে, এমন কি চীন ভারতের পারস্পরিক প্রসঙ্গও বাদ পড়ে নি।

১২টি ও ১৫টি সুন্দর ছবি আছে। হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলের রাজনৈতিক---প্রাকৃতিক---দার্শনিক গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে যা কিছু ঘটে দক্ষিণ ও পূর্ব এশীয় জনজীবনে তা প্রতিফলিত হয়, এমন কি বিশ্ব-সমস্যাতেও প্রভাব পড়ে।
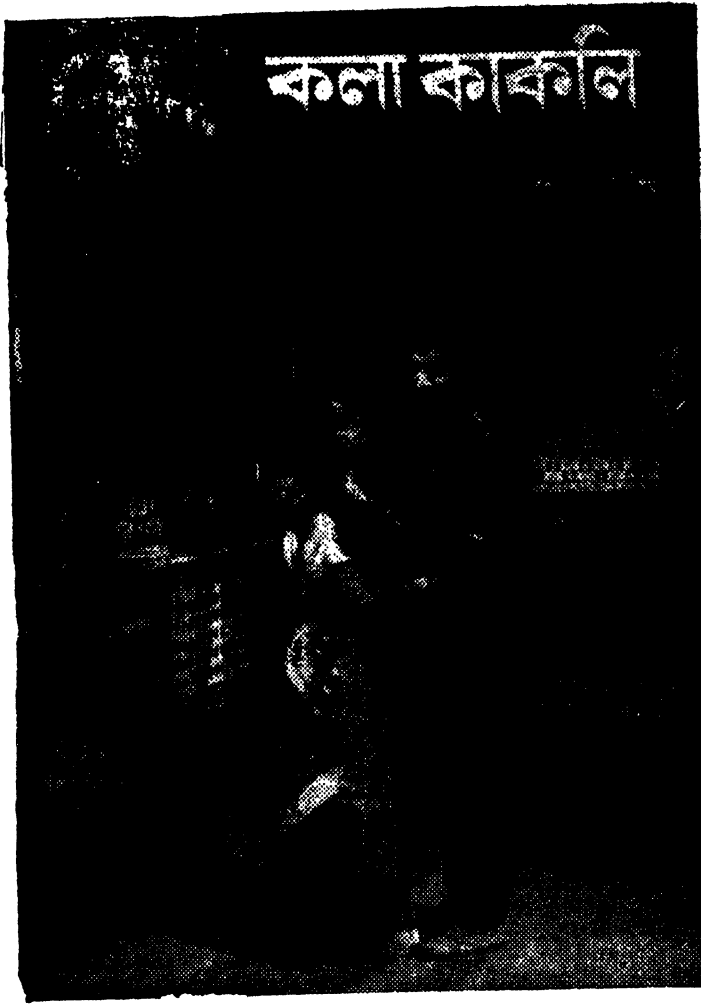
কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত

॥ শেষাংশ ॥

তখন তিনি বয়সের দিক হতে সবে তিরিশ উত্তীর্ণ হয়েছেন। তখন হতে ১৯৪২ সালে মগ্নচৈতন্যে সমাধিস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাধনার ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন গৃহী-যোগী বরদাবাবুর ধারা মতে সাধনা, জীবনসাধনা ও কাব্য-সাধনা চলছিল একই সঙ্গে। তাঁর বন্ধু নলিনীরঞ্জন সরকারের মতে বরদাবাবু শুধু নজরুলকে অধ্যাত্ম শিক্ষাই দেন নি, নজরুলের ঐকান্তিক আগ্রহে বুলবুলের মৃত্যুর পর তাকে আর একবার স্থূল চর্মচক্ষে দেখিয়েছিলেন। যার ফলে নজরুল বরদাবাবু প্রদর্শিত সাধন-পথে অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য তাঁর অন্য বন্ধু মজফ্ফর আহমেদ মনে করেন যে হিন্দু বন্ধুদের প্ররোচিত তন্ত্রোক্ত সাধন-পথই নজরুল ইসলামের এই পার্থিব পরিণতির জন্য দায়ী।

সন্তোষ রায়চৌধুরী

সে অন্য কথা। সাহিত্যের গবেষকদের কারো কারো মতে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যাঁরা শাক্ত গান লিখেছেন' 'তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের শাম্যাসঙ্গীতগুলি উল্লেখের দাবী করতে পারে।' কেউ বলেন 'রামপ্রসাদের সব দিক বিচার করলে শ্যামাসঙ্গীতে নজরুলের গান অনেকেরই উপরে বলা যায়। শাক্ত পদাবলীর উৎসকাল হলো অষ্টাদশ শতাব্দী। যদিও একশো বছরের সীমারেখার মধ্যে শাক্ত পদাবলীর রচনাকাল ধরা হয়েছে। তন্ত্রপ্রধান বাংলা দেশে শাক্ত ভাবধারা প্রবহমান রয়েছে সুদীর্ঘ কাল ধরে। সেই ধারারই এক অভিনব প্রকাশ শাক্ত পদাবলী বা শ্যামাসঙ্গীত। এখানে মূলরস বাৎসল্য-ভাব। বাঙলা দেশের কবি বাঙলার মেয়েদের সামনে রেখে যে কবিতা রচনা করেছেন প্রাণের আকুল বেদনা নিঙ্ড়ে—মানুষ স্বর্গের দিকে হাত বাড়িয়েছে অপরিসীম সুষমা নিয়ে। রামপ্রসাদ এই শাক্ত পদাবলীর প্রথম ও প্রধান উদ্‌গাতা। ফলে পরবর্তীকালে প্রায় সব শাক্ত পদকর্তাই রামপ্রসাদের অনুগামী। নজরুলও তাই।

রামপ্রসাদের গানের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বাঙালীমাত্রই তাঁর সাদা-সীধা কথার গান আর সহজ সরল সুরের সঙ্গে আজীবন পরিচিত। বাঙালী হৃদয়ে তাঁর আসন সহজে বিনষ্ট হবার নয়। রামপ্রসাদের পরেই নাম করা যায় সাধক কমলাকান্তের, তারপর শম্ভুচন্দ্র, নরচন্দ্র, রামদুলাল নন্দী প্রমখের। উনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের পটভূমিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাবধারায় শ্যামাসঙ্গীত রচনা সম্ভব হয়েছে একমাত্র নজরুল ইসলামের পক্ষে। যার একদিকে ছিল তাঁর কবি মানস, অন্যদিকে ছিল তন্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতির যথোপযুক্ত শিক্ষা। প্রথম যৌবনের প্রচণ্ড দেশপ্রেম যাঁকে পরিণত করেছিল বিদ্রোহী কবিতে, পুত্র-শোকের অপরিসীম বেদনা তাকেই নিয়ে এসে ফেলেছে অধ্যাত্ম-চেতনার রাজ্যে। দুরন্ত যৌবনের খেয়ালীপনা আবেগের প্রচণ্ড আঘাতে মোড় নিয়েছে মনোজগতে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মত সংসার হতে সরে যান নি, তিনি গৃহীযোগী

গুরুর পথেই পারিবারিক ও কবি-জীবনকে একই সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন পথ হিসাবেই।

শাক্ত পদাবলীর মূল সুর বাৎসল্য রস। নজরুলের তন্ত্র-সাধনা বা অধ্যাত্ম-সাধনার সূচনা পুত্রের মৃত্যু। রামপ্রসাদ ও সাধক কমলাকান্ত ছাড়া অন্য অনেক পদকর্তারই প্রেরণা ছিল নানা কারণে সংসার-বৈরাগ্য ও তজ্জনিত হতাশা। এঁদের অনেকেই ছিলেন হয় হৃতসর্বস্ব ভূম্যধিকারী বা তাঁদের শ্যামাসেবক কর্মচারিবৃন্দ। কুমার শম্ভুচন্দ্রের---

'চিন্তাময়ী তারা তুমি
আমার চিন্তা করেছ কি?'

অথবা কুমার নরচন্দ্রের---

'যে ভালো করেছ তুমি
আর ভালোতে কাজ নেই।'

অথবা রামদুলাল নন্দীর---

'সকলি তোমারি ইচ্ছা,
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।'

প্রভৃতি গানগুলির মধ্যে ঐ হতাশাই ফুটে উঠেছে নিদারুণভাবে।

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যা শতাধিক। সেই সব সঙ্গীতের মধ্য হতে পদ রচনার সূত্র একটা পাওয়া যায় সহজেই। একটি গানে দেখি---

'ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে গো।
ওমা দে ফিরিয়ে মোর হারানিধি।---
বল মা তারা কেমন করে
নয়ন তারা নিলি হরে।
দিলি মা হয়ে তুই শিশুর বুকে
নিঠুর মরণ শায়ক বিঁধি।।'

অন্য একটি গান এরই পরিপূরক।

'কালি কালি মন্ত্র জপি
বসে লোকের ঘোর শ্মশানে,
মা অভয়ার নামের গুণে
শান্তি যদি পাই এ প্রাণে।
এই শ্মশানে ঘুমিয়ে আছে
যে ছিল মোর বুকের কাছে
সে হয়তো আবার উঠবে জেগে
মা ভবানীর নামগানে।'

তাই আশা-দীপ জ্বালিয়ে কবি বসে আছেন---

'চৌরঙ্গী' চিত্রের শ্রীমতী অলীমা ভট্টাচার্য রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের হাতে বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্য দশ হাজার টাকার একটি চেক দিচ্ছেন

'মার সেই চরণের নিলাম শরণ,
যে চরণে আঘাত হানে।'

বুঝতে কষ্ট হয় না কোন পথ ধরে নজরুল শ্যামামায়ের চরণে শরণ নিয়েছিলেন। শরণ নেবার পর তাঁর ভয় ভেঙেছে। অন্য গানে তাই দেখি---

'আমায়, আঘাত যত হানবি শ্যামা
ডাকবো তত তোরে,
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন
লুকায় মায়ের ক্রোড়ে।।'

তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতে শিখেছেন যে---

'তোরই নামের কবচ দোলে
আমার বুকে হে শঙ্করী।
কি ভয় দেখাস আমি তোকেও
ভয় করি না ভয়ঙ্করী'------
তোর চরণ ছেড়ে পালায় যারা
মায়ার জালে মরে তারা
তোর মায়াজাল এড়িয়ে গেলাম
মা তোর অভয় চরণ ধরি।।'

সাধনা না থাকলে মাতৃ-পদ-নির্ভরতার এ নিঃশঙ্ক সঙ্গীত কি ভাবে রচিত হতে পারে?

ভক্তের আকূতি ক্রমে আত্ম-নিবেদনে তারপরে পরিপূর্ণ শ্যামাভাব-সমাধিতে ডুবে গেছে---

'আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে
শ্যামা ভাব সমাধিতে
শ্যামা, রসে যে মন ডুবে আছে
কাজ কি রে তার যশ খ্যাতিতে
মধু যে পায় শ্যামা পদে
কাজ কি রে তার বিষয় মদে,
যুক্ত যে মন যোগমায়াতে
ভাবনা কি তার রোগ ব্যাধিতে?'

তবে মুজফ্‌ফর আহমেদের আশঙ্কাই সত্যি। যোগসাধনার পরিণতি হিসাবেই নজরুল আজ দুরারোগ্য ব্যাধিতে সমাধিস্থ।

নজরুলের শতাধিক শ্যামাসঙ্গীত হতে কয়েকটিকে বেছে নিয়ে আমার জ্ঞান-বুদ্ধিমত শ্যামাসঙ্গীতের তত্ত্ব বিভাগে সাজিয়ে দিলাম পাঠকদের একনজরে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতের ধারা বুঝবার সুবিধার জন্য। (কয়েকটি গান বাদে সব গানগুলিই পেয়েছি 'রাঙাজবা' নামে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত সংকলনগ্রন্থে। প্রকাশকদের চেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু ভুল বানান ও অসম্পূর্ণ গান ছাপানোর ক্ষেত্রে তাঁরা আর একটু সাবধান হলে ভাল হতো)।

আগমনী ও বিজয়া শ্যামাসঙ্গীতের মুখ্য অংশ। নজরুলের আগমনী বিষয়ক গানের মধ্যে---

১। নিপীড়িতা চণ্ডিকা ডাকে
জাগো চণ্ডিকা মহাকালি।
২। আমার আনন্দিনী উমা আজো
এল না তার মায়ের কাছে।
৩। ওরে আলয়ে আজ মহালয়া,
মা এসেছে ঘরে।
তোরা উলুধ্বনি দে রে, শঙ্খ বাজা,
প্রদীপ তুলে ধর॥
এল মা, আমার মা॥
৪। মা এসেছে, মা এসেছে
উঠলো কলরোল।

বিজয়া বিষয়ক গানের মধ্যে—
১। মাকে ভাসায়ে জলে কেমনে
রহিব ঘরে।
২। কে সাজালো মাকে আমার
বিসর্জনের সাজে।
—ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভক্তের আকূতি পর্যায়ে কয়েকখানি সুন্দর গান আছে। যেমন—
১। মাগো আমি মন্দ মতি,
তবু যে সন্তান তোরই।
২। কোথায় গেলি মাগো আমার
খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে।
৩। মা কবে তোরে পারব দিতে
আমার সকল ভার।
৪। থির হয়ে তুই বস্ দেখি মা
খানিক আমার আঁখির আগে।
দেখবো নিত্য লীলাময়ী
থির, হলে তুই কেমন লাগে।—ইত্যাদি

আত্ম-নিবেদন পর্যায়ে,—
১। মোরে আঘাত যত হানবি শ্যামা,
ডাকব তত তোরে।
২। শ্যামা নাম যার জপমালা,
তার কি মা ভয়-ভাবনা আছে॥
৩। (ওমা) বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ,
শরণ নিলাম সেই চরণে।
৪। তোরই মায়ের কবচ দোলে
আমার বুকে হে শঙ্করী।—ইত্যাদি

সাধন বিষয়ক পর্যায়ে—
১। বলরে জবা বল,
কোন সাধনায় পেলি
শ্যামা মায়ের চরণতল।
২। মাগো আমি তান্ত্রিক নই,
তন্ত্র মন্ত্র জানিনা মা।
আমার মন্ত্র যোগসাধনা
ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা।
৩। আমার দেহ হবে রাঙাজবা,
দেহ বিল্বদল, মুক্তি পাবো
ছুঁয়ে মুক্তকেশীর চরণতল।—ইত্যাদি

জগজ্জননীর রূপবিষয়ক গানগুলির সঙ্গে পরিচিতি আমাদের একটু বেশী। এই পর্যায়ে—
১। মহাকালের কোলে এসে
গৌরী হলেন মহাকালী।
২। আর লুকাবি কোথা মা কালী।
৩। আমার কালো মেয়ের পায়ের
তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
৪। কে বলে মোর মাকে কালো,
মা যে আমার জ্যোতির্ময়ী॥
৫। (মায়ের) অসীম রূপ সিন্ধুতে
বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে।
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা
অনন্ত এই বিশ্ব জুড়ে॥—ইত্যাদি

তত্ত্ব বা নীতিবিষয়ক পর্যায়ের গান—
১। ভুল করেছি ওমা শ্যামা
বনের পশু বলি দিয়ে।
২। দুর্গতিনাশিনী আমার শ্যামা
মায়ের চরণ ধর,
যত বিপদ তরে যাবি
মাকে বারেক স্মরণ কর।
৩। শ্মশান কালির নাম
শুনে রে ভয়কে পায়।
৪। শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অন্তিমে সন্তানে কোলে নিতে।
৫। শ্যামা নামের লাগলো আগুন,
আমার দেহ ধূপকাঠিতে।
যত জ্বলি সুবাস তত
ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে।—ইত্যাদি

কাজী নজরুল ইসলামের উপরোক্ত শ্যামাসঙ্গীতগুলি পাঠ করলে ভক্ত হৃদয়ই যে শুধু উদ্বেলিত হয় তাই নয়, তত্ত্ব, ভাব, ভাষা, রূপ, রস, আঙ্গিক—সব দিক হতে যে পদগুলি শ্যামাসঙ্গীতের পূর্বপ্রচলিত পদগুলির সঙ্গে সমমর্যাদায় একত্র সঙ্কলিত হতে পারে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। সাধক রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত প্রমুখ শাক্তপদকর্তাদের প্রদর্শিত পথে বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের পটভূমিকায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত রচনা আর তার বিস্তৃতি সত্যই বিস্ময়কর।

নজরুল সাহিত্যের উপযুক্ত মর্যাদা দানের জন্য যথোপযুক্ত গবেষণার প্রয়োজন আছে। সে কাজ অবশ্য সাহিত্যের গবেষকদের। এ কাজে অগ্রণী ডঃ সুশীল গুপ্তের 'নজরুল চরিত মানস' হতেই এই প্রবন্ধরচনায় আমি প্রেরণা পাই।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর সেটে হারীন চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়   চিত্র : সোমা চৌধুরী

বাংলার সুবাদার যখন সুজা, দিল্লীর সিংহাসনে তখন আওরঙ্গজেব। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তখন সুজার পক্ষপুটে লখিন্দরপুরের একচ্ছত্রাধিপতি। বিপত্নীক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা উত্তরার মা বাবা দুটি আসনই তিনি দখল করেছেন। জমিদারের কুচক্রী কুটিল দেওয়ান শিবশঙ্কর তার কুকর্মের ফলে পাশ্ববর্তী জমিদারী থেকে বরখাস্ত হবার পরই, আশ্রয় নিয়েছে ইন্দ্রনারায়ণের জমিদারীতে, একমাত্র সন্তান বাসুদেবকে নিয়ে।

প্রতিবেশী রাজ্যের জমিদার একমাত্র শিশুপুত্র দেবীকান্তকে রেখে মারা গেলে, ইন্দ্রনারায়ণ স্নেহবশতঃই তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন আর দেওয়ানের পরামর্শেই সেই জমিদারীও দখল করেন। দেওয়ানের আক্রোশ আছে দেবীকান্তর উপর, কারণ ওর বাবাই তাকে বিতাড়িত করেছিল। ইন্দ্রনারায়ণের স্নেহের ছায়ায় বড় হয়ে উঠতে থাকে উত্তরা ও দেবীকান্ত। সারল্য ও চপলতায় ভরা দুটি শিশু, একজন আর একজনকে না দেখে থাকতে পারে না।

ওদের এক ছোট্ট মনের জগতে মাঝে মাঝে শিবশঙ্করের ছেলে বাসুদেব এসে ঝড় তোলে। উত্তরা কিন্তু তা সহ্য করে না। দেবী- কান্ত উত্তরার এই শৈশব সখ্যতা দেখেই ইন্দ্রনারায়ণের মনে দেবীকান্তকে আপন করে নেবার এক গোপন ইচ্ছা জেগে ওঠে।

অপরদিকে শিবশঙ্করের আশা বাসুদেবের সঙ্গে উত্তরার বিয়ে দিতে পারলে অদূরভবিষ্যতে নাসিরপুরের জমিদারী তার দখলে আসবে।

ঐ ব্যাপারে একদিন শিবশঙ্কর ইন্দ্রনারায়ণের কাছে কথা তুললে, তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে, কখনই তা হতে পারে না। দেওয়ানের ছেলের সঙ্গে জমিদারের মেয়ের বিয়ে কখনই হতে পারে না।

নিরাশ হবার পর সব রাগ পড়ে জমিদারের উপর। সে তখন থেকে ছলে বলে জানাতে ভোলে না যে, দেবীকান্ত এ জমিদারীর কেউ নয়। ইন্দ্রনারায়ণের পরগাছা সে। এই সকল তিক্ত অভিজ্ঞতা তার কাছে নাসিরপুরের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তাই একদিন উৎসবের রাতে উত্তরার চোখে ফাঁকি দিয়ে দূরে দূরে অনেক দূরে চলে যায় দেবীকান্ত। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সে পথিমধ্যে কুখ্যাত ডাকাত ভুজঙ্গ হালদারের খপ্পরে পড়ে। সব কথা শোনার পর ভুজঙ্গ হালদার নিজের কাছেই রাখে দেবীকান্তকে নিজের মত করেই মানুষ করে তোলে তাকে।

দিন গড়িয়ে বছর হয়, বছর গড়িয়ে নতুন বছর। ইন্দ্রনারায়ণ ইতিমধ্যে ব্যাপক তল্লাসী করেও দেবীকান্তর কোন খোঁজ পায় না। উত্তরা এখন আর শিশু বা কিশোরী নয়, পূর্ণ যুবতী। ছোটবেলাকার সেই মধুর দেবীকান্তর স্মৃতি তাকে এখনও জড়িয়ে আছে। এখনও সে মনে প্রাণে দেবীকান্তকেই ভালবাসে। সখা-বিরহে বিজনে সখী ললিতাকে নিয়েই দিন কাটে উত্তরার।

এদিকে বাসুদেব কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও উত্তরার কাছে আসে প্রেম নিবেদনের জন্যে। বাসুদেব সুবাদার সুজার দরবারে মনসবদারের কাজ নেয়।

একদিন ইন্দ্রনারায়ণ সপরিবারে তৎকালীন বাংলার রাজধানী রাজমহলে সুজার দরবারে রওনা হন।

অজিত লাহিড়ী পরিচালিত 'গড় নাসিমপুর' চিত্রে সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

চিত্র: আশু সেনগুপ্ত

দিকে লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে পুজো দিতে যাবার পথে অন্য দুই মনসবদার চন্দ্রভান মিত্র আর মনসুর আলীর দ্বারা আক্রান্ত হয় উত্তরার পালকি। দুজনে উত্তরাকে নিজেদের আখড়ায় তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য গঙ্গার ধার দিয়ে চলতে শুরু করে। সেই সুযোগে উত্তরা পাল্কীর দরজা খুলে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। মনসুর বা চন্দ্রভান কেউ-ই তাকে ধরতে পারে না।

গঙ্গার জলে একটি মেয়েকে ভাসতে দেখে কুখ্যাত ডাকাত রাজাবাবুর লোকেরা উত্তরাকে উদ্ধার করে এনে নৌকায় তোলে। সেখানে রাজাবাবু উত্তরাকে দেখে প্রথমেই চিনতে পারে। উত্তরাও জ্ঞান ফিরে আসার পর রাজাবাবুকে দেবীকান্ত বলে চিনে নিতে ভুল করে না।

বহু বছরের ব্যবধানে আবার মিলিত হয় দুজনে। তবে উত্তরার কাছে দেবীকান্তের পরিচয় রাজাবাবু নামেই থেকে যায়। তার পেশা সম্পর্কে উত্তরাকে কিছু জানায় না। এর পর থেকেই নাসিমপুরের বাইরে নির্ধারিত সময়মত অভিসারে মিলিত হয় নিয়মিত উত্তরা আর দেবীকান্ত।

অবশ্য উত্তরার এই গোপন অভিসার বাসুদেবের চোখ এড়ায় না, তবে সে দেবীকান্তকে চিনতে পারে না রাতের অন্ধকারে। তবে যখন সে চিনতে পারে তখন উত্তরাকে সব জানায় নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য।

উত্তরাও দেবীকান্তর ডাকাত পরিচয় পেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

বসুদেব প্রথম থেকেই শুধুমাত্র গড়নাসিমপুরই নয় বাঙলার রাজত্বের উপর দৃষ্টি ছিল।

সুযোগ আসে। আওরঙ্গজেবের হয়ে সেনাপতি মীরজুমলা সসৈন্যে আক্রমণ করে বাঙলা দেশ।

সুজা পরাজিত ও বন্দী হয়। বন্দী হয় বাসুদেব, চন্দ্রভান মিত্র, মনসুর আলী প্রমুখ কর্মচারিবৃন্দ।

একদিন মীরজুমলা ঐ তিন বন্দীকে ডেকে নিয়ে জানায় যে, ওদেরকে যে একটি শর্তে ছেড়ে দিতে পারে যে, ওরা যদি সুজার দরবারে থেকেও ওর কথামত কাজ করে অর্থাৎ দেশ-দ্রোহী হয়।

এ কাজে মনসুর আলী গররাজী হওয়ায় তার প্রাণদণ্ড হয়। চন্দ্রভান মিত্র রাজী হয়। রাজী হয় বাসুদেবও। তবে একটি শর্ত, মীর-জুমলা সারা বাঙলা জয়ের পর বাসুদেবের কাজের পরিবর্তে তাকে গড় নাসিমপুরে জমিদারী দেবে।

রাজী হয় মীরজুমলা। নাসিমপুরের জমিদারী পেয়েই সে ইন্দ্রনারায়ণ আর উত্তরাকে বন্দী করে। পদের মোহে বাসুদেব তখন উন্মত্ত। দিল্লীর বাদশার দরজায় কোন উচ্চপদ প্রাপ্তির আশায় সে কাশীম খাঁর মেয়ে জিন্নাহকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে। বাবা শিবশঙ্কর রাজী হন না। বিরোধ জমে ওঠে পিতা-পুত্রের মধ্যে।

বাসুদেবও তার পথের সব কাঁটা তুলে ফেলতে বদ্ধপরিকর। বৃদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ, উত্তরা দুজনেই তখন বন্দী। একমাত্র দেবীকান্ত বাকী। ওকে কিভাবে নাসিমপুরে আনা যায় তার মতলব আঁটে বাসুদেব। উত্তরার সখী ললিতার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় আর জানায় যে, দেবী-কান্তকে উত্তরার বন্দীর ব্যাপারে খবর দিয়ে তাকে উদ্ধার করতে আসবার জন্য।

রবীন্দ্র সরোবরে [illegible] লাইফ সেভিং সোসাইটি পরিচালিত 'ওয়াটার ব্যালে'

ললিতাও দেবীকান্তকে সব বলে আর জানায় যে, রাত্রির নির্দিষ্ট কোন প্রহরে যখন সে প্রদীপ দেখাবে তখন যেন সে নাসিরপুরে প্রবেশ করে।

দেবীকান্ত ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ভুজঙ্গ হালদারের আদেশে সদলবলে নাসিরপুর ঘিরে ফেলে অপেক্ষা করে আলোর নির্দেশে।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আলোর নির্দেশ পেয়ে দেবীকান্ত এগিয়ে যায়। ঘরে ঢুকে দেখা পায় সিতারার।

এই সিতারাকেই একদিন দেবীকান্ত রক্ষা করেছিল মৃত্যুর হাত থেকে, আজ তাই সিতারা দেবীকান্তকে বাঁচাল। শুধু তাই নয় সিতারার কাছ থেকে বাসুদেবের সব ষড়যন্ত্রের কথা জানল দেবীকান্ত।

তার পর ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে নাসিরপুরের গড় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। একমাত্র পুত্র বাসুদেবের মৃত্যুতে পাগলপ্রায় শিবশঙ্কর মশাল হাতে এদিক ওদিক ছুটতে থাকেন আর তার পর ঢুকে পড়েন নাসিরপুরের দুর্গে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে গড় নাসিরপুর ভস্মীভূত হয়ে যায় হিংসা, দ্বেষ, প্রেম, প্রতিহিংসার আগুনে।

শুধুমাত্র বেঁচে যায় উত্তরা আর দেবীকান্ত। গঙ্গার শান্ত স্রোতে বজরায় যেতে যেতে দূর থেকে গড়ের লেলিহান শিখার উত্তরা-দেবীকান্তর মুখ লাল হয়ে ওঠে মিলনের আনন্দে।

বারীন্দ্রনাথ দাস রচিত ও বহুপঠিত এই ছবির নাম গড় নাসিরপুর। চিত্রনাট্য লেখকের। বিভিন্ন চরিত্ররূপায়ণে আছেন, উত্তরা-মাধবী মুখার্জী, দেবীকান্ত—বিশ্বজিৎ, বাসুদেব—দেব মুখোপাধ্যায় (বম্বে), শিবশঙ্কর—বিকাশ রায়, ইন্দ্রনারায়ণ—অসিতবরণ, ভুজঙ্গ হালদার—কমল মিত্র, চন্দ্রভান মিত্র—অনুপকুমার, মনসুর আলি—দিলীপ রায়, সিতারা—কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা, ললিতা—সুব্রতা চ্যাটার্জী, কাশীম খাঁ—শেখর চ্যাটার্জী ও সেনাপতি মীরজুমলার চরিত্রে—উত্তমকুমার, সুরকার—শ্যামল মিত্র ও নেপথ্য কণ্ঠদানে আছেন, আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী ও সুরকার স্বয়ং। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন—উত্তমকুমার, পরিচালনায় আছেন, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারখ্যাত অজিত লাহিড়ী।

নাট্যলোক

অসমাপ্ত

গত ৩রা সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) '৬৮ চন্দননগর থিয়েটার সেণ্টারের বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে সংস্থার তরুণ নাট্যকার শ্রীদিলীপ দে রচিত 'অসমাপ্ত' নাটকটি শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিকায় রচিত এই নাটকটিতে বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করে যাঁরা দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাট্যকার শ্রীদে ও পরিচালক শ্রীভট্টাচার্যের স্থান। এঁদের দুজনার অভিনয় এককথায় অনবদ্য। এ ছাড়া প্রেমাংশু বসু, মৃণাল দত্ত, অজন্তা চৌধুরী, রত্না ঘোষাল, নরেশ ব্যানার্জী, মাঃ সুখেন, বেবী মুখার্জী ও উদয় রায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত মোটামুটি।

দিন যাপনের গ্লানি ও বৃষ্টি

'শিল্প ও শিল্পী'র পরিবেশনায় গত ১৪ই সেপ্টেম্বর থিয়েটার সেণ্টারে 'দিন যাপনের গ্লানি ও বৃষ্টি' অভিনীত হল। আজকের কলিকাতা মধ্যবিত্ত সমাজের একটা জীবন্তরূপ ঐ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

একটা মধ্যবিত্ত পরিবার। মিনু (নায়িকা) সেই পরিবারের একমাত্র চাকুরে। আশা-নিরাশা, অভাব-অনটন ব্যর্থতা অর্থাৎ কিনা মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্ত উপকরণ সেখানে বিদ্যমান। পরিচালক দক্ষতার সঙ্গে আপোষহীন অন্যায়কে তুলে ধরেছেন খোকনের (নায়িকার ভাই) চাকরীতে ইস্তফা দেখিয়ে আবার একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বৃষ্টি'কে আগামী দিনের বিশ্বাসের ইঙ্গিত হিসেবে প্রকাশ করে। আর এখানেই নাটকের সার্থকতা বলা চলে।

চন্দননগর থিয়েটার সেণ্টার কর্তৃক অভিনীত 'অসমাপ্ত' নাটকে বিশেষ মুহূর্তে পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অজন্তা চৌধুরী ও নাট্যকার-অভিনেতা দিলীপ দে

আলোকপাতের ত্রুটি ছিল এবং আবহসঙ্গীত থাকলে ভালো হতো, অন্তত নাটককে প্রাণবন্ত করার জন্যে। অভিনয়ের দিক থেকে 'নাট্যকারে'র ভূমিকায় শ্রীপিণ্টু ভট্টাচার্য ভালোই ফুটিয়েছেন। রমেশের (নায়ক) ভূমিকায় শ্রীনরেশ ভট্টাচার্য প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীবিপুল ঘোষ, শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য, শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র আশানুরূপ।

নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীবিপুল ঘোষ।

স্বরবিতানে শ্রীশ্রীচণ্ডীগীতস্তোত্রম্

সম্প্রতি (গত মহাষষ্ঠী উষারাগে) ৮৩, মনসাতলা লেনে (কলি-২৩) প্রখ্যাত সংগীতায়ন 'স্বরবিতান' বিশেষ সাফল্যসহকারে বাণীকুমার রচিত এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক সুর-সংযোজিত ভক্তিমূলক সঙ্গীতালেখ্য 'শ্রীশ্রীচণ্ডীগীত-স্তোত্রম্' পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীরবীন্দ্র বসু।

স্বরবিতানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ১৫ই আগস্ট সকাল ১০টায় খিদিরপুরে ৮৩, মনসাতলা লেনে অবস্থিত প্রখ্যাত সঙ্গীতালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'স্বরবিতান' এক নিষ্ঠাপূর্ণ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী' পালন করে সংস্থাধ্যক্ষ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী শ্রীরবীন্দ্র বসু সংস্কৃত স্তোত্র সঙ্গীত মাধ্যমে অনুষ্ঠান-উদ্বোধন করেন এবং এক আকর্ষণীয় ভক্তিমূলক সঙ্গীতাসর পরিচালনা করেন সর্বশেষে শ্রীবসু 'পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ' শীর্ষক মনোগ্রাহী ভাষণ দেন।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যকলা প্রদর্শনী

বাটানগর, গত ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সৌজন্যে উক্ত ক্লাব হলে নৃত্য-বিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের দ্বারা 'রাবণ বধ' (নৃত্যনাট্য), 'পুতুল বিয়ে' (নৃত্যনাট্য) উচ্চাঙ্গ নৃত্য ও পল্লীনৃত্য সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় নৃত্য-কলা মন্দিরের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী দীপ্তি চক্রবর্তী। সংস্থার কার্যকরী সভাপতি শ্রী বি ঘোষ মহাশয় ছেলেমেয়েদের নৃত্যকলার উপকারিতা সম্বন্ধে সময়োপযোগী ভাষণ দেন। নৃত্যে পাপড়ি বোস, মন্দিতা চক্রবর্তী, শুভ্রা ব্যানার্জী, পূর্ণিমা হালদার, কৃষ্ণা হালদার, মিতা পাল, শিপ্রা সেন, কৃষ্ণা সেনগুপ্তা, মধুমিতা সেন, মায়া ভট্টাচার্য, রুপু সেন, কঙ্কণ বোস, তন্দ্রা রায়, অদীতা ঘোষ, চন্দিমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তা, রিঙ্কু ভাদুড়ী, অরুণ দে, শর্মিলা গুহ, বিদুষী বসু, শোভা ধর, কণিকা রায়, ঝুমু ব্যানার্জী ঠাকুরতা প্রমুখ প্রশংসা অর্জন করেন। সহকারী নৃত্য-পরিচালকরূপে ছিলেন অনুপশঙ্কর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা। ব্যবস্থাপনায় শ্রীস্বপনকুমার দাস। পুতুল বিয়ে (নৃত্যনাট্য) প্রযোজনা ও পরি-চালনায় শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা, সঙ্গীত ও সূত্রধরের ভূমিকায় ছিলেন দীপালী চক্রবর্তী ও অণিমা রায়।

বিন্দের নন্দী

সম্প্রতি ছাত্র সমিতির সভ্যরা এ নাটক অভিনয় করলেন বিশ্বরূপা মঞ্চে। চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে বহুদিন ধরে পরিবেশিত এ নাট্য-কাহিনীর আকর্ষণ আজও আছে। এ বিন্দের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যটুকু সকল সময়ে দর্শকরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অভিনয়ে সেরা তিন শিল্পী ছিলেন—অসিত ঘোষ, কমল চট্টোপাধ্যায় ও কার্তিক নন্দী।

বিবর্ণ

ব্যবস্থার হাট বাণী স্মৃতি পাঠা-গারের সভ্যরা মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিবর্ণ' নাটক সম্প্রতি খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করলেন। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অংশ নিলেন কাশীনাথ ভৌমিক, সিতাংশু ধাড়া, সুনীল বেরা, দীপ্তি ধাড়া, মোহিত ভট্টাচার্য, নিখিল গিরি, মানস চক্রবর্তী, চিত্ত সামন্ত, মোহন চক্রবর্তী, পীযূষকান্তি পট্টনায়ক ও অমলেশ মাইতি। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন নন্দদুলাল মাঝি।

উল্কা ও চন্দ্রগুপ্ত

মেঘদূত সম্প্রদায়ের নাট্য শিল্পীরা সম্প্রতি অভিনয় করলেন 'উল্কা ও চন্দ্রগুপ্ত', এই অভিজাত নাট্যসংস্থাটি বহু বছর ধরে নাট্যচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। যার ফলস্বরূপ এঁরা লাভ করেছেন অসম্ভব জনপ্রিয়তা।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বাটানগরে অনুষ্ঠিত 'পুতুল বিয়ে' নৃত্যনাট্য

চিলড্রেন্স হ্যাপী হোমের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে নৃত্যশিল্পী নবনীতা যে নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেছে। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের পৌরোহিত্যে এই উৎসব গত ১৯৬৮ অব্দের দশকের প্রচুর প্রশংসা লাভ করে।

... দুটি ... এঁদের পূর্বখ্যাতি বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। দুটি নাটকের সেরা কয়েকজন শিল্পী হলেন মদন প্রামাণিক, শ্যামসুন্দর, বিশ্বরূপন, ভারতী সিংহ, নিমাই নন্দী, সুকুমার মাইতি ও রাণী চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত ও নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন দিলীপ রায় এবং শ্যামসুন্দর প্রামাণিক

ডাকঘর

নলহাটি পশ্চিমচত্বরের কান্দপুর বিদ্যালয়মঞ্চে সম্প্রতি একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান এবং 'ডাকঘর' নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেন এখানকার যব শিল্পিগোষ্ঠী। নাটকের নির্দেশকরূপে ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোজ ঘোষ। অনুষ্ঠানের শিল্পীরা হলেন মীনা দেবী, শশাঙ্ক পাল, ধর্মধ্বজ পাল, গোলাম মূর্তুজা, প্রভাস দাস, শ্রীমতী পারুল ও শ্রীমান জলন।

জীবন গোস্বামী

বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা রূপদক্ষ নট জীবন গোস্বামী গত শনিবার ২১শে সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আকস্মিক পরলোকগমন করেন। তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন আর জি কর হাসপাতালে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনীর সভ্যগণ হাসপাতালে উপস্থিত হন। সম্মেলনীর পক্ষ হইতে সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী শবাধারে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, এক কন্যা ও স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স তিপ্পান্ন বৎসর হইয়াছিল। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াচিত্রে তিনি বহুদিন অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ নাটকে রাখালের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় অবিস্মরণীয়। যাত্রাজগতেও তিনি সুপরিচিত এবং সুনাম অর্জন করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শ্মশানঘাটে উপস্থিত হন। শেষদিন পর্যন্ত তিনি সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনীর সভ্যগণ গত সোমবার ২৩শে সেপ্টেম্বর সম্মেলনীর কক্ষে রাত্রি ৮ ঘটিকায় তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
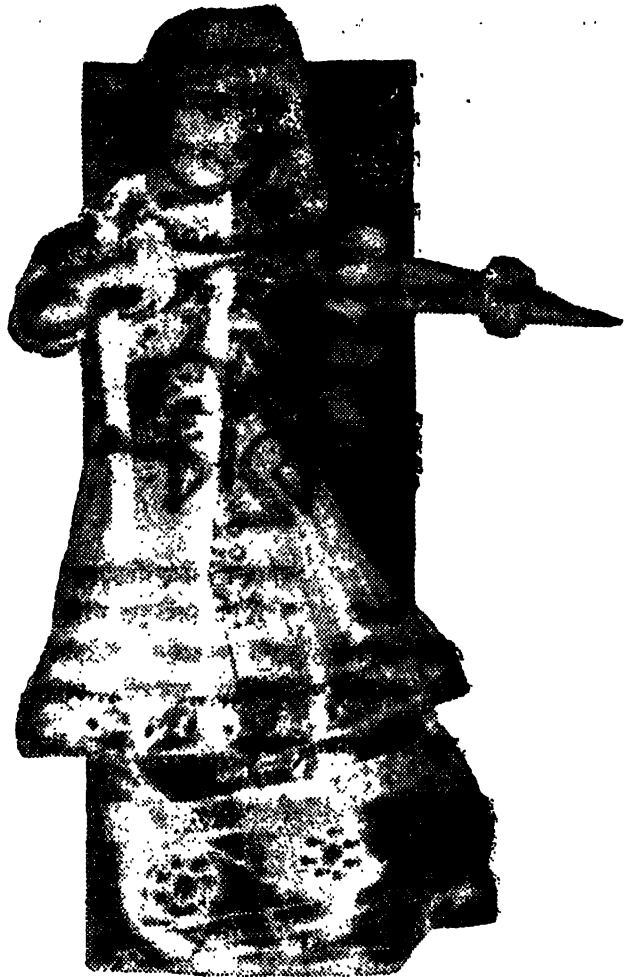
বিজয়া সম্মিলনী

গত ৪ঠা অক্টোবর বিজয়া সম্মিলন উপলক্ষে চিলড্রেন্স পার্কে সঙ্গীতের আয়োজন হয়। সেই উপলক্ষে 'সপ্তর্ষি' কর্তৃক কয়েকটি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। তাঁহারা উক্ত অনুষ্ঠানে

জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী

ত পরিবেশন করে অকুণ্ঠ প্রশংসা ন করেন। সঙ্গীতাংশে ছিলেন— রঞ্জিত দাস, নরেন্দ্র রায়, পশুপতি , প্রবীর রায় ও কার্তিক চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দিক শ্রীজয়দেব পালচৌধুরী।

দিল্লীর পথে শঙ্কর কলামন্দির

শঙ্কর কলা-মন্দিরের সভ্য ও সভ্যা- গত 'শারদীয়া পূজায় শ্রীঅরুণ- কান্তি সাহার 'বাড়ী ভাড়া' নাটক অভিনয়ের জন্য দিল্লীতে আমন্ত্রিত হইয়া গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রাত্রে দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। এই নাটকের বিভিন্ন পুরুষ চরিত্রে সর্বশ্রী পাঁচুগোপাল দাস, মহানন্দ সাহা, শিশিরকুমার দে, তপন ছুই, অর্ধেন্দু মণ্ডল, শেখর রক্ষিত, ভবেশ ঘোষ, প্রণব দাস, দেবাশীষ সাঁতরা, নবকুমার ব্যানার্জী রণেন পোদ্দার, শম্ভু ব্যানার্জী এবং স্ত্রী-চরিত্রে শ্রীমতী ছবি পাল, মিতালী ঘোষ, কবিতা চ্যাটার্জী, চায়না আচার্য অংশগ্রহণ করিবেন।

এই নাটকের পরিচালক শ্রীপ্রদ্যোৎ- কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে।

চেনা-অচেনা

প্রতিভাময়ী লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সামাজিক কাহিনী 'চেনা অচেনা'কে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন চিত্রপরিচালক হীরেন নাগ। আশাপূর্ণা দেবীকৃত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীনাগ। চিত্রটিতে সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। চিত্রটিতে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, বঙ্কিম ঘোষ, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায়, গণেশ নাগ, ছায়া দেবী, বিদ্যারাও প্রমুখ। চিত্রটির মুখ্য দুটি চরিত্রে রয়েছেন সুমিতা সান্যাল ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটি প্রযোজনা করছেন দুলালী চৌধুরী। পরিবেশনায় থাকছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস। চিত্ররঙ্গের চিত্র 'চেনা অচেনা'।

মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র 'চৌরঙ্গী' চিত্রে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক চিত্র : আশু সেনগুপ্ত

পান্না হীরে চুনী

সুখেন দাসের কাহিনী এক সুর-শিল্পীর জীবনের করুণ ও বেদনাময় কাহিনী পান্না হীরে চুনী। এই সঙ্গীত-বহুল চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন অমল দত্ত। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন দীনেশ দে। চিত্রটিতে সঙ্গীতের মায়াজাল বিস্তার করেছেন সঙ্গীত পরিচালক অজয় দাস। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে যাঁদের দেখা যাবে তাঁরা হলেন সুখেন দাস, রত্না ঘোষাল, অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মণি শ্রীমানী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন, দিলীপ প্রমুখ। চিত্রটি দীনেশ চিত্রমের পতাকা তলে নির্মিত হচ্ছে।

শুকসারী

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-বিজয়ী ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী শুকসারীকে রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করছেন প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার। ডঃ তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পীযূষ বসু। এই মনোরম কাহিনীকে যাঁরা গানে গানে মধুময় করে তুলেছেন তাঁরা হলেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, লীনা ঘটক, দেবী মুখোপাধ্যায় ও সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রটিতে নায়কের ভূমিকায় রয়েছেন সুদর্শন চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার এবং নায়িকার চরিত্রে রয়েছেন অঞ্জনা ভৌমিক। পার্শ্ব চরিত্রগুলিতে রয়েছেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, সুখেন দাস, সাধনা রায়-চৌধুরী, প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স। বি কে প্রোডাকসন্সের চিত্র 'শুকসারী'।

শেষ থেকে সুরু

মরমী চিত্রশিল্পী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী 'শেষ থেকে সুরু'কে চলচ্চিত্রায়িত করছেন চিত্রসাথী গোষ্ঠী। চিত্রটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরকুমার, মান্না দে, সবিতাব্রত দত্ত। চিত্রটিতে সুরসৃষ্টি করেছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক অনিল বাগচী ও খ্যাতনামা সুরকার নচিকেতা ঘোষ। চিত্রটিতে অংশগ্রহণ করেছেন—সবিতাব্রত দত্ত, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, বিদ্যা রাও, স্বপনকুমার, সমরকুমার, লতিকা দাশগুপ্ত, রবীন দাস ও কাহিনীকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সাধনা চিত্রপীঠের চিত্র 'শেষ থেকে সুরু।'

বৌদি

বৌদি চিত্রটির রচয়িতা হলেন দিলীপ বসু। গীতরচনা সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রণব রায়। চিত্রটি পরিচালনার বিরাট দায়িত্ব বহন করছেন কাহিনীকার স্বয়ং। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অনুপকুমার, পদ্মাদেবী, সুখেন দাস, রাজলক্ষ্মী দেবী, [illegible], [illegible] চক্রবর্তী, বনানী চৌধুরী, কমল মিত্র, জহর রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নলিনা দেবী, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায় প্রমুখ। বৌদির চরিত্রটিতে রয়েছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী। চিত্রটিতে সুরসংযোজনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

তিন ভুবনের পারে

সমরেশ বসুর প্রেমের কাহিনী 'তিন ভুবনের পারে।' শ্রীবসু কৃত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রগুলিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীমতী অপর্ণা দেবী, তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অলোক মিত্র, সুকুমার ঘোষ, সুমিতা সান্যাল প্রমুখ। প্রধান দুটি চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বোম্বাইয়ের সুদর্শনা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী তনুজা। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটির পরিবেশনায় আছেন রুমা ফিল্মস।

চিরদিনের

সুগীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার চিরদিনের কাহিনীকার। চিত্রটি পরিচালনা করছেন স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক গোষ্ঠী অগ্রদূত। চিত্রটির নায়কের ভূমিকায় রয়েছেন উত্তমকুমার। নায়িকার চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবী। তাঁদের সহযোগিতা করছেন কমল মিত্র, গীতা দে, সুমিতা সান্যাল এবং আরো অনেকে। চিত্র-সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ।

'তিন ভুবনের পারে' চিত্রে নায়িকা তনুজা ও নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সাগর পারের মায়ালোক

সাগর পার থেকে সদ্য ঘুরে-আসা এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। একটা বিশেষ ব্যাপারে কিছু অর্থ সংগ্রহ কিভাবে করা যায় সেটাই ছিলো তাঁর জিজ্ঞাস্য। যেহেতু সর্বসাধারণের জন্যেই জিনিষটা গ'ড়ে তোলার পরিকল্পনা, সে কারণে একটা চ্যারিটি পারফরমেন্স করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে।

তাঁকে বাধা দিয়ে বলি: কিন্তু নামী এবং দামী শিল্পীদের যদি এ কাণ্ডের কাণ্ডারী করতে চাও, দক্ষিণা দিতে হবে তেমনি ধারা।

বন্ধুবরের চোখ কপালে উঠলো: বলো কী! দেশের এবং দশের উপকারের জন্যে আমরা করতে চলেছি কাজ, এতে কেউ সহায়তা করবে না, নাকি? সেলফ হেলপ ইজ দি বেস্ট হেলপ---বলতে বাধ্য হই।

কিন্তু ওদেশে তো এমনটা হয় না। হলিউডের কথাই ধরো---সেখানে খ্যাত-নামা খ্যাতনাম্নীরা---

বলি: হয়তো তদ্বির-তদারকি করলে কিছুটা কনসেশন পাওয়া যেতে পারে, তবে সেজন্যে যে খাটাখাটুনি প্রয়োজন হবে এবং হয়তো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'তে পারে যাতে ক'রে---

বন্ধুটি খুবই মুষড়ে পড়লেন দেখলুম। হয়তো ওঁকে আমার সত্যকথাটা অতো সহজে বলে ফেলা ঠিক হয়নি। কিংবা---যাক সে কথা।

এই ব্যাপারে কিন্তু সাগর পারের নজির অনেক রয়েছে। সত্যিই শিল্পীরা সাহায্যের ব্যগ্র হস্ত সর্বদাই প্রসারিত ক'রে রেখেছেন সেখানে। এই তো কিছুদিন আগে একটা খবরে দেখলুম হলিউডের প্রখ্যাত শিল্পী এলভিস প্রেসলের বদান্যতার বিষয় ফলাও ক'রে লেখা। কি---না উনি ওখানকার সবাইকে টেক্কা মেরেছেন

রমেন চৌধুরী

এই চ্যারিটির ব্যাপারে। যাঁরা শরণ নেন তাঁদেরই শুধু পাশে দাঁড়ান এমন নয়, না ডাকলেও ---গুরুত্ব বুঝলে--- অযাচিত ভাবে ছুটে যান হেথা-সেথায়।

এমধি ধারা একটা সাহায্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো কিছুদিন আগে। সেন্ট জুডস হাসপাতালের সহায়তায় অর্থ সংগ্রহের জন্যে সবাই তৎপর। উদ্যোক্তারা কিন্তু বড়োদের ধারে কাছে ঘেঁষেন নি। তাঁরা নবীন শিল্পীদের দিয়েই কাজ সারতে চান, অন্যদের কাছে বোধ হয় হাজির হননি অহেতুক দ্বিধার জন্যেই। বলা তো যায় না, যদি আশানুরূপ সাড়া না মেলে।

অনুষ্ঠানের ঘোষণাটি পত্রিকা মারফৎ এলভিসের নজরে পড়ে গেল। তাঁর অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটি একনজরেই দেখে নিলো অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যটা। দেখলো---হাসপাতালের শিশু বিভাগের জন্যেই এই আয়োজন। কিন্তু তাঁর ডাক পড়েনি কেন? আশ্চর্যও হলেন। নিজের একান্ত সচিবের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে এটুকু জানলেন যে তাঁর কাছে কেউ-ই আসে নি।

চ্যারিটি শোয়ের দিন। শ্রোতারা তো স্বপ্নেও ভাবেনি এলভিসের মতো শিল্পীকে স্টেজে দেখতে পাবে। তাই বার বার চোখ মুছে তারা হয়রান হয়েছে---অবিশ্যি এটা আমার অনুমান কিন্তু ব্যাপার। কি সেই ধরণের নয়? উদ্যোক্তারাও নিশ্চয় আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন এলভিস প্রেসলেকে সশরীরে হাজির হ'তে এবং অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখে।

কিন্তু এটা কি শুধু বাহবা পাবার জন্যে? মোটেই তা নয়। এটা জানি খবরের কাগজে এ ধরণের কাণ্ডকে কতোই না ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে চমকপ্রদ করে তুলবে পরের দিনই। পয়সার চেয়ে তার দাম অনেক---অনেক গুণ বেশি। কিন্তু তবু বলবো---সেটা মোটেই সত্যি নয়। এটা হোলো হৃদয়ের ব্যাপার। শিশুদের জন্যে প্রেসলের অন্তরের একেবারে অন্তস্তলে একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। সেটা নিজের শৈশবকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বলা চলে। তার কারণ অনেক বড়ো লোকের মতো তাঁরও ছোটোবেলার স্মৃতি বড়োই করুণ। গরীবের সন্তান---অনেক কিছুই তাই তিনি পান নি সে সময়। খাওয়া দাওয়া, সাজ পোষাক সবই তাঁকে সে জীবনে বঞ্চনা করেছে, তাই তো তিনি দরিদ্র শিশুদের দেখলেই আত্মহারা হয়ে পড়েন। তাদের দুঃখ লাঘব না করতে পারলে সুস্থির হ'তে পারেন না। এবং এই কারণেই একবার সবান্ধবে কান্ট্রি সাইডে এক্সকারসানে যাবার পথে এলভিস এক বিরাট শিশু বাহিনীদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। বাচ্চারা সবাই গরীব এটা বলাই বাহুল্য। তারা শহুরে বাবুদের (?) হাতের কাছে পেয়ে কিছু সওদা গছিয়ে দিতে চায়। জিনিষটা খুব বড়ো কিছু নয়, ক্রিসমাস কার্ড। বড়োদিন আসন্ন, তাই তারা কার্ড বেচতে বেরিয়েছে। এলভিস করলেন কি, ছেলেদের কাছে সব কিছু খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে একাই ওদের সব কার্ড কিনে নিলেন। শুধু তাই নয়, আলাদা অর্থও দিলেন তাদের স্কুলের মাহিনা বাবদ। ছেলেরা কতো-জন ছিলো ওই দলে? তা প্রায় শ'-খানেক। এ ধরণের ব্যাপার সাগরপারেই সাধারণত ঘটে। এ দেশেও হয়তো হয়; সেটা দৈবাৎ। আর সেই জন্যেই তো বলে; ব্যতিক্রম ধর্তব্যের মধ্যে নয়।---

তৈলঙ্গ স্বামী

এ্যাদেন

'ওরে বুঝলি, এঁতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণ সকল বর্তমান। ইনি যে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।'

কার উক্তি?

কোন মহাপুরুষ উচ্চারণ করলেন মহামানব বন্দনার এই অনবদ্য মন্ত্র?

এ কোন যুগত্রাতা দিব্যপুরুষ পরম ভট্টারক যাঁর পবিত্র ওষ্ঠ থেকে নির্গত হল এই পরম শ্রদ্ধার নিটোল অঞ্জলি?

---ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

কার সম্বন্ধে? এ কোন মহামানব যাঁর উদ্দেশে স্বয়ং নররূপী নারায়ণ এই শ্রদ্ধার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। কে তিনি স্বয়ং রামকৃষ্ণ যাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন পরমহংসের যথার্থ চিহ্ন---কে সেই পরমপূজ্য পুরুষ রামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে যাঁর কোন পার্থক্য নেই।

--তৈলঙ্গ স্বামী।

ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবনে পরমায়ুর মেলায় যিনি আমাদের জানার গণ্ডীর মধ্যে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন, পরমায়ুর ইতিহাসে যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এক কথায় অবিসম্বাদিত---সেই মহামানব তৈলঙ্গের উদ্দেশে রামকৃষ্ণের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। শিবের উদ্দেশে বিষ্ণু।

অনুরাগীদের দ্বারা যিনি 'মহামতি' বিশেষণে সম্মানিত, অনেকের দৃষ্টিতে যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের তুল্য (?)---সেই আকবর বাদশার রাজ্যকাল যখন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে---সে সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে পৃথিবীতে তৈলঙ্গের আবির্ভাব দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ভিজিয়ানাগ্রাম (বিজয়নগরম?) অঞ্চলে হোলিয়া নামে এক জনপদ। এখানে বাস করলেন পরম সজ্জন, ন্যায়নিষ্ঠ ও দরদী ভূম্যধিকারী নরসিংহ রাও। তাঁর স্ত্রী বিদ্যাবতী, তাঁদের পুত্র শিবরাম। জীবনের প্রথম পর্ব থেকে অলৌকিক ঘটনার বিকাশ। প্রথম অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন জননী বিদ্যাবতী। শিবপূজা শেষ করলেন। তারপরই চোখে পড়ল সেই অলৌকিক স্বর্গীয় দৃশ্য। স্বপ্ন নয়, আচ্ছন্নতা নয়, ভ্রান্তি নয়---স্পষ্ট দেখলেন---শিবলিঙ্গ থেকে নির্গত হল এক দিব্যজ্যোতি---অদূরে শায়িত শিশু শিবরামের দেহে। বিদ্যাবতী স্তম্ভিত, ভাষাহারা, চিনেছিলেন নরসিংহ। এ সংবাদে নরসিংহ এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিলমাত্র আশ্চর্য হলেন না। স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন। ঘটনার পারম্পর্য বুঝিয়ে বললেন। এর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থ প্রাঞ্জল করে দিলেন স্ত্রীর কাছে।

সেদিন পুত্র সম্বন্ধে নরসিংহ যে বিদ্যাবতীকে আলোকিত করলেন---সেই বিদ্যাবতীই একদিন নরসিংহকে আলোকিত করলেন পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। যে ভবিষ্যৎকে একদিন তিনি জানতে পেরেছিলেন নরসিংহেরই মাধ্যমে। পুত্রের বিবাহব্যস্ত পিতার উদ্দেশে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা জননী বললেন, 'ওকে ওর পথে এগোতে দাও, কেন ওকে বাঁধনে জড়াচ্ছ। যে ঈশ্বর-সন্ধানে ও ব্যাকুল সেই ঈশ্বরের কৃপালাভ, ওকে নিজেকে সেই সঙ্গে সারা বংশকে ধন্য হতে আর ধন্য করতে দাও।'

পথ প্রশস্ত করে দিলেন মা নিজে। যা কিছু বাধা, যত কিছু বিঘ্ন সমূলে উৎপাটিত হল মায়ের কল্যাণে।

চল্লিশ বছরে বাবাকে হারালেন শিবরাম। তারপর আরও বার বছর বর্তমান ছিলেন বিদ্যাবতী। মাতৃবিয়োগের

তৈলঙ্গ স্বামী।
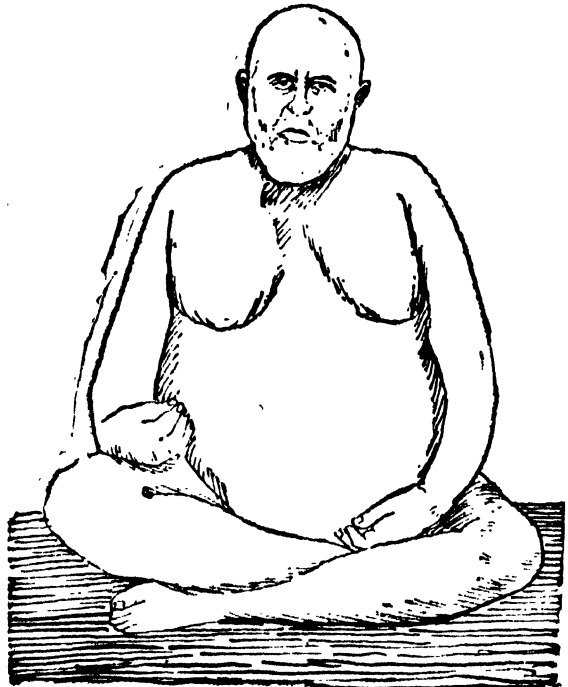
পর আর ঘরে ফিরলেন না তৈলঙ্গ। শ্মশানের প্রান্তে কুটির বেঁধে থাকতে লাগলেন। শ্মশানচারী ভোলা দিগম্বরের অংশে যাঁর জন্ম শ্মশানকেই তিনি বাসভূমি হিসাবে নির্দিষ্ট করলেন। তারপর একদিন সেই শ্মশান ও নদীর সমীপবর্তী কুটিরে এসে আবির্ভূত হলেন স্বামী ভগীরথানন্দ। মহাশক্তিমান যোগী। পাঞ্জাবে আদি নিবাস। ঈশ্বর প্রেরিত চিহ্নিত যোগগুরু।

এই ভগীরথ স্বামীর সঙ্গেই একদিন চিরকালের জন্যে জন্মভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে শিবরাম বেরিয়ে পড়লেন। বৃহত্তর ভারতকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। ঘুরলেন কত নগর, জনপদ, গ্রাম। ক্ষুদ্রতার সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করে বিশালতার বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন নিজেকে।

এলেন পুষ্করে। ভগীরথ স্বামী বুঝলেন লগ্ন সমুপস্থিত, জগৎ থেকে জগতাতীতে শিষ্যের যাত্রারম্ভ করানোর। দীক্ষা দিলেন এইবার। শিবরামের বয়স তখন আটাত্তর। নাম হল গণপতি সরস্বতী। কিন্তু এ নাম স্থায়ী হল না। সারা ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁকে আজও হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি উজাড় করে প্রণাম জানায় একটি অন্য নামে। কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তাঁর যে নিত্য-কালের বন্দনার আরতি তা গণপতি সরস্বতী হিসাবে নয়---তৈলঙ্গস্বামী হিসাবে। কাশীর জনগণ তাঁকে ঐ নামে চিহ্নিত করল। তেলঙ্গ দেশ থেকে তিনি আগত বলে ঐ তাঁর নাম।

পুষ্করেই দেহ রাখলেন ভগীরথ স্বামী। আরও দশ বছর কাটল কঠোর সাধনায়, দুশ্চর তপস্যায়। তারপর আবার ভারত পর্যটন স্রুরু হল।

স্বামী-স্ত্রী তখন রামেশ্বরে। এক মেলায় আনন্দমেলার পরিবর্তে তখন কান্নার রোল শোনা গেল। একটি মৃত্যু এসে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে মেলার সমস্ত আনন্দ। কমণ্ডলু থেকে জল নিক্ষেপ করলেন সন্ন্যাসী। মৃতব্যক্তি লাভ করল পুনর্জীবন।

এ ঘটনা এই একবার নয়। নেপাল, তিব্বত, মানসসরোবর ঘুরে প্রত্যাবর্তনের পথে এক সন্তানহারা জননীর তীব্র হাহাকার সন্ন্যাসীর কানে গিয়ে বাজল। কান থেকে বাজল হৃদয়ে। মিলিয়ে গেল জননীর অশ্রু। আবার হাসি ফুটল শীর্ণ ওষ্ঠাধরে। অন্ধের যষ্টি তার একমাত্র সন্তান আবার জীবিত হয়ে বসেছে তার চিতাশয্যায়।

এই জাতীয় অলৌকিক ঘটনার আরও একবার পুনরাবৃত্তি ঘটল বারাণসীর অসি ঘাটের সামনে। সে এক সদ্যোবিধবার হাহাকার।

বিষধর ভুজঙ্গের ভয়ঙ্কর নিদারুণ এবং নির্মম নিষ্ঠুর দংশন পতি-সোহাগিনীর সীমন্ত থেকে সিঁদুরের বলিষ্ঠ রেখাটি একেবারে একটা দমকা হাওয়ার বেগে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কমণ্ডলুতে ছিল গঙ্গামাটি। তারই খানিকটা লেপন করে দিলেন মৃতের ক্ষতস্থানে। সীমন্তিনীর সিঁদুর মুছেও মুছল না।

নশ্বর জীবনের ঠিক মধ্যভাগে এলেন পুণ্যভূমি বারাণসীতে। সর্ব-ধর্মের মিলনকেন্দ্র, বেদ উপনিষদ অনু-শীলনের লীলাভূমি, সকল সাধকের পদরজে পবিত্র পুরী। ভারতের শাশ্বত সনাতন প্রাচীনতম অঙ্গ। ভারতের কোন প্রদেশ নয়, সারা ভারতের আত্মা। দিগম্বর অবস্থায় পথ চলেছেন সন্ন্যাসী। দীর্ঘ সাধনা তাঁকে পরিপূর্ণ সিদ্ধিতে ভরিয়ে তুলেছে। যোগসাধনার উন্নত শীর্ষে তিনি বহুদিন উপনীত। স্বেচ্ছা-বিহারী সন্ন্যাসীর কাছে বস্ত্র কোন সমস্যাই নয়, দেহটাই তাঁর বস্ত্র আবার বিশ্বভুবনের মধ্যে যিনিই আবৃত---সমগ্র পৃথিবীই তো তাঁর বস্ত্র। সাধারণ মানুষের বেলায় যে কথা খাটে, তাঁর বেলায় তা খাটবে কেন? কিন্তু এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝলেন না পথচারিণী এক মহারাষ্ট্রীয় মহিলা। সামনে বস্ত্রহীন সন্ন্যাসীকে যথেচ্ছ অপমান করলেন। রাত্রে স্বপ্নে জানিতে পারলেন কাকে কি বলেছেন? তারপর নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ ও কৃপালাভ।

স্নানে নেমেছেন সস্ত্রীক এক করদ রাজা। কানাত দিয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ করা হয়েছে যাতে স্নানরত রাজদম্পতি লোক-লোচনের অন্তরালে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য হঠাৎ দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে এই মহাযোগী। তারপর যথেচ্ছ অপমান ও নির্যাতন। অবশেষে পূর্বোক্তা মহিলার ন্যায় রাজদম্পতিরও চৈতন্যোদয় এবং মহারাষ্ট্রীয় মহিলার পদাঙ্ক অনুসরণ।

উজ্জয়িনীর রাজাকেও একবার তাঁর দম্ভের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তৈলঙ্গস্বামী। বারাণসীতে আগত উজ্জয়িনীরাজের নৌকোয় পদধূলি পড়েছে স্বামীজীর। রাজার কটিদেশে একটি তলোয়ার শোভা পাচ্ছিল। মণি-মাণিক্যখচিত এবং যথেষ্ট ন্যাবান। স্বামীজী তলোয়ারখানি চেয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে হঠাৎ সেটিকে ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে। রাজা তো অগ্নিশর্মা। যে যোগীকে পরম শ্রদ্ধাভরে সসম্মানে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়েছিলেন তরবারীর শোকে তাঁকে যথেচ্ছ অপমান করতে তাঁর তখন এতটুকু দ্বিধা নেই। যা মুখে আসছে তাই বলে চলেছেন নির্দ্বিধায়। খেয়াল নেই, কাকে কি বলছেন। অনেকক্ষণ পর গঙ্গা থেকে তরবারি তুলে নিলেন স্বামীজী। তবে, একটি নয়, দুটি একে-বারে অবিকল এক, কোন পার্থক্য নেই, চেনা দুষ্কর কোনটি আসল, কোনটি নকল। শুধু বললেন---তোমার যেটা সেটা বেছে নাও।

রাজা বাক্যহীন, হতভম্ব একি অলৌকিক কাণ্ড।

স্বামীজী শুধু বললেন---যা চেনবার ক্ষমতা নেই, বোঝবার ক্ষমতা নেই, তা 'আমার-আমার' বলে চীৎকার কর কেন। জিনিসের মোহ তোমার---বলে আসলটি রাজার দিকে ছুঁড়ে ফেলে নকলটি নিয়ে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন স্বামীজী।

বহু বিদেশীরও চোখ ফুটিয়েছেন স্বামীজী। পুণ্য ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মহিমা তাদের অবিশ্বাসী মনে উপলব্ধি করিয়েছেন মর্মে মর্মে। অবিশ্বাসকে করে তুলেছেন পরিপূর্ণ

খেলাধূলা

শ্রীক্রীড়ারসিক

মেক্সিকোর অলিম্পিক প্রসঙ্গে

গত ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিক গেমসের চার বছর পরে পুনরায় অলিম্পিকের আসর বসেছে মেক্সিকো সহরে। সমুদ্রতট থেকে ৭৫০০ ফিট উচ্চে পাহাড়ের উপর ১৯তম অলিম্পিক গেমসের এই আসর বসেছে গত ১২ই অক্টোবর থেকে। চারিদিক বরফে আচ্ছাদিত হলেও যোগদানকারী এ্যাথলেটের যাতে কোন অসুবিধা না হয় মেক্সিকো সরকার তার জন্য সোজাসুজি প্লেনের ব্যবস্থা রেখেছেন। অনেকের ধারণা সমতলবাসী এ্যাথলেটদের ক্রীড়াচাতুর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এই উচ্চতাই না কি একটি প্রতিবন্ধক। কিন্তু তাই বলে কোন দেশ পিছিয়ে নেই। গত টোকিও অলিম্পিক গেমসে যেখানে ৯৪টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল এবারে সেখানে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ১১২টি দেশ থেকে আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে অলিম্পিক কমিটির সামনে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। অলিম্পিকের কর্তৃত্ব নিয়েই এই মতবিরোধ। অলিম্পিকের জাতীয় কমিটি এবং আন্তর্জাতিক ফেডারেশন দুটি সংস্থাই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে অধিক ক্ষমতা দাবী করেছে এবং এই ক্ষমতা না দেওয়া হলে তারা চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনেরও হুমকি দিয়েছে। অবশ্য আমরা আশা রাখি এ বিরোধের শীঘ্রই একটা অবসান হবে। এদিকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাকে পিছনের দরজা দিয়ে মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে কি ফ্যাসাদেই না পড়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এই যোগদানের প্রতিবাদে আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলি একজোটে অলিম্পিক থেকে বেরিয়ে আসার প্রচণ্ড হুমকি দিয়েছিল। তাদের পিছনে ছোটবড় আরো রাষ্ট্রও ছিল। মেক্সিকো সরকারও দঃ আফ্রিকার যোগদান অনুমোদন করেন নি। যাই হোক আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি দঃ আফ্রিকার যোগদান সম্পর্কে তাদের নিমন্ত্রণপত্র প্রত্যাহার করাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে।

এদিকে আমাদের দেশে দল গঠনের ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি নিয়ে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সঙ্গে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের মতবিরোধ বেধে গেছে। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা

আস্তিক। কাশীতে সে সময় বহু ইংরেজ শাসকের কর্মভার নিয়ে আসতেন। তাঁরা অনেকেই প্রথম প্রথম শাস্তি দিতে উদ্যত হতেন তৈলঙ্গকে। তারপর? তারপর অলৌকিক লীলাদর্শনে স্বামীজীর কাছে নিজেদের সমস্ত অহং, ঔদ্ধত্য বিসর্জন দিয়েছেন। সগৌরবে ঘোষণা করেছেন—স্বামীজীকে কেউ যেন কোনদিন কোন কারণে উত্ত্যক্ত না করে। তিনি যথেচ্ছ বিহার করবেন। পরিচ্ছদ সম্পর্কে কোনপ্রকার আইন তাঁর উপর প্রযোজ্য নয়।

এক সাধকও তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন নিজেকে তাঁর সমকক্ষ মনে করার ফলে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং সাধকও এই 'অহং'-এর হাত থেকে মুক্তি পান নি। সেই সাধক হলেন মহাত্মা খাকীবাবা।

নর্মদার তীরে দুগ্ধপানের বাসনা জাগ্রত হল তৈলঙ্গস্বামীর মনে। কাছে-পিঠে দুধের সন্ধান কোথাও নেই। নর্মদার জল অঞ্জলি ভরে তুলে নিলেন। দু'হাতে পান করলেন সেই জল। জল তখন দুধ হয়ে গেছে। তুলছেন জল কিন্তু হাতে উঠছে দুধ। দেখলেন খাকীবাবা বাঃ, উনি যদি জলকে দুধ করতে পারেন আমিও বা পারব না কেন, কিন্তু জানতে পারলেন না যে এই সিদ্ধান্তে অলক্ষ্যপুরুষ শুধু একটু হাসলেন।

কিন্তু এ কি? তৈলঙ্গের হাতে উঠছে দুধ, আর খাকীবাবার হাতে জল। খাকীবাবা বুঝলেন তৈলঙ্গের সমপর্যায়ে উঠতে এখনও তাঁর অনেক সাধনার প্রয়োজন।

ভারতীয় সাধনমার্গের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ তৈলঙ্গের কাছেই দীক্ষালাভ করেন।

বারাণসীর আর এক পূজ্য সন্তান যোগিশ্রেষ্ঠ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সঙ্গে তৈলঙ্গের হৃদ্যতাও ছিল যথেষ্ট। শ্যামাচরণ যখনই এসেছেন তাঁর আশ্রমে তখনই পরম সমাদরে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন প্রচ্ছন্ন সাধক যোগিরাজ শ্যামাচরণকে।

স্বামীজীর যে দুজন প্রধান সেবাকারী ও অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর ছিলেন তাঁরা দুজনেই বাঙালী।

১৮৮৭ সাল। ঠিক আগের বছর ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হয়েছেন। আকবরের শাসনের শেষার্ধে যে দেহ সৃষ্ট হয়েছিল, সেই দেহ অপ্রকট হল ইংরেজ শাসনের সূর্য যখন মধ্যগগনে।

বারাণসীতে দেড়শ বছর যাবৎ যে মহামানবকে নরদেহে প্রত্যক্ষ করা গেছে—সেই দেহ সেদিন থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেল।

দাবী করেছেন তাঁরাই বিভিন্ন দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের একমাত্র অধিকারী, যদি তাই হয় তবে অলিম্পিক দল পাঠাতে যে ৬ লক্ষ টাকা খরচ হবে তার ভার তাঁরাই বহন করবেন নতুবা নয়। যাবতীয় অলিম্পিক সংস্থাও স্থির করেছেন টাকার ব্যাপারে তাঁরা আর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক বা নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের দরজায় ধর্ণা দেবেন না---ব্যয়ের সমস্ত টাকা নিজেরাই সংগ্রহ করবেন। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন যেখানেই সেখানে তাঁরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক, নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ এবং জনসাধারণের সঙ্গে একমত হবেন না কেন?

ভারতের ১০ জন প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই মেক্সিকো গিয়েছেন। তাঁরা নিউ ইয়র্ক হয়ে মেক্সিকো যাবেন---এই দলে আছেন,---

কুস্তীগীর---বিশ্বম্ভর সিং (রেল), উদয়চাঁদ (সারভিস), মুক্তিয়ার সিং (সারভিস), সুদেশকুমার (দিল্লী)।

এ্যাথলেটিকস---পরভীন কুমার (পুলিশ), ভীম সিং (সারভিস) ও জি লক্ষণ (মাদ্রাজ)।

ভারোত্তোলনকারী---এস এন ঘোষ (সারভিস), জি ডি তেজার (শিক্ষক ও ম্যানেজার)।

ভারতীয় হকিদল নিম্নোক্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত হয়েছে---

গোলরক্ষক---আর ক্রিস্টি (মহীশূর) এবং মুনীর শেঠ (মাদ্রাজ)।

ব্যাক---পৃথ্বিপাল সিং (পাঞ্জাব), গুরুবক্স সিং (বাঙ্গালা) এবং ধরম সিং (পাঞ্জাব)।

হাফ ব্যাক---বলবীর সিং (সাভিসেস), অজিৎ সিং (পাঞ্জাব), হারমিক সিং (পাঞ্জাব) এবং কৃষ্ণমূর্তি (রেল)।

ফরোয়ার্ড---বলবীর সিং (রেল), ভি জে পিটার (সাভিসেস), হরবিন্দর সিং (রেল), ইন্দর সিং (রেল), তারসেম সিং (পাঞ্জাব), ইনাম উর রহমান (বাংলা), বলবীর সিং (পাঞ্জাব) এবং গুরবক্স সিং (রেল)।

সম্বর্ধনা, না অত্যাচার?

মেক্সিকো বিমান বন্দরে অনুরাগীদের অতিরিক্ত সম্বর্ধনার অত্যাচারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়ার মহিলা জিমন্যাস্ট মিস ভেরা ক্যাসালাভাকা এত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি আর হোটেল ছেড়ে বেরুতে চাননি। মিস ভেরা টোকিও অলিম্পিকে তিনটি সোনার মেডেল পেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহিলা জিমন্যাস্ট বলে গণ্য হন।

ডেভিস কাপ আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যাল

আমেরিকার ডেভিস কাপ দলের অধিনায়ক ডোনাল্ড বেল বলেছেন যে, ডেভিস কাপ আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যাল আমেরিকা বনাম পশ্চিম ও ভারতের বিজয়ী দলের খেলা ৯, ১০ ও ১১ই নভেম্বর পোর্টরিকোর হিলটন হোটেল হার্ডকোর্ট মাঠে হবে। এই দলে যারা বিজয়ী হবে তারাই ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর এডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবে।

মেক্সিকো অলিম্পিকের পোলভল্টে ১৭ ফুট ৭½ ইঞ্চি অতিক্রমকারী আমেরিকার প্রতিনিধি বব উইলসন

ইন্দ্রসেন

> "হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম।
> হেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
> কেহ তাপ, কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
> এরূপে, কে কবে মোরে? সুধিব কাহারে?"
>
> —মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যশোরের রাজপুরীতে আনন্দ-কলতান আর শোনা যায় না।

হাসি-ঝলমল, খুশি-উচ্ছল অন্তঃপুর এখন সদাক্ষণ থমথম করছে। কারও মুখে কথা নেই, হাসি নেই। মৌনব্রত পালনের পালা চলেছে যেন। যত মুখর কণ্ঠ, কী এক শোকাবেগের অস্বস্তিতে যেন মূক হয়ে আছে। যদিও নিয়মানুযায়ী সকল কার্য-প্রথাই পালিত হয়, কিন্তু কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। পোষা পশু আর পাখীগুলিও নীরবতা অবলম্বন করেছে। তারা যেন ডাকতে ভুলে গেছে। খুঁটি ছেড়ে কেউ আর নড়ে না। খাঁচার পাখী আর যখন তখন বুলি কপচায় না। গাছের ফুল গাছেই থাকে। কেউ আর সাদর-যত্নে আহরণ করে না। ঝরা-পাপড়িতে গাছের মূলদেশ ঢেকে যায়।

রাজ-অন্তঃপুরে বড় একটা আর প্রতাপের দেখা মেলে না। তিনি আপন মহলেই থাকেন। রাজ্য-পরিচালনার নির্দিষ্ট কাজ ব্যতীত অপর কিছুতে মনোনিবেশ করেন না। মন্ত্রিমণ্ডলী ও পার্ষদদের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলেন না। মহারাজার গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখাবয়ব দেখে কেউ যেন তাঁর সমুখে বাকাস্ফূর্তি করতে পারেন না। যা কিছু বলার থাকে তা আর বলা হয় না। সাহসে যেন কুলায় না। সঙ্কোচের বিহ্বলতায় বক্তার কথা জড়িয়ে আসে।

শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। নিদারুণ অস্বস্তির প্রাণঘাতী জ্বালায় প্রতাপের মন অস্থির অশান্ত হয়ে আছে। এ দুর্বিষহ জ্বালা অপেক্ষা সর্প-দংশন কী অধিক ক্লেশকর?

কী জানি কেন, মহারাজার মনে ধ্রুব-বিশ্বাস জন্মায়, রাজা বসন্ত রায়ই সকল অনর্থের মূল। নাটের গুরু।

রাজপুত্র উদয়াদিত্য পিতার এই ভ্রমাত্মক ধারণা সংশোধন করতে সচেষ্ট হলেও বার বার ব্যর্থকাম হন। বৃদ্ধের সম্পর্কে রাজকুমার যতই বিশেষণ ব্যবহার করেন, প্রতাপ যেন, ততই রুষ্ট হন। এবং পুত্রকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন।

উদয়াদিত্য বলেন,—আপনার পিতৃব্য দিবারাত্র ধর্মকর্মে রত থাকেন। আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলবেন, তাঁর অবকাশ কোথায়? মহাশয়, আপনি বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ, আপনাকে অধিক বলার প্রয়োজন নেই।

পুত্রের কথায় বিচলিত হয়ে ওঠেন মহারাজা। ম্লান হাসি ফোটে মুখে। প্রতাপ বিজ্ঞ স্বরে বলেন,—আমার খুল্লতাতই যত নষ্টের মূল! অনিবার্য জ্ঞাতিহিংসার হাত, তিনিও এড়াতে পারলেন না। এ জন্যই তিনি আমার উন্নতিতে এত কাতর। বসন্ত রায়ের পুত্রগণও যে তাঁর অপেক্ষা অধিক হিংস্র ও খল হবে, তা আর বিচিত্র কি? কী আশ্চর্য! সেই নখদন্তহীন জরাজীর্ণ অশীতিপর বৃদ্ধ, বাইরে সদাই ঈশ্বরের নাম করেন, ধর্মের এমন মধুমাখা কথা বলেন। অথচ অন্তরে কী ভীষণ হলাহল পোষণ করেন! হয়তো মনুষ্যপ্রকৃতি চিরদিন এমনই দুর্জ্ঞেয় ও গভীর রহস্যময়! শেষে কী না, যাকে অবলম্বন ক'রে আমি এই ধর্ম-রাজ্যের একটা দিক রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছি—খুল্লতাত আমার সেই অতি স্নেহের জামাতাকে পর্যন্ত পর ও শত্রু ক'রে দিলেন!

কথার শেষে একটি দীর্ঘতর শ্বাস ফেলেন মহারাজা। কেমন যেন ক্ষিপ্ত সিংহের মত দেখায় তাঁকে। বিস্ফারিত চক্ষুর স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন উদয়াদিত্যের মুখের পরে। ক্রুর হাসি মুখে ফুটিয়ে বললেন,—রাজকুমার, এই প্রতাপ রায়ও মাতৃস্তন্য পান করেছে। বসন্ত রায়ের মত দিগ্‌গজ হ'তে না পারি, আমিও ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও ধারণ করি। আমি এই অন্যায় কোনমতে বরদাস্ত করবো না। প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

যন্ত্রচালিতের মত মহারাজার দক্ষিণহস্ত ধীরে ধীরে প্রসারিত হ'তে থাকে। বাম কটিদেশ স্পর্শ করে সেই হাত। উদয়াদিত্য যেন শিউরে উঠলেন। সেই কটিতে ঝুলছে খাপে-ভরা তরবারি। প্রখর দিবালোকে জ্বল জ্বল করছে রৌপ্যময় অস্ত্রাধার। উদয়াদিত্য বুঝেছেন, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সহজে লংঘন হওয়ার নয়।

ওদিকে বসন্ত রায়ও যেন সারাক্ষণ বিব্রত বোধ করছেন। ভয়ে ভয়ে থাকেন, পাষণ্ড প্রতাপ কখন তাঁর রক্তদর্শনে লোলুপ হয়! কখন এসে অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করে!

যাই হোক পরস্পর পরস্পরকে বিষম সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন।

বিন্দুমতী কোথায়? সেই কিশোরী-বধূ?

চলুন পাঠক-পাঠিকা, আমরা একটিবার বিন্দুমতীকে দেখে

আসি। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তথাপি বিন্দুমতী একাই যেন দোষের ফল ভোগের দুর্ভাগ্যটা অর্জন করেছে। তার বিবাহের সকল বিধি ও লোকাচার সম্পন্ন হ'ল বটে, বিন্দুমতী কিন্তু স্বামি-গৃহে যাত্রার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'ল। স্বামীর সঙ্গে আর কখনও যে সে মিলিত হবে, আশা করা যায় না' কোথা থেকে এলো এক সর্বনাশা বিক্ষুব্ধ ঝড়ো হাওয়া। এলো যেন মূর্তিমান্ অমঙ্গল। সেই বিধ্বংসী বাত্যাতরঙ্গে যেন ভেসে গেল সব কিছু। রাজপুরীতে রেখে গেল আঁধার-কালিমা। কেড়ে নিয়ে গেল সকলের মুখের হাসি, কণ্ঠস্বর।

বিন্দুমতীর বুকের মধ্যে যেন আঁধার করে আছে। এত বৈষয়িক তত্ত্ব সে জানে না, জানতে চেষ্টাও করে না। তবুও অনুমান করে, সংসার এক অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত জগৎ। সহজ কথা আর মধুর হাসি সংসারে খুব বেশী কার্যকরী হয় না। মানুষের কুটিল অন্তরে থাকে জটিল এক সাপ। মধ্যে মধ্যে সেই সাপটা ফণা বিস্তার করে, হলাহল উগরোয়, বিষেয়ে দেয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

ডেকে ডেকে সাড়া মেলে না বিন্দুমতীর। কত সময়ে মহারাণী কেঁদে কেঁদে ডাকেন,—আয় মা, আমার কাছে। বুকটা আমার খাঁ খাঁ করছে। তোমার চোখে জল, আর যে দেখতে পারি না।

অশ্রুপতন থামে না। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বিন্দুমতীর চোখে যেন শ্রাবণের মেঘ নামে। দশবার ডাকলে একবার সাড়া দেয়। অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে তাকায়। বলে,—আমার কী উপায় হবে? কোথায় আমি যাবো? কে ঠাঁই দেবে?

মহারাণী সান্ত্বনা জানিয়ে বলেন,—আমার কাছে থাকবে তুমি। ভাবনা কিসের?

মাত্র একটি রাত্রির দেখা, ক্ষণেকের মিলন, দুই চার কথায় আলাপ, তবুও বিন্দুমতী কিছুই যেন ভুলতে পারে না। ছাঁদনা-তলায় সেই ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি-বিনিময়, মালা-বদলের খেলা—মেয়েরা কী এত ত্বরায় বিস্মৃত হ'তে পারে? এই বিশেষতম মুহূর্ত-গুলিই তো মেয়েদের বিবাহিত জীবনের মূলধন হিসাবে গণ্য হয়। বালক রামচন্দ্রের মুখখানি, স্বামীর মুখের কথা—বার বার মনে পড়ে বিন্দুমতীর। যত মনে পড়ে তত যেন উতলা হয় সে। কান্নায় ভেঙে পড়ে।

মহারাণীর প্রবোধ-বাক্য, আশ্বাস তত কিছু মূল্য পায় না।

যেন একটা ভয়, মর্মভেদী দুঃখ, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি—বিন্দুমতীর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। প্রতিক্ষণে তার কাছে এগিয়ে আসছে। সেই যে জীবনশূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্ক সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা—তারই একটা ছায়া এসে যেন বিন্দুমতীর প্রাণের মধ্যে পড়েছে। তার মনের ভিতরে কেমন যেন করছে।

শয্যায় একলা পড়ে থাকে বিন্দুমতী। সর্বদা বড় একটা কাছে কেউ থাকে না। মধ্যে মধ্যে মহারাণী এসে দেখে যান একমাত্র কন্যাকে।

যখন একা থাকে তখন কেঁদে কেঁদে কথা বলে বিন্দুমতী। অদৃশ্য স্বামীর উদ্দেশে বলে,—আমাকে কী তবে পরিত্যাগ করলে? আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করেছি? আমার তো কোন দোষ নাই। তবে কেন—

কে উত্তর দেবে! কোথায় কে?

যশোহর থেকে বাকলা, সে তো অনেক দূর। রাজা রামচন্দ্র হয়তো বিষয়সুখে বিভোর হয়ে আছেন। হয়তো তাঁর মনেই পড়ে না, ফেলে-যাওয়া সহধর্মিণীকে। তবুও আপন মনে কথা বলে বিন্দুমতী। সে বলে,—কী দোষ করেছি আমি! একখানা চিঠিও পাই না। কারও মুখে তোমার সংবাদও শুনতে পাই না। বুক ফেটে যায়, ছটফট করি। সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াই। কেউ তোমার খবর বলে না। কারও মুখে তোমার নামটি পর্যন্ত শুনতে পাই না। মা গো মা, আর যে পারি না।

এমন কত দিন যায়। কত বিনিদ্র রজনী উত্তীর্ণ হয়।

এমন কত মধ্যাহ্নে, কত অপরাহ্নে, কত রাত্রে সঙ্গীহীনা বিন্দুমতী রাজ-অন্তঃপুরের ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়।

এ হেন সময়ে একদিন ভরা-দুপুরে রামমোহন মাল এসে অতর্কিতে দেখা দিলো।

বিন্দুমতীর পায়ের কাছে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে বললে,—মা গো, তোমার জয় হোক। ভগবান তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় করেন।

আপন চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না বিন্দুমতী। সে যেন চমকে চমকে ওঠে। তার মাথায় যেন একটা সুখের বজ্র ভেঙে পড়ে। চোখ দুটি জলে ভরে যায়। সে বলে,—মোহন, তুমি এসেছো? কোথা থেকে এলে?

কপালের ঘাম মুছে রামমোহন বলে,—হাঁ গো রাণী মা, আমি এসেছি। সেই বাকলা থেকেই আসছি। ভাবনু যে, মা জননী হয়তো আমাদের ভুলেই গেছেন। তাই এসেছি, একবার স্মরণ করিয়ে দিতে।

মনে মনে স্থির করলো বিন্দুমতী, কত কী জিজ্ঞাসা করবে। শুধোবে কত কথা। লজ্জা এসে যেন বাধা দেয়। বলি বলি করে; কিন্তু বলতে পারে না। অথচ কত কথা শোনার জন্য তার মনটা আকুলি-বিকুলি করে।

রামমোহন নববধূর মুখখানি দেখতে দেখতে বলে,—কেন মা, তোমার মুখখানি এমন মলিন কেন? তোমার চোখের তলায় কালি পড়েছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ। চল' মা, আমাদের ঘরে চল'। এখানে কী কেউ তোমাকে দেখে না, যত্ন করে না।

বিন্দুমতী হাসলো। ম্লান স্বল্প হাসি। ধীরে ধীরে সেই হাসি মুখ থেকে মিলিয়ে যায়। দুই চক্ষু থেকে টপ টপ অশ্রু পড়তে থাকে। শীর্ণ বিবর্ণ কপোল প্লাবিত হ'তে থাকে সেই আঁখিজলে। অশ্রু আর থামে না।

বহুদিন অবহেলা ও অনাদরের পরে সামান্য একটু আদর পেলে যে অভিমান উথলে উঠে, বিন্দুমতী সেই অতিকোমল মৃদু অনন্তপ্রীতিপূর্ণ অভিমানে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। বলে, মোহন, এতদিন পরে কী আমাকে তোমাদের মনে পড়লো?

চোখের জল না কী ভারী ছোঁয়াচে! একের চক্ষু থেকে অন্যের চোখে সংক্রামিত হয়। রামমোহন মাল অসম শক্তির অধিকারী হ'লে কী হয়, সেও যেন আর থাকতে পারে না। তার চোখেও জল আসে। সে বলে,—ক্ষমা করো রাণী মা। অপরাধ স্বীকার করছি। মা লক্ষ্মী, আর দেরী নয়, তুমি আমাদের ঘরে চল। চোখের জল মোছো। আমি তোমাকে ল'য়ে যেতে এসেছি।

সাশ্রুলোচনে বিন্দুমতী বলে,—সত্যিকথা বলছো মোহন? বিশ্বাস হয় না যেন। ভয় ভয় করে।

রামমোহন বললে,—হাঁ গো মা, নিছক সত্যিকথা। ছেলে কখনও মাকে মিথ্যা বলতে পারে! কেউ কখনও শুনেছে এমন কথা?

বিন্দুমতী বলে,—তবে যাই, মহারাণীকে শুনিয়ে আসি। দেখি মা আমার কী বলেন।

চোখের জল মুছে রামমোহন বললে,—যে যাই বলুক, আমি কিন্তুক শুনছি না। তোমাকে সঙ্গে না ল'য়ে আমি এখান থেকে এক পা নড়ছি না।

মহারাণীর মনে মনে আশঙ্কা ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে আর গ্রহণ না করে। মেয়ের মুখে সকল সমাচার শুনে তাঁর যেন আর আনন্দের সীমা থাকে না। বলেন,—বলিস কী বিন্দু

রামমোহন এসেছে তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে? ডাক তো দেখি রামমোহনকে, জামাইবাড়ীর কুশল জিজ্ঞেস করি।

রামমোহন এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। বললে,—কাল শুভদিন মহারাণী, কালই যাত্রা করবো। আপনি অনুমতি দিন।

আনন্দাশ্রু দেখা দেয় মহারাণীর চোখে। তিনি বললেন,—মেয়ে যাবে শ্বশুরঘরে, কেউ কী আপত্তি করতে পারে! মহারাজাকে জানাই আমি। দেখি, তিনি কী বলেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য এ বিষয়ে আর কিছু আপত্তি জানালেন না। মহিষীকে বললেন,—রামচন্দ্র আমার মেয়েটাকে অযত্ন করবে না তো মহারাণী? মেয়ে আমার অনেক আদরের। স্বেচ্ছায় তাকে জলে ফেলে দিতে পারি না। কিম্বা পারি না হিংস্র নেকড়ের মুখের কাছে এগিয়ে দিতে। এখনও ভেবে দেখো।

মহারাণী বললেন,—তা মনে করি না আমি। নয়তো মোহনকে পাঠাবে কেন তারা! আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আমি বিন্দুমতীর যাত্রার সকল ব্যবস্থা পাকা করি।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—তবে তাই হোক। প্রার্থনা জানাই, বিন্দুমতীর যাত্রা নির্বিঘ্ন হোক। সে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করুক।

যাত্রার সকল প্রকার আয়োজন যখন স্থির হয়ে গেছে তখন বিন্দুমতী একটিবার অগ্রজ রাজকুমার উদয়াদিত্যের কাছে গেল। রাজপুত্র তখন নির্জনকক্ষে একাকী বসে কী যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। সহোদরা বিন্দুমতীকে দেখে সহসা চমকিত হয়ে বললেন—বিন্দু, তবে কী সত্যিই তুই যশোর ছেড়ে চললি? তা এরকম ভালই হ'ল। তুই রামচন্দ্রের গৃহে বেশ সুখেই কালাতিপাত করবি। আশীর্বাদ করি, লক্ষ্মীস্বরূপা হয়ে স্বামীর ঘর উজ্জ্বল কর তুমি।

উদয়াদিত্যের পদতলে মাথা রাখলো বিন্দুমতী। ভ্রাতা লক্ষ্য করলেন, বোনটি ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উদয়াদিত্যের চক্ষুপ্রান্তে জল চিক চিক করে। তিনি বিন্দুমতীর মাথায় হাত রেখে বললেন,—কাঁদিস কেন দিদি? এখানে তোর কী সুখ ছিল তাই বল। চারিদিকে কেবল দুঃখ কষ্ট শোক। এ কারাগার হ'তে পালিয়ে তুই রক্ষা পাবি।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো বিন্দুমতী। আঁচলে চোখ ঢাকলো। উদয়াদিত্য আবার বললেন,—যাচ্ছিস? তবে আয়। স্বামীর গৃহে গিয়ে আমাদের যেন একেবারে ভুলে যাসনে বোন। মাঝে মাঝে মনে করিস। অবরে সবরে মঙ্গল সংবাদ দিস।

এমন সময়ে বিন্দুমতী রামমোহনের কাছে এগিয়ে বললে,—মোহন, এখন আমি যেতে পারবো না।

রামমোহন বললে,—কেন মা? মত বদলাও কেন? কী কারণে?

বিন্দুমতী বলে,—না, আমি যেতে পারবো না। ভাইকে আমি একলা ফেলে যেতে চাই না। আমার জন্য তিনি অনেক কষ্ট, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। আর আমি তাঁকে এখানে একলা ফেলে রেখে সুখ ভোগ করতে যাবো! না, তা হয় না, মোহন। যতদিন তাঁর মনে তিলমাত্র কষ্ট থাকবে ততদিন আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। তাঁর সেবাযত্নে নিযুক্ত থাকবো।

অন্তঃপুরে একটা তুমুল সোরগোল উঠলো। মহারাণী এসে বিন্দুমতীকে তিরস্কার করতে লাগলেন। মেয়েকে অনেক ভয় দেখালেন। অনেক পরামর্শ দিলেন।

বিন্দুমতী তবুও বললে,—না, আমি যেতে পারবো না।

মহারাণী রোষে বিরক্তিতে কেঁদে কেঁদে বললেন,—এমন মেয়ে তো কোথাও দেখি নি।

মহারাজার কাছে গিয়ে মহারাণী সকল ঘটনা ব্যক্ত করলেন।

প্রতাপাদিত্য প্রশান্তভাবে বললেন,—তা বেশ তো, বিন্দুর যদি ইচ্ছা না হয় তবে কেন যাবে? তার ইচ্ছায় বাধ সাধি কেন!

হাল ছেড়ে দিয়ে মহারাণী বললেন,—তোমাদের যা ইচ্ছা তাই

আমি আর কোন কথায় থাকতে চাই না।

উদয়াদিত্য এসে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বোনকে মত পরিবর্তন করতে বললেন। বিন্দুমতী যেন তার সিদ্ধান্তে অনড় অটল। ভাইয়ের সঙ্গ সে কিছুতেই ত্যাগ করবে না।

নিরাশায় ভেঙে পড়লো রামমোহন। বললে,—মা, তবে আমি বিদায় হই। আর কেন? মহারাজাকে কী যে গিয়ে বলবো ভেবে পাই না।

কথার শেষে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে সে প্রণাম করলো। গমনোদ্যত রামমোহনকে অতি কাতর সুরে বিন্দুমতী ডাকলো,—মোহন, শুনে যাও।

—আজ্ঞা করুন মা। কিছু কি বলবেন?

বিন্দুমতী বললে,—মহারাজকে বল, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তিনি নিজে আমাকে ডাক পাঠিয়েছেন, তবু আমি যেতে পারলাম না। আমারই দুর্ভাগ্য!

রামমোহন আবার একটা প্রণাম করলো। কক্ষ থেকে বেরিয়ে আর একপল অপেক্ষা করে না। অন্তঃপুর ত্যাগ করে সে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ছাইচাপা আগুনের মত তার বুকে ক্রোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। বিন্দুমতী বোঝে, স্নেহাস্পদ রামমোহন রাগ করেছে। কিন্তু সে যে নিরুপায়।

বিন্দুমতী রইলো। বক্ষে যেন পাষাণভার। চোখের জল থামে না তবুও সে উদয়াদিত্যের সঙ্গ ত্যাগ করলো না। ম্লান শীর্ণ এক ছায়ার মত সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য সস্নেহে সাদরে কোন কথা বললে বিন্দুমতী আনত মুখে একটু হাসে। সাঁঝবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসে, এক আধটা কথা বলতে চেষ্টা করে। মহারাণী অবাধ্য মেয়েটাকে যখন তখন তিরস্কার করেন। বিন্দুমতী নীরবে শোনে। বর্ষার মলিন খণ্ডমেঘের মত ভেসে চলে যায়। বহুক্ষণ আর কেউ মেয়ের দেখা পায় না।

এক অলস মধ্যাহ্নে বিন্দুমতীর কানে যায়, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। মহারাজা প্রতাপাদিত্য আদেশ দিয়েছেন,—উদয়কে কারাবাসে থাকতে হবে।

কোন্ অপরাধে? প্রশ্নটা সকলের মনেই উদিত হয়। লোক পরম্পরায় শোনা যায়, মহারাজা একটা ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। জামাতা রামচন্দ্রকে পলায়নে সাহায্য করেছেন রাজা বসন্তরায়, উদয়াদিত্য প্রমুখ।

মহারাণী বললেন,—মহারাজা, যুবরাজ যে এ কাজ করেছেন, ইহা কোনমতেই বিশ্বাস হয় না।

প্রতাপাদিত্য বলেন,—আমারও তো প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। তবে প্রমাণ কিছু কিছু পেয়েছি। তাই বলি, কারাগারে থাকতে দোষ কী? সেখানে উদয়ের কোনপ্রকার কষ্ট না হয়, সেইমত নির্দেশ দিয়েছি। কেবল গোপনে কিছু করতে না পারে তজ্জন্য কড়া পাহারা নিযুক্ত থাকবে।

বিন্দুমতী মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়ে। অবিশ্বাস্য সংবাদটা শুনে যেন আর প্রকৃতিস্থ থাকতে পারে না।

চন্দ্রদ্বীপের রাজসভা।

মহারাজা রামচন্দ্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। হাতে আলবোলার নল। সুগন্ধি তামাকের খোশবয় ভুর ভুর করছে। মহারাজার দুই পাশে মন্ত্রিমণ্ডলী বসেছেন। সেনাপতি ফার্নাণ্ডিজ চোখে চশমা এঁটে মহারাজার সম্মুখভাগে বসে আছেন। তাঁর হাতে কী যেন কাগজপত্র। সাগ্রহে দেখছেন তিনি। লিপি পড়ছেন, নক্সা দেখছেন। রামচন্দ্রের সৈন্যদের জন্য বাসস্থান নির্মিত হবে' সেই বিষয়ে সভায় শলা-পরামর্শ চলছে।

এমন সময়ে মহারাজা লক্ষ্য করলেন, ঐ যে রামমোহন মাল একাকী বিষণ্ণচিত্ত পদক্ষেপে এই দিকেই আসছে। দুরুদুরু বুকের কাছে। যে যেন এক অপরাধী। তাকে একা আসতে দেখে মহারাজা রামচন্দ্রের গায়ে যেন অনল ধরে। রোষদৃষ্টি ফোটে চোখে। মহারাজা ভেবেছিলেন, বিন্দুমতী আসে যদি, মনের সাধে প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পূর্বপুরুষের নামে বেশ কয়েকটা কড়া কড়া বাক্যবাণ ছাড়বেন। একটা বড় রকমের শোধ তুলতে না পারলে রামচন্দ্রের মনের জ্বালা প্রশমিত হবে না। অবশ্য রামচন্দ্র এমন কিছু হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ নয় যে বিন্দুমতীকে কোন প্রকারে পীড়ন করবেন। তেমন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তবে বিন্দুমতীকে তার পিতার প্রসঙ্গ তুলে সময়ে অসময়ে খুব লজ্জা দেবেন, এই আনন্দেই তিনি মত্ত ছিলেন। রামমোহনকে একা আসতে দেখে মহারাজা বললেন,—কী ব্যাপার রামমোহন? একা কেন?

রামমোহন জোড়হস্তে বললে,—মহারাজা মার্জনা করুন। কাজের কাজ কিছুই হয় নাই।

মহারাজা বললেন,—সে কোথায়? প্রতাপ-কন্যা?

রামমোহন সসংকোচে বলে,—তিনি আসেন নাই। আমার যাত্রা নিষ্ফল হয়েছে। মহারাজ, আমার কপালের দোষ।

রামচন্দ্র সক্রোধে বললেন,—এত বড় অপমান! আমার নাম করে ভিক্ষা-প্রার্থনা জানাতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিলো না? আমাদের বংশের মাথা হেঁট করালি তুই? পাষণ্ড কোথাকার!

আনত মাথা তুলে রামমোহন বললে,—অযথা দোষ দেন কেন? আসল ঘটনা তা নয়। প্রতাপাদিত্য রাজী ছিলেন। কোনরকম বাধা তিনি দেন নাই।

রামচন্দ্র চক্ষু পাকিয়ে বললেন,—তবে সে আইল না কেন তাই শুনি? কে বাধা দিলো?

মুখে যেন কথা জোগায় না। রামমোহন বলে,—মহারাজ—

রাজা বলেন,—ভূমিকা থাক, আসল কথা কী তাই শুনি।

রামমোহন বলে,—মহারাজ, রাণীমা আসতে চাইলেন না।

কথা শুনে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রামচন্দ্র। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—বটে! এত বড় দুঃসাহস! তুই আবার বলিস, সে আমার ধর্মপত্নী! যাই হোক, তুই বেটারছেলে এখনই আমার সম্মুখ থেকে বিদেয় হ।

রামমোহনের চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে। রাজসভা ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। রামচন্দ্র অধীর হয়ে উঠলেন। ভেবে ভেবে তিনি স্থির করতে পারেন না, কোন্ উপায়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। অপমান আর যেন সহ্য হয় না।

কয়েকদিনের মধ্যে সংবাদটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এমন অবস্থায়, প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারলে আর যেন মান থাকে না। এমন কী প্রজারা পর্যন্ত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। তারা বললে,—আমাদের রাজ্যের অপমান! আমাদের মহারাজার অপমান।

অসম্মানটা যেন সকলের গায়ে লেগেছে। কিন্তু কেউ কার্যকরী একটা কিছু করতে পারছে না।

একদিন সভায় মন্ত্রীমহোদয় বললেন,—মহারাজ আপনি আর একটি বিবাহ করুন।

রমাই ভাঁড় বললে,—আর প্রতাপের মেয়ে তার ভাইয়ের সঙ্গে থাকুক।

রামচন্দ্র সহাস্যে বললেন,—রমাই ঠিকই বলেছে।

রাজা হেসেছেন দেখে সকল সভাসদই হাসতে থাকে। এ হাসি প্রকৃত হাসি নয়, হাসির অনুকরণ মাত্র।

দেওয়ানজী বললেন,—মন্ত্রীমহাশয় যথার্থ বলেছেন। মহারাজা পুনর্বিবাহ করলে প্রতাপকে এবং তার কন্যাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।

রমাই ভাঁড় বলে,—মহারাজা, এ শুভকাজে আপনার শ্বশুর, অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যকে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে ভুলবেন না। নয়তো তিনি মনে দুঃখ করতে পারেন। নববধূকে বরণ করবার জন্য এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়ীঠাকরুণকে ডেকে পাঠাবেন। মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, প্রতাপ-কন্যাকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাবেন তখন সেই সঙ্গে গোটা কয় কাঁচা রম্ভা পাঠাতে ভুলবেন না।

রামচন্দ্র হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন। সভাসদেরাও হেসে খুন হ'ল। ফার্নাণ্ডিজ সলজ্জায় সভা ছেড়ে উঠে চলে যায়।

যাই হোক, মহারাজের দ্বিতীয় বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হয়ে গেল। [ক্রমশ]

অকারণ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বাঁশি প্রতিদিন বাজে অন্তরে এবং বাহিরে।
সেই বাঁশির সুরে সুর মেলাবার তাগিদ আসে
প্রেরণার নির্ঝর ঝরতে চায় সুরে
কিন্তু কেমন যেন সব অনড় ও অটল হয়ে আঁকড়ে থাকে।
প্রকৃতির বটগাছ বুড়ো হয়েও যেমন মাটিকে আঁকড়ায়,
মার খেয়ে ছেলে তবু মাকে আরো চায়।

তবু বাঁশি বাজে,
এই বাজাতেই যে তার আনন্দ—
এই বাজা শোনাতেই যে আনন্দ আমার,
কেউ শুনলো আর নাই শুনলো।
তার ভ্রূক্ষেপও থাকে না—
সে অকারণে আনে আমন্ত্রণ আনন্দের,
নির্জনে তাই শুনি—
বাঁশি শুধু বাজে বাজার জন্যেই বাজে।

মহাত্মা গান্ধী

ধ্যান-মৌন, তুষারশুভ্র, ভাব-গম্ভীর হিমালয় যাহার শিরোমণি, উদ্দাম, উন্মত্ত, বাঁধনহারা ছন্দে, লীলায়িত ভঙ্গিমায়, তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র যাহাকে তিনদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেই বিস্তীর্ণ বিশাল পূতপবিত্র ভূখণ্ডেরই নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ মহিমার জন্মভূমি, এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র। এই ভারতবর্ষ ভুবনমনোমোহিনী। সনাতন সভ্যতার লীলাভূমি এবং শাশ্বত সংস্কৃতির বিকাশ কেন্দ্র। এই ভারতবর্ষেরই পবিত্র মৃত্তিকায় যুগে যুগে, কালে কালে আবির্ভূত হইয়াছেন বহু মহামানব। এই পরম পূজ্য মানবেরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নগরে, গ্রামে, জনপদে আবির্ভূত হইয়া ধন্য করিয়াছেন মানব সম্প্রদায়কে—পুণ্য করিয়াছেন দেশের মৃত্তিকা। ইঁহারা দিয়াছেন প্রকৃত পথের সন্ধান, মিথ্যা, ভ্রান্ত, দম্ভকে জয় করার মন্ত্র, জোগাইয়াছেন সত্য, শিব, সুন্দরের অমৃতলোকের যাত্রাপথ পরিক্রমার পাথেয়। রক্ষা করিয়াছেন জাতিকে মানসিক ধ্বংসের কবল হইতে, উপলব্ধি করাইয়াছেন জীবনের সম্যক্ অর্থ, সমগ্র জাতিকে উপনীত করিয়াছেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, এই সুচিন্তিত পরিণতিতে। মানুষ বারবার ভুলের ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হয়, অজ্ঞানতার মোহের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, এক সর্বৈব অন্ধকারের ওড়নায় আচ্ছাদিত হইয়া যায়, তখনই সেই অবস্থা হইতে সেই অনিবার্য এবং সর্বনাশা অবলুপ্তির সম্ভাবনা হইতে এই যুগত্রাতাদের কল্যাণেই মানব সমাজ আবার মুক্তি পায়, আবার পায় আলোকের মন্ত্র, আবার পায় জীবনের স্পর্শ।

ভারতবর্ষের আধুনিককালে যে কয়জন যুগত্রাতার আবির্ভাব হইয়াছে মহাত্মা গান্ধী সেই তালিকায় এক অমৃতের প্রসাদপুষ্ট, চিরন্তনের আশীষ-ধন্য, আনন্দের দীপ্ত স্পর্শসমৃদ্ধ নাম।

একদিকে বুদ্ধ-চৈতন্যের আদর্শ আর একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের মনোভাব—দুইয়ের উত্তরসাধক যেন মহাত্মা গান্ধী। বুদ্ধ-চৈতন্যের অহিংসার, প্রেমের মন্ত্রে সর্ব মানবকে উদ্বোধিত করার পবিত্র দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিলেন, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নেও তিনি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেলেন। হিংসা ও হানাহানি পরিহার করিয়া বুদ্ধ-চৈতন্যের মতই নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের রক্তক্ষয়ী পটভূমিতে অহিংসার শান্তি-বারি সিঞ্চনে তাঁহার ভূমিকা অনস্বীকার্য, আবার মানুষকে তাহার ন্যায়, ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এবং তাহার প্রাপ্য অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়।

একালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে গ্রামকে প্রাধান্য একপক্ষে গান্ধীজীই প্রথম দিলেন। গ্রামোন্নয়ন ও সেবাকার্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ এই উপলব্ধি ভারতবর্ষ প্রথম তাঁহার নিকট হইতেই লাভ করিল।

আসলে গান্ধী কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির দ্যোতক নয়। গান্ধী অর্থ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। সূর্যের মত প্রচণ্ড, চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ, হিমালয়ের মত গম্ভীর, সাগরের মত প্রাণচঞ্চল, পাষাণের মত স্থির, এক মহান ব্যক্তিত্বেরই অপর নাম গান্ধী। এ এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁহার কাছে সত্যই ধ্যান, সত্যই জ্ঞান, সত্যই সাধনা। এ সেই ব্যক্তিত্ব যাঁহার নিকট সত্য এবং মানুষ এই দুই-ই দেবতা-স্বরূপ, সত্যের প্রতিষ্ঠায় যাঁহার জীবনপাত, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাঁহার জীবনব্যাপী সংগ্রাম।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তিনজন গণনায়ককে লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন গান্ধী এবং একজন অরবিন্দ। তিনজনের ধারা ত্রিবিধ, ভিন্নমুখীন তাঁহাদের কর্মধারা বিষয়ে লক্ষ্য এক—লক্ষ্য মানবের মুক্তি, রাজনীতির দ্বারা, মহৎ সৃষ্টির ধারা, আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা ভ্রান্ত মানবকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

গান্ধীজীর জীবনারম্ভ লাঞ্ছনা এবং অপমানের ভিতর। আফ্রিকায় প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাকে লাঞ্ছনা বরণ করিতে হইয়াছে কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার অপরাধে (?) প্রতি পদে পদে এই সাদা-কালোর তারতম্য এবং বর্ণ-বিদ্বেষের ব্যাপকতা তাঁহাকে ধীরে ধীরে উদ্বোধিত করিল সংগ্রামের অভিমুখে। তবে সে সংগ্রাম রক্তক্ষয়ী নয়। বিধাক্ত প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র সেখানে হাতিয়ার নয়, সেখানে প্রধান আয়ুধ হইল সত্য। শক্তি হইল ভগবৎ বিশ্বাস। এই দুটি প্রধান অবলম্বন করিয়া তরুণ গান্ধী তাঁহার জীবনব্যাপী সংগ্রাম শুরু করিলেন, উদ্দেশ্য---সর্ব মানবের জন্ম-সূত্রে লব্ধ মানবিক অধিকার স্বীকার করানো।

সময়ের অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সন্তান একদিন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। জন্মভূমি তখন হইল কর্মভূমি। দেখিতে দেখিতে একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকেই পিতৃপ্রণাম নিবেদন করিল।

কি মহিমময়ী শক্তির অধিকারী ছিলেন এই খর্বকায়, কৃশতনু, অতি আকর্ষণহীন আকৃতির অধিকারী মানুষটি। কি অমোঘ অকাট্য মন্ত্র ছিল তাঁহার অধিকারে---যাহার জোরে আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী বিরাট বিশাল ভারত-বর্ষের মাটি প্রকম্পিত হইয়াছে, ভিত নড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার একটি আহ্বানে, সমগ্র ভারত একটি পতাকা-তলে সম্মিলিত হইয়াছে একটি অঙ্গুলি-হেলনে, কি সেই দুর্বার শক্তি যাহা সারা বিশ্বের প্রাণপিণ্ডে দোলা লাগাইয়াছে---সে শক্তি আত্মিক শক্তি। আত্মিক শক্তিই তাঁহাকে জগজ্জয়ী করিয়াছে। জীবনসংগ্রামে জয়লক্ষ্মী তাঁহার ভালদেশে চর্চিত করিয়াছেন চন্দনে, কণ্ঠে দোলাইয়াছেন জয়মাল্য।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উত্থাপন করিলে আশা করি তথাকথিত প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী আশ্রয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হবে না যে---বাঙলা দেশের সহিত গান্ধীজী একটি আত্মিক বন্ধনে জড়িত ছিলেন। জীবনের প্রথম পর্বে আফ্রিকা হইতে এই বাঙলা দেশেই আসিয়া রাজনৈতিক গতি-প্রগতি তিনি অনুধাবন করেন এবং ভবিষ্যতের সূচীপত্র নির্মাণে ব্রতী হন। দেহান্তরের অল্পকাল পূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালির শ্মশানভূমিতে আবার নবজীবনের বীজ বপন করিবার উদ্দেশে জীবনের শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া তাহার তাপদগ্ধ বক্ষ হইতে ক্ষতের প্রলেপ মুছানোর কার্যে তাঁহাকেই সবার আগে ছুটিয়া আসিতে দেখা গিয়াছিল। মনে হইয়া-ছিল---শান্ত শিব যেন তাঁহার প্রেম ও মৈত্রীর কমণ্ডলু হইতে নূতন জীবনের বার্তাবহ বারি সিঞ্চিত করিতেছেন হিংসায় উন্মত্ত লোভদানবের রুদ্র-রুক্ষ নিষ্করুণ আঘাতের শিকার নোয়াখালির রসস্নিগ্ধ বক্ষ হইতে। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের ভাষা, বিদ্যাসাগর-শ্রীমধুসূদনের ভাষা---এই 'আ মরি বাঙলা ভাষার' সহিতও তিনি প্রত্যক্ষ-রূপে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং সার সত্য বাণীটি এই ভাষাতেই ব্যক্ত করিলেন---(আমার জীবনই আমার বাণী)। রবীন্দ্রনাথের সহিত, সুভাষচন্দ্রের সহিতও আদর্শগত ব্যাপারে মতান্তর তাঁহার ঘটিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মতান্তর মানেই মনান্তর নয়, আদর্শগত মত-পার্থক্য থাকিলেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ব্যক্তিজীবনে সুভাষচন্দ্র কোনদিনই গান্ধীর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি তিলমাত্র হারান নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি-সংগ্রামে ---ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শেষ উল্লেখযোগ্য সংগ্রামে গান্ধীর নিকট কোনরূপ অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ না পাওয়া সত্ত্বেও প্রতি পদক্ষেপের প্রাক্কালে জনগণ-মন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র তাঁহারই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন।

গান্ধী-বিয়োগের পর আজ বিংশতি বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিতেছে। খণ্ডিত, বিভক্ত, প্রতারিত বঞ্চিত, শোষিত ভারতবর্ষে আজ ঘরে ঘরে, তাঁহার জন্ম-শত-বার্ষিকীর পুণ্য-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা মানুষের মনের অন্ধতমকে নির্মূল করুক। জটিলতার মূলোচ্ছেদ করুক, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা নিশ্চিহ্ন করুক---ভারতবর্ষের দিশাহারা মানুষ আজ সেই পুণ্যপ্রদীপের পবিত্র আলোকে আবার প্রকৃত পথের দিকনির্দেশ পাক---ইতিহাসের উজ্জ্বল পুরুষ এই জাতীয় জীবনের মহান দিশারী ---মহাত্মাজীর উদ্দেশে আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া এই প্রার্থনাই করি।

আর কতকাল

'লজ্জা, মান, ভয়---তিন থাকতে নয়''---বাঙলা দেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত এই বহু পুরাতন প্রবাদ বাক্যটি এখন দেখা যাইতেছে মর্মে মর্মে অনুসরণ করিতেছে পাকিস্থান। অনুসরণ করিতেছে ঠিকই তবে ভাবার্থে নয়, আক্ষরিক অর্থে। একবিংশতি বর্ষীয় অর্থাৎ সাবালক-প্রাপ্ত এই রাষ্ট্রটি বর্তমানে তাহার হাবে-ভাবে---আচরণে-কর্মে স্বীয় চরি-ত্রের যে স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতেছে তাহার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে চরিত্র হইতে লজ্জা নামক বস্তুটি পুরোপুরি বিসর্জিত হইয়া গিয়াছে। ঐ পদার্থটির ছিটেফোঁটাও যদি থাকিত তাহা হইলে ভারত সম্বন্ধে এত মিথ্যা কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ও আজগুবী অভিযোগ সম্ভবপর হইত না। লজ্জা বা বিবেক নামক পদার্থ তিলমাত্র থাকিলেও তাহারা জঘন্য মিথ্যা ও অনুত ভাষণের প্লাবন বহাইতে পারিত না। [illegible]

চীনের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া পাকিস্তানের কর্তারা একেবারে উল্লাসে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতের সম্বন্ধে তাঁহাদের কাল্পনিক অভিযোগ একেবারে আরব্য উপন্যাসকেও এবার হার মানাইতে চলিয়াছে।

আয়ুব খাঁকে আমরা এতদিন সামরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিনায়করূপেই জানিয়া আসিয়াছি, এখন দেখিতেছি তিনি ঐতিহাসিক গবেষকরূপেও প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, মোগলযুগে সারা ভারত যখন একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্গত ছিল তখনই ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজ যথেষ্ট সুখে ছিল। কিন্তু গবেষক মহোদয় একটি বিষয়ে তো আলোকপাত করিলেন না। সে যুগে হিন্দুরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছেন? আকবর-জাহাঙ্গীর-শাহজাহান-আলমগীরের যুগে হিন্দুরা কে কত সুখে রাত কাটাইতে পারিতেন সে সম্বন্ধে তো খাঁ সাহেব কোন মন্তব্য করিলেন না।

এ-প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আসিতে পারে দেশ বিভাগের পরও---এখনও মুসলমানরা ভারতবর্ষে যে মর্যাদার সহিত যে নিরাপত্তার সহিত এবং যে প্রতিষ্ঠার সহিত পরম আনন্দে বসবাস করিতেছেন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থার সহিত কি তাহার তুলনা চলিতে পারে? আজ পর্যন্ত পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি যে অবর্ণনীয় ঘৃণ্যতম ও বীভৎস নারকীয় অত্যাচার চলিতেছে তাহার কণার কণাও কি প্রত্যুত্তর হিসাবে ভারতবর্ষে মুসলিমদের প্রতি সংঘটিত হইয়াছে?

পাকিস্তানে যে ভাবে ক্রমশই হিন্দু নিশ্চিহ্ন হইতে চলিতেছে, ভারতবর্ষে কি অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছে বরং দেশ বিভাগের পর মাত্র একবার কলিকাতায় যখন যৎসামান্য গোলযোগ ঘটিয়াছিল সেই ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ছুটিয়া আসিয়াছিলেন কলিকাতায় অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য, এবং সরকারী আচ্ছাদন বা সর্বপ্রকার নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিই।

অথচ, পাকিস্তানী কর্তারা পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতেছেন যে, পাকিস্তানের নীতি শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু যুদ্ধকামী ভারতের উৎপাতে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতেছে না। অথচ ১৯৬৫ সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ তাঁহারাই করিয়াছিলেন, ভারত পাকিস্তানের দিকে হাত বাড়ায় নাই। পাকিস্তানই ক্রমশই গোটা প্রায় ভারতকে আত্মসাৎ করিতে চায় কিন্তু ভারত কোনদিন পাকিস্তানের কোন অংশ দাবী করে নাই।

একটি রাষ্ট্র যে সাধারণ ছিঁচকে চোরেদের ভারত-বিদ্বেষী কার্যে কতখানি প্রশ্রয় দিতে পারে, তাহারও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল পাকিস্তান। সীমান্ত হইতে যে গবাদি পশু পাকিস্তানীরা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে তজ্জন্য এই অপহরণকারীরা খোদ রাষ্ট্র হইতে উৎসাহিত এবং পুরস্কৃত হইতেছে। যুক্তিহীন ভারত-বিদ্বেষ ইহাদের মর্মে মর্মে এমন গাঁথিয়া গিয়াছে যে কারণে গরু-ছাগল চোরেদের পিঠে হাত বোলাইয়া পুরস্কার প্রদান করিতে ইহাদের বিবেকে বাধে না।

পাকিস্তানী নেতাদের মতে ভারতবর্ষ বিবাদ বিসম্বাদ জিয়াইয়া রাখিতে চায়---তাহার উত্তরে শুধু একটি প্রশ্নই আমাদের আছে যে, ফরাক্কা বাঁধ সম্বন্ধে ভারত আগাগোড়াই একটি বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দিকে আগ্রহশীল কিন্তু পাকিস্তান কিছুতেই এখনও পর্যন্ত বৈঠকের সঠিক তারিখ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না কেন? তাহা হইলে বিবাদটি কে জিয়াইয়া রাখিতে চায়?

ত্রিপুরা ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে পাকিস্তান যে ব্যাপকভাবে সামরিক প্রস্তুতি চালাইতেছে তদ্বারা কোন সত্য আলোকিত হয়---যুদ্ধকামী ভারত না যুদ্ধকামী পাকিস্তান?

এখানেই শেষ নয়। নিজেরা তো যাহা খুশী করিতেছেনই তাহাতেও তাহাদের তৃপ্তি নাই। নাগা ও মিজোদের ভারতের বিরুদ্ধে এবার রীতিমত তালিম দেওয়া সুরু করিয়াছেন। সম্প্রতি যে সব গুপ্ত দলিল উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা যেমনই চাঞ্চল্যকর তেমনই ভয়ঙ্কর। বেশ কিছুকাল ধরিয়া বৈরী নাগা ও মিজোদের পাকিস্তান যে উৎসাহই দিতেছে---তাহা নয়, তাহাদের রীতিমত সাহায্য প্রদান করিতেছে। সামরিক শিক্ষা আক্রমণ কৌশল, রণ পদ্ধতি যত রকমের হইতে পারে, প্রতিটি বিষয়ে তাহাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে, আর্থিক সাহায্য ও তাহাদের অকাতরে দিয়া চলিতেছে খাদ্য, যন্ত্রপাতি, উপকরণ প্রভৃতি অকৃপণভাবে সরবরাহ করিয়া চলিতেছে।

ভারতের পান হইতে চুন খসিলে পাকিস্তান পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে গিয়া তিলকে তাল করিয়া বর্ণনা করে। এখন আমাদের প্রশ্ন যে উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান এই সীমাহীন ঔদ্ধত্য এবং এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশা ষড়যন্ত্র আমরা কতকাল নীরবে সহ্য করিব এবং পাকিস্তানের জনজীবনে প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হিন্দু নির্যাতনের নীরব দর্শক হইয়া থাকিব---এই নীরব সহনশীলতার সপক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়াও আমরা খুঁজিয়া পাই না। একটি কথা বিস্মৃত হইলে কিছুতেই চলে না---সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে। ঔদার্য ও সহনশীলতাও তাহার ব্যতিক্রম নয়।

নেপথ্য-চিত্র

নির্বাচন প্রসঙ্গে জনসাধারণের অভিজ্ঞতার অন্য একটি দিকও বিবেচনা করতে হবে। বিগত ২০ বৎসরের কংগ্রেস শাসনে জনসাধারণ ৪টি সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন, নির্বাচিত মন্ত্রী-পরিষদ বাতিল, বিধানসভা বাতিল, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কথায় কথায় কারাগারে প্রেরণ ইত্যাদি ঘটনা জনসাধারণ দেখতে পেয়েছে। এ ছাড়া গত নির্বাচনের পর জনসাধারণ পেয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং সেই সরকারের রীতি-নীতি সম্পর্কে তিক্ত ধারণা। এটা আজ জনসাধারণের চোখে স্পষ্ট হয়েছে যে বর্তমান সংবিধান ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন মন্ত্রীমণ্ডল বদলের দ্বারা অর্থনীতির কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।"

●

নকশালবাড়ীর বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে বলে যখন কংগ্রেসীরা এবং সংশোধনবাদী—নয়া সংশোধনবাদীরা একযোগে তারস্বরে প্রচার করছে, এদিকে তখন নকশালবাড়ী এলাকার মধ্যেই একটি বিরাট সেনানিবাস তৈরীর আয়োজন হচ্ছে। সংবাদটি দিয়েছেন অমৃতবাজার পত্রিকা। এই উদ্দেশ্যে নকশালবাড়ী থানার অন্তর্ভুক্ত বাউনিভিটা গ্রামে জমি দখলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই নোটিশ জারি করেছেন, এই সেনানিবাস নির্মাণের জন্য নাকি সবশুদ্ধ প্রায় ৮২'২২ একরের মত জমির প্রয়োজন হবে। ঐ জমির প্রাথমিক সার্ভে কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে; ভূমিরাজস্ব বিভাগের আমলারা জায়গাটি দেখে এসেছেন।

যুক্তফ্রন্টের নেতাদের নিশ্চয়ই এতে কোন আপত্তি নেই, কারণ তারা আবার মন্ত্রিত্ব পেলে একাজ তাদেরই চালাতে হবে; তাই তারা মন্ত্রিত্ব পেলে এ পরিকল্পনার কোন রদবদল হবে না। জ্যোতি বসু ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছেন তারা আবার মন্ত্রিত্ব পেলে আগেকার মতই নকশালবাড়ীর আন্দোলনের মত আন্দোলনকে 'বেআইনী' বলে মনে করবেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। সেনানিবাস তৈরীর সংবাদের সঙ্গে জ্যোতি বসুর বিবৃতিটি আলাদা করে দেখা যায় না।

●

"দেশব্রতীর গত কয়েকটি সংখ্যাতে 'লিটল থিয়েটার' গ্রুপ কর্তৃক প্রযোজিত 'মানুষের অধিকারে' নাটকের একটা বিজ্ঞাপন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। উক্ত বিজ্ঞাপনে সভাপতি মাও-সে-তুঙ এবং কমরেড লিন পি আওয়ের দুটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে এই উদ্ধৃতি দুটি ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত হয় নাই। কমরেড মাও সে তুঙ ও কমরেড লিন পি আওয়ের উদ্ধৃতিকে ব্যবসাদারের দৃষ্টি কোণ থেকে ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

তার চেয়েও বড় কথা সভাপতি মাও সে তুঙ ও কমরেড লিন পি আওয়ের এই ধরণের কোন বিবৃতিই নেই। লিটল থিয়েটার কোথা থেকে তা যোগার করলেন আমার জানা নেই। আমার মতে না জেনে এই ধরণের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা অত্যন্ত অন্যায়।"

●

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগে আরো একবার স্পষ্ট হয়ে গেল আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক দেশে শিক্ষায়তনের 'পবিত্রতা' শাসকগোষ্ঠী কতটুকু গ্রাহ্য করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্রছাত্রীরা মেদিনীপুরের বন্যার্ত ছাত্রছাত্রীদের বেতন এবং পরীক্ষার ফি মকুব করার দাবিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়োগের প্রতিবাদে উপাচার্যের কাছে কয়েকদিন আগে স্মারকলিপি দিতে যান। কিন্তু ছাত্রদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। গেটে নবনিযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে তাঁদের গতিরোধ করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার। কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বাহিনী শুধু ছাত্র আন্দোলন দমনেই যে ব্যবহৃত হবে তা নয়, কর্মচারীদের আন্দোলন ভাঙতেও কাজে লাগানো হবে বলে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।"

---'দেশব্রতী' (১২ই ও ১৯এ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) হইতে সংকলিত।

পশ্চিম বাঙলায় অশান্তি

শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির লীলাভূমি, নব নব চিন্তাধারার বিকাশক্ষেত্র বিশ্ববন্দিত এক সভ্যতার আবির্ভাবকেন্দ্র বাঙলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ আজ এক ব্যাপক অশান্তির কেন্দ্রে পরিণত। সংবাদপত্র খুলিলেই যে নিত্য নব অশান্তির সংবাদ আমাদের গোচরীভূত হইতেছে তাহা ক্রমশঃই উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার কারণ হইতেছে।

কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি অর্থনৈতিক কি শিল্পনৈতিক নানাদিক দিয়া একটির পর একটি সমস্যা সমগ্র রাজ্যকে এবং রাষ্ট্রকে আজ জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে। প্রকৃতির মার তো আছেই—সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গে বন্যায় যে নিদারুণ তাণ্ডবলীলা ঘটিয়া গেল তাহা যেমনই মর্মান্তিক তেমনই ভয়াবহ। জলপাইগুড়ী শহরে এবং দার্জিলিঙ-এ আজ যে শোচনীয় অবস্থা তাহা উপলব্ধি করিলে বেদনার অন্ত থাকে না। বাঙলাদেশের এক বিরাট অংশ আজ জলমগ্ন। স্থানীয়

বিপুল সংখ্যক অধিবাসীদের আজ নিদারুণ অবস্থা। খাদ্য নেই, বহু বাড়ীর আচ্ছাদন নেই, তদপেক্ষাও লজ্জার কথা যে ত্রাণকার্যও যে রূপ হওয়া প্রয়োজন সেরূপ হয় নাই। নিদারুণ দুর্যোগের ফলে বহু নরনারীর সন্ধান এখনও পর্যন্ত মিলিতেছে না।

এই জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মূলতঃ কেন্দ্র করিয়া আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনও আজ যথেষ্ট বিতর্ক ও উত্তেজনার দৃষ্টান্তে পরিণত হইয়াছে। নভেম্বর অথবা ফেব্রুয়ারী—এই লইয়া আলাপ আলোচনা, চিন্তার অবধি নাই, তথাপি নির্বাচনী কমিশনার এখনও পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিতেছেন না এবং নির্বাচনের তারিখ লইয়া প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় সকল পক্ষই বিরক্তিবোধ করিতেছেন। অথচ, এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যান্য যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা বোধকরি, কাহারও; অবিদিত নয়। ইহার গাম্ভীর্য এবং মর্যাদা সকলের দ্বারাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইয়া তদনুযায়ী তাহার সুষ্ঠু উদযাপন প্রয়োজন।

'ঘেরাও' আর 'বন্ধ' এই দুটি শব্দ জনজীবনে আজ এত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার তুলনা মেলা ভার। যে কোন সামান্যতম ব্যাপারেও ইহাদের আশ্রয়গ্রহণ আজ এক নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত। অভাব, অভিযোগ আমরা কখনই উপেক্ষা করিতে বলি না। ন্যায়সঙ্গত ন্যায্য দাবী আদায়ের স্বপক্ষে আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন জানাইব। কিন্তু যে ভাবে আজকাল বিক্ষোভ জানানোর রেওয়াজ হইয়াছে সে প্রথা কখনই সমর্থনীয় নয়। ইহার ফলও হাতে হাতে আজ দেখাও যাইতেছে। তথাকথিত জনদরদী নেতৃবৃন্দ ইহাদের উস্কাইয়া ধর্মঘট প্রভৃতিতে নিয়োজিত করেন পরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁহারাই মালিক-শ্রমিকে একটা আপোষ করিয়া দেন আবার কখনও কখনও প্রকাশ্য ক্ষেত্র হইতে বেপাত্তা হইয়া যান।

আপোষকারীর ভূমিকায় তাঁহাদের আবির্ভাবের নেপথ্যেও যে কোন পটভূমি নাই জানি না এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু মালিকপক্ষ পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হন না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্রমিক-সাধারণ। ঘরে ঘরে হাহাকারের রোল ওঠে। অভাব আর অনটন নৃত্য করে আঙ্গিনায়। তথাকথিত নেতাদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া শ্রমিক-সাধারণ নিজেদের কবর নিজেরাই খনন করে। ফলে, বাঙলাদেশে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হইয়া বহু ব্যবসায়ী ব্যবসা তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রগতি সম্মুখীন হয় এক বিরাট বাধার।

পথ-ঘাট সংস্কার, আবর্জনা সরানো, স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পালনেও ত্রুটিহীনতার ছাপ আজ অনুপস্থিত। বর্তমানে স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পালনেও ত্রুটিহীন-বিদ্যুৎ-সমস্যাও ক্রমেই যে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহাও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ। রাজ্যবিদ্যুৎ ধর্মঘটের ফলে কলিকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহও যে কতদিন অব্যাহত থাকিবে বলা দুষ্কর। জনজীবনে বিদ্যুৎ এক কথায় অপরিহার্য, শুধু আলো-পাখার ব্যাপারেই নয়, জনজীবনে আরও বহু প্রয়োজনে বিদ্যুতের ব্যবহার অনস্বীকার্য। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির এই অনিশ্চয়তার অবসান না হইলে সমগ্র রাজ্যে আর এক ধরণের অশান্তি ঘনীভূত হইবে।

সকল দিক দিয়াই পশ্চিমবঙ্গ আজ গুরুতর অশান্তির সম্মুখীন। অশান্তি দূরীভূত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এই সীমাহীন অশান্তির কালোমেঘ অপসারিত যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ জাতীয় জীবনের ভাগ্যাকাশে ইহা রাহুর ন্যায় শান্তি-স্বস্তি ও সমৃদ্ধিকে আবরিত করিয়া রাখিবে। এ বিষয়ে আমরা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র

শিশিরোত্তর ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের নবযুগস্থষ্টিতে শিশিরকুমারের প্রধান সহযোগী, বর্তমান ভারতের অভিনয়জগতের দিকপালস্বরূপ নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র গত ৮ই আশ্বিন ৮১ বছর বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। বাল্যবন্ধু শিশিরকুমারের সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকেই রঙ্গমঞ্চে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। কিছুকাল আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার পর পেশাদারিভাবে রঙ্গালয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২২ সালে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই। ঐ বছরই চলচ্চিত্রজগতেও তিনি নিজেকে যুক্ত করেন এবং আপন অসামান্যতায়, অনবদ্যতায় এবং রূপ সৃষ্টির কুশলতায় বাঙলা দেশের অভিনয় জগতে এক আলোড়ন আনতে সক্ষম হন। শেষ জীবনে ইনি যাত্রাভিনয়ে যোগ দেন এবং মৃত্যুর তিন দিন পূর্বেও দর্শকসাধারণকে তাঁর বিরাট প্রতিভার স্পর্শে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছেন বাঙলা দেশের অভিনয়জগতে টাইপ চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শকুনি, কাত্যায়ন, গোপী মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ, বেহারী, কাঙালীচরণ, সাজাহান, পানুবাবু, রামেশ্বর প্রমুখ কয়েকটি চরিত্রে তাঁর অভিনয় এক কথায় অতুলনীয়। তাঁর পরিচালিত নির্বাক ও সবাক ছবিগুলির মধ্যে আঁধারে আলো, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, নৌকাডুবি, গোরা, স্বয়ংসিদ্ধা, বিদূষী ভার্যা, বৌঠাকুরাণীর হাট, কঙ্কাল, নিয়তি, কালিন্দী, উল্কা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমুখ বহু বিখ্যাত শিল্পীর আবিষ্কারক ও শিক্ষাদাতা এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের প্রচয়িতা হিসাবে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী

প্রবীণ শিক্ষাবিদ এবং সুধীজন-সমাদৃত অলঙ্কারিক শ্যামাপদ চক্রবর্তী গত মহাষ্টমীর দিন ৭০ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৯২৮ সালে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে বাঙলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন ত্রিশ বছর পর উক্ত পদ থেকে অবসর নেন। অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় মনীষা দেশের পণ্ডিত সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। কবি হিসাবেও তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শরৎ-বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন বরেণ্য সারস্বতকে হারাল

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

তপশীলী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা পাকিস্তানের প্রাক্তন আইন মন্ত্রী এবং পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম সমর্থক যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল গত ১৮ই আশ্বিন ৬৮ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ইনি অবিভক্ত বাঙলার এবং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীসভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। পাকিস্তানের হিন্দুনীতির প্রতিবাদে তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে এসে বসবাস সুরু করেন এবং আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী ছিলেন

কেশবেশ্বর বসু

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কেশবেশ্বর বসু মহাপূজার দিন ৬৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি একদা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেনেট এবং এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরূপে ইনি দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ডাঃ গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথিতযশা চক্ষু রোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়া দশমীর দিন ৬৮ বছর বয়সে পরলোক যাত্রা করেছেন। ইনি লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ করেন। কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের চক্ষুবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের প্রধান চক্ষু চিকিৎসকের আসন তিনি অলঙ্কৃত করে গেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষুশাস্ত্রের অন্যতম পরীক্ষক রূপেও তিনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে বাঙলা দেশে একটি সম্মানজনক আসনের তিনি অধিকারী ছিলেন।

নিবারণচন্দ্র দে

প্রখ্যাতনামা বর্ষীয়ান সন্তরণবীর নিবারণচন্দ্র দে গত ৬ই আশ্বিন ৭৯ বছর বয়সে পরলোকগত হয়েছেন। বর্তমান সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা মূলে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সাঁতারু হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বাঙলার বহু দিকপাল সন্তরণবীর তাঁর কাছে এই বিদ্যা শিক্ষা করেছেন।

মহারাণী ইন্দিরা দেবী

কুচবিহারের মহারাণী ইন্দিরা দেবীর ৭৭ বছর বয়সে সম্প্রতি তিরোধান ঘটেছে। ইনি বরোদার সুবিখ্যাত গায়কোয়াড় স্বর্গত সায়াজী রাওয়ের কন্যা ছিলেন। এবং কুচবিহারের স্বর্গত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ও স্বনামধন্যা কবি ও শিল্পী মহারাণী সুনীতি দেবীর (পুণ্যশ্লোক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা) পুত্র স্বর্গত মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের সহধর্মিণী ছিলেন। কুচবিহারের বর্তমান মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ও জয়পুরের মহারাণী স্বতন্ত্র দলের অন্যতমা নেত্রী গায়ত্রী দেবী যথাক্রমে তাঁর পুত্র ও কন্যা।

ব্রজবালা ঘোষ

রাণাঘাটের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের স্বর্গত প্রিয়নিধান ঘোষের সহধর্মিণী ব্রজবালা ঘোষের গত ৫ই আশ্বিন ৮৭ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়েছে। ইনি একজন ধর্মপ্রাণা ও নিরহঙ্কারিণী মহিলা ছিলেন। চিত্রশিল্পী শ্রী সি আর ঘোষ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র।

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক এবং প্রেস-ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা-কার্যালয়ের ম্যানেজার নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ২১এ আশ্বিন ৬৪ বছর বয়সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আইন অধ্যয়নের সময় তিনি সাংবাদিক হিসাবে নিউ সার্ভেণ্ট-এ যোগ দেন। চার মাস পরে ইংরাজী দৈনিক বসুমতীতে যোগ দেন এবং বসুমতীতেই তিনি প্রকৃত সাংবাদিকতার শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠায় ইনি এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও অভাবনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন। প্রকৃত ও অভ্রান্ত সংবাদ আহরণের জন্য বার বার তিনি যে ভাবে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে অকুস্থলে গেছেন তা সাংবাদিকদের কাছে এক আদর্শস্বরূপ।

মণি পাল

সুবিখ্যাত ভাস্কর ও মৃৎশিল্পী মণি পালের গত ২০এ আশ্বিন ৫৯ বছর বয়সে প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। ভাস্কর এবং মৃৎশিল্পী হিসাবে তিনি সারা দেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর সৃষ্ট বহু বিখ্যাত মূর্তি এবং ভাস্কর্য তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

শ্রীম বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার

মহাশয়,

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরীজী পরমহংস ঠাকুরের লিখিত 'পূর্ব সীমান্তে পুণ্যতীর্থ পরশুরাম কুণ্ড' শীর্ষক একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ আপনার মাসিক বসুমতীর ১৩৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ২০৯-১০ পৃষ্ঠায় ৬টি পূর্ণ কলমে খুব ক্ষুদ্রাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার নাতনী শ্রীমতী শান্তা উহা আমাকে পড়িয়া শোনাইলে অনেক নূতন বিষয় যাহা আমি এতদিন শুনি নাই তাহা জানিয়া বিশেষ উপকৃত হইলাম। আমার মত অন্য যাঁহারা জানিতেন না, তাঁহারাও পড়িলে বা শুনিলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। চীনের ভারত আক্রমণের পর হইতে 'নেফা' কথাটা আমাদের সুপরিচিত হয়েছে, উহা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিলাম উহা আসামের উত্তরে, আর নাগাভূমি হইল হিমালয়ের পাদদেশে, আসামের উত্তরে ও নেফার দক্ষিণে আর নাগাভূমিতে হইল 'এই পরশুরাম কুণ্ড' অবস্থিত, পূজনীয় পরমহংস মহারাজ আর একটি খবর দিয়াছেন,---'হিমালয়ের পর্বতসীমা অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র যেখানে এসে সমতলে নেমেছে তার পাশেই একটা শীর্ণ জলধারার গায়ে ছিল এই 'পরশুরাম কুণ্ড'। ১৯৫০ সালের ভূমিকম্পে তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বর্তমানে ঐ জলধারা যেখানে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে, তার পাশেই নদীর জলে স্নান হয়।

এই যে জলধারার কথা পরমহংস মহারাজ উল্লেখ করেছেন উহা একটা 'প্রস্রবণ' বা 'ফোয়ারা' বলে মনে হচ্ছে, উহার ব্রহ্মপুত্র থেকে একটা পৃথক সত্তা ছিল এবং বোধ হয় এখনও আছে তাই উহাকে কুণ্ড বলে, আর ভগবানের দশাবতারের একটি অবতার পরশুরাম, তিনি পিতৃ-আদেশে কুঠার দ্বারা মাতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হওয়ায় হস্তস্থিত কুঠার তাঁহার হস্তে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। আর এই প্রস্রবণের জলে অবগাহন স্নান করিলে দৃঢ়বদ্ধ কুঠার-সুতরাং যাঁহারা দারুণ পাপকার্য অনুষ্ঠান করে দুশ্চিকিৎস্য শারীরিক বা মানসিক ব্যাধিতে পীড়িত তাঁহারা পাপ ও রোগ মুক্তির জন্যও ঐ কুণ্ডে স্নান করিবেনই, অন্য লোকে স্নান করিলেও মহান্ পুণ্য সঞ্চয় জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবেন।

পথ অতি কঠোর ও ব্যয়সাধ্য হইলেও বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, নেপাল, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি

ভারতের সব দেশ হইতেই প্রচুর পুণ্যার্থী সমাগম হইয়াছিল শুনিয়া সুখী হইলাম। 'পরশুরাম লোককল্যাণার্থে প্রচার করলেন এই কুণ্ডের কথা' 'সন্ধ্যা ৬টা হতেই ঘড়ির কাঁটার সহিত তাল রেখে এখানে ঝড়ের তাণ্ডব আরম্ভ হয়, তুফানী হাওয়ায়, পরদিন সকাল ৮টা নাগাদ শান্ত হয়।' পরমহংস মহারাজ আরও বলেছেন, 'স্থানীয় অধিবাসিগণ মিসমি জাতীয়, তাদেরকে নাগাদের পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। শিক্ষাদীক্ষার আলো ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পৌঁছাতে আরম্ভ করলেও তা মোটেই আশানুরূপ নয়। তাদের দুঃখ দৈন্য ও অশিক্ষা দেখে ভারতের ধর্মগুরুদের আত্মবিস্মৃতিতে মনকে ব্যথিত করে তুলেছিল।'

এই শেষ কথাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিলাম না। পূজনীয় পরমহংস মহারাজ ঐ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার কথা বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। 'উলুপী ছিলেন নাগকন্যা, তাহার বিবাহ হয় অর্জুনের সঙ্গে---হিমালয়ের সেখানে নেফা ও নাগাভূমির অধিবাসীদের প্রতি পাদ্রিগণের দেশদ্রোহী উপদেশ অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত---একথা বলেছেন।

ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকান পাদ্রিগণ নাগাভূমে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার করিতে পারেন, অথচ ভারতীয় সন্ন্যাসিগণ তাহা পারেন না---. ইহা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। এ বিষয়ে বিশেষ খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা প্রকাশ করিলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

'শঙ্করাচার্য দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠ, পুরীধামে গোবর্ধন মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ ও বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ স্থাপন এবং তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী---এই দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মঠাম্নায় নামক গ্রন্থ রচনা করে এদেরকে চারটি মঠের অধীনে নিয়ে আসেন'----একথা প্রবোধচন্দ্র সেনের ১২।৭।৬৮ তারিখে 'অমৃতে' প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে জানা যায়। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উহা তৎকালোচিত নহে মনে করিয়া তিনি পুরীধামে বসিয়া ও তাঁহার শিষ্যগণ বৃন্দাবনে ও অন্যত্র তাঁহার ভগবৎ ধর্ম প্রচার করেন।' তৎকালে লক্ষাধিক বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচার হয়, তৎপূর্বে নানকের শিখধর্ম মহাবীরের জৈনধর্ম প্রচার ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন হয়। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্ম আর্য-সমাজও প্রচার আরম্ভ করেন। আধুনিক-কালে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সমাজ, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার, স্বামী প্রণবানন্দের ভারত সেবাশ্রম, ভোলানন্দ আশ্রম, পাবনা সৎসঙ্গ প্রভৃতি বহু সন্ন্যাসী দল কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। ইঁহারা কেহই নাগাভূমি বা নেফা বা উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন ইহা শোনা যায় না।

ভাগ্যক্রমে ভগবান পরশুরাম এই তীর্থক্ষেত্র উদ্ধার ও প্রচার করিয়াছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে বহু সংখ্যক নরনারী এই তীর্থে

ভ্রাতা-ভগিনীগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরীজী পরমহংস মহারাজের ন্যায় একজন চক্ষুষ্মান দৃঢ়সঙ্কল্প আত্মারাম সর্বভূতে সমদর্শী ও সর্বভূত হিতে রত বাগ্মী সাহিত্যিক সন্ন্যাসী তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাই আমার মনে হয় নেফা, নাগাভূমি, মিজো ভূমি ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তস্থ পার্বত্য নাগাভূমি অঞ্চলের জনগণের অভ্যুদয় আসন্ন। ভারত সরকার সময়াভাবে ও উপযুক্ত কর্মী অভাবে তাহাদের যে সকল সাংস্কৃতিক কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হন নাই, সেই সকল কার্য ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকান খৃস্টান মিশনারিগণ আরম্ভ করে কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। এবার প্রত্যেক অঞ্চলের স্বধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ও বহু সাধু-সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছেন---সেই সাংস্কৃতিক অনুকূল হয় নাই।

এবার আমরা আশা করি ভারতীয় সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রত্যেক অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ সমবেত হইয়া উক্ত স্বামী পরমহংস মহারাজকে পুরোভাগে রাখিয়া একটি সাংস্কৃতিক মিশন গঠন করিয়া নাগাভূমি ও অন্যত্র বন ও পার্বত্য অঞ্চলে উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যেক নরনারীর বৃত্তি শিক্ষা ও নীতি ও ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যালয় দেবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি, শিল্প ও আরণ্য ও পার্বত্য উৎপন্ন সংগ্রহ ও বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিবেন, তখন আর পাশ্চাত্ত্য মিশনারিগণের প্রয়োজন হইবে না---তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে অধিবাসিগণ নিজেদের কার্য নিজেরা করিতে ক্ষমতা অর্জন মাফ করিবেন।

---শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাং—জয়নগর, জেলা—২৪-পরগণা।

মহালয়া সম্পর্কে

মহাশয়, গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'মহালয়া' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা যখন শাস্ত্রের সমস্ত অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং গাঁজাখরি গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই তখন এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সত্যই যে কতখানি যুগোপযোগী হইয়াছে এ-বিষয়ে পাঠকমাত্রেই আমার সহিত একমত হইবেন। এইরূপ আরও অনেক শাস্ত্রোক্ত অনুশাসন আছে যাহার এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র গুহ-রায় একজন মনীষী এবং সর্বজন-পরিচিত। তাঁহার কলম হইতে এইরূপ জিনিষ আমরা যাহাতে উপভোগ করিতে পারি তাহার জন্য আমি আপনার মারফৎ তাঁহাকে অনুরোধ জানাই। দীপালী, অম্বুবাচী প্রভৃতি আরও অনেক জিনিষের এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা তাঁহার লেখনী হইতে আশা করিতেছি।

পঞ্চানন চক্রবর্তী, শিক্ষক রাজবল হাট উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ—রাজবল হাট, জেলা—হুগলি।

কলা-কাকলি বিভাগ সম্পর্কে

মহাশয়, নিবেদন এই যে, আমি আপনার মাসিক বসুমতী পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা আমার ভাল লাগে। বিশেষ করিয়া 'কলা-কাকলি' বিভাগটি আমার খুব প্রিয়।

ধারাবাহিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'তিনপরুষ' আমার সবচেয়ে ভাল লাগিতেছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের এক গসন্ধিক্ষণের কথা লেখক যে দক্ষতার সহিত উপন্যাসাকারে প্রকাশ করিতেছেন

তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় নতুন রচনার মধ্যে 'মনে রেখো' লেখাটি খুব ভাল। বিশেষ করিয়া লেখার ভাষা ও স্টাইল। এই প্রসঙ্গে একটি সমালোচনা করি। শ্রাবণ সংখ্যায় লেখক হরিহরপুর নামে একটি স্টেশন লালগোলা সেকসনে আছে লিখিয়াছেন। এ নামে কোনও স্টেশন নাই। মনে হয় লেখক ইচ্ছা করিয়াই স্টেশনের নাম দেন নাই। নদীয়ার যে ভয়াবহ বন্যার পটভূমি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক। লেখার বিষয়বস্তুও যথেষ্ট প্রাণবন্ত। 'গাছের পাতা নীল'ও একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এ ছাড়া 'সঞ্জয় উবাচ' নামক রচনাটিও খুবই উপভোগ্য। শ্রীভগবানের নিকট আপনার পত্রিকার মঙ্গল কামনা করিয়া পত্র শেষ করলাম। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

নৃপেন্দ্রনাথ করণ, ২৫সি, কেদারনাথ দাস লেন, কলিকাতা-৩০।

বাংলা ছায়াছবির সংকট প্রসংগে

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙলা ছায়াছবির সঙ্কট' প্রসঙ্গে সময়োপযোগী সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই সঙ্কটের ফলে বাংলা ছায়াছবির অন্ধকার যেভাবে ঘনিয়ে আসছে তাতে দেশের সকল অনুরাগীরা উদ্বিগ্নবোধ করছেন, এমন কি অদূর-ভবিষ্যতে এই চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট শোচনীয় আকার ধারণ করা অসম্ভব নয়। বাংলা-ছায়াছবিকে জাতীয়-জীবন এবং চরিত্র গঠনের এক অন্যতম মাধ্যম বললে হয়ত অতিশয়োক্তি করা হবে না। এই শিল্প যাতে ধ্বংসের মুখে না যায় সেজন্য সরকারকে অনুরোধ করছি বাংলা ছায়াছবির সঙ্কট মোচনে।

—শ্রীতিমির দাশগুপ্ত, ৭৭, অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী লেন, রাসমণি বাজার, বেলেঘাটা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am remitting herewith the sum of Rs. 18/- for the annual subscription of Masik Basumati from Ashar 1375 B.S. to Jyaistha 1376 B.S. Please arrange to send the Masik Basumati regularly. Balaram Chakravarty, Salanpur, Burdwan.

●৮৩ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, তুরা, গারো হিলস, আসাম ● ৮৪ বি এ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, পাঁচগ্রাম, জেলা—কাছাড়, আসাম ● ৮৫ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, শিলং, আসাম ● ৮৬ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, মাসিমপুর জেলা, কাছাড়, আসাম ● ৯০ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, আগরতলা, ত্রিপুরা ●৯১ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আগরতলা, ত্রিপুরা ●৯২ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, বোগাফা, ত্রিপুরা ●৯৩ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, আগরতলা, ত্রিপুরা ● ৯৫ বি এন বর্ডার সিকিউরিটি, প্যানেল মণিপুর ● শ্রীমতী বি বর্মণ, ডাক—টিভিন গোরা ● শ্রীনিখিলকুমার মাইতি, গ্রাম—পূর্ব রামনিয়া, ডাক—দরিয়াপুর জেলা—মেদিনীপুর ●শ্রীমতী ইলা দেবী, অব—শ্রীত'রকদাস ভট্টাচার্য, ৮।১০ (নতুন ৮।১২) ফুলবাড়ী রোড, মালদা ●শ্রী এ সি মুখোপাধ্যায়, ডাইরেক্টর পি ডবলিউ ডি পোস্ট বক্স নং ২১৫ মাসকট ●শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা, জয়বীরপাড়া, টি-ই, ডাক—বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি ● শ্রী এম কে রায়, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, বাণী পার্ক, জয়পুর-৬ রাজস্থান।

আমাদের বই পাঠককে তৃপ্তি দেয় ঃ পাঠাগারের শোভা [illegible]

আমাদের সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থরাজি ঃ

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের
অবিস্মরণীয় ছোটদের গল্প-সংগ্রহ

ঘনাদা চতুর্মুখ ১০·০০

[১৮টি সুবৃহৎ গল্পের সমন্বয় গ্রন্থ]

অমর কথাসাহিত্যিক
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ছোটদের শ্রীকান্ত ৩·০০

গ্রিফিথ ও রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থকার
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহের

জ্ঞানের আলো জ্বাললো যারা ৩·০০

[বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ]

শিউলি সেনগুপ্তের ছোটদের উপন্যাস

পিকলু ২·৫০

প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক স্বপনবুড়োর
ষোড়শ গল্পের অপূর্ব সমন্বয় গ্রন্থ

স্বপনবুড়োর সহজ কথা ২·০০

বাংলা কথাসাহিত্যের কয়েকখানা বাছাই করা বই ঃ

প্রাণতোষ ঘটকের
আকাশ পাতাল ১৮·০০

অজিতকৃষ্ণ বসুর
প্রজ্ঞাপারমিতা ১০·০০

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত
প্রমীলা প্রকৃতি ২০·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
কাঁচ পুঁতি হীরে ৯·০০

বনফুলের
হাটে বাজারে ৪·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই ৭·০০

বিমল মিত্রের
সুয়োরানী ৩·২৫

সুনীলকুমার নাগের
মনের আলোয় দেখা ৫·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শুভবিবাহ কথা ৩·৫০

অগ্নিমিত্রের
নাবিক ও নক্ষত্র ৭·০০

বনফুলের
ত্রিবর্ণ ১০·০০
স্থাবর ৮·০০

মহাশ্বেতা দেবীর
অমৃত সঞ্চয় ১০·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কোকিল ডেকেছিল ৩·২৫

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
যখন তরঙ্গ ৭·০০
অপরাহ্নের আলো ৪·৫০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
সৃষ্টি ৫·৫০

আই. এ. পি.-র **প্রতিষ্ঠা সপ্তাহ ঃ ১৫ই—২২শে নভেম্বর** এই সপ্তাহে আমাদের প্রকাশিত স্কুল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক, নোট বই ; নানা শ্রেণীর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কিশোর-সাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর পুস্তকের ওপর **ক্রেতা-সাধারণকে ১০% পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠাগার সমূহকে ৫% (অতিরিক্ত) কমিশন দেওয়া হবে।**

গ্রাম : কালচার (বি)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১

মাসিক বসুমতী

॥ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ॥

মহাত্মাজী

—শ্রীসুধীর খাস্তগীর অঙ্কিত

॥ দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥

কথামৃত
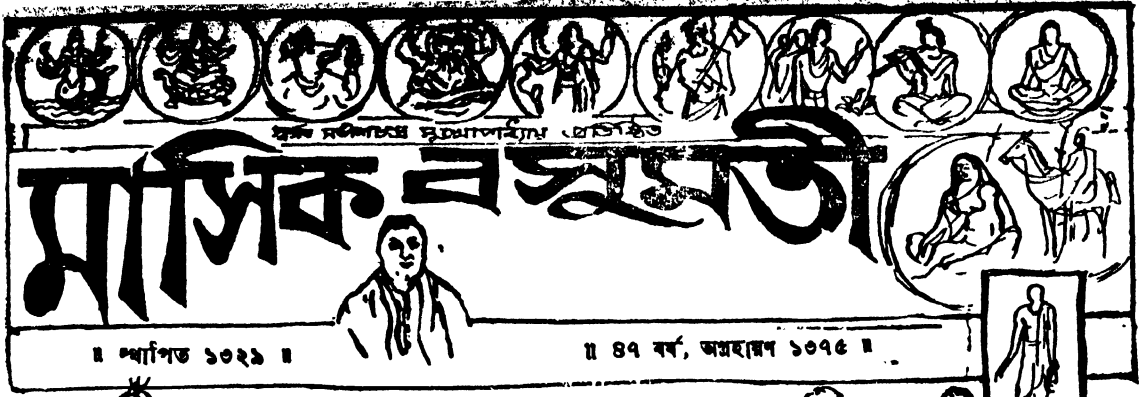
বিদ্যামায়া

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যিনি লীলায় এ সংসার রচনা করেছেন তিনিই আদ্যাশক্তিরূপিণী মহামায়া। তাঁর ভিতরে বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া—দুই-ই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, এসব হয়; আর অবিদ্যামায়া আশ্রয় করলে পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিষ—এরা মুগ্ধ ক'রে বন্ধন ক'রে ফেলে—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

দেখ না, বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়।

তবে অবিদ্যা করেছেন কেন? না,—অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না; দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না; মন্দ' জ্ঞান থাকলে তবে 'ভাল' জ্ঞান হয়। খোসাটি আছে বলেই আমটি বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হ'য়ে গেলে তখন খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

"বিদ্যামায়া ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়। বিজ্ঞান লাভ করার জন্য তাই বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়; ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য; আবার তাঁর নামগুণ কীর্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা—এসব বিদ্যামায়ার ভিতর। বিদ্যামায়া যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পৈঠা; আর একধাপ উঠলেই ছাদ। ছাদে উঠা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ। বিদ্যামায়া ধ'রে ধ'রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

ব্রহ্ম কিরূপ জান? যেমন বায়ু। সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সব বায়ুতে আসছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম গুণাতীত—মায়াতীত; অবিদ্যামায়া, বিদ্যামায়া দুয়েরই অতীত। কামিনী-কাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি—এসব বিদ্যার ঐশ্বর্য। বিদ্যামায়া ধ'রে ধ'রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

"কেউ কেউ ছাদে পৌঁছুবার পরও সিঁড়িতে আনাগোনা করে—জ্ঞানলাভের পরও 'বিদ্যার আমি' রাখে লোকশিক্ষার জন্য, যেমন নারদ, শুকদেবাদি, শঙ্করাচার্য। কেউ বা 'ভক্তের আমি' রাখে ভক্তি আস্বাদ করবার জন্য, ভক্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্য—যেমন চৈতন্যদেব।

"সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, শান্তি-অশান্তি, বিদ্যা-অবিদ্যা—ওসব জীবের পক্ষে—যতক্ষণ তাঁকে লাভ হয় নাই, ততক্ষণ; লাভ হ'লে পর নির্লিপ্ত হ'তে পারে। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবত পড়ছে, কেউ বা জাল করছে—প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের উপরও আলো দিচ্ছে, দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।"

বিদ্বেষ ভাব

শ্রীরামকৃষ্ণ—"মতবাদ নিয়ে ঝগড়া ভাল নয়—বিদ্বেষ ভাব ভাল নয়। জানবে সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি; জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে, যতদূর পার। তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হ'য়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব রাখবে না। হোক্ না মুসলমান, খৃস্টান, বা হিন্দু—সাকার বা নিরাকারবাদী—ঘৃণা কাকেও করবে না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন, সে তেমনি বুঝেছে। এই জেনে সবার সঙ্গে মিশবে, আর ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি, আনন্দ ভোগ করবে। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্ব স্ব রূপকে দেখতে পাবে—নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকবে'।"

'বিনা হরিনাম চার জাত চামার'

ভক্ত তুলসীদাস বলতেন,—'অষ্ট ধাতু পরশমণি ছোয়ালে সোনা হ'য়ে যায়।' তেমনি সব জাতি—চামার, চণ্ডাল পর্যন্ত হরিনাম করলে শুদ্ধ হয়। আবার 'বিনা হরিনাম চার জাত চামার'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যে চামড়া ছুঁতে নেই, সেই চামড়া পাট করার পর ঠাকুরঘরে লয়ে যাওয়া যায়। ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নামকীর্তন অভ্যাস করতে হয়। আমি যদু মল্লিকের মাকে বলেছিলাম, যখন মৃত্যু আসবে, তখন সেই সংসারচিন্তাই আসবে। পরিবার, ছেলেমেয়ের চিন্তা—উইল করার চিন্তা, এই সব আসবে, ভগবানের চিন্তা আসবে না। উপায়—তাঁর নাম জপ, নামকীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যু-সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। তাই মৃত্যু-সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁর নাম করা। হাতী নাওয়ার পর যদি আস্তাবলে যায় তবে আর ধুলোকাদা মাখতে পারে না।"

বিবেক

বিবেক কাকে বলে? মিথ্যা থেকে সত্যকে, অনিত্য থেকে নিত্যকে, অন্যায় থেকে ন্যায়কে বেছে নেওয়ার যে শক্তি তার নাম বিবেক। বৌদ্ধ শাস্ত্রে যাকে 'মনদ্বার ভঞ্জন' বলে, অর্থাৎ যে গুণলাভে মনের দরজা খুলে যায়, তারই নাম বিবেক। জীবাত্মা

প্রকৃতপক্ষে কি চায়, কিসে তার কল্যাণ হবে, তা স্থিরভাবে বিবেক-যুক্ত বিচার দ্বারাই বুঝতে হয়। বিবেকই দেখিয়ে দেয়—বলে দেয় যে, আসক্তি আর কামনা—এরাই বন্ধনের কারণ; আবার সকল মায়িক বিষয়ে বিরাগই মুক্তির কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। সৎ মানে নিত্য,—আর অসৎ মানে অনিত্য। ঈশ্বরই সৎ, কিনা, নিত্যবস্তু; আর সব অসৎ—অনিত্য—দুদিনের জন্য—এইটি বোধ। বিবেক উদয় হলে এইটি বোধ হয়, আর ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভালবাসলে—যেমন দেহসুখ, টাকা, লোকমান্য এ সব ভালবাসলে—কামনা-বাসনার দাস হলে, ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে। একটা গান শোন—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ও রে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে তখন শ্যামা মা'কে পাবি॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।।
যদি মোহ গর্তে টেনে লয় ধৈর্য খোঁটা ধরে রবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু, বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি॥"

মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়; বিবেক হলে তবে তত্ত্ব-কথা মনে উঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, কালীকল্প-তরুমূলে। সেই গাছতলায় গেলে,—ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়ায়ে পাবে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

"সংসার-সমুদ্রে কামাদি ছয়টি কুমীর আছে। হলুদ মেখে জলে নামলে কুমীর ছোঁয় না। বিবেক বৈরাগ্য সেই হলুদ। তখন 'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে' অনায়াসে 'কালী বলে ডুব' দেওয়া যায়—

'রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে॥'

তাই, বিবেকলাভ একটা অপূর্ব সুযোগ—ঈশ্বর লাভের দিকে এগিয়ে দেয়।

"বিবেক বৈরাগ্য না হলে শুধু পাণ্ডিত্যে কোন লাভ হয় না। বেশী শাস্ত্র পড়ার দোষ হচ্ছে, ওতে তর্কবিচার এই সব এনে ফেলে। যদি বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ হয়—তবেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়। বিবেকরূপ জল ছাঁকা দিয়ে ছেঁকে শাস্ত্রের সারমর্ম গ্রহণ করতে হয়। বিবেক না হলে শাস্ত্রের মানে ঠিক বোঝা হয় না। সামাধ্যায়ী বলেছিল—ঈশ্বর নীরস। যিনি রসস্বরূপ তাঁকেই বললে কিনা নীরস! বিবেক না হলে উপদেশও গ্রাহ্য হয় না।"

বিভূতি

গীতায় বিভূতি যোগে শ্রীভগবান যে বিভূতির উল্লেখ করেছেন সে বিভূতি হচ্ছে বি (বিবিধরূপে) ভূতি (উৎপত্তি; মহিমা), অর্থাৎ সর্বপ্রকারে তাঁর সর্বাত্মকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব, এবং সর্ববস্তুসম্পাদন সামর্থ্য; তাতে দেখিয়েছেন যে জগতের নিমিত্তকারণও তিনি, আর উপাদানকারণও তিনি।

তবে, সাধারণত বিভূতি বলতে আমরা বুঝি অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য—

'অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা তথা।
ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িত্ব এব্ চ॥'

শিবের এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য আছে বলেই তিনি সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে থাকেন, দেখাতে—যে এ সব বিভূতি ভস্মমাত্র—ছাই-এর মত মূল্যহীন।

এই বিভূতিকেই চলতি কথায় 'সিদ্ধাই' বলে। বিভূতির আবির্ভাব জ্ঞানের অব্যর্থ লক্ষণ নয়। তপস্যা, যোগাভ্যাস, দ্রব্য, মন্ত্র, ক্রিয়া, কাল ইত্যাদির দ্বারা বিভূতি লাভ হতে পারে, এবং হয়। আত্মজ্ঞান এই সকল বিভূতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ যাদের লক্ষ্য বিভূতি লাভের দিকে তাদের আত্মজ্ঞান হয় না। 'আমি সাক্ষী' এই জ্ঞানের বাধা হচ্ছে 'আমি কর্তা'-বোধ। বিভূতি দ্বারা 'আমি কর্তা'-বোধটাই দৃঢ় হয়। বিভূতি আর মোক্ষ এই দুটি বিপরীত বস্তু। বিভূতি অবিদ্যা, কাজেই পরমপদ প্রাপ্তি বিষয়ে বিভূতি কোনরূপ সাহায্যই করে না; করতে পারেও না।

তবে একটা কথা আছে। কোন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি হয়ত প্রারব্ধ-যোগবশত সিদ্ধি-জাল বাঞ্ছা করেন। তখন তিনি সিদ্ধি-সাধক দ্রব্য বা ক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল ক্রমশ সাধন করেন।

বিরাট

লীলা থেকে গুণে পৌঁছিলেই দেখা যায় যে তিনি মূর্তি মাত্র নহেন; তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁরই মধ্যে। তারই মধ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণাদি। দেবতাগণ, প্রজাপতিগণ, ঋষিগণ, মরুৎ, সাধ্য, সিদ্ধ, রুদ্র, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, অপ্সর, কিন্নর মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর ইত্যাদি—এক কথায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁর মধ্যে। তাই তাঁর হাজার হাজার হাত, পা, চোখ, কান, মাথা চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি তাঁরই ত্রিনেত্র; নদীগুলি শিরা, বনস্পতিগণ রোমরাশি। এই বিশ্বরূপই বিরাট—তাঁর বিরাট দেহ—সমষ্টি স্থূল শরীরে উপহিত চৈতন্য।

এই বিরাটের উপলব্ধি যার হয়েছে, সে বিশ্বের সর্বত্র তাঁকেই দেখে—নিজেকেও তাঁর বিরাট দেহের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ভেবে তাঁর একান্ত শরণাগত হয়। তাই তার সর্বত্রই আনন্দ—তার দুঃখের কোন হেতু নাই। কারণ সবই তার কাছে 'তিনি'—দুঃখও 'তিনি'। এই বিরাটের উপলব্ধিই ভক্তের চরম উপলব্ধি। কিন্তু সাধনার শেষ এখানেই নয়।

স্থূল শরীরে যিনি বিরাট, তিনিই সূক্ষ্ম শরীরে হিরণ্যগর্ভ,

আর কারণ শরীরে ঈশ্বর। কিন্তু এই সকল নাম ও রূপ পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ নয়। যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন সকল নাম রূপ—স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীরই তাঁর পরম নির্গুণ স্বরূপে লীন হয়; সে পরব্রহ্মের উপলব্ধিই সাধনার শেষ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায়, তিনি স্বরাট তিনিই বিরাট। তিনিই অখন্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীবজগৎ হয়েছেন। তাই আমি নিত্যলীলা দুই-ই লই।

"তিনি নিরাকার, আবার তিনিই সাকার। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তাঁর ইতি নাই—শেষ নাই; তাঁতে সব সম্ভবে। যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্ম কেমন—তা বলা যায় না। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম, আর কিছুই নাই।"

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেছেন—"মা! তুমিই মন, প্রাণ ও জ্ঞান-যখন তুমি জীব ভাবাপন্ন সংসাররূপে আত্মপ্রকাশ কর, তখন তোমার নাম মন। এইরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ের অনুভূত ব্যাষ্টি-চৈতন্যই প্রাণ, এবং প্রতিজীবে নিয়ত প্রকাশমান বুদ্ধি জ্ঞান নামে অভিহিত। প্রতিজীবে অনুভূয়মান এই ব্যাষ্টি মন, প্রাণ ও জ্ঞান একটি সমষ্টি বিরাট মন, প্রাণ ও জ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র। প্রতিজীবে যাহা মন, প্রাণ ও জ্ঞান নামে অভিহিত সমষ্টিতে তাহাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে বর্ণিত।

"ঐ বিরাট মন, প্রাণ ও জ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—উঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করতে হলে, স্বকীয় জীবভাবীয় মন, প্রাণ ও জ্ঞানের সন্ধান করতে হয়। উঁহাদিগকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলে পূজা করতে হয়। যেমন পৃথিবীর অন্তর্নিহিত জলরাশি স্পর্শ করতে হলে নিজ প্রাঙ্গণে কূপ খুঁড়লেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়, তেমনি বিরাটের বা সমষ্টির সন্ধান করতে হলে নিজের অন্তরে অনুভূয়মান ব্যষ্টি সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মহামায়ার যে শক্তি-বিন্দুটুকু তোমার ভিতরে প্রকাশ পাচ্ছে—যে অংশটুকু তোমার আয়ত্তে আছে, তাকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জননী বলে বুঝতে চেষ্টা কর। উঁহারই চরণে তোমার সুখ-দুঃখের কথা নিবেদন কর। উনিই মহতী শক্তিরূপে প্রকটিতা হয়ে তোমার অবসাদ দূর করবেন।"

বিরুদ্ধ শাস্ত্রের সমন্বয়

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বিভিন্ন শাস্ত্রে অনেক সময় আপাত-বিরুদ্ধ মত দেখতে পাওয়া যায়। এক পুরাণের মতে কৃষ্ণকে চিদাত্মা, রাধাকে চিৎশক্তি বলেছে। আবার আর এক পুরাণে কৃষ্ণই কালী—আদ্যাশক্তি বলেছে। দেবীপুরাণের মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন। তা হলেই বা! তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত!

"ছাদে উঠা নিয়ে কথা। যে কোন উপায়ে উঠতে পারলেই হলো—দড়ি, বাঁশ, সিঁড়ি, যে কোন উপায়ে। ঈশ্বরের দয়া হলে এ সব সহজে বোঝা যায়। ঈশ্বরের কৃপা না হলে সংশয় আর যায় না।

"কথাটা এই যে, কোনরকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয়—ভালবাসা হয়। নানা খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তাহলেই হলো। ভালোবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে। তারপর যদি দরকার হয়, তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন—সব পথের খবর বলে দেবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হলো—নানা বিচারের দরকার নাই। হনুমানের ভাব—'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র জানি না—এক রাম চিন্তা করি'।"

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

আচার্য রামানুজ স্বামী বিশিষ্ট অদ্বৈত মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। এই তিন তত্ত্বই সত্য:

(১) জীবাত্মাই চিৎ—জীবাত্মাই ভোক্তা।

(২) প্রত্যক্ষগোচর যাবতীয় পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতিই অচিৎ—জড়াত্মক, ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত; যথা: ভোগ্যবস্তু, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। ভোগ্যবস্তু হচ্ছে অন্ন জলাদি; ভোগোপকরণ ভোজন পাত্রাদি; আর ভোগায়তন শরীরাদি।

(৩) ঈশ্বর বিশ্বের উপাদান ও কর্তা; তিনি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ। চিৎ ও অচিৎ তাঁরই শরীর। তিনি সর্বজীবের নিয়ন্তা।

জীবাত্মা ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী বলে দেহটা যেমন জীবাত্মার শরীর বলে ভাবা হয়, তেমনি পরমাত্মা জীব ও জড়ের অন্তর্যামী বলে জড় ও জীবাত্মাকে পরমেশ্বরের শরীর বলে গণ্য করা যায়। জীব নিত্যদাস—ভগবানের দাসত্ব করে দেহাত্মবোধ চলে গেলে সে বুঝতে পারে যে সে চিৎকণা। যেমন অগ্নিরাশিতে অগ্নিকণা মিশলে বা ধূলিরাশিতে ধূলিকণা মিশলে তাদের পৃথকত্ব যায় না, তেমনি অবিদ্যা গেলেও জীব শুদ্ধ হয়ে পৃথকই থাকে—একীভূত হয় না; বৃহতের সঙ্গে থেকে বৃহতের সেবা করে। পরমাত্মা ঈশ্বর—জীবাত্মা তাঁর দাস। সেই পরমাত্মা ভক্ত-বৎসল। ভক্তগণ উপাসনা দ্বারা সাধনায় উন্নতি লাভ করে বৈকুণ্ঠবাসী হয়ে তাঁর সুপবিত্র নিত্যসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। এ মতের প্রধান বিষয়গুলি এই:—

(১) ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়;

(২) জীবাত্মা সকল ব্রহ্মের অংশ, পরস্পর ভিন্ন, এবং ব্রহ্মের দাস;

(৩) জগৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণাম, সুতরাং সত্য;

(৪) সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম, সত্য জগৎ ও অল্পজ্ঞ জীব, একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ;

(৫) আদিত্য ও তাঁর প্রভা যেমন স্বরূপত ভিন্ন নয়, কিন্তু আদিত্য তাঁর প্রভা থেকে অধিক, তেমনি জীব ব্রহ্ম থেকে স্বরূপত ভিন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্ম জীব থেকে অধিক।

(৬) বৃক্ষ যেমন বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখারূপে নানা, ব্রহ্ম তেমনি ব্রহ্মরূপে এক, কিন্তু জগৎরূপে নানা।

(৭) জীব যদি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়, তার ব্রহ্মরূপ হতে

পারে না; কিন্তু উপনিষদ বলেন, 'জীবই ব্রহ্ম'। আবার জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন না হলে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার চলে না; কারণ ব্যবহার ভেদসাপেক্ষ, আর ব্যবহারকে অস্বীকারও করা যায় না। তাই জীব ভিন্ন এবং অভিন্ন দুই-ই। অভিন্ন বলেই মোক্ষ সম্ভব হয়; আবার ভিন্ন বলেই লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সম্ভব হয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে এজন্য ভেদাভেদবাদও বলে।

বৃন্দাবনে শেঠেদের মন্দির এই রামানুজপন্থী আচারী সম্প্রদায়ের মন্দির।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজের মত। কিনা, জীবজগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম; সব জড়িয়ে একটি।

যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন—তখন বোধ হয় 'ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ'—জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বীচি আলাদা করা যায়, আর যদি বেলটা কত ওজনের ছিল দেখতে হয়, তবে শুধু শাঁস ওজন করলে ত' হবে না, খোলা বীচি সমস্তই ধরতে হবে। সব ধরলে তবে বলতে পারবে বেলটা এত ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ; জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে—অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্তাতে শাঁস, সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সবটাই বুঝতে হবে। যার শাঁস, তারই খোলা, বীচি।

"যাঁরই নিত্য (Absolute) তাঁরই লীলা (Relative), যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য; যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন—বাপ-মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভালমন্দ, শুচি-অশুচি, সমস্ত। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

"যতক্ষণ 'আমি'-বোধ থাকে ততক্ষণ জীবজগৎ মিথ্যা বলবার নাই। 'আমি'-বোধ বড় যায় না। তাই ভক্তরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দুই-ই লয়, অরূপ রূপ দুই-ই গ্রহণ করে।"

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

এ মাসের প্রচ্ছদপট

ওয়াশিংটন আরভিং

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকা তখন সবেমাত্র একটি নতুন জাতি হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। স্বভাবতঃই নতুন উপনিবেশিকরা সাহিত্যিক প্রকাশ হিসেবে ইংরেজদের সাহিত্যকেই আদর্শ বলে মনে করত। এই নতুন দেশের সাহিত্য ইংরেজদের সাহিত্য-ধারারই অনুসারী ছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য নতুন দেশে জোর চেষ্টা চলতে লাগল। এই প্রচেষ্টারই প্রথম সাফল্য দেখতে পাওয়া গেল নিউ ইয়র্কের ইতিহাস গ্রন্থখানিতে। গ্রন্থটির লেখক ২৬ বছরের এক যুবক। নাম ওয়াশিংটন আরভিং। 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল'-এর স্রষ্টা ওয়াশিংটন আরভিং। এঁর সাহিত্য-প্রতিভা দেশে প্রবল সাড়া জাগালো।

১৭৮৩ সালে আরভিং জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে এক আইন-ব্যবসায়ীর অফিসে ঢোকেন। কিন্তু তাঁর রোম্যান্টিক ও রসিকতা-প্রিয় মন আইনের কুটিল পথের উপযোগী ছিল না। এ পেশা তিনি ছাড়লেন। সংবাদপত্রের জন্য রঙ্গরসিকতা ও চটল লেখায় তিনি মন দিলেন। নাট্যমঞ্চের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা দিল খুব অল্প বয়সেই।

যুবক আরভিং ঘুরে বেড়াতো হাডসন নদীর তীরে স্বপভরা চোখে। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করতো। পরে এই পটভূমিকাতেই তাঁর বিখ্যাত গল্প 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল' ও 'দি লিজেণ্ড অব স্লিপি হলো' রচিত হয়েছিল। প্রথম গল্পটিকে আধুনিক ছোট গল্পের জনক বলা হয়েছে।

'নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে' গ্রন্থখানির সাফল্যের ফলে আরভিং বেশ খ্যাতনামা হয়ে উঠলেন। প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট তাঁর পরিবারের লোকজনদের বইখানি জোরে জোরে পড়ে শোনাতেন এবং লর্ড বায়রন নাকি বইখানি পড়তে পড়তে রাত কাটিয়ে দিতেন।

১৮১৫ সালে আরভিং দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গেলেন ১৭ বছরের জন্য। এখানে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'স্কেচ-বুক' একই সঙ্গে আমেরিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি লেখককে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলল। পরেই এল তাঁর 'ব্রেস-ব্রিজ হল'। আরও পরে 'টেল্‌স অব এ ট্রাভেলার' এবং দি 'আলহাম্‌ব্রা'। অতি সরল, সুললিত, মধুর ও ছন্দময় রচনারীতি এই গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য। এডগার অ্যালান পো বলেছিলেন এ ভাষা ও রচনাশৈলী 'অননুকরণীয়'। আরভিং-এর লেখা কলম্বাসের জীবনীমূলক গ্রন্থখানিতে সমুদ্রযাত্রার সুন্দর পাঠযোগ্য কাহিনী প্রথম পাওয়া গেল।

আরভিং ১৭ বছর পরে ফিরে এলেন দেশে। প্রকাশিত হল একের পর এক 'এ টুর অব দি প্রেয়ারীজ', 'অ্যাসটোরিয়া', "দি অ্যাডভেঞ্চার্স অব ক্যাপ্টেন বনভিল'।

১৮৪২ সালে তিনি স্পেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। জর্জ ওয়াশিংটনের ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ আরভিং-এর অমর সাহিত্যকীর্তি। ১৮৫৯ সালের ২৮শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

আরভিং মার্কিন সাহিত্যের গর্ব। তিনিই সর্বপ্রথম মার্কিন সাহিত্যে মহৎ বিষয়বস্তুর অবতারণা করেন।

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

॥ দুই ॥

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মমত ও রাজনীতি-চিন্তা এক গভীর স্বাজাত্যবোধের দ্বারা পরিচালিত ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতভেদের ফলে সেই স্বাজাত্যবোধ উৎসারিত হলো শতধারায়। প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্র-মানসে জাতি-চেতনা এবং স্বদেশ-চিন্তা তখন বিচিত্র কর্মাবলীর মধ্যে দিয়ে একটা পূর্ণতর সাফল্যের পথে এগিয়ে চলছিল। এই সাধন-পথে তিনি উপযুক্ত সঙ্গী পেয়েছিলেন নবগোপাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুকে। যোগেশ-চন্দ্র বাগল মহাশয় প্রসঙ্গত লিখেছেন 'তাঁর মত পুরোপুরি স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে দুজন---রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়।'

---দ্রঃ মুক্তির সন্ধানে ভারত।

প্রকৃতপক্ষে এই দুই কর্মিষ্ঠ পুরুষের উৎসাহ ও ঐকান্তিক সহায়তার ফলেই ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার ভিত্তিভূমিতে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

বাংলা দেশে নবগোপাল মিত্রের আবির্ভাব জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উগ্র স্বদেশীয়ানার ক্ষেত্রে নবগোপাল এক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। নব উদ্ভাবিত 'ন্যাশনাল' শব্দটির অনবরত আস্বাদনে তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন। পরবর্তীকালে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় নবগোপাল সম্পর্কে শ্রীমনোমোহন বসু মহাশয় লিখেছিলেন,---

'অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয় ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান প্রচলন কর্তা।--- তাঁহার মুখে 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়।' তাঁহার সকল কা˝ 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়।'

---দ্রঃ জাতীয়তার নবমন্ত্র : যোগেশ-চন্দ্র বাগল।

বাস্তবিকই তাঁর সকল কার্যই ছিল জাতীয় নামাঙ্কিত। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'ন্যাশনাল পত্রিকা', প্রেসের নাম 'ন্যাশনাল প্রেস', বিদ্যালয়ের নাম 'ন্যাশনাল স্কুল', ব্যায়ামাগারের নাম 'ন্যাশনাল জিমনাসিয়াম', সভার নাম 'ন্যাশনাল সোসাইটি' (জাতীয় সভা), মেলার নাম জাতীয় মেলা (হিন্দুমেলা) এবং সার্কাসের নাম 'ন্যাশনাল সার্কাস'। মনে রাখতে হবে ভারতীয় জাতীয় চেতনার জন্ম-যুগে নবগোপালই সর্ব-প্রথম 'ন্যাশনাল' বা 'জাতীয়' শব্দটির বহুল প্রচার এবং প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন।

'ঘরোয়া'তে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন---

'নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতেন ন্যাশনাল নবগোপাল, তিনিই প্রথমে ন্যাশনাল শব্দ সুরু করেন। তখনও ন্যাশনাল কথাটার চল হয়নি।'

নবগোপাল মিত্র জাতীয় ভাবের দ্বারা কিরূপ গভীরভাবে প্রাণিত হয়েছিলেন হিন্দুমেলার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা লক্ষ্য করব। হিন্দুমেলার অধিবেশনগুলিকে সার্থক করে তোলার জন্য তিনি নিদ্রা ভুলে যেতেন। তৎকালীন অমৃত-বাজার পত্রিকায় প্রসঙ্গত লেখা হয়ে-ছিল,---

'Babu Nabagopal has left off eating, sleeping and his roaring from door to door.'

কলকাতার শিমুলিয়ার অধীন শঙ্কর ঘোষ লেনের এই 'জাতীয় মানুষ' নবগোপালের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নিবিড় যোগ ঘটেছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথের তিনি বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি তাকে তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মের দায়িত্ব দিতেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথের সঙ্গেও নবগোপালের নিবিড় সখ্যতা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তার বাল্যবন্ধু। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই নবগোপাল মিত্র ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চার আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় এবং নবগোপাল, রাজনারায়ণ বসু ও ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য সন্তানগণের সমষ্টিগত ঐকান্তিক উৎসাহেই পরবর্তীকালে হিন্দুমেলার যজ্ঞভূমি থেকে নব্য স্বাদেশিকতার জন্ম হয়।

নবগোপালের মত কর্মিষ্ঠ সমাজসচেতন যুবককেই দেবেন্দ্রনাথ আপন সামাজিক কর্মের সহচররূপে পেতে চেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' হস্তান্তরিত হওয়ার পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য জনগণপক্ষপাতী যে সংবাদপত্রের অভাব অনুভব করছিলেন, নবগোপালের সহায়তায় জাতীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করে তিনি সে অভাব পূরণের চেষ্টা করলেন। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে নবগোপালের সম্পাদনায় দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে প্রকাশ পেল 'দি ন্যাশনাল পেপার' নামক ইংরাজী পত্রিকা। 'ন্যাশনাল পত্রিকা'র মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ ও দেশবাসীর কাছে, দেশপ্রেমের পতাকাতলে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানালেন নবগোপাল। ন্যাশনাল পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এবং নবগোপাল মিলিত জাতীয় আন্দোলনে শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যাপক আকারে একটি স্থায়ী গণসংস্থা এবং সমাবেশ প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করছিলেন। কারণ, সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল আন্দোলনের ব্যর্থতায় বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্যদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল—কর্মপ্রকল্প সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, কেউ কেউ স্বার্থান্বেষীও হয়ে পড়েছিলেন।

কলিকাতায় যখন দেবেন্দ্রনাথ এবং নবগোপাল স্বাদেশিক জাতীয় সভা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন, তার কিছুকাল পূর্বেই মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' বা 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করে স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে এক নূতন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হেতু অহেতু ইংরাজী শব্দ ব্যবহারের প্রবণতারোধ করে মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন, স্বদেশী শিল্পসম্পদের উন্নয়নের দ্বারা স্বাবলম্বন ভাব জাগিয়ে তোলা এবং সর্বোপরি জাতির স্বাধীনতা কামনাকে সফল করার উচ্চতর আদর্শগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাজনারায়ণ তাঁর স্বদেশচর্চা সুরু করেছিলেন। সে সময়ে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সরকারী কর্মচারী থাকাকালে এ জাতীয় প্রকাশ্য স্বদেশচর্চার মধ্যে যথেষ্ট দুঃসাহস থাকা প্রয়োজন। রাজনারায়ণ নিঃসন্দেহে সে শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর দুঃসাহসিক বিপ্লবী মানসিকতার জন্য তিনি 'গ্র্যাণ্ড-ফাদার অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র রাজনারায়ণের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর থেকে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভায় ইংরাজী অনুবাদ করতেন তিনি। মহর্ষির নেতৃত্বে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনারায়ণ তার পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৫১ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে রাজনারায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের চাকুরী ত্যাগ করে মেদিনীপুরের সরকারী বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। 'মেদিনীপুরের সমুদায় শুভকর কার্যে' তিনি 'মল ও মস্তকস্বরূপ ছিলেন'। মেদিনীপুরে থাকাকালীন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিরূপ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ ১৯৬৪ জুলাই মাসে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে লিখেছেন,—

'আমার ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে অবসর লইবার জন্য আমাকে বড়ই ব্যস্ত করিতেছে। এ সময়ে যদি তোমাকে পাই তবে ইহা হইতে আর অধিক আহ্লাদ আমার কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া রহিয়াছি।'

—দ্রঃ দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী।

সম্ভবত এই সময় পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রমসাধ্য কর্মাবলী দেবেন্দ্রনাথকে অবসন্ন করে তুলছিল। কর্মের জগৎ থেকে ছুটি নিয়ে ধর্মীয় প্রশান্তির মধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে চাইছিলেন তিনি। সম্ভবত সেই কারণে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব তিনি রাজনারায়ণের উপর অর্পণ করার নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। মহর্ষির মনোনয়নে ভুল ছিল না। কিছু দিনের মধ্যেই রাজনারায়ণ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ধর্মগুরুরূপে ঠাকুরবাড়ীর দেবেন্দ্রোত্তর পুরুষদের স্বাদেশিকতার নব্যমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

উল্লিখিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী' সভার প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনারায়ণ তাকে নিখিল বঙ্গে সম্প্রসারিত করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ও নবগোপালের চেষ্টায় কলকাতায় জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটতে চলেছিল। রাজনারায়ণ এই অনুকূল পরিবেশেই কলকাতায় এলেন তাঁর সভার পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার উদ্দেশ্যে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়, রাজনারায়ণের উদ্যোগে এবং গণেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ নব্য যুবকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে 'স্বাদেশিকদের সভা' প্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরবাড়ির যুবকগণ এই

প্রথম স্বাদেশিকতার জগতে আত্মপ্রকাশ করে দেশাত্মবোধের দীক্ষা নিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাটক, রচনা, ধর্মালোচনা সকল কিছুর মধ্যে দিয়ে ঠাকুরবাড়ীর স্বাজাত্যচেতনা গভীরভাবে অনুশীলিত হয়ে এক মহান জাতীয় আদর্শের রূপ নিতে থাকল। খুব সম্ভব, রাজনারায়ণের 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা'র আদর্শসমন্বিত পরিকল্পনাটি 'Prospectus of a Society for the promotion of National feelings among the educated natives of Bengal' নাম দিয়ে স্বাদেশিকের সভায় আলোচিত হয় এবং ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে ইংরাজী প্রচারিত হয়। (পরিকল্পনা-প্রস্তাবটির উমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত বঙ্গানুবাদের জন্য রাজনারায়ণ বসুর 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং নবগোপাল মিত্র এরূপ সুচিন্তিত স্বাদেশিক প্রকল্পটিকে সাদরে গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরের 'ন্যাশনাল পেপার'-এ এবং ১৭৮৭ শকের চৈত্র সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'Prospectus'টি মুদ্রিত হয়ে বহুল প্রচারিত হয়। Prospectusটি যেন দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘকালীন সাধনার বাঞ্ছিত ফলরূপে এসে পড়ে। প্রস্তাবিত বহুমুখী কর্মসূচীর উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন,---

'এই খসড়াটি থেকে আমরা জানিতে পারি, অন্যূন আশী বৎসর পূর্বে একজন বঙ্গ সন্তানের (রাজনারায়ণ) মনে স্বাজাত্যবোধ কিরূপ পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের জাতীয়তা সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই তবে যে উহা সার্থক হইবে, ইহার মধ্যে তা অত্যন্ত প্রকট। ইহাতে মোটামুটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি রাজনারায়ণ স্বদেশবাসীদের মনোযোগ দিতে বলিয়াছিলেন---স্বদেশীয় ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিকিৎসা-বিদ্যা, ইংরাজী, শিক্ষারম্ভের পুর্বেই বালক-বালিকাদের যথোপযুক্ত রূপে মাতৃভাষা শিক্ষাদান, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলন, বাংলা শব্দ ব্যবহার দ্বারা কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতাসম্পাদন, বাংলা ভাষায় পরস্পরকে পত্রলেখা, বাঙালীর সভাতে বাংলা ভাষায় বক্তৃতাপ্রদান, সুরাপানাদির বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা এদেশে যাহাতে প্রচলিত না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কারকার্য সম্পাদনা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি স্বদেশীয় সুপ্রথা সকল রক্ষা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার সম্পূর্ণ বর্জন, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় প্রভৃতি।' (দ্রঃ সাহিত্যসাধক চরিতমালা: রাজনারায়ণ বসু অধ্যায়) এই অনুক্রমে মূল ইংরাজী খসড়াটির শেষাংশটুকু প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত হল:

"It would be unreasonable to expect that such a society would prove to be the cause of every national feeling. Its main object would be to promote and foster national feelings which would lead to the formation of a national character and thereby to the eventual promotion of the prosperity of the nation."

---দ্রঃ তত্ত্বোধিনী পত্রিকা/১৭৮৭ শক, চৈত্র)

জাতির মনে 'National feeling' জাগ্রত করার ও 'National character'-এর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় জাতীয় জীবনে রাজনারায়ণ যে সমুন্নত স্বাদেশিক বোধের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন বাংলা দেশে তা এক যুগান্তকারী অভীপ্সা।

রাজনারায়ণের এই খসড়া পরিকল্পনার প্রতিধ্বনি তুলেই 'ন্যাশনাল পেপারে' (২০শে, মার্চ ১৮৬৭) 'A National Gathering' নাম দিয়ে সাধারণ্যে একটি আবেদন প্রচারিত হয়। এই আবেদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ শাসিত ভারত ভূখণ্ডের সকল শ্রেণীর মানুষকে সমভ্রাতৃত্বসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করা---

রাজনারায়ণ বসু,
—রবীন্দ্র সদনের সৌজন্যে

"The interests of our country however demand .... that we should .... try to see each and everyone our countrymen in that spirit of brotherly love ... unless we try to do so, all our attempts to move in a National cause or carry any national cause into a successful issue must abortive."

এ আবেদনেই সর্বপ্রথম 'চৈত্র সংক্রান্তির' দিনে 'National Gathering' বা জাতীয় সমাবেশ (মেলা)-র প্রস্তাব আনা হয়েছিল। আবেদনটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, সর্বজাতীয়ত্বের ভিত্তিতে এই জাতীয় সমাবেশের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন আবেদক। এই আবেদনেই পূর্বোক্ত National Gathering-এর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিতব্য আন্দোলনকে A movement which is national নামে অভিহিত করা হয়েছিল। আবেদনপত্রটি যে দেবেন্দ্র-নির্দেশিত এবং নবগোপাল-রচিত ছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে। তবে স্বীকার্য যে রাজনারায়ণের Prospectus-টিই এই আবেদনপত্র রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবেদনে যে প্রভূত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেই শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ পূর্বোক্ত খসড়া এবং আবেদনপত্রের পরিকল্পনার মধ্যে নব্য স্বদেশচিন্তার উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। সুতরাং নবগোপাল ও দেবেন্দ্রনাথ যে জাতীয় সমাবেশের আশা করেছিলেন রাজনারায়ণের সহায়তায় সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে সে সমাবেশ ঘটাতে দেরি হয়নি। সমাজের তৎকালীন কতিপয় প্রভাবশালী মানুষের উৎসাহে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিলের পূর্বে কোন এক সময়ে জাতীয় মেলা বা চৈত্র মেলা (পরে হিন্দুমেলা) প্রতিষ্ঠার বিষয় চূড়ান্ত হয়ে যায়। প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ ও [illegible]পুত্র গণেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে এবং নবগোপাল রাজনারায়ণ ও ঠাকুর বাড়ীর অন্যান্য সন্তানগণের আন্তরিক সহায়তায় চীৎপুরের রাজা নরসিংহচন্দ্র বাহাদুরের উদ্যানে (দ্র: 'দেশ' সাহিত্য সং ১৩৭৪, The National Paper, April 17, 1867) ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে চৈত্র মেলার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। (ইংরাজী ১২ এপ্রিল, ১৮৬৭ খৃ:)। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীনবগোপাল মিত্র মহাশয়। অন্যান্য পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নাট্যকার নন), প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। (দ্র: পূর্ববৎ)

এই প্রসঙ্গে আমরা চৈত্র মেলা (পরে হিন্দু মেলার)-র একটি কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপিত করব।

আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ্য করা গেছে যে, রাজনারায়ণের খসড়া পরিকল্পনার আদর্শেই জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে স্বয়ং রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন:

'শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার' অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্রমহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।'

উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যবিষয়ক কর্মসূচী প্রায় অভিন্ন। সুতরাং রাজনারায়ণ বসুর উক্তি যে যথার্থ তাতে সন্দেহ নেই। তবে প্রসঙ্গক্রমে এও স্বীকার্য যে, রাজনারায়ণ পরিকল্পিত প্রস্তাবসমূহের বাস্তব রূপ দেওয়ার বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের কৃতিত্বই সম্পূর্ণ।

এ মন্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন—

"In 1867 the Hindu Mela was started. Devendra Nath was the Inspirer and founder of this institution, Ganendra Nath Tagore was its secretary, Naba Gopal Mitra its assistant secretary." (দ্র: Evolution of Swadeshi thought : Soumyendra Nath Tagore)

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার নবগোপাল মিত্রর ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন—

"A practical shape was given to Rajnarain's ideas by Nabagopal Mitra through the periodical, National paper, edited by him, and the annual Hindu Mela, a gathering on the last day of the Bengali year, instituted by him." (দ্র: Glimpses of Bengal in the 19th Century.)

এই বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি সমর্থনোচিত উদ্ধৃতিও উপস্থিত করা হলো। লেখা হয়েছে—

'প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে 'ন্যাশনাল পেপার' অর্থাৎ 'স্বজাতীয় সম্বাদপত্র' প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সম্বাদপত্রকে তিনিই উক্ত নাম প্রদান করেন। ঐ আখ্যাপ্রদান অল্প কার্যকর হয় নাই। তারপর প্রায় দশ বৎসর হইল 'স্বজাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব' নামক একটি প্রস্তাব ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়।--- প্রস্তাব লেখকের প্রস্তাবাকল কখনই

ঠাকুর পরিবারের কার্যে পরিণত হইত না যদ্যপি হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপক মহাশয় উহা অবলম্বন করিয়া হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন না করিতেন (দ্রঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : আশ্বিন, ১৭৯৮ শক)।

উল্লেখযোগ্য যে মহর্ষিদেবের প্রেরণায় নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণের খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পূর্বেই একাধিকবার নানান উপলক্ষে বাংলা দেশের (তথা ভারতবর্ষের) এবং 'হিন্দুবর্গ'কে একত্রিত ও দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও ঐক্য সঞ্চার করার চেষ্টা করেছিলেন। উপনিষদের স্তন্যরসে লালিত দেবেন্দ্রনাথ সনাতন হিন্দু জাতিত্ববোধের মধ্যে যে ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐক্য সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন, সহস্র বৎসরের পরীক্ষিত সেই ভিত্তির উপরেই তিনি সমকালীন বাংলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি-ইমারত প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাজনারায়ণের প্রস্তাব ও নবগোপালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁর সে স্বপ্নকে সফল করেছিল হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

হিন্দু মেলার জন্ম-কারণ নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'---পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, চড়ক বা গাজন উৎসবের বিকল্প হিসাবে চৈত্র মেলা (হিন্দু মেলা)র প্রচলন হয়। এই প্রতিবেদন যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নয়। চৈত্র মেলার কার্য-বিবরণীতেও কোথাও এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। হিন্দুমেলার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহিতও ঐ জাতীয় সামাজিক উৎসবের কোন মিল পাওয়া যায় না।

[ক্রমশ।

শান্তিপূর্ণ কাজে আণাবক শক্তির প্রয়োগ

শান্তিপূর্ণ কাজে আণবিক শক্তিকে আজকাল নানাভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলেছে, বিশেষত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে। পশ্চিম জার্মানী এ কাজে প্রচুর এগিয়ে গেছে। হিসেব অনুসারে ১৯৮০ সনে পশ্চিম জার্মানীর প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আণবিক শক্তি থেকে পাওয়া যাবে এবং সেই শক্তি তখন কয়লা, তেল কিম্বা জলবিদ্যুৎ থেকে উৎপন্ন শক্তির চেয়ে কম খরচে তৈরি হবে। এটা ধ্রুব সত্য যে, প্রচলিত শক্তির উৎসগুলি আরও কিছুকাল চলবে কিন্তু আগামী বিশ বছরে যখন বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা চতুর্গুণ হবে এবং দুনিয়ার মজুত কয়লা ও তেল একদিকে কমে আসবে ও অন্যদিকে যানবাহনের জন্য খনিজ তেলের চাহিদা বেড়ে যাবে, তখন আণবিক শক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে সেই ফাঁক পূরণ না কোরে উপায় নেই।

তাই পশ্চিম জার্মানীতে পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানি করা যায়। এখন পশ্চিম জার্মানীর তৈরি হেভী ওয়াটার রি-অ্যাক্টর বেশি বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু ১৯৮০ সাল নাগাদ ফাস্ট ব্রীডার জাতীয় রি-অ্যাক্টরের চাহিদা বেড়ে যাবে, কারণ তার সুবিধা অনেক বেশি।

পশ্চিম জার্মানীতে সম্প্রতি মহাকাশে ব্যবহারের উপযোগী একটি রি-অ্যাক্টর তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। আঠারো ইঞ্চি উঁচু, চোদ্দ ইঞ্চি ব্যাসের এই ক্ষুদে রি-অ্যাক্টরের ওজন ২'৪ পাউণ্ড এবং এথেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে কুড়ি থেকে ষাট কিলোওয়াট। এই শক্তি উৎপন্ন করতে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো হবে। মহাকাশযান ও সংবাদ আদানপ্রদানকারী উপগ্রহগুলিকে এই রি-অ্যাক্টর থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হবে।

কতি দেবাঃ ?

মুক্তাকণা সেনচৌধুরী

কতি দেবাঃ? দেবতার সংখ্যা কত? প্রশ্নটি ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল। রাজর্ষি জনকের 'বহু দক্ষিণ' যজ্ঞসভায় সমবেত ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠব্রহ্মজ্ঞ নির্ণয় সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অপরাপর প্রধান ঋষিদের তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই তর্কযুদ্ধে অশ্বল, আর্তভাগ, ভূজ্যু, উষস্ত এবং ব্রহ্মবাদিনী গার্গী একে একে পরাজিত হইলে, বিদগ্ধ ঋষি শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে ঠিক এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা হইতেই ইহার গুরুত্ব অনুমান করা যায়। এই তর্কযুদ্ধের চিত্তাকর্ষক এবং তত্ত্ববহুল বিস্তৃত বিবরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের আলোচনায় আমরা পরে ফিরিয়া আসিব। ইতিমধ্যে অপরাপর ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই সম্পর্কে কি বলা হইয়াছে তাহা দেখিয়া লইব।

শতপথ ব্রাহ্মণে প্রথমে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে---

'ত্রয়ো বৈ দেবাঃ বসবো রুদ্রাঃ আদিত্যা।' ---১।৩।৪।১২

অর্থাৎ বসুগণ, রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ এই তিন শ্রেণীর দেবতা। পরে বিশেষভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে বলা হইয়াছে---

'অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশাদিত্যাঃ, দ্যাবা পৃথিবী ত্রয়স্ত্রিংশ্যৌ'---৪।৫।৭২।

অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং দ্যাবা (অন্তরিক্ষ) এবং পৃথিবী---এই তেত্রিশটি দেবতা।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে (১২।৬) সোমপানকারী দেবতার সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে 'তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ সোমপাঃ দেবতাঃ।'

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে (১০।১।১৬) দেখা যায় দেবতা ৩৪ জন।

'ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবতা প্রজাপতিশ্চতুস্ত্রিংশঃ।'

অর্থাৎ পূর্বোক্ত ৩৩জন দেবতার সহিত প্রজাপতিকেও দেবতাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

গো-পথ ব্রাহ্মণের উত্তরভাগে (২।১৩) বসু, রুদ্র ও আদিত্য ব্যতীত অপর যে দুই দেবতার নাম করা হইয়াছে তাঁহারা 'বাক্' এবং 'স্বর'।

'বাগদ্বাত্রিংশী স্বরস্ত্রয়স্ত্রিংশ' অর্থাৎ দ্যাবা ও পৃথিবীর পরিবর্তে বাক্ এবং স্বর এই দুইটি নাম যুক্ত করিয়া তেত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করা হইল।

বসু কাঁহারা?

শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।৬।৭।৪) বলেন---

'কত মে বসবঃ ইতি। অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ, চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসবঃ'---

অর্থাৎ অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য (সূর্য), দ্যুলোক, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রমণ্ডলী---ইহারাই অষ্টবসু। বৃহদারণ্যকেও ঠিক ইহাই বলা হইয়াছে (তৃতীয় অধ্যায়, নবম ব্রাহ্মণ)।

পৌরাণিক মতে ধ্রুব, ভব, আপ, বিষ্ণু বা ধব, অনল, অনিল, প্রত্যূষ এবং প্রভাস বা প্রভাব---ইহারাই অষ্ট বসু। লক্ষণীয়---গীতায় (১০।১৩) ভগবান বলিয়াছেন,---

'বসূনাং পাবকশ্চাস্মি।'

পাবক নামটি এই তালিকায় নাই। তবে সমার্থবাচক অনল শব্দটি আছে বটে। একথা বলার কারণ এই যে, দেখা যাইবে রুদ্র ও আদিত্যগণের নামের পৌরাণিক তালিকায় সমার্থবাচক নাম দ্বারা বিভিন্ন দেবতা সূচিত হয়েছে।

রুদ্র কাহারা?

ভাগবতের মতে (৩।১২) মন্যু, মনু, মহিনস্, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উর্ধ্বরেতা, ভব, বামদেব, কাল এবং ধৃতব্রত---এই একাদশ রুদ্র।

পুরাণান্তরে দেখা যায়---অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর এবং ঈশ্বর---এই একাদশ জনই একাদশ রুদ্র।

মতান্তরে একাদশ রুদ্রের নাম---অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র এবং হর। লক্ষণীয় ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিবের বিভিন্ন নাম। একই শিব কেন একাদশ রুদ্র বলিয়া কথিত হইবেন? আরো লক্ষণীয় গীতায় ভগবান বলিয়াছেন---

'রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি'---১০।২৩।

কিন্তু এই তিনটি বিভিন্ন তালিকায় শঙ্কর নামটি নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।৬।৭।৫) বলা হইয়াছে---

'দশমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মৈকাদশঃ'

অর্থাৎ জীবদেহে অবস্থিত দশ প্রাণ এবং আত্মা---ইহারাই একাদশ রুদ্র। রুদ্র নামের কারণও বলা হইয়াছে। মৃত্যুকালে মানবদেহ হইতে ইহাদের উৎক্রমণের সময় ইহারা মৃতব্যক্তির স্বজনদিগকে রোদন করায়।

'রোদয়ন্তি তস্মাৎ রুদ্রা ইতি।'

বৃহদারণ্যকেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এই দশ প্রাণের অর্থ করিয়াছেন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। এবং এখানে আত্মার অর্থ করিয়াছে মন।

তন্ত্রমতে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক দশবিধ প্রাণবায়ু জীবদেহে অবস্থান করে এবং মৃত্যুকালে তাহারা জীবদেহ ত্যাগ করে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও একস্থলে প্রাণ, অপান ও ব্যান এই ত্রিবিধ প্রাণবায়ুকে সুস্পষ্টভাবেই দেবতা বলা হইয়াছে---

'প্রাণ অপানো ব্যানস্তিস্রো দেবাঃ' ---২।৪।

আদিত্য কাহারা?

পুরাণ বলেন কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভজাত---ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু এই দ্বাদশ সন্তানই দ্বাদশ আদিত্য। অদিতির পুত্র বলিয়াই তাহাদের আদিত্য বলা হয়।

মতান্তরে আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, সহস্রাংশু, ত্রিলোচন, হরিদশ্ব, অহঃপতি, দিনকৃৎ, দ্বাদশাত্মক, ত্রয়ীমূর্তি ও সূর্য---এই বারজনই দ্বাদশ আদিত্য। লক্ষণীয়---উভয় তালিকার অধিকাংশ নামই সূর্যের বিভিন্ন নামমাত্র।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন---(১৪।৬।৭।৬)

'দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।' অর্থাৎ বৎসরের দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য। বৃহদারণ্যকেও এই কথাই বলা হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কৌতুকাবহ আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে---যথা, সূর্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থা হওয়ায় সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্মা সূর্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বাদশ খণ্ডই বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন নামে গগনে উদিত হন। মাঘ মাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য, চৈত্র মাসে বেদজ্ঞ, বৈশাখ মাসে গভস্তি, ভাদ্র মাসে যম, আশ্বিন মাসে হিরণ্যরেতাঃ, কার্তিক মাসে দিবাকর, মার্গশীর্ষ মাসে (অগ্রহায়ণে) মিত্র এবং পৌষ মাসে বিষ্ণু।

এবার আমরা বৃহদারণ্যকের সেই তর্কযুদ্ধের কথায় ফিরিয়া যাইব।

'অথ হৈনং বিদগ্ধ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি?' (তৃতীয় অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণ)। অতঃপর (অর্থাৎ গার্গী পরাজিত হইয়া নীরব হইলে) বিদ্বান ঋষি শাকল্য প্রশ্ন করিলেন---হে যাজ্ঞবল্ক্য। দেবতার সংখ্যা কত? বৈশ্বদেব-যজ্ঞ-প্রকরণে প্রদত্ত নিবিদ অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা-বাচক মন্ত্র সকল অবলম্বনে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন---

'ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রেতি।'

অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তিন শত তিন এবং তিন হাজার তিন।(১) শাকল্য 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন---

'কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি' ---'যাজ্ঞবল্ক্য দেবতার সংখ্যা কত তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন---

'ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি'।

অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। শাকল্য 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া পুনরায় একই প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য এবার বলিলেন 'ছয়'।

শাকল্য তাহাও স্বীকার করিয়া পুনরায় একই প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তিন'।

শাকল্য তাহাও স্বীকার করিয়া পুনরায় একই প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'দুই'। পরবর্তী একই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন 'অধ্যর্ধ' অর্থাৎ 'দেড়'। পুনরায় একই প্রশ্ন করিলে, বলিলেন, 'এক ইতি'। শাকল্য তাহাও স্বীকার করিলেন।

অতঃপর 'সঙ্খ্যেয় স্বরূপং পৃচ্ছতি' ---অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংখ্যক দেবগণের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন।

'কতমে তে ত্রয়শ্চ---ত্রীচ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রেতি?'

অর্থাৎ পূর্বে তুমি যে বলিয়াছ দেবতা ৩০৩ এবং ৩০০৩, তাহারা কে কে?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, 'মহিমান এবৈষামেতে, ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি।' তাঁহারা তেত্রিশ দেবতার মহিমা অর্থাৎ বিভূতিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে দেবতা তেত্রিশজন।

শাকল্য---'কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি'। সেই তেত্রিশ দেবতা কে কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---'অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রা; দ্বাদশ আদিত্যাঃ, তে একত্রিংশৎ, ইন্দ্রঃ এব প্রজাপতিঃ চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি'। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি।

শাকল্য---'কতমে বসব ইতি'। এই বসুগণ কে কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---'অগ্নিশ্চ, পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসবঃ। এতেষু হীদং সর্বং হিতমিতি তস্মাৎ বসব ইতি।'---অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রনিকর ইহারাই অষ্ট বসু। এই দৃশ্যমান্ সমস্ত জগতকে ইহারা বাসস্থান দিয়াছেন বলিয়াই ইহারা বসুপদবাচ্য। (বাসয়ন্তি বসন্তি চ তস্মাৎ বসবঃ---শঙ্কর)।

শাকল্য---'কতমে রুদ্রা ইতি'---এই রুদ্রগণ কে কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---'দশমে পরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ।' জীবদেহে বর্তমান দশ প্রাণ এবং আত্মা ইহারাই একাদশ রুদ্র।

'তে যদাস্মাদ্ শরীরাৎ মর্ত্যাৎ উৎক্রমন্ত্যথ রোদয়ন্তি, তদ্ যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি।'

এই একাদশটি পদার্থ যখন মানবের দেহ হইতে মৃত্যু-কালে নির্গত হইয়া যায়, তখন তাহারা পরিত্যক্ত দেহ সম্পর্কিত স্বজনদিগকে রোদন করায়। রোদন করায় বলিয়াই তাহারা রুদ্রপদবাচ্য।

শাকল্য---'কতমে আদিত্যা ইতি' ---আদিত্য কাহারা?

যাজ্ঞবল্ক্য---'দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্য আদিত্যাঃ'---সংবৎসরের দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য। 'এতে হীদং সর্বমাদদন যন্তি। তে যদিদং সর্বমাদানা যন্তি, তস্মাৎ আদিত্যা ইতি।'

ইহারাই পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইয়া প্রাণিগণের 'আদদানা' (আয়ু ও কর্মফল) গ্রহণ করিয়া চলিতে থাকে। আদদানা গ্রহণ করে বলিয়াই ইহারা আদিত্য পদবাচ্য। (বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কৃত অনুবাদ)।

শাকল্য---ইন্দ্র কে এবং প্রজাপতি কে?

১। ঋক, ৩।১১।৯ দ্রষ্টব্য।

যাজ্ঞবল্ক্য---'স্তনয়িত্নু'ই ইন্দ্র এবং বজ্রই প্রজাপতি।

শাকল্য---স্তনয়িত্নু কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---অশনি অর্থাৎ বজ্রই স্তনয়িত্নু।

শাকল্য---যজ্ঞ কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---'পশব ইতি'---যজ্ঞের সাধনভূত পশুই যজ্ঞ। (ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন, যজ্ঞের কোন আকৃতি নাই এবং পশু ব্যতিরেকে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না বলিয়া পশুগণই যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়।)

শাকল্য---তুমি যে ছয় জন দেবতার কথা বলিয়াছ, তাঁহারা কে কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য এবং দ্যুলোক ইঁহারাই ছয় দেবতা। ইঁহারাই সব অর্থাৎ তেত্রিশ দেবতা ইঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং বিস্তারমাত্র।

শাকল্য---তুমি যে তিন দেবতার কথা বলিয়াছ তাঁহারা কে কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---এই তিন লোকই (অর্থাৎ---ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক) সেই তিন দেবতা।

শাকল্য---তুমি যে দুই দেবতার কথা বলিয়াছ, তাঁহারা কে কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---অন্ন এবং প্রাণই সেই দুই দেবতা।

শাকল্য---তোমার কথিত 'অধ্যর্ধ' (অর্থাৎ দেড়খানা) দেবতা কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---'যোঽয়ং পবত ইতি' ---এই যাহা প্রবাহিত হইতেছে (অর্থাৎ বায়ু)।

শাকল্য---বায়ুকে দেড়খানা দেবতা বলা হয় কেন? কেহ কেহ তো বায়ুকে একা বলিয়াই জানে।

যাজ্ঞবল্ক্য---এই বায়ু প্রবাহিত থাকে বলিয়াই অন্যান্য দেবতা অধি-ঋদ্ধি (সমধিক সম্পদ) প্রাপ্ত হন। তাই ইহাকে অধ্যর্ধ বলা হয়।

শাকল্য---তুমি যে একটি দেবতার কথা বলিয়াছ, সেই একটি দেবতা কে?

যাজ্ঞবল্ক্য---'প্রাণ ইতি। স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে'। সেই একমাত্র দেবতা প্রাণ; সেই প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ। যোগিগণ অপ্রত্যক্ষ (পরোক্ষ বস্তুবাচক) 'ত্যৎ' শব্দ দ্বারা তাঁহার নির্দেশ করেন। অতঃপর শাকল্য এই সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করেন নাই।

এইবার আমরা বেদে দেবতার সংখ্যা কিরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখিব। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের একাদশ মন্ত্রে অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে---

'তোমরা ত্রিগুণ একাদশ (ত্রিভিঃ একাদশৈঃ) দেবগণের সহিত মধুপানার্থে এখানে আগমন কর।' সায়নাচার্য 'ত্রিভিঃ একাদশৈঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ত্রয়স্ত্রিংশৈঃ'। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে ২য় মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'দেবতাগণের সংখ্যা তেত্রিশ। তাঁহারা সত্য এবং যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন।' অষ্টম মণ্ডলের ৩৫ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রেও অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞে ভক্ষণকারী ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণের সহিত আহ্বান করা হইয়াছে। ৮।২৮।১ মন্ত্রে এবং ৮।৩০।২ মন্ত্রেও যজ্ঞার্হ দেবগণের সংখ্যা ৩৩ বলা হইয়াছে।

অথর্ববেদের ১০।৭ মন্ত্রেও 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবাঃ' কথাটি তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে। যথা---

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতাঃ।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃস্বিদেব সঃ॥

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গেগাত্রা
বিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে
ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা যাঁহার অঙ্গে সমাহিত হইয়া অবস্থান করেন, তেত্রিশ দেবতা যাঁহার অবয়বস্বরূপ, সেই সর্বাধারই স্কম্ভ অর্থাৎ ব্রহ্ম। কেবল ব্রহ্মবিদ্‌গণই তাঁহাকে জানেন।

একটি বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার

জানেন কি ডিজেল ইঞ্জিন কে উদ্ভাবন করে ছিলেন এবং কবে?

আজ থেকে ৭৫ বছর আগে রুডলফ ডিজেল নামে একটি লোক মাথা খাটিয়ে ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করেন।

চালু ইণ্টারন্যাল কম্বাশন ইঞ্জিনে ইলেকট্রিক স্পার্কের সাহায্যে ফ্যুয়েলকে জ্বালানো হয় কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে সেই কাজ নিজে থেকেই হয় 'হাই প্রেসার' ও 'কম্প্রেশন হিটের' সাহায্যে।

ডিজেল তাঁর ইঞ্জিনের আশ্চর্য উন্নতি দেখে যেতে পারেন নি। ১৯১৩ সালে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে হঠাৎ তিনি নিখোঁজ হয়ে যান এবং অনেকে বলেন যে, নৌকায় সমুদ্রের মাঝে গিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

আজকাল সেই ডিজেলের এতো উন্নতি হয়েছে যে, লরি বাস এমন কি প্রাইভেট গাড়ি ছাড়াও জাহাজে ও বিমানে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার হচ্ছে। আধুনিক সুপারট্যাঙ্কারের জন্য 40,000 হর্স পাওয়ার পর্যন্ত ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যচিন্তা

মানিকতলা বোমার মামলায় সওয়ালকালে বিচারক বীচক্রফ্‌টের আদালতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেদিন রাজনীতির সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবে সেদিন শুধু ভারতবর্ষেই নয়---সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে অরবিন্দ ঘোষ পরিচিত হবেন, 'দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার মন্ত্রোচ্চারক এবং মানবতার প্রেমিক হিসাবে।' সত্য হয়েছে কবি চিত্তরঞ্জনের সেই ভবিষ্যদ্দর্শন। সেদিনের বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ আজ পথদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ।

ইংরাজ-ত্রাস অরবিন্দ ঘোষের বিপ্লবী জীবনের রোমাঞ্চকর ইতিহাসের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। 'বাসুদেব'-এর ধ্যানধন্য শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে আমরা অভিভূত। কিন্তু, অন্তত আমার মনে হয়, এ দু'টি পরিচয়ের অন্যেয় দুর্বার ভার আর একটি পরিচয়কে অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে পরিচয় তাঁর কবি-সমালোচক সত্তার পরিচয়। 'যুগান্তর', 'কর্মযোগিন্' বা 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর যে রচনা, তার সঙ্গে সেকালের ও একালের বহুজনেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। কিন্তু তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্য বা 'দ্য ফিউচার পোয়েট্রি' এগুলির সঙ্গে অনেকেরই পরিচয়ের স্বল্পতা অনস্বীকার্য।

এর মুখ্য কারণ বোধ হয় তার রচনার অনন্যসাধারণ গাম্ভীর্য। তাঁর প্রতিটি রচনাই নিবিড় এক অনুভূতির রঙে রঙীন। দর্শন এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত রচনাগুলিতে আবার এই অনুভূতিটি নিবিড়তম। বলা বাহুল্য এ অনুভূতি যোগীর অনুভূতি। মিস্টিকের অনুভূতি। তাই প্রচলিত অর্থে নান্দনিক তৃপ্তির জন্য যাঁরা কাব্যের বা কাব্য-সমালোচনার রাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁদের অনেকেরই কাছে শ্রীঅরবিন্দের এই শ্রেণীর রচনাগুলি কিছুটা দুরধিগম্য। অবশ্য দুরধিগম্য হলেও এগুলির মূল্য কিন্তু সন্দেহাতীত।

সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'আর্য' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত 'দ্য ফিউচার পোয়েট্রি' সাহিত্য-তাত্ত্বিক শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের মূলসূত্র। এই রচনাগুলি,

শ্রীঅরবিন্দ

যতদূর জানি, বর্তমানে দুর্লভ। কিন্তু এগুলিকে বাদ দিলেও আমাদের আরও একটি মাধ্যম রয়েছে---বিভিন্ন সময়ে লিখিত তাঁর পত্রাবলী। কয়েকজন কবিশিষ্যকে লিখিত এই পত্রগুচ্ছ শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যমতের সঙ্গে পরিচিত হবার পক্ষে পর্যাপ্ত।

এই পত্রাবলীর সুরুতেই চোখে পড়েছে তাঁর কবিতা-বিশ্লেষণ। বিশুদ্ধ এবং নিখুঁত একটি কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এরকম একটি কবিতার সৃষ্টি তখনই সম্ভব হয়, যখন কবিতা-সৃষ্টির মূলে যে অনুপ্রেরণা সেই অনুপ্রেরণাটি যথাযথ এবং অবিকৃত অবস্থায় অন্তর্মানসে উপনীত হয়ে বাঙ্‌মূর্তি পরিগ্রহ করে। একটি কবিতার সৃষ্টিতে বহিঃচেতনার ভূমিকা অপেক্ষাকৃত গৌণ। কবির অন্তর্লোকে যে ভাবটি বাঙ্‌মূর্তি পরিগ্রহ করেছে সেটির বহিঃপ্রকাশেই বহিঃচেতনার ভূমিকা শেষ।

তাঁর মতে অন্তর্মানসের প্রশান্তি স্থৈর্য অথবা অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, মাত্রাতিরিক্ত ভাবাচ্ছন্নতা ইত্যাদির উপর কবিতার গুণাগুণ নির্ভর করে। একটি কবিতার জন্মকালে কবির অন্তর্মানস যদি অতিরিক্ত উত্তেজিত থাকে তা'হলে কবিতাটি সে উত্তেজনার উত্তাপে উত্তপ্ত থাকলেও প্রায়শই কালজয়ী কবিতার যোগ্যতায় দীন হয়ে পড়ে। তাঁর এই অভিমত যে কত যথার্থ, তা সেকালের এবং একালেরও, অনেক কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বুঝতে পারি। সেদিন পরাধীনতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন ছিল কবির অন্তর্লোক। যত দিন গিয়েছে বিদেশী রাজশক্তির শাসন-শোষণ ততই বেড়েছে আর ততই বিক্ষুব্ধ হয়েছে কবিচিত্ত।

এই জ্বালা, এই বিক্ষোভ আর তার সঙ্গে সুতীব্র স্বাধিকার-আকাঙ্ক্ষা সেদিনের অনেক কবির কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছিল। দেশাত্মবোধক কবিতা হিসাবে এগুলি আমাদের পরম শ্রদ্ধার্হ, কিন্তু এগুলিকে যখন কবিতা হিসাবে বিচার করি, তখন দেখি এগুলির অনেক ক'টিই ঠিক 'কবিতা' নয়।

কবি রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা হীনতায়---'অথবা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজরে শিঙা বাজ এই রবে?' প্রভৃত দেশাত্ম-বোধক মূল্য থাকা সত্ত্বেও, কবিতা বিচারের নিরিখে 'কবিতা' নয়। সাম্প্রতিক কালের অনেক কবির অনেক সৃষ্টির সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এ যুগ অবক্ষয়ের যুগ, হতাশার যুগ, একটি সর্বব্যাপী 'এনুই'র যুগ। বর্তমান জীবন 'সপ্তরথী চিন্তা দিয়ে ঘেরা'। এই হতাশা, এই রিক্ততাবোধ, জীবনের চিরন্তন মূল্যগুলিতে এই আস্থাহীনতা---এগুলির বৃশ্চিকদংশনে বর্তমানের কবিচিত্তও অস্থির। কবি যেখানে দার্শনিক প্রশান্তির সঙ্গে এই যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন মাত্র, সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি 'কবিতা' হয়েছে। কিন্তু আবেগের 'ওয়েস্ট উইণ্ড' যখনই কবিমানসকে দিশাহারা করেছে, তখনই তাঁর সৃষ্ট হয়েছে যন্ত্রণাজর্জর যুগের দর্পণমাত্র। ক্ষতলেহনের আনন্দদান ব্যতীত সে সৃষ্টির অন্য কোনও সার্থকতা নাই।

শ্রীঅরবিন্দের মতে কবির বহির্মানস যদি তাঁর অন্তর্লোকে মূর্ত-ভাবটির প্রকাশে কোনও অন্তরায়ের সৃষ্টি করে, তাহলেও কবিতা কবিতা-হিসাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। কবিতার সার্থকতার জন্য প্রয়োজন কবিমানসের অন্তরে-বাহিরে সাযুজ্য।

শ্রীঅরবিন্দের এই কবিতা-বিশ্লেষণ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-এর বিশ্লেষণেরই সমগোত্রীয়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, 'পোয়েট্রি ইজ দ্য স্পনটেনীয়াস ওভারফ্লো অব্ পাওয়ারফুল ফীলিংস।

একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতার একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমতের সঙ্গে কারও কোনও মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। তাঁর মতে একটি কবিতার জন্য প্রয়োজন আবেগের বিশুদ্ধি, কাব্যিক অনুভূতি, অনায়াস-আয়ত্ত ভাষা ও ছন্দ এবং সর্বোপরি প্রেরণা। এইগুলির উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে কবি এবং পদ্যকারের মধ্যে প্রভেদ।

'কাসিজ্ম-'এর একান্ত অনুরাগী শ্রীঅরবিন্দ কবিতায় সংযমের পক্ষপাতী। তাঁর মতে মনোগত ভাবটির যথাযথ প্রকাশই কবিতা। অনুরঞ্জনের, অলঙ্করণের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। উত্তাপে, বর্ণে, চিত্রকল্পে অবশ্যই তাকে মণ্ডিত করতে হবে। কিন্তু সে অলঙ্করণ যেন মৌল সৌন্দর্যকে আচ্ছন্ন না করে। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যহীন, অলঙ্কারের বাহুল্যবর্জিত, আত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ, অচঞ্চল সৌন্দর্যে সুন্দর ও দৃঢ়সংবদ্ধ---এই রকম কবিতাই তাঁর মতে আদর্শ কবিতা। এ কবিতার আস্বাদ তিনি পেয়েছেন হোমার, ঈশকাইলাস, মিলটন প্রমুখ ক্লাসিসিস্ট এবং রোমাণ্টিসিজম্-এর প্রবক্তা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-এর সৃষ্টিতে।

কবিতায় তত্ত্বের স্থান কতটুকু---এ নিয়ে কবিদের এবং কবিতা-পাঠকদেরও মধ্যে মতভেদ প্রচুর। ইংরাজী কবিতার ক্ষেত্রে উনিশশতকী রোমাণ্টিক কবিরা এ-বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে বাদ দিলেও শেলী রয়েছেন এবং বিদগ্ধজনের মতে, শেলী অনেক ক্ষেত্রেই 'ভার্সিফায়িড্ প্লেটো', আবার কীট্সের সেই উক্তিটিও আমাদের মনে আসে, 'ও ফর এ লাইফ্-অব্ সেন্সেসনস্ রাদার দ্যান অব্ থট্স'।

ভিক্টোরীয় আর্নল্ড কবিতায় তত্ত্বের স্বপক্ষে রায় দিয়ে বললেন, কবিতা জীবনের সমালোচনা। বিশশতকের টি এস এলিয়ট শুধুমাত্র তত্ত্বের স্বপক্ষে রায় দিয়েই ক্ষান্ত রইলেন না---তাঁর আপন কবিতাকে করলেন দর্শনের গঙ্গা আর কাব্যের যমুনার সংগমক্ষেত্র।

প্রত্যাশিতভাবেই মিস্টিক শ্রীঅরবিন্দের অভিমতও কবিতায় তত্ত্ব বা দর্শনের অবতারণার অনুকূলে। তাঁর বক্তব্য কবিতায় তত্ত্বের প্রতি অনীহার মূলে রয়েছে কিছুসংখ্যক অতি রোমাণ্টিক এবং অতি আধুনিক কবির কাব্যদর্শন। 'উদভ্রান্ত, উচ্ছল-বেগ' রোমাণ্টিসিজ্‌মের সীমাহীন উচ্ছ্বাসের বহুবর্ণ উত্তরী কবিতার ভাবদেহকে এভাবে আবৃত করে দেয় যে, সেখানে দর্শন বা তত্ত্ব প্রবেশাধিকার পায় না।

আবার অতি আধুনিক কবিরাও রোমাণ্টিক ভাবালুতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে তাঁদের কবিতাকে করলেন অকাব্যিক। আবেগের নির্বাসনের পর তাঁদের কবিতায় তত্ত্ব যেটুকু রইল সেটুকু ইনট্যুইশন---সজ্ঞাত তত্ত্ব নয়---নিছক 'সেনসেশন'ই হল সেটুকুর উৎস। কিন্তু আবেগের সঙ্গে বোধির সহাবস্থান সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই সহাবস্থান নির্ভর করে ঐ বোধি বা দর্শনের প্রকৃতি এবং কবির ক্ষমতার উপরে।

কবিতার তত্ত্ব বা দর্শনের বাঞ্ছনীয়ত্ব ব্যতীত অপর যে প্রশ্নটি আধুনিক মনকে সর্বাধিক আলোড়িত করে সেটি হল সাহিত্যে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার জীবনের এবং অভিজ্ঞতার সম্পর্কের প্রশ্ন।

এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত প্রচলিত মতেরই অনুকূল। সৃষ্টির পক্ষে একমাত্র আবেগই পর্যাপ্ত নয়---অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। কোনও সার্থক সৃষ্টিই 'আকাশস্থো নিরালম্বো' হতে পারে না---একটি 'ব্যাকগ্রাউণ্ড অব্ লাইফ' অপরিহার্য। স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, সৃষ্টি স্রষ্টার মনের অনুবাদমাত্র---এটি একটি প্রাকৃত ধারণা বই আর কিছু নয়। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার মনের কোনও ঐক্য নাই, এমনটি হওয়াও বিচিত্র নয়। সৃষ্টিতে যিনি রোমাণ্টিক, মনের দিক দিয়ে তিনি হয়ত খাঁটি বুর্জোয়া। উপন্যাসে যিনি মানবপ্রেমিক ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হয়ত নিষ্ঠুর, স্বার্থপর।

এ-ক্ষেত্রে স্বতই যে প্রশ্নটি আমাদের মনে আসে---সেটি হল, এটি কী করে সম্ভব হয়: একজন মানুষ যে হাসি, যে অশ্রু নিজের জীবনে অনুভব করলেন না---সততার সঙ্গে সে হাসি, সে অশ্রুকে সৃষ্টিতে প্রকাশ করবেন কী করে?

শ্রীঅরবিন্দের মতে এর কারণ দু'টি---প্রথমত শিল্পীমাত্রেই একটি কারচিত্রী শক্তির মাধ্যম।

দ্বিতীয়ত অন্যান্যজনের মত শিল্পীও বহুব্যক্তিক। সৃষ্টিকালে এই বহুব্যক্তিত্বের মধ্যে তাঁর পছন্দ এবং প্রয়োজনমত যে-কোন একটিকে তিনি বেছে নেন। তখন সেই বিশেষ ব্যক্তিটিই প্রাধান্য লাভ করে, সেই বিশেষ ব্যক্তিটির আবেগ অনুভূতিই হয় তখন সৃষ্টির উপজীব্য।

অনেকেরই ধারণা বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড়তম পরিচয় না থাকলে সৃষ্টিকে বাস্তবানুগ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে এটি বাস্তবতার প্রপঞ্চমাত্র। বাস্তব দুনিয়ায় কি ঘটে বা কেমনটি ঘটে এ-সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তার বলে বাস্তবতার যথাযথ অনুলিপিই সাহিত্য নয়।

এই প্রসঙ্গে তিনি হুগো, জোলা প্রমুখ কট্টর বাস্তববাদীদের উল্লেখ করেছেন।

তাঁর প্রশ্ন---জোলা ভালজাঁ লেখার আগে হুগোকে কি যথাযথভাবে কারাজীবন বর্ণনার জন্য কারাবাস করতে হয়েছিল? না, তা নয়---আসলে শিল্পী দেখেন যতটুকু অনুভব করেন তার চেয়ে অনেক বেশী এবং এই অনুভূতির প্রগাঢ়তাই তাঁর সৃষ্টিতে বাস্তবানুগতা এনে দেয়। এ বাস্তবানুগতা একান্তভাবে তাঁরই বাস্তবানুগতা। তাঁর সৃষ্টির আত্মীয়তা কেবলমাত্র তাঁরই জগতের সঙ্গে।

শ্রীঅরবিন্দের এই মতের সঙ্গে আমরা একালের আর একজন সাহিত্যতাত্ত্বিকের মতৈক্য দেখতে পাচ্ছি---

'সাহিত্যে অকৃত্রিমতার মানে প্রত্যক্ষদর্শনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অভিভাবের পরিণয়।

এই কথাকেই আরও সহজে বলা যেতে পারে যে কবি যখন কোনও দৃষ্ট বস্তু বা অনুভূত ভাবের মুখপাত্র, তখন তার কবিতা শুধু সেই বস্তু বা সেই মনোভাবের আধারেই আবদ্ধ থাকবে, লোকাচার হিসাবে তাদের দাম জানতে চাইবে না'। (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : স্বগত)

এই শতকের তৃতীয় দশকে লেখা এই পত্রাবলীতে শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্যের আত্মা এবং দেহসম্পর্কিত বহু প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। সেগুলির যথাযোগ্য আলোচনার পক্ষে এই নিবন্ধ নিতান্তই স্বল্পপরিসর। এই পত্রগুচ্ছ পড়তে পড়তে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তিটি বারবার মনে আসে : প্রতিভা এমনই জিনিষ যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সে সজীব করিয়া তোলে

অন্য উপকূলে

অশোক নস্কর

আমরা যারা এই জীবনটার দাসানুদাস,
সেই আমরা
গোলামের ছাড়পত্র নিয়ে
সময়ের গলা চেপে ধরি বঞ্চনার বিকারে।
অজস্র প্রলাপ, খিস্তি-খেউড়, এবং
এক ঢোক জোলো আবগারী
আর তুরুপের সাহেব-বিবি দেখে ভাবি
তুমি গোলাম, তুমি বান্দা
তুমি তো এই হতভাগা জীবনটার দাসানুদাস।

এই তো সেদিন,
খোঁড়া ঘোড়াটাও যখন বাজী জিতে গেল
আর ফুটো নৌকোটা পার হয়ে গেল ইচ্ছামতীর উজান,
তখন আমরা কুষ্ঠি খুলে
রাহু কেতু বৃহস্পতির স্থান খুঁজে মরি।

তবে কেন বরাতের দোষ দাও ভাই
এ-ও দোষ, এ-ও পাপ,
এ আর কিছু নয় শুধু গোলামী জীবনটার মস্ত অভিশাপ।
আর নয়, এবার কণ্ঠ কর নত
স্তব্ধ হোক অশ্লীল প্রসংগ।
চেয়ে দেখো,
সেই খোঁড়া ঘোড়াটা আজও পার হয়ে যায় সময়ের ময়দান।

তবে ভেঙে ফেলো চোলাইয়ের বোতল
ছিঁড়ে ফেলো তুরুপের তাস,
বুঝতে তো পার---
ঐ ফুটো নৌকোকে চিরকালই পার হতে হবে
অনাদি অন্তহীন সময়ের উজান।

শুধু আত্মবিড়ম্বনার বিদ্রূপে
বৃথা কেন হার মেনে যাব
সামুদ্রিক বিচারের কাগজে।
হতভাগ্য বান্দার ভূমিকার যবনিকা টেনে,
এসো, হাত মিলিয়ে
আমরা সবাই এগিয়ে যাই জীবনটার অন্য উপকূলে।

গর্কির নাটকে জীবনদৃষ্টি

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্তন চেখভ তাঁর নাটকে রুশ জীবনের রূপান্তরের যে পূর্বাভাষ দিয়ে যান, ম্যাক্সিম গর্কি সেই রূপান্তরকেই তাঁর নাটকে তুলে ধরেন। চেখভ রুশ জীবনকে দেখেছেন দ্রষ্টার দৃষ্টিতে, আর গর্কি রুশ জীবনকে দেখেছেন স্রষ্টার দৃষ্টিতে। চেখভ নিজেকে বৈপ্লবিক কর্মে জড়িত না করলেও তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন রুশিয়ার জনজীবন আর অনড় হয়ে থাকতে চাচ্ছে না; একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোন্ পথে সেই পরিবর্তন আসবে সে সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করতে পারেন নি। একটা যুগ-সন্ধিক্ষণে চেখভ এসেছিলেন; নবযুগের পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন আর সানন্দে স্বাগত জানিয়েছিলেন সেই অনাগত যুগকে। গর্কি তাতে যোগ করলেন গতি। সে গতির প্রচণ্ড বেগ, প্রচণ্ড শক্তি। একদিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যেমন এলো বৈপ্লবিক প্রেরণা, তেম্‌নি অন্যদিকে গর্কির সাহিত্য রুশ জীবনে এনে দিল এক নব চেতনা। শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় থেকে নয়, সক্রিয় মনের আবেগে গর্কি তাঁর সাহিত্যে রুশ জাতিকে জানালেন চলার আহ্বান।

গর্কির সাহিত্যচিন্তার দ্বারা আমাদের দেশে বহু লেখক অনুপ্রাণিত হ'লেও তাঁর সাহিত্য নিয়ে বিশদ আলোচনা বাংলা ভাষায় হয়েছে বলা চলে না। বিশেষত তাঁর নাটক নিয়ে তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কমই হয়েছে। যদিও তাঁর 'লোয়ার ডেপথ্‌স্' নাটকের বাংলারূপ মঞ্চে অভিনীত হয়ে প্রশংসা পেয়েছে এবং 'পেটি বুর্জোয়া' ও 'এনিমিজ'-এর ছায়াবলম্বনে বাংলা ভাষায় নাটক রচিত হয়েছে; কিন্তু পূর্ণ অনুবাদের সাহায্যে মূল রচনার স্বাদ পাওয়ার মতো একখানা নাটকও এ যাবৎ আমাদের সাহিত্যে পাওয়া যায় নি। অথচ গর্কির নাটক

যে রুশ মঞ্চে এক নবদিগন্ত খুলে দিয়েছিল, এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না। এমন একজন যুগপ্রবর্তক নাট্যকারের নাটক সম্পর্কে আমাদের যতখানি ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা থাকা

গর্কি

উচিত ছিল ততখানি যে নেই এ কথা অপ্রিয় হ'লেও সত্য। গর্কির নাটকের তালিকা ও রচনাকালের পঞ্জী জানাই যথেষ্ট নয়; তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতা উপলব্ধি করতে হ'লে নিবিড় অধ্যয়ন প্রয়োজন। নাটকীয় ঘটনার চমৎকারিত্বে গর্কির মানসকে খুঁজে পাওয়া যায় না---পাওয়া যায় তাঁর অননুকরণীয় সংলাপ ও চরিত্র বিশ্লেষণে।

গর্কি তাঁর নাটকে কোথাও চমক লাগাবার চেষ্টা করেন নি; শুধু নাটকীয় চরিত্রের অসঙ্গতি, দুর্বলতা ও দুর্বারতা ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি নিপুণ চিত্রকরের মতো। তাতেই যতটুকু নাটকীয় সংঘাত এসেছে ততটুকুতেই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। কৃত্রিমতার দ্বারা নাটকীয় সংঘাতকে উত্তুঙ্গ করার জন্যে চরিত্রকে তিনি কোথাও বিকৃত করেন নি। মঞ্চে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্যে জীবনকে বিকৃত বা অতিনাটকীয় করে দেখানো ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। জীবনকে মঞ্চের অনুবর্তী না করে তিনি মঞ্চকেই জীবনাভিসারী করে তোলেন।

একারণেই গর্কির নাটকে প্রচলিত অর্থে কোনো হিরো নেই---নাটকের সমস্ত পাত্র-পাত্রী মিলে হিরোর ভূমিকা নেয়। তা বলে তারা কতগুলো চরিত্রের সমষ্টি নয়---প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র চরিত্র। এই স্বাতন্ত্র্য নিয়েই তারা আবার একেকটা গোষ্ঠী---বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও একটা ঐক্যত্রিক রূপ পাওয়া যায়। সৎ-অসৎ, শিষ্ট-অশিষ্ট, বিজ্ঞ-নির্বোধ সব কিছুতে মিলে একটা অখণ্ড সামাজিক সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাটকে। বাস্তব হয়েও তাঁর চরিত্রগুলো কম বিস্ময় উৎপাদন করে না। বিষয়বস্তুতে এই নিবিড় প্রবেশই গর্কির নাটকের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ হয়েও তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো অসাধারণ।

গর্কিই রুশ সমাজের নিচের তলার মানুষকে প্রথম নাটকে স্থান দেন। শুধু তাই নয়---তাঁরই নাটকে প্রথম সামাজিক-রাজনৈতিক (সোসিও পলিটিক্যাল) বিষয়বস্তু বলিষ্ঠভাবে আসে। মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন:

'It was Maxim Gorky who initiated the social-political line in our theatre.'

তিনি আরো বলেছেন যে, গর্কির নাটকের আগে রুশ মঞ্চে ভবঘুরেদের জীবন কখনো আসে নি। সমাজের নিচের তলার অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের মতনই তারাও আকর্ষণীয়। গর্কি তাদের দেখেছেন, তাদের সঙ্গে থেকেছেন, তাদের ভালো বেসেছেন ; কারণ 'তারাও একদিন মানুষ ছিল।'

তার পর স্তানিস্লাভস্কি বলছেন :

'At that time we were seeking for talent among them. Most of the pupils of our theatrical school from the people. Gorky, who also came from the people, was absolutely necessary for our theatre.'

মস্কো আর্ট থিয়েটার গর্কির 'লোয়ার ডেপথস্' নাটকের প্রযোজনা নিয়ে গোড়ার দিকে বিষম ভাবনায় পড়ে। নাটকের চরিত্রগুলিকে কী ভাবে রূপ দেওয়া হবে, কী ভাবে চরিত্রগুলি কথা বলবে, তাদের চালচলন মোটামুটি না কী ধরণের হবে, তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। গর্কি যে সব শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন সেগুলিকে প্রচলিত ধারায় নাটুকে ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে না। তাঁর নাটকের বহু সংলাপে আছে শিক্ষণীয় বিষয়, কোনো কোনো দীর্ঘ সংলাপে আছে প্রচার। সেখানে মাস্টারি করলে বা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললে চলবে না ; সাধারণ মানুষ যেভাবে কথা বলে সেভাবে সেগুলোকে বলতে হবে। তার জন্যে চাই আন্তরিকতা ও সহজ বলার ভঙ্গি। কৃত্রিমতার আশ্রয় নিলে বা নাটুকেপনা করতে গেলেই তা মার খেয়ে যাবে। এর ব্যত্যয় ঘটলেই গর্কির নাটক হয়ে দাঁড়াবে মেলোড্রামা।

স্তানিস্লাভস্কি তাই বলেছেন রুশ ভবঘুরেদের চলন-বলনের নিজস্ব একটা ভঙ্গি আছে। মঞ্চে ভবঘুরে চরিত্রকে রূপ দেবার যে একটা স্থূল রীতি আছে সেই রীতিতে ফেলে গর্কির নাটকের ভবঘুরে চরিত্রকে রূপ দিলে তা বিকৃত হবে। ভবঘুরেদের মধ্যেও যে হৃদয়ের প্রশস্ততা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মহত্ত্ব আছে তা হবে একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এসব চরিত্র ? চিন্তিত হয়ে পড়লেন পরিচালক স্তানিস্লাভস্কি। তারপর একদিন সদলবলে চলে গেলেন তিনি কোনো এক ভবঘুরে আড্ডায়। তাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, তাদের চালচলন দেখে নিলেন, যে ভাবে তারা আছে তা বিশেষভাবে নজর করলেন। গর্কির 'লোয়ার ডেপথস্' নাটকের চরিত্রগুলি স্তানিস্লাভস্কির চোখের সামনে জীবন্তভাবে ভেসে উঠলো। মঞ্চে এ নাটক উপস্থিত করার সময় কেবল তাদের চালচলন বা কথা বলার ভঙ্গিই অনুকরণ করা হলো না, দৃশ্যপট রচনায়ও ভবঘুরেদের সেই বাসস্থলটিকেই ফুটিয়ে তোলা হলো।

এ সম্বন্ধে স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন—

'It was necessary to enter into the spiritual springs of Gorky himself, just as we had done in the case of Chekhov, and find the current of the action in the soul of the writer. Then the colourful words of the tramp's aphorisms and flowery phrases of the sermon would imbibe of the spiritual content of the poet himself, and the actor would share his excitement.'

এ কথা সত্য যে, রুশ ভাষা জানা না থাকলে গর্কির শব্দালঙ্কার ও বাক্যচ্ছটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তবু ইংরেজী ভাষায় তাঁর নাটকের বিশুদ্ধ অনুবাদ পড়েও এই বৈশিষ্ট্য খানিকটা অনুধাবন করা যায়। গর্কি শুধু নিচের তলার মানুষের বহিরঙ্গ দেখেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, দেখেছেন তাদের অন্তরের মানবিক সত্তাকে। শুধু দেখেন নি, নিজে উপলব্ধি করেছেন। তাই মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো দীপ্ত সংলাপ তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে। অন্ধকারে একেক ঝলক আলো যেন দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করে তোলে।

গর্কি তাঁর নাটকে নিজের কথা অনেক বলেছেন। বলবেনই তো, কারণ তাঁর বলার কথা অনেক ছিল। কিন্তু সুকৌশলে নিজের কথাগুলিকে চরিত্রের মুখে এমনভাবে বসিয়ে দিয়েছেন যে, সেগুলি আর তখন তাঁর কথা না হয়ে চরিত্রের নিজস্ব কথা হয়ে গেছে। জীবন সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন সংযুক্তি হয় না। শেক্সপীয়র যেমন তাঁর নাটকে কাব্যাংশ আমদানী করার পূর্বে চরিত্র ও ঘটনাকে এমন স্থানে এনে দিয়েছেন যেখানে চরিত্র দাঁড়িয়ে বললে আর তা বিচ্ছিন্ন কাব্য বলে মনে হয় না, চরিত্রেরই স্বাভাবিক সংলাপ বলে প্রতিভাত হয় ; গর্কিও তাঁর নাটকে ঠিক তেমনি কাব্যাংশকে চরিত্রের বিশ্বাস্য সংলাপ করে তুলতে পেরেছেন। তবে শেক্সপীয়র যেমন কাব্যসৃষ্টির জন্যে 'পোয়েটিক মনলগ' ব্যবহার করেছেন গর্কি তেমন করেন নি। আজকাল মানসচিত্রণের জন্যে আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ 'প্রোজ মনলগ' ব্যবহার কচ্ছেন ; কিন্তু গর্কি তাও করেন নি। তিনি সোজা গদ্য সংলাপের মধ্য দিয়েই কাব্যিক ব্যঞ্জনা এনেছেন। সাধারণ কথার ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ-ঝলক। যেমন তার তীক্ষ্ণতা, তেমনি তার উজ্জ্বলতা।

হবেই তো। গর্কি তো মানুষের রেখাচিত্র আঁকেন নি ; ভাস্করের মতো মূর্তি গড়েছেন আর পূজকের মতো মন্ত্রপূত করে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ছিল বিপ্লবের মন্ত্র, মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা আর মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় সংকল্প। তাই তিনি ভেঙেছেন, গড়েছেন। গড়বার জন্যেই ভেঙেছেন, শুধু ভাঙার জন্যেই ভাঙেন নি। এখানেই তাঁর 'ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস—

এখানেই তাঁর শক্তির মূল উৎস। আপাত-দৃষ্টিতে যে জীবন নিষ্প্রাণ, গতিহীন, লক্ষ্যহীন সেই জীবনকেই তিনি প্রাণ-চঞ্চল করে তুলেছেন---তার আত্মার সন্ধান করে তাকে স্বরূপে প্রকাশ করে-ছেন। মানুষকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেন নি, তাকে চলিষ্ণু করে তুলেছেন। জড়ত্বকে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন জীবনকে চলমান করার জন্যে। এই কারণেই গর্কি সম্বন্ধে চেখভ বলেছিলেন :

'Gorky is a destroyer who must destroy all that deserves destruction. Therein lies his strength and his calling.'

গর্কি জীবনকে ভেঙেছেন সত্যি; কিন্তু কোন্ জীবনকে ভেঙেছেন? যে জীবন আপনার পায়ে আপনি বেড়ি পরিয়ে অচল হয়ে বসে আছে অথচ জানে না সে কেন অচল হয়েছে, সে জীবনকে ভেঙে গর্কি চেয়েছেন তাকে সচল করে তুলতে। তাঁর 'পেটি বুর্জোয়া' নাটকটির কথাই ধরা যাক।

বেসেমেনফ একজন সম্পন্ন লোক। বাড়ির রং করানো তার ব্যবসা। রোজগার ভালো---তাই আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার সংসারে শান্তি নেই। বেসেমেনফ চায়---তার মতে, তারই নিয়মে সংসারের সবাই চলুক। কিন্তু পুত্রকন্যা এবং তার গৃহে এসে বাইরের যারা বাস কচ্ছে তারা কেউ তার মতে চলতে চায় না। কোথায় যেন তারা একটা রজ্জুবন্ধন উপলব্ধি করে---সেটাকে তারা ছিঁড়তে চায়, অথচ পারে না। জীবনের গতানু-গতিকতাই সেই বন্ধন। তাদের জীবনে অনিষ্ট আছে, কিন্তু লক্ষ্য নেই। বেসেমেনফ মনে করে পরিবারের সবাই বিদ্রোহী, তার কথা কেউ শুনতে চায় না। এ নিয়ে পরিবারে কথা কাটাকাটি ও বিষম অশান্তি। গৃহিণী আকুলিনা ইভানোভনা চায় উভয়কূল রক্ষা করতে, কিন্তু পারে না।

এ নাটকের একটি চরিত্র তেতেরেফ। বেসেমেনফের বাড়িতে থাকে সে। সঙ্গীত তার পেশা। মাতাল, কিন্তু বিবেক স্বচ্ছ। সবাইকে বলে সে---শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ো। মেয়ে তাতিয়ানা শিক্ষিকা হয়েও পারে না পায়ের বেড়ি ভাঙতে। জীবন তার লক্ষ্যহীন---তাই সে সদা বিষণ্ণ। সৎছেলে নিল এঞ্জিন-চালক। সে কিন্তু পিতার অমতেই পরিচারিকা পলিয়াকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করে ও বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। পুত্র পিয়োতর ভালোবাসে বিধবা ইয়েলেনাকে। পিতা তাকে শাসায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও ইয়েলে-নাকে বিয়ে করবে বলেই স্থির করে।

আবর্তে হাবুডুবু খাওয়া এই পরি-বারটির মধ্যে তেতেরেফ চরিত্রটি যেন সবাইকে কথার চাবুক মেরে চলেছে। তাতিয়ানাকে এক জায়গায় সে বলে, 'ভালো মানুষরা সদাই প্রফুল্ল, আর ধূর্তরা কদাচিৎ হাসে।'

শুনে পিয়োতর বলে, 'আপনার থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীতে আপনিই সবচেয়ে বড়ো ধূর্ত।'

তেতেরেফের উত্তরটা চমৎকার। সে বলে, 'আমি শুধু একজন মাতাল। জানো, আমাদের রাশিয়ায় এত মাতাল কেন? মদ খেলে জীবন সহজ হয়। আমরা রুশরা মদ খেতে ভালোবাসি। যারা নতুন কিছু করতে চায়, যারা সাহসী, তাদের আমরা ঘৃণা করি, আর মাতালকে ভালোবাসি।'

সামান্য এ কটি কথার সাহায্যে সমাজের অধঃপতনের কী সুন্দর চিত্র এঁকেছেন গর্কি। আবার বেসেমেনফ যখন তেতেরেফকে বলে যে, মদ খেয়ে সে জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে, তেতেরেফ তার উত্তরে বলে, 'মদ খেয়ে নয়, আমার অতিরিক্ত শক্তিই আমাকে ধ্বংস কচ্ছে।'

বেসেমেনফ বলে, 'বাজে কথা, অতিরিক্ত শক্তি বলতে আবার কিছু আছে নাকি!'

তেতেরেফের উত্তর, 'আবার ভুল করলেন। আজ শক্তির মূল্য কী? এটা ধূর্তামির যুগ। পিছল হতে হবে, সাপের মতো পিছল। (ঘুরে কাঁধের পেশী দেখিয়ে) দেখুন। একঘুষি মারলে টেবিলটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু আজকের দিনে এই পেশীর দাম কী? এই হাত দিয়ে আমি কাঠ কাটতে পারি, কিন্তু লিখতে পারি কি? তেমন চেষ্টা করা হবে বোকামি। এত শক্তি নিয়ে আমি কী করবো?'

কর্মহীনতা শক্তিমানকে যে বিপথে চালিত করে সে কথাই এখানে বলে-ছেন গর্কি। একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি যেন গোটা জাতির শক্তির অপচয় দেখাতে চেয়েছেন। আরো কী তীব্র শ্লেষ বেরিয়েছে তেতেরেফের মুখ দিয়ে দেখুন। নিলকে সে বলছে, 'বোকারাই জীবনকে বাঁচার যোগ্য করে বাঁচতে চায়। অবশ্য তেমন লোক বেশি নেই। তারা নিজেদের জন্য কিছু চায় না। তাদের বেশির ভাগ চাওয়াই পরের জন্যে। বিশ্বের কল্যাণ ও সুখ হোক এমন স্বপ্ন দেখতে তারা ভালোবাসে। এ ধরণের আরো কত বাজে চিন্তা তাদের মাথায়।'

আত্মসুখে মগ্ন যারা তাদের প্রতি কী দারুণ কশাঘাত। তাতিয়ানা যখন তেতেরেফের জীবনবৃত্তান্ত জানতে চায় তখন সে কবিতায় বলে, 'সুখের সন্ধানে আমি বেরিয়েছিলাম, ফিরে এলাম নগ্নপদে উলঙ্গ হয়ে, হারালাম আমার সমস্ত পোশাক, আমার সমস্ত আশা ও স্বপ্ন।'

বেদনার নির্যাস রয়েছে এ কটি ছত্রে। জীবনের ব্যর্থতা যে কী শূন্যতা এনে দেয়, এ যেন তারই একটি প্রতি-চ্ছবি। নিজের জীবন ব্যর্থ হলেও সে কিন্তু জীবনবাদী। তাই সবাইকে সে বলে---পায়ের বেড়ি ভেঙে ফেলো, বেরিয়ে পড়ো বদ্ধ খাঁচা ভেঙে।

পিয়োতর যখন নিলকে ভয় দেখায় যে, বেসেমেনকের আশ্রয় ছেড়ে গেলে তার কপালে অনেক দু:খ আছে, নিল তখন আত্মপ্রত্যয়ের ওপর দাঁড়িয়ে বলে,---

'---আমায় ভয় দেখাবে না। জীবন যে কঠোর তোমার চেয়ে আমি তা ভালোই জানি। সময় সময় তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর, নিরঙ্কুশ শক্তি মানুষের ওপর চেপে বসেছে। আমি এ সবই জানি এবং আমি চাই নে এসব। এসব দেখে আমার ক্রোধই হয়। আমি চাই নে যেমন আছে সব কিছু তেমনিই থাক। জীবনটা হেলাফেলার জিনিস নয়, কিন্তু তা এখন বিকৃত। একে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমাকে আমার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করতে হবে। আমি জানি, আমি বীর নই, আমি শুধু একজন শক্ত সৎ মানুষ। তোমাকে আমি বলছি : একটু অপেক্ষা করো, দেখবে শেষ পর্যন্ত আমাদেরই জয় হবে।'

গর্কির দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে এখানে। তাই পরিবর্তনে, জীবন-গঠনে এমন প্রত্যয়। এখানেও ভাঙার মধ্যে গড়ার স্বপ্ন।

নিল ও পিয়োতর একই পরিবারে মানুষ। কিন্তু দু'জনে পার্থক্য অনেক। নিল দু:খকে জয় করে জীবন গড়তে চায়, কিন্তু পিয়োতরের সে সংকল্প নেই। নিল খেটেখাওয়া মানুষ, আর পিয়োতর পিতার ওপর নির্ভরশীল। কলেজেপড়া ছেলে সে, আয়েসী, শ্রমের মর্যাদা বোঝে না। তাই কঠোর জীবনসংগ্রামে সে কুণ্ঠিত। বুর্জোয়া ভাবধারা রয়েছে তার মধ্যে। তাই পিতার আশ্রয় ছেড়ে ইয়েলেনার সঙ্গে সে বেরিয়ে যাবার পরে ক্ষুব্ধ বেসেমেনফকে তেতেরেফ বলে, 'বৃদ্ধ, নিজেকে সামলান। যে ঝড় আপনার ওপর নেমে এসেছে তাকে থামাবার শক্তি আপনার নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার ছেলে আবার ফিরে আসবে।'

বেসেমেনফ জিগ্যেস করে, 'তুমি জানলে কেমন করে?'

তেতেরেফ উত্তর দেয়, 'আপনাকে ছেড়ে সে বেশিদিন থাকবে না। এটা তার সাময়িক উত্তেজনা। ঝোঁকের মাথায় করেছে। মাথা ঠাণ্ডা হতে দেরি হবে না। আপনার মৃত্যুর পর সে এসে আবার আপনার এই শূয়রের খোঁয়াড় জুড়ে বসবে, আসবাবপত্র একটু এদিক সেদিক করে গুছিয়ে নেবে, তারপর আপনারই মতো নিশ্চিন্তে, আরামে ও সসম্মানে জীবনযাপন করবে।---পরমেশ্বর ও মানুষের প্রতি সে তার কর্তব্য পালন করেছে এই প্রত্যয় নিয়ে একই পুরনো ধারায় জীবনযাপন করবে সে। তাকে যে আপনি আপনার মতো করেই গড়েছেন। সে আপনারই প্রতিমূর্তি।'

বেসেমেনফ নিজেকে অপমানিত বোধ করে। সে রেগে যায়। তেতেরেফ তখন তাকে বলে, 'এবং যথাসময়ে সে ঠিক এমনি লোভী, এমনি কঠিন-হৃদয় ও এমনি আত্মতুষ্ট হবে। আপনার আজ যে দুর্দশা অবশেষে তারও ঠিক তাই হবে। বৃদ্ধ, জীবন এগিয়ে চলেছে। যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারবে সে পিছনে পড়ে থাকবে---সে রবে একা।'

'লোয়ার ডেপথস্' নাটকই ম্যাক্সিম গর্কিকে নাট্যকার রূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এ নাটক সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন :

'Perhaps I ought to say a word about the history of that play (*The Lower Depths*). It is a summary of nearly twenty years of observing the life of 'the fallen', among whom I include not only tramps, frequenters of doss-houses and the Lumpenproletariat as a whole, but a certain group of intellectuals as well—those who have become 'demagnetized', disillusioned, abased and humiliated by failure.'

এই ব্যর্থ-জীবন ছন্নছাড়া বুদ্ধিজীবী চরিত্রগুলিই ভবঘুরেদের স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার কক্ষে বিদূষক সৃষ্টি করে। নাটকের লুকা ও সাতিন চরিত্র দু'টি তার প্রতীক। ব্যারনকে লুকা এক জায়গায় বলে, 'এই পৃথিবীতে আমরা সবাই তীর্থযাত্রী। আমি এও শুনেছি যে, আমাদের এই পৃথিবীটাও মহাকাশে এক তীর্থযাত্রী।' বুবনফ যখন বলে যে, ব্যারন যে ভদ্রবংশজাত এখনো মাঝে মাঝে তার আচরণে বোঝা যায়। শুনে লুকা মন্তব্য করে, 'ভদ্রবংশজাত হওয়াটা বসন্ত রোগের মতো---সেরে উঠলেও দাগ থাকে।'

আরেক জায়গায় বুবলফকে সে বলে, 'শোনো বন্ধু, শোনো, কিছু লোক আছে যারা আমাদের এই পৃথিবীটাকে চালাতে চায়। তারা সবাই রক্তচক্ষু হয়ে শাসায়। তবু নেই শৃংখলা, নেই পরিচ্ছন্নতা।'

আন্না মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে যখন কাতরাতে কাতরাতে বলে 'ভগবান, পরপারেও কি এই যন্ত্রণা আছে? সেখানেও?'

লুকা তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'না, না। সেখানে তোমাকে ভুগতে হবে না বাছা। শান্তিতে ঘুমোও। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি সেখানে আরাম পাবে, বিশ্রাম পাবে। আরেকটু ধৈর্য ধরো। যে যে-পথে আছে সেই পথেই তাকে ধৈর্য ধরতে হবে।'

আন্না মরতে চলেছে জেনেও লুকা তাকে সান্ত্বনা দেয়, আশার কথা শোনায়। শুধু আন্নাকেই নয়, অভিশপ্ত জীবন হ'লেও সবাইর প্রাণেই সে আশার আলো জেলে দিতে চায়। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আবার কী মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠে। আন্নাকে সে বলে, 'ও কিছু নয়। মরণের আগের অবস্থা, বাছা। সব ঠিক হয়ে যাবে। যা হবে তা হচ্ছে এই---তুমি এখন চোখ বুজবে, আর সব স্থির শান্ত হয়ে যাবে। ভয়ের

তোমার আর কিছুই থাকবে না, কিছুই না। ওখানে শুধু চুপ করে শান্তিতে শুয়ে থাকো। মৃত্যু তো আমাদের মতো গরিবদের কাছে আশীর্বাদ। মৃত্যু দুশ্চিন্তার সমস্ত রেখা মুছে দেয়, হ্যাঁ মৃত্যু। সে জন্যই সবাই বলে: চিরশান্তি। মাগো, সত্যি তাই, কারণ এ পৃথিবীতে মানুষের শান্তি কই?' মানুষের প্রতি তার এই অপরিসীম মমত্ববোধই তাকে বলায়, 'যে তার প্রতিবেশীর উপকার করে না সে তার ক্ষতিই করে।'

লুকা ভবঘুরেদের আড্ডা ছেড়ে চলে গেলে সবাই যখন বলাবলি করতে থাকে যে, লুকার স্বভাব খালি মিথ্যে-কথা বলে বেড়ানো, সাতিন তখন রেগে যায়। সে বলে, 'চুপ করো গরুর দল। মাথায় কিচ্ছু নেই। বুড়োর সম্বন্ধে কোনো কথা বলো না। (একটু শান্ত হয়ে) ব্যারন, তুমি সবচেয়ে বেশি ওঁছা মাল। কিছুই বোঝ না তুমি। তুমিই মিথ্যেকথা বলো। বুড়ো ধাপ্পাবাজ নয়। সত্য বলতে তুমি কী বোঝ? মানুষ—মানুষই সত্য। সে তা জানে—তুমি তা জানো না। তোমাদের মাথায় কিচ্ছু ঢুকবে না। আমি তাকে বুঝেছি। মিথ্যেকথা সে বলেছে সত্যি, কিন্তু তা বলেছে তোমাদের প্রতি করুণাবশত। গোল্লায় যাও তোমরা। অনেকের প্রতি করুণাবশত অনেকেই মিথ্যেকথা বলে থাকে। আমি বই পড়েছি। আমি জানি। তারা সুন্দর করে মিথ্যেকথা বলে। তাতে থাকে উদ্দীপনা যা তোমাদের জাগিয়ে দেয়। এমন মিথ্যেকথাও আছে যা মানুষকে সান্ত্বনা দেয়, দুঃখের মধ্যেও মানুষের মনে স্থৈর্য আনে। যে গুরুভার শ্রমিকের হাত গুঁড়িয়ে দেয় তারও ওজর খুঁজে বার করে মিথ্যেকথা। অনাহারে মৃত্যুর জন্যে মানুষকে দোষ দেয় মিথ্যে। যারা দুর্বলচিত্ত বা পরের ওপর নির্ভরশীল তাদেরই মিথ্যেকথা বলার প্রয়োজন আছে। কিছু লোক আছে যারা মিথ্যের সমর্থন পায়, আর কিছু লোক মিথ্যে দিয়ে নিজেদের আড়াল করে। কিন্তু যে নিজেই নিজের প্রভু হয়েছে, যে নিজে স্বাধীন ও পরের রক্ত শুষে খায় না, তার মিথ্যের কী প্রয়োজন? দাস আর প্রভুর মিথ্যেই ধর্ম। স্বাধীন মানুষের কাছে সত্যই ভগবান।'

মানুষের স্বাধীন সত্তায় কী অসাধারণ প্রত্যয় ম্যাক্সিম গর্কির! সত্যকেই তিনি ভগবানের আসনে বসিয়েছেন; মানুষের মধ্যে তিনি ভগবানকে জাগাতে চেয়েছেন। সাতিনের কথা শুনে ব্যারন যখন বলে, 'বাহবা, বাহবা। খাসা কথা বলেছ তুমি। তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মতোই কথা বলেছ তুমি।'

সাতিন তখন বলে, 'তোমাদের গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা যদি হামেশাই জোচ্চোরের মতো কথা বলে তবে একজন জোচ্চোরই বা সময় সময় একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে পারবে না কেন? অনেক কিছুই আমি ভুলে গেছি, তবে দু'একটা বিষয় আমার এখনো মনে আছে। সেই বুড়ো খুব চালাক। পুরনো মুদ্রায় এসিড ঢালার মতো কাজ করে গেছে সে আমার মধ্যে। এসো তার স্বাস্থ্য পান করি। গ্লাসটা ভর্তি করে দাও।'

সাতিন মদ খায়, জুয়া খেলে, কিন্তু বিবেক একেবারে হারিয়ে ফেলে নি। 'লোয়ার ডেপথ্‌স্' শুধু নিচের তলার মানুষের বহিরঙ্গ-চিত্রণই নয়। তা যদি হতো তবে এ নাটক মানুষের মনে কেবল হতাশা ও বিষণ্ণতাই সৃষ্টি করতো। এতে আছে মানুষের মনের অন্তস্তলের মর্মকথা, জীবনকে ক্লেদমুক্ত করার সুপ্ত বাসনা। তাই এ নাটক মানুষকে উদ্দীপিত করে, জীবন সম্পর্কে আশাবাদী করে তোলে। মানুষকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন গর্কি। তাই সাতিন আরেক জায়গায় বলে, 'মানুষ নিজেই সব কিছুর মূল্য দেয় আর সে জন্যেই সে স্বাধীন। মানুষ—মানুষই একমাত্র সত্য। মানুষ কে? তুমি নও, আমি নই, সে নয়। ও না। তুমি, আমি, সে আর সেই বৃদ্ধ, নেপোলিয়ঁ, মহম্মদ—সবাই তো সেই একই মানুষ। (শূন্যে আঙুল দিয়ে মানুষের মূর্তি এঁকে) বুঝতে পারছো? কী অদ্ভুত। এতেই শুরু এতেই শেষ। সবই মানুষের অঙ্গ; সব কিছুই মানুষের জন্যে। একমাত্র মানুষই সত্য; আর সবই শুধু তার হাতে গড়া ও মনের সৃষ্টি। কী আশ্চর্য এই মানুষ। মানুষ শব্দটি কানে এলেই কত গর্ব হয়। মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে। করুণা নয়—করুণা অপমানজনক। শ্রদ্ধা, শুধু শ্রদ্ধা।'

এই কথাগুলি কানে গেলে কার মন না পুলকে নেচে ওঠে। যেন কবিতার ঝংকার তোলে প্রতিটি বাক্য। এভাবেই জীবনকাব্য রচনা করেছেন গর্কি তাঁর নাটকে। মানুষের সৃষ্টির প্রতিও কী অসামান্য মমত্ববোধ তাঁর। 'এনিমিজ' নাটকে কারখানার শ্রমিকরা যেখানে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে, যে বিক্ষোভে ডিরেক্টরকে প্রাণ হারাতে হয়েছে, সেখানেও সেই কারখানারই শ্রমিক লেভশিন নিহত ডিরেক্টরের স্ত্রীর আত্মীয়া নাদিয়াকে বলছে, 'বাইরে মানুষ ক্ষেপে গেছে। তারা বলছে কারখানা ও সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করবে—ভস্মস্তূপ ছাড়া আর কিছু থাকবে না। আমরা কিন্তু এই দুষ্কর্ম সমর্থন করি নে। সম্পদ পোড়াবার অর্থ হয় না। কেন সেগুলো পুড়িয়ে শেষ করা হবে? আমরাই তো গড়ে তুলেছি সেগুলো, আমরা ও আমাদের পিতৃপিতামহরা। আমরা কেন যাবো সেগুলো পুড়িয়ে শেষ করতে?—মানুষ নিজের হাতে যা গড়েছে তা পবিত্র। মানুষের শ্রমের মূল্য দিতে হবে; তা পুড়িয়ে শেষ করলে চলবে না। মানুষের মনে এখনো অন্ধকার আছে—তাই আগুনে তাদের এত লোভ।—'

এমন আরো অসংখ্য মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। ম্যাক্সিম গর্কির 'স্মল সিটিজেন্স', 'সামার ফোক', 'দি চিলড্রেন অব দি সান', 'বারবারিয়ান্‌স্', 'কুইয়ার পিপল',

ক থো প ক থ ন

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসহচরী ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে]

[একটি অপরাহ্ণ, পুণ্য বারাণসীধাম, সোমবার, ১৯ আগস্ট, ১৯৬৮]

পূর্বদিবস কাশীধামে পৌঁছে সর্বপ্রথম দর্শন করি শ্রীশ্রীসারদা-দেবী-মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজকে (হরিপদ মহারাজ) তাঁর জন্মবাড়ী আবাসে।

তিনি বললেন, কাশীতে বাস করেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামাতা-লীলাসহচরী বসুমতী মা। তাঁকে নিশ্চয়ই দেখবি। তাঁর নামেই বসুমতী কাগজ।

ঠিকানা ?

তা' তো আমি জানি না। তুই শম্ভুকে নিয়ে মঠে যা। সেখানে নেপাল মহারাজ আছেন। তিনি জানেন তাঁর ঠিকানা আর চামেলিপুরীর লীলাস্থল। এখনি যা'। তাঁর সেবক শ্রীমান শম্ভুকে আদেশ দিলেন আমার সঙ্গী হতে।

মঠে এসে নেপাল মহারাজের কাছে ঠিকানা পেলুম।

আগস্ট উনিশ। বৈকালে শম্ভু সহ পৌঁছেছি নারাঙ্গাবাদ। রামাবাস। লোহিতবর্ণ দ্বিতল সৌধ, সৌম্যভাব এনেছে সমুখের উদ্যান। দেউড়ি দিয়ে প্রবেশ করে দেখা পেলুম একটি কিঙ্করের। দর্শনের অনুমতি চাইলাম। দ্বিতলে গমন করতে বললে।

উঠলুম দ্বিতলে। নির্জন আবাস। অদূরে একটি কক্ষে এক বৃদ্ধা বিবর্ধক-কাঁচ সাহায্যে অধ্যয়নরতা। অনুমানে বুঝি ইনিই রামকৃষ্ণশিষ্যা বসুমতী।

কক্ষে প্রবেশ করে দৃষ্টি আকর্ষণার্থে দণ্ডায়মান রইলুম। বহু পাণ্ডুলিপি, সুতো দিয়ে বাঁধা, দোয়াত কলম, আর বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে পড়ছেন 'বঙ্গ-দর্শন' সাপ্তাহিক বসুমতী থেকে। নয়ন ফেরালেন দর্শনপ্রার্থীদের পানে।

তুফান ঘোষ

প্রণামান্তে উপবেসন করি।

তোমরা কে ? আমার কথা কার কাছ থেকে শুনেছ ?

নেপাল মহারাজ।

জোরে বল। শুনতে পাই না। বুঝলুম, বধির করেছে কাল, কিন্তু দৃষ্টি হরে নি।

কানে শুনতে পাই না। এই বলে একটি শোনবার যন্ত্র কানে দিয়ে বললেন, এটা দিয়েও শুনতে পাই না।

কবে এলে ?

কাল।

কেন এসেছ ? ব্যবসার জন্য ? চাকুরী কর ?

বিশ্বনাথ দর্শন করতে।

আর কে এসেছে সাথে ?

একা।

বিয়ে করেছ ? তবে বৌকে আননি কেন ?

জান, বাবা, আমার তখন দশ বছর বয়স। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুরের সাথে গেছি। ঠাকুর আমায় সাড়ী দিলেন।

একজন মা কালীকে সাড়ী দিয়ে পুজো দিয়েছেন। ঠাকুর অভয়কে বললেন, 'অভয়, ভবতারিণীকে সাড়ীটা দে'। অভয় মা কালীর ঘরে কাজ করে। অভয় মূর্তির হাতে সাড়ী রেখে দিল।

ঠাকুর আবার বললেন, আমাকে দেখিয়ে। ঠাকুর আমায় ডাকতেন ভবতারিণী বলে।

সাড়ী এনে আমার হাতে দিলে, আমি বগলে রাখলুম। আমি ভাবলুম সাড়ীটি বুঝি 'গেঁদা ফুল'-কে দেবার জন্য।

'গেঁদা-ফুল' কথাটি আমি বুঝলুম না। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরে বললেন, 'গেঁদা ফুল' হলো সারদাদি। আমার মাসতুতো বোন হতেন। আমার চেয়ে অনেক বড় হতেন তো, তাই 'গেঁদা ফুল' পাতিয়েছিলাম। ওঁর [illegible] নহবতে থাকতুম।

'দি ওল্ড ম্যান', 'দি কাউণ্টারফিট করেন' প্রভৃতি নাটকগুলি পড়লেই তার সন্ধান মেলে। মাত্র একটি প্রবন্ধে সব তুলে ধরা সম্ভব নয়। অতি সামান্য অংশই এখানে দেয়া হলো। গর্কির নাটকের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিপ্লবী ধারণার প্রচারক হয়েও যথার্থ আবেগ ও জীবননিষ্ঠার দ্বারা প্রত্যয়কে তিনি কীভাবে প্রকৃত শিল্পে উত্তীর্ণ করেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। শিল্পীমাত্রই ভাবুক আর ভাবুকমাত্রই প্রচারক। ভাবসিদ্ধ শিল্পীই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। স্তানিস্লাভস্কির কথা দিয়েই শেষ করি :

'Tendency and art are incompatible; they exclude each other. True art fades whenever it is approached with tendentions, utilitarian, inartistic ideas. In art tendency must change into one's own ideas, turn into emotion, become sincere effort and the second nature of the actor.'

স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতা সম্বন্ধে যা বলেছেন, গুটা গর্কির ক্ষেত্রেও তা নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য।

পরিহাসচ্ছলে ঠাকুর কি সুন্দর বলতেন। তবে শোন।

ঠাকুর বললেন, 'কাপড়টা পর্।' আমি পারি না। বারে বারে হেসে হেসে বলতে লাগলেন। আবার যিনি পুজো দিয়েছিলেন তিনি বললেন, 'বাবা যখন বলছেন, তখন পরেই ফেল'।

আমি পরলুম, আর নিজের সাড়ীটি বগলে রাখলুম।

ঠাকুর বললেন, 'এবার ওটা আমায় দে'। আমার সাড়ীটা যেটা আমি পরেছিলুম।

আমি না করলুম।

'কেন দিবি নে? তোকে তো একটি দিলুম', বলেন ঠাকুর।

আমারটী দেব না। আমারটী কত সুন্দর। কাল পাড়। আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে দিয়েছে। তোমারটী লাল পেড়ে। তবে তোমারটী নিয়ে যাও। এমন সুন্দরভাবে বলছিলেন মনে হতে লাগলো উনি যেন তিরাশী বছর পূর্বের সেই দশ বছরের কিশোরী।

ঠাট্টা করছিলেন। তারপর তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাদের নারী, সংসার, মায়া, শক্তি, সঞ্চয়ী কত কথা বললেন। তোমাদের বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে বাবা।

তাই বলি, বৌকে ছাড়া এলে কেন? কায়া ছায়া। মার প'রে বৌ। রোগ হলে বৌ সেবা করে। তোমার বিছানায় বসে হাওয়া করবে। পা টিপে দেবে। আবার ঘুম পেলে ঢুলতে ঢুলতে তোমার গায়েই পড়বে। ঘুম তো পাবেই। এটা রক্তমাংসের দেহ না? (নিজের দেহ দেখালেন)

বুড়ো বয়সে স্ত্রী যদি আগে মারা যায় তবে বড় কষ্ট। ছেলে বল, মেয়ে বল, তেমনটি কেউ হয় না। মেয়ের নিজের সংসার আছে। তার স্বামীকে ভাত দিতে হয়। তার ছেলেমেয়েদের দেখ্‌তে হয়। সে তোমার কাছে এসে থাক্‌তে পারবে না।

স্ত্রী তোমার খরচ কমাবে। ঠাকুরের কথা বুঝলি। এর পর সুবিধে পেলে বৌকে নিয়ে আসবে। ছায়া কায়া।

তোমার দেশ কোথায়?

বললুম। শুনতে পেলেন না। শম্ভুকে নির্দেশ দিলেন পাশের কক্ষ থেকে স্লেট-পেন্সিল আনতে। নিয়ে এলো শম্ভু।

আর উঠতে পারি না। হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, কোমর বেঁকে গেছে। ধরে ধরে চলি।

লিখলুম, ময়মনসিংহ।

বিয়ে করেছ কোথায়? লিখলুম ঢাকা।

আমি ঢাকায় গেছি। চট্টগ্রাম গেছি। চন্দ্রনাথ দর্শন করেছি। কামাক্ষ্যা দর্শন করেছি। তোমাদের দেশ তো এখন পাকিস্থানে। বেচে কিছু আসতে পেরেছিলে?

না, বললুম, মাথা নেড়ে।

ওখানে মেয়েদের উপর খুব অত্যাচার হয়েছে। ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, নবসত্যযুগ। এটা নবসত্যযুগ। রামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম।

অবতার তো আর হীরে সোনার দেহ ধারণ করে আসেন না। নরদেহে আসতে হয়। রক্তমাংসের দেহে।

দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে এলেন রাম ত্রেতাযুগে। পূর্ণ ব্রহ্ম। দ্বাপরে এলেন কৃষ্ণরূপে বাসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে। পূর্ণব্রহ্ম। নিজে বিয়ে করলেন। ছেলেপুলে হলো। যদুবংশ স্থাপন করলেন।

সে যুগে ছেলেমেয়ে সমানভাবে শিক্ষা পেত। মেয়েরাও শাস্ত্র, শস্ত্র, রথচালনা সব বিদ্যাই লাভ করতো। তার পর নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করতো। তখন তো আর ঘটক ছিল না। ছিল ভাঁড়। ভাঁড় রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে মেয়ের গুণাগুণ বর্ণনা করতো। মেয়ে স্বয়ম্বরা হতো। নিজে বেছে নিত পতি। মামাতো পিসাতো ভাই-বোনে বিয়ে হতো।

অর্জুন আর সুভদ্রা। মামাতো পিসাতো ভাইবোন। কৃষ্ণসখা অর্জুন। কৃষ্ণের রথেই সুভদ্রাকে নিয়ে পালান। কৃষ্ণের সারথি। কি যেন নাম তার? ভুলে যাই এখন। বোধ হয় দারু (দারুকী)।

দারু বললে, এমন কাজ কোরো না। যাদবগণ মেরে ফেলবে তোমায়। তেড়ে আসছে। ভীত দারু।

অর্জুন তাকে রথ থেকে নেমে যেতে বললেন। দারু বলে, নেমে গেলে আমার নিস্তার নেই। তার চেয়ে রথের চূড়ায় আমায় বেঁধে রাখ যা'তে যাদবগণ বুঝবে আমার দোষ নেই।

এদিকে বলরাম ক্ষিপ্ত। তিনি হল কাঁধে নিয়ে বললেন, কুরুকুল ধ্বংস করবো। কৃষ্ণ তাঁকে শান্ত করে বলেন, তিনি নিজেই যাচ্ছেন। দেখেন যুদ্ধ করছেন অর্জ্জুন আর সুভদ্রা সারথি। অস্ত্র নিক্ষেপে ভগ্নী হবেন হত।

এইতো মামাতো পিসাতো ভাই বোনে বিয়ে হয়ে গেল।

ভীষ্মদেব কি করেছেন? নিজে ছিলেন চিরকুমার কিন্তু সুন্দরী যত মেয়ে লুট করে এনে বিয়ে দিলেন কৌরবদের সাথে। তখন জাত-বিচার ছিল না।

দ্বাপরের পর এলো কলি। ভগবান কলিকে ডেকে বললেন, তুমি এবার পৃথিবীতে রাজত্ব কর। কলি নারাজ। বলেন, আমার রাজ্যে হবে ভীষণ পাপাচার। লোকে আমায় অভিশাপ দেবে। আমি যাব না। ভগবান আশ্বাস দেন। আসে কলির রাজত্ব। ভীষণ পাপাচার। তা' আমি তোমাদের কাছে বলতে পারবো না। মা বসুমতী আর সইতে পারেন না। কাতরে জানান ভগবানকে। এলেন রামকৃষ্ণরূপে শ্রীভগবান। পূর্ণ ব্রহ্ম।

বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য—কেউই পূর্ণব্রহ্ম ছিলেন না—আংশিক।

এটা নবসত্যযুগ। আবার তাই হবে। ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েরাও সর্ববিদ্যাবিশারদ হবে। নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করবে। জাত মানবে না। ছেলেমেয়েদের খুব শিক্ষা দেবে। আমাদের সময় ছিল অন্য রকম। খুব ছোটতেই বিয়ে দিত। গৌরী দান

হতো, মাসিক হবার আগেই বিয়ে দিতো। বর্গীর হাঙ্গামা থেকে এ রকম হয়। বর্গীরা বাংলা দেশে লুটে মেয়ে নিয়ে যেত। ওরা বিবাহিতা বা বিধবা নিতো না। বলতো, 'উচ্ছিষ্ট'। কেবল কুমারী নিত। তাই বাল্যবিবাহ।

হেসে বললেন, আমার ন' বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। আমার বাবা ছিলেন ওঁর কাকা। উপেন মুখুজ্যের সাথে উনি বিয়ে ঠিক করলেন।

হেসে বললেন, আমি 'উপেন' বলেই বলি। ঠাকুর মা'কে বললেন, 'খুড়ীমা, উপেনের সাথে ভবতারিণীর বিয়ে দেও।'

মা বললেন, তা' দাও। কিন্তু ছেলে লেখাপড়া কি করছে আর অবস্থা কেমন? যেই শুনেছেন লেখাপড়া জানেন না, মা বেঁকে বসলেন। বললেন, মুক্ষু ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেব না।

রামকৃষ্ণ বলেন, তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে। আর উপেন হলো রত্নাকর। বাল্মীকি হবে। দেশজোড়া নাম হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ী আর আমার বাপের বাড়ী এক সিম্‌লে পাড়ায়। আমার দাদা নরেনের বন্ধু ছিলেন। আমাকে ডাকতেন 'বুড়ী' বলে।

ঠাকুরের সামনেই বলছেন, বুড়ীর সাথে উপেনের বিয়ে হলে না। উপেন কত সুন্দর। আর বুড়ী কালো, নাক দিয়ে ফোঁটা পরে। বুড়ীর পেট থেকে কালো বাচ্চা বেরবে।

ঠাকুর বললেন, ভবতারিণী রাজরাণী হবে।

হ্যাঁ বাবা, রহড়া আশ্রমে গেছ।

ইঙ্গিতে 'না' জানালুম।

যেও সুবিধা পেলে। উপেন ওটা করেছে বহু কষ্টের অর্থ দিয়ে।

উপেনের এবার শতবার্ষিকী হলো বসুমতী অফিসে। বৌবাজারে। গিয়েছিলে? যাও নি। আমিও যেতে পারি নি। লিখে দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ বাবা, তোমার দীক্ষা হয়েছে? কে দিলে?

লিখে দিলুম।

খুব ভাল, খুব ভাল। বহু জন্মের তপস্যায় এমন হয়। নিজের দেহ দেখালেন।

জান, কয়েকদিন আগে বৃদ্ধ এসেছিল। আরে মঠের বৃদ্ধ মহারাজ দুটি এমেরিকান মেয়ে নিয়ে। এই দেখ, তাদের সাথে আমার ছবি তুলেছে।

ছবি দেখালেন। বস্ত্র পরিধানে বসুমতীমা, পাশে দুটি বিদেশিনী ও বৃদ্ধ মহারাজ।

ওরা কি করলে জান। আমি যা' বলেছি তা' একটি যন্ত্রে (টেপ রেকর্ডার) তুলে নিয়ে গেছে। বললে যে ইংরেজী করে সবাইকে শোনাবে আমেরিকাতে।

ওদেরও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, দীক্ষা হয়েছে কি না? বললে, সব পেয়েছে, সব হয়েছে। সবই রামকৃষ্ণলীলা। পূর্ণ ব্রহ্ম। নবসত্যযুগ। সব আবার সেই রকমই হবে।

পাপপুণ্য আবার কি? যে কাজ করলে মনে অশান্তি হয় তাই পাপ, আর যা' করলে মনে শান্তি হয়, তাই পুণ্য।

হ্যাঁ বাবা, বিশ্বনাথ দর্শন করেছ, তাঁর চেলাদের দেখবে না? কাশীতে এসেছ। এ দোকান, সে দোকান দেখবে। কিছু কিনবে। তেমনি বিশ্বনাথের চেলাদের দেখ, কিছু কিনে নিয়ে যাও।

হাত দিয়ে দেখালাম যে বিশ্বনাথের চেলার সামনে বসে আছি। উনি হাসলেন।

অস্তগামী দিনমণি। গোধূলী আগত। বিদায় চাইলুম।

এখানে এলে আবার এসো, বললেন রামকৃষ্ণশিষ্যকুলপূজিতা ভবতারিণী দেবী,---বসুমতী মাতা।

পথ চলো

শ্রীশ্যামসুন্দর বসু

সূর্যসম আলো জেলে আঁধারের বুকে
পথ চলো : ক্লান্তিহীন সদানন্দ চিত্তে
দুর্নিবার বেগে চলো দিবসে নিশীথে
কঠোর প্রতিজ্ঞা যেন থাকে চোখে-মুখে।

হে সৈনিক! প্রস্তুত ঐ সংগ্রাম শিবির
পার হয়ে চলো তুমি দুস্তর প্রান্তর
রক্তে রেখে প্রতিজ্ঞার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর
সম্ভাষণ করো তুমি কালবৈশাখীর।

হে সৈনিক তুলে ধরো সাম্যের নিশান
ডাক দাও মানুষেরে ; যত অভাজন
ক্লিষ্ট দীন বেদনার্তে করিয়া বরণ
শোনাও তাদের কানে যৌবনের গান।

তোমার এ পথচলা আঁধিয়ার রাতে
জাগাবে উজল রবি আগামী প্রভাতে।

॥ চোখ ॥

১৯৫২ সালের কথা। দেশময় তখন 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ বইছে। লাহোর থেকে চিঠি এলো, বোসেস ল্যাবরেটরীর লাহোর এজেন্ট স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে কিছু ওষুধ-পত্র সরবরাহ করবার পর একটি টিংচারের কর্মশক্তি নিয়ে বিতর্ক হয়। কেস আদালতে গড়ায়। তখন কোম্পানীর তরফে আমাকে লাহোরে পাঠালেন ডাঃ বোস।

আমি গিয়ে দেখি, বাজার থেকে অন্যান্য কোম্পানীর তৈরী ঐ টিংচারটি নিয়ে সরকারী পরীক্ষাগারে তার পরীক্ষা করে ফলাফল নজির হিসাবে তৈরী রাখা হয়েছে আদালতে দেখাবার জন্য, কারণ বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া অনুসারে কারো টিংচারেরই পোটেনসি বা কর্ম-শক্তি ঠিক ছিল না।

ঐ নমুনাগুলির মধ্যে বেঙ্গলের নামটি দেখে আমি কোন নমুনাই আদালতে পেশ করতে না দিয়ে মামলার জন্য সময় প্রার্থনা করে সব নিয়ে কলকাতায় চলে আসি, কারণ আমার সন্দেহ হয়েছিল, প্রকাশ্য আদালতে এই সব নমুনাই ডাঃ বোস পেশ করতে অনুমতি দিতে চাইবেন না। ডাঃ বোসকে টেলিগ্রাম করলে তিনিও আমাকে সব নমুনা নিয়ে কলকাতায় আসতে বললেন।

যখন আমি কলকাতায় পৌঁছুলাম তখন ডাঃ বোস তার নিজের অফিস-ঘরেদুপুরের আহার করছেন। জেনারেল অফিসের পাশে যে ঘরে তিনি শুতেন সেই ঘরেই দুপুরে অফিসের কাজ দেখতেন, দিনে রাতে খাবারও সেই ঘরেই দেওয়া হত।

তাঁর খাস চাকর দয়া গিয়ে বলল—'সঞ্জয়বাবু আউচি।'

ডাঃ বোস বললেন—এখানেই ডাক তাকে।

আমি গেলাম এবং ওষুধের নমুনা এবং তার অ্যানালিসিস রিপোর্টগুলি

সঞ্জয়

দেখালাম। বেঙ্গলের টিংচারটির রিপোর্ট-খানি তিনি হাতে তুলে নিয়ে পড়ে দেখলেন।

তখনও টেলিফোন স্বয়ংক্রিয় হয় নি। খাটের পাশে টেলিফোন পড়ে ছিল। সেই খাটে বসেই একটি টুলের উপরে ভাতের থালা রেখে খাচ্ছিলেন ডাঃ বোস। আমায় বললেন—রাজশেখরকে তার বাড়িতে ফোন করো তো।

এ সময় রাজশেখর বেঙ্গল কেমি-ক্যাল থেকে অবসর নিয়েছেন, তবে উপদেষ্টা হিসাবে তখনও সংযুক্ত আছেন কোম্পানীর সঙ্গে। ফোনে তাঁকে পাওয়া গেল।

ডাঃ বোস খাওয়া ফেলে ফোন তুলে ঘটনাটা রাজশেখরকে বুঝিয়ে বললেন। তিনি যে ঐ নমুনা বা তার রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে দেন নি তাও বললেন। তারপর বললেন—এমন হচ্ছে কেন?

ওদিক থেকে কি উত্তর এলো জানি না। কিন্তু ডাঃ বোস বিলক্ষণ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন—কে এ কাজ দেখছে তাকে তো আমি চিনি না। আমি চিনি তোমাকে তাই অভিযোগটা তোমাকেই জানাচ্ছি এবং তোমার কাছেই এর প্রতিকার চাই। দেখ রাজশেখর, বেঙ্গল কেমিক্যালকে তো আমরা কেউ একটা বিজিনেস বলেই শুধু দেখি নি, ও যে সারা বাংলা দেশের মান, সারা বাঙালী জাতির গৌরব। ওর কোন অপযশ তুমি আমি কি দাদা আমরা কেউ সহ্য করতে পারি নি। তুমি এর উপযুক্ত প্রতিবিধান করো—

বলেই ফোনটি তিনি ছেড়ে দিলেন এবং মাছ ভাত শুদ্ধ ভাতের থালা বিরক্তির সঙ্গে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডাক দিলেন,—দয়া, হাত ধোবার জল দে।

স্পষ্টই বুঝলাম, তাঁর দুপুরের আহার মাটি করলাম। মনে মনে বড়ই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম।

তিনি হাত ধুয়ে সেই খাটেই শুয়ে পড়ে বললেন—লাহোরে তার করে দাও, আমরা খেসারত দেব, মামলা চালাব না।

অর্থাৎ ঐ নমুনাগুলির রিপোর্ট নিয়ে আর কোন আলোচনা হয়, তিনি আর তা চান না।

রাতে আবার ঐ ঘরেই সাক্ষাৎ হল। কারণ একান্ত সচিব হিসাবে

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
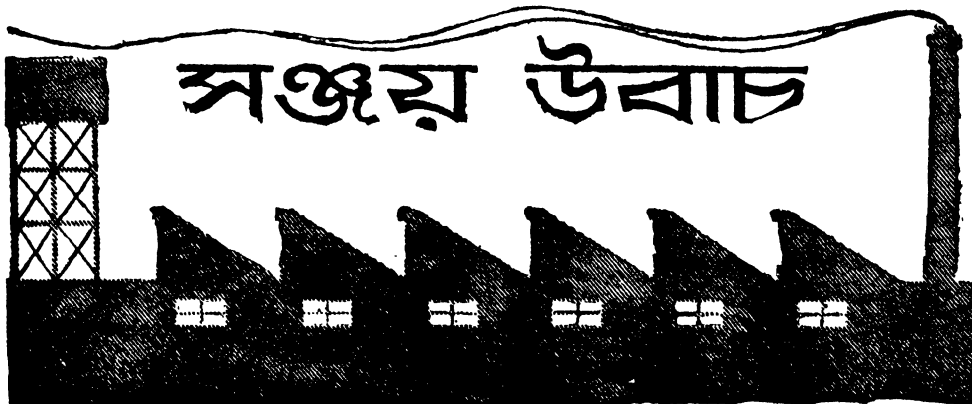
আমায় রাতে কিছুক্ষণ কাগজপত্র নিয়ে রোজই তাঁর কাছে থাকতে হত। আমি থাকতামও পাশের আর একটি কামরায়।

কথাপ্রসঙ্গে বলেই ফেললাম---রাজশেখরবাবু কিছু মনে না করে থাকেন।

ডাঃ বোস শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন, বললেন---তুমি কি মনে করেছ রেগে গিয়ে রাজশেখরকে দু কথা বলেছি বলে সে অসন্তুষ্ট হবে? আরে না, তুমি তাকে চেনো না। সে বড় কাজের মানুষ। কাজে গাফিলতি সে সইতে পারে না। ওহে, আমি তাকে নিজের হাতে কত কাজ শিখিয়েছি আর সে আমার কথায় অভিমান করবে? করে করুক, কিন্তু যেখানে গলদ, তা ঠিক শুধরে দেবে। ও একটা মানুষের মত মানুষ। সারা জীবনে অমনটি আর পেলাম না।

বলে তিনি চন্দ্রশেখরবাবু এবং বেঙ্গল কেমিক্যালে রাজশেখরের প্রথম জীবনের কথা সব বললেন। সে সব শুনবার পর যখন পরদিন রাজশেখর-বাবুকে ডাঃ বোসের কাছে আসতে দেখলাম তখন আর মোটেই আশ্চর্য হলাম না। গুরু-শিষ্যে সেদিন কি কথা হয়েছিল তা অবশ্য শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু রাত্রে যখন ডাঃ বোসের সঙ্গে আবার দেখা হল, তিনি বললেন---রাজশেখর এসেছিল। বলে গেল, সব ঠিক করে দিয়েছে। আর কখনও এমন শৈথিল্য দেখা যাবে না এ আশ্বাসও দিয়ে গেল।

যে কোম্পানী তিনি সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর আগে ত্যাগ করে এসেছেন তার সুনামের জন্য এই দুশ্চিন্তা এবং নিজের আর্থিক লোকসান সহ্য করেও সেই কোম্পানীর সুনাম বজায় রাখবার এই প্রচেষ্টার নিদর্শন নিতান্ত বিরল। একমাত্র ডাঃ বোসের চরিত্রেই দেখেছি তা। আর দেখেছি বিরাট পুরুষ রাজশেখরকেও বাধ্য শিষ্যের মত অতুলনীয় বিনয় এবং অপূর্ব সম্ভ্রম প্রকাশ করতে। তাঁরা কেউ কারো থেকে কম ছিলেন না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে দুজনেই দিক্‌পাল।

॥ পনেরো ॥

ডাঃ বোসের একান্ত সচিব ছিলাম বলেই সহজেই আমি রাজশেখরেরও স্নেহলাভ করেছিলাম। তাঁর খুব নিকট সম্পর্কে আসবার সৌভাগ্য না হলেও রাজশেখরকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম তাঁর বহুবিধ গুণাবলীর জন্য এবং এজন্যই তাঁর জীবনের অনেক ঘটনাই আমি সাগ্রহে জেনেছিলাম। বর্তমান কালের যে-সব মানুষকে আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে রাজশেখর তার মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এখানে তাঁর কথাও তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

রাজশেখর ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ১৬ই মার্চ বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়া গাঁয়ে তাঁর মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা চন্দ্রশেখর বসু দ্বারবঙ্গে রাজার ম্যানেজার ছিলেন। সেখানে স্কুলের পড়া শেষ করে পাটনায় এফ-এ এবং কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বি কোর্সের বি-এ পাশ করেন। তখনও এম-এস-সি কোর্স চালু হয়নি। তিনি রসায়নে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তারপরে আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন।

১৯০৩ খৃস্টাব্দে ডাঃ বোস তাঁকে বেঙ্গল কেমিক্যালে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৬০ খৃস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৭ বৎসর বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে প্রায় ৩০ বছর ম্যানেজার পদে কাজ করেন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে তিনি চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

তিনি গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প, ধুস্তুরীমায়া, কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প, নীলতারা, আনন্দীবাঈ, চমৎকুমারী এইসব গল্পের বই, চলন্তিকা নামক বহুবিখ্যাত অভিধান, লঘুগুরু, বিচিন্তা, ভারতের খনিজ, কুটির শিল্প---এই চারখানি প্রবন্ধের বই, পরশুরামের কবিতা নামক কাব্য এবং রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের মেঘদূত, হিতোপদেশের গল্প এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এই সব অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা মোটে একুশখানি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্র-পুরস্কার, আকাদামি-পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ উপাধিতেও তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁকে বিচলিত হতে দেখি নি।

॥ ষোল ॥

বেঙ্গল কেমিক্যালে যখন ডাঃ বোস ম্যানেজিং ডিরেক্টর তখনকার দু-চারটি কথা এখানে বলে নিই।

সকালে বিকালে ডাক্তারি আর দুপুরে বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজ দেখার নিয়মিত রুটিনে চলছেন ডাঃ বোস। বিকালে ডক্টর রায় কলেজ থেকে ফিরলে দুজনে কথাবার্তা বলে ডাঃ বোস বেরিয়ে পড়েন। ডক্টর রায় কাজকর্ম দেখেন। 'আমি পি, সি, আর তুমি কে, সি,' বলে ডক্টর রায় সেই প্রথম দিনেই ডাঃ বোসকে নিজের ভাইয়ের মত সমাদর করেছিলেন তদবধি আমৃত্যু সেই হৃদ্যতা তাঁদের ছিল। ঘটনাচক্রে ডাঃ বোস বেঙ্গল কেমিক্যাল ছেড়ে এলেন তখনও দুজনের ব্যক্তিগত হৃদ্যতায় ফাটল ধরেনি। এমনও দেখেছি, শেষ জীবনেও ডাঃ বোসকে আচার্যদেব সামান্য উপলক্ষেও কি চমৎকার স্নেহ সম্ভাষণপূর্ণ পত্র লিখতেন। একজন তরুণ ডি-এস-সি'র চোখ দেখাতে হবে তার জন্যও নিজ হাতে চিঠি লিখছেন---ভাই কে, সি---ইহার চক্ষু দেখিয়া দিও।

বেঙ্গল কেমিক্যালের সেই আদি-যুগে ডাঃ বোস রোজ দুপুরে একটি মুরগী রোস্ট করে বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিসে আনাতেন। তার আধাআধি দাদা কলেজ থেকে ফিরে খাবেন বলে রেখে দিয়ে বাকি অর্ধাংশে নিজে জলযোগ করতেন। এ গল্প ডক্টর রায়ের মুখেও শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তাঁদের এই ভ্রাতৃভাব জীবনের শেষদিন অবধি ছিল।

কিছুকাল ধরে প্রায় প্রতিমাসেই ডাঃ বোসের ছোট ভাই চারুচন্দ্র বোসের কাছে ডক্টর রায় নিজের চোখ দেখাতে আসতেন। চারুবাবু ছিলেন ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোম্পানী নামক বিখ্যাত চশমার কারবারের মালিক ও কর্ণধার। আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতেই এ কোম্পানীর কারখানা এবং শো-রুম। চারুবাবু ছিলেন চিরকুমার, অত্যন্ত মিত-ভাষী এবং বহু বিষয়ে সুপণ্ডিত। সারা-জীবন চশমার কারবার আর পড়াশুনা নিয়েই কাটিয়েছেন। তিনি ডাঃ বোসের বৃহৎ কর্মযজ্ঞের অন্য কোন বিভাগে সহজে অংশগ্রহণ করতেন না।

তবে কার্তিকচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে চারুবাবু ডক্টর রায়ের সঙ্গে নিবিড় স্নেহসম্বন্ধে যুক্ত হয়েছিলেন; সেই প্রীতি বেড়েছিল তাঁর নিজের চরিত্রমাধুর্যে। ফলে ডক্টর রায় যেমন মাঝে মাঝে চোখ দেখাবার উপলক্ষে চারুবাবুকে দেখতে আসতেন, তেমনি ডক্টর রায় এলে চারুবাবুও যেন ধন্য হয়ে যেতেন। যত সময় তিনি থাকতেন ---আর সব কাজ ফেলে নিজে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম দিকে যখন বেশী লোকজন ছিল না সেই সময় এক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কেমিস্ট সতীশচন্দ্র সিংহ ডাঃ রায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি একদিন রসায়নাগারে কাজ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন ডাঃ বোস অফিসে নেই, ডক্টর রায়ও কলেজে।

সংবাদ পেয়ে ডক্টর রায় যখন ছুটে এলেন তখন তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। যে-গ্লাসে হাইড্রো-সায়ানিক এসিড ঢালা হয়েছিল, ভুলক্রমে তাতেই বেয়ারা সতীশচন্দ্রকে পানীয় জল দিয়েছিল এবং তিনি সেই গ্লাসের জল খেয়েই জ্ঞান হারান।

ডক্টর রায় কার্তিকবাবুকে তাঁর বড়বাজারের চেম্বার থেকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি এসে পৌঁছবার আগেই সব শেষ। হাইড্রোসায়ানিক এসিড তার বিষক্রিয়া ঘটাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। অনেক সময় সাপুড়ে যেমন বিষাক্ত সাপের ছোবলে প্রাণ হারায় এও যেন তেমনি একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রসায়নবিদ সতীশচন্দ্র মারা গেলেন এসিডের বিষক্রিয়ায়। বেঙ্গল কেমিক্যালে শোকের ছায়া নেমে এল।

অতঃপর ডাঃ বোসকে আরও বেশী সময় দিয়ে কারখানায় কাজ চালু রাখা এবং সবদিকে কাজ বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হল। ডক্টর রায় মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। ডাক্তার বোসের সাহায্যে তিনিও কাটিয়ে উঠলেন এই দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া। কোম্পানীর কাজ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

●

এই সময়কার একটি দুপুরের ঘটনা।

কার্তিকবাবু ৯১ আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজ দেখছেন তখন একজন গুজরাটি ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। তিনি যে লিখিত স্লিপ দিয়েছিলেন, তাতে নাম লেখা ছিল---এম, কে, গান্ডি, উইশেজ টু সি ডক্টর পি সি রায়।

কার্তিকবাবু ভদ্রলোককে ভিতরে ডেকে কথা বললেন। তিনি জানালেন--ব্যাপারটা যদি ব্যবসায়গত হয় তবে আমার সঙ্গেই কথা বলতে পারেন। ডক্টর রায় এখন কলেজে, ফিরতে বিকেল হবে।

প্রয়োজন ব্যবসা সংক্রান্ত নয়, নমস্কার জানিয়ে গুজরাটি ভদ্রলোকটি অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার বোস আবার তাঁর কাজে মন দিলেন।

বিকালে ডক্টর রায় যখন বাসায় ফিরলেন, দেখলেন সেই ভদ্রলোক অফিসের বাইরে পায়চারি করছেন। দেখা হতেই ডক্টর রায় বললেন, হ্যালো মিঃ গান্ধী। বলে সে ভদ্রলোককে পরম সমাদরে অফিসের মধ্যে নিয়ে এলেন।

ভিতরে ডাঃ বোস তখনও কাজ করছিলেন। তাঁর কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন---এই ভদ্রলোক আফ্রিকায় অসহযোগ আন্দোলন করে সুফল পেয়ে এসেছেন। উনি কলকাতায় এসেছেন, এখানে কোন জনসভায় বক্তৃতা করবার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করছেন। ভাবছি, একটা মিটিং কল করব।

যে 'হাফ-নেকেড্ ফকির' দোর্দণ্ড-প্রতাপ বৃটিশ সিংহাসনকেও কাঁপিয়ে তুলেছিলেন, ভারতবাসীর পরম পূজ্য, জাতির জনক, মহাত্মা গান্ধী সেদিন নিতান্তই এম, কে, গান্ধী সেজে বেঙ্গল কেমিক্যালে হাজির হয়েছিলেন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার জন্য কয়েক ঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন তবু অফিসে বসে ডাক্তার বোসের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কাজের ক্ষতি করেন নি। মহাত্মা গান্ধীকে তাই অত্যন্ত বিবেচক এবং সহানুভূতির প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়েছিল ডাঃ বোসের।

পরবর্তী জীবনে মহাত্মা বহুবার কলকাতায় এসেছেন কিন্তু আর কোন সময় ডাঃ বোসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেনি। তার প্রধান কারণ রাজনীতিতে ডাঃ বোসের কোনও আগ্রহ ছিল না, বরং তা কিছুটা এড়িয়েই চলতেন। তবে পল্লী-উন্নয়ন, দেশবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষা, গোজাতি ও কৃষির উন্নয়ন, সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং সে সব কাজে প্রচুর অর্থব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হন নি। সে কাহিনী এরপর অন্যত্র বলব। তবে তিনি যে কর্মোন্মত্ত আর্যো

পছন্দ করতেন না, তার একটি বিশেষ প্রমাণ, যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে বিনা প্রয়োজনে আর কখনই সাক্ষাৎ করতে যান নি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম দিকে কর্মী-সংখ্যা যখন কম ছিল, তাদের মধ্যে একবার একটি বিষয় নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়। ওষুধ তৈরী হবার পর শিশি-বোতলে ভর্তি করে লেবেল লাগিয়ে বাক্সে ভর্তি করে দেওয়ার মধ্যে অনেক সময় অনেক শিশি-বোতল ভেঙ্গে যেত। কোন সময় ধুতে বা ওষুধ ভরতে অসাবধানেও বোতল ভাঙ্গত। ক্রীত মজুত মাল যদি ভেঙ্গে যায়, তাতে কোম্পানীর লোকসান। কার্তিকবাবুর সদাজাগ্রত দৃষ্টি, ঐ লোকসানের পরিমাণ যাতে বেশী না হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, যেদিন যে ক'টি শিশি কিম্বা বোতল ভাঙে তিনি ঠিক সংখ্যা উল্লেখ করে কর্মচারীদের বকাবকি করেন। তারা চুপ করে শোনে আর পরস্পরে এ-ওকে সন্দেহ করে, নিশ্চয় অপর ব্যক্তি কার্তিক বসুর কাছে লাগিয়েছে।

কর্মীদের মধ্যে এই সন্দেহ নিয়েই কলহের উৎপত্তি। কে যে ভাঙা বোতলের কথা ঠিক ঠিক কর্তার কানে তুলে দেয় এ আর কেউ ধরতে পারে না। যে বলে সে যে কার্তিকবাবু অফিসে ঢুকবার ঠিক আগেই বলে দেয় এটাও তাদের সন্দেহ হল কারণ বকুনির পালাটা অফিসে ঢুকেই অমনি আরম্ভ হত।

অবশেষে কর্মচারীরা কয়েকজন আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগল, কে ডাক্তার বোসকে এই বিষয়ে সংবাদ যোগায় তা তারা ধরে ফেলবেই।

সেদিন ডাঃ বোস যখন বেঙ্গল কেমিক্যালে গেলেন, তাঁর ঘোড়ার গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়ালে তিনি গাড়ি থেকে নেবে খানিকটা দূরে একটা নিমগাছ তলায় গিয়ে আবার ফিরে এলেন এবং অফিসে ঢুকেই আবার ক'টা শিশি ক'টা বোতল ভেঙেছে তার ফিরিস্তি দিয়ে তর্জন গর্জন সুরু করলেন।

কর্মচারীদের তখন পরস্পরের সন্দেহ দূরীভূত হল। কারণ তারা নিজেরাই দেখতে পেল, ডাঃ বোস নিমগাছ তলায় ডাস্টবিনে উঁকি দিয়ে দেখে এলেন—ক'টা ভাঙা বোতল ও ভাঙা শিশি সেখানে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলা হয়েছে। ডাস্টবিন থেকে তিনি খবর পেতেন, কি পরিমাণ অপচয় হচ্ছে। এমনই সতর্ক ছিলেন তিনি। লোকে যে বলত, তাঁর মাথার পিছনের দিকেও আর দুটো চোখ ছিল---কথাটা কি নেহাৎ মিথ্যা বলত? [ক্রমশ।

হে ঈশ্বর

মনোময় চক্রবর্তী

আমাদের হাসি কান্না লোভ এবং শরতাদি,
আমাদের স্নেহ মায়া এবং প্রতিশোধস্পৃহা—
এই সব মুছে গেলে (মুছবেই একদিন)
আবার তোমার কাছে ফিরে যাবো, হে ঈশ্বর,
সমর্পণ করবো নিজেকে নিঃশেষে নীরবে।

ইতিমধ্যে সাময়িক জনারণ্যে মিশে যাই ঃ
মানুষের স্রোতে অথবা ইচ্ছার বুদ্‌-বুদে
আমারও ইচ্ছা ভাসুকনা বুদ্‌-বুদ্‌ হয়ে
এবং সুখ ও দুঃখের কিছু কিছু অভিনয়।

তারপরে যেন আমি শুধু অনুভব করি ঃ
পরিব্যাপ্ত আশীর্বাদ ও অনাবিল করুণা
আমার সমস্ত দেহে, মনে, ইন্দ্রিয়ে, সত্তায়
এবং শরীরের সমস্ত অণুতে ও স্নায়ুতে।

এই বোধ অক্ষয় অব্যয় হোক, হে ঈশ্বর,
আমার জীবনে অথবা জীবনোত্তর লোকে
এই বোধ সুস্থ, সাবলীল এবং স্নিগ্ধ হোক

সন্তদাস বাবাজী

জর্জ এরালেন

অনেকদিন থেকেই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করছিলেন হরকিশোর। অনেক কথাই তাঁর কানে আসছিল---শোনাশুনিরও আর কিছুই নেই, নিজের চোখেও দেখলেন অনেক কিছু। তারপর আর বরদাস্ত করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। তাঁর জীবদ্দশাতেই এতবড় অনাচার আর তাঁকে তা সহ্য করতে হবে? কেন---কিসের জন্যে যে পুত্র তাঁর মর্যাদা রাখল না, বংশের ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে গেল, পারিবারিক, সামাজিক সচেতনতা জলাঞ্জলি দিল, পুরুষানুক্রমিক ধর্মকে উপেক্ষা করে বিসর্জন দিল---সেখানে পুত্রস্নেহ আবার কি---রাগে, ক্ষোভে, বেদনায় দিশাহারা হয়ে ওঠেন হরকিশোর। একটা হেস্তনেস্ত এবার তিনি করে ছাড়বেনই।

ছেলে তারাকিশোর তখন কলকাতায়। কলকাতাতেই ছুটে এলেন হরকিশোর। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জের অন্তর্গত বাইম গ্রাম। সেই গ্রামের সম্ভ্রান্ত বনেদি জমিদারের বংশে তাঁর জন্ম। বদান্য, ধর্মনিষ্ঠ, স্বজনপালক জমিদার হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। এই বংশের তিনিই একমাত্র বৈষ্ণব। পরম বৈষ্ণব হরকিশোর কলকাতায় ছেলের মুখোমুখি হয়েই ধর্মত্যাগী পুত্রকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করে ফেলতে চাইলেন। প্রহারের পর প্রহার, রীতিমত কঠোর শাসন।

কিন্তু তার কিশোরের প্রতিক্রিয়া কি হল। প্রাপ্তবয়স্ক স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তারাকিশোর এত মার খাবার পর কি করলেন স্বভাবতই এই বর্ণনার পর এ প্রশ্ন মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারে।

স্থির, অবিচল, নির্বিকার তারাকিশোর। নীরবে সমস্ত শাসন গ্রহণ করলেন, কিন্তু নিজেদের আদর্শ থেকে, আপন বিচারবুদ্ধিজাত সিদ্ধান্ত থেকে একতিলও তাঁকে কেউ সরাতে পারল না। নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তির উপর অটল মহিমায় দাঁড়িয়ে রইলেন তারাকিশোর। শুধু একটি কথা বাবাকে বললেন---'আমার শরীর আপনা থেকে উৎপন্ন সত্য, কিন্তু আমার আত্মা আপনা থেকে উৎপন্ন হয় নি। শরীরকে আপনি অনায়াসে বিনষ্ট করুন, কিন্তু যে পথে আমার কল্যাণ আমি দেখতে পাচ্ছি---সে পথ তো আমি ত্যাগ করতে পারি না।'

১৮৫৯ সালের ১০ই জুন শুক্রবার তারাকিশোরের জন্ম। সংসারাশ্রমে যিনি বিরাট জমিদারবংশীয় এবং হাই-কোর্টের এক অনন্যসাধারণ আইনজীবী তারাকিশোর চৌধুরী এবং সন্ন্যাস জীবনে যিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভারতপূজ্য সন্তদাস বাবাজী। বয়স যখন মাত্র নয় অর্থাৎ আজ থেকে শতবর্ষ আগে মা গিরিজাসুন্দরীকে হারালেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে বছর উত্তীর্ণ হলেন সেই বছরই তাঁর বিবাহ হ'ল অন্নদা দেবীর সঙ্গে। সুপ্রসিদ্ধ বিশারদবংশীয় হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা অন্নদা দেবী ভাবীকাল এত বড় সাধকের সহধর্মিণীরূপে যিনি নিজের শক্তি ও যোগ্যতা সর্বতোভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
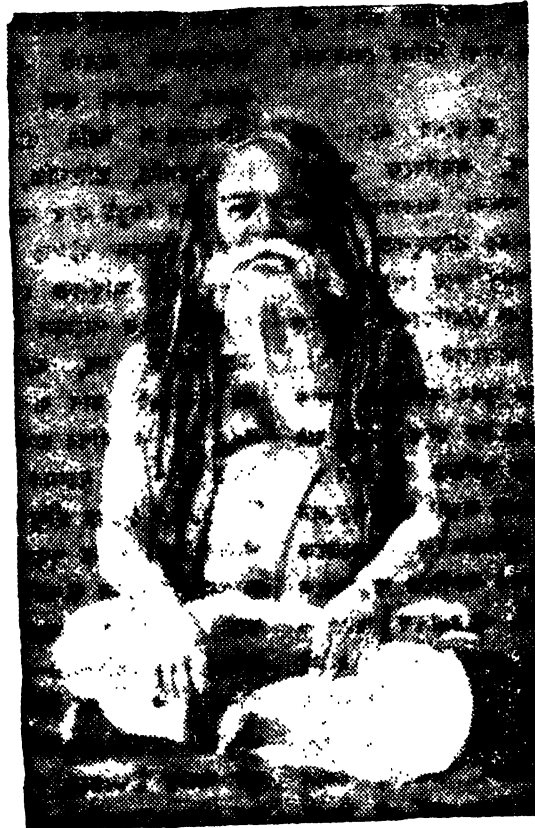
সন্তদাস বাবাজী

এবার শ্রীহট্ট থেকে কলকাতা। স্কুল থেকে কলেজ। শ্রীহট্ট থেকে সেই সময় আরও দুটি ছাত্র কলকাতায় এলেন উচ্চশিক্ষার আশায়। একই মেসে বাস করে তিন সহাধ্যায়ী বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে এগোতে থাকেন। বাঙলা দেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে তারাকিশোরের এই দুই সহাধ্যায়ীও আপন আপন ক্ষেত্রে দিকপালের মহিমায় বিরাজ করে গেছেন। জাতীয় জীবন তাঁদের অবদানেও যথেষ্ট সমৃদ্ধির মুখ দেখেছে। একজন সুন্দরীমোহন দাস অপরজন বিপিনচন্দ্র পাল।

ছাত্রজীবন থেকেই সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ছাপ দেখতে চাইতেন তারাকিশোর। নিজেকে পরিপূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলেছিলেন তারাকিশোর। ব্রাহ্মসমাজে তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে এক আলোড়ন এসেছে। শুধু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেই তারাকিশোর ক্ষান্ত হলেন না সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যও নির্বাচিত হন। এই পদে তরুণদের মধ্যে তিনিই বোধ করি প্রথম জন।

একদিকে জীবনের মধ্যে এই প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সংগ্রামী মনের এক অনন্য আকুলতা। তা ছাড়াও বহুরকমের প্রতিকূলতা। এরই মধ্যে এম-এ পাশ করে প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে তারাকিশোর নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকলেন।

হরকিশোর তখন কাশীতে। অশান্ত পুত্রের মতিগতি কি করে ফেরান যায় এ সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অন্ত নেই অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন হরকিশোর। টেলিগ্রাম করে ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। কাশীতে থাকাকালে তৈলঙ্গস্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করলেন তারাকিশোর। মনের মধ্যে এক নতুন প্রশ্ন দেখা দিল। বিস্ময়ে হতবাক হলেন তিনি ভিতরে শুধু একটি প্রশ্ন---কোন শক্তিতে, কোন সাধনায়, কোন দৈবকৃপায় এই বিরাট শক্তি এঁদের আয়ত্তে এসেছে।

দেখতে দেখতে এক নতুন উপলব্ধির বন্যায় ভেসে গেলেন তারাকিশোর। এক নতুন চেতনা তাঁর সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে ফেলল এক নতুন আলো তার অজস্র রশ্মি ও কিরণ সমেত তাঁর চোখের সামনে ধরা দিল। তখন স্পষ্ট অনুভব করলেন তারাকিশোর যে ব্রাহ্মসমাজে মিশে যে সমস্ত আচার ব্যবহার তিনি পরিত্যাগ করেছেন তা তাঁর পক্ষে আদৌ সমীচীন হয় নি।

জগৎচন্দ্র সেন ছিলেন একজন যোগশিক্ষাদাতা। তাঁর কাছে মন্ত্র নিলেন তারাকিশোর। সেই অনুসারে আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরে বুঝলেন যে এ পথেও তিনি বেশীদূর এগোতে পারবেন না।

এদিকে আইনপড়া শেষ হল। শ্রীহট্টেই ওকালতি সুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পশার জমে উঠল। বাবার চেষ্টায় আবার হিন্দুসমাজে তিনি গৃহীত হলেন।

১৮৮৮ সাল। তারাকিশোর যোগ দিলেন কলকাতার হাইকোর্টে। এখানেও অল্পদিনের মধ্যেই এক তীক্ষ্ণধী, ধুরন্ধর, বিচক্ষণ এবং প্রথম শ্রেণীর আইনজ্ঞরূপে তিনি খ্যাত হলেন। কিন্তু খ্যাতি, প্রতিপত্তি, পসার, অর্থ, যশ কোন কিছুই তার ভিতরকার আকুলতার নিরসন ঘটাতে পারল না। মনের তীব্র আকুলতা মেটাবার কোন পথই যে খুঁজে পাচ্ছেন না। সে আকুলতা ভোগের নয়, যোগের। ভিড়ের নয় গভীরের। মণি বা রমণীর জন্য নয়, স্বয়ং নীলমণির জন্য। কে তাঁকে দিতে পারে সেই সন্ধান?

১৮৯১ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন পতিতপাবনী গঙ্গার পূতপবিত্র বারিতে অবগাহন করছেন তারাকিশোর। মনের কান্না সেদিন যেন আর বাঁধ মানতে চাইছে না। হঠাৎ--হ্যাঁ---হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে চিত্ত উঠল ঝলমলিয়ে। চোখের সামনে দেখলেন হিমালয়ের মূল গঙ্গার উৎসস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন উমা-মহেশ্বর। দেবাদিদেব একটি একাক্ষর বীজমন্ত্র দিলেন, আকুল, পিপাসু সন্ধানী যুবককে বুঝিয়ে দিলেন যে এই মন্ত্র জপের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত গুরুর সন্ধান মিলবে।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা, ভারতবর্ষের পুণ্যকামী নরনারীর নিকটে এই মেলার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সর্বজনবিদিত। ১৩০০ সালের মাঘ মাস (ইং ১৮৯৪)। এর মধ্যে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে শুধু পরিচয়ই নয়---যথেষ্ট মৈত্রী ও অনুরাগ গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। সেইখানেই একদিন সাক্ষাৎ পেলেন মহাপুরুষ কাঠিয়াবাবার। দেশ-বিদেশের আশীর্বাদপূত মন্ত্রজপ সেদিন পরিপূর্ণ সিদ্ধির অমৃতলোকে পৌঁছে দিল তারাকিশোরকে। অন্ধতমিস্রাঘন দুর্যোগময়ী রাত্রির অবসানে যেন মেঘমুক্ত আকাশে বালারাগরঞ্জিত নবজীবনের বার্তাবহ প্রভাতসূর্যের প্রসন্ন আবির্ভাব।

দীক্ষাদাতা, অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শক কাঠিয়াবাবা প্রথম আলাপে কথাপ্রসঙ্গে এমন অনেক তত্ত্বের অবতারণা করলেন বা এমন বহু বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন---যা বিস্ময়ে হতবাক করল তারাকিশোরকে। তরুণ সন্ধানীর মনের মধ্যে এতকাল ধরে যে প্রশ্নগুলি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল সেইগুলিই যেন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও উত্তরের রূপ নিয়ে তাঁর সামনে ধরা দিল। অন্তরের মধ্যে তখন আর কোন জিজ্ঞাসা রইল না।

বৃন্দাবনে গেলেন তারাকিশোর। আশ্রমে কাঠিয়াবাবার দর্শন পেলেন। বড় অবাক লাগল। সেই সঙ্গে এল গভীর হতাশাও। সর্বত্যাগী, সন্ন্যাসী মহাসাধকের---তাঁর আরাধ্য সাধকের এ কোন রূপ---এ রূপ তো যোগীর নয়, এ তো পরিপূর্ণ গৃহীর। এ তো এক পুরোদস্তুর আসক্ত সংসারীর পাশবদ্ধ মূর্তি, নিজে হাটবাজার করেন, হিসেব রাখেন, পাই-পয়সার গোলমাল হলে বাপ-বাপান্ত করে ছাড়েন। আশ্রমজীবনে ধর্মালোচনা, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ অনুপস্থিত বললেই চলে, তার পরিবর্তে বাজার দর কি রকম উঠছে বা পড়ছে, কোন রাজা-মহারাজা ধনীব্যক্তি বৃন্দাবনে

আসছেন, অতএব সেই অনুযায়ী কি রকম ভেট আসবে---এই সব আলোচনা।

তারাকিশোরের বিস্ময় আর হতাশার অন্ত থাকে না। আসলে এ গুরুর লীলাভিনয় মাত্র। শিষ্যের অবিশ্বাস এবং ধৈর্য কতটা খাঁটি এবং দৃঢ় তা পরীক্ষা করার এই এক প্রকৃষ্ট পন্থা।

কৃপা মিলল গুরুর। সম্মত হলেন দীক্ষাদানে। স্থির হ'ল আগামী শ্রাবণ মাসে দীক্ষা দেওয়া হবে। শুধু তারাকিশোরকেই নয়, অন্নদা দেবীকেও।

আষাঢ়ের এক নিঝুম রাত। ছাদে শুয়ে আছেন তারাকিশোর। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসলেন। বিস্ময়বিস্ফারিত হয়ে দেখলেন তাঁর সামনেই কাঠিয়াবাবা একমুখ প্রসন্ন হাসি ও বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে। মন্ত্রদান করে মিলিয়ে গেলেন আবার যেমন শূন্যপথ দিয়ে এসেছিলেন তেমনই শূন্যপথেই চলে গেলেন। ছুটতে হল না বৃন্দাবন, সময় যেই এসে গেল তখনই ঈপ্সিত বস্তুর আবির্ভাব হল। ভক্তের আকুলতায় সাড়া দিলেন গুরু নিজে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে। মন্ত্রদানে তৃষিত-তাপিত হৃদয়ে এনে দিলেন স্বস্তি আর শান্তির প্রলেপ। শ্রাবণ মাসে সস্ত্রীক বৃন্দাবন গেলেন তারাকিশোর। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রলাভ করলেন---যে মন্ত্র আপন গৃহে তিনি পেয়েছেন সেই মন্ত্রই এবার আনুষ্ঠানিক প্রথাসম্মতভাবে পেলেন।

দীক্ষালাভ হল। গুরুর নির্দেশে পথ চলা সুরু হল। গুরু বললেন---সংসারধর্মই বড় ধর্ম, সংসারের মধ্যে দিয়েই সেই সারকে যা সবচেয়ে ধ্রুব, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে শাশ্বত এবং নিশ্চিত---পাওয়া যায়।

কর্মের মধ্যেই তাঁকে লাভ করা যায়। কর্মের মধ্যে মানুষের কল্যাণ, এই বাণীতে প্রাণ ঢেলে দিলেন তারাকিশোর। আইনজীবী হিসাবে কোনদিন তিনি সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। অর্থের প্রলোভন তাঁকে তাঁর সত্যের দৃঢ়ভিত্তি থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি। যে-সব মামলার মধ্যে সত্য নেই, ছলনা আছে অথচ কূটকৌশলে এবং বাকচাতুর্যে ও বিশ্লেষণের যাদুতে তা জয়লাভ করা অসম্ভব নয়, তারাকিশোরও সে মামলা কোনদিনই গ্রহণ করেন নি। উকিল হিসাবেও তিনি যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও মেধার পরিচয় দিয়ে গেছেন সমকালীন ইতিহাসে তাঁর সমকক্ষ নাম মাত্র একটি-দুটির বেশী মিলবে না।

ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্য কানায় কানায় পালন করে আসছেন তারাকিশোর অথচ আধ্যাত্মিক সাধনার পথেও ঠিক এগিয়ে চলেছেন। কৃতিত্ব তো সেইখানেই। সর্ববিধ সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেও যিনি সাধন ভজনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারেন তিনি তো নিঃসন্দেহে নমস্য।

গুরু নির্দেশ দিয়েছিলেন শেষ রাতে সাধনা করতে হবে তারাকিশোরকে। একদিন ঘুমিয়ে পড়েছেন তারাকিশোর। হঠাৎ কিসের স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে দেখলেন গুরু দাঁড়িয়ে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। ঘুমন্ত শিষ্যকে গুরু জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। শুধু দীক্ষা দিয়েই গুরুর কর্তব্যের সমাপ্তি নয়, শিষ্যের সাধন-জীবনের দিকে যথাযথ লক্ষ্য রাখা, ঠিকমত সে এগোচ্ছে কি না সেদিকে অতন্দ্র দৃষ্টি রাখা সদ্‌গুরুর কর্ম। কাঠিয়াবাবার একটি আলোকচিত্র পূজা করতেন তারাকিশোর। সেই চিত্রের মধ্যে প্রয়োজনের সময়ে গুরু আবির্ভূত হতেন, এ আলোকিক দৃশ্য শুধু সস্ত্রীক তারাকিশোরই নয়, অন্যান্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করে এক স্বর্গীয় অনুভূতির রসাস্বাদন করেছেন।

কাঠিয়াবাবা বাস করতেন একটি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে। সেখানে সাপ চলাচল করত মনের আনন্দে। তারাকিশোর কি করে সহ্য করেন এ দৃশ্য, তিনি থাকবেন সুপ্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল ও নিরাপদ কক্ষে আর তাঁর গুরু থাকবেন এই রকম ঘরে? নতুন ভবন তৈরী করতে হবে গুরুর জন্যে। তারাকিশোর উদ্যোগী হলেন। টাকা পাঠাতে লাগলেন কলকাতা থেকে, বাড়ী উঠতে লাগল। ১৮৯৭ সালে নতুন গৃহ তৈরী হল। যুগল শ্রীবিগ্রহ হ'ল স্থাপিত। ঠিক এইদিন সারা ভারতের আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী মৃত্তিকা কেঁপে উঠল। টলে উঠল ভারতের এই প্রবল ভূমিকম্পে---অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে শ্রীবৃন্দাবন ভূমিকম্পের আওতার বাইরে রয়ে গেল।

মনে আবার পরিবর্তনের ঢেউ আসে। চিন্তাধারা পরিবর্তনের মোড় নেয়। সংসারজীবন এবার টানতে পারে না তারাকিশোরকে পুরোপুরি, আশ্রমজীবন হাতছানি দেয়। রোগ-শোক-আঘাত-বেদনা-নিপীড়নে ভরপুর এই সংসারের জাঁতাকল এবার পীড়িত করে তোলে তারাকিশোরকে। এই ঘানি থেকে মুক্তি নিতে হবে তারাকিশোরকে। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করতে হবে গুরুর সেবায়, আশ্রমের কাজে, অধ্যাত্মসাধনায়। মনের বাসনা জানালেন সহধর্মিণীকে সকল দিক দিয়েই তিনি সহধর্মিণী। কোন কাজে তিনি স্বামীর পথে বাধাসৃষ্টি করেন নি। এখানেও করলেন না। প্রশান্তমনে সম্মতি দিলেন অন্নদা দেবী। আয়োজন সম্পূর্ণ। হঠাৎ একদিন, অকস্মাৎ অতর্কিতে---তারাকিশোর চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর শয়নকক্ষে তাঁর আরাধ্য দেবতাকে। ইষ্ট দর্শন হয়ে গেল। সমস্ত দেহে, মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির হিল্লোল বইল, সারাদেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত, অনুপমের পরম স্পর্শে অপরূপ হয়ে উঠলেন তিনি। বুঝলেন যে ভগবান সর্বত্র। তাঁকে পেতে গেলে গিরিশীর্ষে উঠতে হয় না, জলের তলায় ডুবতে হয় না। গভীর গহন অরণ্যে অরণ্যবাসী হতে হয় না। এই দুঃখ, বেদনা, রোগ, শোকের মধ্যেও ডাকার মত ডাকতে থাকলে সেই পরম কারুণিক মঙ্গলস্পর্শ মেলে। সেই অকাট্য প্রমাণ সেদিন পেয়ে গেলেন তারাকিশোর।

জিলিপি বিতরণ করা হচ্ছে।

রাশি রাশি বালক-বালিকার ভিড়। লক্ষ্য করলেন দুটি অপূর্বকান্তি বালক। যেন দেবশিশু, কি অপরূপ চলচল মুখ। সমগ্র পাত্র তাদেরই হাতে তুলে দিলেন। তারা নিজেরা খেল---সকলকে বিতরণ করল। হঠাৎ দেখলেন তারা অদৃশ্য, কোন খোঁজ মিলল না। ভক্ত তারাকিশোর বালকবেশী কৃষ্ণ-বলরামের হাতে সেদিন জিলিপির পাত্র তুলে দিয়েছিলেন।

একদিন সকলের আহার্যের তদারক করতে করতে নিজেকেই অভুক্ত রাখতে হল তারাকিশোরকে। সমগ্র খাদ্য নিঃশেষিত। এজন্যে মনে কোন ক্ষোভ নেই, পরম শান্তিতে শয্যায় আশ্রয় নিলেন তারাকিশোর। খানিক পরে একটি বালক একপাত্র দুধ তাঁকে দিয়ে গেল। কি সুন্দর তার স্বাদ। মিশ্রি, পেস্তা, বাদাম মেশানো। দুগ্ধ-সরবরাহকারী বালকটিকেই শুধু খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথা থেকে সে এল, কেন এল, কে পাঠাল---সব কিছু রহস্যই থেকে গেল। কিন্তু যারা নিছক যুক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে ভক্তির জগতে উপনীত হয়েছে তাদের কি বুঝতে বাকী রইল কে সেই ছদ্মবেশী বালক?

ধর্ম সাহিত্যের, ইতিহাসেও তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিবিধ জ্ঞানগর্ভ ও লোকহিতকর শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচারে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা এবং দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা---এ দুটি প্রদেশের সাধক এবং সন্ধানী সম্প্রদায়ের এক অতি আদৃত গ্রন্থ।

১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে চিরতরে আইনব্যবসায় ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসতিস্থাপন করেন তারাকিশোর। যেদিন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে তিনি শেষ অবসর গ্রহণ করেন---সেদিন হাইকোর্টে এক অভাবনীয় পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল। প্রত্যেকে বিষাদঘন মন নিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন তারাকিশোরকে। একটি ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিন তাঁর বহু আপত্তি সত্ত্বেও বয়সে চৌদ্দ বছরের বড় হয়েও পদধূলি গ্রহণ করেছিলেন যারা ভারতের আইনজগতের এক দিকপাল, বঙ্গজননীর এক উজ্জ্বল রত্ন, জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি স্যার রাসবিহারী ঘোষ। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁকে নেতার আসনে বসিয়ে বাঙলা দেশকে এবং তার সাধনাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। প্রথানুযায়ী স্থানীয় বৈষ্ণব মহান্তেরা তাঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। তাঁর নব-নামকরণ হ'ল সন্তদাস (১৩২৫ বঙ্গাব্দ)।

তারপর লোককল্যাণসাধন এবং জনসেবার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন সন্তদাস। ১৩৪২ সালের কার্তিক মাসে এই মহামানব অনন্তলোকে বিলীন হয়ে গেলেন। রেখে গেলেন দিব্য আদর্শসমৃদ্ধ সাধকজীবনের এক বিচিত্র এবং বরণীয় ইতিহাস।

অভিসার

শ্রীবংশীধর মণ্ডল

তোমার না বলা কথার নৈঃশব্দ রাতের তোমসে
আমি সমুদ্র হতে চাই অপরূপ বেনামী বন্দর
তোমার মানস বনে ফুটি কিংবা ভোরের শিশিরে
শুধু এক আলো দাও নিরপেক্ষ অনন্য নির্ঝর।

অথবা অরণ্য দাও একবিন্দু তিমিরে গোলাপ
ফোটাও স্মৃতির তৃষ্ণা অনাগত তোমাকেই ঘিরে
আমাকে উজ্জ্বল কর কশাঘাতে ব্যর্থ পরিতাপ
আমার সকল আত্মা তোমাকেই খুঁজে খুঁজে ফিরে।

অদৃশ্য চোখের জল চিরন্তন সৌরভে পিয়াসী
আলোর প্রেমিক তুমি আধ ফোটা পাপড়ি শরীরে
দাও প্রেম অভিসার বারম্বার যৌবনে বিলাসী
মগ্ন হতে চাই সেই বহিরন্তরতলে ধীরে ধীরে।

আমি তো আকাশ হব প্রতীক্ষিত একটি হৃদয়
তোমার সে পথ চেয়ে পৃথিবীর অনবদ্য ভোরে।

শিবদর্প

—আশুতোষ সিংহ

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

পৌষ মাসের বিষয়বস্তু

যা ত্রী র যা ত্রা

মাঘ মাসের বিষয়বস্তু

ফ্যা ক্ট রী

১ম পুরস্কার ২০, ২য় পুরস্কার ১৫,

৩য় পুরস্কার ১০

জোরা কাউন্টেন

—অজিত গোস্বামী

কানে কানে

—শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

মাসিক

বসুমতী

অগ্রহায়ণ / '৭৫

উঁচু থেকে নীচু

(৩য় পুরস্কার)
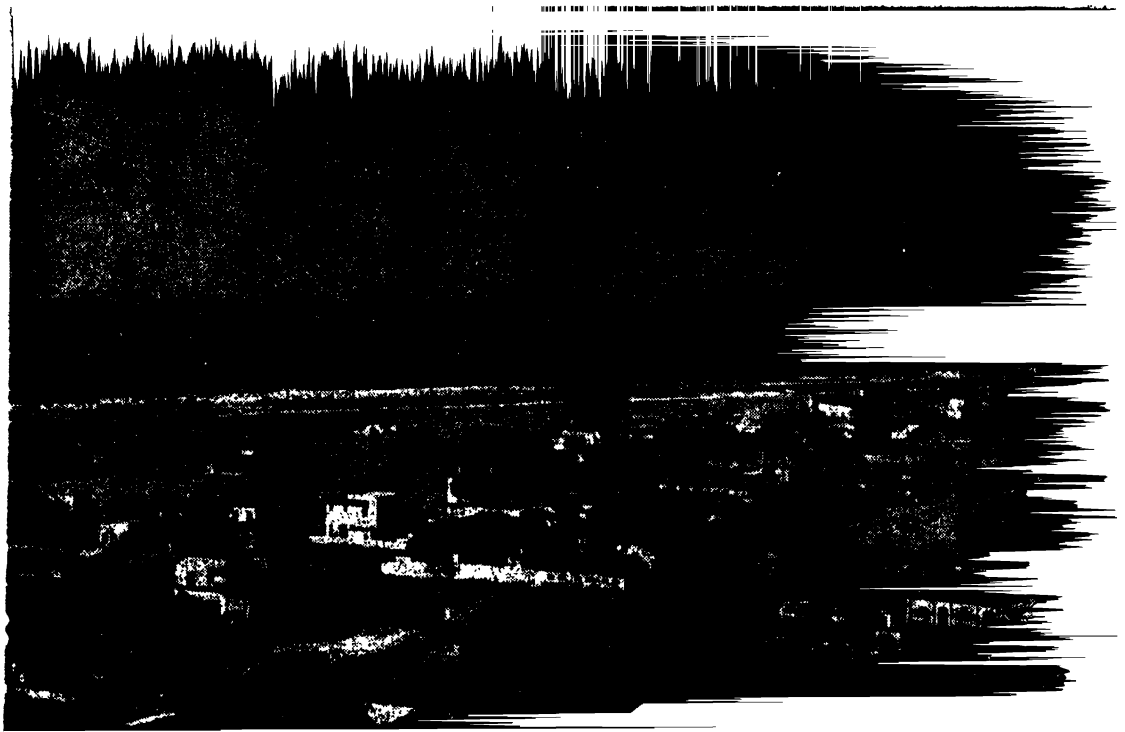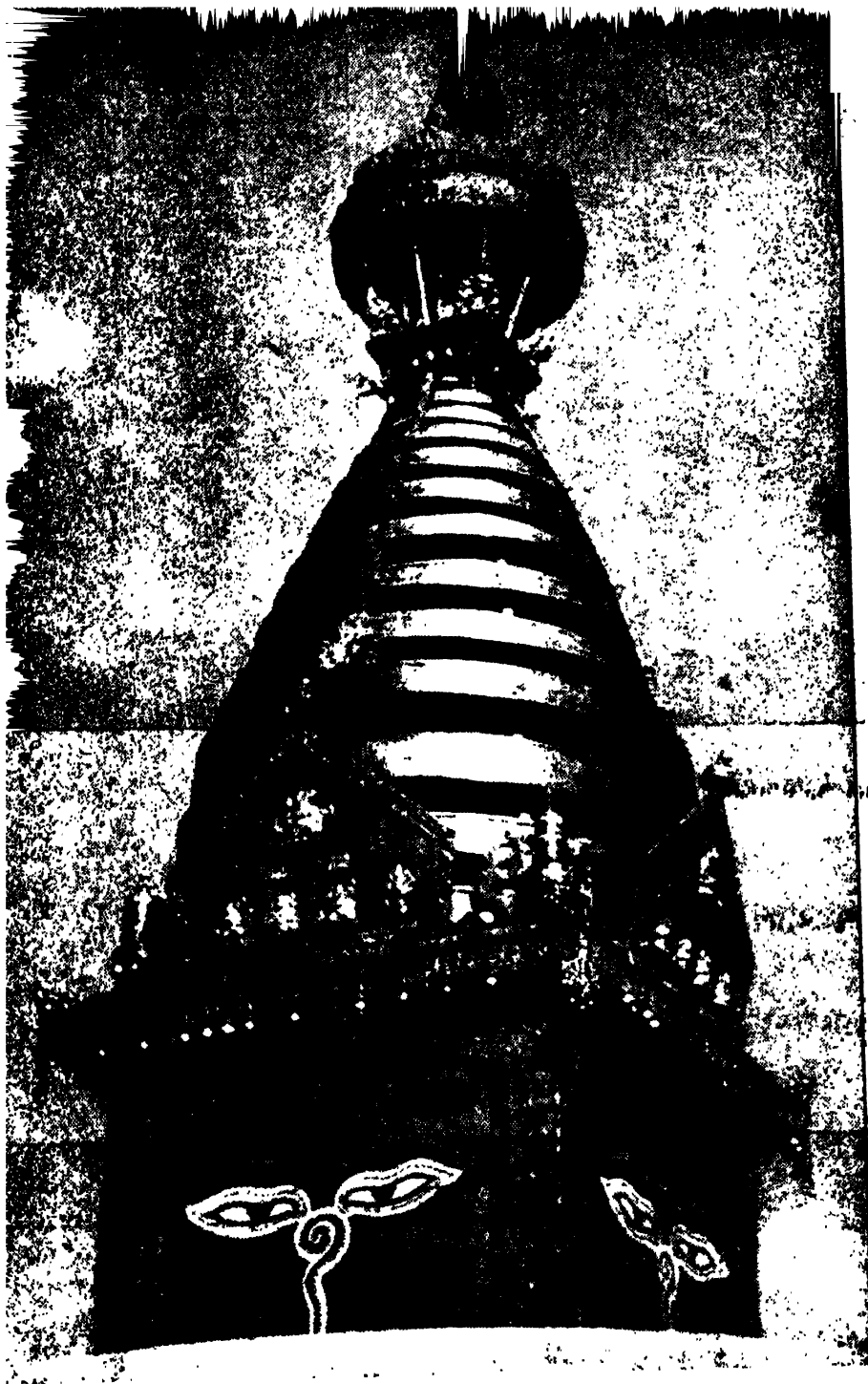
—আশুতোষ সিংহ

—স্বস্তিকুমার মুখোপাধ্যায়

(২য় পুরস্কার)

উঁচু থেকে নীচু

—অঞ্জনকুমার নন্দী

(১ম পুরস্কার)

মাসিক

বসুমতী

অগ্রহায়ণ / '৭৫

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির

সমীরকুমার বসু

ছবি পাঠানোর সময় ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা ও ছবির

বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।

আছে। ওটা খোলার ইচ্ছা সুজয়ের নেই। কি আছে তা জানে সুজয়। ধানাই-পানাই করে আবোল-তাবোল লিখেছে অনেক কথা। যেন সুভাষ মনে কিছু না করে। তার কাজের ক্ষতির কথা ভেবেই আলো তাকে এভাবে অত ভোরে উঠিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। অথচ আসল কথাটা লিখতে পারবে না। অন্য কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না, লিখবে এটাই।

উদ্দেশ্য সুভাষেরই কি ছিল যে তাকে সারাটা দিন শহরে থাকতেই হবে। তার শুধু মনে হয়েছিল, কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে ফিরবে। হাবিতদার মেসে এক দিন কেন দু-তিন দিন থাকলেও কিছু মনে করতেন না। বরং খুশিই হতেন সুভাষকে কাছে পেলে। তার যেন কোথাও থাকার জায়গা নেই ভেবেই আলো সকালে সরোজকে সংগে পাঠিয়েছিল বাস পর্যন্ত। পাছে সুভাষ ফিরে আসে আবার তাই স্টেশনের বাসে উঠিয়ে সরোজ ফিরেছে।

আশ্চর্য! সে তো যেচে তার বাড়ি যায় নি। পথে দেখা হতে আলোই শেষে ডেকে নিয়ে গিয়েছে তার বাড়ি। উপেক্ষা করতে না পেরে, ক্ষুণ্ণ হবে ভেবেই গিয়েছিল সুভাষ।

আরে, সুভাষদা না: তুমি হঠাৎ এখানে?

সুভাষ প্রথমে বুঝতে পারে নি এই শহরে কে এমন পরিচিত মেয়ে আছে যে তাকে ডেকে এমন করে। সুভাষ অন্যদিকে দেখছিল। হঠাৎ আলোর ডাকে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—আলো, তুমি! কোথায় গিয়েছিলে?

—মাসীর বাসায়, কালিঘাটে।

—তুমি একা যে, সংগে কেউ নেই?

একটু হাসল আলো। তারপর ছেলেকে দেখিয়ে বলল,—কেন এই যে ছেলে রয়েছে সংগে? ওকে বুঝি তোমার পুরুষ বলেই মনে হয় না! খোকন কিন্তু সব বোঝে। জেঠু বলেছিল, তোকে মেয়ের মতো দেখায়। ছেলের কি রাগ! জেঠু কেন তাকে মেয়ে বলবে এই নিয়ে ছেলের কি আপশোষ। শেষে জেঠু খেলনা দিয়ে তবে শান্ত করে।

—তাই নাকি! তাহলে ছেলে তোমার মানুষ হয়ে গিয়েছে বল!

—তা তো বটেই। এখন চল, তুমিই আমার সংগী: মেয়েছেলের একা একা চলা ঠিক নয়।

দুজনেই হেসে উঠেছিল। সন্ধ্যা হলেও আলোকে ঠিক আলোর মতোই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কথাবার্তায় মনেই হয় নি যে সে গাঁয়ের মেয়ে।

—তাহলে তোমার বাসায়ই উঠব এখন?

—কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি? আমার চেয়েও পরিচিত কোন লোকে আছে নাকি?

—না, সে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কোনটাই হয় নি এ পর্যন্ত।

মৃদু হাসিতে সৌরভ ছড়িয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে বলল—কেন, এ বৈরাগ্য কেন?

—মনের মতো মেয়ে পেলাম কোথায়?

এ কথায় হাসি বন্ধ হোলো। কথায় কথায় তারা বাসার কাছে এসে গিয়েছিল।

বাসায় এসে শুরু হোলো শহরের আপ্যায়ন। সেই বাঁধাধরা দোকানের খাবার। অবশ্য গ্রামেও তাই। মুড়ি চিড়ে সর্বত্রই প্রায় দুর্লভ। ঘরে ঘরে এখন তা আর মেলে না। সৌজন্য আত্মীয়তা সব কিছুই এখন পরনির্ভর।

—খোকন চলে এসো, নিয়ে যাও—

—না, না, তুমি খাও, ওকে দিয়েছি। ও তো খাচ্ছে। ওর জন্যেও এনেছি শুধু তোমার কথা ভেবেই আনা হয় নি মশায়: বুঝলে?

—বুঝলাম! বেশ ভালোই আছ তাহলে?

—তা আছি! আমার মতো হতকুচ্ছিৎ মেয়ে এর চেয়ে আর কি ভাল আশা করতে পারে বলো?

[illegible] বুঝেছে এ বাণ তার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। আর সংগে বিয়ের কথা হয়েছিল আলোর। আর তা হয় নি বলে আজও মেয়ের মনে দুঃখ। একবার বলে ভাল আছি, আবার তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে বলে সেই যন্ত্রণার হুল কাছে পেয়ে ফোটাতে ছাড়ে না। ভালো থাকলে তো ভুলে যাওয়ারই কথা।

তবে কি ভাল নেই। কোনদিন ভাল থাকে না এ মেয়েরা। মনের মধ্যে যে মূর্তিটা একবার দাগ কেটে বসে তা বুঝি কোনদিনই মুছে যায় না। তা না হলে তার সংগে দেখা হতে দেশের অন্য কথা, বাড়ীর কথা কিছুই না শুধিয়ে নিজের ব্যথা কোথায় তার খোঁজ দিতে বসেছে। অথবা নিজের রূপের অহংকারে আজও সে ডগমগ। তার মতো মেয়েকে হারিয়ে কতটা দুঃখ পেয়েছে সুভাষ তাই জানতে চায় আঘাত দিয়ে দিযে। কিন্তু আসল কথাটা জানতে বুঝতে চায় না। অথচ সুভাষ জানাতে চায়। কেউ তাকে ভুল বুঝে বসে থাকে এটা সে চায় না।

সুভাষেরও মনে হয়েছিল সেও পাল্টা শোনাবে অনেক কথা। কিন্তু সে সহজ হতে চায় এখন। সরোজের কথা জিজ্ঞাসা করে—সবই তো হোলো। কিন্তু আসল লোককে দেখছি না যে; কোথায় লুকিয়ে রাখলে তাকে?

—ওমা! তাকে লুকিয়ে রাখবো আমি।

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়
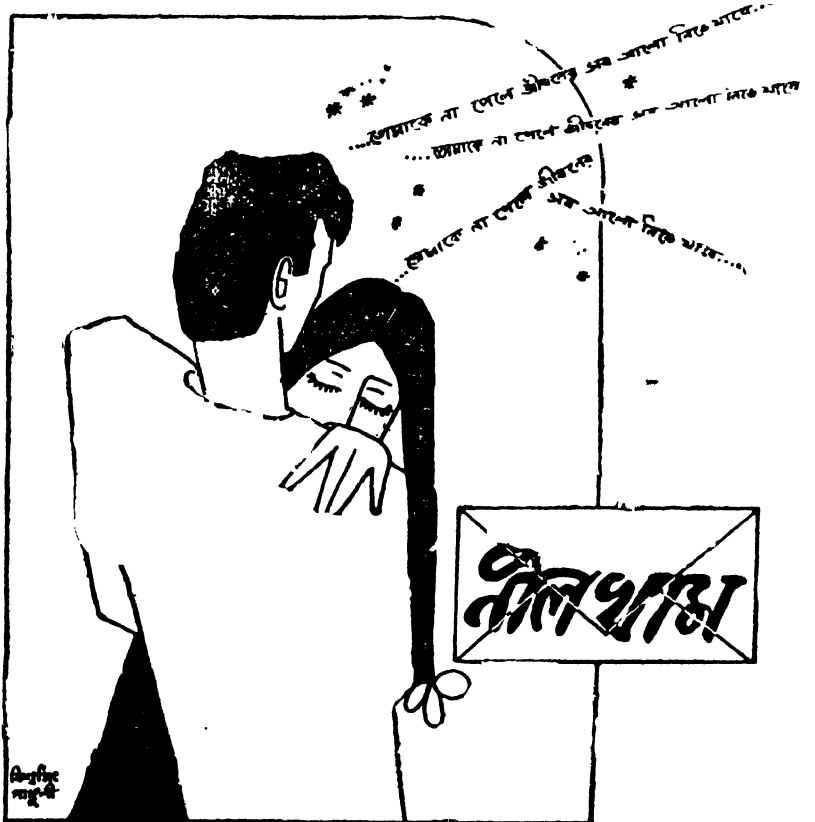
কে শুনিয়ে থাকারই ছলে। কোথায় আজকে ফিরোক মারছে খেলে। বাড়িতে কি ছুটির দিনেও একটু থাকে? সব আমাকেই দেখতে হয়। সব টাকা-পয়সা আমার হাতে তুলে দিয়ে উনি খালাস। পুরুষগুলো এরকমই স্বার্থপর হয়।

আবারও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। আবারও তাই চেষ্টা সুভাষের প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার। তাই মনে করিয়ে দেয় তাকে বাড়ির কথা। বলে,—কতদিন যাও নি বলতো বাপের বাড়ি? যাবে না?

—ইচ্ছা তো করে কিন্তু যাই কখন? সংসার ফেলে যেতে পারি নে? আমি গেলেই তো বাবুর হোটেলে মেসে গিয়ে উঠতে হবে। ও আবার তা একদম পছন্দ করে না।

অর্থাৎ তাকে ছেড়ে থাকতে চায় না সরোজ। সে কত অপরিহার্য তার স্বামীর জীবনে তা সে বুঝেছে। শুধু বোঝে নি একজন। যে বুঝলে জীবনের ধারাটাই যেত পাল্টে।

অথচ কেমন করে বোঝাবে সুভাষ সে পেতেই চেয়েছিল মনে মনে। তার বিশেষ কোন দোষই ছিল না। সে চেয়েছিল কিন্তু বাবা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পাশ করা ছেলের বিয়েতে টাকা-পয়সাও আসবে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। তাছাড়া কৌলিন্য খুইয়ে ছেলের বিয়ে দিতে হবে কেন? তবু চেষ্টা করেছে সুভাষ মায়ের মাধ্যমে বাবার কাছে ছেলের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে। বাবা অটল, বাবার উপরে কথা বলতে পারে নি সুভাষ। আর সে কথা জানতে পেরে আলো বন্ধ করেছে তাদের বাড়ি যাওয়া-আসা। একদম ভাল লাগে নি সুভাষের। আলোকে পুকুরঘাটে একা পেয়ে শুধিয়েছে—কি ব্যাপার! আমাদের বাড়ির পথ কি ভুলে গেলে নাকি?

বড় বড় ডাগর চোখ দুটো তুলে অবাক-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে সুভাষকে। তারপর পাশ কাটিয়ে কলসীকাঁখে বাড়িমুখো হাঁটা দিয়েছে।

—আমার কথাটা শুনবে তো?

—আবার দাঁড়িয়েছে আলো।

—দেখ আমার কোন দোষ নেই। বাবা একেবারে বেঁকে বসেছেন।

—তোমার কথা শেষ হয়েছে? এখন যেতে পারি?

—তুমি আমায় ভুল বুঝলে আলো?

আলো আর দাঁড়ায় নি। সোজা বাড়ি চলে এসেছে। এরপর আরও দেখা হয়েছে সুভাষের সঙ্গে আলোর। আলো চিনতে চায় নি, যেন এ মানুষটাকে দেখে নি কোনদিন এমনি ভাব দেখিয়েছে আর তাতে আরও চটেছে সুভাষ। যদি তার পরেও আলো সজল ছেলের ফোনাফোনির কথা? তারা অফিসের কিংবা মুখ ফুটে বলতো কিছু তাহলে চেষ্টা করতো সুভাষ সরাসরি বাবার সঙ্গে রোকাপাড়ায় নামতে।

তবু যে কথা আলো সরাসরি বলতে পারে নি, সে কথা উপলব্ধি করেছে সুভাষ মনে মনে। মনে হয়েছে আলোকে না পেলে তার জীবনের সব আলো নিভে যাবে একে একে। আলো তাদের বাড়ি এসেছে ইচ্ছামতো। নীরব চোখে অনেক কথা বলেছে, মুখে কোন কথা না বলেও তেমন করে নয়, জোরে জোরে সকলকে শুনিয়ে বলতে চেয়েছে আলোকে আমার চাই। কিন্তু মনে মনেই শুনিয়েছে নিজেকে। বাবার কাছে যেতেই রাশভারী মানুষের তাড়া খেয়ে ফিরেছে। এসেছে আর ততোই ছটফট করেছে আলোকে তার মনের কথা শোনাতে, কিন্তু সে সুযোগ পায় নি। আলো তার চোখের সুমুখ থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়েছে আর অন্ধকার নেমেছে তার চোখে। তার আপশোস হয়েছে শেষ পর্যন্ত আলো তাকে ভুল বুঝেছে বলে, তার মনের কথা জানতে পারে নি বলে।

অথচ এতদিন ঐ আলোই তার ঘরে এসেছে চুপিচুপি।

—দিনের বেলায় আলো কেন?

হেসে উত্তর দিয়েছে—আলো আছে বলেই তো দিন। তা না হলে সব অন্ধকার।

—তোমার এত সাহস। তোমাকে ছাড়া আমার সব অন্ধকার।

আলো লজ্জায় লাল হয়ে দৌড় দিয়েছে বাড়িতে।

অথচ ঐ কথাটাই তো শেষে বলতে চেয়েছিল সুভাষ বলতে পারে নি। বলতে পারে নি—তুমি আমার মনের মধ্যেই আছ, থাকবে। একদিন তুমি আলো হয়ে বসবে আমার ঘরে। একটু অপেক্ষা কর। একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। কিন্তু বলতে পারে নি সুভাষ—বলার সুযোগ পায় নি। আলো একেবারেই সরে গিয়েছে অভিমান নিয়ে, হতাশা নিয়ে। সেই অভিমান আজো তার যায় নি। সে কথা আজও সে বলতে চেয়েছে।

—কি ভাবছো এতো বলতো? অনেক কাজ বাকি বুঝি!

—না ভাবছি তোমার অভিমান আজও যায় নি, আজও তুমি আমায় ভুল বুঝে বসে আছ।

অবাক হয়েছে আলো। কালো দুচোখ তুলে বলেছে—কিসের ভুল বুঝেছি সুভাষদা।

—তুমি হতকুচ্ছিৎ মেয়ে বলে যে আঘাত আমায় দিতে চেয়েছে—আমি তার জন্য সত্যি দায়ী ছিলাম না। আমি সেদিনও তোমায় যেমন ভালবেসেছি, আজও—

সুভাষের এই চিঠিখানা প্রসঙ্গে রঙের আভা দেখা দিয়েছে আলোর মুখচোখে। তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছে—তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ সুভাষদা।

—ছেলেমানুষ নই। সত্যি কথাই বলছি। আমি চেয়েছিলাম নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর—।

—দূর! ছেলেবেলার কথা নিয়ে বুঝি মানুষ বড় হলে এমন করে ভাবে।

—ছেলেবেলা নয় আলো! তুমি ভুল বুঝে থাকবে আমায় এ বড়ো হয়ে গেলেও সহ্য হবে না আমার। তুমি বলছ বৈরাগ্য কেন আমার? এখন বুঝেছ কেন বৈরাগ্য। কেন—।

তুমি বসো সুভাষদা, আমি তোমার চা নিয়ে আসি।

চা নিয়ে এসেছে আলো। তারপর সরোজ ফিরেছে বাসায়। আলাপ-পরিচয় হয়েছে। হাসিখুশি মানুষটি, হাসিঠাট্টা গল্প করেছে আর পরের দিন তাকে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছে বার বার।

—আমার একটু জরুরী কাজ আছে যে বাড়ীতে সকালেই যেতে হবে—

—তা হোক, কি এমন জরুরী কাজ? আপনাকে কাল ছাড়ছিনে কিছুতেই।

শেষে নিমরাজি হয়েছে সুভাষ। ভেবেছে থেকেই যাবে একটা দিন। এত করে বলছে যখন। তার কথায় আলোও সায় দিয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত সেই আলোই কি-না তাকে ভোরবেলায় তুলে দিয়ে বলেছে—কি থাকবে, না তোমার জরুরী কাজে বাড়ি ফিরবে?

অর্থাৎ তুমি এবারে সোজা পথ দেখ। সুভাষ আর দ্বিরুক্তি করে নি। জামা-কাপড় পড়ে সোজা চলে এসেছে। অথচ রাত্রে শোবার সময় কি লাগবে না-লাগবে যখন জিজ্ঞাসা করেছে তার ঘরে এসে, সুভাষ জিজ্ঞাসা করেছে—তুমি আমার ওপর রাগ কর নি তো আলো?

—কেন? রাগ করব কেন?

—ঐ যে অনেক জমানো কথা বললাম বলে—

—তুমি শুধু ছেলেমানুষ নও? আমার খোকনের মতো শিশু তুমি।

তখনকার মতো ভারমুক্ত হয়েছিল সুভাষ। এখন চিঠিখানা পেয়ে অনেক কথাই মনে হচ্ছে। তাদের প্রেমের কথা আলোচনাতেই ভয় পেয়েছিল আলো। যদি স্বামী তার পূর্ব-জীবনের কথা শুনে ফেলে, যদি কোনরকমে সুভাষ গল্পে গল্পে সে-কথা প্রকাশ করে অথবা সুভাষ ইচ্ছা করেই শুনিয়ে দিতে চায় কারণ আলো সে-সব দিনের কথাকে ছেলে-মানুষী বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে এই রাগে।

সুভাষ চিঠিখানা হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে কি সে কথার কোন ইঙ্গিত থাকবে

আমি একজন শিল্পীর মডেল

কাজ আরম্ভ করার সময় সচরাচর আমাকে পোষাক খুলে ফেলতে হয়, কথাটা বিস্ময়কর হলেও সত্য, কারণ পেশায় আমি মডেল।

আর্ট স্কুলে মডেলের কাজ করেই অর্থ উপার্জন করতে হয় আমাকে।

বেশীর ভাগ লোকই আমার এই পেশার কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে অর্থপূর্ণ চোখে হাসেন।

মডেলের জীবিকাকে সাধারণত সকলেই একটু সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন এবং কাজটা যে সত্যিই ক্লান্তিকর ও শ্রমসাপেক্ষ একথা বঝতে চান না।

বেশীর ভাগ লোকেই বিশ্বাস করেন না যে মডেলের জীবিকায় রোমাঞ্চিত হওয়ার মত কিছু নেই, এর পারিশ্রমিক যৎসামান্য এবং যাঁদের কাছে আমরা কাজ করি তাঁরা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ দৃষ্টিতেই আমাদের দেখে থাকেন।

পেশাদার মডেল হওয়ার আগে বেশ কিছুদিন এক আর্টস্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম আমি, যেখানে মডেলের কাজে এ্যাপ্রেণ্টিসি করেছি। পুরো ক্লাসের সামনে মডেল হয়ে পোজ দিয়েছি দিনের পর দিন, অবশ্য কাপড়-চোপড় পরেই কারণ তখনও তো পেশাদার হই নি।

কাজটা ভালই লাগতো তখন, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম বলে শিল্পীরাও খুশী হতেন আমাকে পেয়ে।

হঠাৎ আমার পারিবারিক অবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিলো ও আমার পক্ষে কিছু অর্থ উপার্জন করাটা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠলো।

শিল্পের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ-বশত মডেলের পেশাটাই বেছে নিলাম। নিকটস্থ এক শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে পত্রাঘাত করলাম কাজের সন্ধানে। তিনি সহজেই রাজী হলেন পরীক্ষা-মূলক এক সাক্ষাৎকার করতে, কারণ এ কাজের জন্য মেয়ে পাওয়া তখন খুব সহজ ছিল না।

আপনার দেহশ্রী যদি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় এবং আপনি যদি সত্যই মন দিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক হন তবে প্রতি সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টার জন্য আপনাকে নিযুক্ত করবো আমরা—ঘণ্টা প্রতি পাঁচটাকা করে পাবেন, পারিশ্রমিক হিসাবে—বললেন তিনি।

মন দিয়ে কাজ করা বলতে ঠিক কি যে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি সেদিন বুঝিনি, তবে আজ বুঝি।

কবে থেকে কাজে লাগতে হবে ?

আজ থেকেই---আপনার যদি অসুবিধা না হয়।

স্বীকৃতিসূচক ভাবে ঘাড়টা হেলালাম, গলার মধ্যেটা হঠাৎ কেমন শুকনো শুকনো ঠেকলো।

ওপরে আট নম্বর ঘরে চলে যান দিকি সেখানে শ্রীযুক্ত সরকার আছেন, তাঁর মডেলের প্রয়োজন।

দুরু দুরু বুকে সিঁড়ি ভেঙ্গে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ছোটখাট একটি মানুষ কাজ করছিলেন একটা ইজেলের সামনে, আমাকে দেখে বুক অবধি ঝোলা একরাশ দাড়ি নেড়ে অমায়িক হাসি হাসলেন।

নীল রং-এর ময়লা আলখাল্লা পরনে ছিল তাঁর, ঘরের এককোণে একটি মেয়ে বসে নিবিষ্ট মনে তাঁর কাজ দেখছিলো।

মাপ করবেন, আমি নতুন মডেল। অধ্যক্ষ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।

ও—ওই কোণে পর্দার আড়ালে চলে যান, ওটাই মডেলের পোষাক ছাড়বার জায়গা।

ময়লা দাগ ধরা পর্দা ঘেরা একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন শিল্পী। জায়গাটায় একটা চেয়ার, আয়না ও একটি ড্রেসিং গাউন রাখা ছিল, পর্দা টেনে দিয়ে পোষাক খুলে ফেলতে সুরু করলাম।

কই হল আপনার? নগ্নদেহের ওপর ড্রেসিং গাউনটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম চটপট।

গোল প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিল্পী, দুদিকে দুটো চড়া ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বলছিলো।

শ্রীমতী

দাও। নিশ্চয়ই লিখেছে আলো—আগের কথা ভুলে যেও আর সে-কথা মনে মনেও উচ্চারণ কোরো না। দোহাই সদ্ভাবদা। আমার কথা ভেবে অন্তত ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো।

নীল খামখানা শেষ পর্যন্ত খুলেই ফেলল সদ্ভাব। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা : সদ্ভাবদা খুব রাগ করেছো তো আমার ওপর। ভাবছ মেয়েটা কি? থাকতে বলে ভোরেই বিদায় করে দেয় বাড়ি থেকে। কি অভদ্র হয়ে গেছে আলো। সৌজন্যবোধ-টুকুও হারিয়েছে। সত্যি আমরা এ যুগে সৌজন্যবোধ হারিয়েছি। মাপা সব কিছু আমাদের। রাত্রে তোমাকে রুটি খেতে দিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, তোমার মুখের দিকে। তোমার কষ্টটা বুঝেছিলাম আমি। প্রথম প্রথম গ্রামের মেয়ে আমারও রুটি খেতে কান্নাই পেতো। তোমাকে পরের দিন রাখতে গেলে দুপুরেও রুটি খাওয়াতে হোতো। তাই বিদেয় করেছি সাতসকালে। অন্য কিছু মনে কর নি তো?.......

আগে কোথাও কাজ করেছেন?

ঠিক পেশাদার হিসেবে করিনি —হাসতে চেষ্টা করলাম একটু।

তাই মনে হচ্ছে, যাক ঘাবড়ে যাবেন না। কেউ কিছু মনে করবে না। আপনাকে আঁকতেই সকলে ব্যস্ত থাকবে—কি মনে করে যে কথাগুলো বললেন তিনি তা ঠিক বঝলাম না যদিও।

বসা অবস্থায় পোজ দিন, এটায় বসুন দেখি আরাম করে—প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা সেকেলে প্রকাণ্ড কেদারা এনে রাখলেন তিনি।

চরম মুহূর্তে কি মনে হতে পারে তা ভেবে দেখিনি আগে কিন্তু ড্রেসিং গাউনটা গা থেকে খসিয়ে ফেলার সময় লজ্জার একটা ঝড় বয়ে গেল যেন সর্বাঙ্গে।

বাঃ চমৎকার হয়েছে, বাঁ পাটা একটু ওধারে রাখুন, হাতটা একটু তুলুন, হ্যাঁ—এবার ঠিক হয়েছে, ঘণ্টাখানেক এইভাবে থাকতে হবে, নড়বেন না যেন।

পকেট থেকে একটা চকখড়ি বার করলেন তিনি, তাই দিয়ে সাবধানে আমার দেহের আউট লাইন আঁকতে সুরু করে দিলেন।

প্রথমটা নিজেকে ভয়ানক একাকী বলে বোধ হচ্ছিলো, তারপর লজ্জার ভাবটা একটু কেটে গেলে সমস্ত পরিবেশটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

সারি সারি বসে ছাত্র-ছাত্রীরা দ্রুতহাতে নিজের নিজের বোর্ডে ধরে নিচ্ছে আমার দেহরেখা তুলির টানে টানে।

প্রায় আধঘণ্টাখানেক পর থেকে সমস্ত শরীরটায় আড়ষ্ট এক ব্যথা জেগে উঠলো, বোধহয় একভাবে অতক্ষণ কাটানোর দরুণ, আমার অবস্থা আন্দাজে বুঝে নিয়ে শ্রীসরকার বলে উঠলেন, আপনি বরং একট বিশ্রাম করে নিন মডেল।

ওঃ—কি যে আরাম পেলুম তা আর কি বলবো, মডেলের প্ল্যাটফর্ম থেকে নামার সময় তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন সহানুভূতিভরে নচেৎ হয়ত পড়েই যেতাম গড়িয়ে, শরীরের তখন যে অবস্থা।

আপনি বড্ড কাঠ হয়ে বসেছিলেন সেইজন্যই এতটা কষ্ট পেলেন, একটু নরম করতে চেষ্টা করবেন শরীরটা, এবার একটু ঘুরে ফিরে বেড়ান আমি চা আনতে বলেছি।

যথেষ্ট কৃতজ্ঞবোধ করলাম তাঁর এই সদয় ব্যবহারে, একটু হাঁটাচলা করার পর আবার প্ল্যাটফর্মে উঠে এলাম সিটিং দিতে, তাঁর উপদেশমত দেহটা নমনীয় করে রাখতে সচেষ্ট হলাম এবং এবার সত্যিই অনেক কম কষ্ট হল।

সেই থেকে বহুবার মডেল হয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছি, অনেক শিল্পীর কাছে কাজ করেছি এবং জড়তাও ধীরে ধীরে আপনা হতেই কেটে গেছে।

কাজের সময় শিল্পীদের বিভিন্ন নির্দেশ শুনতে শুনতে মনে হয়েছে যে তাঁরা মডেলকে কোন সজীব মানুষ হিসাবেই বোধহয় দেখেন না অন্তত সাময়িকভাবে মডেল শুধু তাঁদের কল্পনার ভাবমূর্তি।

সব সময় যে নগ্নভাবে সিটিং দিতে হয়েছে তাও নয়, অনেকে পোষাক পরা অবস্থাতেই এঁকেছেন আমাকে।

একভাবে বেশীদিন সিটিং দিতে হলে স্বভাবতই ক্লান্তিকর ঠেকেছে, সে অবস্থায় মাঝে মাঝে ঘুমিয়েও পড়েছি।

আমার কাজের ব্যাপারে বহু জায়গায়ই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে আমাকে, আর বহু মানুষের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছে—যাদের অনেকের কাছ থেকেই প্রীতি ও আন্তরিকতার নিদর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছি।

আর পেশাকে আমি ভালবাসি, কাজে কখনও ফাঁকি দিই না, আর তার ফলেই ভাল মডেল হিসাবে আমার বেশ একটু খ্যাতি আছে।

যে-শিল্পের প্রতি অনুরাগ আমার অকৃত্রিম, এইভাবে তার সেবা করতে পেয়ে আমি তৃপ্ত। পেশাদার মডেল হয়েছি বলে কোন ক্ষোভই আমার নেই।

দুটি লিপি

শ্রীহাসি ভট্টাচার্য

পৃথিবী তোমার উদ্যানে
শান্ত অথচ ক্লান্ত জীবনের
দুটি লিপি রেখে যাই।
প্রথম যৌবনে হৃদয় নীল
ঠিক যেন—রবীন্দ্রনাথের "হৃদয় আকাশ".
তখন প্রতিটি ইচ্ছার মুহূর্তে,—
পেয়েছি রজনী গন্ধার স্বাদ,
মধু সিক্ত করেছে কম্পিত বুক।

তারপর যৌবনের অবসানে
জীবনে এলো দুর্ভেদ্য চড়াই।

অকস্মাৎ নেমে এলো
চাপ চাপ গাঢ়-অন্ধকার
রজনীগন্ধা ঝরে গেছে
মধু নেই। শুধু সাহারা মরুভূমি।

আজ ভগ্নাংশ হৃদয়ে
উদাসীন চোখে
স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে
রেখে যাই শেষ নমস্কার।

আগমনী

জসীম উদ্দীন

আজ তুমি আসিবে যে মেয়ে,
সেই ডোবা পুকুরের—পানা পুকুরের, কলমীলতার
আল দিয়ে ঘেরা পানি
সেই সে পানিতে নেয়ে।
মনে যদি হয় কলমীফুলের কতকটা রঙ
লইও অধরে মেখে
ঠোঁটেতে মাখিও আর একটু হাসি
লাল সাপলার ফোটা ফুলগুলি দেখে।

যদি মনে হয় সিক্তবসনে একটু দাঁড়িও
ও অংগ বেয়ে ঝরিবে সজল সোনা,
দোষ নিও নাক ডাহুকের ডাকে হয় যদি কিছু
ছোট ছোট গীতি বোনা।
দোষ নিও নাক হে লাজ শোভনা, বক্ষে তোমার
যুগল কমল ফুল,
সিক্ত বসন শাসন না মানি
যদি উঁকি দেয় নিমেষে করিয়া ভুল ;
যদি আকাশের সোনা সোনা রোদ
যেখানে ছড়ায়ে পড়ে
তুমি ভাল মেয়ে
কোন অপরাধ রাখিও না অন্তরে।
রঙিন বসন আজ না পরিলে
পদ্মপাতার সবুজে শাড়িটি
তোমারে মানায় ভাল
শ্রীঅংগ হতে তারি ভাঁজে ভাঁজে হাসিবে খেলিবে
বিজলী লতার আলো।
সামনে দেখিবে ধান খেতগুলি
অংগ হইতে ছড়াইও কিছু সোনা
ধান-ছড়াগুলি নাচিয়া উঠিবে
বাতাসের দোলে
হয়ে চঞ্চলমনা।
সাবধানে তুমি চলিও কন্যা!
সামনে রয়েছে মটর শুটির খেত
পাতায় পাতায় রাঙা বউগুলি
ফুল হয়ে হেসে কুটিকুটি,
স্বপনের ঘোরে কোন্ সে বঁধুর
পেয়ে যেন সংকেত।

এখনো রাতের শিশিরের ফোঁটা শুকায় নি কারো গায়ে
এখনো রাতের স্বপন জড়িমা লাগিয়া রয়েছে আঁখির ছায়ে
অতি সাবধানে চলিও কন্যা দু'পায়ে সোনার
নুপুর যেন না বাজে
এ মধু স্বপন ভাঙিলে তাদের
কোথায় লুকাবে সে অপরাধের লাজে।
আরো সাবধান হইও কন্যা
যদি কেউ ভুল করে
সে ফুলের মাঝে তুমিও একটি
লয়বা গণনা করে।
আরো একটুকু এগিয়ে গেলেই সরষে খেতের 'পরে
তোমারে আমার যত ভাল লাগে
সে অনুরাগের হলুদ বসন
বিছাইয়া আছে দিকদিগন্ত ভরে।

খনেক সেখানে দাঁড়াও যদিবা
ভোমর ভোমরী ফুল হতে ফুলে ঘুরে
যে কথা তোমারে বলিবার ভাষা খুঁজে পাইনাক
শোনাবে তোমারে তাহাদের সুরে সুরে।
মাঝে মাঝে সেথা উতল পবন
ফুলের সুবাসে ঢলে
হেথায় সেথায় গড়ায়ে পড়িতে
ঝিলি দেবে সুখে
তাদের মাথার চুলে।

মনে হবে তব মাঠখান যেন হেলিছে দুলিছে
হলুদ স্বপন ভরে
সাবধান হয়ো সুগন্ধ গায়ে ছড়িয়ে যেয়ো না
আর কোন দেশ 'পরে'
যদি মনে লয় সেইখান হ'তে
কিছুটা হলুদ মাখিও তোমার গায়
সারা মাঠখানি জীবন পাইবে
তোমার অংগে জড়াইয়া আপনায়।
দু'ধারে অংই সরিষার বন
মাঝখান দিয়ে সরু বাঁকাপথখানি
দোষ নিও নাক ফুলেরা তোমার
ধরিলে আঁচল টানি।
অতি সাবধানে ছাড়িও আঁচল
যেন তাহাদের সুকোমল দলগুলি ;
ভাঙিয়া না যায়, নিঠুর হয়ো না
যদি বা তাহারা স্বগোত্র বলি
তোমারে বা ভাবে ভুলি।

আরো কিছু পথ চলিতে পাইবে
কুসুম ফুলের খেত
হলুদে লাগাতে মেশামেশি কোন
মাঠের কবির অলিখিত সংকেত।
যদি মনে লয় সেখানে হোঁচট
খাইও ইচ্ছা ভরে
তোমার শাড়িতে রঙ দিয়ে নিও
কুসুম ফুলের খেতখানি তুমি
সারাটি অংগে ধরে।
সামনে দেখিবে আম-কাঁঠালের ছায়ায় শীতল
কৃষাণীর ছোট বাড়ি
শাখায় শাখায় নানা পাখি ফেরে
সুনাম গাহিয়া তারি
সেইখান দিয়ে চলিতে যদিবা
আমার মনের বাসনা হইয়া কুটুম পাখিরা
তোমারে হেরিয়া কুটুম কুটুম ডাকে
খনেক থামিও তুমি ত' এমন সুন্দর মেয়ে
কেমনে এড়াবে সেই ভালবাসাটাকে।
চোখ গেল বলি কোন পাখি যদি
কেঁদে ওঠে উভরায়
দোষ নিও নাক, আমিও দৃষ্টি কবে হারিয়েছি
ও রূপের ধুপছায়া।

যেদিন তোমারে দেখেছি কন্যা
আর কারো রূপ পশে না পরাণে আর,
আমার স্বর্গ মর্ত্য বেড়িয়া তোমার বালিকা
কান্তির যেন স্নান শেষে বারিধার।
আরো কিছুদূর চলিলে হেরিবে
জাঙলা ভরিয়া কন্যা সাজানী শালিলতাগুলি
হইয়া নীলাম্বরী
তোমার লাগিয়া অপেক্ষমাণ
যদি কোনদিন অপ্সে লওবা পরি।
সেখানে কন্যা খনেক দাঁড়িও
কিবা রূপ মরি মরি।

স্নেহ-প্রাণকন্দ হতে বিচ্ছুরিছে সদা
উছলিত রূপ ছায়।
সেখানে হয়ত কোন গেঁয়ো কবি সারিন্দা সুরে
কাহিনীর কোন নায়িকার রূপ দিয়ে,
তোমার নামটি বাজায়ে বাজায়ে নদী তীরে তীরে
ফেরে যদি তার আপন ব্যথারে নিয়ে,
কিছুটা তাহারে দিও প্রশ্রয়,
ইচ্ছা হইলে তাহার কাহিনী জালে;
নিজেরে জড়ায়ে বাঁচিয়া রহিও
অনাগত কোন্ দূর ভবিষ্যৎকালে।

জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্রের জন্মোৎসব

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় রফি আমেদ কিদোয়াই রোডস্থ জ্যোতিষ-সম্রাট ভবনে অল ইণ্ডিয়া এস্ট্রোলজিক্যাল ও এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম আর এ এস (লণ্ডন) মহোদয়ের ৫৭তম জন্মবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এ কে সিনহা এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এন সি তালুকদার।

সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীনকুলেশ্বর কাব্য-ব্যাকরণ-বেদতীর্থ মঙ্গলাচরণ করেন এবং উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী শ্বেতা ভট্টাচার্য। তদনন্তর সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয় এবং উপস্থিত প্রাজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী জ্যোতিষ-সম্রাটকে মাল্য ও তিলক দেন।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচার-পতি শ্রীঅরুণকুমার দত্ত, রহড়ার বিবেকানন্দ কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য এম এ, শ্রীদুর্গা-শরণ চক্রবর্তী এম-এ, (ট্রিপল), কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীশৈলেশ স্মৃতি-তীর্থ, পণ্ডিত শ্রীপবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ এই সভায় জ্যোতির্বিদ্যার মৌলিক বিষয়ে এবং এই শাস্ত্রের প্রতি জ্যোতিষ সম্রাটের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়, এম-এ বি এল এডভোকেট, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সভায় একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবৃতি দেন। বৃন্দাবনের প্রখ্যাত ১১৩ বৎসর বয়স্ক জগদ্গুরু যোগিরাজ ১০০৮ শ্রীস্বামী রঘুনাথ আচার্য ১৯৫৫ সালে জ্যোতিষ সম্রাটের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে অনেক শিষ্যের সহিত পণ্ডিতজীর বাসভবনে আসেন এবং সেখানে তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের নিকট জানান জ্যোতিষসম্রাট পূর্বজন্মে তাঁহার মন্ত্রগুরু ছিলেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এবং তাঁহার দর্শনার্থে তিনি নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরে তাঁহার নিকট আসিতেন। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং সোসাইটির সহ-সভাপতি শ্রী জে পি, মিত্র, এম এ (ক্যান্টাব), বার এট ল এই সভায় জ্যোতিষ-সম্রাটের কতকগুলি অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বিবৃত করেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে এই ভবিষ্য-দ্বাণীগুলি কিরূপ সন্ধানী আলোকের ন্যায় কাজ করে তাহাও বলেন। জ্যোতিষ সম্রাট তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনার বিষয় বলেন ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বহু হাইকোর্টের বিচারক, ব্যবহারজীবী, অধ্যাপক, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমন্বয়ে প্রায় ২৫০ জন ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় এবং পরিশেষে সঙ্গীত-রত্নাকর শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখার্জী, সত্যেশ্বর মুখার্জী ও সম্প্রদায় ও শ্রীমতী মীরারাণী ব্যানার্জীর কীর্তন গান পরিবেশন অন্তে সভা শেষ হয়।

হিমিকার ভাগ্য ভাল। আর কে বিজয়মোহনের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হ'ল না। ম্যানেজারকে ডেকে বিজয়মোহন বললেন,---সারা আর মোস্তাকের হাতে হিমিকে ছেড়ে দাও। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস জিনিস তৈরী হয়ে যাবে। একা ওকে নিয়েই সেল্স বাড়াতে পারবে হোটেলের।

---সারা, মোস্তাক? অনেক খরচ হবে। তার চেয়ে হোসেন ---

---আরে না, না। একদম বুরবাক তুমি ম্যানেজার। তোমার ঐ অ্যাংলো মেয়েগুলোকে দেখে আজকাল আর মজা পায় না রইস আদমীরা। খরচা হোক, সে খরচা উঠে আসবে ওয়ান ইয়ারে। হ্যাঁ, ওকে দিয়ে পাঁচবছরের

তিন বছরের মাঝামাঝি হোস্টেল ছেড়ে উঠে এল হ্যাপি নুকের তিন তলায় একটা রুম নিয়ে। একেবারে আলাদা ফ্ল্যাট নিতেই পরামর্শ দিয়েছিল তিলক, কিন্তু অতটা সাহস করল না হিমি। ব্যাঙ্কে আকাউণ্ট খুলেছে, কিছু টাকাও জমেছে, সেটা এখনো পর্যাপ্ত সংখ্যায় পৌঁছয়নি। খরচপত্রও আছে। ভাল কসমেটিক, নতুন শাড়ী প্রচুর কিনতে হয়। গয়না অবশ্য দরকার নেই। মাথার উপর রাশীকৃত চুলের চূড়া, স্বচ্ছ শাড়ী আভাস দেয় দেহের প্রতিটি অন্তরঙ্গ রেখার।

নারী দেহের রহস্য? কি যে সব বস্তা পচা পুরণো কথা। নারী দেহের আবার রহস্যটা কি। শরীরের কলকব্জা? তার খবর তো রাখবে ডাক্তারেরা। সেই মায়ের মেয়ে হিমি। এ সব তো ওর জন্মসূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতা।

জন্মসূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতা। তাইতো অবোধ সুশীলা হিমিকা তীক্ষ্ণ কুশলী দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। নিজেকে ও ঘিরে রেখেছে মাধুর্যের আবরণ দিয়ে। গোলাপী রং লো-কাট ব্লাউজের অবকাশে প্রকাশিত হয় নধর বুক। পিঠ-পেটের কিছু অংশ, কোমর অনাবৃত থাকে। ওর সুগোল উরু স্বচ্ছ আবরণের ওপার থেকে বারে বারে সঙ্গীকে লুব্ধ করে তোলে।

আশী মাইল স্পীড দিয়ে গাড়ীতে বসে হিমিকাকে বুকে জড়িয়ে নেওয়া যায়, আস্বাদন করা যায় তার সূক্ষ্ম অধর, কম্বুগ্রীবার মাধুরী। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর কিছুতে রাজী নয় হিমিকা।

ধারাবাহিক উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

একটা কণ্ট্রাক্ট সই করিয়ে নিয়ো।

---পাঁচ বছর? তারপর যদি চলে যায়?

---ওউ ফুল, আফটার ফাইভ ইয়ার্স, শি উইল নট রিকোয়ার হার। গেটিং ওল্ড এণ্ড শী উইল লুজ হার চার্ম, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

---ইয়েস স্যার।

আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই হিমিকার উন্নতি দেখে। এক বছরের মধ্যেই ও ছাড়িয়ে গেল ইলা-আভাদের।

ফ্লোর থেকে বিদায় নিল বিয়েট্রিস, --বিউটি কুইন, তার বদলে এলো নিউ কামিং হিমি। অবশ্য পার্ট টাইম কম্পেনিয়নও হতে হ'ল তাকে চুক্তি মত। একটা মস্ত আয় হয় এই থেকে হোটেলের। পার্ট টাইম কম্পেনিয়ন--- এর দেশী নাম দিয়েছেন---অবসর বিনোদিনী---মহারসিক প্রফেসর রুদ্র, রাজী হয়ে প্রচুর টাকা পেতে লাগল হিমিকা।

তারা ছুরি-কাঁচি চালিয়ে, চোখে লাগিয়ে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস, রহস্যের সন্ধান করবে। রহস্যের সঙ্গে ভোগের সম্পর্ক কি। ওতো ওষুধপত্র বের করবার সময় দরকার হয়। শরীরটাকে একেবারে মোলায়েম বানিয়ে, কুয়াশার মত হাল্কা গোলাপী লাল শাড়ী দিয়ে মুড়ে, দেখা যাচ্ছে, আবার যাচ্ছে না, এমনি ভাব নিলেই তো মেয়েদেহ পরম লোভনীয় হয়ে ওঠে। তখন মেজাজী মানুষদের পকেট হতে জলের মত বেরিয়ে আসে টাকা।

এত অল্প দিনে টাকা রোজগারের অব্যর্থ ফন্দি শিখল কি করে হিমিকা? এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। হিমির মা প্রস্টিটিউট ছিল না। বাংলায় বেশ্যা কথা উচ্চারণ করে না ইলারা। ওরা সব ভদ্রঘরের মেয়ে, অশ্লীল কথা মুখে উচ্চারণ করতে বাধে ওদের। তা

মিষ্টি হেসে এর চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা অস্বীকার করে। তার সঙ্গীরা অস্থির হয়, কর্কশ কথা বলে, বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু অতৃপ্ত কামনায় ছুটে আসে আবার পরদিন। হিমি, হিমিকেই চাই রেট বেশী হলেও।

তিলকেশ্বর হাসে---সাবাস হিমি। খুব ঘোড়া ছোটাচ্ছ। কিন্তু আমি তো তোমার সৌভাগ্যের মূলে। ওদিকে দিয়ো ছিটে-ফোঁটা।

হিমিকাও হাসে। টাকা না নিয়েই তিনদিনের জন্য তিলকের সঙ্গে বেড়াতে যায় রাজগীর। ঋণ শোধ করে দেয় খানিকটা চামড়া ঢাকা মাংস দেখিয়ে।

প্রাত্যহিক জীবনের একটানা রুটিনে বৈচিত্র্য এল একদিন। নিউ-মার্কেটে ফুলের দোকানে অলকের সঙ্গে হিমিকার দেখা হল।

---ওমা। আপনি। কি আশ্চর্য। কত যে বলেছি তিলককে আপনার

কথা। ও নিশ্চয়ই জানায় নি। কলরব করে উঠল হিমিকা।

ফুটন্ত ডালিয়ার মত হাস্যমুখী তরুণীকে চিনতে বেশী দেরী হ'ল অলকের।

---কি অত ভাবছেন ? চলুন, চলুন আমার সঙ্গে। আপনি আমার জন্য যা করতে চেয়েছিলেন, জীবনে ভুলব না।

এবার হিমিকাকে চিনল অলক। সেই হিমিকা। ভীতু, একমুঠো মেয়ে, চোখ তুলে যে চাইতে পারত না, যার ঠোঁটের কথা মিলিয়ে যেত বাইরে আসবার আগে, সে একেবারে বিদ্যুতের মত ঝলকাচ্ছে।

অলক বিশেষ প্রতিবাদ করবার আগেই কথা দিয়ে হাসি দিয়ে ঠেলে তাকে দাঁড়াতে তুলল হিমিকা। হ্যাপিনকের নিরালা ঘরটিতে এনে বসাল। আপ্যায়িত করল চা আর স্ন্যাক্স দিয়ে। আন্তরিকতার সীমা রাখল না। রাত আটটার সময় আচ্ছন্নের মত বিদায় নিল অলকেশ্বর।

সুরেশ্বর অসুস্থ। বুদ্ধি ভারসাম্য হারিয়েছে। দাদার সঙ্গে ব্যবসার খানিকটা বাধ্য হয়েই দেখতে হচ্ছে অলককে। তিলক আলাদা ব্যবসা করছে। ফিল্মের ডিস্ট্রিবিউটার। লাল বাড়ীতে অফিস। আয় ভালই।

বাবার অসুস্থ হবার সঙ্গে হিমিকার সম্পর্ক আছে জেনেও মেয়েটিকে দোষী করতে পারেনি অলক। বরং তাকে সাহায্য করতে চেষ্টাই করেছে। তারপর হিমিকা হঠাৎ চলে যেতে চিন্তাও করেছে প্রচুর। ভেবেছে কোনো দুর্বিপাকের মধ্যে চিরদিনের মত হারিয়ে গিয়েছে। হিমিকা। সেই দুঃখী নতমুখী মেয়েটিকে দেখে করুণা জেগেছিল অলকের মনে।

আজ কিন্তু মুক্তোর মালা খোঁপায় জড়ানো প্রগলভা যৌবনময়ীকে দেখে অলক বিহ্বল হ'ল। একটা দুর্নিবার আকর্ষণে আবার, অনেকবার আসতে হ'ল অলককে হ্যাপিনুকে। হিমিকার এখানে কি কাজ তা বুঝেছে সে। গণিকার মেয়ে ফিরে গিয়েছে তাদের স্বকীয় বস্তিতে। তাকে দেখে অলকের সাতাশ বছরের পুরুষ শরীরটার তন্দ্রা ভেঙেছে। হিমিকার অর্ধ অনাবৃত দেহ, তার গায়ের গন্ধ, দৃষ্টি, হাসি, কথা অলকের রাতের ঘুম, মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে।

হিমিকা এত সব বোঝেনি। একটা তপ্ত মরুভূমি পার হবার জন্য ছুটছে সে। অনেক জোরে চলছে, সেই গতিই তাকে চলবার শক্তি দিয়েছে। অলক হিমিকার সামনে দেখা দিল মরুদ্যান হয়ে। যদি অলকের মানসিক দ্বন্দ্বের একতিলও আভাস পেত সে, তা'হলে কখনো এত কাছে এসে দাঁড়াতো না। অলককে অবকাশই দিত না তার শরীরটা খুঁটিয়ে দেখবার জন্য।

অলকের রক্তের মধ্যে টগবগ্ করে উঠেছে আদিম বন্য আবেগ। জেগে উঠেছে পিতা-পিতামহর দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। যে বিষ লুকিয়ে ছিল তার দেহের তন্তুতে তন্তুতে, তাই প্রবল বেগে অলককে আপ্লুত করে দিল। অলকের অব্যাহতি নেই, রক্তের ঋণ শোধ না করে সে যাবে কোথায়।

হ্যাপিনুকে আসতেই হ'ল অলককে। পকেটে হাজার টাকা নিয়ে এল, হিমিকার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল---আজকে আমার সঙ্গে চল।

সমস্ত শরীর মনে চমকে উঠে হিমিকা তাকাল অলকের দিকে। সে তো জানেনি কখন উঠেছে মরুঝঞ্ঝা, অজস্র বালি ঢেকে দিয়েছে তাল-খেজুরের সবুজ পাতা। জলের ক্ষীণ ধারাটি হারিয়ে গিয়েছে তপ্তবালির তলায়। ছুটে আসছে আরো দুর্দান্ত তীক্ষ্ণ বালির বর্ষণ, সেই তাপে পুড়ে যাচ্ছে হিমিকার শরীর। অলক কথা বলতে পারছিল না, চাইতে পারছিল না হিমিকার দিকে। উত্তপ্ত হাতে নরম কোমল হাতটি নিয়ে কোনোমতে বলেছিল---চল। চল?

কোথায় ডাকছে হিমিকাকে অলক? মস্ত বড় শয্যায়? পুরুষ কি চিরদিন ধরে মেয়েদের শেষের আহ্বান জানাবে শয্যায়? তাই কি বাসানো হয় ফুলের শৈবালের, পঙ্কের শয্যা? পঙ্কশয্যা। পুরুষ হিমিকাদের ডেকে নেয় পঙ্কশয্যায়। কত ধর্ম, নীতি, আদর্শের রাশি রাশি কথা লেখা হয়েছে পুঁথির পাতা ভরে। কত ছি-ছি, লোক-নিন্দা, ধিক্কার দিচ্ছে একে অন্যকে তবু তো কোনোদিন পঙ্কশয্যা খালি না। কত সুরেশ্বর অলকেশ্বরেরা আসবে, তাদের জন্য অবারিত থাকবে যূথিকা-হিমিকাদের দল। ওরা হয়তো অনুরাগে রোমাঞ্চিত হবে, তপস্যা করবে সূর্যমুখী হয়ে। নিষ্ঠায় নিজেকে সমর্পণ করে চোখ বুজবে দিনের শেষে। প্রভাতে চোখ খুলে দেখবে সেই থক-থকে দুর্গন্ধ পাঁকের মধ্যে সন্তান এসেছে। তারা কিন্তু পঙ্কজিনী নয়। কোনো মন্দিরের ঘরের দেবতার পায়ে পড়বে না ওরা। ওদের জীবনে এক-মাত্র সত্য পঙ্ক। ওরা পাঁকে জন্মাবে, সেখানে জীবন কাটিয়ে মিশে যাবে পাঁকের মধ্যে। পঙ্ক আর পঙ্কজিনী থাকবে কেবল উপমা হয়ে।

টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়ল হিমিকার। টাকা রেখে দিল অলকের পকেটে। আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-প্রতিকূলতা নয়, এবার মেনে নেবে নিজের ভাগ্যকে। টাকা নিয়ে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বহু লাঞ্ছিত মুহূর্তে হিমিকা শরীর বিক্রী করবে। তবু আজ প্রথম ক্রেতা হোক সে, যে একদিন কিছুর প্রত্যাশা না রেখেই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল হিমিকার দিকে।

---চলুন।

অগ্রসর হতে গিয়েও থেমে গেল হিমিকা। কে যেন স্ক্রু দিয়ে তার পা আটকে দিল পুরু কার্পেটের সঙ্গে। ডানদিকের একটি টেবিলে বসেছে একজন, হিমিকার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টিতে। একঝলক ঘৃণার বাণ এসে তাকে অবশ করে দিল। অনল, অনল চা খেতে এসেছে হ্যাপিনুকে। অলকও তাকে দেখল, শিউরে উঠে ছেড়ে দিল হিমিকার হাত। প্রাণ পালাবার মত ক'রে চলে গেল হোটেল ছেড়ে।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে গোঙাচ্ছিলেন সুরেশ্বর। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এক মূর্তি। কালো রং, রক্তবর্ণ দুই চোখ বেরিয়ে আছে রক্তাক্ত জিহ্বা। ও কে? ও কি সেই 'বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা চামুণ্ডা'—যাকে জাগ্রত করেছিলেন বংশের আদিপুরুষ মহেশ্বর? এ কি সুরেশ্বরের ইষ্টদেবী—'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী, ভদ্রকালী কপালিনী?' না না। এ তো সর্বভয়হারিণী জগন্মাতা নন। ওর মুখ নীল, ওকে গলা টিপে, শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছেন সুরেশ্বর। বাতাসের অভাবে ওর মুখ নীল, চোখ ফেটে রক্ত, জিভ ঝুলে পড়েছে। কিন্তু ওকে তো মেরে ফেলেছেন সুরেশ্বর। যূথিকার দেহ তো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। জলে ধুয়ে গিয়েছে, মিশেছে মাটিতে। ও আবার জীবন্ত হয়ে উঠে এল কোথা হতে? আকাশ বাতাস হতে শরীর যোগাড় করে নিয়েছে? শূন্য হতে শূন্য শরীর যোগাড় করে দাঁড়িয়েছে সুরেশ্বরের সামনে তাঁকে ভয় দেখাতে? ভয়? ষোল বছর ধরে যে রক্ষিতা ছিল, সেই অশুচি পতিতা মেয়েটা ভয় দেখাবে শুদ্ধ পবিত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে? যিনি ইষ্টদেবীকে পূজো না করে জলগ্রহণ করেন না, যাঁর বাহুতে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ, আঙুলে নবরত্ন, সেই মহাশক্তিধর সুরেশ্বরকে ভয় দেখাবে একটা বেশ্যা?—দূর, দূর, দূর হয়ে যা।

খল্‌খল্‌ করে হাসল। প্রেতিনী যূথিকা। আরো অনেকে হাসছে, অট্টহাসি তার পিছনে দাঁড়িয়ে। অনেক নারী, বাবা ভুবনেশ্বর, পিতামহ বীরেশ্বর—তাদের রক্ষিতারাও এসে দাঁড়িয়েছে যূথিকার পিছনে। ওরাও সুরেশ্বরকে ভয় দেখাতে এসেছে। সারি সারি উলঙ্গ নারী-দেহ, জরিত, গলিত, পলিত নারীদেহ, দু'হাত তুলে সুরেশ্বরকে আলিঙ্গন করতে ছুটে আসছে। বিছিয়েছে বহু উপভুক্ত ক্লেদাক্ত শয্যা। সেই দিকে টেনে নিচ্ছে তাকে। ওদের সর্বশরীর থেকে ছুটে আসছে গলিত কামনার স্রোত। ঘিরে ফেলল, আবৃত করল, ডুবিয়ে দিল সুরেশ্বরকে তার মধ্যে।

অব্যক্ত কণ্ঠে চিৎকার করে সুরেশ্বর পালঙ্ক থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, ফেনা বের হচ্ছে মুখ দিয়ে। আর্তরব উঠল সেই প্রথম প্রত্যুষে মার্বেল প্যালেস ভরে।

আবার কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এলেন। রোগের বিবরণ শুনলেন, দেখলেন রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট। তারপর মোটর হাঁকিয়ে ফের চলে গেলেন কলকাতা। সপ্তাহান্তে গৃহ চিকিৎসক এলেন গম্ভীর মুখে। জানালেন—সুস্থ হবার সম্ভাবনা কিছু মাত্র নেই। উচ্ছৃংখলতার মাশুল দিতে হবে এতদিন পরে। তবে বয়েস হয়েছে, রক্তের জোর কম, হয়তো তেমন ভীষণ বাড়াবাড়ি কিছু হবে না।

বাড়ীর সকলে ভয় পেল। তিলক বলল—যাঃ বাবা! এ তো মহা ফ্যাসাদ হ'ল। টাকা থাকলে ফুর্তি-টুর্তি করবেই পুরুষমানুষ। তা তিনপুরুষের পাপ এসে ঘাড়ে চেপে মানুষকে পাগলা করে দেবে? সব ডাক্তার ব্যাটাদের বুজরুকি। তুমি কিচ্ছু ঘাবড়িয়ো না ঠাকুমা। বাবা তারকনাথের মাদুলি লাগাও কর্তার হাতে। সোমবারে উপোস করুক বাড়ীসুদ্ধু সক্কলে। পাপ-টাপ পালাতে পথ পাবে না। কর্তা চাঙ্গা হয়ে উঠবে একমাসের মধ্যে।

অমর শুকনো মুখে ডাক্তারের ক্লিনিকে ছুটল রক্ত পরীক্ষা করাবার জন্য। অলকের ঘরে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল সরমা।

—কি হবে অলক?

দুই রক্তরাঙা চোখ মেলে চেয়ে রইল অলক। ছেলের অবস্থা দেখে সুমঙ্গলা তিরস্কার করলেন সরমাকে।

—কি রকম স্ত্রী তুমি সরমা? স্বামীর বিপদে কোথায় মনে শক্ত জোর আনবে, তা না ছেলেকে শুদ্ধু পাগল করে তুলেছ।

—ভীষণ ভয় করছে দিদি। কি উপায় হবে আমাদের।

—উপায় করবেন মা জয়কালী। তিনি রক্ষা করলে, মারে এমন সাধ্য কার?

কারো সাধ্য নেই মারতে? বড়মার কথা অলকের দুইকান ভরে বাজতে লাগল—মা জয়কালী রক্ষা করবেন। তিনি রক্ষা করলে মারবে এমন সাধ্য কারো নেই।

অমাবস্যার গভীর রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছে মার্বেল প্যালেসের মানুষদের। তারা এসে ভিড় করল কালীঘরের দরজায়। প্রদীপ জ্বলছে, ধূপ-গুগ্‌গুলের ঘন গন্ধ। ধক্‌ ধক্‌ করছে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তির তৃতীয় নয়ন। দুই হাত ভরে ফুল নিয়ে অলক অঞ্জলি দিচ্ছে মায়ের পায়ে। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছে—পাহি মাং সর্ব পাপেভ্যঃ, রক্ষ মাং ভদ্রকালিকে।

কালীপুজো করছে অলক। বংশের অনাচার অমিতাচারের বিষ এতদিন পর উঠে এসেছে সময়ের ব্যবধান পার করে। দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়েছে বিষের ধোঁয়ায়। অলক ভয় পেয়েছে। সুরেশ্বরকে ঘিরে ধরেছে বংশের পাপ—বাণেশ্বর-ভুবনেশ্বরের পাপ, অলক-তিলকের পাপ। মতিচ্ছন্ন হয়েছে তাঁর, তাঁকে কেউ সুস্থ করতে পারবে না। সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্র মন্থন করেও এ বিষের প্রতিষেধকের সন্ধান মিলবে না। রক্ষা করতে পারেন কেবল মা কালী। একদিন রক্তবীজকে মেরেছিলেন তিনি, তিনিই মারবেন অলকদের রক্তে বাসা বেঁধে আছে যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি রক্তবীজের দল। রক্ষা কর মা। খর্পর ভরে রক্তদেব, জীবন অঞ্জলি দেব পায়ে, বাঁচাও অলককে। যে দুর্দম লালসায় তার সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে, তার হাত হতে রক্ষা কর।

রক্ষা করবেন মা? রক্তে, অলকের রক্তে আছে সেই লালসালোভী জীবাণু-গুলো, রক্ত বের করে দিলেই অব্যাহতি মিলবে? অব্যাহতি? মুক্তি পাবে অলক বীভৎস প্রেতটার অশরীরী আধিপত্য থেকে? তবে আর ভয় কি। মায়ের কাছে অভয় মন্ত্র পেল অলক।

শরীর হতে সব রক্ত বের করে দিল অলক। একদিন প্রত্যূষে বাড়ীর লোক চমকে দেখল কালীঘরের সিঁড়ি বেয়ে রক্তের স্রোত নেমে আসছে। নিরক্ত হয়ে, শ্বেতকমলের মত শুয়ে আছে অলক কালী-মূর্তির পায়ের তলায়। রক্তের দাবী, বংশের পাপ হতে অব্যাহতি পেয়েছে সে।

অলকের মৃত্যু বুঝতে পারলেন সুরেশ্বর। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সরমা গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদল। প্রমীলার বুকে মুখ গুঁজে থরথর করে কাঁপতে লাগল অমর।

---চল, চল, আমরা পালিয়ে যাই প্রেমী। চামুণ্ডা জেগে উঠেছেন, এবার সবাই মরব।

হতভম্ব হল তিলক। এ আবার কি ফ্যাসাদ! মেজদাটা চিরদিনই অন্য ধরণের ছিল, তা একেবারে প্রাণ দিয়েই সেটা প্রমাণ করে গেল।

পাপের ফলে বাপ পাগল। তা পাগল হবে না? এ কি সোজা পাপ! একেবারে নারীহত্যা। কিন্তু বাপ পাগল হয়েছে, তাতে তোর কি? তুই প্রাণটা দিলি হাতের শিরা কেটে? বলিহারি যাই বাবা পাশকরা ছেলের বুদ্ধিকে।

মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তিলকের। ভাবল বুলাকি দাসের ম্যানেজার হয়ে চলে যাবে ফরাসী দেশে। ফরাসী মেয়েগুলোর নাকি রস-কস আছে। আর ওদেশে ফুর্তি করলে কোনো পাপও হয় না।

মহামায়া মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। বিবশ হয়ে কাঁদছে সরমা। তার অলক, মায়ের একমাত্র আশা-ভরসা, একটা কথা না বলে, একবার ইঙ্গিত পর্যন্ত না দিয়ে, চিরতরে চলে গেল সেই ছেলে। ও তো কোনো দিন কিছু করেনি, তবে ওকেই কেন দিতে হল বংশের অনাচারের দাম।

অলক কিছু করেনি। কিন্তু ও যে জন্মেছিল একেবারে প্রতিরোধশক্তি-হীন বিশুদ্ধ মন নিয়ে। সরমার বাবা-ভাইয়ের মন নিয়ে। পাপের সঙ্গে চলতে চলতে মানুষের ভ্যাক্সিনেশন হয়ে যায়, তখন আর পাপের ভয় থাকে না। পৃথিবীর নীতিধর্ম চোখ রাঙিয়ে জব্দ করতে পারে না তাকে। পাপ যেমন চিরদিন ধরে চ্যালেঞ্জ করে আসছে ধর্মকে, আর তার দলবল নিয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু করে চলেছে, মানুষও তেমনি শক্তি যোগাড় করে ফেলে। তাই অমরেশ্বর, তিলকেশ্বর, মার্বেল প্যালেস, রাশি রাশি গিনি মোহর এবং পর্বতপ্রমাণ অনাচার নিয়ে সুন্দর বেঁচে রইল। ওরা যে টিকে নিয়েই জন্মেছিল। বাপের অনাচার যদি বা সয়েছিল, নিজের প্রবৃত্তির তাপ সইতে পারল না অরক্ষিত অলক। আর বাঁচতে পারল না সে। পুণ্যকে ঘুষি দেখিয়ে, পবিত্রতাকে ব্যঙ্গ করে তিলক চলতে লাগল ধ্বজা উড়িয়ে।

॥ তেরো ॥

হিমিকার কি ভাগ্য। ঈর্ষার চোখেও তার দিকে চাইতে সঙ্কোচ হয় বান্ধবী-দের এতটা উঁচুতে উঠেছে সে। কিন্তু সেদিন, সেই রাতে যদি সুরেশ্বর চমকে না যেতেন, যদি পালিয়ে না যেতেন লালবাড়ী থেকে, সামান্য প্রতিরোধের পরই হয়ত নিজের ভাগ্য মেনে নিত হিমিকা। বিসর্জন দিত নিজেকে। সুরেশ্বরের চমক তার মনের জড়তাকে ভেঙ্গে দিল। সুরেশ্বরের অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকা-বার সময় পেল হিমিকা। পৃথিবীতে কত মেয়ে আছে। তারা তো চাকরি করছে, নিজেকে বিক্রী না করে সুখে স্বাধীন ভাবে আছে। হিমিকাও তাই করবে। খারাপ মেয়ে না হয়েও বেঁচে থাকবে সে। তিলককে দেখে ভয় পেয়েছিল হিমিকা। ওর চাওয়া, হাসি, কথা---সবটার মধ্যে একটা দুর্গন্ধ। কিন্তু অলক। কি সরল উদার চোখ, কত ব্যগ্রতা তাকে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু অলক তো চাকরি দিতে পারল না। বাধ্য হয়েই তিলকের সাহায্য নিতে হ'ল। চাকরি। শরীর বিকানোর চাকরিই পেল হিমিকা। তবু ভাগ্য ভালই তো। ব্রিজমোহনের নজরে পড়ল। ঘষামাজায় চাকচিক্য বাড়ল। তীক্ষ্ণ দীপ্ত অপ্রতি-রোধ্য হয়ে উঠল হিমিকা। অনেক দেখল, শুনল, বুঝল।

হিমিকা বুঝল আগে যে গণিকালয় ছিল মাত্র কয়েকটা কুখ্যাত গলিতে, এখন তাই ছড়িয়ে পড়েছে সুসভ্য আলো-উদ্ভাসিত হোটেলে। রাত একটার পর হ্যাপিনুকে ক্যাবারে ড্যান্স্। নাম-মাত্র আবরণে লজ্জার ভান নর্তকীর। জ্যাজ ব্যাণ্ড বাজবে, স্তিমিত আলো। স্পট লাইট বিচরণ করে ফিরবে হিমিকার সর্বশরীরে। কারো রক্ত উদ্দাম হবে, কেউ বা কেবল অভ্যাস-বশেই চেয়ে চেয়ে দেখবে। নগ্নদেহ দেখে দেখে তাদের অরুচি জন্মে গিয়েছে। তাই তো নিজেকে অনাবৃত করবার নিত্য নতুন টেকনিক বের করে হিমিকা, সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। একদিন ব্রিজ-মোহনও বললেন সে কথা :

---হেলো হিমি, ইউ আর প্রোগ্রে-সিং ভেরি ফাস্ট।

হিমিকা হাসল।

---ফাস্ট না হলে দাম বাড়বে কি করে? কি তাড়াতাড়ি চলছে পৃথিবী। অ্যাটম, মিজ্‌ল্ স্পুট্‌নিক। আমি পিছিয়ে থাকলে তো গুঁড়িয়ে যাব।

---গুড গুড। ওসোব ঠিক আছে। কিন্তু তুমি বহুৎ কড়া লেড়্‌কি। কিছুতে সারেণ্ডার কর না।

একটু গম্ভীর হলেন ব্রিজমোহন।

হিমিকা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল। যে সে লোক নন সাউ সাহেব। কোটিশ্বর শিল্পপতিদের একজন। এ হোটেলও তাঁরই। প্রথমে বড়লোকদের আপ্যায়ন ব্যবস্থার জন্য এটা খুলে-ছিলেন। এখন অবশ্য কাজ বেড়ে গিয়েছে। প্রচুর ফালতু রোজগার হচ্ছে। তাঁকে চটাতে চায় না হিমিকা।

বলল---আমি কড়া মেয়ে, কি বলছেন আপনি? জুতোর ফিতে খুলে দেব?

নীচু হয়ে জুতোয় হাত দিল হিমি।

---আরে, আরে! কি মুস্কিল।

ছোড়ো ছোড়ো পায়। সে বাত মা আমি। আমি বলছি যে---

---বুঝেছি তো আপনি কি বলছেন। কিন্তু কি জানেন, বয়েস আমার মোটে তেইশ বছর। এখন শুধু নিজেকে দেখিয়ে টাকা নিচ্ছি। যখন বয়েস বাড়বে তখন দেব নিজেকে বিকিয়ে। লাখপতি হতে সুরু করে, রাস্তার কুলি, যে টাকা দেবে, তার হাতেই শরীর ছেড়ে দেব। এখন থেকেই বিকোলে যে দাম পড়ে যাবে। কড়া আছি বলেই তো কড়া টাকাও পাচ্ছি।

হিমিকা হাসল। হাসলেন বিজমোহন।

---ইউ আর এ নটি গার্ল। দেখো হিমি, নন বেঙ্গলী মেয়েরা তোমাদের চেয়ে স্মার্ট, কিন্তু তারা এমন উইটি নয়। তুমি ফ্লোর ড্যানসিং ছেড়ে একটা চাকরি নাও। রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরি। গাড়ী পাবে, ওয়েল ফারনিসড্ কোআর্টার, ভাল স্যাল্যারি।

---রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরি? কোথায় পাব।

---ওয়েল, হিয়ার মি, নতুন যে দাওয়াইটা বের করেছে সাউ-কেমিকেল, সেটা ভাল চলছে না মার্কেটে। বাংলা কোম্পানীর ওষুধ চাইছে। বম্বে কিছু নিয়েছে বটে, কিন্তু মার্কেট ভাল ক্যাল-কাটার। এখানে মেডিসিন না চললে মার খেয়ে যাব।

---ওমা। ওষুধ চালাব কি করে? আমি কি ডাক্তার?

---আরে তুমি ডাক্তারের বাবা আছ। ক্লেভার, বিউটিফুল ইয়ং। কেমি-স্টের কাছ হতে ফরমুলা সমঝে নেবে, তার সঙ্গে টিংচার করবে তোমার স্মাইল, টক আর---

হিমিকার অর্ধ-আবরিত বুকের দিকে কটাক্ষ করল বিজমোহন।

---ব্যস্। আর দেখতে হোবে না। দু'টা ডাক্তার ঘায়েল হলেই কাম ফতে।

ডাক্তার। ডাক্তারদের ঘায়েল করতে হবে? একটা ডাক্তারকে তো অশিক্ষিত পটুত্বে প্রায় অর্ধেক ঘায়েল করেই এনেছিল হিমিকা। ভীষণ অপমান করে গিয়েছে সেদিন। কটমট করে তাকানো দেখেই একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল সে।

হিমিকাকে নীরব দেখে আবার বললেন সাউ সাহেব ---এ লাইন তোমাকে স্যুট করছে না হিমি। রাত দিতে চাও না, গায়ের কাপড় উৎরাবে না। অথচ রেট বাড়াচ্ছ দিনে দিনে। কাস্টমাররা কমপ্লেন করছে হরদম। তবে আমি তোমার অবস্টিনেসি ভাঙতে পারি। হাজার টাকা দিলেই একরাত দেবে। কি বল?

একটু ভাবল হিমিকা।---হ্যাঁ দেব। কিন্তু হাজার নয়, এক লাখ টাকা দিতে হবে তার জন্যে।

---লাখ রূপেয়া। তাজ্জব কি বাত। আশ্চর্য হলেন বিজমোহন।---গায়ের কাপড় উৎরাবার জন্য লাখ রূপেয়া।

---তাজ্জব কেন সাহেব? আমার ব্যবসার মূলধন তো আমার বডি। তার শেষ পর্যন্ত ব্যবসাতে লাগাতে পারি সবচেয়ে বেশী দাম পেলে তবেই তো। না হ'লে যে দেউলে হয়ে যাব। একদম ব্যাঙ্করাপ্ট। তখন কি হবে আমার দশা?

---ও তো ঠিক বাত। লেকিন এক বে-আবরু বডির দাম লাখ টাকা কখুনো হোয়?

বিজমোহনের কথা শুনে বিষের মত হাসল হিমিকা।

---হয় না, না? একেবারে বে-আবরু হ'লে আর তার দাম থাকে না। অল্প একটু আবরু রাখলে দাম তবেই চড়বে, তাই তো বে-আবরু হচ্ছি না। আর সাহেব, আপনাদের পছন্দমত শরীরের মাপ হলে যদি লাখ লাখ টাকা দেন, রাত দিলে কেন পাব না মোটে এক লাখ?

হা-হা করে হাসলেন বিজমোহন।

---বহুৎ উইটি গার্ল। কিন্তু এতো টাকা নিয়ে কি করবে তুমি?

---কি আর। মেয়েরা যা চিরদিন করে, তাই---বিয়ে, ঘর-সংসার।

---শাদি! কে শাদি করবে তোমাকে। টাকার লোভে একটা কুত্তার বাচ্চা এলে সুখ পাবে না তুমি।

---কিন্তু আমি তো ভদ্রলোক বিয়ে করবই না সাহেব। লাখটাকা ফুরিয়ে গেলে, তা'হলে সে আমাকে আবার কলগার্ল বানিয়ে দেবে। আমি গরীব, ভিখিরি ঝুমরাব দলের মরদ ভোলাকে বিয়ে করব।

---বেগারকে শাদি করবে? বড়ি তাজ্জব কি বাত।

---তা বিয়ে করলে ও তো আর বেগার থাকবে না। সাফ জামা কাপড় পরে আমার স্বামী হয়ে যাবে।

---একটা বেগার স্বামী পাবার জন্য এতো কষ্টো করবে?

---করব সাহেব। আস্তে আস্তে জবাব দিল হিমিকা।

---স্বামী পেলে যে আমি ঘর-সমাজ সব পাব। একজনের বউ হ'লে জাতে উঠব। তখন আমার ইজ্জত হবে। আমাকে দেখে কেউ লোভ করলে ভোলা লাঠি নিয়ে মারতে আসবে তাকে। তখন আমি তো কলগার্ল থাকব না, ঘরের বউ হব। পেটের দায়ে যে ইজ্জত বিকিয়ে দিয়েছিল আমার মা, মায়ের মা, টাকা দিয়ে আবার সে ইজ্জত আমি কিনে নেব।

হঠাৎ কোথা হতে উঠে এল এক-ঝলক গরম জল। হিমিকার চোখ রাঙানী না মেনে ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়ল গোলাপী গালের উপর। বিজমোহন হিমিকার হাত নিজের হাতে নিলেন। ব্যবসায়ীর বুকের মানুষটা তন্দ্রার ঘোরে দুঃখ পেল।

●

বোকা মেয়ে হিমিকা। ওর সব-চেয়ে বড় দুঃখ ওর মা পতিতা, তাই ওর ঘরে স্থান নেই, অধিকার নেই সংসারে। ওর মাথায় কেউ কোনো দিন বধূর লজ্জাবস্ত্র তুলে দেবে না। ঘরের স্বপ্ন দেখেছে ও দু'টি বছর অজয়ের আশ্রয়ে থেকে, ভাই-বোন-বাপ দিয়ে ভরা কি মধুর রূপ সেই ঘরের। সরবালা হিমিকার স্বপ ভেঙে দিয়েছে।

...করে জানিয়েছে ওর জন্য ... ও থাকবে বাগান বাড়ীতে। ... নয়, মমতা নয়, ও হাসি নাচ দিয়ে তুষ্ট করবে পুরুষকে। শরীর বিলিয়ে যোগাড় করবে ভবিষ্যতের ...। তখন বড় কষ্ট হয়েছিল কিন্তু ক্রমে বুঝেছে সরবালা তাকে নিষ্ঠুর সত্যের রূপ দেখিয়েছে। না হলে হয়তো আরো ভুল করত।

অনলের সম্মোহন শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে উঠত গিয়ে একটা নরকে। তাকে ভাবত স্বর্গ। দু'দিন পরে জানত প্রেম নয়, দেহজ কামনার বিলাসসঙ্গিনী সে অনলের, যেমন তার মা ছিল সুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার চেয়ে এই ভাল। সে স্বাধীনা। তবু সে গণিকা নয়, কারো রক্ষিতা নয়। অবসরসঙ্গিনী। ধৈর্য ধরে বুদ্ধি খাটিয়ে চলেছিল বলেই হিমিকা কুৎসিত পতিতা হয়ে রইল না, উঠে এল অনেক উপরে। বুদ্ধি থাকলেই মেয়েরা হয় সমাজের মুকুটমণি আর বোকারা পতিতা। দলনেত্রী, গৃহকর্ত্রী, রাণী, কে বানাল মেয়েদের? পুরুষ। ওরা মেয়েদের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। মুক্তো তোলে সমুদ্রে ডুবে। কবি হয়, প্রেমিক হয়। সব পুরুষই চায় মেয়ের জন্য একটা কিছু করতে। কিন্তু মেয়েদের একটু বুদ্ধি করে চলতে হয়। একেবারে সোজাসুজি গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লে যে মোহ ভেঙে যায় পুরুষের। তখন কয়েকটা পয়সা ছুড়ে বোকাগুলোকে পতিতা করে দেয় তারা।

আর বুদ্ধিমতী মেয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়ায় বিশ্বের মাঝখানে। পুরুষ তখন হাঁটু মুড়ে ফিতে হাতে নিয়ে বসে তার পায়ের তলায়। কৃত কৃতার্থ হয়ে মেপে মেপে দেখে গর্বিতার বক্ষকটি নিতম্বের গঠন। কে বলেছে মেয়েদের ছাব্বিশ ইঞ্চি কোমর আর তিরিশ বুক হলে সুন্দরী হবে? পুরুষ, পুরুষ বলেছে---তোমার শরীর এমনি আমাদের পছন্দমত সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট পাবে। বোকা মেয়েগুলো সে কথা শুনেও কয়েকটা টাকার বদলে শরীরটাকে নিলামে তুলল প্রতিরাতে।

আর বুদ্ধিমতী চ্যালেঞ্জ জানালে। বলল---দেখ আমার হরিণ নয়ন, স্তোকনম্র বক্ষ। এই আমার নিম্ননাভি, শ্রোণীভারে আমার অলসগমন। সূক্ষ্ম বসনের ভাঁপ গায়ে জড়িয়ে সেই মেয়ে মোহিত করল পুরুষকে। অমনি তারা জয়ধ্বনি করে উঠল। সিংহাসনে বসিয়ে তার মাথায় তুলে দিল মুকুট। দলে দলে লোক ছুটে এল তাকে দেখে ধন্য হতে। সে মেয়ে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মী, কবির ধ্যানের ধন। বুদ্ধি থাকলে হিমিকার মা মরত না, তার চোখের বিদ্যুতে আহত হত সুরেশ্বর বরং। হিমিকার বুদ্ধি আছে, সে পতিতা নয়। সে অনলকে মুগ্ধ করবে। তখন অনল তাকে ঘর সংসার সন্তানের নিরাপত্তা---সব দেবে। কিন্তু কি দাম সেই নিরাপত্তার? তাও তো নির্ভর করে পুরুষের খেয়ালের ওপর। একদিন স্বামীর খেয়াল হ'লে স্ত্রীকে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করতে হ'ত হাসিমুখে। সেই সন্তানরা হ'ত সব মহান পুরুষ, পুণ্যশ্লোক। আর যেখানে খেয়াল নেই, সেখানে সন্তান এলে, তাকে ভাসাতে হত নদীর জলে। সেটা হ'ত চরম কলঙ্ক নারীজীবনের।

এখন? এখনো বোকা মেয়ের অনেক কষ্ট। পুরুষের দরবারে তাকে প্রেজেণ্টবল বানাতে হয় স্বামীকে উঁচুতে তুলবার মাশুল যোগাবার জন্য। আর বুদ্ধি থাকলে সে নিজে উঠে যায় অনেক উপরে। অনাচার আর স্যাম্পেনের গন্ধ গায়ে নিয়ে অর্দ্ধেক রাতে যারা বাড়ী ফেরে, তারা অনেকেই হয় মহনীয়া সমাজ-সেবিকা। তাদের রেকমেণ্ডেশনে চাকরি পায় কতজন, মঞ্জুর হয় বিদেশে যাবার ছাড়পত্র। লিখে দেয় নৈতিক চরিত্রের সার্টিফিকেট। বোকা বউগুলোরও কোনো দাম নেই পতিতার মত। তাদের একমুঠো ভাত, ক'টা শাড়ী, কয়েকটা ছেলেমেয়ে দিয়ে দাম চুকিয়ে দেয় পুরুষ। ওরা কাঁদে, উপোস করে। তারপর লক্ষ্মীপুজো করতে বসে, বানায় সত্যনারায়ণের সিন্নি।

ভোলার বউ হতে চায় হিমিকা? বউ দরকার ভিখিরি ভোলার। যে ওর ভিক্ষার চাল দিয়ে রাত্তিরে ইট পেতে ভাত রেঁধে দেবে, দুই চোখ গোল গোল ক'রে শুনবে সারাদিন ধরে ভোলা কত অ্যাডভেঞ্চার করেছে। নেবে পিঠ পেতে স্বামীর গুম্‌গুম্ কিল। তেমন অসহ্য হলে নিজেও লাগাবে দু'এক ঘা। কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবী-পায়সে ভোলাকে ভদ্রলোক করে তুললেই অ্যাম্বিশন দু'হাত বাড়িয়ে তাকেও ডাক দেবে। লাখ টাকা উড়ে যাবে নিমেষে। তখন বুদ্ধি না থাকলে হিমিকাকে পতিতা হয়ে যেতে হবে, যেমন হয়েছিল যূথিকার মা কুসুম।

সবাই বলছে সব যুগের দোষ। যত মানুষ সভ্য হচ্ছে, আধুনিক হচ্ছে, ততই তার চাওয়া বেড়ে যাচ্ছে। টাকার তৃষ্ণা আর মিটছে না। টাকা চাই। টাকা দিয়ে কেনা হবে সম্মান সুখ ঐশ্বর্য। আধুনিক সময় আর সভ্যতা পাগল করে ছেড়েছে মানুষকে। কিন্তু আগের দিন, সেই সোনার দিনেও কেন রাজত্বের লোভে পাগল হয়ে গালার ঘরে আগুন দিয়ে মানুষ পোড়াতে চাইল খেলার সাথী ভাইদের? কেন শান্ত ধার্মিক যুধিষ্ঠির কাম্যক বনে রইলেন না ভাইদের নিয়ে মহৎ সুন্দর জীবনের মধ্যে? তাঁরা বললেন ধর্ম-যুদ্ধ। ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ, তাই অন্যায় করেও মারতে হবে প্রতিপক্ষকে। সেই মহান সেকালের কাহিনীতেও পাতার পর পাতা লেখা রয়েছে---কত অন্যায় অবিচার ব্যভিচারের কাহিনী। তবে আর একালের কাণ্ড দেখে দেখে মাথা চাপড়ানো কেন? একালেও জীবনে জয়ী হবার জন্য যুদ্ধেই নেমেছে মানুষ। মেয়ে নয়, পুরুষ নয়, চলেছে মানুষের মিছিল। বুদ্ধি, খলতা, নীচতা, রূপ-যৌবন---সব যুদ্ধের অস্ত্র। আর যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য কোনো উপায়ই তো অন্যায় নয়। বাঁচবার জন্য, জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার

এক অনন্য ব্যাধি

স্বাস্থ্যবিদ

১৪৯৫ খৃস্টাব্দে য়ুরোপ উপদংশ রোগে জর্জরিত হয়েছিল। এত বড় সর্বনাশ মানুষের আর বোধ হয় কখনও হয় নি। ১৩০০-য় 'ব্ল্যাক ডেথ'-এর বলি পঁচিশ মিলিয়ন মানুষ। ১৯১৮-য় ইনফ্লুয়েঞ্জা গোটা পৃথিবীতে সবসমেত কুড়ি মিলিয়ন লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছিল। টাইফাস্—টাইফয়েড রোগের জীবাণু—বার বার এসেছে এবং গেছে। মেরেছে অনেক লোক। উপদংশ এল এবং রয়ে গেল। পৃথিবী জুড়ে। প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উপদংশ কোটি কোটি মানুষকে পঙ্গু করেছে, ক্ষেপিয়েছে, খুন করেছে—সুস্থ সবল মানুষগুলো এই রোগাক্রান্ত হয়ে অকর্মণ্য হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। কলম্বাস-এর সময় তুমুল আলোড়নকারী উপদংশ জীবাণুর বংশধররা বিস্ময় গিয়েছে আজি চড়ায়ে।

এই ঘৃণ্য রোগটির উৎপত্তিস্থল নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। এক মতে আমেরিকা থেকে কলম্বাস-এর সঙ্গীরা এই ভয়াবহ রোগটি য়ুরোপ-এ নিয়ে এসেছিলেন। ১৫০০ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী য়ুরোপীয়দের কঙ্কালের অবশিষ্টাংশ উপদংশজ বিকৃতি দেখা যায় নি, পরবর্তী কাল থেকে বহু সংখ্যক দেখা যায়। রুই দ্য ইসলা নামে জনৈক স্পেনদেশীয় চিকিৎসক কলম্বাস-এর সঙ্গীদের 'নতুন' রোগে ভোগার জন্য চিকিৎসা করেছিলেন বলে লিখে গেছেন। সেভিল্, বারসিলোনা এবং অন্যান্য যে সব বন্দরে গৃহমুখী আবিষ্কারকদের দল থেমেছিলেন সেই সব জায়গায় ১৪৯৩ খৃস্টাব্দে উপদংশের প্রকোপ সুরু হয়েছিল।

প্রায় বছর দুই এ রোগ দক্ষিণ-পশ্চিম য়ুরোপ-এ ধিকিধিকি জ্বলল। তারপর ফ্রান্স-এর রাজা অষ্টম চার্লস নেপলস-এর সিংহাসন অধিকার করার জন্য জার্মান, সুইস, শ্লাভ, হাংগেরীয় এবং ফরাসী সৈন্যর সমাহারে ত্রিশ হাজারী বাহিনী তৈরী করলেন। ১৪৯৫ খৃস্টাব্দে গোয়ার দিকে এই সৈন্য নেপলস-এর দরজাগুলোয় হানা দিয়ে বসল। কয়েক সপ্তাহর মধ্যে সৈন্যরা যেন এক ঐশ্বরিক অভিশাপে জর্জরিত হল, এই বস্তুটি শত্রুর অস্ত্র চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ, বীভৎস ফলসঞ্চারী। ঘায়ে ক্ষয়ে গেল হাড়পাঁজরা। তারা দৃষ্টিশক্তি হারাল, পাগল হয়ে গেল, কেউ কেউ হল পঙ্গু, চিরকালের মত অকর্মণ্য।

তারপর সুরু হল মহামারীর অপ্রতিরোধ্য বিস্তার। প্রথমে আক্রান্ত দেশের মধ্যে রয়েছে রোম। ফ্লোরেন্স-এর ধৃতিভাবান স্বর্ণশিল্পী বেন্‌ভেনুটোর আত্মজীবনীতে এর উল্লেখ আছে। তিনি লিখছেন—প্রত্যহ এই অ-সাধারণ, বীভৎস রোগে কয়েক হাজার ক'রে লোক মারা গিয়েছিল।

চার্চ বন্ধ হল। পবিত্র দিনের অনুষ্ঠান একদম বাতিল। উপদংশে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সবাই এড়িয়ে চলত, এমন কি কুষ্ঠরোগীরা পর্যন্ত। একমাত্র ভিক্ষান্নই ছিল তাদের জীবিকা। ছোটবড় সব রাস্তায় তারা ঘা দেখিয়ে ভিক্ষা চাইত।

নেপলস্ যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হওয়ার পর ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল য়ুরোপ-এর সব দেশে ছড়িয়ে পড়ায় ১৪৯৫-তে ফ্রান্স জার্মানী এবং সুইৎজারল্যাণ্ড, ১৪৯৬-তে গ্রীস-এ, ১৪৯৭-তে ইংলণ্ড আর স্কটল্যাণ্ড-এ উপদংশ মহামারীর আকারে বিস্তৃত হয়েছিল। ১৪৯৮-তে ভাস্কো ডা গামা এ রোগ ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন; ১৪৯৯ খৃস্টাব্দে রাশিয়া আর পোল্যাণ্ড-এ এই রোগ ঢোকে ভ্রাম্যমাণ দলের মারফৎ।

এ রোগ সৎ অসৎ কাউকে রেহাই দেয় নি। প্রসূতিরা আক্রান্ত হত ধাত্রীদের দ্বারা; আক্রান্ত নাপিত খদ্দেরদের দেহে এ রোগের বিষ ঢোকাত ছোটখাট কাটা-র মাধ্যমে।

প্রায় এক পুরুষ এই রোগটির কোনও নাম ছিল না; বরং বলা উচিত অসংখ্য নামে এটি পরিচিত ছিল। ইতালীয়-রা এটি জানত 'ফ্রেন্‌চ ডিসিস্' হিসেবে; ফরাসীদের চোখে এটি 'ইতালীয়ান ডিসিস্।' কেউ বলত 'ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান মিস্‌ল্‌স্', অন্যরা 'টারকিস পক্‌স।' সেকালের ফরাসী চিকিৎসক গিরোলামো ফ্রাকাস্‌টোরো-র লেখা এপিক কাব্যর সিফিলাস-'শূকরপ্রেমী' অশ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য সূর্যদেবতা অ্যাপোলো কর্তৃক একটা নতুন রোগাক্রান্ত হয়। এ থেকেই রোগটির অতি পরিচিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য য়ুরোপীয় নাম 'সিফিলিস্'-এর উদ্ভব। আমাদের ভাষায় বলে উপদংশ।

গোটা য়ুরোপ জুড়ে চলল উপদংশের তাণ্ডবনৃত্য। ১৪৯৭-তে পারিসের

জন্য কলর্গাল হয়েছিল হিমিকা। এবার লেডি রিপ্রেজেণ্টেটিভ হবে। ওর রূপ, যৌবনময় শরীর, তীক্ষ্ণ বাক-চাতুর্য সব দিয়ে বশ করবে ডাক্তারদের। ওর টাকা হবে, বাড়ী হবে, গাড়ী হবে। হয়তো একদিন দেশনেত্রীও হবে হিমিকা। হয়তো কত জাতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবে। মুগ্ধ করবে বিদগ্ধজনকে ভাবগভ দৃষ্টি দিয়ে। নৈতিক জীবনে পবিত্রতার মূল্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে একটা আদর্শ সৃষ্টি করে ফেলবে দেশে। [ক্রমশ।

পার্লামেণ্ট এই রোগগ্রস্তদের নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতে হুকুম দিল। সেণ্ট জার্মেইন-এর সহরতলীতে নাগড়িগাদান প্যারিসবাসী, অবশ্যই রোগগ্রস্তরা, সে এক নারকীয় অবস্থা, অ-দৃষ্টপূ্র্ব। পরেও এমনটা দেখা যায় নি। এতেও রোগের বিস্তার রোধ করতে না পেরে তারা হুকুম দিলেন রোগীদের রাস্তায় দেখামাত্র নদীতে ফেলে দিতে। যা চাকার কোনও উপায় ছিল না। আর, অধিকাংশ লোকই সাঁতার না জানায় এই আদেশ মৃত্যুদণ্ডতুল্য হয়ে দাঁড়াল।

য়ুরোপ-এর দেশে-দেশে এদের চরম নিগ্রহ সুরু হল। জারমানী স্ট্র্যাস্বুর্গ, ন্যুরেমবার্গ, মেইনজ ইত্যাদি সহর থেকে উপদংশাক্রান্ত লোকদের বের ক'রে নগরদ্বারে প্রহরী বসাল, যাতে ওরা আর ঢুকতে না পারে। য়ুরোপীয় রাস্তাগুলো তখন বিকৃতাংগ রোগীতে ঠাসাঠাসি। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, নেই পরনের কাপড় বা ক্ষুধার অন্ন। বনে প্রান্তরে ওরা মরল হাজারে হাজারে, মহামারীতে যেমন গবাদি পশু উজাড় হয়ে যায় ঠিক সেই রকম।

অধিকাংশ চিকিৎসকই নিজেরা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে উপদংশে আক্রান্ত রুগীদের চিকিৎসা করতে রাজি হলেন না। মুষ্টিমেয় ডাক্তার রাজি হওয়ায় তারা বিত্তশালী হয়ে গেলেন। তারা কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করতেন পারদ দিয়ে। পারদের সঙ্গে শূকরের চর্বি মেশান মলম রোগীর আপাদমস্তক ভাল ক'রে লাগাতেন। অর্থবান রোগীদের তারপর 'সোয়েট্বক্স'এ রাখা হত, তার গায়, 'একটা আমোদের জন্য হাজারো কষ্ট' জাতীয় নীতিবাক্য লেখা থাকত। বাক্সর তলায় ছোটখাট কাঠকয়লার আগুন জ্বালা, রোগী ঘামছে আর যন্ত্রণা পাচ্ছে।

গরীবদের মলম মাখিয়ে বৃহদাকার চুল্লীর মধ্যে গাদাগাদি ক'রে ভরে দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হত। ফলে তিন চতুর্থাংশ রোগীর ইহলীলা সাঙ্গ। হয় পারদজ বিষক্রিয়ায়, না হলে অসহ্য উত্তাপে।

পারদে সারত প্রত্যক্ষ ক্ষত। কিন্তু জীবাণু ভেতরে থেকে যাওয়ায় পরবর্তী জীবনে পাগলামী, পক্ষাঘাত, অন্ধত্ব, এবং অন্যান্য সাঙ্ঘাতিক ফলাফল দেখা দিত।

উপদংশ মহামারী কাউকে রেহাই দেয় নি, সম্ভ্রান্তদেরও নয়। পরাক্রান্ত এবং কুখ্যাত বোর্জিয়াস্-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ঐ রোমান ভদ্রলোকের পরিবারেরই সতের জনকে ঐ রোগাক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসা করেছিলেন। ইংলণ্ড-এর পরাক্রান্ত রাজা অষ্টম হেনরী-র এই রোগ হয়েছিল। রাশিয়া-র আইভান দ্য টেরিবল এবং ফ্রান্স-এর প্রথম ফ্রান্সিস-ও এ-রোগের শিকার হয়েছিলেন প্রথম জন ত পাগল হয়ে যান।

সাত বছর ধরে এই রোগের প্রকোপ প্রবল আকারে বিস্তৃত ছিল। প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন আক্রান্ত এবং দশজনের একজন মৃত। তীব্রতা কমার পর থেকে উপদংশ লোক সারতে লাগল ধীরে, কিন্তু অনিবার্য গতিতে।

১৫০৫-এ চীন দেশে, ১৫৬৯-এ জাপানে উপদংশ দেখা দিল। প্রথম দেশে ব্যবসায়ীরা, জাপানে পর্তুগীজ নাবিকরা এটি পৌছে দিয়েছিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সব মানুষ শ্বেতাঙ্গদের এই দান গ্রহণ ক'রে প্রায় উজাড় হয়ে গেল। আমেরিকায় এ রোগ মহামারীর আকারে কিছু পরে পৌঁছোয়। সম্ভবত আদি বসতিস্থাপনকারীদের অত্যন্ত কঠোর নীতিবোধের জন্যই এই বিলম্ব।

উপদংশের জীবাণু মানবদেহ বা পরীক্ষার জন্য নিবাচিত পশুদেহের বাইরে বাঁচে না। তবুও, প্রায় পাঁচ শ' বছর ধরে এই ভয়াবহ রোগ গোটা পৃথিবীকে বারবার আতঙ্কে অভিভূত করে ফেলেছে।

এ দিক দিয়ে রোগটি অনন্য।

আধুনিক যুগে উপদংশের উপযুক্ত চিকিৎসা বেরিয়েছে। সময়মত চিকিৎসিত হলে এখন আর তেমন ভয়ের কোনও কারণ নেই।

আজকে কেন

অজিতকুমার বিশ্বাস

আজকে আমার চিত্তখানি তোমায় কেন বন্দে গো,
দিচ্ছে খালি অর্ঘ্যরাশি তোমার পাদপদ্মে গো।
আমের বোলে মৌ জমেছে সবুজ শাখা ভরলো রে।
গন্ধ তারই হঠাৎ ভারী মনকে উতল করলো রে।

আকাশ আজি নিলাজ নীল, মেঘের দেখা নেইকো যে,
কোন্ বিদেশে চল্‌ছে ভেসে না জানি সে কার খোঁজে।
হাওয়ায় শুধু ঝরছে মধু অঝোর ধারে রাত্রি দিন
কোন্ সাহানায় গাইছে গান, প্রাণের তারে বাজিয়ে বীণ।

আমরা দু'জন আগেও ছিলেম, হঠাৎ কেন এই জোয়ার
তটের পরে আছাড় খেয়ে পড়ছে আজি বারংবার।
আঁখির কোণে কাজল ছিল, ছিল না কি এই মায়া,
ফেলছো কেন সংগোপনে আজকে এমন ধূপছায়া।

হরণ করে' রমণ করে' আমার তুমি করলে কি,
রম্য তুমি, চিত্তপটে তাইতো তব নাম লেখি।
মনের সাজি ভরিয়ে আজি তোমায় করি বন্দনা।
হে মানসী, আজকে তোমায় লাগছে চোখে মন্দ না।

অনেষ্টির একটি শাখা

একটি চলন্ত ট্রেনে মুখোমুখি বসেছিল এগার বছরের একটি কিশোর আর একটি যুবতী স্ত্রীলোক। তারা পরস্পর অপরিচিত ছিল এবং কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছিলো না। তার কারণ স্ত্রীলোকটির মন অস্বস্তিতে ভরা ছিল আর কিশোরটি এখনও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়নি বলে লজ্জা পাচ্ছিল না। তারা ট্রেনের খোলা জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখছিল। মার্চেল্লো দেখতে পাচ্ছিল মাঠে ঘোড়াগুলো দেখা দিয়েই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল আবার কখনও বা দেখা যাচ্ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড়।---

যাত্রার সুরুতেই মার্চেল্লোর মন বেদনায় ভারাক্রান্ত ছিল কিন্তু এই দৃশ্যাবলী তার মনের ভার লাঘব করল। সে আরও দেখতে পাচ্ছিল যে মাঠের ভেতর খানাগুলি দূরে—বহু দূরে মিলিয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছিল আসনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আরও ভাল করে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখে কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল ছোট বাচ্চারাই অমনি করে বসে দেখে।---

হঠাৎ নড়াচড়ার শব্দে তাকিয়ে দেখে স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখের ওপর একটা পাতলা কাপড়ের আবরণ ছিল। তিনি জালের ব্যাগ থেকে নানা জিনিস ঘেঁটে একটা বই আর চিত্রশোভিত একটা পত্রিকা তাঁর আসনের ওপর রাখলেন এবং সুটকেসটা ঠেলে একপাশে রাখলেন। সুটকেসের কাছে একটা হাত-ব্যাগ, রেশমী পোষাক আর টিস্যু কাগজে মোড়া একটা পার্শেল ছিল। তিনি দু'তিনবার হাত-ব্যাগটা খুললেন আর বন্ধ করলেন।--- পার্শেলের মোড়কটা খুলে আবার বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিলেন। এবং আবার বাইরের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলেন। আসনের ওপর এক হাঁটুর ওপর আলতো করে ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই দাঁড়াবার ভঙ্গীটি মার্চেল্লো খুব তারিফ করল। মার্চেল্লোও অমনিভাবে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা চাই। তিনি এমন একাগ্রভাবে বাইরে মাঠের দিকে চেয়েছিলেন যে মার্চেল্লো তাঁকে তাকিয়ে দেখল নতুন কোন আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখা যায় কিনা। হতাশ হল সে। এককোণে গুটিসুটি হয়ে বসে নিচের

মাস্‌সিমো বনতেমপেল্লি

দিকে চেয়ে তার দুঃখের কথা ভাবতে লাগল। ব্যাপারটা এই—অনেষ্টি গাছ—উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা যাকে বলেন 'লুনারিয়া'—তার অদ্ভুত পাতার সঙ্গে নিশ্চয়ই সবার পরিচয় আছে। ইটালীর কোন অঞ্চলে এই গাছকে বলা হয় 'পোপের সৈনাদল' আবার কোন অঞ্চলে বলে 'রাত্রের ভায়োলেট।' এক সময়ে স্ত্রীলোকেরা অনেষ্টিগাছের ডাল বৈঠকখানা ঘরে ফুলদানীতে রাখতে ভালবাসতেন। এই গাছের পাতাগুলো আসলে পাতার কংকাল---গোলাকার পাতাগুলো স্বচ্ছ এবং দেখতে অনেকটা চাঁদের মত।---

বৈঠকখানা ঘরের টেবিলের দেরাজের ভেতর মার্চেল্লোর মা তাঁর ধন-সম্পত্তি রাখতেন। টেবিলের ওপর কয়েকটা ফটো ছিল এবং একটা ফটোর সামনে ছোট্ট একটা ফুলদানীতে অনেষ্টি গাছের ঠিক একটিমাত্র ডালই ছিল।--- মার্চেল্লো অনেকবার লক্ষ্য করেছে এই ডালটিকে—একটি ডাল দু'ভাগ হয়ে দুটি হয়েছে এবং সব মিলে পাঁচটি পাতা।--- একদিন ডালটা পড়ে গিয়ে জীর্ণ পাতাগুলো গুঁড়ো হয়ে গেল।-- মার্চেল্লোর মা কোন কারণে ভাবাবেগে দারুণ আঘাত পেলেন। তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলেন আরেকটি ডাল—কিন্তু ঐ শহরে আর সে গাছ ছিল না। চার মাস ধরে তিনি ঐ গাছের জন্য আশা করে বসেছিলেন।---

●

স্কুলের ছুটির সুরুতেই মার্চেল্লোকে তাদের পরিবারের বন্ধু অন্য এক পরিবারে এক সপ্তাহের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁরা একটা বড় সহরেই থাকতেন। যাবার আগে মার্চেল্লো তার মার কাছে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিল যে অনেষ্টির একটা ডাল সে যে করেই হোক আনবে।--- কিন্তু নানারকম আমোদ-প্রমোদে সে তার প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গেল। ট্রেনে উঠেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ল এবং বন্ধুদের মুখগুলিও ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। ---এই একটা সপ্তাহ তার কাছে একটা প্রকাণ্ড পাপের গহ্বর বলে মনে হল।---ঠিক যাত্রার পূর্বমুহূর্তে শূন্য ফুলদানীটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার মায়ের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল মার্চেল্লো--- শুনতে পেল তাঁর আশার বাণী।--- নিজের আত্মাকে একটা কৃষ্ণকায় দানব বলে মনে হল।---তাই সে বারে বারে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখে নিজেকে ভুলতে চাইছিল এবং খেয়ালও করেনি কখন যে স্ত্রীলোকটি ট্রেনে উঠেছিলেন। হতাশায় আবার সে ভেঙে পড়ল।

স্ত্রীলোকটি বসে আবার বইটা পড়তে সুরু করে দিলেন। বইয়ের নামটা দেখবার জন্য মার্চেল্লোর ভীষণ কৌতূহল হল। মাঝে মাঝে তিনি বইটা উঁচু করে ধরছিলেন।---মার্চেল্লো হঠাৎ লাল-কালো হরফগুলি দেখতে পেল কিন্তু ভাল করে দেখতে না পাওয়ায় পড়তে পারল না। তিনি বইটা খোলা অবস্থায় আসনের ওপর রাখলেন তারপর দাঁড়িয়ে হাত-ব্যাগটা বের করে পাশেই রাখলেন। ব্যাগ থেকে সিগারেট কেস আর দেশলাই বের করে খোলা বইটার ওপর রাখলেন। কেন তিনি সিগারেট ধরাচ্ছেন না? দুই হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চিবুক প'স্ত ঢাকা আবরণটি গালের উপর পর্যন্ত তুললেন—আবরণের কালো প্রান্তরেখাটি তাঁর মুখটাকে দুইভাগে ভাগ করল।---মার্চেল্লো অপেক্ষা করতে লাগল কখন তিনি সিগারেট ধরাবেন। জালের ব্যাগ থেকে টিস্যু-কাগজে মোড়া পার্শেলটি বের করে হাতব্যাগ আর বইয়ের মধ্যি-খানে রাখলেন---তারপর বসে কোলের ওপর চিত্রশোভিত পত্রিকাটি টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলেন মার্চেল্লোর দিকে কোন দৃষ্টিপাত না করে।---মার্চেল্লো যেন এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চলচ্চিত্র দেখছিল---হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে অতি অভদ্রভাবে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে আছে সে। স্ত্রীলোকটি কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আকাশের দিকে চেয়েছিলেন।

সূর্য আকাশের গায়ে অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে। মার্চেল্লো ঘুমে ঢলছিল। ---হঠাৎ মনে হল জানলার ভেতর দিয়ে দেখতে পেল সমস্ত মাঠটা অজস্র অনেষ্টফুলে ছেয়ে গিয়েছে।---একটা মৃদু শব্দে চমকে জেগে উঠল---দেখল স্ত্রীলোকটি পার্শেলটা খুলছেন---মার্চেল্লো চোখ দুটি বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল।---পার্শেলটা খোলা হলে দেখা গেল এক-গোছা অনেষ্টর ডাল।---মার্চেল্লো আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল প্রায়। দু'এক মুহূর্তের জন্য যেন স্বপ্ন দেখছিল।---এতগুলো ডাল। গোটা পঞ্চাশেক তো হবেই।---একটা পরিকল্পনা মাথায় আসাতে হৃৎপিণ্ডটা জোরে জোরে স্পন্দিত হতে লাগল। স্ত্রীলোকটির কাছে সে একটিমাত্র ডাল চাইবে।---হৃৎপিণ্ডটা আবার ধীরে ধীরে স্পন্দিত হতে লাগল। কারণ এবার সে সঙ্কল্প করে ফেলেছে কাজটা করে ফেলবার। কাজ করবার আগে শান্ত থাকা চাই।---স্ত্রীলোকটি অনেষ্টর গোছাটা একমুহূর্তের জন্য ওপরে তুলে একটু নাড়া দিলেন।---মার্চেল্লো যেন একশ ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেল। ট্রেনটা যেন উৎসবের রাত বলে মনে হল।---স্ত্রীলোকটি একহাতে প্রকাণ্ড ফুলের তোড়াটা এবং অন্য হাতে মুখের আবরণটা ধরে হেলান দিয়ে বসে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন---গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।---

মার্চেল্লো ভাবছিল কি বলে কথা সুরু করবে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে—মাদাম।--- তারপর তাঁকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই একটিমাত্র অনেষ্টর ডাল চাইবে তার মা-মণির জন্য এবং নিশ্চয়ই তিনি দেবেন। এখন সমস্যা হচ্ছে ঠিক কোন মুহূর্তে কথা সুরু করবে।--- একটিমাত্র কথা '---মাদাম।---' বললেই যথেষ্ট ---তিনি মুখ ঘুরিয়ে শুনবার জন্য প্রস্তুত হবেন---কিন্তু মুখটা ঘোরান থাকলেই সুবিধে হত।---কি দেখছেন তিনি একদৃষ্টে?---মনে হল তিনি মার্চেল্লোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন—চোখ নামালেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্যও যদি চোখাচোখি হয় তবেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।---ঠিক আছে সেই মুহূর্ত আসবেই।---এখন তাঁর হাত দুটো খালি। অনেষ্টর তোড়াটা একপাশে এবং পার্শেলের কাগজগুলো অপর পাশে রাখলেন। মার্চেল্লো তোড়াটার দিকে নজর রাখল পাছে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি সিগারেটটা ধরাচ্ছেন না কেন?---হয়ত তিনি ফুলগুলো জালের ব্যাগ অথবা স্যুটকেসের ভেতর রাখবেন। ---কিন্তু অতগুলো ডাল ওর ভেতর ধরবে না---যখন তিনি ভেতরে ঢোকা-বার চেষ্টা করবেন তখন আমি তাঁকে সাহায্য করব এবং তবুও কয়েকটা ডাল বাইরে থাকবেই।--- তিনি বলবেন, 'ওগুলো আমাদের একত্র ভ্রমণের স্মারক-চিহ্ন হিসেবে রেখে দাও তোমার কাছে।' আমি বলব 'ধন্যবাদ মাদাম।'---সমস্যার সমা-ধানে খুশী হল মার্চেল্লো।

স্ত্রীলোকটি এবারে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। ফেলে-রাখা সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলেন। কয়েকটা মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি ছিল---এই সময়ে কোন তরুণ কাছে থাকলে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত। সিগারেটটা ধরালেন। নীল
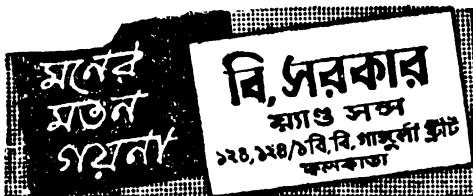
ধোঁয়ার জাল মার্চেল্লোর মুখে এসে লাগল। মার্চেল্লোর কাছে তা স্বর্গীয় বলে মনে হল।---এই ত' সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আগত---মার্চেল্লো মুখ খুলল---'মাদাম।' শব্দটা কি উচ্চারণ করেছিল সে না শুধুমাত্র ভেবেছিল? ---জানে না। এবারে বেশ জোরে বলবে---'মাদাম।'---কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে মুখের সিগারেটটা তিনি বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলেন।---ভয় পেল মার্চেল্লো। কি হল স্ত্রীলোকটির? একঝটকায় মুখের আবরণটা খুলে আসনের ওপর রাখলেন ---একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।---স্ত্রীলোকটি এবারে ফুলের গোছাটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন---বোধ হয় মার্চেল্লোকে একটা ফুল দেবেন---মুখ ফেরালেন--বোধ হয় মার্চেল্লোকে কিছু বলবেন---কিন্তু হঠাৎ যেমনি রেগে সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তেমনিভাবে ফুলের গোছাটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।---উঠে দাঁড়ালো মার্চেল্লো ---মনে হতে লাগল সমস্ত শরীরটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে---যন্ত্রণাটা কণ্ঠ পর্যন্ত উঠে এল---শেষে কান্নায় পরিণত হল।---

এবারে স্ত্রীলোকটি মার্চেল্লোর দিকে চাইলেন---নিচু হয়ে তাকে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন ---'কি ব্যাপার? কাঁদছ কেন?'--- কান্না থামাল সে---একমুহূর্ত নীরব থেকে কয়েক পা পেছনে সরে এসে নাটকীয়ভাবে জবাব দিল---আপনি কখনও তা জানতে পারবেন না।

---এমন রহস্যময় এবং দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল যে স্ত্রীলোকটি বিস্মিত হলেন এবং ট্রেনটা হঠাৎ থেমে যাওয়াতে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ---ট্রেনের দরজা খুলে কে একজন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে 'মার্চেল্লো! মার্চেল্লো!' বলতে বলতে তাকে স্বাগত জানিয়ে দুই বাহুতে তুলে নিয়ে ট্রেন থেকে নামাল।

অনুবাদক---সুধীরকান্ত গুপ্ত

শ্যামলীর সেদিন কাঁপিয়ে জ্বর এলো। অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়, ব্যথা বুকে-পিঠে। মুখে রুচি নেই।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, জ্বর যায় না কিছুতেই। চারুলতা প্রথমে টোটকা দিলেন। চামেলী 'এলকোসিন' ট্যাবলেট কিনে দিয়ে গেল ক'টা।

ইন্দ্রনাথ ডাক্তার ডাকার কথা বললেন চারুলতা।

তোমরা ডাক্তার, ডাক্তার করেই গেলে। সামান্য একটু জ্বর হয়েছে, একটু উপোস দিলেই সেরে যাবে। তা নেহাত যদি ডাক্তার ডাকতেই হয়তো পাড়ার হোমিওপ্যাথ অনাদি ডাক্তারকে ডেকে আনি।

আজ তিনদিন ধরে জ্বর কমছে না একবিন্দু, গায়ে ধান দিলে যেন খই ফোটে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কি করবে রে তুই ডাক্তার সিত্তিরকে ডাক একবার। তোর বাবাকে শেষটায় দেখেছিল সে।

তোমার বড় পুত্রটি তো গত দু'মাস একটি পয়সা পাঠায় নি। ওই এক-ফোঁটা মেয়ে রাত জেগে মুখে রক্ত তুলে রোজগার করে আনছে সে টাকায় এমনি হরির লুঠ করতে পারবো না আমি।

দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের আধখানা ঘর এখন চামেলীর একারই লাগছে। বড় ঘরে খাটের ওপর শ্যামলীকে নিয়ে মা শুয়ে থাকেন। মেঝেয় বিছানা করে ইন্দ্রনাথ, মল্লিনাথ।

গতরাতেও থিয়েটার ছিল চামেলীর। সকাল থেকেই ঘুমোচ্ছিল তাই। জোরে জোরে কথাবার্তা শুনে বাইরে বেরিয়ে এলো। বারান্দা পার হয়ে বড় ঘরে এসে ঢুকলো।

ইন্দ্রটা চেঁচাচ্ছে কেন অমন।

শ্যামলীর ক'দিন থেকে জ্বর কিছুতেই নামছে না। আমি বলছিলাম একজন ডাক্তার ডাকলে হোত না একটু।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই মনে হচ্ছে। আর এ বছর এ রোগটা হচ্ছেও খুব। দেখো আজকের দিনটা যাক না পারলে কালকেই ডাকা যাবে ডাক্তার।

মা আর চামেলী রান্নাঘরে খেতে বসেছে। বাড়ীতে কেউ নেই। ইন্দ্রনাথও না মল্লিনাথও না।

শ্যামলীর কাশিটা বড্ড বেড়েছে কাল রাত থেকে। মা বলছিলেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে কাশি হলে বড্ড ভোগায় মা। দেখ নি মল্লির হয়েছিল একবার।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

আশীষ বন্দ্য

কি জানি মা। যেমন বরাত আমার, এখন ভালোয় ভালোয় সেরে উঠলে বাঁচি।

মল্লির চাকরিটা হোল না মা, কাল হিরন্ময়দা বলছিলেন, পরীক্ষাটা ও নাকি একেবারেই ভালো করতে পারেনি।

কি যে হবে। মণি তো গত দু'মাসে টাকাই পাঠায় নি। চিঠি লিখলে জবাবই দেয় না। কি হোল যে ছেলেটার। এই বিপদের সময়। একবার ইন্দ্রকে পাঠাবো ভাবি।

ইন্দ্র যাবে না, আমি বলে দিলাম তোমাকে।

তাহলে মল্লিই না হয় যাক।

যেতে আবার গাড়ীভাড়া যাবে ডাক্তারের ভিজিটটা দেওয়া হয়ে যাবে মা। তোমার ছেলেকে বরং আর একটা চিঠিই লিখে দ্যাখো। শ্যামলীকে দিয়েই না হয় লেখাও।

মল্লির একটা চাকরি না হলে তো চলছে না। হিরণ্ময়কে বল না একবার ভালো করে। যদি ওদের অফিসেই কোথাও লাগিয়ে দিতে পারে। যে-কোনও কাজে।

হিরণ্ময়দার চাকরী নেই মা।

চাকরী নেই, তাহলে চলে কি করে রে? শুনেছি বউ, ছেলেমেয়ে, আছে।

জানি না।

ইন্দ্রই বা যদি কিছু করে একটা। কত জায়গায় তো ঘুরিস। দ্যাখ না কাউকে বলে।

চাকরীর বাজারটা অত সহজ নয় মা।

ইন্দ্র, মল্লির চাকরীর কথা দু'-একজনকে না বলেছে এমন নয়। দু' একটা বড় অফিসে অভিনয় করতে গিয়ে অফিসার মহলের বেশী গায়ে পড়া-পড়া দু'একজনের কাছে প্রস্তাবটা পেড়েও ছিল কায়দা করে। কিন্তু, না থাক, ওকথা না ভাবাই ভালো। চাকরীর বদলে তারা যা চায় চামেলী তা দিতে পারবে না।

কাশছিল শ্যামলী। ক্রমাগত কাশ-ছিল। কাশির জোর বাড়ছিল। হঠাৎ সেটা বেড়ে গেল আরো। তারপর একটা প্রচণ্ড কাশির সঙ্গে হঠাৎ থেমে গেল কাশিটা।

খাওয়া ছেড়ে ছুটে গেলেন চারুবালা পাশের বড় ঘরে।

বালিশের সঙ্গে যেন মিশে গেছে শ্যামলী। মুখ গুঁজে কাঁদছে ফুলে ফুলে।

মা গিয়ে তাকে জাপটে ধরলেন।

কি, কি হয়েছে মলি?

কিছুতেই মুখ তোলে না শ্যামলী।

ছিঃ মা, এমন করতে নেই। অসুখ-বিসুখ কি হয় না কারো।

মা, এতক্ষণে মুখ তুললো শ্যামলী, মা আমি ঠিক মরে যাবো।

একি এত রক্ত এলো কোথা থেকে।

কাশতে কাশতে গলা থেকে পড়লো না।

হঠাৎ পাশে বাজ পড়লে মানুষ যেমন হতচকিত হয়ে যায় তেমনি হয়ে গেলেন চারুবালা। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন চামেলীকে, চামি চামি ছুটে আয় এদিকে, দ্যাখ হতভাগী কি করে বসেছে এধারে।

●

দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের গাড়ীগুলো ধয়েমুছে ঝকঝকে করা হয় সেই পুজোর সময় একবার। রঙ দেওয়া হয়, কাচের জানলা-দরজাগুলি ভেঙ্গে থাকলে মেরামত করা হয় তা। রাস্তাগুলোর ধারে ধারে দেখা যায় গ্যাংম্যানরা কাজ করে লাইন পরীক্ষা করছে অবিরত। হিলকার্ট রোড যা শিলিগুড়ি থেকে সোজা পঞ্চাশ মাইল পথ বেয়ে এ পাহাড় ও পাহাড় সে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে গিয়ে পৌঁছেচে দার্জিলিং —তার সংস্কার করা হয় অতি ক্ষিপ্র হাতে। পাহাড়ে পাহাড়ে খবর রটে যায় এবার সময় হয়েছে তাদের আসার। সমতলের মানুষ পাহাড়ে আসছে এবার দলে দলে ট্রেনে, উড়োজাহাজে, গাড়ীতে।

উনিশ শো ছাপ্পান্নোর অক্টোবরে দার্জিলিঙে প্রথম এসেছিল মেঘমালা। আর আসছে আবার উনিশ শো উনষাটের মাচে।

শিলিগুড়িতে ট্রেন এসে যখন পৌঁছল তখন বেলা গড়িয়ে আটটা। মণিহারী সকরিগলিতে স্টীমারে গঙ্গা পার হতে গিয়ে চড়ায় আটকে গিয়েছিল জাহাজ। সামনে-পেছনে ঠেলাঠেলি করে অনেক কষ্টে শেষে বার হলো সেটা।

দার্জিলিং-হিমালয়ের রেলের আকার ক্ষুদ্র, অতি মন্থর কিন্তু তা সযত্নরক্ষিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের রেলপথের মতো তার চেহারা নয় গতানুগতিক। প্রতিদিন অতিযত্নে মাজাঘষা হয় তা সিজনের সময় বিশেষ করে পূজাবকাশে। পর পর রেল চলে। এক একটি ট্রেনে তিনখানি করে বগি. পর পর তিনখানা এমনি ট্রেন তাতেই যেন যাত্রীরা ঠাসাঠাসি করে যাচ্ছে।

দার্জিলিঙের ট্রেনে মালপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ব্রেকভ্যান আছে সব গাড়ীর সঙ্গেই, সেখানে যার যার নামের লেবেল এঁটে দিয়ে আসতে হবে। ছোটখাট দু'একটা জিনিস অবশ্য রাখতে পারেন কাছেই।

শিলিগুড়িতে গাড়ী পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই যে-যার সংরক্ষিত আসনে গিয়ে জায়গা নিল। মেঘমালা বসল জানলার ধারটিতে। প্রীতিময় তার পাশে। বাবা তখনও বেঁচে। সঙ্গে করে এনেছেন তাদের।

মিসেস সেনকে মনে আছে, পরে আলাপ হয়ে নাম জেনেছিল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বেশ জাঁকিয়ে টিফিন টিন খুললেন তিনি। বড় লম্বা গাড়ীতে তিন সার গদী আঁটা টানা চেয়ার অনেকটা প্রথম শ্রেণীর ট্রামের পেছনের সিটগুলোর মতো। মিসেস সেন নিজে উঠে গাড়ীতে যতো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল সবাইকে টফি বিলোলেন। আবার নিজে একটা মুখে পুরে মিস্টার সেনের পকেটে দিলেন দু'তিনটে ফেলে আর তারপরই কি দরাজ. আর প্রাণখোলা হাসি তাদের। সেই হাসিতে যোগ দিল সবাই।

পাহাড়ের প্রকৃতিই বোধহয় এই। কতো কষ্ট করে এরা। দিনে রাতে বারো-তেরো ঘণ্টা খেটেও এদের সংসারের যা অবস্থা দেখলে আপনার দুঃখ হবেই তবু মুখে হাসিটি লেগে আছে ঠিক। রঙদার সস্তা সিল্কের শাড়ী পরে সিনেমার তিনটে শো'য়ে এরা ভিড় জমায়। হয়ত দু'দিন বাদে আজ বাড়ীতে জুটেছে ভাত আর স্কোয়াশের তরকারীর সঙ্গে একটা কাঁচা পেঁয়াজ আর লঙ্কা---তাই পরম তৃপ্তি ভরে খেয়ে পুরনো জামা-কাপড়ের দোকানে কেনা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গরম স্যুট পরেই বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়।

সবাই হাসছে এখানে। হাসছে সর্বদাই। গাছপালা, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, পাহাড় পর্বত সবই যেন হাসছে। দূরে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা, সেও যেন হাসছে। বাস যাচ্ছে ড্রাইভার হেসে জায়গা দিচ্ছে যে ল্যাণ্ড রোভারখানা নামছে তাকে। হাত তুলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে দু'জন দু'জনকে হাসিমুখে।

দারুণ শীতে ভীতচকিত সবাই। আগুন জ্বেলেছে একসঙ্গে তারই চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে হাসছে সবাই। বাজারে কমলালেবু নিয়ে বসেছে, চায়ের দোকান দিয়েছে রাস্তার ধারে, হাটে তরিতরকারী নিয়ে এসেছে তারাও সবাই হাসছে। যে কিনছে সেও হাসতে হাসতে কিনছে, যে বেচছে হাসতে হাসতে বেচছে সেও।

মিসেস সেন মিসেন নটরাজনের কথা শুনে হাসছিলেন।

পাঁচ দিন থাকবো দার্জিলিঙে,

আজ ষষ্ঠী, কাল সপ্তমী থেকে দশমী অবধি। একাদশীর দিন অফিস খুলবে ওর। ফিরে যাবো সকালের ট্রেনে। সিল্কের শাড়ী এনেছি পনেরোখানা, রোজ পরবো তিনখানা করে গুণে গুণে। কাটোস টীনের প্যাণ্ট এনেছি দু'টো দু'বেলার ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে জলাপাহাড়।

এক এক করে স্টেশন পার হতে লাগলো। শুকনার চায়ের বাগান পার হয়ে এলো রংটং। এবারে পাহাড় সুরু হবে। মহানদী, গয়াবাড়, তিনধরিয়া, সিপাহী ধোড়া, মহাবন, কার্সিয়াং। তারপর টুং, সোনাদা, ঘুম। যতো দেখছে ততই অবাক হচ্ছে মেঘমালা।

মিসেস সেন পাশেই ছিলেন বসে। মেঘমালাকে ডেকে বললেন, এদিকে এসে বসো মা। ডানদিকে শুধু পাহাড় বাঁদিকটা খোলা।

ট্রেন চলছে তো চলছেই। সকাল সাড়ে আটটায় বেরিয়েছিল, কার্সিয়াং পেঁছিতেই বাজলো একটা।

খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে এখানেই।

ছোট লাইন ঘুরে ফিরে চলে গেছে। কোথাও ইংরাজী এস, কোথাও জেড-এর মতো কোথাও বা লুপ অর্থাৎ বৃত্তাকার পথ।

সেই পথ দিয়েই আবার উঠছে মেঘমালা।

মিসেস সেন নেই আজ। মিসেস নটরাজন নেই। বাবা নেই ওপাশে। ভাই প্রীতিময়ও আসেনি সঙ্গে।

এগারোই নভেম্বর কলকাতায় যে ইন্টারভ্যু দিয়েছিল তারই কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে সে দার্জিলিঙে।

৩

মাথায় জলপটি দেওয়া হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো যেন শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে উঠছে। ভিজে ন্যাকড়া একমিনিটের বেশী থাকছে না ভিজে, গায়ে এত জ্বর।

কেশবপুরে ডাক্তার নেই। পাশকরা ডাক্তার আনতে হলে যেতে হবে সেই হরিহরপুরে। কেশবপুরে তৈরী হচ্ছে হেলথ সেণ্টার তাতে একজন ডাক্তারবাবুর আসার কথা শোনা যাচ্ছে।

সেদিন রাতে যেন যমে-মানুষে টানাটানি। হোমিওপ্যাথি কাম এ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস করা নিবারণ ডাক্তার সন্ধ্যে থেকে দু'বার দেখে গেছেন। লোক ছুটেছে হরিহরপুরে পাশকরা ডাক্তারের খোঁজে।

খোদাবক্সের জায়গাজমি আছে ক'বিঘে তা ছাড়া আছে আখের চাষ চরের জমিতে। একটা আখের বন্দে কমসে কম দু'শো মণ আখ চালান যায় তার। চাষ ছাড়াও বাজারে বিড়ি তৈরীর কারখানা করেছে সে। দশ-বারো জন মেয়েপুরুষ রাতদিন সেখানে বসে কাঁচি চালিয়ে পাতা কাটে আর মসলা মুড়িয়ে বিড়ি পাকায়। এক হাজার বিড়ির মজুরী দেড় টাকা।

গাঁয়ের একটেরে যা ক'ঘর মুসলমান নচেৎ এ অঞ্চলে বড় একটা তাদের বসতি নেই। ওদিকে বেলডাঙ্গা, পলাশীর ধারে ধারে প্রচুর মুসলমানের বসতি দেখা যাবে।

কেশবপুরে বর্ধিষ্ণু মুসলমান বলতে আবদুল হোসেনকেই বোঝায় বাজারে ধানভানার কল আছে তার। খোদাবক্সের নাম করা যেতে পারে তারপরেই। অবস্থা তারও মন্দ নয় খুব।

কথায় বলে, নেই ঘরে খাই বেশী। অর্থাৎ যে ঘরে ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশী সেই ঘরেই যেন অভাবও বেশী। বাড়-বাড়ন্ত তাদেরই, যাদের ঘরে মা ষষ্ঠীর কৃপা কম। খেতে লোক যাদের সামান্য।

খোদাবক্সের দুই পরিবার। আমিনা আর আমরুন্নিসা। আমিনার সঙ্গে বিয়ে হোল যখন তখন তার বয়স আঠারো কি বড়জোর উনিশ। সাত-আট বছরের মধ্যেও ছেলেমেয়ে হোল না দেখে খোদাবক্সের আবার বিয়ে দিলেন বাপ-মা। আর আমরুন্নিসা ঘরে আসার এক বছরের মধ্যেই ঘরে এলো পরীর মতো টুকটুকে একটি মেয়ে। সবাই তার নাম রাখলো ফারিদা।

ফারিদারই জ্বর আজ তিনদিন। সোমবার বিকেলে মেয়েটা খেলছিল বসে দাওয়ায় হঠাৎ ঘরে এসে শুলো। মা আমরুন্নিসা কিন্তু আসলে তার মা যেন আমিনাই। বুকে-পিঠে করে রেখেছে সব সময়। চার বছরের মেয়ে জন্ম থেকেই আমিনার কাছে শুয়ে থাকে রাতেও। তারই বুকে গুঁজে থাকে তার মাথাটা। একরাশ কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে পড়ে আমিনার ঘাড়ে, মুখে।

আমরু যেন পটের বিবিটি। রান্না-বান্না, ছেলেমানুষ করা কোনও কিছুতেই নজর নেই। সাজছে রাতদিন, চুল বাঁধছে সারা বিকেল বসে, পান চিবোচ্ছে পড়শীদের সঙ্গে বসেছে গল্পে। আমিনা একাই সামলাচ্ছে সব হাসিমুখে। ফারিদাকে চান করাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে জামা-কাপড় পরাচ্ছে। আমরুও নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত আমিনাও। খোদাবক্স বলে, সুখের সংসার তার।

একমাত্র সন্তান বলতে ফারিদাই আর তারই কিনা এত জ্বর। প্রথম দিন সবাই বললে, হাওয়া লেগেছে। ঝাড়ফুঁক করো, রোজা ডাকাও। সোমবার বিকেলটা ভালো নয় একরত্তি মেয়েকে কেন যেতে দেওয়া বাইরে। দ্বিতীয় দিনে টোটকা ওষুধ, জংলা, জড়ি-বুটি, তাবিজ, পীরের দোয়া। তৃতীয় দিনে কিন্তু জ্বর বাড়লো আরও। নিবারণ ডাক্তারকে জোর করে ডাকলো আমিনাই।

তিনদিন তিনরাত আমিনার চোখে না আছে ঘুম না আছে মুখে খাওয়া। খোদাবক্স কাজের মানুষ, বাইরে বাইরে ঘুরছে সব সময়, মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যাচ্ছে। কখনো খবর আনাচ্ছে লোক দিয়ে। আমরুরও পান সাজার নজর নেই আজ। পাকের ঘরে রান্না-খাওয়ার জোগাড় করে কে? খেত-খামারের কাজ করে দু'তিনজন, তাদের জন্যে ভাত-তরকারী নামাবার কথা মনে নেই কারোর।

হরিহরপুরের পাশকরা ডাক্তার এসে পড়লেন বেলা দশটা নাগাদ। এসেই ইনজেকশন দিলেন একটা। মেয়েটা যেন নেতিয়ে পড়েছে ক্রমেই।

এসেই বকাবকি করতে লাগলেন, সেই যখন আমাকেই ডাকলে তখন আর একদিন আগে খবর পাঠালে না কেন খুদাবক্স ?

আর একদিন আগে খবর পাঠালে কি হোত বলা যায় না কিন্তু এ যাত্রায় ফারিদাকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না।

সকাল দশটা থেকে বেলা দু'টো অবধি একটানা সংগ্রাম তবু শেষ নিঃশ্বাস ফেলে আমিনার কোলে মাথা রেখে চলে গেল ফারিদা। গতকাল বিকেল থেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। বকছিল হরদম। দুপুর বেলায় যেন শোবারের মতো একবার ফিরে এলো জ্ঞানটা। আমিনার দিকে একবার তাকালো বড় বড় ঘোলাটে ধোঁয়া ধোঁয়া চোখে। তারপর বন্ধ হলো চোখ।

একটু একটু করে সরে যেতে লাগলো নাড়ী। প্রথমে কব্জি থেকে কনুইতে পাওয়া যেতে লাগলো স্পন্দন। ডাক্তারবাবু আবার ইনজেকশেন দিলেন। হাতে-পায়ে হ্যারিকেন সেঁকা উত্তাপ দিতে লাগলো আমিনা। কিন্তু শেষে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল একটু একটু করে। নেতিয়ে পড়লো মেয়েটা। মুখটা নীল নীল সাদা সাদা হয়ে আছড়ে পড়লো তার কোলে।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো আমিনা, আমরু। চোখের জল মুছলো খোদাবক্স। আল্লা দয়া করে দিয়েছিলেন অনেকদিন পর আবার তা ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন নিজে।

●

ক্যালেণ্ডারটা ছেঁড়া হয়নি, ভাবছিল মণিময়।

সামনের কাঁচা রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে কোয়ার্টারের বাইরের বারান্দায় বসে। রাস্তাটা জুড়ে কত মানুষের কতো ছাপ পড়ে। মাটির পৃথিবীতে এমনি কত মানুষের কতো আনাগোনা। পদচিহ্নময় পৃথিবীতে শুধু দাগ ফোটে, মেলায়। ভাবছিল মণিময় সে নিজেও তো একটা দাগ। তার ছাপটাও অমনি হাজারো ছাপের ভিড়ে একদিন মিলিয়ে যাবে।

তাহলে বেঁচে থাকা কি একটু একটু করে মরে যাওয়া নয়। শুধুই কি মুছে যাওয়া নয় আরও অনেক অনেক পদচিহ্নের ভিড়ে?

গতকাল সন্ধ্যায় কল্যাণী ডেকেছিল তাকে। বলেছিল, একটা উপকার করবেন মণিময়বাবু। এই ঠিকানায় কলকাতার একটা চিঠি লিখে দেবেন আপনি আমার জবানী করে। কামিনীকে এখনই এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। আমার এক দূর-সম্পর্কের কাকা এই ঠিকানায় থাকেন জানতাম দেখুন না একবার চেষ্টা করে।

কথাটা আর বেশী এগোতে পারেনি পীতাম্বরবাবু এসে পড়ায়।

কি মণিময়বাবু আজকাল যে একটু সকাল-সকালই খিদে পেয়ে যাচ্ছে আপনার। পীতাম্বরবাবুর কথাটায় বোধহয় ব্যঙ্গের স্বর ছিল একটু।

টিফিন কেরিয়ারের বাটিগুলোর মধ্যে

ভাত ডাল তরকারীর সঙ্গে ছিল একটা খালি বাটিতে কল্যাণীর চিঠি। গাঁয়ের মেয়ে সামান্য অক্ষর পরিচয়-মাত্র ঘটেছিল বোধহয় কোনও এক-কালে। তাই দিয়েই সে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছে তার গ্লানিময় ইতিহাস।

ভাবছিল মণিময়, এই কি জীবন? এই কল্যাণী আর কামিনী, ওই পীতাম্বরবাবু আর ত্রিলোচনবাবু, কমলা আর সাধনা, আমিনা আর আমরু, খোদাবক্স আর ফরিদা। গঙ্গাধরবাবু, শৈলেশ্বরবাবু, আবদুল হোসেন সে নিজে যা করছে এই কি বেঁচে থাকা? কেশবপুরই কি ছোটোখাটো একটা পৃথিবীর ছবি?

কাল চিঠি এসেছে বাড়ীর। শ্যামলীর মুখ থেকে রক্ত পড়েছে। ইন্দ্রকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে কোথা-কার কোন মিথ্যে চাকরিটি শোয়ের টিকিট বিক্রি করার অপরাধে। মল্লিনাথ এখনও ঘুরছে। চাকরী হয় নি তার।

মেঘমালার চিঠি আসে না বহুদিন। কে জানে কি হোল তার।

ভাবছিল মণিময়, এই কি বেঁচে থাকা? একেই কি বলে জীবন? এই কি সংসার?

সাধনা বেঁচে আছে, কল্যাণী বেঁচে থাকবে, কামিনীও বাঁচবে। তিন বছর আগের পুরোনো ঠিকানায় এখনও কি আছেন তার দূর-সম্পর্কের কাকা? একশো পাঁচ মাইল দূরের কেশবপুরে আসবেন কি তিনি উদ্ধার করতে বন্দিনী কামিনীকে? শ্যামলী মরছে, চামেলী মরেছে, কমলা মরে গেছে। মারা গেছেন চন্দ্রকান্তবাবু, সেও কি মরছে না তিলে তিলে?

এই তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়াটাই কি জীবন। এই গ্লানিময় দিন ধারণই কি বেঁচে থাকা? মাটির এই পদচিহ্ন-গুলি কি শুধুই রোদনভরা?

●

হিরণ্ময়দাকে নিয়ে থানায় গেছিল চামেলী যদি আজ রাতেই 'বেল' দিয়ে ছাড়িয়ে আনা যায় ইন্দ্রনাথকে। কিন্তু কিছুই হোল না। বড় দারোগাবাবু বললেন, কালকে কোর্টে হাজির না করা অবধি কিছুই করা যাবে না।

ট্যাক্সীতে করেই ফিরছিল দুজনে। আজকেই আবার রয়েছে চামেলীর থিয়েটার রঙমহলে।

ডাক্তার এসে দেখে গেছেন শ্যামলীকে। রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, তোলা হয়েছে এক্সরে। থুথু, কাশি পরীক্ষা হয়েছে একে একে। চারুলতা নিজের সঞ্চিত দু'-একখানি গহনা যা ছিল তা তুলে দিয়েছিলেন মল্লিনাথের হাতে।

বিপদে বুক আগলে নিজের ছেলের মতো কাজ করছেন হিরণ্ময়-বাবু।

সব পরীক্ষার শেষে ডাক্তার রায় দিয়েছেন শ্যামলীর ফুসফুস দু'টো ভরে গেছে যক্ষ্মার জীবাণুতে। এক্সরে প্লেটখানা আলোর সামনে তুলে তিনি দেখিয়েছেন হিরণ্ময়বাবুকে বুকের কোনখানটায় জমা হয়েছে কত'খানি গলদ।

শ্যামলী যেন এখুনি মরে গেছে। বেদানা, আপেল, আঙ্গুর, ঘন করে জ্বাল দেওয়া দুধ, অতি চড়া দামে কালোবাজারে কেনা হরলিকস—সব জমা হয়ে আছে একপাশে। সাজানো রয়েছে ওষুধ, ইনজেকশন, ইনজেকশন দেওয়ার জন্য ডিসটিলড্ ওয়াটার।

জ্বর কমে গেছে ইনজেকশন পড়তে-পড়তেই। দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের আধখানা আজ শ্যামলীর দখলে। তক্ত-পোষের ওপরে নরম বিছানা করা হয়েছে। জানলার ওপর রাখা রজনী-গন্ধা। তার প্রিয় ফুল। রোগীর যত্নের কোনও ত্রুটি নেই।

চামেলী, মল্লিনাথ সবাই জিজ্ঞাসা করছে তার কুশল প্রশ্ন, ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ডাক্তারবাবু বারণ করে গেছেন রোগীর ঘরে কেউ যেন না যায় তাই দরজার কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে সবাই কথা বলছে।

শুধু মা আসছেন অবিরাম। ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, কমলালেবু সরবতী লেবুর রস বানিয়ে সামনে ধরছেন, থার্মোমিটার মুখে দিয়ে জ্বর দেখছেন। চান করানো বারণ তাই গা মুছিয়ে দিচ্ছেন ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে। বিছানার চাদর পালটে দিচ্ছেন রোজ সকালে।

দেওয়ালটার দিকে তাকিয়েছিল শ্যামলী। দেড়খানা ঘরের মধ্যে তফাৎ সৃষ্টি করা দেওয়ালটার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল সে।

জামা-কাপড়, গামছা-তোয়ালে, গ্লাস, চায়ের কাপ, থালা সব তার আলাদা করে দিয়েছে চামেলী। ছোঁয়াচে রোগ, এ রোগের নাকি এমনি নিয়ম। সর্বদা ঘর সাফ করা হচ্ছে জলের সঙ্গে ফিনাইল মিশিয়ে।

দেওয়ালটার দিকে তাকিয়েছিল শ্যামলী। সমস্ত সংসারের সঙ্গে তার একটা একটা বিভেদ তুলে দিয়েছে দেওয়ালটা। হয়তো বা সারা পৃথিবীর সঙ্গেই।

শ্যামলী ভাবছিল, সে মরেছে। শ্যামলী মরে গেছে।

নূর মহম্মদ লেনের বাড়ীতে সারি সারি ফ্ল্যাট ঘর। একতলা আর দোতলায়। বাবাকে মনে পড়ে। তিনি বলতেন, পায়রার খোপ। সব দিনে খাবার খুঁটে আনতে বেরোয়। রাত্রে ঘরে ফিরে খানিক বকম্ বকম্ করে, তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুম।

আশপাশের ফ্ল্যাটের কেউ কেউ আসে বেড়াতে। বলে যায় নানা কথা। সদুপদেশ দেয় কেউ কেউ। বলে, হাসপাতালে দিন দিদি, আজকাল ও রোগ একেবারে ভালো হয়ে যায়। আর এই দেড়খানা ঘরে কোথায়ই বা রাখবেন রুগী, কোথায়ই বা থাকবেন নিজেরা ও হোল রাজরোগ, বুঝলেন, রাজরোগ, রাজকীয় চিকিৎসা চাই ওর।

পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা চেঁচিয়ে পড়ছিল সেদিন শ্যামলী কান পেতে শুনেছে, যক্ষ্মা একটি ব্যাপক সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশে দিনে দিনে এই রোগ বাড়িয়া চলিয়াছে। যক্ষ্মারোগের মূলে রহিয়াছে ইহার জীবাণু। যক্ষ্মা

রোগীর থুথু ও কফের মধ্যে অসংখ্য যক্ষ্মাজীবাণু থাকে। যক্ষ্মারোগী যখন হাঁচে বা কাশে তখন সেই হাঁচি এবং কাশির সঙ্গে অনেক যক্ষ্মা- জীবাণু ধাবিত হয় ও বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে।

মা, মা চেঁচিয়ে মাকে ডেকেছিল শ্যামলী।

মা তাড়াতাড়ি এসে ঢুকলেন ঘরে।

ওদিকের জানলাটা বন্ধ করে দাও। এরা সবাই চারদিক থেকে বলছে মা আমি মরে গেছি। সত্যি মা আমি কি মরে গেছি নাকি?

বালাই ষাট; কি যা-তা বলছিস।

শ্যামলী জানে সে মরে গেছে। এ পৃথিবীতে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন এ পৃথিবীতে তার আর কোনও দাবীই নেই। এ পৃথিবীর আলো-বাতাস আর এখন সে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারবে না।

তার নিঃশ্বাস এখন বিষাক্ত হয়ে গেছে। সে মরে গেছে।

●

ট্যাক্সীতেই কথাটা বললেন হিরণ্ময়বাবু, তোমার আজকের থিয়েটার তো গোটা দশেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে চামেলী, তাই না।

তা বলা যায় না। অফিসের থিয়েটার। বড় সাহেবদের বক্তৃতা একঘণ্টায় শেষ হলে হয়।

বড়জোর এগারোটা। তার বেশী নিশ্চয়ই নয়।

তারপর।

আমার ওখানে খেয়ে যেতে হবে আজ।

আজই।

বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার ক্রটি হচ্ছে তোমার। তোমার মা তো শ্যামলীকে নিয়েই ব্যস্ত। তাতে আবার ইন্দ্র নেই। খাওয়াটা আমার ওখানেই সেরে যাও।

সত্যি বলছি আপনাকে, খাওয়ার খুব ইচ্ছে নেই আমার।

ইচ্ছে কারই বা থাকে যে সব বিপদ তোমার মাথায়। [ক্রমশ।

মুখোস

রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

মুখোস এ‍ঁটেছি মুখেঃ তবু চোখে ঘাসেরা সবুজ.
ধানের সোনালি শীষ রোদে মাখামাখি, আর স্বপ্নেরা অবুঝ।
মানুষ ঠকানো পেশা। পাটের দালালি
কিংবা ঠিকেদারী করি—ফালি ফালি
কুমড়ো সাজিয়ে এই জীবনের হাটে
খিল আঁটি বাঁচবার নিশ্চিন্ত কবাটে।
আমার মুখোসে এক আদিম জন্তুর ধূর্ত মুখ
এ‍ঁটে বসে থাকি ভিড়ে, তবুও উৎসুক
হাজার ক্রেতার চোখ খুঁজে নেয় ধূর্ত আমাকেই
মাঝে মাঝে ভাবি, এই মুখোসের নিচে বুঝি নেই
আর একটা মানুষের মুখের আদল—
বুঝিবা ফতুর আমি, মেকী জীব—সমস্ত নকল।
হয়তো বা আশাতুর প্রেয়সী আমার
মুখোসের ভূত দেখে পালিয়েছে, প্রেমের খামার
রোদে ফাটা বালুচর, বেহালার ভাঙাচোরা খোল
বুঝি আমি—ফেরারী এ-হৃদয়ের বোল।
অথচ হঠাৎ হাওয়া দু-চোখের ফুটো দিয়ে ঢোকে
কবাটের খিল ভাঙে, কে তারে তখন বলো রোখে।
পাটের গুদাম আর ইঁট-লোহা-পাথরের গাদা,
দালালি ও ঠিকেদারী মুখোসের প্রাণপণ বাধা
ভেঙেচুরে হলুদ ধানের আর সবুজ ঘাসের গলাগলি—
হৈমন্তী রোদের তোড়ে বিধ্বস্ত এ-জীবনের ধূর্ত চোরাগলি।
সেখানে অনেক ফুল ফুটে ওঠে, প্রেমের খামার
নতুন মেজাজে বুঁদ; প্রেয়সী আমার
হঠাৎ পেছন থেকে গালে মারে চড়ঃ
মুখোস ফাঁসির শব—মুখোস তেমনি নিরুত্তর।

প্রায়ে কেঁপে ওঠে চোখের পাতা-দুটো, মুদিত নেত্রের আবরণের পাতলা মসৃণ চামড়ায় সংকোচন দেখা দেয় একটু। একবার—দু'বার— অনেক-বার। সেই সঙ্গে পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট-দুটোর মাঝেও দেখা দেয় এক চিলতে ফাঁক।

ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সেই চোখের পাতার কম্পন। বড় হতে থাকে ঠোঁটের সেই ফাঁকটুকুও। ভেতরের পানের ছোপ্ লাগানো কালচে দাঁতগুলো এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অবশেষে এক সময় চোখ মেলে তাকায় অনন্তচরণ। ভাবলেশহীন একজোড়া ঘোলাটে চোখ। কালো মণি দু'টো ফ্যাকাশে। পাশের সাদা অংশের সঙ্গে তাদের সেই কালো সীমারেখা কেমন অস্পষ্ট যেন। মিলে-মিশে কেমন যেন সব একাকার হয়ে উঠেছে।

স্থির চোখে তাকিয়েই থাকে অনন্তচরণ—কোথায় কোনদিকে তা' সে নিজেও জানে না। সেই তাকিয়ে থাকার মধ্যে তার মনের কোন সম্পর্ক আছে কি না তাও তার অজ্ঞাত। কেবল শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পলক-হীন চোখে মৃত ব্যক্তির শীতল দৃষ্টি।

এতক্ষণে অনন্তচরণ মুখে একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ উচ্চারণ করে। মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে কি যেন বলে ওঠে বিড়-বিড় করে। মাথাটা কাত করতে চেষ্টা করে একটু। তারপর আবার স্থির হয়ে থাকে।

সাদা পোষাকে আবৃত একটি নার্স এগিয়ে আসে সামনে। হাতে তার ফিডিং বটল্।

খানিকটা গরম দুধ পেটে পড়তেই একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে অনন্তচরণ এতক্ষণের ভাবলেশহীন মুখে এবার ফুটে ওঠে যন্ত্রণার চিহ্ন। নিদারুণ যন্ত্রণা।

মাথাটা যেন প্রচণ্ড ভারী ঠেকছে। তবুও দেহের সমস্ত শক্তিটুকু একত্রিত করে অন্যপাশে ঘাড় ফিরায় অনন্ত-চরণ। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন ব্যক্তি—একজন ডাক্তার আর অন্যজন খড়াচূড়ো পরা পুলিশ অফিসার।

নটরাজন

ডাক্তারের মাথায় প্রশস্ত টাক্। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। গম্ভীর ভারিক্কি চেহারা।

অনন্তচরণের নাড়ীর গতি পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার একবার তাকায় পুলিশ অফিসারটির দিকে। ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করে কিছু। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসারটি দু'পা এগিয়ে আসে সামনে। একেবারে ঝুঁকে পড়ে অনন্ত-চরণের মুখের উপর। তারপর মৃদু অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে প্রশ্ন করে, কী হয়েছিল অনন্তচরণ?

নিজের নামটা কানে যেতেই অনন্তচরণের আধবোজা ঘোলাটে চোখ দু'টো বড় হয়ে ওঠে একটু। অক্ষিগোলক দু'টো এপাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে কিসের খোঁজ করতে থাকে যেন।

পুলিশ অফিসারটি পুনরাবৃত্তি করে, কী হয়েছিল অনন্তচরণ? কেন এমন হল?

অকস্মাৎ অনন্তচরণের চোখে-মুখে জেগে ওঠে একটা সাংঘাতিক ভীতির চিহ্ন। একটু একটু করে সব কথা মনে পড়তেই আবার দারুণ ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে সে। হঠাৎ আতঙ্কে থরথর করে সারা দেহটা কেঁপে ওঠে তার। ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে, সিংহ—সিংহ!

সিংহ! কী বলছ তুমি, অনন্তচরণ? বিস্ময় ফুটে ওঠে পুলিশ অফিসারটির কণ্ঠে।

প্রবলবেগে মাথা আন্দোলিত করে বলতে থাকে অনন্তচরণ, হ্যাঁ—হ্যাঁ সিংহ। একটা নয়—দু'টো নয়—তিন, তিনটে সিংহ একসাথে আক্রমণ করেছিল আমাকে সেই খাঁচার মধ্যে।

খাঁচার মধ্যে! সেকি? কোথায় খাঁচা?

উত্তেজনায় তখন হাঁপাচ্ছে অনন্ত-চরণ। বলতে থাকে যে, আজ্ঞে বিশ্বাস করুন আমার কথা। তিনটে সিংহ আক্রমণ করেছিল আমাকে। তাই তো নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে আমি——।

কথাটা শেষ করার আগেই আবার চোখ দু'টো বন্ধ হয়ে আসে তার, কণ্ঠস্বরও থেমে যায়।

শঙ্কিত হয়ে ওঠে পুলিশ অফিসারটি। পরপারে চলে গেল নাকি লোকটা? আসল খবরের কিছুই যে জানা হয় নি এখনও। রহস্য যে রহস্যই থেকে গেল, ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকায় পুলিশ অফিসারটি। বললে, মরে গেল নাকি? একটা বিষণ্ণ হাসি জেগে ওঠে ডাক্তারের ঠোঁটের কোণে জবাব দেয় সে, না, এখনও বেঁচে আছে। তবে সময় হয়ে এসেছে। আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু লোকটা কী সব বললে।

সিংহ—খাঁচা! কী সব আবোল তাবোল বললে!

ওটা ডিলিরিয়াম্। এমন অবস্থায় ও রকম ডিলিরিয়াম্ হয়।

কিন্তু ডিলিরিয়ামের মধ্যে সিংহ, খাঁচা---এসব এল কী করে?

ডিলিরিয়ামের মধ্যে মানুষ অনেক কিছুই আবোল-তাবোল বলে থাকে। ওর মধ্যে অর্থ খুঁজতে গেলে হয়রানি হতে হয়।

ডিলিরিয়ামই বটে। নইলে খাস্ কলকাতা সহরের বুকে অতবড় বিরাট অফিসের তিনতলায় খাঁচাই বা এল কোথা থেকে, আর সেই খাঁচার মধ্যে তিন-তিনটে সিংহ একসাথে অনন্ত-চরণকে আক্রমণ করলই বা কী করে?

কিন্তু, আক্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল কি অনন্তচরণ? না, দেয় নি। হোক্ তারা পশুরাজ সিংহ। তাই বলে, অত সহজে সে কেন আত্মসমর্পণ করবে তাদের কাছে? ডাক্তার বলে—ডিলিরিয়াম্। কিন্তু আর কেউ না জানলেও অনন্তচরণ নিজে তো জানে ওসব ডিলিরিয়াম্ ফিলিরিয়াম্ কিছু নয়। খাঁটি সত্যি ঘটনা। পশুবলে বলীয়ান সেই সিংহ তিনটিকে ঠেকাতে ওদের চাইতে শত সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ একটা শক্তির শরণাপন্ন হতে হয়েছিল তাকে। প্রচণ্ড তার তেজ, অপ্রতিহত তার গতি, দুর্দান্ত তার ক্রোধ। সেই শক্তি গ্রাহ্য করেন না কাউকে। আপন-পর বাছ-বিচার নেই তার কাছে। ক্ষমা করতেও জানে না। সে ভয়ঙ্কর দুরন্ত, দুর্মদ। তাকে ভয় করে না এমন জীব এই পৃথিবীতে নেই। সুরাসুর যক্ষ রক্ষ তার ভয়ে সর্বদা প্রকম্পিত। সামান্য পশু তো কোন্ ছাড়। শেষ পর্যন্ত রক্ষকই ভক্ষক হয়ে দাঁড়াল। সেই দানব-শক্তি উদরস্থ করলে সেই তিন সিংহকে। তারপর খোদ্ অনন্তচরণকেই করলে আক্রমণ। নিজের তপ্ত আলিঙ্গনে বেহুঁস করে ফেললে তাকে। হত্যার নেশায় সে তখন উন্মত্ত। উদর পূর্তির লোভে সে তখন বেপরোয়া।

হাসপাতালের শয্যায় জ্ঞান ফিরে এলেও নিজের অবস্থাটা বোধ হয় তখনও ঠিক উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি অনন্তচরণ। সেই দানব-শক্তির আক্রমণের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে, কেবল মুখখানাই রয়ে গিয়েছিল অক্ষত। বুক থেকে আরম্ভ করে পা পর্যন্ত গোটা দেহে তার সেই আক্রমণের চিহ্ন।

হাসপাতালের ডাক্তার বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল অনন্তচরণের আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনাই আর নেই। তাই চিরতরে তার মুখ বন্ধ হবার আগেই সন্দিগ্ধ পুলিশ অফিসারটিকে অনুমতি দিয়েছিল তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে। আপাতদৃষ্টিতে যত সাধারণ বলেই মনে হোক না কেন, পশ্চাতে কোন গভীর চক্রান্ত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এটাকে সেফ একটা এ্যাক্সিডেণ্ট বলে ধরে নিতে পুলিশের তরফে যথেষ্টই আপত্তি ছিল। তাই, সেই মুমূর্ষু অনন্তচরণকে প্রশ্ন করে আসল খবরটা জেনে নিতে হাসপাতালে সেই পুলিশ অফিসারের আগমন।

কিন্তু কিছুই হল না। কিছুই বললে না অনন্তচরণ। কেবল ডিলিরিয়ামের ঘোরে আবোল-তাবোল কিছু বলে গেল। কোথাকার কোন্ সিংহের খাঁচায় নাকি তিনটে সিংহ একযোগে আক্রমণ করেছিল তাকে। যত সব আজগুবী কল্পনা। বিরক্ত ভঙ্গিতেই অনন্তচরণের শয্যার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল পুলিশ অফিসারটি। জ্ঞানহারা অনন্তচরণ বোধ হয় তখনও স্বপ্নের মধ্যে সেই সিংহ তিনটির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। তাই, থেকে থেকে তার অসাড় মুখের উপর পড়ছে আতঙ্কের ছায়া, কখনও বা দৃঢ়তার ভঙ্গি।

নামেই কেবল সরকারী চাকুরী। আসলে, এক যক্ষ-পুরীর এক নগণ্য ভৃত্য এই অনন্তচরণ।

হ্যাঁ, যক্ষ-পুরীই বটে। তবে সেকালের সেই যক্ষ-পুরী থেকে অনেক তফাৎ। সেকালের যক্ষ-পুরীতে ধন-রত্নের আগমনের পথটাই খোলা থাকত। নির্গমনের পথ ছিল বন্ধ, যক্ষ-পুরীর ধন খরচের অধিকার ছিল না কারুর, জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠত সেই ধনরত্নরাশি।

কিন্তু একালের যক্ষ-পুরীর চেহারাটাই আলাদা। নিয়ম-কানুনও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই পুরীতে খোদ্ যক্ষ বলে কেউ নেই। আছে কেবল তার একজন প্রতিনিধি। তাকেই ঘোষ সাহেব বলে জানে অনন্তচরণ। নব্যযুগের এই যক্ষপুরীর দায়িত্ব এই ঘোষ সাহেবের উপর।

আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নির্গমনের পথও খোলা এখানে। সেই পাহাড়-প্রমাণ ধনরাশি প্রতিদিন বিলি-বণ্টন হয় এখান থেকে। মধুচক্রের মৌমাছির মত প্রতিদিন কাতারে কাতারে লোক এসে ভীড় করে দাঁড়ায় মধুর আশায়।

এখানকার একজন কর্মচারী এই অনন্তচরণ। বহুকালের পুরোণ চাকরী। সে-যুগে ঢুকেছিল মাসিক পনের টাকা মাইনেতে। তারপর অনেককাল কেটে গেছে। অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের দেড় মণ চালের দাম এখন এক কিলোতে এসে ঠেকেছে। সে যুগের মাসিক পনের টাকা বেতন বেড়ে বেড়ে এসে ঠেকেছে একশ' পঁয়ত্রিশ টাকায়। কিন্তু নামেই কেবল একশ পঁয়ত্রিশ টাকা। আসলে মাস গেলে হাতে পায় মাত্র নব্বই টাকা। বাকিটা প্রভিডেণ্ট ফণ্ড এবং অন্যান্য ফণ্ডের দেনা শোধ দিতেই কাটা যায়। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। মাত্র নব্বইটি টাকায় সাত-আটজনের একটা গোটা পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র অর্থ হচ্ছে—অনাহার কিম্বা অর্ধাহার, অনন্তচরণের পরিবারের তাই অবস্থা। কিন্তু নিয়ম বদলের হুকুম নেই। সরকারী চাকরী—সরকারী আইন-কানুন। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা এখানে গৌণ ব্যাপার। নিয়ম-কানুনটাই হচ্ছে মুখ্য। সংসার তোমার চলুক বা না চলুক, নিয়মের হেরফের হবার উপায়

নেই। প্রয়োজনে ধার নিয়ে, এবার শোধ করতে হবে তোমাকে। তুমি অনাহারেই থাক কিম্বা অর্ধাহারেই থাক, নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে না তোমার ক্ষেত্রে।

ধার করেছিল অনন্তচরণ। বিপদে পড়েই ধার করতে হয়েছিল, মেয়ের বাপ হওয়ার চাইতে জন্ম-জন্ম নিঃসন্তান থাকা যেন অনেক ভাল। খাইয়ে পরিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে বড় করে তুলতে হবে। তারপর করতে হবে বিয়ের ব্যবস্থা। চেষ্টা তদ্বির হাঁটাহাঁটি সাধাসাধির এক শেষ। অবশেষে গায়ের রক্ত জল করা টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ। ধার করে, কর্জ করে একদিন সেই মেয়েকে তুলে দিতে হবে অন্যের হাতে।

অনন্তচরণও তাই করেছিল। প্রথম কন্যা। মায়ের চাইতে বাপের একটু বেশি আদরের। পাঁচ-ছ'টি সন্তান নিয়ে কলকাতার মত সহরে বাস করা চাট্টিখানি কথা নয়। মাইনে তো মাত্র ঐ একশ' পঁয়ত্রিশ। বস্তিতে বাস করেও কুড়ি টাকা দিতে হয় ঘর-ভাড়া। বাকি একশ' পনের টাকা সাত আটজন লোকের এই বাজারে খাওয়া-পরা। সে তো এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই অনাহার, অর্ধাহার ছাড়া উপায়ই বা কী। তার উপর অসুখ-বিসুখ তো লেগেই আছে।

তবুও ভবিষ্যতের ভাবনা শিকেয় তুলে রেখে প্রথম মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থায় কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিল অনন্ত-চরণ। সম্ভাব্য সকল জায়গা থেকেই ধার করতে হয়েছিল তাকে। মনের কোণে অবশ্য একটু আশা ছিল। বড় ছেলেটা সবে একটা ফ্যাক্টরীতে ঢুকেছে। এখন অবশ্য হাত খরচ বাবদ সামান্য কিছু পায়। ভবিষ্যতে কাজ শিখতে পারলে হপ্তায় পনের বিশ টাকা পাবে।

চেষ্টার ত্রুটি করে নি অনন্তচরণ। কিন্তু ভবিতব্য এড়াবে কেমন করে? একে তো টাকা-পয়সার জোর নেই। তায় আবার পার্বতী তেমন সুশ্রী নয়।

অবশেষে অনন্তচরণ বর্ধমানে পার্বতীর বিয়ে ঠিক করলে। ছেলেটি দেখতে শুনতে তেমন খারাপ নয়। কিন্তু বয়সটা একটু বেশি। তা' আর কী করা যাবে। পুরুষের আবার বয়স। অত বিচার করতে গেলে তার মত লোকের মেয়ের তো বিয়েই হবে না।

ছেলেটিকে কিন্তু ভালই লেগেছিল অনন্তচরণের। অতি শান্ত প্রকৃতির। মুখচোরা লাজুক গোছের। বর্ধমান সহরেই একটা বড় স্টেশনারী দোকান আছে তার। অবস্থা বেশ সচ্ছল বলেই মনে হয়েছিল অনন্তচরণের।

কিন্তু একটা বিষয়ে খুঁতখুঁত করছিল অনন্তচরণের মনটা। তিন কুলে কেউ নেই তার। কিন্তু অনন্তচরণের স্ত্রী বলেছিল অন্যকথা। বলেছিল, নেই তো কী হল তাতে? একদিক থেকে তো ভালই। বেশ নির্ঝঞ্ঝাট। দু'টিতে থাকবে বেশ নিরিবিলি। ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হবে না। তবে পাত্রর ঐ বয়সটা নিয়েই যা একটু খুঁতখুঁতি ছিল অনন্তচরণের স্ত্রীর।

অবশেষে ঐ নিরঞ্জনের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল পার্বতীর। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অনন্তচরণ। যাক্ ভালই হল। খেয়ে পরে থাকতে অসুবিধা হবে না মেয়েটার।

নিরঞ্জনের তিনকুলে কেউ না থাকলেও তার বন্ধুভাগ্য যে খুবই ভাল, এ কথা স্বয়ং অনন্তচরণও বিশ্বাস না করে পারে নি। বিশেষ করে বর-পক্ষের ঐ কর্তা সত্যনারায়ণ ভদ্র-লোকটি।

নিরঞ্জনের চাইতে বয়সে কিছু বড়ই হবে সত্যনারায়ণ। দেখেশুনে বেশ পয়সাওয়ালা বলেই মনে হয়। কিন্তু কী অমায়িক ব্যবহার। কী সুন্দর কথাবার্তা। লোকটির চালচলনে ওকে নিরঞ্জনের বড় ভাই বলেই মনে হয় যেন।

বিয়ের পরের দিন পার্বতীকে নিয়ে চলে যাওয়ার সময় সত্যনারায়ণ অনন্তচরণকে একান্তে ডেকে বলেছিল, আপনার কোন চিন্তা নেই, বেয়াইমশাই। নিরঞ্জন আমার ছেলেবেলার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। আমার বাড়িও ওর বাড়ির কাছেই। কোন কষ্ট হবে না আপনার মেয়ের। আমরা আছি।

সত্যনারায়ণের কথায় মনে খুব ভরসা পেয়েছিল অনন্তচরণ। সজল চোখে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে-ছিল সত্যনারায়ণের মুখের পানে।

বিয়ের পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল, সত্যনারায়ণ সেদিন মিথ্যে বলে নি। সত্যিই তারা আছে। অন্ততপক্ষে সত্যনারায়ণ নিজে তো আছেই। কিন্তু বড় বেশি পরিমাণে আছে। এতটা না থাকলেই ভাল হত।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই পার্বতী টের পেল, নিরঞ্জনের মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির অন্তরালে কেমন যেন একটা মেয়েলিপনা লুকিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, মাস দু'য়েক যেতে না-যেতেই সে নিঃসন্দেহ হল তার স্বামী কেবল নামেই পুরুষ। আসলে সে পৌরুষহীন একটা জড়পদার্থ বিশেষ। কোন ক্ষমতাই নেই তার।

নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় ছিল না পার্বতীর। কথাটা সে নিজের মা-বাপের কাছেও সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। কী লাভ তাদের বলে? মনে মনে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে তারা?

ধীরে ধীরে পার্বতী আরও অনেক-কিছু জানতে পারলে। জানতে পারলে যে স্টেশনারী দোকানখানার আসল মালিক তার স্বামী নয়। সে কেবলমাত্র একজন কর্মচারী। মালিক হচ্ছে স্বয়ং সত্যনারায়ণ। অবশ্য সত্যনারায়ণ যে নিরঞ্জনের ছেলেবেলার বন্ধু সেটা মিথ্যে নয়।

কিন্তু তখনও এদের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে উঠতে পারে নি পার্বতী। কী এদের অভিপ্রায়? নিরঞ্জনের মত একটা পৌরুষহীন অপদার্থ ব্যক্তি কেন তার জীবনটা

এমনিভাবে নষ্ট করলে? কী তার উদ্দেশ্য?

অবশেষে একদিন শীতের রাতে দোকান বন্ধ করে নিরঞ্জন যখন সত্যনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এল, সেদিন কেন যেন ভয়ে দুর-দুর করে উঠেছিল পার্বতীর বুকটা।

সত্যনারায়ণ অবশ্য এর আগে অনেকদিন এই বাড়িতে এসেছে। দিনে এসেছে, রাতে এসেছে। নিরঞ্জনের সঙ্গে এসেছে। তাকে ছাড়া একাও এসেছে। পার্বতীর সঙ্গে মুখোমুখি হলেই কেমন যেন একটা বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলতে চেষ্টা করেছে তার সঙ্গে। পার্বতী ভয় পেয়েছে, বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু চিরকালের শান্ত প্রকৃতির পার্বতী মুখফুটে কোন কড়া কথা বলতে পারে নি তাকে। শত হলেও সত্যনারায়ণ তাদের অন্নদাতা। বলতে গেলে এই লোকটার দয়াতেই বেঁচে আছে তারা।

দু'খানি মাত্র ঘর। একখানা ঘরে বসেছিল সত্যনারায়ণ। অন্য ঘরে নিরঞ্জনকে খেতে দিয়ে পাশে ম্লানমুখে চুপটি করে বসেছিল পার্বতী।

খেতে খেতে নিরঞ্জন একসময় মুখ তুলে বললে, আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

ভয়ে চমকে ওঠে পার্বতী। বললে, কোথায়?

কলকাতায়। এই লাস্ট লোকালে আমাকে মালপত্র কিনতে যেতে হবে। কাল একবেলা বন্ধ থাকবে দোকান। দুপুর নাগাদ চলে আসবো আমি।

সে কি? আমি একা থাকবো?

একা থাকবে কেন? নির্লজ্জের ভঙ্গিতে হি-হি করে হাসতে হাসতে জবাব দেয় নিরঞ্জন, সেই জন্যেই তো সত্যনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ও থাকবে রাতে।

কিন্তু—না, না, তা' হবে না। ঐ লোকটাকে বড় ভয় করে আমার।

আবার হি-হি শব্দে হেসে ওঠে নিরঞ্জন, আরে ভয়ের কী আছে? ও কি বাঘ না ভালুক?

কিন্তু তাই বলে একটা বাইরের লোকের সঙ্গে একা—

কথাটা আর শেষ করতে পারে না পার্বতী। মুখ নীচু করে থাকে।

খাওয়া শেষে ঢক্‌ঢক্‌ করে এক-গ্লাশ জলপান করে নিরঞ্জন। তারপর আসন ছেড়ে উঠবার আগে পার্বতীর কাছে একটু সরে এসে নীচু কণ্ঠে এমন একটা কথা উচ্চারণ করে যা' নাকি কোনদিন কোন স্বামী তার বিবাহিতা স্ত্রীর সামনে উচ্চারণ করতে পারে বলে ধারণা করতে পারে নি পার্বতী। নিরঞ্জন বললে, ও আমাদের মনিব। ওকে সন্তুষ্ট রেখো। তোমাকে আমি যা দিতে পারি নি ও তোমাকে তাই দিতে পারবে।

চলতে চলতে সামনে হঠাৎ ভয়ঙ্কর বিষাক্ত উদ্যতফণা কেউটে দেখলে মানুষ যেমন সাংঘাতিক চমকে ওঠে

ঠিক্ তেমনিভাবে চম্‌কে ওঠে পার্বতী। মনটা রি-রি করে ওঠে ঘৃণায়। সামনে বসে থাকা স্বামীরূপী ঐ নপুংসক লোকটার দিকে তাকাতেও ঘৃণা হয়। বনের সামান্য পশু পর্যন্ত নিজের সঙ্গিনীকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। আর নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে কিসের উস্কানি দিচ্ছে এই বর্বর লোকটা?

নিরঞ্জনের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আবার চোখ নীচু করে পার্বতী। এই নরপশুটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতেও ঘৃণা হয় তার।

পার্বতীর এই মৌনতায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে নিরঞ্জন। বললে, মনিবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আখেরে অনেক লাভ আমাদের। একদিন সত্যনারায়ণ দোকানটার সমস্ত স্বত্বই দিয়ে দেবে আমাকে। কম্‌সে কম্, দশ-বারো হাজার টাকা দাম হবে দোকানটার—

পাষাণ মূর্তির মত চুপ্ করে তেমনি ভাবেই বসে থাকে পার্বতী। যেন শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতেও সে ভুলে গেছে।

গায়ের জামার উপর আলোয়ানটা ভালমত চাপিয়ে নেয় নিরঞ্জন। তার পর আবার পার্বতীর পাশে সরে এসে নীচুকণ্ঠে বললে, কী এত ভাবছ? এতে চিন্তার কী আছে? তোমাদের ওসব সতীত্ব-ফতিত্ব ছাড়ো। ওতে আর আজকাল পেট ভরে না। দুনিয়ায় এখন টাকাই সব। টাকা না থাকলে সবকিছুই ফাঁকা। আর, তা' ছাড়া লোকটা তো কিছু বাঘ-ভালুক নয় যে তোমাকে খেয়ে ফেলবে। এই একটু ইয়ে---মানে, একটু ভালমত আলাপ-সালাপ করতে চাইবে তোমার সঙ্গে। তাতে এমন ক্ষতিটা কি, শুনি? তোমার গায়ে তো কিছু লেখা থাকবে না। তা' ছাড়া ভবিষ্যতে তোমার কোন বিপদেরও সম্ভাবনা নেই। সত্যনারায়ণ হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করিয়ে এসেছে। চেষ্টা করলেও আর কোনদিন বাপ হতে পারবে না।

পার্বতীকে নিরুত্তর দেখে একটু বিরক্ত ভঙ্গিতেই পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে নিরঞ্জন। তারপর সত্যনারায়ণের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে চোখের একটা বিশেষ ইঙ্গিত করে বেরিয়ে যায় বাইরে।

সেই রাতটা যে পার্বতীর কী করে কেটে গেল তা' সে নিজেও ভালমত বুঝতে পারলে না। একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটে গেল ঠিক্ সিনেমার পর্দায় ছবির মত। পার্বতী যেন শুধু দর্শক। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না তার। বাধা দেওয়ার সামর্থ্যও যেন হারিয়ে ফেলেছিল।

সেই আচ্ছন্নতার ঘোর তার কেটে গেল পরের দিন সকালে। ততক্ষণে সত্যনারায়ণ বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে চলে গেছে। পার্বতী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে গোটা রাতভোর সেই লম্পট লোকটা তার সব কিছু লুটেপুটে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে রেখে গেছে।

শুধু সেই একটা রাতই নয়, তারপরও অনেক রাত পার্বতীকে কাটাতে হয়েছে সত্যনারায়ণের সান্নিধ্যে---একই শয্যায় একান্তভাবে। অনুরোধ-উপরোধেও ফল হয় নি কিছু। তার স্বামী নামক সেই জীবটি যা-তা গালাগাল দিয়েছে তাকে। আর সত্যনারায়ণের উদ্দাম আবেগ আরও বেড়ে উঠেছে কেবল। এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে নিরঞ্জন কেন বিয়ে করেছিল তাকে---তার প্রয়োজন ছিল কেবলমাত্র একটি স্ত্রীর, আর তার ঐ লম্পট বন্ধুটা চেয়েছিল তার দেহটা।

অবশেষে কলকাতায় পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছে পার্বতীর। আত্মহননে বড় ভয় তার, তাই মরতে পারে নি। কিন্তু একা যাবে কেমন করে? জীবনে কোনদিন একা পথেঘাটে বেরোয় নি। কলকাতায় নিজেদের সেই বস্তি বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারবে কেন একা একা?

কিন্তু সত্যিই একদিন পেরেছিল পার্বতী। বাপ অনন্তচরণ বাড়ি ছিল না। ছিল অফিসে। তাকে ঐ অবস্থায় একা দেখে চম্‌কে উঠেছিল তার মা। কান্নায় ভেঙে পড়ে একে একে সব কথা মাকে বলেছিল পার্বতী।

স্ত্রীর মুখে মেয়ের কথা শুনে খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে অন্ধকারে বাইরে তাকিয়েছিল অনন্তচরণ, মেয়ের অদৃষ্টের চাইতে নিজের অদৃষ্টকেই সেদিন ধিক্কার দিয়েছিল বেশি। তার নিজের পাপেই পার্বতীর এমন দশা। তার একমাত্র পাপ সে দরিদ্র। টাকা-পয়সার জোর থাকলে এর চাইতে ভালো ঘরে সে বিয়ে দিতে পারতো তাকে।

অল্পশিক্ষিত দরিদ্র অনন্তচরণ হয়ত জানত না, অদৃষ্ট মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। টাকা-পয়সা খরচ করে তার হাত এড়ানো চলে না।

পার্বতী কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারে নি বাপের বাড়িতে। অনন্তচরণের আর্থিক অবস্থাই তাকে থাকতে দেয় নি সেখানে। মুখফুটে কেউ কিছু না বললেও বৃদ্ধ অসমর্থ বাপের ঘাড়ের বোঝা আর বাড়াতে চায় নি পার্বতী। তাই একদিন যেমনি হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল বর্ধমানে নিরঞ্জনের কাছে। মনে মনে হয়ত ভেবেছিল---পতিরূপী ঐ জানোয়ারটারই ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক্

বিপদ কখনও একা আসে না। পার্বতীর চিন্তায় বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল অনন্তচরণের। এমনি দিনে তার সেই বড় ছেলেটা দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ নিয়ে এসে শয্যা নিলে বাড়িতে। চাকরী গেল। সেই সঙ্গে সংসারের সেই বাড়তি আয়টুকুও গেল বন্ধ হয়ে।

চোখে অন্ধকার দেখে অনন্তচরণ। সকাল হলেই সংসারের এতগুলো লোকের মুখের অন্ন যোগাতে হয়। কিন্তু সম্বল মাত্র মাস গেলে ঐ নব্বইটি টাকা। বাড়িভাড়া কুড়ি টাকা বাদ দিয়ে থাকে সত্তর। তাতে কেঁদে-কঁকিয়ে কোনমতে দিনপনের চলে। তারপরই সব অন্ধকার। ইতিমধ্যে মেজ ছেলেটাকে পড়া ছাড়িয়েছে অনন্তচরণ। পড়াশোনায় ভালই ছিল ছেলেটা। কিন্তু যাদের খাবার সংস্থান কিছু নেই এদের আবার পড়াশোনা।

রাজ্যের বখাটে ছেলের দলে মিশে পাকা পকেটমার হয়ে উঠল মেজ ছেলেটা। অবশেষে একদিন ধরা পড়ে মার খেয়ে আধমরা হয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হল জেলখানায়।

একটার পর একটা আঘাতে মনটা যেন কেমন পাথর হয়ে গেছে অনন্তচরণের। বড় মেয়েটা ব্যভিচারিণী হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে অপদার্থ স্বামীর প্ররোচনায়। বড় ছেলে যক্ষ্মায় আক্রান্ত। মেজ ছেলেটা পকেট মারতে গিয়ে জেলখানায়।

এর মধ্যে আবার মেজ মেয়েটার চালচলনও যেন কেমন হয়ে উঠেছে। বয়স তো কম হল না। এই ষোলয় পা' দিল। এমনিতেই একটু চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। তায় আবার বলাকওয়ার কেউ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মা সংসার আর রুগ্ন ছেলে নিয়েই ব্যস্ত। বাপ বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার পর। কাজেই ঐ চঞ্চলা মেজ মেয়েটি দিব্বি একদল স্তাবক গড়ে তুলল পাড়ায়। মধুর লোভে এই নবোদ্ভিন্ন কিশোরীর চারপাশে ঘুরঘুর করে বেড়ায় তারা সুযোগের অপেক্ষায়। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। তাদের কথাবার্তায়, হাসিঠাট্টায় প্রকৃত সময়ের আগেই কিশোরী পদার্পণ করে যৌবনে। বিষাক্ত লালসার আবেষ্টনীতে নিজেও হয়ে ওঠে লালসাবতী। চোখে জেগে ওঠে মদির-কটাক্ষ। সেই কটাক্ষ-বাণে বিদ্ধ হয়ে বাস্তর সেই বখাটে ছেলেদের মধ্যে কেউ চায় তার পায়ে জীবন বিসর্জন দিতে, কেউ চায় তাকে বিয়ে করতে, আবার কেউ বা তাকে সিনেমা-থিয়েটারে নামিয়ে রাতারাতি স্টার বানিয়ে দিতে চায়। আসলে কিন্তু সবারই লক্ষ্য এক—লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করা। মেয়েটা কিন্তু চঞ্চল হলেও বুদ্ধিমতী। এখন পর্যন্তও কেউ কায়দা করতে পারেনি তাকে। ভাল জামা-কাপড়ের অভাবে মায়ের পুরোন দিনের সেকেলে শাড়ি আর হাতকাটা আধুনিক জামা পরে তাদের খেলিয়ে বেড়ায় সে। কিন্তু কতদিন এই খেলা বজায় রাখতে পারবে মেয়েটা? কোন্‌দিন কোন্‌ কঠিন হাতের ধাক্কায় ধরাশায়ী হয়ে সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বসে থাকবে তার কি কিছু ঠিক্‌ আছে?

মা উদাসীন। বাপ অনন্তচরণ যেন দেখেও কিছু দেখে না, বুঝেও বোঝে না কিছু। আর বুঝেও করবে কী? উঠ্‌তি বয়সের ছেলে-মেয়ে ওরা। ভবিষ্যৎ ওদের অন্ধকার। ওরা নিজেরাও তা ভালমতই জানে। তাই সেই আদিরসের মাধ্যমে কিছু আনন্দ আহরণের বিকৃত পথ ধরতে কোন দ্বিধা কিম্বা লজ্জা নেই ওদের। ইচ্ছা করেই যেন এসব ব্যাপারে বেশ একটু বেপরোয়া, এটা যেন ওদের প্রতিশোধ গ্রহণের পন্থা। দেশ, সমাজ, সংস্কারের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়েই যেন ওরা এই সর্বনাশা পথে এগিয়ে চলছে উন্মাদের মত।

যাদের দু'বেলা দু'মুঠো পেটভরে খেতে দিতে পারে না, তাদের শাসন করতে যেতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করে অনন্তচরণ। তাই পথেঘাটে যেতে যেতে মাঝে-মধ্যে এখানে-ওখানে মেজ মেয়েটার বেলেল্লাপনা দেখেও চোখ ফিরিয়ে নেয় সে। রাগে-দুঃখে নিজের ঠোঁট কামড়ায়। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। চোখ ফেটে এক এক সময় জল এসে পড়ে। তবুও নিজেকে সামলে নেয় অনন্তচরণ। তার নিজেরই যেন সবকিছু অপরাধ। এদেশে নিম্নতম আয়ের সরকারী কর্মচারী হওয়াটা যেন সত্যিই এক মস্ত অপরাধের ব্যাপার। এদের মান আছে, ইজ্জতও হয়ত কিছু আছে। কিন্তু যে বস্তুটি নেই সেটা হচ্ছে অর্থ। ঠাকুরের উপদেশামৃত পান করে 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলে নিরুদ্বিগ্ন মনে যে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকতে পারে সে-ই হয়ে উঠতে পারে প্রকৃত সরকারী কর্মচারী—জনগণের সেবক।

এক এক সময় মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে অনন্তচরণের। ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে—কিন্তু কী ইচ্ছে করে তা' সে নিজেই জানে না। কিন্তু একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই বয়সে সেই শক্তি কোথায় তার?

যক্ষপুরীর একজন নগণ্য ভৃত্য সে। চারদিকে টাকার পাহাড়—শত শত—লক্ষ লক্ষ—কখনও বা কোটি ছাড়িয়েও যায়। স্তূপাকার টাকা। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই যখের ধন। ঐ বিশাল ধনরত্ন নিয়েই তার কাজ। মাঝে মাঝে ছোট ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে ঐ টাকার পাহাড় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে হয় অনন্তচরণকে। বুড়ো হয়েছে। অনাহারে-অর্ধাহারে দেহের শক্তিও যেন কমে আসছে। এখন ঐ টাকার পাহাড় নিয়ে সামান্য একটু যেতেই হাঁফ ধরে তার। সঙ্গে থাকে যক্ষপুরীর সেই প্রতিনিধি—ঘোষ সাহেব।

ঘোষ সাহেব সহানুভূতির কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কিরে অনন্ত, হাঁপিয়ে পড়লি যে?

ম্লান হেসে জবাব দেয় অনন্তচরণ, আর পারছি না বাবু, বুড়ো হয়েছি—

তা' হলে এবার বিশ্রাম নে, অনেক দিন চাকরী করেছিস্‌।

—
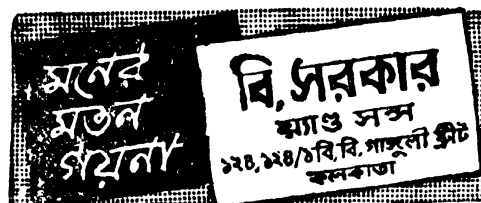
কিন্তু বিশ্রাম নিয়ে খাবো কি, এখনই সংসার অচল। রিটায়ার করলে ঐ গোটাকতক পেন্‌সনের টাকায় তো স্রেফ না খেয়ে মরতে হবে, বাবু।

মাথা নেড়ে সায় দেয় ঘোষ সাহেব।

মাঝে মাঝে নিজের মনেই হাসি পায় অনন্তচরণের। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যে বস্তুর অভাবে তার দেহে শক্তি নেই, মনে শান্তি নেই, সেই বস্তুরই বিরাট বিরাট বাণ্ডিলগুলোকে অমানুষিক শক্তিতে ঠেলে নিয়ে বেড়া'তে হচ্ছে তাকে---ঘাঁটাঘাঁটি করতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এটই তার রুটিন-মাফিক্ কাজ

চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর টাকা--সীমাহীন সংখ্যাহীন যেন। ওর একটিমাত্র বাণ্ডিলই তার দারিদ্র্যকে ঘুচিয়ে দিতে পারে চিরতরে। কিন্তু উপায় নেই। সরকার ঐগুলো নাড়া-চাড়া করার ক্ষমতা দিয়েছে তাকে, কিন্তু ব্যবহারের ক্ষমতা দেয় নি। এ যেন সেই---ওয়াটার ওয়াটার এভ্‌রি হোয়েয়ার, নট্ এ ড্রপ্ টু ড্রিঙ্ক্।

দুপুরের একঘণ্টা টিফিন্। কাউণ্টারগুলো সাময়িক বন্ধ। আণ্ডার-গ্রাউণ্ড স্ট্রং রুমের যক্ষপুরীর মধ্যে পাশে মোটা লীজারের খাতা নিয়ে ব্যস্ত সেই যক্ষের প্রতিনিধি---ঘোষ সাহেব। চারদিকে টাকা বোঝাই ছোট বড় মাঝারি নানা ধরণের বাক্সে এক---দুই---পাচ---দশ---একশ--হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল ছড়ানো। এখানে-ওখানে স্তূপীকৃত থরে-থরে সাজানো টাকার পাহাড়।

অনন্তচরণের টিফিন্ মানে দশ নয়া পয়সার মুড়ি। কিন্তু সেই পয়সাও আজ পকেটে নেই তার। খিদেয় পেট জ্বালা করছে। সেই সাতসকালে একটু ডাল সিদ্ধ দিয়ে তিনখানা রুটি খেয়ে অফিসে এসেছে অনন্তচরণ। চাল নেই ঘরে। বাজার করার পয়সাও নেই।

খিদে পেলেও খাওয়ায় রুচি নেই তার। বড় ছেলেটার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। গল্-গল্ করে একডাবর বুকবমি করে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে ছেলেটা। আজ সাতদিন পর্যন্ত ডাক্তারের ব্যবস্থামত একফোঁটা ওষুধ পড়ে নি ছেলেটার পেটে। পয়সার অভাবে কিনতে পারে নি ওষুধ। বিশ্বাস করে আর কেউ টাকা ধার দিতেও চায় না তাকে। ছেলেটা হয়ত বাঁচবে না আর।

একটা বিড়ি খেলে হ'ত। কিন্তু স্ট্রং-রুমের মধ্যে ধূমপান নিষেধ। বাইরে যেতে হবে।

টাকার সিংহাসনটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অনন্তচরণ। হঁ্যা, সিংহাসনই বটে, একশ টাকার নোট ভর্তি একটা বাক্সর উপর বসেছিল সে। পা' দু'টো রেখেছিল দু'টো দশটাকা ভর্তি বাক্সের উপর। ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্রই টাকার বাক্স।

স্ট্রং-রুমের বাইরে রাইফেল হাতে পাহারাদার। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অনন্তচরণ বাইরে এসে দাঁড়ায়। পকেট হাত্‌ড়ে একটা বিড়ি বের করে মুখে দিয়ে বুকপকেট থেকে টেনে তোলে একটা পুরোনো লাইটার।

অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও কিন্তু লাইটারে আগুন জ্বালাতে পারে না অনন্তচরণ। বুড়ো আঙুলের সমস্ত শক্তিটুকু প্রয়োগ করে সে ছোট্ট লোহার চাকাটা ঘুরোতে থাকে, লাইটারের চক্‌মকি পাথরের সঙ্গে ঘর্ষণে আগুনের ফুল্‌কি বেরোয়। কিন্তু সলতেয় আগুন ধরে না।

বিরক্ত হয়ে আরও যেন ক্ষেপে ওঠে অনন্তচরণ। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে ঘোরাতে থাকে সেই ছোট্ট লোহার চাকাটা।

রাইফেল্ হাতে হিন্দুস্থানী পাহারা-দারটি এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল অনন্ত-চরণকে। এবার সে বাঁ হাতে নিজের গোঁফজোড়ায় তা' দিয়ে মৃদুহেসে ভাঙা বাংলায় বললে, আরে, কী করছো অনন্ত্ ভাইয়া। ওতে কি আগ্ জ্বলবে? মালুম হোচ্ছে কি পেট্রোল খতম্ হয়ে গেছে---

এতক্ষণে খেয়াল হয় অনন্তচরণের। সত্যিই তো। নিজের অন্যমনস্কতায় ব্যাপারটা এতক্ষণ ধরতেই পারে নি সে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে তার। আগের দিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে অফিসের গাড়ির ড্রাইভার লছমন্ সিংয়ের কাছ থেকে একশিশি পেট্রোল চেয়ে নিয়েছিল ঐ লাইটারের জন্যে। কিন্তু তা' আর ভরা হয় নি লাইটারে।

আবার জামার পকেটে হাত দেয় অনন্তচরণ। হঁ্যা, পাওয়া গেছে। পকে-টেই ছিল শিশিটা। বাস্তবিক, আজ যেন বড় বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে সে। অফিসে সারাটা দিন চল্‌তে ফিরতে জামার ঐ পকেটটা ভারী ঠেক্‌ছিল। ভেবেছিল একবার হাত্‌ড়ে দেখবে। কিন্তু অন্যমনস্কতায় প্রতিবারই ভুলে গিয়েছিল। এতক্ষণে বুঝতে পারে শিশিটা বাড়িতে রেখে আসতে একদম ভুলে গিয়েছিল।

লাইটারে পেট্রোল ভরে নেয় অনন্তচরণ। তারপর শিশিটা আবার পকেটে রেখে দিয়ে বিড়ি ধরায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে অনন্তচরণ। হিন্দুস্থানী পাহারা-দারটি কি যেন একটা রসিকতা করতে যায় তার সঙ্গে। কিন্তু অনন্তচরণের চিন্তিত গোমড়া মুখের পানে তাকিয়ে আর কিছু বলে না। অবশেষে পোড়া বিড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার স্ট্রং-রুমে এসে প্রবেশ করে অনন্তচরণ।

মাথাটা যেন কেমন করছে। পা' থেকে মাথা পর্যন্ত কেমন যেন একটা অস্বস্তি। বিড়িটা বোধ হয় বড্ড কড়া ছিল।

নিজের পরিত্যক্ত সেই টাকার সিংহাসনে আবার এসে বসে অনন্ত-চরণ। যক্ষের প্রতিনিধি ঘোষ সাহেব তেমনি ডুবে রয়েছে মোটা লীজারের মধ্যে।

একবার এদিক ওদিক তাকায় অনন্তচরণ। কিছুই ভাল লাগছে না। চুপ্ করে বসে থাকতেও বিরক্ত লাগছিল তার।

একপাশে পড়েছিল সেদিনের

বাংলা সংবাদপত্রটা। ...ঘোষ সাহেব প্রতিদিন নিয়ে আসে ওটা।

অন্যমনস্কভাবে সংবাদপত্রটা হাতে তুলে নেয় অনন্তচরণ। প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা বড় সিংহের ছবি। আলিপুর চিড়িয়াখানার সিংহ। নাম তার 'শয়তান'। নামটা সার্থক। নিজের পরিচর্যাকারীর অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে তাকে হত্যা করে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

একনিঃশ্বাসে সমস্ত কাহিনীটা পড়ে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিংহের সেই ছবিটা দেখতে থাকে অনন্তচরণ।

ভালই হয়েছে। মরে বেঁচেছে লোকটা। সেও তো তার নিজের মতই একজন নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী। হয়ত সেও তার নিজের মতই পেটপুরে দু'বেলা খেতে পেত না। হয়ত সেও তার অসুস্থ পরিবারের পরিজনের মুখে একফোঁটা ওষুধ তুলে দিতে পারতো না। তার চাইতে এই ভালো—এই ভালো হয়েছে। মরে বেঁচেছে।

এতদিন নিজের হাতে যার পরিচর্যা করেছে তার হাতেই শেষে মরতে হল লোকটাকে। এমনিই হয়। কৃতজ্ঞতা বলে কোন পদার্থ নেই কোথাও। বড় নিদয়, বড় নির্মম এই পৃথিবীটা। উপকারীর উপকার স্বীকার করে না কেউ—মানুষ, পশু—কেউ না—কেউ না। সব সমান।

সে নিজেও যদি ঐ লোকটার মত হঠাৎ মরে যেত তো বেশ হত। কিন্তু এত সহজেই কি মরণ হবে তার? আর যে সহ্য হয় না। বাড়িতে ছেলেটা ভুগছে দেখে এসেছে সে। এতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে ঐ একটাই যা ছিল একটু ভাল। কিন্তু তা'ও সহ্য হল না ভগবানের। ওকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েই তবে তাঁর শান্তি। বড় মেয়েটাও ছিল শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু সেও এখন অন্য একটা লোকের সঙ্গে—যাক্ গে, ওসব কথা চিন্তা করবে না। সবই তার অদৃষ্ট। নইলে মেজ ছেলেটাই বা চোর হতে যাবে কেন? ধরা পড়ে রাস্তার লোক নাকি মেরে আধমরা করেছে তাকে। বেশ করেছে, ভালই করেছে তারা। একেবারে মেরে ফেললে আরও ভাল হত। আর ঐ মেজ মেয়েটা। ওটার কপালেও অনেক দুঃখ লেখা আছে। যাক্—যাক্। একেবারে গোল্লায় যাক্। যা খুশী করুক্। সে মুখ বুজেই থাকবে। বাপ হয়ে যখন ওদের দু'বেলা পেট পুরে খেতে দিতে পারে না, তখন ওদের শাসন করতে যাবে কেমন করে?

দারিদ্র্যই মানুষের জীবনের সব-চাইতে বড় অভিশাপ। এই দারিদ্র্যের জন্যেই তার আজ এই অবস্থা। সংসারে সুখ নেই। ছেলেমেয়েগুলো অমানুষ হয়ে উঠেছে একে একে। আর সে নিজে বসে রয়েছে লক্ষ টাকার উপর এই মুহূর্তে। পা দুখানাও রেখেছে হাজার হাজার টাকাসমেত দু'টো বাক্সর উপর।

এই তো সুখ, ভাবতে চেষ্টা করে অনন্তচরণ। দিনরাত লক্ষ কোটি টাকা ঘাঁটছে সে—এতে কি শান্তি নেই? প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কোটি টাকার বাণ্ডিলগুলো পা' দিয়ে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে নিদারুণ অবহেলায়, তবুও কেন অর্থের প্রতি আসক্তি কমছে না তার? দিনরাত ঘাঁটাঘাঁটি করে বলে ময়রা নাকি মিষ্টি খায় না। মাংস বিক্রেতার বাড়িতেও নাকি প্রতিদিন মাংসের হাড়ি চড়ে না। তবে কেন অর্থের প্রতি তার এই লোলুপতা? অসম্ভব জেনেও কেন তার মাঝে মাঝেই মনে হয় এর একটিমাত্র বাণ্ডিল-ই তার দারিদ্র্যকে দূর করে দিতে পারে অনায়াসে। ফিরিয়ে আনতে পারে তার সংসারে শান্তি। ঘুচিয়ে দিতে পারে দারিদ্র্যের অভিশাপ। মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে থাকে অনন্তচরণের। সারা দেহে এক ক্লান্তিকর অবসাদ। একের পর এক অসংলগ্ন চিন্তায় কেমন যেন বিক্ষুব্ধ মনটা।

হাতের সংবাদপত্রটা পড়ে গেছে নীচে। কিন্তু চিড়িয়াখানার সেই 'শয়তান' সিংহটা যেন তখনও তাকিয়ে রয়েছে হিংস্র দৃষ্টিতে অনন্তচরণের দিকে। যেন এখনই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর।

কিন্তু ও কি? দারুণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে যায় অনন্তচরণ। এ কী সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু মুখে কথা জোগায় না তার। একটি নয়, দু'টি নয়, তিনটি জলজ্যান্ত সিংহ আণ্ডার গ্রাউণ্ড স্ট্রং-রুমের এককোণ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। উঠে আসছে ওপাশের স্তূপ করে রাখা দশ টাকার নোটের বাণ্ডিলগুলোর ভিতর থেকে। গায়ে গা ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তারা অনন্তচরণের দিকে। তিনটি সিংহের মুখ তিনদিকে। ঘাড়ে ঘাড় ঠেকেছে তাদের। কিন্তু তিনজোড়া চোখের সেই হিংস্রদৃষ্টি অনন্তচরণের দিকেই নিবদ্ধ। তাদের ঈষৎ-উন্মুক্ত মুখের ফাঁকে লালাসিক্ত লক্লকে জিভ।

ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল অনন্ত-চরণ। চিৎকার করবার শক্তি নেই। দৌড়ে পালিয়ে যাবার শক্তিও সে হারিয়েছে। আর, সেই শক্তি থাকলেও কোথায় পালাতো সে?

স্ট্রং-রুমটা যেন এক বিরাট বন্ধ খাঁচা। যক্ষের প্রতিনিধি সেই ঘোষ সাহেবও যেন তার সেই মোটা লীজার খাতাটা নিয়ে কোথায় পালিয়েছে তাকেও চোখে পড়ে না অনন্তচরণের।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই সিংহ তিনটি। হঠাৎ তাদের চলার গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ওটা কী? ওদের পায়ের কাছে ওটা কী পড়ে রয়েছে একটা গোলাকৃতি চাকার মত? ঠিক্ যেন তার লাইটারের চাকার একটা বড় সংস্করণ। ওটাই কি তবে রুদ্ধ করেছে ঐ হিংস্র পশু তিনটির চলার গতি? ধর্মচক্র। কিন্তু পশুশক্তির পায়ের কাছে কেন ধর্মচক্রটা? ওটার তো থাকার কথা সিংহ তিনটির মাথার উপর—পশুশক্তির উপর ধর্মের আধি-পত্য। তবে কেন ওটা ওদের পায়ের কাছে?

হঠাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে সেই সিংহ তিনটি তাদের পায়ের আঘাতে ভেঙে

টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে সেই চক্রটা। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে আসতে থাকে অনন্তচরণের দিকে।

এসে গেছে। আরও—আরও কাছে এসে গেছে তারা। ওদের উষ্ণ নিঃশ্বাস স্পষ্ট টের পাচ্ছে অনন্তচরণ।

এবার মরীয়া হয়ে ওঠে সে। না—না, কিছুতেই সে আত্মসমর্পণ করবে না ঐ পশুগুলোর কাছে। হোক্ তারা সিংহ—পশুরাজ। কিন্তু তাই বলে এত সহজেই সে মেনে নেবে না ওদের আধিপত্য। সে মানুষ। ওদের চাইতে শ্রেষ্ঠ জীব—মানুষ।

পা' দুখানা যেন শক্ত পাথরে পরিণত হয়েছে অনন্তচরণের। উঠে দাঁড়াবার শক্তিও তার নেই। নাই বা থাকল পায়ের শক্তি। হাত দু'খানা তো এখনও রয়েছে তার।

কিন্তু কী করে ঠেকাবে ওদের? একটা লাঠি পর্যন্ত নেই হাতের কাছে। হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে একটা কথা মনে পড়তেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে পেট্রোলের শিশিটা টেনে তোলে অনন্তচরণ। চোখের পলকে সমস্ত পেট্রোলটা ঢেলে দেয় সিংহ তিনটির গায়ে। তারপর শক্ত হাতে চেপে ধরে লাইটারটা।

হ্যাঁ আগুন দিয়েই ওদের ঠেকাবে অনন্তচরণ। ঐ পশুশক্তির কাছে এর জুড়ি আর নেই। প্রচণ্ড এর তেজ, অপ্রতিহত এর গতি, দুর্দান্ত এর ক্রোধ। ঐ পশুর ক্রোধের চাইতে শতসহস্র গুণ বেশি এর ক্রোধ। ভয়ঙ্কর, দুরন্ত, ক্ষমাহীন দুর্বাসা। একে ভয় করে না এমন শক্তি এই পৃথিবীতে নেই।

লাইটারের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে সিংহের কেশর : আর ওদের বিকৃত মুখের পানে তাকিয়ে আনন্দে অট্টহাসি হেসে ওঠে অনন্তচরণ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আণ্ডার গ্রাউণ্ড স্ট্রং-রুমে আগুন লাগিয়েছিল সেখানকার একজন কর্মচারী। কর্মচারীটা নিজে পুড়ে মারা গেল, আর চীফ্ ক্যাশিয়ার ঘোষ সাহেব সামান্য আহত হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। জোর তদন্ত করেও কিন্তু পুলিশ আগুন লাগাবার কারণটি জানতে পারে নি। আগুনে প্রায় দেড় কোটি টাকার নোট পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। দু'-দশ হাজার নয়, নগদ দেড় কোটি টাকা। কিন্তু সরকারী জমাখরচের খাতায় এই দেড় কোটির মূল্যই বা কতটুকু। কাগজের দাম আর নাসিকের ছাপাখানায় ছাপাবার খরচ মিলিয়ে কতই বা এমন হবে।

নিকটতমা

রমেন চৌধুরী

আজ তোমাকে বলতে পারবো—
অতি সহজে জানাতে পারবো সেকথা :
আমি তোমায় ভালোবাসি।—আজও।
তার কারণ আজ আর তোমার আশায়
পথ চেয়ে থাকি না আমি।—
সেদিনের সেই মোহ আমায় আর পঙ্গু করে নেই,
ভালোবাসলেই যে পেতে হয়
এটা কতো ভুল
তা অন্তর থেকে অনুভব করেছি।
প্রেমের সার্থকতা প্রাপ্তির মাঝে নেই
সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছি এতোদিনে।
সন্দীপের সংগে যেদিন সীমন্তে সিঁদুর এঁকে
একসংগে পা ফেলে
চলে গেলে রাজহংসীর মতো—
আমি দূরে বজ্রাহত বনস্পতিপ্রায়
দাঁড়িয়েছিলেম।
কোনো সম্বিৎ ছিলো না দেহে আর মনে!
আমার চেতনার আরশিটা
ভেঙে খান খান হ'য়ে গেছে যেন'
আমার কবিতায় কিংবা গল্পে
কখনো আর ঠাঁই দিইনি তোমায় তারপর।
অথচ কতোই না প্রেরণা জোগাত
তোমার 'দু' অক্ষরের নামটি 'উগ্রী'!
শ্রীহীনা হ'য়ে গিয়েছিলে তুমি আমার জগতে।—
কতো বসন্ত কতো শীত উত্তীর্ণ হ'য়ে
পৌঁছেছি জীবনের এতো দূরে:
কাছে না এসেও তুমি কিন্তু এখন দেখছি
নিকট হ'য়েছো।
উগ্রি!
তুমি আগের চেয়েও আমার কাছে হ'য়েছো শ্রীময়ী॥

ময়নাগুড়ির নিকট বন্যায় ভেঙে-পড়া রেলওয়ে ওভারব্রীজ

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

অগ্রহায়ণ / '৭৫

শিয়ালদহ স্টেশনে দার্জিলিং-প্রত্যাগত যাত্রীরা

সফরান্তে পালাম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী উপনীত হলে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সহধর্মিণীরা ও পরিবারের অন্যান্যরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন

[illegible] অন্তর্বর্তী নির্বাচন উপলক্ষে মেমারীতে কংগ্রেসের এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণরত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন (এম-পি)

মহিলা-ক্লাব

পরীরাণী সেন

বৃহত্তর কলিকাতার লোকসংখ্যা মোটামুটি ৬৫ লক্ষ ধরিলে, উহার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে নারী। এই নারীসমষ্টির তিন-চতুর্থাংশের বেশী হইবে বাঙালী। এদের মধ্যে অতি-বৃদ্ধাদের কিছু অংশ এবং নেহাৎ শিশুদের সম্পূর্ণ বাদ দিলে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যাটি আজকাল বেশ বড়ই হইবে এবং উচ্চশিক্ষিতাদের ভাগটিও নেহাৎ ছোট হইবে না। আবার শিক্ষিতা ও উচ্চশিক্ষিতাদের পারিবারিক হিসাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাঁদের শতকরা প্রায় ৯৫টি পরিবারই মধ্যবিত্ত, বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত---অর্থাৎ খুবই দরিদ্র। এঁরাই স্থানীয় নারীসমাজের মেরুদণ্ড। তবেই দেখা যাইতেছে, এ যুগে মা-সরস্বতীর করুণা এই দুটি শ্রেণীর নারীরা যে-হারে লাভ করিতেছেন, সেই হারেই বঞ্চিতা হইতেছেন মা-লক্ষ্মীর কৃপা-লাভে। তাঁর এ কৃপণ করুণার দোষটি সত্যিকারের বিচারে চঞ্চলা ঐ দেবীর নয়, তা হইতেছে এই অকরুণ যুগের। সহরাঞ্চলীয়, কিন্তু মূলত কলিকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারী-সমাজ নিয়াই বর্তমান আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা হইবে।

আর গ্রামাঞ্চলের উন্মুক্ত আলো-হাওয়া বাদে, সহরের ভগ্নীদের তুলনায় গ্রামের ভগ্নীদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনেক কম; তদুপরি শিক্ষার সুযোগ তাদের অতি সংকীর্ণ আর চাকুরীর সুযোগ তো একদমই নাই।

সহরাঞ্চলে, বিশেষত কলিকাতায়, উল্লিখিত শ্রেণীর প্রতিটি পরিবারের আভ্যন্তরিক চিত্র দিকে দিকে অতীব বেদনাদায়ক। এর সর্বপ্রধান কারণ---তাঁদের মোটামুটি ভদ্রভাবে জীবন-যাপন করিবার যোগ্য সর্বনিম্ন অর্থেরও নিষ্ঠুর অভাব। আর অভাব-অনটন যখন ভয়াবহ হয়, তখন ঐ চরম দারিদ্র্যের সহযোগী হইয়া অন্যান্য যে-সব উৎপাত অনিবার্য ভাবে দেখা দেয়, তাদের নিত্য দৌরাত্ম্যে পারিবারিক শান্তি বিশ্রীভাবে লোপ পাইতে থাকে; কারণ, ঐ সব অভিশপ্ত পরিবারে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-সামাজিকতা প্রভৃতি সব দিকেই অপূরণের তীব্র হতাশা দুর্নিবার বেগে দেখা দেয়।

আবার এরি সঙ্গে আর দুটি বিরুদ্ধ-শক্তি ক-বছর যাবৎ এ সব মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে একেবারে চরমভাবে নাজেহাল করিয়া চলিয়াছে। এ দুটি হইল---প্রতিটি দ্রব্যের দামের ক্রম-উর্ধ্বগতি এবং ভোজ্যদ্রব্যগুলির সংগ্রহ-বিভীষিকা। এইভাবে এক-একটি পরিবারে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি কার্য-করীভাবে নিজ শিরে যাঁর বহন করিয়া চলিতে হয়, তিনিই হইলেন 'গৃহিণী।' গৃহকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে মুখে দুটি গুঁজিয়া কর্মস্থলে ছোটেন, সংসারের সব-কিছু তদারকির ভার পড়ে পরিবারের মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী দেউলে ঐ গৃহিণীরই উপর। অর্থের তেমন জোর থাকিলে, প্রতিটি পারিবারিক সমস্যারই মোটের পরে একটা সুরাহা করা সম্ভব হয়; কিন্তু সে হাতিয়ার তাঁর হাতে নাই, তাই খালি হাতেই কখনো কখনো শ্রীমান-শ্রীমতীদের সঙ্গে তাঁর প্রায় হাতাহাতি করিয়া বা কখনো কখনো অন্ধের মত শূন্য-ভাঁড়ার হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হয়। এই-ই তো আজকাল অধিকাংশ গৃহিণীর অদৃষ্টের লিখন।

ঐমত গুরু-দায়িত্ব দিনের সুরু হইতে শেষতক যাঁর নিত্য বহন করিয়া চলিতে হয়, উদয়াস্ত দুরন্ত সাংসারিক খাটুনির হাত হইতেও যাঁর অব্যাহতি

[illegible]ই—তাঁর কুষ্ঠ মন স্বভাবতই [illegible] [illegible]র করে ঐ বিষাক্ত আবহাওয়ার, ঐ বৈচিত্র্যহীন বেদনাদায়ক দৃশ্যপটের বাহিরে গিয়া ক্ষণিকের মুক্তির জন্য। দেখা যায়, তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ঐ মুক্তিটুকুর সর্বপ্রধান (বা একমাত্র) বাহন হইল 'সিনেমা হল।' কিন্তু তরুণ-তরুণী পুত্র-কন্যাদের সে দাবী মিটাইয়া অর্থাভাবে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহিণীর পক্ষে বছরে দু-একবারের বেশী ঐ ক্ষীণ সুযোগটুকু গ্রহণও প্রায়ই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

এ সব হতভাগ্য পরিবারের মধ্যে মুষ্টিমেয়মাত্র নিজস্ব বাড়ীতে থাকেন; কিন্তু তার ভিতরও দেখা যায়, অর্থা-গমের জন্য তাতেও ভাড়াটে বসানো। আর এঁদের পনের আনারও বেশী থাকেন ভাড়া-বাড়ীতে। এ সব ভাড়া-বাড়ীতে এক-একটি পরিবারে জন-সংখ্যা আর আলো-হাওয়ার অপ্রাচুর্য পরিবারগুলির বদ্ধ আবহাওয়াকে আরো কলুষিত করিয়া তোলে। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে অর্থনৈতিক, আবার তারি উপর যে-কোন দ্রব্যের বিশেষত ভোজ্য দ্রব্যের ছোট-বড়ো সব বিক্রেতাই যখন বিবেক-বর্জিত উন্মত্ত কালো-বাজারী হইয়া উঠিয়াছে, দেশজননীর এ চরম লাঞ্ছনার দিনে গৃহিণীকুলই তো হইয়া আছেন সে লাঞ্ছনার মূর্তি-মতী প্রতীক।

এই সব অগণিত শিক্ষিতা ও উচ্চশিক্ষিতা গৃহিণীদের মনের মুক্তির বা চিত্তবিশ্রামের সুন্দর একটি স্থায়ী বাহন হইল গৃহিণীদের ক্লাব—অবশ্য তা যদি ফলপ্রসূভাবে সত্যই গড়িয়া তোলা যায়। বর্তমান যুগ দ্রুত পরি-বর্তনশীল; তাই নারী-সমাজও দিকে-দিকে প্রগতির পথে, বিশেষত উচ্চ-শিক্ষার পথে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছেন —সর্বোপরি কলিকাতার মত সহরে। আজকাল তাঁরা কেবল উচ্চশিক্ষার প্রসাদলাভেই তুষ্ট থাকিতেছেন, তা নয়; তাঁদের চিন্তাধারাও যুগোপযোগি-ভাবে পালটাইয়া যাইতেছে। দেশ স্বাধীন, আজ তাঁরা রাজনীতির আসরেও [illegible] অগ্রণী, আবার অধিকাংশ [illegible] [illegible] তাঁরা তেমনি পুরুষ-[illegible] সমান অধিকার দাবী করিতেও পশ্চাৎপদ নন। যুগচেতনা—যুগেরই দান; সুতরাং তাঁদের মধ্যে যতটা স্বাধীন চিন্তার প্রসার ঘটে, ততই মঙ্গল।

সমাজ-চেতনায়ও তাঁরা আজ যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। আগেকার মত বহু নালিশ বক্ষে চাপিয়া রাখিয়া কেবলমাত্র অশ্রু আবেগটুকুকে সম্বল করিয়া তাঁরা আজ অসহায়ভাবে ঘরের কোণে বসিয়া নিষ্ফল কান্নার পক্ষপাতী নন। তাই দেখি; বিবাহ-বন্ধনও বিবাহ-প্রথা প্রভৃতি অনেকটাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা-নুযায়ী যুগোপযোগিভাবে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু তাঁদের ভাগ্যদোষে (কবি-গুরুর) 'বালিকা-বধূ'র কান্না কিছুটা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া আজও পরোক্ষ-ভাবে তাঁদের মর্মপীড়া ঘটাইয়া চলি-য়াছে এবং পূর্বেই তাহা কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। কবি 'বালিকা-বধূ'র মর্ম-বেদনার চিত্র আঁকিতে গিয়া এক-স্থানে বলিয়াছেন:

'হায়রে রাজধানী, পাষাণ কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া;
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখীর গান কই বনের ছায়া।'

হ্যাঁ, ইহা সুবিদিত যে, বালিকা বয়সে বধূত্বে অভিষেক প্রথাটি বহু-কাল পূর্বেই সেকালের নোংরা বস্তু হিসাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে; তথাপি সে সব বালিকা-বধূর মর্মবেদনা, আর বর্তমানকার সহরে মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের নিত্যপুঞ্জীভূত নানা ন্যায্য নালিশ তো অনেকটা একই পর্যায়ভুক্ত অশ্রুময় আবেদন। সেকালের বালিকা-বধূর তৎকালীন সামাজিক নানা অদ্ভুত প্রথা ও বন্ধনহেতু প্রাণপ্রাচুর্য ছিল না বটে, কিন্তু তাদের যেমন ছিল অন্নপ্রাচুর্য, তেমনি ছিল নানা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য। কিন্তু বর্তমান যুগের গৃহিণীদের ঘরে রহিয়াছে খোলা দুয়ার জানালা, আর বাহিরের সঙ্গে তাঁদের অবাধ সংযোগের রীতিমত কোন বাধা না থাকিলেও বহু বাস্তব বাধায় সে আকাঙ্ক্ষাটুকুও তাঁদের আজ নিত্য-প্রতিহত।

গুরুদেবের নারী-বন্দনার একটি শাশ্বত বাণী—

'লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন'---

বর্তমানে এ বাণীর মর্মার্থটি মর্মান্তিকভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। কারণ, এ যুগের কঠোর দাবী অনুযায়ী কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে,—সাধারণ শ্রেণীর ভদ্র নারী সমাজের ত্রিসীমানায়ও 'লজ্জা' ও 'সজ্জার' কোন ফাঁক থাকিবার কোন উপায় নাই; যেহেতু বর্তমানে কঠিন রূঢ় বা বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনে আর তাঁদের লজ্জার শোভন সীমাটুকুও বুঝি বজায় রাখা চলে না এবং এ ঘোর দুর্দিনে (লাজ-লজ্জায়) সৌন্দর্যবিধানের ব্যবস্থা করা তো তাঁদের পক্ষে একেবারে স্বপ্নের মতই অলীক। কারণ, যার যার বহুদুঃখের সংসারটি কোনমতে জীয়াইয়া রাখিতেই গৃহকর্তাদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম।

আজকাল বরং প্রত্যক্ষ করা যায় যে, লাজ-লজ্জা বাধ্য হইয়া বিসর্জন দিয়া তাঁরা গিয়া দাঁড়ান 'রণং দেহি' মূর্তিতে—রেশনের বা অন্যান্য দুর্ভেদ্য লাইনে। আর সজ্জা? মধ্যবিত্ত (ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত) গৃহিণীকুল মাসের মধ্য-ভাগ হইতে ধারদেনা করিয়া ও বাকীতে কিনিয়া নিজ নিজ সংসারের জীর্ণ সঙ্গতির খেয়াটুকুতে পাঁচজনকে নিয়া কোনপ্রকারে সংসার-বৈতরণী পার হইতে পারিলেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। এ সব শিক্ষিতা অথচ আর্থিক ভাগ্য-বিড়ম্বিতা গৃহিণীরা এ-টুকু দিব্য বোঝেন যে, তাঁরা—অর্থাৎ সপরিবার মধ্যবিত্ত গৃহিণীসমাজ এ নির্মম যুগের প্রিয়তম বলি। এঁদের আকাঙ্ক্ষাও তো বেশী নয়; এইটুকুই শুধু তাঁরা চান যে, ছেলে-

মেয়েদের মুখে কখনো কখনো একটু ভাল খাদ্য দিতে পারেন, মোটামুটি ভদ্রবেশে তাদের স্কুল-কলেজে পাঠাইতে পারেন। নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য এবং মনের অন্যান্য ন্যায্য সাধ-আহলাদ পূরণ---এসব তো দূরের কথা---নিত্য দু'বেলা হেঁসেল ঠেলা, দুঃখের সংসারটুকুরও নানা সঙ্গত দাবী অপূরণের গ্লানি, ছেলেমেয়েদের হতাশা-মলিন মুখের ছায়ায় বসিয়া করুণ দীর্ঘ-শ্বাস ---এগুলির পুঞ্জীভূত বেদনাই তো তাঁদের নিত্যকার জীবন-সঙ্গীত।

ক্রমে এ সব পরিবার আরো বড় হয়, সন্তানদের বয়োবৃদ্ধির নানা ব্যয়ও বাড়ে। বয়সে, বিরামবিহীন খাটুনিতে ও অপ্রিয় চিন্তাভাবনায় গৃহকর্ত্রীদেরও একদিকে যেমন দৈহিক ক্ষমতা স্তিমিত হইতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের মনোবল, উৎসাহ প্রভৃতি হইতে থাকে ম্লান হইতে ম্লানতর। কী ভয়াবহ এ সব চিত্র!

কিন্তু জীবনের খাঁটি পাত্রটি যাঁদের কোনদিনই পূর্ণ হইতে পারিল না, এমন এ সব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত) সমাজের অন্তরে অন্তরে নিঃসন্দেহে ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে:

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই,
চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল
পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।'

উল্লিখিত শ্রেণীর অগণিত পরিবারের যাবতীয় সমস্যার ভার গৃহান্তরালবন্দিনী যাঁরা নিত্য বহন করিয়া চলেন, নিষ্ফল-বেদনার মূর্তিমতী বিষণ্ণ-প্রতিমা আমাদের সেই গৃহিণী-কুলের জন্য, মনপ্রাণ জুড়াইবার এবং চিত্তবিশ্রামদায়ক কোন কিছু কি সত্যই গড়িয়া তোলা যায় না? হঠাৎ চমকপ্রদ মনে হইলেও মনে হয়, এ সব শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য ক্লাব সৃষ্টি করিতে পারিলে, তাঁদের মনের বহুবাঞ্ছিত ঐ শ্রেণীর কিছুটা পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে। এবং সে সাময়িক পরিবর্তন হইবে সংসারের একঘেয়ে দৃশ্যপট হইতে, সে পরিবর্তন হইবে জীর্ণ মানসিকতার দিক হইতেও।

মেয়েদের এ শ্রেণীর ক্লাবের গঠন ও কার্যপ্রণালী হইবে কিছুটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর। এ সম্পর্কে কতকটা আনুমানিকভাবেই এখানে একটি রেখাচিত্র উপস্থিত করা যাইতে পারে।

॥ দুই ॥

প্রতিষ্ঠা--মনে করা যাক্, একটি ভদ্রপল্লীতে বড় তিনটি কামরা ভাড়া নেওয়া হইল, সামনে একটু ফাঁকা জায়গা বা 'লন'। অর্থব্যয়ে এ সব হইবে ক্লাবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ: যথা---নানা বিভাগের সুনির্বাচিত বই, নানা প্রকার মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা। সহজসাধ্য এবং তরুণী ও গৃহিণীদের উপযোগী কয়েকটি খেলার সরঞ্জাম। আর সেজন্য চাই---ক'টি আলমারীসহ টেবিল চেয়ার-টুল-বেঞ্চ প্রভৃতি ফার্নিচার। প্রাথমিক ঐ সবে প্রয়োজন হইবে অন্তত ২৫ হাজার টাকার একটা থোক ব্যয়। তা ছাড়া, একটি স্থায়ী ফাণ্ডের জন্যও কয়েক হাজার টাকার প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ঐ সব ক'টি দিক মিলিয়া আন্দাজ ৩০।৩৫ হাজার টাকা স্বরুতেই সংগ্রহ হওয়া চাই।

নিয়মিত ব্যয়--কয়েক শত টাকা মাসিক বাড়ি-ভাড়া ছাড়াও পরিচালক-বর্গের অর্থাৎ, লাইব্রেরিয়ান, দরওয়ান, বয়, মালী---প্রভৃতির মাস-মাহিনা মিলিয়া প্রায় হাজারখানেক মাসিক ব্যয়। মাসিক গড় ব্যয় নূতন নূতন বই, জার্নাল প্রভৃতির জন্য।

একটি নমুনা ও ব্যয় সংগ্রহ---ধরা যাক্, দক্ষিণ কলিকাতার মোটামুটি এক-দেড় মাইল ব্যাসযুক্ত একটি সমৃদ্ধ পল্লী। এর মধ্যে আর্থিক ক্ষমতায় ধনী, মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত---এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েক হাজার পরিবার আছে। দেখা যাইবে, এঁদের মধ্যে এ দুর্দিনেও সচ্ছল ও অতি সচ্ছল (বা ধনী) পরিবারও কয়েক ডজন আছে। শেষের এ ক'টি ভাগ্যবান শ্রেণী স্বভাবতই শিক্ষা, আলোকবঞ্চিতও নয়; অর্থাৎ সহরজীবনের বিশেষ ক'টি আশীর্বাদ এঁদের শিরে একসঙ্গে বর্ষিত হইতে পারিয়াছে। এই সব পরিবারের মধ্যেই এমন কিছু কিছু মহিলাও খুঁজিলে পাওয়া যাইবে, যাঁদের সমাজ-সেবার আন্তরিক আগ্রহ আছে; এবং সংগঠনমূলক কার্যাদিতে নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতাও যাঁদের মধ্যে প্রায় সহজাত। আমরা জানি, পাড়ায় পাড়ায় কিছু কিছু নারী-প্রবক্তা থাকেন, যারা শুধু শিক্ষিতাই নন, যাঁদের কথা সবাই সসম্ভ্রমে শোনে বা মান্য করে।

ঐরূপ ক্লাব গঠন সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেলে, তারপর ধনী-নির্ধন যাই

প্রভৃ, কিছুসংখ্যক সাত্যকারের উদ্যোগী মহিলা এবং ঐ অঞ্চলটুকুর উদ্যোগী ক'জন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্রী মিলিত হইয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া ঐ শ্রেণীর ক্লাব গঠনের উপযোগিতা বিষয়ে প্রচারকার্যে লাগিতে পারেন। এতে 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ, তো করুন না; এ তো খুবই ভালো জিনিষ'---এমন ধারা ফাঁকা উৎসাহ অনেকেই হয়তো দিবেন, কিন্তু তাঁদের মনে ক্লাব সৃষ্টির সার্থকতা এবং উদ্যোক্তা হিসাবে স্থানীয় বয়স্ক ও বিশিষ্ট ক'জনের নাম করিয়া এবং তাহা প্রমাণ করিয়া না চলিলে চাঁদার টাকা কেউ ছাড়িবেন বলিয়া মনে হয় না। মনে রাখিতে হইবে, এ বৃহৎ প্রচেষ্টাটি ঐ পাড়ার একখানি সর্বজনীন পূজামাত্র নয়,---যার উদ্দেশ্য থাকে সবাইকার সুবিদিত এবং যাতে মাত্র এক-দেড় হাজার টাকা হইলেই গোল মিটিয়া যায়।

সুতরাং সকলের আস্থাভাজন ওই অঞ্চলের বয়স্ক বিদ্বান এবং বড়লোক শ্রেণীর কয়েকজনকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সর্বাগ্রে পাওয়া দরকার। তাঁদের বিশেষ সম্মানিত ও বিশ্বাসী দু-চার-জনকে চেষ্টার আসরে প্রত্যক্ষ সূত্রে নামাইতে হইবে; অর্থাৎ, তাঁদের কেহ হইবেন সভাপতি, কেউ সম্পাদক, কেউ কোষাধ্যক্ষ---এই মত। আবার সাধারণ উদ্যোক্তাদের মধ্য হইতে এবং ঐ সব বিশিষ্ট সুধীজনের মধ্য হইতে কয়েকজনকে নিয়া একটি 'কার্যকরী সমিতি' গঠন অতীব প্রয়োজন; বস্তুত এরাই হইবেন প্রধান পরিচালকবর্গ।

উপরে বর্ণিতানুরূপ বিশিষ্ট ও ধর্মিষ্ঠ কয়েকজনের লিখিত ঘোষণাসহ, ধরা যাক, একডজন কর্মী অশেষ ধৈর্য ও উৎসাহের সঙ্গে সংগঠন প্রচেষ্টায় লাগিয়া গেলেন; তখন ছ'মাস এক বছরের মধ্যে ৩০।৩৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হওয়া খুব বিচিত্র নয়। কার্যের আন্তরিকতা হইবে সফলতার গ্যারাণ্টী।

তারপর দেখিয়া বুঝিয়া এবং ঐ পল্লীর যথাসম্ভব কেন্দ্রস্থলে ঘরভাড়া করিতে হইবে। এখন নাম-করা ক'জন শিক্ষাব্রতীর নির্বাচনানুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপের বই কেনার পর্ব। এইভাবে পূর্বপরিকল্পিত পন্থায় অগ্রসর হইলে, ধীরে ধীরে ঐ মহৎ প্রচেষ্টা পূর্ণ সফলতায় গিয়া পৌঁছিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

পরিচালনা ও অঙ্গীভূত বিষয়-সমূহ---লাইব্রেরীর কাজে অভিজ্ঞ বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত---এমন দুজন সুনির্বাচিত মাসমাহিনাযুক্ত লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হইলে কাজ ভাল হইবে, এবং তাঁদের 'ডিউটি' চলিবে পালাক্রমে। সকালে দু' ঘণ্টা, বিকালে তিন ঘণ্টা ঐ প্রতিষ্ঠান খোলা থাকিলে বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত সদস্যাদের সুবিধা হইবে, এবং এতে সদস্যা সংখ্যা বাড়িবারও সুযোগ ঘটিবে।

উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে একটি 'স্থায়ী ফাণ্ড' থাকা খুবই প্রয়োজন। লাই-ব্রেরীর গ্রাহিকা বা সদস্যার মাসিক চাঁদা বর্তমান সময়োপযোগী ন্যায্য হারে ধরা যাক---এক টাকা। দেখিতে দেখিতে পরস্পরের দেখাদেখি হাজারখানেক সদস্যা চাঁদা দিয়া ভর্তি হইবেন, বোধ হয় এটা খুব বড় আশা নয়। বলা বাহুল্য, ক'জন পুরুষ গোড়ার কর্তা ব্যক্তি থাকিলেও, মহিলা-ক্লাবে পুরুষ সদস্য কদাপি লওয়া হইবে না।

ঐ মত একটি প্রতিষ্ঠানের মাসিক আয় অন্তত দু' হাজার টাকা না হইলে, এ কঠিন দিনে ঐ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চলিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, ক'টি মাস-মাহিনা ও ভাড়া মিটানোই বড় বড় ব্যয়ের সবটা নয়; যুগোপযোগী ভাল ভাল বই কিনিয়া চলা এবং পত্র-পত্রিকা অটুট রাখা ছাড়াও খেলার সরঞ্জাম বরাবর উপযোগী অবস্থা বজায় রাখা---এগুলির সবই অর্থসাপেক্ষ ব্যাপার; আবার ক্লাবের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এগুলি না করিলেও নয়। 'রিডিং রুমে' তরুণী, গৃহিণী---সবাকারই রুচিসাপেক্ষ পত্রিকাদি থাকা দরকার; 'রিডিং রুমে'র আকর্ষণটা কম কথা নয়।

বার্ষিক ডোনর---এমন যদি হয় যে, ঐ পল্লীটির বিশ-পঁচিশ জন এমন হৃদয়বান ধনী পরিবারের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায়, যাঁরা কেহ পাঁচ বা কেহ উর্ধ্বের দশ বছর 'বার্ষিক ডোনর' হইবেন, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠার পর ক্লাবের প্রথম দিকের ঝুঁকির ক'টা বছর নির্বিঘ্নে উৎরাইয়া যাইবার পক্ষে সুযোগ ঘটিতে পারে। ঐ 'ডোনেশনে'র অঙ্ক তাঁদের নিজ নিজ ইচ্ছা ও পদমর্যাদার উপর নির্ভরশীল হইবে।

অঙ্গীভূত বিষয়সমূহের মধ্যে কিছু 'ইনডোর', কিঞ্চিৎ 'আউটডোর' খেলাধূলার উপকরণ থাকিলে চিত্তা-কর্ষণের একটি চমৎকার উপায় হইবে, যেমন ---ক্যারম, লুডো, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, ভলিবল প্রভৃতি। এর সব কটিরই কয়েক সেট করিয়া হওয়া দরকার। খেলাধূলায় যোগদানেচ্ছু সদস্যাদের অতিরিক্ত ক-আনা সদস্যা-চাঁদা ধার্য করা যাইতে পারে। ঢালা বারান্দা ও 'লনে' খেলা চলিতে পারে; 'লনে' সদস্যারা গুচ্ছে গুচ্ছে বসিয়া গল্পগুজব করিবার সুযোগও পাইবেন। মহিলাদের এরূপ মেলামেশা এবং ভালো-মন্দ নানা সুখ-দুঃখের আলো-চনার বিশেষ সার্থকতা অবশ্যই আছে বলিয়া মনে করি।

এ সব ছাড়া বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবাব্রতী, ভাল ভাল ডাক্তার, অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও গুণী-জ্ঞানী---এরূপ নারী বা পুরুষ ব্যক্তির মাঝে মাঝে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আশা করা যায়, ঐ সব সুধী-জন মহিলাদের এই মত একটি প্রতিষ্ঠান হইতে কোন পারিশ্রমিক নিবেন না। আবার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে (যেমন মহাপুরুষ শ্রেণীর বা সুবিখ্যাত কোন কোন দেশবাসীর জন্মোৎসবে) নিজেরাই তাঁদের ধর্মজীবন বা কর্ম-জীবন সম্পর্কে আলোচনার জন্য উদ্যোগী হইতে পারেন।

তারপর যুগের রেওয়াজ অনুযায়ী আনন্দের বাহনও কিছু কিছু থাকা ভাল। প্রতি বছরই বিখ্যাত গায়ক-

গায়িকাদের একটি গানের জলসা বসানো যাইতে পারে, এবং এতে প্রবেশাধিকার থাকিবে শুধু সদস্যাদের—তাঁদের পরিবারের আর কারো নয়—তা শিশু তরুণী বৃদ্ধা, যা-ই হোক্ না কেন; কারণ, মনে রাখা দরকার যে, ইহা কোনক্রমেই বারোয়ারী শ্রেণীর জলসা নয়, এবং ইহা ক্লাব-সদস্যাদের চিত্তবিনোদনের একটি ঘরোয়া উপায়-মাত্র। জলসা হইলেই আনুষঙ্গিক কিছু ব্যয়ও থাকে বলিয়া জলসায় আগমনেচ্ছু সদস্যাদের কিছু বিশেষ চাঁদা ধার্য করা যাইতে পারে। মনে হয়, সহৃদয় আর্টিস্টগণ অনুগ্রহপূর্বক মহিলা-ক্লাবকে আনন্দদান ও উৎসাহ-দান করিবার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কেবলমাত্র যাতায়াত ব্যয় এবং চা-সিগারেটেই তাঁদের দাবী সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

যুগের রেওয়াজের আর একটি আনন্দদায়ক সুন্দর উপকরণ হইল, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে (যেমন, দুর্গোৎসবের ও সরস্বতী-পূজার প্রাক্কাল, বড়দিনের ছুটি এবং বৎসরের প্রথম দিন—এইসব) নৃত্যোৎসব, নৃত্যনাট্যোৎসব, সাধারণ নাটকাভিনয়োৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান। এগুলি সম্পূর্ণ গুণী সদস্যদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; এবং এগুলিতেও বেশ-কিছু ব্যয়ের দরকার হয় বলিয়া এগুলির ক্ষেত্রেও বিশেষ চাঁদা ধার্য করা যাইতে পারে। এসবে প্রবেশাধিকার থাকবে শুধু বিশেষ চাঁদা যাঁরা দিবেন, তাঁদের—অন্য কারো নয়।

খেলাধূলার সুযোগ, বক্তৃতা-ব্যবস্থা, জলসা, অভিনয়—এগুলি আনন্দ ও শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির ধারক ও বাহকেরও বটে। শুধু বই ও পত্রিকা পড়ার মধ্যে উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ রাখিলে, তাহা 'মহিলা-লাইব্রেরি' মাত্র হইল; এর আকর্ষণও হইবে ক্ষীণ, তাই সদস্যা-সংখ্যাও তাতে নগণ্য হইবার আশঙ্কা। কিন্তু আমাদের 'মহিলা-ক্লাব' চাই, এবং উহা সম্পন্ন হইবে যদি উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির সংযোগসাধন অবশ্যম্ভাবী করা হয়।

এ নিবন্ধের প্রথমভাগে আর্থিক দিকে সাধারণ স্তরের কিন্তু শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঘর-সংসারের ও পরিবেশগত যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে, দুর্ভাগ্য-পীড়িত সেই মা-বোনদের মানসিক অবসাদ গ্লানির এবং পরিবেশগত নানা একঘেয়েমির নির্মম কবল হইতে ক্ষণিকের হিতকর পরিবর্তনের সুযোগ-সমন্বিত হইতে হইবে এইসব 'মহিলা-ক্লাব'। সেইদিকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া নিবন্ধের এই দ্বিতীয়ভাগে কিছু কিছু পরিকল্পনার আভাস দিবার চেষ্টা করা হইল। বস্তুত, সমগ্র বিষয়টির ইহা রেখাচিত্রমাত্র; এখন রং-রূপ-শিল্প-নৈপুণ্যের তুলিতে এ ক্ষীণ চিত্রটিকে বাস্তব-সম্ভব ও প্রাণবন্ত করিয়া তোলা সম্ভব কি না—তা সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীলা ভগ্নীরা ভাবিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, একটি 'মহিলা-ক্লাবে'র বাস্তব রূপায়ণ করা গেলে, তার দেখাদেখি ক্রমে ক্রমে আরো 'মহিলা-ক্লাব' সৃষ্টির সুযোগ ঘটিবে। এ অনুকরণস্পৃহা বা প্রতিযোগী মনোভাব সমাজের প্রকৃত প্রগতির প্রাণ-স্পন্দন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

টোকিওতে আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিশ্বসুন্দরী মিস ব্রাজিল দ্য গ্লোরিস কাভার্লো

তিনটি মেয়ে

রেখা চট্টোপাধ্যায়

শম্পা আজ তিন মাস হল চাকরীতে ঢুকেছে---শম্পাকে আপনারা চেনেন তো? ব্যারিস্টার অম্লান দত্তের একমাত্র মেয়ে, ঐ যে মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড তিনতলা হাল-ফ্যাসানের বাড়ীটা দেখছেন, যার সামনে রয়েছে ফোয়ারার পাশে ফুলের বাগান আর পেছন দিকে টেনিস লন। আর সেই সঙ্গে দেখুন না ঐ বাড়ীর গ্যারাজে একটা সাদা রঙের ক্যাডিলাক আর হাল্কা নীল রঙের ডজ গাড়ী, হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ বাড়ীটাতেই শম্পা থাকে। আর শুধু থাকে বললেই সবটা বলা হল না---ঐ বাড়ীর সে সবেধন নীলমণি, আদুরী দুলালীও বলা চলে।

শম্পা বাড়ীর রীতি অনুসারে খাস ইংরেজ গভর্নেসের কাছে চালচলন শিখেছে। মিস্টার স্টুয়ার্টের কাছে পিয়ানো, মিস্টার গোমেজের কাছে গীটার, মিসেস এ্যালির কাছে নাচ, আর মিস ফ্রান্সোর কাছে ফরাসী ভাষার তালিম নিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি জার্মান ও রাশিয়ান ভাষা শেখার ইচ্ছাটাও ছিল কিন্তু অতিরিক্ত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়াতে সে ইচ্ছাটায় ইস্তফা দিতে হয়েছে। এ ছাড়া সে যামিনী রায়ের চিত্রকলাকে ভালবাসতে শিখেছে, বঙ্গ বসুমল্লিকের কাছে শিখেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

এককথায় সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি সব কিছুই সে বেশ আয়ত্ত করেছে ও সেই সঙ্গে দেশী-বিদেশী সব অনুষ্ঠানের সে একজন সমঝদার বলা যেতে পারে। ক্যালকাটা ক্লাবের সে মধ্যমণি বলা যায়---তার অনুপস্থিতিতে কেউ নাচের আসরে উদ্দীপনা পায় না, গানের আসরে হাততালি পড়ে না, সাহিত্যিক আসর ম্লান হয়ে যায়। তাই প্রতিটি সাংস্কৃতিক, বার্ষিক, ষাণ্মাসিক অনুষ্ঠানেই শম্পাকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। সবগুলির কার্যনির্বাহক পরিষদে শম্পা দত্তের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। শম্পা এই সব প্রতিষ্ঠানেই অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, আর সঙ্গ দিয়ে প্রেরণা যোগায়।

শম্পার বয়সটা প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে কিন্তু এরই মধ্যে একজন স্বামী নামধারী ব্যক্তির কবলে আত্মোৎসর্গ করবার মত তার মনোভাব গড়ে ওঠেনি। বাড়ীর লোকেরাও শম্পার মত একটি অতি শিশুকে পরের ঘরে পাঠাবার চিন্তাই করতে পারেন না। নিজের মনের খেয়াল-খুশি অনুসারে শম্পা তাই হেসে খেলে গেয়ে আনন্দ করে বেড়াচ্ছিল।

বেশ ছিল শম্পা---হঠাৎ সেদিন মণি মুখার্জীর কথাগুলো শোনবার পর থেকেই শম্পার মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সত্যিই তো দেশের জন্য দশের কল্যাণে কিছু কাজ তো সে করতে পারে। শম্পা ভাবলে দুপুরের দিকে ২।৪ ঘণ্টা সময় এই সব কাজে দিলে নেহাৎ ক্ষতি হবে না---তা ছাড়া মণি মুখার্জী বলেছে একটা মোটরকারের মত হাত খরচের টাকাও নাকি পাওয়া যাবে। মাহিনা বলে না নিয়ে এই টাকার ব্যবস্থা করা হবে এ্যালাওয়েন্স নাম দিয়ে। সত্যিই তো তার ঘরে যত টাকাই থাক তা বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ কে তাড়াতে চায়? আর আছে বলে যে আরো আনতে নেই তাও তো নয়?

সারা দুপুর ধরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আর স্প্রিংয়ের গদিতে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে শম্পা এই কথাগুলোই ভাবতে লাগল। শেষকালে ঠিক করে ফেলল মণি মুখার্জীকেই সে কাজ ঠিক করে দিতে বলবে। একবার ভাবল বাবাকে একবার জানালে হয় কিন্তু তারপরেই মনে হল কোন দরকার নেই, চাকরী মানে তো 'সোস্যাল সার্ভিস', এতে কারো মতের দরকার হয় না---বরং মাসে মাসে টাকাটা পেলে অমিট মিত্র, বরুণ বাসু, আর সুনীলা, মনীলাদের নিয়ে একটা সুইমিং ক্লাবের ব্যবস্থা করা যাবে, নয়ত সুবিধামত আর দু-চারটে স্টীমার পার্টির ব্যবস্থা করাও চলতে পারবে।

তারপর সত্যিই মণি মুখার্জী একদিন শম্পাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চাকরী ঠিক করে দিয়েছে। মহিলা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সেক্রেটারী মাসিক এ্যালাওয়েন্স ৫০০৲ টাকা। সময় নেই---নির্দিষ্ট স্থানও নেই। নিজের সুবিধা-সুযোগমত।

শম্পা চাকরী করছে তাই তার নিজের ব্যবহারের জন্য আর একটা ক্যাডিলাক কেনা হয়েছে, জর্জেটের শাড়ী এসেছে আরো তিন ডজন [illegible] সঙ্গে ইভনিং ইন প্যারিস, ল্যাভেণ্ডার, প্যারিস ও ওডিকোলন ইত্যাদির খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তা অনবরত বাইরে যেতে হলে সাজপোষাকের প্রয়োজন। সেদিন মণি মুখার্জী বলেছিল, শম্পা---তোমাকে গ্রে শিফনের সঙ্গে স্লিভলেস সাদা নাইলনের জামা পরলে বড় সুন্দর দেখায়---তাই শম্পা এই পোষাকের আর দুটো সেট অর্ডার দিয়ে ফেলেছে।

॥ দুই ॥

মণিকা বোস আজ মাসকয়েক চাকরীতে ঢুকে পড়েছে। ঐ যে ও পাশের গলির শেষের ছোট্ট দোতলা বাড়ীটা ---মণিকার বাবা মা আর মণিকা থাকে ঐ বাড়ীটাতে। মণিকার মা বাবা খুব বড়লোক না হলেও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সংসার বলা যেতে পারে। বাড়ীটা তাদের নিজেদের তার ওপর পৈত্রিক সম্পত্তি কিছু আছে। মণিকার বাবা অবশ্য কোনদিন কাজকর্ম তেমন করেন নি---তবে পৈত্রিক সম্পত্তির আয় থেকে তাদের ছোট্ট সংসারটা বেশ ভালভাবেই চালিয়ে এসেছেন। মণিকাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে গান-বাজনাও কিছু কিছু শিখিয়েছেন।

মণিকাও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ঘরে-বাইরের সব কাজকর্মগুলোই বেশ

ভালমত শিখে ফেলেছে। মণিকার বাবা অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ তাই বারবার লোককে বিশ্বাস করে ঠকেছেন কিন্তু জীবনে নিজে কখন কাউকে ঠকাবার প্রচেষ্টাও করেননি। তাই আজকের দিনের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েও মণিকা অতি আধুনিকা হয়ে উঠতে পারেনি। প্রয়োজনের তাগিদে বাইরের জগতে সে বেশ সহজভাবেই চলতে পারে, কিন্তু তাই বলে আত্মসম্ব্রমকে কখন হারাতে পারে না। নিজের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে তবে সে পথে চলে। মণিকাকে সকলেই মনে মনে হিংসা করে দূর থেকে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করে কিন্তু স্পষ্টভাবে মণিকার সামনাসামনি দাঁড়াবার সাহস করে না।

এমন একদিন ছিল যখন শিক্ষায়-দীক্ষায় মেয়েকে গড়ে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে মণিকার বাবার আশা ছিল উপযুক্ত পাত্রে মণিকাকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিজের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তার এ ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়ে আর উঠল না। প্রথম দিকে রূপে গুণে অনেক বাদবিচার করেছেন। উত্তরজীবনে যাকে পছন্দ হয়েছে তার সঙ্গে হয় ঠিকুজী মেলেনি নয়ত টাকার অঙ্কে পোষায় নি---এমনি যা হোক একটা না-একটা কিছু হয়ে শেষ যোগাযোগটা আর ঘটতে দেয়নি। ইতিমধ্যে মণিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটা বেড়াই টপকে বেরিয়ে পড়েছে। এখন মণিকা চুপ করে বাড়ীতে বসে থাকতেও রাজী নয়।

শেষ পর্যন্ত মণিকা চাকরী করার মতটা আদায় করে নিয়েছে। এবার চাকরী জোগাড় করার পালা---আজকের দিনে চট্ করে চাকরী পাওয়া সহজ নয়, তার ওপর একটু পরিবেশটা ঠিক মনোমত না হলে মণিকার পক্ষে চাকরী করাটাও সম্ভব নয়---ইস্কুল-কলেজে মণিকা চাকরী করতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিনা চেষ্টাতেই হঠাৎ একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। বিলিতি এক মারচেণ্ট অফিসে মণিকা চাকরী পেল। মণিকার কাজের নিষ্ঠা ও ভদ্র আচরণ দেখে কর্তৃপক্ষ তার উন্নতির কথা ভেবে রেখেছেন। কর্মক্ষেত্রে মণিকা কিন্তু তেমন সুখী হতে পারেনি, তার একনিষ্ঠ কর্ম-প্রচেষ্টাকে সহকর্মীরা ভাল চোখে দেখেনি---তার ওপর নিতান্ত সাধারণ আর পাঁচজনের মত ব্যবহার করতে গিয়ে সকলেই মণিকার রুচি-সম্মত আচরণের দরজায় মাথা ঠুকে ফিরে এসেছে। ফলে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের ভাব আশপাশের সকলের মনের মধ্যেই দানা বেঁধে উঠেছে। তাই, মণিকার অতি সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও আজ সহকর্মীদের মণিকার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানাবার প্রেরণা জোগাচ্ছে। চাকরী করলেও মণিকা কিন্তু সুখী হতে পারেনি।

॥ তিন ॥

নন্দিতা সেন---একে আপনারা ঠিক চিনতে নাও পারেন, বহুদিন হল চাকরী করে চলেছে। কবে যে প্রথম এই চাকরীর পথে পা বাড়িয়েছিল তার সন তারিখের হিসাব খাতাপত্র খুলে না দেখলে নন্দিতা নিজেও বলতে পারবে না।

নন্দিতা পাঁচটি ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। বাবা কোন্ এক অখ্যাত সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন। সকাল আটটায় ভাত খেয়ে বেরিয়ে যেতেন আর সেই সন্ধ্যার পরে ফিরে

বি ও এ সি-র ৭০৭ বোয়িং রাজহংসী জেট বিমান ভারতের মধ্যে দমদম বিমানবন্দরে প্রথম অবতরণ করলে পর মালা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এয়ার হোস্টেসরা

আসতেন। সকালে ভাত খেতে বসেও কোনরকমে নাকে-মুখে গুঁজে উঠতে হত---এ ছাড়া একটা কৌটায় খানচারেক রুটি ও একটু তরকারি টিফিন নিয়ে যেতেন। নন্দিতার বেশ মনে আছে দিনের পর দিন বাবার টিফিন বাক্স ভরে হাতে তুলে দেওয়ার কাজ নন্দিতা নিজের হাতেই করত। কর্মক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এলে সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে গায়ের জামাটা খুলে দিয়ে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করত। তারপর বাবা একটু সুস্থ হয়ে হাতমুখ ধুতে গেলে বাবার জন্য নিজের হাতে চা-জলখাবার গুছিয়ে নিয়ে আসত। মার কথা নন্দিতার বড় বেশী মনে পড়ে না---সেই কোন ছোটবেলায় মা তাদের সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। ভাই-বোনেদের দেখাশোনার জন্য একটা বুড়ী ঝি ছিল---সেই তাদের সব কিছুর ভার নিয়েছিল।

নন্দিতা তাদের পাড়ার একটা ছোট স্কুলে পড়তে যেত। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা তাকে খুব ভালবাসতেন। এখানেই যেন নন্দিতা সহজভাবে মেলামেশার সুযোগ পেত---এককথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচত।

কিন্তু নন্দিতার ভাগ্যে এ সুখও বিধাতা বেশীদিন বজায় রাখলেন না। নন্দিতা সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে দুচার দিন দম নিচ্ছে এমনি সময় একদিন অফিস থেকে বাড়ী ফেরবার সময় ট্রাম থেকে পড়ে নন্দিতার বাবা মারা গেলেন। ক্রমে নন্দিতা চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। বাবার চাকরীর টাকাটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ভাইবোনেদের মুখে অন্ন জোগাবার প্রশ্নটাই সব কিছুর আগেই মনে পড়ে গেল। কি করবে নন্দিতা? এতগুলো শিশু তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোন পথে তাদের বাঁচাবে? এ অবস্থায় নন্দিতা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

বিশ্ব অলিম্পিকের মশাল হাতে দৌড়চ্ছেন রাশিয়ার এ্যাথলেট এনারিকোয়েভা

নন্দিতাদের বিপদের কথা শুনে তাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী একদিন দেখা করতে এলেন। নন্দিতাকে তিনি বড় ভালবাসতেন---তাই সমস্ত কথা শুনে তিনিই বললেন, দেখ যা হবার তা তো হয়েছে এখন তোমাকেই চাকরী করে সকলের প্রাণ বাঁচাতে হবে। তা তুমি এক কাজ কর, আমার স্কুলের ক্লাসেই পড়াতে লেগে যাও।

নন্দিতা হাতে স্বর্গ পেল---কৃতজ্ঞতায় সে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করল। আর দুটো টিউশনী করতে বাধ্য হয়ে পড়ল। সকাল থেকে নন্দিতা আর নিশ্বাস ফেলবার সময়টুকুও পায় না। ওর ওপর ছোট ছোট ভাইবোনদের অসুখ-বিসুখ তো লেগেই আছে।

দিন এইভাবেই চলেছে ---ইতিমধ্যে চাকরী বজায় রাখবার তাগিদে কোনক্রমে আই-এ পরীক্ষায় পাশ করেছে। তারপর আর নিজের পড়াশুনোর কথা ভাববারও সময় পায়নি। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা আজ বড় হয়েছে---লেখাপড়াও শিখেছে কিন্তু নন্দিতা সেন এখনও কালো ব্যাগ আর লেডিস ছাতাটা নিয়ে বেলা ১০টায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। নিজের হাতে সাবান দিয়ে কেচে মিলের সাদা কাপড় সে পরে। আর চুলটাকে টেনে বাঁধে। প্রয়োজনের তাগিদে একটা চশমাও পরতে হয়। তারপর সেখান থেকেই টিউশানি সেরে বাড়ী ফেরে রাত প্রায় ৯টা নাগাদ। জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার স্বপ্ন নন্দিতার মন থেকে অনেক কাল হল মুছে গেছে। একঘেয়ে জীবন চালাতে চালাতে চলাবলায় এসেছে একটা সীমাহীন রুক্ষতা---চাল-চলনে এসেছে প্রাণহীন নিরসতা। তবু নন্দিতা সেন আজও চাকরী করে চলেছে।

পতিদেবতার জন্য

বিভা চৌধুরী

"দিন কাল পাল্টেছে'---হাল্কা সুরে কথা দু'টো ভাসিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ অধুনা। বেশ যুৎসই, কেন না, পতিদেবতাটির সনাতন দায়দায়িত্ব---আনতে হবে থলি বোঝাই---সামলাতে হচ্ছে ঠিকই, ঝক্কি বরং ক্রমবর্ধমান, অথচ আমাদের মেজাজে যেন কেমন একটা---। কিঞ্চিৎ দায়িত্ব এড়ানোর গন্ধ বুঝি পাওয়া যায়।

সে যাক্। এখানে তর্কের তুফান তোলা বিপজ্জনক। অপ্রয়োজনীয়ও বটে। বলতে চাইছি একটা জানা কিন্তু ঠিকমত খেয়াল-না-করা বিষয়। সহধর্মিণীকে 'উনি' হয় তো ছিমছিমে দেখতে চান, কিংবা নাদুসনুদুস্; কিন্তু একটা কথা অভ্রান্ত---নিজে উনি ভরপেট খুশমেজাজে খেতে চাইবেন। পেট ভরাতে তাই দরকার উপযুক্ত পরিমাণ, মেজাজ খুশ করতে স্বাদ আর যত্ন।

'ভরপেট মেজাজ আনে'---পুরনো বাংলা প্রবাদটা বিবাহিত জীবন সার্থক করতে অত্যাবশ্যকীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। পতির যত্ন নিয়মিত করা দরকার, 'নিয়মিত' শব্দটা জরুরী। অযত্নপ্রস্তুত খাদ্য, যখন তখন তা দেওয়া, নজরটি সময়মত না রাখা---এই সব অসংখ্য দাম্পত্য জীবনের সুখনাশা। সত্যি বলতে কি, পিতা-পতি-ভ্রাতা নির্বিশেষে প্রায় সব পুরুষই খাদ্যের ব্যাপারে রীতিমত দুর্বলচেতা। আর, এ কথা ত' সর্বজনজ্ঞাত যে, দুর্বল স্থানের শুশ্রূষা সমধিক প্রয়োজন।

কর্তা যখন ফিরবেন সন্ধ্যের পর, সারাদিন খাটুনীর পর ক্লান্ত, একটু বিরক্তও হয়ত বা, বড়-মেজ-সেজ নানান বাবুর মন যুগিয়ে চলতে হয়েছে সমস্ত দিন, স্বয়ং বড়বাবু হলে ডিরেক্টর-এর, সেই মুহূর্তে তার পছন্দসই পানীয়টি ---চা, কফি, হরলিকস, দুধ---হাতে তুলে দিন। দু' একটা কথার পর রেহাই দিন আধঘণ্টাটাক। হাত-পা-মুখ ধুয়ে ঝরঝরে হয়ে এলে হালকা খাবার। গরম, পুষ্টিকর পানীয় পেশী এবং স্নায়ুতে আরামপ্রদ. এরপর সামান্য কিছু তার ভালই লাগবে। দেখবেন কী চমৎকার মেজাজী আবহাওয়া তৈরী হয় (বলা বাহুল্য, নিজের 'মেজাজ' আগেই তৈরী করে নিয়েছেন আপনি)।

সমধিক গুরুত্বপূর্ণ সোনার চেয়ে দামী কথা বলেছিলেন আমার প্রৌঢ়া পিসীমা---ভরপেট না খাইয়ে ওর সঙ্গে বাক্যালাপ না করু। জানি, বলা সহজ, কার্যে পরিণত করা দুরূহ। সমস্ত দিনের পরে শিশিরের শব্দের মত নামা-সন্ধ্যায় অনেক কথা তাৎক্ষণিক মুক্তিলাভে ব্যাকুল। এক্ষেত্রে কিন্তু নিজেকে 'ধৈর্যং রহু' শোনান বাস্তববুদ্ধির পরাকাষ্ঠা।

দিনের সূচনা চা কিংবা কফিতে সাধারণত হলেও তার সঙ্গে 'টা' কিংবা 'টফি' কিঞ্চিৎ কিছু থাকা দরকার। এখন ত' 'প্রি-কুক্ড', রান্না-করা খাদ্য বাজারে অঢেল। দুধ, হরলিকস কিংবা দই বা মাখমের সাথে মিশিয়ে নিলেই হল।

খাবারের বৈচিত্র্য আর একটা প্রয়োজনীয় দিক। নিত্য-নতুনের খোঁজ হাস্যকর, অস্বস্তিকরও নিঃসন্দেহে। কেন না, কেবল পাওয়ার ল্যাঠাই নয়, পকেটও এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে হালকা হয়। তবে, মাঝেমধ্যে, বিশেষত ছুটির দিনে, এবং কোন উপলক্ষে নতুন ধরণের রান্না জিভের একঘেয়েমী কাটিয়ে রুচি ফিরিয়ে আনে, দেহমন উভয়ের পক্ষেই তাই বৈচিত্র্য শুভংকর।

নতুনত্বর সঙ্গে যত্নটুকুও সমান গুরুত্বপূর্ণ। 'দেবতা'টিকে বুঝতে দিন সে আদরণীয়, যাই ঘটুক না কেন। দেখবেন, অনেক সমস্যার সমাধান আপনি হচ্ছে, ধৈর্য ধরে তার পছন্দমতন একে একে খাদ্য দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। একরাশ ঢেলে দিলে মনে হয় দায় সারা হল এবং এই রকম ছোটখাট 'মনে হওয়া' জমতে জমতেই দাম্পত্য বৃক্ষটিকে শিথিলমূল ক'রে তোলে।

সাধ্যমতন ত্রুটি করবেন না। যথাশক্তি বাঢ়ম্। আর, তারপরও যদি দেখেন কোন কোন দিন পুরো সন্তুষ্টি হল না, জানবেন মেজাজটা অন্য কোন কারণে খিঁচড়ে আছে। রান্নার খুঁত ধরার মাধ্যম 'ওর' সেই মানসিক অশান্তি প্রকাশ হচ্ছে বই নয়।

যদি শোনেন আপনার উনি---সর্বোত্তম পতিরাও অবরেসবরে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন---খেতে খেতে নিজের মা, ঠাকুমা, বা পিসীর রান্না সম্পর্কে উদাস কণ্ঠে টুকিটাকি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করছেন ত' তা থেকে কিছু ভেবে বসবেন না। না, অনুগ্রহ ক'রে এই ভুলের ফাঁদে পা কখনও দেবেন না। আপনার ছেলেও তার স্ত্রীকে কোন না কোন মুহূর্তে এই জাতীয় কথা বলবে। কারণ শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে পুরুষ-শিশুর সকাল-দুপুর-রাত্রের খাদ্য বিষম ক্ষিদেয় খাওয়া এবং তার সঙ্গে পরিণতবয়সে যুক্ত হয় সোনার খাঁচায় থাকা দিনগুলোর স্বপ্নময় রঙিন স্মৃতি। স্মৃতির রসে জারিত তেমনটা তাকে দেওয়া কারোর সাধ্য নয়। এমন কি, মা ঠাকুমা পিসিও তখন রেঁধে খাওয়ালে সে রকম আর লাগবে না।

তা ছাড়া, না হয় শুনলেনই ছোটখাট দু' চারটে মন্তব্য। ক্ষতি কি। কথায় ত' আর গায়ে ফোসকা পড়ে না। কিন্তু উত্তর দিলে পড়ে এবং দাম্পত্য-জীবনদেহে তা চিরস্থায়ী দাগ ফেললেও ফেলতে পারে। এ ক্ষেত্রে 'বোবার শত্রু নেই' প্রবাদটা যতখানি সার্থক তেমন আর কোন ক্ষেত্রে কিনা সন্দেহ আছে।

বারি দেবী

বিশু বোস-এর খবর মাঝে মাঝে পাচ্ছি অর্জুন সিং-এর কাছে। সে খবর যোগাড় করে আমার বাবার দরোয়ানের কাছ থেকে।

প্রাণটা তার এখনও নিরাপদে দেহে বাস করছে বটে, তবে দেহটা পঙ্গু হয়ে গেছে। শুনলাম বোস্ সায়েবের একটা পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, আর কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ার জন্য, প্ল্যাস্টার করে রাখা হয়েছে। সেজন্য এখনও দীর্ঘকাল ওকে শয্যায় থাকতে হবে।

মাঝে মাঝে মনে বেদনা বোধ করি ওর জন্যে।

না, ঠিক ওর জন্যে নয়, ওর বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্যে। আহা ওর জন্যে কত দুঃখ ভোগ করছে তারা। ভগবান ওকে সুস্থ করে দিন্ এই প্রার্থনা জানাই।

যদিও এটা ধ্রুব সত্য যে, সে ভালো হয়ে উঠ্লেই আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা আবার করবে, তবুও সে ভালো হোক্। দুষ্কর্মের শাস্তিভোগ তো অনেক হল তার।

●

নতুন ফিল্ম কোম্পানী 'কুবের লক্ষ্মী'র প্রথম বই 'হাতছানি'তে নায়কের পার্ট পেয়েছে রজত। ভারি আনন্দ হয়েছে আমার, খবরটা শুনে। স্যুটিং চলছে। পাওয়ার সায়েবের সাধ একদিন স্যুটিং দেখার। রজতকে বলেছিলাম কথাটা। তারপর একদিন আমি ও পাওয়ার সায়েব গেলাম রজতের সঙ্গে, স্যুটিং দেখার জন্য।

সেদিন দেখলাম সিনেমা আকাশের উজ্জ্বল তারকা, সুন্দরী প্রাণোচ্ছলা নায়িকা সঞ্চিতা হালদারকে। একটি প্রণয়-দৃশ্য। নায়ক রজত সেন, আর নায়িকা সঞ্চিতা হালদার। রোমাণ্টিক জুড়ি হিসেবে ওদের মানিয়েছে চমৎকার। প্রেমবিমুগ্ধা, আবেগ-উচ্ছলা নায়িকার ভাবভঙ্গী, সংলাপ যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, সঞ্চিতার নিখুঁত অভিনয়ে। আর বিবেক-চৈতন্যহীন এক রূপমুগ্ধ নায়ক, নিজের পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব গোপন রেখে নায়িকার সঙ্গে সহজ সরল ভাবে মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় মেতেছে, এই পার্টে রজতের নিপুণ অভিনয় আশ্চর্য লাগলো আমার কাছে।

তারপর দেখলাম একটি করুণ-দৃশ্য।

নায়কের বিবাহিতা স্ত্রীর, নিদারুণ মনস্তাপ, আর অশ্রুসজল করুণ মিনতি—

---ওগো তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। আমি যে তোমায় ছেড়ে একমুহূর্তও বাঁচতে চাই না। আমার কি দোষ বলো। কেন তুমি ত্যাগ করতে চাইছো আমাকে ?

নিষ্ঠুর নায়কের উদ্ধত জবাব—না বাঁচতে চাও, মরো। তোমার মত একটা অশিক্ষিতা, রূপহীনা সঙ্গিনী আমার পক্ষে একটা দুর্বহ বোঝামাত্র। সারাজীবন এ বোঝা কখনই বইতে রাজী নই আমি। তার চেয়ে অনেক ভালো হবে, তোমাকে কিছু মাসোহারা দিয়ে আমার দূরে থাকা। তোমার বাপ-মা'র কাছে থাকবে তুমি। অবশ্য ডিভোর্সের পর তুমি আবার বিয়ে করতে পারো। টাকার লোভে আমার বাপ-মা তোমাকে পুত্রবধূ করে যে অন্যায় করেছিলেন, তার খেসারৎ তো আমি দিতেই চাইছি, কিন্তু আমার সারা জীবনটা তো আর ব্যর্থ করতে পারি না।

নায়িকার করুণ কান্না—ভগবান, ---তুমি আমায় মৃত্যু দাও।

দৃশ্যটি দেখতে দেখতে, কখন যে চোখের জলের ধারায় আমার গাল দুটো ভিজে উঠেছে, তার খেয়াল ছিল না।

নিচু গলায় বললো পাওয়ার সায়েব ---চোখমুখ মুছে ফেল সিস্টার।

লজ্জা পেলাম ওর কথায়। চোখ-মুখ মুছে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম।

স্যুটিং-এর অবসর সময়ে রজত এলো নায়িকা সঞ্চিতাকে সঙ্গে করে।

আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বললো সঞ্চিতাকে---রূপকথা মল্লিক। সম্পর্কে আমার বোন হন।

একটু হাসলো রজত আমার দিকে চেয়ে। ওর চোখে জ্বলছিলো খুশির আলো।

খুব আলাপী মেয়ে সঞ্চিতা। হাসি-গল্পে ভরিয়ে রাখলো চায়ের আসরটিকে।

নায়কের অবহেলিতা স্ত্রীর পার্ট নিয়েছে যে মেয়েটি সেও এসে যোগ দিয়েছে আসরে।

নাম ওর মালতী পাইন। শ্যামলা শান্ত মেয়েটিকে আমার ভারি ভালো লাগলো।

ওকে বললাম---এত স্বাভাবিক সুন্দর আপনার অভিনয় যে দেখতে দেখতে আমি কেঁদেই ফেলেছিলাম।

---ওমা তাই নাকি ?—অবাক

হলো সঞ্চিতা। চোখ দুটো বড় করে বললো---আপনি তো খুব সেন্টিমেণ্টাল দেখছি?---তা আমার অভিনয় কেমন লাগলো ; কিছু বললেন না তো?

---খু-উ-ব ভালো। আপনি যেমন সুন্দর, আপনার অভিনয়ও ঠিক তেমনি। মানে নায়িকার পার্টে খুব মানিয়েছে আপনাকে।

একটু হাসির সঙ্গে, জবাব দিলাম আমি।

একটু পরেই উঠে গেল সঞ্চিতা আর রজত। ওদের নিয়ে একটা দৃশ্যের ছবি নেওয়া হবে।

রজত আমাদেরও ডাক্‌লো, কিন্তু আমি আর যেতে চাইলাম না, কারণ বড্ড গরম লাগছিলো। মালতীর এখন ওখানে দরকার নেই, তাই সেও রইলো আমাদের কাছে।

---আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না ;---তবুও বড্ড ভালো লাগছে আপনাকে। দিদি বলে ডাক্‌তে ইচ্ছে করছে। আমার ভাই-বোন কেউ নেই, তাই মাঝে মাঝে বড্ড দুঃখ হয় মনে। আমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো মালতী।

---বেশ তো তাই ডাক্‌বেন। আমারও বোন নেই, তাই বেশ ভালোই লাগবে আপনাকে।

---হ্যাঁ আমারও মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে। বললাম মালতীকে।

---না, না আপনি আর নয়, তুমি বলবেন আমাকে, আর অনুমতি পেলে,---আমিও তাই বলবো। দুটি হাসিভরা চোখ আমার সামনে মেলে ধরলো মালতী। বড় সুন্দর লাগলো ওকে। আমি ওর গালে একটু আঙুলের টোকা দিয়ে আদর করে বললাম---তুমি বললে খুব খুশি হবো আমি মালতী।---আচ্ছা ছায়াপথ বইটাতে কি দেখেছি তোমাকে?

---ঠিক বলেছো দিদি। ঐ বইটাতে আমি সেজেছিলাম জেলের মেয়ে। মাদ্রাজে একটা গ্রামে, সমুদ্রের ধারে তোলা হয়েছিলো ছবিটা। আচ্ছা দিদি। সেই সময় তুমি কি ওখানে ছিলে? মনে পড়ছে ঠিক সমুদ্রের ধারে একটা ঘেরা বারান্দায় একজন বসে থাকতো মানে একটি মেয়ে, দেখতে তাকে ঠিক তোমার মত।

মালতী তার সুন্দর সরল দুটি চোখ মেলে, ভালো করে দেখছে আমার মুখটাকে।

ওর কথায় একটু চম্‌কে উঠলাম আমি। ছায়াপথ ছবিটা যে বিমুনিপত্তনমেই তোলা হচ্ছিলো বছর দুয়েক আগে, সে কথা আমার মনেই ছিল না।

হঠাৎ ওর প্রশ্নের জবাব কি দেব, ভেবে পেলাম না। সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম ওর মুখটাকে। না কোনো দুরভিসন্ধির ছায়া নেই ওর মুখে। ভারি সরল সুন্দর কচি মুখখানা ওর, তাই নিজেকে গোপন করতে চাইলাম না।

জবাব দিলাম ওর কথার---তুমি ঠিকই দেখেছো ভাই, আমি ঐ বাড়ীতে সে সময় ছিলাম। আমাকে দেখেছিলে যখন, চলে আসোনি কেন আমার কাছে?

---যেতে আমার খুব ইচ্ছে করতো দিদি, কিন্তু রজতদা বারণ করতো,---বলতো যে, উনি কারুর সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না।

---আচ্ছা দিদি, রজতদা তোমার কি রকম ভাই হয়? তোমার কথা ওর কাছে আগে তো শুনিনি?

নিছক কৌতূহল নিয়েই বোধহয় মালতী জানতে চাইলো রজত আমার কি রকম ভাই হয়? তবুও জবাব দেওয়া খুব সহজ ছিল না আমার পক্ষে। কারণ মনে হয় রজতের আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে ওর বেশ কিছু জানা আছে। কোনো-রকম মিথ্যা চাতুরীর আশ্রয় নিতেও প্রবৃত্তি হল না আমার। তাই বললাম ওকে---রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই আমার রজতের সঙ্গে। যখন তোমরা গিয়েছিলে ছবি তুলতে বিমুনিপত্তনমে, তখনই ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিলো।

---ও, তাই বলো, ---তা বেশ মজার মানুষ তো রজতদা? নিজে কেমন বোনকে দখল করলো, আর আমাদের কারুকে তার ধারেকাছে এগুতে দিল না।

তা এখন আমার দিদিভাইকে কেমন করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয় দেখি?

কথা বলতে বলতে, এক হাত দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরলো মালতী। তারপর একটু ম্লান হাসির সঙ্গে বললো---তুমি হয়তো আমাকে পাগল ছাগল কিছু ভাবছো দিদি, কিন্তু যদি শোনো, আমার দুঃখের কথাগুলো, তাহলে---

গলার স্বর ওর যেন কান্নায় ভারি হয়ে উঠলো।

আমি ওর চিবুকটা ধরে মুখটা তুলে ধরলাম। তারপর বললাম ওকে---বল না ভাই শুনি তোমার কথা। এমন মিষ্টি কচি মেয়ে, তারও আছে দুঃখ?

চোখ মুছলো মালতী। তারপর বললো---আগে ছিল না দিদি। বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বর্ধমানে আমরা থাকতাম রজতদার বাড়ীর পাশেই। আমি পড়ি ক্লাশ এইটে, আর রজতদা বি-এ পড়ছেন কলেজে। আমি বাপ-মার একমাত্র সন্তান, তাই খুবই আদরের ছিলাম। রজতদাকে বাবা আমার প্রাইভেট টিউটর হিসেবে নিযুক্ত করলেন, আর ওদের বাড়ীর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও বাড়লো।

তারপর বাবা বদলী হলেন হাওড়ায়। আমরা যখন হাওড়ায় আসি, তারপরের বছর রজতদা বি-এ পাশ করে কলকাতায় এলেন, এম-এ পড়ার জন্য। বাবার অনুরোধে উনি আমাদের বাড়ীতে থেকেই পড়া-শোনা করতে লাগলেন, আর আমার পড়াশোনা ব্যাপারেও সাহায্য করতেন। আমি ম্যাট্রিক পাশ করলাম আর রজতদা এম-এ পাশ করে হাওড়ার একটা কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিলেন ---এই সময় আমার বাবা, করোনারী থ্রম্বসিসে অ্যাটাক হয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন।

চুপ করলো মালতী। ওর চোখ

দুটো জলে ভরে গেছে। আঁচলে চোখ মুছে আবার বললো সে---তারপর থেকে সুরু হলো আমাদের দুঃখ-দুর্দশার। বিশেষ কিছু ছিল না বাবার; সামান্য কয়েক হাজার টাকা যা ছিল বা তাঁর মৃত্যুর পর কিছু টাকা পাওয়া গেল ঐসব মিশিয়ে কলকাতায় খুব ছোট্ট একটা বাড়ী কিনে দিলেন আমার মামারা। দোতলায় দুটি ঘর নিয়ে আমরা রইলাম, আর একতলাটা ভাড়া দেওয়া হল। রজতদা আমাদের কাছেই রইলেন। মা ওঁকে ঠিক নিজের ছেলের মত ভালোবাসতেন।

একটু থামলো মালতী। বাগানে খেলা করছিলো দুটো শালিক পাখী, সেই দিকে চেয়ে, যেন কি ভাবলো, তারপর বললো---এই ঘটনার বোধহয় বছরখানেক পরে সিনেমায় নামলেন রজতদা। অধ্যাপনা ছেড়ে দিলেন। মা শুনে খুব রাগ করলেন। রজতদা বোঝালেন মাকে, ভালোভাবে বাঁচতে গেলে যে রকম টাকার প্রয়োজন সে-টাকা ঐ মাস্টারীতে সারা জীবন ধরে করলেও মিলবে না। তাই যখন একটা চান্স পাচ্ছি ছবিতে, ঐ লাইনে একবার নাম করতে পারলে, অনেক টাকা আসবে।

সিনেমায় আসার কিছুদিন পরেই রজতদা চলে গেলেন একটা হোটেলে---কারণ বেলগাছিয়া থেকে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছিলো ওঁর।

এদিকে ঐ সামান্য বাড়ীভাড়ায় আমাদের সংসার চলে না, তাই রজতদাকে ধরলাম, ঐ সিনেমায় আমার একটু সুযোগ করে দেবার জন্য। রজতদার চেষ্টায় সে সুযোগ পেলাম আমি। কিন্তু মুস্কিল হল মাকে নিয়ে। কিছুতেই রাজী করাতে পারি না তাঁকে। তারপর আমি আর রজতদা দুজনে মিলে, অনেক বুঝিয়ে রাজী করালাম তাঁকে। বড় কিছু পার্ট এখনও পাইনি। কখনও পাবো বলে মনে হয় না, কারণ চেহারা তো আমার সুন্দর নয়। বেদনা ছলছল দুটি করুণ চোখ তুলে আমার দিকে চাইলো মালতী।

আমি বললাম---তোমার চেহারা সুন্দর নয়, একথা আমি স্বীকার করি না মালতী। গায়ের রংটাই একমাত্র সৌন্দর্যের মাপকাঠি নয়। আর যে রকম দরদভরা তোমার অভিনয় দেখলাম আজ, আমার স্থির বিশ্বাস যে, তুমি একদিন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর মর্যাদা পাবেই। আহা, এই বয়সে বড্ড দুঃখ পেয়েছো ভাই, পরে তেমনি সুখও পাবে তুমি, দিদির একথাটা বিশ্বাস কোরো।

পাওয়ার সায়েব এতক্ষণ শুনছিলো আমাদের কথাবার্তাগুলো। সে যে উপস্থিত আছে আমাদের মাঝখানে বা তার সঙ্গে মালতীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত---এ সব এতক্ষণ আমার মনে ছিল না। একটু অধৈর্যভাবে বললো পাওয়ার সায়েব,-----আর কতক্ষণ থাকতে চাও সিস্টার? যদি অনুমতি কর, তাহলে আমি বাড়ী যেতে পারি, অনেক কাজ আছে।

ঈষৎ লজ্জিত হলাম ওর কথায়। মালতী আশ্চর্য চোখে চাইলো পাওয়ার সায়েবের দিকে।

আমি মৃদু হাসির সঙ্গে বললাম---এতক্ষণে যে এঁর পরিচয় জানানো হয়নি তোমাকে মালতী। ইনি বিখ্যাত গীটারবাদক পাওয়ার সায়েব, আর আমার সত্যিকারের ভাই। কি চমৎকার যে গীটার বাজান, তুমি শুনলে বলবে যে, এমন চমৎকার বাজনা আগে কখনও শুনিনি।

---তোমার ভাই? তাহলে তো আমারও দাদাভাই! ভারি মজা! মাকে গিয়ে বলবো, আজ হঠাৎ-পাওয়া দাদা-দিদির কথা। মার খু-উ-ব আনন্দ হবে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত মালতী দুহাত দিয়ে ধরলো---আমাদের দুজনের হাত। তারপরে বললো,---দাদাভাই! আমার মাকে গীটার শোনাবে তো? একদিন দুজনে চলে এস আমার সেই ছোট্ট বাড়ীতে। বাড়ীটা ভালো লাগবে না, কিন্তু আমার মাকে খুব ভালো লাগবে, আর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে বলবে যে, এমন সুন্দর রান্না আর খাইনি।

খুব ভালো লাগছিলো আমার মালতীকে, তবুও আর বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে সাহস হল না। কারণ সমাজে আমি যে মৃতা। রজতের সঙ্গে সম্পর্কটা যতক্ষণ না আইনসিদ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ আমার পরিচয় তো রীতিমত গোলমেলে।

পাওয়ার সায়েব বুঝি এখন ভুলে গেছে যাবার কথা, তাই নিশ্চিন্তভাবে বসে, মাথা নেড়ে হাসছিলো আর বলছিলো, হাঁ, হাঁ ঠিক্ ঠিক্, জরুর, জরুর। মালতীর ঠিকানা জেনে নিল পাওয়ার। আমি নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম---আজ চলি ভাই মালতী, অবশ্যই যাবো তোমাদের বাড়ীতে, আর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে পরখ করবো তোমার কথার দামটা। আর তুমি দাদারের গীটার শুনে, আমার কথার দাম, যাচাই করে নেবে সেদিন।

---আচ্ছা দিদি! মিষ্টি হাসির সঙ্গে আমাদের বিদায় জানালো মালতী।

●

রাত দশটায় গ্যারেজে গাড়ী রেখে, ওপরে এসে ক্লান্তভাবে ডিভানে দেহটা এলিয়ে দিল রজত।

পাওয়ার সায়েব কফি দিয়ে গেল দুজনকে। কফি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলো রজত, কাকে কি রকম লাগলো বা অভিনয় কারটা ভালো লাগলো বেশী।

"---তোমার আর মালতীর অভিনয় আমার বেশী ভালো লাগলো। শুধু অভিনয় নয়, ঐ মেয়েটিকে আমার ভারি মিষ্টি লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যেই কেমন আপন করে নিলো আমাকে, আর দিদি বলে ডাকলো। কিন্তু ভারি মুস্কিলে পড়েছিলাম, যখন ও জানতে চাইলো যে, আমি তোমার কি রকম বোন হই?

---আচ্ছা, তুমি হঠাৎ আমার বোন পরিচয় দিলে কেন বলো তো?

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে আমি প্রশ্ন করলাম রজতকে।

---তা ছাড়া আর কি বলা যায় বলো? যদি বলি আমার ভাবি-বৌ, তাহলে চারিধার থেকে এমন সব কৌতূহলের বাণ এসে বিঁধবে এ ব্যাচারাকে, যে তার পৈত্রিক প্রাণটা তখন খাবি খেতে থাকবে, বলো সেটাই কি ভালো হবে? তার চেয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই সকলে একদিন জানবেই আমাদের আসল পরিচয়টা, তখন আর কারুর কৌতূহল মেটাবার দায় থাকবে না আমাদের। ---হ্যাঁ। আরেকটা কথা বলি তোমাকে, ঐ মালতী পাইনকে বিশেষ আমল না দেওয়াই ভালো। বড্ড হালকা স্বভাবের মেয়েটি। অবস্থা খারাপ ওদের তাই আমিই ওকে এনেছিলাম সিনেমায়, দু' তিনটে বই-এ কাজও পেয়েছে, কিন্তু নাম করতে পারেনি তার কারণ খালি আড্ডার দিকেই ঝোঁক ওর বেশী, অভিনয় শিক্ষায় তেমন মন নেই।

আমি বাধা দিলাম রজতের কথায় ---কেন? তোমার অবাঞ্ছিতা স্ত্রীর ভূমিকায় তো চমৎকার অভিনয় কর-ছিলো মালতী? আমার তো চোখে জল এসেছিল, ওর অভিনয় দেখে।

---হ্যাঁ। ঐ একটা রোলেই ও সাক্‌সেসফুল। কিন্তু সব বইতে তো আর ঐ ধরণের পার্ট থাকে না। তাই ওর ভালো চান্স-এরও সুযোগ কম। সব রকম চরিত্রে যার অভিনয়দক্ষতা আছে, তারই চাহিদা বেশী। জবাব দিল রজত।

---সে কথা ঠিক্‌। যেমন তুমি। ওর দিকে চেয়ে হালকা পরিহাসের সুরে বললাম,---আচ্ছা দুটো বিপরীত-ধর্মী পার্ট তুমি একসঙ্গে কেমন করে অমন নিখুঁতভাবে করলে বলো তো? একটি হচ্ছে হৃদয়বাণ প্রেমিকের ভূমিকা, আর অপরটি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, প্রতারক স্বামীর। ভারি আশ্চর্য লাগ-ছিলো আমার।

---হ্যাঁ ঠিক বলেছো। একসঙ্গে দুটো রোল্‌কে স্বাভাবিকভাবে ফোটানো ভারি শক্ত কাজ। আর সব ধরণের চরিত্রে স্বাভাবিক অভিনয় করতে পারলেই প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার মর্যাদা পাওয়া যায়। কথা থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললো রজত---আচ্ছা ঐ সঞ্চিতা হালদার, মানে, আমার প্রেমিকের পার্টে যে ছিল, তাকে তোমার কেমন লাগলো?

---মন্দ নয়। মানে, কি জানো? ঐ ধরণের পার্ট মনে ঠিক ছাপ রাখে না। তবে মেয়েটির চেহারা বেশ ভালো। সংক্ষেপে জবাব দিলাম আমি।

---ঠিক তাই। সিগারেটের ধোঁয়া আমেজ করে ধীরে ধীরে ছাড়তে ছাড়তে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি রেখে, মৃদুকণ্ঠে বললো রজত।

[ক্রমশ।

স্কেচ্‌ শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার

সেজুয়ানের রাশিয়ান প্রডাকসনের একটি দৃশ্য

সেজুয়ানের মহৎ নারী

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[শেন্‌টের দোকানের সামনে কিছু-দূরে একটি নাপিতের দোকান। তারপরে একটি কার্পেন্টের দোকান। আজ সোমবার। শেন্‌টের দোকানের সামনে আটজনের সংসারের দুজন---অর্থাৎ ঠাকুরদা ও ভাইয়ের বৌ দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে বেকার লোকটি এবং মিসেস সিন।]

মহিলা। শেন্‌টে কাল রাত্তিরে ফেরেনি।

মিসেস সিন। অদ্ভুত ব্যবহার। কাজিনটির হাত থেকে উদ্ধার পেলাম---ভাবলাম বাধা দেবার কেউ নেই, এবার শেন্‌টের হাত থেকে একমুঠো চাল পেতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু কাল সারারাত ধরে মেয়েটা কোথায় কোথায় চুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে কে জানে!

[নাপিতের দোকান থেকে চিৎকার শোনা যাবে। ওয়াং টলতে টলতে বেরিয়ে আসবে, আর তার পেছনে ষণ্ডামার্কা নাপিত মিঃ স্নফু। তার হাতে একটা ডাণ্ডা।]

স্নফু। আমার দোকানে এসে খরিদ্দারদের তোর ঐ পচা জল খাবার জন্যে যদি ফের জ্বালাতে আসবি, এমন উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব---এই নে হতভাগা তোর মগ---বেরো এখান থেকে।

বেরটল্ট ব্রেশট

[মগটা নেবার জন্যে ওয়াং হাত বাড়িয়ে দেবে এবং কি বলতে যাবে---এক ঘা ডাণ্ডার বাড়ি তার হাতের ওপর পড়বে---মগটা ছিটকে পড়বে।]

স্নফু। এই এক ঘা দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আমার দোকানের কাছে এলে কিভাবে মার খাবি।

(স্নফু নিজের দোকানে চলে যাবে)

বেকার। (মগটা কুড়িয়ে ওয়াংকে দেবে) এভাবে তোমাকে মারবার জন্যে পুলিশে নালিশ করো।

ওয়াং। হাতটা একেবারে গেছে।

বেকার। ভাঙ্গে নি তো ?

ওয়াং। একেবারে নাড়তে পারছি না।

বেকার। তুমি বসো, আমি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিচ্ছি হাতটার ওপর।

মহিলা। আটটা বাজতে চললো, মেয়েটার দেখা নেই। কোথায় হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে কে জানে।

মিসেস সিন। আমাদের কথাও ভুলেই গেছে।

[রাস্তা দিয়ে শেন্‌টেকে আসতে দেখা যাবে---হাতে একপাত্র চাল]

শেন্‌টে। (দর্শকদের) ভোরবেলায় উঠে শহরটাকে দেখবার সুযোগ কোনোদিন হয়নি। এই সময়টার চিরকাল বিছানায় শুয়ে কাটাতাম। মাথা পর্যন্ত নোংরা কম্বলটা দিয়ে ঢাকা থাকতো। ঘুম ভেঙ্গে উঠতে ভয় হোতো। আজ ভোরে রাস্তায় কত লোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। খবরের কাগজ বিক্রি করছে যেসব ছেলেরা, রাস্তায় ময়লা ধুয়ে যারা সাফ করছে, বলছে টানা গাড়িতে যারা মাঠ থেকে টাট্‌কা সাবু নিয়ে আসছে শহরে। স্নুনের পাড়া থেকে এখানে আসতে লম্বা রাস্তা। কিন্তু বেশ লাগছিল এই পথটা হাঁটতে---পা ফেলবার তালে তালে মনটা খুশিতে ভরে উঠছিল। শুনেছি লোকে যখন ভালবাসতে শেখে তার দেহমন একেবারে বাতাসের থেকেও হাল্কা হ'য়ে যায়। এখানে আপনাদের মধ্যে যাঁরা প্রেমে পড়েন নি---তাঁদের বলি অনেক কিছুই আপনারা 'মিস' করছেন। (দোকানের সামনের লোকদের প্রতি) এই নাও তোমাদের চাল---(সবাইকে চাল ভাগ করে দিতে থাকবে---ওয়াং-এর দিকে নজর পড়াতে) গুড্ মর্নিং ওয়াং, আজ আমার মনটা একেবারে হাল্কা হ'য়ে গেছে। সারা রাস্তায় দোকানের কাঁচগুলোতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছি। দেখতে দেখতে বুঝতে পেরেছি আমার একটা শাল কেনা দরকার। গায়ের ওপর একটা শাল জড়িয়ে দিলেই আমি আরও সুন্দর হয়ে উঠব

[শেন্‌টে কার্পেটের দোকানে চলে যাবে, সুফু নিজের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবে এবং দর্শকদের উদ্দেশে বলবে]

সুফু। বুঝলেন মশায়রা। আজ ঐ তামাকের দোকানের মালিক মিস শেন্‌টের সৌন্দর্য দেখে আমি একেবারে যাকে বলে, অভিভূত হ'য়ে গেছি। এর আগে ওঁকে ভাল করে নজর করেই দেখিনি। তিন মিনিট ধরে নিজের দোকানে দাঁড়িয়ে ওঁর রূপমাধুরী পান করলাম। আর তার ফল হোলো এই---আমার মনে হচ্ছে আমি ওঁর প্রেমে পড়ে গেছি। সম্পূর্ণ মনোহারিণী চেহারা! (হঠাৎ ওয়াংকে দেখে) এই হতভাগা, এখুনি এখান থেকে দূর হয়ে যা।

[নিজের দোকানে ফিরে যাবে সুফু। শেন্‌টে এবং অতিবৃদ্ধ দম্পতি অর্থাৎ কার্পেট-ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রী তাদের দোকান থেকে বেরিয়ে আসবে। শেন্‌টের হাতে একটি শাল, বৃদ্ধের হাতে আয়না]

বৃদ্ধা। এ শালটা ভারি সুন্দর। অথচ সস্তা দামের। নিচের দিকে অবশ্য একটা ছোট ফুটো আছে।

শেন্‌টে। (কার্পেটওয়ালীর হাতের শালের একটা দিক রেখে দেখবে কেমন দেখ্‌তে লাগছে) আমার শালটাও ভাল লেগেছিল।

বৃদ্ধা। (হাসির সঙ্গে) ওটা একেবারে নতুন---দাম বেশি।

শেন্‌টে। না, অত দাম দিয়ে কেনবার টাকা আমার নেই। ছোট্ট দোকান, আয়ও অল্প তার ওপর কত রকমের যে খরচ।

বৃদ্ধা। অত দাতব্য কোরোনা তুমি। নতুন দোকান খুলেছ---প্রতিটি পয়সা বুঝে শুনে খরচ করবে।

শেন্‌টে। (শালটা গায়ে দিয়ে) রংটা আমাকে কেমন মানাচ্ছে?

বৃদ্ধা। (বিনীতভাবে) ভারি সুন্দর লাগছে।

(শেন্‌টে দাম দিয়ে দেবে)

বৃদ্ধা। এটা যদি তোমার ভাল না লাগে, আমাকে বললেই বদলে দেব। তোমার ওই প্রেমিকের টাকা-পয়সা আছে তো?

শেন্‌টে। (হাসতে হাসতে) একেবারে কপর্দকশূন্য।

বৃদ্ধা। তুমি ছ'মাসের ভাড়া দেবে কি করে?

শেন্‌টে। এই দ্যাখো, ভাড়া দেবার কথাটা একেবারে ভুলে গেছিলাম।

বৃদ্ধা। আমিও তাই ভাবছিলাম। আর সোমবারই তো মাসের প্রথম দিন। আমি একটা কথা বলি---শোন, আমি আর আমার স্বামী তোমাকে জানবার সুযোগ পেয়েছি এই ক'দিনেই---তোমার বিয়ের ওই বিজ্ঞাপনটা দেখেই আমরা সন্দিহান হয়ে উঠেছি। তারপর আমরা ঠিক করেছি, দরকার হলে তোমাকে আমরা সাহায্য করবো। আমাদের কিছু জমানো টাকা আছে। তার থেকে দু'শ রূপোর ডলার আমরা তোমাকে ধার দিতে পারি। তোমার ইচ্ছা হলে দোকানের মাল বন্ধক হিসাবে রাখতে পারো। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কিছু লিখিত চুক্তি করবার দরকার হবে না।

শেন্‌টে। আমার মতো বোকা মেয়েকে টাকা ধার দেবে?

বৃদ্ধা। তোমার কাজিন তো আর বোকা নয়---কিন্তু তাকেও ধার দিতে হলে আমরা দুবার করে ভাবতাম। কিন্তু তোমাকে আমরা খুশি মনেই ধার দেব। আচ্ছা।---এই নেও টাকা। (খাম দেবে)।

বৃদ্ধ। (এগিয়ে এসে) কি, তোমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে?

শেন্‌টে। মিস্টার ডেঙ্গ, আমি ভাবছিলাম দেবতারা যদি একটু আগে তোমার স্ত্রীর কথাটা শুন্‌তে পেতেন। দেবতারা নাকি সৎ এবং ভাল লোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যাক্ আমি প্রেমে পড়ে যে বিপদে পড়েছি, তোমরা খুশী হয়ে টাকা দিয়ে আমাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ।

(ওরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হাসবে)

বৃদ্ধ। এই নাও টাকা।

[একটা খাম শেন্‌টেকে দেবে---শেন্‌টে সেটা নিয়ে বাও করবে। ওরাও বাও করে নিজেদের দোকানে চলে যাবে]

শেন্‌টে। (ওয়াংকে খামটা দেখিয়ে) দ্যাখো ছ'মাসের ভাড়া---একটা মিরাক্‌ল্‌-এর ব্যাপারটা ঘটল। আমার নতুন শালটা কেমন হয়েছে ওয়াং?

ওয়াং। এটা কি তোমার প্রেমিকের জন্য কিনলে?

শেন্‌টে। ঠিকই বলেছ।

মিসেস সিন। ওর হাতটা যে মারের চোটে ভেঙ্গে গেছে তা দেখেছ?

শেন্‌টে। (ভয়ে ভয়ে) তোমার হাতে হয়েছে ওয়াং?

মিসেস সিন। ওই নাপতে ব্যাটা ডাণ্ডা দিয়ে ওকে মারাত্মকভাবে পিটিয়েছে, আমরা সবাই দেখেছি।

শেন্‌টে। শীগ্‌গির ডাক্তারের কাছে যাও ওয়াং, চিকিৎসা না করলে হাতটা শক্ত হ'য়ে যাবে। ও হাত দিয়ে আর কোনো কাজ করতে পারবে না।

বেকার। ডাক্তারের দরকার নেই। ওর এখন যাওয়া দরকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। নাপতেটা বেশ ধনী। ওর কাছ থেকে প্রচুর খেসারৎ আদায় করে নিতে পারবে ওয়াং।

মিসেস সিন। তোমার একজন সাক্ষীর দরকার হবে। যে নিজের চোখে মারপিটটা দেখেছে।

ওয়াং। তোমরা সবাই তো এখানে ছিলে---তোমরাই তো সাক্ষী হতে পারবে।

(ওখানকার কেউ ওর দিকে মুখ তুলে তাকাবে না)

শেন্‌টে। মিসেস সিন, তুমিও তো এখানে নিজের চোখেই সব দেখেছ?

মিসেস সিন। পুলিশের ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে চাই না।

শেনটে। (ভাইয়ের বৌকে) তুমি কি বল?

মহিলা। আমি? আমি সে সময় অন্যদিকে চেয়েছিলুম---আমি কিছু দেখিনি।

মিসেস সিন। মিছেকথা বোলো না। আমি দেখেছি তুমি এই দিকেই চেয়েছিলে --- নাপতে ব্যাটার অনেক টাকা আছে। ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে তুমি ভয় পাচ্ছো।

শেন্‌টে। (ঠাকুদাকে) তুমি নিশ্চয়ই সত্যিকথা বলতে ভয় পাবে না।

মহিলা। কেউ ওঁর কথায় বিশ্বাস করবে না।---উনি তো চোখেই দেখতে পান না।

শেন্‌টে। (বেকারকে) তুমি?

বেকার। আমার সাক্ষ্যে ফল হবে না। দুবার ভিক্ষে করবার অপরাধে থানায় আমার নাম তোলা আছে।

শেনটে। (অবিশ্বাস ভরে) তোমরা কি বলতে চাও চোখের ওপরে এই মারাত্মক কাণ্ডটা দেখেও তোমরা কেউ সাক্ষ্য দেবে না?

(বিরক্তি ভরে দর্শকদের প্রতি) এইবার হতভাগারা চোখের ওপর একজন নির্যাতিত হ'ল তবু সবাই চুপ করে আছে---আহত লোকটা ছট্‌ফট করছে এরা তবু নির্বাক এবং নিস্তব্ধ দাম্ভিক অত্যাচারী লোকটা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে--- আর এরা বলছে ব্যাপারটা গোপন রাখাই ভাল নইলে আবার আমাদেরও অত্যাচার সহ্য করতে হবে। এটা কি ধরণের শহর, এখানকার মানুষেরা কি দিয়ে গড়া। অত্যাচার দেখলেই তার বিরুদ্ধে সবাই যদি মুখ তুলে না দাঁড়ায় সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার না করে দেয়, তবে অত্যাচারও কখনও থামবে না। ওয়াং, যারা দেখেছে তারা যখন সাক্ষী দেবে না, তখন না দেখেও আমি বলবো আমি দেখেছি।

মিসেস সিন। তাতে পারজারি হবে।

ওয়াং। হাতের ফোলাটা কি কমে আসছে?

বেকার। না, একটুও কমেনি।

ওয়াং। (এক হাত দিয়ে অন্য হাতটা ধরে) আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই চললাম।

(চলে যাবে)

শেন্‌টে। তোমরাও আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও।

(সবাই বেরিয়ে যাবে)

[সুন-এর বোন মিস ইয়াং এসে হাজির হবে।]

মিস ইয়াং। তুমি মিস্ শেন্‌টে। আমার ভাই সুনের কাছ থেকে সব শুনেছি। শোন, ভাল খবর আছে। সুন বোধহয় পাইলটের চাকরি পাবে। পেকিং থেকে আজ সকালে একটা চিঠি এসেছে---ডাক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখেছেন।

শেন্‌টে। খুব ভাল খবর---সুন তাহলে আবার আকাশে উড়তে পারবে।

মিস ইয়াং। কিন্তু এর জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। পাঁচশো রূপোর ডলার।

শেন্‌টে। অনেক টাকার ব্যাপার---কিন্তু টাকার কথা ভাবলে চলবে না। অন্তত আমার দোকানটা যতক্ষণ আছে।

মিস ইয়াং। তুমি ভারি ভালো মেয়ে।

শেন্‌টে। কিন্তু দোকান থেকে তো সব টাকা উঠবে না। যে দুশো রূপোর ডলার আমার কাছে আছে, তাও ধার করা টাকা। দোকানের মালপত্র বেচে দিয়ে ধারটা শোধ করে দেব।

(টাকার খামটা মিস ইয়াংকে দেবে)

।। ধীরে ধীরে যবনিকা ।।

[ক্রমশ।

অনুবাদক—অশোক সেন

সুখ ও দুঃখ

সুধীর বেরা

সুখ দুঃখ মানসিক অবস্থান্তর মাত্র।
কালের পরিমাপে
দুই-ই এক।
জীবন দ্রুতলয়ে চলে—
মাঝে মাঝে গতি স্খলিত হলেও
স্তব্ধ হয় না।
পিছনে পড়ে থাকে স্মৃতি
সুখের, দুঃখের।
কিন্তু তারা সমান
কারণ তারা স্মৃতিমাত্র।
মৃতদেহ

সাধু অসাধুর মধ্যে যেমন ভেদ নাই।
মরা সুখ আর মরা দুঃখ
তাই সমান।
জীবনে পেয়েছি
সুখ দুঃখ দুই-ই।
আজো পাচ্ছি।
কখনো হই ডগমগ খুশিতে
কখন মুষড়ে পড়ি ব্যথায়।
দিন যায়।

অনুভূতির তীব্রতা
ক্ষীণ-ক্ষীণতর হয়ে আসে।
কিন্তু চমকে উঠি
যখন দেখি—
পাঁচ বছর আগে পাওয়া ব্যথা
আর পাঁচ বছর আগে পাওয়া সুখ
দুই একাকার হয়ে যায়,
সহ অবস্থান করে
স্মৃতির যাদুঘরে।

ছেলেটা বলল, বাবু এবার উঠে পড়ুন, গার্ড ফেলাগ নাড়ছে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছেলেটার সঙ্গে গল্প করছিল নিখিলেশ। আর কিছুটা পরিতৃপ্তির সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। চতুর্দিকে অবিমিশ্র চীৎকার, উঁচু-নীচু গ্রামের কত গলার স্বর, ছুটোছুটি, ঠেলাঠেলি, উৎকণ্ঠা—সব কিছুর দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে বড় তৃপ্তির সঙ্গে বিচার করছিল। এই রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ এবং স্থান দখল করবার নিদারুণ দুশ্চিন্তা থেকে সে মুক্ত। যদিও সে একা, যদিও তার সঙ্গে লটবহর সামান্য, তবুও সামান্য কিছু বুদ্ধি, পরিচিত কিছু কৌশল এবং সমস্ত রাত সোজা হয়ে শোবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ কিছু অর্থব্যয়।

তাড়াতাড়ি আসাটা ঠিক হওয়ায় রিজার্ভেশনের সুযোগ পায়নি নিখিলেশ। কিন্তু যে বন্দোবস্ত সে করেছে, তা রিজার্ভেশনের চেয়ে কম নয়।

বাবু উঠুন, ট্রেন চলতে সুরু করেছে, ছেলেটা একটু যেন আতঙ্কের সঙ্গে বলল।

হ্যাণ্ডেলটা ধরে পা-দানিতে পা রাখল নিখিলেশ। দরজা থেকেই লোক দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক। নিখিলেশ নিশ্চিন্ত। ট্রেন অন্তত বাগনান পেরুক তারপর কষে একটা ঘুম দেওয়া যাবে।

দগ্ধ সিগারেটের শেষাংশটা ছুঁড়ে ফেলে ভেতরে প্রবেশ করবার চেষ্টায় নিযুক্ত হল নিখিলেশ।

রজত রায়চৌধুরী

সরু করিডোর। বাঁদিকে ছোট ছোট খুপরি। করিডোরটা ভর্তি। গিসগিস করছে লোকে। অত্যন্ত সন্তর্পণে এর পা বাঁচিয়ে ওর ছোঁয়া এড়িয়ে নির্দিষ্ট খুপরির কাছে এসে থামল নিখিলেশ। ভেতরের সঙ্কীর্ণ প্যাসেজের মুখেই সপরিবারে মেঝেতে আশ্রয় নিয়েছেন একজন ভদ্রমহিলা। অগত্যা ঐখান থেকেই কসরৎ করে বাঙ্কে উঠে বসল নিখিলেশ।

এবার নিশ্চিন্ত। ফুঁ দিয়ে ফোলানো রবারের মাথার বালিশটা ঠিক করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

জানালার বাইরে অন্ধকার। চিকির-চিকির করে চলেছে ট্রেন। হাতঘড়ি দেখল নিখিলেশ। দশটা দশ। অন্যান্য দিন এ সময় বাড়িও ফেরে না সে। আর আজ এখনই সে শুয়ে পড়েছে এবং ঘুমিয়েও পড়বে অচিরে।

কামরার ভেতরের কলগুঞ্জন কমে এসেছে। ওদিকের কোনো একটা খুপরির থেকে ট্রানজিসটারে বোধ হয় কাওয়ালি গান স্বর তুলেছে।

বুঝলে, শিবুটার ঘাড় সোজা করে দাও---নইলে ঘাড়ে ব্যথা হবে---পুরুষের কণ্ঠস্বর।

কি করব, একে কি বলে যাওয়া। বাবা। এই নাকে খৎ আর ট্রেনে চড়ছি না---ভদ্রমহিলার ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

দুনিয়াটাই এ রকম বুঝলে, সবাই নিজের নিজের সুবিধেতে ব্যস্ত।

ওদিকের বাঙ্কের ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ভদ্রলোক ঈষৎ হাসলেন এবং হেসেই বুঝিয়ে দিলেন এ উক্তি তাঁদেরই লক্ষ্য করে। তারপর আর একবার ওই রকম হেসেই জানিয়ে দিলেন, নীরবতাই এর জবাব।

কায়দা করে চোখের তেরচা দৃষ্টি-টাকে নিচে নামাল নিখিলেশ। ওদিকের বেঞ্চে চারজন পুরুষ ও একজন মহিলা বসেছেন। নিচে মেঝেতে তিনটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এঁকেবেঁকে শুয়েছে এবং ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের জননীর কোলে আর একটি। বাচ্চার মুখটা আঁচলের তলায়। ভদ্রলোক বোধ হয় করিডোরের কোথায়ও আশ্রয় নিয়েছেন।

ছেলেটার কথা মনে পড়ল নিখিলেশের। কতই বা বয়েস। বছর বারো-তেরো হবে। অথচ এই বয়েসেই কেমন দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। লেখা-পড়া কতটুকুই বা। প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত। কিন্তু কি রকম চালাক-চতুর। এই অনিশ্চিত পথে নেমেছে কত সহজে।

কী ঝকৃকি রে বাবা! মোটে বসতে পারা যাচ্ছে না---এর মধ্যে আবার সব ঘুমোচ্ছে---নারীর কণ্ঠস্বর।

ঘুমোবে না কেন? তারা আগে উঠেছে। তুমি থাম---পুরুষের প্রত্যুত্তর।

ঝিকিরঝিকির শব্দটা কমে এল। কোথায় এল। বাগনান।

বাগনান। ছেলেটা বলেছিল, বাগনানেই ওর বাসা।

বাবা আছে, জিজ্ঞেস করেছিল নিখিলেশ।

আছে।

কী করে?

আগে মুদির দোকানের কর্মচারী ছিল, এখন ভিক্ষে করে।

ভিক্ষে করে? কেন?

অন্ধ হয়ে গেছে যে।

এর পর হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল নিখিলেশ।

স্টেশনে রোজ আসিস?

হ্যাঁ।

কখন আসিস।

আটটা নাগাদ।

কতদিন ধরে আসছিস।

মাস চারেক।

আগে কি করতিস?

বাবার হাত ধরে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতাম। ভিক্ষে করতাম।

এখন করিস না।

না বাবু। বাবা স্টেশনের বাইরে বসে ভিক্ষে করে। আর আমি---

থেমে গেল ছেলেটা।

তুই এই কাজ করিস। এই তো?

হ্যাঁ বাবু।

কত টাকা রোজগার হয় রোজ।

ঠিক নেই বাবু। তিন টাকা চার টাকা হয়।

ট্রেনটা চলছে। কামরাটা ট্রেন চুলু চুলু। ভদ্রমহিলা বসে বসে চোখ বুজেছেন। ঘুমোবার এতো আয়োজন, তবু একক'মরা ঘুমের মধ্যে কম এল না নিখিলেশের চোখে। জ'নলা দিয়ে বাতাস আসছে হয়ত। কিন্তু বাঙ্কের ওপর বাতাস বিশেষ নেই। গরম বোধ হওয়ায় উঠে বসল নিখিলেশ। তারপর নিতান্ত অভ্যাসবশত সিগারেট ধরাল একটা।

ওপাশের বাঙ্কের ভদ্রলোক বই পড়ছেন। ইংরেজি ডিটেকটিভ গল্পের বই। এবার তিনি বইটা বুকের ওপর উপুড় করে রেখে বললেন, ঘুম আসছে না।

ঠিক বলেছেন, সবাই ঘুমিয়ে পড়ল অথচ কেন যে ঘুম আসছে না, বলতে পারছি না।

ভদ্রলোক বললেন, আমি ভেবে-ছিলাম ছেলেটা আপনার সঙ্গে যাবে।

ছেলেটা। ও! না, ও কে না কে ওকে সঙ্গে নেব কেন?

তা নয়। আপনি যে রকম গল্প করছিলেন, একসঙ্গে চা খেলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনার এটেনডেণ্ট হয়তো।

এটেনডেণ্ট! মনে মনে হাসল নিখিলেশ। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল সে। ট্রেন তখনও প্ল্যাটফর্মে ইন করেনি। অথচ আসার সময় হয়ে এল। তাই অনেকটা এগিয়ে ব্রীজের তলায় দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, রানিং ট্রেনে না উঠতে পারলে সারারাত্তি বসে এবং জেগে কাটাতে হবে। ফলে কাল আপিসে বসে সারাদিন ঢুলতে হবে। এবং---

বাবু, আপনি কি রাউরকেল্লায় যাবেন?

ফিরে তাকাল নিখিলেশ। ছিটের ফুলহাতা সার্ট। হাফ প্যাণ্ট, খালি পা। শ্যামবর্ণ একটি ছেলে।

কি দরকার তোর?

আমি সিট রাখি কি না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

বাঙ্ক রাখতে পারবি একটা।

হ্যা। এই দেখুন না, আমার কাছে চাদর আছে, এই বলে প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা ময়লা ভাঁজকরা চাদর বার করল।

নিখিলেশের তবুও সন্দেহ গেল না। সোজাসুজি বললে, পারবি তো রাখতে?

কেন পারব না বাবু। রোজ রাখি, এই তো পুরীতে তুলে দিলাম এক বাবুকে।

বেশ, কত করে নিস।

বাঙ্ক তো?

হ্যাঁ।

এক টাকা দিতে হবে।

তাই পাবি।

ছেলেটা চলে গেল চোখের আড়ালে। ঘুরে ঘুরে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে চেনা মুখের অন্বেষণ করল নিখিলেশ। আশ্চর্য একটাও পরিচিত লোকের দেখা পাওয়া গেল না। মাইকে ঘোষণা হল, রাউরকেল্লা ছাড়বে দশটায়। ঘড়ির দিকে তাকাল নিখিলেশ। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে।

এমন সময় আবার দৌড়ে এল ছেলেটা। বললে, বাবু আপনি কোথায় যাবেন?

বড়াজামদা।

সেটা কোথায়?

গুয়ার কাছে?

গুয়া। ছেলেটা চটপট প্রশ্ন করল, গুয়া কোচে যাবেন?

গুয়া কোচে বড় ভিড় হয়। বাঙ্ক কি পাবি।

পাব। আপনি তাহলে এগিয়ে থাকবেন। ট্রেন আসবে এখুনি---বলে দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটা।

সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে প্রায় আঙুলের কাছে এসে পড়েছিল। সচকিত হয়ে নিখিলেশ সিগারেটের আগুনটা নিভিয়ে দিল। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক বই বন্ধ করেছেন। এবার ঘুমোবেন।

এবার নিখিলেশই প্রশ্ন করল, ঘুম এসে গেছে?

সম্রাট বাহাদুর শা' জফরের কয়েকটি দ্বিপদী

[শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শা' জফর উল্লেখযোগ্য উর্দু কবি। তাঁর সময়ে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে তাঁর দুই যুবক পুত্র মারা যায় এবং তিনি স্বয়ং সস্ত্রীক রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। সিপাহী বিদ্রোহ এবং তার পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে জফর কতগুলি দ্বিপদী রচনা করেছেন, সাধারণ পাঠকের কাছে যা কৌতূহলজনক হতে পারে। এমনি কয়েকটি দ্বিপদীর মূল উর্দু থেকে করা অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হল।---সম্পাদক।]

দিল্লী তো শুধু ছিল না শহর,
ছিল সে বাগিচা একও।
কত না শান্তি ছিল সেথা, আজ
উজাড় সে চেয়ে দেখো।

●

এ শহরে অপসরী ও পরী
ছিল সব, ছিল চাঁদ তারা।
কে লুণ্ঠন করে নিল সব,
কেবা জানে কোথা গেল তা'রা।

●

উজাড় এ নগরীতে
কিছু নাকি প্রাণ চায়।
কেবা কিবা পায় বল
অস্থির দুনিয়ায়।

●

কত কত দেখিয়াছি রূপ
এই বাগিচায়।
যত ফুল ফোটে হেথা আজ
অন্য গন্ধ তায়।

●

কী আনন্দ ছিল সকলের
প্রার্থনায় ছিল সবে রত।
ধ্বংসকারী এল যবে সেনা
যত ফল সব হল গত।

●

সর্বত্রই তীব্র আর্তনাদ,
ভাগ্যচক্র কেমন তা বলি বা কি করি।

সে মুকুট নাই, সে সিংহাসনও নাই,
নাই সেই শাহ্ আর নাই সে নগরী

●

ধ্বংস হল এ হিন্দের লোক,
কত না জুলুম হল কি বলি।
যারে দেখে এই জমানার রাজা,
বলে---'এ যোগ্য ফাঁসীর বলি।'

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

ফুলে মাপা যাবে হয় দিন রাত
দুখের কাঁটা সে কেমনে সহে।
কারাগারে পেয়ে শিকল সে জন,
'ফুলের বদলে মালা এ', কহে।

●

মাথার বোঝা এ শরীর আমার,
মরণের নাই, একটুও ডর।
মন্দ বার হলে কাটে তো দুঃখ,
জীবন আমার হল দুর্ভর।

●

রং রূপ মোর গিয়াছে বিগাড়ি,
বন্ধুরা সবে গিয়াছে ছাড়ি।
হল হেমন্তে উজাড় যে বাগ,
বাহারের ফল আমি হে তারি।

●

রক্ষক বা ঘাতকের পরে
বুলবুলের নাই অভিযোগ।

বসন্তের মৌসুম মাঝারে
ভাগ্যে মোর লেখা কারাভোগ।

●

বন্ধুরা মোরে জ্বালাল এত যে ছাড়ি'
চলিলাম দেশ,
শব্বার মতন জ্বলে কেঁদে আমি ছাড়ি
এই সমাবেশ।

●

মালাকার মোর দেয়নিক মত ছাড়ি
চলিবার লাগি
খুশীতে এসেছি, কাঁদিয়া বাগানে রহা
করিলাম শেষ।

●

আমার কবর লাগি
জমিন যদি গো পাই
যেমন তেমন হেথা,
অধিক নাহিকো চাই।

●

কত না মন্দ ভাগ্য তোমার জফর
আপন দেশে
কবরের লাগি দু' গজ জমিও মিলিল না
অবশেষে।

●

মরার পরে মোর কবরে
পড়ল না কেউ ফাতিহাও।
ভগ্ন কবর চিহ্ন ছিল,
পদাঘাতে ঘুচল তাও।

এবার নিখিলেশই প্রশ্ন করল, ঘুম এসে গেছে।

দেখি। ঘুমোতে তো হবে। ভদ্রলোক হাসলেন।

নিখিলেশ বললে, যা বলেছেন, অথচ দেখুন, ঘুমোতে পাবার জন্যই এক টাকা এক্স্ট্রা খরচ করেছি, কিন্তু ঘুম আসছে না।

ভদ্রলোক বললেন, ছেলেটা একটা টাকা নিয়েছে।

না দিয়ে উপায় কি বলুন, শুয়ে যেতে হবে তো? আপনি কত দিলেন?

আমি। ভদ্রলোক, মাথার বালিশটা উল্টে নেড়েচেড়ে নরম করে নিলেন; বললেন, আমি নিজেই জোগাড় করেছি, মানে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার আগেই দৌড়ে উঠেছি---আর---

নিখিলেশ তাকিয়ে রইল ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক শুয়ে চোখটা বুজে তারপর আবার খুলে বললেন, ছেলেটা চাকার তলাতেই চলে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি।

লেখকদের গ

ঈস্কাইলাসকে বলা হয় ট্র্যাজেডির জনক। আর সফোক্লিস ট্র্যাজেডির কুশলী শিল্পী। সফোক্লিসের বয়স যখন পঁচিশ তখন তিনি গুরু ঈস্কাইলাসকে নাটক প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেছিলেন। এর আগে সফোক্লিসের কোনো নাটকই অভিনীত হয় নি। দর্শকদের সামনে প্রথম যে নাটকের অভিনয় হলো তা-ই তাঁকে অকস্মাৎ খ্যাতির শীর্ষদেশে স্থাপন করল।

এই সাফল্য সফোক্লিসের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করল। অন্য সব কাজ ছেড়ে তিনি শুধু নাটক রচনায় মত্ত হয়ে গেলেন। দিনরাত্রি কেবল নাটক আর নাটক। একটা শেষ হয় তো আর একটি নতুন নাটক শুরু হয়। কেউ বাড়ী এলে নাটক পড়ে শোনাতে শুরু করেন।

তাঁর ছেলেরা বাবার উপর খুব চটে গেছে। সংসারের দিকে দৃষ্টি নেই, কেবল নাটক আর নাটক। কি হয় ও দিয়ে? এ সব বদ খেয়াল ছেড়ে যদি জমিজমার তদারক করতেন তাহলে আয় বাড়ত। কিন্তু বাবা কিছুতেই কথা শোনেন না, নাটকের নেশা থেকে তাঁকে মুক্ত করা অসম্ভব।

নিরুপায় হয়ে ছেলেরা আদালতের শরণাপন্ন হলো। বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সাংসারিক দায়িত্ব অবহেলা করেছেন। পিতার সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করা উচিত তা করেন নি। বাবা এখন বুড়ো-হাবড়া হয়ে গেছেন, তাঁর অভিভাবকত্ব আইনত ছেলেদের হাতে দেওয়া হোক।

আদালত থেকে শমন এলো। তিনি এখন অথর্ব, কেন তাঁকে ছেলেদের অভিভাবকত্বে দেওয়া হবে না তার কারণ দেখাও। সফোক্লিস আদালতে নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলেন; হাতে সদ্যসমাপ্ত নাটক ঈডিপাস অব কলোনস।

বিচারকরা অভিযোগের মর্ম বুঝিয়ে সফোক্লিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সম্বন্ধে আপনার কি বলবার আছে?

সফোক্লিস বললেন, হুজুর, আমি কিছুই বলব না। তবে যদি একটু সময় দেন তবে আমার নতুন লেখা থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাতে চাই।

অনুমতি পেয়ে নাটক পড়তে আরম্ভ করলেন। বিচারকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলেন শেষ পর্যন্ত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠ সমাপ্ত করে সফোক্লিস জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর, এই নাটক যে লিখতে পারে তার কি কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়?

---না, না---সমস্বরে বিচারকরা বলে উঠলেন। তাঁকে অভিযোগ থেকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে ছেলেদেরই বললেন, এমন বাবার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ আনে তারাই পাগল।

●

ষোড়শ শতকের দুই বিটিশ নাট্যকার---বোমোণ্ট ও ফ্লেচারের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। দু'জনে এক সঙ্গে কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। একটি নতুন নাটকের আইডিয়া মাথায় এসেছে। ঐতিহাসিক নাটক। দুই বন্ধু এক ট্যাভারনে এসে বসলেন। পরিকল্পিত ট্র্যাজেডির খসড়াটা শেষ করতে হবে। ফ্লেচার লিখবেন ইতিহাসের রাজাকে হত্যার অংশ। তিনি খসড়া শেষ করে বন্ধুকে শোনালেন।

এক পরিচারক কাছেই কোথাও ছিল। ফ্লেচারের কথা শুনে তার তো চক্ষুস্থির। তখন তো ষড়যন্ত্রের এই লোক দুটো রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তৎক্ষণাৎ খবর চলে গেল পুলিশের কাছে। দুই বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। তবে দুর্ভোগ বেশী দূর গড়ায়নি। নাট্যকারদের যখন পরিচয় পাওয়া গেল এবং নিঃসংশয়ে বোঝা গেল তাঁরা থিয়েটারের রাজাকে খুন করছিলেন, তখন তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

●

ফরাসী নাট্যকার মোলিয়ের নিজের নাটকে অভিনয় করতেন। তাঁর শেষ নাটক 'দি ইম্যাজিনারি ইনভ্যালিড', অভিনীত হয় ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে। কাহিনীর নায়ক নিজেকে সর্বদাই অসুস্থ মনে করে। মাথাব্যথা, বুক-ব্যথা, কাশি ইত্যাদি একটা যায় আর একটা আসে। রোগ-কল্পনা তার বিলাস, তার আনন্দ। এই চরিত্রে অভিনয় করছিলেন মোলিয়ের। নায়ক যদিও অসুস্থতার ভাণ করে, মোলিয়ের কিন্তু সত্যি অসুস্থ। বুকের ব্যথা আর কাশিতে ভুগছিলেন। সেদিন শেষ রাত্রির অভিনয়। মোলিয়ের খুবই অসুস্থ। খুব কাশি, বুকে নিজেই হাত বুলাচ্ছেন। দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখছে, হাসির রোলে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। এমন চমৎকার অভিনয়, যেন সত্যি অসুস্থ! মোলিয়ের যত ব্যথায় আকুল হন, কাশি যত বাড়ে, দর্শকরা তত বেশী তারিফ করে অভিনয়ের।

যখন কাশতে কাশতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন স্টেজের উপরে তখন তাঁকে বাড়ী আনা হলো। কয়েকবার রক্তবমির পরই তাঁর মৃত্যু হলো। থিয়েটার করবার জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা করতে সময় পান নি বলে মোলিয়েরকে খ্রীস্টান রীতি অনুযায়ী সমাধিস্থ করা সম্ভব হয় নি।

●

বার্নার দ্যঁ সাঁ-পীয়ের-এর নাম বাঙালী পাঠকের নিকট পরিচিত। এই ফরাসী লেখকের উপন্যাস 'পল

ও ভার্জিনিয়া' কিশোর রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। বিশ্ব-সাহিত্যে এ বই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি শেষ করে সাঁ-পীয়ের তাঁর শিল্পী বন্ধু ভারনার বাড়ীতে এক সাহিত্যসভায় কাহিনীটি পড়ে শোনালেন। সমকালীন বিখ্যাত ফরাসী লেখকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পড়া শেষ হবার পর একজনও একটি কথা বললেন না কেমন হয়েছে সে সম্বন্ধে। বরং তাঁদের আচরণে এটাই বোঝা গেল যে, কিছুই হয় নি।

খুব হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন সাঁ-পীয়ের। একজন দুজন নয়, অনেক লেখকের মিলিত অভিমত জানা গেছে। সুতরাং এ পাণ্ডুলিপি রেখে লাভ কি? ব্যর্থতার চিহ্ন উপস্থিত থাকলে সর্বদা কাঁটার মতো বিঁধবে। তার চেয়ে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।

পোড়াতে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর বন্ধু ভারনা এসে উপস্থিত। তিনি বাধা দিলেন। বললেন, আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে তোমার লেখা। তুমি ওসব বড় বড় লেখকরা কি বলছেন তা শুনতে যেও না। বই ছাপতে চাও, নিশ্চয় পাঠকদের ভালো লাগবে।

বন্ধুর উৎসাহে বই ছাপা হলো। আর তাঁর কথাও ফলল। হু-হু করে বিক্রি হতে লাগল সংস্করণের পর সংস্করণ। সাঁ-পীয়েরের অর্থাভাব দূর হয়ে গেল, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল য়ুরোপের সর্বত্র।

●

বিশ্ব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হেনরি ফীলডিং-এর 'টম জোনস'। উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি শেষ করেই ফীলডিং এক ছোট প্রকাশকের কাছে উপস্থিত। টাকার এত অভাব যে অপেক্ষা করতে পারছেন না। যত কম হোক রয়েলটি হিসাবে কিছু টাকা পেলেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশককে দিয়ে দেবেন। প্রকাশক কয়েকটি পাতা উল্টে-পাল্টে দেখে বলল, আজ কিছু বলতে পারব না, কাল আসবেন। পরদিন যেতেই প্রকাশক পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিয়ে বলল, এ বই ছাপাবার মতো সাহস নেই তার। এর গুণাগুণ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফীলডিং শেষবারের মতো অনুনয় করে বললেন, পঁচিশ পাউণ্ড পেলেও আমি পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেব।

এক বন্ধুর পরামর্শে পরদিন পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলেন আর এক প্রকাশকের কাছে। বড় প্রকাশক। প্রকাশক গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে স্ত্রীর মতামতের উপর নির্ভর করেন। কয়েকদিন পরে স্ত্রী পরামর্শ দিলেন, এ পাণ্ডুলিপি কিছুতেই যেন ছাড়া না হয়। প্রকাশক ফীলডিংকে আমন্ত্রণ করে বললেন, যদি দু'শো পাউণ্ডে রাজী হন, তবে এ বই ছাপাতে পারি।

প্রকাশক বলেছিলেন ভয়ে ভয়ে। হয়তো লেখক রাজী হবেন না এত কম পারিশ্রমিকে। ফীলডিং কিন্তু আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। এত বেশী পাওয়া ছিল ওঁর আশার অতীত। বন্ধুদের খাইয়ে দিলেন খুব করে। প্রকাশক তাঁর জীবিতকালে আঠারো হাজার পাউণ্ড এ বই থেকে লাভ করেছিলেন।

●

ওলিভার গোল্ড স্মিথ একবার চাকরির জন্য সাক্ষাৎকারে যাবেন। কিন্তু পোশাক এমনই মলিন ও জীর্ণ যে নিশ্চয়ই তাঁকে নির্বাচন করা হবে না, যদিও চাকরি খুবই সামান্য। অথচ একটা উপার্জনের ব্যবস্থা না হলে না খেয়ে মরতে হবে। সুতরাং 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকার প্রকাশকের সুপারিশে এক দোকান থেকে একসেট পোশাক ধার করে আনলেন। কথা রইলো, সাক্ষাৎকার হয়ে গেলেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল, গোল্ডস্মিথ পোষাক ফিরিয়ে দিচ্ছেন না। তাগিদের পর তাগিদ আসছে। কিন্তু গোল্ডস্মিথ ফেরৎ দেবেন কি করে? এমন কঠোর দারিদ্র্য যে লোভ সংবরণ করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। সাক্ষাৎকার থেকে বেরিয়েই ধার করা পোষাক বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল গোল্ডস্মিথকে। পোশাক ফেরৎ না দিলে প্রকাশক যখন জেলে যাবার ভয় দেখাল, তখন গোল্ডস্মিথ উত্তর দিলেন, সেটা বরং ভালো; বাইরে থাকলে সাংঘাতিক কিছু হয়ে যেতে পারে।

●

একবার একজন ছাত্র, গ্যেটের বাড়ী এসে উপস্থিত। বিখ্যাত লেখককে দেখতে চায়। এরকম অচেনা লোকের সঙ্গে তিনি সাধারণত দেখা করেন না,---বিশেষ করে যাদের কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই। যাই হোক, এই ছাত্রের অনুরোধে কি জানি কেন গ্যেটে রাজী হলেন। বসবার ঘরে ছাত্রটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গ্যেটে নীরবে ঘরে ঢুকলেন। একটি কথাও না বলে ঘরের মাঝখানে একটি চেয়ারে এসে বসলেন। গ্যেটের এই গম্ভীর নীরব আবির্ভাব ছাত্রটিকে অপ্রস্তুত করতে পারে নি। ঘরের মধ্যে একটি মোমবাতি জ্বলছিল। ছাত্রটি মোমবাতিটি হাতে করে প্রস্তরমূর্তির মতো অধিষ্ঠিত গ্যেটের চারপাশে ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কবিকে। দেখা শেষ হবার পর মোমবাতিটি যথাস্থানে রেখে একটি রৌপ্যমুদ্রা বের করল পকেট থেকে। দর্শনী হিসাবে সেই মুদ্রাটি গ্যেটের চোখে পড়ে এমন এক জায়গায় রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ছাত্রটি।

●

এডমণ্ড স্পেন্সার তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ফেয়ারী কুইন' সমাপ্ত করে আর্ল অব সাদাম্পটনের বাড়ী চলে গেলেন। শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আর্লের খুব নাম। কেউ তাঁর কাছ থেকে শুধু হাতে ফিরে আসে নি কোনদিন।

পাণ্ডুলিপি আর্লের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে স্পেন্সার বাইরের ঘরে বসে

আছেন। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে খুব ভালো লাগল। আর্ল স্পেন্সারকে কুড়ি পাউণ্ড পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে পড়া চলছে। আরো কিছুদূর পড়ে আবার কুড়ি পাউণ্ড দিতে বললেন। যতই পড়েন ততই ভালো লাগে; আর একবার কুড়ি পাউণ্ড পাঠানো হলো। ক্রমশ বেশী ভালো লাগছে। মুগ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছেন আর্ল। আর একবার কুড়ি পাউণ্ড পাঠাবার কথা বলতে গিয়েই তাঁর চৈতন্য হলো। দারোয়ানকে ডেকে বললেন, ওরে ওই যে কবি বসে আছে, তাকে এক্ষুণি বিদেয় করে দে। যেমন লেখা লিখেছে তার পুরস্কার দিতে গেলে আমি ফতুর হয়ে যাবো।

●

লেখকদের সহধর্মিণী সব সময় লেখার সহায় হন না। ফরাসী নাট্যকার রাসিন স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছেন উপেক্ষা, কোনো প্রেরণা পান নি। নাট্যকার হিসাবে রাসিনের খ্যাতি যখন ছড়িয়ে পড়েছে, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তখন তাঁর হঠাৎ ইচ্ছে হলো সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। কিন্তু গুরু বুঝিয়ে বললেন, তোমার পক্ষে সেই কঠিন জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। তুমি বিয়ে-থা করে সংসারী হও, সংসারধর্মেই শান্তি পাবে।

গুরুর নির্দেশে রাসিন বিয়ে করলেন। বিবাহ-পূর্ব প্রেমের প্রশ্ন ছিল না। বেশ গুরুগম্ভীর মহিলা; সংসারের দৈনন্দিন কাজ ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না। রাসিনের স্ত্রী স্বামীর একটি নাটকেরও অভিনয় দেখেন নি, নাটক পড়েন নি এবং এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। য়ুরোপের সর্বত্র স্বামীর নাম ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু স্ত্রীর মনে তার জন্য বিন্দুমাত্র গৌরববোধ ছিল না। সব নাটকের নামও তিনি শোনেননি। একবার চতুর্দশ লুই রাসিনকে পুরস্কৃত করলেন। মূল্যবান পুরস্কার বাড়ীতে এনে স্ত্রীকে ডেকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলতে গেলেন কিন্তু স্ত্রী থামিয়ে দিয়ে বললেন, রাখো, তোমার পুরস্কারের কথা। ছেলেটা যে দু'দিন যাবৎ বই হাতে করেনি আগে তার ব্যবস্থা করো দেখি।

●

সক্রেটিসের স্ত্রীর বদ্‌মেজাজের কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। স্বামীকে সর্বদা কঠোর কথা বলতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য কোনো শ্রদ্ধার লক্ষণ দেখা যেত না স্ত্রীর আচরণে। একদিন বিশ্রি গালাগাল দিয়েও তৃপ্ত না হয়ে স্ত্রী স্বামীর মাথায় একগামলা ময়লা জল ঢেলে দিলেন। শান্তকণ্ঠে দার্শনিক বললেন, হ্যাঁ, এত গর্জনের পর একটু বৃষ্টি তো হবেই।

●

মিলটন অন্ধ হবার পর যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তাঁর কথাবার্তা ছিল ক্ষুরধার। ডিউক অব বাকিংহাম এই নতুন স্ত্রীর রূপ দেখে প্রশংসা করে বললেন, এ যে গোলাপ।

অন্ধ কবি উত্তর দিলেন, গোলাপের রং কেমন বলতে পারব না। তবে তার কাঁটার খোঁচা রোজই পাই।

●

বিখ্যাত শিল্পী ও কবি উইলিয়াম ব্লেক যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না। তার জন্য যে তাঁদের জীবনে কোনো অশান্তি ছিল তার প্রমাণ নেই।

●

থ্যাকারের স্ত্রী ইসাবেলা তৃতীয় কন্যার জন্মের পরে উন্মাদ হয়ে যান। উন্মাদ স্ত্রীর ঝক্কি সামলাতে গিয়ে থ্যাকারের সাহিত্য-জীবনের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল।

●

জন্মের হিসাব দিয়ে প্রতিভার বিচার যে করা সম্ভব নয় তার প্রমাণ দেখা যায় লেখকদের জীবন থেকে। বিখ্যাত নাট্যকার মার্লোর জন্ম হয়েছিল মুচির ঘরে। রূপকথার যাদুকর হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনও মুচির ছেলে। কার্লাইলের বাবা ছিলেন পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরী করবার কুশলী মিস্ত্রী। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যাঁর কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তিনিও ছিলেন তাই। জ্যাক লণ্ডন ছিলেন এক পাগলাটে জ্যোতিষীর অবৈধ সন্তান।

●

অস্কার ওয়াইল্ডের ছেলেবেলা কেটেছে মা'র অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে। মা ছিলেন একটু ক্ষ্যাপাটে ধরণের। তাঁর ছিল মেয়ের শখ। তাই ছেলে জন্মাবার পর হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের শখ মেটাতেন ছেলেকে মেয়ের পোশাকে সাজিয়ে। ছেলেবেলায় অস্কার ওয়াইল্ডকে অনেকদিন মেয়ের পোশাক পরে থাকতে হয়েছে।

●

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সত্য ও সুন্দরের পূজারী, এ কথাই আমরা জানি। কিন্তু তিনিও একবার ভুল করেছিলেন এবং ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার মতো সাহস দেখাতে পারেন নি। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফ্রান্স গিয়েছিলেন এবং সেখানে ছিলেন প্রায় এক বছর। ওরলিয়াঁতে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় সম্ভ্রান্ত বংশের ফরাসী তরুণী অ্যানেট ভ্যালোঁর সঙ্গে। রুশোর সমাজ-দর্শন নিয়ে প্রথম তাঁদের মধ্যে আলাপ চলত। ক্রমশ নিরিবিলিতে দেখা হতে লাগল, হৃদয়-বিনিময় হলো। অ্যানেটের গর্ভে এলো কবির সন্তান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ডরোথির মাধ্যমে অ্যানেটকে বিয়ে করবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন বাবার কাছে। কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায় নি। বাধ্য ছেলের মতো পিতার নিষেধ স্বীকার করে অ্যানেটকে বিয়ে করবার অভিপ্রায় ত্যাগ করলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

●

শেলির একটা মজার শখ ছিল। তা হলো কাগজের নৌকা তৈরি করে জলে ভাসানো। জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তাঁর নৌকা ভাসানোর খেলার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠত। হাতের কাছে যত বাজে কাগজ সব শেষ হয়ে গেলে কম দরকারী চিঠি দিয়ে নৌকা

তৈরী করতেন আর জলে ভাসিয়ে চেয়ে থাকতেন। দেখতেন, নৌকার কি হয়, কতদূর যায়, কখন ডোবে। যেন কাগজের নৌকার সঙ্গে জীবনের যোগ আছে। জীবন আর কাগজের নৌকা দুই-ই ক্ষণস্থায়ী, দুই-ই অন্যের দ্বারা তাড়িত হয়। নিজের জীবনকে যেন দেখতে পেতেন নৌকার ভাগ্যের মধ্যে। তাই এ খেলায় ছিল তাঁর দুর্নিবার নেশা।

সঙ্গের সব কাগজ শেষ হয়ে গেলে বইয়ের ফ্লাই লীফ ছিঁড়ে নৌকা বানাতেন। শেলি দূরে বা কাছে যেখানেই বেড়াতে যেতেন সঙ্গে দু'একটি বই থাকত। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বহু বইয়েরই ফ্লাই লীফ ছিল না।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে এক নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীতে স্রোত দেখে তাঁর ঘুমন্ত নেশাটা জেগে উঠল। কিন্তু সঙ্গে একটুকরো কাগজও ছিল না। একটু আগে অন্যত্র সব কাগজ শেষ করে এসেছেন।

আর একবার পকেটে হাত দিলেন। হ্যাঁ, একটুকরো কাগজ আছে। তবে আজকের মূল্যমানে প্রায় এগারোশ' টাকার একটি ব্যাঙ্ক নোট। অনেকক্ষণ যাবৎ নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করলেন। তারপরে নেশার কাছে হার মানলেন। নোটটি পকেট থেকে বের করে নৌকা বানিয়ে ছেড়ে দিলেন নদীর জলে। দূরে ভেসে যেতেই অনুশোচনা হলো, ---এ কী করলেন! এই তো ছিল শেষ সম্বল। কিন্তু ভাগ্য সেদিন ছিল সুপ্রসন্ন। কিছুক্ষণ পরে বাতাসে মূল্যবান কাগজের নৌকা ভেসে এলো তাঁর পায়ের কাছে। তিনি সাগ্রহে তুলে নিলেন।

●

স্কট মাঝে মাঝে দু'একটি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু লেখক হবার কল্পনা তাঁর ছিল না। স্কট যখন সেলকার্ক শহরের শেরিফ, তখন সেখানে দেখা হলো স্কুলের পুরনো বন্ধু জেমস্ ব্যালেণ্টাইনের সঙ্গে। ব্যালেণ্টাইন ছাপাখানা খুলেছে, কিন্তু কাজ নেই। স্কট অনেকগুলি লোকগাথা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বন্ধুকে কাজ দেবার জন্যই সেই গাথাগুলি সম্পাদনা করে ছাপতে দিলেন। ছাপাখানার মালিক পয়সা পেলেন, কিন্তু লেখক প্রায় কিছুই পেলেন না। কারণ বই বিক্রি হয় নি।

বছর দুই পরে তাঁর নিজের লেখা 'দি লে অব দি লাস্ট মিন্‌স্ট্রেল' নামে গাথা-কাব্য ছাপা হলো বন্ধুর প্রেস থেকে। স্কট কখনো লেখক হবার কথা ভাবেন নি, তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল আইনজীবী হিসাবে সাফল্য অর্জন করা কিন্তু এই গাথা-কাব্য তাঁর জীবনের লক্ষ্য বদ্‌লে দিল। এত খ্যাতি পেলেন বই থেকে আর এত অর্থ যে, লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগল তাঁর মনে।

এবার কবিতা ছেড়ে উপন্যাস আরম্ভ করলেন। তাঁর বিখ্যাত 'ওয়েভালির' প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদ লেখা হবার পর এক বন্ধুকে দেখতে দিলেন। বন্ধু পড়ে হতাশ হয়ে বললেন, উপন্যাস লেখার হাত নেই তোমার। কিছু হয় নি, পুড়িয়ে ফেল।

স্কট দুঃখ পেলেন, তবু বন্ধুর কথা শুনে লেখা ছেড়ে দিলেন। তবে পাণ্ডুলিপি না পুড়িয়ে এককোণে ফেলে রাখলেন। আট বছর হয়ে গেছে। ভুলেই গেছেন পাণ্ডুলিপির কথা। হঠাৎ একদিন তাঁর হাতে পড়ল সেই সাতটি পরিচ্ছেদ। নিজে সবটা পড়ে দেখলেন। মন্দ লাগল না। নিজের ভালোলাগা তাঁকে আত্মবিশ্বাস এনে দিল। তিনি ধীরে ধীরে লিখে উপন্যাসটি শেষ করলেন। ছাপা হলো বন্ধুর প্রেসে। এটি ওয়েভালি সিরিজের প্রথম উপন্যাস। এ বইয়ে লেখকের নাম ছিল না।

ব্যালেণ্টাইনের অনুরোধে স্কট ব্যবসার অংশীদার হয়েছিলেন। গোপন ছিল কথাটা। অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল ওয়েভালি সিরিজের পর পর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি। কিন্তু কোন অলক্ষ্যে গর্ত দিয়ে ডুবে গেল লাভের অংশ, ব্যালেণ্টাইনের ব্যবসা ফেল পড়ল। ব্যালেণ্টাইন বুদ্ধি করে দেউলিয়া হিসাবে নাম লিখিয়ে ঋণের দায় থেকে মুক্তি পেলেন। স্কটের সঙ্গে ব্যবসায়ের যোগাযোগটা এমন ছিল যে, তাঁকে আইনত পাওনাদারের টাকা মেটাবার জন্য দায়ী করতে পারত না। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় সে দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিলেন। আজকের হিসাবে সে দেনার পরিমাণ প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা। স্কট নিজে দেনা শোধ করবার দায়িত্ব নেবার পর দিনরাত্রি কেবল লিখে চললেন। লেখার টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েও তিনি বলে গেছেন, কেউ লিখে নিয়েছে। শুধু পয়সার জন্য অনেক বাজে লেখাও তিনি লিখেছেন। জীবিতকালে স্কট অর্ধেক দেনা শোধ করে যেতে পেরেছিলেন, বাকী অর্ধেক শোধ হয়েছে মৃত্যুর পরে---কপিরাইট বিক্রি করে। যে টাকা শোধ না করলেও চলত---আর তাও পঁচিশ লক্ষ টাকা---তার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবার মতো দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে নেই।

●

হেমিংওয়ের জীবনেও রচনায় আদিম জীবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করেছেন, দুর্গম বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে ঘুরেছেন; তাঁর লেখার মধ্যেও এসব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায়। হেমিংওয়ের কয়েকটি বই বেরিয়ে যাবার পর ম্যাক্স ঈস্টম্যান তাঁর রচনার সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল এই যে, হেমিংওয়ের রচনায় এই যে অহেতুক শক্তির দম্ভ এর পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোনো দুর্বলতা আছে। সেই দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই শক্তির অনাবশ্যক প্রকাশ। এই সমালোচনা হেমিংওয়ের মনে যে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল

তা দীর্ঘকাল তিনি ভুলতে পারেন নি।

চার বছর পরের কথা। একদিন একটা কাজে হেমিংওয়ে প্রকাশক চার্লস স্ক্রিবনারস সন্স-এর দপ্তরে এসেছেন। উপদেষ্টা ম্যাক্সওয়েল পারকিন্সের ঘরে ঢুকেই দেখলেন ঈস্টম্যান বসে আছেন। তাঁকে দেখেই আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। একটা বিশ্রী গালি দিয়েই হেমিংওয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পারকিন্সের টেবিলের উপর ঈস্টম্যানকে জড়িয়ে ধরে টেবিলের উপর গড়াগড়ি যেতে লাগলেন।

পারকিন্স তো হতবুদ্ধি। বুঝি তাঁর চোখের সামনেই একটা খুন হয়ে যায়। অনেক অনুরোধ করে হেমিংওয়েকে শান্ত করা হলো। ঈস্টম্যান ততক্ষণে আধমরা। ভবিষ্যতে তিনি বই সমালোচনা করতে বসে নিশ্চয়ই এই ধরণের বিপদের কথা মনে রেখে কলম ধরেছেন।

দখিন হাতে, না বামে

শেষ মহাযুদ্ধে যেসব সৈনিক লড়েছিল তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক বাঁ হাতে কাজ করত, অর্থাৎ তারা ন্যাটা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয়তে এদের আনুপাতিক সংখ্যা ঢের বেশি।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আগের তুলনায় এখন ন্যাটার সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

এটার জন্য প্রকৃতই জন্মগত ধারার পরিবর্তন দায়ী, না বাবা-মা এবং শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন---অর্থাৎ তাঁরা আর ন্যাটাদের ডান হাতে কাজ করতে বাধ্য করার প্রয়োজন অনুভব করেন না---ঠিক বলা সম্ভব নয়।

হিসেব বলছে অধুনা প্রতি একশ' জনে চার অথবা পাঁচ জন বামমার্গী---বাঁ হাতে তারা কাজকর্ম চালায়। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত একশ' জন জন্ম-ন্যাটার মধ্যে মাত্র সাতজন আজীবন বাঁ হাতে কাজ করত। এ থেকে একটি কুসংস্কার, বাঁ হাতে কাজ করা 'অস্বাভাবিক', সম্পর্কে দৃঢ় প্রমাণ মেলে। কিন্তু ওই শতকরা চার-পাঁচ-জনের ক্ষেত্রে এ ব্যতিক্রম স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

এহ বাহ্য, আগে কহ আর। ঠিক কেন যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ বরাবর ডান হাতের বদলে বাঁ হাত ব্যবহার করতে সুবিধা পায়, তা আজকের অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগেও বলা অসম্ভব। অবশ্য, আমরা মোটা-মুটি সকলেই বা কেন দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারে ইচ্ছুক এবং পটু তারও ব্যাখ্যা মেলে নি।

প্রাচীনতম ব্যাখ্যা বলে আমাদের পূর্বপুরুষরা সর্বদা ডান হাতে প্রথমে জন্তুজানোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, পরে শত্রুর সঙ্গে এবং আপনা-আপনি বাঁ হাত লাগাতেন বুক এবং হৃৎপিণ্ড রক্ষা করার জন্য। প্রাচীন যোদ্ধারা সব সময় তরবারি এবং ছুরিকা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে ঢাল বা ঐ জাতীয় কিছু ধরতেন প্রতি পক্ষের আঘাত প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে।

এ জন্য দায়ী একটি ধারণা: মনে করা হত মনুষ্য-হৃৎপিণ্ড বুকের বাম দিকে অবস্থিত; যদিও প্রকৃতপক্ষে বুকের ঠিক মাঝখানের সামান্য বাঁয়ে হৃৎপিণ্ডর অবস্থান। বৈজ্ঞানিক মতে দেহের ভরকেন্দ্র দক্ষিণে, এবং গড় মানুষের ডান দিকের ওজন অন্য অংশের তুলনায় পনের আউন্স পর্যন্ত বেশি হয়।

এটা সম্ভবত মানুষের দক্ষিণ প্রীতির ফল, কারণ নয়, কেন না, ডান হাত অন্যান্য অংশের তুলনায় পুষ্টতর যদিও দক্ষিণ-বামের এই রহস্যময় ছকের কারণ এখনও জানা যায় নি, আমরা নিশ্চিত জানি উৎপত্তিতে তা মূলগত এবং জন্মগতও বটে। এখন জানা গেছে কোন হাতের প্রাথমিক ব্যবহারের নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্কর বিপরীত দিক, এবং তা বৃহত্তর ক্রিয়ার অংশ আর তা চোখ এবং পা-'র ওপর প্রভাব-বিস্তারী। অধিকাংশ মানুষ ডান হাতে কাজ করলেও, পা-র ব্যাপারে এই ছক কিঞ্চিৎ বেশিমাত্রায় এলোমেলো, যদিও মানুষ বাঁ চোখে ডান চোখের তুলনায় ভাল দেখতে পায় বলে একটি বিশ্বাস বহুল প্রচলিত।

এই 'অদ্ভুত' বাম-পন্থী মানুষ সর্বকালে, সর্বদেশে দেখতে পাওয়া যায়। অথচ, এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিমাণ অতি সামান্য, বিস্ময়কর রকমের কম। তবে, গত দশক থেকে কিছু কিছু বিজ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণা সুরু হয়েছে, এখনো হচ্ছে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে অগ্রণী, অবশ্য এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু প্রমাণ সাপেক্ষে বলা সম্ভব হয়নি। তবে, কিছু কিছু সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে সেখানে ত্রিশেরও বেশি সংখ্যক 'বাম-মার্গী' পরিবার থেকে পাঁচশ'রও বেশি ন্যাটাকে নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

'বাম-পন্থা' জন্মগত, বাপ-মা থেকে সন্তান লাভ করে উত্তরাধিকার সূত্রে। শৈশবে শিক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব, বা গর্ভাবস্থায় মা'র দুর্ঘটনার ফলে, হাত নষ্ট হওয়ার ফলে কেউ ন্যাটা হয় না। বিশ্বাসটি যদিও বেশ চালু ছিল অন্তত। ন্যাটা ছেলেরা

সংখ্যায় ন্যাটা মেয়েদের প্রায় দেড় গুণ।

মোটামুটি নিঃসন্দেহে বলা চলে 'বাঁ'-এ চলার প্রবণতা ন্যাটা মা-র কাছ থেকে বেশি আসে ন্যাটা বাবার তুলনায় এবং যে ক্ষেত্রে উভয়েই ন্যাটা সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকে।

'দক্ষিণ-পন্থী' 'স্বাভাবিক' বাবা-মা'র অবশ্য ন্যাটা ছেলেমেয়ে যে হয় না তা নয়, তবে এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা খুব কম।

কোন কোন বিশেষজ্ঞর মতে, শিশু প্রথম যে পা হাঁটার জন্য ফেলে তা তার 'পন্থা'র অভ্রান্ত নির্দশন।

শিশুকে যদি তার জন্মগত প্রবণতা নিয়ে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয় কোনও বাধা না দিয়ে, তা হলে বাবা-মা'র চিন্তার বিন্দুমাত্র কারণ নেই, অস্বাভাবিকত্ব নেই তিল পরিমাণ। যদিও, ন্যাটাদের জোর ক'রে ডান হাত ব্যবহারে বাধ্য করলে তাদের ছিটগ্রস্থ হওয়ার প্রবণতা গড়ে ওঠে বলে যে ধারণাটি চালু, তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই, তবে একথা ঠিক যে এদের মানসিক বৃদ্ধি খর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি চলার আগেই ভেঙ্গে পড়তে পারে।

বয়স্ক ন্যাটাদের দৈহিক অসুবিধা হয়ই না প্রায়, তবে মানসিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব; কেন না, সকলেই মোটা-মুটি তাদের ভাবে অস্বাভাবিক, অদ্ভুত।

কখনও কখনও হাতের কাজ করতে গিয়ে এরা অসুবিধে বোধ করে, কারণ টেবিল, বেঞ্চি, অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস সবই ডান হাতে ব্যবহারের উপযোগী ক'রে নির্মিত হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বিশেষ কাজে আসে। শিপইয়ার্ড রিভেটার্স সাধারণত একজন ন্যাটাকে কর্মীদলে রাখে, কারণ উদ্ভট জায়গায় এমন সব কাজ সে সহজে করে, যা ডান হাতে কাজ-করা কর্মীর পক্ষে খুবই অসুবিধা-জনক।

বাঁ হাত ব্যবহার করার ইচ্ছা, আংশিকভাবে হলেও, আদৌ বুদ্ধির ন্যূনতাসূচক নয়। আগে অবশ্য ভাবা হত তাই। প্রকৃতপক্ষে বহু সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞ কাজের সময় ডানের বদলে বাঁ হাত ব্যবহার করতেন, এবং করছেন।

আসুন, আমরাও বাঁ হাতে সৃষ্টি করি।

—খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী

কালকাতা-১৯৬৮

হীরালাল দাশগুপ্ত

সর্বাঙ্গে বিষাক্ত ব্যাধি
প্রেতায়িত প্রসাধনে ঢাকা
লাস্যময়ী মহানাগরিকা
সভ্য-শতাব্দীর—
স্তনদ্বয়ে স্তনিত আকাশ
অবিরাম অভিসার
রাত্রি সকাল এবং রাত্রি এবং মৃত্যু
এবং জন্ম এবং এই
ক্র্যাঙ্কের ওঠা আর নামা
(অন্ধ সিসিফাস্)
অবিরাম অবিশ্রাম
(অন্ধ সিসিফাস্) এবং এই
লৌহদণ্ড আশ্লেষিত
বক্র অগ্রভাগ
অতি সূক্ষ্ম ফালি
মরণ-চুম্বনে
ঈশ্বরের শুভ্র শক্ত দাঁতের কামড়
ধী-রে ধী-রে ধী রে
অতিকায়
(ওহো ধী-রে ধী-রে)
ইস্পাতের মেরুদণ্ড
সন্ধি-চ্যুত
গ্রন্থি-শিথিল
উৎকট উল্লাসে
ফুকারিয়া
সুষিরে সুষিরে—
অভাবিত
মন্দ্রিত মধ্য-রজনী
আবর্জনা-স্ফীত গর্ভ
(ধূম্র-ধূসর)
লৌহ লম্বোদর
বিলম্বিত জঠর-জঘনে।
অসন্দিগ্ধ ভৌম উপধাতু
বিকশিয়া তীক্ষ্ণ দন্তরাজি
(কঠিন-নিষ্ঠুর)
জরায়ুর ছাঁচ,
শূন্যোতা-অঙ্কিত
শুভ্র ললাটে তার
অগ্নি-গর্ভ চোখ
গাঢ় শব্দে মুখরিত—
যেন কোন চন্দ্রলোকবাসী
অবিশ্বাসী
ক্ষণতরে
মৌলিকত্বে
এই সব প্রাচীন বস্তুর—
শিথিল করিয়া
ত্বরান্বিত
স্থানান্তরে
বিচূর্ণ করিতে
অদ্ভুত শামুকের খোসা।

গীতা-জিজ্ঞাসা

॥ শেষাংশ ॥

শ্রীভূতনাথ সরকার

দার্শনিকপ্রবর ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে লিখেছেন যে যদু ও বৃষ্ণি বংশীয়গণ সাত্বত ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মহাভারতের বহুস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও যদুবীরগণকে সাত্বত-প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুভদ্রা প্রথম যখন দ্রৌপদীর কাছে এলেন তখন দ্রৌপদী তাঁকে সাত্বত কুমারী বলে সম্বোধন করেছিলেন।

সাত্বত ধর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এই ধর্মই কথিত হইয়াছে। এই ধর্মের অপর নাম ভাগবত ধর্ম---একান্ত ধর্ম।' (পূজা-সংখ্যা, আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ১৩৬০)।

এই ঐকান্তিক বা একান্ত ধর্মের অক্ষর নারায়ণ এবং সাধনার প্রধান অঙ্গ যোগ-বুদ্ধিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ, যা কিছু করা যায় বা ভাবা যায় সবই যোগ---যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। এতে অভিক্রমের নাশ নাই, প্রত্যবায় নাই, যতটুকু পারা যায় বা করা যায় ততটুকুই মহদ্‌ভয় থেকে ত্রাণ করে। এর আদর্শ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ---'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। তিনি যখন যা করতেন সবই যোগযুক্ত হয়ে। তিনি যখন ব্রজের গোচারণ-ভূমিতে গোপবালক-গণের সঙ্গে গরু চরিয়েছিলেন, তখন এমন ভাবে তা করেছিলেন যে, আজ পর্যন্ত কেউ তেমন রাখালী করতে পারেন নাই। আবার যখন বিশাল ভারতের জটিল রাজনীতির ঘূর্ণ্যাবর্তের কেন্দ্রে বসে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন তেমন কূটনীতিজ্ঞ তার পূর্বে বা পরে আর দেখা যায় নাই। এ ধর্মের অনুশীলনে কোন কঠোরতা নাই 'কর্তুম্ সুসুখম্'।

এ পথের প্রথম সোপান পরমাত্মার অংশ আত্মার অস্তিত্বে ও অবিনাশীত্বে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই যোগের সাধনা, তা নইলে যোগের কোন অর্থই হয় না।

থিওরী অব নলেজ ইত্যাদি দার্শনিক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সোজা কথায় বলা যায় যে---যা প্রমাণ করা যায় না অথচ উপলব্ধি করা যায়---বা যাঁরা উপ-লব্ধি করেছেন তাঁদের কথায় শ্রদ্ধা করা যায়---তাকেই বলে বিশ্বাস। আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু শ্রুতিবাক্যে বিশ্বাস করে ধরে নিতে হয়। শ্রুতি বলেছেন---

তদেতৎ সত্যম্---

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথা অক্ষরাদ্বিবিধা সৌম্যভাবাঃ
প্রভবন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥

---মুণ্ডক ২।১।১।

সেই এই সত্য। যেমন সম্যক প্রজ্বলিত অনল হইতে অগ্নির সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, সেই-রূপ, হে সৌম্য! অক্ষর হইতে নানা-বিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়। গীতায় এরই প্রতিধ্বনি ---'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'।

আধুনিক যুগের আধুনিক মানুষ প্রশ্ন করতে পারেন, যা প্রমাণ করা যায় না বা যা যুক্তিসিদ্ধ নয় তা বিশ্বাস করা বা মানা যায় না। তাঁদের মধ্যে আবার মার্ক্সপন্থীরা বলেন, স্বচ্ছলতার মধ্যে আরাম-চেয়ারে বসে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্মাটাত্মার গল্প করতে ভাল লাগতে পারে, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত---অভাবের তাড়নায় বিপর্যস্ত, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অবসাদ-গ্রস্ত মানুষের পক্ষে এমন আলোচনা শুধু অবাস্তব নয়, মেহনতী মানুষকে ভুলিয়ে তাদের শ্রমলব্ধ ভোগ্য কৌশলে নিজেদের ভোগে লাগাবার জন্য সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের একটা চক্রান্ত মাত্র। এসব তত্ত্ব অহিফেনবৎ পরিত্যাজ্য।

কিন্তু ঠিক এই কারণেই এবং এইরূপ অবস্থাতেই আলোচনা, বিশ্বাস এবং সাধনার প্রয়োজন উপলব্ধি করেই ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এবং অর্জুনকে উপলক্ষ করে বিশ্ববাসীকে প্রথমেই আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশীত্বে বিশ্বাস করতে বলেছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ভারতের অবস্থা কার্ল মার্ক্সের গবেষণার ক্ষেত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইংলণ্ডের অবস্থার মতই কিম্বা তার চেয়েও খারাপ ছিল। মার্ক্সের সময়ে ইংলণ্ডে একদিকে যান্ত্রিক শিল্পের বৈপ্লবিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধন-ঐশ্বর্যের ভোগ-বিলাসের অভূতপূর্ব সমারোহ অন্যদিকে মেহনতী মানুষের দুরবস্থা। তবুও সেখানে সুশাসন ছিল, জোর-জবরদস্তি ছিল না। 'দ্বাপরের শেষভাগে, কলির অব্যবহিত প্রাক্কালে পুণ্যক্ষেত্র ভারত অসংযত রিপুর বিলাস-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। - - - রাজ-ধর্মত্যাগী, কাম-কাঞ্চনভোগী অসুর-প্রকৃতি নৃপতির নিত্য কর্ম ছিল দিগ্বিজয়, দরিদ্রপীড়ন আর সুন্দরী-সেবা। ব্যভিচারে---সতীর অশ্রুধারে---অত্যাচারে দীনের হাহাকারে আর্য-ভূমির আকাশ বাতাস নিয়ত ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিত। - - - একদিকে অপরিমিত ভোগ-বিলাস, অন্যদিকে দীন প্রজার মূক মর্মবেদনা, হুতাশ এবং হতাশা। দীন প্রজার কাতর ক্রন্দনে দীননাথ অবতীর্ণ। (শ্রীকৃষ্ণ পৃঃ ৩)।

যে-কোন বিদ্যা বা তত্ত্ব বা কৃষ্টি উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক্ না কেন তার মূলে কিছু না-কিছু অপ্রমাণিত সিদ্ধান্ত ধরে নেওয়া থাকে। অঙ্ক-শাস্ত্রের কথাই ধরা যাক্---যার চেয়ে সঠিক আর কিছুই নাই। একের পরে শূন্য দিলে যে দশ হয়, তা প্রমাণ

করা যায় না, ওটা ধরে নেওয়া হয়েছে। একে শূন্য দিলে যেমন দশ হয় তেমনি X দিয়েও দশ হয় কিম্বা আর কিছু দিয়েও দশ বোঝাতে পারে। কিন্তু ঐ শূন্য ধরে নেওয়ার পর থেকেই অঙ্কশাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সম্ভব হয়েছে। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ কয়টি ধরে না নিলে রেখাগণিত শাস্ত্রে এত উন্নতি হতে পারত না।

আধুনিক ইয়োরোপীয় অর্থশাস্ত্রের কথাই ধরা যাক্---যা ছাড়া আজকাল সভ্যসমাজে কোন কথাই কওয়া যায় না, যেমন এককালে ছিল--'কানু ছাড়া গীত নাই' এখন তেমনি সারপ্লাস ভ্যালু, শ্রেণিসংগ্রাম, বুর্জোয়া, প্রলিতারিয়েত ছাড়া আলোচনা নাই। কমপিটিশন বা প্রতিযোগিতা এই অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ ধরে নেওয়া হয়েছে, আর এর মধ্যে রয়েছে ডারউইনের Struggle for existence তত্ত্ব। এই প্রতিযোগিতামূলক অর্থশাস্ত্র একদিকে যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে (acquisition of creature comforts) উন্নত করেছে তেমনি মানুষের জীবনকে অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে। অপ্রমাণিত সিদ্ধান্ত প্রতিযোগিতাকে ভিত্তি ধরে নেওয়ার ফলে এমন একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যা সর্বধ্বংসী অস্ত্রসম্ভার ছাড়া টিকতে পারে না, এবং সম্ভবত সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

অপরপক্ষে ভারতে বর্ণাশ্রমভিত্তিক অর্থশাস্ত্র ও সমাজনীতিতে সহযোগিতা---symbiosisকে ভিত্তিস্বরূপে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাতে Struggle-এর কোন প্রশ্নই ওঠে না। সকলে সকলের সহযোগিতায় একটা সভ্য সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজকে যুগ যুগ ধরে চালিয়ে নিয়ে এসেছে।

তাতে দেখা যায় যে ওধারে যেমন kill or be killed চলেছে এধারে তেমনি live and let live চলেছে। তাতে বাহ্যিক আরাম একটু কম হলেও অন্তরের সন্তোষ অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকে। যাই হোক্, এই দুই সিদ্ধান্তে যে দুটি স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেওয়া হয়েছে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা ---তার কোনটাই প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত, যুক্তিসিদ্ধ বা অযৌক্তিক নয়।

আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন--হ্যানিম্যানের দেহের economy ---তত্ত্ব কিম্বা সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস তত্ত্ব, যা ধরে নিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। তত্ত্বগুলি প্রমাণ করা না গেলেও, ফল পাওয়া যায়।

মার্ক্সই ধরুন না কেন। তাঁর বস্তুতত্ত্ব---বস্তুই (matter) সৃষ্টির মূল তত্ত্ব, তার পেছনে আর কিছুই নাই---তাঁর ধরে নেওয়া একটা ডগ্‌মা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন matter dematerialized হয়ে energyতে পর্যবসিত হয়েছে, শুধু তাই নয়, কোন কোন অত্যাধুনিক বিজ্ঞানী বলছেন যে, ঐ energyর elementary particles have preference for specific directions এমনও হতে পারে যে, এর পরে কেউ হয়ত এর মধ্যে চৈতন্য বা চেতন সত্তা আবিষ্কার করবেন। অথচ এই বস্তুতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ধরে নিয়ে মার্ক্স যে চিন্তাধারার স্রোত বইয়ে দিয়েছেন তা, পৃথিবীশুদ্ধ লোককে প্রভাবিত করেছে, এবং বহু দেশে বিপ্লব এনেছে, নূতন আদর্শে সমাজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু কেউ যদি বলে যে, এটা রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করবার একটা মায়াজাল মাত্র, এর বাইরে জনগণের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের আশ্বাস কিন্তু পরিণামে একনায়কত্বাধীন দলবিশেষের নাগপাশ, তবে অন্য সব স্বতঃসিদ্ধের মত এও প্রমাণ করা যায় না---অপ্রমাণও করা যায় না।

ইহা অনস্বীকার্য যে, আমি যে হই বা যাই হই, আমি আছি। অক্ষরের স্ফুলিঙ্গই হই কিম্বা matter (energy) organized in a particular way-ই হই, আমি এই মহাবিশ্বের একটি অণোরণীয়ান্ অংশ, সুতরাং আমার সহিত মহাকালে মহাবিশ্বের যোগ আছে। এই ব্যক্তিগত অস্তিত্বের মূল কারণকে আত্মা বলে বিশ্বাস করে সেই বিশ্বকারণের সঙ্গে যোগসাধনার উপায় আবিষ্কার করে যাঁরা সাধনপথে অগ্রসর হয়েছিলেন বা হচ্ছেন, তাঁরা অসাধ্যসাধন করতে পেরেছেন। অবশ্য ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ও তদনুগামী স্বাধীন কর্মপ্রবৃত্তির, যাঁদের ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে তাঁদের এ বিশ্বাসের বা কোন বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তবুও জীবমাত্রেই যে ঐ Universal energy-র ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশ বা স্ফুলিঙ্গ তা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

ঐ অংশটুকুকেই যদি আত্মা বলে ধরে নেওয়া হয় এবং Universal energy তে যে চৈতন্য intelligence আছে বা থাকার সম্ভাবনা আছে, তাকেই পরমাত্মা বিশ্বাত্মা বলে ধরে নেওয়া হয়, তাতে কি আপত্তি থাকতে পারে? এ তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও খুব অযৌক্তিক বলা যায় না। তবে আধুনিক মানুষ বলতে পারেন যে---এত সব জল্পনা-কল্পনার কি কোন প্রয়োজন আছে? এর উত্তরে আমি বলব যে আছে। জীবনযাত্রা নির্বাহে, সমাজ-সংগঠনে Outlook on life এর প্রয়োজন আছে, তা নইলে মূলহীন শৈবালের মত ভেসে বেড়াতে হয়। এর প্রয়োজন আছে বলেই মার্ক্সকে তাঁর অর্থনৈতিক সাম্যবাদের জন্য dialectical materialism তত্ত্ব স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল।

বহুদিন আগে একজন খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ (Col. Berkely Hill) একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, দেখ, তোমরা অপ্রমাণিত একটা কিছু ধরে নিয়ে তার ওপর চুলচেরা বিচার করতে বসে যাও, যেমন আত্মার অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম। আমি বলেছিলাম, ঠিকই তাই। কিন্তু আপনারাও কি ego আর libido ধরে নিয়ে গোটা মনস্তত্ত্ববিদ্যা গড়ে তোলেন নাই? Libido আর ego-র অস্তিত্ব ত প্রমাণ করা যায় না, ও দুটো ধরে নিয়ে দেখা গেছে যে, ফল পাওয়া যায়, কাজ হয়। ego তার

libido দমন হলেই neurotic হয়, split personaitly হয়; আর আপনাদেরই মতে He would be well if the conflict between his ego and his libido came to an end and his ego again had his libido at its disposal (Frued). Ego-libido-র বদলে কেউ যদি শিব-শক্তি, রাধা-কৃষ্ণ কিম্বা কুণ্ডলিনী কূটস্থ তত্ত্বে বিশ্বাস করে সাধনারপথে অগ্রসর হয় তা হলেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনপন্থী (old fossils)---বলে অভিহিত হতে হয়। এই বলে একটি গান অনুবাদ করে বুঝিয়েছিলাম। গোটা গানটি তুলে দেবার এখানে জায়গা নাই, দু' তিনটি কলি দিলাম।

'আমি যে সুখে ঘরে আছি
কার কাছে কই কেবা জানে,
মা-বাপে মোর ঘোর অনৈক্য
তিলেক মিলন নাই দু'জনে।
[illegible]
প্রেম বিচ্ছেদ দিবারাতি
শুনেছি সেই ঘরে নাকি
জ্বলে না সাঁঝের বাতি
কথা কিন্তু মিছে নয়
দেহঘরে কোন সময়
ঘোর অন্ধকার বই আলোক আমি
দেখি নাই এ জীবনে।।

শ্রীনাথ ক'ন সেই জানে
মিলনতত্ত্ব যোগের যোগী যে জন
পরম তত্ত্ব ধ্যানে জ্ঞানে
রোধ করে পবনে।।

সুতরাং প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, এক-একটা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে এক-একটা বিদ্যা, এক-একটা সভ্যতা, এক-একটা কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। এ-ক্ষেত্রেও তেমনি আত্মার অস্তিত্ব [illegible] ভিত্তি হিসাবে বিশ্বাস করে নিয়ে সাধনা ও আত্মোন্নতির পথে যে অগ্রসর হওয়া যায়, তার প্রমাণ ভারতের সাধনা ও সমাজ।

বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেবের কৃপায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও সীমিত উপলব্ধি আমার ধারণা হয়েছে যে, অভিজাত অর্জুনের (অভিজাতোঽসি পাণ্ডব) তদানীন্তন উন্নত সমাজের status quo বজায় রাখার অমিত উৎকণ্ঠা, অন্যদিকে দীনের হাহাকারে দীননাথের ধর্মরাজ্য স্থাপনের দৃঢ়সঙ্কল্প এবং তাতে অর্জুন তাঁর প্রধান সহায়। সুতরাং অর্জুনের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার তন্ময়তা অতিক্রম করে জীবনদর্শনের মূলে নিয়ে যাবার জন্য ভগবান অবিনাশী আত্মা থেকে আরম্ভ করেছেন। এরই উপর এদান্ত ধর্মের---যোগধর্মের সমস্ত কাঠামোই নির্ভর করে আছে।

বন্ধ্যা

নন্দা দাস

তেইশ বসন্ত গেছে কোকিল ডাকেনি
দুঃখহীন বোধহীন শান্ত পঙ্গু মন,
সপ্তরেখা ইন্দ্রধনু বর্ণালী আনে নি
উন্মত্ত শ্রাবণে তা-ও করে নি ক্রন্দন।

তবুও কি আশাবাদী? তবুও কি মুছে
জীবনের জ্বালাময় ঘাত-প্রতিঘাত?
আবার নতুন দিনে নির্মেঘ নীলিমা,
ফলহীন বৃক্ষে শুধু ফোটা পারিজাত।

যদি আসে যদি হাসে, যদি ভালবাসে,
উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা কাঁপে সমগ্র সংসার
আলোকবন্যা, সে-ও করে হাহাকার
কম্পিত প্রদীপশিখা ভীরু আশা তার।

চৌরঙ্গীর দীপ্তবর্ণ ঔজ্জ্বল্যের পাশে
অগণিত পদধ্বনি আসে আর যায়,
দুরাশার স্থান নেই, দিবস অস্থির
অন্তরঙ্গ প্রতিবিম্ব কাঁদে যন্ত্রণায়।

যক্ষ্মারোগী আকাশের শূন্যতায় দেখে
মৃত্যুর মাধুরী নিয়ে সূর্য অস্ত যায়,
কোন পথে যাবে তার কামনাকে রেখে
দেবত্ব করিয়া তারে ধরার ধূলায়।

প্রসববেদনা নেই, অন্তঃসত্ত্বা সময়ের
নবজাতকের গানে ভরে নি গগন
অফুরন্ত অবসর অনাঘ্রাত ফসলের,
রুদ্ধ-দ্বার, সংখ্যাহীন প্রসূতি-সদন।

হবে হবে, আজ নয় পরে একদিন—
সন্ধ্যাবেলা পিলুরাগে বাজে নি সেতার
দীর্ঘসূত্রী জীবনের বিষাদ প্রতিমা
সব কিছু অসমাপ্ত সব ছেঁড়া তার।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জন্মান্তরের সূত্র সন্ধানে

॥ বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ॥

॥ পাঁচ ॥

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একের অধিক অতীত জীবনের কথা স্মরণের কোনো আছে কী?

পৃথিবীর বহু দেশ থেকে এমন অনেক ঘটনার খবর পাওয়া যায় যে ক্ষেত্রে অনুভাবী ব্যক্তি একাধিক অতীত-জীবনের কথা বলতে পারে। অতি সম্প্রতি এ ব্যাপারে একটি চমকপ্রদ ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। উদাহরণ হিসাবে সেটা উল্লেখ করা যেতে পারে।

তেরো বছরের বালিকার নয়টি অতীত জীবন

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রিটোরিয়া শহরের তেরো বছরের বালিকা জোয় ডারওয়ে অত্যন্ত স্থির নিশ্চিতভাবে তার বিগত জীবনের ঘটনা বলতে পারে। তার বিবৃত কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়---তার বিভিন্ন জন্মকাল প্রস্তর যুগ, বাইবেলের সময়ে মিশরীয় খৃষ্টপূর্ব রোম, পঞ্চদশ শতাব্দীর [illegible], সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তমাশা অন্তরীপের বুশম্যান সম্প্রদায়ের জীবিতকাল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট পরিবারের সাথে যোগাযোগের সময়ের মধ্যে বিস্তৃত। কথাপ্রসঙ্গে সে বলে যে, তার কোন এক জীবনে সে কৃতদাসী ছিল এবং তীক্ষ্ণ তরবারি আঘাতে তার গলা কেটে ফেলা হয়েছিল।

জোয় যখন সবেমাত্র কথা বলতে ও লিখতে আরম্ভ করে, তখন থেকেই সে তার অতীত-জীবনের কথা বলতে থাকে। কখনো গল্পে বা ছবি এঁকে সে এ সব বোঝাত ; কিন্তু তার সে সব আচরণ শিশুর অলীক কল্পনা হিসাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল। সম্প্রতি মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখতে চেষ্টা করছেন যে, সত্য সত্যিই জোয় এতগুলো জন্মের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে কি না। মেয়েটি যেমন জানিয়েছিল---এক, অতিকায় জন্তু ডাইনোসোরাস (প্রস্তর যুগে জীবিত ছিল) তাকে তাড়া করে।

দুই, সে যখন কৃতদাসী ছিল তখন তার গলা তরবারি দিয়ে কেটে ফেলা হয়।

তিন, রোমের প্রাসাদে থাকার সময়ে সে সিল্কের সুতো দিয়ে গায়ের চাদর বুনতো।

চার, ভগবানের পুত্র বলে পরিচিত কোন ধর্মপ্রচারককে (সম্ভবত যীশুখৃষ্ট) সে পাথর ছুঁড়ে মারে।

পাঁচ, যে দেশে ঘরের দেওয়ালে এবং ছাদে বিরাট বিরাট তৈলচিত্র আঁকা হয়ে থাকে সে দেশে সে বড় হয়েছে (ইতালীতে পুনর্জাগরণের (Renaissance) কাল।)

ছয়, ক্ষুদ্র পীতকায় লোকদের সাথে থাকার সময়ে শিশুবয়সে বালির তলা থেকে পশু-পক্ষীর ডিম বার করতো (সপ্তদশ শতাব্দীর আফ্রিকার বুশম্যান সম্প্রদায়ের অভ্যাস)।

সাত, ১৮৮৩ খৃঃ থেকে ১৯০০ খৃঃ ট্রান্সভাল রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট স্টিফান্স জোহান্স পাওলাস ক্রুগারের সাথে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ করত।

বিজ্ঞানীদের মতে এ কাহিনী সত্য

জোহান্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার অধ্যাপক ডাঃ আর্থার বিক্লেন জোয়কে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। জোয়ের পিতা এডওয়ার্ড মাইকেল (৪৪) কন্যার এই আজগুবি গল্পগুলি এক সময়ে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু এখন খুব মন দিয়ে শোনেন। তার মা ক্যারলিন ফ্রান্সিস এলিজাবেথ ডারওয়ে অফিসের সেক্রেটারীর কাজ করেন। তিনি সম্প্রতি জোয় যা কিছু বলে তা ডায়েরীতে লিখে রাখেন।

তাঁরা জানালেন---জোয়ের যখন মাত্র দু'তিন বছর বয়স হবে তখন থেকে সে এইসব বিচিত্র ঘটনাবলী বলতে সুরু করে। কথা বলা ও লিখতে পারার আগেই সে ঐতিহাসিকপ্রসিদ্ধ দৃশ্য, নক্সা বা বহুকালের পুরানো ব্যবহৃত জিনিসের ছবি আঁকতো।

'বাড়ীর থেকেও বড় জন্তু' ডাইনোসোরাসের তাড়া করার ঘটনা প্রসঙ্গে জোয় বলে---'আমি আমাদের গুহায় ছুটে পালিয়ে আসি। আমাদের গুহায় প্রবেশের পথমাত্র একটা ছিল। বেশি পথ থাকলে বিপদ ছিল ; বাঘ, সিংহ ইত্যাদি নিশাচর পশুরা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়তো। যেদিন তারা ঢোকার সুযোগ পেতো সকালে আমরা গুহার চারিদিকে রক্তের দাগ দেখতে পেতাম। আমরা বুঝতে পেতাম আমাদের মধ্যে কাউকে ধরে নিয়ে গেছে জানোয়ার।'

জোয় যখন খুব ছোট তখন একদিন একটা পালতোলা জাহাজের ছবি এঁকে জানায়---'আমাকে এই জাহাজে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি প্রাসাদেও অনেকদিন বন্দী রাখা হয়। আমরা

[illegible] থেকে

আর্নেস্ট রিগ

ক্রীতদাসীরা কোন কথা বলতে পারতাম না। কথা বললে আমাদের জিব কেটে নেওয়া হত।'

'প্রাসাদের মধ্যে আমরা সূর্য দেবতার জন্য পূজা ও প্রার্থনা করতাম। 'বাল' নামে একটি বিরাট মূর্তির সামনে চীৎকার করে বৃত্তাকারে আমরা নাচতাম। আমাদের রাজা ভয়ানক দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিল। তার এক রাণীর খুব সুন্দর লম্বা ঘন চুল ছিল। একদিন কী কারণে রাজা রাণীর ওপর রেগে যায় এবং তার মণ্ডপাতের আদেশ দেয়। একজন জোয়ান ক্রীতদাস রাণীর মাথাটি কেটে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আতর মাখিয়ে নিয়ে আসে। রাণীর সেই সুন্দর চুলগুলি মাথার চার পাশে জড়িয়ে রাখা ছিল।'

'একদিন রাজা আমাকে ডেকে পাঠায়। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। আমি যেতে রাজী হই না। একজন ক্রীতদাস একটা ঘেরা বাগানমত জায়গায় আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং অন্য একজন জল্লাদের মত লোক একটা তীক্ষ্ণ তলোয়ার দিয়ে আমার মাথা কেটে ফেলে।'

জোয় বহু জায়গার নাম তার গল্পে বলতে পারেনি। কিন্তু ঘটনার বিবরণ অবস্থান ও সেখানকার ভৌগোলিক ও সামাজিক রীতি-নীতির বর্ণনা থেকে স্থানটিকে বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না।

যেমন তার উটের পিঠে চড়ে মরুভূমির ওপর যাওয়া ও পিরামিডের কথা থেকে বুঝতে পারা যায়---সে মিশরের কথা বলছে। রোম দেশের পুনর্জন্মের কথা বলার সময় সে জানায়, সে দেশের লোকেরা কাঠের জুতো পরতো; যুদ্ধের চামড়ার পোষাকে পেতল ও সোনার কাজ করা থাকতো। ---'আমি যখন রোমে ছিলাম তখন আমার বয়স কম। আমরা পনেরো জন মেয়ে একসঙ্গে সিল্কের সুতো দিয়ে নানা রঙের চাদর তৈরী করতাম।'

মাটির তলা থেকে ডিম খুঁড়ে বের করার গল্পটি সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তমাশা অন্তরীপের বুশম্যান সম্প্রদায়ের কথা মনে করায়, উত্তমাশা অন্তরীপকে তখন পর্তুগালরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াতের রাস্তায় রসদ আদান-প্রদানের বন্দর হিসাবে ব্যবহার করতো। জোয় জানায়---'বুশম্যানরা মাটির নীচে যেখানে বড় ডিম রাখতো তার ওপরে একটা কাঠি নির্দেশ হিসেবে পুঁতে দিতো। আমরা ছোট ছেলে-মেয়েরা সেই কাঠিগুলো তুলে ফেলে তার ওপরে জন্তুজানোয়ারের রক্তের দাগের নিশান মুছে ফেলে মজা করতাম।'

তুরস্ক থেকে

লোবন কোকিন

জোয়ের সবচেয়ে চমকপ্রদ কাহিনী হল উনবিংশ শতাব্দীর প্রেসিডেন্ট; 'ওম পলের' সাথে পরিচয়ের কথা। প্রেসিডেন্টের সেই বাড়ীটি (KRUGER HOUSE) এখন সরকারী মিউজিয়মে পরিণত করা হয়েছে।

জোয় জানিয়েছিল যে, মিউজিয়ম হবার আগে ঐ বাড়ীতে সে বহুবার গেছে এবং ১৯০৪ সালে সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয়প্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর কিছুকাল আগে পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে পরিচিত ছিল। সে জানায় যে, প্রেসিডেন্টের প্রথম পত্নী মারিয়া ডুপেসিস ১৬ বছর বয়সে প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। প্রেসিডেন্ট এরপর প্রথমা পত্নীর ভাইঝিকে বিবাহ করেন এবং তাঁর ষোলটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় খবরগুলি সত্য। জোয়ের স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, এ কাহিনী তাঁর নিজের অজ্ঞাত এবং ক্লাসে এ-ধরণের কোন সংবাদ কখনো পরিবেশন করেন নি।

অধ্যক্ষ ডঃ ব্রেক্সলের মতে--- 'আমি সম্পূর্ণ বিস্মিত ও বিভ্রান্ত। অল্পখ্যাত ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিষয়ের বর্ণনা আমি অবাক হয়ে বালিকাটির কাছে শুনেছি। সে এত পুঙখানুপুঙখভাবে বিষয়গুলি বলে যে, ব্যক্তিগতভাবে সেগুলির সাথে যোগাযোগ না থাকলে তেমন করে বর্ণনা করা অসম্ভব।'

তাঁর মতে---জোয় প্রশ্নকারী ব্যক্তির মানসচিন্তা পাঠ করতে পারে। (Telepathy)। এ বিষয়ে তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন না করেই জোয় সে-সব কাহিনী বর্ণনা করেছে, সে প্রসঙ্গে এ ব্যাখ্যাটি খাটে না।

'অশরীরী আত্মা বাস্তবিক পক্ষে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে একথা বিজ্ঞান-সম্মত ও গ্রাহ্যভাবে প্রমাণ করা Telepathy-র অস্তিত্ব (যদিও তা সম্ভব) প্রমাণের থেকে আরো বেশি কঠিন। ডাঃ ব্রেক্সলে বালিকাটিকে পরীক্ষার পর এ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু এ থেকে এও প্রমাণ করা যায় না যে, বালিকাটির ক্ষেত্রে আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই মেয়েটির ও এ-ধরণের অন্য ঘটনা থেকে আমরা প্রবন্ধের প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারি যে, একাধিক পুনর্জন্মের ঘটনাও থাকতে পারে।

মৃত্যুতে মস্তিষ্কের বিনাশ হলে আত্মা কী করে বেঁচে থাকে?

এ প্রশ্নের জবার খোঁজ করার আগে আর একটি প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। আমরা কী আজও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি যে মন মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত বলে সর্বদাই মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল? অপর ব্যক্তির চিন্তাপঠন বা দূরবর্তী ঘটনার তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ দর্শন প্রভৃতি মনের এই ক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয় এবং সময়, গতি ও পদার্থের চিরন্তন নিয়মের পরিচালনাধীন নয়। যদি সামান্য কিছুকালের জন্যও মানস-পঠন (Telepathy) ও স্বচ্ছন্দ-ভবিষ্য-দর্শন (Clairvoyance) ইত্যাদি মানসিক অবস্থা জাগতিক নিয়মের বাইরে কার্যক্ষম থাকতে পারে, তাহলে পূর্বজন্মের স্মৃতিও কোন-না-কোন উপায়ে বেঁচে থাকতে পারে। বিষয়টি বা অবস্থাটি আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, এটা না মানলে উপায় নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

Clairvoyance-এর একটি দৃষ্টান্ত

জুন মাসের সকালে লণ্ডনের এক শনিবার। ছুটির আনন্দে মত্ত লোকের ভিড়ে মিস্ জিনা বিউচাম্প ও তার মা আছে। জিনার বয়স ২৩, অফিসে সেক্রেটারীর কাজ করে। মান্সটন বিমানবন্দরে যাবার জন্য তারা গাড়ীর অপেক্ষায় ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জিনা মাকে জানাল—'আমাদের কিন্তু আজ যাওয়া উচিত নয়। আমার মনে হচ্ছে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।'

মায়ের অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও জিনা কিছুতেই যেতে রাজী হয় না। অগত্যা মা একা গেলেন এবং জিনা বাড়ী ফিরে আসে। কয়েক ঘণ্টা বাদে খবর এল দক্ষিণ ফ্রান্সের পারাপগনান সহরের কাছে বিমান দুর্ঘটনায় শ্রীমতী বিউচাম্প ও অন্য ৮২ জন সহযাত্রীর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এটাকে কী 'কাকতালীয়' বলা চলে? নাকি নিছক কোন দৈবপাকে জিনা শেষ মুহূর্তে যাবার সিদ্ধান্ত নাকচ করে? অথবা সে এই আসন্ন দুর্ঘটনা দেখতে পেয়েছিল? অন্য হাজার হাজার সমগোত্রীয় ঘটনার সঙ্গে মিস্ জিনা বিউচাম্পের এই ঘটনার তুলনা করলে বলা চলে বিষয়টি সাধারণ

জন্ম থেকে

থেরেস গে

বিচারবুদ্ধির অগম্য। এবং সময় ও কালের পরিধির বাইরে মনের ঠিকানা হিসাবে ব্যাপারটিকে স্বীকার না করলে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা চলে না।

আমরা যদি পুনর্জন্মের ঘটনাগুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির দ্বারা সংঘটিত (Extra Sensory Perception) ভাবি তাহলে বিষয়টিকে অবাস্তব মনে হয় না। জন্মান্তর বাদে অবিশ্বাসীরা ধারণা করে থাকেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জাগতিক বিষয়-বস্তুকাল-গতি ও পদার্থের শরীরী-নিয়মের অধীনে নিয়ন্ত্রিত এবং সেখানে অশরীরী কিছু বিদ্যমান থাকতে পারে না। কিন্তু মানব-মনের এই অশরীরী চরিত্রগুণের উপরেই পুনর্জন্মের ভিত্তিমূল স্থাপিত। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলি জড়বাদী নিয়মের বাইরে স্বয়ংক্রিয় এবং সে-কারণেই পুনর্জন্মের বিষয়টি শরীর-বিদ্যার প্রচলিত নিয়মের ব্যাখ্যা-হীন নয়। সুতরাং পুনর্জন্ম সম্ভব এটা মানতে বাধা থাকে না।

ইংলেণ্ডের একটি কাহিনী

'আমরা নরদাম্পে থাকতাম। আমার এগারো বছর বয়সের সময়ে বড়দিনের ছুটি কাটাতে আমি ওয়েমাউথে এক আত্মীয়ার বাড়ীতে যাবার জন্য রওনা হলাম। ইয়োভিল স্টেশনে আমাদের ট্রেন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। জায়গাটি বিশেষ করে স্টেশনের পাশে পাহাড়ী অঞ্চলটি আমার পরিচিত বলে মনে হয়। আমি আমার ভাইকে বললাম—আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন এখানে আমরা থাকতাম। একবার মনে আছে অন্য দুজন বড় মেয়ের হাত ধরে দৌড়তে দৌড়তে পাহাড় থেকে নামবার সময় সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। আমার পায়ে ভীষণ চোট লাগে।'

'মিথ্যাকথা বলছি ভেবে আমার মা আমাকে ধমক লাগালেন। কারণ আগে আমরা কখনও সে অঞ্চলে আসি নি, থাকার প্রসঙ্গ তো ওঠেই না। আমি কিন্তু বার বার জানালাম কথাটা সত্য। আমি বেশ জোর দিয়ে বললাম—যেদিন পাহাড়ের ওপর পড়ে যাই সেদিন আমি গোড়ালি অবধি ঢাকা একটা শাদা ফ্রক পরেছিলাম, তাতে সবুজের পাতাকাটা কাজ করা ছিল।'

'আমার নাম ছিল তখন মার্গারেট এবার মায়ের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। তিনি পথে আর আমাকে কথা বলতে দিলেন না। পরে আমি জানতে পারি যে, আমি জীবনে কখনও সেখানে আগে যাই নি। কিন্তু তবু সেখানকার ঘটনাগুলো আমার নিজের ছোটবেলার ঘটনার স্মৃতির মতই উজ্জ্বল ছিল।'

প্রায় সতেরো বছর পরে আমি

এর অর্থ খুঁজে পেলাম। আমি তখন মোটরে আমার অফিসের 'বসের' সঙ্গে যাচ্ছিলাম। ডরসেটের কাছে আমাদের গাড়ীর চাকা বদলানোর প্রয়োজন হওয়াতে আমরা সময় কাটানোর জন্য অল্পদূরে একটি কুটিরে বসতে যাই। অল্পবয়সী এক ভদ্রমহিলা আমাদের চা এনে দিলেন।

'ঘরের দেওয়ালে একটা পুরোনো ছবির দিকে আমার চোখ পড়ে। আশ্চর্য হয়ে দেখি সেটা আমার ছেলেবেলার ছবি। আমি অবাক হয়ে চীৎকার করেই বলে ফেললাম।—কী আশ্চর্য আমার ছবি এখানে? সেই ভদ্রমহিলা ও আমার অফিসের বড় সাহেব হেসে উঠলেন।

ভদ্রমহিলা জানালেন— বাচ্চাটি অনেক দিন হল মারা গেছে। তবে তুমি হয়তো ওর মতই দেখতে হয়ে থাকবে। বড় সাহেবও সে-কথায় মাথা নাড়লেন।'

'আমার আগ্রহ দেখে ভদ্রমহিলা তাঁর বৃদ্ধা মাকে ডেকে আনলেন। তিনি গল্প করলেন যে, বাচ্চাটির নাম ছিল মার্গারেট কেম্প থ্রোন এবং এক বর্ধিষ্ণু চাষী পরিবারের একমাত্র মেয়ে ছিল। বৃদ্ধার মা সেই চাষী পরিবারে পরিচারিকার কাজ করতেন। তিনি তাঁর মায়ের মুখে শোনা গল্পটি আমাদের শোনালেন—'

'মার্গারেটের যখন পাঁচ বছর বয়স সে একদিন দুটি বয়স্ক মেয়ের সঙ্গে টিলার ওপরে দৌড়াদৌড়ি করে খেলছিল। তাদের একজনের পা খরগোসের গর্তে পড়ে যাওয়াতে সকলেই একসাথে পড়ে যায়। বাচ্চা মেয়েটি সবার নীচে চাপা পড়ে এবং তার পা ভীষণ জখম হয়। সেই ভাঙ্গা পা আর ভাল হয় নি। দু'মাস ভোগবার পর মেয়েটি মারা যায়। তার বাঁচবার ভীষণ ইচ্ছে ছিল। সে নাকি মারা যাবার আগে বলেছিল —না, আমি কিছুতেই মরবো না।'

বৃদ্ধা জানালেন, সেই ফার্মটা এখন কোথায় তা তিনি জানেন না, তবে কাছাকাছি শহরের নাম ছিল ইয়োভিল। আমি ঘটনাটি কোন্ সময়ের জানতে চাইলাম। ভদ্রমহিলা ফটোটি নামিয়ে আনলেন। ফটোর পেছনে একটা কাগজের স্লিপে লেখা ছিল—মার্গারেট কেম্পথ্রোন, জন্ম: ২৫শে জানুয়ারী ১৮৩০; মৃত্যু: ১১ই অক্টোবর, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।

'মার্গারেটের মৃত্যুর দিনেই ইয়োভিল থেকে বহু দূরে নরদাম্পটে আমার ঠাকুমা জন্মগ্রহণ করেন। আর আমার নিজের জন্মদিন ২৫শে জানুয়ারী।'

কানাডার একটি কাহিনী

কানাডা দেশের এক ভদ্রমহিলার পুনর্জন্মের একটি বিস্ময়কর ঘটনা এখানে উল্লেখ করা চলে।

'আমি আমার স্বামীর সঙ্গে মোটরে অণ্টারিও (কানাডা) প্রদেশে যাচ্ছিলাম। স্মিথ জলপ্রপাতের কাছাকাছি আসার পর আমি সামনের শহরের বর্ণনা করতে লাগলাম। আমার স্বামী জানতেন আমি আগে কখনও এখানে আসি নি। আমার মুখে শহরের রাস্তাঘাটের বর্ণনা শুনে তিনি অবাক হলেন।'

'আমি জানিয়েছিলাম যে, শহরের প্রধান রাস্তার প্রথম মোড়ের মাথায় এককোণে ডেসজারডিংসের মুদির দোকান এবং তার উল্টোদিকের রয়েল ব্যাঙ্ক অফ কানাডার শাখা অফিস আছে।'

শহরে পৌঁছে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম মোড়ের মাথায় ব্যাঙ্কের অফিস আছে এবং অন্য দিকে মুদির দোকানও রয়েছে। কিন্তু দোকানের নাম আলাদা। আমার স্বামী গাড়ি থামিয়ে দোকানে খোঁজ নিলেন। জানা গেল ত্রিশ বছর আগে দোকানের মালিকের নাম ছিল ডেসজারডিংস।

আর একবার ছেলেবেলায় আমরা ইতালীতে প্রথম বেড়াতে যাচ্ছিলাম। ট্রেন কিছুক্ষণ চলার পর আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বারবার কামরার বাইরে ও ভিতরে যাতায়াতে অন্য সকলে বিরক্ত হলেন। আমি বেশির ভাগ সময়ই বাইরের দিকের করিডোরে বসে কাটালাম। হঠাৎ আমি খুব শান্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। এবং তারপরই আমি অনুভব করলাম, ট্রেন যে অঞ্চলে চলছে তার সব কিছুই আমার জানা ও এর পরে কোন জায়গায় যাবো ও সেখানে কী দেখবো সব আমি আগে থেকে মনে করতে পারছি।'

'ট্রেন এখন আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামছে। নীচের দিকে ঐ কোণে একটা গীর্জা থাকবে ধূ ধূ মাঠের মধ্যিখানে। চারপাশ একেবারে ফাঁকা, আশেপাশে কোনো গ্রাম নেই। গীর্জাটা যেন ঠিক প্রহরীর মত।—ও মা, এই তো গীর্জাটা এসে গেল।'

আমি ভাবতে লাগলাম—আচ্ছা এবার একটু পরে বাঁ দিকে একটা ঝর্ণা থাকবে, তার দু'পাশে বড় বড় লম্বা লম্বা গাছ এবং আর একটু পরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে রূপালী পাতাওলা গাছের ঝোপ থাকবে। আচ্ছা পাতাগুলো 'রূপালী' কেন? একথা আগে আমি খুব ভাবতাম। তখন আমি জলপাই (Olive) গাছ কখনো দেখি নি। আমাদের ট্রেনটা সেখানে আসতে অন্য একজন এবারে আমাকে সে কথা বলে রূপালী গাছগুলো চিনিয়ে দিল।'

'সেবারের মত এমন করে কখনও আমার মনে হয় নি জায়গাটা আমি চিনি ও জানি। অবশ্য এও জানতাম এখানে আগে আমি কখনও আসি নি।'

'পরে আমি যখন আমার ফরাসী বন্ধুদের নিয়ে পারিশে (ইতালীতে) ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একজন শ্রমিক আমাদের অভ্যর্থনা করলো ইতালীয় ভাষাতে। আমি ফরাসীতে উত্তর দিয়ে জানালাম ইতালী ভাষা আমি জানি না। শ্রমিকটি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলো না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে বললো—কিন্তু তুমি তো একেবারে ইতালীর মেয়েদের মত দেখতে। আমার স্থির বিশ্বাস তুমি আমার দেশের মেয়ে।'

শিশুর চাহন

—শম্ভু মুখোপাধ্যায়

ফুলদানি

—দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়
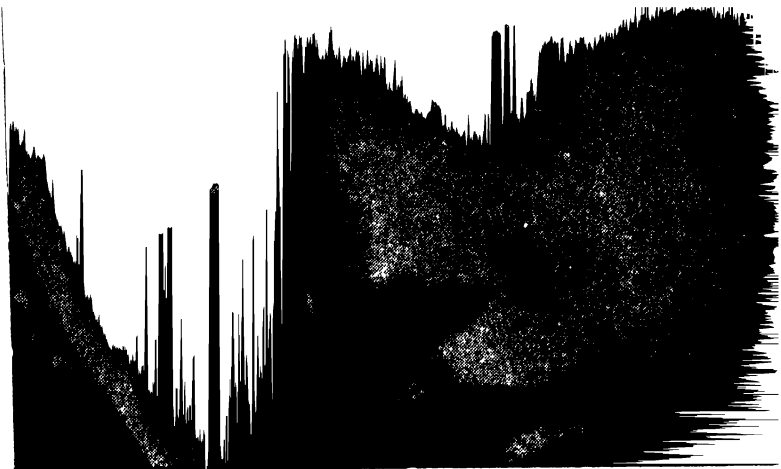
গাছের সারি

—অঞ্জনকুমার নন্দী

মাসিক

অগ্রহায়ণ / ১৩৭৫

শিকার

—অনুপকুমার দাশগুপ্ত

মাসিক
বসুমতী
অগ্রহায়ণ / [illegible]

ভীমতাল লেক
—দিলীপ বসু

ঘরের কাজে
-দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
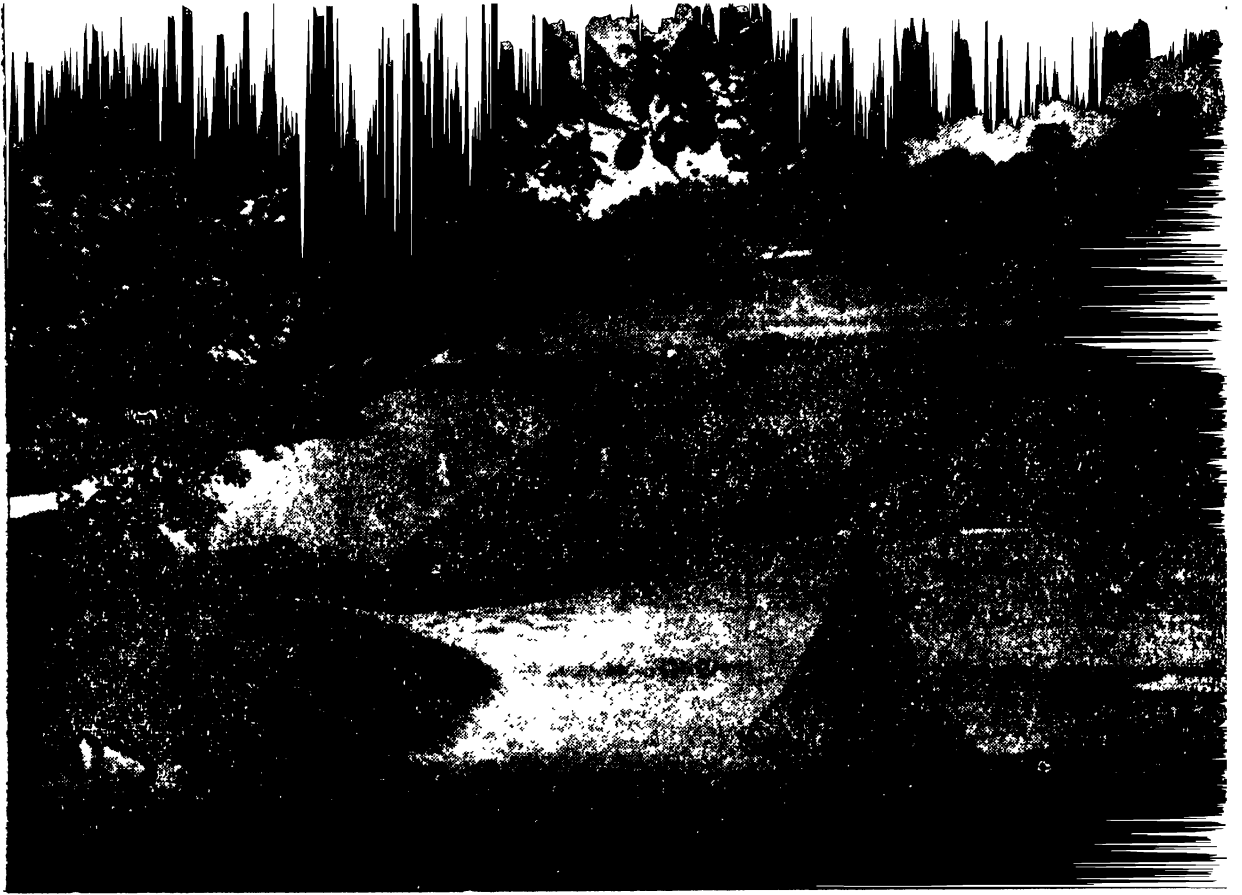
যোগাযোগ

—দুলাল দত্ত

[ছবি গ্লাসি কাগজে ও বর্ধিত আকারে পাঠাবেন]

মাসিক

বসুমতী

অগ্রহায়ণ / ১৩৭৫

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত

মহাপ্রভুর দারুমূর্তি

—সমীরেন্দ্র সিংহরায়

মহারাজা নন্দকুমারের ভগ্নপ্রাসাদ

—সুব্রত রায়

মাসিক

বসুমতী

অগ্রহায়ণ / '৭৫

আমি তখন সেই আগের জনমের কথা ভাবছিলাম। ইতালীয় অনেক কিছু আগেই জেনে ফেলার কথাও মনে পড়ল। এখন এই প্রমিকটি আবার জোর গলায় বলছে আমি তার দেশের মেয়ে। তবে কি আমি এদেশের এক চাষী রমণী ছিলাম? এই পাহাড়ে পাহাড়ে, এই চার্চে সাইপ্রাস আর অলিভ গাছের জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম আগে? আমি অবাক হয়ে আজো ভাবি।'

অস্ট্রেলিয়ার একটি কাহিনী

অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে একটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। খবরের বর্ণনামত মিঃ আর্নেস্ট বিগস মিশরে তাঁর বিগত জীবনের কথা হুবহু বলে যেতে পারেন। অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে না।

ওপরের এইসব ঘটনা থেকে আমাদের প্রবন্ধের প্রশ্নটির উত্তর যথাযথ পাওয়া যেতে পারে। যদি Telepathy ও Clairvoyance জাতীয় অশরীরিক বিষয়গুলি ঘটতে পারে, তাহলে পূর্ববর্তী জীবনের স্মৃতি-শক্তি অবিনষ্ট অবস্থায় থাকতে পারে।

গত জন্মের স্মৃতি পুনর্জন্মের ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে কি? আগামী সংখ্যায় এ প্রশ্নটি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করে দেখার চেষ্টা করা হবে। [ক্রমশ।

অনুবাদক—জ্যোতির্ময় দাশ

ঠিকমতন শুনছেন

শব্দ ভাব আদান-প্রদানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যুগটা 'গ্যাজেট'-এর—রেডিও, টেলিভিশন, আর টেলিফোন এ যুগে অতিমাত্রায় ব্যবহৃত। আগের চেয়ে এখন তাই ঢের বেশি শুনতে হয় সবাইকে। ও দেশে এ ব্যাপারে—অর্থাৎ মানুষ কত বলে আর কতটা শোনে—সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে। নির্দিষ্ট ক'রে ওরা তাই বলতে পারে শতকরা কতজন বলে আর কতজন শোনে, এবং বলা আর শোনার পরিমাণ কতখানি—কতটুকু। আমরাও, ওই হিসেব থেকে আন্দাজ করা সম্ভব, বলার চেয়ে শুনি বেশি।

তবুও অধিকাংশ মানুষই ঠিকমত শুনতে জানেন না। বলা যায় মোটামুটি প্রায় সকলে 'আধা শ্রোতা' অর্থাৎ তাঁরা শ্রুত বিষয়ের অনেকটা একটু পরেই ভুলে যান। মনে রাখতে সচেষ্ট হলেও শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি বক্তব্য তাঁদের মনে থাকে না।

দোকানের বিক্রেতাদের পক্ষে এটি বেশ লোকসানজনক কেন না, ক্রেতা হয়ত চাইলেন পুরো হাতাওলা চাইনীজ শার্ট, দোকানী আনল হাফ হাতাওলা। ক্রেতা আবার বললেন পুরো হাতা আনতে। দোকানী ছুটলেন। ক্রেতা ততক্ষণ অপেক্ষমাণ। ফলত সময় নষ্ট, অর্থহানি। কারণ, দোকানীর অনর্থক খাটনী এবং অকারণে জিনিষপত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি হয়। এবং তার চেয়েও বড় কথা ক্রেতার বিরক্তি।

স্কুলের শিক্ষার মধ্যেই ঠিকমত না শুনতে পাওয়ার ত্রুটি লুক্কায়িত। এখনও এ দেশে—প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত—ছাত্রদের গম্ভীর গলায় আদেশ করা হয়, 'শোনো'। ব্যস্। ও দেশে যদিচ সবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ স্বরু হয়েছে।

'শোনা' একটা মানসিক দক্ষতা যা শিক্ষা এবং অভ্যাসের সাহায্যে গড়ে তোলা যায়। যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ও দেশে গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন শ্রোতা শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশি শুনতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

শোনার অর্থ শব্দগুলো কেবল কানে ঢুকতে দেওয়া নয়, যেমন পড়া মানে ছাপার অক্ষরে নিছক চোখ বুলনো না। আরও কিছু করা দরকার। ভালভাবে শুনতে হলে বক্তব্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু তা করার জন্য কয়েকটা বাধা পেরোতে হয়।

আমাদের কথা বলার ছন্দ চিন্তার চেয়ে অনেক ঢিমে-তেতালায় চলে। ভাবি দ্রুত, বলি ধীরে। অধিকাংশ মানুষ মিনিট-এ একশ' পঁচিশটা শব্দ বলেন, চিন্তার গতি এর চার গুণ দ্রুততর। অস্যার্থ, প্রতি মিনিট-এ কারো বক্তব্য শোনার সময় আমরা চারশ'র কিছু বেশি শব্দ শুনতে পারি।

দক্ষ শ্রোতা না হলে আমরা অধৈর্য হই; আমাদের চিন্তা অন্য বিষয়ে পাক খেয়ে আবার বক্তার কথায় ফিরে আসে। এভাবে ক্ষণিক বিষয়ান্তরে গমন চলতে থাকে বারবার, যতক্ষণ না আমরা অন্য বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগী হয়ে উঠি। তারপর হঠাৎ বক্তার কথায় কান পেতে বুঝতে পারি তিনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তখন তার কথা বোঝা আরও দুষ্কর হওয়ায় এটাসেটা আপনি ভাবতে থাকি। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিই; বক্তা তখনও মুখর; আমরা কিন্তু তখন ভিন্ন চিন্তাজগদ্বাসী।

উত্তম শ্রোতা চিন্তার দ্রুততা কাজে লাগাতে পারেন; বক্তব্য বিষয় নিয়ে তিনি শোনার ফাঁকে ফাঁকে চিন্তা করেন। বক্তব্য বিষয়ের তথ্য কি ঠিক? বক্তা কি কোনও দিকে পক্ষপাতিত্ব করছেন? তিনি কি সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরছেন,

না, নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক অংশ টুকুই কেবল উদ্ধৃত করছেন?

উক্ত বিষয় তলিয়ে বুঝুন। বক্তা সব সময় সবখানি খুলে বলেন না। তাঁর স্বরের উত্থানপতন, দু' একটা ভঙ্গী অর্থবহ হতে পারে। তার মৌখিক ক্রন্দন, অঙ্গভঙ্গী তাই লক্ষ্য করা দরকার।

শ্রবণ বিষয়ক সব বক্তব্যের মূল কথা আকর্ষণ। খারাপ শ্রোতা কোনও বিষয় বা বক্তাকে প্রায়ই যথাযথ সুযোগ দিতে অভ্যস্ত নন। তাঁরা একটুখানি শুনেই বিষয়টি আকর্ষণহীন মনে ক'রে হাল ছেড়ে দেন, তাঁদের মনোযোগ ও স্বরূপে 'প্যাসিভ' না-বাচক। উত্তম শ্রোতা কিন্তু বক্তব্য থেকে আকর্ষণীয় অংশ বেছে নিতে সচেষ্ট, যা তাঁর কাজে আসতে পারে: নতুন কিছু বলা হচ্ছে কি? বিষয়টি জানলে উপকার হতে পারে?---এই সব প্রশ্ন তিনি নিজেকে ক'রে উত্তর খুঁজে নেন চটপট। লাভ হয় তাঁরই। কেন না, ফলত তিনি বক্তব্য মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করেন এবং তাঁর শ্রবণক্ষমতা বেড়ে যায়।

শ্রোতার কোনও না কোনও প্রিয় বিষয় বক্তার গোটা বক্তব্যের মধ্যে সাধারণত থাকে। খারাপ শ্রোতা তাঁকে উত্ত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে উলটো পালটা প্রশ্ন করেন, এড়িয়ে যেতে চান সবটুকু। উত্তম শ্রোতা শোনেন সবটা।

যতক্ষণ না তাঁর প্রতীতি জন্মায় যে, তিনি বক্তব্য বুঝেছেন ততক্ষণ তিনি মন্তব্য করেন না। কাজেই, তাঁর প্রশ্ন এবং উত্তর অত্যন্ত কাজে আসে।

দক্ষ শ্রোতা মূল বক্তব্যে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তারা প্রত্যেকটা তথ্য মনে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় হতাশ হন না। বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্যই তথ্য মূল্যবান, অন্যথায় নয়।

মূল বিষয়ে মনোনিবেশ করলে দেখবেন আশ্চর্যজনক উপায়ে তাঁর সমর্থনসূচক তথ্যাদি আপনার ঠিক মনে পড়ছে।

মনোযোগ থাকলে অর্ধেক কাম কতে। মনোযোগ স্বভাবে ইচ্ছাপূরণ দেবী। তবে, গল্পের দেবীর তুলনায় ঢের বেশি 'র‍্যাশনাল', এই যা। মনোযোগী শ্রোতা মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি বন্ধ ক'রে শোনেন। বাধা দেন কেবল সত্যিকার প্রয়োজন হলে।

মনোযোগ ভদ্রতার খাতিরেও দেওয়া উচিত। তা ছাড়া এটি নিজেদের স্বার্থেও প্রয়োজনীয় ভালভাবে শুনলে, দেখা গেছে, বক্তাও সুন্দরভাবে পারম্পর্য বজায় রেখে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারেন। শ্রোতার চাঞ্চল্য, তার মনোযোগহীনতা বক্তাকেও স্পর্শ করে। অবশ্য, রীতিমত অভিজ্ঞ বক্তার কথা স্বতন্ত্র।

মনোনিবেশ ক'রে শোনা অভ্যাস হলে দেখবেন আপনার লাভ কত বেশি হচ্ছে। ভাল শ্রোতা হওয়ার অর্থই ভাল বক্তা হওয়া। সব কথা খুঁটিয়ে শুনলে এবং তা নিয়ে চিন্তা করলে চিন্তার স্বচ্ছতা অবশ্যম্ভাবী এবং সেই স্বচ্ছতা বলার সময় অত্যন্ত কাজে আসে। ভাল বক্তা হলে ভাল শ্রোতা মেলে। দেখুনই না পরীক্ষা ক'রে

—জ্ঞানান্বেষক

পরিহাস

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

এ যেন এক জীবনের ব্যর্থ পরিহাস,
স্বপ্নহীন রাত্রির চিরন্তন অবকাশ।
অতীতের গান গাওয়া,
সুদূরের প্রত্যাশায় দিন গুণে যাওয়া,
এ যেন এক পৃথিবীর নিস্তব্ধ ইতিহাস।

পৃথিবীর অবিরত স্পন্দনের ক্রন্দন,
পৃথিবীর বিংশতী বৎসরের ইতিহাসের অবলোকন,
স্বপ্নময় অতীতের ঝড়ে যাওয়া পাতা,—
অলীক কল্পনায় জেগে ওঠে
জীবনের ব্যর্থতাকে ঢেকে নতুন করে ইতিহাস রচনায়॥

আমিও তাদের দলেরই একজন,
যারা শুধু চায় পৃথিবীর স্পন্দন,
শুধু চায় অলীক কল্পনায় জগৎ।
সেই ব্যর্থ প্রয়াসীদের তাই মনে হয়,—
"এ যেন এক জীবনের ব্যর্থ পরিহাস"॥

॥ সতেরো ॥

নীচে নেমে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করল বিশাখা। সামনের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'উঠুন চিরঞ্জীববাবু—'

আজ রাত্তিরে বিশাখার হাতে আমাকে সঁপে দিয়েছেন হিরণ্ময় সোম; সে-ই আমাকে যাদবপুর পৌঁছে দেবে।

বিশাখা আমাকে যেখানে বসতে বলেছে তার পাশেই ড্রাইভারের সীট। আমি যদি ওখানে বসি আমার গা ঘেঁসে বসে বিশাখাকে গাড়ি চালাতে হবে। উঠব কি উঠব না---এই দুয়ের মাঝখানে দোল খেতে লাগলাম।

তবু আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। যে মোহময়ী তরুণী শীতরাতের মধ্যযামে একা একা আমাকে নিয়ে যাদবপুরের পথে পাড়ি জমাতে পারে তার পাশাপাশি বসতে কেন জানি ভরসা হয় না।

যাই হোক বিশাখা এবার জোর করেই আমাকে সামনের সীটে বসাল। তারপর ঘুরে গিয়ে ওধারের দরজা খুলে ড্রাইভারের সীটে বসতে বসতে বলল, 'সামনের সীটে বসলে, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। পেছনে বসলে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে কতক্ষণ আর গল্প করা যায়।'

অস্পষ্ট জড়ানো গলায় কী বললাম, নিজেই বুঝতে পারলাম না।

এই মুহূর্তে সারা গায়ে আরামদায়ক উষ্ণতা মেখে লেপের তলায় ডুব দিয়েছে।

যাদবপুরের দিকে খানিক এগিয়ে হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিল বিশাখা।

আমি শুধোলাম, 'কী হল?'

বিশাখা আমার দিকে ফিরে বলল, 'একটা কথা ভাবছি।'

'কী?'

'আপনার কি এক্ষুণি বাড়ি ফেরা দরকার?'

বিশাখার প্রশ্নটার ভেতর একটা অনুচ্চারিত দিক ছিল; আমাকে তা চকিত করে তুলল। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে---'

বিশাখা বলল, 'মানেটা কী?'

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

বিশাখা তাড়া দিল, 'কি হল? উঠুন---'

খানিক ইতস্তত করে দ্বিধান্বিত সুরে বললাম, 'আমি পেছনের সীটে বসছি।'

আঁকা ভুরুর তলা থেকে দুটি দীর্ঘ অবাক চোখ আমার মুখে স্থির করে বিশাখা বলল, 'পেছনে বসবেন কেন?'

বিশাখার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিলাম না, ভয়ানক অস্বস্তি লাগছিল। মুখ নামিয়ে আস্তে করে বললাম, 'এমনি---'

'আপনি ভারি গোঁয়ার তো। মেয়েদের সম্মান রাখেন না।'

আমি চুপ।

বিশাখা নাক কুঁচকে কেমন করে যেন হাসল। বলল, 'আমি বাঘও না, ভালুকও না। টপ করে গিলে ফেলবার সাধ্যও আমার নেই। উঠুন---উঠুন।'

আর কিছু না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল বিশাখা; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

হিরণ্ময় সোমের বাড়িতে বোঝা যায় নি; কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে দেখা গেল জানুয়ারি মাসের এই শীতল রাত্রে কলকাতা মৃতের মত আড়ষ্ট হয়ে আছে। ডাইনে এবং বাঁয়ে সাদার্ন এ্যাভেনিউ ধরে যেদিকে যতদূর তাকানো যায় শুধু নির্জনতা। সন্ধ্যেবেলার সেই বাদামওলারা, মশলামুড়িওলারা, বেলুনওলারা, প্র্যাম ঠেলা আয়ার দল কিংবা সৌখীন বায়ুসেবী---সবাই এখন উধাও। ঘন কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়ে আছে। কলকাতা শহর

'আমি যেখানে থাকি, দশটার ভেতর সেখানে ফিরতে হয়। নইলে—'

'নইলে---?'

'গেট বন্ধ হয়ে যায়।'

নিটোল কোমল কব্জি ঘুরিয়ে বিশাখা ঘড়ি দেখল, বলল, 'ইট ইজ অলরেডি ইলেভেন।'

আমি চঞ্চল হলাম। অজান্তে গলার ভেতর থেকে ভয়ের অব্যয় বেরিয়ে এল, 'ইস্---'

বিশাখা বলল, 'এগারোটা যখন বাজে, আপনাদের গেট নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে।'

'ভাল হয়েছে' কী বলছেন আপনি। আমি রীতিমত অস্থির হয়ে পড়লাম।

'ঠিকই বলছি।' নিশ্চিন্ত সহজ ভঙ্গিতে বিশাখা বলল, 'গেট যখন বন্ধ, আজ তো বাড়ি ফেরা হচ্ছে না।

ফিরে লাভই বা কী? তার চাইতে আমি যা বলি তাই করুন।'

গলা শুকিয়ে আসছিল। বললাম, 'কী করতে বলছেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না বিশাখা। সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখাল, 'দেখুন---দেখুন---'

দেখলাম কিন্তু সে কী বলতে চায় বুঝতে পারলাম না।

বিশাখা আবার বলল, 'দেখলেন তো রাস্তাটা কেমন নির্জন। শীতের মিডনাইট ছাড়া এমন কলকাতার রাস্তায় এমন দৃশ্য আপনি ভাবতেও পারবেন না। সব সময় এখানে ঠেলাঠেলি, ভিড়। নির্ভাবনায় গাড়ি চালাবার উপায় নেই।'

আমি চুপ। অন্যমনস্কের মতন ভাবতে লাগলাম, এখনও যদি ফিরতে পারি নিশ্চয়ই ভেতরে ঢুকতে পারব। সেদিনকার মত হয়ত অমল আমার জন্য জেগে বসে আছে। দিনের পর দিন ওদের তিন ভাইকে দরজা খুলে দিয়েছি; একদিনের জায়গায় দুটো দিন কি আর অমল আমার জন্য জেগে বসে থাকবে না?

অমলের কথা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, পিসেমশাই তাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছেন। সুস্থ সাবালক শিক্ষিত ছেলেকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে তিনি আর রাজী নন। অমল কি তা হলে চলে গেছে? যেতেও পারে, আবার নাও যেতে পারে। দুয়ের সম্ভাবনা সমান সমান। তবু একবার মনে হল, যাবার আগে একবার কি অমল দেখা করবে না?

অমল ছাড়া আরো দু'জন আছে; বিমল আর ঝিন্টু। তারাও নিশাচর। কতবার তাদের দরজা খুলে দিয়েছি, হিসেব নেই। কিন্তু বিমলদের ভরসা বিশেষ করি না। রাত জেগে বসে থাকার ব্যাপারে তারা কতখানি পরার্থপর হবে, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।

বিশাখা ডাকল, 'চিরঞ্জীববাবু---'

দূরমনস্কতা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ তুলে তাকালাম।

বিশাখা বলল, 'বাড়ি ফেরার বদলে আপনার অসুবিধে হলে খানিকটা বেড়ানো যাক।' গাড়িতে আবার স্টার্ট দিল সে।

আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম, 'না-না---'

'না কী মশাই! আমার কোন কথাতেই তো 'হ্যাঁ' বলছেন না।'

আমি চুপ।

বিশাখা বলতে লাগল, 'আপনি কেমন ইয়ংম্যান! এতটুকু শিভালরি নেই?' বলেই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আমি এবার আর্তনাদ করে উঠলাম, 'আজ থাক বিশাখা দেবী; আরেকদিন না হয় আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব।'

'আরেকদিনের কথা আরেক দিন ভাবা যাবে। আজকের রাতটা মাটি করে দেবেন না। প্লীজ---'

'কিন্তু---'

'কী?'

'আপনাকেও তো বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আমার জন্যে চিন্তা করছেন!' ঠোঁটের প্রান্তে খুব সূক্ষ্মরেখায় অদ্ভুত হাসল বিশাখা।

বিমূঢ়ের মতন বললাম, 'হ্যাঁ। মানে---'

'কী?'

'ফিরতে দেরি হয়ে গেলে আপনার বাবা নিশ্চয়ই খুব ভাববেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন চিরঞ্জীববাবু। আই এ্যাম সাফিসিয়েণ্টলি গ্রোন-আপ; আমার জন্যে কেউ ভাববে না। মাঝে মাঝে দু-চারদিন আমি ফিরিও না। কখন ফিরলাম, কোথাও গেলাম, এ সব নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না।'

ভূমণ্ডলের সুদূর প্রান্তে পূর্ববাংলার এক শান্ত স্নিগ্ধ নগণ্য গ্রাম থেকে ছিটকে-আসা ভীরু যুবক আমি। দেশ ভাগ না হলে কোনদিনই হয়ত কলকাতায় আসা হত না; এলেও এভাবে এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই না। কাজেই বিশাখার মতন মেয়ে অদেখা, অজানা থেকে যেত।

আমার নরম নিরীহ স্নায়ুর পক্ষে বিশাখা অসহ্য। দু-চারদিন বাড়ি ফেরে না, অচেনা যুবকের সহচরী হয়ে শীতের সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াতে চায়---আমার সুদূর কল্পনাতেও এমন মেয়ের অস্তিত্ব ছিল না। মেয়ে বলতে মাত্র দু'জনকেই আমি চিনি, বুঝি, তারা আমার বোন এবং মা; আমার সমস্ত ভুবন জুড়ে তারা ছাড়া আর কেউ নেই। এর বাইরে এতকাল যাদের দেখেছি তারা আমার মা আর বোনেরই প্রতিচ্ছবি। সেদিক থেকে বিশাখা ভয়াবহ বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বৈকি।

বিশাখার কথা ভাবতে গিয়ে বিদ্যুচ্চমকের মতন আরেকজনকে মনে পড়ে গেল---সে অলকাদি। এই দুজনের ভেতর আশ্চর্য মিল।

গাড়িটা রাস্তা ঘুরে রসা রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। চমকে উঠে বললাম, 'দয়া করে আমাকে যাদবপুরে দিয়ে আসুন'---

কিন্তু কে কার কথা শোনে। আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল বিশাখা।

আমি সমানে বলতে লাগলাম, 'যাদবপুর দিয়ে আসুন, যাদবপুর দিয়ে আসুন---'

'আপনি ভয়ানক বেরসিক---'

'প্লীজ---'

'আপনি ক্রুয়েল।'

'আমাকে দয়া করুন।'

'আপনি হার্টলেস, সেল্‌ফ্‌সেণ্টার্ড।' বিশাখা বলতে লাগল, 'নিজে ছাড়া খুব সম্ভব আর কোনদিকে আপনার নজর নেই। অথচ---'

বিশাখার কথা আমি বুঝিবা শুনতে পাচ্ছিলাম না। করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে যাদবপুর পৌঁছে দেবার কথাটাই একটানা বলে যাচ্ছি।

বিশাখাও আমার কথায় কান দিচ্ছে না। আপন মনে বলে যাচ্ছে, 'অথচ জানেন, আমি যদি কারোকে আমার সঙ্গে রাত কাটাতে বলি সে স্বর্গ হাতে পেয়ে যাবে। রাত কাটানো তো সুখের কথা; আগুনে ঝাঁপ দিতে

বললে, তাই দেবে। আর আপনি কিনা---'

'আমি কী?'

'যাদবপুর যাবার জন্যে নাকে কেঁদে চলেছেন।'

আমি বললাম, 'আপনি তো জানেন না, আমি পরের বাড়ি থাকি। সেখানে খুব কড়াকড়ি। রাত্তিরে দশটার ভেতর না গেলে খুব মুশকিল।'

'আপনি কোথায় থাকেন, আমি জানি।' বিশাখা বলল।

'কোথায় বলুন তো?'

'হেমজেঠুর বাড়ি।'

'তবে তো ওঁকে আপনি চেনেন।'

'চিনব না। উনি আমার বাবার কতকালের বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে হেমজেঠুকে দেখে আসছি।'

বললাম, 'তা হলে নিশ্চয়ই জানেন, উনি কেমন মানুষ।'

বিশাখা বলল, 'ভীষণ পিউরিটান। নিজের বাড়িটাকে মঠটঠ গোছের কিছু একটা করে তুলবার ইচ্ছা ওঁর।'

'আমার তো ওঁকে বেশ ভালই লাগে।'

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেই আমার দিকে ঘুরে বসল বিশাখা, 'তাই তো, তাই তো---'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চকচকিয়ে গেলাম। বললাম, 'কী?'

'আগেই বোঝা উচিত ছিল, আপনি ঐ দলেরই। নিজের ছেলেদের তো পারেন নি হেমজেঠু, আপনার মাথাটা একেবারে খেয়ে দিয়েছেন।'

'আপনি ওঁর ছেলেদের চেনেন?'

'বা রে, চিনব না।'

চেনাই তো স্বাভাবিক।

পিতৃবন্ধুর ছেলেদের চেনে কিনা, এ জাতীয় প্রশ্ন কেমন করে করলাম সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার; বোকামিরও। আর কিছু না বলে এবার চুপ করে থাকলাম।

বিশাখা বলতে লাগল, 'বিমলদা, অমল, রিণ্টু---ওরা কতবার আমাদের বাড়ি এসেছে, আমি কতবার ওদের বাড়ি গেছি।'

এবারও আমি নিরুত্তর।

বিশাখা আবার বলল, 'হেমজেঠু আপনার কে হন?'

সম্পর্কটা কী, জানালাম।

কথায় কথায় কখন আমরা এলগিন রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম, খেয়াল নেই। এর ভেতর কুয়াশা আরো গাঢ় হয়েছে, রাস্তার আলোগুলো আরো নিভু-নিভু। কদাচিৎ এক-আধটা গাড়ি উল্কার মতন ছুটে যাচ্ছে। নির্জন ফুটপাথে দু-একটা লোক। তা ছাড়া সব অসাড়, মূর্ছিত। শীতের রাত শব্দ-গন্ধ---দৃশ্য, সমস্ত কিছুর ওপর ভারী প্রচ্ছদ টেনে দিয়েছে।

আমি শিউরে উঠলাম, 'কতদূর চলে এসেছি। এই হাতজোড় করছি আমাকে যাদবপুর দিয়ে আসুন।'

'কিন্তু চিরঞ্জীববাবু---'

'কী?'

'আপনার সঙ্গে যে অনেক কথা আছে আমার।'

যাকে আজই খানিক আগে প্রথম দেখেছি, তার সঙ্গে আমার কী কথা থাকতে পারে জানি না। তবু বললাম, 'আরেক দিন এসে আপনার কথা শুনে যাব।'

'আরেক দিন হয়ত আপনাকে আমার দরকার হবে না।'

করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে বলতে লাগলাম, 'আমি ও বাড়িতে আশ্রিত; আমার কথা বিবেচনা করে ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা করব, না?' চোখের তারা এবার জ্বলে উঠল বিশাখার; দপ্ দপ করতে লাগল। একমুহূর্তে তার সমস্ত চেহারাটাই গেল বদলে। জোরে জোরে শ্বাস পড়তে লাগল; ফলে বুক দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। হিংস্র আক্রোশভরা গলায় সে বলল, 'আপনার মত এমন অপমান আগে আর কেউ আমাকে করে নি।'

তার দপ্ দপে চোখ, ঘনশ্বসিত বুক এবং উত্তেজিত চেহারা দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কিভাবে কখন তাকে অপমান করেছি, বুঝতে পারছি না। পারছি না বলে ভয়ের সঙ্গে বিমূঢ়তাও মিশেছে।

বিশাখার কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগল, 'নিজেকে আপনি ভেবেছেন কী? খুব দামী? মূল্যবান? দুর্লভ?'

হকচকিয়ে গেলাম, 'নিজের সম্বন্ধে সে রকম ধারণা আমার কোনদিনই নেই। আমি জানি, আমার দাম কানা-কড়িও না।'

'ঠিকই জানেন, আপনার দাম কানা-কড়িও না। তবে এত গর্ব কিসের আপনার? কিসের এত দম্ভ?'

'গর্ব বা দম্ভ কিছুই তো আমার নেই।'

'না-ই যদি থাকে আমার সঙ্গে বেড়াতে আপনার আপত্তি কেন?' বিশাখা সমানে চেঁচাতে লাগল, 'আপনি জানেন কি, এই কলকাতা শহরে হাতের আঙুল নাড়িয়ে যদি ইশারা করি, যে-কোন ইয়ংম্যান একটা রাত কেন সারা জীবন আমার পিছু-পিছু ঘুরবে।'

আমি কী বলব? বিশাখা কি কামপিপাসু? সে যাই হোক, তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেও কিছু সংশয় জাগছে। কোন কথা না বলে আমি চুপ করে থাকলাম।

বিশাখা ক্ষেপে উঠল, 'চুপ করে রইলেন কেন? আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'আজ্ঞে---'

'আমি মিথ্যে বলেছি?'

ভয়ার্ত স্বরে বললাম, 'আমি তো সে কথা বলিনি।'

বিশাখা আগের স্বরেই বলল, 'মুখে বলেন নি, তবে ভাবভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'এ আপনি কী বলছেন।'

'ঠিকই বলছি।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। শ্বাসরুদ্ধের মতন বলতে চাইলাম, 'ঠিক নয়, ঠিক নয়---' কিন্তু গলায় এবার স্বর ফুটল না।

খানিক আগের মতন আক্রোশ-পূর্ণ স্বরে বিশাখা বলল, 'বিশ্বাস না

করে ভেবেছেন পার পেয়ে যাবেন? কক্ষণো না।'

'আজ্ঞে---'

বিশাখা ধমকে উঠল, 'আজ্ঞে আজ্ঞে করবেন না। আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ব। চলুন---

গাড়িটা ঘুরিয়ে ডানদিকের একটা রাস্তায় ঢোকাল বিশাখা; তারপর দুরন্ত স্পীড তুলল।

এ রাস্তাটার কী নাম, জানি না। কলকাতায় নেহাতই অচেনা আগন্তুক আমি; এই তো সেদিন এখানে এলাম। এখানকার ক'টা পথের নামই বা জানি। যাই হোক, প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'

বিশাখা উত্তর দিল না।

আমি আবার আগের মতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের গন্তব্য জানতে চাইলাম।

বিশাখা এবার মুখ খুলল। বলল, 'চুপচাপ বসে থাকুন; গেলেই বুঝতে পারবেন, কোথায় এসেছেন।'

আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস হল না। দম বন্ধ করে বসে থাকলাম।

খুব বেশিদূর অবশ্য যেতে হল না। বিরাট কম্পাউণ্ডঅলা একটা তিন-তলা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল বিশাখা। ওধারের দরজা খুলে নামতে নামতে বলল, 'আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।' বলে আর অপেক্ষা করল না, একরকম উড়তে-উড়তে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

এ বাড়ি কাদের। শীতরাতের মধ্যযামে হঠাৎ এখানে বিশাখার কী এমন প্রয়োজন থাকতে পারে, বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে এ সব প্রশ্নের সদুত্তর পাবার উপায় নেই। অবশ্য সেজন্য আমার দুর্ভাবনাও নেই। আমি শুধু ভাবছি, কখন মুক্তি পাব।

একটু পরেই বিশাখা ফিরে এল। সঙ্গে সুদর্শন একটি যুবক।

জানলা দিয়ে গাড়ির ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বিশাখা আমার কানের কাছে ফিসফিস করল, 'দেখলেন তো, আমি ডাকলে আসে কিনা—এর নাম সন্দীপ; ঘুমুচ্ছিল। ডাকামাত্র উঠে চলে এল। আপনাকে অত করে বললাম, শুনলেন না তো। ও কিন্তু গুড বয়; সারারাত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।'

চকিত হয়ে আমি বিশাখার সঙ্গীকে আরেকবার ভাল করে দেখে নিলাম।

ইতিমধ্যে বিশাখা গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বার করে নিয়েছে। একটু আগে ফিসফিস করছিল। এবার গলা তুলে বলল, 'আপনি একটু নামুন তো---'

বলামাত্র নেমে পড়লাম।

বিশাখা এবার সন্দীপের দিকে তাকাল। বলল, 'ঐখানটায় বোসো---' আমি যেখানে বসেছিলাম, আঙুল দিয়ে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল বিশাখা।

একটি কথা না বলে আমার জায়গায় উঠে বসল সন্দীপ। বিশাখা তাকে শুধলো, 'তুমি ড্রাইভ করবে?'

'না।' সন্দীপ মাথা নাড়ল।

'কেন?'

'এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যাবে।'

'এ্যাকসিডেণ্ট।'

'ইয়েস ম্যাডাম---' সন্দীপ হাসল, 'কেন না, গাড়ি চালাতে চালাতে আমার চোখ তো সামনের দিকে থাকবে না---'

বিশাখা অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে কোনদিকে থাকবে?'

'জাস্ট ইমাজিন---'

'পারছি না।'

'ট্রাই এগেন---'

'পারছি না।'

ডান চোখ ঈষৎ ছোট করে সন্দীপ বলল, 'আমি তো তোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকব।'

'নটি বয়---' হাসতে হাসতে ঘুরে গিয়ে ড্রাইভারের সীটে বসল বিশাখা।

ভেবেছিলাম, বিশাখা এবার আমাকে উঠতে বলবে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাকে নিদারুণ উদাসীন দেখে মনে মনে শঙ্কিত হলাম। আড়ষ্ট অস্ফুট স্বরে বললাম, 'আমি---'

বিশাখা খানিক সচেতন হয়ে বলল, 'ও আপনি।' বলে একটু থামল। তারপর চট করে কি ভেবে নিয়ে আবার সুরু করল, 'আপনি আমার কথা শোনেন নি। তার জন্য আপনার কিছু শাস্তি পাওয়া দরকার।' বলেই স্টার্ট দিল; নিমেষে গাড়ির চাকায় উল্কার গতি খেলে গেল। আমি কিছু বলার আগেই বিশাখারা রাস্তার দূর বাঁকে অদৃশ্য হল।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। শাস্তিটা যে কী তারপরেই টের পেলাম। কেন না নির্জন হিমাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে অসাড় ক্লান্ত শরীরে যখন যাদবপুর পৌঁছুলাম শীতের দীর্ঘ আড়ষ্ট রাত শেষ হতে খুব বেশি বাকি নেই।

গেট খুলে বাগানের ভেতর ঢুকতেই সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার ঘরে আলো জ্বলছে। তবে কি অমল আজও জেগে বসে আছে?

সে যাই হোক, সদরে টোকা দিতে যে এসে দরজা খুলে দিল, এই মুহূর্তে তাকে অন্তত প্রত্যাশা করিনি। সে অমল না, বিমল। [ক্রমশ।

বিশ্বাসে

বিশ্বজিৎ মতিলাল

শৈশবে ভেবেছিলাম
নাবিক এসে ধরবে হাত,
পৌঁছে দেবে স্থলে।
শঙ্খ, ঝিনুক সঙ্গ নেবে
মুক্তা-শিশু কোলে।
অত প্রাচীন,
এতই সহজ শান্তি!
শতেক ভুল, ভ্রান্তি
সে তো পথ ভোলালই!
এখন কোথায় নাবিক, মাস্তুল বা হাই!

আকস্মিকতা ও আবিষ্কার

সুইডেনের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ আলফ্রেড নোবেল কতকগুলি নাইট্রোগ্লিসারিন-এর কারখানার মালিক ছিলেন। এই রাসায়নিক পদার্থটি হঠাৎ উত্তপ্ত হলে বা ঝাঁকুনি লাগলে বিস্ফোরিত হয়। তাঁর কারখানাগুলিতে এই জাতীয় বিস্ফোরণ লেগেই থাকতো। ফলে গভর্নমেণ্ট এর ব্যবহার বন্ধ করে দিলেন। তাকে শহর থেকে কারখানা গোটাতে বাধ্য করা হল এবং তিনি 'মালানেন' হ্রদে এক বজরা নোঙর করে তার ওপরেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। হঠাৎ সেই বিপর্যস্ত রসায়নবিদের ভাগ্য খুলে গেল এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

একদিন তিনি দেখলেন নাইট্রোগ্লিসারিনের পাত্রে ছিদ্র হয়ে তা থেকে নাইট্রোগ্লিসারিন বেরিয়ে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি কিছু বালি সেখানে ছড়িয়ে দিলেন সেটা শুষে নেবার জন্যে। বালির সঙ্গে মিশে সেটা একটা শক্ত পদার্থে পরিণত হল---যার বিস্ফোরণের ক্ষমতা অনেক কম। এইভাবে নিরাপদে ডিনামাইট হিসাবে সছিদ্র মাটিতে নাইট্রোগ্লিসারিন শুষে রাখবার পদ্ধতি চালু হল।

নোবেলের Blasting Gelatin আবিষ্কারও একটা আকস্মিক ঘটনা। একদিন ল্যাবরেটরীতে কাজ করবার সময় তাঁর হাতের আঙুল একটু কেটে যায়। তিনি অ্যালকোহল আর ইথারে তুলো ভিজিয়ে সেখানে লাগিয়ে দিলেন। পরে তিনি লক্ষ্য করলেন সেখানে চাঁড়ার মত একটা জিনিষ তৈরী হয়েছে। তিনি ভাবলেন নাইট্রোগ্লিসারিনকে তুলোয় ভিজিয়ে রাখলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ---সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলেন বিস্ফোরক Blasting Gelatin---যেটা একাধারে আরও বেশী শক্তিশালী ও নিরাপদ।

[illegible] পার্কিন আলকাতরা থেকে রঙ তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কারও একটা দৈব ঘটনা বলতে হবে। ১৮৫৬ সালে আঠারো বছরের যুবক আলকাতরা থেকে কুইনাইন আবিষ্কারে ব্যস্ত। তাঁর সমস্ত পরীক্ষা যখন বিফল হয়ে যাচ্ছে এমনি সময়েই একদিন পরীক্ষা শেষে তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর 'বিকারে' পড়ে রয়েছে একটা কুৎসিত কালো পদার্থ। প্রথমে ভাবলেন সেটা ফেলে দেবেন—কিন্তু পরক্ষণেই যেন কোন অদৃশ্য শক্তির সঙ্কেতে তিনি কিছু এ্যালকোহল ঢেলে দিলেন তার ভিতর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন তাঁর পরীক্ষা পাত্রটি ভরে গেছে মনমাতানো রঙে। তিনি তাঁর দৃষ্টি কুইনাইন ছেড়ে রঙকে পৃথক করবার দিকে দিলেন এবং কৃতকার্যও হলেন। পারকিন যে জিনিষটি নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন সেটা হওয়া উচিত ছিল বিশুদ্ধ অ্যানিলিন---কিন্তু ছিল সামান্য পরিমাণ আলকাতরা জাতীয় জিনিষ---আর এই অনাহূত জিনিষটাই তাঁকে এক নতুন পথের সন্ধান দিল। কিন্তু শুধু কি তাই আজ আলকাতরা নামে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধময় বস্তুটি থেকে যে অসংখ্যরকম রঙ ও সুগন্ধি দ্রব্য তৈরী হচ্ছে তারও শুভ সূচনা হয় সেদিন। পারকিনের কৃত্রিম নীল আবিষ্কারও এক আকস্মিক ঘটনা। পরীক্ষা পাত্রে তাপ মাপবার জন্য একটা তাপমান যন্ত্র বসানো ছিল, সেটা হঠাৎ নাড়া লেগে ভেঙে যায়, আর পারা বেরিয়ে আসে। তারই স্পর্শে পরীক্ষা পাত্রের তরল পদার্থটি হঠাৎ ঘন নীল রঙ্ ধারণ করে। পারার এই জাতীয় গুণে তিনি বিস্মিত হলেন---তাঁর বহুদিনের সাধনার হল সমাধান। রেলগাড়ীর প্রথম জীবনে গাড়ী থামাবার জন্যে ব্রেকের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। গাড়ীর সমস্ত বগিগুলো [illegible] থামাবার অনেকভাবে চেষ্টা করা হলেও তা কার্যক্ষেত্রে বিফল হত। ফলে বগিগুলো গাড়ী থামাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভাবে পরস্পর ধাক্কা খেত্রো। এটা কিভাবে বন্ধ করা যায় তা ভাবিয়ে তুললো তরুণ ইঞ্জিনীয়ার জর্জ ওয়েস্টিংহাউসকে। তাঁর বাষ্পচালিত ব্রেক বিফল হল---কারণ বাষ্প লম্বা পাইপ দিয়ে পেছনের কামরাগুলোতে যেতে যেতে ঠাণ্ডা হয়ে জল হয়ে যেত।

একটা সামান্য ঘটনা ওয়েস্টিংহাউসের ভবিষ্যৎ জীবন রচনা করে দিয়ে গেল। একদিন তিনি বসে আছেন—এমন সময় একজন মহিলা তাঁর কাছে এসে একখানা মাসিক পত্রিকা দিয়ে গেলেন। তিনি এই জাতীয় পত্রিকা কখনও পড়েন না, কিন্তু মহিলাটির বারবার অনুরোধে তিনি সেটা নিতে বাধ্য হলেন। পত্রিকাটি হাতে পেয়ে চোখ বোলাচ্ছেন---এমন সময় তাঁর লক্ষ্য পড়লো একটা রচনার উপর---সেখানে রয়েছে সুইজারল্যাণ্ডের Mont Cenis সুড়ঙ্গ তৈরী করতে কিভাবে Compressed Air (বায়ুমণ্ডলের ছয় গুণ চাপে) ৩০০০ ফুট পাইপের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে কিভাবে পাথর কাটা হচ্ছে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পত্রিকাখানা ছুঁড়ে ফেললেন। কারণ তাঁর অভীষ্ট বস্তু তিনি পেয়ে গেছেন। তিনি ভাবলেন হাঁ বাতাসকে তো ব্যবহার করা যায় ব্রেক চালাবার কাজে। এতে পাইপের ভিতর ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাবারও ভয় নেই---ফলে অনেকদূর অনায়াসেই পাঠানো যাবে। ওয়েস্টিংহাউসের সাধনা সার্থক হল। একদিন ১৮৬৯ সালে তিনি তাঁর নতুন আবিষ্কৃত ব্রেকের সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে নিরাপদে গাড়ী চালাতে সক্ষম হলেন--গাড়ীর চালক ছিলেন তিনি নিজে।

—বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী

বাঁকুড়া

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মন্দির

বাঙলা দেশে বর্ধমানস্থ বিভাগে বাঁকুড়া একটি জেলা ও শহর। আগে এই জেলা বর্ধমান চাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬০ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর বর্ধমান চাক্‌লা মীরজাফর কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়া হয়। ১৭৬৫ খৃঃ কোম্পানী আবার বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পায়। সেই সময় হতে ১৭৯৩ খৃঃ পর্যন্ত বাঁকুড়া 'বিষ্ণুপুর জমিদারী' নামে অভিহিত হত। ১৭৯৩ খৃঃ ইহা বর্ধমানের অন্তর্গত হয়। আগে বিষ্ণুপুর শহর এবং জেলার প্রধান কার্যস্থল ছিল। পরে বাঁকুড়া শহরে আনীত হয়। বৃটিশ আমলের ১৮৩৪-৩৬ খৃঃ বাঁকুড়া একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিণত হয়। জেলাটির অপর নাম 'বাকুণ্ডা'।

সীমা---এই জেলার উত্তরে দামোদর নদী, দক্ষিণে মেদিনীপুর, পূর্বে বর্ধমান ও হুগলী জেলা এবং পশ্চিমে মানভূম জেলা।

এই জেলার পরিমাণফল ২৬৫৩ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা---১৬,৬৪,৫১৩ (১৯৬১)।

মহকুমা---বাঁকুড়া জেলা বাঁকুড়া সদর ও বিষ্ণুপুর দুই মহকুমায় বিভক্ত। সদর মহকুমা ১৯৩৩ বর্গমাইল ও বিষ্ণুপুর মহকুমা ৭১৪ বর্গমাইল। ইন্দাস, কোতলপুর, সোনামুখী, গঙ্গাজলঘাটি, খাতরা, রাইপুর, সদর ও ওন্দা এই নয়টি থানায় বিভক্ত।

নদী---বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণ ও পূর্ব দিক দিয়ে দ্বারকেশ্বর ও উত্তর দিক দিয়ে গন্ধেশ্বরী নদী প্রবাহিত। দুটি নদীর অবস্থান দুদিকে থাবায় যেন শহরটিকে মালাবেষ্টিতের মত দেখায়। এ ছাড়া দামোদর, আমোদর, (কাঁসাই) বোদাই, শালী, বিড়াই, শীলাবতী, কংসাবতী প্রভৃতি নদী এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। নদীগুলি সুনাব্য নয়, সময় সময় এই সকল নদীতে প্রবল বন্যা এসে দেশের ক্ষতি করে। গন্ধেশ্বরী নদীর জল স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে বাঁকুড়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান।

এই জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এখানে শুশুনিয়া ও বিহারীনাথ নামে দুটি পাহাড় আছে। প্রথমটি ১৪৪২ ফুট ও দ্বিতীয়টি ১৪৬৯ ফুট উচ্চ। এই জেলার অধিকাংশ স্থানই বন-জঙ্গলে পূর্ণ। প্রচুর পশু পাখী, হিংস্র জন্তু এই জঙ্গলে সমাকীর্ণ। প্রচুর গাছপালা এই বনের সম্পদ। বাঁকুড়ার জঙ্গলে শাল, মহুয়া, শিশু, আবলুস, কসুম, পিয়াশাল প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। মহুয়া (মৌল) গাছের ফুল থেকে এক প্রকার তেল তৈরী হয়, সেই তেলে পশ্চিম বাঁকুড়ার লোকেরা প্রদীপ জ্বালায়।

এই সব জঙ্গলের ধারে সাঁওতাল বাউরি, লোহার প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা বাস করে। তাঁরা জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রয় করে, চাষবাসও করে। রাত্রিবেলা তারা মাদল বাজিয়ে নাচ গান করে। পুরুষেরা মাদল বাজায় আর স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কটিদেশ ধারণ করে তালে তালে পা ফেলে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

বিষ্ণুপুর (মল্লভূমি বা বনবিষ্ণুপুর)

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে ইহা একটি রাজ্য ছিল। বিষ্ণুপুর রাজ্য এককালে উত্তর দিকে সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ, পূর্বে বর্ধমানের কিয়দংশ ও পশ্চিমে ছোট নাগপুরের কতকাংশে বিস্তৃত ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজবংশ প্রথমে যেখানে রাজত্ব করতেন, সেই স্থানকে তখন 'মল্লভূমি' নামে অভিহিত করা হত। আরও প্রাচীনকালে রাঢ় ও উৎকল রাজ্যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডকে 'মল্লভূমি' বলত। মল্লজাতিরা এর অধীশ্বর। বর্তমান মানভূম, সিংভূম, শিখরভূম, স্বরভম প্রভৃতি প্রাচীনকালে মল্লভূমির অন্তর্গত ছিল। মান, সিংহ, বীর, সুর, বরা, ধল প্রভৃতি মল্লদিগের পদবী। কারুর মতে মল্লরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নামে মানভূম, সিংভূম, ধলভূম প্রভৃতি বিভাগ তৈরী করেন। (বীরভূমের ইতিহাস)। যাহোক মল্লভূমি বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্রায়তন মল্লভূমি হতে ক্রমে ক্রমে মল্লরাজগণ আপনাদের অধিকার বিস্তার করেন ও পশ্চিমবঙ্গে এক বিশাল স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এঁরা তখন এমনই প্রতাপশালী ছিলেন যে, এক সময়ে এঁরা মোগল সম্রাটের পতাকা

অগ্রাহ্য করে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ রেখেছিলেন। মল্লরাজগণের রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুর। এই বিষ্ণুপুরকে মল্লরাজেরা অমরাবতীর তুল্য মনোরম করে তোলেন। দুর্গে, অসংখ্য মন্দিরে, বিশাল বিশাল বাঁধে, অগণিত অট্টালিকায় এই রাজধানী সুশোভিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিষ্ণুপুরে সেই সব অতীত ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দুর্গ নামমাত্র আছে, অসংখ্য মন্দির আছে কিন্তু ধ্বংসস্তূপে পরিণত, বাঁধসকল শুষ্ক, অট্টালিকা জীর্ণ ও ভগ্ন। এখন যে দিকে চাওয়া যায় সেদিকেই বন আর জঙ্গলে পূর্ণ।
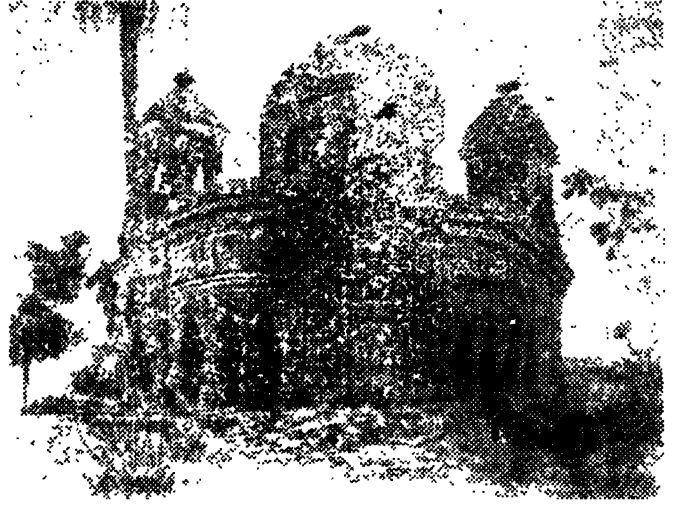
বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির

মল্লরাজবংশের স্থাপনের একটা কিংবদন্তী আছে যে রাজপুতনার অন্তর্গত রণথম্বরের কাছে জয়নগর নামে এক স্থান থেকে ক্ষত্রিয় বংশের কোনও এক ব্যক্তি সস্ত্রীক শ্রীক্ষেত্র পরিদর্শন করতে পদব্রজে আসেন। পথিমধ্যে বিষ্ণুপুরের কাছে লাউগ্রামে (বর্তমান কোতলপুর থানার কাছে) পঞ্চানন ভট্টাচার্য (নামান্তর রামরুদ্র) নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে তিনি একাকীই শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যান। এদিকে পুত্রের জন্মের পর মায়ের মৃত্যু হয়। এক বাগদী জাতীয় রমণী সেই শিশুর ধাত্রী নিযুক্ত হয়। শিশুটির নাম রাখা হয় রঘুনাথ (নামান্তরে গোপাল)। আনুমানিক ৬৯৪ খৃঃ জন্ম। কালক্রমে রঘুনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পঞ্চাননের গোপালক নিযুক্ত হন। ওখানে মাল, বাগদী জাতীয় ছেলেদের সঙ্গে খেলা ও মল্লবিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে এই বালক সাহসী, তেজস্বী ও মহাবলশালী হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি নিকটেই প্রদ্যুম্ন রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। এই সময় থেকেই তিনি ভীমবল মহাজি নামে এক সাঁওতাল সামন্তের সাহায্যে সৈন্যদল গঠন করে জাতবিহারের রাজা প্রতাপনারায়ণ অবাধ্যতা প্রকাশ করলে রঘুনাথ প্রতাপনারায়ণকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য জয় করেন। এরপর আরও অনেক ছোট ছোট রাজ্য রঘুনাথ বা গোপালমল্লের বশ্যতা স্বীকার করে। প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহদেব তাঁর পরাক্রম দেখে ভীত হয়ে গোপনে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন। গোপাল মল্ল সেই সময় কিছুকাল অজ্ঞাতবাস থেকে সাঁওতাল সৈন্য সংগ্রহ করে প্রদ্যুম্নপুর আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। রাজা আত্মহত্যা করেন। গোপাল মল্ল ধ্বজমনিদেবীকে বিয়ে করে প্রদ্যুম্নপুরের সিংহাসনে বসেন। কারুর মতে গোপাল মল্লের পুত্র জয় মল্ল পদ্মপুর আক্রমণ করেন। তিনি নিকটবর্তী লাউগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। গোপাল মল্ল সেই সময় 'আদিমল্ল' নামে বিখ্যাত হন। তাঁকে কেউ কেউ 'বাগদী রাজা' বলেও অভিহিত করতেন। এই আদি মল্লই বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই রাজত্বকালে তাঁরই জন্মদিন হতে সেই রাজ্যের লোকেরা মল্লাব্দ সালের প্রচলন করে। সেটা খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দী অর্থাৎ ৬৯৪ খৃঃ। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী শক্রোত্থান তিথি হতে এই মল্লাব্দের সূচনা (বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের বংশাবলী History of Vishnupur Raj---Abhoy Pada Mallick.

তারপর জয়মল্ল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধীশ্বর হয়ে বিষ্ণুপর রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি মাত্র ১০ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

এরপর রাজাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজ্য বিস্তার করেন।

এই বংশের ১৯ সংখ্যক রাজা জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরের অনেক উন্নতি করেন।

৩৩ সংখ্যক রাজা রামমল্ল দুর্গের উন্নতি সাধন ও সৈন্য গঠনের সুবন্দোবস্ত করেন।

৪২ সংখ্যক রাজা ধাড়িমল্লের সময় মোগল পাঠানের সংঘর্ষ হয়। কতলু খাঁর অধীনে পাঠানগণ উড়িষ্যা থেকে দামোদর নদ পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করে। বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুরও তাঁদের হস্তগত হয়। ধাড়িমল্ল ৪৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

ধাড়িমল্লের পুত্র বীর হাম্বীরও (১৫৮৭-১৬১৯) পাঠানদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই সময়ে মানসিংহ মোগলদের পক্ষ থেকে বাঙলা ও বিহারের সুবেদার হয়ে আসেন। মানসিংহ পাঠানদের দমন করবার জন্যে পুত্র জগৎসিংহকে বাহাদুর খাঁ-এর বিরুদ্ধে পাঠান। পাঠানগণ সন্ধি করতে চাইলে বীর হাম্বীর পাঠানদের মতলব বুঝতে পেরে জগৎসিংহকে সাবধান করে দেন।

কিন্তু জগৎসিংহ সেকথায় কর্ণপাত না করলে তিনি, তাঁকে রক্ষা করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। এই সময়ে কতলু খাঁ মৃত্যুমুখে পড়েন, আর পাঠানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। বীর হাম্বীর ধর্মভীরু ছিলেন, শেষ বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা নেন ও চৈতন্যদাস নামে পরিচিত হন। চৈতন্য দাস ভণিতায় অনেক পদও রচনা করেন।

বীর হাম্বীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধাড়ি হাম্বীর অনূন্য ৬ বছরের (১৬২০-১৬২৬) রাজত্ব করেন। তিনি মারা গেলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ বিষ্ণুপুরের রাজা হন (১৬২৭-১৬৫৬)। রঘুনাথ হতে বিষ্ণুপুরের রাজারা সিংহ উপাধি ধারণ করেন।

রঘুনাথের পুত্র বীরসিংহ অতি উগ্র প্রকৃতির রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি সামন্ত রাজাদের বশে রেখেছিলেন।

তাঁর পুত্র দুর্জয় সিংহের সময় (১৬৮২-১৭০২)। তিনি শোভা সিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান সর্দারের বিদ্রোহের সময় সরকার পক্ষে যোগ দেন।

তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রঘুনাথ (১৭০২-১৭১২) লালবাঈ নামে কোন মুসলমান রমণীর প্রণয়ে পড়েন, তার নামে এক বিচিত্র প্রাসাদ ও লালবাঈ বাঁধ নির্মাণ করেন। লালবাঈ-এর জন্য রঘুনাথ নিজধর্ম পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে রাজ-পরিবারের সকলে মিলে তাঁকে ও লালবাঈকে হত্যা করে।

এবার গোপাল সিংহ রাজা হন (১৭১২-১৭৪৭)। এঁর সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙলার দেওয়ান হয়ে নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। বিষ্ণুপর ও সেরপুর দুই পরগণার রাজস্ব স্থির হয় ১,২৯, ৮০৩ টাকা। গোপালের সময়ে বর্গীর হাঙ্গামাও আরম্ভ হয়। তারা বিষ্ণুপুর লুণ্ঠন করতে এসে ব্যর্থ হয়। কথিত আছে গোপাল সিংহ মদনমোহনের দলমাদল কামান আশ্রয় করে মারাঠাদের বিতাড়িত করেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র এই সুযোগে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে কিছু অংশ কেড়ে নেন। পরিণত বয়সে গোপালের ধর্মানুরাগ প্রবল হওয়ায় তিনি পুত্র কৃষ্ণ সিংহকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁর দ্বারাই রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

কৃষ্ণসিংহের অকাল মৃত্যুতে এবং গোপাল সিংহের পর কৃষ্ণ সিংহের পুত্র চৈতন্য সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজা হন (১৭৪৮-১৭৬৩)। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও সব সময় দেব-সেবায় নিরত থাকতেন। তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রী কমল বিশ্বাসের ওপর শাসনভার অর্পণ করেন ও তাঁকে 'ছত্রপতি' উপাধি দেন। মন্ত্রী এই গৌরবজনক উপাধি পেয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। প্রজারা তাঁর অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে ওঠে। তখন মহারাজের খুড়তুত ভাই দামোদর সিংহ মুর্শিদাবাদে গিয়ে সিরাজ-উদ্দৌল্লার শরণাপন্ন হন। নবাব তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করেন। এই সময় নবাবের সঙ্গে পূর্ণিয়ার যুদ্ধ হয়। দামোদর সিংহ শৌর্য-বীর্য দেখিয়ে পূর্ণিয়া যুদ্ধে জয় করেন। নবাব দামোদর সিংহকে 'রাজা' উপাধি দেন ও বিস্তর সৈন্য দিয়ে বিষ্ণুপুর জয়ের জন্য পাঠান। এই যুদ্ধে দামোদর ও তাঁর ভাই যুগলকিশোর পরাজিত হন। সেই হতেই মল্লভূমির রাজলক্ষ্মী চিরতরে অস্তমিত হন। চৈতন্যচরণ সিংহই বিষ্ণুপুরের শেষ স্বাধীন রাজা। স্বাধীনতা হারান ১৭৬৩ খৃঃ (আনুমানিক)।

দামোদর সিংহের রাজত্বের সময় রাজাদিগের অবস্থা এমন শোচনীয় হয় যে, সেই সময় দামোদর সিংহ তাঁদের কুলদেবতা মদনমোহন-বিগ্রহকে কলকাতার চিৎপুর রোডস্থ গোকুল মিত্রের কাছে লক্ষ মুদ্রায় বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই মদনমোহন চিরকালের জন্য গোকুল মিত্রের বাড়ীতেই রয়ে গেলেন, বিষ্ণুপুর রাজারা আর তা উদ্ধার করতে পারেন নি। বর্তমান কলকাতায় বাগবাজারে মদনমোহনতলায় সেই বিগ্রহ আজও বিরাজিত।

কেউ কেউ বলেন, রাজা যখন সেই বিগ্রহ ফেরৎ নিতে আসেন, তখন গোকুল মিত্র ঠিক সেই রকম এক বিগ্রহ তৈরী করে প্রত্যর্পণ করেন।

স্বাধীনতা হারাবার পর দ্বিতীয় গোপাল সিংহের পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ এই বংশের শেষ রাজা।

বিষ্ণুপুরের রাজারা অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। মল্লভূমি রাজত্বের মধ্যে এমন কোনও ব্রাহ্মণ বা দেবতার বিগ্রহ ছিল না যে তিনি মল্লভূমি রাজপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করেন নি।

দেব ও দেউল

মদনমোহন ঠাকুর জীউ---মল্লভূমির রাজবংশের কুলদেবতা। রাজা দুর্জন সিংহ কোনও এক ব্রাহ্মণের গৃহ হতে এই বিগ্রহ এনে স্থাপন করেন। ১৬৯৪ খৃঃ এর বিচিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরে রক্ষিত একটি শ্লোক থেকেও জানা যায় যায় যে ১০০০ মল্লাদের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজা দুর্জন সিংহ কর্তৃক এই মন্দির তৈরী হয়। এই মন্দিরে ৩৬০ দ্বার বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড রাসমঞ্চ ছিল, তা আজও জঙ্গলমধ্যে দেখা যায়।

বিষ্ণুপুর দুর্গাধিষ্ঠাত্রী মৃন্ময়ী দেবী---দশভুজারূপিণা। এঁর প্রতিষ্ঠাতা জয়মল্ল।

পঞ্চরত্ন শ্যামরায়ের মন্দির---১৬৪৩ খৃঃ রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক দুর্গ মধ্যে স্থাপিত।

মল্লেশ্বর শিবের মন্দির, লালজীর মন্দির---যথাক্রমে ১৬২২ ও ১৬৫৮ খৃঃ বীরসিংহ কর্তৃক স্থাপিত।

মুরারিমোহন মন্দির ও মদনগোপাল মন্দির---১৬৬৫ খৃঃ বীরসিংহ-মহিষী রাণী চূড়ামণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

কালাচাঁদ মন্দির---বীর হাম্বির প্রতিষ্ঠাতা।

রাধামাধবের মন্দির---কৃষ্ণ সিংহ মহিষী রাণী চূড়ামণি কর্তৃক ১৭৩৭ খৃঃ নির্মিত।

দণ্ডেশ্বরী দেবী---লাউগ্রামে আদি মল্ল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

গোকুলচাঁদ ও অনন্ত শয্যাশায়ী বিগ্রহ মন্দির—রাজাদের প্রতিষ্ঠিত—গোকুলনগরে।

গন্ধেশ্বর শিব, ভুবনেশ্বর, দেউলেশ্বর-গোকুলনগরে। গন্ধেশ্বর শিব প্রকাণ্ডকায় শিব। এতবড় শিব ভারতে খুব কম দেখা যায়। গৌরি-পট্ট সমেত গন্ধেশ্বর শিবকে তিন-মানুষ বেষ্টন করতে পারে কি না সন্দেহ।

এ ছাড়া রাধামোহন জীউ রাধা-মোহনপুরে, বৃন্দাবনচন্দ্র বীরসিংহ গ্রামে, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ধালসী গ্রামে। ধর্মঠাকুর প্রচুর। বনে-জঙ্গলে, গৃহস্থের বাড়ীতে গাছের তলায় এই দেবতাকে দেখতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরের রাজা অসংখ্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় দেবালয়সমূহের আরতির জন্য সাড়ে সাত মণ তেল লাগত। এখনও বিষ্ণুপুরের যে দিকে দেখা যায় সেইদিকেই ভাঙ্গা বা আধভাঙ্গা দেবালয় দেখতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরের রাজধানী গড়বেষ্টিত। এই গড় এখনও বিদ্যমান। পরিখার ওপরে মৃৎপ্রাচীরে অনেকগুলি কামান আজও সাজানো আছে। সামনে সিংহদ্বার, সিংহদ্বারটি পাথরের তৈরি। বিষ্ণুপুরে দুটি বড় কামান আছে—দল ও মাদল। এতবড় কামান সে যুগে বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না। বর্তমানে 'দল' কামান লালবাঁধে ও 'মাদল' জঙ্গলের মধ্যে আছে।

সাতটি বাঁধ—বিষ্ণুপুরে ৭টি প্রসিদ্ধ বাঁধ আছে—তাদের নাম লালবাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ, গাঁতার বাঁধ, যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ ও শ্যাম বাঁধ ও পোকাবাঁধ।

বিষ্ণুপুরের স্থাপত্য আজও বাঙলা স্থাপত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদের স্থাপত্য কতকগুলি ইঁট ও ঝামা পাথরে তৈরি। ইঁটের মন্দিরের মধ্যে শ্যামরায় ও মদনমোহনের মন্দির প্রসিদ্ধ। আর ঝামা পাথরের মন্দিরের মধ্যে লালজী, রাধাশ্যাম ও মদনগোপালের মন্দির। বাঙলার চালের ন্যায় তৈরি জোড় বাঙলাও বিশিষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন। রাধাশ্যামের মন্দিরে 'অষ্টোত্তর শত রাধাগোবিন্দ' নামে একখানি বিশাল পাথর আছে।

প্রদ্যুম্নপুর বা পদমপুর

বিষ্ণুপুর শহরের আট মাইল পূর্ব-দিকে প্রদ্যুম্নপুর বা পদুমপুর নামে একটি গড়বেষ্টিত গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বকালে এটি একটি রাজ্য ছিল। প্রাচীনকালে প্রদ্যুম্ন নামে কোন এক রাজা এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আদি মল্লের সময় প্রদ্যুম্নপুরের রাজা ছিলেন নৃসিংহদেব। এখনও এই স্থানে গড়ের মৃৎ-প্রাচীর ও সিংহদ্বারের ভগ্নাংশ দেখা যায়। গড়ের মধ্যে 'কানাই সায়র' নামে পুকুর আছে। এই পুকুরের মধ্যে পাথরের তৈরি এক অট্টালিকার নিদর্শন দেখা যায়। কথিত আছে—গোপাল মল্লের আক্রমণে এখানকার রাজা নৃসিংহদেব শরবিদ্ধ হয়ে এই কানাই-শায়রে আত্মবিসর্জন দেন।

মালিয়াড়া

বাঁকুড়ার মলিয়ারার জমিদারেরা রাজ উপাধি পেয়েছিলেন। এই জমিদার বংশ বহুকাল ধরে দান সদাব্রত করে আসছেন। এই বংশের রাজা দামোদর সিংহ দুর্ভিক্ষের সময় বহু গ্রামবাসীকে অকাতরে সাহায্য দান করেন ও তাদের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি খোলেন। তাঁর নিজ জমিদারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় খোলেন।

কুচিয়াকোল

বাঁকুড়ায় কুচিয়াকোলের রাজারা বিষ্ণুপুর রাজবংশের এক সরিক। এঁরা এক সময় বর্ধমানের পশ্চিমাংশে বাহুবলে প্রায় শত বছর ধরে আধিপত্য বিস্তার করেন। বিষ্ণুপুররাজ মহারাজা চৈতন্য সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর এক পুত্র নিমাই সিংহ দেব গদী না পাওয়ায় কুচিয়াকোলে জমীদারী কিনে সেখানে বসবাস করেন। নিমাই সিংহ সঙ্গীতে ও সূক্ষ্ম-শিল্পে পারদর্শী, সংস্কৃত ভাষা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তিনি অপরিমিত ব্যয়ের জন্য অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেন। তাঁর পুত্র বীরসিংহ পিতার এই অপরিমিত ব্যয় সহ্য করতে পারতেন না। পিতার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষ বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। শেষে মিটমাট হয়ে যায়। নিমাই সিংহ ১৮৩২ খৃঃ ৮০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বীরসিংহ ধর্ম-প্রবণ ছিলেন ও ৫৯ বছরে মারা যান। তাঁর দুই পুত্র রাধাবল্লভ সিংহদেব ও রামজীবন সিংহদেব। ১৬ বছর বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি তাঁর দেশের জনসাধারণের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংরেজী স্কুল, পাঠশালা ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও তাদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তিনি সদাশয় ও দানশীল ছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি দিল্লী দরবার হতে 'রায়-বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তিনি তিন পুত্র—উপেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে রেখে পরলোকগমন করেন।

অম্বিকানগর

অম্বিকানগর এই জেলার রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে রাজা নয়ন রায়ের গড়ের ভগ্নস্তূপ আছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

চিত্র : বিন্দুশেখর বিশ্বাস

ডেভিড কপারফিল্ডের লেখক

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

জন ডিকেন্সের ছেলে চার্লস ডিকেন্স। জন ডিকেন্স কোনদিন হিসেব করে চলতে পারেন নি। তিনি মাইনে পেয়ে সংসারের অবস্থা না-ভেবে অবুঝের মতন খরচ করতেন। প্রতি মাসে তাঁকে দেনা করতে হত। দেনার অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল। পাওনা-দাররা তাগাদা দিল, টাকা মিটিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাল। কিন্তু জন ডিকেন্স টাকা শোধ করতে পার-লেন না। পাওনাদাররা আদালতে নালিশ করল। বিচারে জনের জেল হয়ে গেল।

চার্লস ডিকেন্সের বয়স তখন সবে বারো পেরিয়েছে। জীবনের স্বপ্ন তার ভেঙে গেল। একটা কিছু না করলে পেট চলবে না। ডিকেন্স চাকরীর সন্ধানে বেরোলেন। একটা চাকরী জুটল। ব্ল্যাকিং কারখানায়। লেবেল লাগাতে হবে। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা সেই একা কাজ। তিনি এ কাজ নিলেন। সাতদিন পুরো কাজ করলে মাইনে পাবেন ছ' শিলিং। ডিকেন্স কাজ সুরু করলেন।

কারখানা রাস্তার ওপরেই। ডিকেন্স একটা জানালার সামনে বসে লেবেল লাগান। ডিকেন্স খুব চটপটে, পরি-শ্রমী। কাজ নিখুঁত, কাজে ফাঁকি দেন না। তিনি খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে তাকান। রাস্তায় চেনা-অচেনা মানুষের মিছিল। ডিকেন্স দেখতে পান, অনেকে তাঁর কাজ দেখে হাসাহাসি করে। তিনি মনে মনে বিরক্ত হতেন। নিজের ওপর ঘৃণা হত, দুটো পয়সার জন্যে এই জীবন্ত নরক-কুণ্ডে পড়ে আছেন। কিন্তু ডিকেন্স আবার মন ঠিক করে নিতেন। বাবা জেলে, এমন কেউ এই পৃথিবীতে নেই যার দরজায় গিয়ে তিনি দাঁড়াতে পারেন, যার কাছে তিনি আশ্রয় পেতে পারেন। নীল আকাশের নীচে মাটির পৃথিবীর ওপর তিনি অসহায়, নিঃসঙ্গ। তিনি মন দিয়ে কাজ সুরু করতেন। সাত দিন হলেই হাতে আসত ছ' শিলিং। ওই সামান্য দক্ষিণা হাতে পেয়ে ডিকেন্সের মনে হত, তিনি একজন ছোটখাট রাজা। তাঁর মন খুশীতে ভরে উঠত।

জীবনের প্রভাতকালে চার্লস ডিকেন্স যদি ব্ল্যাকিং কারখানায় লেবেল লাগাবার কাজ না নিতেন, ভোর ছ'টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই একঘেয়ে কাজ যদি না করতেন, পথচারী ভদ্র-লোকেরা যদি ওনার কাজ দেখে উপ-হাস না করতেন, তা'হলে হয়ত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ডেভিড কপারফিল্ড' কোন দিন তিনি রচনা করতে পারতেন না। ব্ল্যাকিং কারখানায় কাজ করে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, যে ছবি দিনের পর দিন তিনি কাজ করতে করতে দেখতে পেয়েছিলেন, তা তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে গেছেন বিখ্যাত উপন্যাস ডেভিড কপারফিল্ডে।

সাংবাদিক মহাত্মা গান্ধী

কল্যাণ মিত্র

মহাত্মা গান্ধীকে আমরা একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেখে আসছি এবং তিনি সে ভাবেই আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তাঁর জীবনের আর একটা দিক ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই বিশেষ কোন জ্ঞান নেই। তিনি ছিলেন একজন মহান সাংবাদিক। গোড়া থেকেই সাংবাদিকতার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং বরাবর এটাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

সাংবাদিক হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৮৯১ খৃস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী। এই দিনই তাঁর প্রথম লেখা বেরোয় লণ্ডনের 'ভেজিটেরিয়ান' পত্রিকায়। এই পত্রিকা ছিল 'লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটি' নামে একটি সমিতির মুখপাত্র।---কিন্তু সাংবাদিকতার জগতে তাঁর নাম প্রথম ছড়ায় ১৯০৩ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুন। তখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ডারবানে তাঁর প্রথম পত্রিকা সেখানেই প্রকাশিত হয়, নাম-'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন', এটা ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতে ভারতীয় সমাজ জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন।

তার পর ১৯১৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজী কলকাতায় ফিরে আসেন। এসে ভাবলেন, পত্রিকার মাধ্যমে খালি খবর ছাপালেই চলবে না মতামতেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তাই ভারতীয় রাজনীতির ওপর তাঁর বিভিন্ন আলোচনা ও মন্তব্য ক্রমশ

গান্ধীজী

প্রকাশিত হতে লাগল তাঁর পত্রিকায়। এ ছাড়া আরও তিনটি পত্রিকার সঙ্গে তিনি নিযুক্ত ছিলেন---'ইয়ং ইণ্ডিয়া', 'হরিজন' এবং 'নবজীবন'। একসময় তিনি এত নাম করেছিলেন যে, তার থাকাকালীন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র প্রচার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজার। এই পত্রিকায় খবর বিশেষ ছাপা হতো না তার জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তির নানা রকম বিষয়ে আলাপ আলোচনা, প্রকাশ পেতো।

তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর পত্রিকায় কোন রকম বিজ্ঞাপন ছাপা হ'ত না। বিজ্ঞাপন না ছাপিয়েও কি ভাবে পত্রিকা চালানো যায় তা তিনি দেখিয়েছেন। সংবাদপত্রের সমস্ত রকম কাজ তাঁর জানা ছিল। সংবাদ জোগাড় করা, তার বিবরণ লেখা, সেগুলোকে আবার কাগজে ছাপাবার উপযোগী করে লেখা সাব-এডিটিং এমন কি প্রুফ দেখার কাজও তিনি জানতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কলম সচল ছিল। তাঁর শেষ লেখা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিয়মাবলীর ওপর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। এটা লেখা হয় ১৯৪৮ সালে ৩০শে জানুয়ারী সকালবেলা আর তারই কয়েকঘণ্টা পরে নিভে যায় তাঁর জীবনদীপ অবাঞ্ছিত ভাবে।

সেই জাহাজটা কোথায় গেল?

অধীরকুমার রাহা

একশ' বছর আগের কথা।

খবর রটেছে অস্ট্রেলিয়ার নদীর পাড়ে, মিলছে সোনার গুঁড়ো, সোনার ঢেলা। কুড়িয়ে আনতে পারলেই হয়। রাতারাতি রাজা।

বেওয়ারিশ সোনার লোভে ইউরোপ আর আমেরিকা থেকে দলে দলে লোক ছুটল। চষে বেড়াতে লাগল সেই সব নদীর পাড়, যার কূলে কূলে ছড়ান রেণু রেণু, তাল তাল সোনা।

ভাগ্যবানেরা বস্তা-বোঝাই সেই সোনা নিয়ে চাপত জাহাজে। দুর্ভাগাদের খোঁজাখুঁজি আর খোঁড়াখুঁড়িই সার।

এমনি ভাগ্যমন্তদের একটা দল প্রায় দু'লক্ষ পাউণ্ডের (তখনকার দামে) সোনা দানা নিয়ে চেপেছিল 'জেনারেল গ্রান্ট' নামে একটা জাহাজে। যাত্রীদের মনে আনন্দের সীমা নেই। এই সোনা বেচে দেশে ফিরে গিয়ে সবাই হবে লক্ষপতি। উঠবে সমাজের চূড়ায়।

কেউ কি জানত, অলক্ষ্যে হেসেছিলেন বিধাতা ওদের এই স্বপ্নে?

জাহাজগুলো অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরত নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দিয়ে। তার পর পূবমুখো ঘুরে যেত দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্ত কেপ হর্ন। সেখান থেকে ইউরোপ আমেরিকায়।

'জেনারেল গ্রান্ট'ও যাবে এই পথেই।

বাঁধাধরা চেনা পথ। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগেই চলেছে জাহাজ। সময়টাও ঝড়-বাদলের নয়। মে মাস। সমুদ্র এখন শান্ত। দক্ষিণ গোলার্ধে এ সময় শুরু হয় শীত। কনকনে শীতের বাতাস বইতে থাকে দক্ষিণ মেরু থেকে। মেরু শীতের দাপট এড়াতে খুব দক্ষিণে

যায় না জাহজগুলি। নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণে অকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের কোল ঘেঁষে চলে।

এই দ্বীপপুঞ্জ পার হ'বার সময় পড়ে ডিসঅ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আইল্যাণ্ড— হতাশার দ্বীপ। যে মাসের মাঝামাঝি এই দ্বীপটি পার হয়ে এল জাহাজটা।

দ্বীপটা পার হয়ে যাবার সময়ও মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। বাতাসের টানে এগিয়ে চলেছিল পালের জাহাজ। হঠাৎ এক সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল দ্বীপটির থেকে কিছু দূরে যেতেই।

জাহাজ তবু কিন্তু এগিয়ে চলেছে, খরতর তার বেগ।

চমকে ওঠে নাবিকেরা। এ কেমন ধারা ব্যাপার। বাতাস নেই, অথচ তর তর বেগে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

প্রবল এক স্রোতের টানেই ছুটে চলেছে জাহাজ। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সভয়ে দেখতে পায় তারা।

এই চেনা সমুদ্র পথে কোথা থেকে এল এই অজানা স্রোতের টান? আশ্চর্য হয়ে যায় নাবিকেরা। প্রাণপণ চেষ্টা করল তারা স্রোতের টান থেকে জাহাজ বের করে নেবার। বৃথা। জাহাজ এগিয়েই চলল দুর্বার বেগে।

জাহাজের সব চেয়ে উঁচু থেকে, দূরবীনে চোখ লাগিয়ে ক্যাপ্টেন দেখতে থাকেন, কোথা থেকে আসছে এই টান। যদি সামনে কোনও ঘূর্ণি থাকে তা হলে সর্বনাশ।

এক সময় দূরবীনে দেখা গেল, দূরে বহু দূরে যেন ডাঙ্গার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সব চেয়ে বড় মাস্তুলটার উপর একজন মেটকে উঠতে বললেন দূরবীন নিয়ে।

হ্যাঁ, ডাঙ্গাই। সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল সে মাস্তুলের উপর থেকে। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে উঁচু উঁচু পাহাড়-চূড়া। সে দিক পানেই যেন উন্মাদের মত ছুটে চলেছে জাহাজখানা। এখনই এর এই পাগলা ছুট বন্ধ করতে না-পারলে, ঐ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হবে জাহাজ।

জাহাজ বাঁধ!—হাঁকলেন ক্যাপ্টেন।

নোঙর ফেলা হল, কিন্তু জল সেখানে এত গভীর যে, নোঙর মাটিতে পৌঁছতে পারল না। তেমনি তীব্র গতিতে ছুটে চলল জাহাজ।

পাগলের মত ছুটোছুটি করছে নাবিকেরা। ব্যস্ত চঞ্চল ক্যাপ্টেন।

কাঁড়ি কাঁড়ি সোনাদানার মালিক যাত্রীরা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ঘুমাচ্ছে। মায়াবী স্রোতের টানে ছুটে চলেছে জাহাজ দুর্বার গতিতে। রোধ করা যাচ্ছে না তার সর্বনাশা ছুট। ঐ ছুটের শেষ হবে দূরের ঐ পাহাড়ের গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে। এ সব তারা তখনও কিছু জানেন না।

সুখে ঘুমিয়ে ছিলেন যারা, স্বপ্ন দেখছিলেন ভবিষ্যৎ-দিনের আমীরীর। জাহাজের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। হন্ত দন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন ডেকে।

অবাক বিস্ময়ে সকলে দেখলেন, সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

সমুদ্রের মাঝে বিরাট এক পাহাড়। বড় বড় ঢেউ পাগলের মত এসে আছড়ে পড়ছে তার বুকে। পাহাড় ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে এক দুর্বার আবর্ত, উন্মাদ ঘূর্ণি। সেই ঘূর্ণির আবর্তে পড়ছে জাহাজ। বারে বারে ঠোক্কর খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। কখনও সামনের দিকে, কখনও পিছনের দিকে। কখনও পাশে। এক-একটা ঠোক্কর লাগছে আর যাত্রী ও নাবিকেরা ছটোপুটি খাচ্ছে। ছুটছে পাগলের মত। এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো। কোন দিকে যাওয়া নিরাপদ? কোন্ দিকে গেলে রক্ষা পাবে? দিশাহারা দিকবিদিক-জ্ঞান শূন্য। উন্মাদের মত অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত যেন সকলে।

এদিকে স্রোতের টানে সমানে ঠোক্কর খাচ্ছে জাহাজ। যেন বর্ষার নালার জলে টলমল ছোটো নৌকা।

লাইফ বোট নাবিয়ে যাত্রীরা যে পালাবে, সে উপায়ও নেই। এই ঘূর্ণির মাঝে পড়লে নৌকাগুলি ডুবে যাবে।

হঠাৎ এক সময় পাহাড় ঘিরে ঘুরপাক খাওয়া বন্ধ হল। তার পর সোজা এগিয়ে চলল একটা স্রোতধারা ধরে পাহাড়টার দিকে।

স্রোতধারা চলেছে পাহাড়ের একটা গুহার মুখে। জাহাজ গিয়ে ঢুকল সেই গুহার গর্ভে।

দুপাশের খানিকটা অংশ গুহার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গেল। সামনের দিকের কয়েকটি বড় বড় মাস্তুল ধ্বসে পড়ল দড়াদড়ি নিয়ে। জাহাজখানা ক্রমেই গুহার ভিতরে ঢুকছে। সবটাই হয়ত ঢুকে যেত। আটকে দিল জাহাজের সব চেয়ে বড় মাস্তুলটা। আধখানা ঢুকে জাহাজটা আটকে রইল গুহার মধ্যে।

গুহাটা অদ্ভুত ধরণের। দু'পাশ মসৃণ। খাড়া। ফাটল নেই, খাঁজ নেই যে তা বেয়ে কেউ নিচে নেবে যাবে। গুহার শেষ দেখা যায় না। নিচ দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে, সমুদ্রের জল-ধারা। গুহা দিয়ে জল কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে তাও ভাল বোঝা যায় না। সামনে ঘন অন্ধকার। রাত গভীর। আকাশে দু'একটা তারা।

জলে নাবতে পারলে বোঝা যেত চারিধারের অবস্থা। নিচে গর্জন করে চলেছে সাগর-তরঙ্গ। সাধ্য কার তার মাঝে নৌকা নাবায়।

পিছনের ডেকে, জাহাজের যে অংশটা গুহার বাইরে, সেখানে জড়ো হয় যাত্রীর দল। শঙ্কায় ভয়ে ত্রাসে তারা কাঁপছে। সমুদ্রের তলে ডোবা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজ-ডুবি হয়। সমুদ্রের মাঝে পাহাড় মাথা জাগিয়ে থাকে, এ সবই তাদের জানা। কিন্তু এ কি বিচিত্র ব্যাপার সাগরের মাঝে মাথা জাগানো এক পাহাড়ের গুহাগর্ভে ঢুকে গেল মস্তবড় জাহাজের আধখানা। মাস্তুলে না আটকালে হয়ত সবটাই ডুবে যেত। এমন ব্যাপার কেউ কখনও শোনে নি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

যান্ত্রিক গরু

তোমরা সবাই গরু দেখেছো এবং গরুর দুধও খেয়েছো। কিন্তু আমি যে গরুর কথা বলছি তার কথা শুনে তোমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে। এ গরুর কিন্তু প্রাণ নেই। অথচ সাধারণ গরুর মতোই দিব্যি সে মুখ নাড়ে, লেজ চোখ পর্যন্ত নাড়াচাড়া করে, এমন কি দুধ পর্যন্ত দিয়ে থাকে। শুধু প্রাণই নেই। এ গরুকে বলা হয় যান্ত্রিক গরু।

গরু সাধারণত ঘাস, খইল, নুন, ভাতের ফেন প্রভৃতি খেয়ে থাকে এবং তা থেকেই দুধ দেয়। তাই বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখলেন যে, যে সব খাদ্য খেয়ে গরু দুধ দেয় সেই সব খাদ্য থেকে কেন দুধ তৈরী করা যাবে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণা করে আবিষ্কার করলেন এই যান্ত্রিক গরু। এ গরু সাধারণ গরুর মতোই দেখতে এবং সাধারণ গরুর মতোই দুধ দিয়ে থাকে।

অবশ্য এ গরু তৈরী করতে অনেক টাকার দরকার। প্রথমত টিন, তামা, লোহা দিয়ে এই যান্ত্রিক গরুটি সৃষ্টি করা

রথীন সরকার

হয়। তারপর সেই ধাতুনির্মিত গরুর সারাদেহে একটি সত্যিকারের গরুর লোমওয়ালা চামড়া টান টান করে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তখন আর এ গরুকে নকল গরু বলে মনে হয় না। এ গরুর পেটের মধ্যে যন্ত্র বসানো থাকে এবং সেই যন্ত্রের সাহায্যে পাইপ দিয়ে দুধ বাইরে বেরিয়ে আসে।

তোমরা বলতে পারো অত টাকা খরচ করে একটি গরু তৈরী করে লাভ কি? লাভ নিশ্চয়ই আছে। নইলে বিজ্ঞানীরা এত বুদ্ধি খাটিয়ে যান্ত্রিক গরু সৃষ্টি করবেন কেন। জীবন্ত গরুর কাছ থেকে তো আর আমরা ইচ্ছামত দুধ পেতে পারি না তার একটা ক্ষমতা আছে। যে গরু পাঁচ সের দুধ দেয় তাকে ভালো করে খাওয়ালে বড়ো জোর সে সাত সের দুধ দিতে পারে। কিন্তু যান্ত্রিক গরুর ক্ষেত্রে সেটি হবার উপায় নেই। তার কাছ থেকে আমরা ইচ্ছা-মতো দুধ পেতে পারি। কারণ যন্ত্র মানুষেরই সৃষ্টি। এর পেটের মধ্যে যে ইঞ্জিন বসানো থাকে তার সাহায্যেই নাক, মুখ, চোখ, লেজ নাড়াতে পারে।

তবে ইচ্ছা করলেই যে আর পাঁচটা সাধারণ গরুর মতো তেড়ে এসে তোমাকে আমাকে গুঁতোবে সে ক্ষমতা কিন্তু তার নেই। কারণ এটি তো আর আসলে গরু নয়—এটি একটি যন্ত্র। তাই প্রাণ বা ইচ্ছাশক্তি বলে এর কিছু নেই।

দাবাখেলায় একটি অসাধারণ প্রতিভা

ইউডা হেমপেলের বয়স এখন মাত্র সাড়ে সাত বছর কিন্তু এই বয়সেই সে বারোজনের বিপক্ষে একা দাবা খেলতে পারে।

ইউডা প্রতিভাশালী সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর প্রতিভা স্ফুরণে তার বাবা হেরমান তাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। ইউডার বয়স যখন সবে তিন, তার বাবা তাকে সব ঘুঁটির নাম বলে কোন ঘুঁটির কি চাল শিখিয়েছিলেন। ছ'মাসের মধ্যে ইউডা দাবার খুঁটিনাটি শিখে নিয়ে বাবার বিপক্ষে খেলতে আরম্ভ করে-ছিল। বাবার মত ইউডার ঠাকুর্দাও জবরদস্ত দাবা খেলোয়াড় ছিলেন। এই আশ্চর্য শিশু ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বহু বাঘা দাবা খেলোয়াড়কে হারি-য়েছে। দাবা খেলার মতন পড়াশুনাতেও ইউডা সমান পারদর্শী। আগামী বছর থেকে ইউডা খোলা প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে।

জানলা দিয়ে পড়ন্ত বিকেলের রোদ এসে ঘরের দেয়ালে পড়েছিল, মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

ওই পড়ন্ত বেলার ঝিকিমিকি আলোকে বড় ভয় মীনাক্ষীর। ওটা যেন একটা সর্বগ্রাসী কালো দৈত্যের সোনালী মুখোস। মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে মুখোসটা, মুহূর্তে সেই কালো দৈত্যটা তার লোমশ থাবাটা বাড়িয়ে মীনাক্ষীকে চেপে ধরবে, সেই থাবার মধ্যে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে মীনাক্ষী, মুছে যাবে মীনাক্ষী নামের মেয়েটা।

●

কিন্তু মীনাক্ষী নামের সেই মেয়েটা কি আছে এখনও? সেই ভীরু অথচ বিদ্রোহী, মৃদু অথচ সতেজ এমনি উল্টোপাল্টা উপাদানে গঠিত সেই মেয়েটা।

নিজে তো সে ভাবছে, সে শেষ হয়ে গেছে, মুছে গেছে, মরে গেছে। তাই পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে আছে সে।

এই পৃথিবীর দিকের একটি দরজা মাঝে মাঝে ঝড়ের ধাক্কায় খুলে যায়, আর সে ঝড় আছড়ে আছড়ে পড়ে মীনাক্ষীর উপর। 'রাতদিন শুয়ে থেকে থেকে আর কতো মুখ পোড়াবে? বাড়ির লোক তো কানা নয়, তারা ভাবছে কি? 'জ্বর' বলে শুয়ে থাকলেই তো আর লোকের সন্দেহের হাত এড়ানো যায় না? বলবে না তারা, এতদিন ধরে জ্বর যদি তো ডাক্তার আসে না কেন?'

কিন্তু মীনাক্ষী সেই ঝড়ের মুখে বোবা কালা পাথর। মীনাক্ষী দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে।

কখনো কখনো সেই ঝড় আবার কাছে এসে ফিসফিসে গলায় কথা কয়, মীনাক্ষীর গালে কপালে উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের তাপ এসে লাগে। 'কেলেঙ্কারী তো করেই এসেছো, বুঝতে পারছি, এখন চূড়ান্ত বিপদ কিছু ঘটেছে কি না তাই বলো। তা' হলে শতজন্মের নরক ভোগ স্বীকার করে নিয়েও তা'র ব্যবস্থা করতে হবে।'

পাথরের কী অনুভূতি থাকে?

পাথরও কী ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় শিউরে উঠতে পারে?

বোঝা যায় না।

বোঝা গেলে হয়তো একটা তীব্র চীৎকার-দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেতো 'ছি ছি। ছি ছি।'

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বলে উঠতো। 'এই আমার পুণ্যবতী আর ধর্মশীলা মা।'

আর্তনাদটা ওঠে না।

বোবা দেয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে থাকে একটা বোবা পাথরের পুতুল।

ঝড়টা অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। যে ঘরটা নাকি তার চিরশত্রুর ঘর।

'মান-অপমানের মাথা খেয়ে তোমার কাছেই এসে পড়তে হলো বৌমা। তবে এও বলে রাখছি বাছা, এ কলঙ্ক শুধু একা আমারই নয়, তোমাদেরও। তোমার এই শ্বশুরকুলের কলঙ্কের কথা যদি রাষ্ট্র হয়, তো চূর্ণকালি তোমাদের মুখেও পড়বে। আমি তো লক্ষ্মীছাড়া মেয়েকে জিজ্ঞেস করে করে হার মেনে গেছি, একটা বাক্যি বার করতে পারিনি মুখ থেকে। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো দিকি। আমার ভাগ্যিক্রমে আজকাল যখন বাড়িতে থাকছো।'

কিন্তু সুনন্দা শুনলো। সুনন্দাও প্রায় পাথরের পতুলের মতোই ভাবশূন্য মুখে তার শাশুড়ীর উত্তেজনা-রক্তিম মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওটাই এখন ওর প্রকৃতি।

যেন কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমি সব বিশদ বোঝাবে, তবে আমি বুঝবো।

অথচ সুনন্দা সবই টের পাচ্ছে।

কারণ সুনন্দা আজকাল প্রায়ই বাড়িতে থাকছে। আর মেয়েমানুষের প্রখর দৃষ্টিতে ঘটনার স্পষ্ট চেহারাটা ধরা পড়তে দেরী হচ্ছে না।

তবু সুনন্দা অবোধ সাজলো।

তাকিয়ে রইল ভাবশূন্য চোখে।

দেখে অবশ্য হাড় জ্বলে গেল বিজয়ার, তবু বিজয়া মনের রাগ মনে চেপে আবার বললেন, 'লক্ষ্মীছাড়িকে বোঝাও গে একটু এভাবে পড়ে থাকলে লোকলজ্জা বাড়বে বৈ কমবে না। আর এও জিজ্ঞেস করগে একটা কিছু ঘটিয়ে বসেছে কি না। ভগবান, এমন কপালও করে এসেছিলাম।'

কপালের দুঃখ গাইতে পারেন বিজয়া, কারণ এই ভয়াবহ সঙ্কটের সময় কিনা বড় মেয়ে কাছে নেই। সে গেছে বম্বে বেড়াতে। অজন্তা ইলোরা দেখে তবে ফিরবে।

মেয়ে থাকলে কি তিনি বৌয়ের শরণাপন্ন হতেন? তা ছাড়া এখন যে

আবার 'চণ্ডিনী' ঢং করে বাড়িতেই থাকছেন বেশী বেশী। বেশীর ভাগ দিনই নীলু একা বেরিয়ে যাচ্ছে। কী কারণ কে জানে। মীনাক্ষীকে পাহারা দিচ্ছে না কি?

হ্যাঁ একথাও ভাবতে দ্বিধা করেন না বিজয়া, হয়তো মীনাক্ষীর উপর চোখ রাখতেই সুনন্দা বাড়ি বসে থাকছে। হয়তো দেখছে বিজয়া কী করেন।

যাক এখন একটি মোক্ষম চাল দেওয়া গেল, ভাবলেন বিজয়া, 'এ বাড়ির কলঙ্ককালিমা যে ওদের গালেও উঠবে সেটা বুঝিয়ে ছেড়েছি। এ কাহিনী আর বাপের বাড়ি গল্প করতে যাবে না। তা ছাড়া---এ আস্থা আছে বৌয়ের উপর, নিষেধ করলে বলবে না কাউকে। সে বরং নিজের বড় মেয়ের সম্পর্কে বিশ্বাস কম। তার পেটে কথা থাকে না।

বিজয়া তাই ভাবলেন, মান সম্মান খুইয়ে বৌয়ের শরণ নিয়ে এখন উদ্ধার তো হই। তবু নিজ কপালকে ভর্ৎসনা করলেন।

বৌ কিন্তু সেই দুঃখে সমবেদনা দেখালো না, শুধু অবাক গলায় বললো, আপনি যে কী সম্পর্কে কথা বলছেন, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।

বিজয়া একটু থতমত খেলেন, তারপরই এই হাড়ে বজ্জাত বৌয়ের ন্যাকামীতে নিজের হাড়টাই জ্বলে গেল তাঁর। তবু সামলে বললেন, 'কী সম্পর্কে সেটা কি আর তোমার মত বুদ্ধিমতীকে খুলে বলতে হবে বৌমা দেখছো তো ছোট ননদটাকে? আর ওর কী হয়েছে, তাও অবশ্যই অনুমান করতে পারছো?'

'অনুমান? আমি?'

সুনন্দা আকাশ থেকে পড়ে।

'আমি কী, অনুমান করবো? আমি কি ডাক্তার? প্লোফিভার--- মানে ঘুস-ঘুসে জ্বর কতো কারণেই হয়।

'জ্বর? জ্বরটা সত্যি ওর গায়ে নাকি বৌমা? বিজয়া তীব্র চাপা গলায় বললেন, 'ও তো মনের জ্বর। সেই জ্বরে জর্জর হচ্ছে। সেই একদিন কোন চুলোয় রাত কাটিয়ে এসে কী সর্বনাশ যে ঘটালো কে জানে।

সুনন্দা অমায়িক গলায় বলে, 'পাড়া-গাঁয়ে রাত কাটালে মশা থেকে ম্যালেরিয়া হতে পারে, জল থেকে বিকোলাই হতে পারে, ব্যাং থেকে---'

'থামো বৌমা, তুমি আর ন্যাকামি কোরো না।' বিজয়া ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের কী জ্বালা জানো না? তদবধি ও কেন ঘরের কোণে মুখ গুঁজে পড়ে আছে তা জানো?'

'শরীর খারাপ হলে তো থাকবেই।'

'তা সেই খারাপটাই কোন জাতের সেটাই দেখ। দেখে তার প্রতিকার করো। মশা ছারপোকা সাপব্যাঙ ছাড়াও শত্রু আছে মেয়েমানুষের। সেই শত্রুর নিপাত চেষ্টা করতে হবে।'

এবার সুনন্দা ঘৃণা আর রাগের সংমিশ্রণে গঠিত একটা ভাব নিয়ে বলে, 'এ সব কী বলছেন আপনি। মীনাক্ষী না আপনার নিজের মেয়ে।'

বিজয়া ধিক্কারে বিচলিত হন না। বলেন, 'নিজের মেয়ে বলেই তো এতো জ্বালা বৌমা। পাড়ার মেয়ে হলে কি আর এইভাবে মরমে মরতাম? এখন দেখ গে যাও বাছা। তোমার ওপর সব দায় ফেলে দিলাম। যা প্রতিকার করবার কর।'

বললেন, অনায়াসেই বললেন এই মান-খোওয়ানো কথা।

কিন্তু সুনন্দা সেই ধুলোয়-পড়া সম্মানের দিকে না তাকিয়ে স্থির গলায় বলে, 'আপনি কিছু নিশ্চিত হয়েছেন?'

'তা নিশ্চিত ছাড়া আর কি?' বিজয়া কপালে করাঘাত করেন, 'কী হাল হয়েছে মেয়েটার, তাকিয়ে দেখলে বুঝতে। লেখাপড়ায় এতো মন ছিল, সে জিনিষ ভাসিয়ে দিল। বই ছুঁচ্ছে না, কলেজ যাচ্ছে না।'

বিজয়া হঠাৎ আঁচলে চোখ মোছেন।

সুনন্দা নির্নিমেষে একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখে আরো স্থির ধাতব গলায় বলে, 'আপনি কী ধরণের প্রতিকারের কথা বলছেন?'

বিজয়ার গায়ে বিষ ছড়ায়।

বিজয়ার গায়ে আগুন ছড়ায়।

তবু বিজয়া মেজাজ শান্ত রেখে ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'সে কথা কি আমি তোমাকে শেখাতে যাবো বৌমা? তোমাদের একালে কত ব্যবস্থা হয়েছে, তোমরা আধুনিক মেয়েরা সে সবের কত জানোশোনো। প্রাণটা যাতে না যায়, সেইভাবে---'

কথার মাঝখানে কথা বলে ওঠে সুনন্দা। হেসে উঠে বলে, 'আমাদের একাল তা হলে আপনাদেরও কিছু কিছু সুবিধে করে দিচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি কী করতে পারি।'

●

এ ঘরে সুনন্দা দৈবাৎই আসে। বলতে গেলে আসেই না।

আজ এলো।

এসে মীনাক্ষীর পড়ার চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে সহজ আন্তরিক গলায় বললো, 'কি রে মীনা, তুই নাকি পড়া ছেড়ে দিবি বলেছিস?'

মীনাক্ষী এ আক্রমণে ভ্রুকুটী একটু কোঁচকালো। বুঝতে পারলো না, এটা আবার কি।

স্ব-ইচ্ছেয় এসেছে, না কারো প্রেরিত দূত হয়ে? কার হবে? ছোড়দাটাও তো চলে গেছে। মার প্রেরিত নিশ্চয়ই নয়। তবে কি যাবার? মীনাক্ষী নিজের মৃত্যুকে ডাকতে লাগলো। আকস্মিক মৃত্যু।

সুনন্দা আবার বললো, 'মা বলছিলেন, তুই নাকি আর কলেজ-টলেজ যাস না। বই ছুঁস না। অথচ জ্বরটর সব বাজে কথা।

সুনন্দার গলায় কোন বহু পের আগের ঘরোয়া সুর।

সুনন্দা কতকাল এ সুরে কথা বলেনি। মীনাক্ষীর কী হলো কে জানে, সুনন্দার নিজের কানটাই যেন অনাস্বাদিত

একটা স্নিগ্ধস্বাদে ভরে গেল। যেন এখনো এই সহজ ঘরোয়া কথা বলার শক্তিটা তার আছে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেছে স্নুনন্দা। কাটা-ছাঁটা গলায় মাপা-মাপা কথা বলতে বলতে স্নুনন্দা যেন যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিল, স্নুনন্দা তাই এই আকস্মিক আবিষ্কার হয়ে যাওয়া শক্তিটার স্বাদ আর এক-গণ্ডূষ পান করতে চাইলো।

স্নুনন্দা বললো, 'হলো কি তোর? সারা বছর ফাঁকি দিয়ে, এখন বুঝি পরীক্ষার সময় ভয় ধরেছে?'

ভয়! পরীক্ষার!

মীনাক্ষী হঠাৎ উঠে বসলো।

মীনাক্ষীও বুঝি স্নুনন্দার এই নতুন রূপে অথবা পুরনোকালের রূপে বিচলিত হলো। তাই মীনাক্ষী কথা বললো।

উদাস বিষণ্ণ গলায় বললো, 'আমি আর তোমাদের সেই মীনাক্ষী নেই বৌদি।'

স্নুনন্দা নির্লজ্জ বেশ করে পার্টিতে গিয়ে মদ খায়, স্নুনন্দা মেহেরা সাহেবের গায়ে ঢলে পড়ে হি-হি করে হেসে তার স্বামীর কর্মোন্নতির সহায়তা করে, স্নুনন্দা সর্বপ্রকার ভাবপ্রবণতাকে ব্যঙ্গ হাসি দিয়ে বিদীর্ণ করে, তবু স্নুনন্দার ওই বিষণ্ণ মুখটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মায়ায় মন ভরে গেল। স্নুনন্দার মনে হলো হয়তো বা বিজয়ার সন্দেহই সত্যি।

কিন্তু স্নুনন্দা সেই জটিল সন্দেহটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলো না, হেসে উঠে বললো, 'নেই? তুই আর সে মীনাক্ষী নেই? কন্ধকাটা শাঁখচুন্নী হয়ে গেছিস? কই বুঝতে পারছি না তো? ঠিক তো আগের মতই দুই হাত দুই পা দুই চোখ দুই কান ও একটি মাথা-সমেত আস্ত একটা মানুষকেই তো দেখছি।'

মীনাক্ষী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'বাইরে থেকে যা দেখা যায় সেটাই তো সব নয়।'

স্নুনন্দা এক মুহূর্ত কী ভাবলো, তারপর কৌতুকের গলায় বলে উঠলো,

'সর্বনাশ! এ মেয়েটা কী বলে গো! ভিতরের অদৃশ্য কোটরে কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছিস না কি রে বাবা!'

মীনাক্ষী চমকে ওঠে।

মীনাক্ষীর মনটা হঠাৎ বিমুখ হয়ে ওঠে।

ওঃ তাই!

বিদ্রূপ করতে আসা হয়েছে।

ওই মমতার কণ্ঠটুকু তা'হলে ছল।

মীনাক্ষীর সেই বিষণ্ণ-বিধুর স্বরটুকুতে রূঢ়তার ছাপ পড়ে। মীনাক্ষী ঈষৎ সোজা হয়ে বসে বলে, 'ওঃ, অনুসন্ধানে এসেছো?'

স্নুনন্দা গম্ভীর হয়।

বলে, 'তোর অবশ্য সেটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমার প্রতি এর চাইতে উচ্চ ধারণা আর কীই বা হবে। কিন্তু এ ধারণা বদলালেও পারতিস। যদিও মার নির্দেশেই এসেছি আমি, তোকে সদুপদেশ দিয়ে 'প্রতিকারে' প্ররোচিত করবার হুকুম নিয়ে। তবু---না থাক।' স্নুনন্দা মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ভেবে এক এক সময় হাসি পায় মীনা, অথচ একদা 'বাংলা দেশের' লক্ষ্মী বৌয়ের আদর্শটাই আমার আদর্শ ছিল।'

মীনাক্ষী একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হয় তো 'আদর্শ' নামের লোকটা একদম ক্ষমতাহীন, ঘটনাচক্রই সমস্ত কিছুর নিয়ামক।'

'তা' বটে। 'ঘটনাচক্রের' কোপে পড়ে আমি তো একদিন তোদের মৈত্র পদবী ছেড়ে 'মিসেস মেহেরা' হতে বসেছিলাম। শেষে আবার ওই ঘটনাচক্রই রক্ষে করলো। একটা মদে চুরচুরে লোকের প্রেম নিবেদনের ওপর আস্থা রাখা সমীচীন মনে হল না। এর জন্যে তোমার দাদা খুব ক্ষুব্ধ হলেন। ভেবেছিলেন ওই পদবী বদলের বদলে একটা বিরাট অঙ্কের চেক বাগাতে পারবেন। তা' সে আশায় ছাই পড়লো। হতভাগাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে আবার তোমার দাদার স্কন্ধে ভর করলাম।'

'বৌদি।'

মীনাক্ষীর এই ক'দিনের নীরব হয়ে-থাকা কণ্ঠে একটা তীব্র স্বর ঝনসে ওঠে, 'দাদার মূর্তিটাকে এতোটা নারকীয় করে বলবার দরকার ছিল না। তোমাকে তো কেউ কিছু বলতে যায় নি।'

মীনাক্ষী ভেবেছিল, এ অপমানে স্নুনন্দা ঠিকরে উঠে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তা গেল না স্নুনন্দা। ও সেই একই ভাবে চেয়ারের পিঠটায় দোল দিতে দিতে বলে, 'তোকেও তো কেউ কিছু বলতে আসেনি। তবু তুই মৃত্যুশয্যার পণ নিয়ে পড়ে আছিস কেন? বিবেক না কী যেন সেই আছে না একটা? সেটাই হুজুগ করে। যাক্ মায়ের হুকুম হয়েছে তোমার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তো, 'প্রতিকার অফিসে' নিয়ে যেতে।'

'বৌদি।'

মীনাক্ষী তীব্র গলায় বলে ওঠে, 'মা বলেছেন এই কথা?'

'বললেন তো!'

কেমন একটা ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় মীনাক্ষীর ঠোঁটটা যেন বেঁকে যায়। মীনাক্ষী তীব্রতর গলায় বলে, 'মা রাতদিন ঠাকুর পুজো করেন? মা না মশা ছারপোকা পিঁপড়ে মারাকেও 'জীবহত্যা' বলে ধরেন?'

স্নুনন্দা হঠাৎ হেসে ওঠে।

স্নুনন্দা বলে, 'মানুষ' নামের জীবটা এমনি সব উল্টোপাল্টা জিনিস দিয়েই তৈরী রে মীনা। ওই জন্যেই বোধহয় বলে 'পঞ্চভূতের দেহ।' কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি বল?'

মীনাক্ষী আবার শুয়ে পড়ে।

মীনাক্ষী দেয়াল-মুখো হয়।

মীনাক্ষী যেন ধূসরকণ্ঠে বলে, 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। সেটা আরও একটা পাপ দিয়ে হয় না।'

'পাপ।'

স্নুনন্দা যেন আকাশ থেকে পড়ে। স্নুনন্দার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে। স্নুনন্দা ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'কোন যুগে আছিস তুই? যে তাই

এখনো 'পাপ পুণ্য,' 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' এই সব পচা পুরনো শব্দগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস? রাবিশ!'

কিন্তু এ ব্যঙ্গ কাকে করে সুনন্দা? সত্যিই কি মীনাক্ষীকে?

মীনাক্ষীর দিক থেকে কোনো উত্তর আসে না। মীনাক্ষী যেন আবার পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরোয়।

সুনন্দা ওর ওই পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরোনো ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে, 'দেখ মীনা অসতর্কে কাউকে যদি ককরে কামড়ায়, সে কি সেই কামড়ের বিষটাকে দূর করবার চেষ্টা না করে তাঁকে আঁকড়ে বসে বলে, 'বিষটা থাক। আমার অসাবধানতার প্রায়শ্চিত্ত করবো।'

মীনাক্ষী তথাপি নীরব।

সুনন্দা একটু অপেক্ষা করে সূক্ষ্ম হাসি হেসে বলে, 'এ যুগের 'সভ্য সমাজ'কে তেমন করে দেখবার সুযোগ তোর আসেনি মীনা তাই তুই এখনো তোর সেই প্রপিতামহীর সংস্কারের বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছিস। এ ভাবে 'অসুবিধে-মুক্ত' হওয়াটা এখন এতো বেশী স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে, এটা শুনলেই লোকে হাসে।'

'বৌদি আমার এ সব কথা শুনতে কষ্ট হচ্ছে।'

সুনন্দা একটু হেসে আস্তে কিন্তু কৌতুকের গলায় বলে, 'তার মানে অপরাধীটি নেহাৎ আততায়ী নয়? তোমার প্রেমপাত্র। তাই তার দেওয়া উপহার---'

বৌদি। আমাকে নিজের ধরণে মরতে দাও।'

সুনন্দা যেন একটা বাছার অভিমান দেখছে, তাই সুনন্দা বলে ওঠে, 'এই তো নিজের ধরণে মরাটা তো হয়েই গেছে। এইবার আমাদের ধরণে বাঁচাবার চেষ্টা করবো আমরা।'

'দোহাই তোমাদের বৌদি। আমার জন্যে তোমরা একটু কম ভেবো। আমি নিজেই এতো বেশী ভাবছি যে যথেষ্টর অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

'তবু তো বোকার মতো 'ডিসিশান' নিচ্ছিস। আদি অন্তকাল ধরে যা চলে আসছে, হয় তো অনন্তকাল ধরেই যা চলবে সেই সহজ পথটা ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলতে চাইছিস। সেটা চাইলে, সমাজে চলে না মীনা। যে প্রপিতামহীর সংস্কারের কথা বলছি, তাঁরও পিতামহী প্রপিতামহীদের আমল থেকেই সমাজের সমস্ত পবিত্রতা আর শুচিতার সংস্কারের অন্তরালে প্রবাহিত হয়ে চলেছে 'বিপন্মুক্তির' অভিযান। পরিবারের সুনাম যাবে, বংশে কলঙ্ক পড়বে। এই ভয়ঙ্কর ভয়ে জলজ্যান্ত মেয়েগুলোকেই রাতারাতি 'ভ্যানিশ' করে দিয়েছে মানুষ ---এ ইতিহাসও তো কম নেই? মোট কথা পাপ পুণ্য ধর্ম বিবেক, ওগুলোর ধার ততক্ষণই ধারে মানুষ, যতক্ষণ অবস্থাটা থাকে বেশ পোষা জন্তুর মতো শান্ত শিষ্ট বাধ্য। কিন্তু যে মুহূর্তে মানুষ দেখবে অবস্থা 'অসুবিধের' হয়ে উঠেছে, সেই মুহূর্তেই তার পাপ পুণ্য ধর্ম বিবেক, এ সবের সংস্কার মুছে যাবে। সেই অসুবিধেটা দূর করতে, করতে পারবে না এমন কাজ নেই। এই হচ্ছে সংস্কারের মূল্য, এই হচ্ছে চিরন্তন মূল্যবোধের মূল্য। পাপ পুণ্য ধর্ম অধর্মের একটা ফাটকাবাজার আছে বুঝলি? 'স্বার্থ' আর 'সুবিধে' এঁরাই হচ্ছেন সে বাজারের মালিক।'

মীনাক্ষী ওদিকে পিঠ ফিরিয়ে থেকেই বলে, 'তোমার এই দামী-দামী কথাগুলো থাক বৌদি, আমার ভালো লাগছে না।'

সুনন্দা তবু যেন হাসির গলায় বলে, 'তা' হলে বলছিস হেরে ফিরে যাবো?'

'তোমার 'কোনটা' হার কোনটা জিত জানি না বৌদি, শুধু জানি আমিই বড়ো বেশী হেরে গেছি।'

সুনন্দা তবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, সুনন্দা তবু বোঝাতে চেষ্টা করে এ যুগ এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে নিয়ে চিন্তা করে না। এটাকে নিতান্তই অ্যাক্সিডেণ্ট বলে মনে করে তারপর ফিরে যায়।

যাবার সময় শুধু আবারও বলে, 'বুঝলাম লোকটা তোর প্রেমাস্পদ তাই 'পাপ প্রায়শ্চিত্ত', এই সব শব্দগুলো বেছে নিয়ে মনকে চোখ ঠারছিস। কিন্তু তোর এই প্রায়শ্চিত্ত পদ্ধতিটা কোন মাটিতে বসে চালাবি তাই ভাবছি। যুগ যতই উদার আর প্রগতিশীল হোক, তুমি যে একটা গোত্র-পরিচয়হীন প্রাণীকে স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে মানুষ করতে বসবে, সেটি চলবে না। 'কর্ণকে'---চিরদিনই কুন্তীর ক্রোড়চ্যুত হতেই হয় হাজার হাজার বছরের পৃথিবীতে সমাজের কত পরিবর্তনই হলো, কিন্তু 'কর্ণকুন্তী' সংবাদটা অপরিবর্তিতই রয়ে গেলো।'

❂

সুনন্দা হেরে ফিরে গেল।

কিন্তু বিজয়া কি হার মানবেন?

বিজয়া নিজের খুব শক্ত অসুখ বলে বড় মেয়েকে 'তার' করান। বিজয়ার এক ভক্ত গুরুভাইকে এই তার-বার্তা প্রেরণের ভার দেন বিজয়া।

নীলাক্ষ বড় মুস্কিলে পড়ে গেছে।

নীলাক্ষ বাইরের জগতে ঘুরছে, যেন হালভাঙ্গা নৌকোর মতো, হাতিয়ারহীন সৈনিকের মতো। অথচ কিছুতেই যেন সুনন্দাকে বশে আনতে পারছে না। সুনন্দা প্রায় রোজই বলে 'মাথা ধরেছে' বলে, 'জ্বর আসছে---' বলে মুড্ নেই।'

আশ্চর্য!

এই যে মেহেরা সাহেব গাড়ী পাঠাতে চাইছে এবং সেই সঙ্গে এ ইসারাও জানাচ্ছে বেশী চালাকি চালালে 'নীলাক্ষ' নামক মিথ্যে বাঘটাকে পুনর্মূষিক করে দেবে, এটা কি কম যন্ত্রণার?

তুই তুচ্ছ একটা মেয়েমানুষ, একটু উপকারে লাগিস বলেই না তোকে এতো তোয়াজ করা, নইলে

তোর কাছে হেঁট হতে আসি আমি? সেই সুযোগটুকু পেয়ে তুই আমাকে দেখাতে আসিস 'মুড'?'

অনবরত মনে মনে এই কথাগুলোই মনের মধ্যে ফুঁসতে থাকে নীলাক্ষ, 'কি দাম তোর? কী ছিলি আগে? সেই তো একহাঁড়ি ঠেলা মা আর বাজার-বওয়া বাপের বেটি! চেহারা তো ছিল জবজবে গাঁইয়া একটা মেয়ের মতো। সাতচড়ে রা বেরোতো না।---কে তোকে এতোখানি করে তুললো? ঘসে মেজে পিটিয়ে বুঝিয়ে, কে তোকে বাইরের পৃথিবীর যোগ্য করে তুললো? কে তোকে ওই সব লাখপতি কোটিপতিদের চোখের সামনে নিয়ে গিয়ে তুলে ধরলো? এই আমি নয়? এখন আমায় তুই মুড্ দেখাতে আসিস? কারণ আমি তোকে মাথায় তুলেছি বলে কেমন? সেই যে সেদিন? মেহেরা সাহেবটার সঙ্গে বলতে গেলে কেলেঙ্কারী তো কিছু বাকি ছিল না, তবু কিছু বলেছি আমি? দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করি নি? করেছিলাম কেন, না তুই আমার সাহায্যকারিণী সহধর্মিণী এই বিশ্বাসে। আর তোর বুদ্ধির ওপর আস্থার বশে। বিশ্বাস রেখেছিলাম আর একটু প্রশ্রয় দিয়ে, তুই ওই মাতালটাকে কাত করে তারপর সম্মানহানির ছুতো করে, একটা মোটা খেসারৎ বাগাবি। তা' নয় তুই খালি হাতে ফিরে এসে স্বামীকে নস্যাৎ করতে কাটা কাটা বুলি ছাড়লি। একবার একটু এদিক ওদিকে সব সতীত্ব ধ্বংস হয়ে গেল তোমার। হুঁঃ! ওটাও একটা 'শো' বাবা, জানতে আর বাকি নেই। হয়তো কোনদিন আমাকেই হট আউট করে দিবি।

সারাক্ষণ মনের মধ্যে এই গজরানি নিয়ে কাটাচ্ছে নীলাক্ষ। অথচ সুনন্দাকে বাগ মানাতে পারছে না।

এমন কি বাপের বাড়িতেও তেমন বেশী বেশী যাচ্ছে না। সুনন্দার মা পর্যন্ত অনুযোগ করছেন, 'সুনু আর আসছে না কেন বাবা? বিচ্ছু বাবুকেও দেখতে পাচ্ছি না অনেক দিন—'

কিন্তু কেন সুনন্দার এই পরিবর্তন? এ বাড়ির ছোট ছেলেটা, একদা না কি যার বৌদির প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ভালবাসা, সে অবজ্ঞা করেছে বলে?

আরে দূর দূর।

সুনন্দা কী পাগল? সেই ছেলেটা আবার একটা 'মনুষ্য পদবাচ্য' না কি? তাই তার একটু শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার প্রশ্নে সুনন্দা নামের দামী মানুষটা নিজেকে বদলাতে বসবে? তবে হয়তো তার ওই অবজ্ঞার আর্শীতে হঠাৎ নিজের এই আত্মঘাতী মূর্তিটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে সুনন্দা। হয়তো—ভাবছে, 'কার উপর আক্রোশ করে এই আত্মহননের যজ্ঞ করতে বসেছি আমি?' যার উপর আক্রোশ, সে কি আক্রোশেরই যোগ্য?

গভীরে তলিয়ে গেলে হয় তো দেখা যায় আক্রোশের পাত্র নীলাক্ষ নামের ওই অর্থলোভী স্বার্থপর অন্তঃসারশূন্য লোকটাই নয়। হয় তো এ বাড়িতে যে আর একটি আত্মচিন্তা-কেন্দ্রিক পুরুষ নিজেকে সংসারের সমস্ত মালিন্য থেকে ভাগিয়ে নিয়ে উর্ধ্বে স্থাপন করে রেখেছেন!

অভিমান বুঝি সুনন্দার তাঁরই উপর। যেন উনি রক্ষা করতে পারতেন, উনি সে কর্তব্য পালন করেন নি। উনি কেবলমাত্র আপন অহমিকার পরিমণ্ডলে বাস করেছেন, আপন সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার দিকে সজাগ থেকেছেন। তার মানে উনি গৃহকর্তার কর্তব্য পালন করেন নি। উনি ভেবেছেন পাছে কেউ ওঁর নির্দেশ না মানে।

কিন্তু সুনন্দার বাবা তো এমন নয়?

তিনি নিজের ওই সম্মানহানির ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন না কখনো। তিনি স্ত্রী পুত্র পরিবারকে বকেন, শাসন করেন, ভালবাসেন। অতএব তাঁর শাসিত প্রজাকুল সেটাকেই স্বাভাবিক নীতি ভেবে তটস্থ থাকে।

কিন্তু সরোজাক্ষ যদি হঠাৎ শাসন করতে নেমে আসেন? কেউ কি স্বাভাবিক ভাববে? শাসিতরা নিজেদের অপমানিত ভাববে।

'অথচ আমি সেই রকমই একটি সংসার চেয়েছিলাম—' সুনন্দা ভাবে, সেই আমার ধারণাগত পারিবারিক আদর্শের ছাঁচে তৈরি সংসার। চেয়েছিলাম কল্যাণী বধূ হতে, সেবাময়ী স্ত্রী হতে, স্নেহময়ী মা হতে। আমি তা' হতে পেলাম না। আমার স্বামীর লোভের আগুনে ধ্বংস হয়ে গেলাম আমি।---আমি নির্লজ্জ পোষাক পরাটাই বাহাদুরী বলে গণ্য করতে শিখলাম, লোকব্যবহারে আমি শালীনতা বর্জন করতে শিখলাম, আমি অকল্যাণের মশাল হাতে নিয়ে জীবনের সমস্ত মূল্যবোধগুলিকে পুড়িয়ে দিতে শিখলাম।

তার মানে আমি জগতের সেই চরমতম বোকামীর নিদর্শন---'চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার উদাহরণ হলাম।' অথচ লোকে আমায় বুদ্ধিমতী বলতো। আর আমিও বিশ্বাস করতাম সে কথা।---

আপন জীবনটুকুকে যে নিজের মতো করে সাজাতে পারে না, ধূলোয় ছড়িয়ে ফেলে, তার আবার বুদ্ধির বড়াই।

●

কিন্তু শুধু সুনন্দাই নয়, আরো একজন ওই শব্দটা ব্যবহার করে প্রবল কণ্ঠে।

'বুঝলেন কাকীমা এ যুগের সবাই বুদ্ধির বড়াই করে। ভাব দেখায় যেন সব বোঝে। আমি বলবো কিছু বোঝে না।'

বিরাট একবোঝা কাগজ হৈমবতীর টেবিলে বসানো, তার দুদিকে দু'জন বসে। হৈমবতী আর সারদাপ্রসাদ।

হৈমবতী না কি তাঁর কোন-এক বান্ধবীর কাছে শুনেছেন পুস্তক প্রকাশনের ব্যবসাটা খুব লাভজনক। টাকায় টাকা আয়। তাই তিনি একটি 'পাবলিশার---' হয়ে বসতে চান। এবং প্রথম বই হিসেবে সারদাপ্রসাদের ওই গবেষণা-পুস্তকটি গ্রহণ করতে চান।

ওই কাগজের বোঝা তাই নিয়ে এসেছেন সারদাপ্রসাদ।

সারদাপ্রসাদ উদাত্তকণ্ঠে বলেন, 'দাদার পরে এই প্রথম আর একজনকে দেখলাম যে লোক ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। অথচ চিরদিনই বৌদির মুখ থেকে আপনার সমালোচনাই শুনে এসেছি, আপনি না কি ফ্যাসানি, আপনি না কি মেমসাহেব।'

বলে ফেলে এ কথা সারদাপ্রসাদ। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় তোয়াজ করতেও নয়, আর বিজয়ার নিন্দে করতেও নয়। অথবা বিজয়ার নামে লাগিয়ে দিয়ে 'সুয়ো' হতেও নয়। বলে নিতান্তই আবেগের বশে।

হৈমবতী নিজেই ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন, জানিয়েছেন সেই সেদিন থেকে তাঁর মাথায় ওই বইটাকে কেন্দ্র করে একটা বিজনেস-চিন্তা মাথায় ঘুরছে। তাই তিনি প্রেসের মালিক-টালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে দেখেছেন, এইবার কাগজপত্র কিনে সুরু করবেন। এখন সারদাপ্রসাদ কতটা অ্যাড্‌ভান্স চান, সেটাই হৈমবতীর জিজ্ঞাস্য।

সারদাপ্রসাদ প্রথমে চমকে উঠেছিল। বক্তিম মুখে বলেছিল, 'আপনার কাছে অ্যাড্‌ভান্স নেবো? বলেন কি?'

কিন্তু হৈমবতী বুঝিয়েছেন, বিজনেসের ব্যাপারে সমস্ত কেতাকানুন মেনে সুরু করাই সঙ্গত। নইলে নিজের কাছে গুরুত্ব থাকে না, কেমন যেন এলেবেলে মনে হয়।

সারদাপ্রসাদ এ যুক্তিতে ভিজেছে। সারদাপ্রসাদ অতএব বলেছে, 'আপনি যা বলেন।'

হৈমবতী বলেছেন, 'আমার তো বাপু এই প্রথম ব্যবসায় নামা? বেশী দিতে পারবো না। প্রথমে হাজার তিনেক দিই, তারপর আরম্ভ হলে—'

অঙ্কটা সারদাপ্রসাদের কাছে আশাতীত। আর সে কথাটা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাও বোধ করেনি সে। কিন্তু হৈমবতী যে সব হিসেব-নিকেশ করে কাজে নামছেন। হৈমবতী তো জানছেন, যে তিনটি খণ্ডে বইটি সম্পূর্ণ তার এক একটা খণ্ডই অন্তত ত্রিশটাকা করে হবে। দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ডটা অবশ্য এখনো লেখা হয় নি, কিন্তু মালমশলা তো সবই মজুদ, লিখতে আর কতক্ষণ? প্রথম খণ্ড ছাপতে ছাপতেই হয়ে যাবে। তা' সে যাক, যে বইয়ের দাম হবে তিরিশ টাকা তার জন্যে অগ্রিম অন্তত ওই তিন হাজার না দিলে প্রকাশিকার সম্ভ্রম থাকবে কেন?

সারদাপ্রসাদ বলে 'আশ্চর্য'! আপনি একজন বিধবা মহিলা, আপনি সাহস করছেন, অথচ এই শহরের তা-বড় তা-বড় প্রকাশক মশাইকে বললেন, 'রিস্ক' নিতে পারবো না।'—তার মানে জিনিসটার প্রতি আস্থা নেই। তার মানে ভিতর থেকে কোনো প্রেরণা নেই। তার কারণ দেশ সম্পর্কে চিন্তা করেনি কোনোদিন। শুনলে অবাক হবেন, সেদিন একটি ছোকরাকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'আচ্ছা বল তো এই যে আমাদের দেশে 'আকাশ-প্রদীপ' দেওয়ার রীতি আছে, এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি?' ছোকরা বাংলায় এম-এ, খুব না কি ভাল ছাত্র, বললো কিনা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে কিছু নেই, সম্পূর্ণ কুসংস্কার। স্রেফ মরা গরু ঘাস খাওয়ার ব্যাপার! মরে-যাওয়া পিতৃপুরুষের প্রেতদের জন্যে যমপুরীতে আলো দেওয়া হয়।' বলে সে কী ব্যঙ্গ হাসি।—অথচ একটু ভেবে দেখলেই তাৎপর্যটা দেখতে পেতো। তখন ছোকরার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, 'ওহে বাপু ওটা হচ্ছে 'পোলা' লোকদের জন্যে ব্যাখ্যা! মানুষ জাতটাতো এক নম্বরের অবাধ্য? ভাল কথা কিছু শুনবে না তো? তাই একটা রূপকের বহিরঙ্গ। আসলে শ্যামাপোকার উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়। বাড়িতে উঁচুতে একটা করে আলো জ্বললে পোকাগুলো সেখানেই ভিড় করবে।' তা' ছোকরা কথাটা বিশ্বাস করল কি না কে জানে। হেসে চলে গেল। দেওয়ালীর আলো ও আতসবাজির তাৎপর্যটাও বুঝিয়ে দেব ভেবেছিলাম, সময়ই দিল না। তা' যাক সে কথা, আপনি তা হলে মনস্থই করে ফেলেছেন?'

হৈমবতী প্রায় হৈ-চৈ করে ওঠেন, 'মনস্থ বলে মনস্থ? আমি তো দিন গুণছি। তবে কিন্তু ওই যা বলেছি, একটি শর্তে। কিছুতেই যেন না—'

হ্যাঁ একটি শর্ত হৈমবতী করেছেন তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে। হৈমবতী যে প্রকাশিকা হতে চলেছেন, এটা যেন এখন না প্রকাশ হয়ে পড়ে। সবাইকে তিনি তাক্ লাগিয়ে দিতে চান।

সারদাপ্রসাদ সে কথা বিশ্বাস করেছে বৈ কি। এবং তাতে আমোদই অনুভব করেছে।

সারদাপ্রসাদ ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'তা' আবার বলতে। এ শুধু আপনি জানবেন আমি জানবো আর কম্পোজিটার জানবে। আচ্ছা তা'হলে চলি। সময় অন্তর একটু দেখবেন উল্টে-পাল্টে।—না কি একেবারে ছাপা হলেই?'

হৈমবতীও ঘাড় হেলিয়ে বলেন, 'তাই ভালো।'

'কিন্তু ওই যা বললাম কাকীমা, প্রুফটা আমার নিজের দেখা দরকার।'

'হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়,' হৈমবতী অমায়িক গলায় বলেন, 'তুমি নিজে না দেখলে তো যা তা কাণ্ড হয়ে যাবে।'

সারদাপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত হয়।

'এই, এই জন্যেই আপনাকে এতো পূজ্যি করি কাকীমা। বোঝেন সব জিনিসটা। একটা অক্ষরের এদিক ওদিকে যে জিনিসটা একেবারে মার্ডার কেস হয়ে যাবে, এ কথা ক'জন বোঝে?

সারদাপ্রসাদ শেষবারের মতো পরম স্নেহভরে কাগজের বোঝাগুলোর উপর হাত বুলিয়ে বলে 'তা হলে রইল? দেখবেন যেন কিছু—'

'না না এ আমি এখুনি যত্ন করে তুলে রাখছি।'

সারদাপ্রসাদ আবার একটু বসে। এক্‌গ্লাশ জল চায়।

জল খাওয়ার অবকাশে আরও বার দুই-তিন কাগজগুলো স্পর্শ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'যাক আপনি আমায় বাঁচালেন। চাকরী খুঁজে খুঁজে বেড়ানোর দায় থেকে বাঁচালেন।

চাকরী?

হৈমবতী যেন আকাশ থেকে পড়েন। হৈমবতী যেন কোনোদিন শোনেন নি, সারদাপ্রসাদ নামের অবোধ প্রাণীটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তাই আকাশ থেকে পড়া গলায় বলেন, 'চাকরী।'

সারদাপ্রসাদ হেসে ওঠে।

যেন সবটাই কৌতুকের বিষয়।

বলে, 'আর বলেন কেন? ওই সব গণ্ডমূর্খ্য পাবলিশারদের ওপর চটে মটে গিয়ে খাতাপত্তর গুটিয়ে চাকরীই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। করতে তো হবে একটা কিছু?'

হৈমবতী ঈষৎ হেসে বলেন, 'তা তো সত্যি। সরোজও তো---'

'না না সে জন্যে নয়, সে জন্যে নয়। দাদার কিসের অভাব? হাতীর জন্যে মশা---' কি করবে? এ কেবল আমার নিজেরই জন্যে। মানে চুপ করে কি দিন কাটানো যায়?'

সারদাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি পালায়।

হৈমবতী অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন। হৈমবতীর মুখে একটা বিচিত্র বিষণ্ণ হাসিফুটে ওঠে।

[ক্রমশ।

স্কেচ্ শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার

রাগমোচন

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

মিলনকালে নর-নারীর উভয়েরই দেহ ও মন ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রতিটি যৌনকেন্দ্রের পেশী-গুলো শক্ত হয়---কোষগুলি রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে যায়। যৌনাবেগ উভয়ের দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা দুজনেই ভুলে যায়। কাম-ক্রীড়ারত দুটি দেহ পরস্পরকে আনন্দ দান করতে ব্যগ্র হয়---উভয়ে আবার উভয়ের কাছ থেকে আনন্দ পেতে চায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য দুটি হৃদয় মিলে-মিশে এক হয়ে যায়।

তারপর একসময় পুরুষের বীর্য-স্খলন হয়। তার লিঙ্গমুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে বীর্য বেরিয়ে আসে---গড়িয়ে পড়ে ভরিয়ে দেয় নারীর যোনির অভ্যন্তরভাগ। আনন্দিত জরায়ু বুঝি নিঃশেষে শুষে নেয় প্রেমাস্পদের বীর্য-সম্ভার। যাকে ভালবাসে নারী সেই পুরুষের ভালবাসার দান ছড়িয়ে পড়ে তার দেহের মধ্যে। নারীর তলপেট, জঙ্ঘা, ভগাঙ্কুর প্রচণ্ড আবেগে আন্দোলিত হতে থাকে---তার কামসুধা ফলিত হতে থাকে।

এই অবস্থার এক সুন্দর বর্ণনা করেছেন ভেলডি সাহেব---

That intercourse which takes place between two sexually mature individuals of opposite sexes ; which excludes cruelty and the use of artificial means for producing voluptuous sensations ; which aims directly or indirectly at the consummation of sexual satisfaction, and which, having achieved a certain degree of stimulation, concludes with the ejaculation—or emission—of the semen into the vagina, at the nearly simultaneous culmination (orgasm) of sensation—or orgasm—of both partners.

শেষ হয় দুটি দেহের রতিক্রীড়া। ধীরে ধীরে দুটি দেহের যৌন উত্তেজনা প্রশমিত হয়। যৌন কেন্দ্র-গুলির পেশীসমূহ আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। কোষের রক্তোচ্ছ্বাস শান্ত হয়। যৌনবিদরা এ অবস্থাকে বলেন রাগমোচন। যৌন আবেগের নিবৃত্তিই হচ্ছে রাগমোচন।

রাগমোচনের পরবর্তী অবস্থা কি? পরবর্তী অবস্থায় নর-নারী দুজনের দেহই গভীর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়। উত্তেজনার যে স্রোত উভয়ের দেহ-মন অধিকার করেছিল, রাগমোচনের ফলে সে উত্তেজনা লোপ পেল---সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি ত' তাদের দেহকে অধিকার করবেই। এটাই স্বাভাবিক। একবার রাগমোচনের পর সঙ্গে সঙ্গেই আর নর-নারীর দেহ যৌন উত্তেজনায় দুর্বার হয়ে ওঠে না। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আবার উভয়ের দেহ কামার্ত হয়। এই সময়ের ব্যবধান দৈহিক সক্ষমতা ও বয়স অনুযায়ী কমবেশী হয়। প্রাক-মিলন পর্বের উত্তেজনাও দৈহিক সক্ষমতা ও বয়সের উপর নির্ভরশীল।

স্বাভাবিকভাবে কিশোর তরুণ যুবক এবং কিশোরী তরুণী যুবতীরা প্রাক-মিলন পর্বে খুব অল্পক্ষণের মধ্যে যৌন উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে। ফলে তাদের পক্ষে শৃঙ্গারকাল অল্প-ক্ষণের হয়, ---কিন্তু রতিমিলন হয় দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের দেহ-মন অত সহজে যৌন আবেগে উত্তপ্ত হয় না। দীর্ঘ সময় ধরে শৃঙ্গার করলে তবেই তাদের মনে আসে যৌন কামনা। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে আসল রতিক্রীড়া হয় অল্পক্ষণস্থায়ী। মিলন উত্তর-কালেও ঠিক একই অবস্থা দাঁড়ায়। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী অল্পসময়ের ব্যবধানে আবার মিলন কামনায় উত্তেজিত হতে পারে---

কিন্তু প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের ক্ষেত্রে এ সময়ের ব্যবধান হয় যথেষ্ট বেশী।

এ অবস্থার সঙ্গে আবার দৈহিক সক্ষমতাও বিচার্য।

রাগমোচন তিনভাবে ঘটে—(১) স্ব-মৈথুন, (২) রতি মিলন, (৩) স্বপ্ন-স্খলন।

যৌবনোদগমের (Puberty) পর থেকেই কিশোর-কিশোরীর দেহে একটা পরিবর্তনের জোয়ার আসে---এই পরিবর্তনের ঢেউ তার মনের তটেও আঘাত হানে। সে যৌন আবেগ অনুভব করে। যৌন-মিলনের দৃশ্য, (মনুষ্যেতর জীব-জন্তুর কিংবা পিতা-মাতার) প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের ছবি, গল্প উপন্যাস নাটক সিনেমার প্রেমকাহিনী তাদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে—তাদের মনকে কামার্ত করে তোলে। তাদের দেহের যৌনকেন্দ্র ও যৌনাঙ্গ উত্তেজিত হয়, কামক্ষুধা প্রবল হয়। যৌনমিলনের স্বাভাবিক উপায় না থাকলে তখন তারা অস্বাভাবিক পথ বেছে নেয়। সে পথ আত্মমেহনের পথ। এই পথে তাদের রাগমোচন ঘটে।

যে-সব নারী-পুরুষের বিবাহ বিলম্বে ঘটে আত্ম-মেহন ছাড়া তাদের আর কোনও পথ থাকে না। আবার যাদের আদপেই বিবাহ হয় না তাদেরও একমাত্র উপায় স্ব-মৈথুন। কেন না যে-কোন ভাবেই হোক কামার্ত অবস্থায়, রাগমোচন না হলে নর-নারীর দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক সময় যৌন বিকৃতি দেখা দেয়। স্ব-মৈথুন নিঃসন্দেহে রাগমোচনের অস্বাভাবিক উপায়।

স্বপ্ন-স্খলনও রাগমোচনের আর একটি অস্বাভাবিক উপায়। দিনের বেলায় যৌন-মিলনের দৃশ্য কিংবা যৌনচিন্তা যা নরনারীর মনকে অধীর করতে পারে না---কিন্তু সে সবের ছাপ পড়ে মনের পটে---এবং এই ছাপ গভীর-ভাবে বিধৃত হয়ে থাকে 'সাব-কনশাস মাইণ্ডে।' দিনের বেলায় এ সব নর-নারীর 'কনশাস মাইণ্ড' খুবই প্রবল থাকে কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় 'কনশাস মাইণ্ড' পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং 'সাব-কনশাস মাইণ্ড' প্রবল হয়ে ওঠে। আর তখন তার দেহমন যৌন-কামনা-আচ্ছন্ন করে ফেলে। ঘুমের মধ্যেই তার মনে হয় সে যেন যৌন-মিলনে রত হয়েছে। পুরুষ ভাবে যে, সে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, কিংবা উলঙ্গ নারীদেহকে সে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরেছে। এই চিন্তায় তার রাগমোচন ঘটে। আবার নারী দেখে তার দয়িতকে। তার প্রেমাস্পদ তাকে রতি-সুখ দান করছে এই চিন্তা তার মনকে কামার্ত করে তার রাগমোচন শেষ হয়। অনেক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না হলে নর-নারী স্বপ্ন-স্খলনের মাধ্যমে রাগমোচনের সুখ অনুভব করে।

রাগমোচনের স্বাভাবিক পথ হচ্ছে নর-নারীর রতিমিলন। নর-নারী (প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী, কিংবা রক্ষিতা নারী ও পুরুষ) যখন কামার্ত হয়ে শৃঙ্গারে মত্ত হয় এবং উপযুক্ত ক্ষণে তারা রতি-ক্রিয়া সুরু করে এবং প্রচণ্ড কামনায় মৈথুনে রত হয়, তারপর এক সময় তাদের রাগমোচন ঘটে, যৌন-কামনা নিবৃত্তি লাভ করে। এ ধরণের রাগমোচন স্বাভাবিক উপায়। এতে নর-নারী উভয়েই তৃপ্তিলাভ করে।

নারী ও পুরুষের দেহে রাগ-মোচনের চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন রকম।

পুরুষের দেহে যৌন অনুভূতির প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে তার যৌনাঙ্গ। অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের উত্তেজনার উপরই তার দেহমনের যৌন উত্তেজনা নির্ভর-শীল। তার যৌনাঙ্গের পেশী-কোষ ইত্যাদিও খুবই সরল। শিশ্ন-মুখ দিয়ে যখন বীর্যস্খলন হয়ে যায়, তখন তার যৌন আবেগ প্রশমিত হয়। রাগমোচন ঘটে। যৌবনোদগমের কাল থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পুরুষের যৌনাঙ্গ হচ্ছে তার যৌন-উত্তেজনার মূল কেন্দ্র, রতি-ক্রিয়ার মূল হাতিয়ার এবং বীর্যস্খলনেরও প্রধান যন্ত্র।

কিন্তু নারীর যৌন অনুভূতির কেন্দ্র অনেকগুলি। নারীর স্তন-মুকুল, নিতম্ব, ওষ্ঠ ইত্যাদি খুবই যৌন অনুভূতির প্রবণ। কিন্তু তার যোনিমুখের ভগাঙ্কুরটি সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীল। যৌবনোদগমের কালে তার ভগাঙ্কুরে সমস্ত যৌন কামনা জমাট বেঁধে থাকে। পুরুষের দেহে পুরুষাঙ্গের মতন নারী-দেহে ভগাঙ্কুরও মূল যৌনকেন্দ্র। কিন্তু ভগাঙ্কুর রতি-ক্রিয়ার হাতিয়ার নয়। ভগাঙ্কুর মর্দনে নারী যৌন উত্তেজনা লাভ করে ঠিকই---কিন্তু এতে তার রাগ-মোচন হয় না। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর যৌন অনুভূতি ভগাঙ্কুর থেকে ভগদেশে ব্যাপ্তিলাভ করে। তখন যোনিপথের ঘর্ষণে তার মনের যৌন আবেগ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে। তখন সে কামনা করে একজন সক্ষম পুরুষকে---যে পুরুষ উত্তেজিত লিঙ্গ তার যোনিপথে চালনা করে তার কামনার আবেগকে আরও আরও বৃদ্ধি করবে। তার লিঙ্গ-ঘর্ষণে নারীর যোনিপথের দেওয়াল বেয়ে কাম-সুধা ক্ষরিত হবে। কামনার তুঙ্গশিখরে উঠলেই তবে নারীর কাম-সুধা ক্ষরিত হয়---তখন তার তলপেট জঙ্ঘা ও যোনিদেশ প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হয় ও তার রাগমোচন ঘটে। সুতরাং নারীর রাগমোচনের হাতিয়ার ভগাঙ্কুর নয়---ভগদেশ এবং বিশেষ করে যোনি-পথ।

প্রতিবার স্বমৈথুন, রতিমিলন বা স্বপ্ন-স্খলনের ফলে পুরুষের রাগমোচন ঘটে---কারণ পুরুষের যৌনাঙ্গ জটিল নয়, সরল। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা' সম্ভব হয় না। নারীর রাগমোচন তার মনের উপর নির্ভরশীল। অনুকূল পরি-বেশে প্রেমাস্পদের দ্বারা আশ্লিষ্ট পিষ্ট ও উপগত এবং পরিপূর্ণভাবে কামার্ত না হলে নারীর রাগমোচন ঘটে না এবং মিলনে যদি নারীর সম্মতি না থাকে তাহলে সে রতিমিলন স্বাভাবিক ও সুখকর মিলন হয় না---হয় অস্বাভাবিক ব্যাভিচার। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও স্ত্রী যদি মিলন-কামী না হয় এবং স্বামী যদি অনিচ্ছুক স্ত্রীর সঙ্গে নিছক গায়ের জোরে মিলিত হয়, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর রাগ-মোচন না ঘটার সম্ভাবনা অধিক। আবার অনেক সময় গোপনে রতিমিলনে

উদ্যত হলে পুরুষটির রাগমোচন ঘটলেও নারীর রাগমোচন ঘটে না। বারাঙ্গনাদের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত সত্য। একই রজনীতে বহু পুরুষ তার দেহ নিয়ে যৌনক্রীড়ায় মত্ত হয়। তার সঙ্গে রতিমিলন ঘটায়---পুরুষদের রাগমোচন হয়। কিন্তু বারাঙ্গনাটির একবারও রাগমোচন হয় না। যদি ঘন ঘন সেই বারাঙ্গনার রাগমোচন ঘটত তাহলে কিছুতেই সে প্রতি রাত্রে একাধিক পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারত না। তার সঙ্গমবিমুখ মন তাকে রক্ষা করে। কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য তারা মিলিত হয়,—রতিসঙ্গমের জন্য নয়। তাই সঙ্গমকালে তাদের দেহমনে যৌন উত্তেজনা দেখা দেয় না। ফলে রাগমোচনের প্রশ্নও ওঠে না। এই নিঃসাড় যৌন-অনুভূতিসম্পন্না নারী যখন মনের মানুষের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তখন তার রাগমোচন ঘটে। তার দেহমনও যৌন কামনায় অধীর হয়।

রাগমোচনের ব্যাপারে এমনও ঘটে যে, সঙ্গমকালে নারীর একাধিকবার রাগমোচন হয়ে যায়। যোনিদেশে কাম-সুধা ক্ষরিত হয়। দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে কিন্তু রতিক্রীড়ায় মত্ত পুরুষ তা' জানতেও পারে না।

হ্যাভেলক এলিস সাহেব একটি নারীর কথা বলেছেন---একটি নারী বিবাহোত্তর জীবনে তার স্বামীর সঙ্গে বহুবার মিলিত কিন্তু রাগমোচনের ঘটনা সে একবারও বুঝতে পারেনি। স্বামীকে সে স্বামী হিসাবেই শুধু দেখেছে --দেখেনি প্রেমাস্পদ হিসাবে।

বিবাহোত্তর জীবনে স্বামীর ইচ্ছা হলে স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রীড়ার সুখ ভোগ করবে---এটা প্রচলিত অনুশাসন। ইচ্ছা থাক বা না থাক কামার্ত স্বামীকে কি করে বাধা দেবে স্ত্রী। , আর সেজন্যই স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে বাধা দেয়নি। মাঝে মাঝে সে নিজেও অল্প পরিমাণ উত্তেজনাও ভোগ করেছে---তবে স্বামীর প্রতি সাব-কনশাস মনের বিতৃষ্ণা তার উত্তেজনাকে তুঙ্গে পৌঁছতে দেয়নি। স্বাভাবিকভাবে সেই নারী সন্তানের জননীও হয়েছিল---কারণ সন্তানের জননী হওয়া না-হওয়া নারীর রাগমোচনের উপর নির্ভরশীল নয়।

কয়েক বছর পরে এই নারী একটি পুরুষকে ভালবাসে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেই পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। গোপন মিলন--কিন্তু তবু সেই মিলনের জন্য নারীটি অধীরা ছিল---তাই মিলনকালে তার রাগমোচনও হয়েছিল। সেই প্রথম নারীটি যৌন-মিলনকালে রাগমোচনের স্বাদ গ্রহণ করেছিল।

রাগমোচনের ব্যাপারে যৌনশিক্ষা নারী-পুরুষের সহায়ক হয়। প্রাক-বিবাহিত জীবনে অনেক পুরুষ বারাঙ্গনা গৃহে গমন করে, অন্যভাবে গোপনে কোনও নারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে রাগমোচনের ঘটনা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পারে। শৃঙ্গারের মাধ্যমে কিভাবে যৌন উত্তেজনাকে বর্ধিত করা যায় এবং রতিক্রিয়ার দ্বারা রাগ-মোচনের আনন্দে বিভোর হওয়া যায় সে জ্ঞান তার থাকে---কোনটির পর কোনটি কেমনভাবে ধাপে ধাপে ঘটে তা' তার অজানা থাকে না। সে রতি-মিলনের পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করে। কিন্তু কুমারীর পক্ষে রতিমিলনের আনন্দ বিবাহের পূর্বে জানা সম্ভব হয় না সব ক্ষেত্রে। রাগমোচন কি, কেমনভাবে রাগমোচনের আনন্দ উপভোগ করা যায় এ সব সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞা থেকে যায়। তা ছাড়া সে ভাবে, তার ভগাঙ্কুরই হচ্ছে যৌন আনন্দ উপভোগের প্রধান হাতিয়ার। ভগদেশ ও যোনিপথ সম্বন্ধে সে কোনও ধারণা লাভ করতে পারে না। বেশী বয়সে যে-সব কুমারী কন্যার বিবাহ হয় তারা রাগমোচনের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে না। মনে মনে ভগাঙ্কুরকে প্রাধান্য দেয় বলে ভগদেশ ও যোনি-পথকে অবহেলা করতে শেখে। কাজেই নর-নারী উভয়ে যদি উপযুক্তভাবে রতিশিক্ষা লাভ করতে পারে তবে রাগমোচনের পরিপূর্ণ আনন্দও তারা পায়।

রাগমোচনের সঙ্গে চরম পলক লাভের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে রাগমোচন না হলে নরনারী যৌন-মিলনের চরম পুলকলাভ করতে পারে না। কিন্তু চরম পুলক না পেলেও নর-নারীর রাগমোচন হতে পারে।

স্ব-মৈথুনে অভ্যস্ত নর-নারীর রাগ-মোচন হয় কিন্তু তারা পরিপূর্ণভাবে চরম পুলক লাভ করতে পারে না। প্রথম প্রথম যখন নর-নারী হস্তমৈথুন করে তখন হয়ত কিছুটা পুলক লাভ করে কিন্তু পরে হস্তমৈথুন যখন অভ্যাসে দাঁড়ায় তখন তাদের মনে পুলকের সঞ্চার হয় না। গোপন রতিক্রীড়া কিংবা বারবনিতা গমন পুরুষের মনে আনন্দের চেয়ে ভয়ের সঞ্চার করে অধিক। কাজেই রাগমোচন হলেও স্বাভাবিক চরম-পুলক সে লাভ করে না। অসামাজিক প্রেম নারীমনে ভয়ের সৃষ্টি করে এবং অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপাদনের আশঙ্কাও তাকে রাগমোচনের শেষে চরম পুলক দিতে পারে না। স্বপ্ন-স্খলনও নর-নারীর মনে চরম পুলক সৃষ্টি করতে পারে না। যৌন-আবেগ—হস্তমৈথুন কিংবা স্বপ্নস্খলন---অবশেষে রাগমোচন। এর মধ্যে আনন্দের কোনও চিহ্ন থাকে না।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বিবাহোত্তর জীবনে নর-নারী যখন কামার্ত হয়ে মিলিত হয় এবং রতি-ক্রীড়ার শেষে তাদের রাগমোচন ঘটে তখনই তারা উপভোগ করে চরম পুলক। তবে পুরুষের বীর্যস্খলন ও নারী কাম-সুধা ক্ষরণ যখন একই সময়ে হয় তখনই মিলনরত দুটি হৃদয় পরম ও চরম পুলক অনুভব করে। তখনই সেই নারী ও পুরুষের মিলনও সফল ও আদর্শ-মিলন।

চেকোশ্লোভাকিয়া

[পৃথিবীর যে কটি রাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আলোচনার বস্তুতে পরিণতি লাভ করেছে এবং সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে চেকোশ্লোভাকিয়া সেই তালিকায় একটি নতুন নাম। চেকোশ্লোভাকিয়া বর্তমানে সংবাদপত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এই রাষ্ট্রের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প-বাণিজ্য, আয়তন, সীমা প্রভৃতি নানা তথ্যসম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নলিখিত রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হল।—স।]

উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে স্যাক্সনি (পূর্ব-জার্মানী), পূর্বে ইউক্রেনিয় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র-রুথেনিয়া যার অন্তর্ভুক্ত, উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব পোল্যাণ্ড, পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্যাভেরিয়া (পশ্চিম জার্মানী), দক্ষিণে অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরী। এই সীমানার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নাম চেকোশ্লোভাকিয়া। পৃথিবীর অগণিত রাষ্ট্রের মধ্যে আজ যে বিশ্বজোড়া দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে, সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানগুলি অনেকখানি অধিকার করে আছে, বেতারের বিশেষ সংবাদে হয়েছে পরিণত—মধ্য ইয়োরোপের অন্তর্গত সেই চেকোশ্লোভাকিয়ার আয়তন উত্তর থেকে দক্ষিণে পঞ্চাশ থেকে এক শ' মাইল আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ছ'শ মাইল। পূর্বে এবং উত্তর-পূর্বে তারা শোভা পাচ্ছে কারপেথিয়ান পর্বতসমূহ তার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ হল তাত্রাস যেখানে বিরাজ করছে আট হাজার সাত শ' সাঁইত্রিশ ফিটের জারলা চাভকা ওরফে স্ট্যালিন শৃঙ্গ।

চেক এবং শ্লোভাক—দুয়ের সমন্বয়ে যে ভূমি চেকোশ্লোভাকিয়া নামে খ্যাত সেখানে চেকেদের সংখ্যা আশী লক্ষেরও বেশী এবং শ্লোভাকদের সংখ্যা তেত্রিশ লক্ষেরও বেশী। চেক এবং শ্লোভাক উভয়েই স্লাভদের উত্তরপুরুষ, জাতীয় উদ্দীপনা এবং সচেতনতায় এরা যথেষ্ট ভরপুর। এরা ছাড়াও চেকোশ্লোভাকিয়ায় বসবাসকারী হাঙ্গেরীয়, জার্মান, রুথেনিয়ান-উক্রেনিয়ান এবং পোলেদের সংখ্যাও যথেষ্ট। এই সংখ্যা যথাক্রমে সাড়ে চার লক্ষ, দু'লক্ষ, এক লক্ষ এবং এক লক্ষ।

এর প্রাচীন ইতিহাস অনুধাবন করতে গেলে অন্তত হাজার বছর পিছিয়ে যেতে হবে। আগে বোহেমিয়া, মোরেভিয়া এবং শ্লোভাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ মোরেভীয় সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৯০৬ খৃস্টাব্দের পর বোহেমিয়া এবং মোরেভিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান রাজধানী প্রাহা (প্রাগ) বোহেমিয় নৃপতিদের অধীনে চতুর্দশ শতাব্দীতে সমগ্র মধ্য ইয়োরোপের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির এক পীঠস্থান বলে খ্যাতিলাভ

রাষ্ট্রনেতা দুবচেক

করে। সম্রাট পঞ্চম চার্লসের ভাই ফার্ডিনাণ্ড বোহেমিয়া এবং হাঙ্গেরীর সিংহাসন লাভ করলেন ১৫২৬ সালে। রাজ্যপ্রাপ্তির পর স্লাভদের তিনি জার্মান ছাঁচে পরিণত করার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। তবে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হতে পারলেন না। ১৬১৮ সালে প্রাহায় 'ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ' সুরু হয়ে গেল।

তারপর প্রায় তিন শ' বছর পার হল। কত ঘটনা, কত আবর্তন-বিবর্তন, কত ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার ইতিহাস রূপ নিতে থাকল এবং সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে সেই ইতিহাস পুষ্ট থেকে পুষ্টতর হতে থাকল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে একেবারে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। এই সময়ে টমাস মাসারিক এবং এডোয়ার্ড বেনস শ্লোভাক নেতাদের সহায়তায় অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন। মিলান স্টিফানিক বিদেশে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামগুলির সংগঠন ও পরিচালনার ভার নিলেন। ২৮-এ অক্টোবর ১৯১৮ অস্ট্রিয়ার পতন ঘটলেই চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল। ৩০-এ অক্টোবর মাসারিক হলেন রাষ্ট্রপতি। স্টিফানিক হলেন যুদ্ধমন্ত্রী। তার পরের বছরেই ১৯১৯ সালে স্টিফানিক লোকান্তরিত হলেন। মাসারিকের জায়গায় এলেন বেনেস ১৯৩৫ সালে।

১৯৩৮ সালে হিটলার সাডেটেনল্যাণ্ডের সংযুক্তিকরণ দাবী করলেন। আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝে সে সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্যেই তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন মিউনিকে ঐ বছর ৩০-এ সেপ্টেম্বর তারিখে হিটলারের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করলেন, সেই চুক্তিতে সংযুক্তিকরণের দাবী মেনে নেওয়া হল অবশ্য হিটলার এবং মুসোলিনীর কাছ থেকে শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। আমেরিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টও হিটলারকে অনুরোধ করলেন চুক্তির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শান্তিরক্ষা করে যাওয়ার। হিটলার সাডেটেনল্যাণ্ড অধিকার করলেন ১লা-২রা অক্টোবর।

৫ই অক্টোবর পদত্যাগ করলেন বেনেস। ৫ই নভেম্বর জার্মানী ও ইটালী চেকোশ্লোভাকিয়ার চার হাজার বর্গমাইল হাঙ্গেরীকে দিয়ে দিতে রাজী হয়ে গেল। চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্যান্য অংশগুলি টুকরা টুকরা করে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়া হল পোল্যাণ্ডকে উপহৃত করার জন্য।

বিপুলসংখ্যক শ্লোভাক দল শ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করল ১৯৩৯ সালের ১৪ই মার্চ ডক্টর টিসোকে রাষ্ট্রনায়ক করে। টিসো ইহুদী নিধনে নাৎসীদের সহায়তা করলেন যথেষ্ট এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর একেবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। দলের অন্যেরা বেনেসকে সমর্থন করলেন এবং নির্বাসিত চেক সরকার নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে তখন ঘোষণা করলেন সংগ্রাম। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েট রাশিয়ায় সৈন্য পাঠাল শ্লোভাক দল। আর মস্কোকার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করল ১৯৪৫ সালের এপ্রিল ও মে মাসে। ৮ই মে ১৯৪৫ বেনেস প্রত্যাবর্তন করলেন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দেখা গেল যদিও রাষ্ট্রের শতকরা সত্তর জন কম্যুনিস্ট-বিরোধী, তথাপি কম্যুনিষ্ট শক্তি রাষ্ট্রশাসন-যন্ত্র অধিকার করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হল এবং বেনেসকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে হল কম্যুনিস্ট ডঃ ক্লেমেণ্ট গটওয়াল্ডকে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৪৭ সালে টিসোর প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হল। ৭ই জুন ১৯৪৮ বেনেস পদত্যাগ করলেন এবং তিন মাসের মধ্যেই ৩রা সেপ্টেম্বর গতায়ু হলেন।

চেক এ্যাসেমব্লি তিনশ' জনকে নিয়ে এবং শ্লোভাক এ্যাসেমব্লি একশ' জনকে নিয়ে সংগঠিত। এর আয়ুষ্কাল তিন বছর। চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপতি হলেন স্বাবোদা (৭৪) এবং কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান হলেন দুবচেক (৪৭)। এ দেশের সৈন্যবাহিনী সোভিয়েট-পরামর্শ অনুযায়ী সংগঠিত করা হয়।

দেশের বাসিন্দারা আনুমানিক অধিবাসী রোম্যান ক্যাথলিক অবশিষ্ট প্রোটেস্ট্যাণ্ট গ্রীক সংরক্ষণশীল ইত্যাদি। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টি অতি প্রাচীন। ১৩৪৮ সালে তার সৃষ্টি। সমগ্র রাষ্ট্রে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান এবং কয়েকটি কারিগরী শিক্ষণ সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। চেক এবং শ্লোভাক ভাষা এখানকার সরকারী ভাষা।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ অজস্র। প্রকৃতি তার অফুরন্ত সম্পদে ভরিয়ে তুলছে এই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রটিকে। কৃষিজ, খনিজ সম্ভারে এবং শিল্পোন্নয়নে এ দেশ যথেষ্ট এগিয়ে আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে তিন ভাগের একভাগ কৃষিজীবী। কয়লা, লোহা, তেল প্রভৃতি এখানকার প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্যগুলির অন্যতম।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহিত্য-সম্পদ এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এখানকার যে সাহিত্য বিশ্বজনীন স্বীকৃতিতে বিভূষিত হয়েছে সেগুলি মূলত চেক ভাষাতেই লেখা। জান হাসের লেখা সারা জাতির পূজা পেয়ে এসেছে। ইনি ১৪১৫ সালে শহীদ হলেন। এ্যামস কমেনস্কি (১৫৯২—১৬৭০) যখন দেশ থেকে বহিষ্কৃত হলেন—সেই সময় সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানকার সাহিত্য তরঙ্গিত হয়ে উঠল, ফলে এই সাহিত একটা নতুন রূপ নিয়ে নতুন ইতিহাসের পৃষ্ঠার উদ্বোধন করল। আধুনিককালে যাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সফলকাম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কে এম কাপেক কড (১৮৬০-১৯২৭), এফ এক্স ভোবোদা (১৮৬০-১৯৪৩), জারোস্লাভ হিলবার্ট (১৮৭১-১৯৩৬), ভিক্টর ডাইক ১৮৭৭-১৯৩০), এ্যাস্ট ভোরাক (১৮৮০-১৯৩৩), আইভান ও লব্রাকট, কে কাপেক (১৮৯০-১৯৩৮) ভ্লাদিমির ভ্যানকুরা (১৮৯১-১৯৫২) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর নতুন করে যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার সৃষ্টি হল, তার অব্যবহিত পরেই নবরূপায়িত এই রাষ্ট্র বৃটিশের শাসনাধীন সেদিনকার ভারতবর্ষ তার নিজের রাষ্ট্রপ্রতিভূর দুর্লভ সম্মান তার নিজের দেশের কোন অধিবাসীকে না দিয়ে, যা করল—আজ অনেকের কাছেই হয়তো এ তথ্য বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে—তিনি একজন বাঙালী আজ থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে চিকিৎসাবৃত্তিধারী যে তরুণ বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম একজন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রতিভূর গৌরব অর্জন করে বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে যিনি পথিকৃৎ-স্বরূপ, বাঙলার সেই সম্মানিত সন্তান স্বর্গত ডাঃ স্যার বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৪৪) কই চেকোশ্লোভাকিয়া নির্বাচিত করল সর্বভারতীয় পরিসরে তার কনসাল হিসাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই চেকোশ্লোভাকিয়া ক্রমশই ধীরে ধীরে একটি সোভিয়েট ঘাঁটিতে পরিণত হতে থাকে। কয়েক মাস আগে ২০-এ অগাস্ট তারিখে পূর্ব-জার্মানী হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া প্রভৃতি প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলির সহায়তায় সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ায় অনুপ্রবেশ করে এবং সেখানে বাহিনী মোতায়েন রাখে। সোভিয়েট রাশিয়ার এই আচরণ সারা বিশ্বকে আজ বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এই অন্যায় এবং অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদে গোটা পৃথিবী আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কারণ, আজকের দিনে অন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও প্রভুত্ব বিস্তারের নীতি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। সোভিয়েট রাশিয়ার মত সাম্যবাদের প্রবক্তা এত বড় একটি বিশ্বশক্তি কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি উপনিবেশবাদী মনোভাবের পরিচয় দেবে—বিস্ময়ের এর চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত আর কি আছে, তা আমাদের জানার বাইরে।

—তথ্যাপ্রয়

সতীশচন্দ্র মেইকাপ

তবে কি সবই শেষ! ঐ যে লাইট হাউসের তলায় নিথর পর্তুগীজ নাবিকের দেহ, তার রক্তরেখায় ফুটে ওঠে কোন এক জীবনের থরে থরে জমে-ওঠা বিরহ বেদনা; বেহুঁস ফার্নাণ্ডিজ, তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ফাদার এ্যাভেরী। সম্মুখে বিশাল আরব সাগর, পাশে মালাবারের পাহাড় শ্রেণী বন-ঝাউ-দেবদারুর ভেতর দিয়ে ঐ দূরে দেখা যায় কটেজ-ডা-লিস, আর দূর পশ্চিমে নিঃসীম আঁধার পর্দাটার ওপারে নারিকেল ঘেরা বাংলো বাড়ী, তার লাইট হাউসের আলোয়, বারে বারে সজীব হয়ে ওঠে। এসেই অভিশপ্ত কোচিন বাংলো—জারিনার বন্দী-গৃহ।

ফাদার এ্যাভেরীর উপস্থিতি সকলের দেহে মনে এক অদ্ভুত-শক্তি এনে দেয়, আদিবাসী জেলেদের চোখেমুখে আতঙ্ক ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়—বাবা সাহেব কি জয়—শব্দে সকলে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে, আলো আঁধারী সেই বর্ষারাতে দেখলুম, স্থির দুটি হাসিমাখা চোখে আয়ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে কোচিন গীর্জার বিশপ, তাঁর হাতের মৃদু ছোঁয়ায় তাঁ নির্দেশে জেলেদের আনা গাছ-গাছাড়া প্রলেপে ধীরে ধীরে ফার্নাণ্ডিজ চোখ খুলে তাকায়, ভাবতে থাকি. কি সে শক্তি ঐ ক্রস বুকে আঁকা পাদ্রীর যা অসংখ্য মানুষের সকল ভয় শঙ্কাকে নিমেষে দূর করে দিতে পারে।

শিলভিয়া আর আমার কাঁধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে ফার্নাণ্ডিজ ধীরপায়ে চলতে থাক, জলেরা আপন ভাষায় চীৎকার করতে করতে পৌঁছে দেয়—আমাদের কটেজ ডা-লিস-এর দরজায়। কিন্তু কোথায় ফাদার এ্যাভেরী—যেন একখণ্ড শরতের মেঘ অসীম নীল আকাশের নীরব নিস্তব্ধতায় কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

পরের দিন ফার্নাণ্ডিজের রোগ-শয্যা পাশে গিয়ে বসি—শিলভিয়া বড় শ্রান্ত ক্লান্ত, কষ্টের হাসি দিয়ে সে অভ্যর্থনা জানায়: 'আ জীবনের যতটুকু সঞ্চয় তার প্রায় সবটুকুই দিয়েছি আমার জারিনার ঐ প্রতিমূর্তি গড়ে তুলতে'—নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে ফার্নাণ্ডিজ জারিনার ছবির দিকে, ছবি সজীব হয়ে ওঠে—করুণ সহানুভূতি, এক মোহময় মায়া ঝরে ঝরে পড়তে থাকে সর্বাঙ্গ জুড়ে।

'ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারায় আমার কটেজের—সব মেঝেটুকু সেদিন লাল হয়ে গেল, জেন, আমি জড়িয়ে ধরলুম, জারিনাকে—বহু কষ্টে আমার গলায় দুহাত দিয়ে কি বলতে চাইল সে ছোট্ট শিলভিয়ার দিকে অপলক চোখে চেয়ে আমার চোখ ফেরাবার ইসারা করে জারিনা—তারপর অতি ধীরে তার ফুলের মত হাত দুটো খসে পড়ে আমার গলা থেকে, বরফের মত কঠিন হয়ে যায়, পাপড়ি ছড়ান চোখের পাতা দুটো হয়ে আসে সম্পূর্ণ নীরবে অসহায় আমার জারিনা। আমার বুকের তলায় অনন্ত শান্তির জগতে ঘুমিয়ে পড়ে—ও: গড়, এক বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস শিলভিয়াকে আমাকে এক প্রচণ্ড আঘাত করে যায়। আমাদেরও দীর্ঘশ্বাস থেকে থেকে যেন গোপনে এসে মিশে যায়—খোলা জানলা দিয়ে দূর সাগরের বুকে পালতোলা নৌকোর ওপর গিয়ে পড়ে চোখ দুটো সেদিন ডিরো জার অন্তরাত্মা থেকে নেমে এসেছিল বিষাক্ত নীল অভিশাপ—ঐ আরবের নীল ঢেউ-এর মত। শয়তানের বিদ্রূপ দেবতার সমস্ত হাসিকে এক ফুৎকারে কোথায় মিশিয়ে দিয়েছিল যেন।

আঙ্গুর বাগানের ঐ ঝাউগাছটার তলায়—জারিনার সর্বাঙ্গ শাদা কাপড় মুড়ে শুইয়ে দিলুম—কফিনের ভেতর—অতি যত্ন করে মাটি চাপা পড়লো—যেন আমার বুকের ওপর পাহাড়ের পর পাহাড় জমে উঠলো—কত ফুল সাজিয়ে দিলুম থরে থরে, তারপর এই বিশ বছর আমি জারিনার সমাধিতে প্রতিটি সন্ধ্যায় গিয়ে বসছি, আরবের কত উন্মত্ত ঝড়-জল দেখেছি—কিন্তু আমার বুকের ঝড় শান্ত হোল না। তারপর?

ফার্নাণ্ডিজ আমার প্রশ্নে হঠাৎ ফিরে তাকায়—মৃদু হাসি দেখতে পাই—সে বড় দুঃখের, বড় ব্যথার হাসি।

'জানতুম, জেন। আমার জারিনা নেই—কিন্তু বসে থাকতে পারলম না।

কে যেন রাতে দিলেন আমার রক্তে প্রচণ্ড উত্তেজনার ঝড় তুলে, শাস্তি দাও—ডিরোজের দণ্ড দাও, আমাকে শান্তি দাও।

গীর্জায় প্রার্থনা করতে গেলুম—ফাদার এ্যাবেরীর পায়ের তলায় কত চোখের জল ফেললুম; কিন্তু আগ্নেয়গিরির দাহ জলতেই লাগলো, কিছুতেই শান্তি নেই।

একদিন পাগলের মত বেরিয়ে পড়লুম কয়েকজন বাছাই করা জেলেদের সঙ্গে নিয়ে জলদস্যু ডিরোজের সন্ধানে, এক জাহাজের খালাসীর বেশে, শিলভিয়া রইলো ফাদার এ্যাবেরীর মঠে।

হ্যাভরস্ট ফার্নাণ্ডিজ।

অবসন্ন সে, বিশ্রামের অনুরোধ জানায় অগাস্টাস।

শিলভিয়া ব্যাণ্ডি গ্লাস এগিয়ে দেয় তার মুখে—মৃদু গন্ধমাখা ফুলের তাড়া এসে টেবিলটার ওপর সাজিয়ে দিতে থাকে। অর্গ্যানের নীচু পর্দায় আঙুলের চাপ পড়ে যায়, অতি মিহি সুরের কম্পন যেন তরঙ্গ তুলে তুলে কোথাও মিশে থাকে,—বড় করুণ সুরের সে প্রবাহ, যেন কেউ রুদ্ধ আবেগে আপনার মধ্যে আপনি লুপ্ত হয়ে যায়।

ফার্নাণ্ডিজের দু'চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়—কত কালের রুদ্ধ বেদনার এমনি প্রকাশ—সে বড় মর্মন্তুদ। নিদ্রায় অভিভূত ফার্নাণ্ডিজ।

কটেজের বারান্দা পার হয়ে ছোট্ট টিলার ওপর শিলভিয়া নীরবে বসে থাকে। দূর দিগন্তরেখায় সাগরের শেষ সীমাটার মাপ করতে থাকে যেন, পেরে ওঠে না, একের পর এক ঢেউ—

তারপর—তারপর, কোথাও বিরতি নেই—'জীবনের চলার পথও যে ঠিক তাই,' বলে উঠি আমি, 'কোথায় সুরু, কোথায় তার শেষ, সে হিসাব কেউই যে আমরা মিলাতে পারি না শিলভিয়া।'

ফিরে তাকায় সে, দুই চোখ সম্পূর্ণ জলের ভারে ভরপুর; ধারা নামে। বিশ বছরের কত জানা-অজানা সুখ-দুঃখের অনুভূতি পরিস্ফুট হতে পারে নি, তার জীবন-যৌবনের সমস্ত কলিগুলো প্রস্ফুটিত হবার পথ পায় নি। ফাদার এ্যাবেরীর মঠের সন্ন্যাসিনীদের শিক্ষায় শিলভিয়ার সাধনাসিদ্ধ জীবনের শুধু একটি পথেরই নির্দেশ দিয়েছে—মৃত্যুর বিভীষিকা, যৌবনের প্রবল প্রভাবে সে কিছুরই সম্পূর্ণ হয় নি। পাহাড়-সমুদ্র-বনানী-ছায়ায় কিশোরী সন্ন্যাসিনীর সে নিস্তব্ধ জীবনের নির্জনতা মাঝখানে প্রৌঢ় ফার্নাণ্ডিজের আবির্ভাব পিতা-পুত্রীর সাক্ষাৎকারের সে স্মৃতির আগল ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়—

তারপর জেন্ অগাস্টাসের উপস্থিতি তার অনাস্বাদিত জীবনে জাগিয়ে তোলে যৌবনের প্রথম শিহরণ—শিলভিয়ার দেহমনে তার প্রকাশ।

'জেন্, তুমি ত জান না, যখন প্রথম দেখলুম ড্যাডিকে তখন আমার বয়স দশ বছর। কত অনুনয় চোখের জল কত প্রার্থনা আমার ড্যাডি ফাদারের কাছে করেছিল—আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখলুম—মঠ থেকে তার ঘরে এসে উঠলুম—এই কটেজ ডা-লিস-এর দরজায়। মামির সমাধির সামনে এসে ড্যাডি হাঁটু ভেঙ্গে বুকে হাত দিয়ে বসে রইলো। তার ব্যথা-বেদনার আগ্নেয়গিরি যেন গলে গলে যেতে চাইলো, অজ্ঞাত কোথা থেকে চোখের জল আমায় ভাসিয়ে দিতে চাইলো—ঝড় স্নেহ সোহাগে আমায় ড্যাডি মানুষ করতে লাগলো। দেখলুম আমার মায়ের—জারিনার প্রতিমূর্তি সেই প্রথম। আমার কি মনে হল জেন্, ড্যাডিকে আর বেশীদিন ধরে রাখতে পারবো না—কিন্তু তারপর—

একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শিলভিয়া, নীল দুটি চোখের কানায় কানায় জল—কালো চুলের গোছায়-গোছায় বাতাস খেলা করে যায়—তার হাত
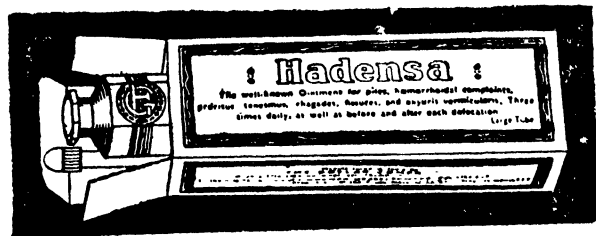
দুটো হাতের মধ্যে তুলে নেয় জেন্—এঁকে দেয় তার হাতে মধুর মুক্ত চুম্বনরেখা। কাঁধের ওপর ঢ'লে পড়ে শিলভিয়া, তার দেহমনের দুঃখ-সুখের অদ্ভুত আবেশে জড়িয়ে ধরে জেন্‌কে, কেঁপে ওঠে, হারিয়ে যায় যেন।

'হ্যাভ, ফেথ—প্রকৃতির শক্তিকে বিশ্বাস রাখো'—বলে ওঠে জেন্।

সন্ধ্যা নামে পশ্চিম দিগন্ত বিস্তার করে, সমুদ্র-আকাশ সেখানে আলিঙ্গনে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে,—রক্তিম রাগ নীল সমুদ্রে ছড়াতে থাকে তার রং রূপ,—পাখীর দল সাগর ফেরার আবেগে অস্থির, আমরাও ফিরে যাই ফার্নাণ্ডেজের কটেজ ডা-লিসের শয্যাশিয়রে।

ভাবভোলা চোখে ফার্নাণ্ডিজ আমাদের বসতে ইঙ্গিত করে, রণক্লান্ত সৈনিক জীবন-যুদ্ধে যেন পরাজিত, নিঃস্ব-নাবিক বলে যায় তার অভিযানের দুঃসাহসিক কাহিনী—

'আমার জাহাজ এসে নোঙ্গর করে করাচি বন্দরে—কত পণ্য কত চোখ-ঝল্‌সানো সব দ্রব্যসামগ্রী—জাহাজ থেকে নামে—আর নূতন নূতন কত কি আমাদের অজানা জিনিষে জাহাজের খোল ভরে ওঠে। কতকগুলো ঘর ছিল জাহাজে, যেখানে আমাদের নূতন খালাসীদের যাওয়া নিষেধ।

তারপর বন্দরের কাল শেষ হলো একদিন। এরপর এডেন। কত মানুষের, স্ত্রী-পুরুষের আনাগোনা হলো তার লেখাজোখা নেই। দীর্ঘ একমাস আমরা এডেন বন্দরে কাটালুম—ভূমধ্যসাগর থেকে জাহাজ এসে পৌঁছলে তা থেকে মাল খালাস নিয়ে আমরা যাবো মাদাগাস্কার—তারপর কেপ্ অফ গুড হোপ।

কিন্তু জেন্—আমরা বুঝতে পারি নি—রাতের অন্ধকারে কি সব জিনিষ ধান হ'তো জাহাজের খোলের ভেতর। কোন কোন জাহাজের এমন গোপন রহস্য থাকে যার সন্ধান গুটি-কয়েক জাহাজের আকাসার ছাড়া আর কারুর জানা সম্ভব নয়। এডেনের ঘাটে-বন্দরে বাজারে দেখলুম, কত মেজ আর সিরাজের আতর নৌকো-বোঝাই হয়ে জাহাজে ওঠে, আর—হঠাৎ থেমে যায় ফার্নাণ্ডিজ—যেন শিলভিয়াকে দেখে আঁতকে ওঠে।

বুঝতে পারি না নাবিক-জীবনে কত রহস্য, কত অবিশ্বাস্য ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। বিচিত্র সে-অভিজ্ঞতা, হয়ত শিলভিয়ার উপস্থিতিতে প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত। শিলভিয়া সরে যায়, মনে করিয়ে দিই তাকে—

'একদিন রাতে অন্ধকারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি, সিগন্যাল লাইট ছাড়া ডেকের উপর কোন আলোই নেই—সমুদ্রের ঢেউ-এর ছলাৎ ছলাৎ শব্দই শুধু কানে আসছে, এমন সময় অন্ধকারে জলের ওপর দেখতে পেলুম, একটি কালো মোটর লঞ্চ ধীরে এসে জাহাজের পেছন দিকে থেমে পড়লো। তারপর যা দেখলুম সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য, জেন্—

দেড়শ মণ ওজনের নোঙ্গরটা যেখানে বাঁধা আছে তারই পাশে হঠাৎ একটা ছোট্ট দরজার মুখ খুলে গেল। মোটর লঞ্চ থেকে সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢাকা এক দীর্ঘদেহ খালাসী এসে দাঁড়ালো। হাতে তার লোহার চাবুক—কি এক ইসারা করতেই মোটর লঞ্চের ভেতর একের পর এক প্রায় তিরিশ জন মেয়েকে চুলের গোছা, হাতের কব্জি ধরে কয়েকজন খালাসী জাহাজের খোলের ভেতর নিয়ে গেল, যারা মরীয়া হয়ে ওদের হাত ছাড়াতে চাইলো, চাবুকের আঘাতেও যাদের পারলো না, চোখ বাঁধা অবস্থায় শুধু গোঁঙানীর শব্দ বেরুতে লাগলো, তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে আলাদা কক্ষে ঢুকিয়ে দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলুম। উঃ কি ভীষণ সে দৃশ্য।

আবার অচেতন হয়ে যায় ফার্নাণ্ডিজ।

স্তব্ধ হয়ে ভাবি,—সভ্যতার গর্বে দুনিয়া আজ মুখর, কিন্তু মানুষের দেহ কেনাবেচার সেই অন্ধকার যুগের বর্বরতা আইনের কোন ছিদ্রপথে আজও তার বিষাক্ত নিশ্বাস ব'য়ে চলেছে—তার সন্ধান কে রাখে।

এডেন ছেড়ে চলেছে জাহাজখানা আফ্রিকার পূর্ব-উপকূল ধরে, দক্ষিণ অভিমুখে। আরও কয়েকটা ছোট-খাটো বন্দরে নেমে আফ্রিকার অন্যতম বৃহত্তম পোতাশ্রয় মাদাগাস্কারে পৌঁছবার সময় হয়ে এলো।

যতই দিন ঘনিয়ে আসে ক্যাপ্টেনের ডেকে ঘন ঘন গোপন পরামর্শ-সভা হতে থাকে।

হঠাৎ একদিন চমকে উঠে ফার্নাণ্ডিজ এক নাবিকের মুখে ডিরোজের উল্লেখ শুনে, ডিরোজের কেপ্‌টাউন থেকে মাদাগাস্কার অভিমুখে জাহাজ ছাড়ার সংবাদ এসেছে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বার বার প্রার্থনা জানায় সে, তবে কি চরম পরিশোধের সময় হয়েছে। ---জারিনার শেষ আর্তনাদ তার বুকে মোচড় দিতে থাকে। অতবড় বিশাল সমুদ্রের মুক্ত হাওয়াতেও একফোঁটা নিশ্বাস নেওয়ার মত বাতাস যেন কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না সে।

অশান্ত নাবিক বিরহী জীবনাহত ফার্নাণ্ডিজের হৃদয়-কল্লোল বুঝি সমুদ্র-কল্লোলকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। কি দিয়ে থামাবে তার উগ্রে আসা বুকের জ্বালা---জারিনার প্রেম, তার সুকোমল বাহুবন্ধন, তার উষ্ণ বুকের আবেগ-আলিঙ্গনের স্মৃতি বারে বারে তাকে আহত করে। মাত্র একটি বছরের অপূর্ণ, সে অসম্পূর্ণ মিলনাভূত, অসহ্য জ্বালায় তাকে অস্থির করে তোলে। ছট্‌ফট্ করতে থাকে সে, উগ্র মদের বোতলের মুখ খুলে সবটা ঢেলে দেয় তার তপ্ত কণ্ঠনালীতে। টলতে টলতে কোথায় গিয়ে পৌঁছয় সে জানে না। —জাহাজের যে গোপন কক্ষের শত সন্ধান করেও ব্যর্থ হয়েছে, দিনের পর দিন, রাতের অন্ধকারে ব্যর্থ হয়েছে অন্ধকারের কারাকক্ষের—সেই বন্দিনীদের সন্ধান দিতে—বিভ্রান্ত বিমূঢ় ফার্নাণ্ডিজ এসে হাজির হয় ইঞ্জিন-রুমের পাশে, সেই গোপন কক্ষের গুপ

তারপরে। সমুদ্রবক্ষে—ঝড়ের দাপাদাপি, বর্ষারাতে সাইক্লোনের সঙ্কেত-ঘণ্টা বেজে ওঠে। ঝড়ের হাওয়া, সমুদ্রের গর্জে-ওঠা ঢেউয়ের ফণা ডেকের ওপর নিষ্ফল আক্রোশে আছড়ে পড়ে। মদির-মাতাল ফার্নাণ্ডিজ গড়িয়ে পড়ে দরজার ওপর, খুলে যায় গোপন ঘরের গোপন দরজা। হঠাৎ এসে কে যেন দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে। সুঠাম সুন্দর একটি পালকের কোমলতায় মূর্তি, এক অর্ধ-উলঙ্গ নারী, তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে মসৃণ পেলবতা।

ফার্নাণ্ডিজের দুই হাঁটুর মাঝে তার বিস্রস্ত চুলে ঢাকা মাথা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, কি অব্যক্ত যন্ত্রণায় বলে যায়—অজানা সে ভাষা—না, আর চাবুকের আঘাত নয়, মৃত্যু মৃত্যু তার কামনা। ফার্নাণ্ডিজ আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরে উন্মুক্ত দেহখানা। ওষ্ঠে এঁকে দেয় তার গাঢ় চুম্বন। থর্ থর্ বেগে কাঁপতে কাঁপতে ফার্নাণ্ডিজের ওপর সম্পূর্ণ অচেতন দেহ এলিয়ে পড়ে।

বিস্ময়ে হতবাক্ ফার্নাণ্ডিজ, তার হুঁস ফিরে আসে ততক্ষণে। অতি যত্নে শুইয়ে দেয় শক্ত কাঠের মেঝের ওপর, ধীরে ধীরে চোখের পাতা তার খুলে যায়।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ফার্নাণ্ডিজের দিকে—

না হাতে ত' চাবুক নেই, শিকারী পশুর মত কই সে ত' নখ-দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কামড়ে ধরছে না তার শরীরটাকে। তবে—দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ফার্নাণ্ডিজের উরুর ওপর। মাসের পর মাস দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া উরুতে, বুকে, মুখে চাবুকের দাগ তখনও মিলিয়ে যায় নি কিন্তু এমন সহানুভূতি, স্নেহের সামান্য পরশ তো ছিল না। তৃষ্ণার্ত ফার্নাণ্ডিজের, বুভুক্ষু ফার্নাণ্ডিজ বুকে তুলে নেয় সেই ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীকে আনন্দে আবেশে। দীর্ঘদেহ ফার্নাণ্ডিজের দু'বাহুর মধ্যে মেলে ধরে জীবন-যৌবনের সমস্ত সম্ভার। গাঢ় আলিঙ্গনে দুটো চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

তৃপ্ত দেহ-মন নিয়ে জেগে ওঠে ফার্নাণ্ডিজ, বুঝতে পারে মিশরীয় সেই কুমারী নারীর আকুল জীবনজ্বালার বেদনা, কত আর্তনাদ, দাস-ব্যবসায়ীর গোপন বিক্রয়ের সামগ্রীরূপে তারই মত আরও কতজন এমনি অন্ধকার কক্ষে চাবুকের আঘাতে মৃত্যু কামনা করে চলেছে। তাদের সমস্ত দেহমন নিঃশেষ করে দিয়ে, সাজসজ্জার ওড়নায় ঢেকে কিছুদিন পরেই বিক্রয় করা হবে স্পেনীয় ব্যবসায়ী মারফৎ লেবানন, প্যারিস, ভিনিসের বাজারে।

শিউরে ওঠে ফার্নাণ্ডিজ—এদের কি মুক্তির কোন পথ নেই! তবে কি ফিরোজ—ঐ জলদস্যু ফিরোজের হাতে ওদের সঁপে দেওয়া হবে? বিদ্যুৎ-চমকের মত—ফার্নাণ্ডিজের বুদ্ধি-জগতে জেগে ওঠে তার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। লিডিয়া সেই মিশর-নারীর মুখখানা আর একবার দু'হাতে তুলে ধরে একটি চুম্বন এঁকে দেয়। তার কানে কানে কয়েকটি কথা—হাতের ইসারায় বুঝিয়ে চারিদিক দেখে নেয়। তারপর মাতালের ভঙ্গিতে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

পামারস টন দ্বীপ

১৪ বছর বয়সে উইলিয়াম্ মারস্টারস্ জন্মস্থান বার্মিংহাম থেকে পালিয়ে জাহাজে কাজ নেয়।

১৮৫০ সালে পেনরিন দ্বীপে সে আবার জাহাজ থেকে পালিয়ে যায়। নরখাদক-অধ্যুষিত এই দ্বীপে বুদ্ধিবলে স্থান করে নিয়ে, এবং উপরি পাওনাস্বরূপ সর্দারের কন্যাকে বিয়ে করলে। ১৮৬০ সালে সে পেনরিন্ দ্বীপ থেকে একদল লোক নিয়ে পামারস্টন দ্বীপে গেলো নারকেল গাছ পুঁততে, তাহিতির এক ব্যবসায়ীর তরফ থেকে।

ইতিমধ্যে সে তার প্রথমা স্ত্রীর এক ভগিনীকেও বিবাহ করেছিলো এবং তার দুই কন্যা হয়েছিল।

চুক্তি ছিল পামারস্টনে এক বছরের, কিন্তু জাহাজ এল তাহিতি থেকে ছ'বছর পরে খবর নিয়ে এল যে, উক্ত ব্যবসায়ীর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে।

জাহাজে ব্যবসায়ীর জামাই ছিল। তার কাছে বিল পেশ করলো মারস্টারস ছ'বছরের খাটুনির। বিলের টাকা দিতে সে অসমর্থ হওয়ায়, গোটা দ্বীপটাই লিখে-পড়ে নিলো মারস্টারস্।

সম্পত্তি হওয়ায় মারস্টারস্ তৃতীয় পত্নীর পাণি-পীড়ন করলো এবং কালক্রমে ১৭জন পুত্রকন্যা, ৫৪জন নাতি-নাতনী হয়ে দ্বীপ ছেয়ে গেল। পঞ্চম পুরুষে এদের সংখ্যা দাঁড়াল হাজারেরও ওপর—সকলেই মারস্টারস্ উপাধিধারী।

মারস্টারস্ জীবিতকালে ইংরেজী ছাড়া কোন ভাষায় এদের কথা বলতে দেয় নি। আজ অবশ্য এরা দ্বিভাষী—ইংরাজী এবং মাওরী।

এদের ইংরাজী অবশ্য 'রাণীর ইংরাজী' নয়—এক বিচিত্র অশ্রাব্য-খিচুড়ি।

আজও পর্যন্ত এ দ্বীপের প্রধান একজন মারস্টারস্।

● সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ●

ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

"ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন" ব্যোমকেশের তিনটি অসাধারণ গোয়েন্দা-কাহিনীর সংগ্রহ। দু'টি ছোট উপন্যাস "চোরাবালি" ও "অর্থমনর্থম্" এবং একটি বড় গল্প "অদ্বিতীয়" এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। জোর করে বলা যায় যে, এ কাহিনী তিনটিও রহস্যের জটিলতায় ব্যোমকেশের আগের কাহিনীগুলির মতই পাঠকদের রোমাঞ্চিত করবে এবং শ্বাসরুদ্ধ করে রাখবে ॥ দাম ৪'০০ ॥

দ্বিতীয় দর্পণ ॥ প্রতিভা বসু

জীবন বড় বিচিত্র বস্তু—অঙ্কের মত সোজা ও সরল নয় বুঝি তার হিসেব। তা না হলে রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্যের দেবী প্রতিমা সুমনাকে হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মানিত জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে অসম্মানের পাঁকে গিয়ে পড়তে হয় কেন? "দ্বিতীয় দর্পণ" এক দুর্ভাগা নারীর বিশুদ্ধ জীবনায়নের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী ॥ দাম ৮'০০ ॥

ভালোবাসার অনেক নাম ॥ শিবরাম চক্রবর্তী

স্বনামধন্য শিবরাম চক্রবর্তীর বাছা বাছা একুশটি সাম্প্রতিক গল্পের এক অনবদ্য সংকলন "ভালোবাসার অনেক নাম"। নানান কারণে আজকের দিনে মানুষের মন থেকে আনন্দ নামধেয় বস্তুটি যখন ক্রম-অপস্রিয়মাণ, তখন এই গল্পগুলি পাঠকদের কাছে যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক গুচ্ছ আশীর্বাদের মত মনে হবে ॥ দাম ৬'০০ ॥

নগ্ন নির্জন ॥ বুদ্ধদেব গুহ

রোম্যান্টিক প্রেম-কাহিনী তরুণ লেখক বুদ্ধদেব গুহর কলমের ছোঁয়ায় যে এক অদ্ভুত মাদকতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে, তাঁর "হলুদ বসন্ত" উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা তা স্বীকার না করে পারবেন না। তাঁর নতুন উপন্যাস "নগ্ন নির্জন" বন-জঙ্গল এবং শিকারের এক নির্জন ভয়াবহ পটভূমিকায় রচিত বিচিত্র ধরনের এক প্রণয়-কাব্য ॥ দাম ৪'০০ ॥

সন্ধ্যারাগ ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্র যাদু জানেন। তাঁর কলমের যাদুস্পর্শে অতিসাধারণ মানুষ এবং ঘটনাগুলি অকস্মাৎ যেন অসাধারণ এবং অপরূপ হয়ে ধরা দেয় আমাদের সামনে। কোনও এক মহান্ শিল্পী এবং স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব এই অসাধ্যসাধন। "সন্ধ্যারাগ" মহান্ শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ন'টি মহৎ সৃষ্টি—ন'টি অসাধারণ ছোটগল্পের এক অভিনব সংকলন ॥ দাম ৫'০০ ॥

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ॥ বিমল কর

ছ'টি বড়গল্পের এক অতুল্য সংকলন "আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন"। এগুলির প্রত্যেকটিই এক কথায় অনন্য। কেননা, বিমল করের লেখার যাঁরা নিয়মিত পাঠক, বিশেষ করে তাঁর গল্পের, তাঁরাই জানেন, তাঁর গল্পগুলির এমন কিছু উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য আছে, যা সেগুলিকে এক আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করে ॥ দাম ৪'৫০ ॥

নিবেদিতা লোকমাতা ॥ শঙ্করীপ্রসাদ বসু

নিবেদিতা কি ছিলেন এবং কি করেছিলেন তার অর্ধাবৃত ইতিহাসকে বিপুল পরিশ্রমে বহু অজানিত তথ্যসহ এই গ্রন্থে লেখক উন্মোচন করেছেন, সমসাময়িক সংবাদপত্র, দুর্লভ গ্রন্থ, নানা স্মৃতিকথা ছাড়াও নিবেদিতার পাঁচ শতাধিক অপ্রকাশিত পত্র থেকে উপাদান সংগৃহীত। গ্রন্থে ছবির সংখ্যা প্রচুর ॥ প্রথম খণ্ড : দাম : ৩০'০০ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৫৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯।

স্নেহময়ী মা

—মাখন দত্তগুপ্ত অঙ্কিত

কুমারী টেস্ম্যান। (দরজার খুব কাছে থেমে শ্ুনলেন এবং নরম গলায় বললেন) আমার বিশ্বাস হয় না ওরা এরই মধ্যে উঠে পড়েছে, কিরে কাটছি!

বারটা। (নরম গলায়) আমি ত' আপনাকে বলেইছিলাম। কাল কত রাত্রে জাহাজ এসে পেণছেছিল ভেবে দেখুন। আর তারপর, ওরা যখন বাড়ি ফিরলেন!—হা ঈশ্বর, শোয়ার আগে আমাদের নতুন কর্ত্রীর প্যাকেট খোলা যেন আর শেষ হতে চাইছিল না।

কুমারী টেস্ম্যান। আচ্ছা, আচ্ছা—ওরা প্রাণভরে ঘুমিয়ে নিক। কিন্তু আসামাত্র যাতে ভোরবেলার টাট্কা বায়ু ওরা পায় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার।

[কাঁচের দরজার কাছে গিয়ে ওটা খুলে দিলেন]

বারটা। (টেবিল-এর পাশে, হাতের পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে কী করবে ভেবে ভ্যাবাচাকা খেয়ে) দেখুন ত', একফোঁটাও জায়গা নেই। এখানেই রাখা উচিত মনে করছি, কী বলেন?

[পিয়ানো-র ওপর পুষ্পগুচ্ছ রাখলো]

কুমারী টেস্ম্যান। যাক্, এবার তাহলে নতুন কর্ত্রী পেলে, কি গো বারটা! ঈশ্বর জানেন তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার কী কষ্ট হচ্ছে।

বারটা। (ক্রন্দনমুখী) আর, আমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে না? আহা, কতকাল কী আনন্দেই না কেটেছে আপনার আর কুমারী রীণা-র কাছে।

কুমারী টেস্ম্যান। আর ত কিছু করা সম্ভব নয়, বারটা, অবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহারই কর্তব্য। ভেবে দেখো তোমাকে ছাড়া জরজ-এর চলবে না—অসম্ভব। সেই শৈশব থেকে সে তোমার আদর-যত্নে অভ্যস্ত।

বারটা। তা ঠিক বটে, কিন্তু ও বাড়িতে কুমারী রীণা অসহায়ভাবে বিছানায় পড়ে রয়েছেন, আমি কিছুতেই না ভেবে পারি না যে। আর সেই নতুন মেয়েটিও রয়েছে! ও কোনদিন পঙ্গুর যথোচিত সেবা করতে শিখবে না।

কুমারী টেস্ম্যান। দেখো, আমি ওকে ঠিক শিখিয়ে দেবো। আর, বুঝতেই পারছো, অধিকাংশ দায়িত্বই আমি নিজে বহন করবো। বারটা, আমার ভাগ্যহীনা বোনের কথা ভেবে তুমি অস্থির হয়ে উঠো না।

বারটা। বেশ, কিন্তু আর একটা কথা রয়েছে—আমার ভীষণ ভয় কচ্ছে, আমি কিছুতেই নতুন কত্তামার সংগে মানিয়ে নিতে পারবো না।

কুমারী টেস্ম্যান। আহা শোন—হয়ত একেবারে প্রথম প্রথম দু'একটা বিষয়ে—

বারটা। খুব সম্ভবত তিনি নিজের মতে চলবেন সাংঘাতিক গাম্ভীর্য নিয়ে।

কুমারী টেস্ম্যান। শোন, তাতে অবাক হতে পারো না কিন্তু—জেনারেল গ্যাব্লার-এর মেয়ে! ভেবে দেখো তার বাবা বেঁচে থাকতে সে কী ধরণের জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। মনে নেই আমরা দেখতুম সে জেনারেল-এর সংগে ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে? পরনে সেই লম্বা কালো পোশাক—টুপিতে পালক?

বারটা। সত্যিই তাই—বেশ স্পষ্ট মনে আছে—! কিন্তু কী আশ্চর্য তখন স্বপ্নেও ভাবি নি আমাদের শ্রীমান জরজ-এর সংগে তার বিয়ে হবে, এরা দুজন হবে স্বামী-স্ত্রী।

কুমারী টেস্ম্যান। আমিও ভাবি নি।—কিন্তু, সে যাকগে, বারটা—কথাটা যখন ভাবি, তুমি কিন্তু আর শ্রীমান জরজ কখনও বোল না, বলবে ডক্টর টেস্ম্যান।

বারটা। হ্যাঁ, নতুন কত্তামাও তাই বলছিলেন—গতরাত্রে—বাড়িতে পা দেওয়ামাত্তর। তাহলে এ খবরটা সত্যি?

কুমারী টেস্ম্যান। হ্যাঁ, বটেই ত। একবার ভাবো, বারটা—কোন এক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ওকে 'ডক্টর' উপাধি দিয়েছে—সে যখন বাইরে ছিল তখন। জাহাজ থেকে নামার মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সে নিজে আমাকে না বলা পর্যন্ত আমিও এর কিছুবিসর্গও জানতাম না।

বারটা। সে-কোন ব্যাপারেই সে উপযুক্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যে লোকের চিকিৎসা ক'রে বেড়াবে এতটা আমি ভাবি নি।

কুমারী টেস্ম্যান। না, না, ও সে ধরণের ডাক্তার নয়। (অর্থপূর্ণভাবে মাথা ঝোঁকালেন) কিন্তু শুনে রাখো, হয়ত খুব শীগ্গিরই তাকে আরও গালভারী নামে ডাকতে হতে পারে।

বারটা। আপনি তা বোঝাচ্ছেন না নিশ্চয়! সেটা কী হতে পারে?

কুমারী টেস্ম্যান। (মৃদু হেসে) হুঁ—জানতে ইচ্ছে করে না! (আবেগের সংগে) আহা, আহা গো—ভাইটি যদি আজ কবর থেকে একবার দেখতে পারতো তার ছোট্ট ছেলেটা কী হয়েছে! (চারপাশে তাকালেন) কিন্তু, দুর্গা দুর্গা, বারটা, এ তুমি কেন করেছো? সব আসবাবের ওপর থেকে বহুরঙা ঢাকনা তুলে নিয়েছো?

বারটা। কত্তামার হুকুম, তাই। চেয়ারের ওপর ঢাকনা তিনি দেখতে পারেন না, তাই ত' বলেন।

কুমারী টেস্ম্যান। তাহলে কি ওরা এটাকে ওদের প্রাত্যহিক বসার ঘর করবে?

বারটা। হ্যাঁ, তাই ত' মনে হল কত্তামার কথা শুনে। শ্রীমান জরজ—ডক্টর—তিনি কিছু বলেন নি।

[ডানদিক থেকে ভেতরের ঘরে ঢুকলেন জরজ টেস্ম্যান গুনগুন করতে করতে, তার হাতে একটা স্ট্র্যাপ-হীন ফাঁকা পোর্টম্যান্টু। উচ্চতা মাঝামাঝি, বয়স তেত্রিশ, চেহারায় তারুণ্য পরিস্ফুট, বেশ শক্তপোক্ত, মুখ গোল এবং হাসিখুশি, চুলদাড়ি সুন্দর। তার চোখে চশমা, কিঞ্চিৎ এলোমেলোভাবে আরামদায়ক গার্হস্থ্য পোশাকপরিহিত।]

কুমারী টেস্ম্যান। সুপ্রভাত জরজ, সুপ্রভাত।

টেস্ম্যান। (ঘরগুলোর মধ্যকার দরজায়) জুলিয়া পিসী! কী আনন্দ! (তার কাছে গিয়ে আন্তরিকতার সংগে করমর্দন করলেন) এতটা রাস্তা এসেছো—এত সকালে! অ্যাঁ?

কুমারী টেস্ম্যান। বারে, আসতে ত হবেই। তোমাদের চলছে কেমন তা কি না দেখলে চলে।

টেস্ম্যান। রাত্রে ঠিকমত ঘুম না হওয়া সত্ত্বেও?

কুমারী টেস্ম্যান। আ, ওতে আমার কিছু এসে যায় না।

টেস্ম্যান। আচ্ছা, তুমি জাহাজ থেকে নামার মঞ্চ থেকে বেশ নিরাপদে বাড়ি পেণছেছিলে ত? অ্যাঁ?

কুমারী টেস্ম্যান। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিরাপদে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বিচারক ব্র্যাক বড় দয়ালু, আমাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পেণছে দিয়েছিলেন।

টেস্ম্যান। গাড়িতে তোমাকে জায়গা দিতে না পেরে খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু দেখলে ত কত গন্ডা বাক্স-পেঁট্রা ছিল হেডার সংগে।

কুমারী টেস্ম্যান। হ্যাঁ, ওর সংগে অ-নে-ক বাক্স ছিল। নিশ্চয়।

বারটা। (টেস্ম্যান-কে) ভেতরে গিয়ে দেখবো কত্তামার জন্য কিছু করতে হবে কি না?

টেস্ম্যান। উঁহু, থাক বারটা, ধন্যবাদ—দরকার নেই। দরকার হলে সে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকবে।

বারটা। (ডানদিকে এগোতে এগোতে) তাই হবে।

টেস্ম্যান। কিন্তু এদিকে তাকাও—এই পোর্টম্যান্টুটা নিয়ে যাও।

বারটা। (নিয়ে) এটা চিলেকোঠায় রেখে দেবো।

[হলের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল]

টেস্ম্যান। একবার কল্পনা কর পিসীমা ঐ পোর্টম্যানটু-টা বোঝাই ছিল

নকল-করা দলিল নিয়ে। তুমি [illegible] করতে পারবে না যে বহু, মহাফেজ-খানায় পরীক্ষা ক'রে আমি কী পরিমাণ দলিলপত্র জোগাড় করেছি—অদ্ভুত সব খুঁটিনাটি তথ্য, যা কেউ ভাবতেই পারে না—

কুমারী টেস্‌ম্যান। জর্‌জ, মনে হচ্ছে মধু-চন্দ্রিমা উপলক্ষে ভ্রমণ তুমি ব্যর্থ হতে দাও নি।

টেস্‌ম্যান। ঠিকই বলেছ। কিন্তু তোমার 'বনেট' খুলে ফেল ত'। দাও, আমি সুতোগুলো বেঁধে দিচ্ছি—অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। (টেস্‌ম্যান যখন সুতো বাঁধছে) বেশ, বেশ—এ যেন ঠিক আমাদের সংগেই তোমার জীবন-যাপন।

টেস্‌ম্যান। ('বনেট' হাতে নিয়ে চারপাশ থেকে দেখতে দেখতে) আরে, তুমি কী জাঁকাল একটা 'বনেট' কিনেছ বল ত!

কুমারী টেস্‌ম্যান। হেডা-র অ্যাকাউণ্ট-এ কিনেছি।

টেস্‌ম্যান। হেডা-র অ্যাকাউণ্ট-এ? অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, যাতে একসংগে বাইরে বেরুলে হেডা লজ্জা না পায় সেইজন্য।

টেস্‌ম্যান। (পিসীর গালে আদর করতে করতে) পিসী, তুমি সব সময় সব দিকের কথা ভাবো। (টেবিল-এর পাশে একটা চেয়ার-এর ওপর 'বনেট'টা রেখে) আচ্ছা এখন—এস, হেডা আসা পর্যন্ত আমরা আরামে সোফায় বসে একটু গল্পগাছা করি।

[দুজনে বসলেন। কুমারী টেস্‌ম্যান ছাতাটা রাখলেন সোফার কোণে।]

কুমারী টেস্‌ম্যান। (টেস্‌ম্যান-এর দুটো হাত ধরে তার দিকে তাকালেন) তোমাকে আবার কাছে পাওয়া, একেবারে নিজের চোখের সামনে—কী যে আনন্দ! জীবনের মত সজীব—আমার জর্‌জ, আমার হতভাগ্য ভাইয়ের নিজের ছেলে!

টেস্‌ম্যান। জুলিয়া পিসী, তোমাকে আবার দেখতে পাওয়াও অত্যন্ত আনন্দ-দায়ক। তুমি একদেহে আমার বাবা আর মা।

কুমারী টেস্‌ম্যান। আমি নিশ্চিত, বুড়ি পিসীরা তোমার মনে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

টেস্‌ম্যান। রীণা পিসীর খবর কী? কোনও উন্নতি হয় নি—অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। না বাবা, তার উন্নতি বোধহয় আশার অতীত, আহা বেচারা। আগের মতই সে অসহায়ভাবে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু [illegible] করুন, তাকে যেন এখুনি না হারাই! কারণ, তা হলে নিজের জীবন নিয়ে কী করবো জানি না—বিশেষত এখন ত আর তোমাকেও দেখাশুনো করতে হবে না।

টেস্‌ম্যান। (তার পিঠে আদর করতে করতে) হুঁ, তাই বটে, হুঁ—

কুমারী টেস্‌ম্যান। (হঠাৎ সুর পাল্টে) আর, ভাবতেও অবাক লাগে জর্‌জ—তুমি এখন বিবাহিত! তুমিই কি না শেষে হেডা গ্যাব্‌লার-কে জিতে নিলে—সুন্দরী হেডা! একবার ভেবে দেখো—তার চারপাশে ছিল অনুরাগীদের কি জমজমাট ভিড়!

টেস্‌ম্যান। (একটু গুন্‌গুন্‌ ক'রে পরি-তৃপ্তির হাসি হাসল) হ্যাঁ, আমার মনে হয় এই সহরে আমার সৌভাগ্য বরণ করার মত লোকের অভাব হবে না—অ্যাঁ।

কুমারী টেস্‌ম্যান। আর তারপর এই দীর্ঘ-স্থায়ী মধুচন্দ্রিমা যাপন করলে! পাঁচ-মাসেরও বেশি—প্রায় ছ'মাস—

টেস্‌ম্যান। তবে আমার পক্ষে এই ভ্রমণ গবেষণামূলকও বটে। পুরনো গ্রন্থপত্র খুব ঘেঁটেছি—আর পড়েছি অসংখ্য বই।

কুমারী টেস্‌ম্যান। ও হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। (অধিকতর দৃঢ়তার সংগে, গলা একটু নামিয়ে) আচ্ছা জর্‌জ আমাকে বিশেষভাবে বলার মত কোন খবর নেই? একটাও না?

টেস্‌ম্যান। আমাদের ভ্রমণ সংক্রান্ত?

কুমারী টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ।

টেস্‌ম্যান। না পিসীমা, চিঠিতে যা লিখেছি তার বাইরে আর কিছু জানি না। আমি 'ডক্টর' ডিগ্রী পেয়েছি—কিন্তু গতকাল ত সে-কথা বলেছি তোমাকে।

কুমারী টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ত বলেইছ। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি—তোমার কি কোনও—কোনও—আশা—?

টেস্‌ম্যান। আশা?

কুমারী টেস্‌ম্যান। জর্‌জ, তুমি ত জান আমি তোমার বুড়ি পিসী।

টেস্‌ম্যান। আরে, নিশ্চয়, নিশ্চয় আমার আশা আছে।

কুমারী টেস্‌ম্যান। আঃ।

টেস্‌ম্যান। আজকালের মধ্যেই আমি অধ্যাপক হওয়ার আশা রাখি।

কুমারী টেস্‌ম্যান। ও আচ্ছা, অধ্যাপক—

টেস্‌ম্যান। সত্যি বলতে কি, বলা চলে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু পিসী গো—তুমি ত এসবই জানো!

কুমারী টেস্‌ম্যান। (মনে মনে হেসে) হ্যাঁ, তা ত বটেই। তুমি ঠিকই বলেছ। (বিষয় পাল্টে) কিন্তু আমরা তোমার ভ্রমণ নিয়ে কথা বলছিলুম। [illegible] অনেক খরচা হয়েছে, জর্‌জ?

টেস্‌ম্যান। আচ্ছা, দেখ পিসী ঘোরার জন্য যে জলপানি পেয়েছিলাম তাই খুব কাজে এসেছে।

কুমারী টেস্‌ম্যান। কিন্তু আমি বাপু বুঝতে পারছি না ওই পয়সায় দুজনের কুলিয়ে গেল কী ক'রে।

টেস্‌ম্যান। না, সেটা বুঝতে পারা খুব সহজ নয়, অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। বিশেষত একজন মহিলার সংগে ভ্রমণ—শুনেছি মহিলা সংগে থাকলে খরচপত্র হু-হু ক'রে বেড়ে যায়।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, তা ঠিকই বটে। খরচ কিঞ্চিৎ বাড়ে সত্যি। কিন্তু পিসী, হেডা-র পক্ষে এই ভ্রমণটা ছিল অত্যা-বশ্যক! না হলেই নয়। আর ত কিছুই করার ছিল না।

কুমারী টেস্‌ম্যান। না, না, মনে হয় সত্যি ছিল না। মধুচন্দ্রিমা উপলক্ষে ভ্রমণ আজকাল অত্যাবশ্যক।—কিন্তু এবার বল—তোমরা কি এখনও গোটা বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখেছ?

টেস্‌ম্যান। নিশ্চিন্ত থাক পিসী। ভোর থেকে দেখে বেড়াচ্ছি।

কুমারী টেস্‌ম্যান। দেখেশুনে কী মনে হল?

টেস্‌ম্যান। খুশি হয়েছি! খুব খুশি! কেবল ভেতরের এই বৈঠকখানা আর হেডা-র শোবার ঘরের মধ্যেকার দুটো খালি ঘর নিয়ে কী করবো ভেবে পাচ্ছি না।

কুমারী টেস্‌ম্যান। (হাসতে হাসতে) বাবা জর্‌জ, কিছুদিন গেলে ঐ দুটো কোন-না-কোন কাজে লাগাতে পারবে, দেখে নিও।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, তুমি খাঁটি কথা বলেছ পিসীমা। আমার পাঠাগার যেই বাড়তে থাকবে—অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, ঠিক তাই বাবা। তোমার পাঠাগারের কথাই ভাবছিলাম।

টেস্‌ম্যান। হেডা-র কথা ভেবে আমি বিশেষ খুশি। বিয়ের আগে ও বারবার বলত সেক্রেটারী ফক্‌স-এর ভিলা ছাড়া অন্য কোথাও থাকার কথা ও ভাবতেই পারে না।

কুমারী টেস্‌ম্যান। সৌভাগ্যক্রমে তোমরা সুরু করার ঠিক পরেই বাড়িটা বিক্রির নোটিস পড়েছিল।

টেস্‌ম্যান। তা ঠিক জুলিয়া পিসী, ভাগ্য আমাদের সহায়, তাই না—অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। কিন্তু কেনার খরচা—জর্‌জ! এই সবই রীতিমত টাকাপয়সার ব্যাপার বাবা।

টেস্‌ম্যান। (তার দিকে তাকালেন, একটু বিষণ্ণ) হ্যাঁ, আমাকে সবই করতে হবে পিসী।

কুমারী টেস্‌ম্যান। আহা, সাংঘাতিক ব্যাপার।

টেস্‌ম্যান। সব জড়িয়ে কত হবে বলে তোমার মনে হয়—অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। না বাবা, সব হিসেব না আসা পর্যন্ত আন্দাজও করতে পারিনি না।

টেস্‌ম্যান। যাক, সৌভাগ্যক্রমে বিচারক ব্র্যাক আমার জন্য সব থেকে সুবিধাজনক সর্ত আদায় করেছেন,—হেডা-কে চিঠি দিয়ে তা জানিয়েও দিয়েছেন।

কুমারী টেস্‌ম্যান। ভেবো না জরুজ—এ ছাড়াও সব আসবাব আর কারপেটগুলোর সিকিউরিটি আমি দিয়েছি।

টেস্‌ম্যান। সিকিওরিটি? তুমি দিয়েছো? হ্যাঁ গো পিসী—কী ধরণের সিকিওরিটি দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব?

কুমারী টেস্‌ম্যান। আমাদের অ্যানুইটি মরটগেজ রেখেছি।

টেস্‌ম্যান। (লাফিয়ে উঠে) কী বললে! তোমার—আর রীণা পিসীর অ্যানুইটি!

কুমারী টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, অন্য কোন প্ল্যান আমি যে জানি না বাবা।

টেস্‌ম্যান। (নিজেকে পিসীর সামনে রেখে) পিসী, তোমার কি কান্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে! তোমাদের অ্যানুইটি—আরে, এই ত' তোমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

কুমারী টেস্‌ম্যান। আচ্ছা, শোন বাবা, এ নিয়ে অত উত্তেজিত হয়ো না। এত কেবল একটা 'ফরম'-এর লোকদেখান ব্যাপার বই নয়, বিচারক ব্র্যাক আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনিই অনুগ্রহপূর্বক সবকিছু ক'রে দিয়েছেন। তিনিই বলেছেন এটা নিছক 'ফরম'-এর ব্যাপার বৈ নয়।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, তা হলে ত' খুবই ভাল। তৎসত্ত্বেও—

কুমারী টেস্‌ম্যান। এখন ত' নিজের রোজগারেই তোমার চলবে। এবং, ঈশ্বর না করুন, যদি কিছু শোধ করতেও হয়—! গোড়ায় কিছুটা সামঞ্জস্য করার জন্য—! আরে, এত আমাদের আনন্দের ব্যাপার।

টেস্‌ম্যান। পিসী গো—তুমি কি কোনদিনই আমার জন্য আত্মত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হবে না!

কুমারী টেস্‌ম্যান। (উঠে তার কাঁধের ওপর হাত রাখলেন) তোমার পথ মসৃণ করা ছাড়া আমার আর কোন পার্থিব সুখ আছে কি বাবা? তোমার মা বাবা কেউ ছিলেন না—সেই তুমি। এতদিনে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে জরুজ! কখনও কখনও গতিক আদৌ সুবিধের ঠেকেনি, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আজ আর ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

টেস্‌ম্যান। সত্যি, আশ্চর্যজনকভাবে সবকিছু ভালর দিকে মোড় নিয়েছে।

কুমারী টেস্‌ম্যান। আর যারা তোমার বিরোধিতা করেছিল—যারা তোমার উন্নতির পথে ছিল বাধাস্বরূপ—তারা আজ তোমার পদপ্রান্তে। তারা হেরে গেছে জরুজ। তোমার সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী—তার পতন মর্মান্তিক।—এখন সে স্বরচিত শয্যালীন—বেচারা, পথভ্রষ্ট প্রাণিবিশেষ।

টেস্‌ম্যান। এইলার্ট সম্পর্কে কিছু শুনেছ? মানে, আমার যাওয়ার পর থেকে।

কুমারী টেস্‌ম্যান। শুধুমাত্র এই যে, সে না কি একটা নতুন বই ছেপেছে।

টেস্‌ম্যান। কি! এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ! সম্প্রতি—অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, তাই ত' বলছে লোকে। ঈশ্বর জানেন বইটা আদৌ পাঠ্য কি না! আহা, তোমার নতুন বই যখন বেরুবে—সে ব্যাপারই আলাদা জরুজ! এটা কোন বিষয়ে?

টেস্‌ম্যান। মধ্যযুগীয় ব্র্যাবান্ট-দের গার্হস্থ্য শিল্প সম্পর্কীয়।

কুমারী টেস্‌ম্যান। ভাবো একবার, এইরকম একটা বিষয়ের ওপর লিখতে পারা কি চাট্টিখানি ব্যাপার!

টেস্‌ম্যান। সে যাক, বইটা লিখতে হয়ত কিছুদিন লাগবে। জান, সংগৃহীত তথ্যগুলো প্রথমে সাজাতে হবে।

কুমারী টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, সংগ্রহ আর সাজান—এ ব্যাপারে তুমি অ-দ্বিতীয় বটে। আমার ভাইটির যোগ্য পুত্র তুমি।

টেস্‌ম্যান। কাজটা সুরু করার জন্য আমি সাগ্রহে অপেক্ষমাণ, বিশেষত এখন আমি নিজের মেজাজী বাড়িতে বসে কাজ করতে পারবো।

কুমারী টেস্‌ম্যান। আর, সবচেয়ে বড় কথা, এতদিনে তুমি তোমার প্রিয়তমাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছো, প্রিয় জরুজ।

টেস্‌ম্যান। (তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে) তা ঠিক পিসীমা, তা ঠিকই। হেডা—আমার সব সেরা ধন। (দরজার দিকে তাকালেন) মনে হচ্ছে ও আসছে—অ্যাঁ?

[ভেতরের ঘরের মধ্য দিয়ে বাঁদিক থেকে হেডা ঢুকলেন, ঊনত্রিশ বছর বয়েস। তাঁর মুখ এবং চেহারা মার্জিত এবং স্বাতন্ত্র্যের ছাপ-লাগা। তাঁর গাত্রবর্ণ ফ্যাকাশে এবং ঘোর। তাঁর ইস্পাত—ছাই রং-এর চোখে ভাবলেশহীন, নিস্তব্ধ প্রশান্তি। তাঁর চুল হার্দ পিংগল বর্ণের, কিন্তু সুপ্রচুর নয়। পরনে রুচিকর, ঢিলেঢালা সকালের গাউন।]

কুমারী টেস্‌ম্যান। (হেডা-র সংগে দেখা করবার জন্য এগিয়ে এসে) সুপ্রভাত প্রিয় হেডা! সুপ্রভাত, আর আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি।

হেডা। (হাত বাড়িয়ে) সুপ্রভাত, প্রিয় কুমারী টেস্‌ম্যান! এত সকালে এসেছেন! আপনার অনুগ্রহ।

কুমারী টেস্‌ম্যান। (কিঞ্চিৎ বিড়ম্বিত) ইয়ে—হ্যাঁ, নতুন বউ নতুন বাড়িতে বেশ আরামে ঘুমিয়েছে ত'?

হেডা। ও হ্যাঁ, ধন্যবাদ। মোটামুটি।

টেসম্যান। (হাসতে হাসতে) মোটামুটি! বেশ বলেছ হেডা! বিছানা ছাড়ার সময় দেখলাম তুমি মড়ার মত ঘুমোচ্ছ।

হেডা। সৌভাগ্যক্রমে। নতুন পরিবেশে সকলকেই ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে হয়—কী বলেন (কুমারী টেস্‌ম্যান-এর প্রতি)? (বাঁদিকে তাকিয়ে) আ—বি চলে গেছে, যাবার সময় বারান্দার দরজা খুলে দেওয়ায় সূর্যালোকে প্লাবিত হয়ে গেছে ভেতরটা।

কুমারী টেসম্যান। (দরজার দিকে গিয়ে) আচ্ছা, ওটা তাহলে বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।

হেডা। না, না, তা নয়! টেস্‌ম্যান পরদাটা দয়া ক'রে টেনে দাও। আলো তাহলে বেশ মৃদু হয়ে ঢুকবে।

টেস্‌ম্যান। (দরজায়) ঠিক আছে—ঠিক আছে! এইবার হেডা, এইবার তুমি ছায়াও পাবে, আর টাট্‌কা বাতাসও পাবে।

হেডা। হ্যাঁ, টাট্‌কা বাতাস অবশ্যই চাই, এই গাদা গাদা ফুলের সংগে—কিন্তু, আপনি কি বসবেন না কুমারী টেস্‌ম্যান?

কুমারী টেসম্যান। না, ধন্যবাদ। এখন ত' দেখলাম যে এখানে সব ঠিকঠাক আছে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—এবার আমি বাড়ি যাবো। বেচারা রীণা বিছানায় শুয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

টেস্‌ম্যান। তাঁকে আমার প্রগাঢ় ভালবাসা জানিও পিসী; আর বোলো যে দুপুরের দিকে তাঁকে দেখতে যাবো।

কুমারী টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় বলবো, ভুলবো না। কিন্তু সে যাক, জরুজ—(জামার পকেটে হাত দিয়ে)—প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম—তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।

টেস্‌ম্যান। কী গো পিসী? অ্যাঁ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। (একটা খবরের কাগজে মোড়া চ্যাপটা পারসেল ক'রে টেস্‌ম্যান-এর হাতে দিলেন)। দেখ ত' বাবা।

টেসম্যান। (পারসেল খুলে) বাঃ বেশ, বলছি শোন—পিসী, তুমি সত্যিসত্যি এটা আমার জন্য রেখে দিয়েছো। হেডা! ঘটনাটা মর্মস্পর্শী নয়, অ্যাঁ?

হেডা। (ডানদিকের 'হোয়াটনট'-এর পাশে) হুঁ, বস্তুটি কি?

টেসম্যান। সকালে পরার পুরনো জুতো-জোড়া! আমার শ্লিপার।

হেডা। তাই না কি। ভ্রমণের সময় তুমি প্রায়ই এদের কথা বলতে বলে মনে পড়ছে।

টেসম্যান। তা ঠিক, জুতোজোড়ার অভাব তখন খুব অনুভব করেছিলাম। (তার কাছে গিয়ে) এইবার এগুলো তুমিও দেখবে হেডা।

হেডা। (স্টোভ-এর দিকে এগিয়ে) ধন্যবাদ, এ ব্যাপারে আমার কোন ঔৎসুক্য নেই।

টেসম্যান। (তাকে অনুসরণ করতে করতে) শুধু ভেবেদেখো—অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও রীণা পিসী এগুলো আমার জন্য এমব্রয়ডার ক'রে দিয়েছেন। হায়, তুমি ভাবতেও পারো না এর সংগে কত অনুসংগ জড়িয়ে আছে।

হেডা। (টেবিল-এ) আমার তাতে কি।

কুমারী টেসম্যান। ঠিক তাই জর্জ, হেডা-র কোন অনুসংগ এতে জড়িয়ে নেই।

টেসম্যান। ইয়ে মানে, এখন ত' ও এই পরিবারেরই একজন, আমি ভাবছিলাম—

হেডা। (বাধা দিয়ে) টেসম্যান, এই ঝির সংগে কক্ষণও মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না।

কুমারী টেসম্যান। বার্টা-র সংগে মানাতে পারবে না?

টেসম্যান। কেন গো, তোমার মাথায় এই চিন্তাটা কী ক'রে ঢুকল? অ্যাঁ?

হেডা। (দেখিয়ে) ওদিকে তাকাও! শ্রীমতী তার পুরনো 'বনেট' চেয়ার-এর ওপর ফেলে রেখে চলে গেছেন।

টেসম্যান। (বিস্ময়মিশ্রিত ত্রাসে শ্লিপার-জোড়া মেঝেতে ফেলে) আরে, হেডা—

হেডা। একবার কল্পনা কর, যদি কেউ ঘরে ঢুকে ওটা দেখে!

টেসম্যান। কিন্তু হেডা—ওটা ত' জুলিয়া পিসীর 'বনেট'।

হেডা। তাই না কি!

কুমারী টেসম্যান। ('বনেট' তুলে) হ্যাঁ, এটা আমারই বটে। আর, তা ছাড়া, এটা পুরনোও নয় মাদাম হেডা।

হেডা। আমি সত্যি ভাল ক'রে দেখি নি।

কুমারী টেসম্যান। শোনো, এই প্রথমবার বনেট'টা পরেছি—এই প্রথমবার।

টেসম্যান। আর এটা ভারী সুন্দরও বটে—চমৎকার দেখতে!

কুমারী টেসম্যান। আ, এটা তেমন কোন বিরাট কিছু নয় জর্জ। (চারপাশে তাকিয়ে) আমার ছাতা—? ও, ওইখানে। (ওটা নিলেন) কেন না এটাও আমার—(বিড়বিড় ক'রে)—বার্টা-র নয়।

টেসম্যান। একটা নতুন 'বনেট' আর একটা নতুন ছাতা! একবার ভাবো হেডা!

হেডা। সত্যি, ভারী সুন্দর।

টেসম্যান। হ্যাঁ, তাই নয়? অ্যাঁ? কিন্তু পিসী, যাবার আগে হেডা-র দিকে ভাল ক'রে একবার তাকিও! কি সুন্দর দেখতে ওকে!

কুমারী টেসম্যান। আ, বাবা জর্জ, এতে ত' নতুন কিছু নেই। হেডা ত' চিরকালই রমণীয়।

[মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি ডানদিকে গেলেন]

টেসম্যান। (পেছন পেছন গিয়ে) তা বটে, কিন্তু এখনও কী দারুণ অবস্থায় রয়েছে দেখেছো? লক্ষ্য করেছ ভ্রমণকালে—

হেডা। (ঘরের ওদিকে গিয়ে) আঃ, থামো, একটু চুপ করো—!

কুমারী টেসম্যান। (থেমে এবং ঘুরে তাকিয়ে) তাই না কি?

টেসম্যান। নিশ্চয়, এখন পোশাক পরেছে বলে তোমার চোখে পড়ছে না। কিন্তু আমি, যে ঠিক দেখতে পায়—

হেডা। (কাঁচের দরজায়, অসহিষ্ণুভাবে) উহুঁ, তুমি কিছুই দেখতে পাও না।

টেসম্যান। এটা নিশ্চয় টীয়ল-এর পার্বত্য বায়ু—

হেডা। (রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিয়ে) যাত্রা সুরু করার সময় যেমন ছিলাম ঠিক তেমনই আছি।

টেসম্যান। তুমি তাহলে একথা বলবেই; আমি কিন্তু নিশ্চিত তুমি তা নেই। পিসী, আমি ঠিক বলি নি?

কুমারী টেসম্যান। (হাত জোড় ক'রে হেডা-র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন) হেডা রমণীয়—রমণীয়—সত্যি রমণীয়। (তার কাছে গিয়ে দু'হাতের মধ্যে তার মস্তক গ্রহণ ক'রে নিচুর দিকে টেনে চুলে চুম্বন করলেন) জর্জ-এর জন্যই ঈশ্বর হেডা-কে আশীর্বাদ ক'রে রক্ষা করুন।

হেডা। (ধীরে নিজেকে মুক্ত ক'রে) ও—! আমাকে যেতে দিন।

কুমারী টেসম্যান। (শান্ত আবেগের সংগে) একটা দিনও তোমাদের না দেখে কাটাব না।

টেসম্যান। না, তা হয় না, তাই না পিসী? অ্যাঁ?

কুমারী টেসম্যান। বিদায়—বিদায়!

[হল-এর দরজা দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। টেসম্যান তাঁর সংগে গেলেন। দরজাটা আধ-খোলা। শোনা যাচ্ছে টেসম্যান তার রীণা পিসীকে আবার একই বার্তা দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন, আর ধন্যবাদ দিচ্ছেন শ্লিপার-জোড়ার জন্য]

[ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে হেডা হাত তুলে এমন-ভাবে মুষ্টিবন্ধ করেছেন যে মনে হয় যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। তারপর কাঁচের দরজার পরদা পেছনে ঠেলে দিয়ে সেখানে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি বহির্মুখী।]

[এমন সময় টেসম্যান ঘরে ঢুকে পেছনের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।]

টেসম্যান। (মেঝে থেকে শ্লিপার দু'টো তুলে নিলেন) হেডা, কী দেখছো গো?

হেডা। (আবার শান্ত এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত) শুধু পাতাগুলোর দিকে দেখছি। ওগুলো কী হলদে—কী ভীষণ শুকনো।

টেসম্যান। (শ্লিপারগুলো মুড়ে টেবিল-এর ওপর রেখে) ইয়ে, ভেবে দেখো এখন সেপ্টেম্বর অনেকদূর এগিয়েছে।

হেডা। (আবার অশান্ত) হ্যাঁ, ভাবলেই!—এরই মধ্যে সেপ্টেম্বর হু হু ক'রে এগিয়ে গেছে।

টেসম্যান। প্রিয়তমে, জুলিয়া পিসীর ব্যবহার একটু অদ্ভুত লাগে নি? প্রায় গাম্ভীর্য-পূর্ণ? কল্পনা করতে পার তাঁর কী হয়েছে? অ্যাঁ?

হেডা। আমি তাঁকে সামান্যই জানি। নয়? তিনি কি প্রায়ই ওরকম নন?

টেসম্যান। না, আজকের মত তিনি নন।

হেডা। (কাঁচের দরজা ছেড়ে) তোমার কি মনে হয় তিনি 'বনেট'-এর ব্যাপারে বিরক্ত হয়েছিলেন?

টেসম্যান। ও, আদৌ না। সম্ভবত সেই মুহূর্তে সামান্য—

হেডা। কিন্তু, মতলব কী অদ্ভুত বলত, বসার ঘরে 'বনেট'-টা ফেলে রাখা! এরকমটা কেউ করে না কিন্তু।

টেসম্যান। ও আচ্ছা, তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পার জুলিয়া পিসী আর কখনও এমনটা করবেন না।

হেডা। সে যাই হোক, আমি ও'র সংগে ঠিক মানিয়ে চলবো।

টেসম্যান। হ্যাঁ গো হেডা, যদি ওইটুকু করো।

হেডা। দুপুরে যখন যাবে তখন ও'কে সন্ধ্যেটা এখানে কাটিয়ে যাওয়ার জন্য বলতে পারো।

টেসম্যান। হ্যাঁ, নিশ্চয় বলবো। আর একটা কাজও করতে পার, করলে উনি আনন্দিত হবেন।

হেডা। কাজটা কী শুনি।

টেসম্যান। যদি একটু চেষ্টা ক'রে ও'কে 'তুমি' বলতে পারো। আমার মুখ চেয়ে হেডা, অ্যাঁ?

হেডা। না, না টেসম্যান—আমাকে ঐটি

জানাতে কিছুতেই ভোলো না। আমি ত' বলেই দিয়েছি। আমি তাঁকে 'পিসীমা' বলতে চেষ্টা করবো; আর তোমাকেও তাতেই খুশি থাকতে হবে।

টেস্‌ম্যান। আচ্ছা, আচ্ছা। আমি শুধু ভাবছি এখন ত' তুমি এই পরিবারভুক্ত—

হেডা। হুঁ—আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কেন—

[হেডা মাঝের দরজার দিকে এগোলেন।]

টেস্‌ম্যান। (একটু থেমে) হেডা, তোমার কিছু হয়েছে কি? অ্যাঁ?

হেডা। আমি শুধু আমার পুরনো পিয়ানোটা দেখছি। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এটা আদৌ মানানসই হয় নি।

টেস্‌ম্যান। প্রথমবার মাইনে পেলেই ওটা বদলাবার কথা ভেবে দেখবো।

হেডা। না, না—বদল-টদল নয়। আমি ওটা ছাড়তে ইচ্ছুক নই। ধর, ভেতরের ঘরে এইটা রেখে এর জায়গায় আর একটা রাখা যাবেখন। অবশ্য সুবিধে মতন।

টেসম্যান। (একটু হকচকিয়ে) হ্যাঁ—বটেই ত', তাই করা যাবে।

হেডা। (পিয়ানো-র ওপর থেকে পুষ্পস্তবক নিয়ে) কাল রাত্রে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন এই ফুলগুলো এখানে ছিল না।

টেস্‌ম্যান। জুলিয়া পিসী নির্ঘাৎ ওগুলো তোমার জন্য এনেছেন।

হেডা। (পুষ্পস্তবক পরীক্ষাতে) একটা ভিজিটিং কার্ড। (নিয়ে পড়তে লাগল) 'দুপুরের দিকে ফিরে আসব।' আন্দাজ করতে পার এটা কার কার্ড?

টেস্‌ম্যান। না। কার গো? অ্যাঁ?

হেডা। 'শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর নাম রয়েছে।

টেস্‌ম্যান। তাই না কি? শেরিফ এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর স্ত্রী? উনি ছিলেন কুমারী রাইসিঙ।

হেডা। ঠিক বলেছ। সব সময় যে মেয়েটি বিরক্তিকর চুল দেখিয়ে বেড়াত। শুনেছি, তোমার পুরনো ইয়ে।

টেসম্যান। (হাসতে হাসতে) আঃ হা, সে বেশিদিন টেঁকে নি; আর, সে সব তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে। কিন্তু, ভেবে দেখো সে এখন সহরে!

হেডা। আমাদের সঙ্গে তার দেখা করতে আসা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত। স্কুল ছাড়ার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয় নি বললেই হয়।

টেস্‌ম্যান। আমিও ওকে দেখি নি—কতদিন একমাত্র ঈশ্বর জানেন। ভাবতে অবাক লাগে ও কিভাবে খাপছাড়া ওই গর্তের মধ্যে বাস করতে পারে—অ্যাঁ?

হেডা। (এক মুহূর্ত ভেবে হঠাৎ) টেস্‌ম্যান, আচ্ছা, ওই অঞ্চলের কাছাকাছি কোথাও সে—ইয়ে—সে, অর্থাৎ এইলার্‌ট লিউভ-বোর্‌গ থাকে না?

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, ওখানেই কোথাও না কোথাও সে থাকে।

[হলঘরের দরজা দিয়ে বার্‌টা ঢুকল।]

বার্‌টা। দিদিমণি, যে মহিলাটি খানিক আগে ফুল এনেছিলেন তিনি আবার এসেছেন। (নির্দেশ ক'রে) যে ফুলগুলো আপনার হাতে রয়েছে।

হেডা। ও, তিনিই বুঝি? আচ্ছা, তাকে ভেতরে নিয়ে এস।

[শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর জন্য দরজা খুলে দিয়ে বার্‌টা বেরিয়ে গেল।—শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌ রোগাটে, চেহারা নরম এবং সুন্দর। চোখ-দুটো হাল্কা নীল, বড়সড়, গোল, এবং বেশ চোখে পড়ার মত, দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু এবং হতচকিত। তার চুল খুব হাল্কা, প্রায় শণের মত, এবং অ-স্বাভাবিক ঢেউখেলান আর সুপ্রচুর। হেডা-র থেকে কয়েক বছরের ছোট পরনে কাল ভিসিটিং ড্রেস, রুচিপূর্ণ, কিন্তু শেষতম ফ্যাসান-অনুসারী নয়।]

হেডা। (আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে) প্রিয় এল্‌ভস্‌টেড্‌, কেমন আছেন? আবার দেখা হওয়ায় বড় আনন্দ পেলাম।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (চমকে গিয়ে, আত্ম-সংযমের চেষ্টা করতে করতে) হ্যাঁ, অনেকদিন আগে আমাদের দেখা হয়েছিল!

টেসম্যান। (তাঁর হাতে হাত দিয়ে) আর আমরাও—অ্যাঁ?

হেডা। চমৎকার ফুলগুলোর জন্য ধন্যবাদ—শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। ও, আদৌ নয়—কাল বিকেলেই সোজা এখানে চলে আসতাম; কিন্তু শুনলাম আপনারা বাইরে—

টেস্‌ম্যান। আপনি কি সবে সহরে এসেছেন? অ্যাঁ?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। কাল দুপুর নাগাদ পৌঁছেছি এখানে। সত্যি, যখন শুনলাম আপনারা বাড়িতে নেই, ভীষণ নিরাশ হয়েছিলাম।

হেডা। নিরাশ? কী ক'রে?

টেস্‌ম্যান। কেন শ্রীমতী রাইসিঙ—আই মীন শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌—

হেডা। আশাকরি কোন অসুবিধেয় পড়েন নি।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ, অসুবিধে হচ্ছে। এখানে আর একজনকেও চিনি না যার কাছে যাওয়া যায়।

হেডা। (টেবিল-এর ওপর ফুলগুচ্ছ রেখে) আসুন—এখানে সোফায় বসি—

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। আমি যত অস্থির অনুভব করছি, বলা সম্ভব নয়।

হেডা। আরে না, না, উঁহু; এদিকে আসুন।

[তাকে সোফা-র ওপর টেনে বসিয়ে হেডা তার পাশে বসলেন।]

টেস্‌ম্যান। তাহলে? ব্যাপারটা কি?

হেডা। বাড়িতে আপনাকে নিয়ে বিশেষ কিছু ঘটেছে কি?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ—ইয়ে না ও বটে। দেখুন, আমার দুশ্চিন্তা আপনারা আমাকে পাছে ভুল বোঝেন—

হেডা। সে ক্ষেত্রে সব থেকে ভাল প্ল্যান আমাদের সবকিছু খুলে বলা।

টেস্‌ম্যান। আমার ধারণা সেজন্যই আপনি এসেছেন—অ্যাঁ?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। ও হ্যাঁ,—বটেই ত'। আচ্ছা, তাহলে আপনাদের বলতেই হবে—যদি অবশ্য ইতিমধ্যে না জেনে থাকেন—মানে, এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গও এখন সহরে।

হেডা। লিউভ্‌বোর্‌গ—!

টেস্‌ম্যান। কী! এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ কি ফিরে এসেছে? হেডা, একবার ভাবো!

হেডা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনলাম ত'।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। সে এখানে এক সপ্তাহ যাবৎ রয়েছে। একবার ভাবুন—একটা গোটা সপ্তাহ! এই সাংঘাতিক সহরে—একা! চারপাশে অসংখ্য প্রলোভন ছড়ান।

হেডা। কিন্তু, প্রিয় শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌,—তাতে আপনার এত মাথাব্যাথা কেন?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (উচ্চকিত নয়নে হেডা-র দিকে তাকিয়ে একনিশ্বাসে) সে ছিল বাচ্চাদের গৃহশিক্ষক।

হেডা। আপনার বাচ্চাদের?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। আমার স্বামীর। আমার নিজের কোনও ছেলেপুলে নেই।

হেডা। তাহলে আপনার সৎ ছেলে-মেয়েদের?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ।

টেস্‌ম্যান। (কিছুটা ইতস্ততভাবে) আচ্ছা, সে কি—ঠিক বুঝতে পারছি না কী ভাবে বলবো—সে কি—ঐ পদের উপযুক্ত সুযম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল? অ্যাঁ?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। গত দু'বছর ধরে তার ব্যবহার ত্রুটিহীন।

টেস্‌ম্যান। তাই বুঝি? হেডা, একবার ভাবো!

হেডা। শুনলাম।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। একদম নিখুঁত, নিশ্চিন্ত থাকুন! প্রতিটি ব্যাপারে। কিন্তু সে যাই হোক—এখন যখন জানতে পেরেছি সে এখানে—এই বিরাট সহরে—হাতেও রয়েছে মোটা টাকা—ওর জন্য

আমি ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

টেসম্যান। কেন, সে কি সেখানে ছিল সেখানে আর থাকে নি? আপনাদের সংগে? অ্যাঁ?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। তাঁর বইটা ছাপা হওয়ার সে বড় বেশি চঞ্চল আর অস্থির হয়ে উঠল। আমাদের সংগে থাকা সম্ভব হল না।

টেসম্যান। ও, আচ্ছা, জুলিয়া পিসী বলছিলেন ও একটা বই ছাপিয়েছে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ, বিরাট বই, বিষয় সভ্যতার অগ্রগতি—মোটামুটি তাই বলা যায়। এক পক্ষকাল আগে বেরিয়েছে। তারপর থেকে বিক্রী হচ্ছে খুব, লোকে পড়ছেও খুব—একটা বা সাড়া জাগিয়েছে না—

টেসম্যান। সত্যি? ভাল সময় নিশ্চয় ও একাজ ক'রে রেখে দিয়েছিল।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। বলতে চাইছেন ঢের আগে?

টেসম্যান। হ্যাঁ।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। না, আমাদের সংগে থাকার সময় গোটা বইটা লিখেছে—গত বছরে।

টেসম্যান। খবরটা ভাল নয় হেডা? ভেবে দেখো।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। ও হ্যাঁ, যদি কেবল টিকে যায়!

হেডা। সহরে তাকে দেখেছেন?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। না, এখনও নয়। তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের করতে আমার জিভ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু, শেষপর্যন্ত আজ সকালে আবিষ্কার করেছি।

হেডা। (তাঁর দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে) জানেন, আপনার স্বামীর এই ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে—হুঁ—

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (উচ্চকিত হয়ে) আমার স্বামীর? কি?

হেডা। তিনি যে আপনাকে এইরকম একটা কাজে সহরে পাঠালেন—তিনি নিজে এসে বন্ধুর খোঁজ না নিয়ে—

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। ওহো, না, না—তাঁর ত' সময়ই নেই। আর তা ছাড়া, আমার—মানে আমার কিছু কেনাকাটাও ছিল।

হেডা। (ঈষৎ হেসে) ও, সেটা অবশ্য অন্য ব্যাপার।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (চট ক'রে অস্বস্তির সংগে উঠে) আর, শ্রীযুত টেসম্যান, এখন আপনাকে বিনীত অনুরোধ এই যে, লিউভ্‌বোর্‌গ এলে তাকে সদয়ভাবে অভ্যর্থনা জানাবেন! সে নির্ঘাৎ আসবে। জানেন ত', এককালে আপনারা কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাছাড়া, আপনারা একই বিষয়ে অনুরক্ত—বিজ্ঞানের একই শাখায়—ততদূর আমি বুঝতে পারি।

টেসম্যান। আমাদের মধ্যে কখনো ত' ছিলই।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। সে জন্যই আমার প্রার্থনা যে, আপনি—আপনি ও—ওর দিকে কড়া নজর রাখবেন। আমার কাছে নিশ্চয় এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করবেন—করবেন না?

টেসম্যান। অত্যন্ত আনন্দের সংগে, শ্রীমতী রাইসিঙ—

হেডা। এল্‌ভস্‌টেড্‌।

টেসম্যান। নিশ্চিন্ত থাকুন এইলার্‌ট-এর জন্য যা করা সম্ভব নিশ্চয় করবো। আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। সত্যি, আপনি কত দয়ালু! (তাঁর হাতে চাপ দিয়ে) ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ! (ভীত হয়ে) জানেন, আমার স্বামী ওকে কী ভালটাই না বাসেন!

হেডা। (উঠে) টেসম্যান, তাকে তোমার চিঠি লেখা উচিত। সম্ভবত নিজে থেকে তিনি তোমার কাছে আসবেন না।

টেসম্যান। হ্যাঁ, সম্ভবত তাই করা ঠিক—অ্যাঁ?

হেডা। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। এক্ষুণি নয় কেন?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (অনুরোধের সুরে) ও, যদি আপনি করেন!

টেসম্যান। এই মুহূর্তে লিখবো। শ্রীমতী—শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌, আপনার কাছে তাঁর ঠিকানা আছে?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ। (পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে তাঁর হাতে দিলেন) এই যে।

টেসম্যান। ভাল ভাল। তাহলে ভেতরে গিয়ে—(নিজের দিকে তাকিয়ে) ওহো,—আমার শিলপারজোড়া? আচ্ছা, এই ত'।

[প্যাকেট-টা নিয়ে গমনোদ্যত।]

হেডা। দেখো, বেশ একখানা আন্তরিকতা-পূর্ণ, বন্ধুজনোচিত চিঠি লিখো। বেশ বড়সড় একটা চিঠি কিন্তু।

টেসম্যান। হ্যাঁ, তা ত' লিখবোই।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। কিন্তু, শুনুন, অনুগ্রহ ক'রে জানাবেন না যে আমিই এই ইঙ্গিত দিয়েছি।

টেসম্যান। না, কী ক'রে ভাবলেন আমি তাই লিখবো? অ্যাঁ?

[ভেতরকার ঘরের মধ্য দিয়ে টেসম্যান ডানদিকে গেলেন।]

হেডা। (শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড-এর কাছে গিয়ে মৃদু হেসে নিচু গলায়) দেখলেন! এক ঢিলে দু'টো পাখি মারলাম।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। কী বলতে চাইছেন?

হেডা। বুঝতে পারছেন না ওকে অন্যত্র সরাতে চাইছিলাম?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ চিঠিটা লেখার জন্য—

হেডা। এবং যাতে আমি আপনার সংগে নিরিবিলিতে কথা বলতে পারি।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (গুলিয়ে ফেলে) একই বিষয়ে?

হেডা। ঠিক তাই।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌ (শঙ্কিত কণ্ঠে) কিন্তু, আর ত' কিছু বলার নেই শ্রীমতী টেসম্যান! একটি শব্দও নয়!

হেডা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে আছে। আরও অনেক কিছু রয়েছে—আমি জানি। এখানে বসুন—তারপর ঘনিষ্ঠভাবে গোপনে কথাবার্তা বলা যাবেখন।

[স্টোভ-এর পাশে-রাখা ইজিচেয়ার-এ হেডা শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌-কে বসতে বাধ্য ক'রে নিজে বসলেন একটা ফুটস্টুল-এর ওপর।]

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (চিন্তিতভাবে, নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে) কিন্তু, প্রিয় শ্রীমতী টেসম্যান, আমি সত্যিসত্যি যাবার জন্য উঠছিলাম।

হেডা। আরে, আপনার এত তাড়া থাকতেই পারে না।—তারপর? এবার আপনার গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। ও, এ ব্যাপারটাই আমি আলোচনা করতে সবচেয়ে কম ইচ্ছুক।

হেডা। কিন্তু, আমাকে, ভাই—? বাঃ রে, আমরা একই স্কুলে পড়তাম না?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। তা বটে, কিন্তু আপনি ত' এক ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। বাবা, তখন আপনাকে কী ভীষণ ভয়ই না করতাম!

হেডা। আমাকে ভয় করতেন?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ, সাংঘাতিকভাবে। কেন না, সিঁড়িতে দেখা হলেই আপনি আমার চুল ধরে টানতেন।

হেডা। সত্যি টানতাম?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ, আর একবার বলেছিলেন এগুলো ছাড়িয়ে দেবেন।

হেডা। ও, অর্থহীন কাণ্ড যত, সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। তা বটে, কিন্তু তখন আমি কী গাড়লই না ছিলাম।—আর, তারপর থেকেও—আমরা কত সরে এসেছি—দুজন দু'জনের কাছ থেকে বহু দূরে। আমাদের পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণ ভিন্ন।

হেডা। আচ্ছা, তাহলে আবার কাছে সরে আসতে নিশ্চয় চেষ্টা করবো। এখন

শোন! স্কুলে আমরা পরস্পরকে তুমি বলতাম; আর ডাকতাম ক্রিশ্চিয়ান নাম ধরে—

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড। উহ্‌, আমি নিশ্চিত আপনি ভুল করছেন।

হেডা। না, আদৌ নয়! আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আমরা এখন পুরনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নেবো। (ফুটস্টুল-টা শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর আরও কাছে টেনে এনে) আচ্ছা, এইবার! (তার গণ্ডে চুমু খেলেন) আমাকে অবশ্য 'তুমি' বলবে, আর ডাকবে হেডা বলে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (তাঁর হাতে চাপ দিয়ে আদর ক'রে) আহা, আপনি কত ভাল আর সহৃদয়, এ ধরণের সহৃদয়তায় আমি অনভ্যস্ত।

হেডা। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা! আর আমিও তোমাকে 'তুমি' বলবো পুরনো দিনের মত, ডাকবো প্রিয় টোরা বলে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। আমার নাম টায়া।

হেডা। আরে, তাই ত' বটে! টায়া-ই বলতে চেয়েছিলাম। (তাঁর দিকে দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে তাকালেন) টায়া, তুমি মমতা আর সহৃদয়তায় অভ্যস্ত নও না? নিজের বাড়িতেও নয়?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড। আহা, যদি নিজের বাড়ি থাকত! কিন্তু আমার তা নেই; আমারও কোনদিন বাড়ি ছিল না।

হেডা। (তাঁর দিকে ক্ষণেক তাকিয়ে) আমারও প্রায় সেইরকম সন্দেহই হয়েছিল।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (তাঁর সামনে অসহায়ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

হেডা। আমার ঠিক মনে নেই—এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর বাড়িতে হাউসকীপার হিসেবেই তুমি ওখানে যাও নি?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। প্রকৃতপক্ষে ঢুকেছিলাম গভর্নেস হিসেবে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী—পরলোকগতা স্ত্রী— পঙ্গু হওয়ায়, ঘর ছেড়ে বেরোতেনই না প্রায়। কাজেই, ঘরকন্নার কাজও আমাকে দেখতে হত।

হেডা। তারপর—অবশেষে—তুমিই গৃহকর্ত্রী হলে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (বিষণ্ণভাবে) হ্যাঁ, তাই হলাম।

হেডা। ব্যাপারটা বুঝে নিই—আচ্ছা, কতদিন আগে বল ত'?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। আমার বিয়ে?

হেডা। হ্যাঁ।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। পাঁচ বছর আগে।

হেডা। নিশ্চয়, তা-ই হবে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। সেই পাঁচটা বছর, উঃ—! অন্তত গত দু'তিনটে বছর! আপনি যদি কেবল কল্পনাও করতে পারতেন—

হেডা। (তাঁর হাত আলতো করে চাপড়ে) আপনি? ছিঃ টায়া!

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি নিশ্চয় চেষ্টা করবো—আচ্ছা, যদি—যদি ব্যাপারটা কল্পনা করতে আর বুঝতে পারতে—

হেডা। (হাল্কাভাবে) এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ তিন বছর যাবৎ তোমার প্রতিবেশী, তাই না?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড। (তাঁর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে) এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ? হ্যাঁ—তা ঠিক।

হেডা। তুমি কি তাকে আগে জানতে, সহরে থাকতে?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। না বললেই চলে। অবশ্য নাম শুনেছিলাম বই কি।

হেডা। কিন্তু, সহরতলীতে বেশ ভালমত দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ, ও আমাদের বাড়ি রোজ আসত। ছেলেদের পড়াত; কেন না, শেষপর্যন্ত একা আমার পক্ষে সামলান সম্ভব হত না।

হেডা। না, সে ত' বেশ বুঝতেই পারছি।—আর তোমার স্বামী—? আমার ধারণা তিনি প্রায়ই বাড়িতে থাকেন না।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ। শেরিফ্‌ ত', কাজেকাজেই তাঁকে সমস্ত জেলায় খুব ঘুরতে হয়।

হেডা। (চেয়ার-এর হাতলের ওপর ভর দিয়ে) টায়া—বেচারা মিষ্টি টায়া—এইবার আমাকে সব বল—একেবারে ঠিক ঠিক।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। বেশ, তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে।

হেডা। টায়া, তোমার স্বামী কী ধরণের মানুষ? অর্থাৎ—বুঝতেই পারছো—প্রাত্যহিক জীবনে তিনি কেমন? তোমার প্রতি সদয় ত'?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড। (এড়িয়ে গিয়ে) আমি নিশ্চিত তিনি সব ব্যাপারেই ভাল চান।

হেডা। আমার মনে হয় সব মিলিয়ে তিনি তোমার তুলনায় রীতিমত বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে প্রায় কুড়ি বছরের তফাৎ—ঠিক বলি নি?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (বিরক্ত কণ্ঠে) হ্যাঁ, তা ঠিকই বটে। তার সবকিছু আমাকে বিকর্ষণ করে! আমাদের 'সাধারণ' চিন্তা বলে কিছু নেই। কোন একটা ব্যাপারে পর্যন্ত আমরা একমত নই—সে আর আমি।

হেডা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি সে তোমার প্রতি অনুরক্ত নয়? তাঁর নিজের মত ক'রে?

শ্রীমতী এলভসটেড্‌। আমি সত্যি জানি না। মনে হয় ওর চোখে আমি একটা দরকারী জিনিস—ব্যস। তাছাড়া আমাকে পুষতে খরচও বেশি নয়।

হেডা। ওটা তোমার মূর্খতা।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (মাথা নেড়ে) অন্যথা করার উপায় নেই—তাঁর সঙ্গে নয়। আমার ধারণা নিজের ছাড়া আর কারও ব্যাপারে তাঁর মাথাব্যথা নেই—সম্ভবত ছেলে-মেয়েদের কথা একটু ভাবে।

হেডা। আর, এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ-এর জন্য?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (তাঁর দিকে তাকিয়ে) তাঁর মাথাব্যাথা এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ-এর জন্য? এটি তোমার মাথায় কে ঢোকাল?

হেডা। আহা, প্রিয় টায়া—বলতে চাইছি, তিনি যখন তোমাকে তাঁর জন্য এতো পথ ঠেঙিয়ে সহরে পাঠিয়েছেন—(প্রায় অদৃশ্য সূক্ষ্ম হাসি হেসে) আর তাছাড়া, তুমি নিজেই টেস্‌ম্যান-কে এ কথা বলেছ।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) বলেছিলাম না কি? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে বলেছিলাম। তীব্রভাবে, কিন্তু উচ্চৈস্বরে নয়) না—এক্ষুণি সব খোলাখুলি বলে ফেলতে পারি! কেননা, এসব যেভাবেই হোক প্রকাশ পাবেই।

হেডা। কেন, প্রিয় টায়া—?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। বেশ, সংক্ষেপে বলতে হলেঃ আমার আসার কথা আমার স্বামী জানতেন না।

হেডা। কী! তোমার স্বামী একথা জানতেন না!

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। না, নিশ্চয়ই নয়। আরে, তিনি ত' তখন বাড়িতেই ছিলেন না—ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হেডা, আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না! সত্য অসম্ভব হয়ে উঠেছিল—ভবিষ্যতে আমি যে কী ভীষণ একা হবো।

হেডা। আচ্ছা, তারপর?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। তাই কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নিলাম—খুব দরকারী জিনিসগুলো—যথাসম্ভব ধীরেসুস্থে। তারপর বাড়ি ছেড়ে এলাম।

হেডা। কিছু না জানিয়ে?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ—সোজা সহরগামী ট্রেন ধরলাম।

হেডা। বাস্‌, প্রিয় টায়া—তুমি কি না সাহস ক'রে এ কাজ করলে, ভাবতেও অবাক লাগে!

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (উঠে ঘরে পায়চারী করতে করতে) এছাড়া আর কী-ই বা করতে পারতাম?

হেডা। কিন্তু, তুমি বাড়ি ফিরলে তোমার স্বামী কী বলবেন বল ত'?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (টেবিল-এ, হেডার দিকে তাকালেন) তাঁর কাছে ফিরে যাবো?

হেডা। নিশ্চয়।

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। আর কখনও তাঁর কাছে ফিরছি না।

হেডা। (উঠে তাঁর কাছে গিয়ে) তাহলে বাড়ি ছেড়ে এসেছে—চিরদিনের মত?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। হ্যাঁ। আর কিছুই করার ছিল না।

হেডা। কিন্তু তাহলেও—এমন খোলাখুলি চলে আসা।

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। ও, এই ধরণের কিছু গোপন রাখা অসম্ভব।

হেডা। টায়া, ভেবে দেখেছ সাধারণ মানুষ তোমার সম্বন্ধে কী বলবে?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। যা খুশি বলুক, আমি থোড়াই কেয়ার করি। (ক্লান্তভাবে, বিষন্নভাবে সোফা-র ওপর বসলেন) যা করেছি তা করা ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না।

হেডা। (একটু চুপ ক'রে থেকে) এখন তোমার প্ল্যান কি? কী করতে চাও?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। এখনও পর্যন্ত জানি না। কেবল জানি এখানেই আমাকে থাকতে হবে, এখানে যে এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ রয়েছে—আদৌ বাঁচতে হলে নান্যঃ পন্থাঃ।

হেডা। (টেবিল থেকে একটা চেয়ার নিয়ে তাঁর পাশে বসে তাঁর হাতে টোকা মারতে মারতে) প্রিয় টায়া—কীভাবে এটা—এই বন্ধুত্ব—তোমার আর এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ এর মধ্যে হল?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। ও, একটু একটু আর কি। আমি ক্রমে ওর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলাম।

হেডা। সত্যি?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। ও পুরনো অভ্যাসগুলো ছেড়ে দিল। আমি বলেছি বলে নয়, বলার সাহসই ছিল না আমার। কিন্তু সন্দেহ নেই ও বুঝতে পেরেছিল ওগুলো আমি কত অপছন্দ করি; তাই ছেড়ে দিল।

হেডা। (উদ্‌গত তিরস্কারসূচক হাসি চেপে) টায়া, তাহলে তুমি ওকে রি-ক্লেইম করছ, অচ্ছা!

শ্রীমতী এলভস্টেড। সেও ত' তাই বলে, সে যাক। আর সে আমাকে সত্যিকার মনুষ্যত্ব দিয়েছে—আমাকে চিন্তা করতে, কত সবকিছু বুঝতে শিখিয়েছে।

হেডা। সে কি তাহলে তোমাকেও পড়াত?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। না, ঠিক পড়াত বলা চলে না। কিন্তু আমাকে শোনাত—অসংখ্য বিষয় সম্পর্কে বলে যেত। তারপর এল সেই সুন্দর সুখপূর্ণ মুহূর্ত, যখন আমি তার কাজে অংশগ্রহণ করতে সুরু করলাম—যখন সে আমাকে তাকে সাহায্য করার অনুমতি দিল।

হেডা। ও, দিল না, দিয়েছিল বুঝি?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। হ্যাঁ! আমার সাহায্য ছাড়া কখনও সে একটা পঙক্তিও লেখে নি।

হেডা। বস্তুত তোমরা দু'জন বিশ্বস্ত কমরেড হয়ে উঠেছিলে না?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। (আগ্রহের সংগে) কমরেড! হ্যাঁ, ভেবে দেখো হেডা—সেও ঠিক এই কথাটাই ব্যবহার করত!—আহা, আমার সম্পূর্ণ সুখী হওয়া উচিত; তবুও তা হচ্ছে না; কারণ আমি জানি না এ সুখ কতদিন টিকবে।

হেডা। তুমি কি তাঁর সম্বন্ধে এর বেশি নিশ্চিৎ হতে পার না?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। (বিষন্নসুরে) আমার আর এইলার্ট লিউভ্‌বোরগ্‌-এর মাঝখানে অন্য একটি মহিলার ছায়া সঞ্চরমান।

হেডা। (তাঁর দিকে চিন্তান্বিত দৃষ্টিপাত ক'রে)। সে কে?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। আমি জানি না। এমন একজন, যাকে সে জানত—অতীতে জানত। এমন একজন যাকে সে পুরোপুরি ভুলতে পারে নি।

হেডা। সে তোমাকে কী বলেছে—এই বিষয়ে?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। কেবল একবার—অত্যন্ত ভাসাভাসাভাবে—একটু ইংগিত দিয়েছিল।

হেডা। বেশ। সে কি বলেছিল?

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। সে বলেছিল বিদায়কালে মেয়েটি তাকে পিস্তল দিয়ে গুলী করার ভয় দেখিয়েছিল।

হেডা। (ঠাণ্ডা গলায়) ও, অর্থহীন প্রলাপ! এখানে কেউ ওরকম কাণ্ড করে না।

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। না। সে জন্যই আমার ধারণা এ সেই লাল-চুলওলা গাইয়ে মেয়েটি, যাকে সে একবার—

হেডা। হ্যাঁ, খুব সম্ভব তা-ই।

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। কেননা, আমার মনে আছে লোকে বলত মেয়েটি গুলীভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র বয়ে বেড়ায়।

হেডা। ও—তাহলে এ নির্ঘাৎ সেই মেয়েটি।

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। (নিজের হাত মুচড়ে) হেডা, একবার শুধু ভাবো—শুনলাম এক গাইয়ে মেয়েটি—সে এখন আবার সহরে এসেছে! সত্যি, কী করবো ভেবে পাচ্ছি না—

হেডা। (ভেতরকার ঘরে উঁকি মেরে) চুপ! টেস্‌ম্যান আসছে। (উঠে কানে-কানে) টায়া—এসব কথা কেবল তোমার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কিন্তু!

শ্রীমতী এলভস্টেড্‌। (লাফিয়ে উঠে) ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ! ভগবানের দোহাই—!

[হাতে একটা চিঠি নিয়ে জর্জ টেস্‌ম্যান ডানদিক থেকে ভেতরের ঘরের মধ্য দিয়ে এলেন।]

টেস্‌ম্যান। এই যে—চিঠি শেষ।

হেডা। ঠিক আছে। শ্রীমতী এলভস্টেড্‌ এখুনি যাচ্ছেন। এক মিনিট দাঁড়াও—আমি তোমার সংগে বাগানের দরজা পর্যন্ত যাবো।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ গো হেডা, আচ্ছা বার্টার। চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলতে পারবে না?

হেডা। (চিঠিটা নিয়ে) আমি ওকে বলবোখন।

[হল থেকে বার্টা-র প্রবেশ।]

বার্টা। বিচারক ব্র্যাক জানতে চাইলেন দিদিমণি ও'কে স্বাগত জানাতে পারবেন কি না।

হেডা। পারবো, বিচারককে ভেতরে আসতে বল। আর, এদিকে শোন, এই চিঠিটা ডাকে দিও মনে ক'রে।

বার্টা। (চিঠিটা নিতে নিতে) হ্যাঁ দিদিমণি।

[বিচারক ব্র্যাক-এর জন্য দরজা খুলে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। ব্র্যাক-এর বয়স পয়'তাল্লিশ; মোটাসোটা, কিন্তু সুগঠিত এবং ক্ষিপ্র চলাফেরার উপযোগী দেহ। মুখটা গোলাকৃতি, অর্ধাস্যাচিত্র অভিজাত। চুল ছোট, প্রায় কালো, এবং সযত্নলালিত। চোখদুটো জীবন্ত এবং উচ্ছল। ভুরু ঘন। গোঁফও ঘন, প্রান্তভাগ ছাঁটা। পরণে সুন্দর ক'রে কাটা বেড়ানর স্যুট, তাঁর বয়সের তুলনায় রীতিমত রঙচঙে। তাঁর চোখে আই-গ্লাস, যা তিনি প্রায়ই ফেলে থাকেন।]

বিচারক ব্র্যাক। (হাতে টুপি, অভিবাদন ক'রে) এত সকালে কি কেউ দেখা করাতে আসতে পারে?

হেডা। নিশ্চয়, পারেই ত'।

টেস্‌ম্যান। (তাঁর হাতে চাপ দিয়ে) যে-কোন সময় আপনি স্বাগত। (পরিচয় করিয়ে) বিচারক ব্র্যাক—কুমারী রাইসিং—

হেডা। ওঃ—!

ব্র্যাক। (নত হয়ে) আ—বড় আনন্দ পেলাম—

হেডা। (তাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন) বিচারক, দিনের বেলা আপনার দিকে তাকান একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা!

ব্র্যাক। কেন, আমাকে অন্যরকম মনে হচ্ছে না কি?

হেডা। মনে হয় তরুণতর।

ব্র্যাক। অনেক ধন্যবাদ।

টেস্‌ম্যান। কিন্তু হেডা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা—অ্যাঁ? ওকে বেশ উন্নতিশীলা মনে হচ্ছে না? প্রকৃতপক্ষে ও—

হেডা। আহা, আমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করো না। বিচারক যে কষ্ট করেছেন সেজন্য এখনও ধন্যবাদ পর্যন্ত দাও নি—

ব্র্যাক। অর্থহীন!—আমার পক্ষে এত আনন্দজনক—

হেডা। হ্যাঁ, আপনি ত' সত্যিকার বন্ধুই। কিন্তু, টয়্যা এখন যাওয়ার জন্য অস্থির —কাজেই বিদায় বিচারক। এখুনি ফিরে আসবো।

[পারস্পরিক নমস্কার বিনিময়। হল-এর দরজা দিয়ে হেডা আর শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌ চলে গেলেন।]

ব্র্যাক। আচ্ছা,—আপনার স্ত্রী কি মোটামুটি সন্তুষ্ট—

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, আপনাকে উপযুক্ত ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। অবশ্যই ও এখানে ওখানে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজানর কথা বলেছে; আর দু'একটা জিনিসও আনতে হবে। কয়েকটা বাড়তি টুকিটাকি জিনিস কেনা দরকার।

ব্র্যাক। তাই না কি!

টেস্‌ম্যান। কিন্তু এজন্য আপনাকে আর জ্বালাব না। হেডা বলে নিজেই প্রয়োজনীয় এটা সেটা নিয়ে আসবে।—আমরা বসবো না? অ্যাঁ?

ব্র্যাক। ধন্যবাদ। (টেবিল-এর পাশে বসে) প্রিয় টেস্‌ম্যান, আমি আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই।

টেস্‌ম্যান। সত্যি? ও, বুঝেছি! (বসে) মনে হচ্ছে, এইবার আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দিকটা আলোচিত হবে। অ্যাঁ?

ব্র্যাক। ওঃ, টাকার প্রশ্নটা তেমন জরুরী নয়; যদি, সে কথা বলতে হলে, আমার মতে আর একটু চেপে খরচ করাই উচিত ছিল।

টেস্‌ম্যান। কিন্তু তাতে ত' কিছুতেই হত না, জানেন না? বিচারপতি হে, একবার হেডার কথা চিন্তা করুন! আপনি—যে কি না তাকে ঘনিষ্টভাবে জানেন—। আমি তাকে নোংরা ধরণে জীবনধারণ করতে বলতে পারতাম না!

ব্র্যাক। না, না—সেইটাই ত' আসল অসুবিধে।

টেস্‌ম্যান। আর তারপর—সৌভাগ্যক্রমে—চাকরি পেতে আমার খুব বেশি দেরি হতে পারে না।

ব্র্যাক। ইয়ে, দেখুন—এ ধরণের ব্যাপার কিছুদিন ধরে প্রায়ই ঝুলে থাকে।

টেস্‌ম্যান। নির্দিষ্ট কিছু শুনেছেন কি? অ্যাঁ?

ব্র্যাক। ঠিক নির্দিষ্ট কিছু নয়— (নিজের কথার মাঝখানে) কিন্তু, প্রসঙ্গত, আপনার জন্য একটা খবর আছে।

টেস্‌ম্যান। আচ্ছা?

ব্র্যাক। আপনার পুরনো বন্ধু এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ সহরে ফিরে এসেছেন।

টেস্‌ম্যান। এ খবর আগেই পেয়েছি।

ব্র্যাক। সত্যি! কী করে জানলেন?

টেস্‌ম্যান। হেডা-র সঙ্গে যে ভদ্রমহিলা গেলেন তাঁর কাছ থেকে।

ব্র্যাক। সত্যি? মহিলার নামটা যেন কী? আমি ঠিক খেয়াল করি নি।

টেস্‌ম্যান। শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌।

ব্র্যাক। ও হো—শেরিফ্‌ এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর স্ত্রী? নিশ্চয়ই—ও ত' ঐ অঞ্চলেই বাস করছে।

টেস্‌ম্যান। আর ভাবুন,—তাঁর চরিত্র সংশোধিত শুনে আমি আনন্দ পেয়েছি।

ব্র্যাক। লোকে তাই বলে বটে।

টেস্‌ম্যান। এবং সে একটা নতুন বই ছাপিয়েছে—অ্যাঁ?

ব্র্যাক। হ্যাঁ, সত্যিই সে ছাপিয়েছে।

টেস্‌ম্যান। এবং শুনছি বইটা না কি বেশ সাড়া জাগিয়েছে!

ব্র্যাক। অস্বাভাবিক সাড়া।

টেস্‌ম্যান। কল্পনা করুন—খবরটা ভাল নয়! এরকম অ-সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মানুষ—তাঁর বারটা বেজে গেছে ভেবে কী দুঃখই না হত।

ব্র্যাক। সকলেই তা-ই ভাবত।

টেস্‌ম্যান। আমি ত' ভাবতেই পারি'না ও এখন কী করবে! কী ক'রে পেট চালাবে? অ্যাঁ?

[শেষের কথাগুলো বলার সময় হেডা হল-ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে এসেছেন।]

হেডা। (ব্র্যাক-এর প্রতি, তিরস্কারমিশ্রিত হাসি হেসে) টেস্‌ম্যান চিরকাল ভেবে আকুল মানুষ কী ক'রে পেট চালায়।

টেস্‌ম্যান। আহা, শোনই না—আমরা বেচারা এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ সম্পর্কে কথা বলছিলাম।

হেডা। (তাঁর দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে) ও, তাই না কি? (স্টোভ-এর পাশে রাখা আরামকেদারায় বসে নিস্পৃহ কণ্ঠে) তাঁর কী হয়েছে?

টেস্‌ম্যান। আচ্ছা—নিঃসন্দেহে অনেক আগেই সে নিজের সম্পত্তি ফুঁকে দিয়েছে; আর, প্রতিবছর একটা নতুন বই লেখা তাঁর পক্ষে কঠিন ব্যাপার—নয়? কাজেই, আমি ত' ভেবে পাই না তাঁর কী হবে।

ব্র্যাক। এ ব্যাপারে কিছু খবর বোধহয় দিতে পারি।

টেস্‌ম্যান। তাই না কি!

ব্র্যাক। নিশ্চয় মনে আছে ওর আত্মীয়রা বেশ প্রভাবশালী।

টেস্‌ম্যান। ও, ওর আত্মীয়রা—দুর্ভাগ্যক্রমে —ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি।

ব্র্যাক। একসময় ওকে তাঁরা পরিবারের আশা বলত।

টেস্‌ম্যান। একদা, তা বটে! কিন্তু ওপাট সে চুকিয়ে দিয়েছে।

হেডা। কে জানে? (সামান্য হেসে) শুনছি তাঁরা এখন ওকে শেরিফ্‌ এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে—

ব্র্যাক। তারপর, যে নতুন বইটা সে ছেপেছে—

টেস্‌ম্যান। বেশ, বেশ, প্রার্থনা করি তাঁরা যেন ওর জন্য কিছু করার মত পায়। আমি তাকে এইমাত্র লিখেছি। হেডা, আমি তাকে সন্ধ্যেবেলা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছি।

ব্র্যাক। কিন্তু, মশাই, আপনি আজ সন্ধ্যের সময় আমার ব্যাচেলরস্‌ পার্টিতে যাচ্ছেন, আগাম প্রতিশ্রুতি পেয়েছি কাল রাতে, জেটির ওপর।

হেডা। তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে?

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম।

ব্র্যাক। যাক, তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ নিশ্চিন্ত থাক সে আসছে না।

টেস্‌ম্যান। এরকম ভাবছেন কেন—অ্যাঁ?

ব্র্যাক। (কিছুটা ইতস্তত ক'রে উঠে নিজের চেয়ার-এর পেছনে হাত রেখে) প্রিয় টেস্‌ম্যান—আপনিও, শ্রীমতী টেস্‌ম্যান—শুনুন, একটা বিষয়ে আপনাদের অন্ধকারে রাখা উচিত নয়, যে বিষয়— —যেটা—

টেস্‌ম্যান। এইলার্ট সম্পর্কে?

ব্র্যাক। আপনার এবং এইলার্ট—উভয়ের ব্যাপারে।

টেস্‌ম্যান। ও, বিচারপতি মশাই, বলে ফেলুন।

ব্র্যাক। আপনি যেরকম চেয়েছিলেন বা আশা করেছিলেন, সে তুলনায় আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনেক পেছিয়ে যাবে।

টেস্‌ম্যান। (অস্বস্তিকরভাবে লাফ দিয়ে) কোন খট্‌কা বেধেছে কি? অ্যাঁ?

ব্র্যাক। মনোনয়ন সম্ভবত একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাভিত্তিক হবে—

টেস্‌ম্যান। প্রতিযোগিতা! হেডা, একবার শুধু ভাবো!

হেডা। (চেয়ার-এর পেছনে আরও হেলে) আ—আ!

টেস্‌ম্যান। কিন্তু আমার প্রতিযোগী কে হতে পারে? নিশ্চয়—নয়—?

ব্র্যাক। হ্যাঁ, ঠিক তাই— এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ।

টেস্‌ম্যান। (তার হাত ধরে) না, না—এ ত' ভাবাই যায় না! সম্পূর্ণ অসম্ভব! অ্যাঁ?

ব্র্যাক। হুঃ—তৎসত্ত্বেও এরকমটাই হওয়া সম্ভব।

টেস্‌ম্যান। বেশ, কিন্তু এ ত' আমার প্রতি অবিশ্বাস্য, বিবেচনার অভাবসূচক। (হাত নেড়ে) কেন না—চিন্তা করুন—আমি একজন বিবাহিত লোক! হেডা আর আমি—আমরা এই সম্ভাবনা সামনে রেখে তবে বিয়ে করেছি; ধার করেছি দেদার; এমন কি জুলিয়া পিসীর কাছ থেকেও টাকা ধার নিয়েছি। দুর্গা দুর্গা, ওরা ত' আমাকে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। অ্যাঁ?

ব্র্যাক। বেশ, বেশ, বেশ—নিঃসন্দেহে আপনিই

অতি কমনীয় – অতি রমণীয়
CIBA
বসন্তসম স্নিগ্ধ...
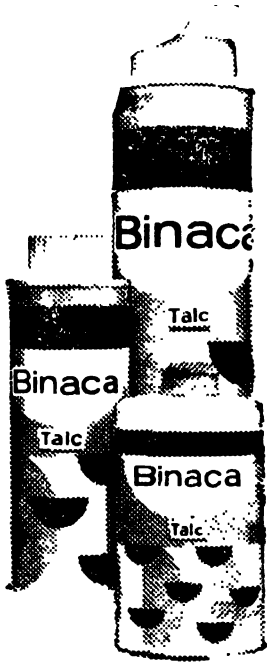
নাশক, শীতল, আনন্দদায়ক
মনমাতানো সুগন্ধযুক্ত
বিনাকা
ট্যাল্ক পাউডার
দুর্গন্ধনাশক ও ত্বক কোমলকরী

শেষ পর্যন্ত পদটা পাবেন; প্রতি-যোগিতার পরেই।

হেডা। (আরামকেদারায় অনড়) টেস্‌ম্যান, ভেবে দেখো, এতে বেশ একটা খেলার আনন্দ আছে।

টেস্‌ম্যান। আচ্ছা হেডা, প্রিয়তমাসু, তুমি কী ক'রে এ ব্যাপারে এতটা নির্লিপ্ত থাকতে পারলে?

হেডা। (আগের মত) আমি আদৌ নির্লিপ্ত নই। কে জেতে দেখার জন্য আমি সব থেকে বেশি আগ্রহান্বিত।

ব্র্যাক। সে যাই হোক, অবস্থাটা কী তা আপনার জানা দরকার, শ্রীমতী টেস্‌ম্যান। অর্থাৎ—যে টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে চাইছেন সেগুলো কেনার আগে।

হেডা। এতে কিছুমাত্র এসে যায় না।

ব্র্যাক। আচ্ছা! তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। বিদায়! (টেস্‌ম্যান-এর প্রতি) বৈকালিক ভ্রমণ সেরে ফেরার পথে এসে আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো।

টেস্‌ম্যান। ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনার খবর আমাকে বেশ চমকে দিয়েছে।

হেডা। (হেলান দিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিলেন) বিদায় বিচারক; সন্ধ্যের মুখে আসতে ভুলবেন না।

ব্র্যাক। অনেক ধন্যবাদ। বিদায়, বিদায়!

টেস্‌ম্যান। (তাঁর সংগে দরজা পর্যন্ত গেলেন) বিদায় প্রিয় বিচারক। আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন—

[ব্র্যাক হলঘরের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত।]

টেস্‌ম্যান। (ঘরের ও প্রান্তে গিয়ে) হেডা গো,—কারুর পক্ষেই মনস্থ ক'রে একটা কিছু ক'রে বসা ঠিক নয়। অ্যাঁ?

হেডা। (মৃদু হেসে তাঁর দিকে তাকালেন) তুমি কি তাই করো না কি?

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ গো,—অস্বীকার ক'রে লাভ নেই—নিছক প্রত্যাশার ওপর ভিত্তি ক'রে বিয়ে করা আর বাড়ি কেনা অ্যাড্‌ভেঞ্চার বই নয়।

হেডা। সম্ভবত ঠিকই বলেছ।

টেস্‌ম্যান। এখন, সে যাই হোক, বড় সুন্দর বাড়ি হয়েছে, না? ভাবো, এই বাড়ির স্বপ্ন দুজন মিলে দেখেছি—বলা চলে এর প্রেমে পড়েছিলাম। অ্যাঁ?

হেডা। (ধীরে ধীরে ক্লান্তভাবে উঠে) আমাদের চুক্তি ছিল যে আমরা 'সোসাইটি'-তে ভিড়ে যাবো—ঘর খোলা থাকবে।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, যদি কেবল জানতে আমি এইদিনের অপেক্ষায় ছিলাম কত আন্তরিকভাবে! ভাবো—তোমাকে দেখছি নির্দিষ্ট একটা গণ্ডীতে হোস্‌টেস্‌ হিসেবে! অ্যাঁ? বেশ, বেশ, বেশ—হেডা, আপাতত সোসাইটি ছাড়াই দিনাতিপাত করতে হবে—কেবল জুলিয়া পিসীকে ঘনঘন নেমন্তন্ন করবো।—সত্যি, প্রিয়ে, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের জীবনযাপন করাতে চেয়েছিলাম—!

হেডা। বুঝতেই পারছি এক্ষুণি উর্দিচাপান চাকর রাখা হচ্ছে না।

টেস্‌ম্যান। দুর্ভাগ্যক্রমে নয়, হেডা। বোঝ ত' এখনই ফুটম্যান নিয়োগ করা অসম্ভব।

হেডা। আর যে জিন্‌-লাগান ঘোড়াটা আমার পাওয়ার কথা ছিল—

টেস্‌ম্যান। (বিস্ময়ে অভিভূত) জিন্‌-লাগান ঘোড়া!

হেডা। মনে হচ্ছে, ও বিষয়ে এখন ভাবা অর্থহীন।

টেস্‌ম্যান। ভগবানের দোহাই, না!—এ ত' দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

হেডা। (ঘরের মধ্যে গিয়ে) আচ্ছা, ইতিমধ্যে সময় কাটানর জন্য অন্তত একটা জিনিস আমার চাই।

টেস্‌ম্যান। (আশান্বিত কণ্ঠে) আহা, ঈশ্বরকে সেজন্য ধন্যবাদ! সেটা কী গো হেডা? অ্যাঁ?

হেডা। (মাঝের দরজায়, তাঁর দিকে চাপা তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকালেন) জর্জ, আমার পিস্তলগুলো চাই।

টেস্‌ম্যান। (চমকে উঠে) তোমার পিস্তল-গুলো!

হেডা। (শীতল দৃষ্টি মেলে) জেনারেল গ্যাব্‌লার-এর পিস্তলগুলো।

[ভেতরকার ঘরের মধ্য দিয়ে হেডা বাঁদিকে বেরিয়ে গেলেন।]

টেস্‌ম্যান। (মাঝের দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে তাকে ডাকলেন) না, ভগবানের দোহাই হেডা—ঐ সাংঘাতিক জিনিসগুলো ছুঁয়ো না। আমার দোহাই, হেডা! অ্যাঁ?

। ক্রমশ।

অনুবাদক : সমীরণ চৌধুরী

অতি ব্যক্তিগত

অমৃততনয় গুপ্ত

এ-টা কিম্বা ও-টা, আমি কোনোটাই আজ সাবলীলভাবে
পছন্দ করি না বললে ঝামেলা মেটে না।
ভীষণ কল্পনা থাকে ভেদাভেদ নিরূপণ করার তাগিদে
সত্যিকার মনোনয়নের নামে প্রার্থনাগুলোকে
ক্লিষ্ট বলে মনে হয়। যত্রতত্র ব্যাপার, বস্তুরা
সহায়ক হওয়ার মতন
ভাণ করে চতুর্দিকে শ্লীল শিষ্ট হয়ে পড়ে থাকে।

অংশবিশেষেরে চেয়ে জরুরি সমস্ত অখণ্ডতা
স্ব স্ব ক্ষেত্র অনুযায়ী অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যতিব্যস্ত হলে
সাম্যবাদীদের চেয়ে আমি কিছু বড়ো হয়ে যাবো
কেন না ঈর্ষায় রাগে একমাত্র স্বচ্ছন্দ আমিই।

পুষ্যা-নক্ষত্রে এ মাসের পূর্ণিমা, তাই এর নাম পৌষ মাস। হিন্দু-জ্যোতিষে এরূপ নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। রাশিগুলির নাম অনুধাবন করলেও দেখা যায়, তার মধ্যে বিশেষ যুক্তি-বিবেচনা কাজ করেছে। বর্তমানে পৌষ মাসই আমাদের আলোচ্য; এ মাসে রবি থাকবে ধনু রাশিতে। মাসের ধনুতে প্রবেশে চন্দ্র মঙ্গল, বৃহস্পতি ও কেতু কন্যায়, বুধ ধনুতে, মকরে শুক্র এবং মীনে শনি ও রাহু রয়েছে; ধনু রাশির চতুর্থভাব পাপ-পীড়িত এবং এই রাশির অধিপতি বৃহস্পতি অরিগৃহগত এবং পাপযুক্ত ও পাপদৃষ্ট; যদিও চন্দ্র বৃহস্পতির সঙ্গে, তবু চন্দ্রেরও এই অবস্থা। শনি বক্রী হয়েছে। মাসের ছয় তারিখে বক্রী ত্যাগ করবে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর রাজনৈতিক ঘনঘটা প্রবল হয়ে উঠতে পারে। এখন প্রায়ই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অকাল ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প এবং যানবাহনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ মাস থেকে তিন বছর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠার বিশেষ সম্ভাবনা। পৌষ মাসে যাঁদের জন্ম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও কৃতিত্বের দিক থেকে আগামী জন্ম বৎসর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে অশুভ ইঙ্গিতই দেয়। ধনু-লগ্নের জাতকের পক্ষেও একথা খাটে। যাক্ এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসেই শুভাশুভ আভাস দেওয়া হল :---

॥পৌষ মাসের ফলাফল॥

মেষ ঃ প্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রসারের দিক থেকে এ মাস সুযোগপ্রদ। নিজের কোনো কাজে অন্যের সহায়তা কিংবা সুপারিশের প্রয়োজন হলে সেদিক থেকে অনুকূল সময়। বুদ্ধিজীবী প্রচার-প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করেন, তাঁদের পক্ষে বিশেষ তৎপর হওয়া দরকার। শস্য বা কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের মাঝে মাঝে অত্যন্ত উদ্বেগনার আশঙ্কা। ফসলাদি নিয়েও গোলমাল হতে পারে। সাধারণ কেনা-বেচার ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। কিন্তু মাসের শেষাংশ নৈরাশ্যসূচক। পারিবারিক অসুখ-বিসুখে বেশী অর্থ ব্যয় হবে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারও মনোমত হবে না। বিশিষ্ট বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের সঙ্গেও মনোমালিন্য হতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। নতুন প্রার্থীর চাকুরী হতে পারে। মহিলা জাতকের মনের উপর বিশেষ চাপ

ভৃগুজাতক

পড়বে। মেষ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্র সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। তবু পুরনো কোনো ব্যাপারের সুরাহা এবং অপ্রত্যাশিত আর্থিক কিছু লাভ হতে পারে।
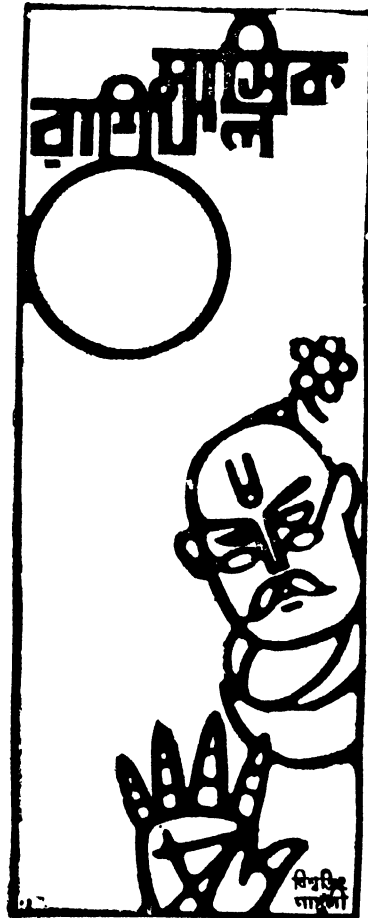
বৃষ ঃ মাসটা একদিকে প্রলোভন দেখাবে, অপরদিকে সাংসারিক ব্যাপার ও কর্মক্ষেত্রের অশোভন বিশৃঙ্খলা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ করে তুলবে। সঙ্কল্প-মত কোনো বিশেষ কাজ আরম্ভ করে তাতে বাধা এবং সেই কাজ সম্পন্ন করার মতো সময়েরও অভাব ঘটতে পারে। আবিষ্কার গবেষণা কিংবা গঠনমূলক কাজে এ-মাস অনেকখানি সহায়তা করবে। বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির সহায়তাও পেতে পারেন। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। কোনোরূপ ব্যথা-বেদনা দেখা দিলে সতর্ক হবেন। ছাপাখানার মালিক ও প্রকাশকদের আকস্মিক কোনো সঙ্কট দেখা দেবার কথা। ব্যবসায়ে শেষাংশ মন্দাসূচক। চাকুরীক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে সহ্য করা ও নিজের কাজ করে যাওয়াই ভাল। মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক ক্ষেত্রে শুভ হলেও স্বাস্থ্যের উৎপাত এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ভাবনা মনের উপর বিশেষ চাপ দিতে পারে।

মিথুন ঃ বাইরের লোকের বা গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে নতুন কিছু আশা করা যায়। কিন্তু চুক্তির কাজ কিংবা সৃষ্টিমূলক কাজে প্রচণ্ড বাধা আসতে পারে। যে ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য বা প্রশংসা আশা করছেন, তা নিষ্ফল হতে পারে। শরীর উৎপাত করবে। গোড়ায় সাবধান না হলে কয়েকদিন শয্যাশায়ী হবার আশঙ্কা। ব্যবসায় ক্ষেত্রে, কিছু ভাল হলেও মাসের মধ্যভাগের পর জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে অন্যের কাছে লজ্জিত হবার আশঙ্কা। ছেলেমেয়েদের ব্যাপার আশানুরূপ নয়। কারো অসুখ-বিসুখ হঠাৎ গোলমাল বাধাতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে নতুন কিছু ঘটতে পারে। এবার সঞ্চিত অর্থে টান পড়ার সম্ভাবনা। কোনো ব্যাপারে তাসের ঘরের মত স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে পারে। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে

জটিলতা দেখা দিতে পারে। মহিলা-জাতকের পক্ষে কোনো সূত্রে লাভের সম্ভাবনা। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে আয় বৃদ্ধি হলেও সাংসারিক অশান্তি ও চাকুরীক্ষেত্রে অস্বস্তিকর অবস্থা দেখা দিতে পারে। বাইরে কোথাও যাবারও সম্ভাবনা আছে।

কর্কট: একটু সপ্রতিভ বা সতর্ক হয়ে চলবেন। সামান্য গাফিলতির জন্য গোলমালে পড়তে পারেন। চাকুরীই হোক আর বুদ্ধিবৃত্তি, লেখক কিংবা শিল্পীর কাজই হোক, একটু অশান্তিকর অবস্থা দেখা দিতে পারে। ধৈর্যহারা হবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ কোনো কিছু করা সম্বন্ধে সাবধান। তবু উন্নতির আভাস আছে। কাজকর্ম বাড়বে। সেই অনুপাতে আর্থিক উন্নতি না-হতে পারে। পারিবারিক ব্যাপার নিজের মনোমত হবে না। বেশী খরচ করেও শান্তি পাওয়া কঠিন। গচ্ছিত অর্থে টান পড়বে। ধার-দেনায় পড়তে পারেন। ব্যবসায়ে নতুন প্রচেষ্টা এবং নতুন কোনো সহায়তা লাভেরও আভাস আছে। সরকারীসূত্রে যাঁদের ব্যবসা তাদের সুযোগ বেশী। কিন্তু লভ্যাংশ সম্বন্ধে মনোমালিন্য হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। বাতজ-পীড়া ও বায়ুর উৎপাত কষ্ট দিতে পারে। মহিলাদের পারিবারিক ব্যাপারে প্রায়ই উত্যক্ত হবার আশঙ্কা। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্মের প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিতে পারে।

সিংহ: পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে বাধা। বারবারই বাইরের চাহিদা কিংবা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য সময়ের অপচয় হবে। অবশ্য সামাজিক যোগাযোগ ও সম্মান-প্রতিপত্তির দিক থেকে শুভ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অথবা দলীয় ব্যাপারে সাফল্য আশা করা যায়। কিন্তু এসব ব্যাপারে আর্থিক অপচয়ও হতে পারে। বিশিষ্ট বন্ধু কিংবা হিতৈষীজনের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে মত-বিরোধে অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল কিন্তু উদর-বায়ুর উৎপাত এবং বাতজ-ব্যথা-বেদনা কষ্ট দিতে পারে। চাকুরী-ক্ষেত্রে নতুন কোনো সম্ভাবনা। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যাপার সম্বন্ধে হিসাব করে চলা উচিত। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে আইন-ঘটিত গোলমাল বাধতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে ক্রোধ ও ভাবপ্রবণতা ত্যাগ করে চলা উচিত। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে সম্মান-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং নতুন কোনো কাজে উদ্যোগের সম্ভাবনা। যাদের শনি কিংবা রাহুর দশান্তর্দশা চলছে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত।

কন্যা: শনির বক্রত্যাগ এই রাশির পক্ষে অনেকাংশে ভাল। যাক্, এ মাসে আগের কোনো প্রচেষ্টার সুফল পেতে পারেন। কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়। সঞ্চিত অর্থ না থাকলেও কোনো দ্রব্য বিক্রয় ও ধার-দেনার সম্ভাবনা। পুরনো কারবারে ঝঞ্ঝাট বাড়বে এবং নতুন কিছু করতে গিয়ে লোকসানের মুখোমুখি হতে হবে। তবু মধ্যভাগে কারো সহায়তা এবং কন্ট্রাক্টার ও সাপ্লাইয়ের কাজ যাঁদের তাঁরা অনুকূল অবস্থা পেতে পারেন। কাপড়ের ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাসের মধ্যভাগ সুযোগপ্রদ। খনি ও কারখানার মালিকদের কোনো দুর্যোগ যেতে পারে। ধান্যাদি ফসলের কারবারী ও জমির মালিকদের অশান্তিকর অবস্থা দেখা দিতে পারে। চাকুরী-ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। এমন কি নতুন প্রার্থীর চাকুরী হতে পারে। মহিলা জাতকের স্বজন-পীড়ায় কষ্ট কিন্তু আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। কন্যা-লগ্নে জন্ম হবে প্রীতির প্রসার ও উপহার লাভ কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়।

তুলা: কোনো ব্যাপারে ব্যস্ততা এবং আর্থিক অপচয়ের সম্ভাবনা। কোনো বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি দেখা দিতে পারে। নিতান্ত প্রিয়জনদের কারো জন্যও উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। রক্তের চাপে গোলমাল ও জ্বর হলে বিশেষ সাবধান। নতুন কারবার কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপযোগী সময়। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এগারো দিন জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের অনুকূল। বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহের পাকা-পাকি কথাবার্তাও হতে পারে। কিন্তু বয়স্ক পুত্রের আচরণ মনে চাপ দিতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে আগের বাধা দূর হতে পারে। চাকুরী ছাড়া অন্য আয়ের চুক্তিবদ্ধ কোনো ব্যাপার থাকলে, বাধা পড়তে পারে। মহিলা-জাতকের পক্ষে সাংসারিক ব্যাপারে অনুকূল। তুলা লগ্নে জন্ম হলে মঙ্গলের দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান। সাধারণভাবে সামাজিক সম্পর্কের উন্নতিসূচক।

বৃশ্চিক: শরীরের উপর নজর দিন। উত্তেজনা ও বিতর্কমূলক কাজ থেকে দূরে থাকুন। আপনার স্পষ্টবাদিতা অনেক সময় অযথা শত্রু সৃষ্টি করবে। রাজনৈতিক কার্যকলাপে গুপ্ত শত্রুতা ক্ষতি করতে পারে। দূরে কোথাও যাবার পক্ষে মাসের শেষাংশ অনুকূল নয়। ব্যবসায়ে নতুন সুযোগ বুঝায়। কিন্তু খেয়ালের বশে কিংবা ঝোঁকের মাথায় আর্থিক লেনদেন সম্বন্ধে সাবধান। জমি-বাড়ি ও দোকান থাকলে সেই সম্বন্ধে কোনো গোলযোগ উপস্থিত হতে পারে। ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। কিন্তু নানা ব্যাপারে খরচ অত্যন্ত বাড়বে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যে কোনোভাবে মাসের শেষাংশ মনের উপর আঘাত দিতে পারে। মহিলা জাতকেরও অনুরূপ ফল। বিবাহযোগ্যাদের বিবাহের যোগাযোগ

হতে পারে। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক যোগাযোগের দিকে আশাপ্রদ কিন্তু বৈষয়িক ও সাংসারিক ঝঞ্ঝাট উত্যক্ত করবে।

ধনু : উচ্চ লক্ষ্য ও অদম্য আকাঙ্ক্ষা কৈশোর থেকে প্রায় মধ্য বয়স পর্যন্ত চালিত করছে; যাদের বয়স আঠারো, সাতাশ, ছয়ত্রিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশের কাছাকছি, তাদের জীবনে এবার নতুন কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়। চুয়ান্নের উর্ধে বয়স হলে এবং পঁয়ষট্টির কম হলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। ব্যবসায় ক্ষেত্রে এবার যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। কিন্তু গত তিন মাসের কার্য-কারণ হয়ত বর্তমান সুযোগও নষ্ট করে দিতে পারে। তবু ধৈর্য ধরে চলুন। এ মাসের মধ্যভাগ অনুকূল হবে। আর্থিক ব্যাপারে অনেকাংশে আশাপ্রদ। সংসারের দিক থেকে ঝঞ্ঝাট ও ব্যয়বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। ভালবাসার ক্ষেত্রেও কয়েক দিনের অশান্তি বুঝায়। চাকুরীক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা। মহিলাজাতকের পক্ষে মনোমত কাজের সুযোগ ও কেনা-কাটার যোগ। ধনু লগ্নে জন্ম হল কোনো ব্যাপারে হতাশ হবার আশঙ্কা। পারিবারিক দিক থেকে যে-কোনাভাবে অশান্তি ও আঘাত আসার আশঙ্কা আছে।

মকর : প্রলোভনীয় কোনো ব্যাপার কানে আসতে পারে। কিন্তু নিজে ধৈর্যহারা হবেন না। হয়ত কারো প্ররোচনায় আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। লেখক, শিল্পী, ও গবেষক-দের পক্ষে সুযোগপ্রদ। গল্প লেখকদের গল্প রূপায়িত এবং কোনোভাবে পুরস্কৃত হবারও সম্ভাবনা। এখন থেকে তিন মাস বিশেষ লক্ষণীয়, কেনা-বেচার ব্যবসায়ের মধ্যে বস্ত্র-ব্যবসায়ী-দের আয় হ্রাস পাবে। ফ্যান্সী জিনিস ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়েও মন্দা চলতে পারে। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এখন থেকে চার মাস অনুকূল। প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষাদিতেও চাকুরী লাভের সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসায় আরম্ভ করবারও অনুকূল সময় পাবেন। চাকুরীক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। নতন প্রার্থীর চাকুরী হতে পারে। মহিলাজাতকেরও অনুরূপ ফল। মকর-লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলমাল ও বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটে মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দিতে পারে।

কুম্ভ : নতুন কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেবার সম্ভাবনা। কিন্তু বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটে ব্যয়বৃদ্ধি ও ছুটাছুটিতে সময়ের অপচয় ঘটবে। মধ্যভাগে শরীর উৎপাত করবে। কয়েকদিন শয্যাশায়ী হবার আশঙ্কা। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কারো কোনো বিপদ-আপদেও উদ্বেগ যেতে পারে। জমি-জমা ও ফসলের ব্যাপারে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটতে পারে। দূরে কোথাও যাবারও সম্ভাবনা। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়েও গোলমাল হবার আশঙ্কা আছে। কারখানা ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মালিকদের পক্ষে কোনোরূপ সঙ্কট যেতে পারে। ব্যবসায়ে আশানুরূপ আয় বাড়বে না। চাকুরীক্ষেত্রে উন্নতির আভাস পাবেন। কিন্তু বদলীর সম্ভাবনা। মহিলা-জাতকের কোনো সূত্রে লাভ হতে পারে। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট হলেও ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধি ও চাকুরীক্ষেত্রে কোনো সুযোগ উপস্থিত হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান।

মীন : উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হলেও নিজে স্থির-ধীর থাকাই হচ্ছে বর্তমানে অনেক সঙ্কট উত্তীর্ণ হবার প্রধান উপায়। কোনোপ্রকার বিতর্ক কিংবা রাজনৈতিক বাদানুবাদে নির্লিপ্ত থাকুন। অযথা শত্রু বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তার জন্য সজাগ থাকবেন। ব্যয় অত্যন্ত বাড়বে। মাসের মধ্যভাগে শরীরও উৎপাত করতে পারে। পারিবারিক কোনো শুভবার্তারও ইঙ্গিত রয়েছে। চাকুরীক্ষেত্রে গতানুগতিকভাবে চলবে। লেখক, শিল্পী ও অধ্যাপকদের নতুন স্বীকৃতিলাভের সম্ভাবনা। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষতিকর হতে পারে। মাসের মধ্যভাগের পর বাইরে কোথাও যাওয়া উচিত হবে না। ভালবাসা ও প্রেম-প্রণয়ের ক্ষেত্রে তরুণদের সতর্ক থাকা উচিত। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বিবাহের যোগাযোগ হলেও বাংলা এই বছরে বিবাহ যুক্তিযুক্ত হবে না। মীন লগ্নে জন্ম হলে শরীর-কষ্ট ও কর্ম-ক্ষেত্রে অশান্তির আশঙ্কা আছে।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রী বা-মা-রা আমগুড়ি বাজার)—(১) আর্থিক সচ্ছলতা আসতে তিন বছর লাগবে, (২) আগামীবার চেষ্টা করতে পারেন। ● শ্রীসুষমা বাগচি (কলিকাতা)—(১) ভয় নেই, (২) ধৈর্য ধরে থাকুন। দু' বছর পর ভাল সময়। ● শ্রীঅমলকুমার ঘটক (হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জী, ১ম বাই লেন, কদমতলা)—(১) বৃষ লগ্ন ও কন্যা রাশি, (২) আগামী মার্চ পর্যন্ত দেখুন। ● শ্রীডালিমকুমার ঘর (বালী)—(১) বর্তমান বছর দেখুন, (২) মাঝে মাঝে অত্যন্ত ঝঞ্ঝাট হতে পারে। ● শ্রীদীপকরঞ্জন রায় (গঙ্গারাম পালিত লেন, কলিকাতা)—(১) সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বর্তমান বছরের কার্যকারণ সম্বন্ধে

জা দান, (২) শিক্ষা বিভাগই বুঝায়। ●শ্রীমতী বীণা মিত্র রাজারহাট, বিষ্ণুপুর)---আশঙ্কার কারণ নেই। ● শ্রীনবকুমার ধর (গিরিবালা লন কলিকাতা)---(১) সম্ভবনা দেখি না, ২) ইন্দ্রনীল পাঁচ-ছয় রতি কোন রূপার আংটিতে যথাবিধি শাধনাদি করে ধারণ করতে পারেন। ●শ্রীগোবিন্দদাস সন, দয়াল সোম লন, কলিকাতা)---নীল অপরাজিতা ফুল একটি ও রক্তকরবী ফুল একটি শনিবারে কালো প্রতিষ্ঠিত কালীর পায়ে ঠেকিয়ে তামার মাদুলীতে পুরে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীখি জন্দ্রনাথ দাস (টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা)---(১) পড়ার স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি বুঝায় এবং বিবাহে দেরীও বুঝায়, (২) গতানুগতিক চলবে; শ্রীরাজেশ চক্রবর্তী অরবিন্দ নগর)--- ১) তিন বছর এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে চলতে পারে, ২) বিশেষ সুবিধা হবে না। আট রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ধৈর্য ধারণ এবং বিবেচনা করে কাজ করবেন। ●শ্রীভোলানাথ ব্যানার্জি (দশবন্ধু রোড, আলমবাজার)---তুলা রাশি ও তুলা লগ্ন, (২) চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। ● শ্রী এস বি ধর চৌধুরী (কাহিমা)---(১) লগ্ন ও রাশি ঠিক আছে, ২) সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়সের পর প্রকৃত উন্নতি। ● শ্রীবারীন মুখার্জি (দুর্গাপুর-২) --- ১) আগামী বছর ভাল, (২) বাধা-বিঘ্ন দূর করার জন্য শ্বেত-প্রবাল ছয় থেকে আট রতির মধ্যে ধারণ করতে পারেন সোনার আংটিতে। ●শ্রীবংশধর পাল বলগ্রাম)--(১) বাড়িতে মাসে একদিন শুক্র অষ্টমীতে চণ্ডীপাঠ করান এবং নারায়ণকে তুলসী দিয়ে দেখতে পারেন, ২) এসব আইনের ব্যাপারে কোনো উত্তর দেওয়া হয় না। ●শ্রীঅমরনাথ মেদ্দা (সেহারা)---(১) বর্ষকালের কার্যকরণের উপর নির্ভর করছে, (২) স্বাধীন কাজ নয় প্রোফেশন। ● ড পরিচয় গুপ্ত (গরচা রোড, কলিকাতা---(১) অত্যন্ত বাধা তবু মার্চ পর্যন্ত দেখুন, (২) পীতাম্বর নীলা ছয় রতি যথাযথ শাধনাদি করে ধারণ করতে পারেন। ●শ্রীসুনীলকুমার শীল (নবীন মুখার্জী লেন, শিবপুর)---হবার সম্ভবনা। ●শ্রীকল্যাণকুমার দাস (ক্রীক রো, কলিকাতা)---(১) মোটামুটি হবে, (২) গোলমাল যাবে, কিন্তু প্রতিকারে বিশেষ ফল হবে না, তবু পাঁচ-ছয় রতি পলা ও আট রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীশ. সুকুমার গাঙ্গুলী কপাটী শিবতলা)---(১) অত্যন্ত গোলমেলে সময় তবু মার্চ পর্যন্ত দেখুন, ২) গোমেদ ছয় রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীশঙ্করনাথ ভৌমিক (গুরদহ, নতুন পল্লী)--- ১) এ বছর না হলে বত্রিশের পর, ২) এখন উপযুক্ত সময় নয়। ● শ্রী এস, আর, চ্যাটার্জি (লালপুর, চাকদহ)---এখন বিশেষ অনুকূল সময় নয়, (২) সাধারণ ভদ্রভাবে চলার মত। ● শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ (নফরচন্দ্র দাস রোড, কলিকাতা)---(১) বৃষরাশি ও কর্কট লগ্ন, (২) রাশি অনুযায়ী প্রথম অক্ষর 'হ' হবে; ●শ্রীঅরবিন্দ মুখার্জী এন, এম, এল, জামসেদপুর)---(১) রক্তমুখী প্রবাল আট-নয় রতি ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) আগামী চৈত্র পর্যন্ত বিশেষ অনুকূল নয়। ● শ্রীমতী সায়ন্তনী সরকার (ফ্ল্যাট নং ৩, আলিপুর রোড, কলি-২৭) (১) সময় হয়েছে, দেড় বছর মধ্যে হতে পারে, (২) ঠিক আছে। বাধা দূর করার জন্য রক্তমুখী প্রবাল সোনার আংটিতে আট রতি ধারণ করিয়ে দেখুন।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

মাসিক রাশিফল

নাম-..............................

ঠিকানা-..............................

....

মাসিক বসুমতী

শ্রীমতী বিনতা বসু (বি বকারমন্দ রোড, রিষড়া)---(১) বাইশের মধ্যে হতে পারে, (২) ভাল হবে ● শ্রীপরশুরাম শর্মা (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা)---একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠানো রীতি নয়, (১) আগামী জুন পর্যন্ত দেখুন, (২) মার্চের মধ্যে না হলে দেরী হবে, (৩) মোটামুটি, হবে, (৪) দুই বছর পর হতে পারে; ● শ্রীস্বপনকুমার ঘোষাল (বীরকুল) ---(১) সময় গোলমেলে। যদি হয় নয়-মাসের মধ্যে। (২) মামলা-মোকদ্দমা এড়িয়ে চলা উচিত। ● শ্রীমতী মলিনা রায় কলিকাতা ১২)---চিকিৎসা করান। ● শ্রীশ্রবণকুমার (কে, বি, লেন, হাওড়া) ---(১) পরিবর্তন হবে, (২) আগামী বারে, (৩) পরে ব্যবসায় (৪) হবে না। একসঙ্গে দুটি কুপন পাঠানো আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। ● শ্রীসুকুমার সেন ডাক্তার লেন, কলি)---(১) আছে, (২) তিন বছর পর ভাল। ● কুমারী ...সেন (ডাক্তার লেন, কলিকাতা) ---ধনু রাশি ও কর্কট লগ্ন (২) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। ● শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রায় ...বাগ স্ট্রীট, কলি)---(১) এ ব্যাপারে ...ভাবের জন্মকুণ্ডলী দরকার, (২) তবু আগামী নয় মাস দেখুন। ● শ্রী পি বড়ুয়া ব্যান্ডেল)---(১) তুলা রাশি ও দেবগণ (২) দেড় বছর বিশেষ ধৈর্য ও সতর্কতা দরকার। ● শ্রীষষ্ঠীচরণ দাস (তালগ্রাম) মুর্শিদাবাদ)---মিথুন রাশি ও মীন লগ, (২) ব্যবসায় (৩) মোটামুটি হবে; (৪) চেষ্টা করতে পারেন। ● শ্রীমায়ারাণী ব্যানার্জী (দয়ালকৃষ্ণ মুখার্জী রোড, আলমবাজার)---কর্কট লগ্ন, (২) কারোর পর। ● শ্রীমতী শিবাণী দেবী (বাঙ্গালোর) ---(১) বাধা রয়েছে; (২) আগামী দেড় বছর দেখুন। ● শ্রী আর এন চক্রবর্তী (রামাপুরা, বারাণসী)---শনির প্রতিকার (২) বিশেষ সুবিধা হবে না। তবু কারো সহায়তা পেতে পারেন। ● শ্রী জি ...টক (আসানসোল)---(১) আছে, (২) দক্ষিণা কালিকা কবচ। শ্রীহরি (আসানসোল)---(১) পাঁচরতি পীতাম্বর নীলা ধারণ করে। দেখতে পারেন, (২) দেরী হবে। ● শ্রী এস কুমার (জামসেদপুর)---(১) ভালভাবে কাটবে, (২) তিন বছর দেখুন। ● শ্রীঅমলকুমার পূজারি---বাবুপাড়া, বর্ধমান)---(১) নূতন বছরে, (২) পাঁচরতি মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীপঙ্কজ রায় (শশীভূষণ ব্যানার্জী রোড, বরিষা)---(১) পড়াশোনার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল; (২) জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, বৃশ্চিক রাশি ও বৃষ লগ্ন। ● শ্রীঅজয়শ্রীমানী (হিন্দুস্থান পার্ক) ---(১) বর্ষকাল দেখুন। (২) এবার হতে পারে। ● শ্রীকণিকা দাস (কাণপুর)---(১) ভাল সময় আসবে; (২) প্রতিকার জন্য শ্বেত প্রবাল ছয় থেকে আট রতির মধ্যে ধারণ করে দেখুন সোনার আংটিতে। উক্ত বিষয়ে উপকার হবে। ● শ্রী সু-কু-রা (বর্ধমান)---(১) আরো মনোযোগ দরকার, (২) এবার চিন্তা দূর করা উচিত। ● শ্রীগৌরেন্দ্রমোহন দাস (মাড়ুইবাজার)---(১) দু' বছর প্রতিকূল (২) রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ও কণক-ক্ষেত্র বৈদূর্য আড়াই রতি ধারণ করে দেখুন। ● শ্রী...কুমার বর্মণ (জি টি রোড, শেওড়াফুলি)---(১) দেরী হবে, (২) দেড় বছরের কার্যকারণের উপর সব নির্ভর করছে, (৩) উৎপাত করবে, (৪) গোড়ায় ভাল চাকুরী হবে না। ● শ্রীপি, বি ভট্টাচার্য (লক্ষ্ণৌ, আর ডি এস ও) ---(১) মার্চের মধ্যে হতে পারে, (২) এখন হবে না। ● শ্রীপি পট্টনায়ক (ভুবনেশ্বর)---(১) বছর দেড়েকের মধ্যে হতে পারে, (২) অন্তত এক রতির তিন ভাগের একভাগ হীরক ধারণ করে দেখতে পারেন। আর বগলামুখী কবচ। ● শ্রীব্রজরাজ ঘোষ (কান্দি)---(১) আগামী চৈত্রের পর কিছু ভাল হবে। শনির জন্য ইন্দ্রনীল ধারণ করে দেখতে পারেন। (২) তিন বছর পর। ● শ্রীবিশ্বজিৎ ঘোষ (কান্দি) ---ছয় রতি রক্তমুখী প্রবাল, (২) আঠারো বর্ষ বয়সের পর।

ঈশানুসরণ / শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠ

১ম, ২য়, ও ৩য়, ৪র্থ পর্ব — আলোচ্য গ্রন্থটি অনুবাদকর্ম, টমাস এ কেম্পিস বিরচিত The Imitation of Christ নামে মহতী গ্রন্থের সরল বঙ্গানুবাদ। যীশুখৃস্টের জীবন ও বাণীকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মূলগ্রন্থে, রচনার ছত্রে ছত্রে মনুষ্যত্ব ও উচ্চ অধ্যাত্মস্থান লাভ করবার জন্য যে ভাবে নির্দেশাদি দেওয়া হয়েছে তা এককথায় অপূর্ব। মূল গ্রন্থের ভাবধারা এই অনুবাদকর্মে যে শুধু অব্যাহতই রয়েছে তা নয় বরং আরও বিকশিত হয়েছে, কারণ অনুবাদক হিন্দু মানসিকতাকে শিরোধার্য করে এতে হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধর্মশাস্ত্র থেকে শ্লোক বা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির সুন্দর বঙ্গানুবাদও সন্নিবেশিত করেছেন। এই অনুবাদ কর্মটি পাঠ করলে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সর্বদেশে সর্বকালে ধর্মের সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন ; একই সত্য বিভিন্ন রূপে সপ্রকাশ। ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে গ্রন্থটি অমূল্য বলে বিবেচিত হবে। আমরা এই অনবদ্য অনুবাদকর্মের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শালীন, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। অনুবাদক—স্বামী সচ্চিদানন্দ, প্রকাশক—স্বামী ত্রিপুরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ, ১নং চিৎপুর ব্রীজ্ এপ্রোচ্, বাগবাজার কলিকাতা-৩।

দাম—১ম ও ২য় পর্ব একত্রে—পাঁচ টাকা ; ৩য় ও ৪র্থ পর্ব একত্রে—পাঁচটাকা।

পুষ্পাঞ্জলি / শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা-মঠ

আলোচ্য গ্রন্থটি ভক্তিমূলক কয়েকটি কবিতার সংকলন। ভক্ত-ভগবানের সংলাপই এই কবিতাগুচ্ছের বিষয়বস্তু, অধ্যাত্ম উপলব্ধির মাধ্যমেই শুধু মানুষ এই দুঃখ-দাহে ভরা পৃথিবীতে বাস করেও প্রকৃত শান্তির অধিকারী হতে পারে, প্রকৃত ধার্মিকের মর্যাদাও তাই এত বেশী। ভক্তের হৃদয়োৎসারিত

ভক্তির অনাবিল প্রকাশ তাঁর কথায়-লেখায়, বর্তমান কবিতা-গুচ্ছের মাধ্যমে ও এক ভক্ত হৃদয়ের বাণীই স্বপ্রকাশ। এই কবিতার মালা যেন ভগবানের কণ্ঠে ভক্ত প্রদত্ত অম্লান কুসুমমালা, পূজার অন্যতম প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উপচার। ভক্ত পাঠকের কাছে এই ছোট কাব্য-গুচ্ছটি সমাদৃত হবেই। আঙ্গিক সাধারণ, ছাপাও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—ব্রহ্মচারী বীরেন্দ্র, প্রকাশনা—শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠ, ১০, রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩, দাম—এক টাকা মাত্র।

দেবীস্তুতি / জেনারেল প্রিণ্টার্স

নজরুল ইসলামের কবি পরিচয় সকলেরই সুপরিচিত, কিন্তু সেই পরিচয়ই শেষ কথা নয়, তাঁর আসল সত্তা বিকশিত তাঁর ভক্তিমূলক রচনায়, স্বভাবে ও স্বরূপে তিনি মাতৃসাধক পরম শাক্ত। গীতি সুরকার বা কবি গায়ক নজরুলের অন্তরালে সাধক নজরুলের অস্তিত্বের খবর হয়ত আজও সকলে সম্যক্‌ভাবে অবগত নন। আলোচ্য গীতি-সংকলনে সেই সাধক সত্তাই স্বরূপে সপ্রকাশ। এখানে তিনি শক্তিতত্ত্বের নব ভাষ্যকার। নজরুলের তিনটি অপ্রকাশিত রচনা ও মোট ষোলটি অপ্রকাশিত মাতৃবন্দনা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। গানগুলির ভাব-গাম্ভীর্যে ও ভক্তিসাধি[illegible] চমক জাগে মনে ; মনে হয় মানুষে মানুষে ভেদ, জাতিভেদ এসব সত্যই কত না তুচ্ছ, কত না অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃতপক্ষে 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই শাশ্বত সত্যেরই যেন নবরূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গীতিমাল্যটির মাধ্যমে, নচেৎ মুসলমান-কবির লেখনী, এমন তাৎপর্যপূর্ণ হিন্দু ধর্মের সঙ্গীত কেমন করেই বা প্রসব করে? আমরা এই বইটি হাতে পেয়ে গভীর আনন্দ লাভ করেছি। প্রসিদ্ধ সুরকার নিতাই ঘটকের দ্বারা গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নজরুল ইসলাম, প্রকাশনায়—জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স, প্রাঃ লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, দাম—তিন টাকা।

সঙ্গীতাঞ্জলি / জেনারেল প্রিণ্টার্স

আলোচ্য গ্রন্থে নজরুল ইসলামের একত্রিশটি বিখ্যাত গান, স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত হয়েছে। গানগুলির সুরও কবির দেওয়া, সে হিসাবে এগুলির একটা বিশেষ মূল্য বর্তমান। কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিও এতে আছে, যার সঙ্গে এ যুগের অনেক সঙ্গীতোৎসাহীরই হয়ত পরিচয় নেই। এই স্বরলিপি গ্রন্থে, রাগপ্রধান, গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বিখ্যাত সুরকার নিতাই ঘটক। আধুনিক, গজল, ঠুংরী, কীর্তন, বাউল, ঝুমুর ও শ্যামাসঙ্গীত সব ধরণের গানই স্থান পেয়েছে এবং সর্বশেষে আছে দেশাত্মবোধক মাতৃবন্দনা। সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই যে এই মূল্যবান স্বরলিপি গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নজরুল ইসলাম, প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, দাম—পাঁচ টাকা।

কিরোর আপনি ও আপনার হাত / আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাব্লিশার্স

পৃথিবীবিখ্যাত হস্তরেখাবিশারদ কিরোর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ইউ এ্যাণ্ড ইয়োর হ্যাণ্ড'-এর এই বঙ্গানুবাদটি হাতে পেয়ে, জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনুরাগী পাঠকমাত্রই খুসী হবেন। কিরোর নাম সকলেরই সুপরিচিত, হস্তরেখা পাঠ করে নির্ভুল ভাবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে দিতেন তিনি, বস্তুত তাঁর গণনা এমনই অভ্রান্ত ছিলো, যার জন্য অনেকেই তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ বলে মনে করতেন। হস্তরেখা বিচার প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করে গিয়েছেন কিরো, আলোচ্য গ্রন্থটি তার অন্যতম। এই গ্রন্থে অনেক নতুন বিষয় সন্নিবেশিত, অনেক নতুন তথ্য পরিবেশিত, জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা তো বটেই, তাছাড়া সাধারণ পাঠকও যে এই গ্রন্থকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অনুবাদ সরল ও স্বচ্ছন্দ। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। অনুবাদক---পরীক্ষিৎ, প্রকাশক---আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২, দাম---বারো টাকা।

উলঙ্গ আত্মা / বিদ্যাভারতী

সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি উল্লেখ্য বলে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে। গ্রন্থনায়ক এক আদর্শভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী, নিজের ফেলে আসা জীবনকে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচার করতে চেয়েছে সে। আজকের যুগে কোন সত্য কোন মহৎ আদর্শকেই যে আঁকড়ে ধরে বাঁচা চলে না, সুধন্য রায় অর্থাৎ নায়কের মূল বক্তব্য সেটাই। লেখকের কলমে যথেষ্ট জোর আছে, এ যুগের হতাশাজর্জরিত জীবন ও যৌবনকে স্পষ্ট ভাবেই চিত্রিত করেছেন তিনি, তাঁর বক্তব্য হয়ত বা কিছুটা অশালীন কিন্তু অসত্য নয়। মানুষের আত্মা যে কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নগ্ন ও নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় তারই বাস্তব ছবি এই কাহিনী। তবু মনুষ্যত্ব কি একেবারে নিঃশেষ হয়? হয় না, তাই সুধন্য রায়ের পাশাপাশি নমিতাও থাকে, থাকে অরিন্দমও। আর বোধ হয় সেটাই লেখকের মূল বক্তব্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, প্রকাশনা---বিদ্যাভারতী, ৮-সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯, দাম---নয় টাকা।

চেনা-শোনার বাইরে / জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স।

আলোচ্য গ্রন্থটি নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়, অজানা অচেনা এক দেশের মর্মবাণী, যে দেশের সঙ্গে মনে মনে গ্রন্থিবদ্ধন হয়ে যায় পাঠকের, গ্রন্থটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে। রুমানিয়াতে গিয়েছিলেন লেখিকা কার্যকারণ যোগে, সে দেশ তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিলো, চমক জাগিয়েছিলো প্রাণে, আলোচ্য গ্রন্থটি তারই ফলশ্রুতি। আশ্চর্য এক দেশ, আশ্চর্য এক সমাজের কথা শুনিয়েছেন লেখিকা কাহিনীর মাধ্যমে; পড়তে পড়তে বিস্ময় বোধ না করে পারা যায় না, এখনও এই হতাশাজর্জরিত যুগেও এমন দেশ আছে তাহলে, সেখানে কোন সমস্যা নেই, নেই নিত্য-নতুন দুশ্চিন্তার আগ্রাসী প্রভাব? এমন দেশের কথা শোনাতেও শান্তি, জানাতেও সুখ। সুন্দর ও আশ্চর্য এমনই এক দেশ রুমানিয়া, যার কাহিনী যে-কোন গল্প উপন্যাসের চেয়েও মনোহারী, লেখিকার কৌশলে সে কাহিনী জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে পরিবেশিত। আমরা বইটি পড়ে সত্যি খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা---অমিতা রায়, প্রকাশক---জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, দাম---পাঁচ টাকা।

জমকালো মেঘ / অরুণিমা পাবলিশার্স

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী গতানুগতিক হলেও লেখকের বলার ভঙ্গীতে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে। সমাজের নীচের তলার মানুষ কালু, পেশায় সে ছিঁচকে চোর। চুরি করতে গিয়েই একটি সুন্দরী তরুণীকে ডাকাতের দলের হাত থেকে বাঁচালো সে একদিন, এবং এই থেকেই তার জীবনের মোড়ও ঘুরে গেলো। নানা ঘটনার পর সেই মেয়েটির সঙ্গেই মিলন হল কালুর, প্রণয় পরিণতি পেলো পরিণয়ে। ছেলেমানুষী ধরণের হলেও গল্পটি একেবারে অপাঠ্য নয়, তবে লেখকের কলম যে এখন ও প্রচুর অনুশীলন সাপেক্ষ এ-কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---বাণীপ্রসাদ মিশ্র, প্রকাশনা---অরুণিমা পাবলিশার্স, ১৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, দাম---দু'টাকা।

রত্নাকরের প্রেম / মোহন লাইব্রেরী

আলোচ্য উপন্যাসটিকে কক্‌টেল জাতীয় সুরার সঙ্গে তুলনা করা চলে, এতে নেই কি—সব আছে, রাজনীতি, যৌনতা, বিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিকতাকে পাঞ্চ করে এক অভিনব বস্তু পাঠকদের পাতে পরিবেশন করেছেন লেখক। লেখকের উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎ, শিল্পসৃষ্টি, কিন্তু পরিমিতি জ্ঞানের অভাবেই বোধ হয় তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থতায় পরিণত। বেশী বলতে গিয়ে প্রায় কিছুই বলতে পারেন নি তিনি, নায়ক বিধু চরিত্রটিই একমাত্র যা একটু মনোযোগ আকর্ষণ করার মত, অবাস্তব হলেও তার দৃষ্টিভঙ্গী মানবিক এবং সেজন্যই পাঠকের কাছ থেকে কিছুটা সহানুভূতি অন্তত সে আদায় করে নেয়। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক---নিমাইকুমার ঘোষ, প্রকাশক---মোহন লাইব্রেরী, ৩৫-এ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, দাম---ছয় টাকা।

অভিশপ্ত নায়ক / গ্রন্থপীঠ

অভিশপ্ত নায়ক। আদর্শবাদী একটি ছেলের জীবনসংগ্রামের ছবি আঁকতে চেয়েছেন লেখক এই উপন্যাসে। পড়াশুনোয় ভাল হওয়াটাই ছিলো মাতৃহীন জমিদার-পুত্র সমর রায়ের জীবনের অভিলাষ, কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর, আই এ পরীক্ষা ভালভাবে পাশ করে বি-এ পড়ার সময়ই ঘটলো বিপর্যয়, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও দলীয় রাজনীতির টানা পোড়েনে পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেল তার। ছাত্রনেতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও মা সরস্বতীর কমলবনে প্রবেশ করার দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল তার মুখের উপর। হতাশাজর্জরিত সমর শেষ পর্যন্ত শান্তি পেলো মৃত্যুর আশ্রয়ে। গোঁজামিল দিয়ে আর যাই হোক সাহিত্য সৃষ্টি যে সম্ভব নয়, আলোচ্য উপন্যাসটি পড়লে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। আখ্যানভাগ যেমন দুর্বল তেমনি অনুজ্জ্বল শৈলী, এ রচনা সম্পর্কে এ ছাড়া আর কিছু মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীঅনঙ্গ পাণ্ডা, প্রকাশক—গ্রন্থপীঠ, ২০৯, বি, বিধানসরণী, কলিকাতা-৬, দাম—চার টাকা।

স্বরলিপি / কাত্যায়নী মেশিন প্রেস

আলোচ্য গ্রন্থটি সঙ্গীত সম্বন্ধীয়, এতে সবরকমের গান ও সবরকমের সুরের প্রকাশ ঘটেছে। বিভিন্নধর্মী কয়েকটি গান সুর ও স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশ করা হয়েছে, প্রকাশভঙ্গী এত সরল ও স্বচ্ছন্দ যে প্রায় সকলেই ইচ্ছা করলে এর থেকে গান তুলে গাইতে পারবেন। আমরা এই স্বরলিপি গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি গীত রচনা—শ্রীগোপী ভট্টাচার্য, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদ্বিজেন ভট্টাচার্য, প্রধান পরিবেশক—কাত্যায়নী মেশিন প্রেস, ৩৯।১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬, দাম—তিন টাকা।

ফেরারী / সুদেশ

আলোচ্য উপন্যাসের পরিবেশ একটু নতুন ধরণের, সৈন্য বিভাগের কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বিষয়বস্তু, পাত্র পাত্রী পরিবেশ সবই সামরিক, কাজেই খানিকটা বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায় কাহিনীতে। আখ্যান ভাগের মূল বক্তব্য যদিও চিরন্তন, সেই ত্রিকোণ প্রেম, তবু লেখকের সরল কথকতার প্রসাদে তা কিছুটা আকর্ষণীয়। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন লেখক। পড়তে ভালই লাগে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—সুদেশ, ৩২, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩, দাম—দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নাগরাজ। কিশোর সাহিত্য সঙ্ঘ

একটি কিশোর কাহিনী। কলকাতা থেকে গেলেন মিঃ সেন সুন্দরবন অঞ্চলের অফিস পরিদর্শন করতে। সেখানে আছে ম্যানেজার মিঃ খাদিম আলি। মিঃ সেন সশস্ত্র অবস্থায় তাঁর সন্ধানে সুন্দরবনের বিপদসংকুল পথে পা বাড়ালেন। দেখলেন জলের কুমীর, ডাঙায় বাঘ। আর দেখলেন সহস্র সাপ। কত রকমের বিষধর সাপ। কিন্তু সেই সাপদের রাজাকে যে এমনভাবে দেখতে পাবেন তা তাঁর ধারণার অতীত। লেখক একটি বাস্তব কাহিনী তুলে ধরেছেন যা লোমহর্ষক এবং রীতিমত বিস্ময়কর। এই বইটি বড়দের কাছেও আকর্ষণীয় এবং ছোটদের কাছেও তেমনি প্রিয় হবে। একটি চমৎকার কাহিনী। লেখক: বাদল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: কিশোর সাহিত্যসঙ্ঘ, ৭৩ স্বামীজী সরণী, কলি: ৪৮। দাম—দুই টাকা।

ডুবে থাক অবান্তর

গীতা ঘোষ

গভীর সমুদ্র সে কি নদীর রহস্য নিয়ে ভাবে
অথবা নদীর কান্না সমুদ্রে যাবার আশা নিয়ে
সমুদ্র হওয়ার সাধ সফল হয় না কোন কালে
অসীম রহস্য জানা অপূর্ণই থেকে যায় যাক
নাইবা সমুদ্র পেলো তৃপ্তি ত' নদীতেই
অজানায় অজানা থাক্ সমুদ্র গহবরেই
তৃষ্ণার্ত আমি যে তৃপ্ত শুধুমাত্র হাতে দাও
চায়ের পেয়ালাটুকু তাইতে মদির হব
ভরাট এ হৃদয়টুকু ছোটখাট খুশিতেই
বরং ভরিয়ে দেব কাজ নেই সমুদ্রেই।

কতটুকু পাওয়া যায় কত ধরে এ হৃদয়
অনন্ত প্রশ্নের রাশি আসে আর চলে যায়
একটি জিজ্ঞাসা থাক একটি উত্তর
তার বেশি চাই না-ক, ডুবে থাক অবান্তর।

চারজন

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সরস্বতীর পীঠভূমি। জ্ঞানতপস্বীদের মিলনক্ষেত্র। নানা বিদ্যার, নানা কলার, নানা শিল্পের অপূর্ব সঙ্গম। বাঙলা দেশের নবজাগৃতির ইতিহাসে এক বিরাট অধ্যায় যে জুড়ে আছে। এক-কথায় শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির মহাতীর্থ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনও স্বভাবতই যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই মর্যাদাসম্পন্ন এবং তেমনই পবিত্র। এই বিরাট আসনের ঐতিহ্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বাঙলার বহু কালজয়ী এবং দিকপাল সন্তানদের যাঁরা বিভিন্ন সময়ে এই আসন অলঙ্কৃত করেছেন। এই ঐতিহ্যসমৃদ্ধ মহান আসনের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব বাঙলা দেশের বর্তমানকালের আর এক সুসন্তানেরই উপর ন্যস্ত। সারস্বত-সাধনায় যিনি লব্ধসিদ্ধি। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে যাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত---তিনি ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

ছাত্র হিসাবেও তিনি কৃতী। আজ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে তিনি সমাসীন সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় একদিন তিনি সাফল্যের মুখোমুখি হলেন। তারপর বিদেশে পাড়ি। অর্থনীতিতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি অর্জন করলেন।

১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক তিনি নিযুক্ত হলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বিভাগের প্রধানের এবং কলা ও বাণিজ্য ফ্যাকালিটির ডীনের আসনেও তাঁকে সসম্মানে সমাসীন দেখা গেছে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ তাঁর বিদেশে অবস্থান। বাঙলার কৃতী সন্তান এই সময়ে পৃথিবীর নানা দেশ ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। ইয়োরোপের নানা দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই সময়ে তাঁর ঝুলিতে ভরে ওঠে। যুক্তরাজ্য ছাড়াও ফ্রান্স, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশসমূহ তাঁর ভ্রমণসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
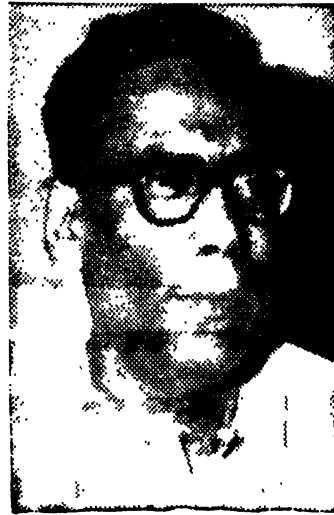
ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন

১৯৬২-'৬৩ সালেও তাঁকে দেশের বাইরে যেতে হয়েছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশানের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা এবং গবেষণার জন্য তিনি গমন করেন।

জনজীবনেও তিনি নানাভাবে জড়িয়ে আছেন। বহু লোকহিতকর কার্যে এবং প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজেকে সংযুক্ত রেখেছেন। অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ও দেশবিখ্যাত সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত।

কলকাতার যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও মহাজাতি সদনের অছি পরিষদের, পশ্চিমবাংলার বেতন-কমিশনের (১৯৬৭-৬৮), খড়গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সেনেটের, কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস-টিক্যাল ইনস্টিটিউটের গবেষণা এবং শিক্ষণস্কুলের গভর্নিং বডির এবং দিল্লীর ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সদস্যের এবং দিল্লীর ও পশ্চিম বাংলার স্টেট কো-অপরেটিভ ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি ও রিসার্চ প্রোগ্রাম কমিটির পূর্ব আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। সমবায় আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি জড়িত। ১৯৬৮ সালের ২৩-এ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কর্মভার তাঁর হাতে অর্পিত হ'ল।

গ্রন্থকার হিসাবেও তিনি তাঁর প্রতিভার প্রগাঢ়তার পরিচয় রেখেছেন। যে গ্রন্থগুলির মাধ্যমে তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়ক পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তি বিকশিত, তাদের নাম---সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইন আণ্ডার-ডেভেলাপড মানি মার্কেট (১৯৫২), দি সিটি অফ ক্যালকাটা---এ সোসিও ইকনমিক সার্ভে (১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৬০), দ্য কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৬৬) এবং টি পিপলাইয়ের সহযোগে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশানস ইন দ্য জুট ইণ্ডাস্ট্রি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৬৮)।

শ্রীঅমরেশচন্দ্র রায়

(কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি)

বাংলা দেশের পাবনা জেলা। কিন্তু আজ লেখবার বা বলবার সময়ে বাংলা দেশের' বললে ভুল হয়ে যাবে, এখন বলতে হবে 'পূর্ব পাকিস্তানের'। পাবনা জেলার মধ্যে হার্টুরিয়া গ্রাম। এই গ্রামের রায়-পরিবার একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় পরিবার। নানাবিধ সৎকর্মে এবং মহৎ প্রচেষ্টায় এঁদের অবদানের অন্ত নেই এবং এ বিষয়ে এঁদের খ্যাতিও দেশজোড়া। বহু কারণের মধ্যে যে বিশেষ কারণটি এই পরিবারকে প্রখ্যাত করেছে তা হল এই পরিবার থেকে বাঙলা দেশ সর্বসমেত তেরজন আইনজ্ঞ লাভ করেছে।

এই পরিবারের স্বর্গত দুর্গাসুন্দর রায়ের এক পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গত সুরেশচন্দ্র রায়। কালক্রমে সেই পুত্রও বংশগত ধারা অনুযায়ী আইনকেই প্রকাশের পথ হিসাবে অবলম্বন করলেন। মোট তের জনের মধ্যে এই ধারায় তিনি নবম। আইনের সাধনা তাঁর বিফলে যায় নি। আজ সেই সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর দিকে অর্থাৎ শ্রীঅমরেশচন্দ্র রায়ের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতা মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতির আসন। সেই সম্মানজনক আসনে আজ তিনি সগৌরবে সমাসীন।

১৯১২ সালের ৫ই জানুয়ারী পাবনা শহরে তাঁর জন্ম। পাবনাতেই লেখাপড়া আরম্ভ হল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর পাবনা এডোয়ার্ড কলেজ থেকে কলাবিদ্যায় প্রাক্-স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলে আসেন কলকাতায়। ১৯৩১ সালে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় সগৌরবে সমুত্তীর্ণ হলেন। ১৯৩৩ সালে এম-এ পাশ করলেন অর্থনীতি—গ্রুপ 'বি' নিয়ে অর্থাৎ আজকের দিনে যাকে 'রাজনীতি' আখ্যা দিয়ে অর্থনীতি থেকে পৃথক করা হয়েছে।

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সসম্মানে আইন পরীক্ষার গণ্ডীও অতিক্রম করে গেলেন। আইন পরীক্ষায় সাফল্যের স্পর্শ পাওয়ার পর পাবনায় জেলা জজের কোর্টে প্রোবেশনার প্লিডার হিসাবে যুক্তথাকলেন (১৯৩৫)। শহরের আদালতে যোগ দেওয়ার আগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এবং

শ্রীঅমরেশচন্দ্র রায়

প্রকৃত ভিৎ গঠনের জন্য কিছুকাল মফঃস্বলে মহড়া দিয়ে নিলেন।

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে চেম্বারশিপ পরীক্ষা দিলেন—কলকাতার হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ীরূপে গৃহীত হলেন ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে। বাইশ বছর পর ১৯৫৭ সালে নিযুক্ত হলেন পশ্চিম বাঙলা সরকারের ডেপুটি লিগাল রিমেমব্রানসার। তিন বছর পর অর্থাৎ হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট শ্রেণিভুক্ত হওয়ার রজত-জয়ন্তী বছরে ১৯৬০ সালে নিযুক্ত হলেন এই মহামান্য আদালতেরই এক মাননীয় বিচারপতি। এ-আসনে আজও তিনি সসম্মানে সমাসীন।

সুদীর্ঘ আইনজ্ঞ জীবনে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন অমরেশচন্দ্র। অগণিত মামলা পরিচালনা করেছেন। সহকর্মী বা প্রতিপক্ষ হিসাবে পেয়েছেন বহু ধুরন্ধর আইনজ্ঞকে। কত দিকপাল বিচারপতির কাছে মামলা পেশ করেছেন। সওয়াল লড়েছেন। আবার নিজে বিচারপতি হিসাবেও কত বিচিত্র মামলার রায় দিয়েছেন। জীবনের স্মরণীয় মামলা বলতে তিনি কোন নির্দিষ্ট মতে আসতে চান না। তাঁর মতে এক একটি মামলার এক-একটি চরিত্র থাকে, কোনটি লেখক-সত্তায় সাড়া জাগায়, কোনটি মানব-সত্তায় ঘা মারে, কোনটি আইনজ্ঞ সত্তায় রেখাপাত করে যায়। ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন দৃষ্টিতে তার স্বরূপ ধরা পড়ে। সেই অনুসারে এক-একজনের বিচারে এক-একটি মামলা স্মরণীয়।

সুদক্ষ আইনবিদ ছাড়া শ্রীরায়ের আরও একটি পরিচয় আছে। সে পরিচয়ও কোন দিক দিয়েই উপেক্ষণীয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাঙলা-সাহিত্যের তিনি একজন বিদগ্ধ পাঠক। শুধু বাঙলা সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর পাঠস্পৃহাকে আবদ্ধ রাখেন নি বা বিশেষ কোন যুগ বা বিষয়বস্তুর মধ্যে তাঁর পাঠতৃষ্ণা সীমাবদ্ধ নয়। এককথায় তাঁর পাঠকমন দেশ-কাল-সমাজ-গণ্ডী-বিষয়বস্তুর সীমারেখা মানে না। এবং যা তিনি পড়েন তা নিছক সময় কাটানোর জন্য নয়। পাঠ্যবস্তুর মধ্যে নিজের মনপ্রাণ সম্পূর্ণরূপে ঢেলে দেন।

সমগ্র ছাত্র-জীবন তাঁর কাছে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই সময়ে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে। ১৯২১ সাল থেকে বহু বিখ্যাত অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিজেকে যুক্ত

করেছিলেন তের-চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে এই জাতীয় বহু স্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মহানায়কদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন 'শিক্ষার সঙ্কট' শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথ, রামতনু লাহিড়ী বক্তৃতা প্রদান করছেন তখন প্রায়ই অন্যান্য ছাত্রদের মত নিজেদের ক্লাস না করে অমরেশচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাকক্ষে উপস্থিত হয়ে সেই কালজয়ী বক্তৃতা শুনেছেন।

শ্রীকুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত

[পশ্চিমবাঙলার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট]

দীর্ঘকালের কথা নয়। মাত্র এক বছরের ঘটনা। ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এক ঐতিহাসিক পরিণতির মধ্যে সমাপ্ত হল। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে একটানা কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটল। গঠিত হ'ল যুক্তফ্রণ্ট সরকার। নয় মাস স্থায়ী এই সরকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান (?) হিসাবে আশা করি 'ঘেরাও'-কেই সবাগ্রে উল্লেখ করা যায়। সরকারের সমর্থনে ঘেরাও পর্ব এমন এক সাংঘাতিক রূপ পরিগ্রহ করল, যা সমগ্র রাজ্যের জাতীয় জীবন বন্যা-দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ডের মতই আর এক ধরণের মহামারী হিসাবে এক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াল। ঘেরাও পর্ব প্রথমত অব্যাহত ধারায় অনুষ্ঠিত হতে তো থাকলই এবং ক্রমানুয়ে সরকারী সমর্থনপুষ্ট ঘেরাওকারীর দল অসীম উৎসাহে তাদের শিকারদের উপর যথেচ্ছ নির্যাতন এবং অত্যাচার চালাতে লাগলেন তাদের অনাহারে রেখে এমন কি তাঁদের প্রাকৃতিক কৃত্যাদি পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

এ-হেন পরিস্থিতিতে সারা রাজ্যে যে অচলাবস্থার উদ্ভব হ'ল তার অবসানকল্পে যথেষ্ট শ্রম ও দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করে এবং অপরিসীম দৃঢ়তা ও অটুট মনোবল মূলধন করে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে রাশি রাশি অভিনন্দনের অধিকারী। তিনি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীকুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত।

একদিকে পরম অমায়িক ও অতিথিবৎসল অন্যদিকে একনিষ্ঠ কর্মসাধক এই মানুষটির বয়স আজ ৫৫ চলছে। ১৯১৩ সালের ১লা ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) বিখ্যাত আইনজীবী স্বর্গত দ্বিজপদ সেনগুপ্তের তিনি পুত্র। এই পরিবার বিদগ্ধ আইনজ্ঞের পরিবার হিসাবে বিপুল প্রসিদ্ধির ও সুনামের অধিকারী ছিলেন।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র হিসাবে স্নাতক হওয়ার পর পারিবারিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে আইনকেই পঠিতব্য হিসাবে নির্বাচন করলেন। আইনব্যবসায়ে বলা বাহুল্য যথেষ্ট কৃতিত্বই তিনি প্রদর্শন করলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

তখনও বয়েস চল্লিশে পৌঁছয় নি। মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়েস তখন। সরকারী উকীলের মর্যাদালাভ করলেন কুমারজ্যোতি। এই পদে তাঁর অভিষেক এক ঐতিহাসিক এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—যার ভিতর দিয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা এবং প্রতিভার এক জ্বলন্ত সাক্ষ্য পাওয়া গেল। এত কম বয়সে অন্য কোন আইনজীবী এই পদে বৃত হন নি।

দেশ স্বাধীন হ'ল। সরকার স্থির করলেন প্রত্যক্ষ আইনব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে চারজনকে সরাসরি জেলাজজের আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। এই চারজনের মধ্যে কুমারজ্যোতি অন্যতম। অতিরিক্ত জেলাজজ হিসাবে তিনি আলীপুরে যোগ দিলেন। এক বছরের মধ্যে তাঁকে পাঠান হ'ল কৃষ্ণনগরে নদীয়ার জেলাজজ হিসাবে নিযুক্ত করে। সেখান থেকে তিন বছর পর তিনি মালদা এবং পশ্চিম দিনাজপুরের জেলাজজ হিসাবে বদলী হয়ে মালদায় আসেন।

১৯৬৪ সালে কলকাতায় এলেন। গ্রহণ করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের আইন-উপদেষ্টার পদ। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের একাধারে সম্মানজনক অন্যদিকে যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার গ্রহণ করলেন যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে।

ছাত্রজীবনে দক্ষ ক্রীড়াবিদ হিসাবেও তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ফুটবল ক্যাপ্টেন হিসাবেও তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

আইন ব্যবসায়ের মধ্যেও জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখে গেছেন। মানুষের কল্যাণে সমৃদ্ধিসাধনে এবং উন্নয়নের কাজে পেশাগত কর্মের মধ্যেও আত্মনিয়োগ করেন। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার থাকাকালীন মানবজীবনের নানা রূপ তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং সুখ-দুঃখ ঘাত-প্রতিঘাতময় এই মানবজীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তাঁর সঞ্চয়ে জমা হতে থাকে। নিজের পৈত্রিক গ্রাম (আনিয়া-বদ্যপুর ইউনিয়ান বোর্ডের সভাপতির আসনও তিনি অলঙ্কৃত করেন অত্যন্ত অল্পবয়সে।

তাঁর কর্মনিষ্ঠ জীবনের আগামী দিনগুলি আরও ঘটনাবহুল এবং গৌরবোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিক।

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[বহুপ্রতিভ কথাশিল্পী]

জীবনের নানা রূপ, নানা রঙ, নানা দিক। এই বহুর সমন্বয়ে জীবনকে যিনি যত সফলতার সঙ্গে লেখনীর মাধ্যমে চিত্রিত করতে পারেন লেখক হিসাবে তিনি তত সার্থক, তত কুশলী, তত শক্তিমান। লেখক হিসাবে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আজকের দিনের এই বিপুল জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি হয়তো এখানেই। জীবনের নানা অলিন্দে পড়েছে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সেই-জন্যেই তাঁর সৃষ্টি এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, এত সম্ভারসমৃদ্ধ। কোথায় সাহিত্য-অভিনয়, কোথায় আইন-আদালত আবার কোথায় ব্যাঙ্ক-বীমা। কিন্তু হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, এ'সব একটি ক্ষেত্রেও পারদর্শিতা দেখাতে তিনি কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি।

কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁর আদি বাড়ী। বাবা স্বর্গত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুন-বর্মা রেলওয়ে অফিসের চীফ এ্যাকাউণ্টস অফিসার। মা—শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা দেবী। দুই ভাইয়ের মধ্যে হরিনারায়ণই জ্যেষ্ঠ। ১৯১৬ সালের ২৩-এ মার্চ কলকাতার পৈত্রিক ভদ্রাসনে হরিনারায়ণের জন্ম।

শিক্ষার সত্রপাত রেঙ্গুনেই। প্রথমে বেঙ্গল এ্যাকাডেমী স্কুল এবং পরে রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি কলেজে। ১৯৩২ সালে ডিস্টিংসান নিয়ে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৯৩৮ সালে সফলতা বরণ করলেন আইন পরীক্ষায়। এই পরীক্ষায় সমগ্র বর্মা মুল্লুকে পঞ্চম স্থানটি তাঁর অধিকারে এল। ১৯৩৬ সাল। ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেন। বিষয়বস্তু হল—'রামকৃষ্ণ এ্যাণ্ড হার্মনি অফ রিলিজিয়ান্স'। এই প্রবন্ধ তাঁকে এনে দিল প্রথম পুরস্কার। একটি স্বর্ণপদক। নিখিল ব্রহ্ম সাহিত্য সম্মেলনে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পর পর তিন বছর প্রথম হলেন।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত হরিনারায়ণের আইনজ্ঞ-জীবন। এই সময়ে তিনি রেঙ্গুন কোর্টে ওকালতি করেছেন। ১৯৪০ সালে কলকাতায় ফেরার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য আর বার্মায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। এখানেই রয়ে গেলেন। সাল-

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

তারিখের বিচারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হরিনারায়ণকে দেশের বুকে চিরকালের মত আটকে রেখে দিল, তেমনই প্রথম মহাযুদ্ধও এই রেঙ্গুন থেকেই বাঙলা দেশে ফিরিয়ে দিয়েছিল, বাঙলার এক প্রবাসী সন্তানকে। তিনি সাহিত্যেরই সেবা করে গেছেন। তিনিও চট্টোপাধ্যায় পদবীধারী। আজ সারা বাঙলার অসংখ্য পাঠকের হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও বন্দনার আলোয় মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ উপেক্ষা করতে সমর্থ। বিশ্ব-সাহিত্যের যুগস্রষ্টাদের তালিকায় তিনি একটি স্মরণীয় নাম।

কিছুকাল ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করলেন হরিনারায়ণ। তারপর কিছুদিন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী করলেন। বর্তমানে তিনি ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের সচিব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কর্ম-জীবন বীমা-জগতের মাধ্যমে বিকশিত—বাঙলা দেশে এই বীমা-ব্যবসায়ের পথিকৃতের জয়মাল্য অনায়াসে যাঁর গলায় দুলিয়ে দেওয়া যায়—তিনি সাহিত্য সরস্বতীর একজন একনিষ্ঠ সেবক। তিনি স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যের অনুপ্রেরণা বাবার কাছ থেকেই পান এবং তা ছেলেবেলা থেকেই। বসুমতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলী-সমূহ বাল্যকালেই তাঁর ভিতর লেখার বীজ বপন করে। বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হল সতের বছর বয়সে বাঙলার একটি প্রথম শ্রেণীর অভিজাত পত্রিকায়। প্রথম গল্পও বেরুল তার ঠিক দু বছর পরে বাঙলার তৎকালীন একটি বিখ্যাত পত্রিকায়। যে পত্রিকায় তাঁর প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম উপন্যাসও প্রকাশিত হয় আরও বারো বছর পর। এই উপন্যাসটিই 'ইরাবতী' নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে এক প্রবল আলোড়নের মধ্যে হরিনারায়ণ বাঙলা দেশের এক প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পী বলে গণ্য হন। তাঁর অন্যান্য গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে আরাকান, নারী ও নগরী, অনাদিগন্ত-নায়িকার মন, শহরে-বন্দরে, এই ঘর, এই মন, ক্লান্ত বিহঙ্গী, অন্য দেশ অন্য দাহ, বাসরলগ্ন,

হ ত চ্ছ ড়া

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

পদ্মভূষণ হবেন এবার
মদনচন্দ্র বাড়ুরি
পারেন যদি রুখুন!
ভায়রা, শালা, ফ্রেন্ড্ বা নেবার
সাধ্য তা নয় কারুরই
যতই প্রাণে দুখুন!
আর তা হবার নয়!
জয় মদনের জয়!!

*

মদনচন্দ্র কী কৌশলে
লাভ করলেন সাফল্য
সে-কাহিনী শোনাই—
সবাই ডাকতো মদ্না বলে
যতদিন তার না মল্লো
কারবারী এক বোনাই!
বিধবা বোন দু-য়!
জয়, মদনের জয়!!

*

ব্যবসা ছিল বোনাইদাদার
বদনা এবং গাড়ুরই
খ্যাংরাপটির মুখে—
হাতে পেয়ে লিগ্যাল ব্রাদার
হলো মিস্টার বাড়ুরি
থাকে পরম সুখে!
একেই বলে পয়!
জয়, মদনের জয়!!

*

ক্যাশের টাকায় দিনেধ শেষে
মদন আসে ছোঁ দিতে
ঈষৎ টলতে টলতে—
বিধবা বোন শুকোয় দেশে
মদন শতেক রাতিতে
জ্বালায় প্রেমের সলতে!
নাগর রসময়!
জয়, মদনের জয়!!

*

মুর্শিদাবাদ আর খাগড়াতে
খবর গেল উড়ন্ত
—মদনচন্দ্রে সামলে!
মোরাদাবাদ ও আগ্রাতে
মহাজন সব দুরন্ত
পড়লো এসে হামলে!
মানুষ কী নির্দয়!
জয়, মদনের জয়!!

*

মহাজনদের হুলিয়াতে
মদন হলো ফেরারী
ব্যবসা ওঠে লাটে—
গাড়ু এবং ঝুলি হাতে
গেরস্থদের বেড়ারই
পাশেতে দিন কাটে!
কত না দুখ্ সয়!
জয়, মদনের জয়!!

*

কষ্ট শেষে সয় না প্রাণে
গাড়ুই বেঁধে গলাতে
শরণ নেয় মা গঙ্গার—
জাহাজ যে এক যায় জাপানে
নাড়লো মদন তলাতে
দেখতে পায় সারঙ্ তার!
ভগবান আছয়!
জয়, মদনের জয়!!

*

মালের জাহাজ কাতামারু
জাহাজীদের যা দস্তুর
মদনকে তো তুললো—
দেখে গলায় বাঁধা গাড়ু
শুধোয়—ওটা কী বস্তুর?
দাম কি মহামূল্য?
মুখেতে বিস্ময়!
জয়, মদনের জয়!!

*

মদন তখন বুঝে সুযোগ
বললো তাদের নিকটে
—ভগবান শ্রীবুদ্ধ
করতে বসে দুরূহ যোগ
চা খেতেন এই টি-পটে
পবিত্র, বিশুদ্ধ!
পাত্রটি অক্ষয়!
জয়, মদনের জয়!!

*

চুরি করে বিদেশী চোর
পালাচ্ছিল বিমানে
মদন সুকৌশলে
গুপ্ত থেকে প্লেনের ভিতর
কাবু করেই শ্রীমানে
দিয়েছে লাফ জলে!
কী অকুতোভয়!
জয়, মদনের জয়!!

*

ব্যাস্, মদনের ভাগ্য ফেরে
স-গাড়ু যায় জাপানে
মহামান্য অতিথ্—
জাপানীদের ফেললে পেড়ে
সম্রাট ডাকেন চা-পানে
মুছলো গ্লানি অতীত!
সাহস কী দুর্জয়!
জয়, মদনের জয়!!

*

সেই না থেকে সরবরাহ
করছে মদন বিদেশে
প্রাচীন ভারতীয়
চা-দানি যে যেমন চাহ
গড়ছে হাজার নিমেষে
জিও, মদন জিও!
এমন নইলে হয়!
জয়, মদনের জয়!!

*

মদ্না বলে যতই ডাকো
মদন দেশের সু-সন্তান
কীর্তি বীরোচিত
ডলার আনছে কোটি লাখো
গাড়ু থেকে তার চা খান
স্বয়ং হিরোহিতো!
সারা ভারত কয়—
জয়, মদনের জয়!!

চন্দনকুঙ্কুম, জোনাকীর দীপ, পঞ্চরাগ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা গ্রন্থের সামগ্রিক সংখ্যা পঞ্চাশ। শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ রচনাতেও তিনি পারদর্শী, তাঁর বহু গল্প হিন্দী, মালয়ালী, গুজরাটী, তামিল ও কর্নাটী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর রচিত কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি চলচ্চিত্র মুক্তিলাভ করেছে এবং আরও কয়েকটি ছবি নির্মীয়মাণ।

ভবানীপুরের প্রথিতযশা আইনজ্ঞ স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে অরুণা দেবী তাঁর সহধর্মিণী।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ইনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে মুক্তি-প্রাপ্ত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নামক ছায়াচিত্রে বাঙলা দেশের দর্শক-সমাজ হরিনারায়ণের অভিনয় দেখেছেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভূমিকায়।

॥ মহিলা মহল ॥

॥ পাঠকরা পড়বেন না ॥

● শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য, হুগলী—

প্রথম প্রশ্নে যে কথা বলেছেন, তা স্বাভাবিক। ওই অবস্থাতে প্রত্যেক নারীরই ওই রকম রস নির্গত হয়। ও জন্যে চিন্তার কোন কারণ নেই। সন্তান-এর জন্য বিবাহের পর দু'বছর স্বাভাবিক জীবন যাপন করবেন, তাতেও যদি না হয়, তাহলে চিকিৎসকের কাছে যাবেন। এ নিয়ে ভাববেন না, কারণ বহু ভাল চিকিৎসার উদ্ভাবন হয়েছে।

প্রশ্ন ২: পেটের গোলমালে ভুগি। ছোট ছোট কৃমি আছে---

উত্তর: এ্যান্টিপার অথবা হেলমাসিড ওষুধ চা-চামচের দু'চামচ করে দিনে দুবার সাতদিন খাবেন, তার পর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে Palymin Liquid চা-চামচের ২-চমচ করে ২ মাস খাবেন।

● শ্রীমতী কুন্তলা দত্ত, কলিকাতা,---

ও নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। মাসিকের পূর্বে ও ধরণের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যদি মাসিকের গোলমাল না থাকে তাহলে ভাবনার কিছু নেই।

● শ্রীমতী শান্তা সেনগুপ্তা, জওহর-নগর, গড়ে গাঁও, বাম্বাই-৬২—

Siozan বড়ি সকালে ২টি, সন্ধ্যায় ২টি, ৭ দিন ধরে খাবেন। খাওয়া দাওয়ার বাদবিচারের দরকার নেই। যদি কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকে, তার জন্যে জোলাপ নেবেন সাতদিনের দিন রাতে শোবার সময়। তার পর চবি হওয়ার জন্য শার্কাক্সের'ল বা 'ক্যোডল' জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করবেন।

● কুমারী রেখারাণী সাহা, করুই, বর্ধমান---

প্রশ্ন: আমার বোন। ৭ বৎসর। ক্ষিধে হয় না।

উত্তর: আপনি ওকে ভাত খাবার আধ ঘণ্টা আগে দশ ফোঁটা করে Incremin Drops দুবেলা খেতে দেবেন।

● অমাবিকা, দমদম, কলি-৫২—

আমার মনে হয় কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য ওই ধরণের উপসর্গ হচ্ছে। আপনি দৈনিক একটু বেশি করে শাক খেয়ে দেখুন।

● শ্রীমতী রেখা বসু, ব্যাণ্ডেল—

প্রশ্ন ১: আমার বয়স ৩৩। ২টি সন্তান অম্বলে প্রায়ই বুক জ্বলে যায়। একটি ভাল ওষুধের নাম জানাবেন।

উত্তর: Takacombex (Park Davis) দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু'চামচ করে খাবেন, একমাস।
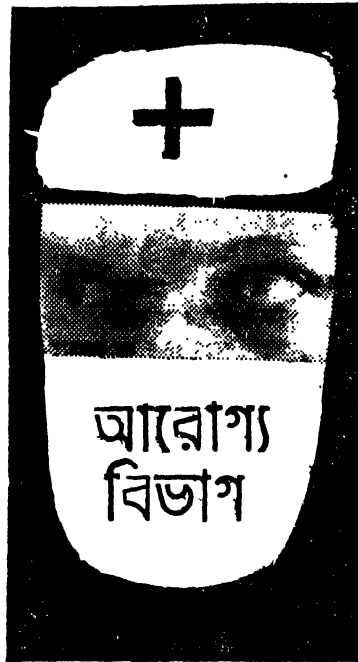
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

প্রশ্ন ২: মনে হয় আমার প্রস্রাবের দোষ আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ঠিকমত প্রস্রাব নির্গত হল না—

উত্তর: আমার মনে হয় আপনার সন্তান প্রসবের সময় যোনিপথ ঢিলে হয়ে গেছে এবং প্রস্রাবের থলি স্বাভাবিক স্থান থেকে নেমে এসেছে। চিকিৎসককে দেখিয়ে প্রয়োজন হলে অপারেশন করিয়ে নেবেন।

● শ্রীমতী অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়, C/o ডাঃ জি সি মুখোপাধ্যায় বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ---

প্রশ্ন ১: প্রায় দেড় বছর পূর্বে জণ্ডিস হয়েছিল, সেই থেকে স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে যায়।

উত্তর: আপনি দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে খাঁটি মধু সারা শীতকাল খেয়ে যান।

২নম্বর প্রশ্নের উত্তর—১নং প্রশ্নের চিকিৎসা করলেই দু'নম্বরের উপকার পাবেন।

● শ্রীমতী আরিফা খাতুন, কলিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে

● শ্রীমতী রাণু ভট্টাচার্য, শিলচর-৫, কাছাড়—

আপনার কোন ভয় নেই। আপনি নিশ্চিতভাবে সেরে যাবেন কথা দিচ্ছি। আপনি কলকাতার যে-কোন বড় হাসপাতালে যোগাযোগ করলেই আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

● শ্রীমতী রমা দাস, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলি-৬—

আপনি দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে 'এ্যাসিনোজাইম' খাবেন এ ছাড়া সকালে ১/২ খানা সন্ধ্যায় ১/২ খানা 'ল্যাক্টিনন' বড়ি খাবেন একমাস।

● শ্রীমতী মালা দে, পুরুলিয়া—

আপনি একদিন অন্তর 2 ml করে ভিটামিন বি কমপ্লেস ইনজেকশন নেবেন। দশটি ইনজেকশন।

● শ্রীমতী মীনা মুখার্জী, সোনামুখী, বাঁকুড়া---

প্রশ্ন: আমার ছেলের বয়স ৩ বৎসর। গায়ে খুব ফোড়া হয়। মাথাতে, বুকে, কাঁধে ছোট ছোট ফোড়া খুব শক্ত ও ব্যথা হয়।

উত্তর: আমার মনে হয় ওর Strepto Staphylo Infection হচ্ছে। স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিন। 'পেনিসিলিন' জাতীয় 'এ্যান্টিবায়োটিকস'দিলেই সুস্থ হয়ে যাবে। অথবা 'অটো-ভ্যাকসিন' করাবেন।

● শ্রীমতী মধুছন্দা গুপ্তা, জহরনগর, গড়ে গাঁও, বম্বে-৬২

আপনি অম্বল এবং বায়ুর প্রকোপে ভয় পেয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আপনার কোন ভয় নেই। আপনি যা খুসি খাবেন কেবল জল ফুটিয়ে খাবেন আর দু'বেলা খাবার ১০ মিনিট আগে এক চামচ করে Elixir Eupeptine খাবেন আর ভাত খাবার পর ২-চামচ করে Taka Combex খাবেন। রাতে শোবার সময় ১টি করে Nevuovitamin 4 (adult) বড়ি খাবেন।

আপনার ছেলের বিষয় আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না জেনে কোন মতামত দিতে পারছি না।

●শ্রীমতী সাগরিকা মিত্র, পাতিপুকুর, কলি-৪৮৬---

আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তিনমাস পর দেখবেন আপনার দুশ্চিন্তার কারণ দূর হয়ে গেছে। আপনি দুবেলা খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Shaskoferrol খাবেন তিনমাস এবং codliver oil অথবা vitamin AD (Sunny's Laboratory) মালিশ করবেন সকালে স্নানের সময় এবং সন্ধ্যার সময় পাঁচ মিনিট ধরে। মালিশ পেছন থেকে সামনের দিকে করবেন।

'সুমতী---' ব্যারাকপুর---

যে চিকিৎসা করছেন, তাই করুন। অস্বীকার করব না। চেষ্টা করব সাধ্যমত

●শ্রীমতী বৈশাখী সাহা, রঘুনাথপুর, ২৪ পরগণা---

আপনি দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Haliborange খাবেন তিনমাস।

পুরুষ মহল

(পাঠিকারা পড়বেন না)

●শ্রীসমর চন্দ্র, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান---

আপনার কুপন না দেওয়া চিঠি পড়লাম। কুপন ছাড়া চিঠির উত্তর দেওয়ার নিয়ম নেই, এবারের মত দিলাম। যদি অন্য কোনদিকে অসুবিধা না থাকে, তাহলে বিবাহ করুন। হাঁপানির জন্য যথযথ চিকিৎসা করান। রাণীগঞ্জে বহু শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক আছেন।

●শ্রীসুধিনকুমার মিত্র, লায়ন্স রেঞ্জ, কলি-১---

ওই বয়সে নারীদের ওই ধরণের উপসর্গ দেখা দেয়; আপনি চিকিৎসক দেখিয়ে চিকিৎসা করান। আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি parendram Linguate বড়ি জিবের তলায় রেখে দেবেন একমাস ধরে।

●শ্রীসুবীরকুমার রায়, গার্ডেনরীচ, কলি-২৪---

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Metaton (Park Davis) ওষুধ খবেন একমাস ধরে।

●মিঃ সরকার, কলি-১২---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম, "বিজয়ার নমস্কারের প্রতিনমস্কার গ্রহণ করবেন। আপনি Paladec ও Calcinol অথবা Pulmocod (Plain) জাতীয় ওষুধ সমস্ত শীতকাল ধরে খেয়ে যান। ওষুধ বদলে আপনি যত না উপকার পাবেন তার চেয়ে বেশি উপকার পাবেন অনেক দিন ধরে একই ওষুধ খেলে।

●শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, হুগলী---

প্রশ্ন---পুরুষলিঙ্গে দুধের ছানার মত দেখিতে একপ্রকার পদার্থ জন্মায়, উহা কি? উহা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর না হিতকর?

উত্তর: ওগুলো একজাতীয় ময়লা। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক পুরুষের হয়, এবং নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

আরোগ্য বিভাগ

নাম-------------------------------------

ঠিকানা-------------------------------

মাসিক বসুমতী

● নাম জানাতে অনিচ্ছুক, বাতসর, হাওড়া--

স্বপ্নদোষ দূর করতে হলে অহেতুক যৌনচিন্তা ত্যাগ করতে হবে---

● শ্রীনির্মলেন্দু বাচস্পতি, চন্দনপুকুর ব্যারাকপুর---

আপনার পুত্রের বিষয় কোন ভয় নেই। আপনি প্রস্রাব এবং রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিন ডায়াবিটিস মেলিটাস রোগ আছে কি না? যদি থাকে, তার চিকিৎসা করাবেন, যদি না থাকে, Nervigor with Vitamins and Formats ১ চামচ (চা-চামচের) করে দু'বেলা খাবেন।

শ্রীএন ঘোষ, কলি-৫---

আপনি সকাল সন্ধ্যা ২ চামচ করে Pulmocod (plain) খাবেন, তিনমাস ধরে।

● শ্রীঅনুপম বোস, লক্ষ্ণৌ---

এখন আপনি মাথায় বিশুদ্ধ নারকোল তেল মাখুন।

● শ্রীদেবানন্দ মুখার্জী, হুগলী---

আপনি দু'বেলা তেল মেখে, জলে ভিজিয়ে ব্রাশ করে চুল আঁচড়াবেন। হয়ত চুল নরম হতে পারে।

● শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায়, খোসবাগান, বর্ধমান---

Amicline বড়ি সকালে ১টি দুপুরে ১টি, সন্ধেয় ১টি ১০ দিন খাবেন, তার পর Aminozyme দু'বেলা ভাতখাবার পর চা-চামচের ৩ চামচ করে খাবেন।

● শ্রী আর সি সাহা, পাথুরিয়াঘাটা, কলি-৬---

আপনার কোন ভয় নেই। ওটা কোন রোগ নয়।

● শ্রীনকুলেশ্বর চক্রবর্তী, কাজীপুর, পাটনা---

ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীঅমরনাথ মেদ্দা, সেহারা, বর্ধমান---

প্রশ্ন ১: দাঁত হইতে রক্ত পড়ে।

উত্তর: আপনি কলগেট মাজন দিয়ে আঙুল দিয়ে রগড়ে দাঁত মাজুন। ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। ভিটামিন সি খাবেন। এ ছাড়া দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Haliborange খাবেন তিন মাস।

● শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ হালদার, কুলপী, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা---

আপনি নিয়মিত দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Metatone খাবেন দু'মাস।

● শ্রীঅসিত চক্রবর্তী, দক্ষিণ চাতরা, ২৪ পরগণা---

আপনার ব্যাপারে চিন্তিত হবেন না। আপনার স্ত্রীকে Amebamagma দু'চামচ (চা-চামচের) করে দিনে তিনবার সাতদিন দেবেন।

● শ্রীরমানাথ মুখার্জী, চাঁপদানী, মায়াভবন---

আপনি দু'বেলা খাবার আগে ১ চামচ করে Neogadine খাবেন একমাস

● শ্রীসপ্তর্ষি মণ্ডল, নায়কাবাজার---

প্রশ্ন ১: আমার এক বৎসর যাবৎ দাদ হয়েছে।

উত্তর: আপনি ঢোল কোম্পানীর দাদের মলম ব্যবহার করুন।

প্রশ্ন ২: জাঙ্গিয়া ব্যবহার করলে কি দাদ হয়?

উত্তর: হতে পারে।

● শ্রীশঙ্করকুমার ঘোষ, থান জোরা চা-বাগান, দার্জিলিঙ---

আপনার কোন রোগ নয়। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।

● শ্রীবি দাস, শ্রীরামপুর---

আপনি দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Diapepsin খাবেন।

● শ্রীঅশোককুমার সামন্ত, কলাইকুণ্ড, রামনগর, হুগলী---

আপনি দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে এ্যামিনোজাইম খাবেন।

● নাম ঠিকানা দিতে অনিচ্ছুক---

আপনি দুবেলা খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Sioplex Lysine খাবেন একমাস ধরে।

● শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রিন্স আনওয়ার শা রোড, কলি-৪৫---

প্রশ্ন: উড়কা কেন সারবে না?

উত্তর: শিশুদের জ্বর হলেই উড়কা হয়। এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আমার মতে E. E. G. করাবার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

● শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, ইস্ট বেলঘরিয়া, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আমার মনে হয় আপনি পূর্বে যে ইনজেকশন নিয়েছিলেন, তাই আবার নিন।

● শ্রীভোলানাথ দাস, নদীয়া---

প্রশ্ন: আমার কন্যার বয়স ১৮। তাহার মুখের দুই ধারে Spot পড়িতেছে।

উত্তর: আপনি Liv52 বড়ি সকালে ১টি সন্ধ্যায় ১টি খেতে দেবেন একমাস এবং Livoderm মলম লাগাবেন দিনে দু'বার।

● সেখ লাল মোহন, ধনিয়াখালী, কালিকাপুর, হুগলী---

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। না, কোন দোষের নয়।

● শ্রীশতদল মুখার্জী, সোনামুখী---

আপনার দীর্ঘ চিঠি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি। সন্তানদের মধ্যে ওই রোগ সবসময়ে বর্তায় না। অনেক সময়ে দেখা গেছে রোগগ্রস্ত পিতামাতার সুস্থ সন্তান। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সকলের রক্ত পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য উপদেশ চিঠিতে দেওয়া সম্ভব নয়।

● শ্রীনরেন্দ্র পাল, চাকদহ, নদীয়া---আপনি Medical-এর Outdoor-এ বিশেষজ্ঞকে দেখান। এ ধরণের রোগ নিয়ে হেলা করবেন না।

● শ্রীসত্যরতন গঙ্গোপাধ্যায়, ওল্ড নিমতা রোড, কলি-৪৯---

আপনি দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Sioplex Lysine খাবেন দু'মাস।

● শ্রীসমর পাল, লিলুয়া,---

আপনার চিঠি সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

● শ্রীসোমনাথ মিত্র, মীরবাজার, মেদিনীপুর---

আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। আপনার দাদার পরে Tarsolone মলম লাগাবেন দিনে দু'বার।

● শ্রীশরদিন্দু বসু, বালেশ্বর, উড়িষ্যা---

● আপনি নিয়মিত দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে B-Neurophos খাবেন দু'মাস।

● শ্রীকাজলকুমার রুদ্র, পদ্... রোড, কদমা, জামসেদপুর---

আগে পিঠের একটি এক্সরে করে নিন। যদি কোন দোষ না পাওয়া যায় তাহলে Siobutazone বড়ি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি, দশদিন খেয়ে দেখতে পারেন।

● শ্রীএম মিত্র, কলিকাতা---

আপনাকে ধূমপান ছেড়ে দিতেই হবে। সকাল সন্ধ্যা চা-চামচের ২-চামচ করে খাঁটি মধু খাবেন।

● শ্রীকেশবচন্দ্র দেবনাথ, দুর্গাপুর-৪—

আগে রক্তপরীক্ষা করে জেনে নিন কোন দোষ আছে কি না। না থাকলে দু'বেলা খাবার পর ২টি করে Nevrovitamin 4 (adult) বড়ি খাবেন।

● সাবর্ণ ঘোষ, টাকী, ২৪ পরগণা—

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Haliborange খাবেন। উচ্চতা কমাবার উপায় আমার জানা নাই।

● শ্রীসুব্রতকুমার সাহা, আলিগঞ্জ মেদিনীপুর---

আপনি মুখে Eskamel মলম মেখে দেখতে পারেন। চর্মরোগ সাধারণত অপরিষ্কার থাকার জন্য হয়।

● নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক, শ্যামচক, মেদিনীপুর---

প্রশ্ন : মাড়ির ক্ষয়, ও রক্তক্ষরণ কি করে বন্ধ হয়?

উত্তর : ব্রাশ ব্যবহার করবেন না হাত দিয়ে মাজবেন। ভাল মাজন দিয়ে মাজবেন। রোজ দু'বেলা Hygina Granules দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলবেন। Vitamin C খাবেন।

ঝড়ের চেতনা

সমরেন্দ্র পাল

সমুদ্রে সাইক্লোন—বিকেলের সন্ধ্যা মাটি-মেঘে ঢাকা
আকাশের মুখ—
সৈকত খালি—সোনাবালি ছুটন্ত ছুঁচ-হাওয়ার পদক্ষেপ
নটরাজ-পৃথিবীতে ঝড়;
ঢেউগুলি দুরন্ত স্বাধীন বল্গাহীন বন্যঘোড়া—খুরে খুরে
মাটি জল লবণাক্ত ফেনা—
গতির চৈতন্যে কেঁপে ওঠে স্থিতি, শিলাস্তর,
বিশাল আয়তন সৈকত জড়;
পরিত্যক্ত নৌকার বিজোড় তক্তাগুলি খোঁজ করে অভিজ্ঞ নাবিক
জোড়বাধার সম্ভার দড়ি ঘাস খড়।
সমুদ্রের ভিতর বিরোধ, অবরোধ ভাঙার শব্দ, বিপ্লব,
বিক্ষোভ মিছিল, অসাম্য অসুখ।

অবশেষে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর, কেবল শব্দ আর
শব্দের পরাক্রম, ভীষণ আক্রোশ
বারান্দার আলো ছেড়ে ছুটে গেল হঠাৎ দুজন—মানুষ-মানুষী
আর তাদের যৌবন
চলে গেল ঢের দূর যেন কত কত ক্রোশ।
ফেলে গেল লজ্জা ভয় বাধা দিনের বসন
যেন তারা নিজেদের দেখেছে দর্পণ-আন্দোলিত প্রতিভাস—
জেনে গেছে
রক্তের বিক্রম, রংফেরা পরিবর্তন
সমুদ্র মন!
মানুষ-মানুষী দুটি যেন তুমি আমি কত চেনা। ঝড়ের চেতনা!

খেলাধূলা

ক্রীড়ারসিক

অলিম্পিকের খবর

গত ১২ই অক্টোবর যে শহরটি উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল, সারা বিশ্বের মধ্যে ১১২টি দেশের প্রতিনিধি সমাগমে যে শহরটি ঝলমল করে উঠেছিল প্রতাগ্নির অনির্বাণ দীপশিখায় আর সাত হাজার প্রতিযোগীর বাদ্যের তালে তালে মার্চ পাস্ট-এ যোগদানের ভিতর দিয়ে যেখানকার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। প্রায় একলক্ষ দর্শকের হাসি-কান্নায় দোলায়িত ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছিল আজ সেখানে নেমেছে বিষাদের ছায়া, দু হাজার শান্তি পারাবত আর চল্লিশ হাজার বিভিন্ন বর্ণের বেলুনের বর্ণাঢ্য শোভা আজ বিলীন, শুধু স্মৃতিভারে পড়ে আছে মেক্সিকোর ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ।

আজ তারি কথা লিখতে বসে ভাবছি কোন কথা আগে লিখব কোন খবর আগে জানাব। অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রথম স্থানাধিকারী এ্যাথলেটদের জীবনী, না ভারতের পরাজয়ের কাহিনী, না অলিম্পিক মাঠের টুকরো টুকরো কথা---যার মধ্যে অনেক কিছুই গ্রহণ করার আছে আমাদের দেশের উদীয়মান এ্যাথলেটদের। শেষেরটা দিয়েই তাই সুরু করছি।

এবার অলিম্পিকে যোগদানকারী ৭০০০ প্রতিযোগীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ যে---তার নাম ফেলিপ মনোজ। বয়স তার ১৭। সে এখনও স্কুলের ছাত্র। মেক্সিকোর ঐ যুবকই এবারে ২০০ মিটার বুক-সাঁতারে প্রথম হয়ে উপরে উঠলে প্রায় দশ হাজার দর্শক তাকে ঘিরে ধরে নাচতে আরম্ভ করে। ভালবাসার অত্যাচারে ছাত্রটি হাঁপিয়ে ওঠে। শহরময় বাজী পোড়ানোর ধুম পড়ে যায়। বিজয়মঞ্চে দাঁড়ানো মনোজকে দেখার জন্য মেক্সিকোর প্রতিটি মানুষ উৎসুক হয়ে ওঠে। দর্শকরা কমবয়সী ঐ ছেলেটিকে দেখে ফুল ছুড়তে সুরু করে। আনন্দমুখর দর্শকদের মধ্য থেকে অতি কষ্টে মনোজকে বাইরে আনলে, সে বলে, 'এত বড় পদক, এ নিয়ে আমি কি করবো জানি না।'

মেক্সিকোর উঁচু জায়গায় বাতাসে অক্সিজেনের অভাবে প্রায় প্রতিদিনই কোন-না-কোন প্রতিযোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। বহু মহিলাও তার মধ্যে আছেন। সবচেয়ে বিষাদের কথা রন ক্লার্কের মত বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর, ১৭ বার যিনি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী, তিনিও অক্সিজেনের অভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং ষষ্ঠ স্থান অধিকার করার ফলে অলিম্পিক স্বর্ণপদক লাভে বঞ্চিত হন।

মেক্সিকো অলিম্পিকে 'হ্যামার থ্রো'তে ভারতের প্রতিযোগী পরভীনকুমার মেক্সিকান বালিকা টিনা মারিয়ার অটোগ্রাফের খাতায় স্বাক্ষর দিচ্ছেন

আমেরিকার ফেনসিং দলের সদস্যা ৫৭ বছর বয়সী মিসেস জ্যাকলিন মিচেলকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এক সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্থাৎ ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া কোন মহিলা প্রতিযোগীকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেওয়া হবে না শুনে বলেছেন, 'কি লজ্জা। বাড়ীতে তাঁর ৪টি ছেলে ৮টি নাতির কাছে কি বলবেন এইটাই তাঁর কাছে সমস্যা।'

টিকিটের কালোবাজারী শুধু ভারতেই নয় এটা অন্যান্য রাষ্ট্রেও আছে দেখা যাচ্ছে। মেক্সিকো অলিম্পিকের ভারতীয় মুদ্রায় ১০০ টাকা মূল্যের টিকিট বিক্রি হয়েছে ৭৫০্ টাকায়। কর্মকর্তাদের কাছে এ খবর গিয়ে পৌঁছুলে তাঁরা ১০০০০টি টিকিট বাজেয়াপ্ত করেন।

গাছে চড়া ল্যাম্প পোস্টের উপরে ওঠা বাড়ীর ছাদে অথবা স্টেডিয়ামের পাঁচিল টপকেও বহু অত্যুৎসাহী দর্শক জীবন বিপন্ন করে এ খেলা লক্ষ্য করেছেন।

সরাসরি হাতাহাতিও যে খেলার মধ্যে হয় নি তা নয়। 'স্পেন ও মেক্সিকো'র মধ্যে হকি খেলার সময় এরূপ মারামারি চলে। দর্শকরাও অর্থাৎ আপন আপন দলের সমর্থকরাও নিজেদের মধ্যে ইট ছোড়াছুড়িও করে।

এ ছাড়া ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতাতেও যুগোশ্লাভ ও পূর্ব জার্মানীর খেলায় রীতিমত মারামারি হয়েছে। এর ফলে রেফারীকে উভয় দলের একজন করে খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে

বহিষ্কার করে দিতে হয়েছে। মারের দরুণও যুগোশ্লাভ দলের একজনের নাক থেকে প্রচুর রক্ত পড়ায় তিনি বাইরে যান।

অলিম্পিকের একটিমাত্র বিষয় যার স্বর্ণপদক কোনদিন মার্কিন মুলুকের বাইরে যায় নি এবারও সে বিষয়ে আমেরিকা বিশ্ব রেকর্ডের কৃতিত্বে স্বর্ণপদক পেয়েছে। বিষয়টি হোল পোল ভল্ট। বব সিগ্রেন ১৭ ফুট সাড়ে ৮ ইঞ্চি লাফিয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন

পুরুষদের হাতুড়ি ছোঁড়ায় ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি প্রবীণ কুমার ফাইনালে ছোঁড়বার যোগ্যতাই লাভ করতে পারে নি। অথচ এ বিষয়ে ভাল ফল লাভ করবে বলেই তিনি ডিসকাস ছোঁড়ায় যোগদান করেন নি। তিনি যা ছুঁড়েছেন, তা তাঁর নিজের জাতীয় রেকর্ডের থেকেও কম। ফাইনালে ওঠার মান ছিল ৬৫'৬৮ মিটার।

আমেরিকার ২২ বছর বয়সী নিগ্রো লাফিয়ে বব বীমনের ২৯ ফুট আড়াই ইঞ্চি লাফের দূরত্বকে অলিম্পিক রেকর্ড বা বিশ্ব-রেকর্ডের নিরিখে মাপ করা হয় নি---এ্যাথলেটিকসের বিচারকরা দূরত্ব মেপে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বলেছেন, এ্যাথলেটিক বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিশ্ব-রেকর্ড থেকে এক ইঞ্চি অথবা দুই ইঞ্চি বেশী লাফাতেই যেখানে কয়েক বছর কেটে যায় সেখানে প্রায় ২৪ ইঞ্চি লাফান সত্যিই বিস্ময়কর।

অলিম্পিক প্রাঙ্গণে সবচেয়ে বেশী করে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। যেদিন ১৭টি বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার রন ক্লার্ক ১০০০০ মিটার দৌড়ে হেরে যান। অলিম্পিক অঙ্গনে সেদিন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বহু অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধি। শিশুর মত তাঁরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। অস্ট্রেলিয়াবাসীর কাছে এ দুঃখ জাতীয় দুঃখের মতই বেজেছে। অস্ট্রেলিয়ার একজন ডাক্তারও ক্লার্কের অজ্ঞান এবং অচৈতন্য অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

ক্লার্ক নিজে বলছেন, আমি পুনরায় ১০০০০ মিটার প্রতিযোগিতায় যে-কোন প্রতিযোগীকে পরাস্ত করতে পারি কিন্তু হালকা বাতাসকে পরাস্ত করতে পারি না। হালকা বাতাসে শ্বাসকষ্টের কারণই অক্সিজেনের অভাব। আমার হারার কারণ মুখ্যতঃ তাই।

আগামী সংখ্যা থেকে কয়েকজন প্রথম স্থানাধিকারী এ্যাথলেটদের পরিচিতি দেওয়া হবে।

অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের মার্চ পাস্ট

গানের এই ঝর্ণাতলায়

অর্চনা মিত্র

সঙ্গীতকলায় মানবজীবনে সুখ ও আনন্দ হয়। এই কলার বিকাশ, যুগে যুগে মানব-মস্তিষ্কে বিকশিত হয়েছে।

আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, শব্দরূপী 'ব্রহ্ম' অনাদি, বিনাশহীন ও একটিমাত্র---'শব্দ'---'ব্রহ্ম'। সুতরাং শব্দ দ্বারাই মানুষ জানতে পারছে---'ব্রহ্ম'। শব্দই মানুষের মনোভাব প্রকাশে সাহায্য করে।

ভারত সঙ্গীতের পীঠস্থান। ভারত প্রাচীনযুগ থেকে ঠাট, গ্রাম, রাগ-রাগিণীদের রূপাঙ্কন করেছে। স্বর-লিপি পদ্ধতির সাথে সে বহুদিন পরিচিত।

মানবমনের প্রতিটি অবস্থা, যেমন হর্ষ, শোক, বিরহ, মিলন, করুণা, আনন্দ-বিষাদ ইত্যাদি সঙ্গীতের দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব। অন্তরের ভাবগুলি, সুর ও তালের সহযোগে গীতে নৃত্যে বাদ্যে ফুটিয়ে তোলা যায়। সুতরাং সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীগুলির প্রয়োগ অপরিহার্য।

রাগ দুই প্রকার। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ।

পুরুষ রাগগুলি---সাহস, ক্রোধ ও হাস্যরসের পরিচায়ক। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে পাঁচ রাগ ও তার ছত্রিশ রাগিণীর উল্লেখ আছে। পাঁচ রাগ---ভৈরব, মালকোষ, দীপক, মেঘ ও হিন্দোল।

মনে হয়, আমাদের দেশের ছয়টি ঋতুর কল্পনায়, এদের সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দেশের লোকেরা ধর্ম-প্রবণ। তাই, দেব-দেবীদের কল্পনা করেই, রাগিণী ও রাগেদের সৃষ্টি হয়েছে।

স্ত্রী-জাতীয়া রাগিণীগুলি, প্রেম, বিরহ, দুঃখ ইত্যাদি ভাবগুলিকে ব্যক্ত করে। যেমন—ভৈরবী রাগিণী। তার মধ্যে প্রেম ও ভক্তিরস পাওয়া যায়। তার রূপটি যোগিনীর মত। সে মহা-দেবের পূজা করে।

'মল্লার' রাগে ভক্তি রস, বিরহ রস আছে। মীরাবাঈ-এর অনেক ভজন মল্লার রাগে গাওয়া হয়। কৃষ্ণভক্তির ভাবটি এবং কৃষ্ণের বিরহ 'অসহ্য' এই ভাবটি গানের কথাগুলির সাথে সুরটির মধ্যে মিশে যায়।

তোড়ী রাগিণীকে এক সুন্দরী যুবতীর রূপে দেখা হয়েছে। সে বীণা বাদন করে। তার সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে বনের হরিণ তার কাছে ছুটে এসেছে।

শাস্ত্রে রাগ-রাগিণীগুলি গাওয়ার সময় নির্ধারণও করা আছে। অনেক সময় যেন মনে হয়, এই ধরণের গোঁড়ামী একটু কম হলে, ভালো হত। যেমন---ভূপালী, বসন্ত সকালে গাওয়া উচিত। মালকোষ গ্রীষ্মকালে দিনের প্রথম প্রহরে গাওয়া ভালো।

রাগ মালকোষ, গম্ভীর স্বভাবের। গভীর রাত্রে গাওয়া হলে যথেষ্ট শ্রুতি-মধুর হয়। তবুও 'শাস্ত্রের বচন।'

শ্রী ও সারং মধ্যরাত্রে গাইবার নিয়ম। মূলতানী দিনের দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে গাওয়া উচিত।

তবুও সন্ধি-প্রকাশ রাগ-রাগিণী-গুলির অর্থ আছে। প্রাতঃকালীন সন্ধি-প্রকাশ রাগ-রাগিণী, যেমন ভৈরব, কালিংড়া ইত্যাদি, যাতে কোমল 'রে' কোমল 'ধা' ও শুদ্ধ 'মা' ব্যবহৃত হয়, প্রাতঃকালে গাওয়া হয়। সন্ধ্যাকালীন রাগ-রাগিণীগুলি যাতে কড়ি 'মা' ব্যব-হৃত হয়,---যেমন পূরবী, পূরিয়া ইত্যাদি সন্ধ্যায় গাওয়া হয়। আহীর ভৈরব কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় গাওয়া উচিত নয়, কারণ, কোমল নিষাদের প্রয়োগ করা হয়।

কোমল 'গা' ও কোমল 'নি' সম্বলিত রাগ-রাগিণীগুলি গাওয়ার সময় হল—দিনের দশটা থেকে তৃতীয় প্রহরের বেলা চারটা পর্যন্ত।

যে রাগ-রাগিণীতে শুদ্ধ 'রে', শুদ্ধ 'ধা' আছে ও শুদ্ধ 'মা' আছে সেগুলি সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত গাওয়া যায়।

যে রাগ-রাগিণীগুলিতে, একসাথে কোমল 'রে' ও কোমল 'ধা' ও শুদ্ধ 'মা' আছে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত গাইলে শ্রুতিমধুর হবে।

মনে হয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গীতশাস্ত্রীরা নিজেদের যুগের পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা ও সময় বুঝেই রাগরাগিণীগুলির গাইবার সময় নির্ধারণ করেছিলেন।

অনেক সময়, আজকের দিনে রাগ-রাগিণীগুলি সময় অনুযায়ী গাওয়া হয় না। মূল রাগ-রাগিণীর স্বরগুলিও হয়তো ঠিকমত প্রয়োগ করা হয় না।

আজকের দিনে, দীপক রাগের প্রভাবে আগুন জ্বলে ওঠে না বা 'মেঘ' রাগের বশীভূত বর্ষাও হয় না। আজকের দিনের কলা-প্রেমী নৃত্য শিল্পে, যৌন অনুভূতির অভিব্যক্তি দর্শন করেন অথবা নৃত্য-শিল্পে কেবলমাত্র চোখের পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

নৃত্যও সঙ্গীতের অংশ। যার মূল—শব্দ এবং যার দ্বারা মানুষ 'ব্রহ্মের' অস্তিত্ব স্মরণ করছে প্রতিনিয়ত॥

নাট্যলোক

মহেশ

রঙ্গরূপ নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি অভিনয় করলেন শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নাট্যরূপ, সু-অভিনীত এই নাটকে চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য দর্শকদের প্রশংসা পান পিনু ঘোষ, ম[illegible]ন রায়, শচীদুলাল চক্রবর্তী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, রথী সিনহা, খোকন গঙ্গোপাধ্যায় দুলাল দত্ত, পিনাকি চৌধুরী, রজত চক্রবর্তী, বাবলু বসাক, স্বপন, বাবুয়া ও অজয়। নাটকটি পরিবেশনার ব্যবস্থা করেছিলেন বালীগঞ্জ বয়েজ ক্লাব, নির্দেশনা পিনু ঘোষের, সঙ্গীত নির্দেশনায় অনিল ঘোষ।

দুই মহল

বাগমারী বন্ধুমহলের তৃতীয়বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ বন্যাত্রাণ তহবিলের সাহায্যার্থে প্রতাপ মেমোরিয়ালে মঞ্চস্থ হল 'দুইমহল' নাটক। দলগত অভিনয়ে নাটকটি উপভোগ্য, বহু অংশে শিল্পীদের অভিনয় উচ্চ পর্যায়ের হয়েছিল। অভিনয়ে প্রশংসা পাবেন প্রদীপকুমার, লোধ রায়, লক্ষ্মী হালদার, রঞ্জিত বসু, গোবিন্দ দত্ত, শঙ্কর দে, বেনু সেনগুপ্ত, তুষার দত্ত, বাদল সাহা, অনুপ ভট্টাচার্য, প্রসাদ দাশগুপ্ত, গীতা দে ও আরো অনেকে। নাট্য-নির্দেশনা রঞ্জিত বোসের।

শ্রীমতী সুনন্দা রায়

বর্তমানে যাঁরা সুষ্ঠু রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন শ্রীমতী সুনন্দা রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।

এমন সুমিষ্ট কণ্ঠ ও বলিষ্ঠ গায়কী আজকের দিনে সত্যাই দুর্লভ। কোলকাতায় এবং বাইরে বিভিন্ন অভিজাত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

শ্রীমতী রায় বললেন, 'খুব ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি আমার একটা গভীর আকর্ষণ ছিল, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি।

আমার দুই দিদি গীটারে যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজাতেন, আমি সেই সুরে গলা মিলিয়ে গান গাইতাম।

শ্রীমতী সুনন্দা রায়

আমার বাবা-মা দুজনেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্ত। আমার মা বলতেন, 'বড় হলে তোকে ভালো গানের স্কুলে ভর্তি করে দেব।'

বেশ মনে আছে বারো বছর বয়সে বাবা-মা'র সঙ্গে 'উদীচী'তে এসে ভর্তি হলাম। যেমন সুন্দর পরিবেশ তেমনি সুন্দর শিক্ষণপদ্ধতি। সেটা ১৯৫৬ সালের জুলাই মাস। সেই সুরু হল আমার গান শেখা। শিশু-বিভাগে ৩ বছর ও সাধারণ বিভাগে ৫ বছর শিক্ষা গ্রহণ করে 'কৃতিত্ব'পত্র পেলাম। সেটা ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাস। তারপর ১৯৬৬ সালে বি-এ পরীক্ষাতেও সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হই এবং তারপর থেকেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমার জীবনের একমাত্র সাথী।

বর্তমানে 'শৈলেশদা'র (ভড়) স্নেহচ্ছায়ায় 'উদীচী'র শিক্ষিকা এবং নিয়মিত শিল্পী হিসাবে 'উদীচী'র প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে যোগদান করে থাকি। এবং সঙ্গীতের সাধনায় ব্রতী আছি।

সংক্রান্তি

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া পার্কসার্কাস শাখার কর্মীরা সম্প্রতি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' অভিনয় করেন —রঙমহলে, নাটকের দুর্বার গতিবেগের সঙ্গে এই কুশলী শিল্পীরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন, ফলে এঁদের অভিনয়ের সুরটি ছিল চড়া এবং দর্শকরা এই দুয়ের দ্বন্দ্বটুকু সারাক্ষণ অসীম আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন। চমৎকার অভিনয়ের জন্য সর্বপ্রথম যাঁদের নাম উচ্চারিত হবে তাঁরা হলেন—রাধাশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ ভট্টাচার্য, সুকুমার দাস, প্রভাত ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, অমল দত্ত, প্রশান্ত গুহ ও রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট)। অন্যান্য চরিত্র মোটামুটি সু-অভিনীত করেছেন রোহিনী মজুমদার, বিষ্ণু দত্ত, শ্যামল মৌলিক, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ দাশগুপ্ত, তাপস চৌধুরী, সুশীল দত্ত, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, কল্পনা বাগ প্রমখ শিল্পীরা। নাটকের নির্দেশক ছিলেন কুসুম নাগ।

বিচিত্র সংলাপ

সংলাপী নাট্যদল বিজয়া-সম্মিলনী উপলক্ষে হাওড়া নবীন দল পূজামণ্ডপে অভিনয় করলেন, শক্তিব্রত চৌধুরীর একাঙ্ক নাটক 'বিচিত্র সংলাপ'। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে আছেন--যাদব বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিব্রত চৌধুরী, অবনী কর্মকার, অসীম দাস, শংকর দলুই, দিলীপ মিত্র, বিমল বিশ্বাস, কিশোর দত্ত, ও তাপস চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং।

অহল্যা উদ্ধার

উত্তর কোলকাতা সার্বজনীন পূজামণ্ডপে ছোট ছোট ছেলেদের মিলিত প্রচেষ্টায় অভিনীত হল 'অহল্যা উদ্ধার'। নাটকে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের বয়স সকলেরই দশের মধ্যে, সেদিক থেকে এদের অভিনয় দর্শকদের অবাক করেছে। নাটকের বহু অংশই এদের অভিনয়ে যথার্থ প্রতিফলিত, শিল্পীদের মধ্যে প্রশংসা পাবেন সকলেই। তবুও কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য। যেমন সঞ্চিতা, সবিতা, মিনতি, সীমা ও বাণী পাল, নাট্যকার ও নির্দেশক ছিলেন অশোক রায়।

কিশোর কল্যাণ সংস্থা সপ্তডিঙা

কলকাতার কিশোর কল্যাণ সংস্থা সপ্তডিঙা এবার পূজায় শতাধিক কিশোর-কিশোরীদের একটি দল নিয়ে নয়া-দিল্লীর কালীবাড়ী, বেঙ্গল ক্লাব, মিণ্টো রোড, রাজপতনগর, সফদরজঙ্গ প্রভৃতি পূজামণ্ডপে আলিবাবা, শ্যামা, সাত-ভাই চম্পা নৃত্যনাট্য এবং সোনালী সিং, নকল রাজা ও মুখোশ নাটক সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করে কলকাতায় ফিরেছে,। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন---শ্রীসুশীল চন্দ্র দাস ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে---কুমারী রূপালী ভট্টাচার্য, কাকলী দাস, শান্তা গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, রাজশ্রী দাশগুপ্তা, সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়, সান্ত্বনা রায়, তাপস চট্টোপাধ্যায়, গোপা চট্টো-পাধ্যায়, অনিতা চক্রবর্তী ও অর্চনা বর প্রমুখ। সমগ্র দলটি পরিচালনা করেছেন প্রলয়জী।

জাপানে যাদুকর সরকার জুনিয়র

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলনীর আমন্ত্রণে যাদুকর পি সি সরকার, জুনিয়র (প্রদীপচন্দ্র সরকার) সাত হাজার পাঁচশ সভ্যবৃন্দের মাঝে তাঁর মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ছবিতে Radio Japan-এর আয়োজিত এক সাক্ষাৎকারে যাদুকর সরকার জুনিয়রকে দেখা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় ইন্দ্রজালের প্রতিনিধিত্ব করতে শ্রীসরকার জুনিয়র জাপানে গেছেন তিনবার এবং আগামী বছর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের জন্য আবার আমন্ত্রিত হ'য়েছেন।

সম্রাটের মৃত্যু

স্থানীয় যাযাবর-গোষ্ঠী সম্প্রতি ডায়মণ্ডহারবার স্টেশনের কাছে দিবাকর ঘোষের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন 'সম্রাটের মৃত্যু'। নাটকটিতে, বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন--হিরণ্ময় হালদার, দিবাকর ঘোষ, শঙ্কুরাম মান্না, শঙ্কর নন্দী, আবদুল্লা এল কাফি, প্রভাত-কিরণ দাস, বাদল ঘোড়াই, তুষু সেন, পান্নালাল ভাণ্ডারী, দিলীপ কর, বিমল দাস, সমর মণ্ডল, বাসুদেব মণ্ডল, প্রভাতেন্দু হালদার, সবিতা দাস, দীপা দাস।

একক অভিনয়

একক অভিনয়ের কৃতিত্ব---শিল্পীর নাম সাহাদত হোসেন। শুধু কলিকাতায় নয়, সারা বাংলায় এই শিল্পীটির নাম ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীহোসেন একাই শিল্পী। বিভিন্ন চরিত্রে একক অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই শিল্পীটির জুড়ি মেলা ভার গত কয়েক দিন ধরে হাওড়া জেলা রবীন্দ্রমেলা, বাগজার সার্বজনীন, বরানগর বাটা ফ্যাক্টরী, পার্ক সার্কাস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন নাটকের রূপ দিয়েছেন শ্রীহোসেন একাই---এবার রবীন্দ্র মেলায় শ্রীহোসেন একটা পেন ও কিছু অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন। একক অভিনয়ের জায়গাটা পূরণ করতে পেরেছেন বলে আমরা শ্রীহোসেনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। ওনার করতলগত নাটক সিরাজ-দ্দৌল্লা, কলিকাতার বুকে, মানুষ, বৌদির প্রেম প্রভৃতি আবহাওয়া সঙ্গীতে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন শ্রীশরদিন্দু বসু।

'হরবোলা' শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজধানী সফর

"বেতার শিল্পী শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় গত ২৬শে সেপ্টেম্বর দিল্লী যাত্রা করেন। সেখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হরবোলার শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণের জন্য দিল্লীতে ৮ দিন অবস্থানকালে দিল্লীর 'সফদরজঙ্গ' 'বেঙ্গল ক্লাব' মিণ্টোরোড, 'লজপত নগর', ইত্যাদি বড় ক্লাবের কয়েকটি বিচিত্রানুষ্ঠানে 'হরবোলা' শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় সপ্তডিঙ্গা আসরের নাটকে ও চিল্ড্রেন নভেল থিয়েটার-এর 'মুখোশ' নাটকে শুধুমাত্র মুখ দিয়ে নানা রকমের ডাকের মাধ্যমে বিভিন্ন দৃশ্যের শব্দ ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকগুলি পরিচালনা করেন শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস। দিল্লীতে থাকাকালীন হরবোলা শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর 'সহধর্মিণী' শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়। শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় দর্শকমহলে 'হরবোলা' গঙ্গোপাধ্যায় নামে সুপরিচিত।

নিষ্কৃতি

আরামবাগের কেশবপুর মহেন্দ্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্রীরা বিদ্যালয়ভবনে শিক্ষয়িত্রীদের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' নাটকটি অভিনয় করে। ছাত্রীদের সম্মিলিত অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বিভিন্ন চরিত্রগুলিতে অংশ-গ্রহণকারী অভিনয়-শিল্পীরা ছিল---স্বপ্না বসু, রাজলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়, চন্দনা রায়, বর্ণালী দত্ত, সবিতা কোনার, দীপালি দত্ত, শিখা দত্ত, স্নিগ্ধা বসু, শুভ্রা, তপতী, চম্পা, লিপিকা, শিবানী ও নিবেদিতা ঘোষ।

অপরিচিত

সমরেশ বসুর সামাজিক প্রেমের কাহিনী 'অপরিচিত'। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন সুখ্যাত চিত্র-পরিচালক সলিল দত্ত। চিত্রটির সুর-সংযোজনায় রয়েছেন প্রবীণ ও প্রখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। অপরিচিত চিত্রটিতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায় দিলীপ রায়, উৎপল, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা সেন প্রমুখ। আর ডি প্রোডাকসন্সের চিত্র অপরিচিত। চিত্রটির পরিবেশনায় আছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ।

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

আর ডি বনশল নিবেদিত চিত্র 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে।' সমরেশ বসুর কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন পীযুষ বসু। চিত্রটিতে সঙ্গীতাংশের ভার

অজয় কর পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মালা দেবী ও অন্যান্য শিল্পিবৃন্দ

নিয়েছেন শৈলেশ রায়। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন কালিপদ দত্তগুপ্ত চরিত্রচিত্রণে দিলীপ রায়, তরুণকুমার সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বেবী, রীতু, মাধবী মুখোপাধ্যায় নবাগত স্বরূপ দত্ত প্রমুখ। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন আর ডি বি এ্যাণ্ড কোং।

আরোগ্য নিকেতন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত সামাজিক কাহিনী 'আরোগ্য নিকেতন' চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। কাহিনীর নচিত্রাট্য রচনা করেছেন বিজয় বসু। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, ধীরাজ দাস, ইন্দিরা দে প্রমুখ। চিত্রটির পরিচালনায় আছেন সুভাষচন্দ্র খ্যাত বিজয় বসু। চিত্রটির নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির মুক্তি আসন্ন।

জীবন সঙ্গীত

সুসাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন সুখ্যাত পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। চিত্রটিতে অবতীর্ণ হয়েছেন প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, সুমন মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, সন্ধ্যারাণী, কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, তমাল লাহিড়ী প্রমুখ। সঙ্গীতাংশে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির নাম 'জীবন সঙ্গীত।'

মায়া

'মায়া' চিত্রটির কাহিনী-রচয়িতা নির্মল সর্বজ্ঞ। ছবিটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন কাহিনীকার স্বয়ং। চিত্রটির পরিচালনায় অরিন্দম। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুস্মিতা সান্যাল, অজয় বিশ্বাস অপর্ণা দেবী, অসিতবরণ, শিখা ভট্টাচার্য, সুব্রত সেন, শ্যামল ঘোষাল, পারিজাত বসু, চিত্রা মণ্ডল প্রমুখ। নেপথ্যে কণ্ঠ-সঙ্গীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটির প্রযোজনায় শম্ভুচরণ দে। সুরকার অনল চট্টোপাধ্যায়।

অঞ্জন

ইন্দ্র মিত্র-কৃত কাহিনী রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করছেন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ। ছবিটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক তপন সিংহ। চিত্রটির পরিবেশনায় থাকছেন ছায়াবাণী প্রাঃ লিঃ। চরিত্রচিত্রণে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সুস্মিতা সান্যাল, নির্মল কুমার, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, স্বরূপ দত্ত, ছায়া দেবী, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন তপন সিংহ। প্রযোজনায়—বে এল কাপুর প্রোডাকসন্স।

হীরেন নাগ পরিচালিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সবরমতী' চিত্রে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী ও রূপক মজুমদার

'অপরিচিত' চিত্র-কাহিনী

সংসারে এমন প্রকৃতিরও মানুষ আছে যারা ভাবে পয়সা দিয়ে মানুষের মনও কেনা যায়। ধনীর ছেলে রঞ্জন মল্লিক সেই প্রকৃতির মানুষ। দাম্ভিক। উচ্ছৃঙ্খল না হলেও উচ্ছল। অর্থের দ্বারা সব কিছু করা যায় এই ভেবেই সুনীতাকে তিন লাখ টাকা দিয়ে মিঃ রায়চৌধুরীর হাতের মধ্যে থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল। মিঃ দাসও সেদিন বাধা দিতে পারেন নি এঁকে। অতিথি অভ্যাগত সকলেই নিশ্চল হয়ে শুধু মাত্র ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি। কিন্তু রঞ্জন সুনীতাকে জোরের বশে ঘরে এনে তাকেও কি বেঁধে রাখতে পেরেছিল টাকা দিয়ে বা মন দিয়ে।

পারে নি। কিন্তু কেন? এ জিজ্ঞাসা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। উত্তর পায়নি। মাঝে মাঝে সেই সরল সাধা সিধা মানুষটি—সুজিত মিত্রের কথা মনে পড়েছে। মনে হয়েছে এই অর্থের মিথ্যা গর্ব ও দাম্ভিকতাই বুঝি তার মানসিক ও আত্মিক অবনতির কারণ। এই জটিল চরিত্রটিতে রূপদান করছেন জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমার।

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুজিত মিত্র মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। অল্প বয়সেই কোন কারণে মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে দূর পশ্চিমে চলে যায়। সুস্থ হয়ে উঠে কয়েক বছর বাদে। ফেরার পথেই গাড়ীতে মিঃ দাস ও সুনীতার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। স্টেশনে এসে আলাদা হয়ে গেলেও কোলকাতায় এসে প্রায়ই দাসের বাড়ীতে যাওয়া আসা কচ্ছে।

মিঃ দাসেরও সুজিতকে যে খারাপ লাগে তা নয়। নিজেকে ওদের পরিবেশে ঠিকমত খাপ খাওয়াতে না পারলেও তার আসার অন্য কারণও ছিল—তা হল সুনীতা। দেখার প্রথম ক্ষণ থেকেই যৌবনের সুললিত রাগিণী সুজিতের মনে হয়তো সুর তুলতে সুরু করেছিল। প্রকাশ করতে পারেনি কখনোও। শান্ত সংযত ধীর স্থির ভাবেই সে সব কিছু নিতে চেষ্টা করেছে।

মিঃ দাসের বাড়ীতে অনুষ্ঠানের দিনে রঞ্জন মল্লিকের ঔদ্ধত্য সেও নিশ্চলভাবে দর্শকের আসনে বসে দেখেছিল। হয়তো বা তার অজান্তে চোখ দুটো চিক চিক করে উঠেছিল। মনের কোন অন্ধকার কোন মুহূর্তের জন্য ভিজে উঠেছিল। মনে মনে

তরুণ মজুমদার পরিচালিত হেমন্তকুমার সুরারোপিত 'রাহগীর' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়
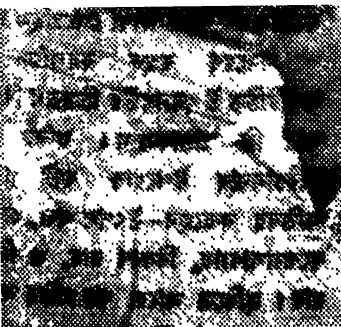
অনুমান করলেও সুনীতার এমন দশা হবে কোন দিন সে অনুমান করেনি। বজ্রাঘাতের মত সুনীতার পরিণতির দুঃসংবাদ তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এই জটিল মানসিকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জী। সুনীতা---মা বাবার পরিচয়ে পরিচিত নয় সে তথাকথিত সোসাইটিতে। মিঃ দাসের মেয়ে নামেই সকলে চেনে তাকে। ওপরতলায় পিকনিক পার্টি, গেট-টুগেদারের অন্যতম আকর্ষণ সে। ছোটবেলাতেই মা বাবাকে হারিয়ে মিঃ দাসের কাছেই সে মানুষ। লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছে সে। গরীবের মেয়ে হলেও এখন সে রীতিমত মডার্ন অন্ততপক্ষে পোষাক পরিচ্ছদে, কথা-বার্তায় তো বটেই। তাই মিঃ রায়-চৌধুরী যখন তাকে দেড় লাখ টাকা যৌতুক দিতে চেয়েছে হীরের নেকলেস দিয়ে যখন শিবেনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে পাকা করতে এগিয়ে এসেছে—তখন সে বলে উঠেছে, 'নেকলেস, (হাসতে হাসতে) কত নেকলেস জমা হল আমার, আচ্ছা মিঃ রায়চৌধুরী আমার হাত আর গলাটা ভারী সুন্দর, তাই না। সবাই-ই নেকলেস পরাতে চায় কিন্তু আর টানা হেঁচড়া করে কি হবে। তার চেয়ে বরং শিবেনবাবুর সঙ্গে আংটি বদল হয়ে গেলে ভাল হয় না।'

শিবেন রায়ের সঙ্গে আংটি বদল তার হয়নি। তার আগেই রঞ্জন মল্লিক তাকে নিয়ে চলে এসেছে। আকস্মিক এই ঘটনায় সোসাইটি গার্ল হয়ে কিছু রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল হয়ত কিন্তু মনের কোন সাড়া ছিল কি? রঞ্জনকে কি স্বামী হিসেবে কোনদিন সে মনে দেখতে পেরেছে। আর রঞ্জনই কি তাকে কোনদিন রক্ষিতার চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছে। তবে মিঃ দাশের হাতের পুতুল হয়ে কেন সে তার জীবনটাকে নষ্ট করল। সে তো একটা দিনের জন্য রঞ্জন মল্লিককে ভাল বাসতে পারলো না সুজিতের সঙ্গে প্রথম দেখার স্মৃতি তার মনে পড়ল যাতে শৃঙখলা ছিল, উন্মাদনা ছিল, মনের কোণে কোন এক সুন্দর ফুল শুধু গন্ধ বিলিয়েছিল। সেই ক্ষণটুকু স্মৃতির কৌটায় ভরে পরপারে চলে গেল সুনীতা। অর্পণা সেন (দাশগুপ্ত) এই চরিত্রটিতে রূপ দিচ্ছেন।

দেববানী প্রোডাকসন্সের 'নিমন্ত্রণ' চিত্রের নায়িকা লিলি চক্রবর্তী

মিঃ দাস। খ্যাতিমান ব্যবসায়ী। সুনীতাকে সে মানুষ করেছে নিজের মনের মত করে। সুযোগসন্ধানী, স্বার্থান্বেষী এই ভদ্রলোক নিজের স্বার্থের জন্যই সুনীতাকে ব্যবহার করেন অনেক ক্ষেত্রে। তার সোসাইটি গার্ল হওয়ার মূলে মিঃ দাসই দায়ী। যে কয়েকবার তার স্ট্যাটাসের উপযুক্ত একাধিক যুবকর সঙ্গে এনগেজমেণ্ট অনুষ্ঠান করে নিজের ব্যবসায়িক ও অন্যান্য ব্যাপারে সুবিধা আদায় করেছে। রঞ্জন মল্লিকের সুনীতাকে অতর্কিতে নিয়ে যাবার দিনও সে চেষ্টা করেছিল মিঃ রায়চৌধুরীর সেক্রেটারীর সঙ্গে বেশ মোটা মূল্যের বিনিময়ে এনগেজমেণ্ট অনুষ্ঠান করতে তবে তা আর সম্ভব হয়নি।

মিঃ রায়চৌধুরী---ধনী ব্যবসায়ী। যে কোন ভাবে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে ওস্তাদ তিনি। তার ব্যবসায়ের অন্যতম অংশীদার ভুজঙ্গভূষণ রায়কে যে ঠকিয়ে প্রায় সব ব্যবসায়টাকে হাতিয়ে নিয়েছে। তবে যাতে রায় আর বেশী মুখ খুলতে না পারে, তার জন্য তারই একমাত্র ছেলে শিবেনের যে নিজের সেক্রেটারী করে নিয়েছে। আর নিজেরই স্বার্থের খাতিরে শিবেনের সঙ্গে সুনীতার বিয়ের চেষ্টা করে এমন কি সুনীতাকে এ কথা জানিয়েছে।

সুনীতা এ কথা শুনে হেসে বলেছে, 'দেখুন, দেখুন এই ভদ্রলোক আমাকে মাত্র দেড় লাখ টাকায় কিনতে চান।' অবশ্য সুনীতাকে আর তার কেনা হয় নি। রঞ্জন মল্লিক এসে ঝড়ের মত সব উড়িয়ে দিয়ে গেছে।

ভুজঙ্গভূষণ রায়---যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল সময়ে। বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে ব্যবসা করতে সুরু করেছিল কিন্তু বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা তাকে সর্বহারা করেছে। শিবেনের সঙ্গে সুনীতার যে বিয়ে হবে না এ ধারণা তার থাকলেও মাঝে মাঝে মিঃ দাসের কথায় আশান্বিত হয়েছে। রঞ্জন মল্লিকের ঔদ্ধত্যে তার ভাল লেগেছিল।

অমল তেজী জেদী ছেলে যদি তার শিবেন হোত। তা হোল না। সুনীতার অমন পরিণতি হবে সে আশা করেনি। বড়ই ব্যথা পেয়েছিল তাই।

সমরেশ বসুর বহুপঠিত এই অপরিচিত উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন আর ডি প্রডাকসন্স। ললিল দত্তর পরিচালনায় উপরোক্ত কটি চরিত্রে অভিনয় করছেন---উৎপল দত্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ও দিলীপ রায়। ছবিতে আরো বহু চরিত্র আছে। বর্তমানে মোটামটি দেওয়া হল।

সাগরপারের মায়ালোক

ফ্যানদের বিচিত্র কার্যকলাপের কথা কিছুদিন আগে পত্রস্থ করেছিলুম। এদেশ ওদেশ ভেদাভেদ নেই এই বিশেষ শ্রেণীটির। এরা পারে না হেন জিনিষ নেই। বেশ মনে পড়ে, সেবার কলকাতায় এসেছিলেন বোম্বাইবাসিনী জনৈকা চিত্রতারকা। উত্তর কলকাতার শ্রী সিনেমায় তাঁকে আসতে হোলো এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। পথে, আশেপাশে অগণিত মানুষ, তারা অধীর, আত্মহারা শুধু একটু দর্শন পাওয়ার জন্যে। যথাসময়ে তারকার উদয় হতেই জনতা তো উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। বরং বলা ভালো, জনসমুদ্র গর্জে উঠলো। ফলে হোলো কি তারকাটি তাঁর বহুমূল্য শাড়িটির আঁচলখানি হারিয়ে বসলেন। হ্যাঁ, স্রেফ কাঁচিকাটা হয়ে গেল। সে এক বীভৎস কাণ্ড। এ-ও দেখেছি কোনো কোনো শিল্পী অত্যুৎসাহী অনুরাগীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পাঁচিল ডিঙিয়ে পগার পার হয়েছেন।

সম্প্রতি এহেন বিপত্তির মাঝে পড়েছিলেন শ্রীমতী হেলে মিলস। কতো রূপেই তো সাগরপারের নায়িকারা আবির্ভূতা হ'ন রজতপটে। সে সজ্জা, সেই চলনবলন দেখে মুনিরও মতিভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। কাজেই এক প্রেমিকপুঙ্গব রীতিমতো উদ্‌গ্রীবই ছিলো, সহসা সে খবর পেল হেলে মিলস হাজির হয়েছেন লণ্ডনের মাটিতে। ব্যস, জানামাত্রই বাটিতি ছুটে এলো সেই গৃহ সমুখে, যেখানে তার কল্পলোকের কল্পনা মূর্তি ধরে বিরাজ করছেন।

ফ্যানের আগমনে কিছুটা খুশি-ভরা মনে (বোধ হয়) দর্শন দিলেন শ্রীমতী। কিন্তু এ কী। এ যে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি। নাকি তার চেয়েও বেশি—লোকটির গদগদ কণ্ঠ, চকিত চাহনি, সর্বোপরি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ও কী বাণী উচ্চারণ?

না, হেলে মিলস অতোটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তার প্রণয়-সম্ভাষণের প্রতিদানে ব্যস্ত কণ্ঠে ডাক দিলেন লোকলস্করকে। তারা দ্রুত এসে পাগলের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করলো। সহজে কি যেতে চায়, অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো বৈকি। কিন্তু সেটা সাময়িক। ঘরের বাইরে নীত হয়েও তার উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়লো না। সমানে বন্ধ দরজায় করাঘাত ক'রে চললো। না, অনন্তকাল নয়। তার আগেই বেরসিক পুলিশবাহিনী আবির্ভূত হ'য়ে নিয়ে গেল তাকে সরিয়ে।

রমেন চৌধুরী

আদালতে সোপর্দ হ'য়ে তাকে আক্কেল সেলামি দিতে হোলো কতো জানেন? মাত্র দ' পাউণ্ড। বলে প্রাণ দিতে যে কুণ্ঠিত নয় (তাই তো মনে হয়, এরা এমনই আজব চিড়িয়া) সে ওই ক'টা টাকায় বাধা মানবে। বলেছে আমি আসবো—বার বার আসবো যতোক্ষণ না দেবী ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন।

●

ভিট্টরিও ডি'সিকা সম্প্রতি 'দি লাভারস' চিত্রটির কাজ শেষ করে ফেলেছেন। ব্রুনেল্লো রোনদির একই নামের নাটকের এটি অবিকৃত চিত্ররূপ। মুখ্য দুটি চরিত্রে রূপ দিয়েছেন মার্সেল্লো মাস্ত্রোয়ানি এবং ফে ডনওয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি নতুন ছবি নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন। এ ছবিটির নাম: 'জিওভান্না'। মহাযুদ্ধের সময়কার গল্প। স্বামীর নিরুদ্দেশের খবরে চিন্তাতুরা জিওভান্না পথে বেরিয়ে পড়েছে। খোঁজ তাকে করতেই হবে। চললো সে রাশিয়ায়, যদি স্বামীর উদ্দেশ পায়। মস্কোতে পৌঁছে সম্মুখীন হোলো বিভিন্ন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির। তাই নিয়েই চিত্রনাট্য। রচনা করেছেন সিজার জাভাত্তিনি এবং এনিও দ্য কনসিনি। সোফিয়া লোরেন আর মার্সেল্লো মাস্ত্রোয়ানিকে প্রধান ভূমিকা দুটিতে দেখা যাবে।

●

'দি বেস্ট ওম্যান অভ মাই লাইফ'—চেক চলচ্চিত্রকার মার্টিন এরিকের নতুন ছবি। এটির দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি প্রাগের স্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। ওখানকার শ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী জিরি বোডাক শ্রেষ্ঠাংশে অবতীর্ণ হচ্ছেন। এটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি। জারোস্লাভ দিৎল চিত্রনাট্যকার। আলোকচিত্রী-রূপে রয়েছেন ক্যামেরা ম্যান জ্যাঁ রোথ।

●

আমাদের এখানে 'এ' মার্কা ছবিতে 'নলচে আড়াল' না দিয়েই অনেক কাণ্ড চলছে আজকাল। এটা হিন্দী ছবির ব্যাপারেই একমাত্র প্রযোজ্য। এই বিশেষ জাতের ছবিগুলোকে নির্বাধ করে দিলে অনেক ক্ষেত্রে মনে হবে না যে এদেশের তৈরি। প্রবৃত্তির সুড়সুড়ি জাগানো এই ছবির নির্মাতা প্রভৃতিকে কিন্তু কোনোই জবাবদিহি করতে হয় না। অথচ খোদ মার্কিন মুলুকে—একটা খবরে দেখছি—এক-খানি অশ্লীল ছবি দেখানোর জন্যে শাস্তি পেতে হয়েছে ছবিঘরের মালিক এবং তস্য ম্যানেজারকে। ওয়াশিং-টনের স্টেশন আর্ট থিয়েটারের কর্ণধার ফ্রেডরিক হ্যারম্যান এবং এই চিত্রগৃহের
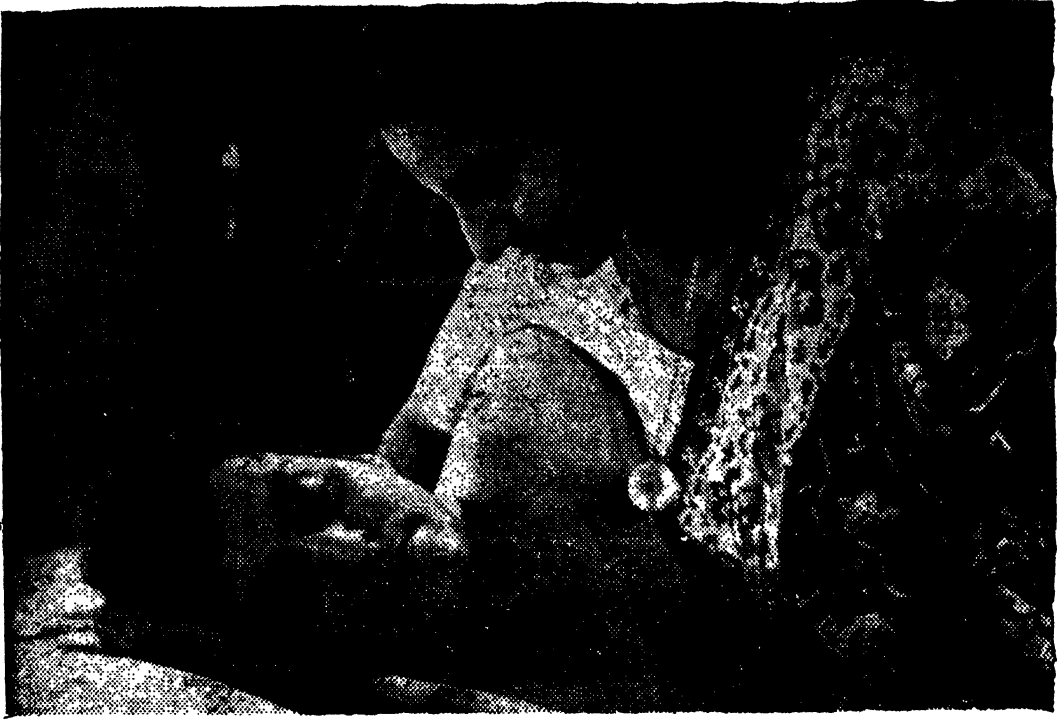
ইন্দার সেন পরিচালিত 'প্রথম কদমফুল' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা — চিত্র : আশু সেনগুপ্ত

রাত্রিকালীন ম্যানেজার ওলাফ কন্নি-কমনকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সম্প্রতি। অপরাধ : অশ্লীল ছবি দেখানো। মালিকের হোলো আড়াই শো ডলার জরিমানা এবং ষাট দিনের জেলঘর বাস, আর ম্যানেজারের আড়াই শো ডলার জরিমানা। ১৯৬৭ সালে অশ্লীলতার নতুন আইনের এই প্রযুক্তি। বিচারক তাঁর রায়ে বলেছেন—সম্মানিত যে-কোনো ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে ছবিটি দেখতে অসমর্থ হবেন।

●

খ্যাতিমান অভিনয়-শিল্পী গ্রেগরি পেক এবার 'দি চেয়ারম্যান' চিত্রে নায়করূপে দর্শন দেবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আলোচ্য ছবিটি উঠবে টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের পতাকা-তলে। রিচার্ড কেনেডির সর্বাধুনিক একটি উপন্যাসের এই চিত্ররূপটি কমিউনিস্ট চায়নায় এক গুপ্তচরবৃত্তির বিতর্কমূলক কাহিনী। স্ক্রীন প্লে রচনা করছেন বেন মেডো। এ পি জে এ সি'র প্রধান আর্থার পি জেকব জানিয়েছেন মোট এব্রাহাম ছবির প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন, পরিচালনায় থাকছেন জে লী টমসন। চলচ্চিত্রায়ণের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সুরু হবার কথা। দূরপ্রাচ্য, ওয়েলস এবং লণ্ডনে দৃশ্যগ্রহণ করা হবে।

●

অভিনেতা-পরিচালক এ ডি ফিশার বর্তমানে 'পেণ্ট ইয়োর ওয়াগন' চিত্রের কাজে ব্যাপৃত। ফিশারের আগের ছবি-টির বাণিজ্যিক ব্যর্থতার জন্যে (সোজা কথায় ফ্লপ করায়) অর্থলগ্নিকারের দল তাঁর ত্রিসীমানায় আর ঘেঁষছিলেন না। বহু চেষ্টা-চরিত্র করে নতুন ছবির দৃশ্য গ্রহণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন উনি ; ইতি-মধ্যে কোনো এক চিত্র প্রতিষ্ঠান দু' লক্ষ স্টার্লিং দিয়ে চিত্রের যাবতীয় স্বত্ব কিনতে চাইছিলেন। ও প্রস্তাবে ফিশার রাজী ছিলেন না। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপত্তি বাধ্য করলো তাঁকে ওই প্রস্তাব গ্রহণে। হোলো কি উনি সদলবলে আউটডোর সুটিং-এ গেলেন অরিগনে। হঠাৎ এলো প্রবল বন্যা। শিল্পী কলাকুশলীদের নিয়ে ফিশার আটক পড়ে গেলেন সেখানে। অনেকের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন পাঠালেন, শেষে দু লক্ষ স্টার্লিং-এর অফারই গ্রহণ করলেন। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল থেকে ফিরে এলো সবাই। এঁদের মধ্যে ছিলেন লী মারভিন, ক্লিট ওয়াকার, জিন সেবার্গ প্রমুখ। বন্যার ফলে ওঁদের একটি ট্রাক জলে ডুবে গিয়েছিলো। ছবিটি বর্তমানে সমাপ্তি-মুখে এবং এর পরে ফিশার 'দি কফি কেস' নামে প্যারামাউণ্টের একটি চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

●

নদীর এপার ভাঙে ওপার গড়ে। সেটা ঘটে একই জায়গায়। কিন্তু এ ভাঙাগড়া নানান দেশে। এক্ষে হ্রাসবৃদ্ধিও বলা চলে।

ইউরোপের কয়েকটি দেশে সিনেমা গৃহের সংখ্যা উদ্বেগজনক-ভাবে কমে গেছে। ইতালীতে চিত্র-গৃহের সংখ্যা এখন ৩৭৭১-এ ঠেকে—অথচ ১৯৫০ সালে ওই সংখ্যা ছিলো ৫০০০। ১৯৫৪ সালে আমেরিকায় ছিলো ১৮,৪৯১টি চিত্রগৃহ, এখন আছে ১৩,৬২৩টি। ইংলণ্ডে ১৯৬৭তে দেখা গেছে ১,৮০৫টি ছবিঘরের সংখ্যা অথচ ১৯৫০-এ সংখ্যাটা ছিলো ৪,৫৮৪। বৃদ্ধি ঘটেছে জাপানে। ২,৫৭৫ থেকে দাঁড়িয়েছে ৪,২৯৬-এ। ফ্রান্সে ৫০০০ থেকে ৪,২৮৩, স্পেনে ৩,৯০০ থেকে ৭,৩৯৫, জার্মানীত ৩,৯০০ থেকে ৪,৭৮৪-এ পৌঁছেছে চিত্রগৃহের সংখ্যা।

তিন পুরুষ

ইন্দ্রসেন

"গৃহ-বিসংবাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতী মাঝে।"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লোক-প্রিয় ও ধর্মপ্রাণ রাজা বসন্ত রায় প্রত্যেক বৎসরে মহাসমারোহে পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করেন। প্রতাপের সঙ্গে মনোমালিন্যের পর-বৎসরেও তিনি যথারীতি পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন। মনে মনে যথেষ্ট বিরোধ বা ভয় থাকলেও লৌকিকতার খাতিরে ও সামাজিক শিষ্টাচার অক্ষুণ্ণ রাখতে এবারও তিনি প্রতাপাদিত্যকে নিমন্ত্রণ জানাতে জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার গোবিন্দ রায়কেই পাঠালেন। পিতার আদেশ, অমান্য করতে পারেন না। তবুও যাত্রার পূর্বে গোবিন্দ রায় প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন,—পিতৃদেব, প্রতাপকে বাদ দেওয়া হউক। এই মহৎ কাজে যোগদান করবার যোগ্যতা প্রতাপের নাই। তদুপরি সে আপনাকে তার শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে না। বরং শত্রু জ্ঞান করে। সেই হেতু বলি, অতিথি-তালিকা থেকে প্রতাপের নামটা বাতিল করাই সমীচীন।

বসন্ত রায় ক্ষণেক নীরব থেকে বললেন,—রাজপুত্র, তুমি আর বাধ সাধিও না। আমি প্রতাপের মনোভাব জানি। আমার প্রতি সে কী রূপ বিরূপ ভাব পোষণ করে তাও আমার অবিদিত নাই। তৎসত্ত্বেও আমি তাকে আমার পিতৃ-শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ জানাতে চাই, কেন না লৌকিকতা ও সামাজিকতা রক্ষা করা আমার কর্তব্য। যশোরের জনগণ যেন আমাকে না দোষারোপ করে। কর্তব্যে অব-হেলার দোষ না দেয়। উপরন্তু প্রতাপ আমাকে অমান্য ও অস্বীকার করলেও আমি তাকে আন্তরিক স্নেহ করি।

গোবিন্দ রায় বললেন,—প্রতাপ যদি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে! যদি সে না আসে?

বসন্ত রায় মাথা চুলকাতে থাকেন। কিছু যেন ভেবে স্থির করতে পারেন না। বললেন,—আমার দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

বিনম্র সুরে গোবিন্দ রায় বললেন,—দুর্ভাগ্যকে কেউ কী স্বেচ্ছায় আহবান জানায়? স্বল্প-বুদ্ধি আমি, ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। মহাশয়ের কথায় যে আপত্তি জানাই, তেমন ধৃষ্টতা আমি ধারণ করি না।

বসন্ত রায় কোবিদ। তাঁর প্রকৃতিও কবিসুলভ। শিশুর মত সরল দৃষ্টিতে সকল কিছু দেখতে অভ্যস্ত তিনি। মনে মনে ছন্দ গাঁথবেন, কথায় মিল খুঁজবেন, না সাংসারিক কুটিলতায় দাক্ষিণ্য আচ্ছন্ন রাখবেন নিজেকে? তিনি বললেন,—কুমার-বাহাদুর, দায় সারতে দেও। নিমন্ত্রণ প্রাপ্তির পরে প্রতাপ যদি আসে আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হবো। আর প্রতাপ যদি সত্যিই না আসে সেই নিজের কাছে পরাজিত হবে। লোকে বলবে, প্রতাপটা সামাজিক-নীতিভ্রষ্ট। লৌকিকতা কারে কয়, জানে না। যাই হোক, তুমি স্বয়ং যাও। প্রতাপকে সাদর আমন্ত্রণ জানাও।

—মহারাজা!

প্রতাপের একান্ত সচিব বীরযোদ্ধা শঙ্কর চক্রবর্তী সসম্ভ্রমে ডাকলেন। সাড়া না পেয়ে, কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার ডাকলেন,—মহারাজা, অবধান করুন। কুমার গোবিন্দ রায় সদরে অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার সাক্ষাতে অভিলাষী।

—কেও?

নিদ্রার ঘোরে যেন ব্যাঘ্র ঈষৎ গর্জন তোলে।

—আমি। শঙ্কর চক্রবর্তী।

—কী বক্তব্য?

—মহারাজা, মার্জনা করবেন, আপনার চিন্তাপথে বিঘ্ন উৎপাদন করেছি। রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায় আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

—কোন্ অভিসন্ধিতে শঙ্কর? কিছু কী বিদিত আছো?

—না মহারাজা। জানি না।

কী যেন এক গভীর চিন্তাসমুদ্রে ডুবে ছিলেন প্রতাপাদিত্য। কক্ষে একাকী তিনি। সম্মুখে ও দুই পাশে মুক্ত বাতায়ন। আসমানে অপলক আঁখি মেলে ভাবনার তরঙ্গে যেন ভেসে ছিলেন প্রতাপ। অধুনা নির্জন কক্ষে একা থাকেন মহারাজা। কেউ বড় একটা কাছে ঘেঁষতে সাহস পান না। মহারাজার নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান যেন ভঙ্গ হয় না। দিবারাত্র প্রায় একইভাবে থাকেন, একই অবস্থায়। আধা-শোয়া, আধা-বসা। করতলে মাথা।

—তুমি জানো শঙ্কর, গোবিন্দ আবাল্য আমার প্রতিপক্ষ?

মহারাজা বললেন,—আকাশে দৃষ্টি রেখে। প্রতাপের হাতে মুক্তার কণ্ঠমালার নিম্নাংশ। মালার নিম্নদেশে আর একখানি বৃহৎ মুক্তা। ময়ূরকণ্ঠী রঙ ঠিকরোয় থেকে থেকে।

—জানি মহারাজা। সে আপনাকে হিংসা করে। কুনজরে দেখে। গোবিন্দ নিজে বড় হতে পারলো না কোনমতে, মান্য-গণ্য হতে পারলো না, তাই সে অন্যকে ছোট দেখে। চোখে তার কুদৃষ্টি। মনে রোষ।

—তা হোক শঙ্কর। কথা বলতে বলতে উঠে সোজা হয়ে বসলেন মহারাজা। গোঁফের সক্ষম প্রান্ত পাকাতে থাকলেন। বললেন,—আমার ভবনে এসেছে যখন, গোবিন্দকে সাদরে আনয়ন কর। দেখি কী বক্তব্য তার।

কয়েক পল অপেক্ষার পর শঙ্কর পুনরায় এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে এলেন গোবিন্দ রায়।

প্রতাপ বললেন,—শঙ্কর, তুমিও থাকো।

গোবিন্দ রায় সহাস্যে বললেন,—ভাবছি আমি, তোমাকে কী বলা যায়। মহারাজা বলি না প্রতাপ বলি ভাই—

—যাহা ইচ্ছা তোমার। আমি কিন্তু সেই প্রতাপই আছি।

—পিতৃদেব পাঠালেন, তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে। আগামী-কল্য দ্বিপ্রহরে আমাদের গরীবখানায় তোমার উপস্থিতি প্রার্থনা করি। কল্য পিতামহের বার্ষিক শ্রাদ্ধ-কার্য সম্পন্ন হবে। পিতৃদেব বলেছেন তুমি কল্য আমাদের আলয়ে আহার করবে।

স্মিতহাসির সঙ্গে প্রতাপ বললেন,—আমার পিতৃব্যের ধর্ম-জ্ঞান সত্যই প্রশংসনীয়। পালা-পার্বণ, দায়-দায়িত্ব কিছুই পালন করতে ভুলেন না।

হাসি মিলিয়ে যায় প্রতাপের মুখ থেকে। বললেন,—তোমার ধর্ম তোমাতেই থাক। তিনি যখন আদেশ জানিয়েছেন, অবশ্য অবশ্যই যাইব। যেতে আমাকে হবেই। আমি যাবো ভাই গোবিন্দ, তুমি নিশ্চিন্ত হও। পূজনীয় পিতৃব্যকে জানিও। শঙ্কর!

—ব্যস্ত করলেন মহারাজা।

নীরব দর্শক শঙ্কর চক্রবর্তী এগিয়ে গিয়ে বললেন।

—শঙ্কর, অন্দরে সমাচার পাঠাও। গোবিন্দ এসেছেন। যেন পান তাম্বুল সরবৎ পাঠানো হয়।

—থাক থাক মহারাজা। অন্যদিন হবে। আমি এখন উঠি। অনেকের গৃহে যেতে হবে। নিমন্ত্রণ-কার্যটা আজই শেষ করতে হবে। যেন তেন প্রকারে।

প্রতাপ নিস্পৃহের মত বললেন,—আয়োজনটা তবে তো বৃহৎ। এই বিশেষ দিনটি পিতৃব্য মহাসমারোহে প্রতি বৎসরেই পালন করেন। আপন পিতার প্রতি কী অটুট শ্রদ্ধা-ভক্তি! এমনটা দেখা যায় না।

—আমরা কিন্তু তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো প্রতাপ।

—কথা দিয়াছি যখন—

বলতে বলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন গোবিন্দ রায়। শঙ্কর চললেন তাঁর সঙ্গে। আপ্যায়ন জানিয়ে চললেন, রাজপুরীর প্রধান দ্বার পর্যন্ত।

গোবিন্দ বললেন,—বিদায় শঙ্কর।

শঙ্কর বলেন,—বিদায়।

পরদিন মধ্যাহ্নে। আকাশে অগ্নিগর্ভ সূর্য। প্রখর রৌদ্রালোকে দিগ্বিদিক দেখা যায় না। নিদারুণ গ্রীষ্মের দগ্ধ দুপুরে, খরতাপ উপেক্ষা করে মহারাজা প্রতাপাদিত্য চললেন পিতৃব্যের গৃহের পথে। সঙ্গে চললেন অমাত্যগণ। তন্মধ্যে পরিবেষ্টিত প্রতাপ। ছত্রধারী স্বর্ণছত্র ধরেছে মহারাজার মাথার 'পরে। ছত্রের চতুষ্পার্শ্বে মুক্তার ঝালর। চলতে চলতে দুলছে মুক্তার সারি। একেক সারিতে ঝুলছে একটি একটি পান্নার নোলক।

জ্ঞাতি-বিরোধিতার জন্য অভিমানে স্ফীত না হয়ে, সাদরে ও সসম্ভ্রমে পিতৃব্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে চললেন। প্রতাপ বিশেষ বিবেচনাপূর্বক রাজ-পরিচ্ছদেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললেন। যাত্রার প্রাক্কালে সহধর্মিণী মহারাণী পদ্মিনী ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে প্রতাপ উত্তর দিলেন,—জ্ঞাতির বাটীতে হীনবেশে যাইতে নাই।

কিন্তু ইহা ব্যতীত আর একটি কারণও ছিল না তা নয়। প্রতাপ স্ত্রীকে তা আর ভেঙে বললেন না। প্রতাপ মনে মনে বিবেচনা করেছেন—

কী জানি, পিতৃব্য ও তদীয় পুত্রগণের মনে মনে কী আছে! হিংসার বশবর্তী লোকে না পারে, এমন কাজ নাই। কী জানি, যদি আমাকে নিরস্ত্র দেখে সুযোগ সুবিধা পেয়ে তারা আমার প্রাণহননে উদ্যত হয়। অতএব আত্মরক্ষার জন্য, সঙ্গে অন্তত একখানি তরবারি লওয়া কর্তব্য। রাজবেশে গেলে আমার সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে।

এদিকে কিন্তু বিধির বিধানে ঘটনা ঘটলো অন্যরূপ।

হায়, মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আর।

পিতৃব্য-গৃহে উপনীত হলে প্রতাপ যথেষ্ট সম্ভ্রম ও শিষ্টা-চারের সহিত অভ্যর্থিত হলেন। স্বয়ং বসন্ত রায়, পুত্রগণ সমভিব্যাহারে প্রতাপকে আদর আপ্যায়ন জানাতে উদ্যোগী হলেন। বসন্ত এগিয়ে গিয়ে প্রতাপকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন। হৃষ্ট-কণ্ঠে বললেন,—আইস প্রতাপ। তোমার মঙ্গল হোক। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘ-জীবন দান করুন। তুমিই আমাদের রায়বংশের মুখ উজ্জ্বলকারী সন্তান।

কিন্তু কী জানি কেন, মুহূর্তকাল মধ্যে সেই সদানন্দ বৃদ্ধের মুখকমল ধীরে ধীরে যেন শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়ে যায়। বুকের স্পন্দন-গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। হঠাৎ কে যেন এসে তাঁর কানে কানে বললেন,—মন্দভাগ্য! আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিলে কেন? কী কারণেই বা প্রতাপকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনিলে? দেখিতেছ না, প্রতাপের কটিতটস্থ ঐ তীক্ষ্ণ তরবারি, তোমারই রক্তদর্শনে লোলুপ হইয়া কোষমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিতেছে?

যেমনি মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হওয়া, অমনি বৃদ্ধ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, প্রাণভয়ে বিকলকণ্ঠে বলে উঠলেন,—কে আছো? শীঘ্র আমার 'গঙ্গাজল' লয়ে আইস।

হায়! বৃদ্ধের অন্তিম আশা, এই অস্ত্রে তবুও যতক্ষণ আপনাকে রক্ষা করা যায়। গঙ্গাজল বসন্ত রায়ের প্রিয়তম আয়ুধ, জীবনসহচর। এই অস্ত্র হাতে ধরে বসন্ত একদা শত শত আক্রমণকারীকে পরাস্ত করেছেন। গঙ্গাজল বসন্তের ব্রহ্মাস্ত্র।

গঙ্গাজল আনয়নের আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপও স্বীয় তরবারিকে কোষমুক্ত করলেন।

গোবিন্দ রায় দূর থেকে পিতার গঙ্গাজল আনয়নের আজ্ঞা শুনে এবং প্রতাপকে মুক্ত-কৃপাণহস্তে অবস্থান করতে দেখে অনতিবিলম্বে প্রতাপকে লক্ষ্য করে এক শাণিত অস্ত্র সজোরে প্রয়োগ করলেন। দৈবক্রমে গোবিন্দ রায় কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতাপের শরীরে অণুমাত্র বিদ্ধ না হয়ে ব্যর্থ হল।

পদদলিত প্রসুপ্ত সিংহের ন্যায় প্রতাপাদিত্য এক লম্ফে গোবিন্দ রায়কে আক্রমণ করলেন। বেশ খানিক সম্মুখ যুদ্ধের পরে গোবিন্দ রায় পরাস্ত ও নিহত হলেন। গোবিন্দর মৃত্যু-সংবাদ ব্যাপ্ত হতে প্রাসাদমধ্যে মহা-কোলাহল উপস্থিত হল।

বসন্ত রায় বনাম প্রতাপাদিত্য।

দুই পক্ষের লোক শস্ত্রপাণি হয়ে পরস্পরের সাহায্যে আগমন করতে থাকে। শান্তিপূর্ণ রাজভবন অকস্মাৎ যুদ্ধস্থলের প্রচণ্ড-মূর্তি ধারণ করলো। অন্যান্য অতিথি ও অভ্যাগতেরা অচিরে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। প্রাসাদের এখানে-সেখানে মনুষ্যরক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। গোবিন্দ রায়ের স্পন্দনহীন দেহ থেকে রক্তস্রোত বইতে থাকে।

গোবিন্দকে শমনসদনে পাঠিয়ে প্রতাপাদিত্য ত্বরিতগতিতে বসন্ত রায়ের কক্ষে উপস্থিত হলেন। বসন্ত রায় প্রতাপকে রক্তাক্ত কলেবরে দেখে আবার উচ্চৈঃস্বরে বললেন,—কৈ রে, আমার গঙ্গা-জল কোথায়?

বসন্তকে রক্ষার জন্য তাঁর প্রহরিগণ দ্রুতবেগে আসে। কিন্তু

সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়। প্রতাপ অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হয়ে ভীষণ তরবারি-প্রহারে বসন্ত রায়কে যমভবনে প্রেরণ করলেন। তাঁর কর্তিত মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

রক্ত-গঙ্গা বইতে থাকে। চারিদিকে হাহাকার শোনা যায়।

প্রতাপের যেন ধৈর্যরহিত অবস্থা। বিকৃতকণ্ঠে ভীষণস্বরে প্রতাপ বলতে থাকেন,—গঙ্গাজল আর প্রয়োজন নাই। আমার এই শাণিত অস্ত্রে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিপাত করেছি। অতঃপর এই অস্ত্র দ্বারা তোমার বংশাবলীর অস্তিত্ব ঘুচাবো—তবেই আমার নাম প্রতাপাদিত্য! আমার আপন পথ নিষ্কণ্টক করতেই হবে। উঃ! কী গভীর ষড়যন্ত্র! কী বিষম বিশ্বাসঘাতকতা! খুল্লতাত, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।

প্রতাপের সেই বজ্র-কঠিন-হস্ত-ধৃত, সেই শাণিত অস্ত্রের পূর্ণবেগ, স্থির হওয়ার পূর্বেই, বসন্ত রায়ের পুত্রগণ সশস্ত্রে প্রতাপকে বেষ্টন করলো। কিন্তু মত্ত মাতঙ্গকে, ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছে বদ্ধ করা যায় না। এ চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র।

অধিকতর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রতাপ। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সমগ্র জ্ঞাতিভ্রাতাদের প্রাণসংহার করলেন।

জগদানন্দ, পরমানন্দ, শ্রীরাম, রূপরাম, রামকান্ত, মধুসূদন, মাণিক্য প্রমুখ বসন্ত রায়ের পিতৃ-অনুগত পুত্রগণ নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রসহ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য যৌথভাবে অগ্রসর হলো। প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বীরগণ সংযতভাবে অবস্থান করে অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলেন। বসন্ত রায়ের পুত্রগণ একে একে নিহত হলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বসন্ত ও তাঁর পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তাঁদের পক্ষীয় যোদ্ধাগণ আত্মরক্ষার্থে চতুর্দিকে পলায়ন করলো।

বসন্ত-মহিষী উন্মাদিনীর ন্যায় কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবকে বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে কচুবনের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করলেন। তিনি যেন দিশাহারা। স্বামী ও পুত্রদের হারিয়ে খানিক যে ডাক ছেড়ে কাঁদবেন, উপায় নেই। বৃদ্ধার শরীর কম্পমান। চোখে নীরব কান্না।

ইন্দ্রজালের ন্যায় এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। আভ্যন্তরিক রহস্য অবগত না হওয়াতে পৃথিবীমধ্যে এইরূপ কত শত কাণ্ড ঘটে চলেছে, তার ইয়ত্তা নাই। অতি নগণ্য ও সামান্য কারণে পৃথিবীর মধ্যে কত শত বৃহৎ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, কে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারে?

রাজসূয়-যজ্ঞকালে জলমগ্ন দুর্যোধনকে দর্শন করে যদ্যপি পাণ্ডবেরা হাস্য না করতেন, তাহা হলে লোকক্ষয়কর কুরুক্ষেত্র-সমর সংঘটিত হইত কী না, সন্দেহের বিষয়। যদি বসন্ত রায় প্রতাপকে দেখে গঙ্গাজল অস্ত্র আনয়ন করতে না বলতেন তাহা হলে বোধ করি প্রতাপাদিত্য জ্ঞাতিবধজনিত পাপের ভাগী হতেন না।

এই প্রলয়ঙ্কর কাজের শেষে যাতে আর হত্যাকাণ্ড না হয়, তজ্জন্য প্রতাপ সুব্যবস্থা করলেন। তিনি প্রথমেই বসন্তের অনুচরবর্গকে নিরস্ত্র করতে আদেশ দিলেন। ততঃপর অন্তঃপুরের মধ্যে যেন কোনরূপ অত্যাচার না হয়, তাই তিনি একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন।

প্রতাপ শান্ত হয়েছে শুনে বসন্ত-মহিষী কচুবন থেকে বেরিয়ে কিশোর রাঘবকে প্রতাপের পদতলে বসিয়ে দিয়ে অতি কাতর সুরে বললেন,—প্রতাপ, তুমি শৈশবে মাতৃহারা হলে আমিই তোমাকে লালন-পালন করেছি। আমিও তোমার মা। আমার দুইটি মাত্র প্রার্থনা আছে।

—আজ্ঞা করুন দেবী।

প্রতাপ বললে বিনম্রভঙ্গীতে।

বসন্ত-মহিষী রোরুদ্যমানা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। বললেন,—আমাকে আমার স্বামীর সহমৃতা হতে দেও। আর আমার এই বুকের দুলাল রাঘবকে তুমি রেহাই দিও। একে হত্যা কর না। দোহাই তোমার।

—তথাস্তু। তাই হোক।

সহমরণ-প্রথার সকল প্রকার আয়োজনে ত্রুটি করলেন না প্রতাপ। বসন্ত-মহিষী স্বামীর পদযুগল স্মরণ করতে করতে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। ঢাক, ঢোল আর শিঙা বেজে উঠলো। এয়োস্ত্রীরা উলুধ্বনি দিলেন।

আপন প্রাসাদে ফিরে প্রতাপ তাঁর সহধর্মিণী পদ্মিনীকে ডাক পাড়লেন। শত্রু নির্মূল হয়েছে। তাই বেশ খুশি-খুশি কণ্ঠস্বর।

পদ্মিনী এসে দেখলেন, মহারাজার পরিচ্ছদ রক্তাক্ত। মাথার কেশ আলুথালু। চক্ষু রক্তবর্ণ। স্বামীকে এমন ঘাতকের বেশে দেখবেন, কল্পনা করতে পারেন না পদ্মিনী। তিনি সবিস্ময়ে গালে হাত দিলেন। ভুরুযুগল যেন বাঁকিয়ে উঠেছে। চোখে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি।

রাঘবকে দেখিয়ে প্রতাপ বললেন,—মহারাণী, এই কিশোর-টিকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমা 'পরে ন্যস্ত করলাম।

পদ্মিনী বললেন,—মহারাজার এই বেশ কেন? কার সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন, জানতে পারি কী?

প্রতাপাদিত্য সহাস্যে বললেন,—শত্রুদের সহ। জ্ঞাতিশত্রু, যার বড় আর শত্রু নাই।

রাঘবের একখানি কোমল শীতল হাত ধরলেন মহারাণী। বললেন,—এ যে দেখি মহারাজার পিতৃব্যের কনিষ্ঠ সন্তান। এই তো সেই রাঘব।

আবার হাসলেন প্রতাপাদিত্য। সরব হাসির শব্দে অন্তঃপুর যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাসতে হাসতে প্রতাপ বললেন,—ওর নাম আর রাঘব নয়। ওর নাম দেওয়া যাক কচু। বসন্ত রায়ের স্ত্রী ওকে সঙ্গে লয়ে কচুবনে লুকিয়েছিলেন।

কথার শেষে প্রতাপ আরও জোরালো সুরে হেসে উঠলেন।

এই লোমহর্ষক ঘটনার দুঃসময়ে বসন্ত রায়ের অপর কয়েকটি পুত্র, চাঁদ রায় প্রমুখ মাতুলালয়ে অবস্থান করছেন। তাঁরা এই অনিবার্য মৃত্যুমুখ থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়েছেন।

ঠাকুর বসন্ত রায়। যশোরের ছোট রাজা। কবি ও বিদ্বান বসন্ত।

তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারী আর কেউ নয়, মহারাজা প্রতাপাদিত্য—এই দুঃসংবাদ দিল্লীর দরবারে পৌঁছতে বিলম্ব হল না।

সমাচার শুনে দিল্লীশ্বর কিছু যেন চিন্তিত হলেন। গৌড়-বঙ্গের আকাশে কালো মেঘের ছায়া দেখলেন যেন। হাতের রসি আর আলগা রাখা যায় না। লাগাম টেনে ধরতে হবে। মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে সায়েস্তা করতে হবে। একটা কিছু উচিত-শিক্ষা দিতে হবে প্রতাপকে। পিপীলিকার পাখা দেখা দিয়েছে।

[ক্রমশ।
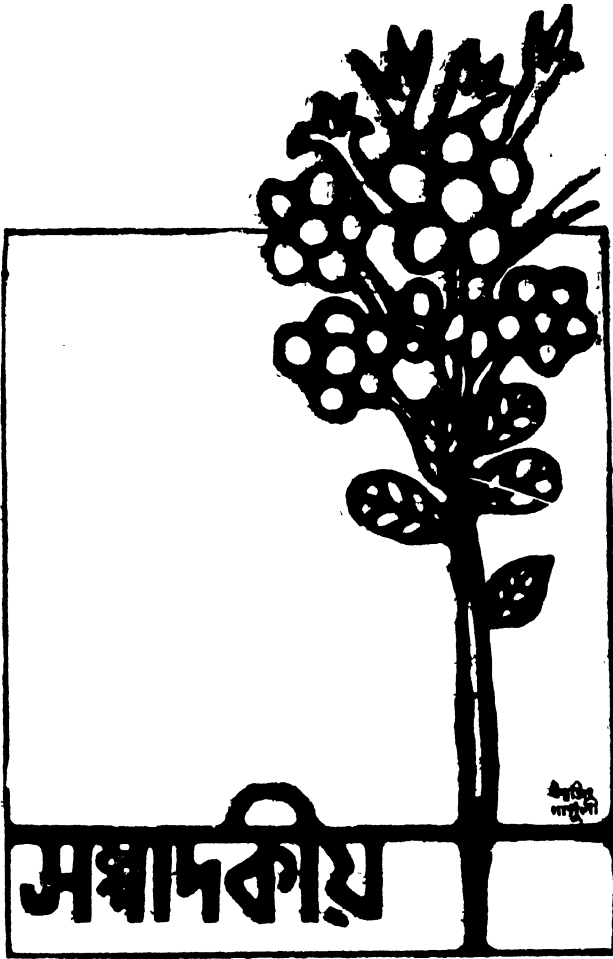
আজাদ হিন্দ ফৌজের রজত-জয়ন্তী

শুধু দুই শত বৎসর নয়, সুদীর্ঘ সাড়ে সাত শত বৎসরের বিদেশী শাসনের লৌহশৃঙখল দেশজননীর যে সোনার অঙ্গ অধিকার করিয়াছিল তাহার অপসারণ অর্থাৎ জননীর শ্রীঅঙ্গ হইতে পরাধীনতার গ্লানি দূরীভূত করার দুর্জয় সঙ্কল্প, মরণপণ এবং অটুট ব্রত যে পূজ্য সন্তানগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন দেশমাতৃকার বন্ধনের জ্বালা যে প্রাতঃস্মরণীয় সন্তানদের অন্তরের অন্তস্তলে, হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে গভীর বেদনা এবং নিবিড় ব্যথার সঞ্চার করিয়া জীবনের নিশ্চিন্ত আরামের সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি (এবং নিরুপদ্রব ও সুখ-ঐশ্বর্যসম্পন্ন জীবনের হাতছানি) উপেক্ষা করাইয়া ত্যাগ-সঙ্কুল অনিশ্চিত এবং প্রতি পদে ঘোর দুর্যোগ-বিপদময় জীবন হাসিমুখে স্বেচ্ছায় বরণ করাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—সেই তালিকায় যতগুলি নাম শোভা পাইতেছে তাহাদের সংখ্যা যেমনই বিরাট, তেমনই অভাবনীয়। এই নামমালার মধ্যে সাল তারিখের বিচারে সর্বশেষ নাম কিন্তু অবদানের গুরুত্বে, ব্যক্তিত্বের বিচারে এবং কীর্তির পরিমাণে অনেকেরই ঊর্ধ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ অমলিনদীপ্তিতে বিরাজিত একটি মহিমায় উজ্জ্বল নাম সুভাষচন্দ্র বসু। সাম্প্রতের কক্ষপথের সীমা অতিক্রম করিয়া শাশ্বতের বিস্তীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে লীলায়িত একটি নাম। ক্ষণকালের সঙ্কীর্ণতায় নয়, নিত্যকালের প্রসারতায় বিস্তৃত একটি নাম। আসমুদ্র-হিমাচল-ব্যাপী, মহিমায় জন্মভূমি সারা এশিয়ার তীর্থক্ষেত্রে ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ের বন্দনায় উদ্বেলিত শ্রদ্ধার প্রদীপে ভাস্বর একটি বিশিষ্ট স্থান।

আধুনিককালে পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলি পরমপূজ্য দেশপ্রেমিক এবং সর্বদেশের মুক্তিযজ্ঞের সর্বত্যাগী ঋত্বিকদের নাম অশেষ শ্রদ্ধার আলোকে লিপিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে বোধ করি একটি নামও নাই যাহার পরে সুভাষচন্দ্রের স্থান নির্দেশ করা যায়। ইহা আমাদের নিছক আবেগপ্রবণতা বা অসার স্বপ্নবিলাস বা অন্ধ ভক্তির নিদর্শন বলিলে অবিচার করা হইবে, তাহা অপেক্ষাও বড় কথা সত্যের অপলাপ করা হইবে। ইহা ইতিহাসের সত্য—যে সত্যের প্রতিষ্ঠা বহু সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিচারের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এবং বহু যুক্তি ও বিশ্লেষণের গণ্ডী অতিক্রমণের পর। সুভাষচন্দ্রের ত্যাগদীপ্ত জীবনের পবিত্র গাথা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে সেই বিরাট জীবনের দেশপ্রেম এবং দেশ-জননীর মুক্তিবিধান ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ছিল না। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার নিকট অদেয় কিছুই ছিল না।

'সোনার চামচ' মুখে দিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সুখ, বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা—এ তিনটিই ঈশ্বর কানায়-কানায় সেই পরিবারকে দিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রও অতি অল্পসময়ের মধ্যে যেভাবে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া যেভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহা তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং মেধারই পরিচায়ক। সিভিল সার্ভিসে তিনি যদি নিজেকে বহাল রাখিতেন তাহা হইলে প্রশাসনের ক্ষেত্রে কালে তিনি অতি উচ্চ এক সম্মানের আসন অনায়াসে অধিকার করিতে পারিতেন এবং খ্যাতি-যশ-প্রতিপত্তির সহিত শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতে জন্মসূত্রেই যেন দেশপ্রেমের বীজ তাঁহার মধ্যে উপ্ত, সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে এই বীজ ক্রমে তিলে তিলে এক বিরাট মহীরুহের

আকার ধারণ করিল। সারা অন্তরে দেশপ্রেমের প্রবল জোয়ার আরম্ভ হইল। সেই জোয়ারের টানে আরাম, নিরুপদ্রব জীবন ও ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির প্রলোভন বা প্রতিশ্রুতি স্রোতের মুখে এককথায় তৃণের মত ভাসিয়া গেল। রাজার কুমার যেন প্রাসাদশীর্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন একেবারে সর্বসাধারণের মধ্যে সেইমতই সুভাষচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভেই গুরু দেশবন্ধুর আশীর্বাদে নিজেকে পূর্ণ করিয়া সারা বাঙালীর জাগ্রত যৌবনের একেবারে হৃৎপিণ্ডে যেন সাড়া জাগাইলেন। সমগ্র জাতি নির্দ্বিধায় নবনায়কের নেতৃত্ব শিরোধার্য করিয়া লইল এবং তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সুভাষচন্দ্রের গৌরবময় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি আজাদ হিন্দ ফৌজ। জাতীয় মানসে সুভাষ-চরিত্রের বিকাশের যতগুলি মাধ্যম উল্লেখিত হইতে পারে তন্মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজকে শ্রেষ্ঠত্ব অনায়াসে অর্পণ করা চলে। সেই বিচারে এই বাহিনীকে সুভাষচন্দ্রের শক্তির এক সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক বলিয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কল্পনা ও বাস্তবে রূপায়ণের ইতিহাস যেমনই রোমাঞ্চপূর্ণ তেমনই বিস্ময়কর। সুভাষ-চন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক মনোভাব সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য আপোষবিহীন সংগ্রাম ভারতের রাজ-নৈতিক জগতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে নিঃসঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিল। হিমালয়-সদৃশ সেই বিরাট নায়কটির পাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানোর ক্ষমতা দুই-একজন ছাড়া তৎকালীন রাজনৈতিক তারকামণ্ডলে আর কাহারও ছিল না। এই পরিবেশে সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে দেশকে মুক্ত করা দেশের ভিতর থাকিয়া সম্ভবপর নয়, দেশীয় মুক্তির জন্য দেশত্যাগ তাঁহার প্রয়োজন। সুদক্ষ প্রহরীর সতর্কদৃষ্টি ও সুরক্ষিত ব্যূহ উপেক্ষা করিয়া

এই কালজয়ী কল্পনায়ক যেভাবে দেশ-ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা ভাবীকালের ইতিবৃত্তে সসম্মানে লিখিত থাকিবে। তাহার পর সারা ছদ্মবেশে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে, বহুবিধ দুঃখ, ক্লেশ বরণ করিয়া অনাহারে, অর্ধাহারে, প্রবল শীতের ভিতর তাঁহাকে নিরাপদে বন্দরে উপনীত হইতে হইয়াছে। মুহূর্তের জন্যও মনোবল বা লক্ষ্য হইতে তিনি কদাচ ভ্রষ্ট হন নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত যে বিরাট অবদান সে রাখিয়া গেল

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

তাহার মূল্যায়নের যথেষ্ট সময়ও সমুপগত। সারা এশিয়ার পরিসরে ইহার প্রতিষ্ঠায় সুভাষচন্দ্রের যে সম্পূর্ণ একক এবং অভাবনীয় সংগঠনশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল ইতিহাসে তাহার সমান নজীর অনুপস্থিত বলিলেও ভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না।

অস্বীকার করি না, ভারতের স্বাধীনতা আসিয়াছে দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহু আত্ম-ত্যাগ এবং আন্দোলনের মাধ্যমে। মুক্তিযজ্ঞে সারা ভারতের কত কুটস্ত

তাহার সীমা-সংখ্যা নিরূপণের বাইরে। স্বাধীনতার বেদীমূল যে কত শহীদের রক্তে লাল হইয়া আছে তাহার সাক্ষ্য ইতিহাস গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, জনপদে জনপদে এই মর্মে যে কত আন্দোলন-বিক্ষোভ সংঘটিত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। ইহাদের মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য এবং পরম শ্রদ্ধার সহিতই স্বীকার্য। কিন্তু এ-দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে শেষ উল্লেখযোগ্য সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা নিঃসন্দেহে এক বিশেষ উল্লেখ ও শ্রদ্ধার অধিকারী।

দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্ব-শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সুভাষচন্দ্রের আমরণ সংগ্রামী জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠার সম্প্রতি রজত-জয়ন্তী বর্ষ পূর্ণ হইল। সুভাষ-চন্দ্রের কায়িক অস্তিত্ব আজ এক রহস্যে আবৃত। তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজও আজ ইতিহাস। কিন্তু তাঁহার কীর্তির ফল ভারতবাসী পুরুষানুক্রমে ভোগ করিবে। সেই অবিনশ্বর কীর্তির মধ্যেই, সেই ত্যাগের মহিমায়, সেই অবদানের আলোয় আজাদ হিন্দ ফৌজের রূপকার সর্বাধিনায়ক এ-কালের অভিমন্যু সুভাষচন্দ্র বসু সারা ভারতবর্ষের হৃদয়-মন্দিরে নিত্য-কালের দাবীতে অটুট ভক্তি ও অবিচল শ্রদ্ধার সিংহাসনে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সুবর্ণ-জয়ন্তী লগ্নে জাতীয় জীবনের এই মহান নেতার উদ্দেশে এবং তাঁহার অবদানের উদ্দেশে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করি এবং প্রার্থনা করি বর্তমান ভারতবর্ষে এই সর্বনাশা পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া সমগ্র জাতি বিপর্যয়ের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কল্যাণের পথে যাত্রা

ডঃ খোরানা—ইন্দ্রাসুনারি কাওয়াবাতা

বর্তমান কাল হইতে ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের মরণ ভেরী পৃথিবীর দিক দিগন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হওয়ার ঠিক বর্ষকাল পূর্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, তাহার সতের বৎসর পর ১৯৩০ সালে স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণ এবং তাহার পর এই দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর পর পৃথিবীর বুকে অসংখ্য ঘটনার ঘনঘটা হওয়ার পর বিরাট, বিপুল, বিস্ময়কর পরিবর্তনের সমারোহ পৃথিবীর আলেখ্য পরিপূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়ার পর সমগ্র বিশ্ববাসী উত্তর হইতে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে কোটি কোটি নরনারীর গোচরীভূত হইল যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয়দের তালিকায় একটি তৃতীয় নাম যুক্ত হইয়াছে। সেই তৃতীয় নাম অর্থাৎ বিদেশের বুকে ভারত জননীর গর্ব ও গৌরব বিবর্ধনের এক মহান ভূমিকাগ্রহণকারী অবিস্মরণীয় শুভনাম ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা।

অতীতে কণাদ নাগার্জুন এ যুগে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ পূজ্য পুরুষবৃন্দ যে দেশের বিজ্ঞান সাধনাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন আপন আপন দুশ্চর সাধনায় এবং দুরূহ তপস্যায় যাহার ফলে বিজ্ঞানের জটিল দুরূহ তত্ত্বগুলির প্রতি নব নব আলোকপাত ঘটিয়াছে এবং নব নব আবিষ্কারে মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকার তিলে তিলে দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের প্রসন্ন সূর্যালোকে সভ্যতার জয়বার্তা সূচিত হইয়াছে---ডঃ খোরানা সেই দেশেরই নমস্য বিজ্ঞানগুরু ও বিজ্ঞানসাধকদের এক স্বনামধন্য এবং লব্ধকীর্তি উত্তরপুরুষ। বিজ্ঞান সাধনায় যে দেশের সহস্রাধিক বর্ষের ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যের পুণ্য আলোকধারায় রশ্মিস্নাত একটি উজ্জ্বল নাম ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা। বর্তমান বর্ষে অপর দুই বিজ্ঞানীর সহিত নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বকে যিনি আরও একবার অবহিত করিলেন যে ভারতজননীর 'রত্নপ্রসূ' আখ্যাটি নিছক ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত একটি অভিব্যক্তি বা কবিমনের কল্পনাপ্রসূত একটি স্বপ্নমাত্র নয়।

ডঃ খোরানার এই সম্মানে সারা ভারতবর্ষে আজ আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে। প্রতিটি ভারতবাসী তাঁহার সম্মানে আজ সম্মানিত। এ সম্মান আজ তাঁহার একার নয়। এ সম্মান ভারতবর্ষের।

ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা

কিন্তু এইবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা এ প্রসঙ্গে আশা করি নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ডঃ খোরানা ভারতের গৌরব ঠিকই, তাঁহার গৌরবে ভারত জননীর গৌরবান্বিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তৎপরিবর্তে এক অপরিসীম লজ্জায় দেশজননীর পরম সুন্দর আনন আজ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে নাই কি---কিন্তু কেন? সন্তানের গৌরবে জননীর লজ্জায়, সঙ্কোচে, অনুশোচনায় ভরপুর হওয়ার জন্য দায়ী কে---কাহাদের জন্য দেশজননীর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্তি আজ বিষাদের ও লজ্জার কালিমাচ্ছন্ন হইয়া গেল---দায়ী কয়েক জন সবজান্তা অযোগ্য সরকারী অফিসার---যাঁহাদের বিচারে এবং বিবেচনায় প্রতিভা মনীষা মেধার কোন মূল্যই নেই, আছে শুধু তদ্বির তদারক এবং খুঁটির প্রাধান্য। ইহারই জন্য দেশের কৃতী সন্তানের স্থান আজ দেশের মাটিতে হইল না। দু'মুঠো অন্নের সংস্থানের জন্য বিদেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে হইল। ইহা অপেক্ষা একটি সভ্য সুসংস্কৃতি ও এক সুপ্রাচীন সভ্যতায় সমৃদ্ধ দেশের লজ্জা আর কি থাকিতে পারে?

ভারতের তাঁহার এই সাফল্যে গর্বের যথেষ্ট কারণ আছে অস্বীকার করি না কিন্তু প্রশ্ন এই এ গৌরবের সুফলে হস্তক্ষেপ করার এই গৌরব স্পর্শ করার অধিকার কি আজ ভারতবর্ষের আছে---একদিন যে সুসন্তানকে দু'মুঠো অন্ন না দিয়া ভারতবর্ষ আপন অঙ্ক হইতে নির্বাসিত করিয়াছে, জননীর স্নেহঘন করুণায় যাহাকে আপন বক্ষের প্রশান্তিঘন পরিমণ্ডলে না টানিয়া বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়া এত বড় বিশাল বক্ষে স্থান দিল না---আজ তাঁহার গৌরবে কোন লজ্জায় ভারতবর্ষ বাহু তুলিয়া নৃত্য করিবে?

সত্যই কি ডঃ খোরানার মত গুণীকে, কৃতীকে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধককে দেশের অঙ্কে স্থান দেওয়া যাইত না---আজও পদে পদে ভারতবর্ষকে তাহার নানাবিধ উন্নয়নমূলক গঠনমূলক কর্মে বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের ও কুশলীদের শরণাপন্ন হইতে হয় অথচ আমলাতান্ত্রিক লালফিতাগুলির কল্যাণে দেশের বিজ্ঞানীর দেশের বুকে স্থান সঙ্কুলান হইল না।

আজ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে ডঃ খোরানা পরিণতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিষয়ে সমগ্র ভারতবাসী জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু নানা বিষয়ে

কৃতবিদ্য অসংখ্য গুণী, কৃতী ভারতীয় তাঁহাদের সম্মুখে দেশের দুয়ার অর্গলরুদ্ধ দেখিতেছেন ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া বিদেশে তাঁহাদের বাস করিতে হইতেছে এবং স্বভাবতই তাঁহাদের অন্তর হইতে এখন যদি দেশপ্রেম একটু একটু করিয়া ভাটা পড়িতে থাকে তাহা হইলে কি তাঁহাদের দোষারোপ করা চলে--বিষয়টি একটু ধীর মস্তিষ্কে এবং বিবেচনার সহিত চিন্তা করিলেই এ সম্পর্কে সদুত্তর মিলিতে পারে।

এখনও যদি ভারত সরকারের টনক না নড়ে তাহা হইলে কিভাবে যে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে তাহা জানা নাই, তবে, এই ঘটনায় তাঁহাদের মনশ্চক্ষুর উন্মীলন হওয়া অবশ্যই উচিত এবং ডঃ খোরানার ন্যায় যে-সকল কৃতী ভারত সন্তান বিদেশে বাধ্য হইয়া পড়িয়া আছেন তাঁহাদের স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিয়া সম্মানের সহিত মর্যাদার সহিত শিরোভূষণ করিয়া রাখিয়া তাঁহাদের আপন আপন সাধনায় অগ্রসর হইতে সর্বপ্রকার সহায়তার হস্ত প্রসারিত করা উচিত। তাঁহাদের সাধনার ফল ভারতবর্ষেই লাভ করুন---আপন সন্তান থাকিতে কেন ভারত জননীকে অন্যের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে?

এ বৎসর নোবেল পুরস্কার প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ১৮৯৬ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে বিজ্ঞানসাধক আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর ১৯০১ সাল হইতে অদ্যাপি এই পুরস্কার পাঁচটি বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত হইতেছে। এই দীর্ঘকালে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এতাবৎ মাত্র ছয়জন লাভ করিয়াছেন। এ বৎসর তাহার সংখ্যা দাঁড়াইল আটে। ডক্টর খোরানার সহিত এ বৎসর আরও একজন এশীয় এই পুরস্কার লাভ করিলেন। তিনি জাপানের বিখ্যাত লেখক কাওয়াবাতা। এখানে নোবেল কমিটিকেও একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। এই দীর্ঘকালে তাঁহাদের পুরস্কার লাভ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কি এই কয়জন ছাড়া আর তাঁহারা পান নাই? সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, চিকিৎসাবিদ্যায় পাশ্চাত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা কি এশিয়ায় ছিল না বা নাই? যাঁহারা এতাবৎ ইয়োরোপীয় এ্যামেরিকানদের মধ্যে লাভ করিয়াছেন এশীয় মহাদেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক প্রতিভাধরগণ কোন অংশে তাঁহাদের তুলনায় পশ্চাৎপদ---এই কৈফিয়ৎ আমরা নোবেল কমিটির সামনে অনায়াসে তুলিয়া ধরিতে পারি। সমগ্র এশিয়ার সাহিত্য সাধকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পর এই প্রথম লাভ করিলেন দ্বিতীয়জন। ইহাতে একদেশদর্শিতা ও উন্নাসিক মনোভাবেরই চিত্র পরিস্ফুট হইয়া ওঠে।

জাতীয় গ্রন্থাগারে চুরি

শুধু কলিকাতা বা বাঙলা দেশ এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষও নয়---সারা পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার বর্তমান তন্মধ্যে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। উন্নত এবং সমৃদ্ধ গ্রন্থশালা হিসাবে ইহার শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। সেই কারণেই জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগৃহগুলির তালিকায় এই গ্রন্থালয় একটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে ভারতের তদানীন্তন উপরাজ ও বড় লর্ড ল্যান্সডাউনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে স্মরণীয় হইয়া বিদ্যমান। ইতিহাসে তাহার গৌরব ও গুরুত্ব সমাদরের সহিত স্বীকৃত। বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও ঐতিহাসিক গবেষণার সাফল্যের মূলে ইহার অবদান অনস্বীকার্য। অনুশীলনকার এবং গবেষকবৃন্দের যাত্রাপথ এই গ্রন্থাগার যে কত সুগম করিয়া দিয়াছে তাহা উপলব্ধির গণ্ডীতে পড়ে। দেবী সরস্বতীর পরম পবিত্র প্রসাদের সম্ভার তথা মহার্ঘ রত্নগুলি লইয়া যে প্রতিষ্ঠান রূপজ পরিগ্রহ করিয়া ছ তাহাকে সারা জাতির এক পরম শ্রদ্ধার সম্পদ বা পবিত্র মন্দির বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না। এই কারণেই জাতীয় গ্রন্থালয় আমাদের নিকট এক পবিত্র তীর্থসদৃশ।

কিন্তু এই গ্রন্থমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রতি যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা যেমনই বেদনাদায়ক তেমনই লজ্জাজনক। যে কোন সৎ ব্যক্তিমাত্রই এই সংবাদে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইবেন, এ সম্পর্কে কোনপ্রকার দ্বিমতের অবকাশ নাই।

কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থালয় হইতে প্রায় দুই লক্ষ গ্রন্থ নিখোঁজ। এই সংবাদ প্রতিটি সারস্বত ব্যক্তির মনে যে কি পরিমাণ মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কোন ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করা যায়---সে তথ্য আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিবহির্ভূত।

সংবাদে প্রকাশ এই বিপুলসংখ্যক গ্রন্থের অন্তর্ধান আরম্ভ হইয়াছে আজ অর্থাৎ আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের মহান রূপকার লোকনায়ক স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখনও জীবিত। ঐ সময়ে তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবন সেই সময়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ লক্ষের উপর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বর্তমানে দেখা যাইতেছে সংরক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা আট লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার দুই শত ত্রিশ। দুটি তথ্যই যদি ভ্রান্তিহীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছে যে, প্রায় দুই লক্ষ গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে নিখোঁজ শুধু তাই নয়, প্রতি বছর গ্রন্থাগারে পনের-বিশ হাজার গ্রন্থ যুক্ত হয়। তাহা হইলে সেই অনুপাতে হিসাব করিলে

দেখা যাইবে নিখোঁজ গ্রন্থের সংখ্যা আরও অধিক।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে আরও যে দুটি তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাও কঠোর সমালোচনার যোগ্য। গ্রন্থাগারের কাজকর্ম যথাযথভাবে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারা সেই কমিটি সংগঠিত হওয়া উচিত কিন্তু তৎপরিবর্তে যাঁহাদের সমন্বয়ে এ-কমিটি গঠিত হইল তাঁহাদের কেহ জুতা কোম্পানীর ম্যানেজার, কেহ লৌহ-ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের বড় অফিসার, কেহ বা রাজনৈতিক নেতা। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেখা যাইতেছে কাহারও তিলমাত্র সংযোগ এবং স্বভাবতই বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতাও নাই। সকলেই ভিন্ন পরিধির বাসিন্দা কিন্তু এ বিষয়ে যোগ্য এবং উপযুক্ত ব্যক্তির দুর্ভিক্ষ বাঙলা দেশে এখনও দেখা দেয় নাই। গ্রন্থাগারের এই বিরাট চুরির তদন্ত সম্পর্কেও একটি কমিটি কয়েক বৎসর পূর্বে গঠিত হইয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ পর্যন্ত সে কমিটির বৈঠক বসিয়াছে মাত্র একবার। এই দীর্ঘ সময়ে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মাত্র একবারের বেশী বৈঠক কেন বসিল না এ-সম্পর্কে কোন সদুত্তর এখনও পর্যন্ত মেলে নাই।

উপরোক্ত দুটি ব্যবস্থা যে কোন শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে যথেষ্ট প্রতিকূলতার চক্ষে দেখিবেন এ-বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যে দেশে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির বিজয় পতাকা এখনও সগৌরবে উড্ডীয়মান, যে দেশের ধ্যান-ধারণা-চিন্তাধারা এখনও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইতেছে, যে দেশের সাংস্কৃতিক অবদান আজও বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডার পরিপূরণে যথেষ্ট সহযোগিতাই করিয়া চলিতেছে সে দেশে গ্রন্থসম্পর্কিত এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তিদের গ্রহণ এবং যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে বর্জন কোন যুক্তিতে করা হইল এবং এত বড় একটা নিদারুণ ব্যাপারের তদন্ত বৈঠক তিন-চার বৎসরে মাত্র একবার কেন অনুষ্ঠিত হইল, আশা করি সে সম্বন্ধে জবাব চাওয়ার অধিকার জনগণের নিশ্চয়ই আছে।

এ বিষয়ের কৈফিয়ৎ চাওয়ার দাবী জনগণের পক্ষ হইতে নিশ্চয়ই উত্থাপন করা যাইতে পারে, কারণ এ-প্রতিষ্ঠান সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইলেও ইহা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের জ্ঞান-তপস্বীর ইহা এক নির্বিশেষ মিলন ক্ষেত্র। সকল বিষয়ের সকল ভাষার ইহা পাশাপাশি অবস্থানের নিরবচ্ছিন্ন কেন্দ্র। এখানে জল নাই, রাজনীতি নাই, তাই এখানে আমলাতান্ত্রিক নিয়ম খাটিতে পারে না। ইহা এমন একটি স্থান যেখানে কাহারও প্রত্যাখ্যান নাই---যেখানে 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে', যেখানে 'হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন। শক-হূণ-দল, পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন'। যেখানে অশোকের পাশে ঔরঙ্গজেব, হর্ষবর্ধনের সন্নিকটে শিবাজী, রিজিয়ার পাশে এলিজাবেথ—দেশ-কাল-ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালকে সর্ব সমাজকে যে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সমবেত করিয়া এক মহাতীর্থের সৃষ্টি হইল—জনসাধারণের প্রত্যেকেই এই মহাতীর্থের এক-একটি তীর্থঙ্কর।

তাবৎ ঘটনায় একটি জিনিস জলের মত স্বচ্ছ হইয়া গেল—যে এত বড় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম-নির্বাহের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহারা কতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অক্ষম সে জন্য এই মহাতীর্থ আজ যথেচ্ছাচারিতার কেন্দ্রে পরিণত। সতর্কদৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা ও নিয়মের অভাব আজ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করিল তাহা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কিভাবে পূরণ করিবেন তাহা আমাদের জানা নাই। তাঁহাদের অযোগ্যতা এবং শৈথিল্যের জন্য সারা জাতি এত-বড় ক্ষতি স্বীকার কেন করিবে? যে-গ্রন্থগুলি চোখের আড়াল হইয়া গেল নিশ্চয়ই সেগুলি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ধরিতে হইবে এবং সেগুলি যে প্রভূত অর্থের বিনিময়ে আরও কোনদিন লোকচক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইবে না একথাও একরূপ জোর করিয়াই বলা যায়। এমন অনেকে আছেন---যাঁহারা নিজের পরিশ্রম লাঘব করার জন্য পাতা কাটিয়া লন---তাঁহারা একবার ভাবিয়াও দেখেন না যে একটুখানি পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য আরও কতজনকে তাঁহারা বঞ্চিত করিলেন, যাঁহাদের সাধনায় দেশ নানাভাবে সমৃদ্ধ হইতে পারিত—কিন্তু যাঁহারা প্রহরারত, তাঁহারা কি নিদ্রিত থাকেন?

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে দুই লক্ষ গ্রন্থ আজ সাত বৎসর ধরিয়া অপসারিত হইতেছে, এতদিন পর কর্তাদের টনক নড়িল কেন? আরও কিছুকাল অতিবাহিত হইলেই তো হইত। যথাসময়ে অর্থাৎ গোড়ায় গোড়ায় এই সর্বনাশ রোধ করায় কোন চেষ্টা কেন করা হইল না, জানি না ইহারও কোন সদুত্তর আদৌ কখনও মিলিবার তিলমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না—

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনন্দকুমার [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

মহালয়া প্রসঙ্গে

মহাশয়, বিগত ভাদ্র, ১৩৭৫ বাংলার মাসিক বসুমতী সংখ্যায় মহালয়া প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। লেখক যে-সব যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন বিশেষত চিত্রগুপ্তের ব্যাখ্যার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি, "কালক্রমে সাধনার অভাবে সথত্য আবিষ্কারে অসমর্থ অসাধকেরা পুরাণের গল্পের উপাদানগুলিকে পূজার বেদীতে বসাইয়া হিন্দুর সমস্ত আয়োজন পণ্ড করিয়া দিয়াছে। পুরাণকারের গল্পের খোসার উপর ধস্তাধস্তি না করিয়া সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে চিত্রগুপ্তের বিষয়টির মত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে।' লেখকের এই কথাটি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। সাধকের নির্দেশিত পন্থা আচরিত না হইয়া বর্তমানেও সাধকদের পূজাই সাড়ম্বরে হইতেছে।

'ব্রহ্ম যদি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া লিখিতে বসেন তবে তাঁহার অসীমত্ব বিলুপ্ত হইয়া সসীমের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়।' লেখকের এই উক্তি সম্বন্ধে সামঞ্জস্য রাখিয়া পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাগুলি পৃথক বস্তু নয় এরূপ একটা সমাধানে অর্থাৎ মনকে অখণ্ড চৈতন্য শক্তি হইতে জীবাত্মার মধ্যে পৃথকভাবে না দেখিয়া অসীমত্ব বজায় আছে এরূপ ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কোটি কোটি নক্ষত্র যদি আকাশে থাকিতে পারে, সূর্য হইতে পৃথক হইয়া গ্রহ-উপগ্রহগুলি যদি নিজ নিজ পথে অনন্তকাল পরিভ্রমণ করিতে পারে তবে জীবাত্মাগুলি পরমাত্মা হইতে পৃথক হইয়া অনন্তকাল অদৃশ্যভাবে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন দেহে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? এ প্রশ্নে আসিলে পরমাত্মার বা চৈতন্য শক্তির অসীমত্ব অস্বীকার করার অবস্থা আসিয়া পড়ে। প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথে ক্রমে সকলকেই আসিতে হইবে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, রূপান্তরিত হওয়ার

ক্ষমতা থাকায় কোন বস্তুই জড় নয়। শব্দ, ছায়া প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে লয় হয় না, ঈশ্বর নিরাকার। অজ্ঞতার জন্যই লোক অবিশ্বাসী। স্থূলবুদ্ধি লোককে বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত আসল সত্য জ্ঞাপনের ব্যবস্থা নাই।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক বস্তু কি না এ সম্বন্ধে একটা সমাধানের চেষ্টা করিতে গিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, বস্তুর মিশ্রণে কোন এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে আসিলেই অদৃশ্য একটা শক্তি তাহাতে যোগ হয় এবং প্রাণধারা প্রকাশিত হয়। সুইচ টিপিলে যেমন বাতি জ্বলে, মিটার অনুযায়ী রেডিওতে শব্দ আসে। স্ত্রী ও পুরুষ ধাতুর মিশ্রণে এরূপ একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন অখণ্ড চৈতন্য শক্তি তাহাকে চালিত করার সুযোগ পায়। এই চালনায় প্রাণধারার বিকাশ। দেহযন্ত্র যতক্ষণ এই শক্তিকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, ততক্ষণই প্রাণী জীবিত থাকে, রোদ্রের তাপে অল্পসময়ের মধ্যে কতকগুলি প্রাণীর মৃত্যু হয়, কারণ তাহাদের দেহ জীবন ধারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে। দেহের অংশবিশেষ নষ্ট হইলে বা কাটিয়া ফেলিলেও মানুষ বাঁচে, কিন্তু মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের সংযোগকারী কণ্ঠনালী খণ্ডিত করিলে কোনও প্রাণী বাঁচে না। মস্তিষ্কই ব্রহ্মের ধারক (ব্রহ্মতালু)। ইথার সমুদ্রের মত চৈতন্য শক্তির মাঝেই আমরা ডুবিয়া আছি। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই চৈতন্য শক্তি তাহার কাজ আরম্ভ করে—শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে থাকে। বায়ুর উপাদানগুলি দেহযন্ত্রকে সক্রিয় রাখে অথবা বায়ুর দ্বারাই চৈতন্য শক্তি দেহের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ককে চালু রাখে। যতক্ষণ শ্বাস চলে ততক্ষণই প্রাণী জীবিত থাকে। চৈতন্যশক্তির আগমন-নির্গন ইলেক্‌ট্রিক বাতির মত, প্রতিমুহূর্তে জ্বলে ও নিভে; কিন্তু সাধারণ চোখে তাহাকে স্থায়ী বলিয়াই মনে হয়।

পরমাত্মার শক্তিতেই জীবের প্রাণধারা এইভাবে চলিতেছে যাহাকে জীবাত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে। অখণ্ড চৈতন্যশক্তি দেহে আবদ্ধ হইতেছে না। দেহের যান্ত্রিক ক্ষমতা থাকা অবস্থায় কোন কারণে শ্বাস বন্ধ হইলে কৃত্রিম উপায়ে আবার চালু করিলেই দেহে চেতনা শক্তি আসে। দেহের যন্ত্রগুলির উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। এইভাবে ভাওয়াল সন্ন্যাসী বাঁচিয়া গেলেন, জলে ডোবা, সাপে কাটা মানুষ আবার জীবন পায়।

এ জীবনের চিন্তাধারা এবং দৈনন্দিন কর্মের ছাপ মস্তিষ্কে থাকে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাজকর্ম কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করে ইহা বুঝা সম্ভব। চিন্তাধারা যদি দেহের বাহিরেও বিচরণ করে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে পরবর্তীকালে অর্থাৎ মস্তিষ্ক ধ্বংস হওয়ার পর অন্য কোন মানুষের মধ্যে যে কোন সময়ে সেই চিন্তাধারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। ইহা ঠিক ঠিক জন্মান্তর গ্রহণ নয়। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিলে এই পথে সমাধানে আসা যায়। আত্মা আবার জন্মে না; কিন্তু অখণ্ড চৈতন্য শক্তিতে ভেসে আসা বা ভেসে থাকা চিন্তাধারা সমশক্তিধর অপরের মস্তিষ্কে আঘাত করে। (শব্দ-তরঙ্গে গ্রামফোন বাজিবার মত) তখন কতকগুলি কথা ও ভাব সে প্রকাশ করিতে পারে।

চিন্তাধারা বাহিরেও ব্যাপ্ত হয় বিশ্বাস করা যায়। [illegible]

রাজনৈতিক কোনও নূতন কথা যখন আমরা আলোচনা করি, সময় সময় তার ২।৪ দিনের মধ্যেই কোন কোন পত্রিকায় বক্তৃতা অথবা প্রবন্ধে তাহা প্রকাশিত হয়। জ্ঞানী-গুণী লোকের চিন্তাধারা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের মধ্যেও কিছুটা আসিয়া পড়ে। সময় সময় দূরবর্তী আত্মীয়দের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিত হইতে পারি। যোগী-ঋষিরা এভাবেই বোধ হয় কোন কোন জীবের পূর্ব কথা বলিতে পারিতেন। মৃত্যুর পরে যদি চিন্তা ও ভাবধারা থাকিতে পারে তবে তাহাকেই পরলোকের অবস্থা বলা যাইতে পারে। পুনর্জন্ম, জীবাত্মা-পরমাত্মা, পরলোক প্রভৃতি সব কিছুরই বৈজ্ঞানিক সমাধান অনুসন্ধিৎসা থাকিলে ক্রমে পাওয়া সম্ভবপর হইবে। কুসংস্কার দূর করার পথে অগ্রসর হইয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। নমস্কারান্তে---শ্রীঅনিলরঞ্জন ভট্টাচার্য, কে, অ,---ডি এস ভট্টাচার্য, পোঃ---ডিগবয়, মিশনপাড়া, আসাম।

এক রাতের রাণী প্রসঙ্গে

মহাশয়, 'মাসিক বসুমতী'র অভিনবত্বে বড়ই আনন্দ পাই, কারণ আমি একজন নিয়মিত পাঠক। "এক রাতের রাণী"---প্রসঙ্গে গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় যে সমালোচনা করেছেন তার সঙ্গে আমি একমত হইতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। নটরাজন একজন বিখ্যাত লেখক এবং তিনি যে সম্পূর্ণ কাহিনীটিই স্বপ্নের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ণনা-সৌষ্ঠব, প্রাঞ্জল ভাষা, কল্পনার দূরদর্শিতা ও লেখনীর বলিষ্ঠ প্রকাশ উপন্যাসটিকে মনোগ্রাহী ও সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসটিতে চরিত্রগুলি যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। রচনাটির অভিনবত্ব পাঠকদিগকে এক স্বাদ দিয়াছে (আমি মনে করি) এবং স্বপ্নের মাধ্যমে রচিত হওয়াতেও এক বাস্তব সত্যের সন্ধান এতে পাওয়া গেছে। মিঃ নটরাজন একটি অবাস্তব (?) কাহিনীর মাধ্যমে নর-নারীর চির-মধুর স্বর্গীয় সম্পর্কের যে প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ বর্ণনা করেছেন, দুই একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে উপন্যাসটি একটি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস, মিঃ নটরাজনকে আমার অভিনন্দন জানাইবেন।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসটির সম্বন্ধে যে মত দিয়াছেন এবং আপনার মত এক সত্যিকার সাহিত্যিক তথা সম্পাদকের প্রতি যে রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেছেন---একজন পাঠক হিসাবে আমি তার জন্য দুঃখিত। কটু সমালোচনা করার আগে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের আজকের পাঠক-পাঠিকা সমাজকে ভালো করে জানা উচিত ছিল বলে মনে করি--কারণ তাঁর সমালোচনার জন্য বেশীর ভাগ পাঠক ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

"খেলাধূলা" বিভাগটি আবার প্রকাশ হওয়াতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। বড় বড় খেলোয়াড়দের জীবনী প্রকাশ হলে দেশের তরুণ খেলোয়াড়রা উৎসাহ পাবেন---আপনার এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বসুমতীর দীর্ঘ-জীবন ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। নমস্কার জানিবেন।

---মনোজিৎ রায়, গৌরীপুর।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● শ্রীমতী বি বর্মণ, ডাক---তিভিম, গোয়া ● শ্রীমতী নিখিলকুমার মাইতি, গ্রাম---পূর্ব বামুনিয়া, ডাক---দরিয়াপুর, জেলা---মেদিনীপুর ● শ্রীমতী ইলা দেবী, অবঃ শ্রীতারকদাস ভট্টাচার্য, ৮।১০ (নিউ নং ৮।১২) ফুলবাড়ী রোড, ডাক---জেলা---মালদা ● শ্রী এ সি মুখার্জী, ডাইরেক্টার পি ডবলিউ ডি, পোস্ট বক্স ২১৫, মাসকট ● শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত, জয়বীর পাড়া, টি ই, ডাক---বীরপাড়া, জেলা---জলপাইগুড়ি ● শ্রী এম কে রায়, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, 'হিমাংশু ভবন', বাণী পার্ক, জয়পুর-৬, রাজস্থান ● শ্রীনন্দী ভাই, গুড়গুড় পল, মেদিনীপুর ● ডঃ সীতেশচন্দ্র বসু, খড়গপুর, মেদিনীপুর ● ফণিভূষণ রায়, মোহনপুর, কালিয়াগঞ্জ, পঃ দিনাজপুর।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮৲ টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠালাম। দয়া করে আমার ঠিকানায় নিয়মিতভাবে পাঠালে বাধিত হব। রাণী চক্রবর্তী, সাহেবগঞ্জ।

মাসিক বসুমতীর ১৩৭৫ সালের এক বছরের চাঁদা ১৮৲ টাকা পাঠালাম, আমার ঠিকানায় নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রী এ কে সেন, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর আশ্বিন হইতে ভাদ্র ১৩৭৬ পর্যন্ত এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৮৲ টাকা পাঠাইলাম। আমার বর্তমান ঠিকানায় মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী বিভা রাণী গঙ্গোপাধ্যায়, হাজারীবাগ, বিহার।

I am sending herewith Rs. 18/- for the annual subscription of Masik Basumati. Please send the magazine regularly.—Sm. Biva Bhattacharji, New Delhi.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক মূল্য বাবদ ২০৲ টাকা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। জ্যোৎস্না ঘোষ।

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের গ্রাহক মূল্য ৯৲ টাকা পাঠাইলাম, বসুমতীর গ্রাহক করে বাধিত করবেন। ডঃ এন সি দে, বিহার।

মাসিক বসুমতীর ভাদ্র সংখ্যা থেকে ছয় মাসের জন্য ৯৲ টাকা চাঁদা বাবদ পাঠালাম। মাসিক বসুমতী, পাঠিয়ে বাধিত করবেন। আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, হায়দ্রাবাদ।

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
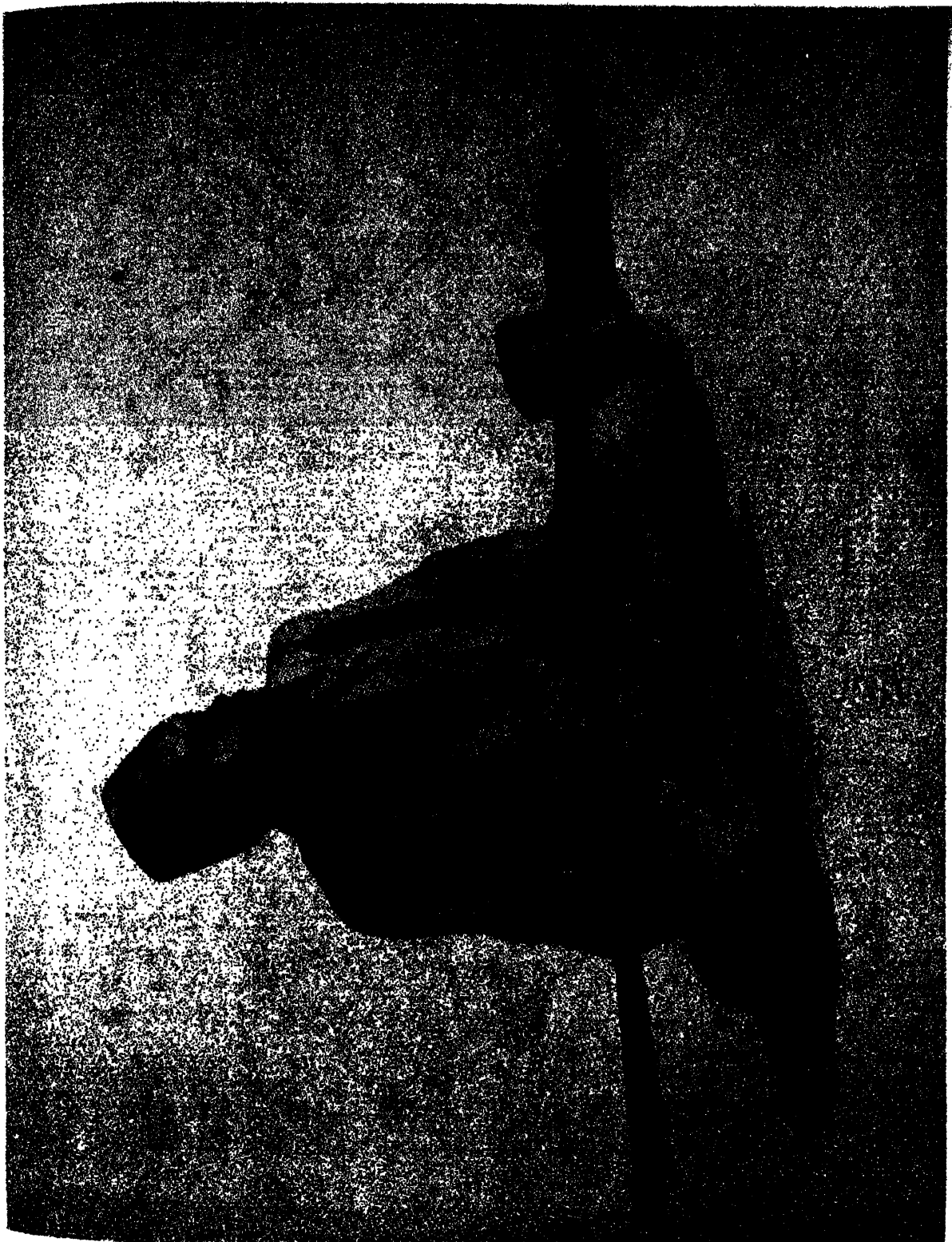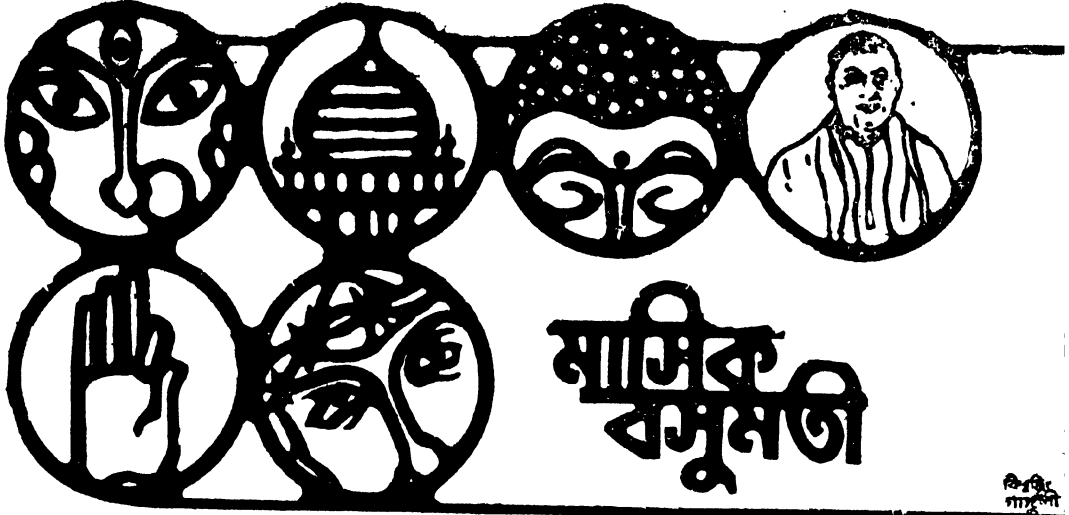
॥ ৪৭ বর্ষ, পৌষ, ১৩৭৫ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা ॥

বিশুদ্ধ চক্র (পদ্ম)

সুষুম্না মার্গস্থিত ষট্ চক্রের পঞ্চম চক্র হচ্ছে বিশুদ্ধ চক্র বা বিশুদ্ধ পদ্ম। ইহা কণ্ঠমূলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা-মালীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা গাঢ় ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল পদ্ম; ইহার দলগুলিতে অকারাদি ষোড়শ অক্ষর শোন ফুলের ন্যায় অরুণবর্ণ প্রভাযুক্ত। ইহার কোরকে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হং বীজ (আকাশ বীজ) আছে। ইহার আশ্রিত তত্ত্ব ব্যোম্।

এই বিশুদ্ধ চক্রই জনঃ লোক। এখানে হংস (পরমশিব)—যিনি পঞ্চ শিব সদাশিব—শাকিনী শক্তির সহিত অর্ধ নারীশ্বর-রূপে বিরাজমান। ইনিই যোগীর কর্মনিয়োজক অভয়দাতা ও মুক্তিদাতা।

এই পদ্মের ষোড়শ দলের প্রথম আটটি দল বিষ এবং দ্বিতীয় আটটি অমৃত বলে বর্ণিত। এখানে অষ্টতীর্থ বিরাজিত; এই অষ্টতীর্থে স্নান করে সাধক অষ্টদলের বিষে অষ্টপাশ নাশ করে অষ্ট অমৃত দ্বারা কৈবল্য লাভ করেন।

এই পদ্ম আকাশ বীজাত্মক বলে সকল তত্ত্বই এখানে এসে আকাশে লীন হয়। সদাশিব লিঙ্গরূপী; আকাশেরও অন্য নাম লিঙ্গ—ইহা সকলের লয়স্থান বলে লিঙ্গ বলা হয়।

বিশুদ্ধ চক্র সাধকের পঞ্চম জ্ঞানভূমি।

শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদেরা কাছে যাই গাইলেন—

'তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল
ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হ'য়ে ষোড়শ দল
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হ'লে সকলি আকাশ।'

তখন ঠাকুর মাস্টারকে বলছেন—"এই শুন, এরই নাম নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন। বিশুদ্ধ চক্র ভেদ হলে সকলি আকাশ।

"এই মায়াজীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌঁছায় যায়।"

বিশ্বরূপ

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"কেউ কেউ মনে করেন গীতায় যে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা আছে তা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনা মাত্র। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বিশ্বরূপ দর্শন অর্জুনের মানসিক অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় ছিল বলেই অন্তর্যামীর অলক্ষিত প্রেরণায় তিনি বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে-ছিলেন। তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় সেটা তেমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় না, যেমন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হয় উপলব্ধ জ্ঞান। অর্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সংশয় জেগেছিল, শ্রীভগবানের জ্ঞান-গর্ভ উপদেশেও সেগুলির পূর্ণ নিরসন ঘটে নি। কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের সব সংশয় চিরদিনের মত অপনীত হ'য়ে গেল—বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হ'য়ে গীতা রহস্য উপলব্ধির যোগ্য হ'ল। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত গীতায় কথিত জ্ঞান সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ; সেই রূপ দর্শনের
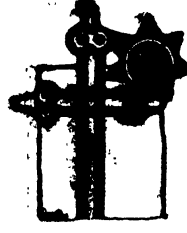
যাবতীয় যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষাই কতকগুলি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনা হ'য়ে দাঁড়ায়। বস্তুত বিশ্বরূপ দর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, অদ্ভুত সত্য; তবে ইহা অতি প্রাকৃত সত্য নয়—কেন না বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত বিশ্বরূপ অতি প্রাকৃত হ'তে পারে না। বিশ্বরূপ কারণ জগতের সত্য; কারণ জগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত অর্জুন কারণ জগতের বিশ্বরূপ দেখেছিলেন।

"যিনি শক্তির উপাসক, কর্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্ররূপে ভগবৎ নির্দিষ্ট কর্মে আদিষ্ট, বিশ্বরূপ দর্শন তাঁর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্বে তিনি আদেশ প্রাপ্ত করতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শন লাভ না হওয়া পর্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না—রুজু হয়েছে, তখনো পাশ হয় নি, সে পর্যন্ত তাঁর কর্ম—শিক্ষার ও তৈরি হওয়ার সময়। বিশ্বরূপ দর্শনে কর্মের আরম্ভ। সাধকের সাধনা ও স্বভাব অনুযায়ী অনেক প্রকার বিশ্বরূপ দর্শন হ'তে পারে। কালীর বিশ্বরূপ দর্শনে সাধক জগৎময় অপরূপ নারীরূপ দেখেন। এক অথচ অগণন দেহযুক্ত, সর্বত্র সেই নিবিড়-অমিস্রা-প্রসারী ঘন কৃষ্ণ কুন্তলরাশি আকাশ ছেয়ে রয়েছে, সর্বত্র সেই রক্তাক্ত খড়্গের আভা নয়ন ঝলসে নেচে বেড়াচ্ছে, জগৎময় সেই ভীষণ অট্টহাসির স্রোত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ কচ্ছে! এ সকল কথা কবির কল্পনা নয় —অতি প্রাকৃত উপলব্ধিকে অসম্পূর্ণ মানব ভাষায় বর্ণনা করবার বিফল প্রয়াস নয়। ইহা কালীর আত্মপ্রকাশ,—আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ; যা দিব্যচক্ষুতে দেখা হয়েছে, তার অনতিরঞ্জিত, সরল, সত্য, বর্ণনা। অর্জুন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন নাই, দেখেছিলেন কালীরূপী কৃষ্ণের সংহারকে বিশ্বরূপ। একই কথা, দিব্যচক্ষুতে দেখেছিলেন, বাহ্যজ্ঞানহীন সমাধিতে নয়; যা দেখেছিলেন ব্যাসদেব তার অবিকল অনতিরঞ্জিত বর্ণনা করেছেন। স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, সত্য—জাগ্রত সত্য!"

বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তাঁতে বিশ্বাস থাকা; আর শরণাগত হওয়া—এ দুটি দরকার। যে পথেই থাকো—ভুল হোক,—দৃঢ় বিশ্বাস করে, শরণাগত হ'য়ে, ব্যাকুল হ'য়ে, তাঁকে ডাকলে সে আন্তরিক ডাক—অন্তর্যামী তিনি—শুনবেনই শুনবেন। বিশ্বাস ঠিক ঠিক হওয়া চাই।

"ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তাহলে সাধনার সময় বেশি খাটতে হয় না। তাঁর নামে বিশ্বাস কর। একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি, আর করবো না। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হ'য়ে যায়।

"নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই। কেমন করে বিশ্বাস হয় শুনবে? তাঁতে অনুরাগ কর। একটা গানে আছে—'প্রভু, বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা?' যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তার জন্যে তাঁর কাছে, গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর; আর কাঁদো! মাগের ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোকসান হ'লে, কি বিষয়কর্মের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে; ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল দেখি?

প্রধান কথা বিশ্বাস। 'যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।' বিশ্বাস হ'য়ে গেলে আর ভয় নাই। তাঁতে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে পাপই করুক আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই। আগে বিশ্বাস, তার পর ভক্তি। বিশ্বাস হলো তো সবই হ'য়ে গেল। বিশ্বাস না থাকলে পূজা জপ সন্ধ্যাদিতে কিছু হয় না।

"আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা সব কথা বুঝে উঠতে পারি না। তাই যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন সেই সাধু মহাত্মাদের কথা বিশ্বাস করতে হয়।

"তাঁর নামে বিশ্বাস হ'লে তীর্থাদির প্রয়োজন হয় না। ঠিক বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়; আর, সব বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয়। বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়; আর যে গরু শাক-পাতা, খোসা ভুষি, জাব,—যা দাও গব্ গব্ করে খায়, সে গরু হুড় হুড় করে দুধ দেয়।

"বালকের মত বিশ্বাস না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়।

"গুরু বাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু। তাঁর কথা বিশ্বাস করলে,—বালকের মত বিশ্বাস করলে, ঈশ্বর লাভ হয়। বালকের কি বিশ্বাস! মা বলেছে, 'ও তোর দাদা হয়', অমনি জেনেছে 'ও আমার দাদা!' একেবারে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস! তা সে ছেলে হয়ত বামুনের ছেলে, আর দাদা হয়ত ছুতোর কামারের ছেলে!

"মা বলেছে, 'ও ঘরে জুজু!'—তো পাকা জেনে আছে—ও ঘরে জুজু! এর নাম বালকের বিশ্বাস। গুরু বাক্যে এমন বিশ্বাস চাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি করলে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"বিশ্বাস আর সরল হওয়া; কপট হ'লে হবে না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ। কপট থেকে তিনি অনেক দূরে। সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট্ করে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূরে। বিষয়বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়—বিশ্বাস হয় না।
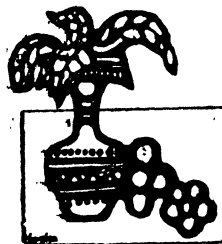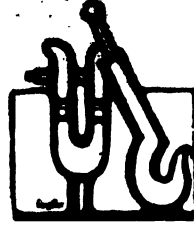
"বিশ্বাস জ্বলন্ত হওয়া চাই—এমন দৃঢ় হওয়া চাই যে সত্যি সত্যি ধারণা হবে, তাঁর নাম করলে পাপ থাকতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ" সে বৃন্দাবনে গিছিল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতেষ্টা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে—'ওরে, তুই একঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত?' সে বললে—'ঠাকুরমশাই, আমি হীন জাত; মুচি।' কৃষ্ণকিশোর বললে—'তুই বল্ 'শিব'। সে শিব বলতে বললে—'নে, এখন জল তুলে দে!' দেখলে, কেমন জ্বলন্ত বিশ্বাস!

"শাক্তদের কি জ্বলন্ত বিশ্বাস দেখেছ? তাদের মনে খুব জোর!—ভক্তির তমঃ। কি! মা'র নাম করেছি,—কালী বলেছি—আমার আবার পাপ!

"বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাস! গুরু বলে দিয়েছেন—"ওহি রাম ঘট্ ঘট্‌মে লেটা!' ভক্তের অমনি বিশ্বাস যখন একটা কুকুর রুটি মুখে করে নিয়ে পালাচ্ছে তখন ভক্ত ঘিয়ের ভাঁড় হাতে করে পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে, আর বলছে, 'রাম, একটু দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মাখিয়ে দিচ্ছি।' এমনি গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। বিশ্বাসে সব মিলে। বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে—'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।'

"গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলে বিশ্বাস না হ'লে মন্ত্রে বিশ্বাস হবে কি করে? বিশ্বাস হ'লেই সব হ'য়ে গেল। একলব্য মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে পূজা করতো বলেই বাণ শিক্ষায় সিদ্ধ হ'তে পেরেছিল।

"ঈশ্বর দর্শনের উপায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস; তাঁর বাক্য ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়।

"তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সমস্ত হয়—জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, আলাপ,—সব। যার ঠিক বিশ্বাস ঈশ্বরই কর্তা, আর আমি অকর্তা, তার পাপকার্য হয় না। যে নাচতে ঠিক শিখেছে, তার বেতালে পা পড়ে না।

"অন্তর শুদ্ধ না হ'লে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না। যারা জীব-কোটি তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বর-কোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ 'ক' লিখতে গিয়ে কান্না—কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। জীবের স্বভাব—সংশয়াত্মক বুদ্ধি। তারা বলে—'হাঁ, বটে, কিন্তু—'।

"তাঁকে দর্শন করলে সব সংশয়ই চলে যায়। শুনা এক—দ্যাখা এক। শুনলে ষোল আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হলে বিশ্বাসের আর কিছু বাকী থাকে না।

"মা'র কথা বিশ্বাস করেই জটিল বালক ভয়ের হাত এড়িয়েছিল। অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেটি তার সামনে বসিয়ে ঠাকুরকে খাওয়াতে পেরেছিল।

"হনুমান বিশ্বাসের জোরে লাফ দিয়ে সমুদ্র পারে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু রামচন্দ্রকে লঙ্কায় যেতে সমুদ্র বাঁধতে হ'ল। বিভীষণ একটি রামনাম লেখা পাতা একজনের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিয়ে তাকে বিশ্বাস করে সমুদ্র পার হতে বলেছিল।

"ব্যাসদেব ঠিক ঠিক বিশ্বাস করতেন—'তিনি শুদ্ধাত্মা—শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত—প্রকৃতির পার। তার ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই—জন্ম-মৃত্যু নাই।'

"জড়ভরত ঠিক ঠিক বিশ্বাস করতেন তিনি শুদ্ধ আত্মা।

"গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ।"

বিষয়-রস

শ্রীরামকৃষ্ণ—"শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়—কামিনী কাঞ্চন রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়। যেমন কাঠের রস শুকিয়ে গেলে শীঘ্র ধরে যায়; আর ভিজে দেশলাইও জ্বলে না। বিষয়রস শুকলে সদা ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।

"ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। এ উদ্দীপন শুধু তারই হয়, যার বিষয়বুদ্ধি আগে হয়েছে, বিষয়রস যার শুকিয়ে গেছে, বিষয়বুদ্ধি রূপ রস শুকিয়ে গেলে আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়; যেমন রস শুকিয়ে গেলে সুপারি বা বাদামের ছাল আলাদা হয়ে যায়।

"বিষয়রস থাকতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। রস শুকুলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

"বিষয়রস শুকুবার উপায় কি? মা'কে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হলে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে; কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষণই হয়। ব্যাকুল হ'য়ে মা'র কাছে আব্দার করো—তিনি অবশ্য দেখা দেবেন। তখন বিষয়রস শুকুবে।"

বিষয়ানন্দ—ভজনানন্দ—ব্রহ্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ।"

(১) বিষয়ানন্দ যা সব্বাই নিয়ে থাকতে চায়—কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ—'সসাগরা ধরণীর আধিপত্য, সবল পুষ্ট শরীর, সুন্দর রূপ, স্ত্রী, হিরণ্য, ব্রীহি, যব, পশু' প্রভৃতি অশেষ প্রকার ভোগ্য বিষয়ের (পদার্থের) অনায়াস অধিকার ও ভোগের দ্বারা যে আনন্দ, তারই নাম বিষয়ানন্দ। কিন্তু সকল বিষয়-সুখেরই সীমা আছে—শেষ আছে। এমন কি সকাম উপাসনা দ্বারা স্বর্গলাভ করেও 'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীতা—৯।২১)—পুণ্যক্ষয় হ'য়ে গেলেই মর্ত্যলোকে অসতে হয়; স্বর্গে গিয়েও স্থায়ী আনন্দের আশা নাই। ইন্দ্রের সিংহাসনচ্যুতির ভয় আছে।

তবে স্থায়ী আনন্দ কোথায় আছে? বিচার করলেই দেখা যায় যে, সকল রকম মিষ্টান্নেরই মিষ্টত্বের কারণ যেমন চিনি, তেমনি সকল রকম আনন্দেরই কারণ একমাত্র স্ব-স্বরূপ পরমাত্মা। এই আত্মানন্দ ছেড়ে দিয়ে বিষয়ানন্দ ভোগের প্রয়াসও যা, হাতের মুঠিতে রসগোল্লা রেখে, সেটা আস্বাদ না করে, সেই রসগোল্লা [illegible]

শ্রীরামকৃষ্ণ—"টাকার আনন্দ, ইন্দ্রিয় সুখের আনন্দ,—এক কথায় কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ, যা নিয়ে সংসারীরা সকলে দিন কাটাচ্ছে, তার নামই বিষয়ানন্দ। এর মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ. এগুলি নিয়ে আনন্দ করা—শ্রেষ্ঠ বা পরমানন্দকে ভুলে থাকা।"

(২) ভজনানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"ভগবানের ভজনা করে, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে নৃত্যগীত দ্বারা যে আনন্দ হয়,—সাধন ভজনে যে আনন্দ—তার নাম ভজনানন্দ। ঈশ্বরের নামগুণ গান করে আনন্দ।"

(৩) ব্রহ্মানন্দ—ব্রহ্মবিদোপনিষদ্ বলেন—যাঁরা সাধু, অধীতবেদ, বলিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক সাধন-সম্পন্ন, তাঁরা এই পার্থিব উপভোগ দ্বারা যে বিষয়ানন্দ লাভ করেন তাঁরাই চরম মনুষ্যানন্দ। এই মনুষ্যানন্দ পিতৃলোকের আনন্দ, গন্ধর্বলোকের আনন্দ, দেবলোকের আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দ, বৃহস্পতির আনন্দ, প্রজাপতির আনন্দ ইত্যাদি উত্তরোত্তরক্রমে শতগুণ অধিক। ব্রহ্মলোকের আনন্দ তারও শতগুণ। ব্রহ্মানন্দ পরম আনন্দ, যে আনন্দের কোন দ্বিধা বা তারতম্য নাই—যাহা ভূমা (মহান্) বা অমৃত—যাহা ব্রহ্মজ্ঞেরই ভোগ্য, অবিনশ্বর পরমানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ব্রহ্মানন্দ বিষয়ানন্দের উল্টো। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে—কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ। বিষয়াসক্তি একেবারে না গেলে ব্রহ্মানন্দ হয় না; বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ একসঙ্গে হয় না।

"ভজন করতে করতে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন—তখন ব্রহ্মানন্দ। এ দিকের আনন্দ (ব্রহ্মানন্দ) পেলে ওটা (বিষয়ানন্দ) আর ভালো লাগে না; ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না। একবার যে ভগবানের আনন্দ পেয়েছে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায়। ক্রমে যত বাড়ে, কাজ আর করতে পারে না—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায় তখন চাতকের মত বৃষ্টির জলই খোঁজে—বিনা স্বাতি কি জল সব ধূর!"

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

এ মাসের প্রচ্ছদপট

জন স্টাইনবেক

নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী মার্কিন কথা-সাহিত্যিক জন স্টাইনবেক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যুগপৎ বাস্তবতাবোধ ও কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সহানুভূতিমাখা রসিকতা ও সমাজ-সচেতনতায় তাঁর রচনা প্রাণবন্ত। নোবেল কমিটির মতে এইগুলিই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

সমকালীন মার্কিন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জন স্টাইনবেককে বহুমুখী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলে মনে করা হয়। তিনি ১৯০২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ক্যালিফোর্নিয়ার স্যালিনাসে জন্মগ্রহণ করেন। স্যালিনাস উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

স্ট্যানফোর্ড ছাড়ার পর তিনি নিউ-ইয়র্ক সিটিতে সংবাদপত্র রিপোর্টারের কাজ করেন। এরপর তিনি কৃষিকর্মী, ল্যাবরেটরী সহকারী এবং শ্রমিক-রূপেও কাজ করেছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এগুলি তাঁর খুবই সহায়ক হয়েছিল।

স্টাইনবেকের প্রথম উপন্যাস 'কাপ অব গোল্ড' প্রকাশিত হয় [illegible] অন্তত তিনখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছিলেন। এর মধ্যে দু'খানি তিনি কাউকে না দেখিয়েই বিনষ্ট করেন। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দি পশচার্স অব হেভেন' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। তারপর ক্রমানুয়ে প্রকাশিত হয় 'টু এ গড আননোন' (১৯৩৩), 'টরটিলা ফ্ল্যাট' (১৯৩৫), 'ইন ডুবিয়াস ব্যাটেল' (১৯৩৬), 'অব মাইস এ্যাণ্ড মেন' (১৯৩৭), 'দি গ্রেপস অব র‍্যাথ' (১৯৩৯), 'দি মুন ইজ ডাউন' (১৯৪২)। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত 'ইস্ট অব ইডেন' তাঁকে প্রচুর খ্যাতি এনে দিয়েছে।

এ ছাড়া তিনি 'দি উইন্টার অব আওয়ার ডিসকন্টেন্ট', 'সুইট থার্সডে', 'ক্যানারি রো', 'দি ওয়েওয়ার্ড বাস', 'দি পার্ল' প্রভৃতি উপন্যাসও লিখেছেন। 'ট্র্যাভেলস উইথ চার্লি' তাঁর একখানি ভ্রমণ কাহিনী। 'দি লং ভ্যালি' তাঁর কতকগুলি গল্পের সংগ্রহ।

১৯৪৩ সালে তিনি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের বৈদেশিক সংবাদ-[illegible] যান। উক্ত পত্রিকার জন্য তাঁর পাঠানো লেখাগুলি পরে ১৯৫৮ সালে 'ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এ ওয়ার' নামে প্রকাশিত হয়।

স্টাইনবেক ১৯৪০ সালে 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ' উপন্যাসটির জন্য পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেছেন এবং ১৯৬২ সালে তিনি অতুলনীয় সাহিত্য-কৃতির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৬৬ সালে ডিসেম্বর মাসে স্টাইনবেক দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গেলেন ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। প্রধানত 'নিউজ ডে' পত্রিকার জন্য লিখলেও ভিয়েৎনাম থেকে পাঠানো তাঁর লেখাগুলি বিশ্বের আরও ৬০টি পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে।

স্টাইনবেকের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য হল তিনি কখনও অযথা বেশী কথা বলেন না, দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটান না। তিনি কিছুটা বলেন, আর বাকীটা পাঠকের কল্পনা-শক্তির ওপর ছেড়ে দেন।

স্টাইনবেকের সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবিক আবেদনে ভরা। এসব চরিত্রের অন্তর্জগৎ অতুল সম্পদের আকর।

মহামানব

শঙ্করাচার্য

ভগ্নী নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্যের মত অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন মহামানবের আবির্ভাব পাশ্চাত্ত্যের মনীষিগণ ধারণা করিতে পারেন না। এরূপ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব আদৌ সম্ভব কি না ইহা তাহাদের কল্পনার বাহিরে। শঙ্কর অতি স্বল্পায়ু ছিলেন। এই অল্প-সময়ের মধ্যে তিনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ধর্মসংঘের নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় এখনও সগৌরবে বিদ্যমান। বেদাদি-শাস্ত্র সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া সুগভীর দার্শনিকতত্ত্ব ভারতবর্ষে এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে তাহার তুলনা মিলে না। তাহার পর বারশত বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি এই ভিত্তিতে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরে নাই। তিনি বহু কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভারতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ উহা বুঝিতে না পারিলেও উহার মাধুর্য স্বীকার না করিয়া পারেন না।

শঙ্করের জীবন ঋষির জীবন। তিনি শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, সপ্রেম ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিতেন। উচ্চ চিন্তাধারার মধ্য দিয়া তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। একই ব্যক্তির মধ্যে স্বল্পজীবনে এত গুণের সমাবেশ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন এবং স্বীকার করা উচিত কিন্তু ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার মধ্যে সেণ্ট ফ্রান্সিসির শুদ্ধাভক্তি, এলবার্ডের ক্ষুরধার বুদ্ধি, মার্টিন লুথারের স্বাধীন অভিব্যক্তি ও সংগঠন শক্তি এবং ইগনেসাস্ লয়লার রাষ্ট্র বিষয়ে দূরদর্শিতার সমাবেশ দেখা যায়। এত স্বল্পজীবনে ইহা কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা বুঝা কঠিন কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সমাবেশ যে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি জগতের বিস্ময়।

স্বামী তত্ত্বানন্দ

হিমালয় প্রকৃতির রম্য পীঠস্থান। ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে ইহার মাহাত্ম্য বুঝা যায়। কোন বিশিষ্ট কবি বলেন ইহার প্রস্তি-প্রস্তর খণ্ডে ভগবান যেন নিদ্রায় মগ্ন, এখানকার পশুদের মধ্যেও তিনি

শ্যামক শঙ্করাচার্য

স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন, বৃক্ষ-লতাদির মধ্যে তাঁহার নিশ্বাস বহি-তেছে এবং মানুষদের মধ্যে তাঁহার উজ্জ্বল চেতন-সত্তা বিরাজমান। এখানে সর্বত্র তাঁহার মহিমা বিদ্যমান। সকল বস্তুর মর্মরধ্বনিতে একই সুর 'ভগবান এখানে আছেন।' প্রকৃতি এখানে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই যাহা প্রকৃতির এই পীঠস্থানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। হিমের আলয় তাই হিমালয় অতুলনীয়। এই বিশাল মনো-রম পীঠস্থানের কবাট সকল ধর্মের জন্য উন্মুক্ত। সকল উচ্চ চিন্তাধারা বিকাশের পরিবেশ এখানে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। সর্বদোষমুক্ত এই পীঠস্থান বহু সভ্যতার মিলনক্ষেত্র। আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রবাহ এই মনোরম ভূমিতে অবিরাম গতিতে চলিতেছে। হিমালয়ের অসীম সৌন্দর্য, চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী, শত সহস্র সাধু, সন্ন্যাসী, মুনি, ঋষি, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিককে মুগ্ধ করে। এই পীঠস্থানের প্রতি গুহা, নদী, স্রোতস্বতী কোন না-কোন ঋষি কিম্বা দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত, কিম্বা তাঁহাদের নামের সঙ্গে জড়িত।

কপিল, গৌতম, পাতঞ্জল, জৈমিনি, ব্যাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ এই মনোরম পীঠস্থানে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং স্ব স্ব মতের শাস্ত্র-সকল প্রণয়ন করিয়া দার্শনিক জগতে নূতন আলো আনিয়াছেন। এই পীঠ-স্থানই বহু উচ্চ তত্ত্বের উৎপত্তিস্থল। হিমালয়ের মাহাত্ম্য এবং অসীম সৌন্দর্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য লেখকও জন স্ট্রেসী তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়া'য় লিখিয়াছেন, 'আমি ইয়োরোপের বহু পাহাড়-পর্বত দেখিয়াছি কিন্তু বিশালতা, উচ্চতা, মনোহারিতা, আকর্ষণী শক্তি, সৌন্দর্য এবং প্রাণস্পর্শিতার দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহার তুলনা মিলে না। অতুলনীয় বলিয়াই বোধ হয়।' কোন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, 'দেবতাদের মত সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিলেও আমি শত শত বৎসর চেষ্টা করিয়া

হিমালয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব না।

প্রকৃতির এই রম্য পীঠস্থান পৃথিবীর বিস্ময়। ইহার অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়া জগৎ-সভ্যতা সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই পীঠস্থানের মূলকথা ত্যাগ, ভোগ নয়—দান, গ্রহণ নয়। জগতে ভোগের মূল্য আছে সত্য কিন্তু এখানে ত্যাগের বেদীতে ভোগ নিষ্প্রভ শুষ্কপত্রের ন্যায় নীরস, মূল্যহীন। এই রম্যভূমি মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বল। এই পীঠস্থানে শত সহস্র মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে, সহস্র সহস্র ত্যাগী সন্ন্যাসী ইহার স্নেহে বর্ধিত হইয়া 'জীব'মাত্রই 'শিব' এবং 'নরই নারায়ণ' তত্ত্বের অনুশীলন করিতেছেন। শাশ্বত সত্যের প্রতীক্ শিব এই মনোরম পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ভুবন ত্রয়ম্' তাঁহার স্বদেশ, চির তুষারাবৃত কৈলাস তাঁহার বৈঠকখানা। তিনি দয়ার আধার। অজ্ঞানের বিরাট্ বোঝা জাতিকে পিষিয়া চূর্ণ করিবার উপক্রম করিলে, অবিশ্বাসের প্রচণ্ড বন্যা পৃথিবীর বুক ভাসাইবার চেষ্টা করিলে, সমাজ-জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে ফাটল ধরিলে, ব্যক্তিগত সমাজগত রাষ্ট্রগত এবং ধর্মগত জীবনে দুর্নীতি বাসা বাঁধিলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। তখন ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থির থাকিতে পারেন না। অলক্ষ্যে কালের চক্র ঘুরাইয়া দেন, কলকাঠি নাড়িয়া জাতীয় জীবনের মোড় ফিরাইয়া দেন। দেশকে রাহুমুক্ত করেন। ধ্বংসের হাত হইতে পীড়িত মানবাত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য বেদ ও সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতা মুখ ফিরান। সুদিন ফিরিয়া আসে।

কেরল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সুন্দর দেশ। দেশটি আয়তনে ছোট। সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আরব সাগরের উপকূলে প্রকৃতি এখানে অকুণ্ঠ হস্তে স্বীয় মাধুর্য বিলাইতেছেন। শস্যশ্যামলা দেশ, উর্বর মাটি বৃক্ষলতাদিতে পূর্ণ। ইহার সজীবতা মনে আনন্দ জাগায়। উহার ভৌগোলিক অবস্থা বিচার করিয়া ভূতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা এককালে সমুদ্রগর্ভে লীন ছিল। ইহার অধিবাসিগণ প্রাণবন্ত, তীক্ষ্ণ, মেধাবী, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। পুরাণে পাওয়া যায় জমদগ্নি ঋষির পুত্র পরশুরাম স্বীয় তপস্যা-প্রভাবে এই স্থানটিকে সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্তোলন করেন।

কালাডি কেরলের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-প্রধান একটি সুন্দর গ্রাম। পাশেই নদী, পরিবেশ ভাল। ভারতে অসংখ্য গ্রাম আছে। অল্প লোকেই গ্রামের খবর রাখে; কিন্তু যে গ্রামের বিশেষ অবদান আছে তাহার খবর অনেকে জানে। জনৈক মহামানবের জন্মে কালাডি ধন্য হইয়াছে। ত্যাগ, তপস্যা, জ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভাবে এই মহাপুরুষ জগৎপূজ্য হন। লোকে তাঁহাকে শিবের মূর্ত প্রতীক্ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে বহু গুণের সমাবেশ দেখা যায়। বিশুদ্ধ প্রেম, সরলতা, মহত্ত্ব, অহেতুকী, ভক্তি, শুদ্ধ জ্ঞান, তীক্ষ্ণ মেধা, অদম্য শক্তি, স্বাধীন অভিব্যক্তি, অদ্ভুত সংগঠন-শক্তি, অসাধারণ প্রতিভা তাঁহার মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ব অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি সাহিত্য-সমাজে ও ধর্মে নব যুগের উদ্বোধন করিয়াছেন।

শিবগুরু নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ, কালাডি গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ। তিনি ধার্মিক, সরল এবং শিবভক্ত। নিত্য স্নান, স্তোত্রাদি পাঠ, শাস্ত্রালোচনা, শিবের পূজা এবং ধ্যানেই তাঁহার দিন কাটিত। তাঁহার স্ত্রী বিশিষ্টাদেবী কাহারও মতে জন্মাবধি স্বামীর মত ধর্মপরায়ণা এবং নিষ্ঠাবতী। আলেয়া নদী তাঁহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া প্রবাহিত। নদীর তীরেই চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের মন্দির। জাগ্রত দেবতা। গ্রামবাসিগণ নিত্য মন্দির দর্শন এবং শিবের পূজা দিয়া ধন্য হন। শিবগুরু এবং বিশিষ্টাদেবী তাঁহাদের অন্যতম। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শিবের ভক্ত হইলেও কাহারও মনে শান্তি নাই। কারণ পুত্রমুখ কি তাহা অনুভব করিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের ঘটে নাই। অপুত্রক গৃহস্থের দুঃখ অন্যের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। এই জন্য লোকে বলে, যে গৃহে পুত্র নাই তাহা অরণ্যতুল্য। হিন্দুদের বিশ্বাস—পিণ্ডদান করিয়া পুৎ নামক নরক হইতে পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করে বলিয়াই 'পুত্র' বলা হয়। পিণ্ড লোপ হইলে পিতৃপুরুষদের যন্ত্রণা ঘুচে না। পুত্রমুখ দেখিবার জন্য তাই পিতা-মাতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। পুত্রের জন্যই ভার্যা, শিবগুরু এবং বিশিষ্টাদেবী নিত্যই চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের নিকট প্রার্থনা করেন। তিনি যেন এক পুত্রসন্তান ভিক্ষা দেন। ভক্তের ভক্তিতে ভগবানের আসন টলে। পাষাণের হৃদয় গলে। হয়ত চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের কৃপা হইয়াছে।

একদিন আলেয়া নদীতে স্নান করিয়া শিবগুরু চন্দ্রমৌলীশ্বর মন্দিরে ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় এক বাণী শুনিতে পাইলেন। কে যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, 'শিবগুরু, আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। অচিরে তুমি পুত্রমুখ দর্শন করিবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সে শিবের ন্যায় মহান্, উদার ও জ্ঞানী হইবে। তাঁহার যশ সর্বত্র ছড়াইবে'। দৈববাণী শিবগুরু এবং বিশিষ্টাদেবীর প্রাণে আশা জাগাইল।

বৈশাখ মাস। শুক্লপক্ষ, পঞ্চমী তিথি। ৭৮৮ সাল। ভারতের ইতিহাসে ইহা স্মরণীয় দিন। এই পুণ্যদিনে চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব-মন্দিরের দৈববাণী সার্থক হইল। শিবগুরু এবং বিশিষ্টা-দেবীর পুণ্য জীবন ধন্য হইল। তাঁহারা পুত্রমুখ দর্শন করিলেন।

দৈববাণী অনেক সময় মনের খেয়াল বা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় কিন্তু কখন কখন উহার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

শিবগুরুর ক্ষেত্রে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। এই পুত্রই কালে ত্যাগের পতাকা উড়াইলেন.

মানবজাতির সম্মুখে জ্ঞানের আলো তুলিয়া ধরিলেন। অমৃতত্ব লাভের পথ দেখাইলেন।

শিশু স্বর্গের দান। যখন ধরাধামে আসে তখন নীরব ভাষায় কপালে অদৃষ্টের লিখন অঙ্কিত থাকে। উহা বিধিলিপি। বিধিলিপিতে যেমন মহত্ত্বের ছাপ থাকে দুঃখ-কষ্টের ছাপও থাকে। দুঃখ-কষ্ট মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে।

বৈশাখের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে ধর্মপ্রাণ শিবগুরু। গৃহে যে ক্ষণজন্মা শিশুটি জন্ম নিল, বিধি তাহার কপালে যে মহত্ত্বের ছাপ অঙ্কিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাকে এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছিলেন; যাহা দ্বারা সে জগতের অশুভ চিন্তার ধারাকে বিপরীত দিকে বহাইয়া অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে জন্ম। তাই নবাগত অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজনও সামান্য। শঙ্খধ্বনি দ্বারাই সাধারণভাবে শিশুকে বরণ করা হইল। শিবের দান বলিয়া তাহার নাম রাখা হই —শঙ্কর। শঙ্কর শিবগুরু এবং বিশিষ্টাদেবীর তপস্যার ফল। বংশের, জাতির এবং দেশের গৌরব।

শঙ্করের জন্ম-সাল সম্বন্ধে উনিশ রকমের মতবাদ আছে। প্রসিদ্ধ লেখক টেলাঙ্গের মতে শঙ্কর ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী মোক্ষমূলার বলেন শঙ্কর ৭৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মতই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করেন। ডকান কলেজের অধ্যক্ষ বি কে পাঠক মোক্ষমূলারের মতই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন (ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসের নবম রিপোর্ট, ভিয়েনা, দ্রষ্টব্য)।

উষাই দিনের জ্ঞাপক, সারাদিন কেমন কাটিবে ভোরবেলাতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। অতি শৈশবকাল হইতে শঙ্করের অসাধারণ প্রতিভা এবং তাঁহার মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা যে তাহার মধ্যে নিহিত ছিল তাহা দিন দিন স্পষ্ট হইতে লাগিল। তাহার স্মৃতিশক্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। একবার মাত্র যাহা শুনিত তাহা অবিকল পুনরাবৃত্তি করিত। টিয়া পাখীর মত শুধু যে মুখস্থ বলিত তাহা নয়, যাহা শুনিত তাহার সম্যক তাৎপর্যও বলিতে পারিত। তিন বৎসর বয়সে দেখা গেল তাহার মাতৃভাষা মালয়ালমে এমন কোন বই ছিল না যাহা শঙ্কর পড়িতে পারিত না কিম্বা যাহার সম্যক্ তাৎপর্য সে বলিতে পারিত না। তাহার অসাধারণ মেধা দেখিয়া পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবাসিগণ চমৎকৃত হইতেন। পিতা শিবগুরুর ইচ্ছা ছিল পুত্র সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হয়। শঙ্কর সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া পিতার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেটা পরবর্তীকালে হইয়াছে। শিবগুরু সেই গৌরব দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্বেই নির্মম কাল তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। শিবগুরুর অকালমৃত্যু সকলকে দুঃখের কোলে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় পুত্রকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী সর্বশাস্ত্রে বিশারদ করা দূরে থাকুক তাহার ভরণ-পোষণ নির্বাহ করাও বিশিষ্টাদেবীর পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল।

দশবিধ সংস্কার হিন্দুর প্রধান কর্তব্য। উপনয়ন সংস্কার তাহাদের অন্যতম। ইহা ব্যতীত বেদ, উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার মিলে না। শাস্ত্রাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে তবে বংশের শিক্ষা-সংস্কৃতির গৌরব রক্ষা পায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ তিন বর্ণের পক্ষে উপনয়ন অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণের না হইলে আদৌ চলে না। শঙ্করেরও নয়—শঙ্কর ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাঁহার উপনয়ন হওয়া চাই। যথাবিধি উপনয়ন সংস্কার হইয়া যাওয়ার পর বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তাহাকে গুরুগৃহে পাঠান হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শঙ্করের অসাধারণ মেধা, ক্ষুরধার বুদ্ধি। বালক, দৈববলে বলীয়ান। অধ্যাপকগণ বালক ব্রহ্মচারীর উপর অতিশয় প্রীত। এরূপ প্রতিভাধর তাঁহারা পূর্বে একটাও পান নাই। বালকের যেমন প্রখর বুদ্ধি তেমনি উদার হৃদয়। বিশেষত গরীবদের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত সহানুভূতি। এরকম সচরাচর দেখা যায় না।

দৈনন্দিন কার্যাবলী হইতে তাঁহার মানসিক গঠন কিরূপ তাহা বুঝা যায়। শঙ্কর বাল-ব্রহ্মচারী। গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা করিতে হয়। ইহাই নিয়ম। একদিন শঙ্কর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণীর গৃহে আসিয়াছেন। ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দেওয়া সৎ গৃহস্থের কর্তব্য। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী এবং ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইলে ত' কথাই নাই। প্রয়োজন হইলে নিজে উপবাসী থাকিয়াও ভিক্ষা দিতে হয়। অতিথি-সৎকার গৃহস্থের কর্তব্য। না দিলে প্রত্যবায় হয়। দিবার কিছু না থাকিলে মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়।

কারণ অতিথি নারায়ণ। অতিথিকে ফিরাইতে নাই। অতিথি-সেবা হিন্দু ধর্মের প্রধান অঙ্গ। বালক ব্রহ্মচারীকে দেওয়ার মত সেদিন ব্রাহ্মণীর ঘরে তেমন কিছু ছিল না। অগত্যা একটা আমলকীমাত্র দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অন্য কিছু দিতে পারিলেন না বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ব্রাহ্মণীর ছলছল নেত্র দেখিয়া বালক শঙ্করের হৃদয় গলিয়া গেল। বালক লক্ষ্মীদেবীর স্তব করিলেন। সরল হৃদয়ের কাতর প্রার্থনায় দেবতার হৃদয় সহজে গলে। বালক ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিবে। দুঃখ দূর হইবে।

শঙ্করের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল! তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইল। পরের দিন ব্রাহ্মণী দেখিতে পাইলেন যে, অলৌকিক উপায়ে তাঁহার দুঃখ ঘুচিয়াছে। তিনি একটামাত্র আমলকী

ভিক্ষা দিয়াছিলেন। তার পরিবর্তে অসংখ্য স্বর্ণ-আমলকী জুটিয়াছে। তাঁহার দারিদ্র্য দূর হইয়াছে। ব্রাহ্মণী বালকের দীর্ঘ জীবনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বালক শঙ্করের অলৌকিক শক্তির কাহিনী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বেদান্ত অত্যন্ত কঠিন বিষয়। ইহা বুঝা এবং আয়ত্ত করা আরও কঠিন। সারাজীবন অধ্যয়ন এবং আলোচনা করিয়া ইহার দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব বুঝা যায় না। কিন্তু বালক ব্রহ্মচারী শঙ্কর অতি অল্প সময়ে ইহা অধ্যয়ন করিলেন। দুরূহ তত্ত্ব আয়ত্ত করিলেন অধিকন্তু ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলিরও সমাধান করিতে সমর্থ হইলেন।

বালকের অসাধারণ প্রতিভা অধ্যাপকমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিল। তাঁহাদের ধারণা হইল যে, এ সামান্য বালক নয়। নিশ্চয়ই দৈব বলে বলীয়ান্। নইলে এত অল্প বয়সে অতি অল্প সময়ে এত সূক্ষ্মতম তত্ত্বের সমাধান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। ভগবৎ কৃপায় বালক দীর্ঘজীবী হইলে বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। দেশ কৃতার্থ হইবে। তাঁহার মধ্যে যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুককায়িত রহিয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মধ্যে যে মহত্ত্বের বীজ আছে তাহা একদিন বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইবে। ঐ বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল খাইয়া লোক ধন্য হইবে এবং তাহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া অগণিত লোক সান্ত্বনা পাইবে।

অধ্যাপকগণ এই অসাধারণ প্রতিভাধরকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া চলিতেন। দুই বৎসরের মধ্যে শঙ্কর বেদ, উপনিষদ্ স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্র সম্যক্ আয়ত্ত করিলেন। অধ্যয়নের পর সমাবর্তন, সমাবর্তনের পর অধ্যাপকদের আশীর্বাদ নিয়া বালক যখন গৃহে ফিরিলেন তখন মাতা বিশিষ্টাদেবীর আনন্দ আর ধরে না। পুত্রের গৌরবে মাতার গৌরব। এবার দুঃখ ঘুচিবে। স্বামী শিবগুরু পুত্রকে যেমন শাস্ত্রবিশারদ করিতে চাহিয়াছিলেন পুত্র তেমন হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। জীবদ্দশায় না হইলেও মৃত্যুর পর হইয়াছে। ইহাতে স্বামীর আত্মা তৃপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এমন পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া তিনি নিজে ধন্য হইয়াছেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং শাস্ত্রবিশারদ হিসাবে বালকের খ্যাতি চারিদিক ছড়াইল।

সমাবর্তনের পর শঙ্কর বিদ্যার্থীদের শাস্ত্র অধ্যয়নের সুবিধার্থে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী খুলিলেন। শৈশব হইতে তাঁহার মধ্যে যে অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ দেখা দিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা বিষয়েও তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব এমন প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করিতেন যে কাহারও বুঝিবার পক্ষে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইত না। তাঁহার অধ্যাপনায় মুগ্ধ হইয়া বিদ্যার্থীরা টোলে যোগ দিতে লাগিল, তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল।

বয়স কম হইলেও অধ্যাপনা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনেক প্রাচীন অধ্যাপকের চেয়েও অধিক এবং গভীর। এই জন্য তাঁহার সুনাম বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার অল্প বয়সে এত সুনাম হইয়াছে, ইহা অনেকের অসহ্য হইয়া উঠিল। বিশেষত প্রাচীন অধ্যাপক মণ্ডলী ইহা ভালভাবে নিতে পারিলেন না। সুবিধা পাইলেই তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেন। অধ্যাপনায় শঙ্করের জ্ঞান ভাসা ভাসা, মোটেই গভীর নয়, অধ্যাপক হইবার উপযুক্ততা তাঁহার নাই ইত্যাদি বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন।

কিন্তু শঙ্কর একদিনের তরেও তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই, প্রাচীন অধ্যাপকদের এত বিদ্বেষ প্রচার সত্ত্বেও শঙ্করের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যার্থীর সংখ্যা কমে নাই বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা যত প্রকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সবগুলি একে একে ভগবৎ কৃপায় এবং মাতা বিশিষ্টা দেবীর [illegible] দূর হইল।

বিদ্যা মানুষকে বিনয়ী করে। প্রকৃত জ্ঞান অহংকার দূর করে। প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারিগণ ক্রমশ আপনাদের ভুল বুঝিতে পারিলেন। বালকের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অকাট্য যুক্তি, ক্ষুরধার বুদ্ধি, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সর্বোপরি তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার উদার মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিলেন।

মহৎ ব্যক্তিমাত্রেই সাধারণত মাতৃভক্ত হন। মাতৃসেবা তাঁহাদের জীবনের প্রধান কর্তব্য। সর্বদেশে সর্বকালে অকুণ্ঠ মাতৃসেবার মাহাত্ম্য স্বীকৃত। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শঙ্করের মাতৃভক্তি অসীম অতুলনীয়। একদিন আলেয়াই নদীতে স্নান করিয়া ফিরিবার পথে বিশিষ্টা দেবী শারীরিক দুর্বলতা বশত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শঙ্কর তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া, মাথায়, চোখে-মুখে জল দিয়া মায়ের চৈতন্য সম্পাদন করাইলেন। ভগবৎ কৃপায় বিপদ কাটিয়া গেল।

বিশিষ্টাদেবীর বয়স হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে নদীতে স্নান করিতে যাইতে কষ্ট হয়। অথচ নিত্য তাঁহাকে যাইতে হয়। চিরকালের অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না। তাঁহার নিকট আলেয়াই নদী গঙ্গার ন্যায় পবিত্র। মায়ের ইচ্ছা যাতে পূর্ণ হয় এবং তাঁহার নিষ্ঠা যাতে বজায় থাকে, সেই জন্য শঙ্কর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে নদীর স্রোত পরিবর্তিত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা হইলে তাঁহার মাতা নদীতে নিত্য স্নান করিবার সুযোগ পাইবেন এবং স্নান করিয়া তৃপ্ত হইবেন। ইহাতে তাঁহার নিষ্ঠা বজায় থাকিবে।

সরল প্রার্থনা বৃথা যায় না। শঙ্করের প্রার্থনা বৃথা যায় নাই। ভগবান তাঁহার সদিচ্ছা পূর্ণ করিবেন এই সম্ভাবনা

দেখা দিল। অল্পদিনের মধ্যে নদীর গতি বদলাইল। বিশিষ্টাদেবী এখন নিত্য নদীতে স্নান করিয়া তৃপ্ত হন। পুত্রের ঐশী শক্তির প্রভাবে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। নদীর গতি পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া সকলে ভাবিল বালক শঙ্কর শুধু পণ্ডিত নয়, ঐশী শক্তিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি। দৈব বলে বলীয়ান। সাধারণ মানষের বহু উর্ধ্বে।

রাজশেখর কেরলের রাজা, বিদ্যার উৎসাহদাতা এবং নিজেও কবি, বিদ্বান। বালক শঙ্করের অসাধারণ প্রতিভার খবর তাঁহার কানে উঠিয়াছে। এমন প্রতিভাধরের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিলে সুখী হইবেন। তাঁহাকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য রাজা জনৈক মন্ত্রীকে পাঠাইলেন।

কিন্তু শঙ্কর বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ। এই বয়সে সংসারের চালচাল আয়ত্ত করিয়াছেন, বিশেষত বড়-লোকের প্রকৃতি তিনি বুঝিতে পারেন। সমাজ যে ভালমন্দ মিশ্রিত তাহা বুদ্ধিমানের নজর এড়ায় না। সাধারণত পণ্ডিতবর্গ রাজসমীপে বিদ্যা জাহির করিয়া, পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী খুলিয়া কিংবা বিদ্যা বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করিবার মতলবে থাকেন।

বালক শঙ্কর এই দোষ হইতে মুক্ত। তিনি ইহা কল্পনাও করিতে পারেন না। তিনি নিজ অবস্থাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট, তাঁহার দারিদ্র্যজনিত কোন দুঃখ নাই। সন্তোষ তাঁহার মূলধন বলিয়া অভাব বোধ নাই, অভাবজনিত হতাশাও নাই। শঙ্কর ত্যাগের মূর্তপ্রতীক। তিনি কেরলের রাজা রাজশেখরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাজানুগ্রহ লাভের প্রলোভন দমন করিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কেরালাধিপতি রাজশেখর প্রকৃতপক্ষে গুণী ব্যক্তি। প্রজারঞ্জনে যেমন তাঁহার আনন্দ, বিদ্যার উৎসাহদানেও সেরূপ আনন্দ। অধিকন্তু তিনি নিজে গ্রন্থকার। বাল ভারত, বাল রামায়ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বালক শঙ্করের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। রাজা ইচ্ছা করিলে সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রজার ঔদ্ধত্যের শাস্তি বিধান করিয়া তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। বরং অদ্ভুত ত্যাগী এবং আত্মবিশ্বাসী পণ্ডিত বালকের উপর অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইলেন। বালককে দেখিবার জন্য তাঁহার মন খুব ব্যাকুল হইল।

রাজশেখর জানেন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সর্বত্র একরকম হইতে পারে না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন নিদর্শন স্বীকৃত। শূদ্রের মাপ-কাঠি বয়স, বৈশ্যের ঐশ্বর্য, ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবীর্য আর ব্রাহ্মণের জ্ঞান। আর ব্রাহ্মণ যদি নির্লোভ এবং বালক হন তবে ত কথাই নাই।

একদিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সঙ্গে নিয়া রাজা রাজশেখর দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের পর্ণকুটিরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া প্রণাম করিলেন। আধ্যাত্মিকতার মূর্তপ্রতীক শঙ্করের সুন্দর সৌম্য মূর্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের গভীরতা, বেদাদি শাস্ত্রে দখল, সরলতা এবং ব্যক্তিত্বে তিনি মুগ্ধ হইলেন। বালকের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বালকের পরামর্শমত স্থানে স্থানে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিলেন।

পরবর্তীকালে তাঁহার গ্রন্থ বিদ্বৎ-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল পূর্বে বলা হইয়াছে রাজা রাজশেখর সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সম্মুখে রাখিয়া শঙ্করকে প্রণাম করিয়াছিলেন। প্রণামী বালকের প্রয়োজন নাই। তিনি উহা দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবার জন্য রাজকর্মচারীদের অনুরোধ করিলেন। ইহাতে বালকের প্রতি রাজা এবং রাজকর্মচারীদের শ্রদ্ধা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার নির্লোভ ভাব, আদর্শনিষ্ঠা এবং নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, রাজা যতদিন জীবিত ছিলেন

এক দিনের জন্যও শঙ্করের কথা ভুলেন নাই।

রাজার আন্তরিক সহানুভূতি বালকের নূতন বিপদ ডাকিয়া আনিল। আত্মীয়-স্বজন শঙ্করকে সুনজরে দেখিলেন না। জ্ঞাতি-বিদ্বেষ ভীষণ। বিদ্বেষবহ্নি বহু অনর্থ ঘটায় জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিলেন। সভা-সমিতি করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার কুৎসা রটাইলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে লোকের মনে হীন ধারণা সৃষ্টি করিবার জন্য অবাঞ্ছিত উপায় অবলম্বন করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এত করিয়াও তাঁহারা শঙ্করকে তাঁহাদের নিকট নতি স্বীকার করাইতে পারিলেন না এবং তাহার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেন না। জ্ঞাতিদের এত বিদ্বেষভাব পোষণ সত্ত্বেও শঙ্কর তাঁহাদের প্রতি কখনও বিরূপ হন নাই। এখানেই শঙ্করের মহত্ত্ব উদারতা এবং বৈশিষ্ট্য।

শঙ্করের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কয়েকজন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী এক দিন কৌতূহল বশত তাঁহার কোষ্ঠী সম্যক্ বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি মহান্ হইবেন, নেতার আসন গ্রহণ করিবেন, নূতন ধর্মের প্রবর্তক হইবেন। তাঁহার খ্যাতি পৃথিবীময় ছড়াইবে, আধ্যাত্মিক জগতে তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাইবেন।

কোষ্ঠীর গণনা তাঁহাদিগকে চমৎকৃত করিল, কিন্তু একটা বিশিষ্ট ফল লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন কোষ্ঠীর গণনা অনুসারে বালক স্বল্পায়ু। আট বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যুযোগ আছে। দৈবের কৃপায় যদি ঐ সময় কাটাইয়া উঠিতে পারেন তবে আরও আট বৎসর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইবে।

যদি ভগবৎ কৃপায় সময়ও কাটাইয়া উঠিতে পারেন তবে আরও ষোল বৎসর পরমায়ু পাইবেন এবং উহা শেষ হইলে অন্তিমকাল আসিবে। তাহার পর আয়ুবৃদ্ধির আর কোন প্রকার লক্ষণ গণনায় পাওয়া যায়

না। স্বল্পায় হইলেও তাঁহার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিহিত আছে।

এই অল্পকালের মধ্যে তিনি ধর্মের এমন গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন, যাহা যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ লোকের আধ্যাত্মিক এবং মানসিক খোরাক যোগাইবে, এবং সত্যের নূতন আলো তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবে। শঙ্করের আয়ুষ্কাল বিচার করিবার সময় ব্রাহ্মণদের মুখে যে মলিন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বিশিষ্ঠাদেবী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। জীবনের অবলম্বন একমাত্র পুত্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁহার মনে শঙ্কা জাগিল। পুত্রের আয়ুষ্কাল জানিবার জন্য তিনি বার বার ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁহারা যখন বলিলেন যে, পুত্র স্বল্পায়ু হইবেন তখন তিনি ভীষণ কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।

কোষ্ঠীর ফলাফল শুধু যে মাতার মনে তীব্র শঙ্কার ভাব জাগাইল তাহা নয়, শঙ্করের মনেও ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বালক হইলেও তিনি জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খুব সচেতন। জীবন অনিত্য। এই আছে এই নাই। যে কোন মুহূর্তে চলিয়া যাইতে পারে। কালের গতি বঝা কঠিন। কাল জীবন-প্রদীপের নিকট ওৎ পাতিয়া আছে, কখন ফুৎকারে নিবাইয়া দিবে কে জানে। অনিত্য সুখের আশায় গা ঢালিয়া দিলে অশেষ দুঃখ পাইতে হইবে। সুতরাং সময়ের সদ্ব্যবহার এখন হইতে করা উচিত। কালবিলম্ব না করিয়া জীবনের প্রধান সমস্যার সমাধান করা উচিত। সত্যলাভই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কাল গ্রাস করিবার পূর্বেই যে-কোন মূল্য দিয়া ইহা লাভ করিতে হইবে। সত্য লাভ করিতে হইলে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে মাতা বিশিষ্ঠা দেবীর অনুমতি একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে তিনিই প্রধান অন্তরায়; কারণ পুত্র-বিরহের আশঙ্কায় কোন মাতা কখনও কোন পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিতে পারেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বৃদ্ধা মাতা পুত্র-শোকে প্রাণ ত্যাগ করিবেন।

শঙ্করের সম্মুখে ভীষণ সমস্যা, একদিকে মাতা অন্যদিকে সত্যলাভ। মাতার আশীর্বাদ ব্যতীত যেমন সন্ন্যাসগ্রহণ হয় না আবার সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যতীতও সত্যলাভ হয় না। কঠিন সমস্যা। একমাত্র উপায় অনুনয় বিনয় করিয়াও মায়ের অনুমতি লাভ করা।

শঙ্কর বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। তিনি খব হতাশ হইলেন। ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহা বিচার করিলে মনে হয় ভগবানই কৃপা করিয়া বাধামুক্ত করত তাঁহার হতাশা দূর করিলেন।

একদিন শঙ্কর মাতা বিশিষ্ঠাদেবীর সঙ্গে আলেয়াই নদীতে স্নান করিবার জন্য জলে নামিয়াছেন, এমন সময় একটা ভয়ানক কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মা'র নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন 'মা, কুমীরের কবল হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। মৃত্যু অবধারিত, এখনও যদি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দাও তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও আমি মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভগবৎ চিন্তায় শান্তিতে মরিতে পারি। তুমি অনুমতি না দিলে কুমীরের কবলে আমার অপ-মৃত্যু ঘটিবে এবং শান্তিতে মরণ সম্ভব হইবে না।'

শঙ্করের চীৎকারে বিশিষ্ঠাদেবীর হৃদয় গলিয়া গেল। পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পর হইয়া যাক্ ইহা কোন মাতা চান না; কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটুক ইহাও কখনও চান না। পুত্র সন্ন্যাসী হইলে তাহার সঙ্গে পুনরায় দেখা হইতেও পারে এইরূপ আশা করা যায়, কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার সঙ্গে কখনও দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও যদি পুত্র মৃত্যুর কবল এড়াইতে পারে তবে সেটাই বাঞ্ছনীয়। উপায়ান্তর নাই।

এক অসতর্ক মুহূর্তে মায়ের মুখ হইতে পুত্রের সন্ন্যাসের অনুমতি মিলিয়া গেল। ইহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন কি না সন্দেহ। তিনি নদীতীরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কোন দিক্ দিয়া সময় চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে কুমীরের দয়া হইল, শঙ্করকে ছাড়িয়া দিল। কবলমুক্ত হইয়া শঙ্কর অবিলম্বে তীরে উঠিয়া প্রাণপণে সেবা করিয়া মায়ের সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলেন।

কেহ কেহ বলেন কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা মিথ্যা। মায়ের অনুমতি লাভ করিবার জন্যই শঙ্কর মায়া কুমীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৌশল কৃতকার্য হইয়াছিল। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগে, যিনি সত্য লাভ এবং প্রতিষ্ঠার জন্যই ধরাধামে আসিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, জীবনে কখনও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, এমন কি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই তিনি এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন--তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ঘটনা যে এরূপ ঘটিয়াছিল তাহা জীবনী লেখকদের অভিমত। এই অলৌকিক ঘটনার কোন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন শঙ্করের বয়স সাত পার হইয়া আটে পা দিয়াছে। জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের গণনা যদি সত্য হয় তবে এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু যোগ দেখা যায়। দৈবক্রমে যদি মৃত্যু এড়ান যায় তবে আরও আট বৎসর বাঁচিবেন এবং তাহা কাটিয়া গেলে আরও ষোল বৎসর বাঁচিবেন। কুমীর কর্তৃক আক্রমণ এবং দৈব কৃপায় তাঁহার জীবন রক্ষার সঙ্গে জ্যোতিষীর গণনার মিল পাওয়া যায়। বিশ্বাস অবিশ্বাস পাঠকদের উপর রহিল।

আলেয়াই নদীর জলে কুমীরের কবলে থাকিতে থাকিতেই শঙ্কর মায়ের নিকট সন্ন্যাসের অনমতি লাভ করিয়া মনে মনে

দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি সন্ন্যাসী এবং ভগবৎ চরণে তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। বিপন্মুক্ত হইয়াও তাঁহার সে ধারণা টলিল না। বিরজা হোম করিয়া বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলেও তিনি এখন সন্ন্যাসী। গৃহে থাকিবার অধিকার নাই। বৃক্ষতলায় রাত্রি কাটাইলেন। ভোর হইলেই তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। পুত্র চলিয়া গেলে মাকে দেখিবার কেহ থাকিবে না, এই জন্য সন্ন্যাসের সংকল্প ত্যাগ করিতে বিশিষ্টাদেবী শঙ্করকে বহু বুঝাইলেন, বার বার কাকুতি-মিনতি করিলেন।

কিন্তু শঙ্কর এখন সন্ন্যাসী, গৃহে থাকিতে পারে না। নানা রকমে মাকে সান্ত্বনা দিয়া শঙ্কর বলিলেন যে, সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেও মায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্বের ন্যায় অটল থাকিবে। জ্ঞানলাভ করিবার পর মক্তি হইলে তবে মানুষকেও জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়িতে হয় না। কিন্তু তাহার পর্বে তাহার রেহাই নাই।

মাতা বিশিষ্টাদেবীকে যাহাতে জন্ম মৃত্যুর কবলে পড়িতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন, মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে ইষ্ট দর্শন করাইবেন। মা'র জীবনের শেষ সময়ে তাঁহার কাছে থাকিবেন এবং তাঁহার প্রাণ চলিয়া গেলে তাঁহার দেহের বিধিপূর্বক সৎকার করিয়া শেষকৃত্য সম্পাদন করিবেন। মাতার এই কয়েকটি বাসনা তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও পূর্ণ করিবেন। শঙ্কর ভাল করিয়া জানেন মাতৃত্বের স্থান সকলের উর্ধ্বে। মাতৃত্বেই ত্যাগ ও মহত্বের পরাকাষ্ঠা। দুহিতৃত্ব স্ত্রীত্বে পরিণত হয়, আর মাতৃত্ব দুহিতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের পরিণতি, দুহিতার ভক্তি, স্ত্রীর ভালবাসা মাতার স্নেহরূপে প্রকাশিত হয়। দুহিতা এবং স্ত্রীর ভালবাসায় স্বার্থের গন্ধ থাকিতে পারে, তাঁহারা কিছু চাইতে পারেন এবং সময়ে সময়ে চাহিয়াও থাকেন কিন্তু মাতৃস্নেহে স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। ইহাতে গ্রহণের প্রশ্ন থাকে না। থাকে শুধু দানের প্রশ্ন। মাতৃস্নেহে দান করিয়াই সন্তুষ্ট। সন্তানের কল্যাণে যে-কোন ত্যাগ মাতা অকাতরে করিয়া থাকেন। মাতা বিশিষ্টাদেবী শঙ্করের প্রতিজ্ঞায় আশ্বাস পাইলেন। নিজেকে অশেষ দুঃখ পাইতে হইবে জানিয়াও পুত্রের সৎ সংকল্পে বাধা সৃষ্টি করিলেন না। প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পিতা-মাতা সৎ হইলে পুত্রও সৎ হয়। ভক্ত এবং সাধকপ্রধান গুরুর মত পিতা এবং বিশিষ্টাদেবীর মত উদার মা না হইলে শঙ্করের মত পুত্র লাভ সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মহাপুরুষের জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। মাতৃ-আশীর্বাদ লাভ করিয়া শঙ্কর সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

[ক্রমশ।

আমাকে তবুও কেন

সমরেন্দ্র ঘোষাল

আমাকে তবুও কেন......।
আমাকে কেন তবু......।
আমাকে কেন......।

আমি কি বুঝি না কিছু...বুঝি আম বুঝি
আমি কি ভাবিনি কিছু...ভাবি আজও ভাবি।
আমি কি নিজেকেও দেখতে চাই না...চাই এখনও চাই।

সমস্ত শরীরে আমার......
যে ট্রেন ছেড়েছে লাইন মাটিতে মিশতে।
যে তারকা ফিরে চায় তার মৃত জ্যোতি।
যে শ্বেত করবী চায় নাকো কোন উপরি রং।
......সমস্ত শরীরে আমার।

আমাকে তবুও কেন......।
আমাকে কেন তবু......।
আমাকে কেন......।
এই ভাবে দৃশ্য হয়ে স্তব্ধ হতে হবে
চিত্রের মধ্যে মিশিয়ে রক্ত মাংস আমার।

বি বে কা ন ন্দ

অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়

নিজস্ব সংস্কৃতির জোরে সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছা আধুনিক ভারতবর্ষের, এর চূড়ান্ত প্রকাশ ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো সহরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ধর্ম-সভায়। মানব-জীবনের মহত্তম লক্ষ্য নির্দেশ করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বিতর্কে অংশ নিতে। অথচ আশ্চর্য এই যে, হিন্দুধর্মকে আদৌ গণ্য করা হয় নি। স্পষ্টত বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ধর্ম বলে আমেরিকার সংগঠকবৃন্দ মনে করেছিলেন হিন্দুধর্ম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছাপাখানার দৌলতে এই সর্বজাতীয় সম্মেলনের খবর ভারতবর্ষে পৌঁছোলো। কোটি কোটি মানুষের ধর্মের প্রতি এ জাতীয় তাচ্ছিল্য ভারতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের বুকে বাজলো অপমানের মতন। কিন্তু কোন কার্যকরী প্রতিবাদের নিশানার অভাব মেনে নিতে হল ক্ষুব্ধচিত্তে।

কলকাতা-নিবাসী জনৈক যুবক এই অসহায় অবস্থা মানতে পারলেন না। মুস্কিল আসান করতে তিনি বদ্ধপরিকর। ইনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩-১৯০২), পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত। আজীবন ইনি জীবনের সত্যাদর্শের সন্ধানে ভাবাকুল চিত্তে ব্যাপৃত ছিলেন। কলেজের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার কর্তৃক প্রভাবিত হন; তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এই নবীন যুবক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত ব্রাহ্ম-সমাজের কর্মধারার প্রতি তাঁর সাময়িক আকর্ষণ জন্মায়। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে তিনি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেদান্ত প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণর সংস্পর্শে এলেন প্রথমবার। ফলে এই যুবকের জীবন-ধারা নতুন বাঁক নিলো আর সব অনুসৃত পন্থা ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যানুযায়ী হিন্দুধর্মের উন্নতিবিধানে আত্মোৎসর্গ করলেন তরুণ নরেন্দ্রনাথ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ধর্মের বিশ্বজনীনতা জোর দিয়ে বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, এই তাঁর শিক্ষার মূল কথা। উদারচিত্ত এই সাধক কখনও কোন ধর্মের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। তাঁর প্রিয় উক্তি ছিল 'যত মত তত পথ', অর্থাৎ বিভিন্ন মত শেষাবধি একই লক্ষ্যাভিমুখী। সব ধর্মেরই সার কথা অভিন্ন, ভেদ শুধু অবলম্বিত মার্গে।

এমন কি তিনি খৃস্টধর্ম বা ইসলাম ধর্মের অন্তঃসার উপলব্ধি করেছিলেন বলে মনে করা হয়। পরা বিদ্যা নয়, অপরা বিদ্যার সাহায্যে তাঁর এই উপলব্ধি। যাদের বুঝতে চাইতেন, সেই মানুষেরই মত তিনি খেতেন-পরতেন, তাদের কার্যে ব্রতী হয়ে কথা বলতেন তাদের ভাষায়। তিনি বলতেন, 'নিজেকে 'জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' করতে হবে, অন্য পথ নেই।'

কলকাতার কাছাকাছি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজারী এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রথমে স্বল্প পরিচিত ছিলেন। গতানুগতিক শিক্ষাও ছিল না তাঁর। কয়েকটি মানুষকে তিনি শোনাতেন সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান উপদেশ এবং নীতিগর্ভ রূপক-কাহিনী। ক্রমে শিক্ষিত-সমাজের কিছু কিছু বিশিষ্ট মানুষ কথা বলতে, জ্ঞান লাভ করতে এলেন তাঁর সন্নিধানে খৃস্টান এবং মুসলমানরাও বাদ যান নি এ দল থেকে। কিছু ভক্ত-শিষ্য রেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অমরলোকে প্রয়াণ করেন ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে। এঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষম ও ভাস্বরতম পুরুষ।

গুরুদেবের দেহত্যাগ হ'লে দু' বছর ধরে সমস্ত ভারতবর্ষ, এমন কি হিমালয় ছাড়িয়েও পর্যটন করে বেড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্দেশ্য দেশ-প্রচলিত সব ধর্ম বোঝা এবং গভীরতর অর্থে এ দেশের অগণিত মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব ছবি অবলোকন। তাদের আতঙ্কজনক দারিদ্র্য ও অসহায়তা দেখে দুঃসহ বেদনায় ভরে উঠল তাঁর মন। কিন্তু

স্বদেশের বর্ণাঢ্য অতীতের গৌরবময় উত্তরাধিকার, সাহিত্য ও সঙ্গীতে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে, দর্শনের সুগভীর আলোচনা এবং বীরোচিত কর্মে— তাঁর মন ছিল।

চিকাগো সম্মেলনের খবর পেয়ে বিবেকানন্দ স্থির থাকতে পারলেন না। এই বিশ্ব-সভায় হিন্দুধর্ম-প্রতিনিধিরূপে বক্তব্য রাখার সঙ্কল্প নিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দু বলেই কোন হিন্দুর লজ্জিত হওয়া অর্থহীন, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য কোন কৈফিয়ৎও অপ্রয়োজনীয়। চিকাগোর ধর্মসভায় যোগ দেবার জন্য অর্থসংগ্রহ সুরু হয়ে গেলো। তাঁর মাদ্রাজী বন্ধুবর্গ, কিছুসংখ্যক উদারচিত্ত কায়েমী স্বার্থ-রক্ষণশীল ব্যক্তিও এগিয়ে এলেন জাতীয় স্বার্থে তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে। স্বীয় ক্ষমতার বিশ্বাসী বিবেকানন্দ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনন্ত বিশ্বাস নিয়ে কোন পরিচয়-পত্র ছাড়াই হঠাৎ চিকাগোয় উপস্থিত হলেন। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে সভায় বক্তৃতা করার অনুমতিও পেয়ে গেলেন।

তাঁর বক্তৃতার ফলাফল চমকপ্রদ। ভারতীয় সন্ন্যাসীর বেশে পীতাম্বর-পরিহিত বিবেকানন্দ নির্ভুল ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানোপযোগী প্রভাবপূর্ণ উপস্থিতি, মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সর্বোপরি সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারশক্তি তাঁর ছিল। তাঁর বক্তব্যের প্রতি অংশে অপরের প্রতি সহনশীল মনোভাব এবং মানব-প্রীতি স্বাক্ষরিত। তাঁর ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে চিকাগো সম্মেলন আক্ষরিক অর্থে তুমুলভাবে আন্দোলিত হয়। অনিমন্ত্রিত এই মানুষটিই তখন সর্বাধিক আলোচিত। ভারতীয় জাতিকে একলাফে অনেক ওপরে তুলে দিলেন বিবেকানন্দ। বহু আমেরিকান খৃস্টান তাঁর শিক্ষা নিতে এবং শিষ্য হ'তে চাইলেন। সমস্ত আমেরিকা জুড়ে বিবেকানন্দের বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। হাজার হাজার আমেরিকাবাসী তাঁর আলোচনা শোনার জন্য উন্মুখ। বিখ্যাত 'New York Herald-এর সম্পাদক প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন যে, যে দেশ থেকে বিবেকানন্দর ন্যায় অনন্য ব্যক্তিত্ব উদ্ভূত, সে দেশে ধর্মপ্রচারকদের পাঠানো মূর্খামী। ভারতের নবোখিত জাতীয়তাবাদের জনৈক প্রতিক্রিয়াশীল টোরী সমালোচক স্যার ভ্যালেণ্টিন চিরল স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, বিবেকানন্দ 'ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও নবজাত জাতীয়াতাবাদের জন্য বিদেশে স্বীকৃত প্রথম হিন্দু প্রতিপাদক।' (অ) ইংলণ্ডেও তাঁর বেদান্তভিত্তিক বিশ্বজনীন ধর্মের জয়জয়কার। এখানে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং বহু পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষের কথা ভোলেন নি তিনি। অনেকের মত মিস মার্গারেট নোবল নাম্নী ইংলণ্ড-নিবাসী একজন মহিলা তাঁর শিষ্যা হ'তে চাইলেন।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে ইনি ভারতে আসেন; ১৯১২ খৃস্টাব্দে দার্জিলিংয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এদেশে আসার পর আমৃত্যু এই মহীয়সী নারী ভারতবাসীর উন্নতি প্রচেষ্টায় দিন কাটান। গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির জন্য ইনি পরে সমস্ত ভারতে খ্যাত হন ভগিনী নিবেদিতা নামে। ১৯০০ খৃস্টাব্দে ধর্মেতিহাস সম্মেলন-এর প্যারিস অধিবেশনে যোগ দিতে ইউরোপে এলেন বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার। সমসাময়িক ইউরোপের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর সমাজগত দৃষ্টিভঙ্গী দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। এমন কি ১৮৯৬ খৃস্টাব্দেই তিনি নিজেকে 'সমাজতন্ত্রী' বলে ঘোষণা করেন।

যতদূর জানা যায়, ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এ জাতীয় দৃঢ় উক্তি করেছিলেন। প্যারিসে ধনরাজ পিটার ক্রোপেটকিন্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কালে তিনি তৎকালীন রাশিয়ার জন-সাধারণ এবং তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেন। তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত সান ইয়াৎ সেন-এর বন্ধুস্থানীয় হ'বার পর তিনি চীনাদের বিষয়ে বিবেকানন্দর বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মনে পড়ে তখন চীনা দূতাবাসে বন্দী সান-ইয়াৎ সেন মুক্তি পান বৃটিশ পুলিসের সাহায্যে। যেন শূন্য থেকে ছিটকে এসে দাঁড়িয়ে আছেন হলঘরে. এমন একজন প্রাচ্য দেশীয়কে দেখে মহেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন তাঁর দ্বারা কোন সাহায্য হওয়া সম্ভব কি না। অপরিচিত বললেন, 'আমি সেই বহু আলোচিত চীনদেশীয় মানুষ।' (অ) এভাবে তাঁদের বন্ধুত্বর সূত্রপাত। প্রগাঢ় প্রেম সত্ত্বেও অন্যান্য নজির দ্বারা প্রভাবিত হ'তে তিনি পিছপা হন নি, এমনই ছিল তাঁর মানস-গঠন। উপর্যুপরি ইউরোপ ভ্রমণের ফলে তাঁর দৃষ্টি হ'ল স্বচ্ছতর; ফলে ভারতবর্ষে প্রচারিত তাঁর মতবাদ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দিষ্ট সীমাতিশায়ী। শ্রীরামকৃষ্ণর অন্য একজন শিষ্য এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে নির্দ্বিধায় বললেন বিবেকানন্দ:

'Hands off! who cares for your Ramkrishna? Who cares for your ভক্তি and মুক্তি? Who cares what the Scriptures say? I will go into a thousand hells cheerfully, if I can rouse my countrymen to stand on their own feet, to be men inspired with the spirit of কর্মযোগ (Philosophy of Action). I am not a servant of Ramkrishna or anyone, but of him only who serves and helps others, without for his own ভক্তি or মুক্তি।'

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন—এ সিদ্ধান্ত এ-জাতীয় ভাবাবেগপূর্ণ উক্তি থেকে কোনমতেই করা যায় না। গুরুর মতবাদ তিনি উজ্জ্বল করে ঢেলে সাজিয়েছিলেন মাত্র। নতুন সামাজিক তাৎপর্যে রামকৃষ্ণর আন্দোলন পরিপুষ্ট করলেন বিবেকানন্দ। 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তিনি; আজও সম্প্রসারণ-শীল এই প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক ও

সামাজিক কাজের জন্য, বিশেষত পীড়িত মানবের সেবাকার্য সমস্ত ভারতে এবং এ দেশের বাইরের জগতেও বিখ্যাত। বিবেকানন্দর উদ্দীপনায় হিন্দুধর্ম সংগঠিত এবং গতি-প্রবণ হ'ল।

তরুণ দেশপ্রমী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে বৃটিশশাসনমুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন। বিদেশী শাসনের জোয়াল খুলে ফেলার জন্য দেশীয় নরপতিবৃন্দের একটি সংগঠন তৈরী করার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়ান তিনি এবং এমন কি বৃটিশ বন্দুকনির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাক্সিম প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার অকার্যকারিতা বুঝতে তাঁর বেশী দিন লাগে নি। ভারতবর্ষের বিত্তশালী শ্রেণী, যাদের বলা হয় উচ্চতর শ্রেণী, শীঘ্রই তাঁর বিশ্বাস টলিয়ে দিলো। তিনি উপলব্ধি করলেন—'ভারতের মানুষ কুটিরবাসী' (অ:) এও বুঝলেন যে, কুটিরবাসী শত সহস্র 'জনসাধারণের' উন্নতি ছাড়া ভারতবর্ষের এবং হিন্দুধর্মের মুক্তির নানা পন্থা:।

'The only hope of India is from the masses and the first step to become a patriot is to feel for the starving millions.' 'Ye ever trampled labouring masses of India, I bow to you !'

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস তিনি বুঝেছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এবং সাহসের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, এ দেশের সজীব প্রাণের চিরন্তন সাফল্যের ভিত্তিভূমি শ্রমিকশ্রেণী।

'It is through their physical labour only were possible the influence of the Brahmans, the progress of the Kshatriyas and the fortune of the Vaisyas.'

নবীন ভারতের যে ছবি তিনি দেখেছিলেন তাতে সকলেই সমান সুবিধার অধিকারী। এখানে—

'No privilege for anyone, equal chance for all. The youngmen should preach the gospel of social rising up, the gospel of equality.'

জাতীয়তার প্রথম যুগেই বিবেকানন্দ বুঝতে পারেন—শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বৃটিশশাসনমুক্তি ভারতবাসীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। দরিদ্রদের জন্য 'ধনীর অভিভাবকত্ব'-এ (অ) তাঁর কোন আস্থা ছিল না।

'The upper classes are physically and morally dead. I do not expect anything from the rich people of India.'

তিনি অনুভব করেন যদি কখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাদের মুঠোয় আসে, সে মুঠো সাধারণ মানুষের জন্য কখনও আলগা হ'বে না। এ জন্যই তিনি স্বাধীনতাদানে অনিচ্ছুক মানুষের স্বাধীনতা পাওয়ার বিরুদ্ধমত অবলম্বন করে সংগ্রাম করে গেছেন।

এ কারণে বিবেকানন্দর বৈদান্তিক মতবাদ গোঁড়ামীশূন্য কিন্তু বৃটিশ ধনতন্ত্রীদের সম্ভাবনাময় প্রতিযোগ তদানীন্তন উঠতি মধ্যবিত্ত সমাজের সঠিক উপযোগী। ঐতিহ্যানুসারী ভাববাদের খোলস সত্ত্বেও তাঁর মতবাদের মূল বস্তুতান্ত্রিক।

'Bread, bread ! I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven !' 'More bread, more opportunity for everybody.' 'No priest-draft, no social tyranny.' 'Heaven is nearer through football than through the Gita. We want men of strong biceps.'

এগুলো সমস্ত শতাব্দীব্যাপী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত তাঁর কয়েকটি বাণী। গান্ধীজীর বহু পূর্বেই তিনি ডাক দিয়েছিলেন হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য। মুসলমানদের কর্মোদ্যম এবং গণতান্ত্রিক সমাজ সংগঠন তাঁর প্রশংসাধন্য এবং ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের জন্য তিনি চেয়েছিলেন একটি 'Islamic body with a Vedantic heart' বিধবা বিবাহ বা অন্ত:-বর্ণ-বিবাহ ইত্যাদি সমাজ সংস্কারে তাঁর আপত্তি ছিল না, কিন্তু এহ বাহ্য।

'Liberty is the first condition of growth. Just as man must have liberty to think and speak, so he must have liberty in food, dress and marriage and in every other thing, so long as he does not injure others.'

সংক্ষেপে এই হ'ল তাঁর সমাজ দর্শনের মর্মকথা।

শিক্ষিত সমাজের প্রতিভূ ভারতে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বৃটিশ সরকারের ভারত-শাসন-পদ্ধতির সমালোচনাও তিনি একইভাবে সমর্থন করেন। লক্ষ্য পূরণের জন্য এও তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি। তাই বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি দেশনেতৃবৃন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তিনি কখনও কোন রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মস্রোতে পা ডোবান নি। জনসাধারণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে রাজনীতি তাঁর কাছে অর্থহীন। সুতরাং তিনি একদল যুবককে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, যারা ভারতীয় জনগণের উন্নতির জন্য 'Patiently, steadily and without noise' কাজ করবে।

১৯০২ খৃস্টাব্দে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে বিবেকানন্দর মহাপ্রয়াণ আধুনিক ভারতেতিহাসের এক ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে আশাবাদী বিবেকানন্দ যে-কোন রাজনৈতিক নেতার থেকে ঢের সূক্ষ্ম ভাবে জনগণের অবস্থা উপলব্ধি করেছিলেন। মৃত্যুর অনতিপূর্বে বলেছিলেন :

'The country has become a powder magazine. A little spark may ignite it. I will see the revolution in my lifetime !'

ভবিষ্যদ্রষ্টা বিবেকানন্দ ঘোষণা করেন—

'What India needs to-day is bomb!'

শীঘ্রই বোমাও তৈরী হ'ল এবং বিপ্লবাত্মক উত্থানও হল ভারতবর্ষে, কিন্তু দুঃখ এই যে, নিজের চোখে এ সব তিনি দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং অদ্যাপি তাঁর জীবিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলা দেশের বিপ্লবী সঙ্ঘ গড়ে উঠলো। এই দলই বাংলা দেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে '১৯০২ সালের গৌরবময় বিপ্লব' (খ) চালায়। বিবেকানন্দ-জীবনী গ্রন্থে রোমাঁ রোলাঁ ঠিকই বলেছেন—

'Indian nationalist movement smouldered for a long time untill Vivekananda's breath blew the ashes into flame which erupted violently after his death. His New-Vedantism spread like burning alcohol in the veins of the intoxicated nation.'

১৯০৫ সালে বাংলা দেশের উত্থান কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিশ্বের ঘটনা স্রোতের এই বাঁক ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দেই বিবেকানন্দর ভবিষ্য-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। জনৈক আমেরিকান শিষ্যকে তিনি তখনই বলেছিলেন এক বিরাট জগদ্ব্যাপী সমাজ বিপ্লব এলো বলে। হিন্দুদের সমাজবিভাগ সম্বন্ধীয় শব্দের সাহায্যে তিনি বলেছিলেন বৈশ্য-প্রভুত্ব চলছে, কিন্তু শীঘ্রই শূদ্র রাজত্ব সুরু হ'বে।

'The first glow in the dawn of this new power has already begun to slowly break upon the Western world. Socialism, Anarchism, Nihilism and like other sects are the vanguard of the social revolution that is to follow.'

এই উপলব্ধি ১৯০১ সালে স্বামীজীর দর্শনাগত জনৈক তরুণ বাঙালী বিপ্লবীর কাছে অধিকতর মূর্ত হয়ে ওঠে। 'India should be freed politically first' বলালেনা বিবেকানন্দ। পরে আরও কথাপ্রসঙ্গে যেন স্বগতোক্তি করে চললেন

'Yes, the Sudras of the world will rise. And that is the dictate of the Social Dynamic that is Sivam (শিবম্— absolute good). It is as clear as daylight that the entire orient will have a resurrection to build anew a human world. Lo! the future greatness of China, and in the wake of it, of all the Asiatic nations.'

এ জাতীয় অপ্রত্যাশিত বক্তব্য তরুণ বিপ্লবীর অবিশ্বাস্য মনে হ'ল; বিশ্বাস করার জন্য তিনি প্রমাণ চাইলেন। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বক্তা গম্ভীর প্রত্যয়াত্মক কণ্ঠে বললেন

'Don't you see, I can see through the veil, the shadow of coming events of the world. By God's grace it has descended on me, this insight of mine, through years of close observation. Study and travel— that is Sadhana (সাধনা). As the astronomers see the movements of the stars through telescope, likewise the movement of the world falls within the range of my vision. You take it from me, this rising of the Sudras (শূদ্র) will take place first in Russia and then in China. India will rise next and will play a great role in shaping the future world'

ব্রিটিশ-অধীনতা সত্বেও ভারতবর্ষের অদূরবর্তী ভাবী গৌরব বিবেকানন্দর বিশ্বাস কোন মর্ত্যবাসীর পুত স্বপ্ন নয়। জ্বলন্ত, ভয়হীন আবেগপূর্ণ এই বিশ্বাস। বাংলা ও ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনাবলীতে তিনি নিজেক আবেগের সঙ্গে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি কথাশিল্পী নন। বাংলায় লেখার সময় তিনি শৈল্পিক ফলশ্রুতির দিকে নজরও দেন নি। পাঠক-মনে প্রত্যক্ষ আবেদন-সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য ছিল। সম্মোহন, যুক্তি ও চিন্তার গুরুত্ব সহজ প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে [illegible] রেখে গেছে। তাঁর রচনায় বাংলা গদ্যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হল। প্রতিদিনের কাজ চলে যে-সব শব্দ আর বাক্যাংশ নিয়ে তাই দিয়েই তিনি প্রকাশ করতে পারতেন সমুন্নত চিন্তাধারা এমন কি বিমূর্ত তর্কপদ্ধতি। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য হতে তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা আছে এ বই-এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মনে হয়েছিল এ বই বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়। মর্মভেদী স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয়ী আদর্শ ছাড়াও এ বই পড়ে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন— কথ্য বাংলা কত সজীব ও বেগবান হতে পারে। কবি হবার কামনা বিবেকানন্দর ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর আবেগের কাব্যিক প্রকাশ প্রয়োজন হত। কোনও বন্ধুকে চিঠি লেখার সময় তিনি নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি ক'টি রচনা করেছিলেন। সুপরিজ্ঞাত এই চরণগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বকৃত বাংলা কবিতার সংকলনে গ্রহণ করেন।

সখার প্রতি

ভিক্ষুকের কবে বলো, সুখ,
কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল—
দাও, আর ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী,
প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
দাও, দাও—যেবা ফিরে চায়,
তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু,
সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো,
সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।*

অনুবাদক—স্বপন চৌধুরী

* বাংলা কাব্য সাহিত্যের ভূমিকা, [illegible]

ঋষভচাঁদ

বিশ্বচরাচর যে কেবল আনন্দ থেকে উদ্ভূত, তাই নয়, আনন্দেই এর অবস্থিতি, আনন্দই এর জীবন, আনন্দই এর মূলাধার। পৃথিবীর দুরপনেয় নিরানন্দের অন্তরেই নিগূঢ় রয়েছে আনন্দের অনন্ত ক্ষীরসমুদ্র অথচ পৃথিবীর জীব রাখে না তার সন্ধান। এই আনন্দের উচ্ছ্বাস বা উচ্ছলনই পরাপ্রকৃতিতে সৃষ্টির সূচনা। আনন্দের উদ্বেলনের প্রথম অন্তময় ফল সর্বস্রষ্টা বিজ্ঞানলোক উপনিষদ যাকে বলেছে 'সর্বেশ্বর', 'প্রজ্ঞানঘন', 'বিশ্বযোনি'। এই বিজ্ঞানলোক বা অতিমানস লোক থেকে বেরিয়ে আসে কত প্রজ্ঞাভাস্বর লোক-লোকান্তর—অধিমানস সম্বোধিমানস প্রভৃতি। চেতনার ক্রমিক অবতরণের ফলে এমন একটা পর্ব আসে যখন একত্বের সঙ্গে বহুত্বের ঐকান্তিক বিচ্ছেদ হয়। মানবমনেই এই বিচ্ছেদের প্রারম্ভ। এখানে বহু আছে, এক নাই। বহুর সমতার বা সমবায়ের দ্বারা একে একটা আনুমানিক ধারণামাত্র সম্ভব, একের অখণ্ডত্বের বোধ এখানে জাগে না। অবতরণের পরবর্তী অবস্থায় চেতনা প্রাণের স্তর হয়ে অচিতির অকূল সাগরে ডুবে যায়। এই অচিতি থেকেই জড়জগতের উদ্ভব, এই অচিতি থেকেই আবার চেতনার ক্রমবিকাশ, এই অচিতি থেকেই আনন্দের ক্রমিক স্ফুরণ। অসীম, আনন্দ বিকাশনশীল সত্তার অতিসীমিত চেতনায় খণ্ডিত, বিকৃত হয়ে চঞ্চল সুখ-দুঃখের আবর্তিত সংবেদনে পরিণত হয়।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে কেমন ক'রে পরমপুরুষ যজ্ঞের হবিরূপে নিজকে উৎসর্গ করলেন, সৃষ্টির জন্য অতিচেতন নিশ্চেতনে নিমজ্জিত হ'লেন। এই নিমজ্জনের বর্ণনাও ঋগ্বেদে আছে নাসদীয় সূক্তে: 'তখন সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না; অন্তরীক্ষ ছিল না, ব্যোম ছিল না, ও ছিল না তারও পরে যা।--তখন না ছিল মৃত্যু, না ছিল অমৃত---আঁধার ছিল আঁধারে নিগূহায়িত হ'য়ে, অপ্রকেত সলিল ছিল এই সব যা কিছু---'তখন তপের মহিমায় জন্ম নিলেন সেই এক।'

অচৈতন্যের প্রগাঢ় তমিস্রা বিদীর্ণ ক'রে যখন চেতনার উন্মেষ, তখন সহজেই বোঝা যায় যে, সংবৃত আনন্দও চেতনার ক্রমবিকাশের ক্ষীণ ছন্দেই বিকশিত হবে। সীমিত চেতনার মধ্যে পূর্ণানন্দ হঠাৎ ফুটে উঠতে পারে না।

মানুষের সকল ব্যথার পরিসমাপ্তি হবে অন্তর্হীন অব্যাহত আনন্দে যখন তার অহংকেন্দ্রিত চেতনা প্রসারিত হবে অনন্ত চেতনায়। যতদিন চেতনা সঙ্কীর্ণ ও পঙ্কিল, বাহ্যবিষয় সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়-সংবেদনেই আসক্ত, ততদিন সুখ-দুঃখাতীত ভূমানন্দের স্ফুরণ সম্ভব নয়। অহং নিরসনের দ্বারা চেতনার ব্যাপ্তি ও প্রসার, ব্যষ্টিচেতনার বিশ্বচেতনার এবং বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনার সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভই অনন্ত আনন্দের পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায়।

তা হ'লে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, দুঃখ-কষ্ট মায়া মিথ্যা নয়। ক্ষণিক সত্য হ'লেও তা সত্য। চেতনার ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায় এদের উপযোগিতা অনিবার্য। দুঃখ-কষ্টের অভিঘাতেই চেতনার জাগরণ ও সম্প্রসারণ হয়, জুগুপ্সা ও তিতিক্ষার দ্বারাই আত্মশক্তির উদ্রেক ও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট চিরস্থায়ী নয়, এদের অবশ্যম্ভাবী পর্যবসান নিত্যানন্দে। এদের নিঃশেষ নিরাকরণই পরম পুরুষার্থ। পৃথিবীর বুক থেকে এদের আমূল অপনোদনই ক্রমবিকাশের অন্তিম লক্ষ্য। অনবচ্ছিন্ন আনন্দেই সর্বজীবের জন্মগত অধিকার।

প্রাচীন বৈদিক ও ঔপনিষদীয় সাধনা এই আনন্দকেই কেন্দ্র ও লক্ষ্য ক'রে সিদ্ধি ও ঋদ্ধির অধিকারী হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে ঋষিরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আনন্দকে—

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

আনন্দ অমৃতছিল তাঁদের চোখে। জগতের দুঃখকষ্ট তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাতে পারে নি। তাঁরা দেখেছিলেন যে, দুঃখ-শোক অজ্ঞান-প্রসূত ও অন্তরাত্মার ক্রমবিকাশে একটা সাময়িক পর্যায়মাত্র। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নিরানন্দের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন শাশ্বত আনন্দের উপর, তাই নিরানন্দের প্রাবল্যে অভিভূত হ'য়ে তাঁরা ঘোষণা করেন নি, 'সংসার অসার, বিভীষিকময়, দুঃখ-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর দ্বারা চিরগ্রস্ত। একে পরিহার ক'রে নিবৃত্তির পথে ব্রহ্মপদের দিকে ছোটো চল।' তাঁরা জীবনকে স্বীকার করেছিলেন, জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য স্বীকার করেছিলেন এবং মানুষের সমস্ত পার্থিব জীবন যাতে আনন্দময়, অমৃতময় হতে পারে—'সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে', 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'—তার সাধনার দীক্ষা দিয়েছিলেন।

দুঃখবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, মায়াবাদ, বস্তুতন্ত্রবাদের সর্বপ্লাবী প্রভাবের যুগে প্রাচীন ঋষিদের আনন্দের সঞ্জীবনী শিক্ষার যত অধিক আদর ও আলোচনা হয় মানবজীবনে তার যত অধিক অনুশীলন হয় ততই জগতের কল্যাণ।

বলেছি, বৈদিক সাধনা ছিল আনন্দমুখী। সোম আনন্দের প্রতীক, সোমপান বলতে তাঁরা বুঝতেন আনন্দ-সুধা পান। বৈদিক যজ্ঞগুলির মধ্যে সোমযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'ত।

'যত্র সোমঃ সূয়তে যত্র যজ্ঞো, ঘৃতস্য ধারা অভিতৎ পবন্তে'—

যেখানে সোম অভিষুত হয়, যেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, সেই দিকে জ্যোতির ধারা প্রবাহিত হয়। (ঋগ্বেদ—৪-৫৮-৩) 'তস্য ধারা মধুমৎ পবন্তে'—জ্যোতির ধারা মধুমান হয়ে প্রবাহিত হয়। (ঋঃ ৪-৫৮-১০) দেবতাদের স্তুতি বা

প্রবাহনে আনন্দের দীপ্তি যেন সর্বাগ্রে ফুটে উঠেছে। ইন্দ্রের স্তুতিতে বলা হয়েছে—

'উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা ইদ্রেবতো মদঃ।'

—এস আমাদের সোমরসের হবি গ্রহণ করতে, হে সোমপায়ি! সোমরস পান কর; তোমার দিব্য আনন্দের মহিমা সত্যই প্রকাশ বা আলোক প্রদান করে।

ভগসবিতার উদ্দেশে গান করা হয়েছে—

'অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ
সাবীঃ সৌভগম্।
পরা দুঃষ্বপ্ন্যং সুব॥

—অদ্য, হে দেবরচয়িতা, আমাদের নিকট ফলপ্রসূ আনন্দ প্রেরণ কর, যা দুঃস্বপ্নের অন্ধকার তা দূর করে দাও।

ঊষার স্তুতি:

"উষো দেব্যমর্ত্যা বি ভাহি চন্দ্ররথা
সুনৃতা ঈরয়ন্তী।
আ ত্বা বহন্তু সুযমাসো অশ্বা হিরণ্যবর্ণা
পৃথুপাজসো যে॥ (ঋঃ ৩-৬১-২)

—হে দিব্য ঊষা, অমৃতময়ী হ'য়ে তোমার আনন্দোজ্জ্বল রথে, সত্যের সুমধুর বাণীর প্রেরণা ক'রে দীপ্ত হয়ে ওঠো। তোমার সুনিয়ন্ত্রিত অশ্বগুলি যেন তোমাকে এখানে নিয়ে আসে, যারা হিরণ্যবর্ণ এবং ঘনীভূত সামর্থ্য যাদের।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৯০-৬-৯ সূক্তে ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দেখছেন—

'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধী॥ ১

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥' ২

বৈদিক ঋষিদের এই রস-সাধনা ও মধুবিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন উপনিষদের ঋষিরা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যার অতি বিশদ ও হৃদ্য বিবৃতি আছে। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ যে এক মধুময় সূত্রে বিধৃত, আনন্দের নিত্য সম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত, তার অতি মনোহর চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। ভগবান রসঘন, তাঁর সাধনাও রসের বা আনন্দেরই সাধনা, এ কথা ঋষিরা অনুভব করেছিলেন। তাঁদের সাধনায় যে উত্থান-পতন ছিল না, আঁধার আলোক ছিল না, তা নয়। অগণিত অন্তর শত্রুদের অবিরাম আক্রমণের মধ্য থেকে তাঁদের এগিয়ে যেতে হ'ত। এই শত্রুদের উল্লেখ বেদে বহুবার করা হয়েছে বত্র, পণি, বল, নিদঃ অত্রি, দস্যু ইত্যাদি নামে। এরা অন্ধকারের পুত্র, এদের কাজই হচ্ছে অমৃতত্বকামী সাধকদের পথে বাধা দেওয়া, তাদের আলোর অভিযান ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা করা। কিন্তু এই বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা যে রস-সাধনায় সমর্থ হয়েছিলেন তার কারণ তাঁদের সাধনার একমাত্র সম্বল ছিল তাঁদের উদ্বুদ্ধ অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষের নতি, পরমাত্মা ও তাঁর দিব্য বিভূতিসমূহের প্রতি তাঁদের সহজ আত্মনিবেদন। তাঁদের সাধনা পরিচালিত হ'ত তাঁদের পুরুষ-কারের দ্বারা নয়, ভগবানের অমোঘ শক্তির দ্বারা অন্তরাত্মাকে অগ্রণী ক'রে আত্মসমর্পণের এই সাধনাকে শ্রীঅরবিন্দ 'The sunlit path' বা সূর্যযান বলেছেন। ঋষিদের সাধন জীবন ছিল যেন স্তব-স্তুতি, আকৃতি-প্রণতির এক অখণ্ড পরম্পরা, দিব্য শক্তির উল্লসিত জয়গাথা।

বৃহদারণ্যকের ঋষি বলছেন,—

১। 'ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু---'

—এই পৃথিবী সমুদয় ভূতের মধু, সমুদয় ভূত এই পৃথিবীর মধু---।

১৩। 'ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু---'

—এই মনুষ্যজাতি সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই মনুষ্যজাতির মধু---

১৪। 'অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু---'

এই আত্মা সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আত্মার মধু—ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়েও এই মধুবিদ্যার বর্ণনা আছে।

১। 'অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু---',

—এই আদিত্য দেবগণের মধু---।

২, ৩। 'তস্য যে প্রাঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাড্যঃ

ঋচ এব মধুকৃত ঋগ্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপস্তা বা এতা ঋচঃ'—

—তাহার পূর্ব দিকের যে কিরণরাজি তারাই পূর্ব দিকের মধুনাড়ী; ঋক মন্ত্রই মধুকর; ঋগ্বেদই পুষ্প; যজ্ঞাগ্নিতে আহৃত জলাদিই অমৃত।

১১শ খণ্ড—৪। 'তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ'—এই মধুবিদ্যা ব্রহ্মা প্রথমে প্রজাপতিকে বলেছিলেন, পরে প্রজাপতি মনুকে, মনু তাঁর সন্তান-দের এবং পিতা বরুণ জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালক আরুণিকে এই ব্রহ্মবিদ্যা (মধুবিদ্যা) শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৬। 'এতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয়ঃ ইতি'—অর্থাৎ এই মধুবিদ্যা, এই ব্রহ্মবিদ্যা সব বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলে—

'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ
সুকৃতমুচ্যত ইতি।
যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ।'

তিনি স্বয়ং নিজকে সৃষ্টি করলেন, সেইজন্য তাঁকে সুকৃত বলে। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ।

আনন্দঘন ব্রহ্মের সৃষ্টি আনন্দময়, মধুময়। এই মধুনিস্যন্দী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কণায়, প্রতি জীবে, প্রতি বস্তুতে, প্রতি কাজে, প্রতি মুহূর্তে সেই প্রেমময় রসঘনকে পরমানন্দে আলিঙ্গন করার পরম রহস্য নিহিত আছে এই মধুবিদ্যায়। মধুবিদ্যার অনুশীলনে সন্ন্যাসের রিক্ততা নাই, কৃচ্ছ্রসাধনের তিক্ততা নাই। মধুবিদ্যার সিদ্ধির ব্যঞ্জনা মেলে সোমশিতা: (সোমরসে প্রদীপ্ত) ঋষিদের প্রার্থনায়: 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—পার্থিবীর রজঃ মধুময় হোক্।

ঠাকুর [illegible]বারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

॥ তিন ॥

হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে। এর পর মেলার বাৎসরিক অধিবেশন যথাক্রমে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে চৌদ্দবার অনুষ্ঠিত হয়, এ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়।

(দ্রঃ 'The Hindu Mela met altogether fourteen times from 1867 to 1880'—History of the freedom movement in India. Vol. I Ch II: By R. C. Majumder).

চিৎপুরের রাজা নরসিংহচন্দ্র বাহাদুরের উদ্যান (প্রথম অধিবেশন), আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যান (এই উদ্যানকে ডনকিন বা ডন কাস্টারের বাগানও বলা হত), হীরালাল শীলের নৈনানের বাগান, রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরের বাগান, মৃজাপুরের পার্শীবাগান, রাজা বদনচাঁদের টালার বাগান, রাজাবাজারের বৃজনাথ ধরের বাগান প্রভৃতি উদ্যানে মেলার অধিবেশনগুলি সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। পার্শীবাগানে, নৈনানে এবং বেলগাছিয়া উদ্যানে মেলার অধিবেশন একাধিক বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মেলার আদর্শে বারুইপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানেও কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতীয় মেলার অধিবেশন হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য---'জাতীয় মেলার আদর্শে বারুইপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও মেলার অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। বারুইপুরে তৃতীয় বার্ষিক মেলা হয়, ১২৭৮ সালের ফাল্গুন সংক্রান্তি দিবসে। মূলমেলার (হিন্দুমেলা) উদ্যোক্তাগণ ইহাতেও যোগদান করেন' (দ্রঃ হিন্দুমেলার বিবরণ, প্রস্তুয়মান সংস্করণ: শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মেলার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ায় মেলাকে 'চৈত্রমেলা' বলা হত। প্রথম তিন বৎসর উৎসবের তারিখ ছিল চৈত্র মাস। তৃতীয় বৎসরের অনুষ্ঠানের পরে, সংবাদ প্রভাকরের ১২৭৬ সালের ২রা বৈশাখের প্রতিবেদনে চৈত্র-সংক্রান্তিতে প্রখর গ্রীষ্মে অনুষ্ঠানের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে মাঘ মাসে অনুষ্ঠান আয়োজনের একটি প্রস্তাব

[illegible] ঠাকুর
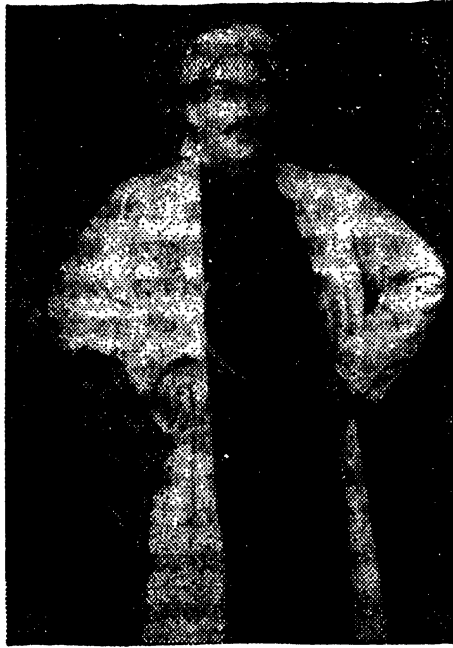
দেওয়া হয় (দ্রঃ ঐ)। সম্ভবত 'সংবাদ প্রভাকরের' প্রস্তাব অনুসারে বা অন্য কোন কারণে চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন থেকে মাঘ সংক্রান্তি ও ১লা ফাল্গুন মেলার অনুষ্ঠান-সময় স্থির করা হয়। এই পরিবর্ত্তনে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' খুশী হয় নি।

সমালোচনা করে লেখা হয়, 'লোকের কষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্রসঙ্গত পর্ব্বদিন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না।'

'সমাচার চন্দ্রিকা' মাঘ মাসে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব দেন। কারণ '--- এ সময়েও রৌদ্রের প্রাদুর্ভাব বড় কম নহে। অতএব যখন চৈত্র-মেলার নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে, তখন আরও একমাস পূর্বে অর্থাৎ মাঘ মাসে হইলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না।' (দ্রঃ ঐ)।

তৃতীয় অধিবেশনের মেলায় বিভিন্ন বিষয়ে উৎকর্ষ প্রদর্শনকারীদের যে পদক দেওয়া হয়, তাতে 'হিন্দুমেলা' নামাঙ্কন ছিল। চতুর্থ বৎসরের অধিবেশনে জাতীয় মেলার নাম সাধারণ্যে 'চৈত্র মেলার' পরিবর্তে 'হিন্দুমেলা' ঘোষণা করা হয়। নাম পরিবর্তন সম্পর্কে তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'অদ্যকার এই যে সমারোহ ইহা এতদিন পরে ইহার প্রকৃত নাম ধারণ করিয়াছে, ইহা হিন্দুমেলা নামে আপনাকে লোকসমক্ষে পরিচয় দিতেছে, বিহঙ্গ শাবক যেমন অল্পে অল্পে আপনার বল পরীক্ষা-পূর্বক ক্রমে উচ্চতর নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে সাহসী হয়, সেইরূপ অস্ফুট শব্দ আমাদের শ্রবণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে 'হিন্দুমেলা' এই সুস্পষ্ট নাম দ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ পাইতেছে।'

—দ্রঃ 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা' ৭৪, পৃঃ ১০০—১০১, শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুমেলাকে প্রথমাবধি 'জাতীয় মেলা' বলা হত। সে আখ্যাও অযৌক্তিক ছিল না। নবগোপাল মিত্রের সর্বোত্তম আকাঙ্খার বস্তু ছিল, 'ন্যাশনাল গ্যাদারিং' বা জাতীয় সমাবেশ। সর্ব

বিষয়ে জাতীয় আদর্শ প্রচারই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় প্রসঙ্গত লিখেছেন, 'জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় ব্যায়ামশালা, জাতীয় সভা, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রেরণা জোগাইয়াছে হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা।'

---দ্রঃ জাগৃতি ও জাতীয়তা।

হিন্দু মেলার বিভিন্ন বর্ষের কার্য-বিবরণী ও উদ্যোক্তাগণের ভাষণ আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা হিন্দুমেলার 'জাতীয় মেলা' নামের সার্থকতা খুঁজে পাব।

হিন্দুমেলার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের পরেই বৎসরব্যাপী সময়-কালের মধ্যে মেলার কার্যসূচী প্রণয়ন, নীতি-নির্দেশ এবং আলোচনাচক্রের মাধ্যমে জাতীয় ভাবের উদ্দীপন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে মেলার কর্মকর্তাগণ 'জাতীয় সভা বা ন্যাশনাল সোসাইটি' স্থাপন করেন। জাতীয় সভার সদস্য-চাঁদা ছিল 'অন্যূন এক মুদ্রা বার্ষিক দান।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য---'ন্যাশনাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা জাতীয় মেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। জাতীয় মেলা সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান। জাতীয় মেলার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া স্বদেশের উন্নতিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে সম্বৎসর ধরিয়া কার্য ও আলাপ আলোচনার জন্য জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।'

—দ্রঃ হিন্দুমেলার বিবরণ, প্রস্তুয়মান সংস্করণ: শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

জাতীয় সভার আলোচনা সভা বসত প্রতি মাসে একবার করে। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সমাজপতিগণ বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করতেন। জাতীয় সভার পাঠচক্রে জাতীয় চেতনা-উদ্বোধক এবং স্বদেশ-উন্নয়নকর নানা বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দধর্মের শ্রেষ্ঠতা' ও 'বাঙালা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি সংস্থাপনী সভা'), শ্যামাচরণ সরকার ('হিন্দু আইন' বিষয়ক), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যোগ-শাস্ত্র বিষয়ক), সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ('ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত বিষয়ক'), সীতনাথ ঘোষ (যন্ত্রবিষয়ক), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (বাণিজ্যবিষয়ক), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ (মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক), ওড়িয়া পণ্ডিত হরিহর দাসশর্মা ('ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' শীর্ষক), মনোমোহন বসু প্রমুখ চিন্তা-শীল ব্যক্তিগণ। জাতীয় মেলার সপ্তম অধিবেশনের পর থেকে জাতীয়সভার কর্মধারা নানা জনহিতকর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রসার লাভ করে। জাতীয়

নবগোপাল মিত্র

সভার নির্দেশানুসারেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় জাতীয় মেলার কর্মসূচীর অন্তর্গত জাতীয় ব্যায়ামশালা, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় অশ্বারোহণ শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত জাতীয় সভা হিন্দুমেলার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুমেলা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উষালগ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছিল। মেলার বিভিন্ন বার্ষিক কার্য-বিবরণী ও উদ্যোক্তাগণের ভাষণ উদ্ধৃতির মাধ্যমে লক্ষ্য করা যাবে জাতীয় মেলা কি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল।

হিন্দুমেলার প্রথম বার্ষিক অধি-বেশনের কোনও মুদ্রিত কার্য-বিবরণী এখনও দেখা যায়নি। তবে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল সীমিত সমারোহে নিরাড়ম্বর পরিবেশে তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য-বিবরণীতে (১৭৯০ শক) মনোমোহন বসু মহাশয়ের বক্তৃতায়, হিন্দুমেলার 'জন্মদিনে কেবল কতিপয় বান্ধব ও প্রতিবেশী মাত্র উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ নিজ বাটির লোক ও নিজ কুটুম্ব বই নয়।'

দ্রঃ—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

প্রথমবারের অধিবেশনে স্বাদেশি-কতার মন্ত্রগুরু রাজনারায়ণ বসু অসুস্থ-তার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তথাপি পণ্ডিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গের পূর্ব মহিমা বর্ণন' শীর্ষক একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা তিনি সংশোধন করে মেলার অধিবেশনে পাঠের জন্য স্বগ্রাম (বোড়াল) বাসিগণের পক্ষ থেকে প্রেরণ করেন। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ:

দেখিয়া উৎসব-সভা পুলকিত প্রাণ।
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যা'তে বিদ্যমান।
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল।
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তাঁর সকলে মিলিল॥'

—ইত্যাদি

—দ্রঃ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত: ১৩১৫।

এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সম্ভবত সর্ব প্রথম সাধারণ জনগণের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় অভীপ্সার প্রকাশ ঘটেছিল। শতবর্ষ পূর্বে 'বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল'—গ্রামবাসিগণের এ আশা দুরাশা হলেও বিস্ময়কর ছিল, এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

চৈত্র মেলার প্রথম অধিবেশন সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত না হলেও সুপ্ত জাতিচেতনা ও স্বদেশ-ভাবনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যবর্তী এক বৎসরের সময়-সীমার মধ্যে মেলার

উদ্যোক্তাগণ বিপুল পরিশ্রম ও নিরলস উৎসাহের সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে ব্যাপক প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। অর্থ-সামর্থ্য দিয়েই নয়, নিঃস্বার্থ দেশসেবার মহান দায়িত্ব এঁরা অযাচিতভাবে মাথায় নিয়েছিলেন। যার ফলে চৈত্র মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন বাংলা দেশের স্বদেশ-চেতনার এক নব বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল।

চৈত্র মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন বিভিন্ন দিক দিয়ে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অধিবেশনের নানান ভাগণের মধ্যে দিয়েই হিন্দুমেলার যুগান্তকারী বহুমুখী উদ্দেশ্যসমূহ ব্যক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় অধিবেশন আয়োজিত হয়েছিল আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার উদ্যানে (ডনকিন্ সাহেবের বাগান) চৈত্র-সংক্রান্তির দিন। এ বৎসরও সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহোদয়।

দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনে প্রচারিত কার্যবিবরণীতে সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক যুক্তভাবে প্রথম বর্ষের অনুষ্ঠানে গৃহীত জাতীয় মেলার কর্ম-প্রকল্প সম্পর্কে যে প্রতিবেদন উপস্থিত করেন তাতে বলা হয়েছিল, 'দেশীয় লোকমধ্যে সদ্ভবে সংস্থাপন এবং দেশীয়' লোকদ্বারা স্বদেশীয় সৎকার্যসাধন করাই ইহার (হিন্দুমেলার) প্রধান উদ্দেশ্য।'

—দ্রঃ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

অতঃপর 'স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণদ্বারা স্বদেশের উন্নতি সম্পাদন'-এর উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত কার্যসূচী প্রকাশ করা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগীয় কার্য সম্পাদনের জন্য তৎকালীন বঙ্গসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে পৃথক পৃথক পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়। উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী কার্যসূচীর ছয়টি বিভাগ এখানে অবিকল উদ্ধৃত হল।

যেরূপ কার্য নির্বাহ হইবে (মেলার), তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা হিন্দু-জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিয়োগকরত এই জাতীয় মেলার গৌরববৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দুসমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্ববিধারণ জন্য চৈত্র-সংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্ধন করা হইবে।

৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি মেলার স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্ধন করা যাইবে।

৬। যাঁহারা মিল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোকমধ্যে ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।—' (দ্রঃ পূর্ববৎ)

'যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উপরোক্ত কর্মসাধনের ভার গ্রহণ' করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ পাল, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, সালিকরাম, জয়গোপাল সেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল প্রমুখ সমাজের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। জাতীয় মেলার আয়ব্যয় পরীক্ষার ভার নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভবানীচরণ গুহ, নীলকমল মুখোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

উপরোক্ত কর্মসূচী আলোচনার অবকাশে চৈত্র মেলার বহুমুখী সমাজ-কল্যাণকর উদ্দেশ্যগুলির ব্যাপকতা অনুধাবন করে বিস্মিত হতে হয়। অবশ্য 'চৈত্র মেলা'র উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনাপ্রসঙ্গে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু প্রমুখ যে ভাষণগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের জনচিত্তে যে কালে 'ভারত'—শব্দটি পরিপূর্ণ শ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হত না; 'স্বাধীনতা'—শব্দটি যে কালে স্বপ্নমাত্র ছিল সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের ভাষণগুলি শুধু যে অভাবনীয় ছিল তাই নয়, জাতির জীবনে নবজাগরণের বৈপ্লবিক শিহরণ সঞ্চারিত করেছিল। হিন্দুমেলার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে ভাষণগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য' শীর্ষক লিখিত প্রস্তাবে বলেন:

'এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা,—আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম সাধন, অনেক উৎসাহবৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা 'হিন্দুমেলা' ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।

ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভরতা—

যাহাতে এই আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়---ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি, এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।' (দ্র: পূর্ববৎ)

এই বৎসরের অধিবেশনেই মনোমোহন বসু 'মেলার উদ্দেশে' যে 'বক্তৃতা' করেন, তাতে মেলার উদ্দেশ্যবর্ণনার সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক শোচনীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে মেলা-অনুষ্ঠানের উপযোগিতার কথাও আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে:

'স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধহয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্য নামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ-তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে, যে যখন জাতি গৌরব রূপ তাহার নবপত্রাবলীর মধ্যে অতিশুভ্র সৌভাগ্যপুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্তত 'স্বাবলম্বন'নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলত একতাই সেই মলিন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এইরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

'ইহাতে অধিক আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়া নাবধি এদেশে যতকিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্তক। কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইয়োরোপীয়দিগের নামগন্ধমাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত। স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।'

মনোমোহন বসুর ভাষণের মূল বক্তব্য---আপামর ভারতবাসীকে ঐক্যের জগতে, কর্মের জগতে আহ্বান। এই আহ্বানই চৈত্র মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য:

'---হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন আমাদের পরম হিতের জন্য, জননীজন্মভূমির জন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্যেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষার জন্য, শারীরিক বলাধান জন্য, মনের উৎকর্ষ জন্য, শিল্প-বিজ্ঞানের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে মিলিত হই। আজ ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে বলিয়া অনাদর করা নির্বুদ্ধির কর্ম, আপনাদিগের দ্বারা লালিত-পালিত হইলে ইহাই তখন মহামহীরুহ হইয়া উঠিবে। যখন দেখিবেক ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের, পূর্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্র মেলার রঙ্গভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে---যখন দেখিবেন তাঁহারা মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে---যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নব-রোপিত বৃক্ষের ফললাভ হইল। সেই শুভকাল আসা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক---ধৈর্যধারণপূর্বক সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক।---আপনারা স্বীয় কর্তব্যভার উপযুক্তরূপে বহন করিতে পারিলেই এই ক্ষুদ্র মেলা জগতের একটি মহামেলা নাম পাইতে পারে।' (দ্র: পূর্ববৎ)

মনোমোহন বসু ও গণেন্দ্রনাথের বিভিন্ন অভিভাষণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের সমর্থনে যে আহ্বান ছিল তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত জাতীয় গৌরবময় অতীতকে আদর্শ হিসাবে স্মরণ করা এবং সেই আদর্শে জাতিকে উদ্বোধিত করা, দ্বিতীয়ত গণতান্ত্রিক উপায়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা, তৃতীয়ত শিল্পে সাহিত্যে খাদ্যে বস্ত্রে সকল বিষয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করা এবং সবগুলি উপায়কে একটিমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রানুগ করা, তাহলো জাতির জীবনে স্বদেশচিন্তার সঞ্চার---যার বৃহত্তর ফল 'স্বাধীনতা' লাভ। যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তি সংক্রান্ত সুদূর ভাবনা নিয়ে ভাষণগুলিতে সুস্পষ্ট কোন আলোচনা হয় নি। হওয়া স্বাভাবিকও ছিল না।

হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত মনোমোহন বসুর অভিভাষণ একটি বিশেষ বিষয়ে সমধিক তাৎপর্যপূর্ণ। যে কোন জাতির জীবনে একটি বিশেষ সামাজিক বোধ বাঞ্ছনীয়। এই সামাজিক বোধ থেকেই 'জাতীয়তা বোধের' জন্ম হয়। ভাষণে তাই বলা হয়েছিল—'সে সামাজিকতার অভাবে স্বাতন্ত্র্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতন্ত্রতা, ইহারাই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্তে অর্পণ করিয়াছে।

অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম। সেই স্বজাতিধর্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার কারাগারে

পরবশ্যতাশৃংখল আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্ব প্রথমে বিধেয়।' কারণ, 'সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি জাতিপদবাচ্য হইতে পারে না।' অভিভাষণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই সামাজিক-বোধ লাভের উপায় হলো, 'স্বাবলম্বনরূপ অমূল্য নিধি।' অতএব জাতির জীবনে পরনির্ভরপ্রবণতা দূর করে সকল বিষয় আত্মনির্ভর হতে হবে।

মনোমোহন বসু হিন্দুমেলার প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে সুচিন্তিত সারগর্ভ ভাষণ দিতেন। তৎকালীন সমস্যাসঙ্কুল পরাশ্রয়-প্রবণ ভারতবাসীর সুপ্ত স্বাদেশিক ভাবের উদ্বোধনে ভাষণগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মনোমোহন বসু পারবশ্যের গ্লানিজর্জর ভারতবাসীর প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের অবহেলা এবং উপেক্ষাকে বারংবার ধিক্কার দিয়েছেন, সেইসঙ্গে হীনমন্য ভারতবাসীকে আত্মাধিকারে সচেতন করতে চেয়ে বারবার ইংরাজশাসনে শোষিত দেশের ও জাতির দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন—

'ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত-পা বাঁধা, সে-সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদের কোন কথাই চলে না।' এরই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে পরাধীন জাতির স্বাধিকার চেতনার অবক্ষয়ের সঙ্গে শিল্প ও অর্থনৈতিক বিষয়েও অসহায়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই মনোমোহন বসু আক্ষেপ করেছিলেন---

'শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদের নির্ভরতা দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আসিলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি, বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না।'

তৎকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার এ-হেন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সকল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। জাতীয় শিল্প, জাতীয় বিজ্ঞান, জাতীয় ভাষা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নাট্যানুষ্ঠান ও নাট্যালয় প্রভৃতি সমাজান্তর্গত সকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সুপরিকল্পিত কার্যসূচী প্রণয়ন করেছিলেন হিন্দুমেলার পরিচালকমণ্ডলী।

জাতীয় মেলার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'হিন্দুমেলা' নাম প্রসঙ্গের আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে চৈত্র মেলার বা (জাতীয় মেলার) চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সুস্পষ্টভাবে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হিন্দুমেলা'। প্রসঙ্গত তৎকালীন সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন:

'এক্ষণে 'হিন্দুমেলা' এই সুস্পষ্ট নামদ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ পাইতেছে।' গণেন্দ্রনাথের ভাষণেও 'হিন্দুমেলা' নামের উল্লেখ দেখা গেছে। তৃতীয়বর্ষে পুরস্কারের পদগুলিতে 'হিন্দুমেলা' নাম খোদাই ছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন বক্তার ভাষণে 'হিন্দুজাতি' 'বাংলা দেশ', 'বাঙ্গালী জাতি' ইত্যাদি দেশ ও জাতিবোধক শব্দগুলির বহুল প্রয়োগের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই কোন কোন ব্যক্তির মনে এই ধারণা এসেছিল যে হিন্দুমেলা সাম্প্রদায়িক / এবং প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট ছিল। কিন্তু এই ধারণা স্বাভাবিক হলেও তা যে নিতান্ত অমূলক ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 'হিন্দুমেলা'র 'হিন্দু' শব্দের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বা ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। মেলার উদ্যোক্তাগণ সকলেই ছিলেন বেদ-উপনিষদের উচ্চ আদর্শে লালিত। 'হিন্দুত্ব' তাঁদের কাছে একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত মহান আদর্শরূপে প্রতিভাসিত ছিল। 'হিন্দুবোধ'—সে সময় সঙ্কীর্ণ—জাতিবৈর মনোভাব দ্বারা ব্যাঘাত হয় নি। 'ভারত-বোধ' ও 'হিন্দুবোধ'—প্রায় সমার্থক ছিল। 'হিন্দু'—নামের মধ্যে এক সর্বভারতীয় ঐক্য সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন উদ্যোক্তাগণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সমকালীন কবি নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয়। এই কাব্য ত্রয়ের মধ্যে বিশেষ করে, 'রৈবতক'-এ অখণ্ড হিন্দু জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির সূত্র নির্দেশ করা হয়েছিল। অবশ্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তৎকালীন বাংলা দেশের জননেতাগণের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু বা হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ তখনও দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে হিন্দুজননেতাদের সঙ্গে সামিল হন নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে হিন্দুমেলার আদর্শ প্রচার এবং কর্মাবলীর মধ্যে দিয়ে বার বার নানাভাবে উদার জাতীয়তাবাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছিল, কোন সঙ্কীর্ণ জাতিচেতনা নয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মনোমোহন বসু চৈত্র মেলার উপযোগিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ দেশে এমন একটি মেলার প্রয়োজন '—যেখানে ধর্মসংক্রান্ত মতভেদ তিরোহিত হইয়া সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্য শৃংখলে আবদ্ধ হইবেন---যেখানে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৃদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই আপনাপন মেলা ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে উৎসবের সমভাগী হইতে পারেন---।'

পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত ন্যাশনাল পেপারের মাধ্যমে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল তাও প্রণিধানযোগ্য:

"We despise race distinctions. It should be our object to raise up a vast nationality in India composed of Christian, Hindoo, Parsee and Mahomedan governed by one interest and one faith viz, faith in the supremacy of human love and charity." (দ্রঃ The National Paper, 1st April, 1867).

মনোমোহন বসুর ভাষণ এবং ন্যাশনাল পেপারের বক্তব্য এই দুই প্রতিবেদন 'হিন্দুমেলার' বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ খণ্ডন করার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। উল্লেখ করেছি জাতীয়তার ক্ষেত্রে হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাগণ উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁরা হিন্দুমেলার জাতীয় আন্দোলনকে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে গড়ে তোলার বিষয়েও সচেষ্ট ছিলেন। ন্যাশনাল পেপারের আরও একটি প্রতিবেদন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

"The National gathering bids fair to be a great undertaking. Not to speak of the sympathy evinced in the cause by the Calcutta Citizens, the Bombay people, so far as we can gather from the 'Native opinion', wishes to have some thing under still there". (দ্রঃ The National Paper 1st May, 1867).

এই অনুক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অখিল ভারতীয় ভিত্তিতে 'ভারতবর্ষীয় সভা' প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দুমেলার আন্তঃপ্রাদেশিক নীতি নির্ধারণে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অনুমান করা যায়। [ক্রমশ।

* রচনাটির সঙ্গে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলির জন্য রবীন্দ্র সদনের সৌজন্য স্বীকার করি।

অম্ল-মধুর

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

বন্ধু তুমি কেমন আছ? কওনা খুলে লজ্জা কি?
চুলে ঢাকা যায় কত আর কাটা কানের বজ্জাতি?
অতি চালাক হইলেই পড়ে গলায় দড়ি শেষকালে,
যা হবার তা হয়ে গেছে
খুলবে না বাঁধ ফসকালে।
যাকগে তাতে ক্ষতি নেই—
একা কেবল তুমিই নহ সংসারেরই গতি এই।

মধুরো কি মধুর পরী কুঞ্জীর কী যে রূপখানি
আমরা নেহাৎ খুকি তো নই বার্তাটি সে খুব জানি।
পেট টা নাকি মৃদঙ্গ আর পিঠটা নাকি ময়ূরপঙ্খী তার:—
কোটর-চোখী ভোঁদর-মুখী ডাইনী বুড়ী রূপকথার'
এঘর থেকে ওঘর যেতে পিছন থেকে ঠেলতে হয়,
রান্না খেয়ে কান্না আসে দুই চোখে জল ফেলতে হয়;
ভাত রাঁধিতে জাউ রাঁধে সে কচুর শাকে ঝোল ঢালে,
অম্বলে দেয় ঘী সম্বরা উকুনে মাথার গোলমালে!
যাকগে—তাতে নেই ক্ষতি—
একা শুধু তোমার নহে সংসারেরই এই গতি!

আগুন জ্বালা রুচতো না,—অম্ল এখন যদি কুঞ্জী কয়,
পান্তাভাতে বেগুনপোড়া তাতেও নাকি রুচি হয়?
কান মলাটা, নাক মলাটা, প্রেম-রোগীদের পথ্যই,—
মাঝে মাঝে তাও খেয়ে যাও এসব কথা সত্য কী?
খাও—কি আছে দোষ তাতে?—
এই নিয়মের নিগড় কেউ পারে না ফসকাতে।

গোপাল ছিলে ভূপাল হলে কিন্তু তাতে ফয়দা কি?
এক শতবার ধুইয়ে দেখো কয়লা আছে ময়লা-ই।
চোর চিরকাল চোরই থাকে হয় না কভু ভদ্র সে,—
বাইরে যতই হোক সাধু তার ভিতর ভরা বদরসে।
পরের কেনা প্রাণ যে বিকায় নিজবলে কু-বুদ্ধিতে,
খবিন্দারের ক্ষতি তারে এমনিতে হয় শোধ দিতে।
তাই দিয়ে যাও,—লজ্জা কি?—
এ সংসারে কে না কহে কিল চুরির এই বজ্জাতি?

মহাকাব্যের ও মৌর্য্য-পূর্ব যুগের নগর বিন্যাস—

মহাকাব্যের যুগ

অনেকের মতে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক পর্যন্ত মহাকাব্যের যুগ ধরা যাইতে পারে। এই সময়ে স্থাপত্যবিদ্যা অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহাকাব্য দুইটি হইতে এই যুগের দুর্গ, প্রাসাদ ও সহরের বিবরণ পাওয়া যায়।

এই সকল দুর্গের বিবরণ হইতে পূর্ববর্তী যুগের দুর্গের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বহুতল-বিশিষ্ট সৌধকে বলা হইত 'প্রাসাদ'। ইহাদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এক সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদও এই সময়ে নির্মিত ছিল। 'সুবিভক্ত মহাপথে'র উল্লেখে জানা যায় যে, সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাটও এই সময়ে তৈয়ারী করা হইত। মনে হয় এই প্রকারের রাস্তা মধ্যস্থলে ঘাসের সবুজ অংশ দ্বারা বিভক্ত ছিল অথবা উহার পৃথক পৃথক অংশ বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন ও পথচারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

রামায়ণী যুগে নগর-বিন্যাস

অযোধ্যানগরী—নগরের আকার ছিল ধনুকের ন্যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে বার যোজন এবং প্রস্থে তিন যোজন বিস্তৃত ছিল। নগরের জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজা দশরথ সহরের বহুল সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন। নগরের চারিদিক ঘেরিয়া শালগাছের প্রশস্ত ভূখণ্ড বা 'শালমেখলা' ছিল। নগরটি প্রাচীরবেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। নগরের কয়েকটি খিলানযুক্ত সুউচ্চ ও মজবুত তোরণ ও প্রবেশদ্বার ছিল। নগরপ্রাচীরের উপর নগর রক্ষার জন্য 'শতঘ্নি', কামান ও অন্যান্য মারণাস্ত্র স্থাপিত ছিল। নগর প্রাকারের অনতিদূরে নগরকে বেষ্টন করিয়া গভীর জলপূর্ণ পরিখা থাকায় শত্রুর পক্ষে সহজে নগরে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য ছিল।

নগরে বহু সুদৃশ্য ও প্রশস্ত রাস্তা সুসমঞ্জসভাবে বিন্যস্ত ছিল। এমন কি অপ্রশস্ত রাস্তা ও সরু গলিগুলিও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ছিল। রাস্তাঘাটগুলিতে নিয়মিতভাবে জল দেওয়া হইত।

বহু সুউচ্চ প্রাসাদ, সপ্ততলবিশিষ্ট অট্টালিকা, উত্তম প্রস্তর বা মার্বলনির্মিত রাজপ্রাসাদ, অসংখ্য উদ্যান ও আম্র-কানন এই নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। বহু সুদক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পী এই নগরে বাস করিতেন। অসংখ্য অশ্ব, হস্তী, গরু, উট, গাধা প্রভৃতি প্রাণীও নগরে ছিল।

শ্রীঅবনীকুমার দে

গৃহগুলি রাস্তার দুই পার্শ্বে পাশাপাশি সন্নিবেশিত ছিল। সকল গৃহের সম্মুখভাগ পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া বিন্যস্ত থাকায় রাস্তার দুই ধারের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর বোধ হইত।

নগরের বিভিন্ন অংশে মহিলাদের জন্য বিশেষ নাট্যশালার বন্দোবস্ত ছিল; নগরে পৌর-সভাগৃহ, বহু চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ, মহিলাদের জন্য উদ্যান এবং আমোদ-প্রমোদ গৃহ ছিল।

কৈকেয়ীর পুত্র ভরত গান্ধার দেশের (পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব আফগানিস্থান) তক্ষশীলা ও পুস্কলে দুইটি নগর স্থাপনা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই দুইটি নগর সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বহু লোক এখানে বসবাস করিতেন। নগর দুইটির ভিত্তি প্রস্তুতি কার্যে পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। নগরের প্রধান রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে ও সুসমঞ্জসভাবে দোকানগুলি বিন্যস্ত ছিল। বিভিন্ন প্রকারের উদ্যান, দেবস্থানসমূহ এবং তাল, তমাল, বকুল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি নগর দুইটির শোভা নয়নমনোহর করিয়া রাখিয়াছিল।

নগরকে ঘিরিয়া পরিখা থাকিত। কোন কোন ক্ষেত্রে এ করও অধিক পরিখা থাকিত। মিথিলা নগরের চারিধারে তিনটি পরিখার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পরিখাগুলি যথাক্রমে জলপূর্ণ, কর্দমাক্ত ও শুষ্ক ছিল।

ভারতীয় আর্যেরা আয়তাকার ও বর্গাকার নগর পরিকল্পনা করাই বেশী পছন্দ করিতেন। কয়েকপ্রকার আকৃতির নগর শুভলক্ষণযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইত। অপরপক্ষে কয়েক প্রকার আকৃতি অশুভ চিহ্নসূচক ছিল। পাখার ন্যায় আকৃতির নগরকে শুভলক্ষণযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইত না। এইজন্য রাজা বালীর রাজধানী সৌনীতপুর সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার পাখার ন্যায় আকৃতির জন্য ভাগ্যলক্ষ্মী ইহার উপর সুপ্রসন্ন হন নাই। রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী লঙ্কার অপূর্ব শোভা ও ঐশ্বর্যের জন্য ইহাকে স্বর্ণলঙ্কা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও লঙ্কানগরীর আকার 'মৃদঙ্গাকৃতি' হওয়ার জন্য ইহা বিনষ্ট হইয়াছিল। কারণ এইরূপ ধারণা ছিল যে, নগরের আকার মৃদঙ্গাকৃতি হইলে উহার রাজা সবংশে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।

মহাভারতের যুগে নগর-বিন্যাস

রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি ছিল—

(১) পাঞ্চাল—এই রাজ্য গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বিস্তৃত ছিল। আগ্রার নিকটে মথুরা ও কান্যকুব্জ এই রাজ্যের দুইটি প্রধান সহর ছিল।

(২) কোশল—ফৈজাবাদের নিকট অযোধ্যা এই রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(৩) উত্তর বিহারে বিদেহ ও দক্ষিণ বিহারে মগধ (ইহার রাজধানী ছিল রাজগৃহ) দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্য ছিল।

(৪) কাশী—আধুনিক বারাণসী।

মহাভারতের যুগের নগর-বিন্যাস-রীতির সাধারণ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

বিপদের সময় বা শত্রুর হাত হইতে নগরকে রক্ষা করিবার জন্য নগরের চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করা হইত। প্রাচীরের বাহিরে থাকিত জলপূর্ণ গভীর পরিখা। জলচর প্রাণীতে উহা ভর্তি থাকিত। গুপ্ত দরজা দিয়া নদী হইতে জল আনিয়া উহা দ্বারা পরিখা পূর্ণ করা হইত। পরিখা খনন করিয়া যে মাটি পাওয়া যাইত সেই মাটি দিয়া পরিখার চারিদিকে 'বপ্র' নির্মাণ করা হইত। এই বপ্রের উপর তৈয়ার করা হইত সুদৃঢ় প্রাচীর। প্রাচীরের উপর স্থানে স্থানে থাকিত পর্যবেক্ষণ বুরুজ। যুদ্ধের সময় এই বুরুজগুলি হইতে সৌ কেরা লুক্কায়িত থাকিয়া অগ্রসর-বর্তী শত্রুর প্রতি অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিত। সহরের অন্তত চারিটি প্রধান প্রবেশদ্বার থাকিত। এই সুউচ্চ প্রবেশ-দ্বারগুলির উপর 'গোপুর' নির্মাণ করা হইত। কোনও কোনও সহরে সম-কেন্দ্রিক বৃত্তাকারে বিন্যস্ত ছয়টি পর্যন্ত সীমা-প্রাচীর থাকিত।

প্রাসাদ, তোরণদ্বার, যূপ, চৈত্য, উদ্যান প্রভৃতি সহরের শোভা বর্ধন করিত। বহুতলবিশিষ্ট 'প্লাস্টার'করা গৃহও সহরে ছিল। সাধারণ গৃহগুলির চাল খড়, পাতা ইত্যাদি দ্বারা ছাওয়া হইত।

পুর ও নগরাদি একই প্রথায় পরিকল্পনা করা হইত। নগরের রাস্তা-ঘাটগুলি সুবিন্যস্ত থাকিত। 'মহাপথ' ও 'রাজমার্গ' প্রধানত এই দুই শ্রেণীতে রাস্তাঘাটগুলিকে বিভক্ত করা হইত। মহাপথের দুই ধারে দোকান বাজার থাকিত। স্থানে স্থানে পানীয় জল-সত্র থাকিত।

গ্রামগুলি ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া নগর ও সহরে পরিণত হইয়াছিল। নগর ও সহরগুলি একই প্রথায় বিন্যাস করা হইত। রাজপ্রাসাদ ও দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন পল্লী ও গ্রামগুলি সুবিন্যস্ত থাকিত। রাজধানীগুলি ক্রমে ক্রমে শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল। সিন্ধু ও অন্যান্য প্রধান নদ-নদীগুলি এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই নদ-নদীগুলির তীরেই প্রথমে আর্যদের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। সৈন্যদের ব্যবহারের নিমিত্ত রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি করা সরকারের দায়িত্ব ছিল। ব্রাহ্মণেরা আর্য ঐতিহ্য ও কৃষ্টির রক্ষক ছিলেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণদের গ্রাম বা 'আশ্রম'-গুলি ক্রমে 'বিশ্ববিদ্যালয় নগর' রূপে পরিণত হইয়াছিল। এইখানে ব্রাহ্মণ যুবকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিতেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ

পাণ্ডবদের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ 'উদ্যান-নগর'রূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল। এক সময়ে ইহা দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইত।

মহাভারতের আদিপর্ব হইতে জানা যায় যে, এই সুরক্ষিত সহরের সমুদ্রের ন্যায় বিশাল পরিখা, গগনস্পর্শী প্রাচীর এবং সুবিশাল তোরণদ্বার ছিল।

সহরের প্রশস্ত রাস্তাঘাটগুলি সুবিন্যস্ত ছিল। দুর্গ, বুরুজ, সুদৃশ্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা, জাদুঘর, মনোরম অবসর যাপনের স্থান, কৃত্রিম পাহাড়, অসংখ্য সুনির্মল জলপূর্ণ পুষ্করিণী, পদ্মফুলে পূর্ণ সুদৃশ্য হ্রদ, বহুপ্রকার পাখীতে পূর্ণ উদ্যান এবং বহুমনোরম উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত পুষ্করিণী-সমূহ সহরের শোভাবর্ধন করিত।

দিল্লী

প্রাচীন দিল্লী সহরেরও চারি-দিকে সুরক্ষিত ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর ছিল। আজও পর্যন্ত এই প্রাচীন প্রাচী-রের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নদী হইতে আনীত জল দিয়া প্রাচীরের চারিদিকের পরিখা পরিপূর্ণ করা হইত। মহাভারতের শান্তিপর্বে লিখিত আছে যে, জলপূর্ণ পরিখাতে কুমীর, হাঙর প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী ছাড়িয়া দেওয়া হইত, যাহাতে শত্রুপক্ষ নিরাপদে এই পরিখা সন্তরণ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

'ব্রহ্মানন্দ পুরাণে' লিখিত আছে যে, মাটি খনন করিয়া নির্মিত পরিখার জল আনয়ন ও জল-নির্গমনের দ্বার-গুলির নদীর সহিত সংযোগ থাকিত। 'দেবী পুরাণ' মতে সহরের নর্দমাগুলির জল এই পরিখাতে নিষ্কাশিত হইত।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ।

স্বামীজীর জন্মভিটা

ধীরেন্দ্রনাথ বসু

হেথায় জনম যাঁর সুবিদিত নাম তাঁর
বিশ্বের বিবেক বীর তিনি
জনমিলা যেই ভিতে আঠারো তেষট্টি খৃঃ-তে
প্রাচ্যের গৌরব সেই মণি॥

শ্রদ্ধানত চিতে হেথা স্মর তাঁর কীর্তিকথা
মানব-মঙ্গল চির যিনি।
যুগবীর জন্মে যথা প্রণতি রাখিও তথা
হে পথিকবর গুণমণি॥

রূপপিয়াসী

মন্মথনাথ ঘোষ

সালোয়ার কামিজ পরে কাজল যেদিন ওই সরু গলিটার একটু ভেতর দিকে আকর পথে এসে দাঁড়াল, তখন ওকে দেখে যারা গা টেপাটেপি করে হেসে উঠেছিল, তারা ওরই স্বগোত্রীয়া সমব্যবসায়ী বয়স ও অভিজ্ঞতা, সব কিছুতেই তারা কেবল ওর অগ্রণী ছিল না, এ গলির ঘাঁৎ-ঘোঁৎ সব ছিল তাদের নখদর্পণে।

এ গলির সঙ্গে তাদের বহু দিনের সম্পর্ক। খে রং মেখে, চোখে কটাক্ষ হেনে, বিড়ি টানতে টানতে খুঁটি-খাটি তারা রূপের ফাঁদ পেতে বসে থাকে। রূপ তাদের নেই, তবু শিকার ধরায় ওরা ওস্তাদ। অব্যর্থ তাদের শরসন্ধান, কদাচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

এ পথের যারা পথিক, তাদের চেনে ওরা ভাল করে। ওরা জানে, তারা রূপসন্ধানী নয়, তারা এক শ্রেণীর মাংসাশী জানোয়ার। রক্ত-মাংসের তীব্র ক্ষুধা নিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মত তারা ঘুরে বেড়ায় আনাচে কানাচে।

কাজলের ওই সালোয়ার কামিজ দেখে তারা তাই হাসে। হাসে ওর পাঞ্জাবী তরুণী সাজার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে।

ছিপছিপে দেহ, বব করা চুল নিয়ে, সালোয়ার কামিজ পরে কলেজ গার্ল সাজলে কি হয়। আসলে সে তো বাঙালীর মেয়ে। পাঞ্জাবী তরুণীর যে অবধ্য উদ্ধত-যৌবন, যাকে বেঁধে বন্দী করে ওই সালোয়ার ও কামিজের কারাগারে বন্ধ করে রাখলেও পাষাণ কারার আবরণ ভেদ করে বেড়িয়ে আসার জন্য ছট্‌ফট্ করে সব সময়, তাতে পুরুষের লুব্ধদৃষ্টির ক্ষুধা আরো বাড়িয়ে দেয়।

বিদ্রূপের হাসি হাসে তাই সবাই ওর সখ দেখে। কাজলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কার গরজ পড়েছে, ওর ওই পোষাকের আড়ালে কোথায় কত কুসম্পদ আছে, খুঁজে দেখবার—তার আগে ওই গলির মোহাড়া আগলে দাঁড়িয়ে আছে যারা পসারিণীর মত পণ্য সাজিয়ে নিজের দেহের ডালায়, পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে তাদের এড়িয়ে যাওয়া কি সহজ কথা?

কিশোরী বতী, অতিক্রান্ত যৌবনার দল, বেহায়া নির্লজ্জের মত দেহের পশরা উন্মুক্ত করে রাখে। সব রকমের রুচির নারীদেহ কানা খরিদ্দার যেন মুখ ফিরিয়ে না চলে যেতে পারে।

মাছের বাজারে যেমন সবরকমের খরিদ্দার আসে। টাটকা মাছ, শুঁটকী মাছ, রং করা মাছ, পচা মাছ, বরফের ঘরে দীর্ঘ দিনের সংরক্ষিত মাছ কিছুই অবিক্রীত পড়ে থাকে না। এখানেও ঠিক তেমনি ব্যবসা চলে। শেষ মাছটাও যেমন সাবাড় হয়ে যায় তবে বিলম্বে—কাজ থেকে হয়ত দস্তুর গড়িয়ে যায়।

ঠিক তেমনি। এখানেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কোমর থেকে নীচের দিকটা হয়ত টন-টন করে ঘামের দাগে মুখের রং বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ঠোঁটের কোণে বিড়ির আগুন জলে জলে ছাই হয়ে যায়। তবু দাঁড়িয়ে থাকে তারা। অপেক্ষা করে, কার কখন সময় হবে, কেউ জানা নেই।

মাছের দালাল, ফল আমদানীকারী মুসলমান ফড়ে, হিন্দুস্থানী ট্যাক্সি ড্রাইভার কে কখন আসে, তাদের সময়ের স্থিরতা নেই। এ ছাড়া মুটে মজুর, ওভারটাইম খাটা কারখানার মিস্ত্রি আছে। আবার বাজারের মেছো, বারুইপুরের সবজিওলা, মসলার দোকানের কর্মচারী যারা টাকার বদলে মাল দিয়ে পুষিয়ে দেয়। তাতে উভয় পক্ষেরই গায়ে লাগে না। এদের সঙ্গে মাসকাবারী ব্যবস্থা। এরা ধারের খরিদ্দার। সারা মাস ধরে লেন দেন চলে।

মাছওলা, কেটে মাছ ওজন করে বিক্রি করতে গিয়ে, খরিদ্দারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মোটা বঁটিটার তলায় মাছের যে টুকরো সরিয়ে রাখে, তার কিছু নিজের ছেলেমেয়েদের খাবার জন্যে যেমন ঘর নিয়ে যায়, তেমনি কিছু এদের দিয়ে রাত্রির ঋণ শোধ করে। আনাজ তরকারি যারা বেচে, তারাও ওদের বাজারের ঝুড়িতে, কলাটা মূলোটা ফেলে দেয়।

মসলার দোকানের কর্মচারী, মনিবকে লুকিয়ে চুপি চুপি অন্য মসলার ভেতর সুপারি খয়ের, এলাচ, লবঙ্গ, এইসব পানের মশলা বেঁধে দিয়ে দেয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যে এদের দাদে বাঁধা বন্দোবস্ত করে রাখে তারা। শেষ খেয়া ছাড়বার আগে মাঝি যেমন এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষ যাত্রীটিকে তুলে নেয় ওরা তেমনি যতক্ষণ ওই হাজারীর পরটা ও মাংসের দোকানে আলো জলে, ততক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঝাঁপের পাশেই দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে, বেশী পাওয়া যায়। অনেকটা কেবল হাজারী খুলে ভেতরে নেয় যায়, ওরাও তখন যে যার ঘরে ফেরে। বঝতে পারে, আর কোন খরিদ্দারের আশা নেই।

হাজারীর দোকানে গিয়ে কেউ এক মটে চচ্চড়ি, কেউ বা সকালের রান্না কাঁকড়ার এক তরকারী, কেউ বা হ্যাণ্ডেল-ভাঙা কাপে করে দু'আনার মাংসের ঝোল নিতে গিয়ে বলে, ওই হাড়ের টুকরোটুকু দিয়ে দাও হাজারী। কাপটা তোমায় কাল সকালে দিয়ে যাবে

●

সুখের বিষয় কাজলকে এ সব কিছুই করতে হয় না। যারা সেদিন ওকে দেখে হেসেছিল। ওর ওই সালোয়ার কামিজের ভবিষ্যৎ ভেবে মনে মনে উল্লসিত হয়েছিল তারা অল্প দিনের মধ্যেই ঈর্ষিত হয়ে ওঠে কাজলের প্রতি। ও কি, ম্যাজিক জানে। ওর ওই পোসাকের মধ্যে কি আছে, ভেবে পায় না

চোঙা প্যাণ্টপরা কলেজের ছোকরারা ওদের দিকে না তাকিয়ে সোজা ভেতরে চলে যায়—কাজলের কাছে।

তবে কি কাজল লেখাপড়া জানা কোন ভদ্রঘরের মেয়ে। বিপাকে পড়ে এপথে আসতে বাধ্য হয়েছে। জল্পনা কল্পনার অন্ত থাকে না।

বাড়ীউলী মাসীর কাছে গোপনে লোক পাঠায়। হ্যাঁগা মাসী, এ মেয়েটি কে, কোথায় একে জোগাড় করলে।

বাড়ীউলী বলে, রামবাগান ওর নানী থাকে। সেই ওকে এখানে রেখে গেছে।

তাহলে, ভদ্দরঘরের মেয়ে নয়। কি বলো?

না-না। তাহলে কি কেউ এইভাবে পথে এসে দাঁড়াতে পারে? বলে গলায় স্বর টেনে বাড়ীউলী মাসী বলে, তবে মেয়েটার ঢং-ঢাংগুলো ভদ্দরলোকের মেয়ের মত। মুখে রং মাখে না। বিড়ি সিগ্রেট খায় না। ত ছাড়া ঠিক আটটা বাজবে ঘড়িতে আর অমনি ঘরে চলে আসবে।

তাই নাকি?

হাঁগো আমি বলি, হাঁগো মেয়ে এই তো বেশী রোজগারের সময়, তা তুমি চলে আসো কেন?

সে বলে, বেশী রোজগারে আমার দরকার নেই মাসী। শরীরটা আগে, দেহটাকে টাকাতে পারলে রোজগার আমার ঢের হবে। তা ছাড়া আরো কি জানো যত সব মেদো-মাতালে চরিত্রহীনগুলো রাত্রে শিকার করতে বেরোয়।

মাসী একটু থেমে জবাব দেয়। তবে কি জানো, নামতে নেমে যেমটা দেওয়া কি ভালো, যে পথে নেমেছো এটা তো মেদো মাতাল, লম্পট, বদমাইস, চরিত্রহীনদের জন্যেই—ভালো মানুষ যারা শিক্ষিত, সৎ, তারা তো এ পথকে ঘেন্না করে, তা কি জানো না?

জানি। সেইজন্যেই ত তাদের চাই না মাসী।

তুমি না চাইলে তারা ত চাইবে।

●

সত্যি মাসীর কথা তারপরের দিনই হাতে হাতে ফললো। বেলা তখন সবে শেষ হয়েছে। গলিতে দু-একটি বাড়ীতে আলো জ্বলেছে। এমন সময় এক লরীড্রাইভার এসে বললে, কেত্না লেগা?

ঘৃণায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কাজল বলে, যাও ভাগো। তুমকো হাম নেহি বৈঠায়েগা

কেয়া! অপমানে তার মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। তোমার যা রেট আমি দিতে প্রস্তুত। তার সঙ্গে আরো বকশিশ দেবো।

ফিন্ কৈ বাত বোলে গা, ত হাম পুলিশ বোলায়েগা।

যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হলো। কেয়া, রেণ্ডিবাজী করনে আয়া, ফিন্ পুলিশ দেখলাতা হায়।

আরে যাও, তোমার মাফিক বাবুর মুখে আমি লাথি মারি। বলে ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় কাজল।

ব্যর্থ আক্রোশ ও অপমানে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে যায় তখন সেই ড্রাইভারটা।

বেশ্যাবৃত্তি নিরোধ আইন সরকার থেকে পাশ হয়ে গেছে, নইলে দেখিয়ে দিতে মজা। সত্যি যে রকম ভদ্রবেশ পরে থাকে কাজল, তাতে পুলিশ ওকে সন্দেহ না করে লোকটাকেই হয়ত থানায় নিয়ে যাবে।

●

কেবল বেশভূষায় কলেজী মেয়ের অনুকরণ করেনি কাজল। ঘরের ভেতরটাও তেমনি রুচিসম্মতভাবে সাজিয়েছে। শিক্ষিত কোন লোকের ড্রয়িংরুম যেন কাজলের নিজের রুচিটাই খুব উন্নত। তাই এদের ভেতরে বাস করলেও নিজের স্বতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারছে।

বাস্তবিক তার চোখে মুখে কোথাও কোন উগ্রতা নেই। রাত্রি জাগরণের দরুণ অন্য মেয়েদের মত তার কণ্ঠস্বর তেমন মোটা, ধরা নয়, তেমনি লাম্পট্যের কোন চিহ্ন তার মুখের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঠিক পাঁচটার সময় কাজল গলির পথে এসে দাঁড়ায়, আবার ঠিক আটটার ঘরে চলে যায়। এরি মধ্যে যেটুক তার উপার্জন। তাও অবারিত দ্বার নয়। নিজের রুচিমত, পছন্দমত মানুষ পেলে, তবে ঘরে বসায়। নইলে মুখ ফিরিয়ে বলে, হবে না।

অনেক যুবক গালাগাল দিতে দিতে যেমন ফিরে যায়। তেমনি অনেক কেরানী, অফিসের ছুটির পর যারা এই গলির পথে সর্টকার্ট করে শিয়ালদহ স্টেশনে যেতে যেতে কাজলের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে তার কানের কাছে গিয়ে বলে, কিগো কত নেবে? হবে নাকি?

না হবে না।

কেন?

আমার খুশি। বলে মুখটা কঠিন করে, তার দিকে চাইতেই লজ্জায় ফিরে যায় লোকটা।

আবার কোন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে আড়চোখে বার বার তাকাতে দেখে

কাজল হয়ত নিজেই তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, বসবেন আমার ঘরে, চলুন।

তার লজ্জা নিজে যেচে ভাঙিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

●

তেমনি আবার একদিন এক প্রৌঢ়কে ওর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কাজল ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে, এদিকে নয়, নিমতলাটা ওই দিকে। বলে গলির উল্টো দিকটায় আঙুল দেখিয়ে বলে ছিঃ লজ্জা করছে না আপনার? এখনো দাঁড়িয়ে আছেন?

ভদ্রলোক এবার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, লজ্জা যে জন্যে পাওয়া উচিত আমি তোমার কাছে সে জন্যে আসিনি। আমার শরীরটা ভাল নয়। একগ্লাস জল এখুনি খাওয়াতে পারবে? তাই ভাবছি তোমার কাছে চাইবো কি না?

কেন চাইবেন না। আসুন। বলে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে সোফায় বসিয়ে কাজল কাঁচের গ্লাসে করে জল নিয়ে এলো।

ভদ্রলোকটি পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বার করে বললেন, এটা খুলে একটা বড়ি তাড়াতাড়ি বার করে দাও ত?

কাজল সঙ্গে সঙ্গে শিশির প্যাঁচটা ঘুরিয়ে একটা বড়ি বার করে তাঁর হাতে দিতেই এক ঢোক জলের সঙ্গে তিনি সেটা তখনি গিলে ফেললেন। তারপর বাকী জলটা সব খেয়ে বললেন, আঃ বাঁচালে তুমি আমাকে। লো প্রেসারটা ক'দিন থেকে বেড়েছে। ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই কিনতে বেরিয়েছিলুম।

কেন, আপনার বাড়ীতে কোন লোকজন নেই?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, আছে সব, ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনী সব। কিন্তু সবাই নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত। আমার দিকে তাকাবার কারো সময় নেই।

আপনার স্ত্রীও কি দেখেন না?

আমার স্ত্রী বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই দেখতেন। তিনি গত হয়েছেন, তাই আমার আজ এ দুর্দশা। থাক। সে সব দুঃখের পাঁচালী। সব থেকেও কেউ নেই আমার। বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার অনেকটা সময়ের ক্ষতি করলুম।

না—না, সে কিছু নয়। আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না। ভাল করে সুস্থ হলে বাড়ী যাবেন। আর একটু বিশ্রাম করুন। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এখনো আরো বিশ্রাম দরকার।

এই দেখো, তুমি আমার কেউ নও পর কিন্তু আমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছো যে বিশ্রাম দরকার। অথচ আমার নিজের ছেলে-বৌ, নাতি নাতনী একঘর থাকতেও কেউ একবার ভুলেও মুখের দিকে তাকায় না। বরং তারা চায় যত তাড়াতাড়ি আপদ বিদেয় হয়। তত ভাল। বাড়ী বিষয় সম্পত্তি সব কিছুর মালিক হয়ে বসবে।

কাজল বলে, যাক ওসব এখন চিন্তা করবেন না। তাহলে শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়বে।

ভদ্রলোক বলেন—ঠিক বলেছো। সে-ও, এইকথা আমায় সব সময় বলতো। আচ্ছা, এক কাপ চা দিতে পারো?

হাঁ - হাঁ কেন পারবো না। বলেই ভেতর থেকে সুদৃশ্য কাপে করে চা এনে দিলে কাজল।

ভদ্রলোক বলেন —না, না—তা হবে না। আমি একা খাবো না। তোমার চা কৈ? তুমিও নিয়ে এসো। আমার সামনে বসে খাও।

অগত্যা কাজল আবার নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরী করে নিয়ে আসে। কিন্তু চায়ের কাপে চুমুক দেবার আগে ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা সন্দেশের কৌটা বার করে তার হাতে দিয়ে বলেন। একটা আমায় দাও আর একটা তমি নিয়ে আমার সামনে বসে খাও।

না-না, সেকি! আপনি অসুস্থ মানুষ, আপনি খান। আমি সন্দেশ খাই না।

এ ভালো সন্দেশ। ভীম নাগ থেকে কিনে আনছি। আমার অনুরোধ তুমি একটা খাও।

বেশ, আপনি যখন বলছেন, খাচ্ছি। বলে কাজল তাঁর সামনে চা ও সন্দেশ খেতে ভদ্রলোক একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, তিনি বেঁচে থাকতে, ঠিক এমনি করে দু'জনে এক সঙ্গে বসে চা সন্দেশ খেতুম। কত দিন হয়ে গেল। যতক্ষণ না আমি অপিস থেকে ফিরতুম, নিজে চা না খেয়ে বসে থাকতো। এক সঙ্গে খাবে বলে।

আপনি, আবার কেন চিন্তা করছেন? এবার আস্তে আস্তে বাড়ী যান। আমার ঝিকে বলবো। বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে?

না, আমি নিজেই যেতে পারবো, এটুকু পথ। এই ত মীর্জাপুর স্ট্রীট। বলেই তিনি জামার পকেট হাত ঢুকিয়ে একখানা দশ টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিতে গেলেন

না না। ছিঃ। এ সব দিচ্ছেন কেন? না ফিরিয়ে নিন। নইলে আমি অপমানিত বোধ করবো। পয়সার জন্যে এ পথে নেমেছি বলে মনুষ্যত্বও কি বিসর্জন দিতে বলেন?

না। তবে তোমার এতটা সময় নষ্ট করলুম। তার ত একটা দাম আছে। বলতে বলতে চলে গেলেন।

•

পরের দিন ঠিক ওই সময় একটা ঝাঁকা মুটে ছোট একটা গঙ্গার ইলিশ, ও একটিন শ্রী ঘি, কিছু ময়দা ও তার সঙ্গে এক হাঁড়ি রাজভোগ এনে হাজির হলো। তার হাতে ছোট্ট একটা কাগজে বাড়ীর ঠিকানা ও কাজলের নাম লেখা।

কে পাঠালে? কাজল প্রশ্ন করতে মুটেটা বললে, একঠো বাবু।

আরে বাবু ত বুঝলুম। কিন্তু বাবু সে কোথায়?

নেহি জানতা। উনো চলা গিয়া। হামকো বোলা ওয়ে বাসামে দে দেনা।

কাজল বুঝতে পারলো কে

উঠিয়েছে। তখনই ফেরত দেবার ইচ্ছা থাকলেও পারলে না। বাজারের ঝাঁকামুটে। বাবুকে চেনে না। কার কাছে নিয়ে যাবে ?

এর দশ বারোদিন পরে হঠাৎ তিনি এসে হাজির হলেন।

কাজল আগ্রহে তাঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে তিরস্কার করলে, কেন আপনি এতটাকা মিছিমিছি খরচ করলেন? এ আপনার ভারী অন্যায়। আমি আপনার ঘি ময়দা সব রেখে দিয়েছি। আজকে আপনার সঙ্গে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। আর একটা ইলিশমাছও ঝিকে কিনে দিতে বলবো। ছি: ছি: কি অন্যায় বলুন ত।

ভদ্রলোক কাজলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন। ও থামলে, তিনি বললেন, গঙ্গার টাটকা ইলিশ খেতে বড় ভালবাসতেন তিনি। হঠাৎ একটা ভাল মাছ পেয়ে গেলাম—

ওই বিজয়ের ছেলেমেয়েদের জন্যে বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে আমার মত একটা বেশ্যাকে পাঠালেন। চমৎকার যুক্তি আপনার ?

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বলেন, একটা কথা যদি তোমায় বলি রাগ করবে না ত?

যদি তেমন কথা বলেন, নিশ্চয়ই রাগ করবো।

তবে থাক।

আচ্ছা, বলুন। রাগ করবো না।

ভদ্রলোক বলেন, ঠিক তার মত তোমার কথাবলার ভঙ্গী, আর এই যে তিরস্কার করছ, তাও বললে বিশ্বাস করবে না। ঠিক তার মত। তোমার কণ্ঠস্বরটা একেবারে হুবহু তারমত। আর এই ঠোঁট থেকে নীচের দিকটা। তাই তোমার মুখের দিকে তাকালেই তার কথাটা মনে পড়ে।

কাজল ঝপ্ করে কথাটাকে চেপে দেবার জন্যে বলে, আজ এখুনে আমি আপনাকে ওই ঘি ময়দা দিয়ে লুচি করে দেবো, খেয়ে তবে বাড়ী যাবেন। তা ছাড়া গঙ্গার ইলিশ আর রাজভোগ আনতে এখনি আমি বৌবাজারে ঝিকে পাঠাচ্ছি।

না—না, ও সবের দরকার করবে না। তুমি লুচি করে দিলেই খাবো, তবে তোমাকেও খেতে হবে আমার সঙ্গে সামনে বসে।

বেশ, তাই হবে। তবে সেদিন আমার যা যা খাইয়েছেন, আজও আমি আপনাকে তা খাওয়াবো—না বলতে পারবেন না।

●

শাড়ী পরে দুখানা থালায় লুচি রেকাবী সাজিয়ে নিয়ে যখন ঘরে এসে ঢুকলো কাজল, তখন আর একবার তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে নীরবে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

টেবিলের ওপর থালা রেখে, কাজল বললে, নিন সুরু করে দিন। রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনাকে বাড়ী ফিরতে হবে।

তুমিও বসো।

এই ত বসেছি। বলে যেই একখানা লুচি গালে তুলেছেন ভদ্রলোক অমনি বাড়ীওলা ছুটতে ছুটতে ঘরের ভেতরে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে। পুলিশ এসেছে। তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে।

সেকি! বলে ভদ্রলোক তার মুখের দিকে তাকাতেই কাজল খপ্ করে উঠে দাঁড়াল।

বাড়ীওলী মাসী বললে, তোর ওপর হিংসে সকলের। তারা গোপনে পুলিসে খবর দিয়েছে তোকে তাড়াবার জন্যে।

বলতে বলতেই সাদা পোষাক পরিহিত একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দু' তিনজন কনসটেবল এসে দাঁড়ালো ঘরের সামনে।

ইনসপেক্টর সাহেব একখানা ছাপা কাগজ বার করে কাজলের হাতে দিয়ে বললে, 'ইল্লিগ্যাল ট্রাফিকে'র অপরাধে আপনাকে এবং আপনার ঘরের ওই ভদ্রলোককে আমরা এরেস্ট করতে এসেছি, এখনি থানায় চলুন।

ভদ্রলোক এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কি বললেন, 'ইল্লিগ্যাল ট্রাফিক' কে বলেছে? জানেন ও আমার কে হয়। ও আমার মেয়ে।

আপনার মেয়ে। বলে ভ্রূকুঞ্চিত করে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক দু'তিন বার দেখে তিনি বললেন, বেশ চলুন তাহলে থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে আসবেন?

চলুন। বলে তখনি তারা থানায় চলে গেল।

'আনারস' রাষ্ট্র হাওয়াই দ্বীপ

আমেরিকার পঞ্চাশতম খণ্ডরাজ্য হাওয়াই দ্বীপ—নারিকেল বৃক্ষ, 'হুলা' বালিকা—সর্বোপরি আনারসের দেশ। বর্তমান সভ্যতার গতিবেগে ক্লান্ত লোকেরা সেখানে যায় নাচ-গান-আনন্দে ভরা জীবনরসের সন্ধানে, কিন্তু দ্বীপবাসীরা জানে যে তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে বছরে প্রায় ৭,৮০,০০০ টন আনারস রপ্তানির উপর অনেকখানি।

অবশ্য টুরিস্টদের কাছ থেকেও এরা কম আদায় করে না। গল্পে, উপন্যাসে যেমনটি বর্ণনা আছে, ঠিক তেমনটি করেই এরা দ্বীপকে সাজিয়েছে—টুরিস্ট পৌঁছলেই তার গলায় 'লেই' নামক ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেয়, দাম নেয় প্রতি মালা পিছু অন্তত ২৫।২৬ টাকা। ফিল্মী সাজে সজ্জিত 'হুলা' মেয়েরাও অর্থের বিনিময়ে হুলা নাচে, টুরিস্টদের সঙ্গদানে তৃপ্ত করে।

কিন্তু আনারস-এর ব্যাপারটা অন্য—রীতিমত ব্যবসায়। পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বেশী আনারস উৎপাদক ও রপ্তানীকারক এরা। বিশালাকার যন্ত্রদানবের সাহায্যে টুকরো করে, টিনে ভরে চালান দেয় নানা দেশে। যে সব অংশ বাকি থাকে, তা' থেকে তৈরী হয় সুপেয় এবং সুমধুর রস—যা 'পাইন এ্যাপল্ জুস' রূপে সুদৃশ্য আধারে ইউরো-আমেরিকার ভোজনবিলাসীদের রসনা পরিতৃপ্ত করে।

গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

আর না; অনেকক্ষণ লেখা-লেখা খেলা হয়েছে। এখন সাঙ্গ করতে হবে খেলার পালা, তাই লেখার টেবিলের মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেওয়াই ভাল; উঠে পড়লেন বেইলে—এই ঘরের চারিদিকে একবার তাকালেন, বাইরে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, ঘন হয়ে নামছে রাত্রি। সেই দুপুর থেকে লেখার টেবিলে বন্দী হয়ে আছেন আঁরি বেইলে—রু রিশ্‌নুর এই কুঠুরিতে। 'যথেষ্ট হয়েছে'—মনে মনে বললেন বেইলে, মুখে একটু অধৈর্যের রেখা ফুটে উঠেছে, টেবিলের ওপর বেশ সজোরেই কলমটা রেখে দিলেন। এখন চাই গান, গন্ধ, সুখ—নারী। বাইরে তাকালেন আঁরি বেইলে। পারীর আকাশ ঝলমল করছে। এখন চাই মুক্তি। লেখার টেবিল থেকে-মুক্তি। জীবনের থেকে সরে এসেছিলেন শিল্পের কারায়—উপন্যাসচর্চায়। স্রষ্টার বন্ধন তার টেবিলের সঙ্গে, তার আসনের সঙ্গে, তার প্রেরণার সঙ্গে। এখন নামতে হবে পথে। জীবনের রঙ্গোজ্জ্বল পথে। পারীর পথঘাট তাঁকে ডাকছে। চা করে বেরিয়ে পড়তে হবে। আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে কেমন যেন থমকে যান বেইলে। খুড়ো গাগানোনের কথা মনে পড়ে: Tu es laid mais- - -tu as de la physiag-nomie.

—'তুই কুৎসিত, কিন্তু—তোর শরীরের বাঁধন আছে।' বড় বড় চোখ, ভোঁতা নাক, গোল মুখ—কিন্তু সমস্ত শরীর তার টগবগ করছে অথৈ প্রাণে। একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে পড়লেন আঁরি বেইলে।

সারা পারী নাচছে। যৌবন জল-তরঙ্গে নাচছে। রাতের পারী—মোহিনী মায়া।—'সে নে পোঁ, ক্য সে না'—মনে মনে বললেন বেইলে। পারীর হাওয়ায় মদ, 'বুর্গাণ্ডি', 'ফুর্তি', নেশা, বিলাস উচ্ছ্বাস। পারী জ্বলছে—হাজার-বাতির প্রদীপ হাতে নিয়ে নাচছে। মোহিনী নারীর মত উতলা করছে সকলকে। দোকান-পাট, গাড়ী, রাস্তা, কাফে।

পারীর রজনী হল উতলা। পথে পথে কত মাদ্‌মোয়াজেল, মাদাম-দ্য-রেমাল্‌, ম্যাটিল্‌ডা; পথে পথে কত সুন্দর মেয়ে—রঙীন মাছের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। ভিক্টোরিন কেব্‌লির মত অভিমেত্রী পারীর পথের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন বেইলে। জীবনের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে সাঁতরে যাচ্ছেন তিনি। চেখে চেখে দেখছেন চারপাশ, একটু থেমে, দাঁড়িয়ে, হঠাৎ চকিত হয়ে উঠছেন হাসির দোলায়, একজোড়া প্রেমিকের হাসির ঢেউ কানে আসছে, জোড়া-জোড়া হাতে-হাত রেখে হেঁটে চলেছে সব। নিজের দিকে তাকিয়ে একটু বেমানান লাগছে যেন। সবুজ কোটটা কেমন যেন খেচপ—কেমন একটা মফস্বল-মফস্বল ভাব এসেছে, পারীর ঝকমকে বিলাসের পাশে কেমন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে নিজেকে। তাঁর পেটের কাছে একটু চর্বি জমেছে, শরীরটা একটু পৃথুল, তুলনায় পা দুটো ছোট। কিন্তু বেইলের গায়ের চামড়া বেশ তেলতেলে—ভেতরের প্রাণ তাতে ঝিলিক দিচ্ছে। বাইরের প্রচ্ছদপটের অন্তরে যে মানুষটা আছে, সেটা ঠিক এর উল্টো—সঙ্গ-আসঙ্গের তৃষ্ণার এক সরোবর। সেই সরোবরে ঢেউ উঠেছে। প্রাণের ঢেউ, আসঙ্গের ঢেউ, আশ্লেষের ঢেউ। সে যেন অনুভূতির এক দৈত্য। এত যার অনুভূতি, এত যার সংবেদন, তার বাইরেটা কেন এই প্রকৃতির অভিশাপ। প্রেরণা চাই? জীবনকে পুরোপুরি চাই। দু-হাত ভরে। চোখে কামনার সংকেত, তৃষ্ণার দাহ। 'যদি গাহন করিতে চাহ, এসো ওগো, এসো মোর হৃদয়-নীরে।' একটা কাফে-খানায় ঢুকে পড়লেন আঁরি বেইলে। জীবনকে ভালবাসলেন। আর ডায়েরীতে লিখলেন; তলায় নাম লিখলেন তাঁদাল; ১৮১০, পারী:

'জীবন আরো বেশী উপভোগের। —সত্যি, জীবন এক অপূর্ব ব্যাপার। যখন বুড়ো বয়স নেমে আসবে, তখন পুরনো দিনের কথা ভেবে বই লেখা যাবে, কিন্তু সে-সব এখন কেন। জীবন অনেক বেশী সমৃদ্ধ, পরিপূর্ণ, আর এত বেশী সুন্দর যে লেখার টেবিলে একরত্তি সময়ও নষ্ট করা চলে না।'

ভালবাসা চান তাঁদাল। নারী-হৃদয়ের মায়াময় স্পর্শ। সমস্ত দেহমন আর্ত। চাপাস্বরে বলেন:—'ইউন্‌ বেল আমি, ইউন আমি এনও', 'একটা সুন্দর মেয়ে, ভালবাসার এক মেয়ে'। দুরীয় প্রেরণা কোথায়? জীবন ত' সৃষ্টির চেয়েও সুন্দর। জীবনের রঙ এত অফুরন্ত—যে একফোঁটা রঙও যেন নষ্ট না হয়। তাঁর রূপ নেই। আছে দীপ্তি। তাঁর রমণীমোহন দৃষ্টি নেই, আছে প্রবল দর্প, বীরোচিত। নারী ত' প্রতিভাশুল্কা। তাঁর মুখে ঝকমকে কথা, প্রতিভার বিদ্যুৎ—তবু কি 'সহস্র বর্ষের সাধনার ধন'কে পাওয়া যাবে না। 'Les talent penvent consoler d' l' ab-sence de la beauti'.

সৌন্দর্যের অভাবের সান্ত্বনা ত' প্রতিভা। আর প্রতিভা যার আছে, এ জগতে কি চাই তার। মাথার টুপিটা ঠিক করে, হাতে দস্তানা পরে

ঝরিয়ে পড়লেন স্তাঁধাল। প্রতিভা আর প্রতিজ্ঞা দুই চোখে। সঙ্গীত শুনতে যাবেন তিনি, আর চিত্তজয় করবেন। তিনি হবেন চারুমুখ-চিত্তহরা।

১৮০১, ৩১শে মে ভিয়েনা :

আঁরি দ্য বেইলে, অদ্বিতীয় দ্য লা গ্রন্ আমি, ব্যক্তিগত সুযোগে আজ ভিয়েনা এসেছেন, ইচ্ছেটা মোজার্টের 'Requiem শুনে' যাই। মোজার্ট আমার প্রিয় দেবতা—সুরের গুরু। ভিয়েনা সুন্দরী—অনুপম এর মানুষ আর সঙ্গীত। সবার চেয়ে বড়, এখানে আছেন মাদাম দারু (মাদাম রেনাল), একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়া যাবে, আর্ট গ্যালারী দেখা যাবে, খাওয়া যাবে লা থিয়েৎ' Karntnertor-এ। সেখানে সন্ধ্যা ঝরে পড়বে—রমণীয় সন্ধ্যা ফুলের পাপড়ির মত ঝরে পড়বে। মিস্টার পিয়ের দারু? তিনি হয়ত ততক্ষণ কাজ-কাজ আর কাজের স্তূপে হারিয়ে যাবেন—জীবনের ধারা বইবে বেইলে ঘিরে।'

সঙ্গীত আর নারী, সুর আর প্রেম, আনন্দ ও কল্পনা—এই ত' স্তাঁধালের জীবন আর ভুবন। এই জীবনকে বড় ভাল লাগে স্তঁধালের—তাই ভোগের অধিকারকে বাড়িয়ে যেতে চান। জীবন-সম্ভোগের এই মাহাত্ম্যকথাই ত' রেনেসাঁসের সার কথা। যে য়ুরোপে স্তাঁধাল চোখ মেলেছেন, সে ইউরোপে তখন রেনেসাঁসের রৌশনী বইছে। জীবনকে ভোগ করতে পেলে শিল্পী হতে হবে। স্তাঁধালের কাছে এইটেই ত' বড় প্রশ্ন—জীবনের কাছে তিনি বিজয়ী বীর না পরাজিত সৈনিক।—'ন এ্যাতিতুড্ জেনারেল্ এতে সেলা দ্য'উন্ এ্যামঁ স্যালোর'—'এক্ষেত্রে আমার সাধারণ ধারণা এই যে সখ্যে আমার একান্ত দুর্ভাগ্য'। এই ব্যর্থতার যাতনা তাঁর জার্নালের পাতায় পাতায়।

১৮০১ মিলান :

'এক কোণে বসে আছি। 'এঞ্জেলা ত' সকলের নয়নমণি, সকলের কাছেই সে উঠছে, বসছে, হাসছে। কিন্তু 'এঞ্জেলা কি জানে যে শুধু তারই, তারই জন্য আমার মন মানে না দিনরজনী। অফিসারদের সঙ্গে 'ফারো' খেলেন, অথচ যার জন্য এত কাঁদন কাঁদলেন, সে ত' কখনও ফিরেও তাকায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এগিয়ে যান তার দিকে, হাতটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকেন, অথবা কানে কানে বলেন 'মি পিয়াস', কিন্তু নেপোলিয়ানের সৈন্য-দলের একজন হয়েও বেইলে লজ্জার পাথর ঠেলে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। অসি কোষবদ্ধ থাকে, বাণী থাকে গুহায়িত—'কিছু বলব বলে এসেছিলুম, রইনু চেয়ে'। ইটালীতে এসে বেইলে চরিতার্থ—ইটালী—সুন্দর মুখের ছড়াছড়ি। কিন্তু বুকের ব্যথা ত' বেড়েই চলে?

স্তাঁধালের কাছে সুষ্টির চেয়েও জীবন বড়। জীবন আগে, লেখা পরে। জীবন মানে প্রেম, স্বাধীনতা, নির্জনতা। নিজের কাছে নিজের মত থাকা। এই জন্যই ত' মিস্টার পিয়ের দারুকে ভাল লাগে না স্তাঁধালের। পিয়ের দারু বড় বেশী বাইরে ছড়িয়ে পড়েন—বড় বেশি উন্নতি আর উন্নতি করে হাঁপিয়ে উঠেন। ক্লান্ত, ক্লান্ত বোধ করেন বেইলে। জীবনের পথে-প্রান্তে কত উদ্দীপনা, নিত্য নব আবিষ্কার। লেখা তখনই সত্য, যখন তা জীবনের এই গোটা চেহারাটা তুলে ধরে। 'আমার জগৎ আমি হারিয়ে যেতে দেব না,'—শুধু এইজন্যই লেখা। আগে 'সুন্দর করে বাঁচো, তার পর লেখা।' বাঁচার চেয়ে বড় শিল্প আর নেই। আনন্দের চেয়ে বড় পাওনা আর নেই। সমালোচক, প্রকাশক যাই বলুন না কেন, তবু তিনি লিখে যাবেন। 'ভোতর লিভর এ সেক্রে, ক্যা পাসোগ্রে নি তুসে'—'তোমার বই পবিত্র, কোন লোক ছোঁয় না'—প্রকাশকের এই কথা তাঁকে দমিয়ে দেয় না, কারণ সাফল্য ত' তাঁর লক্ষ্য নয়, দিনে মাত্র পাঁচ ফ্রাঁ উপায় হলেই চলবে। তবু নিজের কাছে নিজের কৈফিয়ৎ আছে তাঁর। 'কেন আমি লিখব, কী জন্য লিখব,'—এই চিরকালের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন স্তাঁধাল। তিনি জীবনকে শিল্পের মূল্যে দেখেছেন।

দুঃখী কৃষক

কুমারী সুস্মিতা বসু

ভেবেছিলুম এবার ঘরে তুলব কিছু ধান
পারব হয়ত তার থেকে মোর শুধতে ধার থান

খড়ে ছাওয়া কুটির আমার
ছাইতে হয়ত পারব আবার

হয়ত এবার আসবে ঘরে ঈশ্বরেরই দান।
অনেক আশায় ধান রুয়েছি ধূসর মাটির বুকে
বৃষ্টি কত পড়েছে মোর রোগে কাতর মুখে

জ্বর গায়েতে নিয়েও আমি
মাঠের কাজে গিয়েছি নামি

বীজ ফোটা মোর ধানগুলিকে রুয়েছি মনের সুখে।
জ্যৈষ্ঠ শেষে বৃষ্টি এল একি ভীষণ হায়!
মাঠগুলি সব জলে—জলে ভরিয়া যে গো

যতনে রোয়া চারা আমার
জলের তোড়ে রইল না আর

জলের টানে ভেসে তারা গেল যে কোথায়!
মুষলধারে বৃষ্টি এল ভাসিয়ে দিল ধান
ভাসিয়ে দিল মাটির গড়া আমার কুটিরখান

সারা বছর খাব বলে
রুয়ে ছিলুম যে ধান জলে

ভাসিয়ে দিয়ে বরষা তাহা ভাঙল আমার প্রাণ।
শুনেছি আবার নতুন করে চষতে হবে জমি
জন্মভূমি, ওগো মা মাটি! তোমার আমি নমি

রুইব আমি কেমনে ধান
বরষাতে শেষ করেছে প্রাণ

বীজ ধানেরই তরেতে ধান দেবে কে জননী?
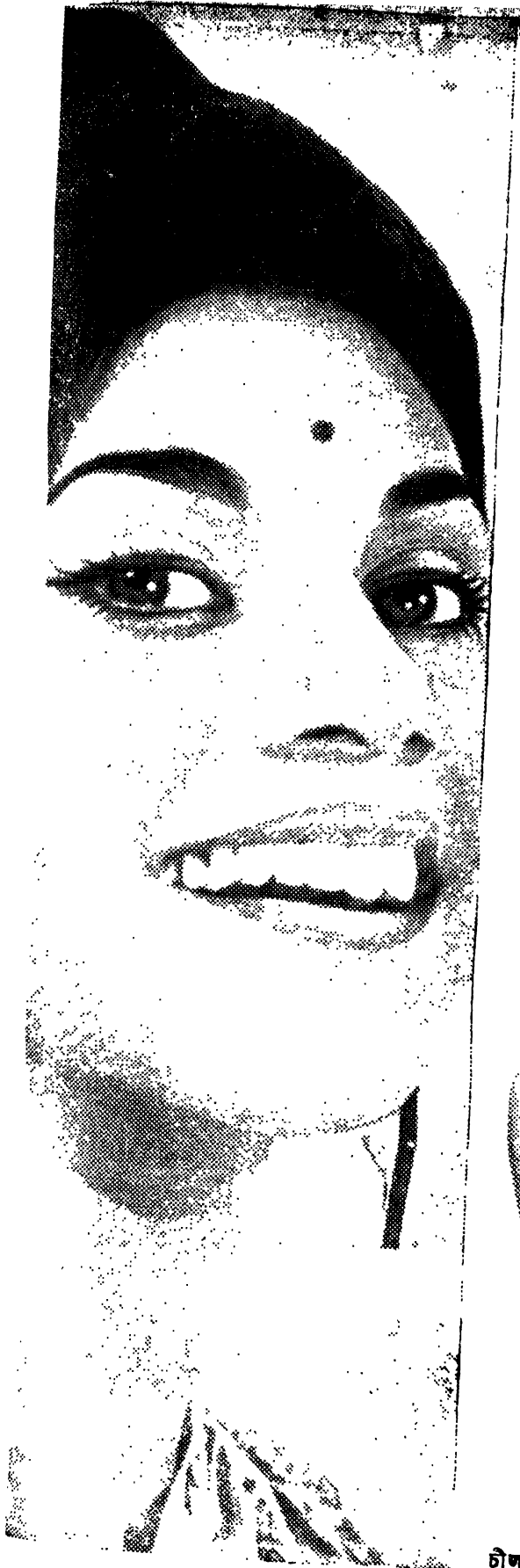
মাত্র ৭ দিনে সুনীতার মুখশ্রী হয়ে উঠল আরো পরিষ্কার, কোমল, লাবণ্যমণ্ডিত; আর এই অঘটন ঘটিয়ে দিল

পণ্ড্‌স-এর
৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা

কলেজের সোশ্যালের আর মাত্র ৭ দিন বাকি! অরুণ তো সেখানে থাকবেই! আমার দিকে কি ওর নজর পড়বে? মিছে আশা—মুখের যা চেহারা হয়েছে—শুকনো, ফ্যাকাশে···চকিতে আমার জ্যোতির কথা মনে পড়ে গেল। ৭ দিনেই ওর চেহারা ফিরে গিয়েছিল পণ্ড্‌স-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্য ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে।

পরিকল্পনা ও তার কাজ
এক সপ্তাহ ধরে রোজ রাত্তিরে দুবার আমি পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মাখতে লাগলুম। প্রথমবারে ওপরের ময়লা এবং মেক-আপ পরিষ্কার হয়ে গেল।

তারপর খুব নরম টিস্যু কাগজ দিয়ে ক্রীম মুছে ফেললুম।

দ্বিতীয় বার আবার ক্রীম মাখলুম। এবং এটাই হল আমার রূপলাবণ্যের চাবিকাঠি। এবারের ক্রীম ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে এমন সব লুকানো ময়লা বের করে দিল, জল ও সাবান যার নাগাল পায় না। এই দুবার ক্রীম মাখার ফলে মুখশ্রী সত্যিই ফুটফুটে, তাজা আর কমনীয় হয়ে উঠল।

পার্টিতে—৭ দিনের দিন আমার মুখশ্রী হয়ে উঠল উজ্জ্বল, মসৃণ, লাবণ্যে অপরূপ। আর হ্যাঁ, অরুণ যে আমার চেহারার তারিফ করল তা বলাই বাহুল্য!

আমি ঠিক করে ফেললুম, পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম দিয়ে নিয়মিতভাবে রূপচর্চা চালিয়ে যাবো যাতে আমার মুখশ্রী সব সময় ফুটফুটে, কোমল ও লাবণ্যমণ্ডিত থাকে।

আজই মাখুন পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম—পৃথিবীতে এই মুখশ্রী-পরিষ্কারক ক্রীমই কাটতিতে সবার ওপরে

পণ্ড্‌স
কোল্ড ক্রীম

পৃথিবীতে এই মুখশ্রী-পরিষ্কারক ক্রীমই
কাটতিতে সবার ওপরে

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

ষ মাসের
লোকচিত্র
তিযোগিতা

যা
ত্রী
র
যা
ত্রা

—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্বত্য-অভিযান

—আশীষকুমার দত্ত
(৩য় পুরস্কার)

মাসিক
বসুমতী
পৌষ / ১৩৭৫

রস্কার ২০ টাকা
" ১৫ টাকা
" ১০ টাকা
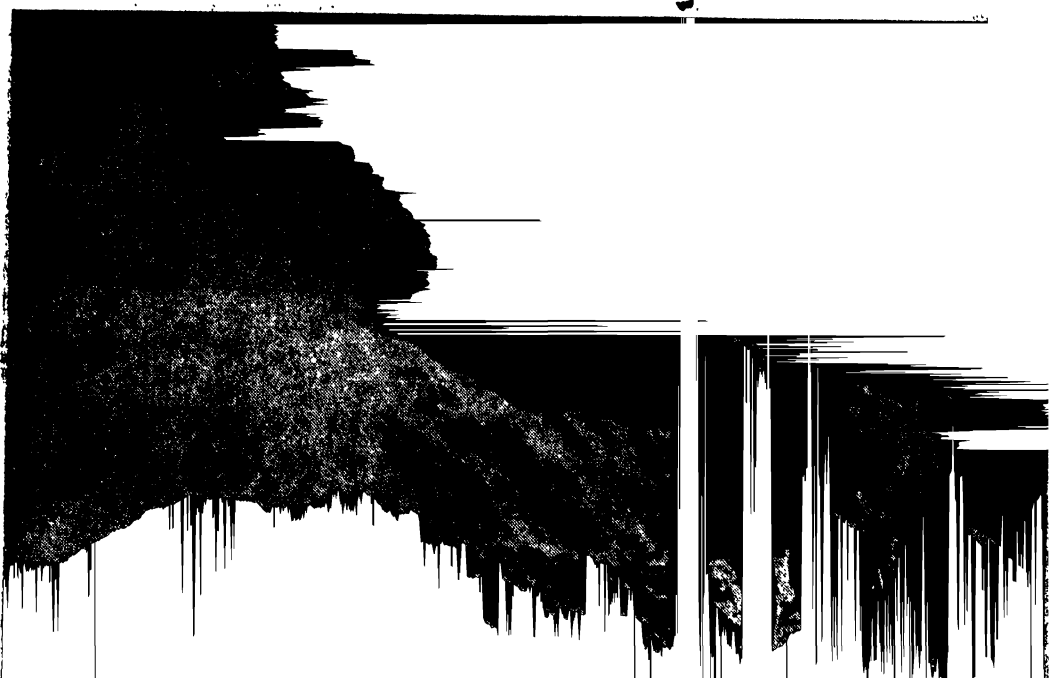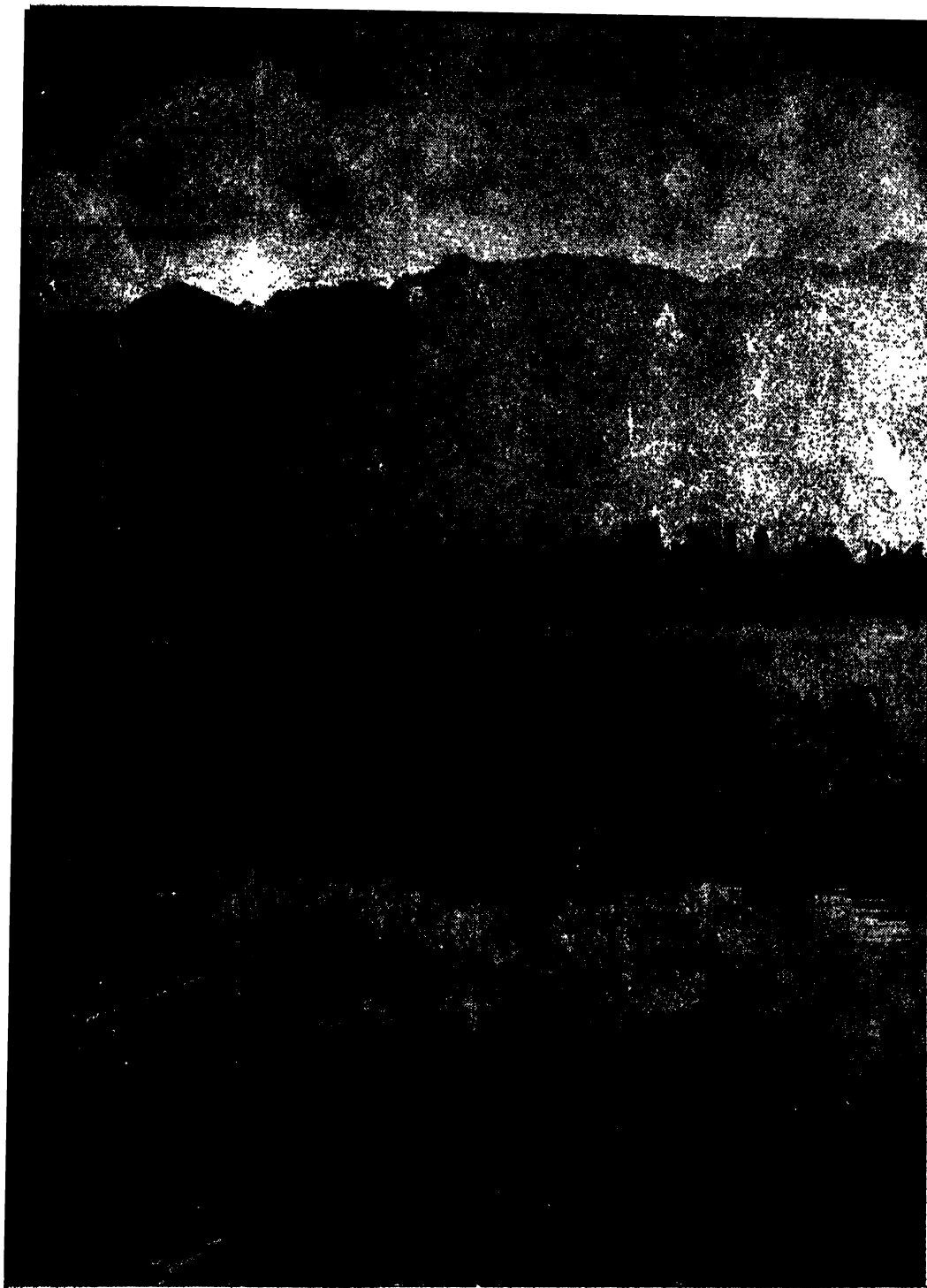
কাশ্মীরী সরোবর —সৃজনকুমার রায়

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা
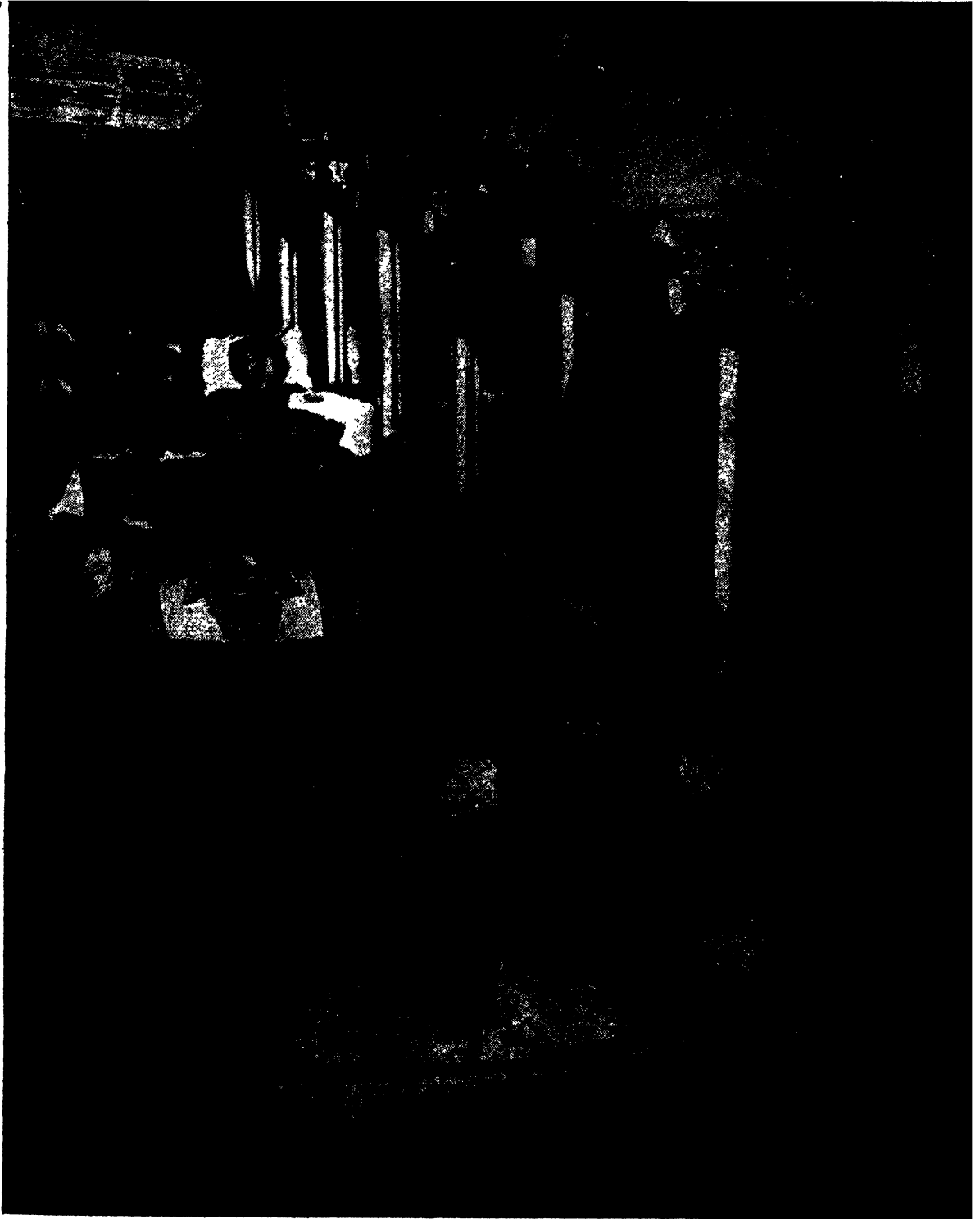
মাঘ সংখ্যায়	ফাল্গুন সংখ্যায়	১ম পুরস্কার কুড়ি টাকা
		২য় ,, পনেরো ,,
ম্যাক্টেরী	বিনোদিনী	৩য় ,, দশ ,,

যাত্রীর যাত্রা

—শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়
(২য় পুরস্কার)

[ছবি বর্ধিত আকারে ও

মাসিক

॥ যাত্রীর যাত্রা ॥

—দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়

—এস কে বিশ্বাস

মৃণাল রায়
(১ম পুরস্কার)
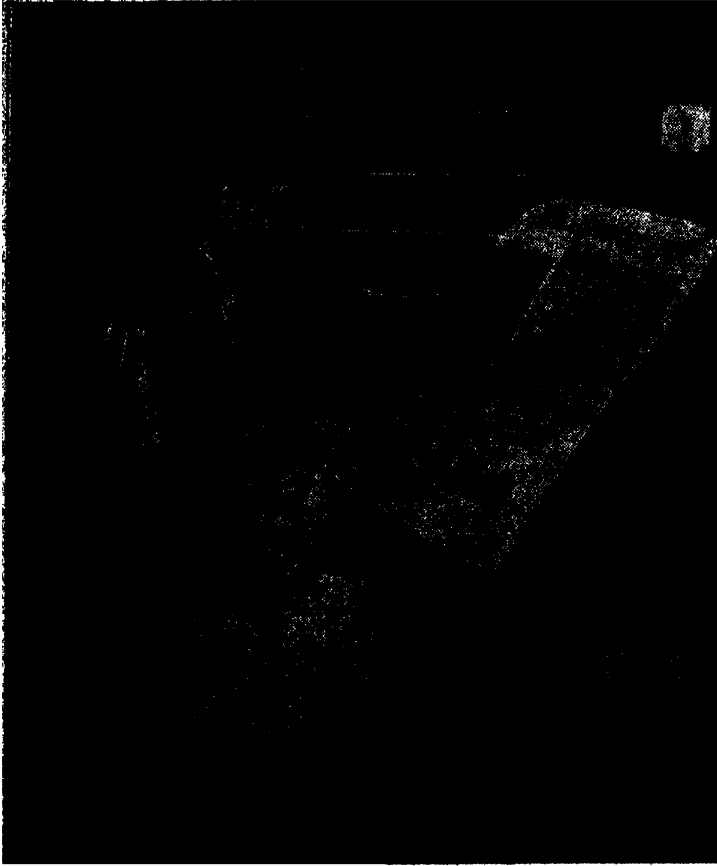
মুরগীটাকে কিছুতেই ছাড়বে না তবরেজ। অনেকদিন আগে বাবাই না বলেছিল, ও তোর বন্ধু, দোস্ত। ওকে কিছুতেই বেচবো না আমরা। তাই না ফাতিমার মাকে দিয়েছিল ছেড়ে।

তবরেজের দাদামশাই মুকন্দে আলীর আখের ক্ষেত আর জমি-জায়গা কিছু ছিল এক সময়। আবদুল হোসেনের আর খোদাবক্সের কাছে একটি একটি করে সব গেছে তার। টুপী বানাতো এক সময়, চোখের নজর যাওয়া থেকে পীতাম্বরবাবু সে কাজও আর দেন না ওকে। তার বড় ছেলেটা সেবার মারা গেল কলেরায়। ওই এক ছেলে, বিয়ে দিয়েছিল সখ করে—দু'বছরের মাথায় বউ-বেটা মারা গেল এ-সপ্তাহে আর ও সপ্তাহে। রেখে গেল এক বছরের এই কচি ছেলেটাকে। বুকে পিঠে করে তাকে মানুষ করলো এই বুড়ো বুড়ি।

তারপরও কেটে গেছে দু বছর। থালা, ঘটি বেচেছে মুকন্দে, খাট ছিল ঘরে একখানা বেচেছে তাও। বলদ ছিল দু'টো সেগুলো গেছিল আগেই। মুরগী পুষেছিল কয়েকটা। হাটে ডিম বেচতো, ভিক্ষে করতো এ-বাড়ী ও-বাড়ী। মুরগীগুলোও বেচতে লাগলো একে একে।

গ্রামের একটেরে বসত বাড়ী বেশ কয়েক কাঠা জমির ওপর তাও আবদুল হোসেনের কাছে বেচা হয়ে গেছে দয়া করে থাকতে দিয়েছে তাই, নচেৎ একদিন গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হতো।

কাল পরশু দু' দিন শুধু চিঁড়ে জলে ভিজিয়ে নুন মাখিয়ে খেতে দিয়েছে সে ছেলেটাকে। মুরগীটাকে খাওয়াতে পারে নি এক সপ্তাহ। আর বুড়ো-বুড়ির কথা তো বাদ।

ভিক্ষেয় বেরিয়ে কিছুই জোটে না আজকাল। টেস্ট রিলিফের গম, চাল থেকে আবার ভিক্ষে দেবে কে।

মুরগীটা তবরেজের বড় পেয়ারের। প্রাণ ধরে কিছুতেই সেটাকে বেচতে পারে নি এতদিন। আজ গাঁয়ে মেলা বসবে গাজনের সেখানে নিয়ে গেলে মিলতো গোটা দুই টাকা। পেটে দানা পানি পড়তো ক'দিন পরে।

আজই কি ছাই মন চাইছে। কিন্তু উপায় কি আর কতদিন থাকবে উপোষ করে? ফি বছর গাজনের মেলায় নিয়ে যায় নাতিটাকে আজ কি থাকবে ঘরে বসে?

গাজনের মেলা বসেছিল কেশবপুরের দক্ষিণের মাঠের পশ্চিম কোণে

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
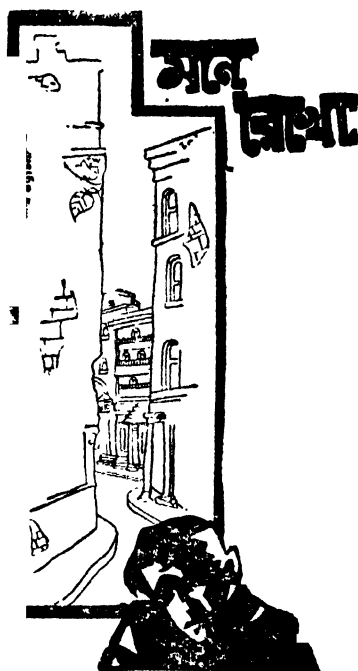
আশীষ বসু

একটা উঁচু ডাঙ্গায়। মেলা বরাবরই বসে সেখানে।

গাজনের মেলায় আসে হিন্দু, মুসলমান সবাই।

পশ্চিম বাঙলার আর পাঁচটা সাধারণ মেলার মতোই কেশবপুরের গাজনের মেলা বসে দক্ষিণের বিলে চড়িডাঙ্গার মাঠে। চড়িডাঙ্গা কথাটার জন্ম সম্ভবত চড়াইডাঙ্গা থেকে কেন না মাঠের অন্যান্য জায়গার চেয়ে ও অংশটা উঁচু।

এ-পাশে মিঞার গোর বা কবরস্থান রয়েছে সেখানে মুসলমান মেয়েরা এসে কলদের সন্ধ্যায়, প্রদীপ জ্বালে। ওপাশে বুড়ো পণ্ডিত কালীকান্তের পাঠশালা। তারপর নেমে গেছে মাঠ।

চৈত্রের উলটো-পালটা হাওয়া বইছে। বোশেখ আসছে আর বাতাসের জোর বাড়ছে। কাল-বোশেখীর আভাস আছে সে হাওয়ায়।

ওপাশে দেখা যায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। সেখানে টেস্ট রিলিফের মাটি উঁচু করে ফেলা তার দু'পাশে সরকারী বাড়ী উঠছে।

আমিনা আর আমরু এসেছিল মেলায়। আমরু বাইরে বেরোয় মাঝে মাঝে। খবর রাখে গ্রামের কিছু। বেলডাঙ্গার মেয়ে, ওখানকার জুনিয়ার মাদ্রাসায় পড়েছিল কিছুদিন।

পাঁপর ভাজা আর বাদাম তেলের তৈরী খাবার সাজানো থালায় থালায়, মাটির রঙ্গীন পুতুল, কম্বল, টিনের বাক্স থেকে পদ্মর চাক অবধি নিয়ে দোকান বসে গেছে পরপর। মিষ্টি হাওয়া মিঠাই বানাচ্ছে একজন চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কাঁচ-ঢাকা চাকা ঘোরানো বায়োস্কোপ এসেছে। নাগরদোলা বসেছে আর এক পাশে। অন্য ধারে দোকান বারকোষ, পাথরের থালা, বাটি, গেলাস, পেতলের বাসন কোসনের। লক্ষ্মীর ব্রতকথা, সচিত্র পাকপ্রণালী সহ যৌনবিজ্ঞানের কিছু বই পাতানো দোকান একটেরে। বেলুন উড়ছে, বাঁশী বাজছে, বাচ্চারা চেঁচাচ্ছে, কেঁদে আকাশ মাথায় করছে কেউ কেউ। বড়দের নিষেধ কানেই নিচ্ছে না।

ও-পাশের সবচেয়ে বড় বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে আমরুকে জিজ্ঞাসা করলো আমিনা, ওখানে এতবড় বাড়ীটা বানায় কে রে, স্কুলের দোকান না কি?

ওটাতো সরকারী হাসপাতাল হবে শুনেছি।

হাসপাতাল। হাসপাতালের নাম শুনেছে, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমিনা, এখানে হাসপাতাল হবে। ডাক্তার থাকবে অনেক। রোগীদের খাট থাকবে শোবার। চিকিৎসা হবে গৌরাঙ্গী-কৃষ্ণনগরের হাসপাতালের মতো।

গ্রামের মেয়ে আমিনা। স্বামীর একবার গেছিল গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর। চোখে জ্বালা করতো সব সময় তাই ডাক্তারকে দিয়ে চোখ দেখিয়ে নিয়েছিল চশমা।

চোখের চশমাটা খুলে আর একবার বড়ীটার দিকে তাকালো আমিনা। আর এক বছর আগে বাড়ীটা যদি উঠতো তাহলে অমন বেঘোরে মারা যেতো না ফারিদা।

মজার কবরের ওপাশে বেড়ার গায়ে ছোট্ট একফালি জমিতে বুঝি ঘুমিয়ে আছে ফারিদা। ওপরে তার কোনও আবরণ নেই। শুধু বড় বড় ঘাস উঠেছে সেখানে। নরম ঘাস মুঠো করে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল আমিনার।

●

মুরগীটা মেলাতেই বিক্রি হয়ে গেল। বেশ ভালো দামেই।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুই কিনে নিলেন সেটা। মৃত্যুঞ্জয় জানা, কণ্ট্রাক্টর।

মেলায় বেড়াতে এসেছিল মণিময় মুরগী কিনতে দেখল সে। মনে পড়লো পীতাম্বরবাবুর সেদিনের কথাটা, সরকারী অফিসার গাঁয়ে এসে শুধু ডেভোলেপমেণ্ট করছেন মুরগীর দামের। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন অবশ্য।

অনেক কষ্টে তবরেজের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল মুরগীটা। বিক্রি হল আড়াই টাকা দামে। বুড়ো মুকসেদ নাতির জন্য বেলুন কিনলো একটা, পাঁপর ভাজা কিনলো, পুতুল কিনলো দুটো। কচুরী তরকারী কিনলো চার আনার। প্রাণভরে খাওয়া যাবে আজ। আজ সোমবার কালকের হাটে গিয়ে কিনতে হবে চাল, ডাল। কিন্তু তারপর।

তারপর কি হবে মুকসেদ তা জানে না। আল্লাই জানেন।

তাড়াতাড়ি মেলা থেকে ফিরলো মুকসেদ। নাতিটা ঘুমিয়ে না পড়ে শেষে।

●

নার্সিং হোমের ৬নং কেবিনের বডটায় শুয়ে সেদিনকার কথাগুলোই ভাবছিল চামেলী।

থিয়েটারের শেষে নিজের ফ্ল্যাটে তাকে খেতে নিয়ে গেলেন হিরণ্ময়বাবু।

টেবিলে খেতে বসে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বললেন তাকে, এমনি করে একটু একটু করে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়ায় কি লাভ চামেলী। এমনি খেটে যারা বছর ধরে তুমি যা রোজগার করবে, ইচ্ছে করলে একদিনেই তো সেটা রোজগার করতে পারো তুমি।

চমকে উঠেছিল চামেলী, কি বলতে চাইছেন হিরণ্ময়দা।

অবুঝ হোয়ো না। আমার কথা শোন, শ্যামলীর অমনি শক্ত অসুখ, ইন্দ্রকে ছাড়িয়ে আনতে 'বেল' দিতে কালই লাগবে দু' তিনশো টাকা। তারপর কেসও চালাতে হবে। তোমার এখন অনেক টাকার দরকার।

কিন্তু তাই বলে।

কেউ তো জানতে পারছে না, ক্ষতি কি এতে। তুমি যদি কোনও আপত্তি না করো তো কালই আমি সব বন্দোবস্ত করি। পঞ্চাশ টাকা, ষাট টাকা করে পাওয়ার জন্য পনেরো দিন রিহার্সাল দিচ্ছ, একটু থেমে চামেলীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন হিরণ্ময়বাবু, যদি চাও তো তুমি হাজার টাকাও রোজগার করতে পারো একদিনে।

তোমার কোনও কিছু চিন্তা নেই। তোমাকে ভাবতে হবে না মোটেই। না, না আপত্তি কোরো না, যা বলছি যা করছি সব তোমার ভালোর জন্যই, থেমে থেমে বলতে লাগলেন হিরণ্ময়-বাবু।

সিস্টার, চেঁচিয়ে উঠলো চামেলী আমার দু' হাজার টাকার চেকখানা ভাঙিয়েছে।

নার্স ছুটে এলো ঘরে। কেন অমন করছেন, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন আরও অনেক রোগী রয়েছে, এখানে ডিসটার্ব করবেন না সবাইকে।

নার্সটাও ঘৃণা করছে তাকে, বুঝতে পারছে চামেলী। নার্সিং হোমের সে অবাঞ্ছিত আগন্তুক।

ছেঁড়া ভাবনাগুলোকে জোড়বার চেষ্টা করছিল চামেলী। সেদিনের সেই রাত। হিরণ্ময়দার ঘরের বাতিটা নিবে গেল আচমকা।

গঙ্গার ধারে কোথা থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছিল একটা মৃতদেহ। আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে চামেলী দেখেছিল একবার। একটা শকুন ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে সেটা।

কালো দু'খানা লোমশ হাত চামেলীর নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছিল যেন। কোথায় একটা তীব্র সেণ্টের কটুগন্ধ, ভারী ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ চামেলীর মনে হচ্ছিল তার মরা দেহটা কেউ ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে।

সিস্টার, আবার চেঁচিয়ে উঠলো চামেলী, জল দাও আমাকে।

জল পাবেন না আজ, আজ আপনার অপারেশন হয়েছে। লেমনেড খেতে চান তো দিচ্ছি, নার্স বলল এসে। কেন বৃথা চেঁচামেচি করছেন। বয়স তো কম হয় নি, শখ তো ষোল আনা এদিকে। শেষ রক্ষে করতে এই নার্সিং হোম সহায়। আজকাল ডাক্তার বাগচীর যে কি হয়েছে, টাকা পেলে আর কথা নেই। আমাদেরই যেন হয়েছে জ্বালা। চুপচাপ শুয়ে থাকুন বেশী ন্যাকামী করতে হবে না। ঢং হচ্ছে মেয়ের।

অপারেশন টেবলের বড় আলোটার কথা মনে পড়ছে চামেলীর। ক্লোরো-ফর্মের কটু গন্ধ। কে যেন জাপটে ধরছে তাকে, একি, একি, নিঃশ্বাস বন্ধ হচ্ছে যে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে ক্রমে। তারপর যেন কখন একবার জ্ঞান হয়েছিল একটু। মনে হল করাত দিয়ে কে যেন কাটছে তাকে দু'ভাগ করে।

বিকেলে দেখা করতে এলো সবাই। মা, মণি, ইন্দ্র, শ্যামলী। ইন্দ্র ছাড়া পেয়েছে, শ্যামলী গায়ে বল পেয়েছে। ডাক্তার তাকে অনুমতি দিয়েছেন একটু একটু ঘোরাফের করবার। হিরণ্ময়বাবু এসেছেন।

মা, আমার চেকটা ভাঙিয়েছো?

ভাঙ্গিয়েছি। তুই চুপ কর তো ঘুমো এখন।

ঘুমোবো। মা মা ঘুমোলেই সেই লোকটা আসবে। জানো মা, সেই শকুনটা আমাকে টুকরো টুকরো করে খাবে। চেঁচিয়ে উঠলো চামেলী।

দিদির মাথায় সযত্নে হাত বোলাচ্ছিল শ্যামলী। দিদির ব্যথাটা বুঝি টের পেয়েছে সে।

মা হাতে, পায়ে, গায়ে হাত বুলোচ্ছেন।

হাত বুলোও মা, হাত বুলোও সব গা'টা পুড়ে যাচ্ছে যেন। আমায় ছুঁয়ো না তোমরা কেউ। মলি চানের ঘরে নতুন সাবানটা রেখে আয় তো আমি গা ধোব। চামেলীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার। সত্যি সেলুকস্, কি বিচিত্র এই দেশ, নিম্নস্বরে আবৃত্তি করছিল চামেলী। মণিময় বলতো, উই ফিস্ট অন দি গারবেজ অব এ কারকাস্। উই ফিস্ট অন দি, বলতে বলতে হাঁপিয়ে পডলো চামেলী।

চামেলী একেবারে পাগল হয়ে গেলো।

দু'হাজার টাকার চেকখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল হিরণ্ময়বাবুর ঘরেই। তিনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চারুলতাকে এলেন দিতে।

চামি কোথায় মা।

কি জানি কাল সারা রাত সে কোথায় ছিল। আজ সকালে দেখি বাড়ীর সামনে এক পেল্লায় ট্যাক্সী। মেয়ে নেমে ভাড়া দিয়ে এসে সেই যে শুয়েছে আর তো ওঠে নি।

চেকখানা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন চারুবালা, চিঠি কার, চামির? তিনি চেক জীবনে দেখেন নি কখনো।

চেক। এটা ভাঙ্গালে দু'হাজার টাকা পাওয়া যাবে। চামেলীর নামের টাকা।

দু'হাজার টাকা। এত টাকা কোথায় পেলো চামি।

সে, আমতা আমতা করেছিলেন হিরণ্ময়বাবু, এ ওর অনেকদিনের জমানো টাকা।

জমানো টাকা দু'হাজার। বড় বড় চোখে চেয়েছিলেন চারুবালা। এত টাকা ছিল চামির জমানো।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে চারুবালা একটু পরেই বললেন, তা তুমি ইন্দ্রর কি করলে বাবা?

চেকটা ভাঙ্গিয়ে শ' দুই টাকা দিয়ে মল্লিকে পাঠাবেন আমার কাছে বেলা এগারোটা নাগাদ। দেখি কি করতে পারি।

তার পর থেকে আজ তিন মাস একটা রাতও ঘুমোয় নি চামেলী। সারা রাত ধরে শুধু চিৎকার করেছে, মা আমার বুকের উপর একটা পাথর কেন বলো তো। ঠেলে নামিয়ে দাও না, একটু বুকভরে নিঃশ্বাস নেই। কোনও সময় বলছে, মা দেখেছো করাতটা যেন আমাকে এখুনি দু'খানা করে কাটবে। কখনও চেঁচাচ্ছে, আমার চেকটা ভাঙ্গিয়েছো মা। কই টাকাগুলো আমায় দাও তো।

চামেলী পাগল হয়ে গেছে।

ডাক্তার, কবরেজ, হোমিওপ্যাথ, রোজা, ঝাড়-ফুক কিছুই বাদ দেন নি চারুলতা। শেষে হিরণ্ময়বাবুর কথা মতো ভর্তি করেছেন নার্সিংহোমে।

ওই সিস্টারটা আমায় বকেছে জানো মা। ওই হিরণ্ময়বাবু, আস্তে আস্তে কানের কাছে মুখ এনে বলেছে মাকে, শ্যামলীকেও খুন করবে জানো মা, আমাকে বলেছে।

হিরণ্ময়বাবু তখন ছিলেন না কেবিনের মধ্যে। ডাক্তার বাগচী যাঁর নার্সিং হোম তিনি বড় সিস্টারকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে। জানাচ্ছেন এ রোগীকে দু'তিন দিনের মধ্যেই নিয়ে যেতে হবে বাড়ীতে। এমন চেঁচামেচি করবে জানলে কিছুতেই তিনি এ কাজ নিতেন না হাতে। এসব কাজ কোথায় সারা হবে অতি গোপনে তা না রোগী নিজেই ঢাকঢোল পেটাচ্ছে সব সময়। আজকাল নানারকম লোক ঘোরে নানান মতলবে। দিনকাল ভালো নয় মশাই। শেষে আপনার ক'টা টাকার লোভে কি নার্সিং হোমটাই তুলে দিতে হবে আমায়।

পরের দিন রাত শেষ হবার আগেই মারা গেল চামেলী। পাশের কেবিনের রোগিণীর ঘর থেকে কি একটা ইন্‌জেকসনের কয়েকটা ফাইল চুরি করে এনে গলায় ঢেলে দিয়েছিল সে। অনেক রাতে ঝিমিয়ে পড়া নার্সের কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগে সে তার জীবনের সব জ্বালা এমনি করে শেষ করলো।

মরা চামেলীর যন্ত্রণাবিকৃত মুখটার দিকে চেয়েছিল শ্যামলী। ও কি বুঝতে পারছিল কিছু?

পাশের কেবিনের পাগলীটা কাল রাতে মরে গেছে। আজকের রাতে ঘুমনো যাবে নিশ্চিন্তে, যা চেঁচাতো সারারাত। ভাবছিল নার্সিং হোমের পাশাপাশি রোগিণীরা।

পাগলী মেয়েটা অভিমান করে চলে গেল, কাঁদছিলেন চারুলতা, তাও গোপনে,

হাসতে হাসতে শত্রুর হাতে একেবারে অস্ত্র তুলে দিয়ে ঘুরিয়ে মরে নিজের তলোয়ার তেমনিভাবে আসরে কথাটা ঘোষণা করলেন পীতাম্বরবাবু। তাঁর বাড়ীতে রোজকার মতো সেদিনও তাস খেলার আসর বসেছিল। এক মণিময় ছাড়া হাজির ছিল আর সবাই।

বুঝলে হে গদাধর, বাছাধন একেবারে কাত এবার। আমি পীতাম্বর গাঙ্গুলী, বলি আমার কাছে কত বড় বড় হাতি গেল তল—এখন কানাঘোড়া উঠে বলেন কতটুকু জল। বাছাধনকে একেবারে ঠেলেছি তিনশো মাইল দূরে। ট্রান্সফারের অর্ডার সই হোল আমার সামনেই। এবার দেখি কত হিম্মত কার ঠেকাতে পারে ট্রান্সফার।

●

জীবন তো অফুরন্ত নয় যে পলকে পলকে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায়। জীবনতো শুধু তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। সামান্যতম এই অবসরে অবকাশ কোথায় পর্যবেক্ষণের। সুখমাখা, দুঃখভরা, হাসি কান্নায় মোড়া জীবন শুধু একটা কম্প্রোমাইজ। শুধু মেনে নেওয়া। শুধু দিনযাপনের জন্য মেনে নেওয়া। দিন যাপনই জীবন। যে মেনে নিয়েছে সেই বেঁচেছে। সাধনা বেঁচেছে, কল্যাণী বেঁচেছে, কাদম্বিনী বাঁচবে। যে মানে নি সে মরে গেল। চামেলী মরে গেল।

চামেলী মারা যাওয়ার খবর এসেছে বাড়ী থেকে। চিঠিখানা টেবিলের ওপর রেখে কাঁদছিল মণিময়। অঝোরে কাঁদছিল।

তবে এই মেনে নেওয়াই কি জীবন? পরিবেশকে স্বীকার করাই—কি সার্থকতা? তাকে অস্বীকার করাই কি মৃত্যু? জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্কে এই কি শেষ কথা? ভাবছিল মণিময়।

অনেকদিন বাদে আবার কাঁদছে মণিময়। শিশুর মতো সরলভাবে কাঁদছে। টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

●

লেনের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের আধখানা ঘরে রাখা অপরিসর চৌকিটার ওপর শুয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছিল সেও। দিদি মরে গেল। শ্যামলী জানে দিদি কেন মরে গেল।

নার্সিং হোমে যাবার আগে অনবরত চিৎকার করতো চামেলী। চিৎকার করে বলতো, আমার চেকখানা হারিয়ে ফেলেছি, জানিস মলি। একদিন দেখবি তোর চেকখানাও তুই হারিয়ে ফেলেছিস।

লুকিয়ে লুকিয়ে বাথরুমে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতো চামেলী। শ্যামলীর কাছে ধরা পড়ে গেলে বলতো, জানিস মলি বিষ খেয়েছি। এত বমি করছি কিন্তু কিছুতেই তুলে ফেলতে পারছি না। সারা গায়ে খালি সাবান ঘষতো চান করতে বসে। বলতো, আমার গায়ে কতো ময়লা দেখতে পাচ্ছিস না। দ্যাখ না এতো ঘষছি তবু উঠছে না।

নার্সিং হোমে যাবার আগের দিন এসে চুপি চুপি বললো তাকে, জানিস মলি, তোরা ভাবছিস আমি পাগল হয়ে গেছি তাই না। আরে না রে, দূর বোকা পাগল হবো কেন, আমি তো অভিনয় করছি। এবারের অভিনয় বড় শক্ত। জানিস অভিনয় করার জন্য কতো টাকা পেয়েছি। নিজেই বলতো হাত ঘুরিয়ে, দু'হাজার টাকা। বড় জবর অভিনয় এবার। আরে আমার চেকখানা কোথায় গেল, মার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতো, আমার চেকখানা দেখেছো মা। সেই যে সেই দু'হাজার টাকার চেকটা।

কাঁদছিল শ্যামলী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

জলে চোখ ভরে যাচ্ছিল চারুলতারও। উনুনে ডালনাটা পুড়ে যাচ্ছিল বারবার। উল্টে পাল্টে দেবার জন্য খুন্তিটা নাড়ার কথা মনে থাকছিল না তাঁর। শুধু আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকছিলেন। কি মূল্য দিয়ে তাঁদের ঋণ শোধ করে গেলো মেয়েটা তাই বার বার মনে পড়ছিল।

'আমরা ভাল আছি।
'আমরা ভাল আছি।'
'আমরা ভাল আছি।'

—এ প্রতিধ্বনি নয়, সাধারণ চিঠিপত্রের সমাপ্তি-বাক্যও নয়। এর পর 'আপনারা কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা নেই। স্তুত এর পরে কোন প্রশ্নই নেই।

তবে এটা কি?

এটা নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পাওয়া নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, আকাশতল তীরভূমি স্পর্শ করার উল্লাসে উৎসিত কয়েক শত যাত্রীর নিরাপত্তাবোধের বার্তা—আত্মীয়-পরিজনদের উদ্দেশে।

দার্জিলিং গিয়েছিলেন অনেকে। ফিরতে চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন ফিরেছেন কিছু; যাঁরা ফিরতে পারেন নি—শতাধিক ট্রেনযাত্রী,—ভাগ্য যাঁদের নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে অবিশ্রান্ত বারিধারায় নীরন্ধ্র কালো আঁধারের পটভূমিকায় ক্ষতবিক্ষত পর্বতগাত্রে—তাদেরই আতঙ্ক মুক্তির প্রথম আনন্দ-সংবাদ—আমরা ভাল আছি।

পর্বতশিখর যাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, যাদের রক্তে মিশে রয়েছে গৈরিক গাম্ভীর্যের দুরন্ত মোহ, তাদেরই কেবল গিরি অভিযান নিরুৎসাহিত হবে না কোনদিন। তারা কেউ কেউ এইভাবেই বাঁচবে এবং বার্তা পাঠাবে—আমরা ভাল আছি। কেনও ম্যালেশিয়ান কবলে আশ্রয় না পেলেও তারা ফিরে এসে বলবে—আমরা ভাল ছিলাম। সমতল মাটির সারল্য তাদের অন্তরে দোলা দেয় না। ... গিরিশ্রেণীই তাদের ... সেখানেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা তারাই লড়ে' ...—আমরা ভাল আছি।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ এ সময় দার্জিলিং সহরের আকর্ষণী শক্তি বহু বিচিত্র। নানান ধরণের রঙীন ফুলের সমারোহ, মেঘমুক্ত আকাশের গাঢ় নীলিমা, প্রভাতী কুয়াশার স্বচ্ছ আবরণ, রৌদ্রকরের অবারিত দাক্ষিণ্য। কিন্তু এবারের অক্টোবরের সূচনা ধ্বংসের ... এনেছে।

মৃত্তিকার কঠিন ... পারত—আমরা ভাল আছি, যাদের চোখের সমুখে চকিতে ভেসে উঠেছিল চরম ক্ষণে পরিচিতদের মুখচ্ছবি মুহূর্তের জন্য—তাদের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে রইল সোনাদার বাতাস,

কালপুরুষ

চাপা কান্নার ধ্বনিতে মলিন হয়ে রইল অক্টোবর '৬৮-র প্রথম সপ্তাহের দার্জিলিং। ভবিষ্যতের যাত্রী-দলের জন্য পথে ছড়ানো রইল ভয়াবহ স্বপ্ন।

সাধারণ যাত্রীর মুখের হাসি, বুকের বল, নিঃশেষে শুষে নিয়েছিল ধ্যানগম্ভীর তুষারমৌলির কোন্ দেবতার রুদ্ররোষ? কার অপরাধে এই দুর্দৈব ... কেউ তা জানে না। দিনান্তের অন্ধকার যবনিকা ছেয়ে গেল মানুষের ভীত আর্তনাদের অসহায় ক্রন্দনধ্বনিতে, আসন্ন মৃত্যুর প্রহর

গুণল ক্ষতবিক্ষত পর্বতগাত্র বেয়ে। পায়ের তলার মাটি হয়ে গেল বিশ্বাসহন্তা—সমাসন্ন পূর্ণিমার আকাশ তখন পরম শত্রু। ভবিষ্যতের গতি হয়ে গেল স্তব্ধ। মহাকালের বক্ষপটে আঁকা যেন দুর্গত মানুষের এক দুষ্প্রাপ্য ছবি।

কিন্তু তাই কি সত্যি?

বিপদ-কারণ যিনি, বিপদবারণও তিনিই। হরণ যিনি করেন, শরণের ব্যবস্থাও তিনিই করে দেন।

তাই তো সেদিন দুর্গম পথের যাত্রী দলের চোখে পড়েছিল ক্ষুদ্র এক আলোকবিন্দু। স্বর্গীয় দেবদূতের আশীর্বাদের কণার মত অপরিসীম আশ্বাস ভরা দূরবর্তী একটি আলোকচিহ্ন তাকেই লক্ষ্য করে, অচঞ্চল স্থির বিশ্বাসে এগিয়ে গিয়েছিল যারা দেবশিশুর মতই, তারা চিরদিনের স্মরণীয়। চিরকালের পথিকৃৎ। তারা সেবাধর্মকে মহীয়ান করে তুলেছে, মনুষ্যত্বকে অমূল্য সম্পদে ভরিয়ে তুলছে জীবনের নাড়ীতে এনে দিয়েছে

সহ্যশক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে মরণের ভ্রূকুটিকে যারা অগ্রাহ্য করে এসেছেন সেদিন, সৈনিকের সাহস বুকে নিয়ে যাঁরা সেদিন ভবিষ্যতের বাতাস নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন, নিদারুণ ভয়াল রাত্রির গর্ভে সেদিন তাঁদের নবজন্ম। অবধারিত মৃত্যুর ইঙ্গিত যখন উঁকি দিচ্ছে পায়ের তলায়, মাথার উপরে, ডাইনে-বাঁয়ে; এক ভয়ঙ্কর দিনের অমোঘ বাণীর মৃদু পদক্ষেপ যখন বাজছে বুকে; তখন বেঁচে থাকা বা বাঁচতে পারার অর্থই দ্বিতীয় জন্ম, দ্বিতীয় জীবন।

আবার, জীবনীশক্তির প্রমাণ এগিয়ে চলা। এগিয়ে চলার অর্থ তাই জীবন।

তাই, সেদিনও মানুষ ভুলতে পেরেছিল মর্মান্তিক ভীষণ অভিজ্ঞতা। পরের দিন এগিয়ে এসেছিল—বলেছিল, আমরা ভাল আছি। তাই তারা পিছে ফেলে-আসা রাত্রিটিকে দিনের আলোয় নূতনরূপে খুঁজে দেখেছিল, দেখতে চেয়েছিল রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত কেমন করে ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে পা ফেলে এগিয়ে গেছে প্রভাতের দিকে। ব্যক্তিগত ক্ষতির হিসাব তুচ্ছ করে অথবা ভুলে গিয়ে রাত্রির এগিয়ে যাওয়া দেখতে এসেছিল 'নবজাতকের' দল। রাত্রির জীবনে গতির হিসাব নিতে এসেছিল বিভীষিকাময়ী রাত্রির যাত্রিদল।

ঘরের বাঁধন যাদের কাছে তুচ্ছ নয়, ঘর যাদের পর করে দেয় নি, ঘরের আকুল আহ্বান যাদের বক্ষোদুয়ার থেকে কেঁদে ফিরে যায় নি—সেই ভাগ্যবানেরাই সেদিন প্রতিটি ঘরের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল—উদ্বিগ্ন গৃহবাসীর সকল দুশ্চিন্তার অবসানকল্পে তিনটি আনন্দময় শব্দ—আমরা ভাল আছি। মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়েছি আমরা, তাই আমরা ভাল আছি। মৃত্যুকে দেখেছি জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে—তাই আজও এত বিপর্যয়ের পরেও আমরা ভাল আছি।

দৈবশক্তির মধ্যে শৈব অংশটুকু যেমন অঘটন ঘটায়, অশৈব অংশটুকুও তাই। 'আমরা ভাল আছি'র মধ্যে সেই কথাটাই প্রমাণিত হল। 'আমরা ভাল আছি।' জানিয়ে দিল বিশ্বজগৎকে শিব আর অশিবের দ্বন্দ্ব, জন্ম আর মৃত্যুর খেলা, উদয় আর অস্তের লীলা। মহাসঙঘর্ষের মধ্য থেকে তাই জন্ম নিল এক অপরূপ শান্ত জীবন; ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে তাই আবির্ভাব সম্ভব হল এক নবীন আশার আলোকরশ্মির; তাই তো সম্ভব হল মরণের কাছে জীবনের নির্ভয় প্রত্যাশা।

বিশ্ববিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অন্যতম উদাহরণ—মানুষ। হিংসা-কুটিল, ক্রূর, নিষ্ঠুর, খল মানুষের পাশাপাশি বাস করে দেবোপম পূতচরিত্র, নিঃস্বার্থ, পরহিতব্রতী। দেশ-দেশান্তর ভেদে এদের প্রকৃতিতে প্রভেদ নেই। পর্বতশীর্ষে অথবা সমতল প্রদেশে-ও ভেদ নেই এদের স্বভাবে। এদের জাত-ই আলাদা। ইতিহাসের পাতায় না থাক, মানুষের—বিশেষত বিপন্ন মানুষের মানস-লোকে এরা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধার অধিকারী। মানুষের সেবা-ই এদের ধর্ম; পুরস্কারের প্রতি লোভ নেই, নামের জন্য লালসা নেই, প্রতিদান পাওয়ার সাভিমান আগ্রহ নেই এদের। এরা নিজেরাই বাঁচতে জানে—তা নয়, অপরকেও বাঁচাতে আপন কোলে টানে পরম স্নেহভরে পিতৃতুল্য বাৎসল্যে,—তখন এদের চোখের সামনে থেকে মুছে যায় ধর্ম, সমাজ, জাতি, দেশ; শুধু জেগে থাকে—অসহায়, আর্ত, দুর্গত মানুষের দল।

ন্যালেসিয়ান কলেজের ফাদাররা সত্যিই যেদিন দিশেহারা, প্রকৃতির হাতে একান্ত অসহায়, জীবগুলোকে যেভাবে অপূর্ব মমতায় ও স্নেহে নিজেদের কোলে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাতে তাদের মনে হয়েছিল—দিব্যলোকর জ্যোতির্ময় আত্মা মরলোকে অবতীর্ণ। অলৌকিক কর্মক্ষমতা, অকল্পনীয় সাহস, পরিশুদ্ধ নির্মল চিত্তাকাশের স্বর্গীয় আলো, স্বচ্ছ স্বতোৎসারিত করুণাধারা—দুর্যোগের ঘনঘটাকে এক নিমেষেই যেন ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিল কঠিন প্রস্তরঘেরা গিরিশ্রেণীর বুকে এমন ভালবাসা, এত মমতা, এত স্নেহ-মাধুর্য কেন যে ভগবান দিয়েছিলেন, কে জানে। বৈপরীত্যই সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করে কি না, তাই বা কে বুঝতে পারে। ভাঙা গড়াতেই তো সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে অনাদি কাল থেকে, চলবেও বোধ করি এই পথ বেয়ে অনন্তকাল। তবেই মানুষ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে বলবে—আমরা ভাল আছি।

ভগ্নস্তূপের নীরব কান্না যারা শুনেছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা ফোটে নি মুখে। হারিয়ে যাওয়া মানুষের হারানোটা কতখানি সত্য—সেটা না জানা পর্যন্ত তারা বোবা ও বিবর্ণ হয়েই ছিল। আলোর পথে যারা সঙ্গী ছিল, হাস্য-কলরোলে যারা দিনপ্রান্ত মুখর ও উজ্জ্বল করে রেখেছিল, দৈবের নির্মম আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে তমসাবৃত পথে বিচ্ছিন্নতার রেখা টেনে মনের আকাশ থেকে মুছে ফেলতে চায় নি কেউই তাদের। তাই যখন হারানোর দুঃখটা সত্য ও বৃহদাকার হয়ে দেখা দিল, ম্লান-বিষণ্ণ একখানি মেঘ নেমে এসে বিবশ করে দিল যারা বেঁচেছিল তাদের, কোনক্রমেই তাদের মুখ থেকে চাপা কান্নার স্তর ভেদ করে স্বর বেরিয়েছিল—আমরা ভাল আছি। হ্যাঁ, আমরা যারা কথা বলছি, ভাল আছি। মরিনি আমরা। আমরা ভাল আছি।

যে ঘটনা কুড়ি বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার ঘুরে আসে তা বোধ হয়, ইতিহাস রচনা করে না, ইতিহাসের ছল করে মাত্র।

১৯৫০ সালের জুন মাসে একবার ধস নেমেছিল দার্জিলিঙে। সেবারও মানুষকে বোবা করে দিয়েছিল, মানুষের কণ্ঠ এমনিভাবে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির নির্মম হস্তাবলেপ। দুর্ভাগ্যের সাক্ষী হিসাবে যারা

অবাশি ছিল সেদিন বির্তমান লেখক অন্যান্যরা, তাদের দুর্গতি হয়েছিল সীমাহীন, দিনাতিপাত হয়েছিল দুঃসহ। সভ্যতার সব গর্ব চূর্ণিত হয়েছিল সেদিন প্রকৃতির বিরূপ কটাক্ষে। এ দুর্ভোগের ইতিহাস শোনাবার মত লোক তখন ছিল না। সবার মুখেই হতাশার চিহ্ন আতঙ্কের আবিলতা, নৈরাশ্যের দুর-বগাহ ছায়া। সেবারের দুর্ভোগ কয়েক ঘণ্টার ছিল না, কয়েক দিনের উপর সে পক্ষ বিস্তার করে ফিরেছে। শত-সহস্র আলোকিত জীবনের অকাল-সন্ধ্যা, হাজার হাজার প্রতিশ্রুতিবান ভবিষ্যতের অকাল সমাধি ঘটিয়ে যখন তার শান্তি হল---তখন খুব কম লোকেরই বলার সাহস ছিল---আমরা ভাল আছি।

তবু এর মধ্যে যারা বাঁচতে পেরে-ছিল, যারা সেই দুর্গম পথযাত্রা পার হয়ে আসতে পেরেছে, তারাই এতদিন পরে, দ্বিতীয় একটি দুঃখময় দিনের দুর্গত মানুষদের তাদেরই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করে বলতে পারে—আমরাও ভাল ছিলাম।

সেদিন 'আমরা ভাল আছি' বার্তা আমরাও পৌঁছাতে চেয়েছিলাম দার্জিলিং শহরের বুক থেকে দূর-দূরান্তে। কিন্তু যে শহরের বৈশিষ্ট্যের চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে বিধাতার রুদ্র কোপে, যার সর্ব অঙ্গে মৃতের লক্ষণ, সে কোন্ শব্দকে বাণীরূপ দেবে? অন্যের দান-ই বা গ্রহণ করবে সে কেমন করে? সে তো বলতে পারে নি —আমি ভাল আছি।

আলোহীন নিঃশ্রীক অন্ধকারের গর্ভে বসে যে 'আঁধারের রূপ' আমরা দেখেছিলাম; তা বোধ হয় মরণোত্তর জগতের অন্ধকার দুর্ভেদ্য দুরতিক্রম্য; সীমাহীন, শব্দ বৈচিত্র্যহীন।

তারপর।

অভাব ছিল চতুর্দিকে। নেই নেই রবে চারিধার আচ্ছন্ন হাহাকারে নৈরাশ্যভরা শহরের আকাশ-বাতাস। প্রকৃতিও তখন রিক্ত, অবসন্ন, হতাশা-পীড়িত।

শত-সহস্র অভাব-অভিযোগ শত সহস্রের জন্যই নয়; দুর্ভোগ-দুর্গতিও চিরকালের জন্য নয়। তাই সকলেই একই পথের যাত্রী হলেও সবার জন্য যাত্রাশেষের বিন্দুটি একই জায়গায় থাকে না। কেউ তাই বলতে পারে---আমরা ভাল আছি; কেউ বলতে চায় সে কথা; কারও কণ্ঠ কিছু বলবার আগেই নীরব হয়ে যায়।

তবু মানুষই বলতে পারবে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়ে—

আমরা ভাল আছি।

আমরা ভাল আছি।

আমরা--ভাল--আছি।

সেজুয়ানের রাশিয়ান প্রডাকশনের একটি দৃশ্যে

সেজুয়ানের মহৎ নারী

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

শেন্‌টের তামাকের দোকান
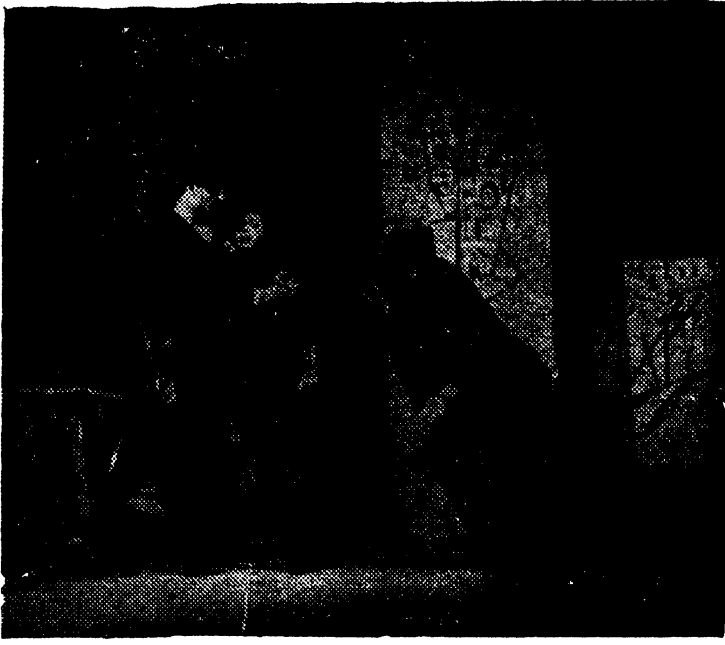
[স্যুইটা দোকানের সামনে একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে—মিসেস সিন সামনের জায়গাটা পরিষ্কার করছে আর সেই সঙ্গে কথা বলে চলছে।]

মিসেস সিন্। মালিকের নামে স্থানীয় লোকেদের কাছে যদি বিশ্রী গুজব রটে যায়, তবে এ ধরণের ছোট ব্যবসা দু'দিনেই উঠে যাবে। শেন্‌টে এবং ইয়াং সুনের মেলা-মেশাটা এমন বিশ্রী এবং রহস্য-জনক হয়ে উঠেছে কি বলব। এই সময়ই আপনার মতো বুদ্ধিমান আর বিবেচক লোকের দরকার। আপনি সহজেই সমস্ত নোংরামিকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিতে পারবেন। আর ভুলে যাবেন না পাশের দোকানের কেশসজ্জাকর মিস্টার স্যুফুকে—বারোটা বাড়ির মালিক ইনি—একবার মাত্র বিয়ে করেছেন, তারও বয়স হয়েছে। আমাকে সেদিন এই ভদ্রলোক ইঙ্গিত দিলেন যে শেনটেকে

বের্টল্ট ব্রেশট

উনি যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখেন, এমন কি তার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও খোঁজ নিচ্ছিলেন। এটাকে ভাগ্যের কথা বলতে হবে বৈকি।

(বাইরে থেকে সুনের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে)

সুন নেপথ্যে। এটা কি মিস্ শেনটের দোকান?

মিসেস সিন। (চীৎকার করে) হ্যাঁ, শেনটের দোকান, তবে এখন এখানে আছেন তাঁর কাজিন মিস্টার স্যুইটা

(সুন ঢুকবে এবং মিসেস সিন পেছনে গিয়ে কাজ করতে থাকবেন)

সুন। আমার নাম হচ্ছে ইয়াং সুন।

(স্যুইটা এবং সুন পরস্পরকে বাও করবে)

সুন। শেনটে বাড়ীতে আছে?

স্যুইটা। না, সে বাইরে গেছে।

সুন। তাই নাকি? যাকগে আপনি বোধহয় আমাদের সম্পর্কটা জানেন। (দোকানটা ভালভাবে দেখে নিয়ে) এ যে দেখছি সত্যিকার ভালো দোকান। আমি ভেবেছিলাম শেনটে দোকান সম্বন্ধে একটু বাড়িয়ে বলেছিল। তাহলে তো আর আমার আকাশবিহারে যাবার কোনো বাধা থাকল না।

(একটা বাক্স থেকে সিগার বার করে ধরিয়ে নেবে)

সুন। আপনার কি মনে হয় এই দোকানটা থেকে আরও তিনশো ডলার পাওয়া যাবে?

স্যুইটা। মশায়ের কি এখনই দোকানটা বেচে দেবার ইচ্ছা?

সুন। কেন? ক্যাশে কি তিনশো ডলার আছে নাকি? (স্যুইটা মাথা নেড়ে বোঝাবে টাকা নেই) শেন্‌টে খুব ভাল মেয়ে। আগেই দুশো ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার যে আরও তিনশো ডলারের দরকার। না পেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

স্যুইটা। তোমাকে টাকাটা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার কাজিন একটু হঠকারিতার কাজ করেছে এজন্যে দোকানটাকে পর্যন্ত ওর বেচে দিতে হতে পারে। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

সুন। টাকাটা এখনি আমার দরকার, —পরে হলে চলবে না। সমস্ত ভেস্তে যাবে। আর আমি জানি আমাকে কোনো কিছু দিতে শেনটের আপত্তি হবে না।

স্যুইটা। তাই নাকি

সুন। অবশ্য এটা সবই তার নিজস্ব ধনে।

সুইটা। আচ্ছা, আমি যদি জিজ্ঞেস করি, এই পাঁচশো ডলার কিভাবে খরচ করা হবে?

সুন। নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন। পিকিং এর এয়ারপোর্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হচ্ছেন আমার বন্ধু। ফ্লাই স্কুলে আমরা দুজনে একই সময় ছাত্র ছিলাম। পাঁচশো ডলার পেলে সে আমাকে চাকরিটা জোগাড় করে দেবে।

সুইটা। এত টাকা সে দাবি করছে?

সুন। আর একটা দিকও তো ভাবতে হবে। একজন অত্যন্ত বিবেকসম্পন্ন পাইলটকে কর্তব্যবোধ অবহেলার ছুতো দেখিয়ে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। এই লোকটার আয়ের ওপর নির্ভর করে সংসার চলছে অনেকগুলো প্রাণীর। এই লোকটাকে সরিয়ে আমার বন্ধু আমার চাকরির ব্যবস্থা করবে—এই জন্যে তার দায়িত্বও যেমন বড়, সেই জন্যে সে বড় অঙ্কের টাকাও হেঁকেছে। যাকগে এ সব কথা আপনার আমার মধ্যে থাকাই ভাল। শেনটেকে কিছু বলবেন না।

সুইটা। হ্যাঁ, না বলাই বোধহয় ভাল। কিন্তু একটা কথা—তোমাকে যে তোমার বন্ধু একমাস বাদে এইভাবেই পথে বসাবে না কে বলতে পারে।

সুন। না না। সে কখনও সম্ভব? —সে হল আমার বন্ধু লোক।

সুইটা। আমার মনে হয় তুমি অসম্ভব-রকম বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাইছ। তাছাড়া মিস্টার ইয়াং সুন, তুমি আমার কাজিনকে তার এই ছোট্ট ব্যবসাটা বেচে দিয়ে, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে তোমার ওপর নির্ভর করতে অনুরোধ করছ। তোমার আসল উদ্দেশ্য কি? তুমি কি শেনটেকে বিয়ে করবে?

সুন। সেজন্য আমি প্রস্তুত হবো।

সুইটা। এটা কি খারাপ [illegible] নয়, যে সামান্য কিছু টাকার জন্যে আমার কাজিনের এই ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বিক্রি করবার গরজ দেখলে লোকে ঝোপ বুঝে কোপ মারবার চেষ্টা করবে। ফলে দামও বিশেষ উঠবে না। যে দুশো রূপোর ডলার তুমি পেয়েছ সেটা দিয়ে দোকানের ভাড়া দেওয়া যায়। তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে না অন্য কোনো কাজে না গিয়ে এই দোকানের ব্যবসাটা চালাতে?

সুন। কি যে অদ্ভুত কথা বলেন মশায়। লোকে দেখলে কি ভাববে? পাইলট ইয়াং সুন কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে তামাক বেচবে?

সুইটা। আকাশবিহারটাই তাহলে বিংশ শতাব্দীর একমাত্র সম্মানজনক বৃত্তি বল?

সুন। (পকেট থেকে চিঠি বার করে) ওরা আমাকে প্রতি মাসে মাইনে দেবে আড়াইশো ডলার করে। এই যে ওদের চিঠিটা দেখুন—টিকিটের ওপর পিকিং-এর পোস্ট মার্ক রয়েছে।

সুইটা। আড়াইশো ডলার। সে তো অনেক টাকা।

সুন। আপনি কি ভাবছিলেন আমি বিনে মাইনেয় ওদের কাজে ঘুরে বেড়াবো?

সুইটা। মনে হচ্ছে কাজটা ভালই। মিস্টার ইয়াং সুন। আমার কাজিন আমাকে অনুরোধ করেছে, তোমাকে তোমার এই বহু আকাঙ্ক্ষিত কাজটা পেতে সাহায্য করতে। তার এই আন্তরিক ইচ্ছাতে বাধা দেবার মতো কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। নরনারীর স্বর্গীয় প্রেমের আনন্দ থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে চাই না। ওই যে বাড়িওয়ালী মিসেস মিৎসু আসছেন—দোকান বিক্রির ব্যাপারে ওঁর পরামর্শ নেওয়া যাক।

মিসেস মিৎসু। (ভিতরে ঢুকে) সুপ্রভাত মিস্টার সুইটা। কাল বাদে পরশু বাড়ি ভাড়া দিতে হবে—সে বিষয়ে পরামর্শ করতে চান নাকি?

সুইটা। মিসেস মিৎসু, এখন এমন একটা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যার ফলে দোকানটা আর শেনটে চালাবে কি না, ঠিক করতে পারছে না। শেনটে এখন বিয়ে করবার কথা ভাবছে। এই তার ভাবী স্বামী মিস্টার ইয়াং সুন। সুন ওকে পিকিং নিয়ে যাবে। সেখানে ওরা নতুন জীবন সুরু করতে চায়। ভাল দাম পেলে তামাকের এই দোকানটা আমি বেচে দেব।

মিসেস মিৎসু। কত টাকা চান আপনি?

সুন। নগদ তিনশো ডলার।

সুইটা। (বাধা দিয়ে) না না, পাঁচশো রূপোর ডলার।

মিৎসু। (সুনের প্রতি) মনে হয় আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব, তোমাদের এই দোকানের মাল কিনতে কত খরচ পড়েছিল?

সুইটা। আমার কাজিন হাজার রূপোর ডলার দিয়ে দোকানটা কিনেছিল। যা স্টক ছিল তার থেকে এখন পর্যন্ত অতি অল্পই বিক্রি হয়েছে।

মিসেস মিৎসু। হাজার রূপোর ডলার বল কি? তোমার বোনকে ঠকিয়েছে। আমি প্রস্তাব করছি। পরশু যদি এখান থেকে চলে যেতে রাজী হও, তাহলে মালপত্রসহ দোকানটার জন্যে তোমাকে তিনশো রূপোর ডলার দিতে পারি।

সুন। খুব ভাল প্রস্তাব—আমি রাজী।

সুইটা। এ অত্যন্ত কম দাম।

সুন। যথেষ্ট যথেষ্ট—

সুইটা। পাঁচশো ডলারের কমে হবে না।

সুন। কেন হবে না?

সুইটা। (মিৎসুকে) আমার কাজিনের

ভাবী স্বামীর সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করে নিই। (একান্তে সুনকে) এ দোকানের সমস্ত মাল এক বৃদ্ধ দম্পতির কাছে দুশো রূপোর ডলার দিয়ে বাঁধা আছে। সেই দুশো রূপোর ডলারই কালকে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সুন। (ধীরে ধীরে) এ সম্বন্ধে লিখিত ভাবে কিছু আছে কি?

সুইটা। না।

সুন। (একটু থেমে মিসেস মিৎসুকে) তিনশো ডলার হলেই আমাদের চলবে।

মিৎসু। কিন্তু আমার জানা দরকার এই ব্যবসাটার দরুণ কোনো ধার বা অন্যের পাওনা টাকা আছে কি না?

সুন। (সুইটাকে) উত্তর দিন।

সুইটা। সে রকম কোনো ধার নেই।

সুন। কবে তিনশো ডলারটা পেতে পারি?

মিৎসু। কাল বাদে পরশু। কিন্তু তার আগে ভাল করে ভেবে দেখ। একমাস বাদে দোকানটা বিক্রি করলে অনেক বেশী টাকা পাবে। আমি তিনশো ডলার দিতে রাজী। আর তার একমাত্র কারণ—এই তরুণ-তরুণীর ব্যাপারে আমি ওদের সাহায্য করতে চাই।

(মিসেস মিৎসু চলে যাবে)

সুন। দুদিন বাদে বিক্রি করলে বোধ হয় আরও ভাল দাম পাওয়া যাবে। আর সেক্ষেত্রে ধার করা দুশো ডলারও শোধ করে দিতে পারব।

সুইটা। এ সময় তিনশো ডলারের বেশি দাম কিছুতেই উঠবে না। তোমাদের দুজনের টিকিট কেনার এবং কিছুদিন চলবার মতো টাকা তোমার কাছে আছে তো?

সুন। চিন্তা করবেন না। যে করেই হোক পিকিং-এ পৌঁছবই।

সুইটা। দুজনের টিকিটে কিন্তু যথেষ্ট খরচ লাগবে।

সুন। দুজন? শেনটে এখন এখানে থাকবে। প্রথমটায় ওকে নিয়ে গেলে ও তো আমার বোঝাবিশেষ হয়ে দাঁড়াবে।

সুইটা। তোমার কথাটা বুঝতে পারছি কিন্তু আমার কাজিন কি ভাবে তার খাওয়া-পরা চালাবে?

সুন। আপনি তার ভার নিতে পারেন না?

সুইটা। দেখি কি করা যায়। (একটু থেমে) মিস্টার ইয়াং সুন ওই দুশো রূপোর ডলার আমাকে ফেরৎ দাও। পিকিং-এর দুটো টিকিট কিনে আমাকে দেখিয়ে টাকাটা নিয়ে যেও।

সুন। প্রিয় কাজিন, আমার একটা কথা শুনুন—নিজের চরকায় গিয়ে তেল দেবার ব্যবস্থা করুন।

সুইটা। সমস্তটা শুনলে সে দোকান বিক্রি করতে রাজী না-ও হতে পারে।

সুন। আমি বলছি সে রাজী হবে

সুইটা। তুমি কি মনে কর আমি না করলেও—

সুন। আপনি নেহাৎ গোবেচারী।

সুইটা। ভুলে যেয়ো না সেও রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ।—তারও একটা নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে।

সুন। (মৃদু হেসে) আমার সত্যিই আশ্চর্য লাগে যখন পুরুষেরা মনে করে তাদের সংসারের যুবতী মেয়েদের যুক্তি দিয়ে তারা সব কিছু বুঝিয়ে দেবে। মেয়েরা যখন প্রেমে পড়ে তখন কোনো যুক্তি দিয়েই তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাদের সমস্ত বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, যুক্তি সব লোপ পেয়ে যায়। বুঝলেন? শুনুন, আমাদের বিয়েতে আপনি বাধা দিতে পারবেন না। আর সেই সঙ্গে তিনশো রূপোর ডলারও সে আমাকে এনে দেবে—আচ্ছা আমি চললাম। [প্রস্থান।

(দোকানের পেছন দিক থেকে মিসেস সিন এগিয়ে আসবে)

মিসেস সিন। কি বিশ্রী ব্যাপার। আরে সারা শহরের লোক এখন জানে যে এই হতভাগা শেনটেকে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলেছে।

সুইটা। (কেঁদে উঠে) সব নষ্ট হয়ে গেল—দোকানটা উঠে যাবে। সুনও সত্যিকার প্রেমিক নয়—ও ওর নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত।

মিসেস সিন। আমার মনে হয় নাপিত সু-ফুকে ডেকে আনি—ওর সঙ্গেই কথা বলে ফেলুন—আপনার কাজিনের ওই হচ্ছে যোগ্য পাত্র।

[মিসেস সিন চলে যাবে এবং সুফুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে নিজে সরে যাবে]

সুইটা। আমি খবর পেলাম আমার কাজিন শেনটেকে আপনার ভাল লাগে—তাই আপনাকে জানাচ্ছি। ও বড় বিপদে পড়েছে।

সুফু। তাই নাকি?

সুইটা। কয়েক ঘণ্টা আগে যে ছিল দোকানের মালিক এখন তার অবস্থা পথের ভিক্ষুকের থেকে খুব ভাল নয়। মিস্টার সুফু, দোকানটা দেনার দায়ে একরকম বিকিয়ে যাচ্ছে।

সুফু। মিস্টার সুইটা, আপনার ভগ্নী আমাকে মোহিত করেছেন তাঁর অন্তরের মহত্ত্ব দিয়ে—দোকানের জাঁকজমক থাক বা না-থাক, সেটা আমার কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আশে পাশের লোকজনেরা আপনার কাজিনের কি নামকরণ করেছেন জানেন? দি এঞ্জেল অব দি স্লামস্।

সুইটা। এই মহত্ত্বের কি দাম দিতে হয়েছে আমার কাজিনকে জানেন? একদিনে দু'শো ডলার। প্রত্যেক ব্যাপারেই একটা সীমা-পরিসীমা থাকা দরকার।

সুফু। আমি বলি কি সেই সীমা-পরিসীমার গণ্ডীটা উঠিয়ে দেওয়া যাক। শেনটের স্বভাবটা হচ্ছে

সুন্দর, মহৎ এবং নিষ্পাপ। প্রত্যেক দিন সকালে সে যেখানে চারজনকে ক্ষুধার অন্ন দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে দেয়, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়, যদি এমন বন্দোবস্ত করা যায় যে, সে স্বচ্ছন্দে চারশো লোককে খাওয়াতে পারবে তবে কেমন হয়? শুনলাম গৃহহারা কয়েকজন লোকের থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্যে সে মরীয়া হয়ে উঠেছে। ওই তো কিছুটা এগিয়ে গেলেই আমার কয়েকটা বাড়ি খালি পড়ে আছে। শেন্‌টে ইচ্ছা করলেই ওগুলো ব্যবহার করতে পারে। শেনটে সম্বন্ধে আমার মনোভাবের কথা নিশ্চয় আপনার অজানা নেই—আপনার ভগ্নী কি আমার প্রস্তাবে রাজী হবেন?

সুইটা। মিস্টার সুফ্, আপনার প্রস্তাব নিশ্চয় সে মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

[ওয়াং ও পুলিশ অফিসার ঢুকবে। সুফু দোকানে ঢুকে জিনিষপত্র দেখায় মনোযোগ দেবেন]

ওয়াং। মিস শেন্‌টে এখানে আছেন?

সুইটা। না।

ওয়াং। আমি ভিস্তী ওয়াং। আপনি বোধহয় মিস্টার সুইটা?

সুইটা। ঠিকই ধরেছ। সুপ্রভাত ওয়াং।

ওয়াং। আমি শেন্‌টের বন্ধু।

সুইটা। আমি জানি তোমাদের বন্ধুত্ব অনেক কালের।

ওয়াং। (পুলিশ অফিসারকে) দেখছেন তো? আমি আমার আহত হাতের ব্যাপারটা নিয়ে এসেছি।

পুলিশ। এটা সত্যিকথা যে, ওর হাতটা অকেজো হ'য়ে গেছে।

ওয়াং। নাপতে ব্যাটা যে আমাকে মেরেছিল তার সাক্ষী একমাত্র শেন্‌টে।

পুলিশ। ওয়াং বলছে যে আপনার কাজিন স্বচক্ষে দেখেছেন যে, নাপিত সুফু ওকে ডাণ্ডা দিয়ে বেদম পিটি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?

সুইটা। আমি যা জানি তা হচ্ছে, যে সময় মারামারিটা হয়, সে সময় আমার কাজিন সেখানে ছিল না।

ওয়াং। কোথাও একটা ভুল বোঝা-বুঝি হয়েছে—শেন্‌টে আসুক—সেই বলিয়ে বলবে আমার কথা সত্যি কি না।

সুইটা। মিস্টার ওয়াং, আপনি বলছেন আপনি আমার কাজিনের বন্ধু। আমার কাজিন এখন নানা ধরণের বিপদ-আপদ নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত রয়েছেন। নানাভাবে নানা লোক এসে তাঁকে এত রকম-ভাবে 'এক্সপ্লয়েট' করছে যে আর কোনোরকম দুর্বলতা দেখালে এবার তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি মনে করি আপনার কেস-এ মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যে অনুরোধ করে আপনি তার সর্বনাশ করবেন না।

ওয়াং। কিন্তু সেই তো আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে বলেছিল।

সুইটা। কেন, ম্যাজিস্ট্রেট কি আপনার হাতের চিকিৎসা করবেন বলে ঠিক হয়েছিল?

পুলিশ। ম্যাজিস্ট্রেট নাপিত সুফুকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করবেন বলেই বোধহয় ওখানে গিয়েছিল।

(মিঃ সুফু ঘুরে দাঁড়াবেন)

সুইটা। মিস্টার ওয়াং, বন্ধুদের গোলমালে মাথা গলাতে আমি ভালবাসি না।

(সুইটা এবং সুফু পরস্পরকে বাও করবে)

পুলিশ। তার মানে হচ্ছে এখানে আমার আর কোনো কাজ নেই। (ওয়াংকে) দেখতে পাচ্ছি মিছি-মিছি এক ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে নালিশ করে তাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিলে। (ওয়াং বিষণ্ণভাবে মাথা নোয়াবে) ভবিষ্যতে এ ধরণের নালিশ করবার আগে একটু ভেবেচিন্তে কাজ কোরো, মিঃ সুফু ইচ্ছা করলে তোমার বিরুদ্ধে ডিফামেশন কেস করতে পারেন জান?

সুইটা। উনি এবারের মত ওকে ক্ষমা করে দিলেন, কি বলেন মিঃ সুফু?

সুফু। আপনি যখন বলছেন।

পুলিশ। (ওয়াংকে) তুমি সরে পড়ো এখান থেকে। (ওয়াং বেরিয়ে যাবে) আপনি কিছু মনে করবেন না মিঃ সুফু।

সুফু। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।

(পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যাবে)

সুইটা। বুঝলেন মিঃ সুফু, আপনার সঙ্গে যে সব কথা হল, আমার কাজিনকে গিয়ে বলছি। এই দোকানটা সম্বন্ধে সে বড়ই চিন্তিত। এটাকে সে দেবতাদের থেকে পাওয়া উপহার বলে মনে করে। আপনি দু-চার মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি ভেতর থেকে আসছি।

(ভেতরে চলে যাবে।)

মিসেস সিন। (ভেতরে থেকে বেরিয়ে এসে) আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারি?

সুফু। তা পারেন। মিসেস সিন, শেন্‌টের পোষাদের আজ রাত্রের আগেই খবর দেবেন—আমার ওই দিককার বাড়িগুলোতে আমি ওদের থাকবার ব্যবস্থা করবো।

মিসেস সিন। (হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে) আপনি যেমনটা চেয়েছিলেন, সেইভাবেই সব হয়েছে তো?

সুফু। আচ্ছা মিসেস সিন, ইয়াং সুন সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

মিসেস সিন। ও একটা কুঁড়ে, নোংরা—

সুফু। যেতে দিন। ওকি আবার একটা মানুষ। ওর কথা আমি ধরিই না।

(স্নুনের প্রবেশ)

স্নুন। এখানে কি সব ব্যাপার হচ্ছে?

মিসেস সিন। মিস্টার স্মুফু, আপনি যদি বলেন তো মিস্টার স্নুইটাকে ডেকে আনি। অপরিচিত লোকেরা এসে দোকানের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করবে, এ সব মিস্টার স্নুইটা পছন্দ করেন না।

স্মুফু। মিস শেন্‌টে মিস্টার স্নুইটার সঙ্গে বসে কি নিয়ে পরামর্শ করছেন—এখন ওখানে না যাওয়াই ভাল।

স্নুন। শেন্‌টে ভেতরে আছে? কিসের পরামর্শ হচ্ছে? আমাকে বাদ দিয়ে শেন্‌টে আবার কি আলোচনা করতে বসেছে।

(ভেতরে যেতে চেষ্টা করবে—স্মুফু বাধা দেবে)

স্মুফু। একটু ধৈর্য করতে হবে মশায়। আপনি কে আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি মিস শেন্‌টে এবং আমার বিয়ের কথা-বার্তা একরকম পাকাপাকি হয়ে গেছে।

স্নুন। কি বললেন?

মিসেস সিন। এ কথা শুনে খুবই অবাক লাগছে বুঝি?

(শেনটে এসে ঢুকবে)

স্মুফু। আচ্ছা শেন্‌টের মুখ থেকেই শুনুন।

স্নুন। ব্যাপার কি শেন্‌টে? এরা কি বলছে জান? তুমি নাকি এই লোকটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

শেন্‌টে। স্নুন, আমার কাজিন এবং মিস্টার স্মুফু কথাবার্তা বলে এই ঠিক করেছেন। মিস্টার স্মুফু বলেছেন আমাদের বিয়ের পর আমার সমস্ত আশ্রিতদের তিনি সাহায্য করবেন। আমার কাজিন তোমার সঙ্গে আমাকে মিশতে পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছেন।

স্নুন। তুমি তার কথায় রাজী হয়েছ?

শেন্‌টে। হ্যাঁ। রাজী হয়েছি।

(একটু থেমে স্নুন ফের বলবে)

স্নুন। ওরা বোধ হয় বলেছে আমি বদচরিত্রের লোক?

(শেন্‌টে চুপ করে থাকবে)

স্নুন। হয়তো কথাটা সত্যি। আর সেই জন্যেই তো আমার তোমাকে দরকার। আমি একটা খুব আদর্শ চরিত্রের লোক নই। আমার না আছে টাকা পয়সা, না আছে ভদ্রতাবোধ। কিন্তু 'আই ক্যান পুট আপ এ ফাইট'। ওরা তোমার সর্বনাশ করতে চাইছে শেনটে। (এগিয়ে ওর কাছে গিয়ে) ওই লোকটার দিকে একবার নজর করে দেখো। ও কি তোমার স্বামী হবার যোগ্য। আমি মানছি ওর টাকা আছে, কিন্তু টাকাটাই কি সব? আমি না থাকলে তুমি ওকেই নিশ্চয় বিয়ে করতে?

শেন্‌টে। তা করতাম।

স্নুন। যাকে ভালবাস না তাকেই বিয়ে করতে?

শেন্‌টে। তা করতাম।

স্নুন। তোমার আমার প্রথম আলাপের দিনটা কি ভুলে গেলে? আমি মরতে চাইছিলাম—তুমি বাধা দিলে?

শেন্‌টে। (কাঁপতে কাঁপতে) তুমি কি চাও?

স্নুন। আমার সঙ্গে চলে এস।

শেন্‌টে। মিস্টার স্মুফু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি স্নুনের সঙ্গে চলে যাচ্ছি।

স্নুন। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। চল শেন্‌টে।

স্মুফু। কিন্তু এ তো ভুলিয়ে সরল শেন্‌টেকে নিয়ে আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন। (চিৎকার করে) মিস্টার স্নুইটা।

স্নুন। ওকে চিৎকার করতে বারণ করো।

শেন্‌টে। দয়া করে আমার কাজিনকে ডাকবেন না। এ বিষয়ে ওঁর মতের সঙ্গে আমার মত মিলছে না—আর এখন বুঝতে পারছি যে, আমার মতটাই ঠিক।

(দর্শকদের প্রতি)

I would go with the man
whom I love.
I would not reckon
what it costs me.
I would not consider
what is wiser.
I would not know
whether he loves me.
I would go with the man
whom I love.

[স্নুন এগিয়ে গিয়ে ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে দুজনে ধীরে ধীরে চলে যাবে]

।। যবনিকা ।।

[ক্রমশ।

অনুবাদক—অশোক সেন

খুলে রেখো দ্বার

লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা খুলে রেখো গৃহদ্বার—
কে জানে কখন কে এসে পড়ে:
অমারাত্রির কালো ঝড়,
যখন গগন অন্ধকার।

কোথায় কাহার ভেঙেছে নীড়,
অভাগী বিহগী আশ্রয়হারা;
পথে পথে তারা ঘুরে হলো সারা,
বন্যা যেথায় ভাসায় তীর।

তাহাদের তরে বলি বার বার—
শোনো শোনো, ওগো গৃহস্থ,
যার যাহা আছে দাও সমস্ত
খুলিয়া রেখো হৃদয় দ্বার।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তার মনে হচ্ছিল আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে আসছে। সাবানের ফেনায়-ফেনায় আচ্ছন্ন শীর্ষেন্দুর মুখ। আয়নায় তার যে প্রতিবিম্ব কাঁপছিল, তা কতকটা তুলোর পুতুলের মতন। চোখ দুটোও এখন যেন কাচের, কৃত্রিম—ঠেলে ঠেলে জোর করে বসানো।

শীর্ষেন্দু গালে ক্ষুরের চাপ অনুভব করছিল। এই রকম দাড়ি কামাবার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করবার সময় একটি দুর্ঘটনার কথা কিছুদিন আগে শুনেছিল শীর্ষেন্দু। শুনেছিল, কি কোন কাগজে পড়েছিল—এখন তার মনে পড়ল না।

একজন মানুষের গালের কিছু মাংসপিণ্ড বৈদ্যুতিক ক্ষুর ছিঁড়ে দিয়ে দাঁতের মাড়ি দেখা যাচ্ছিল—স্পষ্ট, বীভৎস। রক্ত পড়ছিল। এবং সেই মানুষ, সে হঠাৎ ভূতের মতন দেখতে হয়ে গিয়েছিল—চিৎকার করছিল।

এত কথা শীর্ষেন্দু শোনে নি, পড়েও নি। আয়নায় নিজের সফেন প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে একটা মানুষের বিকৃত, ভয়ঙ্কর চেহারা সে আপনা আপনি কল্পনা করে নিতে পারছিল। এবং ভাবছিল, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরে তার চেহারাও সেইরকম অদ্ভুত হয়ে উঠতে পারে।

মানুষের চেহারা সে কত অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে অন্যরকম হয়ে যায় তা জানে শীর্ষেন্দু। সে নিজেই তো কেতকীকে চিনতে পারে নি। কেতকী প্রথমে ছিল তার পাশে। পরে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করবার জন্যে মিনকুকে সামনের সীটে বসিয়ে নিজে পিছনে চলে গিয়েছিল।

সেটাও সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধ। এই রকম সকাল। আকাশে সাবানের ফেনার মতন মেঘ—সাদা, ঘন,—রোদের হাল্কা ছোঁয়ায় আয়নায় প্রতিবিম্বের মতন চকচক করছিল। আর নিচে, এই মর্ত্যে পিচঢালা টানা রাস্তার ধারে দূরে-দূরে কখনো কখনো ধান ক্ষেতে কিম্বা ঝোপে ঝাড়ে ও ছোট বড় গাছের মাথার উপরে শরৎ ঋতু অবাধে ফুটে উঠেছিল।

এবং ফাঁকা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডও অবাধে শীর্ষেন্দুকে আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্কেত জানাচ্ছিল। স্টিয়ারিং শক্ত করে চেপে এক-একবার মিনকুকে দেখছিল শীর্ষেন্দু এবং গাড়ির ছোট আয়নায় কেতকীর মুখের সে প্রতিবিম্ব কাঁপছিল তাও দেখছিল। কেতকীর মুখে সাবানের ফেনা ছিল না। বড় কমনীয়। বিকৃতির কোন সঙ্কেত কি পূর্বাভাস সে মুখের কোথাও ছিল না। শীর্ষেন্দু থেকে থেকে দেখছিল অতি প্রসন্ন একটি মুখ—অতি নিরাপদ।

শান্তিনিকেতন থেকে কেনা কতকগুলো বেতের ঝুড়ির ঠাসাঠাসিতে গাড়ির দরজার একেবারে কাছে সরে এসেছিল কেতকী, শীর্ষেন্দুর ঠিক পিছনেই, আয়নায় মুখোমুখি। সম্ভবত সেও দেখছিল তার প্রতিবিম্ব, কেন না শীর্ষেন্দু অনেকবার লক্ষ্য করেছিল তার দৃষ্টি আয়নার উপরেই। টুকরো-টুকরো কিছু কিছু কথাও ওরা বলছিল পরস্পরকে—শান্তিনিকেতন স্বর্গের মতন, ছুটি না ফুরোলে আর কিছু দিন থাকা যেত—এই রকম সব আলোচনা হু-হু হাওয়া কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

তারপর হঠাৎ সতর্ক এবং তৎপর হয়ে উঠেছিল শীর্ষেন্দু। ঘন ঘন হর্ণ টিপছিল, হাত নেড়ে বার বার সঙ্কেত জানাচ্ছিল লরী ড্রাইভারকে আরো বাঁ দিক ঘেঁষে যেতে।

একটা লরী হুড়-মুড় করে আসছিল বিপরীত দিক থেকে। শীর্ষেন্দুর গাড়ির খুব কাছে এসে পড়ছিল। আরো কাছে। যথাসম্ভব বাঁ দিকে ঘেঁষে এসেছিল শীর্ষেন্দু। আর জায়গা ছিল না। সে স্পীডও কমিয়ে দিয়েছিল। এবং তার মনে হয়েছিল তারা নিরাপদ—লরীটা বেরিয়ে যাবে ঠিক।

কিন্তু কিছু পরেই বিশ্রী রকমের একটা শব্দ উঠেছিল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তার গাড়ি ছিটকে পড়েছিল অনেকটা—একেবারে উল্টে গিয়েছিল। দরজা খোলা। শীর্ষেন্দুর শরীরের কিছু অংশ বাইরে, মাথা ভিতরে—সীটের নিচে। মিনকু মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়েছিল তার বুকের ওপর।

পিঠ ঘষে ঘষে বেরিয়ে এসেছিল শীর্ষেন্দু মিনকুকে নিয়ে। তার মাথার মধ্যে নাগরদোলা থেকে নেমে আসার মতন শুধু ঘূর্ণনের একটা অনুভূতি হচ্ছিল। সম্ভবত মিনকুরও তেমন—বিমূঢ়, স্তব্ধ। আর কিছু না।

বেতের ঝুড়িগুলো কেতকীকে ঢেকে রেখেছিল গাড়ির ভিতরেই। দরজা বন্ধ। কাচ ভাঙা। লরীর খুব চোখা একটা লোহা কেতকীর গাল

এ-কোঁড় ও-কোঁড় করে দিয়েছিল। একটা অক্ষিকোটর শূন্য, রক্তের ধারায় লাল—চোখের মণি পড়েছিল খুড়ির ওপর। দাঁতের পাটি বে-আব্রু, ভয়ঙ্কর।

শীর্ষেন্দু দেখল। গাড়ির ছোট আয়নায় যে কমনীয় মুখ প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল তা আবার দেখল। বেদনা ও বিস্ময়—এই সব অনুভূতি যে আর্তনাদ ফেনিয়ে তুলছিল শীর্ষেন্দুর বুকের ভিতরে, তার গলা ঠেলে তা আর উঠল না গলা শুকনো-শুকনো, জ্বলছিল।

সেই আর্তনাদ মিশে থাকল শীর্ষেন্দুর রক্তকণিকায়। এইরকম শরৎ—এই রকম সকাল। দাড়ি কামাবার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ঠেলে রাখল শীর্ষেন্দু। তার কাজ হয়ে গিয়েছিল। গাল এখনো অক্ষত। দাঁতের মাড়ি দেখা যাচ্ছে না। তা হলেও এখনো একটা আতঙ্ক শীর্ষেন্দুর মন জুড়ে ছিল।

আয়নার ঠিক ওপরেই সুন্দর করে বাঁধানো একটা ছবি। কেতকী আর শীর্ষেন্দু। সে তা দেখল অনেক সময় নিয়ে। এবং পরে, ঠাণ্ডা একটা নিশ্বাস ফেলে বাইরে এল।

॥ দুই ॥

মিনকুর ইস্কুল পৌনে নটায়। তার জন্যেই কিছু আগে বেরুতে হয় শীর্ষেন্দুকে। মিনকুকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে সে সোজা অফিসে চলে আসে। তার অফিস আরো অনেক পরে, দশটায়। মিনকুর যখন ছুটি হয়, দুপুর তিনটেয় —তখন শীর্ষেন্দুর আসবার আর সময় হয় না। ড্রাইভার আসে গাড়ি নিয়ে। একা ড্রাইভারের সঙ্গে মিনকুর মতন ছোট মেয়েকেও ছাড়তে শীর্ষেন্দুর ভরসা হয় না। তার আয়া ইস্কুলে আগেই এসে পৌঁছয়। সেও থাকে ড্রাইভারের সঙ্গে।

মিনকুকে দেখাশোনা করবার জন্যে সুমনা এখনো আছে বলে তবু অনেকটা নিশ্চিন্ত শীর্ষেন্দ। সে আছে

একটা লোক মহুয়ার ঠিক পিছনের টেবিলে অনেকটা জায়গা নিয়ে বসেছিল

মিনকুর জন্মের সময় থেকেই। প্রায় সাত বছর। কেতকী তাকে ভালবাসত, বিশ্বাস করত। শীর্ষেন্দু যদিও ততখানি বিশ্বাস রাখতে পারে না ঝি-চাকরের ওপর, কিন্তু কিছু সময় নির্ভর না করলেও চলে না—অন্তত মিনকু যতক্ষণ একা বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ।

শীর্ষেন্দু মিনকুর গলা পাচ্ছিল। বাথরুমে সে সুমনার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে। রোজই তার স্নানের সময় এই রকম হয়। সে নিজে স্নান করবে ঠাণ্ডা জলে—সুমনা ছাড়বে না, কিছু গরম জল মিশিয়ে দেবে—তাকে স্নানও করিয়ে দিতে চাইবে। মিনকুর জেদাজেদি, কান্না। তার পর 'বাবা বাবা' বলে চিৎকার।

আজ তাকে ডাকবার আগেই শীর্ষেন্দু মিনকুর গলা পেয়ে বাথরুমের কাছে এসে দাঁড়াল এবং ভিতরে মিনকুর দাপাদাপির কথা ভেবে আপন মনেই হাসল। কেতকীর মৃত্যুর পর পুরো একবছর পার হয়ে গেল। এই সময়ের ভিতর অনেক বেড়েছে মিনকু—শীর্ষেন্দুর কাছে প্রশ্রয় পেয়ে-পেয়ে আরও দুরন্ত হয়েছে—অস্থির এবং চঞ্চল।

সুমনার সাধ্য নেই মিনকুকে সামলে রাখবার। শীর্ষেন্দু বাড়িতে যখন থাকে না তখন যদিও সে কিছু শান্ত, বাধ্যও—শীর্ষেন্দু থাকলে সুমনাকে কাছেই ঘেঁসতে দেয় না মিনকু, তার কোন কাজ তাকে করতে দেয় না—সব করতে হবে শীর্ষেন্দুকে। জুতো মোজা, ইস্কুলের ইউনিফর্ম—তাও পরিয়ে দিতে হবে।

'মিনকু—' বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে শীর্ষেন্দু নরমস্বরে ডাকল, 'আর না। এবার বাইরে এস। ইস্কুলের দেরী হয়ে যাবে কিন্তু—'

শীর্ষেন্দুর গলা শুনে বাথরুমের দরজা জোর করে খুলল মিনকু, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কান্না কান্না গলায় বলল, 'সুমনাদি' আমাকে কিচ্ছু করতে দিচ্ছে না বাবা, ওই তো দেরী করিয়ে দিচ্ছে—'

সুমনাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলে শীর্ষেন্দু তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিল। তার ভয় হল, ঠাণ্ডা লেগে মিনকুর অসুখ হতে পারে। সে বলল, 'মিনকু, আমি তোমায় চান করিয়ে দি এস—'

'না, বাবা। আমি নিজে করতে পারব, তুমি দেখ না।'

শীর্ষেন্দ গরম জলের কেটলি তুলে নিয়ে বালতির কাছে এগিয়ে যেতেই মিনকু তার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'না বাবা—'

'একটু গরম জল নাও, শীত লাগবে—'

মিনকু হেসে বলল, 'আমার খুব গরম লাগছে বাবা, দেখছ না

ঘাম হচ্ছে? সুমনাদি জোর করে খালি-খালি এত্ত গরম জল মিশিয়ে দেয়—আমার গা পুড়ে যায় বাবা।'

শীর্ষেন্দু মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ' পরে বাথরুমের ছোট আলনায় সে মিনকুর ফ্রক, জাঙিয়া, তোয়ালে দেখল। তাকে সাবান, পাউডার পাফ, চিরুণী, ব্রাশও ছিল। সেসব দেখে সে হাসল, 'একটু গরম জল বালতিতে ঢেলে দি, তার পর তুমি নিজে-নিজে চান কর। সবসুদ্ধ চার মগ জল ঢালবে কিন্তু। দু মগের পর সাবান মাখবে—'

মিনকু বলল, 'সাত মগ জল বাবা। আমার বয়েস সাত কি-না। সুমনাদি' রোজ আমাকে সাত মগ জল নিতে দেয়—'

'তবে ঝগড়া কর কেন তার সঙ্গে?' শীর্ষেন্দু হালকাস্বরে বলল, 'বড় দুষ্টু হয়েছ তুমি মিনকু, সুমনার কথা একটুও শোন না।'

'আমি বড় হয়েছি তো। সব নিজেই করতে পারি। সুমনাদি ভাবে, আমি কিছু করতে পারি না। সুমনাদি বড় বোকা, না বাবা?'

মিনকু শীর্ষেন্দুর কথামতন জল ঢালল, সাবান মেখে স্নান করল। শীর্ষেন্দুর পায়জামা কিছু ভিজল, জলের ছিটে লাগল গায়ে, মাথায়। সে তোয়ালে দিয়ে মিনকুর গা হাত-পা মুছে দিল, বুকে অনেক পাউডার ঘষে ফ্রক পরাল। এবং পরে, শোবার ঘরে এসে তার জুতো মোজা টেনে, চুল আঁচড়ে, মাথায় সাদা রিবন পর্যন্ত বেঁধে দিল।

সে-ঘরেই কিছু দূরে দাঁড়িয়ে শীর্ষেন্দুর অপার ধৈর্যের পরিচয় পাচ্ছিল সুমনা। তাকে রোজই সে এইরকম করতে দেখে। তাহলেও সে এগিয়ে আসে না। মিনকুর কাছে। কেন না সুমনা জানে, এ সময় তার জন্যে কিছু করবার চেষ্টা করলেই সে চিৎকার করে তাকে সরিয়ে দেবে।

শীর্ষেন্দু হাসছিল।

●

খাবার ঘরে বৃহৎ এবং প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন টেবিলের ওপর মিনকুর সামনে দুধ পায়রুজ, কলা, আপেল, ডিম আর টোস্ট। ছোট একটা প্লেটে কয়েকটা সন্দেশও আছে। শীর্ষেন্দুর সামনেও ঠিক এই রকম সব খাবার। মিনকু গরম লাঞ্চ খায় ইস্কুলে বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে। মাইনের সঙ্গে মাসে একবার দাম চুকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা। শীর্ষেন্দুর লাঞ্চের খরচ নেই, অফিসেই পায় ঠিক দুপুর একটায়।

কিন্তু স্নানের সময় বাথরুমে যেমন গোলমাল করে মিনকু, খাবার ঘরেও ঠিক সেইরকম। বেশী কিছু মুখে তুলতে চায় না। প্লেট ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'এত খেলে লাঞ্চ খেতে পারব না বাবা, সব না খেলে সিস্টার পলা ভীষণ বকে, রেগে যায়—'

শীর্ষেন্দু তার সামনে আবার প্লেটটা এগিয়ে দিল, 'আহা, একটা টোস্ট খাও না ডিমের সঙ্গে। বারোটার সময় ঠিক খিদে পেয়ে যাবে, দেখো—''

'আমার এখন সত্যি বলছি, একটও খিদে নেই।'

'আমার কোন কথা তুমি আজকাল শুনতে চাও না—' শীর্ষেন্দুও জেদ করে কিছু রূঢ়স্বরে বলল, 'ডিম আর টোস্ট তোমাকে খেতেই হবে। কী রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি দিন দিন। তোমার ক্লাশে তুমিই বোধ হয় সবচেয়ে রোগা।

মিনকু খুব করুণ করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল শীর্ষেন্দুর দিকে। পরে তেতো ওষুধ খাবার মতন মুখের ভাব করে ডিম খেল, টোস্টও।

মিনককে শান্ত ও চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল শীর্ষেন্দু। লণ্ডনের সেই সাদা লোমশ বেড়ালটার কথা তার এত পরে আবার মনে পড়ল।

গ্লস্টার ওয়াকের যে বাড়িতে শীর্ষেন্দু থাকত, সেখানকার ল্যাণ্ডলেডি মিসেস স্ট্রেটসনের একটা বড় আদরের বেড়াল ছিল। দুধের মতন সাদা, মোটাসোটা। বাথরুম থেকে ফিরে শীর্ষেন্দু দেখল একদিন সেই বেড়াল আরাম করে বসে আছে তার খাটের ওপর—পাতলা জিব দিয়ে ঘন ঘন গা চাটছে।

কুকুর কিম্বা বেড়াল শীর্ষেন্দুর প্রিয় নয় কোন কালেই। তার ঘ্যাম মিসেস স্ট্রেটসনের আদরের বেড়ালও তাকে অপ্রসন্ন এবং ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল, ইতস্তত করে নি শীর্ষেন্দু, জুতোর একটা কালো ব্রাশ খুব জোরে ছুঁড়ে মেরেছিল সেই বেড়ালের দিকে। আঘাত লাগলেও শীর্ষেন্দুর খাট থেকে সঙ্গে সঙ্গে নেমে যায় নি বেড়াল—অদ্ভুত, ব্যথিতদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল কিছু সময়। পরে তাকে তেমন করে দেখতে-দেখতেই আস্তে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

আঘাতের জন্যে সম্ভবত তার বিস্ময় ও বেদনা নয়—কেউ যে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে তা ছিল তার কল্পনার অতীত—সে কথা শীর্ষেন্দু পরে বুঝেছিল। কেন না খেয়ে-খেয়ে সেই বেড়াল মারা গিয়েছিল দিনকয়েকের মধ্যেই।

মিসেস স্ট্রেটসন করুণ গলায় বলেছিল শীর্ষেন্দুকে, 'অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নি আমার পুষির। চোখ দেখে মনে হত ওর মনে ভারী আঘাত লেগেছিল—কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

মিনকুর চোখের দিকে তাকিয়ে বিদেশের সেই আহত ও মৃত বেড়ালকে
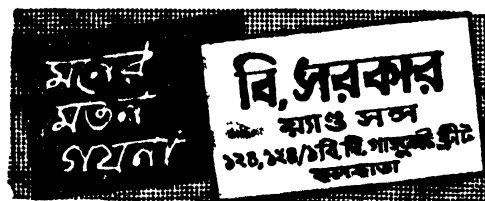
কথা ভাবতে ভাবতে শীর্ষেন্দু বিব্রত হয়ে বলল, 'এই মিনকু, বকে নি তোমাকে। এত চুপচাপ হয়ে গেলে যে? ইচ্ছে না হলে আর খেও না—'

সুমনা ফ্রিজ খুলে দুটো জলের বোতল বার করল। মিনকু ফ্রিজ বন্ধ করবার শব্দ শুনে সেদিক তাকিয়ে থাকল কিছু সময়, শীর্ষেন্দুকে বলল, 'বাবা, ফ্রিজের ভেতরে ঢোকা যায় না কেন? কাল সুমনাদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলবার সময় আমি ওর মধ্যে লুকোতে গিয়েছিলাম—'

শীর্ষেন্দু চমকে উঠল, 'ফ্রিজের মধ্যে যেতে হয় নাকি?'

'গেলে কী হয়?'

'সেই টিকটিকিটার কী হয়েছিল জান না?' শীর্ষেন্দু তার নতুন বড় রেফ্রিজারেটারের দিকে তাকিয়ে চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে মিনকুকে টিকটিকির কথা মনে করিয়ে দিল।

একদিন খুব সকালে মরা একটা টিকটিকি ফ্রিজের ভিতর থেকে বের করেছিল সুমনা। আগের সন্ধ্যায় তাকে আলোর ঠিক নিচে খাবারঘরের দেয়ালের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখেছিল মিনকু। সুমনা যখন পুরনো একটা পোস্টকার্ড দিয়ে ভিজে, ঠাণ্ডা মরা টিকটিকি ফ্রিজের ভেতর থেকে বের করল—তখনো দেখেছিল মিনকু। ওটা কেমন করে ঠাণ্ডার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, সে বুঝতে পারে নি।

মিনকু জিজ্ঞেস করল, 'ফ্রিজের মধ্যে গেলে মরে যেতে হয়, না বাবা?'

'হুঁ। খুব ঠাণ্ডা তো।'

মিনকু দু-এক মিনিট কী ভেবে বলল, 'তুমি যে বল বাবা, ওর মধ্যে সব জিনিষ ভাল থাকে, টাটকা থাকে—'

'সেসব খাবার-টাবার, মাছ-মাংস —এইসব।''

'জ্যান্ত মাছ ওর মধ্যে রাখলে ঠিক মরে যাবে।'

শীর্ষেন্দু আবার বলল, 'হুঁ'।

'তবে মরা মাছও অনেকদিন ফ্রিজের মধ্যে ভাল থাকে বাবা, কত-দিন?'

'অনেক দিন।'

গেলাস থেকে কিছু জল উছলে পড়েছিল খাবার টেবিলের ওপর, মিনকু গেলাস অল্প সরিয়ে রেখে জলে আঙুল ঘষতে থাকল—সাদা ঝকঝকে রেফ্রিজারেটার দেখতে দেখতে সেই মরা টিকটিকির কথা আবার ভাবল। এবং তা ভাবতে ভাবতে বড় একটা গাছের তলায় তাদের গাড়ি উল্টে যাওয়ার কথাও তার মনে পড়ে গেল। সুমনা যেমন এক সকালে মরা টিকটিকি বের করেছিল ফ্রিজ থেকে তেমন শীর্ষেন্দুও মৃত কেতকীকে টেনে বের করেছিল গাড়ির ভেতর থেকে। গাড়ি ফ্রিজ সুমনা টিকটিকি মা বাবা—এই সব জিনিস ও মানুষ এক হয়ে চক্রাকারে খেলে বেড়াতে লাগল মিনকুর মাথার মধ্যে। এবং কিছু সময় সেও ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকল।

'মিনকু ওঠ এবার, আর সময় নেই—' শীর্ষেন্দু বলল কিছু পরে খবরের কাগজ খুলতে খুলতে।

'বাবা?'

'কী বলছ?'

অল্প ইতস্তত করে টেবিলে আঙুল ঘষতে-ঘষতেই মিনকু বলল, 'মরা টিকটিকিটাকে ফ্রিজের মধ্যে রাখলে অনেকদিন থাকত—'

এখনো টিকটিকির জন্যে মিনকুর খুব দুঃখ হচ্ছে ভেবে শীর্ষেন্দু হেসে বলল, 'ওসব কেউ ফ্রিজে রাখে না, ঘেন্না পায়। ওটাকে বের করবার সময় সুমনার মুখ কী রকম হয়ে গিয়েছিল, তোমার মনে নেই?'

মিনকু বলল, 'ঠিক তোমার মুখের মতন বাবা। মাকে তুমি যখন গাড়ি থেকে টেনে বের করছিলে—' গেলাসে আরো কিছু জল ছিল, তা চকচক করে সে খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল, 'আমাদের ফ্রিজটা যদি খুব বড় হত তাহলে মাকে অনেক—অনেক দিন রাখা যেত—'

শীর্ষেন্দু মিনকুর কথা শুনে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে স্থির-বিমূঢ় [illegible]

চায় মিনকু, কেন তার এইরকম মনে হল—শীর্ষেন্দু কিছু বুঝল না। সুমনা টেবিল থেকে খালি কাপ প্লেট গেলাস —এ সব সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—তার হাতের নীল চুড়ি মিষ্টি আওয়াজ তুলেছিল—শীর্ষেন্দু দেখল, শুনল। ফ্রিজের ওপর দুটো চড়ুই সোহাগ করছিল—মিনকু উঠে পড়তেই তারা উড়ে পালাল।

শীর্ষেন্দু হয়তো আরো দু-একটা খবরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারত, কিন্তু তখন শোবার ঘরে ফোন বেজে উঠতেই সুমনা এসে বলল, 'আপনার ফোন।'

এ সময় কে আবার শীর্ষেন্দুকে ডাকল। সে ঘড়ি দেখল, আটটা কুড়ি। সময় আর নেই। খবরের কাগজ হাতে নিয়েই শোবার ঘরে এসে শীর্ষেন্দু সাদা টেলিফোন তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো?'

'শীর্ষেন্দু?'

'কথা বলছি।'

'আমি অতীন। শোন, একটু মুশকিলে পড়ে তোকে ফোন করছি। মানে, আজ সন্ধ্যেবেলা তোকে খুব দরকার। এই ধর, ঘণ্টা দু-তিনের জন্যে?'

শীর্ষেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'মানে, আমার গাড়িটা তোকে চালাতে হবে। দেখা হলে সব বলব। আমি নিজে ড্রাইভিং জানি না কি না। ড্রাইভার-ট্রাইভার থাকলে খুব অসুবিধা হবে—'

শীর্ষেন্দু হাসল, 'বুঝেছি—' পরক্ষণে কিছু গম্ভীর হয়ে ঈষৎ ভিজে গলায় বলল, 'তবে অতীন, তুই তো জানিস আমি আর ড্রাইভিং করি না—'

'বোকার মতন এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে থাকিস না শীর্ষেন্দু। যত সব বাজে ইয়ে—রাবিশ। আমি তোর অফিসে গাড়ি নিয়ে পৌঁছব ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। ড্রাইভারকে তোর অফিসে গিয়ে ভাগিয়ে দেব। তুইও তোর গাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিস—পারবি?'

শীর্ষেন্দু অতীনের কথায় রাজী হতে পারছিল না, কিন্তু সময় ইতস্তত করে সে বলল, 'আমার কোনই আপত্তি নেই অতীন, তবে মিনকু আছে তো। আমি না থাকলে ও খাবে না, ঘুমোবে না—'

'ওর একটা আয়া আছে না? বিলায়েবল, খুব তাজা?'

'ওর কাছে খেতে চায় না।'

'আরে, ঠিক খাবে। তুই বোকামি করে মিনকুর অভ্যেস একেবারে খারাপ করে দিচ্ছিস। আয়া তাহলে আছে কেন, তোর সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে?'

'এই চুপ—' শীর্ষেন্দু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'কী করবি, কোথায় যাবি—সে সব তো বললি না?'

'খুব ইণ্টারেস্টিং জায়গায় যাব। এখন থাক, তোর অফিসে গিয়ে বলব সব। কিচ্ছু ঘাবড়াস না, তোর খুব ভাল লাগবে আজ সন্ধ্যেবেলা, দেখবি। তাহলে এই ঠিক থাকল—'

অতীন বলল, 'ছেড়ে দিলাম।'

তার কথাবার্তা এই রকমই। অতীন শীর্ষেন্দুর ছেলেবেলার বন্ধু। বিলেতেও ওরা একসঙ্গে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল, একই বছরে ফিরেছে। টেলিফোন নামিয়ে রেখে মিনকুর হাত ধরল শীর্ষেন্দু, বলল, 'চল।'

সুমনা আসছিল মিনকুর স্যুটকেস আর জলের বোতল নিয়ে গাড়ি অবধি। শীর্ষেন্দু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাকেও বলল, 'আমার ফিরতে একটু দেরী হবে আজ, মিনকুকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিও—'

মিনকু শীর্ষেন্দুর কথার মাঝে চিৎকার করে উঠল, 'না, আমি খাব না, ঘুমব না। তুমি কোথায় যাবে বাবা?'

'অফিসের কাজ আছে—' কিছু বিরক্ত হয়ে শীর্ষেন্দু বলল, 'মিনকু, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, আমার কথা শুনবে—'

'আমি জেগে থাকব। আমার ঘুম পাবে না। সুমনাদির কাছে আমি কিছু করতে পারব না—'

অসহায় মানষের মতন শীর্ষেন্দু মুখ দিয়ে শুধু যন্ত্রণার অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারণ করল। এবং মিনকুর সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে মাথা নিচু করে গাড়িতে উঠল।

ওদের দেখতে পেয়ে ড্রাইভার আগেই স্টার্ট দিয়েছিল।

॥ তিন ॥

অতীন শীর্ষেন্দুর অফিসে এল সাড়ে পাঁচটার কিছু পরে। আকাশে মেঘ ছিল বলে বিষণ্ণ বিকেল সময় হওয়ার আগেই ডুবে গিয়েছিল আবছা অন্ধকারে। শীর্ষেন্দুর টেবিলের ওপর বাঁকা স্ট্যাণ্ডে একটা ল্যাম্প জ্বলছিল। তার সামনে কফির খালি কাপ, কয়েকটা ফাইল। কিছুদূরে হ্যাঙারে তার কোট ঝুলছিল।

বাইরে আলো থাকলেও এ সময় ল্যাম্প জ্বালবার দরকার রোজই হয় শীর্ষেন্দুর। শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর। রোদের তাপ এখানে পৌঁছয় না। কাচ ভেদ করে বাইরে তাকালে বোঝাও
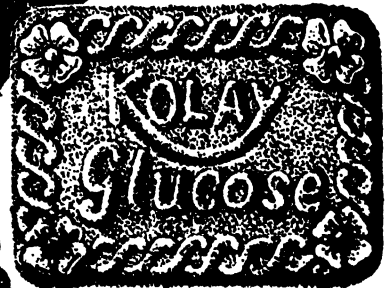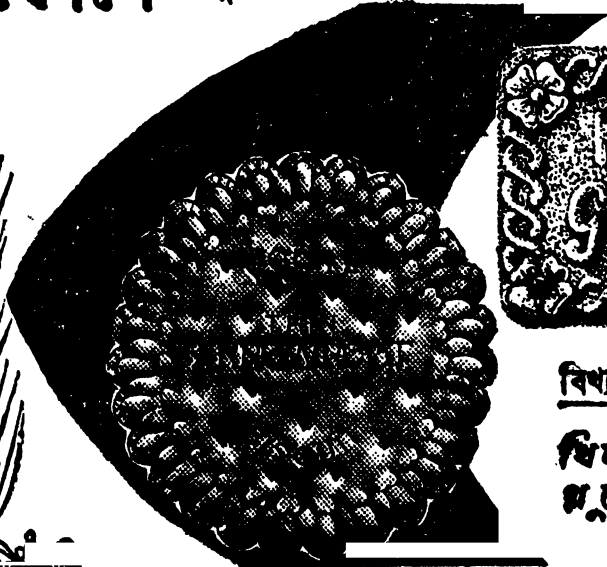
যায় না কোথাও গ্রীষ্ম গড়িয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা রোদ, গাছপালা, রাস্তা মানুষ—যা কিছু দেখা যায় শীর্ষেন্দুর ঠাণ্ডা ঘর থেকে—সবই ভিজে, স্যাঁৎসেতে। এ সব দেখতে দেখতে শীর্ষেন্দু গলায় কিছু গরম পানীয় ঢেলে উত্তাপের স্বাদ পাবার ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়। তখন সে কফি খায় পর-পর দু কাপ।

অতীন সিগ্রেট মুখে নিয়ে ঢুকেছিল, শীর্ষেন্দুর খালি কাপে ছাই ঝেড়ে বলল, 'ড্যামণ্ড তোর এয়ারকণ্ডিসণ্ড অফিস। এখানে বেশীক্ষণ বসে থাকলেই হয়েছে। একেবারে জুড়িয়ে যাব।'

অতীনকে কফির কাপে ছাই ফেলতে দেখে শীর্ষেন্দু তাড়াতাড়ি তার দিকে চীনেমাটির বড় একটা অ্যাস-ট্রে এগিয়ে দিয়ে হাসল, 'ইউ আর সোয়েটিং—'

'লাইক এ পিগ—' শীর্ষেন্দু কী বলতে চেয়েছিল তা না শুনেই বুক-পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল চাপতে চাপতে তার কথা শেষ করে দিল অতীন, 'শুয়োরের বাচ্চার মতন ঘামছি। শীর্ষেন্দু, তুই বাইবেল পড়েছিস ?'

'বাইবেল ?' কিছু বিস্মিত হয়ে শীর্ষেন্দু পাল্টা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খৃস্টানদের ধর্মপুস্তক—' অতীন ঘাম মুছে আবার রুমাল পকেটে রাখল এবং অ্যাসট্রে হাতের আরো কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'অ্যাডাম আর ইভ, আদিম পুরুষ ও নারী নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলল। ঈশ্বর তার প্রথম দুই অবাধ্য সন্তানের ওপর ক্ষেপে গিয়ে অভিশাপ দেন, পুরুষদের মাথার ঘাম পায়ে না পড়লে খাওয়া জুটবে না। অর্থাৎ সকাল থেকে রাত অবধি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে। এবং সমগ্র নারীকুল সন্তান প্রসবের সময় বুঝবে ঠেলা—'

শীর্ষেন্দু অতীনের হালকা স্বর ও কথা বলবার ধরণ উপভোগ করে বলল, 'ঈশ্বরের দে অভিশাপ আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি কিন্তু—'

'ত্যাগ। ঘামছিস তুই ?' অতীন সিগ্রেট শেষ করে অ্যাসট্রেতে টিপতে-টিপতে বলল, 'ঈশ্বরকে তোলা মিথ্যেবাদী বানিয়ে দিয়েছি আমরা। শীততাপ আর গর্ভনিরোধ ট্যাবলেট সেবন কিম্বা লাইগেশন—ঘাম হয় না, গর্ভও না—তা গর্ভযন্ত্রণা।'

শীর্ষেন্দু বলল, 'কফি খাবি ?'

'না চল বেরিয়ে পড়ি। তোর সব হয়ে গেছে তো ?'

'কী ব্যাপার অতীন ?' শীর্ষেন্দু সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে ঘোরান চেয়ারের অনেকটা পিছনে হেলে হাসিমুখে বলল, 'কিসের এত লুকোচুরি ? ড্রাইভার যাবে না, আমাকে গাড়ি চালাতে হবে ? কোথায় যাবি, কী করবি—সব বল আগে ?'

টেবিলে হাত ঘষতে-ঘষতে অতীন হাসল, 'উই উইল বি গোয়িং টু হ্যাভ এ নাইস টাইম।'

'কোথায় ?'

'ড্রাইভারকে তোর জন্যেই কাটাতে বলেছিলাম। আমার তো দু-কান কাটা; কিছু কেয়ার করি না। তুই একটা উঁচুদরের ইডিয়ট কি না।'

অতীনের কথা শুনে শীর্ষেন্দু বিমর্ষ হয়ে বসে থাকল কিছু সময়। সে মিনকুর কথা ভাবছিল এবং মনে-মনে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যেই ব্যাকুল হচ্ছিল। শীর্ষেন্দু এখন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল যে অতীন তাকে আবার পার্ক স্ট্রীটের কোন পানশালায় টেনে নিয়ে যাবে, সেখানে বসে থাকবে যতক্ষণ খোলা থাকবে ততক্ষণ। আশেপাশের লোকের সঙ্গে তর্ক করবে, শেষ অবধি মারামারিও করে বসতে পারে।

অতীনকে অনেকবার এড়িয়ে যেতে চেয়েছে শীর্ষেন্দু, পারে নি। সে এই রকম হঠাৎ-হঠাৎ এসে পড়ে জোর করে তাকে টেনে নিয়ে গেছে নৈশ কলকাতার হালকা ও উচ্ছৃংখল আর এক জগতে। শীর্ষেন্দু গেছে তার সঙ্গে, উপভোগ করেছে এলোমেলো বিশৃংখল এক-এক মুহূর্ত এবং পরে বাড়ি ফিরে অনুতাপ করেছে, মনে মনে শপথ নিয়েছে আর এত রাত করে বাড়ি ফিরবে না।

কেন না শীর্ষেন্দু এসে দেখে মিনকু ঘুমিয়ে পড়েছে। সুমনা তার সামনে এসে ক্লান্ত একটা ভঙ্গী করে ছোট্ট হাই তোলে—সলাজ হেসে বলে, 'কিছুতেই খেতে চায় নি, জোর করে অল্প খাইয়েছি—'

'এ রকম হলে তো হবে না—' যেন সুমনার ওপর বিরক্ত হয়েই কথা বলে শীর্ষেন্দু, 'রোজ রোজ বিকেলবেলা আমি ফিরব কেমন করে।'

'অভ্যেস হয়ে যাবে।'

'এতদিনেও ওকে ঠিক করতে পারলে না, অভ্যেস আর কবে হবে ?'

সুমনা সম্ভবত বুঝতে পারে শীর্ষেন্দু কিছু বে-সামাল এবং তার কাছে সরে এসে দুটো হাত পলকের জন্যে ওপরে তুলেই আবার নামিয়ে ফেলে, 'আপনি যদি পর-পর কয়েকদিন এই রকম দেরী করে ফেরেন তাহলে ও ঠিক আমার কাছে ভাল করে খাবে।'

শীর্ষেন্দু খাটের কাছে এগিয়ে আসে, মশারীর ভেতর ঘুমন্ত মিনকুর দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, 'কখন ঘুমিয়েছে ?'

'এই তো, আপনি আসবার মিনিট কয়েক আগে।'

'কেঁদেছিল নাকি ?'

'অল্প। জানালার ধারে বসে যত গাড়ি আসছিল, ঝুঁকে পড়ে সব দেখছিল।'

শীর্ষেন্দু একটা নিশ্বাস ফেলে টাই ঢিলে করতে করতে কিছু রুক্ষস্বরে বলে, 'জানলায় ও রকম বসে থাকতে দাও কেন ? গল্প-টল্প বলে ভুলিয়ে রাখতে পার না ?'

'টেপ রেকর্ডার চেয়েছিল, দিয়েছিলাম।'

শীর্ষেন্দু টেপ রেকর্ডারের কথা শুনে হঠাৎ খুব উৎসাহী হয়ে ওঠে, 'গান করেছিল নাকি ?'

'না, কথা বলছিল।'

শীর্ষেন্দুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। টাই আর খোলা হয় না, মিনকু ঘুমিয়ে

থাক লও ন এখন তার স্বর শুনতে পাবে ভেবে মৃদু এক উত্তেজনার ঝোঁকে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে এবং আঙুল এদিক-ওদিক করে টেপ রেক-র্ডারের সুইচ টিপে চাবি ঘোরায়।

গলা আসে না মিনকুর প্রথমেই। টেপের কোথায় তার স্বর গেঁথে আছে, সুমনা তা জানে না। শীর্ষেন্দু একবার সুইচ টেপে—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপ। ঘস করে একটা শব্দ। চাকা ঘোরে স্বর শোনা যায় না। আবার শব্দ করে শীর্ষেন্দু। শুভলক্ষ্মীর মীরার ভজন। আবার শব্দ। কিছু সময় টপ রেকর্ডারের চাকা ঘোরে ঘোরে ঘোরে—গান না, কথা না—শুধু খস-খস-খস। শূন্য শূন্য শূন্য।

—'সুমনাদি, তুমি চোখ বন্ধ করে থাক। এক দুই তিন। বাবা, বাবা, বাবা। এসে গেছে, সুমনাদি শীগগির দরজা খুলতে যাও। আমাদের গাড়ির হর্ন। দূর। আচ্ছা, আবার—ওয়ান টু থ্রী। বাবা, বাবা, বাবা—'

হাসির শব্দ। কাচের চুড়ির টিন টিন আওয়াজ, 'দাদাবাবুর আজ ফিরতে অনেক রাত হবে মিনকু—'

'না, হবে না। কেন দেরী হবে সুমনাদি?'

আবার হাসি, 'দাদাবাবু তোমার জন্যে একটা নতুন মা-র খোঁজে গেছে—'

'যাঃ—' কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। কাশির শব্দ। গাড়ির হর্ন। কুকুরের ডাক। দূরে রাত ন'টা বাজবার ঘণ্টার আওয়াজ,—'আমার মাকে খুব বড় একটা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিয়েছে বাবা—'

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দেয় শীর্ষেন্দু। সুমনার দিকে বিরক্তির কড়া দৃষ্টি ছুঁড়ে মারে, 'এ সব আজেবাজে কথা ওর সঙ্গে বল কেন? তোমাদের ওপর একেবারে নির্ভর করা যায় না দেখছি। এসব বল বলেই মিনকু তোমার কাছে কিছু করতে চায় না—'

সুমনার মুখ থমথম করে। সম্ভবত ওর খেয়ালে আসে নি যে টেপ রেকর্ডার তাকে এই রকম প্রতারণা করবে। আগে বুঝতে পারলে শীর্ষেন্দুর কাছে ও এই স্বর গেঁথে রাখবার যন্ত্রটার কথা তুলতই না।

সুমনা মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু সময়। পরে আস্তে বলে, 'খাবেন এখন?'

'না, আমি খেয়ে এসেছি, তুমি খেয়ে নাও—' শীর্ষেন্দুর গলা শুকনো। তার স্বর মৃদু তিরস্কারের মতন।

সুমনা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে আর সাহস পায় না, আস্তে সরে যায়। শীর্ষেন্দু কোট খুলে ছুঁড়ে দেয় টেবিলের ওপর—পকেট থেকে ঝুরঝুর করে অনেক চীনেবাদাম মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।

চীনেবাদামের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শীর্ষেন্দু। এ সব যে মিনকর কথা ভেবেই আস্তে আস্তে পকেটে জড়ো করেছিল। অতীন তাকে জোর করে কোথাও টেনে নিয়ে গেলেই সে অভদ্রের মতন মিনকুর জন্যে এইরকম সঞ্চয় করে—স্ন্যাকস-এর প্লেট থেকে পাঁপরের টুকরো চীনে কিম্বা কাজুবাদাম তুলে তুলে পকেটে ফেলে, কেন না টফি চক-লেটের সব দোকান বন্ধ হয়ে যায় তখন।

শীর্ষেন্দু মশারীর মধ্যে আর এক-বার দেখে মিনকর ঘুমন্ত মুখ। তার মাথা বালিশ থেকে অনেকটা সরে গেছে। সে মশারীর কিছু অংশ তুলে তাকে ঠিক করে শুইয়ে দেয়। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ডাকে, 'মিনকু, মিনক—'

মিনকু ঘুমের মধ্যেই চোখ খোলে। অল্প হাসে। আবার চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে ঘুমোয়। শীর্ষেন্দু মশারীর বাইরে এসে, যত বাদাম জড়ো করে-ছিল কোটের পকেটে—সব তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। কাল সকালে বাসি হয়ে যাবে এ সব। মিনকু শুনবে না, দেখলেই খেতে চাইবে।

অতীনের দিকে তাকিয়ে এত কথা আবার হুড়মুড় করে শীর্ষেন্দুর মনে এসে গেল। বাইরে এখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। শীর্ষেন্দুর অফিসও প্রায় নিঝুম। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টাইপিস্ট মেয়েটি চলে গেছে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। শীর্ষেন্দু ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজতে চলেছে।

'যাবি তো সেই পার্ক স্ট্রীটের বারে—' শীর্ষেন্দু হেসে বলল, 'শুধু শুধু ড্রাইভারকে ছেড়ে দিতে বললি। ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করলে গাড়ি চালাতে আমার বেশ স্ট্রেইন হয়—হঠাৎ ধাক্কাটাক্কা মেরে দিলে—'

অতীন বাধা দিয়ে বলল, 'মারলে মারবি। অত ভাবনার কি আছে। না রে, বারে-টারে আজ যাচ্ছি না প্রথমে—'

'তবে?'

'একটা গার্লফ্রেণ্ড জুটিয়েছি তোর জন্যে, তার কাছে তোকে নিয়ে যাব—' অতীন খুব সহজ গলায় ছেড়ে ছেড়ে বলল।

শীর্ষেন্দুর চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত। মিনকু সম্ভবত এখন এসে বসেছে জানলায়—এক একটা গাড়ির হর্ন শুনে চমকে উঠছে, ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দেখছে। সুমনা টেপ রেকর্ডার তার সামনে আবার ধরে দিয়েছে কি-না কে জানে।

শীর্ষেন্দু মনে মনে কিছু অস্থির হয়ে বলল, 'তুই জানিস বেশী রাত অবধি বাইরে থাকতে আমার ভাল লাগে না—'

'কদিনই বা থাকিস বাইরে?' অতীন একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে দিল, নেভানো টেবিল ল্যাম্পের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি জানি কী তোর ভাল লাগে, আর কী লাগে না—'

শীর্ষেন্দু কোনরকম উষ্মা প্রকাশ না করে হাসল এবং অতীনকে থামিয়ে দিয়ে খুব আস্তে বলল, 'তাহলে রাত অবধি আটকে রাখিস কেন? আমি না থাকলে মিনকু খায় না, ঘুমতে চায় না—সে কথা অনেকবার তোকে বলেছি তো।'

অতীন একদৃষ্টিতে শীর্ষেন্দুর দিকে অনেক সময় তাকিয়ে থেকে যেন তার মাংস ও হাড় ভেদ করে মনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা করতে চাচ্ছিল। 'দেখ শীর্ষেন্দু, আমি জানি আমার সঙ্গে বাইরে থাকতেও তোর ভাল লাগে—' শীর্ষেন্দুকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সে নিজেই বলল, 'লাগবেই। আমি তোর এই ভাল লাগা কে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তো বাঁচিয়ে রাখতে চাই। না হলে আমার কী দায় পড়েছে তোর কাছে এসে এই রকম ধর্না দেবার?'

'ভাল যে লাগে না তা নয় তবে—'

'থাম।' অতীন যেন শাসন করে শীর্ষেন্দুকে থামিয়ে দিল 'একসুরে সেই সব কথা বলবি তো আবার। কিন্তু তুই নিজেই বুঝতে পারছিস না পরে কী হবে—'

'কী আবার হবে।'

'একটা যন্ত্র হয়ে যাবি, মিনকুকেও সহ্য করতে পারবি না—' শীর্ষেন্দু কিছু বলতে যাচ্ছিল, অতীন বলতে দিল না, একটা হাত তুলে তাকে চুপচাপ থাকবার ইঙ্গিত করে বলে যেতে থাকল, 'তোর মনে যা-ই থাক, স্নেহ-ভালবাসা, কেতকীর স্মৃতি—এ সব বৃত্তিগুলো, তোর অনুভূতি—যদি বরাবর ঠিক রাখতে চাস তাহলে যন্ত্রের মতন হয়ে গেলে—এ সব থাকবে ভাবছিস?'

'যন্ত্রের মতনই তো হয়ে আছি—' শীর্ষেন্দু কোন প্রতিবাদ করল না, বড় করুণ করে অতীনের দি ক তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়বার মতন বলল।

'ইচ্ছে করেই হয়েছিল। সে সব বুঝতে পারি বলেই আমি এসে তোকে আবার মানুষের মতন করে তুলতে চাই—' অতীন পকেট থেকে সোনালী সিগ্রেট কেস বের করে খুলল, আর একটাও সিগ্রেট ছিল না। সে তা আবার বন্ধ করল। বেলুন ফেটে যাওয়ার মতন একটা শব্দ হল। অতীন সিগ্রেট কেস পকেটে ভরতে ভরতে বলল, 'খিদে পেলে খেতেই হয়। উপোস করে যদি থাকিস তাহলে মিনকু কিম্বা কেতকী তোকে কেউ সহজ মানুষের মতন থাকতে দেবে না।'

'তুই যা বলিস, আমি তাই তো করি। তাকে আমি এড়াতে পারি না অতীন—' শীর্ষেন্দু খুব অল্প সময় চুপ থেকে বলল, 'তবে ড্রিঙ্ক করলে শরীরে কী রকম রিয়েকশন হয়—'

'মেয়েমানুষের দরকার হয় মনে করছিস তো?' অতীন হাসল, 'তা তো হবেই। একটু কুতিচুতি করতে তোর তো কোন বাধাই নেই। তুই যন্ত্রের মতন হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশী শকড হব আমি। না হলে তোকে মেয়েমানুষ জুটিয়ে দিয়ে আমার কী লাভ বল? দালাল পেয়েছিস নাকি আমাকে?'

শীর্ষেন্দু ইতস্তত করল। বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকল। বলল, কফির খালি কাপ নিয়ে যেতে এবং ড্রাইভারের কাছ থেকে গাড়ির চাবি চেয়ে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে। অতীনের কিছু লাগবে কিনা সে তাকে তা-ও জিজ্ঞেস করল।

'না', অতীন বলল, 'চল এবার আমরাও বেরুই?'

'বল না কোথায় যাবি?'

'আরে, আমার সঙ্গে যাচ্ছিস তো—' অতীন দরজার দিকে তাকিয়ে গলা কিছু নামিয়ে বলল 'একে দে খই আমার তোর কথা মনে পড়েছে—'

'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান?'

'খাঁটি বাঙালী, ব্রাহ্মণ—' অতীন অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'এত খুঁচিয়ে জানতে চাইছিস যেন বিয়ের বর হয়ে মেয়ে দেখতে চললি। যন্ত্র যেন না হয়ে যাস, সেই জন্যে শুধু একটু সতর্কতা অবলম্বন কোন রিস্ক নেই, নিশ্চিন্ত থাক।'

॥ চার ॥

রাস্তার কোথাও কোথাও নিওনের নীলাভ আলো খেলছিল বলে এক-একটি মানুষকে শীর্ষেন্দুর মনে হচ্ছিল আবছা মূর্তির মতন। কেতকীর মৃত্যুর পর আজ অনেক পরে সে আবার স্টীয়ারিং ধরল। প্রথম কিছু সময় শীর্ষেন্দু কিছু ভীত, কিছু অন্যমনস্ক—তার মুখে কথা ছিল না এবং এখন তার বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছাই হচ্ছিল।

কিছু আগে—শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে অতীন কিম্বা শীর্ষেন্দু কেউ বুঝতে পারেনি—বাইরে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তা ভিজে। যে সব জায়গায় ছোট ছোট গর্ত সেখানে অনেক জল জমেছিল। এখনো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শীর্ষেন্দুর গাড়ি মাঝে মাঝে এ-পাশে ও-পাশে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল।

অতীন গাড়িতে বসেই শীর্ষেন্দুকে আস্তে আস্তে সব ভাঙল এখন তারা যাচ্ছে মহুয়ার ফ্ল্যাটে। অতীনের এক দুঃস্থ বন্ধু—সিনেমার অসফল পরিচালক প্রণবেশ একদিন মহুয়ার কাছে তাকে নিয়ে গিয়েছিল। দু-একটা ছবিতে ছুটকো পার্ট করেছে মহুয়া। ফিগার মন্দ না' কথাবার্তা বোকা-বোকা। তবে ফিল্ম লাইনে জাঁকিয়ে বসতে হলে যা-যা করতে হয় মহুয়া সে সব করতে সুরু করে দিয়েছে। ইংরেজি বলা, নাচ-গান, সাঁতার, ড্রাইভিং—এ সব শিখছে এবং গাড়িওলাদের ওপরই তার চোখ বেশী। সম্ভবত প্রণবেশ তাকে সামনে খাড়া করে কোন বড় বড় দরের মক্কেলকে ফাঁসিয়ে আবার ছবি-টবি করতে চায়।

শীর্ষেন্দু স্পীড কিছু বাড়িয়ে আর একটা গাড়ির পাশ কাটাল এবং কিছু সময় একটানা হর্ন টিপে বলল,—'আমাকে আবার প্রডিউসার-টার ভাববে না তো?'

'ভাবুক না। একটা ছবি করা তো দুঃখের কথা নয়। করছি করব ভাবছি—এই রকম হুঁ-হাঁ করে তুই চালিয়ে যা-না। তারপর মহুয়া বাসি হয়ে যাবে তোর কাছে।'

'প্রণবেশের সঙ্গে ওর কিছু সম্পর্ক আছে?'

অতীন বলল, 'বাবু বটে, দালালও বটে। তবে গাড়ি-টাড়ি নিয়ে কেউ গেলে প্রণবেশ দেখি সুড়-সুড় করে বেরিয়ে যায়।'

'ম্যারেড?'

'সে সব চুকেবুকে গেছে। ক্যারিয়ার করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। দুটো ছেলেও নাকি আছে—'

শীর্ষেন্দু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'দুটো ছেলে?'

অতীন হা-হা করে হাসল, 'তোর পিলে চমকে উঠল যে রে—' একটু থেমে সে বলল, 'মহুয়া এমন ভেবেই দুটো ছেলের কথা কখনো ফাঁস করে না। বলে, ছোট একটা ছেলে আছে তার। বদমাশ বাপ জোর করে আটকে রেখেছে তাকে। এমন বলবার সময় একটু একটু ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে—'

'কেন?'

'যেন ছেলেকে না দেখতে পাওয়ার জন্যে কত দুঃখ মাগীর। মহুয়া বসে আছে ছেলেকে নিজের কাছে রাখবার জন্যে। রাত-বিরেতে মদ টেনে এক-একটা বাবুকে এণ্টার-টেইন করতে হবে না?'

'তাই করে নাকি?'

'তা না করলে উঠবে কী করে? অন্যস্থানে র‍্যাকেট বেঁধে ক্যারিয়ার করা যায় নাকি রে ইডিয়ট?'

শীর্ষেন্দু কিছু বিরক্ত হল, 'এই রকম একটা প্রস্টিটিউটের ফ্ল্যাটে তুই কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস অতীন?'

শীর্ষেন্দুর পিঠে হাত রাখল অতীন, তার কানের কাছে মুখ আনল এবং ছোট একটা ছেলেকে সংশোধন করে দেবার মতন খুব নরম স্বরে বলল, 'ছিঃ শীর্ষেন্দু! ক্যারিয়ার করবার জন্যে যাকে শাড়ি-ব্লাউজ খুলে যাবর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হয় তাকে খানকী-টানকী তুই কখনো বলবি না—বলবি ফিল্ম স্টার।'

আরও কিছু পরে অতীনের নির্দেশ-মতন দক্ষিণ কলকাতায় গুরুসদয় দত্ত রোডের ওপর দোতলা বাড়ির একতলার ছোট একটা ফ্ল্যাটের কাছে গাড়ি রাখল শীর্ষেন্দু। গাড়ির আওয়াজ হওয়ার পর পর্দা কিছু সরে গেল, মুহূর্তের জন্যে একটি চকচকে মুখ দেখল শীর্ষেন্দু। এবার দরজায় কোনরকম শব্দ করবার আগেই তা খুলে গেল। শীর্ষেন্দু আবার স্পষ্ট করে দেখল সেই মুখ।

'আসুন, নমস্কার!' মিষ্টি, কচি গলা। চুল, বেশবাস, প্রসাধন—ইংরেজি বলা মেয়েদের মতন হলেও কথাবার্তা ও আদব-কায়দায় মধ্যবিত্ত ছাপ অতি প্রকট। অতীন আলাপ করিয়ে দেয়ার আগেই শীর্ষেন্দু ধরে নিল, এরই নাম মহুয়া।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অতীন মহুয়াকে লক্ষ করে বলল, 'এই যে, আমার বন্ধু শীর্ষেন্দু। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম—'

মহুয়া জলে ঢেউ তোলার মতন কলকল করে হাসল, 'বসুন।'

ড্রয়িং-রুমের মতনই সাজানো ছোট ঘর। ডিসটেম্পার করা দেয়াল। গোলাপী রং। একদিকে খুব বড় একটা বুক-কেস। বই-এর অভাবে অনেকটা খালি। সে সব ফাঁকা জায়গায় কৃষ্ণনগরের পুতুল, এয়ারওয়েজ-এর প্রতীক মহারাজা এবং এদের সঙ্গে একটা খৃস্টমাস ফাদারকেও ফাঁক পূরণের কাজে লাগান হয়েছে। বুককেসের ওপর নীল বড় ফ্লাওয়ার ভাস্। ফুল নেই। খালি। আর একদিকে বুককেসের ওপরেই রবীন্দ্রনাথের মাটির একটা মূর্তি। জানলা আর দরজার পর্দার রং আলাদা। শীর্ষেন্দু এসব পলকে দেখে নিয়ে খুব নিচু সোফায় বসে মহুয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল।

এইরকম তাজা এবং সহজলভ্য মেয়ের এত কাছে কখনো আসেনি শীর্ষেন্দু। মদ খেলে যেমন মনে হয়, মহুয়ার গন্ধ তাকে তেমন অনুভূতি দিচ্ছিল। দামী বিলিতি পারফিউম ব্যবহার করেছে সে। চোখের ভুরু ঘন কালো, কৃত্রিম। খোঁপা উঁচু। মহুয়ার ব্লাউজ তার শরীরের অনেকটা অনাবৃত রেখেছে। সে আস্তে আস্তে এসে শীর্ষেন্দুর পাশে বসে পা নাচাতে নাচাতে হাসতে থাকল।

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে অতীন ওদের কাছেই আর একটা চেয়ারে বসে আবার বলল, 'শীর্ষেন্দু যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে মহুয়া, তুমি ওকে মন্তর-টন্তর দিও—যেন মানুষই থাকে—'

মহুয়া একটা হাত মেলে দিল সোফার পিছনে, ছোট মেয়ের মতন ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বলল, 'মানুষ কখনো যন্ত্র হয়। প্রাণ থাকে না মানুষের? প্রাণ ভিতরে ভিতরে তার কাজ ঠিক করে যায় অতীনবাবু, মানুষকে মানুষই থাকতে দেয় চিরকাল।'

'বাঃ,' অতীন মহুয়াকে বিদ্রূপ করে বলল, 'যেন ফ্লোরে দাঁড়িয়ে অ্যাকটিং করছ মহুয়া। তা এটা কোন ছবির ডায়লগ?'

'এটা স্টুডিয়ো নাকি ড্রয়িংরুম বলব?' মহুয়া অভিমান করবার মতন নিজের গলার হারের লকেট নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, 'সব সময় যদি পার্ট বলার সুযোগ হত। চব্বিশ ঘণ্টা আমি শুধু ভাল অভিনয় করবার স্বপ্ন দেখি।'

শীর্ষেন্দু মহুয়াকে দেখতে দেখতে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছিল, এখন সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নতুন ছবি কী?'

'ওমা।' একটা আঙুল গালে ঠেকাল মহুয়া, পরে অল্প অল্প হাসল, 'এ মাসের সোজা নৌকার কভারে আমার ছবি দেখেন নি? 'মডার্ন মাস্টারনী' পূজোর সময় রিলিজ করবে। আমিই হিরোইন।'

'এ ছবি নিশ্চয় খুব ভাল হবে?'

'নিশ্চয়ই। যেমন গল্প তেমন সিনারিও। সেক্স-অ্যাপিল খুব। আমাকে যে কতবার—' শীর্ষেন্দুর গায়ের ওপর প্রায় গড়িয়ে পড়ল মহুয়া, 'থাক, এখন কিছু বলব না—দেখবেন, 'মডার্ন মাস্টারনী' ঠিক হিট ছবি হবে।'

'ভালই তো', শীর্ষেন্দু আস্তে বলল, 'আপনারও খুব নাম হবে।'

'আমার এখন কিছু কম নাম ভাবছেন? সবে তো চব্বিশ বছর বয়েস। দেখুন না, আর দু-এক বছরের মধ্যে কোথায় পৌঁছে যাই—'

অতীন এত সময় চুপ করে ওদের দু-জনের আলাপ শুনছিল এবং মহুয়া তার নিজের কথা বোকা, অশিক্ষিত মেয়ের মতন এত বেশী বলতে শুরু করেছিল যে সে ভাবল, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শীর্ষেন্দু অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, আর ভবিষ্যতে তার সঙ্গে দেখা করবারও কোন আগ্রহ প্রকাশ করবে না।

আলোচনা অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য অতীন বলল, 'কী করবে আজ মহুয়া, বাইরে-টাইরে বেরুবে?'

'ওমা, এই তো এলেন! একটু বসবেন না?'

'বাইরে কোথাও গিয়ে বসলেই তো হয়—' অতীন শীর্ষেন্দুর দিকে তাকিয়ে মহুয়াকে বলল, 'ধর, কোন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা জায়গায়? যেখানে মিউজিক আছে, ড্রিঙ্কস আছে—যাবে?'

'আপনারা বললে না গিয়ে কি পারি? তবে বেশী ড্রিঙ্ক আমি কিন্তু আজ করতে পারব না।'

'অল্পই কর না হয়।'

'না-না, আমাকে সে কলেজের মেয়েদের মতন কনজার্ভেটিভ-টেটিভ ভাবছেন না তো?'

'না-না।'

'দেখুন—' মহুয়া একবার অতীনকে দেখল, একবার শীর্ষেন্দুর দিকে তাকাল এবং তার বুকের কাপড় যেন পাখার হাওয়ায় হঠাৎ সরে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে বিরক্তির অস্ফুট একটা শব্দ করল ও বুক আরও উঁচু হবে বলে শরীর টান-টান করে ঠোঁট টিপে বলল, 'যারা উদার, যারা পরিশ্রম করে—মানে আপ-টু-ডেট ছেলেমেয়েরা সকলেই তো আজকাল ড্রিঙ্ক করে—'

অতীন মহুয়াকে সমর্থন করে হালকা চালে বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক।'

"আমি আজ বেশী ড্রিঙ্ক কেন করতে চাই না জানেন?'

মহুয়ার মনের কথা জানবার কোন কৌতূহল ছিল না অতীনের, তাহলেও সে কৌতুক করবার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'কেন বল তো?'

'সবচেয়ে আগে আমি যে শিল্পী, আর্টিস্ট—' গরুর মতন ভাবলেশহীন চোখ তুলে মহুয়া বলল, 'কাল আমার স্যুটিং আছে কি-না। যদি চেহারা খারাপ দেখায়?'

মহুয়ার পাতলা সবুজ ব্লাউজ ভেদ করে তার নরম বুকের আবরণ বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শীর্ষেন্দু কিছু চঞ্চল, কিছু উন্মুখ। এত দিনের যে উপবাস তাকে শীর্ণ, ক্লান্ত ও সত্যি-সত্যিই একটা যন্ত্রের মতন করে তুলেছিল এখন তা অসহ্য মনে হচ্ছিল তার এবং প্রতীক্ষার ধৈর্য আর ছিল না, আদিম এক তীব্র ইচ্ছায় সে কতকটা আত্মবিস্মৃতের মতন হঠাৎ বলে উঠল, 'যা-ই করুন না কেন, আপনার চেহারা কখনো খারাপ দেখাবে না।'

শীর্ষেন্দুর মুখ থেকে প্রশংসার এমন কথা শুনে খুব হাসল মহুয়া, ছটফট করে বলল, 'অমন আপনি-আপনি' বলে আমার সঙ্গে কথা বললে আর আমি উত্তর দেব না কিন্তু। এত কাছে বসেছেন, তা-ও দূরে-দূরে কেন? আপনি কথাটা যে পরস্পরকে নিকট বন্ধু করে তোলে না, তা কি জানেন না?'

'বাঃ, মহুয়া! ফাইন!' অতীন চোখ মারল শীর্ষেন্দুকে, মহুয়াকেও। তারপর হাত তুলে ঘড়ি দেখল, 'চল এবার বেরুই?'

'যাবেন?' শীর্ষেন্দুর হাতের কাছে হাত রাখল মহুয়া, সোফায় জোরে জোরে ঘষল, 'আমাকে দয়া করে শুধু দশ মিনিট সময় দিন, তৈরী হয়ে আসি?'

মহুয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়াল শীর্ষেন্দু। মহুয়া এই রকম শিষ্টাচারে অভ্যস্ত নয় বলে থমকে থেমে পড়ল, 'উঠে পড়লেন যে? দশ মিনিট সময় চাইলাম না? কিছুই মনে থাকে না দেখছি আপনার—না কি আমার কথা কানেই যায় না—'একসঙ্গেই যন্ত্রের মতন এত কথা বলে সে দ্রুতপায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ফিরতে অনেক রাত হল। এত রাতে শেষ করে বাইরে ছিল, শীর্ষেন্দুর মনে পড়ে না। শেষ বিকেলে কিছু বর্ষণ হয়েছিল বলে চারদিকে এখন কুয়াশার মতন হয়ে আছে। রাস্তায় মানুষ আর নেই। দক্ষিণ কলকাতা আরও নির্জন। সরু একফালি চাঁদ আকাশে সেঁটে আছে কি-না শীর্ষেন্দু

জানে না। তবে কিছু কিছু নরম আলো আকাশ থেকে ঝরে পড়ছিল।

মহুয়া প্রথমে বলেছিল বেশী মদ খাবে না—অতীন তাকে জোর করে খাইয়েছে। তাহলেও ঠিক আছে সে। অসংলগ্ন কোন কথা তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয় নি। শুধু শীর্ষেন্দুর খুব কাছে সরে আসছিল মহুয়া এক-একবার এবং উচ্চ হাসিতে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁর সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। শেষ অবধি সম্ভবত ইচ্ছে করেই থাকে নি অতীন—মহুয়া আর শীর্ষেন্দুকে রাতারাতি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়ে ঘণ্টাখানেক পরেই চলে গিয়েছিল। সে চলে যাবার পর-পরই একটি কাণ্ড ঘটে যায় রেস্তোরাঁয়। শীর্ষেন্দু কল্পনা করতে পারে নি, সে এই অঞ্চলের এমন অভিজাত পানশালা ও রেস্তোরাঁয় এই রকম বিশ্রী ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এবং এই বয়সে তার নিজের হঠাৎ অত উত্তেজিত হয়ে ওঠারও যে-কোন মানে হয় না—এখন গাড়ি চালাতে চালাতে সে তা ভাবল।

একটি লোক মহুয়ার ঠিক পিছনের টেবিলে অনেকটা জায়গা নিয়ে বসেছিল। মেদবহুল শরীর। বড় বড় গোঁফ। ঘন ঘন মূল্যবান বিদেশী সুরার গেলাস মুখে তুলছিল। এবং মহুয়ার দিকে অনেক সময় নিয়ে তাকাচ্ছিল নির্লজ্জ কামুকের মতন। তার দৃষ্টি প্রথম থেকেই ভাল লাগেনি শীর্ষেন্দুর, সে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও এমন উত্তেজনার জন্যেই অস্বস্তিবোধ করছিল।

মহুয়া কামুক পুরুষের দৃষ্টি কিম্বা শীর্ষেন্দুর ক্রোধ খেয়াল করেনি প্রথম প্রথম। সে হাসছিল, কথা বলে যাচ্ছিল শীর্ষেন্দুর সঙ্গে এবং মদ খাচ্ছিল খুশীমতন। এখানেও তার বুক-ছোঁয়া শাড়ির অংশ গড়িয়ে পড়েছিল মাটিতে। শীর্ষেন্দু নেশার ঘোরে একজোড়া ডালিমের কল্পনা করতে করতে মহুয়ার বুক দেখছিল ও তার পরিচ্ছন্ন বাহুমূলের দিকে চোখ রেখে সংযম হারাচ্ছিল—অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ, অসম্ভব এক দুঃস্বপ্নের মতন শীর্ষেন্দু দেখল তার কল্পনার সুপক্ব ডালিম দুটোর ওপর পিছন থেকে কঠিন হাতের চাপ দিচ্ছে সেই মেদবহুল কামুক লোকটা। শীর্ষেন্দু নিজের দৃষ্টিবিভ্রম কি-না বোঝবার আগেই আর্তনাদ করে উঠল মহুয়া। পরে উঠে দাঁড়াল, পিছন ফিরে চিৎকার করল, 'অসভ্য জানোয়ার—'

মহুয়াকে অপ্রকৃতিস্থ মেয়ের মতন চিৎকার করতে দেখে শীর্ষেন্দুর মনে প্রথম যৌবনের তেজ দপ করে জ্বলে উঠল এবং সে-বয়সের মতন বীরত্ব প্রকাশ করবারও সাহস সে অনুভব করল। মহুয়াকে সরিয়ে দিয়ে সেই লোকটার পেটে সজোরে একটা লাথি চালাল শীর্ষেন্দু, 'শুয়ার কা বাচ্চা।'

আশে-পাশের যত মানুষ এত সময় নিমগ্ন ছিল পানে, তাদের তন্দ্রা ভাঙল শীর্ষেন্দুর ধমকে—মহুয়াকে ঘিরে ভিড় জমে গেল। কিন্তু শীর্ষেন্দু তাকাল না কোনদিকে, কারুর প্রশ্নের উত্তর দেয়া দরকার মনে করল না। বিল সে তো আগেই মিটিয়ে দিয়েছিল—এখন মহুয়ার হাত ধরে নায়কের মতন গাড়িতে এসে উঠল।

শীর্ষেন্দুর পাশে গাড়িতে বসে হাঁপাচ্ছিল মহুয়া অনেক সময়। শীর্ষেন্দু শান্ত, নম্র। তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এল রাতের হাওয়ায়। মদের ঘোরে এতদিন পর গাড়ি চালালেও, কোন আশঙ্কা শীর্ষেন্দুর মনে ছিল না, স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে প্রত্যেক মুহূর্ত সে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়েই গ্রহণ করতে পারছিল।

মহুয়ার দেহের অনেকটা এসে পড়েছিল শীর্ষেন্দুর গায়ের ওপর। পারফিউমস, মদ ও পাউডারের গন্ধ মিশে শীর্ষেন্দুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল নেশার সর্বশেষ পর্যায়ে এবং তার মনে হচ্ছিল গাড়ি যেন আপনিই চলছে। সে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতন হয়ে থাকল।

'বাব্বাঃ', মহুয়া আরও পরে যেন অনেক দূর থেকে কথা বলে উঠল, 'কী অসভ্য লোক!' তারপরই সে শীর্ষেন্দুর গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, আপনার মতন পুরুষের সঙ্গে আমি সব জায়গায় যেতে পারি।'

শীর্ষেন্দু হাসল, 'এসব জায়গা আমার ভাল লাগে না। আজকাল বড্ড আজে-বাজে লোকের ভিড়।'

'ঠিক বলেছেন—' মহুয়া কাঁধ ঝাঁকাল, শীর্ষেন্দুকে আদর করল অনেক সময়, 'নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো কথাও বলা যায় না—'

'কিছুই করা যায় না নিজের খুশীমতন। ওরা যা গান শোনাবে তা শুনতে হবে, ওরা যতক্ষণ বসাতে দেবে তার বেশী বসা যাবে না। এই রকম ঘড়ি ধরে চলাফেরা করলে—'

মহুয়া খুব হেসে অতীনের কথাই হালকা গলায় বলল, 'একেবারে যন্ত্র হয়ে যেতে হয়, না?'

'ঠিক।'

শীর্ষেন্দু বাইরে তাকিয়ে একটু চুপ করে থাকল, পরে মহুয়ার দেহে অল্প চাপ দিল। মহুয়া আবেগের ঘোরে তাকে শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'মাঝে মাঝে শহর থেকে দূরে, বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে—'

'গেলেই তো হয়।'

'কোথায় আর যাব।'

শীর্ষেন্দু বলল, 'আমার এক বন্ধুর একটা বাংলো মতন আছে মাইল বারো দূরে। বড় পুকুর, নৌকো, অনেক গাছ পাখি—সবই আছে সেখানে।'

'ওমা, তাই নাকি?' মহুয়া ছোট মেয়ের মতন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'আমি এই রকম জায়গার স্বপ্ন দেখি, চলুন না একদিন, যাবেন?'

'কবে যাবেন বলুন?'

মহুয়া শীর্ষেন্দুর কাঁধের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল, আপন মনে হিসেব বারাতে বারাতে বলল, 'কাল

পরশু, পরপর দু-দিন 'মডার্ন মাস্টারনী' স্যুটিং, তার পরদিন শুক্রবার—সেদিনও থাক। শনিবার চলুন। তখন আমি দিন-রাত্তির একেবারে ফ্রী—খুব মজা করতে পারব।'

'হ্যাঁ, খুব মজা হবে—' শীর্ষেন্দু বলল, 'একেবারে রবিবার বিকেলে ফিরব, রাজী ?'

'ওমা হ্যাঁ, আপনার মতন পুরুষ-মানুষের সঙ্গে বললাম না আমি সব জায়গায় যেতে পারি। ক্যামেরা আর লাইট, ফ্লোর আর অ্যাকটিং—এসব আরও কত ভাল লাগবে ওই রকম নির্জন জায়গা থেকে ফিরে আসবার পর—'

'এমন জায়গায় আমিও অনেক-দিন যাই নি—' শীর্ষেন্দু অদ্ভুত একটা কাতরতা অনুভব করে হঠাৎ বলল, 'যা কিছু দেখি ঘরে বাইরে, সবই কৃত্রিম—সবই যন্ত্র।'

'আমি কিন্তু মোটেও যন্ত্র নই—' ঠোঁট ফুলিয়ে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় শীর্ষেন্দুর বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে মহুয়া বলল।

'তাই তো যাচ্ছি যন্ত্রের জগৎ পার হয়ে—'

'ওমা, কী সুন্দর কথা বলতে পারেন আপনি! ফিলিমের জন্যে কিছু লিখুন না। আমি হিরোইন হব কিন্তু—আগে থেকে বলে রাখলাম।'

শীর্ষেন্দু মহুয়ার গাল টিপে বলল 'ও সিওর।'

এবং অনেক রাতে কুয়াশায় অন্ধ ছেঁড়া-ছেঁড়া আলোয় গুরুসদয় দত্ত রোডে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে মহুয়া মিনতির মতন বলল, 'ব্ল্যাক কফি খেয়ে যাবেন এককাপ ?'

'ধন্যবাদ। আজ না—' শীর্ষেন্দুও নামল, 'তাহলে শনিবার আসব ?'

'ওমা, হ্যাঁ। আমিও তৈরী হয়ে থাকব—' অল্প ইতস্তত করল মহুয়া, 'কী নেব সঙ্গে বলুন তো ? খাবার-দাবার কিছু ?'

'ওখানে একটা লোক আছে। রুমাল মুখে বুলিয়ে হাসল, 'আপনি শুধু সঙ্গ দিয়ে ধন্য করবেন। আমি আসব সন্ধ্যে সাতটা থেকে সাড়ে-সাতটার মধ্যে—ঠিক আছে ?'

'এখনো অমন 'আপনি আপনি' করছেন ? যান! কোথাও যেতে চাই না আমি অচেনা মানুষের সঙ্গে। আড়ি! আড়ি! আড়ি!'

শীর্ষেন্দু মহুয়ার কাছে এল। ভাবল, কফি খেতে খেতে আরও কিছু সময় তার সঙ্গে কাটায়। ধৈর্য রাখল। প্রথম দিন সহবাসের ইচ্ছাও দমন করে মাতালের মতন বলল, 'তোমার ফিগার দেখলে সব গোলমাল হয়ে যায় মহুয়া।'

'আহা!'

শীর্ষেন্দু আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠল, ফিরে-ফিরে তাকাল মহুয়ার দিকে। যাবার বেলায় হাত নেড়ে বলল, 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট। আসবেন কিন্তু ঠিক।'

শীর্ষেন্দু খুব জোরে বলল, 'শনিবার।' এবং আরও কিছুদূরে এসে সে হঠাৎ অনুভব করল তার পাশের আসন শূন্য, ঠাণ্ডা। ঝিরঝিরে ভিজে হাওয়ায় শীর্ষেন্দুর সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনার কথাই মনে হচ্ছিল।

একটা লরীও বিকল হয়ে পড়ে আছে মাঝ-রাস্তায়।

॥ ছয় ॥

শীর্ষেন্দু বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল ঠিক সময়। ড্রাইভারকেও সে ছুটি দিয়েছে আজও। সুমনা গাড়িতে তুলে দিয়েছে নানারকম মুখরোচক রাতের খাওয়া। হুইস্কি ও সোডার বোতল শীর্ষেন্দু পরে রাস্তা থেকে কিনে নেবে। প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য ও বৈভবের কথা মাথায় থাকলেও সে অভ্যাসবশত সঙ্গে নিয়েছে ছোট একটা ট্রানজিস্টার, টেপ-রেকর্ডার, গ্রামোফোন—চিত্ত-বিনোদনের এই রকম সব আধুনিক

মহুয়াকে কথা দিয়ে আসার পরেও অনেক ইতস্তত করেছে শীর্ষেন্দু, অতীনের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। মিনকুকে দেখতে দেখতে অনেকবার তার মনে হয়েছে—যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই থাক। সরে যাবার দরকার নেই। অতীন তাকে বিদ্রূপ করেছে। এইসব ভাবালুতা মুছে ফেলে মানুষ হয়ে থাকবার পরামর্শ দিয়েছে।

প্রথমে মিনকুকে কাছে ডেকে তাকে আদর করতে করতে খুব মিষ্টি করে শীর্ষেন্দু বলল, 'আমি অফিসের কাজে একটু বাইরে যাচ্ছি মিনকু। কাল বিকেলে ফিরব। মোটে তো একটা রাত। তুমি সুমনা মাসির কাছে লক্ষ্মী হয়ে থাকবে।'

'না বাবা, কখখনো থাকব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা একটা ভূতের বাড়ি। লাইট-টাইট নেই। অন্ধকার।'

'আমি যাব।'

শীর্ষেন্দুর সময় হয়ে যাচ্ছিল, সে দু-তিন পা হাঁটল এবং কিছু বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঘুমানোর জায়গা নেই সেখানে। সারারাত জেগে থাকতে হবে। তুমি যেও না মিনকু। তোমার খুব কষ্ট হবে।'

'হোক, আমি যাবই—'

অনেক সময় স্বর টেনে শীর্ষেন্দু বলল, 'না—'

'বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'জেদ কর না মিনকু'—শীর্ষেন্দু চলতে চলতে বলল, 'সুমনা, ওকে দেখ।'

'বাবা, ও বাবা—' এত জোরে চিৎকার করে মিনকু কেঁদে উঠল যে শীর্ষেন্দুর মনে হল এখুনি পাশের ফ্ল্যাট থেকে কেউ এসে জিজ্ঞেস করবে, কী হয়েছে।

সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লণ্ডনের বেড়ালের চোখের সঙ্গে মিনকুর চোখের কোনরকম সাদৃশ্য এখন শীর্ষেন্দু খুঁজে

তালিমের মতন [illegible] অনাবৃত জলজ্যান্ত পিছল শরীর।

শীর্ষেন্দু কিন্তু একটা জানোয়ারের মতন বলল, 'চল, আবার গাড়ি উল্টে দেব। মজা বুঝবে তখন।'

সুমনা কিছুদূরে দাঁড়িয়েছিল, শীর্ষেন্দুর কথা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে মিনকুকে কাছে টেনে নিল, 'ছি ছি দাদাবাবু, ভর সন্ধ্যেবেলা এ কী বললেন।'

●

শহর থেকে এগারো-বারো মাইল দূরে, আমতলায়, শীর্ষেন্দুর বিলেতের বন্ধু নিয়োগী সাহেবের বাংলোর মতন বাড়িতে ওরা এসে পৌঁছল রাত দশটারও পরে। চারপাশ বড় নির্জন। দীর্ঘ দীর্ঘ গাছ সন-সন করছে। জোনাকী দপদপ করছে এখানে-ওখানে। ঝিল্লির রবও উঠছে। অনেকটা জমি। বাড়ি খুবই ছোট। পাশাপাশি দুটো ঘর। লাগোয়া বাথরুম। রান্নাঘরও আছে কিছুদূরে। দারোয়ান মালী এবং অতিথি-অভ্যাগত-দের দেখাশোনা করবার জন্যে একজন বেয়ারাও আছে।

বড় বড় গাছের তলায় অনেক বেতের হাল্কা চেয়ার, একটা টেবিল। সামনেই লেকের মতন পুকুর খোঁড়া হয়েছে। পুকুরে কয়েকটা নৌকো। নিয়োগী সাহেব শীর্ষেন্দুকে বলেছিল, 'রাতে রোয়িং না করে ফির না। এমন থ্রিল আর কিছুতেই নেই।'

শীর্ষেন্দু এসব দেখেও বিমর্ষ, বিরক্ত। সে যেন এখানে বাইরের লোকের মতন ঘুরছে, ফিরছে। কেন না মিনকু তার সঙ্গে আছে ছায়ার মতন। শীর্ষেন্দু মহুয়ার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারছে না। এত আয়োজন বিফল হয়ে যাচ্ছে।

মিনকুকে কিন্তু খুব আদর করেছে মহুয়া—অনেক মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলেছে। মিনকু একেবারে চুপ রুদ্ধ একটা বি[illegible]য় ওকে বোবার মতন করে রেখেছে। এখানকার গাছপালা অন্ধকার, পাতার শনশন, পুকুরের জলে চাঁদের মরা আলো তাকে শুধু ভয় দেখাচ্ছিল এবং এত পরে তার মনে হচ্ছিল, এই রকম অচেনা দূরের কোন জায়গায় তার মা লুকিয়ে আছে। সে একসময় আস্তে বলে উঠেছিল, 'মা।'

মহুয়া কিম্বা শীর্ষেন্দু কেউই তার সে মৃদুস্বর শুনতে পায় নি।

বাইরে বড় বড় গাছের নিচে বেতের টেবিলের ওপর গেলাস, হুইস্কি ও সোডার বোতল এবং প্রচুর খাবার রাখা হয়েছিল। মিনকুকে জোর করে কিছু কিছু খাবার খাইয়ে দিয়েছিল মহুয়া। পরে বলেছিল, 'ঘুম পাচ্ছে যে মা-মণি, এবার চল তোমায় শুইয়ে দিয়ে আসি?'

'না, ঘুম পায় নি।'

মহুয়া শীর্ষেন্দুর মুখে চোখে-চোখে কথা বলে তাকে আবার বলেছিল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি শোব এবার।

'বাবা শোবে না ?'

'না, তোমার বাবা এখানে জেগে বসে থাকবে সারা রাত—

'আমিও জেগে বসে থাকব।

মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া, মহুয়ার উত্তাপ শীর্ষেন্দুকে আস্তে আস্তে বড় নিঃর ও নিলজ্জ করে তুলছিল। মিনক যেন বাধার মতন—যন্ত্রণার কতকগুলো অসহ্য মুহূর্ত তাকে বিষধর সাপের মতন ছোবল মারছিল।

শীর্ষেন্দু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এক-হেঁচকা টানে মিনকুকে পাশের চেয়ার থেকে তুলে বলল, 'এখুনি ঘুমতে হবে, চল—

মিনকু ফোঁপাতে-ফোঁপাতে ধরা-গলায় বলল, 'তুমি ?'

'আমিও যাচ্ছি, এস মহুয়া।'

'এবার মিনকু ঘুমবে ঠিক, লক্ষ্মী মেয়ে—' মহুয়া টলতে টলতে মিনকু ও শীর্ষেন্দুর পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকল। বেশ বড় খাট। বিছানা শীর্ষেন্দ সঙ্গে এনেছিল।

মিনককে খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে শীর্ষেন্দু বড় কঠোর হয়ে বলল, 'কোন কথা নয়, মহুয়া তুমিও শোও—'

'বাবা, তুমি ?'

শীর্ষেন্দ মুখের কাছে আঙুল তুলে খুব জোরে বলে উঠল, 'চুপ।'

রাতজাগা একটা পাখি কর্কশ চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। এখানে মাটির ঘ্রাণ বড় উগ্র। মানুষের পায়ের শব্দের মতন অবিশ্রাম শব্দ হচ্ছে বাইরে। আকাশও দু-একবার গর্জন করে উঠল। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই আমতলার বাংলোয়। একপাশে লণ্ঠনের শিখা মিটমিট করছে।

মহুয়া নীরব হয়ে মিনকুর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাকে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে থাকল এবং এক একবার শীর্ষেন্দুর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। অস্পষ্ট আলোয় শীর্ষেন্দু বুঝল যে তার মুখেও বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

কামাহত পশুর মতন শীর্ষেন্দু প্রবল উত্তেজনা অনুভব করছিল বলে সে প্রথমে বসল মহুয়ার পায়ের কাছে। তার পা টিপল, আর একটু ওপরে হাত তুলল এবং ধৈর্য রাখতে না পেরে মহুয়ার কাছ ঘেঁষে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল শীর্ষেন্দু। তার উন্মুখ হাত তাকে বেষ্টন করবার জন্যে যেই উত্তোলিত হল ঠিক তখন মিনকু উঠে বলল, 'বাবা, আমি তোমার পাশে শোব।'

খাট থেকে খুব দ্রুত নেমে পড়ল শীর্ষেন্দু। অস্বাভাবিক ক্রোধের একটা তীব্র অনুভূতি তাকে বিমূঢ় করে রাখল কিছু সময়। পরে সে মিনককে কোলে তুলে নিয়ে চলে এল পাশের ঘরে, তক্তপোষের ওপর একটা বালিশ ছুঁড়ে তার মাথা জোর করে চেপে ধরে বলল, 'হতভাগা মেয়ে। সেই থেকে জ্বালাচ্ছ। তোমাকে একা-একা এ ঘরে ঘুমতে হবেই—'

'বাবা, ও বাবা—'

'চুপ।'

একটা বিন্দুর মত বড় হয়ে এল মিনকর। সে স্তব্ধ হয়ে থাকল। এ তার বাবা না অন্য মানুষ ? অন্ধকারের কোন ডাকাত ? শীর্ষেন্দু বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে চলে গেছে। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার।

মিনকু অন্ধকার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল।

৬

আরও অনেক পরে, সম্ভবত মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে তখন—ক্লান্ত শীর্ষেন্দু এলোমেলো পায়ে মিনকুর ঘরের শিকল খুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখবার চেষ্টা করল। অন্ধকার, দৃষ্টিও এখন ঝাপসা শীর্ষেন্দুর। কিছু দেখা গেল না।

সে তাকাবার অনুশোচনা প্রকাশের মতন বড় কান্না করে, 'মিনক, মিনক' শীর্ষেন্দু ডাকল, এত রাত অবধি জেগে থাকতে পারে নাকি ও। কখন একসময় কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তক্তপোষের কাছে এসে বড় যত্ন করে আস্তে তুলে ঘুমন্ত মিনকুকে, পাশের ঘরে এনে তাকে শুইয়ে দিল নরম বিছানায়।

'মিনকু, মিনকু—' আবার ডাকল শীর্ষেন্দু। লণ্ঠন নিভে আসছিল, মিনকুর ঘুমন্ত মুখ ভাল করে দেখবার জন্যে তা সে তুলে ধরল। এবং বুকের ভিতর আশঙ্কার একটা শীতল প্রবাহ শীর্ষেন্দুর হাতও পক্ষাঘাত রুগীর মতন অসাড় করে দিল—লণ্ঠন মাটিতে পড়ে নিভে গেল।

শীর্ষেন্দু দেখেছিল মিনকর চোখ খোলা এবং বুঝতে পারছিল তার শরীরে রক্ত চলাচলও থেমে গেছে অনেকক্ষণ। মিনকুর মৃতদেহ সে কোলে করে নিয়ে এসেছে পাশের ঘর থেকে এইমাত্র।

কোনরকম অস্থিরতা প্রকাশ করল না শীর্ষেন্দু। সে দাঁড়িয়ে থাকল স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে। শুধু তার এখন মনে হচ্ছিল ক্ষৌরকর্মের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তার চেহারা বিকৃত, বীভৎস করে দিয়েছে।

পাখির কর্কশ ডাক, হাওয়ার শনশন, মাটির উৎকট ঘ্রাণ—বাইরে যেন অনেক মানুষের পায়ের খস খস শব্দ। মরা টিকটিকি, কেতকীর মুখ, মিনকু ও মহুয়া—শীর্ষেন্দু ভাবছিল সকলকে নিয়ে সে একটা খুব বড় ফ্রিজের মধ্যেই আছে। মহুয়া, পরিশ্রান্ত, বেহুঁশ। তাকেও এখন মড়ার মতন মনে হচ্ছিল শীর্ষেন্দুর।

সির্দির সাঁইবাবা

[পি সি ভি আয়ার, সচিব শ্রী সাঁই সমাজ]

সির্দির সাঁইবাবা হলেন আশা-হীনদের আশা, অন্ধের দৃষ্টি আর মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে প্রাণদানকারী। চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়ে যাঁদের জীবনে এসেছিল গভীর হতাশা সাঁইবাবার সাথে সাক্ষাতের পর তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই জীবনের একটা মল্যায়ন ও উদ্দেশ্য আছে।

১৯১৮ সালে তাঁর দেহান্তর ঘটলেও আজ এবং এখনও তিনি জীবনের এক মূর্ত প্রতীক। শুধ তাই নয় এই পৃথ্বীর জীবনের চেয়ে আরও শক্তিধর। অল্প কথায় সাঁইবাবা হলেন এক মহান জীবনের প্রতীক।

এই চিত্তাকর্ষক মহান পুরুষকে জানবার বা বোঝবার আগে এটা জানা প্রয়োজন যে, পশ্চিম ভারতে কিভাবে তাঁর নাটকীয় আবির্ভাব ঘটল। তখন বৃটিশ রাজত্ব বেশ কায়েম হয়েছে। বিজ্ঞান এবং জড়বাদ তাদের গর্বিত মাথা তুলে তখন আধ্যাত্মিকতা ও যোগের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শন করছে। ধর্ম তখন এক শ্রেণীর মানুষের কাছে গোঁড়ামি।

এই জড়বাদের যুগেই বেনারসে (উত্তরে) তৈলঙ্গস্বামীর আবির্ভাব ঘটে, ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস (পূর্বে) ভগবান শ্রীরামানা তিরুভন্ন-মালাইতে (দক্ষিণে) এবং সির্দির সাঁইবাবা (পশ্চিমে) এই কয় মহাপুরুষ বিশেষ করে দেশের যুব-সমাজকে জড়বাদ ও নাস্তিকতাবাদের ক্লোরোফর্ম হইতে মুক্তির পথ দেখান।

এই চার মহাপুরুষের উদ্দেশ্য ছিল প্রায় এক। দেশের চার কোণে এই চার জনের আবির্ভাব। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাঁরা আপন করে নিয়েছেন।

ধর্মের গোঁড়ামি ...

মুক্ত। নিজেদের পথে আধুনিক এবং তাঁদের আবেদন ছিল সার্বজনীন। ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাণী সশ্রদ্ধচিত্তে বহু বিদেশী গ্রহণ করেন।

১৮৫৪ সালে বালক হিসাবে সাঁই-বাবা যখন সির্দিতে এলেন এর আগে তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। কিছুকাল অনুপস্থিতির পর তিনি ১৯১৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বাকী জীবনটাই এই গ্রামে কাটান। মহারাষ্ট্রের আমেদনগর জেলার কোনারগাঁও রেল স্টেশনের

সাঁইবাবা

কাছে এই গ্রামটি অবস্থিত। প্রথমে তিনি একটি নিমগাছের তলায় বসে অসুস্থদের গাছ-গাছড়া দিতেন। তৎপর তিনি একটি মসজিদে যান। একে তিনি দ্বারকাময়ী বলে ডাকতেন। এখানে কি এক আগুন জেলে ছিলেন। সেই আগুন অনির্বাণ আজও জলছে। গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ তৈরী করা ছেড়ে তিনি অসুস্থ নরনারীদের সেই আগুনের ছাই দিতেন।

নাম দিয়েছিল 'উধী'। অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা জেনেছিলেন যে এই ছাই সকল রোগের নিরাময়। সাঁই-বাবার কাছে প্রার্থনা করে যাঁরা যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন।

সাঁইবাবার কয়েকটি চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য তাঁকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবেযখন আমরা আধ্যাত্মিকতার মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করি, তখন দেখি আমরা কোন না কোন পার্থিব সুখ-মগ্ন এবং চিরকালই একটা সাময়িক ত্রাণ পেতে চাই। আমাদের এই দুর্বলতার কথা জেনেই সাঁইবাবা মানুষকে পার্থিব উপকার অনুমোদন করতেন এবং পরে মানুষের কৃতজ্ঞতা উপাসনায় পরিবর্তন করতেন। এই ভাবে কিছু পাওয়ার জন্য প্রার্থনা উপাসনায় পরিবর্তিত হত। বাবার চিন্তা পারস্পরিক কথোপকথন এবং প্রশংসা পরিণত হত পূজায়।

সাঁইবাবা তাঁর ভক্তদের পূজা-অর্চনা ও দান-ধ্যানের মধ্যে নিয়োজিত রাখতেন। এই সৎচিন্তা ও সৎকর্মের মধ্য দিয়ে অর্জিত ফল যাতে এই জীবনেই কাজে লাগে তার পথ দেখাতেন। আধুনিক মানুষ ভগবানের দয়া, শক্তি ও জ্ঞানসম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও আইনের সাক্ষ্য চায়। সাঁইবাবা এর প্রমাণ দিয়েছেন।

সির্দিতে সাঁইবাবার যে মঠ তৈরী হয়েছে তা একটি বিরাট এস্টেট। সরকার নিযুক্ত একজন রিসিভার এবং তার স্টাফ-এর দেখাশুনা করেন। বিশ্বের দরবারে যিনি সাঁইবাবাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সেই শ্রদ্ধেয় বি ভি নরসিংহ স্বামীজী মাদ্রাজে নিজস্ব বাড়ীতে সর্বভারতীয় সাঁই-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।

…' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও আছে। কলকাতার ১২০।বি রাসবিহারী এভিনিউতে বিগত ২৭ বছর ধরে সাঁই-সমাজ চলছে। সেখানে প্রতি রবিবার ১ থেকে ৩ শত ব্যক্তিকে খাদ্য বিতরণ করা হয় … বছরের ১০ই মার্চ থেকে প্রাত্যাহিক পূজা, প্রতি বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক ভজন, সাঁই পুস্তক, ছবি, লকেট প্রভৃতি বিক্রয় চলছে। দেশপ্রিয় পার্কের বিপরীত দিকে ১৩৪।এ রাস-বিহারী এভিনিউতে। তবে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে হবে শুধুমাত্র ১২০।বি, রাসবিহারী এভিনিউতে।

সমাজ ইংরাজীতে প্রতি মাসে একটা বুলেটিন বার করেন। এতে সাঁইবাবার শিক্ষা, সমাজের কার্যকলাপ এবং আগামী দিনের সভাসমিতি সম্পর্কে সংবাদ থাকে। শ্রী জে এন বসুর গৃহে ১১নং সুইনহো স্ট্রীটে বঙ্গীয় সদগুরু সাঁই সঙ্ঘ তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুবাদক—শ্যাম মল্লিক

একান্ত

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

একা আমি এবং একান্ত প্রাণমন,
একলষণ্ডী ব্যতিদানে শিখাশিহরণ।
নিতান্ত নিভৃতি নিয়ে বুকের গভীরে
শীতের কুণ্ঠিত ত্বক বাসনার সতৃষ্ণায় ঘিরে—
বাসনা একক জাগে নিভৃত মানসে
যত না নির্জন কক্ষ মনের বিলীন স্তরে আপন রভসে,
একা আমি এবং একান্তে থাকি যদি—
হৃদয়ের দ্বারভাঙ্গা ছুটে চলে দ্রুতগতি নদী।

এপার ওপার নিয়ে পদ্মাগঙ্গা তোলপাড় পাড়া,
তবুও কি পাওয়া যায় সাড়া?
হৃদয়-অরণ্য ঘেরা অন্য কোনো অন্য কারো মনে
একক হৃদয় নিয়ে থাকা জানি শুধু তো গোপনে।
আশ্চর্য সমস্ত দেহ সুস্থ ও সবল,
অথচ নির্জন বাস শরীরের ত্বকে নিয়ে প্রগতি চঞ্চল;
কিন্তু প্রাণ প্রগতির ছন্দে
অনেক আনন্দ থেকে ধ্যাননেত্রে নিরন্ত উচ্ছলে।

ভাসা মেঘে চলোর্মির গতি—
সেটা কি আসল নতে শাশ্বত প্রগতি?
অথবা উপর পানে হাসির আভাস
অন্তরে শানানো ছুরি বিদ্বেষী আকাশ।
কিন্তু তার ঘনকৃষ্ণ মেঘ
জমেছে অনেক,
সেখানে প্রচুর আছে আলোর উচ্ছ্বাস,
অন্তরে গভীর জানি বাণী কোনো ধ্বনিত বিভাস
অরূপে মহিমামগ্ন নিশ্চিন্ত নিলয়—
একান্ত ধ্যানের মন্ত্রে সুবিস্তৃত আত্মার নির্ভয়।
সেখানে প্রাণের দিকে ফিরে চায় এক
সে এক, এবং জানি অদ্বিতীয় প্রাণের আরেক।—
হারানো গুহার নিম্নে অতলের তলে
তলিয়ে যাওয়ার থেকে প্রাপ্তির চমকে যেন জাগ্রত উচ্ছলে,
সাগরের লোনাজল খেয়ে খেয়ে মুক্তার সন্ধান
নিরুদ্ধ নিশ্বাস টেনে গৌরীশৃঙ্গ আনন্দের অবাধ্য অভিযান।

সুস্থ মন, চেতনার অসুস্থ অতৃপ্তি
জ্বালিয়ে ধরেছে রাতে প্রাণের প্রদীপ্তি—
রাত্রির ঘনালো কালো তবু তো ভোরের আলো এবং কাকলি,
রয়েছে আগামী দিনে আগামীর আনন্দ সকলি।
তারারা সব তাই হয় তো বা প্রচ্ছন্ন প্রস্তুতি

সুন্দরবন অতীত ও বর্তমান

নরোত্তম হালদার

বর্তমান সুন্দরবনের নূতন জনপদ ও রক্ষিত জঙ্গল

বঙ্গোপসাগর কূলে হুগলী নদী এবং মেঘনা নদীর মোহনার মধ্যবর্তী নিম্নবঙ্গের একশত পঁয়ষট্টি মাইল দীর্ঘ ও পঁচাশি মাইল প্রশস্ত অঞ্চল সুন্দরবন নামে অভিহিত। সুতরাং সমগ্র সুন্দরবনের আয়তন প্রায় চৌদ্দহাজার বর্গমাইল। পূর্বে এই বিশাল অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ইংরাজ আমলে ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে এখানে জঙ্গল হাঁসিলের কাজও পুনর্বসতি সুরু হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে সুন্দরবনের খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ অংশ পূর্ব-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্তমান ভারতের সুন্দরবন বলতে চব্বিশপরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত কাকদ্বীপ, সাগর, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর, জয়নগর, ক্যানিং, হাড়োয়া, হাস্নাবাদ ও সন্দেশখালি থানার লাট-অঞ্চলকে বোঝায়। শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্য হাঁসিল করে ১৬৩টি লাট এবং 'এ' থেকে 'এল্' পর্যন্ত ১২টি প্লটে ভাগ করা হয়েছে। ইহার পূর্ব-দক্ষিণাংশে কিছু জঙ্গল সংরক্ষিত আছে; সেখানে বাদা-সহ এই লাট-অঞ্চলের আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গমাইল।

ইহার পশ্চিম সীমা কাকদ্বীপ থানার ১ নং লাট থেকে সাগরদ্বীপের সমুদ্রতীর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রায় আটাশ মাইল; কিন্তু পূর্বসীমা হাসনাবাদ থানার টাকীরোডের নিকটবর্তী ৯৫ নং লাট থেকে সন্দেশখালি থানার দক্ষিণ সীমায় সমুদ্রতীর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বাহাত্তর মাইল। আবার উত্তরাংশে হাড়োয়া থানার ৬৮ নং লাট থেকে ইছামতী নদী পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে ইহা প্রায় কুড়ি মাইল এবং দক্ষিণাংশে হুগলী নদীর মোহনা থেকে হাঁড়িয়া ভাঙ্গা নদীর মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রতীর পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় বাহাত্তর মাইল বিস্তৃত। সুতরাং বর্তমান লাট-অঞ্চলের সীমা-বাঁধ বা 'সুন্দরবন এম্বাঙ্কমেণ্ট'-এর উত্তরে বসিরহাট, আলিপুর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার আবাদ-অঞ্চল কোণাকুণিভাবে অবস্থিত; পূর্বে ইছামতী, কালিন্দী ও হাঁড়িয়াভাঙ্গা নদীর ওপারে পূর্ব-পাকিস্থানের সুন্দরবন বিভাগ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে হুগলী নদীর ওপারে মেদিনীপুর জেলা। পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী বলে এই

একদা এই লাট-অঞ্চল ছিল জন-মানবহীন গভীর অরণ্য; সেই গভীর অরণ্য সীমান্তে বসিরহাট, আলিপুর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অবশিষ্ট অংশেও স্থানে স্থানে জঙ্গল ছিল। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মাটির নিচে সুন্দরী গাছের মূল বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে। এসব অঞ্চলে আবাদকারী মানুষের বসবাস বেশী থাকলেও উক্ত তিনটি মহকুমা পূর্বে সম্পূর্ণভাবে সুন্দরবন অঞ্চলরূপে পরিগণিত হত।

সুতরাং সুন্দরবন অঞ্চলকে বর্তমানে (১) রক্ষিত জঙ্গল বা অভয়ারণ্য, (২) লাটঅঞ্চল ও (৩) আবাদ-অঞ্চল—এই তিন বিভাগে ভাগ করা যায়। বহু শহর ও শিল্পকেন্দ্রে পরিপূর্ণ আবাদ-অঞ্চল এখন সুসমৃদ্ধ জনপদরূপে প্রতিষ্ঠিত। সুন্দরবন উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে লাট-অঞ্চলের উন্নয়নকার্য ত্বরান্বিত করা চলেছে এবং রক্ষিত জঙ্গলে পশুপক্ষী শিকার ও যথেচ্ছ বৃক্ষচ্ছেদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুন্দরবনের রক্ষিত জঙ্গল এখনও সকলের কাছে রোমাঞ্চকর বিস্ময়স্থল। এখানকার কাঠ ও মোম মূল্যবান এবং মধু, মাছ, পাখী ও মৃগমাংস প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর হলেও—ডাঙায় বাঘ

সুন্দরবনের হরিণ-হরিণী

ও হাঙর-কুমীরের ভয়ঙ্কর লীলাক্ষেত্র এবং ভয়চকিত-হরিণ, বানর, সজারু, শিয়াল, বনবিড়াল ও নানা জাতীয় পক্ষিকুলের স্বেচ্ছাবিচরণস্থল।

সুন্দরবন অরণ্যের লোমহর্ষক ও বিস্ময়-বিমুগ্ধকর দৃশ্য-মাধুর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এবং নিজ চোখে না দেখলে সম্পূর্ণ অনুভব করা যায় না। সুন্দরী, পশুর, বাইন, ধোন্দল, ক্যাওড়া, গর্জন, গরাণ, গেঁয়ো, হেঁতাল, বনঝাউ, গোল, বলা, হোদো, করঞ্জ, হিঙ্গে, গিলে, বেত প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষলতা ও কাঁটা গাছের নিবিড় অরণ্যভূমি অসংখ্য নদী ও খালে ভরা।

নদনদীগুলির মধ্যে কালনাগিনী, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণী, বারাতলা, মড়িগঙ্গা, চড়াগঙ্গা, হুগলী, গোবধিয়া, গোসাবা, মৃদঙ্গভাঙ্গা, পাখী-রালা, খিয়াবতী, ইচ্ছামতী, বিদ্যাধরী, কালিন্দী, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল, নেতি-ধোপানী, চাঁদখালি, জামিরা, মণি, মাতলা, ঝিল্লা, পিয়ালী প্রভৃতি প্রধান।

এই সব নদীখালে কৈভোল, ভোলা, ভেট্‌কী, ভাঙন, পায়রাতলি, পাঙ্গাস্‌, পার্শে, তপ্‌সে, খল্‌সে, খয়রা, ফ্যাসা, শেলে, শংখচূড়, মুরলী, আইড়, চেঁওয়া, চাঁদ, ট্যাংরা, ডাগ্‌রা, দাঁতনে, সিলিন্দা, চিত্রা, রেখা, রুচা, রূপাপাতি, লহরা, কামট ও করাতমাছ প্রভৃতি নানা জাতীয় মৎস্য, বহু রকমের চিংড়ি, সমুদ্র-কাঁকড়া ও কচ্ছপ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সে জন্য এখানকার অভয়ারণ্যে দেশী-বিদেশী অসংখ্য মৎস্যাশী পাখী বাস করে। বক, বাজ, বাচ্‌কা, চিল, চাতক, কাক, কোরল, কাক, বনমুরগী, বাটাং, বুলবুলি, মাছাল, মাছরাঙা, মানিক-জোড়, মদনটাক, শালিক, শামুকখোল, ধেনো, পানকৌড়ি, খরহাঁস, গয়াল, পায়রা, ঘুঘু, দোয়েল, ফিঙে, টিয়ে, ময়না, ছাতারে, হল্‌দেমণি প্রভৃতি নানা জাতীয় অসংখ্য পাখীর কলরবে বনভূমি সর্বদা মুখরিত থাকে। এখানকার সজনেখালি জঙ্গলে সাপপাখী, কৃষ্ণ-কণ্ঠ সারস, সবুজ বক প্রভৃতি অদ্ভুত পাখীও দেখা যায়।

গভীর অরণ্যে নিয়তই নানারূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কোন কোন মাছ গাছ বেয়ে ওপরে ওঠে। সাপেরা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। এমন কি বাঘও মাঝে মাঝে গাছের ডালে বিশ্রাম করে—সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যায়। আবার কুমীরেরা ডাঙায় উঠে জীবজন্তু শিকার করে। বাঘে, শূকরে ও কুমীরে প্রচণ্ড লড়াই বাধে। মৎস্য শিকার এবং শুশুক, হাঙর ও কামট-কুমীরের লড়াই উপলক্ষে জলের মধ্যে তোলপাড় হয়। একটি নদীর সঙ্গে [illegible]

দুটো একই নদীর উভয় অংশে স্রোত বিপরীত মুখে প্রবাহিত হয়।

এখানকার শুশনী নামক একপ্রকার মৎস্যাশী জলজীব অনেকটা মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট। নদীকূলের জলে-কাদায় পা ছড়িয়ে দিয়ে শুশনী-জননী যখন তার সন্তানকে স্তনাপান করায় এবং নৌকার কাছাকাছি ভেসে উঠে হঠাৎ ডুবে যায়—তখন দর্শক যেন তার নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারে না।

এখানকার বানরেরা হরিণদের পরম উপকারী বন্ধু। গাছের উপর থেকে দূরে-কাছে কোথাও বাঘ, শিকারী বা অন্যান্য শত্রু দেখতে পেলেই তারা নানারূপ অঙ্গভঙ্গী, মুখভঙ্গী ও চীৎকার করে হরিণদের জানিয়ে দেয়। গাছের তলায় সমাগত হরিণদের ডাল-পাতা ভেঙে খাওয়ায়। কখনও তাদের পিঠে চড়ে রাখাল বালকের মত অভিভাবকের ভঙ্গীতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

জলে যেমন মাছে মাছ খায়, ডাঙায় তেমনি সাপে খায় সাপ। কেউটে, গোখ্‌রো, শংখচূড়, শাঁখামুটি, বোড়া, কালনাগিনী, উদয়কাল, বঙ্করাজ, বরাচিতা, ময়াল, শিয়রচাঁদা প্রভৃতি অসংখ্য নামের হরেকরকম সাপ সুন্দর-বনে আছে। সর্বকিছু মিলিয়ে সুন্দরবনকে 'ভয়ানক—সুন্দর' বলা যেতে পারে।

ইতঃপূর্বে স্বনামে ও ছদ্মনামে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় 'সুন্দরবনের জঙ্গলে' এবং 'দখিনা' পত্রিকায় 'সুন্দরবনের চিঠি' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধসমূহে সুন্দরবনের কথা বিশদ আলোচনা করেছি।

'সুন্দরবন' নাম কবে থেকে হয়েছে সঠিক বলা যায় না। জোয়ারের সময় বনভূমি জলে ডুবে থাকে এবং ভাঁটায় জেগে ওঠে মাটি, তাই সুন্দরবনকে বলা হয় 'ভাঁটি'। স্থানীয় বাসিন্দাগণের নিকট সুন্দরবনের জঙ্গল বাদা, মহল, বাগান প্রভৃতি নামেও সমধিক পরিচিত। প্রচুর সুন্দরী ('হেরিটিয়েরা মাইনর') বা সুঁদরী গাছ পাওয়া যায় বলে এই বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন—এই ধারণা [illegible]

কেউ বলেন 'সমুদ্রবন' থেকে, কেউ বলেন 'চন্দ্রদ্বীপ বন' বা 'চন্দ্রবন' নাম থেকে, আবার কেউ মনে করেন 'চণ্ডভণ্ড' নামক বন্যজাতির বাসস্থান থেকে সুন্দরবন নামের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, বাহান্ন পীঠের অন্যতম যে পীঠস্থানে সতীদেবীর নাসিকা পতিত হয়েছিল—বাখরগঞ্জের সেই 'সুগন্ধ' বা সুন্ধ নামক স্থান ও নদীর নামানুসারে কথিত 'সুন্ধ'র বন বা 'সুন্দ'র বন কালক্রমে প্রসারিত হওয়ায় পরবর্তীকালে সমগ্র বনভূমি 'সুন্দরবন' নামে অভিহিত হয়েছে।

জঙ্গল হাঁসিলের সময় থেকে সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র মনুষ্যবসতির নিদর্শনস্বরূপ যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এই বিশাল অঞ্চল চিরকাল অরণ্যাবৃত ছিল না। ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মৃত্তিকাফলক, তাম্রফলক, ভগ্ন অট্টালিকা, মন্দির, মূর্তি ও অলঙ্কারাদি এবং দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত, পর্যটক, বণিক ও ঐতিহাসিকগণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এককালে এখানে সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল এবং নদ-নদীগুলির তীরে তীরে বহু বন্দর-নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পৌরাণিক যুগে 'রসাতল', 'পাতাল' ও 'ম্লেচ্ছ রাজ্য,' মৌর্য ও গুপ্তযুগে 'গঙ্গারিডি', পাল ও সেন যুগে 'ব্যাঘ্রতটিমণ্ডল' প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে এবং বিভিন্ন সময়ে 'পৌণ্ড্রবর্ধন', 'গৌড়', 'যশোহর' প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং বাণিজ্য গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে এই অঞ্চল উন্নতি-শিখরে আরোহণ করেছিল।

পালযুগে 'শ্রীবলবর্মা' ও পাঠানযুগে 'রামচন্দ্র খাঁ' এখানকার জনপ্রিয় শাসনকর্তা ছিলেন। মোগলযুগের 'প্রতাপাদিত্য' এখানকার সর্বশেষ স্বাধীন নরপতি। এখানকার গঙ্গাসাগর-সঙ্গম পৌরাণিক যুগ থেকেই মহাতীর্থরূপে পরিগণিত।

ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে কালক্রমে এই অঞ্চল অত্যধিক নিম্নতা-প্রাপ্ত হওয়ায় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বারংবার লোনা জলে নিমজ্জিত হওয়ায় এবং আরাকান, মগ, পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যু ও বোম্বেটেদের অপ্রতিরোধ্য নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এখানকার অধিবাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যেতে থাক। এভাবে ক্রমশ এখানকার জনশক্তি ও ধনসম্পদ বিলুপ্ত হতে হতে সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে, একসময়ে বিশাল অরণ্য অপরূপ-রূপে গ্রাস ক'রে ফেলে এই বিস্তীর্ণ সুসমৃদ্ধ জনপদকে—শ্বাপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে সে অরণ্য। ভয়ঙ্কর হলেও বহুকাল ধ'রে এখান থেকে অফুরন্ত লবণ, কাঠ, মাছ, মধু, মোম, পক্ষী ও মৃগ-মাংস আহরিত হয়েছে, অতঃপর কাল-ক্রমে বিদেশী শোষণে ভারতবর্ষের প্রাচুর্য ক্রমাগত নিঃস্বতায় রূপান্তরিত হওয়ায় এবং বিপুলহারে জনসংখ্যা বর্ধিত হওয়ায়—খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে মানুষ প্রাণের দায়ে প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে, ভয়াবহ জঙ্গল হাঁসিল ক'রে আবার এখানে নিজেদের বাসস্থান রচনা করেছে। অপরিসীম অধ্যবসায়ে অসংখ্য লোনা নদী ও খালকে বেঁধে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে গ্রাম বসিয়েছে এখানকার মানুষ। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ও শহর-বাজার স্থাপন ক'রে সুন্দরবন-বাসীরা এখানকার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

আদি গঙ্গার স্তোত্র

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর গঙ্গাষ্টক স্তোত্রে বলেছেন—

'গাঙ্গং বারি মনোহারি, মুরারি চরণচ্যুতং গঙ্গা
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি, পাপহারি পুনাতু মাং ॥'

অর্থাৎ শ্রীহরির পদনির্গত যে স্নেহবারি দেবাদিদেব মহাদেব মস্তকে ধারণ করেন সেই পাপহারী মনোহর গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুক।

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে আছে—অসংখ্য তীর্থঘাটে ঢেউ দিয়ে এই গঙ্গার সুগন্ধ পুষ্পবাহী জল প্রবাহিত হত।

অর্থাৎ তৎকালে তীর্থঘাটে গঙ্গাস্নানার্থীদের স্নান-পূজার পুষ্প-চন্দনাদির কথাই বলা হয়েছে।

বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপিতে এই ভাগীরথী বা জাহ্নবীকে বলা হয়েছে 'সুরসরিৎ' বা স্বর্গধারা এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে বলা হয়েছে 'সুরনদী' বা দেবনদী—

'পবিত্র করিল ধরা সুরনদী তীর্থবর,
আইল সাগর সন্নিধান।
আসি গঙ্গা এইপথে কহিলেন ভগীরথে
কোথা মৈল সগরনন্দন।'
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

হিন্দুগণের বিশ্বাস, এই স্বর্গধারা বা দেবনদী গঙ্গা পাপহারিণী, কোন

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদম্পতি—রয়েল বেঙ্গল টাইগার

জাক বা বস্তু যতই অপবিত্র হোক না কেন গঙ্গাজল স্পর্শে সমস্তই পবিত্র হয়, প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে এই ভাগীরথী জাহ্নবী হিন্দুর পরমতীর্থরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বিভিন্ন ঋতুতে অসংখ্য পুণ্যার্থী পবিত্র স্নানের সুপ্রাচীন আদি-গঙ্গা বিভিন্ন অংশে গঙ্গাস্নান করে। স্বর্গদ্বার হিমালয় ও ভারতের বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে এই গঙ্গা সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হন এবং পূর্বকালে 'পাতাল' নামে কথিত বর্তমান সাগরদ্বীপ থেকে সমুদ্রের সহিত মিলিত হন। তাই এ অঞ্চলে কালীঘাট, রাজপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, বড়াশী, গণ্ডঘাটা, কাকদ্বীপ, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি স্থানে পৌষ সংক্রান্তিতে মকর স্নান, চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদে নন্দাস্নান ও চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ স্নান সময়ে প্রচুর লোক সমাগম হয়—মেলা বসে।

দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্রে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর নিধনের পর দৈত্যগণ জলধিবক্ষে আশ্রয় নেয়। মুনি-ঋষি-গণকে হত্যা ও যাগযজ্ঞ পণ্ড ক'রে আবার তারা সকলকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। জলযুদ্ধে দেবতাগণও তাদের দমন করতে না পেরে অবশেষে অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হন। অগস্ত্যের সমুদ্র-শোষণের ফলে তারা পরাস্ত হয়। তারপর দীর্ঘকাল নদনদী শুষ্ক থাকায় দেশে দারুণ জলাভাব উপস্থিত হয় এবং যানবাহন চলাচল ও ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তৎকালে অযোধ্যার সূর্যবংশীয় নৃপতি হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। তদুপলক্ষে তাঁর ষাট হাজার সন্তান কর্তৃক পাতাল অধিকৃত হয়; কিন্তু মহর্ষি কপিলের অভিশাপে সেখানে তাঁরা সকলে ভস্মীভূত হন। সগরের প্রপৌত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র মহাত্মা ভগীরথ বহু সাধনায় স্বর্গ থেকে পতিতপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন; তাই গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী, পাতালে সাগর-সঙ্গম স্থলে গঙ্গাজল স্পর্শে সগর-বংশ শাপমুক্ত হয় এবং দারুণ জলাভাব ও অশান্তির হাত থেকে দেশ রক্ষা পায়। রামায়ণ ও মহাভারতে গঙ্গা আনয়নের এই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

এই কাহিনী থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আর্যগণের নিকট স্থলযুদ্ধে পরাজয় বরণের পরেও অনার্যগণ সমুদ্রে ও সমুদ্রতীরে আশ্রয় নিয়ে যাগযজ্ঞের বিরোধিতা ক'রে আর্যপ্রভাব প্রসারে বাধাদান করেছিল, রথ-অশ্বের স্থলযুদ্ধে পারদর্শী আর্যগণ নৌশক্তিতে অনার্যগণের নিকট সহজেই পরাজয় বরণ করেন। অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণ ও নদ-নদীগুলি শুষ্ক হওয়ার কাহিনীর সঙ্গে সমুদ্রগর্ভ ও নদীমুখ চরাট হওয়ার সম্বন্ধ আছে। ব্যাপক ভূমিকম্পে সমুদ্র ও নদীগর্ভের মাটি উঁচু হওয়ায় এবং উৎসমুখ রুদ্ধ হওয়ায় নদীগুলি মজে গিয়ে দেশ একদা চরম দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছিল—এবং আগ্নেয়গিরি-সমূহের অগ্ন্যুদ্‌গারের ফলে পাতাল প্রদেশে সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান বা প্রজা ভস্মীভূত হয়েছিল, মহর্ষি কপিলের উপদেশক্রমে এবং মহাত্মা ভগীরথের উদ্যোগে উৎসমুখ ও নদীগর্ভের রুদ্ধ ও মজা অংশগুলি খননের দ্বারা গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর উৎপত্তির ফলে দেশের দুর্দশা দূরীভূত হয়েছিল। এই শুভকর্মের সমাপ্তি-দিবস উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তিতে আদিগঙ্গার ঘাটে ঘাটে আজও স্নানোৎসব প্রতি-পালিত হয়।

বর্তমানে গঙ্গার গতি হুগলী নদী-পথে পরিবর্তিত হওয়ায় আদিগঙ্গা বা ভাগীরথীর সর্বপ্রাচীন ধারা আবার অবলুপ্ত হয়ে গেছে। একদা যেখান থেকে বড় বড় বাণিজ্যতরীর আনাগোনা ছিল, সেই স্রোতস্বিনী আজ কোথায়ও ক্ষীণাঙ্গীরূপে অন্যান্য নদ-নদী ও খালের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে, আর কোথাও কোথাও হাজামজা পুষ্করিণী ও জলাভূমিরূপে তার নিদর্শন রক্ষা করছে। কালীঘাট, গণ্ডঘাটা, কাকদ্বীপ, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি স্থানের ক্ষীণধারা ও রাজপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ প্রভৃতি স্থানের পুষ্করিণীর জল আজও গঙ্গাজল রূপে ব্যবহৃত হয় এবং এইসব স্থানে হিন্দুদের শব দাহ করা হয় ও শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান কার্যাদি অনুষ্ঠিত হয় যুগ যুগ ধ'রে। কিন্তু খিদিরপুরের উপর দিয়ে যে হুগলী নদী বিরাট কলেবরে প্রবাহিত হয়েছে—তা ভাগীরথী-জাহ্নবীর নিম্নাংশ নহে (নবাব আলীবর্দীর সময়ে এখানে খাল কেটে সরস্বতী নদী ও হুগলী নদীকে যুক্ত করা হয়েছিল)। সেজন্য উহাতে গঙ্গাস্নান ও শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান কার্যাদি অনুষ্ঠিত হয় না।

'গয়া কাশী নীলাচল, দ্বারকা মথুরা স্থল
রামেশ্বর বদরিকাশ্রম।
এসব যতেক তীর্থ বিষ্ণুর সম মহত্ত্ব
সর্বতীর্থ গঙ্গা সর্বোত্তম ॥'
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ (আদিকাণ্ড)।

গঙ্গানদীর তীরে তীরে

'একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
চতুর্দিকে আর যত দেব ঋষিগণ ॥
সভামাঝে ত্রিলোচন গান পঞ্চমুখে।
দেবঋষি স্বর্গবাসী পুলকিত দেখে ॥
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম, ডম্বুরে বলে হরি।
পঞ্চমুখে স্তুতিগান করেন ত্রিপুরারি ॥
লক্ষ্মীসহ বসিয়া আছেন মহাশয়।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময় ॥
দ্রবরূপ হইলেন নিজে নারায়ণ।
পতিতপাবনী গঙ্গা তাহাতে জনম ॥'
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ (আদিকাণ্ড)।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও সগর-সন্ততিগণের উদ্ধারের সময় থেকে মহর্ষি কপিলের সাধনাক্ষেত্র গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-স্থল মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে—

'মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম।
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম॥
গঙ্গাসাগরে যে নর করে স্নান দান।
সর্বপাপে মুক্ত হয়ে স্বর্গে পায় স্থান ॥
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহৎ ॥'
—রামায়ণ (আদিকাণ্ড)

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

পৌষ / '৭৫

ভারতের সামরিক বাহিনীর অধ্যক্ষ শ্রী পি পি কুমারমঙ্গলম নয়াদি
সর্দার প্যাটেলের মূর্তিতে মাল্য অর্পণ করছেন

পালাম বিমানবন্দরে নেপালের রাজা ও রাণীকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি ডঃ
জাকির হোসেন ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
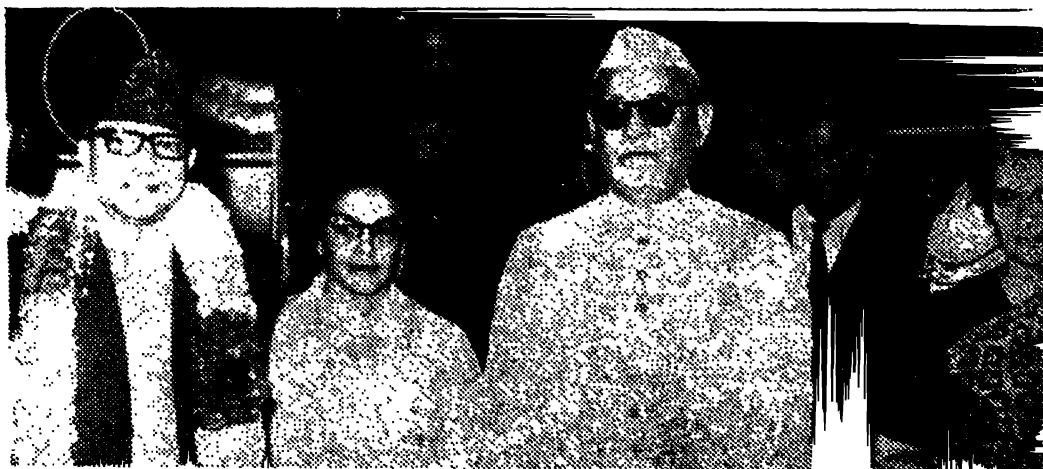
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মিঃ নিক্সন সংবাদপত্র প্রতিনিধি ও সমর্থকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন

রেডক্রশের পতাকা দিবসে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর রেডক্রশ পতাকা পরছেন

মহাকাশচারী বেরেগোভয়কে অর্ডার অব লেনিন ও স্বর্ণপদক পুরস্কার দিচ্ছেন
সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি শ্রীপদগর্নি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শ্রীজনসন ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধের কথা ঘোষণা করছেন

পরেশনাথের শোভাযাত্রা

রবীন্দ্র সদনে নট্ট কোম্পানীর যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। পার্শ্বে শ্রীঅশোককুমার সরকার ও ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দারা ভারতবর্ষের অসংখ্য তীর্থযাত্রী ও বিদেশীয় পর্যটকগণ সুদূর অতীত থেকে ভাগীরথী প্রবাহের তীর্থঘাট-গুলিতে এবং সাগর সঙ্গম মহাতীর্থে আসা-যাওয়া করতেন। কালক্রমে পুণ্য-তোয়া ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বদেশ পুণ্যভূমিরূপে পরিগণিত হয় এবং বাণিজ্য গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। জঙ্গল হাঁসিলের সময় থেকে পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চলে যে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি, দেবালয় ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষসমূহ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা থেকে মনে হয়—বিজ্ঞানে চরম উন্নতি ঘটলেও বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যযুগের গ্রা...নি আজও ততখানি সুসমৃদ্ধ হতে পারেনি। বিরাট বিরাট দীঘি, বাঁধানো ঘাট, অসংখ্য কূপ, মন্দির ও অট্টালিকায় ভরা ছিল পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর উভয়-পার্শ্বস্থ এই গ্রামগুলি। বর্তমান কালের শহর-কেন্দ্রিক সভ্যতায় শহরের সমৃদ্ধির পাশে গ্রামের এমন দুর্দশা ছিল না বলে মনে হয়। শহর-বন্দরগুলি অনুপাতে অধিক সমৃদ্ধিশালী হলেও সে যুগের গ্রামগুলিও বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।

পঞ্চদশ শতকে (১৪৯৫ খৃঃ) বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে সদাগরের বাণিজ্যতরী ভাগীরথীপথে কালীঘাট, চূড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাতীয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম ক'রে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পৌঁছায় এবং চাঁদ-সদাগর সেখানে তীর্থকার্য ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করেন—

'কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পূজিয়া।
চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া ॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে ॥
ছলিয়ার গাঙ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপয়ে ত্বরিত ॥

●

তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশে।
তীর্থকার্য কৈল রাজা পরম হরিষে ॥'

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত', মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এই ভাগীরথী প্রবাহ ও তার উভয় তীরস্থ তৎকালীন জনপদগুলির বর্ণনায় উক্ত স্থানসমূহের উল্লেখ আছে—

"বালিঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা ॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর ॥
নাচন গাছার ঘাটখান বামদিকে থুয়া।
ডাহিনেতে বারাসাত খলিনা এড়াইয়া ॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুসুত।
ছত্রভোগে এড়াইল হয়ে হর্ষযুত ॥
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অম্বুলিঙ্গিয়া উত্তরিল সদাগর ॥
সঙ্কেত মাধব পূজা করিল সত্বর।
তাহার মেলায় সাধু পায় হাত্যাঘর ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর চলে রাত্রিদিন ॥
সেইদিন সদাগর হাত্যাঘরে রয়।
রজনী প্রভাত করি মেলি সাত পায় ॥
দুই এক নৌকা জলমাঝে ভাসে।
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জন ॥
মোহানা বাহিল ডিঙ্গা করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দুর্জয় মগরা ॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (পৃঃ ২১০)

সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'রায় মঙ্গল' কাব্যে সুন্দরবনের লোকদেবতা দক্ষিণ রায়ের কাহিনীতে পুষ্পদত্ত ও দেবদত্ত সদাগর এই গঙ্গা-পথে মগরা, কাকদ্বীপ, ছত্রভোগ, অম্বুলিঙ্গ, বিষ্ণুপুর, জয়নগর, বড়ুক্ষেত্র, বারাসাত, মূলটি, সাধুঘাট, সূর্যপুর, বারুই-পুর, মালঞ্চ, কল্যাণপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম ক'রে বড়দহে উপনীত হন—

'যতেক ডিঙ্গার ন্যায় সঙ্গম গেলেন বায়্যা
তরণী লইয়া যায় ত্বরা।
গাটের গাবর যত বাহিতে বড়ই রত
ছাড়াইতে দুর্জয় মগরা ॥
সোজা না' বাহিয়া চলে কর্ণধার কুতূহলে
ধামাই বেতাই কৈল পাছে।
সাড়িগায় জুড়ি জুড়ি কাকদ্বীপ গজমুড়ি
ছাড়াইল বণিকের রাজে ॥
ভাবিয়া দক্ষিণ রায় ঠেঙ্গার পসত্ত যায়
হরষিত তরণীর লোক।
টিয়াখোল পাছু আন গঙ্গাধারায় করি স্নান
উপনীত হইল ছত্রভোগ ॥
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ
বাজে বাদ্য সুমধুর বাহিয়া হাজা বিষ্ণুপুর
জয়নগর করিল পশ্চাত ॥
সঘনে দামামা ধ্বনি শুনি রায় গুণমণি
বড়ুক্ষেত্র বহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত হইয়া সাধু হরষিত
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে ॥
বাহিল হাসুড়ি করি চাপাইল সপ্ততরী
মূলটি করিল পাছু আন।
দুই দুর্গা ক্রমে (ক্রমে) বাহিল হরিষে ডিঙ্গে
বাজে কাড়া বরগ বিষাণ।
সাধুঘাটা পাছে করি সূর্যপুর বাহে তরী
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পূজি
বাহে তরী সাধু গুণরাশি ॥
মালঞ্চ রহিল দূর বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণ মাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ কহিয়া নাম
বড়দহ ঘাটে উত্তরিল ॥'

—কবি কৃষ্ণদাসের গ্রন্থাবলী (রায় মঙ্গল, ...পৃঃ)

এছাড়া জাওডি ব্যারস (১৫৫০ খৃঃ), ভন্ ডেন্‌ব্রুক (১৬৬০ খৃঃ) প্রমুখ পাশ্চাত্য বণিক ও পণ্ডিতগণের অঙ্কিত নকশা সমূহে এবং ইবনে বতুতা (১৩২৮—৫৪ খৃঃ), রাল্‌ফ্ ফিচ্ (১৫২৮—৯১ খৃঃ), ফার্নাণ্ডিজ (১৫৯৮ খৃঃ), ফন্‌সেকা প্রমুখ পর্যটকগণের বিবরণীতে এই সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাচীন গঙ্গাপ্রবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

'হরিপদ পদ্ম-তরঙ্গিণী গঙ্গে।
হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে ॥
দূরীকুরু মম দুষ্কৃত-ভারং।
কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারং ॥'
—শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য (গঙ্গাস্তব)

এই রচনাটির সঙ্গে প্রকাশিত চিত্র-গুলি শ্রীশ্যামসুন্দর হালদার কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য-অঞ্চলে
[illegible]

আমার শ্রোত পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা আজ পুরুষানুক্রমে। মাঝে মাঝে নানা পার্টির নানা মহাপুরুষদের ঢাক-ঢোল বাজে বটে তবে তাতে আমাদের নির্বিবাদী শান্ত জীবনযাত্রার ব্যতিক্রম খুব বেশী ঘটে না।

আগামী ফেব্রুয়ারীতে নতুন নির্বাচন। সীমানায় লাল মেঘ। ভেতরেও ইতস্তত লাল রং-এর প্রাধান্যই শুনছি বেশী। আমরা উলুখড়—তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার অবকাশ কম। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধাক্কায় ব্যতিব্যস্ত। এরই মধ্যে এল দশভুজার মর্ত্যে আগমনের বার্তা। বর্ষায় ছাতাপড়া শহরটি সিক্ত বেশবাস ছেড়ে অতিথি ভ্রাম্যমাণ আগন্তুকদের জন্য নিজেদের সুসজ্জিত করে তুলেছে। চা-বাগানের নির্জনতা ছেড়ে আমরাও তখন এঁদের দর্শনের জন্য দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাই মাঝে মাঝে ছুটির অবকাশে।

মলরোডে কলকাতার মত জনস্রোত দেখে বেশ আনন্দ হয়। চারিদিক হতেই নানাধরণের মানুষ এসেছেন। রেলে, গাড়ীতে, রাস্তায়, ল্যাণ্ডরোভারে, জিপে, ট্যাক্সিতে তখনও আসা চলছেই।

গত বছ'র দশের কথা। একবার [illegible] দিন [illegible] জন্য দার্জিলিং-এর [illegible] [illegible] ও [illegible] জন্য [illegible] সব হল [illegible]। সিনেমা দুটিতেই 'হাউস ফুল' হয়ে গেছে। সকাল থেকেই দিনটা ছিল মেঘলা। শো ভাঙার পর কার্শিয়াং-এর উদ্দেশ্যে যখন গাড়ীতে উঠছি আমরা, তখনই মাঝামাঝি ধরণের বৃষ্টি নামল। সঙ্গে বেশ হাওয়াও দিচ্ছে। পথের মধ্যে প্রবল বর্ষণ এবং ঝড়ের আভাস পেলাম। কোনও রকমে বাড়ী পৌঁছান

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

গেল রাত দশটায়। সারা রাত সেদিন বর্ষণের বিরাম ছিল না। পরদিন সকাল হতেই ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া ও বর্ষণ চলতেই থাকল। রাতেও যখন কমল না বৃষ্টি আমাদের ১৯৫০ সালের দুর্যোগের কথা মনে হতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল তবুও কোথাও আকাশের উজ্জ্বলতা নেই। চারদিক যেন আশঙ্কা ও অন্ধকারে থমথম করছে। আটচল্লিশ ঘণ্টার বৃষ্টির আভাসেই যাত্রীরা সব দার্জিলিং ছাড়তে আরম্ভ করেছেন।

একে ঝড় জল তার উপর বেশ কনকনে ঠাণ্ডা ভাব। তাই সবাই এবার ঘরমুখো হতে চান। দার্জিলিং-এর তিন চারখানি মেল ছাড়ছে রোজই। কিন্তু চার তারিখ অক্টোবরের ট্রেণগুলি নিউ জলপাইগুড়ি আর পৌঁছাল না—আজও এই [illegible] পর্যন্ত।

রাতে বাগানের [illegible] জোরে গৃহকর্তা ফিরে [illegible] যে গত দুদিন এবং আজও শ্রমিকদের কাজ বন্ধই রাখা হয়েছে। বাইরে বেরোনোই অসম্ভব। তবে নিজেরা এঁরা দুর্যোগেও সহকারী দুজন সমেত সকাল-বিকেল বাগান যথারীতি পর্যবেক্ষণে গেছেন এবং বর্ষাকালে কাজ দেখে ফেরার মতই ভিজে বৃষ্টিস্নাত হয়ে ঐ তিনজন ফিরেছেন। এ সময়ও চায়ের পাতা থাকে। এঁরা দেখতে বেরুচ্ছেন চা-গাছগুলির ক্ষতি হচ্ছে কি না এবং ধ্বস নামছে কি না বাগানের মধ্যে কোথাও। যাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব থাকে তার জন্য সচেতন থাকতেই হয়।

অন্যদিন খাওয়ার টেবিলেই আমাদের দৈনিক গল্প এবং ঘরে বাইরের সমাচারের আসর বসে বলা যায়। কিন্তু ঐ শুক্রবার প্রত্যেকে যেন কিসের চিন্তায় আচ্ছন্ন। কোনও রকমে আহারাদি সেরে রাত্রের উপাসনার পর ঠাকুরঘর বন্ধ করে যে যার শয্যাশ্রয় করা গেছল। রাত বারটার পূর্ব পর্যন্ত যেমন ঝড়জলের দাপট তেমনি বিদ্যুতের চমক। দু-তিনটি বজ্রপাতও হ'ল দেখলাম। সেই সঙ্গে বেশ একটা গুম্‌গুম্ আওয়াজ কানে এল ঝাঁকানিও অনুভব হ'ল। পরে শুনি যে ভূমিকম্প হয়েছিল রাতে। কোনও রকমে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে সকালেই ঝড়ের বেগে চারিদিকের দুর্ঘটনার সংবাদ আমাদের কাছে আসতে সুরু করল।

১৯৫০ সালের দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণহানি খুবই কম ছিল। কিন্তু এবারে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা পাহাড়েই ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ট্রেন-যাত্রীদের খবর আপনারা শ্রীঅমিতাভ ঘোষের মাধ্যমে সবাই জেনেছেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। আমি নিজে বিকালের দিকে বৃষ্টি ধরার পর পাংখাবাড়ী রোডের ওপর গিয়ে দূর-দূরান্ত অবধি যতটুকু
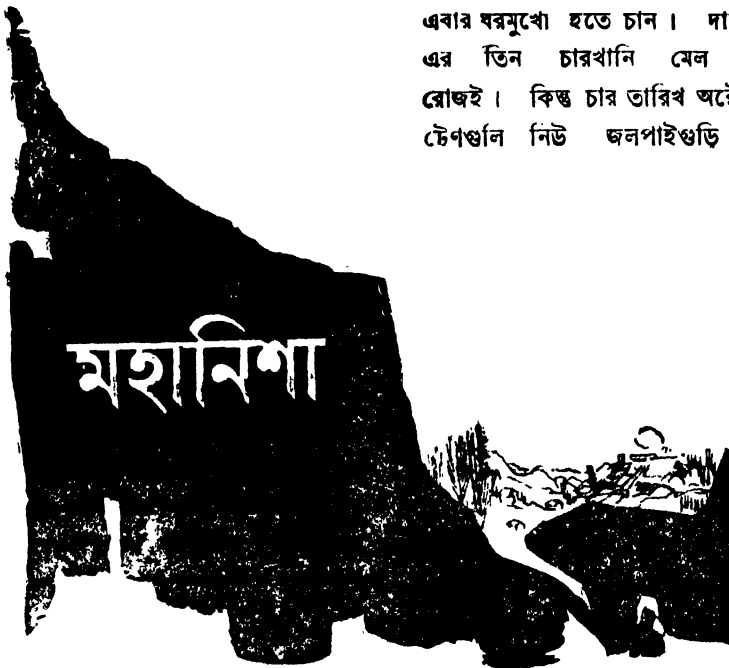
দেখা যায়, দেবদারু গাছের আয়তনের মত পাহাড়ের গা-গুলিতে ধস নামার চিহ্ন।

মানুষের বসতিগুলির কয়েকটি সম্পূর্ণ কোথাও কিছু কিছু ঘর নামিয়ে নিয়ে গেছে ধসে। মানুষ স্তব্ধ। পূজা পাহাড়ের মানুষদেরও একটি উৎসব। বিজয়ার দিন হতে এঁদেরও চলে "টীকা" অর্থাৎ ফোঁটা লাগাবার পর্ব। নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে পাহাড় হতে পাহাড়ে আনাগোনা। আনন্দ-সম্ভাষণ। প্রীতি-সম্মেলন। সব আনন্দ ডুবে গেল নিরানন্দের কালো-ছায়ায়। প্রকৃতির একটু অনিয়মে মানুষের গড়ে তোলা কত যত্নের গৃহগুলি নিশ্চিহ্ন আজ। একটি ঘরে কন্যা-জামাতা শুনলাম বিবা হর পর প্রথম এসেছিলো "টীকা" লাগাতে। রাতের অন্ধকারে দুর্যোগের মধ্যে তাদের ঘর ও সমগ্র পরিবারের কোথায় মিলিয়ে গেছে কেউ আজও সন্ধান জানে না।

বাড়ী ফেরার পর শুনলাম স্থানীয় রাজরাজেশ্বরী হল হতে হলের প্রধান শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলে উপস্থিত হয়ে চাল-ডালের ভাণ্ডার খুলে দেবার ডাক এসেছে জরুরী। সকাল হতেই হাঁটাপথে যতদূর পথ আছে কিছুটা গাড়ীতে সোনাদায় রেল ও ধসের দুর্ঘটনায় সালেশিয়ান কলেজের ফাদারদের সেবাযত্নে সহানুভূতিতে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদেরই কিছু কিছু অংশ কার্শিয়াং-এর হলে আসছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের ঢালাওভাবে যাত্রীদের জন্য যা প্রয়োজন সব কিছু দেবার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করে এলেন। তাঁর থাকার উপায় নেই। বাগানের কাঁচা পাতা চায়ে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থার ভারও তাঁর ওপর। জলঢাকা ও কার্শিয়াং-এর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। গুদামের মেশিনগুলি বিদ্যুতেই পরিচালিত হয়।

পরিবর্ত ব্যবস্থা এখনও তিনি করে উঠতে পারেন নি। চা-বন্ধ হলে হবে। কাজেই তিনি বিশিষ্ট বন্ধু আমবুটিয়া চা-বাগানের বর্তমান ম্যানেজার শ্রীবানশাল্লককে অনুরোধ করলেন

বাগানের অধিকারী শ্রীকুমারও আমাদের বন্ধু। তাঁর সম্মতিতে মকাইবারি চা-বাগানের পাতা আমবুটিয়া চা-বাগানেই আজও প্রস্তুত হচ্ছে। কেন না বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা হতে এখনও তিন সপ্তাহের মত লাগবে।

প্রায় দশ হাজার যাত্রীর শ'তিনেক প্রায় গত পাঁচ ছয়দিনে সরকারী এবং বেসরকারী ব্যবস্থায় শিলিগুড়ির পথে নেমে গছেন। বর্তমানে দার্জিলিং হতে কার্শিয়াং-এর চিমনী পর্যন্ত যে একটি রাস্তা আছে (সামরিক যাতায়াতের জন্য) সেটির পঙ্কোদ্ধার অক্লান্তভাবে করে দেন বন সম্পদের চীফ কনজারভেটর শ্রীকনক লাহিড়ী। তার ফলে দার্জিলিং হতে সোজাসুজি যাত্রীরা সকাল হতে রাত পর্যন্ত আজও নামছেন পাংখাবাড়ী রোড ধরে শিলিগুড়ি এবং বাগডোগরা বিমানঘাঁটীতে।

পাংখাবাড়ীর পথটি খুবই খাড়াই পথ হলেও পি-ডবু-ডি কর্তৃপক্ষ বেশ বহালতবিয়তেই রেখেছেন মনে হয়। বর্তমান জরুরী অবস্থায় এই পথটিই দার্জিলিং-এর একমাত্র ভরসা সমতলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। হিলকার্ট রোডের দুতিন জায়গায় নতুন পথ না খুললে চলবে না বলেই শুনছি।

গির্দা পাহাড়ের পরে 'আপার' পাগলঝারার কাছে দুটি জনশূন্য ঘর নিয়ে বেশ খানিকটা হিলকার্ট রোডের কোনও চিহ্ন নেই। আর সোনাদর পথ ত' কতদিনে তৈরী হবে কে জানে? বিশেষজ্ঞরা অবশ্য অনেক রকমই বলে থাকেন সব সময়েই আশার কথা।

কালিম্পং-এর প্রধান সেতুটি বিপন্ন হবার ও বহু প্রাণহানির বেসরকারী খবরের পর খবরে মন যখন সকলেরই ব্যথিত ভারাক্রান্ত তখনই এল জলপাইগুড়ির ভয়াবহ বন্যাবিধ্বস্ত নগরীর বিবরণ। এই পাহাড়েরই জলের ঢল নেমে গেল তিস্তায়। বন্যা ছোটখাট বা একতলা জলময় হওয়ায় নূতনত্ব কিছু নয়—কিন্তু কলকল করে জল খাটের তলায় এল। চৌকী হতে নেমে দাঁড়াতেই হাঁটুজল কিছুক্ষণের মধ্যেই বুকজল হওয়ায় ঘুমন্ত ভাইপো-ভাইঝির হাত ধরে টেনে উঠিয়ে টিনের ছাত আশ্রয় না করলে এখুনি সবাই ডুবে যাবে যে!! কোনও রকমে ছাতের ওপর উঠে সপরিবারে পরদিন পর্যন্ত ভয়ঙ্কর জলের রাশি সামনে নিয়ে অপেক্ষা করতে হ'ল উদ্ধারকারীরা না আসা পর্যন্ত। সে সময়টুকুর কি কোনও বর্ণনা আছে?

প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগীর বিবরণ। শিলিগুড়ি হ'তে পূজায় জলপাইগুড়ি গেছলেন আপনজনেদের কাছে ছুটির ক'দিন কাটাতে।

একের পর এক বেতারে মানুষের মুখে বন্যার সংবাদে বড়ই উতলা হতে হ'ল। জানি ভারতসেবাসংঘের দুর্দ্ধর্ষ কর্মীরা ও কর্মযোগীরা প্রথমেই আসবেন—সরকারী, সামরিক সব উদ্যোগই একযোগে কাজে লাগবেন—কিন্তু ঐ সময়টিতে নিকটের অধিবাসী যাঁরা—ধনী-নির্ধন নেই—নেই বিভেদ বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জবী-পাহাড়ীতে। শিলিগুড়িতে নেমে দেখে এলাম ধন্য হয়ে এলাম মানুষের বিপদে মানবের স্বতঃস্ফূর্ত সেবাধর্মের। যাঁরা যেমনভাবে পারছেন খাদ্যে, বস্ত্রে, পানীয়ে প্রয়োজনীয়
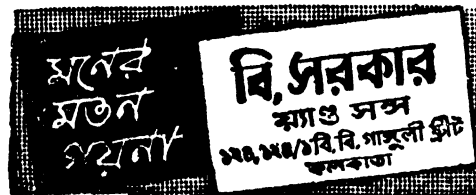
অবেক্তের নিজ সাধ্যমত সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন জলপাইগুড়ির দিকে।

বিশিষ্ট কোনও পত্রিকার সংবাদদাতার কাছে শুনলাম স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বেতারে বিপদসঙ্কেত জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি করে দিলে এতটা বিপদ হত না। কেহ কেহ বলেন যে, স্থানীয়ভাবে কর্তৃপক্ষ নাকি তিস্তার জল বিপদসীমা অতিক্রমের খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু আসন্ন কোজাগরী পূর্ণিমার উৎসবে তাঁদের কথাতে তত গুরুত্ব দেয় নি। কেন না তিস্তার জল বিপদের লাইন অতিক্রম করলে বড়জোর মাঠঘাট এবং বাড়ীর উঠনটুকুই ভরতে পারে। এত জল বাঁধ-ভেঙ্গে নিয়ে এসে সহর তলিয়ে দেবে এ ধারণা আর কে করতে পারে? চব্বিশ ঘণ্টা বারকিট জলের তলা থেকে যখন নগর জাগল—গৃহপালিত জীবের এবং মানুষের মৃতদেহ পাহাড়ের মত হয়ে রয়েছে। গলিত শবের গন্ধে সহর পলিব্যাপ্ত। মানবজীবনের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ বন্যার পলিমাটির নীচে চাপা রয়েছে। হয়ত মানুষের সাধ্যও নেই সেই হিসাব-নিকাশ বার করার। চিরতরেই পলিমাটির নীচে সমাধি রচনা হ'ল কতশত অমূল্য জীবনের।

রাজগৃহে এত মশা

শ্রীরমানন্দ ব্রহ্মচারী

দেখেছি তো, এখানে শান্তি নেই কোথাও কখনো।
লাস্যহীন সুশান্ত নয় একটি দৃষ্টিকোণও
যতই হোক না অধর হিমাঙ্ক উজ্জ্বল—
পিছনে সবারই প্রেত—হাসে খলখল।

এই ভাবি সকল তালাতেই খাটে।
শয্যায়, যে কোনো নদীর ধারে,
তপোবনে, মহিমার পর্বত-কিনারে,
স্থাণু, বা যে হাঁটে হাটে-বাটে—
সবারই বুকে বা জংঘায় সুপ্রাচীন ব্যথা,
কেউ মূক—কেউ বা মসৃণ মুখরতা।

ভাবো বুঝি সান্ধ্য পাখি ডানা মুড়ে শান্ত হয়,
অথবা মুখের মিছিল থেকে
কোনো স্বাতী নক্ষত্রকে বেছে নেওয়া যায়—
নিশ্চিন্ত কুলায়?
গৈরিকধারীরও কিন্তু বলিষ্ঠ স্রোতের তৃষ্ণা আছে,
পাশটিতে শুতে চায়, না হয় বসতে চায়
একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি কাছে

সুধা বলো, শুভ্রা বলো, কণ্ঠে নিয়ে যে কোনো পাখির গান-
সব ক্ষর; দিগম্বর!
কুরুক্ষেত্রের কোনদিন নেই অবসান।
তথাপি যেটুকু চেনাচেনা স্পর্শ পাই অজ্ঞাত গায়ে,
টেনে নিই ছিন্ন কম্বল শীতার্ত রাত্রির দায়ে।
কোথাও বসতে পারি না—রাজগৃহে এত মশা
পিশাচিনী মদালসা।

অতএব প্রতি রাত্রির প্রেমিকাকে কবোষ্ণ বুকে নিয়ে
আনন্দে বিদায় দাও
সম্মুখ ও পিছনের সব দ্বার দিয়ে—
গোপন গুহার পথ দেখিয়ো না যেন!
হাসিটুকু রেখে দিয়ে, সাপুড়ে সর্পিল বাঁশীর

॥ আমরো ।

বিমলকে এই মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করি নি। রাত জেগে সে আমার জন্যে বসে থাকবে, এ ছিল অকল্পনীয়। বিমূঢ়ের মতন আমি তাকিয়ে থাকলাম।

বিমল হাসল, 'খুব অবাক হয়ে গেছ, নয়?'

কিছু বললাম না। ঘাড় কাত করে জানালাম, হয়েছি।

দরজা বন্ধ করতে করতে বিমল আবার বলল, 'রোজ রোজ তুমি আমার জন্যে জেগে বসে থাকো, একদিন না হয় আমি জেগেছি। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা কথা আছে।'

অমলও সেদিন এই কথাই বলেছিল, দু' ভাইয়ের কৃতজ্ঞতাবোধ পরে হচ্ছে। তার আগে আরেকটা কথা বলি।'

'কী?'

'আমাদের মতন তুমিও নিশাচর হয়ে উঠলে দেখছি।'

আরো একদিন আমি রাত করে ফিরেছিলাম। সেদিন বাইরে নিশি-যাপন নিয়ে অমল আমাকে ঠাট্টা করেছিল। আমি জানি এ বাড়ীতে পা দিয়েই এখানকার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ফেলেছি। সেদিনও হেসেছিলাম, বিমলের ঠাট্টায় আজও হাসলাম।

বিমল আবার বলল, 'যতদূর জানি, তুমি শুদ্ধ নয়—একেবারে আদর্শ যুবক। বাবা তো উঠতে-বসতে তোমার তুলনা আনছেন। কিন্তু ব্রাদার তুমি যে এদিকে গায়ে কলকাতা শহরের রং ধরাতে শুরু করলে—' ডিপ্লোমেটিক উত্তর দিতে শিখেছ, দেখছি। তাবাই বলছ না জানবে না। এলো মিলান করছ না। 'হী ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফেলো।'

অমিও হাসলাম, 'সত্যি, ভালোই মনে হয়েছে। এই বয়েসেও উনি ভদ্রলোককে দেখলাম আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছেন। তার ছাড়া আর কী বলতে পারি বলুন।

'হিরণ্ময় জেঠুর ওখানে গিয়েছিলে কেন?'

'আমার নেমন্তন্ন ছিল।'

'রিয়ালি।'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ?'

নিমন্ত্রণের পেছনে কী কারণ বলাতে হল। সব শুনে বিমল বলল, 'আই সী, আই সী। হিরণ্ময় জেঠুর কথা আপাতত বাদ দাও। আসল কথাটা

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

দেখছি বেশ টনটনে। আমি এবারও নিরুত্তর থাকলাম।

দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে ফিরে বিমল বলল, 'চলো, তোমার ঘরে যাই। শুধু কৃতজ্ঞতা দেখাতে না, অন্য একটা দরকারেও তোমার জন্যে বসে আছি।'

'চলুন—'

আমার ঘরে এসে বিছানার ওপর বসল বিমল। লক্ষ্য করলাম, আজ আর নেশা-টেশা করে নি সে। মুখ থেকে ভকভক গন্ধও বেরুচ্ছে না, হাত-পা-মাথাও টলছে না। আমিও তার পাশে বসলাম।

বিব্রত মুখে বললাম, 'না, মানে একটা বিশেষ দরকারে আমাকে বেরুতে হয়েছিল। ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

"এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?"

কোথায় ছিলাম, বললাম।

বিমলের চোখের তারায় ঝকমকানি খেলে গেল, 'হিরণ্ময় জেঠুর ওখানে গিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ'—আমি মাথা নাড়লাম।

'কেমন লাগল ভদ্রলোককে।

'ভালই।'

বল দিকি ব্রাদার—'

আমি অবাক। বললাম, 'আসল কথাটা আবার কী?'

চোখের তারায় বিচিত্র ভঙ্গি করে বিমল চাপা গলায় বলল, "বিশাখার সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে?'

আমি চকিত হলাম, 'বিশাখা দেবীকে আপনি চেনেন।'

'কথাটা কিন্তু একেবারে বোকার মতন হল।'

'কেন?'

'হিরণ্ময় জেঠু আমার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। তাঁর মেয়েকে চিনব না, এ হতে পারে না। তা ছাড়া—'

চোখ দুটো কুঁচকে একান্ত গোপন কথা বলার মতন করে বিমল বলল, 'বুঝলে ব্রাদার, এই কলকাতা শহরে যত বিউটিফুল পরী আছে তাদের সবাইর সঙ্গে বিমল চ্যাটার্জির বন্ধুত্ব।' একটু থেমে আবার বলল, 'বিশাখার সঙ্গে তোমার আলাপ-টালাপ হয়েছে নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ।'

'ইজ শী নট চার্মিং?'

'হ্যাঁ। তবে—'

'কী?'

খানিক ইতস্তত করে বললাম, 'একটু খেয়ালী ধরণের—'

বিমল আমার কম্বলটা টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ করে জড়িয়ে নিল। উৎসাহের সুরে বলল, 'কি রকম, কি রকম—'

যেভাবে জাঁকিয়ে বিমল বসেছে তাতে খুব তাড়াতাড়ি উঠবে বলে মনে হচ্ছে না। যাই হোক, খানিক আগের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতাটা আগাগোড়া বলে গেলাম। এবং পৌষের এই কুয়াশাচ্ছন্ন নির্জন রাত্রে বাতাস যখন বরফের সহোদর সেই সময় একা একা কিভাবে এলগিন রোড থেকে এতদূর শুধু পা দু'খানার ওপর ভরসা করে পাড়ি দিয়েছি তাও বলে গেলাম।

খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনে গেল বিমল। তারপর বলল, 'ইউ আর এ ফুল—'

'ফুল।'

'ইয়েস, একেবারে মূর্খ অবোধ বালক।'

ধিক্কারটা সারা গায়ে মেখে বিগ্রহের মতন আমি বসে থাকলাম।

বিমল আবার বলল, 'হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে কেউ এমন করে ধুলোয় ছুঁড়ে দ্যায়। এমন সুযোগ জীবনে আর কখনও পাবে!'

আমি চুপ।

বিমল বলতে লাগল, 'তোমার মতন অপদার্থ জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমার সন্দেহ হয়, তুমি কিন্তু—'

'কী?'

'বিশাখা দেবীর ইচ্ছেমতন চললে রাত্রিবেলা যে ফিরতে পারতাম না।'

'না ফিরলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যেত।'

কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

বিমল আবার বলল, 'এই তো ট্যাং ট্যাং করে পাঁচ-সাত মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরলে। এখন কী করবে শুনি?'

আস্তে করে বললাম, 'ঘুমোব।'

'কি সাংঘাতিক কাজ। তুমি না ঘুমোলে পৃথিবী তো অচল হয়ে যাবে।' বিমল বলতে লাগল, 'রোজই তো ঘুমোও। একটা দিন না ঘুমোলে আর চলছিল না। জানো এই কলকাতা শহরের যে কোন ইয়ংম্যান বিশাখার জন্যে মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত।'

বিমল যেভাবে আক্ষেপ করছে তাতে মনে হয়, আমার নিদারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু লোকসানটা কোথায় কতখানি হল, কিছুতেই তা অনুভব করতে পারছি না। আমি প্রায় বিভ্রান্তের মতন তাকিয়ে থাকলাম।

হাতের বাইরে যখন ব্যাপারটা চলেই গেছে তখন কী আর করা। বিমল বুঝল বৃথাই আপশোস, বৃথাই আমাকে ধিক্কার দেওয়া। উদাসীন সুরে সে বলল, 'যাক গে ওসব। যা ভাল বুঝেছ, করেছ। এখন যে জন্যে রাত জেগে বসে আছি, বলি—'

আমি উন্মুখ হলাম।

বিমল বলল, 'অলকাদির সঙ্গে আজ বিকেলবেলা আমার দেখা হয়েছিল।'

আমি চমকে গেলাম। জড়িত আধ-ফোটা গলায় কী যে উত্তর দিলাম নিজের কাছেই তা স্পষ্ট নয়।

বিমল আবার বলল, 'অলকাদি তোমার ওপর খুব রাগ করেছে।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কেন?'

'কেন, বলে নি শুধু বলেছে—'

'কী?'

'তুমি নাকি মহিলাদের মর্যাদা

আমি নীরব।

বিমল আবার বলল, 'সে যাই হোক, কী হয়েছিল, কিভাবে অমর্যাদা করেছ, আমি জানতে চাই না। তবে—'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

বিমল বলতে লাগল, 'অলকাদি বলে দিয়েছে, তুমি তার কথা রাখো নি। কিন্তু সে যে কথা দিয়েছিল, রেখেছে।'

'কী কথা?'

'তোমার জন্যে একটা চাকরি ঠিক করেছে অলকাদি।'

আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল যেন। চকিতে বিমলের দিকে ফিরে উৎসুক সুরে বললাম, 'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ।' বিমল ঘাড় কাত করল।

'কিসের চাকরি?'

'ঠিক জানি না। তবে অলকাদি যখন চাকরি জোগাড় করেছে, সেটা ভালই হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আজ কী বার?'

'বেসপতিবার।'

'রবিবার নিশ্চয়ই অলকাদির সঙ্গে দেখা করবে।'

'কখন যাব?'

'সকালের দিকেই যাবে। যাবে কিন্তু, বারবার বলে দিয়েছে অলকাদি।'

'আচ্ছা।'

বিমল এবার আমার সম্বন্ধে সচেতন হল বুঝিবা। সদয় সুরে বলল, 'রাত প্রায় কাবার হতে চলল। অতখানি পথ হেঁটে এসেছ, নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমি এখন যাই, তুমি শুয়ে পড়।'

বিমল চলে গেল।

৯

শেষ রাত্রের দিকে শুয়ে মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, পরের দিন দুপুরের আগে আর উঠছি না। কিন্তু ভোর-বেলাতেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

শীতের সকালে কম্বলের উষ্ণ

ছিলাম। দরজায় ওপর হঠাৎ জোরে জোরে ধাক্কা এবং সেই সঙ্গে একটা ডাক শুনতে পেলাম, 'চিরঞ্জীব—চিরঞ্জীব—'

ঘুম তখনও খুব গাঢ়। ডাকটা কানে এলেও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এদিকে বাইরের ধাক্কা আর ডাকটা ক্রমশ আরো অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল।

অগত্যা আর শুয়ে থাকা গেল না। উঠেই পড়তে হল। করুণভাবে বিছানাটার দিকে একবার তাকিয়ে কম্বলখানা নিবিড় করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

চোখ এখনও জ্বালাজ্বালা করছে, কপালের দু পাশে দুটো রক্তবাহী শিরা সমানে লাফিয়ে চলেছে। মাথার ভেতরটা একটানা দপ্‌দপ্‌ করে চলেছে।

যাই হোক, দরজা খুলতেই দেখি অমল দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে অস্থির অসুস্থ স্নায়ুগুলোর ওপর স্নিগ্ধ একটি স্পর্শ এসে লাগল যেন। নিমেষে সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। খুশী গলায় বললাম, 'আরে তুমি। আমি ভেবেছিলাম, কে না কে —এসো—'

অমল বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি তো বেশ আর্লি রাইজার, অন্যদিন সূর্য উঠবার আগে উঠে পড়। আজ এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিলে—'

'কাল শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি তো লেট-লতিফ। সূর্যকে মাঝ-আকাশে না পাঠিয়ে বিছানা ছাড়ো না। আজ হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙল।'

অমল হাসল, 'বড় জব্বর বলেছ ভাই। যে তাড়াতাড়ি ওঠে সে আজ লেট-লতিফ। আর যে লেট-লতিফ সে কিনা আজ সূর্যোদয়কে হার মানিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং, না?'

আমিও হেসে ফেললাম, 'যা বলেছ।'

অমল বলল, 'বিশেষ দরকারে আমাকে আজ তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছে।'

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছে অমল। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'ঐ দ্যাখো, বাইরে তোমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এসো—এসো—'

অমল ভেতরে এল। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার চোখে পড়ল, তার হাতে বড় মতন একটা চামড়ার স্যুটকেশ।

স্যুটকেশটা নামিয়ে চেয়ারে বসল অমল। তার মুখোমুখি বিছানায় বসে শঙ্কাতুরে বললাম, 'সকালবেলা স্যুটকেশ নিয়ে চললে কোথায়? লম্বা পাড়ি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ' ঘাড় কাত করল অমল। আমার মতনই হাল্কা গলায় বলল, 'অনেক অনেক দূরে পাড়ি।'

'হেঁয়ালি থাক, সত্যি কোথায় চললে?'

'আপাতত কোন ঠিকানা নেই।'

বিমূঢ়ের মতন বললাম, 'তবে?'

অমল বলল, 'আপাতত রাস্তায়। তারপর—' বলে চুপ করল।

'তারপর কোথায়?'

'পথ যেখানে নিয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আমিই নীরবতা ভাঙলাম, 'ব্যাপারটা কী বল তো?'

অমল বলল, 'তোমার স্মৃতিশক্তি দেখছি খুবই দুর্বল।'

'কি রকম?'

'বাবা আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দিয়েছেন না?'

মনে পড়ে গেল। সে নোটিশ নিজের হাতে আমিই লিখেছিলাম। বললাম, 'তাই বুঝি—'

'হ্যাঁ—' আস্তে করে মাথা নাড়ল অমল, 'আমি যথেষ্ট সাবালক হয়েছি। বেকার বসে বসে পিতার অন্ন ধ্বংস করার অধিকার আমার নেই। তাই এ্যাম রাইটলি সার্ভড।'

এই সকালবেলা মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ কেন? তোমাকে তো তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।'

'তা হয়েছে।'

'তবে?'

'দেরি করে কী লাভ। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, চলে যাওয়াই ভাল।'

এই ছেলেটিকে আমার খুব ভাল লেগেছিল, আপনজন বলে মনে হয়েছিল। প্রথম আলাপেই সে আমাকে জয় করে নিয়েছিল। বললাম, 'সময় যখন হাতে ছিল, একটা ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করে গেলেই তো পারতে।'

অমল জোরে হেসে উঠল, 'তুমি দেখছি আমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছ। কিচ্ছু ভেবো না, এত বড় পৃথিবী, কিচ্ছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।' একটু হেসে আবার বলল, 'যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিয়ে গেলাম বলে কিছু মনে করো না ভাই। আচ্ছা চলি—'

স্যুটকেশ হাতে নিয়ে অমল উঠে দাঁড়াল।

আমিও উঠলাম। গাঢ় বিষাদে মনটা ছেয়ে গিয়েছিল। বললাম, 'আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?' মনের ঘোলাটে বিষণ্ণতা আমার কণ্ঠস্বরেও বুঝি ভর করেছে।

আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে অমল বলল, 'কি বোকা ছেলে, দেখা হবে না কেন, নিশ্চয়ই হবে।'

'কি ভাবে?'

'একটা আস্তানার ব্যবস্থা হলেই তোমাকে খবর দেব।'

'দেবে ঠিক?'

'সিওর। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, চললাম—

অমল বাইরে পা বাড়িয়ে দিল, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম।

বাইরের বাগানে আসতেই পিসেমশাইর সঙ্গে দেখা। যথারীতি এই সকাল বেলায় দারা গায়ে মাটি-টাটি মেখে খুরপি দিয়ে গাছেদের পরিচর্যা করছিলেন তিনি। অমল সোজা তাঁর কাছে চলে এল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'আমি চললাম বাবা।'

পিসেমশাই বললেন, 'যাচ্ছ, বেশ।' একটু থেমে আবার, 'আমায় ভুল বঝো না।'

'আজ্ঞে না।'

'আমি চাই অন্যের ওপর নির্ভর না করে তোমরা স্বাবলম্বী হও।'

'আমি স্বাবলম্বী হতেই চেষ্টা করব।'

'যদি কিছু দরকার হয়, আমাকে জানিও।'

'আচ্ছা—'

অমল গেটের দিকে চলল। আমিও তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছন ফিরলাম, পিসেমশাই আবার গাছের যত্ন সুরু করেছেন। এমন আবেগশূন্য বিদায় আগে আর কখনও দেখি নি।

গেট পর্যন্ত এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। অমল রাস্তায় নামল। যাচ্ছে আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে অমল। রাস্তার দূর বাঁকে গিয়ে একবার হাত নাড়ল সে; আমিও নাড়লাম। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল অমল।

এখানে ক'দিনই বা এসেছি, কতটুকুই বা দেখেছি অমলকে। তবু মনে হয়, এ-বাড়ির অনেকখানি জায়গা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে।

বিষাদময় এক শূন্যতার ভেতর আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মাঝখানে একটা মোটে দিন। তারপরেই শনিবারটা এসে গেল।

আজ তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নিলাম। তারপর পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম। এখনি কলকাতার এই দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সুদূর উত্তর মেরুতে পাড়ি জমাতে হবে।

আজ শিশির মুখুটির স্ত্রীর শ্রাদ্ধ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ সেই মেয়েটির মুখ মনে পড়ে গেল। ক্লান্ত বিষণ্ণ প্রতিমার মতন সেই মেয়েটা যার নাম মালতী।

[ক্রমশ।

ইচ্ছের ভুবন

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইচ্ছে ছিল একটি ইচ্ছের হাতে
জনসে উঠি অনিঃশেষে
একোত্তম মুহূর্তে।
নীলাভ এষণার দুই করতলে
আমার সত্তার রক্তাক্ত যন্ত্রণা
প্রবল শিখায় একটু একটু করে
শেষের সীমান্তে এসে
শতদল-অমলিনতায় আভাসিত হোক।
পুনরুজ্জীবনের পরম পর্যায়ে
আলোককণিকার অগ্রশীর্ষে উত্তরণ হবে।
মৃত্যু লভিবে আমার আত্মহননের সুতীব্র বাসনা
অবশেষে।
কিন্তু অন্য ইচ্ছের করতলে,
বিচ্যুত বাসনার ক্ষুদ্রে অন্তরীপ
সংহত সত্তার অখন্ড সুর্বশিখায়
শেষ হতে অনিচ্ছিত
নির্মম তার অভিব্যক্তি.
আপন ঔদাসীন্যের আনন্দ
বিমলিন সুখের অমলপদ্ম
ফুটাবার অনুভূতিতেই
প্রতিধ্বনি।
অন্ধকারের পাতালগর্ভে আমার যন্ত্রণা
নীল হোক।
মৃত্যুর মগ্ন সম্ভাষণে আমার ইচ্ছের মৃত্যু হোক!
তখন......
সেই প্রত্যাশিত মুহূর্তে
এষণান্তরের করতল
অনিঃশেষিত ইচ্ছার মন্ত্র
হবে আচিত্রিত॥

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের একটি কথা দিয়েই আরম্ভ করা যাক্:
'তেত্রিশ কোটি দেবতা সুলভ। কিন্তু মানুষ লাখে না মেলে এক।'

সত্যিই তাই, প্রকৃত মানুষ লাখে না মিলে একটি। আজকে সেই লাখে না মিলা মহান ত্যাগধর্ম দীক্ষিত আজন্ম সন্ন্যাসী কর্মবীর একটি মানুষের সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলব। চারিত্রিক সংযমে, শৌর্যে, বীর্যে, দার্ঢ্যে, নিরলস কর্মসাধনায় যাঁর তুলনা সমগ্র বিশ্বে কোটিতেও একটি মিলা দুষ্কর, সেই স্বামী বিবেকানন্দ এই বাঙলা দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শৈশব থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বহু কথা শ্রুতিগোচর হয়েছে। পুঁথিপত্তরে যৎসামান্য পাঠ করবারও সৌভাগ্য হয়েছে। বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কিন্তু স্বামীজীর অমল বাণী ও উপদেশামৃত পড়ে, বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর গিয়ে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু উপলব্ধি হয়েছে তাতে এই কথাটি মনকে স্বতই এক অপূর্ব দোলা দিয়েছে যে, তিনি ছিলেন যথার্থ কর্মযোগী সন্ন্যাসী, 'আপনি আচরি' কর্ম অপরকে শিখিয়েছেন। নতুবা তিনি তো বনে গিয়ে শুধু দশচর তপস্যায় রত থাকতে পারতেন।

কিন্তু তিনি তা না করে সতত নিরলস কর্ম-সাধনায় দ্বারা বিশ্বের মানবকুল বিশেষত ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষকে যথার্থ মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

জীবকে শিবজ্ঞানে পূজাই ছিল স্বামীজীর জীবনের চরম আদর্শ ও লক্ষ্য। নরই নারায়ণ, তাঁকে সেবা মানে ঈশ্বরের ভজনা। এই সার কথা তিনি বুঝেছিলেন। স্বামীজী তাঁর অমৃতময় বাণীতে বলে গেছেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

এই জীব বা নরের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃস্টান, আর্য-অনার্য, দ্রাবিড়-চীন-জাপান এ সব কোন ভেদাভেদ থাকবে না। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন তাই তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন—
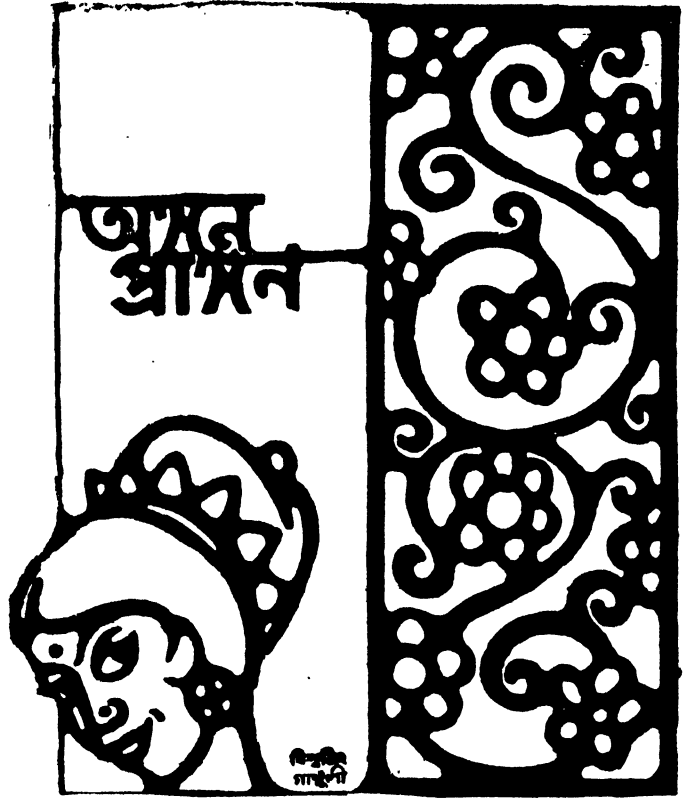
'নরেন, ও ঋষি, জীব উদ্ধার করবার জন্য নররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে।'

সুদেষ্ণা মৈত্র

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যই নরেন্দ্র যেন নরের রাজা হয়েই এই ভারতবর্ষের লোককে জ্ঞান দেবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে স্তরভেদে কোন্ কোন্ কর্মের সাধন দ্বারা এক সুস্থ সবল উন্নতশির জাতিতে পরিণত হওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে ইহাই ছিল স্বামীজীর লক্ষ্য।

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।'

ওঠো, জাগো, নির্ভীক হও, জড়তা ত্যাগ কর। জগৎ হতে তোমার যা প্রাপ্য তা গ্রহণ কর—এই ছিল তাঁর মহান আদর্শ। বাস্তবিকপক্ষে তিনি কখনও হাজার দুঃখ প্রকাশ করে কেবল কাঁদুনি গান নি।

উপনিষদের এই বাণীই তিনি বলেছেন: 'যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'। আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূল মন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে হয়?—আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীকে বাংলা দেশের রেনেশাঁ বলা হয়। সেই সময় রাজা

রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, কেশব সেন প্রমুখ বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়। তখন বাংলা দেশে তথা সারা ভারতে দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে চলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দও এই মহা-যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে পাঠকালে স্বামীজী বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে আসেন। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। স্কুল-কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে পারতেন। যুক্তি-তর্কের ওপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। তিনি মার্ক্সীয় দর্শন ইত্যাদি বহু সাহিত্য ছাত্রাবস্থায়ই পাঠ করেন। বৌদ্ধধর্মের সান্নিধ্যে আসেন।

'কিন্তু তাতে তাঁর চিত্ত ভরে নাই।'

তাই ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণার স্নেহচ্ছায়ায়। তাঁর ধ্যানের স্বর্গ হাতে পেলেন যেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ঠিক ঠিক জানতে পেরেছিলেন, তাই তিনি আনন্দে গদগদ হয়ে বলেছিলেন,---'এমন আধার এ যুগে আর আসেনি।' বস্তুত স্বামীজী ছিলেন আজন্মসিদ্ধ। আর এই আজন্মসিদ্ধ পুরুষের চেতনা বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত সেদিন সঞ্চারিত হয়েছিল ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্যে। স্বামীজী ছিলেন 'অভীঃ' মন্ত্রের দীক্ষাগুরু।

তিনি বলেছেন---'আমরা যখন বৈদান্তিক তখন আমাদিগকে সর্বদাই সকল বিষয় ভিতরের দিক্ হইতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চিতই জানি, যদি আমরা নিজেদের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে। সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যেমন ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই প্রায় দশ লক্ষের অধিক লোক খৃস্টান হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ?'

প্রশ্ন এই---ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে না?? আমি ইংলণ্ডের জনৈক সরলা বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম---সে অসৎপথে পদার্পণ করিবার, বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্বে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন।

তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়---এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না। কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াময়ী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন ---'কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।'

আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা তাদের জন্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি---আমরা নিজেরা কি শিখিয়াছি, আর নিজেরা নিজেদের হাতে জ্ঞানের

মেক্সিকো অলিম্পিকের জিমন্যাস্ট-রাণী ভেরাকাসলোভাস্কা

মশাল লইয়া কতদূর উহার আলোক বিস্তারের সহায়তা করিয়াছি।

ভারতের পক্ষ হতে স্বামীজী আমেরিকায় চিকাগো শহরে ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। যখন তিনি বক্তৃতা দিতে ওঠেন, তখন তিনি 'হে আমার আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করে বললেন—

'ভারতের সাধনলব্ধ যে বাণী—তোমরা অমৃতের সন্তান—আমি তাহাই আপনাদের দিতে এসেছি।'

তখন সেই সভায় পাঁচ হাজার নরনারী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কয়েক মিনিটের বক্তৃতা কয়েক ঘণ্টা শোনেন এবং আরও শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন

স্বামীজী বিশেষ করে এই কথাটাই সেদিন বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন—'সকল ধর্মকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'একসক্লুসন' (হেয় বা পরিত্যাজ্য) শব্দ কোনমতে অনূদিত হইতে পারে না, আমি সেই ধর্মভুক্ত।'

ধন্য ধন্য রবে মুখরিত হল সারা চিকাগো সহর, দেশ-দেশান্তর। বিশ্বের কাছে ভারত লাভ করল তার যোগ্য মর্যাদা।

স্বামীজীকে প্রকৃতরূপে জানবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। স্বামীজীকে জানবার মধ্যেই ভারতের পরিচয় নিহিত আছে। এখনও ভারতবাসীর ঘুমের ঘোর কাটেনি, কাটলে জানতে পারত, স্বামীজী ভারতের জন্য কি চেয়েছিলেন। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের যেরূপ কামনা করেছিলেন তাতে ধনীর স্থান নেই।

'যাঁরা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তধারায় অর্জিত অর্থে বিদ্যার্জন করে, বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করবার অবসর পায় না—তাদিগকে আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করি।'

তিনি বলেন,—বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষীর কুটির ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের ঝুড়ির মধ্যে হতে'

কোথায় উপনিষদের নচিকেতার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ, যাঁর কথা উল্লেখ করে স্বামীজী দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমি যদি নচিকেতার মত মাত্র একশত যুবক পেতাম তাহলে সমগ্র বিশ্ব জয় করতে পারতাম।'

সত্যই আজ আধারের অভাব। নতুবা স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, কর্মাদর্শের মধ্যেই তাঁকে জানবার যে সূত্র সমাহিত রয়েছে, তাকে জ্ঞান, যোগ আর কর্মের মধ্য দিয়ে আহরণ করতে দেখা যেত।

অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে তিনি বলে গেছেন এখন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা পূজায় কোন ফল হইবে না। বাঁশী বাজাইয়া এখন আর দেশের কল্যাণ হইবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালীর পূজা। ডমরু শিঙ্গা বাজাইতে হইবে, ঢাকে বৃহৎ রুদ্র তালের দুন্দুভিনাদ তুলিতে হইবে।

যথার্থই তাই। আজ আর বৃন্দাবন লীলা খেলায় কাজ হবে না। দেশের সম্মুখে চতুর্দিক হতে আজ ঘোর দুর্দিনের করালছায়া পড়েছে। স্বামীজীর ধর্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ না হলে দেশের সমূহ বিপদ। বস্তুত সর্বসাধারণের মধ্যে স্বামীজীর ত্যাগ, আদর্শ, চরিত্র মাহাত্ম্য, কর্মাদর্শের বীজ যাতে কিছুটা পরিমাণেও অঙ্কুরিত হয় তার ব্যাপক কর্মসূচী নিতে হবে। তবেই হবে সেই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ জন্মজয়ন্তী পালনের সার্থকতা

চাঁদের ও পঠ

অসীমা ঘোষাল

সময় তো মনের যথার্থ প্রলেপ নয়। তা যদি হোত তবে কেন ভোলো না বুকের সেই রক্তাক্ত ক্ষতটা—আজও যা দিনেরাত্রে সমানে দগ্ধ করে চলেছে আমাকে, আজ এতদিন পরেও ?

লোলিতা রায়কে যে আমার ভাল লেগেছিল তার জন্যে যদি কেউ আমাকে দোষারোপ করতে চায় তাকে একবার অনুরোধ করব লোলিতাকে যেন একবার অন্তত সে দেখে। আমি যে জানি তাকে ভাল না লাগার কথা চিন্তায় আনতে পারবে না কেউ।

সূর্যের মত উজ্জ্বল নয়, বরং গভীর রাতের চাঁদের আলোর মতই স্নিগ্ধ ছিল লোলিতা। প্রগলভা নয় সপ্রতিভ। লোলিতাকে আমার ভাল লাগার সাধারণ অর্থ বাদ দিলেও লোলিতার স্বাভাবিক সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নয়। কি পবিত্র আর নিষ্পাপ দৃষ্টি ছিল তার দুটো ডাগর চোখে। বুনো ঝোপের আড়ালে হঠাৎ জেগে ওঠা কালো-হরিণ চোখ। যার দিকে তাকিয়ে যে কোন মন যায় হারিয়ে, কাজল-কালো দীঘি বলে ভুল করে কোন মনের ইচ্ছা হয় না ঝাঁপিয়ে পড়তে।

মনে হয়েছিল যদি ভালবাসতে হয় তাহলে লোলিতা বায় ছাড়া আর কাউকে নয়। অনেক সহজে কাছে এসেছিল সে। এজন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলাম সেদিন আপন সৌভাগ্যকে। এই প্রাণ-মনুষ্যত্ব সমাজে অদ্বিতীয় সুখী বলে মনে হয়েছিল নিজেকে।

প্রথম দেখাতেই অনন্যতমা বলে মনে হয়েছিল লোলিতাকে। আর বিচিত্র সেই সাক্ষাৎকার। রাতের টিউশনী সেরে শেষ ট্রামে বাড়ী ফিরছিলাম। ফাঁকা ট্রামের মৃদু আলো-ছায়ায় ঘেরা লোলিতার মুখখানায় সেদিনই প্রত্যক্ষ করেছিলাম এক অনির্বচনীয় আকর্ষণ।

অনেক ভিড়ের মাঝখান থেকে

লালিতা এক আশ্চর্য আবিষ্কার আমার কাছে। এবং সে আবিষ্কারের জন্যে আমার মনে প্রচ্ছন্ন গর্বেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রায় প্রতিদিন রাত্রেই সেই শেষ ট্রামে দেখা হতে লাগল লোলিতার সঙ্গে। তখনও কথা বলা হয়ে ওঠেনি, অথচ দুজনের কাছে দুজনেই পরিচিত হয়ে উঠেছি নীরব দৃষ্টি-বিনিময়ে। অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে শুরু করেছি রাতের সেই শেষ ট্রামটির জন্যে। নামটা জানি না তখনও, জানার আগ্রহ হয়ে উঠেছে প্রবল। ঝড়-জলেও কামাই হচ্ছে না টিউশনীতে, ভাল মাস্টার হিসাবে সুনামও পাচ্ছি ছাত্রের বাড়ীতে। এমন মাস্টার সচরাচর মেলে না। হাসি পায় মাঝে মাঝে।

আকস্মিকভাবেই একদিন আলাপের সুযোগ ঘটে গেল। আমার আগেই নেমে যেত লোলিতা। সেদিন মনের ভুলে লোলিতা তার ব্যাগটি ফেলে গেল তার সীটে। আমার আগেই নামত, নামত বিভিন্ন স্টপেজে। উঠতো আমার আগেই। না জানতাম তার গন্তব্যস্থান, না জানতাম কোথা থেকে আসে। এ নিয়ে লোলিতা বেশ ভাবিয়ে তুললে। এত কী দরকার থাকে ওর রোজ ভেবে পাইনি। পরে বলেছিল নিজেই—বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, তাই বেশী রাত হলেও তাকে বিভিন্ন জায়গায় টিউশনী করতে হয়।

তাকে ফেরত দেবো বলেই ব্যাগটা নিয়ে এসেছিলাম বাড়ীতে সেদিন। ভেবেছিলাম হয়তো তার ঠিকানা থাকবে ভেতরে। খুলে কিন্তু হতাশ হলাম। নাম পেলাম—একটা বাসটফটোর ওপর ইংরাজীতে লেখা—লোলিতা রায়। কিন্তু কোন ঠিকানা নেই। কিছু টাকা আর তার প্রসাধনের টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস। সে রাতে কী এক অস্বস্তিতে ঘুম আসছিল না আমার চোখে। ব্যাগটি ছুঁলেই একটা শিরশিরে আমেজ বয়ে যাচ্ছিল আমার সারা শরীর বেয়ে।

পরদিন কাঁপা-বুকে ট্রামে উঠতেই দেখতে পেলাম লোলিতা তার নির্দিষ্ট সীটে বসে আছে। ওকে অবাক করে দিয়ে পাশে বসতেই লোলিতা তার ভাসা-চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আমার দিকে। গলায় জোর এনে বললাম—কাল আপনি ভুল করে ব্যাগটা ফেলে গিয়েছিলেন, এই নিন।

কাগজে মোড়ানো ব্যাগটা হাতে নিয়ে একটু হাসল লোলিতা। বলল—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, খুব ভাবছিলাম কাল ফিরে গিয়ে।

কিছুক্ষণের জন্যে আবার নীরবতা নেমে এল আমাদের মাঝখানে। অনেক সীট খালি ছিল। লোলিতার সঙ্গে আমার কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনায়াসে গিয়ে বসতে পারতাম তারই কোন একটায়। কিন্তু পারি নি। কী একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে ধরে রেখেছিল, উঠতে পারি নি আমি। লোলিতা কী মনে করতে পারে সেকথা ভাবতেও ভুলে গিয়েছিলাম আমি। আমাকে সচকিত করে ট্রামটা থেমে গিয়েছিল এক জায়গায়। উঠে পড়েছিল লোলিতা। তেরছা করে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে বলেছিল—চললাম, আবার দেখা হবে কাল।

দেখা হয়েছিল। পরের দিন থেকেই আমাদের পরিচয় ক্রমশ এক আশ্চর্য পথ ধরে ঘনিষ্ঠতার দিকে এগিয়ে চলেছিল। আলাপের স্থানও আর আবদ্ধ থাকেনি রাতের শেষ ট্রামে। ধীরে ধীরে লেক আর পার্ক আমাদের মিলন-ক্ষেত্র হয়ে উঠল। দিনের কাজের পালা চুকিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে মিলতাম আমরা। কত অসংলগ্ন অবান্তর কথা ঘন্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতাম। খুব সহজভাবে মিশলেও লোলিতাকে আমার রহস্যময়ী বলেই মনে হত। যখনি মনে হত ওকে বুঝে ফেলেছি তখনই সে বোঝার বাইরে চলে যেত। যখন চিনতে পারলাম না বলে হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছি তখনই আবার অত্যন্ত কাছে এসে ধরা দিত, মনে হত ভীষণ ভুল করতে যাচ্ছিলাম।

একদিন স্পষ্ট বললাম—এমন করে আর ভাল লাগছে না। তোমায় আরো কাছে পেতে চাই। বল কবে আসছ আমার ঘরে? তারপর সব ভার ছেড়ে দাও আমার উপর।

বেমানানভাবে হেসে উঠেছিল লোলিতা। মনে হয়েছিল সে যেন কাঁদছে। তার কাঁপা স্বরের প্রতি পর্দায় ব্যথার ঝঙ্কার বাজছিল। ভেবেছিলাম বাড়ীর কথাই চিন্তা করছে লোলিতা। হয়ত সে ভাবছিল বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোট ছোট ভাই-বোনদের ভবিষ্যৎ, যার উপর নির্ভর করছে, তার স্বপ্ন দেখা সাজে না। তাই বুঝি আমার দেওয়া সুখী জীবনের আশ্বাস তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারল না। সে আশ্বাস যেন এক বিস্বাদ বিদ্রূপ হয়ে তার অন্তরকে যন্ত্রণা-কাতর করে তুলেছিল। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম—আমি তোমার ওপর অবিচার করবো না লোলিতা। এখন যেমন আছ, তেমনই থাকবে। তোমার স্বাধীনতা আমি কেড়ে নেব না। যতদিন না তোমার ভাইয়েরা মানুষ হচ্ছে, ততদিন এখনকার মতই সংসারকে সাহায্য করবে। কোনদিন আমি তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াব না। অত ভাবছ কেন? আমি তো তোমারই পাশে রইলাম, সাহায্য করব তোমাকে। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলব তাঁকে। তুমি অমন করে ভেঙে পড়ো না লক্ষ্মীটি।

লোলিতা সেদিন চুপ করে ছিল। সেই আলো-আঁধারে ঘেরা রাতে লোলিতার নীরব চোখের নতদৃষ্টি আমায় যেন ব্যাকুল আগ্রহে কী কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি।

আর একদিন। আনমনে বসে থাকতে থাকতে লোলিতা বলেছিল—বিশ্বাস কর অজয়। আমার বেশ ভাবতে ইচ্ছে করে, আমি যেন তোমার বউ হয়ে তোমাদের বাড়ীতে গেছি। লাল উড়নিতে মুখ ঢেকে, ফোঁটা ফোঁটা চন্দনের টিপ কপালে, গালে, চিবুকে, পরণে বেনারসী, মাথায় শোলার মুকুট, সিঁথিভর্তি সিঁদুর, হাতে শাঁখা। তোমার সঙ্গে

দেখা হবার পর অনেক রাতে আমি এমন স্বপ্নই প্রায় দেখি। বিশ্বাস কর তোমার সঙ্গে আলাপ করার আগে কোনদিন ভাবিনি এমন স্বপ্ন আমি কোনদিন দেখব। সারাটা জীবন একটা প্রচণ্ড তাপে ভরা মরুভূমির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে কেটে যাবে, এই ভেবেই এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম, মেনে নিয়ে ছিলাম তাকেই আমার ভবিতব্য বলে।

কথা বলতে বলতে চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল। অভিমান ভরা গলায় বলেছিল—তোমার ওপর আমার রাগ হয় অজয়, কেন এলে আমার জীবনে এমন করে। বেশ তো ছিলাম আমি। আশা-কামনা-স্বপ্ন শূন্য অন্ধকারে ঘেরা জীবনে বেশ তো অভ্যস্ত করে নিয়েছিলাম নিজেকে। মনটাকে মেরে ফেলে কবর চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে তুমি ভালবাসার ফুলগাছ লাগালে। বিশ্বাস কর, ভীষণ ভয়ে বার বার পালাতে ইচ্ছে হয়েছে তোমার কাছ থেকে। কিন্তু পারি নি, হেরে গেছি নিজের কাছে। তোমার ভালবাসা পাবার লোভ আমি সামলাতে পারিনি অজয়। আমি বেশ জানি আমার স্বপ্ন বাস্তবে কোনদিন ধরা দেবে না। আমি যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি সেখানে থেকে আর যাই চলুক, স্বপ্ন দেখা চলে না। তুমি বুঝবে না অজয়, বুঝবে না। ছেলে হয়ে বুঝবে না এ যন্ত্রণা।

যে লোলিতার দিকে অতবড় একটা সংসার মুখ চেয়ে আছে—তার পক্ষে এ কথাগুলো আশ্চর্যের কিছু নয়। তবু আমি লোলিতাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, বার বার অনুরোধ করেছিলাম সে যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করে। তার সংসারের দায়িত্ব আমার ওপর কিছুটা দিক না লোলিতা। আমার কী কোন কর্তব্য নেই মনে করে? তার আপনজনেরা আমার কাছে কী পর। আমরা দুই শক্তি মিলিত হয়ে জীবন-সংগ্রামের জন্যে তৈরী হব, একথা কেন ভাবতে পারছে না লোলিতা, এত ঘনিষ্ঠতার পর এখনো তার এত সঙ্কোচ কিসের? কেন স্বাভাবিক হতে পারছে না সে, কেন সহজভাবে নিতে পারছে না আমাকে। প্রথমে সংগ্রামের প্রতীক বলে মনে হয়েছিল লোলিতাকে, এখন মনে হল ভীষণ ভাবপ্রবণ আর ভীত মেয়েটা। সে যাই হোক, তার মধ্যে উদার আকাশের মত এক বিরাট হৃদয়কে দেখতে পেয়েছিলাম। যতই দিন যেতে লাগল ততই যেন গভীরভাবে ভালবেসে ফেলছিলাম ওকে।

আগের সে ভাব আর ছিল না লোলিতার। দিনকতক ধরে কেমন যেন মন-মরা লাগছিল ওকে। তার প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা স্নিগ্ধ জীবনে যেন ভাঁটার টান পড়তে সুরু করেছিল। কথা বলতে বলতে কোথায় যেন হারিয়ে যেত। বার বার ডেকেও সাড়া পেতাম না। যখন পেতাম জানতে চাইতাম নীরবতার কারণ। হাসত লোলিতা। আমাকে খুসী করবার জন্যে সহজ হবার চেষ্টা করত। ওর প্রাণমাতান হাসি কেমন যেন করুণ হয়ে উঠেছিল, নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি। ভবিষ্যতের চিন্তায় ভেঙে পড়েছে লোলিতা—এটাই বুঝলাম।

অনেক ভেবে নিজে থেকেই এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য বলে স্থির করলাম। আমার বিয়ের জন্য আমার মা-ও ভীষণ তাড়া দিচ্ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় পাত্রী দেখছিলেন আমার কথায় কান না দিয়ে। সত্যিই তো কতদিন আর চুপ করিয়ে রাখা চলে? তখনও লোলিতার কথা বলতে পারিনি তাঁকে। তবে বিশ্বাস ছিল আমার কথা তিনি ফেলতে পারবেন না। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলাম। আমিই একমাত্র সন্তান, মা আমাকে বুঝতেন। সময়মত লোলিতা আর তার বাড়ীর সম্মতি নিয়ে আমি তাঁকে বলবো এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি।

সেদিন সন্ধ্যায় দেখা হতে লোলিতাকে বললাম সে কথা। সব কথা শুনে ও হেসে বলল—আচ্ছা, বোকা ছেলে তো তুমি। আমার মত মেয়েকে কেউ বিয়ে করে। তুমিই বল কি আছে আমার? তার চেয়ে মায়ের পছন্দমত মেয়েকে সুবোধ বালকটি হয়ে বিয়ে করে ফেল।

বললাম—ঠাট্টা রাখবে তুমি। রসিকতা পরে কোর। তোমার কোন কথা আর আমি শুনবো না। তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা আমাকে দাও, যা করবার আমিই করছি।

লোলিতা বলল—পাগলামো রাখতো: খালি দুষ্টুমী, যেন আর তর সইছে না। বিয়ে করবে? কত বয়স তোমার অজয়? জানো? ছেলেদের ব্যক্তিত্ব চল্লিশ বছরের আগে আসে না? তোমাকে বিয়ে করে নাবালক বাবুর হাতে পড়ে ঠকে যাই আর কি?

প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠেছিল লোলিতা আমাকে রাগিয়ে দিয়ে।

গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম—এমন সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করতে ভাল লাগছে তোমার লোলিতা? বেশ, তোমার ঠিকানাটা দাও আর কিছু চাই না।

ও বলল—ইস, কী রাগ ছেলের। ঠিকানার দরকার কী। আমি না হয় তোমায় নিয়ে যাবো একদিন আমাদের বাড়ী। তবে তার আগে তোমার সম্বন্ধে আমাদের বাড়ীতে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হোল আমার কাছে, মেনে নিলাম। দুদিন অপেক্ষা করলে কী এমন ক্ষতি হবে?

সেদিন লোলিতা বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠেছিল। হঠাৎ কী দুর্বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। আমিও একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে ড্রাইভারকে ইঙ্গিতে বললাম আগের ট্যাক্সিটার পেছনে যেতে। মনে মনে ভীষণ হাসি পাচ্ছে তখন। কেমন ফাঁকি দেবার মতলব দেখা যাবে এবার। আজকেই ঠিকানা জেনে নেব। একদিন ওকে অবাক করে দিয়ে হাজির হয়ে যাব। নিশ্চয় ভয় পেয়ে যাবে, যা ভীতু মেয়ে—বোকা মেয়েটা জানতেও পারছে না আমিও ওর পেছনে চলেছি। এতদিন কেন যে ঠিকানা চেয়ে এত অনুরোধ করেছি, ভাগ্যিস এমন বুদ্ধিটা খেলে গেল মাথায়।

আনন্দে ছটফট করছিল মনটা। অনেক কথা আনমনে ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম। নরম সীটে চোখ বুজে রঙিন স্বপ্নগুলো রোমন্থন করতে চেষ্টা করছিলাম, কল্পনার রূপগুলো আনতে চেষ্টা করছিলাম চোখের সামনে। আচ্ছা, কোন রঙের শাড়িতে লোলিতাকে সুন্দর দেখায়, আকাশি? না হলুদ? না, তাও নয়। ফুলশয্যার রাতে ও লাল বেনারসীই পরবে। রজনীগন্ধার গোড় মালা থাকবে গলায়, চন্দন তো থাকবেই। ফ্যাশান করে চুল বাঁধতে দেবো না, বেঁধে রাখতে দেবো না ওই একরাশ ঘন কালো চুল। ওগুলো পিঠময় ছড়ান থাকবে কালো মেঘের মত। সাদা কপালে বড় করে একটা সিঁদুরের ফোঁটা পরবে লোলিতা, অপূর্ব দেখাবে লোলিতাকে। ভাবতেও ঘুম পাচ্ছে। অজানা পুলক শিহরণে কেঁপে উঠছে সারা দেহমন। আমার সাজ লোলিতার পছন্দমতই হবে। বর আর কনে, লোলিতা আর অজয়। না: ভালই লাগবে। এমন কিছু খারাপ নয় আমার চেহারা।

ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙল—বাবু। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। আপনি কি এখানেই নামবেন?

চোখ খুলে তাকাতেই আমার টলল পড়বার মত অবস্থা। না, ভুল তো দেখছি না। আমি মদ খাই নি, অজ্ঞানও হয়ে যাই নি। নেমে পড়লাম ট্যাক্সি থেকে। এ কি, লোলিতার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এখানে কেন? ডাকবার জন্যে চীৎকার করতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না।

ঐ তো ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোলিতা। চারদিকে মাতালের অর্থহীন প্রলাপ, কৌতূহলী রঙমাখা মুখ সারি সারি, মদের ভ্যপসা গন্ধ, মালা-বিক্রি করা কোন ছেলের কণ্ঠস্বর। আমি কী স্বপ্ন দেখছি? না; পাগল হয়ে গেছি? নাকি মরে গেছি আমি?

*

লোলিতা ঢুকে পড়ল একটা আলো-ঝলমলে সাদা রঙের বাড়ীতে। ভেতরে তবলার বোলের সঙ্গে নাচের আওয়াজ ভেসে আসছে। টুকরো টুকরো অশ্লীল শব্দ কুৎসিত হাসির সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি। পায়ের নীচে মাটি থরথর করে কাঁপছে। সারা পৃথিবীটা পাক খাচ্ছে চোখের সামনে। নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, মাথার ভেতর কিলবিল করছে কতকগুলো পোকা, বোবা যন্ত্রণায় আকাশের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠতে গেলাম। দেখলাম চাঁদটা সরে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে।

উপহার

বকুল বসু

রচিয়াছি কত ভুল দুজনার মাঝে
তবু মোরা বাঁধা আছি প্রেম-প্রীতি সুরে,
জানি ফুরাবে সকল কাল জীবন ধারায়—
স্মৃতি রবে একা শুধু মোহ রচিবারে।

সেদিনের কথা ভেবে শুষ্ক ফুলে মোর
ভরিয়াছি একখানি উপহার ডালি,
শ্রীমতী আমার, লও সব ভালোবাসা তুমি
মোর দীনতারে রেখ না মরমে তুলি।

নারি দেবী

স্যুটিং দেখতে আর যাইনি আমি। রজতের 'হাতছানি' ছবি প্রায় শেষ হয়ে এলো। আরো দুটো বই-এ নায়কের পার্ট পেয়েছে সে। সে ছবিগুলোর কাজও চলছে। ছবির জগতে এখন উদীয়মান পপুলার রজত সেন।

বড় ব্যস্ত দিন এখন ওর, তাই এখন বেশী মেলে না আমাকে সঙ্গ দেবার। তবুও সে প্রতিদিন একবার আসেই, তা যত অল্প সময়ের জন্যে হোক। আউটডোর স্যুটিং-এ মাঝে মাঝে যখন রজত কিছুদিনের জন্যে চলে যায় বাইরে, তখন আমার ভারি শূন্য লাগে। কারণ প্রতিদিন ওর প্রতীক্ষায় থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। বেশী সময় না থাকতে পারলেও, একবার আমার কাছে তাকে হাজিরা দিতেই হয়, তা যে-কোন সময়ে হোক।

তাই যখন এই বাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তখন মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় সে বুঝি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। তখন শূন্য মনে, এখানে সেখানে গাড়ী নিয়ে ঘুরে বেড়াই। এমনি ধারা বেড়ানোর সময়, একদিন লেকের ধারে গাড়ী রেখে একা হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম পাওয়ার সায়েবের সঙ্গে। খানিক পরে দুজনে বসলাম একটা বেঞ্চিতে।

চুপ করে বসেছিলাম আর মনের পর্দায় ছায়াছবির মত ভেসে চলেছে, রজতের সঙ্গে প্রথম দিকে যখন এখানে তন্ময় হয়ে যেতাম কোন এক সুখের নেশায়—সেই দিনগুলোর স্মৃতি রঙিন ছবি হয়ে ধরা দিয়েছে মনের পর্দায়।

পাওয়ার সায়েব যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বললো,—এখানে আর নয় সিস্টার, মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে কে যেন আমাদের ফলো করছে! ঐ দিকে গাছের ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন, মনে হচ্ছে।

আমরা দুজনে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম গাড়ীর দিকে। যেতে যেতে একনজরে, দেখবার চেষ্টা করলাম লোকটাকে।

মনে হল বেশ লম্বা, আর বলিষ্ঠ গড়নের, একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে গাছের তলায়। ধুতি পাঞ্জাবী পরনে, আর চোখে ছিল চশমা। এর বেশী কিছু বুঝতে পারলাম না।

গাড়ীতে স্টার্ট দিলো পাওয়ার সায়েব।

আমি নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম —এতদিন পরে আবার কে এলো? কিছু বুঝলে সায়েব?

—না সিস্টার। লোকটার মতলব কিন্তু আমার কাছে কেমন সন্দেহজনক ঠেকলো। কারণ লোকটা যে তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে, ভালো করে দেখবার চেষ্টা করছিলো, সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। বলা যায় না, বোস সায়েবের চর হতে পারে।

গাড়ী চালাতে চালাতে জবাব দিল পাওয়ার সায়েব। ওর কথায় কিন্তু আমার মন আজ সায় দিল না। কোন এক দুর্জ্ঞেয় অনুভূতিতে যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো মনটা।

—ও কে? কে দাঁড়িয়েছিল ওখানে, আমাকে দেখার জন্য? ওকে যে আমি চিনতে চাই। বহুকাল আগে শোনা কোনো এক প্রিয় সঙ্গীতের হারানো সুর যেন সহসা ছুটে এসে ছুঁয়ে গেছে মনটাকে। তাই শুনতে পাচ্ছি মনের অতল গভীরে করুণ কান্নার ধ্বনি। মনটা যেন ঐ হারানো সুরের পেছনে ছুটে চলেছে; ব্যাকুল প্রশ্ন নিয়ে, তুমি কে? বলো, বলো তুমি কে? কোথায় দেখেছি তোমাকে? তোমার দূর উপস্থিতি মনে এমন আলোড়ন জাগালো কেন?

❁

রজতের 'হাতছানি'র কাজ শেষ হয়েছে। সিনেমা পত্রিকাগুলোতে বেরিয়েছে তার বিভিন্ন দৃশ্যের ফটোগুলো। কয়েকটি নাটকীয় দৃশ্যে রজতের সঙ্গে আছে সঞ্চিতা হালদার আর মালতী পাইনের ছবি। বইগুলো রজত আমাকে এনে দিয়েছিল।

ট্রেড শোতে আমার যাওয়া হয়নি, কারণ মালতী পাইনকে যে কথা দিয়েছিলাম তার বাড়ীতে একদিন যাবো। ওদের শোনাবো পাওয়ার সায়েবের বাজনা, আর ওর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে আসবো।

মালতী যে দিদি বলে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলো, আর অকপটে বলেছিলো তার জীবনের দুঃখের কাহিনী; কিন্তু আমি তো তার সে ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করিনি, কারণ রজত পছন্দ করে না মালতী পাইনকে। তাই ওর বাড়ীতে আমার যাওয়া হয়নি। তবুও যে আমি ভালোবেসেছি তাকে, ট্রেড শোতে আমাকে মালতী, আর আমাকে দেখতে পেলেই বলবে যে, কৈ দিদি ...

কথা দিয়েছিলে সে কথা রাখলে না তো ?

কি জবাব দেব তার কথার ? তাই শরীর খারাপের ছুতো করে গেলাম না ট্রেড শোতে। পরে অবশ্য একদিন নাইট শোতে, রজতের পাশে বসে দেখেছিলাম তার ছবি 'হাতছানি', খুব চমৎকার হয়েছে রজতের অভিনয় ও ছাড়া মালতীর অভিনয় আমার খুব স্বাভাবিক সুন্দর মনে হলো।

সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে রজতের বই প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করলো। টাকা, পয়সা, সম্মান, খ্যাতির সবই আশাতীতভাবে লাভ করলো রজত সেন। আরো অনেক ছবিতে নায়কের পার্টও পেয়ে গেল।

জীবনে এখন সে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর জন্যে অবশ্য সে কৃতজ্ঞ আমার কাছে।

ওর উন্নতির জন্যে আমারও মনের পাত্র আনন্দে টলোমলো হয়ে উপচে পড়ছে, আমাদের সুখে পাওয়ার সায়েবও ... তবও মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে বলে সে। —সবই তো হলো, দিনও অনেক গেলো, বিয়েটা কবে হবে ? আর দেরী নয় সিস্টার এবারে মাদাম ডেনিয়েলের কাছে যাবার ব্যবস্থা করি ; বিয়েটা সেরে তবে অন্য কথা।

কথা ছিল, আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ যখন সম্ভব নয়, তখন, বিমূনিপত্তনম গিয়ে মাদারের কাছে থেকে, খৃস্টধর্ম প্রথমে গ্রহণ করে চার্চে আমাদের বিয়ে হবে, তারপর ফিরে এসে পুনরায় নিজের ধর্মে ফিরে আসা হবে। রজতকে বললাম, বিমূনীপত্তনমে এবার যাওয়ার কথা। জবাবে সে বললো,—তার চারটি বই-এর স্যুটিং সুরু হয়েছে।—সেজন্য এখন যে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। তবে এই বই ক'টা হয়ে গেলে বিয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই হবে এবং সেজন্য অন্য কোন বইতে আর সে কাজ নেবে না।

সত্যিই তো। ও বেচারীর সময় কোথায় ? ওকে বিয়ের তাড়া দেওয়া আমার ভারি অন্যায়। একটু লজ্জিত ভাবে বললাম ওকে—ঠিক্ আছে, তোমার কাজ সেরে নাও। দু' বছর তো গেছে, আর না হয় একটা বছর যাবে।

খুসী হল রজত আমার কথায়। আমার একটা হাত টেনে নিল নিজের হাতে, তারপর একটু হেসে বললো—একটা ভালো খবর আছে নীল। তুমি শুনলে খু-উ-ব খুসী হবে।

—তাই ? কি খবর ? তোমার ভালো কিছু শুনলে তবে তো খুসী হবো। জবাব দিলাম আমি।

—হ্যাঁ। ঠিক্ তাই। আমার তোমার দুই-এর ভালো। মানে নিউ আলিপুরে আমি পাঁচকাঠা জমি কিনেছি ; আজ রেজিস্ট্রী হয়ে গেল। অনেকগুলো টাকা হাতে এল তাই ওটাকে মাটিতে পুঁতে ফেললাম আর কি। কেমন খুসী তো ?

খুসীর বিদ্যুৎ চমকালো রজতের দুটি চোখে।

আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিয়ে, ছোট্ট মেয়ের মত নেচে উঠলাম আমি। ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললাম—ভীষণ—ভীষণ ভালো খবর।

দশ হাজার দর্শনার্থী ও জাপানের রাজা-রাণীর সম্মুখে জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাস্টিকে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীবৃন্দ

জমি হলো তোমার পছন্দে, কিন্তু বাড়ীর প্ল্যান হবে আমার মতে। বড় বাড়ী নয়, ছোট একটি বিলিতি প্যাটার্নের কটেজ, আর তাকে ঘিরে থাকবে একটা দামী ফুলবাগান। দেশ-বিদেশ থেকে গাছ আনাবো আমি, মালীদের সঙ্গে দিনরাত বাগানে কাজ করবো আমি, তখন তুমি তো থাকবে কাজে ব্যস্ত। তারপর যখন গাছে গাছে ফুটবে কত রং-বেরঙের ফুল, তার নামও জান না তুমি, আমি তোমার হাত ধরে, ঘুরে ঘুরে ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দেব। ইস! কি মজা যে হবে সেদিন।

রজত তার হাসিভরা চোখ দুটো আমার চোখের ওপর রেখে শুনছিলো আমার কথাগুলো। আমার কথার শেষে জবাব দিলো সে—যে রকম অর্ডার করছো, সে যে অনেক টাকার ব্যাপার গো। জমি কিনতেই তো সব খতম। তোমার ধারটা এখনও শোধ হয়নি . .

ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে আমি থামিয়ে দিলাম ওর কথা। তারপর কোপের সঙ্গে বললাম,—ফের যদি আমাকে পাওনাদার, কাবলীওলা বলে গালাগাল দিয়েছ, তাহলে দেশ ছেড়ে পালাবো কিন্তু।

—পালাবে? না, না নীল—আমি জানি তুমি আমাকে ছেড়ে স্বর্গেও কোনদিন পালাতে পারো না। আমার হাতটা গভীর অনুরাগের সঙ্গে নিজের বুকে চেপে ধরে জবাব দিলো রজত সেন।

●

কেটে গেছে আরো এক বছর। মাঝে মাঝে অর্জুন সিং-এর কাছে পাই; ও দিকের খবর। আমার নতুন মায়ের একটি পুত্র সন্তান লাভ হয়েছে, আর চাঁদু ভাই গেছে, বিলেতে, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্য।

বিশু বোস নকল পায়ের সাহায্যে বাড়ীতে এখন চলাফেরা করেন। অবশ্য এ সব খবর আমার কাছে অবান্তর শুধু চাঁদু ভাইটির জন্যে মাঝে মাঝে প্রাণটা কাঁদে। বিলেত থেকে ফিরে এসে সে যদি শোনে তার দিদি বেঁচে আছে, তবে নিশ্চয়ই সে ছুটে আসবে একদিন। সেইদিনের প্রতীক্ষাই আমার এখনকার সান্ত্বনা।

মাডাম ডেনিয়েল মাঝে মাঝে পত্র মারফৎ উদ্বেগ প্রকাশ করেন- - - বিয়েতে এত দেরী হচ্ছে কেন? ওটা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ। জবাবে আমি জানাই সময় অভাব। অবশ্য চেষ্টা চলছে ঐ কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে। রজত একটা নতন ফিয়াট গাড়ী কিনেছে। আর তার বাড়ীটা'ও তৈরী হচ্ছে।

তবে আমার মনোমত বাড়ী হল না, কারণ সে বললো, ফ্ল্যাট সিস্টেম বাড়ী হলে, ওর থেকে ভালো আয় হবে। সিনেমার পয়সা তো, আজ আছে কাল নেই।

ওর যুক্তি অকাট্য। তাই আমিও ফ্ল্যাটবাড়ীর সম্মতি জানালাম।

রজতের সিনেমার কাজ চলেছে পুরোদমে। মাঝে মাঝে ওকে আউটডোর স্যুটিং-এ বাইরে যেতে হচ্ছে।

দিন সাতেক হল রজত গেছে স্যুটিং-এর জন্যে বেনারসে। ওখানে আরো সাত দিন থাকতে হবে। ও' চলে গেলে বড্ড ফাঁকা লাগে, বেরুতেও ইচ্ছে হয় না। সেজন্য সন্ধ্যের দিকে ওর জন্যে হলে বসে একটা পুলোভার বুনছিলাম।

পাওয়ার সায়েব এসে বসলো আমার সামনের একটা চেয়ারে।

কেমন যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর মনে হল ওর মুখটাকে। আর এমন সময় তো ও রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে, তাই ওকে আজ আমার সামনে চুপ করে বসে থাকতে দেখে, একটু আশ্চর্য হলাম আমি। মনে হল ও যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

আমি কোমল হাসির সঙ্গে ওকে বললাম, —কি সায়েব, কাজকর্ম সব সারা হল? তা হলে একটু গীটার শোনাও না।

মাথা চুলকে, দু একবার কেসে, গলাটাকে ঠিক করে নিয়ে কণ্ঠিতভাবে বললো পাওয়ার—না, ঠিক তা নয়, তবে, তবে, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি সিস্টার।

—বেশ তো, বলেই ফেলো না। তার জন্যে অমন কিন্তু-কিন্তু করছো কেন বলো তো? আমি মুখ টিপে হাসতে লাগলাম, ওর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে।

পাওয়ার সায়েব কিন্তু হাসলো না। স্থির দৃষ্টি মেলে সে কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ভারী গলায় বললো—কথাটা বলতে আমার বড্ড সরম লাগছে সিস্টার, তবুও তোমার মঙ্গলের জন্য যে আমাকে এই অপ্রিয় সত্য কথাগুলো বলতেই হবে। আজ বিকেলে যখন ফেরাজিনিতে গিয়েছিলাম কিছু প্যাস্ট্রি কেনার জন্য তখন হঠাৎ নজরে পড়লো, সেন সায়েবের গাড়ীটা সামনে পার্ক করা আছে। কিছু যেন ভেবে, আমি সামনে দিয়ে না গিয়ে পাশের দরোজা দিয়ে ভেতরে গেলাম, আর সেখান থেকেই লক্ষ্য করলাম সেন সায়েব খাওয়া শেষ করে বিল চোকাচ্ছেন, আর তাঁর পাশে বসে আছে সেই মেয়েটা। —কি যেন নামটা? সাম হালদার?

—সঞ্চিতা হালদার। কিন্তু তুমি ভুল দেখেছো সায়েব ওরা তো এখন বেনারসে! উৎকণ্ঠিত স্বরে জবাব দিলাম আমি।

—না সিস্টার। দৃষ্টি আমার বেশ সুস্থই আছে। ওরা যখন হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠলো, তখন বেশ স্পষ্টভাবেই দেখেছি ওদের। তারপর যখন ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগলো, তখন সেন সায়েবের হোটেলে ফোন করে জানতে চাইলাম যে তিনি ফিরেছেন কি না। ম্যানেজার বললো, যে, তিনি এখনও হোটেলে ফেরেন নি। সেজন্যেই আরো ভাবনা হলো আমার। তিনি কলকাতাতেই আছেন, অথচ হোটেলে না থেকে, কোথায় আছেন? তোমার সঙ্গেই বা দেখা করছেন না কেন? সঙ্গে ঐ মেয়েটাই বা কেন? নানারকম চিন্তা করে আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে সিস্টার।

ওঃ! বুকের ভেতরটা যে আমার থরথরিয়ে কেঁপে উঠছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে অমানিশার অন্ধকার।

না, না, রজত অবিশ্বাসী নয়, প্রতারক নয়। ভুল ভুল। পাওয়ার সায়েব হয় ভুল দেখেছে, না হয় তাকে ঈর্ষা করতে সুরু করেছে। মনের নিদারুণ যন্ত্রণা চেপে বিকৃত স্বরে বললাম,—সায়েব। রজত সেন ধাপ্পাবাজ, প্রতারক এ যে কিছুতেই আমি ধারণা করতে পারি না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু ভুল আছে। সেজন্য এ নিয়ে বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত না করে, এসো আমরা ধৈর্য ধরে তার আসার প্রতীক্ষা করি। আমার মনে হয় সে এলেই গোলমালগুলো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—তা ছাড়া আর উপায় কি? অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে উঠে গেল পাওয়ার সায়েব। কিন্তু তক্ষুণি, আবার ফিরে এসে একহাত মুঠো করে ওপর দিকে তুলে ভীষণ উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলো—বিয়েটা। সিস্টার এবারে ও ফিরে এলে সেরে ফেলতেই হবে। আর কোনো কথা নয়,—কোনো ওজর আপত্তি নয়, কোনো কাজ নয়, শুধু বিয়েটা। অবশ্যই—। যত তাড়াতাড়ি হয়, সব কাজ ফেলে, শুধু বিয়েটা। শুধু বিয়েটা।

আপন মনে বিড়বিড় করে বকতে বকতে হনহন করে ছুটে চলে গেল পাওয়ার সায়েব।

অথৈ চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলাম আমি। মনটা আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো—রজত, রজত, কোথায় তুমি। আজ যে তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। অবিশ্বাস আর সন্দেহের ভূমিকম্প যে ভেঙে চুরমার করতে চাইছে আমাদের বড় সাধ, বড় আশা, আনন্দ দিয়ে গড়ে তোলা প্রেমের তাজমহলকে। বন্ধু তুমি এস। মনেপ্রাণে স্মরণ করছি তোমায়—তুমি এসে দাঁড়াও একবার আমার সামনে। তুমি বলো, ও সব ভুল, মিথ্যে। সত্য আমাদের প্রেম—ভালবাসা।

সারারাত ছটফট করলাম বিছানায় শুয়ে। ঘুম এলো না চোখে। সকালে উঠে বললাম পাওয়ার সায়েবকে—চলো সায়েব, মালতী পাইনের বাড়ী যাই। সেখানে গেলে হয়তো সেন সায়েবের খবর পাওয়া যাবে।

আমাদের দেখে, ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো মালতী। আলাপ করিয়ে দিল ওর মার সঙ্গে।

মালতীর মা বললেন,—মেয়েটা তো দিদি দিদি করে অস্থির হয়ে যায়, কিন্তু আমি বলি,—কেমন দিদি তোর, যে ছোট বোনটাকে একদিন দেখতেও এলো না? ও বলে ঠিক আসবে একদিন তুমি দেখে নিও। আজ তোমাকে দেখে, বুঝলুম মা, তুমি সত্যিই ওর দিদি।

চা, খাবার নিয়ে এলেন মালতীর মা।

গল্পের আসর যখন আমাদের খুব জমে উঠেছে তখন মালতী হঠাৎ বললো—পাওয়ার দাদার গীটারটা এবারে শুনবো দিদি। গল্পে গল্পে সময় যাবে—শেষে হয়তো আর শোনাই হবে না।

পাওয়ার সায়েব বললো—এখন নয়। মেজাজ এলে ঠিক সময় বাজাবো বহিন্। এখন তোমরা গল্প করো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম মালতীকে—কটা বইতে এখন কাজ করছো?

—খুব বেশী কাজ তো পাই না দিদি। শোক দুঃখের পার্ট ছাড়া আমার কপালে আর কিছু জোটে না। সম্প্রতি একটা বইয়ের আউটডোর স্যুটিং-এ বেনারস গিয়েছিলাম। রজতদা আর সঞ্চিতাও আছে ঐ 'বেলোয়ারী' বইতে। বললো মালতী।

বুকের ধক্‌ধকানি বাড়ছে, কিছু একটা শোনার জন্য।

—ও; তাই নাকি? কবে ফিরলে? রজতও ফিরে এসেছে নাকি? দুরু-দুরু বুকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—এই তো। দিনতিনেক হলো ফিরেছি। তবে আমরা এসেছি ট্রেনে। আর রজতদা, তাঁর মোটরে ওখান থেকে রওনা হয়েছিলেন সঞ্চিতাকে নিয়ে। জবাব দিল মালতী।

সব তো জানা হয়ে গেল। রজত ফিরেছে কলকাতায়। সঙ্গে সঞ্চিতা। কিন্তু হোটেল বা আমার কাছে নয়। তবে কোথায়? তবে কি, তবে কি?

উঃ। আর পারছি না। দুচোখ ভেঙে নামতে চাইছে জলের ধারা।

অতিকষ্টে সব কিছু দমন করে এক অবান্তর প্রশ্ন করলাম মালতীকে—আচ্ছা মালতী। রজতের সঙ্গে কি সঞ্চিতার বিশেষরকমের ঘনিষ্ঠতা আছে।

আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। তা না হলে খুঁচিয়ে এসব বিষয় উত্থাপন করছি কেন?

একটু চমকে উঠে, মালতী গভীর দৃষ্টি মেলে চাইলো আমার দিকে—তারপর মৃদুস্বরে বললো,—বিশেষ নয় দিদি। একেবারে চরম। বলবো, একদিন সব কথা তোমাকে বলবো দিদি। মালতীর গলায় যেন বাজলো চাপা কান্নার সুর।

এবারে চমকে উঠলাম আমি, ওর দিকে চেয়ে।

মালতীর সঙ্গেও কি তার---?

গীটারটা বার করে আপন মনে এতক্ষণ সুর বাঁধছিলো পাওয়ার সায়েব। আমাদের দুজনের ওপর সে একটা বেদনার্ত দৃষ্টি বুলিয়ে, দুচোখ বন্ধ করে বাজাতে সুরু করলো।

—দুটি হৃদয়ের কান্না যেন গুমরে উঠলো ওর গীটারের তারে।

সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গীটারের বুকে কান্নার ঢেউ তুলে যাচ্ছে পাওয়ার সায়েব।

আমি নির্বাক নিস্পন্দ পাথর হয়ে গেছি, আর মালতীর গাল দুটো ভেসে যাচ্ছে চোখের জলের ধারায়।

[ক্রমশঃ।

বাঁকুড়া

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরের সম্মুখভাগ

ছাতনা গ্রাম

এর প্রাচীন নাম ছত্রিনগর। এই স্থানে ক্ষত্রিয় রাজারা যখন রাজত্ব করতেন তখন কথিত আছে—কবি চণ্ডীদাস স্বপ্নে আজ্ঞা পেয়ে এই স্থানে বাসুলি মন্দির স্থাপন করেন ও নিজেই পূজো করেন। কিন্তু এ নিয়ে মতদ্বৈত আছে। তবে এই গ্রামে অনেক প্রাচীন কালের ঐতিহ্য ছড়িয়ে আছে। আনুমানিক ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে এই মন্দির স্থাপিত হয়। সে মন্দির এখন ধ্বংসপ্রায়। তার সামনে এখন এক নূতন মন্দির তৈরি হয়েছে। ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজত্ব-সময়ে এই স্থানে 'রাজার বাঁধ' নামে মন্দিরের কাছেই এক বাঁধ তৈরি হয়। এই বাঁধে বর্তমান কালে পাথর বসানো এক ঘাট দেখা যায়—তাকে সকলে 'রামীর ঘাট' বলে। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ, সত্যকিঙ্কর সাহানা প্রমুখ চণ্ডীদাস (গবেষকগণ দুজন চণ্ডীদাস স্বীকার করেন)। তন্মধ্যে 'কৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা চণ্ডীদাসের জন্মভূমি এই ছাতনা গ্রামে বলেন। সারা ছাতনা গ্রাম জুড়ে চণ্ডীদাস, রামী ধোপানী, বাসুলি দেবীর নাম ও স্মৃতিবিজড়িত পুষ্করিণী, ঘাট প্রভৃতি আজও শোনা যায়। (মাসিক বসুমতী, ১১০ নং জবাবদিহি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪)।

উৎসব ও মেলা

বাঁকুড়া বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। এ জেলায় শাক্ত, শৈব প্রভৃতি আরও অনেকে আছেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের সংখ্যা বেশী বলেই মনে হয়। এ জেলার দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি সাধারণ পুজোগুলি তো হয়, তা ছাড়া বৈষ্ণবদের নানা রকম মহোৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। এ জেলায় বিশেষ কয়েকটি উৎসবও হয়। সেগুলির বিবরণ দিচ্ছি।

বৈষ্ণব মহোৎসব
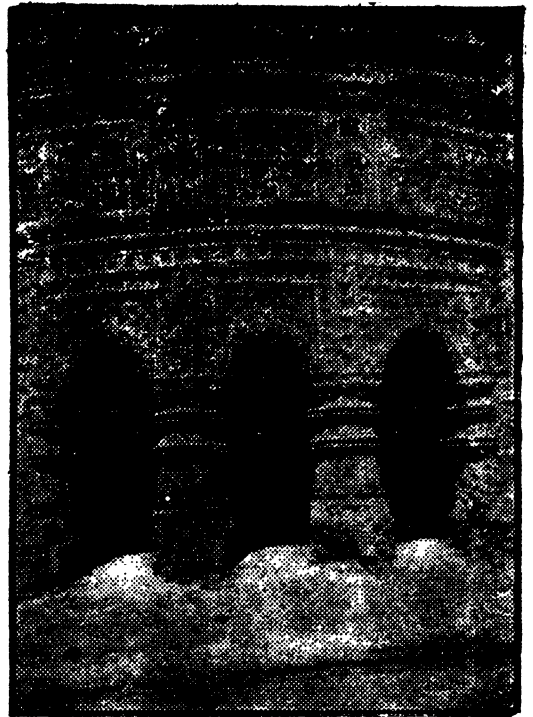
সোনামুখী থানার রামনবমীর দিন বৈষ্ণবদের একটি বিরাট মেলা বসে থাকে। এখানে বৈষ্ণব মনোহর দাসের সমাধি আছে। নানা স্থান থেকে বৈষ্ণবগণ এই সময় এখানে এসে জড়ো হয়ে মনোহর দাসের পূজো, গান, কীর্তন প্রভৃতি করেন। তিন-চারদিন ধরে মহাসমারোহে মেলাও হয়ে থাকে। এখানে বড় বড় আখড়া, ছোট আখড়া বলে অনেক আখড়া আছে। সেখানেও নানা উৎসব হয়। বৈষ্ণব-সেবাও চলে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সব আখড়ায় অর্থ ও উপকরণাদি দান করে থাকেন।

ভাদু পূজা

ভাদু সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—পঞ্চকোটের রাজার কন্যা ভাদু। এই কন্যার অকালমৃত্যুতে রাজা নিজের রাজ্যের মধ্যে সমস্ত প্রজাকে ভাদুর প্রতিমা তৈরি করে শোক করতে আদেশ দেন। সেই থেকে ভাদু-পূজার প্রচলন হয়। পশ্চিম বাঁকুড়ার বালিকারা ভাদ্র মাসে এই ভাদুর উদ্দেশ্যে নানা গান ও ছড়া গেয়ে থাকে। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়ে পূজো হয়। পূর্ব বাঁকুড়ায় কিন্তু এ উৎসব দেখা যায় না। মানভূমে এই গল্পটির উৎপত্তিস্থল, বীরভূমেও আছে। 'বীরভূম' পরিচয়ে এই দুটি কাহিনী উল্লেখিত হবে।

ধর্ম ঠাকুরের পূজা

এই জেলায় বহু ধর্মঠাকুর আছেন। বনে-জঙ্গলে, গৃহস্থের বাড়ীতে, গাছের তলায়, পুকুরের ধারে, এই ঠাকুরকে দেখা যায়। কতকগুলি মাটির ঘোড়া ও হাতি এই সব দেবতার দ্যোতক। পৌষ-সংক্রান্তির দিন ও মাঘ মাসের ১লা তারিখে এই সব দেবতার ভোগ হয়ে থাকে। মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য লোকে এই সকল ঠাকুরের কাছে মানসিক করে থাকে। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে পড়াশে গ্রামে পঞ্চানন নামে এক ধর্মঠাকুর আছেন। সন্তান কামনায় এঁর কাছে অনেকে গাজন মানসিক করে থাকেন। কালো রঙের পাঁঠা পুষে ধর্মের নামে ছেড়ে দেন। এই পাঁঠার নাম হয় 'লুইয়ের পাঁঠা।' গাজনের নাম—'খিরভরণ।' এই গাজন

উপলক্ষে বহু লোক আসেন। বৈশাখী শুক্লপক্ষের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন গাজন আরম্ভ হয়ে পূর্ণিমায় শেষ হয়। গাজনে ধর্মের গান হয়ে থাকে। পূর্ণিমার দিন পাঁঠাটির বলি হয়। ধর্মের কৃপায় সন্তান হলে ছেলের নাম রাখা হয় 'লুইধর।' বাঁকুড়া জেলায় অনেক এরূপ 'লুইধর' আছেন।

এখেন পর্ব

এই জেলায় লোকেরা আগে মাঘ মাসের প্রথম দিনে এখেন পর্ব করত। দেশের রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জঙ্গলে গিয়ে শিকার করতেন। গরীব-দুঃখী লোকেরা মুরগীর লড়াই, ভেড়ার লড়াই প্রভৃতি করে, ছোট ছোট ছেলেরা কাঁদে আঠা মাখিয়ে পাখী শিকার করে। আধুনিকতা ও অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে বর্তমানে এ সব পর্ব ক্ষীয়মাণ হয়ে গেছে।

গাজন পর্ব

বাঁকুড়া জেলার প্রত্যেক গ্রামেই গাজনের উৎসব হয়ে থাকে। কোথাও বা চৈত্র মাসে, কোথাও বা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাদের 'আবনে' গাজন বলে। গাজনের প্রায় ১৫ দিন আগে থেকে শিবঠাকুরের সামনে রামায়ণ গান, যাত্রাদি হয়ে থাকে। তারপরে একদিন রাত্রিকালে ও পরের দিন সকালবেলার গাজন হয়ে পর্ব শেষ হয়। গ্রামবাসীর অনেকেই সন্ন্যাসী হয়ে থাকে। আগে গাজনে
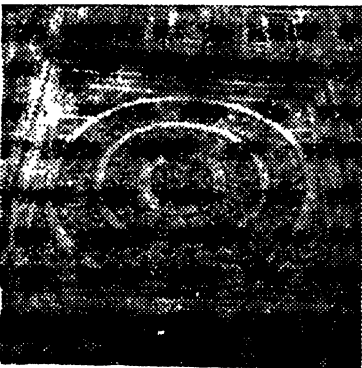
বিষ্ণুপুর মন্দিরের কারুকার্য

বিষ্ণুপুর মন্দিরের কারুকার্য

চড়ক হত, পিঠ ফুঁড়ে প্রবল বেগে চড়ক গাছে ঘুরত। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আইন-বলে তা রোধ হয়েছে।

জামাইষষ্ঠী

বাঁকুড়া জেলার জামাইষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠ মাসে না হয়ে কার্তিক মাসে শ্যামা-পূজোর পর শুক্লা প্রতিপদে হয়।

রথযাত্রা

আষাঢ় মাস ছাড়াও বাঁকুড়া জেলাতে রাইবাঘিনী, চাতরা, তপোবন প্রভৃতি স্থানে বিজয়ার দিন রথ-পরিক্রমা হয়। একে 'রাবণ-কাটা' রথযাত্রা বলে। এ সময়ে রামচন্দ্রের উৎসব হয়। রাজসোল গ্রামে রাম-নবমীর দিন চৈত্র মাসে 'আধারকুলী' নামে ধর্মঠাকুরের রথযাত্রা হয়।

ছাতাপরব

(নামান্তর ইন্দ্রধ্বজ পূজা) বিষ্ণুপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে বিষ্ণুপুরের রাজা ইন্দ্রের ধ্বজাকে পূজো করতেন। আদি মল্লের বিজয়োৎসবের এটা একটা অঙ্গ ছিল। এই উৎসবে সাঁওতালদের বিরাট মেলা বসে। এখনও বিষ্ণুপুরের সাঁওতালদের মধ্যে এই 'ছাতা পরব' উৎসব দেখা যায়।

সয়লা পর্ব

স্ত্রীলোকদের সই-পাতানো ও বালকদের সাঙ্গাত-পাতানোর পর্ব। ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে বা আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গল বা শনিবারে হয়। প্রথমে মনসাদেবীর পূজো, মনসার গান হয়। বেলাশেষে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা একত্র হয়ে 'সই' পাতায়। পরস্পরের গায়ে তেল-হলুদ ও গন্ধদ্রব্য মাখায়। বালকেরা 'সাঙ্গাত' পাতিয়ে পান-মিষ্টির আদান-প্রদান করে।

তোষলা পূজা

এই জেলার বালিকারা পৌষ মাসের প্রথম দিনে একখানি মালসায় তোষলা দেবীর প্রতিষ্ঠা করে ও প্রত্যহ সন্ধ্যায় নানারকম ছড়া বলে ফুল দিয়ে ঐ দেবীর পূজো করে। সমস্ত পৌষ মাসেই এই দেবীর পূজো হয়। পরে বালিকারা পৌষ-সংক্রান্তির দিন সকালবেলায় ঢাক-ঢোল সহকারে তোষলা দেবীকে নদীতে বা পুকুরে বিসর্জন দিয়ে থাকে। পরে আগুন জ্বেলে সকলে মিলে আগুনকে বেষ্টন করে ছড়া প্রভৃতি আবৃত্তি করতে থাকে।

গাজনের মেলা

দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে এক্তেশ্বর শিবের গাজনের মেলা।

শিল্প

তসরের কাপড় ও গালার কাজ এই জেলার প্রধান পণ্য। বিষ্ণুপুরের শ্যামনগর গ্রামে পাটের একরকম শীতের কাপড় তৈরি হয়। গোপীনাথপুরে 'চারখা' থান নামে এক রকম কাপড় তৈরি হয়। এতে গায়ের কোট
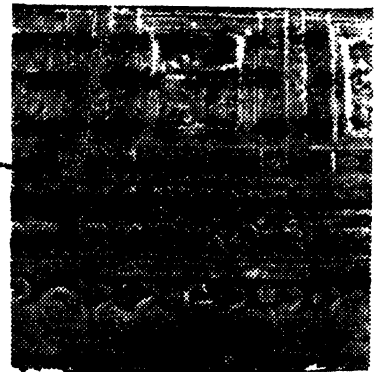
বিষ্ণুপুর মন্দিরের কারুকার্য

হয়। এ ছাড়া সিল্ক ও তসরও হয়। ইন্দাসের মধ্যে শ্বাসপুরে ছুরি, কাঁচি, সোনামুখীতে গালার কাজ হয়। এ-ছাড়া এই জেলায় নানা স্থানে কাঁসার থালি, বাটি, শাঁখ, মহিষের সিং-এর চিরুণী হয়। বেলিয়াতোড়ে 'বেচা' নামে এক প্রকার বিখ্যাত সন্দেশ হয়। লোহা, কয়লা, ঘুটিন চুন ও বাড়ী তৈরির উপ-যোগী পাথরের খনি আছে। 'সোপ স্টোন' নামে পাথরের থালা-বাটিও এই জেলায় তৈরি হয়। গঙ্গাজল ঘাটি থানার কালিকাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাথুরে কয়লা পাওয়া যায়। মেজিয়া ও শালতোড়ার কয়লার খনি আছে।

বাঁকুড়া জেলার গৌরব

অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শুভঙ্কর দাস (শুভঙ্করী গণিত নামে বিখ্যাত) এর সোনামুখী গ্রামে জন্ম। তাঁর নামে সাত-আট ক্রোশব্যাপী খাল 'শুভঙ্কর খাড়া' নামে খ্যাত।

সঙ্গীত আলোচনায় বিষ্ণুপুর বাঙলা দেশে সর্বোচ্চ আসন পায়। রাজা শিবমল্লের সময় থেকে সঙ্গীত-চর্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেকালে বিষ্ণুপুরকে 'ছোট দিল্লী' বলা হত। বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞের নাম---রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু ভট্ট, জগৎচাঁদ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী দেঘরিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি, যাত্রাপালা রচয়িতা ভৈরবচন্দ্র চট্টরাজ (পাত্রসায়র), আনন্দমেলার 'মৌমাছি' বিমলকুমার ঘোষ (বেলিয়াতোড়), ভাষা-রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্রি প্রণেতা কবি জগৎরাম রায় (ভুলুই---মহিষারা পরগণার অন্তর্গত গ্রাম), রায়বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা।

এই রচনাটির সংগে প্রকাশিত মন্দিরের কারুকার্যের আলোকচিত্রগুলি শ্রীপ্রভাত পাল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

পুরীধামে ঘূর্ণিঝড়ে

শ্রীশিবেশচন্দ্র পাকড়াশী

কার্তিকের নীলাকাশে,
বেতার বারতা আসে,
ঘূর্ণিবায়ু উঠিয়াছে বঙ্গোপসাগরে,
সাগরের জলোচ্ছ্বাসে
উপকূল বুঝি ভাসে
সাবধান জনগণ সাগরের তীরে।
উত্তাল তরঙ্গদল সহসা জলধি
ক্রোধভরে গরজিছে কেন নিরবধি?
অসময়ে ক্রুদ্ধ আজ কেন সর্বনাশে?
আকাশ ছাইল মেঘে,
প্রবল বায়ুর বেগে
সাগর মেতেছে যেন সমর বিলাসে।
উর্ধ্বে তুলি ঊর্মি-ফণা
বিষাইছে বায়ুকণা
পবন ছুটিছে ঘোর উদ্দাম উল্লাসে।
ক্ষিপ্ত গতিবেগে তার
ঘর-বাড়ি চুরমার
পথঘাট রসাতল করিল নিমেষে।
কৃষকের শস্যহানি,
ক্ষয়-ক্ষতি হয়রানি,
কত বিপর্যয় আসে কার ভাগ্যাকাশে।
উপকূলবাসীগণ
সভয় ব্যাকুল মন
প্রমাদ গণিছে সবে কিবা হতাশে।
বিস্তারিয়া জটাজাল
নাচে যেন মহাকাল
প্রলয় তাণ্ডব রসে উন্মত হরষে,
ডমরু বাজায়ে করে ভৈরব নির্ঘোষে।

ক্যানভাসার বা রিপ্রেজেণ্টেটিভের কাজটা ক্রমেই মেয়েদের হাতে এসে যাচ্ছে। পুরুষ আউট। তবু অল্প-বয়সে একরকম চলে যায়, বয়স বাড়লে আর নয়। কে চায় সারাক্ষণ কতগুলো বুড়ো-হাবড়া চারদিকে ঘিরে থাকবে। টাকা? আরে সে তো আর ওরা দেবে না। যে কোম্পানীর কাজ গছালো তারাই প্রডাকশন ম্যানেজার, সেল্‌স ম্যানেজারের পকেট ভর্তি করে দেবে। পাবলিসিটি অফিসারও কম যান না। তেমন তেমন কোম্পানী হলে চার লাখ টাকার উপর বরাদ্দ থাকে পাবলি-সিটির জন্য।

পরুষ রিপ্রেজেণ্টেটিভ এলে দেবে দামী সিগারেট, দু'-একটা ভ্যারাইটি শো'র কার্ড, বড়জোর একটা ড্রিঙ্কের জেণ্টেটিভ মেয়ে। সুতরাং ছেলেরা কাজ পাবে কেন? বড়ই টাই-স্যুট হাঁকিয়ে, পালিশ মুখ নিয়ে দন্ত বিকশিত করুক, তার বেশী তো আর কিছু নয়। তবে ওদের অর্ডার দিয়ে কি হবে।

অবশ্য যদি অদূর ভবিষ্যতে অফিসের অফিসররা সব মেয়ে হন, তাহলে হয়তো আবার ওদের ভাগ্য ফিরবে। তখন আবার তরুণীদের চাকরির বাজারে মন্দা দেখা দেবে। কিন্তু এখন তো পুরুষের রাজ। ডিরেক্টরের ধাতানি, সেক্রেটারির কড়া নোট, কোম্পানীর পলিসি বদল, ইউ-নিয়নের আবদার—চারদিকে আগুনের হলকা। তার মধ্যে একঝলক বসন্তের বাতাস বয়ে নিয়ে আসে মেয়ে-প্রতিনিধি। মেয়েদের অধিকার একচেটিয়া হয়ে উঠেছে। স্টেনো-টাইপিস্টও মেয়ে পেলে ছেলে চায় না কেউ। স্পীডে চল্লিশের তারতম্য আর অজস্র ভুলের প্রভেদ থাকলেও ছেলের বদলে মেয়েই রিক্রুইজিশন করেন অফিসররা। কারণ দেখানো হয়—মেয়েরা নাকি স্টেডি, অ্যাবসেণ্ট কম। অ্যাডভানসের জন্য রেকমেণ্ড করতে হয় না। দল পাকায় না ইউনিয়নের পাণ্ডা হয়ে। অবশ্য তাদের জন্য কনভেইঅ্যানস দরকার হয়, কাজও জমে ওঠে বিস্তর। সেজন্য ধমক দিলে আবার লালিত্যে বিস্তার করে চোখ ছলছলিয়ে তোলে। তা এসব তো মাধুর্যেরই অঙ্গ। কাজে ইম-পেটাস পাবে কি করে মানুষ, ছিটে-

ধারাবাহিক
উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

অফার। আর মেয়ে? একেবারে অপূর্ব। সারাক্ষণ কাছে বসে, মিষ্টি হেসে, বিলোল ভঙ্গীতে চেয়ে, একেবারে মন ভরে দেবে। ওরা আবার আসেও সময় বুঝে—হয় লাঞ্চ টাইমের একটু আগে, নয় তো সাড়ে পাঁচটা বাজবার মুখে মুখে। পেটি ক্লার্করা চারদিক ফাঁকা করে চলে যায়। দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাটে বসে তখন বাক-বিনিময় হয়। মেয়েরা বুদ্ধিমতী সুদর্শনা আর অভিজাত। কুদর্শনা, পেটের দায়ে ধুঁকছে, তাদের চাকরি নেই এ লাইনে। পাতলা কড়া রং ব্লাউজ একটু এদিক-ওদিক হয়েই হাওয়া। বুকের কড়া থেকে নাভি পর্যন্ত উন্মুক্ত। সরলা অবলা। শ্রবণ-সুখ, নয়ন-সুখ তো পাওয়া যায় ভূমিকাতেই। তারপর দিনে দিনে ঘন হতে থাকে পরিচয়। সুখ পাওয়া আর দেওয়ার আদান-প্রদানে ঘনিষ্ঠতা পরি-বর্ধমানা। হোটেলে ডিনারের সঙ্গিনী, লম্বা ড্রাইভে অবসর-বিনোদিনী রিপ্রে-

সব অফিসেই অবশ্য মেয়ে আছে। স্টেনো, পি-এ, টেলিফোন অপা-রেটার, রিসেপ্শনিস্ট। কিন্তু নিজের অফিসে ওদের বেশী ইয়ে করলে মান যাবার সম্ভাবনা। তারপর মেয়েগুলো দিনে দিনে ভারি বদমাস হয়ে ওঠে। ওদের চোখ যায় আরো উঁচুতে। ডিরেক্টর বা জেনারেল ম্যানেজার ডাকলে ছুটে আসবে, আর অন্য অফি-সাররা একবার ভাল করে তাকালেই এমন মুখ বানাবে, যেন সাক্ষাৎ সীতা-সাবিত্রীকে অপমান করা হল।

রিপ্রেজেণ্টেটিভ মেয়েদের অত সব খুঁতখুঁতি নেই। কাজ বাগাতেই আসে ওরা। চাইতে দিয়ে, ছুঁতে দিয়ে অর্ডারটি ঠিক বের করে নেয়। দু'দলেরই লাভ। ওদের চাকরি পাকা হয়, অফিসারদের একঘেয়ে জীবনে আসে বৈচিত্র্য।

অনেকগুলি লাইনেই দিনে দিনে ফোঁটা মাধুর্য অনুভব করবার সুযোগ না পেলে। আরে এই মাধুর্যের জন্য তো সত্যকালে দেবতারা পর্যন্ত দেবীদের জেনারেল করে যুদ্ধে নামিয়ে দিতেন। তাতেই তো ক্ষেপে উঠে ক্ষুদে ক্ষুদে দেবতারা পর্যন্ত প্রাণপণে লড়াই দিত।

অসুররাও প্রেরণা পেতো দেবীর মদির-কটাক্ষ দেখে। দেবীর প্রশংসা পাবার জন্যই পাগলা হয়ে কি অস্ত্রের বদলে কি অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে, হেরে ভূত হ'ত। দেবীকে যুদ্ধ করতে ডাকলে, হেসে দেবী বলতেন—দাঁড়া দাঁড়া, মধুটুকু খেয়ে নিই। তারপর দেখব তোর কেরামতি। জোয়ান মদ্দ অসুরটা আর এগুতে পারত না। আহা! যুদ্ধ করতে এসেছে, শ্রান্ত হয়েছে। থাক, থাক, মদ-টদ খেয়ে তাজা হয়ে নিক। ব্যস্, দেবীর অর্ধেক কাজই ফতে। গলা যে বাড়িয়েই দিল, তাকে এককোপে সাবাড়। ভারি তো মেয়েদের দিয়ে কাজ গোছানো দেখে বক্তৃতা দেন এখনকার

[illegible] সেকালে, কি হ'চ্ছে আর যে [illegible] জন্য বৌ দিয়ে কর্তাদের মন ভোলালে ছি-ছি ওঠে, গোটা চালু হল কি করে ভারতবর্ষে? পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে এগিয়ে দেন নি কৃষ্ণের মন ভোলাবার জন্য? কৃষ্ণ বশ না হলে কেবল ধর্মের জোরে ভারতবর্ষের সম্রাট হয়ে বসতে হ'ত না পাণ্ডবদের।

●

হিমিকা চলে যাবে শুনে ব্যস্ত হ'ল ম্যানেজার। হন্তদন্ত হয়ে এল মালিকের কাছে।

—হিমি চলে গেলে বড়দিনের জৌলুষ কমে যাবে হোটেলের।

ম্যানেজারের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন বিজয়মোহন।

—বহোৎ আজব কি বাত ম্যানেজার, হিমি না থাকলে স্পয়েল হবে বড়দিন? একটা ছোকরীকে এতটা ইমপর্টেন্স দিয়ে ফেলেছ?

খাঁটি কাজের ম্যানেজার। সাহস থাকলে বলত—সে নয়, হিমিকে বাড়িয়েছেন সাউসাহেব নিজেই। মুখে বলল—হিমিকে দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। অনেক টেবিল বুক হয়ে গিয়েছে।

HAPPY NOOK
Testy Chinese, English and
Indian dishes.
Dance with lovely Himi.
Happy Nook means the best
everything on Christmas Eve.

বিজ্ঞাপন দেখে ভ্রূ কোঁচকালেন বিজয়মোহন। হোটেল হতে বিস্তর লাভ হলেও, নতুন বের করা মেডিসিন পপুলারাইজ করা বেশী দরকার। ওর সঙ্গে কেবল টাকা নয়, সম্মানের প্রশ্নও জড়ানো। মালিককে চুপ করে থাকতে দেখে কথা বলল ম্যানেজার—বড়দিন আর পয়লা জানুয়ারিটা কাটিয়ে দিয়ে ও যাক। তা'হলে দু'টো দিকই রক্ষা হয়।

রক্ষা যে হয় তা জানেন সাউ-সাহেব। হিমিকে বলেও ছিলেন সে কথা। [illegible] হিমিকা রাজী [illegible] বড়দিন, পয়লা জানুয়ারিতে এবার আরো ভিড় হবে। দিনে দিনে মানুষ যেমন পয়সা কামাচ্ছে, আবার তেমনি উড়িয়েও দিচ্ছে সেই পয়সা। আজব শহর কলকাতা। এখানে খেতে দিতে না পেরে বাপ বাচ্চা ফেলে দেয় গঙ্গার জলে, বেকার থাকার জ্বালায় জলে কুড়ি বছরের ছেলে মরে গলায় দড়ি জড়িয়ে। আবার হাজার হাজার টাকা উড়ে যায় মদে, সেদ্ধ-করা মুরগীতে আর নিরাবরণ করবার জন্য মেয়েকে।

হিমিকা বলেছে—ফ্লোর-শোতে ওকে সবাই ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাবে। তারপর রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে ওষুধ ক্যানভাস করতে গেলে চিনে ফেলবে অনেকে। পরে যাই হোক, প্রথমে তো একটা আভিজাত্যের বর্ম পরেই হিমিকাকে নতুন আসরে আপিয়ার হতে হবে।

বিজয়মোহন ওর কথা শুনে হেসেছিলেন।

—কিন্তু তোমাকে যে মেলাই টাকা খরচা করে ইংলিশ ডান্সিং সব কিছু শেখানো হ'ল সে টাকাটা বরবাদ যাবে।

—ভয় নেই, টাকা নষ্ট হবে না। আপনার মত বড় বড় রইস আদমীদের জন্য তৈরী থাকব আমি। আর ওষুধটা চালু হয়ে গেলে আমাকে আপনি বিশ্ব-সুন্দরী করেও পাঠাতে পারেন। মাপ-টাপ সব ঠিক আছে। একবার বিশ্ব-সুন্দরী হলে, আর দেখতে হবে না, মেলা টাকা পাবেন আমাকে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া খাটিয়ে। আপনার নামও হবে প্রচুর।

হা-হা করে হেসেছিলেন সাউ-সাহেব।

—নটি, ইন্টেলিজেন্ট গার্ল। আমার কি ইচ্ছে হয় জান হিমি, তোমাকে এসব উমদা কাজে না লাগিয়ে একদম শাদি করে ফেলি।

—শাদি? বিয়ে আমাকে? আঁতকে উঠেছিল হিমিকা।

—বিয়ের কথা কি বলছেন সাহেব? বিয়ে আমাদের হয় না। আমাদের উচিত সরাব খাওয়া, খাওয়ানো, কিন্তু বিয়ে করলে জাতি যাবে [illegible] লোকদের।

গম্ভীর হয়ে গেলেন বিজয়মোহন। হিমিকাকে তিনি স্নেহ করেন। রূপ-গুণ ক্ষুরধার বুদ্ধি। রাণী হবার যোগ্যতা আছে মেয়েটির কিন্তু কসবীর বেটি কসবী হওয়া ওর নসীব। মেয়েদের ধরম একেবারে এখনো ছাড়ে নি হিমি। ও বেড়াতে যায়, নাচ-গানা করে এই পর্যন্ত, তার বেশী নয়। কত ভদ্দরঘরের মেয়ে আসছে হ্যাপিনুকে, টাকার বদলে ইজ্জত দিয়ে যাচ্ছে। তারা কেবল একটা বিষয়ে সাবধান—কেউ কিছু না জানলেই হ'ল।

তিন বছর আগের কথা মনে পড়ল বিজয়মোহনের। বিবর্ণ ভীতু মেয়েটিকে বেমানান লেগেছিল এখানে।

সেই ভয় আর ম্লানিমাই তাকে অন্যরকম স্বাদে প্রলুব্ধ করেছিল। তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন হিমির সাহস দেখে। বিজয়মোহন সাউ, যাঁর কৃপা-কটাক্ষ লেগে গলে গিয়েছে কত খানদানী ঘরের মেয়ের ক্যারেক্টর, তাঁকে খুশী করতে নারাজ হল এই তুচ্ছ মেয়েটা - রাগ হয়েছিল, আবার ভালও লেগেছিল। ওর জন্য বিস্তর খরচ করেছেন। অদ্ভুত হয়ে উঠেছে মেয়ে। ওকে সঙ্গী নিতে চাইলে চার্জ হয় চারশো টাকা। তিনি কুড়ি পার্সেন্ট পান, বাকীটা হোটেলের লাভ

ওকে বিয়ে করতে চেয়ে কি ঠাট্টা করলেন বিজয়মোহন? ঠাট্টা নয়, বাঙালী মেয়ের নরম মন আর বুদ্ধির কথা কত শুনেছেন তিনি। তাদের নিয়ে ব্যবসার খেলা জমাতে কোনোদিন দিল চায় নি। কত বছর আগে, প্রায় ইংরেজ আসবার সময় সময় কালেই বিজয়মোহনের দেশোয়ালীরাও এসেছিল বাংলা দেশে ব্যবসা করতে। তাঁরা বানিয়ার জাত, ব্যবসা করেছেন সব

করে কাপড়-কল—যত রকমের ব্যবসা হয়, সব করেছেন। কিন্তু মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ব্যবসার কথা তাঁদের মনে হয় নি। ভারতবর্ষের অন্য অন্য দেশের মানুষ, তারা আংরেজীতে জবরদস্ত, তাদের কামের জবর জৌলুস। তারা গদ্দি বানায় না, খইনি ভুজা খায় না, তারাই সবসে পরথম বাঙালী মেয়ের ইজ্জত নিয়ে ব্যবসার পত্তন করল। কোনো ব্যবসায় মার খাওয়া জাত-ব্যবসায়ীর ধরম নয়, তাই মনে ঘৃণা হলেও ব্রিজমোহনদের নামতে হয়েছে এই ব্যবসাতেও।

হিমিকাকে ভাল লাগে ব্রিজমোহনের। অজস্র টাকা কামাচ্ছেন, মাটি সোনা হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু শ্রান্তি আসে দিনের শেষে। বাড়ীতে স্ত্রী আছে রাজকুমারী। বিয়ের জোরে সে ব্রিজমোহনের সব কিছুর অধিকারী কিন্তু পরিশ্রান্ত স্বামীকে খুশী করবার শক্তি নেই তার। হিমি—। শী ইজ এ কলগার্ল। দুর্দান্ত ভাবনাটাকে দু' পা দিয়ে যেন জোরে চেপে ধরলেন ব্রিজমোহন। বড়দিনে কাস্টমাররা গোলমাল বাঁধাবে, ম্যানেজারের এই ভয় একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না সাউসাহেব। একটু ভাবলেন।

—ম্যানেজার, তোমার নতুন রিক্রুট হিমানী কেমন মেয়ে?

—হিমানী? একেবারে রদ্দিমার্কা। ডুল অ্যাণ্ড প্লাম্প।

—প্লাম্প? বস্ বস্। ওকে ডাকো।

একটু পরেই মোটা-সোটা একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

—এই হিমানী? বোসো, বোসো, সিটডাউন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে খুঁটে খুঁটে হিমানীকে দেখলেন ব্রিজমোহন।

—তোমাকে দিয়ে এবার বড়দিনের আসর জমাবেন বড়বাবু। পারবে তো? জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটাকে।

বেড়ালের মত গলা দিয়ে একটা ঘড় ঘড় শব্দ তুলে হাসিতে ডগমগ হ'ল হিমানী। থকথকে গাল দুলে উঠেছে, চোখ কুৎকুতে। সমস্ত শরীরে একটা বিবমিষা অনুভব করলেন ব্রিজমোহন। বিদায় দিলেন হিমানীকে।

—হিয়ার সি ম্যানেজার সারাকে বল, ওকে কড়া দু' একটা নাচের তালিম দিতে। খুব টাইট করেকটা ড্রেস বানাতে অর্ডার দাও। দেখবে তোমার হিমানীই কাস্টমারদের খুশী করে দেবে, বড়দিনের আসর মাৎ করবে।

—কিন্তু, ও কি ঠিক পারবে? আমতা আমতা করল ম্যানেজার।

—ও, সিয়োর। ঘন লাল, মেরুন, ফ্লেস কালারের ড্রেস বানাও। মেয়েটার চুল ছাঁটিয়ে খুব স্যাম্পু ঘষে ফোলাতে বলবে।

—ওর নাচের পা—

—আঃ, ম্যানেজার! একদম বুরবাক তুম। হু কেয়ার্স ফর ড্যানসিং রিদম্ অ্যাট দি ডেড অব নাইট? মাচ হুইস্কি উইল ম্যানেজ এভরি থিঙ। শী ইজ প্রেজেন্টলি ফ্যাট। প্যাশানিট মিউজিক, ড্রিঙ্কস, তার সঙ্গে ঐ হিমানীই জমজমাট করে রাখবে। একটু বুদ্ধি করে যদি চালাতে পার, দেখবে হিমির চেয়ে হিমানী বেশী পপুলার হবে। হিমি খুব প্রাউড আর হিমির চেয়ে হিমানীর অ্যাপিল বেশী হবে, বুঝলে?

চুরটে আগুন ধরালেন ব্রিজমোহন।

●

হিমিকার চেয়ে হিমানীর অ্যাপিল বেশী হবে। রাগ হ'ল ম্যানেজারের, কতগুলো চর্বি ছাড়া আর আছে কি ওর। ধারালো তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ ঝকঝকে হিমি, তার সঙ্গে তুলনা এই মেয়েটার। যাক গে, প্রতিবাদ করে কড়া কথা শুনবার দরকার কি ম্যানেজারের। সে তো জানেই সাউসাহেবের টাকা আছে, রুচি নেই। কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম হোক।

সারাকে ডাকা হল। হেসেই অস্থির সে। ও, মাই গড। এ লাম্প অব ফ্লেস; ও নাচ শিখবে কি। হোয়ার ইজ হিমি—বেস্ট ব্যালে ডান্সার ইন ক্যালকাটা।

বড়দিনের বেশী দেরী নেই। দু' বেলা সেসন নিয়েও আজকাল হিমানী। মোটা টাকা যাচ্ছিল সারার ব্যাগে। সাউসাহেব সেটা লক্ষ্য করলেন।

—ওয়েল ম্যানেজার, ডোণ্ট ওয়রি মাচ্ মানি। শী উইল বি রাউণ্ড উইদিন এ ইয়ার। সামনের বছর ওকে দিয়ে কাজ হবে না।

কাজ যে হবে না একথা ম্যানেজারের চেয়ে বেশী জানে কে। কিন্তু এবার তো চালাতে হবে। সাউসাহেবের আর কি, অর্ডার দিয়েই খালাস। একটু এদিক-ওদিক হলে রক্ষা রাখবে না কাস্টমাররা। হল নষ্ট করবে, ভিড় জমাবে ম্যানেজারের মাথা দাবী করে। শুধু একটা মন্দের ভাল যে মেয়েটা তার নির্দেশমতই অল্প কাপড় পরতে রাজী। হিমিকে দিয়ে এতটা হত না।

হিমিকাকে দিয়ে এতটা হয় না। কিছু লজ্জার অংশ রাখবেই সে শরীরে। দুলতে দুলতে খসে ঘোমটা টানবে। সেই জন্যই হিমানী সম্বন্ধেও কৌতূহল জাগল তার, যখন শোনা গেল যে ইণ্টারভেলের ঠিক আগের মুহূর্তে শু পায়ের সর্বশেষ কাপড়টিও ছুড়ে ফেলে ছুটে পালাচ্ছে। হিমানীর সম্বন্ধে একটু ভাল করে জানবার জন্য নিজের পুরনো হোস্টেলে এল হিমিকা। উচ্ছসিতা হয়ে উঠল মেয়েরা।

—ওমা। হিমি, হিমি এসেছে! দেখ দেখ কাণ্ড—কত কেক পেস্ট্রি চানাচুর। বোসো বোসো হিমি। মাসীমা খুব ভাল করে চা বানাতে অর্ডার দিন। তারপর ব্যাপার কি বল? ভূতলে চাঁদের উদয় কেন?

—ব্যাপার আবার কি। হাসল হিমি—তোমাদের, বিশেষ করে হিমানীকে দেখতে এলাম। ওর তো খুব নাম হয়েছে। বড়দিনের অ্যাট্রাকশন্। ও কোথায়? ডাকো না একটু।

—হিমানী? বিভা ভড়বড়িয়ে উত্তর দিল: হিমানী তো বাড়ীতে থাকে। বিয়ে হওয়া মেয়ে, হোস্টেলে পচে মরবে কোন্ দুঃখে।

—বিয়ে হওয়া মেয়ে? অবাক হল হিমিকা।

—ওকে দেখে তো তেমন গরীব ধলে মনে হয় না। ও কেন—

হিমিকার কথা শেষ হল না, দরজায় ছায়া পড়ল। হিমানী ঘরে ঢুকছে।

—কি, খুব যে মজলিশ জমিয়ে বসেছ? বিকেলে ডিউটি নেই কারোর?

—এসো হিমানী। তোমার কথাই হচ্ছিল। না, বিকেলের ডিউটি নেই আমাদের। তোমাদের মত ভাগ্য করে কি এসেছি যে দু'-বেলাই ডিউটি দেবেন ম্যানেজার সাহেব। এই দেখ, হিমিকা এসেছে। ওর সঙ্গে আলাপ আছে তো তোমার?

—আলাপ? নাঃ, আলাপ করবার সময় কই! নাচ-গান, আবার ডিউটি। মুখপোড়াদের চোখে যেন অন্য মেয়ে ধরেই না। তিনদিন আগে হতে বুক করে রাখছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আভার কথার উত্তরে বলল হিমানী।

—তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যই এসেছে হিমি, তা তুমি বাড়ীতে থাক শুনে গালে হাত। বড় একটা কেকের টুকরো মুখে দিল শেফালী।

—হবে, হবে। আমারও সুইট নিয়ে, থাকবার দিন হবে। সবে তো কলির সকাল। তা গালে হাত দেবার কি হল? ঘর-বাড়ীতে তো মানুষই থাকে।

—না, না, তা নয়। বিপদ দেখে এগিয়ে এল মেট্রন মাসী।

—হিমি বলছিল বিয়ে হওয়া মেয়ে তো এসব কাজে বড় আসে না, তাই—।

—ও, এই কথা? বিয়েটা আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট বুঝলে ভাই। এতক্ষণে হিমির দিকে সোজা চোখে তাকাল হিমানী।

—বাপ-মায়ের সপ্তম কন্যার একটি। দুধের ডিপোয় চাকরি করে চল্লিশ টাকা কামাচ্ছি। জানতাম প্রেমে পড়া ছাড়া গতি নেই। তা লাভারটি ভালমানুষই পেয়েছিলাম, বিয়েতে পৌঁছতে আর বেশী গোলমাল হল না। কিন্তু ও হরি। মুজরই জুম। দেড়খোটা টাকাতে তিনি টাইপের চাবি টিপছেন। থাকবার ব্যবস্থা ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের এক রিফিউজি কলোনীতে। আরে তাই যদি থাকব, তবে বাপের ঘর দোষ করেছিল কি? আমাকে স্যুট করে এমনি চাকরির বিজ্ঞাপনে চোখ পেতে-ছিলাম। এখন দেখছ তো অবস্থা।

—স্বামী আপত্তি করেন না এ কাজে? হিমিকা জিজ্ঞেস করল।

—আপত্তি? গতমাসে টেরিলিনের প্যাণ্ট কিনে দিয়েছি। টাকা ছাড়া পৃথিবী অচল, বলেছি সাফ কথা। সমস্ত শরীরে গর্বের ঢেউ তুলল হিমানী।

—উঠি এখন। আর একদিন কথা হবে। সারা মাগীর সঙ্গে নেচে নেচে জীবনটা আমার গেল। সমস্ত শরীর যেন টাটিয়ে আছে। কি করব। উন্নতির জন্য সবই সইতে হয়।

ভঙ্গী ভরে মাথা কাত করে ঘর হতে বেরিয়ে গেল হিমানী। হিমিকা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

*

রাতের বিছানায় অনেকক্ষণ জেগে রইল হিমিকা। একটি মেয়ে ভালবেসেছিল, ঘর স্বামী সব পেয়েছিল কিন্তু সবই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে টাকার অভাবে। ভালবাসাও তুচ্ছ হল। ভালবাসা কেমন তার রূপ, কোন কামনার স্বর্গলোকে তার বাস সে কি জানবে পতিতার মেয়ে হিমিকা? তবু পতিতা হলেও তার মা ভালবাসা জেনেছিল একদিন। ভালবাসার হাত ধরে ভয় ভাবনা ভবিষ্যৎ তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিয়েছিল অনিশ্চিতের বুকে। কিন্তু হিমিকা ভালবাসার কি জানে। ষোলো হতে তেইশ—জীবনের এই বছর ক'টা। তো তার কাটছে কেবল যুদ্ধ করে হিংস্র শ্বাপদের নখ-দন্ত হতে শরীরটাকে একটু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য লড়াই।

কিন্তু সবাই কি হিমির শরীরটাকে ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছে? সেই আগুনের নামে নাম যার, তাঁর চোখে কি দেখেছে হিমিকা? কৌতুক, স্নেহ, ঘৃণা?—হ্যাঁ, সবার শেষে একটা তীব্র ঘৃণার হলকা ছুটে এসে তাকে পুড়িয়ে ছাই করতে চেয়েছে। হিমিও ছাই হতে চেয়েছে। বলেছে—আমাকে মারো, ওগো আমার মহৎ মৃত্যু, আমাকে ছাই করে দাও। সবার ধিক্কার পাওয়া এই লাঞ্ছিত জীবনের শেষ হোক। আমাকে মারো, সেই মরণের মধ্য দিয়ে গ্রহণ কর আমাকে। কিন্তু একেবারে ভুলো না। যে তান একদিন তোমার বীণায় বেজে উঠেছিল, তোমার স্মৃতির এককোণে যেন গুঞ্জরিত হয় সেই সুরটি মুহূর্তের আবেগ লেগে।

'ধরকসে পত্তি হিলে
ওড়ি সিংহল দ্বীপ
তেড়ে বীণাকে রবসে মেরা
শির কিয়া বকশিস।
শির কাটো কটোরা বনাৰ,
গোস মেরা খা
মেরা মৃগ-চর্ম পর বৈঠকে
তুম হরদম বীণ বাজা।'

সুরমুগ্ধ হরিণী নিজের শরীর বকশিস দিয়ে তৃপ্ত করতে চায় বীণ-কারকে। কিন্তু পতিতার শরীর—সে তো অস্পৃশ্য, অমেধ্য, তা তো দক্ষিণার কাজে লাগে না। তাই হিমিকা পুড়তে চায়। দাউ দাউ জলবে আগুন। পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে হিমিকা।

হিমিকা কি পতিতা হতে চেয়েছে? ও তো ভেবেছিল ছোট একটি ঘরের বউ হবে। সন্ধ্যাকে আরতি করবে সন্ধ্যা-দীপ জেলে, সকালকে বরণ করে নেবে তুলসীতলায় প্রণাম করে। এখন ওকে লুব্ধ চোখের লেহন, কামনাহত স্পর্শের বদলে টাকা উপার্জন করতে হয়। সাউসাহেব বলছেন এবার তাকে সেলস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ করে দেবেন। এবার কি অব্যাহতি ঘটবে এই ঘৃণ্য জীবন হতে। অব্যাহতি? পাগল হয়েছে নাকি হিমিকা?

অব্যাহতি দেবার জন্য ওকে ওষুধ পপুলারাইজ করবার কাজে লাগাচ্ছে নাকি ব্রিজমোহন সাউ? আরো তীক্ষ্ণ দীপ্ত হতে হবে হিমিকাকে। আরো সূক্ষ্ম কারুকলায়

আয়ত্ত করতে হবে নীতিবান চরিত্র-বানদের। এ বড় কঠিন কাজ। প্রমোদ-বিলাসীদের দিয়ে কারবার তো সোজা। আসে চামড়া দেখিয়ে, হেসে নেচে গেয়ে তাদের খুশী করা যায়। কিন্তু এইসব রুচিবানদের জন্য চাই একেবারে আলাদা টেকনিক; সরলা সম্ভ্রান্ত। শরীর ঢাকবার ভাণ করে প্রকাশ। মুখে আং আধো কথা, চোখে অপার বিস্ময়—আরো অনেক অস্ত্র দিয়ে সেই নির্লোভী মানুষগুলোকে লোভী বানাতে হবে। হয় তো কাজ শেষ করবার জন্য আরো এগুতে হবে হিমিকাকে। তখন আর একজনের ঘৃণা দগদগে দুটি উদরে মাথা উঁচু করে বলতে পারবে না—অমন করে চেয়ো না তুমি। একেবারে নষ্ট অশুচি নই, আমার শেষ মর্যাদা হারিয়ে একেবারে দেউলে হই নি আমি এখনো।

নাইট ক্লাবগুলো, হিমিকার মত মেয়েরাই দেশ অধঃপাতে দিচ্ছে। চারদিকে ধিক্কার ওদের উদ্দেশ্যে। একবার কেউ ভেবে দেখে না নাইট ক্লাবে আসে কারা, ক'জন। পকেটভর্তি টাকা না থাকলে হিমিকারা দুর্লভ হয়ে থাকে। স্কুলের ছেলে, যারা মোড়ে, বাড়ীর আড্ডায়, হাপ-কাপ চা গিলবার রেস্টুরেন্টে ভিড় করছে, তারা কি হিমিকাদের মুখের শ্রেণীটিও দেখতে পায়।

ওদের জন্য তো আছে নামী দামী লেখকদের উপন্যাস। বাস্তব-ধর্মী বলে সেগুলোর অজস্র প্রশংসা-ভরা সমালোচনা করছেন পণ্ডিতের দল। তাতে উপন্যাসের কুরুচিসম্পন্ন ভাষা-চিত্র আছে। নতুন ভাষা তৈরী হচ্ছে। ছেলেরা মেয়েরা পড়ছে, অধঃপাতে নয়, বাস্তব রসাস্বাদন করছে।

(ক্রমশ।

বিরূপ হয়ো না

ছোট ছোট পা ফেলে ফিরে এস
এখানে এখন প্রচুর সুযোগ
প্রিয়তমা বিরূপ হয়ো না।
চিরদিন মনে রেখো—
সময়ের স্রোতে পথ কোনদিন ফেরে না।
কান পেতে শোন
তার প্রতিটি উপশিরায়
কি করুণ বেদনা দীর্ঘশ্বাস!
যে বাঁশী বিকৃত পাণ্ডুর মুখে ম্যান
অথচ নিশ্চিত কোন মেঠোসুরে হাল্কা গান শোনায়;
তারা আহত গাঙচিলের মত
কতদূরে মিলিয়ে যায় কেউ জানে না।
মস্ত নক্ষত্রের কোন ধূসর জগতে তারা ঘর বাঁধে
স্বপ্ন দেখে পুরুষমানুষের
সেই ঘরে বিশ্রাম করে পাথরে খোদাই করা
বুদ্ধের মূর্তি।
শিপ্রার জলে রক্তগোলাপ ভেসে যায়
কাঁচের মত স্বচ্ছ জল,
মেঘ ডাকে বিদ্যুৎ চমকায়,
অবন্তী বিদিশার মানুষগুলো চাঁদের আলোয়
ঘুমিয়ে পড়ে,
তাদের ঘুম কোনদিন ভাঙে না॥

॥ [illegible] ॥

জাহাজ কি গুহা থেকে বের করে আনা যাবে কখনও?

কয়েক ঘণ্টা আগেও যাঁরা লক্ষপতি হবার স্বপ্নে ছিলেন মসগুল, প্রাণের দায়ে তাঁরা তখন ডেকের উপর দাপাদাপি করতে লাগলেন। প্রহর গুণতে থাকেন রাত্রির।

কখন শেষ হবে এই অন্ধকার রাত্রি!

রাত শেষ হবার আগে দেখা দিল আরও এক ভয়াবহ বিপত্তি।

সমুদ্রে ভাটার টান শুরু হল।

গুহার ভেতর থেকে জল কমে যাচ্ছে। জল নেবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও গুহার ভিতরে আরও এগিয়ে যেতে থাকে। ভিতরের দিকে গুহার ছাদটা আরও ঢালু। গুহার ছাদে ঠেকে মাস্তলটা আরও চাপ দিতে থাকে পাটাতলে। সেই প্রচণ্ড চাপে চড় চড় করে ফেটে যেতে থাকে জাহাজের খোলের খানিকটা।

জাহাজের খোলে হু-হু করে জল ঢুকছে। আবার উন্মাদের মত ছুটো-ছুটি। যেন যাঁতাকলে ধরা পড়া ইঁদুর।

ভাটার টানে একটু একটু করে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে গুহার ভিতরে। গুহার ছাদে ঠেকে ক্রমাগত ক্যাচক্যাচ শব্দ তুলছে মাস্তলটা। শেষ পর্যন্ত সেই প্রবল চাপ আর সহ্য করতে পারে না মাস্তল। একসময় মড়মড় শব্দ করে খোলের খানিকটাও উপড়ে আসে। মাস্তলটা খোলের সঙ্গে লাগান ছিল। খোলের সেই মস্ত ফুটো দিয়েও তোড়ে জল ঢুকতে থাকে।

ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছিল।

ফুটো জাহাজ ছাড়বার জন্য সকলে ব্যাকুল। দু'খানা ছোট নৌকায় করে কিছু যাত্রী নামিয়ে দেওয়া হল। তারা গুহা ছেড়ে গেল বাইরে। নিরাপদ স্থানের সন্ধানে।

কিছু যাত্রী চলে গেলেও আরও কিছু রয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক নাবিক। জাহাজের ক্যাপটেন। এরা চেষ্টা করতে থাকে, যদি জাহাজ গুহার মুখ থেকে
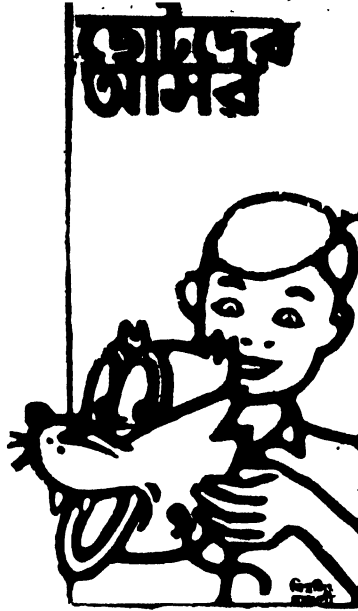
সেই জাহাজটা কোথায় গেল?

বের করার কোনও পথ পাওয়া যায়! এত সোনায় ভরা জাহাজ এখানে আটকে থাকলে ত' চলবে না।

নৌকা দুটো চলে যাবার কিছু পরেই গুহার ছাদে চাপ খাওয়া মাস্তলটার খানিকটা দুমড়ে ভেঙ্গে গেল। জাহাজ

অধীরকুমার রাহা

গুহায় গিয়ে ঢুকল পুরাপুরি। তারপর এক জায়গায় গুহার নীচু ছাদে গিয়ে ভাঙ্গা মাস্তল ঠেকতে সেখানেই আটকে রইল।

নীচের জলের স্রোত তেমনি প্রবল। জলস্রোত ক্রমেই জাহাজটিকে গুহার ভিতরে টেনে নিয়ে যেতে চায় আর সেই সঙ্গে মাস্তলের চাপে একটু একটু করে ডবতে থাকে।

উপর থেকে ছাদে ঠেকা মাস্তলের চাপ। নিচে ভাঙ্গা খোল দিয়ে হু-হু জল ঢোকা। জাহাজ এবার বেশ দ্রুত ডবতে থাকে।

যারা সোনার লোভ ছাড়তে পারেনি ভেবেছিল কোনমতে হয়ত উদ্ধার করা যাবে জাহাজ, তাদের [illegible]

পেয়ে লাফিয়ে পড়ল। যারা সাঁতার জানত ওদের কেউ কেউ সাঁতরে গিয়ে ছোট নৌকা দুটিতে উঠল। অন্যরা ডুবল।

কিন্তু অতি-বুদ্ধিমান যাত্রী ও নাবিক আশ্রয় নিল জাহাজের গায়ে লাগান বড় বড় নৌকা দুটিতে। ওদের মতলব জাহাজ যেই ডুববে অমনি এই বড় নৌকাগুলি ছেড়ে দিয়ে তারা পালাবে। একটু একটু করে ডুবছিল যে জাহাজ। একসময় জলে ভর্তি হয়ে ঝপ করে ডুবে গেল। বিপুল জল ছলকে উঠল। বড় বড় নৌকা দুটি তার প্রলয়ঙ্কর ঝাপটায় ছিটকে গিয়ে আছাড় খেল গুহার দেওয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার। নৌকার প্রায় সব যাত্রীর ঘটল সলিল-সমাধি।

ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন যাত্রী শেষ পর্যন্ত ছিল জাহাজে। ডুববার সঙ্গে সঙ্গে তারাও জলের বিপুল ঝাপটার মাঝে কোথায় তলিয়ে গেল।

ছোট নৌকা দু'খানা গুহার বাইরে সবই দেখেছিল। ডুবন্ত জাহাজের মাত্র দু-একজন যাত্রীই সাঁতরে তাদের দিকে আসতে পেরেছিল।

ছোট নৌকা দুটি আশেপাশের মাথা জাগান পাহাড়গুলির মধ্যে নাববার চেষ্টা করল। কোথায়ও নাববার উপযোগী জায়গা নেই। খাড়া পাহাড়ের গায়ে প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। তার কাছে নৌকা নিয়ে গেলে চুরমার হবে।

একমাত্র ভরসা ডিস-অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আইল্যাণ্ড। দশ মাইল দূরে জায়গাটা। নৌকা দু'খানা চলল সেই দ্বীপের পানে।

দ্বীপটি তার নামের মর্যাদা রাখল।

দ্বীপের পথে যেতে যেতে ঝড় উঠল। দৈত্যের মত বিরাট ঢেউ উঠে উঠে নৌকা দুটোকে টেনে নিয়ে গেল দূরে, ভিন্ন পথে। সারাদিন মাতাল ঢেউ-এর মাথায় নাচতে থাকে নৌকা দুটি। ঢেউ-এর জল ছিটকে আসে নৌকার খোলে। অহোরাত্র সবাই মিলে জল ছেঁচে নৌকা ভাসিয়ে [illegible]

সিঙ্গাপুরের চীনে ঠগ ধরার ম্যাজিক

সিঙ্গাপুরের ক্যাপিটল হোটেলে একজন অদ্ভুত চরিত্রের চীনে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম মিঃ ওয়ং। জুয়াখেলায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। নানা ধরণের বাজী ধরে তিনি অদ্ভুত উপায়ে জিতে যেতেন। তাঁর একটা বিশেষ ধরণের বাজী ধরার বাতিক ছিল। সে হচ্ছে ম্যাচ বাক্সের বাজী। দুটো খালি ম্যাচ বাক্স নিয়ে তিনি তার একটার মধ্যে ভরে দিতেন একটা মুদ্রা। এর পরে এই ম্যাচ বাক্স দু'টো নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিতেন যার ফলে ঠিক ঠিক কোন বাক্সে মুদ্রা রাখা আছে তা বোঝা সম্ভব হত না কারও পক্ষে। এমন কি তিনি নিজেও জানতেন না ঠিক কোন বাক্সে মুদ্রা আছে। এর পরে ধরা হত মোটা টাকার বাজী। কেউ মোটা টাকা বাজী রেখে বলতেন ডানদিককার বাক্সে মুদ্রা আছে কেউ বা বলতেন বাঁদিককার বাক্সে মুদ্রা আছে। তিনি যে দিককার বাক্সের উপরে বাজী রাখতেন তিনি সেই দিককার বাক্সটা তুলে ঝাঁকুনী দিতেন। খট খট শব্দ করে বাক্সের ভেতরকার মুদ্রা তাঁর অবস্থিতির কথা প্রচার করে ওয়ং সাহেবের বাজী জেতার কথা ঘোষণা করতো।

এইভাবে তিনি প্রচুর পয়সা করেছিলেন বাজী জিতে। অনেক পয়সা আরও করতে পারতেন কিন্তু তাঁর কাল হল আমাকে হারাতে গিয়ে। ব্যাপারের আদ্যোপান্ত শুনে আমি আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। বাজী ধরেছিলাম মোটা টাকা।

বাজী ধরা হতে ওয়ংসাহেব হাত বাড়াবার আগেই আমি আমার পছন্দ করা বাক্সটা হাতে তুলে সজোরে ঝাঁকুনি দিলাম—শব্দ হল খট্ খট্ খট্।

বাজীতে হেরে ওয়ং সাহেবের মুখ এইটুকু হয়ে গেল। বেজার মুখে তিনি গুণে গুণে বাজীর পয়সা এতগুলো লোকের সামনে আর কোন কথা হল না।

সন্ধ্যার পরে মিঃ ওয়ং আমার ঘরে এলো। তাকে খোলাখুলি বললাম, দেখ সাহেব, অনেক লোক তো ঠকালে। এবার তো সব গোমর

লেখকের এ সি সরকার

ফাঁক। ভালয় ভালয় এখান থেকে যদি না সরে পড় তবে পুলিশে ধরিয়ে দিতে বাধ্য হব।

পুলিশের কথায় ওয়ংসাহেব একটু যেন ভীত হলেন। আমাকে দলে টানবার অনেক চেষ্টা করলেন। অনেক লোভ দেখালেন, কিন্তু কোন ফল হল না। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ১২নং কামরা খালি—ওয়ংসাহেব চম্পট দিয়েছেন কারবার গুটিয়ে।

ওয়ংসাহেব একটা ম্যাজিকের কৌশল প্রয়োগ করেই এই জোচ্চুরির কারবার করছিলেন। একটা খালি দেশলাইর বাক্সের ভেতরে একটা মুদ্রা পুরে নিয়ে সেই বাক্সটাকে তিনি বেঁধে রাখতেন তাঁর বাঁ হাতের কব্জির একটু উপরে একটা রাবারের ব্যাণ্ড দিয়ে। গায়ে কোট থাকাতে এই বাক্স কেউ দেখতে পেতেন না। এখন খালি বা পছন্দ না কেন, ঝাঁকুনী দিলে কোটের আস্তিনে ঢাকা কায়দা করা ম্যাচ বাক্স খট খট শব্দ করতো আর মনে হত বুঝি হাতে ধরা বাক্সটা থেকেই আওয়াজ আসছে। সবাই ধরে নিতেন যে তাঁর হাতে ধরা বাক্সটাই মুদ্রাভরা বাক্স।

সিঙ্গাপুর থেকে কুয়েলালামপুর হয়ে গেলাম পেনাং শহরে। সেখানে এক রবিবারের সকালে হঠাৎ সাক্ষাৎ পেলাম ওয়ংসাহেবের। ওখানকার 'পি এণ্ড ও' হোটেলের লবিতে তিনি জমিয়ে বসেছেন তাঁর বাজীর আসর। ক্ষণকাল বিলম্ব না করে ফোনে ডাকলাম পুলিশের খোদ কর্তাকে। পুলিশ এসে হাতেনাতে ধরে ফেললো ওয়ংকে। তাঁর আস্তিনে ঢাকা বাঁ হাত থেকে বেরুলো মুদ্রাভর্তি একটা দেশলাই-এর বাক্স রাবারের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা অবস্থায়। লোক ঠকানোর দায়ে ওয়ংসাহেবের শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা হল।

তীরচিহ্ন দিয়ে দেখান হয়েছে বাঁ হাতের কব্জীতে কেমন করে পয়সা-ভরা দেশলাই আটকানো থাকে রবার ব্যাণ্ড দিয়ে

তোমরা এই কৌশলে একটা মজাদার যাদু কৌশল দেখাতে পার। চারটে একই রকমের খালি দেশলাই-এর বাক্স নিয়ে তার একটার মধ্যে একটা দু নয়া পয়সা ভরে দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াও আর দর্শকদের একজনকে এই চারটে বাক্সকে এলোমেলোভাবে মিশিয়ে দিতে বল। এরপরে বাক্স-

একটা বাক্স বাঁ হাত দিয়ে তুলে ঝাঁকনি দিয়ে দর্শকদের দেখাও যে তুমি ঠিক ঠিক পয়সা-ভর্তি বাক্সটাই তুলেছ। এমনি ধারা দু'-তিনবার করলে দর্শকেরা খুব অবাক হয়ে যাবেন। কায়দাটা নতুন করে বলার দরকার আছে কি? সেই যে ওস্তাদসাহেবের কায়দা—বাঁ হাতের কবজির কিছুটা উপরে একটা পয়সা-ভরা দেশলাই বাক্স ব্যাণ্ড দিয়ে কৌশলে আটকে রাখা আর কোটের আস্তিনে তা ঢেকে রাখা?

বিক্রমাদিত্য-বেতাল কথা-

বেতাল দমদমের এক তালগাছের তলায় বসে গাঁজায় দম দিয়ে বেতালা-বেসুরো-গলায় গান গায় হরদম। এরোড্রাম ফেরৎ বিক্রমাদিত্য তাকে দেখে খাদামী-রংয়ের দামী গাড়ী থেকে নামেন।

বেতাল থমকে চমকে একপলকে গাঁজার কলকে ছুঁড়ে ফেলে। বিক্রমাদিত্য এগিয়ে গেলে সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সংক্ষেপে দুই ক্ষেপে বলে, একি সম্রাট, হঠাৎ অসময়ে?

প্রতিক্ষেপেই তার ভয় গাঁজার গন্ধ ছড়ালে আক্ষেপ করতে হবে।

বিক্রমাদিত্য শিকারী বিড়ালের গোঁফ চেনেন। তাই বলেন, কি হে ভিজে বিড়াল আবার অপকর্ম করছিলে তো? বললাম যে ওটা ঘরে বসেই কোরো। বাড়ী যেতে বললাম, তা যাওনি দেখছি। আগের কাহিনীটা অর্ধেক শুনেছি। তাই ওটা বাতিল। এবার অন্য কিছু বলো। এটা শেষ হলে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' দ্বিতীয় খণ্ড পূর্ণ হবে। ভয় নেই, দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাবো না। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পঁচিশ নম্বর কাহিনীটা বলো হে বিড়াল-তপস্বী।

বেতাল খানিক ভেবে বলে, জনক গ্রামে এক প্রফেসর ডি-এস-সি ডিগ্রী-লোভী মিস রেবাকে বিয়ে করতে চাইলে সে একটা শর্ত জুড়ে দেয়,—তিন বছরের মধ্যে সে কিছুতেই মা হবে না। জনক 'তথাস্তু' বললে বিয়ে হয়। কিন্তু বছর না ঘুরতেই জনক জনক হওয়ার আশায় রেবার পাশে ঘুরতে থাকে। রেবা মুখ ঘুরিয়ে তাকে বিমুখ করে। জনক বংশরক্ষা করার যুক্তি তোলে, তাই রেবা শর্ত রক্ষা করতে বংশ তোলে। বংশ রক্ষার আশা ছেড়ে জনক পালিয়ে নিজেকে বংশ থেকে রক্ষা করে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার স্তব করতে থাকে।

ব্রহ্মা ব্যাপারটা বুঝে আনন্দে গায়ে র‍্যাপারটা চাপিয়ে ক্ষ্যাপার মত ছুটে ডিস্পেন্সারীতে গিয়ে কিছু মোক্ষম বড়ি নিয়ে পোঁটলায় বাঁধেন। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের যুগেও একজন তাঁকে ডেকেছে। তাই এখনই তাঁকে দ্রুতগামী বাহনে চড়ে মর্ত্যে

[illegible]

যেতে হবে। দেরী হলে পাজীলোকের কারসাজিতে সে ডিগবাজী খেতে পারে। নারদের ঢেঁকি আর বিষ্ণুর গরুড় পাখী দারুণ স্পীডি বাহন। নারদ বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কাছেই ঘুরঘুর করেন। সেখানে গেলেই জোড়া বাহনের দেখা মিলতে পারে। তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখেন যে বিষ্ণু ঢুলুঢুলু চোখে অপ্সরানৃত্য দেখতে মত্ত আর লক্ষ্মীদেবী সযত্নে তাঁর মাথায় কলপ লাগাচ্ছেন। ব্রহ্মার চুলে কলপ দেবার কেউ নেই, তাই তিনি হিংসায় ফেটে পড়ে গলা খ্যাঁকারি দিলেন।

চতুরা লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুকে চিমটি কাটলে তিনি উঠে আসেন। ব্রহ্মা চোখ পাকিয়ে বলেন, প্রচুর লীলাখেলা করেও সখ মেটেনি দেখছি। বয়সটা বাড়ছে না কমছে? আগে যা হোক লালন-পালন করতে। তখন লোকে চার মাস চাষ করে আট মাস নাক ডাকাতো। কুলীন তিনশো শ্বশুরবাড়ীতে একদিন করে থেকে তিনশো স্ত্রীকে ধন্য করতো। সতীদাহ-প্রথার মহিমায় স্ত্রীরা সোজা স্বর্গে যেতো। আঁতুড়ঘরে শিশুরা সহজে মুক্তি পেতো ভবযন্ত্রণা থেকে। পতিত বিধর্মী হয়ে টিকিবাজদের সুখী করতো। দেশবাসী বিদেশীকে রাজা বানিয়ে সসম্মানে থাকতো তার দাস হয়ে। এখন আর সে স্বর্ণযুগ নাই। এখন পবিত্র গোবর ও গঙ্গাজলের স্থান নিতে চলেছে ডেটল। কেউ একসাথে দুটো শ্বশুরবাড়ী বাগাতে গেলে সকলে থানায় শ্বশুরবাড়ী দেখিয়ে দেয়। স্বামীর চিতায় না উঠে অনেকে আবার বিয়ের পিঁড়িতে উঠার জন্য পীড়াপীড়ি করে। নার্সিং হোমের অত্যাচারে শিশুরা ভবযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হয়। হরিজনদের দাপটে টিকিধারীরা আজ শঙ্কিত। এখন জোয়ানরা শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।

একদমে বক্তৃতা দিয়ে ব্রহ্মা এবার দম নেন। বিষ্ণু দম ফেলে বাঁচেন।

মহারাজ বলুন, ব্রহ্মা পরে নরম হয়ে বিষ্ণুকে কি বলেন?

বিক্রমাদিত্য চুরুট ধরিয়ে বলেন, ব্রহ্মা তাঁকে বলেন, তুমি অনেক ভালো কাজও করেছ। শিক্ষাসমিতির মাতব্বর আর চিটারদের পকেট ভরাবার সোজা পথ বাতলে দিয়েছ। ধনীকে বাচ্চা কুবের করেছ। লায়েলাপ্পামার্কা ফিল্ম ও গান চালু করে বুড়োদেরকে করে দিয়েছ নব্য-ছোকরা। ট্রামে-বাসে ভিড় বাড়িয়ে স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান ঘুচিয়েছ। সকলের জিভে শান দিয়েছ, তাই সর্বত্র ভাষণ, প্রতিবাদ আর গুলের তুবড়ী ছোটে।

বেতাল হেসে বলে—স্বামীর প্রশংসা শুনে লক্ষ্মীদেবী হাসিমুখে এগিয়ে এলে বিষ্ণু তার দিকে চেয়ে সগর্বে হাসেন। ব্রহ্মা বলেন, তোমার বাহনে চড়ে এখনই মর্ত্যে যেতে চাই। গজকচ্ছপ আর সাপ খেয়ে সে কার্তিকের বাহনের সাথে আডডা মারছে। এখন ওটাকে দাও।

বিষ্ণু আমতা আমতা করে বলেন, হ্যাঁ মানে না না মানে ইয়ে—।

মহারাজ বলুন, বাহনকে মর্ত্যে পাঠাতে বিষ্ণুর এত আপত্তি কেন ?

এখন মর্ত্যের আকাশে রকেটগুলো প্রচণ্ডবেগে অবিশ্রান্ত ছুটছে। চন্দ্রেও আস্তানা গাড়ছে। ওদের কোনটার সাথে ধাক্কা লাগলে বাহন অক্কা পাবে। তাই বিষ্ণুর এত আপত্তি।

বেতাল বলে, ব্রহ্মা ব্যাপারটা বুঝে বলেন, নারদের ঢেঁকির তো প্রাণ নেই। ধাক্কা লাগলে কিছু কেরাসিন কাঠ নষ্ট হবে। নতুন ঢেঁকি বানাতে বিশ্বকর্মার আধঘণ্টার মামলা। ওই বুদ্ধির ঢেঁকি নারদকে বলো ঢেঁকিটা দিতে।

বিষ্ণু বলেন, নারদ স্বর্গে নেই।

ব্রহ্মা বলেন, তাই তো ভাবি স্বর্গে এখন এত শান্তি কেন ! সে বংগড়ানন্দ গেল কোথায় ?

মহারাজ বলুন, নারদ কোথায় ?

বিক্রমাদিত্য চুরটের ছাই ঝেড়ে বলেন, তাসখণ্ড চুক্তিপত্র খণ্ড খণ্ড করতে না পারায় সে ভিয়েৎনামে ছোটে লণ্ডভণ্ড করতে। সেখানে নতুন করে গণ্ডগোল বাধায় সে বৈকুণ্ঠে ফিরছে।

বেতাল বলে, কিছুক্ষণ পরে আকাশের দিকে চেয়ে বিষ্ণু বলেন, ওই তো নারদের ঢেঁকি দেখা যাচ্ছে।

খানিক পরে নারদ এসে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলে তিনি বলেন, আশীর্বাদ করি শতপুত্রের জনক হও।

বিষ্ণু রেগে বলেন, নারদের মতো বেকার মুনির একশো ছেলেকে খাওয়াবো কেমন করে। আমার তো কামধেনু নেই।

ব্রহ্মা বলেন, আমি ডেলিভারী মন্ত্রী। আমার কাজ সৃষ্টি করা। তুমি পালন করবে, অসুবিধা হলে ডেস্ট্রয়-মন্ত্রীর সাহায্য নেবে। মহাদেব তো প্রলয় ড্যান্স আর ভস্ম করতে ওস্তাদ। তা ছাড়া সেকেলে ত্রিশূল বা মডার্ন বম দিয়ে সে নিমেষে দুনিয়া লোপাট করতে পারে।

ব্রহ্মা নারদকে বলেন, জনক নামে এক প্রফেসর আমাকে ডেকেছে। তোমার বাহনে চড়ে এখনই মর্তে যাবো। নারদ মুচকি হেসে বলে, এরোড্রামে এসে যখন ঢেঁকিতে বসি তখন জনক আপনার নামে লেখা চিঠি আমাকে দেয়। মেয়েলি স্বভাবটা থেকে যাওয়ায় চিঠিটা খুলে পড়ি।

মহারাজ বলুন, জনক কি জানতে চেয়েছে ?

বিক্রমাদিত্য একটু ভেবে বলেন, এই নার্সিং হোমের যুগে ডেলিভারীর দারুণ খরচ। তা ছাড়া সার্জন ধরলে তো হাজার টাকার ধাক্কা। তাই সে দত্তকপুত্র নিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করেছে। নিজের শিশুর জন্য দুধ-টনিক চাই, দামী পোষাক ও খেলনা চাই। কিন্তু চার বছরের পরের ছেলেটার জন্যে গেঞ্জি আর কাঁকরমণি চালই যথেষ্ট। এখন চীনা জুতো থেকে শুরু করে চীনাবাদাম পর্যন্ত সব কিছুরই আকাশ-ছোঁয়া দাম। তার উপর ডিভালুয়েশন। এ ছাড়া হাজার রকম মিটিং, মিছিল, স্ট্রাইক আর বন্ধের হিড়িকে দম বন্ধ

সম্প্রতি ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর সটুটগার্টের উইল হেলমা চিড়িয়াখানায় ওরাং টাং-এর প্রথম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। চিত্রে ওরাং টাংটিকে দুধ খাওয়াতে দেখা যাচ্ছে

মরবার অবস্থা। এর সাথে দমদম দাওয়াই তো আছেই। বছর দুই পরে পৃথিবীটাই অক্কা পাবে ধূমকেতুর সাথে ধাক্কা লেগে। পরের ছেলে অক্কা পেলে ক্ষতি হবে না। এই সব ভেবেই সে দত্তকপত্র নিয়েছে। তাই ব্রহ্মাকে সংে বারণ করেছে।

চিঠি পড়ে ব্রহ্মা কি বললেন ?

বিক্রমাদিত্য হেসে বলেন, বলার সুযোগ পান নি। চিঠি পড়ামাত্র জ্ঞান হারিয়ে চিৎপাত হলে বিষ্ণু লোক জড়ো করার জন্য পাঞ্চজন্য শংখে ফুঁ দিতে ছোটেন। লক্ষ্মীদেবী স্বর্গের নারীদের মতো আনাড়ী নন। তিনি ব্রহ্মার নাড়ী দেখে বলেন, ভয় নেই। মন্দাকিনীর জলের ছিটে দিলেই বুড়োবাবা চোখ মেলবেন। তাই শুনে নারদ কমণ্ডলু হাতে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে মন্দাকিনী নদীর দিকে। বেতাল লজ্জিত হয়ে বলে, মহারাজ যেন সর্বজ্ঞ। আপনার সাথে পারার উপায় নেই। এবারও ঠকে গেলাম। এ নিয়ে পঁচিশ বার হলো। কাল একদফা লেগে বেতাল পঞ্চবিংশতির দ্বিতীয়পর্ব শেষ করে দেবো ভাবলাম, কিন্তু আজই শেষ হলো।

বিক্রমাদিত্য হেসে বলেন, কাল বিকালে এদিকেরই একটা সভার প্রেসিডেণ্ট হয়ে আমাকে আসতে হবে। ছটার আগেই ভাঙবে। তখন এখানে এসে তৃতীয় পর্বের প্রথম কাহিনী ভজকো। যাও গাড়ীতে ওঠো। তোমাকে এখন বাড়ী পৌঁছে দেবো। তোমাকে রেখে গেলে তুমি আবার তালগাছের তলায় বসে বেতালা বেসুরো গলায় গান গাইবে হরদম। আর তার সাথে চালু করবে অপকর্মটা।

বেতালের মনে পড়ে গেল ফেলে দেওয়া কল্কের কথা। তাই মাথা চুলকে বলে—আমি বরং—

বিক্রমাদিত্য মুচকি হেসে বলেন—তুমি বরং আমার গাড়ীতে উঠে বসো।

বেতাল শুকনো মুখে গাড়ীতে এসে বসে। গাড়ী ছেড়ে দেয়। অসহায় বেতাল করুণ চোখে চেয়ে থাকে ফেলে-আসা কল্কেটার দিকে।

দরদ

তোমরা কেউ তুকারামের নাম হয়তো অনেকেই শুনেছো। কিন্তু তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানো না, তাই না ? তুকারাম জন্মেছিলেন ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু তাঁর এই জন্মসাল সর্বজনসম্মত নয়। যাই হোক, তাঁর জন্মস্থান হচ্ছে পুণার যোল মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দেহু নামক স্থানে। তুকারাম ছিলেন খুব গরীব। সামান্য ব্যবসায় করে যা আয় হতো তাতে সংসার ভালভাবে চলতো না। কিন্তু নিজে গরীব হলে কি হবে পরের জন্যে তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম।

তুকারামের স্বভাবই ছিল পরের দুঃখে কেঁদে ফেলা। দুঃখগ্রস্তকে আপনার সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে তিনি কখনো কুণ্ঠা বোধ করতেন না। কেঁদে কেটে যে যা জিনিস ধার চাইত তুকারাম তাকেই তা দিয়ে দিতেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা তাঁর পরদুঃখকাতরতার সুযোগ নিয়ে টাকা আর শোধ করতো না। অনেকে ঋণ স্বীকারও করতো না। ফলে তুকারামের কোন ব্যবসায়ই বেশীদিন টিকতো না।

একবার মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ লাগলো। ঘরে ঘরে হাহাকার। তুকারামের কিন্তু সেদিকে কোন হুঁশ নেই। সারাদিন তিনি "রামকৃষ্ণ হরি" নামেই বিভোর। পত্নী জীজাবাই তাই দেখে গেলেন ভীষণ ক্ষেপে। বললেন, তোমার রাম নামে তো আর আমার পেট ভরবে না। সংসারের দিকে একটু মন দাও। দু'পয়সা যাতে আয় হয় সে চেষ্টা করো। তা না হলে না খেয়ে মরতে হবে যে।

পত্নী জীজাবাইর তিরস্কারে তুকারামের হুঁশ হলো। তিনি মন দিলেন ব্যবসায়ে। দৈবকৃপায় তিনি লাভও করলেন বেশ কিছু টাকা।

প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

বেশ খুশী মনেই টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন তিনি। জীজাবাইকে তুষ্ট করা যাবে। আর জীজাবাই শান্ত হলেই তাঁর জপতপ নির্বিঘ্নে হবে। তাই তিনি আনন্দে প্রায় ছুটতে ছুটতেই বাড়ী ফিরছিলেন।

হঠাৎ এক স্ত্রীলোকের কান্না শুনে থমকে দাঁড়ালেন তুকারাম। দেখলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু ষণ্ডামার্কা লোক দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। আর তার পিছে পিছে কাঁদতে কাঁদতে চলছে তার স্ত্রী।

এহেন করুণ দৃশ্য দেখে তুকারামের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। তিনি ছুটে গিয়ে লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করলেন, ওকে অমন করে তোমরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছো কেন ? লোকগুলো তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে গর্জে উঠলো। ব্যাটা পাজী নচ্ছার। তোকে আজ পিটিয়েই মেরে ফেলবো। কেন—কেন ? কি করেছে ও ? উত্তেজিত হলেন তুকারাম। লোকগুলো তাকে বললো, কি করেছে মানে—বেইমানি করেছে। বজ্জাত বুড়ো আমাদের কাছ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ধার নিয়েছে, অথচ শোধ করবার নাম নেই।

আহা। টাকার জন্য তোমরা ওকে মেরে ফেলতে চাও ? তোমাদের কাছে টাকাটা এতোই বড় ? বললেন তুকারাম। লোকগুলো তাঁকে বিদ্রূপ করে বললো, খুব যে দরদ দেখছি। অতোই যদি দরদ থাকে তবে দাও না দেখি টাকা ক'টি মিটিয়ে। বেশ তো, নাও না। বলে ব্যবসায় লব্ধ সব টাকা তুকারাম লোকগুলোর হাতে তুলে দিলেন। টাকা পেয়ে লোকগুলো বিস্ময়ে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তুকারামের দিকে। তুকারাম তখন নিজের হাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাঁধন খুলে দিয়ে চলে গেলেন বাড়ীর দিকে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে একবারটি তাঁর পায়ে কৃতজ্ঞতার প্রণামও করতে দিলেন না।

প্রতীক্ষিতা

—অঞ্জনকুমার নন্দী

মাসিক

পৌষ / ১৩৭৫

শূন্যতরী
—মুকুল ঘোষ

আদিবাসী মেয়ে
—পুলিনবিহারী চক্রবর্তী
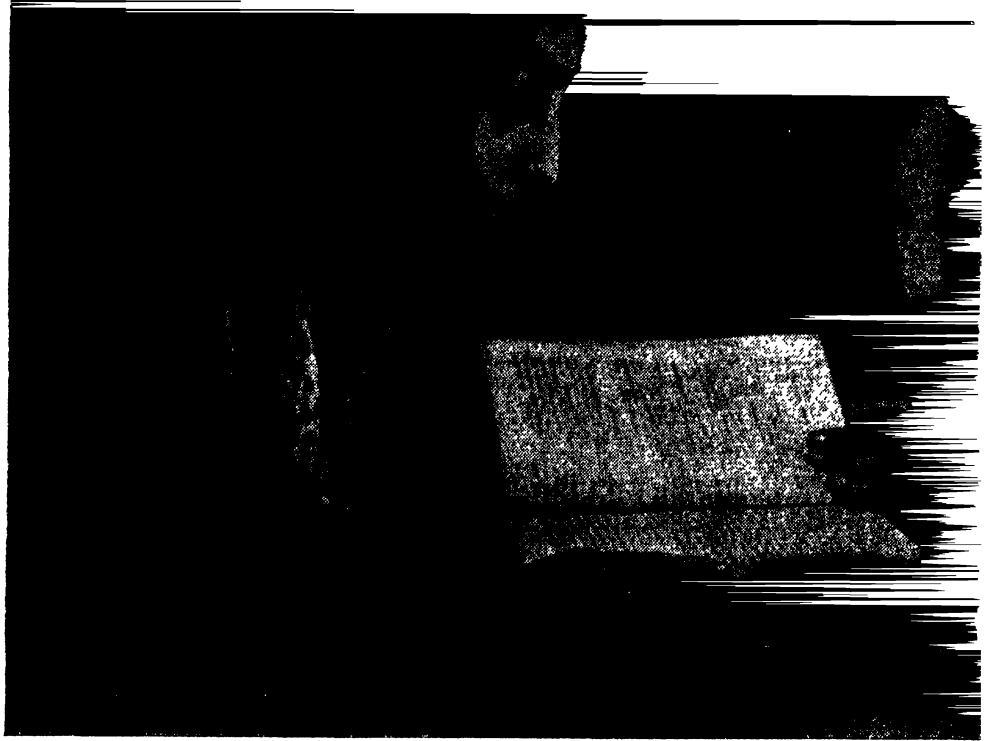
পরীক্ষা এসে গেছে

—সাগর রক্ষিত

হাতীর জলপান

—আশুতোষ সিংহ
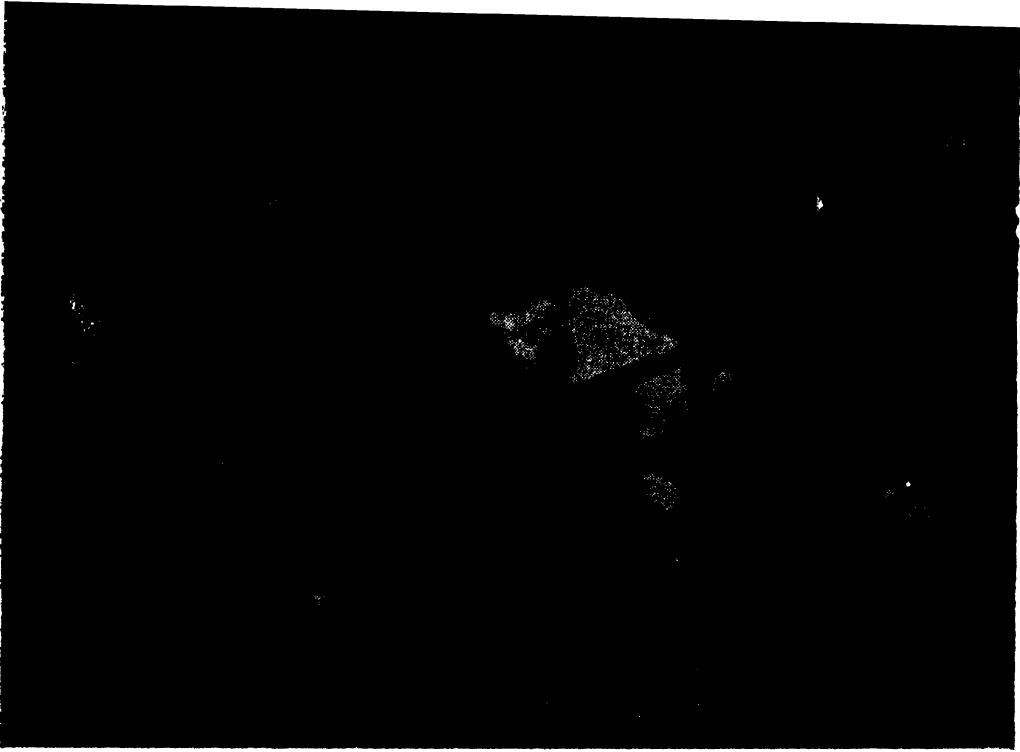
শূন্যশাখা

-লেখা লাহিড়ী

মাসিক বসুমতী, পৌষ / '৭৫

দূর থেকে তাজমহল

—শর্বরী ঘোষ
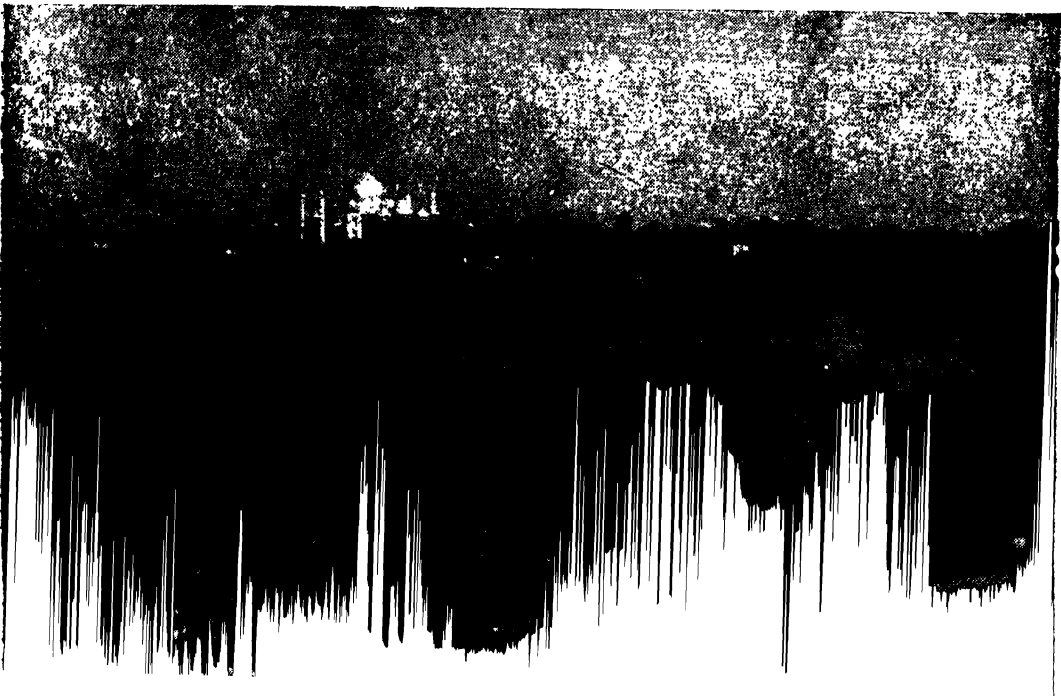
বাপ্‌পা ও টিয়াপাখি

বাপ্‌পাদের টিয়াপাখিটা সেদিন মারা গেল।

বাপপারা খব সকালে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল মামীর বাড়ি হালতুতে। সেখানেই ছিল সারা দিন। দুপুরবেলায় ছাদে উঠে দেখল আকাশে দারুণ মেঘ করেছে আর বাতাস কোথা থেকে ছেঁড়া কাগজ, শালপাতা এইসব এনে ছাদের মাঝখানটায় লাট্টর মত ঘোরাচ্ছে। সারা আকাশে কোথাও সূর্যিঠাকুরকে দেখতে পেল না। কিন্তু তাই বলে পুরো রাত্রি নয়। রাত্রি আর দিন মেশানো কেমন যেন রং। একবার রোদের মধ্যে বাবার কালো চশমাটা চোখে দিয়ে বাপ্‌পা মাঠের দিকে তাকিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কি রকম ছায়া ছায়া হয়ে গিয়েছিল সমস্ত মাঠটা। কি আশ্চর্য, আজ চোখে কালো চশমা পরে নি, তব সেই রকম রং।

বাপ্‌পার দিদির নাম ঝুমা। ছাদের ওপর হালতুর বন্ধুদের সঙ্গে ঝুমা চোর-চোর খেলছে। জলের ট্যাঙ্ক, চিলে-কোঠার ঘোরানো দেওয়াল—এইসব হচ্ছে ওদের লুকোবার জায়গা। বাপপা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখল। একবার ফিক করে হেসেও ফেলল। দিদির মত একটা মেয়ে ট্যাঙ্কের তলায় লুকোতে গিয়ে জামা ভিজিয়ে ফেলেছে। বাপপার এখন খেলতে ভাল লাগছে না। রেলিং-এর ধারে গিয়ে চুপটি করে দেখতে লাগল। রাস্তা দিয়ে লোকজন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। মেঘগুলিও আকাশে চোর-চোর খেলছে।

এমন সময় কড় কড় করে আওয়াজ দিয়ে আকাশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিরে গেল। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও গায়ে পড়ল। পিছনে তাকিয়ে দেখল ছাদে কেউ নেই। সুতরাং বাপ্‌পার এখন ভয় পাবার কথা। কিন্তু একটুও ভয় করছে না। মোটকথা, ও তখন ভাবছিল পৃথিবীতে কড়কড়ে রোদের বদলে যদি এই ছায়ার মত রঙটাই থাকত।

—কিরে বাপ্‌পা, তুই এখানে। আমি খুঁজে খুঁজে মরছি।

বাপ্‌পা তাকিয়ে দেখল পতুল মাসী।

—আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। বাপ্‌পা বলল।

—ঘুমুবি না?

—না!

—ভূতের গল্প বলব।

—আমি কিছুতেই যাব না।

—চকোলেট পাবি মা তা হলে ঝুমা ঘুমোচ্ছে। ওকে তিনটে চকোলেট দিয়েছি।

বিজনকুমার ঘোষ

চকোলেটের কথায় একটু যেন নরম হল বাপপা। তবু সন্দেহ যায় না। বলল, আগে দাও—

পুতুল মাসী আঁচল খুলে একটা রাংতা জড়ানো চকোলেট দিয়ে বলল, এখন একটা নে, ঘুমুলে আরো দুটো দেব

বাপ্‌পা গুটিগুটি মাসীর পিছনে পিছনে চলে এল। তারপর দিদিমার পাশে বিছানায় শুয়ে পড়তেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে এল। বৃষ্টি আর ঝড়। আর কি শব্দ। কটকট করে চকোলেট খেতে খেতে (ঝুমার মত এখনো চষে খেতে শেখে নি, তাই তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়) বাপ্‌পা ভাবল, ভাগিস ঠিক সময়ে নিচে চলে এসেছে।

ব্যস, তারপর আর কিছু মনে নেই। দিদিমা বারকয়েক পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই বৃষ্টির মতন ভীষণ জোরে ঘুম নেমে এল। দুপুর থেকে বিকেল, বিকেল থেকে রাত্রি নামল হালতুর বাড়িতে। আলো জলল। পাশের পুকুরে তিনশো ব্যাঙ একসঙ্গে গলা ফুলিয়ে ডাকতে লাগল। একবার একটখানির জন্যে ঘুম ভেঙেছিল বাপ্‌পার।

মা ডাকছে, বাপ্‌পা ওঠ ওঠ, যাবি না?

মাসী বলছে, এই নে বাপ্‌পা, তোর যে দুটো চকোলেট বাকী ছিল।

বাপ্‌পা চোখ বড় বড় করে জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে-ছিল। রাস্তার ওই আলোটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। আলোটার জন্যে

আলপনা

শিল্পী : [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত

যায়। খল বাপ্পাও ... আবার চলে পড়ল বিছানায়।
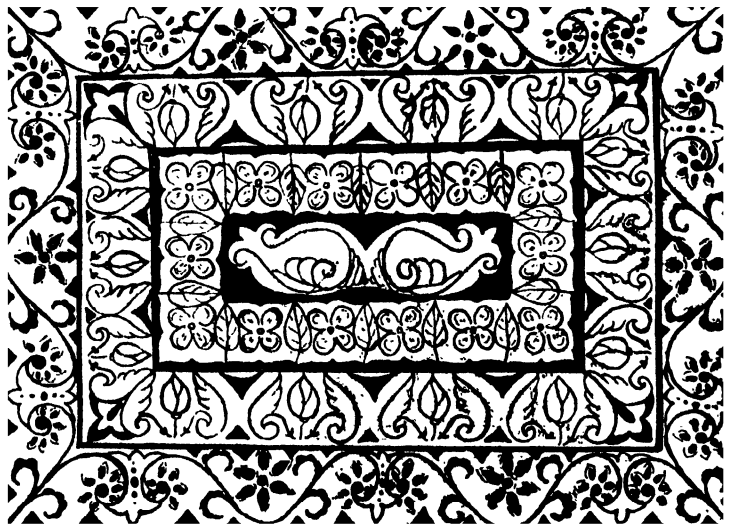
ভোর হল। হাওড়ার এদিকে বৃষ্টি হলে পথঘাটগুলি সমুদ্র হয়ে যায়। রাস্তাঘাট চেনা যায় না। সব জলময়। ট্যাক্সি-বাস বন্ধ। শুধু রিকশা চলে। বাড়ির সামনে, একটা রিকশা এসে দাঁড়িয়েছে। একটা রিকশায় বাবা আর বাপ্পা, আরেকটাতে মা আর ঝুমা। জল কাটতে কাটতে ঠিক নৌকোর মত ওরা বালিগঞ্জের বাসায় চলে এল।

জলে ধুয়ে ঘরে ঢুকতেই বাপ্পার হঠাৎ টিয়াপাখিটার কথা মনে হল। দৌড়ে গেল বারান্দায়। খাঁচাটা একধারে ঝোলান ছিল। তবে অদ্ভুত বলে মনে হল ব্যাপারটা। ঠ্যাং উঁচু করে উপুড় হয়ে টিয়াপাখিটা ঘুমিয়ে আছে। এই পোজ বাপ্পা কখনো দেখে নি। তাই চীৎকার করে উঠল ভয়ে।

সেই চিৎকার শুনে ছুটে এল মা, ঝুমা, গোপেনবাবু।

—আহা রে, টিয়াপাখিটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। মা বলল।

গোপেনবাবু বললেন, সারারাত ধরে বৃষ্টির ছাট খেয়েছে। একটাও দানা নেই। টিয়াপাখিটার কথাও ভাবা উচিত ছিল। ও-ও সংসারের একজন।

ঝুমা কাঁদতে লাগল, মা টিয়াপাখিটা মরে গেল—

বাপ্পা যদিও টিয়াপাখিকে ভালবাসত, কিন্তু বুঝতে পারল না। ও ভেবে কি করা উচিত। তাই বলল, বাবা টিয়াপাখিটা কথা বলছে না কেন?

—ও মরে গেছে। ঝুমা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল।

—মরা কি?

ঝুমা বাপ্পার চেয়ে দেড় বছরের বড়। তাই যে-কোন কথাবার্তায় ও এই পার্থক্যটাও বজায় রাখে। বলল, মরে গেলে একদম কথা বলতে পারে না। দেখিস নি, সতুর পিসিমা মরে গেল, আর একটা কথাও বলে নি বুড়ি, হরিনামের মালাও জপ করে নি। কাঁদিস না ভাই। ওর গালটা একটু টিপে দিল।

বাপ্পা বলল, ও খাঁচার শিক খাচ্ছে না কেন, ছোলা খাচ্ছে না কেন?

গোপেনবাবু বললেন, মরে গেলে কিছু খেতে পারে না। ওর আত্মা তখন দেহ ছেড়ে চলে যায় কি না।

—বাবা আত্মা কি?

কঠিন প্রশ্ন। গোপেনবাবুর কপালে ঘাম দেখা দিল। একটা মস্তবড় ইস্কুলের মাস্টার তিনি। চোখের পলকে শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে দেন। ছাত্ররা এক মুহূর্তে বুঝে ফেলে। কিন্তু ছোট ছেলেকে টিয়াপাখির আত্মা বোঝাতে হিমসিম খেয়ে উঠলেন।

—আত্মাকে ঠিক ... চোখে দেখা যায় না। এই দেহটা মধ্যে বাস করে। তাই দেহটা ছো খায়, বনে যাবার জন্যে শিক কামড়ায় এখন দেহটা ফেলে রেখে ওর আ উড়ে গেছে নীল আকাশে।

বাপ্পার চোখ বড় বড় হ উঠল বিস্ময়ে। বলল, নীল আক থেকে আর আমাদের বাড়িতে আস না বাবা?

—না। কাল তুমি যেমন মাসী বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলে, তখন য যতু তোমাকে ডাকতে আসত তাহ খুঁজে পেত কি? তেমনি পাখিটা খাঁচার বাসা ছেড়ে নীল আকাশে বাসায় বেড়াতে গেছে। আর ও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না বুঝলে বাপ্পা?—গোপেনবাবু হাসত লাগলেন আত্মপ্রসাদে। যেন বাপ্পাকে ঠিক মতন বোঝাতে পেরেছে ব্যাপারটা।

কিন্তু বাপ্পা কি সত্যি বুঝল ও তখন খাঁচা-মরার বহু ঊর্ধ্বে উ অসীম মমতায় তাকিয়েছিল সবু টিয়াপাখিটার দিকে। আপেলের ম লাল টুকটুকে ঠোঁট, গলায় ফুলের মালা মত নীল দাগ নিয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন একটু পরেই ঘুম ভেঙে যা আর তখন মিষ্টি গলায় রোজকার ম ডেকে উঠবে, কৃষ্ণ কথা কও—

যীশু

জয়ন্তকুমার মিত্র

আস্তাবলে ঘাসের ডাবায়
জন্মেছে এক শিশু।
তিনি হলেন বড়ো হ'য়ে
মহামানব যীশু।

যীশুখৃস্ট করেন প্রচার
বাণী ভালোবাসার।
তাঁর কথাতে ছুটে এলো
মানুষ হাজার হাজার।

ইহুদীরা ক্রুশে বিদ্ধ
করলে তাঁকে শেষে।
ক্ষমা করে মহত্ত্ব যে
শিখিয়ে গেলেন হেসে।

বিশ্ববাসী নোয়ায় মাথা
আজকে তাঁকে স্মরে।
বড়দিনের খুশির ঢেউ
ওঠে ভবন জুড়ে।

॥ সতেরো ॥

কবিরাজেরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় যত ধরণের ওষুধ ব্যবহার করেন, তার মধ্যে প্রধান হল বটিকা বা বড়ি। ছোট বড় মাঝারি গোল গোল হাতে পাকানো গুলি রোদে শুকিয়ে খটখটে করে শিশি ভরে, কাগজে মুড়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির আদিম কাল হতেই এ-ব্যবস্থা চালু আছে মনে করায় কোন বাধা নেই, কারণ বড়ি পাকাতে ওষুধগুলি জলে ভিজিয়ে শিলে বেটে নিলেই হল, তারপর হাতের কাজ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর তর্জনীর মোলায়েম ঘর্ষণের মধ্যে পড়ে বটিকা বা বড়ি তার সুডৌল অণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হয়। পরশুরামের 'চিকিৎসা-সঙ্কটে' তারিণী কবিরাজের যে-সব জ্যান্ত বড়িকে লাফাতে বারণ করা হয়েছে—সে-সব বড়িই এভাবে চিরকাল তৈরী হয়েছে। তারা কবিরাজের ছাত্রদের হাতে লাফিয়েছে (কারণ ছাত্রেরাই তো বড়ি তৈরী করতো), রোদে পুড়ে ডালা-কুলোর উপর গড়িয়েছে, শিশিতে উঠে লাফিয়েছে, খলের মধ্যে পড়ে মধুর সঙ্গে পিষ্ট হতে গিয়ে লাফিয়েছে। যারা লাফাতে পারেনি—যেমন চ্যবন-প্রাশের কিম্বা মদনানন্দ মোদকের ছোট ছোট তাল, তারাও গোল পাকিয়ে গেছে। আমরা জীবনে-মরণে বড়ির শরণ নিয়েছি কিন্তু তাই বলে বড়ি তৈরী নিয়ে বাড়াবাড়ি করিনি। এমন কি তারিণী কবিরাজকেও দেখি—ঠ্যাং গজাবার জন্য দিলেন ঠুসে একতাল চ্যবনপ্রাশ, তবু কোনও বৃহৎ অট্টালিকাচূর্ণ বটিকার নাম তাঁর মনে পড়ল না।

ভারতবর্ষে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওষুধের বড়ি তৈরী করবার কথা প্রথম ভাবলেন কার্তিকচন্দ্র। বিলাতি এলোপ্যাথি ওষুধের বড়িগুলি হাতে নিলেই বোঝা যায়, সবগুলি বড়ি সমান আকারের, সমান ওজনের।

সঞ্জয়

কোন কোন বড়ির গায়ের উপরে নাম লেখা, কোন বড়ির মাঝে আধাআধি ভাঙবার জন্য স্ক্রুর মাথায় আড়াআড়ি গভীর দাগের মত দাগ কাটা।

মোটকথা বিলাতি ওষুধের বড়ি দেখলেই বোঝা যায়, তা আঙুলে পাকিয়ে তৈরী করা নয়। কোনও যন্ত্রে তৈরী করা। দেশীয় ওষুধের বড়িও অমন সমান আকারের এবং সমান ওজনের করতে হবে। তার জন্য বড়ি তৈরীর যন্ত্র আনাতে হবে, চিন্তা করলেন ডাঃ বোস।

নানা রকম ক্যাটালগ পড়া বাতিক ছিল কার্তিকের ছোটবেলা থেকেই। তাঁর বেশ মনে পড়ে—একবার মেডিক্যাল কলেজে দু-একটি যন্ত্রপাতি কিনবার কথা ক্লাসের মধ্যে আলোচনা হয়। স্বভাবতই ঐ আলোচনায় ছাত্রদের চাই-চাই বলবার ভূমিকাটাই মুখ্য হয়ে থাকে। কিন্তু 'কোথায় পাই' সে আলোচনায় ছাত্রেরা অংশগ্রহণ করতে চায় না। সে সবই যেন কলেজের কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথা।

কিন্তু আশ্চর্য ছেলে কার্তিক। যন্ত্রের নাম শুনে সে তার আনুমানিক দাম, এদেশে কোথায় পাওয়া যায়, বিদেশ থেকে আনাতে হলেই বা কাকে জানাতে হয়—স্বয়ং প্রিন্সিপ্যালের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে গেল, যেন পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করে এসেছিল। প্রশ্ন করামাত্র মন উজাড় করে উত্তর ঢেলে দিলে। বলা বাহুল্য, প্রিন্সিপ্যাল একটি ছাত্রের মুখে এসব কথা শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন।

ডাঃ বোস নানা কোম্পানীর সচিত্র ক্যাটালগ পড়ে-পড়েই অনেক যন্ত্রপাতির বিবরণ জানতেন। পরে এই ক্যাটালগ-পড়া বিদ্যাতেই তিনি জার্মানির ট্যাবলেট তৈরীর মেশিন বিষয় জানতে পারেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের পক্ষে একটি ট্যাবলেট তৈরীর যন্ত্রের অর্ডার পাঠান।

যন্ত্রটি যখন এসে পৌঁছুল ততদিনে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ত্যাগ করে আসবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে তাঁকে ঐ ট্যাবলেট তৈরীর যন্ত্রটি দিয়ে দেওয়া হয়—অবশ্য পুরা দামেই।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
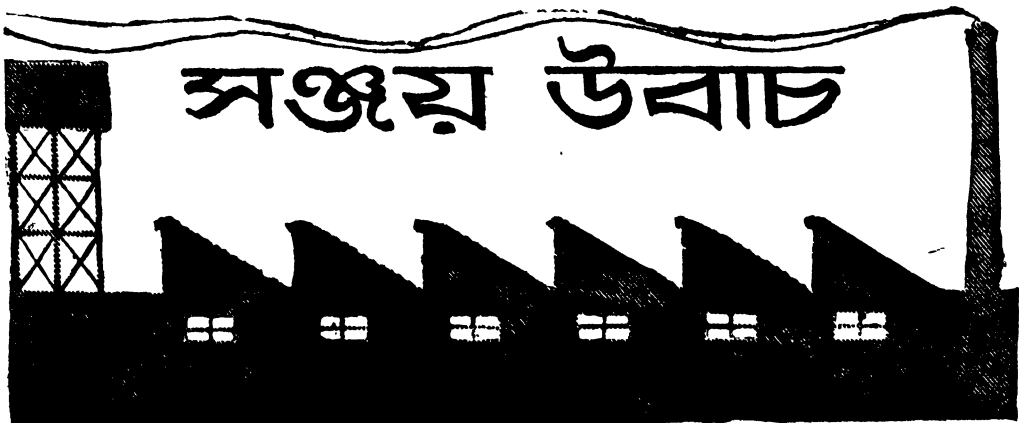
ডাঃ বোস যন্ত্রটি বাড়ি নিয়ে এসে প্রথমে ঐ দিয়ে ওষুধের বড়ি তৈরী করবার ব্যবস্থা করেন। ভারতের বাজারে সেই প্রথম যন্ত্রে তৈরী ভারতীয় ওষুধের বড়ি বেরুল। ওষুধ প্রস্তুতকারকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

তখন অন্য অন্য দু-একটি কোম্পানী ডাঃ বোসের নিজস্ব নবগঠিত ফার্ম এই ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরি লিমিটেড হতেই তাদের ওষুধ পাঠিয়ে বড়ি তৈরী করে নিতে লাগল। চাহিদা হয়েছে বুঝে তখন ডাঃ বোস তাঁর যন্ত্রটির অনুকরণে আরও ট্যাবলেট তৈরীর যন্ত্র তৈরী করতে লাগলেন—গড়ে উঠল বেলেঘাটা এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, বোসেস ল্যাবরেটরির বেলেঘাটা কারখানার একাংশ জুড়ে সুন্দর একটি যন্ত্রপাতির কারখানা।

ডাঃ বোসের তৈরী ট্যাবলেট তৈরীর যন্ত্র দেখতে দেখতে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। ছোট বড় সকল ওষুধ তৈরীর কারখানায় তখন ঐ যন্ত্রটি ব্যবহৃত হত। বেলেঘাটা এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ থেকে রাসায়নিক কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী ছোটবড় আরও নানা রকম যন্ত্রপাতি তৈরী হত। একসময়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়মে দেশী যন্ত্রপাতির একটি স্থায়ী প্রদর্শনী ছিল—সেখানে ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরি লিমিটেডের তৈরী ঐ যন্ত্রপাতিগুলিও সগৌরবে স্থান পেয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ডাঃ বোসের ৪৫নং আমহার্স্ট ট্রীটের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরি লিমিটেডের ট্যাবলেট ডিপার্টমেন্ট হতেই একসময়ে লক্ষ লক্ষ ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট তৈরী হয়ে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারত ভ্রমণের সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল। দিনরাত খেটে সে কাজ উদ্ধার করেছিলেন ডাঃ বোস, তাঁর প্রিন্সিপাল ডাঃ বমফোর্ডের ঐকান্তিক অনুরোধে। সে কথা পূর্বেই বলেছি।

॥ আট ॥

রাজশেখর বসু বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেওয়ার পর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁকে ম্যানেজারের পদে উন্নীত করা হয়। তিনি ছিলেন কেমিস্ট্রীতে এম-এ পাশ, তাও আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান নিয়ে। অধিকন্তু তিনি আইনও পাশ করেছিলেন, কিন্তু আদালতের আবহাওয়া তাঁর সহ্য হয়নি, তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে এসে যেন নিজের উপযুক্ত স্থানটি খুঁজে পেয়েছিলেন।

নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র ছিলেন বলে স্বভাবতই রাজশেখরের উপর ডাঃ বোসের আন্তরিক স্নেহ জন্মেছিল। তার উপর তিনি ছিলেন রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখরের গৃহ-চিকিৎসক। তাই রাজশেখরকে তিনি ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। ফলে রাজশেখরের উপর তাঁর নির্ভরতা সহজেই জন্মেছিল। রাজশেখরও নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং চরিত্র-গুণে কেবল ডাঃ বোস নন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও মন জয় করেছিলেন।

কিন্তু রাজশেখরকে অল্পদিনেই ম্যানেজার পদে উন্নীত করায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে ডাঃ বোসের উপর অপর একজন কূটনীতিবিশারদ কেমিস্টের জাতক্রোধ উপস্থিত হল। তিনি নিজেকে ডাঃ বোসের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন নি, কারণ ডাঃ বোস ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কৃতিত্বের অধিকারী। ডাক্তারীতে তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জন মাসিক কয়েক সহস্র মুদ্রা। তাঁর বড় ভাই-এর ছেলে,—পরে ঔপন্যাসিক হিসাবে যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন সেই মণীন্দ্রলাল তখন বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়েন। ডাঃ বোসের বড় ছেলে পঞ্চানন তখন কলকাতা থেকে এম-বি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে জার্মানিতে এম-ডি পড়তে গিয়েছেন। এই দুই ছেলের বিলাতে পড়বার খরচ বাদে বাড়িতেও বৃহৎ সংসার। বাড়ি গাড়ি চাকর দরোয়ান—সব মিলে একটা বৃহৎ ব্যাপার। সুতরাং তেমন ব্যক্তির সঙ্গে সোজাসুজি প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ওঠেই না।

অধিকন্তু পদাধিকারবলে তিনি তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সর্বময় কর্তা। একমাত্র ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়—যিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ, তিনি ব্যতীত ডাঃ বোসের উপর কথা বলবার আর কেউ নেই। কিন্তু তিনিও ডাঃ বোসকে ছোট ভাইয়ের মত ভালোবাসেন, তাঁর সুপরিচালনায় কোম্পানীর সর্ববিষয়ে উন্নতি হচ্ছে দেখে ডক্টর রায় পরম আশ্বস্ত ও নির্ভরশীল। সুতরাং তিনিও ডাঃ বোসের ব্যবস্থাপনার উপর কথা বলতে আসেন না। তা ছাড়া তিনি তখনও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সরকারী চাকুরে। তাঁর পক্ষে তাই ইচ্ছা হলেও কোম্পানী পরিচালনায় কোন পদে আসীন থাকা সম্ভব নয়। সে প্রশ্নও তাই অবান্তর। তবু কূটবুদ্ধি কেমিস্টটি ভাবতে থাকেন—কি উপায়ে এই ব্যবস্থার কিছু ওলোট-পালোট ঘটানো যায়, যাতে তাঁর নিজের অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

কেমিস্ট হিসাবে তিনি ডক্টর রায়ের প্রীতিভাজন ছিলেন, নিজের কাজেও তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তাঁর হাতে বেঙ্গল কেমিক্যালের দু'একটি নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছিল। সেদিক দিয়ে তিনি যদি নিজেকে রাজশেখরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে থাকেন তবে তাঁকে খুব বেশী দোষী করা যায় না।

কিন্তু রাজশেখরের সর্বাত্মক অখণ্ড মনোযোগিতায় এবং মনস্বিতায় সমগ্র প্রতিষ্ঠান যে রূপ পেয়েছে বস্তুত তার কোন তুলনাই হয় না। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিটি ব্যাপারেই রাজশেখরের মৌলিক চিন্তার ছাপ পরিস্ফুট। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে বাংলায় হিসাব রাখবার ব্যবস্থা পর্যন্ত অনুমোদন করেছিলেন। বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারে

সংস্কৃত বা বাংলা নামকরণ, লেবেলের নক্সা, এমন কি বিজ্ঞাপনের কথা এবং রূপচিত্রণে রাজশেখরের প্রতিভার ছাপ পরিস্ফুট। তাই দেখি বেঙ্গল কেমিক্যালের টুথ পেস্ট-এর নাম রদ কন, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপন যতীন্দ্রকুমার সেন এর লীলায়িত রেখা ও রং-এর চিত্রসহ অপূর্ব ভাষাসম্পদের সমাবেশ অতুলনীয় বিজ্ঞাপন এমন কি মাণিকতলার কারখানায় গেটের উপর সর্বভুক গরুড় মূর্তির পরিকল্পনাটিও রাজশেখরের। সত্য বলতে কি বেঙ্গল কেমিক্যাল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু তাঁর শৈশব অবস্থার সঙ্কটকালে লালন করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরে প্রতিটি কাজে প্রতিটি পদক্ষেপে রাজশেখর তাঁকে পালন ও পরিপুষ্ট করেছিলেন। এমন কি যখন তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল পরিচালনা-ব্যবস্থার উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয় সেদিনও তিনি দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিশ্রাম করছিলেন। সেদিনও তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালক সভার অধিবেশনে যোগ দিতে যাবেন বলে তাঁকে আনতে গাড়ি তাঁর বাড়িতে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু হায়! তার আগেই পরপারের গাড়ি এসে পৌঁচছিল এবং তিনি মহাপ্রয়াণ করেছিলেন। আমরণ সেবা করেছিলেন তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের। এমন যে রাজশেখর, তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করবে কে?

সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্য পথ দেখতে হয়। কেমিস্টটি ডক্টর রায়কে খুশী করবার জন্য আরও কাজ দেখাতে লাগলেন। ক্রমে তিনি আরও ঘনিষ্ঠ হলেন ডক্টর রায়ের, তাঁকে বেঙ্গল কেমিক্যালের বাইরে জনসেবামূলক অন্যান্য কাজেও সহায়তা করে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের আর্থিক বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় করবার জন্য তিনি আরও বেশি পরিমাণে শেয়ার বিক্রি করবার পরামর্শ দিতে লাগলেন ডক্টর রায়কে। এমন কি শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করতে চাইলেন।

ডক্টর রায় বললেন—এসব ব্যাপারে কার্তিককে বলো, সেই তো ম্যানেজিং ডিরেক্টার। তার বক্তব্যও শোনো।

মূলধন বাড়বে এ কথায় বাধা দেবেন কেন ডাঃ বোস, তবে কেবল বাঙ্গালীর কাছে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে, প্রফুল্লচন্দ্রের এই পূর্ব-নির্দেশ তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং যাকেই শেয়ার বিক্রয় করা হোক না কেন, এই সর্তে দিতে হবে, তিনি বাঙ্গালী ব্যতীত অপর কাউকে শেয়ার হস্তান্তর করতে পারবেন না।

কলকাতার সর্বজনমান্য দুইজন সেরা আইন-ব্যবসায়ীর কাছে মোটা মোটা অঙ্কের শেয়ার দু'-চারদিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল। ডাঃ বোস তখনও এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্রের আভাস পান নি। তিনি ছিলেন সোজা পথের, কাজের মানুষ। অফিসের পলিটিক্স্ তিনি বঝতেন না, কেউ সে কথা কানে তুললেও ঘৃণাভরে উড়িয়ে দিতেন। কাজ, কাজ আর কাজ। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন তিনি। ঘৃণা, রাজনীতি, কূটনীতি, কুৎসিত পরশ্রীকাতরতা তাঁর মনে স্থান পেত না।

মোটা টাকার অংশীদার হয়ে দুইজন বিশিষ্ট আইনবিদ বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালক সভার অন্তর্ভুক্ত হলেন। এতদিনে কূটনীতির খেলা চরম মুহূর্তের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ পেল। ডক্টর রায়ের অগোচরে ঘটনা-প্রবাহ কোন্ দিকে চলেছিল তা তিনি প্রথমে লক্ষ্যই করেন নি। তিনি ছিলেন উদার-হৃদয় বৈজ্ঞানিক, কূটনীতির চক্রান্ত তাঁরও মনে আসত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর হাত দিয়েই অন্য লোকে পাশার ঘুঁটি চালাতে লাগল। বুদ্ধিমান কার্তিকচন্দ্র এবার বুঝলেন, তাঁকে হয় একজন বেতনভুক কর্মচারী হয়ে অন্য কর্মীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এখানে টিকতে হবে, না হলে বিদায় নিতে হবে।

স্বাধীনচেতা কার্তিক চাকুরীর দাসত্ব গ্রহণ করতে যাবেন কোন দুঃখে? তা ছাড়া তিনি কর্মী মানুষ, কাজ ভালোবাসেন। নোংরা কলহে সময় কাটানো কল্পনাও করতে পারেন না। তিনি জানতেন যে, বেঙ্গল কেমিক্যাল তিনি নিজের অর্থব্যয়ে, কায়িক শ্রমে, মূল্যবান সময় নিয়োগে—এককথায় বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছেন—তা কোনও জঘন্য চক্রান্তের শিকার হয়ে ছেড়ে যেতে তাঁর কষ্ট হবে। কিন্তু এতটুকু আত্মবিশ্বাসও তাঁর তখন জন্মেছে যাতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটা বেঙ্গল কেমিক্যাল ছেড়ে গেলে আর একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলতে পারবেন। সেটাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন এবং ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং-এ যখন তিনি গেলেন, সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়েই গেলেন।

ডাঃ বোসের নিজের মুখেই সেদিনের ঘটনা শুনেছি পরে।

যথাদিনে ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং বসল। এবার বোর্ডে সেই দুইজন বিশিষ্ট আইনবিদও উপস্থিত। ডক্টর রায় সভাপতিত্ব করলেন এবং তার মুখ দিয়েই কথাটা উত্থাপিত হল।

ডক্টর রায় বললেন—ডাঃ বোস আমাদের কোম্পানীর প্রথম থেকেই আছেন, তাঁর হাতেই কোম্পানী সামান্য মূলধন হতে আজকের বিরাট যৌথ কারবারে পরিণত হয়েছে। তিনিই মাণিকতলার কারখানা গড়েছেন, বিক্রয় বাড়িয়েছেন। তাঁকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাখায় কোম্পানী বিশেষ লাভবান হয়েছে।

কিন্তু যেহেতু কোনও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীকে তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় চালাবার সঙ্গে আবার এই ওষুধ তৈরীর কাজে রাখা বে-আইনী, পরন্তু একসঙ্গে এই দুটি দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করাও অসম্ভব, তাই আমরা প্রস্তাব করি ডাঃ বোস তাঁর প্র্যাকটিস ত্যাগ

করে পুরোপুরি বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

আইনবিদেরা এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ডাঃ বোস বললেন—আমি যদি বেঙ্গল কেমিক্যালের কোন সেবা করে থাকি তবে তা আমার মেডিক্যাল প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়েই করেছি এবং মেডিক্যাল প্র্যাকটিস বজায় রেখেই করেছি।

আপনারা বেঙ্গল কেমিক্যালের আর্থিক অবস্থা সম্যক অবগত আছেন। সহসা তার এমন কিছু উপার্জন বৃদ্ধি হয় নি যাতে কোম্পানী একজন ভালো মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনারের উপার্জনের সমান বা তার আংশিক টাকা বেতন হিসাবে দিতে পারে। আমার বড় সংসার প্রতিপালন করতে হয়, দুজন ছাত্রকে বিলাতে পড়বার খরচ পাঠাতে হয়। এই ন্যূনতম খরচ যোগাবার অবস্থা এই কোম্পানীর এখনও হয় নি। তবু বোর্ড যদি বিশেষভাবে কেবল আমার জন্য তেমন বেতন দেওয়ার অনুমোদনও করেন, আমি তা নিতে পারি না, কারণ অন্যান্য কর্মচারীদেরও তা হলে সেই অনুপাতে বেতন বৃদ্ধি করা উচিত। আর্থিক সামর্থ্য নেই বলে আমি কোম্পানীর ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত রাজশেখর বসু মহাশয়কেও তাঁর গুণের উপযুক্ত পারিশ্রমিক এখনও দিতে পারি নি। আমাদের ব্যক্তিগত অনুরোধে পরন্তু একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মহৎ প্রেরণাতেই তিনি আমাদের সাধ্যমত দেওয়া বেতন গ্রহণ করছেন। কোম্পানীর উপার্জন বৃদ্ধি হলে তাঁর এবং অন্যান্য কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দিলে বরং আমি আরও খুশী হব।

আমার পক্ষে প্র্যাকটিশ ত্যাগ করা সম্ভব নয় বলে আমি এখান হতে পদত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করছি এবং পদত্যাগপত্র আমি লিখেই এনেছি।—এই বলে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্রখানি সভাপতি ডক্টর রায়ের হাতে দিলেন।

সভার মধ্যে যেন একটি বজ্রপাত হল। কেউ এজন্য প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হল না। কেউ কেউ আপত্তিও জানালেন।

ডাঃ বোস বললেন—শুধু পদত্যাগ-পত্র নয়, বেঙ্গল কেমিক্যালের শেয়ার-গুলিও আমি নিয়ে এসেছি—এগুলি আপনাদের মধ্যে যে কেউ নিয়ে নেবেন। আমি কোম্পানীর অংশীদারও থাকতে চাইনে।

সভায় আবার গুঞ্জন উঠল।

এবার ডাঃ বোস বের করলেন—বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলার কারখানা যে জমিতে তৈরী হয়েছিল, সেই জমির দলিলখানি। তারপর বললেন—কোম্পানীর কারখানা যখন তৈরী করি তখন জমি কিনবার মত টাকা কোম্পানীর ছিল না। ওখানে পরিত্যক্ত প্লেগ হাসপাতালের জমি আমার নিজের টাকায় কিনে রেখে-ছিলাম। ইচ্ছা করলে চিরদিন আমি বেঙ্গল কেমিক্যালকে আমার প্রজা হিসাবে রাখতে পারি। কিন্তু দেশের গৌরব এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সে অগৌরবের মধ্যেও রাখতে চাইনে। যে দামে জমি কিনেছিলাম সেই দামেই জমিটা কোম্পানি কিনে নিক্—এ দলিলও তাই আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি।

কোম্পানীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সভা হতে বেরিয়ে আসবার পর-মুহূর্তে ডাঃ বোস বললেন—বেঙ্গল কেমিক্যাল আরও বড় হোক এই কামনা নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি। তবে একথাও জানিয়ে যাচ্ছি, বেঁচে থাকলে আর একটা বেঙ্গল কেমিক্যাল আমি গড়ে দেখিয়ে দেব, স্বাধীন প্র্যাকটিশ বজায় রেখেও সে কাজ করবার ক্ষমতা কার্তিক বোসের আছে।

মাথা উঁচু করে চলে এলেন ডাঃ বোস, কোম্পানীর বেতনভুক দাসত্ব স্বীকার করলেন না কিছুতেই। বরং সব স্বার্থ অবহেলায় ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন আরও মহীয়ানরূপে।

[ক্রমশ।

গৃহিণীর খরচ কত?

বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর সাধারণ মানুষের মাসে রোজগার প্রায় ২,০০০ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু হলে কি হবে, এক গৃহিণীর খাঁই মেটাতেই তার প্রাণ খাঁচাছাড়া। সযত্নে হিসেব করে দেখা গেছে যে চারজনের পরিবারে একজন গৃহিণীকে যে কাজ করতে হয় তার পারিশ্রমিক প্রায় কর্তার আয়ের সমান বেচারীকে কত কাজ করতে হয়। ঘরের আয়ব্যয় সামলানো, ছেলেপুলে দেখা, বাজার করা এসব তো আছেই, তার ওপর নিজের লেখাপড়া, রাজনীতি, সমাজসেবা, সাজগোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এসবেও সে আজকাল জড়িয়ে পড়েছে। এই সবের জন্যে যদি আবার গৃহিণীকে পারিশ্রমিক দিতে হয়, তা হলে কর্তার বিবাগী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জন্মান্তরের সূত্র সন্ধানে

॥ বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ॥

॥ সাত ॥

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার জন্মান্তর ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা হতে পারে কী?

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্ব-জীবনের অভিজ্ঞতা বলতে পারার ঘটনা পুনর্জন্ম না হয়ে অন্য আলাদা ব্যাখ্যা হতে পারে। সেগুলি নীচে উদাহরণসহ বিবৃত করা হল—

বিভ্রান্তি (Fraud)

কোন কোন ঘটনা পরের কাহিনীটির মত বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

আগ্রার কাছে খৈর.নগর গ্রামে স্কুলের ছেলে শিশুপাল দাবী জানাল যে সে পূর্ব-জীবনে মহাত্মা গান্ধী রূপে জন্ম নিয়েছিল। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে সে অনেকগুলি চিঠি লেখে। জানায় যে সে এক অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক জীবন যাপন করছে।

অসুস্থ অবস্থায় শিশুপাল প্রথম এই পুনর্জন্মের কাহিনী প্রচার করে থাকে। তার অশিক্ষিত অভিভাবকেরা একথা বিশ্বাস করে এবং তা থেকে গ্রামের অন্য অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত লোকেরাও কথাটা সত্য ভাবে। ক্রমশ জনশ্রুতিতে বিষয়টা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাটি অনুসন্ধান করে দেখা হয়। কোনটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। দেখা গেল ছেলেটি মহাত্মা গান্ধীর হত্যার আগে জন্মগ্রহণ করেছে। আসলে সে স্কুলের লাইব্রেরী থেকে একটি গান্ধী-জীবনীর বই সংগ্রহ করে গোপনে পড়াশোনা করে গল্পটি ছড়ায়।

আত্মার অধীনে (Spirit Possession)

পূর্ব-জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনে এটিও একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে।

কোন মৃতব্যক্তির আত্মা অস্থায়ি-ভাবে কোন জীবিত ব্যক্তির চিন্তা-ধারণা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পারে। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

লোবন কাকিন নামে তুরস্কের এক অল্পবয়স্ক ভদ্রমহিলা সন্ধ্যায় তাঁর শয়নঘরে ঢুকলেই দিব্য অনুভূতিতে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেতেন: একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেখানে একটি লোক আলখাল্লা পরা জাকোস বলে নিজের পরিচয় দিয়ে এক বিচিত্র ভাষায় যেন ভদ্রমহিলাকে কিছু বলে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা কিছু বুঝতে না পেরেও সেই একই কথা পুনরুচ্চারণ করতেন। লোকটি তার মুখ সর্বদা ঢেকে রাখত—তবুও তাদের মধ্যে ক্রমশ পরিচয় গভীর হল এবং ভদ্রমহিলা স্বপ্নেই সেই ভদ্রলোকের প্রেমে পড়লেন।

প্রায় ২।৩ মাস একনাগাড়ে এ ঘটনা ঘটে। তারপর হঠাৎ আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকবছর বাদে আবার লোকটি স্বপ্নে দেখা দেয়। ভদ্রমহিলার মনে হল তিনি কোন সমুদ্রের ধারে লোকটির সাথে দেখা করছেন। তিনি তার ভাষা আবার শিখতে লাগলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হত তা লিখে রাখার চেষ্টা করতেন, কিন্তু জাগরিত অবস্থায় সে ভাষার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারতেন না। ভদ্রমহিলা বিশ্বাস করতেন যে তিনি যখন প্রকৃতপক্ষে কখনও এই ভাষার সংস্পর্শে এ জীবনে আসেন নি তখন এটা নিশ্চয়ই তাঁর পূর্ব-জীবনের কোন ব্যাপার হবে। বিগত-জীবনের স্মৃতি হয়তো এভাবেই মাঝে মাঝে জেগে ওঠে।

কোরিয়া থেকে

কিম ইউং ইয়ং

স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শন (Clairvoyance)

পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের এটিও একটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

শারীরিক অনুভূতি গ্রাহ্য ইন্দ্রিয় ও কল্পনার বাস্তব পথ ছাড়াই স্বাভাবিক অনুভব ক্ষমতার বাইরের কিছু প্রত্যক্ষ করার নাম স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শন (Clairvoyance)-কে টেলিভিশন যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অনভ্যস্ত টেলিভিশনের মতই দূরবর্তী ঘটনা ও বিষয়বস্তুর ছবি নিজের চেতনায় দেখতে পান। এই দর্শন স্বপ্নের মধ্যে হতে পারে অথবা জাগ্রত অবস্থায় হতে পারে। নীচে স্বপ্নের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ-দর্শনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন আততায়ীর হাতে নিহত হবার কিছুকাল আগেই নিজের মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছবি দেখেছিলেন। যে পরিস্থিতিতে তিনি এই ঘটনাটি বলেছিলেন এবং যেভাবে এই কাহিনীটিকে সংরক্ষিত করা হয়েছে তাতে ব্যাপারটা আজগুবি বা গল্প কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হোয়াইট হাউসে এক বিশেষ জমায়েতে তিনি ঘটনাটি বলেছিলেন। লি'র আত্মসমর্পণের সংবাদে প্রেসি-ডেন্টের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আনন্দ করছিলেন। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন অস্বাভাবিক নির্জনভাবে বসেছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় ও শ্রীমতী লিঙ্কনের

পীড়াপীড়িতে তিনি স্বপ্নের কথা জানান। কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের মার্শাল ওয়ার্ড হিল ল্যামন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আমরা হুবহু সেই রিপোর্টের অনুবাদ তুলে দিলাম।

প্রেসিডেণ্ট বলতে শুরু করলেন—'দিন দশেক আগে বেশ রাত হয়ে যায় শুতে। সেদিন আমি কতকগুলি জরুরী ডাকের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।--- শোবার অল্প পরেই আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমার চারপাশে মৃত্যুর স্তব্ধতা যেন ঘিরে রয়েছে। তারপর আমি চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হল যেন অনেক নরনারী মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছে। স্বপ্নেই আমি বিছানা থেকে উঠে যেন সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। সেখানের স্তব্ধতা রুদ্ধ কান্নার শব্দে ভেঙ্গে পড়ছে। কিন্তু আমি শোকার্তদের কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।'

'আমি ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম কিন্তু জীবিত কাউকে চোখে পড়ল না। আমার চারদিকে কান্নার শব্দ কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন চলতে লাগল। সমস্ত ঘরেই আলো জ্বলছিল, সমস্ত জিনিষই আমার পরিচিত তবে কারা এমন হৃদয়বিদারক কিছু ঘটার জন্য কাদছে।'

আমি কিছুটা আশঙ্কিত ও হতচকিত হলাম। এ সবের মানে কী হতে পারে? ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় দেখার জন্য পূর্ব দিকে ঘুরতে ঘুরতে এলাম। সেখানে আমার জন্য এক মারাত্মক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দেখি শবযাত্রার গাড়ীতে একটি মৃতদেহ কফিনে দেবার কাপড়ে ঢাকা। মৃতদেহটির চারপাশে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে সেখানে বহুলোক জমা হয়েছে। তাদের সকলেই মৃতের দিকে চেয়ে অঝোরভাবে কাঁদছে।—হোয়াইট হাউসে এখন কে মারা গেল? আমি একজন সৈনিকের কাছে জানতে চাইলাম।

উত্তর এল—আমাদের প্রেসিডেণ্ট। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।'

পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতা কেউ বর্ণনা করলে তার বিকল্প ব্যাখ্যা কী হতে পারে এই উদাহরণগুলিতে তা বোঝাতে চেষ্টা করা হল। বিশেষ সন্দেহ-বাতিকেরা বিষয়গুলি যথাযথ বিচারের ধৈর্যের অভাবে হয়ত পুনর্জন্মের সব ঘটনাগুলোকেই 'বিভ্রান্তিকর' (Fraud) বলবেন।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা বেশি আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি না কেন না বহু প্রমাণিত সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করার পর পুনর্জন্ম সত্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এমন অনেক ঘটনা রেকর্ডে আছে যেখানে অনুভাবী বিগত

ইংল্যাণ্ড থেকে

টমাস হাক্সলে

জীবনের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের (যারা এখন মৃত) জীবনের ঘটনাও উল্লেখ করেছে। স্বাভাবিকভাবে সেগুলি কারোর জানা সম্ভব নয় যদি না ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-পরিচয় থাকে।

স্মৃতিকথা ছাড়াও তাঁরা পূর্বজীবনের সাথে যুক্ত জায়গা ও জিনিষপত্র সনাক্ত করেছেন এবং অতীত জীবনে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা গেছে তাঁদের বর্তমান জীবনে।

বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

পূর্ব-বর্ণিত আত্মার অধীনে নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার কারণ দিয়েও পুনর্জন্মের সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা চলবে না। এটা দেখা গেছে যে 'আত্মার অধীনস্থ' ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বা আংশিক হারিয়ে ফেলে এবং একটি 'মিডিয়ামে' পরিণত হয়। মিডিয়াম আত্মার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং অস্বাভাবিক আচার-আচরণ করতে থাকে। পুনর্জন্মের ঘটনায় যুক্ত লোকেরা সে ধরণের উন্মাদবৎ আচরণ করে না এবং অন্য সকল সাধারণ মানুষের মত নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

অতি মনের অধিকারীরা (Extra Sensory Perception) যারা Telepathy ও Clairvoyance-এ দক্ষ তাদের বিষয়ে পরীক্ষা করে এখন দেখা যাক।

Clairvoyance-এর প্রকৃতি বোঝাবার জন্য প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। একদল সিদ্ধান্তকারীরা বলে থাকেন যে Telepathy বা Clairvoyance-এর সাহায্যে কেউ মৃতব্যক্তির জীবনের কিছু কিছু ঘটনা জেনে নিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য 'পুনর্জন্মের' ব্যাপার বলে ঘটনাটা চালাতে চেষ্টা করতে পারে। এ যুক্তির ভিত্তি খুব সবল নয়। অতীত জীবনের স্মৃতির অধিকারীদের পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা Telepathy বা Clairvoyance শক্তির অধিকারী নন। এই শক্তিগুলির বাড়তি অধিকারী হলেও তারা কিছুতেই অতীত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকেদের ও বিভিন্ন জিনিষকে সনাক্ত করতে পারতো না এবং পূর্বজীবনের পরিচিতদের দেখে অমন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক ভাবাবেগে উদ্বেলিত হতেও পারতো না। এখানে থাইল্যাণ্ডের একটি ঘটনার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে

এখানে আমার মৃতদেহ শায়িত ছিল

প্রাজ্ঞদণন শীর্ণকায় বৌদ্ধ সাধু থাইল্যাণ্ডের নাকন সাওন গ্রামের এক সাধারণ কুটিরের বারান্দার এককোণে আঙুল তুলে নির্দেশ দিলেন। তারপরে খুবই স্বাভাবিক গলায় তিনি বর্ণনা করলেন যে সেদিন থেকে প্রায় উনপঞ্চা

বছর আগে তাঁর মৃত্যুর পর শোকার্তরা কীভাবে মৃতদেহটি বারান্দায় ঐখানে রাখে, দেহের সৎকার কী করে করা হয়েছিল এবং তিনি তাঁর ছোট বোনের ছেলে হয়ে কেমন করে পুনর্জন্ম নিয়েছিলেন—এ সবই তিনি নিজে দেখেছিলেন।

সন্ন্যাসীর নাম ক্রা রাজাসুস্থাজারন। তিনি থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্মানিত সদস্য—এবং ঐ অঞ্চলের সকলেই তাঁর পুনর্জন্মের কাহিনী জানে। পরিবারের অন্য লোকেরাও সমস্ত কাহিনীটিকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তিনি শিশুবয়সে প্রথম যখন কথা বলতে আরম্ভ করেন সেদিন থেকেই বর্তমান মাকে 'ভগিনী' বলেন এবং পরিবারের অন্য সকলকেই আগের জীবনের সম্পর্কসূত্রে সম্বোধন করতেন। অতীত জীবন সম্পর্কে যে-সব গুহ্যকথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন তা বর্তমান জীবনে কোন প্রকারেই জানতে পারার কথা নয়।

আশা করা যায় এখন পাঠকেরাই পুনর্জন্মের সঠিক ব্যাপার পক্ষে নিজেদের মতামত নিজেরাই ব্যক্ত করতে পারবেন।

॥ আট ॥

জন্মান্তরের ঘটনাগুলিকে কিভাবে পরীক্ষা করা হয়?

জন্মান্তরের ঘটনায় সত্যাসত্য বিচার করতে গবেষককে যুগপৎ ঐতিহাসিক, আইনগত ও মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। পূর্বের অর্জিত জ্ঞানের ওপরেই স্মরণশক্তি নির্ভরশীল—এটি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। পূর্ব-জন্মের স্মৃতিকথা বলার ক্ষেত্রে এই আগে থেকে জানা-শোনার ব্যাপারটি থাকে না। বিষয়টি প্রাঞ্জল করার জন্য ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর জনৈক সৈনিকের কাহিনীটি বর্ণনা করা যেতে পারে।

পরিচিত পথে পুনর্ভ্রমণ

আমি একজন সাধারণ সৈনিক। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের অল্পকালের মধ্যেই আমাদের পূর্বাঞ্চলে পাঠান হয়। আমি আগে কখন ভ্রমণ করি নি বা বিদেশে যাই নি। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর আমাদের এমন এক স্থানে যাবার আদেশ দেওয়া হল যে সেখানে আগে কখনও কোন ইংরাজ দল যায় নি। আমাদের অফিসারেরা একটু চিন্তায় পড়লেন যে, কোন পথে রওনা হবেন। আমাদের দলের কেউই জায়গাটি সম্বন্ধে কিছু জানতো না এবং সে-স্থানের কোনও ম্যাপও আমাদের কাছে ছিল না।

কিসের জন্য জানি না আমি সোজা অফিসারদের কাছে গিয়ে জানালাম সুযোগ দিলে আমি আমাদের দলকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে পারবো। কারণ এ জায়গাটা আমার বিশেষভাবে জানা। সকলেই আমার ওপর যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করলেন। প্রমাণ দেবার জন্য আমি জানালাম যে, সামনের ঐ পাহাড়ের ওদিকে একটা পাথরের তৈরী পরিত্যক্ত বাড়ী আছে। যাচাই করার জন্য সেখানে গিয়ে সকলে এবং আমিও অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার কথাই ঠিক। এরপর আমাকে পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং পথ সম্পর্কে আমার প্রতিটি আগাম সংবাদ সত্য প্রমাণিত হতে থাকে। ব্যাপারটাতে আমি নিজেও ভীষণভাবে বিস্মিত হয়ে পড়ি।'

এই সৈনিকটি যেখানে তার দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সেখানে আগে সে কখনও যায় নি। অন্য সৈন্যরা ও তাদের অফিসারেরা মেনে নিয়েছিলেন যে সৈন্যটি পূর্বজীবনে এ অঞ্চলে বসবাস করেছে। সেই অতীত জীবনের স্মৃতি আজ জাগরিত।

এই ধরণের একটি ঘটনা গবেষণা করার সময় পরীক্ষককে যত বেশি সম্ভব লোকের সাক্ষ্য নিতে হবে। পূর্ব-জীবনের স্মৃতির দাবীদার ব্যক্তির, তার বর্তমান পরিবারবর্গের ও অতীতের সাথে যুক্ত পরিবারের সকলের হাবভাব আচার-আচরণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সাধারণত দেখা যায় পুনর্জন্মের দাবীদাররা অল্পবয়স্ক শিশু। আগের জীবনের ঘটনা ও ব্যক্তির প্রসঙ্গে কথা বলার সময় তারা বড্ড বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। তারা যে-রকম বিস্তারিতভাবে সে সব কথা বলে থাকে সেগুলি বর্তমান জীবনে সাধারণভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ফ্রান্সের একটি ঘটনা

হেনরিয়েটা গে'র তিন মাসের শিশু কন্যা থেরেসা গে হঠাৎ কথা বলতে সুরু করে তার বাবা-মাকে চমকে দেয়। প্রথম শব্দটি সে বলে 'অরূপ।' শব্দটি তাঁরা বুঝতে না পেরে হাসাহাসি করতেন। পরে তাঁরা জানলেন 'অরূপ' একটি সংস্কৃত শব্দ। তিন বছর বয়সে সে কথাবার্তায় ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করতে থাকে অথচ তার মা ফরাসী শেখানোর বিশেষ চেষ্টা করতেন। তারও কিছুকাল পরে সে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে কথা বলতে থাকে। গান্ধীজীর কথা বলার সময় সে 'বাপু' শব্দটি ব্যবহার করতো এবং তার বিবরণ থেকে বোঝা যায়, গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের [illegible] সে তাঁর বিশেষ পরিচিত ছিল।

মেয়েটির বাবা-মা হকচকিয়ে গেলেন। তাঁরা নিজেরাই গান্ধী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না। অথচ তাঁদের শিশুকন্যা বিস্তারিত বিবরণ দেয় গান্ধীজীবনের।

এই ধরণের ঘটনা পরীক্ষা করার সময় অনুসন্ধানকারীরা কাহিনীগুলি

খবরের কাগজের মাধ্যমে বা বই থেকে সংগ্রহ করার সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দিতে পারেন না যদিও সাধারণভাবে বুঝতে পারা যায় শিশুটি বাস্তব পথে এই অতীত স্মৃতি অর্জন করে নি। অনুভাবী হয় তো কী ভাবে সংবাদগুলি সংগ্রহ করেছে তা ভুলে যেতে পারে এবং যথেষ্ট সততার সঙ্গে অতীতের ঘটনার ছোটখাট বিষয়গুলি বর্ণনা করে মৃত-আত্মার পুনর্জন্মের কথাই বিশ্বাস করাতে পারে। গবেষককে তাই বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রেখে কাজে এগোতে হয়।

যখন বিশ্লেষণ করে মোটামুটি ধারণা জন্মায় যে, অনুভাবী বর্তমান জীবনে এ-কাহিনী স্বাভাবিক পথে অর্জন করে নি তখন তাকে বর্ণিত জীবনের পারিপার্শ্বিকতায় নিয়ে যাওয়া হয়। এতে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, অনুভাবী যে জীবনের জন্মান্তরের দাবী করছে তার সমসাময়িক অন্যান্য লোককে, জিনিষ অথবা স্থানকে চিনতে পারতে পারে কিংবা অতীতের জায়গায় এসে হয়তো অন্য আরো ঘটনা স্মরণ করতে পারে। এ-ব্যাপারে আর একটা উদাহরণ দেওয়া চলতে পারে।

থাইল্যাণ্ডের কাহিনী

থাইল্যাণ্ডের এক শিয়ামিজ বালিকা তার পূর্ব-জীবনের চৈনিক মাতা-পিতার কথা স্মরণ করতে পারতো। সে তার পূর্বের মায়ের নাম জানায় এবং তার কাছে ফিরে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। সেই স্থানের ধারেকাছে কোন চীনা পরিবার না থাকলেও বালিকাটি বেশ কয়েকটি চীনা শব্দ বলতে পারতো এবং খাবার সময় হাত দিয়ে খাওয়ার চেয়ে চীনা প্রথায় কাঠি দিয়ে খেতে পছন্দ করতো। বন্ধু-বান্ধবদের জানাতো যে সে আগের মাকেই বেশি ভালবাসে।

লোকপরম্পরায় তার আগের মা এই কাহিনী শুনতে পান এবং তিনি প্রায় চৌদ্দ মাইল নদীপথ অতিক্রম করে এই বালিকাটির গ্রামে আসেন। কিন্তু বাড়ী চিনতে না পারায় তাঁকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মেয়েটি সে সময়ে স্কুলে যাচ্ছিল—সে তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিনতে পারে এবং 'মা' বলে জড়িয়ে ধরে।

এরপর তাকে আগের জন্মস্থানে নিয়ে আসা হয়। বালিকাটি নিজে এবং তাদের বর্তমান পরিবারের কেউ এ শহরে আগে কোনদিন আসেন নি। বালিকাটি নির্ভুলভাবে পথ দেখিয়ে নিজেদের পুরোনো বাড়ীতে চলে আসে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাকে লোক চেনার পরীক্ষা করা হয়। মেয়েটির চীনা পিতা প্রায় পঞ্চাশজন শ্যামদেশীয় ও অন্য চীনা লোকের সঙ্গে 'পাবলিক' বেশ ধরে আফিং খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন এবং দরজার দিকে পিছন ফিরে শুয়েছিলেন। মেয়েটিকে সেই ঘরে আনা হলে সে এত লোকের মধ্যে বিনা-দ্বিধায় 'পিতাকে' সনাক্ত করে।

প্রথমে তার 'বাবা' বিশ্বাস না করলেও বিভিন্ন ঘটনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শেষে মেনে নেন যে, তাঁদের মৃতকন্যা পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে।

অন্য অনেক স্তূপীকৃত জিনিষের মধ্যে সে তার নিজের ব্যবহৃত জিনিষগুলো বার করে নেয় এবং অন্য যেগুলি তার মধ্যে ছিল না তার কথা জিজ্ঞাসা করে। সুরু থেকেই সে সেই শহরের ও পরিবারের সব কিছুর সাথে বিশেষভাবে পরিচিত তা নানাভাবে প্রমাণ করে দেয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় মেয়েটি মৃত্যুর পর এবং মানব-শিশুরূপে জন্মগ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ের কথাও স্মরণ করতে পারতো। সেই সব কাহিনীর মধ্যে একটি প্রমাণ থেকে মেয়েটির জন্মান্তরের আরও এক সূত্র পাওয়া যায়। সে জানায় যে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণের আগে তার সঙ্গে তার জীবিতকালের বন্ধুর আত্মার দেখা হয়। তারা কিছুকাল একত্রে কাটায়। খবর নিয়ে দেখা যায় মেয়েটির সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুটিও একই দিনে মারা গিয়েছিল। দুজনেই শিশুবয়সে এই মহামারীতে প্রাণ হারিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের কোন শাখা জন্মান্তর-বাদের ওপর গবেষণা করে? এ-প্রশ্নটি আমাদের আগামী সংখ্যার আলোচ্য বিষয় হবে।

ক্রমশ।

অনুবাদক—জ্যোতির্ময় দাশ

হেমন্তে

প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

আকাশটা আজ বিষণ্ণতায় ভরা,
ঘাসে ঘাসে শিশির-অশ্রু-ঝরা।
বিশ্ব-নিখিল ঢাকা কুয়াশায়—
তবুও চেয়ে আছি দুরাশায়!

চরণ-ধ্বনি শুনি মনের কাছে
নয়ন-মণি সেই খুশিতে নাচে!
আছে আছে আছে গোপন হ'য়ে—
পাখিরা যায় সেই কথাটিই ক'য়ে।

হাতেতে তার ধানের শিষের গুচ্ছ
মাঠে মাঠে বেড়ায় শিশির মুছি।
রোদের খুশি ছড়ায় মুঠো মুঠো ঃ
একটি বোঁটায় ফুল ফুটেছে দুটো।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে

[কলকাতার মেয়র]

১৯৫২ সাল। আজ থেকে ষোল বছর আগের কথা। রাজনৈতিক বিচারে এক স্মরণীয় কাল। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পশ্চিম বাংলায় আবার মন্ত্রিসভা গঠন করলেন পশ্চিম বাঙলার মহান স্থপতি, ভারত-বিখ্যাত জননায়ক স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর মন্ত্রিসভায় সেই প্রথম উপমন্ত্রী পদের সৃষ্টি হল। অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত, অঙ্গচ্ছেদের এক হতভাগ্য শিকার, পশ্চিমবাঙলাকে নতুন করে গড়ে তোলার, সমস্ত ক্ষতচিহ্ন তার অঙ্গ থেকে মুছে দেওয়ার, তার আকাশফাটা হাহাকারের অবসান ঘটিয়ে তার সর্ব অঙ্গ সমৃদ্ধিতে লাবণ্যময়ী করে তোলার দায়িত্ব সেদিন বিধানচন্দ্রের। তাঁর চিন্তার সেদিন যেন শেষ নেই।

এই সময়েই হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বিধানচন্দ্রের আহ্বান এসে পৌঁছল উত্তর কলকাতার হেদুয়ার সন্নিকটে সিমুলিয়া অঞ্চলে। যে অঞ্চল ধন্য হয়ে আছে পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র স্মৃতিতে, যে অঞ্চল স্মরণীয় হয়ে আছে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় স্মৃতিতে। এই অঞ্চলেরই একটি সম্ভাবনাময় তরুণকে ডাক দিলেন বিধানচন্দ্র পৌরসভায় যোগ দেওয়ার জন্যে। মহানগরীর পৌরপাল সেদিন বাঙলার আর এক সুসন্তান পরম বিদ্যোৎসাহী স্বর্গত জননায়ক নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। নির্মলচন্দ্রই এই তরুণের সন্ধান দেন বিধানচন্দ্রের কাছে। আজ যিনি মহানগরীর পৌরপালের আসনে সগৌরবে সমাসীন সেদিনকার সেই উনত্রিশ বছরের তরুণ গোবিন্দচন্দ্র দের পৌরপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার এই ইতিহাস।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে

স্বর্গত বসন্তকুমার দের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান গোবিন্দচন্দ্র ১৯২৩ সালের ২৩-এ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বয়সের হিসাবে বর্তমানে পঁয়তাল্লিশের ঘর অতিক্রম করেছেন। রাণী ভবানী স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর সমকালীন ছাত্ররূপে যাঁদের সমাবেশ হয়েছিল তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে আপন আপন ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও সফলতা অর্জন করেছেন। এই তালিকায় মাসিক বসুমতী সম্পাদক ও প্রখ্যাত কথাশিল্পী প্রাণতোষ ঘটক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ, হাইকোর্টের বিচারপতি ব্যারিস্টার তরুণকুমার বসু, স্বর্গত জননায়ক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অনুতোষ মুখোপাধ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে স্নাতক শ্রেণিভুক্ত হলেন ১৯৪৩ সালে।

ছাত্রজীবন শেষ হ'ল। কর্মজীবনের সূচনা। প্রায় অবলুপ্ত পৈত্রিক ব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করে তার উন্নয়নকল্পে আত্মনিয়োগ করলেন গোবিন্দচন্দ্র।

পরের বছর নোয়াখালি হাঙ্গামা। এই দুর্যোগকে কেন্দ্র করেই তাঁর জনজীবন আরম্ভ হয়ে গেল। নেতাজী তরুণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে ত্রাণকার্যে এগিয়ে এলেন গোবিন্দচন্দ্র। বিপর্যস্তদের, আক্রান্তদের, দুর্গতদের সর্ববিধ সেবার মধ্যে নিজের সংগঠনীশক্তির ও দরদীমনের পরিচয় দিতে থাকলেন। সমাজসেবামূলক কাজে তিনি উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা পান স্বর্গত সাংবাদিক অমূল্য সেনগুপ্ত এবং সঙ্গীতাচার্য স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র দের অগ্রজ ও বর্তমানে বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মান্না

দে'র পিতৃদেব স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র দের কাছে।

১৯৫২ সালে পৌরপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাউন্সিলার নির্বাচিত হলেন গোবিন্দচন্দ্র। পৌরসভায় আসার ইতিহাস এই রচনার প্রারম্ভেই বর্ণিত হয়েছে। পৌর প্রতিনিধি থেকে স্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং পরে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৩৭ সালে মহানগরীর মেয়রের আসন অলঙ্কৃত করলেন। সে আসনে আজও তিনি সগৌরবে সমাসীন। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন গোবিন্দচন্দ্র।

১৯৬৭ সালেই প্রাচ্যদেশসমূহ এবং ১৯৬৮ সালে পাশ্চাত্য দেশসমূহ ইনি পরিদর্শন করেন। ১৯৬৮ সালেই নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর পৌরপ্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

কলকাতার রোটারি ক্লাব এবং প্রেস ক্লাবের সঙ্গে তিনি জড়িত। এ ছাড়া মহাজাতি সদন, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা রেডক্রসের অছি-পরিষদের তিনি পদাধিকার বলে সদস্য। বিখ্যাত নাট্য-সংস্থা 'শৌভনিক'-এর তিনি সভাপতি।

বাঙলা চলচ্চিত্র জগতের একটি সুপরিচিত নাম শ্রীহরিপ্রিয় পালের বড় মেয়ে শ্রীমতী ছবি দের সঙ্গে ১৯৪৫ সালে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

[প্রখ্যাত কবি এবং প্রবীণ সাংবাদিক]

শুধু শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি নয়, বাঙলা দেশ আধ্যাত্মিকতারও লীলাভূমি। যুগ-যুগ ধরে অগণিত সাধকের আবির্ভাবে বাঙলার মাটি হয়েছে ধন্য, মানুষের মনের অন্ধতম বিদূরিত হয়ে উপলব্ধি ও অনুভূতির লক্ষপ্রদীপে আলোকিত হয়ে উঠেছে মানবচিত্ত। তাঁদের সাধনা আমাদের জীবন সম্বন্ধে এক নতুন বোধের ও চেতনা সঞ্চারিত ক'রে প্রতিবারই পথভ্রান্ত মানুষকে ঠেলে দিয়েছে সত্যের পথে, সুন্দরের পথে, শ্রেয়ের পথে। এই তালিকা যেমনই বিরাট, তেমনই গৌরবময়, এই তালিকায় একটি হিরণ্যদ্যুতি চিরপ্রণম্য নাম—রামপ্রসাদ। সাধক রামপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে নৈকট্যের ইঙ্গিত দিয়ে যে আলোড়ন এনেছিলেন সে আলোড়ন আজও সারা বাঙলাকে আন্দোলিত করে রেখেছে। বাঙালীর প্রাণের গভীরে গানের ভিতর দিয়ে মাতৃচেতনার যে ঝঙ্কার ধ্বনিত করেছিলেন রামপ্রসাদ তার তুলনা বিরল বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

রামপ্রসাদের বড়ছেলে রামদুলালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এই রচনার আলোচ্য নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। বাঙলা দেশের প্রথিতযশা কবি সমালোচক ও সাংবাদিক হিসাবে একটি প্রখ্যাত নাম। ঈশ্বর দুটি জিনিষ সমান ধারায় বর্ষিত করেছেন তাঁর উদ্দেশে। এক—বিরাট পাণ্ডিত্য, সহজাত কাব্যপ্রতিভা এবং প্রগাঢ় মনীষা। দুই—অর্গলমুক্ত একটি বিরাট হৃদয়, দরদপ্লুত সহানুভূতিশীল মন এবং অতুলনীয় বন্ধুবাৎসল্য।

স্বর্গত বসন্তকুমার সেনগুপ্তের ছেলে নন্দগোপাল ১৯১০ সালের ২৮-এ অগাস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন। হালিশহর

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

তাঁর পিতৃভূমি হলেও জন্মস্থান নয়। জন্মেছেন মুর্শিদাবাদে মাতুলালয়ে।

ঝাড়গ্রামে কেটেছে স্কুলজীবন। কলেজী পাঠ নিয়েছেন মুর্শিদাবাদে এবং মেদিনীপুরে। ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় হয়েছেন উত্তীর্ণ। ১৯৩২ সালে পাশ করলেন এম-এ। সহপাঠিনী ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী স্বনামধন্যা শিক্ষাব্রতিনী স্বর্গতা মৃণালিনী এমার্সনা।

কলকাতায় কিছুদিন স্কুলশিক্ষকতা করলেন। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হয়ে চলে গেলেন। সেখানে অধ্যাপনা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক সহকারীর কর্মভার গ্রহণ করলেন (১৯৩৬-৩৮)। ১৯৩৮-এর শেষভাগে যোগ দিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকায়। বর্তমানে ঐ পত্রিকারই তিনি অন্যতম প্রবীণ সহকারী সম্পাদক।

সাহিত্য সাধনায় হাতেখড়ি ছেলেবেলা থেকেই সুরু হয়ে গেছে যে সাধনা তাঁর আজও অটুট। ১৯২৬ সালে মানসী-মর্মবাণীতে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হ'ল। ঐ পত্রিকা তখন প্রকাশিত হয়ে চলেছে বাঙলা সাহিত্যের এক দিকপাল মহারথী স্বর্গত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সেতু'। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হ'ল তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ভূমিকা। প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থ আজ বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির লেখনী থেকেই জন্ম নিয়েছে। অসংখ্য শিক্ষা-ব্রতী, অধ্যাপক এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু নন্দগোপালের এই গ্রন্থটিই এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। গ্রন্থটি উৎসর্গীত রবীন্দ্রনাথকে। পরের বছর প্রকাশিত হ'ল তাঁর 'শতাব্দী ও সাহিত্য'। মার্কস, ফ্রয়েড ও আইনস্টাইন একালের সাহিত্য-

মানসকে কিভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করেছেন—এ গ্রন্থটি সেই পটভূমিতেই রচিত। এ গ্রন্থটি নন্দগোপাল উৎসর্গ করেছিলেন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম মহানায়ক বীরবল প্রমথ চৌধুরীকে। এ ছাড়াও রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সময়, সমাজ-সমীক্ষা (অপরাধ ও অনাচার) প্রভৃতি সারগর্ভ জ্ঞানো-দ্দীপক তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাগ্রন্থগুলির তিনি সার্থক রচয়িতা। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আমি, তুমি ও অন্যান্য। গল্প, উপন্যাসেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলির নাম মিছে-কথা, মহানির্বাণ ও কান্নাহাসির রূপ এবং উপন্যাস দুটির নাম জীবনবন্দ ও কাঁটাতার

উদীয়মান সাহিত্য-সেবীদের অন্যতম পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর পুত্র।

শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়

[কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি]

আলোর পিছন পিছন যেমন ছায়া, রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উত্তাপ, পুঞ্জীভূত মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জনের পর আকাশের বুক চিরে অবরুদ্ধ জলধারার স্রোতোমুখ খুলে যাওয়া যেমন স্বাভাবিক—ঠিক তেমনই প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে একটি দরদপুষ্ট, মাধুর্যমণ্ডিত, বর্ণোজ্জ্বল এবং বন্ধুবৎসল, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল মনের আত্মপ্রকাশ ঘটবেই—এ এক রকম অবধারিত বললে অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য বললেও চলে।

উপরোক্ত ধারণার বা মন্তব্যের জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত আমাদের পরিপার্শ্বে একাধিক বর্তমান। তাদেরই একটি—কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির এক রসগ্রাহী পূজারী ও সুবোদ্ধা পাঠক ও সমালোচক।

জীবনের অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আজ বছর তিনেক। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে আদিবাড়ী। জন্ম—মাতুলালয়ে। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ জিয়াগঞ্জ তাঁর জন্মস্থান। পিতামহ—স্বর্গত সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাবা—স্বর্গত: দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মনিয়োগ করলেন ব্যবসায়ে। বাঙলা দেশের সাইকেলের ব্যবসা আজ জগজ্জোড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাইকেলের মাধ্যমে বাঙলা দেশের বাণিজ্যিক সাফল্য আজ পৃথিবীর দিকে দিগন্তরে স্বীকৃত ও পরিব্যাপ্ত। এই সাইকেল ব্যবসায়ের পথিকৃতের জয়মাল্য নিঃসন্দেহে যাঁদের প্রাপ্য—দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য এবং অমলিন দীপ্তিতে ভাস্বর এক অবিস্মরণীয় নাম

প্রথম দশ বছর দেশে কেটেছে। কলকাতায় রাণী ভবানী স্কুল ও তালতলা হাইস্কুলে বিদ্যালয়ের পাঠ নিলেন। স্কুল-জীবনে তাঁর সহপাঠী ছিলেন

শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম বাঙলার বর্তমান এ্যাডভোকেট জেনারেল রথীন্দ্রচন্দ্র দেব। ১৯৩১ সালে উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায়। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। প্রাক্-স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বিজ্ঞানে, তারপর স্নাতক-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কলাবিদ্যা ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে।

এরপর কলকাতা থেকে অক্সফোর্ড। বর্তমান পৃথিবীর এক সুপ্রাচীন শিক্ষা-পীঠ। গৌরব আর ঐতিহ্যে ভরপুর। অক্সফোর্ডে স্নাতক পরীক্ষায় আবার সফলতার হাতে হাত রাখলেন। অর্জন করলেন এম-এ উপাধি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে। ১৯৪৫ সালে ফ্যাকাল্টি অফ মিডিভ্যাল এ্যাণ্ড মডার্ন ল্যাঙ্গোয়েজেসে বি-লি-টি উপাধি অর্জন করলেন। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল রুশ মহাকবি লেরমানভর উপর বায়রনের প্রভাব। ঐ বছরই ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় হলেন লব্ধসিদ্ধি।

দেশের ছেলে দেশে ফিরে এলেন। সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করে পশ্চিম পাড়ির সফলতা করলেন প্রমাণিত। মাথায় নিয়ে এলেন যশের মুকুট। ১৯৪৭ সালে হাইকোর্টে যোগ দিলেন। ১৯৬৬ সালে বিচার-পতির আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। আজও তিনি সগৌরবে এবং সবাক্তিত্বে সে আসনে সমাসীন।

১৯৩৯ সালে জেনেভায় লীগ অফ নেশানস্-এ কমিটি অব ইনটালেকচুয়াল ডেলিগেশান-এ একজন ডেলিগেট মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে লইয়ার্স ডেলিগেশানের অন্যতম সদস্যরূপে পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশসমূহ পরিদর্শন করেন। এই দলটির নেতৃত্ব করেছিলেন বর্তমান ভারতের আইন জগতের এক দিক-পাল তদানীন্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন।

শিশিরকুমার আইনজ্ঞ হিসাবে যে দু' জনের কাছে সহকারিত্ব করেছেন তাঁরা বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী

মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায়। শিশিরকুমার নিজেও সহকারিরূপে যে চারজন আইনজ্ঞকে পেয়েছেন তাঁদের দু'জন ব্যারিস্টার ও দু'জন এ্যাডভোকেট। বিলেতে থাকার সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ইনি লিখেছেন। ভ্রমণ (বিশেষ করে অরণ্য অঞ্চলে) এবং যে কোন বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে তিনি আনন্দ পান এবং তাঁর মানসিক ক্ষুধা নিরসনের এই হল চাবিকাঠি।

ইয়োরেকা প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিসিটির প্রতিষ্ঠাতা স্বত্বাধিকারী এ দেশের প্রখ্যাত মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়মেয়ে শ্রীমতী নমিতা দেবীর সঙ্গে ইনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ। পুত্র ইন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র এবং কন্যা অপর্ণা লোরেটো হাউসের ছাত্রী।

শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী

[স্বনামধন্য কথাশিল্পী]

একটি শতাব্দীর পর আরও একটি দশক অতিক্রান্ত হ'ল। সারা ভারতবর্ষে সেদিন সিপাহী বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে' উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, নগরে, বন্দরে, গ্রামে, জনপদে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা অবধি সুবিস্তৃত ভারতের পবিত্র মৃত্তিকায় বিপ্লবের পদধ্বনি। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আসা ইংরেজের বেনিয়ার ছদ্মবেশটি খসে পড়েছে। মুখোস সরে গিয়ে দেখা দিয়েছে মুখ। সে মুখ লোভের, শোষণের, রাজ্যগ্রাসের—এ হেন পরিস্থিতিতে ভারতের একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে জ্বলে উঠল একমুঠো আগুন। দিব্যদীপ্ত তার শিখা, অত্যুজ্জ্বল তার রশ্মি। কোথা থেকে বিনির্গত হ'ল এই অগ্নিপুঞ্জ। এক লাবণ্যময়ী, অনন্যরূপা তরুণীই এর উৎস। সেই আগুনের শিখায় শিখায় ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ভারতবর্ষে সেই অগ্নিকন্যার জ্বালাময়ী বজ্রগর্ভ মন্ত্র—'মেরে ঝাঁসি দুঙ্গা নেহি।'

নড়ে উঠল ভারতের ভিত্তি, কেঁপে উঠল ভারতের মাটি, বারেকের তরে রুদ্ধগতি হ'ল অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসরমাণ প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সৈন্যের।

তরপর ? তারপর ইতিহাসের পাতা থেকে কোথায় হারিয়ে গেলেন লক্ষ্মীবাই। কেউ সে খোঁজ পেল না, কেউ সে সংবাদ নিল না, কেউ সে তথ্য রাখল না।

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেল, কত ঘটনা, কত কাহিনী, কত পরিবর্তন শতাব্দীর ঘর প্রায় ছুঁই-ছুঁই। অগ্নিকন্যা লক্ষ্মীবাইকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করে, তাঁকে অবলুপ্তির অন্ধ গহ্বর থেকে উদ্ধার করে বাঙলা সাহিত্যের পাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটালেন, বাঙলা সাহিত্যে সসম্মানে তাঁর আসন পেতে দিয়ে পাঠক সমাজে আলোড়ন আনলেন এক বঙ্গকন্যা। তাঁর নাম মহাশ্বেতা দেবী। আজকের দিনের বাঙলা সাহিত্য-জগতে একটি প্রথম শ্রেণীর নাম।

শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী

সরস্বতীর দরবারে ছাড়পত্রের অধিকার রক্তের মধ্যেই রয়েছে। বাঙলা দেশের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) তাঁর পিতৃদেব। উত্তরাধিকারসূত্রেই যেন একটি শক্তিশালী লেখনী হাতে এসে গেছে।

ঘটকদের আদিনিবাস পাবনা জেলায়। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী জন্মেছেন ঢাকায় মাতুলালয়ে। কর্মসূত্রে কবি মনীশ ঘটককে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। তাই ছেলেবেলা থেকেই মহাশ্বেতা দেবীর নানা জায়গায় ঘোরার ও নানা অঞ্চল দেখার সুযোগ এসেছে।

আট বছর বয়েসে ভর্তি হলেন শান্তিনিকেতনে। পৃথিবী তখনও রবিহীন হয় নি। শিক্ষাজীবন এইখানেই অতিবাহিত হ'ল। শান্তিনিকেতন থেকেই স্নাতিকা হ'লেন ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে।

১৯৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণা হলেন। বর্তমানে কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপিকারূপে যুক্ত আছেন। ১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'লীলা পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিতা করেছেন। ১৯৬৮ সালে তিনি লাভ করলেন 'মতিলাল পুরস্কার'।

অধ্যাপনা ছাড়া আরও নানাবিধ কর্মে তিনি লিপ্ত থেকেছেন। স্কুল শিক্ষিকার দায়িত্বও পালন করেছেন। করণিকের কর্মও গ্রহণ করেছেন। আবার দরজায় দরজায় জিনিষ ফিরি করতেও তাঁকে দেখা গেছে অর্থাৎ জীবনের রঙ্গমঞ্চে সেলসগার্লের ভূমিকাতেও তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

জীবনে প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রঙমশাল' পত্রিকায়। ১৯৫০-৫২ সালে নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫৫ সালে তাঁর যুগান্তকারী এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'ঝাঁসীর রাণী' প্রকাশিত হ'ল। লেখাটি আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া তুলল পাঠকমহলে। অভিভূত হলেন মনীষিমণ্ডলী। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে ভরিয়ে

মধুসূদন সরস্বতী

জর্জ এ্যালেন

বিপুল বিস্ময়ে ভরপুর সে এক অনবদ্য কাহিনী। গল্প কথা নয়—ইতিহাস। বিস্মরণের অতীত সে এক অলোক-সামান্য ইতিহাস। অবিশ্বাস্য কিন্তু অসত্য নয়। রাশি রাশি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতেন প্রতিটি প্রত্যক্ষদর্শী। এ কি করে সম্ভব? এ কি পরমাশ্চর্য। এ কি অপরূপ—বারো বছরের বালক। খেলার মাঠ ছেড়ে শাস্ত্রপাঠে তার এতখানি অধিকার। তবে কি এ জাতিস্মর—এইটুকু বালক কাব্যরচনায় এবং সর্বশাস্ত্রে কোথা থেকে পেল এই দক্ষতা। দেবী সরস্বতীর পবিত্র প্রসাদের অমৃত-ধারা এর উপর কি বর্ষিত হয়ে আসছে জন্মান্তরের ধারায়। কত প্রবীণ, বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন এই দুগ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায়। কাব্যসৃষ্টিতে যেমনই তার ছন্দজ্ঞান, শব্দচয়ন, বিন্যাসভঙ্গী শাস্ত্রালোচনায় তেমনই তার তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, প্রগাঢ় যুক্তিবাদী মন এবং অসাধারণ বিশ্লেষণী নৈপুণ্য।

এরই নাম বিস্ময়। বিস্ময়ের যেন অন্ত নেই।

কিন্তু কাকে কেন্দ্র করে এত কথা! কাকে নিয়ে সেদিন এই দুর্বার আলোড়ন। লোকের মুখে মুখে ফেরা কিম্বদন্তীর মত নিত্য উচ্চারিত কার এই নাম—বিস্ময়ের মূর্তিমন্ত বিগ্রহরূপে কে সেদিন বাঙলা দেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পরবর্তীকালে শাস্ত্রানুশীলনের এবং মানুষের অধ্যাত্মচেতনার এক নবদিগন্তের উন্মোচন করতে, মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসার রুদ্ধ দুয়ারগুলির বাতায়ন অর্গলমুক্ত করতে, আমাদের চিরন্তন শাস্ত্রচেতনার নতুন ভাষ্যদান করতে?—তিনি মধুসূদন সরস্বতী।

শ্রীচৈতন্য নিবেদিতপ্রাণ এই মহান পুরুষ ষোড়শ শতাব্দীর এক গৌরবময় উপহার। বাঙলা দেশের ইতিহাসে এই মধ্যযুগ এক অসামান্য যুগ। মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার পর তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারে, তাঁর লীলা ব্যাখ্যানে তাঁর প্রেমধর্মে সর্বসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার শুভ অভিপ্রায়ে যে সাহিত্য সৃষ্টির স্রোতোমুখ খুলে গেল, বলতে গেলে সেই স্রোতোমুখই বাঙলা সাহিত্যের এই অবিরাম ধারার যথার্থ উৎস। শুধু মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করেই নয়, রামায়ণ মহাভারত ও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি—এই সময়ে এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। আজ যার নাম বরিশাল সেদিন তারই নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। রাজনৈতিক পরিবেশও সেদিন নানা ঘটনায় সমাকীর্ণ। ঘোর তরঙ্গসঙ্কুল। দিল্লীর সিংহাসনে সেদিন জালালউদ্দীন আকবর। মোগল সৈন্যের মুক্ত অসির ঝঙ্কারে সারা ভারত সেদিন তটস্থ রাজ্যলিপ্সু মোগলবাহিনীর অশ্বখুরের উদ্দাম ছন্দে ভারতবর্ষের মাটি সেদিন কেঁপে কেঁপে উঠছে। মোগল সেনানীর রণবাদ্যে সেদিন নিনাদিত হয়ে উঠেছে সারা ভারতবর্ষ।

কোনক্রমে স্বাধীনতাটুকু বাঁচিয়ে রেখেছেন রাজা কন্দর্পনারায়ণ। রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা এবং অনিশ্চয়তা কিন্তু বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পার নি তাঁর সংস্কৃতির পূজারী রসপিপাসু মনকে। মানসিংহের দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁকে এতটুকু টলাতে পারে নি সারস্বত-সাধনার বেদীমূল থেকে। সর্বনাশা বিপদের হাতছানি তিলমাত্র সফল হয় নি তাঁর বিদ্যোৎসাহিতায় ভাঁটা পড়াতে।

গর্বের সীমা নেই প্রমোদন পুরন্দরাচার্যের। পুত্র গর্বে তিনি দিশাহারা। ভগবানদত্ত এই অনন্য প্রতিভা তাঁর পুত্রের দ্বারা অর্জিত—এ চিন্তায় তাঁর মনে পরিতৃপ্তি এবং সার্থকতাবোধের প্লাবন বয়ে যায়। প্রমোদন পুরন্দরাচার্য নিজেও স্বনামধন্য পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর সুবিদিত।

স্থির করলেন পুরন্দরাচার্য কন্দর্পনারায়ণকে পুত্রের এই কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ করাতে হবে। গুণী রাজা কন্দর্পনারায়ণ। পুরন্দরাচার্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তিনি দেখুন যে পুরন্দরাচার্য নিজেই শুধু গুণী নন। কত বড় গুণী প্রতিভাধর বালকের তিনি জনক।

অফুরন্ত আশার তরীতে পাড়ি জমালেন পুরন্দরাচার্য। পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এলেন রাজদরবারে। সকল বিষয় ব্যক্ত করলেন কিন্তু প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। কোথায় যেন একটা ছন্দপতন হল। অত্যন্ত মানসিক দুশ্চিন্তার শিকার হয়েছিলেন তখন কন্দর্পনারায়ণ। এত চিন্তা যে সেদিন কাব্যচর্চার ফাঁকে ফাঁকে যেন মোগলবাহিনীর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন, মোগল

তুললেন ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

তারপর সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিতেই তিনি লিখলেন আর একটি অনবদ্য উপন্যাস—নটী। এ ছাড়া অমৃত সঞ্চয় ('চম্পা তার নাম') নামে ধারাবাহিকভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত) বায়স্কোপের বাক্স, সন্ধ্যার কুয়াশা, লায়লী আশমানের আয়না ('সংঘর্ষ' নামে হিন্দীভাষায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত) সুভগা বসন্ত, প্রেমতারা, কত রাধিকা ফুরালো (শারদীয়া দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত) প্রভৃতি তাঁর সারগর্ভ সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে। আকাশছোঁয়া এবং অগ্নিশিখা নামক চলচ্চিত্র দুটি তাঁরই কাহিনী অবলম্বনে রূপ নিয়েছে।

সেনানীর হাতের উন্মুক্ত তরবারি থেকে অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরছে—এই ধরণের কোন ভয়াবহ দৃশ্য হয়তো তখন মনে মনে দেখে শিউরে উঠছিলেন। ঠিক যথাযথভাবে সম্বর্ধনা জানাতে পারলেন না সপুত্রক পরন্দরাচার্যকে। আপ্যায়নে দায়-সারা ভাবটা এসে গেল। আঘাত লাগল পুরন্দরাচার্যের বুকে। তিনি ধরলেন এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। মধুসূদন বয়সে নিতান্ত বালক বলেই তাঁদের এই অবস্থা।

বিচার না করেই কন্দর্পনারায়ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। এ অসম্মান সহ্য করা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। এ অসম্মান তীব্রভাবে বুকে বাজল মধুসূদনেরও। নিজের অসম্মানের থেকেও পিতার অসম্মান বালককে আরও অধিকতর সচেতন করে তুলল।

এই অসম্মানই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল মধুসূদনের। তাঁর সমগ্র জীবনের গৌরবময় ইতিহাসের এ যেন অমলিন দীপ্তিতে বিরাজিত প্রচ্ছদপট। এই অসম্মানের জ্বালাই এঁকে দিল তাঁর মধ্যে এক গভীর উপলব্ধি। সে উপলব্ধি শুধু গভীরই নয়, শাশ্বতও। রাজসভা থেকে প্রত্যাগমনের কালে নৌকোয় বসে বালক উপলব্ধি করলেন—যে মানুষের মনোরঞ্জনের থেকে ঈশ্বরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা সঙ্গত। রাজার অনুগ্রহ থেকে রাজার রাজার অনুগ্রহ অনেক অনেক মূল্যবান। ভিতরে বৈরাগ্য দেখা দিল। জীবনের মোড় ঘোরা তখনই সুরু হয়ে গেল।

জন্মভূমি উনসিয়া গ্রাম। এখানকার ফরিদপুর জেলার কোটালিপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত। যে বংশে মধুসূদনের জন্ম সে বংশ সারা বাঙলায় ন্যায় ও বেদ-বেদান্ত চর্চার জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধ এবং বিপুল শ্রদ্ধার অধিকারী ছিল। অনেকানেক দিকপাল পণ্ডিত তাঁদের আপন আপন প্রতিভার আলোয় বংশের ঐতিহ্য ও মর্যাদাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে গেছেন। পুরন্দরাচার্যেরও কবি ও শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধির অন্ত ছিল না। তাঁর [illegible] পুত্র মধুসূদন।

১৫২৫ সালে মধুসূদনের জন্ম। ভারতবর্ষে পাঠান রাজত্বের কাল তখন একেবারে সমাপ্তির মুখোমুখি। মোগলের পদধ্বনি তখনই শোনা যাচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তখনও ধরাধামে প্রকট। আট বছর বয়েসে অর্থাৎ যে সময় মহাপ্রভুর নশ্বর লীলার অবসান হচ্ছে—মধুসূদনের বিদ্যাচর্চা সুরু হ'ল। কবি প্রতিভার হ'ল উন্মেষ। চার বছরের সাধনায় অসাধারণ শক্তির অধিকারী হলেন মধুসূদন। সে ঘটনা পূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের আদর্শে তিনি পরিপূর্ণরূপে সাত। মহাপ্রভু তাঁরও কাছে সাক্ষাৎ অবতার। জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা এবং মতাদর্শে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন মধুসূদন। মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথই তাঁর কাছে তমঃ থেকে মহত্তমে উপনীত হওয়ার সরণি বলে বিবেচিত। তা ছাড়া সেদিন নব্যন্যায়ের স্রোতে ভাসমান নবদ্বীপ। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রচর্চা এবং বিদ্যাবত্তার জন্যে ভারতে এক শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে নবদ্বীপ।

মধুসূদনের জীবনে এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সাথে অকাট্য যুক্তিবাদী মন, তীক্ষ্ণ তীব্র বিশ্লেষণধর্মী মনোভাবের সঙ্গে পরিপূর্ণ সমর্পণের এক ঐকান্তিক আকুলতা।

বারো বছর বয়সেই গৃহত্যাগ করলেন মধুসূদন। পিতৃহৃদয়ের হাহাকার দিয়ে পুত্রের দুর্বার অগ্রগতির পথ রোধ করলেন না পরন্দরাচার্য। সমস্ত বেদনা বুকে চেপে প্রাণ খুলে পুত্রের অগ্রসরণের পথে আশীর্বাদ জানালেন। পুত্রের কোন সঙ্কল্পপূরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় তাঁর নেই।

বালক মধুসূদন গৃহত্যাগ করে এলেন। পিছনে পড়ে রইল স্নেহপ্রীতিপূর্ণ আত্মপরিজন, শান্তির সুখনীড়—সামনে শুধু অনিশ্চিতের মেলা অজানার হাতছানি।

কত পথ অতিক্রম করে এলেন। অতিক্রম করে এলেন কত প্রান্তর। সামনে পড়ল মধুমতী। স্ফীতকায়া, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গসঙ্কুলা। পার হওয়ার কোন উপায় নেই। অথচ পার হতে হবেই কারণ এ অবস্থায় পিছনে ফেরা আর চলে না। লৌকিক চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ হয়, সেখানেই অলৌকিকের অন্বেষণ। স্বয়ং জাহ্নবীর ধ্যান সুরু করলেন। বালক-হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করলেন ঐকান্তিকভাবে—হে দেবী, তুমি প্রসন্ন কর, আমার মনস্কামনা পরিপূরণের বাধা অপসারণ করে দাও।

প্রসন্না হলেন দেবী গঙ্গা। আবির্ভূতা হলেন ভক্তের সামনে। করুণাঘন শান্তমরতি। আশীর্বাদ করলেন। শুধু এই নদী নয়—ভবনদীও। দেবীর আশীর্বাদ বিফল হওয়ার নয়। হঠাৎ দেখা গেল ধীবরদের একটি নৌকো আসছে দ্রুতগতিতে। অসহায় বালককে তারা ফেলে যেতে পারল না। তুলে নিল নৌকোয়।

নবদ্বীপে সেদিন পণ্ডিত মথুরানাথ দিকপাল নৈয়ায়িক। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা সেদিন আকাশচুম্বী। ন্যায়শাস্ত্রের গুরুরূপে মধুসূদন বরণ করলেন মথুরানাথকে। মথুরানাথেরও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বালকের এ কি আশ্চর্য ক্ষমতা। অতীব দুরূহ জটিল তত্ত্বগুলি এত অল্প বয়সে অচিরে আয়ত্তে এনে ফেলল বালক। গুরুর ভাণ্ডার যে সবই উজাড় করে নিল শিষ্য। গুরুর তখন একাধারে বিস্ময়, একাধারে আনন্দ।

নবদ্বীপ থেকে বারাণসী। ভারতের পুণ্যভূমি। রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে ভারতের কোন প্রদেশ নয়, ভারতের আত্মা। শাশ্বত ভারতের প্রাণকেন্দ্র। ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থান বারাণসী। বেদান্তচর্চার জন্যে এখানে এলেন মধুসূদন। ভাবতেও অবাক লাগে যে সেদিন নবদ্বীপ থেকে বালক মধুসূদন বারাণসীতে এলেন পদব্রজে। সুতরাং কত দীর্ঘ সময় যে এ বাবদ লেগেছিল তা সহজেই অনুমেয়। অপরিসীম অধ্যবসায় এবং দৃঢ় তন্ময়তাই

ছিল তাঁর পাথেয়। কাশীধামে সেদিন ধুরন্ধর পণ্ডিতদের মিছিল চলছে। দিক-পাল শিরোমণিদের পাণ্ডিত্যের দীপ্তিতে সমগ্র বারাণসী সেদিন উদ্ভাসিত। উপেন্দ্র-তীর্থ, মাধবসরস্বতী, নারায়ণ ভট্ট, অমর দীক্ষিত, জগন্নাথ আশ্রম, নৃসিংহাশ্রম, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী, কৃষ্ণতীর্থ, রামতীর্থ প্রভৃতি আপন আপন প্রতিভার সৌরভে সমগ্র কাশীধাম সেদিন আমোদিত করে রেখেছেন। বেদান্তকেশরী রাম-তীর্থের চরণেই শিষ্য হিসাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন মধুসূদন। তারপর মীমাংসাশাস্ত্রও আয়ত্তে আনলেন মাধব সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

শাস্ত্র তো আয়ত্তে এল, এল যশ, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। প্রতিভা পূর্ণতা পেল। পাণ্ডিত্যের এল পরিপূর্ণ স্বীকৃতি। কিন্তু মন ভরছে না কেন—মন আরো কি যেন চায়—এত প্রাপ্তির পরেও মনে শূন্যতার সমারোহ কেন—কিসে সেই শূন্যস্থান পূরণ হতে পারে।—মধুসূদনের চিত্তে তখন আকুলতার ও জিজ্ঞাসার তরঙ্গ চলছে। সেই পরমের একটি স্পর্শ—যা উপশম করতে পারে এই বিরাট তিয়াসা। সেই স্পর্শ উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন মধুসূদন। শুকনো পাণ্ডিত্য নিয়ে আমি কি করব, কি হবে আমার যশ-খ্যাতি নিয়ে, তোমার অমৃতকণার একটুখানি কণাও যদি আমি না পেলুম—তা হ'লে যে আমার এ জীবনই ব্যর্থ, নিষ্ফল।

উপলব্ধি আসে মধুসূদনের। অনুভূতির রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। চেতনার লক্ষপ্রদীপে দীপ্যমান হয়ে ওঠে ব্যাকুল মন। সব কিছুর সার পরিণতি তুমি, জগত অনিত্য, মানুষ অনিত্য, কিন্তু তুমি নিত্য, তুমি ধ্রুব, তুমি সত্য, তুমি অভঙ্গুর, আমি তোমাকে চাই, তুমি ছাড়া আমার প্রার্থিত বস্তু এই অনিত্য জগতে আর কিছু নেই। আধ্যাত্মিক পিপাসা ক্রমশই বিরাট থেকে বিরাটতর হতে থাকে। কোথায়—কোথায় সেই পিপাসা নিবারণের উৎস।

গেলেন বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর কাছে। অকপটে নিবেদন করলেন অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বেশ্বরও দেখতে চাইলেন যে শিক্ষার মানসিক প্রস্তুতি কতটা গভীর হয়েছে। এ সত্যিই আকুলতা না একটা ক্ষণকালের উচ্ছ্বাস। সেটা ভাল করে বুঝতে চান বিশ্বেশ্বর। উপদেশ দিলেন গীতার একখানি টীকা রচনা করতে।

রচনা করলেন একটি অনবদ্য টীকা। পরম পবিত্র শ্রীশ্রীগীতার এক নতুন ভাষ্যের সৃষ্টি করলেন। সমন্বয় ঘটালেন অকৃত্রিম ভক্তিরসের, অপরূপ বিশ্লেষণী শক্তির এবং অসাধারণ মনীষার।

যমুনার তীরে স্বীয় সাধনক্ষেত্র রচনা করলেন। ঘটল এক আলৌকিক কাণ্ড। সম্রাট-মহিষী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিছুতেই রোগের উপশম হচ্ছে না। প্রাণসংশয় পীড়া। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন যমুনার তীরে এক সন্ন্যাসীর কৃপায় তাঁর রোগমুক্তি ঘটেছে। যাচাই করে দেখলেন। হাতে হাতে পেলেন ফল। মহিষীর রোগমুক্তিতে খুশিতে ভরপুর সম্রাট আকবর। কিছুই আজ তাঁর অদেয় নেই এই তরুণ তাপসকে। কিন্তু সম্রাটের সম্রাট যাকে কৃপা করেছেন সম্রাটের অনুগ্রহের দাম তার কাছে কতটুকু?

কাশীর চৌষট্টি যোগিনী ঘাটে তাঁর অবস্থান। তাঁর নিকট প্রতিবেশী আর এক ভারতপূজ্য সাধককবি। রাম-সীতা চরিত্রের এক অনন্য প্রবক্তা। তিনি তুলসীদাস। যাঁর রামায়ণ ধর্ম ভারতীয় শাশ্বত সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। তাঁর ভক্তি সমগ্র ভক্তিমার্গের এক দিগন্তের পরিধি বিস্তার করেছে। কিন্তু একটি দিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। সোচ্চার প্রতিবাদে তারা মুখর করে তুলল দিগ্‌দিক। তাদের অভিযোগ তুলসীদাস সংস্কৃতভাষার পরিবর্তে কেন হিন্দীতে তাঁর কাব্যের প্রচার করছেন—মধুসূদন সরস্বতী এসে দাঁড়ালেন বিপন্ন কবির পাশে। তীক্ষ্ণ যুক্তিতে, বলিষ্ঠ বিশ্লেষণে তুলসীদাসের পক্ষ তিনি সমর্থন করলেন। সমস্ত অভিযোগের ঢেউ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কাশীতে প্রাণসংশয় হয়ে দাঁড়াল—হিন্দুসন্ন্যাসীদের। একশ্রেণীর ধর্মান্ধ মুসলিম সম্প্রদায় উন্মত্ত আচরণ চালাতে লাগলেন হিন্দু সাধুদের উদ্দেশে। ধর্মের দোহাই পেড়ে হিন্দু সাধুদের নিধন-যজ্ঞের অগ্নিশিখা বেশ লেলিহান হয়ে উঠল। নির্বাক দর্শক হয়ে তা অবলোকন করা সম্ভবপর হ'ল না মধুসূদন সরস্বতীর পক্ষে। আকবরের অন্যতম অমাত্য টোডরমলের একদিন প্রতিপত্তি সম্মান বাঁচিয়েছিলেন মধুসূদন। আকবরের মত টোডরমলও মধুসূদনের প্রতি ছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। মধুসূদনের ইচ্ছানুসারে তিনি ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করলেন। সমাপ্ত হ'ল উন্মত্ত তাণ্ডবলীলার। শান্ত হ'ল বারাণসী।

নবদেহে একশ সাত বছর বর্তমান ছিলেন মধুসূদন। ১৬৩২ সালে হরিদ্বারে তিনি সম্বরণ করলেন নশ্বরলীলা। দিল্লীর সিংহাসনে তখন সমাসীন সম্রাট শাহজাহান।

বিগত-আগত-অনাগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র

বর্তমান অতীতেরে ডাকি দর্পে কয়
"আমি সত্য, তুই মৃত, তুই কেহ নয়॥"

অতীত অধীর ক্রোধে কহে বর্তমানে
"আমি না মরিলে তুই বাঁচিস কেমনে?"

ভবিষ্যৎ হেলাভরে কহিল দোঁহারে
"চিরস্থায়ী আমি একা ভুবন মাঝারে॥"

মহাকাল ভাবে এরা জানিবে কেমনে
সত্য ও শাশ্বত কেবা এই ত্রিভুবনে।

একটি সাড়াজাগানো হত্যাকাণ্ড

ইতিহাসে দ্রাগা ম্যাসিনই বোধহয় একমাত্র নারী, যে একজন রাজাকে ভালবাসার অপরাধে দেশের লোকের কাছ থেকে পেয়েছিল অপরিমেয় ঘৃণা। যার পরিণতি মর্মান্তিক মৃত্যুতে।

১৯০৩ খৃস্টাব্দে এই সব ঘটনা ঘটে যার বিবরণ আজ আপনাদের কাছে পেশ করতে বসেছি।

১৮৬৬ খৃস্টাব্দে সার্বিয়ার এক কৃষক পরিবারে দ্রাগার জন্ম হয়েছিল। সে সময় সার্বিয়ার শাসনভার ছিল রাজবংশীয়দের হাতে, নামত তাঁরা কনস্ট্যান্টিনোপলের মুসলমান সুলতানের অধীন হলেও কার্যত তাঁরা ছিলেন স্বাধীন।

ছোট্ট দেশ হলে কি হয়, রাজনৈতিক দলাদলির কোন অভাব ছিল না, বিশেষ করে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী বংশের মধ্যেই এ বিষয়ে রেশারেশি ছিল সবচেয়ে তীব্র। সম্ভ্রান্ত এই পরিবারদ্বয়ের নাম ছিল যথাক্রমে ক্যারাজেরোজেভিচ ও অবরেনোভিচ। বহু দিনাবধিই সার্বিয়ার শাসনাধিকার নিয়ে এই দুই বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে খেয়োখেয়ি লেগেছিল, অবশেষে ১৮৮২ খৃস্টাব্দে 'প্রিন্স মিলান অবরেনোভিচ পূর্ববর্তী শাসনকর্তাকে হত্যা করে গদী দখল করে নেন এবং সুলতানকে একেবারে হঠিয়ে দিয়ে নিজেকে সার্বিয়ার সার্বভৌম রাজা বলে ঘোষণা করেন।

সরকারী দফতরে দ্রাগার বাবা ছোটখাট কোন একটা কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত পাগলাগারদে যখন তার মৃত্যু হয়, তখন স্ত্রীপুত্রের জন্য বিশেষ কিছুই ছিল না।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটার বিয়ে দিতে চাইলো সকলে এবং তার ফলে মাত্র সতেরো বছর বয়সেই দ্রাগার বিয়ে হয়ে গেল, ম্যাসিন পদবীধারী এক মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে।

খুব স্পষ্ট ধরা পড়লো নবপরিণীত বরের অদম্য সুরাসক্তি, মাঝে মাঝেই তরুণী বধূকে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হত প্রহার এড়াবার জন্য।

কিন্তু তা বলে মাতাল স্বামীর সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি করেনি মেয়েটি, তবে খুব বেশীদিন তাকে এই জীবন-যাপন করতে হয়নি; বিয়ের মাত্র বছর খানেক পরেই মারা গিয়েছিল ম্যাসিন।

রেবা দেবী

এরপর কিছুদিন বেশ কষ্ট করেই সংসার চালাতে বাধ্য হয় তরুণী বিধবা তবে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে তার ভাগ্যে এক বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল।

রাজা মিলানের ধর্মপত্নী রাণী নাতালীর সুনজরে পড়ে গেল সে অকস্মাৎ, রাণী তাকে নিজের অন্যতমা সহচরী করে নিলেন।

রাণীর সহচরী বা লেডি ইন ওয়েটিং রূপে দ্রাগাকে ঘনঘনই প্রাসাদে থাকতে হত এবং হয়ত এরই ফলে চারদিকে কানাকানি শোনা যেতে লাগলো যে রাজা নাকি দ্রাগাকে উপপত্নী স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এ গুজবে কত সত্যতা কিছুই ছিল না, কারণ রাজা মিলান যদিও যথেষ্ট পরিমাণ লাম্পট্যের অধিকারী ছিলেন তবু তাঁর দৃষ্টি প্রায়ই নিবদ্ধ থাকতো ফরাসী রঙ্গালয়ের সুন্দরী ও কৌতুকময়ী তরুণী-অভিনেত্রীদের প্রতি।

স্পেনের সমুদ্রোপকূলে বিয়ারিজ নামে স্বাস্থ্য নিবাসটির জনপ্রিয়তা তখন খুব বেশী, ১৮৯০ খৃস্টাব্দে রাণী নাতালীর সঙ্গে দ্রাগা গিয়েছিল সেখানে।

স্বামীর মৃত্যুর পর কিভাবে কাল কাটাচ্ছিল সে? জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করা চললে বলা যায় যে, সে জীবন খুব গৌরবের নয়, সত্যি বলতে কি কোন দুর্নামই সে সময় তার পক্ষে খুব অসম্ভব বলে বিবেচিত হত না। লোকে বলত টাকার জন্য সে সব কিছুই করতে পারে এবং প্রকৃত পক্ষে একাধিক পুরুষের কাছে দেহ বিক্রয় করেই নাকি সে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করত।

হয়ত এই জনশ্রুতির অনেকটাই সত্য, কারণ সুন্দরী ও অনাথা একটি মেয়ের পক্ষে অর্থোপার্জনের এই পথটাই তো সবচেয়ে সুগম।

তবু একটা কিন্তু থেকেই যায়, এই ধরণের যার চরিত্র সে মেয়েকে নাতালীর মত ধর্মপরায়ণা এক মহিলা কি করে নিজের সঙ্গিনী হিসাবে মনোনীতা করেছিলেন?

সে যাই হোক, এই সময় থেকেই দ্রাগার শ্বশুরকুল তাকে ঘোরতর সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখতে থাকেন বিশেষ করে তার ভাসুর কর্নেল আলেকজাণ্ডার ম্যাসিন তার শত্রুতা করতে থাকেন পুরোদমে।

১৮৮৯ খৃস্টাব্দে রাজা মিলান, বুলগেরিয়ার সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরাজিত হওয়ার পর সিংহাসন ত্যাগ করলেন, নিজের বারো বছরের বালক পুত্র আলেকজাণ্ডারের স্বপক্ষে।

দ্রাগা ম্যাসিনের সঙ্গে নবীন রাজার পরিচয় ঘটেছিল অবশ্য আরও কয়েক বছর পরে: আলেকজাণ্ডার

তখন আঠারো বছরের তরুণ যুবক, দ্রাগার চেয়ে ঠিক দশ বছরের ছোট।

নবীন রাজার চেহারা মোটেই ভাল ছিল না। শরীরের উপরিভাগ অত্যন্ত স্থূল। নীচের ভাগ সরু, মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। চোখে একজোড়া পিসনে চশমা চেন দিয়ে যা আবদ্ধ থাকত তাঁর পোষাকের সঙ্গে।

অল্পবয়সে সুন্দরী বলে খুব খ্যাতি ছিল দ্রাগার, যদিও যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন বেশ একটু মোটা হয়ে পড়েছিল সে।

মোটাসোটা বাঁটুলের মত চেহারা, মিলিটারী ফ্যাসানের আদর্শে তৈরী পোষাক, গর্বিত চাল চলনে, নকল আভিজাত্যের একটা খোলস পরে থাকত যেন সে, রাজা ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই হেসে বাক্যালাপ করতে দেখা যায়নি তাকে সে সময়।

রাজা যে প্রথমাবধিই মুগ্ধ হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ মাত্র নেই. দ্রাগাকে নিজের করে নেওয়ার জন্য উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। তাঁর তরফে বিস্ময়কর হলেও একথা সত্যি যে, খুব সহজে ধরা দেয়নি দ্রাগা, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল রাজাকে সেজন্য।

সে যাই হোক, অবশেষে রাজপ্রাসাদের খুব কাছেই একটি ছোট অথচ সুন্দর বাড়ীতে প্রেয়সীকে প্রতিষ্ঠিত করলেন আলেকজাণ্ডার, নিয়মিত দু'বেলা যাতায়াতও সুরু করে দিলেন সেখানে। রাজরক্ষিতা হিসাবে চিনলো সবাই তাকে।

এইভাবে কিছুদিন কাটার পর হঠাৎ দেশশুদ্ধ সকলকে হতবাক করে দিয়ে রাজা ঘোষণা করলেন যে, অবিলম্বে তিনি দ্রাগাকে বিয়ে করে রাণীরূপে বরণ করতে চান।

আলেকজাণ্ডার আরও জানালেন যে, প্রেমের কাছে সিংহাসন তুচ্ছ, দ্রাগাই তাঁর জীবনে একমাত্র বরেণ্যা রমণী, তাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি রাজত্ব ত্যাগ করতেও নাকি দ্বিধামাত্র করবেন না।

স্বভাবতই তাঁর মন্ত্রিবর্গ ও অপরাপর সভাসদেরা তরুণ রাজাকে নিবৃত্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন, দ্রাগাকে গোপনে দেশান্তরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে গেল কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাজা সব টের পেলেন, বানচাল হয়ে গেল সব পরিকল্পনা, উপরন্তু এবার সরাসরিই দ্রাগাকে নিজের ভাবী পত্নীরূপে ঘোষণা করলেন তিনি।

মহিলাটির আঙুলে এনগেজমেণ্ট রিং প্রকাশ্যেই ঝলমল করে উঠলো।

প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সমস্ত দেশ, কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে রাশিয়ার মহামান্য জার এগিয়ে এলেন প্রেমিকযুগলের সাহায্যে, এ বিবাহকে বৈধ বলে ঘোষণা করলেন তিনি, আর নিজে যোগ দিলেন বিবাহোৎসবে। ১৯০০ খৃস্টাব্দে গ্রীষ্মের এক উজ্জ্বল প্রভাতে আলেকজাণ্ডার বরণ করে নিলেন প্রেয়সীকে পত্নীরূপে।

খুব ছোটঘর থেকে এলেও দ্রাগা যে ভাল বধূ বা মাতা হ'ত না একথা কে জোর করে বলতে পারে, কিন্তু তার অদৃষ্ট তাকে সে সুযোগ দিল না।

শত্রু পক্ষ এই দম্পতিকে মুহূর্তের জন্যও শান্তি দেয়নি।

নানা ধরণের নোংরা গাল-গল্প গুজব ছড়াতে লাগলো নববধূর নামে, তরুণ রাজাকে সর্বনাশী কুহকে মজানো এক অলক্ষ্মী নারী ব্যতীত আর কোন চোখে দ্রাগাকে বিচার করে দেখতে রাজী হল না দেশের লোক।

দ্রাগার সন্তানহীনতা ও চরিত্রহীনতার নজিরস্বরূপ প্রতিভাত হল সাধারণ প্রজাবর্গের চোখে।

আরও শোনা গেল যে এই দুশ্চরিত্রা রমণী নাকি তার এক অপদার্থ ভাইকে রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই গুজবের পেছনে কোন সত্যই ছিল না, কিন্তু দেশবাসীর ঘৃণার আগুনে ইন্ধন জোগাতে এর কার্যকারিতা কম ছিল না।

রাজার বিরুদ্ধে দেশের সব শ্রেণীর মানুষই যেন এক হয়ে দাঁড়াল।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও যেন ভেঙ্গে পড়তে বসলো, এই অবস্থায় ষড়যন্ত্র গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, আর হলও তাই ১৯০৩ খৃস্টাব্দে একদল তরুণ সামরিক অফিসার গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ হল সশস্ত্র সামরিক বিপ্লবের জন্য।

এই বছরেরই জুন মাসের দশ তারিখে মন্ত্রিসভায় বিপর্যয় ঘটার উপক্রম ঘটলো। মন্ত্রীরা একে একে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, রাত দশটা নাগাদ রাজা ও রাণী প্রাসাদের সামনের খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এসে পাশাপাশি বসলেন, বলা বাহুল্য এই দৃশ্যে ক্রুদ্ধ জনতা আরও চঞ্চল হয়ে উঠলো, প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্ববর্তী থমথমে ভাব যেন আকাশে বাতাসে।

ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে একদল সন্ধ্যা থেকেই সার্বিয়ান ক্রাউন নামে সরাইখানায় বসে মদ্যপান করতে করতে নানান রকম মতলব আঁটছিলো, মধ্য রাত্রির কিছু আগেই এরা বেরিয়ে পড়লো রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে।

রাস্তা দিয়ে কলরব করতে করতে যাওয়ার সময় এদের দল বৃদ্ধি ঘটলো উল্লেখ্যভাবে, একদল সশস্ত্র সামরিক অফিসার এসে যোগ দিলেন এদের সঙ্গে, এই শেষোক্ত দলের অধিনায়ক কর্নেল আলেকজাণ্ডার মাসিন।

প্রাসাদে পৌঁছনোর পর দেখা গেল, পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থার কিছু রদবদল ঘটেছে। প্রাসাদের একজন রক্ষী কথামত সদর-দরজা খুলে না রাখার বিদ্রোহীরা ডিনামাইট দিয়ে দরজাটি উড়িয়ে দিতে বাধ্য হল।

দারুণ আওয়াজ হলেও আশেপাশের বাসিন্দারা কেউ বিশেষ ব্যস্ত হল না, তবে প্রাসাদের লোকজনরা সকলেই সজাগ হয়ে গেল।

বিস্ফোরণের ফলে প্রাসাদের বিজলী সরবরাহের ভাণ্ডারটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল, ফলে মুহূর্তের মধ্যে

সমগ্র প্রাসাদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে আসা হল, বিদ্রোহীরা ছড়িয়ে পড়ল প্রাসাদের সর্বত্র, রাজা ও রাণীর খোঁজে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে চললো এই অনুসন্ধান, অবশেষে রাজার শয়ন-কক্ষে পৌঁছলো তারা, বৃহৎ কক্ষে যুগলশয্যা আস্তৃত, মনে হয় কিছু আগেও কেউ শুয়েছিল তাতে, কিন্তু এখন শূন্য বিছানার পাশে ছোট একটি টেবিলের উপর উপুড় করে রাখা আছে এক ফরাসী উপন্যাস, রাজার নিদ্রা পূর্বের খোরাক।

রাজা ও দ্রাগা অবশ্য খুব বেশী দূরে ছিলেন না, শয্যাকক্ষের লাগোয়া এক ক্লোজেট বা বস্ত্ররুমে লুকিয়ে ছিলেন তাঁরা, ছড়ানো পোষাক-আসাকের আড়ালে, কতবার বিদ্রোহীদের পায়ের শব্দ এগিয়ে এসে আবার দূরে চলে গেল এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁরা বেঁচেই যেতেন যদি ক্লোজেটের ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে একজন রক্ষীকে দেখতে পেয়ে দ্রাগা চেঁচিয়ে না উঠতো।

অসম্ভব একটা আশায় বুক বেঁধে সে চেঁচিয়ে উঠলো—'এস তোমাদের রাজাকে বাঁচাও।'

উত্তরে তাকে লক্ষ্য করে প্রহরী একটি গুলি ছুঁড়লো, তারপর সে দৌড়ে গিয়ে অনুসন্ধানকারীদের জানালো রাজা-রাণীর গোপন কক্ষে অবস্থান করার খবর।

বড় বড় কুঠার নিয়ে আসা হল, দমাদম ঘা পড়তে লাগলো, অচিরেই ছোট ঘরটির দরজা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল, রাজদম্পতি বেরিয়ে এলেন।

অবিন্যস্ত বেশভূষায় এবং ভয়ের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ দুটিকে দেখে শ্রদ্ধার বদলে অশ্রদ্ধাই জেগে উঠলো সকলের মনে, অন্তত রাজার রাজকীয় মহিমার কিছুই তখন আর অবশিষ্ট ছিল না।

তারা কি দয়া ভিক্ষা করেছিল? ঠিক জানা যায় না কিন্তু করে থাকলেও দয়া তারা পায়নি।

রিভলবারে খট করে আওয়াজ উঠলো, রাজা আলেকজাণ্ডার ঢলে পড়লেন দ্রাগার বাহুর মধ্যে।

আবার গর্জন করে উঠলো ছোট মারণাস্ত্রটি, দ্রাগা পড়ে গেল মাটিতে বিগতপ্রাণা হয়ে, কিন্তু এতেই প্রশমিত হল না আক্রমণকারীদের ক্ষোভ, গত-প্রাণ দেহ দুটিকে যতভাবে পারা যায় লাঞ্ছিত করে, উলঙ্গ অবস্থায় সে দুটিকে ছুঁড়ে ফেলা হল রাস্তায়, জানালা দিয়ে।

আরও ভয়াবহ ব্যাপার, এই যে, রাজা নাকি তখনও জীবিত ছিলেন, জানালা দিয়ে বাইরে পড়ার সময় একহাতে চেপে ধরেছিলেন, জানালার ধারী। এক সৈনিক তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দিয়ে কোপ বসালো সেই হাতের উপর, মাটিতে পড়ার পরও নাকি রাজার হাত আঁকড়ে ধরেছিল আসেপাশের ঘাস, মৃত্যুর পূর্ববর্তী আক্ষেপে।

ভয়াবহ সেই রজনীর অবসানে নতুন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো বেলগ্রেডের প্রাসাদ প্রান্তরে, প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার রাজদূত এসে দেখা দিলেন অকস্থলে, রাজ-প্রাসাদের ঠিক সামনে তাঁর বাসস্থান থাকায়, পর্দার আড়াল থেকে সব কিছু দেখেছিলেন তিনি।

তাঁর কথামত শবদেহ দুটিকে পথ থেকে তুলে আবার প্রাসাদে নিয়ে আসা হল এবং পরে সমাধিস্থ করার জন্য পাঠানো হল।

সেই রাত্রেই রাজার অনুগামী আরও কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে রাজ্যের দু'জন মন্ত্রী ও দ্রাগার দুই ভাইও ছিল।

সে রাত্রের ঘটনার জন্য রাজধানী বেলগ্রেডে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, জনসাধারণ বেশ প্রসন্ন-ভাবেই সমস্ত ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছিল, বরং পার্লামেন্টের এক বিশেষ অধিবেশনে সে রাত্রির বিদ্রোহীদের দেশের মুক্তি-দাতারূপে অভিনন্দিত করা হল।

কিন্তু সমস্ত দুনিয়া এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে একবাক্যে নিন্দা করে-ছিল; বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ডে এর প্রতি-ক্রিয়া যথেষ্টই তীব্র হয়েছিল; ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড বলেছিলেন, আমি তীব্র ভাষায় এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করি, মানুষ হিসাবে এবং রাজা হিসাবে স্বতই এ ধরণের ঘটনার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে আমি বাধ্য।

রাজা আলেকজাণ্ডারের স্বপক্ষে এটুকু নিশ্চয় বলা যায় যে, প্রেমিক হিসাবে তিনি অন্তত খাঁটি ছিলেন, যে নারীকে তিনি ভালবেসেছিলেন তার জন্য জীবন দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রমাণ করে গেলেন যে, প্রেম সত্যই অবিনশ্বর।

হে বিমুগ্ধ ভালবাসা

বরুণ মজুমদার

হে বিমুগ্ধ ভালবাসা, হে আমার ক্লান্ত প্রতিবেশী,
ফোটাও রজনী শেষে ভোরের সে নন্দিত গোলাপ
অন্ধকার আছে বলে আমি একা সীমান্ত সরণি
হেঁটে যাবো প্রেমিকের মত সেই গোপন আশায়।
এখন আলোর দীপ হাতে নিয়ে কে আসবে ঘরে
মানুষের মন থেকে অন্ধকার মুছে দিতে হবে।
কেন না মানুষ তার অতীতের সব গ্লানি ভুলে
রমণীয় হবে বলে প্রতিশ্রুত আছে সারাদিন।

এখন নদীর প্রান্তে তোমরা কেউ ডেকো না আমায়
এখন ঝড়ের সাথে মুখোমুখি হতে হবে তাই
সমস্ত দেনা নিয়ে বসে আছি ফুলের মেলায়—
একটি নতুন ফুল বাগানের ফোটাবো আবার।

হে বিমুগ্ধ ভালবাসা, হে আমার রমণীয় স্মৃতি
বিপন্ন দুঃখের কাছে এইবেলা ডেকো না আমায়।

চেক [illegible] টাকার নোটও নয়, স্রেফ্ দশ টাকার নোটের তাড়া। হয়তো হৈমবতী ওটাই সুবিধে বুঝেছিলেন।

সরোজাক্ষ সেই তিন তাড়া নোটের দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বলেন, 'কী এ?'

সারদাপ্রসাদ যেন শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরতে যাচ্ছে।

সারদাপ্রসাদের ভঙ্গীতে অন্তত সেই ব্যস্ততা। নোটের তাড়া তিনটে সরোজাক্ষর সামনে ফেলে দিয়ে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যেতে যেতে বলে যায়, কিছু না কিছু না। একজন পাবলিশার প্রথম খণ্ডটা নিয়ে—হাজার তিনেক টাকা অ্যাডভান্স দিলো, তাই—'

সারদাপ্রসাদের কণ্ঠে অনায়াস তাচ্ছিল্যের সুর। যেন হাজার তিনেক টাকাটা কিছুই না, যেন সেটা খোলাম্-কুচির সমগোত্র, তাকে পকেট থেকে বার করে যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়ার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই।

পালিয়ে গিয়ে অবশ্য পরিষ্কার করে কি, ভাবতেও সময় লাগে বেচারার।

বুকের ধড়ফড়ানি কমলে তবে ভাবে, নাঃ মিথ্যে কথাটা আর কি? 'পাবলিশার', বলতে দোষ কোথায়? বাংলায় তবু 'প্রকাশিকা' বলে একটা শব্দ আবিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু ইংরিজি ভাষায়, ওই পাবলিশার' শব্দটার 'নারী সংস্করণ' কী হওয়া উচিত তা' যখন সারদাপ্রসাদের জানা নেই, তখন পাবলিশার ছাড়া আর কী বলবে সে?

তবে হ্যাঁ, মনে মনে মাথাটা নাড়ে সারদাপ্রসাদ, ওই 'দিয়েছে' শব্দটা উচ্চারণ করা গর্হিত হয়েছে। 'দিয়েছেন' বলা উচিত ছিল। কিন্তু কেমন গোলমাল হয়ে গেল। যাক্ গে ভবিষ্যতে যাতে না জিভটা অমন অসতর্ক হয়ে বসে হুঁশ রাখতে হবে।

তা সারদাপ্রসাদ যাই ভাবুক, সরোজাক্ষ সেই নোটের তাড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবেন, 'সারদা কি শেষটায় চুরি-ডাকাতি ধরলো নাকি?'

সারদার সঙ্গে ওই 'চুরি-ডাকাতি' শব্দটা খাপ-খাওয়ানো সহজ নয়, কিন্তু এটাই কি বিশ্বাস করা সহজ, সত্যি সত্যিই কোনো প্রকাশক ওকে তিন

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

তিন হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বসেছে। কথায় ভুলে টাকা খসাবে, 'ব্যবসাদাররা' এমন কাঁচা ছেলে নয়।

তবে আর কি?

ইদানীং যে সারদা উপার্জনের চেষ্টায় ঘুরছে সেটা সরোজাক্ষ বিজয়ার সুতীব্র এবং সশব্দ স্বগতোক্তির কল্যাণে নিজের এই 'আত্ম-নির্বাসন' কক্ষে অবরুদ্ধ থেকেও টের পেয়েছেন, [illegible] সেই 'চেষ্টা'র গাছে যে সহসা এতোখানি ফল ধরে, সে ফল একেবারে পেকে উঠেছে, তাই বা বিশ্বাস করা যায় কি করে?

টাকাটা যে সারদাপ্রসাদ কোনো অ-লৌকিক পথে পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নাস্তি, কিন্তু অবোধ লোকটা কার খপ্পরে পড়লো সেটাই তো চিন্তা।

তা'ছাড়া সরোজাক্ষর এই আচরণটাও চিন্তার। এনে ফেলে দিয়েই ছুটে পালাবার হেতুটা কি?

লজ্জা?

হতে পারে।

কতকগুলো ব্যাপারে অহেতুক লজ্জা ওর আছে। কারো প্রতি মায়া-মমতা প্রকাশ করতে পারে না সে, ওটা খুব লজ্জার বিষয়, ওর কাছে। তাই যে-কোনো ভাবে পাওয়া ওই টাকাটা অমন করে—

কিন্তু সরোজাক্ষ?

সরোজাক্ষর কি লজ্জা নেই?

সরোজাক্ষ ওর সেই অব্যক্ত মায়া-মমতার শিকার হবেন?

না তা হয় না।

সরোজাক্ষকে আপন নির্বাসন কক্ষ থেকে বেরতে হল।

সরোজাক্ষকে ওই পলায়মান লোকটাকে ডেকে বলতে হয়, 'তা' হয় না।'

সারদাপ্রসাদ সেই তার অবোধ মুখটা নিয়ে বলে, 'হয় না? তার মানে?'

'মানে বুঝিয়ে দিতে হবে, এমন শক্ত কথা তো এটা নয় সারদা? ধরে নিচ্ছি তোমাকে তোমার কোনো পাবলিশার দিয়েছে টাকাটা। কিন্তু আমি সে টাকা নিতে যাবো কেন? আর আমাকেই বা দিতে যাবে কেন তুমি?'

'আপনি নিতে যাবেন কেন?' আপনাকে দিতে যাবো কেন?' সারদা হতভম্ব মুখে তাকিয়ে থেকে বলে, 'তবে কাকে দেব?'

'সরোজাক্ষ বলেন, 'দেবার কথা আসছে কোথা থেকে? তোমার টাক

তোমার নিজের কাছে রেখে দেবে। ব্যাঙ্কে জমা দেবে।'

সারদাপ্রসাদের মুখটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে ওঠে। তবু সারদাপ্রসাদ উত্তেজিত হয় না। শান্ত গলায় বলে, 'আমার টাকা আমি ব্যাঙ্কে জমা করে রাখবো?'

সদা উত্তেজিত সারদাপ্রসাদের মুখে এই শান্ত ভাবটা অদ্ভুত দেখতে লাগে। কিন্তু সরোজাক্ষর চোখে বোধ হয় সেটা ধরা পড়ে না। কারণ সরোজাক্ষর চোখ দুটোই অন্যদিকে। সরোজাক্ষ আকাশে চোখ রেখে কথা বলছেন।

তাই সরোজাক্ষ আগের মতো সুরেই বলেন, 'হ্যাঁ তাই তো রাখবে। সেটাই তো স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে ওই টাকা থেকে তুমি অন্য খণ্ডগুলো ছাপাতে পারবে। সব সময় এ রকম পাবলিশার নাও পেতে পারো।'

সারদাপ্রসাদও এবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলে, 'ওই টাকা দিয়ে ভবিষ্যতের সুবিধের কথা ভাববো? সেই ভবিষ্যতের জন্যে আমি দোরে দোরে ঘুরে—'

থেমে যায়।

হয়তো শেষটা আর বলা সঙ্গত নয় ব'লে বলে না। অথবা হয়তো শেষটা আর বলতে পারে না বলেই বলে না।

কিন্তু যতটুকু বলেছে, বোঝবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।

সরোজাক্ষর মুখটা লালচে হয়ে ওঠে।

সরোজাক্ষ গম্ভীর মুখে বলেন, 'আমার জন্যে তুমি দোরে দোরে ঘুরে টাকার সন্ধান করে বেড়িয়েছ?'

'আহা হা। কী আশ্চর্য। ইয়ে মানে আমি কি তাই বলছি? মানে আমি বলতে চাইছি, আমি বাউণ্ডুলে মানুষ, টাকা-ফাকা নিয়ে করবোটা কি? হয়তো কোথায় রাখতে কোথায় রেখে হারিয়েই ফেলবো। এ বরং নিরাপদ থাকলো।

'তা হয় না।'

জজের রায় দেবার ভঙ্গীতে ওই ছোট কথাটুকু উচ্চারণ করেন সরোজাক্ষ।

কিন্তু ওইটুকুই তো যথেষ্ট।

সারদাপ্রসাদের চোখটা যেন গরম জলের চাপে ফেটে যেতে চায়।

সারদাপ্রসাদের কানদুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে। ওই টাকাটাকে ঘিরেও মিষ্টি একটি স্বপ্ন দেখতে দেখতে আসছিল। আর কিছুই নয়। মিষ্টি একটু প্রসন্নতা, বইটা সম্পর্কে একজনও আগ্রহী হয়েছে শুনে এতটুকু আনন্দ। কিছুটা রিহার্সালও দিতে দিতে এসেছিল সারদাপ্রসাদ, প্রকাশকের নামধাম জিগ্যেস করলে কি বলবে।

সরোজাক্ষ সারদা প্রসাদের সেই রঙিন কাঁচের ফুলদানীটা আছড়ে ভেঙে দিলেন।

তবু সারদাপ্রসাদ, হ্যাঁ সেই গরম জলে ফেটে পড়া চোখটাকে কষ্টে সামলে সারদাপ্রসাদ ভাবলো, আমারই ভুল হয়েছিল। আমার ভাবা উচিত ছিল দাদা এইরকমই একটা কিছু বলবেন। দাদাকে তো আমি জানি। এ টাকা বৌদির হাতে দিলেই ঠিক হতো। আমি দাদার একটু প্রসন্নতার আশায় এই বোকামীটা করে বসলাম।

তাই সারদাপ্রসাদ কষ্টে গলা পরিষ্কার করে বলে, 'ঠিক আছে। আপনাকে নিতে হবে না।'

বলে ফের ঘরে ঢুকে নোটের তাড়া তিনটে কুড়িয়ে নিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে এগোয়।

সরোজাক্ষ অবোধ নন।

সরোজাক্ষ বুঝতে অক্ষম হন না। সারদাপ্রসাদের লক্ষ্যটা কি।

তাই সরোজাক্ষ গম্ভীর গলায় ডাকেন, 'সারদা।'

শুধু 'সারদা।'

তার বেশী কিছু নয়।

তবু, সেই কেবলমাত্র ওই ডাকটির মধ্যেই ভয়ঙ্কর একটি প্রতিবাদ। যেন পায়ে লোহার শিকল পড়লো সারদাপ্রসাদের।

অগত্যা দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে।

সেই দাঁড়িয়ে পড়ার মধ্যেও শক্তি সংগ্রহ করতে লাগলো সে। বেশ তো, উনি না নিলেন তো বয়েই গেল, বৌদি কখনোই—

মনে করলো শক্তি সঞ্চয় হয়ে গেছে।

তাই শান্ত গলায় বললো, 'কী বলছেন?'

'বলছি টাকাগুলো নিয়ে তুমি ছাতে যাচ্ছো কেন?'

'যাচ্ছি এমনি।'

'এমনি' বলে কোনো কথা হয় না সারদা।'

'এমনি আবার কি। আমি বাড়ির গিন্নীকে দেব।'

'তা হয় না সারদা।'

'তা'ও হয় না?'

সারদাপ্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে বলে, বাড়ির লোকেরা বাড়ির ছেলেরা রোজগার করে এনে বাড়ির হেডের হাতে দেয় না?'

সরোজাক্ষ একটু থেমে যান।

কিন্তু সরোজাক্ষ থেমে থাকেন না, আবার কথা বলে ওঠেন।

হয়তো সরোজাক্ষের শত্রুগ্রহই কথা বলায়। নইলে সরোজাক্ষ তো বাদ-প্রতিবাদের মানুষ নন। সরোজাক্ষ তো একটা বিষয় নিয়ে দুটো কথা বলতে ভালবাসেন না।

তবু আজ বললেন।

বললেন, 'ওটা তোমার রোজগারের টাকা হলে হয়তো আপত্তির ছিল না—সারদা, কিন্তু তা তো নয়।'

'তা নয়?'

সারদাপ্রসাদ কায়দা করে জামার কাঁধে মুখ নামিয়ে চোখটাকে কিঞ্চিত ভদ্রমতো করে নিয়ে বলে, 'তবে কি আমি চুরি করে এনেছি?'

'কি করেছ 'তা' অবশ্য তুমিই জানো, কিন্তু হঠাৎ তুমি—'

তা জানি। সারদা ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ আহত গলায় বলে, 'হঠাৎ আমাকে কেউ একটা অফিসারের চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে সে কথা বলছিও না। পাবলিশার দিলে সেটাও রোজগারই।'

'পাবলিশার?'

সরোজাক্ষর মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে।

সে হাসি সারদাপ্রসাদের চোখ এড়ায় না। সারদাপ্রসাদের মনে হয়, সিঁড়িটা দলছে। সারদাপ্রসাদের মনে হয় চিরদিন যে মাটিটার ওপর সে 'মাটি' ভেবে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ দেখা যাচ্ছে সেটা চোরাবালি।

সারদাপ্রসাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা তরল আগুন ছুটোছুটি করে ওঠে। সারদাপ্রসাদ ধৈর্য হারায়, জীবনে কখনো যা না করেছে তাই করে, সরোজাক্ষর সামনে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হাসলেন যে? হাসলেন কেন?

সরোজাক্ষ চমকে ওঠেন।

সরোজাক্ষর হঠাৎ মনে হয়, সারদাপ্রসাদের গলার স্বর জীবনে এই প্রথম শুনলেন।

এই অপরিচিত স্বরক'ক আর শুনতে সাহস হল না 'সরোজাক্ষর, বললেন, 'হাসবো কেন?'

বলে ঘরে ঢুকে এলেন।

'হাসলেন তো—' বলে সারদাপ্রসাদও পিছু পিছু আসে।

কিন্তু ততক্ষণে অন্য ঘটনা ঘটে গেছে। সারদাপ্রসাদের ওই বিকৃত কণ্ঠের চীৎকার সুনন্দাকে ঘর থেকে বার করেছে, বার করেছে মীনাক্ষীকেও, আর নামিয়ে এনেছে বিজয়াকেও।

ওরা সাহস করলো না।

বিজয়া সাহস করলেন।

বিজয়া ঘরে ঢুকে এসে বলে উঠলেন, 'ব্যাপার কি? ঠাকুরজামাই হঠাৎ হাল্লা তুলেছ যে?'

'হাল্লা?'

সারদাপ্রসাদের ভিতরের গুহার হঠাৎ জেগে ওঠা ঘুমন্ত বাঘটা আবার গর্জে ওঠে, আপনারা ভেবেছেন কি? আমি একটা মানুষ নয়? আমার রোজগারের টাকা দাদা পা দিয়ে ছুঁলেন না, অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন, আর আপনি—'

'তোমার রোজগারের টাকা—'

বিজয়ার এতক্ষণে সারদাপ্রসাদের হাতের ওপর চোখ পড়ে, বিজয়ার চোখে লোভের আগুন জ্বলে ওঠে। টাকা হচ্ছে টাকা, তার ইতিহাসটা যাই হোক।

আর মোটামুটি ইতিহাসটা বিজয়া অনুমান করেই নেন, যেভাবেই হোক ওই টাকাটা সারদাপ্রসাদ এনেছে এবং সরোজাক্ষকেই দিতে এসেছে, কিন্তু 'মহাপুরুষ'টি নিতে অস্বীকৃত হচ্ছেন।

বিজয়া বলে ওঠেন, 'তুমিও আচ্ছা বটে ঠাকুরজামাই, টাকা দিতে এসেছো পরমহংস ঠাকুরের কাছে। যাঁর কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা। আমরা বাবা সংসারী মানুষ, আমাদের কাছে টাকা টাকা। আমায় দাও—'

বিজয়া আপন পরিধেয়র শুচিতা ভুলে প্রায় ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে নিতে যান।

কিন্তু সরোজাক্ষর বুঝি আজ সর্বনাশের নেশায় পেয়েছে। তাই সরোজাক্ষ কঠিন গলায় বলেন, 'না। নেবে না। ও টাকা সারদা নিজের জমি-জমা বেচে নিয়ে এসেছে—'

'জমি-জমা!'

আকাশ থেকে পড়ে সারদা।

'আপনি সেই কথা ভাবছেন।'

'তবে কি সত্যিই ভাববো সারদা। তোমার ওই বই নিয়ে পাবলিশার—'

'ওই! আবার আপনি হাসলেন। সারদাপ্রসাদের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, সারদাপ্রসাদ আবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'নেহাৎ নাম বলা বারণ আছে তাই, নইলে আমি এক্ষুণি আপনাকে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দিতাম। দেখাতাম সত্যিই কেউ দিয়েছে কিনা।'

নাম বলা বারণ। তবে আর কি করা—সরোজাক্ষ খাটের উপর বসে পড়ে বলেন, 'কিন্তু ওই অনামা অজানা টাকা তো তোমার বৌদিকে নিতে দিতে পারি না সারদা।'

নিতে দিতে পারেন না?

সারদাপ্রসাদও বুঝি বসে পড়ে।

'তার মানে এ-সংসারের ওপর আমার কোনো দাবি নেই। আমার টাকা আপনারা পা দিয়েও ছোঁবেন না? অথচ আমি চিরকাল নিজের বাড়ি ভেবে—' সারদাপ্রসাদ ছটফটিয়ে পায়চারি করতে করতে বলে, 'বিনা-দ্বিধায় খেয়েছি পরেছি, আবদার করেছি। তার মানে সেটা দয়ার ভাত খেয়েছি। তার মানে—আপনি আমাকে বাড়ির একটা পোষা কুকুর-বেড়াল ছাড়া আর কিছু ভাবেন নি।'

'আঃ।' সরোজাক্ষ প্রায় ধমকে ওঠেন, 'কী বাজে বাজে কথা বলছো।'

'বাজে নয়, বাজে নয়, ঠিকই বলছি—' সারদা সরোজাক্ষর সামনে এসে দাঁড়ায়, লাল লাল চোখে বলে, 'বুঝতে পারছি চিরদিনই আপনি আমার লেখাকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেছেন। আজ সেই হাসি প্রকাশ পেয়ে গেছে। আমি মুখ্যু আমি গাধা তাই বিশ্বাস করে এসেছি—' সারদাপ্রসাদের চোখের জল এবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে পরম শত্রুতা করে বসে। সারদা ভাঙা ভাঙা গলায় বলে ওঠে, 'কিন্তু জগতে একজনও খাঁটি লোক আছে—জিগ্যেস করুন গে আপনার খুড়িমাকে, টাকা সারদা কোথায় পেয়েছে—'

আবেগে উত্তেজনায় নাম প্রকাশের নিষেধবাণী রক্ষা করা সম্ভব হয় না সারদাপ্রসাদের। বলে ফেলে জামার হাতাটা তুলে তুলে ঘন ঘন চোখের জলটা মুছতে থাকে সারদা।

পুরুষ মানুষের চোখের জল একটা মর্মান্তিক দৃশ্য বৈকি। বোধকরি জগতের প্রধানতম মর্মান্তিকের অন্যতম। সরোজাক্ষ অপ্রতিভ হচ্ছিলেন, কিন্তু 'খুড়িমা' শব্দটা যেন সরোজাক্ষর মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিল। সেই আঘাতে সরোজাক্ষর সামনের অন্ধকারের পর্দাটা ছিঁড়ে উড়ে গেল। সরোজাক্ষ আর ওই মর্মান্তিক দৃশ্যটার জন্যে অপ্রতিভ হতে পারলেন না।

সরোজাক্ষ কপালটা টিপে ধরে

বিকারের গলায় বলে উঠলেন, 'সারদা, সত্যিই তুমি মুখ্যু অবোধ। তাই খুড়িমা তোমাকে মাধ্যম করে—তোমার পাবলিশার সেজে খুড়িমা ও টাকা আমার সংসারকে ভিক্ষে দিয়েছেন সারদা। জানেন—তুমি সেটা বুঝতে পারবে না। তুমি সত্যিই বিশ্বাস করবে তোমার ওই ছেঁড়া কাগজের বোঝাগুলো—'

কথার মাঝখানে থেমে যান সরোজাক্ষ। বোধ করি হঠাৎ হুঁশ হয়। কোথায় গিয়ে পড়ছিলেন।

কিন্তু এ হুঁশে কি আর কোনো উপকার হয়? যেখানে পৌঁছতে যাচ্ছি ভেবে থমকালেন, সেখানে তো পৌঁছে গেছেনই।

ওই আধখানা কথায় শান্ত হয়ে গেছে সারদাপ্রসাদ। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

সারদাপ্রসাদ সেই শুকনো চোখ আর শান্ত গলায় বলে, 'এখন বুঝতে পারছি সেটা। মূর্খের শতেক দোষ, এ-কথাটা শাস্ত্রেই আছে, তবে অন্ধরও চোখ ফোটে।'

বলে টাকাগুলো আবার পকেটে পুরে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

সুনন্দা দেখে, মীনাক্ষী দেখে, ঘটনাটা কি ঠিক না বুঝলেও ওরা ভীত হয়। ওদের সাহস হয় না, ওই চির সহজ মানুষটার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে, যাচ্ছো কোথায়?

এমন কি বিজয়াও মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আর সরোজাক্ষ?

তিনি তো চির মূক।

তিনি যেন অনুভব করেন, তাঁর হৃদপিণ্ডের একটুকরো অংশ তিনি নিজেই খামচে ছিঁড়ে বার করে ফেলে দিলেন। সেই খামচানো জায়গাটায় হয়তো চিরদিনই ক্ষত থেকে যাবে।

সরোজাক্ষ আর কোনদিন ওই মূর্খ অবোধ লোকটার মুখের দিকে তাকাতে পারবেন না।

কিন্তু এছাড়া আর কি করতে পারতেন সরোজাক্ষ?

বিজয়ার মতো টাকাকে কেবলমাত্র 'টাকা' ভাবতে পারার ক্ষমতা—তাঁর কোথায়? তবে এবার সরোজাক্ষকে স্বীকার করতেই হবে মানুষ পরিবেশের দাস। পরিবেশকে অস্বীকার করে নিজের ছাঁচে নিজেকে গড়বো বলে পণ করে বসে থাকলে সেটা ব্যর্থতার বোঝা হয়ে ওঠে মাত্র।

সরোজাক্ষ কালই আবার কলেজের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবেন। ঘাড় হেঁট করে বলবেন, 'আমি ভুল করেছিলাম।'

আমি ভুল করেছিলাম।

মনে-প্রাণে স্বীকার না করলেও, বলতেই হয় মানুষকে একথা।

আমি ভুল করেছিলাম।

না বললে এই সমাজের মধ্যে তোমার ঠাঁই হবে না। তুমি যদি তোমার কর্মস্থলে গিয়ে 'সাধু' হয়ে থাকতে চাও, যদি ঘুষ নিতে না চাও, দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে না চাও, যদি দুর্নীতিকে উদ্‌ঘাটিত করতে চাও, তোমার ভাগ্যে জুটবে উৎপীড়ন, অসুবিধে, লাঞ্ছনা, অপমান, জুটবে দারিদ্র্য, অসহায়তা, অনিশ্চয়তা।

তুমি দরজায় দরজায় ঘুরে পৃথিবীর চেহারাটা দেখতে পাবে, তখন তুমি ফিরে গিয়ে বলতে বাধ্য হবে, 'আমি ভুল করেছিলাম, 'সাধু' থাকার পণ করে মস্ত একটা ভুল করেছিলাম।'

তুমি 'পৃথিবীর মন্ত্রে' দীক্ষা নেবে তখন।

পৃথিবীই দেবে সে দীক্ষা।

সরোজাক্ষকে কেউ দীক্ষা দিতে আসেনি, কিন্তু ভিক্ষা দিতে এসেছে। তার থেকে অসহায়তাই বা আর কী আছে?

সরোজাক্ষকে অতএব পুরনো দরজায় ফিরে গিয়ে বলতেই হবে, 'আমি ভুল করেছিলাম'।

আর সেটা যদি বলতে না পারো ভীরু কাপুরুষের মতো পৃথিবী থেকে বিদায় নাও।

সরোজাক্ষ কি সেই পথই বেছে নেবেন?

ছি ছি।

তার মধ্যেই বা সম্মান কোথায়? গৌরব কোথায়? নিজের মতো করে বাঁচা কোথায়? নিজের মতো করে মরাটাকে পৃথিবী ক্ষমা করে না।

বলে, 'ছি ছি! লোকটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালালো!'

অথচ অতর্কিতে সহজ আর স্বাভাবিক মৃত্যু আসবে সেই সব মানুষের যারা দীর্ঘদিন পৃথিবীটাকে আঁকড়ে ধরে থেকে অনেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা গুণতে চায়।

সরোজাক্ষর দরজায় নাকি একদিন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল, দরজা থেকে ফিরে গেছে, ঘরে এসে ঢোকেনি। অতএব সরোজাক্ষকে জীবনের দরজায় গিয়ে হাত পাততে হবে।

কারণ পৃথিবী যদি কাউকে দীক্ষা দিতে না পারে, তো—ভিক্ষা দিতে আসে।

●

'আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে এ-রকম শত্রুতা করছো কেন বলতো?'

নীলাক্ষ পরম আদরে স্ত্রীকে নিবিড় বাহুবন্ধনে বেঁধে বলে, 'সেই সেদিনের রাগটা বুঝি আর ভুলতে পারছো না?'

সুনন্দা সুকৌশলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অবাক গলায় বলে, 'রাগই বা কিসের, শত্রুতাই বা কিসের?'

নীলাক্ষী মনে মনে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'হারামজাদী শয়তানী! ভদ্রঘরের বৌ হতে এসেছিলে কেন তুমি। স্টেজে যাওনি কেন? পাবলিক থিয়েটারের স্টেজে? পয়লা নম্বরের একটি অভিনেত্রী হতে পারতে! অথচ আমার উপকারের জন্যে একটু প্রেমের অভিনয় করতে ক্ষয়ে যাও তুমি। তুতিয়ে পাতিয়ে খোসামোদ করে পাঠালে, তুমি শয়তানী আমাকে জব্দ করবার জন্যে এমন বাড়াবাড়ি করে বস যে পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে যায়। বুঝতে পারি না সেটা সত্যি না অভিনয়। যেমন মেহেরাটার সঙ্গে করছিলে। ব্যস যেই সে একটু বেশী

এগোতে গেল, অমনি তুমি পতিব্রতা হিন্দু কলবধূ হয়ে ছিটকে পালিয়ে এসে ঘরের কোণে এসে আশ্রয় নিলে। আর আমার অবস্থাটা কী হলো? ভাবলে সেটা? ভাবছো একবারও? ব্যাটা বদমাস যে এখন আমাকে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, তার কি? তাকে আমি দোষ দিই না। এতোখানি অপমানে পুরুষ বাচ্ছা ক্ষেপে যাবে না? কিন্তু আমাকে যে সেই ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড় খেতে হচ্ছে। পতিব্রতা। তাই যদি পতির একটু উপকার করতে পারো না—এতো অহঙ্কার। আরে বাবা তুই একটা বিবাহিতা মেয়ে, ঘরে তোর আস্ত সুস্থ একটা স্বামী রয়েছে, তোর আবার এতো ভয়টা কি?

কিন্তু মনের দাঁত মনের বাইরে, মুখে আসে না। মুখের মধ্যেকার সাজানো দাঁতের পাটিটাই মুখের বাইরে উঁকি মারে।

'তা রাগ ছাড়া আর কি। আমার সঙ্গে বেরোতেই চাও না।'

মেহেরা সাহেব কতো দুঃখ করছিলেন। বলছিলেন, 'মদের ঝোঁকে কখন কি আবোল-তাবোল বলে ফেলেছিলাম, তার জন্যে মিসেস এতো রেগে গেলেন যে—।'

'বলেছেন বুঝি সাহেব?' সুনন্দা মৃদুহেসে বলে, 'কোনটা কোন ঝোঁকে বলেছেন, সেটাই অবশ্য গোলমেলে রয়ে গেল। কিন্তু তোমার আজ ব্যাপার কি? চাঁচাছোলা কণ্ঠস্বর, পদক্ষেপ সঠিক, আজ বুঝি ড্রাই ডে?'

নীলাক্ষ আর একবার মনের দাঁতটা কড়মড়িয়ে, মুখের দাঁতে হেসে ওঠে, তুমি কেবলই আমাকে মাতাল হতে দেখো। অথচ ক্লাবে আমার সবাই বলে, 'এই মিস্টার মৈত্র হচ্ছেন একটি লোক যাকে কোনোদিন টেনে তুলে নিয়ে যেতে হয় না, নিজের পায়ে বাড়ি ফেরে।'

'সত্যি?' সুনন্দা চোখে হাসির ঝিলিক মেরে বলে ওঠে, 'এ যে দেখছি দারুণ সার্টিফিকেট। বেশ। বেশ।'

নীলাক্ষ ওই ঝিলিকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে, 'আমার জন্যে ওটুকুর বাজে খরচা কেন? আমি কি ওতে কাৎ হবো?'

কিন্তু মুখে নীলাক্ষকে অভিমানী স্বামীর ভূমিকা অভিনয় করতে হয়, 'ভাবছি—আর 'বেশ' থাকবো না। বেহেড় হবো। রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি খাবো—'

'বাঃ বাঃ, চমৎকার সাধু সঙ্কল্প। সুনন্দা হাততালি দিয়ে ওঠে, উঃ হি আইডিয়া।'

'তা তুমি যদি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর, উচ্ছন্ন যাওয়া ছাড়া গতি কি আমার।'

সুনন্দা মনের দৃষ্টিটাকে শ্যোন করে। ওর শেষ চাল। নিজে উচ্ছন্ন যাওয়ার ভয় দেখিয়ে স্ত্রীকে সেই পথে ঠেলে দেওয়ার সাধু চেষ্টা। কিন্তু প্রভু তোমার ইচ্ছের পুতুল হয়ে আমার স্বর্গে নরকে কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। যাই যদি তো নিজের ইচ্ছেতেই যাবো। নরকে হলে নরকেও।

কিন্তু সুনন্দাও মনের ছায়া বাইরে ফেলে না। সুনন্দা কৌতুকের গলায় বলে, 'তা' সেটাই বা কম কি?' 'উচ্ছন্ন' নামক জায়গাটা তো পৃথিবীর সেরা জায়গা, যদি আমার কল্যাণে তুমি সেই সেরা জায়গার টিকিটটা সংগ্রহ করে ফেলতে পারো, নিজেকে আমি ক্রেডিট দেবো।'

'আচ্ছা সেটা না হয় পরে দিও। আজ চল না একটু আমার সঙ্গে।

(সুনন্দা মনে মনে) 'হুঁ বুঝেছি, নতুন কোনো রুই-কাতলার সন্ধান পেয়েছো, খেলিয়ে তুলতে ভালো 'টোপ'-এর দরকার। কিন্তু আমি আর তোমার টোপ হচ্ছি না।----না সতী-ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাতে নয়, পবিত্রতার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতেও নয়, স্রেফ্ তোমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির হাতিয়ার না হবার জন্যে। তুমি যে হরদম তোমার সুন্দরী স্ত্রীটিকে ভাঙিয়ে খাবে, তা আর হতে দিচ্ছি না, ভেবো না তোমার থেকে আমি বোকা।'

মুখে—

'আজ তো হতেই পারে না। আজ আমার বিশেষ একটু কাজ আছে।'

'কাজ। তোমার আবার কাজ কি?'

'কেন' আমার কোনো কাজ থাকতে পারে না?'

'আঃ পারবে না কেন? তবে আমি জানি না, অথচ বিশেষ কাজ—।'

'তাতে চোখ কপালে তোলবার কি আছে? আমি জানি না, অথচ তোমার 'বিশেষ' এমন কাজ তো ঝাঁকে ঝাঁকে আছে তোমার।'

'তা' অবশ্য আছে—'

নীলাক্ষ গৌরবের গলায় বলে, 'পুরুষের একটা আলাদা কর্মজীবন থাকে—।'

'মেয়েদেরও সেটা থাকতে পারে।'

'কী ব্যাপার, তলে তলে কিছু আয় উপায় করা হচ্ছে না কি?'

সুনন্দা এবার মুখের সেই ব্যঙ্গ-হাসির খোলসটা খুলে ফেলে বলে, 'যদি হয়। সেটা কি ভুল করা হবে?' সংসারের অবস্থা তুমি জানো ত'?

'সংসারের?'

নীলাক্ষ সহসা উদ্দীপ্ত গলায় বলে ওঠে, 'আমি সংসারের অবস্থা জানতে যাবো কী জন্যে? সংসার আমার অবস্থা জানতে চেয়েছে কোনোদিন? আজই আমি দু' পয়সা করে খাচ্ছি, কিন্তু

এমন দিনও গেছে আমার যে, একটা সিগারেট কেনবার পয়সা জোটেনি, বন্ধুদের কাছে ধার করে করে 'বন্ধু' হারিয়েছি। একটা ভিন্ন ধটে গরম স্যুট ছিল না। দেখেছে সেদিকে তাকিয়ে সংসার? না, না, সংসার যেন আমার কাছে কিছু আশা করে না।'

'করছেও না।'

সুনন্দা জানলার কাছে সরে গিয়ে বলে, 'করছেও না সে আশা।

'কিন্তু তুমি? তুমি আমার স্ত্রী, তুমিই বা সে আশা দেখতে যাবে কেন? বহুবার তোমায় বলেছি—এখনো বলছি—আমরা এখান থেকে সরে পড়ি—'

'অথচ আগে যখন আমি বলেছি ওকথা, তুমিই বলেছো চলে গেলে বাড়ির ভাগ পাবে না।'

'বলেছিলাম। মানছি সেকথা। কিন্তু কর্তার যা মতিগতি দেখা যাচ্ছে, তাতে আর এ বাড়ির একখানা ইঁটও উত্তরপুরুষদের জন্যে থাকবে বলে মনে হয় না। গুরু তো জগদগুরু হয়ে বসে আছেন। কোনদিন শুনবো বাড়ি মর্টগেজ আছে। হ্যাঁ, হঠাৎ কোনোদিন একথা শুনলে আশ্চর্য হবো না। তারপর? বাড়ির কর্তাটির যদি হঠাৎ এদিক-ওদিক হয়ে যায়, তখন? ভেবেছো তখন গলায় কি কি পড়বে? বিধবা মা, আইবুড়ো বোন, অপগণ্ড ভাই, ওই এক আগাছা, আর নিজের স্ত্রী-পুত্র তো আছেই। বুঝছো অবস্থা?

'বুঝেছি বৈ কি।' সুনন্দা বলে আহা ভেবে এখন থেকেই তোমার জন্যে করুণা হচ্ছে। এই বঙ্গভূমিতে কার কার ভাগ্যে এহেন গন্ধমাদন চেপেছে।'

নীলাক্ষ ট্রাউজার ছেড়ে পায়ে একটা পায়জামা গলাতে গলাতে বলে, 'জানি তুমি ব্যঙ্গ করবে। জানি আমার জন্যে তোমার সহানুভূতির কানাকড়িও নেই। কেন যে এখনো ও আমায় দু' চক্ষের বিষ—'বলে ডিভোর্স স্যুট ... আনছো ... ভাই ... ভাবি। আনছো না বোধ হয় তোমার এই সাধের শ্বশুরবাড়ি, পরম পূজনীয় শ্বশুর-ঠাকুর, আদরের ঠাকুরপো ঠাকুরঝিদের হারাতে হবে ভেবে।' -----

সুনন্দা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, 'এই সেরেছে, কারণটা ধরে ফেলেছ? সত্যি তুমি কী চালাক।'

নীলাক্ষ এ কথার উত্তর দেয় না।

নীলাক্ষ হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা মীনার কি হয়েছে বলতে পারো?'

'মীনার।'

'হ্যাঁ।' রাতদিন দেখি ঘরে শুয়ে আছে, কলেজ-কলেজও যাচ্ছে না না কি?'

'রাতদিন।'

সুনন্দা আবার হি হি করে হাসতে থাকে। 'তুমি এতো দেখার সময় পেলে কোথায় গো। তুমি যে আমায় চমকে দিলে। অ্যাঁ, রাতদিন বাড়ির কে কি করছে, তার খবর রাখছো তুমি?'

[ক্রমশ।

দেওয়ালীর রাতে রাষ্ট্রপতি ভবন

চিত্র : [illegible]
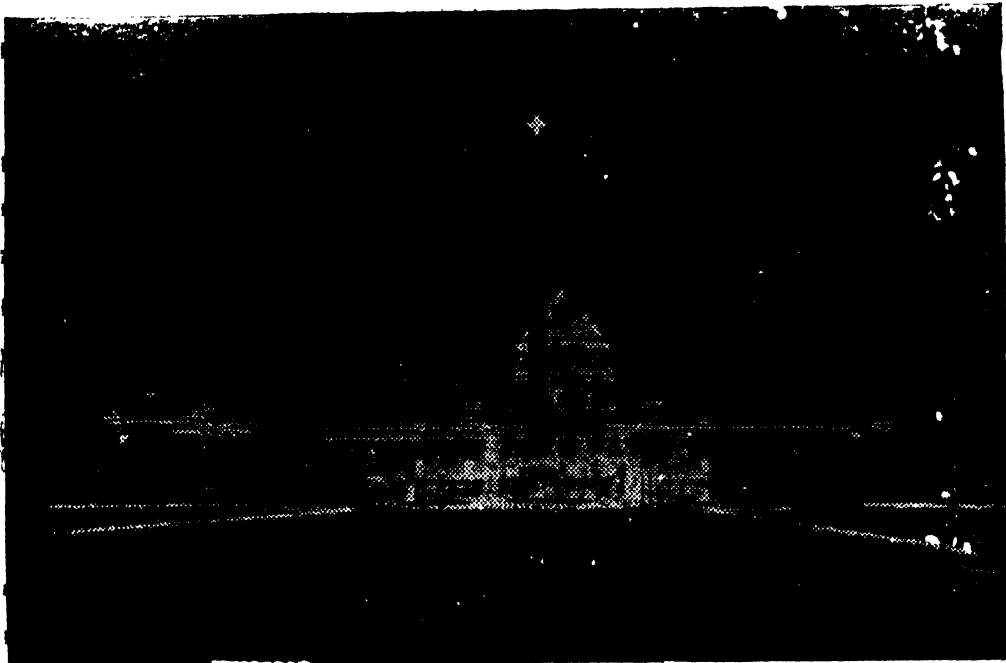
আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন। ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরীতে উন্নতি, বদলি, বিবাহ, সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ নির্ভুলভাবে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। একবার পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন।

পণ্ডিত হরিনারায়ণ শাস্ত্রী,
জ্যোতিষার্ণব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ নজরে পড়লো বিজ্ঞাপনটি। হরিনারায়ণ শাস্ত্রী? জ্যোতিষার্ণব রামনারায়ণ শাস্ত্রীর কেউ হন না ত'? কী জানি? পণ্ডিত রামনারায়ণ শাস্ত্রী জ্যোতিষার্ণবের কথা আবার বহুদিন পরে মনে পড়ে গেল।

১৯৪০ সালের কথা। তখন আমরা নিতান্তই নাবালক। জ্যোতিষার্ণব রামনারায়ণ শাস্ত্রী মশাইর সে কী নামডাক আর পসার-প্রতিপত্তি! যশ-সৌভাগ্যের তখন তিনি তুঙ্গে অধিষ্ঠিত। মানুষের ভাগ্য নিয়ে ভানুমতীর ভেলকী খেলাতে খেলাতে পণ্ডিতমশাই তখন নিজের ভাগ্য ষোল আনার জায়গায় বত্রিশ আনাই গুছিয়ে নিয়েছেন। মাথাজোড়া টাক। টকটকে গৌরবর্ণ ছোট্টখাট্ট মানুষটি যখন গায়ে নামাবলি জড়িয়ে শিবনেত্র হয়ে ত্রিকালদর্শীর ভঙ্গিতে ভবিষ্যদ্বাণী আউড়ে যেতেন মাঝে মাঝে গ্রহ-উপগ্রহের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতির ব্যাখ্যা করে, তখন তা বিশ্বাস না করা তেমন তেমন অবিশ্বাসীর পক্ষেও রীতিমত দুষ্কর ছিল। ফলে বাড়ীর দরজায় 'অস্টিন', 'মরিস', 'ফোর্ড' থেকে সুরু করে 'বুইক', 'ক্যাডিলাকের' সার প্রায় বারমাসই কায়েম থাকতো। কারণ অবশ্য আরও একটি ছিল। শুধু অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীই নয়। কুগ্রহের কোপ কাটিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট ভবিষ্যৎ গড়ার ব্যাপারেও নাকি তিনি ছিলেন তুলনাহীন কারিগর

ভিড়ের বাড়াবাড়ি ছিল বেশী আসলে সে কারণেই। কুগ্রহ দুর্গ্রহকে জব্দ করে করায়ত্ত করার জন্য ছিল তার একাধিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন বাছা বাছা অস্ত্র। তাবিজ কবচ মাদুলির ছড়াছড়ি। আর তাদের নামেরই বা সব বাহার ছিল কত। জয়লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী, মোহিনী, সর্বমঙ্গলা এমন আরও কত কী। অমোঘত্বে এক একটি মাদুলি ছিল যেন সাক্ষাৎ 'এটমবম'। কুগ্রহ দুর্গ্রহের সাক্ষাৎ যম। জয়লক্ষ্মী

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাদুলি ধারণ করে মামলায় জেতেনি বা জ্ঞানদায়িনী ধারণ করে পরীক্ষায় পাশ করেনি অথবা মোহিনী মাদুলি ধারণ করে ঈপ্সিতজনকে মজাতে পারেনি এমন অঘটনের নাকি একটিও নজির ছিল না। মোহিনীরও আবার কিন্তু হায়ার পোটেন্সি ছিল। তার নাম মনোমোহিনী। টিংচার আর মাদার টিংচারের মত আর কী। আর সে মনোমোহিনী যে কী বাঘা মাদুলি ছিল তা বুঝতে হলে পণ্ডিত মশাইর নিজের ভাষায়ই ঐ মাদুলির বিশেষত্বের কথা শুনতে হয়।

---'এই মাদুলি যথাবিহিত শাস্ত্র-সম্মতভাবে ধারণ করিলে আপনার ঈপ্সিতজন তাহা সে স্ত্রীলোকই হোক বা পুরুষই হোক যতই বিরাগ হোক বা পাষাণ হৃদয়ের লোক আপনার প্রতি তাহাকে আকৃষ্ট হইতেই হইবে। চন্দ্রসূর্য যেমন অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানেন, মনোমোহিনী মাদুলীকেও তদ্রূপ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিবেন। একবার পরখ করিয়া গুণাগুণবিচার করিয়া লন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।'

—পণ্ডিত রামনারায়ণ শাস্ত্রী,
জ্যোতিষার্ণব।

অতএব আশ্চর্য হবার কীই থাকতে পারে যদি পণ্ডিত মশাইর দৌলতখানা দৌলতের চমকে চকমকিয়ে উঠে? দেব-দেবে বিশ্বাসী এমন দেশে অমন দৈবশক্তি যার মুঠোয় ধরা তার মুঠো যদি সোনাদানায় না ভরে তবে ভরবে কার মুঠো? আর ভরা কি শুধুই ভরা। প্রায় উপচে পড়ার অবস্থা। সমাজের সব স্তর থেকেই চলছিল মক্কেলের গড্ডলিকা প্রবাহ। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে মামলাবাজ, প্রমোশন শিকারী (চাকুরীতে) বা প্রেম ভিখারী কারোই আনাগোনার কিছু কমতি ছিল না। তার উপর ছিল কালোবাজারের কালোয়াতরা। তাদের আসরটা আবার জমতো রাতের অন্ধকারে। তখন ত' ছিল কালোবাজারের নূতন [illegible]

পণ্ডিত মশাইকে আর তখন রোখে কার সাধ্য।

তাবিজ কবচ বিতরণের ব্যাপারে পণ্ডিত মশাইর কোন বাছবিচার ছিল না। তবে একটি মোক্ষম ঘা খেয়ে শেষের দিকে অবশ্য বিলক্ষণ হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। মিলিটারীদের কথা উঠলেই কেমন যেন একটু ঘাবড়ে যেতেন। খুব বেশী দূর অর প্রসঙ্গ এগুতে দিতেন না।

'থাউক অগো কথা, আর বেশী না কওনই ভাল। বেটারা বড় পাষণ্ড! হিতাহিতজ্ঞানশূন্য সব চণ্ডাল! অরা মানুষ না। অগো নিয়া ঘাটাঘাটি না করণই ভাল। কথাটা বোজলা না?'

এমন সর্বজয়ী জ্যোতিষীর মিলিটারীর ব্যাপারে নিস্পৃহ নির্বিকার ভাবের আসল কারণ জেনেছিলাম অবশ্য অনেক পরে।

কবে নাকি যুদ্ধের এক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে এক লালমুখো পল্টুনে ক্যাপ্টেন এসে ধন্না দিল পণ্ডিত মশাইর দ্বারে। 'হোম' থেকে খবর এসেছে তার ভাবী-পত্নী হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে। অথচ যুদ্ধের যা অবস্থা দেশে ফিরে যাবারও উপায় নেই। গোরা কাপ্তেন অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়লো আকুল হয়ে —'পান্ডিট হাম শোনা আপকো ডিভাইন পাওয়ারকো বারে। যো কৈ সুরৎ সে হে আইরিনি কো (ভাবী পত্নীর নাম) রুকনেই পড়ে গা। উনকো না না মিলনেসে হাম ব্লাডি সুইসাইড করে গা। প্লিজ, পান্ডিট প্লিজ। উস্‌কো রুকনেই পড়েগা। রূপেয়াকো পরোয়া মাৎ করনা। ইয়ে হায়। অল দিজ আর ফর ইউ।'

একতাড়া কচকচে নোট পণ্ডিত মশাইর সামনে এগিয়ে ধরলো। একনজরে না গুণতে পারলেও প্রায় শ'দুই-তিন বলেই অনুমিত হ'ল। লোকটা বলে কী? হাত-পা কেঁপে পণ্ডিত মশাইর তখন প্রায় তুরীয় অবস্থা। কিন্তু মুখে বরাভয় ভাব। —হে-হে-হে, আপ ফিকির না করো দেতা হায়। যেইসা যেইসা বলে গা তৈসা তৈসা করেগা। অব্যর্থ মাদুলি হায়। তারপর গিয়া আসল তামাসা দেখে গা। বজ্জাত বেটি যেইসা গোবরের ঘুইঠা দেওয়াইল মে সাইপটা লাইগা থাকতা হায় ঐসা আপকো দেহমে সাইপটা লাইগা রহেগা। অর সাধ্য ভি নাই হোগা যে আপকো ছাড়-কর অন্য পুরুষের কাছে যায়গা।'

অঙ্গভঙ্গি সহকারে কীভাবে সাপটে লেগে থাকবে আইরিন তা'ও সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন।

সাহেবও যেন অকূলে কূল পেল। ধাঁ করে তিনশো টাকা প্রণামী (?) দিয়ে মনোমোহিনীকে রুমালে বেঁধে সাগরপারের আইরিনকে ঘরে বাঁধার স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে গেল। পণ্ডিত মশাইও চকচকে চোখে কড় কড়ে নোটগুলি গুণতে গুণতে ভাবলেন পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা লাভ মোটা-মুটি মন্দ হল না। যুদ্ধের যা অবস্থা বেটা কোথায় গিয়ে গুলী খেয়ে মুখ ভেংচি দিয়ে মরে পড়ে থাকবে কে জানে? আর যদি না'ও মরে তাতেই বা কী এল গেল? ওদের দেশেও আকছারই এ রকম হয়। শালা দুদিনেই ভুলে যাবে সব। তখন কোথায় থাকবে ওর আইরিন আর কোথায় থাকবে কী। শালারা যেন সব আমার সাবিত্রী সত্যবান রে। আর যদি লেগে যায় তবে আর আমায় মারে কে? এক মিলিটারীতে তিনশো তখন ত' শয়ে শয়ে ছয় লাপ। হে মা জগদম্বা অধমের মুখ রেখো মা। শিবশম্ভু।

কিন্তু অব্যর্থ মাদুলির স্রষ্টা রাম-নারায়ণ জ্যোতিষী মশাই বোধ হয় ঐ প্রথমই একটি অব্যর্থ ভুল করে বসলেন। ছ' মাসও পার হল না। ভুর ভুর কড়া হুইস্কির গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে খোলা রিভলভার হাতে এসে উদয় হল সেই গোরা কাপ্তেন। টলটলায়মান অবস্থা। চক্ষু রক্তবর্ণ। ঘরে ঢুকেই হুঙ্কার ছাড়লো—'হোয়ার ইজ দ্যাট ব্লাডি পান্ডিট? হাম্ উস্‌কো ম্যান মোহিনী গলচু? কাম্ অন, ব্লাডিকো জলদি ব্যোলাও। বাস্টার্ডকো হাম 'রাম নাম স্যাট্ আয়' 'ব্যোলায়গা। ক্যাম্ অন কুইক্ ব্যোলো উ কি-কিডার আয়?'

কে জবাব দেবে ঐ মদমত্ত (হাতে উন্মুক্ত রিভলভার) পল্টুনে গোরাকে? সব তখন ভয়ে ডরে বাক্‌-রুদ্ধ যে। নড়াচড়ার সাহসটুকু অবধি কারো নেই। আর পণ্ডিত মশাই? তিনি উধারেই ছিলেন। তবে বড় টাইমমাফিক স্খলিতপদ রিভলভার-ধারী গোরাকে আসতে দেখেছিলেন। বুঝেছিলেন যে মনোমোহিনী ছেড়ে সর্বমঙ্গলাকে দিয়েও ঐ মামদোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া মুস্কিল। তাই তাড়াতাড়ি মুস্কিল আসান আলমারীটির পেছনে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন। যত-ক্ষণ গোরার হুঙ্কার চললো পণ্ডিত-মশাই রাজ্যের ধূলা আর মাকড়সার জালে জড়িয়ে কেবল গায়ত্রী নামই জপে চললেন। শেষ পর্যন্ত গায়ত্রী নামের জোরে কি না জানি না 'পিঁ' করে পণ্ডিত মশাইর দরজায় এসে দাঁড়ালো এক মিলিটারী পুলিসের জীপ গাড়ী। তারপর ইয়া পেল্লায় পেল্লায় তিনজন মিলিটারী পুলিশ নেমে এসে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল মাতাল গোরাকে। তারপর বের হয়ে এসে আত্মপ্রকাশ করলেন সারা গায়ে ধূলা আর মাকড়সার জালে মাখামাখি করে মনোমোহিনীর আবিষ্কারক খোদ রামনারায়ণ শাস্ত্রীমশাই, নারায়ণ নারায়ণ করতে করতে। মিলিটারী-ঘটিত ভেলকীখেলা ঐ এক মন-মোহিনীতেই শেষ। তারপর থেকে আর ওপথও মাড়াতেন না। মিলিটারীর প্রসঙ্গ উঠলেই পাশ কাটাতে সচেষ্ট হতেন। ---'বুজলা না কথাটা?---হ।

কিন্তু কথাটা সবাই বুঝলেও পণ্ডিতমশাই নিজে বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারে নি। পারেন নি বলেই বোধ হয় ঐ মনোমোহিনীর হাতেই খেলেন দ্বিতীয় মোক্ষম গুঁতোটি। আর ঐ এক মোক্ষম গুঁতোতেই পণ্ডিত-[illegible] করলেন।

ঘটনাটা তবে আনুপূর্বিক নিবেদন করেই এবারের মত পণ্ডিতমশাইর কথা শেষ করি।

একদিন ফিল্ম প্রডিউসার ও বিখ্যাত ধনকুবের শ্রীধোকালাল গুল-রাজকে সাথে নিয়ে এসে হাজির হল পণ্ডিতমশাইর পুত্রবৎ স্নেহধন্য ফিল্ম ডাইরেক্টার শ্রীমদনগোপাল শর। বাড়ীর ছেলের মত ছিল বলেই শরের অন্দর-মহল অবধি আনাগোনা ছিল। আর শুধু যে পণ্ডিতমশাইকে সে অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি করতো তাই নয়। বিনা পয়সায় বাড়ীর সবাইকে নিয়ে সিনেমাও দেখাতো ঘন ঘন। তাই পণ্ডিত পরি-বারে শরের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও ছিল বিলক্ষণ। অল্প বয়স, এর মাঝেই প্রচুর যশ অর্থের অধিকারী হয়েছে মদন শর। কিন্তু বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, 'যা কিছু সামান্য পেয়েছি গুরুদেব সবই ত' আপনার কৃপা আশীর্বাদে।'

---'কথা শোন আমার পাগলা ছেইলার। আরে পাগলা কে কারে দেয়। বেবাক দেওন নেওনের মালিক ত থাকে ঐখানে, ঐ উপরে। সবাই যার যার কর্মগুণে পায়। কথাটা বুজলি না?'

গর্বের হাসি হেসে তত্ত্বকথা শোনাতো পণ্ডিতমশাই মদন শরকে।

শর পাকা ঘুঘু। সে জানে কী করে শর হানতে হয়। সেই ব্যবস্থা সাথে নিয়েই সে এসেছে। এসে আবদার করার ভঙ্গিতে ধরে পড়লো পণ্ডিত-মশাইকে।

---'গুরুদেব আপনার কৃপাভিন্ন ত আর কোন উপায় দেখছি না। এক-মাত্র আপনিই পারেন এবার মান ইজ্জত বাঁচাতে। বিমুখ হবেন না যেন গুরুদেব। দোহাই আপনার।'

---'ব্যাপারখান কী তাই আগে পরিষ্কার কইরা কও না। এত ভাবনের কী অইছে? জলে ত' আর পর নাই। কও দেহি শুনি কী ব্যাপার?'

---'আজ্ঞে তার আগে পরিচয় লাল গুলরাজন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী, নাম শুনেছেন বোধ হয়?'

---'তা শুনি নাই, কও কী? নমস্কার ধোকালালজী।'

---'নোমোস্কার পোনডিতজী।'

---'তা কও দেহি এইবার কী ব্যাপার।'

---'আজ্ঞে আমরা বিখ্যাত নাট্য-কার শ্রীন্যাংটেশ্বর গড়গড়ির 'চিনির চেয়ে চুমু মিঠে' বইটিতে হাত দিয়েছি। অনেক খুঁজে পেতে একটি মনের মত হিরোয়াইনেরও সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু মুস্কিল হল যে সম্ভ্রান্ত ঘরের কলেজে পড়ুয়া মেয়ে। সংকোচ যেন আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তার উপর চালু মেয়েও বটে। বড্ডই লেজে খেলাচ্ছে। অনেকগুলো টাকা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি গুরুদেব। চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। যদি কোন উপায়ে মেয়ে-টাকে হাত করার একটু বন্দোবস্ত করে দেন তবে---

তোবে হাপনের বোনদোবস্তের কোন কসুর হোবে না পণ্ডিতজী।'

শরের কথা লুফে নিয়ে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে কথা শেষ করে দেয় প্রডিউসার ধোকালালজী।

---'মানে কথাটা অইলো গিয়া কিনা এই ধর তোমার গিয়া মানে কইতে চাই এই আর কী যে অর্থাৎ গিয়া তোমার মানে কী রকম আর কী ঐ গিয়া তোমার অর্থাৎ কী রকম খরচাপাতি করতে পারবা সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করণ আর কী? কথাটা বুজলা না?'

পণ্ডিত মশাই পাকা শিকারী। অনেক ইতস্তত করেই যেন নেহাৎ না জিজ্ঞেস করলে নয় ভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করলেন। তবে চট করে জবাবও পেয়ে গেলেন।

---'দেখুন পণ্ডিতজী হামার কাছে সিধা কোথা। টাকার জইন্যে পরোয়া কোরবেন না। যোতো লাগে খোরচা না। কামটা আগে দোরকার আছে। তা ঠিক আছে, আভি এই লিন পানসো টাকা। য়েডভান্স কোরে দিলাম। ওর কাম হাসিল হোলে ওর ভি হাজার টাকা কেস দেবো। দেখুন রাজি আছেন?'

নোটের তোড়াটা প্রায় খপ করে নিয়ে নিলেন তিনি ধোকালালের হাত থেকে। তারপর চিত্ত ঠাণ্ডা করা একগাল হাসি হেসে বললেন,---'হে-হে-হে-হে, কথা শোন রাজী---অরাজীর এতে আছে কী কও দেহিন? আসল কথা অইলো গিয়া তোমাগো কাম। হেইটা কইরা দিতে পারলেই না কথা? কী কও? টাকাটা ত' আর কোন বড় কথা। না। টাকা অইলো গিয়া তোমার হাতের ময়লা। টাকা কী আর সারা জীবন থাকে না তোমাগো লগে আমার টাকার সম্পর্ক? কথা শোন। হে-হে-হে-হে।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে হাসতেই টাকাগুলি কোমরে গুঁজে ফেললেন। তবে মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলে হবে কী। চোখ কিন্তু লালসায় জ্বল জ্বল করছিল।

হাসতে হাসতেই খড়ম খট খট করতে করতে উঠে গেলেন দরজার দিকে। তারপর সদর অন্দরের দরজা খুব ভাল করে খিল এঁটে দিয়ে এসে নামাবলি সামলাতে সামলাতে বসলেন ধোকালালের গা ঘেঁষে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গলার স্বর খাটো করে প্রশ্ন করলেন,---'ছুকরীর বয়স কত? শ্যামাঙ্গী না গৌরাঙ্গী? একবার এইখানে আনতে পার? তবে বড় সুবিধা অইতো কিন্তু।'

প্রশ্ন করে ব্যাকুল আগ্রহে তাকালেন ধোকালালের দিকে।

---'হাঁ হাঁ জরুর লিয়ে আসবে। কিউ নেই। তোবে আগে কামটা ত' হাঁসিল কোইরে দেন তারপর কয়েকবার কেনো, ছুকরীকে বিশবার লিয়ে আসেন না। কোন শালার কী বোলবার থাকবে তাতে। তোখন ত' সেটা হাপনারই জিনিষ হোয়ে গেলো। ঠিক বোললাম

—'ছ্যা: ছ্যা: ছ্যা: কি যে কও! রাধেমাধব রাধেমাধব। আমি কি হেই কথা কইলাম নাকি? কী কইলাম আর তার কোন অর্থ করলা। ছি: ছি: ছি:। আমি ছুকরীরে আনতে কইলাম এইলেইগা যে তাতে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি অইতো এই আর কী। তা থাউক, তার আর দরকার নাই। ব্যবস্থা আমি এইখান থিকাই কইরা দিতাছি। আইচ্ছা তবে তোমরা বসো ব্যবস্থা দিয়া দিতাছি।'

পণ্ডিতমশাই উঠে খড়মের আওয়াজ করতে করতে অন্দরমহলে চলে গেলেন। মিনিট দশেক পরে আবার এলেন। বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে এনে দিলেন মনোমোহিনী মাদুলি ধোকালালের হাতে। অত:পর মাদুলি ধারণের বিধি-ব্যবস্থাদি বাতলে দিয়ে বললেন—'মাদুলিটি ধারণ কইরা যে কোন শনি-মঙ্গলবার আমাবশ্যা রাইতে ধস্তাত বেটির বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা স্পর্শ কইরা অ'র মাথার একগাছ চুল ছিড়া নেবা। তারপর হেই চুলটার সাথে এই শিকড়টা নিয়া গিয়া তোমার স্টুডিওর দরজার চৌকাঠের নীচে মাটির তলায় পুইতা রাখ। তারপর দেখবা গিয়া তোমার তামাসা কয় কারে।

পণ্ডিতমশাইর মুখটা তখন দেখাচ্ছিল ঠিক হিংস্র শ্বাপদের মুখের মত। বলে চললেন—'হারামজাদী আসতে চায় না। না? অর বাপে আইবো বুজলা অ'র বাপে আইবো। এই মাদুলীর নাম অইলো গিয়া মনোমোহিনী মাদুলি বুজলা? চন্দ্র-সূর্য যদি সত্য অইয়া থাকে ধর্ম যদি সত্য অইয়া থাকে, আর সতী মায়ের সন্তান যদি আমি অইয়া থাকি তবে দেইখো মজাটা। লেজে খেলায়? ঐ হারামজাদী যদি কুলের মুখে কালি দিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তোমাগো স্টুডিওর দরজায় আইস্যা, তোমাগো পায়ে পইড়া মাথা কপাল না কোটে তখন আমারে কইও। এই যদি না অয় তো একটা ঘষা পয়সাও লমু না। বেবাক টাকা ফিরৎ দিমু। এর নাম মনোমোহিনী মাদুলি বুজলা? এই মাদুলি যেই দিন ব্যর্থ অইবো হেইদিন জানবা চন্দ্র-সূর্য মিথ্যা অইবো। সত্য বইলা কিছু থাকবো না। পৃথিবী রসাতলে যাইবো। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। হারামজাদীর কোন উপায় নাই, আসতেই অইবো। হে-হে-হে।'

একদমে অতগুলো কথা বলে প্রায় হাঁপাতে লাগলেন। তারপর একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নাদ তুললেন—'তারা ব্রহ্মময়ী মাগো।'

কথা আর এগোলো না, দরকারও ছিল না। ধোকালাল আর মদন শর ভক্তি কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করে চলে গেল মনোমোহিনী মাদুলির শক্তি পরখ করতে। পণ্ডিতমশাইরও কাজ শেষ। ওঁরা চলে যেতে ধূর্ত হাসির রেখা ফুটে উঠলো ঠোটের কোণে। আর সময় নষ্ট না করে আঙুলের ডগা চেটে নিয়ে বসে গেলেন নোট গুণতে।

না। মাদুলি ব্যর্থ হয়নি। ২৪ ঘণ্টার আগেই যেন মাদুলি কথা বয়ে জবাব দিল। চন্দ্র-সূর্য রক্ষা পেল। রক্ষা পেল ধর্ম। রক্ষা পেল না কেবল সতী মায়ের পুত্র পণ্ডিত রামনারায়ণ শাস্ত্রী জ্যোতিষার্ণবের ধর্ম। তার একমাত্র কন্যা সত্যবতী সত্যিই কুলের মুখে কালি দিয়ে গিয়ে ধোকা, মদনের স্টুডিওর দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তবে হারামজাদী গেলেও তার বাপ কিন্তু গেল না। সব ফেলে রেখে সে যে কোথায় গা ঢাকা দিল তার খোঁজ কিন্তু আজ অবধিও কেউ দিতে পারে না।

বেতোরোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা

রোগ নির্ণয়ের জন্য পশ্চিম জার্মানীতে একটি নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ যাবত সাধারণ চিকিৎসকদের পক্ষে বাতের সব মূল কারণগুলি খুঁজে বার করা এক প্রকার দুরূহ ছিল এবং তারা আন্দাজে নানারকম ওষুধ ব্যবহার কোরে 'লাগে তুক না লাগে তাক' ভাবে চিকিৎসা করতেন।

এখন যে পরীক্ষা পদ্ধতি বেরিয়েছে তার সাহায্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বাতের আসল কারণ দ্রুত আবিষ্কার করা সহজসাধ্য হয়েছে। খুব যন্ত্রণাদায়ক বাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শরীরে যখন বাতের জীবাণু ঢোকে তখন শরীরে একধরণের প্রতিরোধক বস্তু গড়ে ওঠে। সেগুলি যখন রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে তখন বাতের জীবাণুর সঙ্গে তাদের ঠোকাঠুকি লেগে যায় এবং এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ফলে বাতের ব্যথা অসহ্য হয়ে ওঠে।

আরেকরকম বাত হয় শরীরে যখন তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা 'অটো অ্যান্টি বডি' উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে দেহ কোষের এমন পরিবর্তন হয় যে, শরীর এগুলিকে শত্রু মনে করে ও তাদের দেহ থেকে উৎখাত করতে 'অটো অ্যান্টি বডি' গড়ে তোলে। বাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তরসে যে প্রোটিনের পরিবর্তন ঘটে সেটিও রোগ নির্ণয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

নতুন পরীক্ষায় বাত রোগের কারণ নির্ণয় সহজসাধ্য হওয়ায় ঠিক ওষুধ সযত্নে পরিকল্পিত 'স্নানারোগ্য' এবং সর্বাধুনিক শারীরিক ব্যায়াম ও বিকিরণের সাহায্যে নিরাময় করা মোটেই কঠিন হবে না।

প রি চি তি

'ফরমাল' আমরা নই। 'ওরা' অতি-মাত্রায়। এবং যেহেতু ওরা আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল শ' দুই বছর, প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা কিছু পরিমাণে ওদের রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি অন্দরে যদি বা 'সেই ট্র্যাডিশন' অনেকটা এখনও 'সমানে চলেছে,' বাইরে আমরা কিছুটা 'ফরমাল' হয়ে উঠছি ধীরে ধীরে।

ওরা যাওয়ার পর থেকেই যেন 'স্বাধীন' আমরা স্বাধীন রুচিমাফিক ওদের দিকে ঝুঁকছি। আগে যা ছিল—রায়সাহেব, খাঁ সাহেব অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতা, এখন তা ভারতময় গিয়েছে বুঝি ছড়িয়ে।

পরিচিতির ক্ষেত্রে কথাটা খাটে বোধ হয় বেশ খানিকটা।

এই ত সেদিন বসেছিলাম কফি হাউস-এ (স্মরণ করুন এটি কাদের দান), কানে এল—একজন পরিচয় দিচ্ছেন অন্যজনের।

'মিস্টার রায়, ইনি মিস্টার ভদ্র।' অন্তত আমার কানে এল ঐ জাতীয় শব্দগুচ্ছ।

ভদ্রমশাই চলে যাওয়ার পর রায়মশাই পরিচয়কারীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'ওর নামটা যেন কী বললে? ঠিক ধরতে পারলাম না।'

'গজানন ভদ্র।'

'গজানন ভদ্র?' রায়মশাই চমকে উঠে বললেন, 'আহা পুরো নামটা যদি তখন বলতে। বিখ্যাত লেখক। ওর সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছি কত দিন ধরে—।' তার কণ্ঠস্বর রীতিমত ক্ষুণ্ণ। কিঞ্চিৎ অভিযোগপূর্ণ।

ভদ্রলোককে দোষ দেওয়া যায় না। ইংরেজ কায়দায় বঙ্গীয় পরিচিতির জন্য উনি দীর্ঘদিন ধরে যার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক তার সঙ্গে আলাপ করতে পারলেন না।

সঠিক পরিচিতি আমাদের জীবনে অনেক সময় স্বস্তি, এমন কি খুশির কারণ হতে পারে। হয়ও। পুরো নামটা বললে পরিচিতির প্রাথমিক পর্ব শেষ।

বলতেনও তাই। আমাদের বাবা-কাকারাই দেখেছি কাউকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় কেবল নাম বলতেন না, তার বাবা বা অন্যান্য আত্মীয়র নাম, যার সঙ্গে হয়ত দ্বিতীয়-জন পরিচিত এবং তার অন্যান্য গুণের কথাও উল্লেখ করতেন।

বস্‌বন্ধু

নিমন্ত্রণ করার সময় নিমন্ত্রিতদের গুণাবলী, তাদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র, সখ, বা সাম্প্রতিক কোন ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে জানালে নিমন্ত্রণবাড়িতে একটা অন্য আবহাওয়া তৈরি করা সম্ভব হয়।

আগে থাকতে পারস্পরিক পরিচয় জানা থাকলে কেবল যে আলাপ সুরু করতে সুবিধে তাই না, দেখা হওয়ার আগেই পরস্পরের কাছ থেকে নিজস্ব আকর্ষণীয় ঘটনা ইত্যাদি আলাপ-মাধ্যমে জানতে চাওয়ার ইচ্ছাও গড়ে ওঠে।

রামবাবু ইতিহাসের অধ্যাপক, তিনি শ্যামবাবুর সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিক আলোচনা করতে উৎসুক। কারণ, শ্যামবাবু অবসরসময়ে পুরাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান। যদু মল্লিক চান মধু লাহার সঙ্গে বাগান করা নিয়ে আলাপ করতে। প্রথমজনের বাগান করা সখ, মধুবাবু ও ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। বিভা চায় শুভার কাছ থেকে উল বোনার কোনও একটা বিশেষ প্যাটার্ন তুলে নিতে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি কোনও অতিথি কোনও বিশেষ বিষয়ে খ্যাতনামা হন, বা তার কাজ যদি খুব আকর্ষণীয় হয়, তা হলে অন্যান্য অতিথিদের আগে ভাগে সে খবর জানিয়ে দেওয়া ভাল। তাদের হয়ত এমন কিছু বলার থাকতে পারে, যা শুনলে খ্যাতনামা ভদ্রলোক উপকৃত হবেন। উল্টোটাও সমানভাবে সম্ভাব্য।

'ডক্টর' বলতেই মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে স্টেথো হাতে রোগ সারানোর চিকিৎসক। কিন্তু উপাধিটা পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইংরেজি, বাংলা, দর্শন ইত্যাদি যে-কোন বিষয়ে গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে প্রাপ্তব্য। কাজেই নিমন্ত্রিত কারো 'ডক্টরেট' উপাধি থাকলে তা ব্যাখ্যা ক'রে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কুমারী অবস্থায় খ্যাতনাম্নীদের বিয়ের পর, পরিচয় করাতে গেলে অসুবিধা হয়। পরিবর্তিত পদবী বললে কুমারী-জীবনের কৃতিত্ব ঠিক খেয়াল করে না লোকে, আবার কুমারী-জীবনের পদবীসমেত পরিচয় দিলে মহিলার স্বামী খুব সম্ভবত অসন্তুষ্ট হবেন।

এ অবস্থায় মুশকিল আসান করা যায় একটু কায়দা করতে পারলে। যেমন ধরুন, কোন লেখিকার পরিচয় দেওয়ার সময় বলা চলে, 'ইনি ইভা বোস, লেখেন ইভা ঘোষ নামে।'

ছোটদের পরিচিতি অত্যন্ত দায়-সারা গোছের হয়ে থাকে। দু'জন বয়স্ক মানুষ নিজেরাই পরিচিত হবেন, সে আশা আমরা করি না। কিন্তু ছোট-দের ক্ষেত্রে ধরেই নিই যে, ওরা আপনা হতে ভাব ক'রে নেবে।

বড়দের মতই ছোটদেরও ভাল-ভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। 'এটি বুলু, ও টুলু, এই হল মিল, আর ইনি শ্রীমতী শুভা',—এ ধরণের পরিচিতি অবাঞ্ছনীয়। পরিচয় করানর মাঝখানে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়াও ঠিক নয়।

হঠাৎ কোনও বন্ধুকে পরিচিত করাতে গিয়ে তার নাম মনে না এলে? এ ধরণের ঘটনার কথা শুনে মজা পাই বটে, কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে ঘটলে বেশ অস্বস্তি বোধ করি।

একবার ঠিক এ রকম হয়েছিল। ফিরে বললাম, 'দেখো, ভাবতেও অবাক লাগছে, কিন্তু ভাই আমি এত ক্লান্ত যে, তোমার নামটা মনে করতে পারছি না।' বন্ধুটি বুঝল আমার অবস্থা।

আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় কেউ সামান্য ইতস্তত করলেও আমি তক্ষুণি নিজের নাম বলে দিই। যেন প্রসঙ্গক্রমে বলছি, এই ভাবটা বজায় রেখে।

সত্যি বলতে কি, কে কী ভাবে পরিচিত হতে চান, তা জানা থাকলে সব থেকে ভাল হয়।

কে বলেছিলেন মনে নেই, কিন্তু কথাটা বোধ হয় সত্যি যে, নিজের নাম প্রত্যেকের কানে মধুবর্ষী। সুতরাং ভালভাবে পরিচয় করালে আমরা অন্যের কাজে সুধাবর্ষণ করতে ত পারিই, তাদের কানে প্রিয়ও হয়ে উঠি।

আর, প্রিয় হতে কেই বা না চান?

আরবী ঘোড়া

অজিতকুমার বিশ্বাস

বাংলাদেশের ছেলে আমি
বাংলাভাষাই পড়ি,
মনের মাঝে ইচ্ছা ছিল
আরবী ঘোড়ায় চড়ি।
ঘোড়াই ভালো দেখিনিকো
চড়ার কথা পরে,
আরবী ঘোড়া তবু আমার
মনের মাঝে ঘোরে।

আপন মনে চলতে ছিলেম
বনের পথে একা—
একটি ঘোড়া কোথায় থেকে
হঠাৎ দিলো দেখা।
পাশ কাটিয়ে চলতে গেনু,
আমায় দিলো ডাক—
এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা
এখন পড়ে থাক।
আমার কাছে সোজাসুজি
আপনি এলো চলে
নীচু হ'য়ে পিঠের ওপর
তুললো সবলে।
ঊর্ধ্বশ্বাসে চললো সেটি
আমায় পিঠে নিয়ে
পক্ষিরাজের মতন সে যে
আকাশ পথ দিয়ে
চাঁদের দেশে নিমেষ-মাঝে
পরীর দেশে দেশে—
কী অপরূপ ছন্দেতে সে
কী অপরূপ বেশে!

মোহন তাহার দোলনখানি
মোহন তাহার গতি,
ঝড়ের বেগে উধাও চলে
দাঁড়ায় না এক রতি।
স্বপ্নাচ্ছন্ন আঁখি আমার
স্বপ্নে-ঘেরা মন।
ভুলে গেলাম আপন স্বরূপ
ভুলিনু স্বজন।
এমনি করে স্বপ্নাবেশে
চলতে থাকি আমি,
এমনি করে সেই ঘোড়াটি
চললো দিবস-যামী।
আরবী ঘোড়া মোটেই কি না
বুঝিনিকো তাহা
মোহন তাহার দ্যুতিতে মোর
মন ভুলানো আহা!
এমনি করে কখন সে এক
আনলো বেড়ার ধারে,
ধাক্কা দিয়া বিষম—সে যে
ফেলিয়া দিল হা রে!
উঠতে গিয়ে দেখি আমার
কোমর গেছে ভেঙে।
খাদের মধ্যে পড়ে আছি
পথের পাশে থেমে।
মুখটি তুলে এদিক-ওদিক
চারপাশেতে চাই,
পালিয়ে গেছে আরবী ঘোড়া
হদিশ তাহার নাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম অঙ্কে বর্ণিত টেস্‌ম্যান-দের ঘর, কেবল পিয়ানো-টা সরিয়ে একটু ছোট্ট সুন্দর লেখার টেবিল বুক-শেল্‌ফ সমেত ঐ জায়গায় রাখা হয়েছে। বাঁদিকে সোফা-র কাছে আরও ছোট একটা টেবিল। প্রায় সব ক'টা ফুলের তোড়া অপসৃত। সামনের বড় টেবিল-এর ওপর শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর দেওয়া পুষ্পস্তবক।

সময়—অপরাহ্ণ।

অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানর উপযোগী পোশাকে হেডা ঘরে একা। খোলা কাঁচের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটা রিভলবার-এ গুলী ভরছেন। লেখার টেবিল-এর ওপর খোলা পিস্তল-কেস-এ ওর জোড়া পড়ে রয়েছে।

হেডা। (বাগানে তাকিয়ে ডাকলেন) আচ্ছা, আবার তাহলে এসেছেন আপনি!

ব্র্যাক। (দূর থেকে ডাকছেন শোনা যাচ্ছে) দেখতেই ত' পাচ্ছেন!

হেডা। (পিস্তল তুলে নিশানা ক'রে) এখন আপনাকে গুলী করবো, বিচারপতি ব্র্যাক!

ব্র্যাক। (অদৃশ্য অবস্থায় হেঁকে) না, না, না! আমার দিকে তাক করবেন না।

হেডা। এটাই পেছন দিয়ে চুপিসাড়ে আসে।

[গুলী করলেন]

ব্র্যাক। (আরও কাছে এসে) বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে না কি—!

হেডা। হায় হায়—আমি কি আপনাকে আঘাত দিয়েছি?

ব্র্যাক। (তখনও বাইরে) শুনছেন, এইসব খামখেয়ালী একা একা করলে হয় না!

হেডা। বেশ ত', ভেতরে আসুন।

[কাঁচের দরজা দিয়ে বিচারক ব্র্যাক ঢুকলেন, পোশাক যেন মেনস পার্টির উপযুক্ত। হাতের ওপর একটা হাল্কা ওভারকোট।]

ব্র্যাক। কী কাণ্ড—এখনও এই খেলায় ক্লান্ত হন নি? কী লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়ছেন?

হেডা। ওহো, শূন্যে গুলী চালাচ্ছি।

ব্র্যাক। (তাঁর হাত থেকে আলতোভাবে পিস্তলটা নিয়ে নিলেন) মহাশয়া, অনুমতি দিন! (ওটার দিকে তাকিয়ে) আ—এই পিস্তলটা আমি বেশ চিনি। (চারপাশে তাকালেন) কেসটা গেল কোথায়? ও, এই যে। (পিস্তল ওর মধ্যে রেখে বন্ধ করে দিলেন) আজ আর এ খেলা খেলবো না। কী করবো বলতে পারেন?

ব্র্যাক। কোন অতিথি আসেন নি?

হেনরিক ইব্‌সেন

হেডা। (কাঁচের দরজা বন্ধ করতে করতে) একজনও না। মনে হয় পরিচিতরা এখনও সহরের বাইরে রয়েছেন।

হেডা। (লেখার টেবিল-এর ড্রয়ার-এ পিস্তল রেখে বন্ধ ক'রে দিলেন) না। দুপুরের খাওয়ার পরেই সে সোজা পিসীর বাড়ি গেছে; আপনাকে এত সকাল আশা করে নি।

ব্র্যাক। হুঁ,—মূর্খের মত এ কথাটা একবারও ভাবি নি।

হেডা। (তাঁর দিকে তাকানর জন্য মাথা ঘুরিয়ে) মূর্খ কেন?

ব্র্যাক। কাল, এ কথাটা মাথায় এলে আরও একটু আগে আসতে পারতুম।

হেডা। (থেমে ও প্রসঙ্গে গিয়ে) তাহলে সাক্ষাত জানানোর জন্য কাউকে পেতেন না; কেন না, দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর থেকেই নিজের ঘরে আমি পোশাক পাল্টাচ্ছিলাম।

ব্র্যাক। ছোটখাট এমন কোন ছিদ্র নেই যার ভেতর দিয়ে আলোচনা বইয়ে দেওয়া যায়?

হেডা। ব্যবস্থা করতে ভুলে গেছেন।

ব্র্যাক। এই আর এক মূর্খতা।

হেডা। আচ্ছা, এখানে জাঁকিয়ে বসা যাক—তারপর অপেক্ষা। কিছুক্ষণের মধ্যে টেস্‌ম্যান-এর ফেরার সম্ভাবনা অল্প।

ব্র্যাক। বাদ দাও; আমি ধৈর্য হারাব না।

[কোণের সোফায় হেডা বসলেন। সব থেকে কাছের চেয়ার-এর পেছনে ওভারকোট রেখে ব্র্যাক বসলেন, কিন্তু টুপি তাঁর হাতে। অল্পস্থায়ী নীরবতা। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকালেন।]

হেডা। তাহলে?

ব্র্যাক। (এক সুরে) তাহলে?

হেডা। আমি প্রথমে কথা বলেছি।

ব্র্যাক। (সামনের দিকে অল্প ঝুঁকে) আসুন শ্রীমতী হেডা, একটু জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক।

হেডা। (সোফায় আরও হেলে) আমাদের শেষ কথা হওয়ার পর থেকে একটা যুগ কেটে গেছে মনে হচ্ছে না? অবশ্যই কাল রাত্রে আর আজ সকালে যে দু-চারটে কথা হয়েছে তা ধরছি না।

ব্র্যাক। বলতে চাইছেন আমাদের শেষ গোপনীয় কথা? আমাদের শেষ নিভৃত আলাপ?

হেডা। বেশ; তাই বটে—ওভাবেই যখন বললেন।

ব্র্যাক। এমন একদিনও যায় নি যখন আমি আপনার গৃহে প্রত্যাগমন কামনা করি নি।

হেডা। আমিও ঠিক তাই ভেবেছি শুধু।

ব্র্যাক। আপনিও? সত্যি? আমি ভাবছিলাম আপনি ভ্রমণ-সুখ-মগ্ন।

হেডা। হ্যাঁ, ঠিকই, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হোন!

ব্র্যাক। কিন্তু টেস্‌ম্যান-এর চিঠিতে খুশি উপচে পড়েছিল।

হেডা। ও, টেস্‌ম্যান! দেখুন, পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে কাপ করা তার সবচেয়ে বড় আনন্দ।

ব্র্যাক। (ঈর্ষার সুরে) আরে, এ ত' তাঁর জীবনের পেশা—অন্তত অংগ ত' বটেই।

হেডা। হ্যাঁ তা ত' বটেই; এবং সন্দেহ নেই এটা যখন আপনারও পেশা—কিন্তু আমি। সুপ্রিয় বিচারক, আমার যা ভীষণ একঘেয়ে লাগছে।

ব্র্যাক। (সহানুভূতি সহকারে) সত্যি তাই বলছেন? খাঁটি আন্তরিকতার সঙ্গে?

হেডা। হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—! আমাদের সারকুল সম্বন্ধে যাহোক-কিছু জানা, একজনেরও সঙ্গে আদৌ দেখা না হয়ে পুরো ছ'মাস কাটান; এমন কি আমাদের কৌতূহল আছে এমন একটা বিষয় সম্বন্ধেও কারুর সঙ্গে কথা বলতে পাই নি।

ব্র্যাক। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমিও মনে করতাম বঞ্চিত হচ্ছি।

হেডা। তারপর, যা ছিল সবচেয়ে বেশি অসহ্য—

ব্র্যাক। আচ্ছা?

হেডা। চিরকাল এক এবং অভিন্ন লোকটির সান্নিধ্যে থাকা—

ব্র্যাক। (সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে) সকাল, দুপুর, রাত্রি—ঠিক, সব সময়, সব ঋতুতে।

হেডা। বলেছি 'চিরকাল।'

ব্র্যাক। ঠিক তাই। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আমাদের খাসা টেস্‌ম্যান-এর সঙ্গে কে-কেউ—

হেডা। টেস্‌ম্যান একজন বিশেষজ্ঞ, সুপ্রিয় বিচারক।

ব্র্যাক। 'না' বলার উপায় নেই।

হেডা। এবং, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বেড়ান আদৌ আনন্দজনক নয়। শেষ পর্যন্ত কোনমতেই নয়।

ব্র্যাক। এমন কি, যে বিশেষজ্ঞকে মানুষ ভালবাসে তাঁর সঙ্গেও নয়?

হেডা। দোহাই যাক—ঐ বিরক্তিকর শব্দটা ব্যবহার করবেন না!

ব্র্যাক। (চমকে গিয়ে) কী বলছেন আপনি?

হেডা। (আধা হাস্যময়ী, আধা বিরক্তিপূর্ণ) শুধু একবার চেষ্টা করুন! সকাল, দুপুর, রাত্রি—শুধুমাত্র সভ্যতার ইতিহাস শোনা—

ব্র্যাক। চিরকাল।

হেডা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! আর তারপর মধ্যযুগের গৃহশিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা—! এইটাই সব থেকে বেশি ন্যক্কারজনক।

ব্র্যাক। (তাঁর দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে) কিন্তু বলুন ত'—তাহলে, আমি কীভাবে বুঝবো আপনার—? হুঁ—

হেডা। আমার টেস্‌ম্যান-কে স্বামী হিসেবে গ্রহণ বলতে চাইছেন?

ব্র্যাক। বেশ ত,' ওইভাবেই বলা যাক।

হেডা। হা ঈশ্বর, এর মধ্যে বিস্ময়কর কিছু দেখছেন না কি?

ব্র্যাক। হ্যাঁ; আবার না-ও বটে, শ্রীমতী হেডা।

হেডা। আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, ওহে বিচারক। আমার দিন ফুরিয়ে-ছিল—(একটু কেঁপে উঠে) ও না—আমি তা বলতে পারি না; ভাবতেও পারি না।

ব্র্যাক। তা করার কোনও কারণই নেই।

হেডা। হায়, কারণ?—(তাঁকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে) আর জর্জ টেস্‌ম্যান—নিশ্চয় স্বীকার করবেন—মূর্তিমান খাঁটি-ত্ব।

ব্র্যাক। তাঁর খাঁটি-ত্ব আর সম্ভ্রান্ততা প্রশ্নাতীত।

হেডা। তাছাড়া, তাঁর মধ্যে পুরোপুরি হাস্যকর কিছু আমার চোখে পড়ে নি।—আপনার?

ব্র্যাক। হাস্যকর? ন্—না—ঠিক তা বলতে পারি না—

হেডা। আর তাঁর গবেষণার ক্ষমতা, যাই ঘটুক না কেন, ক্লান্তিহীন।—শেষ পর্যন্ত প্রথম সারিতে তাঁর না আসার কোনও কারণ আমি দেখতে পাই না।

ব্র্যাক। (তাঁর দিকে দ্বিধান্বিত দৃষ্টি ফেলে) আমি ভেবেছিলাম আর পাঁচজনের মত আপনিও আশা করেন সে একদিন সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করবে।

হেডা। (ক্লান্তি হাবভাবে ফুটে উঠেছে) হ্যাঁ, তাই ভেবেছিলাম।—আর, তারপর, যখন সে যে-কোন ঝুঁকি নিয়ে আমাকে পুষতে চাইল—সত্যি বুঝতে পারছি না কেন তাকে ফিরিয়ে দেবো।

ব্র্যাক। না, যদি ঐভাবে দেখেন ত'—

হেডা। সুপ্রিয় বিচারক, আমার অন্যান্য প্রণয়ীদের কেউই এতটা করতে প্রস্তুত ছিল না।

ব্র্যাক। (হেসে) দেখুন, সকলের হয়ে উত্তর দেওয়া আমার কর্ম নয়; কিন্তু নিজের কথা বলতে পারি এই যে, আপনি ভাল-ভাবেই জানেন আমি বরাবর মনে করেছি বিয়ে— বিবাহ একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যাপার—এটা একটা ইন্সটিটিউশন ত' বটে!

হেডা। (ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে) আহা, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার সম্পর্কে কোনও আশা আমার কোনদিনই ছিল না।

ব্র্যাক। আমি চাই একটা মেজাজী, অন্তরঙ্গ ভেতরবাড়ি, যেখানে আমি নিজেকে সব রকম ভাবে কাজে লাগাতে পারবো, আর যাতায়াতেরও অবাধ স্বাধীনতা থাকবে একজন—একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে—

হেডা। বাড়ির কর্তার বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে, তাই না?

ব্র্যাক। (নত হয়ে) খোলাখুলি বলছি—প্রথমে কর্ত্রীর; তবে নিশ্চয়ই কর্তারও বটে, সেটা পরে। এই ত্রিভুজ বন্ধুত্ব—যদি বলার অনুমতি পাই—সত্যি সকলের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধেজনক। শুনে রাখুন।

হেডা। হ্যাঁ, ভ্রমণকালে কোনও একজনকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে পেতে চেয়েছি

বারবার। বাস্—ট্রেন-এ মুখোমুখি বসে সেই অন্তহীন বকবকানি—।

ব্র্যাক। সৌভাগ্যক্রমে আপনার মধুচন্দ্রিমা উপলক্ষে ভ্রমণপর্ব সমাপ্ত।

হেডা। (মাথা নেড়ে) অ-নে-ক দিন হয় নি। কেবল লাইন ধরে স্টেশন-এ পৌঁছে গেছি এই যা।

ব্র্যাক। বেশ, আরোহীরা এখন কিছু কিঞ্চিৎ লম্পঝম্প করবে বেরোবার জন্য, নড়েচড়ে বেড়াবে এদিক সেদিক।

হেডা। আমি কখনও লাফিয়ে বের হই না।

ব্র্যাক। সত্যি?

হেডা। না—কারণ, সব সময় কেউ না কেউ পাশে দাঁড়িয়ে—

ব্র্যাক। (হাসতে হাসতে) বলতে চাচ্ছেন, আপনার গোড়ালি দেখে?

হেডা। ঠিক তাই।

ব্র্যাক। বেশ, কিন্তু হায়রে হায়—

হেডা। (বিরক্তি প্রকাশ ক'রে) আমি সহ্য করতে পারি না। বরং নির্দিষ্ট জায়গায় বসে—হ্যাঁ, এক জায়গায় অনড় হয়ে বকবকানি চালিয়ে যেতে রাজি আছি।

ব্র্যাক। কিন্তু ধরুন, কোনও তৃতীয় লাফ দিয়ে ভেতরে গিয়ে দম্পতীর আলাপ-আলোচনায় যোগ দিল।

হেডা। আঃ, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

ব্র্যাক। একজন বিশ্বস্ত, সহানুভূতিশীল বন্ধু—

হেডা। সব রকম টাটকা বিষয়ে কথা বলতে পারেন—

ব্র্যাক। এবং ছন্দাংশেও বিশেষজ্ঞ নয়।

হেডা। (স্পষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ সে একটা রিলিফ ঠিকই।

ব্র্যাক। (সামনের দরজা খুলতে শুনে ঐদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন) ত্রিভুজ সম্পূর্ণ।

হেডা। (নাতি উচ্চৈঃস্বরে) আর ট্রেনও চলতে সুরু করল।

[হলঘর থেকে ঢুকলেন জর্জ টেস্‌ম্যান, পরনে ধূসর ওয়াকিং স্যুট, নরম ফেল্ট হ্যাট। বগলের তলায় আর পকেটে বেশ কয়েকটা না-বাঁধান বই।]

টেস্‌ম্যান। (কোণের সেটী-র পার্শ্বস্থ টেবিল পর্যন্ত গিয়ে) উফ্—গরমের দিনে কী বিরাট বোঝা রে' বাবা—এই বইগুলো। (ওগুলো টেবিল-এর ওপর রাখলেন) হেডা, আমি রীতিমত ঘামছি। হ্যালো—প্রিয় বিচারপতি, এরই মধ্যে এসে গেছেন দেখছি। অ্যাঁ? বার্‌তা আমাকে বলে নি ত'।

ব্র্যাক। (উঠে) বাগানের ভেতর দিয়ে এসেছি কি না।

হেডা। ওগুলো কী বই গো?

টেস্‌ম্যান। (দাঁড়িয়ে দুখানকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে) আমার বিশেষ বিষয়ের ওপর একেবারে নতুন বই—এগুলো না হলেই নয়।

হেডা। তোমার বিশেষ বিষয়?

ব্র্যাক। হ্যাঁ, ও'র বিশেষ বিষয়ের ওপর লেখা বই, শ্রীমতী টেস্‌ম্যান।

[ব্র্যাক আর হেডা গোপনে মৃদু হাসি বিনিময় করলেন।]

হেডা। তোমার বিশেষ বিষয়ের জন্য এখনও আরও নতুন নতুন বই দরকার?

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ গো হেডা, বই কখনও অতিরিক্ত হতে পারে না। যা কিছু লিখিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে তার সংগে তাল না মেলালে ত' চলবে না।

হেডা। হ্যাঁ, মনে হয় ওটা অবশ্যকৃত্য।

টেস্‌ম্যান। (বইয়ের ডাঁই ঘাঁটতে ঘাঁটতে) আর শোন—এইলার্ট লিউভ্‌বোর্গ-এর নতুন বইখানাও পেয়েছি। (হেডা-কে বইটা দিয়ে) হেডা, একবার চোখ বোলাতে তোমার হয়ত ভাল লাগবে। অ্যাঁ?

হেডা। না, ধন্যবাদ। ইয়ে বরং—পরে সম্ভবত।

টেস্‌ম্যান। বাড়ি আসার পথে একবার চোখ বুলিয়েছি।

ব্র্যাক। ও, তা আপনার মতামত কি—বিশেষজ্ঞ হিসেবে?

টেস্‌ম্যান। আমার ধারণা বইটায় বিচার-বুদ্ধির গভীরতা উল্লেখযোগ্য। ও আগে কখনও এরকম লেখে নি। (বইগুলো একসংগে ক'রে) এবার সব আমি পড়ার ঘরে নিয়ে যাবো। পাতাগুলো কাটতে খুব ইচ্ছে করছে—। তারপর পোশাকও অবশ্য পাল্টাতে হবে। (ব্র্যাক-এর প্রতি) এক্ষুণি যাত্রা করার দরকার নেই ত'? অ্যাঁ?

ব্র্যাক। আরে, না, না—বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।

টেস্‌ম্যান। বেশ, তাহলে সময়টা কাজে লাগাই। (বই নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দরজার ওপর দাঁড়িয়ে ঘুরলেন) ওহো, হেডা—জুলিয়া পিসী আজ সন্ধ্যার আসছেন না।

হেডা। আসছেন না? 'বনেট'-ঘটিত ব্যাপারটার জন্য?

টেস্‌ম্যান। আদৌ নয়। তুমি জুলিয়া পিসী সম্পর্কে এরকম ভাবলে কী ক'রে বলত? একবার কল্পনা করো—! আসল কথা রীনা পিসী খুব অসুস্থ।

হেডা। তিনি ত' সব সময়ই অসুস্থ।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, আজ তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়েছে, বেচারা!

হেডা। ও, তাহলে তাঁর বোন যে তাঁর সংগে থাকবেন তা ধরেই নেওয়া যায়। আশাভঙ্গজনিত বেদনা আমাকে সইতেই হবে।

টেস্‌ম্যান। আর, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তোমাকে চমৎকার চেহারায় বাড়ি ফিরতে দেখে জুলিয়া পিসী কী খুশিই না হয়েছেন!

হেডা। (একটু উঁচু গলায়, উঠতে উঠতে) হায়, চিরকেলে এইসব পিসীর দল!

টেস্‌ম্যান। কী বললে?

হেডা। (কাঁচের দরজার দিকে অগ্রসরমাণ) কিছু না।

টেস্‌ম্যান। ও, ঠিক আছে।

[ভেতরকার ঘরের মধ্য দিয়ে টেস্‌ম্যান ডানদিকে চলে গেলেন]

ব্র্যাক। কোন 'বনেট' সম্বন্ধে বলছিলেন?

হেডা। হুঁ, আজ সকালে কুমারী টেস্‌ম্যান-এর সংগে ও নিয়ে ছোটখাট একটা ঘটনা ঘটেছিল। ওখানকার চেয়ার-এর ওপর তিনি 'বনেট'-টা রেখেছিলেন—(তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন)—এবং আমি ভাণ করলাম যেন ওটা ঝির।

ব্র্যাক। (মাথা ঝাঁকিয়ে) সুপ্রিয় শ্রীমতী হেডা, এরকম একটা ব্যাপার করলেন কী ক'রে? ওই অপূর্ব মহিলাটির প্রতি, এঃ!

হেডা। (সোরভাস হয়ে ঘরের ও প্রান্তে যেতে যেতে) ইয়ে, দেখুন—আমার হঠাৎ এরকম করতে ইচ্ছে হয়; আর তা চেপে যেতেও পারি না। (স্টোভ-এর পাশে-রাখা চেয়ার-এ ধপ ক'রে বসে) সত্যি, বুঝতে পারছি না কীভাবে বুঝিয়ে বলবো।

ব্র্যাক। (আরামকেদারার পেছনে) আপনি ঠিক সুখী নন—এর মূলে তাই।

হেডা। (নিজের সামনে সোজা তাকিয়ে) এমন কোন কারণ আমার জানা নেই যা আমাকে সুখী করতে পারে। সম্ভবত আপনার ঝুলিতে এক-আধটা মিলতে পারে।

ব্র্যাক। আচ্ছা—অন্য কথা বাদ দিলেও আপনি ত' একেবারে ব্যক্তিগত পছন্দমত বাড়ি পেয়েছেন।

হেডা। (তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন) আপনিও এই আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করেন?

ব্র্যাক। ব্যাপারটা আগাগোড়া বানানো!

হেডা। ও হ্যাঁ, কিছুটা সত্যি বটে।

ব্র্যাক। আচ্ছা?

হেডা। আসল কথা গত গ্রীষ্মে পার্টি থেকে বাড়ি ফেরার সময় টেস্‌ম্যান-কে কাজে লাগাতাম—

ব্র্যাক। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাকে যেতে হত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে।

হেডা। তা ঠিক। জানি গত গ্রীষ্মে আপনি ভিন্ন পথের পথিক ছিলেন।

ব্র্যাক। (হেসে) আরে দূর! ও তারপর—আপনি আর টেস্‌ম্যান—?

হেডা। হ্যাঁ, এক সন্ধ্যায় আমরা এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বেচারা টেস্‌ম্যান কথা খুঁজে না পেয়ে ছটফট করছিল; তাই বিদ্বান লোকটির প্রতি আমার দয়া হল—

ব্র্যাক। (সন্দেহপূর্ণ হাসি হেসে) আপনার দয়া হল? হুঁ—

হেডা। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। আর তাই—ওকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য—বলেছিলাম, আদৌ কিছু না ভেবে—আমি এই ভিলা-য় বাস করতে পেলে আনন্দিত হবো।

ব্র্যাক। ব্যস্।

হেডা। সেই সন্ধ্যায় আর নয়।

ব্র্যাক। কিন্তু পরে?

হেডা। বিচারপতি, আমার চিন্তাহীনতারও ফলাফল আছে।

ব্র্যাক। শ্রীমতী হেডা, দুর্ভাগ্যক্রমে তাও প্রায়ই ঘটে।

হেডা। ধন্যবাদ! দেখতেই পাচ্ছেন, সেক্রেটারী ফক এবং ভিলা-র ব্যাপারে উৎসাহই আমার আর জর্জ টেস্‌ম্যান-এর মধ্যে প্রথম সহমর্মিতার সূত্র গ্রন্থন করেছিল। তা থেকেই আমাদের এনগেজমেন্ট আর বিয়ে, মধুচন্দ্রিমা উপলক্ষে ভ্রমণ এবং আর সবকিছু। বেশ, বেশ, বিচারপতি—বিছানা যেমন করবেন তাতে শুতে হবেই—তা প্রায় বলতে পারি।

ব্র্যাক। বাহবা! আর আপনি এ ব্যাপারে ছিটেফোঁটা গুরুত্বও দেন নি?

হেডা। ঈশ্বর জানেন, একটুও না।

ব্র্যাক। কিন্তু এখন? এখন আমরা এটা আপনার জন্য বাসযোগ্য করার পর?

হেডা। আ—সব ঘরগুলোয় যেন ল্যাভেণ্ডার আর শুকনো গোলাপ পাতার গন্ধ—কিন্তু সম্ভবত জুলিয়া পিসীর সঙ্গে গন্ধটা এসেছে।

ব্র্যাক। (হেসে) না, আমি মনে করি এটা স্বর্গত শ্রীমতী ফক-এর কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার।

হেডা। হ্যাঁ, এর মধ্যে যেন একটা মৃত্যুর ঘ্রাণ রয়েছে। এটা আমাকে একগুচ্ছ ফুলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়—বলনাচের পরের দিন। (মাথার পেছনে হাত রেখে চেয়ার-এ ঝুঁকে ব্র্যাক-এর দিকে তাকালেন) ওহে প্রিয় বিচারক—আপনি কল্পনাও করতে পারেন না এখানে কী সাংঘাতিক একঘেয়ে লাগবে আমার!

ব্র্যাক। আচ্ছা, আপনিই বা কেন কোন একটা পেশা নেবেন না?

হেডা। একটা পেশা—যা আমাকে আকর্ষণ করবে?

ব্র্যাক। নিশ্চয়ই, সম্ভব হলে অবশ্য।

হেডা। ঈশ্বর জানেন সেটা কী ধরণের পেশা। প্রায়ই অবাক হই এই ভেবে যে—(থামলেন) কিন্তু তাতে কখনও হবে না, উঁহু।

ব্র্যাক। কে বলতে পারে? শুনিই না সেটা কী।

হেডা। টেস্‌ম্যান-কে রাজনীতিতে যোগ দেওয়াতে পারবো কি না।

ব্র্যাক। (হেসে) টেস্‌ম্যান-কে? না, সত্যি নয়, রাজনৈতিক জীবন তার জন্য নয়—তার লাইনেই নয় আদৌ।

হেডা। না, আমি নিশ্চিত তা নয়।—কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি এর মধ্যে বেড়াতে পারতাম?

ব্র্যাক। কেন—এতে আপনি কি তৃপ্তি পেতেন? সে যখন এর উপযুক্ত নয়, সে ক্ষেত্রে জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিয়ে লাভ কি?

হেডা। কারণ, আমার একঘেয়ে লাগছে, শুনে রাখুন! (একটু থেমে) তাহলে আপনার মতে টেসম্যান-এর পক্ষে মন্ত্রী হওয়া কোনকালেই সম্ভব নয়?

ব্র্যাক। হুঁ—দেখুন শ্রীমতী হেডা—মন্ত্রী হতে গেলে বেশ কিছুটা রেস্ত থাকা চাই-ই।

হেডা। (অসহিষ্ণুভঙ্গীতে উঠে) হ্যাঁ, ওইটাই খট্‌কা! বেশ শোভন দারিদ্র্যের মধ্যে কোনক্রমে এসে প'ড়েছি—! (ঘরের অন্য প্রান্তে যেতে যেতে) এজন্য জীবনটা করুণা উদ্রেককারী হয়ে উঠেছে। আগাগোড়া হাস্যকর!—এ ত' তাই!

ব্র্যাক। এখন আমি বলবো ত্রুটি অন্যত্র।

হেডা। তাহলে কোথায়?

ব্র্যাক। আপনি কখন সত্যিকার উৎসাহবর্ধক অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি।

হেডা। বলতে চাইছেন একটা গুরুত্বের কিছু?

ব্র্যাক। হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কিন্তু এবার বোধহয় সেরকম একটা কিছু পাবেন।

হেডা। (মাথা দুলিয়ে) ও, আপনি ভাবছেন এই ছন্নছাড়া অধ্যাপকের পদ পাওয়ার ব্যাপারে বিরক্তির কথা। কিন্তু সে কেবল টেস্‌ম্যান-এর ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ও নিয়ে একটুও ভাবছি না।

ব্র্যাক। না, না, কিছুতেই নয়। কিন্তু ধরুন, লোকে যাকে বলে বেশ একটা দায়িত্ব—তাই যদি আপনাকে বহন করতে হয়? (মৃদু হেসে) একটা নতুন দায়িত্ব, কি?

হেডা। (রাগতস্বরে) থামুন! কোনদিনই এরকম কিছু ঘটবে না!

ব্র্যাক। (ক্লান্তভাবে) এক বছর পরে এ সম্বন্ধে আবার কথা বলবো—ঠিক বাইরে।

হেডা। (কেটে কেটে) বিচারক ব্র্যাক, ও জাতীয় কোন কিছুতেই আমার রুচি নেই। আমি কোন দায়িত্ব বহন করবো না।

ব্র্যাক। সাধারণ মহিলাদের থেকে আপনি এতই ভিন্ন যে দায়িত্ব নিতে এত অনিচ্ছুক যা—?

হেডা। (কাঁচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) আঃ, চুপ করুন, শুনছেন—! প্রায়ই মনে শুধু একটা পার্থিব ব্যাপারে আমার প্রবণতা আছে।

ব্র্যাক। (তার কাছে গিয়ে) প্রশ্ন করতে পারি সেটা কি?

হেডা। (বাইরের দিকে তাকিয়ে দণ্ডায়মান) নিজেকে ক্লান্ত করতে করতে মৃত্যু-আলিঙ্গন। এবার আপনি জেনে গেলেন। (ঘুরলেন, ভেতরকার ঘরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন) হ্যাঁ, যেমনটি ভেবেছিলাম! অধ্যাপক আসছেন।

ব্র্যাক। (নরম গলায়, সাবধানতাসূচক কণ্ঠে) শ্রীমতী হেডা শান্ত হোন, শান্ত হোন, একটু শান্ত হোন ত'।

[ভেতরকার ঘরের মধ্য দিয়ে ডানদিক থেকে টেস্‌ম্যান ঢুকলেন, পার্টি-তে যাবার জন্য প্রস্তুত, হাতে গ্লোভস আর হ্যাট।]

টেস্‌ম্যান। হেডা, এইলার্ট লিউভ্‌বোর্গ-এর কাছ থেকে কোনও খবর আসে নি? অ্যাঁ?

হেডা। না।

টেস্‌ম্যান। তাহলে দেখো, এক্ষুণি এখানে উপস্থিত হবে।

ব্র্যাক। সত্যি মনে করেন সে আসবে?

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, আমি প্রায় নিশ্চিত। কেন না, সকালে যা বলছিলেন তা নির্ঘাত উড়ো গুজব।

ব্র্যাক। আপনার তাই মনে হচ্ছে?

টেস্‌ম্যান। যাই হোক, জুলিয়া পিসী বলছিলেন ও আমার পথে আবার দাঁড়াবে বলে তিনি মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করেন না। একবার ভাবুন!

ব্র্যাক। ও, তাহলে ত' ঠিকই আছে।

টেস্‌ম্যান। (ডানদিককার একটা চেয়ারে গ্লোভস্ আর হ্যাট রেখে) হ্যাঁ, কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব তার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে দেবেন নিশ্চয়?

ব্র্যাক। এখনও যথেষ্ট সময় আছে। আমার কোন অতিথিই সাতটা সাড়ে সাতটার আগে এসে পৌঁছোচ্ছেন না।

টেস্‌ম্যান। তাহলে ততক্ষণ হেডা-র সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে কী হয় দেখা যাক। অ্যাঁ?

হেডা। (ব্র্যাক-এর হ্যাট আর ওভারকোট কোণের সেটী-র ওপর রেখে) এবং তেমন তেমন অবস্থা হলে এইলার্ট লিউভ্‌বোর্গ এখানে আমার সঙ্গে থেকে যেতে পারবেন।

ব্র্যাক। (তাঁর জিনিসগুলো নিতে চেয়ে) ও, আমাকে অনুমতি দিন, শ্রীমতী

টেস্‌ম্যান।—তেমন তেমন অবস্থা বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

হেডা। যদি তিনি আপনার এবং টেস্‌ম্যান-এর সংগে না যান।

টেস্‌ম্যান। (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে হেডা-র দিকে তাকালেন) কিন্তু, হেডা— তোমার কি মনে হয় সে তোমার সংগে থাকতে চাইবে? অ্যাঁ? মনে রেখো, জুলিয়া পিসী আসতে পারবেন না।

হেডা। না, কিন্তু শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌ আসছেন। তিনজন মিলে দিব্যি চা পান করা যাবে।

টেস্‌ম্যান। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বেশ ভালই হবে।

ব্র্যাক। (মৃদু হেসে) এবং তাঁর পক্ষে এইটাই সম্ভবত নিরাপদতম প্ল্যান।

হেডা। কেন?

ব্র্যাক। আচ্ছা, আপনি ত' জানেনই আমার ক্ষুদে ব্যাচেলর পার্টিগুলো আপনি কীভাবে ঘিরে রাখতেন। ঘোষণা করেছিলে ওগুলো চূড়ান্ত নীতিনিষ্ঠ পুরুষদের জন্য।

হেডা। কিন্তু এখন এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ-এর নীতিবোধ নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত। পাপী ত্রাণলাভ করেছে—

[হল-এর দরজায় বার্‌টা-র আবির্ভাব।]

বার্‌টা। দিদিমণি, একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করছেন আপনারা বাড়ি আছেন কি না—

হেডা। ঠিক আছে, তাঁকে ভেতরে নিয়ে এসো।

টেস্‌ম্যান। (নম্র গলায়) আমি নিশ্চিত সে এসেছে। কল্পনা করুন!

(হল থেকে এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ-এর প্রবেশ। পাতলা, রোগাটে চেহারা; টেস্‌ম্যান-এর সমবয়সী, কিন্তু বড় দেখায়, কিছুটা ক্লান্ত শরীর। তাঁর চুল আর দাড়ি কালচে বাদামী, মুখ লম্বা এবং বিবর্ণ, তবে গণ্ডের ওপর ছোপ ছোপ রং আছে। একেবারে নতুন, সুন্দর কার্ট-এর কালো ভিসিটিং স্যুট পরিহিত। ঘোর রঙের গ্লোভস আর সিল্কের হ্যাট হাতে এবং মাথায়। খানিকটা বিব্রতভাবে অভিবাদন করলেন দ্রুত-গতিতে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।]

টেস্‌ম্যান। (তাঁর কাছে গিয়ে আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন) এই ত', প্রিয় বন্ধু এইলার্‌ট, অবশেষে আমাদের আবার দেখা হল।

এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ। (চাপা গলায়) টেস্‌ম্যান, তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। (হেডা-র কাছে গিয়ে) শ্রীমতী টেস্‌ম্যান, আপনিও কি আমার সংগে করমর্দন করবেন?

হেডা। (তার হাত ধরে) আপনাকে দেখে আনন্দ পেলাম, (হাত নেড়ে) আমি জানি না আপনাদের দুজনের মধ্যে—?

লিউভ্‌বোর্‌গ। (সামান্য ঝুঁকে) মনে হচ্ছে বিচারপতি ব্র্যাক।

ব্র্যাক। (ওইরকমভাবে) ও, হ্যাঁ—এক কালে—

টেস্‌ম্যান। (লিউভ্‌বোর্‌গ-এর প্রতি, তাঁর কাঁধে হাত রেখে) এইলার্‌ট, এইবার পুরোপুরি স্বস্তির সংগে বসো! হেডা, তাই নয়?—কেননা, শুনলাম তুমি আবার সহরে বাস করবে ঠিক করেছ? অ্যাঁ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ।

টেস্‌ম্যান। ঠিক, ঠিক। ওহো শোন, তোমার নতুন বইখানা পেয়েছি; কিন্তু এখনও পড়বার সময় পাই নি।

লিউভবোর্‌গ। ও ঝঞ্ঝাট এড়াতে পারো।

টেস্‌ম্যান। কেন, কেন?

লিউভ্‌বোর্‌গ। কেন না ওতে সারবস্তু অতি সামান্য।

টেস্‌ম্যান। একবার ভাবো এ কথা বললে কি করে?

ব্র্যাক। কিন্তু শুনেছি বইটা খুব প্রশংসিত হয়েছে।

লিউভ্‌বোর্‌গ। আমি ঠিক তাই চেয়েছিলাম। কাজেই, সকলের যাতে মতৈক্য আছে তাছাড়া আর কিছু লিখি নি।

ব্র্যাক। খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।

টেস্‌ম্যান। সে যাক, ভাই এইলার্‌ট—!

লিউভ্‌বোর্‌গ। কারণ এখন চাইছি নিজের জন্য একটা জায়গা নতুন ক'রে সুরু করার ইচ্ছা।

টেস্‌ম্যান। (কিছুটা অস্বস্তির সংগে)। ও, তুমি তাই করতে ইচ্ছুক? অ্যাঁ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। (মৃদু হেসে টুপি রেখে একটা কাগজ মোড়া প্যাকেট কোট-এর পকেট থেকে বের করলেন) কিন্তু টেস্‌ম্যান, এটা বেরোলে তোমাকে পড়তেই হবে। কেন না, এটাই আসল বই—এর মধ্যে নিজেকে আমি উজাড় করে দিয়েছি।

টেস্‌ম্যান। সত্যি? বস্তুটা কী?

লিউভ্‌বোর্‌গ। পরবর্তী অংশ।

টেস্‌ম্যান। পরবর্তী অংশ? কিসের?

লিউভ্‌বোর্‌গ। বইটার।

টেস্‌ম্যান। নতুন বইটার?

লিউভ্‌বোর্‌গ। নিশ্চয়।

টেস্‌ম্যান। কেন ভাই এইলার্‌ট—ওতে কি আধুনিক কাল পর্যন্ত আলোচনা কর নি?

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ, তা বটে; আর এই বইটার বিষয় অনাগত কাল।

টেস্‌ম্যান। ভবিষ্যৎ! কিন্তু, হা ভগবান!—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ত' আমরা কিছুই জানি না!

লিউভ্‌বোর্‌গ। না, তাহলে এ ব্যাপারে দু-একটা কথা বলা সম্ভব। (প্যাকেট-টা খুললেন) এদিকে—

টেস্‌ম্যান। আরে, এ ত' তোমার হাতের লেখা নয়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। আমি ডিক্টেশন দিয়েছিলাম। (পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) বইটার দু'টো ভাগ। প্রথম অংশ ভাবী সভ্যতাকারী শক্তিগুলো নিয়ে। আর, এই যে দ্বিতীয় ভাগ—(পাতা উল্টে শেষের দিকে এগোতে এগোতে) উন্নতির সম্ভাব্য ধারার আলোচনা আছে এতে।

টেস্‌ম্যান। কী কিম্ভূত! আমি কখনও এরকম কিছু লেখার কথা ভাবতাম না।

হেডা। (কাঁচের দরজায়, কাঁচের ওপর আওয়াজ করতে করতে) হুঁ—কিছুতেই নয়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো গুছিয়ে প্যাকেট-টা টেবিল-এর ওপর রাখতে রাখতে) এটা এনেছিলাম এই ভেবে যে, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে কিছুটা পড়ে শোনাতে পারবো।

টেস্‌ম্যান। এইলার্‌ট, এ ত' ভাল কথা। কিন্তু এই সন্ধ্যায়—? (ব্র্যাক-এর দিকে চেয়ে) ঠিক বুঝতে পারছি না কীভাবে তা হতে পারে—

লিউভ্‌বোর্‌গ। ও, আচ্ছা, তাহলে অন্য কোন সময়ে হবে'খন। কোনও ব্যস্ততা নেই।

ব্র্যাক। শ্রীযুত লিউভ্‌বোর্‌গ, আপনাকে বলা দরকার—আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে ছোট্ট একটা পার্‌টি দিচ্ছি—মুলত টেস্‌ম্যান-এর সম্মানার্থে—

লিউভ্‌বোর্‌গ। (হ্যাট খুঁজতে খুঁজতে) ও—তাহলে আপনাদের আটকে রাখবো না—

ব্র্যাক। না, কিন্তু শুনুন—আপনি কি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সংগে আসবেন না?

লিউভ্‌বোর্‌গ। (কাটাকাটভাবে, নিশ্চিত প্রত্যয়ে) না, সম্ভব নয়—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ব্র্যাক। ও, বাদ দিন—চলুন! বেশ পূর্ব-নির্দিষ্ট অল্প কয়েকজন মিলে জমান যাবে। এবং, নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা রীতিমত 'টগ্‌বগে সময়' কাটাতে পারবো? যেমন বলেন শ্রীমতী হে—শ্রীমতী টেস্‌ম্যান।

লিউভ্‌বোর্‌গ। আমার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহলেও—

ব্র্যাক। তাছাড়া, পাণ্ডুলিপিটা সংগে নিয়ে আমার বাড়িতে বসে টেস্‌ম্যান-কে শোনাতেও পারেন। আমি কেবল আপনাদের জন্যই একটা ঘর ছেড়ে দেবো।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, কথাটা ভেবে দেখো এইলার্‌ট,—কেন যাবে না? অ্যাঁ?

হেডা। (নাক গলিয়ে) কিন্তু টেস্‌ম্যান, যদি উনি সত্যি যেতে না চান! আমি নিশ্চিত জানি এখানে থেকে রাত্রে আমার সংগে সাপার খেতে ও'র ঢের বেশি ভাল লাগবে।

লিউভ্‌বোর্‌গ। আপনার সংগে?

হেডা। আর শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড-এর সংগে।

লিউভ্‌বোর্‌গ। ও—(হাল্কাভাবে) আজ সকালে মুহূর্তের জন্য তাকে দেখেছিলাম।

হেডা। তাই না কি? তা বেশ, সন্ধ্যায় তিনি এখানে আসছেন। বুঝতেই পারছেন, এ জন্য এখানে আপনার থাকা প্রায় আবশ্যিক, অন্যথায় তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবে কে?

লিউভ্‌বোর্‌গ। তা ঠিক। অনেক ধন্যবাদ —সে ক্ষেত্রে ত' থাকতেই হচ্ছে।

হেডা। ঝিকে তাহলে দু'-একটা কাজ করতে বলা দরকার—

[হল-এর দরজায় গিয়ে ঘন্টি বাজালেন। ঝি-টা ঢুকল। তাকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কী যেন ব'লে হেডা ভেতরকার ঘর দেখালেন। মাথা নেড়ে ঝি-টা আবার বেরিয়ে গেল।]

টেস্‌ম্যান। (একই সময়ে, লিউভ্‌বোর্‌গ-এর প্রতি) এইলার্‌ট, তুমি কি এই নতুন বিষয়ে—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে—বক্তৃতা দেবে?

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ।

টেস্‌ম্যান। বইয়ের দোকানে শুনলাম আগামী শরতে তুমি পরপর কয়েকটা বক্তৃতা দিচ্ছ।

লিউভ্‌বোর্‌গ। তাই ত' ভাবছি। টেস্‌ম্যান, আশা করি তুমি এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবে না।

টেস্‌ম্যান। আরে না, না, আদৌ নয়! কিন্তু—?

লিউভ্‌বোর্‌গ। বেশ বুঝতে পারি এটা তোমার পছন্দসই হতে পারে না।

টেস্‌ম্যান। (হতাশ হয়ে) ও, আমার কথা ভেবে যে তুমি—ইয়ে, আমি আশাই করতে পারি না যে—

লিউভ্‌বোর্‌গ। কিন্তু তুমি চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো।

টেস্‌ম্যান। অপেক্ষা করবে? হ্যাঁ, কিন্তু—হ্যাঁ, কিন্তু—তুমি আমার সংগে প্রতিযোগিতায় নামছ না? অ্যাঁ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। না, কেবল নৈতিক জয়ই আমার কাম্য।

টেস্‌ম্যান। দুর্গা দুর্গা,—জুলিয়া পিসী তাহলে ঠিকই বলেছিলেন! ঠিক ঠিক—এ ত' জানতামই! হেডা! একবার ভাবো! —এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ আমাদের পথের কাঁটা হচ্ছে না।

হেডা। (কাটা কাটা ভাবে) আমাদের পথে? আমাকে রেহাই দাও বাপু।

[তিনি ভেতরকার ঘরে গেলেন, সেখানে ঝি-টা টেবিল-এর ওপর ট্রে-তে প্লাস আর ডিক্যান্টার সাজাচ্ছে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে হেডা আবার সামনে এলেন। ঝি-টা বেরিয়ে গেলেন।]

টেস্‌ম্যান। (একই সময়ে) বিচারপতি ব্র্যাক, আপনি—এ ব্যাপারে আপনার কী মত? অ্যাঁ?

ব্র্যাক। ও, বলছি যে নৈতিক জয়—হুঁ—শুনতে বেশ চমৎকার—

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু তা হলেও—

হেডা। (টেস্‌ম্যান-এর দিকে শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছ যে মনে হচ্ছে যেন বজ্রাহত—

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ—আমি তাই—আমার প্রায় মনে হচ্ছে—

ব্র্যাক। শ্রীমতী টেস্‌ম্যান, দেখতে পাচ্ছেন না বজ্রসহ ঝঞ্ঝা সবে শেষ হল?

হেডা। (ভেতরকার ঘরের দিকে অংগুলি নির্দেশ ক'রে) ভদ্রমহোদয়গণ, ঠাণ্ডা পান্‌চ এক এক গ্লাস নেবেন না?

ব্র্যাক। (নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে) যাবার মুখে এককাপ? তা মন্দ নয়।

টেস্‌ম্যান। খাসা প্রস্তাব, হেডা! ঠিক জিনিসটি! এখন আমার মন থেকে বোঝা নেমে যাওয়ায়—

হেডা। (লিউভ্‌বোর্‌গ-কে) আপনি কি ওদের সংগে যাচ্ছেন না?

লিউভ্‌বোর্‌গ। (অস্বীকৃতির ভংগী ক'রে) না, ধন্যবাদ। আমার কিছু লাগবে না।

ব্র্যাক। কী কাণ্ড, হায় হায়—ঠাণ্ডা পান্‌চ নিশ্চয় বিষ নয়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। সম্ভবত সকলের পক্ষে নয়।

হেডা। আপনারা যান, আমি ইতিমধ্যে এঁ'র সংগে আলাপ করি।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই কর প্রিয়তমা।

[তিনি এবং ব্র্যাক ভেতরকার ঘরে ব'সে পান্‌চ টেনে সিগারেট ফুঁকে, তারপর মেজাজে খোশ গল্প চালাতে লাগলেন। লিউভ্‌বোর্‌গ দাঁড়িয়ে রইলেন স্টোভ-এর পাশে। হেডা লেখার টেবিল-এ গেলেন।]

হেডা। (কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) লিউভ্‌বোর্‌গ, আপনি কি কয়েকটা ফটো দেখবেন? শুনেছেন নিশ্চয় বাড়ি ফেরার পথে আমি আর টেস্‌ম্যান টীরল্‌ ঘুরে এসেছি?

[হেডা অ্যাল্‌বাম নিয়ে সোফা-র পার্শ্বস্থ টেবিল-এ রেখে নিজে বসলেন আরও কোণের দিকে। এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ এগিয়ে থেমে হেডা-র দিকে তাকালেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে তার বাঁ দিকে বসলেন, ভেতরকার ঘরের দিকে পেছন ফিরে।]

হেডা। (অ্যাল্‌বাম খুলে) এই পর্বতমালাটা দেখতে পাচ্ছেন? এটা অর্‌টেলার গ্রুপ। টেস্‌ম্যান নিচে নামটা লিখে রেখেছে। এই যে: 'মেরান-এর কাছাকাছি অর্‌টেলার গ্রুপ।'

লিউভ্‌বোর্‌গ। (মুহূর্তের জন্যও হেডা-র ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেন নি, এবার ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বললেন) হেডা—গ্যাব্‌লার।

হেডা। (তার দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে) আঃ, চুপ!

লিউভ্‌বোর্‌গ। (মৃদু কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলেন) হেডা গ্যাব্‌লার।

হেডা। (অ্যাল্‌বাম-এর দিকে তাকিয়ে) এককালে আমার ঐ নাম ছিল—যখন আমরা দু'জন পরস্পরকে জানতাম।

লিউভ্‌বোর্‌গ। এবং আর কখনও হেডা গ্যাবলার বলতে পাবো না—কখনও নয়, যতদিন বেঁচে আছি ততদিন নয়।

হেডা। (তখনও পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) হ্যাঁ, অবশ্যই তাই করবেন। এবং আমার মনে হয় অভ্যাসটা সময় থাকতে করে ফেলুন। বলছি, যত শীগগির হয় তত বেশি মংগল।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (ঘৃণা এবং ক্রোধমিশ্রিত কণ্ঠে) হেডা গ্যাব্‌লার বিবাহিত? আর, বিয়ে করেছে—জর্‌জ টেস্‌ম্যান-কে!

হেডা। হ্যাঁ, সবাই ত' তাই বলে।

লিউভ্‌বোর্‌গ। ও হেডা, হেডা—তুমি কী ক'রে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে?

হেডা। (তার দিকে তীব্রদৃষ্টি হেনে) কী! এ আমি সহ্য করবো না!

লিউভ্‌বোর্‌গ। কী বলতে চাইছ?

[ঘরে ঢুকে টেস্‌ম্যান সোফা-র দিকে এগোলেন।]

হেডা। (তাকে আসতে শুনে নিস্পৃহ কণ্ঠে) আর, এটা হল ভল্‌ ডি' অ্যাম্‌পেজ্‌জো-র একটা দৃশ্য। চূড়োগুলোর দিকে একবার তাকান! (টেস্‌ম্যান-এর দিকে প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে) হ্যাঁ গো, এই অদ্ভুত চূড়োগুলোর নাম কি?

টেস্‌ম্যান। দেখি। ও, ওগুলো ডোলোমাইটেস্‌।

হেডা। হ্যাঁ, তাই ত'!—ওগুলো ডোলোমাইটেস্‌, বুঝলেন।

টেস্‌ম্যান। প্রিয়তমা,—আমি শুধু জানতে চাইছি তোমাদের জন্য একটু পান্‌চ আদৌ আনবো কি না। অন্তত তোমার জন্য—অ্যাঁ?

হেডা। হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি নিয়ে এসো; কয়েকটা বিস্কুট হলেও ভাল হয়।

টেস্‌ম্যান। সিগারেট নয়?

হেডা। না।

টেস্‌ম্যান। তাই হোক।

[ভেতরকার ঘরে গিয়ে ডানদিকে বেরিয়ে

গেলেন। ঐ ঘরে বসে [illegible] [illegible] হেডা আর লিউভ্‌বোর্‌গ-এর দিকে নজর রাখছিলেন।]

লিউভ্‌বোর্‌গ। (আগের মত মৃদুকণ্ঠে) জবাব দাও হেডা—তুমি একাজ করলে কী ক'রে।

হেডা। (আপাতভাবে অ্যালবাম-এ ভুলিয়ে গিয়ে) আপনি যদি আমাকে অনবরত 'তুমি' বলেন ত' আমি আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করবো।

লিউভ্‌বোর্‌গ। যখন কেবলমাত্র দু'জন রয়েছি, তখনও তুমি বলার অনুমতি পাবো না?

হেডা। না। ভাবতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই উচ্চারণ করবেন না।

লিউভ্‌বোর্‌গ। ও, বুঝেছি। এটা একটা অপরাধ—জর্জ টেস্‌ম্যান-এর বিরুদ্ধে—টেস্‌ম্যান, যাকে আপনি ভালবাসেন।

হেডা। (তার দিকে কটাক্ষ ক'রে মৃদু হাসলেন) ভালবাসা? কী অপূর্ব ধারণা!

লিউভ্‌বোর্‌গ। তাহলে আপনি ওকে ভালবাসেন না!

হেডা। কিন্তু কোনরকমে অবিশ্বস্ততার প্রসঙ্গও আমি শুনতে রাজি নই! মনে রাখবেন।

লিউভ্‌বোর্‌গ। হেডা. একটা প্রশ্নের জবাব দিন—

হেডা। চুপ!

[ভেতরকার ঘর থেকে একটা ছোট ট্রে নিয়ে টেস্‌ম্যান ঢুকলেন।]

টেস্‌ম্যান। এই যে! এটা বেশ লোভনীয় নয়?

[ট্রে-টা টেবিল-এর ওপর রাখলেন]

হেডা। তুমি নিজে আনলে কেন?

টেস্‌ম্যান। (গ্লাসগুলো ভরতে ভরতে) কারণ, তোমার কাজে আমা দারুণ মজার ব্যাপার হেডা।

হেডা। কিন্তু তুমি যে দুটো গ্লাস ভরলে। (লিউভ্‌বোর্‌গ-কে দেখিয়ে) উনি বলছিলেন একটুও খাবেন না—

টেস্‌ম্যান। না, কিন্তু শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌ ত' খুব শীগগির এসে পড়বেন, নয়?

হেডা। হ্যাঁ, প্রসঙ্গক্রমে—শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌—

টেস্‌ম্যান। তাঁর কথা ভুলে গিয়েছিলে? অ্যাঁ?

হেডা। আমরা এত নিবিষ্টচিত্তে এই ছবিগুলো দেখছিলাম। (তাকে একটা ছবি দেখিয়ে) এই ছোট্ট গ্রামটার কথা তোমার মনে আছে?

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা ত' ব্রেনার গিরিপথের ঠিক তলায়। ওখানেই ত' আমরা সেই রাত কাটিয়েছিলাম—

হেডা। আর উচ্ছল সেই ভ্রমণকারীদের দেখা পেয়েছিলাম।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, এই জায়গাতেই। ভাবুন—এইলার্‌ট, যদি তুমি থাকতে আমাদের সঙ্গে! অ্যাঁ?

[ভেতরকার ঘরে ফিরে গিয়ে ব্র্যাক-এর পাশে বসলেন।]

লিউভ্‌বোর্‌গ। হেডা, এই একটা প্রশ্নের জবাব দিন—

হেডা। আচ্ছা?

লিউভ্‌বোর্‌গ। আমার সঙ্গে বন্ধুত্বেও কোন ভালবাসা ছিল না? একটুও না—ছিটেফোঁটা ভালবাসাও নয়?

হেডা। ছিল না কি? ভাবতেও অবাক লাগে। আমার মনে হয় আমরা দুজন সত্য বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলাম—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু। (মৃদু হেসে) বিশেষত আপনি ছিলেন খোলা মনের প্রতিমূর্তি।

লিউভ্‌বোর্‌গ। আপনিই আমাকে ওইরকম করেছিলেন।

হেডা। পেছনে তাকালে মনে হয় ঐ গোপন অন্তরঙ্গতা ছিল সত্যিই রমণীয়, রীতিমত আকর্ষণীয়—বেশ সাহসিকতাপূর্ণ—এ ধরনের বন্ধুত্ব কোনও জীবিত প্রাণী কল্পনাও করতে পারে না।

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ হেডা, ঠিক বলেছেন! তাই নয়?—যখন আমি জেনারেল-এর বাড়ি আসতাম বিকেলবেলায়—আর জেনারেল জানলার ধারে বসে ব্যক্তিগত কাগজপত্র পড়তেন—আমাদের দিকে পেছন ফিরে—

হেডা। আর আমরা দুজন কোণের সোফা-র ওপর—

লিউভ্‌বোর্‌গ। সবসময় এক এবং অভিন্ন ছবিওলা কাগজ নিয়ে—

হেডা। হ্যাঁ, অ্যালবাম না থাকায়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ হেডা, আর আমি যখন আপনার কাছে স্বীকারোক্তি করতাম—নিজের সব কথা, একান্ত ব্যক্তিগত, যা তখন আর কেউ জানত না! সেখানে বসে বলে যেতাম আমার নিয়মলঙ্ঘনের কথা—দিনরাতের সব শয়তানী। ও হেডা, কিসের জোরে আমি সব উজাড় ক'রে দিতে বাধ্য হতাম?

হেডা। আপনার কি মনে হয় এটা আমার ক্ষমতা?

লিউভ্‌বোর্‌গ। আর কীভাবে এর ব্যাখ্যা করবো? এবং সেইসব—সব ঘোরানো প্যাঁচানো সব প্রশ্ন করতেন আমাকে—

হেডা। যা আপনি বিশেষ ভালভাবে বুঝতে পারতেন—

লিউভ্‌বোর্‌গ। আচ্ছা, বসে বসে আমাকে ঐভাবে প্রশ্ন করতেন কী ক'রে? রীতিমত খোলাখুলি প্রশ্ন করতেন—

হেডা। দয়া ক'রে মনে রাখবেন ঘোরানো প্যাঁচানো ভাষায়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ, কিন্তু তাহলেও বেশ খোলাখুলি। জেরা করতেন—ঐ জাতীয় সব ব্যাপারে?

হেডা। আর, আপনি উত্তর দিতেন কেমন ক'রে?

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ, ঠিক ঐটেই ত' বুঝে উঠতে পারি না—পেছনদিকে তাকালে ঐ একটা ধাঁধা লাগে। কিন্তু হেডা, এবার বলুন—আমাদের বন্ধুত্বের মূলে কি ভালবাসা ছিল না? আপনার কি মনে হয় নি কখনও যে, আপনি আমার পাপ ধুয়েমুছে সাফ ক'রে দিতে সক্ষম—যদি আমি আপনাকে আমার 'কনফেসর' করতাম? মনে হয় নি?

হেডা। না, ঠিক তা নয়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। তাহলে আপনার মতলব কী ছিল?

হেডা। আপনার কি মনে হয় একজন তরুণী—যখন তা করা সম্ভব—কাউকে না জানিয়ে—

লিউভ্‌বোর্‌গ। আচ্ছা?

হেডা। মাঝেমধ্যে উঁকি মারতে খুশি হবে সেই জগতে যা—

লিউভ্‌বোর্‌গ। যা—?

হেডা। যা তাঁর জানা নিষেধ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। ব্যাপারটা তাহলে এই?

হেডা। অংশত। অংশত—প্রায় তাই মনে হচ্ছে।

লিউভ্‌বোর্‌গ। জীবনতৃষ্ণা মেটানর বন্ধুত্ব। কিন্তু যাই হোক, তা চলতে থাকল না কেন?

হেডা। সে ত্রুটি আপনার।

লিউভ্‌বোর্‌গ। আপনিই ত' আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

হেডা। হ্যাঁ, যখন আমাদের বন্ধুত্ব গুরুতর কিছু একটা হওয়ার আশংকা দেখা দিল। ছিঃ, ছিঃ! আপনি কীভাবে আপনার—আপনার দিলখোলা বন্ধুর প্রতি অবিচার করার কথা ভাবলেন?

লিউভ্‌বোর্‌গ। (নিজের হাত মুচড়ে) হায়, কেন আপনি শুধু ভয় দেখিয়েছিলেন! কেন আমাকে গুলি করেন নি?

হেডা। কারণ, কেলেংকারীতে আমার নিদারুণ ভয়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। জানি হেডা, মনে মনে আপনি ভীতু।

হেডা। সাংঘাতিক ভীতু। (সুর পাল্টে) কিন্তু এ ত' আপনার সৌভাগ্য। আর, এখন এল্‌ভস্‌টেড্‌-দের ওখানে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণও পেয়েছেন।

লিউভ্‌বোর্‌গ। জানি টায়া আপনাকে বিশ্বাস ক'রে কী কী বলেছে।

হেডা। এবং আপনিও সম্ভবত আমাদের

[illegible] তাকে গোপনীয় কথা কিছু কিছু বলেছেন?

লিউভ্‌বোর্‌গ। একটা শব্দও নয়। ও একটা বুদ্ধু, এসব কিছু বোঝার মত ছিটেফোঁটা বুদ্ধিও ওর নেই।

হেডা। বন্ধু?

লিউভ্‌বোর্‌গ। ঐ জাতীয় বিষয়ে ও বন্ধু।

হেডা। আর আমি ভীরু। (তাঁর দিকে ঝুঁকে আরও মৃদুকণ্ঠে বললেন, মুখের ওপর দৃষ্টি না রেখে) কিন্তু এখন আপনাকে গোপনীয় খবর দেবো।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (সাগ্রহে) আচ্ছা?

হেডা। আমি যে আপনাকে গুলী করতে সাহস পাই নি তার কারণ—

লিউভ্‌বোর্‌গ। তারপর!

হেডা। আমার কুখ্যাত ভীরুতা নয়—সেই সন্ধ্যায়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (এক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরে আবেগের সঙ্গে ফিসফিস ক'রে বললেন) ও হেডা! হেডা গ্যাবলার! এখন আমি আমাদের বন্ধুত্বের মূলে একটা গুপ্ত কারণ দেখতে পাচ্ছি। তুমি আর আমি—! শেষ পর্যন্ত তাহলে এ তোমার জীবনতৃষ্ণা—

হেডা। (নরম গলায়, তীব্রদৃষ্টি হেনে) সাবধান! ও ধরণের কিছুই বিশ্বাস করবেন না!

[গোধূলি ঘনিয়ে আসছে। বাইরে থেকে বার্টা হলঘরের দরজা খুলে দিল।]

হেডা। (অ্যালবাম্ দুম্ ক'রে বন্ধ ক'রে) মৃদু হেসে ডাকলেন) আঃ, এলে তাহলে! প্রিয় বান্ধবী টায়া—এসো এসো!

[হলঘর থেকে শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্ ঢুকলেন। পরনে সান্ধ্য পোশাক। তাঁর পেছনে দরজা বন্ধ হল।]

হেডা। (সোফা-য় বসে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে) মিষ্টি টায়া,—কল্পনাও করতে পারবে না কীভাবে মনেপ্রাণে তোমার আগমন চাইছিলাম।

[যাবার সময় ভেতরকার ঘরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রতাসূচক নমস্কার বিনিময় ক'রে টেবিল-এর কাছে গিয়ে শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্ হেডা-র হাতে হাত রাখলেন। এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ উঠে দাঁড়িয়েছেন। নিঃশব্দে মাথা দুলিয়ে তিনি এবং শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্ পরস্পরকে অভিবাদন জানালেন।]

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। আমার কি ভেতরে গিয়ে তোমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলা উচিত?

হেডা। আরে, না, না! ওদের দুজনকে নিরিবিলিতে থাকতে দাও। ওরা শীগগিরই যাবে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। ও'রা কি বেরোচ্ছেন?

হেডা। হ্যাঁ, নৈশভোজের আসরে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। (লিউভ্‌বোর্‌গ-কে, সঙ্গে সঙ্গে) আপনি নন?

লিউভ্‌বোর্‌গ। না।

হেডা। উনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। (একটা চেয়ার নিয়ে লিউভ্‌বোর্‌গ-এর পাশে বসতে উদ্যত) আহা, এখানে কী চমৎকারই না লাগছে!

হেডা। না টায়া, তোমাকে ধন্যবাদ! ওখানে নয়! লক্ষ্মীটি, আমার কাছে এদিকে এসো। আমি তোমাদের মাঝখানে বসবো।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। আচ্ছা, যা তোমার ইচ্ছে।

[টেবিল-টা ঘুরে হেডা-র ডানদিকে সোফা-য় বসলেন। লিউভ্‌বোর্‌গ নিজের চেয়ার-এ আবার বসলেন।]

লিউভ্‌বোর্‌গ। (একটু থেমে হেডা-কে) ওর চেহারা রমণীয় নয়?

হেডা। (আলতো হাতে ওর চুলে টোকা দিতে দিতে) শুধু চেহারাই রমণীয়?

লিউভ্‌বোর্‌গ। তা ঠিক। কেন না আমরা দুজন—ও আর আমি—আমরা দুজন সত্যিকার বন্ধু। আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি; সুতরাং একদম খোলা মনে আমরা কথা বলতে পারি—

হেডা। ঘোরানো প্যাঁচানো নয় ত'?

লিউভ্‌বোর্‌গ। ইয়ে—

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। (ধীরভাবে হেডা-র কাছ ঘেঁষে) ও হেডা, আমি কী সুখী! কারণ, ও বলে আমি না কি ওকে অনুপ্রাণিতও করেছি, কল্পনা কর।

হেডা। (মৃদু হেসে তাঁর দিকে তাকিয়ে) আঃ! উনি তাই বলেন না কি টায়া?

লিউভ্‌বোর্‌গ। এবং ওর সাহসও যথেষ্ট, শ্রীমতী টেস্‌ম্যান!

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। হা ঈশ্বর—আমি সাহসী?

লিউভ্‌বোর্‌গ। দারুণ—তোমার বন্ধুর যে কোন ব্যাপারে।

হেডা। ও আচ্ছা—সাহস! যদি কারুর কেবল তাই থাকত!

লিউভ্‌বোর্‌গ। তাহলে কী? কী বলতে চাইছো?

হেডা। তাহলে জীবনটা বাঁচার মত হত বোধহয় সব মেনে নিয়েও (হঠাৎ সুর বদলে) কিন্তু প্রিয় টায়া, তোমাকে এবার একগ্লাস ঠাণ্ডা পাঞ্চ খেতেই হবে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। ধন্যবাদ, লাগবে না। ও ধরণের কিছুই আমি কোনদিন খাই না।

হেডা। আচ্ছা, তাহলে আপনি খাবেন কি?

লিউভ্‌বোর্‌গ। ধন্যবাদ, আমিও না।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। না, ওরও লাগবে না।

হেডা। (লিউভ্‌বোর্‌গ-এর দিকে স্থির দৃষ্টিপাত ক'রে) কিন্তু আমি যদি বলি খেতে হবেই?

লিউভ্‌বোর্‌গ। কোন লাভ হবে না।

হেডা। (উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে) বেচারা হেডা! তাহলে আপনার ওপর আমার কোন প্রভাবই নেই?

লিউভবোর্‌গ। ঐ ব্যাপারে নয়।

হেডা। কিন্তু শুনুন, আমার মনে হয় আপনার নিজের জন্যই খাওয়া দরকার। না, না, ঠাট্টা নয়।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। কেন হেডা—!

লিউভ্‌বোর্‌গ। কী রকম?

হেডা। বরং বলা চলে অন্যদের জন্য।

লিউভ্‌বোর্‌গ। তাই না কি?

হেডা। অন্যথায় ওরা সব সন্দেহ করতে পারে যে, ভেতরে ভেতরে আপনি ঠিক নিরাপদ বোধ করেন না—নিজের ওপর পুরো বিশ্বাস নেই।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। (নরম গলায়) হেডা, দয়া ক'রে—।

লিউভ্‌বোর্‌গ। আপাতত ওরা যা খুশি ভাবতে পারে।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। (খুশি হয়ে) হ্যাঁ, ভাবুক গে!

হেডা। কিছুক্ষণ আগেই বিচারক ব্র্যাক-এর মুখ দেখেছি।

লিউভ্‌বোর্‌গ। কী দেখেছেন?

হেডা। তাঁর ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি, যখন আপনি তাদের সঙ্গে ভেতরকার ঘরে যেতে সাহস পেলেন না।

লিউভ্‌বোর্‌গ। সাহস পেলাম না? নিঃসন্দেহে এখানে বসে আপনার সঙ্গে আলাপ করাই আমার বেশি পছন্দ।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। হেডা, এই ত' সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক?

হেডা। কিন্তু বিচারক তা আন্দাজ করতে পারেন নি। এবং আপনি যখন তাঁর যাচ্ছেতাই নৈশভোজে যোগ দিতে সাহসী হলেন না, তখনও তিনি কী ভাবে হেসে টেস্‌ম্যান-এর দিকে কটাক্ষ করলেন তাও চোখে পড়েছিল।

লিউভ্‌বোর্‌গ। সাহসী হলাম না? কী বললেন, আমি সাহস পাই নি?

হেডা। আমি তা বলি না। কিন্তু বিচারক ব্যাপারটা এভাবেই বুঝেছেন।

লিউভ্‌বোর্‌গ। বেশ ত', তাই বুঝুন।

হেডা। আপনি তাহলে ওদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?

লিউভ্‌বোর্‌গ। আমি আপনার এবং টায়া-র সঙ্গে এখানে থাকবো।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্। তাই ত' হেডা—তুমি এতে সন্দেহ করছ কী ক'রে?

হেডা। (মৃদু হেসে লিউভ্‌বোর্‌গ-এর প্রতি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন) পর্বতসদৃশ অটল! এখন আর চিরকাল নিজস্ব নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা! আঃ, পুরুষমানুষের ত' তাই হওয়া উচিত। (শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌-এর দিকে ফিরে তাকে আদর করলেন) আচ্ছা, এবার বলত সকালে যখন অস্থির হয়ে এসেছিলে তখন তোমাকে কী বলেছিলাম—

লিউভ্‌বোর্‌গ। (বিস্মিত কণ্ঠে) অস্থির!

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (আতঙ্কিত হয়ে) হেডা—ও হেডা—।

হেডা। নিজেই ত' দেখতে পাচ্ছো; এরকম সাংঘাতিক আতঙ্কিত হওয়ারও কোন কারণ নেই—(প্রসংগ বদলে) এইবার! এবার আমরা তিনজন একসংগে মজা করতে পারবো!

লিউভ্‌বোর্‌গ। (চমকে উঠে) আঃ—এসব কি বলুন ত'?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড। হা ঈশ্বর! হেডা, তুমি কী বলছো? কী করছো?

হেডা। উত্তেজিত হয়ো না! ভয়াবহ বিচারকটি এসে তোমাকে লক্ষ্য করছেন।

লিউভ্‌বোর্‌গ। ও তাহলে সাংঘাতিক আতঙ্কিত হয়েছিল! আমার জন্য!

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (নরম গলায়, করুণ সুরে) ও হেডা—এবার তুমি সব কিছু ধ্বংস করলে!

লিউভ্‌বোর্‌গ। (একমুহূর্ত তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর মুখ বিকৃত) এই তাহলে আমার বন্ধুর খোলাখুলি কথা—আমার কাছে?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (অনুনয়ের সুরে) শোনো, প্রিয়তম বন্ধু আমার—তোমাকে কেবল বলতে দাও—

লিউভ্‌বোর্‌গ। (পান্‌চ-এর গ্লাস ঠোঁটের কাছে নিয়ে নিচু, খসখসে গলায়)। টায়া, তোমার স্বাস্থ্যপান করছি!

[গ্লাসটা খালি ক'রে নিচে রাখার পর আর একগ্লাস তুলে নিলেন।]

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (নরম গলায়) ও হেডা, হেডা—তুমি কী ক'রে এ কাজ করলে?

হেডা। আমি করলাম? আমি? তুমি কি ক্ষেপে গেছ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। শ্রীমতী টেস্‌ম্যান, এই গ্লাস আপনার স্বাস্থ্য কামনায়। সত্য বলার জন্য ধন্যবাদ। হুর্‌রে!

[গ্লাস খালি ক'রে আবার ভরতে উদ্যত]

হেডা। (তার বাহুর ওপর হাত রেখে) থাক, থাক—এখন আর নয়। মনে রাখবেন, আপনি নৈশভোজে যোগ দিচ্ছেন।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড। না, না, না!

হেডা। চুপ! ওরা তোমাকে লক্ষ্য করছে।

লিউভ্‌বোর্‌গ। তোমার স্বামী জানেন তুমি আমার খোঁজে এসেছ?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (হাত মোচড়াতে মোচড়াতে) ও হেডা—শুনতে পাচ্ছো ও কী বলছে?

লিউভ্‌বোর্‌গ। তোমার কি তার সংগে এমন ব্যবস্থা হয়েছিল যে, সহরে এসে তুমি আমার দেখাশুনো করবে? সম্ভবত শেরিফ্‌ নিজেই তোমাকে আসার জন্য তাড়া দিয়েছিলেন? আহা, জানি—নিঃসন্দেহে অফিস-এর কাজে তিনি আমার সাহায্যপ্রার্থী! কিংবা, তাস-খেলার সময় বোধহয় আমার অভাব অনুভব করেছিলেন?

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (বেদনার্ত কণ্ঠে, ধীরে) ও লিউভ্‌বোর্‌গ, লিউভ্‌বোর্‌গ—!

লিউভ্‌বোর্‌গ। (একটা গ্লাস নিয়ে ভর্তি করতে উদ্যত) শেরিফ্‌-এর জন্যও এক-গ্লাস হোক!

হেডা। (বাধা দিয়ে) এখন আর নয়। মনে রাখবেন আপনার পাণ্ডুলিপি টেস্‌ম্যান-কে পড়ে শোনাতে হবে।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (শান্তভাবে গ্লাস রেখে) টায়া, এভাবে ব্যাপারটা নেওয়াই মূর্খামী হয়েছে। প্রিয় বন্ধু, শোন গো প্রিয় বন্ধু, আমার ওপর রাগ কোর না। দেখো—অন্যরাও দেখবে—যে, একবার পতন হলেও আমি আবার মাথা উঁচু করেছি! টায়া, তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (আনন্দে উদ্ভাসিত) ও, ঈশ্বরের অসীম করুণা—!

[ইতিমধ্যে ব্র্যাক নিজে হাতঘড়ি দেখেছেন। টেস্‌ম্যান এবং ব্র্যাক উঠে ড্রইংরুম-এ এলেন।]

ব্র্যাক। (নিজের হ্যাট আর ওভারকোট নিয়ে) শ্রীমতী টেস্‌ম্যান, বিদায় নেবার সময় এবার হোল।

হেডা। হ্যাঁ।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (উঠে) আমারও তাই, বিচারক ব্র্যাক।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (নরম গলায় অনুনয়ের সুরে) ও লিউভ্‌বোর্‌গ, এটা কোর না!

হেডা। (তাঁর হাতে চিম্‌টি কেটে) ওরা শুনতে পাচ্ছে!

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (তীক্ষ্ণ আওয়াজ চেপে) উঃ!

লিউভ্‌বোর্‌গ। (ব্র্যাক-এর প্রতি) আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

ব্র্যাক। আচ্ছা, তাহলে কি শেষ পর্যন্ত আসছেন?

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ।

ব্র্যাক। খুব আনন্দিত হলাম—

লিউভ্‌বোর্‌গ। (টেস্‌ম্যান-এর পকেটে পাণ্ডুলিপির প্যাকেটটা রেখে তারপর) ছাপাখানায় পাঠানোর আগে তোমাকে দু-একটা জিনিস দেখাতে চাই।

টেস্‌ম্যান। ভাবো—সে ত' আনন্দের কথা। কিন্তু হেডা, শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌ বাড়ি যাবেন কী ক'রে? অ্যাঁ?

হেডা। সে একরকম ক'রে হয়ে যাবে'খন।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (মহিলাদের দিকে তাকিয়ে) শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌? আমি নিশ্চয় ফিরে এসে ও'কে নিয়ে যাবো। (এগিয়ে) দশটা বা ওরই কাছাকাছি সময়ে। তাতে হবে ত' শ্রীমতী টেস্‌ম্যান?

হেডা। নিশ্চয়ই। চমৎকার হবে।

টেস্‌ম্যান। যাক, ঠিক হয়ে গেল সব। কিন্তু হেডা, আমাকে অত সকাল সকাল আশা কোর না।

হেডা। ও, তোমার যতক্ষণ— যতক্ষণ খুশি তুমি থাকতে পারো।

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (দুশ্চিন্তা গোপনের চেষ্টা ক'রে) বেশ, তাহলে আমি আপনি না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবো।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (হাতে নিজের হ্যাট নিয়ে) হ্যাঁ, অনুগ্রহ ক'রে তাই করবেন।

ব্র্যাক। আচ্ছা, এবার এক্স্‌কারশন-এর রেলগাড়ি ছাড়ল! আশাকরি কোনও এক সুন্দরী মহিলার উক্তি অনুসারে সময় আমাদের বেশ উচ্ছলভাবেই কাটবে।

হেডা। আহা, যদি সুন্দরী মহিলাটি কেবল অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থাকতে পারতেন—!

ব্র্যাক। অদৃশ্যভাবে কেন?

হেডা। আপনাদের উচ্ছলতার প্রত্যক্ষ স্বাদ নিতে!

ব্র্যাক। (উচ্চৈঃস্বরে হেসে) আমি সুন্দরী মহিলাটিকে একাজ করতে অনুরোধ জানাবো না।

টেস্‌ম্যান। (গলা চড়িয়ে হাসতে হাসতে) আরে, তুমি বেশ মজার মেয়ে হেডা! একবার ভাবো!

ব্র্যাক। আচ্ছা, ভো মহিলাবৃন্দ বিদায়।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (নত হয়ে) দশটা নাগাদ, কেমন?

[ব্র্যাক, টেস্‌ম্যান আর লিউভ্‌বোর্‌গ হল-ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একই সময়ে বার্‌টা ঢুকল ভেতরকার ঘর থেকে তার হাতে একটা জ্বলন্ত বাতি, সেটা রাখল খাবার টেবিল-এর ওপর; একই রাস্তা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।]

শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌। (যিনি উঠে সমস্ত ঘরে অস্থির পদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন)

হেডা। দশটার সময় তিনি এখানে আসছেন। আমি তাকে এখনই দেখতে পাচ্ছি—চুলে আঙুরলতা জড়ান—উদ্দীপ্ত এবং নির্ভীক—

শ্রীমতী এল্ভস্টেড্। আহা, তাই যেন হয়।

হেডা। আর তারপর, দেখো—সে তারপর নিজের ওপর কর্তৃত্ব ফিরে পাবে। তারপর সে আজীবন এক স্বাধীন সত্তা।

শ্রীমতী এল্ভস্টেড্। হা ঈশ্বর!—তোমার বর্তমান কল্পনা অনুযায়ী ঠিক ওইরকমভাবে সে যদি ফিরে আসত!

হেডা। আমি যেভাবে দেখছি সেইভাবেই তিনি ফিরবেন—ঠিক সেইভাবে, অন্যভাবে নয়! (উঠে টায়া-র দিকে এগোলেন) যতদিন খুশি তাঁকে সন্দেহ করতে পারো; আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। এবং এবার আমরা চেষ্টা করবো—

শ্রীমতী এল্ভস্টেড্। হেডা, এ ব্যাপারে তোমার কোনও গোপন মতলব আছে।

হেডা। হ্যাঁ, আছেই ত'। জীবনে অন্তত একবার মানুষের ভাগ্য গড়ে দিতে চাই।

শ্রীমতী এল্ভস্টেড্। তোমার কি সে ক্ষমতা নেই?

হেডা। নেই—কোনকালে ছিলও না।

শ্রীমতী এল্ভস্টেড্। তোমার স্বামীরও নয়?

হেডা। তোমার কি মনে হয় তা কষ্ট করার যোগ্য? হায়, যদি একটু বুঝতে আমি কী ভীষণ দরিদ্র। আর, ভাগ্য তোমাকে সম্পদে ভরে দিয়েছে! (তাকে আবেগভরে আলিঙ্গন করে) ভাবছি, শেষ পর্যন্ত তোমার চুল পুড়িয়েই দেবো।

শ্রীমতী এল্ভস্টেড্। আমাকে যেতে দিন। আমাকে যেতে দিন! হেডা, তোমাকে আমার ভয় করছে।

বার্থা। (মধ্যখানের দরজায়) দিদিমণি, খাবার ঘরে চা দেওয়া হয়েছে।

হেডা। বাঃ, বেশ। আমরা আসছি।

শ্রীমতী এল্ভস্টেড্। না, না, না। আমি বরং একা বাড়ি যাবো! এক্ষুণি!

হেডা। প্রলাপ! প্রথমে এককাপ চা খাবে, বুঝেছ মুখ্যু। আর তারপর—দশটার সময়—এইলার্ট লিউভ্বোর্গ এখানে আসছেন—চুলে তাঁর আঙুরলতা জড়ান।

[তিনি প্রায় জোর করে শ্রীমতী এল্ভস্টেড্-কে মাঝের দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন।]

[ক্রমশ]

অনুবাদকঃ সমীরণ চৌধুরী

বিচিত্রবর্ণা

প্রতিবেশী কবিতা (ওড়িয়া)

সচ্চিদানন্দ রাউতরায়

গভীর সমুদ্র জলে হঠাৎ সে মৎস্যকন্যা হয়ে
খেলিতেছিল বৈদূর্য ও প্রবাল তোরণে
দাঁতে কেটে তরঙ্গের কুঞ্চিত কেশ
জ্বলে জ্বলে ফস্‌ফরাসের করুণ শিখায়....

মনে হয় দেখেছিলাম তাকে
কবে যে গঙ্গোত্রী তীরে পাহাড়ী সন্ধ্যায়
শালগ্রাম সংগ্রহের কালে,
কখনো বা গুণাঢ্যের উপাখ্যান মাঝে
তাকে আবার দেখেছিলাম
খৃস্টীয় প্রথম শতকে।
হয়ত বা তার আগে

বিষকন্যা হয়ে নিংড়ে সে নিয়েছিল
আমার অধর থেকে জীবনের যত সব সুরা
সাপের চিকুর জাল সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
মুহূর্ত মুহূর্ত দিন দিন মাস মাস ধরে
পাংশুলে পাণ্ডুর আর নিরক্ত কলস
মাটির উপরে ফেলে চূর্ণ করি পদে।

আর একবার মৃত মমী স্বর্ণ ঢাকনায়
অথবা নাইল্ তীরে পিরামিডের নিচে
দ্বিতীয় জন্মের সঙ্গী রূপে
বহু উপপত্নী আর স্বর্ণ ও মাণিক্য
ধান যব রৌপ্য আর মৃৎপাত্র সহ
নিক্ষিপ্ত সে হয়েছিল শব সাথে মোর
একই কবরে।

আর একবার
দ্বিতীয় প্রেমিকে তার বর্শাবিদ্ধ করে
ছিন্নশির পদতলে দিয়ে উপহার
পেয়েছিলাম পাণি তার দলপতি থেকে
বাইসনের চর্ম আর মৃগনাভি যৌতুক সহ।

কবে আবার
পারস্য রোমক কিম্বা গ্রীসীয় বাজারে
সংগ্রহ আমি করেছিলাম তাকে
শত মুদ্রা বিনিময়ে বিপণিশালায়—
অথবা কোন সামন্ত-রাজার মুকুট থেকে
শত শত মণি মাঝে মধ্যমণি তাকে
পেয়েছিলাম আমি উপহার।

সে সব যাই হোক্
আজ এই কালোরাত্রি নিষিদ্ধ প্রহরে
নীল নদী বালুচরে শীতল হাওয়ায়
সর্বাঙ্গ শিহরি উঠে
কোন মৃত রমণীর বিষাক্ত নিশ্বাসে।
নারী আর সাপ আর ভগবানের অন্তরে।
নারী আর সাপ আর রাত্রির হাওয়ায়।

অনুবাদিকা—সুজাতা মিশ্র

বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি / নিউ এজ

অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্র গোস্বামী মহোদয়ের 'বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি। লেখক মননশীল সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি বৈদিক সমাজের প্রকৃতি ও রূপ-নির্ণয়ে এবং বৈদিক সংস্কৃতির মূল্য ও মান নির্ধারণে ব্রতী রহিয়াছেন। এই কার্যে তিনি উন্মুক্ত মনে বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে আধুনিক বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং তারই সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যে ও আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান প্রযুক্ত হওয়ায় মণি-কাঞ্চন সংযোগ সাধিত হইয়াছে। বিদ্বৎ সমাজে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সামাজিক বিকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে, মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব এবং মর্গানের নৃতত্ত্ব বিষয়ে আধুনিক সমালোচকদের মতামত আলোচিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এই ধরণের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ইতিপূর্বে হয় নাই। মার্কসীয় চিন্তাধারার অন্ধ অনুকরণের সহিত বাঙ্গালী পাঠক পরিচিত। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিন্তাধারার মধ্যে কিছু সংস্কার ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে নূতন রীতিতে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা সকলে অনুভব করিবেন। —নৃপেন্দ্র গোস্বামী, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—পনের টাকা।

ছোটদের বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড) / মডার্ন বুক এজেন্সী

বিশ্বকোষ বা বুক অফ নলেজ জাতীয় গ্রন্থের উপকারিতা অপরিসীম, ছোটদের জন্য এই ধরণের গ্রন্থ প্রণয়ন করে গ্রন্থ প্রকাশক ও সম্পাদক উভয়েই বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। প্রথম খণ্ডটি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থটি দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডে স্থানাভাববশতঃ যে-সব বিষয় সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর হয় নি,

বর্তমান খণ্ডে সে-সবই আলোচিত। চিত্রকলা, সঙ্গীত, সংস্কৃত, সাহিত্য ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই খণ্ডে, সেই সঙ্গে আছে জীবনী-বিচিত্রা দেশ-বিদেশের রূপকথা, বাংলা-সাহিত্যের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। কালানুক্রমিক ধারায় বিষয়গুলির পরিচয় প্রদত্ত এবং এজন্যই ভবিষ্যতেও এগুলি সম্বন্ধে আলোচনার সম্যক সুযোগ বর্তমান। সম্পাদন কৃতিত্বে আলোচ্য বিষয়গুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে স্বচ্ছন্দেই। আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। সম্পাদনা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশনা—মডার্ন বুক এজেন্সী, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—বারো টাকা।

মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতবর্ষের মহান নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন-আলেখ্য সমগ্র ভারতবাসীর কাছে অমূল্য সম্পদ। এই মহান নেতার জীবন নাটকীয়রূপে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, পট থেকে পটান্তরে রেখাপাত করেছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটিতে লেখক যথেষ্ট যত্ন করে নেতাজীর জীবনের বহুদিক একের পর এক সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের এত বড় একজন নেতা সমগ্র জীবনব্যাপী স্বাধীনতার জন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, কত দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিয়েছেন। তারপর সেই অসীম শৌর্য ও বীর্যের ফলস্বরূপ তিনি স্বাধীনতা করায়ত্ত করলেন। আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেছিলেন এবং অবশেষে এই সরকারের সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা, তাঁর আদর্শ, রাষ্ট্র দর্শন সব এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। নতুন চেতনা এনে দিয়েছে ভারতবাসীকে। তাঁর সংগ্রামময় জীবন কখনো নতি স্বীকার করেনি, বীরদর্পে এগিয়ে চলেছেন সামনে, এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছেন ভারতবাসীকে। শক্তিশালী নেতা সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আত্মোৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য। তাঁর স্বাধীনতার বেদীমূলে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এনে দিয়েছিল দেশবাসীর মনে পূর্ণ বল, পেয়েছিলেন তাদের সহযোগিতা, তাই ইংরাজ ভয় পেয়েছিল নেতাজীকে। তাই তাঁকে বারংবার কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। এই গ্রন্থটি সেই মহান নেতার সম্পূর্ণ জীবনী। এমন করে একের পর এক জীবন-গাথা সাজানো সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তিমাত্রেই বইটি পড়ে খুশী হবেন। লেখক—শ্রীশিশির দাশ। পরিবেশক: সুবোধচন্দ্র ঘোষ, গোবর্ধন প্রেস, ২০৯বি, বিধান সরণী, কলি-৬। দাম:—বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লৌকিক শব্দকোষ / ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস

সব ভাষারই দু'টি করে রূপ আছে। এক সাহিত্যের ভাষা দুই কথ্য ভাষা। সাহিত্যের ভাষার মধ্যেও আবার বিভিন্ন শৈলী বর্তমান। সাহিত্যের ভাষা যে-ভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন মূলতঃ তা কথ্য বা মুখের ভাষারই আধারে ধৃত। সেইজন্যই কোন ভাষার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পেতে গেলে, শুধু সাহিত্যের ভাষাকে গ্রহণ করলেই চলে না, প্রধান প্রধান কথ্য ভাষার

সঙ্গেও সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে লৌকিক শব্দকোষের মূল্য অসীম। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার সেই মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কাজে নেমেছেন। খুব বড় আকারে না হলেও সীমিত পরিধির মধ্যে লৌকিক শব্দের এই যে সংগ্রহটি তিনি সম্পাদনা করেছেন, তাতে আন্তরিকতা ও সযত্ন পরিশীলনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। গ্রন্থভূমিকাটিও সুচিন্তিত ও সুপাঠ্য। বোদ্ধা পাঠকমাত্রই যে বর্তমান গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীকামিনীকুমার রায়, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ৩, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলি-১। দাম—বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

জেনানা ফাটক / প্রকাশ ভবন

জেনানা ফাটক, অর্থাৎ নারী কয়েদীর বাসস্থান, ১৯৪২ খৃস্টাব্দের বিখ্যাত স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন লেখিকা এবং সে সময় বেশ কিছুদিনের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়, আলোচ্য গ্রন্থে সেই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। বিভিন্ন জেলে তাঁকে থাকতে হয়েছে পর্যায়ক্রমে, সে সময় যা তিনি দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তার এক অপূর্ব মধুর ভাব ব্যঞ্জনাময় ছবি এঁকেছেন গ্রন্থোক্ত কাহিনীর মাধ্যমে। এই রচনায় মানবিকতা বোধের পরিচ্ছন্ন পরিচয় বিধৃত। খুনী আসামী শুনলে স্বভাবতই সকলে শিউরে ওঠে, কিন্তু লেখিকার দরদী কলমে খুনী আসামীদের যে ছবি আঁকা হয়েছে তাতে অভিভূত হতে হয়। একসঙ্গে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে পাশাপাশি বাস করার সময় তিনি বহু খুনী নারীকয়েদীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছেন, চেয়েছেন কঠিন খোলার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে হৃদয়বত্তার শ্যামসবুজ শাঁসের পরিচয় পেতে এবং তাতে তিনি সম্পূর্ণ সফলও হয়েছেন। সরলা মিছিরণ, স্নরাজন বাণ্, রূপজান প্রভৃতি চরিত্র তাই এত সরল এত সহজ হয়েই ফুটে উঠতে পেরেছে, কাহিনীর ছত্রে ছত্রে। পড়তে পড়তে পাঠকও একাত্ম হয়ে উঠতে পারেন চরিত্রগুলির সঙ্গে, ঘৃণ্যতম অপরাধে দণ্ডিত কয়েদী হিসাবে না দেখে, ভালমন্দয় মেশানো সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবেই তাদের দেখতে সক্ষম হন। গ্রন্থটির এই সুসজ্জিত নবসংস্করণকে আমরা সানন্দ স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—রাণী চন্দ, প্রকাশনা—প্রকাশ ভবন। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ঝিলা মল / বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

আলোচ্য গ্রন্থটি রম্যরচনা জাতীয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বিদেশে সফর করতে গিয়েছিলেন, ছোট ছোট কয়েক টুকরো রচনার মাধ্যমে তারই স্মৃতিচারণ করেছেন; সেই সঙ্গে আছে তাঁর সরকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা 'নিশিকুটুম্ব' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। এ ছাড়াও আছে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার টুকরো কাহিনী এবং আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে সরস মধুর অথচ প্রামাণ্য গবেষণা। লেখকের শৈলী সত্যিই বিচিত্র, সরসতার সঙ্গে হৃদয়বত্তার এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ বোধ হয় আর নেই এবং সেজন্য তিনি যা বলেন তা সরাসরি এসে মনের দুয়ারে ঘা মারে, অর্থাৎ কিনা এককথায় মর্মস্পর্শী। বর্তমান রচনারও মূল আকর্ষণ সেটাই, বুদ্ধির শুকনো পাথারে না আছড়ে হৃদয়বত্তার গভীর শীতল জলে অবগাহন করিয়ে শান্তস্নিগ্ধ করে ছেড়ে দেয় পাঠক মনকে এই রচনা। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি এবং এর সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—মনোজ বসু, প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

চলে নীল শাড়ি / ভারবি

বহুদিন বাদে প্রিয় লেখকের এক মন-ভরানো উপন্যাস হাতে পেয়ে, বাঙ্গালী সাহিত্য পাঠক খুসী হয়ে উঠবেন। এই গ্রন্থে আমরা আবার সেই 'প্রথম কদমফুলের' অচিন্ত্যকুমারকে খুঁজে পেলাম। লেখক সেই আশ্চর্য ব্যতিক্রমদেরই একজন যাঁরা কখনও ফুরিয়ে যান না, ভাষার ঔজ্জ্বল্যে বক্তব্যের স্বকীয়তায় যাঁরা সদা-সর্বদাই এক ও অনন্য। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সংসার ভাঙ্গে কিন্তু প্রেম মরে না—এই কথাটাই সোচ্চার আলোচ্য কাহিনীর ছত্রে ছত্রে। সুখেন্দুর লোভ বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো। তার সংসারে, সাধ্বী শান্ত স্ত্রীকে সে পরিণত করতে চেয়েছিলো পতঙ্গ আমন্ত্রণকারী দীপশিখায়, ঘরের কোণের স্নিগ্ধ প্রদীপটিকে করে তুলতে চেয়েছিলো হাজার পাওয়ারের ফ্লুরেসেন্ট আলো। যমুনা জ্বললো কিন্তু জ্বালালো না, আশ্চর্য অনতিক্রম্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাঁচিয়ে রাখলো নিজেকে বাঁচালো সংসারকে। ঐশ্বর্যের হাতছানি এড়িয়ে সে ফিরে গেলো আপন আসনে, পেছনে রেখে গেলো এক অমলিন অশঙ্ক প্রেমের প্রতীক চঞ্চলকে। অপূর্ব শৈলীতে এক অনন্য প্রেমের কাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখক, পড়তে পড়তে মুগ্ধ হতে হয়, শিহরিত হতে হয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই অনবদ্য। লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রকাশক—ভারবি, ২৬, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২, দাম—দশ টাকা।

বসন্ত রাগ / ভারতী লাইব্রেরী

আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক এক সাংবাদিক, বিষয়বস্তু, তাঁর প্রেম যার সমাপ্তি পরিণয়ে। পুরী বেড়াতে যাওয়ার সময় বিখ্যাত বার্তা সম্পাদক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হল কৃষ্ণা নামে এক তরুণীর, যে নাকি কাজে কালো হলেও, কালো দুটি হরিণ চোখের মালিক। ব্যস চোখ-কান বুজেই প্রেমে পড়ে গেলেন সাংবাদিকপ্রবর, তারপর পুরীর সমুদ্রের উদার

পটভূমিতে বিকশিত হল সে প্রেম, পরিণামে মধুর প্রত্যাশার ইঙ্গিত দিয়ে। লেখকের হাত কাঁচা হলেও একটা অকপট আন্তরিকতার আভাস পাওয়া যায় কাহিনীর মাঝে। কিশোর-কিশোরীর কাছে এই প্রেম-কাহিনী উপাদেয় লাগবে বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অবিনাশ সাহা। পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ম্যাজিকের গল্প / এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী

যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থকার ইতিপূর্বে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেটি পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে, কাজেই আলোচ্য রচনাটিও যে সমাদরের সঙ্গেই গৃহীত হবে এ আশা করা যায় সহজেই। অগ্রযুগের এক প্রখ্যাত যাদুকর শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় একসময়ে 'রয় দি মিস্টিক' নামে যিনি সুখ্যাত ছিলেন, তাঁর অনেকগুলি রোমাঞ্চকর খেলার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে, সেই সঙ্গে আছে আরও কতজন অখ্যাত ও প্রখ্যাত যাদুকরের যাদুকাহিনী। লেখকের সুভাষিত কথকতার গুণে কাহিনীগুলি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক সম্বন্ধে কৌতূহলী-জনের তো কথাই নেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পাঠকও যে গ্রন্থোক্ত গল্পগুলি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অজিত-কৃষ্ণ বসু, প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এ: ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প-বিরোধ / ডি এম লাইব্রেরী

বর্তমান যুগ-জীবনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনোত্তর ভারতে ভারতীয় শ্রমিক আইনগুলির আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করা হয়েছে, তবু মালিক-শ্রমিক সমস্যা মেটেনি এবং তা ক্রম-বর্ধমান। মেহনতী মানুষের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করছে ফলে শিল্পে ধর্মঘট, লক আউট, ছাঁটাই, সাসপেণ্ড, বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি এত মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে যে, যার ফলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ ও সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয়। এই পটভূমিতে ট্রেড ইউনিয়নের মূল সূত্র-গুলি সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ ধারণা থাকা প্রয়োজন সকলেরই---বিশেষ করে শ্রমিক-শ্রেণীর মানুষদের। এ সম্বন্ধে ইংরাজীতে অনেক পুস্তকাদি থাকলেও বাংলায় নেই। আলোচ্য পুস্তকটিও তাই শুধু প্রয়োজনীয়ই নয় মূল্যবানও। এই গ্রন্থে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য প্রায় সব বিষয়ের উপরই আলোকপাত করা হয়েছে। একেবারে সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী পাঠকও বর্তমান গ্রন্থটি পড়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে পারবেন। বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক---শ্রীসুখেন চট্টো-পাধ্যায়, প্রাপ্তিস্থান---ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬। দাম---একটাকা পঁচাত্তর পয়সা।

কি পাই নি / অনুরাধা প্রকাশনী।

আলোচ্য উপন্যাসে কাহিনীর জাল-বোনা হয়েছে বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে। নানারকমের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনীটি হয়ে উঠতে পেরেছে আকর্ষণীয় ও ঔৎসুক্যসঞ্চারী। চরিত্রচিত্রণেও সফল হয়েছেন লেখিকা। গিরিজানাথ, মহিমানাথ, সুষমা, শোভনা, শিবনাথ প্রভৃতি সব চরিত্রই বেশ উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা—পারুল ঘোষ। প্রকাশনা—অনুরাধা প্রকাশনী, ১-এ, নন্দলাল বসু লেন, কলিকাতা-৩, দাম—পাঁচ টাকা।

চোখের আলোয় / মিত্রাণী।

আলোচ্য উপন্যাসটি এক আশ্চর্য সুন্দর পটভূমিতে রচিত প্রকৃতির অবারিত মাধুর্যকে যেন নিংড়িয়ে নিয়ে কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়া হয়েছে। বিচ্ছেদের মধ্যেই পূর্ণ যে প্রেম তারই বার্তা সোচ্চার কাহিনীর মধ্যে। নায়ক-নায়িকা শংখ ও সর্বাণী যেন সেই অমর প্রেমেরই দুটি ভাবরূপ। বইটি পড়তে ভাল লাগে, পাঠশেষেও মন ভরে থাকে এক মধুর আবেশে। লেখকের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বর্তমান। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শঙ্কর মিত্র, প্রাপ্তি-স্থান—ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

হাওয়া দেয়

সাম্প্রতিক কাব্য-সাহিত্যের পরিসরে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য দুই উল্লেখ্য নাম। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে এই দুই কবির কয়েকটি রচনাকে একত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে যুগচেতনার ছাপ সুস্পষ্ট। তা ছাড়া একটা সহজ আত্ম-প্রত্যয়ের ভাবও লক্ষণীয় এদের মাঝে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়। প্রকাশনা---বাংলা কবিতা প্রকাশনী। ১৮, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। দাম---এক টাকা।

গীতাংশুক

আলোচ্য গীতিসংগ্রহের গীতি-গুচ্ছে একটা সহজ সরল সৌন্দর্য লক্ষণীয়। গানগুলি কবিতা হিসাবেও পড়তে ভাল লাগে। ভাষা ও ভাব খুব সহজেই পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পেরেছে। লেখিকার সারল্য প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখিকা—মমতা মিত্র, প্রকাশনায়—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচিত্রা নিকেতন লি:, ২৭।১, ফড়িয়া পুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা, দাম—একটাকা।

বসন্ত রোগ উচ্ছেদ চাই

ডাঃ কনক সর্বাধিকারী

[আ]পনারা জানেন যে, বসন্ত রোগ মানুষের এক ভয়াবহ শত্রু। কারো এ-রোগ হয়েছে শুনলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আগে হাজারে হাজারে মানুষের জীবনান্ত ঘটেছে। এখন প্রতিষেধক টিকা বার হওয়ার পর এর প্রকোপ কিছুটা কমেছে, কিন্তু জনসাধারণের অসতর্কতার সুযোগ পেলে এখনো এ রোগ মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়ে।

বসন্ত রোগে আক্রান্ত হবার আগে প্রবল জ্বর হয়, তিনদিন পরে সারাদেহে লাল লাল ছোপ বেরিয়ে পড়ে, চতুর্থ দিনে ফুসকুড়ির মত দেখা দেয়। পঞ্চম দিনে গুটি বেরোয়। প্রথমে কপালে মুখে কব্জিতে, ক্রমে সারা গায়ে, হাতে, তালুতে ও পায়ের চেটোয় এই গুটি ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে গলার ভিতরেও এই গুটি হতে পারে। প্রথম দিকে গুটিগুলির মধ্যে তরল পুঁজ হয়, পরে ঐ পুঁজ গাঢ় হলদে রংয়ের হয়ে যায়। দু সপ্তাহ দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করবার পর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে যন্ত্রণা কমে আসে, গুটিগুলি শুকিয়ে মামড়িতে পরিণত হয়। ক্রমে মামড়িগুলি আপনা থেকে খসে পড়তে শুরু করে। এই সময়টা রোগীর বাড়ীর অন্যান্যদের পক্ষে খুব মারাত্মক। এই মামড়িগুলি যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না পড়ে, তার জন্য সতর্ক হওয়া বিশেষ দরকার। কারণ এই মামড়ি থেকেই রোগের বীজাণু অন্যান্যদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

বসন্ত রোগ যাঁহাদের হয়, তার মধ্যে আমাদের দেশে শতকরা ৪০ জনের মৃত্যু ঘটে। ভাগ্যক্রমে যাঁরা বেঁচে যান, তাঁদের দেহে ঘটে নানা বিকৃতি। কেউ চিরকালের মত অন্ধ হয়ে যান, কেউ হন বধির, কারো বা দেখা দেয় শ্বাস-যন্ত্রের রোগ, সারাদেহে থেকে যায় স্থায়ী দাগ। মুখের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়।

ডাঃ কনক সর্বাধিকারী
এম বি (কলিকাতা), এফ আর সি এস
(ইংল্যান্ড ও এডিনবারা)

অথচ, এই রোগ নিবারণ করার অতি সহজ প্রতিষেধক রয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ও সাধনায় এই রোগের প্রতিষেধক টিকার উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। এই সাংঘাতিক রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হ'লে তিনবছর অন্তর রক্ষাকবচ হিসাবে বসন্ত রোগের টিকা নিলে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করা যায়।

এই রোগের নানা রূপ---

১। প্রথমত কনফ্লুয়েন্ট টাইপ-এতে আক্রান্ত রোগের শতকরা ৪৫ জনের মৃত্যু ঘটে।

২। দ্বিতীয়ত ডিসক্রিট টাইপ এতে মারা যায় রোগীদের মধ্যে শতকরা ৫ জন।

৩। তৃতীয় প্রকার রোগীকে বলা হয় হেমোরেজিক টাইপ। পশ্চিম বাংলায় এই ধরণের বসন্ত রোগ বিশেষ দেখা যায় না। এর আবার দুটো রকম আছে----

(১) পাসচুউলার ফর্ম এতে রোগীদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জনের মৃত্যু হয়। (২) পারফিউরিক ফর্ম এতে শতকরা রোগীদের মধ্যে ১০০ জনেরই মৃত্যু ঘটে। (৩) তৃতীয় বা শেষ প্রকারটির নাম হচ্ছে মডিফায়েড টাইপ। এই টাইপের রোগে আক্রান্ত হলে কোন উপসর্গ না থাকলে রোগী মারা যায় না। কিন্তু এইটি আবার অত্যন্ত ক্ষতিকর রোগ। অভিজ্ঞ চিকিৎসকও ধরতে পারেন না---রোগী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা। এতে রোগী শয্যাশায়ী হয় না---হাটে-বাজারে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় ও রোগের জীবাণু ছড়ায়। সুতরাং এটি যে কত মারাত্মক, তা সহজেই অনুমেয়। অতএব রোগের লক্ষণ বা উপসর্গের সূচনা দেখলেই জনস্বাস্থ্য অফিসে অবিলম্বে খবর দেওয়া একান্ত দরকার।

এখনও কারো কারো বিশ্বাস মা শীতলার রোষে এই রোগ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে তা নয়। এই রোগ হয় ভ্যারিওলা ভাইরাস-এর আক্রমণে। অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ভ্যারিওলা ভাইরা। এই রোগের বাহক। রোগীর কফ ও থুথুর কণায় এই জীবাণু থাকে। রোগাক্রান্তের হাঁচি, কাশী বা কথা বলার সময় থুথু-কণার মধ্য দিয়ে এই রোগ অন্য দেহে

প্রবেশ করে। হাঁচি প্রায় ২০ ফুট, কাশি ১৫ ফুট, কথা বলার সময় থুথুর কণা ৮ ফুট পর্যন্ত এই রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে। বসন্তের গুটি শুকিয়ে গিয়ে যে মামড়ি খসে পড়ে, তার কণাগুলিও বাতাসে উড়ে রোগ ছড়ায়। যাঁরা এক বা একাধিকবার বসন্ত-প্রতিষেধক টিকা নেন নি, তাঁদের মধ্যে এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটা সকলের বিশেষ করে জেনে রাখা দরকার বসন্তের টিকা নিলে, এই রোগের বিস্তার বন্ধ করা যায়।

প্রাথমিক টিকা দেওয়া উচিত শিশু জন্মের ৬ মাসের মধ্যে। তারপর ৩ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে নিতে হবে। গর্ভবতী নারীর টিকা নিতে আপত্তি নাই, কিন্তু গর্ভ ধারণের ৩ মাস না নিলেই ভাল হয়। যখন কোন অঞ্চলে বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে বলে শোনা যায়, তখন ঐ এলাকার প্রত্যেক অধিবাসীদের উচিত টিকা নেওয়া। এমন কি, সেই এলাকার সদ্যোজাত শিশুদেরও টিকা দেওয়া উচিত। এটা করতে পারলে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায় বসন্ত রোগের প্রকোপ থেকে। নিছক কুড়েমি বা অবহেলা করে এই মারাত্মক রোগের আক্রান্ত হওয়া কি ভাল? এর হাত থেকে নিজেকে, নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে এই সহজ উপায়ে রক্ষা করতে না পারলে, আপনি কি অপরাধী হবেন না? সহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতি মানুষকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন পশ্চিম বাংলা সরকার। এই সুযোগ গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? আমাদের শাস্ত্রেই ত' আছে 'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ'। শাস্ত্রবাক্য মেনে নিয়ে আপন প্রিয়জনদের এই ভয়াবহ রোগের হাত থেকে রক্ষা করবার ও নিজে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথাসময়ে বসন্ত প্রতিষেধক টিকা নেওয়া সকলের কর্তব্য।

টিকা নেওয়ার পর ৪।৫ বছর কেটে গেলে প্রতিষেধক ক্ষমতা চলে যায় বা বহুলাংশে হ্রাস পায়। যে সব লোক আগে টিকা নেন নি, তাদের নাক ও মুখের মধ্য দিয়ে ভ্যারাইওলা ভাইরাস বীজাণু প্রবেশ করে। এই রোগ হ'লে রোগীকে পৃথক করে রাখতে হবে। রোগীর পক্ষে মুক্ত আলো-বাতাসের প্রয়োজন আছে। যে ঘরে রোগী থাকবে, সে ঘর থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ রোগের বীজাণু কখন কোথায় ছড়িয়ে পড়বে, লুকিয়ে থাকবে, তার ঠিক নেই। রোগীর পক্ষে মশারী ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এর দ্বারা মাছির আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করাও সম্ভব হয়। মাছি আবার ঐ রোগ ছড়াবার একটা বাহক। রোগীর পাত্র, পরিধেয় বস্ত্র গরম জলে ফোটান দরকার। তারপর সেইগুলিকে ধোবিখানায় পাঠান উচিত। রোগীর কফ ও থুথু ঢাকা পাত্রে রেখে পরে পুড়িয়ে দিতে হবে। মামড়িগুলির বেলাতেও তাই। রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র শোধন করতে হলে ১০% ব্লিচিং পাউডার লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে। একঘণ্টা কাল এগুলিকে ঐ লোশনে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

রোগীর সেবা করবেন তাঁরাই, যাঁরা কিছুদিন আগে বসন্তের টিকা নিয়েছেন। এঁদেরও হাত ও কাপড়-চোপড় শোধন করবার সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। এঁরা ছাড়া রোগীর ঘরে আর কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

বসন্ত রোগে মৃতব্যক্তিকে যতশীঘ্র সম্ভব দাহ অথবা কবর দিতে হবে। শবদেহ নিয়ে যাওয়ার আগে শতকরা ৪০% ফরমালীন লোশনে ভেজান কাপড় দিয়ে শবের সর্বাঙ্গ মুড়ে দিতে হবে কি সধবা, কি বিধবা, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সব ক্ষেত্রেই এটি অবশ্যই করণীয়।

পূর্বে এ রোগ পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে জেনার নামক একজন ইংরেজ নিজের দেহের উপর অল্পমাত্রায় গো-বসন্তের ইনজেকশান নিয়ে প্রমাণ করেন যে, এর দ্বারা দেহে বসন্ত রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে— রোগের প্রকোপ কমে বা একেবারেই নিরোধ হয়ে যায়। টীকার প্রচণ্ড প্রতিরোধ ক্ষমতা যে কী এবং কি করে তা সম্ভব হয়, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লুই পাস্তুর তা প্রমাণ করেন। সেই থেকে পৃথিবীর লোক ক্রমশ আস্থাবান হ'য়েছে এই প্রতিষেধক টিকার উপরে।

এই মারাত্মক রোগ আমাদের দেশ থেকে একেবারে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এক জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পশ্চিম বাংলায় এই পরিকল্পনা চালু হয়েছে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ থেকে। এই পরিকল্পনায় কাজ হ'য়েছে অনেক, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় নি।

আমরা এখন জেনেছি বসন্ত রোগের সহজ ও একমাত্র প্রতিষেধক হলো ব্যাপকভাবে এই টিকা নেওয়া। এই টিকা যদি সফল হয়, তাহলে বসন্ত রোগের ভাইরাস্ শরীরে প্রবেশ করলেও কেউ রোগাক্রান্ত হবেন না। কিন্তু শুধু এই সত্যটি উপলব্ধি করলেই চলবে না। বাংলার প্রতিটি মানুষকে অভ্যাস করতে হবে নিয়মিতভাবে এই টিকা নেওয়া। যুক্তি যতই সুদৃঢ় হোক, আইন-কানুন, কর্মসূচী যতই হোক সুষ্ঠু, যতদিন না দেশের প্রতিটি মানুষ এই জাতীয় পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, ততদিন নির্মূল হবে না এই ভয়ঙ্কর রোগ।

আমার অনুরোধ, আপনারা সকলে এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলবার জন্য, এই মহামারীর হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করবার জন্য জাতীয় এই পরিকল্পনাটিকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা দিয়ে সাফল্য-মণ্ডিত করে তুলুন।*

---

* আকাশবাণীর সৌজন্যে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বেণীসংহার ৪·০০
ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন ৪·০০
শজারুর কাঁটা ৪·০০
তুঙ্গভদ্রার তীরে ৬·০০
ধরণী যখন তরুণী ছিল ৪·০০
শঙ্খ কঙ্কণ ২·৫০
কহেন কবি কালিদাস ৩·০০
বহু যুগের ওপার হতে ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ভালোবাসার অনেক নাম ৬·০০
ঘরণীর বিকল্প ৩·০০
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন ২·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

আগ্রা যখন টলমল ৪·০০
প্রতিধ্বনি ফেরে ৪·০০
পঞ্চশর ৩·০০

বিমল মিত্রের

হাতে রইলো তিন ৬·০০
চলো কলকাতা ৫·০০
বেগম মেরী বিশ্বাস ২৫·০০
নিবেদন ইতি ৫·০০
রং বদলায় ৩·৫০

সন্তোষকুমার ঘোষের

জল দাও ৩·৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

আত্মপ্রকাশ ৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

প্রেমের চেয়ে বড় ১২·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

দু'হারা ৭·০০
প্রেম ৪·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অমাবস্যার গান ৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

রূপসী রাত্রি ৬·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য ৩·৫০

কালকূটের

কোথায় পাবে তারে ২০·০০

সমরেশ বসুর

এপার ওপার ৫·০০
প্রজাপতি ৬·০০
স্বীকারোক্তি ৫·০০
বিবর ৫·০০
ফেরাই ৩·০০
দুই অরণ্য ৬·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সন্ধ্যারাগ ৫·০০
সূর্যসাক্ষী ১৪·০০
সেতুবন্ধন ৫·০০
ময়ূরী ৩·০০
তিন দিন তিন রাত্রি ৬·০০

বুদ্ধদেব বসুর

কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ (নাটক) ৫·০০
গোলাপ কেন কালো ৫·০০
তুমি কেমন আছো ৬·০০
পাতাল থেকে আলাপ ৫·০০
তপস্বী ও তরঙ্গিণী (নাটক) ৩·০০

রূপদর্শীর

ব্রজদার গুল্প-সমগ্র ৬·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

পিয়ামুখচন্দা ৬·০০
জনম জনম হম ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

লোকটা ৩·০০

শংকরের

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৪·৫০

সুবোধ ঘোষের

বন উপবন ৪·০০
জিয়াভরলি ৬·০০
বসন্ততিলক ৫·০০
শতকিয়া ৮·০০
ভারত প্রেমকথা ৭·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

সময়ের সুর ৩·০০
সেই রাত্রি এই দিন ৫·০০
রাতের পাখি ৪·০০
দোলনা ৫·০০

প্রতিভা বসুর

দ্বিতীয় দর্পণ ৮·০০
রাঙা ভাঙা চাঁদ ৪·০০

বুদ্ধদেব গুহর

নগ্ন নির্জন ৪·০০
হলুদ বসন্ত ৪·০০

বিমল করের

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ৪·৫০
যদুবংশ ৭·০০
পূর্ণ অপূর্ণ ১০·০০
পরিচয় ৪·০০
বালিকা বধূ ৩·০০
গ্রহণ ৪·০০
খড়কুটো ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঘুণপোকা ৪·০০

মনোজ বসুর

সেতুবন্ধ ১২·০০
স্বর্ণজঙ্ঘা ৪·০০
রূপবতী ৩·০০

সুশীল রায়ের

অদ্বিতীয়া ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর

পরাজিত সম্রাট ৪·০০
গল্প-সমগ্র ১০·০০
বনপলাশির পদাবলী ৮·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সারারাত ৫·০০
মনের মানুষ ৩·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

লোকারণ্য ৪·০০
ভ্রষ্টলগ্ন ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯ । ফোন ৩৩-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলকাতা ৯ ।

॥ মাঘ মাসের ফলাফল ॥

এবার ইংরেজী ১৯৬৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী থেকে মাঘ মাস সুরু হচ্ছে। ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এ মাসের স্থিতিকাল। মঘা নক্ষত্রে এ মাসের পূর্ণিমা হয়ে থাকে। গ্রহজগতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে এ মাসে ২৩এ জানুয়ারী গুরু বক্রী হবে এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গল বৃশ্চিকে যাবে। গুরু বক্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আবহাওয়া চাঞ্চল্যকর ও আতঙ্কসূচক হয়ে উঠতে পারে। মাসের শেষাংশে ইউরোপ ও এশিয়ার কোনো কোনো অংশে যুদ্ধের আতঙ্ক প্রকাশ পেতে পারে। সংঘর্ষে লোকহানি এবং তুফান ঝড়ঝঞ্ঝা ও ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতির আশঙ্কা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষেও সঙ্কট দেখা দিতে পারে। মাঘ মাসে যাদের জন্ম, তাদের পক্ষে এ মাস থেকে এক বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ঘটনায় তাদের অদৃষ্টের মোড় ঘুরে যেতে পারে। কিন্তু আমাশয়ঘটিত পীড়াদি কষ্ট দিতে পারে। মকর রাশি ও মকর লগ্নের জাতকের পক্ষেও একথা খাটে। এ মাসে জাতকদের মধ্যে যাদের বয়স চার থেকে সাত কিংবা দশ থেকে আঠারো তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। যাক্ এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের শুভাশুভ আভাস দেওয়া হল।

মেষ : যে-সব মৌলিক কাজ কিংবা গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা আছে, সেগুলো করে ফেলতে চেষ্টা করুন। লেখক, শিল্পী ও গবেষণাকারীদের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ কাজের মূল্য তাঁরা নিশ্চয়ই পাবেন। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলা মোকর্দমায় না গিয়ে আপোষ করার চেষ্টাই যুক্তিযুক্ত। শিল্পপতি বা কারখানার মালিকদের শ্রমিক কিংবা কর্মীদের অসন্তুষ্টির জন্য সঙ্কট দেখা দিতে পারে। এ বিষয়েও মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ আপোষমূলক ভাবে চললে সুফল হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে মধ্যভাগ আশাপ্রদ কিন্তু শেষাংশ বিবাদ-বিতর্কে ক্ষতিকারক। দূর ভ্রমণের সম্ভাবনা। কিন্তু বেশী দূরে যাওয়া উচিত হবে না। বাস ট্রাম ও ট্রেনে ভ্রমণকালে বিপত্তি ঘটতে পারে। পড়ে গিয়ে কষ্ট কিংবা ব্যথা-বেদনায় কষ্ট বুঝায়। চাকুরীক্ষেত্রে সকল প্রকার উত্তেজনা দমন করে চলা উচিত। মহিলাদেরও অনুরূপ ফল।

ভৃগুজাতক

মেষ লগ্নে জন্ম হলে অর্থাগমের যোগাযোগ ও সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু নানাধরণের ঝঞ্ঝাট ও স্বাস্থ্যের গোলযোগ উৎপাত করতে পারে।

বৃষ : আগের কোনো ব্যাপারের সুরাহা হতে পারে। মাসের সাত থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত সময় লক্ষণীয়। কাউকে কোনো কথা দেওয়া সম্বন্ধে সাবধান। স্নেহের বা বাৎসল্যের দুর্বলতা অন্যায় কার্যে প্ররোচিত করতে পারে। এ মাসের শেষাংশে কোনো নূতন কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন। নূতন কাজ, ব্যবসায় কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পক্ষে আঠারো তারিখ পর্যন্ত অনুকূল। ব্যবসায়ে আগের চেয়ে ভাল। পুস্তক ব্যবসায়ী, ছাপাখানার মালিক ও প্রচার বিভাগীয় কার্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজকদের পক্ষে এ মাস অনুকূল নয়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল কিন্তু আকস্মিক ব্যথা বেদনা ও রক্তের চাপের গোলযোগ দেখা দিতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। নূতন প্রার্থীর চাকুরী হতে পারে। মহিলাদের অভিলষিত ব্যাপারে সাফল্য বুঝায়। শত্রুতা বৃদ্ধি অশান্তি আনতে পারে। বৃষলগ্নে জন্ম হলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতি হলেও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

মিথুন : সাংসারিক সমস্যা কাজকর্মের ক্ষতি করবে। এমন কি অর্থাগমের নূতন যোগাযোগেও বাধা পড়তে পারে। অথচ মাসের মধ্যভাগ বিশেষ সুযোগপ্রদ। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বাতজপীড়া ও স্নায়বিক দৌর্বল্য মাঝে মাঝে কষ্ট দেবে। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে নূতন কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। বয়স্ক পুত্রের উন্নতিরও আভাস রয়েছে। পত্নীর স্বাস্থ্য আকস্মিকভাবে বিব্রত করে তুলতে পারে। নূতন ব্যবসায়ে নামারও যোগ রয়েছে। মধ্যভাগ থেকে ব্যবসায়ের মন্দা কেটে যেতে পারে। তবু আর্থিক সমস্যা চিন্তাগ্রস্ত করবে। চাকুরী ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা দেখা যায়। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে হঠাৎ অশান্তিজনক পরিবেশ ব্যাকুল করতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে বান্ধবীদের ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। মেয়েদের পক্ষে স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে বাধা পড়তে পারে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় যুবকদের সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা এবং

আর্থিক উন্নতির লক্ষণ আছে। স্বাস্থ্য উৎপাত করলে সতর্ক হবেন।

কর্কট: আকস্মিক কোনো ঘটনা শরীর ও মনের উপর চাপ দেবে। আর্থিক ব্যাপারে বেশ ঝুঁকি সামলাতে হবে। পারিবারিক পীড়াদি সঞ্চয়ের ঘর শূন্য করে তুলবে। গুরুজন সম্পর্কে সঙ্কট যেতে পারে। জমি-বাড়ি ও ফসলাদির ব্যাপারেও গোলযোগ বুঝায়। ব্যবসায়ে আশানুরূপ নয়। নূতন কোনো কাজ করতে গিয়ে ঝঞ্ঝাট হতে পারে। অবশ্য গঠনমূলক কাজের তাগিদ আসবে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সাবধানে চলা উচিত। গচ্ছিত অর্থ বা সম্পত্তির ব্যাপারে গোলযোগ বুঝায়। চাকরী ক্ষেত্রে আশানুরূপ হবে না। নূতন উদ্যমে বাধা এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধে ক্ষতির আশঙ্কায় কাজের গাফিলতি এবং কোনোরূপ ফাঁকির ব্যাপারে যাতে জড়িয়ে না পড়েন, সেদিকে নজর রাখুন। মহিলা জাতকের শত্রুবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের গোলযোগ যাবে। বিবাহযোগ্যাদের বিবাহে বাধা রয়েছে। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে পারিবারিক অশান্তি এবং কোনো সন্তানের জন্য দুর্ভোগের আশঙ্কা। নিজের স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে।

সিংহ: এ মাস অত্যন্ত গোলমেলে। সুতরাং যে-কোনো কাজই করুন না কেন, বিশেষ চিন্তা করে করবেন। টাকাকড়ির লেনদেনের ব্যাপারেও হিসাবী হওয়া দরকার। বাড়িঘর ও পুরনো ব্যবসায়ের ব্যাপারে আইনজীবীর শরণাপন্ন হওয়ারও সম্ভাবনা। এ ছাড়া স্বজনদের গাফিলতির ও অন্যায় কর্মের জন্যও ঝঞ্ঝাট হতে পারে। মধ্যভাগে শরীর উৎপাত করবে পত্নীর আকস্মিক পীড়াদিও মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। দূরস্থ আত্মীয়ের জন্যও উদ্বেগ ভোগের আশঙ্কা। রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকলে তাতে অনুকূল ফল হবে না। শত্রু বৃদ্ধি এবং আর্থিক অপচয়েরও সম্ভাবনা। শিল্পী, সাহিত্যিক ও গবেষণাকারীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুভ ফল হতে পারে। কিন্তু পারিবারিক ঝঞ্ঝাটে কাজের ক্ষতি হতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চলা উচিত। ঐ রাশির বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারেও পাত্রীদের পক্ষে শুভ। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্য চিন্তা ও আর্থিক দুর্ভাবনার আশঙ্কা।

কন্যা: কাজকর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেবে। অবশ্য সাংসারিক ব্যাপারে টাল সামলানো কঠিন হয়ে উঠতে পারে। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় এবং ধারকর্জ হবারও আশঙ্কা। যতদূর সম্ভব হিসাব করে চলুন। উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হলেও নিজে স্থির হয়ে চলুন। ব্যবসায়ে ঝুঁকি নেবেন না। নূতন কোনো যোগাযোগ মাসের মধ্যভাগে অর্থাগমের সুযোগ এনে দিতে পারে। জমি বাড়ি ও ফসলাদির ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট বুঝায়। সম্পত্তিঘটিত মামলা-মোকদ্দমা ঘটতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে অনুকূল হবে না। চাকুরীক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা। অবশ্য চাকুরীর মেয়াদ যাদের শেষ হবে, তাদের পুনর্নিয়োগের আশা কম। দাম্পত্য ক্ষেত্রেও মানসিক অশান্তি বাড়বে। উদরঘটিত পীড়া ও হৃদদৌর্বল্য সম্বন্ধে সাবধান। ঐ রাশির মহিলাদের স্বজন-বিরোধে অশান্তি এবং টাকাকড়ির ব্যাপারে দুর্ভাবনার কারণ ঘটতে পারে। বিবাহযোগ্যাদের এখন বিবাহ যুক্তিযুক্ত হবে না। কন্যালগ্নে জন্ম হলে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি ও আর্থিক সম্ভাবনা কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষ উৎপাত করবে।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

মাসিক রাশিফল

নাম— ....

ঠিকানা— ....

মাসিক বসুমতী

তুলা ঃ আগের কোনো কাজের সুরাহা এখন হতে পারে। আট তারিখ থেকে সতেরো তারিখ পর্যন্ত সময় বিশেষ লক্ষণীয়। মতামত প্রকাশে কিংবা লেখায় ও প্রচারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাধ্যতামূলকভাবে সঙ্কুচিত হতে পারে আর্থিক ব্যাপারে পরনির্ভরশীলতা মনের উপর চাপ দেবে। প্রিয়জনদের কারো অসুখ-বিসুখ দুশ্চিন্তা বাড়াবে। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। উদর বায়ুর উৎপাত ও জরাদি কষ্ট দিতে পারে। পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি কিংবা সত্তর বর্ষ বয়সের কাছাকাছি বয়স হলে বিশেষ সাবধান। বিষয়সম্পত্তি ও জমি বাড়ির ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট বুঝায়। অবশ্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে নূতন সুযোগ আসবে ও আয় বাড়বে। চাকুরী ক্ষেত্রে মাসের শেষাংশ শুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতি-যোগিতামূলক ব্যাপারে সাফল্য আসতে পারে। মহিলা জাতকের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা। তুলা লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুর্ভাবনা থাকলেও কর্মের প্রসার ও নূতন কোনো কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। বাইরে যাবারও সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক ঃ যে কাজই করুন না কেন, আর্থিক ব্যাপারে তেমন সুবিধার নয়। ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। আবার যোগাযোগের দিক থেকেও আশাপ্রদ। কিন্তু পারিবারিক ব্যাপারে ব্যয়বৃদ্ধি, কারো অসুখ-বিসুখের জন্য উৎকণ্ঠা এবং ছেলেমেয়েদের কারো জন্য উত্ত্যক্ত হবার মত যোগ। লেখক, শিল্পী ও অভিনেতাদের পক্ষে যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। রাজনৈতিক ব্যাপারে মাসের মধ্যভাগে অনুকূল। কিন্তু মন-মেজাজ প্রায়ই উত্ত্যক্ত হবে। যাদের উপকার করেছেন, তাদের কেউ আবার শত্রুতা করতে পারে। আবার যাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু ভাবেন তাঁদেরও পরম মিত্রতার আভাস পাবেন। কাজেই খেয়ালের বশে হিতৈষী ব্যক্তিকে ভুল বোঝা সম্বন্ধে সাবধান। নূতন প্রার্থীদের চাকুরী হতে পারে। ঐ রাশির বিবাহ-যোগ্য পুরুষ ও নারীদের বিবাহের যোগাযোগও হতে পারে। কিন্তু নব-বিবাহিতদের দাম্পত্য ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি হলেও আর্থিক ক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়।

ধনু ঃ স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ নজর রাখুন। দূরে কোথাও যাবার যোগাযোগ হতে পারে। কিন্তু তাতে বাইরে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে পারেন। টাকাকড়ির লেনদেনের ব্যাপারে মনো-মালিন্য এবং পুরনো প্রাপ্য আদায়ে গোলমাল হতে পারে। অযথা পরের ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলা সম্বন্ধে সাবধান। রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকলে তাতে প্রতিকূল অবস্থা ঘটতে

জন্যে। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে নূতন উদ্যমে নৈরাশ্য আসবে। সুযোগ পেয়েও টাকাকড়ির ব্যাপারে অসুবিধা আসবে। যৌথ ব্যবসায়ে কিংবা অন্যের ব্যবসায়ের পরিচালক হলে মনো-মালিন্য এবং গোলযোগ হতে পারে। চাকরী ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূল। পরীক্ষাদির ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্যের গোলযোগ গেলেও উদ্যমে সাফল্য আসতে পারে। স্বজনপীড়াদি উৎপাত করবে। ধনু লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নৈরাশ্য ও বিশেষ কোনো সুযোগ নষ্ট হতে পারে।

মকর : মৌলিক কাজের জন্য বিশেষ করে সৃষ্টিধর্মী কাজ ও গবেষণার কাজে সাফল্য ও প্রশংসা লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু চাকুরীজীবীদের পক্ষে মতবিরোধে অশান্তি ঘটতে পারে। ভুল-ভ্রান্তি ও সহকর্মীদের ব্যাপারেও উৎপাত হতে পারে। মাসের মধ্যভাগ স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। উদর ও কিডনি সংক্রান্ত গোলযোগ দেখা দিলে বিশেষ সাবধান হবেন। ব্যবসায়ে নূতন উদ্যম এবং যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে। দূরে কোথাও যাবার যোগাযোগও হতে পারে। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য অশান্তি হতে পারে। বেফাঁস কথা বলা এবং কোনো ঝুঁকি নেওয়া সম্বন্ধে সাবধান। দাম্পত্য ক্ষেত্রেও কোনো ভাবে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রীতির প্রসার ও আর্থিক সাফল্য বুঝায়। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। মকর লগ্নে জন্ম হলে কর্মের প্রসার ও আর্থিক ব্যাপারে আগের চেয়ে ভাল হতে পারে।

কুম্ভ : কেমন যেন এক ধরণের অশান্তিকর পরিবেশ সবক্ষেত্রেই গোল-মাল বাধাতে পারে। কাজের দিক থেকে যোগাযোগ ভাল কিন্তু নিজের মন-মেজাজ কাজের উপযোগী হবে না। প্রচুর অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা। সামাজিক ব্যাপারেও অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। প্রিয়জনদের মধ্যে কারো জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ, মাসের শেষাংশে উৎপাত করবে। কোনো চুক্তির কাজ কিংবা কনট্রাক্টের কাজের যোগাযোগ হতে পারে। অপ্রত্যাশিত অর্থ লাভের কিংবা উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। চাকুরীক্ষেত্রে আশানুরূপ হবে না। শত্রুতায় মানসিক অশান্তি ঘটতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্কে মালিন্যের আশঙ্কা। বিবাহের যোগা-যোগে বাধা আসতে পারে। মহিলা-দের পক্ষে প্রিয়জনের জন্য উদ্বেগ ভোগের আশঙ্কা। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও বাড়িঘর নিয়ে বিরোধ কিংবা অশান্তি ঘটতে পারে। ব্যবসায়েও নূতন ভাবনা দেখা দিতে পারে।

মীন : এ মাসে কোনো জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সুরাহা হতে পারে। বৈষয়িক ব্যাপারে কিছু অশান্তি মাসের এগারো তারিখ পর্যন্ত থাকতে পারে। স্বাস্থ্য মাসের শেষাংশে উৎপাত করবে। আর্থিক চিন্তা বড় হয়ে উঠতে পারে। সঞ্চিত অর্থে টান পড়বে। অবশ্য ছেলেদের মধ্যে কারো কৃতিত্বে গর্ববোধ করতে পারেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিতও রয়েছে। চাকুরী ক্ষেত্রে যাদের মেয়াদ শেষ হয়েছে তাদের পুনর্নিয়োগের আশা আছে। নিজের গাফিলতির অথবা আত্মসম্মানবোধের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগও নষ্ট হতে পারে। পরীক্ষার্থীর পক্ষে আসন্ন পরীক্ষা জটিলতাসূচক হতে পারে। ব্যবসায়ীর পক্ষে আগামী ফাল্গুন মাস পর্যন্ত এক ধরণের অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হবে। ঐ রাশির মহিলাদের স্বাস্থ্যের গোলযোগ যাবে। স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে আগ্রহীদের এখন শান্ত থাকা উচিত। মীন লগ্নে জন্ম হলে নূতন কাজের যোগাযোগ ও আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষ উৎপাত করতে পারে।

পত্রোত্তর

● শ্রীবংশধর পাল (বেলগ্রাম)—(১) স্বাস্থ্যের উৎপাতসূচক। (২) লেখা-পড়া জানা বলা চলে। ডিগ্রী বলা সম্ভব নয়। ● শ্রীমাণিকলাল ওঝা (ধানবাদ)—(১) সাত বছর ধৈর্য ধরে চলুন, পরে ভাল; (২) নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল ও আটরতি গোমেদ রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীহরেকৃষ্ণ মিশ্র, (ঝরিয়া, ধানবাদ)—(১) তিন বছর ধৈর্য ধারণ করতে হবে, (২) পরে হবে। ● শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মিশ্র (ঝরিয়া)—(১) পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন উত্তর দেওয়া হয় না, (২) বিজ্ঞান সংক্রান্ত লাইন, খনিজ কিংবা ভূতত্ত্ব বিদ্যা। প্রতিকার জন্য ইন্দ্রনীল কমপক্ষে ছয়রতি। রূপার আংটিতে। যথাবিধি পরীক্ষা করে এবং শোধনাদি করে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীদেবনাথ ব্যানার্জী (দমদম)—(১) বর্তমানে দেড় বছর নানা ঝঞ্ঝাটে যেতে পারে, (২) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান, ভাল হতে পারে। ● শ্রীমতী সুচিন্তা চ্যাটার্জী (জনক রোড, বালিগঞ্জ)—(১) আগামী বৈশাখের মধ্যে সম্ভাবনা, (২) বাধাও প্রবল; তা দূর করার জন্য আটরতি রক্তমুখী প্রবাল সোনার আংটিতে এবং ছয়রতি গোমেদ রূপার আংটিতে যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণ করা উচিত। ● শ্রীমেঘদূত (দিনহাটা)—(১) আগামী নূতন বর্ষ দেখুন, (২) চাকুরী হতে পারে। ● শ্রীবদ্রীনাথ (গিরিশ বসু রোড, কলিকাতা)—এভাবে ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া আমাদের কাজ নয়। আর এক সঙ্গে একটির বেশী কূপন পাঠানো নিয়ম নয়। ● শ্রীভরত নাগ (বহুবাজার স্ট্রীট, কলিঃ) —(১) চেষ্টা করুন, (২) অধ্যাপনা হতে পারে; (৩) রাহু ক্ষতিকর, (৪) তুলা লগ্নের শনি, বুধ ও শুক্রের শুভাশুভের উপর সব নির্ভর করে। একটির বেশী কূপন পাঠানো নিয়ম নয়। ● শ্রীমতী যূথিকা দাশগুপ্ত (বনমালী নস্কর রোড, বেহালা)

—(১) বর্ষকাল মধ্যে না হলে, বত্রিশের পর, (২) রক্তমুখী প্রবাল আটরতি। সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীমতী হরিদাসী (নিউদিল্লী)—(১) উন্নতির সম্ভাবনা। (২) পরিবর্তন হবে। ● শ্রীমতী অমলা বোস (বারিপদা)—(১) মুক্তা চাররতি ও রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ধারণ করা চলে, (২) অশুভগ্রহের জন্যই প্রতিকার। ভয় নেই। বৃহস্পতি শুভ। (৩) ভাইয়ের বিবাহ এক বর্ষ মধ্যে হতে পারে, (৪) ভাইয়ের কুম্ভ রাশি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ও ধনু লগ্ন। ● শ্রীরমেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (গড়িয়া)—(১) উক্ত সালে বাংলা তেরশো পনেরো সাল, দোসরা মাঘ এবং রাশি তুলা, (২) লটারী প্রাপ্তি নেই। ● শ্রীসুখেন্দু চ্যাটার্জী (গড়িয়া)—(১) শ্বেত বেড়েলার মূল ধারণ করে দেখুন। (২) গ্রহ সমাবেশ বলা এরূপ প্রশ্নোত্তরে সম্ভব নয়। ● শ্রীআনোয়ার হক (ধুবড়ী)—(১) বৃশ্চিক রাশি ও সিংহ লগ্ন, (২) লটারীতে প্রাপ্তি এখন নেই, (৩) পরিবর্তন হবে, (৪) কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াই রতি ও গোমেদ আটরতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● কুমারী মিনতি ঘোষ (জামির লেন, কলিকাতা)—(১) বর্তমান দেড় বছরের কার্যকারণের উপর নির্ভর করছে, (২) আশঙ্কা নেই। ● শ্রীপ্রদীপকুমার দেমজুমদার (দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা)—(১) মনের জোর রাখুন; (২) উভয় মতের প্রতিকারস্বরূপ রক্তমুখী প্রবাল আটরতি রূপার আংটিতে এবং তার সঙ্গে শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা কবচ ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীঅসিতকুমার সাহা (বারুইপাড়া লেন, কলি)—(১) এখনো দেড় বছর কিছু কিছু অশান্তি থাকবে, (২) চলনসই হবে। ● শ্রীঅশোককুমার দাশ (বেলগাছিয়া, হাওড়া)—কিছু উৎপাত থাকবে; বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান। (২) আট বছর পর মোটামুটি ভাল। ● শ্রীবিতুকুমার রায় (উত্তর ঘোষপাড়া, বালি)—(১) সম্ভাবনা, (২) রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ধারণ করতে পারেন।

● শ্রীতপনকুমার দত্ত (আড়ুডি লেন, শ্রীরামপুর)—(১) এ রকম কোনো রত্ন নেই; চার পাঁচ রতি মুক্তা এবং কমপক্ষে আড়াই রতি লাল চুণী ধারণ করা উচিত; (২) চিকিৎসা বিজ্ঞান কিংবা ঔষধের ব্যবসায়। কিন্তু কোনো ব্যবসায়েই আশানুরূপ হবে না। ● কুমারী সুমিতা দত্ত (আড়ুডি লেন, শ্রীরামপুর)—(১) মকর রাশি ও কর্কট লগ্ন, (২) আটরতি রক্তমুখী প্রবাল ও চাররতি পান্না ধারণ করিয়ে দেখতে পারেন। ● শ্রীদেবাশীষ দত্ত (আড়ডি লেন, শ্রীরামপুর)—(১) কৃষ্ণাভ ক্যাটস আই আড়াইরতি ও রক্তমুখী প্রবাল আটরতি; (২) অধ্যাপনা কিম্বা অ্যাকাউন্টেন্সী। ● শ্রীরবীন্দ্রকুমার দত্ত (রায় স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) মার্চের মধ্যে না মিটিলে আরো দেড় বছর, (২) ইংরেজী নূতন বছরে পরিবর্তন হতে পারে। ● শ্রীমনোমোহন ঘোষ (বঙ্কুবিহারী ঘোষ লেন, বেলুড়)—(১) পরিবর্তন হবে, (২) দশ বছর লাগবে। ● শ্রীসুশান্ত রায়চৌধুরী (মানকুণ্ড গড়ের ধার)—(১) উন্নতি হবে, (২) মাঝামাঝি ধরণের। ● শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য (বেলিয়াতোড়)—(১) পনেরো মাসের মধ্যে হতে পারে, (২) হীরক ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীরঞ্জিত মুখার্জী (ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি)—(১) দু বছর ধৈর্য ধরে দেখুন, (২) দু' বছর পর ধীরে ধীরে ভাল হবে। ● শ্রীমতী উমা মুখার্জী (ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) বর্তমানের চাইতে ভাল, (২) হবে। ● শ্রীমানিক ব্যানার্জী (বৈদ্যবাটি)—(১) আগামী মার্চের পর, (২) প্রতিকার জন্য রক্তমুখী প্রবাল নয় রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● কুমারী অশোকা মণ্ডল (লালবাগ)—দেড় বছর দেখুন, এরই মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীশ্যামলকুমার বাগচী (কলিকাতা-৩৫) (১) মকর লগ্ন ও সিংহ রাশি। (২) মোটামুটি আছে। ● শ্রীতনু চৌধুরী (যাদবপুর)—(১)

নয় মাস দেখুন, (২) চলনসই হবে। ● শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী (যাদবপুর)—(১) দেড় বছরের কার্যকারণের উপর নির্ভর করছে; (২) যেখানেই হোক সুখী হবে। ● শ্রীশৈলেন শীল (মাতৃনিবাস, ফিডার রোড, আড়িয়াদহ)—(১) চাকুরী হতে পারে, (২) লটারীর যোগ নেই। ● শ্রীবনফুল (মুখার্জী পাড়া লেন, সালকিয়া)—(১) দেরী হবে, (২) দেড় বছরের কার্যকারণ দেখুন। ● শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায় (নিউ আলিপুর)—(১) একবর্ষ মধ্যে না হলে বত্রিশে, (২) মোটামুটি ভাল হবে। ● শ্রীশ্যামসুন্দর রায় (শিবাজী রোড, দুর্গাপুর)—(১) মেষ রাশি, (২) চাররতি মুক্তা ধারণ করতে পারেন। ● শ্রী এস, বি (কালিঘাট)—(১) হবে না, (২) হতে পারে। ● শ্রীদিলীপকুমার সরকার (চণ্ডীদাস এভিনিউ, দুর্গাপুর)—(১) দেড় বছর দেখুন, (২) ফেব্রুয়ারীর মধ্যে না হলে এখন হবে না। ● শ্রীমতী লালিমা রায়চৌধুরী (লিটন স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) মুক্তা ধারণ করা চলে,

(২) রক্তমুখী প্রবাল আটরতি। ● শ্রীসমীররঞ্জন মাইতি (মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কাল)—(১) বত্রিশের পর, (২) কনক ক্ষেত্র বৈদূর্য কমপক্ষে আড়াইরতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীকালাচাঁদ মুখার্জী (সোমড়া)—(১) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে চলুন, (২) প্রতিকার জন্য পীত পোখরাজ ছয়রতি এবং সূর্য কবচ ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রী এস পি ডি (লক্ষ্মীগঞ্জ)—(১) আগামী জুনের পর লক্ষণীয়। (২) তিন বর্ষ মধ্যে। ●শ্রীসবুজ গাড়ী (রায়পাড়া)—(১) চন্দ্রের ক্ষেত্রে, (২) সম্ভাবনা। ●শ্রীকানাই পাঠক (বেণু-গোপাল কুঞ্জ, দমদম)—একসঙ্গে দুটি কুপন পাঠানো আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। (১) বৃষ লগ্ন ও সিংহ রাশি, (২) দেড় বছর ধৈর্য ধরতে হবে, (৩) এ সময়ে অন্য কোনো কিছু না করাই ভাল, (৪) আয়ু বলা হয় না। ● শ্রীসত্যজিৎ (কলিকাতা—২)—(১) ঝঞ্ঝাট থাকবে; (২) সমস্ত থাকা কঠিন। ●শ্রীমতী রাণী (কলিকাতা-২)—(১) আগামী এগারো মাসের কার্যকারণের উপর নির্ভর করছে, (২) আগামী শ্রাবণ থেকে কিছু ভাল। ● শ্রীবিশ্বজিৎ (কলি-২)—(১) হবে, (২) বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়। ● শ্রীপ্রকাশ-কুমার গুণ (টিপুক চা-বাগান, আসাম)—(১) সম্ভাবনা, (২) হবে। ●শ্রীসুকুমার ব্যানার্জী (দুর্গাপুর)—(১) ধনু রাশি, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র, (২) উন্নতি হবে। ●শ্রীমাধব ব্যানার্জী (দেশবন্ধু রোড, আলমবাজার)—(১) বত্রিশ বর্ষ বয়সের পর, (২) ভদ্রভাবে চলার মত। ●শ্রীশ্যা-ম-রি (চিরিমিরি)—(১) চাকুরীর যোগ, (২) তিন বছর দেখুন। ● কুমারী কুহু দত্ত (পশ্চিম ঘোষ পাড়া রোড, ভাটপাড়া)—(১) নিজের প্রস্তুতির উপর নির্ভর করছে; (২) মনোমতই হবে। ●শ্রীঅসিতকুমার ব্যানার্জী (বাক্ সাড়া)—(১) আগামী জুনের মধ্যে না হলে স্থির হওয়া কঠিন, (২) হতে পারে। ●শ্রী এ সামন্ত (তমলুক)— তথ্য অনুযায়ী রাশি ও লগ্ন ঠিক, (২) প্রতি-কার করলেও সব অশান্তি দূর হয় না; ধৈর্য ধরে তিন বছর দেখুন। ●শ্রীমতী অনামী (কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী লেন, কদমতলা)—(১) পৌষের পর অনেকাংশে, (২) আশঙ্কা নেই। ●শ্রীননীগোপাল ঘোষ রায় (ইস্ট রোড, যাদবপুর)—আড়াই থেকে সাড়ে তিন রতির মধ্যে কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই সোনার আংটিতে, আটরতি গোমেদ রূপার আংটিতে এবং নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণীয়, (২) তিন বছর বিশেষ সুবিধা হবে না। ●শ্রীসুধাকৃষ্ণ কুইলা (মঙ্গলধারী, মেদিনীপুর)—(১) প্রতি-কার করলেই যে ফল হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই; কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াই থেকে সাড়ে তিন রতির মধ্যে সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) চার বছর পর। ●শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জী (পরাশর রোড, কলিকাতা)—কুপন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হয় না। প্রতিকারের জন্য বিশ্বাসী ও বিশেষজ্ঞ জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করুন। ●শ্রীরঘুনাথ ব্যানার্জী (নিউ টালিগঞ্জ)—(১) পাঁচ বছর বিশেষ সুবিধার নয়, (২) মানসিক উন্নতির জন্য ধৈর্য ধরা দরকার। ● শ্রীরবি (কারাণ্ডা)—আগামী জুনের পর সুবিধা হবে, (২) এরূপ সম্ভাবনা দেখি না। ●শ্রী বিভূতিভূষণ ঝা (ঝরিয়া)—এবার মার্চ থেকে জুনের মধ্যে (২)কনক ক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াই রতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয় রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী মণিকা ঝা ঝরিয়া)—(১) তিন বছর পর, (২) আট-রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীরাজেশকুমার চক্রবর্তী (অরবিন্দ নগর, কলিকাতা)—(১) তিন বছর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটবে। এর মধ্যে কিছু ভালও হতে পারে, (২) আড়াই রতি কৃষ্ণাভ ক্যাটস আই ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী (আসানসোল)—(১) প্রদত্ত জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী এখনো ছয় বছর খুব ভাল বলা চলে না, (২) বিবাহের ব্যাপারে বলা চলে এখন থেকে বর্ষকাল মধ্যে না হলে অত্যন্ত দেরী ও নানা বাধা আসবে। অষ্টমস্থ শনি, মঙ্গল ও কেতু এবং দ্বিতীয়স্থ রাহু অত্যন্ত কুফলপ্রদ। ● শ্রীরজত (ছোট পাড়া, রায়পুর)—ব্যক্তিগতভাবে চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না, (১) ব্যব-সায় (২) দেড় বর্ষ মধ্যে হতে পারে। ●শ্রীমতী শ্রদ্ধাপূর্ণা দেবী (আসানসোল)—(১) প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে এই বিনিময় অশান্তিকর, (২) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে এর ফল শুভ-কর। ● শ্রীভোলানাথ ব্যানার্জী (দেশবন্ধু রোড, আলমবাজার)—(১) সাত থেকে সুরু হতে পারে, (২) চাকুরী হবে। ●শ্রীপ্রদীপকুমার মিত্র (ইন্দা)—কন্যা রাশি ও সিংহ লগ্ন, (২) চব্বিশ থেকে। ●শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (হাসিপুর)—(১) একচল্লিশ বর্ষ বয়স থেকে ধীরে ধীরে ভাল, (২) ভদ্রভাবে চলার মত, ছয়রতি পান্না ধারণ করতে পারেন। ● শ্রীরঞ্জিতকুমার দাস (উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেন, সালকিয়া)—(১) ব্যবসায়, (২) কর্কট রাশি। রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীমনোজ মৈত্র (যতীন দাস রোড, কলিকাতা)—(১) এখন স্থায়ী কোনো কিছু হবে না, (২) পাঁচ বছর দেখুন। প্রতিকার জন্য পাঁচরতি মুক্তা ও নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীসুভাষরঞ্জন দাশ (ঘোট সুটার নর্থ মিল, হাওড়া)—(১) হস্তা নক্ষত্র, কন্যারাশি ও মেষ লগ্ন, (২) আটরতি গোমেদ ধারণ করে দেখুন। ●শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্ত (গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি:)—(১) মিথুন রাশি, দেবগণ ও মকর লগ্ন, (২) আগামী বছর কিছু ভাল হবে। ●শ্রীদীপঙ্কর মুখার্জী (বিদ্যাসাগর এভিনিউ, দুর্গাপুর)—(১) উন্নতি হবে কিন্তু তিন বছর বিশেষ সাবধান, (২) আগামী তিন বছর পর মোটামুটি ভাল।

● শ্রীঅনিলকুমার ব্যানার্জী, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলি—৭—

আপনার রোগের কথা আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী, এই ঠিকানায় লিখলেই যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।

● শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁটিয়াকোল, বাঁকুড়া—

আপনি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহেলা করবেন না। যে চিকিৎসকের চিকিৎসায় আছেন, তাঁরই চিকিৎসায় থাকবেন এবং তাঁর উপদেশমত চলবেন।

শ্রীশ্যামাপদ সরকার, চন্দ্রমণ্ডল লেন, কলি—২৬—

হাইড্রোসিল রোগের অপারেশন ছাড়া নিরাময় হবার চিকিৎসা আমার জানা নেই।

● শ্রীঅরুণ রায়, হাওড়া—

পোকায় খাওয়া দাঁত তুলে ফেলাই ভাল, তা না হলে পাশের দাঁত এবং মাড়ি নষ্ট করে দেয়।

● নাম ও পুরো ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, নৈহাটি—

প্রশ্নকর্তার নাম গোপন করলে, অনেকসময়ে যিনি প্রশ্ন করেছেন, তিনি বুঝতে পারেন না। সেইজন্যে যিনি অনুরোধ করেন, তাঁর নাম ছাড়া অন্য সকলের নাম দেওয়া হয়। প্রশ্ন গোপন করার প্রধান কারণ, নিছক ব্যক্তিগত প্রশ্ন সকলের প্রয়োজনে না লাগতেও পারে, দ্বিতীয় কারণ, প্রশ্ন ছাপলে হয়ত প্রশ্নকর্তা লজ্জায় পড়তে পারেন।

আপনি Whitfield Ointment দিনে দুবার করে দাদে লাগাবেন একমাস।

প্রশ্ন ২ : আমার বয়স ১৭। উচ্চতা ৫' ৬''। কি করলে আরও লম্বা হতে পারি ?

উত্তর : লম্বা হবার কোন ওষুধ আমার জানা নেই। শুনেছি স্কিপিং করলে লম্বা হয়। চেষ্টা করতে পারেন।

* শ্রীমান বীণা (ছদ্মনাম), কলিকাতা—

খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা ও ব্যায়াম করলে ওই অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

● শ্রী বি পোদ্দার, গান্ধীনগর, কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন ১ : আমার দাদার বয়স ৩০ বছর। বারো মাসই সর্দি থাকে।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

উত্তর : ভিটামিন এ ডি ও ক্যালসিয়ম মিশ্রিতভাবে অথবা আলাদাভাবে সমস্ত শীতকাল খেতে দেবেন।

দাদ সাধারণত নোংরার জন্য হয়। রোজ পরিষ্কার জাঙিয়া, আণ্ডারউইয়ার পরবেন। পরিষ্কার থাকলে দাদ আর হয় না। এদিকে যে ওষুধ লাগাচ্ছেন, লাগিয়ে যাবেন।

● শ্রীঅরুণ রায়, কলিকাতা—

একেবারে বন্ধ হয় না। সপ্তাহে একদিন। ক্ষতি হয়। শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা।

শ্রীমণাল সেন, ভদ্রেশ্বর, হুগলী—

কোন ভয় নেই। এতদিনে নিশ্চয়ই প্রকাশ পেত, তবে আপনি একবার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন না, ল্যাঠা চুকে যাবে।

● শ্রী এন কর্মকার, কলি—১২—

আপাতদৃষ্টিতে দুটি প্রশ্নের কোনটাই অসুখ বলে মনে হচ্ছে না। আপনি অনর্থক বিচলিত হচ্ছেন।

● শ্রীসোমনাথ মিত্র, জামসেদপুর-

কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অম্লাধিক্য থাকলে দাঁতে হলদে ছোপ লাগে। শুধু দাঁত পরিষ্কার করলে যাবে না তার সঙ্গে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখতে হবে।

আপনার আত্মীয়ের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে মতামত নিন।

● শ্রীশান্তিময় দাশ, গোলাপপট্টি, মালদহ-

আপনি দু'বেলা খাবার পর Sioplex Enzyme অথবা Takacombex অথবা Diapepsin চা চামচের ২ চামচ করে খাবার পর একমাস খাবেন।

● শ্রীদেবব্রত হাজরা, বর্ধমান, কালনা রোড—

আপনি টিপে অন্যায় করেছেন। কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মতামত নিন।

● সাবনি বসু ও বিদ্যুৎ মিত্র, টাকী, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন ১ : গোড়ালি ফাটে। শীতকালে বাড়ে।

উত্তর : আপনি পায়ে গ্লিসারিন মাখবেন এবং দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে প্যালাডেক্ খাবেন পুরো শীতকাল। এতে কোঁচকানো চামড়াও ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ২ : আমি ছোটবেলায় খুব ফর্সা ছিলাম, কিন্তু বর্তমানে কালো হয়ে যাচ্ছি।

উত্তর : আমার মনে হয় যকৃতের দুর্বলতার জন্যে আপনার রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে। আপনি যকৃতের চিকিৎসা করান, উন্নতি হবে।

● এ। কে জি, এলগিন রোড, কলিকাতা—

এর আগে আর কোন চিঠি পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। আমাদের বিভাগে জমা থাকে না। প্রতি মাসের উত্তর সেই মাসেই দিয়ে দেওয়া হয়।

আপনার পত্র পড়েছি। অনায়াসে বিয়ে করতে পারেন। যে ব্যাপার নিয়ে ভাবছেন, তা কোন রোগ নয় এবং অধিকাংশ পুরুষের অনুরূপ উপসর্গ ঘটে।

● শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর—

হাঁপানি রোগের কোন ভাল ওষুধ এ্যালোপ্যাথিক প্রথায় আছে বলে মনে হয় না। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগাবেন না। একটু ফাঁকা হাওয়ায় বেড়াবেন, এ ছাড়া সহজপাচ্য পথ্য খাবেন।

● শ্রীকানাইলাল ঘোষ, ঠাকুরদাস ঘোষ স্ট্রীট, বেলুড়—

প্রশ্ন: আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর যাবৎ আমার গলায় ভীষণ কফ জমে।

উত্তর: আপনি পুরো শীতকাল ধরে পাল্‌মোকড্‌ প্লেন ব্যবহার করবে। দু'বেলা ভাত খাবার পর, চা চামচের দু চামচ করে খাবেন; আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না।

● শ্রীমনোজকুমার মৈত্র, আনন্দমোহন বোস রোড, দমদম—

প্রশ্ন ১: আমার অত্যধিক ঢেঁকুর উঠে।

উত্তর: রোজ বেশি করে জলপান করবেন। জল খাবার পর কয়েকটা ঢেঁকুর উঠে যাবে।

২য় নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই কোন খারাপ নয়। (প্রশ্নটি না ছাপাতে অনুরোধ করেছেন)।

প্রশ্ন ৩: আমার পেটের বাঁদিকে নাভির পাশ বরাবর এক ধরণের ব্যথা হয়। বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে বা হাঁটিলে ব্যথাটা বাড়ে, আবার বেশ খানিকক্ষণ চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে আরাম পাই।

উত্তর: আমার মনে হয়, আপনার হানিয়া হচ্ছে আর নইলে কিডনীর যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। আপনি চিকিৎসক দেখিয়ে, তাঁর মতামত নিন।

● শ্রীকুমার তরুণ বোস, প্রভু রামশঙ্কর লেন, ট্যাংরা—

আপনি অ্যামিক্লিন বড়ি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাত্তে ১টি করে দশ দিন খাবেন। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন স্থানীয় চিকিৎসককে দিয়ে নেবেন একমাস।

● শ্রীবিমলচন্দ্র দাস, শিবনগর, আগরতলা,—

আপনি সিরাপ সায়োমেথিয়েনিন ফোর্ট চা চামচের ২ চামচ করে, দুবেলা ভাত খাবার পর দু'মাস ধরে খাবেন। আমার মনে হয়, সমস্ত উপসর্গ কমে যাবে।

● শ্রীকল্যাণকুমার চ্যাটার্জী, বড়-দুয়ারি, হুগলী—

আপনি ডেভোকুইন বড়ি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি দশদিন খাবেন।

● শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মথুরাপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। কিন্তু চিঠি পড়ে কোন মতামত দিতে সাহস হচ্ছে না। সঠিকভাবে পরীক্ষা না করে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে তার মত গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই মোটেই ভাল নয়। আশু চিকিৎসার প্রয়োজন।

● শ্রীঅমল সরকার, তপন রোড, কলকাতা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে আপনি পুরনো আমাশয়ে ভুগছেন। আপনি Davoquin বা Amicline বড়ি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি এবং রাতে ১টি করে দশদিন খাবেন এবং কিম্‌ সিরাপ দু'বেলা ভাতখাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে একমাস খাবেন।

● শ্রীকনককুমার মুখার্জী, উত্তর-পাড়া, হুগলী—

আপনার হানিয়া কি হাইড্রোসিল হয়েছে, তা জেনে নেবার জন্যে, কোন ভাল চিকিৎসকের মতামত নিন। তারপর চিকিৎসা করাবেন। কি হয়েছে না জানা পর্যন্ত ব্যায়াম করবেন না।

● শ্রীআদ্যনাথ অধিকারী, খুজুটি-পাড়া, বীরভূম—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পাঠ করলাম। মাথায় চোট লাগার পর, এতদিন ধরে যন্ত্রণা হচ্ছে, আপনি কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ নিন। কোন কঠিন মাথার কাজ করবেন না, কারণ মাথার শিরাতে জোর লাগলে যন্ত্রণার উদ্রেক হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য কোন ভাবনা নেই। মনে হয়, পুরনো আমাশয়ের জন্য অনুরূপ ব্যথা হচ্ছে।

● শ্রীঅভিজিৎ সেন, শিলং, আসাম—

আপনার কোন ভয় নেই। আপনি অযথা ভাবছেন। ও উপসর্গ প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেরে যায়।

● শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রাহা, মহানন্দ পাড়া, গোবরাপুর, ২৪ পরগণা—

আপান দীর্ঘদিন ধরে পেটের গোলমালে ভুগছেন বলে অনুরূপ কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার কোন ভয় নেই। আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি ডেভোকুইন বড়ি ১৫ দিন খাবেন আর দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে অ্যামাইনোজাইম্‌ খাবেন।

● নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলি—২৬—

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে পাল্‌মোকড্‌ (প্লেন) পুরো শীতকাল খাবেন।

● শ্রীমতী পু চ, পাটনা—

আপনি পুরো শীতকাল হ্যালিবুঅরেঞ্জ চা চামচের ২ চামচ করে দু'বেলা ভাত খাবার পর খাবেন।

● শ্রীমতী শিপ্রা মিত্র, (ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক), কলকাতা—

আপনি তিনমাস দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে ফেরোচিলেট সিরাপ খাবেন। একই সঙ্গে ডোলোরিনা কর্ডিয়াল্‌ ২ চামচ করে দু'বার খাবেন।

● শ্রীমতী স্বপ্না চন্দ, মেদিনীপুর—

আপনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স চা চামচের ২ চামচ করে দিনে দু'বার খাবেন তিনমাস ধরে।

শ্রী কে কে মুখার্জী, শ্রীরাম বিদ্যাপীঠ, বদিরাল, ২৪ পরগণা—

আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা কোন অসুখ নয়। ও নিয়ে ভাববেন না।

●শ্রীদেবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া—

আপনি বেরিন বড়ি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি করে ২ মাস ধরে খাবেন। তাতেও যদি না কমে, তাহলে ট্রাই-মেডিসল্ এইচ ইনজেকশন একদিন অন্তর একটি করে ইণ্ট্রামাসকুলারলি নেবেন।

●শ্রীশচীনকুমার দাস, সাঁখারিপাড়া, বাঁকুড়া—

প্লাস্টিক সার্জারি কলকাতার এস এস কে এম হসপিট্যালে করা হয়, তবে যে জন্যে লিখেছেন তার প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন ২: আমার মুখে অত্যন্ত ব্রণ হইতেছে।

উত্তর: মিষ্টি, চর্বি কম খাবেন, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন।

●শ্রীঅপূর্বকুমার কোনার, স্টেশন রোড, কাটোয়া—

প্রশ্ন ১: প্রায় এক বৎসর থেকে মুখে ও কপালে ব্রণ হচ্ছে—

উত্তর: মিষ্টি কম খাবেন। চর্বি ও বাদামজাত খাদ্য পরিহার করবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন এবং প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে একটু বেশি করে শাক খাবেন।

প্রশ্ন ২: আমার চোখ ভীষণ খারাপ—

উত্তর: ভিটামিন এ প্রচুর পরিমাণে খাবেন।

●শ্রীমতী মনু বসু, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলি-৬—

প্রশ্ন ১: চার বছর ধরে মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

উত্তর: চশমা সবসময়ে পরতে হবে, তা ছাড়া বেশি করে ভিটামিন এ ডি ও ই খেতে হবে।

প্রশ্ন ২: টি বি কেন হয়?

উত্তর: মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলাই নামে এক প্রকারের জীবাণু দেহে আক্রমণ করে। এই রোগ সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে হয়।

১। কোন টি-বি রোগীর সংস্পর্শে এলে।

২। কোন টি-বি রোগীর উচ্ছিষ্ট খেলে।

৩। কোন টি-বি রোগীর জামা-কাপড় বা বিছানা ব্যবহার করলে।

৪। টি-বি রোগী যেখানে সেখানে থুথু ফেললে সেই থুথু শুকিয়ে যায়। কিন্তু জীবাণু বাতাসে উড়ে বেড়ায়। তখন কোন লোক সেইখানে নিঃশ্বাস গ্রহণ করলে রোগাক্রান্ত হয়।

৫। রোগগ্রস্ত গরুর দুধ না ফুটিয়ে খেলে।

প্রশ্ন ৩: মাথায় মরামাস কেন হয়?

উত্তর: দুর্বলতার জন্য এবং কীটাণু আক্রমণে।

●শ্রীভট্টাচার্য, কোহিমা, নাগাল্যাণ্ড—

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে টাকাকমবেল্প খাবেন তিনমাস। পরে যে কথা বলেছেন তার জন্য ভাবনার কিছু নেই।

●শ্রীমতী নীলিমা দেবী, কলিকাতা—

আপনি ডাইনিস্টেরল ক্রীম লাগাবেন এবং সিরাপ সায়োমেথিয়োনিন ফোর্ট চা চামচের ২ চামচ করে ভাত খাবার পর দুবার খাবেন, তিনমাস ধরে।

●শ্রীমতী সীতা পাল, ষষ্ঠীতলা—

আপনি সায়োপ্লেক্স লাইসিন (অ্যালবার্ট ডেভিড) চা চামচের ২ চামচ করে দুবার খাবেন তিন থেকে চারমাস।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সংগে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

আরোগ্য বিভাগ

নাম— ....

ঠিকানা— ....

—মাসিক বসুমতী

● শ্রীনীলকমল মণ্ডল, মাঝেরগ্রাম, গাঙ্গসার, নদীয়া—

আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি প্রোব্যাগ্নাইন বড়ি পনেরো দিন খাবেন।

● শ্রীনিকুঞ্জচন্দ্র দাস, কানাইপুর, হুগলী—

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে কলিবিল এস খাবেন একমাস ধরে।

● শ্রীঅনন্তকুমার দাশ, হাওড়া—

আপনি রোজ রাতে শোবার সময় ২ চামচ করে কুইনোবেল খাবেন। দুমাস ধরে।

● শ্রীমজীবর রহমান, প্রতাপপুর, হুগলী—

আপনি দু'মাস ধরে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স খাবেন।

● শ্রীমতী নন্দা রায়চৌধুরী, আনকুণ্ডু, চন্দননগর, হুগলী—

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু'চামচ করে সায়োপেক্স এনজাইম তিনমাস খাবেন। ঐ কন্যাকে অ্যাবডেক ড্রপ্‌স্ খাওয়াবেন।

● শ্রীবিকাশ দাশ, হাসনাবাদ, ২৪ পরগণা—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে অ্যামাইনোজাইম খাবেন দুমাস ধরে।

● পদ্মাবতী, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলি—১২—

আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি নেব্রোভিটামিন (বয়স্কদের জন্য) বড়ি একমাস খাবেন।

● শ্রীনন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর, বর্ধমান—

আপনি যে দুটি বিষয়ে বলেছেন, তার কোনটাই অসুস্থতার লক্ষণ নয়।

● শ্রীমতী বাসবী বসু, সীমা নন্দী, কৃষ্ণা বসু, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা—

আপনারা প্রশ্ন ছাপার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু অনেক সময়ে প্রশ্ন দিতে প্রশ্নকর্তা বা কর্ত্রী নিষেধ করেন, তা ছাড়া অনেকসময় প্রয়োজন হয় না। আপনাদের অনুরোধ মনে রাখব এবং এর পরে যথাসাধ্য প্রশ্ন দিতে চেষ্টা করব।

● শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক, ক্যানিং স্ট্রীট—

আপনি নাক কান গলার কোন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে তাঁর মতামত নিন।

● শ্রীনিমাই রায়, সি পি সি বি বুক, কলি—২৭—

আপনার কোন রোগ নয়। কোন ভয় নেই।

● শ্রীনবজিৎ মুখার্জী, জলপাইগুড়ি—

আপনি হাইজিনা গ্রানুল দিয়ে দুবেলা গার্গল করবেন দুমাস ধরে। ঠাণ্ডা লাগাবেন না। খুব জোরে বা খুব আস্তে কথা বলবেন না।

● শ্রীমতী লতা নন্দন, রামধন মিত্র লেন—

আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে হেপাটোগ্লোবিন খাবেন দুমাস ধরে।

● মাস্টারমশায়, খড়গপুর, মেদিনীপুর—

আপনি এবং আপনার স্ত্রী উভয়েই ডাক্তার দেখান। এ নিয়ে অবহেলা করবেন না।

● শ্রীভারতী দেব, নর্দান অ্যাভেন্যু, কলি—৩৭—

হাঁপানির ভাল ওষুধ নেই। অযথা ঠাণ্ডা লাগাবেন না। বেশি কঠিন পরিশ্রম করবেন না। সহজপাচ্য খাবার খাবেন। বেশি ধুলো বা ধোঁয়ায় ঘুরবেন না।

ব্যক্তিগত চিঠির উত্তর

● শ্রীমোহন চ্যাটার্জী, খোসবাগান, বর্ধমান, ● শ্রীভোলানাথ ব্যানার্জী, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলি-৭, ● শ্রীতপনকুমার দত্ত, উত্তর ঘোষপাড়া, নদীয়া, ● শ্রী এস মিত্র, দুর্গাপুর, বর্ধমান, ● শ্রীগৌরীকুমার ঘোষাল, মহুলা, বীরভূম, ● শ্রীগোপেশ্বর মজুমদার, উকীলপাড়া, বারুইপুর, ২৪ পরগণা, ● শ্রীকল্যাণকুমার চ্যাটার্জী, বড়দুয়ারী, হুগলী, ● শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস-কৈবর্ত, উলাড়া, রসুলপুর, বর্ধমান, ● শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ) কলি-২৫, ● শ্রী এ কে চ্যাটার্জী, বিরাটি, ● শ্রীমতী চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়, রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, কলি-৪৩, ● শ্রীস্বদেশকুমার মিত্র, মালদা, ● শ্রীপ্রদীপকুমার মজুমদার, দুর্গাপিতুরী লেন, কলি-১২, ● শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা, হরিমোহন দত্ত রোড, কলি-২৮, ● শ্রীমতী মায়া দেবী, বহরমপুর।

'Our Youth today love luxury, they have bad manners, contempt for authority, disrespect for older people, they contradict their parents, gobble their food and tyrannize their teachers.'

—Socrates (470-399 B.C.)

খেলাধূলা

ক্রীড়ারসিক

১৯৬৮ সালের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়

অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার পুরুষ বিভাগে ও আমেরিকার বিলি জিন কিং মহিলা বিভাগে বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকায় ১৯৬৮ সালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। ৬টি দেশের টেনিস খেলায় ১৫ জন জাঁদরেল লেখকের ভোট নিয়ে এই ফলাফল বার হয়েছে। নির্বাচিত সকল খেলোয়াড়কেই সিগ্রাম ওয়ার্লড র‍্যাঙ্কিং ট্রফির দ্বারা পুরস্কৃত

এক টেনিসমন

করা হবে। টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইন্যাল খেলায় রড লেভার মনে হয় একটি বিষয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেছিলেন। তা হচ্ছে উইম্বলডেনের ফাইন্যালে তিনি মাত্র ৫৫ মিঃ তাঁর প্রতিপক্ষ ম্যাকিনলেকে পরাজিত করেছিলেন। আর '৬২ সালে বিশ্বের চারটি প্রধান টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে রড লেভার গ্রাণ্ড স্ল্যাম খেতাব অর্জন করেছিলেন।

বিলি জিন কিংস-এর কুমারী জীবনের নাম বিলি জিন মোফিট। ধনীর দেশের মেয়ে বটে। তিনি কিন্তু বাবা ছিলেন সাধারণ একজন ফায়ারম্যান। তাই একসঙ্গে র‍্যাকেট কেনবার পয়সা জোগাড় করতে না পেরে প্রতিদিন কিছু কিছু করে কাঁচের জারে জমাতে সুরু করলেন। যখন এমনি করে আট ডলার জমল তখন কিনলেন খুবই সাধারণ নাইলনের একখানি র‍্যাকেট। পার্কে পার্কে ঘুরে খেলা সুরু করেছিলেন। তারপর ছোট ছোট প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন উইম্বলডন প্রতিযোগিতায়। তখন তার বয়স মাত্র ১৬ বছর। পরের বছর '৬২ সালে এক মহা বিস্ময় সৃষ্টি করলেন তিনি। এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মার্গারেট স্মিথকে প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই তিনি হারিয়ে দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করলেন। এরপর হতেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। '৬৪ সালে তিনি আইন কলেজের ছাত্র ন্যারি কিংকে বিবাহ করে হলেন বিলি জিন কিং—টেনিস ব্যাট কেনার একদিন যাঁর কোন সামর্থ্য ছিল না আজকের সেই মেয়েটিই বিপুল অর্থের অধিকারিণী। 'কিং আজ তাই কুইন।'

অস্ট্রেলিয়া সফরে স্কুল ক্রিকেট দল

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলে যে ১৬ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তার মধ্যে পাঁচজন ইতিমধ্যে '৬৭ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিলেন। এঁরা হচ্ছেন, রাজা মুখার্জী, লক্ষ্মণ সিং, মহীন্দর অমরনাথ, দীপঙ্কর সরকার এবং রামেশ ট্যাণ্ডন। এঁদের প্রত্যেকেই স্বয় ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ছেলে, নয় ভাই। যেমন লালা অমরনাথের ছেলে মহীন্দর, বুধি কুন্দরণের ভাই ভারত কুন্দরণ, চাঁদ বোরদের ভাই রমেশ বোরদে এবং রবি ব্যানার্জী পিতা সুধাংশু ব্যানার্জী। এঁদের গড়পড়তা বয়স ১৭। প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় হেমু ব্যানার্জী দলের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনজন বাংলার, দুজন মহীশূর, ২ জন বোম্বাই, ২ জন রাজস্থান এবং একজন করে নেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, পাঞ্জাব,

রাজা মুখার্জী

সৌরাষ্ট্র ও বরোদা থেকে। তার মধ্যে বাংলার রাজা মুখার্জী, দীপঙ্কর সরকার ও রবি ব্যানার্জী যথাক্রমে জগবন্ধু হাইস্কুল, আজাদগড় বিদ্যাপীঠ ও বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলের ছাত্র। গত বছরে ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল ১৮টি খেলার মধ্যে, ৯টিতে জয়লাভ করে, ৮টি ড্র হয় ও একটি খেলা পরিত্যক্ত হয়। আশা করা যায় ভারতীয় দল এবারেও তাদের পূর্ব সুনাম বজায় রাখবে।

বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফ্রেডী ট্রুম্যান

বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফ্রেডী ট্রুম্যানের অবসর গ্রহণ বিশ্বের ক্রীড়ামোদীদের কাছে এক বিরাট বিস্ময়। খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করেও তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ট্রুম্যান যে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করে গেছেন তা বোধ হয়, বহুদিন অম্লান থাকবে। যুদ্ধোত্তরকালে তিনিই ছিলেন খাঁটি ফাস্ট বোলার। ৩০৭টি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব তাঁর পক্ষেই সম্ভব। মাঠের মধ্যে বিপক্ষ-দলের বিরুদ্ধে বল করার সময় তাঁর সংহারমূর্তি দেখে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানও ভয় পেয়ে যেত সময় সময়। কিন্তু মাঠের বাইরে তিনি ছিলেন অন্য মানুষ। গল্প-করা তাস-খেলাই তখন তাঁর আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ।

এম সি সি'র সফর বাতিল

এত আশা-ভরসা শেষ পর্যন্ত বোধ হয় কেঁচে গেল। বোধ হয় যেন পাকাপাকিই বলা চলে। বিদেশী মুদ্রার অভাব দেখিয়ে ইন্দিরা-সরকার ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতিকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। সেই শুনে কর্তাব্যক্তিরা তো মাথায় হাত দিয়ে পড়েছেন। যা হোক বা একটা ব্যবস্থা হোল তাও গেল। কেউ কেউ তাই ধারণা করে নিয়েছেন, মুদ্রা-সঙ্কটই কি এর একমাত্র কারণ, না অন্য কিছু।

অনেকের তাই অনুমান, আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ করে সদ্যসমাপ্ত মেক্সিকো অলিম্পিকে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর সরকার আর কোন্ মুখে বিদেশের নামকরা একটা টিমকে ভারতে আনবেন।

খানিকটা হৈ-হুল্লোড় কর্তৃপক্ষের আত্মপ্রচার এবং কাজ গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া আর হবেটাই বা কি? তাঁদের মতে সরকারের এবার টনক নড়েছে। কারণ বিদেশী কোন টিমকে আনতে হলে একটা মোটা অঙ্কের গ্যারাণ্টি মানি জমা দিতে হয়, তা ছাড়া টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থেরও কিছু পরিমাণ দেবার সর্ত থাকে। যা এখন কোনমতেই সম্ভব নয়। অথচ ভারত যখন বিদেশে সফর করে তখন গ্যারাণ্টি মানি'র প্রশ্নই ওঠে না। হয় গেট-মানির কথা। যাতে সেই দেশের পেট ভরে আর ভারতের হাতখালি করে আসতে হয়। কারণ বিদেশে ভারতের খেলায় উৎসাহ না থাকায় গেট-সেল কমই হয়ে থাকে। পাকিস্তান তাই এইদিক ভেবেই বিদেশ সফরে যাবার আগে গেট-মানির বদলে গ্যারাণ্টি মানি'র প্রশ্ন তোলে। রাজী না হলে সেই সফর বাতিল করে দেয়।

কিন্তু আমাদের দেশের কর্মকর্তারা সে জায়গায় সম্পূর্ণ নীরব। যাই হোক এখনও পর্যন্ত কেউ হাল ছাড়েন নি। কথাবার্তা চলছে। তাই বলছি কোলকাতার দর্শকরা নিরাশ হবেন না। এখনো আশা আছে।

জগন্নাথ দর্শনে

(গীতি-কাব্য)

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র পাকড়াশী

তব চরণ ধৌত করিছে নিত্য নীল বিপুলে বারিধি।
কভু সে শান্ত কভু প্রমত্ত গগনচুম্বী পরিধি।
নৃত্যপুলকে ধাইছে সতত,
শুভ্র বারিবিন্দু মথিত,
কল্লোল স্বরে করিছে চকিত
দিক্‌দিগন্ত অবধি।
ছুটিছে মত্ত হরষে,
সৈকতভূমি পরশে
শ্বেত ফেনিল সলিল কণায়
উচ্ছল উঠিছে জলধি।
অরুণ কিরণ উদ্ভাসিত দীপ্ত প্রভাত সিন্ধু,
শরৎ রজনী প্রকাশে আকাশে স্নিগ্ধ অমৃত ইন্দু,
বিবিধ বরণে ঊর্মি রচিয়া
মন্দির পানে দিতেছে ঢালিয়া
পাদ্য, অর্ঘ, মাল্য প্রদানে
পূজিছে তোমারে, হে বিধি।
গরজিছে সদা জলদ মন্দ্রে
নাচিয়া নাচিয়া চপল ছন্দে,
গাহিতেছে যেন বন্দনাগীতি
জয় জগদীশ, শ্রীনিধি।

ইন্দ্রাসেন ॥

"বিশ্বাসে নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" ....,

—চাণক্য

শত্রু-নিপাতের পরে মহারাজা প্রতাপাদিত্য সমগ্র যশোহর-রাজ্যের একাধীশ্বর হলেন। পূর্বে মধুমতী, পশ্চিমে ভাগীরথী এবং দক্ষিণে সমুদ্র—এই বিস্তৃত যশোর-রাজ্য প্রতাপের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হল। সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী, অপরিসীম বল ও বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে মহারাজার প্রতাপ-পরাক্রম দিনে দিনে বর্ধিত হতে থাকলো। গৃহশত্রুদের চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে—তাই আর ততটা চিন্তা-ভাবনা নেই।

১৫৫৮ খৃস্টাব্দ।

গোয়ার প্রধান পাদরী নিকোলাস পাইমেণ্টা সারা গৌড়বঙ্গে যীশুর মহৎ ধর্মপ্রচারের জন্য ফ্রান্সিস ফার্নাণ্ডেজ ও ডমিনিক সোসা নামক দু'জন জেসুইট পাদরীকে বাঙলা দেশের উদ্দেশে প্রথম প্রেরণ করলেন। পাইমেণ্টা দুই শিষ্যকে বললেন,—আপনারা গৌড়-অভিমুখে যাত্রা করেন। অবহেলিত আর উৎপীড়িতদের দুয়োরে দুয়োরে যাবেন। যীশুর নাম শুনায়ে তাদের উজ্জীবিত করতে হবে। তাদের আশার আলো দেখাতে হবে। আশা অর্থেই যীশু। আমাদের সেই মহান পিতার আলো দেখাবে তাদের আঁধার-ঘরে—

বুকে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন দুই শিষ্য। শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মাথা নত করলেন তাঁরা। ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—আমেন। জীবন যায় যাক, সবার 'পরে যীশু।

দুই শিষ্যের মস্তক স্পর্শ করলেন পাইমেণ্টা। বললেন,—জানি, তোমরা নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারবে না। পথে বিপদ আসবেই। জলদস্যু ও স্থলদস্যুদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে যদি সক্ষম হও, জানবে তোমাদের 'পরে যীশুর কৃপা অশেষ।

—যীশুই আমাদের ভরসা ফাদার। আর আপনার ব্লেসিং।

১৫৫৮ খৃঃ অব্দের ৩রা মে তারিখে ফার্নাণ্ডেজ ও ডমিনিক কোচিন থেকে সমুদ্র-পথে যাত্রা করলেন। আঠারো দিন পরে তাঁরা ক্ষুদ্রবন্দর বা পিপলীতে উপস্থিত হলেন। পিপলী থেকে আবার তাঁরা যাত্রা করলেন জলপথে। আট দিন পরে গুলো বা হুগলীতে পদার্পণ করলেন। গুলো গঙ্গার মোহানা থেকে একশত পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

হুগলীতে পৌঁছেই তাঁরা ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করলেন। পদযাত্রা উদয়াস্ত। চলেছেন তো চলেছেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক নগর থেকে অন্য নগরে পায়ে চলা পথ ধরে পরিক্রমা করছেন।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—ব্রাদার ডমিনিক, বাঁকা পথে ফল পাওয়া যাবে না। সোজা পথ ধরতে হবে।

ডমিনিক বলেন,—সেই পথটি কী?

ফার্নাণ্ডেজ বলেন,—ওরা আমাদের বিদেশী ভাষা বুঝতে পারছে না। আমাদের বক্তব্য ওদের কানে উঠছে না।

ডমিনিক বললেন,—প্রতিকার কি ব্যক্ত করুন।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—ব্রাদার, তোমাকে বাঙলা ভাষা শিখতে হবে। মেহনতী কাজ। তবুও।

আকাশ ভেঙে পড়লো যেন ডমিনিকের মাথায়। অগ্রপশ্চাৎ ভেবে ঠাওরাতে পারছেন না তিনি। পুরো একটা অজানা দেশ। দুর্বোধ্য ভাষা তাদের। একটু-আধটু সংস্কৃত জানতেন ডমিনিক। বললেন,—আপনার আদেশ পালন করতে চেষ্টা করবো। তবে পণ্ডিতদিগের সাহায্য চাই।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—পথ-পরিক্রমায় দেখেছি এখানে-সেখানে পণ্ডিত আর মৌলবীদের পাঠশালা। সন্ধানে থাকো, এ দেশটায় আর যাই হোক পণ্ডিতের অভাব হবে না। তুমি ডমিনিক, সর্বাগ্রে বাঙলা অক্ষরগুলি সংগ্রহ কর। এই দেশের এ্যালফাবেট, ভাওয়েল ইত্যাদি—

অপরাহ্ণবেলায় দুই পাদরীতে পথের ধারের এক গাছের তলায় মাটির বেদীতে বসে কথা বলছিলেন। এমন সময়ে তাঁরা দেখতে পেলেন, জনৈক রাজদূত অশ্বারোহণে আসছে। যেন তাঁদেরই উদ্দেশে আসছে। সুসজ্জিত দূতের মুখে যেন কিছু কথা অব্যক্ত রয়েছে।

অশ্ব থেকে নেমে পর পর বেশ কয়েকটা কুর্নিশ ঠুকলো সেই দূত।

হাত তুললেন ফার্নাণ্ডেজ। বললেন,—আমরা আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন।

দূত বললেন,—আমাকে মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রতাপাদিত্য রায় আপনাদের সমীপে পাঠিয়েছেন। এই লিপি আছে। গ্রহণ করুন।

সাধার হাসি ফুটলো যেন ফার্নাণ্ডেজের মুখে। তিনি যে বঙ্গভাষা জানেন না। লিপি খুলে দেখলেন স্বদেশীয় ভাষায় লিখেছেন মহারাজা প্রতাপ। লিপির শেষে তিনিই স্বাক্ষর করেছেন।

লিপিখানি আর কিছুই নয়, আমন্ত্রণলিপি।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—বাঙলা ভাষা আমাদের জানা নাই। আপনি পাঠ করেন, মহারাজার পত্রখানি।

দূত পড়লেন প্রতাপের লিপি। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বললেন,—মহারাজা আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনাদের সঙ্গে মহারাজা সাক্ষাৎ করতে চান।

ফার্নাণ্ডেজ দেখলেন তাঁর দিনলিপি। দেখে দেখে বললেন,—বর্তমানে সম্ভব হবে না। আমরা আইজ কাইলের মধ্যে চট্টগ্রাম যাবো। সেখানে কিছু জরুরী কাজ আছে। মহারাজাকে জানাবেন, ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলেই আমরা রাজ-দরবারে উপস্থিত হবো। মহারাজাকে বলবেন, আমরা তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি।

আবার কুর্নিশ ঠুকতে থাকলো রাজদূত। পলকের মধ্যে ধুলি উড়িয়ে ছুটলো অশ্ব। রাজদূত হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করলো।

কয়েক দিন পরে হুগলী থেকে চট্টগ্রামের দিকে পাড়ি জমালেন পাদরীদ্বয়। সেখানে ধর্মপ্রচারের কাজে এমনই ব্যস্ত থাকলেন যে দেখতে দেখতে বছর শেষ হয়ে গেল। হুগলীতে ফিরে এসে তাঁরা দেখলেন আরো দুজন পাদরী এসে পৌঁছে গেছেন। একজনের নাম মেলসিওর ফনসেকা। অপর জনের নাম এণ্ড্রু বাউয়েস।

এই জেসুইট পাদরী চতুষ্টয় হুগলী, চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকান প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে অনেককে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

ফার্নাণ্ডেজ জানতে পারলেন, আমন্ত্রণ-রক্ষায় অসমর্থ হওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি চ্যাণ্ডিকানাধিপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এ সমাচার শুনে ফার্নাণ্ডেজ যেন কিছুটা বিব্রত হয়ে ওঠেন। যেন-তেন প্রকারে মহারাজাকে তুষ্ট করতে হবে। তাই সত্বর পাঠিয়ে দিলেন ডমিনিককে। বললেন,—ডমিনিক, তুমিই মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও। নম্র ও মিষ্ট ব্যবহারে মহারাজাকে পরিতুষ্ট করবে। তাঁর বক্তব্য শুনবে। মহারাজার নির্দেশ পালন করতে সচেষ্ট হবে।

১৫৯৮ খৃঃ অব্দ। চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হতে ডমিনিকের বেশ বিলম্ব হল। কেন না পথিমধ্যে তিনি দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন।

চ্যাণ্ডিকানে পৌঁছে [illegible]নিক দেখলেন, মহারাজা স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থি[illegible]। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আছেন অন্যান্য রাজকর্মচারী প্রভৃতি।

মহারাজা বললেন - মাননীয় মহাশয়, আপনার আতিথ্যের জন্য কয়েকটা দ্রব্য আনয়ন করেছি। আপনি গ্রহণ করলে আমি সবিশেষ বাধিত হবো।

ডমিনিক দেখলেন উপহার-সামগ্রী। চাউল, ঘৃত, চিনি, ছাগশিশু প্রভৃতি।

ত্যাগের ব্রত পালন করেন পাদরীরা। উপহার গ্রহণ করেন না। তাঁরা নিস্পৃহ, নির্লোভ। তৎসত্ত্বেও মহারাজার সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। তজ্জন্য সব কিছু রেখে একটিমাত্র ছাগশিশু গ্রহণ করলেন ডমিনিক।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন,—আপনি একা কেন? ফার্নাণ্ডেজ কৈ? কোথায় এখন তিনি?

ডমিনিক বললেন,—মহারাজা, তিনিও অচিরে এসে পৌঁছাবেন। বর্তমানে তিনি হুগলীতে অবস্থান করছেন। আমি তাঁর কাছে জরুরী পত্র পাঠিয়েছি।

১৫৯৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ফার্নাণ্ডেজ চ্যাণ্ডিকান অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনিও দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন।

মহারাজা অবগত হলেন ফার্নাণ্ডেজের আগমন-সংবাদ। একজন প্রবীণ ব্রাহ্মণকে মহারাজা পাঠালেন, ফার্নাণ্ডেজকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। ব্রাহ্মণ সবিনয়ে জানালেন,—মহারাজা আগামীকাল সোমবার দ্বিপ্রহরে আপনাদের সহ সাক্ষাৎ করতে চান।

পাদরিগণ সানন্দে সম্মতি জানালেন। রাজ-দরবার বিশেষভাবে সজ্জিত হল।

নির্দিষ্ট দিনে পাদরীরা রাজপুরীতে উপস্থিত হলেন। মহারাজা সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে পাদরীদের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—আমরা রিক্ত নিঃস্ব। আমাদের একমাত্র সম্বল যীশুর নাম। মহারাজার জন্য কয়েকটা লেবু আনয়ন করেছি। বেরিনগাঁয়ের কমলালেবু। আপনি গ্রহণ করলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করবো।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—অবশ্যই গ্রহণ করবো। জানি, এই লেবু অত্যন্ত সুস্বাদু।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—মহারাজা, আপনার নিকট কয়েকটি আবেদন আছে। আপনি মঞ্জুর না করলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। অনুমতি প্রদান করেন, একে একে জানাই।

মহারাজা সাগ্রহে বললেন,—আপনাদের আবেদন পূর্ণ করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আমি কী করতে পারি বলেন।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—খৃস্টধর্মে দীক্ষিত লোকদিগের অবস্থানের জন্য একটি স্থানের প্রার্থনা জানাইতেছি। আপনার রাজ্যমধ্যে দেখি সুপ্রচুর শূন্য জমি আছে। তন্মধ্যে যদি সামান্য কিঞ্চিৎ জমি আমাদের দান করেন।

প্রতাপাদিত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন। মন্ত্রীদের জানালেন, এই নির্দেশ কার্যকরী করতে।

ফার্নাণ্ডেজ আবার বললেন,—আপনার রাজ্যে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য আমরা অনুমতি প্রার্থনা করি।

মহারাজা বললেন,—তথাস্তু। অনুমতি দিলাম।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—আরও একটি নিবেদন আছে। আমরা একটি গির্জা স্থাপন করতে চাই। আরও কিঞ্চিৎ ভূমি এই উপলক্ষে দান করেন মহারাজা।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—গির্জা-প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা স্থান মনোনীত করেন। আমি অনুমতি দিতেছি।

ফার্নাণ্ডেজ বিনয়-নম্র কণ্ঠে বললেন,—মৌখিক অনুমতি অপেক্ষা লিখিত অনুমতির মূল্য ও প্রয়োজন অনেক অধিক। যদিও আমরা জানি, মহারাজার জবানই যথেষ্ট।

মহারাজা সহাস্যে বললেন,—লিখিত অনুমতিই দিব আমি। বাধা নাই কিছু। দানপত্র লেখা হউক।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন,—দানপত্রে মহারাজার স্বাক্ষর চাই।

মহারাজা বললেন,— তাই হবে।

ফার্নাণ্ডেজ বলেন,—আর চাই মহারাজ-কুমার উদয়াদিত্যের স্বাক্ষর। কেন না মহারাজার অবর্তমানে জমি লয়ে কোন বিরোধ হোক তাহা আমরা চাহি না।

প্রতাপাদিত্য হাসতে হাসতে বললেন,—মহাশয়গণ যে অত্যন্ত দূরদর্শী সন্দেহ নাই। উদয়ও স্বাক্ষর দিবে। নিশ্চিন্ত হউন।

১৬০০ খৃঃ অব্দ।

মহামতি যীশুর শুভ জন্ম-দিবসানুষ্ঠানের কয়েক দিন পরে, ১লা জানুয়ারী তারিখে চ্যাণ্ডিকানস্থিত সদ্য-নির্মিত গির্জার দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব পালনের আয়োজন করলেন পাদরিগণ।

এই বিশেষক্ষণে শূড়ে দিনটিতে বাঙলা দেশের হৃদয় যেন সাড়া দিয়ে উঠলো। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে গির্জা-প্রতিষ্ঠার খবর। দলে দলে কাতারে কাতারে আসছে গৌড়বঙ্গের যতেক হিন্দু আর মুসলমান। দেখতে আসছে এক অভিনব দেব-দেউল। মন্দির নয়, মসজিদ নয়, গির্জা। ভজন, পূজন, সাধন, আরাধনার আরেক পীঠস্থান। গির্জার সর্বোচ্চ চূড়ায় স্থাপিত হয়েছে কালো গ্রানাইট পাথরের ক্রুশচিহ্ন। ঘড়িঘন্টার আওয়াজ উঠছে প্রতি ঘন্টায়। ঢঙ ঢঙ ঢঙ—ং-ং-ং—

যেন ওঙ্কারধ্বনির মত শোনায় দূরে থেকে।

নানা ফুল ও লতাপাতায় সেজেছে নতুন গির্জা। এখানে সেখানে ফুলের তোরণ। ঝাঁক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতি উড়ছে সবুজ চত্বরে। ফুলের গন্ধে বাতাস যেন মধু মধু লাগছে।

মুক্তদ্বার থেকে চোখে পড়ে, গির্জার আঁধার অভ্যন্তরে দূরের বেদীতে সারি সারি বাতি জ্বলছে আলোক-আধারে। রূপার ধূপদানিতে গুচ্ছ গুচ্ছ ধূপকাঠি জ্বলছে আঁকাবাঁকা ধোঁয়া খেলিয়ে।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আগমন-অপেক্ষায় আছেন পাদরীরা। সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করছে, যীশুর অনুরাগীদের জন্য আজ থেকে এই গির্জার দ্বার মুক্ত থাকবে। প্রধান ফটকের শীর্ষে ফুলের লেখা। পুষ্পাক্ষরে লেখা—

GOD IS NOW HERE.

গৌড়-বাঙলায় প্রথম খৃস্টীয় পর্বের অনুষ্ঠান। দিকে দিকে তাই সাড়া জেগেছে। উৎসব দেখতে এসেছে আবালবৃদ্ধবনিতা। গির্জার চতুষ্পার্শ্বে তিলধারণের ঠাঁই নেই।

এ হেন সময়ে প্রতাপাদিত্যের হাতীর দোলায়িত শুঁড় দেখতে পেয়েছে জনতা। রব উঠলো একটা যেন। মহারাজা প্রতাপাদিত্য আসছেন। হাওদার শীর্ষে সোনার ছত্রে মতির ঝালর দুলছে। মহারাজার পিছনের আর একটি হস্তিপৃষ্ঠে যুবরাজ উদয়াদিত্য বসে আছেন।

গির্জা দেখে মহা খুশি হলেন মহারাজা। পাদুকা বাইরে খুলে রেখে প্রতাপ গির্জামধ্যে প্রবেশ করলেন। সাজসজ্জা ও বিন্যাস দেখে মুগ্ধ যেন তিনি। পাদরীদের বললেন,—আপনাদের আরও যদি কিছু প্রার্থনা থাকে জানাতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

১৬০০ খৃঃ অব্দের ২০শে জুন তারিখে ফনসেকা তাঁর দিনলিপির পৃষ্ঠায় লিখলেনঃ

"গত ২০শে নভেম্বর আমি চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হই। তথায় ডমিনিক সোসার সহিত সাক্ষাতে আমরা উভয়েই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। তথায় পর্টুগীজগণ কর্তৃকও আমি অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম। সোমবারে আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। অভ্যর্থনাকালে তিনি আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজা আপনার আসনে উপবেশন করিলে আমরা তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করি। আমাদের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, আপনারা আপনাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের জন্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রধান পাদরী মহাশয়ের আদেশানুসারে আমরা এই প্রথম চ্যাণ্ডিকানে গির্জা স্থাপনে যথেষ্ট যত্ন লইয়াছিলাম, তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিলাম। আমরা তথায় আনন্দোৎসব করিয়াছিলাম এবং তাহাই বাঙলার প্রথম খৃস্টান পর্ব। হিন্দুদিগের নিকট তাহাকে বিখ্যাত করিবার জন্য আমরা অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলাম। পর্বের পূর্বদিনের সন্ধ্যাকালে ও পর্বদিবস প্রাতঃকালে অনেক কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল। কামান শ্রেণীর প্রদর্শনে হিন্দুরা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। মহারাজা প্রতাপাদিত্য গির্জা দেখিবার জন্য স্বীয় অমাত্যবর্গ পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার সাজসজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাসহকারে শূন্যপদে গির্জার মধ্যে প্রবেশ করেন ও তাঁহার জন্য গালিচার উপর যে চেয়ার রক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে না বসিয়া সোপানের উপর তিনি উপবিষ্ট হন, বেদীর উপর যে সমস্ত দ্রব্য ছিল তিনি তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং বাঙলার মধ্যে ইহাকে প্রধান গির্জা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছে। পঞ্চদশ দিবস এই প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে। অনেকে ধর্মোপদেশ লাভের জন্য ও অনেকে তাহাদের পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য প্রত্যহই আসিতেছে। আমরা পবিত্র দীক্ষার জন্য অনেক ক্ষুদ্র পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করিতাম। আমরা এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। কারণ তাহাতে আগত অনেকে সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা সত্যধর্ম অবগত হইতে পারিবে।"

বাঙলার ভুঁইয়াদের মধ্যে প্রায় সকলেই জেসুইটদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। কেদার রায়, ঈশা খাঁ, রামচন্দ্র রায় প্রমুখ ভুঁইয়াগণ তাঁদের রাজ্যমধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি আগেই দিয়েছেন, কিন্তু পাদরীদের সঙ্গে ব্যবহারে মহারাজা প্রতাপাদিত্য যতটা উদারতার পরিচয় প্রদান করলেন তত আর কেউ নয়।

ইতিমধ্যে মহারাজা জানতে পারলেন, পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো সন্দীপ অধিকার করেছেন। আরাকানরাজ সেলিমসা সনদীপ পুনরধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্য-শুল্ক ইত্যাদি বিষয় লয়ে সেলিমসার সঙ্গে পর্টুগীজদের বিবাদ বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। অধিকন্তু মগেরা কতকগুলি খৃস্টানকে ক্রীতদাস করবার জন্য উদ্যোগী হলে পাদরী ফার্নাণ্ডেজ বাধা দেন। ফলে ফার্নাণ্ডেজকে মগেরা প্রহার করে এবং তাঁর একটি চক্ষু নষ্ট করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ফার্নাণ্ডেজকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁর সহকর্মী বাউয়েসকেও বন্দী করা হয়, ১৬০২ খৃঃ অব্দের ১৪ই নভেম্বর উক্ত কারাগারেই ফার্নাণ্ডেজের মৃত্যু হয়। বাউয়েস শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ফার্নাণ্ডেজকে তথায় সমাহিত করেন। মুক্তিলাভের পরে বাউয়েস চট্টগ্রাম থেকে সন্দীপে উপস্থিত হলেন।

আরাকানরাজ সেলিমসা সন্দীপ আক্রমণ করলে পর্টুগীজেরা শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকানে পলায়ন করে।

কার্ভালো প্রথমে শ্রীপুরে ও ততঃপর চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হলেন। সাগরদ্বীপে অবস্থানের পূর্বে কার্ভালো হুগলীতে গমন করেন। হুগলীতে মোগলদিগের একটি দুর্গে চারশত সৈন্য থাকে। কার্ভালো অল্পসংখ্যক পর্টুগীজের সঙ্গে মোগল সৈন্যদের আক্রমণ করলেন, সৈন্যদের মধ্যে একজন ব্যতীত অন্যান্য সকলেই যুদ্ধে নিহত হল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় কার্ভালো সমস্ত বঙ্গদেশে অত্যন্ত সাহসী বলে পরিচিত হলেন। হুগলী বন্দর অধিকারের পরে কার্ভালো সন্দীপ অধিকারের প্রস্তুতি হিসাবে আপনার জাহাজাদির সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন।

এই সময়ে আরাকানরাজ সেলিমসা সন্দীপ পুনরধিকারের পরে বাকলা দখল করলে যশোহর-রাজ্যের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি নিপতিত হয়।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য আরাকানরাজকে সন্তুষ্ট করবার জন্য গোপনে বলে পাঠালেন,—আমি কার্ভালোকে ছলে, বলে, কৌশলে ধৃত করবার জন্য প্রস্তুত আছি। ফলাফল কী হয় শীঘ্র জানাবো আপনাকে।

কার্ভালোর কাছে দূত পাঠালেন প্রতাপাদিত্য। বলে পাঠালেন,—আপনার সহ সাক্ষাৎ করতে চাই। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আপনি আমার দরবারে আসুন, এই অনুরোধ।

তিনখানি সুসজ্জিত রণতরী, পঞ্চাশখানি জেলিয়া ও একদল সৈন্যের সহিত কার্ভালো উপস্থিত হলে মহারাজা প্রতাপাদিত্য বিশেষ সম্মানের সঙ্গে তাঁকে সমাদর প্রদর্শন করলেন। বললেন,— আমি আপনাকে খেলাত প্রদান করতে চাই।

কার্ভালো হৃষ্টচিত্তে খেলাত গ্রহণ করলেন।

প্রতাপ আরও জানালেন,—আপনাকে আশ্বাস দিতেছি, আমি শীঘ্রই আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো।

পক্ষকাল অতীত হওয়ার পরেও যুদ্ধযাত্রার কোন আয়োজন দেখা যায় না। প্রতাপাদিত্য ইতিমধ্যে আরাকানরাজের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন এবং কার্ভালোকে বন্দী করতে সচেষ্ট হন।

মহারাজার মনোভাব অবোধ্য ঠেকায় পাদরীরা কার্ভালোকে স্থানান্তরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু কার্ভালো মহারাজার নিকট থেকে সুস্পষ্টরূপে সমস্ত অবগত হওয়ার জন্য যশোহরে উপস্থিত হলেন। তিন দিন অপেক্ষার পরেও প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না।

চতুর্থ দিবসে কার্ভালো রাজ-দরবারে উপস্থিত হলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করা হয়। তাঁর অনুচর কয়েকজন পর্টুগীকেও শৃংখলাবদ্ধ করা হল।

হাতীর পিঠে তোলা হয় কার্ভালোকে। চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরী, পলায়নের কোন পথ নেই। কারাগারে কার্ভালোর অবস্থিতির স্থান পূর্বেই নির্দিষ্ট ছিল। অবশেষে এই কারাগারেই কার্ভালোকে হত্যা করা হয়। রাজসেনাপতি স্বয়ং এই হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেন। ১৬০৩ খৃঃ অব্দের প্রথমেই এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ মধ্যরজনীতে সাগরদ্বীপে পৌঁছালো। সেখানে যে সকল পর্টুগীজ আছে তাদের গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দিলেন প্রতাপ। কার্ভালোর জাহাজগুলি বাজেয়াপ্ত করলেন তিনি। পাদরীদের প্রতি নানা প্রকার সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের প্রতি যশোহর-রাজ্য পরিত্যাগের আদেশ প্রদান করলেন মহারাজা। তাঁদের গির্জাটিও ভূমিসাৎ করতে হুকুম দিলেন তিনি।

পাদরীরা তিন সহস্র মুদ্রা দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করলেন।

কেদার রায়ের অধীনে কার্ভালো যেরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন, সেইরূপ বিশ্বস্ততাসহকারে প্রতাপের রণতরী ও সৈন্য পরিচালনের উদ্দেশ্যেই কার্ভালো এসেছিলেন মহারাজার দরবারে।

কিন্তু আরাকানরাজ সেলিমসার ভয়েই প্রতাপাদিত্য বিশ্বাসী সেনাপতি কার্ভালোকে এই জগৎ থেকে অপসারিত করলেন।

অবশ্য প্রতাপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই কার্ভালোকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। রাজনীতিতে না কী বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই। মহাপরাক্রান্ত বীরশ্রেষ্ঠ যিনি, তিনিও হীনতার আশ্রয় লয়ে কুকাজে লিপ্ত হন—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজীর ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

[ক্রমশ।

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ছবি দেখা কে না ভালোবাসে।
কিন্তু কোথাও কি আছে কিছু মিল-
কিংবা ভাষার ধারাবাহিকতা আছে
এ জীবনে? তবুও

এখনও ছবি দেখি ;
অজস্র ফুল, নদী, দ্বীপ, দীর্ঘ পাহাড়—
আরো কত কি
চিরদিনের ভালোবাসার মতন খুব কাছে আছে।

এখনও : আকাশের তারাগুলি
জোনাকির আলো হয়ে নামে
প্রতি সন্ধ্যায়—

এখনও ; প্রণয়ীর সুশাসনে
উন্মোচিত বুক, প্রসন্নতা হৃদয়ের গভীরে ;

ছবি দেখা কে না ভালোবাসে!

অজস্র ফুল, নদী, দ্বীপ, দীর্ঘ পাহাড়—
আরো কতো কি•

ভারতের প্রাচীন সঙ্গীত ধ্রুপদ

অর্চনা মিত্র

বর্তমান যুগে ধ্রুপদ এবং ধামারের প্রচলন খুব কম। অথচ ভারতবর্ষের সঙ্গীতের মূলধারা যে ধ্রুপদ তা' অস্বীকার করা চলে না।

শুদ্ধ যে-কোন রাগের (বিশেষত গম্ভীরভাবের রাগে)- ধ্রুপদ গান সঙ্গীত-রসপিপাসুদের শুনতে ভালোই লাগে।

এখনকার রাগ-রাগিণীগুলিতে, বিশিষ্ট শিল্পীরা বিবাদী স্বরের মিশ্রণ করে, পাশ্চাত্য সুরের প্রয়োগে রাগ-রাগিণীগুলিকে মাধুর্যমণ্ডিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন সম্ভবত সেই জন্যই, আমাদের দেশের 'বীঠোফেন' অথবা 'মোজার্ট' ভক্তরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনতে আগ্রহী হচ্ছেন।

বিদেশী সঙ্গীতকাররা বরং ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট। যেমন---ইহুদী মেনুহিনের বেহালা বাজনা শুনলে মনে হয়, ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন---সঙ্গীত তাঁর সাধনায় প্রাণ পেয়েছে। ভারতের মানুষ তাঁর সঙ্গীতকে প্রশংসা করেছে---ভালোবেসেছে।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞরা যখন ভারতীয় রাগ-রাগিণীতে আসক্ত হচ্ছেন ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞরা তখন ভারতীয় রাগ-রাগিণী-গুলিতে বিদেশী সুরের মিশ্রণ করছেন।

একথা স্বীকার করা অনুচিত হবে না যে, ভারতীয় সঙ্গীত প্রাচীনতম---যুগে যুগে সুর ও সঙ্গীতের আবিষ্কর্তারা জন্মেছেন, তাঁরা অসীম জ্ঞান ও সাবধানতার সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের গবেষণা করে, সিদ্ধান্ত নিয়ে পুস্তক রচনা করে, নিজেদের শিষ্যদের সেই অনুযায়ী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন।

ভারতের ঋষিরা কল্পনায় রাগ-রাগিণীগুলির রূপদান করেছেন---এই রাগ-রাগিণীগুলির যথার্থ রূপ আজকাল গান বা বাজনার মাধ্যমে পাওয়া যায় না বললেই চলে---অথবা এদের বিশুদ্ধভাবে রূপ দেওয়ার লোকের অভাব।

যদিও সঙ্গীতের মূল নিয়ম হয়তো একই তবুও প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কলারই যে নিজস্ব ধারা আছে একথা বলা অসঙ্গত হবে না বোধ হয়।

প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে যেমন সঙ্গীতের বিকাশ হয়েছিল---১৬০০ শতাব্দীতে তেমনি সঙ্গীতের নামে এক ধরণের গলাবাজী প্রচলন ছিল। আজকের দিনে 'খেয়াল' গানেও অনেক সময় গলাবাজী ও একঘেয়েমী দেখা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শিল্পী ও তবলচীর যেন পাল্লা দেওয়া চলে দুজনেই দুজনকে হারাতে চান---শেষের দিকে দেখা যায় 'খেয়াল' তার খেয়াল মত চলেই একঘেয়েমীতে এসে থেমে যায়।

অবশ্য নামে যখন 'খেয়াল' তখন খেয়ালখুসীমত গাওয়া হলেও বলার কিছু নেই। তবে কতটা শ্রুতিমধুর হয় সে কথা বলা কঠিন। অনেক সময় অনেক শ্রোতা শিল্পীদের এই ধরণের সঙ্গীত শুনেই উৎসাহ দেন।

খুব সম্ভব রাগ-সঙ্গীতের মূলধারা বজায় রাখতে হবে, মনে করেই ধ্রুপদ ধামার গানের বেশী প্রচলন নেই।

আর একথাও বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, ধ্রুপদ ও ধামারের মত গম্ভীর, গভীর ও বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী সঙ্গীতের শ্রোতাও খুব কম।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রোতার অভাব নেই, কিন্তু ধ্রুপদ ও ধামার শোনার মত শ্রোতা আমাদের দেশে নেই কেন? অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাষামাধুর্যে, সুর-মাধুর্যে, সর্বোপরি মানুষের মনের সকল রকমের অনুভূতির (দুঃখ, বিরহ, আনন্দ, শোক, ধর্ম প্রভৃতি) সঙ্গে এমন ভাবে সমতায় এসে যায়---যা একেবারে অতুলনীয়। তবুও ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারাটি তার মধ্যে আছে। ঠিক এই কারণেই ধ্রুপদ ও ধামারের অপ্রচলন বিষয়টি আপনা থেকেই মনে আসে।

আরও একটি কারণে ধ্রুপদ গানের অপ্রচলন হতে পারে, সেটি হলো---রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করে

প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমারের সঙ্গে নবাগত শিল্পী ইন্দ্রজিৎ। রঙমহলের নতুন নাটক 'সেমসাইডে'র নায়কের চরিত্রে ও 'ফিরে পাওয়া' চিত্রের বিশিষ্ট শিল্পী ইন্দ্রজিৎ।

খেয়াল গানের আতিশয্য বাদ দিয়ে দুগুণ, তিন গুণ, চৌগুণ ইত্যাদিতে ধ্রুপদ গান করা সহজসাধ্য নয়।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ভাল ধ্রুপদ গান করে গিয়েছেন।

ভারতের ঋষিসৃষ্ট এই ধ্রুপদ। রাগ-রাগিণীগুলিও ঋতু অনুযায়ী, বিশেষ বিশেষ সময় অনুযায়ী গীত হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা আমরা আজ ভুলতে বসেছি। যেমন বসন্ত-কালে 'হিন্দোল', গ্রীষ্মে 'দীপক' বর্ষায় 'মেঘ' হেমন্তে 'শ্রী' ও শীতে 'ভৈরব'।

আজকের দিনে সামবেদের মন্ত্রগুলি আর শোনা যায় না। সঙ্গীতের মাধ্যমে রাগ-রাগিণীর রূপগুলি ফুটে ওঠে না—তাদের সুর প্রকৃতির উপরে প্রভাব বিস্তার করে না---এমনি করেই অনেক কিছু হারিয়ে গেছে যা ছিল ভারতের ঋষিদের সৃষ্টি।

সামবেদই ভারতের আদিগানের উৎস। বৈদিক সঙ্গীত বলতে সাম-গানকে বোঝায়। মোগল যুগেও রাগ ও তার রূপের অঙ্কিত চিত্র পাওয়া যায়। বৈদিকযুগে রাগ ও তার রূপের ধ্যানমন্ত্রও পাওয়া যায় সম্ভবত দেবদেবীদের কল্পনা করেই ঋষিরা সে সব বর্ণনা করেছিলেন।

পূর্বকালে গ্রীস, আরব, রোম প্রভৃতি দেশ ভারতীয় সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছে। আজকের দিনের ভারতীয় শিল্পীদের অবদানও কম নয়। বিদেশী সঙ্গীত শিল্পীরা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট—তারা ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষায় আগ্রহী।

অবশ্য একথাও সত্য যে, খিলজী সম্রাটদের আমলে আমীর খসরু এবং মোগল সম্রাট আকবর অনেক পারসিক সুর নিজেদের সৃষ্ট রাগ রাগিণীতে প্রয়োগ করেছিলেন।

বিদেশী সুর ভারতীয় রাগ-রাগিণীতে পূর্বকাল থেকেই প্রয়োগ করা হয়েছে। অনার্য যুগের সুরের সংমিশ্রণ হয়েছে মার্গসঙ্গীতে। ভারতে যুগে যুগে বহু জাতি এসেছে। সভ্যতা সংস্কৃতির ওপর পরস্পরের প্রভাব পড়েছে—সঙ্গীতও সে প্রভাবমুক্ত নয়। কে কাকে কতটুকু দিয়েছে বানিয়েছে, তা নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সঙ্গীতের আদি উৎস এই ভারতেই—এইখানেই তার উৎকর্ষ ও বিকাশ।

ভারতের সভ্যতা যেমন সম্পূর্ণ ভারতীয় —সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ তেমনি এই ভারতেই হয়েছে। এর সঙ্গে বিদেশী সুরের সংমিশ্রণে ঘটিয়েছেন পূর্বকালের সঙ্গীতকারেরা এবং এখনকার তথা-কথিত জনপ্রিয় শিল্পীরা।

ভারতীয় সঙ্গীতে যে বিভিন্ন সুরের প্রয়োগ হয়েছে এবং হচ্ছে একে কোন-মতেই 'মার্গ সঙ্গীত' বলা চলে না। ইংরাজী ভাষায় 'ক্লাসিক্যাল' কথাটি জুড়ে দিয়ে একে 'ক্লাসিক্যাল মিউজিক' আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মার্গসঙ্গীতে ভারতের বৈদিক যুগের আভিজাত্য আছে—এর সঙ্গে কোন কিছুর মিশ্রণ হলে সে তার বৈশিষ্ট্য হারাবে।

এর পরে আরো একটি কথা আছে। শিল্পী যা দিতে চান আমরা তা নিতে পারি না বা চাই না। সুতরাং শ্রোতারা যে ধরণের সঙ্গীত চান শিল্পীদের বাধ্য হয়ে তা-ই পরিবেশন করতে হয়। আর এই একটি প্রধান কারণেই ধ্রুপদ ধামার প্রভৃতির বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর রূপগুলি লুপ্ত হয়ে যাবার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

সাগরপারের মায়ালোক

স্টার সিসটেম বা তারকা-প্রথা আজ চলচ্চিত্র জগতে বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কি এদেশ কি ওদেশ—কোনো দেশেই এর প্রকোপ কম নয়। অবিশ্যি সাগরপারের দেয় টাকার অঙ্কটা খুবই ডাগর লাগে, তার কারণ ইংরিজি ছবির বাজার বিশ্বজোড়া। এখানে তোলা ছবিতে যেখানে কয়েক লাখ টাকা লাভের ফসল হয়, ওখানে তার পরিমাণ কোটিতে দাঁড়ায়। খরচও হয় তেমনি। তারকাদের যে হারে দিতে হয়—সময় সময় সেটা তো অবিশ্বাস্য বলেই ঠেকে। কিন্তু তাতো নয়। ওটা তারকা-প্রথার সর্বশেষ পরিণতি।—

অথচ এমনটা আগে ছিলো না একেবারেই। ছবি তোলার উষাকালের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কথাই ধরা যাক। একটু নজর জোর করলে কি দেখি? দেখি শিল্পী-পরিচয় দর্শকদের সামনে তুলে ধরার বিশেষ কোনো ব্যবস্থাই নেই। ওদিকটা সকলের কাছে অজ্ঞাতই থাকত। চিত্র-নির্মাতারা সে সময়েই ভূয়োদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বেশ বুঝেছিলেন ওইভাবে শিল্পীকে না রাখলে তারা প্রাধান্য পেয়ে যাবে। আর তার ফলে রাতারাতি কোহিনূরের চেয়েও দামী হয়ে উঠবে। দফায় দফায় ওই ক্রম-প্রচারিত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁদের দাবী আকাশ-চুম্বি করে তুলবেন, সে সময়ের প্রযোজকরা সেটা কল্পনার চোখে দেখেছিলেন। বলিহারি তাঁদের অনুমান।

●

চলছিলো ভালোই। কিন্তু খাল কেটে কুমীর আনার বন্দোবস্ত করলেন কার্ল লিমলী। ভদ্রলোক হচ্ছেন একজন প্রযোজক। তুখোড় ধরণের সেটা বলাই বাহুল্য। তখনকার দিনের একস্ট্রা গার্লদের (যারা ছবির ভিড়-ভাট্টায় দল বাড়ায়) মাঝ থেকে তিনি একটি দর্শন-ধারী মেয়েকে বেছে নিলেন। মেয়েটির নাম ফ্লোরেন্স লরেন্স। তাকে প্রলোভন দেখালেন অর্থের সেইসংগে নামের।

সে তো সংগে সংগে রাজী। এদিকে কাগজে-পত্তরে চললো ঢালাও ব্যবস্থা তার নাম প্রচারের। শুরু হোলো চলচ্চিত্রের আকাশে তারকার আবির্ভাব।

উনিশ শো চোদ্দ সালের কথা। এই সময় থেকে স্টারেরা দামের দিক থেকে উর্ধমুখী হলেন। মেরী

রমেন চৌধুরী

পিকফোর্ডকে সাপ্তাহিক দু হাজার ডলারে চুক্তিবদ্ধ করলেন যে প্রযোজক তাঁর নাম অ্যাডলফ জুকর। এগিয়ে চললো নবপ্রবর্তিত রীতি। চার্লি চ্যাপলিনকে দেখা গেল এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। বছরে পাবেন তিনি ছ লক্ষ সত্তর হাজার ডলার। বছরখানেকের মধ্যে চার্লির বার্ষিক আয় দশ লক্ষ ডলারে পৌঁছে গেছে। এই ধরণের উপহারের পারিশ্রমিক পেতে থাকলেন চিত্র-তারকারা দুই দশক পর্যন্ত। চার্লি এবং মেরী পিকফোর্ডের কাছাকাছি এগিয়ে এলেন আরো বেশ কিছু শিল্পী। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক, লিলিয়ান গিশ, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, রুডলফ ভ্যালেন্টিনো, হ্যারল্ড লয়েড, বাস্টার কীটন, জন গিলবার্ট, রোমান নোভারো প্রমুখ।

●

সময়ের স্রোত বয়ে চললো। নীরব ছবি সরব হোল। সেই সংগে পাল্লা দিয়ে চললো তারকাদের প্রশস্তি। শিল্পীর নামকে ঢেকে রাখার কথা ভাবার সুযোগ চলে গেল চিরকালের জন্যে।

টুর্গেনিভের 'ফার্স্ট লাভ' চিত্রে ইরিনা পেচারনিকোভা ও ইনোকেন্টি স্মোকটুনোভস্কি

বরং বড়ো নামী এবং দামী তারকা বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন সেই নিয়ে চললো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বলা প্রয়োজন এ ব্যাপারে মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের নাম প্রথমেই দেখা গেল।

এমনি করে তারকার জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে কিন্তু সে যাত্রা-পথে বহু প্রযোজক প্রতিষ্ঠানকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই তো চারদিকে সামাল সামাল রব উঠেছে, তারকাকে দীপ্যমান রাখতে বহু প্রতিষ্ঠান নিজেকে হত্যা করে চলেছে। তাই তো সবাই খুঁজছে পথ কিন্তু নান্যঃ-পন্থা।

❀

শতবর্ষ পার হয়ে গেছে, গল্পটি লিখেছিলেন রুশ সাহিত্যরথী টুর্গেনিভ তৎকালীন সাময়িক পত্রিকা লাইব্রেরী ফর রিডিং-এ। সেটা হোলো ১৮৬০ সালের কথা। ফার্স্ট লাভ-এর সৃষ্টি সেই সময়েই। মুক্তোর মতো নিটোল সাহিত্যিক প্রচেষ্টা, নিজের জীবনের ছায়া পড়েছে গল্পটিতে। এক যুবকের প্রথম প্রেম তার স্বপ্ন তার ব্যথা-বেদনার অপূর্ব সুন্দর সাহিত্যকৃতি এই কাহিনী।

এই নভেম্বর টুর্গেনিভের দেড়শত-তম জন্মদিবসে মস্কোর মস ফিল্মস 'ফার্স্ট লাভ'-এর চিত্র রূপদানের আয়োজন করেছেন। রঙিন টেলিভিশন চিত্রটির নাম একই আছে, শিল্পী সমাবেশ হচ্ছে উল্লেখনীয়ভাবে। নবীন প্রবীণ উভয়কেই দেখা যাবে চরিত্র-লিপিতে। 'ভ্লাদিমির'-এর ভূমিকায় ভাদিম ভ্লাসভ অবতীর্ণ। মস্কো ইয়াং স্পেকটেটার্স থিয়েটার স্টুডিওর ছাত্র ইনি. এটাই হবে তাঁর প্রথম চিত্রা-বতরণ। মায়াকেভস্কী থিয়েটারের তরুণী অভিনেত্রী ইরিনা পেচারনি-কোভা 'জিনাইদা-র' রূপসজ্জা গ্রহণ করছেন। শ্রীমতী ইরিনা ইতিমধ্যে বেশকিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন। লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ইনোকেন্টি স্মোকটুনোভস্কীকে দেখা যাবে ভ্লাদিমির-এর পিতার চরিত্রে।

'কিবাবাত্রির কাব্য' চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও স্বপন রায়

ভ্যাসিলি অরডিনস্কী ছবির চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক। ক্যামেরার দায়িত্ব নিয়েছেন ভ্যালেনটিন বেলেঙ্কো-নিয়াকোভা।

●

ছবি তোলার তোড়জোড়ের খবরেই চারদিকে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। কাজ আরম্ভ হলে তা দানা বেঁধে উঠবে এবং ছবিটি দেখতে পেলে সবাই তারস্বরে হৈ-চৈ শুরু করে দেবে। এমনি তো ধারণা হচ্ছে প্রস্তুতিপর্বের সূচনায়। কী এমন ছবি কী-ইবা তার কাহিনী—যার জন্যে এমন আশংকা? এ কাহিনী সেই মানুষটিকে নিয়ে লেখা যাঁর নাম বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। ইনি হচ্ছেন 'চে গুয়েভারা'।

হ্যাঁ, এঁরই স্বনামে ছবি তুলতে অগ্রসর হয়েছেন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স। ওই নামেই নামাঙ্কিত হবে চিত্রটি। কবে চিত্রগ্রহণ শুরু হবে, শেষ কখন করা হবে সেটা পূর্বাহ্নে যাতে কেউ না জানতে পারে তার জন্যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছেন চিত্রনির্মাতারা। এটা বিরূপ সমালোচনার ভয়েই করা হয়েছে। যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় ওমর শরীফ-ই হবেন নাম-ভূমিকায় শিল্পী। বার্লেট চিত্রনাট্য রচনা করছেন, ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন 'রিচার্ড ফ্লেচার।' আশা করা যায় 'চে গুয়েভারা' সব বাধা নিষেধ কাটিয়ে অদূর ভবিষ্যতে রূপালি পর্দায় রূপবিস্তারে সমর্থ হবে।

❀

'ভুবন জোড়া প্রেমের ফাঁদে।
কি জানি কবে কাহারে বাঁধে'—

কবির এই উক্তি শত সহস্র বছর ধরেই কার্যকরী। এই ফাঁদে—সর্বশেষ খবরে জানা গেল—জড়িয়ে পড়েছেন নাকি মার্কিন নিগ্রো অভিনেতা সিডনী পোইটিয়ার। শিল্পীরা লিণ্ডা ক্রিস্টলের প্রেমে নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন। শিল্পী নির্বাচনে ভুল হয় নি, লিণ্ডাও সম-গোত্রীয়া অর্থাৎ সে-ও চিত্রাভিনেত্রী। দুজনে ওঁরা হোটেল প্লাজায় দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন।

উৎসাহী দল একফাঁকে লিণ্ডাকে প্রশ্ন করেছিলো। জবাবে লিণ্ডা বলেছেন: লস এ্যাঞ্জেলসে ওঁরা পক্ষকাল মিলিত ছিলেন বটে। সিডনী এখন নেই, হলিউডে ফিরলেই আবার দেখা হবে।—

জাহানারা

জামসেদপুরের টেলকো নগরীর সবুজ কল্যাণ সঙ্ঘের কিশোর শিল্পীরা সম্প্রতি অভিনয় করলেন 'জাহানারা' নাটক, নাটকটির রচয়িতা শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পান চিত্রা ভট্টাচার্য, রূপা বাগচী, বিজন চট্টোপাধ্যায়, তপন সরকার, অর্চনা ঘোষাল ও নাট্যকার স্বয়ং।

অদৃষ্টের পরিহাস

পুরুলিয়ার বিশিষ্ট শিশু সংগঠন সবুজ সঙ্ঘ অভিনয় করলেন হেমচন্দ্র চৌধুরীর অদৃষ্টের পরিহাস। এতে অভিনয় করেন অসিতকুমার রায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, সুভাষ রায়, কল্পনা অধিকারী ও অন্যান্য বহু শিল্পী।

বিদিশ ও ঝর্ণা

দক্ষিণ কোলকাতার মৈত্রী সঙ্ঘ সম্প্রতি তাদের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করল, অনুষ্ঠানে তারা শৈলেশ গুহ-নিয়োগীর 'বিদিশ ও ঝর্ণা' নাটক দুটি পরিবেশন করল, 'বিদিশ'-এ দিলীপ দাস, তপন নাথ, সুধীর দাশগুপ্ত, সন্দীপ রায়চৌধুরী, দিলীপ দত্ত, জয়ন্ত সরকার, প্রণব দাস প্রমুখ প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। নাটকটি পরিচালনা করেন অসিতবরণ সরকার, ঝর্ণার পরিচালনা করেন দিব্যেন্দুমোহন বিশ্বাস, অভিনয়ে দেবাশীষ চাকলাদার, সৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনকুমার দাস, লাল্টু নাথ, প্রদীপ দাশগুপ্ত, সুভাষ সেন, সুকুমার হালদার, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ সরকার, প্রণব দাস, শিবানী ভট্টাচার্য, অঞ্জলি গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা অংশ নেন।

ওথেলো

সুরাঙ্গন সঙ্গীত শিল্পায়তনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ দিনে মহাকবি সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' অভিনয় করলেন উক্ত সংস্থার এবং শুভানুধ্যায়ীরা লেক স্টেডিয়াম মঞ্চে। এই নাটকটির মূল ইংরেজী এবং বাংলার রূপান্তর ঘটিয়ে অনেক প্রখ্যাত নাট্য-সংস্থা একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন কিন্তু একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে নাটকটি নির্বাচন যেমন দুঃসাহসিক তেমনই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এর উপস্থাপনা (বাংলায়) অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। সম্পূর্ণ সৌখীন অপেশাদার সংস্থার অভিনয় বিচারে প্রতিটি শিল্পী সূক্ষ্মতম শিল্পসৃষ্টির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী হয়েই নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সামগ্রিক উপস্থাপনা যে একেবারেই ত্রুটিমুক্ত একথা যেমন বলা চলে না তেমনই দলগত অভিনয় মানকে উন্নীত করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার্হ। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে দর্শক

শিল্পী সংসদ কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় সঙ্গীত পরিবেশনরত উত্তমকুমার

অভিনন্দন লাভ করেছেন তাঁরা হলেন রডরিগো, ইয়াগো, ক্যাসিও, ব্রাবানসিও, মণ্টাগো, ডেসডিমোনা, এমিলিয়া ও রিয়াঙ্কার রূপকার যথাক্রমে অজয় ঘোষ, সুজিত কর, দিলীপ ভট্টাচার্য, পঙ্কজ চক্রবর্তী, প্রবীন সেন, ইন্দ্রাণী গোস্বামী, শুভ্রা শীল ও শর্মিষ্ঠা ভৌমিক, প্রতিটি আঙ্গিকের কাজ অত্যন্ত সুসংবদ্ধ হওয়ায় সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানটি একটি সৎ প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, নাট্য সম্পাদনা ও নির্দেশনার প্রতি যথাসম্ভব সুবিচার করেছেন জ্যোতিপ্রকাশ।

সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের 'ক্ষুধিত পাষাণ' নৃত্যনাট্যে গণেশ সিংহ ও বেবী গুপ্তা

রাহুমুক্ত ও গোলাপকাঁটা

বৈশালী নাট্য-সংস্থার অভিনয়-শিল্পীরা সম্প্রতি গয়েশপুরে 'রাহুমুক্ত' ও 'গোলাপ কাঁটা' নাটক দুটি খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করলেন। উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণের জন্য দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করেছেন চিত্ত দত্ত, পরেশ ঘোষ, প্রীতি ভট্টাচার্য, অমূল্য সরকার, অরুণ দাশগুপ্ত, জ্যোতি মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, সুভাষ মজুমদার, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, মণিকা দত্ত ও আগমনী দাশগুপ্তা, নাটকের আগে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাংবাদিক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক আকর্ষণীয় ভাষণের মাধ্যমে সংস্কৃতির নামে প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশী অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য যুব-সমাজকে আহ্বান জানান।

সিরাজের স্বপ্ন

নিবেদিতা এ্যাথলেটিক্স ক্লাবের সভ্যারা দশম বার্ষিক উৎসবের সমাপ্তি দিবস উপলক্ষে বঙ্কিম দাশগুপ্তের 'সিরাজের স্বপ্ন' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলো। অভিনয় মঞ্চ ছিলো নিবেদিতা প্রাঙ্গণে। তিনটি প্রধান চরিত্রে শ্যাম দেব, প্রেমতোষ এবং পরিমলের অভিনয় আকর্ষণীয় হয়। এ-ছাড়া মোটামুটি চরিত্র-চিত্রণের জন্য দেবনারায়ণ, প্রদীপ, রামদাস, বাসুদেব, রঞ্জিত ও শঙ্কর সুনাম পাবে। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন মাণিক ভট্টাচার্য।

চোর

বিড়লা মিউজিয়ামের নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বি আই টি এম ক্লাবের সভ্যারা মঞ্চস্থ করলেন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'চোর' নাটক। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করলেন—কে পি রক্ষিত, এস এন দত্ত, পি বি দাস ও জি মান্না, অন্যান্য ভূমিকায় লতিকা পাল ও কেয়া রায়ের অভিনয়ও দর্শকদের খুশী করে।

৪৩-এর পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি কর্তৃক অভিনীত 'সাজাহান' নাটকে সমর মিত্র, মলিনা দেবী ও সমর চট্টোপাধ্যায়

'সোনাই দীঘি' চিত্র-কাহিনী

ভাবনা কাজী। দুশ্চরিত্র এবং লম্পট বলেই তার পরিচয়। গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের দেওয়ান ছিলো ভাবনা কাজী। সারা বাংলা দেশ তার কার্যকলাপে ভীত, সন্ত্রস্ত। গ্রামে গ্রামে নারীহরণের স্রোত বইছে। এমন সময় দীঘলহাটির রাজা প্রতাপরুদ্রের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি ভাবনা কাজীর ঔদ্ধত্য দেখে বিচলিত হন। কিন্তু বাধা দিতে অপারগ। সে শক্তি তাঁর নেই।

দীঘলহাটির লক্ষ্মণ পণ্ডিত ভাটুক ঠাকুরের বোন সোনাইকে নিয়ে এ-কাহিনীর নাটকীয় সূচনা। ভাটুক ঠাকুরের স্ত্রী মুক্তকেশীর সংসারে

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনাই এক অবাঞ্ছিতা নারী। পরাধীনতার মাঝে তার প্রাত্যহিকতা। তবু প্রেম আসে। দুঃখী সোনাই একটুকরো সুখের মুখ দেখতে প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে না। বরং ভালবাসার রঙে রঙীন হয়। তাই প্রতাপরুদ্রের একমাত্র পুত্র মাধবের ভালবাসাকেই সে গ্রহণ করে। ঘর বাঁধতে চায়। মাধবও সাড়া দেয়।

কিন্তু আসন্ন মাধব-সোনাইয়ের মিলনে হঠাৎ ছন্দঃপতন হল। চাঁদর-হাটির রাজা তাঁর মেয়ের সঙ্গে মাধবের বিয়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করে প্রতাপ-রুদ্রকে খবর পাঠালেন। পিতা এ-প্রস্তাবে রাজী হলেন। আনন্দ প্রকাশও করলেন।

কিন্তু মাধব মুগ্ধ হল না। তীব্র আপত্তি জানাল। সোনাইকে ছেড়ে সে আর কাউকে ভালবাসতে বা বিয়ে করতে পারবে না।

পুত্রের কথায় প্রতাপরুদ্র স্তম্ভিত হলেন। তিনি মাধবকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়ে ঘোষণা করলেন প্রতাপরুদ্রের অবর্তমানে দীঘলহাটির রাজা হবেন তাঁর ভাগে যাদব।

মাধব বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হল। যাদব ছুটে এসে মাধবকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু রাজী হয় না সে। মনে তার সোনাই-এর স্বপ্ন। সানাইয়ের সুর। সে অন্য কোথাও ঘর বাঁধবে?

কিন্তু চরম ঘটনাটা ঘটল চলে যাবার দিন। সেদিন রাজপ্রাসাদে

'শ্রীগৌরাঙ্গ' চিত্রে শ্রীমতী কল্যাণী মণ্ডল

চিত্র: দেবু দাস

উৎসবের আনন্দ। মাধবের অবর্তমানে চাঁদরহাটির রাজার মেয়ের সঙ্গে যাদবের বিয়ে। রাজবাড়ীতে তাই আনন্দের হাট বসেছে। মাধব এক-মুহূর্তের জন্য এই আনন্দ উপভোগ করতে সোনাইকে সতীমার ঘাটে রেখে চলে যায়।

এই অবসরে সোনাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাবনা কাজীর দলবল। ওরা জোর করে ভাবনার কাছে নিয়ে চলে যায়।

মাধব ফিরে এসে দেখে ঘাট শূন্য। নেই। সোনাই নেই। মাধব অনুমানে বুঝতে পারে, ছুটে যায় ভাটুক ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তখন এর প্রতিশোধ নিতে দলে দলে লোক জড় করেন। গ্রামবাসীরা ক্ষেপে ওঠে। ভাবনা কাজীর উদ্দেশ্যে সবাই এগিয়ে যায় সোনাইকে উদ্ধার করতে। মাঝপথে ভাবনার বজরাতে বীরবিক্রমে ছিপ নিয়ে ওরা ঘিরে ফেলে সোনাইকে মুক্ত করে মাধবের হাতে ফিরিয়ে দেয় ঠাকুরের দল।

সোনাইকে নিয়ে মাধব ফিরে আসে রাজপ্রাসাদে। ছোট ভাইকে ফিরে পেয়ে যাদব আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু ওদিকে ভাবনা কাজী সোনাইকে না পাওয়ায় হিংস্র হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রতাপরুদ্রকে খবর পাঠায়। ভাবনার ছলনা বুঝতে না পেরে যখন প্রতাপরুদ্র তার দরবারে হাজির হন তখন দেওয়ানের হাতে তিনি বন্দী হলেন।

আর এদিকে বাচস্পতি সমাজে ঘোষণা করলেন সোনাই অপহৃতা। সুতরাং সমাজে তার স্থান নেই। কিন্তু যুবরাজ যাদব সোনাইকে রাজবাড়ীতে স্থান দিয়ে বাচস্পতিকে জানিয়ে দেয় সোনাই মাধবের স্ত্রী। রাজবাড়ীর বধূ।

মাধব তখন পিতার বন্দীর খবর পেয়ে ভাবনা কাজীর প্রাসাদে ছুটে যায়। নিজে বন্দী হয়ে পিতাকে মুক্ত করে। প্রতাপরুদ্র মুক্তি পেয়ে প্রাসাদে ছুটে আসেন।

ভাবনা কাজী মোটেই সন্তুষ্ট নয়। প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় দীঘলহাটির সাধারণ মানুষের সঙ্গে। যাদব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়। সোনাই যুদ্ধ থামাতে চলে যায় ভাবনার কাছে সতীত্ব বিসর্জন দিতে। কিন্তু সোনাইয়ের সতীত্বের আগুনে ভাবনা কাজীর অভিশপ্ত জীবন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আর জয় হয় সত্যের। মাধব ফিরে পায় সোনাইকে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এই কল্পিত কাহিনীর নাম 'সোনাই দীঘি।' যাত্রাসফল এ-নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন, অঞ্জনা ভৌমিক, নির্মলকুমার, দিলীপ রায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা (ঘোষ), সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল ও ছায়া দেবী প্রমুখ।

'শ্রীগৌরাঙ্গ' চিত্রে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে কল্যাণী মণ্ডল   চিত্র : দেবু দাস

সুর্যপরশ

শ্রীঅনিল সরকারের অপরাধমূলক কাহিনী 'সূর্যপরশ' চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। এই অপরাধমূলক কাহিনীকে চিত্রে রূপদান করছেন চিত্র-পরিচালক শ্রীখগেন রায়। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পীকে চুক্তিবদ্ধ করার জন্য শ্রীরায় বোম্বাইয়ের পথে যাত্রা করেছেন। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুখেন দাস, উদয়কুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, দীপ্তি রায়, সমিতা বিশ্বাস, অঞ্জলি রায়, সন্ধ্যা কাপুর, পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনিল চৌধুরীর সুরে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন আশা ভোঁসলে, সবিতা চৌধুরী, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে। নিতাই দাস ফিল্মসের প্রযোজনায় চিত্রটি দ্রুত অগ্রসরমাণ।

দৃষ্টিদর্পণ

শ্রীদিলীপ দে-চৌধুরী রচিত এক অন্ধ-গায়িকার জীবনের করুণ কাহিনীকে রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করছেন তরুণ চিত্র-পরিচালক রঞ্জন মজুমদার। সঙ্গীতবহুল চিত্রটির সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ও সুরকার শ্যামল মিত্র। চিত্রটিতে এ পর্যন্ত যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন ছায়া দেবী, কণিকা মজুমদার, অনুভা গুপ্তা, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, জহর রায়, নির্মলকুমার, রবি ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, গীতা দে। চিত্রটির নায়কের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, অন্ধ-গায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। এস জি প্রোডাকসন্সের চিত্র 'দৃষ্টি-দর্পণ।'

ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য

সাধক শংকরাচার্যের মহান জীবনালেখ্য চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। এই মহামানবের জীবন-কাহিনীকে পর্দায় প্রতিফলিত করার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন চিত্র-পরিচালক হীর ভঞ্জ। ভগবান শ্রীশংকরাচার্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এক নবাগত শিল্পী। চিত্রটির সুর-সংযোজনায় রয়েছেন প্রখ্যাত ও প্রবীণ সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীকালীপদ সেন। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন শ্রীসুকুমার বসু। চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালক তাঁর শিল্পী কলা-কুশলীদের নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে রওনা হয়ে গেছেন।

চেনা-অচেনা

স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীকৃত সামাজিক কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন প্রবীণ চিত্র-পরিচালক শ্রীহীরেন নাগ। চিত্রটির পরিবেশনায় থাকছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস। চিত্রটিতে সুরসৃষ্টি করেছেন বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ও সুরকার হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে আছেন বিকাশ রায়, সুমিতা সান্যাল, ছায়া দেবী, বিদ্যা রাও, গণেশ নাগ, বঙ্কিম ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। চিত্রটি মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

চৈতালী

খ্যাতিমান লেখক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর কাহিনী চৈতালীকে রঙীন চিত্রে চিত্রায়িত করছেন আর ডি বনশল। চিত্রটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির নায়কের চরিত্রে দেখতে পাবেন উত্তমকুমারকে। উত্তমকুমারের বিপরীতে রয়েছেন বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী তনুজা। চিত্রটির সঙ্গীত বিভাগের ভার নিয়েছেন প্রবীণ সঙ্গীত-শিল্পী ও প্রখ্যাত সুরকার শ্রীশচীনদেব বর্মণ। চিত্রটির নেপথ্যে যাঁরা যাঁরা

'পান্না হীরে চুনী' চিত্রের বিশিষ্ট শিল্পী জ্যোৎস্না বিশ্বাস

'দৃষ্টি-দর্পণ' চিত্রের একটি বিষণ্ণ মুহূর্তে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও গীতা দে

গেয়েছেন তাঁরা হলেন লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে ও মান্না দে।

গৌরী মা

মহীয়সী রমণী 'গৌরী মা'র বিরাট প্রেরণা ও আকর্ষণীয় জীবন-কাহিনী রুপালী পর্দায় ফুটিয়ে তুলছেন চিত্র-পরিচালক রবি বসু। চিত্রটির সুরকার হলেন অপরেশ লাহিড়ী। এই ভক্তি-মূলক চিত্রটিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন পদ্মা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, তপতী দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

রাহগীর
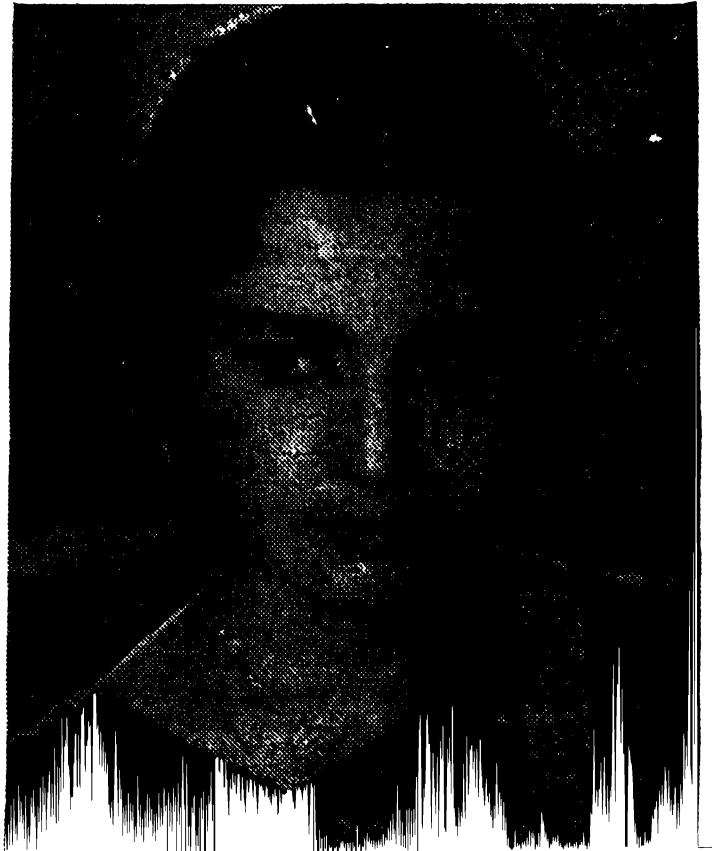
জনপ্রিয় ও বহুল প্রদর্শিত 'পলাতক' চিত্রটির হিন্দীরূপ বর্তমানে চলছে। পলাতকের হিন্দী নামকরণ করা হয়েছে 'রাহগীর'। রাহগীর চিত্রটি পরিচালনা করছেন স্বনামধন্য চিত্র-পরিচালক তরুণ মজুমদার। চিত্রটিতে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। রাহগীর শিল্পী-তালিকায় আছেন সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, শশিকলা, বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, নিরূপা রায়, কানহাইয়ালাল, জহর রায়, ইফতিকার, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অসিত সেন, আনওয়ার হোসেন, চমনপুরী ও শিশুশিল্পী প্রসেনজিৎ প্রমুখ। গীতাঞ্জলি চিত্রদীপের ছবি রাহগীর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 'ভরত পুরস্কার' বিজয়ী অভিনেতা উত্তমকুমার। ছবিতে শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী ও প্রযোজক শ্রীকান্তকে দেখা যাচ্ছে

যৌন জ্ঞান

কেউ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ, ভীত হয় কেউ, অন্যজন দংশন করে। কিন্তু, বলেছেন বিজ্ঞ মানুষ, সবচেয়ে বিশ্রি কাণ্ড ঘটে চুম্বিতার চুম্বিত ওষ্ঠে যখন হাসির ঢেউ রিন্ রিন্ শব্দে মুহুর্মুহু ভেঙে পড়ে। অবস্থা যখন হাস্যকর, তখন তা অনায়ত্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমূহ এবং ব্যক্তিক কথা যেহেতু কাছে আনার, গভীরভাবে আকর্ষণের মধুরতম উপায়, না বলা বাণী যেহেতু না কি এরই মাধ্যমে মনান্তরে পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃত পন্থা, সে জন্যই হাস্য এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনের চোখে এত মারাত্মক। 'ঠোঁটের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'---চুম্বনকারী মানেরই আশা এই চুম্বিতার কাছ থেকে শোনার।

বসন্ত না কি মোপাসাঁর চোখে ক্যানি-আকর। আর সে ব্যাধি-মাধ্যমের মধ্যে সব সেরা বোধ করি চুম্বন। যে চুম্বন 'হাস-বিকচ-বিম্বাধরে' আঁকা মাত্র 'বিশ মদিরায় সংজ্ঞা আমার টুটে' বলেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় নায়িকা। এ জন্যই কি ভয়ে ভয়ে শেক্সপীয়র লিখেছিলেন, 'টেক্, ও টেক দোজ লিপস এ্যাওয়ে।'

হুঁসিয়ার ব্যক্তি, সন্দেহ নেই।

জর্জ মেরেডিথ্ আর একজন হুঁস-অলা ইংরেজ কবি। সার বুঝেছিলেন তিনি 'কিসিং ডো-ন্ট লাস্ট, কুকারি ডু।'

চুম্বন এসেছে ক্ষণকালের পরমায়ু নিয়ে (শবদ অন্তে ফুরিয়ে সে যায়, এই তারি আনন্দ?), রান্নাঘরের প্রভাব চিরকালের পরোয়ানা পেয়েছে।

ক্ষণস্থায়ী? হবেও বা। তবে ওজনে কমতি নেই। ম্যাক্স ফ্যাক্টর হিসেব দিয়েছেন: প্রথম শ্রেণীর চুম্বন ওজনে দশ পাউণ্ড, আত্মহারা মুহূর্তে—বিশ্বাস করুন বা না করুন—পঁচিশ পাউণ্ড।

সম্প্রতি গবেষণা চলেছে—ও দেশে, গো-এষণার স্বর্গভূমিতে—চুম্বনে কী কী রোগ হয় এবং হওয়া সম্ভব।

রোগ ত' আছেই, জন্মানোর পরই মুখে জন্ম নেয় কোক্কি এবং স্ট্রেপ্টো-কোক্কি। অ্যানিরোবেস্ আর ইরোবেস্—দুই সহচর জীবাণু, মৌখিক। প্রথমটি অক্সিজেন ছাড়াই সজীব, দ্বিতীয়টির অবশ্য জীবনধারণের জন্য ঐ গ্যাসটি প্রয়োজন। তা ছাড়া, রীতিমত সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান মানুষের পক্ষেও নিউমোনিয়া অথবা মেনিঞ্জাইটিস্ রোগ-জীবাণুবাহী হওয়া সম্ভব, হয়ও। চুম্বন, বিশেষ তা গভীর হলে, বলছেন বাঘা পণ্ডিতরা, যে-কোন মুহূর্তে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য, এখনও তাঁরা জোনাথন সুইফ্ট-এর গলায় গলা মিলিয়ে বলেন নি, 'লর্ড আই ওয়াণ্ডার, হোয়াট ফুল ইট ওয়াজ হু ফার্স্ট ইনভেণ্টেড কিসিং!'

—হা ঈশ্বর! চুম্বনের আবিষ্কর্তা মূর্খটি কে?

চুম্বনতত্ত্ব

রুচিভেদ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন সংস্কৃত মহিলা-কবি মধুরবর্ণীর মতে 'চুম্বনে পারাবত' হওয়া প্রেমিকের বিশেষ গুণ। বিজ্জকা লিখে গেছেন: 'কেশাকর্ষণপূর্বক মুখোত্তোলন করিয়া যখন প্রেমিক (প্রেমিকাকে) বলপূর্বক চুম্বন করে, মানিনীর তখনকার সেই অস্পষ্ট 'হুঁ হুঁ', ধ্বনি জয়লাভ করুক।' ---ডঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরীর অনুবাদ।

কেন এই শ্লোক? উত্তর পাচ্ছি অজ্ঞাতনামা ইংরেজ কবির পংক্তিতে— চুম্বন ছাড়া (প্রেমরস দানা না বাঁধায়) অনেক প্রেমিকাই আকাশকুসুম হয়ে থাকতেন, ধরা দিতেন না গৃহের চতুঃসীমায়। বস্তুত, প্রাজ্ঞজনের বিজ্ঞমত ফুৎকারে উড়িয়ে না দিয়েও বোধ হয় বলা চলে, নু্য ইয়র্ক-এর বিচারক ল্যুই বুড্সকি-র ভাষায়: 'কিসিং ইজ পারফেক্টলি লীগাল এনিহয়ার এনি টাইম।'

—যত্রতত্র, যে কোনও সময় চুম্বন সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ব্যাপার।

এবং, যুগটা যেহেতু কেবল আইন-শৃংখলা রক্ষার, আসুন আমরা রবার্ট হেরিক আওড়াই প্রাণ খুলে:

Give me a kiss, and to that kiss add a score;
Then to that twenty, add a hundred more;
A thousand to that hundred; so kiss on,
To make that thousand up to a million.
Treble that million, and when that is done,
Lets' kiss afresh, as when we first begun.

একটি চুম্বন দাও,
আর আরও দাও তার সাথে;
শতেক চুম্বন মাগি,
দাও প্রিয়া, ক্ষতি কি বা তাতে।
হাজার চুমার পর থামিও না
চুম্বন চলুক,
অযুত নিযুত চুমা—
লোকে যাহা বলে তা বলুক।
অর্বুদ নির্বুদ চুমা,
গণনা যখন হার মানে,
শেষ থেকে সুরু হোক,
হে প্রিয়া, নতুন অভিযানে।

—বাৎস্যায়ন
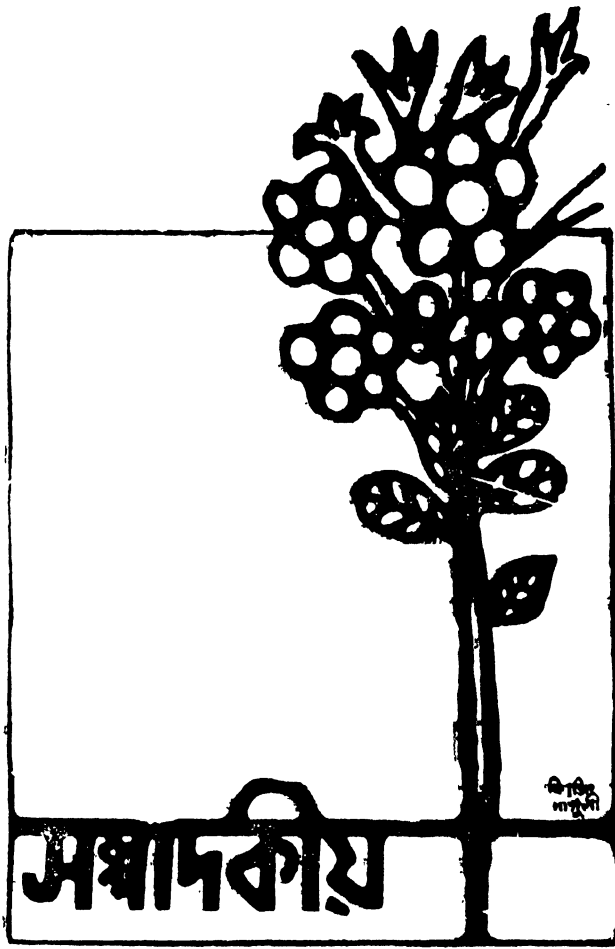
ম্যাকনামারার সফর ও মহানগরীর উন্নয়ন

ভারতের বৃহত্তম এবং পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহানগরী কলিকাতার নামের পূর্বে যদি কোন বিশেষণের প্রয়োগ অনুভূত হয় তাহা হইলে 'বিক্ষোভকারী' কথাটি বোধ করি সর্বাংশে প্রযোজ্য। কলিকাতার অধুনা-কালীন অবস্থা এবং বাস্তবচিত্র পর্যালোচন করিলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয় বিশেষণ আর একটিও মনে হইবে না। বৃহৎ-তুচ্ছ নির্বিশেষে যে-কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কারণে-অকারণে বিক্ষোভের সৃষ্টি এবং তাহার পরিণতিস্বরূপ সমগ্র নগরে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি, জাতীয় সম্পদনাশ, বাণিজ্যিক ক্ষতিসাধন—আজিকার নগর-জীবনের যেন এক প্রধান অঙ্গ।

কলিকাতায় সর্বশেষ যে বিক্ষোভটি ঘটিয়া গেল তাহা হইল প্রাক্তন মার্কিন সমরসচিব ও বর্তমানে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ ম্যাকনামারার কলিকাতা আগমনকে কেন্দ্র করিয়া। মিঃ ম্যাকনামারা কলিকাতা সফরের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিলেন তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল (?) হইল। ভারতের আরও নানা স্থান তিনি পরিভ্রমণ করিলেন এবং তুলনামূলকভাবে যখন তিনি এ নগরীর শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির আভিজাত্যের সভ্যতার বহু কীর্তিকাহিনী গৌরবগাথা ইতঃপূর্বে তিনি শুনিয়াছেন—সেই দেশের বর্তমান স্বরূপ যাহা দেখিয়া গেলেন সেই অনুসারে তৎসম্পর্কে যে মনোভাব তিনি অন্তরে পোষণ করিবেন তাহাতে নগরীর মুখে যে চুণকালি পড়িল জানি না তাহার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হইবে। অথচ এই বিদেশী ভদ্রলোক অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে যে মনোভাবেরই পরিচয় দিন এ দেশে তিনি আসিয়াছিলেন সম্পূর্ণ বন্ধুর ভূমিকাতেই। মহানগরী কলিকাতা আজ সর্বতোভাবে বিপন্ন। কি অর্থগত, কি স্বাস্থ্যগত, কি সামাজিক নিরাপত্তাগত সকল দিক দিয়াই আজ সেই অতীতের বিরাট ঐশ্বর্যশালিনী, সারা বিশ্বের ঈর্ষার কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরী ঘোর দুর্যোগের সম্মুখীন। রাস্তাঘাট এখানে অসংস্কৃত, বেকারীর চাপ এখানে ক্রমবর্ধমান, রাস্তাঘাটে জঞ্জালের স্তূপ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ সরবরাহে বিরতি, গৃহসমস্যা এবং সর্বোপরি সমাজ-বিরোধীদের অবর্ণনীয় দৌরাত্ম্য এবং পুলিশকে চ্যালেঞ্জস্বরূপ বড় বড় ভয়ঙ্কর ডাকাতি এই তো কলিকাতার বর্তমান আলেখ্য, যেমনই বেদনাবহ তেমনই সকরুণ। কলিকাতাবাসীকে একদিকে যেমন ভেজাল খাবারে, দূষিত জলে এবং অপরিচ্ছন্ন বস্তীতে বসবাসে (অবশ্যই সকলে নন) ক্রমশই ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে হইতেছে আবার তেমনই সমাজ-বিরোধীদের অতর্কিত ও বেপরোয়া আক্রমণে প্রায়ই সর্বস্বান্ত হইতে হইতেছে এবং মহিলাদের প্রায়শই সম্মান ও সম্ভ্রমের দিক দিয়া চরম সর্বনাশ সাধিত হইতেছে এবং বলিতে বাধা নাই এই জাতীয় উপদ্রব পুলিশ দমন করিতে ব্যর্থতাই বরণ করিয়াছেন। এই কলিকাতার এখনকার বাস্তবচিত্র সুতরাং সমস্যা অজস্র। কিন্তু সমাধানের পথ কই?

সেদিন—সেই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে মোগল বাদশাহ আলমগীরের রাজ্যকালে এই নগরীর জন্ম হইলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজেরই সৃষ্টি। ভারতের ইতিহাসে সে এক সন্ধিলগ্ন—সেই যুগান্তরকালেই ইংরেজ ধীরে ধীরে তিলে তিলে এই মহানগরীর পরিচর্যা সাধন করিয়া তাহাকে সর্বতোভাবে লাবণ্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে—ইহার গঠনপর্বে ইংরেজের স্বাক্ষর পরিপূর্ণভাবে স্বীকার্য। অবশ্যই এ কার্যে ইংরেজ আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তাহার আপন

উদ্দেশ্য সাধনে। আজ এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বর্তমান প্রয়োজনানুযায়ী এবং যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে কলিকাতার সর্বাঙ্গীণ সংস্কার ও উন্নয়নসাধন বিশেষ প্রয়োজন।

কলিকাতার উন্নয়ন লইয়াও অনেক বাগবিতণ্ডা আলাপ-আলোচনার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কথা যাহা হইয়াছে কাজ তাহার সিকির সিকিও হয় নাই। বস্তি-সমস্যা কলিকাতার আজ একটি প্রধান সমস্যা। অথচ কলিকাতার আশে-পাশে এমন বহু বিরাট পরিসরে ব্যাপ্ত প্রসারিত খালি জমি আছে যেখানে অনায়াসে সুন্দর সুন্দর আলো-হাওয়া-যুক্ত স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের উপযোগী পরিচ্ছন্ন বাসস্থান নির্মাণ করিয়া মানুষের অজস্র সমস্যার একটির অন্তত সমাধান করা যাইতে পারে।

কলিকাতার উন্নয়ন প্রকল্পে সি-এম পি-ও সংগঠিত হইয়াছে, তাহার কার্য পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কিছু সৎ, সহানুভূতিশীল এবং সেই সঙ্গে অভিজ্ঞ ও বিবেচক ব্যক্তির—যাঁহাদের নির্দেশনায় বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হইবে অর্থাৎ বিপুল অঙ্কের একটি বিরাট বরাদ্দ ভূতভোজন না হইয়া কয়েকটি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পকেট না ভরাইয়া যথার্থ কার্যে নিয়োজিত হইবে।

কি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কি অবাঙালী ব্যবসায়িবৃন্দ,—এই উভয় সম্প্রদায়কেই এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিতে আশা করা গিয়াছিল, দুঃখের বিষয় উভয় পক্ষই এ ব্যাপারে আমাদের একেবারে নিরাশ করিয়াছেন। যাঁহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্র এবং অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র হিসাবে কলিকাতাকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছেন সেই মহানগরীর এতবড় বিপর্যয়ে তাঁহারা যে ভাবে নির্বিকার, নির্লিপ্ত এবং আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে যেভাবে অবিচল আছেন, তাহাতে একটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে যে আর যে-কোন বস্তুর সহিতই তাঁহাদের সম্পর্ক থাকুক—নাই কেবল 'বিবেক' নামক বৃত্তিটির সহিত।

১৯৫৬ সালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-নিধনের তদানীন্তন ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া সর্বজনবরেণ্য দেশনায়ক স্বর্গত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া সাধারণ্যে বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

'বাঙলা ডুবিলে একা ডুবিবে না, সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়াই ডুবিবে'—

এই প্রসঙ্গে সেই কথাটিই আজ বারবার স্মৃতিপটে দোলা লাগাইতেছে।

উত্তরবঙ্গের বন্যা

সুজলা - সুফলা - মলয়জশীতলা এই বঙ্গভূমিকে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার লীলাভূমিরূপে সুদীর্ঘ কালের অবিরাম ধারায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব পটভূমি অনুধাবন করিয়া এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, এ দেশ শুধু জ্ঞানগরিমারই লীলাক্ষেত্র নয়—সেই সঙ্গে আজ তাহা প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরও লীলাক্ষেত্র। বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি বিপর্যয় আজ এক নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত বলা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অবশ্য অস্বাভাবিক বা অভিনব কিছু নয়। সৃষ্টির আদিম লগ্ন হইতে ইহার নিদর্শন অতি স্বাভাবিকভাবেই ভূরি ভূরি মিলিতেছে। প্রকৃতি তাহার সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলায় অবিরামভাবে পরিচয় দিয়া চলিতেছে। কখনও তাহার অবদানের প্রাচুর্যে পৃথিবী আরও সমৃদ্ধিশালিনী, লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিতেছে। কখনও আবার তাহার উন্মুক্ত প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলায় পৃথিবী এক সর্বনাশা ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে। পৃথিবীর ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

তবে, কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘন ঘন শিকার হইতেছে। ইহার প্রাদুর্ভাব ক্রমশই যেন ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে। এই জাতীয় দুর্যোগের দুঃসংবাদ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ঘন ঘন পূর্ণ হইতেছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়িয়া যেন এক প্রকৃতির প্রলয় নাচন এবং তাহাতে না আছে ক্লান্তি, না আছে শ্রান্তি, না আছে শান্তি।

কিন্তু শুধু অস্বাভাবিক নয়—আপত্তিকর অবস্থার উদ্ভব তখনই হয় যখন দেখা যায় যে এই জাতীয় দৈব-দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক জুয়াখেলা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। অসহায় নরনারীর বিপন্নবুদ্ধির শপথ লইয়া ভিতরে ভিতরে দলীয় উদ্দেশ্য সাধনকে আর যাই বলা যায় সাধু জনোচিত কার্যের পর্যায়ে তাহাকে কখনই ফেলা যাইতে পারে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণনার অতীত অসংখ্য নরনারীর উপর দৈব অভিশাপকে কাজে লাগানো যে কোন মনের পরিচয় বহন করে তাহার সুবিস্তৃত ও সম্যক ব্যাখ্যা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন স্থিতধী ব্যক্তির নিকট নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের বন্যা ও প্লাবনকে কেন্দ্র করিয়া এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে এইমত অভিমত ব্যক্ত করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। তথাকথিত বামপন্থী নেতাদের স্বরূপ আজ সূর্যালোকের মত স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। নিপীড়িত হতভাগ্য জনগণের নিকট সেই স্বরূপ আজ অস্পষ্ট বা অবোধ্য নয়। দেশপ্রেমের অগ্নি-পরীক্ষায় বলিতে বাধা নাই তাঁহারা কেহই যে উত্তীর্ণ হইয়া খাঁটি সোনা বলিয়া নিজেদের প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ১৯৬৭ সালের নয়-মাস স্থায়ী যুক্তফ্রণ্ট সরকারই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই নয়মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনে দেশের খাদ্যাবস্থা এবং মানুষের জীবনযাত্রা যে কোন চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল সে সকরুণ এবং ভয়াবহ স্মৃতি চিত্ত হইতে অপসৃত হওয়ার নয়।

বন্যাকে কেন্দ্র করিয়া ইঁহাদের অনেক কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম —কিন্তু যে বন্যায় বিধ্বস্ত নরনারীদের জন্য ইঁহাদের হৃদয় হাহাকারে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যাইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তাহার বিপরীত প্রতিচ্ছবি আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যথার্থ ত্রাণকার্যের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রচার-অভিযানই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিতেছে না কি? সরকারী সমালোচনাতেই এখন তাঁহাদের যথারীতি অধিক সময় ব্যয়িত হইতেছে না কি? এই দুর্যোগঘন মুহূর্তেও বিপর্যস্ত মানুষের যথাথ উদ্ধার সাধনের নাম করিয়া তাঁহাদের শতমুখে সরকারী ব্যর্থতা আলোচনায় ও নিজেদের গুণগানে তাঁহারা যতটা শক্তি, শ্রম ও অধ্যবসায় নিয়োগ করিতেছেন তাহার কিয়দংশও যদি যথার্থ ত্রাণকার্যে নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে অন্তত বহু বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু এবং অসহায় আর্তজন যথেষ্ট পরিমাণ উপকৃত হইতেন। সর্বনাশা দুর্যোগের মারাত্মক গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শান্তি ও স্বস্তির আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া অনেকখানি তৃপ্তির শ্বাস ফেলিতে পারিতেন।

এই দুর্যোগে, অবশ্য ইহাও মিথ্যা নয়, বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন, সাহায্য-দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং এই অর্থ ও দ্রব্যদান নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে. সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং উদ্দেশ্যবিহীন। এই পরোপকারী, মহান, সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মহৎ হৃদয়ের যথাযথ মর্যাদা হইয়াছে কি—সংবাদ-পত্রের বিবরণে বা বাস্তব অভিজ্ঞতায় সাহায্যের বহর দেখা বা শোনা বা জানা গিয়াছে, তাহার মান অনুযায়ী তো সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর ত্রাণকার্য অতীব সুচারুরূপে হওয়ার কথা. তৎসত্ত্বেও তাহা হইলে এ অভিযোগও কেন এখনও অবধি শ্রুত হইতেছে যে প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য সেখানে পৌঁছিতেছে না। ব্যাপারটিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই রহস্যজনক কিছু আছে। সাহায্যদ্রব্য যাহা প্রেরিত হইতেছে—মধ্যপথে নিশ্চয়ই তাহার একটি বিরাট অংশ সরিয়া যাইতেছে বা কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যদ্রব্য আদৌ প্রেরিত না হইয়া তাহা অন্য কার্যে লাগিতেছে। এই যেখানে অবস্থা সেক্ষেত্রে মানবতার কঙ্কালটুকুও অবশিষ্ট আছে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

অথচ দেখা গেল যে, বন্যার ব্যাপারে সর্বাগ্রে যিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং অসার কথার জাল না বুনিয়া প্রকৃত গঠনমূলক কথার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের একটি সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করিলেন—তিনি কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ। বিপদের সময়ে মানুষ কথার জাল চায় না, পরের সমালোচনা ও আত্মপ্রশংসা তাহার বেদনা ভরাইতে পারে না, বড় বড় বুকনির দ্বারা বিপদের সমাধান হয় না—এ কথাটি নিঃসন্দেহে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন এবং প্রকৃত গঠনমূলক পথের সন্ধান সেক্ষেত্রে প্রয়োজন—শ্রীঅতুল্য ঘোষের অভিনন্দনীয় কার্যাবলী এ প্রসঙ্গে তাহাই প্রমাণ করিল। এ প্রসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের হুমকীর পরিবর্তে তথাকথিত কয়েকজন বামপন্থী নেতৃবর্গ যদি কিছুটাও জনহিতকর গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন তাহা হইলে জনতার জয়মাল্য তাঁহাদের কণ্ঠেও অবশ্যই শোভা পাইত।
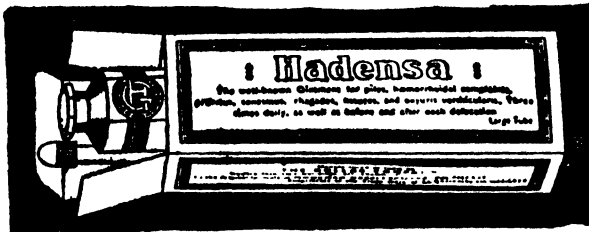
কলেজ স্ট্রীটের তাণ্ডব

বাঙলা দেশের গৌরবসূর্য বহুদিন ধরিয়াই অস্তাচলগামী। এ দেশের যে শিক্ষা - দীক্ষা - শৌর্য-বীর্য-গরিমার আলোক একদিন সমগ্র ভারতকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল, সেই অত্যুজ্জ্বল আলোক-রশ্মি আজ নির্বাপিতপ্রায়। তাহা আজ শুধু অতীতের স্মৃতিমাত্র। বর্তমানের পটভূমিতে তাহার আর স্থান নাই—ইতিহাসের অভ্যন্তরে আজ তাহার আশ্রয়। কিন্তু শত সহস্র ঝঞ্ঝা, বিপর্যয়, প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়াও সব কিছু হারানোর পরেও বাঙলা দেশের যে সম্পদ আজও বিদ্যমান—যে সম্পদের গুরুত্ব আজও অনস্বীকার্য, যাহার শ্রেষ্ঠত্ব আজও অবিসম্বাদিত—সে সম্পদ হইল সাহিত্যসম্পদ। বিশ্ববন্দিত বঙ্গ-সাহিত্যের অমর রূপকার পথিকৃত-দের সাধনার ধারা আজও অব্যাহত। জাতীয় জীবনের এই ঘোর দুর্যোগের মধ্যেও বাঙালী যে তাহার এই গৌরব-টিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে ইহা অবশ্যই ঈশ্বরের অসীম করুণার নামান্তরমাত্র।

কিন্তু অবশেষে এতদিনে এ গৌরবটিও বুঝি লুপ্ত হয় হয়। শেষ গৌরবটিও আজ যেন অপস্রয়মান। সাম্প্রতিক কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া এবং তাহার গতি অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আজ আমাদের বাধ্য হইয়া উপনীত হইতে হইতেছে। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলটিই বাঙালা সাহিত্য গ্রন্থের বিক্রয়ের এবং প্রকাশের প্রধান কেন্দ্র। তাই সাহিত্যের প্রকাশ এবং প্রসার উভয় দিক দিয়াই এই অঞ্চলটি সাহিত্যজগতে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইহারই মধ্যে শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় অব-স্থিত।

কথায় কথায় বিক্ষোভ এবং আন্দোলন এবং তাহার পরিণতিস্বরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সম্পদ নাশ, এখন এক নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। হাঙ্গামা-হুজ্জত এখন যেন ডাল-ভাতের ব্যাপার। দেশীয় বা আন্ত-র্জাতিক যে-কোন ব্যাপার লইয়াই বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে অমনই রণডঙ্কার গর্জিত হইয়া উঠিল এবং পরিণতিস্বরূপ একটি ছোটখাটো যুদ্ধ সংগঠিত হইয়া গেল, কিন্তু জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট হইয়া নিরীহ অসহায় জনসাধারণের দুর্ভোগের পথ আরও প্রশস্ত হইল, সমগ্র নগরজীবনে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইল।

কলেজ স্ট্রীটের এই নিয়ত গোল-যোগের ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুস্তক কেন্দ্রসমূহ। এই নিয়ত গোলযোগের ফলে মাসের মধ্যে কত দিন যে ঐ অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে কেনা-বেচা হয়, তাহা রীতিমত গবেষণা-সাপেক্ষ। কারণ যে অঞ্চল একটি যুদ্ধকাণ্ডের প্রতিনিয়তক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেখানে আর যাহাই হউক স্বাভাবিকভাবে কোন বিকিকিনি হইতে পারে না।

অধুনা শিক্ষাক্ষেত্রগুলি ক্রমশই তিলে তিলে রাজনৈতিক পীঠস্থানে যে পরিণত হইতেছে আশা করি এ সম্বন্ধে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই দ্বিমত হইবেন না। তথাকথিত ছাত্র-দরদীদের প্ররোচনায় দেশের ভরসা-ভবিষ্যৎ ছাত্রবৃন্দ আজ পুস্তক ও লেখনীর পরিবর্তে হস্তে ড্যাগার, টিয়ার গ্যাস ও বোমা ধারণ করিতে-ছেন। ছাত্রদের হাতে গ্রন্থের পরিবর্তে আজ বোমা। তদুপরি সমগ্র শিক্ষা-জগতে আজ 'বর বড় না কনে বড়' অর্থাৎ মাও-সে-তুং বড় না লি-শাও-চি বড় এই আলোচনাই আজ বিরাট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হব রাজ-নৈতিক নেতারা আজ যাঁহারা ছাত্র হিসাবে চিহ্নিত—তাঁহারা এই আলো-চনায় আজ এত মশগুল যে ধীরে ধীরে সমগ্র শিক্ষাজগতের চেহারাই বদলাইয়া ফেলিতেছেন। বোমা ফাটানো, ট্রাম-বাস পোড়ানো, সংঘর্ষ প্রভৃতি যেন তাঁহাদের পঠিতব্য বিষয়ের সিলেবাসে সর্বাগ্রে উল্লেখিত আছে।

ইঁহাদের তথাকথিত শুভৈষীদের অনুপ্রেরণায় (?) যে আত্মনিধনযজ্ঞে আজ ইঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, ইহার পরিণতি যে কোথায় এবং কতদূর ব্যাপী তাহা এখনও যদি ভাবিয়া দেখা না হয়, তাহা হইলে পরে সমগ্র যুগ ধরিয়া ভাবিলেও আর কোন ফল হইবে না।

এমনিতেই কিছুকাল ধরিয়া নানা-বিধ প্রতিকূলতার জন্যে বাঙলা গ্রন্থের ব্যাপক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যে পরিমাণ বিক্রয় পূর্বে বইয়ের বাজারে হইত এখন দেশের অর্থনৈতিক পরি-স্থিতির জন্য এমনিতেই আর সে বিক্রয় নাই। তদুপরি সরকারী পৃষ্ঠপোষণপুষ্ট গ্রন্থাগারসমূহ পূর্বের ন্যায় বর্তমানে আর সরকারী সহায়তা পাইতেছে না। ফলে বইয়ের বাজার আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এমতাবস্থায় এই অহেতুক গোলযোগে যদি মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বইয়ের দোকান-গুলির দরজা বন্ধ রাখিতে হয় তাহা হইলে এই ব্যবসায় বাঙলা দেশে আর কতদিন টিকিবে তাহা বলা রীতিমত দুঃসাধ্য।

দোকানগুলি ছাড়াও এই ভয়াবহ ক্ষতির এক বিরাট শিকার হইল ফুট-পাথের উপর যে-সকল বইয়ের দোকান সাজানো থাকে।

স্বল্পবিত্ত এই ছোট ছোট ব্যব-সায়ীরা যে মর্মান্তিক ক্ষতির নিত্য শিকার হইতেছেন তাহার গভীরতা কতখানি তাহা তাঁহাদের দোকান লুঠ করার প্রাক্কালে বা তাঁহাদের ত্রিপল প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগের প্রাক-মুহূর্তে এই অপকর্মের নায়কগণ একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? জনগণের প্রতি যাঁহারা মুখে এত দরদ দেখাইতে-ছেন কিন্তু এই সকল ক্রিয়াকলাপ জনগণ-প্রেমের কোন ধরণের নিদর্শন তাহা বুঝি না।

যাহাই হউক, এই ঘোর দুর্যোগের

অন্ততঃও বাঙলা দেশের বইয়ের বাজার এখনও যে টিঁকিয়া আছে ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

দুর্ভাবনার কারণ এই যে, দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত এখন যদি এইভাবে ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে যে দেশ শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির সৌরভে একদিন সমগ্র বিশ্ব আমোদিত করিয়াছিল তাহার সেই গৌরব নিঃশেষিত হইতে আর তো দেরী নাই। বাঙলা দেশে পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য আজ ভূলুণ্ঠিত, বাঙালীর জাতীয় আলেখ্যই আজ সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তিত। বর্তমান তো আমাদের গিয়াছে, ভবিষ্যতের ক্ষীণ আশাটুকু সযত্নে সশ্রম পরিচর্যার দ্বারা বীজ হইতে শাখা-চ্ছায়া সমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত করা শ্রেয় না অঙ্কুরেই তাহার বিনাশ সাধন শ্রেয়—এ বিচারের ভার আমরা দেশবাসী জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিলাম। উপসংহারে শুধু এইটুকু বলি যে, যদি শেষোক্ত পথটি বাছিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বাঙলা দেশের মহেঞ্জোদারোয় পরিণত হওয়া আর দিবাস্বপ্ন থাকিবে না।

সরোজ আচার্য

প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্য-সেবী সরোজ আচার্য গত ১লা কার্তিক ৬৩ বছর বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। মার্কসীয় দর্শনে অসামান্য ব্যুৎপত্তির অধিকারী সরোজ আচার্য ছাত্রজীবনে বৈপ্লবিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন এবং কারারুদ্ধ অবস্থাতেই ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়-করণিক ও একটি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত থাকার পর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন ও পরে আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদকের আসনে বৃত হন। কয়েকটি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। অসাধারণ বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতার জন্যে সুধীসমাজে একটি বিশেষ সম্মানের আসন তাঁর অধিকারে এসেছিল।

ডঃ সনৎকুমার বসু

প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সনৎকুমার বসু সম্প্রতি ৫৬ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। গণিতশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং অধ্যাপনা অবলম্বন করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি পি এইচ ডি অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে (১৯৫৮) ইনি হুগলী মহসীন কলেজ ও সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের অধ্যক্ষের আসন ও কিছুকাল রাজ্য সরকারের সহকারী শিক্ষা অধিকর্তার আসনে সমাসীন ছিলেন। ১৯৬৭ সালে অবসর গ্রহণ করে ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকেন। বিদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট গণিত প্রতিষ্ঠানের ইনি সদস্য ছিলেন।
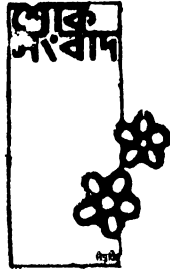
স্বর্ণপ্রভা সেন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্গত অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা সেন গত ৬ই কার্তিক ৭২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সাফল্যের সঙ্গে বি-টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হওয়ার পর ইনি নিজেকে শিক্ষাদানের কর্মে নিয়োজিতা করেন। বুনিয়াদি শিক্ষা-সংক্রান্ত বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলির পথিকৃৎস্বরূপ 'শিক্ষা' পত্রিকাটি ইনি সম্পাদনা করেছেন—তা ছাড়া ডোভার লেন শিল্পকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকারূপে তাঁকে দেখা গেছে এবং এ ছাড়াও বহু লোকহিতকর ও বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কলকাতায় অপরাধী শিশুদের বিচারালয়ে অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বও তিনি কিছুকাল পালন করেছেন।

নির্মলচন্দ্র সিংহ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নির্মলচন্দ্র সিংহ গত ১২ই কার্তিক ৭০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যায়তন কেশব একাডেমীর প্রধান শিক্ষকের আসনে দীর্ঘ চল্লিশ বছর সমাসীন থেকে সমগ্র বাঙলা দেশে একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ প্রধান শিক্ষকরূপে প্রভূত সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগেও উনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। এডিনবারার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি ডিপ-এড ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কবি ও সুরকার সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ১৫ই কার্তিক ৫৪ বছর বয়সে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। আধুনিক কবি হিসাবে পাঠকসমাজে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জনে সমর্থ হন। তাঁর লেখা গ্রন্থাদির মধ্যে আকাশমাটির গান ও একটি নির্জন তারার নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কালকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসদকুমার [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

কবিতা প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আমি 'মাসিক বসুমতী'র একজন নিয়মিত ও অনুরাগী পাঠক, যদিও আমি গ্রাহক নই। স্থানীয় পত্রিকার দোকান থেকে প্রত্যেক সংখ্যারই 'মাসিক বসুমতী' কিনে পাঠ করি। কারণ, আমার দৃঢ় ধারণা, বাংলা সাহিত্যে বসুমতীর একটা নিজস্ব অবদান আছে এবং বলা বাহুল্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বাড়ীতেও আমি প্রত্যহ বসুমতী রাখি। সে যাই হোক, বাংলা কবিতার সামান্য একজন অনুরাগী হিসাবে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই। কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনার যে মার্জিত রুচি, সক্ষ্ম রসবোধ ও অনাবিল সৌন্দর্যের পরিচয় মেলে তা কলকাতার বহু বিশিষ্ট পত্রিকা (সব পত্রিকা নয় তা বলে) সম্পাদকগণও হারিয়ে ফেলেছেন অশ্লীলতা, বিকৃত রুচির প্রভাবে। এটা আমার পক্ষপাতিত্ব নয়। যে কোন অভিজ্ঞ ও রস-পিপাসু কবিতা পাঠকমাত্রই অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে 'মাসিক বসুমতী'র প্রকাশিত কবিতাকে তুলনা করলে অতি সহজেই এই প্রভেদটি লক্ষ্য করতে সক্ষম হবেন।

বর্তমানে বাংলা গদ্য ও অনুবাদ কবিতা---বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে এবং নিঃসন্দেহে নূতন যুগের সূচনা করেছে। বাংলার বহু বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকগণ একে যথোচিত মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। বর্তমান যুগের কঠিন বাস্তবতা, প্রেম-প্রণয়, ব্যর্থতা-হতাশা, বঞ্চনা-নিষ্ঠুরতা এই গদ্য-কবিতায় অধিকাংশ প্রাধান্য লাভ করে মানুষের হৃদয়ের ভাষাকে আরও সুন্দর ও পরিস্ফুট করেছে। তবে দুঃখের কথা যে, বর্তমানে কিছুসংখ্যক তথাকথিত উঠতি লেখক এই কবিতার মহৎ উদ্দেশ্য ও পবিত্রতাকে উপেক্ষা করে অশ্লীলতার তুলি দিয়ে যা খুশী তাই লিখছেন। যাঁরা পূর্বে কবিতা পড়েন নি বা লেখেন নি এমন বহুসংখ্যক

ব্যক্তিও বর্তমানে গদ্য-কবিতা লিখছেন এবং কিছুসংখ্যক কলকাতার পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হচ্ছে। এতে আসল গদ্য-কবিতার উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে ও পাঠকদের হৃদয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। ঐ সব তথাকথিত 'কবিরা' মনে করেন যে, আপাত-দৃষ্টিতে এ-ধরণের কবিতায় ছন্দ যখন নেই, তখন যা খুশী তাই লিখলেই বুঝি পাঠকদের ভাঁওতা দিয়ে প্রশংসা কেনা যাবে। কিন্তু এ ধারণা অতি মারাত্মক। আপাতদৃষ্টিতে এ-কবিতায় 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র মত উপর-নীচে মিল না থাকলেও গদ্য-কবিতার অবশ্যই ছন্দ আছে। কাজেই গদ্য কবিতার গূঢ় রস ও মাধুর্য কোন অংশেই কম নয়। এবং এর ছন্দও হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। কাজেই প্রকৃত ছন্দের অভাবে ঐ সব তথাকথিত বেশীর ভাগ লেখকদের কোন কবিতাই হৃদয়াবেগকে আকর্ষণ করতে পারে না বরং বিরক্তির ও বিতস্পৃহতার সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে যারা সত্যিকারের কবিতার রসপিপাসু ও আগ্রহশীল পাঠক, তাদের হতাশ ও ব্যথিত করে সত্যকার রসঘন কবিতাকে পরোক্ষভাবে অপমানিত করে।

এই প্রসঙ্গে আমি মনে করি যে, সাপ্তাহিক ও মাসিক বসুমতী যথেষ্ট যত্নবান ও সজাগ। সেই কারণে বাংলা কবিতা পাঠকদের কাছে ধন্যবাদের পাত্র। একমাত্র বসুমতীই বাংলা কবিতার রসপিপাসু পাঠকদের এখনও সত্যকার রসের সন্ধান দান করে যাচ্ছেন। আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি 'মাসিক বসুমতীর' এই পবিত্রতা চির অক্ষয় হোক।

গত ভাদ্র সংখ্যার 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত সব কবিতাগুলোই রসে-গুণে সমৃদ্ধ। শ্রীবিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অরুন্ধতী' কবিতাটি সর্বাপেক্ষা ভাল লেগেছে। সম্ভবত 'মাসিক বসুমতীতে' তিনি নবাগত। তা সত্ত্বেও উক্ত কবিতায় তাঁর প্রতিভা ও মৌলিকত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। তাছাড়া শ্রীগোপাল ভৌমিক রচিত 'ফাল্গুনের একটি দিন', শ্রীসুধীরকুমার দেবের 'প্রেম' এবং শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজের 'আমার হৃদয় যদি' কবিতাগুলো অপূর্ব হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সহ এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাবেন। ভবিষ্যতে এঁদের লেখা 'মাসিক বসুমতী'তে দেখতে পেলে সুখী হব।

---প্রলয়রাজ মুখোপাধ্যায়, ৩৮, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

'ঠিক করে লিখুন' সম্পর্কে

মহাশয়,

ভাদ্র মাসে প্রকাশিত, মাসিক বসুমতীতে, পত্রনবীশের 'ঠিক করে লিখুন' নামক প্রবন্ধটি আমাদের মত অনেক নবীশ-এর চোখ খুলে দিয়েছে। তবে অত সংক্ষিপ্ত সমাচার আমাকে ক্ষিপ্ত করেছে মাত্র। একটু বিশদ ব্যাখ্যা পেলে বাস্তবিক উপকার হতো।

অনুগ্রহপূর্বক বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করবেন। আপনাকে আর একটি অনুরোধ জানাচ্ছি যে, নাট্যলোক, ছায়াছবি, মায়ালোক ছাড়া ফিরপো, গ্র্যাণ্ড, পার্ক হোটেল প্রভৃতি হোটেল-এ যে 'শো' হয় সে সম্বন্ধে যদি কিছু বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয় তা একটু নতুন

হতে পারে। আমাদের মত ভেতো অথবা ভীতু বাঙ্গালীরা কদাচিৎ ও সব জায়গায় যেতে সাহস করে অথচ অবাঙ্গালীরা প্রায় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে হোটেলকেও বাদ দেন না। আশা করি, অনুরোধটি বিবেচনা করে দেখবেন, 'টেল অব হোটেল' সম্বন্ধে। বসুমতী আমার জীবনের বাল্যকাল থেকে টমাস সাহেবের 'বল পাখি সে কি আমায় ভালবাসে' থেকে আরম্ভ করেছিলো---আজও নব কলেবরে সে বরেণ্য হয়ে আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি---

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-বি বি-এস, ডি-টি-এম (ক্যাল), ডি-পি-এইচ, (লণ্ডন), ২ এফ, গড়চা ফার্স্ট লেন, কলি---১৯।

নারীসমাজ ও ঠাকুরবাড়ী সম্পর্কে

মহাশয়,

ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীদিলীপ মজুমদারের লেখা 'নারী স্বাধীনতা ও ঠাকুর বাড়ী' পড়লাম। কিন্তু এই নারী স্বাধীনতায় লেখার মধ্যে 'কেশবচন্দ্র সেনের' নাম দেখলাম না---ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বোধ হয় ১৮৬০ খৃঃ সর্বপ্রথম তাঁর ষোড়শ বর্ষীয়া স্ত্রীকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ উপেক্ষা করে কলিকাতার পথে খোলা 'ফিটন গাড়ীতে' চেপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র সেনের নাম থাকা উচিত ছিল।

---শ্রীসুনীলকুমার নিয়োগী, 'নিয়োগী লজ' আপকার গার্ডেন, আসানসোল।

পত্রিকা-সমালোচনা

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

১৩৭৫ সালের ভাদ্র সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে 'কলাকাকলি' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীসত্যশঙ্কর সুর মহাশয় লিখিত 'নীলদর্পণ নাটক' প্রবন্ধটি পড়লাম। এ-প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটির রচয়িতা শ্রীসুরকে আমি অভিনন্দন জানাই। তাঁর এই তথ্যপূর্ণ রচনাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের একজন ছাত্রী হয়ে আমি স্বীকার করছি যে, আমার পাঠ্য বিষয় 'নীলদর্পণ' নাটকটির জন্যে এই প্রবন্ধটি আমার যথে কাজে লেগেছে। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বাংলার এক অন্ধকারময় যুগ নিয়ে যথেষ্ট জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি পড়ে শ্রীসুরকে বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ভক্ত বলেই আমার মনে হয়। এবং তিনি যে বাংলা সাহিত্যের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি---সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবুও একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁর রচিত প্রবন্ধটিতে আমি ভাষাগত একটি মারাত্মক ত্রুটি লক্ষ্য করলাম। 'সাধু' অথবা 'চলিত'-এর যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে তিনি যদি প্রবন্ধটি লিখতেন, তাহলে উৎসাহী পাঠক-সমাজ আরও বেশী আনন্দিত হতে পারতেন। উভয় ভাষার মিশ্রণের ফলে প্রবন্ধটির 'রস' অনেকখানি ন হয়েছে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন---'সুতরাং বলা যেতে পারে নীলদর্পণ পরবর্তী সামাজিক নাটক সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে।' আবার এর পরবর্তী অনুচ্ছেদেই তিনি লিখেছেন,---'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইবার পর বৎসর ১৮৬১ সাল।' এ রকম অজস্র জায়গায় অজস্র সাধু-চলিতের ভুল তিনি করেছেন---যেটা এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচয়িতার কাছে আশা করতে পারি না। আশা করি তিনি এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও একটু সচেতন হবেন---বসুমতীর একজন নিয়মিত নগণ্য পাঠিকা হিসেবে এটুকুই আমার অনুরোধ।

---শ্রীমতী মণিকা দাশগুপ্ত, ৯১বি, মাইকেল দত্ত স্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩।

সাহিত্য, গল্প, সমালোচনা

মহাশয়, আপনাদের শ্রাবণের শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের 'আধুনিকতম সাহিত্য' প্রবন্ধটি ও ভাদ্রের শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বৌদ্ধ যুগের এক বারবনিতা' গল্পটির বিষয়ে কিছু নিবেদন করতে চাই। এই লেখক দুই জনকেই তাঁদের অনবদ্য রচনা ও একটি বিশেষ মননশীল ভাবধারা ফুটিয়ে তোলবার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অতি অল্প কথার মধ্যে শ্রীগুপ্ত আধুনিকতম সাহিত্যের পরিবেশনে যে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি আমরা দেখতে পাই---সেই বিষয়ে একটি বিশেষ কোণ থেকেও দৃষ্টি-ভঙ্গিমা দিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন, 'আজকালকার সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাহাতে আলো অপেক্ষা উত্তাপ বেশী---উত্তাপ অপেক্ষা দাহ বেশী----আনন্দ অপেক্ষা ব্যথা বেশী---ব্যথা অপেক্ষা জ্বালা বেশী, প্রসন্নতা অপেক্ষা তীব্রতা বেশী---তীব্রতা অপেক্ষা কুটিলতা বেশী---স্থৈর্য অপেক্ষা গতি বেশী, গতি অপেক্ষা ঘূর্ণি বেশী। এরচেয়ে সুন্দর ভাবে আর বোধ হয় আধুনিকতম সাহিত্যের অশ্লীলতার কথা বর্ণনা করা সম্ভবপর হয় না। মানুষের জীবনে জৈবিক প্রয়োজন আছে স্বীকার করি---সাহিত্যেও যে এর কিছু ছিটেফোঁটা এসে পড়বে না তাও না। তবে নর্দমার ঘোলা জলকে গঙ্গার জলে মিশিয়ে ফেলাটাই সাহিত্য নয়। পাঁকেই পঙ্কজ ফোটে তবে পঙ্কজের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে যেয়ে কেউ পাঁক ঘেঁটে তোলে না। এবং সেটা সাহিত্যও না। আজ আমাদের আধুনিকতম সাহিত্য নর্দমার ঘোলা জলে ও পাঁকে ভর্তি হয়ে গেছে। এটাই যেন আমরা আজ আধুনিকতম সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি বলে ধরে নিয়েছি। কেউ যদি শরৎচন্দ্রের "কিরণময়ী", "অভয়া", "সাবিত্রী" ও "রাজলক্ষ্মী" চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেন তবে দেখতে

পাবেন যে সমস্ত অশ্লীলতার হাত থেকে বাঁচিয়ে এই চরিত্রগুলির জীবন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন শরৎচন্দ্র। আমাদের পূর্বসূরীরা সাহিত্যে যে ভাবধারা রেখে গেছেন তাঁর ধারক ও বাহক হিসাবে আমরা কি বর্তমান সাহিত্যকে অশ্লীলতার হাত থেকে বাঁচাতে পারি না। সাহিত্য হচ্ছে চিরসুন্দরের জয়গাথা—এতে অশ্লীলতার কোন স্থান থাকতে পারে না—থাকাও উচিত নয়। তাই সুন্দরভাবে শ্রীগুপ্ত বলেছেন, "দেবতার শিল্প—মানুষের শিল্প যাহা তাহা অন্য ধরণের বস্তু।"

—শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮, সি এন রায় রোড, কলিকাতা।

বেচিতে চাই

মহাশয়,

আমার কাছে গত ১০।১২ বৎসরের পুরাতন মাসিক বসুমতী পড়িয়া আছে। আমি তাহা কোনও ভাল গ্রন্থাগারকে অথবা গ্রাম্য মহিলা সমিতিকে বিনামূল্যে দিয়া দিতে চাই। আপনি যদি তাহার কোনও ব্যবস্থা অথবা যোগাযোগ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

—বিদ্যুৎকুমার দত্ত। ২৬, রায় মথুরানাথ চৌধুরী স্ট্রীট, বরাহনগর, কলিকাতা।

●

মহাশয়,

আমার কাছে ১৩৪৪ হইতে ১৩৭৫ সালের বসুমতী আছে (বাঁধাই করা), আমি উহা বিক্রয় করিতে চাই। একত্রে বা পৃথকভাবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন।

—সনৎ ভট্টাচার্য, ৮৮।৩এ ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● শ্রীঅমলকুমার নন্দী, গ্রাম-।-পোঃ—গুড়গুড়িপল, জেলা—মেদিনীপুর ● ডঃ সীতেশচন্দ্র বসু, ডাক—হিজলি, (খড়গপুর হয়ে) জেলা—মেদিনীপুর— ● শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী, গ্রাম—মনোহরপুর (কালিয়াগঞ্জ), পঃ দিনাজপুর ● শ্রীবিরাজকুমার সিনহা, গ্রাম -।- ডাক—হালহালি, ত্রিপুরা ● ডঃ নীরদরঞ্জন বিশ্বাস, মেডিকেল অফিসার, যাত্রা সাব হেলথ সেণ্টার, ডাক—যাত্রা, বীরভূম ● জে সি ৪৩৭৬০ এন, ৬ সাব, বি এন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৯, কনসট্রকসন কোম্পানী (জি, আর, ই, এফ) অবধায়ক—৯৯, এ, পি ও ● শ্রীকামিনীকুমার শীল, ডাক—ফিরিঙ্গীবাজার, চট্টগ্রাম, ইস্ট পাকিস্তান ● হেড লাইট কিপার, দরিয়াপুর লাইট হাউস (কাঁথি হয়ে), জেলা—মেদিনীপুর ● ডঃ এইচ পি ভট্টাচার্য, গ্রাম -।- ডাক—হরিচরণপুর, জেলা—কেওনঝাড়, উড়িষ্যা ● সাহিত্য সম্পাদক, রিক্রিয়েশন ক্লাব (টিরোলজিক্যাল অফিস, গভঃ অব ইণ্ডিয়া কলিকাতা-২৭ ● শ্রী কে এল চৌধুরী, এস এস আর এম 'কিউ' ডিভিশন, ব্যাঙ্গালোর-২০ ● শ্রীমতী এস আর গাবুর, অবঃ—শ্রী এন কে গাবুর, গ্রাম -।- ডাক—নিমাতিদোমহনী (কালচিনি হয়ে), জেলা—জলপাইগুড়ি ● শ্রীশচীনন্দন চার, গ্রাম -।- ডাক—চেপকিয়া (গোবিন্দপুর হয়ে), জেলা—ধানবাদ।

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা ১০ টাকা পাঠালাম। মাসিক বসুমতী আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করবেন। শ্রীমতী চন্দনা সেন অবঃ—শ্রী জে এন সেন, ২৩ নিউ সারদী রোড, মাদ্রাজ—১০।

মাসিক বসুমতীর দেড় বছরের চাঁদা ২৪ টাকা পাঠালাম, পৌষ থেকে মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাবেন। শ্রীগোবিন্দদাস ঘোষ, বিহার।

ভাদ্র সংখ্যা থেকে এক বছরের চাঁদা বাবদ ১৮৲ টাকা পাঠালাম। মাসিক বসুমতী পাঠিয়ে সুখী করবেন। এইচ জি হাজরা, মেদিনীপুর।

মাসিক বসুমতীর কার্তিক ১৩৭৫ হইতে আগামী আশ্বিন '৭৬ পর্যন্ত এক বছরের চাঁদা ১৮ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অপর্ণা সান্যাল, হাজারীবাগ।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের গ্রাহক মূল্য ১৮ টাকা পাঠালাম। প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ে সুখী করবেন। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাবেন। বিজয়রতন গুপ্ত, দার্জিলিং।

ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে মাসিক বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন। বাসন্তী দেবী, রাজস্থান।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের সডাক চাঁদা ২০ টাকা পাঠানো হল। মাসিক বসুমতী পত্রিকা যথারীতি পাঠিয়ে সুখী করবেন। অধ্যক্ষ, সতীশচন্দ্র শিল্প বিদ্যালয়।

বর্তমান ১৩৭৫ সালের কার্তিক মাস হইতে এক বৎসরের সডাক গ্রাহক মূল্য ২০ টাকা মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইলাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাইলে সুখী হইব। সমরেন্দ্র মিশ্র।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৮ টাকা পাঠাইলাম। অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। গৌরগোপাল সামন্ত, পিংলা, মেদিনীপুর।

I am sending herewith the sum of Rs. 18·00 for the annual subscription from Pous 1375 B. S. to Agrahayan 1376 B.S. Please arrange to send the Masik Basumati regularly.—M. K, Basu, 3B, Waltair Park, Visakhapatnam-3, Andhra Pradesh.

বলাকা

গাছের পাখী

শিল্পী—শ্রীসুহৃদ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

॥ ৪৭ বর্ষ, মাঘ, ১৩৭৫ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা ॥

বিষয়াসক্তি

আসক্তি কেন হয়? জ্ঞানী বলেন—গুণবুদ্ধি দর্শনে আসক্তি হয়। ধনাসক্তি, ভোগাসক্তি—এ সব কেন হয়? ধন থেকে অনেক রকম সুখ-সুবিধা হয়; ধনের এ সব গুণ দর্শনে ধনে আসক্তি হয়। ভোগে সুখবোধ হয়, এই সংস্কার ও বিশ্বাস থাকায় সাংসারিকদের ভোগাসক্তি ও ভোগতৃষ্ণা হয়। আবার বিচারের দ্বারা ধনের বা ভোগের দোষ দর্শনে সমর্থ হ'লে আসক্তির পরিবর্তে [illegible] এসে পড়ে। বিষয়ভোগে আসক্তি ও তৃষ্ণা পরিণামে ত্রিবিধ দুঃখের ও বন্ধনের কারণ—সুবিচার দ্বারা আসক্তির এরূপ নানা রকম দোষ দর্শনে সমর্থ হলে তবেই আসক্তি গিয়ে বৈরাগ্যের (বিরক্তির) উদয় হতে পারে। তাই, আসক্তি দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সদ্বিচার ও তীব্র বৈরাগ্যের সহিত আসক্তির দোষ দর্শন। বস্তুবিচার দ্বারা যখন বিষয়ানন্দের অসারতা, ক্ষণস্থায়িতা, পরিণামবিরসতা স্পষ্ট বুঝা যায় তখনই কেবল আসক্তির বদলে বৈরাগ্য আসে।

মায়িক বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ চাই; বস্তু-বিচার দ্বারা বৈরাগ্য এলে, অসঙ্গ উপায় অবলম্বনই শ্রেয়ঃ পন্থা। কাম কাঞ্চনে আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন হয় না। সংসারীই হোক, আর যে-ই হোক, যতক্ষণ এই দুই বস্তুতে মন আছে, ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ বা শ্রদ্ধা কখনো আসবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বিষয়াসক্তি থাকলে—বিষয়ের উপর, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা থাকলে, তাঁর উপর ভালবাসা আসে না। সন্ন্যাস করলেও হয় না। বিষয়াসক্তি চলে গেলে চিত্তশুদ্ধ হয়—ব্যাকুলতা আসে; তবে যোগ হয়। তখন তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবে।

"যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনীকাঞ্চনে ভালোবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্ম-জ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারা যায়, আর দেহবুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়; তখন আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা বোধ হয়।

"বিষয়াসক্তি থেকেই বিষয়ের কামনা, বিষয়লাভের বাসনা, বিষয়চিন্তা, আর বিষয়বুদ্ধির নানা উপাধি পর পর এসে পড়ে।

"বিষয়ীরা ধনের, ঐশ্বর্যের, আদর করে, মনে করে এমন জিনিষ আর হবে না। শম্ভু বললে, 'এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদ-পদ্মে দিয়ে যাব, এই ইচ্ছে।'

"কি জান? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে বলে মনে করে ঈশ্বরও ঐশ্বর্যের আদর করেন। তাই আমি শম্ভুকে বলে-ছিলাম—'এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য; তাঁকে তুমি কি দিবে? তিনি কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি কি চান? টাকা নয়, বিষয় নয়; ভাব, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য—এই সব তিনি চান।"

বিষয়ীলোক

বিষয়ীলোক কাকে বলে? বিষয়াসক্তির প্রেরণায় যার মনো-বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির চিন্তা ও চর্চায় ব্যাপৃত থাকে,—যার বিষয়বুদ্ধি প্রবল, আর যে বিষয়রসে নিমজ্জিত হ'য়েই বেশি আনন্দ পায়, সে-ই বিষয়ীলোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বিষয়ীলোক টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়। পাছে কিছু দিতে হয় এই ভয়ে সাধু-সন্তদের কাছে যেতে চায় না। প্যালার ভয়। আর রাতদিন কেবল টাকা টাকা করে। মন একাগ্র করে ঈশ্বর-চিন্তা করবে কখন? তারা ছেলে বা স্ত্রীর জন্য যেমন কাঁদে, তেমনি ঈশ্বরের জন্য কই কাঁদে?

"বিষয়ীলোক দেখলেই খোসামুদে এসে জোটে, যেমন মরা গরু দেখলেই শকুনি পড়ে। তারা বলে, আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী! বলা ত নয় অমনি বাঁশ!

"সাধারণতঃ এরা তিনজনের দাস—মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস। আর খোসামোদের দাস ত' আছেই—তাই সালিমী, মোড়লী, এ সব পছন্দ করে।

"বিষয়ীলোকদের রোক নাই—হোলো হোলো, না হোলো না হোলো। একটা কাজ কচ্ছে,—সুবিধে হলো না তো ছেড়ে দিলে; আর একটা আরম্ভ করলো। আবার সেটা ভাল লাগলো না—ছেড়ে দিলে। যেটা আরম্ভ করেছে সেটাই রোক করে করবে তবে তো আগেকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। বিশেষ করে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিষয়ে এটা আরো বেশি দেখা যায়। তার কারণ বিষয়ী লোকদের ঈশ্বরে অনুরাগ কমই থাকে।

"তবে কখনো কখনো তাদেরও জ্ঞান দেখা যায়—যেন ফুটো দিয়ে সূর্যের একটি কিরণ আসছে। তাদেরও এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে। উন্মনা-সমাধি। সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়। বিষয় মেঘ।

"আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হল, তখন বিষয়ীলোক আসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতাম।

বিষ্ণু

বিষ্ণু শব্দের অর্থ জগৎ-ব্যাপক চিৎশক্তি। যাতে জগৎ অবস্থিত—যে চৈতন্য জগৎ-প্রতীতি-বিশিষ্ট, তারই নাম বিষ্ণু। যে সমষ্টি প্রাণ কর্তৃক এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড পরিধৃত, তিনিই বিষ্ণু। সাধনা ক্ষেত্রে তিনি প্রাণ নামে অভিহিত। শ্রুতিও আছে—'এই সমস্ত জগৎ প্রাণেই ধৃত। প্রলয়কালে যখন জগদ্-ভাব লুপ্ত হয়, তখন ভবিষ্যমান জগতের বীজসকল নিয়ে এই জগদ্ব্যাপক চৈতন্য বা প্রাণ যোগনিদ্রাগত থাকেন—যোগনিদ্রারূপিণী মাতৃসত্তায় নিমজ্জিত থাকেন; তখন তাঁর আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যখন মা আবার জীবভাবাপন্ন সংস্কাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তার নাম মন, আর প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অনুভূত ব্যষ্টি চৈতন্যের নাম প্রাণ এবং প্রতি জীবে নিয়ত প্রকাশমান বুদ্ধিই জ্ঞান নামে অভিহিত।

'প্রতি জীবে যাহা মন, প্রাণ ও জ্ঞান নামে অভিহিত, সমষ্টিতে তাহাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে বর্ণিত। বিষ্ণু প্রাণশক্তি—প্রাণময় বিশ্বব্যাপী পুরুষ। বিষ্ণুর স্থান হৃদয়পদ্ম বা অনাহতপদ্ম।'

"ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান—ব্রহ্মের এই ত্রিধা শক্তিতে যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী এবং তাদের পুংমৈথুন যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হয়েছে। সত্ত্বগুণে জগজ্জননী মহামায়া বিষ্ণুতে বৈষ্ণবীশক্তিসমন্বিতা হয়ে ত্রিজগৎ পালনোদ্দেশ্যে মাতৃবক্ষে মাতৃস্তনে অফুরন্ত পয়ঃসঞ্চার করেছেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই পালনীশক্তি বা বিষ্ণুশক্তি নীলবর্ণা, স্থিতি বা পুষ্টিসম্পন্না, সত্ত্বগুণান্বিতা; সুতরাং তিনি পালনতৎপরা। ইহাই গায়ত্রীর ভুবঃ—ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ তত্ত্ব, সাধনপথে অনাহতচক্র, আর মহাশক্তি মধ্যস্তরে পীনোন্নত-পয়োধরা বৈষ্ণবী (মহালক্ষ্মী) বা ক্রিয়াশক্তি—পালন বা স্থিতিতত্ত্ব। ইহাই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির ত্রিধা শক্তির মধ্যশক্তি—স্থিতি বা পালনশক্তি। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই ত্রিগুণাতীত জ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তি মহদ্‌ব্রহ্ম (গীতা—১৪।৩)।

শাস্ত্রে বিষ্ণুকে নীলোৎপলদল-প্রভ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর, বনমালী, গরুড়-বাহন বলে বর্ণনা আছে; বৈকুণ্ঠ বা গোলোক তাঁর বাসস্থান।

ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণুকে অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দন, হংস এবং নারায়ণ—এই অষ্টনামে স্তুতি করা হয়েছে। বিষ্ণুর ষোড়শ নামে আছেঃ—

'ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্॥
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্বকার্যেষু মাধবম্॥'

বিষ্ণুকে নীলবর্ণ কেন বলা হয়? মধ্যাহ্ন-গায়ত্রী 'বিষ্ণুরূপা সূর্যমণ্ডল মধ্যস্থা তার্ক্ষস্থা' বলে ধ্যেয়া। কুম্ভকে নীলোৎপলদলপ্রভ বিষ্ণুর ধ্যান করতে হয় বিষ্ণুগ্রন্থি বা অনাহত পদ্মে। এর কারণ হচ্ছে, সূর্যের প্রাভাতিক লোহিতাভ রশ্মিসমূহ দিবাভাগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমে আসে, আর নীলরশ্মিগুলি ক্রমশ বাড়তে থাকে। মধ্যাহ্নে সূর্যের নীলরশ্মিই পূর্ণ শক্তিমান—পুষ্টিক্রিয়াসমন্বিত হয়ে ওঠে জগতের সকলরকম পুষ্টিক্রিয়াই সূর্যদেবের এই নীলরশ্মিগুলি দ্বারা সংসাধিত হয়। মধ্যাহ্ন গায়ত্রীমাতা সবিতৃদেবতার সত্ত্বগুণযুক্ত স্থিতি, পুষ্টি বা পালনীশক্তি সমন্বিতা; তাই তিনি নীলবর্ণা, বিষ্ণুরূপা, স্থিতি বা পালনতৎপরা। বৈষ্ণবীর এবং
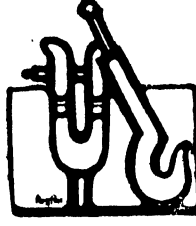
ধ্যানে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুষ্টি সহ অধিভৌতিক পুষ্টিও যথেষ্ট হয়ে থাকে। তাই নিত্য মধ্যাহ্নে বা মধ্যাহ্নের অল্প পূর্বে হৃদয়ের পশ্চাতে 'অনাহত ক্ষেত্রে', এমন কি, বিনা মন্ত্রোচ্চারণেও, কেবল নীলবর্ণ চিন্তা করে, মানুষের পিত্তধাতুর শান্তি হয়—দেহ স্নিগ্ধ হয়, সকল রকম পিত্তজ ব্যাধির উপশম হয়। দেহের পুষ্টির পক্ষে ইহা খুব উপকারী।

বিষ্ণুকে গরুড়বাহন কেন বলা হয়? ভাগবতে আছে, বেদই গরুড়পক্ষী (কিনা, কর্ম ও জ্ঞানরূপ পক্ষদ্বয় ভর করে বেদ সঞ্চরণশীল); ইনি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে বহন করেন। বিষ্ণু জগৎ-ব্যাপক চৈতন্য—মুক্তিদাতা। জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়াত্মক সাধনা দ্বারাই সর্বব্যাপী বিষ্ণু দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়। যোগবাশিষ্ঠ বলেন, যেমন পক্ষিগণ উভয়পক্ষ দ্বারা উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করে, সাধকগণও তেমনি জ্ঞান ও কর্মরূপ উভয়াত্মক সাধনা বলে বিষ্ণুর পরমপদের সন্ধান পায়—কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্মদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। জীব যখন বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের জ্ঞানময় অনুষ্ঠানতৎপর হয়, তখনই সে পক্ষীস্থানীয় হয়। বেদোক্ত কর্ম ও জ্ঞান এই দুটি গরুড়ের পক্ষস্থানীয়। এ ছাড়া গরুড়ের আর একটি ধর্ম হচ্ছে পন্নগাশনত্ব—সর্প ভক্ষণ। এই সর্প ভক্ষণ কি? কর্মসমূহ যতই জ্ঞানময় হতে থাকে ততই সংসারাসক্তি—দেহাত্ম-রূপী কুটিল গতি সর্প সকল বিনষ্ট হতে থাকে; ইহাই গরুড়ের সর্পভক্ষণ। মানুষ যখন এভাবে গরুড় ধর্ম লাভ করতে থাকে, তখনই দেখতে পায় মোক্ষদাতা বিষ্ণু তাতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই, জ্ঞানময় কর্ম যজ্ঞই—গরুড়ই, যজ্ঞেশ্বরের (বিষ্ণুর) বাহন। গীতাও বলেন—'সর্বগত ব্রহ্ম নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত' (গী—৩।১৫)।

বিষ্ণুকে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারী বলে কেন? ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেছেন—"শঙ্খ নাদশক্তির প্রতিভূ। যে প্রণবধ্বনি অনন্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, অনাহত চক্র হইতে সাধক যে ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার বিভিন্ন তরঙ্গসমূহ জগতে শব্দ আকারে পরিচিত—শঙ্খ তাহারই প্রতিনিধি। তাই গীতায় সারথিরূপী ভগবানের হাতে শঙ্খ সুশোভিত।

"চক্র শব্দের অর্থ জগৎ। অন্ন হইতে প্রাণী, পর্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জন্য, কর্ম হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে কর্ম এবং অক্ষর পুরুষ হইতে বেদ সম্ভূত। অনুলোম ও বিলোম-ভাবে এই চক্রবৎ গতির নাম সংসার। ইহাই বিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্র; ইহাই সুদর্শন নামে অভিহিত। সুদর্শন নাম কেন? ব্রহ্ম হইতে প্রবর্তিত এই জগৎচক্রকে যাঁহারা নিরত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তাঁহাদের চক্ষে এই চক্র অতি সুন্দর দর্শন।

"গদা—লয় বা সংহার শক্তির প্রতিভূ। যে শক্তি প্রভাবে এই জগৎচক্রের প্রলয় হয়, তাহাই গদা নামে অভিহিত। গদ্ ধাতুর অর্থ ব্যক্ত শব্দ; শঙ্খ বা প্রণব নাদে জগতের উৎপত্তি; উহা অব্যক্ত ধ্বনি। আর গদা বা ব্যক্ত নাদে ব্যোম্ (বি+ওম্) শব্দে জগতের প্রলয়। সুতরাং শঙ্খ-চক্র-গদাধারী বলিলে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্তা বুঝা যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেমভক্তি হয়; সে প্রেম ভক্তি যাবার নয়। জ্ঞান বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি (যদি) কমে যায়, আবার এক সময় হু হু করে বেড়ে যায়। তাই বলে,—বিষ্ণু অংশে ভক্তির বীজ যায় না।"

বিষ্ণুগ্রন্থি

অনাহত চক্র (মহর্লোক) বিষ্ণু বা বৈষ্ণবী শক্তির অধীন। তাই এই অনাহত ভূমি বিষ্ণুগ্রন্থি নামে প্রসিদ্ধ। এখানেই রক্ষা বা পুষ্টিকার্যসম্পন্ন হয়—এখানেই সাধক মন্ত্রাদি যোগপুষ্টতা লাভ করে। এটাই মধ্যভূমি—প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর রূপ 'ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্রের' যুক্ত ভূমি। ইহা মিশ্রসত্ত্ব ও মিশ্র রজোগুণ প্রধান। ইহা দ্বারা ভক্তি-উপাসনা ও যোগাদি অলৌকিক ধর্মকর্ম ও আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়স্বরূপ কর্মসকল সিদ্ধ হয়। ইহাতে বিদ্যাতত্ত্ব জ্ঞানলাভ হয়।

প্রাণ শুধু একটুখানি সংকীর্ণ অব্যক্ত চৈতন্যের আভাসমাত্র নয়—আমাদের প্রাণই নামরূপের আকারে আকারিত হয়ে আছে। সর্বব্যাপী মায়ের প্রাণ—গুরুর প্রাণই জীবের প্রাণরূপে অভিব্যক্ত—বিষয়মাত্রই প্রাণের মূর্তি। প্রাণ বললেই বিশ্বময় চিৎসত্তা বুঝায়। কিন্তু তবু নামরূপের প্রতি—বিষয়ের প্রতি যে একটা মমত্ববোধ, তা-ই আমাদের প্রাণময় গ্রন্থি বা বিষ্ণুগ্রন্থি;—ইহাই আমাদের সঞ্চিত কর্মসংস্কার। যখন এই গ্রন্থি ভেদ হয়ে যায়, তখন বুঝা যায়, প্রাণই বিশ্বময় চিৎসত্তা—তখনই প্রাণের প্রকৃত-রূপ হৃদয়ঙ্গম হয়—সঞ্চিত কর্মসংস্কারগুলি দগ্ধবীজবৎ হয়ে আর ফলপ্রসূ হয় না।

বিষ্ণু গ্রন্থিই প্রাণে প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কেন জান? প্রাণই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের মিলন বা গ্রন্থিবন্ধনের উপকরণ; প্রাণ প্রত্যক্ষভাবে স্থূলদেহের পরিচালক এবং মন-প্রাণের পরিচালক। সুতরাং প্রাণ শুদ্ধ বা স্থির হলে মনের ক্রিয়াযন্ত্র আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়; সেই সঙ্গে চিত্তপটে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রবৃত্তির বেগ ও নিবৃত্তির সংযম ক্রিয়াদি সকলরকম ভাবের যথাযথস্বরূপ লক্ষ্য পথে আসে।

বীজমন্ত্র

প্রত্যেক দেবতার একাক্ষর মন্ত্রগুলিই বীজমন্ত্র বা সেই সেই দেবতার প্রণব নামে উক্ত হয়। সাধকমাত্রই তাহা মূলমন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্ররূপে শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষার সময়ে প্রাপ্ত হন। বীজমন্ত্র গুরুমুখগত না হলে সিদ্ধিপ্রদ হয় না।

বীজ অর্থ হচ্ছে বীর্য—যা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হয়। —যা থেকে মনের শুদ্ধির সৃষ্টির হয়, মন-প্রাণ প্রাপ্ত হয়, তা-ই মন্ত্রবীর্য বা বীজমন্ত্র।

মন্ত্র চৈতন্য ছাড়া বীজমন্ত্র জপে সম্পূর্ণ ফল হয় না। তা হলেও সাধারণ সাধকের প্রভূত কল্যাণ বীজমন্ত্র জপে হয়ে থাকে।

বীজ মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, বীজ মন্ত্রটি সাধকের দর্শনে বা শ্রবণে এলেই তৎক্ষণাৎ ইষ্টের রূপ, পূজা, ধ্যানাদি স্মৃতিপটে এসে পড়ে। তাই হৃদয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে ইষ্টের ধারণার জন্য মুহুর্মুহু বীজমন্ত্র-জপে বেশি কাজ হয়। ক্রমাগত বিন্দু বিন্দু বারিপাতে যেমন প্রস্তরও ক্ষয় হয়, তেমনি বীজমন্ত্রের অবিরত জপে ইষ্টসাক্ষাৎকার সুগম হয়।

বিশেষ বিশেষ মাতৃকাবর্ণই বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্র। ওঁ সর্ববীজ-শ্রেষ্ঠ—আত্মা বা ব্রহ্মবীজ। এই প্রণব বীজ থেকেই সকল বীজ উৎপন্ন এবং উহাতেই সকল বীজ লয় হয়।

প্রণব বীজ ওঁকার আবার পঞ্চবিধঃ

(১) মূল প্রণব 'ওঁ'কার—ইহাই শব্দব্রহ্ম;

(২) দীর্ঘ প্রণব 'ঔঁ'কার—ইহাই স্ত্রী ও শূদ্র প্রণব;

(৩) বালা প্রণব 'ঐঁ'কার—;

(৪) শিব বা মৃত্যুঞ্জয় প্রণব 'হুঁ'; এবং

(৫) তারা প্রণব 'হূঁ'।

এই প্রণব বীজ ওঁ থেকে যে প্রধান বীজগুলি উৎপন্ন হয়েছে তাহা এইঃ—

(১) গুরুবীজ 'ঐঁ'—এই বীজকে বালা প্রণব, বালাদ্য, সরস্বতী, বাক্ এবং অধর বীজও বলা হয়;

(২) শক্তিবীজ 'হ্রীঁ'—ইহাকে ভুবনেশ্বরী, মহেশ্বরী, লজ্জা, মায়া, ধাত্রী, পরমেশ্বরী, মহামায়া, শিবা, ইত্যাদি বীজও বলা হয়।

(৩) রমা বা লক্ষ্মীবীজ 'শ্রীঁ'—একে কমলা বীজও বলে।

(৪) কামরাজ বীজ 'ক্লীঁ'—একে কৃষ্ণ, গোপাল, মদন, মন্মথ, এবং গুপ্তকালী বীজও বলে;

(৫) যোগবীজ 'ক্রীঁ'—একে কালী বীজ এবং রতি বীজও বলে;

(৬) রক্ষাবীজ 'হ্লীঁ' 'হলীঁ'—একে হলাদ এবং আহ্লাদ বীজও বলে;

(৭) শান্তি বীজ 'স্ত্রীঁ'—ইহাকে কামিনী, যোষিৎ এবং স্ত্রী বীজও বলে।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

মহাকবি গ্যেটে

পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের ধারায় অসংখ্য প্রতিভাধর কৃতবিদ্য মনীষীর মালিন্য-বিহীন ও হিরণ্যগর্ভ নামে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত প্রতিভা, মনীষা, মেধার বরপুত্রদের আবির্ভাব দলে দলে হয়েছে দেশে দেশে, কালে কালে—কিন্তু সর্ববিদ্যা-পারঙ্গম, সহস্রকর্মা ও ব্যাপক বৈচিত্র্যের পথগামী শক্তিধর পুরুষের সন্ধান সে অনুপাতে যথেষ্ট সংখ্যক মেলে নি। এই তালিকায় নগণ্য সংখ্যক কয়েকটি নামই উল্লেখিত হওয়ার দাবীদার। এই অঙ্গুলিগণ্য নামের মধ্যে মহাকবি গ্যেটে একটি অবিস্মরণীয় নাম।

মহাকবি বিশেষণটিই চিরকাল গ্যেটের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্যেটেকে কেবল যেন কাব্যজগতেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু গ্যেটের প্রতিভা শুধু বহুমুখীন বললে ভুল হয়—বলা যায় সর্বতোমুখীন। পূর্বকালে দ্য-ভিন্সির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল পরবর্তীকালে দেখা গেল গ্যেটে যেন সেই ধারারই এক উত্তর-সাধক।

কাব্যক্ষেত্রে, নাটক রচনা ও প্রয়োগ-কুশলতায়, আইনবিদ্যায়, প্রশাসনে, রাজনীতিতে, সঙ্গীতে, প্রাচ্যতত্ত্বে, শরীরতত্ত্বে, আবহবিজ্ঞানে এবং রসায়নে সকল ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতা প্রদর্শন করে গেছেন শতাব্দীর অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জোহান উলফগ্যাঙ্গ ফঁ গ্যেটে।

২৮এ আগস্ট ১৭৪৯ সালে ফ্র্যাঙ্ক-ফার্টে এক কারুশিল্পী পরিবারে গ্যেটের জন্ম। মা ছিলেন এক আইনজ্ঞ পরিবারের মেয়ে। বাবা একদিন আসন লাভ করেছিলেন তৎকালীন ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে।

প্রথম শিক্ষা লাইপজিগে তারপর স্ট্রাসবারায়। আইন ছিল পঠিতব্য বিষয়। কিন্তু একই সঙ্গে শুনতে থাকেন শরীর-তত্ত্ব এবং রসায়নের বক্তৃতাসমূহ। আবার সেই সময় নাট্যকলাও তাঁকে রীতিমত আকৃষ্ট করে তোলে। নাটকে তাঁর সর্বপ্রধান অনুপ্রেরণা সেক্সপীয়ার। বাইশ বছর বয়সেই নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

আইন পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর ওয়েজলারের সুপ্রীম কোর্টে কর্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু লেখায় ছেদ পড়ল না। কাব্য এবং নাটক রচনার মাধ্যমে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে সারা দেশ জুড়ে স্বীকৃতি পেলেন। ১৭৭৬ সালে গ্যেটে এসে বাসা বাঁধলেন ওয়াইমারে। এখানে প্রশাসনক্ষেত্রে তিনি প্রভূত দক্ষতা দেখালেন। মন্ত্রী-পদও তাঁর অধিকারে এল। সমরমন্ত্রী হিসাবে বৈদেশিক এবং খনিসংক্রান্ত বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর নৈপুণ্য প্রদর্শিত হ'ল। এখানে রঙ্গালয়-পরিচালক হিসাবেও প্রয়োগকুশলতার ক্ষেত্রে এক নবযুগের তিনি প্রবর্তন করলেন। সহযোগী শিলারের সহযোগিতায় জার্মাণ সাহিত্যের এক নতুন ধারার সৃষ্টি করলেন—আজ যে ধারা কালের কষ্টিপাথরে সসম্মানে স্বীকৃত হয়ে আছে।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—ফাউস্ট। অন্যগুলির নাম—দি সরোস অফ ইয়ং ওয়ের্দার, এগমাল্ট টাসো, ইফিজিনি, ওয়েস্ট-ইস্ট ডিভান, মেটামোরফসিস অফ প্ল্যাণ্টস্ প্রভৃতি।

দীর্ঘদিন ইটালীতে তিনি অতিবাহিত করেছেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অন্তরে ছিল গভীর শ্রদ্ধা। ভারতের শাশ্বত সাহিত্যসমূহের তিনি একজন সুবোদ্ধা পাঠক এবং এক সার্থক ভাষ্যকার। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা স্বর্গ-মর্ত্যের এক সেতুবন্ধন হিসাবে তাঁর মনোদৃষ্টিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল।

ওয়াইমারে ২২-এ মার্চ ১৮৩২ সালে তিরাশি বছর বয়সে তাঁর গৌরবময় জীবনের অবসান হয়। জীবিতকালে তাঁর শেষ কথা—আলো, আলো, আরো আলো।

আলোক-তপস্বীর কণ্ঠ থেকে এ মহান আলোকমন্ত্রের এক অমৃত উচ্চারণ

মহামানব শঙ্করাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শাস্ত্রে আছে জন্মলাভ করিয়া মানুষ শূদ্র থাকে, উপনয়ন সংস্কারের পর দ্বিজ হয়। সন্ন্যাস দ্বিজত্বের অবসান, সংসারের মৃত্যু, এই জন্যে বলা হয় সন্ন্যাসে মানুষের নবজন্ম লাভ হয়। নবজন্মের প্রস্তুতি হিসাবে শঙ্কর শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলেন।

সন্ন্যাস দুই রকমের (১) বিবিদিষা এবং (২) বিদ্বৎ।

সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া জ্ঞান লাভের জন্য বিরজা হোম করিয়া যে সন্ন্যাস তাহা বিবিদিষা। অনেক উচ্চ আধার জ্ঞানলাভের পরে ও শাস্ত্রবিধি পালনার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শঙ্কর যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তাহা বিদ্বৎ সন্ন্যাস। তবে বিদ্বৎ সন্ন্যাসী যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাসের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

শঙ্কর পরে তাহাও করিয়াছেন। মনে হয় কোমলমতি বালকের সন্ন্যাস গ্রহণে দেবগণও তুষ্ট। অলক্ষ্যে তাঁহাদের আশীর্বাদ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইয়া-ছেন সত্য কিন্তু তিনি মানুষ। দয়াদি-গুণ বিসর্জন দেন নাই। বরং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার অনু-পস্থিতিতে তাঁহার সম্পত্তির বিনিময়ে মাতা বিশিষ্টা দেবীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, তাঁহার নিরাপত্তা রক্ষা এবং অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করিবেন, এই শর্তে শঙ্কর গৃহত্যাগের পূর্বে এক আত্মীয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেন, গৃহ দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, মাতার পদধূলি ও আশীর্বাদ এবং প্রতিবেশীদের শুভেচ্ছা নিয়া শঙ্কর মহৎ উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিলেন। যাওয়ার পূর্বে আর একটা মহৎ কার্যের সূচনা করিয়া গেলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে শঙ্করের প্রার্থনার ফলে আলেয়াই নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার মাতার নদীতে নিত্যস্নানের সুবিধা হইয়াছে। নদীর তীরে যে মন্দির ছিল তাহার ভিত্তিতে ফাটল ধরাতে মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে এই লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

স্বামী তত্ত্বানন্দ

শঙ্কর পুরোহিতের অনুমতি নিয়া মন্দিরের বিগ্রহ সরাইয়া নিলেন এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে উঁহার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

শঙ্কর যখন গৃহত্যাগ করেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর জন্মস্থান কালাডি পরিত্যাগ করিয়া তিনি গুরুর উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী সৎগুরুই তাঁহাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের খবর দিতে পারেন, ভবনদী পার করাইয়া দিতে পারেন, জন্ম মৃত্যুর চক্র রোধ করিয়া দিতে পারেন এবং আত্যন্তিক দুঃখের অবসান ঘটাইতে পারেন। পথ চলিবার কালে নানা অসুবিধা সত্বেও তিনি নিত্য স্নান, সন্ধ্যা-বন্দনা, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ, ভগবৎ-ধ্যান, সুবিধা হইলে মন্দিরাদি দর্শন, বিগ্রহাদি প্রণাম করিতেন। কিছুকাল পথ চলার পর অবশেষে তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এক গ্রামে পৌঁছিলেন। একদিন নদীতে স্নানাদি সারিয়া এক বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, দেখিলেন কতকগুলি ব্যাঙ নিশ্চিন্ত মনে রৌদ্র পোহাইতেছে এবং এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে প্রচণ্ড সূর্যের তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে, ব্যাঙ খাদ্য, সর্প খাদক। খাদক খাদ্য পাইলে তাহাকে অচিরে খাইয়া ফেলে। খাদ্য-খাদকের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ সাধারণত দেখা যায় না। ভক্ষক ভক্ষ্যকে গ্রহণ করে না বরং তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে ইহা অস্বাভাবিক। হিংসা যাহার স্বভাব তাহার পক্ষে হিংসা বৃত্ত পরিত্যাগ অসম্ভব বলিলে চলে।

এইখানে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। যখনই সাধারণের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় তখন অন্য কিছুর প্রভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। যুক্তির উপর এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে পাওয়া যায় একমাত্র যোগীর যোগশক্তির প্রভাবে হিংসাবৃত্তি দূর হইতে পারে এবং অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

শঙ্কর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি জানেন যেখানে ব্রহ্মজ্ঞ যোগিপুরুষ বাস করেন সেখানে হিংসার প্রভাব খর্ব হয়। ভক্ষক ভক্ষ্যকে প্রীতির চক্ষে দেখে, সেখানে প্রকৃত শান্তি বিরাজ করে, যোগীর ত্যাগ-তপস্যা অসম্ভবকে সম্ভব করে।

শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয় না। শঙ্কর ইহার প্রমাণ পাইলেন, যোগীর সন্ধান মিলিল। তাঁহার নাম গোবিন্দপাদ। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, মধ্যভারতে নর্মদা তীরে ওঁকারনাথ পাহাড়ে এক নির্জন গুহায় সমাধি-মগ্ন থাকেন, মণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকাকার এবং অজাতবাদ প্রবর্তক প্রসিদ্ধ যোগী আচার্য তাঁহার

(গোবিন্দপাদের) গুরু। আধ্যাত্মিকতার মূর্তপ্রতীক গোবিন্দপাদকে শঙ্কর মনে মনে গুরুপদে বরণ করিলেন।

কিন্তু ওঁকারনাথ অনেক দূর। দুর্গম স্থান। বহু প্রাচীন কাল হইতে ওঁকারনাথ হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিচিত। এককালে ইহা রাজা মান্ধাতার রাজধানী ছিল। পুরাণে এই পার্বত্যস্থানকে বৈদূর্যমণি পর্বত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভারতের নানা স্থান হইতে বহুযাত্রী ওঁকারনাথ তীর্থ দর্শন করিতে আসে। মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শিব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুণ্যতীর্থ নর্মদা নদীতে স্নানাদি সারিয়া যাত্রিগণ শিব দর্শন করেন। শঙ্কর দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করিয়া বাঞ্ছিত স্থান ওঁকারনাথে আসিলেন।

শঙ্কর নর্মদায় স্নান সারিয়া পাহাড়ের উপর ওঁকারনাথ দর্শন করিলেন। পূজা, ধ্যান এবং স্তোত্রাদি দ্বারা শিবের প্রসন্নতা লাভ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার স্তব-স্তুতিতে শিব প্রসন্ন বলিয়া মনে হইল।

মন্দির নিকটে এক গুহামুখ দেখিতে পাইলেন। সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। গুহার মধ্যে কয়েকজন যোগী গভীর ভগবৎ ধ্যানে নিমগ্ন, তপস্যারত যোগীদের সম্মুখে ধুনীর কাঠ সাজান রহিয়াছে। তাঁহাদের ভগবৎচিন্তার প্রভাবে একটা পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন পরিবেশে শঙ্কর আনন্দিত হইলেন। একজন বৃদ্ধ যোগীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া শঙ্কর বিনয়সহকারে বলিলেন, 'আপনার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া আমি অপরাধ করিয়াছি। তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি মহাযোগী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ গুরু গোবিন্দপাদের সন্ধানে আসিয়াছি। তাঁহার কৃপা এবং আশীর্বাদ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইতে চাই। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি কোথায় থাকেন, কোথায় গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সন্ধান দিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। তাঁহার দর্শন লাভ, কৃপা এবং আশীর্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমার প্রাণে কিছুতেই শান্তি আসিবে না।'

শঙ্করের অদৃষ্ট ভাল। বৃদ্ধ যোগীর অন্তরে স্নেহ জাগিল। বালকের মনে আশার সঞ্চার হইল। সেই যুগে গ্যাস কিম্বা বিজলী বাতি ছিল না কিন্তু আলোর প্রয়োজন ছিল, অগ্নির আলোতেই মিটিত। বৃদ্ধ যোগী চকমকি পাথর ঘসিয়া আলো জ্বালিলেন এবং যে গুহায় গোবিন্দপাদ নিয়ত সমাধিতে মগ্ন থাকেন তাহা দেখাইয়া দিলেন। যোগী কখনও ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে নামেন না, গুহার বাহিরেও আসেন না, সমাধি ভঙ্গ হয়না বলিয়া অন্যেরা তাঁহাকে দেখিতেও পায় না। শঙ্করের অদ্ভুত সাহস অসীম ধৈর্য এবং গভীর ভক্তি। গুহার মুখ খুলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে যেন সাক্ষাৎ পাতঞ্জল ঋষি সমাধিমগ্ন। আশ্চর্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন যোগীর সৌম্যমূর্তি, প্রশান্ত বদন, তপস্যার প্রভাবে গুহা যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। উজ্জ্বল চেহারা আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

শঙ্করের পূর্বে কেহ আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক এই যোগীর সম্মুখে আসেন নাই, হয়ত আসিতেও সাহস করেন নাই। বালক শঙ্কর করজোড়ে তাঁহার নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন।

সরল প্রার্থনার মূল্য আছে। যাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইতে কেহ কখন দেখেন নাই আজ তিনি শঙ্করের প্রার্থনায় সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া 'আমি' 'আমার' জগতে ফিরিয়া আসিলেন, যে বালকের প্রার্থনায় যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল সে বালক সামান্য নয়, হয়ত যোগী এই চিহ্নিত বালকের জন্যই যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন নাই। বালকের মারফতে জগতের একটা নূতন আদর্শ তুলিয়া ধরিতে হইবে বলিয়াই এতকাল অপেক্ষা করিতেছিলেন। সময় হইয়াছে, বালক আসিয়াছে। মহাযোগী সমাধি হইতে নামিয়া বালককে কৃপা করিলেন। শিরচুম্বন করিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বালক শঙ্কর শ্রেষ্ঠ আধার, আজীবন তপস্যা এবং যোগাভ্যাসের ফল মানব কল্যাণে এই শ্রেষ্ঠ আধারে অর্পণ করিলে তাহা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হইবে, এই বিষয়ে যোগীর কোন সন্দেহ নাই। শুভদিন দেখিয়া তিনি বালককে কৃপা করিলেন। যথাবিধি বিরজা হোম করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেন। অচিরে উহা প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইবে। ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া অগণিত লোককে আশ্রয় দান করিবে। এই বৃক্ষের ফল খাইয়া তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিবেন। সারা জীবনের তপস্যা এবং যোগশক্তি উপযুক্ত শিষ্যকে দান করিয়া যোগী নিশ্চিন্ত হইলেন।

শঙ্করের জীবন সার্থক হইল। যাহার জন্য বিধবা মাতা বিশিষ্টাদেবী, বিষয়-সম্পত্তি, ইহকাল এবং পরকালের সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইল। শিষ্য যেমন উপযুক্ত আধার গোবিন্দপাদও তেমন উপযুক্ত গুরু। তিনি শঙ্করকে হটযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি বহু বিষয় একে একে শিক্ষা দিলেন যাতে শিষ্য সর্ব বিষয়ে উপযুক্ততা লাভ করিতে পারেন।

শিষ্যের অন্তর্নিহিত অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তাঁহার শারীরিক, মানসিক গঠন সম্বন্ধে গুরু সবিশেষ জানেন এই শিষ্যই হিন্দুধর্ম তথা বৈদিক ধর্ম, সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। সেই জন্য শিষ্যের সম্মুখে একটা আদর্শ কর্মসূচী তুলিয়া ধরিলেন, ভবিষ্যৎ সংগঠন কাজের সুবিধার জন্য মানব জাতির হিতার্থে ঐগুলিকে বাস্তবে রূপ দিবার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন, ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতে প্রসিদ্ধ তীর্থ বদ্রীনাথের নিকটে নির্জন স্থানে বাস করিয়া প্রস্থানত্রয়ের (উপনিষদ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের) ভাষ্য এবং অন্যান্য

শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন উক্ত কর্মসূচীর অঙ্গ। এই কর্মসূচী অনুসরণ করিলে বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হইবে এবং জগতের কল্যাণ স্থায়ী হইবে।

শঙ্কর প্রতিভাধর। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি গুরুর শিক্ষাদি আয়ত্ত করিলেন, শঙ্কর যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পাইলেন। গুরুর কৃপায় শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিলেন, জ্ঞানের চরম সীমায় উদ্ভাসিত হইলেন, অদ্বৈত বেদান্তের রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হইলেন, নির্বিশেষ ব্রহ্মলাভ করিলেন।

তাঁহার জীবনের পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিচার করিলে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিকজ্ঞানের গভীরতা জীবন-নাট্যে ভগবৎ মহিমা প্রচারের ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয়, গুরুর ছক্‌বাঁধা কর্মসূচী অনুসরণ দ্বারা ষোল বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রণয়ন এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা এবং শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদান প্রভৃতি অনেক ব্যাপার জানা যায়। তিনি ভারতের তিন দিকে তিনটি প্রসিদ্ধ ধামে এবং অন্যদিকে একটি মোট চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু তথা বৈদিক ধর্মে নূতন প্রেরণা জাগাইলেন, দশনামী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ভারতের নানা স্থানে ত্যাগ, তপস্যা, ভাব, ভক্তি ও জ্ঞানের বীজ ছড়াইলেন, কালে তাহাই ফুলে ফলে সজ্জিত হইয়া ভারতীয় ধর্ম-উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করে, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, পশ্চিমে দ্বারকা হইতে পূর্বে কামাখ্যা ধাম পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ ছুটাইয়া জীবন-যুদ্ধে জয়ী হন। দেশকে নাস্তিকতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বৈদিক ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

অষ্টম শতাব্দীতে সমস্ত আর্যাবর্তে যে আবহাওয়া সৃষ্টি করিলেন তাহার প্রভাব এখনও চলিতেছে। আধুনিক জগৎ বিজ্ঞানের বলে নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিলেও চিন্তাজগতে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। তিনি স্বল্পায়ু ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে হারকিউলিসের মত এত বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া সম্যক জয়লাভ করা সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁহার জীবন-রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তন আশাতীতভাবে দ্রুত হইয়াছিল। অদ্ভুত দৃশ্যগুলির মাধুর্য অনুভব করিবার সুযোগ পর্যন্ত ঘটিল না। তার পূর্বেই যবনিকা পতন হইল। এই সব নানা কারণে হিন্দুগণ বিশেষত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাঁহাকে মহামানবরূপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি কেহ পূজাও করিয়া থাকেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

শঙ্কর যে শুধু জ্ঞানের খনি ছিলেন তাহা নয়। স্বল্প আয়ুকালের মধ্যে তিনি অদ্ভুত যোগশক্তির পরিচয়ও দিয়াছেন। গুরু গোবিন্দপাদ আচার্যের নিকট শিক্ষাধীন অবস্থায় একবার নর্মদায় ভীষণ বন্যা হয়, কয়েক দিন অবিরাম বৃষ্টির ফলে নদীর জল স্ফীত হইয়া সব ভাসাইয়া লইয়া যায়, জল এত বাড়িয়াছিল যে তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদ যে-গুহায় বাস করিতেন তাহার দরজা পর্যন্ত আসিল। বন্যা কমিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না বরং ক্রমশ বাড়িয়া চলিল, গুরু গোবিন্দপাদ কয়েক দিন সমাধিতে মগ্ন হইয়া ছিলেন। সন্ন্যাসিগণ যোগীর জীবনের নিরাপত্তার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যদি ইতিমধ্যে তাঁহার সমাধি না ভাঙ্গে এবং বন্যার জল গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তবে তাঁহার জীবন রক্ষা সম্ভব হইবে না।

শঙ্কর অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলেন, সন্ন্যাসীদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন ভয়ের কোন কারণ নেই। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাঁহার গুরুর অনিষ্ট করিতে পারে। তাঁহার জীবন রক্ষার ব্যাপারে প্রকৃতিই সহায় হইবে। শঙ্কর এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। গুহার পার্শ্বে একটি মাটির কলস স্থাপন করিলেন। বন্যার জল বাড়িতে বাড়িতে হঠাৎ কলসীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু কোথায় যায় তাহার হদিস পাওয়া যায় না। বন্যার জল চারিদিক ভাসাইয়া নিলেও গুহার কোনপ্রকার অনিষ্ট হইল না। এইভাবে কনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর যোগশক্তির বলে গুরু গোবিন্দপাদের অমূল্য জীবন রক্ষা পাইল। এমন উচ্চ আধার না হইলে গুরু গোবিন্দপাদ আজীবন লব্ধ আধ্যাত্মিকতা এবং যোগশক্তি শঙ্করের মধ্যে সঞ্চার করিতেন না। গুরুশক্তি এবং শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি একত্রিত হইলে অসম্ভব সম্ভব হয়।

সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া গুরু গোবিন্দপাদ কনিষ্ঠ শিষ্য শঙ্করের গুরুভক্তির কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। ভগবৎ কৃপায় তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তোমার নির্বিশেষ ব্রহ্ম লাভ হইয়াছে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম লাভে জ্ঞান পূর্ণ হয়। তোমার তাহা হইয়াছে। সর্বশাস্ত্রের রহস্য তোমার নিকট উদঘাটিত হইয়াছে, তুমি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, সমস্ত যোগশক্তি তোমার করায়ত্ত। যদি তোমার আর কিছু বাসনা থাকে তাহা অকপটে বল। আমি তাহা পূর্ণ করিব।'

গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শঙ্কর বলিলেন, 'প্রভু আপনার শ্রীচরণে কোটি প্রণাম। ভগবৎ কৃপা এবং আপনার আশীর্বাদ আমার সম্বল। আমার কোনপ্রকার বাসনা নাই। আপনি আশীর্বাদ করুন আমি যেন ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকিতে পারি এবং সমাধিতে এই দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি।'

গুরুর কৃপায় নির্বিশেষ ব্রহ্ম লাভের পর সমাধি যোগে দেহত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি নাই। শঙ্করের অভিপ্রায় তাই। কিন্তু তাহা হইবার নয়, হয়ত ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরকম। গুরু গোবিন্দপাদও বাদ সাধিলেন। তাঁহার দেহ অপটু হইয়াছে, এখন দেহ রাখিবার ইচ্ছা। স্নেহভরে শিষ্যকে বলিলেন, 'বৎস, তোমার অভিপ্রায় জানিলাম, কিন্তু তোমার এখনও সময় হয় নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তুমি ধরাধামে জন্ম নিয়াছ। তোমাকে অনেক মহৎ কর্ম সাধন

করিতে হইবে। তোমার উপর গুরু-দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার যাওয়া হইবে না। তোমাকে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ধর্ম প্রতিষ্ঠা কঠিন কর্ম, উহা করিতে হইলে উহার ভিত্তিকে দৃঢ় করিতে হইবে। দৃঢ় না হইলে ভিত্তিতে ফাটল ধরিবে, প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হইবে না। উহা স্থায়ী করিতে হইলে শাস্ত্রের মূল রহস্য প্রচার করিতে হইবে। অদ্বৈত তত্ত্বই মূল তত্ত্ব, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ইহাই প্রকৃত এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত, ইহা আদর্শকে সঞ্জীবিত করে, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞানে প্রেরণা যোগায়, মহত্তম সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। ইহার মূল কথা বিশ্বাত্মবোধ, ধর্ম-বিশ্বমানব ধর্ম, বাণী বিশ্ব মৈত্রী, তত্ত্ব একত্ব। উদ্দেশ্য জ্ঞানের দ্বারা এই সত্যের আবিষ্কার, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থাপন। এই তত্ত্বকে কোন একটা বিশেষ যুগ বা সময় বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলিবে না। ইহা সর্ব-কালে, সর্ব সময়ে সব যুগের মানুষের মনে যাহাতে রেখাপাত করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই তত্ত্ব প্রচারের দ্বারা বৈদিক ধর্মের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তীর্থের তীর্থত্ব রক্ষা পাইবে। নাস্তিকতা অবিশ্বাস যাহা সমাজ, ধর্ম এবং দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক তাহা দূর হইবে। এই গুরু-দায়িত্ব ভগবৎ ইচ্ছায় তোমার উপর অর্পিত, তুমিই উপযুক্ত আধার, শুধু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তোমার দায়িত্ব শেষ হয় নাই। এখনও অনেক বাকী। তোমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই আমি এতকাল অপেক্ষা করিতে-ছিলাম, এখন আমার কর্ম শেষ হইয়াছে, এই সব গুরুদায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হইল। তুমি বারাণসী যাও, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার অনুমতি লইয়া দায়িত্ব পালন কর। আমার দেহরক্ষার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। আমি চলিলাম।'

এই বলিয়া প্রিয় শিষ্য শঙ্করের নিকট বিদায় নিয়া গুরু গোবিন্দপাদ সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। সমাধি আর ভাঙ্গে নাই। উহা মহাসমাধিতে পরিণত হইয়াছে। মুক্ত আত্মা মহাকাশে লীন হইয়াছে। তাঁহার দেহ পড়িয়া রহিল, তাঁহার মহাপ্রয়াণে আধ্যাত্মিক আকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল।

শঙ্করের জীবন-নাট্যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। গুরুর আদেশে তিনি বারাণসী আসিলেন। বরুণা এবং অসী উভয় নদীর মধ্যস্থল বারাণসী নামে খ্যাত। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার স্থান। ভারতীয় ধর্ম, হিন্দু শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। শাস্ত্রবিৎ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ, ভক্ত, জ্ঞানী সকলে বেদ-পাঠ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, ত্যাগ, তপস্যা, পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যানাদি অভ্যাস দ্বারা এই সংস্কৃতির উচ্চ মান বজায় রাখেন। এখানে শত সহস্র শিবমন্দির আছে, নিত্য গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা শিবের পূজা হয়। বেদপাঠ, প্রার্থনা, স্তোত্র, হর হর ব্যোম ব্যোম রবে আকাশ-বাতাস সর্বদা মুখরিত হয়। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার পূজা এবং আরতির সময় যখন কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে ওঠে তখন একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পুণ্যসলিলা গঙ্গা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি-রূপে সহরকে বেষ্টন করিয়া সহরের সৌন্দর্য অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছে। গঙ্গায় শত শত ঘাট, সহস্র সহস্র লোক নিত্য গঙ্গাস্নান সারিয়া বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ধন্য হন। হরিশ্চন্দ্র এবং মণি কর্ণিকার প্রসিদ্ধ শ্মশান-ঘাটে নিত্য বহু শব দাহ করা হয়। শ্মশানঘাট নিত্য মানুষের মনে বৈরাগ্য উৎপাদন করে, আর জানাইয়া দেয় যে জগৎ অনিত্য, মানুষের পরিণতি ওখানে, সুতরাং বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার শরণাপন্ন হইয়া জীবন যুদ্ধে পদক্ষেপ করা উচিত, নইলে শুধু আসা-যাওয়াই সার হইবে। চরম মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পিষিয়া মরিতে হইবে। শঙ্কর বৈরাগ্য ক্ষেত্র মণি-কর্ণিকার নিকটেই থাকিয়া গুরুর আদেশ প্রতিপালনার্থে অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রণালী, অকাট্য যুক্তি, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের সহায়ে কঠিন তত্ত্ব সহজ করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা, তপঃপুঞ্জ, উজ্জ্বল সাত্ত্বিক শারীরিক গঠন, অমায়িক ব্যবহার—সবই শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

মুক্তিকামী এবং ধর্মপিপাসুগণ তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে একটা আকর্ষণী শক্তি অনুভব করিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল এই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহাদের নিকট ধর্মের প্রকৃত আলো দেখাইয়া মুক্তির সন্ধান দিতে পারেন। তাঁহার প্রদর্শিত নূতন আদর্শ অনুসরণ করিলে জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তাঁহার মধ্যে স্বার্থের লেশ গন্ধ নাই। তাঁহার জীবন মানব-সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগাইয়া তোলা, তাঁহার ব্রত। তিনি আধ্যাত্মিকতার ডাইনেমো, তিনি মহামানব, বারাণসীর জনসাধারণ এই অদ্ভুত প্রতিভাশালী মহাপুরুষের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই।

সনন্দন চোল দেশের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্য মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। তিনি শান্তি চান। হৃদয়ে অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। তিনি এমন একজন আধ্যাত্মিক গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধানে ফিরিতেছিলেন যিনি তাঁহার মনের অন্ধকার ঘুচাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার সম্মুখে আলোক-বর্তিকা তুলিয়া ধরিতে পারেন। তিনি শঙ্করের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইলেন। তখন তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, শঙ্করের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিকতা, প্রেম ভালবাসায় মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে গুরুরূপে পাইয়া ধন্য হইলেন। সনন্দনই শঙ্করের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য। তিনি সন্ন্যাসী সংঘে পদ্মপাদ আচার্য নামে পরিচিত। তিনি পরে পুরী গোবর্ধন মঠের অধ্যক্ষ হন।

তার পূর্বে তিনি শঙ্কর-ভাষ্যের বার্তিক রচনা করেন। এই বার্তিক তাঁহার অমরকীর্তি।

একবার শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে গুরু শঙ্করের অনুমতি নিয়া রামেশ্বর তীর্থ ভ্রমণ করিতে যান। সঙ্গে স্বীয় রচিত ভাষ্য বার্তিক লইয়া যান। পথে মাতুলের গৃহে গ্রন্থখানি রাখিয়া যান। তাঁহার মাতুল প্রাভাকর মতাবলম্বী ছিলেন আর ভাগিনেয় পদ্মপাদ বিরুদ্ধমত পোষণ করেন। পদ্মপাদের গ্রন্থখানি প্রচারের সুবিধা পাইলে প্রাভাকর মত ম্লান হইয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি গ্রন্থখানি নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং রামেশ্বর তীর্থ হইতে ভাগিনেয় ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে মিথ্যাকথা বলিয়া প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করেন। পদ্মপাদ গ্রন্থখানি পুনরায় লিখিবেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে খাদ্যের সঙ্গে বিষাক্ত ঔষধ দিয়া পাগল করিয়া দেন।

পদ্মপাদ অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া আসিলেন। গুরুর নিকট প্রকৃত বিবরণ বলিলে শঙ্কর শিষ্যকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'আমি গ্রন্থখানি একবার শুনিয়াছি। আমার সব স্মরণ আছে তুমি লিখিয়া লও।'

এই গ্রন্থই 'পঞ্চ পাদিকা' নামে বিখ্যাত মৌলিক নিবন্ধ গ্রন্থ।

শঙ্কর গুরু গোবিন্দপাদের মানস পুত্র এবং গৌরপাদ আচার্যের পৌত্র, মাণ্ডুক্য উপনিষদ এবং তাহার উপর আচার্য গৌরপাদের কারিকাই তিনি প্রথম দিকে প্রচারের বিষয়বস্তু করিলেন। এই মূল্যবান গ্রন্থে অন্য বিষয়ের অবতারণা না করিয়া সোজাসুজি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার মর্ম—ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা।

'ন নিরোধো ন চোৎপত্তি
র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত
ইত্যেষা পরমার্থতা।'
৬।৩২ (মাণ্ডুক্যকারিকা)।

দ্বৈত মিথ্যা সেই জন্য পরামার্থত উৎপত্তি সংসারী, সাধক, মুমুক্ষু ইত্যাদি প্রতিপন্ন হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ। অজ্ঞান দূরীভূত হইলে স্ব স্ব রূপকে জানা যায়। ব্রহ্ম সবিশেষ, নির্বিশেষ উভয়ই নির্বিশেষ ব্রহ্মই লক্ষ্য। নির্বিশেষ শেষ কথা। উহা অতীব কঠিন, ধারণায় আসে না। উহার অধিকারী অতি বিরল। শঙ্কর নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া শাস্ত্রে যে অধিকার বাদ আছে তাহা এড়াইয়া যাইতেছেন আশঙ্কা করিয়া মাতা অন্নপূর্ণা প্রিয় সন্তান শঙ্করের ভুল সংশোধন করিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। কারণ শুধু নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রচার করিতে গেলে যে উদ্দেশ্যে শঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা ব্যাহত হইবে।

শঙ্কর সন্ন্যাসী তথাপি ব্রাহ্মণের সংস্কার কাটাইতে পারেন নাই। নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করেন। একদিন গঙ্গাস্নান সারিয়া বিশ্বনাথ মন্দিরে যাইবার পথে দেখিতে পাইলেন এক দরিদ্র মহিলা মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়া রোদন করিতেছেন। মৃতের ছড়ান পা, রাস্তা জুড়িয়া থাকাতে চলিবার পথ বন্ধ। মহিলার মুখে শোকের চিহ্ন, পরনে শাড়ী, হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর এখনও মুছিয়া যায় নাই। মৃত স্বামীর দেহ সৎকার করিবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে পয়সা ভিক্ষা করিতেছেন। গঙ্গাস্নানের পর মৃত দেহ স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হইবে, এই জন্য শঙ্কর করযোড়ে মহিলাকে বলিলেন, 'মা, মৃতদেহ সোজা করিয়া রাখুন।'

কিন্তু মহিলা নির্বিকার। কোন সাড়া দিলেন না, শঙ্কর বার বার অনুরোধ করিলে মহিলা অবশেষে উত্তর দিলেন, 'মৃতদেহকে বলুন, তিনি যেন পা সরাইয়া নেন, আপনার চলিবার পথ করিয়া দেন, তাহা হইলে আপনার দেহ অপবিত্র হইবে না।'

মহিলার উত্তর শুনিয়া শঙ্কর ভাবিলেন মহিলা সম্ভবত স্বামী-শোকে পাগল হইয়াছেন। কি বলিতেছেন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি বলিলেন, 'মৃত কি করিয়া পা সরাইয়া নিবেন। তাঁহার যে শক্তি নাই।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা সমুচিত উত্তরদানে শঙ্করের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'বাবা, তুমি ত' আমাকে জান না, শক্তি অস্বীকার কর, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রচার কর। শক্তিযুক্ত সবিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমার মনোভাব বিরূপ। তোমার কথা স্ববিরোধী, কথা ও কার্যে মিল নাই।

নিমিষের মধ্যে মহিলা এবং মৃতদেহ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন, ব্যাপার দেখিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইলেন, কে এই মহিলা? কে এই মৃতব্যক্তি? সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। অবিলম্বে তাঁহার অন্তরে নূতন আলো দেখা গেল। ভ্রান্তি দূর হইল। শঙ্কর বুঝিলেন মা অন্নপূর্ণা সন্তানের ভুল ভাঙ্গিবার জন্য এইরূপ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি আরাধ্যা জননী। তাঁহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এই ঘটনার পর হইতে শঙ্কর প্রচারের ধারা বদলাইলেন, তিনি বুঝিলেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম শাস্ত্রের লক্ষ্য হইলেও সবিশেষ ব্রহ্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম ধারণার অতীত। উহাকে বুঝিতে হইলে সবিশেষ ব্রহ্ম উপাসনার মাধ্যমে পৌঁছাইতে হয়, এখন হইতে শঙ্কর শাস্ত্র ও যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া এমনভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন যাহাতে উহা সকলে ধারণা করিতে পারে এবং বিশ্বধর্মরূপে স্বীকৃতি পাইতে পারে।

[ক্রমশ।

আর এক মীরাবাঈ

[শ্রীমৎ স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দজী—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙেঘ যিনি 'ঈশ্বর মহারাজ' নামে সমধিক পরিচিত—দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ মানসপুত্র পরমপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন। তিনি পাবনার এক বিখ্যাত জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু জমিদার-গৃহের ধনদৌলত বিলাস-ব্যসন কিছুই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, মাত্র ১৯ বৎসর বয়সেই তিনি গৃহত্যাগী হন। ১৯১৪ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মানন্দজীর সেবক নিযুক্ত হন। যুগজননী সারদামণির কৃপাধন্য তিনি—সন্ন্যাস দিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ। শ্রীশ্রীমহারাজের দেহ রাখার পর তিনি কিছুকাল মঠে এবং কিছুকাল কাশীতে থাকেন। পরে অসুস্থ হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন। এখানে তাঁর দেহে একটি অস্ত্রোপচার হয় এবং ডাক্তার-গণের নির্দেশে তিনি কার্শিয়াং-এ বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসেন। কার্শিয়াং-এর একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত দয়াল সিংহ মহাশয়ের গৃহে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। ঐখানেই তিনি শ্রীদয়াল-বাবুর মুখে তাঁরই দৌহিত্রী শ্রীমতী অঞ্জনা দেবীর অপূর্ব জীবন-কথা শোনেন। ঐ বৎসরই শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে এই অপূর্ব জীবন-কাহিনী সমবেত ভক্ত ও সুধীমণ্ডলীকে পরিবেশন করেন। তারপর দীর্ঘকাল অতীত হয়েছে। সম্প্রতি শ্রীমৎ স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দজী দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল রসগ্রাহী ভক্ত ও সুধী-মণ্ডলীকে এই অপূর্ব জীবন-কথা শোনাবেন। সেই ইচ্ছাকে স্মরণ করে পত্রিকা মারফৎ এই অলৌকিক জীবন-কথার পরিবেশন---রসগ্রাহী ভক্ত ও সুধীমণ্ডলীর উদ্দেশে।]

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা। ভাগবত, ভক্ত, ভগবান এক।'

অনন্ত ভাবময় ও লীলাময় ভগবানের লীলার কথা ভাষায় প্রকাশ করতে যাওয়াটা ধৃষ্টতা বই আর কিছুই না। অতীতের লুপ্ত-স্মৃতির পুনরুদ্বোধন হওয়াটা, আমরা দেখতে পাই ভালবাসার হৃদয় বা ভক্ত হৃদয়ের একোন্মুখী প্রতিভাদীপ্ত সাধনার ভেতরেই। শ্রীভগবানের অফুরন্ত প্রেমের কিঞ্চিৎ আভাস প্রথম পাই আমরা ভক্তের কঠোর সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অবলীলায় আত্মতর্পণের ভেতর দিয়ে। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ইহকাল-পরকালের সমস্ত সুখ, শান্তি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিসর্জন, কঠোর সাধনা, ত্যাগ, সংযম, অপূর্ব ধৈর্য ও তপস্যার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভক্ত ভাব-ভক্তি-প্রেমের ত্রিবেণী ধারায়, নিজের দেহ-মন-প্রাণ নিমজ্জিত করেন। ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাবে, ভক্ত যখন মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন তখন সেই ভক্তের পূত চরণ স্পর্শে ধরণী হন কৃতার্থা, জগতের নরনারী হন ধন্য।

এই রকম ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করে কোটি কোটি পাপী তাপী, পথহারা, সংসার জ্বালায় ব্যথিত নিপীড়িত জনগণ চিরশান্তি ও মুক্তির মহা আনন্দ লাভ করে জ্ঞান ও ভক্তিধনের অধিকারী হন। ভক্তগণ এই রকম মহামানবের চরণ স্পর্শে ধন্য হন বলেই আজও জগতের নরনারী ভক্তের স্মরণে, প্রেমাশ্রু নয়নে, ভক্তিভরেই মস্তক নমিত করেন। তীর্থের তীর্থত্ব সম্পাদন হয় ভক্তজনের প্রাণশক্তি সিঞ্চনের জন্য। তাঁরা যেখানে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে সব স্থানে বাস করেন, সেই সব স্থানই মহাতীর্থে পরিণত হয়।

ভক্তের পুণ্যময় জীবন-বেদের আলোচনা করায় যে সুখ ও আনন্দ আছে সেইটুকুর লোভেই আজ আমি এই বক্তার আসনে বসেছি।

মীরা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুজাতা, অহল্যাবাঈ, করমেতিবাঈ প্রমুখ মহীয়সী মহিলাবৃন্দের জীবনী আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখত পাই। আজ আমি এই যুগেরই একটি অপূর্ব, অভিনব মহিলা ভক্তের জীবনী আপনাদের উপহার দেব। বেশীদিনের কথা নয়, ইনি তিন বৎসর পূর্বেও জীবিতা ছিলেন। আমি স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য কার্শিয়াং সহরের কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত 'অন্তরেটায় নামক স্থানে বাস উপলক্ষে নেপালী-বৃদ্ধ শ্রীদয়ালবাবুর নিকট ভক্ত নারী শ্রীমতী অঞ্জনা দেবীর বিষয় শুনি। শ্রীদয়ালবাবুর অতিথি হয়ে অঞ্জনা দেবীর নামে নব প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি-মন্দিরে বাস করবার সময় আমি এই অমূল্য জীবনটী সংগ্রহ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। ভক্তনারী অঞ্জনা দেবী শ্রীদয়ালবাবুরই দৌহিত্রী। অঞ্জনা-জননী অঞ্জনার শৈশব অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীদয়ালবাবুর পত্নীও অঞ্জনার মাতার পূর্বেই মারা যান। অঞ্জনার পিতা শ্রীযুক্ত দলবীর রাও চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন বলে এবং শ্রীদয়ালবাবুর সমস্ত স্নেহ, মমতা ও প্রীতি ভালবাসা তাঁর পাঁচটি নাতি-নাতনীর ওপর পতিত হওয়ায় অঞ্জনা দেবীরা দাদামহাশয়ের নিকট শিংবলীতেই লালিত ও পালিত হ'তে লাগলেন। শ্রীদয়ালবাবুর কর্মস্থল শিংবলী। তিনি তখন সেখানে চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। অঞ্জনা দেবীরা দুই ভগ্নী ও তিন ভাই ছিলেন।

অঞ্জনা দেবীর জন্মস্থান দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত মর্মা নামক গ্রাম বা পল্লী। অঞ্জনা দেবীর মাতার নাম রত্নশীলা দেবী। রত্নশীলার তৃতীয় সন্তান অঞ্জনা দেবী। অতি শৈশবকালেও অঞ্জনার ভেতর দেখা গেছে এক অদ্ভুত ধর্ম-প্রেরণা। সামান্য ছেলেখেলা, গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, হুটোপাটির ভেতরও তার একোন্মুখী মনের অপূর্ব-দৃঢ়তা, অনায়াস-গাম্ভীর্য, একটা অন্তর্মুখীভাব তাকে সর্বদাই যেন অপর সকল বালক-বালিকার থেকে দূরে রেখে দিত।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিবাদ-বিসম্বাদ হলে অঞ্জনাই মধ্যস্থ হয়ে অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নী বা বালক-বালিকারও বিবাদ মিটিয়ে দিত এবং তার মধ্যস্থতা প্রসন্ন চিত্তেই সকলে গ্রহণ করত। স্বল্প ও মিষ্টভাষিণী এই বালিকার সহজ-সরল কথাবার্তা ও অকপট ব্যবহারে তার আন্তরিক স্নেহ ও প্রীতি-ভালোবাসায়, তার ছোট্ট একটুখানি হাতের সেবা-যত্নে বড় থেকে ছোট পর্যন্ত সকলেই তার গুণমুগ্ধ ও অনুগত হয়ে পড়েছিল।

অঞ্জনার একটি শ্রীকিষণজীর (শ্রীকৃষ্ণ) মূর্তি ছিল। এই মূর্তিটিও অঞ্জনার ছিল একটি খেলার সাথী, নিত্য সহচর। খেলার ছলে নিত্যই চলতো এই মূর্তিটির সঙ্গে অঞ্জনার আলাপ-আপ্যায়ন, কথাবার্তা, আদর-সোহাগ, সযত্ন সাজসজ্জা, চপল নৃত্য-গীত, বিরহ-মিলন অভিনয়। খেলার সাথীরা সেইজন্য অনেক সময় তাকে অঞ্জনা পাগলী বলে উপহাস ঠাট্টাও করতো। কিন্তু এও দেখা গেছে তারা অঞ্জনার ভাবগম্ভীর কথাবার্তায় ও ব্যবহারে সে ভাব বেশীক্ষণ রাখতে পারত না। অঞ্জনার সত্য ও গাম্ভীর্যের আভাসে তার খেলার সাথীরা এমন কি বয়োজ্যেষ্ঠ দর্শনার্থীরাও নির্বাক হয়ে অঞ্জনার এই অভিনব খেলা নিরীক্ষণ করত। কোন সুপ্ত চেতনার আভাসে নরনারী জড়ের ভেতরেও চেতনের অনুভব করে, অযোগ্যের মধ্যেও যোগ্যতার সন্ধান পায়, কুৎসিত বীভৎসের ভেতরেও সুন্দর শোভন সৌন্দর্যের আবেশ অনুভব করে—তা কে বলতে পারে।

কিন্তু দেখা গেছে জগতে এমনটা বিরল হ'লেও—হয় কখন কখন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন—

'মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার
যায় গো চেনা।
সে উজান পথে করে আনাগোনা,
সে দু-একজনা॥'

এমন দু-একজনা এ-জগতে আসেন বলে জগৎটা এখনও পাগলা গারদে পরিণত হয়নি। কিন্তু মজা এই, এই জগতের জনগণ এই রকম লোককে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করেছে ও নব-নব ভাবে ইন্দ্রিয় সুখ এবং বিলাস-ব্যসনের আবিষ্কার করে তারই পঙ্কিলতা-পূর্ণ আবর্তে নিজে পড়ে অপর সকলকেও ডোবাবার চেষ্টা করেছে ও এখনও করছে। জানি না আর কতকাল এমনভাবে জগৎ চলবে। আশার কথা এই তমসাপূর্ণ ভারত-গগনে এখনও উজ্জ্বল নক্ষত্র সব দেখা দেয়। মেঘের আড়াল ভেঙে অন্ধকারের বুক চিরে এখনও চন্দ্রকিরণে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। তাই মনে হয় এ নিশি কাটবে, এ-অন্ধকার একদিন চিরতরে দূর হবে, তরুণ অরুণোদয়ে জগতের সকল কালিমা, সকল মলিনতা শীঘ্রই নষ্ট হবে। তারই পূর্ব সূচনা আরম্ভ হয়েছে, ঊষার আগমনী শোনা যাচ্ছে, আর বিলম্ব নেই, ওঠ তরুণ ভারত-ভারতী জাগো, তোমার 'পরেই জগতের ভাবী কল্যাণ, আনন্দ, শান্তি, ভারতের মুক্তি তথা জগতের মুক্তি নির্ভর করছে। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, বরান্ প্রাপ্য নিবোধত।' ওঠ জাগো, জাগাও।

অঞ্জনার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বীণা দেবী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরভূপ, চতুর্থ ভ্রাতা চারু সন্ধ্যা-আরতির সময় গৃহ-দেবতার বিষ্ণু-মন্দিরে যেতেন। আরতির পর প্রসাদ নিয়ে বালক-বালিকারা সবাই ফিরে যেত। কিন্তু অঞ্জনা দেবী কি এক ভাবাবেগে চক্ষু মুদিত করে অনেকক্ষণ বসে থাকতেন। এই সময় অঞ্জনার বয়স মাত্র ছয় সাত বৎসর ছিল।

বার কি তের বৎসর বয়সে অঞ্জনা দেবীর বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবন ও স্বামিগৃহ অঞ্জনার পক্ষে বিষময় হয়ে উঠেছিল। অনেক রকম উৎপীড়ন ও দুঃখ-বেদনার অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে এই সময় তাকে সাধন পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল। অঞ্জনা তার স্বামীকে নিজ ইষ্ট কিষণজীর মতই দেখতেন, সেবা করতেন ও ভালবাসতেন। অঞ্জনা দেবীর একখানা চিঠির ভেতর আমরা দেখতে পাই, তিনি লিখেছেন তাঁর প্রায় সমবয়স্কা মামীকে 'ঐ হাড় আর মাংস দিয়েই তো শরীর তৈরী। ওর ভেতরে যিনি আছেন, যাঁর থাকার দরুণ ঐ নোংরা শরীর সুন্দর দেখায় তিনি হ'লেন পতি। তাঁকেই পতি অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জেনে সমস্ত দিক দিয়ে সুখী করাই হলো স্ত্রীদের একান্ত কর্তব্য। পতিকে সুখী করতে না পারলে স্ত্রীদের মুক্তি নেই। তুমি হয়তো বলবে, আমি কেন তা করলাম না। তার উত্তরে আমি বলব তাঁকে (নিজ স্বামীকে) সুখী করবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কি করবো আমার পূর্ব জন্মের কর্মফলে এ রকম যোগিনী হতে হল।'

অঞ্জনা দেবীর মাতৃভাষা হ'ল

নেপালী। নেপালী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল খুব বেশী। নেপালী ভাষায় লেখা তাঁর অনেকগুলি কবিতা আছে। তিনি নিজেই তার রচয়িতা। নেপালী ভাষায় মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ ও ধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থগুলি এবং সাধক-জীবনী, পুরাণ, ইতিহাস ও সাধ্বী-চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলি তিনি অতি সমাদরে পাঠ করতেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি সর্বদা তাঁর কাছে থাকত এবং অবসর সময়ে নিত্য তিনি পাঠ করতেন। অনেক সময় তিনি বাড়ীর সব মেয়েদের একত্রিত দেখলে কোন একখানি ধর্মবিষয়ক পুস্তক এনে তার থেকে কিছু কিছু পাঠ করে তাঁদের শোনাতেন ও সেই বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করতেন। বিশেষভাবে তিনি সমবয়স্কা তরুণীদের কাছে সাধিকা জীবনী বিষয়ক আলোচনা ও কথাবার্তা বলতেন বেশী করে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মীরাবাঈ প্রমুখ মহীয়সী সাধ্বী মহিলাবৃন্দের জীবনী-বিষয় নিয়ে অঞ্জনা দেবী যখন আলোচনা করতেন, তাঁদের ত্যাগ, তপস্যা, সংযম, তাঁদের ক্ষমা, তিতিক্ষা, ধৈর্য, তাঁদের অপূর্ব প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা এবং একনিষ্ঠ ইষ্ট-জ্ঞানে পতিভক্তি সম্বন্ধে যখন কথাবার্তা বলতেন তখন মনে হতো যেন অতীতের সেই সমস্ত সাধ্বী রমণী একীভূত হয়ে মূর্ত হ'য়ে উঠেছেন বিংশ-শতাব্দীর সমস্ত কুজ্ঝটিকা (কুহেলিকা) ভেদ করে এই রমণীর ভেতর।

সাধারণত দেখা যায় অনেকগুলি মেয়ে একত্রিত হ'লে বেশীর ভাগ সময়েই তাঁরা তরল হাসি, ঠাট্টা, অবান্তর গল্প-গুজব, সাজসজ্জা ও অপরের ভাল-মন্দ চরিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটান। কিংবা নিজ নিজ প্রিয়জনদের রূপগুণ ব্যাখ্যা করে তাঁদের আন্তরিক প্রীতি-প্রেম আদর-যত্ন ও বিশেষ বিশেষ বস্তু উপহার দেবার যোগ্যতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর আলোচনার উদ্ভব করে অপরের থেকে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে গর্ব অনুভব করেন এবং এই নিয়ে পরিশেষে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা করে সময় অতিবাহিত করেন। অঞ্জনা দেবী এই রকম বৈঠকী আলোচনার সময় উপস্থিত থাকলে অল্প কথায় ও মধুর ব্যবহারে এবং সময় অনুযায়ী কথা বলে অপ্রীতিকর আবহাওয়া বন্ধ করে দিতেন। তাঁর সরল, মিষ্ট ও যুক্তিতাৎপর্যব্যঞ্জক ভাবভঙ্গী ও কথাবার্তায় উপস্থিত সকলেই তখন মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। তাঁর নিজের কথা এখানে একটু লিখছি।

'বৃথাই আমাদের রূপ যৌবন, সাজসজ্জা—যদি না পরম প্রিয় প্রিয়তম মাধবের দর্শন, স্পর্শন মেলে এই তনুতে। যে মেয়ে অমৃত ও গরল চিনতে পারে না সেই নারী কেবল গরলপূর্ণ শরীর আশ্রয় করে অমৃত ছেড়ে। নারী-শরীর ধন্য, কেন না এই শরীর দিয়ে প্রিয়তম মাধবকে লাভ করা যায় অতি সহজে। সেই নারী আগুনের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং পরিশেষে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা অনুভব করে। যে নারী তনুর ভেতরে মাধবের দর্শন পায় না। পরমপতি শ্রীকিষণজী পতির তনুমন ঘিরে রয়েছেন বলেই পতিকে স্ত্রী প্রার্থনা করে। মাংস, পেশী, শরীর কেবলমাত্র পতির থাকবার বাসস্থান, সে পতি নয় কেবল পতির বাসস্থান বলে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে হয়। যে স্ত্রী পতির সঙ্গে ইহলোক-পরলোকে ছায়ার মত ঘুরতে পারে তাকেই, সত্যকার স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী এবং সহধর্মিণী বলে।'

নিজ পতিকে অঞ্জনা অন্তর থেকেই শ্রদ্ধা করতেন ভালবাসতেন। স্বামীকে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-নিরানন্দে, সম্পদে-বিপদে প্রকৃত সহধর্মিণীর মত সেবা-যত্ন, যুক্তি-পরামর্শ, আদর ও প্রেম দিয়ে ঘিরে রাখতেন। এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতিও এদিক থেকে তিনি হতে দিতেন না। অঞ্জনা দেবীর ভিতর এই ভাবটা সর্বদা লক্ষিত হতো যে, পাষাণে যদি শ্রীভগবানের উপাসনা, পূজা, স্তুতি ও পুষ্প এবং ভোগরাগাদি নিবেদন করা সম্ভব হয়, তাহলে মানুষে কেন তা হবে না। ভক্তের আকুল প্রার্থনা ভক্তি ও প্রেমে পাষাণ যদি জাগ্রত হতে পারেন তাহ'লে জীবন্ত মানুষ কেন জাগ্রত হবে না। দরদী ভক্তের বাণীতে আছে—

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

স্বামীজী বলেছেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

অঞ্জনা দেবীর চরিত্র ও জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখলে আমরা দেখতে পাই মানুষের ভেতর ভগবানের উপাসনাই ছিল তাঁর প্রধানতম ও প্রকৃষ্টতম ভাব-মাধুর্যপূর্ণ সাধনপন্থা। আরও মনে হয় এই ভাবমাধুর্যময় দারুণ বিঘ্নসঙ্কুল পথ অতিক্রম করেই তিনি চরম সিদ্ধলাভ করেছিলেন। প্রতি মানুষের ভেতর তিনি শ্রীভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব ত' দেখেছিলেনই 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্তম্' তিনি তাঁর নিত্য বিরাজমান বা 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' অথবা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন বা উপলব্ধি করেছিলেন। অঞ্জনা দেবীর পরবর্তী জীবনে আমরা এই ভাবেরই পরিপূর্ণ অবস্থা প্রকটভাবে দেখতে পাব।

স্বামিগৃহে অবস্থানকালে অঞ্জনা দেবীকে দু-একজন শ্রদ্ধা ও স্নেহের চক্ষে দেখলেও বেশীর ভাগ লোকই তাঁর এইরকম ভাবকে গৃহস্থ-জীবনের পক্ষে প্রতিকূল বলেই বিবেচনা করতেন। লজ্জাসরমহীনা, বাচাল, ধর্মজ্যাঠা, কলির সতী ইত্যাদি বলে অনেকে তাঁকে যন্ত্রণা দিতেন। মেয়েরা মেয়েদের সম্বন্ধে যখন নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন তখন নিজেদের জাতের ওপর তাঁরা এত অত্যাচার ও নিপীড়ন আরম্ভ করেন, এত হিংসা-দ্বেষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়েন, এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনা ও

বন্ধনের কারণ হয়ে হয়ে ওঠেন যে, তার তুলনা হয় না। অমলাদি নিজের কথা এখানে একটু লিখছি—

'যাই বল না কেন দাদু, শ্রীকিষণজীকে না পাওয়া পর্যন্ত আমার এ-অসুখ ভাল হবে না। তাঁকে না পেলে আমি মরে যাব। তুমি তো আমাকে এত ভালবাস, স্নেহ কর, সত্যি বলছি তোমাকেও আমার ভাল লাগে না। শ্বশুরবাড়ীর ওরা আমাকে কত না জ্বালা-যন্ত্রণা দিত, কত কটু কথা শোনাত, অত্যাচার করত, আবার কেউ কেউ আমাকে ভালও বাসত। তাদের আদর, অত্যাচার, নিপীড়ন আমার কাছে দুই—একরকম বোধ হত। হাসতাম তাদের (কাণ্ডকারখানা) ব্যাপার দেখে।' এখানে স্বামীজীর একটা কথা মনে হলো—

'কেহ বা তোমারে মালা পরাইবে।
কেহ বা তোমারে পদ প্রহারিবে॥
কিছুতেই চিত্তের প্রশান্তি ভেঙো না।
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা॥'

আদর্শ গৃহস্থ-জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই সময় অঞ্জনা দেবী স্বামীকে পরিচালিত করবার চেষ্টায় ছিলেন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও বিলাস-সম্ভোগ ছাড়াও যে আরও আনন্দ ও শান্তিপ্রদ কিছু আছে এই দিকটা তিনি নিজ পতিকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং নিজেও ইষ্টবুদ্ধি বা ভগবদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত চিত্তে সাধনার গভীরতর রাজ্যে প্রবেশের জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। দুটি স্রোতস্বতী নদীর মিলিত ধারা সমধিক বেগসম্পন্ন হয়। একভাবাপন্ন, একোন্মুখী একই গন্তব্যস্থানাভিলাষী যাত্রীর মিলনে চলার পথ সুগম হয়, কষ্টের লাঘব হয়। পতি-পত্নীর মিলনের ভেতর হিন্দু নর-নারী যুগ যুগ ধরে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম ও প্রেমের অপূর্ব জাগরণ-আভাস পেয়েছে বলেই পবিত্র উদ্বাহবন্ধনে হরগৌরী বা শিব-শক্তির মিলন বলেই আজও বহুজন ভক্তিপ্লুত চিত্তে হিন্দু-বিবাহের জয় ঘোষণা করেন। দীর্ঘ দুর্গম যাত্রা-পথের একক যাত্রীর পক্ষে পথ চলা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে অনেক সময়ই। শুকদেব, শঙ্করাচার্য প্রমুখ ত্যাগমার্গী চলার পথে একক যাত্রী 'কোটিকে গোটিক' মেলে। একক যাত্রী ও মিলিত যাত্রী দু'য়ের পক্ষে উপনিষদের বাণী স্মরণ করে দিয়েছেন

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তাৎ কবয়ো বদন্তি।'

আদর্শ সন্ন্যাসীও আদর্শ গৃহস্থের ভেতর কে যে বড় কে যে ছোট নির্ণয় করা কঠিন। দুর্গম মরুপথ, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে স্রোতস্বতী মহাসাগরে সম্মিলিতা হয়। সাগরই তার গতি, সাগরই তার স্থিতি। হিন্দুর বিবাহিত জীবন ও অবিবাহিত জীবন দুয়েরই আদর্শ ভগবান লাভ ব্রাহ্মীস্থিতি বা ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়।

[ক্রমশঃ।

মানসিক রোগের নতুন চিকিৎসা

মানসিক রোগ ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এবং এই বৃদ্ধির হার রীতিমত উদ্বেগ-জনক। মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা এই প্রসার রোধ করার ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত এবং তৎপর।

মানসিক উদ্বেগ থাকলে দৈহিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে পারে, রোগ সারতেও সময় লাগতে পারে তুলনায় অনেক বেশি। এই অবস্থা কাটানর জন্য কিছুদিন যাবৎ 'আর্ট থেরাপী' কাজে লাগান হচ্ছে অর্থাৎ রোগীকে ছবি আঁকতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, এবং আঁকতে গিয়ে সে সংক্ষোভকে মুক্তি দেওয়ার একটা পথ পাওয়ায় মানসিক চাপ কমে যাচ্ছে।

ছবিগুলোই ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করে। জনৈক মহিলা ন'টা ছবি এঁকেছিলেন—গোড়ায় হিংস্র, এলোমেলো আকৃতি, শেষ পর্যন্ত তিনি আঁকেন স্পষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাতে পর্বতমালা এবং ঘরবাড়ি যথাযথ সন্নিবিষ্ট।

অঙ্কন দিনদিন জনপ্রিয়তা হচ্ছে। এবং এই বিস্তৃতি থেকেই হয়ত প্রমাণ হয়, আধুনিক মানুষ অনস্বীকার্য মানসিক চাপ থেকে এর মধ্য দিয়ে মুক্তি পাচ্ছে, ব্যাপারটা স্পষ্টাস্পষ্টি না বুঝতে পারলেও। দৈনন্দিন জীবিকার্জনের চাপ ক্রমবর্ধমান। জীবনের 'স্বাভাবিক' আনন্দ উপভোগের সুযোগ ক্রমক্ষীয়মাণ আজ তাই মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার প্রয়ো-জনীয়তাও অনস্বীকার্য। এবং, ছবি আঁকা এ ব্যাপারে মানুষের মস্ত সহায় রূপে প্রমাণিত।

আচার্য রামানুজ

জর্জ এমলেন

সুনিপুণভাবে পরিকল্পনাটি সাজানো হল। কোথাও কোন ফাঁক নেই, এতটুকু ছিদ্র নেই, যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে গড়ে তোলা হল ষড়যন্ত্রের জাল, অত্যদ্ভুত সূচীভেদ্য এক চক্রান্ত। কেউ জানতে পারবে না, কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না কেমন করে একটি তরুণ প্রাণ কি পরিবেশে শেষ হয়ে গেল। যারা গেল—তারা সবাই ফিরে এল—কেবল একজন বাদে, বিশ্বে তার রহস্য জানতে পারবে না কেউ। স্থান পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বিন্ধ্যপ্রদেশের গোণ্ডা অরণ্য। গহন, গভীর, ভয়াল ভীষণ, চতুর্দিকে হিংস্র শ্বাপদ। প্রতি পদে চরম সর্বনাশের সম্ভাবনা। জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই।

কাকে ঘিরে এই ষড়যন্ত্র? কার এত পরিকল্পনা? কার প্রাণনাশ না হওয়া পর্যন্ত এতগুলি লোকের অস্বস্তি? এই তরুণ আজও—যদিও সময় আরও এক হাজার বছরের ঘরে পৌঁছতে চলল,—তবুও সারা ভারতের ঘরে ঘরে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অমলিন আলোকে স্মরণীয় হয়ে আছেন অধ্যাত্মসাধন ও জ্ঞান ও কর্মমার্গে তাঁর অবদান ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ইনি শ্রীরামানুজ।

তাঁর তরুণ বয়সে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের যে কথা এখানে উল্লেখিত হল, কারা সেই ষড়যন্ত্রের মূলে—এই সমগ্র চক্রান্তের নায়কটি কে? এইবার সকলের চমকানোর পালা—কারণ চমকানোর মত ঘটনাই যে। নায়ক আর কেউ নয়। স্বয়ং তাঁর গুরু যাদবপ্রকাশ। ঈর্ষার অনলে দগ্ধবিদগ্ধ। সঙ্কীর্ণ চিত্তের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু কেন? কি কারণ? কি এমন ঘটল যার ফলে গুরু স্বয়ং শিষ্যকে ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে নরখাদক হিংস্র জন্তুর কবলে ফেলে দিতে চাইলেন। যেখানে গুরুর হাত থেকে ঝরবে অভয়ের আশ্বাস, সেখানে সেই হাত থেকে ঝরল মৃত্যুর নির্দেশ—

এর প্রধান কারণ—রামানুজের প্রতিভা এবং বিরাটত্ব যাদবপ্রকাশ সহ্য করতে পারলেন না। অল্পকালের মধ্যে রামানুজ যেভাবে সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে লাগলেন, তা কোনক্রমে সহ্য করা সম্ভব হল না যাদবপ্রকাশের পক্ষে। অবস্থা চরমে উঠল সেদিন যেদিন কাঞ্চীরাজকন্যাকে প্রেতের কবলমুক্ত করলেন রামানুজ। কিছুকাল ধরে কাঞ্চী রাজকন্যার দেহ একটি দুষ্ট আত্মার অধিকারে চলে গেল। কিছুতেই সেই অশরীরী রাজকন্যার শরীর পরিত্যাগ করতে চায়

না। একদিন সর্বসমক্ষে প্রেত বলল, সে যদি রামানুজের চরণ মস্তকে ধারণ করতে পার তবেই সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে কারণ রামানুজের মত নির্মল বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী আর কেউ নেই বললেই হয়।

যে কথা সেই কাজ। রাজকুমারীর দেহে পা ঠেকাতেই রাজকন্যা সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্তা হলেন। জ্বলে উঠলেন যাদবপ্রকাশ। আর নয়। পথের কাঁটা এবার সরাতেই হবে।

কিন্তু ঈশ্বর এবং ধর্ম যাঁর সহায় ন্যায় এবং নীতি যাঁর পাথেয়, সত্য এবং বিবেক যাঁর উপাস্য কুচক্রীর চক্রান্ত তাঁকে সাময়িকভাবে বিপদে ফেলতে পারে কিন্তু সে ধরণের মারাত্মক কোন সর্বনাশ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে রামানুজ গোপনে দল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর অলৌকিকভাবে মুক্তি পেলেন এক ব্যাধদম্পতির কৃপায় পরে প্রমাণ মিলল---এই ব্যাধদম্পতি আর কেউ নয়,---স্বয়ং লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

দক্ষিণ ভারতের পেরেমবদুরে পণ্ডিত, ধর্মপ্রাণ ও শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে কেশবাচার্যের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। এই দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের খ্যাতিতে বিমুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে উপাধি দিলেন সর্বক্রতু। পার্থসারথি মন্দিরে তাঁর নিত আনা-গোণা। একদিন স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং পার্থসারথি অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিতে তাঁর সামনে প্রতিভাত। পার্থসারথি তাঁকে বলছেন---শীঘ্রই এক পরম ভাগবৎ পুত্র তোমার ঘরে যাচ্ছে।

তাঁর যশ, খ্যাতি ও ভক্তি তোমার বংশকে উজ্জ্বল করবে। শক্তিশালী সাধকরূপে তোমার পুত্রই হবে এ যুগে জ্ঞানমিশ্রাভক্তিধারার পুণ্য ভগীরথ। ১০১৭ সালে কেশবাচার্যের পুত্ররূপে জন্ম নিলেন রামানুজ। বিশিষ্টাদ্বৈতাদের প্রবর্তক ও প্রবক্তা। কেশবাচার্য ও কান্তিমতীর পুত্র রামানুজ বাবার দিক থেকে পেলেন জ্ঞান ও মনীষার জগতের সন্ধান আর মায়ের দিক থেকে পেলেন ভক্তি ও নির্ভরতার মন্দাকিনী ধারা। এই দুয়ের সমন্বয় তাঁর জীবনে অপূর্বভাবে সাধিত হল যার সার্থক প্রকাশ ঘটল তাঁর চিন্তায় ধারণায় এবং কর্মে।

ষোল বছর বয়সে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলেন রামানুজ। তার অল্পকাল পরেই কেশবাচার্যের জীবনে ঘনিয়ে এল অন্তিম মুহূর্ত।

বাল্যকাল থেকেই রামানুজের জীবনে একদিকে দেখা গেল জ্ঞান, বিদ্যা অর্জনে তীব্র সাধনা, অন্যদিকে প্রেম, ভালবাসা এবং ভগবদ্‌ভক্তির এক অতুলনীয় প্রবাহ।

যাদবপ্রকাশের কাছে যখন রামানুজ অধ্যয়ন করছেন তখন থেকেই সুরু হয় সংঘাত। তার চরম পরিণতি এই রচনার প্রারম্ভেই বর্ণনা করা হয়েছে।

সমগ্র দাক্ষিণাত্যে পরম বৈষ্ণব এবং ধর্মজগতের একচ্ছত্র নায়ক সেদিন যামুনাচার্য। বয়সে তিনি শতায়ু। বহুদিন পূর্বে একদিন তিনি যাদবপ্রকাশের কাছে এসে রামানুজকে দেখে ছিলেন---সেই দেখা তাঁর মনকে নানা ভাবে দোলা দিতে থাকে। তাঁর বারবার মনে হতে লাগল---'এই সেই। এই সেই, এই সেই আগামী দিনের নায়ক।'

বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। ভগবানের কৃপায় ষড়যন্ত্র থেকে অব্যাহতিলাভ করে নির্বিঘ্নে নিরাপদে ফিরে এসেছেন রামানুজ। হঠাৎ এক দিন মহাপূর্ণ তাঁর কাছে এলেন যামুনাচার্যের দূত হয়ে। মহাপূর্ণ জানালেন যামুনাচার্যের অন্তিমলগ্ন উপস্থিত, যাবার আগে একবার তিনি রামানুজকে দেখে যেতে চান।

অভাবনায় প্রস্তাব। কত বড় সৌভাগ্য। যামুনাচার্য দেখতে চাইছেন রামানুজকে কিন্তু দেখা হল না। শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে যামুনাচার্য ততক্ষণে দেহরক্ষা করেছেন কিন্তু তাঁর হাতটি বদ্ধমুষ্টি। রামানুজ একটি একটি করে শ্লোক আবৃত্ত করলেন, আর একটি একটি আঙুল খুলে যায়। এই অলৌকিক ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌বিদিকে। লোকের মুখে মুখে তখন শুধু রামানুজকে ঘিরেই আলোচনা।

রামানুজের অন্তরেও তখন এক ভাবের পরশ লাগে। বদ্ধ হৃদয় উন্মুক্ত হতে চায়। সেই পরমের নিকট সান্নিধ্য পাবার জন্য চিত্ত তাঁর ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কাঞ্চীপূর্ণের কাছে দীক্ষা নিতে চান রামানুজ। কাঞ্চীপূর্ণ সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম, দিকপাল শাস্ত্রজ্ঞ এবং পণ্ডিত কিন্তু জাতিতে শূদ্র। সেই বিচারে কাঞ্চীপূর্ণ এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হতে পারেন না। কি করে তিনি এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে আপন পদধূলি অর্পণ করবেন? রামানুজও অটল। কৌশল অবলম্বন করলেন একটি। একদিন কাঞ্চীপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করলেন। উদ্দেশ্য সেইদিন কাঞ্চীপূর্ণের প্রসাদ ভক্ষণ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। কাঞ্চীপূর্ণ এ উদ্দেশ্য সহজেই বুঝলেন। যে দিন নিমন্ত্রণ সেই দিন রামানুজ আনতে গেলেন অভ্যাগতকে। অন্য রাস্তা ধরে ইতিমধ্যে কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের গৃহে ব্যস্ততার ভাণ করে খাওয়াটা সেরে নিলেন। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে খুঁজে না পেয়ে গৃহে এসে দেখেন কাঞ্চীপূর্ণ ততক্ষণে আহার সমাপ্ত করেছেন এবং তাঁর পাত্রাদিও ততক্ষণে ধৌত পরিষ্কৃত হয়ে গেছে। রামানুজের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না।

তা হলে এখন পথ কি? কোন পথ খোলা আজ তাঁর সামনে? অনন্যোপায় রামানুজ। কাঞ্চীপূর্ণের মাধ্যমেই শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ এল। ভগবান রামানুজকে বলছেন মহাপূর্ণের কাছে দীক্ষা নিতে।

পরম ভক্তিভরে বৈষ্ণব দীক্ষা নিলেন রামানুজ। পরম আন্তরিকতায় দীক্ষা দিলেন মহাপূর্ণ। দীক্ষান্তে রামানুজকে তিনি সম্বোধিত করলেন 'যতিরাজ' আখ্যায়।

যাদবপ্রকাশ তখন কোথায় ছি

অবস্থায়? নিষ্কলুষ চিত্ত, গুরুভক্ত শিষ্যকে একদিন তিনি বিনা দোষে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন আত্মম্ভরিতায় এবং জঘন্য হিংসার বশীভূত হয়ে। অনুশোচনার আজ তাঁর অন্ত নেই। পূর্বকৃত পাপের স্মৃতি সকল সময় মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। শেষে একদিন রামানুজের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলেন যাদবপ্রকাশ। আপন শিষ্যকেই বরণ করলেন গুরুপদে। রামানুজ তাঁর নামকরণ করলেন গোবিন্দদাস। অন্ধকার থেকে আলোর স্পর্শ পেলেন যাদবপ্রকাশ। রত্নাকর যাদবপ্রকাশ পরিণত হলেন বাল্মীকি গোবিন্দদাসে।

শ্রীরঙ্গমের মঠাধ্যক্ষ হলেন রামানুজ পুণ্যশ্লোক যামুনাচার্যের তিন প্রধান অনুসারী— কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ ও গোষ্ঠীপূর্ণ এই তিনজনের কাছেই শিক্ষালাভ করেছেন রামানুজ। রঘুপতি রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষণের অবতার হিসাবে পূজা পেতে থাকলেন শ্রীরামানুজ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের ঘরে ঘরে।

ঈর্ষায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রধান পূজারী। জনচিত্তে রামানুজের এই বিরাট আসন তার পক্ষে যেন কিছুতেই সহ্য করা সম্ভব নয়। বিষপ্রয়োগে তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত করল, চরণামৃত বলে বিষপূর্ণ পাত্র এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। সাধকের বিশ্বাসে বিষ হয়ে গেল অমৃত। কোথায় গরলের তীব্রতাস তাঁর সমগ্র শরীর হিম-নীল হয়ে যাবে কিন্তু তার বদলে একি হল সারা দেহ মন এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে ভরপুর, সারা দেহে আলো আর জ্যোতির হিল্লোল।

কাঙাল বৈষ্ণব বরদাচার্যের গৃহে আতিথ্য নেওয়াই স্থির করলেন রামানুজ। এতবড় মহাপুরুষের চরণধূলি ঘরে পড়ল—এই আনন্দ যেমন গৃহিণী লক্ষ্মীদেবীর অন্তরে পুলকবন্যা বওয়াল অন্য দিকে তাঁর মনে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল, কিভাবে এই মাহামান্য পরম পূজ্য অভ্যাগতকে আপ্যায়ন জানাবেন। দুশ্চিন্তার অন্ত নেই লক্ষ্মীদেবীর। এক কামাতুর শ্রেষ্ঠীর নজর পড়েছিল লক্ষ্মীর দিকে। লক্ষ্মীর অনিন্দ্যসুন্দররূপে বণিক মুগ্ধ। প্রচুর অর্থ সে দিতে রাজী, বিনিময়ে লক্ষ্মীকে তার দৈহিক ভোগ বিলাসের সঙ্গিনী হতে হবে। সাধ্বী শিরোমণি লক্ষ্মী প্রতিবারই এ কুপ্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু আজ, আজ লক্ষ্মী কি করবে?

লক্ষ্মী প্রস্তাব পাঠায় শ্রেষ্ঠীর কাছে, তার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে। মহাসাধকের সেবার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত। ঈশ্বরের এক মানসপুত্র তার দুয়ারে আজ অতিথি। সেখানে দেহবোধ কোন প্রশ্নই হতে পারে না। দেহবোধের উর্ধ্বে তখন মন। স্বামী বরদাচার্যকে জানাল লক্ষ্মী এই ঘটনা। লক্ষ্মীর এই অসাধারণ আত্মত্যাগ ও অচলা সাধুসেবাকে প্রাণ খুলে স্বাগত সমর্থন জানালেন বরদাচার্য। কিন্তু উন্মত্ত দুঃশাসনের হাত থেকে রজস্বলা দ্রৌপদীর সম্মান বাঁচিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। মহাসতীর সতীত্বের মর্যাদা সেই পরম কারুণিকই রক্ষা করলেন। শ্রেষ্ঠীর মনে ভাবান্তর এসে গেল। লক্ষ্মীর আত্মসমর্পণের গূঢ় কারণ জানতে পেরে বিস্ময়ে ও সেই সঙ্গে শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ল শ্রেষ্ঠী, সেই অবনত মুখ যখন তার উঠল তখন সে মুখের আলেখ্য পুরোপুরি বদলে গেছে। কামুকর মুখ তখন আর নয়। তখন সন্তানের মুখ।

পার্থিব দেহে রামানুজ বর্তমান ছিলেন এক শ' কুড়ি বছর। শুক্লপক্ষের এক মাঘী দশমীর দিন পরম জ্যোতিতে তিনি বিলীন হয়ে গেলেন।

আকাঙ্ক্ষা

বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

আমি একজন
সেই অযুত নিযুত বুদবুদের।
আমি রঙ চড়াই
এই বিশ্ব আলপনায়॥
প্রিয়াকে দেখার লোভ এবং লোভ
তার উষ্ণ আলিঙ্গনে
মজ্জাগত
আমার আলাপের রেশ এবং
হয়তো একজন
সেই আদিম পৃথিবীর কর্মী

যার ভয় ও শক্তি দুই-ই
ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর,
কেবল স্থায়ী স্থবির পিরামিড
ও প্রেমের কীলক লিপিগুলি।
আমি একজন
সেই আদিম অরণ্যের
বটের লতার মত
বহু শতাব্দী প্রতীক্ষিত স্ফিংকসের থাবা
কিম্বা এ অভিসার অনন্তযুগের......
এ পার্থিব যা কিছু সব, আমার,
আমার, আমারই, এ সব॥

বাংলাদেশে তিব্বতী দেবালয়

ভোটবাগান মঠ

কোথায় মহাদুর্গম অভ্রভেদী হিমালয়, তার অন্তরালে মালভূমি-তিব্বত বিশ্বের সর্বোচ্চ লোক-বসতিস্থান, 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়, আর সেই পার্বত্য-রাজ্যের দক্ষিণে—ভারতের অসংখ্য বনভূমি, জনপদ, নদ-নদীর পরে আরও দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রের প্রায় সমনিম্নে বাংলা দেশ।

উভয় স্থানের ব্যবধান শত শত ক্রোশ, যাতায়াত পথ বা কোন যোগাযোগ বর্তমানেও নেই, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দেশ দুটির মধ্যে অতীতে —বৌদ্ধপ্রাধান্য যুগে, একটা সম্পর্ক হয়েছিল কিছুকালের জন্যে, স্থায়ী কোন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নি।

কিন্তু সেই সুদূর রাজ্যবাসী তিব্বতীদের একটা উল্লেখযোগ্য মঠ বা দেবস্থান গড়ে উঠেছিল, আজ থেকে প্রায় দু'শ বৎসর পূর্বে এই বাংলা দেশের বুকে—কলকাতার গঙ্গার অপর পারে উত্তর পশ্চিম তীরে। মঠের স্থানটি হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে বলা যায়—ঘুসুড়ী। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ঘুসুড়ী পল্লীর যে অংশে আলোচ্য মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে স্থানের নাম 'ভোটবাগান' হয়ে যায়। এটি দশনামী শৈব সন্ন্যাসীদের ও তারকেশ্বর মঠের অন্তর্গত।

তিব্বতীদের 'ভোট' বলা হয়। 'ত্রিভোট' থেকে 'ভোট' শব্দ এসেছে। ভোট বা তিব্বতীদের এই দেবস্থান—মঠ, মন্দির প্রভৃতি প্রায় দু-শতাব্দীর প্রাচীন হলেও সকল স্থাপত্যই অটুট আছে। ধর্ম-সাধনা, পূজা-পার্বণ, অতিথি, সাধু-সন্ন্যাসীসেবা নিয়মিত-ভাবে আজও অনুষ্ঠিত হয়। এ-মঠের বহু স্থায়ী সম্পত্তি—বাড়ী-বস্তি এবং একটি দৈনিক বাজার আছে, বার্ষিক আয় প্রায় ষাট হাজার টাকা।

বিরাট প্রবেশ-দ্বার বা সিং দরজা পার হলে প্রাচীরে ঘেরা প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, এর দু'ধারে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির ও বিগত মোহান্তদের সমাধি, মধ্যভাগে মোহান্ত মহারাজের বৃহৎ দ্বিতল গৃহ। তার নীচে —এক-তলায়, সারি-সারি কক্ষ, তার একটি

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ব্যবস্থাপকদের দপ্তরখানা, এই কক্ষের পাশ দিয়ে পথ আছে অন্দরের দিকে, সেখানে গেলে মনে হবে চক-মিলানো মহল, এখানে যে অঙ্গন আছে, তার উত্তর অংশ সবটাই পূজাস্থান বা মন্দির, অপর দিকের গৃহগুলি ভোগ-ঘর, অতিথিশালা ইত্যাদি, একটি গো-শালাও আছে।

মন্দিরের শীর্ষদেশে দেওয়ালের উপর উৎকীর্ণ আছে শ্রীশ্রীমহাকাল জীউ-মন্দির, মহাকাল এ মঠের প্রধান দেবতা। মন্দিরটি চূড়াহীন বিরাট ও সুউচ্চ কক্ষের মত অবয়ব। এ-কক্ষের কেন্দ্রস্থানের প্রশস্ত দরজা উন্মুক্ত করলে দেখা যায়, মেঝের উপর সিংহাসনে ও তার আশপাশে বহু দেবতার বিগ্রহ। সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ তন্ত্রযানী বৌদ্ধদের উপাস্য ধাতু নির্মিত, প্রাচীন ও মহাদুর্লভ, কক্ষের মধ্যে এবং অন্যত্র কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য দেবতার মূর্তিও আছে। সব দেব-বিগ্রহগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে নিয়মিত পূজিত হয়ে আসছে। এ লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায় এককালে ভোটবাগানের দশনামী শৈবদের এই পূজাস্থানটি বিভিন্ন ধর্মপন্থীদের মহামিলন-ক্ষেত্র ছিল।

মহাকাল এ মঠে কোন দেবতার সহচর বা আবরণরূপে পূজিত হন না, তিনিই প্রধান উপাস্য, তাঁর নামেই মন্দির। সিংহাসনের উপর কয়েকটি দেবমূর্তির কেন্দ্রস্থলে মহাকালের বিগ্রহ স্থাপিত। ত্রিমুখ, প্রধান মুখটি সিংহের অনুরূপ, উৎসঙ্গ দেশে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রকৃতি। মহাকালের পাশে রুদ্র-ভৈরব, কালভৈরব, পদ্মপাণি,
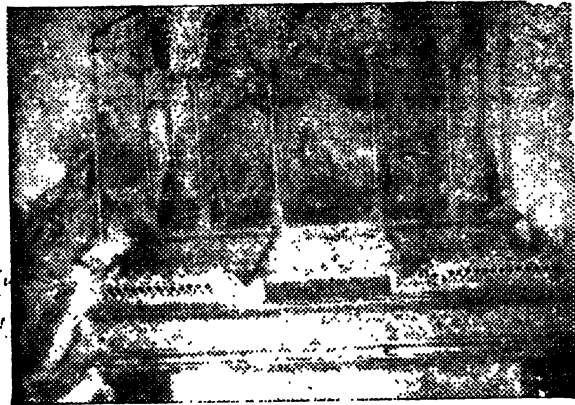
ভোটবাগান তিব্বতী মঠ

বজ্র-ভ্রূকুটি। সিংহাসনের পাশে তারা-মূর্তি, অতি সুশ্রী বিগ্রহ, উচ্চতায় প্রায় দেড় ফুট, ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, ত্রিনয়ন, পঞ্চচূড় মস্তকে এবং বহুহস্তবিশিষ্ট, সকল হস্তেই বিভিন্নরূপ প্রহরণ আছে। দেবীর আসনের নিম্নভাগে কিছু লিপি আছে, দূর থেকে দেখলে দেবনাগরী অক্ষরের মনে হয়, এর কাছে যাওয়া বা ফটো তোলা নিষিদ্ধ, তবে পুরোহিতকে অনুরোধ করলে তিনি পড়ে দেন—(যতটা তিনি পড়তে সক্ষম হন)—'বিক্রমাব্দ-উনিশশ চৌষ্ট—ফাল্গুন শুক্ল সপ্তমী---চন্দ্রপ্রতীপ---।' তারামূর্তিকে আর্যতারা মতান্তরে বজ্র তারা, তাঁর পাশে শ্বেত-প্রস্তরনির্মিত প্রায় দু'ফুট উচ্চ মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গার মূর্তি, ক্রোড়ে কার্তিক। এ-কক্ষে একটি বহু প্রাচীন তাম্রপট্ট আছে, উহাতে পদযুগল খোদিত, পুরোহিত প্রচার করেন---পদচিহ্ন দুটি মহামুনি জীং-কপিলের। অন্যত্র একটি শিব-মন্দিরে, ভৈরবের প্রস্তরমূর্তি আছে, তিনি চর্তুভুজ ও কুকুরের উপর উপবিষ্ট।

তন্ত্রযানী বৌদ্ধদের বহু দেববিগ্রহ নিত্য পূজিত হয় এ-মঠে, কিন্তু তন্ত্রাচার বলতে সাধারণত যা বোঝায়, সেরূপ বীভৎস বিধানে নয়, এ স্থানের সকল দেবতার পূজাচারে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য আচার দেখা যায়। নৈবেদ্য---আতপ চাল, ফলমূল, মিষ্টান্ন, দুধ, দ্বিপ্রহরে অন্ন-ভোগ, রাত্রে শীতল দেবার রীতি আছে। মদ্য-মাংস একেবারে নিষিদ্ধ, তার কারণ এ-মঠ আসলে উত্তর ভারতীয় শৈবদের, এঁরা শঙ্করাচার্যপন্থী-বৈদিক। এ মঠে তান্ত্রিক বিগ্রহ কেন আছে সে কথা পরে বলছি।

নিত্যপূজার জন্য পুরোহিত আছেন, মোহান্ত মহারাজও সময় বিশেষে পৌরোহিত্য করেন।

আদিতে তিব্বতীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও পরবর্তীকালে ঐ রাজ্যের সঙ্গে এ-মঠের যোগাযোগ রুদ্ধ হয়ে যায়, মঠটি বাংলা দেশের দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মকেন্দ্র তারকেশ্বর মঠ বা ঐ স্থানের সন্ন্যাসীদের দ্বারা গঠিত দশনামীসম্প্রদায়মণ্ডলীর পরিচালনাধীন। 'তারকেশ্বরমণ্ডলী' ভোটবাগান মঠের মোহান্ত নির্বাচন করেন, তবে তাঁদের এই নির্বাচন হাওড়ার জেলা-জজের দ্বারা অনুমোদন করে নিতে হয়।

এ-মঠ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা কিছু বিচিত্র, তার ইতিহাস পাওয়া যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়, ১৭৭৫ থেকে ১৭৭৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন এককালে আলোচ্য মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে হলেও এর প্রতিষ্ঠাতারা কেউ বাঙ্গালী ছিলেন না। স্থাপন বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন তিনজন, তাঁরা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ব্যক্তি, ধর্ম ও প্রকৃতির দিক থেকে একজনের সঙ্গে অপরের আদৌ মিল ছিল না। ঐ প্রতিষ্ঠাতারা তিনজন হলেন—

তিব্বত রাজ্যের ধর্মগুরু পাঞ্চেন লামা, তিনি সে সময় দলাই লামার প্রতিনিধিরূপে ঐ ধর্মরাষ্ট্র শাসন করছেন।

উত্তর-ভারতীয় দশনামী শৈব-সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক---পুরাণগিরি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল-ওয়ারেন হেস্টিংস।

বিভিন্ন ধর্ম-সমাজ ও প্রকৃতির তিনটি ব্যক্তির একযোগে একটি ধর্ম স্থান সংগঠিত করা বিস্ময়জনক ঘটনা সত্যই সম্ভব হয়েছিল---সে প্রতিষ্ঠান আজ প্রায় দুশ বৎসর হল ভালভাবেই আছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন---এই মঠ স্থাপনের ব্যাপারে শুধু ধর্মীয় আবেদন ছিল না। বিশেষ করে হেস্টিংসের দিক থেকে ত নয়ই।

সে সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে দেওয়ানী স্বত্ব ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠা কায়েমী হয়েছে, ইংরেজের লুব্ধদৃষ্টি আরও সুদূরপ্রসারতা লাভ করেছে, ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য-গুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে আগ্রহান্বিত, এই সময় কোচবিহার ও ভুটান যুদ্ধের ব্যাপারে হেস্টিংস হস্তক্ষেপ করায় তিব্বতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটলো, যোগাযোগকারী বা দূতের কাজ অনেকটা করছিলেন সন্ন্যাসী পুরাণগিরি---ইনি পরিব্রাজক অবস্থায় বহুবার তিব্বতে গেছেন, তিনি সে স্থানের ধর্মগুরু ও রাজ্য-শাসকদের বিশেষ পরিচিত; হেস্টিংসের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল।

পুরাণ গিরির মাধ্যমে তিব্বতের পাঞ্চেন লামা হেস্টিংসের কাছে বাংলা দেশে---কলকাতার নিকটবর্তী স্থানে তিব্বতীয়দের একটি মঠ গঠনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এই সময়। কূটনৈতিক কারণবিশেষে হেস্টিংস শুধু পাঞ্চেন লামার প্রার্থনা রক্ষা করলেন না তাঁর শাসন-কেন্দ্রের কাছে হাওড়া-ঘুসুড়ীতে তিব্বতী মঠ স্থাপনে সর্বপ্রকার সহায়তা করলেন।

স্থির হল ঐ মঠের মোহান্ত হবেন পুরাণ গিরি—তিনি ইংরেজ ও তিব্বতীদের উভয়ের বন্ধু। হেস্টিংস পুরাণ গিরিকে আশাপুর পল্লী জায়গীর দিলেন। স্থাপনকালে এই মঠের জন্যে তিব্বতের তাসী লামা বহু ধনরত্ন ও ধর্মগ্রন্থ (পুঁথি) দেন এবং পুরাণগিরি মহাচীন হতে কয়েকটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতার ধাতুবিগ্রহ এনে মঠে স্থাপন করেন।

হয়ত হেস্টিংসের নির্দেশে বা পুণ্য-লাভের আশায় স্থানীয় কয়েকজন ভূস্বামী ঘুসুড়ীর গঙ্গাতীরে প্রায় দেড় শতবিঘা জমি ঐ মঠের নামে দানপত্র করলেন, প্রতিষ্ঠাকালে।

পুরাণগিরি দশনামী সন্ন্যাসী, তিনি বাংলা দেশের দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান তারকেশ্বর মণ্ডলীর অধীন ছিলেন, সে কারণ ভোটবাগান-মঠ তারকেশ্বর কেন্দ্র মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, এখনও তাই আছে।

বর্তমানে ভোটবাগান মঠের মোহান্ত জাতিতে বাঙালী, এঁর পূর্বে এখানে কোন বাঙালী ঐ পদ পান নি।

সদালাপী, সৌম্যদর্শন, শাস্ত্রজ্ঞ সাধক এই প্রৌঢ় মোহান্তের আশ্রমিক নাম—দণ্ডীস্বামী শ্রীদিব্যাশ্রম (মোহান্ত মহারাজ)।

প্রাণেশ চক্রবর্তী

অ[illegible] সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যুগে যুগে মানুষ আপন সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। শত সহস্র বাধাবিপত্তিকে সে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেছে। অজানা পথের পথিকরা যে সবাই সাফল্য লাভ করেছেন তা নয়, অনেকে অজানাকে জানতে পারার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে পরবর্তী কালের পথিকরা নিরস্ত হয়নি, বিচ্যুতি হয়নি বিগতকালের পথিকদের লক্ষ্য থেকে। কারণ এই জ্ঞানের নেশাকে যে কোন কিছুর দ্বারাই বশীভূত করা সম্ভব নয়। অনাদিকাল থেকে মানুষ এ নেশায় মাতাল হয়েছে। চিরকাল মানুষ এ নেশায় মাতবে।

এমনি এক দুর্বার নেশা পর্বতাভিযান। প্রকৃতির নানা প্রতিকূল পরিবেশে, ঘাত-প্রতিঘাতময় বন্ধুর পথে কি এক অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে। দূরের ওই শ্বেতশুভ্র মৌন শৃঙ্গগুলি অবিরত যেন হাতছানি দিচ্ছে কাছে যাবার জন্য। কি এক অদ্ভুত মায়াজাল ছড়ানো রয়েছে সেখানে। যেন মন্ত্রশক্তির বিপুল টানে ওরা সর্বদাই টানছে। একে উপেক্ষা করার সাধ্য নেই পর্বত-প্রেমিক মানুষের। পাহাড়ের ডাক বড় মধুর ও মর্মান্তিক। পাহাড় তাদের দেহের রক্তকে চঞ্চল করে তোলে।

কবে কোথায় প্রথম পর্বতাভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। সর্বপ্রথম এ নেশায় কার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে তার সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যতটুকু জানতে পারা গেছে তাতে মনে হয় হানিবলই প্রথম বিপদসঙ্কুল পাহাড়ী পথ পাড়ি দেন। খ্রীস্টপূর্ব ২১৮ অব্দে তিনিই সর্বপ্রথম বহু পদাতিক সৈন্য-বাহিনী (হাতি-ঘোড়া ইত্যাদিসহ) নিয়ে আল্পস পর্বতমালা অতিক্রম করে কারথেজিনা থেকে পো-য়ের সমতল ক্ষেত্রে নেমে আসেন। পো-য়ের সমতল ক্ষেত্র দিয়ে নিকটবর্তী কোন এক রাজ্যে পৌঁছতে তাঁর মাসপাঁচেক সময় লাগে। কিন্তু তাঁর আল্পস পর্বতমালার পথ পাড়ি দিতে সময় লাগে মাত্র পনের দিন।

পলিবিয়াসের রিপোর্ট থেকে জানা যায় দুর্গমপথের নানা অসুবিধাজনিত কারণে হানিবলকে প্রায় এক হাজার আটশ' পদাতিক সৈন্য ও দু'হাজার ঘোড়সওয়ার হারাতে হয়। বলা বাহুল্য পলিবিয়াস নিজেও এর বেশ কিছুদিন পরে উক্ত পথ অতিক্রম করেন।

তারপরে মার্কোপোলো পামীরের বিস্তৃত মালভূমি অতিক্রম করেন। তিনি এ অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—তীব্র ঠাণ্ডা ও অক্সিজেনের অভাবে সাধারণ পরিবেশ থেকে অত্যধিক উচ্চতায় চলাফেরা করতে বেশ কষ্ট হয়। তিনি বলেছেন এ সমস্ত কারণেই বোধহয় অত উচু দিয়ে কোন পাখী উড়ে যেতে পারে না। অত্যাধিক ঠাণ্ডার জন্য সেখানে আগুনের উত্তাপকে নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। শুধু তাই নয়। আগুনের রঙও কেমন যেন টনক ফ্যাকাশে লেগেছে মার্কোপোলোর কাছে।

পৃথিবীর ছাতে দাঁড়িয়ে মার্কো-পোলো বোধ করি ভবিষ্যৎকালের

হুইমপার ও গাইড ক্রজ ম্যাটারহর্ন শীর্ষে

অভিযাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে থাকবেন। তাই তিনি তাদের সঙ্গে করে খাবারদাবার নিয়ে আসতে পরামর্শ দিয়েছেন।

১৩৩৬ সালে Petrarch-এর ভেনটকস্ শৃঙ্গ আরোহণ সেকালে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে। ১৩৩৮ সালে মহিলা অভিযাত্রী হেন্দ্রিয়েটের প্রথম মাউন্ট ব্লাঁ আরোহণ রীতিমত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে যুগে একজন মহিলা দুর্গম মাউন্ট ব্লাঁ-র শিখরে আরোহণ করেছিলেন একথা ভাবতে আজও বেশ অবাক লাগে। তিনি তাঁর আরোহণের এক রুদ্ধনিঃশ্বাসকারী বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—আরোহণকালে প্রবল ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছিল। কোন বিশ্রাম না নিয়ে একনাগাড়ে তিনি চুয়াল্লিশটি পদক্ষেপের বেশী উঠতে পারছিলেন না। উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই পদক্ষেপের সংখ্যা আরো কমে এসেছে। তাঁর নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তিনি লক্ষ্য করেন তখন মিনিটে একশ' ছত্রিশবার নাড়ীর স্পন্দন হয়েছে তাঁর। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসরোধের জন্য তিনি আরোহণকালে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করেন। কিন্তু শীর্ষে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা নিমেষে দূর হয়ে যায়।

১৮৭১ সালে একজন মহিলা আল্পস পর্বতমালার দুরারোহ ম্যাটারহর্ন আরোহণ করেন। তাঁর নাম লুসি ওয়াকার। তিনি তাঁর ভাই লুসি হোরেসের (অনেকের মতে তাঁর বাবা ফ্রাঙ্ক ওয়াকারের সঙ্গে) এই দুরূহ কাজটি করতে সক্ষম হন। শোনা যায়, আরোহণকালে তিনি শুধু স্পঞ্জকেক্ খান ও জলের পরিবর্তে স্যাম্পেন পান করেন।

পৃথিবীর পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত হয় ১৮৬৫ সালে ম্যাটারহর্ন শিখর আরোহণের পরে। এই অভিযানকালে হুইমপার ও তাঁর সহ-অভিযাত্রীরা সর্বপ্রথম পর্বতারোহণের প্রকৃত ক্রীড়াশৈলীকে ব্যাপকভাবে পর্বতপৃষ্ঠে প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, পর্বতারোহণ যে একটা উচ্চতর পর্যায়ের 'স্পোর্ট', তাও হুইমপার ম্যাটারহর্ন আরোহণের দ্বারা প্রমাণ করেন। দুঃখের কথা শিখর আরোহণের পরে অভিযাত্রীরা যখন নেমে আসছিলেন, তখন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে চারজন অভিযাত্রী প্রাণ হারান। ফলে এই পর্বতাভিযান সেকালে সমস্ত ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চারজন দড়ি ছিঁড়ে নুড়ির মত গড়িয়ে পড়ছে

তারিখটা ছিল ১৩ই জুলাই। জারমেট থেকে আটটি মানুষ খুব ভোরে বেরিয়ে যান ম্যাটারহর্নের পথে। এঁরা হলেন—হাডসন, হুইমপার, লর্ড ফ্রান্সিস, ডগলাস ও হ্যাডো। এ ছাড়া ছিলেন তিনজন বিখ্যাত গাইড—ক্রজ, ওল্ড পিটার-টাগওয়াল্ডার ও ইয়ং পিটার। আর ছিল একজন কুলী—জোসেফ। শেষোক্ত এই দু'জনই ওল্ড পিটারের ছেলে।

এদের রওনা হবার কয়েকদিন পূর্বে আরো একটি দল ম্যাটারহর্ন আরোহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন জিন ক্যারল। ক্যারল হুইমপারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে ইতিপূর্বে আল্পসের পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন বিস্তর। অথচ সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যারল বলতে গেলে একেবারে গোপনেই সর্বপ্রথম ম্যাটারহর্ন আরোহণের জন্য দলবল নিয়ে এগিয়ে যান। কারণ ক্যারলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথমত ইটালিয়ান গিরিশিরা ধরে সর্বাগ্রে ম্যাটারহর্ন আরোহণ করা ও দ্বিতীয়ত স্বীয়দেশ অর্থাৎ ইটালীর সুনাম বৃদ্ধি করা। বন্ধুর এই গোপন উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে হুইমপার ভীষণ আঘাত পান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিরুৎসাহ বোধ করেন না। বরং প্রবল উৎসাহে তিনি মর্যাদার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এবং শেষ পর্যন্ত হুইমপার বিচক্ষণ গাইড ক্রজকে নিয়ে সর্বপ্রথম ম্যাটারহর্ন শিখর আরোহণ করার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

শিখরে সর্বাগ্রে পৌঁছেও হুইমপার কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারেন না। ক্যারল ও তাঁর সহযাত্রীরা আগে শিখরে আরোহণ করেছেন কিনা যাচাই করার জন্য হুইমপার পদচিহ্ন খুঁজতে থাকেন সেখানে। কিন্তু পদচিহ্ন তো দূরে,

অতঃপর তিনি স্বস্তি বোধ করেন। অবশেষে ইটালিয়ান গিরিশিরার দিকে নজর পড়তেই তিনি আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। তিনি ও ক্রজ নিচের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পান ক্যারেল তখনও শীর্ষদেশের বহু নিচে। এবারে তাঁর মনে আর কোন দ্বিধা থাকে না। শৃঙ্গ-বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ হুইমপার ম্যাটারহর্ন শীর্ষদেশে একটি তাঁবুর রড পুঁতে তাতে ক্রজের নীল জামা উড়িয়ে দেন।

কিন্তু এই অপার আনন্দ যে একটু বাদেই বিষাদে পরিণত হবে তা কে জানতো। শিখরে ঘণ্টাখানেক সময় অতিবাহিত করে তাঁরা নেমে আসবার জন্য প্রস্তুত হন। হাড্সনের সঙ্গে পরামর্শ করে হুইমপার সিদ্ধান্ত করেন দড়ির সর্বাগ্রে থাকবে অভিজ্ঞ গাইড ক্রজ। ঠিক তার পেছনেই থাকবেন হ্যাডো, হাড্সন, ডগলাস, ওল্ডপিটার, হুইমপার ও দড়ির সর্বশেষে ইয়ং পিটার।

উত্তরগাত্রের ভয়াবহ পথ ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই ওঁরা সকলে নামছিলেন এক একজন করে। তবু অকস্মাৎ হ্যাডোর পা ফসকে যায়। তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ফলে দড়িতে পড়ে প্রবল টান। ক্রজের সাবধানবাণী শুনে হুইমপার ও ওল্ডপিটার তৎক্ষণাৎ নিজেদের সামলে নেন। কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই তাঁরা দেখতে পান সামনে থেকে চারজন দড়ি ছিঁড়ে ছোট্ট নুড়ির মত গড়িয়ে পড়ছে। চোখের পলকে চারটি প্রাণী হাজার চারেক ফুট নীচে হিমবাহের অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এ যেমনি অভাবনীয় তেমনি কল্পনাতীত। জীবন্মৃত অবস্থায় বাকি তিনটি প্রাণী কোন প্রকারে নীচে নেমে আসেন। বিষাদের ছায়া সাফল্যের আলোকে গ্রাস করে ফেলে।

শোনা যায় পুরোন দড়ির জন্যই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণহানির জন্য অবশ্য হুইমপারকে আজীবন দেশের করতে হয়েছিল।

১৬ই জুলাই হুইমপারের সহযোগিতায় একটি উদ্ধারকারীদল হাড্সন্, হ্যাডো ও ক্রজের নিঃসাড় দেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। কিন্তু লর্ড ফ্রান্সিস-ডগলাসের মৃতদেহ কিছুতেই উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

দেশের মানুষের কাছে হুইমপার যতই লাঞ্ছিত হয়ে থাকুন, তাঁর এই দুঃসাহসিক অভিযানের পর থেকে ইউরোপে পর্বতারোহণের ব্যাপক চর্চার সূত্রপাত হয়। পর্বতকন্দরে নানা বিপজ্জনক অবস্থার কথা চিন্তা করে পর্বতারোহণের নানা উপায় উদ্ভাবন হতে থাকে। কালক্রমে সে সমস্ত ক্রীড়া-কৌশল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ফলে আজ পর্বতগাত্রে পর্বতারোহী দৃঢ়পদক্ষেপে নিঃসঙ্কোচে অবিচল আস্থার সঙ্গে এগিয়ে যেতে একটুও কুণ্ঠিত বোধ করে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিম্বা ভয়াবহ পরিস্থিতিকে আস্থার সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্য দিন দিন আরো যে উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে, একথা বলাই বাহুল্য। তবে আজকের পৃথিবীর উন্নততর পর্বতারোহণের মূলে হানিবল, মার্কোপোলো, লুসিওয়াকার, হুইমপার, ক্যারল প্রমুখের দানকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁদের নিয়মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়ই পরবর্তীকালে তরুণ মনে 'এ্যাডভ্যাঞ্চারের' প্রেরণা জুগিয়েছে।

হিমালয়ের দেশ ভারতবর্ষে কিন্তু পর্বতারোহণ এবং পর্বতাভিযানের সত্যিকারের আগ্রহের উন্মেষ হয় ১৯৫৩ সালে বৃটিশ অভিযাত্রী দলের সঙ্গে শ্রীতেনজিং নোরগের এভারেস্ট আরোহণের পরে। তৎকালীন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহাতিশয্যে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পর্বতারোহণ শিক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৪ সালে দার্জিলিং-স্থাপিত হয়।

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ও অন্যান্য খেলাধূলার মত পর্বতারোহণও আজ আন্তর্জাতিক 'স্পোর্ট' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর ব্যাপক প্রসারের জন্য সরকারী উদ্যোগে আমাদের দেশে আরো দুটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। একটি পাঞ্জাবের মানালিতে, অপরটি উত্তরপ্রদেশের উত্তর কাশীতে। তা ছাড়া সারা দেশে বহু বেসরকারী পর্বতারোহণ সংস্থা গঠিত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য পর্বতারোহণ ও পর্বতাভিযানকে জনপ্রিয় করে তোলা।

পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ একেবারে নবাগত বলা চলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে পৃথিবীর পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট ছাড়া হিমালয়ের ছোট-বড় ত্রিশটিরও বেশী পর্বতশৃঙ্গে আজ ভারতীয় পর্বতারোহীরা বিজয় কেতন উড়াতে সক্ষম হয়েছেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা, তার মধ্যে বাংলা দেশের পর্বতারোহীরা দশটি শৃঙ্গ বিজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

আজ আর আমাদের দেশে পর্বতারোহণ কেবল স্পোর্ট নয়। দেশের নিরাপত্তার প্রয়োজনে পর্বতারোহণের গুরুত্ব অপরিসীম। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আজ আমাদের দেশে পর্বতারোহণের ব্যাপক প্রচলন হওয়া দরকার। তাছাড়া প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হিমালয়কে আমাদের এই দরিদ্র দেশে দারিদ্র্য মোচনে নিয়োগ করতে হবে। এজন্য অজানা হিমালয়কে আমাদের জানতে হবে, তার সকল ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করতে হবে। এই আবিষ্কার পর্বতাভিযানের মাধ্যমে সম্ভব। তাই পর্বতারোহণ একালে অপরিহার্য।

মাস্কল্যাণ্ডের

কলাকার

মানুষ থেকে ইতর প্রাণী পর্যন্ত আত্মগোপন করার প্রবৃত্তিতে এক পর্যায়ভুক্ত হলেও মানুষ ও ইতরপ্রাণীর আত্মগোপন-প্রবৃত্তির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে—ইতর প্রাণী সাধারণত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নির্জন বা নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করার চেষ্টা করে থাকে—আবার দৈহিক আকৃতি বা বর্ণের পরিবর্তন সাধন করেও তারা আত্মগোপনে প্রবৃত্ত হয়। কেন্নো খনরুই প্রভৃতি কীট ও প্রাণী স্পর্শ-মাত্র পিণ্ডাকৃতি হয়ে যায়—উহাতে আত্মরক্ষা সম্পন্ন হয় কি না উহা বিচার্য বিষয় নয়, তবে দেহের রূপান্তর সাধন করে শত্রুর কবল থেকে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে। কাঁকলাস ও কোন কোন কীট-পতঙ্গ আবার বর্ণ পরিবর্তন করে শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রম উৎপন্ন করে।

মানুষের ঐ সকল সুবিধা না থাকায় তারা শত্রুর মনে ভীতি বা উপেক্ষা উৎপন্ন করার জন্য দেহ চিত্রকেই সর্বপ্রথম প্রাধান্য দিয়েছিল—মানব-জীবনের মধ্যে সে সময় ছিল রাক্ষসী প্রবৃত্তির প্রাধান্য, ঐ সময় পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে নিজ দেহকে চুন-কালী দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে চিত্রিত করে পরস্পরকে আক্রমণ করত। চুন-কালী মাখা ভয়ঙ্কর মূর্তিটি ব্যক্তির দুর্বলতা আবৃত করার ছদ্ম পরিচ্ছদ।

মা কালীর মুখোশ

প্রাচীনকালে ডাকাতরা মুখ কালী বা চুন-কালী দিয়ে চিত্র করে ডাকাতি করতে যেত। লুণ্ঠিতের বা নির্যাতিতের চিত্তে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য। ইহার মূলে অপর একটি উদ্দেশ্যও নিহিত থাকে অর্থাৎ আক্রমণকারী নিজ মূর্তিকে অপ্রাকৃত বা ভয়ঙ্কর শক্তির নবাগত প্রাণিরূপে নির্যাতিতের মনে রহস্য সৃষ্টি করার প্রবৃত্তিতে ছদ্মবেশ ধারণ করে। বর্তমান যুগের শত্রু পক্ষ চোখে চশমা এঁটে মুখে কাল কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে ও পরচুলা পরে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়—কোন কোন দেশের অপরাধীরা সময় সময় রবারের বা কাগজের মুখোশও পরিধান করে। মুখোশের এই কুৎসিত দিক ব্যতীত অপর একটি আনন্দ ও পবিত্রতা মাখান সাত্ত্বিক প্রয়োগও আছে।—

ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বে অনার্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে মুখোশ পরিধান করার রীতি প্রচলিত ছিল—খননকার্যের ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসংগ্রহের মধ্যে মাটির মুখোশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ঐগুলি খেলনার উপকরণরূপেই নির্মিত হয়েছিল।

শিশুদের মনে কৌতূহল ও আনন্দসৃষ্টির জন্য অপর ব্যক্তি মুখের উপর হাত দিয়ে মুখোশ ধরে রাখত—দৃষ্টিপথের দুটি রন্ধ্রমুখের উপর রাখত—দৃষ্টিপথে দুটি রন্ধ্র থাকায় অভিনেতা দর্শককে দেখতে পেত। মাটির মুখোশ মুখে সংলগ্ন করে রাখার অসুবিধার জন্য অভিনয়ক্ষেত্রে

উহার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না— মুখে সংলগ্ন করে অভিনয় করার জন্য পাতলা মুখোসের প্রয়োজন—কাগজ আবিষ্কৃত না হওয়ায় বা উহার সাহায্যে মুখোশ নির্মাণ করার পদ্ধতির অজ্ঞতার জন্য অভিনয় করার প্রয়োজনবোধ থেকে কাঠের মুখোস নির্মিত হয়েছে। ঐগুলি আকৃতি ও ওজনে কুড়ি থেকে চল্লিশ সের পর্যন্ত হয়।

ঐগুলি মুখে না পরে মাথায় রেখে—মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে অভিনেতা তাঁর অভিনয়কার্য সম্পন্ন করেন। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, ভারতের মাদ্রাজ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চলে কাষ্ঠ-নির্মিত মুখোসের প্রচলন আছে। সাধারণত শিবলীলা অভিনয়ের জন্য হিন্দু-উৎসবে মুখোস প্রয়োজন হয়—বৌদ্ধ সম্প্রদায় মার বা ঐ জাতীয় বিভীষিকা সৃষ্টির জন্য অতি ভয়ঙ্কর মুখোসের পরিকল্পনায় মুখোস নির্মাণ করেন। পবিত্র অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে নির্মিত কাষ্ঠ-নির্মিত বৃহৎ মুখোসগুলি পবিত্র বস্তুরূপে মন্দিরে রক্ষিত হয়—বৎসরের নির্দিষ্ট তিথিতে অভিনেতারা ঐগুলি মন্দির থেকে অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করে অভিনয়মঞ্চে অবতীর্ণ হন।

তিব্বত ও ভুটানে এখনও এ-প্রথা প্রচলিত আছে। মুখোসগুলি মাথার উপর স্থাপন করার জন্য অভিনেতার উচ্চতা অত্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় উহাতে অভিনেতার মধ্যে সহজে অতি-মানবিকতা আরোপিত হয়।

বৃহৎ ভারী মুখোস পরিধান করার সময় যথাস্থানে বিন্যাসের জন্য কপিকলের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠে। শিব, পার্বতী-নন্দী, ভৃঙ্গী ব্যতীত বৃষ, পক্ষী, সারমেয় ও ভূত-প্রেত প্রভৃতির অভিনয়েও মুখোস ব্যবহার প্রচলিত আছে। শিবের বিভিন্ন কর্ম অনুসারে মুখোসের ও পরিবর্তন ঘটে—তবে শিবের প্রত্যেকটি মুখোসই ভীতিব্যঞ্জক। শিব রুদ্র বা ধ্বংসের দেবতারূপেই অধিক প্রচারিত থাকায় তাঁর রুদ্রমূর্তিই অধিক প্রদর্শিত হয়।

বাংলা দেশে শৈব পর্বদিনে কাগজের মুখোস পরিধান করার রীতি প্রচলিত আছে—ঐগুলি খব হালকা হওয়ায় মুখে পরিধান করার সুবিধা থাকে—দৃষ্টি উন্মুক্ত রাখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রন্ধ্র রাখা হয়। নেপাল ভুটান প্রভৃতি স্থানে কাষ্ঠনির্মিত

মা দুর্গার মুখোস

মুখোস নির্মাণ করার জন্য বিশেষ এক প্রকার শিল্পী আছে, তারা পাঁচ টাকা থেকে একশত টাকা মূল্যের মুখোস প্রস্তুত করে—

বাংলা দেশে বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে কাগজ জুড়ে জুড়ে যে মুখোস শৈব উৎসবের জন্য নির্মিত হয়, উহার শিল্পীরা সমস্ত বৎসর ঐ কাজে নিযুক্ত থাকে না তারা কৃষি বা অন্য ব্যবসায়ের অবসরে উৎসবের জন্য মুখোস প্রস্তুত করে—প্রত্যেকটি মুখোস পাঁচ টাকার অধিক বিক্রয় হয় না—ইহাদের কোন ব্যবসায়িক ভিত্তি না থাকায় ইহাদের মুখোস গ্রামেই সীমাবদ্ধ আছে।

নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে এ-শিল্পটি যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলা দেশে তেমন হয় নি। মুখোস পড়ে অভিনয় করার মধ্যে দু'টি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে প্রথমত অপ্রাকৃত শিবমূর্তি। রুদ্ররূপ মুখোসে যতটুকু প্রতিফলিত হয়, মুখে ততটুকু প্রতিফলিত করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত অভিনয়ে অভিনেতার আত্ম-পরিচিতি উহ্য থাকায় উহাতে নির্দিষ্ট ভাব সহজেই বিধৃত হয়। অভিনয়-ক্ষেত্রে মুখোস একটি প্রতীকরূপে গৃহীত হওয়ায় ইহার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ আরোপিত হয়েছে। মুখোসপরিহিত অভিনেতার মধ্যে যে অপ্রাকৃত রস ও মাধুর্য পাওয়া যায় উন্মুক্ত বদনে উহা দুর্লভ। মালদহের একটি কালীবাড়ীতে কালীর প্রতীক-রূপে কালীর মুখোস পূজো করা হয়। মন্দিরে অপর কোন বিগ্রহ স্থাপিত নেই—এই কালীর নাম 'জহুরা কালী'। মুখোস প্রতীকের মাধ্যমে দেবপূজা অন্য কোথাও প্রচলিত আছে কি না জানা নেই।

কাষ্ঠ, রবার ও কাগজ জুড়ে মুখোস

নির্মাণ-পদ্ধতি ব্যতীত কাগজের মণ্ডের সাহায্যেও মুখোস নির্মিত হচ্ছে। আধুনিক গৃহসজ্জার মধ্যে ইহা একটি নূতন উপকরণরূপে গৃহীত হওয়ায় সাধারণের মধ্যে ইহার চাহিদা দেখা দিয়েছে। ভারত বা এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের মুখোসের তুলনায় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের মুখোসগুলি একঘেঁয়ে ও বৈচিত্র্যহীন ঐগুলি সার্কাসের ক্লাউনের আকৃতি নিয়ে নির্মিত হয়।

খৃষ্ট উৎসবে বৃদ্ধ উপহারদাতা সকলের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন—এই কারণে উপহারের মধ্যে শুভ্র শ্মশ্রুল বৃদ্ধের মুখোসের প্রযোজন হয়। ঐ বৃদ্ধমূর্তিকে বা মুখোসকে খৃষ্টান সম্প্রদায় পবিত্র মনে করেন। এভাবে সমাজ-জীবনে বিভিন্ন সময়ে মুখোসের প্রয়োজন হয়। কৌতূহলোদ্দীপক বা ভীতিব্যঞ্জক মূর্তি ব্যতীত বিগ্রহদেবতার আকৃতিতে মুখোস প্রস্তুত হওয়ায় অনেক ভক্তিমান গৃহস্থ-ঘরেও ঐগুলি এখন সমাদৃত হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও পরিকল্পনা নিয়ে নিভৃতে বাংলা দেশে যে একটি নূতন কুটির-শিল্প ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করে চলেছে এবং ইহা যে ভবিষ্যতে একটি উন্নত শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, উহার সূচনা লক্ষ্য করেছি বর্তমান বৎসরের বিগত স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রীর প্রদর্শনীতে।

প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় মাস্কল্যাণ্ড ও ইহার প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় পর অমৃতবাজার দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত ও মাসিক বসুমতীতে এই প্রতিষ্ঠানের যে সকল বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, উহার প্রতিটি বিবরণ অভ্রান্ত সত্য। প্রায় সত্তর বৎসরের সন্নিকটবর্তী ক্ষীণ-দৃষ্টি বৃদ্ধ অধ্যাপক একমাত্র সাময়িক সহকারী-ছাত্র প্রকাশ চক্রবর্তীকে নিয়ে যে অক্লান্ত নিষ্ঠায় শিল্পটিকে গতিশীল রেখেছে উহাতে চমৎকৃত হতে হয়।

মণ্ড শিল্প সম্বন্ধে শ্রীদাসের একটি প্রবন্ধ ও কোলকাতা রেডিও স্টেশন থেকে গত বৎসর প্রচারিত হয়েছিল—সমস্ত পত্র-পত্রিকার প্রসংশাকে অম্লান রেখে যে কয়টি মণ্ডশিল্পের নির্দশন উপস্থিত করা হয়েছিল, তন্মধ্যে ভুটিয়া মুখোসের নিদর্শন ছিল না কারণ ঐগুলি পূর্বেও শত শত প্রস্তুত হয়ে বিক্রয় হয়েছে এখনও প্রস্তুত হয়। নূতন কর্মশৈলীর সঙ্গে সাধারণের পরিচিতির জন্য মাস্কল্যাণ্ড খেলনা, ঘোড়া ও বাংলার বাউল, ঢাকী প্রভৃতির এক ফুট রিলিফ মডেল এবং দুর্গা ও কালীর ২৪ ইঞ্চি মুখোস উপস্থিত করেছিলেন। ছাঁচে প্রস্তুত না হওয়ায় প্রত্যেকটি মুখোস পরিকল্পনার দিক থেকে স্বতন্ত্র ও অভিনব। প্রত্যেকটি কারুকর্ম বিশেষ যত্নে প্রস্তুত হওয়ায় মাস্কল্যাণ্ডের উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যগুলি উচ্চমানে স্থাপিত আছে। বর্ণের দিক থেকে ইহাদের মধ্যে যে ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তি দান করা হয় উহার মানও কারুকলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তেজস্বী ও লোভনীয়।

দুর্গা, কালী ও শিবমূর্তির বিভিন্ন আকৃতির মুখোস বিগত বৎসর থেকে প্রস্তুত হচ্ছিল, ঐগুলির মধ্যে দুর্গামূর্তির একটি বিশেষ পরিকল্পনা টুরিস্ট ব্যুরোর সহকারী অধিকর্তা অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁদের বাৎসরিক উৎসবে ভ্রমণকারীদের মধ্যে উপহার দানের জন্য নির্বাচন করেন। ঐ নির্বাচিত দুর্গা মুখোসগুলি ভারত বহির্ভূত ছত্রিশটি দেশের ভ্রমণকারীদের গতানুগতিক উপহারের মধ্যে প্রদত্ত হওয়ায় উহারা নির্বাচন-বৈশিষ্ট্যের একটি স্থান করে নেয়।

প্রদর্শনীতে ২৪" ইঞ্চি দুর্গা ও কালী-মূর্তির মুখোসের যে নিদর্শন উপস্থিত হয়েছিল, ঐগুলির বর্ধিত আকৃতি ব্যতীত কলাকর্ম ও পরিকল্পনার দিক থেকেও প্রশংসার যোগ্য। বহু পত্র-পত্রিকার আলোকচিত্র শিল্পীদের ঐ মুখোসগুলির চিত্র সংগ্রহ করার আগ্রহ থেকে উহাদের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, ভারতীয় ভাস্কর্য-রীতির শুভ্র মুকুটগুলির কারুকার্যের মধ্যে মর্মর প্রস্তরের ভাবধারা সুস্পষ্ট। ঐগুলির উপর বর্ণ প্রয়োগ না করে শিল্পী ভাস্কর্য-কর্মকে গুরুত্ব দেওয়ার যে চেষ্টা করেছেন তা সার্থক হয়েছে। গতানুগতিক পাহাড়ী ও সরকারী কলা-কেন্দ্রের মুখোসগুলির মধ্যে উহারা সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেছিল। শ্রীদাসের মুখোসগুলি ভাস্কর্যধর্মী, এই কারণে মাস্কল্যাণ্ডের ভুটিয়া বা বিগ্রহ অনুকৃত মুখোসগুলি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

মাস্কল্যাণ্ডের সম্প্রসারণের জন্য বোর্ড অব ইণ্ডাস্ট্রী দশ হাজার টাকা অনুমোদন করেছেন কিন্তু অধ্যাপক দাসের সহকারী শিল্পী প্রকাশবাবু দুঃখ করে বললেন, ঐ টাকা এখন পর্যন্ত তাঁদের হস্তগত হয় নি, এই কারণে অত্যন্ত সীমিতভাবে তাঁরা কাগজের মণ্ডের ঘোড়া, বাংলার বাউল ও বিভিন্ন পল্লী-চারণ ও বাদ্যকরদের ক্ষুদ্র মূর্তি নির্মাণ আরম্ভ করেছেন মোজেক কলারের ঐপ্রকার কয়েকটি জিনিস প্রকাশবাবু আমাদের দেখিয়ে বললেন---ঐগুলি গৃহ-সজ্জার জন্য প্যানেল আকারে মন্দিরের প্রাচীরসংলগ্ন টেরা-কোটা ভাস্কর্যের ন্যায় অভ্যন্তরভাগে সংযুক্ত করা যায়। যাঁরা গৃহসজ্জায় গতানুগতিকভাবে অর্থব্যয় করেন, তাঁরা এই মণ্ড-শিল্পের ভাস্কর্যধর্মী প্রস্তর অনুকৃতি নিয়ে গঠিত বিভিন্ন বিষয়ের প্যানেলের যুক্ত করতে পারেন।

কালীকার ভীষণ রূপের সঙ্গেই আমাদের অধিক পরিচয়, শ্রীদাসের মূর্তি উহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। লোলজিহ্বা-যুক্তা প্রফুল্ল হাস্যমুখী কালীমূর্তি কচিৎ দেখা যায়—কিন্তু শ্রীদাসের মূর্তিতে উহাই প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি বলেন---কালীকার ধ্যানে আছে---'কর্ণাবত শতানিতং শব-যুগম্ ভয়ানকং'—ঐ কারণে কর্ণ-ভূষণে দুটি বিকট শিশু-মূর্তি সংযুক্ত হয়েছে---

ভাব সম্বন্ধে বলেন—ধ্যানের মধ্যে কালীকার বিস্তৃত চরিত্র ও রূপ বর্ণিত আছে—সমগ্র রূপ একচিত্রে উদ্ধৃত হতে

পারে না—এই কারণে তিনি গ্রহণ করেছেন ধ্যানের সর্বশেষ অংশ বা রূপ—'শিবা বির্ঘোর রাবাভি চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাং, মহাকালেন সমং বিপরীত রতাতুরাং, সুখ প্রসন্ন বদনাং—ইত্যাদি।' প্রলয়ের পর মহাস্থিতি ও সৃষ্টি—কালী এখানে জননী বা মাতা—ব্যাঞ্জল্যাণ্ডের কালী মাতৃমূর্তিতে চিন্তিত হয়। দুর্গা মূর্তির বিভিন্ন আকৃতি ও ভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক দাস বলেন—মনে কখন কে এসে চেপে বসে জানি না—ভাবের বশে কখন তিনি গণেশ-জননী, কখন মহিষ-মর্দিনী, কখনও পার্বতী, গৌরী, ভৈরবী আবার কখনও তিনি কুমারী—আমি ইচ্ছা করে কিছু গড়তে পারি না—কোন পরিকল্পনাও মনে থাকে না—কাজের নেশায় মগ্ন নিয়ে বসলেই কল্পনা হাতটিকে কোথায় টেনে নিয়ে যায় তা আমার সম্পূর্ণ অগোচর। আমরা এই নীরব সাধনার জয় ও সিদ্ধি কামনা করি।'

সৃষ্টি স্থিতি লয়

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ছিল সব আঁধারে মগন
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
কেহ সৃষ্ট হয়নি তারা
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর লভেনি জনম।

নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম স্বীয় সত্তে লীন
নিবাত নিষ্কম্প সব
নাহি স্পন্দ নাহি রব,
যোগনিদ্রাচ্ছন্ন সব প্রাণস্পর্শহীন।

নিশ্ছিদ্র সে অন্ধকারে আলোকের রেখা
নিশব্দে জাগিয়া ওঠে
সর্ব ব্যাপ্ত সে আলোকে।
অন্ধকার মধ্যে যেন ব্যাপ্ত দীপ্ত শিখা।

ব্রহ্ম মধ্যে সুপ্ত আছে সৃষ্টি স্থিতি লয়
নূতন সৃষ্টির লাগি
নাশশক্তি ওঠে জাগি
সৃষ্টি, স্থিতি ধ্বংস সহ নিয়ে বরাভয়।

উলঙ্গ উন্মত্ত শক্তি উঠিল জাগিয়া
ব্রহ্মবক্ষে পদ রাখি
ভয়ঙ্করা শশিমুখী
হুঙ্কারে ওঙ্কার শব্দ চলিল ভাসিয়া।

অন্ধকারে জমাটরূপে আলোর বিকাশ
মুখে অট্ট অট্টহাসি
হাতে বিঘ্ননাশি অসি
বরাভয় করধৃত মা ভৈঃ আশ্বাস।

ব্রহ্মশক্তি মূর্তিমতী সৃষ্টি স্থিতি লয়
কালরূপে আলো করি
সৃষ্টিরূপা মহেশ্বরী,
কালান্তে প্রলয়রূপে করিতেছে ক্ষয়।

ব্রহ্মময়ী মহাকালী মহাকাল মায়া
ব্রহ্ম বক্ষ সুপ্তা শক্তি
ভববন্ধন পরামুক্তি
লীলাচ্ছলে সৃষ্টি মধ্যে মায়াবন্ধ কায়া।

নির্গুণ ব্রহ্মের তুমি সগুণা প্রকৃতি
মায়াবন্ধ করি জীবে
কি খেলা খেলিছ শিবে
মায়ামুগ্ধ জীবে তার নাহি অনুভূতি।

মায়া আবরণে ঢাকি সৃষ্টি তত্ত্বখানি
ব্রহ্মস্থিত সৃষ্টি বীজে
রূপায়ে তুলেছ নিজে,
মায়াডোরে বাঁধি রাখি খেলিছ জননী

নিশ্চল নিস্তব্ধ ব্রহ্ম নাহিক স্পন্দন
চঞ্চলা প্রকৃতি তুমি
সৃষ্টি স্থিতি লয়ভূমি।
নূতন সৃষ্টির তুমি দেখেছ স্বপন।

খেলাচ্ছলে সৃষ্টি তরে করিয়া মনন
সৃজন পালন করে
শেষে ধ্বংস করিবারে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করেছ সৃজন।

কত শত মহাবিশ্বে, কত সূর্য তারা,
কত চাঁদের স্নিগ্ধ আলো
কত মহাকাশে জ্বালো
কত শত কোটি কোটি ছায়াপথ ঘেরা।

বিশ্বময়ী বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বের জননী।
তোমার নিয়োগক্রমে
যে যার কক্ষেতে ভ্রমে।
অদ্ভুত নিয়মে মাগো বেঁধেছ বন্ধনী।

সুনির্দিষ্ট কর্মপথে করিছে ভ্রমণ
নিজ কর্ম অনুসারে,
যে যার কক্ষেতে ঘোরে
তুমি শুধু দ্রষ্টারূপে করিছ দর্শন।

তোমা হতে সৃষ্টি লভি তোমারই কৃপায়
নিজ কর্মকক্ষপথে
ঘুরিতেছে দিবারাতে
কর্মশেষে তোমাতেই হইতেছে লয়।

লীলা শেষে লীলাময়ী হইয়া নির্দয়,
ব্রহ্মারূপা মহেশ্বরী
সর্ব সৃষ্টি ধ্বংস করি,
পুনরায় ব্রহ্ম ব্রহ্মে হইতেছে লয়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

টেসম্যান-দের ঘর। মাঝের দরজা এবং কাচের দরজারও ওপরে পরদা টানা। বাতিটা জ্বলছে টেবিল-এর ওপর, আধা হেলান, ওপরে ছায়া। স্টোভ-এর খোলা মুখে প্রায় নিভন্ত আগুন দৃশ্যমান।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌ আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে আছেন স্টোভ-এর [illegible] তাঁর পায়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-এর [illegible] [illegible]-পরা। অবশেষে [illegible] [illegible] [illegible]

হেনরিক ইবসেন

নিদ্রিত। সোফা-র ঢাকনা তার গায়ের ওপর বিছানো।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌। (একটু থেমে হঠাৎ [illegible]-এ [illegible] [illegible] [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] পেছনে হেলান দিলেন, মনে মনে [illegible] করতে করতে) এখনও এল না। —হা ঈশ্বর—হা ঈশ্বর—এখনও নয়।

[হলঘরের দরজা দিয়ে বার্টা ঢুকল, সন্তর্পণে। তার হাতে একটা চিঠি।]

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড। (ঘুরে সাগ্রহে ফিস্‌ফিস্ করে) বার্টা—কেউ এসেছে কি ?

বার্টা। (মৃদুকণ্ঠে) হ্যাঁ, একটি মেয়ে এই চিঠিটা নিয়ে এসেছে।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড। (সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে) চিঠি। আমাকে দাও i

বার্টা। মাপ করবেন, এটা ডক্‌টর টেস্‌ম্যান-এর চিঠি।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌। ও, তাই না কি।

বার্টা। কুমারী টেস্‌ম্যান-এর পরিচারিকা চিঠিটা এনেছে। এখানে টেবিল-এর ওপর এটা রেখে যাচ্ছি।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড। ঠিক আছে।

বার্টা। (চিঠিটা রেখে) বাতিটা নিভিয়ে দেয়াই উচিত মনে হচ্ছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওটা থেকে।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌। বেশ ত, দাও নিভিয়ে। খুব শীগ্‌গিরই দিনের আলো ফুটবে।

বার্টা। (বাতিটা নিভিয়ে) সকাল হয়ে গেছে ত।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌। হ্যাঁ, পরিষ্কার দিন। কিন্তু কেউই এখনও পর্যন্ত ফিরে এল না!

বার্টা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন দিদিমণি—ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াতে পারে তা আমি আঁচ করেছিলাম।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌। তুমি আন্দাজ করেছিলে ?

বার্টা। হ্যাঁ, যখন দেখলাম কোনও একজন সহরে ফিরে এসেছেন—এবং তিনিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। কারণ ঐ ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে এর আগে অনেক কথা শুনেছি।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌। অত চেঁচিয়ে কথা বোল না। তুমি দেখছি শ্রীমতী টেস্‌ম্যান-কে জাগিয়ে দেবে।

বার্টা। (সোফা-র দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল) না না—আহা বেচারা, ওঁকে ঘুমোতে দেওয়া উচিত। আগুনে আরও কাঠ দেব কি ?

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌। ধন্যবাদ, আমার কোন প্রয়োজন নেই।

বার্টা। ও আচ্ছা।

[হলঘরের দরজা দিয়ে সে নিঃশব্দপায়ে বেরিয়ে গেল।]

হেডা। (দরজা বন্ধ করার শব্দে জেগে উঠে তাকালেন) ওটা কি— ?

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্‌। কেউ না, কি কেবল—

হেডা। (তার দিকে তাকিয়ে) ও, আমরা এখানেই—। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। (সোফা-র ওপর সোজা হয়ে বসে আড়মোড়া ভেঙে চোখ কচ্‌লালেন) টিয়া, এখন ক'টা বাজে ?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে) সাতটা বেজে গেছে।

হেডা। টেস্‌ম্যান কখন বাড়ি ফিরল ?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। তিনি ত ফেরেন নি।

হেডা। এখনও বাড়ি ফিরল না ?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। কেউই আসে নি।

হেডা। ভোর চারটে পর্যন্ত এখানে বসে বসে আমাদের অপেক্ষা করার কথা একবার ভাবো—

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (নিজের হাত মুচড়ে) আর, তার জন্য কী ভাবেই না আমি হা ক'রে বসেছিলাম !

হেডা। (হাই তুলে মুখের সামনে হাত তুলে) হুঁ দেখো—এই অশান্তিটুকু ভোগ করার কোনও দরকার ছিল না।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। তুমি কি একটুখানি ঘুমোতে পেরেছিলে ?

হেডা। পেরেছি। মনে হচ্ছে বেশ ভালই ঘুমিয়েছি। তুমি ?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। এক মুহূর্তের জন্যও না। হেডা, আমি পারলাম না ! বেঁচে থাকার তাগিদেও নয়।

হেডা। (উঠে তার দিকে গেলেন) আরে, আরে, গুলি মারো। এত চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। যা ঘটেছে তা বেশ বুঝতে পারছি।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। বেশ, তোমার কী মনে হচ্ছে ? আমাকে বলবে না ?

হেডা। আরে, নির্ঘাৎ বিচারকের পার্‌টি রীতিমত রাত ক'রে সুরু হয়েছিল—

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাহলেও—

হেডা। আর তা ছাড়া, মাঝ রাতে বাড়ি এসে আমাদের জাগানো টেসম্যান-এর যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি। (হাসতে হাসতে।) সম্ভবত নিজের মুখ দেখাতে সে ইচ্ছুকও ছিল না—ঐ হৈ-হুল্লোড়ের পর।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। সে ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে কোথায় যাওয়া সম্ভব ?

হেডা। নিঃসন্দেহে পিসীর বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়েছে। ও'রা ওর পুরনো ঘরটা ওর জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দিয়েছেন।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড। না, ও'দের সঙ্গে তোমার স্বামী থাকতে পারেন না ; কেন না, তাঁর একটা চিঠি কুমারী টেস্‌ম্যান-এর কাছ থেকে সবে এসেছে। ঐ যে চিঠিটা।

হেডা। সত্যি ? (ঠিকনার দিকে তাকালেন) আরে, সত্যিই ত, জুলিয়া পিসী নিজে ঠিকানা লিখেছেন। আচ্ছা, তাহলে সে বিচারক ব্র্যাক-এর ওখানেই থেকে গেছে। আর, এইলার্‌ট্‌ লিউভ্‌বোর্‌গ—সে বসে তার পাণ্ডুলিপি পড়ছে, চুলে তার আঙুরলতার বাহার।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। হায় হেডা, নিজে যার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করো না, তাই বলছো।

হেডা। সত্যি তুমি কিছুটা বুদ্ধু।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। ও হ্যাঁ, তাই বটে। আমারও তাই মনে হয়।

হেডা। আর, তোমাকে কী সাংঘাতিক ক্লান্তই না দেখাচ্ছে।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। হ্যাঁ, আমি সাংঘাতিক ক্লান্ত।

হেডা। আচ্ছা, এখন যা বলবো তাই করতে হবে। আমার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো ত।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। ও, না, না—আমার ঘুমোতে পারা উচিত নয়।

হেডা। আমি নিশ্চিত তুমি ঘুমোতে পারবে।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। তা না হয় হল, কিন্তু তোমার স্বামী নিশ্চয় শীগ্‌গির ফিরে আসবেন ; তক্ষুণি আমার জানা দরকার—

হেডা। সে এলে তোমাকে ঠিক জানাবো।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। হেডা, আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলে ত ?

হেডা। হ্যাঁ, আমাকে বিশ্বাস করো,—এখন সোজা ঘরে গিয়ে ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নাও।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। অনেক ধন্যবাদ ; তাহলে চেষ্টা ক'রে দেখি।

[তিনি ভেতরকার ঘরের মধ্যে দিয়ে চলে গেলেন ।]

[কাচের দরজার কাছে গিয়ে হেডা পর্‌দা তুলে দিলেন। সকালের উজ্জ্বল রোদ ঘর ভাসিয়ে দিল। তারপর লেখার টেবিল-এর ওপর থেকে একটা হাত-আয়না তুলে নিয়ে চুল ঠিক করলেন। এর পর হলঘরের দরজায় গিয়ে চাপ দিলেন ঘণ্টার বোতামে।

[হলঘরের দরজায় বার্‌টা-র আগমন]

বার্‌টা। দিদিমণি, আপনার কিছু চাই ?

হেডা। হ্যাঁ, শীগ্‌গির স্টোভ-এর মধ্যে আরও কাঠ গুঁজে দাও। আমি কাঁপছি।

বার্‌টা। হায় হায়—এক্ষুণি আগুন খুঁচিয়ে দিচ্ছি। (পোড়া কাঠের ওপর একখণ্ড কাঠ চাপিয়ে শুনল কান পেতে) দিদিমণি, সদর দরজায় ঘণ্টা বাজল।

হেডা। আচ্ছা, যাও ওখানে। আগুনটা আমি দেখছি।

বার্‌টা। শীগ্‌গিরই বেশ গনগনে আঁচ হবে।

[হলঘরের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।]

['ফুট-স্টোভ'-এ হাঁটু গেড়ে হেডা স্টোভ-এর ভেতর আরও কয়েক খণ্ড কাঠ গুঁজে দিলেন।]

[সংক্ষিপ্ত বিরতির পর টেস্‌ম্যান ঢুকলেন হলঘর থেকে। তাঁকে বেশ ক্লান্ত এবং সীরিয়াস দেখাচ্ছে। মাঝের দরজার দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে তিনি পর্‌দার মধ্য দিয়ে চলে যেতে উদ্যত।]

প্রভাত।

হেডা। (স্টোভের কাছে, না তাকিয়ে)। শুভ প্রভাত।

টেস্‌ম্যান। (ঘুরে দাঁড়ালেন)। হেডা! (তার দিকে এগিয়ে) দুর্গা দুর্গা—তুমি এত সকালে উঠেছ ? অ্যাঁ ?

হেডা। হ্যাঁ, আজ সকালে খুব তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি।

টেসম্যান। আর আমার তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে তুমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হেডা, অবস্থাটা একবার কল্পনা করো !

হেডা। অত চেঁচিয়ে কথা বোল না। শ্রীমতী এল্‌ভসটেড্‌ আমার ঘরে বিশ্রাম করছেন।

টেসম্যান। উনি কি সারা রাত এখানেই রয়েছেন ?

হেডা। হ্যাঁ, কেউই ওকে নিতে এল না, তাই।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, তা ঠিক

হেডা। (স্টোভ-এর দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়ালেন)। আচ্ছা, বিচারক ব্র্যাক-এর ওখানে মজা লুটতে পেরেছিলে ত ?

টেস্‌ম্যান। আমার জন্য চিন্তিত হয়েছিলে ? অ্যাঁ ?

হেডা। না, আমি কখনও চিন্তিত হওয়ার কথা ভাবিই নি। জিজ্ঞেস করেছি তুমি ওখানে মজা লুটতে পেরেছো কি না।

টেস্‌ম্যান। ও হো, হ্যাঁ, হ্যাঁ—একরকমভাবে। বিশেষত আগ রাত্তিরে ; কেন না, তখন এইলারট্‌ আমাকে ওর পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছিল। আমরা এক ঘণ্টারও বেশি আগে গিয়ে পৌঁছেছিলাম—ভাবো একবার ! এবং ব্র্যাক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আয়োজন নিখুঁত করতে—তাই এইলার্‌ট আমাকে পড়ে শোনাল।

হেডা। (ডানদিকের টেবিল-এর পাশে বসে) আচ্ছা তা হলে শোনাও ?—

টেস্‌ম্যান। (স্টোভ-এর কাছে একটা পাদানীর ওপর বসে) ও হেডা, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না বইটা কী অপূর্ব ! আমার মতে এ বই শ্রেষ্ঠ বইগুলোর অন্যতম। একবার ভাবো।

হেডা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ও নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই—

টেস্ম্যান। হেডা, তোমার কাছে একটা স্বীকারোক্তি করতেই হচ্ছে। পড়া শেষ হলে—জান, তখন একটা বীভৎস অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল।

হেডা। একটা বীভৎস অনুভূতি ?

টেস্ম্যান। এইলার্ট-এর এমন একটা ক্ষমতা আছে দেখে আমার ঈর্ষা হয়েছিল। হেডা, শুধু ভেবে দেখো!

হেডা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ভাবছি।

টেস্ম্যান। এবং তারপর এত গুণ সত্ত্বেও তাকে কেউ চায় না—আহা, ভাবলেও কষ্ট হয়।

হেডা। আমার মনে হয় তুমি বলতে চাইছো আর সকলের চেয়ে এইলার্ট বেশি সাহসী ?

টেস্ম্যান। না, আদৌ তা নয়— বরং ও স্বাভাবিক উপায়ে আনন্দ লাভ করতে অক্ষম।

হেডা। শেষ পর্যন্ত ঘটনা কী দাঁড়াল ?

টেস্ম্যান। তাহলে শোন, সত্যি বলতে কি, সব ব্যাপারটা শেষ অবধি উন্মত্ত আনন্দোপভোগে পর্যবসিত হয়েছিল বলাই সঙ্গত।

হেডা। ও'র চুলে কি আঙুরলতা জড়ান ছিল ?

টেস্ম্যান। আঙুরলতা ? না, তেমন কিছুই ত আমি দেখিনি। কিন্তু যে মহিলা ওকে এই রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্যে ও সুদীর্ঘ প্রলাপ বকল—'এই রচনার প্রেরণাদাত্রী' শব্দগুচ্ছ ও উচ্চারণ করেছিল।

হেডা। মহিলাটির নাম বলেছিলেন কি ?

টেস্ম্যান। না। নাম বলে নি। কিন্তু আমার বারবার মনে হচ্ছিল শ্রীমতী এল্ভ্সেটেড্-এর কথাই ও বলছে। নিশ্চয় তাই, বুঝলে ?

হেডা। বেশ, ও'র কাছ থেকে কোন্খানে বিদায় নিলে ?

টেস্ম্যান। শহরে আসার পথের মাঝখানে। আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম—অন্তত আমরা দু'জন—একদম আলাদা ; আর, টাটকা বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে ব্রাক আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। এবং তারপর, বুঝতেই পারছো, আমরা এইলার্টকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হলাম ; কেন না ও অপর্যাপ্ত পানভোজন করেছিল।

হেডা। তাতে সন্দেহ নেই।

টেস্ম্যান। হেডা, এইবার একটা আশ্চর্যজনক কাণ্ড ঘটল ; কিংবা, বলতে পারি, একটা বিষাদঘন পর্যায়। এইলার্ট-এর জন্য—হেডা, ওর জন্য আমি স্বেচ্ছায় করছি—এ কথা তোমাকে বলতে আমি প্রায় লজ্জিত—

হেডা। ওঃ, বলে যাও—

টেস্ম্যান। আমরা যত শহরের দিকে এগোচ্ছিলাম, বুঝতেই পারছো, আমি সকলের পেছনে পড়ে গেলাম। মাত্র মিনিটখানেক, মিনিটদুই-এর জন্য—কল্পনা কর !

হেডা। করেছি, করেছি, নাও—তারপর— ?

টেস্ম্যান। তারপর, যেই তাদের পেছন পেছন দৌড় লাগালাম—বল ত কী পেলাম রাস্তার ধারে ? অ্যাঁ ?

হেডা। আ রে, আমি কোত্থেকে জানবো ?

টেস্ম্যান। হেডা, তৃতীয় কোন প্রাণীকে এ কথা বলবে না। কক্ষণো নয়। কী বললাম শুনেছ ? এইলার্ট-এর ভালর জন্য প্রতিজ্ঞা কর। (কোট-এর পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা পারসেল বের করলেন) প্রিয়ে, কল্পনা কর—এইটা পেয়েছি !

হেডা। এই পার্সেল-টাই ও'র কাছে কাল ছিল না ?

টেস্ম্যান। হ্যাঁ, এইটাই ওর মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ! একমেবাদ্বিতীয়ম্ ! আর ও এটা হারিয়েছে, চলে গেছে, অথচ এ সম্পর্কে কিছু জানে না। হেডা, শুধু ভাবো ! কী শোচনীয়ভাবে—

হেডা। কিন্তু তুমি ও'কে তক্ষুণি পার্সেলটা ফিরিয়ে দিলে না কেন ?

টেস্ম্যান। আমার সাহস হয় নি—তখন ওর যা অবস্থা—

হেডা। অন্য কাউকে এইটা পাওয়ার কথা জানিয়েছ কি ?

টেস্ম্যান। আরে না, না। নিশ্চয় বুঝতে পারছো এইলার্ট-এর কথা ভেবেই আমার পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না।

হেডা। সুতরাং এইলার্ট-এর লিউভ্বোর্গ-এর পাণ্ডুলিপি যে তোমার কাছে রয়েছে সে খবর কেউ জানে না ?

টেস্ম্যান। না। এবং আর কেউ যেন কিছুতেই এ খবর জানতে না পারে।

হেডা। পরে তুমি তাঁকে কী বললে ?

টেস্ম্যান। তার সঙ্গে আদৌ আর কথা বলি নি, কেন না, বড় রাস্তায় পৌঁছানোর পর দুই-তিনজনের সঙ্গে ও সটকে পড়ল। অবস্থাটা কল্পনা কর !

হেডা। সত্যি ! তাহলে ঐ লোকগুলো ও'কে নিশ্চয় ও'র বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

টেস্ম্যান। হ্যাঁ, তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এবং ব্র্যাকও চলে গেলেন।

হেডা। তারপর থেকে কী ক'রে বেড়াচ্ছ ?

টেস্ম্যান। হ্যাঁ, তারপর এক স্ফূর্তিবাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরা কয়েকজন তার বাড়ি গিয়ে প্রাভাতিক কফি খেলাম : কিংবা বলা উচিত রাতের কফি—অ্যাঁ ? কিন্তু এবার, এতক্ষণ বেচারা এইলার্টকে ঘুমোবার সুযোগ দেওয়ার পর, এখন ওকে এটা ফেরৎ দিয়ে আসতেই হবে।

হেডা। (প্যাকেটটার জন্য হাত বাড়ালেন)। না—এটা ও'কে দিও না ! ইয়ে, মানে, এত তাড়াহুড়োর দরকার কি ? আগে আমি পড়ে নিই।

টেস্ম্যান। না প্রিয়তমা, কিছুতেই তা হয় না, হতে পারে না।

হেডা। কিছুতেই নয় ?

টেস্ম্যান। না—কেন না, সহজেই অনুমান করতে পারো, জেগে উঠে পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে না পেলে তার মানসিক অবস্থা কী হবে। শোন, এর আর কোনও কপি নেই ! ও নিজে আমাকে তাই বলেছে।

হেডা। (তার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) এ ধরণের জিনিস কি দ্বিতীয়বার হুবহু লেখা যায় না ? নতুন ক'রে লেখা অসম্ভব ?

টেস্ম্যান। না, আমার মনে হয় না তা সম্ভব। বুঝতেই পারছো, উদ্দীপনা বারবার আসে না—

হেডা। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,—আমারও মনে হয় এসব উদ্দীপনা-নির্ভর। (হাল্কাভাবে।) কিন্তু, ভুলে গিয়েছিলাম—তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে।

টেস্ম্যান। তাই না কি— !

হেডা (তার হাতে চিঠিটা দিয়ে)। আজ ভোরে এসেছে।

টেস্ম্যান। জুলিয়া পিসী পাঠিয়েছেন ! কী খবর থাকতে পারে ? (প্যাকেট-টা অন্য 'ফুট-স্টল'-এর ওপর রেখে চিঠি খুলে পড়েই লাফিয়ে উঠলেন) ও হেডা—পিসী লিখেছেন রীণা পিসী মৃত্যুমুখে !

হেডা। ও, আচ্ছা—তা আমরা ত এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

টেস্ম্যান। আর এই যে, তাঁকে দেখতে চাইলে এক্ষুণি যাওয়া দরকার। এক্ষুণি আমি ওখানে যাবার জন্য দৌড়োব।

হেডা (হাসি চেপে)। তুমি কি সত্যি দৌড়োবে ?

টেস্ম্যান। প্রিয়তমা হেডা—তুমি যদি মনস্থির ক'রে আমার সঙ্গে যেতে ! একটু চিন্তা করো !

হেডা (উঠে ক্লান্ত ভঙ্গীতে টেস্ম্যান-এর অনুরোধ উড়িয়ে দিয়ে বললেন) না, না, আমাকে যেতে বল না। রোগ আর মৃত্যুর দিকে আমি তাকাব না। সবরকম কুশ্রীতাই আমার চোখে ঘৃণ্য !

টেস্ম্যান। বেশ, বেশ, তা হলে— ! (চারদিকে চঞ্চলপদে ঘুরতে ঘুরতে।) আমার হ্যাট—আমার ওভারকোট— ? ও, হলঘরে রয়েছে— হেডা, আশা করছি

ফিরতে খুব বেশি দেরি হবে না ! অ্যাঁ ?

হেডা। ও, যদি দৌড় লাগাও—

[হলঘরের দরজায় বারটা উপস্থিত হল]

বারটা। বিচারক ব্র্যাক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, ভেতরে আসবেন কি না জিজ্ঞেস করলেন।

টেস্‌ম্যান। এই সময়। না, সম্ভবত তাঁর সংগে দেখা করতে পারবো না।

হেডা। কিন্তু আমি পারি। (বারটা-কে) বিচারককে ভেতরে আসতে বল।

[বারটা বেরিয়ে গেল।]

হেডা। (চট্‌পট্‌, ফিস্‌ফিস ক'রে)। টেস্‌ম্যান, পারসেল-টা !

[স্টুল-এর ওপর থেকে ছিনিয়ে নিলেন]

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, ওটা আমাকে দাও।

হেডা। না, না, তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এটা রেখে দেবো।

[লেখার টেবিল-এ গিয়ে বুক-কেস-এ ওটা রাখলেন। টেস্‌ম্যান এত অস্থির যে গ্লোভস্‌ দুটো পরতে পারলেন না]

[হলঘর থেকে বিচারক ব্র্যাক ভেতরে এলেন।]

হেডা। (তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে) বলতেই হচ্ছে আপনি ভোরের পাখি।

ব্র্যাক। হ্যাঁ, তাই নয় ? (টেস্‌ম্যান-এর প্রতি) আপনিও কি বেরোচ্ছেন ?

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, পিসীর ওখানে এক্ষুণি যাওয়া দরকার। কল্পনা করুন—বেচারা শয্যাশায়ী রীণা পিসী মৃত্যুমুখে।

ব্র্যাক। হায়, হায়, সত্যিই তাই ? তাহলে কিছুতেই আপনাকে আর আটকে রাখবো না। এরকম একটা সংকটময় মুহূর্তে—

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, এবার আমি দৌড় লাগাব—বিদায় ! বিদায় !

[তিনি হলঘরের দরজা দিয়ে ব্যস্তপদে বেরিয়ে গেলেন]

হেডা। (এগোতে এগোতে) বিচারপতি, আপনার বাড়িতে রাত্রে রীতিমত একটা প্রাণোচ্ছল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন মনে হচ্ছে।

ব্র্যাক। নিশ্চিন্ত হোন শ্রীমতী হেডা, কাপড়চোপড় আমার অংগেই ছিল। যথাস্থানে।

হেডা। ও ?

ব্র্যাক। না, বুঝতেই পারছেন। কিন্তু রাতের অভিযান সম্পর্কে টেস্‌ম্যান আপনাকে কী বলছিলেন ?

হেডা। সে এক ক্লান্তিজনক গল্প। কেবল এই যে, ওরা অন্য কোথায় যেন গিয়ে কফি খেয়েছিল।

ব্র্যাক। সেই কফি পার্টি সম্পর্কিত খবর ইতিমধ্যেই শুনেছি। মনে হচ্ছে, এইলার্ট লিউভ্‌বোরগ ওদের সংগে ছিলেন না ?

হেডা। না, ওরা তার আগেই এইলার্টকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।

ব্র্যাক। টেস্‌ম্যান-ও ?

হেডা। না, ও বলল অন্যান্য কয়েকজন।

ব্র্যাক। (মৃদু হেসে) শ্রীমতী হেডা, জরুজ টেস্‌ম্যান সত্যি সত্যিই স্রষ্টা।

হেডা। হ্যাঁ, ঈশ্বর জানেন ঠিক তাই। তাহলে এসবের পেছনে কিছু একটা রয়েছে ?

ব্র্যাক। হ্যাঁ, সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হেডা। আচ্ছা, তা হলে বসুন বিচারক, এবং আরাম ক'রে বলুন আপনার কাহিনী।

[হেডা টেবিল-এর বাঁ দিকে বসলেন। টেবিল-এর লম্বা দিকে ব্র্যাক বসলেন, হেডা-র কাছাকাছি]

হেডা। তাহলে এখন ?

ব্র্যাক। কাল রাত্রে আমার অতিথিদের—বরং বলা উচিত কয়েকজন অতিথির—গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিলাম বিশেষ কারণে।

হেডা। অন্যান্যদের সংগে সম্ভবত এইলার্ট লিউভবোরগ-এরও ?

ব্র্যাক। সত্যি বলতে কি তাই বটে।

হেডা। এবার আপনি আমাকে পুরো কৌতূহলী ক'রে তুলেছেন—

ব্র্যাক। শ্রীমতী হেডা, জানেন কি অন্য দু'একজন রাত্তিরটা কোথায় কাটিয়েছে ?

হেডা। স্থানটি নিশ্চয়ই অনুচ্চার্য নয়, আমাকে বলুন।

ব্র্যাক। আরে না, না, আদৌ অনুচ্চার্য নয়। তা ওঁরা বিশেষ প্রাণোচ্ছল এক গানের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হেডা। বেশ প্রাণপূর্ণ আসর ?

ব্র্যাক। চূড়ান্ত প্রাণপূর্ণ—

হেডা। বিচারক, এ সম্বন্ধে আরও খবর দিন—

ব্র্যাক। লিউভ্‌বোরগ এবং অন্যান্যরা সবাই ওখানে নিমন্ত্রিত অতিথি। আমি এ সম্বন্ধে সব জানতাম। কিন্তু তিনি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ; কারণ, জানেনই ত, তিনি এখন নতুন মানুষ।

হেডা। এলভ্‌স্টেড-দের ওখানে, তা ঠিক। কিন্তু তা হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত গেলেন ?

ব্র্যাক। দেখুন শ্রীমতী হেডা—দুর্ভাগ্যক্রমে মদ তাঁকে কাল রাত্রে আমার বাড়ি যেতে প্ররোচনা দিয়েছিল—

হেডা। হ্যাঁ, শুনলাম তিনি উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।

ব্র্যাক। রীতিমত হিংস্র উদ্দীপনা। সে যাই হোক, আমার মনে হয় এর ফলেই তাঁর উদ্দেশ্য বদলে গিয়েছিল ; কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পুরুষেরা যতখানি নীতিনিষ্ঠ হওয়া উচিত ততখানি নই।

হেডা। ও, আমি নিশ্চিত যে, আপনি অন্যতম ব্যতিক্রম। কিন্তু লিউভ্‌বোরগ সম্পর্কে—

ব্র্যাক। সংক্ষেপে বলতে হলে—তিনি অবশেষে শ্রীমতী ডায়না-র ঘরে উপস্থিত হলেন।

হেডা। শ্রীমতী ডায়না-র ঘরে ?

ব্র্যাক। এই শ্রীমতী ডায়না-ই নির্বাচিত কয়েকজন অনুরাগী এবং ব্যক্তিগত মহিলা-বন্ধুদের গানের আসরে ডেকেছিলেন।

হেডা। মহিলাটির চুল কি লাল ?

ব্র্যাক। ঠিক তাই।

হেডা।— বলা যায়—গাইয়ে গোছের ?

ব্র্যাক। ও হ্যাঁ,—অবসর সময়ে। আর তা ছাড়াও একজন অতি দক্ষ শিকারী—পুরুষ-শিকারী। নিঃসন্দেহে তার কথা শুনেছেন। নিজের গৌরবপূর্ণ সময়ে এইলার্ট লিউভ্‌বোরগ তার একজন অতি উৎসাহী রক্ষক ছিলেন।

হেডা। আর ব্যাপারটা শেষ হল কী ভাবে ?

ব্র্যাক। মনে হয় ও আদৌ ভদ্রভাবে নয়। অত্যন্ত হার্দ্য সাক্ষাতের পর তারা দুজনে মনে হচ্ছে ঘুসোঘুসি সুরু করেছিলেন—

হেডা। লিউভ্‌বোরগ আর ঐ মহিলাটি ?

ব্র্যাক। হ্যাঁ। লিউভ্‌বোরগ তাকে বা তার বন্ধুদের বলেন যে, তারা তাঁর সর্বস্ব লুটে নিয়েছেন। বললেন তাঁর পকেটবই নেই—অন্যান্য জিনিসও। সংক্ষেপে, তিনি সম্ভবত তুমুল সোরগোল তুলেছিলেন।

হেডা। এর ফলে কি হল ?

ব্র্যাক। ফলে ভদ্রমহোদয় এবং মহিলারা সকলে মিলে ধস্তাধস্তি সুরু করেন। সৌভাগ্যক্রমে অবশেষে ওখানে পুলিশ গিয়েছিল।

হেডা। পুলিশ-ও

ব্র্যাক। হ্যাঁ। লিউভ্‌বোরগ যেরকম ব্যাপারে, তাতে এই উচ্ছল প্রমোদ তাঁর পক্ষে রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে মনে হচ্ছে।

হেডা। কেমন ক'রে ?

ব্র্যাক। শুনলাম তিনি হিংস্রভাবে বাধা দিয়েছিলেন—একজন পুলিশ-এর মাথায় গুঁতো মেরে তার কোট পিঠ থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। কাজেই অন্যান্যদের সংগে তাঁকেও পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হেডা। আপনি কী ক'রে এইসব জানলেন ?

ব্র্যাক। পুলিশ-এর কাছ থেকে।

হেডা। (সোজা সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে) ও আচ্ছা, তা হলে এই কাণ্ড ঘটেছে। তা ছাড়া, ওঁর চুলে আঙুরলতাও ছিল না।

ব্র্যাক। কী বললেন, আঙুরলতা ?

হেডা (স্বর বদলিয়ে)। কিন্তু বিচারক, এবার বলুন ত—এইলার্ট লিউভ্বোর্গ-এর পেছনে ঘুরে এত খুঁটিয়ে খবর নেওয়ার আসল কারণ কী ?

ব্র্যাক। [illegible], পুলিশ-আদালতে যদি জানাজানি হয় যে, তিনি আমার বাড়ি থেকে সোজা এসেছিলেন, তা হলে উদাসীন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হেডা। ব্যাপারটা তা হলে আদালত পর্যন্ত গড়াবে ?

ব্র্যাক। নিঃসন্দেহে। সে যাই হোক, এ ব্যাপারে অত হ্যাপা পোয়ানর দরকার আমার বিশেষ ছিল না। কিন্তু ভাবলাম, পারিবারিক বন্ধু হিসেবে আপনাকে আর টেস্‌ম্যান-কে এইলার্ট-এর নৈশ অভিযানের পুরো খবর জানান কর্তব্য।

হেডা। কেন বিচারক ?

ব্র্যাক। কেন ? কারণ, অবস্থাদৃষ্টে আমার মনে হচ্ছে এইলার্ট আপনাকে হয় ত সুবিধেজনক আবরণ হিসেবে কাজে লাগাতে ইচ্ছুক।

হেডা। আরে, এরকম অদ্ভুত চিন্তা আপনার মাথায় এল কী ক'রে ?

ব্র্যাক। ঈশ্বরের দোহাই শ্রীমতী হেডা—আমাদের মস্তিষ্কেও চোখ রয়েছে। শব্দগুলো খেয়াল রাখুন। এই শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌ শহর ছাড়ার জন্য আদৌ ব্যস্ত হবেন না আর।

হেডা। বেশ ত, যদি তাদের মধ্যে কিছু থাকেও, দু'জনের দেখা করার মত আরও অসংখ্য জায়গা রয়েছে।

ব্র্যাক। একটা ঘরও নয়। এবার থেকে, আগের মতই, এইলার্ট লিউভ্‌বোর্গ-এর সামনে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত বাড়ির দরজা বন্ধ।

হেডা। বলতে চাচ্ছেন আমার দরজাও বন্ধ রাখা উচিত ?

ব্র্যাক। হ্যাঁ। এই লোকটি আপনার বাড়ি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পেলে আমার পক্ষে তা খুবই বেদনাদায়ক হবে। যদি তিনি জোর করে ঢুকে পড়েন ত সে কী ভীষণ একটা অপ্রয়োজনীয়, গা-জোয়ারী ব্যাপার হবে—

হেডা। ঢুকে পড়েন কোথায় ? —ত্রিভুজের মধ্যে ?

ব্র্যাক। ঠিক তাই। এর সাদা মানে—আমি হবো গৃহহীন।

হেডা। (তার দিকে মৃদু হেসে তাকিয়ে) অর্থাৎ, অসপত্ন রাজ্যভোগই আপনার লক্ষ্য ?

ব্র্যাক (ধীরে ধীরে মাথা ঝুঁকিয়ে আরও নিচু গলায়)। হ্যাঁ, তাই আমার লক্ষ্য। এবং সেজন্য আমি লড়াই করবো—আমার সাধ্যায়ত্ত সব ক'টি অস্ত্র নিয়ে।

হেডা। (তার হাসি উবে যাচ্ছে) দেখা যাচ্ছে আপনি লোকটা সাংঘাতিক—ঠিক জায়গায় পৌঁছোনমাত্র।

ব্র্যাক। আপনার তাই মনে হচ্ছে না কি ?

হেডা। সেইরকমই মনে হওয়া সুরু হল। এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই ভেবে যে—আমার ওপর আপনার কোন জারিজুরি খাটবে না।

ব্র্যাক। (উচ্চৈস্বরে দ্ব্যর্থবোধক হাসি হাসতে হাসতে)। আচ্ছা, আচ্ছা, শ্রীমতী হেডা—সম্ভবত এ ব্যাপারে আপনার ভুল হয় নি। যদি খাটত, কে জানে আমি কী করতে পারতাম ?

হেডা। বিচারক ব্র্যাক, হয়েছে। ওটা প্রায় শাসানীর মত শোনাচ্ছে।

ব্র্যাক (উঠতে উঠতে)। আরে, আদৌ নয়। শুনুন, সম্ভব হলে ত্রিভুজ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নির্মিত হওয়া দরকার।

হেডা। এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

ব্র্যাক। আচ্ছা, যা বলার ছিল বলে ফেলেছি ; এখন শহরে ফিরে যাওয়াই ভাল। বিদায় শ্রীমতী হেডা।

[কাচের দরজার দিকে এগোলেন]

হেডা (উঠে।) বাগানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন না কি ?

ব্র্যাক। হ্যাঁ, রাস্তাটা সংক্ষিপ্ত কি না।

হেডা। তা ছাড়া, রাস্তাটাও পেছন দিকে।

ব্র্যাক। ঠিক ঠিক। পেছন দিকের রাস্তা ব্যবহারে আমার কোন আপত্তি নেই। এগুলো সময়বিশেষে রীতিমত মুখরোচক হয়ে ওঠে।

হেডা। গুলিছোঁড়ার অভ্যাস চলাকালে ?

ব্র্যাক। (দরজায়, তার প্রতি উচ্চ হেসে) আমার ধারণা, কেউ তার পোষা জীবকে গুলি করে না।

হেডা (উচ্চৈস্বরে হেসে)। ও, না, না—বিশেষত একটাই যখন পোষা জীব—

[হাস্যমুখর পরিবেশে ব্র্যাক বিদায় নিলেন। হেডা তার পেছনে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।]

[হেডা এখন রীতিমত গম্ভীর। দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে একটুক্ষণ তাকালেন। তারপর মাঝের দরজায় গিয়ে পর্দার ভেতর দিয়ে উঁকি মারলেন। ফিরে গেলেন লেখার টেবিল-এ, গিয়ে লিউভ্‌বোর্গ-এর পাণ্ডুলিপি বুক-কেস থেকে বের ক'রে পড়তে উদ্যত। শোনা গেল, হলঘরে বার্টা উঁচু গলায় কথা বলছে। হেডা ঘুরে কান পাতলেন। তারপর চট্‌ ক'রে ড্রয়ার-এ পাণ্ডুলিপিটি বন্ধ ক'রে দোয়াতদানিতে চাবি রাখলেন]

[ধূসর রঙের কোট পরিহিত এবং হাতে হ্যাট—লিউভ্‌বোর্গ ঢুকলেন হলঘরের দরজা দুম্‌ ক'রে খুলে। তিনি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত এবং বিরক্ত।]

লিউভ্‌বোর্গ। (হলঘরের দিকে তাকিয়ে) এবং আমি তোমাকে বলছি শোন, আমাকে আসতে হবেই, আসবই আমি। ওই যে।

[দরজা বন্ধ ক'রে ঘুরে হেডা-কে দেখতে পাওয়ামাত্র আত্মসংযমপূর্বক নত হলেন]

হেডা (লেখার টেবিল-এ)। আচ্ছা, আপনি। দেখুন, টায়া-কে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সময়টা বোধহয় ঠিক—

লিউভ্‌বোর্গ। বলতে চাইছেন বড্ড সকাল সকাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন।

হেডা। কী ভাবে জানলেন টায়া এখনও এখানে আছে ?

লিউভ্‌বোর্গ। ওর বাসস্থানে শুনলাম ও সারা রাত বাইরে থেকেছে।

হেডা। (ডিম্বাকৃতি টেবিলের দিকে এগিয়ে) এ কথা বলার সময় ঐ বাড়ির লোকজনের ব্যবহারে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছিলেন ?

লিউভ্‌বোর্গ (তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি ফেলে) তাদের ব্যবহারে বিশেষ কিছু ?

হেডা। অর্থাৎ ওঁরা ব্যাপারটা অ-স্বাভাবিক মনে করেছিলেন কি ?

লিউভ্‌বোর্গ। (হঠাৎ বুঝতে পেরে) ও হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। আমি ও-কে নিজের সংগে নামিয়ে আনছি। সে যাক্‌, কিছু আমার চোখে পড়ে নি।— টেস্‌ম্যান সম্ভবত এখনও ওঠে নি ?

হেডা। না,—মনে হয় না—

লিউভ্‌বোর্গ। সে কখন বাড়ি ফিরেছিল ?

হেডা। খুব দেরি ক'রে।

লিউভ্‌বোর্গ। আপনাকে কিছু বলেছে কি ?

হেডা। হ্যাঁ, শুনলাম বিচারক ব্র্যাক-এর ওখানে দারুণ প্রাণোচ্ছল এক সন্ধ্যা কাটিয়েছেন।

লিউভ্‌বোর্গ। আর কিছু না ?

হেডা। মনে হচ্ছে না। সে যাক্‌, আমার এমন সাংঘাতিক ঘুম পাচ্ছিল যে—

[মাঝের দরজার পর্দা ঠেলে শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌ ঢুকলেন]

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (লিউভবোর্গ-এর দিকে এগোতে এগোতে) আহা, লিউভ্‌বোর্গ ! শেষ পর্যন্ত— !

লিউভ্‌বোর্গ। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত। এবং মাত্রাতিরিক্ত দেরিও হয়ে গেছে !

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌ (তার দিকে চিন্তিত-

ভাবে তাকিয়ে) কী মাত্রাতিরিক্ত দেরি হয়ে গেছে ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। সব কিছুই। আমার বারটা বেজে গেছে।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। ও, না, না—ও কথা বোল না !

লিউভ্‌বোর্‌গ। তুমিও একই কথা বলবে যখন শুনতে পাবে—

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। আমি কিছু শুনবো না !

হেডা। সম্ভবত ওর সঙ্গে আপনি নিভৃতে কথা বলা পছন্দ করবেন ! সেক্ষেত্রে আমি চললাম।

লিউভ্‌বোর্‌গ। না, দাঁড়ান—আপনিও অনুগ্রহ ক'রে থেকে যান।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। হ্যাঁ, কিন্তু শুনেছ ত আমি কিছু শুনবো না।

লিউভ্‌বোর্‌গ। বিগত নৈশ অভিযান সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছি না।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। তা হলে কোন্ বিষয়ে— ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। বলতে চাই এখন থেকে আমাদের দু'জনকে ভিন্ন পথে চলতে হবেই।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। ভিন্ন পথে !

হেডা (আপনা হতে) এ আমি জানতাম !

লিউভ্‌বোর্‌গ। টায়া, তোমাকে দিয়ে আমার আর কোনও কাজ হবে না।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড। প্রাণে ধরে একথা বললে কী ক'রে ! তোমার কোনও কাজে আসব না ! আগের মত এখনও তোমায় সাহায্য করতে হবে না ? আমরা দু'জন কাজ করব না একসঙ্গে ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। এখন থেকে আমি আর কাজ করবই না।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (হতাশ স্বরে) তাহলে বাঁচব কী নিয়ে ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। যেন আমার সঙ্গে কখনও আলাপ হয় নি—তাই ভেবে বাঁচতে চেষ্টা করবে।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। কিন্তু তুমি ত জান আমি তা পারব না !

লিউভ্‌বোর্‌গ। টায়া, না পারলেও চেষ্টা করো। আবার তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতেই হবে—

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড। (তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে) প্রাণ থাকতে কখনও নয়। তুমি যেখানে, আমিও সেখানে ! এভাবে নিজেকে বিতাড়িত হতে দেব না, কিছুতেই না ! আমি এখানেই থাকব ! বইটা যখন বেরুবে তখন তোমার সঙ্গে থাকবই।

হেডা। (উৎকণ্ঠায় কিছুটা উচ্চৈস্বরে)। ও, হ্যাঁ—বইটা !

লিউভ্‌বোর্‌গ (তার দিকে তাকিয়ে)। আমার এবং টায়া-র বই ; প্রকৃত অর্থেই তাই।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। হ্যাঁ, আমারও ঠিক তাই মনে হয়। এবং সেজন্যই বইটা বেরোনোর সময় তোমার সঙ্গে থাকার অধিকার আমার আছে ! আমি স্বচক্ষে দেখব নতুন সম্মান আর শ্রদ্ধায় কীভাবে তোমাকে আপ্লুত ক'রে ফেলা হয়। এবং সেই সুখ—সেই সুখ—ও, তোমার সঙ্গেই সেই সুখ আমি উপভোগ করবই।

লিউভ্‌বোর্‌গ। টায়া—আমাদের বই কখনও বেরোবে না।

হেডা। সে কি !

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। কখনও বেরোবে না !

লিউভ্‌বোর্‌গ। বেরুনো সম্ভব নয়।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (যন্ত্রণার ভাবী আশঙ্কায়) লিউভ্‌বোর্‌গ—পাণ্ডুলিপি নিয়ে তুমি কী করেছ ?

হেডা। (তার দিকে চিন্তান্বিত দৃষ্টি ফেলে) হ্যাঁ, পাণ্ডুলিপিটা— ?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। ওটা কোথায় ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। টায়া গো, —এ প্রশ্ন আমাকে কোর না !

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে জানতেই হবে। এক্ষুণি বল।

লিউভ্‌বোর্‌গ। পাণ্ডুলিপিটা— আচ্ছা, শোন—পাণ্ডুলিপিখানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছি।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (তীক্ষ্ণ, বেদনার্ত কণ্ঠে)। না, না, না—!

হেডা। (আপনা হতে)। কিন্তু তা ত নয়—

লিউভ্‌বোর্‌গ। (তার দিকে তাকিয়ে) সত্যি নয়, তাই আপনার ধারণা ?

হেডা। (সামলে নিয়ে) ইয়ে, বটেই ত—আপনি যখন বলছেন। কিন্তু এত অ-সম্ভব শুনতে লাগল যে—

লিউভ্‌বোর্‌গ। অ হলেও এ কথা ঠিকই।

শ্রীমতী এলভ্‌সটেড্‌। (নিজের হাতের মোচড় দিতে) হা ঈশ্বর—হা ঈশ্বর, হেডা—নিজের রচনা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে !

লিউভ্‌বোর্‌গ। নিজের জীবনই টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছি। সুতরাং আ-জীবনের রচনাই বা ছিঁড়ব না কেন—?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। এবং এই কাজ তুমি কাল রাত্রে করেছ ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ, আগেই ত বলেছি। টুকরো টুকরো ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছি পাহাড়ী উপকূলের ভেতরকার সংকীর্ণ উপসাগরে—বহু দূরে। ওখানে ঠাণ্ডা সমুদ্রজল. ত আছেই—ওগুলো ভেসে যাক্‌। —স্রোত আর বায়ুর সঙ্গে ভাসতে ভাসতে যাক্‌। এবং ওগুলোও আমারই মত ডুবে যাবে টায়া—গভীর থেকে গভীরতর সমুদ্রতলে।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। শোন লিউভ্‌বোর্‌গ তুমি বইটার যে হাল করেছ—মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমি মনে করব তুমি যেন শিশুহত্যার পাপে পাপী।

লিউভ্‌বোর্‌গ। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটা এক ধরণের শিশুহত্যা।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। তা হলে, তুমি কী ক'রে—! শিশুটি কি আমারও নয় ?

হেডা। (প্রায় অস্ফুট স্বরে) আহা, শিশুটি—

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে) তাহলে সব শেষ। বেশ, বেশ, হেডা, এখন আমি যাচ্ছি।

হেডা। কিন্তু শহর ছেড়ে যাচ্ছ না নিশ্চয় ?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড। ও, কী করব আমি নিজেও জানি না। সামনে শুধু অন্ধকার—আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

[হলঘরের দরজা দিয়ে শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌ বেরিয়ে গেলেন।]

হেডা। (এক মুহূর্ত দেখে) তাহলে আপনি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন না ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। আমি ? রাস্তা দিয়ে ? আপনি কি চান লোকে দেখুক ও আমার সংগে যাচ্ছে ?

হেডা। কাল রাত্রে যে আর কী ঘটতে পারত তা আমি বাপু বুঝতে পারি না, কিছুতেই নয়। কিন্তু এটা কি একেবারেই গেছে, চিরতরে ?

লিউভ্‌বোর্‌গ। কাল রাতের সংগে তা শেষ হবে না—খুব ভালভাবেই জানি। এবং আসল কথা এই যে, ঐ ধরণের জীবনের প্রতি আমার এখন কোনও আকর্ষণ নেই। আবার নতুন ক'রে সুরু করা অসম্ভব। আমার সাহস ও ভেঙে দিয়েছে, জীবনকে খুশিমত নির্ভয়ে গড়ে তোলার ক্ষমতাটুকুও।

হেডা। (নিজের সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে) তা হলে ওই তুচ্ছ আহাম্মকটা একটা মানুষের বরাত ঠিক করার কাজে এসেছে। (তার দিকে তাকালেন) কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি ওর সংগে হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করলেন কী ক'রে !

লিউভ্‌বোর্‌গ। না, না—আমার ব্যবহার হৃদয়হীনের মত বলবেন না।

হেডা। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যা তার সমস্ত আত্মা জুড়ে তাই ধ্বংস

করা হয়েছে। এটাকে হৃদয়হীনতা বলেন না।

লিউভ্‌বোর্‌গ। হেডা, আপনাকে আমি সত্যি কথা বলতে পারি।

হেডা। সত্যি কথা?

লিউভ্‌বোর্‌গ। আগে প্রতিজ্ঞা করুন—কথা দিন—যে, আপনাকে গোপনে যা বলব টায়া কখনও তা জানতে পারবে না।

হেডা। কথা দিলাম।

লিউভ্‌বোর্‌গ। উত্তম। তাহলে শুনুন, এক্ষুণি যা বললাম তা সত্যি নয়।

হেডা। পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে?

লিউভ্‌বোর্‌গ। ওটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ি নি—পাহাড়ী উপকূলের ভেতরকার সংকীর্ণ উপসাগরেও ফেলে দিই নি।

হেডা। আমি বুঝতে পারছি না।

লিউভ্‌বোর্‌গ। টায়া বলে গেল আমি যা করেছি তা শিশুহত্যার সমতুল্য।

হেডা। হ্যাঁ, ও তাই বলে গেছে।

লিউভ্‌বোর্‌গ। কিন্তু এই শিশুটিকে খুন করা—কোনও বাবার পক্ষে এটাই জঘন্যতম কাজ নয়।

হেডা। জঘন্যতম নয়?

লিউভ্‌বোর্‌গ। না। আমি টায়া-কে জঘন্যতম ব্যাপারটা শোনাতে চাই নি।

হেডা। সেটা কী?

লিউভ্‌বোর্‌গ। হেডা, মনে কর একটা লোক—ভোরবেলা—সারা রাত চূড়ান্ত হৈ হুল্লোড় আর লাম্পট্যের পর তার সন্তানের মাকে এসে বলছে: 'শোন,—রাতটা এখানে ওখানে কাটালাম—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চক্কর দিয়ে। এবং আমাদের শিশুটিকে সংগে নিয়েছিলাম—এখানে সেখানে। এবং আমি শিশুটিকে হারিয়েছি—চিরতরে। শয়তান জানে কার হাতে ও পড়েছে—যারা হয় ত এই ব্যাপারটার ভেতর পেছনে সক্রিয়।'

হেডা। আচ্ছা—কিন্তু, সব কিছু বলা এবং করার পরও একথা ত মানবেন—এটা একটা বই ছাড়া অন্য কিছু নয়—

লিউভ্‌বোর্‌গ। ঐ বইতে ছিল টায়া-র পরিশুদ্ধ আত্মা।

হেডা। হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি।

লিউভ্‌বোর্‌গ। এবং আপনি একথাও নিশ্চয় বোঝেন যে, ওর আমার যৌথ ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।

হেডা। তাহলে আপনি কোন্ পথে যাবেন ঠিক করেছেন?

লিউভ্‌বোর্‌গ। কোন পথই নয়। কেবল সব কিছু শেষ ক'রে দিতে সচেষ্ট হবো—যত শীগ্‌গির সম্ভব।

হেডা। (তার দিকে এক পা এগিয়ে) এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ—আমার কথা শুনুন। —আপনি কি তা—তা কি সুন্দরভাবে করবেন?

লিউভ্‌বোর্‌গ। সুন্দরভাবে? (মৃদু হেসে) আগে যেমন স্বপ্ন দেখতেন—চুলে আঙুরলতা জড়িয়ে—?

হেডা। না, না। আঙুরলতায় আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু, তা হলেও সুন্দরভাবে। অন্তত একবার এমনভাবে। —বিদায়। আপনাকে এখন যেতেই হবে—এবং এখানে আর আসবেন না।

লিউভ্‌বোর্‌গ। বিদায় শ্রীমতী টেস্‌ম্যান। জর্‌জ টেস্‌ম্যান-কে আমার ভালবাসা জানাবেন। [তিনি গমনোদ্যত]

হেডা। না, দাঁড়ান। স্মৃতি-উদ্রেককারী একটা জিনিস দিচ্ছি, সংগে নিয়ে যান। [লেখার টেবিল-এ গিয়ে হেডা ড্রয়ার আর পিস্তল-কেস খুললেন; তারপর লিউভ্‌বোর্‌গ-এর কাছে ফিরে এলেন একটা পিস্তল নিয়ে।]

লিউভ্‌বোর্‌গ। (হেডার দিকে তাকালেন)। এইটা? এইটাই কি স্মৃতি-উদ্রেককারী বস্তু?

হেডা (ধীরে মাথা নেড়ে) চিনতে পেরেছেন? আপনার দিকে এইটা তাক্ করা হয়েছিল।

লিউভ্‌বোর্‌গ। তাহলে এটা আপনার ব্যবহার করা উচিত ছিল।

হেডা। নিন—এবং এবার নিজেই ব্যবহার করুন।

লিউভ্‌বোর্‌গ। (বুকপকেটে পিস্তলটা রাখলেন) ধন্যবাদ।

হেডা। এবং সুন্দরভাবে, এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন।

লিউভ্‌বোর্‌গ। বিদায় হেডা গ্যাব্‌লার। [হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন]

[হেডা এক মুহূর্ত দরজাতে শুনলেন। তারপর লেখার টেবিল-এ গিয়ে পাণ্ডুলিপির প্যাকেট হাতে নিয়ে মলাটের ভেতর উঁকি দিলেন, কয়েকটা কাগজ অর্ধেক বের ক'রে দেখতে লাগলেন। এর পর স্টোভ-এর পাশে-রাখা আরাম কেদারায় বসে প্যাকেটটা রাখলেন কোলের ওপর। তখন স্টোভ-এর দরজা আর মোড়কটা খুললেন]

হেডা। (এক দিস্তা আগুনে ফেলে নিজেকেই শোনালেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে) টায়া, এইবার তোমার শিশু পোড়াচ্ছি! —এটা পুড়িয়ে দিচ্ছি, ঢেউখেলান চুলের গোছা! (আরও দু'-এক দিস্তা স্টোভ-এর আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে) তোমার আর এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ-এর সন্তান। (বাকি সব ফেলে দিয়ে) আমি পোড়াচ্ছি—আমি তোমাদের শিশু পুড়িয়ে ফেললাম।

[তৃতীয় অংক সমাপ্ত]

অনুবাদক: সমীরণ চৌধুরী

ব্যাখ্যান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র

বহু কথা বহু পাঠ শাস্ত্রের ব্যাখ্যান
আত্ম প্রচারণা শুধু আত্মঅভিমান ॥
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে নিজ বাড়াতে গৌরব
শাস্ত্র কর ধ্যান তার অনন্ত সৌরভ ॥

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের সিঁড়ি

—মানসরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী

—শিবু দত্ত

(২য় পুরস্কার)

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা—ফ্যাক্টরী

দীপ জেনলে যাই

—সাগর রক্ষিত

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

॥ বিষয়বস্তু ॥

ফাল্গুন সংখ্যার

বিনোদিনী

চৈত্র সংখ্যার

খেলাধূলা

[ছবি গ্লসি কাগজে ও বর্ধিত আকারে পাঠাবেন]
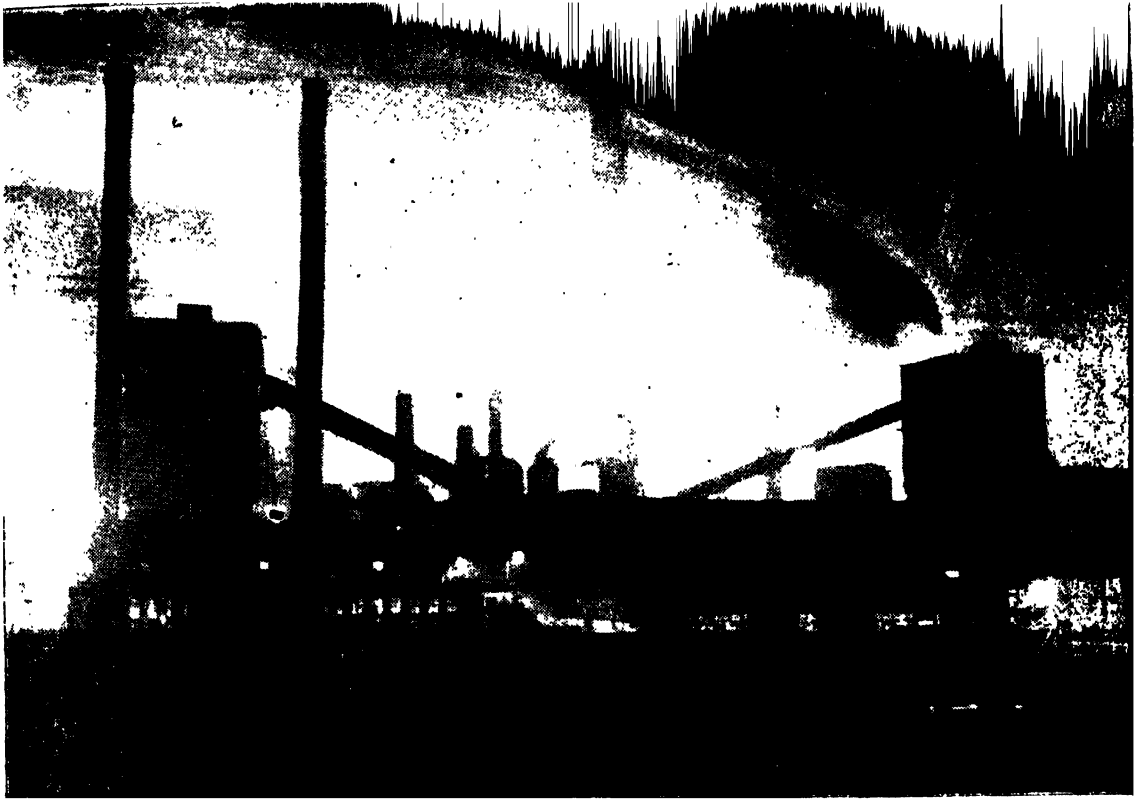
—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১ম পুরস্কার)

-শম্ভু মুখোপাধ্যায়
(৩য় পুরস্কার)

--দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম ভূমিকায়—নন্দিনী
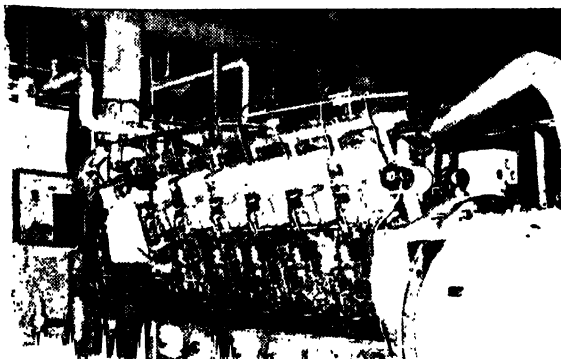
চিত্র—সঞ্জয় ধর

অলংকরণ—সমরজিৎ

মাসিক

বসুমতী

মাঘ / '৭৫

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস নিয়মিত ব্যবহারেই তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ

নকলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কিনিবার সময় ট্রেডমার্ক শ্রীরামচন্দ্র মূর্তি, পিলফার প্রুফ ক্যাপের উপর RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারক এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস

কেশ তৈল

এম.এল বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

নতুন
সুপার সার্ফ
'অনুপম ফর্সা'
ক'রে ধোয়
NEW!
SUPER
Surf
FOR
SUPER
WHITENESS

স্বামী তত্ত্বানন্দ

আধ্যাত্মিকতার জন্য সম্যক্ চেষ্টাই মানুষের আদর্শ। এই আদর্শই জীবনের আশ্রয়-পরিমাপক। ইহার সাধনাই জীবনের চিহ্ন, ত্যাগে ইহার সার্থকতা, মনের শান্তি, আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্তি আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি, চরিত্রের মাধুর্য ত্যাগের দ্বারা সম্ভব হয় ত্যাগীর জীবন প্রগাঢ় পূর্ণাঙ্গ। অনুশীলনযোগ্য তাঁহার আদর্শ এবং কৃতকর্ম, আশা ও অনুপ্রেরণার উৎস, জীবনের অবলম্বন-স্বরূপ। জীবনের কৃত্য, ব্রত, উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে তিনি সদা সচেতন এবং সক্রিয়। তিনি সার্থকজন্মা, স্বীয় ব্যক্তিত্ব এবং স্বকীয় প্রতিভায় মানুষের হৃদয়ে অক্ষয় আসন লাভ করেন। তিনি পথিকৃৎ, আগামী দিনের সম্ভাবনা তাঁহার চিন্তা ও কর্মে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার সাধনার ভাবধারা ব্যক্তিগত নয়। মানব সমাজের বাস্তব সুখ-দুঃখ এবং চিন্তার সঙ্গে জড়িত।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাহার মূল্য আছে। তাঁহার ব্যক্তিমন সমাজমন নর নারীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিনি সংসারের দুঃখ দন্য ব্যাধি শোকের প্রতি উদাসীন নন। তাঁহার চিন্তাধারা ধর্মনীতিকে সঞ্জীবিত করে, সমাজ নূতন আলোড়ন আনে, প্রগতির রুদ্ধ পথ খুলিয়া দেয়, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, উদারতা, সত্য, পবিত্রতা প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি করে।

কাশীক্ষেত্র পবিত্র স্থান। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বরুণা এবং অসী দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহার অপর নাম বারাণসী। মোক্ষধাম, বিশ্বনাথ মুক্তিদাতা মাতা অন্নপূর্ণা অকাতরে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিলাইতেছেন। পুণ্যসলিলা গঙ্গা কল-কল নাদে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে বহিয়া যাইতেছে, হাজার হাজার নর-নারী নিত্য গঙ্গাস্নান সারিয়া বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার নিকট জ্ঞান বৈরাগ্য ভিক্ষা করেন।

এই ভাবে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা, বহু সাধক, মহাপুরুষদের কঠোর ত্যাগ তপস্যা, অগণিত জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার জমাট বাঁধা হইয়া এই তীর্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে, মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে। মরণান্তে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার কোলে স্থান পাইবার আশায় দূর দূর দেশের বহু ভক্ত এইখানে আশ্রয় নিয়াছেন এবং কষ্ট সহ্য করিতেছেন।

বহুকাল পূর্বে কাশীতে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি সত্য-সেবী, প্রজাবৎসল এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। যে সকল গুণ থাকিলে রাজা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন তাঁহার সে সকল গুণ ছিল। তাঁহার রাজ্যে চোর-তস্করের সংখ্যা খুব কম ছিল। তিনি কঠোর হস্তে তাহাদের দমন করিতেন। প্রজারা সুখে ছিল।

ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ধ্যান-ধারণায় সময় কাটাইবার সুযোগ পাইতেন। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যের শৃংখলা রক্ষায় রত থাকিতেন, বৈশ্যেরা ধন উপার্জন এবং বৃদ্ধি করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতেন। রাজ্যে সকলে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া উন্নতি লাভের সুযোগ পাইত। রাজা কর্তব্যপরায়ণ, উদার, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান। বিদ্যার উৎসাহদাতা।

রাজ্যে সর্বত্র শৃংখলা বিদ্যমান, বিশাল রাজ্য। কিন্তু তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। কোন পুত্রসন্তান নাই। উত্তরাধিকারীর অভাবে ভবিষ্যতে রাজ্য ছারখারে যাইবার সম্ভাবনা। পিতৃ পুরুষদের পিণ্ডদান করিয়া বংশের ধারা রক্ষা করিবার কেহ নাই। বৈরাগ্যহীন সাধু এবং পুত্রহীন গৃহস্থ দুয়েরই একই অবস্থা। উভয়কে কষ্ট পাইতে হয়। ধন, দৌলত, মান, সম্মান কোনটাই রাজাকে শান্তি দিতে পারে নাই। রাজার ন্যায় রাণীরাও পুত্রসন্তানের অভাবে মনের দুঃখে দিন কাটান। পুত্রকামনায় রাজা বেদ-বিদ্ ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দেবার্চনার ব্যবস্থা করিলেন, প্রধানা মহিষীও মাতৃত্বের কামনায় অনেক ব্রত উপবাস করিলেন, দেব-মন্দিরে কত ধন্না দিলেন, মানত করিলেন, অন্তত একটি সুন্দর এবং সুযোগ্য সন্তানের মাতা হইলেও তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিবেন। ভক্তের করুণ প্রার্থনা দেবতার আসন টলাইয়া দেয়, তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। কৃপা করিয়া ভক্তের মনের বাসনা পূর্ণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে প্রধানা মহিষী এক অনিন্দ্য-সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া স্বামীকে উপহার দিলেন। রাজ্যে আনন্দের হাট বসিল। সন্তানের কল্যাণার্থে অনেক পূজা-পার্বণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন কাঙ্গালী- ভোজন করা হইল।

নবজাত কুমার দেবতার দান, তাহার রূপ যেন উথলিয়া পড়িল। দলে দলে লোক কুমারকে দর্শন করিতে আসিল, যথাসময়ে যথাবিধি সংস্কারাদি করাইয়া ব্রাহ্মণেরা কুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কুমারের চোখ, কান, নাক,

মুখ এবং শরীরের লক্ষণাদি লক্ষ্য করিয়া অনুমান ধারণা করিল কুমার শুধু রূপবান নয়, অশেষ গুণী হইবে, অনেক শুভ সংস্কার নিয়া যে সে জন্ম নিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজা, রাণী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সকলের অজস্র ভালবাসা এবং শুভ ইচ্ছায় কুমার দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

যাহার জীবন লোক-কল্যাণার্থে উৎসর্গীকৃত—তাহার জীবন, চাল-চলন সাধারণ লোকের মত হয় না, সে যেন শৈশবেই জীবনের উদ্দেশ্য এবং কৃত্য সম্বন্ধে সচকিত থাকে।

একদিন কুমারকে কোলে নিয়া রাজা আদর করিতেছেন। এই সময়ে কোতোয়াল চারিজন চোরকে ধরিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল, মণিরত্ন চুরি করিবার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে। চেষ্টা করিয়াও পলাইবার সুযোগ পায় নাই। প্রমাণাদি সকল তাহাদের প্রতিকূল।

সকল কথা শুনিয়া রাজা তাহাদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন, দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মণিরত্ন চুরির অপরাধে তাহাদের শূলে চড়াইবার আদেশ দিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে জন্ম-জন্মান্তরের অনেক শুভ সংস্কার নিয়া কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি তাহার মনে পড়িল। কুমার ভাবিল—'জন্মান্তরে রাজকার্য পালনের সময় আমি এইরূপ বহু ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছি। দেশের প্রচলিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য নিজেই বহুবার বহু অপরাধীর এরূপ শাস্তির বিধান দিয়াছি। এবারও রাজবংশে জন্ম নিয়াছি। বড় হইয়া এইভাবে রাজকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। অপ্রীতিকর বহু ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইবে। দোষী সাব্যস্ত হইলে অপরাধীর জন্য নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান করিতে হইবে। নিষ্ঠুরতার পরিণাম নরক, নরক-যন্ত্রণার চেয়ে অধিক কোন যন্ত্রণাই হইতে পারে না। নরক-যন্ত্রণা কি তাহা জানিয়াছি। জানিয়া-শুনিয়া পুনরায় নরকে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়, আমি আর নরকে পচিতে প্রস্তুত নই। এখন হইতে সাবধান না হইলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে।

সুতরাং রাজ্য আমার পক্ষে কণ্টক-স্বরূপ। রাজ্য, উচ্চ পদবী, ভোগাকাঙ্ক্ষা সকলেই শান্তির প্রতিকূল যাহা শান্তির প্রতিকূল তাহা অশান্তির অনুকূল। নরক সহায়ক, যে পথ নরকের সহায়ক আমি সে পথে কিছুতেই পা বাড়াইব না। সুতরাং এখন হইতে এ বিষয়ে সাবধান হই, যাহাতে আমাকে আবার নরকের আগুনে পুড়িতে না হয়।'

কুমারের এখনও মুখে কথা ফুটে নাই। অতি শৈশবে সে বিজ্ঞ হইয়াছে। সংসারের ধারা বুঝিয়াছে, উহার ফাঁদে আর পড়িতে না হয় সেজন্য সে মনে মনে এক অদ্ভুত উপায় স্থির করিয়াছে, যাহাতে তাহাকে পরিণত বয়সে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিতে না হয়। রাজ্য-পরিচালনার দায়িত্ব এড়াইবার জন্য এখন হইতে তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। পিতার কোলে বসিয়া সে স্থির করিল সে বোবা এবং কালার ন্যায় পড়িয়া থাকিবে। কারণ ঘটিলেও আনন্দে হাসিবে না, দুঃখে কাঁদিবে না, উঠিবে না, বসিবে না, ক্ষুধা পাইলে খাওয়ার জন্য কোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না, মূক ও বধির হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা এমন নিখুঁতভাবে করিতে হইবে যাহাতে কেহ ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারে যে সে ভাণ করিতেছে। প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এইভাবে কাটাইয়া দিবে—যাহাতে ভবিষ্যতে রাজ্যের দায়িত্ব লইতে না হয়। যদি ইহাতে কৃতকার্য হয়, উদ্দেশ্য সফল হইবে। না হইলেও ক্ষতি নাই। বিন্দুমাত্র সুযোগ পাইলেই সে তাহার সদ্ব্যবহার করিবে। সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া মুক্তির সন্ধান করিবে। মুক্তিলাভ করিলে জরা-মৃত্যুর হাত হইতে চিরতরে রেহাই পাইবে এবং ও নরক-যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে না। তাহার দেখাদেখি আরও অনেক নরক-যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য মুক্তির চেষ্টা করিবে।

[illegible] দান করে বলিয়াই সন্তানকে পুত্র বলে। আর পিণ্ড দান করিয়া পুৎ নামক নরক হইতে উদ্ধার করিয়াই পুত্র বলে। তাই পিতা-মাতা সকলে মনে পুত্রের উপর নির্ভর করে, পুত্রই তাহাদের ইহকাল ও পরকালের ভরসা। রাজা-রাণী স্থির করিয়াছেন কুমার বড় হইলে তাহার জন্য ক্ষত্রিয় রাজার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এমন উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে শিক্ষার ভার দিবেন, যাহাতে কুমার সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবে। শাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবে। অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করিবে, আদর্শ রাজা হইবে। তাহার উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া উভয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ভগবৎ চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিবেন।

মানুষ অনেক আশা পোষণ করে কিন্তু পূরণ হয় না, এক ভাবে—হয়ে যায় অন্য। পিতার কোলে বসিয়াই কুমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছে। লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়ও স্থির করিয়াছে। কুমার হাসে না, কাঁদে না, উঠে না, বসে না, এদিকে-ওদিকে নড়া-চড়া করে না, খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে না, ক্ষুধায় কাতর হইলেও নয়। যদি কেহ খাওয়াইয়া দিল তবে খায়, নচেৎ চুপচাপ পড়িয়া থাকে।

অন্যান্য বালক-বালিকা তাহার সম্মুখে খেলাধুলা, নাচ-গান, চীৎকার কিম্বা কান্না-কাটি করিলে সে শুধু চাহিয়া থাকে, উহাতে যোগ দেয় না। তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করে না। তাহার আচরণ দেখিয়া মনে হয়, সে অল্প বয়সেই বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, দার্শনিক হইয়াছে। বিজ্ঞের মত সাক্ষী-স্বরূপে অবস্থান করিয়া সব দেখিতেছে। বয়োবৃদ্ধি হইলেও কুমার সঙ্কল্পচ্যুত হইল না। শৈশব উত্তীর্ণ হইল, কৈশোরে পড়িল, তথাপি তাহার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চালনা না করিলেও কুমারের স্বাস্থ্য ভাল, দেহের গঠনাদি

দেখিয়া কেহ কখনও বিশ্বাস করে নাই যে তাঁহার দেহে কোন প্রকার অসুখ আছে কিম্বা সে কালা, বধির কিম্বা বোকা। তাহার অবস্থা দেখিয়া রাজা, রাণী ও অন্যান্য সকলে চিন্তিত হইলেন। তাহার কোন প্রকার অসুখ হইয়াছে কিনা স্থির করিবার জন্য ভাল ভাল ডাক্তার, কবিরাজ আনা হইল। ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা অভিমত জানাইলেন যে, কুমারের কোন অসুখ নাই; কোন অঙ্গ বিকল হয় না। ইচ্ছা করিলে উঠিয়া বসিতে পারে, চলাফেরা করিতে পারে, এমন কি কথাও বলিতে পারে। তবে কেন করে না, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তের বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল কুমারের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। চিকিৎসা-শাস্ত্র কোন প্রতিকার করিতে পারিল না। একমাত্র পুত্র বলিয়া রাজা, রাণী, আত্মীয়-স্বজন সকলে তাহাকে ভালবাসিতেন। মাতা সকলসময় কুমারের নিকট বসিয়া থাকিতেন। নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া কান্নাকাটি করিতেন। একবার অন্তত তাহার মুখে 'মা' ডাক শুনিবার জন্য কত ব্যগ্র হইতেন, কত কাতরভাবে অনুরোধ করিতেন, কিন্তু কুমার স্থির, কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইল না, মৌনব্রত ভঙ্গ করিল না।

সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে রাজা এখন অন্য উপায় অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া কিম্বা প্রাণনাশের ভয় দেখাইয়া কুমারের মধ্যে কোন-রকম পরিবর্তন আনা যায় কি না চেষ্টা করিলেন। একদিন রাজার আদেশে কয়েকটা সাপের গোপনে বিষদাঁত উৎপাটিত করিয়া কুমারের বিছানার চারিদিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সাপগুলি বিছানার কাছে আসিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কুমার অতি শৈশবে সংসারের হাল-চাল জানিয়া বিজ্ঞ হইয়াছে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বুঝিয়াছে। তাহার নিকট সুখ-দুঃখ এক বোধ হইয়াছে। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।' জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, সুতরাং সাপের ভয়ে, প্রাণের তাগাদায় সে বিন্দুমাত্র ভীত হইল না, একটুও নড়াচড়া করিল না।

এইভাবে কুমারের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আনা সম্ভব হইল না। ইহার পর রাজা অন্য এক উপায় স্থির করিলেন। তাঁহার আদেশে একটা শুকনা খড়ের চালায় কুমারকে রাখিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিছানা পুড়িয়া যাওয়ার যোগাড় হইল, তাপ লাগিয়া শরীর দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছিয়াও কুমার সঙ্কল্পচ্যুত হইল না। একটু নড়াচড়া করিল না। আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিল না। যাহার মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার নিকট শারীরিক কষ্ট অতি তুচ্ছ, তাহার পক্ষেই এই অবস্থায় উদাসীন থাকা সম্ভব।

যাহা হউক কুমারের প্রাণনাশ হইল না। বিপদ যখন ঘনীভূত হইল, তাহাকে সরাইয়া নেওয়া হইল। স্থানান্তরে নেওয়া হইলে প্রাণরক্ষা হইয়াছে বলিয়া আনন্দের কোন লক্ষণ কুমারের মধ্যে প্রকাশ পাইল না, এত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াও যখন তাহার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আনা সম্ভব হইল না তখন রাজা অন্য এক নূতন উপায় স্থির করিলেন।

এবার সমস্ত শরীরে গুড় মাখাইয়া কুমারকে মেঝের উপর ফেলিয়া রাখা হইল। গুড়ের লোভে অসংখ্য মাছি আসিয়া সমস্ত শরীরে বসিল, কানের কাছে ভন্‌ভন্‌ করিয়া জ্বালাতন করিতে লাগিল, সারি দিয়া ক্ষুদে পিঁপড়া আসিল এবং সমস্ত শরীর কামড়াইয়া ফুলাইয়া দিল। ইহাতেও কুমারের মধ্যে শারীরিক কষ্টের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। এই অবস্থায় মনকে অবিচলিত রাখা সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হইলেও তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, কুমারের আত্ম-সংযম খুবই প্রবল। শারীরিক কষ্টকে তুচ্ছ বোধ করিবার ক্ষমতা সে আয়ত্ত করিয়াছে। উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনকে সর্বদা নিবিষ্ট রাখিয়া দেহ বোধ ভুলিয়াছে, তাই তাহার পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব হইয়াছে।

এত রকম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াও যখন কুমারের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আনা সম্ভব হইল না, তখন সকলে হতাশ হইল। যার কষ্ট সে জানে, অন্যে বুঝিতে পারে না। ইহা সত্য কিন্তু সংসারের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বেশী আপনার সে অনেকটা বুঝিতে পারে, মার চেয়ে আপনার কেহ নাই, পুত্রের দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া কুমারের মা রাজাকে অত্যন্ত কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন পুত্রকে যেন আর কষ্ট দেওয়া না হয়। মা হইয়া সন্তানের এত কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না। সন্তান যতই মন্দ কিম্বা বিকলাঙ্গ হউক না কেন, তথাপি সন্তান, সে বাঁচিয়া থাকিলেই মাতা সুখী হন।

এইভাবে কষ্টের মধ্যে কুমারের দিন যায়। কত রকম নির্যাতন যে সে সহ্য করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। তথাপি কুমার সঙ্কল্পচ্যুত হয় নাই, সে এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। রাজা স্থির করিলেন আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। উহাই শেষ চেষ্টা। যদি তাহাতেও কুমারের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আনা সম্ভব না হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে সকল আশা পরিত্যাগ করিবেন। তখন বাধ্য হইয়া ধরিয়া নিবেন নিয়তির লিখন কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। যাহা হইবার তাহা হইবে।

শেষ চেষ্টার প্রস্তুতি হিসাবে কুমারের জন্য নূতন রকমের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য রথ-চালককে ডাকিয়া বলিলেন, 'কুমারকে রথে চড়াইয়া সহরের পশ্চিম ফটকের দ্বার দিয়া গভীর জঙ্গলে লইয়া যাইবে, পরিচারকগণ একটা বড় গভীর গর্ত

করিয়া তাহার মধ্যে কুমারকে দাঁড় করাইয়া দিবে তারপরে কড়ুলের আঘাতে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হইবে বলিয়া খুব ভয় দেখাইবে। সেই অবস্থাতেও যদি কুমার মুখ না খুলে কিম্বা ভয়াবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য কোন প্রকার ব্যাগ্রতা প্রকাশ না করে তবে তাহাকে কড়ুল দিয়া কোন প্রকার আঘাত করিবে না, গর্ত হইতে উঠাইয়া আবার রথে চড়াইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিবে। আর যদি কথা বলে কিম্বা প্রাণরক্ষার জন্য কোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে অবিলম্বে আমার নিকট খবর পাঠাইবে। আমি নিজে গিয়া তাহাকে প্রাসাদে লইয়া আসিব।

ইহার পর কুমারকে সম্বোধন করিয়া রাজা বলিলেন, 'কুমার, এত বৎসর হইয়া গেল, এক দিনের তরেও তুমি মুখ খুলিলে না, উঠিলে না, বসিলে না, নড়চড়া করিলে না, হাবভাবেও কোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে না, তোমার দ্বারা সংসারের কোন কাজ হইবে না। রাজবংশে তোমার মত অপদার্থ কেহ নাই। তুমি কুলের কলঙ্ক এই প্রাসাদে তোমার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়াছে, রাজ্যে তোমার স্থান নাই, আমার আদেশে রথচালক এবং অন্য পরিচারকগণ তোমাকে গভীর জঙ্গলে নিয়া গিয়া করিয়া জীবন্ত কবর দিবে। আগামী কালই ইহা করা হইবে, প্রস্তুত থাকিও।

রাজার আদেশ মত পরের দিন রথচালক এবং পরিচারকগণ কুমারকে রথে চড়াইয়া সহরের পশ্চিম ফটক দিয়া গভীর জঙ্গলে লইয়া গেল। কুমারকে জীবন্ত কবর দেওয়ার জন্যে পরিচারকগণ একটা বড় গর্ত খুঁড়িল। কুমার স্বচক্ষে সব দেখিল। সে ভাবিল মৃত্যু অনিবার্য, ইহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই, কেহ পায় নাই, শিশু অবস্থায় পিতার কোলে বসিয়া ভবিষ্যতে কিভাবে জীবন যাপন করিব বলিয়া যে সংকল্প নিয়াছিলাম তাহা কার্যে পরিণত করিবার এই উপযুক্ত সময়, এখন সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে। এই সুযোগ ভবিষ্যতে আসিবে কিনা বলা যায় না। মানুষ-জন্ম দুর্লভ, এখনই মৃত্যু হইলে ভবিষ্যতে মানুষ হিসাবে জন্ম নাও হইতে পারে। ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানকে অবহেলা করা চলে না। আমার কর্তব্য এখনই ত্যাগের পথ অবলম্বন করি, সন্ন্যাসী হইয়া অবশিষ্ট জীবন সৎচিন্তায় কাটাইয়া দিই এবং মুক্তিলাভের চেষ্টা করি, মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য, মুক্তি পথের কণ্টক যে বাসনা তাহা সমূলে নির্মূল করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করি, এইভাবে জীবন কাটাইয়া যদি পিতামাতাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারি তবে আমার জীবন সার্থক হইবে এবং পিতামাতাও মুক্তির আস্বাদ পাইয়া ধন্য হইবেন, ইহাতে আমার এবং পিতামাতা সকলের কল্যাণ হইবে।'

কুমারের মনে তীব্র বৈরাগ্য, এতদিন প্রয়োজনের খাতিরে ইচ্ছা করিয়া উহাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, সুযোগ পাইয়া এখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতকাল জীয়ন্ত জড়-পিণ্ডের মত ছিল, এখন উহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, রথ হইতে নামিয়া কুমার পরিচারকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, 'তোমরা কি জন্য গর্ত খুঁড়িতেছ? এত বৎসর কুমার নিজ মাতার সঙ্গে পর্যন্ত একটি কথা বলেন নাই, আজই প্রথম মুখ খুলিল।

পরিচারকগণ নিজেদের কানে মনে করিল, 'কুমারের জয় হউক' বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল—'আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই, আমাদের জীবন ধন্য, এতদিন পরে সকলের বাসনা পূর্ণ হইল। আজ শুভদিন, এত বৎসর পর্যন্ত রাজা, রাণী এবং রাজবাড়ীর সকলে কত মনের দুঃখে দিন কাটাইয়াছেন তাহা বলিবার নয়, এখন রথে করিয়া আপনাকে প্রাসাদে লইয়া গেলে রাজা ও রাণীমা অতিশয় সুখী হইবেন আর আমরাও প্রচুর উপহার পাইব।'

কুমার তখন মূল্যবান ও মনোহর বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি, রথচালক এবং পরিজনদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া বলিলেন—এই সব উপহার গ্রহণ করু, তোমরা প্রাসাদে ফিরিয়া যাও, এবং আমার পিতামাতাকে খবর দাও যে আমি আর প্রাসাদে ফিরিব না। তাহারা যদি আমাকে দেখিতে চান তবে এই জঙ্গলে আসিয়া দেখা করিতে পারেন, তাঁহাদের বলিবে যে আমার জন্য তাঁহারা যেন চিন্তিত কিম্বা দুঃখিত না হন, পরিজনদের কুমারের নিকট রাখিয়া রথচালক রথ হাঁকাইল, মনে আনন্দ, 'কুমার কথা বলিয়াছে'—এই খবর দিলে রাজা এবং রাণীমা প্রচুর উপহার দিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাসাদে পৌঁছিয়া রথচালক রাজা, রাণী এবং অন্যান্য সকলকে কুমারের খবর দিল। কুমারকে জীবন্ত কবর দিবার জন্য রথচালক এবং পরিচারকেরা জঙ্গলে লইয়া গেলে রাণী অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রের ভাবনায় চোখে ঘুম নাই, পুত্রের মঙ্গল কামনায় অহর্নিশি ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। কুমারের মঙ্গল খবর শুনিবার জন্য উৎসুক নয়নে তাকাইয়াছিলেন। চোখের জল-গণ্ডস্থল প্লাবিয়া অবিরল ধারায় বহিয়াছে, ধারার বিরাম নাই। দুঃখের আগুনে হৃদয় দগ্ধ হইয়াছে। কুমারের মঙ্গল খবর না পাইলে ইহা নিভিবার নয়, দুশ্চিন্তায় রাণীর মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ার যোগাড় হইল।

একমাত্র পুত্রকে তাঁহারই হুকুমে জঙ্গলে লইয়া গেলেও রাজার মনে সুখ নাই। অতি কষ্টে তিনি উহা চাপিয়া রাখিয়াছেন। সারথির মুখে কুমারের খবর শুনিয়া রাজা এবং রাণী অত্যন্ত সুখী হইলেন, অবিলম্বে দাস-দাসী লইয়া রথে চড়িয়া জঙ্গলে বধ্যভূমিতে

উপস্থিত হইলেন, পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া এবং তাহার মুখে মা বুলি শুনিয়া রাণী এত বৎসরের দুঃখ ভুলিলেন, রাণীর আনন্দ আর ধরে না।

কুমারকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া রাজাও জীবন সার্থক করিলেন, চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল, কুমারকে সম্বোধন করিয়া রাজা বলিলেন 'বৎস, আজ মহা শুভদিন, এত বৎসর বহু কাতর প্রার্থনার পর বিধাতা মুখ তুলিয়াছেন, শনির দশা কাটিয়া গিয়াছে, দুর্দিন গিয়া সুদিন আসিয়াছে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা কোন সৎবংশজাত সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়া তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করি, পরে তোমার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই এবং অবশিষ্ট কাল ভগবৎ চিন্তায় কাটাইয়া জীবন সার্থক করি, আমার সময় হইয়া আসিয়াছে, রাজ্যে আসক্তি নাই, প্রজাবর্গের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করিতে পারিলে আমার ভার লাঘব হয়, এই রাজ্য তোমার, তুমিই ইহার মালিক, দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রজাহিতে জীবন উৎসর্গ কর এবং ধন্য হও'।

বিনীতভাবে কুমার বলিল 'পিতঃ, জীবনে এই প্রথমবার আপনাকে প্রকাশ্যে পিতৃসম্বোধন করিতেছি, জীবনের উদ্দেশ্য কি জানিয়াছি, সংসারের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়াছি। বিশ্বপ্রপঞ্চে জীবনের পরিসর অতি সঙ্কীর্ণ। এক প্রান্তে জীবন অন্য প্রান্তে মৃত্যু, মানবজীবন এই দুইয়ের মধ্যে সীমিত। ইহা অনিত্য, ইহার জন্য দুর্লভ মানবজীবন নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় নয়। ভাবিয়া দেখুন, জন্মে দুঃখ, ব্যাধিতে দুঃখ, বার্ধক্যে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ। প্রিয় বিয়োগে দুঃখ এই দুঃখ অপর্যাপ্ত দুর্লভ মানবজীবন লাভ করিয়া মুক্তির চেষ্টাই এক-মাত্র কাম্য। তাই আমি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছি, এতকাল মূক-বধিরের ভাণ করিয়াছি। স্বেচ্ছায় জড়ের মত রহিয়াছি। আমার পক্ষে রাজ্যভার গ্রহণ সম্ভব নয়, বৈরাগ্যই একমাত্র পথ।

রাজা কুমারকে অনেক বুঝাইলেন 'তুমি এখন মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ, এখনও তোমার সংসার ত্যাগের বয়স হয় নাই প্রজারঞ্জন তোমার কর্তব্য। কিছুকাল রাজ্য পরিচালনা করিয়া বৃদ্ধ হইলে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মুক্তির চেষ্টা করিবে।'

পিতার হিতবচন কুমারের মনে রেখাপাত করিল না। কুমার বলিল 'পিতঃ, যৌবনই প্রশস্ত সময় এই সময়ে বাসনা প্রবল থাকে এইজন্য এই সময়ে বাসনাকে সংযত করিতে হয়, রোধ করা কঠিন হয়, মন দুর্বল হয়, বয়স হইলে সংযমের বাঁধ হাল্কা হয়, যদি এইরূপ কোন আইন থাকে শুধু বৃদ্ধ বয়সেই মানুষ মরিবে তাহা হইলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে। কিন্তু জীবনের কোন স্থিরতা নাই মৃত্যুর কোন সময় নাই, শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে যে-কোন সময়েই মৃত্যু আসিতে পারে। মৃত্যু কাহাকেও রেহাই দেয় না। ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য অনন্ত সুখের সম্ভাবনাকে দূরে পরিহার করা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং যৌবনেই বৈরাগ্য অবলম্বন বিধেয়, আপনি যদি সত্যই আমাকে ভালবাসেন, তবে দয়া করিয়া আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিন।

রাণী কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'বাছা, তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, অনেকদিন তোমার কিছু খাওয়া হয় নাই। আমি তোমার জন্য খাবার নিয়া আসিয়াছি, খাও, আমি সুখী হইব।'

মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কুমার বলিল 'মা আমি ঐ রাজসিক খাবার খাইব না উহা আমার পক্ষে হিতকর নয়, আমি ত্যাগের পথ বাছিয়া নিয়াছি, আমি ফল মূলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিব, আমি ফল খাইয়াছি আমার আর খাবার প্রয়োজন নাই।'

পুত্রের কথায় রাণীর মনে পরিবর্তন আসিল, তিনি বলিলেন, 'বাছা, আমি প্রাসাদ, ধন, দৌলত, রাজ্য সুখ কিছুই চাই না, শুধু তোমাকেই চাই, তুমিই আমার সর্বস্ব, তোমার সুখে আমার আনন্দ, তোমার সঙ্গে এই বনে বাস করিব। মুক্তির চিন্তায় জীবন কাটাইয়া দিব।'

হাওয়া বদলাইয়াছে ত্যাগী পাত্রে সংস্পর্শে রাজারও মনে বৈরাগ্য আসিল, তিনি বলিলেন আমি আর রাজ্যে ফিরিয়া যাইব না-এই বনে বাস করিয়া অবশিষ্ট জীবন মুক্তির চিন্তায় কাটাইয়া দিব, তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী হইব। তোমার কথায় আমার চৈতন্য হইয়াছে, জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি, এখন একমাত্র কর্তব্য ভগবৎ চিন্তায় ডুবিয়া থাকা।

এতদিন পরে কুমারের সংকল্প সিদ্ধ হইল, যে জন এতকাল ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছে, কঠোর বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ হইয়াছে, জীবনকে মধুময় করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছে, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। কুমারের তপস্যা ব্যর্থ হয় নাই।

ইহার পর রাজা আপন ভাগিনেয়কে রাজ্যে ফিরিয়া রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বলিলেন, সুযোগ্য মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজ্যশাসন এবং অপত্য নির্বিশেষ প্রজাপালন করিবার উপদেশ দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিলেন। কুমারের সংস্পর্শে রাজা-রাণী ব্যতীত বহু পরিচারক ত্যাগের জীবন অবলম্বন করিলেন। বনের মধ্যেই পাঁচ শত কুটির নির্মিত হইল। শত শত লোক ত্যাগীর জীবন যাপন করিয়া ধন্য হইল, বন-তীর্থ হইল।

প্রাসাদে রাজা এবং রাণী কুমারকে পুত্র হিসাবে পাইয়া সুখী হন নাই। কিন্তু এই বনে তাহাকে পুত্র হিসাবে এবং আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক হিসাবে পাইয়া সুখী হইয়াছেন, প্রাসাদে শান্তি পাই নাই কিন্তু এখন ত্যাগের জীবন অবলম্বন করিয়া প্রকৃত শান্তি পাইলেন ত্যাগের অপার মহিমা ধন্য পুত্র, ধন্য মাতা, ধন্য পিতা। ত্যাগের মহিমা ঘোষিত হউক।

ছিন্নপত্র ও সাজাদপুর

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ছিন্নপত্রের একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিষ নয়। চিঠি দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে---।' ছিন্নপত্রের প্রত্যেক পত্রই ভাবে, ভাষায়, বর্ণনামাধুর্যে পাঠকের মনে নবনব রসের সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর পত্র-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র একটা অপূর্ব অবদান। পত্র যে এত আকর্ষণীয় এত রসঘন হতে পারে ছিন্নপত্র না পড়লে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই ছিন্নপত্র গ্রন্থে আবার সাজাদপুর একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। সাজাদপুরকে বাদ দিলে ছিন্নপত্রের মূল্যায়ন অসম্ভব।

শিলাইদার পদ্মা, পতিসরের নাগর নদী, কালিগ্রাম, কটক, বালেশ্বর, দার্জিলিং-এর বিভিন্নপ্রকার সৌন্দর্য, বিভিন্ন স্থানের কথা ও ভাষাচিত্র আমরা দেখতে পাই ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় কিন্তু সাজাদপুরের কুঠিবাড়ী ও অতি সাধারণ মানুষের চরিত্র ও কাহিনী, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অঙ্কিত হয়েছে পত্রের মাধ্যমে তা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

সাজাদপুর থেকে লেখা ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির ভাব বিশ্লেষণ করলে মুখ্যত কয়েকটি জিনিষ আমাদের চোখে পড়ে,—রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা, রবীন্দ্র সাহিত্যে নব যুগ, রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর সাজাদপুরের পল্লীপ্রকৃতির প্রভাব এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাজাদপুরের নরনারীর স্থান।

যে যুগে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর থাকতেন বা নিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া করতেন জমিদারী সংক্রান্ত কাজে, তখন রবীন্দ্র কাব্য বা সাহিত্যের স্রোতধারা কোন একটা বিশেষ পথ অবলম্বন করে নি। রবীন্দ্র-মানস তখন দোদুল্যমান অবস্থার ভেতর অতিক্রম করছে। জীবনে কোনটি তার ঠিক পথ সাহিত্যের কোন ধারাটি তার অবলম্বনীয়, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। কভুও ভাবছেন গীতিকার হবেন, কখন ভাবছেন অভিনয়কার্যে প্রবৃত্ত হবেন, আবার কোন সময় ভাবেন 'বাল্য বিবাহ' বা 'শিক্ষার হেরফের' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবেন, কখনও বা চিত্রবিদ্যার প্রতি 'হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টি' পাত করছেন। কোন্‌টা নিয়ে থাকলে ভালো হয়, ঠিক বুঝতে পারছেন না।

'মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলো প্রণয়ীকে নিয়ে কোন-টাকেই হাতছাড়া করতে চায় না,' কবিরও সেই দশা হয়েছে। ছিন্নপত্রের একস্থানে কবি লিখছেন—'আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোনটা আমার আসল কাজ। এক এক সময় মনে হয়, আমি ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে—লেখবার সুখও পাওয়া যায়। এক এক সময় মনে হয়, আমার মাথায় এমন অনেক-গুলো ভাবের উদয় হয়, যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়। সেগুলো ডায়ারী প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো। এক এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা দরকার—আবার এক এক সময় মনে হয়, মিল করে ছন্দে গেঁথে ছোট ছোট কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে।—লিটজের মধ্যে কোনটাকেই আমি নিরাশ করতে চাই না।

বেশ বুঝতে পারা যায় যে, তিনি একটা বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে চলেছেন কোনটা ধরবেন তাও বুঝতে পারছেন না অথচ কোনটাকেই তার ছাড়বার ইচ্ছে নেই। তাই তিনি বলেছেন—'আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়।' (ছিন্নপত্র ৩০শে আষাঢ় ১৮৯৩।)

একদিন ঘটলো এই দ্বন্দ্বের অবসান। তিনি অবশেষে স্থির করলেন তিনি কবিই হবেন। তিনি লিখলেন ---'একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে।—বোধহয় উনিই যেন আমাকে সবচেয়ে বেশী ধরা দিয়েছেন; আমার ছেলেবেলাকার আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।' (৩০শে আষাঢ় ১৮৯৩)

সাজাদপুর থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারার পাকা ফসল পরবর্তী জীবনে তিনি ঘরে তুলতে পেরেছিলেন। যদিও প্রধানত তিনি ছিলেন কবি কিন্তু তার বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে, কাব্য সাহিত্য, দর্শন, চিত্রবিদ্যা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ সব দিকই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানুষের মননশীলতা, জ্ঞান ও কর্মের ধারা যত দিকে প্রসারিত হওয়া সম্ভব, রবীন্দ্র-জীবনে তার সব কিছুরই বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে সাজাদপুরের একটি ঘরে বসে একদিন যে আত্মসমীক্ষা ও আত্মজিজ্ঞাসার কবি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, পরবর্তী জীবনে পেয়েছিলেন তার সম্যক সমাধান, তার উত্তর। তাই তিনি বিশ্বকবি, মহাকবি। আর এই বিশ্বকবি হওয়ার পথে সাজাদপুরের দান উল্লেখযোগ্য।

সাজাদপুরে রবীন্দ্রযুগ সোনার তরী থেকে সুরু হয়ে চৈতালীতে শেষ হয়েছে অর্থাৎ ১২৯২ থেকে ১৩০৪

দন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে সব সময়েই যে তিনি সাজাদপুরে থাকতেন অথবা 'সোনার তরী', 'চৈতালীর' সব কবিতাই যে সাজাদপুরে লেখা হয়েছে তা নয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি রচনা করেন। সাজাদপুরের যুগ প্রধানত ছোট গল্পের যুগ। সাধনা ও হিতবাদী পত্রিকার জন্য এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অজস্র গল্প রচনা করেন।

এই যুগেই রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখেছিলেন—'আজকাল আমার মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি ত'হলে কতকটা মনের সুখে থাকি। (ছিন্নপত্র ২৭শে জুন ১৮৯৪।)

সাজাদপুর থেকে আর একখানি পত্রে তিনি লিখলেন—'এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না—আমার সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা। মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোষ্টমাষ্টার গল্পটি লিখেছিলুম (ছিন্নপত্র ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।)

সাজাদপুরের কুঠিবাড়ী রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির উৎস। ছিন্নপত্রই তার সর্বোচ্চ সমর্থনযোগ্য প্রমাণ। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাজাদপুরের তীর্থে' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—বাংলা ভাষার গদ্যসাহিত্যের যে জয়যাত্রা সুরু হয়েছে, তার আরম্ভ হয় সাজাদপুরের একটি গৃহ থেকে। যেখানে বসে রবীন্দ্রনাথ গল্পের পরে গল্পের মধ্যে বাংলার গ্রাম্য নরনারীর অখ্যাত জীবনের অবগুণ্ঠিত কাহিনীকে রূপ দিয়েছিলেন। পোষ্টমাষ্টার, ছুটি, সমাপ্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি সাজাদপুরেই লেখা।

রবীন্দ্র মানস ও রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর পল্লী-প্রকৃতির প্রভাব ছিল অপরিমেয়। বিশেষ করে সাজাদপুর পল্লীতে রবীন্দ্র মানসকমল অনেকখানি বিকশিত হয়েছিল। সাজাদপুরের আলো, হাওয়া, শ্যামল বৃক্ষলতা, বিজন স্তব্ধতা, মেঘমুক্ত আকাশ অনন্তবিস্তারে কবিচিত্তকে অধিকার করে বসেছিল, বিশেষ করে এখানকার দুপুরবেলাটা।

সাজাদপুরে যে বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তাকে কুঠিবাড়ী বলা হয়। এটা আগে ছিল নীলকর সাহেবদের। পরে ঠাকুর জমিদাররা এটাকে কিনে নেন। দ্বিতল প্রাসাদোপম অট্টালিকা, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে দুটি বাগান, নানারকম ফুল, পাতাবাহার, দারুচিনি, ঝাউ ও লিচুগাছে পরিপূর্ণ। ছিন্নপত্রের ভাষায় বলি—'অনেকক্ষণ বোটে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়ীতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড় ভালো লাগে। বড় বড় জানলা দরজা, চার দিক থেকে আলো আসছে, যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই। দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি, এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্য একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেট ভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল। এখানে যেমন আমার লেখবার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন আর কোথাও না। বাইরের জগতের একটা সজীব প্রভাব ঘরে অবাধে প্রবেশ করে। আলোতে, আকাশে, বাতাসে শব্দে আমার মনের নেশায় মিশিয়ে কত গল্পের ছাঁচ তৈরী হয়ে ওঠে। পোস্ট মাষ্টার গল্পের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারিদিকের আলো, বাতাস, তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এইরূপ চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মত একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে অল্পই আছে। (ছিন্নপত্র ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)

সাজাদপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ যে রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, ছিন্নপত্রের আর এক চিঠি থেকে উল্লেখ করি---বসে বসে সাধনার জন্য একটা গল্প লিখছি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া, আলোক, বর্ণধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে সমস্ত দৃশ্য, লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারদিকে এই রৌদ্রে বৃষ্টি, নদীস্রোতে ও নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা, এই প্রফুল্ল শস্য ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে (ছিন্নপত্র ২৮ জুন, ১৮৯৫।) এইটি হচ্ছে 'অতিথি' গল্পের পটভূমিকা।

সাজাদপুরের কুঠিবাড়ীতে বসে রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সুর সংযোজনও হয়ে যেতো। কুঠিবাড়ীর মাঝের কক্ষে অবস্থিত টেবিল-হারমনিয়মটি বার্ধক্যের ভারে জীর্ণ হয়েও আজও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। স্নানের ঘরে ঢুকে মাথায় জল ঢালতে ঢালতে তিনি নতুন নতুন গানের সুর দিতেন এবং গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে কবির একটা ভাবোন্মাদনাও জন্মাতো। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন---এখানে আমি একলা, মুগ্ধ তদ্‌গতচিত্তে, অর্ধনিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি এবং জীবন ও পৃথিবীটা একটি সূর্যকরোজ্জ্বল অতি সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে সাতরঙা ইন্দ্রধনুরেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়। প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে তর্জমা করে দেওয়া যায়—দুঃখ-কষ্টও আভাময় হয়ে ওঠে। (ছিন্নপত্র ১০ই জুলাই, ১৮৯৩।)

সাজাদপুরের নির্জন আবহাওয়ায় কবি মুগ্ধ হয়ে থাকতেন। এখানকার পল্লী-প্রকৃতি যেন স্নেহময়ী জননীর মত শ্যামাঞ্চলছায়ায় তার এই বিশ্ববরেণ্য পুত্রটিকে ঘুম পাড়াতো। এখানকার বর্ষার জ্যোৎস্না কবিকে মুগ্ধ করেছে। দুপুরবেলার কথা তো ছিন্নপত্রের বহু চিঠিতে আছে।

পূর্বেই বলেছি, সাজাদপুরের কুঠিবাড়ী রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির

উৎস। এই সব গল্পে আমরা দেখা পেলাম গ্রামের সরল-সাধারণ শ্রেণীর নাম-গোত্রহীন নরনারীর, আর পেলাম জনপদ, নদী ও তরুলতার প্রতিচ্ছবি। এখানকার মানুষগুলির সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি নিজেকে কতখানি জড়িয়ে ফেলেছিলেন পোস্টমাষ্টার, ছুটি গল্পের ফটিক চক্রবর্তী, সমাপ্তির মৃণ্ময়ী প্রভৃতি তার প্রমাণ। পোস্টমাষ্টারকে তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে, মহাকবি কালিদাসকে ফেলে রেখে তার সঙ্গে আলাপ করতেন। তিনি লিখেছেন—যখন আমাদের এক-তলাতেই পোস্ট অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতুম তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় পোস্টমাস্টার গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন বেরলো তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, লোকটাকে আমার বেশ ভালো লাগে। বেশ নানা রকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। (ছিন্নপত্র ২৯ জুন ১৮৯২।)

এখানে বিকেলবেলা প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ বোটে বসে থাকতেন। পাড়ে পল্লী-বালকেরা খেলা করতো, তিনি তা উপভোগ করতেন। এই খেলায় কেউ বাধা দিলে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পেতেন। এমন একদিনের এমন খেলা থেকেই ছুটি গল্পের উৎপত্তি। ---ডাঙার উপর একটা মাস্তুল পড়েছিল। গোটাকতক বিবস্ত্র খুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যদি যথোচিত কলরবসহকারে সেইটেকে ঠেলে গড়ানো যায় তাহলে একটা খুব নূতন ও আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ—সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো, মারো ঠেলা হেঁইয়ো। মাস্তল যেমনি একপাক ঘুরেছে অমনি সকলের আনন্দ উচ্চহাস্য। (ছিন্নপত্র জুন ১৮৯১।)

উপরোক্ত ঘটনা থেকেই ছুটি গল্পের উৎপত্তি, এদের সর্দারই 'ছুটির' নায়ক ফটিক চক্রবর্তী।

সাজাদপুরের গোপাল সাহার ঘাটে ছেলে কোলে করা যে মেয়েটিকে কবি দেখেছিলেন সেই মেয়েটি 'সমাপ্তি' গল্পের মৃণ্ময়ী। কবি লিখেছেন---ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে তার প্রতি আমার মনযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে---ছেলেদের মত চুল ছাঁটা, তাতে মুখখানি বেশ দেখাচ্ছে। মুখখানিতে কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা অসরলতা কিংবা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষত আধাছেলে আধামেয়ের মত আরো একটু বেশী মনযোগ আকর্ষণ করে।

মেয়েটি সম্বন্ধে আলাপ শোনা গেলো---একটিমাত্র 'ম্যায়া, অন্য ছাওয়াল' নাই কিন্তু মেয়েটির বুদ্ধিশুদ্ধি নেই—'কারে কী কয়, কারে কী হয়, আপন পর জ্ঞান নেই। আরো অবগত হওয়া গেলো, গোপাল সা'র জামাই ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। (ছিন্নপত্র ৪ জুলাই, ১৮৯১।) এই মেয়েটিই গোপাল সা'র মেয়ে, এই 'সমাপ্তির' নায়িকা।

এই তো গেল বাইরের লোকের কথা। এখানকার ভৃত্য, পাচক, বোটের মাঝি, পরিচারক প্রভৃতির উপরও কবির স্নেহ কত আন্তরিক ছিল তাও তাঁর বিভিন্ন গল্প, নাটক ও কবিতায় দেখতে পাই। সাজাদপুরের কলিমুদ্দি বাবুর্চি 'চিরকুমার সভায়' অমর হয়ে আছে। বোটের মাঝি তাপসী গোলায়ের দুঃসাহসের কাহিনীর উল্লেখ আছে ছিন্নপত্রে। এমনি একজন ঠিকা চাকর ছিল মোমিন মিঞা। লোকটা একেবারেই বুদ্ধিহীন কিন্তু কর্তব্যে অটল ছিল। এই মোমিন মিঞা রবীন্দ্রনাথের কর্ম কবিতায় অমরত্ব লাভ করছে। কবি লিখেছেন---স্মরণে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরী করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্য-নিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে ঝাড়ণ কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়-পোঁছ করতে গেল। কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকের অবসর নেই (ছিন্নপত্র ১৪ আগষ্ট ১৮৯৫।)

'এমনি আরো কত নাম-না-জানা মানুষের কাহিনী রবীন্দ্র কাব্য ও সাহিত্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে, যার খবর আমাদের জানা নেই। সাজাদপুরের আলো, হাওয়া, রূপ রসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এখানকার নিস্তব্ধ রাত্রি, কর্মচঞ্চল গ্রাম, এখানকার খেয়াঘাট, শেওলাপড়া মরা নদীর সোঁতা, শহর-সংস্পর্শবর্জিত পল্লীর নরনারী, শিশু, তাঁর অন্তরকে কতখানি আকর্ষণ করেছিল ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় তার চিহ্ন রয়ে গেছে।

সাজাদপুরের ছোট-খাটো ঘটনাগুলিও তাঁর চোখ এড়ায় নি। কুঠিবাড়ীর সামনে বিস্তৃত মাঠের উপর তাঁবু ফেলা বেদিয়াদের ঝগড়া, পৌষের মেঘলা দিনে স্নান করতে অনিচ্ছুক শিশুটির উপর মায়ের নিষ্ঠুর প্রহারের দাগও ছিন্নপত্রে স্থায়ী দাগ রেখে গেছে। (ছিন্নপত্র ফেব্রুয়ারী ১৮৯১।)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন আগে দেহত্যাগ করেছেন, সাজাদপুরও আজ আমাদের কাছে নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়েছে, তবু যখনই ছিন্নপত্রের পাতা খুলে বসি তখনই সব যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মৃত্যুর বহুদিন আগে থেকেই বৈষয়িক কারণে সাজাদপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল; কিন্তু সাজাদপুরের প্রতি তাঁর অন্তরের টান পূর্বের মতই ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ---মানুষের এক জীবনে জন্মজন্মান্তর ঘটে। সাজাদপুরের সীমানার মধ্যে যে দিনগুলি গাঁথা পড়েছিল তার রূপ তার রস, তার আলো, তার হাওয়া আর এক জন্মের---আমার দূরবর্তী জীবনে সাজাদপুর আমার মনকে অনেকবার টেনেছে—সে মন কোথায় হারিয়ে গেছে

এশিয়ার ফ্লু : পূর্বকথা

১৯১৮-র 'ফ্লু' ছড়িয়েছিল পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ লোকের দেহে। মারা যায় দেড় কোটিরও বেশি সংখ্যক 'ফ্লু'-রোগাক্রান্ত হতভাগ্য। বিগত ১৯৫৬-য় এশিয়ায়—'দূর প্রাচ্যে' —কয়েক লক্ষ লোক 'ফ্লু'-তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে চমকে ওঠে য়ুরো-আমেরিকা-র জনস্বাস্থ্য বিভাগগুলো। এবার কি তাদের পালা ?

তবে, তাঁরা তখন নিশ্চিত ছিলেন ১৯১৮-তে সংঘটিত প্রলয়ের পুনরাবৃত্তি হবে না, যদিও সংক্রমণ এড়ানো অসম্ভব। ফ্লু সাধারণত অত্যধিক দুর্বল ক'রে নিউমোনিয়া জাতীয় রোগের সহজ শিকার ক'রে তোলে। অধুনা সালফা ওষুধ আর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ফ্লু ঠেকানো যায় না, কিন্তু নিউমোনিয়া জাতের রোগের বিরুদ্ধে এগুলো খুব কার্যকর। ফ্লু-ভ্যাক্সিনও দ্বিতীয় স্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যদিও এ বস্তু পর্যাপ্ত অমিল।

১৯১৮ খৃস্টাব্দের ফ্লু-মড়ক অভাবিত বেগে আমাদের অভিভূত করে ফেলেছিল। ব্যাপারটার সঠিক তাৎপর্য বুঝতেই লেগেছিল কয়েক বছর। ১৯৫৬-র পরেই বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা প্রায় সব দেশে ফ্লু-ডিটেক্টিভ রাখে, এবং ছেচল্লিশটা দেশ নিয়ে গবেষণাগারের 'চেন' আর পৃথিবীব্যাপী রেডিও-নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বাস্থ্য দপ্তরকে সাবধান করার জন্য। এর সদর দপ্তর জেনিভায়। লন্ডন-এর বিশ্ব ফ্লু কেন্দ্র এবং মন্টোগোমারী-তে (আলবামা) ইন্টারন্যাশনাল ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা সেন্টার ফর দ্য অ্যামেরিকাস —এই দুই কেন্দ্রে ফ্লু-সংক্রান্ত সব খবর পৌঁছে দেওয়া হয়।

বিশ্বজোড়া এই তোড়জোড়ের কারণ বোঝা সহজ। ফ্লু কয়েক সপ্তাহে গোটা পৃথিবী চক্কর দিতে পারে, জাতীয় কোনকালেই মানে না।

ফ্লু একমাত্র রোগ না হওয়ায় এতদ্‌সংক্রান্ত কর্মীদের কাজ জটিলতর হয়েছে। একগুচ্ছ রোগের সমাহার ফ্লু—কয়েকটা প্রধান ধরণের বীজানুর সমবায়ে গঠিত: 'ক', 'খ', 'গ', এবং সম্ভবত 'ঘ'। 'ক' আর 'খ'-এর উপবিভাগ বর্তমান। আজও বিজ্ঞানীরা জানেন না ঠিক কোন্ জাতের বীজাণু ১৯১৮-য় মহামারী ঘটিয়েছিল। মুশকিল আরও এই যে, আজ যে মানুষ 'ক' জাতের

স্বাস্থ্যবিদ

ফ্লু-তে ভুগছে, পরের মাসে সে 'খ' বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। 'ক' প্রতিষেধক 'খ' প্রতিরোধে কাজে আসে না। কাজেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণাগারগুলোর কাজের বড় অংশ জুড়ে থাকে সংক্রমণ কোন্ জাতের বীজাণুঘটিত তা নির্ণয় করা। নানা ধরণ হলে তবু ভাল, অজানা ধরণের বীজাণু হলে নতুন ভ্যাক্সিন বা ওষুধ আবিষ্কারের জন্য তোলপাড় করতে হয়।

ফ্লু-এর বীজাণু ত্যাঁদড় নম্বর ওয়ান। একবার তা বেশ ঠাণ্ডা, দুর্বল, পরের বার তার সাংঘাতিক রোখ, প্রাণধ্বংসী মূর্তি। দুটো মহামারীর মধ্যবর্তী সময়ে বীজাণুগুলো কোথায় লুকোয় কেউ জানেন না। '৫৭-র ফ্লু-র উৎপত্তি সম্ভবত উত্তর চীনদেশে। চীন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সভ্য না হওয়ায় এপ্রিল মাসে হংকং-এ মহামারী ছড়ানর পর তা বিশ্বের নজরে আসে। সিংগাপুরে পৌঁছোয় ৪ঠা মে, কয়েক দিনের মধ্যে একলক্ষরও বেশি লোক ফ্লু-আক্রান্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ফ্লু-ডিটেক্টিভরা কাজে নেমেছেন।

মালয় এবং অন্যান্য জায়গা থেকে লন্ডনে আর মন্টোগোমারী-তে ফ্লু বীজাণুর নমুনা পৌঁছোল। সেখানে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এক সপ্তাহের মধ্যে লন্ডন থেকে ডাঃ ক্রিস্টোফার অ্যান্ড্রু এবং ডাঃ অ্যালিক্ আইজ্যাক্স ঘোষণা করলেন ফ্লু নতুন জাতের—নাম দিলেন: 'এ সিঙ্গাপুর। ১।৫৭' ঐ দিনই ওয়াশিংটন থেকে ডাঃ মরিস্ হিলেম্যান এবং তাঁর সহযোগী পরীক্ষান্তে ঘোষণা করলেন 'এসিয়ান ফ্লু পূর্বদৃষ্ট অন্যান্য ধরণের তুলনায় উল্লেখযোগ্য রকমে ভিন্ন।'

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সারা পৃথিবীকে সাবধান ক'রে নতুন 'ভ্যাকসিন' আবিষ্কারের জন্য প্রোগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করল। এক সপ্তাহের মধ্যে লন্ডন আর মন্টোগোমারী থেকে পৃথিবীর সর্বত্র অসংখ্য গবেষণাগারে ঐ বীজাণুর নমুনা পৌঁছে গেল। উদ্দেশ্য মহৎ—রক্ষণামূলক ভ্যাক্সিন তৈরীর কাজে ভিত্তি স্থাপন।

ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ফিল্ড'-এর কর্মিবৃন্দ মানবদেহে ঐ বীজানুর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত খবর যোগাড় করছিলেন। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল নতুন জাতের ফ্লু প্রাণঘাতী নয়। হাজারে একজনের বেশি মারা যায় নি। মৃতরাও বৃদ্ধ, অন্যান্য রোগকাতর। ১০৪° পর্যন্ত জ্বর, মাথা এবং মাংসপেশীর যন্ত্রণা, এক সপ্তাহ স্থিতি—এই হল সেবারকার ফ্লু-র বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষিত ওষুধ সেবার খুব কাজে লাগল—সংগে বিশ্রাম। ব্যস্, কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ।

রোগটার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা। সায়গন ২০শে মে জানাল সেখানে ফ্লু নেই; ছ' দিন পরে সায়গনে ফ্লু-আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ছ' হাজার। ১৭ই মে ম্যানিলা জানাল মোট রোগীর সংখ্যা আট শ; তিনদিন পরে তা এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজারে পর্যবসিত হল। গোটা প্রাচ্যে সে বছর লক্ষ লক্ষ লোক ফ্লুতে শয্যাশায়ী। ফরমোসায় সংখ্যা কুড়ি লাখ, জাপানেও প্রায় সমান সংখ্যক। ফিলিপাইন্স-এ রোগীর সংখ্যা ছিল ১,৬০০,০০০; মৃত মোট দু' হাজার জন।

সেবার গ্রীষ্ম এবং শরতের গোড়ায় য়ুরো-আমেরিকা এসিয়ান ফ্লু-এর ধাক্কা সামলেছে। যদিও তেমন মারাত্মক ছিল না, কিন্তু জেনিভার 'কো-অর্ডিনেটর' ডাঃ অ্যান্টনী পাইন সাবধান করেছিলেন এই বলে যে, ঐ ফ্লু ভয়ানক হয়ে ওঠা আদৌ অসম্ভব ব্যাপার নয়।

সব থেকে বড় সমস্যা এর পর্যাপ্ত ভ্যাক্সিন তৈরি করা নিয়ে। পৃথিবীর কয়েক শ' কোটি লোককে নিরাপদ করতে হলে যে বিপুল পরিমাণ ভ্যাক্সিন লাগে তা নেই। করাও খুবই দুরূহ।

এ প্রশ্ন কেবল ফ্লু-এর ক্ষেত্রেই ওঠে; কারণ এর মত সাংঘাতিক দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে—অন্য কোনও রোগবীজাণুর নেই।

সাম্প্রতিক ফ্লু-রও উৎপত্তিস্থল নাকি চীন। কাগজ বলছে 'মাও-সে-তুং-ফ্লু'। বৈপ্লবিক ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কেবল, দুঃখ এই যে শোনা গেল 'সংশোধনবাদী' রাশিয়া তেই কেবলমাত্র এই জাতীয় ফ্লু প্রতিরোধের ভ্যাক্সিন মেলে। বিচিত্র।

সমীক্ষার আলোকে

চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ল্যাম্পপোস্টের নিচে অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে।
রাত নেমেছে।
অস্বচ্ছ, নির্মম, ভয়াল জন্তুর মত গভীর রাত।...
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য
স্থির, স্পন্দনহীন। মাঝে মাঝে পেচকের ডাক
অট্টহাসির মত চমকে ওঠে।
বুকের তটে রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ে......
শিরা-উপশিরার গহন
অরণ্যে ড্রাম বাজে—ড্রিম, ড্রিম, ড্রিম......। তারা কি এল?
যাদের প্রতীক্ষায় বসে আছি সেই রাত বারোটা থেকে।—প্রতিদিন
কাটে উৎসবের ফেনিল স্রোতে—কামু, ব্রাউনিং, কীটস......
কফি হাউসে কফি উছলে ওঠে পেয়ালার বৃত্তে।—আলো বিচ্ছুরিত।
চোখের কোণে বিকীর্ণ বিদ্যুৎ—জন্ম নেয় অজস্র কবিতা—মনের
একেকটি জ্বালা।—গজানো, তীব্র, তীক্ষ্ম যন্ত্রণা ফুটে ওঠে সাদা-
পাতায় কালো-কালো আখরে।—স্বর্গ কি আছে? যদি থাকে
তবে কেন নামছে না? নরক কি আছে? আছে।
তাই তো পৃথিবীতে
এত দাহ। ভিয়েটনামে তার ছায়া, প্রবৃত্তির রক্তক্ষরী সংগ্রামে তার
প্রতিচ্ছবি।—তাই আমি নরকেরই সমর্থক।—স্বার্গ নাকি
আমার
রমণীর মত—পেলব, পুষ্পিত, কোমল।—স্পর্শলোভাতুর মানস-
ভূমিতে তাই ছায়াশরীরীদের আনাগোনা অবিরত।...আমি পাপ
ভালবাসি। পৃথিবীতে প্রথম উষার আলোয় যে রক্তরাগ তা তো
সূর্যের রক্তচক্র নয়, তাতে তো মানুষের শোণিত অজস্র।...
যুগে যুগে বিভিন্ন ক্ষেমসংপৃক্ত পৃথিবীর দেহনিঃসৃত পাপ
ক্ষরিত
সতত।—পৃথিবীর দশদিক কোণে পাপরা রাজ্য করে—ওরা আমায়
হাতছানি দেয়—নীরক্ত দেহে, নির্বিকার দৃষ্টি কাজল গভীর
খাদের মত।
আমি তাদেরই সাধক। দেখবো আমার অস্তিত্বের পরতে পরতে
তাদের আহবান জানিয়ে পাপেদের সূক্ষ্মতম সত্তা কি বলে।—
গভীর রাত। প্রেরণার এক একটি শপথ। অশরীরী ছায়ারা আনা-
গোনা করে। দেখতে চাই অশুভ ক্ষমতা তাদের কত।—রাত
বারোটা থেকে চলে আত্মসমীক্ষা।—তারা তো কই এল না।—
রাতচরা পাখিরা অতর্কিত ডাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে
দেয় রাত্রির অতল রহস্য।—দিন নামে।......জ্বালা বাড়ে।......
প্রিয়চোখে টলটলে জল।—অট্টহাসি ছলকে ওঠে ওষ্ঠ সীমান্তে।—
কোন চোখে আগুনের শিখা আমার মনের গভীরে আনে
বিশ্বাসের তরঙ্গ অতলান্ত।......আজও রাত বারোটা।...
শিস, শিস, শিস,......ওই তো আসে তারা একে একে।
মিছিল করে......মুখ ঢাকা। সাদা সাদা আঙুল তুলে দাঁড়ায়
ওরা......কি গভীর ভয়, কি গভীর আতঙ্ক।......
কুকুর ডাকে দূরে দূরে।......ঢং, ঢং, ঢং...রাত বারোটা
অস্তিত্ব ঘোষণা করে ওঠে।......আসছে, আসছে, আসছে,
সুশুভ্র হাত বাড়ালো আমার পানে......কবরখানা বুঝি
আমার সামনে।—চুপচাপ...ঝিম-ঝিম-ঝিম......আবরণ
তুলে ধরলো ওরা।—বিদ্যুৎ চমকালো অমনি।—প্রেতচোখ
এমনি? শান্ত-সুন্দর-গভীর-অতলান্ত দৃষ্টি প্রদীপে
উর্ধ্বায়িত শিখার মত।—ওরা মিশে গেল আমার সত্তার
ঘনতায়।—কিন্তু পাপবোধ কই? নেই। পাপেরই শায়কে
বিদীর্ণ অজ্ঞান—প্রস্ফুট রক্তকমল—বিকশিত তার
সহস্রদল—বুঝলাম। অন্ধকারের ঘনতায়ই আলোর
জন্ম।—সৃষ্টির প্রারম্ভে যে ছিল শূন্য আর সে শূন্যতার
বুক হতেই এসেছে সৃষ্টি; এসেছে পুষ্টি; এসেছে আনন্দ।—
ভয় নেই, শঙ্কা নেই; চেতনা সাগরে ভাসে শতদল,
অম্লান, তারকালোকে।

সূতানুটীর বাজ আর পদ্মার নাগিনী

১৯২৬ সালের ২২শে নভেম্বরের বিকেলের রোদে শীতের আমেজ-জড়ানো একটা অম্লমধুর স্বাদ পাকে পাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও, একটা পুলক-রোমাঞ্চের বিনম্রোদ্ধত উত্তেজনাও যেন তার মধ্যে অবিমিশ্রভাবে জড়িয়ে ছিল, অন্তত একজনের কাছে, যিনি হ্যারিসন রোড-আপার সার্কুলার রোডের মোড়ের বিভাগীয় বিপণীটিতে উঠে একটা ২৬ ইঞ্চি চামড়ার-স্যুটকেস দুম্ করে কাউণ্টারের ওপর ফেলে এক-নিঃশ্বাসে শাড়ী-ব্লাউজ-সায়া- বডিস - তেল - সেণ্ট-সাবান- স্নো - পাউডার - পমেটম - আল্‌তা প্রভৃতির শতেক ফরমাস দিয়ে ফেলে উপস্থিত খদ্দের ও কর্মচারীদের যুগপৎ বিস্মিত ও হতচকিত ক'রে দিলেন।

কর্মচারীদের প্রকৃতিস্থ হয়ে তার আগেই ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে দিয়ে হাওয়া খেতে-খেতে পুনর্বার ব'লে উঠলেন—ঠিক দিন, আমাকে এই খুলনা এক্সপ্রেস ধরতে হবে।

কর্মচারীদের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি। পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তাঁরা যাঁর-যাঁর জিম্মার সামগ্রীগুলো টেনে টেনে নামিয়ে জড়ো করছেন সামনে, আর প্রত্যেকেই বলছেন—এই যে, আপনি এদিকে আসুন, দেখুন!

কাজেই ভদ্রলোক এবার বিরাট কাউণ্টারটার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পছন্দ করছেন, দাম জিজ্ঞেস করছেন, ক্যাশমেমো কাটাচ্ছেন এবং (কর্মচারী এবং অন্যান্য খদ্দেরদের জন্যে আরো আরো বৃহত্তর বিস্ময় অপেক্ষা করছে) ঐ ২৬ ইঞ্চি চাম্‌ড়ার স্যুটকেশ ভর্তি ভিক্টোরিয়া-মার্কা, এডোয়ার্ড-মার্কা, পঞ্চম জর্জ-মার্কা, কাঁচা টাকা থেকে এক একটি ক্যাশমেমো টাকা এক একবার স্যুটকেশ খুলে গুণে-গুণে

শ্রীবিশ্বেশ্বর নন্দী

মিটিয়ে দিচ্ছেন,—স্যুটকেশ এবং টাকা সম্বন্ধে একদম সাবধানতা অবলম্বন না ক'রে—কোনো সময়ে বা ডালা বন্ধ ক'রে চাবি না দিয়ে কোনো সময়ে বা ডালাটি খুলে রেখে—বন্ধ করতে একদম ভুলে গিয়ে, কিংবা বন্ধ করার প্রয়োজনও অনুভব না ক'রে—এতো-গুলো কাঁচা টাকার প্রদর্শনী খুলে রেখে।

উপস্থিত সকলেই ভদ্রলোক সম্বন্ধে উদ্ভট ধারণা করতে লাগলেন,—উন্মাদ, কিংবা তার চেয়েও যোগ্য বিশেষণ দান ক'রে পরবর্তী বিস্ময়ে আবিষ্ট হ'বার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগলেন।

ভদ্রলোকের এই পাগলাটে আচরণ লক্ষ্য করছেন আরো-একজন, বাইরে দোকানের বিপরীত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে; তিনি অল্প অল্প হাসছেন, মনে মনে হয়ত কোনো সঙ্কল্পও গ্রহণ করছেন, আর কিছু কিছু উত্তেজনাও অনুভব করছেন। যেরকম ক্ষ্যাপা ধরণের লোক সামান্য বুদ্ধি খাটালেই স্যুটকেশসুদ্ধো টাকা হস্তগত করা যাবে। ঐ অদ্ভুত লোকটি সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্যও কম নয়। সুতরাং টাকা আত্মসাতের লোভ এবং ভদ্রলোক সম্বন্ধে ঔৎসুক্য তাঁকে টেনে একরকম দোকানে ভদ্রলোকের পাশে নিয়ে হাজির করল।

প্রথমে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও জিনিষ-পত্রগুলো ধরে ধ'রে স্থায়িত্ব, কোয়ালিটি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করতে লাগলেন, তারপর অযাচিত অভিমত ভদ্রলোকের পছন্দাপছন্দের ওপর,—না, না, ও-শাড়ীর সঙ্গে এ-ব্লাউজ মোটেই ম্যাচ্ করবে না, এটা নিন!

—এটা নেব? হ্যাঁ বেশ চমৎকার

ম্যাচ করবে। আপনার তো খুব পছন্দ আছে দেখছি।

—আর কি কিনবেন?

—না, আর কিছুই কিনব না। কিনলে তো মশাই দোকানসুদ্ধো সবই কিনতে পারা যায়। এবার এগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে নিই।

ব'লে ভদ্রলোক নতুন মালপত্র ঐ টাকাভর্তি স্যুটকেশটায় গাদা ক'রে ঢোকালেন; কিন্তু ডালাআর বন্ধ হয় না।

এ তো আচ্ছা এক মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি।

ব'লে আবার সব নামিয়ে, আবার অন্যরকমভাবে গাদা ক'রে ঢোকালেন। কিন্তু ফল একই হ'ল, ডালা বন্ধ হয় না।

এমনি ক'রে বার-কয়েক বের-করা আর ঢোকানোর ব্যাপার ক'রে যখন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন, তখন গায়ে-পড়া ভদ্রলোকটি বললেন—দিন, আমাকে দিন—ব'লে দেখার অপেক্ষা না ক'রেই সমস্ত টেনে নামিয়ে সুন্দর ক'রে ভাঁজ ক'রে ক'রে গুছিয়ে স্যুটকেশে সাজিয়ে দিলেন। তারপর ডালাটি চমৎকার বন্ধ হয়ে গেল।

—বাঃ, ওস্তাদ লোক তো আপনি! চলুন, চা খান তো আপনি।---না, না, কোনো আপত্তিই শুনছিনে আমি।

ব'লে একরকম টেনেই তাঁকে ঐ রেস্তোরাঁটায়—শেয়ালদা স্টেশনের সংলগ্ন যেটা সেটায় নিয়ে হাজির করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই পরটা-মাংসের অর্ডার। দু'দিন দু'রাত্তির কাটালাম ট্রেনে—শরীর ভীষণ ক্লান্ত—খিদেও পেয়েছে বাঘের মতো।

সহচর গায়ে-পড়া বন্ধুটি—বেশ-ভূষা চেহারায় ভদ্রলোকের মতোই—কথাবার্তা মার্জিত; কিন্তু পেশা-সম্বন্ধে ধারণা করাই কঠিন। গল্পের সুবিধের জন্যে ওঁর নাম দেওয়া যাক্ সুলোচন, আর বোমভোলা ভদ্রলোকটির নাম ভোলানাথ। উভয়কে সমবয়সীই দেখায়—পঁচিশ-ছাব্বিশের কোঠায় বলেই মনে হয়।

সুলোচন বলল—সত্যিই আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আসছেন কোত্থেকে?

ভোলানাথ বলল—মাদ্রাজ থেকে।

—মাদ্রাজ থেকে? ওখানেই কাজ-কর্ম করেন বুঝি?

—হ্যাঁ, সেখানেই চাকরী। আচ্ছা, আপনি ভাগ্যটাগ্য এসব বিশ্বাস করেন?

—করি। যখন নিজের শক্তিতে কুলিয়ে ওঠে না, তখন ভাগ্যে বিশ্বাস করি আরো বেশী।

—তা ঠিক। শক্তিহীনেরা ভাগ্য বিশ্বাস করে বেশী। কিন্তু আমার বেলায় শক্তিহীন বা শক্তিমানের প্রশ্নই ওঠে না—ওটা পুরোপুরি ভাগ্যেরই খেলা।

—কি রকম?

—তবে বলি, শুনুন।

ততক্ষণে পরটা-মাংস এসে পড়েছে। ভোলানাথ দু'দিনের উপবাসী, তাই কাঁটা-চামচ একপাশে সরিয়ে রেখে সে-ই খাদ্যে হাত লাগলো আগে। দেখাদেখি সুলোচনও। কিন্তু ভাগ্যের খেলার কাহিনী বলতে না পারলে ভোলানাথের যেন স্বস্তি নেই; তার মধ্যে যে তার একটা বিরাট গর্ববোধ তাই আহারের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীও ব'লে যেতে লাগলো। আহারের প্রক্রিয়ায় সুলোচনকেও কম-উপবাসী মনে হয় না; তৎসত্ত্বেও সে নিষ্ঠাবান-শ্রোতারই পরিচয় দিয়ে চললো।

ভোলানাথ কাহিনী আরম্ভ করার আগে ছয় বৎসর আগেকার একটি করুণ মধুর জীবন সায়রে যে ডুব দিয়ে উঠল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার হঠাৎ শুব্ধ হয়ে যাওয়া এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করার মধ্যে—যা আহাররত সুলোচনের দৃষ্টিতে পড়েনি।

ভোলানাথ বলল—তার চোখের জল আমি ভুলি নি, ভুলে নি তার রুদ্ধকণ্ঠের করুণ আকুতিও।

ভোলানাথের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সুলোচন সচকিত হয়ে মুখ তুলল। জিজ্ঞেস করল—মানে? আপনার কি---

—আচ্ছা, মেয়েরা তাদের নিজের ঘর সংসারের জন্য খুব লালায়িত হয়, না?

—হ্যাঁ, বোধহয়। কেন? আপনি কি বিয়ে-সাদী করেছেন নাকি?

—করেছি। সেইজন্যই তো----

—কিন্তু 'চোখের জল', 'করুণ আকুতি'—ওসব তো প্রেমে-পড়ার এবং বিয়ের আগের ব্যাপার। বিয়ের পরেও কি----

—ঐ যে বললাম—ঘর-সংসার—নিজস্ব----

—ঘর সংসার মানে তো খুঁটিনাটি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া—পান থেকে চুণ খসলেই রণচণ্ডীর----

ভোলানাথ এমনভাবে সুলোচনের দিকে তাকালো যে, বাকি-কথাগুলো আর নিঃসরিত হ'ল না তার মুখ দিয়ে। যেন সুলোচন তার সুখের স্বর্গলোক ভেঙে দিচ্ছে। ভোলানাথ স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু যে ওরকম আচরণ পায় নি তা নয়, ওরকম ভাবার মধ্যেও যেন একটা অবাস্তবতা বিদ্যমান। স্ত্রীর ভালোবাসার নিখুঁত নিদর্শনগুলো যে তার অঙ্গে অঙ্গে লেপ্টে আছে, ছয় বৎসরের প্রবাসী-জীবন—যে সে ঐ স্মৃতি-মন্থন-করা সুধারই আস্বাদে পূর্ণ ক'রে রেখেছিল।

ভোলানাথের সেই কঠোর করুণ দৃষ্টি এবার স্তিমিত হ'ল—যেন আবার সে অতীতের সুখ স্মৃতির সমুদ্রে নিমজ্জিত হ'ল।

সুলোচন কিন্তু টাকাভর্তি স্যুট-কেশটার মোহে আবিষ্ট হয়ে গেল এই অবসরে। কিন্তু সে ভাব ধরা পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—ও কি, আপনার খাওয়া যে এগোচ্ছে না, আমার তো শেষ হয়ে এলো।

—এ্যাঁ, হেঁ, তাই তো। ব'লে তাড়াতাড়ি হাত চালাতে লাগল। খেতে খেতে আপন-মনেই বলল—হতভাগ্য আমি।

—আপনার 'ভাগ্যের খেলা' কি ওখানেই শেষ হয়ে গেল?

—কোন্খানে?

—ঐই মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়ে?

—মাদ্রাজ পর্যন্ত যাওয়াটাই তো একটা ভাগ্যের খেলা। সে কথাই তো বলছি আপনাকে।

—বললেন আর কোথায়? দু'য়েক ফোঁটা 'চোখের জল', আর সামান্য একটু 'করুণ আকুতি'তেই তো খতম্ হ'ল।

—আবার সেকথা মনে করিয়ে দিলেন তো? সেসব কথা মনে হলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

—খেলা দেখাতে থাকুন, সব ভুলে যাবেন। মানে, ঐ ভাগ্যের খেলা।

—ভাগ্যেরই খেলা, নইলে এমন দুর্ভাগ্য হয় আমার। সৌভাগ্যও বলতে পারেন। আজকের দিনে ভাগ্য আমার সম্পূর্ণ সুপ্রসন্ন—একথা আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি।

—সে কথাই তো বুক ফুলিয়ে বলছিলেন—কিন্তু কিছুই বললেন না—বুকের ফোলাটা শুধু-----

—বলছি। গোড়া থেকে বলব?

—আমার কাছে আগাগোড়া একাকার। যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারেন। না বললেও ক্ষতি নেই। আর, আমার মতো অপরিচিতের কাছে বলবেন কিনা তাও ভেবে দেখুন।

—অপরিচিত, মানে? বলব না, মানে? তবে কি ঘরের বৌকে গিয়ে বলব, মশাই? শুনুন, এই বৌকে দিয়ে শুরু করি। বৌ, মানে আমার বাবার বাল্যবন্ধুর মেয়ে, আমি যাঁর বাড়ীতে থেকে মানুষ হয়েছি, যাঁর মেয়ে আমার কাছে পড়াশুনা করত।

—তাই বলুন, আগাগোড়া একটা রসের ব্যাপার তা'হলে।

—হ্যাঁ, রসেরও বটে, আবার---শুনুন না। ব'লে সংক্ষেপে সে বৃত্তান্ত বলল ভোলানাথ।

৩

: শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন অভিভাবকহীন ভোলানাথ গ্রাম-প্রান্তের পিতৃবন্ধু গোলোকনাথের বাড়ীতে থেকেই মানুষ। লেখাপড়ায় যেমন ঝোঁক তেমন মেধা। ডিস্টিংশন নিয়ে বি-এ পাস করার আগের সব ক'টা পরীক্ষাতে তার অসাধারণ কৃতিত্বের ছাপ। তারপরেই ঘটা ক'রে বিয়ে—এই গোলোকনাথেরই একমাত্র কন্যার সাথে, সে তার একই টেবিলে বসে পড়াশুনা করত,—ভোলানাথ যাকে পড়িয়ে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস করিয়েছে। পিতৃবন্ধু খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করার ঋণ এমনি ক'রে শোধ নিলেন, না, উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের কাছেও অনেকখানি এসে পড়েছিল, সে প্রশ্ন অবান্তর; কিন্তু তারা যে সুখী হয়েছে, তা'তে সন্দেহের অবকাশ নেই।

: পরের দিন সকালেই ভোলানাথ সস্ত্রীক নিজ বাড়ীতে চলে এলো।

সুলোচন ব'লে উঠল—চালচুলোর ঠিক নেই, তবু?

ভোলানাথ গম্ভীরভাবে বলল—হ্যাঁ, জীবনের চেয়ে মর্যাদার দাম বেশি। এবং সেদিনই সন্ধ্যের গাড়িতে কলকাতা রওনা দিলাম আমি।

—স্ত্রীকে বাড়িতে একলা ফেলে?

—হাঁ, প্রতিবেশীরা রয়েছেন, ভয় কিসের? তা' ছাড়া বাপের বাড়ি তো কাছেই, আসা-যাওয়া বন্ধ থাকবে না। আর, স্নেহশীল পিতা কন্যার একাকিত্ব লাঘবের ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়ই। ব'লে এসেছি—যে মর্যাদা রক্ষার জন্যে এ ব্যবস্থা সে মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, অর্থাৎ, বাপের বাড়িতে হামেশা গিয়ে আমার মাথাটা যেন আর বেশি কেটে না আসে।

—বাঃ, চমৎকার! একেই বলে ভাগ্যের খেলা।

—না, মশাই, ভাগ্যের খেলা ঠিক ওখানটায় নয়,—ওটা এর পরে।

—কিন্তু----

—তাই তো বলছি। শুনুন, রওনা তো দিলাম কলকাতায়। এই প্রথম বেরুলাম গাম ছেড়ে,—তাও আবার কলকাতায়;—কোথায় উঠবো—কী করবো—কিছুই ঠিক নেই। একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে যাচ্ছি এইমাত্র—চাকরি বা অর্থার্জন চাইই—মর্যাদার প্রতিষ্ঠা চাই—স্ত্রীর স্বামী-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে।

—স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বলুন।

—তাই হোলো। তারপর শুনুন না। গোয়ালন্দ থেকে তো চাপলাম কলকাতার ট্রেনে। কতো আকাশ-পাতাল যে ভাবছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। চাকরি যে কোথায় ভগবান জানে—এদিকে আমি তো রাজা-উজীর হয়ে উঠছি। বিরাট মানসিক উত্তেজনায় ঘুম নেই চোখে। সব চিন্তা ছাপিয়ে শুধু একজনের চিন্তাই পেয়ে বসল আমাকে, স্ত্রীর চিন্তা। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে ছাড়াছাড়ি, কে কবে ভেবেছিল মশাই।

: ব'লে স্ত্রীর ক্ষুদ্রতম প্রেম-ভালবাসার নিদর্শনগুলো, কোনোদিনের মান, কোনোদিনের অভিমান, ক্ষোভ একে একে কেমন ক'রে নিদ্রাহীন নেত্রের পর্দায় ভেসে উঠল সে কাহিনী বলল ভোলানাথ। তারপর বলল সেই ভদ্রলোকের কথা, যিনি গভীর রাতে মাঝ-স্টেশনে তাদের কামরায় উঠে পড়লেন, যাঁর বিরাট ফ্যাক্টরী আছে মাদ্রাজে, যাঁকে ডেকে বসালো কাছে, কথায় কথায় যাঁর আপন পরিচয় উদ্ঘাটিত হল, ভোলানাথও যাঁকে অকপটে গৃহত্যাগের কাহিনী জ্ঞাপন করল, চাকরির কথাটাও বাদ গেল না। তারপর বলল গ্র্যাজুয়েট জেনে কেমন ক'রে টেনে তাকে মাদ্রাজ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে নিজের ফ্যাক্টরীর একাউন্টেন্টের পদে বসিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, কেমন ক'রে সাইড্-বীজনেস্-এর সুযোগ করে দিলেন, কেমন ক'রে আশার অতিরিক্ত অর্থ তার রোজগার হতে লাগল।

তারপর বুক ফুলিয়ে বলল ভোলানাথ—বাড়িতে স্ত্রীর কাছে মাসে মাসে মোটা টাকা পাঠানো এবং আমার যাবতীয় খরচা নির্বাহ করার পরও এই ছয় বছরে আমার এতগুলো টাকা জমেছে। আন্দাজ করুন তো কতো হ'তে পারে।

—তা কম হ'বে না। প্রায় এক স্যুটকেস।

ব'লে সুলোচন তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টিটা আরেকবার বুলিয়ে নিল স্যুটকেসটার

ওপর। সে দৃষ্টি যেন ফেরানো যায় না, লেগে থাকে, কিছুতেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসা যায় না। স্যুটকেসটাই তো মূল কারণ এই অকারণ ঘনিষ্ঠতার। স্যুটকেসটাই তো তাকে অনেক সময় নষ্ট করিয়ে দোকানের ভেতর বন্ধ ক'রে রেখেছিল। বটের আঠার মতো লেগে আছে যেন সে ওই স্যুটকেসটার ভেতরে বাইরে? ছাড়ালেও ছাড়ানো যায় না। ওটা হস্তগত না করা পর্যন্ত তার ছুটি নেই। আবার ভাবে সুলোচন—ভদ্রলোক বড্ড সরল;—অকপটে ঘরের নিভৃত কোণের কথাটি পর্যন্ত—স্ত্রীর সঙ্গে একান্ত গোপনীয় আচরণটি পর্যন্ত ব্যক্ত করল একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে। যার অর্থার্জনের শেষ কথাটি পর্যন্ত তাকে নিঃসংশয়ে জ্ঞাপন করেছে,—তার সেই অর্থটাই সে আত্মসাৎ করবে। ভদ্রলোক সম্বন্ধে তার মনের ভাবটা একটুখানি কোমল হয়ে আসতে আসতে ভাবনাটা উল্টে যায় আবার—অতো সব ভাবলে তাদেরই-বা চলে কী ক'রে। পরের ধন লুঠ করেই তো তাদের জীবিকা। এখানেও দুর্বল হ'লে চলবে না। এ টাকা তারই। দেখাই যাক্ না—যেমন ঢিলেঢালা লোক—তেমন কঠিনও হ'বে না কাজটা।

সুলোচনকে অন্যমনস্ক দেখে ভোলানাথ বলল—কী এতো ভাবছেন, মশাই?

সুলোচন থতমত খেয়ে বলল—ভাবছিলাম যে, একেই বলে ভাগ্যের খেলা।

—তবে? এখন বিশ্বাস হ'ল তো?

—তা' হ'ল। আপনি যাবেন কোথায়?

—খুলনা।

—খুলনা? তা ভালই হ'ল। একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমিও খুলনাই যাব।----

—বাঃ, কী চমৎকার! ভাবছিলাম—এতোখানি রাস্তা একলা যেতে হবে। —তা আপনার মতো একজন সঙ্গী পাওয়া গেল, ভালোই হ'ল। দাঁড়ান, টিকিটটা ক'রে নিয়ে আসি। ব'লেই সুলোচনকে কোনো কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই একরকম ছুটে চ'লে গেল স্টেশনের দিকে।

সুলোচন যেন জানতো—এ ধরণের একটা সহজ সুযোগ অপেক্ষা করছে তার জন্যে। এবার সব গুটিয়ে নিয়ে রওনা দিলেই হ'ল। কোনো সাক্ষী নেই—হৈ-চৈ নেই—নীরবেই কাজ হাসিল। ভদ্রলোক এতক্ষণ যে ভাগ্যের বড়াই ক'রে আসছিলেন, তার চেয়ে তার নিজের ভাগ্য কি অনেক বেশি সুপ্রসন্ন নয়। ভাগ্যের প্রসন্ন হওয়ার ওপর তাদেরও তো নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। কিন্তু ভদ্রলোক কী বোকা, কী সরল। সামান্য কতক্ষণের পরিচয় মাত্র। এক স্যুটকেশ টাকা তার জিম্মায় রেখে চলে গেল। এ অবস্থায় সাধুও তো চোর হয়ে ওঠে। সরল লোকগুলোই ঠকে বেশি। ঘুণাক্ষরেও যদি জানতে পারতো সে তার আসল পরিচয়! আহা, ভদ্রলোকের এতো আশা আর সঙ্কল্পের অর্থে ছাই পড়তে আর মুহূর্তও বিলম্ব নেই! আহা বেচারী!

সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে রেস্টুরেণ্টের বিল নিজ পকেট থেকেই মিটিয়ে দিল সুলোচন শুধু রেস্টুরেণ্টওয়ালা পথ না আগলায়,—এই জন্যে।

কিন্তু এর মধ্যেই ভোলানাথ টিকিট কিনে ফিরে এলো। বলল—এই নিন মশাই, আপনার টিকিট। ভিড় ছিল না মোটেই,—যাওয়ামাত্রই হয়ে গেল।---ওহে, দেখি তোমাদের বিলটা নিয়ে এসো তো।

সুলোচন মুখ মিষ্টি-মিষ্টি ক'রে বলল—বিল আমি চুকিয়ে দিয়েছি।

—কেন? এ ভারী অন্যায় আপনার। কতো? এই নিন। ব'লে পকেটে হাত দিল ভোলানাথ।

—ঐ দেখ, আপনি এতো পর পর ভাবছেন কেন মশায়? আপনি আমার টিকিটটা ক'রে আনতে পারলেন, আর আমি এই সামান্য টিফিনের খরচাটা দিতে পারব না? নিন, উঠুন, চলুন স্টেশনের দিকে যাওয়া যাক। গাড়ীর আর বেশি দেরী নেই।

তল্পিতল্পা দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে স্টেশন মুখে রওনা দিল তারা।

সুলোচনের এখন নিজের মাংস নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে করছে। কী সুবর্ণ সুযোগটা হারালো—এমন সুযোগ কি আর আসবে। কেন সে এতসব আকাশ-পাতাল ভাবতে গেল! যার যেমন পেশা, তেমনটি কাজ করলেই তো হয়ে যেতো। আসল উদ্দেশ্যের একবিন্দুও কিছু হ'ল না,—তার ওপর রেস্টুরেণ্টের খরচা বাবদ নগদ আড়াইটি টাকা গাঁট-গচ্চা গেল। কিন্তু তবু একদম দমে গেল না সুলোচন। হাল ছাড়াব পাত্র নয় সুলোচন শর্মা। খুলনা অবধি তো সঙ্গে সঙ্গে আছেই। দেখাই যাক না। হাতছাড়া হবার ভয় নেই। ঐ স্যুটকেস শুদ্ধো টাকা যে তারই, তা'তে সন্দেহ করবে কোন্ আহাম্মক! ট্রেনে যেতে যেতে ভদ্রলোক একসময় ঘুমিয়ে পড়বেনই। তারপর স্যুটকেসটা নিয়ে কোনো জায়গায় নেমে পড়লেই হ'বে।

কিন্তু সারাটা রাত কারো চোখেই ঘুম নেই। ভোলানাথ অনর্গল বকে যেতে লাগল,—আপন ভূত-ভবিষ্যতের কথা—নূতন কর্ম-পরিকল্পনার কথা—মনের সঙ্কল্পের কথা,—স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসার কথা—আকর্ষণ-বিকর্ষণের কথা। সুলোচন অস্থিরচিত্তে 'হুঁ' 'হুঁ' ক'রে যেতে লাগল এবং মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ার ভাণ করতে লাগল,—যাতে শ্রোতার অভাবে নিরুৎসাহ হয়ে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু হা হতোস্মি। সে নিজে তো ঘুমোবেই না, সুলোচনকেও ঘুমোতে দেবে না ব'লে ঠিক করেছে যেন।

সুলোচনকে চুপ ক'রে থাকতে দেখলেই ব'লে ওঠে—ও মশাই, ঘুমোলেন নাকি?—একটা রাত বৈ তো নয়, এর পর তো ছাড়াছাড়ি—কে কোথায় ছিটকে পড়বো ঠিক নেই; কারো সঙ্গে কারো জীবনে আর সাক্ষাৎ না-ও

ঘটতে পারে। ইত্যাদি আরো অনেক প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক কথা। অর্থাৎ সুলোচনের আশা আর পরিকল্পনার মুখে এক উনুন ছাই ঢেলে দিয়ে সমস্তটা রাস্তা জেগে বসে রইল ভোলানাথ।

৲

দুপুরের কিছু পরে গিয়ে পৌঁছল নৈন প্লন্দ স্টেশন। ভোলানাথ অনেক অনুরোধ, অনেক টানাটানি করল সুলোচনকে তাদের বাড়িতে নেবে। কিন্তু সুলোচন ঐ-টাকাটা হস্তগত করবার জন্য প্যাঁচ কষেছে; তাই কাল্পনিক আত্মীয়ের বাড়ি যাবার গুরুত্ব সম্বন্ধে ভোলানাথের বিশ্বাস উদ্রেক করে এবং কলকাতায় ফিরবার আগে অবশ্যই দেখা ক'রে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভোলানাথের বাড়ির ঠিকানা এবং রাস্তাঘাটের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে সুলোচন অন্য রাস্তায় চলে গেল। ভোলানাথও একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

সময় কাটাবার জন্য সুলোচন রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল; মনের ভেতর তার সেই মোক্ষম পরিকল্পনাটা খেলে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যা হওয়ার শুধু অপেক্ষা। একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পেটভরে কিছু খেয়ে নিল সুলোচন;—রাত্রে পেটে খাদ্যাদি পড়বার সম্ভাবনা নেই।

এমনি ক'রে সময় ক্ষেপণ ক'রে ক'রে সূর্যদেবকে পাটে বসালো সুলোচন,—পশ্চিমদিক তখন লালে লাল হয়ে উঠেছে। তার পরিকল্পনাটাও কল্পনার রঙে লাল হয়ে উঠল। সে এবার ভোলানাথের বাড়ির রাস্তা ধরল। ভোলানাথের দেওয়া নির্দেশ মিলিয়ে মিলিয়ে সে অভীষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেল। হ্যাঁ, ঠিক এটাই ভোলানাথের বাড়ি। এখান থেকেই পদ্মার তীরটা ঢালু হয়ে গেছে। এটাই সেই জোড়া বট-অশ্বত্থ, তার পাশেই নানান্ গাছ-গাছড়ায় ঘেরা এই মাটির একতলা কোঠা ঘর, পুবে-উত্তরে ওগুলো কারবার বাড়ি যেন। বাঃ চমৎকার বাড়ি তো! চারধারে! সুনিবিড়! কয়েক গাছের আড়ালেই পদ্মা! বাঃ খাসা! ভাগ্যবান ভোলানাথ!

সুলোচন এবার সন্তর্পণে বাড়ীর আঙিনায় ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আত্মগোপনের অসুবিধে নেই। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে লণ্ঠনের মিটমিটে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। এ বাড়িটাই তো ভোলানাথের? নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে বাড়ির পাশের কলাগাছের ঝাড়ের আড়াল থেকে জানালা গলিয়ে দৃষ্টিটা ঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করল সুলোচন। ঐ তো দেখা যাচ্ছে ভোলানাথকে! ওদিকে সম্ভবত রান্নাঘর হবে,—স্ত্রীর পেছন পেছন ঘুরঘুর করছে ভোলানাথ! বাড়িতে অন্য লোকজন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ভোলানাথের অনুমানলগ্নে শ্বশুরের যে লোকজন পাহারায় থাকতো—ভোলানাথের আগমন হেতু তারা আজ বিদায় নিয়েছে।

বাড়ির অধিবাসীদ্বয় ওদিকে রান্নাঘরে ব্যস্ত। এই ফাঁকে ঘরে ঢুকে পালঙ্কের পাশের ঐ আলমারীটার পেছনে লুকিয়ে থাকলেই তো ভাল হয়,—সেখান থেকে এ-ঘর সে-ঘরের সমস্ত কিছু লক্ষ্যও করা যাবে। বৃথা চিন্তায় সুযোগের অপব্যয় হবে আর সে করবে না। যেমন চিন্তা তেমন কাজ করল—আস্তে আস্তে ঢুকে সেই আলমারীটার পেছনে লুকিয়ে পড়ল সুলোচন। চকেই কিন্তু তার সন্ধানী-দৃষ্টি টাকাভর্তি স্যুটকেসটা খুঁজে বেড়াচ্ছে—আবছা-আলোয় সবকিছু ভালরকম দেখাও যাচ্ছে না। কোথায় সেটা? এসেই কি সেটা এই আলমারীর গহ্বরে ঢুকিয়ে ফেলেছে! এতো আলাভোলা স্বভাব ভোলানাথ বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এতো সাবধান হয়ে গেল তার সমস্ত অভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেবার জন্যে! তার স্ত্রীও সেটা দেখেশুনে রাখতে পারে। স্ত্রীরা পুরুষের তুলনায় একটু বেশি হিসেবী। তা হ'লে তো আবার আলমারীর তালা ভাঙতে হবে!

ওঃ, কেন যে সে চায়ের দোকানে সেই সহজ সুযোগটা নিল না! হঠাৎ চোখ দুটি তার আনন্দে এবং উত্তেজনায় জ্বলজ্বল ক'রে উঠল—তার ঈপ্সিত ধন তারই গায়ের কাছে—আলমারীর মাথার উপরে—যেটার পেছনে সে আত্মগোপন করে আছে। খুশির প্রাবল্যে সে তক্ষুণি সেটা নিয়ে চম্পট দেবার কথা ভাবছিল, আর ঠিক সে সময়েই ভোলানাথ ওদিক থেকে এদিকে এসে ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে খিল লাগিয়ে দিল।

রাতের অন্ধকার একটুখানি ঘনীভূত

রয়েছে বলে হয়ত, কীটপতঙ্গ সরীসৃপাদির গৃহপ্রবেশের আশঙ্কায় ; নইলে মানুষের ভয় এদের আছে বলে তো মনে হয় না ; চোরের উপদ্রবও হয়ত নেই। পেটের অন্ন থাকলে চুরি করে কে! সত্যি ভাগ্যবান এরা। দরজাটা দিয়েই ভোলানাথ আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। ততক্ষণে পিঁড়ি পাতা হয়ে গেছে ; পাশে বাটি-ঢাকা গ্লাসে জল ; গৃহিণী ভাতের-থালা-হাতে দাঁড়িয়ে। ভোলানাথ বসে পড়ল। অন্ন পরিবেশিত হ'ল, থালার চারিদিকে গোটা-কয়েক বাটিই সাজানো হয়েছে। বেশ চতুর তো বৌটি। এরই মধ্যে এতো সব রান্না ক'রে ফেলেছে। রান্না-করা উপাদেয়ের উৎকৃষ্ট গন্ধ তার নাকেও কিছু এসে পৌঁছাচ্ছিল।

—তুমিও বসে গেলে পারতে। বলল ভোলানাথ স্ত্রীকে।

—মেয়েদের আগে খেতে নেই। স্ত্রী বলল।

বা:, পতিব্রতা-স্ত্রীরই কথা। শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল সুলোচন। সুলোচন আবার তার স্বপ্নলীন কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ভোলানাথের তো খাওয়া হয়ে গেল ব'লে ; তারপর স্ত্রীর খাওয়া ; তা আর কতোক্ষণ লাগবে। ছ'বছর পরে স্বামিসঙ্গ লাভের আনন্দে খাওয়া-পর্ব যেমন-তেমন করে সেরে তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়তে বড় জোর আধঘণ্টা। তারপরই তো তার স্বর্গদ্বার খোলা।

ভোলানাথের খাওয়া শেষ। মুখ ধুয়ে এবার এ ঘরের দিকে আসছে। এসেই কমিয়ে-রাখা লণ্ঠনটার সল্‌তেটা একটু উস্কিয়ে বাড়িয়ে দিল ; বসল এসে শাদা ধবধবে বিছানাপাতা-পালঙ্কের ওপর। স্ত্রী একটা রেকাবীতে ক'রে পান সাজিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ালো স্বামীর সামনে। বা:, চমৎকার তো দেখতে বৌটি। এতোক্ষণ দূর থেকে লণ্ঠনের আলোতে যাকে মাত্র সুন্দরী ব'লে মনে হয়েছিল, তিনি তো সত্যি অপরূপা। আয়ত নেত্র নিটোল। স্বর্গের অপ্সরাদের কথা শুনেছে সে, যে অপ্সরীরা এর চেয়ে সুন্দরী রূপসী ন'ন ব'লে অনুমান হয় সুলোচনের। এমন বৌ ছেড়ে ছয় ছয়টি বছর বিদেশে পড়ে থাকতে পারল ভোলানাথ। হতভাগা। স্ত্রীর হাতের রেকাবী থেকে পান তুলে মুখে দিল ভোলানাথ।

চিবুতে চিবুতে বলল—আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পাচ্ছে,—তিন রাত ট্রেনে কেটেছে—শরীরও ক্লান্ত। তোমার কি দেরি হ'বে খুব ?

—একদম না। ওদিকের কাজগুলো সেরে আসতে যেটুকুন সময় লাগবে তার বেশি একদণ্ডও নয়।

—না, না, ওসব কাজকর্ম ফেলে রাখ, ঘুমে চোখ আমার জড়িয়ে আসছে। ব'লে অমনি জড়িয়ে ধরে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল স্ত্রীকে। তারপর চুম্বনে-চুম্বনে ছেয়ে দিল তার আরক্তিম মুখমণ্ডল। দীর্ঘ ছয় বছর পরে দেখা। কামনার অতিরেকে লুব্ধ হয়ে উঠেছে ভোলানাথ।

স্ত্রীর কিন্তু প্রাণপণ প্রচেষ্টা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার—ও কি, ও কি করছ! ছাড়, ছাড় না। আমি খাওয়া-দাওয়া করব না ?

শেষ পর্যন্ত ভোলানাথের দানবীয় বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হলো সে।—আসছি, খেয়েই আসছি। ব'লে চোখে-মুখে প্রহেলিকার হাসি টেনে আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো সে।

ভোলানাথ কণ্ঠটাকে একটুখানি প্রেমের কোমল আবেগে ভিজিয়ে নিয়ে বলল—দেরী কোরো না কিন্তু। ব'লে প্রেয়সীর ছন্দিত-গমনপথের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আলমারীর মাথার ওপর থেকে সেই চামড়ার স্যুটকেসটা টেনে নামালো।

সুলোচনের বুকের ওপর একটা হাতুড়ির প্রচণ্ড ঘা পড়ল। টাকাগুলো এবার নিশ্চয়ই আলমারীতে তুলে রাখবে। যা:, বাঁচা গেল। ভোলানাথ স্যুটকেস খ'লে স্ত্রীর-জন্যে-কেনা শাড়ী-ব্লাউজগুলোই বের করল শুধু। টাকাগুলোর দিকে তাকালোও না। তারপর এক-একটা শাড়ির সঙ্গে এক-একটা ব্লাউজ ম্যাচ্ করিয়ে রান্নাঘরের দিকে একেকবার তাকাতে লাগল, অর্থাৎ স্ত্রী এগুলো পরলে কী রকম দেখতে লাগবে, তা পরখ ক'রে দেখছে—; আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে ও গর্বে সমগ্র মুখমণ্ডল তার একটা পুলক-দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। তারপর সেগুলোকে আবার স্যুটকেসে বন্ধ ক'রে পুনর্বার আলমারীর মাথায় স্যুটকেসটা তুলে রাখতে-রাখতে ব'লে উঠল—কৈ, হলো তোমার ?

—এই হয়ে এলো। রান্নাঘর থেকে উত্তর ভেসে এলো।

হয়ে এলো, অর্থাৎ বিলম্ব খুব সামান্যই। সুতরাং শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েই প্রতীক্ষা করতে লাগল ভোলানাথ তার আগমনের। কিন্তু গৃহপালিত মশককুল ছয় বছর পরে হলেও মুনিবকে চিনতে পারার যে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল, তা'তে মশারীটা ফেলে দেওয়া ছাড়া ভোলানাথের আর গত্যন্তর রইল না।

●

এদিকে সুলোচনের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো আনন্দে ; তার সুযোগ ঘনিয়ে আসছে, তাই। ভোলানাথের স্ত্রী এই এসে পড়লো বলে। খাওয়া-দাওয়া কি আর মুখে ঢুকছে! ছয় বছর পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা। এতক্ষণে মুখ ধোয়া হয়ে গেছে তার। সুলোচন রুদ্ধনিঃশ্বাসে মুহূর্ত গুণতে লাগল। এদিকে ভোলানাথের নাসিকা-গর্জন শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। অস্বাভাবিক নয়। তিন রাত্রির অনিদ্রা। —তজ্জনিত দৈহিক ক্লান্তিও! এই ক্লান্তির নিদ্রা ভদ্রমহিলা এক্ষুণি এসে ভেঙ্গে দেবেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা এখনো আসছেন না কেন ? আনন্দে কি ভাত কিছু বেশি খাচ্ছেন ? না কি রান্নাঘরের কাজ সব আজকের দিনেও শেষ না ক'রে আসতে পারছেন না! ছ' বছর পরে স্বামী-সঙ্গলাভের কাঙ্ক্ষিত-শুভক্ষণে

রাতিরেও কি ওসব কাজকর্ম তোলা থাকতে পারে না কাল সকাল পর্যন্ত! আশ্চর্য!

সুলোচন মনে মনে ভদ্রমহিলার ওপর চ'টে যাচ্ছে,—কী বেরসিক বৌ এটা। আর কতক্ষণ অন্ধকারে আলমারীর পেছনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাবে। সযত্নে আল্‌তো-হাতে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া মারারও উপায় নেই। উঃ কী অমানুষিক শাস্তি! ধৈর্যহারা হয়ে উঠল সুলোচন। রান্না-ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখল সুলো-চন—দেখল—ভদ্রমহিলা রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে মেঝের ওপর দাগ কাট-ছেন কাঠি দিয়ে। কিসের হিসেব মেলাবার চেষ্টা করছেন তিনিই জানেন; আজকের দিনেই যেন সব হিসেব মিলিয়ে তবে তার আগুতে হ'বে। বিচিত্র বটে। উঠে বিছানায় আসার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না তার। মাঝে মাঝে এদিকপানে তাকাচ্ছে—তারপর যেন আরো চঞ্চল হাতে দাগ কেটে চলেছে।

সুলোচনের একবার ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে ভদ্রমহিলার দু'গালে দুটো কষে চড় লাগিয়ে দিয়ে কান ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনে স্বামীর মশারীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। রাত-দুপুরে ছাড়া রসিকতা করার আর সময় পেলে না! এই তার স্বামীভক্তি! পতিপ্রেম! এই তার সুদীর্ঘ বিরহান্তে মিলন-প্রতীক্ষা! যথেষ্ট উত্তেজিত হ'য়ে উঠল সুলোচন।

ভদ্রমহিলা তেমনি দাগ কেটে চলেছেন মেঝের ওপরে। রাত অনেক হ'বে হয়ত। সারা বিশ্ব নিস্তব্ধ নিঝুম! শুধু নিশাচর পাখির পাখা-ঝাপটানির শব্দ শোনা যায় মাঝে মাঝে—কোথাও বা কোনো কুকুরের চীৎকার। পদ্মায় বোধ হয় জোয়ার এসেছে—একটা একটানা শোঁ-শোঁ-শব্দ কানে এসে লাগছে। দুপুর-রাত আতক্রান্ত হয়েছে কি? না হলেও তার বেশি বিলম্ব নেই। পল্লী-অঞ্চল ব'লে নিস্তব্ধতাটা আরো গভীর মনে হচ্ছে।

সুলোচনের গাটা কেমন ছম্‌ছম্ ক'রে উঠল—এমন ভয়ঙ্করী রজনীর মুখোমুখি দাঁড়ায় নি সে কোনোদিন। কিন্তু ভদ্রমহিলার এ কী-আচরণ,—দাগ কেটেই চলেছে সে।

●

হঠাৎ দরজায় টোকা হ'ল তিনটে—গুণে-গুণে তিনটে। স্তব্ধ হয়ে গেল সুলোচন। এ কিসের সংকেত। আর অমনি ভদ্রমহিলা ত্বরিতপদে এসে সন্তর্পণে খুলে দিলেন দরজাটা। সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল একটি লোক—হাতে তার উন্মুক্ত তরবারি—লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতেও ঝক্ ঝক্ করছে। ভদ্র-মহিলা ভোলানাথের পালঙ্কের মশারিটা নিজ-হাতেই তু'লে দিয়ে ত্বরিতপদে চলে গেলো আবার রান্নাঘরের দিকে। লোকটা

এক-পা দু-পা ক'রে এগিয়ে আসতে লাগল শয্যাগত—ভোলানাথের দিকে।

বাঃ, চমৎকার নাটক তো! সুলোচনও আস্তে আস্তে আলমারীর পেছন থেকে বেরিয়ে লোকটির পেছন পেছন এগোতে লাগল। লোকটি এবার নিদ্রিত ভোলানাথের গলা লক্ষ্য ক'রে তরবারি তুলল দুই হাতে,—আর অমনি পেছন দিক থেকে সুলোচন সজোরে জড়িয়ে ধরল লোকটিকে। ব্যাপারটা আকস্মিক ব'লেই হয়ত তরবারিটা ছিটকে পড়ে গেল লোকটার হাত থেকে। তারপর ধস্তাধস্তি—মল্লযুদ্ধ, পালঙ্কেও আলোড়ন—ভোলানাথের নিদ্রাভঙ্গ!

চমকে লাফিয়ে উঠে বসল ভোলানাথ। যুধ্যমান দুই ব্যক্তিকে দেখে স্তম্ভিত ভোলানাথ দু-তিনবার দুই হাতে চোখ রগড়িয়েও কিছুতেই ঠিক ক'রে উঠতে পারছে না—সে কি এখনো কোনো স্বপ্নে এই অভিনব নাটকীয় দৃশ্য দেখছে,—না কি সত্যি তারই শয়নকক্ষে এই অভিনব নাটক অভিনীত হচ্ছে। সুলোচনই বা কখন এ ঘরে ঢুকল,—ও লোকটাই বা কে এবং কখন কেমন ক'রে ঢুকল। সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্নীয় অবাস্তবতা—তাকে বাক্‌রুদ্ধ ক'রে রাখল।

সুলোচন ততক্ষণে লোকটাকে ঘায়েল করতে সমর্থ হয়েছে এবং তারই পরণের কাপড় দিয়ে হাত-পা বেঁধে তারই তরবারি হাতে নিয়ে বলল—তোরই খড়্গ দিয়ে তোর গর্দান নেব হারামজাদা। ভেবেছিলে—ভোলানাথকে কেটে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না—সে যে ফিরেছে তার সাক্ষী নেই; তোমাদের স্বর্গের পথের কাঁটা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কেমন?

নেপথ্যে ভোলানাথের রূপবতী স্ত্রী হয়ত ততক্ষণে নিজহাতে টেনে টেনে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করছে।

বিস্মিত এবং বাক্‌রহিত ভোলানাথকে বলল সুলোচন—ওরে বাবা রে,—তোমাদের পাড়াগাঁয়ে তো দেখছি আমাদের চেয়েও বড়ো পকেটমার আছে! এদের তুলনায় আমরা তো শিশু! ব'লে সুলোচন তার অভিযানের আদ্যোপান্ত কাহিনী বলল।—তোমার ঐ টাকাভর্তি স্যুটকেসটা হাত করার জন্যেই কলকাতা থেকে এ পর্যন্ত ধাওয়া করেছি; —কিন্তু এ ব্যাটা তো দেখছি আমিকবে শুদ্ধো প্রায়েব করতে এসেছিল। ব'লে সন্ধ্যা থেকে এখানে অভিনীত নাটকের দৃশ্যগুলোও সে একে একে তুলে ধরল।

ভোলানাথ এতক্ষণে ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। বলল—তুমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু! তোমার মনে যে-অভিসন্ধিই থাকুক না কেন,—আমি তার বিন্দু-বিসর্গও জানি নে; শুরু থেকে-শেষ পর্যন্ত তোমার যে পরিচয় আমি পেয়েছি—তার সবটুকুন তো বন্ধুত্বেরই। আর এই শেষ মুহূর্তে তুমিই আমার প্রাণরক্ষা ক'রে অদ্বিতীয় বন্ধুত্বের পরিচয় দিলে। তাই এই বাক্সভর্তি টাকা তোমাকেই আমি উপহার দিলাম অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ। শুধু কাশী-যাবার-ভাড়াটা আমায় ভিক্ষা হিসেবে দিও।—আর, ঐ লোকটাকে ছেড়ে দাও—ওর কোনো দোষ নেই; —ও ওই পদ্মার নাগিনীর খোজা মাত্র। —চল, বেরিয়ে পড়ি। এখানে আর একমুহূর্তও নয়।

দুই বন্ধু হাত-ধরাধরি ক'রে রাত্রির সেই অজ্ঞাত প্রহরে কাশীর উদ্দেশেই হয়ত পা বাড়ালো।'

কোথায় কি

গৌর মোদক

শিয়ালদায় ভাই শিয়ালের আড্ডা,
সত্যি জেনো তুমি, নয় কোন ঠাট্টা।
বেহালায় পাওয়া যায়, সস্তায় বেহালা,
আরো তুমি পাবে চা, আনায় তিন পেয়ালা।
কলা সস্তা কলাবাগানে, টাকায় শো চারশো,
আর মুরগীহাটায় পাবে মুরগীর মাংস।
আরামও কিনতে পারো তুমি, আরামবাগে,
যদি না বাগবাজারের বাঘগুলো রাগে।
নারিকেলডাঙায় নাকি নারকেল সস্তা,
পরসাতেও পাওয়া যায় দু-চার বস্তা।
আর শোন, তোমাকে করে দেই সাবধান,
ভুলেও কখন তুমি যেও না চোরবাগান।
চোর আর গুন্ডা সেখানে, ঘুরছে দিনরাত,
পকেটটি মেরে দিয়ে করে তারা বাজিমাৎ।
যাই হোক বাজারটা সস্তায়, যদি চাও সারতে,
শোন ভাই মোর কথা, এস নাকো মারতে।

দেশের কিছুসংখ্যক ভদ্রলোক হঠাৎ যত্রতত্র পুঁজিবাদের ভূত দেখতে শুরু করেছেন। ব্যাপারটা আরো মর্মান্তিক এই জন্য যে ভূত তাঁরা নিজেরা দেখেন নি। তাঁদের কান ধরে ভূত দেখান হয়েছে।

একদিন একটি বিদেশী বেতারে হঠাৎ ঘোষণা করা হ'ল—সাবধান, ও বাড়ীতে ভূত আছে! আর অমনি এ দেশের কিছু ভদ্রলোক ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেলেন।

এঁদের আর্ত চিৎকার শুনে আমরা জানতে পারলাম, সোভিয়েট ইউনিয়নের কাঁধে নাকি পুঁজিবাদের ভূত চেপেছে। অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবর্তনের সূচনা হয়েছে এবং সোভিয়েটের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যেই নাকি সেই সূচনার ইঙ্গিত রয়েছে।

আপনি যদি প্রমাণ চান তাহলে চিৎকার শুনবেন—মুনাফা, মুনাফা, মুনাফা। অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পসংস্থাগুলির মুনাফা সর্বাধিক করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর যেহেতু এদের মতে মুনাফা হ'ল একমাত্র পুঁজিবাদেরই লক্ষণ আর যেহেতু সোভিয়েট ইউনিয়নে এই লক্ষণটি বেশ প্রকট, অতএব সেখানে পুঁজিবাদের প্রবর্তন হ'তে চলেছে।

শব্দমন্ত্রে যাঁরা বিশ্ববিপ্লব ঘটাতে চাইছেন তাঁরা কি এ কথা জানেন না যে পুঁজিবাদই শুধু মুনাফার জন্ম দেয় না, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও মুনাফার অস্তিত্ব থাকতে পারে?

অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ যেমনই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই মুনাফার সৃষ্টি হয় উদ্‌বৃত্ত মূল্য (Surplus Value) থেকে। শ্রমিক যেটুকু মূল্য (Value) মজুরী হিসাবে পায় তার চেয়ে বেশী মূল্য সে উৎপাদন করে। শ্রমশক্তি যে মোট মূল্য উৎপাদন করে এবং তার বিনিময়ে শ্রমিককে তার শ্রমশক্তি ব্যবহারের জন্য যতটুকু মূল্য মজুরী হিসাবে দেওয়া হয়, এই দুইয়ের পার্থক্যই হল মার্ক্সের ভাষায় উদ্‌বৃত্ত মূল্য বা Surplus Value.

মনে করুন, কোন দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোট ১০০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে এই মোট মূল্যের মধ্যে রয়েছে (ক) যে সব যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তার মূল্য, (খ) সেই নির্দিষ্ট সময়ে যতটুকু শ্রমশক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে

ভবানীশংকর ভট্টাচার্য

তার মূল্য বা মজুরী এবং (গ) উদ্‌বৃত্ত মূল্য। তার মানে মোট মূলধনের উপর

মুনাফার হার হবে $\frac{(গ)}{(ক)+(খ)}$

(গ) বেশী হ'লে মুনাফার হার বেড়ে যাবে আর (গ) কম হ'লে মুনাফার হার কমবে। মোদ্দা কথা, উদ্‌বৃত্ত মূল্যই হ'ল মুনাফার উৎস।

এখন জেনে রাখা ভালো যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও একইভাবে উদ্‌বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয়। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান শ্রমিককে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের ক্ষমতা দিয়েছে। এই অতিরিক্ত উৎপাদনের মূল্যই উদ্‌বৃত্ত মূল্য যা পুঁজিবাদী সমাজে যায় পুঁজিপতির পকেটে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে যায় রাষ্ট্রীয় তহবিলে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও শ্রমিকদের উদ্‌বৃত্ত মূল্য বঞ্চিত থেকে করা কি শোষণের নামান্তর নয়?

জবাবে বলব, না। উদ্‌বৃত্ত মূল্য শ্রমিকের পকেটে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তারই নিরিখে কোন সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ আছে কি নেই তার বিচার করতে গেলে ভুল হবে। পুঁজিবাদী সমাজে শোষণ আছে কারণ সেখানে উদ্‌বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে একটি বিশেষ শ্রেণী—যার স্বার্থে সেই উদ্‌বৃত্ত মূল্যকে ব্যবহার করা হয়। এই উদ্‌বৃত্ত মূল্যের মালিকানা থেকেই আসে নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য এবং শ্রমিককে আরো বেশীমাত্রায় শোষণ ক'রে আরো বেশী উদ্‌বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার ক্ষমতা—যার অনিবার্য পরিণতি অর্থনৈতিক সঙ্কট।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর ঠিক বিপরীত চিত্রটিই দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে উদ্‌বৃত্ত মূল্যের মালিকানা কোন ব্যক্তির নয়, রাষ্ট্রের। যেহেতু সেখানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে অতএব সেখানে উদ্‌বৃত্ত মূল্যের ব্যবহার হয় শ্রমিক-শ্রেণীরই স্বার্থে। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় কাঠামোতেই ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের (Investment) জন্য মূলধন গঠনের প্রধান উপকরণ উদ্‌বৃত্ত মূল্য।

পুঁজিবাদী সমাজের চরিত্র অনুযায়ী এই মূলধন বিনিয়োগ করা হয় মালিক শ্রেণীর স্বার্থকে আরো পুষ্ট করার তাগিদে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই মূলধন বিনিয়োগ করা হয় শ্রমিক-শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থের দিকে নজর

খে। শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে যেখানে ট্র পরিচালিত হয় সেখানে এমন ওয়াটাই স্বাভাবিক।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন কৌশলগত মিল থাকলেও মৌলিক মিল রয়েছে উৎপাদন সম্পর্কের ধ্যে। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে প্রভেদ আসলে উৎপাদন সম্পর্কগত (Production relation) উৎপাদন কৌশলগত নয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য (উদ্‌বৃত্ত মূল্য) থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এমন কথা কেউ যেন না ভাবেন-কারণ রাষ্ট্র যেটুকু উদ্‌বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে সেটুকুও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর কল্যাণমূলক কাজেই ব্যয়িত হয়।

অতএব সোভিয়েট ইউনিয়নে মুনাফার অস্তিত্ব আছে বলে সেখানে পুঁজিবাদের পুনরুন্মেষ ঘটেছে এমন কথা মনে করে শঙ্কিত হবার কোন কারণ দেখছি না।

যাঁরা আমাকে সরবে বা নীরবে সংশোধনবাদী ইত্যাদি মধুর বিশেষণে অলঙ্কৃত করছেন তাঁরা এ কথা জানেন কি যে বিপ্লবের খলিফা মাও-এর দেশেও মুনাফার অস্তিত্ব আছে? সেখানেও যে শ্রমিকরা তাদের উৎপাদনের সম্পূর্ণ মূল্য মজুরী হিসাবে পায় না, সেখানেও যে উদ্‌বৃত্ত মূল্য রাষ্ট্রের পকেটে যায় এমন কথা তাঁরা কখনো শুনেছেন কি?

রাষ্ট্র যদি উদ্‌বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ না করে তাহলে ভবিষ্যৎ দক্ষযজ্ঞের আশায় যে বিশাল সশস্ত্র বাহিনী পোষণ করা হচ্ছে তার জীবনধারণের উপকরণ আসবে কোত্থেকে? আণবিক অস্ত্র উৎপাদনের ঘোড়দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার খেসারৎ দিতে যে সম্পদের অপচয় হচ্ছে তা আসবে কোথা থেকে?

এবার বলুন তো, সোভিয়েটের সাম্প্রতিক সংস্কার পরিকল্পনায় মুনাফা শব্দটি ব্যবহার করা কি সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার লক্ষণ? মুনাফা সর্বাধিক করার যে পরিকল্পনা সেখানে করা হয়েছে তাও শ্রমিকের মাথায় কাঠাল ভেঙে নয়। শিল্পের উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন শক্তি (Excess capacity) ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সেখানে মুনাফা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়। শ্রমিক-শ্রেণীর অধিক দক্ষতাই যেহেতু মুনাফা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ সেহেতু বর্ধিত মুনাফার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শ্রমিককে 'বোনাস' হিসাবে দেবার পরিকল্পনাও সেই সঙ্গে রয়েছে।

এর মধ্যে শোষণ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আরো হরেকরকম 'বাদে'র গন্ধ কেমন ক'রে পাওয়া যায় তা আমি ঠিক বুঝি না। এ জন্মের মত হয়ত আর বোঝা হ'ল না। আগামী জন্মে যদি সারমেয়-নাসা হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে পারি তাহ'লে দেশী-বিদেশী উঠতি বিপ্লবীদের নাকে নাক মিলিয়ে আমিও হয়ত সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদের গন্ধ আবিষ্কার করতে পারব। সেই আশা নিয়েই আমার এ মনুষ্য জন্মের জন্য ক্ষমা চাইছি।

কবির স্বর্গ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কবির স্বর্গ কবির সৃষ্টি
নয় সে সবার জন্য
তবু নিজে নিজেই সে ধন্য।
তুচ্ছের পানে তৃষিত দৃষ্টি
অন্যের কাছে সে অনাসৃষ্টি
হয়তো যা তার কমনীয়তম
কেহ তারে কয় বন্য!

কবির স্বর্গ কবির সৃষ্টি
শুধু রসিকেরি জন্য।
কবির প্রবাল প্রিয়ার অধরে
দশনে মুকুতা হাসিলেই ঝরে
হিরণ রূপের কিরণের কণা
মণি মাণিক্য রত্ন
দুগ্ধ-ধবল-শয়নে কি কাজ?

স্খলিতাঞ্চলে মুগ্ধ নিলাজ
ভূমিশয্যায় মৌন তাপস
চাহে না সুখের যত্ন।
কুসুম-কোরকে ভ্রমরের মত
সুন্দরে হয় বন্দী
কবির কাব্য সুস্বাদু রস
সতত সুধাস্যন্দী।
রূপের সাগরে রসের ডুবুরি
রতন মাণিক তোলে ভূরি ভূরি
তস্করে নারে করিতে সে চুরি
যে ধনে সে হয় ধন্য
অরসিক তারে যদি ধিক্কারে
রসিকেরা করে গণ্য
সে-রূপ-রতন অপরূপ ধন
শুধু রসিকেরি জন্য।

আন্তর্জাতিক স্পোর্টস-এ মোটর চালনা

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে এত রকমের খেলাধুলা রয়েছে যে সবগুলোর সাথে আমরা পুরোপুরি পরিচিত নই। অবশ্য সবরকম স্পোর্টস আর গেমসের সাথে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচিত হওয়া কোন ব্যক্তি হিসেবে তো নয়, এমন কি কোন দেশ হিসেবেও ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভবপর নয়।

যেমন ধরা যাক কার-রেসের কথা। যাকে পরিভাষায় বলা হয় মোটর চালনা প্রতিযোগিতা। এ রকম স্পোর্টস আর গেমসের সাথে আমরা প্রায় অপরিচিত বললেই চলে। অবশ্য আমাদের এই অপরিচিতের পিছনে কয়েকটা যুক্তিও আছে। আমাদের দেশে গাড়ী ব্যয়-বহুল ও বিলাসিতা। সুতরাং আমাদের মত দরিদ্র দেশে আমরা মোটর রেসের কথা এখনো ঠিক তেমনভাবে ভাবতেই পারি না। আর যে সব দেশের অধিবাসীদের মোটর গাড়ী নিত্য ব্যবহার্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারাই আজ মোটর রেসের জন্য দৈনন্দিন নতুন নতুন গাড়ী ব্যবহার করছে। তবে আমাদের দেশে যে মোটর রেস প্রতিযোগিতা না হয় তা না, কিন্তু তা অন্যান্য দেশের থেকে অনেকাংশে নিম্নস্তরের।

খুব সম্ভবত মোটর রেসের জন্মস্থান পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকায়, তবে বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকার সীমানা ছাড়িয়ে মোটর রেস প্রতিযোগিতা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আমেরিকা ও জার্মানীতে মোটর রেস প্রতিযোগিতা পুরোপুরি স্পোর্টস-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই মোটর রেস দেখে স্থানীয় দর্শকরা সবচেয়ে বেশী আনন্দ উপভোগ করেন।

বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকা ও জার্মানীতে মোটর রেস প্রতিযোগিতাকে ঘিরে চলে বৃহৎ আকারের গবেষণা এবং এই গবেষণার জন্য পৃথক পৃথক গবেষণা কেন্দ্রও আছে। গবেষণার ফলাফলকে ঘিরে সুরু হয় মহা সোরগোল, উৎসাহ ও উদ্দীপনা। যে সব ব্যক্তি মোটর রেসের গবেষণা নিয়ে মত্ত থাকেন তাঁরা সকলেই এক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দক্ষ মোটর-চালক।

এখন কথা হচ্ছে, মোটরগাড়ীকে নিয়ে এত কি গবেষণা যাকে কেন্দ্র করে এত কৌতূহল। হ্যাঁ সত্যিই গবেষণা—যেমন ধরা যাক—কি করে গাড়ীর আকার আয়তনে ছোট-বড় করা যায়, গাড়ী কিভাবে দ্রুত থেকে আরো দ্রুতগতিতে চালান যায় এবং এর জন্য কি ধরণের ইঞ্জিন ও কত অশ্বশক্তি চালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশ, ত্রিশ না ষাট অশ্বশক্তি চালিত ইঞ্জিন। হাঁ, তবে একটা কথা, সাধারণত স্পোর্টস কারের ইঞ্জিন একশ' অশ্বশক্তি চালিত ইঞ্জিনের কম হয় না। এখন পর্যন্ত যতদূর আমার জানা আছে স্পোর্টস কার দু'শ অশ্বশক্তি চালিত পর্যন্ত হয়েছে। এ সব গবেষণার সাথে সাথে চলতে থাকে গাড়ীর চালক আর আরোহীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। গাড়ীতে বসে থাকাকালীন চালক ও আরোহীরা কতটুকু করে জায়গা পাবেন, গাড়ীতে কতজন আরোহী থাকবে, কিভাবে তাঁরা গাড়ীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে গাড়ীর প্রবল গতি আর চালক ও আরোহীদের আরামের গবেষণাই প্রধান।

হয়তো দেখা যায় গাড়ীর চালক নিজেই গাড়ীর মেকার বা প্রস্তুতকারক, নিজেই ইঞ্জিনীয়ার ও টেকনিশিয়ান। দিন-রাত তাঁর ভাবনা চিন্তা কিভাবে গাড়ীর গতি আরো বাড়ান যায়। কোন যন্ত্রের জন্য গাড়ির গতি কমছে, কোন যন্ত্রের ব্যবহারে গাড়ীর গতি বাড়বে, এই তাঁর লক্ষ্য। এই তাঁর স্বপ্ন।

প্রত্যেক দেশ তাঁদের শ্রেষ্ঠ চালক ও শ্রেষ্ঠ গাড়ী আন্তর্জাতিক মোটর রেস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য পাঠান। চালকদের উপর নির্ভর করে দেশের মানসম্মান ও ইজ্জত। এর উপর নির্ভর করে গাড়ী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসা ও সুনাম।

দর্শকরা যেমন তাঁদের প্রিয় দেশের গাড়ী ও চালকের জয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন, ঠিক তাঁদের পরাজয়ে সে রকমই শোক নেমে আসে তাঁদের বুকে। কিন্তু সব থেকে দুঃখের কথা মোটর রেস এমন একটা স্পোর্টস যে, প্রাণহানির সংখ্যা ঘটে বেশী। দুর্ঘটনার ফলে কেবল গাড়ীই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একাধিক গাড়ীর চালক প্রাণ হারান এমন কি দর্শকরাও নিস্তার পান না---প্রাণনাশের আশঙ্কা থেকে।

হয়তো দেখা গেল অনেকগুলো গাড়ী পাশাপাশি প্রচণ্ডরকম গতিতে চলার সময় সংঘর্ষের ফলে কোন গাড়ী হয়তো ছিটকে গিয়ে দর্শকদের মধ্যে পড়ল। কোন গাড়ী হয়তো সামান্য সংঘর্ষের ফলে উল্টে গিয়ে আগুন ধরালো। এত দুর্ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও---প্রাণ হাতের মুঠোয় জেনেও মোটর রেসের উৎসাহী প্রতিযোগী দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আর দর্শকরাও প্রাণের মায়া না করে কাতারে কাতারে উপস্থিত হচ্ছেন মোটর রেসের আনন্দ উপভোগ করতে। ওঁরা বলেন---এটাই নাকি আসল স্পোর্টস।

স্পোর্টস কার চালকদের মধ্যেও আবার দুটো ভাগ আছে। একদল পেশাদার অপর দল অপেশাদার। যাঁরা পেশাদার চালক তাঁদের জীবিকা স্পোর্টস কার চালিয়েই। যেমন ধরা যাক আর্জেন্টিনার 'ফাঙ্গিও' বা ইংল্যাণ্ডের 'স্টার্লিং মশ'-এর কথা। এঁরা শুধু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোটর চালকই ছিলেন না মোটর চালনায় অভিজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞের মতে এঁরা ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চালক। এর থেকেও বড় কথা এঁরা কোনদিন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নি।

কার রেসকে কেন্দ্র করে দর্শকরা করেন শুধু আনন্দ উপভোগ, আর চালকেরা শুধু খ্যাতি অর্জন করেন তাই না। মোটর রেসকে কেন্দ্র করে চলে প্রচুর টাকার লেন-দেন। প্রচুর টাকার লেন-দেনের বিনিময়ে এক একজন চালক এক একটা স্বর্ণখনির মালিক হতে বসেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মোটর নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি বহু টাকা দিয়ে পোষেন স্পোর্টসকার চালকদের। তাঁরা নিজেরাই গাড়ীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাজারে চালু করেন। সুদক্ষ চালকের সুষ্ঠু পরীক্ষার ফলে--তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী গাড়ী প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রি করা হয়। এককথায় বাজারে গাড়ির জনপ্রিয়তা ও চাহিদা বাড়ে চালকদের সুনাম-এর উপর। আরো সহজ কথায় চালকের খ্যাতি অনযায়ী বাজার গাড়ির কাটতি। গাড়ীর চালকই গাড়ীর বিজ্ঞাপন।

বোধ করি অনেকেরই জানা আছে পশ্চিম জার্মানীতে মোটর রেসিং খব জনপ্রিয়। এখানকার নুইরবুরগ্রিং মোটর রেস কোর্স সবচেয়ে সাজান-গোছান। ২৩ কিলোমিটার পাহাড়ী জায়গা জুড়ে ১১৪টি বাঁক নিয়ে এই রেস কোর্স। এতগুলো বাঁক থাকা সত্ত্বেও এখানে গাড়ীগুলো প্রচণ্ড বেগে ছোটে

তাই তো ভাবি, মোটর চালনা নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এত গবেষণা। এর ফলে আগামী দিনে মোটর গাড়িও প্লেনের মতো গতিতে ছুটবে না তো?

অজ্ঞাতবাস

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

সিংদরোজায় সন্ন্যাসিনী, গোধূলিতে রহস্যময়
আকাশে চাঁদ, বাউলেরা
পথের ওপর চাদর বিছায়।
আনন্দঝোপ হাওয়ায় নড়ে—
তার দু'পাশে প্রেমিকেরা
পূর্বস্মৃতির গল্প করে, খোঁজ করে কেউ আততায়ীর

মুখ দেখে না তথাপি কেউ
সন্ন্যাসিনীর মুখোমুখি
আরশি হাতে দাঁড়ায় না কেউ
প্রদীপটাকে ঊর্ধ্বে ধরে ঃ

কোথায় প্রেমিক সন্ন্যাসিনী, কোথায় বাউল
পথের ওপর
একতারাটা এমনি বাজে
চাঁদের আলোয় কয়েক প্রহর
অজ্ঞাতবাস।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এই বিষয়বস্তুটি ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল তাঁহার "অপরাধ-বিজ্ঞান" বলিয়া বৃহৎ ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই পুস্তক অবলম্বনে আমার এই প্রবন্ধটি লিখিবার উদ্দেশ্য।

প্রথমে অন্যায়, পাপ ও অপরাধ কি তাহা বুঝিবার দরকার। এই তিনটি কথার ভিতর তফাৎ শুধু গুরুত্বের। গুরুতর অন্যায়কে পাপ ও গুরুতর পাপকে অপরাধ বলা যায়। পাপ ও অন্যায় জ্ঞানত বা অজ্ঞানত করা যায়, কিন্তু অপরাধ সর্বদাই জ্ঞানত করা হয়। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মানুষ অনেক প্রকার অপরাধ করে। আইন কিন্তু অপরাধীর তৎকালীন মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া শাস্তির পরিমাণ কম করে। আইনের উদ্দেশ্য মানুষের স্বাভাবিক ক্রোধকে শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা সংযত করে।

মনুষ্য দেহে দুই প্রকার কোষ বা cell আছে। দেহকোষ বা Somatic cell এবং বীজকোষ বা Germ cell। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই দেহকোষ দ্বারা নির্মিত এবং এই দেহকোষ ব্যতীত আর এক প্রকার কোষ দেহে রক্ষিত আছে। উহাকে বীজ-কোষ বলা হয়। এই সকল বীজকোষই পরবর্তী বংশধরের জন্ম দেয়। এখন মানুষের অপরাধ করিবার স্পৃহা ও তারতম্যের কারণ বলা হইতেছে। মানুষের আদিম যুগের অপরাধস্পৃহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (⅔) নিহিত থাকে এই বীজকোষের মধ্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ মাত্র দেহকোষের মধ্য দিয়া স্নায়ু ও মজ্জার মধ্যে তথা মানবমনের অন্তর্দেশে স্থান পায়। সাধারণত মানুষের এই অপরাধ-স্পৃহা ⅔ অংশ বংশ-পরম্পরায় বীজকোষেই নিবদ্ধ থাকে। দেহকোষে কদাপি সংক্রামিত হয় না। কিন্তু কদাচিৎ এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। বহু পুরুষ বাদে বংশের কোন কোন সন্তানের দেহকোষে তা দৈবক্রমে সংক্রামিত হয়। তখন সেই সন্তানটি একজন উৎকট অপরাধী হইয়া উঠে। এইরূপ অপরাধীকে বলা হয় স্বভাব-অপরাধী। অপর-দিকে কেবলমাত্র দেহকোষ নিহিত ⅓ অংশ অপরাধস্পৃহার বহিঃপ্রকাশ দ্বারা যে সকল ব্যক্তি অপরাধমুখী নন তাঁদের বলা হয় অভ্যাস অপরাধী। অভ্যাস অপরাধীরা স্বভাব অপরাধীর ন্যায় অতি উৎকট অপরাধী হয় না। মানুষ মাত্রেরই মধ্যে স্বল্পাধিক অপরাধস্পৃহা বর্তমান থাকে। ডক্টর ঘোষাল এই অপরাধস্পৃহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—শোণিত-স্পৃহা এবং দ্রব্যস্পৃহা। শোণিত-স্পৃহায় খুন, জখম, বলাৎকার প্রভৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়া থাকে এবং এই দ্রব্যস্পৃহার কারণে মানুষ চুরি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে থাকে। কুপরিবেশ ও দেশের অবস্থা হিসাবে এই দুইপ্রকার স্পৃহার উদয় হয়। ১৯৪৬ সালের কলিকাতায় মহা-দাঙ্গার সময় দুইপ্রকার স্পৃহাই দেখা দিয়াছিল।

অভ্যাস অপরাধী ও (দৈবক্রমে) উৎকট অপরাধীর ন্যায় মানবের মধ্যে যেমন অভ্যাস লম্পট, স্বভাব লম্পট, ও দৈব লম্পট হয় সেইরূপ মানবীর পক্ষে অভ্যাস বেশ্যা, দৈব-বেশ্যা ও স্বভাব বেশ্যা দেখা যায়।

প্রায়ই দেখা যায় ভাই স্বভাব চোর হয়ে বোন স্বভাব বেশ্যা হয়। অভ্যাস চোর বা অভ্যাস বেশ্যা অবস্থা গতিকে হয়। ভাই ভাই অভ্যাস চোর হলেও বোন সব সময়ে অভ্যাস চোর হয় না।

কুসঙ্গ, লোভ, অভাব, প্রতিশোধস্পৃহা, পারিবারিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির ন্যায় ঔষধাদি দ্বারাও মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধস্পৃহার বিকাশ সাধন করে। কোকেন (Cocaine) নিয়মিত প্রয়োগ দ্বারা যে কোন সহজ মানুষকেও অপরাধী করিতে পারা যায়।

এই Cocaine ছেলেদের চোর ও মেয়েদের বেশ্যাতে পরিণত করে। কলিকাতায় PROCURESSES (সংগ্রাহিকা) পানের সঙ্গে Cocaine খাওয়াইয়া ধীরে ধীরে মেয়েদের মধ্যে নির্বিকার যৌনস্পৃহার আবির্ভাব ঘটিয়ে আপন উদ্দেশ্য হাসিল করে। পৃথিবীতে বিশ্বাস কাউকে করা উচিত নয়, সাধুকেও নয় অসাধুকেও নয়।

অপরাধীদের চরিত্রের মধ্যে প্রধানত আমরা চারটি বিশেষ অবস্থার সন্ধান পাই। উহাদের ভিতর (১) যথাক্রমে অলসতা বা জড়তা, (২) ভাবপ্রবণতা, (৩) দাম্ভিকতা, (৪) নিষ্ঠুরতা এবং উৎকট অপরাধীরা সাধারণত কার্যক্ষম হইয়া থাকে। তার কখনও কাজকর্ম করে না। ভাবপ্রবণতাসূচক উল্কি ধারণ করিতে দেখা যায় যেমন "প্রাণের খাঁচা", "ভালবাসা", "ভুল না" ইত্যাদি। কি নিষ্ক্রিয় অপরাধী কি শোণিতাত্মক অপরাধী তাহাদের অন্তর্নিহিত দম্ভবৃত্তির কারণে তাহাদের কুকর্মের কথা বেপরোয়াভাবে যায় তার কাছে বলে। অহায়া নিষ্ঠুর কার্যে আগুয়ান হয়।

(৫) দৈহিক অসাড়তা—অত্যধিক দৈহিক অসাড়তার জন্য স্বভাব অপরাধী বা স্বভাব বেশ্যারা হুল্লোড় বা Orgy ভালবাসে। এই দৈহিক অসাড়তার কারণে অপরাধী বিশেষ মিথ্যা নালিশ দ্বারা অপরকে ফাঁসাবার জন্য নিজের দেহ সহজেই ক্ষত বিক্ষত করিতে পারে।

প্রতারকদিগের প্রতারণা করিবার নানাবিধ উপায় ও প্রতারিত কেন হয়—

(১) সিঁদেল চোর ঘরে ঢুকিয়া কোকেন, চরস্ ও কর্পূর ইত্যাদি মিশ্রিত বিড়ি ধরাইয়া তাহার ধোঁয়ার সাহায্যে ঘরের লোককে অঘোরে ঘুম পাড়ায়।

(২) জুয়োখেলা—ইহাতে চাতুর্য-সহকারে প্রতারকেরা তাস বা ঘুঁটি এমন-ভাবে সাজিয়ে রাখে বা সরিয়ে দেয় তাহাতে প্রবঞ্চিত সহজে হারিয়া যায়।

(৩) Note doubling—আসল Note ছাপকরা একখানা কাগজে মুড়ে দুইদিন পরে খুলিবার পরামর্শ দেয়। দুদিন পরে দেখা যায় যে হাত সাফাই-এর দ্বারা ঐ আসল Noteখানি দুর্বৃত্তরা সরাইয়া লইয়াছে। দুইখানি সাদা কাগজ পাইয়া লোক প্রতারিত হয়। স্বার্থ ও লোভ মনুষ্যের প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে।

(৪) মানুষ ঠকে তখনই যখন সে ভালবেসে ফেলে অর্থাৎ লোভে পড়ে। ভালরূপ তথ্য-তল্লাস না কোরে বিবাহ দিবার জন্য বিলাতে বেশ্যাকন্যা বধূরূপে আসে। Marriage Tricks—মাঝখানে দুর্বৃত্তেরা টাকা উপায় করে।

(৫) দেশপ্রেমের নামে ভন্ড রাষ্ট্র-নায়করা পৃথিবীর মানুষদের যেমন অমানুষিক ক্ষতি করেছে, চুরি ডাকাতির দ্বারা তদনুরূপ ক্ষতি পৃথিবীর হয় নি। অন্ধ ও উৎকট ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

(৬) গুরুদেবের রং সবুজ ও পীত হইল এবং গুরুদেব অদৃশ্য হইলেন। প্রথমে সূর্যের দিকে তাকাইয়া গুরুদেবের দিকে তাকাইলে গুরুদেবকে দেখিতে পাইল না।

গুরুদেব অদৃশ্য হইলেন

গুরুদেব শ্বেতবর্ণের বিভূতি মাখিলেন এবং শিষ্যের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং গুরুদেব ও শিষ্যের মধ্যস্থলে একটি কাঁচের পাত্রে লাল জল রাখিয়া শিষ্যকে একদৃষ্টে সেই জলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিবার পর তাঁহার দিকে চাহিতে বলিলেন, ফলে শিষ্য গুরুদেবকে সবুজ দেখিল। পীতোদক রাখিয়া গুরুদেবকে নীল দেখিল। এইরূপ দেখাইয়া শিষ্যের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়ে বিক্রয়-লব্ধ অর্থ মঠের নামে আত্মসাৎ করিলেন।

[রং এর তাৎপর্য লাল রং-এর উল্টা সবুজ এবং পীত রং-এর উল্টা রং নীল ইহাকে Red-Green process and Yellow-Blue process বলে। তাৎপর্য এই যে, লাল রং-এর একটি জিনিস দেখিয়া হঠাৎ দেওয়াল দেখিলে নীল রং দেখিবে।]

গুরু অনেক প্রকার—উদাসী, বিদেশী, স্থানী, স্বস্ত্রীক-গুরু, ছোকরা-গুরু ইত্যাদি। এইরূপ স্বস্ত্রীক গুরু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শিষ্যদের গুরুদেব বলেন, "ভোগের মধ্যেই ত্যাগ, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নিজে ভোগ করে তিনি ভক্তদের তা থেকে মুক্তি দিতে চান"।

একটি ছোকরা গুরুর বিবৃতি

গুরু-গিরি করিতে হইলে দুইটি জিনিস জানা চাই—একটি মনস্তত্ত্বের খুটিনাটি—আর কিছুটা ম্যাজিক—

স্ত্রীকে হাতাইবার জন্য শিষ্যকে ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ এবং বাকপ্রয়োগের দ্বারা শিষ্য যাহাতে স্ত্রীর উপর নানারূপে অত্যাচার করে সেইভাবে তাহাকে প্ররোচিত করা—উদ্দেশ্য (১) স্বামীর উপর তাহার বিরক্তি জন্মা, (২) স্বামি-সাহচর্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা এবং তার যৌবনবোধকে তিক্ত করা, (৩) চরণামৃত নামে শিষ্যকে মাদক দ্রব্য সেবন করান।

খোদ সাধুবাবারা সাধারণত নিষ্ক্রিয় অপরাধী হয়ে থাকেন অথাৎ পারতপক্ষে তাঁহারা কাউকে আঘাত হানেন না। এমন কি ধরা পড়ার পরও না। সাধারণত তাঁহারা নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা ধর্মের নামে গৃহস্থের অর্থে অলস জীবন যাপন করেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বড় বড় ব্যারিষ্টার, হাকিম, জমিদার, অধ্যাপক প্রভৃতি—সাধুদের ভেল্কীবাজীতে ভুলে যান কেন?

উত্তর—মানুষের মনোদেশে অনেকগুলি কেন্দ্র বা Point থাকে। একটি কেন্দ্রে হয় তো সে মূর্খ, রোগী বা পাগল কিন্তু অন্য অন্য পয়েন্টে সে একজন স্বাভাবিক মানুষ।

এইসব সাধু সন্ন্যাসীরা বা গুরুদেবরা অনেক সময়ে বিকল্পের সাহায্যেও মানুষ ঠকিয়ে থাকেন। বিকল্প দুইপ্রকার হয়, যথা,—(১) বহির্বিকল্প, (২) অন্তর্বিকল্প—

রজ্জুসর্প, শক্তি মুক্তা, মায়া মরীচিকা প্রভৃতি বহির্বিকল্পের (Illusion) দৃষ্টান্ত এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিকল্প চক্ষু হইতে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে অন্তর্বিকল্পের বিষয়বস্তু চিন্তার দ্বারা মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয় এবং উহার ছবি মস্তিষ্ক হইতে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ অবস্থায় আমরা ভূত, বিভীষিকা প্রভৃতি দেখি। ঠগী অপরাধীরা এই স্বভাবগত বিকল্প সম্বন্ধে অভিহিত থাকে এবং তারা প্রায়ই কখনও বাক্য প্রয়োগ দ্বারা (Suggestion), কখনও বা হাতসাফাই বা ম্যাজিকের সাহায্যে দুর্বলচিত্ত মানুষের মধ্যে বিকল্পের সৃষ্টি করে। নানারূপে তাদের ঠকিয়ে থাকে। মাদকদ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত শ্রম, দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাহীনতার কারণেও অন্তর্বিকল্পের সৃষ্টি হয়।

কোন কোন সাধু বাক প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মধ্যে মানসিক রোগ সৃষ্টি করেন। মানুষের মন যখন অশান্ত হইয়া উঠে তখন সেই সাধু আবার উল্টা বাক প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে নিরাময় করে তাহাকে বশীভূত করেন। Magic যে আজিকার দিনে হাত-সাফাই বা কতকগুলি রসায়ন দ্রব্যের মারপ্যাঁচ মাত্র, একথা সকলের জানা আছে। এই Magic-এর সাহায্যে কোন কোন সাধু নানারূপে গন্ধ বার করার জন্য গন্ধবাবা সাজেন। এমন কি কেহ কেহ শূন্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। শিষ্যদের বশীভূত করার জন্য সাধুবাবারা আর একপ্রস্থ আগাইয়া যান।

পরপুরুষের সাহচর্যের স্পৃহা প্রায় সকল মেয়েদের ভিতরই কমবেশী থাকে। এই বিশেষ স্পৃহা স্ত্রী মাত্রেরই আদিম স্পৃহা, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবী তার এই আদি স্পৃহা ত্যাগ করেছে, কিন্তু তা হলে কি হয়, যে কোন দুর্বল মুহূর্তে সে এই বিশেষ স্পৃহার কবলে পুনরায় পড়িতে পারে। ভয়, ভাবনা, আত্মসম্মান বা কর্তব্যবোধ মানবীকে তার এই স্বাভাবিক স্পৃহা হইতে রক্ষা করে। গুরুসেবার মধ্যে লজ্জাবোধের কারণ নাই, মেয়েরাও এই সুযোগে তাহাদের সেই সুপ্ত স্পৃহার (গুরুসেবার দ্বারা) উপশম ঘটায়। তবে উহা অচেতন মনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, বাহিরে বা চেতন মনে উহা কদাচিৎ প্রকাশ পায়। তবে তাহাদের চেতন মনে এই স্পৃহা বা ইচ্ছা পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে প্রায়শ গুরু বা সাধুর বয়স বা ইচ্ছার উপর।

পকেটমার

নিচু হইবার মাত্রই রেজর (RaZor) ব্লেড বুক পকেটের তলা খানিকটা বেমালুম কাটিয়া দেয়। তারপর Bladeখানা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া আঙ্গুলের সাহায্যে Note-এর Bundleটা বাহির করে।

সিঁদকাটি

ইহার চেহারা ছোট, গোল মুখ, ক্রমশ ছুঁচাল অর্ধ হস্ত লম্বা লোহের সাবলের মত।

তালা খোলা

তালাখোলার এক প্রকার যন্ত্র অপরাধীর নিকটে থাকে।

যৌনবোধ

কম বেশী যৌন বোধ সকল যুবতী কন্যার মধ্যেই দেখা যায়। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, কর্তব্যবোধ, ভয় ভাবনা ইত্যাদি ইহাকে দমন করে মাত্র তত্রাচ মধ্যে মধ্যে এই বোধ অত্যন্তরূপে তীব্র হইয়া উঠে; এবং কন্যাকে উতলা করিয়া তোলে। এই দুর্বল মুহূর্তে যদি কেহ সাহস করে তাহার মুখে সুধার পাত্র তুলে ধরে তাহা হইলে সে কৃতকার্য হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার এই যৌন বোধ সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে, সেইসময় যদি কোন দুর্বৃত্ত তাহার কাছে কোন প্রকার প্রস্তাব করে তাহা হইলে সে তাহা ঘৃণার সহিতই প্রত্যাখ্যান করে—Bernard Shaw remarked 'Morality is nothing but want of opportunity.'

যৌন তৃপ্তির বা satisfaction অপেক্ষা উপশম বা sublimation মানুষের পক্ষে অধিক উপকারী। ইউরোপে Ball dance বা যুগ্ম নৃত্যাদি এই যৌন উপশমের প্রধান সহায়ক। ভারতীয় সমাজেও এই যৌন উপশমের নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। এদেশে বৌদি ও ঠাকুরপোর, নাতি ও ঠাকুমা, ভগিনীপোত ও শ্যালিকার, বেহান ও বেহাই, বন্ধু ও বান্ধবীর মধ্যে যে সুমধুর ঠাট্টা আবহমান কাল হইতে চলে আসছে তাহা এইরূপ যৌন উপশমের নামান্তর মাত্র। এইরূপে যৌন উপশম উভয় পক্ষের অজ্ঞাতেই প্রতিদিন ঘটে থাকে।

উগ্র যৌবন বোধকে জোর করে দমিত করিলে ফল কদাচ ভাল হয় না। প্রদমিত যৌনস্পৃহা মানুষকে নিউরেটিক, শুচিবাই-গ্রস্তা, ধর্মরোগী, স্বার্থপর, হিংসুক, ঝগড়াটে এমন কি পাগলেও পরিণত করে দিতে পারে।

যৌনবোধ রোধের কুফল

আশ্রমে অনেক বৎসর থাকিয়া একটি স্ত্রীলোক (Pseudo-religionist) হইয়া উঠে। তারপর অন্যত্র আসিয়া ক্রমে ক্রমে সারিয়া যায়।

Neurotic বা স্নায়ুর রোগ একবার আসিলে সারানো দুষ্কর হইয়া উঠে।

মেয়েদের চৌদ্দ হইতে ২১ পর্যন্ত বয়সের একটু বিশেষত্ব আছে। এই বয়স কালের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের মনে একবার দাগ কাটিবে বা first impression ফেলবে সেই জিতবে। সে ব্যক্তি যদি বড় কদাকার, অশীতি বৎসরের বৃদ্ধও হয় তবুও সে জিতবে।

দুর্বৃত্তদের কার্য

অনেক দুর্বৃত্ত টাকার সাহায্য দ্বারা গরীব অভিভাবকদের হস্তগত করিয়া সুন্দরী বোন বা বৌকে হস্তগত করে এবং কোকেনাদি (Cocaine) ব্যবহারে নির্বিচার যৌন স্পৃহার আবির্ভাব ঘটিয়ে দেয়।

অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তির কথায় আস্থা স্থাপনের বিপদ

দুর্বৃত্তেরা সময় সময় অভিভাবকদের বুঝায় যে তারা তাদের কন্যাকে বিবাহ করিবে এবং বিবাহের দিন পেছিয়ে দিয়ে থাকে। এই সময়ে অবোধ বালিকারা এদের নিশ্চিতরূপে ভবিষ্য

ব্যোমিজ্ঞানে স্নেহ দান করে, কিন্তু পরে কোনও-না-কোন ছুতো করে এই দুর্বৃত্তের তাদের পূর্বে সম্বন্ধ ত্যাগ করে।

আবার অপরদিকে হতভাগ্য ভদ্রসন্তান-দের বুঝা উচিত যে এইসব তথাকথিত Private girls কেবলমাত্র তাঁহার একার জন্যই সংগৃহীত হইয়াছে কি? একদিক থেকে এরা সাধারণ বেশ্যা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যৌনস্পৃহা জাগ্রত করে যাহারা মানুষ ঠকিয়ে থাকে তাহারাই হচ্ছে আসল অপরাধী।

ডাকাতের জীগাঁ দেওয়া

সিংহ ও ব্যাঘ্র যেরূপ শিকারের সময় রক্ত জমান গর্জন (Blood-curdling roar) করে সেইরূপ ডাকাতদের "জীগাঁ দেওয়া" প্রথা ছিল। যথা "আবা-আবা-আবা-আ-ইয়া-য়া-য়া" কিংবা "ও-ও-ও-এ-এ-এ—" "রে-রে-রে-রে-এ-এ"—ইত্যাদি।

গরিলা যুদ্ধ

সন্ত্রাসবাদীদের শেষ অস্ত্র হয়ে থাকে গরিলা যুদ্ধ। পৃথিবীতে প্রথম গরিলা যুদ্ধের প্রবর্তন করেন মধ্যযুগের বিস্ময়কর অন্যতম যোদ্ধা রাজা শিবাজী।

বাঙ্গালীর মেধা, বুদ্ধি, ধৈর্য, প্রতিভা এবং সাহসের উপর ব্রিটিশ জাতির পরোক্ষভাবে আস্থা ছিল। তাই বাঙ্গালী (তথা সমগ্র ভারতীয়) বিপ্লবীদের দমন করিবার জন্য তাদের বাঙ্গালীর সাহায্য নিতে হয়েছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। ইংরাজেরা এই দেশে কেবলমাত্র আমাদের অর্থনৈতিক এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছিল কিন্তু তাহারা কখনও দেশের ধর্মবিশ্বাস বা কৃষ্টির উপর কিম্বা দেহের উপর বা সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করে নি; কিন্তু ঐ সময়ে আরব ও তুর্কী সৈন্য সেনানী এবং বিদেশী ধর্মান্ধ সরকারী কর্মচারীরা বাঙ্গালীদের ধর্ম ও নারীর উপর কারণে ও অকারণে অকথ্য অত্যাচার করেছিল। জগৎ শেঠের পুত্রবধূ হরণ এই সকল অপরাধের অন্যতম উদাহরণ। রাণী ভবানীর কন্যা অপহরণের চেষ্টা এইরূপ অপরাধের আর একটি উদাহরণ।

রাজা গণেশ এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ প্রচেষ্টার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই আধুনিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক উপায়ে রাজনৈতিক দল গঠনের পদ্ধতি পৃথিবীতে তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। এস্থলে গ্রন্থকারের (ডঃ ঘোষাল) মনে বেদনা জেগেছে এই যে এখনও কি এই প্রদেশে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাৎসরিক জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করিবার সময় আসে নি?

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আমরা উপলব্ধি করবো জাতীয় জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রয়োজন কত বেশী। ঈজিপ্ট বা পারস্য আজও স্বাধীন আছে কিন্তু আজ সেখানে ঈজিপসিয়েন বা পারশিক জাতি নাই। সেখানে এখন বাস করে আরব ও তুর্কীদিগের লোক, তারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে পারে নাই। তাই জাতি হিসাবে তাহারা আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া নাই, কিন্তু আমরা ভারতবাসী গত শত শত বৎসর ধরে শত দুঃখ দুর্দশার মধ্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করে এসেছি, তাই আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা তেমনি করেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।

অশ্লীলতা

অর্ধবিবসা নারীমূর্তি অশ্লীল, কিন্তু নগ্না নারীমূর্তি অশ্লীল নয়। মন্দিরের বাহিরের অশ্লীল মূর্তি সকল বুঝাইয়া দেয় যে যাহা কিছু অশুচি তাহা বাহিরের, ভিতরের নয়। মন্দিরের ভিতর ভগবান আছেন। সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা অশ্লীলতা নয়।

ভৈরব চক্র

এই ধর্মানুষ্ঠান অনুসারে সাধক উলঙ্গ অবস্থায় রুদ্ধকক্ষে এক নারীকে ক্রোড়ে নিয়া কালীমূর্তির সম্মুখে বসে উপাসনা করেন। এই সাধন পদ্ধতিতে মদ্য, মাংস, নারী নিষিদ্ধ নয়। (ভারতীয়েরা এই উপাসনা পদ্ধতি কোন যুগেই পছন্দ করেন নি) এই উপাসনায় সাধক-সাধিকারা অতি অদ্ভুত মনোবল ও সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। এই অবস্থায় এদের রেতঃপাত পর্যন্ত হয় নি। যৌন সঙ্গম তো দূরের কথা।

কিন্তু এমন অনেক দুর্বৃত্ত আছে যাহারা বহু সরলমনা নারীদের ধর্মের অছিলায় মিথ্যা ভৈরব চক্র দ্বারা বিভ্রান্ত করে তাহাদের উপভোগ করেছে।

কামশাস্ত্রের উপকারিতা

বিবাহের পর যৌন সঙ্গমে অসুবিধা ঘটিলে যুবক-যুবতীর যৌন-বিজ্ঞান বা কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। এমন অনেক নারী আছে যাহাদের বৃহৎ যোনির কারণে পুরুষে সর্বাধিক সুখলাভে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থায় অন্য নারীতে অনুরক্ত হইতে পারে। কিন্তু কাম-শাস্ত্র পড়া থাকিলে এই সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। পেশী সঞ্চালন পদ্ধতিতে স্বামীকে সুখী করিতে পারে। মানসিক কারণে সকল স্বামীর উত্তেজনা আসে না, তারাও এই শাস্ত্রের রীতিগুলি অনুধাবন করে স্ত্রীকে সুখী করিতে সক্ষম। বাৎস্যায়ন ঋষি বলেন যে স্ত্রী যদি বুঝে

যে স্বামীর রেতঃপাত শীঘ্রই হবে তাহা হইলে তাহা বুঝিবা মাত্র তাহার উচিত স্বামীর পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠের নিম্নে চপেটাঘাত করা। এইরূপে সে নিজেকে ও স্বামীকে সুখী করিতে পারিবে। পুরুষের উচিত অন্যমনস্ক থাকা, যেন সে কিছু করে নি বা কচ্ছে না।

বৈদিক যুগেও অশ্লীল বাক্য অশ্লীল-রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। এবং কিরূপে সাব-ধানতার সহিত উহা সাহিত্যে স্থান পেতো তাহা নিম্নের শ্লোকটিতে বুঝা যাইবে।

যকাসকৌ শকুন্তিকা হলগিতি বঞ্চতি।
আহন্তি গভে পসো নিগলগলীতি ধারকা॥

শ্লোকটি শুক্ল যজুর্বেদ ২৩।২২—অশ্ব-মেধ পর্বের। ইহা নিহত অশ্ব সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে। শ্লোকটিতে "গর্ভে" রূপ একটি শব্দ দেখা যায়। আসলে এই শব্দটি "গভে" নয়। উহার আসলরূপ "ভগে"। অশ্লীলতা বিধায় ঐ "ভগে" শব্দটি মন্ত্র উচ্চারণের সময় "গভে" বলিয়া উচ্চারিত হতো। এই মন্ত্রটি একটি যাদুমন্ত্র। অশ্বের কর্তিত লিঙ্গটি মন্ত্রপূত করে বন্ধ্যা স্ত্রীগণ যোনির মধ্যে স্থাপন করে ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলে না কি সহজেই সন্তান সম্ভাবনা হতে পারতেন।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয়

সাপে কামড়ান মন্ত্রে বহু অশ্লীল কথা শোনা যায়। বহু ক্ষেত্রে সাপ কামড়ায় না বা কামড়ালেও বিষ নির্গত হয় না। অশ্লীল বাক্যে রোগীর অচেতন মনকে অন্যমনস্ক করে দেয়।

সাধারণত মেয়েদের ভূতে পায় ও ছেলেদের পেত্নীতে পায়। এই রোগের কারণ যৌন অবনমন বা Sex suppression.

বাংলা দেশের মেয়েরা সকলের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে কিন্তু স্বামীর বা ভাল-বাসার লোকের নিকট হইতে সামান্য অবহেলা সহ্য করিতে পারে না।

নিপুণ খেলোয়াড়ের হাতে লাঠি পড়িলে উহা দুর্জয় শক্তি আনয়ন করে। ঘূর্ণায়মান বংশ যষ্টি Rifle-এর গুলি প্রতিরোধ করে, তলোয়ার বা সড়কী ভেঙ্গে দুইখানা করে দেয়।

অহিংসা মন্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা বৌদ্ধদের দুর্বল করে দেয়। বৌদ্ধেরা মাথা নেড়া রাখতো এইজন্য বাঙ্গালার মুসলমানকে আজও হিন্দুরা 'নেড়ে' বলে, কারণ তাদের চক্ষের সম্মুখেই এই নেড়েরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়।

পাকিস্তান যে হিন্দুস্থানেরই অংশ এবং মুসলমানগণ ধর্মে মোসলমান হলেও জাতিতে যে তারা হিন্দু, তা দেশের নামগুলিতে আজও প্রমাণিত করছে।

একদিন সুন্দরবন ছিল বিত্তশালীসমৃদ্ধ জনপদ। কিন্তু জলদস্যুদের অত্যাচারে লাঞ্ছিত হয়ে তারা দেশের অভ্যন্তরে সরে এসেছিল। পর্তুগীজ জলদস্যু এই সকল বাঙ্গালী কন্যাদের অপহরণ করিয়া সূচী দ্বারা তাদের হাত ফুটা করে হাতের চেটো-গুলির মধ্যে দড়ি পুরে একত্রে তাদের জাহাজের পাটাতনে বিক্রয়ার্থ মজুদ রাখতো।]

হত্যা—রাজনৈতিক হত্যা

অন্য উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিহত করিবার জন্য বিষকন্যার ব্যবস্থা ছিল। উপহার যৌতুকরূপে এই সকল সুন্দরী বিষকন্যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিগণের নিকট প্রেরণ করা হতো। বিষকন্যার স্বরূপ—শৈশবকাল হইতে এই সকল কন্যাকে বিষ পরিপাক করিতে অভ্যস্ত করান হতো। পরিশেষে এই সকল ঘর্ম ও নিশ্বাসও বিষময় হয়ে উঠতো। কিছুদিন সংস্পর্শে থাকিলে মানুষ মাত্রেরই ধীরে ধীরে পীড়িত হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হতো। এই সকল নারীরা বিষময় হয়ে উঠায় নিজে বিষপান করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হতো না। এই কারণ বিষ-মিশ্রিত সুধাপাত্র হতে কিছুটা বিষ নিজেরা গলাধঃকরণ করে বাকিটুকু প্রেমাস্পদ নৃপতিকে পান করিতে দিলে ঐ সকল নৃপতিগণ নিঃসংকোচে তা পান করে মৃত্যুবরণ করে নিয়েছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে অভিনয় দ্বারা বশীভূত করিয়া বিষদানে নিপুণা কন্যাগণকেই বিষকন্যা বলা হতো।

হাকিমী চিকিৎসা

যৌবনশক্তি ফিরিয়া আনিবার জন্য হাকিমী চিকিৎসকগণ আরসেনিক বিষ আহারে অভ্যস্ত মোরগের মাংস রন্ধন করিয়া আহার করিয়ে বহু বৃদ্ধেরও যৌবনশক্তি ফিরিয়ে এনেছেন।

নরহত্যা

(১) ধর্মের নামে যেমন মধ্যযুগে ছিল।

(২) শিশুমানত—ইহার প্রভাবে বহু মাতা কুসংস্কারবশত সাগর-সঙ্গমে আপন শিশুদের স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছে। বন্ধ্যা বা নিঃসন্তান স্ত্রীগণ মানত করতো যে যদি তাহারা সন্তান প্রসবে সক্ষম হয় তাহলে তাদের প্রথম সন্তানটিকে সাগর-সঙ্গমে বিসর্জন দেবে।

(৩) মধ্যযুগে আফ্রিকায় নরমাংস খাদ্য-রূপে ব্যবহার হতো। বহু নরমাংস বিক্রয়ের দোকান দেখা গিয়াছে।

(৪) শিশুকন্যা হত্যা পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় ছিল।

(৫) গণনার ফলে অনেককে হত্যাকারী করেছে।

(৬) আক্রোশজনিত হত্যা—উপপতির সহিত মিলিত হইবার জন্য বহু স্ত্রী আপন পতি ও পুত্রকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

(৭) পৃথিবীতে দুইটি মানুষের অঙ্গুলের ছাপ কখনও এক প্রকার হইতে পারে না। এমন কি এক মানুষের একটি

বিজ্ঞানের অবদান

(ক) Forensic Science এবং Ultra-violet ray দ্বারা অপরাধ নির্ণয়ের ব্যাপারে যুগান্তর আনিয়াছে। ইহার সাহায্যে অপহৃত দ্রব্যের বর্ণের ছটা ফরিয়াদির গৃহের অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিলাইয়া একটা নিশ্চয় তথ্যে আসা যায়।

(খ) Oxalic acid, Sulphate mixture, Sulphuric acid, পাতি-লেবুর রসে লেখা পোঁছা যায় এবং Alcohol Ink-এর দাগ পুঁছিতে পারে।

(গ) চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর মনুষ্য রক্ত ধীরে ধীরে ফিকে বা ধূসর বর্ণের হতে থাকে।

(ঘ) গলায় দড়ি দিয়া মৃত্যুতে মুখের লালা বক্ষের উপর দিয়া সরলভাবে গড়িয়ে পড়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত মৃতদেহ হইতে বীর্য বা যৌন সার, রক্ত বা Menses নির্গত হয়েছে দেখা যায়।

(ঙ) সর্পের বিষ—যদি কেহ গোক্ষুর সাপের বিষ ভক্ষণ করে তাহা উদরে হজম হইয়া যায়। কিন্তু মুখবিবরে বা পাকস্থলীতে যদি ক্ষত থাকে তাহা হইলে ঐ বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়ে থাকে।

(চ) বিষ চারি প্রকার—

(১) Corrosive—দহন বিষ, যেমন Sulphuric acid, Nitric acid, Hydrochloric acid, Caustic.

(২) Irritant বা চিকীর্ষ অর্থাৎ দেহ অভ্যন্তরে ফুলিয়া উঠে যথা মাদার, লালচিটা, arsenic, antimony সেবনে দহন, জ্বালা, বমন, জলীয় বাহ্যে হয়।

(৩) স্তম্ভকারিণী অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ করিয়া দেয়—যথা Prusic acid, Aconiti, Carbon Monoxide ইত্যাদি।

(৪) স্নায়বিক বিষ

(ক) স্নায়ুদন্ত এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ করে।

(খ) উত্তেজক বা Excitement উত্তেজনা করায় এবং পরে Coma সৃষ্টি করে যেমন Cocaine, Hemp, Alcohol.

(গ) বৈগারিক—যাহাতে বিগার এবং অসাড়তা আনে—যেমন ধুতরা (Belladonna).

(ঘ) Narcotic—Opium, Morphia

বলাৎকার

বলাৎকার অপরাধের পর পুরুষের যৌনকেশ স্ত্রী যোনিতে এবং ধর্ষিত নারীর যৌন কেশ ঐ পুরুষের যৌন দেশে বা উহার পরিধেয় বস্ত্রে সংলগ্ন হইতে দেখা যায়।

(খ) ভ্রূণহত্যা তিন প্রকারে হইতে পারে—আরগট ও লিয়েন্ডার, মুদার, হরিতাল বা আর্সেনিক, লালচিটা ও রসকর্পূর বা Mercury.

উদর টিপে বা উহাতে ঘুঁষি মেরে কিম্বা ভ্রূণহত্যার কাটি বা শিকড় উহাতে প্রবেশ করিয়ে।

অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা উচ্চাঙ্গের ডাক্তারি যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

পশুহত্যা—বিষপ্রয়োগে

(ক) সেঁকো বিষ বা সাখিয়া —white arsenic ; হরিদ্রা arsenic বা হরিতাল ; লোহিত arsenic বা মেমছাল—ইহাতে পশু আহার করে না, রক্তসহ বাহ্যে ইত্যাদি হয়। মুচিরা চামড়ার লোভে পশুহত্যা করতে ইহা ব্যবহার করে।

(খ) কুঁচ বা গুঞ্জা—উভয় প্রকার লতার বিষই রক্তের উপর ক্রিয়াশীল। অতি উগ্র বিষ রক্ষিত আছে। এই বিষ বীজ প্রথমে গুঁড়িয়ে জলসহ তরলাকৃতি করা হয়ে থাকে। ইহার পর দুইটি লৌহ গুণছুঁচের অগ্রমুখে সাবধানে ঐ বিষ প্রলেপ করা হয়। বিষসহ ঐ ছুঁচের মুখে অপরাধিগণ শৃঙ্গের নিম্নে বিঁধিয়ে দেয়। পশুটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়।

(গ) Nuxvomica—এই বিষও বীজে থাকে। পশু ছটফট করিতে করিতে মারা যায়।

(ঘ) কল্কে ফুলের বীজ—এই বিষ-প্রয়োগে পশু নিস্তেজ হইয়া যায়।

(ঙ) ধুতরা—ইহার প্রয়োগে বমন, গোঙানি, ক্রন্দন প্রকাশ পায়।

নীতিবচন বা প্রবচন—

(১) পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, সাধুকেও নয় অসাধুকেও নয়।

(২) অন্ধ-ধর্ম-বিশ্বাসী লোকদের দুর্বলতার সুযোগ বিজ্ঞ দুর্বৃত্তেরা প্রায়ই নিয়ে থাকেন।

(৩) গৃহস্থের উচিত মাহিনা দিবার সময় চাকরদের সহি ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার টিপসহি লওয়া। ইহাতে চুরি করে পালালে তাহাকে সহজে ধরে আনা সম্ভব হয়।

(৪) বন্ধুদের সহিত স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া আজকাল একটা বাহাদুরির ভিতর পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফল সাধারণত অশুভ হয়।

ভারতীয় শাস্ত্রে সহমরণ প্রথার নিদর্শন

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষে যে সতীদাহ প্রথা ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুরতম আচার-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, তার প্রথম উদ্ভব সঠিক কোন সময়ে হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত সর্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হয় নি।

তবে বৈদিক সাহিত্যের প্রথম দিকে অর্থাৎ ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রকে নিদর্শনরূপে দেখিয়ে প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকারেরা এবং বর্তমান যুগের কিছু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বৈদিক যুগেই এই নিষ্ঠুর প্রথার প্রাথমিক রূপটি প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ অনুবাকের মূলত তিনটি মন্ত্রকে ঋগ্বেদের সময়ে সহমরণ প্রথার অস্তিত্বের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমটি হল—

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা
নিপদ্যতে উপত্বা মর্ত প্রেতম্।
বিশ্বং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ
প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি॥

বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সারার্থ হল এই যে, পতির মৃত্যু হ'লে মৃতস্বামীর স্ত্রী সকলসময়েই পতিলোক প্রাপ্তির ইচ্ছাবশে তাঁর কাছে গমন করবেন। এই হল নিয়ম। কারণ, 'পতিব্রতাণাং স্ত্রীণাং পত্যা সহৈব বাসঃ পরমো ধর্মঃ'—অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রী যাঁরা তাঁদের প্রধান ধর্মই হল সকল অবস্থাতেই স্বামীর সঙ্গে বসবাস করা।

তাই মৃত্যুর পরেও মৃতস্বামীর সঙ্গে মৃত্যুলোকে সতী স্ত্রীর বাস করা উচিত। এই বিধান থেকে পরবর্তী যুগে সহমরণ প্রথার উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। উক্ত মন্ত্রের শেষাংশের ভাবটি এই—স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্মতি নেওয়া থাকলে পুত্র, পৌত্র ও ধনসম্পদের রক্ষার জন্য স্ত্রী সহমরণের কবল থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন।

সহমরণ প্রথার উল্লেখ-সম্বলিত দ্বিতীয় ঋক্-মন্ত্রটি হল এই—

ইমা নারীরবিধবা সপত্নীরাঞ্জনেন
সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবা সুরত্না আরোহন্তু
জনয়ো যোনিমগ্রে॥

মন্ত্রটির অর্থ মোটামুটি এই রকম—এই নারীগণ—যাঁরা এখনও পর্যন্ত বিধবা হন নি (স্বামীর দাহ না হওয়ার

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্য)—এঁরা চোখে অঞ্জনের ও ঘৃতের প্রলেপ দিয়ে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করুন। অগ্নিতে প্রবেশ করার সময় এঁরা হবেন অশ্রুবর্জিতা, মানসদুঃখবর্জিতা এবং শোভন অলংকারপরিহিতা। কোনও কোনও স্মার্ত পণ্ডিত উপরি-উক্ত মন্ত্রের সর্বশেষ শব্দ 'অগ্রে' এই পাঠের পরিবর্তে 'অগ্নেঃ'—এই পাঠ সমর্থন ক'রে 'অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করা' এই অর্থ করেন এবং এই ভাবে সহমরণ প্রথার সমর্থনে যুক্তি দৃঢ় করেন। অধ্যাপক Kaegiও এই মতের সমর্থক কিন্তু H. H. Wilson এই মন্ত্রের যে অনুবাদ করেন তা থেকে মনে হয় এই মন্ত্রে তিনি সহমরণের অস্তিত্বের সমর্থন করেন না। মন্ত্রটির অনুবাদ তাঁর মতে এই—

"May these women, who are not widows, who have good husbands, who are mothers, enter with unguents and clarified butter without tears, without sorrow; let them first go up into the dwelling."

এই পর্যায়ের তৃতীয় মন্ত্র—

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং
গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং
পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূব।

এই মন্ত্রের সায়নকৃত টীকার সংক্ষেপিত অর্থ—হে নারী! তুমি তোমার মৃতস্বামীর পাশে শুয়ে আছ। এখান থেকে ওঠ। জীবলোকে প্রাণিসমূহের কাছে অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদির কাছে যাও। এই মন্ত্র সম্বন্ধে কোনও কোনও শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা বলেন যে, স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে উদ্যতা নারীকে সম্বোধন করে তার দেবর বা স্বামীর বন্ধুস্থানীয় কোন ব্যক্তি, অথবা স্বামীর কোনও বয়স্ক ভৃত্য এই মন্ত্রটি পাঠ করবে। অর্থাৎ, 'তুমি তোমার মৃত্যুশয্যা থেকে ওঠ এবং আমার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পুনরায় সাংসারিক জগতে প্রবেশ কর'—এই-ই হবে বক্তার বক্তব্য।

উপরি-উক্ত ঋক্ মন্ত্রটিতে 'জীবলোক' শব্দটি সম্বন্ধে H. H. Wilson-এর বক্তব্য—শব্দটির অর্থ সামাজিক কর্তব্য (social duties)। অতএব মন্ত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থ হল—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে অর্থাৎ নিজ সংসারের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে না। এই ভাবে তিনি বৈদিক সাহিত্যে সহমরণ ব্যবস্থার অসারত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে Wilson-এর উক্তি উল্লেখ্য—

"The author of the Grhya Sutra, Aswatayana furnishes further proof of what is meant, as he specifies the person who

is to address the stanza to the widow, placed on the north of her deceased husband's head, and who is to be her husband's brother, or a fellow-student on an old servant, and who, having thus spoken to her, is to take her away. The authority of the Sutras is little inferior to that of the Veda; and here, therefore, we have additional and incontestable proof that the Rgveda does not authorise the practice of the burning of the widows."

কিন্তু Wilson ঋগ্বেদের যুগে সহমরণ প্রথা অস্বীকার করলেও অথর্ববেদ ও প্রাচীন যুগের স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে এই প্রথার বহুল সমর্থন পাই। অথর্ববেদে বলা হয়েছে পুরাণ ধর্ম অনুসারে বিধবা স্ত্রী মৃতস্বামীর অনুসরণ করবেন। তা ছাড়া শাস্ত্রে সতীর যে লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে তার মধ্যেও এই প্রথার ইঙ্গিত পাই—

আর্তার্তে মুদিতা হৃষ্টে
প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ
সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥

অর্থাৎ—স্বামী পীড়িত হলে যে স্ত্রী পীড়া অনুভব করেন, পতির আনন্দে যিনি হন আনন্দিত, বিদেশে অবস্থিত পতির শোকে যিনি হন মলিন ও কৃশ এবং স্বামীর মৃত্যু হলে যে স্ত্রী নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন, তিনিই হলেন পতিব্রতা।

ব্রহ্মপুরাণ ঋগ্বেদের নির্দেশ সামনে রেখে বলেছেন—

দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ
সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা
প্রবিশেজ্জাতবেদসম্ ॥

স্বামী যদি দেশান্তরে গিয়ে পরলোকগমন করেন তবে সাধ্বী স্ত্রী তাঁর পাদুকাদ্বয় বক্ষে ধারণ করে শুদ্ধচিত্তে অগ্নিতে প্রবেশ করবেন। কোনও কোনও শাস্ত্রকারের মতে এই বিশেষ বিধি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতিদের পক্ষে প্রযোজ্য। আবার কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ এই বিধান দিয়েছেন যে, শিশুসন্তানের জননী, রজস্বলা ও গর্ভবতী নারীদিগের সহমরণ বিধেয় নয়। তবে সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের সাধারণ মত সহমরণের পক্ষে।

মৃতে ভর্তরি যা নারী
সমারোহেৎ হুতাশনম্।
সারুন্ধতী সমাচারা
স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥

স্বামী মারা গেলে যে স্ত্রী সহমৃতা বা অনুমৃতা হন, তিনি অরুন্ধতীতুল্যা এবং তিনি স্বর্গলোকে পূজিতা হন। এই মতেরই সমর্থক অন্য একটি শ্লোক—

সাধ্বীনামেব নারীনামগ্নি
প্রপতানদৃতে।
নান্যো ধর্মো হি বিজ্ঞেয়ো
মৃতে ভর্তরি কর্হিচিৎ ॥

পতি মৃত হলে সাধ্বী নারীদের অগ্নিপ্রবেশ ছাড়া অন্য কোনও ধর্মাচরণ বিহিত নয়।

সহমরণের সময় পুরোহিতেরা সহমরণোদ্যতা নারীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করতেন। বৈদিক সাহিত্যে ধৃত বহু মন্ত্রের মধ্যে একটি এই—

'ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ
স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ। সহভর্তৃনারীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুম্ ॥'

মহাকাব্যের যুগেও সহমরণের নিদর্শন মেলে। অবশ্য রামায়ণে এই প্রথার উল্লেখ নেই। মহাভারতে সহমরণ প্রথার একাধিক নিদর্শন মেলে। মাদ্রীর পাণ্ডুর চিতায় আরোহণ ও বসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁর চারজন স্ত্রীর সহমরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সহমরণ সম্বন্ধে মহাভারতরচয়িতা বলেছেন—

ভর্ত্রানুমরণং কালে যাঃ
কুর্বন্তি তথাবিধাঃ।
কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়াৎ মোহাৎ
সর্বাঃ পূতা ভবন্তি তাঃ ॥

সহমরণসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিধিবিধানের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, কোনও ক্ষেত্রেই এই প্রথা বাধ্যতামূলক ছিল না। মনুসংহিতায় স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সন্ন্যাসিনী হওয়ারও নিদর্শন আছে। তা ছাড়া মনুসংহিতায় সহমরণ প্রথার পরিষ্কার উল্লেখ নেই।

এই জন্যে কারো কারো মত এই যে, মনুতে যা নেই, তার অস্তিত্বও নেই। কারণ, 'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।' মনুর বচনের বিপরীত যে বিধান তাকে পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন না। তাছাড়া বলা হয়েছে, "যৎকিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজম্"—মনু যা কিছু বলেছেন, তাই ঔষধতুল্য। এই সব বচনের উপর নির্ভর করে রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষিগণ সহমরণ প্রথার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' পুস্তিকায় রামমোহন বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রামাণ্যরূপে উপস্থাপিত করে প্রমাণ করেছেন যে, সহমরণ বিধি শাস্ত্রে অনুপস্থিত এবং যা কিছু বর্তমান তা ভ্রমকল্পিত। রামমোহনের এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে 'সমাচারদর্পণ'-এর সম্পাদক লেখেন—

'সহমরণ।— কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে, সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।'

উইলসন সাহেবও রামমোহনের মতকে সমর্থন করেন এবং তাঁর যুক্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের নাম—

"On the supposed vaidic authority for the Burning of the Hindu widows and on the funeral ceremonies of the Hindus."

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি স্বাভিমত ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে—

"I had occassion to notice some very remarkable passages in one of the Suktas or Hymns of the Rick, relating to the disposal of the dead, and especially to the burning of the widows, for which the hymn in question was always cited as authority.....

I have since examined the passages more deliberately and propose now to offer to the society the conclusions which I have deliberately formed, namely, that the text of the Rgveda cited as authority for the burning of the widows enjoins the very contrary, and directs them to remain in the world."

১৮৯১ খৃস্টাব্দে Friend of India নামক সাময়িকপত্রে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই সহমরণ প্রথার অস্তিত্ব খণ্ডন করেন—

"After persuing many works on this subject the following are my deliberate and digested ideas : Vishnoo Moone and various others say, that the husband being dead, the wife may either embrace a life of abstinence and chastity, or mount the burning pile ; but on viewing the whole I esteem a life of abstinence and chastity, to accord best with the law ; the preference appears evidently to be on that side, Vyasa, Sungkoo, Ungeera, and Hareeta speaking of a widow's burning, say, that by burning herself with her husband she may obtain connubial bliss in heaven ; while by a life of abstinence and chastity, she attaining sacred wisdom, may certainly obtain final beatitude. Hence to destroy herself for the sake of a little evanescent bliss, cannot be her duty : burning is for none but for those who despising final beatitude desire nothing beyond a little short lived pleasure. Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act, and a life of abstinence and chastity as highly excellent...."

উইলসন-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি দেখিয়ে রাধাকান্তদেব বাহাদুর বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তুলে প্রমাণ করেন যে, বেদে সহমরণ বা অনুমরণ বিধি প্রচলিত ছিল। তাঁর অভিমত এই যে, বৈদিকযুগে প্রচলিত না থাকলে পরবর্তী যুগে স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে এই প্রথার বিস্তৃত উল্লেখ থাকা সম্ভব নয়।

প্রায় ২ হাজার বছর আগে গ্রীক ভাষায় রচিত ভারতবর্ষের সতীদাহ প্রথার একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে বয়সেস্ নামে জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত ঐ কবিতার একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'বিশ্বকোষে' ধৃত ঐ কবিতার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখযোগ্য—

"Happy the laws that
in those climes obtain.
Where the bright morning
reddens all the main,
There, whensever the happy
husband dies,
And on the funeral couch
extended lies,
His faithful wives around
the scene appear,
With pompous dress
and a triumphant air ;
For partnership in death
ambitions strives,
And dread the shameful
fortune to survive,
Adorned with flowers the
lovely victims stand,
With smiles ascend pile,
and light the brand !
Grasp their dear partners
with unaltered faith,
And yield exulting to the
fraguant death."

এই সব বিভিন্ন শাস্ত্রোক্তি দেখে এ কথাই মনে হয় যে, সে যুগে সহমরণ বা অনুমরণ প্রথা একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। অবশ্য এই প্রথা যে বাধ্যতামূলক ছিল না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রামমোহন রায় প্রমুখ যে এ প্রথার অনস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন তা' বিশেষ যুগপ্রয়োজনের তাগিদে। শাস্ত্রাদিতে এই প্রথা সম্বন্ধীয় যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে এটি যে ঐচ্ছিক ছিল তা বোঝা যায়। আবার যাঁরা সহমরণে যেতেন না তাঁদের জন্যেও শাস্ত্রে কয়েকটি বিধিনিষেধ ছিল।

'যিনি সহমরণ না করিবেন, তিনি স্মরণ, কীর্তন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জন করিবেন। তাঁহার পক্ষে প্রতিদিন একাহারী হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন কর্তব্য। যদি কোনও বিধবা স্ত্রী পর্যঙ্ক বা খট্টায় শয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বামী অধঃপতিত হয়। ঐ বিধবা রমণী প্রতিদিন তিল ও কুশোদক দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবেন। কিন্তু তর্পণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, যাহার পুত্র ও পৌত্রাদি নাই তাহারই পক্ষে তর্পণ করিতে হইবে। অন্যের পক্ষে নহে।'

॥ আট ॥

রাতে শুতে যাবার আগে দাওয়ায় বসে গড়গড়া টানছিলেন পীতাম্বরবাবু। কল্যাণী এসে দাঁড়ালো পাশে।

কি গো গিন্নী, এ সময়ে এখানে। আবার গয়না-টয়না চাই না কি কিছু?

সে কথার জবাব না দিয়ে বলল কল্যাণী, ডোমন্নার মায় শরীর খারাপ হয়েছে। বলে পাঠিয়েছে আজ আসবে না শুতে।

বেশ তো।

কামিনীর কাছে তাহলে আজ আমিই শোব।

কেন?

ছেলেমানুষ ভয় পাবে না।

আমি একা ঘরে থাকলে ভয় পাবো যে আবার। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন পীতাম্বরবাবু। তুমি না থাকলে চলে কি, বুড়ো বয়সের সংসার।

রতন তাহলে আজ না হয় থাকুক ওর কাছে। শেষ অবধি আর না পেরে বললে কল্যাণী।

তা কি হয়, অত টাকার মাল রয়েছে অফিস ঘরে। আচ্ছা তোমাদের দু'জনের পাহারা না হয় আমিই দোব আজকে। পীতাম্বরবাবু বললেন হাসতে হাসতে।

৯

ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে মন্থরগতিতে গরুর গাড়ী এগোচ্ছিল।

আজ ৩০শে আগস্ট, উনিশশো উনষাট সাল।

সেই চিরপরিচিত পথ দিয়ে তেমনি আস্তে আস্তে চলছে হরিবল্লভের গাড়ী। না হরিবল্লভ এখনও মরে নি, মরে নি তার বলদ দু'টোও।

আমাদের তাহলে ছেড়ে চললেন বড়বাবু, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলল হরিবল্লভই। বললো, ভালো মানুষের জায়গা নেই কেশবপুরে।

মণিময়ের মনের নিস্তব্ধতা ভাঙলো যেন।

এই পথ দিয়ে কতবার গেছে এসেছে, দিনে রাতে বিকেলে, সকালে, সন্ধ্যায়। কিন্তু এবারের যাওয়া যেন আর সববারের থেকে পৃথক। এবারে যাওয়ার মধ্যে ফিরে আসার আর যে প্রতিশ্রুতি নেই।

কেশবপুর একটি গ্রামের নাম। পশ্চিম বাঙলার শত শত অজানা গ্রামের মতো এও একটি গ্রাম। যে

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

আশীষ বসু

গ্রাম মণিময়ের জীবনের এক অধ্যায়। এখানে সে কিঞ্চিদধিক তিনটি বছর কাটিয়ে গেল। জীবন তো তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়া, তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া, ভাবছিল মণিময়। সেই সামান্যমাত্র জীবনের তিনটি বছর সে রেখে গেল, একটি গ্রামে, যে গ্রামটি সে এইমাত্র পেছনে ফেলে এল।

রাত এগারোটার সময় কেশবপুর ছেড়েছে মণিময়। ইচ্ছা করেই সে বেরিয়েছে রাতে। ভোর তিনটেয় ট্রেন ধরবে হরিহরপুরে। সাড়ে ছ'টায় শেয়ালদা। সওয়া ন'টায় ট্রেন, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস। দার্জিলিঙের ফুলবাজার বুকে বদলি হয়েছে সে।

মন্থরগতিতে গাড়ী চলছিল। অন্ধকার রাত। বাইরে এক আকাশ তারা। কৃষ্ণপক্ষের রাত, আকাশে চাঁদ নেই।

রাতের আঁধারেই কোয়ার্টার ছেড়ে হরিহরপুরের পথ ধরেছিল। যখন বেরোল তখন সারা কেশবপুর ঘুমিয়ে পড়েছে। যেখানে হাট বসে সোমবার আর বৃহস্পতিবারে সেখানে দুটো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে একপাশে। পর পর কয়েকটা দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে জনকয়েক গাঢ় ঘুমে অচেতন। গরম পড়েছে ক'দিন। গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে। বাইরে শুয়েছে তাই।

ডাক্তার নিবারণ হালদারের চেম্বার বন্ধ। বাইরে বড় তালা ঝুলছে তিনটে। বাতিকগ্রস্ত ডাক্তার সব সময়ে চুরির ভয়ে সন্ত্রস্ত।

গঙ্গাধরবাবুর আখের গদি, ত্রিলোচনবাবুর তেলের ঘানি অন্ধকার। তার পাশ দিয়ে নিঃশব্দে চলে এল গরুর গাড়ী। বাজারের রাস্তা পার হয়ে এসে গাড়ী ঢুকলো বাঁ-হাতি। সামনেই পীতাম্বরবাবুর আফিস আর গুদাম। চা-আর বিস্কুটের ছোট্ট দোকানটা, মণিহারী জিনিষের একমাত্র প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি লেখা সাইনবোর্ডসহ পেছনে পড়ে রইলো পরিচিত 'মালতী স্টোর্স।' শৈলেশ্বরবাবুর বাড়ীটা পার হয়ে গেল। ঘুমন্ত কেশবপুর রইলো পেছনে পড়ে। মণিময় চলে গেল।

গ্রামের বাইরে বিল, ধান-জমি বিঘের পর বিঘে জুড়ে। তারই বুক চিরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে কেশবপুরে ঢোকবার মুখেই পরপর সরকারী হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদির অর্ধসমাপ্ত গৃহসমূহ।

মণিময় কেশবপুর ছেড়ে এল।

হরিবল্লভের কথার জবাব দিল মণিময়, সরকারী চাকরীতে জায়গা বদল তো একটা নিয়মিত ব্যাপার।

চুপ করে গেল হরিবল্লভ।

মনভর্তি যেন চিন্তা। স্মৃতিভর্তি যেন মানুষ। জীবনের একটা অধ্যায়কে মণিময় পেছনে ফেলে যাচ্ছে।

মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের বিদ্যুৎবাহী তার। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানে খুঁটির পর খুঁটির সার যেন ওই দূরে যেখানে ঐ বড় তারাটা জ্বলছে দপ্‌দপ করে সেখানে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে।

পার হয়ে গেল মুন্সীগঞ্জের হাট, দূরে দেখা যায় নখুরে, কোটুরে পাশাপাশি দুই গ্রাম। লক্ষহীরা আর কোটিহীরা, দুই যমজ ভগিনীসমা।

এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছেন লর্ড ক্লাইভ তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে।

মন্থরগতিতে গরুরগাড়ী চলছিল। এখন রাস্তা অনেকটা সমতল। গাড়ীর আওয়াজটা তাই অনেক কম। গাড়ীর সামনে খড়ের বিছানায় বালিশ পেতে আধশোয়া মণিময়। পেছনে জমা করা বাক্স, বিছানা, সুটকেশ, কটা ব্যাগ আর খুচরো যাবতীয় জিনিষ।

মণিময় চলে গেল বদলী হয়ে।

২

পাশাপাশি দু'খানা ঘর ওপরে আর নীচে সমান সাইজের। ঘরের সামনে সংলগ্ন দরদালান, ঘরের সমানই চওড়া। বাইরে বারান্দা দিয়ে সামনে বাঁয়ে এগোলে বৈঠকখানা, সামনে উঠোন।

বৈঠকখানা ঘরে শোয় চাকর রহমত, পীতাম্বরবাবুর অনেক দিনের পুরোনো আর বিশ্বস্ত লোক। পীতাম্বরবাবুর সঙ্গেই এসেছিল কেশবপুরে। পীতাম্বরবাবুকে বলতে শোনা যায় মাঝে মাঝে, ওই রহমতই আমার মা-বাপ, ওই মানুষ করেছে আমায়।

বৃদ্ধ রহমত সোজা হয়ে চলতে পারে না কিন্তু টুকটুক করে সব কাজই করে। কানে কম শোনে তাই তার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। বলে ঐ বাবুই আমার সব, ও আমার বাপ-মা। ওকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।

গড়গড়া ছেড়ে রহমতকে ডাকলেন পীতাম্বরবাবু। বাড়ীর দরজা বন্ধ করার ভার তার। ভিতরের দরজার কড়ায় অন্দর তালা লাগাতে হবে রহমতকে। তারপর চাবী নিয়ে দোতালায় উঠবেন পীতাম্বরবাবু।

৩

গরুর গাড়ীটায় আবার আওয়াজ উঠছিল।

মণিময় ভাবছিল, চামেলী মরে গেল। চিঠিতে শ্যামলী লিখেছে বিস্তারিতভাবে সবকিছু। পাশে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের কেসে সাজানো মদের বোতল, সোডা গ্লাস আর সব সরঞ্জাম। একটা বোতল টেনে বার করলো সে। মণিময় ভাবছিল, সেও মরে গেছে।

●

মেঘমালার চিঠি এসেছে। মাকে তাই পড়ে শোনাচ্ছিল প্রীতিময়।

মেঘমালা লিখেছে, দার্জিলিঙের একটা বছরকে যদি তুমি ভাগ করো মা তাহলে দেখবে শীতকালটা এখানকার বৃদ্ধাবস্থা। যখন মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন তার গতি হয় শ্লথ, যখন তার সকাল হয় দেরীতে, রাত হয় অতি সত্বর। আর তার যৌবন হল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর যখন সমতলের লোক আসে এখানে। দোকানগুলোয় শুরু হয় ঝাড়পোঁছ। তখন এখানকার বাড়ীগুলোয় রঙ ফেরানো হচ্ছে, হোটেলগুলোর ফার্নিচারে দেওয়া হচ্ছে নতুন পালিশ। রাস্তাগুলো করা হচ্ছে তকতকে-ঝকঝকে, বাসগুলো সারানো হল, বদলানো হল যতো পুরোনো চাকা, অচল কলকব্জা।

হিলকার্ট রোডে নোংরা নেই একবিন্দু। লাডেনলা রোড, নেহরু রোডের দোকানগুলো পুরানো সওদা বার করে মুছে সাজাচ্ছে শো-কেসে। কেউবা নতুন সওদায় ভরে তুলেছে আলমারী। চারিদিকে যেন সাড়া পড়ে গেছে। সকলে বুঝছে, লোক আসছে দার্জিলিঙে—সেই সব লোক যাদের পকেটে অনেক টাকা। যারা আসছে তা দু'হাতে ছড়াতে।

৩

কল্যাণী কলকাতাকে ভয় করে। ওর কাছে সহর কলকাতা একটা অতিকায় রাক্ষসের মত ভয়ঙ্কর। লম্বা লম্বা রাস্তা, তাদের কেশবপুরের হাট বসে যেখানটায় তেমনি চওড়া। এত লম্বা যে তার শেষটা দেখা যায় না। সেই রাস্তার ওপর দিয়ে বাস যাচ্ছে একতলা, দোতলা যেন দৈত্যের মতো। রেলের মতো কেমন একরকম গাড়ী যাচ্ছে, যেখানে সেখানে থামছে আর লোক তুলছে তার নাম শুনেছে টেরাম্‌-গাড়ী। পেল্লায় পেল্লায় সব পাকা বাড়ী। রাস্তার দু'ধারে, কেশবপুরের জমিদারবাবুদের বাড়ীটা যেন তার কাছে কিছুই নয়।

কলকাতাকে ভয় করে কল্যাণী। ভয় করে নানা কারণে। এখানকার মানুষগুলোর ধারা যেন কেমন। বাবা বেঁচে থাকতে কলকাতা কেন গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরই দেখেনি কখনো।

পীতাম্বরবাবু তাকে নিয়ে এলেন সহরে দু'বছর আগে। বললেন, চলো কলকাতা দেখে আসবে। বড় ভারী সহর। মা কালীর মন্দিরে পূজো দেবে কালীঘাটে।

কলকাতাকে ভয় করে কল্যাণী। একদিন কি কারণে খাওয়া-দাওয়াটা বেশী হয়েছে বলে শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল তার, ঠাকুরমশাই একেবারে ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। পীতাম্বরবাবুকে কেশবপুরের সাধারণ লোকেরা ঠাকুরমশাই বলেই ডেকে থাকে।

কলকাতাকে ভয় করে কল্যাণী। ভয় করে কলকাতার অনেক কিছু। সামান্য শরীর খারাপ হোল কলকাতায় আর ডাক্তার কিনা এনে হাজির করলে হাজারো রকমের যন্ত্র, ওষুধ। কি এমন হয়েছিল তার যার জন্য হল তার রক্ত পরীক্ষা। তাকে যেতে দেওয়া হল না একদিন। তাকে অজ্ঞান করা হল। কি সব জানি কাটাকুটি করলো ডাক্তার দু'জনে মিলে। কতবার যে ছুঁচ ফুঁড়লো তার শরীরে ইনজেকসন দিতে তার ঠিক নেই। শুয়েই রইলো ক'দিন একটানা। উঠবার হুকুম নেই। শরীরটা কেমন

কমজোর হয়ে গেল। হাঁটতে গেলে ব্যথ লাগে তলপেটে পায়ের গিঁটে। চোখের কোলে রক্ত নেই, মুখখানা কালি মাখানো। বমিই হোল কতো। সবসময় মনে হোত কিসে যেন তার নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে দিচ্ছে।

মনে আছে, কলকাতা থেকে ফিরে আসার সময় ঠাকুরমশাই বারণ করে-ছিলেন অসুখের কথা কাউকে জানাতে। বললেন, ভারী খারাপ ব্যামো হয়েছিল তার। যদি কেউ জানে তো তাকে ছোঁবে না আর।

কাল ঠাকুরমশাই বলেছেন, কামিনীকে নিয়ে যাবেন কলকাতায়। কলকাতাকে ভয় করে কল্যাণী। না, সেখানে কখনো যেতে দেবে না কামিনীকে। কালীঘাটের কালী মাথায় থাকুন।

কলকাতার কথাটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কল্যাণী।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল আচমকা। পাশ ফিরে বুঝতে পারলো পীতাম্বরবাবু নেই বিছানায়। ভাবলো নিশ্চয়ই বাইরের বারান্দায় পায়চারী করছে বা নীচে নেমে দেখে আসতে গেছে শোলার টুপীর গুদামটা। টাকার মা মায়া লোকটার।

পাশের ঘরে কামিনী একা শুয়ে। ভোমরাব মা পীতাম্বরবাবুর বিশেষ স্নেহভাজন। কামিনীর কাছে শোয় এসে রাতে। তিনকুলে কেউ নেই তার তবু স্বামীর বসতবাড়ীটা আগলে পড়ে আছে এখানে। কল্যাণী উঠলো বিছানা ছেড়ে। ভাবলো একবার দেখে আসবে কামিনীকে।

দোতলার দরদালানে পা দিয়ে কামিনীর ঘরটার কাছাকাছি আসতেই একটা চাপা কথাবার্তা কানে এলো তার, এল গয়নার আওয়াজ, শাড়ীর খসখস শব্দ।

কামিনী বলছে আর্তস্বরে, ঠাকুর-মশাই আপনার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিন আমায়। দয়া করুন।

কথার মাঝখানে কেউ তাকে যেন থামিয়ে দিল।

খুব অল্পকালের জন্য যেন মৃদু ধস্তাধস্তির একটা আওয়াজ এল কানে।

তারপর আস্তে আস্তে থেমে গেল সব। শুধু মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল কারো একটানা নিঃশ্বাস ফেলার ভারী ভারী আওয়াজ, আর অতি মৃদু একঘেয়ে কাতরোক্তি—সঙ্গে পুরোনো খাটটা নড়ার সামান্যতম আওয়াজ।

কল্যাণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দায়।

কলকাতায় যেতে হবে কামিনীকে বুঝলো কল্যাণী। সেও গেছিল, কামিনীও যাবে। সেও মরেছে, কামিনীও মরল।

●

মণিহারী ঘাট থেকে গাড়ী ছেড়েছে রাত দশটায়। কাটিহার পার হলো যখন তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো বারোটা বেজে পঁচিশ। অনেক লেটে যাচ্ছে ট্রেনটা।

প্রথম শ্রেণীর চার বার্থের চারটি বার্থই ভরতি। ওপাশে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক, সঙ্গে একটি বাচ্চা।

এ পাশের গাড়ীতে নীল আলো নেই তাই সবগুলো বাতি নিবিয়ে ঘরকে করা হয়েছে অন্ধকার।

মনটাও যেন চাইছিল অবসর আর চিন্তাগুলো চাইছিল এমনি অন্ধকারময় পরিবেশ। কল্যাণীর কথা ভাবছিল মণিময়, ভাবছিল কামিনীর কথা, চামেলী শ্যামলীর কথা, কেশবপুরের কথা, মেঘমালার কথা। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, গাড়ীর একটানা আওয়াজ, কামরার ভেতরের অন্ধকার সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ।

একটার পর একটা সিগারেট পুড়-ছিল মণিময়ের হাতে।

কিসের এই অভিমান তার, ভাবছিল মণিময়। কেন এই জীবনকে স্বেচ্ছার অপচেষ্টা। জীবন তো অফুরন্ত নয় যে তাকে নিয়ে অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাটিয়ে দেওয়া যাবে কাল। তাহলে, তাহলে জীবন কি? জীবন একটা কম্প্রোমাইজ, একটা মেনে নেওয়া। ওই পাশের বার্থের ভদ্রলোক কেমন নিশ্চিতভাবে জীবনকে মেনে নিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বেড়াতে চলেছেন বিদেশে। কিন্তু যারা তা মানে নি তারা কি হেরে গেল? হেরে কি গেল চামেলী? কল্যাণী, কামিনী যে জীবনের সঙ্গে বাধ্য হয়ে কম্প্রোমাইজ করলো তারা বাঁচলো কি?

সারা জীবনটাই যন একটা মস্ত বড় জুয়াখেল মনে হল মণিময়ের, শুধু রঙের সঙ্গে যেন রঙ মেলানো। এক, দুই, তিন সাজিয়ে তিন তাস ফ্লাসে জেতার মতো। সেই রঙে রঙ মেলাবার খেলায় যার হাতে রঙের তাস এলো না তার শুধু কম্প্রোমাইজ, শুধু যেন তাস ফেলে ফেলে যাওয়া আশায় আশায়। যে তা পারলো না সে হারল। সে হাতের তাস ছিঁড়ে কুটি কুটি করলো। যে ওস্তাদ খেলোয়াড় সে শুধু খেলালো আর একজনকে, শুধু জমা করলো তার ঘরে টাকা, সিকি, আনি, দুয়ানী।

শুধু সাহেব, বিবি, গোলামের মালা যার হাতে সে তো ভাগ্যবান। কপালে সে রাজটীকা নিয়ে জন্মেছে, হাতের তাস চিৎ করেই তো তাদের জিত অনিবার্য। এরা ছাড়া জীবনযুদ্ধে আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা শুধু জমানো পয়সা ছুঁড়ে গেছে সারা জীবন হাতের তাস চিত না করে। শুধু আশায় আশায় জমিয়ে গেছে বাজী। অন্ধের মতো পাওনা ছুঁড়ে দিয়েছে। তারপর হাতের তাস চিৎ করে পেয়েছে দুরি, তিরি, নহলা, আটা। সমাজে তারাও আছে। বার বার তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে তবু আবার খেলায় বসেছে তারা। আবার হেরেছে।

কিন্তু জীবনটা তো অফুরন্ত নয়, ভাবছিল মণিময়, যে শুধু বাজী রেখে রেখে পরখ করা যাবে তাকে। যে সারা জীবন শুধু হারলো সে কি পেলো। কি পেল চামেলী, সাধনা, কামিনী, কল্যাণী? কি পেলেন পীতাম্বরবাবু, গঙ্গাধরবাবু, আবদুল হোসেন, ত্রিলোচন দত্ত?

নুর মহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

মাঘ, ১৩৭৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বৃটিশ বৈদেশিক ও কমনও
সচিব মিঃ মাইকেল স্টুয়ার্টকে স্বাগত জানাচ্ছেন

সি পি এম-এর রাজ্য সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে মুজাফফর আ
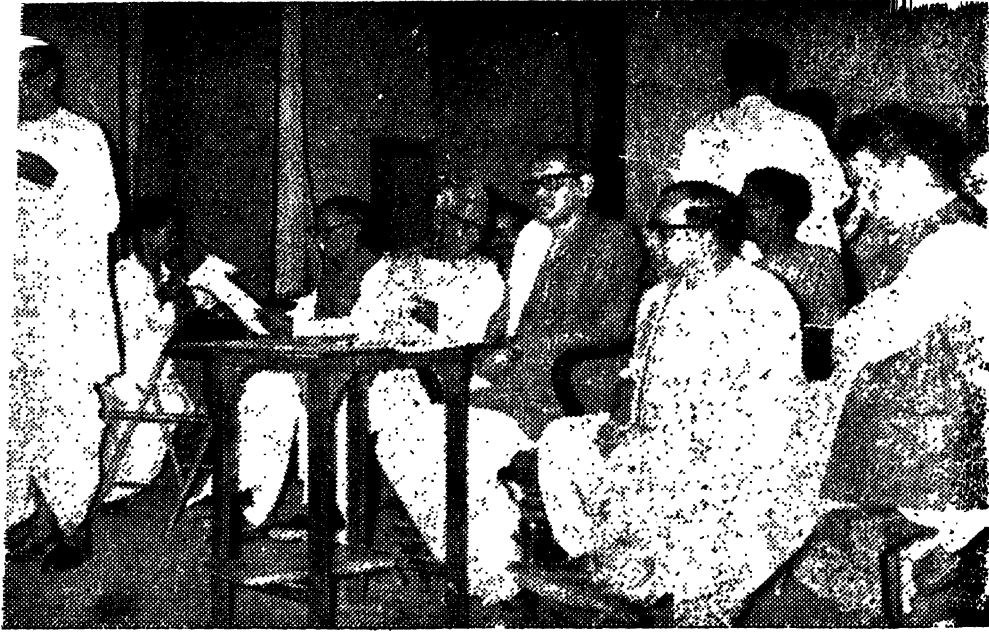
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যুক্ত কৃষক কনভেনশনে ভাষণরত শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার

ক সীমান্তের একজন জওয়ান প্রিয়জনদের চিঠি লিখছেন

রাজস্থানের দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলের মহিলাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে শিক্ষায়তনে পুলিশের প্রবেশ সম্পর্কে আলোচনায় উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন, অধ্যাপক প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ

ভারতের সংবিধান রচনা শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

মাসিক বসুমতী, মাঘ / '৭৫

দিল্লীতে সেক্রেটারী পর্যায়ে ফরাক্কা সংক্রান্ত পাক-ভারত বৈঠকে পাক প্রতিনিধিদলের নেতা জাফরী ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীমাথরানী

ফ্ল্যাটে কোন জীবনের প্রতিচ্ছবি ধরা আছে? অসুস্থ শ্যামলীর জীবনে রঙের তাস কখনো মিলবে না, কোনও রাজপুত্তুর এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ভাঙ্গাবে না তার ঘুম। জীবনের খেলায় রঙের তাস মলাতে পারলো না সাধনা, কল্যাণী, কামিনী। তারা শুধু দুরি, তিরি, নহলা, আটার খেলা খেললো। শুধু মেনে নিল যা ঘটল তাকে। চামেলী হাতের তাস ছিঁড়ে কুটি কুটি করলো। স মরলো। পীতাম্বরবাবু, আবদুল হোসেন, গঙ্গাধরবাবু, ত্রিলোচন দত্ত তারাই কি পেলেন ট্রাম্প? মণিময় কি শুধুই 'ব্লাইণ্ড' খেলে গেল সারাজীবন হাতের তাস চিত না করে!

তাহলে জীবন কি? তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়াই কি জীবন? বেঁচে থাকাটা কি জীবনের পরমায়ু?

মিটার গেজের লাইনের ওপর অন্ধকারের বুক চিরে অতি দ্রুতগতিতে ... যাচ্ছিল ট্রেনটা। লোট ... করছে।

বাইরে মিশকালো অন্ধকার। অন্ধকার কামরার ভেতরে। অন্ধকার মণিময়ের ...

নিঃশব্দে আর একটা সিগারেট ধরালো মণিময়।

৩

পনরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শো উনষাট ... নতুন জায়গায় এসে কাজে যোগ- ... মণিময়। চিঠি লিখলো বাড়ীতে ...দিন পরে, টাকা পাঠালো টেলিগ্রাম ...অর্ডার করে।

বিকেলে পোস্টাফিস থেকে ফেরবার পথে একখানা খবরের কাগজ কিনলো মণিময়। প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বোলাতেই বড় বড় হরফে চোখে পড়লো সেদিনকার সবচেয়ে বড় সংবাদ, কলকাতায় লক্ষাধিক জনতার খাদ্য মিছিল। এ মিছিল মহানগরীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ, কয়েকজন হতাহত ইত্যাদি।

লাডেন লা রোড আর নেহরু রোড গিয়ে মিশে গেছে ম্যালে। ওপাশে গভর্ণরের বাড়ী, এপাশে চৌরাস্তা, পার্ক। চৌরাস্তায় সার সার বেঞ্চিপাতা তাতে অনেক মানুষের ভিড়। রঙদার শাড়ী, চটকদার জামা-কাপড়ের মিছিল। একপাশে ঘোড়া পাওয়া যাবে, ভাড়া ঘণ্টা হিসাবে। আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। ওপাশে রাস্তা নেমে গেছে স্টেপ এ্যাসাইডে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি যেখানে রয়েছে সুরক্ষিত। অন্যপাশে দোকানের সার। সেখানে আছে অক্সফোর্ড কোম্পানী, লেখরাজ কোম্পানী আরও অনেক। মাঝখানে বার্চহিলকে ঘিরে দুভাগ হয়ে গেছে ম্যাল। ম্যাল রোড ইস্ট আর ম্যাল রোড ওয়েস্ট। তারই পাশে দার্জিলিঙের আবাসিক ক্লাব জিমখানা।

শাড়ীর মিছিল নেহরু রোডে। পাশের রেস্তোরাঁগুলো যেন হাসছে। সমতলের লোক আসছে পাহাড়ে।

নেহরু রোডের পাশের একটা ছোট রেস্তোরাঁর দোতালায় জায়গা নিয়েছে মণিময়। খাবার বানিয়ে দেয় রেস্তোরাঁর মালিক একটি পাহাড়ী মেয়ে। সকালে বাজারে তরকারীর দোকান দিয়ে বসেন ওর মা। মেয়ে থাকে রেস্তোরাঁয়। বিকেলে মা নিজেই বসেন এখানে।

কাঠের পার্টিশন করা ঘর। ওপরে একখানি বড় ঘরকে দু'ভাগ করা, একটিতে থাকে মা, মেয়ে। তলায় বড় ঘর একখানা ওপরের ঘরের সাইজের, তাতে রেস্তোরাঁ। পেছনে একটু জায়গায় উনোন আর কাপ প্লেট ধোয়ার স্বল্প পরিসর স্থান।

নেহরু রোডে রঙের মিছিল। রঙের মিছিল গান্ধী রোডে, লাডেন লা রোডে, চৌরাস্তায়। হোটেল, রেস্তোরাঁয়, ম্যালে।

খবরের কাগজটার দিকে তাকিয়েছিল মণিময়। আজকের সবচেয়ে বড় সংবাদ, কলকাতার লক্ষাধিক জনতার খাদ্য মিছিল। এ মিছিল মহানগরীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ, কয়েকজন হতাহত।

সামনের একটি বড় রেস্তোরাঁ থেকে মাইক্রোফোনে কোনও একটি বিদেশী
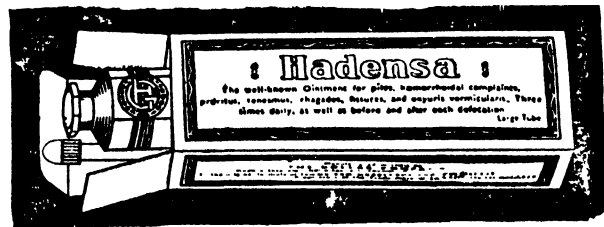
মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। একটু পরেই গান শেষ হলো। উপস্থিত সকলের হাততালির আওয়াজ পাওয়া গেল। রাস্তার ওপাশে বড় একটা হোটেলের বাগানে লাল, নীল, হলদে বেতের ডেক-চেয়ারগুলো বার করা হয়েছে। চারদিকে মরশুমী ফুল ফুটেছে, মধ্যে গোল টেবিল ঘিরে চেয়ার পাতা। বাগানে টেবিলের মাথায় খাটানো হয়েছে রঙিন বড় ছাতা।

সবাই হাসছে এখানে। ওপাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার লাল আভা প্রতিফলিত হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে সেই শোভা দেখছে কেউ। কারণে অকারণে সবাই হাসছে।

কেশবপুর, নর মহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের কলকাতার ফ্ল্যাট, দার্জিলিঙের লাডেন লা রোড, নেহরু রোড, চৌরাস্তা এইসব মিলিয়েই কি পৃথিবী? ভাবছিল মণিময়। সাধনা, চামেলী, কল্যাণী, কামিনী, শ্যামলী, মেঘমালা আর ঐ দূরের রক্তরঙ শাড়ী-পরা চমৎকার দেখতে মহিলা যিনি হোটেলের বাগানে দূরবীণ চোখে দিয়ে দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা দেখছেন এদের নিয়েই কি জীবন?

॥ নয় ॥

শীত এসে গেছে দার্জিলিঙে।

আজ ডিসেম্বরের পয়লা তারিখ। উনিশ শো উনষাট সালের পয়লা ডিসেম্বর। মেঘমালাদের স্কুলের ছুটি হয়ে গেল—মেয়েরা সবাই যে যার বাড়ী ফিরে যাবে, আজ, কাল, পরশুর মধ্যে। খালি হয়ে যাবে হোস্টেল। শিক্ষয়িত্রীরাও ফিরে যাবেন।

দার্জিলিঙের ডিসেম্বরে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য যে জিনিসটি তা হোল পরিষ্কার আকাশ আর রোদভরা দিন। কোনও মূল্যেও তার দাম নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

এখন বাজারে কমলালেবুর আমদানী হয়েছে। টাটকা মাখন নিয়ে আসছে দেহাতের পাহাড়ী লেপচা আর ভুটিয়া মেয়েরা। ভরিতরকারীর দাম গেছে কমে। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে এখন আর সব সময় কলকাতার ইলিশ আর গলদা চিংড়ী সহজলভ্য নয়। দাম পড়ে গেছে টমাটো আর গাজরের, বিট আর ফ্রেস বিনসের।

লাডেন লা রোডে আর গাড়ীর মিছিল নেই। চৌরাস্তায় আর লোক চলে না বিকেলে সাড়ে পাঁচটার পর। এপাশের ঘোড়া রাখার আস্তাবল শূন্য হয় সন্ধ্যে হতে না হতেই। অল্প রাত্রেই ম্যালের বেঞ্চিতে জড়াজড়ি করে দু'টো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শীতে কাঁপে ঠক ঠক করে।

নেহরু রোড, গান্ধী রোডে গাড়ীর আনাগোনা কমে গেল বিকেলের আলো কমতে না কমতেই। চৌরাস্তার মোড়ে বিটের কনস্টেবল ওভারকোট জড়াচ্ছে গায়ে, ঠিক করছে তার কান ঢাকা টুপী। রেস্তোরাঁর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, হোটেলের মালিকেরাও নীচে নামার তোড়জোড় করছেন।

ক্যুরিও শপগুলোতেও ভিড় নেই মোটেই। তাদের শো-কেস থেকে নিয়ন আলো খুলে রাখা হয়েছে। বাক্স প্যাঁটরায় বন্ধ হয়েছে গ্যাংটকের মুখোশ, কালিম্পংয়ের কাঠের কাজ, তিব্বতের নক্সী শাল, কাশ্মীরের কাজ করা ক্লোক, দার্জিলিঙের ঝুটোমুক্তোর কাচ মালা।

ডিসেম্বর, জানুয়ারী দার্জিলিঙের বৃদ্ধাবস্থা, ভাবছিল মেঘমালা। সবাই যেন পরিত্যাগ করে যাচ্ছে তাকে, এমন কি এখানকার অবস্থাপন্ন অধিবাসীদের অনেকেও। যেমন জরাগ্রস্তকে পরিত্যাগ করে সংসারের আর সবাই ঠিক তেমনি।

শীত আসতেই প্রজাপতিগুলো অবধি যেন চলে গেল অন্য কোনও দেশে। কই আর তো স্কুলের মাঠে, বাগানে হাজারে হাজারে আসে না ওরা পঙ্গপালের মতো? তারা এখন আর ঘরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ে না খাটের বিছানায়, টেবিলে, বুক কেসে।

যদি রোদ থাকে আকাশে তবু দিনগুলো মিষ্টি বলে মনে হয় আগের মতো। নচেৎ হাওয়া বইতে থাকে অবিরাম সাঁই সাঁই আওয়াজ করে ঝড়ের মতো বেগে। মেঘে আর কুয়াশায় ঢেকে যায় আকাশ। টিপ-টিপ করে যেন মেঘ গলে পড়ে আকাশ থেকে, মাথা ভিজে যায়, জুতোর মধ্যে পাগুলো ঠাণ্ডায় জমে সাদা হয়ে যায়, গায়ের চামড়া যায় কুঁচকে। সূতোর জামা যেন গায়ে নেই বলে মনে হয়, উলের জামা যেন ভিজে সপসপে।

রাতগুলো আরও দু:সহ। নীচে আর ওপরে কম্বল, লেপ চাপিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। খাটের নীচে বিজলীর হিটার জ্বালাতে হবে নয়তো ফায়ার প্লেসে আগুন ধরিয়ে রাখতে হবে সারা রাত।

কাঠের বাড়ী শতকরা নব্বুই ভাগ তবুও যেন ভিতরে হাড়ে কাঁপুনী ধরে। চা, জলখাবার, তরকারী ভাত নামাতে নামাতে ঠাণ্ডা। হিটারে ফুটতে ফুটতে হাতা করে পেটে খাবার দেয় সুগৃহিণী। কাচের জানলার বাইরে জল বাষ্প হয়ে জমে আবার গলে জল হয়ে যায়। সারারাত ধরে টিনের ছাদে হিম পড়ে বড় বড় ফোঁটায়। যেন বৃষ্টি হচ্ছে টুপ টাপ শব্দ করে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন এগিয়ে এসেছে বলে মনে হল মেঘমালার। কাঞ্চনজঙ্ঘা আর দার্জিলিঙ সহরের মধ্যে একগাদা পাহাড় পর পর সাজানো যেন ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে ওখানে। চিরতুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার পরিধি বাড়ে ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে। সামনের পাহাড়গুলো বরফে ঢেকে যায় একে একে। সাদা হয়ে যায় সব পাহাড়ের মাথাগুলো। ডাইনে বাঁয়ে যত পাহাড় দেখা যায় সব যেন সাদা মুকুট পরেছে মাথায়, হঠাৎ মনে হয় কাঞ্চনজঙ্ঘাই বুঝি এগিয়ে এলো।

স্কুলের সবাই চলে গেল একে একে। হেডমিস্ট্রেস মেঘমালাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যাবে না কলকাতায়?

না।

এই শীতে থাকবে এখানে। আমরা আছি কত বছর তবু সহ্য করতে পারি

না শীত। তুমি এসেছো নতুন কি করে থাকবে এখানে? জানো এখানে কত শীত পড়ে? এই দেখছো টেম্পারেচার ছয়-সাতে নেমে গিয়েছে ডিসেম্বরের শেষে বরফ পড়বে দেখো, কাপের মধ্যে চা জমে গিয়ে বরফ হবে।

সব জানে মেঘমালা। জানে আরও এগিয়ে আসবে কাঞ্চনজঙ্ঘা, এগিয়ে এসে দার্জিলিঙকেও টেনে নেবে তার কোলে। একদিন সকালে উঠে দেখবে বরফে ভরে গেছে চারদিক। জলের কলে জল পড়ছে না, পাইপ ফেটে গেছে বরফের চাপে। সব জানে, মেঘমালা তবু যাবে না কলকাতায়। কখনো না। শীতের দার্জিলিঙকে ফেলে যাবে না সে একান্ত স্বার্থপরের মতো।

জবাব দিল, আমি থাকবো এখানে কখনো দেখি নি বরফ পড়া, দেখবো এবার।

৩

মেয়েটির নাম ভায়োলেট। ভায়োলেট লেপচানী। দার্জিলিঙের কলেজ থেকে এবার পরীক্ষা দেবে ইণ্টারমিডিয়েট। এখন পড়ছে সেকেণ্ড ইয়ারে। আই-এ।

প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিল মণিময় পরে তার অদ্ভুত অধ্যবসায় দেখে মেয়েটিকে পড়াবার ভার নিল।

টাকাটা সেদিন ফিরে এসেছে। কলকাতা থেকে। টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার ডেলিভারী না হয় ফিরে এলো মণিময়ের কাছে। সঙ্গে ফিরে এলো চিঠিটাও। শ্যামলীর নামে পাঠিয়েছিল চিঠি আর টাকা, সব ফিরে এসেছে। ওখানে ও নামে কোনও লোক নেই।

কাচের জানলাটা দিয়ে দূরের কালো কালো পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়েছিল মণিময়। আর কাঁদছিল নিঃশব্দে। টপ টপ করে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল জল।

চামেলী তার টাকা নেয় নি, শ্যামলীও আর তার টাকা নিল না। ওরা কেউ আর নেবে না তার টাকা। কি করবে সে? কালকের প্লেন কি ধরবে মণিময়? নেমে যাবে বাগডোগরায়, সেখান থেকে উড়ে যাবে দমদম, কলকাতা? কিন্তু বিরাট কলকাতায় কোথায় সে সন্ধান করবে শ্যামলীর, মল্লিনাথের, ইন্দ্রনাথের, আর তার মায়ের? কে তাকে খবর দেবে নুর মহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা উঠে গেল কোন লেনে, কত নম্বরে, কোন তলার আর এক অন্ধকূপে।

কাঁদছিল মণিময়। টেবিলের ওপরে ছড়ানো দশ টাকার দশখানা নোট। চিঠিখানা পড়ে আছে আধখোলা অবস্থায়। কখন ঘরের মধ্যে নেমে এসছে অন্ধকার। উঠে আলোটাও জ্বালতে ইচ্ছে হয়নি তার।

চামেলী মরে গেছে। লিখেছে শ্যামলী, দিদি কলকাতায় গিয়ে বমি করবার চেষ্টা করতো দিনরাত। বলতো যে বিষ খেয়েছে সেটা তুলে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন বিষ খেলো চামেলী? কেন খেলো?

সামনে নেহরু রোড, লাডেন লা রোডের লোক যাচ্ছে আর আসছে। চৌরাস্তার মুখে এসে গাড়ীগুলো সজোরে ব্রেক কষছে, নামাচ্ছে সওয়ারী আবার ব্যাক করে দাঁড়াচ্ছে গিয়ে স্ট্যাণ্ডে। ম্যালে গাড়ী যাবার হুকুম নেই।

রাস্তার ওপারে রেস্তোরাঁ আর হোটেলগুলোয় লোক ঢুকছে, বেরোচ্ছে, মৃদুস্বরে ভেসে আসছে বাজনার আওয়াজ, কেউ গান গাইছে মিহিসুরে, কাঁটা, চামচ, প্লেটের টুং-টাং আওয়াজ কান পাতলে যেন শোনা যাবে।

ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে অন্ধকার। অন্ধকার মণিময়ের মনে। চামেলী মরে গেল, শ্যামলীরা হারিয়ে গেল কোন এক অজানা দুনিয়ায়, মেঘমালার কোনও খবর নেই আজ এক বছর। সাধনা মরে গেল, মরে গেল কল্যাণী, কামিনী। পীতাম্বরবাবু, আবদুল হোসেন, গঙ্গাধরবাবু, ত্রিলোচন দত্ত সবাইকে নিয়ে কি মরে গেল কেশবপুরও? মরে গেল কি সে নিজেও?

চুপি চুপি কাঁদছিল মণিময়। নুর মহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের যে ছেলেটি বড় জানলাটার ওপর বসে রাস্তার দিকে চেয়ে নিজের আদর্শবাদ ছকেছিল মনে মনে সে মরে গেল। মণিময় কাঁদছিল। আধপোড়া সিগারেটটা পুড়ছিল টেবিলের ওপরে রাখা ছাইদানে। পাশে হুইস্কীর খোলা বোতল আর গ্লাস তেমনি পড়ে রইলো।

ভায়োলেট এসে ডাকলো। বাতিটা জেলে দিল অন্ধকার ঘরের। সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল আলোটা।

রাত গড়িয়ে নটা, খাবার নিয়ে এসেছে ভায়োলেট।

মণিময়ের চোখের জলটা কি দেখেছিল ভায়োলেট?

সেদিন আর বলে নি কিছু, পরের দিন সকালে এসে নিঃশব্দে ভেজানো দরজাটা খুলে মণিময়ের সারা ঘরটা গোছালো ভায়োলেট। বিদেশে থাকে লোকটা একান্ত একলা আর থাকে এমনি অসহায়ের মতো। খেতে দিলে খায় তাও ফেলে ছড়িয়ে। অফিস থেকে ফিরে এসে জামা কাপড়গুলো ছড়িয়ে ফেলে এধারে ওধারে আবার সেখান থেকে তুলেই পরে যায় তা পরের দিন। সারা ঘরময় শুধু সিগারেটের টুকরো আর ছাই, খবরের কাগজ জড়াজড়ি করে পড়ে খাটের নীচে, হোলডওলটা একপাশে অযত্নরক্ষিত। নেহাত ধুলো বালি নেই এখানে তাই নষ্ট হয়নি। সুটকেশের চাবি দিতে কখনো দেখে নি লোকটাকে। ধোপা বাড়ীর কাচানো জামাগুলো মিলিয়ে দেবেও না, নেবেও না। কেউ কি নেই লোকটার? কোনও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কোনও ছবিও দেখে নি সঙ্গে।

গুছিয়ে রাখলো টেবিলটা, ঘরটাকে সাফ করলো ঝাঁটা দিয়ে, কাপড় চোপড়গুলো গুছিয়ে তুললো আলনায়, খবরের কাগজগুলো টেনে নামালো একপাশে ভাঁজ করে রাখলো তা। ও ঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে আনলো একটা ফুলদানী তাতে লাগালো কয়েকটা মরশুমী ফুল।

চায়ের পেয়ালা হাতে দেখা দিল

আবার একটু পরেই। পা গুটিয়ে পিছন ফিরে হাঁটু দুটো ভাঁজ করে লেপটাকে কান অবধি টেনে অন্ত বেলাতেও শুয়েছিল মণিময়। শুয়ে শুয়ে বুঝছিল মণিময়—ভায়োলেট কাজ করছে। অনুভব করছিল মন দিয়ে। খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল নূর মহম্মদ লেনের বাড়ীতে তার মা খুব সকাল সকাল উঠে কাজ করতেন। কলে জল পড়তো ছড় ছড় করে, বাসন মাজার আওয়াজ হতো, কয়লা ভাঙতো কেউ হাতুড়ী পিটে পিটে। ফস করে দেশলাই জললো, স্টোভ ধরানো হচ্ছে। জলের কলটা এখন বন্ধ তবু টিপ টিপ করে জল পড়ছে। সব শুনতো সে ঘাড় গুঁজে শুয়ে।

চায়ের কাপ একহাতে ধরে অন্য হাতে খাটের গায়ে মৃদু আওয়াজ করলো ভায়োলেট। মণিময় দুষ্টুমী করে তবু শুয়ে। কেমন যেন ভালো লাগছে আজ।

টেবিলের ওপর ঠক করে নামিয়ে রাখলো কাপসমেত ডিসটা। তবু আওয়াজ নেই লোকটার। শেষে গায়ের লেপটায় আলতোভাবে হাত দিল ভায়োলেট।

হেসে পাশ ফিরলো মণিময়। হাসলো ভায়োলেটও।

তারপর থেকে ঘরদোর রোজই গুছিয়ে দেয় ভায়োলেট। খাবার নিয়ে আসে ঠিক সময়ে। হঠাৎ সেদিন একটা অঙ্ক নিয়ে এল মণিময়ের কাছে। মণিময় এক নিমিষে কষে দিল সেটা; বুঝিয়ে দিল জলের মতো।

সেই থেকে অঙ্ক নিয়ে প্রায়ই আসে ভায়োলেট, আসে বাঙলা নিয়ে, ইংরাজী নিয়ে।

সকাল বেলায় মণিময় চুপচাপ শুয়ে থাকে। জানে, ভায়োলেট আসবে। এসে গুছোবে ঘরদোর, টেবিলের ডেট ক্যালেণ্ডারটার তারিখ পাল্টাবে, টাইমপিসটার দম দেবে, ফুল পালটাবে ফুলদানীতে। চা নিয়ে এসে ডাকবে তাকে রোজকার মতো। অফিসে যাবার সময় সার্ট, জামাগুলো এগিয়ে দেবে, রঙ মিলিয়ে বেছে রেখে টাই আর রুমাল। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই আর মনিব্যাগ থাকবে যথাস্থানে।

মাঝে মাঝে অবাক বিস্ময়ে মণিময় তাকিয়ে থাকে তার দিকে। যেমনি গায়ের পাকা সোনা রঙ তেমনি নিখাদ মন। এক দেড় মাসের পরিচয়ে কেমন আপনার করে নিয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন, কেন তোমার নাম ভায়োলেট? কে রেখেছে এ নাম?

জলা পাহাড়ের দিকের এক স্কুলের একজন ফাদার নাকি ছোটবেলায় তাকে বড় ভালবাসতেন। তিনিই রেখেছেন এই নাম। ভায়োলেট বলেছিল, বাবাকে দেখি নি কখনো জ্ঞান হয়ে। মা-ই বড় করেছে আমাকে। স্কুলে পড়িয়েছে, কলেজে পড়াচ্ছে।

ভায়োলেটদের ছোট ঘরখানা দেখেছে মণিময়। সুন্দর করে গোছানো। সেখানে আর আর ছবির সঙ্গে রয়েছেন ক্রুশবিদ্ধ যীশু। ভায়োলেটরা খ্রীস্টান নয় তবু খ্রীস্টধর্মের প্রভাব তাদের জীবনে কম নয়।

দার্জিলিঙে অনেক জায়গাতেই এমন ঘটনা দেখেছে মণিময়। একথা অনস্বীকার্য যে মিশনারীগণের প্রভাব এদের জীবনে পড়েছে দীর্ঘদিন ধরে এবং তার ছাপ পড়ে গেছে এদের মনে।

মণিময়ের সুটকেশটায় কখনো হাত দেয় নি ভায়োলেট। সেদিন কথায় কথায় বললো মণিময়কে, এটা কি দেবো গুছিয়ে?

সেদিনটায় কিসের একটা ছুটি দুপুরে বাড়ীতে বসে একটা বই পড়ছিল মণিময়। জবাব দিল, কোনও কিছু গোছাবার আগে তো জিজ্ঞাসা করো না। এটার বেলায় যে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে?

কথার জবাব না দিয়ে সুটকেশটা খুললো ভায়োলেট।

বইটা মনযোগ দিয়ে পড়ছিল মণিময়। ভায়োলেট এসে দাঁড়ালো পাশে।

ভায়োলেট, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

কলম না, একটা কেন, একগোছা।

আমার মদের বোতলগুলো ছিল আলমারীতে সেগুলো গেল কোথায়?

আমি ফেলে দিয়েছি। ওসব ছাই পাঁশ খেতে পারবেন না। বৌদি এখানে নেই বলে কি কিছুই দেখবো না আমরা, যা খুশী করবেন।

বৌদি, অবাক হয়ে বাক্ ফেরালো, মণিময়, বৌদি আবার পেলে কোথায়।

হাতের আড়াল থেকে একটা ছবি বার করলো ভায়োলেট। বললো সুটকেশের মধ্যে পেয়েছি। তা লুকিয়ে রাখেন কেন অমন করে, টেবিলে রাখলেই তো পারেন। এই তো আমি রাখছি, দেখুন তো কেমন সুন্দর মুখখানা।

মেঘমালার ছবি। একটা ফটো ফ্রেমে এঁটে দিয়েছিল একবার।

মেঘমালা কিছুতেই ছবি তুলতে চাইতো না। বলতো, যা কুৎসিত চেহারা, ও আর ধরে রাখবে কে যত্ন করে।

না হয় চেহারাটা দেখতে একটু ভালই তা বলে অত গর্ব কেন মেয়ের, হাসতে হাসতে জবাব দিত মণিময়। কবিতা মিলিয়ে বলতো,

হে রাজকন্যে তোমার জন্যে,
গাঁথিয়া এনেছি পুষ্পহার
চমৎকার।

হো হো করে হাসতো মেঘমালা, মিললো না, মিললো না। কবিতার কি ছিরি, পুষ্পহারের সঙ্গে চমৎকার।

প্রসঙ্গ পালটাতো মেঘমালা। এড়িয়ে যেতো নানা অছিলায় কিছুতেই দিতো না ছবি তুলতে।

সেবারে আর পারলো না কিছুতেই। মণিময় বেঁকে বসলো, অতদূরে আমি কি নিয়ে থাকি বলতো। তোমাকে তো পাবো না অন্তত তোমার ছবি নিয়ে সময় কাটাবো।

কিছুতেই দেবে না মেঘমালা। শেষে মাথার দিব্যি, তাও না। শেষে বললো আর আসবো না তাহলে।

মেঘমালার মুখ এতটুকু—করুন ধরা গলায়, ঐতো জানে শুধু আসবো না, আসবো না, আর আসবো না। জানো

ক'দিন না এলেই আমি আবার লিখতে বসবো চিঠি। আমার মনটা জেনে গেছো তাই ভারী মজা হয়েছে তোমার না। ঠিক বুঝেছ যে ঐ কথা বললেই আমি নাচার।

সেই ছবিখানা দিয়েছিল মেঘমালা একখানা ফ্রেমে বাঁধিয়ে, টেবিলে রাখতে পারবে তো। জানি পারবে না, বলল একটু পরেই—সে সাহস নেই।

পারবো, পারবো। ঠিক পারবো। আচ্ছা দেখো ওখান থেকে চিঠি লিখবো তোমায়।

কিন্তু কি জানি কেন ছবিখানা টেবিলে রাখতে পারে নি মণিময়। স্যুটকেশের এক কোণাতেই ছিল পড়ে।

কেশবপুরে একদিন যখন পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল সব কিছু তখন কেমন করে জানি রয়ে গেছে ওটা একপাশে। হয়তো এড়িয়ে গেছে দৃষ্টি।

ভায়োলেট দাঁড়িয়েছিল টেবিলটার কাছে।

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো মণিময়, যার ছবি সে টেবিলে দেখলে ভারি সুখী হোত।

যার ছবি তাকে আমি চিনি।

তাকে তুমি চেনো না ভায়োলেট।

ভালো করে ছবিটার দিকে তাকালো ভায়োলেট। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেদিকে, নিশ্চয়ই চিনি। এ মুখ ভুল হবার নয়।

কোথায় দেখেছো একে, কলকাতায়।

না, এখানেই।

দার্জিলিঙে?

ঘাড় নেড়ে সায় দিল ভায়োলেট।

তুমি ভুল দেখেছো নিশ্চয়ই। আচ্ছা দেখেছো ক' বছর আগে।

ক'বছর নয়, কালই দেখেছি।

মেঘমালাকে দেখেছো এখানে। কোথায়?

সে কথার জবাব না দিয়ে বললো ভায়োলেট, ইনি কে হন আপনার বলবেন? হাসতে লাগলো মৃদু মৃদু।

কেউ না।

কেউ না, সত্যি বলছেন যার ছবি আপনার স্যুটকেশে সে আপনার কেউ না। হাসতে লাগলো ভায়োলেট।

কই বললে না তো কোথায় দেখেছো ওকে।

মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেলটা ছাড়িয়ে খানিকটা নেমে গিয়ে একটা রাস্তা উঠে গেছে দেখেছেন অন্য পাহাড়ের ওদিকে।

দেখেছি। তারপর।

ঐ রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে যেতে হবে আধ মাইল কি তার চেয়েও কিছু বেশী তারপর রাস্তাটা যাবে বাঁ-দিকে বেঁকে। রাস্তাটা সোজা নেমে যাবে এরপর। মনে হবে যেন অন্য একটা পাহাড়ের ধারে গিয়ে মিশেছে। সেই বাঁকের মুখে মিনিটখানেক গেলেই একটা মেয়েদের স্কুল। উনি কাজ করেন সেখানে।

নাম কি স্কুলটার।

সেণ্ট সোফিয়াস কনভেণ্ট।

●

মাউণ্ট এভারেস্ট যে দার্জিলিঙের এক নম্বর হোটেল সকলেই তা এক বাক্যে স্বীকার করবে। হোটেলের দুটো গেট। যদি ম্যালের দিক থেকে এগোন যায় তো সামনে পড়বে যে গেটটা সেটাকে বাঁ হাতে রেখে রাস্তাটা নেমে যাবে। এগিয়ে যেতে যেতে হোটেলের সীমানা যেখানে শেষ হবে সেখানে আর একটা গেট। সেই গেটের শেষ থেকেই উঠে গেছে রাস্তাটা। উঠে গেছে সোজা। সে রাস্তাটা এত উঁচু যে দার্জিলিঙের লোকেরাই এড়িয়ে চলে তাকে যতদূর সম্ভব। বাইরের লোক যারা এ পথে চলে তারা ঘোড়া নেয় নচেৎ রাস্তার পাশে ঘেরা লোহার রেলিঙ ধরে দু'পা চলে আর নিঃশ্বাস নেয় জোরে জোরে। এ পথে বড় চড়াই।

স্টেশন থেকে সোজা রাস্তাটা ধরে মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেলটার কাছে উঠে এল মেঘমালা।

বেলা গড়িয়ে একটা। শিলিগুড়ির শেষ ট্রেন ছেড়ে গেল বারোটা বেজে দশে। বিদায় দিয়ে এল স্কুলের মেয়েদের আর সব মিস্ট্রেসদের। বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছে সবাই। সামনে দীর্ঘ অবসর। সেই [illegible] শালে কেন খুলবে [illegible] শীতের ঠাণ্ডা তখন [illegible] হয়ে [illegible] কাঞ্চনজঙ্ঘা গুটিয়ে নেবে নিজেকে।

দ্রুত পায়ে অনেকটা চড়াই উঠে এসে হাঁপাচ্ছিল মেঘমালা। আস্তে আস্তে আস্তে এরপর বাঁ-দিকের রাস্তাটা ধরলো। আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড। যেতে হবে অনেকটা। এখনো আধ মাইলের বেশী। শীতের বেলা ফুরিয়ে যাবে এখুনি। আকাশের রোদ ঢেকে যাবে মেঘে আর কুয়াশায়।

●

জ্বরটা বাড়ছিল মণিময়ের।

মাথার কাছে চেয়ার পেতে বসে ভায়োলেট। ভায়োলেটের মা ডাক্তার ডাকতে গেছেন।

থার্মোমিটারের পারাটা ঝেড়ে নামিয়ে আলতোভাবে মণিময়ের মুখে ধরলো ভায়োলেট। বলল, দেখি একটু।

যেমন সেদিন ভিজে এলেন ঠাণ্ডায় এত করে বললাম মাথায় একটা টুপী দিয়ে যান, কিছুতেই শুনলেন না তো আমার কথা। মাথা ভিজেই লেগেছে ঠাণ্ডা।

নিশ্চুপ ঘরটা। একপাশে একটা ইলেকট্রিক হিটার জ্বলছে তারই তাপে যা কিছু গরম পাওয়া যায় নচেৎ সমস্ত পৃথিবীটা যেন ভিজে গেছে ঠাণ্ডায়।

বাইরের কাচের জানলাটার দিকে চেয়েছিল মণিময়। টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে বাইরে ভেতরের আলোর প্রতিফলনে সেটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

মুখের থার্মোমিটারটা বাইরে এনে আলোর দিকে তুলে ধরলো ভায়োলেট। ইস, কি জ্বর বেড়েছে। মা যে কি করছে এখনও। মণিময়ের কপালে হাত রাখলো ভায়োলেট। বললো, গায়ে যেন হাত দেওয়া যায় না, খুব কষ্ট হচ্ছে না? বিদেশ জায়গা, কাউকে খবর পাঠাবো?

মাথা নাড়লো মণিময়। বললো, বড় বিরক্ত করছি তোমাদের, হাসপাতালে দিয়ে দাও আমাকে।

তাই বুঝি বলেছি আপনাকে। কি কথার কি জবাব হোল।

ভায়োলেটের মুখের দিকে চাইলো মণিময়। ঠিক যেন মেঘমালা কথা বলছে তেমনি অনুযোগের সুরে।

ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেলেন। বলে গেলেন, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে একটু সাবধানে থাকতে হবে। জ্বর আরও বাড়তে পারে, ভয় পাবেন না। এই ওষুধটা দিচ্ছি সারা রাত ধরে খাওয়ান। চার ঘণ্টা অন্তর দুটো করে ট্যাবলেট সঙ্গে একদাগ করে মিকশ্চার খাওয়াবেন।

ডাক্তারবাবুর ডিস্পেনসারী থেকে মিকশ্চার আর ট্যাবলেট নিয়ে এলো ভায়োলেট।

রাত তখন দশটা। জ্বরটা তেমনি রয়েছে মণিময়ের। ভায়োলেট তেমনি বসে চেয়ারটায়।

বড্ড কষ্ট হচ্ছে। হাত বুলিয়ে দেবো কপালটায়।

তোমারই কষ্ট হচ্ছে ভায়োলেট। যাও খেয়ে শুয়ে পড়োগে।

আমার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে।

মেঘমালাই কথা বলছে কি, ভাবছিল মণিময়। ভায়োলেটের মুখের দিকে চেয়েছিল একদৃষ্টে। সাধনা, কল্যাণী, কামিনী, চামেলী, শ্যামলী, মেঘমালা, ভায়োলেট এরা সবাই কি একই সুরে কথা বলে।

বোধহয় তখন অনেক রাত। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছিল মাথাটা। ঘুমটা ভেঙ্গে গেল মণিময়ের। চোখ মেলে দেখলো, ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছে ভায়োলেট। একটা হাত তার কপালের 'পর তখনো এলানো। একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়েছে—মণিময়ের মাথার বালিশে। কাত হয়ে শুয়ে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে ভায়োলেট।

পরের দিন সকালে জ্বরটা কমে গেল একটু।

গরম এককাপ কফি করে আনলো ভায়োলেট। সকালে উঠেই চান করে কাপড় বদলে এসেছে সে। মাথায় একরাশ চুল কোনওরকমে একটা গোছা করে একপাশে সরানো।

নিন, নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এখুনি। গরম কফিটা চটপট খেয়ে ফেলুন।

কিন্তু মুখ ধোওয়াই যে হয় নি এখনো।

দরকার নেই। কই চুমুক দিন তো দেখি লক্ষ্মীছেলের মতো। কই ঘাড়টা তুলুন। তাড়াতাড়ি। আমার কি কাজ নেই আর। মুখের কাছে কফির কাপটা ধরলে ভায়োলেট। ঘরদোর গোছাতে হবে। কলেজে যেতে হবে, টেস্টের রেজাল্ট বেরোবে আজ। ফেল তো করবোই জানা কথা।

মেঘমালাই কথা বলছে, ভাবছিল মণিময়। তাকিয়েছিল তার দিকে একদৃষ্টে।

কি দেখছেন আমার মুখের দিকে চেয়ে। সে কথার জবাব না দিয়ে কফির পেয়ালাটা হাতে নিল মণিময়।

ভায়োলেট টেবল ক্যালেণ্ডারটার তারিখ পালটালো প্রথমে। সাতই ডিসেম্বর।

ঘর গুছোতে গুছোতে কথা বলছিল ভায়োলেট—যদি পাশ করতে পারি তো আপনার জন্য একটা জিনিস নিয়ে আসবো। নিতে হবে কিন্তু।

কি জিনিস, জিজ্ঞাসা করলো মণিময়।

সে দেখতেই পাবেন।

তুমি নিশ্চয়ই পাশ করবে ভায়োলেট, যা চেষ্টা তোমার।

আপনি যদি আমাদের পরীক্ষার খাতাগুলো দেখতেন। হো হো করে হেসে উঠলো ভায়োলেট, তাহলে বেশ হতো।

কি হতো তাহলে।

কিছু না লিখলেও নম্বর দিয়ে দিতেন।

বিকেলে পরীক্ষার খবরের সঙ্গে একবাক্স চকোলেট কিনে বাড়ী ফিরলো ভায়োলেট।

বাড়ী ফিরে দোতালায় এসে দেখে মণিময় আধশোয়া অবস্থায় একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মণিময়ের মাথার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে তার চোখ দুটো চাপা দিল ভায়োলেট।

কে, হাতে হাত দিয়ে বললো মণিময়, ও তুমি। কই দেখি, কি এনেছো আমার জন্যে? কেমন কথা ঠিক হলো তো আমার?

চকোলেটের বাক্স থেকে একটা চকোলেটের কাগজ খুলে রেখেছিল ভায়োলেট, মুখে পুরে দিল মণিময়ের, তারপর বাক্সটা তার পাশে ফেলে রেখে চলে গেল হাসতে হাসতে।

ভায়োলেট আর মেঘমালার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই, ভাবছিল মণিময়।

সন্ধ্যার দিকে আবার জ্বর বাড়লো মণিময়ের।

পাশে বসে সোয়েটার বুনছিল ভায়োলেট। চার আঙুল মতো বোনা হয়েছে। মাপ নিলো মণিময়ের। বললে, না এখনকার মাপটা ঠিক হবে না, বড্ড রোগা হয়ে গেছেন কদিন ভুগেই। একটু বড় করেই বুনি, মোটা তো হবেনই আপনি, অসুখ সেরে গেলে।

রাতে ডাক্তারবাবু এলেন আবার। পরীক্ষা করলেন ভালো করে। ফিরে যাবার সময় ভায়োলেটকে ডেকে নিয়ে গেলেন বাইরে। বলে গেলেন, আড়ালে, রোগটা ভালো নয়। বসন্তের গুটি গায়ে দেখা যাচ্ছে একটা দু'টো। কাল দিনের আলোয় একবার এসে দেখে যাবো। রাতটা সাবধানে রেখো। কাল সকালেই হাসপাতালে পাঠাতে হবে। যদি রাতে দেখো যে জ্বর বাড়ছে তো এই পুরিয়াটা দিচ্ছি এটা খাইয়ে দিও। এখন আর ওষুধপত্তর কিছু দোব না। বেশী ওঘরে যেয়ো না তোমরা। রোগটা ছোঁয়াচে। সাবধানে থাকাই ভালো।

রাতটা যন্ত্রণায় ছটফট করে কাটালো মণিময়। মাথার কাছে বসে ভায়োলেট।

ভুল বকেছে মণিময় হরদম। ভায়োলেট তুমি আমার কাছে এসো না। আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে বুঝলে। চামেলী মরে গেল বিষ খেয়ে।

ভায়োলেট কি করবে খুঁজে পায়

মা.। [illegible] [illegible] [illegible] এই শীতের রাত্তে বাড়ি পাঠাবো কাকে। খালি কপালটায় হাত দেয় আর বলে, বড্ড কষ্ট হচ্ছে আপনার তাই না। একটু সহ্য করুন কাল সকালেই আসবেন ডাক্তারবাবু।

ভায়োলেটের মা এসে মাঝে মাঝে থাকছিল একরে। বকে তাকে শুতে পাঠায়। ভায়োলেট।

কষ্ট, কষ্ট তুমি কি দেখেছো। কল্যাণীকে দেখেছো, কেশবপুরের কল্যাণী; কামিনীকে। জলে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তারা তবু কথাটি বলেনি। চামেলী মরে গেল, শ্যামলী মরে যাচ্ছে, মেঘমালা মরে গেছে, আমিও মরে যাবো, মা---।

একটু ঝিমিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। আবার যেন উঠে বসতে চায় বিছানায়। চেঁচিয়ে ওঠে, সাধনাকে দেখেছো তুমি। মাকে দেখেছো, আমার মাকে। মা, মা আমি মরে যাবো মা, বাবার ছবিটা কোথায় নিয়ে এসো প্রণাম করি।

বড় ভয় করছিল ভায়োলেটের।

রাত যত বাড়ছিল, তত বাড়ছিল জ্বর। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছিল ভুল বকা।

---শ্যামলী মরে যাবে, চামেলী মরে গেছে। টাকাটা নিলে না মা, আচ্ছা আমিও দেখবো।

খানিকটা থাকে চুপ চাপ। আবার বকতে শুরু করে মণিময়, তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছো ভায়োলেট। ভালোবেসো না, কখনো না। জানো, আমি একজনকে ভালবাসতাম। না, না, পরক্ষণেই বললো মণিময়, কাউকেই ভালবাসি নি আমি, কখনো না। এরপর কথা নেই খানিকক্ষণ।

ভয়ে কাঠ হয়ে আছে ভায়োলেট।

কথা বলছো না কেন ভায়োলেট, তুমি কথা বলছো না কেন, বলো না ভালবেসেছো কখনো। বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছিল মণিময় কথা বলতে বলতে।

নিজের বুকের মধ্যে মণিময়ের মাথাটা চেপে ধরলো ভায়োলেট। চোখ দিয়ে তার টপ-টপ করে গড়িয়ে [illegible] দুহাতে জড়িয়ে ধরলো মণিময়ের মাথাটা। তার পর আস্তে আস্তে তাকে ধরে শুইয়ে দিল বিছানায়।

●

পরের দিন সকালে ডাক্তার এসেই বললেন, রোগীকে পাঠাতে হবে হাসপাতালে। আর এক মুহূর্তও বাড়ীতে রাখা ঠিক হবে না।

সারাদিন ছোটাছুটি করলো ভায়োলেট। মণিময়কে নিয়ে গেল হাসপাতালে। ---মেঘমালাকে গিয়ে খবর দিল।

পরের দিন থেকে দেখা গেল ভায়োলেটের গায়েও জ্বরের তাপ বাড়ছে ক্রমশঃ। প্রথম এক-দু দিন গ্রাহ্য করে নি কাজকর্ম সবই চালিয়ে যাচ্ছিল যথা নিয়মে। তার পর গুটি দেখা দিল গায়ে। শেষে হাসপাতালে জায়গা নিতে হোল তাকেও।

দিন পনেরো ভুগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল মণিময়। মারা গেল ভায়োলেট আঠারো দিনের দিন।

●

চড়াইয়ের রাস্তাটা ধরে উপরে উঠছিল মণিময় আর মেঘমালা।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছে দুজনে। চড়াইয়ের পথটা দিয়ে উঠে আসছিল উপরে।

ভায়োলেট মরে যাবে এ আমি সাতদিন আগেও ভাবি নি মালা। আর মরে যাবে এমনি করে। বলছিল মণিময়।

দুজনেরই মন যেন কান্নায় ভরা। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। একটু আগেই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে ভায়োলেট।

হাসপাতালে ভায়োলেটের পাশ ছেড়ে কিছুতেই নড়বে না মণিময়। খালি বলছে, তুমি জানো না মালা, ভায়োলেট আমাকে কতখানি ভালবাসতো। এই দ্যাখো এখানকার বাতাসে এখনো ভায়োলেটের কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। একটু আগেই যা বলেছে ও তা রয়েছে এখানে বেঁচে। আমি কি করে ছেড়ে যাবো তা।

সব মেয়েই এমনি মণি, যখন যাকে ভালবাসে তাকে এমনি নিঃশেষে ভালবাসে, বলল মেঘমালা।

আরও অনেকক্ষণ রইলো তারা ভায়োলেটের পাশে বসে। সাদা চাদর দিয়ে তার দেহ ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

নার্স এসে বললো, এটা ছোঁয়াচে রোগের ওয়ার্ড। এখানে বেশীক্ষণ থাকবেন না। দেখতে পেলে ডাক্তারবাবু আমাকেই বকবেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে চৌরাস্তা হয়ে লাডেন লা রোডে নেমে এল মেঘমালা আর মণিময়।

তেমনি রয়েছে রেস্তোরাঁটা যেন কিছুই হয় নি, শুধু দরজাটা খোলা পড়ে আছে। চারদিকে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির লোক। মণিময় আর ভায়োলেট দুজনেরই বসন্ত হয়েছিল এখানে।

দোতালার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল দুজনে।

ঘর তেমনি রয়েছে। কেউ যেন ঘরটাকে গোছায়নি অনেকদিন। টাইমপিসটা বন্ধ হয়ে গেছে, দম দেয় নি কেউ। টেবিল ক্যালেণ্ডারটায় সাতই ডিসেম্বরের তারিখ দেখানো রয়েছে আজ আটাশে ডিসেম্বরেও।

টেবিলের এক কোণে পড়ে আছে উলের আধবোনা সোয়েটারটা। এরনক্কার মাপটা ঠিক হবে না, বড্ড রোগা হয়ে গেছেন কদিন ভুগেই, একটু বড় করেই বুনি, মোটা তো হবেনই পরে অসুখ সেরে গেলে। মনে পড়ছিল ভায়োলেটের কথা।

আধবোনা সোয়েটারটা মেঘমালার হাতে তুলে দিল মণিময়। বলল, আমার জন্য বুনেছিল ভায়োলেট, তুমি বুনে দেবে বাকীটুকু?

●

রাত বারোটা বাজে। ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়েছিল মণিময়। আজ আর একটা বছর শেষ হবে। শুরু হবে উনিশ শো ষাট সাল আর একটু পরেই।

তিন দিন তিন রাত পার হয়ে

হয়েছে ভায়োলেট মারা যাওয়ার পর। দিনরাত ঘুমোয় নি মণিময়।

মেঘমালা মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বার বার। বলেছে, আবার অসুখে পড়বে তুমি। এ অসুখের পর মানুষ এমনিতেই দুর্বল হয়ে যায় আর তুমি কি না দিনরাত এক মুহূর্ত ঘুমোচ্ছো না।

জবাব দিয়েছে মণিময়, ঘুমোতে চেষ্টা তো করছি কিন্তু পারছি কই।

বাইরের টিনের ছাদটায় টপ-টপ করে শিশিরজমা জল গড়িয়ে পড়ছে। ঘরের মধ্যে নীল আলো জ্বলছে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে ধিক-ধিক করে। কাচের জানলার বাইরে বিন্দু বিন্দু জল জমা হচ্ছে, মিশছে একসঙ্গে আর গড়িয়ে পড়ছে নীচে। বাইরের অন্ধকারটা যেন ধোঁয়ায় ভরা। ইজি-চেয়ারটায় বসে কাচের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল মণিময়। পায়ের ওপরে বিছানো একটা পুরু কম্বল।

সিগারেটের ধোঁয়াগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল জানলাটার কাছে গিয়ে, সেদিকে তাকিয়েছিল মণিময়।

ভায়োলেট মরে গেল, ভাবছিল মণিময়। চামেলী গেল, শ্যামলীও যাবে।

ওপাশের খাটটায় শুয়ে মেঘমালা। ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখে এসে পড়ছে নীল আলোটা। একটা লেপ আর কম্বল দিয়ে ঢাকা গলা অবধি। পাশ ফিরে শুয়ে আছে মণিময়ের দিকে মুখ করে।

●

সামনে স্কুলের সীমানা ছড়িয়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোড শুরু হল। বাইরের ধোঁয়া কেটে গিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার মিউনিসিপ্যালিটির বাতিগুলো দেখা যাচ্ছে। কালো কালো পাহাড়ের সার ওদিকে। আকাশে চাঁদ নেই, শুধু এক আকাশ তারা হাসছে।

খালি চোখে দু'হাজার তারা দেখা যায় বইয়ে পড়েছে মণিময়। যাদের দেখা যায় না তারা সংখ্যায় কতো? হাজার, লক্ষ, কোটি কোন মাপে মাপা যাবে তাদের? মা বলতেন, ভাবছিল মণিময়, মানুষ, মরে গেলে তারা হয়ে জেগে থাকে আকাশে। ভায়োলেটও কি তারা হয়েছে বেঁচে আছে আকাশে? চামেলীও কি ভেসে আছে তারাদের ভিড়ে?

নূরমহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাট, কেশবপুর আর দার্জিলিংয়ের লাডেন লা রোডেই কি পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি? সাধনা, কল্যাণী, কামিনী, চামেলী, শ্যামলী, ভায়োলেট এদের নিয়েই কি পৃথিবী? পীতাম্বরবাবু, ত্রিলোচনবাবু, আবদুল হোসেন এদের নিয়েও তো পৃথিবী?

ভায়োলেটের আধ-বোনা সোয়েটারটা পড়ে আছে টেবিলে। মেঘমালা বাকীটা সত্যিই বুনে দেবে কি না মণিময় ঠিক জানে না।

বিছানায় পাশ ফিরলো মেঘমালা। তার গায়ের লেপ সরে গেছে। শীতে কাঁপছে মেঘমালা।

ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠলো মণিময়। এগিয়ে গেল মেঘমালার দিকে। তার দিকে চেয়ে রইলো কতক্ষণ। ভাবলো মেঘমালা আজই বলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই মণিময়কে নিয়ে সে ফিরবে কলকাতায়। শীতে কাঁপছিল মেঘমালা। মণিময় তার গায়ের লেপটা ভালো করে টেনে দিয়ে এসে আবার বসলো চেয়ারে।

●

ভোর ছ'টায় যে দার্জিলিঙ ছাড়ার একটা ট্রেণ আছে সে কথা জানতো মণিময়। মনে ভাবেনি যে অসুস্থ শরীরটাকে ওভারকোটে মুড়ে এতটা পথ সে একাই নেমে আসতে পারবে।

মেঘমালার ঘর ছেড়ে আসার আগে কয়েকটি লাইনের একটি চিঠি লিখে সে রেখে এসেছিল টেবিলে চাপা দিয়ে। লিখেছিল: তোমার চোখে আমি ঘর বাঁধার ইচ্ছা দেখেছি মালা। আজ আর তা হয় না। চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি তা আমি নিজেও জানি না। চাকরীতে ইস্তফা আগেই দিয়েছি। আমাকে খোঁজার চেষ্টা কোরো না। তবু একটা অনুরোধ করবো, আমাকে ভুলো না। আমাকে ভুলে যেও না, আমাকে মনে রেখো।

●

ছোট ট্রেনটা ক্রমেই নামছিল। বাতাসিয়া লুপ পার হয়ে গেছে কখন। তার পর ঘুম অবধি ট্রেন ওপরে উঠেছে। এবার নামছে। গেল সোনাদা, টুং, কার্শিয়াং। সকাল হয়ে গেছে। কাঞ্চনজংঘার মাথায় সূর্য উঠেছে। দার্জিলিঙ শহর রইলো পেছনে পড়ে কালো কালো পাহাড়ে ঢাকা কুয়াশার মধ্যে।

সমাপ্ত

অবাঞ্ছিতা

সুপ্রভা মজুমদার
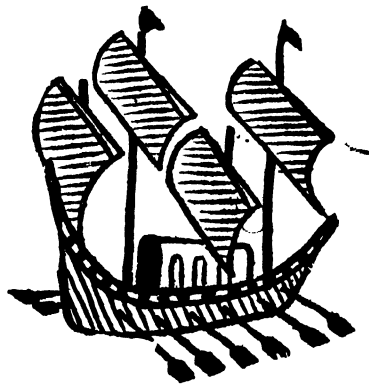
মায়ের মন মানে না, কিন্তু বলারও কিছু নেই। তাঁর আদরের ক্যাথারিন ভুল করেছে একথা তো বলতে পারেন না। চার্লস ডিকেন্স তখন একটি বিস্ময়। সকলের মুখে মুখে তাঁর নাম। তাঁর বিরাট প্রতিভা শুধু লেখাতেই সীমাবদ্ধ নয়। গল্প, গুজবে, রঙ্গরসেও তিনি অসাধারণ। আসর মাতিয়ে তোলেন। চার্লস ছাড়া কোন মজলিস জমে না। অভিনয়েও প্রায় সকলের সেরা। সুযোগ পেলে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ম্যাকরেডিকেও ছাড়িয়ে যেতেন। এ বিষয়ে অনেকেই একমত।

শুধু ক্যাথারিন কেন, তাঁর ছোট বোনদের কাছেও চার্লস যেন পরম আবির্ভাব। তিনি তাদের আশার অতীত। ক্যাথারিন চার্লসকে পেয়ে আত্মহারা। তাঁর চেহারা, কথাবার্তায় ছোটরাও মুগ্ধ। ক্যাথারিনের পরের বোন মেরী দুই চোখ টান টান করে দেখে এই নতুন অতিথিকে।

বড় প্রয়োজনের দিনে ক্যাথারিনের দেখা পেয়েছেন চার্লস। চার্লসের মনে এলো শান্তি। অস্থির তাড়নায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। মনে দুঃসহ জ্বালা। তরুণ বয়সের প্রথম প্রেম জানিয়েছিলেন মারিয়া বিডনেলকে। তার মূল্য মেলেনি মারিয়ার কাছে। মারিয়া চার্লসকে জ্বালিয়েছেন। অত্যাচার করেছেন। খেয়ালের দাস করেছেন। আঘাতে আঘাতে চার্লসের মনকে করেছেন ক্ষতবিক্ষত। এমন সময় ক্যাথারিনের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর সঙ্গ, তাঁর স্বভাবের মাধুর্য চার্লসের সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিলো। স্থির, নিশ্চিন্ত জীবনের চিন্তা তাঁর মনকে শান্ত করলো।

তরুণ শিল্পী ড্যানিয়েল ম্যাকলিস ক্যাথারিনের অকৃত্রিম বন্ধু। চার্লস এলেন ক্যাথারিনের জীবনে। জীবনের মোড় ঘুরে গেল। এখন মনেও পড়ে না ড্যানিয়েলকে। আর ড্যানিয়েল! নিঃস্বার্থ ভালবাসা তাঁর ক্যাথারিনের জন্য। আঘাত দেবার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। ক্যাথারিনের সুখেই তাঁর সুখ। ক্যাথারিনের জন্য সব সইতে পারেন তিনি। তাঁর বিচ্ছেদও দুঃখ নয়, ব্যথার আভাস পর্যন্ত নয়। নিঃশব্দে সরে আসেন ক্যাথারিনের জীবন থেকে।

বড় বড় ছেদ পড়ল, বুঝলেন না ক্যাথারিন। বোঝাব সময় নেই। মনও নেই। চার্লস ছাড়া আর কোন ভাবনা যে তাঁর নেই। বিয়ে হয়ে গেল চার্লস ডিকেন্স ও ক্যাথারিন হোগার্থের। খুশী হন না ক্যাথারিনের মা। দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাঁর গোপনে। মন খুলতে পারেন না কারোর কাছে, নীরবে সহ্য করেন গোপন ব্যথা। চার্লসকে তিনি পছন্দ করেন না। অন্তর দিয়ে তাঁকে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারেন নি।

মধুযামিনীর পালা সারা হয়েছে। ফিরে এসেছেন চার্লস। মেরীকে নিয়ে যেতে চান নিজের সংসারে। কিন্তু কেন? নতুন জীবনের রঙ কি এর মধ্যেই বিবর্ণ? হোগার্থ পরিবারের অমত নেই। ক্যাথারিনও কোন আপত্তি তোলেন নি।

মেরী এলো। মেরীকে দেখেই চার্লসের মনে হয়, যে নারী ছিল তাঁর কল্পনার রঙে মিশে, এ সেই। ক্যাথারিন নয়। দু'দিনেই মেরী হয়ে উঠল চার্লসের নয়নের মণি, দিনরাতের সঙ্গী। ক্যাথারিন মা হতে চলেছেন, তিনি থাকেন ঘরের কোণে। মেরী হয়ে ওঠে চার্লসের সংসারের সর্বেসর্বা। মেরী যেমন চটপটে, তেমনি প্রাণরসে উচ্ছল। তার আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে ঘরে, বাইরে, সর্বত্র। চার্লসের সঙ্গে মেরী যায় পার্টিতে, নাচের আসরে। পরিচয় হয় চার্লসের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে, নিত্য নতুন নামে চার্লস সম্ভাষণ করেন মেরীকে, সারা দিনের পরিশ্রমের পর মেরীই তাঁর মুক্তির আনন্দ। একঝলক দখিন হাওয়া।

দু'বছরেই সব শেষ। মৃত্যু এসে ছেদ টেনে দেয়। জীবন থেকে ছিনিয়ে নেয় মেরীকে—মাত্র সতেরো বছর বয়সে। কিন্তু এই অল্প সময়েই চার্লসের

জীবনে রেখে গেল ঝড়ের আলোড়ন। মেরীর শোকে চার্লস উন্মত্ত অধীর। হোগার্থ পরিবারের চেয়েও তাঁর ক্ষতি বেশী ; এমনি ভাব তাঁর। চার্লসের শোকের উন্মত্ততা মেরীর মার মনে পর্যন্ত অশান্তি আনলো।

সাগরপারের দেশগুলো চার্লসকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। দূরের ইশারায় চার্লস উন্মনা হন। ক্যাথারিনকে নিয়ে চার্লস সাগর পাড়ি দেন। যাবেন আমেরিকা। ঘুরবেন দেশ-দেশান্তর। শুধু তাঁরা দুজন। জীবনের স্বপ্ন তখনও মধুর। বাচ্চারা থাকল ঘরে। ম্যাকরেডি তাদের দেখাশুনা করবেন।

ছোট ছোট চারটি ছেলেমেয়ে। মা-বাবা ছেড়ে তারা রইল পরের কাছে। স্নেহের উত্তাপ মেলে না ম্যাকরেডি দম্পতির কাছে। রুক্ষ, কড়া মেজাজ তাদের। হাঁপিয়ে ওঠে শিশুরা। বেঁচে গেল তারা মাসীকে পেয়ে। মাসীরই বা কী বয়স। পুতুল খেলার বয়সও তখন পার হয় নি। কিন্তু পুতুলের চেয়ে দিদির সুন্দর বাচ্চাদের আকর্ষণ অনেক বেশী। তাই ঘুরে ঘুরে তাদের কাছে যায়। আদরে আদরে ভরে দেয় তাদের।

চোদ্দ বছরের জর্জিনার প্রশংসা সকলের মুখে মুখে। এমন প্রাণঢালা ভালবাসা। এমন বিবেচনা। এমন মিষ্টি স্বভাব।

ফিরে এলেন চার্লস বহুদিন পর, ডেভনশায়ার টেরেসে তাঁর বাড়ী সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন মিসেস হোগার্থ— ক্যাথারিনের মা। ছোট বাচ্চাটাকে কোলে করে অভ্যর্থনা করতে এলো কিশোরী জর্জি। যেন বর্ষায় বেড়ে ওঠা কচি চারাগাছ। সুন্দর চুলের মধ্যে মুখখানি সদ্যফোটা একটি টিউলিপ। চার্লসের পলক পড়ে না। দুই চোখে বিস্ময়।

ডেভনশায়ার টেরেসে জর্জিকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব উঠল। জর্জির মা-বাবা সানন্দেই মত দিলেন। মা-বাবার স্নেহের নীড় ছেড়ে জর্জিনা চলল দিদির সংসারে, দিদির সঙ্গিনী আর বাচ্চাদের গভর্নেস হিসাবে।

কত আদরের ছোট বোন। তার ওপর কী না করেছে সে তার ছেলে-মেয়ের জন্য। স্নেহে, যত্নে মায়ের অভাব ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। তাই তো তারা মাসীর এমন ভক্ত।

ক্যাথারিন এসে সব দেখলেন। শুনলেন। মনে কৃতজ্ঞতার আনন্দ। মুখে প্রসন্ন হাসি। সারাজীবন ধরে শুধতে হয়েছে সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ। জীবনের সর্বস্ব হারাতে হয়েছে। জর্জি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। জর্জির দিক থেকে তাই ছিলেন নিঃশঙ্ক। সেদিন কেউ ভাবতেও পারেন নি, চার্লসের জীবনে আরেক মেরীর উদয় হয়েছে সেই কিশোরীর মধ্যে।

ক্যাথারিন আবার সেই ভুল করলেন। আরেকটি বোনকে আবার আনলেন নিজের সংসারে। বয়স বিবেচনা করে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। বলতে গেলে জর্জি তখন শিশুই। কত আদর করে, কত আশা নিয়ে ক্যাথারিন তাকে এনেছিলেন। বাড়ীতে এনেই ক্যাথারিন তুলে নিলেন জর্জির অসমাপ্ত শিক্ষার ভার। চার্লসও চাইলেন নাচে, গানে, সাহিত্যে সে হবে অতুলনীয়া।

দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। ষোলতে পা দেবার আগেই জর্জি বুঝতে পারে তার দিদির জীবনে শান্তি নেই। মনের মিল নেই তাদের দুজনের। তখনও তার মনটা কচি সরলতায় ভরা। সমস্ত অশান্তি সমস্ত কাঁটা দূর করে দিতে চাইল। এনে দিতে চাইল সুখ, শান্তি তার দিদির জীবনে। রাগ হলে চার্লসের জ্ঞান থাকত না। থাকত না জর্জির বয়সের হিসেব। তার কাছে নালিশ জানাতেন ক্যাথারিনের বিরুদ্ধে। অগোছালো স্বভাব, আলস্যে জড়।

কী বলবে জর্জি। প্রতিবাদ করে চার্লসকে চটাত না। মৃদুস্বরে বলত শুধু দুর্ভাগা- -- ।

ক্যাথারিনের শিক্ষা মায়ের কাছে। শিথিলতা, জড়তা থাকতেই পারে না। তার অস্ফুট কথা চার্লসকে স্পর্শ করত। শান্তির প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হতেন।

আরো একটা বছর কাটল। জর্জির বয়স সতেরো। অল্পবুদ্ধি বালা। এই সময়ে মিসেস হোগার্থ নিশ্চিন্ত থাকলেন কী করে। তিনি স্থিরবুদ্ধি, বিচক্ষণ। চার্লস যখন জর্জির মধ্যে দ্বিতীয় মেরীকে আবিষ্কার করলেন, তখনই কেন মায়ের মন সচেতন হয় নি? জর্জিকে সে সময় ডেভনশায়ার থেকে সরানো উচিত ছিল। চার্লসকে তিনি জানতেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন হতে দিলেন?

কিন্তু ক্যাথারিন। তিনি কি চোখ মেলে কিছু দেখেন নি। মন দিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করেন নি? বুঝবেন কেমন করে? সংসারের মারপ্যাঁচ তাঁর জানা নেই। কুটিল সন্দেহ, হিংসা, দ্বেষ-এর অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর মন। তাছাড়া কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করা তাঁর স্বভাবের বাইরে। চার্লস রাগারাগি করেছেন। কটূক্তি করেছেন। নীরবে সহ্য করেছেন ক্যাথারিন।

জর্জি ভয় করেনি কোনদিন। কেন করবে? তার বেলা চার্লসের স্নেহের অভাব হয়নি। ঔদার্যেরও নয়। জর্জির মধ্যে দেখতে পেয়েছেন তাঁর প্রিয় মেরীকে। জর্জি বুঝতে ভুল করেনি। পুরুষের চিরন্তন মুগ্ধদৃষ্টি। এ ভুল হবার নয়। সতেরো বছর বয়সে জীবনের গতিপথ স্থির হয়ে গেল। আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সুযোগ। অবহেলায় হারালে চলবে না। জর্জি মনকে প্রস্তুত করে নিল। চার্লসের মন থেকে দূর করতে হবে মেরীকে। বসাতে হবে সেখানে নিজেকে। জর্জি ছাড়া চার্লসের জীবন হবে অচল। ক্যাথারিনের চেয়েও তার প্রাধান্য হবে বেশী। এতদিন ক্যাথারিনের জন্য জর্জির ভালবাসা ভক্তি ছিল আন্তরিক। আত্মসচেতন হতেই সেখানে ফাটল ধরলো। স্নেহ, মমতার জায়গায় এলো বিশ্বাসঘাতকতা।

নিজের কাছে এনেছিলেন ছোট-বোনকে। প্রীতি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে ঘিরেও রেখেছিলেন ক্যাথারিন। সেখানে কখন ভাঙন ধরেছিল জানতেও পারেন নি। সন্তান প্রসবে ক্লান্ত ক্যাথারিন। ঘন ঘন মাতৃত্বে নিস্তেজ, নিরুদ্যম। সবদিক সামলাতে হয় জর্জিকে। সময়-

বিশেষে ঘরের সব ভারই নিতে হয়। আধিপত্য তার বেড়েই চলে। চার্লসের সঙ্গে সর্বত্র তার যাতায়াত। চার্লসের বন্ধুমহলেও তার যথেষ্ট প্রভাব। জর্জি সুন্দরী। জর্জি সুরসিকা। অনেকেরই কামনার ধন। তারা সকলেই নামী ও মানী। তবুও জর্জির মনের নাগাল কেউ পান না। তার মন বাঁধা পড়েছে অনেক উঁচুতে। রূপে, গুণে চার্লস অনুপম। প্রতিভা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। হাসিতে, গল্পে, ব্যঙ্গ-কৌতুকে চার্লসের তুলনা নেই। অদম্য তাঁর প্রাণশক্তি।

জর্জিও কম নয়। নাচে, গানে, রঙ্গ-কৌতুকে জর্জির উৎসাহ অন্তহীন। কিন্তু ক্যাথারিন যেন আরেক মেরুর আধবাসিনী। ক্লান্ত, বিষণ্ণ দৃষ্টি। জীবনের সুখ, আনন্দ থেকে নির্বাসিত। কোন কিছুই তাকে আনন্দ দেয় না। চার্লসের এ সব বরদাস্ত হয় না। সন্তান সম্ভাবনাতেই তিনি ক্ষেপে যান। তাঁর শিশু-প্রীতি কাগজে-কলমেই সীমিত। নিজের সন্তানদের জন্য শতধারায় কোনদিন উৎসারিত হয়নি।

চম্পা মাতৃ-সদন

ছোট্টো মেয়ে চম্পাকলি, কোমরে জড়িয়ে হাঁটু অবধি লাল সাড়ীটি পরে মায়ের সাথে রোজ সকালে মাঠে যায়। কৃষকের মেয়ে সে, তাই তার ঘরে মন বসে না। তার মা সারাদিন মাঠে যথাসাধ্য স্বামীর কাজে সাহায্য করে, ছোটেলাল চাষীর স্ত্রী সে, তার বিশ্রামের সময় কোথায়।

প্রতিবাসী টিকারাম কৃষক। একমাত্র ছেলে তার ভীম, সেও যায় রোজ মা-বাবার সাথে মাঠে। পাশাপাশি দুজনের খেত। মাঝখানে আল-তোলা।

শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায়

ভীমের সাথে চম্পাকলির ভারী ভাব। কখনো দুটিতে ঝগড়া বা মারামারি হয় না। বর্ষায় মেঘলা দুপুরে, মেঘে-ঢাকা ঘোলাটে আকাশের নীচে, খোলা হাওয়ায় দুটি দুরন্ত ছেলেমেয়ে মানিকজোড়ের মত অবাধে মাঠে খেলা করে।

পরিবর্তনশীল জগতের সব কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ছোট্টো তিরগা গ্রামের চাষার ছেলেমেয়ে, ভীম ও চম্পাকলির জীবনেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হ'তে থাকে। দুটি বালক-বালিকা কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। এখন আর চম্পাকলি নিরাভরণা নয়। তার সুডোল দুটি হাতে বৈঁচির বালা, গলায় রূপার গিনি-হার, পায়ে প্যাজনা, কানে টানা-দেওয়া ঝুমকো। অনাবৃত গায়ে এখন তার লাল চেলী। দু-হাতে গোছভরা নানা রং-এর কাঁচের চুড়ি। এই সামান্য অগোছাল সাজ-সজ্জায়, আঁট-সাঁট চল-চলে, শ্যাম-বর্ণ চম্পাকলিকে কিন্তু খাসা মানায়। কালো হলেও তার ভাসা-ভাসা চোখ দুটি ভারী সুন্দর। যেন বিশ্বের সৌন্দর্য ভরা তার ঐ দুটি কালো চোখে।

যুবক-যুবতীর একসাথে মেলা মশার ফলে সর্বত্র যা পরিণাম ঘটে থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেউই যেতে পারে না। অর্থাৎ যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চম্পাকলি ও ভীমের অন্তরে প্রেমের

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ল্যাণ্ডের উদ্যোগে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী বিষয় সংক্রান্ত ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত বসুমতী চিত্র। চিত্রটি বসুমতীর স্টাফ ফটোগ্রাফার শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে

পুলক জেগে উঠল। ভালবাসার ছোঁয়াচ লেগে তাদের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মনে খুশির আজ জোয়ার বইছে। আর সেই জোয়ারের মুখে তারা দুটিতে ভেসে চলেছে অবাধে।

সম্প্রতি ভীম ও চম্পাকলির পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় আজ ভীম দুটি কৃষক-পরিবারের অভিভাবকস্বরূপ।

তিরগা পাহাড়ী গ্রাম। মাঠের গা-ঘেঁসে বিরাট পাহাড়। শীতের দুপুরে কুয়াসায় ঘেরা সেই সবুজ পাহাড়ে ভীম ও চম্পা ক্লান্তদেহে গিয়ে বসে। চম্পাকলির সারা পিঠব্যাপী রুক্ষ চুল-গুলো এলোমেলো হাওয়ায় উড়তে থাকে। সে বহুদূরে ধানের ক্ষেতে উদাস দৃষ্টি মেলে নীরবে বসে কি যেন ভাবছে।

হঠাৎ একসময় অবান্তর প্রশ্ন ক'রলে ভীম---আচ্ছা চম্পা, এবার তো তুই বড় হয়েছিস, তোর বিয়ে হবে। আমাকে ছেড়ে এবার তুই চলে যাবি?

ধক্ ক'রে ওঠে চম্পাকলির বুকটা। সত্যিই তো সে বড় হয়েছে। বন্যার জলের মত তার সারা দেহে যৌবন-শ্রী উপচে পড়ছে। কিন্তু তথাপি সে বিয়ের কথা আজ অবধি ভাবে নি। হঠাৎ তার মুখে কথা যোগায় না। হেমন্তের শিশিরের মত কপালে তার বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। আয়ত চোখের পাতা দুটি জলে ভিজে আসে। বড় বড় চোখ দুটিতে করুণ মিনতি ফুটিয়ে তুলে, লজ্জানত মুখে ধীরে ধীরে বলে সে—না---এ গাঁ ছেড়ে, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

এবার চম্পার আরও একটু গা-ঘেঁসে বসে পুনরায় বলে ভীম—কিন্তু খুড়ি যখন তোর বিয়ের ঠিক করবে?

এবার চম্পা দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দেয়—কেন নদীর জল তো শুকিয়ে যায় নি, ঐ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

শিউরে ওঠে ভীম। কি বলবে ভেবে পায় না। চম্পাকে না পেলে, তার জীবনও দুর্বহ হ'য়ে উঠবে। তথাপি চম্পার মাকে পারে না সে বিয়ের কথা জানাতে। লজ্জা এসে বাধা দেয়।

পর পর কয়েক বছর ফসল ঠিকমত না হওয়ায় চম্পাদের দু'টি প্রাণীর সংসারও অচল হ'য়ে উঠেছে। দারিদ্র্য তাদের চরমে পৌঁছেচে। চম্পার মায়ের চিন্তার আর অন্ত নেই। মাত্র একখানি খড়ের কুঁড়েঘর সম্বল, সেও আজ জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে-মাঝে তার চাল ছেঁড়া কাঁথার মত পচে বেরিয়ে গেছে। তার ফাঁকে-ফাঁকে বর্ষায় বৃষ্টির জল, শীতের দিনে হিম এবং জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলো অবাধে প্রবেশ করে। সারা-দিনের পরিশ্রমের পরে, কোন প্রকারে সেই ভাঙ্গা ঘরখানিতে, মা-মেয়ে রাত কাটায়।

শুষ্ক পৃথিবীর বুকে দেখতে দেখতে অজস্র ধারে বর্ষা নেমে এল। পথ, ঘাট, নদী, নালা, ছোট-ছোট ডোবাগুলি অবধি জলে-জলাকার হয়ে গেল। চাষীদের হতাশ প্রাণে আশা জাগল। বিষণ্ণ মুখে তাদের হাসি ফুটল। কয়েক বছর অজন্মার পর এবার ফসল মন্দ হবে না মনে হয়। গরীব চাষীদের এ বছর হয়তো দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন জুটবে।

খড়ের ভাঙ্গা চাল দিয়ে ঝর-ঝরিয়ে জল পড়ে, চম্পার হাঁটু পর্যন্ত কাপড় প্রায় ভিজে যায়। তার মা রোগক্লিষ্ট ক্ষীণস্বরে বলে—ভিজে-ভিজে যে অসুখ করবে মা, আমার কাছে সরে এসে গুড়িসুড়ি হয়ে শো।

চম্পা কিন্তু মায়ের কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। তার খুব ভাল লাগে জলে ভিজতে। যৌবনপ্লাবিত মনে তার এ-এক নতুন অনুভূতির অনুভব। সে জীর্ণ চালের ফাঁক থেকে, বর্ষার ঘোলাটে আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে।

চম্পাকলির মায়ের পরপারের ডাক এসেছে। দীর্ঘ কাল রোগে ভুগে জীর্ণ দেহটা কাঁথার সাথে মিশে গেছে। এ-যাত্রায় মৃত্যুর কবল থেকে যে রক্ষা নেই সে তা বুঝতে পেরে ডেকে পাঠায় ভীমকে।

আকুল মিনতি জানিয়ে বলে সে—বাবা, অভাগী মেয়েটাকে তুমি পায়ে ঠাঁই না দিলে যে আর ঠাঁই রবে না বাবা। আমার তো যাবার দিন ঘনিয়ে এল। শেষের দিকে কান্নার সুর ফুটে ওঠে তার কথায়। বৃদ্ধার কোটরে ঢোকা চোখ দুটিতে বাষ্প জমে ওঠে।

ভীমও আজকের দিনটির প্রতীক্ষায় ছিল। অবশ্য দীনদরিদ্র চম্পার সাথে তার বিয়ে দিতে, মা প্রথমে ক্ষীণ প্রতি-বাদ করেছিল। কিন্তু চম্পার মুমূর্ষু মায়ের অন্তিম অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাধ্য হয়েই এ-বিয়েতে সম্মত হতে হ'ল।

॥ ৩ ॥

প্রভাত-সূর্যের স্বর্ণ দীপ্তিতে, পৃথিবী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ঠিক যেন শিশুর কচি ঠোঁটের মৃদু হাসি। উঠোন ভরা গাঁদাফুলের অরণ্য। শীতের প্রথম আমেজে ওই ফুলগুলি যেন সজীব হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল সেই হলুদ শোভার দিকে চেয়ে বসে আছে চম্পা। সে আজ পুলক আবেশে তন্ময়। কারণ বিয়ের দীর্ঘকাল পরে আজ সে সন্তানসম্ভবা।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি। বর্ষার রাক্ষুসী মূর্তিতে আবির্ভাব হওয়ায়, মধ্যপ্রদেশের এই ছোট্ট তিরগা পাহাড়ী গ্রামটি আজ প্রায় জলমগ্ন। মেঘের বিকট গর্জনে কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। এই মহা দুর্যোগের দিনে চম্পা আসন্নপ্রসবা। প্রকৃতি দেবীও যেন চম্পার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বগ্রাসীমূর্তিতে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেছেন। মড় মড় শব্দে বৃহৎ আকার দৈত্যের ন্যায় ঝাউ-দেবদারু গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ছে। সেই প্রাণ-কাঁপানো ভয়ঙ্কর শব্দে আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ঘন-ঘন শিউরে ওঠে ভীম। চম্পা বাণ-বিদ্ধ হরিণীর ন্যায় কাতরদৃষ্টিতে স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে আছে। অন্ধকার বিভীষিকা-ময়ী রাত্রি যেন সর্বগ্রাসী বাহু দুটি মেলে জনমানববিরল নিস্তব্ধ সুপ্ত গ্রামটিকে মুহূর্তে গ্রাস করবে। এমনি মনে হচ্ছে।

চারিদিকে কেবল থৈ-থৈ করছে জল আর জল। পল্লীর সঙ্কীর্ণ গলিপথে কলকল ধ্বনিতে জল বয়ে চলেছে।

বহু-দিন যাবৎ চম্পা প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। রাত জেগে শুদ্ধ ভীম একা বসে থাকে। হার মানলো গাঁয়ের হাতুড়ে দাই ও বদ্যিদের তুক্-তাক্।

শেষ রাতে ভীষণ বেগে আবার প্রচণ্ড ঝড় উঠল, কি ভয়ানক তার দাপাদাপি, আর গোঁ-গোঁ শব্দ। যেন চম্পার ব্যথায় ধরিত্রী মাতার বুক ফাটা কান্না গুমরে-গুমরে উঠছে। হোক্ দুর্যোগ। তবুও ভীম ভোরেই চম্পাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাবে স্থির করলে।

ভোর হতেই গরুর গাড়ি জুতে ফেললে ভীম। জ্ঞানশূন্য হয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চললো সে। গ্রামের সীমান্তে নদী। সেই নদী পার করে শহরে যেতে হবে। নদীর উপর কাঁচা পুল। কাঠ আর মাটি দিয়ে তৈরী। নদীর ধারে এসে ভীম নির্বাক বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইল। সেই ক্ষীণকায়া পাহাড়ী নদীর এ কি প্রলয়ঙ্করী মূর্তি। কোথায় ভেসে গেছে সেই কাঁচা ব্রীজ। নদী পার হয়ে, ওপারে যাওয়া অসম্ভব। ভীষণ বন্যা এসেছে নদীতে। জীবনে এই প্রথম ভীম নিজেকে শিশুর মতই অসহায় বোধ করলে। আজ প্রথমবার দেবতার বিরুদ্ধে তার মনে জমে ওঠে রুদ্ধ আক্রোশ—কি মহাপাপ করেছে চম্পা, যে তাকে তিনি এত কষ্ট দিচ্ছেন। যদি চম্পা না বাঁচে? ধক্ করে ওঠে ভীমের বুকটা। দিশাহারার ন্যায় গাড়ির মোড় ঘোরালো গ্রামের দিকে।

পাগলের মত ভীম ছুটলো, গাঁয়ের মোড়লের কাছে। কিন্তু সেও আজ ভীমের মতই অসহায়। শহরে যাবার আর কোন পথই যে নেই। প্রকৃতির অসীম শক্তির কাছে, আজ সবাইকে হার মানতে হল। ভীমের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল, মেঘে-ঢাকা সন্ধ্যায় অসহ্য যন্ত্রণা থেকে চম্পা মৃত্যুর কোলে চির শান্তি পেল।

সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনাকে কেউ ভুলতে পারলে না। অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসীরা এর প্রতিবিধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। চম্পাকলির অকাল-মৃত্যু, গাঁয়ের লোকেদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। যে নদী চম্পার প্রাণ নিয়েছে, তাকে তারা ক্ষমা করলে না। পঞ্চায়েতের এক বৈঠকে প্রস্তাব রাখা হল, নদীকে বেঁধে, তার উপর পাকা পুল তৈরী হবে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব তো পাশ হয়ে গেল। কিন্তু তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এক মহা সমস্যা। শেষে স্থির হল সরকারের কাছে তারা সাহায্য চাইবে।

সরকার অর্থ সাহায্যে স্বীকৃত হলেন। চাষী-গ্রামবাসীদের চোখের সামনে আলো ফুটে উঠল। মনে তাদের আশা জাগলো। টাকা তাদের নেই, কেবলমাত্র সম্বল তাদের বাহুবল। বিপুল উৎসাহে কাজ আরম্ভ হল। তার পরের ঘটনা সে এক ইতিহাসের বিস্ময়কর অধ্যায়।

ভাগ্য-বিধাতা আর তিরগা গ্রামের শ্রমিক চাষীদের সে এক গৌরবময় সংগ্রামের কাহিনী। সাফল্যের এক মহা-সঙ্গীত। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে, নব-উদ্যমে, সম্মিলিত গ্রাম-বাসীদের আপ্রাণ চেষ্টায়, তারা বেঁধে ফেললে সেই পাহাড়ী দুরন্ত নদীকে।

কিন্তু এখানেই তারা নিবৃত্ত হল না। নদীর উপর পাকা ব্রীজ তৈরী হয়ে গেল। এবার প্রয়োজন প্রসূতি-গৃহের। তারা নিজেদের প্রিয়তমাদের চম্পার মত কিছুতেই অকালে মরতে দেবে না। আবার তারা সরকারের দরবারে বিনম্র আবেদন জানালে। এবারও সরকার তাদের প্রার্থিত আবেদন মঞ্জুর করলেন। কর্মের যে অদম্য প্রেরণা তাদের অন্তরে জেগেছে তাতে তারা হাসপাতাল নির্মাণে প্রবৃত্ত হল। আবার শুরু হল মহা-যজ্ঞ।

সব কাজ শেষ হলে ভীম গেল মোড়লের কাছে। সস্নেহে প্রশ্ন করলে মোড়ল—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে, কিছু বলবি?

বিনম্রভাবে ভীম বলল, মোড়ল খুড়ো—হাসপাতালের দেওয়ালে, চম্পার নাম লিখে দিলে হয় না, যেমন শহরের হাসপাতালে লেখা থাকে?

ভীমের কথায় বুড়োর ঘোলাটে চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে। সে দুঃখিত-ভাবে বলে—ঠিক বলেছিস ভীম, চম্পা মারা যাওয়াতেই তো আমাদের চোখ খুললো। আহা কি ভাবে চ'লে গেল চম্পা।

ভীমের আন্তরিক ইচ্ছায়, হাস-পাতালের নামকরণ হল, চম্পা মাতৃ-সদন। শহর থেকে এল নার্স, লেডী ডাক্তার, আর চিকিৎসা-সামগ্রী। দেখতে-দেখতে অখ্যাত গ্রাম তিরগার বুকে বিরাট 'চম্পা মাতৃসদন' সদ্যো-জাত শিশুদের ক্রন্দনে মুখরিত হয়ে উঠল।

অন্যের ঠিকানায়

বারি দেবী

বড় অস্থির চিত্তে কাটালাম আরো সাতটা দিন। আট দিনের সকালে এলো রজত সেন। ঐ দিনই তার আসার কথা ছিল।

ক্লান্তভাবে সে আমার পাশে এসে ধপ করে বসে পড়লো। মনে হল যেন ওর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

আমি নির্বাক দৃষ্টি মেলে দেখছিলাম ওকে।

—কী হল নীল? অমন করে চেয়ে আছ কেন? বললো রজত।

—তুমি কি আজই ফিরলে? না সাতদিন আগেই ফিরেছো? উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো রজত। তারপর বললো, হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। সাত দিন আগে স্যুটিং হঠাৎ বন্ধ রাখা হল বলে আমি চলে এলাম আমার গাড়ীতে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র কলকাতায় ছিলাম সেজন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। মানে সোজা চলে যেতে হল দেশে। বেনারসে থাকাকালীন আমাদের এক আত্মীয়র সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, আর তার কাছেই শুনলাম যে আমার মা বড় অসুস্থ। তাই চলে গিয়েছিলাম দেশে।—কিন্তু তুমি এসব খবর পেলে কোত্থেকে? মালতী পাইনের কাছে নাকি?

উঃ! বুক থেকে যেন একখানা ভারী যন্ত্রণার পাথর সরে গেল। রজতের একখানা হাত তুলে নিলাম নিজের হাতে। তারপর বললাম,—উঃ! বাঁচলাম তোমাকে দেখে। বলছি সব এবার।

ফেরাজিনীতে ওদের দুজনকে পাওয়ার সায়েবের দেখতে পাওয়া থেকে, মালতীর বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত সব কিছু বললাম ওকে।

সব শুনে জবাব দিলো রজত—ত্রুটি গোড়ায় আমারই হয়েছে নীল। যদি তোমাকে একটা চিঠি দিতাম, তাহলে গোলমাল কিছু হতো না। আমি কলকাতায় ফিরছি গাড়ীতে দেখে সঙ্গিতা বললো, তাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাই তবে সে খুব উপকৃত হয়। কি করি বলো, একসাথে কাজ করি, তাই ওর কথাটা রাখতেই হলো। তারপর কলকাতায় পৌঁছে খুব খিদে পেয়েছিলো, তাই ফেরাজিনীতে নেমে কিছু খেয়ে ওকে ওর ফ্ল্যাটে নামিয়ে দিয়ে, আমি সোজা বর্ধমানে রওনা হয়ে গেলাম।

এতক্ষণে স্বস্তির বাতাস লাগলো আমার মনে। খুব সুস্থ মনে এলাম অন্য প্রসঙ্গে। ওর মা কেমন আছে জানলাম। আরো বললাম যে, ভবিষ্যতে যেন ওর খামখেয়ালীপনার দণ্ডভোগ আমাকে আর না করতে হয়, সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে ওর।

পাওয়ার সায়েব চা স্যাণ্ডউইচ রেখে জানতে চাইলো—সায়েব দুপুরে লাঞ্চ করবেন কি না।

—না সায়েব। । এখন বড্ড কাজ পড়েছে। অন্য দিন খাবো। জবাব দিল রজত।

●

কেটে গেছে আরো তিন-চার মাস। রজত ভীষণ ব্যস্ত সিনেমার কাজে। বেশীক্ষণ আমাকে সঙ্গ দেবার সময় পায় না।—তবুও কথার ফাঁকে আমি ওকে একটু জোরের সঙ্গেই বলেছি যে, —আমাদের বিয়েটা এবারে সেরে ফেলা একান্ত প্রয়োজন।

জবাবে বলেছে রজত—হ্যাঁ এবারে যা হোক একটা কিছু করে ফেলতেই হবে।

জবাব দেবার সময় যেন বড় বিব্রত মনে হল ওকে। গলার স্বরটা কি কেঁপে উঠেছিলো? না আমার মনের ভুল কল্পনা?

রাঁচীতে স্যুটিং-এ যাবে রজত। ফিরতে বোধহয় মাস দুয়েক দেরী হতে পারে। যাবার দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললো যে—আর ভালো লাগছে না নীল। সিনেমা লাইনে এত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা আগে জানলে কখনই আসতাম না এদিকে। এর চেয়ে ঢের ভালো চাকরী-বাকরী করে ভদ্র জীবন যাপন করা। আর আমার জন্যে তোমাকেও অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে; সেজন্য আমাকে ক্ষমা কোরো নীল। অথচ দেখ, তোমাকে দুঃখ দেবার কোন ইচ্ছে যে আমার থাকতে পারে না সে তো তুমি বিশ্বাস করো। দুজনে ঘর বাঁধবো, সুখী হবো, এই বাসনা নিয়েই তো এতদিন সব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা মাথায় করে, সেই দিনটির অপেক্ষা করছি—কিন্তু—কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তির নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে যেন সব বানচাল হয়ে যাচ্ছে। আমি যেন আর সইতে পারছি না নীল।

বড় আবেগের সঙ্গে আমার দুটো হাত নিজের হাতে জড়িয়ে ধরলো রজত। মনে হল যেন থরথর করে কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ।

আমি আশ্চর্য বোধ করলাম ওর

এই অস্বাভাবিক ভাবালুতার আতিশয্য দেখে।

গভীর মমতার সঙ্গে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে মিষ্টি গলায় বললাম—কাজের জন্য ব্যস্ত থাকাটা তো অপরাধ নয় বন্ধু। তার জন্য তুমি এতটা অধীর হচ্ছো কেন? কাজ সেরে নির্বিঘ্নে ফিরে এসে তারপর ভালো না লাগলে ও লাইন অবশ্যই ছেড়ে দেবে। তাতে দুজনেই স্বস্তি পাবো। আবার ফিরে আসবে আমাদের সেই হারানো দিন-গুলো। বেশী টাকা তো সত্যিই সুখ দিতে পারে না মানুষকে, সেটুকু বুঝতে পেরেছো যখন তখন অনায়াসে তুমি ও পথ ছেড়ে, মানে সিনেমার কাজ ফেলে চলে আসতে পারবে। তখন আমরা চলে যাব সেই বিমূনিপত্তনমে। তারপর বিয়ে সেরে ফিরে এসে, তোমার নতুন বাড়ীতে হবে আমাদের গৃহ-প্রবেশ। আর এ বাড়ী ভাড়া দিলে, আমাদের জীবন বেশ স্বচ্ছলভাবেই কেটে যাবে।—কি বলো?

আমার কোন কথার জবাব দিলো না রজত। মাথা হেঁট করে চোখ বুজে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর আমার দুই কাঁধের ওপর রাখলো ওর দুটি হাত। আর করুণ দুটি চোখ মেলে রাখলো আমার মুখের ওপর।

—এবারে বিদায় দাও নীল। জানি না ভাগ্য আমায় কোথায় নিয়ে চলেছে—বড্ড যেন প্রাণটা কেমন করছে—কেন তা বুঝছি না। তবুও—। বলতে বলতে চুপ করে গেলো রজত, আর ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো।

ওর চোখের জল দেখে, নিজেকে আর স্থির রাখা আমার সম্ভব হলো না। দু'হাতে মুখ ঢেকে আমিও অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

●

রজত চলে গেছে। আমার মনটা যেন বড় বেশী উতলা হচ্ছে ওর জন্যে। কতবারই তো সে গেছে বাইরে, কিন্তু এমন করে কেঁদে কখনও যায় নি তো? মনে হচ্ছে—এবারে ওকে যেতে না দিলেই হতো।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? কনট্রাক্টে যে সই করা আছে, যেখানে ওরা নিয়ে যাবে ওকে যেতে হবেই। কথা ছিল রজত গিয়ে আমাকে চিঠি দেবে, কিন্তু দশ-বারো দিন হয়ে গেল, ওর চিঠি না আসাতে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেছে। কি করি? করবার কিছু নেই, তাই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াই এখানে-ওখানে।

সেদিন একটু বেলা থাকতেই বেড়াতে গিয়েছিলাম লেকের ধারে। একটু ঘোরাঘুরি করলাম পাওয়ার সায়েবের সঙ্গে, তারপর গিয়ে বসলাম আমার অতিপ্রিয় সেই জল ছুঁই-ছুঁই গাছটার তলায়। চোখের সামনে ভেসে চলেছে রঙিন ছবির মেলা। গত দিনের সুখময় স্মৃতিগুলি রঙিন ছবি হয়ে মনের পর্দায় ভেসে চলেছে।

কত মধুর সন্ধ্যা আমাদের এখানে কেটেছে। কত হাসি-গল্প, ভবিষ্যতে নতুন জীবন, নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে কত কল্পনার কথা ছড়ানো রয়েছে এখানকার আকাশে-বাতাসে। লেকের জলের ঢেউ-এ ঢেউ-এ জল-তরঙ্গ হয়ে বাজছে সেই হারানো দিনের কথাগুলো। অন্যমনা হয়ে পড়েছিলাম, তাই পাওয়ার সায়েব কখন যে উঠে গেছে গাড়ীতে টের পাই নি। হঠাৎ নজরে পড়লো, আমার পাশ দিয়ে আমার মতই অন্যমনস্কভাবে চলে যাচ্ছে মালতী পাইন। আশ্চর্য হলাম দেখে যে সে একবারও ফিরে চাইলো না আমার দিকে।

আমি ছুটে গিয়ে ডাকলাম ওকে। ওর হাত ধরে নিয়ে এসে বসালাম আমার পাশে। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম—এমন অন্যমনা হয়ে একা

জনৈক জার্মান তরুণী হোভারক্রাফ্‌ট দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছেন

একা ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন মালতী? আমাকে কি দেখতে পাও নি?

—না দিদি, তোমাকে দেখলে কি আর চলে যেতাম? আচ্ছা দিদি রজতদার খবর জানো কিছু? কাল স্টুডিওতে গিয়ে শুনলাম যে রজতদা নাকি সঞ্চিতাকে বিয়ে করে উটিতে গেছে হনিমুন করতে।

বিষাদভরা চোখ দুটি আমার দিকে মেলে বললো মালতী।

মাগো!—এ কি শুনলাম? ওর কথাগুলো যেন পিস্তল থেকে বেরিয়ে আসা বুলেটের মত আমার হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করলো।

আর্তকণ্ঠে বললাম—এসব আজগুবি গল্প আমি বিশ্বাস করি না মালতী। রজত গেছে রাঁচীতে আউট ডোর স্যুটিং-এ।

একটু ম্লান হাসি খেলে গেল মালতীর ঠোঁটে। হতাশা জড়ানো করুণ সুরে বললো ও—তুমি জানো না দিদি, স্টুডিও শুদ্ধ লোক সবাই জানে, এ খবর সত্যি। সব সত্যি—সব সত্যি। বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মালতী।

আমি যে তখন কি করি ভেবে পাচ্ছিলাম না, তাই নিজের যন্ত্রণা ভুলে ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম—তোমার কি হয়েছে মালতী? কিছু তো জানি না আমি। বলবে আমাকে তোমার কথা?

আঁচলে চোখ মুছে ধরা গলায় বললো সে,—হ্যাঁ, বলবো দিদি। সেদিন যে কথা বলা হয় নি, আজ বলবো, আমার সব দুঃখ-দুর্দশার কথা। তুমি যে ভালোবাসো আমাকে, তাই তোমাকে বললে মনের ভার হয়তো কিছুটা কমবে। কান্নাভাঙা গলায় বলে গেল মালতী তার জীবনের গোপন কাহিনী।

●

হাওড়ায় যখন মালতীদের বাড়ীতে থেকে এম-এ পড়তো রজত, তখনই মালতীর বাবা রজতের মা-বাবার কাছে রজতকে জামাই করার প্রস্তাব করেন। রজতের মত সাধারণ ঘরের ছেলেকে মালতীর বাবা জামাই করবেন এ প্রস্তাব একেবারে অপ্রত্যাশিত, রজতের মা-বাবার কাছে। তাই তাঁরা সানন্দে মত দিলেন আর মালতীর মা-বাবা সেইদিন থেকেই রজতকে নিজের জামাই বলে গ্রহণ করলেন। ওদের দুজনের মেলামেশায় তাই কোনো বাধা আসে নি অভিভাবকের দিক থেকে। আর তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে ওদের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো প্রেমের সম্পর্ক। কথা ছিল, রজত এম-এ পাশ করার পরেই ওদের বিয়ে হবে, কিন্তু তা তো হল না। ওদের বিয়ের আগেই মারা গেলেন মালতীর বাবা। আর ওদের জীবনে এলো দারুণ বিপর্যয়। রজত অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলো তখন, তাই মালতীদের বেলগাছিয়াতে যে নতুন বাড়ী কেনা হয়েছিল, সেখানেই রয়ে গেল সে, ওদের দেখাশোনা করার জন্য।

তারপর বছরখানেক পরে রজত সিনেমায় যোগ দেয় আর ওখান থেকে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য কলকাতায় একটি হোটেলে চলে যায়। তারপর মালতীর অনুরোধেই সে মালতীকে সিনেমায় নামবার সুযোগ করে দেয়, এ সব কথা মালতীর কাছে প্রথম দিনেই শুনেছিলাম।

আমি অতি কষ্টে ওকে প্রশ্ন করলাম—তোমাদের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হল না কেন?

—তা তো জানি না দিদি। মা বারবার ওকে বলেছে বিয়ের জন্যে, কিন্তু ও বলেছিলো, আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হলেই বিয়ে করবে, সে জন্যে চিন্তার কিছু নেই। তবে আমি বেশ বুঝেছিলাম যে, রজতদা যেন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

তাই এই কিছুদিন আগে ওকে বলেছিলাম,—তুমি কি আজকাল আমাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করতে চাইছো? তা না হলে, আজকাল এমন দূরে সরে থাকছো কেন?

—সম্পর্ক? অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে জবাব দিয়েছিল রজত—কৈ সেরকম কোনো সম্পর্ক তো তোমার সঙ্গে গড়ে উঠেছে বলে মনে পড়ছে না। তবে হ্যাঁ, তোমার বাবার কাছে আমি উপকৃত একথা স্বীকার করি। তবে তার মানে এই নয় যে, নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করবো তোমার পায়ে। সেই উপকারের বিনিময়ে আমিও তোমাদের যথেষ্ট উপকার করেছি। সিনেমায় নেমে দু' পয়সা রোজগার করছো, নাম হয়েছে সে আমারই জন্যে। পরেও দরকার হলে আমাকে পাবে, আমি অকৃতজ্ঞ নই।

—তাহলে তোমার প্রেম, ভালো-বাসা, প্রতিশ্রুতি, সবই কি শুধু অভিনয়-মাত্র?

সজল চোখে প্রশ্ন করেছিল মালতী?

—না, অভিনয় নয়। ভালো তোমাকে আজও বাসি। তবে ভালোবাসলেই যে তার সঙ্গে সমগ্র জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলতে হবে, একথা আমি জানি না। সে রকম কোন ইচ্ছেও আমার নেই।

আর কথা বাড়ায় নি মালতী। মাকেও কিছু বলে নি, কারণ উনি আজও বিশ্বাস করেন, তাঁর ভাবি-জামাইকে। অবশ্য সে কেন আর আসে না একথা বারবার জিজ্ঞেস করেন, আর দুঃখ করেন। তবুও মালতীর মনে নিদারুণ হতাশার অন্ধকারের মাঝে একটি সূক্ষ্ম আলোর রেখার মত জ্বলছিল ক্ষীণ আশার আশ্বাস—সে একদিন হয়তো নিজের অন্যায় বুঝতে পারবে, আর ফিরে আসবে তার কাছে। কিন্তু আজ ওর বিয়ের খবরটা, মালতীর সকল আশাকে নির্মূল করে দিয়েছে।

—সে যে কথা দিয়েছিল দিদি, কোনদিন সে আমাকে ছেড়ে যাবে না, আমি যে বড় বিশ্বাস করেছিলাম তাকে। বলতে বলতে আমার কোলের ওপর আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো মালতী। কি সান্ত্বনা দেব আমি ওকে? সব কথা যে আমার এই মুহূর্তে ফুরিয়ে গেছে। তাই নিথর নিস্পন্দ ভাবে বসে রইলাম আমি।

তারপর কখন যে চলে গেছে মালতী—আর সন্ধ্যের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে, কিছুই টের পাই নি আমি। সম্বিৎ ফিরে পেলাম পাওয়ার সায়েবের ডাকে—বাড়ী চলো সিস্টার, মালতী অনেকক্ষণ হল চলে গেছে।

পাওয়ার সায়েবের সঙ্গে কলের পুতুলের মত ফিরে চললাম গাড়ীর দিকে আর আমার পেছনে ভূতের মত তাড়া করে চললো—মালতী পাইনের কথাগুলো—রজত বিশ্বাসঘাতক, রজত ভণ্ড, রজত সেন হৃদয়হীন প্রতারক।

৩

গাড়ী চালাতে চালাতে পাওয়ার সায়েব জিজ্ঞাসা করলো—মালতীর কাছে সেনসায়েবের কোন খবর পেলে সিস্টার?

তখন জলে-ডোবা মানুষ যেমন একটা কিছু ধরবার জন্য হাঁকপাঁক করে হাতড়ে বেড়ায়, আমার অবস্থাটা ঠিক সেই রকম। আমিও অবিশ্বাসের মহাসাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে খুঁজে বেড়াচ্ছি একটা কিছু অবলম্বন।

হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা জাগলো মনে। মালতী হয়তো জানে, রজত আর আমার সম্পর্কের কথা। তাই আমার মন ভাঙাবার জন্যে বারবার মিথ্যে খবর দিচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ওর সব গল্প মিথ্যে। মিথ্যে মালতী পাইন। রজত সত্য। সত্য তার প্রেম, ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি। মনে ফিরে এলো পূর্বের বল। প্রত্যয়ের দড়ি ধরে আমি অবিশ্বাসের মহাসাগর থেকে আবার উঠে এলাম স্থির বিশ্বাস-আশ্বাসের তীরভূমিতে। তাই পাওয়ারের কাছে চেপে গেলাম মালতীর গল্পগুলো। ওকে বললাম—না, মালতী, সেন সায়েবের খবর জানে না। ও বলছিলো তার নিজের জীবনের কথা।

পাওয়ার সায়েব যে আজকাল রজতকে পছন্দ করছে না, সেটা আমি বুঝেছি—তাই এই সাংঘাতিক মিথ্যে খবরটা ওকে না জানানোই ভালো বলে মনে হল। রজত আসবে। অবশ্যই সে ফিরে আসবে আমার কাছে; সেইদিন পাওয়ার সায়েবকে শোনাবো মালতীর আজকের গল্পটা।

[ক্রমশঃ

জীবন-বোধের ক্ষুধা

শ্রীমতী সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

জীবন-বোধের তৃষ্ণা যত যায় বেড়ে
অশান্তির আনাগোনা চলে অবিরাম
হৃদয়তন্ত্রীতে শুধু চাওয়ার খঞ্জনী
ভোজ চলে টুং টুং টাং।

কী পাই নি, কি পাওয়া উচিত ছিল
অসংগত চিন্তার দুর্লংঘ্য ঝটাপটি
নিরন্তর নিরবধি রক্ত স্রোতের ধারায়
বিদ্রোহের দুন্দুভি ধমনীর শাখা-প্রশাখায়।

ক্ষতি ছিল কার যদি নিঝুম রাতের মত
দ্বিধা চিন্তাহীন এই বিক্ষুব্ধ অন্তর
শান্ত স্থির অচঞ্চলের মাঝে
পেত নিশ্চিন্ততার অমোঘ নোঙরাশ্রয়।

চাই চাই চাই শুধু এই দীপ্ত ব্যঞ্জনা
বত্রিশ নাড়ীতে জাগে হাহাকার ধ্বনি
কেন যে পাওয়ার নয় সঞ্জীবনী সুধা
কেন যে পায় না তার হিসাব মেলে না।

রত্নাকরের রূপান্তর যদি
বাল্মীকির অমূল্য বেদীতে
সেই সঞ্জীবনীর নিয়ত সঞ্চরণে
কালিদাসের নব মূল্যায়ন?

সেই সূত্র ধরে বেড়ে চলে মনের হনন
আদিগন্ত অতৃপ্ত যাতনা
অশান্তি চলেছে যেন বীরগর্ব ভরে
শান্তির কোমল হাতখানি ধরে।

ভদ্রলোক গড়গড়ায় নল টানছিলেন। প্রশান্ত চেহারা। চুপ করে বসে থাকলে মনে হয় পৃথিবীতে তাঁর কোনো চিন্তা নেই। মুখে-চোখে বেশ একটা অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। মুখ আন্দাজে নাকটা যেন একটু বেশী খাড়া। আমরা ঢুকতেই ব্যস্ত হয়ে উঠে বসেন।

—আরে আরে তোরা এসেছিস। আমি তো ভাবলাম বৃষ্টিটৃষ্টি আসছে তোরা কেউ বুঝি আসবিই না। বস্, বস্ বাবা বস্।

বলাই বাহুল্য আমাদেরও দন্ত বিকশিত হয়ে ওঠে। সবাই বসল। আমি একেবারে রায়মশায়ের মুখোমুখি বসলাম।

—তারপর! আর কি করার ইচ্ছে আছে। নিশ্চয়ই তাস। নাকি—রায়মশাই-এর কথায় বাধা পড়ে। রায়গিন্নি একথালা ঝাল মুড়ি আর গরম গরম একপেয়ালা করে চা দিয়ে গেলেন।

বিধু খুশীতে উপচে পড়ে বলে—ও! গ্র্যাণ্ড! সত্যি রায়গিন্নির তুলনা নেই!!

সবাই হেসে উঠল। আমার কিন্তু খাবারের দিকে নজর ছিল না। আস্তে আস্তে বললাম—রায়দা আজ তাস্ থাক্, বরং একটা গল্প বলুন।

রজত মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে—সেই ভাল। আপনি বরঞ্চ আপনার জীবনের কোন কথা বলুন তাহলে অরুণের খুব সুবিধা হবে—হয়ত বা কোনো মনোমত প্লটই পেয়ে যাবে।

হো-হো করে সবাই হেসে উঠল, মাঝের থেকে আমিই যেন মিইয়ে গেলাম।

রায়দা গম্ভীরভাবে বললেন—ঠিক আছে? আজ একটা ঘটনাই বলব। আমার জীবনের নয়—আমার এক বন্ধুর ঘটনা। তবে অরুণ তুমি এটা আবার লিখে বোস না। তোমার তো আবার ওই বদ অভ্যেসটা আছে।

এবার সৌরেন মুখ খোলে—কেন রায়দা, কি এমন ঘটনা যা অরুণকে এমন নিরাশ করে দিতে পারে।

রায়দা শুধু হাসে, তারপরে চোখ বুজে নলটায় বারচারেক গুড়ুক গুড়ুক করে টান দেন। তারপর বলেন—এই আর কি। মানে ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত কিনা তাই।

আমি আশ্বাস দিলাম—আপনার কোন ভয় নেই রায়দা, লিখব না! পাছে এমন গল্পটা ফস্কে যায় তাই রায়দাকে তাড়া দিই বলবার জন্যে।

কৃষ্ণা চৌধুরী

প্রশান্ত হাসি হাসে রায়দা। তারপর বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ না করে গড়গড়ায় টান দিতে থাকেন। আমরা সবাই অধৈর্য হয়ে উঠলাম।

রজত আর থাকতে পারলো না, বলে উঠলো—এই কি আপনার নল টানার সময় রায়দা—বলুন!

—হ্যাঁ। ঘটনাটা ঘটেছিল বর্মায়। কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী এবং আমি একসাথে বর্মায় রওনা হই। কৃষ্ণেন্দু খুব ভাল শিকারী ছিল। বন্দুক নিয়ে শিকার করা ওর যেন একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুটা বেপরোয়া বলতে পার। ওর সাথে মাঝে মাঝে আমিও শিকারে যেতাম। সেই রকমই একদিন ইনসিনের জংগলে গিয়েছিলাম। গহীন বন, কিন্তু ভারী সুন্দর। এত নিস্তব্ধ যে আমার বেশ ভয় করতে লাগল। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর চোখে দেখলাম কি উৎসাহ। বন্দুক হাতে করে চকচকে দৃষ্টিতে আগে আগে যেতে লাগল। কিন্তু বেশ খানিকটা যাওয়ার পরেও কোন পশুর হদিশ পেলাম না। হঠাৎ কাছাকাছি মনে হোল যেন কিছু একটা আছে। কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছে।

খানিকক্ষণ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল—রায়, একটা আওয়াজ আসছে না?

আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। সহসা কৃষ্ণেন্দু বন্দুকটা ওপর দিকে তুলে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল। আর তাতেই হল অভূতপূর্ব কাজ।

আস্তে! বলে একটা সুললিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম এবং পরক্ষণেই দ্রুত দৌড়ে যাবার মধুর অস্পষ্ট এক আওয়াজ।

কৃষ্ণেন্দু বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাল, তারপর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে যেদিক থেকে আওয়াজটা এল সেদিকে ছুটে চলে গেল। আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

রায়দা থামলেন।

রজত উত্তেজিত ভাবে বলল—আপনি—মানে একটা মোট্ ইয়ে রায়দা। এমন একটা জায়গায় কেউ থামে কখনও!

রায়দা রজতের কথার কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ না করে, নিঃশব্দে নলটা মুখে পুরে টানতে লাগলেন। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সত্যি বলতে কি রবার্ট ব্রুসের মত ধৈর্যের অধিকারী আমি ছিলাম না,—তাই প্রশ্ন করে বসলাম—কৃষ্ণেন্দুর কি হল রায়দা?

রায়দা নল নামিয়ে বললেন—হ্যাঁ; কৃষ্ণেন্দু দৌড়ে চলে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বাদে ক্লান্ত শরীরে ও ফিরে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কিরে! কিছু পেলি?

বন্দুকটা কাঁধে রেখে ও বলল—না, কিছু পাইনি, তবে অপূর্ব একটা পোশাকের ঝলকানি দেখেছি।

—তার মানে?

কৃষ্ণেন্দু হাসল—মানেটা তলিয়ে দেখি নি। শব্দ শুনে দৌড়ে যেতে দূর থেকে শুধু একটা ঝকঝকে লুঙ্গি, ফুলহাতা চমৎকার একটা ব্লাউজ আর মাথার উপর আরেকটা মাথা, মানে মস্ত

এক ঝোঁপা দেখতে পেলাম। বাব্বা! কি প্রচণ্ড জোরে দৌড়ে কোথায় যে লুকিয়ে গেল আর খুঁজেই পেলাম না।

আমি বললাম—বার্মিজ মেয়েটেয়ে হবে হয়ত, ভয় পেয়ে পালিয়েছে! কৃষ্ণেন্দু অন্যমনস্কভাবে বলল—হয়ত তাই!

আগেই বলেছি, আমরা তখন দুজনেই যুবক। আর কৃষ্ণেন্দুর কলেজে প্রচুর নামডাক ছিল, ওর চেহারার জন্য। অমন সুপুরুষ চেহারা আমি খুব কম দেখেছি। যাই হোক, সে রাতের কথায় আসা যাক। ভাবনাযুক্ত কৃষ্ণেন্দু মুখার্জীকে আমি সে রাতেই আবিষ্কার করলাম। খেতে বসেও ও কি যেন ভাবতে লাগল। আমি হাসলাম, তারপর দু' চোখে কৌতূহলের কাজল টেনে বললাম—কিরে—কি ব্যাপার তোর?

ও চমকে যাওয়ার মত বলল—কি—কি ব্যাপার আবার।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কি ভাবছিস বলত!

কোন উত্তর দিল না কৃষ্ণেন্দু। নিঃশব্দে খাওয়া সেরে ঘরে ঢুকলাম। রাতের পোষাক পরতে পরতে ও আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—এতদিন যা খুঁজছিলাম, তাই পেয়েছি।

আমার কৌতূহলের আগুনে যেন ঘি পড়ল। এত দিন ধরে কোন একটা কিছু ও খুঁজছে অথচ আমি তার বিন্দুবিসর্গ জানি না!

ক্ষোভ মিশ্রিত গলায় বললাম—কি সে জিনিস যা আমি পর্যন্ত জানি না!

ও আবার হাসল। তারপর বিছানায় শুতে শুতে বলল—ঝকঝকে লুঙ্গি, চকচকে ব্লাউজ আর চঞ্চল পদক্ষেপে পালিয়ে যাবার একটা মিষ্টিমধুর ছোঁয়া।

সকালের কথা মনে পড়ল। আর তখন বুঝতে না পারলেও এখন সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছি কেন ও এত আনমনা ছিল সারাদিন। খুব ভয় হল মনে। বর্মায় আমি এর আগেও একবার এসেছি। কাজেই বার্মিজ জাতটাকে মোটামুটি চিনেছি। ওরা সব হিংস্র হয়। তবে মেয়েদের কথা জানি না কারণ কৃষ্ণেন্দুর মত মন-ভুলানো চেহারা আমার কস্মিনকালেও ছিল না। মনে আছে কলেজে একটি মেয়ে প্রায়ই আমার দিকে তাকিয়ে দেখত। আমার যেন কেবলই মনে হতো ও তাকিয়ে হাসছে। ভাবলাম, একেই বোধহয় প্রেমের ভূমিকা বলে। তাই পৈত্রিক সাহসটাকে যথাসম্ভব সুসংবদ্ধ করে একদিন করিডোরে বললাম—ইয়ে ম্যাডাম। আপনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন কেন।

মেয়েটি ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সত্যি সত্যিই একটু হেসে বলল—ওঃ হো—মনে পড়েছে। আপনার চেহারাটা অনেকটা আমার পোষা উল্লুকটার মত কি না তাই—

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

অর্ডন্যান্স ক্লাব আয়োজিত ফ্যাশান প্যারেডে অংশগ্রহণকারিণী তরুণী হালফ্যাশানের শাড়ি দেখাচ্ছেন। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার তিনজন বিজয়িনী

মহাকাব্যের ও মৌর্য্য যুগের নগর বিন্যাস

॥ শেষাংশ ॥

শ্রীঅবনীকুমার দে

বারাণসী

'মৎস্য পুরাণ' মতে নদীতীরে অবস্থিত নগরগুলির আকার অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক হিন্দুই অবগত আছেন যে পবিত্র বারাণসী সহর গঙ্গানদীর বাঁকে অবস্থিত ও আকারে অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

মথুরা

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে লিখিত আছে যে যমুনা নদীর বাঁকে অবস্থিত মথুরা নগরীকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি দেখাইত। এক সময় এই নগর দুর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। নগরের চারিদিকে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর ছিল। বপ্রের উপর কামান রাখিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজ স্থাপিত ছিল। নগরে অসংখ্য উদ্যান ও বন ছিল।

দ্বারকা

দেবী পুরাণের বিষ্ণুপর্বে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রাজধানী দ্বারকা বা দ্বারাবতীর নগরবিন্যাস ও নির্মাণকার্য সম্বন্ধে যাদবদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন—'নগরে মন্দির স্থাপনা করিতে হইবে। রাজপথগুলির পরিমাপ করিতে হইবে। রাস্তার সংযোগস্থলে বা অন্যান্য সুবিধাজনক স্থানে ত্রিভুজাকৃতি বা চতুর্ভুজাকৃতি উন্মুক্ত বা অনাবৃত স্থান রাখিতে হইবে। গৃহনির্মাণের জমিগুলি নির্বাচিত করিয়া ও পরে দিক-নির্ণয় করিয়া গৃহগুলি উত্তমরূপে বিন্যস্ত করিতে হইবে।'

দেবস্থানগুলির জায়গা সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইত। বৃক্ষাদি রোপণের জন্যও বিশেষ বিশেষ স্থান সংরক্ষিত থাকিত। নির্মাণকার্যে নিযুক্ত যাদবেরা নগরের স্থান নির্বাচন করিয়া এবং পরে ইহার চতুঃসীমা পরিমাপ করিয়া ও নগরটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া, শুভদিনে বাস্তুদেবতার পূজা করিবার পর নগর নির্মাণকার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এক সময়ে এই নগর দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইত। নগরের পরিখা এরূপ প্রশস্ত ছিল যে, উহাকে গঙ্গানদীর ন্যায় দেখাইত। সহরে আটটি প্রশস্ত পথ ছিল। ইহাদের মধ্যে চারটি অপর চারটির সহিত সমকোণে অর্থাৎ আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত ছিল। নগর-প্রাচীরের ভিতর দিকে ঐ পথগুলিকে বেষ্টন করিয়া নগরের চারদিকে অপর একটি প্রশস্ত বৃক্ষশোভিত প্রদক্ষিণপথ ছিল। পথগুলির সন্ধিস্থলে বৃক্ষ অথবা মন্ত্রণা-মণ্ডপ ছিল। বয়স্ক ব্যক্তিরা এইখানে বসিয়া গল্প করিতেন বা একত্রে স্থানীয় রাজনীতি আলোচনা করিতেন।

হরিবংশ হইতে জানা যায় যে, বহু নির্মল জলপূর্ণ পুষ্করিণী, সুদৃশ্য চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ, ফলের বাগান, উদ্যান ইত্যাদি দ্বারকা নগরীর শোভা বর্ধন করিত। পথে স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিবার চালাঘর ও জন্তুদের পানীয় জলের ঢাকনিবিহীন সরু লম্বা পাত্র থাকিত।

দ্বারকানগরী প্রথম পরিকল্পনাকালে শ্রীকৃষ্ণের স্থপতি বিশ্বকর্মা বলিয়াছিলেন যে, নগরবাসীদের সংখ্যার অনুপাতে নগরের আয়তন যথেষ্ট হইবে না। আরও অধিক স্থানের প্রয়োজন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি ভুল বুঝিতে পারিয়া নগরের পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের আদেশ দেন।

নূতন পরিকল্পনায় নগরের পৌর এলাকা দ্বিগুণ বর্ধিত করিয়া দৈর্ঘ্যে বার যোজন ও প্রস্থে আট যোজন করা হইল। পূর্বে নগরে কিছুসংখ্যক প্রশস্ত রাস্তা থাকিলেও উহাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। নগরে অসংখ্য সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। নগরী সম্প্রসারণকালে প্রশস্ত রাস্তাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এই রাস্তাগুলির ষোলটি সন্ধিস্থলে ষোলটি অপূর্ব প্রাঙ্গণ নির্মাণ করা হইয়াছিল। নগরীর নূতন পরিখাগুলি আরও প্রশস্ত করা হইয়াছিল। নগর-প্রাচীরের উপর আরও অধিক সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র ও আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্রাদি রাখা হইয়াছিল। নগরের উদ্যানগুলিতে সুসমঞ্জসভাবে অধিক সংখ্যায় বৃক্ষলতাদি রোপণ করা হইয়াছিল।

নগর সম্প্রসারণকালে পুরাতন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। পুরাতন পরিখাগুলি মাটি ভর্তি করিয়া বুজান হইয়াছিল। নগরের বাহিরে পার্শ্ববর্তী স্থান পরিষ্কার করিয়া নূতন নগরের ভিত্তিস্থাপনের উপযোগী করা হইয়াছিল।

নগর সম্প্রসারণকালে সাধারণত পুরাতন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সম্প্রসারিত নগরের চারিদিকে নূতন প্রাচীর নির্মাণ ও পরিখা খনন করা হইত। কখনও কখনও প্রাচীর না ভাঙ্গিয়া কেবলমাত্র পরিখা মাটি দিয়া ভর্তি করিয়া ফেলা হইত। সাধারণত পুরাতন প্রাচীর ও পরিখাগুলিকে নূতন রাস্তায় পরিবর্তিত করা হইত। পুরাতন রাস্তাগুলিকে আরও প্রশস্ত করিয়া উভয় দিকে দৈর্ঘ্যেও বর্ধিত করা হইত।

মহাভারতের বর্ণনা হইতে প্রাচীন ভারতের যে সমাজচিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে, শেষ পর্যন্ত চতুর্বর্ণ বিন্যাসই আর্যসমাজের ভিত্তি ও

প্রধান বৈশিষ্ট্য রহিয়া উঠিয়াছিল। গুণ ও কর্মগত বর্ণবিভাগ ক্রমে ক্রমে জন্মগত হইয়া উঠিয়াছিল। উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকেদের উপর অত্যাচার, অবিচার ক্রমশই অধিক পরিমাণে চালাইতেছিল। ইহার ফলে সমাজের ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের লোকেরা ক্রমে ক্রমে অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিল।

মহাবীর ও বুদ্ধদেব, যে দুইজন বৈদিক ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ও তাহার আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন ও বৈদিক ধর্মের সংস্কার করিবার জন্য ভারতে নূতন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করিলেন, তাঁহারা দুইজনেই ছিলেন অব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজবংশসম্ভূত। মহাবীর ও বুদ্ধদেব দুই জনেই খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত প্রায় একসময়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধযুগ ও জৈনযুগ হইল আর্য-ভারত ও হিন্দু-ভারত এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সেতু।

জাতকের যুগ

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ববর্তী সময়ে জাতকের যুগে স্থাপত্য-শিল্প অত্যন্ত উন্নত ছিল। এই সময়ে নির্মিত কুটিরগুলির দেওয়াল শর অথবা কাঠের তৈয়ারী হইত এবং পাতা ও ঘাস দিয়া তাহাদের চাল ছাওয়া হইত। অধিকতর শক্ত গৃহগুলি কাঠ, ইঁট অথবা পাথরের তৈয়ারী হইত। গৃহনির্মাণে পোড়ান এবং রৌদ্র-শুষ্ক দুই প্রকার ইঁটেরই ব্যবহার হইত। গৃহে স্নানঘরও তৈয়ার করা হইত। নগরাদি ও দুর্গের পরিকল্পনা ও নির্মাণরীতি পূর্ববর্ণিত প্রকারের ছিল। নগরের বাহিরে চারিদিকে পরিখা খনন করা হইত। প্রধান রাস্তার দুই পাশে দোকান ও অন্যান্য রাস্তার দুই ধারে গৃহগুলি সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকিত।

পালি অনুশাসনের মধ্যে স্থাপত্য-শিল্প অত্যন্ত উন্নততরে উন্নীত হইয়াছিল। গৃহনির্মাণে ইঁট ব্যবহার করা হইত। ইঁট অথবা পাথর দিয়া গৃহের ছাদ নির্মাণ করা হইত। গৃহে স্নানঘর ও নর্দমাও থাকিত।

মৌর্য-পূর্ব যুগ—রাজগৃহ

রাজগৃহ—শিশুনাগ বংশের পঞ্চম রাজা বিম্বিসার খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিহারের রাজগৃহে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

বিপুলগিরি, বৈভরগিরি, শোণগিরি, উদয়গিরি ও রত্নগিরি নামে পাঁচটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী অধিত্যকায় এই নগরটি অবস্থিত ছিল। প্রাচীর-বেষ্টিত নগরটির পরিধি ছিল প্রায় পাঁচ মাইল। প্রথমে নগরের পাঁচটি প্রবেশদ্বার ছিল। দুইটি সন্নিকটবর্তী পাহাড়ের ঢালের মধ্যবর্তী অগভীর

প্রথমে রাজগৃহ একটি প্রাসাদ-নগরী ছিল। রাজপ্রাসাদ ও ইহার রক্ষণার্থ নির্মিত অন্যান্য স্থান ও ইমারতগুলি ছিল নগরের প্রধান কেন্দ্র। এই অংশের উত্তরদিকে উচ্চ সমতল স্থানে রাজপ্রাসাদ ও ইহার প্রাঙ্গণ এবং সন্নিকটে কয়েকটি ক্ষুদ্রতর গৃহ ছিল। নগরের দক্ষিণ দ্বারের নিকট দুর্গ অবস্থিত ছিল। নগরের মধ্যে প্রাসাদের পরই এই দুর্গ ছিল দ্বিতীয় প্রধান ইমারত। প্রাসাদ ও দুর্গ প্রস্তরদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত হইয়াছিল।

প্রাকারের নিকটে কয়েকটি ইমারতের অল্প ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় এইগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল পর্যবেক্ষণের বুরুজ। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটির এখন অধিকাংশই জঙ্গলে ভর্তি। সুতরাং নগরীর
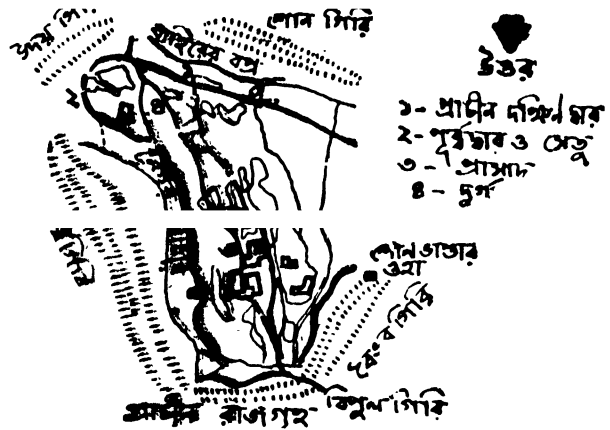
গিরিখাতের সুবিধাজনক স্থানে প্রবেশদ্বারগুলি রাখা হইয়াছিল। উদয়গিরি রত্নগিরির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট পার হইবার জন্য একটি সেতু ছিল।

পূর্বদিকের প্রবেশ দ্বারের সহিত এই সেতুর সংযোগ ছিল। বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত চারিদিকের নগর প্রাচীর অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। এই প্রাচীর নির্মাণে কোনপ্রকার মশলা ব্যবহার করা হয় নাই। স্থানে স্থানে এই দেওয়াল নিকটস্থ জমি হইতে তিন ফুট পর্যন্ত উঁচু ছিল। প্রাচীরের নিম্নে জল-পূর্ণ পরিখা ছিল।

নগর-বিন্যাসের নিদর্শন কিছুই মেলে না, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে নগরের মধ্যে সাধারণ লোকেদের বসবাসের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এই প্রাসাদ-নগরে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে শুধু সম্ভ্রান্ত রাজ-অনুচরবর্গের বসবাসের জন্য সুবন্দোবস্ত ছিল। নির্দিষ্ট সংখ্যক অন্যান্য কর্মচারীদেরও বাসগৃহ ছিল। ইহাদের দেওয়াল কঞ্চির বেড়ার দ্বারা তৈয়ারী ও কাদার প্রলেপ ছিল। এই সকল গৃহের এখন কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ হইতে নগরের রাস্তাঘাট বিন্যাসের সুস্পষ্ট

ধারণা করা যায় না। তবে মনে হয় নগরের উত্তর প্রবেশদ্বারের সহিত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দ্বার সংযুক্ত করিয়া দুইটি রাস্তা ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম রাস্তাটি প্রাসাদের পশ্চিম দিক দিয়া বিন্যস্ত ছিল। উত্তর দ্বার হইতে সুরু করিয়া আরও একটি প্রধান রাস্তার কিছু অংশের চিহ্ন পাওয়া যায়। শোন ভাণ্ডার গুহার পর ইহা জঙ্গলের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

সম্ভবত এই প্রধান রাস্তাগুলির সহিত আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত ছোট ছোট রাস্তাও ছিল। মনে হয় এইগুলি এখন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। প্রধান রাস্তাগুলি এরূপভাবে বিন্যস্ত ছিল, যাহাতে নগরের নিকটবর্তী চারিদিকের সকল অঞ্চলের সহিত সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়।

রাজপ্রাসাদই ছিল এই সুরক্ষিত নগরটির প্রধান সৌধ। সুবিধাজনক প্রাকৃতিক পরিবেশে ও পাঁচটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী উচ্চ স্থানে অবস্থিত বলিয়া নগরটি সাধারণতই সুরক্ষিত ছিল। উচ্চ স্থানে অবস্থিত প্রাসাদ হইতে বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসরবর্তী শত্রুপক্ষের গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করা যাইত এবং শত্রু নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই প্রয়োজন অনুসারে সতর্কতা অবলম্বন করা যাইত। শত্রুপক্ষ নিকটবর্তী হইলে সু-উচ্চ দুর্গপ্রাচীর ও ইহার চারিদিকের পরিখা আত্মরক্ষার জন্য খুবই কার্যকরী হইত।

বিম্বিসারের পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু রাজা হন। তিনি শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে 'পাটলি' নামে একটি নগর নির্মাণ করেন। ইহার নগর-বিন্যাসের বিশদ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এই পাটলকেই কেন্দ্র করিয়া পাটলীপুত্র নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনুমান করা হয় যে, অজাতশত্রুর রাজত্বকালের পরের দিকে পাটলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার পুত্র দর্শক পাটলের সংলগ্ন স্থানে কুসুমপুর নামে এক নগর নির্মাণ করেন। *

---

*এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ, পুস্তকাদি হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য লওয়া হইয়াছে—

১। 'টাউন প্ল্যানিং ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া'—বিনোদবিহারী দত্ত।

২। সমাজবিদ্যা—বিনয় ঘোষ।

৩। 'আর্লি চ্যাপ্টার্স্ ইন ইণ্ডিয়া টাউন প্ল্যানিং'—এস সি মুখার্জী।

৪। 'স্টাডি অন বাস্তুবিদ্যা'—ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য।

যুগের ধারায় গির্জা নির্মাণ

যুগটা আণবিক, তাই গির্জার চেহারাতেও তার ছাপ পড়ছে। ডুসেলডর্ফের নতুন সেণ্ট রোকাস গির্জাকে একটি কোণ থেকে দেখলে মনে হয় যেন সেটি একটি পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর নয় একটি বিশাল টুপি। গির্জাটির স্থপতি হচ্ছেন পল শ্নাইডার এসলেবেন। যুগের ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে ঘরবাড়ির যে রূপ বদলাবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

আমি

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়
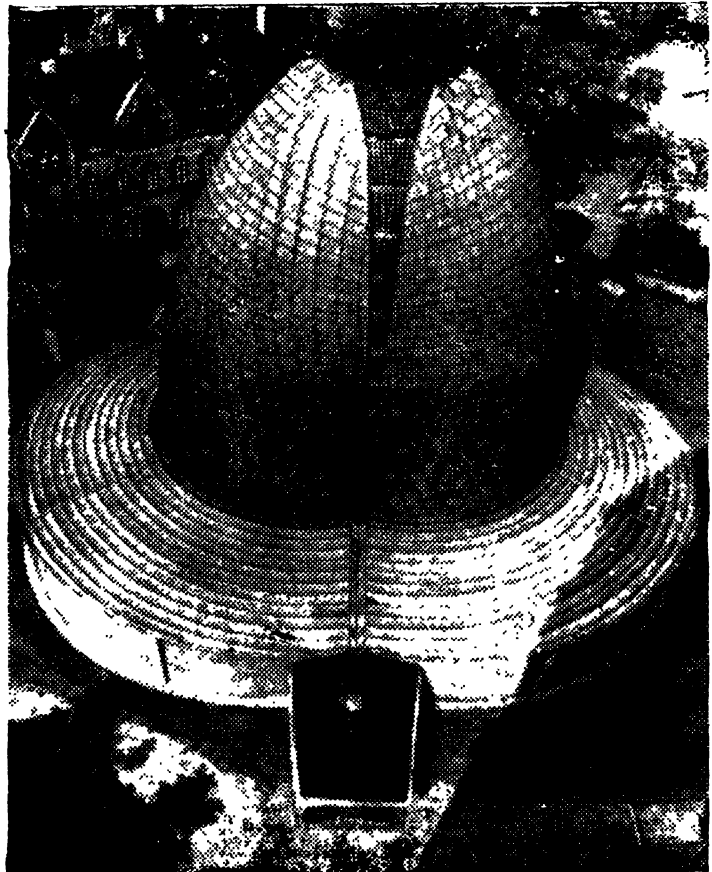
আজকের পৃথিবীতে অনেক কাজ আর মানুষের ভিড়, অনেক সমস্যা আর যন্ত্রণা। সবাইকে নিয়ে সবার জন্যে ভাবতেই মানুষ সবসময় ব্যস্ত। নিজেকে নিয়ে ভাববার তার আর সময় কোথায়? বাজার, চাল, ডাল, নুন—পাঁউরুটি, কয়লা, কেরোসিন—রোজকার দরকারিদ্রব্যের একটা না একটা রোজ উধাও হচ্ছে। জোগাড় করতে প্রাণান্ত। খোলাবাজার থেকে চোরাবাজার হাঁটা-হাঁটি করতে করতে জুতোর 'সোলের' সঙ্গে আয়ুরও ক্ষয়। এর ওপর আছে লাইন। সাপের মত বা তরুণী মেয়ের বিনুনীর মত আঁকাবাঁকা কিউ।

কিন্তু আজকের আমার আপনার বেঁচে থাকার যন্ত্রণা কি এখানেই শেষ? মোটেই নয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের মিল কিছুতেই হয় না, খাওয়া পরাতেই প্রায় সব বাজেট আপসেট। কিন্তু তাই বলে আপশোষ করবার সময় কই? সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়। সময় নদীর স্রোতের মত সস্তা গণ্ডার দিনেও যেতো, এখনো যাচ্ছে। তবে তফাৎ এই তখন সময়ের স্রোতে আরামে গা এলিয়ে অনেকক্ষণ আরাম করা যেতো, এখন তা একেবারেই করা যাচ্ছে না।

করা যে যাচ্ছে না তা কিন্তু কোনমতেই—জওহরলালজীর সেই 'আরাম হারাম হ্যয়' স্লোগানের ভয়ে নয়। সত্যিই আরাম করবেন কি করে? ভেজাল ভক্ষণে রোগ ও সেই সঙ্গে ডাক্তারের বিল বেড়েছে। ঘন ঘন ছাত্র-ধর্মঘটে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা সমস্যা হয়েছে এবং বেকার সমস্যার পাশ করার পর ছেলেমেয়েদের চাকরিরও সমস্যা হয়েছে। মেয়ের বিয়ের সমস্যা, ছাঁটাই ও লক আউটে চাকরি বজায় রাখার সমস্যা ও সবার উপরে দুরাচার, অনাচার ও দুর্নীতিতে চরিত্র খাঁটি রাখার সমস্যা।

সে যুগে সস্তাগণ্ডার দিনে এত সমস্যা ছিল না। আর প্রতিসমস্যা নিয়ে এত বাড়াবাড়িও ছিল না। জিনিষপত্রের আকাশছোঁয়া দামে এখন মাটিও ছোঁয়া যাচ্ছে না। গ্যাঁতে হুমড়ি খেয়ে পড়া ছাড়া মাটি ছোঁয়ারও আজ আর কোন উপায় নেই। তবু মর্মান্তিক পরিহাস এই যে মানুষ আজ শুধু চাঁদেরই স্বপ্ন দেখছে না, চাঁদে পা ফেলার চেষ্টা করছে।

কিন্তু এতো অভাব অভিযোগ, এতো অনটন; বেঁচে থাকার এতো যন্ত্রণা সত্ত্বেও সবই হচ্ছে যা এতকাল হয়ে এসেছে: উৎসব হচ্ছে, বিলাস হচ্ছে। অতি-আহার, অনাহার, ভোগ, দুর্ভোগ: বাদ যাচ্ছে না কিছুই। থাকছে সবাই, মা, বাবা, ভাই, বোন। থাকছে সবই: লোভ, ক্ষুধা, অবসাদ, অনুপ্রেরণা। শুধু ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে একজন। সে হল আমি। মানুষ সমাজ, সংসার, মা, বাবা, ভাই, বোন, অফিস নিয়ে এখন এত ব্যস্ত যে সে নিজের কথা ভাবতে পারছে না। দ্রুতগতি সময়ের প্রচণ্ড কলস্রোতে নিজের জন্যে ভাববার সে একটুও সময় করতে পারছে না।

তার মানে এই নয় যে, মানুষ নিজের জন্যে কিছু করছে না। খাওয়া পরার ব্যবস্থা তো হচ্ছেই। আমি যেই হই, আর যেমনই হই, দু'বেলা খাওয়া আমার ঠিকই দরকার। পরবার জন্যে কাপড় জামা জুতো প্রয়োজন অবশ্যই। নিজের জন্যে দামী ঘড়ি, রেডিও, ভাল বিছানা করছে বৈকি অনেকে। নিজের জন্যে বাড়ি, গাড়িও। কিন্তু দেখা গেছে, ঘড়িটি পরে বেড়াচ্ছে মেয়ে; গাড়িটি চালিয়ে বেড়াচ্ছে ছেলে, বিছানায় নাক ডাকছে শ্যালক আর রেডিওর বারোটা বাজাচ্ছে গৃহিণী। সুতরাং নিজের সখ ও সুখের জন্যে জিনিষ কেনা ও তা ব্যবহার করা এর মধ্যে তফাৎ অনেক। আমি আমার সখের জন্যে কিছু কিনে ত যদি ব্যবহার করতে না পারলাম, তবে আমার আমিকে দোষ দেয়া ছাড়া আর উপায় কি? আর জোর করে ব্যবহার করতে গেলে পাড়াপড়সী তো বটেই নিজের অতি প্রিয়জনদের কাছেও মর্মঘাতী মন্তব্য শুনতে হবে, কি স্বার্থপর।

সুতরাং সুখে আমি নেই। কিন্তু দুঃখেও কি নেই? দুঃখের কথা, সেখানে আছি। দুর্ঘটনা হলে আমাকে ছুটতে হবে, হাসপাতালে যেতে হলে আমার গাড়ি বেশ কিছুদিন বিনা ভাড়ার ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আর বিয়োগান্ত কিছু হলে বাড়ি গিয়ে সমবেদন জানানো থেকে শ্মশানে শেষকৃত্য পর্যন্ত সঙ্গে থাকতে হবে।

সুখ যদি না চান অতি উত্তম। যদি না পান, আরো উত্তম। জোর করে নিজের সুখে ভাগ বসাতে গেলে আপনি মন্দ কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, দুঃখে উদাসীন থাকলে স্বার্থপর মন্তব্যের সঙ্গে আরও একটি বিশেষণ, 'নিষ্ঠুর'। এর পর আর আমি কোথায়? প্রিয়জনদের অপ্রিয় চক্রান্তে আমি কোণঠাসা হতে হতে একেবারে নির্বাসিত হতে চলেছে।

অনেকেই বলবেন আমির দরকারটা কি। আমির মধ্যে আমিত্ব যত না থাকে ততই ভাল। যার মধ্যে যত আমি-আমি গন্ধ লোকে ততই তাকে অপছন্দ করবে। সব কাজে আমি আমি করে সব ব্যাপারে নিজেকে নিয়ে বড়াই করা শোভন তো মোটেই নয় বরং নির্লজ্জ ব্যাপার। অতএব আমির গন্ধ যত যায় ততই কাম্য।

হয়ত ঠিক। হয়ত কন, ঠিকই। আমি আমি করে আমিত্ব ফলাতে খুব কম আমিই চায়। কিন্তু আমির দুঃখ আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আর কেউ অনুভব করতে পারবে না। আমির জন্যে কোথাও তেমন প্রশংসা নেই, সাধুবাদ নেই, সহানুভূতি সমবেদনা তেমন নেই। যা আছে তাতে

খুব কম আমিরই মন ভরে। প্রিয়-জনেদের জন্যে অনেক কিছু করেও কৃতজ্ঞতার তালিকায় ওপরের দিকে শুকনো শ্রদ্ধা কি ভালবাসাই অনেকের ভাগ্যে জোটে। দেশের ও দশের জন্যে করলে আর কিছু না হক কাগজে নাম ও ছবি ছাপা হয়। খুবই সৌভাগ্য-বান হলে মর্মর মূর্তি গড়া হয়, এমন কি রাস্তার নাম হয়।

আমি ছাড়া পৃথিবীতে সকলেই তো তুমি। সেই তুমি বলবে আমি বড ভাগ্যবান। কারণ সে হৃদয়বান। কারণ সে নিঃস্বার্থ। তার ত্যাগের তুলনা নেই। আমির কাজ তোমার জন্যে কাজ করা। সুতরাং ফলাফলের কি লাভ কি লাভ আমির থাকা উচিত নয়। সত্যি বলতে কি এই তুমিই আমার সর্বনাশ করছে। কারণ সে জানে তুমি না থাকলে আমির কোন অস্তিত্ব নেই এই পৃথিবীতে।

যতই যুক্তি হক, যতই কথা হক তবু আমি বলব আমি একান্তই একা। বড়ই নিঃসঙ্গ। এ আমির যন্ত্রণা। আবার এ আমির সুখ। এ আমির অভিশাপ, এ আবার আমির আশীর্বাদ। আজকের এই কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে কাজ, কথা আর মানুষের এতো ভিড় যে আমি কখনই আমিকে একা পেতে পারছে না মনের মত করে। তবু রাতে বিছানায় শুয়ে একা একা ঘুমোবার আগে ঘুম যখন আসে না, তখন। শ্রাবণের কোন বৃষ্টি-ঝরা মেঘলা দুপুরে ঘরে একলা বসে জানলা দিয়ে মেয়েদের আনাগোনা দেখা আকাশে তাকানো, তখন। কনকনে শীতের বিকেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়সড় চোখে দুটো চড়ুই পাখীর কিচিরমিচির খেলা দেখা, তখন।

গীতাঞ্জলি খুলে সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটি যখন আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করবে, তখন। তখনই সেই অবাক আশ্চর্য মুহূর্ত অনেকগুলো পাওয়া যাবে নিজের জন্যে। উদাস হয়ে আসবে মন। কবিতা হয়ে যাবে ভাবনা সব। কথা হয়ে যাবে গান। ইচ্ছে হবে হিসেব করতে কি যে পেলাম আর কি পাইনি। ইচ্ছে করবে ভাবতে সেই একজনকে যে এক সময় অনেক কাছে ছিল। নিজেকে একা পাওয়ার দুর্লভ এই অবসর-গুলোতে ভালবাসার অনেক কিছু ভাবতে ইচ্ছে করবে। ভালবাসত হচ্ছে করবে শুধু নিজেকে। রেলের জানলা দিয়ে বাইরে চলমান প্রকৃতির ছবি দেখা, নদীর ধারে বসে ভেসে-চলা বকেদের সারি দেখা—এই উদাস মুহূর্তগুলোতে যে মন উধাও পাখা মেলে অনন্তে উড়ে যায়, সে মন একান্ত আমার—সেখানে শুধু আছে সেই হাসি আর কান্নার আসরে অবগাহন করবার জন্যে আছে 'চিরদিনের সেই আমি।'

আজকের যুগযন্ত্রণায় অবজ্ঞা অবসাদ ও অপূর্ণতার ভিড়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে আমি। হারিয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য সুন্দর এই উদাস মুহূর্তগুলো। মুহূর্তগুলো কে জানে আসে হয়তো; কিন্তু কবিতা আসে না, আসে কান্না। মনের কথার চেয়ে মাইনের কথা বেশী মনে আসে। দেখেছি তার কালো হরিণ চোখের চেয়ে মনে আসে কোন টালে কয়লা দেখেছিলাম। হাতে হাত ধরার কোন পুরোনো স্মৃতি বাসের হাতল ধরার জায়গা নেয়।

তবু আমি, আমি। সব তুমিই আমি। আর ভয় কি? কারণ আর কিছু থাক না থাক, আর কেউ থাক না থাক, এ নিশ্চয়ই জানি: তুমি আছ, আমি আছি

মৎস্য-শিকারী

মৎস-শিকারীর মানসিক ক্রিয়া পদ্ধতি আকর্ষণীয়। মাছ ধরার চিন্তায় সে এমন অদ্ভুত মশগুল থাকে যে, তার মস্তিষ্কের অনুভূতি হয় যেন সেটা অক্ষিগোলকের মধ্য দিয়ে ফাৎনা-র ডগায় নোঙর করা হয়েছে।

তখন তার মন থেকে বাড়তি তেল খরচা নিয়ে বউয়ের সঙ্গে তুলকা-লাম ঝগড়ার স্মৃতি অপসৃত, কিংবা গয়লাকে কী বলে আগামী কাল ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তাও সে বেমালুম ভুলে গেছে। পাগলামী মনে হলেও একথা সত্যি যে, তার মাথায় তখন একমাত্র মাছ ধরার চিন্তা। মাছ ছাড়া দুনিয়ার আর সব কিছু তখন শুধু মায়া, স্বপন-মায়া, নিছক ছলনা। এবং, সেজন্য তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

কোন মৎস্য-শিকারীকে—'আহা, যদি আপনার মত ধৈর্য আমার থাকত,' বলা আর গরিলাকে—'আহা, তোমার মত সঙ্গীতের কান আমার যদি থাকত' বলা প্রায় একই ব্যাপার।

কেন না, আর যাই হোক্, এরা আদৌ ধৈর্যশীল নয়। সম্ভবত এরাই অ-ধৈর্যশীল পার্থিব প্রাণী। ওরা ঠিক চুপচাপ একটা কিছু যখন হোক ঘটার অপেক্ষায় বসে থাকে না। ওদের আশা, এমন কি তীব্র ইচ্ছা, এক্ষুণি কিছু ঘটুক, নয়ত পরমুহূর্তেই।

এমন কি, না ঘটলেও ওরা বিশ্বাস করে না যে তা ঘটবে না, ওদের স্থির বিশ্বাস অমনোযোগী হওয়ামাত্র ঈপ্সিত ঘটনা ঘটবেই। এ জন্যই তারা এমন সাংঘাতিক অধৈর্যশীল

ধারাবাহিক উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

ব্রিজমোহনের সত্যি সত্যি হিমিকার মত একটি মেয়ে দরকার হচ্ছিল। ওকে ভাল মাইনে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কারণ জানতেন হিমি যদি কাজ করতে পারে, কোম্পানীর প্রচুর লাভ হবে। নতুন ওষুধটা দু'বছর পরেই অকেজো হয়ে যাবে। অবশ্য লেবেল বদলে দিলে আরো দু'বছর সময় হাতে থাকে কিন্তু তাতেও ঝামেলা প্রচুর। খুব গোপনে লেবেল বদলানোর কাজ হলেও কিছু লোক কাজে লাগবেই। দু' একটা প্রমাণ—পুরনো লেবেল হাতসাফাইয়ের জোরে পাচার করে নিতে পারলেই, কাম ফতে। তখন কোম্পানীকে চোখ রাঙাবে ইচ্ছেমত।

সুতরাং ওসব ঝুট-ঝামেলার মধ্যে যেতে ইচ্ছা নেই সাউসাহেবের একান্ত দরকার না হ'লে। হিমি যদি কিছু ওষুধ চালাতে পারে। কয়েকটা হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ডাক্তার, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার আর কিছু বড় বড় ওষুধের দোকান। ব্যস, তাহলেই আর দেখতে হবে না। মাল কেটে যাবে হুড়-হুড় করে। আরে সব ওষুধের প্রপার্টিস্ তো এক—এক ফরমূলা। কেবল নতুন দু' একটা নাম ঢোকানো। কাস্টমারদের মাথায় ঢোকাতে হবে যে সাউ কেমিকেলের ভিটাটোন খেলেই শরীর একদম চাঙ্গা হয়ে উঠবে। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, টি-বি—সব বড় বড় অসুখের পর ভিটাটোন অবশ্যই খেতে হবে। একবার কয়েকজন লোক কনভিন্সড্ হ'লে তারাই পরে বন্ধু-বান্ধবের কাছে ভিটাটোন রেকমেণ্ড করবে। টনিকগুলো আর ডাক্তারের কথামত খাচ্ছে ক'জন, নয় যে প্রত্যক্ষ ফলপ্রাপ্তদের রেকমেণ্ডেশন। অনেক সময় রেকমেণ্ডেশনকে মর্যাদা না দিলে বন্ধু-বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে যায়।

ট্রাঙ্কুলাইজারটাও তেমন চলছে না। সাধারণ মানুষ ট্রাঙ্কুলাইজার ব্যবহারে এখনো তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তাদের ঘুমের খুব বেশী ব্যাঘাত ঘটতে আরম্ভ হয় নি। আশ্চর্য হয়ে ভাবেন ব্রিজমোহন—টাকা নেই, একপাল পোষ্য, ভাড়া করা ফ্যান অচল পড়ে আছে জ্যৈষ্ঠমাসে, তবু দিব্যি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয় মানুষগুলো একচিলতে দম বন্ধ করা ঘরে শুয়ে। অবশ্য এদেরও কিছুসংখ্যক অনিদ্রাতে ভুগতে আরম্ভ করেছে। তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার, টাকা করবার ইচ্ছা যাদের গ্রাস করতে পেরেছে, তারা খায় কিছু ঘুমের ওষুধ। কিন্তু নতুন ওষুধ কখনো খাবে না। সেই আদ্যিকালের পুরনো ঘুমের বড়ি কিনবে দোকান খুঁজে খুঁজে।

ট্রাঙ্কুলাইজার দরকার উপরতলার মানুষদের। উপরে, আরো উপরে উঠবার প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাড়া করে ফিরছে তাদের। এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘরে, নরম ডিভানে শুয়েও চোখে ঘুম নেই। চোখে ভাসছে শেয়ার মার্কেটের বৈকালিক দর। কিন্তু তারাও তো দেশী ওষুধ ব্যবহারই করে না। আভিজাত্য নষ্ট হবে যে অত কম দামের মিনমিনে সহজ বানানের নামের ওষুধ কিনলে। সাধারণের কাছেই সাউ কেমিক্যাল কোম্পানীর ওষুধ চালাতে হবে। আর তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হিমিকা।

হিমিকাকে হ্যাপিনুকের পিছন দিকের তিনতলার দু'টি ঘর দিলেন ব্রিজমোহন। পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা। কাস্টমারদের চোখে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল হিমি। হিমিকার মাইনে ঠিক হ'ল তিনশো টাকা। থাকা, খাওয়া, গাড়ী সব ফ্রী। বিজনেসের উপর কুড়ি পারসেণ্ট কমিশন।

এ ধরণের সেল্স রিপ্রেজেণ্টেটিভের কাজ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই হিমির। সে ঠিক করল দু'টো রাস্তার পরেই মস্ত ওষুধের দোকানে প্রথম চেষ্টা করবে। ব্রিজমোহন বাধা দিলেন।

—না না, বড় দোকানে প্রথমেই এ্যাপ্রোচ করা ঠিক নয় হিমি। ওরা রিফিউজ করলে মার্কেট নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি সুবার্বের ছোটো ডাক্তারখানায় যাও। তাদের সঙ্গে কাম করা সোজা হবে। আর ওঁরা রিফিউজ করলেও ফিল্ড স্পয়েল্ড হবে না। ওখানে আর কত মাল কাটবে।

সুবার্ব—শহরতলীর খুপরি ঘরের দোকান—কয়েকটা এনকোসিন, কিছু এ্যানাসিন, ফিনাইল, আয়োডিনের ডাক্তারখানা! একটা কেমন যেন বিতৃষ্ণা বোধ করল হিমিকা। ওখানে গিয়ে কি করবে সে! হিমিকার মনের ভাব বুঝে হাসলেন ব্রিজমোহন।

তোমার তো খুব লিডার বনবার শখ। সুবার্বের লোকেদের কন্‌ভিন্স করতে না পারলে, ভোট পাবে কি করে? কারা সভা ডেকে তোমাকে মালা পরাবে? কে ঠেলে দেবে কাদায়-পড়া তোমার গাড়ীর চাকা? ওখানের দোকানেও পাশকরা ডাক্তার বসেন। তাঁরা ওষুধের বিষয় ভালই বুঝবেন। তুমি গরীব লেড়কীর সাজ করে। কথা বলবে আস্তে। অ্যাপিল জানাবে নিজের দুখ্। বাপের অসুখ, মা নেই,

ভাই লাগবে। দু'টো ছোট বোন, একটা লেংড়া। ওষুধ বেচবে তো কমিশন হবে, সংসার চলবে। ডাক্তারদের মনে দয়া আনবে। ব্যস্, ভব তো কেল্লা ফতে। সুবিস্তাও হোবে। ওসব ডাক্তার-খানায় ছোকরা ডাক্তার বসে না। সব বুড়ো, তাদের সন্তুষ্ট করতে দেরী হবে না।

চুপ করে ওসব শুনল হিমিকা। আর রাগ হয় না—ওসব আমি পারব না।

—পারবে, জরুর পারবে। আস্তে আস্তে হিমির পিঠ চাপড়ালেন বৃজমোহন।

—না। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল হিমিকা।

—অতসব বাজে কথা বলতে পারব না আমি।

—দু'দিন ভেবে দেখ। উঠে দাঁড়ালেন সাউসাহেব। —না পারলে তোমার নিজের প্রফেশন তো আছে, তাতেই ফিরে যাবে আবার।

হিমিকার গালে দুই আঙুল ঠেকিয়ে চলে গেলেন বৃজমোহন। আস্তে আস্তে খাটের উপর বসে পড়ল হিমি। কি বলে গেলেন সাউসাহেব। নিজের প্রফেশন। শরীরের ব্যবসা? ঠাট্টা? বিদ্রূপ? কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কেন হবে। সত্যি কথাই তো বলেছেন উনি। শরীরের ব্যবসা ছাড়া আর কি করতে পারে হিমিকা, আর করতে দেবেই বা কে তাকে। আবার সেই অর্ধ অনাবৃত শরীরে ফ্লোরে নাচ। প্রমোদসঙ্গিনী হওয়া। সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ জাগল। মনের কান্না শুনতে পেল হিমিকা। না না, আর সে শরীরের পশরা ফেরী করতে পারবে না।

দু'দিন, তিনদিন, একসপ্তাহ কেটে গেল, রবিবারের সন্ধ্যায় আবার এলেন বৃজমোহন।

—কি, কি ঠিক করলে? স্মৃতি দেওয়া পানের পিক পিলে ফেললেন বৃজমোহন।

—আপনার কথামতই কাজ করব।

—করবে? গুড। শোনো হিমি, এ কাজই তোমাকে স্যুট করবে। কেবল দরকার বুঝে সাজ বদলাবে এই আর কি। কখনো একদম ইনোসেন্ট পুয়োর গার্ল, কখনো একদম অ্যারিস্টোক্র্যাট লেডি। দেখো তোমার কত নাম হোবে। অন্য কোম্পানী তখুন তোমাকে পাবার জন্য টানাটানি লাগাবে।

বৃজমোহনের কথা শুনে ম্লান রেখায় হাসল হিমিকা। সর্বত্রই টানাটানি চলছে। মেয়ে নিয়ে টানাটানি। পৃথিবীতে চিরদিন ধরে মেয়ের চাহিদা। যৌবনবতী মেয়ে। নাচের আসর, রাজনীতি, সমাজনীতি সব জায়গায় মেয়ে চাই। মেয়ে সন্ন্যাসিনীরও আদর বেশী। সন্ন্যাসিনী। দু'একটা সন্ন্যাসিনীর আশ্রম দেখে অবাক হয়েছে হিমি। মেট্রনমাসী তাকে নিয়ে গিয়েছিল আশ্রম দেখাতে। সুন্দর আশ্রম, অপাপবিদ্ধা তপস্বিনী দেখল, দেখল ভগবানকে ভালবেসে তারা সংসার ছেড়ে এসে বানিয়েছে আশ্রমের সংসার। সেই অবিকল চচ্চড়ি. তেঁতুল আচারের রান্নাঘর। কড়োলোক ছাত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব। বাজার খরচের চুলচেরা হিসাব আর ক্ষুদি ক্ষুদি মূর্তি বানিয়ে ভোগ দেওয়া, ঘুম পাড়ানো গান শোনানো।

হিমি ভেবে পায়নি, এরা ঘর ছেড়ে আশ্রম বানাল কেন। কেনই বা মানুষের বদলে পুতুল নিয়ে সংসারের খেলা খেলতে বসেছে। লোকসেবা? কিন্তু কোথাও সেবার চিহ্নও দেখেনি হিমি। সন্ন্যাসীদের স্কুলে পড়ছে বড় লোকের সন্তান, গরীবের দরজা বন্ধ সেখানে। সন্ন্যাসীদের গড়া গেস্ট হাউসের কি অদ্ভুত বিলাসিতা। এয়ার কণ্ডিশণ্ড, যে কোনো বড় হোটেলের চেয়ে বেশী আরামের ব্যবস্থা। লোকসেবা করবে সন্ন্যাসীরা? নিজেরাই তো সেবিত হচ্ছে সুখ-সম্মান-প্রতিপত্তি আর খ্যাতি দিয়ে।

ভগবানকে আশ্রমে দেখতে পায়নি হিমিকা, কেবল দেখেছে সংসারীদের দানের টাকা নিয়ে আশ্রম চলছে, আর সমাজের মাথায় বসে সন্ন্যাসীরা উদাত্ত কণ্ঠে জানাচ্ছে—সংসারটা বিষময়, পাপের স্থান। কি দাও। সংসারীদের টাকা ভাল,—খারাপ মানুষগুলো। হিমিকারা যেমন শরীর দিয়ে টাকা রোজগার করে, সন্ন্যাসীদের উপার্জন তেমনি ধর্ম দেখিয়ে। হিমিকা শুনেছে আছেন অনেক মহাপ্রাণ, তাঁরা সত্যিই সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন পরহিতায়। জীবনবলি দিয়ে মানুষকে ত্রাণ করেন। কিন্তু কোথায় তাঁরা। হিমিকার মত যাদের বড় দরকার, তাদের কাছে তাঁরা এসে অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করেন না কেন।

হিমিকাদের জন্য আছে কেবল সুরেশ্বর, বৃজমোহন। আর মৃত্যুর চেয়ে, প্রেম হতে বঞ্চিত হবার চেয়েও বড় যন্ত্রণা দেয় যে সেই দারিদ্র্য। কি তীক্ষ্ণ দাঁত ক্ষুধার, কত দরকার আচ্ছাদন বস্ত্রের, মাথা গুঁজবার একটু আশ্রয়ের। হিমিকা দেখেছে মার্বেল পাথরের প্রাসাদে সোনার চূড়া মাথায়, সোনার বাঁশী হাতে নিয়ে যে ভোগে দরকার নেই তাই পাচ্ছেন ভগবান। আর ভক্তিতে গদগদ হয়ে সংসারের মানুষ ছুটেছে অজস্র ভোগের আয়োজন নিয়ে। পুজোর চাঁদা চাইলে পাড়ার ছেলে গুণ্ডা হয়, আর মঠ-মন্দিরের কৌপীনবস্ত যখন মাসের পয়লা তারিখে চাঁদার খাতা নিয়ে দরজায় দাঁড়ায়, তাঁর কি সমাদর। পথের ভিখারী অস্থিচর্মসার হাত বাড়িয়ে একটি পয়সা চাইলে খেটে খাবার উপদেশ পায়, অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা যায় ধর্মের খাতে।

ভাবতে ভাবতে ভয় পায় হিমিকা। দিনে দিনে কি হয়ে উঠছে সে। মানুষ, পৃথিবী, ধর্ম সব কিছুর উপর তীব্র ঘৃণা। মাধুর্য কোমলতা সব যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত শুকোচ্ছে জল, হিমিকা কি শেষে একটা মরুভূমি হয়ে যাবে? জল নেই মাটি নেই, হু হু করে বইছে বালির ঝড়ো হাওয়া, আর রাশি রাশি অস্থির স্তূপ।

বালিশে মুখ ঘষতে থাকে হিমিকা। জল নেই, জল নেই চোখে। চারদিকে অন্ধ শুষ্ক নিস্তব্ধ রাত্রি। ভগবান, একটু জল, একটু আলো দাও

—এই ওষুধটা, গাউ কেমিক্যালের —এই ওষুধটা—। থেমে গেল আধো আধো গলার বাধো বাধো কথা। নিজের মনের মধ্যে একেবারে ডুব দিয়ে সদ্য-পড়া মেডিকেল জার্নালের প্রবন্ধটার কথা ভাবছিলেন জিতেশ ডাক্তার। মিনমিনে একটা শব্দ যদি বা কানে ঢুকতে পথ পেল, মন সাড়া দিল না। তিন-চারবার ভাল করে নিজের বক্তব্য আবৃত্তি করল হিমিকা। শেষের দু'বার বেশ জোরে জোরেই বলল।

এতক্ষণে চোখ তুললেন ডাক্তার। পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো অন্যমনস্ক চোখের সামনে প্রথমে একটা ছায়া-ছায়া অস্পষ্ট কিছু। ক্রমে পরিষ্কার হ'ল। আরে। একটা মেয়ে। ওষুধের মেয়ে-ক্যানভাসার। রুক্ষ চুল পাতলা চেহারার মেয়েটা করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। ক্লান্ত হয়েছে। শুকনো মুখ দেখে মায়া হ'ল। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার।

---বসো, বসো। বসে কথা বল। কি ব্যাপার? ওষুধ? ভিটাটোন—টনিক। হুঁ। মনে মনে ওষুধের প্রপার্টিস্-গুলো পড়তে লাগলেন জিতেশ রায়।

---বেশ ভাল ভাল জিনিষই তো লাগিয়েছে টনিকটাতে। কিন্তু কিনবে কে বল এ জায়গায়। একটা এল্‌কোসিনের বড়ি কিনতে চায় না সাধ্যপক্ষে, কিনবে টনিক? তোমার এই টনিকের দাম সাড়ে পাঁচটাকা যোগাড় করতে পারলে বাজার করবে পাঁচদিন, তেলাপিয়ার ঝোল মেখে ভাত খেলেই বল পাবে শরীরে। বুঝলে মা, এ কলোনীর মানুষদের ওষুধ-টনিকের দরকার নেই। ভাত-মাছ, এককোঁটা দুধের দরকার ওদের। পেটে ভাত নেই, টনিক খাবে। হুঁঃ।

বুড়ো মানুষ বেশী কথা বলে। জিতেশ ডাক্তার হিমিকাকে কিছু বলবার সময়ই দিলেন না। একনিঃশ্বাসে নিজেই একশো কথা সেরে হাঁক দিলেন।

—পট্‌লা, ও পটলবাবু। বলি গেলে কম্‌নে?

—আজ্ঞে যাই।

পিছন দিকের সুইং-ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল এক মূর্তি। গামছ'পরা। খালি গায়ের চামড়া চাকা মস্ত হাড়গুলো হিমির চোখে ধাক্কা দিল।

ডাক্তারবাবু বললেন—ও পটলা, ডাক্তারখানার চাকর।

পটলা বিষম চটে গেল।—মিথ্যি বদনামী দিতি হবে না ডাক্তারবাবু।

—বদনাম কিসির? তুই ডাক্তারখানা ঝেটোস না?

—ঝেটোলি কি হবে, ওষুধ দিতি হলি তো আমার ডাক পড়ে। আমি কম্পাউণ্ডার।

—আচ্ছা, তাই সই। তুই কম্পাউণ্ডার। এখন এই মেয়েটির কাছে হতি দু'টো ভিটাটোন নিয়ে আল-মারিতি রাখ।---তোমাকে এখন দাম দিতে পারব না গো মা-লক্ষ্মী। সই করে দিচ্ছি, দু'মাস পরে এসো। দেখি কি হয়।

—টনিক? টনিক রাখতিছেন? ও খাবে কেডা? বলল চাকর কাম কম্পাউণ্ডার পটল।

—আরে সেই কথাই তো বলতিছিলাম মা-লক্ষ্মীরে। তবে ছেলেমানুষ, দরকারে পড়ে ঘরের বার হয়েছে। ফিরোতি মন চায় না। রাখি দে তুই দু'টো বোতল। সারখেলের বুনের আসবার কথা আছে। তার স্বামী অফিস থেকে ওষুধের দাম পায়, তারে গছায়ে দিতি পাল্লি—।

—এই ঘুমের ওষুধের বড়ি ক'টাও রাখবেন? খুব ভাল ওষুধ। রাতে খুব ভাল ঘুম হবে, শরীর একেবারে ঝরঝরে লাগবে সকালবেলা।

কয়েকটা প্যাকেট বের করে ডাক্তারকে অনুরোধ জানাল হিমিকা।

—ঘুমের ওষুধ? বুঝলি পটলা, ঘুমোবার জন্যিও আবার ওষুধ লাগে। ও ওষুধ নেবো না মা। এদিকে মানুষ-গুলোর ঘুমের কিছু কমতি নেই। রাত আটটা মা বাজতেই যেন জলার ব্যাঙ্‌ ডেকে ওঠে ঘ্যাঙোর ঘ্যাং। ও চালাতি পারব না। তুই কি বলিস পটলা?

—নিলি হয় গোটা কয় স্যাম্পুল।

—তা আর হয় না। বেলা দশটা অবধি ঘুমোয়ে তুমি তা'হলি আমার পিণ্ডি ভালমতই চটকাতি পার। টনিকের বোতোল দুটো তুলে রাখ, আলমারিতে। আর দ্যাখ, মা-লক্ষ্মীরে এট্টু জল খাওয়াতে পারিস? মুখখান একেবারে শুকোয়ে গিয়েছে।

---না না। আমার কিছু দরকার নেই। ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল হিমিকা। ভীষণ অবাক হয়েছে। তার মুখ শুকনো, জল খেতে দেবে।

---আরে আরে, করে কি মেয়েটা! ডাক্তারও ব্যস্ত হলেন। হাত ধরে ফের বসিয়ে দিলেন হিমিকাকে।

—এই দুরন্ত রদ্দুরে এট্টু জল মুখি না দিয়ে বারয়ে গেলি ডাক্তার-খানার অকল্যাণ হবে। বসেন, আমি ছুটে আসতিছি।

সত্যি সত্যি ছুট লাগাল পটল। হিমিকা তাকিয়ে তাকিয়ে ডাক্তারখানার চেহারাটা দেখতে লাগল। বেশ মাঝারি আকারের ঘর। পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা। দেয়ালে অপর্যাপ্ত ক্যালেণ্ডার। দুর্গা কালী শ্রীরামকৃষ্ণদেব হতে সুরু করে বিম্বাধরা সিনেমা অপ্সরীদের ছবিও আছে। দু'টো আলমারিতে কিছু কিছু শিশি-বোতল, একটা হরলিক্‌স, তুলোর প্যাকেটও দেখা যাচ্ছে, কয়েকটা পরিষ্কার ঘর। হিমিকা দেখল দেয়ালে ঝুল, টেবিলে ধূলো নেই।

—বুঝলে মা-লক্ষ্মী। ইস্!

একচড়ে দু'টো মশা মারলেন ডাক্তারবাবু।

—মশাগুলোর জ্বালায় আর তিষ্ঠো-বার উপায় নেই।

---তা বুঝলে মা, এই পটলা ব্যাটাই ডোবাল্লে আমাকে। সব কাজে সাং-ঘাতিক শ্লো।

—সোলো? কি নিদারুণ বোম্বাই মেলের ইস্পিড দিয়ে গিয়েলাম আর এয়েলাম, তবু তোমার মুখি অকথা? একটা ঘড়ি কেনেন দেখি, তালি বুঝতি পারবেন আমি সোলো না ফাস্ট।

একটা কানাভাঙা প্লেট আর এক-গ্লাস জল টেবিলের উপরে রাখল পটল।

—আমি, আমি তো এ সব—

হিমিকার কথা শেষ হতে পারল না, ডাক্তারবাবু, পটল দু'জনেই হেসে উঠল।

—কোনো কথা তোমাকে বলতে হবে না। মিষ্টিটুকু মুখে দিয়ে জল খাও দেখি। লজ্জা কিসের।

—হু, লজ্জাটা আবার কিসের। মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। দু'টো ভাত খেলে ভাল হ'ত। কি বলেন ডাক্তার-বাবু? নোংরা দাঁত দেখালো পটলা।

---ভাত, ভাল কথাই বলেছিস। কি গো মা-লক্ষ্মী, খাবে দু'টো ডাল-ভাত? বেলা হয়েছে, তোমার ফিরে যেতে দু'টো বেজে যাবে।

ভাত খাবে। শুকনো মুখ। শুকনো মুখে কিসের আভাস। হিমিকার শরীর দেখে সবাই। দেখে ঠোঁট ফোলানো হাসি, চোখের কটাক্ষ। কিন্তু শুকনো মুখ? অবশ্য শুকনো মুখের চেহারা দেখবে কি করে তারা। প্রসাধনীর প্রলেপে হিমিকাই তো যত্ন করে ঢেকে রাখে মুখ। ওর হাসির দাম আছে। শুকনো মুখ দেখলে মানুষের মন খারাপ হবে, নষ্ট হবে মজলিশের মেজাজ। ডাক্তারবাবু, পটল তার শুকনো মুখ দেখল। কিন্তু কত চাতুরীতে আজ যে মুখকে শুকনো বানিয়েছে হিমি তা জানলে মায়ার বদলে ভয় হ'ত ওদের। হিমিকার আসলরূপ ধরতে পারে নি, শুধু নিয়েছে। এনেছে রসগোল্লা, খাবার জল। বলছে ভাত খেতে। ভাত? জল? হিমিরা শরীরের ব্যবসা করে টাকা পায়, সেখানে ভাত-জল মস্ত হাসির কথা। মদ-মাংস খেতে পারে, কিন্তু ডাল-ভাত।

তাড়াতাড়ি জল দিয়ে মুখ ভিজিয়ে নিল হিমিকা। আপত্তি না করে রস-গোল্লা দু'টোও খেয়ে ফেলল। এসব কথা শুনে হাসি পেলে কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে একটা।

বাসে বসে মস্ত পথ পাড়ি দিতে দিতে ভাবছিল হিমিকা। কি ভাবছিল? হোটেল ব্যবসার একটি মেয়ে কত কিছু যে ভাবতে পারে। একটা মধুর স্বপ্নের ভাবনা ভরা রাত্রের পাখায় তার মনে। কিন্তু হিমিকার মত মেয়ে—আদরে প্রতিপালিতা বিলাসিনী আঙুরে, যৌবন আসবার সঙ্গে সঙ্গে যে আবর্তিত হচ্ছে তুফানের মধ্যে সে কি ভাবনে সুন্দর ভাবনা? সুন্দরের সঙ্গে, মাধুর্যের সঙ্গে যে ওর দেখাই হ'ল না কোনদিন। প্রথমে ভেবেছে কেমন করে নিজেকে রক্ষা করবে পুরুষের দুর্দান্ত লালসার গ্রাস থেকে, এখন ভাবে টাকার কথা। টাকা চাই, প্রচুর টাকা। তাহলেই এ জন্মের মত বেঁচে যাবে হিমিকা। টাকার জন্য নিজেকে নানারকমে লোভনীয় করে তুলেছে। চাকরিও নিয়েছে টাকার আশায়। ভেবেছিল চাকরিতেও তার মূলধন হবে শরীরটা।

মস্ত বড় ধাক্কা খেল এখানে এসে। ডাক্তার, পটল—তারা হিমিকার শুকনো মুখ দেখল, দেখল শ্রান্ত রোদে ঝলসে যাওয়া একটি মেয়েকে। পাখা এগিয়ে দিল, আনল তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার খাদ্য। শুকনো মুখ, শুকনো চুল বানিয়ে প্রসাধন করবার সময় হিমিকা কিন্তু সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের ফাঁকে ফাঁকে শরীর দেখাবার অবকাশ রেখেছিল। সে নিশ্চয়ই জানত শুকনো মুখ-চোখের চাইতে তার উদ্ধত যৌবন বেশী দরকার হবে অর্ডার পাবার কাজে। কিন্তু ওরা তো একবার তাকিয়েও সেদিকে দেখল না। তাদের উদ্বিগ্ন চোখ দেখল হিমিকার ঘামে-ভেজা কপাল, রুক্ষ চুল, তার বেশী নয়। বাসের শব্দ ভেদ করে হিমিকার কানে বাজতে লাগল—মা, মা-লক্ষ্মী।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা খুব অল্প কথায় বর্ণনা করল হিমিকা। সিগারেট টানতে টানতে ব্রিজমোহন শুনলেন। হাসতে লাগলেন মৃদু মৃদু।

—হাসছেন যে? জিজ্ঞেস করল হিমিকা।

—হাসি কমছি? আধপোড়া সিগা-রেট অ্যাসট্রেতে গুঁজলেন ব্রিজমোহন।

—দেখ হিমি, কয়টি ইয়ারস্ এক্স হ'ল আমার। বিশ বছর বয়স হতে জীবনে দেখেছি। একনজরে যে দেখলেই তার কেমন ভাগ্য বলে দিতে পারি। একদম বাইরের মেয়েদের মত নও তুমি। নাচ-গান করে মেজাজী মানুষ-দের খুশী করে টাকা রোজগার করছ বটে, কিন্তু তোমার মন খুশী হচ্ছে না। জেনানা মহলে থাকবার মত মন তোমার।

হিমিকা চুপ করে রইল। বেশ বুঝল কি বলতে চান সাউসাহেব। কিন্তু মেয়েদের মন কি চায় তার কত-টুকু জানেন তিনি। তাঁর হোটেলের সব মেয়েই যে অন্দরে ফিরে যাবার দিন গুনছে তার হিসাব কি রাখছেন ব্যবসায়ী? এমন যে নির্লজ্জ হিমানী, সেও তার ঘরকে সুন্দর স্বচ্ছল করবার আশাতেই গায়ের কাপড় ছুড়ে ফেলছে।

সব মেয়ের এক আশা—তারা ঘর বাঁধবে, প্রিয়জনদের পরিচর্যা করবে। সেবা না করে যে সুখী নয় মেয়েরা। খোঁজ নিলে দেখা যাবে দেশনেত্রী থেকে সুরু করে দেহব্যবসায়িনী মেয়ে—সবাই একটু সময় চুরি করে এসে বসেছে রান্নাঘরে। অবসর পেলেই সবার মধ্য হতে বেরিয়ে আসছে একটি মেয়ে, যে চিরদিন পৃথিবীতে ঘর গড়েছে।

—কথা নেই কেনো? হিমিকার হাতে টোকা দিলেন সাউ। হাসল হিমিকা। সে জানে একবার সম্মতি দিলেই সাউসাহেবের রক্ষিতা হয়ে থাকতে পারে সে। গাড়ীতে বাড়ীতে প্রাচুর্যে তাকে ভরে দেবেন তিনি। অনেকের মন ভোলানোর কঠিন কাজ হতে একেবারে অব্যাহতি পেয়ে যাবে তা' হলে। যূথিকা যেমন সুরেশ্বরের রক্ষিতা ছিল, সে তেমনি হবে ব্রিজ-মোহনের। আচ্ছা কথাটার মানে কি। রক্ষিতা---অর্থাৎ, যে মেয়েকে রক্ষা করছে একজন পুরুষ। কিন্তু স্ত্রীকেও তো স্বামী রক্ষা করে রাখে। তবে স্ত্রী স্বামীর রক্ষিতা নয় কেন? অনেক ভেবেও ব্যাপারটা বুঝতে পারে না হিমিকা। দু'জন নারী একই ভাবে আদর সোহাগ পীড়ন সহ্য করে। স্ত্রী হয়ে উঠে মহিমময়ী নারী আর রক্ষিতা হয়

ঘৃণার পাত্রী। কেন এমন প্রভেদ! কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্রের এমন জোর যে এক নারী তার বলে হল সতীলোকের অধীশ্বরী, আর অপরা নরকের দ্বার! আর পুরুষ। যাদের ঘরের সুখ, একক ভোগের জন্য স্ত্রী, সন্তান সব আছে, তারা কয়েকটি মুহূর্ত বর্বর উল্লাসে ব্যয় করবার জন্য এমন করে একদল মেয়েকে একেবারে নিঃস্ব করে দিল।

—হিমি!

—জি।

—কথার উত্তর দিলে না যে?

—কি উত্তর দেব সাহেব। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু আমাকে রাখবার জন্য কে অন্দরমহল তৈরী করে দেবে?

এবার ব্রিজমোহনকেও চুপ করে থাকতে হ'ল। তিনি ভালই জানেন কেউ হিমিকে অন্দরের জেনানা বানাবে না। তিনি? তিনি নিজেও পারবেন না। হিমিকার জন্য লাখ টাকা দিয়ে মহ্‌ফিলখানা বানাতে পারেন তিনি কিন্তু একটি ঠাণ্ডা শান্ত জেনানা মহল দেবার সাধ্য নেই তাঁর।

আস্তে আস্তে অনেক ওষুধের দোকানের সঙ্গে পরিচিত হ'ল হিমিকা। তারা সাউ-কেমিকেলের ওষুধ রাখল, প্রতিশ্রুতি দিল মার্কেটে পুশ্‌ করবার। প্রথম দিনের সেই উপকণ্ঠের পার্টিকে কিন্তু ছাড়তে পারল না হিমিকা। পানা-ঢাকা পুকুরধারে টিনের ছাদ দেওয়া ডাক্তারখানা, চশমার কাচভাঙ্গা ডাক্তার আর নোংরা পটল কি এক আকর্ষণে তাকে টেনে আনে বারবার।

পটল ভীষণ খুশী হয়ে বলে —আমার লক্ষ্মী দিদিডির পা'খানা পড়তি তো ডাক্তারখানার দিন ফিরে গেল। একমাসে শ'টাকা বিক্রী, বল দিদি ডাক্তারবাবু, দশ বছরের মধ্যি হ'ল এমনডা?

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন।

—বলেছিস সত্যি কথাই। তবে জ্বর-জ্বারিটাও এবার—।

পটল রেগে ডাক্তারবাবুর কথায় বাধা দিল।

—থাম দিদি তুমি। অ্যা—বলি জ্বর কমে না হতিছে? কিন্তু এমন ওষুধ খাতি চেয়েছে এ তল্লাটের মানুষ কোনো দিন।

—তা যা বলিস। বসো মা লক্ষ্মী। তোমার ওষুধ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কইরে পটলা, মায়ের টাকাটা দে, আর জুৎ ক'রে একখানা শরবৎ খাওয়া দেখি মাকে।

—ও তোমার শরবতে আজ কাম নেই। মা বলে দেছেন দিদিরে বাড়ীতি নিয়ে যাতি।

বাড়ীতে! ভীষণ ঘাবড়ে গেল হিমিকা। না না, বাড়ীতে যাবার সময় নেই তার। কিন্তু তার কথা কানে তুলছে কে। প্রসন্ন হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে চটিতে পা ঢোকালেন ডাক্তারবাবু।

—ডাক্তারখানা বন্ধ করে তবে তুইও চলে আয় পটলা।

—সে আর তোমারে বলতি হবে না। তবে একটু পরে যাব। বাড়রী ধাড়ীর কত্তা বলিছেন এগারোডার লোময় ওষুধ নিতি আসবেন, তানারে ওষুধটুকু দিয়েই আমি গিয়ে পড়ব। তুমি দিদিরে নিয়ে যাও ততক্ষণ।

দু'খানা মাটিরঘর, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠন, ফুল ফুটেছে, তুলসী গাছ। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল হিমিকা। ঢুকবে? এই স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র ঘরে ঢুকবে ও? ঘর হতে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া। কপালে সিঁদুরের টিপ, মাথার কাপড়ের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কাঁচাপাকা চুল। হাত ধরলেন হিমিকার।

—আসো মা, আসো। আমি কত-দিন ধরে কত্তারে বলতিছি—মায়েরে একবার নিয়ে আসো। তোমার কথা বলতি তো পটল একেবারে অজ্ঞান। বসো, বসো মা চৌকীখানের উপর। ও আশা, সুধা, তোরা বারয়ে আয়। লজ্জা কিসির বুনেরে। আহা কচি মাইয়ে। রোজগারের ধান্ধায় পথে নামতি হয়েছে। তা রোজগারে বের হলি দোষ নাই মা। আমার বউমাও শুনতিছি কাজে লাগিছেন। কত্তার মত নয় যে বউমা কাম করেন, তা পুত্তুরের তেমন আয় নাই, শহরে থাকে, খরচাও ওদের বেশী। আমাদের কথা চলবে না। আর ওদের সুখেই আমাদের সুখ।

আশা, সুধা—ডাক্তারবাবুর দুই মেয়ে এসে হিমিকার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুধা বাধা দিল মায়ের অবিশ্রান্ত কথায়।

—মা, শীগ্‌গির যাও, তোমার ডালনা পুড়ে যাবে।

—যাই। তোরা মায়ের সাথে খাবাডা ক'। এই মাত্তর রান্না হয়ে যাবে। মলোর অম্বলডা হলি পরেই পায়েসটুক চড়িয়ে ভাত দেব। মুখি-চখি জল দাও মা। ছ্যান কল্লি ভাল লাগত। মায়ের আমার নামখান বড় সুন্দর। যেমন ছিরি, তেমনি নাম—লক্ষ্মী।

কোনোদিন জীবনে এমন পেট ভর্তি করে খাবার খায়ান হিমিকা। খেতে ভালই লাগত না তার। আজ প্রথম বুঝল খাদ্য কেবল বেঁচে থাকবার জন্য নয়, আর স্নেহে, অনুরোধে তার স্বাদও অপূর্ব হয়ে ওঠে। খাবার পরে একটি পানও মুখে দিতে হ'ল। তারপর একটু গড়িয়ে নেবার অনুরোধ ঠেলে বেরিয়ে পড়ল হিমিকা। পাতের কাছে খাবার সময় মা বসে থাকে, বারণ না মেনে থালায় তুলে দেয় খাবার—মা!

হিমিকা জানত একটি পরিবারের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা তার পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু না গিয়েও পারে না। কি যে অনাস্বাদিত মধু, কি নরম শান্ত আলো। বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে তর্ক করে কিছুতেই বশে আনতে পারে না হিমিকা তার অবুঝ মনকে। প্রত্যেক শনিবারের জন্য শরীরের প্রতিটি কণা যেন উন্মুখ হয়ে থাকে।

ডাক্তারবাবুরা জেনেছেন তার নাম লক্ষ্মী নয় হিমিকা। হেসেই অস্থির ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। পোড়া কপাল নামের। ও নাম মানায় নাকি এমন সোনার মেয়েকে। কি যে নাম রাখবার ঢং হয়েছে আজকাল। হিমিকা, হিমানী। হিমানী সে তো মেখেছেন অল্পবয়সে। ও লক্ষ্মীই ভাল। সুতরাং হিমিকাকে মেনে নিতে হ'ল লক্ষ্মী নামটি।

—রবিবার তোমার নেমন্তন্ন লক্ষ্মী। নিচ্চয় আসতি হবে।

ডাক্তার গিন্নির কথায় হাসল হিমিকা।

—নেমন্তন্ন তো প্রত্যেক শনিবারে খাচ্ছি মা, আবার বিশেষ করে কেন?

—কারণ আছে গো। সাতুই দিনডা ভাল। মনে করতিছি পাঁচ বেন্নন রাঁধি বউমারে এট্টু পায়েস খাওয়ায়ে দেব। ওরা স্বাধীন হয়ে সংসার কত্তিছে বলি আমি তো আর আমার কত্তব্য না করি পারব না। শাশুড়ী থাকতি বৌয়ের প্রেথম সাধ হবে না, তা কি হয়?

ক'মাসের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ডাক্তার-বাবুর পরিবারের সব কথাই জানা হয়ে গিয়েছে হিমিকার। বড় ছেলে নিজের পছন্দমত বিয়ে করে কলকাতায় বাসা নিয়েছে। ছেলের ইচ্ছা ছিল না, ঠমক লাগানি বউয়ের জন্যই বাসা করতে হল। কলোনী দেখে নাক সিটকায় বউ। কলের জল, ফ্যানের হাওয়া না হলে বাঁচে না জীবন। তা বাসা করে প্রথম প্রথম খুব কাবু হয়ে পড়েছিল পরেশ। এখন বউ চাকরি করছে, ভালই আছে তারা দু'জনের রোজগারে। ছেলের বিয়েতে কোনো সাধ মিটেনি মায়ের। অফিসে গিয়ে আইনেব বিয়ে করেছিল ছেলে। ছোট ছেলের বিয়েতে ইচ্ছে আছে সব দুঃখ মিটিয়ে নেবেন। দেবেশ অফিসে ঢুকেছে। আর একটু মাইনে বাড়লেই—। কত বয়েস হ'ল লক্ষ্মীর? তেইশ? দেবুর এই পঁচিশ চলছে। বড় বেশী কাছাকাছি, কিন্তু যে দিন-কাল পড়েছে, কত ছেলে বয়সে বড় মেয়ে বিয়ে করে আনছে, এ তো দু বছরের ছোটবড়। যেতে হবে একদিন লক্ষ্মীদের বাড়ী। বর-পক্ষের মান খুইয়ে নিজেই চেয়ে নেবেন লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মীকে দিয়ে সোনার সংসার সাজাবেন মা। এখন বৌটি ভালয় ভালয় খালাস হয়, তবেই শান্তি।

দেবুর মায়ের মনের এত ভাবনা জানে না হিমিকা। সাধের ব্যাপার শুনে বেজায় খুশী হল। এ সব কখনো দেখেনি সে। আর খুব ভালও লাগল তার। বউ বাড়ীর সঙ্গে বিরুদ্ধতা করে স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার গর্ভে শিশু এসেছে, পরিবারের তৃতীয় পুরুষ সে। গর্ভিণী বধূর উপর থেকে সব বিচ্ছেদ সরিয়ে দিয়ে তাকে আদর করে ডেকে আনছে সবাই।

রবিবারে শহরের কয়েকটা দোকানে ওষুধ দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল হিমিকা। বাসে পঞ্চান্ন মিনিট, একটু হাঁটতে হয়। সাড়ে বারটার সময় ডাক্তারবাবুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল হিমিকা। তার দেরী হয়ে গিয়েছে। বাড়ীভর্তি মেয়ে। থালায় থালায় সাজানো অন্নব্যঞ্জন। সামনে বউ বসে। তার চারদিকে ভিড় জমেছে। উঁকি মেরে হিমিকা নতুন মায়ের মুখের মাধুর্য দেখতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গেই

একেবারে পাগল হয়ে গেল রে। ও রে। ও যে হ্যাপিনুকের হিমানী। বউ সেজে লালপাড় শাড়ীর ঘোমটা টেনে বসেছে হিমানী। নত চোখে, সমস্ত মুখে লজ্জার ছায়া। একমুহূর্ত, তারপরই সচেতন হয়ে উঠল হিমিকা। দ্রুতপায়ে বাড়ীর বাইরে চলে এলো। নিজের জন্য, হিমানীর জন্য পালালো হিমিকা।

দুপুরবেলা রোদে লাল মুখ হিমিকাকে দেখে অবাক হ'ল মেট্রন মাসি।

—এই রোদে, ভর দুপুরে কোথা হতে হিমি?

—আমি? দুপুরে? এই একটু কাজ—। আচ্ছা মাসি, হিমানী হ্যাপিনুকে আর নেই?

হাসল মেট্রন।

—এই কথা। হিমানী কাজ ছেড়ে দিয়েছে। ওর যে বাচ্চা হবে। আভাও চলে গিয়েছে, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে তার।

—হিমানীর বাচ্চা হবে? ও যে বলেছিল মাসি, ওর সংসারে ঘৃণা বলেই নাচতে এসেছে?

—বলেছিল। তুমিও যেমন, তাই সত্যি ভেবে বসে আছ। অমন কথা সবাই বলে, তার পর টাকা-পয়সা যোগাড় হলে লক্ষ্মীবউ হয়ে সংসার করে ঘোমটা টেনে। তুমিও করবে সময় এলে।

●

হিমিকাও সংসার করবে সময় হলে? কে? কে সেই দুঃসাহসী যে ওকে বউ বানাবে, সংসার দেবে? মেট্রনমাসী জানে না, হিমিকার বউ হতে নেই। হিমানী মা হ'ল, আভা-বেলা সবাই বউ হবে, একা হিমিকা হ্যাপিনুকের তিনতলার ঘরে বসে বসে বুড়ী হয়ে যাবে। কোনো দিনও ঘর হবে না ওর।

[ক্রমশ।

ফটোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা

ফোটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রকে আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ফিল্ম, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, এমন কি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পর্যন্ত পেশাদারি ব্যবহারে লাগানো হচ্ছে। এসব ছবি তোলেন সাধারণ পেশাদার ফোটোগ্রাফাররা কিন্তু সৌখীন ফোটোগ্রাফাররাও পিছিয়ে নেই। যেমন দাম কমছে, কলাকৌশল উন্নত হচ্ছে, ক্যামেরার ব্যবহার সহজতর হয়ে উঠছে, সাধারণ লোক ছবি তোলার দিকে বেশি করে ঝুঁকছে। ক্যামেরার বাজার সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মানীর স্থান তৃতীয়, মার্কিন দেশ ও গ্রেটবৃটেনের পরেই। এখানে ক্যামেরা যেমন বিক্রি হয়, তেমনি তৈরীও হয়। ১৯৪৫ থেকে পৃথিবীতে ১৭০ মিলিয়ন ক্যামেরা তৈরি হয়েছে আর তার মধ্যে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন তৈরি হয়েছে শুধু জার্মানীতেই—যার দাম ৫০০০ মিলিয়ন মার্কের বেশি।

ক্যামেরার উন্নতি না হলে জীবন আজকের মত সরল হ'ত না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথাই ধরুন—কত সহজে আজ এক্সরে ছবি নিয়ে নির্ভুল চিকিৎসা করা যায়। ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রামে কত সহজে হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। অন্যত্র যেমন ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ চেকের ফোটো তুলতে, লাইব্রেরীতে লক্ষ লক্ষ পুস্তকের কপি রাখতে ফোটোগ্রাফির অবদান অনস্বীকার্য। ফোটোগ্রাফির কল্যাণে আজকাল বই ছাপানো ২০০ গুণ দ্রুততর করা সম্ভব হয়েছে।

ফোটোগ্রাফি শিল্পে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা উন্নত। তাই পশ্চিম জার্মানী যেখানে স্বদেশের উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানি করে, নিজের প্রয়োজনে সেখানে ৩৫ শতাংশ উন্নত ধরণের ক্যামেরা ও সংশ্লিষ্ট মাল-মশলা আমদানি করে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সেজুয়ানের মহৎ নারী

বের্টল্ট ব্রেশট

[অন্ধকার স্টেজ। বাঁদিকে স্টেজের শেষ প্রান্তে শেন্‌টে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁদিকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন ও তার বোন মিস ইয়াং সুন। প্রথমটায় আলোর ফোকাস এসে পড়বে শেন্‌টের ওপর এবং সে কথা বলতে শুরু করবে]

শেন্‌টে। একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল। মাত্র বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি—সারা মনটা আশা এবং আনন্দে ভরে উঠেছে—হঠাৎ নজরে পড়ল সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃদ্ধা কার্পেট-ওয়ালী। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে আমাকে বলল তার স্বামী আমাকে টাকাটা ধার দেবার পর থেকেই দুশ্চিন্তা এবং উত্তেজনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা তাই টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে এসেছিল। আমি অবশ্য তখনই তাকে টাকাটা ফিরিয়ে দেব বলে আশ্বস্ত করলাম—সে আমাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল। সুনকে গিয়ে বলতে বাধ্য হলাম—

(আলোর ফোকাস ঘুরে গিয়ে সুন এবং বোন মিস ইয়াং-এর ওপর পড়বে)

সুন। খুবই খারাপ খবর বোন। এই একটু আগে শেন্‌টে এসে বললে তার পক্ষে দোকানটা বিক্রি করা সম্ভব হবে না। যে দুশো টাকা ঋণ করে সে তোমার হাতে আমাকে পাঠিয়েছিল তার পাওনাদারেরা সেই টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে।

মিস ইয়াং সুন। তুমি তাকে কি উত্তর দিলে? এরপর আর ওকে বিয়ে করতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছ তো? ওর ভাইটা তো চায় সেই নাপতে বেটার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে।

সুন। নাপতে বেটা জানে মেয়েটা আমাকে ভালবাসে। সুতরাং সে আর ঘেঁসবে না। ওর দিক থেকে আমার আর ভয় নেই। আমি দুশো ডলার ফেরৎ না দিলে ওর পক্ষে ওই দোকান চালান অসম্ভব। পাওনাদারেরা এসে দোকান আগলে বসবে। কিন্তু এদিকে যদি আমি এখনি আরও তিনশো ডলার না পাই তাহলে আমার চাকরির দফাও রফা।

(আলো নিভে যাবে।)

[আলো জ্বললে দেখা যাবে রাস্তার ধারে ওয়াং শুয়ে ঘুমোচ্ছে—মিউজিক চলতে থাকবে। দেবতাদের আবির্ভাব হবে—ওয়াং উঠে বসবে। এঁদের দেখবে, হাত দিয়ে চোখ কচলে আরও ভালভাবে দেখবে—তারপর বলতে শুরু করবে]

ওয়াং। প্রভুরা এসেছেন, ভালই হল।

২য় দেবতা। আমাদের দেখে তুমি এত অভিভূত হ'য়ে পড়লে কেন?

ওয়াং। প্রভু শেনটের জন্যে। আপনাদের নির্দেশ আছে প্রতিবেশীদের ভালবাসতে হবে। সেই নির্দেশ মানতে গিয়ে শেন্‌টে তার প্রেমাস্পদকে হারাল। আমার মনে হয় তার মত মহৎ নারীর থাকবার জন্যে এ পৃথিবীটা তৈরী করা হয়নি।

১ম দেবতা। কেন আজেবাজে কথা বলছ। সৃষ্টিরহস্য বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার মাথায় নেই। কুসংস্কার এবং দ্বিধায় তোমার মগজটা একেবারে ঠাসা হ'য়ে আছে।

ওয়াং। আপনারা যা বলবেন আমাকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হবে প্রভু। বিপদে পড়ে শেন্‌টে সরে পড়ে তার কাজিনকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে কাজিন সুইটার পক্ষেও আর শেন্‌টের ব্যবসার গোলমাল সামনে দেওয়া সম্ভব হবে না। দোকানটাতে লালবাতি জ্বলল বলে।

৩য় দেবতা। তোমার কি মনে হয় আমাদের তাকে সাহায্য করা উচিত।

১ম দেবতা। আমার মত হচ্ছে তার নিজেরই নিজেকে সাহায্য করতে হবে।

২য় দেবতা। বিপদ যত বাড়বে, সত্যিকার মহৎ মানুষ সেই অনুপাতেই নিজের শক্তির পরিচয় দেবার সুযোগ পাবে। আঘাত এবং পীড়ন মহৎ মানুষকে মহত্তর করে তোলে।

১ম দেবতা। আমাদের সমস্ত আশার চরিতার্থতা এখন নির্ভর করছে শেন্‌টের ওপর।

২য় দেবতা। যে অন্বেষণের কাজে আমরা বেরিয়েছিলাম, তা বিশেষ কার্যকরী হচ্ছে না। এখানে ওখানে যাই, মনে হয় ভাল লোক দেখতে পেলাম—কিছু পরেই বুঝি আমাদের ভুল হয়েছে।

ওয়াং। একটা অনুরোধ করছি। আপনারা যদি অন্তত—

দেবতারা। না, না, কোন অনুরোধ আমরা রাখতে পারব না। আমরা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সত্যিকার মহৎ ব্যক্তি নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। যত বাধা-বিপত্তি আসে ততই সে আরও শক্ত আরও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে দেখ বৎস বুঝতে পারবে সব ভাল যার শেষ ভাল।

(দেবতাদের কথা বলার শেষ দিকটায় আলো নিভে যাবে)

॥ যবনিকা ॥

আলোকচিত্রে
মাসিক
বসুমতী
াঘ / ১৩৭৫
—বিজয় ঘোষ
—অশোককুমার বাগচী
যান-বাহন
সেকাল ও একাল

মিছিল

অনাথ ভট্টাচার্য

মাসিক

বসুমতী

মাঘ / '৭৫

হাতীর পিঠে
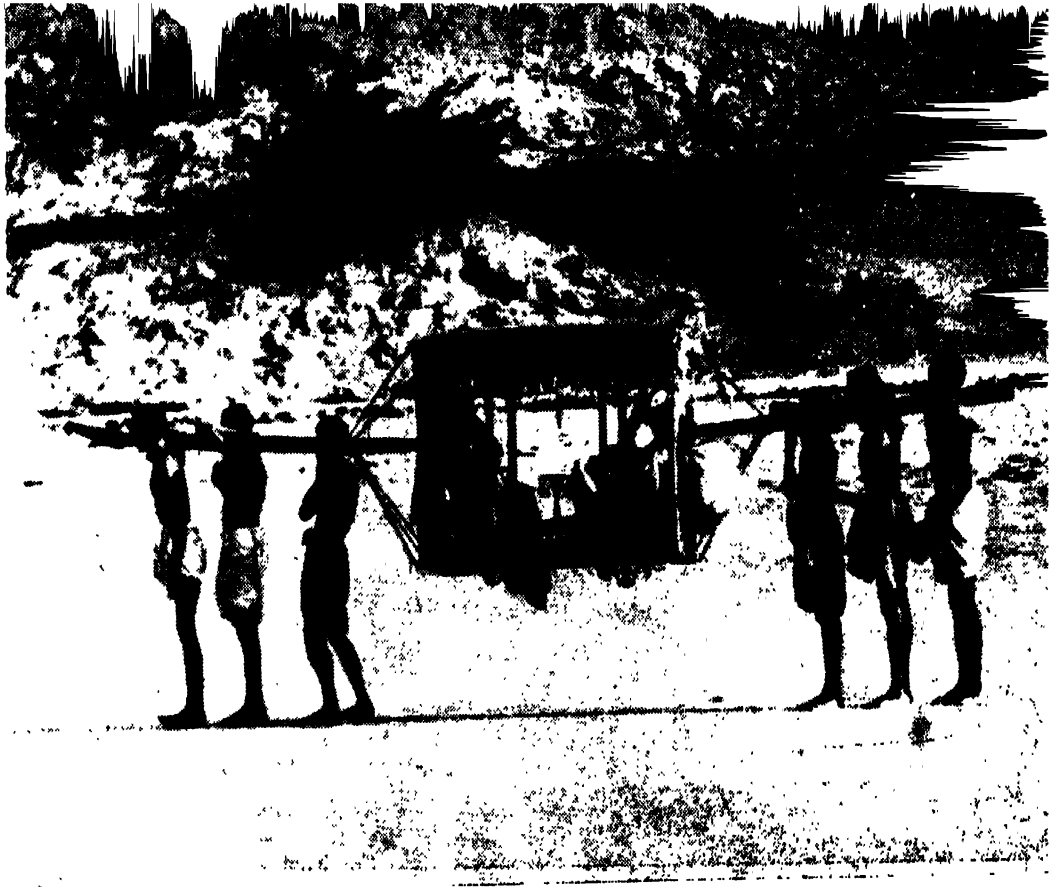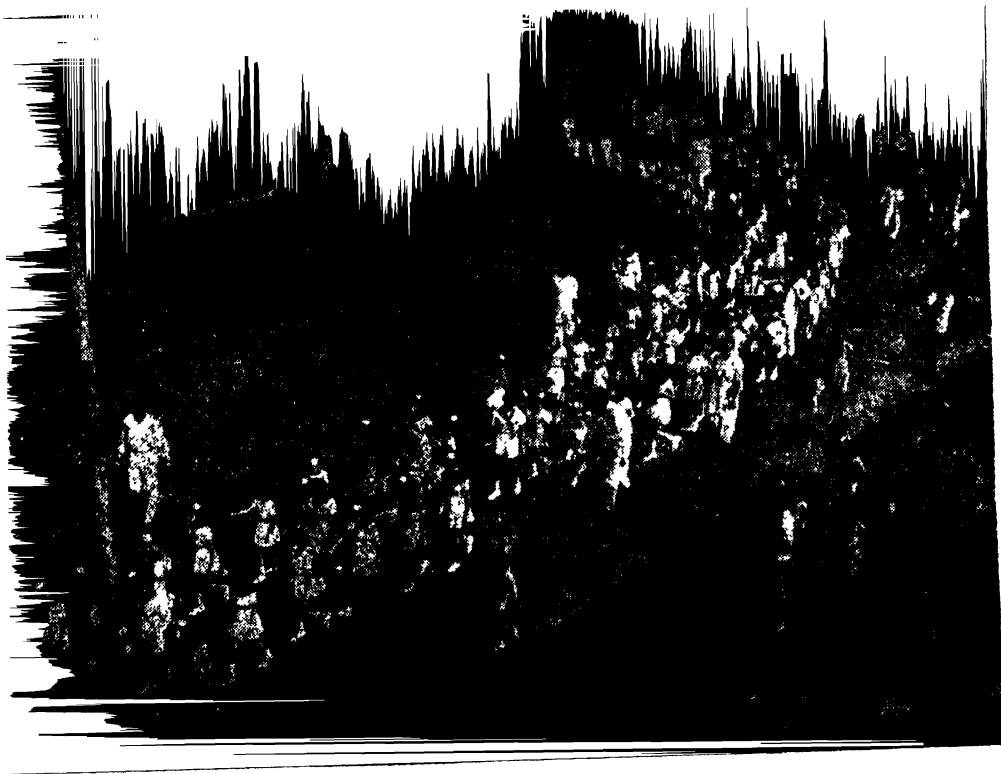
—বিন্দুশেখর বিশ্বাস

খেয়াঘাট

-শক্তি ঠাকুর

মাসিক

বসুমতী

মাঘ / '৭৫

গলতে-গঙ্গা (জয়পুর)

—এস পাল
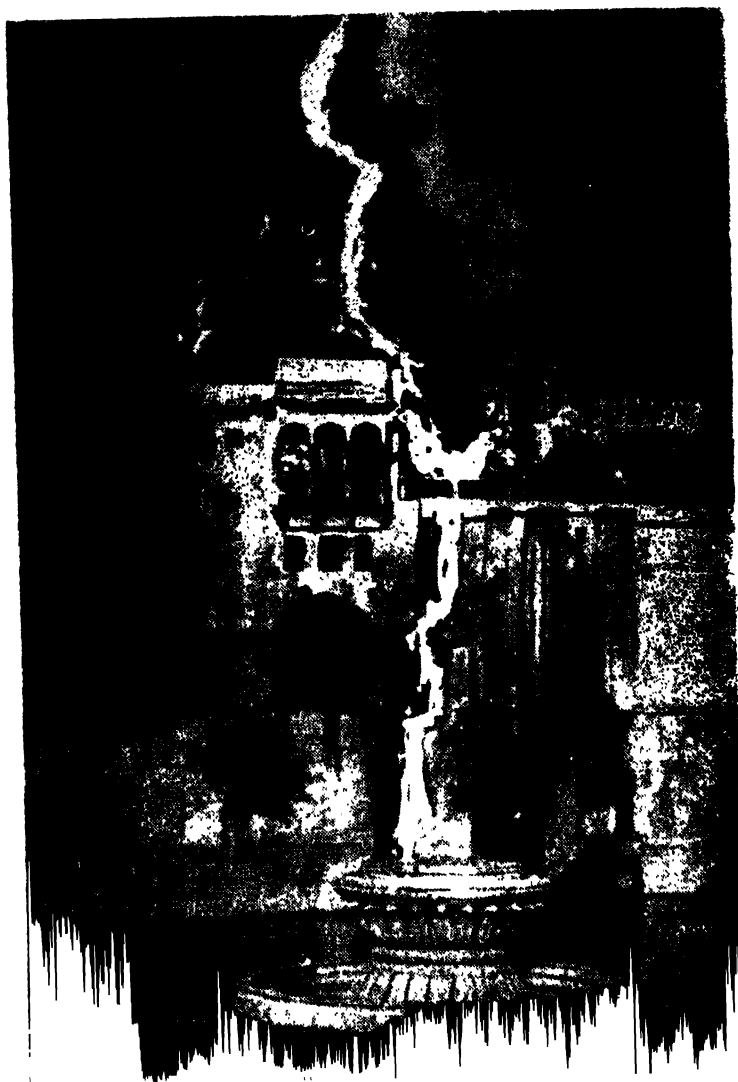
মাসিক

বসুমতী

মাঘ / '৭৫

ঘরে বাইরে

—দেবব্রত দাস

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

॥ পুরস্কার ॥

বাঙলা দেশে একমাত্র মাসিক বসুমতীতে প্রতি মাসে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

১ম	পুরস্কার	২০ টাকা
২য়	"	১৫ "
৩য়	"	১০ "

[illegible] দৃশ্য

(শেন্‌টের দোকানের সামনে শেন্‌টে বসে আছে এবং মিসেস সিন সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে)

মিসেস সিন। ব্যবসা রাখতে গেলে আরও শক্তভাবে তোমাকে যুঝতে হবে।

শেন্‌টে। কি করে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। দোকানের ভাড়া দেবার টাকা পর্যন্ত আমার কাছে নেই। বৃদ্ধ দম্পতিকে তাদের পাওনা দুশো ডলার আজকেই শোধ দিতে হবে। এই টাকাটা অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছি বলে এখন আমাকে দোকানের সব মজুত মাল মিসেস মিৎস্থর কাছে বিক্রী করে ওই টাকাটা তুলতে হবে।

মিসেস সিন। ওই টাকাটা তাহলে গেছে? লোকজন নেই, মালপত্র নেই, বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন অবস্থা হোল কেন জান? রয়ে সয়ে না চললেই এই হয়। এখন কি করে নিজেরটা চালাব ভেবেছ?

(দ্রুতবেগে মিস্টার সুফ এসে ঢুকবেন)

সুফু। আমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি সব জানি। বৃদ্ধ দম্পতির যাতে সর্বনাশ না হয়ে যায়, সেজন্য তুমি তোমার অন্তরের প্রেমকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হও নি। এমন কি আমাদের শহরের হতভাগা এবং হতচ্ছাড়া লোকগুলো পর্যন্ত তোমার মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে তোমার নামকরণ করেছে 'দি এঞ্জেল অব দি স্লামস্‌।' যে লোকটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল সে তোমার মত নীতিশীল নয় বলেই তুমি তাকে পরিত্যাগ করেছ। এখন তুমি বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করে দিচ্ছ—যে দোকানের আয় থেকে তুমি কত জনকে পালন করেছিলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার এ সর্বনাশ দেখতে পারি না। দিনের পর দিন আমি লক্ষ্য করেছি তুমি আশ্রিতদের চাল ভাগ করে দিচ্ছ। এই মহৎ দৃশ্য আর কখনও দেখতে পাব না সে কি হয়? এই মহত্ত্ব, এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে আমি বেঁচে থাকতে? তুমি আমাকে সুযোগ দাও তোমার সব ভাল কাজে সাহায্য করতে। এই নাও একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক—তোমার ইচ্ছে-মতন একটা যে-কোন অঙ্ক বসিয়ে নাও। আর মনে রেখো প্রতিদানে আমি কিছুই চাই না। এ আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য—নিজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত করে একে আমি কলঙ্কিত করতে চাই না।

(দ্রুতবেগে চলে যাবে)

মিসেস সিন। যাক্ বেঁচে গেলে। তোমাদের মত বোকা শ্রেণীর লোকদের জীবনেই এই ধরণের সৌভাগ্য মাঝে মাঝে দেখা দেয়। চেকটার খালি অঙ্কের জায়গায় হাজার রূপোর ডলার লিখে দাও, ব্যাঙ্কে গিয়ে এখুনি ভাঙ্গিয়ে আনি। দেরি করলে বোকা নাপতে-টার মনে সুবুদ্ধির উদয় হতে পারে—তখন এসে নিশ্চয় চেকটা ফেরৎ চাইবে।

শেন্‌টে। চেকটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সোজা এখন লণ্ড্রিতে যাও—যে সব কাপড় দিয়েছিলাম, ফেরৎ নিয়ে এস।

[মিসেস সিন মুখভঙ্গী করে বেরিয়ে যাবে। শেন্‌টে সুইটার ছদ্মবেশ পরে নেবে, পকেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকবে। মিসেস মিৎস্থ ঢুকবে।]

মিৎস্থ। মিস্টার সুইটা, দোকানের মাল-পত্র বিক্রী করবার জন্যে তৈরী তো? আমি সঙ্গে করে তিনশো রূপোর ডলার নিয়ে এসেছি।

সুইটা। মিসেস মিৎস্থ, ঠিক করলাম মালপত্র বিক্রী করব না। আপনার সঙ্গে চুক্তিপত্রেই সই করব।

মিৎস্থ। কি বললেন? টাকার দরকার নেই? পাইলটকে টাকা দেবেন কি করে?

সুইটা। দেব না।

মিৎস্থ। বাড়িভাড়ার টাকা আছে তো?

সুইটা। (ব্ল্যাঙ্ক চেকটা নিয়ে অঙ্কের ঘরটায় লিখে নেবে) এই আমার কাছে দশহাজার ডলারের একটা চেক আছে। মিস্টার সুফুর সই করা—তিনি আমার কাজিনের ব্যবসার ব্যাপারে খুবই ইণ্টারেস্ট দেখাচ্ছেন। আপনার দুশো ডলার অর্থাৎ সামনের ছ'মাসের ভাড়া সন্ধ্যে ছটার আগেই আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা মিসেস মিৎস্থ, আমি এখন নানা কাজে খুব ব্যস্ত আছি। কিছু মনে করবেন না। আপনি এবার আসুন।

মিৎস্থ। তাহলে পাইলটের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন মিস্টার সুফু। দশ হাজার রূপোর ডলার। যাই হোক, টাকার গন্ধ পেলে আজকালকার যুবতীরা কত সহজে প্রেমকে বিসর্জন দিতে পারে—আপনার কাজিনকে দেখে শিখলাম।

(বেরিয়ে যাবে—ব্ল্যাক আউট)

মধ্যবর্তী দৃশ্য—রাস্তার ধারে

[স্বপ্ন দৃশ্য—ওয়াং শুয়ে তন্দ্রাবেশে বলতে থাকবে—তার ওপর আলোর স্পট পড়বে। দূরে দেবতারা দাঁড়িয়ে আছেন দেখা যাবে—তাঁদের ওপরেও লাল রং-এর স্পট]

ওয়াং। শেন্‌টে আপনাদের কৃপায় একটা সুন্দর তামাকের দোকান কিনে ব্যবসা করে বসল। তার জানা-শোনা যত বেকার নরনারী এসে তার কাছে আশ্রয় নিল—তাছাড়া যে পারে তাকে ঠকাতে চেষ্টা করে। মনে হল দেনার দায়ে দোকানটাই বুঝি উঠে যাবে। এমন সময় এসে হাজির হল সুইটা—সেই এসে শেন্‌টেকে উদ্ধার করছে এইসব পরগাছাদের অত্যাচার থেকে।

১ম দেবতা। তাহলে শেনটে এখন ভালই আছে।

ওয়াং। তা একরকম ভালই বলতে হবে। তবে বিপদ এড়াবার জন্যে অনেক সময়ই সে কাজিনের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়—আজকাল প্রায়-প্রায়ই এ ব্যাপারটা ঘটছে।

২য় দেবতা। কাজিন যখন তার ব্যবসার তদারক করতে আসে তখন সে কি কাজকর্ম ছেড়ে শুধু আমোদ-প্রমোদেই মেতে থাকে?

ওয়াং। সেজুয়ান শহরেই তখন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না প্রভু।

৩য় দেবতা। সে যে কাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিল?

ওয়াং। ইয়াং সুন বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শেনটের সব টাকা হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল দোকানটা বেচে। কাজিন এ কথা জানতে পেরে ঠিক সময় এসে হাজির হয়ে সুনকে হটিয়ে দেয়। সে ঠিক সময় না এলে শেন্‌টেকে পথে বসতে হোত।

১ম দেবতা। তাহলে কাজিনটি তো ভাল লোক বলতে হবে।

ওয়াং। শেন্‌টের পক্ষে ভাল কিন্তু তার দুঃস্থ বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষে সাক্ষাৎ শনি।

১ম দেবতা। তাহলে তো লোকটা ভাল নয়।

১ম দেবতা। এ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে শেন্‌টে দুদিন বাদে আর ভাল লোক থাকতে পারবে না।

ওয়াং। প্রভু, আজকের পৃথিবীতে বাঁচতে হলে শেনটের মন নিয়ে চলা যায় না।

৩য় দেবতা। আমরা কিন্তু মহৎ মানুষের থাকবার জন্যেই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলাম।

১ম দেবতা। আমরা এখন ব্যস্ত আছি, চললাম। তুমি শেন্‌টের খবরাখবর জেনে রাখবে—আবার দেখা হবে।

(দেবতারা চলে যেতে থাকবেন, আলো নিভে যাবে)

শেনটের তামাকের দোকান

[সুইটা দোকানের সামনে বসে কাগজ পড়ছে—এমন সময় মিস ইয়াং সুন ঢুকবেন এবং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন—সুইটা কাগজ থেকে মুখ তুলে বলবে

সুইটা। বলুন মিস ইয়াং সুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি? আপনি কি সিগারেট কিনতে এসেছেন?

মিস সুন। মিস্টার সুইটা, আপনি তো জানেন আমি কেন এসেছি। আপনার তদারকিতে আপনার কাজিনের ব্যবসা এই ক'মাসে একেবারে ফেঁপে উঠেছে। সারা সেজুয়ানের শহরে আপনারা অন্তত দশটা তামাকের দোকান খুলেছেন। পয়সার অভাব আপনাদের নেই। আমি আমার ভাইকে জেল থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনার কাছে দয়াভিক্ষা করতে এসেছি। আজ সকালে পুলিশ আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তারা জানালে শেনটের সেই দুশো রূপোর ডলার ফেরৎ না দিলে আপনারা তার নামে কেস করবেন।

সুইটা। পুলিশ সত্যিকথাই বলেছে। আপনার ভাইকে টাকা দিয়ে যেতে বলুন।

মিস সুন। আমি স্বীকার করছি আমার ভাই একটা হতভাগা। যেদিন সে জানলো যে শেন্‌টে তাকে বাকি তিনশো ডলার দিতে পারবে না, তখনই সে বুঝতে পারল যে পাইলটের চাকরি তার আর হবে না। তারপর দুদিনের ভেতরেই সে ওই দুশো ডলার ফুঁকে দিল। এখন টাকা ফেরৎ দেবে সে কোথা থেকে?

সুইটা। ঋণ শোধ না করার অপরাধে তাহলে তাকে জেলে গিয়ে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মিস সুন। আপনি দয়া করে শেন্‌টেকে একবার ডেকে দিন। সে তো একসময় সুনকে ভালবাসতো। সে কখনই আপনার মত নিষ্ঠুর হতে পারবে না।

সুইটা। শেন্‌টে এখানে নেই।

মিস সুন। কবে আসবে?

সুইটা। বলতে পারি না।

মিস সুন। শহরে গুজব যে আপনি তাকে কোথাও আটক রেখে দিয়েছেন।

সুইটা। গুজবে বিশ্বাস করবেন না।

মিস সুন। বেশ, আমি থানায় গিয়ে পুলিশের সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করব।

সুইটা। চেষ্টা করতে পারেন।

[মিস ইয়াং সুন রেগে বেরিয়ে যাবেন। বৃদ্ধ কার্পেটওয়ালা ও তার স্ত্রী ঢুকবে]

কার্পেটওয়ালী। আজ সকালের ডাকে একটা রেজিস্টার্ড খাম পেলাম। ভেতরে দুশো ডলারের নোট। বুঝতে পেরেছি শেনটেই টাকাটা পাঠিয়েছে। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিতে চাই। অনুগ্রহ করে তার ঠিকানাটা আমাদের বলুন।

সুইটা। অত্যন্ত দুঃখিত—আমাকেও সে ঠিকানা জানায় নি।

বৃদ্ধ। চল, তাহলে যাই।

বৃদ্ধা। আচ্ছা পরে এসে আবার খবর নেব—একদিন তো তাকে আসতেই হবে। আচ্ছা চলি।

[সুইটা বাও করবে-এঁরাও বাও করে চলে যাবেন। বাইরে থেকে ওয়াং-এর গলা শোনা যাবে]

নেপথ্য কণ্ঠ। ওয়াং—সেজুয়ানের মহৎ নারী কি এতদিনেও ফেরেন নি? (ভেতরে ঢুকে) মিস্টার সুইটা, আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কবে শেনটে ফিরছে? ছ'মাস আগে আপনি বলেছিলেন সে দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে। তারপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। যা সে থাকলে হতে পারত না।

মিস্টার সুইটা, শহরের লোক বলছে নিশ্চয় তার কোন বিপদ ঘটেছে। তার বন্ধুরা এখন খুবই চিন্তিত। আপনি দয়া করে তার ঠিকানাটা আমাদের জানাবেন কি?

সুইটা। এখন আমার সময় নেই মিস্টার ওয়াং—আমাকে উঠতে হবে। আসছে সপ্তাহে আসবেন।

ওয়াং। লোকে বলছে আবার দীন-দুঃখীদের বাড়িতে বাড়িতে চাল পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুইটা। এ থেকে তারা কি বুঝতে পারছে?

ওয়াং। শেনটে শহর ছেড়ে কোথাও যায় নি।

সুইটা। কিন্তু আমার অনুরোধ এ বিষয় নিয়ে আপনি মিথ্যা চিন্তা করবেন না। তার খবর পাওয়া-মাত্র আমি নিজে গিয়ে আপনাকে জানিয়ে আসব। ক্ষমা করবেন, আমাকে এখন উঠতে হবে।

(উঠে দাঁড়াবে—ব্ল্যাক আউট)

শেষ দৃশ্য

রাস্তার ধার

[সঙ্গীত। ওয়াং রাস্তার ধারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে—দেবতাদের আবির্ভাব হবে]

ওয়াং। প্রভুদের সঙ্গে দেখা হবার প্রতীক্ষায় আমি ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছিলাম। শেনটের ওখানে ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটছে—আবার সে সেজুয়ান ছেড়ে চলে গিয়েছে। এবার সে কয়েক মাসের জন্যে অদৃশ্য হয়েছে। এদিকে তার কাজিন সব কিছু লুটেপুটে নিচ্ছে। কেউ কেউ সন্দেহ করছে কাজিন তার ব্যবসা ও টাকাকড়ি আত্মসাৎ করবার জন্যে তাকে হত্যা করেছে। আমার নিজের কিন্তু তা মনে হয় না। আমার ধারণা হ'ল যে শেনটেকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। যাক্, প্রভুরা সবাই এসে গিয়েছেন—আপনারাই দয়া করে তাকে খুঁজে বার করুন।

১ম দেবতা। সত্যিই ভয়াবহ ব্যাপার, আমরা তাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে গেছি তবু তার দেখা পাইনি। পৃথিবীতে মহৎ মানুষের অনুসন্ধান করতে গিয়েও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। শেনটেই আমাদের একমাত্র ভরসা।

৩য় দেবতা। অবশ্য যদি সে এখনও পর্যন্ত ভাল থেকে থাকে।

ওয়াং। ভাল সে চিরকালই থাকবে—তবে সে যে অদৃশ্য হয়েছে।

১ম দেবতা। তাহলে তো সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

২য় দেবতা। তুমি কি আত্মবিস্মৃত হয়েছ?

১ম দেবতা। তাহলেই বা ক্ষতি কি? শেনটেকে খুঁজে না পেলে আমাদের এই পৃথিবী-পরিক্রমা বাতিল করতে হবে। এখানে এসে কি দেখলাম বল দেখি। অসহনীয় দারিদ্র্য, নীচতা এবং নোংরামি। যদি বা দুচারজন ভাল লোক দেখা যায় তারাও এ ধরণের সমাজে নিজেদের বেশিদিন ভাল রাখতে পারে না।

২য় দেবতা। দেখ জলবিক্রেতা, এত কাল পৃথিবীর লোকেদের জন্যে যে-সব বিধি-বিধান আমরা ঠিক করে এসেছি—আমার ভয় হচ্ছে সবই বাতিল করে দিতে হবে। কি করে কোনমতে বেঁচে থাকবে সেই চিন্তাতেই মানুষ অহরহ পাগল হয়ে উঠছে—ভাল হবার কথা তারা ভাববে কখন? (অন্য দেবতাদের প্রতি) পৃথিবীটা আর বাস করবার উপযোগী জায়গা নেই—তোমাদেরও এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

১ম দেবতা। মানুষগুলো সব অপদার্থ।

২য় দেবতা। তার কারণ পৃথিবীর আবহাওয়াটা এমন বিষাক্ত যে এখানে শুদ্ধ আত্মাও বেশী দিন পবিত্র থাকতে পারে না। মানুষ যদি দুর্বল স্বভাবের না হোত তাহলে পৃথিবীকে এভাবে পঙ্কের ভেতরে টেনে আনতো না। এখানেই ভূস্বর্গ গড়ে তুলতো।

১ম দেবতা। বন্ধুগণ, আমরা কে—সে কথা ভুলে গেলে চলবে না, নৈরাশ্যের দ্বারাই বা অভিভূত হব কেন? অন্তত একজন সত্যিকার মহৎ মানুষের দেখা আমরা পেয়েছি—পাপের সঙ্গে তার এখন পরিচয় হয়নি। সে অদৃশ্য হয়েছে বর্তমানে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। একজন মহৎ মানবই আমাদের এই জগৎ পরিক্রমাকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। সফরের আগে কি সিদ্ধান্তে আমরা এসেছিলাম স্মরণ কর—পৃথিবীতে অন্তত যদি একজন ভালো লোকের সন্ধান পাই, তাহলে বুঝবো আমাদের জগৎসৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে পর্যবসিত হয়নি।

[অন্য দিক থেকে সুইটা ঢুকবে—দেবতাদের বাও করে বসবে]

সুইটা। হে দেবতার দল, আমার বড় ভাগ্য আবার আপনাদের দর্শন পেলাম।

১ম দেবতা। (ওয়াংকে) এ কে? একে তো আমরা আগে দেখি নি।

ওয়াং। জানি না ও আপনাদের চিনতে পারল কি করে? প্রভু, এই হচ্ছে শেনটের স্বার্থপর কাজিন সুইটা। বিখ্যাত তামাকের ব্যাপারী।

১ম দেবতা। তুমি কি বিখ্যাত টোব্যাকো মারচেণ্ট সুইটা?

সুইটা। (মৃদুভাবে) আজ্ঞে হাঁ।

২য় দেবতা। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তুমি তোমার কাজিন শেনটেকে হয় খুন করেছ না হয় তাকে গুম করে রেখেছ। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ব্যবসাটাকে হস্তগত করা। তুমি এ অভিযোগ অস্বীকার করো?

সুইটা। নিশ্চয়ই অস্বীকার করি।

৩য় দেবতা। আমাদের সেজুয়ানের মহৎ নারীকে নিয়ে তুমি কি করেছ? তাকে কি কোথাও লুকিয়ে রেখেছ, না হত্যা করেছ?

সুইটা। প্রভু, আমিই সেই নারী।

(ছদ্মবেশ খুলে ফেলবে)

৩য় দেবতা। শেনটে।

শেনটে। প্রভু, আমিই সেই। আমিই সুইটা। আর আমিই শেনটে। শেনটেকে বাঁচাতে গিয়ে সুইটার হীন ছদ্মবেশ আমাকে ধারণ করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। 'নিজে ভাল থাকা এবং পরের ভাল করা'—এই বিধান মানতে গিয়ে আমার সর্বনাশ হতে বসেছিল—আমি বুঝলাম যে শেনটেকে বাঁচাতে হবে, শেনটে হিসাবেই—অর্থাৎ সেজুয়ানের একমাত্র মহৎ নারীরূপে। কিন্তু পৃথিবীর আজ যে অবস্থা তাতে সেটা সম্ভব হবে যদি সুইটার আবির্ভাব ঘটানো যায়। সুইটা এসে শেনটেকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবে, অথচ তার মহৎ চরিত্রে এতটুকু পাপের স্পর্শ পর্যন্ত লাগবে না। প্রভু, আপনারা পৃথিবী-পরিক্রমা করে দেখলেন, আমার দ্বৈতরূপ—সুইটাও বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীতে কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। পাপীর দল এখানে সুখে দিন কাটায়, আর যারা সত্যিকার ভাল তাদেরই ওপর দিয়ে দুঃখের ঝড় বয়ে চলে।

১ম দেবতা। এ সব কি বলছ শেনটে? তোমাকে খুঁজে পেয়ে আমরা কত খুশি হয়েছি। এখন অবান্তর কথার অবতারণা করে আমাদের স্বর্গীয় আনন্দে বাধা দিও না।

২য় দেবতা। তুমি হচ্ছ আমাদের আবিষ্কৃত সারা পৃথিবীর একমাত্র মহৎ ব্যক্তি।

শেনটে। কিন্তু প্রভু, সুইটার নিন্দায় তো লোকে পঞ্চমুখ।

১ম দেবতা। তুমি নিজেই বলেছ তোমার হীন ছদ্মবেশ। আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি দিনে দিনে মহৎ থেকে মহত্তর, মহত্তম হয়ে ওঠ।

দেবতারা তিনজন একসঙ্গে। 'বিদায় শেনটে। বিদায় ওয়াং।

(পেছনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দাঁড়াবে)

শেনটে। কিন্তু আমাকে বাঁচতে হলে মাঝে মাঝে আমার কাজিন সুইটাকে যে ডাকতে হবে।

১ম দেবতা। তার সাহায্য বেশী নিও না।

শেনটে। সপ্তাহে একবার।

১ম দেবতা। মাসে একবার হলেই যথেষ্ট। বিদায় শেনটে।

শেনটে। কিন্তু প্রভু, এখনও আমার অনেক কথা বলবার আছে—

২য় দেবতা। স্বর্গ থেকে অদৃশ্য মহাশক্তি আমাদের আকর্ষণ করছে শেনটে। আর এখানে থাকার আমাদের উপায় নেই। বিদায় শেনটে, বিদায়—

[বলতে বলতে তাঁরা মিলিয়ে যাবেন। ওয়াং এবং শেনটে বাও করবে। দুজনে মাথা তুলবে, আলো মিলিয়ে আসতে থাকবে। ওয়াং শেনটের হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকবে]

(এরপর একজন অভিনেতা এসে ইংরাজীতে এপিলগটি বলবে)

— যবনিকা —

অনুবাদক—অশোক সেন

জাপানের সাংস্কৃতিক সংকট

বিগত দশকের গোড়ায় জনৈক বৃটিশ সাংবাদিক জাপান ঘুরে এসে মন্তব্য করেন, যে দেশে সাংস্কৃতিক সঙ্কট চলছে। তাঁর মতে, জাপানীরা একটা গভীর সাংস্কৃতিক সঙ্কটের মুখোমুখি। যুদ্ধোত্তর কালে ইয়াংকী জীবনধারার বিস্তৃত অনুপ্রবেশের ফলে জাপানী জীবনের বৈশিষ্ট্য বেশিদিন আর বজায় থাকবে কি না সন্দেহ। আমেরিকান প্রাধান্যর বৈশিষ্ট্য এই যে, কিছু লোক ওখানে প্রচলিত গণতন্ত্রের মহিমা প্রচারে সচেষ্ট হলেও তা শেষ পর্যন্ত আপাতভাবে কিম্ভূত প্রদর্শনী, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছায়াছবি, 'পিন-টেব্‌ল সেলুন' প্রায় প্রত্যেক জায়গায়, এবং সর্বত্র সস্তা আর খেলো 'নাইট-ক্লাব' স্থাপনে পর্যবসিত হয়েছে। এই ওলোট-পালটের ফলে আধুনিক শিল্পকলা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। অবশ্য, এক্ষেত্রে 'আদর্শ' ফ্রান্স, আমেরিকা নয়। জাপানী শিল্পীর কাছে ফ্রান্স হল মক্কা, আর পিকাশো হলেন অবতার। যে কোন সেলুন-এ আধুনিক ফরাসী শিল্পীদের আঁকা ছবির অনুকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, অনুকরণকারীরা ঐ শিল্পীদের মাধ্যম বা যে সমস্যার ফলে য়ুরোপীয় শিল্পীরা ঐ ধরণের শিল্প সৃষ্টি করেছেন তার কোনটাই বোঝেন না।

এই মন্তব্যের পর দেড় দশক অতিক্রান্ত। আজকের জাপান কি পাল্টেছে? প্রাণহীন অনুকৃতির হাত থেকে রেহাই মিলেছে তার?

লা-জিরোস্-এর নাম শুনেছেন কি?

না?—সত্যি কথা বলতে কি, আমিও শুনিনি।

সুতরাং, লেখকজনোচিত বিজ্ঞতার পরিচয়স্বরূপ এই গ্রামের বিশদ বর্ণনা না দিয়ে ওটুকু আপনাদের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তির ওপর ছেড়ে দিলাম। ভেবে নিন সদর রাস্তা থেকে অনেক, অ-নে-ক ভেতরে একটা গ্রাম; ঠিক অন্য যে-কোনও গ্রামের মতন। গ্রামের প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে—বাইরের জগত সম্বন্ধে ধারণা—তাদের খুবই অস্পষ্ট।

গল্পটা আমার—কাজেই তা আরম্ভের দিনক্ষণ আমারই ইচ্ছা-নির্ভর। মে মাসের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে শুরু করা যাক্—

চওড়া সদর রাস্তার একপাশে সবুজের সমারোহ, অপর পাশে অশান্ত সমুদ্র।

১৪১৮ খৃস্টাব্দের এমন এক মধ্যাহ্নে উক্ত রাস্তা দিয়ে দু'জন লোক চলেছে লা-জিরোস্-এর দিকে। একজন বয়স্ক, অন্যজন যুবক—পিতা ও পুত্র। দু'জনেই চাষী—দু'টি টাটুঘোড়ায় চড়ে দুল্‌কি চালে চলমান।

ছেলে বলল, 'সময়ে পৌঁছতে পারব ত?'

'আরে হ্যাঁ,—দু'টোর আগে কিস্যু হবে না!—আর, সবে ত দুপুর এখন।'

'দেখতে এত ইচ্ছে হচ্ছে যে কী বলব!'

আলেকজান্দার দ্যুমা

'সে ত হবেই।'

'লোকটাকে না কি তারই চুরি-করা বর্ম পরিয়ে ফাঁসীতে ঝোলান হবে?'

'তাই ত শুনেছি।'

'আচ্ছা, এত জিনিস থাকতে বর্ম চুরি করতে গেল কেন?'

'আরে বাপু, এত আর যে সে বর্ম নয়!—এর সারা গায়ে সোনার পাত মোড়া!'

'ও হো, তা-ই না কি?—তা, বর্ম পরিয়ে ফাঁসী দিচ্ছে কেন?'

'কারণ, লা-পিরোস্-এর জমিদার মশাই এই ফাঁসী থেকেও ফয়দায় বিশ্বাসী—বর্মটা তাঁর সম্পত্তি কি না। কেন, শুনিস নি ফাঁসীর আসামীর ছোঁয়া জিনিস ব্যবহার করলে মংগল হয়? সেজন্যই তিনি চোরটাকে বর্ম পরিয়ে ফাঁসী-কাঠে ঝোলাচ্ছেন, যাতে পরে ঐ বর্মটা ভাবী-যুদ্ধে তাঁর পক্ষে মংগল-দায়ক হয়।'

'বাবু ত খুব চালাক লোক!'

'হবে না? জমিদার মানুষ—আমাদের মত মুখ্যু চাষা ত আর নয়।'

●

পিতাপুত্র এই ধরণের পথক্লান্তিহর কথাবার্তা বলতে বলতে আধঘণ্টার মধ্যেই লা-পিরোস্-এ পৌঁছে গেল। পিতার ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক—তারা যথাসময়ে পৌঁছেছিল।

পিতারা কি সব সময়েই ঠিক কথা বলেন?

জমিদারের বিশাল প্রাসাদের সামনে মস্ত মাঠ লোকে লোকারণ্য। এমন কি গাছের উপরেও লোক উঠে বসেছে। মাঠের মাঝামাঝি ফাঁসীর মঞ্চ—দড়িটা ক্ষুধার্ত সাপের মত হাওয়ায় দুলছে। সামনে অশান্ত সমুদ্র। লোকটা মরবার সময় প্রকৃতির সমারোহ দেখতে পাবে প্রাণভরে—ঊর্মিমুখর সিন্ধুর অনন্ত

বীরভূম

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

চণ্ডীদাস-পূজিতা নান্নুরের বাশলী দেবী
(পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বীণাপাণি মূর্তি)

বীরভূম জেলা বাঙলার ইতিহাসে অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জেলা। এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম, স্থান স্বাস্থ্যকর। পাদরী লঙ সাহেব তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'অ্যানালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল' গ্রন্থের দ্বিতীয় পাতার পাদটীকায় এই বীরভূমকে 'সুইজারল্যাণ্ড অব বেঙ্গল' আখ্যায় বিভূষিত করেছেন।

ইতিহাসে প্রাচীনকালে মল্লভূমির নাম পাওয়া যায়। বীরভূম বা বীরভূমি এই মল্লদেশের অন্তর্গত ছিল। ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে এই অংশ মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তারও আগে শুম্ভ দেশের অধীনে। ১২শ শতাব্দীতে রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত।

বীরভূম নামের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। কারুর মতে বীরভূম আগে অরণ্যসঙ্কুল ছিল। তখন মধ্যদেশের বর্বর জাতিরা এই দেশের অধিবাসীদের প্রায়ই আক্রমণ করত। এই অসভ্যদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য এই অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে অনেক সাহসী পরাক্রান্ত বীরের উদ্ভব হয়েছিল। সেই বীরদের জন্মভূমি বলেই 'বীরভূমি' নাম।

কেউ বলেন পশ্চিম ভারত থেকে বীরসিংহ ও চৈতন্যসিংহ নামে দুই ভাই এই স্থানে এসে অসভ্য আদিম জাতিদের পরাভূত করে দেশের রাজা হন। বড় ভাই বীরসিংহ স্বীয় নামানুসারে বর্তমান সিউড়ির ৬ মাইল পশ্চিমে 'বীরসিংহপুর' নামে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বীরসিংহ রাজাই বীরভূমের আদি হিন্দু রাজা বলে কথিত।

আবার এখানে শাক্তদেরও বাস কম ছিল না। শাক্তদের আচার-ব্যবহারের নাম ছিল 'বীরাচার।' বীরাচারীরা তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। বীরাচারীদের মহাকেন্দ্র ছিল রাঢ়ের দুর্গম অঞ্চল। পলাশী যুদ্ধের ৫ বছরের মধ্যে এই বীরাচারীরা বীরভূম থেকে বর্ধমান আর সঙ্গতগোলার কাছে ইংরেজদের বাধা দিয়ে সংগ্রাম চালায়। এই বীরাচারিগণের আবাসভূমি বলে এই স্থান বীরভূমি।

কেউ বলেন, সাঁওতাল ভাষায় 'বির' শব্দের মানে 'জঙ্গল'। সাঁওতালদের এই জন্মভূমিই পরবর্তীকালে 'বীরভূমি' হয়।

নানা মতভেদের মধ্যে কোনটা সঠিক আর জানার উপায় ইতিহাসবিদেরাই বলতে পারবেন।

দেখা যায় ১৩শ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত এদেশে হিন্দু রাজত্ব ছিল। তখন বীরভূমের রাজধানীর নাম 'নগর' বা 'রাজনগর' ছিল। এই শতকেই অর্থাৎ ১২২৬ খ্রীঃ বাঙলার সুবেদার গিয়াসুদ্দীন এই হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংসোন্মুখ করেন। তখন থেকেই এই স্থান মুসলমানদের অধিকারে আসে। পাঠান রাজত্ব চলে। হিন্দু রাজা নামমাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতেন।

১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে যখন বাঙলার পাঠান প্রাধান্যের একেবারে বিলোপ সাধন হয় নি, অথচ তাদের ক্ষমতা ক্রমশ খর্ব হয়েছিল সেই সময় আসাদ উল্লা ও জোনাদ খাঁ নামে আফগান বংশীয় দুই ভাই বীরভূমের হিন্দু রাজার অধীনে সামান্য কাজ করতে করতে ক্রমে বীরভূমের জমিদারী হস্তগত করেন। তখনও 'নগর' বা 'রাজনগর' বীরভূমের রাজধানী ছিল।

জোনাদ খাঁর পুত্র বাহাদুর বা রণমস্ত খাঁ বীরভূম জমিদারী পেয়ে মোগল বাদশাহের অধীন হলেন। তিনি ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশের রাজাদের আক্রমণ থেকে বাঙলা দেশকে রক্ষা করবার জন্যে মোগল সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হন। মোগল সরকার তাঁর সৈন্য প্রভৃতি পোষণ করবার জন্য সমগ্র বীরভূম জেলাটি নিষ্কর জায়গীর স্বরূপ তাঁকে দান করেন। রণমস্ত খাঁর পৌত্র আসাদুল্লা খাঁ। তিনি ১৬৯৭ থেকে ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত সাধু ছিলেন। এ দেশে অনেক মসজিদ স্থাপন ও বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে দেশের অনেক উপকার করেন। সুবা বাঙলার নবাব মর্শিদ মুর্শিদকুলী খাঁ। তাঁর সঙ্গে বীরভূমের বন্দোবস্ত করেন। আসাদুল্লার পুত্র বদী-উল জমন খাঁর সঙ্গে আর এক নতুন বন্দোবস্ত হয়। বীরভূম জমিদারী মুর্শিদাবাদ চাকলার অধীনে হয় ও একটা স্বতন্ত্র বিখ্যাত জমিদারী বলে পরিগণিত হয়। বীরভূম জমিদারী বাঙলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ছিল।

তখন বীরভূম জমিদারীর অধীনে ছিল ভাগীরথী থেকে আরম্ভ করে সমুদয় দেওঘর, সাঁওতাল পরগণার অধিকাংশ এবং বিষ্ণুপুর জমিদারী (বাঁকুড়া)। সেই সময় বিষ্ণুপুর জমিদারী বাদ দিলেও বীরভূম জমিদারীর আয়তন ছিল ৩,৮৫৮ বর্গ মাইল।

অক্‌বরের সময় বীরভূম ছিল মান্দারন সরকারের অধীন। পরবর্তী সময়ে বীরভূম-সীমানা কিছু সঙ্কুচিত ও কিছু সম্প্রসারিত হয়ে বীরভূমের অধীন তাতে সরকারের দাউদসাহী, স্বরূপ সিং, কুমার প্রতাপ, গোঘাট সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বীরভূম স্বতন্ত্র হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলার দেওয়ানী গ্রহণের (১৭৬৫ খ্রী:) পাঁচ বছর পরে যে মহামারী দুর্ভিক্ষ হয়, তাতে এই অঞ্চল একেবারে জনশূন্য ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। দস্যুর উপদ্রবও বাড়ে। দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি বিরাজ করে। দস্যুরা বাইরে থেকে এসে পশ্চিম সীমানার জঙ্গলে আস্তানা গড়ে তোলে। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী জি বি ফলী নামে এক ইংরেজের ওপর এই অঞ্চলের ভার দেয়। ১৭৮৭ সালের ২৯শে মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিশ বীরভূম ও বিষ্ণুপুর একত্র করে 'পাই' নামে এক ইংরেজকে বিষ্ণুপুরের কালেক্টর নিযুক্ত করেন।

এর পর শেরবরণ সাহেব কালেক্টর হন। শেরবরণের সময় (১৭৮৭) সংযুক্ত জেলার রাজধানী বিষ্ণুপুর হতে সিউড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ইংরেজরা তাদের ব্যবসায় রক্ষাকল্পে বর্ধমান ও বীরভূম মিলিত করে এক জেলার সৃষ্টি করে। তখন উভয় জেলার শক্তি সমন্বয়ে লুণ্ঠনকারীদের তারা বিতাড়িত করে (১৭৮৯)। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলা হতে বীরভূমকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করে। এই সময় থেকে সিউড়ি বীরভূমের প্রধান শহর হয়।

ইংরেজি ১৭৯৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর আদেশমত বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর বীরভূম থেকে বর্ধমানে স্থানান্তরিত হয়। পরে কয়েক বছর জঙ্গলমহালের অন্তর্গত থেকে ১৮৩৫-৩৬ সালে বাঁকুড়াও স্বতন্ত্র জেলা হয়।

১৮৫৫ সালে এই জেলায় সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়। বীরভূমের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। বহু লোক হতাহত হয়। বহু চেষ্টায় এই বিদ্রোহ দমিত হয়।

এর পর আর বিশেষ ঘটনা বীরভূমে ঘটে নি।

বর্তমান বীরভূম জেলার আকৃতি অনেকটা ইংলণ্ডের অনুরূপ। এই জেলা সমুদ্র তীর হতে সোজাসুজি প্রায় ১৫০ মাইল দূরে বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত।

সীমানা—দক্ষিণে অজয় নদী। উত্তর-পূর্বে গাঙ্গেয় দ্বীপের নদীর বন্যার দ্বারা সঞ্চিত পলিমাটিসমন্বিত ভূমি। পশ্চিমে ঢেউ-খেলান ছোট ছোট রাঙামাটির পাহাড়।

আয়তন—১,৭৫৭ বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা—১,৪৪৬,১৫৮।

মহকমা—সহর (সিউড়ি)—১,১৩৭ বর্গমাইল।

রামপুরহাট—৬০৬ বর্গমাইল।

নদী

অজয়—দক্ষিণে এই নদী এই জেলাকে বর্ধমান থেকে বিভক্ত করেছে। দুবরাজপুর থেকে ১০ মাইল ও বোলপুর থেকে ২ মাইল এর দূরত্ব। এই নদী কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে।

ময়ূরাক্ষী—বীরভূম শহরের ২ মাইল উত্তরে প্রবাহিত, এই নদী পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার দেওঘরের পূর্বে ত্রিকূট পাহাড়ের কাছ থেকে উঠে এসে জেলার মধ্যস্থল দিয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে।

কানা—সিউড়ির ৩ মাইল উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী থেকে এই শাখানদী বের হয়ে ৮ মাইল গিয়ে সাঁইথিয়ার আগেই ময়ূরাক্ষীতে আবার মিশেছে। এই কানা নদীতে সারা বছর জল পাওয়া যায়। এই শাখানদীর জন্যে ময়ূরাক্ষীর এই অংশে জল একেবারে কমে গেছে।

এ ছাড়া বক্রেশ্বর, চন্দ্রভাগা, হিন্দোলা দ্বারকা বা বাবলা ব্রহ্মাণী, সাল বা কোপাই, পুষ্করিণী, বাশলই, পলাসী প্রভৃতি বহু ছোটবড় নদী আছে। এর মধ্যে দু-একটি নদী একেবারেই শুকিয়ে যায়। আর যে কটিতে জল থাকে সে জলের উচ্চতা দু-তিন হাতের বেশী হয় না। কিন্তু বর্ষাকালে নদীর জল ভীষণ বেড়ে যায়, এমন কি পাশের গ্রামগুলিও

ভেসে যায়। ময়ূরাক্ষী, কানা, অজয়, বক্রেশ্বর, হিন্দোলা প্রভৃতি নদী গুলিতে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

কৃষি

বীরভূম জেলার মাটি অনুর্বর নয়। এর মাটি চাষের উপযোগী বটে, ধান চাষও খুব হয়। এখানে ময়ূরাক্ষী বা কানাডা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এই বাঁধ সমস্ত বাঁধের মধ্যে সুন্দর। সিউড়ি থেকে ময়ূরাক্ষী বাঁধ প্রায় ২৫ মাইল দূরে। বর্তমানে এখানে নিয়মিত বাস চলাচল করে।

যা হোক, এই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা বর্তমানে এই জেলার প্রাণ। এর জন্য এই অঞ্চলে সেচের খুব উন্নতি হয়েছে। চাষও সেই পরিমাণ বেড়ে গেছে। বর্তমানে বীরভূম জেলায় চাষের জমির পরিমাণ সরকারী মতে ৭'৫ লক্ষ একর এবং তার মধ্যে মাত্র ৩'৬ লক্ষ একর ময়ূরাক্ষী এলাকার মধ্যে পড়ে। বীরভূম জেলায় উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করার ফলে দুবার ফলন করে উৎপাদন অনেকটা বেড়ে গেছে। কয়েকটি এলাকায় কৃষিজীবীরা যৌথ ভাগচাষ করছে বলে জানা গেছে। ছাত্ররাও অবসর সময়ে চাষের প্রতি আগ্রহশীল হয়েছে বলে শোনা যায়। সুসংবাদ নিশ্চয়ই।

শিল্প ও ব্যবসায়

এই জেলায় স্থানে স্থানে মাটির নিচে ও মাটির ওপর বড় বড় পাথর পাওয়া যায়। এই সমস্ত পাথর কেটে মন্দির ও বাড়ী তৈরী হয়। চুন তৈরীর জন্য এখানে ঘুটিং পাথর প্রচুর পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে কয়লাও আছে।

বীরভূমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প হচ্ছে পেতল ও কাঁসার দ্রব্য (দুবরাজপুর ও নলহাটিতে), ছুরি-কাঁচি ও সিল্কের কাপড় তৈরি। মারগ্রাম, পালসা, বালিয়া, পাঁচগ্রাম তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। কয়ালীপর কারিধ্যার—তসরের কাপড় ও শাঁখের অলঙ্কার মহিষের শিং-এর কাজও এ অঞ্চলে হয়।

শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা যে মনোরম কারুকার্যের প্রচলন করেছেন, তার ফলে চামড়ার কুটির শিল্পের কদর বেড়ে গেছে। বিচিত্রিত চটি-জুতো, মনিব্যাগ, নোটবুক, বসবার মোড়া প্রভৃতির মধ্যে এক বিশেষ শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীনিকেতনে কাঠের তৈরি জিনিষ, বেত, বাঁশের তৈরি সুদৃশ্য দ্রব্যগুলি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এখানে তাঁতের কাপড়ের মধ্যে যে বিচিত্র শিল্প দেখা যায় তাও আদৃত হয়েছে।

বীরভূমে এককালে পটশিল্পের পটুয়াদের খ্যাতি ছিল। আজকাল নিত্য প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা প্রাচীন শিল্প ত্যাগ করে অন্য কাজে নিয়োজিত হয়েছেন।

প্রসিদ্ধ স্থান

নান্নুর—বীরভূম জেলার সাকুল্লিপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির আছে। কবি চণ্ডীদাস এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে চণ্ডীদাসের ভিটা আছে।

তারাপীঠ—মল্লারপুর স্টেশন হতে খুব কাছে দ্বারকা নদীর তীরে অবস্থিত তারাপুর। এখানে মহাশ্মশানে সতীর ঊর্ধ্বনয়নতারা পতিত হয়। এটি পীঠস্থান তারাপীঠ। বশিষ্ঠ মুনি কর্তৃক আরাধিতা তারাদেবী এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবতা চন্দ্রচূড় মহেশ্বর। দ্বারকা নদীর পূর্বতীরেই তারামায়ের মন্দির। এই তীর্থস্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। এই পীঠেই নাটোরের রাজা সাধক রামকৃষ্ণ রায় সিদ্ধিলাভ করেন। আনন্দনাথই প্রথম কৌলের পদ গ্রহণ করেন। আনন্দনাথ তারাপুরে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের সমন্বয় করে গেছেন। এই তারাপুর ভিন্ন শাক্ত ও বৈষ্ণবদের একত্র সম্মেলন আর কোনও তীর্থে দেখা যায় না। আনন্দনাথের পরলোকগমনের পর (১৯৬১) তাঁর শিষ্য মোক্ষদানন্দ তাঁর পদ গ্রহণ করেন। মোক্ষদানন্দের পর আসেন মহাসাধক বামাক্ষেপা। তারাপুর গ্রামের কাছে আটলা গ্রামে ১২৪১ সালে বামাক্ষেপার জন্ম হয়। এঁর পুরো নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সিউড়ি—এই জেলার প্রধান নগর। এই শহর অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পও আছে। এখানে নানাবিধ মোরব্বা পাওয়া যায়। সিউড়ি থেকে পশ্চিমে ৬ মাইল দূরে বীরসিংহপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সিউড়ি শহরের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ গ্রাম—লাভপুর। এখানে 'রতন লাইব্রেরী' নামে এক প্রসিদ্ধ সংগ্রহশালা আছে। সিউড়ি থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে বক্রেশ্বরের মন্দির ও কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এক একটা এত গরম যে তাতে নামা যায় না। এটি একটি পীঠস্থান।

রামপুরহাট—মহকুমাশহর। ইহা একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান।

বোলপুর—এখানে শান্তিনিকেতন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতন থেকে দু মাইল দূরে শ্রীনিকেতন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লীর উন্নয়নজনক আশ্রম। এখানে কৃষি, পশুপালন, নানারকম হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

দুবরাজপুর—এখানে ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র।

কেন্দুলী বা কেন্দুবিল্ব গ্রাম—অজয় নদের তীরে। ১২শ শতাব্দীতে 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেব গোস্বামীর জন্মস্থান।

কীর্ণাহার—চণ্ডীদাসের সমাধি-মন্দির। তার পাশেই বৈষ্ণব বাবাজীদের আশ্রম। স্তূপগাত্রে একটি ছোট মন্দির। এখানে নিত্য চণ্ডীদাসের পুজো হয়।

[ক্রমশ।

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাংলা দেশে বাঙ্গালীর পরিচালনায় হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু পূর্বেই বলেছি হিন্দুমেলার পরিচালকগণ সর্বভারতীয় বোধের দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। মেলার দ্বিতীয় বর্ষের অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র লিখিত ভাষণ পাঠ প্রসঙ্গে বলেন,—

'এক্ষণে গত বৎসরে আমাদের দেশমধ্যে বা দেশসম্পর্কে কি কি প্রধান ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল বৃত্তান্ত আপনাদের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হই।'

—দ্রঃ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ৬৭বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

এখানে 'আমাদের দেশ' বলতে তিনি 'বাংলা'-কে নয় সমগ্র 'ভারতবর্ষ'-কেই বুঝিয়েছিলেন। কারণ অতঃপর তিনি পূর্ব বৎসরে সংঘটিত রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, মৃত্যু, বিদ্যা, সমাজ সম্বন্ধীয় যে সকল সংবাদ পরিবেশন করেন তার মধ্যে ছিল, 'পঞ্জাব সীমায় বিজোর্টি জাতির উপদ্রবের' সংবাদ, 'আবিশিনিয়ার যুদ্ধযাত্রাকে'—ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ, এই যুদ্ধ-ব্যয়ের কিয়দংশ ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইয়াছে এরূপ সংবাদ মহীসুরের রাজার পরলোকগমন ও তাঁর পোষ্যপুত্রের রাজ্য প্রাপ্তির সংবাদ, 'সিবিল সরবিস পরীক্ষার দ্বার ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্ত' উন্মুক্ত রাখার জন্য লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বেতেও চিহ্নিত কর্মচারীর পরীক্ষা' গ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাব, রাজস্ব বৃদ্ধি সম্পর্কে সাধারণের ক্ষোভসম্পৃক্ত প্রতিবেদন, জয়পুর, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি স্থানের সরকারী সংবাদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গবর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সমাজের আসন প্রাপ্তির সংবাদ, মনোমোহন ঘোষের হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে যোগদান ইত্যাদি সংবাদ। সংবাদগুলি নিঃসন্দেহে সর্বভারতীয়। অতএব 'হিন্দুমেলা'র মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্যসমূহ যে জাতিগত ভেদবুদ্ধিপ্রণোদিত ছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য।

হিন্দুমেলার বার্ষিক অধিবেশনগুলি কি গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা আয়োজিত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কার্যবিবরণীর বিষয়তালিকাগুলি আলোচনা করলে।

সভা অনুষ্ঠান ছাড়াও হিন্দুমেলার কর্তৃপক্ষগণ এক বৃহদায়তন শিল্পমেলার আয়োজন করতেন। সেই সঙ্গে লোকচিত্ত বিনোদন ও দেশীয় ভাবোদ্দীপন উদ্দেশ্যে তিন থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী মেলায় বিভিন্ন লোকসঙ্গীত, দেশীয় ঐকতান বাদন, বিভিন্ন ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হ'ত।

সাধারণভাবে মেলার সমস্ত কাজ তিনটি বিশেষ শাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন সাহিত্য, শিল্প এবং ব্যায়াম বা ক্রীড়াবিষয়ক।

দেশাত্মবোধক জাতীয় সঙ্গীতের দ্বারা সাহিত্য সভার উদ্বোধন হত। সম্পাদকীয় ভাষণ, সভা আহ্বান ইত্যাদির পরে মেলার কার্যবিবরণী ও উদ্দেশ্যবিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হত। পূর্ববৎসরের রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, মৃত্যু, বিদ্যা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ক দেশীয় সংবাদের প্রতিবেদন উপস্থাপনের পরে দেশপ্রেমমূলক বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত কবিতা, প্রবন্ধাদি পঠিত হত। কবিতা পাঠের পর দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের আসর বসত। তৃতীয় অধিবেশনের সময় থেকে সাহিত্য-শিল্প-ক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের 'হিন্দু-মেলা' নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক দানের প্রচলন হয়। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণীর সাধারণ সভা ও সাহিত্য সভার অনুষ্ঠানসূচীর অংশবিশেষ প্রয়োজনবোধে এখানে উদ্ধৃত হল :

—দ্রঃ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ৬৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১। সম্পাদকীয় ভাষণ : শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীনবগোপাল মিত্র স্বাক্ষরিত।

২। শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন কর্তৃক সভা আহ্বান ও 'মিলে সবে ভারত সন্তান' সঙ্গীত সহকারে সভার উদ্বোধন।

৩। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মেলার উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রস্তাব পাঠ।

৪। শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র কর্তৃক পূর্ববৎসরের :

(ক) রাজ্য সম্বন্ধীয়, (খ) বাণিজ্য সম্বন্ধীয়, (গ) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়, (ঘ) মৃত্যু সম্বন্ধীয়, (ঙ) বিদ্যা সম্বন্ধীয়, (চ) সমাজ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত পাঠ।

৫। নিম্নলিখিত পদ্যসকল পাঠ :

(ক) যথা দেশ দেশান্তর, পর্যটিয়ে —শ্রীঅক্ষয় চৌধুরী।

(খ) জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান।—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(গ) আহা কি অপূর্ব শোভা আজি এ কাননে—শ্রীশিবনাথ শর্মণঃ (শাস্ত্রী)।

৬। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু কর্তৃক মেলায় সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দান।

৭। সংস্কৃত কবিতা পাঠ :

শ্রীতারানাথ শর্মা, শ্রীরামতারণ শিরোমণি ও শ্রীভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিরচিত ও পঠিত।

৮। এই সমস্ত কবিতা পাঠের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল—

(ক) উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান—
(খ) লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে—
(গ) এ দেশের দুঃখে কার না সরে চোখের জল—
(ঘ) ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ—

পূর্বোক্ত আদিকা কর্মসূচী ছাড়াও সাহিত্য বিভাগের কাজের মধ্যে ছিল শাস্ত্র আলোচনার ও লোকসঙ্গীতের আয়োজন, জাতীয় সভার সদস্য নির্বাচন ও বিষয় নির্বাচন, শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পদক ও অন্যান্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশন সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকায় (২০শে জানুয়ারী, ১৮৭১) একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গবোধে বিজ্ঞাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। লেখা হয়েছিল :

'যাঁহারা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রকার উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ মেলার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে ন্যাশনেল প্রেসে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে যদি তৎসমুদয় মেলার অধ্যক্ষ সভার বিবেচনায় নূতন ভাবাত্মক ও দেশের যথার্থ হিতজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মেলার সময় বিশেষ সম্মানসূচক চিহ্ন ও সাধ্যমতে অন্যপ্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইবে, যাহারা উক্ত প্রকারের কোন গ্রন্থ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পাণ্ডুলিপি যদি উক্ত সভার মনঃপূত হয় তবে তাঁহাদিগকে মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাধ্যমত অর্থ সাহায্য হইবে।'

—(দ্রঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রস্তুয়মান নূতন সংস্করণ।

ইতিপূর্বে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চে প্রকাশিত 'চৈত্র মেলার বিজ্ঞাপন' নামে আরও একটি বিজ্ঞাপনে ১০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ন্যাশনাল প্রেসে ২০শে চৈত্রের মধ্যে লেখা প্রেরণের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। পূর্বোক্ত দুটি বিজ্ঞপ্তি থেকে বোঝা যায় যে, হিন্দুমেলার কর্মকর্তাগণ স্বদেশীয় লেখকদের উৎসাহ দান ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে জাতীয় ভাব প্রচারের কাজে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। বর্তমানে আমরা গ্রন্থ মেলার উপযোগিতার কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলে থাকি। দীর্ঘ শতবর্ষ পূর্বে হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাগণ 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক' গ্রন্থমেলার যে আয়োজন করেছিলেন তা তাঁদের দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সপ্তম অধিবেশনের গ্রন্থমেলা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় উল্লেখ করেছেন :

'এবারকার পুস্তক-প্রদর্শনীটি বড়ই উত্তম হইয়াছিল। কবিতা, ইতিহাস, উপন্যাস, সাধারণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত বাংলা বহু পুস্তক গ্রন্থকারগণ প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।'

—দ্রঃ 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রস্তুয়মান নূতন সংস্করণ।

হিন্দুমেলার সাহিত্য আলোচনার সভায় কয়েকটি বিতর্কমূলক এবং সারগর্ভ মৌলিকচিন্তাসঞ্জাত রচনা পঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক নিবন্ধ, চতুর্দশ অধিবেশনে পদ্মনাভ ঘোষালের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা' সংক্রান্ত বক্তৃতা এবং তৎকালীন মহিলা পণ্ডিত বিদুষী রমাবাই'র ভাষণ। পদ্মনাভ ঘোষালের প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা'র একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। রমাবাই'র বক্তৃতা সম্পর্কে সমকালীন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল :

'বিখ্যাত বিদুষী রমাবাই ভারতীয় ভাষা শিক্ষা আবশ্যক, হিন্দু ললনাদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য এবং পুরাকালে আর্য নারীদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে দর্শকমাত্রেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ দান করেন।'

'বীরাঙ্গনা' ও 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের মধ্যে দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যে নারী-জাগরণের সূত্রপাত করেছিলেন রমাবাই'র বক্তৃতায় সেই স্বাধিকার সচেতন নারীর ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তৎকালীন বাংলার জাতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রমাবাই'র বক্তৃতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

হিন্দুমেলার দ্বিতীয় শাখা ছিল 'কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী'। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'এই হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে নাও হয়, সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশন পত্তন করিল।'

---দ্রঃ জ্যোতি স্মৃতি।

জাতীয় মেলায় দেশীয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে এ উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে।

পূর্বোদ্ধৃত হিন্দুমেলার বিজ্ঞপ্তিগুলির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর জন্য উপকরণ প্রদানের আহ্বানও জানান হত। প্রদর্শনীতে প্রেরিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের অধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হত। এই পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় মেলার উদ্যোক্তাগণ দেশীয় কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন আজকের যুগে সে কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আয়োজনের উপকরণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

তিনি লিখেছেন, নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর কারু ও চারুশিল্প প্রদর্শিত হয় :—

শিল্প—(১) স্ত্রীলোকদিগের সূচি-নির্মিত পশমের ও পুঁতির কার্য, (২) ছাঁচ ও খয়েরের গঠন, (৩) জামা, চাপকান, রুমাল, পেশোয়াজ, উড়না, সাটী ইত্যাদি, (৪) কুম্ভকারদিগের নির্মিত নানাবিধ ফল, (৫) নদীয়ার

বাজার, (৬) নানাপ্রকার পুতুল, (৭) চিত্র, (৮) বারাণসী কাপড়, (৯) চীনদেশীয় নানাপ্রকার রেশমী কাপড়, (১০) ঢাকাই স্বর্ণকারদিগের নানা প্রকার রূপা ও সোনার গঠন, (১১) নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, (১২) নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, (১৩) ফোয়ারা, (১৪) ভাস্করীয় প্রতিমূর্তি।

উদ্ভিজাদি—ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ, কৃষি ও শিল্পকারক যন্ত্রাদি—লাঙ্গল, চরকা ও তাঁত।'

—দ্রঃ 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' : প্রদ্যুম্মান নূতন সংস্করণ। (শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল)

প্রদর্শনীর যে তালিকা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে তা কেবলমাত্র একটি বিশেষ বর্ষের। প্রতিবৎসরেই শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীতে বিপুল পরিমাণে বৈচিত্র্য-পূর্ণ দেশীয় সামগ্রী প্রদর্শিত হত। সূচিশিল্পে তৎকালীন সমাজের বিখ্যাত পরিবারের মহিলারাও অংশগ্রহণ করতেন। দেশীয় বাদ্য যন্ত্রাদি প্রদর্শনও মেলার অন্যতম প্রদর্শনীয় উপকরণ হিসাবে সংগৃহীত হত। পঞ্চম অধিবেশন সম্পর্কিত প্রতিবেদনে একটি সংবাদ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'তানপুরা, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বড় বড় এদেশের তারের যন্ত্রগুলি এত মস্ত দেখিলে 'বাপ' করিয়া উঠিতে হয়। (দ্রঃ পূর্ববৎ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললিতকলাবিভাগীয় ছাত্রগণ চিত্রাঙ্কন ও ভাস্করীয় মূর্তি প্রদর্শনীতে অংশ নিতেন। পুতুল প্রদর্শনের বিষয়ে হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের কাছে তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকায় (১৮৭৩, ২০শে ফেব্রুয়ারী) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, 'তিনি (নবগোপাল) যদি বারওয়ারির সং কি দেবদেবীর উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে না চান, তবে এক কাজ করিতে পারেন। তিনি পুতুল দ্বারা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক দুর্দশা প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশ করিতে পারেন।' (দ্রঃ পূর্ববৎ)।

শিল্প মেলায় কয়েকটি বিশেষ দ্রব্যের প্রদর্শন হয়েছিল। সেগুলির উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে 'কতকগুলি সব-আসিস্টান্ট সর্জন' অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রসায়ন-বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় সকল প্রদর্শন করেন। পঞ্চম বার্ষিকী অধিবেশনে (১৮৭১) যশোহরের সীতানাথ ঘোষ মহাশয় নূতন ধরণের চরকা ও তাঁত প্রদর্শন করেন। দশম অধিবেশনের মেলায় সীতানাথ ঘোষ মহাশয় তাঁর কলে প্রস্তুত কাপড় প্রদর্শনীতে দেন। 'কলটি মেলায় প্রদর্শিত হয় নাই কিন্তু উক্ত কলের কাপড় দেখা গিয়াছিল।' এই বৎসরের অধিবেশনে আন্দুলের গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি অক্ষর নির্মাণের ও কাগজ প্রস্তুত করবার কল প্রদর্শন করেন। (দ্রঃ পূর্ববৎ)। একাদশ অধিবেশনে (১৮৭৭) কাপড়ের কল, দেশীয় দেশলাই, কালি এবং সাবান প্রদর্শিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখেছিলেন—

'এই হিন্দুমেলাতেই প্রথম নূতন রকমের তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল, ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছের খ্যাতনামা ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন, মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়া মহেন্দ্রবাবু তখন পটুয়াটুলি লেনে থাকিয়া একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দু-মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোকে বলে নাচিয়াছিলেন।'

—দ্রঃ বঙ্গবাণী, ১ম বর্ষ, ১৩২৯ দ্বিতীয়ার্ধ ৪র্থ-সংখ্যা।

হিন্দুমেলায় কৃষিপণ্যের সঙ্গে পুষ্প প্রদর্শনী, জীবজন্তু প্রদর্শনেরও আকর্ষণীয় আয়োজন হত। এই বিভাগেও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।

জাতীয় মেলার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল ব্যায়াম ও ক্রীড়াবিষয়ক। আলোচ্য বিভাগীয় কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ন্যাশনাল স্কুলের ও অন্যান্য ভারতীয় স্কুলের ছাত্রদের নানাবিধ ব্যায়াম-চাতুর্য প্রদর্শন, বিভিন্ন প্রদেশীয় মল্লদের কুস্তি প্রদর্শন, জীপসী (বেদে) মেয়েদের বাঁশবাজী কসরৎ, লাঠি খেলা, আগুনের মধ্যে দিয়ে যুবকের খালি পায়ে হেঁটে যাওয়া, 'বাহুদ্বয়ের মাংস পেশীর উপর লৌহ-গোলক ধারণ,' অশ্বারোহণ ও অশ্বচালনা, গঙ্গানদীতে বাইচ প্রতিযোগিতা, বন্দুক চালনা প্রভৃতি। বিশেষ করে এই বিভাগের কৃতী প্রতিযোগীদের প্রচুর পদক ও অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হত।

জাতীয় মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে শারীর-চর্চার উপযোগিতা বর্ণিত একটি কবিতা পাঠ করা হয়। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—

"বিদ্যা শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে
ব্যায়াম।
সুস্থ চিত্তে সুস্থ দেহে পাইবে
আরাম॥
কেন বঙ্গবাসীগণ এমন দুর্বল।
নীচেদের কায়শ্রম, তাই এমন॥
অন্য সব জাতিশ্রমে, সদাই আদরে।
তাই তারা নানামতে সুখ ভোগ করে॥

—দ্রঃ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

পঞ্চম অধিবেশনে (১৮৭১) তৎকালীন ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে মেলার পক্ষ থেকে ব্যায়ামচর্চায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য শ্যামাচরণ ঘোষকে পদক দ্বারা পুরস্কৃত করেন।

মেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে যশোহরের নড়াইল গ্রামের জমিদার শ্রীরাইচরণ রায়কে স্বহস্তে অন্যূন ৫ ফুট ব্যাঘ্র সম্মুখযুদ্ধে হত্যা করার 'বাঙ্গালী দুর্লভ বীরত্ব ও সাহসের জন্য হিন্দুমেলার কর্তৃপক্ষগণ স্বর্ণ মেডাল প্রদান করেন।'

দশম অধিবেশনে 'ডন কুস্তি ব্যায়াম সন্তরণ প্রভৃতিতে পটু' হাওড়ার অন্নদাপ্রসাদ মিত্র 'হিন্দুমেলা' নামাঙ্কিত পদক লাভ করেন। সম্ভবত: ইতিপূর্বে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন জে এন ব্যানার্জী) মহাশয়ও ঐ পদক লাভ করেন।

হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাগণ শিল্প-সাহিত্য-শারীরচর্চা সকল বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে এক সার্বিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে শারীরচর্চা বা ব্যায়াম শিক্ষার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ছিল অতিনিবদ্ধ। ব্যায়ামচর্চার প্রতি এই প্রীতিপক্ষপাত অহেতুক প্রমোদ লাভের জন্য ছিল না—এর ফলশ্রুতি ছিল বিস্ময়কর এবং সুদূরপ্রসারী। নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ও হিন্দুমেলার উদ্যোগে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল পূর্বোক্ত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণ মিলিতভাবে যে 'মহা-ব্যায়াম-প্রদর্শনে'র আয়োজন করেন সে সম্পর্কে জাতীয় মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা মনোমোহন বসু এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই ভাষণে শ্রীযুক্ত বসু প্রকাশ্যে ব্যায়াম চর্চার মাধ্যমেই 'স্বাধীনতা' লাভের কথা উল্লেখ করেন।

—দ্রঃ হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত : প্রস্তুয়মান সংস্করণ : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

হিন্দুমেলার উদ্যোগে ব্যায়াম-চর্চা বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকাও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—

'আমাদের দেশীয়গণ যেন মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ভুলেন না। শিল্প-বিদ্যা উন্নতির নিমিত্ত মেলা নহে, শারীরিক বল, মাংসপেশী সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত। শিল্পবিদ্যার উন্নতি এই সঙ্গে হয়ত ভালই। শারীরিক বলবৃদ্ধির জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে—শারীরিক বল যখন গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিবে, তখন মেলার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।' (দ্রঃ পূর্ববৎ)।

জাতীয় মেলার গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচীর মধ্যে ছিল অস্ত্রচালনা এবং বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা। মাসিক পাঁচটাকা বেতনে ন্যাশনাল স্কুলের পক্ষে অশ্বারোহণ শিক্ষার নূতন শ্রেণী খোলা হয়েছিল। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ডঃ সুন্দরীমোহন দাস, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ পরবর্তীকালের বিখ্যাত বহু দেশনেতা নবগোপাল মিত্রের ব্যায়াম বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চা ও অশ্বারোহণ শিক্ষা করতে যেতেন।

—দ্রঃ পূর্ববৎ এবং 'আমারবাল্যকথা': সত্যেন্দ্রনাথ।

বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রচালনা শিক্ষা বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখেছেন,—

'তখনও অস্ত্র-আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক-ছোঁড়া বা তরোয়াল-খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু-মেলার বিশিষ্ট কর্মকর্তারা পাখী শিকারের ভাণ করিয়া বন্দুক-ছোঁড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন।'

—দ্রঃ বঙ্গবাণী, ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ; ১৩২৯।

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমাবধি জাতীয় মেলার উন্নয়নে ব্যায়াম শিক্ষা ও অস্ত্র ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অমৃতবাজার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ছিলেন মেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'বাহুবল'কে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। চতুর্থ অধিবেশনের প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে অমৃতবাজার লিখেছিলেন 'লাঠি খেলায় একজনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুক ছুড়াতে একজন মরিয়াছে শুনিলে অসংখ্যগুণে সন্তুষ্ট হইতাম।'

সপ্তম অধিবেশনের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল,

'যদি কাজে লাগিবে এই উদ্দেশ্যে, লাঠি, তলোয়ার, বন্দুক, তীর প্রভৃতি শিরা করে তবে বড় ভাল হয়।'

অষ্টম অধিবেশনের প্রতিবেদনে অমৃতবাজারের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট,

'(আমরা) যখন দেখিব হিন্দু-সন্তানগণ বন্দুক-তলোয়ার প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহপূর্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পর প্রবৃত্ত হইতেছে এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আঘাতিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে কেহ আহত পদে, কেহ বা আহত হস্তে, কেহ বা আহত মস্তকে রঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন ও তদুপলক্ষে পুলিশ আসিয়া নবগোপালবাবুর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, সেইবার জানিব হিন্দু-মেলার মহৎ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে।'

হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাগণ কোথাও সুস্পষ্টভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের কোন কথা বলেন নি। কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ব্যায়ামচর্চা ও আগ্নেয় অস্ত্রাদির অনুশীলনের দ্বারা তাঁরা একটি জাতীয় প্রতিরোধবাহিনী গঠন করে তোলার বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন।

১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহ তৎকালীন বৃটিশ শাসকবর্গকে সাময়িকভাবে বিচলিত করেছিল। ব্যর্থ-বিদ্রোহের সেই অগ্নিময় প্রভাব কিন্তু তখনও অপসৃত হয়ে যায় নি। হয়ত হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের কারো কারো মনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংগুপ্ত ইচ্ছা সক্রিয় হতে চেয়েছিল। যদিও সমকালীন বাংলা দেশে স্বাধীনতা কামনার সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহকে এক করে দেখা যায় না তথাপি পূর্বোক্ত প্রমাণাদিও অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া দেখা গেছে অন্যতম কর্মী রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (শিশিরকুমার ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী), প্রমুখের জীবনচর্যার দেশাত্মবোধের একটি অগ্নিময় দিক সদা সক্রিয় ছিল।

পরবর্তীকালে এঁদেরই চেষ্টায় 'সঞ্জীবনী সভা' স্থাপিত হয়েছিল। অগ্নিমন্ত্রে শিবনাথ শাস্ত্রী স্বদেশ পূজার আয়োজন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নবগোপাল মিত্রের স্বদেশ-পূজা সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা থেকে জাতীয় মেলার শারীরচর্চা ও অস্ত্রশিক্ষা সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষ বাহুবলে ইংরেজের নিকট হটিয়া গিয়াছে, তাঁহার (নবগোপাল মিত্র)

এই ধারণা ছিল। সুতরাং ইংরাজ তাড়াইতে হইলে এই বাহুবলেরই ভজনা করিতে হইবে; ইহাই তাঁহার স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু অন্নবল ব্যতিরেকে বাহুবল লাভ সম্ভব নহে। আবার ইংরেজ আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষকে নিরন্ন ও বিবস্ত্র করিয়া তুলিয়াছে সুতরাং ইংরেজের কবল হইতে স্বদেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে না পারিলে দেশের লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে না, অন্নবস্ত্রের অভাবে অনশনে ও রোগে শীর্ণ এবং নিদারুণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া মরিবে; সুতরাং স্বজাতির বাহুবলের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে হবে—এই সকলই ব্যায়াম-চর্চা, অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা, স্বদেশের পণ্যদ্রব্যের পুনরুদ্ধার—নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের স্বদেশ পূজার মধ্য উপকরণ হইয়াছিল—'

—দ্রঃ বঙ্গবাণী ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২৯।

যুবক বিপিনচন্দ্র হিন্দুমেলার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর মত রাজনীতি-সচেতন যুবকের পক্ষে নিশ্চয়ই বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি যে জাতীয় মেলার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল। এ কথা স্বীকৃত যে জাতীয় মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা। তৎকালীন বিচারে এরূপ স্বাধীনতা কামনা স্বপ্নের বস্তু হলেও, সে স্বপ্নও যে হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাগণ সাহস করে দেখতে চেয়েছিলেন, সে যুগের বিচারে তা এক নূতন বিস্ময়। হিন্দুমেলা দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে দেশ ও জাতিকে যে অস্ত্র-দীক্ষা দিয়েছিল পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র সন্তানদলের মধ্য দিয়ে এবং সক্রিয়ভাবে বিংশ শতাব্দীতে 'সন্ত্রাসবাদী' নামে খ্যাত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ও ঋষি অরবিন্দের কর্মপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তার ফলপ্রকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছিল।

ব্যায়াম চর্চা ছাড়াও হিন্দুমেলার প্রদর্শনীতে নানা আমোদ-প্রমোদের ও দেশীয় সঙ্গীত বাদ্যবাদনের আয়োজন থাকত। ঝামাপুকুর, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর প্রভৃতি তৎকালীন বিখ্যাত স্থানের শখের বাদ্যের আয়োজন করতেন মেলার কর্তৃপক্ষ। বাঁশবাজী, ডাকাতেবাজী, ভোজবাজী, বেদেদের ভেল্কি, সাপের খেলা, ভালুক লড়াই, 'বোট কৌতুক' প্রভৃতি 'তামাসা'র ব্যবস্থা হত।

পঞ্চম বার্ষিক মেলার প্রতিবেদনে 'সুলভ সমাচারে' লেখা হয়েছিল, 'মেলাতে বিদ্যুতের আলোর অনেক তামাসাও দেখান হইয়াছিল।'

অবনীন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনীতে' (ঘরোয়া) হিন্দুমেলার প্রমোদ-সংক্রান্ত দিকটির একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। উদ্যোক্তাগণ মেলা প্রাঙ্গণে কথকতা প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের আসর বসাতেন। কোন কোন বৎসর জাতীয় নাট্যশালার পক্ষ থেকে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হত। তৃতীয় অধিবেশনে সংস্কৃত 'বেণী সংহার' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু অতিরিক্ত জনসমাগমের ফলে নাটক অভিনয় সম্পূর্ণ হতে পারেনি।

সপ্তম অধিবেশনে মেলায় জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতৃগণ 'ভারতমাতার বিলাপ' নাটকের 'মর্মস্পর্শী' অভিনয় করেন। ভারতমাতার বিলাপ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যও ছিল জাতীয় ভাবোদ্দীপন প্রচেষ্টা।

এ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'ভারতভূমির ও ভারত সন্তানদের বর্তমান দুরবস্থা প্রদর্শনই 'ভারতমাতা'র উদ্দেশ্য।'

'ভারতমাতা' নাটকে মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' এবং 'দেখ গো ভারত মাতা তোমারি সন্তান'—গান দুটি ভারতলক্ষ্মীর মুখে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

—দ্রঃ দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, '৭৪ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড: শ্রীসুকুমার সেন।

দেশাত্মবোধক জাতীয় সঙ্গীত ছাড়াও জাতীয় মেলার আসরে দেশীয় মার্গসঙ্গীতের চর্চা হত। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় মেলায় বরোদার বিখ্যাত মার্গসঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক মৌলাবক্স খাঁ-কে ভারতীয় সঙ্গীতে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। 'মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীত ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মগ্ধ করিয়াছিলেন।'

—দ্রঃ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।

জাতীয় মেলার বহুমুখী উদ্দেশ্য-প্রসূত কর্মসূচীর মতই মেলার বহিরাঙ্গিক অনুষ্ঠানও সমারোহপূর্ণ হত।

দ্বিতীয় বর্ষের বিবরণীতে লেখা হয়েছিল।

'উদ্যান প্রবেশদ্বারে নহবৎ বসিয়াছিল তথা হইতে মেলার স্থান প্রায় ২৫ বিঘা দূর হইবে। এ পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে নবপল্লবাবৃত অর্ধচন্দ্রাকার বেড়া দেওয়া হয়; উদ্যানের স্থানে স্থানে— ক'একটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছিল।'

—দ্রঃ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ ২য় সংখ্যা।

মেলার আয়োজন জনমনে যে কি বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করত তার পরিচয় পাওয়া যায় 'সংবাদ প্রভাকরের একটি প্রতিবেদনে,—

সর্বপ্রথমে বেলা সার্ধ নবমঘটিকার সময় ২১১ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হইতে মহাসমারোহে মেলাস্থলে যাত্রারম্ভ হয়। পতাকা, আশাসোঁটা এবং জাতীয় কীর্তন করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলাস্থলে গমন করেন। এতদ্দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ বাটীর গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকেন। এ দৃশ্যটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা, পত্র এবং পুষ্পাদিতে পরম রমণীয়রূপে শোভিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে হিন্দু প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হইয়াছিল।'

—দ্রঃ 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত'; প্রস্তূয়মান সংস্করণ; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

[ক্রমশ

বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে বিরাট ইতিহাস। সর্বপ্রথম এর আবিষ্কার হয় গ্রীসে—খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০-৬০০ সালে। তারা দেখে রেসিন জাতীয় একটা পদার্থকে শুকনো কাপড়ে ঘষলে এর মধ্যে এমন এক শক্তির উদ্ভব হয় যার ফলে এটা চুম্বকের মত কাগজের ছোট টুকরোকে আকর্ষণ করে। কিন্তু চুম্বকের মত এর আকর্ষণ অত জোরালো নয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এ নিয়ে জোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়। বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম গিলবার্ট (১৫৪০-১৬০৩) এ ব্যাপারে অনেকটা অগ্রসর হন। তিনি ব্যাপারটা তখনকার ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথকে জানান। রাণীর অনুরোধে তিনি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর আবিষ্কারের এক নতুন নাম দিলেন 'ইলেকট্রিসিটি'—গ্রীক শব্দ 'ইলেকট্রন' থেকে ('ইলেকট্রন'-এর অর্থ রেসিন জাতীয় একটা পদার্থ)। গিলবার্ট-এর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের এক নতুন পথের সন্ধান দিল।

তারপর এলেন বিজ্ঞানী ভন গেরিক (১৬৬৫), জিন পিকার্ড (১৬৭৫), ফ্রান্সিস হক্সবি (১৬৮৭)—তাঁরা পরীক্ষার সাহায্যে দেখালেন ঘর্ষণের সাহায্যে শুধু চুম্বক-শক্তি কেন, আলোক-শক্তি তৈরী করাও সম্ভব। তারপর স্টিফেন গ্রে (১৭২০) একটা নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন। তিনি দেখালেন কতকগুলো পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি সহজেই প্রবাহিত হতে পারে কিন্তু কতকগুলো পদার্থ আছে যেগুলো বিদ্যুৎপ্রবাহকে বাধা দেয়। তাঁর পরীক্ষাটা ছিল অদ্ভুত। তিনি তাঁর বাচ্চা চাকরটাকে কোমরে সিল্ক-এর দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেন সিলিং থেকে, তারপর একটা বৈদ্যুতিক আধান (চার্জ)-যুক্ত কাঁচের রড দিয়ে স্পর্শ করে তার সমস্ত শরীরটাকে চার্জড করে নিলেন। তারপর
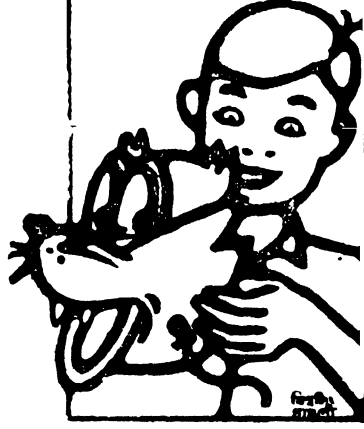
ইলেকট্রিসিটি

আস্তে করে তিনি তার শরীরটা স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত অনুভূতি তাঁর সমস্ত শরীরে খেলে গেল। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, মানুষের শরীরটাও হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহী।

বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কার হয় বিদ্যুৎশক্তিকে কিভাবে একটা আবদ্ধপাত্রে ধরে রাখা যায়। এর থেকেই জন্ম নেয় 'কনডেনসার'—যার ব্যবহার আজ দিকে-দিকে। ১৭৪৫ সালে এওয়াল্ড জর্জ নামে জনৈক পাদরী—তিনি একহাতে একটা কাচের শিশিকে ধরে আর একহাতে একটা সরু লোহার শলাকার সাহায্যে পাত্রটিকে বিদ্যুৎ আধানে (চার্জ) পূর্ণ করতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সরু শলাকাটি তাঁর শরীর স্পর্শ করে যায়—আর সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সমস্ত দেহে একটা অদ্ভুত অনুভূতি খেলে যায়।

এই সাধারণ ব্যাপারটাকে তিনি কিন্তু উপেক্ষা করেন নি—গবেষণা আরম্ভ করলেন কেন এমনটি হোল। দিনের পর দিন চলল তাঁর সাধনা—এর থেকেই জন্ম হল আজকের 'কনডেনসার।'

এরপর এলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তাঁর ঘুড়ি ওড়ানোর গল্প কে না জানে। তিনি তখন যুবক—থাকতেন আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায়। একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লেখেন এবং সেখানে দেখা যায় তিনি লিখেছেন যে আকাশে যে বিদ্যুতের ঝলক আমরা দেখি সেটাও এই একই বিদ্যুৎ।

তাঁর এই মন্তব্য চারদিকে যেন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখন একজন ফরাসী বিজ্ঞানী এলিবার্ড এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করলেন। একটা লম্বা লোহার দণ্ডকে লম্বাভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন—নীচের দিকটা রইল মাটি থেকে অনেক উপরে। তিনি দেখলেন ফ্রাঙ্কলিনের মন্তব্য ঠিকই—তিনি সহজেই আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন।

ফ্রাঙ্কলিন এসব পরীক্ষার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি একদিন ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলেন, আকাশে তখন ঘন মেঘ আর মাঝে মাঝেই বজ্রপাতের শব্দ। হঠাৎ সেই ভিজে সূতোয় তিনি একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করলেন—ব্যস্, তাঁর সমস্ত সন্দেহের নিরসন হল। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন তাঁর নব আবিষ্কার। এটা ছিল ১৭৫২ সালের জুন মাস।

এর ঠিক এক বছর পরেই ১৭৫৩ সালে সেণ্ট পিটার্সবার্গের বিজ্ঞানী জর্জ রিচম্যান ফ্রাঙ্কলিনের এই পরীক্ষাটি করতে গিয়ে তড়িতাহত হয়ে মারা যান।

ফ্রাঙ্কলিনের এই আবিষ্কার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ আরম্ভ হয় ১৭৫৩ সাল থেকে। তখন বড় বড় বাড়ীগুলোর ওপরে 'লাইটনিং কণ্ডাক্টার' বসতে সুরু করে—তখন একে বলা হোত 'ফ্রাঙ্কলিনের দণ্ড'—(ফ্রাঙ্কলিনের রড)—

বিদ্যুৎ-শক্তিকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে

আনলেন বিজ্ঞানী প্রিস্টলি (১৭৬৭), কুলম্ব (১৭৮৫) ও হেনরী ক্যাভেন-ডিস (১৭৩১-১৮১০)। এঁরাই হলেন আধুনিক 'ইলেকট্রনিক' মতবাদের স্রষ্টা। দুই ভিন্নধর্মী বিদ্যুৎ—পজিটিভ আর নেগেটিভ, এদের পারস্পরিক আকর্ষণ বলের---পরিমাপ, এদের প্রকৃতি, সব কিছুই আমরা পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে।

এতদিন চলছিল স্থির বিদ্যুৎ--অর্থাৎ 'স্ট্যাটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি' নিয়ে কারবার। বিজ্ঞানের আকাশে দেখা দিল আবার এক উজ্জ্বল তারকা। তিনি হলেন ইটালীর কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যালভানি (১৭৮৬)। 'ব্যাঙ নাচানো অধ্যাপক' হিসাবে সবাই তাঁকে চেনে। ডাক্তারের পরামর্শমত তিনি নাকি ব্যাঙ-এর ঠ্যাং সিদ্ধ করে তার ঝোল খেতেন। অধ্যাপক একদিন একটা মরা ব্যাঙ লবণ জলে ভিজিয়ে তার বারান্দায় একটা হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আর নীচে ছিল রেলিং। অধ্যাপক লক্ষ্য করলেন বাতাসে দুলতে দুলতে ব্যাঙের শরীরটা যখন রেলিংকে স্পর্শ করছে তখনই শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

তিনি শুরু করলেন গবেষণা—কেন এমন হচ্ছে? এ থেকেই আবিষ্কার হোল চলমান বিদ্যুৎ, অর্থাৎ কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি যাকে বলা যেতে পারে আধুনিক সভ্যতার চাবিকাঠি।

তার পর এলেন ভোল্টা (১৭৪৫—১৮২৭)। দুটো আলাদা ধাতব চাকতির মাঝখানে একটুকরো ভিজে কাপড় বসিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে অতি সহজেই বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এর থেকেই তিনি আবিষ্কার করেন তড়িৎ-কোষ। তড়িৎ-কোষ আবিষ্কারে বিদ্যুৎ শক্তিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা অধিকতর সোজা হয়ে গেল। তারপর আবিষ্কার হয় 'তড়িৎ-বিশ্লেষণ' পদ্ধতি।

১৮০৩ সালে জোহান রিটার আবিষ্কার করেন 'সঞ্চয়ক-কোষ'-অর্থাৎ স্টোরেজ ব্যাটারি যদিও এর বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৮৫৯ সালের পর থেকে।

চুম্বকের ওপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাব প্রথম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী ওরস্টেড (১৮২০)। তাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এর পরই বিজ্ঞানজগতে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। আবিষ্কার হোল বৈদ্যুতিক চুম্বক, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক বালব। এলেন বিজ্ঞানী এ্যামপিয়ার (১৭৭৫—১৮৩৬), ফ্রেডরিচ গস্ (১৭৭৭—১৮৫৫), বিজ্ঞানী ওহম (১৭৮৭—১৮৫৪) প্রমুখ। বিজ্ঞানাকাশে এঁরা সবাই এক একটি উজ্জ্বল তারকা।

তারপর এলেন মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁর আবিষ্কার চুম্বকীয় আবেশ (১৮৩১) বিজ্ঞানজগতের আরেকটি বিস্ময়। এ থেকেই জন্ম নিল বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো—আরো শতসহস্র যন্ত্রপাতি।

'ইলেকট্রন' আবিষ্কার করেন ১৮৯৫ সালে জন থমসন্, সেই বছরেই অধ্যাপক রনজেন্ আবিষ্কার করেন এক্স-রে।

তারপর বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড, থমসন্, বোর এঁরা দিয়ে গেলেন তাঁদের ইলেকট্রনিক মতবাদ যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আজকের বিজ্ঞান-জগৎ। 'বিদ্যুৎ' আবিষ্কার না হ'লে মানব-সভ্যতা যে কতখানি পিছিয়ে থাকত সেটা কল্পনা করাই শক্ত।

নাকের বদলে

নগদ নয়, দস্তুরমত ধন-দৌলত, মান-যশ, সব পেয়েছিল কোরিয়ার এক চতুর শয়তান।

কেমন করে, তাই বলছি।

ই-চিন হো একজন রাজনীতিবিদ—সচরাচর এঁরা সবদেশে যেমন কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকেন, ই-চিনও তদ্রুপই ছিল। কিন্তু শাসনকর্তার বিষ-নজরে পড়ে সে জেল খাটছিল। সকল রাজকর্মচারীর মত ই-চিনও ঘুষ খেতো, কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তার ফাঁসীর হুকুম হয়। তাই সে জেলে।

ই-চিন জেলে বসে খালি ভাবে আর ভাবে কি করে মুক্তি পাওয়া যায়, সোজা কথা তো নয়, নগদ একলাখ টাকা রাজা তার কাছে পান এবং সে জানে যে এ টাকাটা দিয়ে দিতে পারলেই তার মুক্তি। কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে? তাই সে বসে বসে ভাবে, কেমন করে টাকাটা জোগাড় করা যায়। ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে ওঠে, মাথায় জল ঢালতে হয়।

শ্রীসুবীরকুমার চৌধুরী

অবশেষে সে এক মতলব বার করল। একজন জেলরক্ষককে টাকা দিয়ে বশ করে সে একদিন বেরিয়ে পড়ল চুপিচুপি। জেলরক্ষক-এর সঙ্গে তার চুক্তি হ'ল যে ঠিক একমাস পরে সে আবার ফিরে আসবে—সফল হোক বা না হোক।

ই-চিন জেল থেকে বেরিয়ে আনন্দে গান করতে করতে এক নির্জন বনের ধারে গিয়ে বসল। একটুকরো কাগজে গভীর মনোযোগসহকারে সে একটি নাকের ছবি আঁকল। আহা, সে কী নাক! তিলফুলের মত তার ডগা, বাঁশীর মত তার দেহ, আবার সে নাকের গায়ে একটি ছোট্ট আঁচিল। সারা কোরিয়ায় এমন নাক কেউ কখনো দেখে নি!

কোত্থেকে সে এ নাক পেল? এখন, হয়েছে কি, ই-চিন যখন রাজ-কর্মচারী ছিল, তখন সে একবার ভারত-বর্ষে রাজদূত হয়ে এসেছিল এবং সেখানে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়। তার নাক মনে পড়ে যাওয়াতেই ই-চিন অমন নাকের ছবি এঁকেছিল।

ওই যে ভারতীয় ব্যবসায়ী, সে তখন কোরিয়ায় এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করছিল এবং মোটা মুনাফা লুটছিল।

ই-চিন নাকের ছবি আঁকে আর গুন্‌গুন্ করে গান করে। অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে তার ছবি আঁকা শেষ হ'ল এবং সে রাজধানী ছেড়ে সুদূর পূর্ব-উপকূলের দিকে যাত্রা করল।

হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেই যে ঘুষখোর কারারক্ষী!—তাকে আরো কিছু টাকা দিয়ে সম্রাটের নামের সীলমোহর লাগিয়ে নিল নাকের ছবিটার ওপর ই-চিন।

ই-চিন চলেছে তো চলেইছে—কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-উপবন, কত মহাসমুদ্র পেরিয়ে অবশেষে সে পূব দেশে পৌঁছল।

কপালের ঘাম মুছে ই-চিন পোঁটলা থেকে জমকাল পোষাক বার করে রাখল। তার পর স্নান সেরে সেই সব কাপড় পরে, তিনগাছা দাড়ি আর দেড়গাছা গোঁফে তা'দিতে দিতে গম্ভীর চালে গিয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীর দরজায় সজোরে ঘা দিল।

তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। চাকররা সব বসে গুলতানী করছে সদর বন্ধ করে। হঠাৎ দরজায় এত জোরে ঘা শুনে তারা তো ভড়কে গেল। ব্যাপার কি? ডাকাত পড়ল না কি?

ভয়ে ভয়ে তারা দরজা ফাঁক করে মাত্র একজন লোক দেখে আশ্বস্ত হ'ল এবং দরজা খুলে দিল।

ঘরে ঢুকেই ভুরু কুঁচকে ধমক দিয়ে ই-চিন বলল—তোমাদের মনিব কোথায়? রাজার কাছ থেকে আসছি আমি---ডাক তাকে।

ভয়ে ভয়ে চাকরেরা বুড়ো মনিবের ছেলেকে ডেকে দিল।

তাকে দেখেই ই-চিন গাড়ম্বরে বলল, আমি সম্রাটের কাছ থেকে আসছি।

এ কথা শুনেই তো বেচারার চক্ষুস্থির। সম্রাটের কাছ থেকে? সর্বনাশ। তার মানে, হয় টাকা না হয় কোতল—আর কি দরকার থাকতে পারে তার মত লোকের সঙ্গে সমাটের?

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বেচারা বলল, স—স—ম্রাট? মহানুভব সম্রাটের আমার মত দীনহীন ভিক্ষুককে কি দরকার?—তা, আসুন, বিশ্রাম করুন। তারপর, সুস্থ হয়ে কথাবার্তা বলা যাবে—হেঁ, হেঁ, হেঁ!

গম্ভীর গলায় ই-চিন বলল, সম্রাটের কাজে দেরী চলে না। শোন! আমাদের মহামহিম সম্রাটের অত্যন্ত অসুখ। কত বৈদ্য এল, কত বৈদ্য গেল—কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারলো না। —অবশেষে এল এক ভিনদেশী বৈদ্য। সে বলল যে এই ছবির মত নাক একটি জোগাড় হলে সম্রাটের রোগ সারবে —না হলে নয়। দেখ ছবি!

বলেই সে ছবি এগিয়ে ধরল।

দেখে তো ছোকরার আত্মারাম খাঁচাছাড়া!—এ যে হুবহু তার পিতার নাক!—সর্বনাশ! আমতা আমতা করে বলল,—তা,—তা আ—আ—মার কাছে কেন? আমি চোদ্দপুরুষেও এমনধারা নাক দেখিনি!

তোমার বাবাকে নিয়ে এস, হুঙ্কার ছাড়ল ই-চিন।

আ—আজ্ঞে, বাবা ঘুমোচ্ছেন।

কেন বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ? তুমি জান যে এ তোমার বাবার নাক। নিয়ে এস তাঁকে, এককোপে নাকটা কেটে নিয়ে যাই। সম্রাটের কাজে লাগবে, তাতেও আপত্তি?

হুজুর, দয়া করুন!—এ হতে পারে না! ওরে বাপরে, নাক কাটা যাবে—তা' হলে আর মান-সম্মানের রইল কি?—দয়া করে রিপোর্ট করুন যে আপনি ও নাক দেখেন নি?

কী! এত বড় স্পর্ধা! সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে শেষকালে মিথ্যে বলব? না, তা হবে না!—তা' হলে আমার প্রাণ যাবে!

ছোকরা চতুর, ব্যবসা করে খায় তো। চট্ করে বুঝে নিল ব্যাপারটা। বলল, আজ্ঞে আপনার প্রাণের দাম কত?

হেঁ, হেঁ—মানে বুঝছ তো? সহজ কথা নয়—সম্রাটের ব্যাপার! তা' তোমার পিতৃভক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপাতত দশ লক্ষ টাকা হলেই চলবে।

মুখ ব্যাজার করে তাতেই রাজী হল ছোকরা। কেন না তা' ছাড়া উপায় ছিল না আর।

দশ লাখ টাকা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে ই-চিন বলল, সাবধান, এ কথা যেন কাক-পক্ষীও টের না পায়। তা' হলে সম্রাট অন্য লোক পাঠাবেন এবং সে আমার মত দয়ালু না-ও হতে পারে।

রামচন্দ্র! তা' কি বলি?—তা' হলে আপনি আসুন, নমস্কার!

ই-চিন কি আর সেখানে দাঁড়ায়? চট্‌পট্ রাজধানীতে ফিরে সে আগে রাজপ্রাপ্য পরিশোধ করল।

তারপর? তারপর আর কি-ই বা বলার রইল?

মুসাফির

শিবানী দেববর্মণ

মন ছেড়ে মনে, বন ছেড়ে বনে
অজানাকে জানার অন্বেষণে—
আমি বাসা ছেড়ে বাসা বাঁধি
হাসি কিম্বা কাঁদি:
মেঘের আড়ালে
হাত বাড়ালে
হয়তো আলোর স্পর্শ পাই,
এ জীবনের রোশনাই
মাটিকে প্রতিবিম্বিত করে
একফোঁটা অশ্রুকণার স্বাক্ষরে।
বাতাস কানে কানে গান গায়
চল শুধু চল, চল দু'পায়।
আকাশ হাতছানি মারে
এসো, আমার এ অসীম-ধারে।
আঁধার বলে:
মন যেন না টলে!
লতাপাতা গাছপালা
এরাও আমার আকণ্ঠমালা।
আমাকে বরণ করে:
নেশার সুরাপানে মাটির অম্বরে।

আপ্টন সিনক্লেয়ার

শ্রীঅরুণকুমার সেনগুপ্ত

আপটন সিনক্লেয়ার আমেরিকার বাল্টিমোর শহরে ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সিনক্লেয়ারের বাবা মদ বিক্রি করতেন। বাবা মদ খেতেন, সিনক্লেয়ার মদকে ঘৃণা করতেন। পনের বছর বয়স থেকেই সিনক্লেয়ার লিখতে সুরু করেন। তিনি প্রথমে ছোট ছোট পত্রিকায় গল্প-উপন্যাস লেখেন। তাঁর কিছু আয় হতে লাগল। এই আয়ের ফলে তিনি নিউইয়র্ক শহরের কলেজে ভর্তি হতে পারলেন। সিনক্লেয়ার কলেজে পড়তে পড়তে বেহালা শিখতে লাগলেন। এমন দিনও গেছে তিনি দিনে দশ ঘণ্টা বেহালা বাজিয়েছেন। সিনক্লেয়ার উনিশ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন।

১৮৯৮ সালে সিনক্লেয়ার ঠিক করলেন, তিনি বড় উপন্যাস লিখবেন। ১৯০১ সালে তিনি লিখলেন 'কিং মিডাস।' ১৯০৩ সালে তিনি লিখলেন 'প্রিন্স হেগেন।' ১৯০৪ সালে তিনি লিখলেন 'মানাসাস।' ১৯০৬ সালে সিনক্লেয়ার লিখলেন 'এ ক্যাপটেনস ইণ্ডাস্ট্রি।' পর পর চারখানা বই লিখলেন বটে, কিন্তু সিনক্লেয়ার বেশী অর্থ পেলেন না। সিনক্লেয়ার কুড়ি বছর বয়স থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত খুব কষ্ট করেছেন। এমন দিনও গেছে তাঁকে না খেয়ে থাকতে হয়েছে।

সিনক্লেয়ার কিন্তু এতে দমে যান নি, নিরাশ হন নি, কলম থামান নি। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, কি করে আরো ভাল উপন্যাস লেখা যায়, কি করে আরো বিখ্যাত হওয়া যায়। তাঁর চেষ্টা সফল হল। ১৯০৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই দি জাঙ্গল (অরণ্য) প্রকাশিত হল। সিনক্লেয়ার 'জাঙ্গল' উপন্যাসটি লিখে খুব কম সময়ের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। বইটা হু-হু করে বিক্রি হতে লাগল। 'জাঙ্গল' বইটি লিখে তিনি কয়েক লক্ষ ডলার উপার্জন করেছেন। তিনি এই অর্থের বেশীরভাগই গরীবদের বিলিয়ে দিয়েছেন।

সিনক্লেয়ারের আর একখানা বিখ্যাত উপন্যাস 'অয়েল'। এই বইটি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। একশ'র বেশী বই তিনি লিখেছেন। তিনি পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন। সিনক্লেয়ারের লেখা পঞ্চাশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আমেরিকার এই নামকরা সাহিত্যিক আপ্টন সিনক্লেয়ার ১৯৬৮ সালের ২৪শে নভেম্বর ৯০ বছর বয়সে পরলোকগমন করলেন।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় মুক্ত আকাশের তলায় হাতী

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়
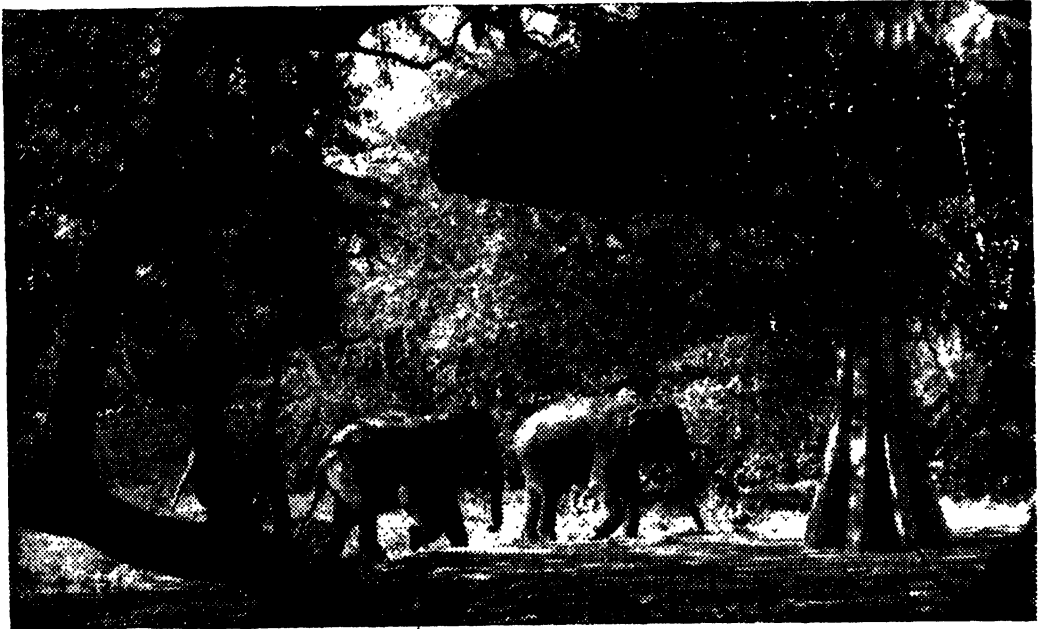
বাগবাজারে গোপাল মল্লিক লেনে যখন পৌঁছলাম তখনও দুপুর হয় নি। পৌষের অনুজ্জ্বল নিস্তেজ রোদ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। শীতের হাওয়া বইছে এলোমেলো—কখনও উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনও পুবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি।

সেই পুরনো ভাঙাচোরা একতলা বাড়িটার সামনে শিশির মুখুটির ভায়রাভাই রাধামোহন দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে বলে উঠল, 'আসুন—আসুন—'

আমার খুব খারাপ লাগছিল। দশ বছরের বাচ্চা ছেলেটাও জানে, মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। এই অমোঘ নিদারুণ পরিণামকে এড়াবার কোন উপায় নেই। মৃত্যু যেদিনই আসুক যখনই আসুক—সে এক পরম শোকাবহ ঘটনা। যে শূন্যতা সে রেখে যায় তা কখনও পূরণ হবার নয়।

তব পরিণত বয়েসের মৃত্যুতে কিছু সান্ত্বনা আছে। কেন না দীর্ঘকাল পৃথিবীর সুখ-দুঃখ আলো-বাতাস ভোগ করে সব কর্তব্য পালনের পর যে মানুষটি যায় সে জীবনের একটি বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে যায়। কোন দায়িত্বই সে কারো জন্য ফেলে রেখে যায় না, কোন সাধ অপূর্ণ রেখে যায় না। নিজের সব ভার নিজেই বহন করে, বহুদিন এই বসুন্ধরার অসংখ্য ভাল-মন্দ আনন্দ-যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটি পড়ে তখন মৃত্যুই তার কাছে একমাত্র কাম্যবস্তু। জীবনের ওপর পূর্ণচ্ছেদ পড়াই তখন প্রয়োজন।

কিন্তু শিশির মুখুটির স্ত্রীর মৃত্যু পরিণত বয়েসের মৃত্যু নয়। এ-মৃত্যু কোনদিক থেকে বাঞ্ছিতও নয়। নিতান্ত অসময়ে, যখন তাঁর অসংখ্য দায়িত্ব অনেক কর্তব্য—ভদ্রমহিলা নিজের জীবনে নিজেই সমাপ্তি টেনে দিয়েছেন।

আমার খুব খারাপ লাগছিল, গাঢ় গভীর বিষাদ বুকের ভেতর যেন অনড় হয়ে আছে। শ্বাস টানতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল।

রাধামোহন আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। সমস্ত বাড়িটি শোকাচ্ছন্ন, বিমর্ষ। চাতালের একধারে কাপড় টাঙিয়ে তার তলায় শ্রাদ্ধের আসর বসেছে। শিশির মুখুটির বড় ছেলে গোপাল ন্যাড়া মাথায় নতুন কাপড় পরে চাদর গায়ে পুরোহিতের মুখোমুখি বসে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। কত আর বয়েস হবে ছেলেটির? বারো-তের'র বেশী না। তার পাশে তার ছোট ভাই। এর বয়েস আরো কম; আট-নয়ের মতো। ছোট ছেলেটারও মাথা ন্যাড়া, পরনে নতুন কাপড়-চাদর।

দৃশ্যটি এত করুণ এত মর্মান্তিক যে দেখতে দেখতে কখন আমার চোখ জলে ভরে গেছে, নিজেই জানি না।

রাধামোহন আমাকে নিয়ে বারান্দায় একটি চেয়ারে বসাল। আরো কিছু লোক ইতস্তত বারান্দায় বসে আছে। তাদের কারোকে কারোকে চিনি, তবে বেশির ভাগই অচেনা। খুব সম্ভব শিশির মুখুটির আত্মীয়-স্বজন হবে; শ্রাদ্ধের ব্যাপারে এসেছে।

আজ এ-বাড়ি আসার পর শিশির মুখুটির সঙ্গে দেখা হয় নি। রাধামোহন আমাকে বসিয়ে চলে যাচ্ছিল।

শুধোলাম, 'শিশিরবাবু কোথায়?'

রাধামোহন বলল, 'দাদা বাজারে গেছেন।'

'অনেকক্ষণ?'

'না। আপনি আসার একটু আগে বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে না; এখুনি এসে পড়বেন।'

আমি আর কিছু বললাম না।

রাধামোহন বলল, 'ছাদে রান্না চেপেছে। যাই, ওদিকটা একবার দেখে আসি। আপনি বসুন ভাই।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'আচ্ছা—'

রাধামোহন চলে যাবার পর খানিকটা সময় কেটেছে। আশেপাশে যারা বসে আছে তাদের সবাই প্রায় চুপচাপ। দু-একজন চাপা নীচু গলায় এক-আধটা কথা বলছে। কী বলছে বুঝতে পারছি না। ছাদ থেকে রান্নার আওয়াজ এবং গন্ধ ভেসে আসছিল। সব গন্ধ আর শব্দ ছাপিয়ে পুরোহিতের

বিচিত্র সুরের একটানা যন্ত্রণা শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত পরিবেশটাই এমন শোকাবহ এবং বিষণ্ণ যে ধীরে ধীরে আমার স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে আনতে লাগল। অভিভূতের মতন আমি বসে থাকলাম।

কতক্ষণ বসেছিলাম, মনে নেই। হঠাৎ ফোঁপানির আওয়াজ কানে এল। ঈষৎ চকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলাম আমি যেখানে বসে আছি তার পাশেই একখানা ঘর; ঘরটার একধারে দরজার কাছ ঘেঁষে সেই মেয়েটি বসে আছে যার নাম মালতী। দুই হাঁটুর মাঝখানে ঘাড় ভেঙে মাথাটা কাত হয়ে আছে। চোখমুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না; সেগুলো এলোমেলো চুলে ঢাকা। শরীরটা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে।

মালতীর দিকে কারো লক্ষ্য নেই। সবাই নানা কাজে ব্যস্ত; কিংবা এমনই শোকার্ত হয়ে আছে যে, অন্য কারো কথা এদের মনে পড়ছে না।

হঠাৎ অপার মমতায় আর সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গেল। নিজের অজান্তে কখন উঠে পড়েছি আর কখন যে মালতীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, জানি না।

আমি যে এসেছি, মালতী টেরও পায় নি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কান্নার শব্দ শুনলাম, তারপর একসময় খুব আস্তে কোমল সহানুভূতির স্বরে ডাকলাম, 'মালতী—'

মালতী বোধ হয় শুনতে পেল না। অনুচ্চ স্বরে ফুলে ফুলে সমানে কেঁদে যেতে লাগল।

আমি আবার ডাকলাম।

এবার মুখ তুলল মালতী। এলোমেলো আলুথালু চুলের ওপারে তার চোখদুটি ফোলা ফোলা, রক্তাভ, গালের ওপর দিয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে।

বিহ্বলের মতন আমার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে থাকল মালতী।

পূর্ব-বাঙলা থেকে আসার সময় ইস্ট বেঙ্গল মেলে দু-একটার বেশী কথা হয় নি মালতীর সঙ্গে। কলকাতায় এসে বার-দুই দেখা হয়েছে। তখনও কেউ কথা বলি নি।

হঠাৎ আজ আমাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পরম শোকের ভেতরেও মালতী যেন অবাকই হয়ে গেছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সে; গলায় স্বর ফুটল না; ঠোঁট দুটো থরথর করল শুধু।

আমি বললাম, 'কেঁদো না মালতী, কেঁদো না—'

বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝরঝর করে কাঁদতে শুরু করল মালতী।

আমি আবার বললাম, 'অত ভেঙে পড়লে কী করে চলবে? বাপ-মা চিরকাল তো সবার থাকে না—বলেই টের পেলাম, কথাগুলো বড় সাজানো এবং যুগ-যুগান্ত ধরে শোকের মুহূর্তে এগুলো সবাই সবাইকে বলে আসছে। ব্যবহারে ব্যবহারে কথাগুলো জীর্ণ মলিন অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে। তাছাড়া আমার যা বয়েস সেই তুলনায় সান্ত্বনার এই বাক্যগুলো খুবই বেমানান।

ভাঙাভাঙা কান্না জড়ানো গলায় মালতী বলল, 'মা যদি অসুখ করে মরত, বুঝতাম। তা না, গলায় দড়ি দিল—'

আমি কি বলব, ভেবে পেলাম না।

মালতী আবার বলল, 'মা নেই। আমাদের যে কি হবে, কে আমাদের দেখবে—

আমি বলতে চাই নি, আমার মুখে মানায়ও না। তবু আমাকে দিয়ে কেউ যেন বলিয়ে দিল, 'তোমার এখন অনেক দায়িত্ব মালতী। ছোট ভাই দুটো, বাবা—সবাইকে তোমায় দেখতে হবে। মায়ের জায়গাটা তোমাকেই নিতে হবে। এ সময় নিজেই যদি ভেঙে পড়, তোমাদের সংসার যে নষ্ট হয়ে যাবে।'

এতক্ষণ চাপা নীচু গলায় কাঁদছিল মালতী। জোরে জোরে মাথা নেড়ে, চুল আরো আলুথালু করে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে শুরু করল। সহানুভূতির সামান্য একটু ছোঁয়ায় তার অবরুদ্ধ কান্না উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জড়ানো জড়ানো গলায় বলল, 'পারছি না, কিছুতেই পারছি না। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

একবার ইচ্ছা হল, হাঁটু মুড়ে বসে মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে মালতীর কান্না থামাই। পরক্ষণেই আমার বুকের ভেতর থেকে কেউ যেন ফিসফিসিয়ে বলল, তেইশ বছরের একটি যুবকের পক্ষে প্রায়-অচেনা এক তরুণীকে সান্ত্বনা দেবার রীতি এ নয়।

বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করব যখন ভাবছি সেই সময় শিশির মুখুটির গলা শুনতে পেলাম, 'চিরঞ্জীব বাবু—'

তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাতেই দরজার ঠিক বাইরে ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। তাঁর হাতে জিনিসপত্তরে বোঝাই একটা থলে। চোখাচোখি হতেই শিশির মুখুটি আবার বললেন, 'কখন এসেছেন?'

'এই খানিকক্ষণ। এসে শুনলাম, আপনি বাজারে গেছেন।'

'হ্যাঁ, ক'টা জিনিসের দরকার হয়ে পড়ল। তাই—'

কথা বলছিলাম ঠিকই। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্যও করছিলাম। শিশির মুখুটির চোখমুখ ফোলা আছে অর্থাৎ শোকের চিহ্নটি তাঁর গোপন নেই। স্ত্রীর এই পারলৌকিক কাজের দিনে সবার সামনে না হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ালে কেঁদেছেন।

একটু নীরবতা।

আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে মালতী কেঁদেই যাচ্ছিল, আষাঢ়ের বর্ষার মতন একটানা যতিহীন কান্না।

আমি বললাম, 'আমি আসা থেকেই দেখছি, মালতী খুব কাঁদছে।'

আবছা গলায় শিশির মুখুটি বললেন, 'কাঁদবেই তো।' বলতে বলতে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতের পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলেন তিনি।

আমি আবার বললাম, 'মালতীকে কাঁদতে দেখে ওর কাছে এসেছিলাম।'

আমার বলার ভেতর কৈফিয়তের ভঙ্গি ছিল। শিশির মুখুটি বললেন, 'বেশ করেছেন। ওকে একটু বোঝান, এত ভেঙে পড়লে চলবে না। ওর মাথায় এখন অনেক দায়, অনেক কর্তব্য।'

'বোঝাচ্ছি তো। কিন্তু—'

'কী?'

'শুনছে না। খালি কাঁদছে।'

খানিক চুপ করে থেকে শিশির মুখুটি বললেন, 'ভাল করে বোঝান, আমি একটু ওদিকে যাচ্ছি।'

●

বেশ কিছুক্ষণ হল শিশির মুখুটি চলে গেছেন; তারপরেও আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটানা মন্ত্রপাঠ আর মালতীর কান্না আমার কানে অবিরাম আঘাত দিয়ে যেতে লাগল।

কখন একসময় মালতীর পাশে বসে পড়েছি, নিজেই জানি না। কখন তার মাথায় হাত রেখেছি তাই বা কে বলবে।

কান্নার ভেতরেই চমকে আবার মুখ তুলল মালতী। গভীর স্নেহের সুরে বললাম, 'অনেক কেঁদেছ। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলে গেছে। আর কেঁদো না—'

ধীরে ধীরে নিজের মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে পেছনে নিয়ে গেল মালতী। আমার দিকে কেমন করে যেন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর দু'হাত দিয়ে আলগা করে একটা খোঁপা বেঁধে চোখ নত করল।

আমার স্পর্শে কী ছিল, জানি না। কান্নাটা ক্রমশ থেমে আসতে লাগল মালতীর।

❀

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে চুকতে দুপুর পেরিয়ে গেল। বিকেলের মুখে রাধামোহন আমাকে ছাদে নিয়ে গেল।

ছাদটা বেশ বড়সড়ই। ওপরে নীল কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙিয়ে তলায় খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারদিকে সারি-সারি আসন পাতা। প্রতিটি আসনের সামনে কলাপাতা, মাটির গেলাস—ইত্যাদি ইত্যাদি সাজানো। আরেক ধারে চটের আড়াল দিয়ে রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত হয়েছে।

আমি একাই নয়, অন্য নিমন্ত্রিতরাও একে একে ছাদে আসতে আরম্ভ করেছে।

একখানা আসন দখল করে রাধামোহনকে বললাম, 'আবার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে গেলেন কেন?'

রাধামোহন বলল, 'আর বলবেন না; অনেকবার বারণ করেছিলাম। দাদা কিছুতেই শুনলে না।'

'এর কোন মানে হয়?'

রাধামোহনের কথা শেষ হতে না হতে শিশির মুখুটি এসে পড়লেন। মৃদু হেসে বললেন, 'কী কথা হচ্ছে?'

আমরা যা আলোচনা করছিলাম, বললাম। এবং খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করার জন্য অনুযোগও করলাম।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন শিশির মুখুটি। তারপর গভীর স্বরে বললেন, 'যারা শ্মশানে গিয়েছিল, শ্রাদ্ধের দিনে তাদের পাতে একটু কিছু দিতে না পারলে নিজেরই কি ভাল লাগে?'

রাধামোহন এই সময় বলে উঠল, 'দেশ থেকে কী-ই বা আনতে পেরেছেন, তা যদি এভাবে নষ্ট হয়—মানে ভবিষ্যৎ বলেও তো একটা কথা আছে। এ কলকাতা শহর, দুটো পয়সা হাতে থাকা দরকার।'

নিমন্ত্রিতেরা সবাই প্রায় এসে গিয়েছিল। আসনে আসনে তারা বসেও পড়েছে। দ্রুত তাদের একবার দেখে নিয়ে চাপা গলায় শিশির মুখুটি বললেন, 'এখন ওসব কথা থাক রাধামোহন, সবাই এসে পড়েছে।'

রাধামোহন তবু গজগজ করতে লাগল।

শিশির মুখুটি এবার বললেন, 'রাধামোহন, মনে রেখো, এটা আমার স্ত্রীর শেষ কাজ। এরপর তার জন্যে কোনদিন কিছু করার সুযোগই হয়ত পাব না।'

রাধামোহন এবার চুপ করে গেল।

শিশির মুখুটি থামেন নি। আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'দেশ থেকে কিছু আনতে পেরেছিলাম বলেই তো খরচ করলাম। ধরো, খালি হাতেই তো আসতে পারতাম।'

এর উত্তরও ছিল। কিন্তু এ সময় তা দেওয়া গেল না।

❀

খাওয়া-দাওয়ার পর একে একে নিমন্ত্রিতেরা চলে গেল।

শীত-বিকেলের আয়ু আর কতটুকু? দেখতে দেখতে রোদের রং মলিন হয়ে এল। চারদিক দ্রুত শীতল হয়ে যাচ্ছে, দিনের শেষ নিভু-নিভু আলো কোন কিছুকে উত্তপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমি বললাম, 'এবার তা হলে যাই?'

শিশির মুখুটি বললেন, 'এখনই যাবেন? কাজ আছে?'

না, কাজ আর কী—'

'তা হলে আমরা খেয়ে আসি, একটু বসুন—'

আমাকে নীচের ঘরে বসিয়ে শিশির মুখুটি, তাঁর দুই ছেলে, মালতী এবং রাধামোহনের বাড়ির সবাই ছাদে চলে গেল। ওরা যখন ফিরল, তখন আর বিকেল নেই; লম্বা পায়ে শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

মালতী, রাধামোহন, শিশিরের দুই ছেলে আর শিশির এ-ঘরেই এসে ঢুকলেন। একধারে একটা তক্তপোষ। রাধামোহন আর শিশির বসলেন তক্তপোষে। অন্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মেঝের ওপর।

শিশির মুখুটি বললেন, 'মালতীর মা মরার পর দেখতে দেখতে বারোটা দিন কেটে গেল।' তাঁর বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল।

রাধামোহন বলল, 'সময় যে কিভাবে যায়!'

একটি গাঢ় বেদনা শীতের বাতাসে

অনেকক্ষণ অনড় হয়ে থাকল। তারপর শিশির মুখুটি শুধোলেন, 'অকল্যাণে আর গিয়েছিলেন ?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না। আপনি ?'

'আমি আর কখন গেলাম। সেদিন ফিরে এসে দেখি বিপদ ঘটে গেছে। আপনিও তো সঙ্গে ছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর এই নিয়েই তো কাটছে। আজ শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকল, দু-একদিনের ভেতর অকল্যাণে যাব। ফর্ম-টর্ম ফিল-আপ করে দিয়ে আসব। আর—'

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

শিশির মুখুটি বললেন, 'এবার একটা চাকরি-বাক্‌রির ব্যবস্থা করতে হবে।' বলতে বলতে কী মনে পড়তে আবার বললেন, 'ভালো কথা, আপনি কিছু চাকরি-টাকরি পেলেন ?'

'না। এখনও পাই নি। তবে—'

'কী ?'

'একজন ভরসা দিয়েছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কিসের ?'

আমার চোখের সামনে অদৃশ্য কোন পর্দায় অলকাদির মুখ ভেসে উঠল। অন্যমনস্কের মতন বললাম, 'চাকরিটা আমার ঠিক পছন্দ না।'

শিশির মুখুটি কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

রাধামোহন বলে উঠল, 'চাকরির আবার পছন্দ-অপছন্দ কী। যা পাচ্ছেন নিয়ে নিন। চাকরির বাজার বড় খারাপ।

অলকাদির মুখ এখনও চোখের সামনে ভাসছে; কাজেই চাকরিটার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করলাম না। আমি চুপ করে থাকলাম।

শিশির মুখুটি প্রসঙ্গটার ওপর যতি টেনে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, 'দেশের খবর-টবর কিছু পেলেন ?'

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আজ প্রায় ষোল-সতের দিন কলকাতায় এসেছি। এসেই বাবাকে চিঠি লিখে-ছিলাম, কিন্তু এখনও উত্তর আসেনি। নানা মানুষ, অসংখ্য ঘটনা, বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা এ ক'দিন আমাকে যেন আচ্ছন্ন দূরমনস্ক করে রেখেছিল। বাড়ির কথা, যাদের জন্য পূর্ব-বাংলার সজল-শ্যামল ভূখণ্ড ছেড়ে আমায় এতদূরে এত দুঃসহ পাড়ি জমানো তাদের কথাই যেন ভুলে ছিলাম।

এই মুহূর্তে নিদারুণ এক দুর্ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। কেমন আছেন বাবা-মা ? কেমন আছে সবিতা ? ওদের কোন ক্ষতি হয়ে যায় নি তো ? পনের-ষোল দিন আগে চিঠি লিখেছি, ঢাকা জেলার আমতলি গ্রামটা তো পৃথিবীর ওপারের দেশ নয়, এর ভেতর তার উত্তর এসে যাওয়া উচিত ছিল।

আমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলাম। অস্থির গলায় বললাম, 'না, এখনও পাই নি। কিন্তু—'

'বলুন—'

'অনেকদিন হল চিঠি লিখেছি, এর মধ্যে কোন বিপদ-আপদ হল কি না বুঝতে পারছি না। ভাবছি —'

'কী ?'

'কাল-পরশুর ভেতর চিঠি না পেলে দেশেই চলে যাব।'

একটুক্ষণ নীরবতা।

তারপর আমিই আবার বললাম, 'পাকিস্তানে গোলমালের কোন খবর পেয়েছেন ?'

শিশির মুখুটি বললেন, 'না। এ ক'দিন খবরের কাগজও ভাল করে দেখতে পারি নি।'

রাধামোহন বলল, 'গ্রামের দিকে কোন কিছু হলে তা কি আর কাগজে বেরোয়। কত খবর জানতেই পারা যায় না।'

আমার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। কী করব, কী বলব—কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না।

শিশির মুখুটি আমার মনের কথা খানিক পড়তে পারলেন যেন। বললেন, 'তাই তো, ভারি চিন্তার কথা। কি যে সর্বনাশা পার্টিসান হল, আমাদের পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের আর বাঁচার পথ নেই।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তা এক কাজ করুন —'

'কী ?'

'কাল একবার শিয়ালদা স্টেশনে যান। দেশের লোক তো রোজই আসছে। আপনাদের গ্রামের, কি আশেপাশের গ্রামেরও কেউ এসে পড়তে পারে। তাদের কাছে খবর-টবর পেয়ে যেতে পারেন। আর যদি তেমন কারোকে না পান একটা টেলিগ্রাম করে দিন। এখনই—' বলতে বলতে থেমে গেলেন শিশির মুখুটি।

'এখনই কী ?'

'কিছু না জেনে-শুনে হুট করে আপনার দেশে যাওয়া ঠিক হবে না।'

উদ্বিগ্ন স্বরে বললাম, 'কেন বলুন তো ?'

একটু ভেবে নিয়ে শিশির মুখুটি বললেন, 'যদি গোলমাল-টোলমাল হয়ে থাকে, আপনি গিয়ে বিপথে পড়বেন।'

রুদ্ধ গলায় বললাম, 'কিন্তু আমার মা, বাবা, বোন---ওরা ?' বুকের ভেতরটা ঝড়ের দোলায় যেন কাঁপতে শুরু করেছে। আমার মনে হতে লাগল, তীক্ষ্ণ ধারাল কোন অস্ত্রে আমার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হয়ে গেছে।

শিশির মুখুটি এবার কী বলবেন, ভেবে পেলেন না। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আর ক'দিনের ? একই দুর্ভাগ্যের শরিক হয়ে একই ট্রেনে এসেছি—এই পর্যন্ত। তারপর দু'দিন মোটে দেখা হয়েছে।

আত্মীয়তা শুধু রক্তের সম্পর্কেই হয় না। মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যও কখনো কখনো একজনকে আরেকজনের খুব কাছে এনে দ্যায়। পূর্ব-বাংলার সকল ছিন্নমূল-বিড়ম্বিত মানুষ একই দুর্বিপাকের শিকার হয়ে পরস্পরের আত্মীয় হয়ে উঠেছে।

দিশেহারার মতন শিশির মুখুটি বললেন, 'আপনাকে কী করতে বলব, বুঝতে পারছি না।'

এ-বাড়িতে বসে থাকতে আমার

আর ইচ্ছা করছিল না, কথা বলতেও না; দেশের খবরের জন্য আমার সমস্ত অস্তিত্ব অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। এরই ভেতর হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, মালতী একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্ষণকালের জন্য হলেও নিজেদের অপার দুঃখ এবং শোকের কথা সে বুঝিবা বিস্মৃত হয়েছে। চোখ-মুখ দেখে মনে হল, আমার জন্যই এই মুহূর্তে সে উদ্বিগ্ন বিচলিত।

আমার যা মানসিক অবস্থা, তাতে এখন কোন কিছুই রেখাপাত করার কথা নয়। মালতীর উৎকণ্ঠা আলতো-ভাবে আমার ভাবনার বাইরের দিকটায় ছুঁয়ে গেল মাত্র।

একসময় উঠে পড়লাম, বললাম, 'আজ আমি যাই।'

শিশিরা মুখুটি আর বাধা দিলেন না। আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত সবাই এলেন।

শিশির মুখুটি বললেন, 'দেশের খবর-টবর পেলে জানাবেন।

আমি মাথা নাড়লাম, 'জানাব।'

খানিক ইতস্তত করে শিশির মুখটি এবার বললেন, 'আমি আপনাকে 'না' বলতে পারি না; আপনার বাবা-মা-বোন দেশে আছে। যদি একান্তই যেতে হয়, সাবধানে ভেবে-চিন্তে যাবেন।'

সংক্ষেপে বললাম, 'আচ্ছা —'

'দেশে যদি একান্তই যান, আমরা যেন জানতে পাই।'

'জানাব।'

মালতী সেইরকম উদ্বেগপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিশির মুখুটিরা বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি বিদায় নিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

৬

আমি যখন যাদবপুর পৌঁছুলাম তখনও খুব একটা রাত হয় নি। খুব বেশি হলে সাড়ে আটটা-ন'টা। কিন্তু এরই ভেতর শহরতলীর এদিকটা একেবারে নিঝুম নিশুতিপুর হয়ে গেছে।

পৌষ মাস শেষ হয়ে আসতে চলল; শীতের আসর জমজমাট। সেই সন্ধ্যে থেকে যে হিম পড়ছে সেগুলো ঘন হয়ে এখন চারদিক ঝাপসা করে দিচ্ছে। রাস্তার আলোগুলো নিষ্প্রভ মিটমিটে। শীতের কুয়াশা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে একেবারে মলিন করে দিয়েছে।

গেট পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই মঙ্গলের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'এই যে দাদাবাবু, সারাদিন ছিলেন কুথায়?'

কোথায় ছিলাম বললাম। তারপর ভয়ে ভয়ে শুধোলাম, 'কেন বল তো? পিসেমশাই খুঁজেছিলেন না কি?'

'তেমন কিছু নয়। একবার খালি আপনার কথা শুধিয়েছিলেন। আপনি বাড়ি আছেন না বেরিয়ে গেছেন— এই কথা। যান, ঘরে যান। শীতে একেবারে কালিয়ে গেছেন।'

আমি সামনের দিকে পা বাড়ালাম। মঙ্গলও উল্টোদিকে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভালো কথা দাদাবাবু—'

থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, 'কিছু বলবে?'

'আজ্ঞা, আপনার নামে একখানা চিঠি এসেছে।'

এস্রাজে দ্রুত ছড় টানার মতন ঝড়ের বেগে আমার বুকের ভেতর দিয়ে অতি দ্রুত কি যেন বয়ে গেল। তবে কি বাড়ির খবর এসেছে? অস্থির কাঁপা গলায় বললাম, 'চিঠিটা কোথায়?'

'আপনার ঘরে, বিছানার ওপর রেখে এসেছি।'

নিশ্বাস বন্ধ করে যেন ঘরের মধ্যে ছুটতে ছুটতে ঘরে এলাম। দেয়ালে বোতাম টিপে আলো জ্বালিয়ে বিছানার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, সত্যিসত্যিই একটা খামের চিঠি।

ছোঁ মেরে খামটা তুলে নিয়ে দেখলাম, গোটা গোটা অক্ষরে আমার নাম এবং ঠিকানা লেখা আছে। কিন্তু হাতের লেখাটা একান্ত অপরিচিত। বাবা-মা কিংবা সবিতার হস্তাক্ষর তো এ নয়। ভাল করে লক্ষ্য করতেই এবার দেখতে পেলাম খামটা পাকিস্তানের নয়, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের। সীলমোহরের ছাপও স্থানীয় কোন ডাকঘরের।

কে আমাকে এ-চিঠি লিখতে পারে? বিমূঢ়ের মতন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে খামটা শিথিল হাতে ছিঁড়ে ফেললাম। ভেতর থেকে যে চিঠিটা বেরুল সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত।

তাড়াতাড়ি 'ইতি'র তলার নামটা দেখে নিলাম। সেটা বিশাখা সোম।

বিশাখা আমাকে এ চিঠি লিখেছে! প্রথমটা বিশ্বাসই হতে চাইল না। তারপর দুর্বার কৌতূহলে একপলকে পড়ে ফেললাম।

'চিরঞ্জীববাবু,

আপনার মতো অভদ্র ব্রুট ইয়ং-ম্যান আমার জীবনে আর কখনো দেখিনি। সভ্যসমাজে এ জাতীয় মানুষ একেবারেই অচল। মেয়েদের আপনি মর্যাদা দিতে জানেন না।

অভদ্রতার জন্য সেদিন রাত্রে আপনাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে-ছিলাম। আশা করি শীতের মধ্যে একা-একা পায়ে হেঁটে যাদবপুর ফিরতে ফিরতে আপনার কিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়েছে। ভেবেছিলাম, আপনার কথা মনে রাখব না। কিন্তু কেন জানি না, আপনার সম্বন্ধে খানিকটা দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়েছে। আপনাকে পালিশ-টালিশ করে মেজে-ঘষে সভ্য সমাজে চালু না-করা পর্যন্ত আমার ঘুম নেই।

আসছে রবিবার আমাদের বাড়ি যদি একবার আসেন, খুশী হব। নইলে আমাকে গিয়েই যাদবপুরে চড়াও হতে হবে। ইতি—

বিশাখা সোম।

পড়া হয়ে গেলে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কে চেয়েছিল এ-চিঠি? বিশাখার জন্য আমার যেন ঘুম হচ্ছিল না।

আজও মা-বাবার খবর এল না। গভীর নিদারুণ হতাশা চারদিক থেকে আমাকে যেন ঘিরে ধরতে লাগল।

●

পরের দিন সকালবেলা উঠেই শিয়ালদা ছুটলাম। শিশির মুখুটি বলেছিলেন, দেশে যাবার আগে ইস্টবেঙ্গল মেলে একবার যেন খোঁজ করে নিই।

শিয়ালদা স্টেশনে সেই একই দৃশ্য। দেশের মাটি থেকে উন্মূল হাজার হাজার বিড়ম্বিত মানুষ চারদিকে পিণ্ডাকারে ভয়ার্ত পশুর মতন বসে আছে। ওদিকে সারি সারি লঙ্গরখানা, বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা লাল সালুর পতাকাগুলো চারধারে উড়ছে।

আজ আমার পরই ইস্টবেঙ্গল মেল এসে পড়ল। কামরায় কামরায় উঁকি দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলাম, 'বজ্রযোগিনী, সোনারং, পাইকপাড়া, মীরকাদিম, টঙ্গিবাড়ি, আমতলি থেকে কেউ এসেছেন?'

সাড়া পাওয়া গেল না।

পরের দিনও শিয়ালদা হানা দিলাম। আজও ওদিককার কেউ আসে নি। তারপরের দিনও সেই একই ব্যাপার।

পর পর তিনদিন আমাকে ব্যর্থ, হতাশ হতে হল।

তিনদিনের ভেতর যখন কোন খবর আসে নি তখন নিশ্চয়ই ওদিকে কিছু ঘটেছে।

আজ তৃতীয় দিনে আমার উদ্বেগ আমার উৎকণ্ঠা একেবারে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। নিদারুণ মানসিক অস্থিরতা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আজ শিয়ালদা থেকে যাদবপুর যেতে যেতে স্থির করলাম, দেশে ফিরে যাব। আমার যা-ই ঘটুক, বাড়ি আমাকে ফিরতেই হবে।

যাদবপুর এসে বিছানাপত্রের গোছগাছ করতে বসলাম। সন্ধ্যেবেলা ইস্টবেঙ্গল মেল ধরব। গোছগাছ হয়ে গেলে পিসেমশাইকে যাবার কথা জানাব।

বাঁধা-ছাঁদা, সাজানো-গোছানো শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় মঙ্গল একটা খাম নিয়ে এল, 'দাদাবাবু আপনার চিঠি—'

চকিত হয়ে তার দিকে তাকালাম। পরক্ষণেই মনে হল, বিশাখা আবার লেখে নি তো?

মঙ্গল তাড়া দিল, 'কি হল, নিন—'

এবার হাত বাড়ালাম। চিঠিটা নিয়ে তাকাতেই আমার সত্তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুচ্চমকের মতন কি খেলে গেল; খামের ওপর বাবার হস্তাক্ষর।

এতদিনে—এতদিন পর দেশের খবর এসেছে।

[ক্রমশ।

ত্রয়ী

এটি: একটা 'ইলেক্‌ট্রিকাল ফার্ম' রেকর্ড পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যন্ত্রটি এইরকম: একটি 'পলিথিন অটোমাইজার' বোতলে থাকে পরিষ্কারক তরল আর 'ফোম প্লাসটিক প্যাড'। ঐ তরল ময়লা পরিষ্কার করা ছাড়াও রেকর্ড-কে 'আন্টি-স্ট্যাটিক হতে সাহায্য করায় রেকর্ডটি আরও ময়লা আকর্ষণ করতে পারে না।

●

ওটি: পোকা কামড়ালে বা মৌমাছি জাতীয় পতঙ্গ হুল ফোটালে যে যন্ত্রণা হয় তা বৈজ্ঞানিকরা কিছুদিন আগেই দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের মতে, ওষুধটি দু'এক সেকেণ্ড-এর মধ্যেই কার্যকর হয়। এর রহস্য? এটি 'অ্যানাল্‌জেসিক-অ্যানাস্‌থেটিক' মিশ্রণ,—জির্‌কোনিয়াম্ কম্‌পাউণ্ড' মিশ্রিত।

●

সেটি: কুকুরের কামড় খেয়ে জনৈক ভদ্রমহিলা ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি বললেন তাঁর জলাতঙ্ক অনিবার্য, ডাক্তার হিসেবে তাঁর কিছুই করার নেই। তিনি মহিলাটিকে তক্ষুণি উইল ক'রে ফেলতে উপদেশ দিলেন।

মহিলাটি কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে লিখতে সুরু করলেন।

'বেশ লম্বা নামের ফর্দ, অ্যাঁ?' ডাক্তার বললেন।

'নামের ফর্দই বটে,' মহিলাটি দাঁত কড়মড় ক'রে উত্তর দিলেন। 'জলাতঙ্ক হওয়ামাত্র কাকে কাকে কামড়াবো তার ফর্দ করছি। আর, শুনুন মশাই, আপনাকে কামড়াবো সবার আগে।'

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র / সারস্বত লাইব্রেরী

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্কটি যে ঠিক কি ছিল তারই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে এবং এই বক্তব্যকে যথাযথরূপে প্রকাশ করার জন্যই লেখক তৎকালীন দেশের তথা বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমি, চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার ঘাত-প্রতিঘাতকে সঠিকভাবে চিত্রিত করেছেন আলোচ্য রচনায়। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্ম-সাধনাকে, রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি চোখে দেখেছিলেন বা দেখতে চেয়েছিলেন উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধই বা কি ধরণের ছিল, এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে, বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করলে। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মসাধনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তাঁর বক্তৃতা, ভাষণ, বিবৃতি ইত্যাদির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে; তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যেসব চিঠিপত্র, বাণী ও তার বিনিময়াদি ঘটেছিল তাও গ্রন্থমধ্যে সংকলিত। লেখকের সযত্ন পরিশীলনে রচনাটি সহজেই তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নেপাল মজুমদার, প্রকাশনা—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬, দাম—দশ টাকা।

প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী / বসুমতী

বাংলা সাহিত্যাকাশে যে কয়টি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিরাজমান তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কল্লোল যুগের শক্তিমান লেখক ও কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে নতুন করে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁরই এক বিরাট কৃতিত্বের পরিচয় বহন করছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি

অমূল্য গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থটিতে দু'টি পূর্ণাঙ্গ সম্পূর্ণ উপন্যাস, নয়টি অনবদ্য ছোট গল্প ও তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। 'মিছিল' ও 'প্রতিশোধ' নামক উপন্যাস দু'টি পাঠক-পাঠিকাদের নিঃসন্দেহে অভিভূত করে রাখবে। উপন্যাস দুটিতে লেখকের সৃজনীশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর। মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ, ঘাত, প্রতিঘাত মানুষের প্রতি মানুষের গভীর মমত্ববোধ, সহানুভূতি প্রভৃতি সব-দিকগুলিই লেখকের বলিষ্ঠ কলমের ছোঁয়ায় অনুপম রূপ পরিগ্রহ করেছে। উপন্যাস দু'টি পাঠক-পাঠিকাদের মনে গভীর রেখাপাত ও আলোড়নের সৃষ্টি করবে। ছোট গল্পগুলি মহানগর, অরণ্যপথ, দুর্লঙ্ঘ, নতুন বাসা, বৃষ্টি, পরোপকার, একটি কড়া টোস্ট, নিরুদ্দেশ ও পান্থশালা প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক একটি মনোরম গল্প সৃষ্টিতে লেখকের আন্তরিকতা উল্লেখনীয়। ছোট গল্পে রবীন্দ্র-নাথ নামক প্রবন্ধটিতে লেখকের গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

মনীষীদের কৌতুককথা / ভারতী লাইব্রেরী

আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্গীয় মনীষী বর্গের পরিহাসপ্রিয়তার এক সুললিত নিদর্শন আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান যুগসমস্যায় কণ্টকিত, হাসিটা যেন এক দুর্লভ বস্তু, হাসির গল্প হাসির কথা আজ আর তেমন শোনা যায় কই, কিন্তু সেকালের লোক হাসতে জানতেন হাসাতেও জানতেন, আলোচ্য রচনায় তার স্বাক্ষর রয়েছে। বইটি পড়তে ভাল লাগে, এ যেন রসনির্ঝর অনাবিল মুক্ত মনের এক-টুকরো আকাশ, যার তলায় বসে কিছু-ক্ষণের জন্যও অন্তত মনের ভার নামিয়ে রাখা যায়। লেখককে ধন্যবাদ জানাই। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—তিন টাকা।

কাজললতা / মিত্র ও ঘোষ

জনপ্রিয় সাহিত্যকারের নবতম এই উপন্যাসটি হাতে পেয়ে সকলেই খুসী হবেন। এক অপ্রকৃতিস্থ ধনীর দুলাল, কাহিনীর নায়ক, যার উন্মত্ততার পরিচয় পেয়ে ফুলশয্যার রাত্রিতেই নবপরিণীতা বধূ মল্লিকা বেরিয়ে পড়েছিল পথে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই খেলা যে, সেই স্বামীকেই আবার সেবা করে সুস্থ করে তোলার ভার পড়ল একদিন তার কাঁধে। চিরন্তন সংস্কারের দাবী সেদিন তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারল কই মল্লিকা; এগিয়ে এল সে কল্যাণের হাত বাড়িয়ে, সুস্থ করে তুলল স্বামীকে একাগ্র সেবায়, অচল নিষ্ঠায়। সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠল অসিত; সার্থক হল মল্লিকার অতন্দ্র সাধনা। কাহিনীতে নাটকীয়তার আমেজ আছে তবে লেখকের মুন্সিয়ানায় তা হয়ে উঠতে পেরেছে রীতিমত সুপাঠ্য। কাহিনীর গতি এতই স্বচ্ছন্দ যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল অব্যাহত থাকে। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ

শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২. দাম—ছয় টাকা।

অনুবাদ-বিবেকানন্দম

আলোচ্য গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য দুটি রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ও 'বর্তমান ভারত'কে সংস্কৃতে অনুবাদ করে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। সংস্কৃতানুরাগী পাঠক যাতে স্বামীজীর অনবদ্য রচনার আস্বাদ গ্রহণে তৃপ্ত হতে পারেন, বলা বাহুল্য অনবাদক সেইজন্যই এ কর্মে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টা সত্যই আনন্দজনক। অনুবাদ-কর্মে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় আছে। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, প্রকাশক—ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, 'কল্যাণী' ৬৩।১এ, সেলিমপুর লেন, কলিকাতা-৩১, দাম—সাত টাকা

কালের পদধ্বনি / ডি এম লাইব্রেরী

আলোচ্য উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা ও আদর্শবাদের দেখা মেলে। নায়িকা স্তুতারা, পরিপূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত, জীবন তার কাছে প্রমোদ-ভূমি মাত্র নয়, কর্তব্য ও প্রেমের সমন্বয়ে গঠিত দাঁড়াবার শক্ত মাটি। তাকে আঁকড়ে ধরে যে কটি জীবন প্রাণচাঞ্চল্যে ভাসমান তাদের সবলকেই সমানভাবে কল্যাণের স্নেহাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে চলে তার জীবন-যাত্রা। অকল্যাণ ও অমঙ্গলের স্পর্শে কখনই নিবতে দেয়নি সে জীবন-প্রদীপটি তাই কোন আঘাতেই মরে যায়নি তার মন। অচঞ্চল মহিমায়, স্থৈর্যে, সদাই স্বপ্রকাশিত এই নারীচরিত্র সত্যই আকর্ষণীয়। আদর্শবাদে যে অখণ্ড বিশ্বাস, এই রচনার ছত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত, তাতে মুগ্ধ হতে হয়। এ রচনা রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার ভাগে পড়ে না বটে, কিন্তু লেখিকার বক্তব্য যে আন্তরিক ও উচ্চাশা-অভিসারী তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখিকা—শিপ্রা দত্ত, প্রকাশনায়—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—ছয় টাকা

বসন্ত রাঙন / ডি এম লাইব্রেরী

ঘাত প্রতিঘাতেভরা অদ্ভুত জীবন-ধর্মী এই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসের মাধ্যমে। মধ্যবয়স্ক ধনী চাষী মুকুন্দ ও দেহোপজীবিনী রেবতী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলো একদিন একসঙ্গে। কিন্তু স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়? বোধ হয় না—নচেৎ পদে পদে সন্দেহ অবিশ্বাস এসে উঁকি দিতে সুরু করলো কেন? রেবতী আহত হল, উপলব্ধি করলো চাইলেই সব পাওয়া যায় না, ফিরে যেতে উদ্যত হল সে তাই আবার তার পর্ব-জীবনে। এবার চমকালো মুকুন্দ তবে সে হেরে যাবে? কিন্তু প্রেম যে সর্বজয়ী। তাই তো শেষ পর্যন্ত কঠিন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হল মুকুন্দ, সন্দেহ দ্বিধা দ্বন্দ্বকে হারিয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করেই এসে ধরলো রেবতীর হাত। মুকুন্দ ও রেবতী দুটি আহত মানুষ পরস্পরকে অবলম্বন করে, নতুন করে আবার পদক্ষেপ করলো জীবনের পথে। স্বচ্ছ ও অনবদ্য শৈলীতে আপন বক্তব্য পেশ করেছেন লেখক, পড়তে পড়তে অভিভূত হতে হয়। প্রচ্ছদ রঙিন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রকাশনা—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—সাড়ে তিন টাকা।

বাড়ি বদল / মিত্র ও ঘোষ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক ছোট ও অনবদ্য গল্পসংগ্রহ। দুটি গল্প মাত্র সংগৃহীত হয়েছে, 'বাড়ি বদল' ও 'চারতাস', দুটিই ভাবব্যঞ্জনায় অপরূপ। বহুদিনের আবাস ছেড়ে অংশু যখন চলে যাচ্ছে অন্য বাড়ীতে তখনকার পরিবেশ এঁকেছেন লেখক অপরূপ শিল্পচাতুর্যের সঙ্গে, সব বিদ্বেষ সব মনোমালিন্য ছাপিয়ে যূথীর চোখের একফোঁটা জলই শেষ পর্যন্ত টলমল করতে থাকে পাঠকের মনের গহনে। লেখকের শৈলী আশ্চর্য সরল ও সংযত, বক্তব্যকে তা শুধু প্রকাশই করে না জীবনময় করে তোলে। আমরা এই গল্পগ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শিল্পসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিমল কর, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

সূর্যগ্রহণ / ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং

দেশের বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল রাজনৈতিক পটভূমিকে আশ্রয় করে, সে সম্পর্কে আপন বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন লেখক আলোচ্য রচনার মাধ্যমে। শ্লোগান মিছিল ঘেরাও ইত্যাদির মাধ্যমে কিশোর ও তরুণদের উত্তেজিত করে তোলার পেছনে রাজনৈতিক নেতাদের যে কূটবুদ্ধি আত্মগোপন করে আছে, তার উলঙ্গ মূর্তিটাকে স্পষ্টভাবে দেখানোই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এ জন্যই রচনাটি স্যাটায়ার বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, লেখকের শৈলী সরস, বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। রচনাটি যে একান্তভাবেই সময়োপযোগী, তাতে সন্দেহ নাস্তি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—সত্যদর্শী, প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, দাম—তিন টাকা।

দোলন চাঁপা / বর্ণালী প্রকশনী

বনিয়াদী ক্ষয়িষ্ণু এক পরিবারের কয়েকটি মানুষকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কাহিনী, সেই সঙ্গে দ্রষ্টার ভূমিকায় উপস্থাপিত সহজ ও স্বাভাবিক যুবক অরুণেশ্বর, প্রধানত তার মাধ্যমেই

অন্তরঙ্গ হতে পারেন পাঠক প্রত্যেক চরিত্রগুলির সঙ্গে। বনিয়াদী পরিবারের ঘুণধরা মনষত্বের প্রতীক ত্রিদিবনারায়ণ, সুদীপ, তৃপ্তি, সুপ্তি সব চরিত্রগুলিই ফুটে উঠেছে বিশ্বাস্যভাবে। অজন্তার মানসিক ভারসাম্যের অভাবও যেন নগধর্মেরই সার্থক প্রতীক, সে সুস্থভাবে বাঁচতে চায়, ভালবাসতে চায় স্বামী-সন্তান দিয়ে গড়া সংসারকে তব কেন যেন সফল হয় না। বিশ্লেষণী ভঙ্গীতেই স্পষ্ট চরিত্র-গুলিকে বিচার করে দেখেছেন লেখক, দেখাতে চেয়েছেন এবং এ কথা অনস্বী-কার্য যে তাঁর এই প্রচেষ্ট সার্থকতায় পর্যবসিত। নানা ধরণের বিকৃতির মাঝে সুপ্তি চরিত্রটি বিকশিত স্বমহিমায়, রূপে গন্ধে বর্ণে সে যেন সত্যই এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত দোলনচাঁপা। পাকা হাতে কাহিনীকে পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন লেখক; সব বিকৃতিকে ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে সুস্থ জীবন-বোধ। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি এবং এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিশোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—সম্রাট সেন, প্রকাশক—বর্ণালী প্রকাশনী, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, দাম—দশ টাকা।

আজগুবি গল্প / এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক মজাদার আজগুবি গল্পের সংকলন, বিখ্যাত ও অখ্যাত লেখক-লেখিকার লেখা মোট ষোলটি গল্প স্থান পেয়েছে এতে। গল্পগুলির নামায়ন সার্থক, পাতা উল্টোলে সত্যই পৌঁছে যাওয়া যায় সেই দেশে যেখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই, যে দেশে মানান-বেমানানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। পড়তে ছোটদের তো ভাল লাগেই বড়রাও সে ভাললাগার আস্বাদে বঞ্চিত হন না। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ চমৎকার, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। সম্পাদনা—গীতা দাশ, প্রকাশনা—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এ ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

আধুনিক পোলট্রি পালন / দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

আলোচ্য গ্রন্থটি পূর্বে 'পারিবারিক পোলট্রি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে নতুন নামে আবার এর আত্ম-প্রকাশ ঘটল। পারিবারিক প্রয়োজনে হাঁস-মুরগী পালনকারীদের সাহায্যার্থে রচিত হলেও, এ গ্রন্থ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় বলেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। পোলট্রি পালন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সব তথ্যই এই রচনায় উপস্থিত, হাঁস-মুরগী পালন সম্বন্ধে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রই বইটি হাতে পেয়ে সুখী হবেন। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—শ্রীশান্ত, প্রকাশক—শ্রীতপনকান্তি দত্ত, ১৭৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড, সাউথ বরাহনগর, কলিকাতা—৩৬, দাম—[illegible]।

পারিবারিক পোশাক ধোলাই পদ্ধতি / দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

আলোচ্য গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ময়লা পোশাক সাফ করার প্রক্রিয়া শেখানো হয়েছে। বর্তমানে ঘরে ঘরে নিজেদের পোশাক-আসাক নিজেরাই সাফ করে নেওয়ার প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে, এর কারণ দ্বিবিধ, এক—কাপড় ধোলাইয়ের ক্রমবর্ধমান পারিশ্রমিক, দুই—কাপড় জামাকে অকালে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজেদের পোশাক নিজেরাই ধোলাই করাটা যে সত্যই কত সুবিধাজনক, এ রচনায় তারই হদিস মিলবে। গৃহস্থের ঘরে এই বইটি সমাদর পাবে বলেই বোধহয়। আঙ্গিক সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—শ্রীশান্ত, প্রকাশক—শ্রীতপনকান্তি দত্ত, ১৭৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড, সাউথ বরাহনগর, কলিকাতা—৩৬, দাম—তিন টাকা।

এই রোদ এই বৃষ্টি / বর্ণালী প্রকাশনী

মানবিক আবেদনে ভরা কাহিনী গভীর দাগ এঁকে দেয় পাঠক মননে। নিম্নবিত্ত এক সংসারের অন্যতমা এক সদস্যা মৈত্রেয়ী, শুধু তাই নয় বিধাতার অভিশাপ নেমে এসেছে তার উপর—পঙ্গু সে, তবু মনুষ্যত্বে সে দীন নয়, ক্রাচ বগলে নিয়ে জীবনের পথে সে চলে বিজয়িনীর ভঙ্গীতেই। কর্তব্য করে চলার আনন্দেই বুঝি ভরপুর ছিল এতদিন মৈত্রেয়ীর মন, দোলা জাগলো একদিন সে মনেও, ভালবাসলো সে। আনন্দ সান্যাল জীবনযুদ্ধে মার খাওয়া আর এক সৈনিক, তাকে ভালবাসলো মৈত্রেয়ী; ভালবাসা কি আপনাতে আপনি সার্থক—না হলে জীবনে দয়িতকে গ্রহণ করতে না পেরেও কি করে এত সুখী হতে পারলো? পারলো সব আঘাতের মাঝে থেকে জীবনের অমৃতকে আস্বাদন করতে? সুন্দর ও শান্ত এক প্রেমের ব্যঞ্জনায় ভরা কাহিনীটি পড়তে ভালই লাগে। লেখকের ভাষা সাবলীল, ভঙ্গী আন্তরিক। প্রচ্ছদ সুদৃশ্য, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দ্বৈপায়ন, প্রকাশনায়—বর্ণালী প্রকাশনী, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মরণের পরে

আলোচ্য বইটির বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক। মরণের পরে জীবাত্মার কি পরিণতি হয়, মুখ্যত তাই নিয়েই আলোচনা করেছেন লেখক। অধ্যাত্ম-বাদ ও পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী পাঠকের কাছে এ রচনা আকর্ষণীয় বলেই প্রতিভাত হবে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—রাখালদাস সেনগুপ্ত (কাব্যতীর্থ), প্রকাশক—শ্রীবলরামধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিমলজ্যোতি দাস

কিছুদিন আগে ব্যবসা উপলক্ষে মণিপুর যেতে হয়েছিল। কলকাতা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত প্লেন-এ গিয়ে সেখানে কিছু কাজ সেরে মণিপুর গেলাম। এখানকার কাজ শেষ করে লামডিং গেলাম একটু দরকারে। লামডিং থেকে ট্রেনে গৌহাটি ফেরার পথে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। সেই কথা এবার বলব।

গভীর রাত্রে ট্রেন। সে জন্যও বটে এবং অপরিচিত জায়গা বলেও বটে, একটা ছোট প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করেছিলাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন ছুটেছে নিজের গন্তব্যপথে। ছোট্ট কামরায় মধ্যে একা বসে নানা কথা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল গাড়ির দরজার ওপর খট্‌খট্‌ শব্দে। কেউ বোধ হয় গাড়িতে উঠতে চায়। শুয়ে শুয়েই বিরক্তভাবে বললাম—রিজার্ভ।

উত্তর এল—শীগ্‌গির দরজা খোল সিতাংশু! আমি অনিমেষ। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম। সত্যই একটা স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। আগন্তুক চট্ করে উঠে পড়ল। গলার আওয়াজেই তাকে চিনেছিলাম। এখন গাড়ির আলোতে দেখে কোনও সন্দেহ রইল না। ওর নাম অনিমেষ—আমার স্কুলের সহপাঠী এবং বাল্যবন্ধু। খুব গরীব ওরা। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর পয়সার অভাবে পড়তে পারেনি। টুইশানি করে কোনও রকমে চালাচ্ছিল। তারপর পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ এসে পড়ল। অনেক চেষ্টায় বিধবা মায়ের সম্মতি আদায় করে অনিমেষ মিলিটারিতে যোগ দিল এবং বছরখানেক চাকরি করল। তারপর আবার বেকার। শেষে অনেক যোগাড়-যন্ত্র করে এর এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের সাহায্যে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল-এ ফায়ার ব্রিগেডে চাকরি পেল। সামান্য কাজ নিয়ে অতদূরে ও যেত কি না সন্দেহ, তবে একটা সুবিধা হয়ে গেল। একসঙ্গে দুটি পদ খালি ছিল। অনিমেষ এবং আমাদের অন্য এক সহপাঠী সত্যবিলাস দুজনে ঐ দুটি পদ পেয়ে একই সঙ্গে চলে গেল। সে আজ বছর দুই আগেকার কথা। তারপর ওর সঙ্গে এই প্রথম দেখা।

চেহারা ওর সেই রকমই আছে। গায়ে ফায়ার ব্রিগেডের নীল কোট-প্যান্ট। কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জিজ্ঞাসা করলাম—তোর মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন রে অনিমেষ?

ম্লান হাসি হেসে ও উত্তর দিল—বড্ড পড়ে গিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে।

মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম রংটা যেন অত্যন্ত ফ্যাকাসে বলে মনে হতে লাগল। কথার আওয়াজেও দুর্বলতার সুস্পষ্ট আভাস। প্রশ্ন করলাম—তোর কি অসুখ করেছিল না কি?

—অসুখ? হাঁ, করেছিল বৈ কি।

—মনে হচ্ছে এখনও ভাল সারিস নি। দিনকতক ছুটি নিয়ে বাড়িতে এলেই পারতিস।

—ছুটি? আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে।

—এখন তবে কোথায় যাচ্ছিস? এখানে কি করছিলি? সঙ্গে ত' মোট-ঘাটও নেই দেখছি।

—না, যাচ্ছি না কোথাও। তুই ত' জানিস আমরা ইম্ফলে আছি। আপাতত একটা সরকারী কাজে এদিকে এসেছিলাম। আজ রাত্রির গাড়িতেই ফিরে যাব। প্ল্যাটফর্মে একটু বেড়াচ্ছি, এমন সময় তোদের গাড়িখানা এল। গাড়ির কাছ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তোকে দেখতে পেয়ে ডাকলাম। আমার ট্রেনের ত' এখন দেরি আছে। ভাবলাম, তোর সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কয়ে নি। অনেকদিন পরে দেখা।—তারপর বাড়ির খবর ভাল?

—হ্যাঁ ভাল। তোর ভাই অমলেশ ভালই পড়াশুনা করছে।

—বেশ। তারপর, তোর খবর কি? বিয়ে-থা করেছিস?

—না ভাই। ভাবছি, তুই আর সত্যবিলাস ছুটি নিয়ে এলে একসঙ্গে তিনজনেই বিয়ে করা যাবে।

—তবেই হয়েছে! না না, তুই আমাদের জন্য বসে থাকবি কেন? তুই হলি বড়লোকের ছেলে, তোর কথা আলাদা, তা, এদিকে কোথায় গিয়েছিলি রে সিতাংশু?

—লামডিং। গৌহাটিতেও একটু কাজ ছিল। ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার।

—ওঃ।

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপচাপ। তারপর অনিমেষ বলল—দেখ সিতাংশু, তোকে আমার একটা কাজ করতে হবে ভাই।

—কি কাজ?

—কিছু টাকা আর একটা আংটি আমার মাকে দিবি। অনেকদিন থেকেই এগুলো পাঠাব-পাঠাব মনে করছি। কিন্তু সুবিধা হয় নি।

বলে তার বুক কোটের পকেট থেকে একটা লাল ফিতে বাঁধা কাগজের বাক্স বার করল। সেটা খুলে আমার দিকে ধরে বলল—এতে একশো টাকার নোটে মোট পনের হাজার টাকা আছে। আর এই একটা হীরের আংটি আছে। এর দাম খুব কম হলেও হাজার টাকা হবে।

আমি বিস্মিতভাবে তাকাতে আমার মনের ভাব অনুমান করে বলল—ভাবছিস এত টাকা এবং এমন মূল্যবান আংটি আমি কোথায় পেলাম? সে অনেক কথা। এখন বলবার সময় হবে না। পরে তোকে সব জানাব। আংটিটা মাকে দিবি, আর টাকাগুলো মা'র নামে ব্যাঙ্কে জমা করিয়ে দিবি। আর বলবি, অমলেশের পড়াশুনা যেন খুব ভাল করে হয়। বলে বাক্সটা বন্ধ করে ফিতে দিয়ে বেঁধে আমাকে দিল। আমি ওটা সুটকেসে বন্ধ করে রাখলাম।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে ও বলল—এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—বোস একটু, আসছি। বলে, গাড়ির পায়খানার দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল। আমি বসে আছি, অনিমেষ আর বেরয় না। ক্রমে দশ, বিশ, ত্রিশ মিনিট হয়ে গেল। তবু দেখা নেই। আমার তখন কেমন যেন সন্দেহ এবং একটু ভয়ও হল। ভিতরে গিয়ে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায় নি ত' হঠাৎ? মানুষের কথা কিছুই বলা যায় না। বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে কয়েকবার ওর নাম ধরে ডাকলাম, দরজায় টোকা দিলাম, কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বাধ্য হয়ে দরজা খুলে ফেললাম। এ কি! কোথায় সে? পায়খানার মধ্যে কেউ নেই। বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। স্বপ্ন দেখছি না ত'? দেখবার ভুল হয়নি ত'? না, স্পষ্ট পরিষ্কার সব জিনিষ দেখছি। চারিদিকে দেখলাম, কোথাও কোন ভাঙা-টাঙা আছে কি না, নতুন মজবুত গাড়ি। দেয়ালগুলো ধাক্কা দিয়ে দেখলাম, ঠিকই আছে। তবে—?

এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর আছে—অনিমেষ আর এ-জগতের মানুষ নয়। আমি যার সঙ্গে কথা বলেছি সে অনিমেষের প্রেতাত্মা। কথাটা মনে হতেই আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ধাবমান ট্রেনের সেই নির্জন কামরার মধ্যে বসে আমি ঘেমে উঠলাম। অনেক চেষ্টায় মনে সাহস ফিরিয়ে আনলাম। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন ছুটে চলেছে অশ্রান্ত গতিতে। লৌহবর্ত্মের উপর তার চাকার একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ করে বয়ে যাচ্ছে তীব্র গতিবেগে আলোড়িত শীতল নৈশ বায়ু। মাঝে মাঝে এধারে-ওধারে দুটো একটা আলো সাঁ-সাঁ করে ছুটে চলে যাচ্ছে বিপরীত দিকে। হঠাৎ মনে হল—অনিমেষ, আমি এবং পৃথিবীর আরও অসংখ্য নর-নারী কি এমনি দ্রুত অন্ধগতিতে ছুটে চলেছি জীবনের অন্ধকার পথ বেয়ে আলোকহীন মৃত্যুর অভিমুখে? কে জানে?

॥ দুই ॥

বাড়িতে পৌঁছে আমার নামে একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিখানা দু'দিন আগে এসেছিল। খামের উপর ইম্ফল পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কম্পিত হাতে খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। দীর্ঘ পত্র। সত্যবিলাসের লেখা। লিখেছে—

ভাই সিতাংশু, আজ দু বছর হল চাকরি নিয়ে মণিপুরে এসেছি বটে, কিন্তু এই প্রথম তোকে চিঠি লিখছি। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে এ-চিঠি তোর কাছে আনন্দের দূত হয়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে শোকের বার্তা বহন করে। দু'বছর আগে যখন বাড়ি ছেড়ে আসি, তখন আমরা ছিলাম দুজন, আমি আর অনিমেষ। আজ কিন্তু আমি একা। কেমন করে এই অঘটন ঘটল, সেই করুণ কাহিনী আজ তোকে জানাব।

ফায়ার ব্রিগেডে আমরা এক-রকম সুখে-স্বচ্ছন্দেই কাজ করে যাচ্ছিলাম। মাস ছয়েক আগে একদিন গভীর রাত্রে একটা বড় বাড়িতে আগুন লাগল। সংবাদ পেয়ে আমরা ছুটে গেলাম। শুনলাম ওটা মণিপুর মহারাজের এক আত্মীয়ের বাড়ি। অনেক কষ্টে বাড়ির লোকজনদের একে একে উদ্ধার করা হল, কিন্তু গৃহস্বামীর কন্যা কুমারী ভানুমতীকে কেউ বার করে আনতে পারল না। সমস্ত বাড়িটা তখন প্রলয়-আগুনে ঘিরে ফেলেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে কোন কর্মীই ভিতরে যেতে রাজি নয়। হঠাৎ অনিমেষ বলে উঠল—আমি যাব। অনেকে নিষেধ করল, কিন্তু ও শুনল না। পাঁচ-ছয় মিনিট আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে স্পন্দিত বক্ষে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর মূর্চ্ছিতা ভানুমতীকে দু'হাতে নিয়ে অনিমেষ বেরিয়ে এল। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে দুজনের কেউই বেশী আহত হয়নি। ভানুমতীর পিতা অনিমেষকে ডাকিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার এবং বহু ধন্যবাদ দিলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। এই সুদর্শন বাঙালী যুবক এবং লাবণ্যবতী মণিপুর-কুমারীর হৃদয়ের মধ্যে সেই প্রলয়ঙ্কর অগ্নি-রাশির মধ্যে থেকে বুঝি দুটি স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে প্রেমের প্রদীপ হয়ে জ্বলতে লাগল। অনিমেষ ও ভানুমতীর মধ্যে গোপনে প্রেমের আদান-প্রদান চলতে লাগল চিঠির মারফৎ। ফায়ার ব্রিগেডের এক মণিপুরী ছোকরা ছিল এই সব চিঠি-পত্রের বাহক। তার এক আত্মীয়া ভানুমতীর পিতৃগৃহে দাসীর কাজ করত। সে ছিল ওদিককার বাহক। কৃতজ্ঞা ভানুমতী তার জীবনদাতা অনিমেষকে শুধু প্রেম-নিবেদন করেই ক্ষান্ত হয় নি। চিঠির ভিতরে করে দশ হাজার টাকা এবং একটি বহুমূল্য হীরের আংটিও দিয়েছিল। অনিমেষ মহারাজার আত্মীয়ের দেওয়া টাকা এবং এই দশ হাজার ও আংটি সব একত্র করে একটা বাক্সের মধ্যে রেখেছিল। আমাকে অনেকবার দেখিয়েছে।

আমি অনিমেষকে নিষেধ করে-ছিলাম এই ব্যাপারে অধিক অগ্রসর হতে। কিন্তু হায়! প্রেম অন্ধ। সে বুঝতে পারেনি কি ভীষণ খেলা সে খেলছে। মহারাজার সৈন্য-বাহিনীতে কামদেব বলে একটি যুবক কাজ করে। সে একজন অভিজাত-বংশীয় মণিপুরী এবং বহুদিন থেকে ভানুমতীর প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে এই গোপন প্রণয়-ব্যাপারটা জানতে পারল এবং ভানুমতীর বাড়ির অন্য একজন দাসীর সাহায্যে অনিমেষকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করল। ফলে, একদিন গভীর রাত্রে ভানুমতী তাকে আহ্বান করেছে এই মিথ্যা সংবাদ পেয়ে অনিমেষ ওদের প্রাসাদের বাইরে এক বিশেষ স্থানে এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে উপরের একটা জানলা থেকে দড়ির মই নামিয়ে দেওয়া হল এবং অসন্দিগ্ধ অনিমেষ সেই মই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। প্রায় জানালার কাছাকাছি এসেছে এমন সময় মইয়ের দড়ি ঘরের ভিতর থেকে কেটে দেওয়া হল এবং অনিমেষ সেই পাঁচতলা থেকে সশব্দে আছড়ে পড়ল নীচের শান-বাঁধান চাতালের উপর। মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে ভানুমতীদের বাড়িতে অনেক হৈ-চৈ হয়েছিল, কিন্তু কি করে কি হল কাউকে জানতে দেওয়া হল না। আমি পরে বহু কষ্টে এই সব সংবাদ সংগ্রহ করেছি। অনিমেষ চলে গেছে আজ পনের দিন হল। যদি পারিস্ ওর দুঃখিনী মাকে একটু সান্ত্বনা দিস।—হ্যাঁ, আর একটা আশ্চর্য কথা। অনিমেষ মারা যাবার পর ওর সেই পনের হাজার টাকা এবং আংটির বাক্সটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভালবাসা নিস্। ইতি—

—সত্যবিলাস।

ট্রেনের ঘটনাটা এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হল। টাকা এবং আংটি সে নিজেই আমার হাতে পৌঁছে দিতে এসেছিল। পরদিন বাক্সটা ওর মায়ের হাতে তুলে দিলাম।

তীর্থযাত্রী — চিত্র: মানসরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী

● সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ●
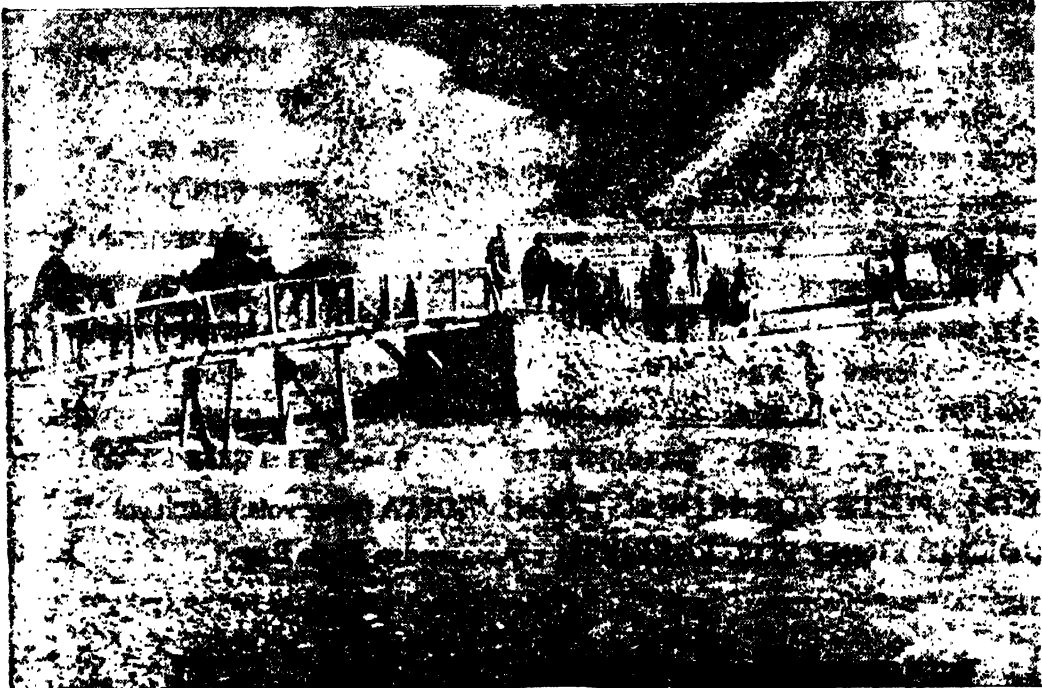
কালকূট-এর

কোথায় পাবো তারে

"কোথায় পাবে তারে' রূপে ও অরূপে মেশানো রাঢ়বঙ্গের এক বিচিত্র চিত্র। আকাশ গাছপালা প্রকৃতি, গ্রাম ও নগর, নানা পুজো পার্বণ মেলা, নানান সংস্কৃতির বিভিন্ন মানুষ এই বিশাল গ্রন্থে উপস্থিত। বাউল বৈষ্ণব ফকির শাক্ত শৈব সকলের রূপের হাটে বিশেষ করে নিবিড় হয়ে উঠেছে কিছু নরনারীর সুখদুঃখের অন্তরঙ্গ কাহিনী, যা উপন্যাসের থেকেও আরও বেশী কিছু, আ... গভীর এবং স্নিগ্ধ।

দাম : কুড়ি টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বেণীসংহার

কন্‌ট্রাক্‌টারী করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন বেণীমাধব চক্রবর্তী। একদিন রাতে তিনি হঠাৎ খুন হলেন। এ খুনের খবর শুনে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ ঠাট্টা করে বলেছিল—বেণীসংহার! তা বেণীসংহার বা বেণীবন্ধনই বটে! এমনই জটিল এবং দুর্ভেদ্য এ রহস্য জাল। এ গ্রন্থে ব্যোমকেশের সর্বাধুনিক গোয়েন্দা-উপন্যাস "বেণীসংহার" ছাড়াও "ছলনার ছন্দ" ও "রুম নম্বর দু-" নামে ব্যোমকেশের আরও দুটি দীর্ঘ গোয়েন্দা কাহিনী আছে।

দাম : চার টাকা

● আমাদের গল্প-উপন্যাসেতর গ্রন্থরাজি ●

অয়ান দত্তের

প্রগতির পথ ৩·০০

গণযুগ ও গণতন্ত্র ৩·০০

সুধীর ঘোষের

গান্ধীজীর দূত ১৫·০০

সুভাষচন্দ্র বসুর

তরুণের স্বপ্ন ৬·০০

সংকলন

কাশ্মীর '৬৫ ১০·০০

রাণু সান্যালের

শিবঠাকুরের আপন দেশে ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি ৫·০০

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৮·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৪·০০

শ্রীগৌরাঙ্গ ৩·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

নিবেদিতা লোকমাতা (১ম) ৩০·০০

লাল বল লারউড ৬·০০

নট আউট ৬·০০

শ্রীপান্থের

হারেম ৫·০০

ঠগী ৫·০০

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মেঘ বৃষ্টি রোদ ৩·০০

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের

ইন্দ্রজিতের আসর ৩·০০

বীরেন্দ্রনাথ সরকারের

রহস্যময় রূপকুণ্ড ৩·৫০

জওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ ২০·০০

আত্মচরিত ১২·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত ৭·০০

বিশ্বদেব বিশ্বাসের

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ৫·০০

সাগরময় ঘোষের

ঝরাপাতার ঝাঁপি ৪·০০

সম্পাদকের বৈঠকে ৬·০০

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর

বাংলার লৌকিক দেবতা ৬·০০

মুকুল দত্তের

ফুটবলের আইনকানুন ৬·০০

ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাসের

এভারেস্ট ডায়েরী ৯·০০

আর. জে. মিনির

চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ৪·০০

সরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য (কবিতা) ৩·০০

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

সুর ও সুরভি (কবিতা) ৩·০০

THE COMPLETE WORKS OF SISTER NIVEDITA (Four vols.) Each vol. Rs. 12·00

STUDENTS FIGHT FOR FREEDOM : Amarendra Nath Roy Rs. 6·00

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

আফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৪৭

বিক্রয়-কেন্দ্র : ৭৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯।

অলস মধ্যাহ্নে

—শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

● [illegible], কলকাতা—৩৩

যে প্রক্রিয়ার কথা লিখেছেন, তা অধিক পরিমাণে করলে মাংসপেশী শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তাই ঘটবে। অভ্যাস না কমালে কোন চিকিৎসাই ফল দেবে না।

প্রশ্ন ২ : দিনে অথবা রাত্রে ঘুমোবার সময় মুখে লালা জমে।

উত্তর : রোজ রাতে এবং দিনে ভাত খাবার পর দাঁত মাজবেন।

● শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন মজুমদার, গৌহাটি, আসাম—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায়, বাদকুল্লা, নদীয়া—

আপনার স্ত্রীকে Macalvit I. M. ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থা করবেন। এ ছাড়া সায়োপ্লেক্স লাইসিন (অ্যালবার্ট ডেভিড) চা চামচের দু চামচ করে খাওয়াবেন।

● শ্রীদিলীপকুমার রায়, টিকারহাট, লাকুরডি, বর্ধমান—

প্রশ্ন ১ : আমি দুই বৎসর যাবৎ হজমের গোলমালে ভুগিতেছি, যাহা খাই তাহা ঠিকমত হজম হয় না এবং পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত দাস্ত হয়। পেটে প্রচুর ছোট ছোট কৃমি আছে।

উত্তর : আপনি ওয়ারমিনল্ ওষুধ পর পর দু'রাত শোবার সময় ১ আউন্স করে খাবেন। তৃতীয় দিন থেকে দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু'চামচ করে টাকাকমবেক্স অথবা ডিজিপ্লেক্স খাবেন।

প্রশ্ন ২ : এর জন্য কোন চিন্তা নেই

● শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মথুরাপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি দীর্ঘদিন ধরে ভুগেছেন বলেই অত হতাশ হয়ে পড়েছেন। আপনি Micaldee 12 ইনজেকশন কুড়িটি নিন, দেখবেন অনেক সুস্থ বোধ করছেন। এ ধরণের উপসর্গ সহজে নিরাময় হবার নয়। না, সন্তানের মধ্যে

সাধারণত সংক্রামিত হয় না। আপনার স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা করবার কোন কারণ নেই, কেবল চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করে জেনে নিন অন্তঃসত্ত্বা কি না।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

● এইচ, এইচ, হাওড়া—

আপনি প্রথমে Adepin বা Antipar ওষুধ খেয়ে কৃমি সারিয়ে নিন, তারপর যে চিকিৎসা করেছিলেন, তাই আবার করুন, দেখবেন ভাল ফল পাবেন। অন্য উপসর্গগুলোর জন্য অত ভাবতে হবে না।

● শ্রীবাবলু গুপ্তা, টিপুক, তালাপ, আসাম—

প্রথম প্রশ্নের উত্তর : স্থান বদলের জন্য। কিছুদিন পরে আবার ঠিক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : একশ বছর পর্যন্ত বলা যায়। তারপরে আর যায় না।

● শ্রীশুভেন্দু দে, চন্দননগর, হুগলী—

প্রশ্ন ১ : আমি ভীষণ তোতলা হয়ে যাচ্ছি।

উত্তর : কোন কারণে আপনার মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি কোন চিকিৎসককে দেখান, কারণ যে ধরণের ওষুধ আপনাকে দেওয়া দরকার, তা লিখে প্রকাশ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ২ : আমার ভাইয়ের খুব হাঁপ ধরে।

উত্তর : আগে রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নিন হাঁপানি আছে কি না। না থাকলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন এবং পালমোকড্ (প্লেন) চা চামচের ২ চামচ করে সারা শীতকাল খেতে দিন।

● শ্রীনারায়ণচন্দ্র দেবসরকার, বেলানগর, হাওড়া—

আপনি Siocobin 500 mcg অথবা Macrabin 500 mcg ইনজেকশন চিকিৎসকের উপদেশমত একমাস নেবেন আর হাত-পায়ে মালিশ করবেন।

● শ্রীবাবুল বর্মণ, জোরহাট, আসাম—

প্রশ্ন : আমার মুখে ব্রণ হয়েছিল, সেরে গেছে, কিন্তু কালো দাগগুলো এখনও সারে নাই।

উত্তর : আপনি মুখে Siloderm (Neopharma) মলম দুবেলা মেখে দেখতে পারেন।

● শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায়, আলিপুর-দুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি—

গায়ের রং ফর্সা করার ওষুধ আমার জানা নেই। ছোট বোনের জন্য ভয় নেই। আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।

● শ্রীঅলককুমার নন্দী, গুড়গুড়িপাল, মেদিনীপুর—

আপনার ভাইপোকে দুবেলা ২ চামচ করে খাঁটি মধু পুরো শীতকাল খাইয়ে দেখুন।

● শ্রী এস নরেন্দ্র, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং—

আপনার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য দাঁতে টার্টার পড়ছে। আপনি আগে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে Digeplex অথবা Sioplex Enzyme দুমাস খান। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হলে দাঁত পরিষ্কার করিয়ে

নেবেন। ধূমপান না ছাড়লে আবার টা'র পড়বে।

শ্রী এস এস চক্রবর্তী, বেলঘরিয়া—

আপনি Antipar ওষুধ খাবেন আর Anusol মলম লাগাবেন।

শ্রীমঙ্গল এম এ, এস পি মুখার্জী রোড, কলি-২৬—

খাবার সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পরেই জল খাওয়া উচিত নয়, কারণ জল হজমী শক্তিধারক এনজাইমগুলিকে অনেক পরিমাণে অকেজো করে দেয়।

শ্রীখোকনচন্দ্র মাইতি, গোপীনাথ-পুর মেদিনীপুর—

প্রশ্ন: আমার বদহজম, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য প্রায় লেগেই আছে।

উত্তর: আপনি ভাত খাবার পর দুবেলা চা চামচের ২ চামচ করে Aminozyme দু মাস খাবেন।

নাম দিতে অনিচ্ছুক, দীঘি, ঘড়োয়া, সাঁওতাল পরগণা—

প্রশ্ন: আমার নিতম্বে দাদের মত কিছু হয়েছে, অত্যন্ত চুলকায়।

উত্তর: আপনি জায়গাটি সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে, Scabalcid লাগাবেন দিনে তিনবার করে। তেল যেভাবে মালিশ করে, তেমনিভাবে মালিশ করবেন। আণ্ডারউইয়ার, জাঙ্গিয়া, গেঞ্জী প্রভৃতি রোজ সাবান কাচা করে পরবেন।

শ্রীশ্যামসুন্দর প্রামাণিক, রেল-বাজার, শান্তিপুর—

আগে একমাস দুবেলা ভাতের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে দুধ-ভাত খান। টক ও ঝাল একদম খাবেন না। একমাস পরে কেমন থাকেন জানাবেন। আপনার স্ত্রীকে যে ওষুধ দিচ্ছেন, তাই খাওয়ান। চার-পাঁচ বার খেলে তখন ভাল হবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র সাহা, মমতা স্টোর্স, আগরতলা, ত্রিপুরা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনার পুত্রের যে জটিল রোগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রক্তের মধ্যে যে অংশ রক্তকে জমায়, সে অংশ অত্যন্ত অল্প আছে, সেই জন্য অনুরূপ উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। ওর চিকিৎসা বহুদিন ধরে করতে হবে। নিয়মিত ওকে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি ও দুধ খেতে দিন; দরকার হলে সারাজীবন খাবে। এ ছাড়া যে চিকিৎসা করাচ্ছেন, তাই করুন।

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, রাধামোহন-পুর, বাঁকুড়া—

আপনি দিনে দুবার করে চুলকানির জায়গায় Scabalcid মলম লাগাবেন, আর কৃমির চিকিৎসা করাবেন।

শ্রীকাশীপতি ঘোষ, সাঁইথিয়া, বীরভূম—

আপনার চিঠি পড়লাম। আপনি অহেতুক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কোন ভয় নেই। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে ওয়াই-নিমিনণ (ক্যালকাটা কেমিক্যালস্) খাবেন, তিনমাস ধরে, এ ছাড়া পুরো শীতকালটা সকাল বিকাল ২ চামচ করে খাঁটি মধু খাবেন।

শ্রীমৈনাক চৌধুরী, রামগড়, গড়িয়া, কলি-৪৬—

প্রশ্ন ১: প্রতি বছর শীতকালে আমার মুখে সাদা সাদা ছুলি হয় খুব বেশি পরিমাণে।

উত্তর: আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে Siomethionine Forte খাবেন, দুমাস ধরে।

প্রশ্ন ২: আমার কোথাও বের হতে হলে পায়খানা পায়।

উত্তর: আমার মনে হয়, আপনি পুরনো আমাশয়ে ভুগছেন। আপনি Amicline অথবা Davoquin বড়ি দিনে তিনটে করে দশদিন খাবেন।

শ্রীঅনিল রায়, বাজেশিবপুর রোড, হাওড়া—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে Waterbury's Compound with vitamins তিনমাস খাবেন। বিবাহে বাধা নেই।

শ্রীনলিনী (ছদ্মনাম), মধ্য হাওড়া—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে Pulmocod (Plain) খাবেন, তিনমাস ধরে। বিয়েতে বাধা নেই।

শ্রীমহাদেব দে-রায়, পদ্ম ঘোষ বাগান, লিলুয়া—

আপনার স্ত্রী Migraine রোগে ভুগছেন। আপনি ভিটামিন বি ১২ ইন-জেকশন এবং Stemetil অথবা বড়ি Ambodryl খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন। বহুল পরিমাণে কমবে।

উকাসা, শ্যামপুর, হাওড়া—

আপনি সকালে এবং বিকালে চা চামচের দু চামচ করে Nervigor with vitamins and Formates.

শ্রীশঙ্করলাল আঢ্য, ডালতলা, বাঁকুড়া—

আপনার কোন রোগ নয়। সপ্তাহ-খানেক মিশ্রীর সরবৎ খেলেই কমে যাবে।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ, কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি—

নিয়োগাডাইন অন্ততপক্ষে তিন মাস খেতে দেবেন। স্ত্রীর অমতে কোন রতিসঙ্গম করা বিধেয় নয়।

শ্রীমঞ্জুলাল গোস্বামী, কাপাসডাঙ্গা, হুগলী—

আপনার উপসর্গগুলি পড়লাম। কোন ভয় নেই। ওগুলো সকলেরই হয় এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

শ্রীকমলকুমার ঘোষ, ঝালুয়ার রোড, মাকড়দহ, হাওড়া—

প্রশ্ন ১: মুখে ব্রণ হয় কেন?

উত্তর: নানা কারণে।

প্রশ্ন ২: আমার দাঁতের গোড়ায় মাঝে মাঝে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

উত্তর: আপনি Hygina Granule দিয়ে দুবার Gargle করবেন।

শ্রীঅজয় দাশ, বেলগাছিয়া, হাওড়া—

প্রশ্ন ১: ডান পায়ের গোড়ালীতে এমনভাবে চোট লাগিয়াছে, ঠিক ধরিতে পারি নাই। প্রায় ৫ মাস হইল। মালিশ করিয়া কোন ফল পাই নাই।

উত্তর: মালিশ করার জন্যই ব্যথা কমছে না। মালিশের বদলে আপনি

মুনের পুঁটলির সেঁক দিন, অথবা Infra Ray-র সেঁক দিন, দিনে তিনবার করে। এ ছাড়া Siosylamide বড়ি দিনে তিনটে করে (সকালে ১, দুপুরে ১, রাতে ১) দুমাস খাবেন।

প্রশ্ন ২ : প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ অম্বলে ভুগিতেছি।

উত্তর : জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে খাবেন। এ ছাড়া দুবেলা ভাত খাবার পর একগ্লাস করে দুধ খাবেন।

● শ্রীরেবতীরঞ্জন দে, গোপালনগর, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন : আমি তোতলা। এর কি কোন নির্দিষ্ট ঔষধ বা চিকিৎসা আছে ?

উত্তর : সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, তবে মনের জোর, অভ্যাস এবং পুষ্টিকারক ওষুধে বহুল পরিমাণে কমে যায়।

● শ্রীমান পিলু, হাওড়া—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। কোন ভয় বা ভাবনা নেই। ওগুলো কোন রোগ নয়, অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।

● শ্রীশিশির বসু, পুরাতন বাজার, শ্রীরামপুর, হুগলী—

প্রশ্ন : আজ ৬।৭ দিন হইল, তলপেটের ডান দিকটা কনকন করিতেছে।

উত্তর : আপনি এ বিষয়ে দ্বিধা না করে চিকিৎসক দেখান এবং তাঁর মতানুযায়ী চিকিৎসা করুন। তলপেটের ডানদিককে অবহেলা করবেন না। ওই দিকে অ্যাপেণ্ডিক্স থাকে।

● শ্রীনীরদ ভট্টাচার্য, দমদম, কলি-৫২—

আপনার লম্বা চিঠি পড়লাম। আপনি আমাশয়ের চিকিৎসা করুন, তার সঙ্গে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স চা চামচের ২ চামচ করে দুবেলা ভাত খাবার পর খাবেন, দু মাস।

● শ্রীমতী উমা চন্দ, কলি-১২—

আপনার চিঠি পড়লাম। কোন ভয় নেই। আপনি যা লিখেছেন, তা কোন রোগ নয়। আপনি স্বাভাবিক-ভাবে কাজকর্ম করে যান। আপনার বান্ধবীর বিষয়ে জানাই, অনেকের দেরি হয়।

● শ্রীরমা সেন (ঠিকানা গোপন রাখতে অনুরোধ করেছেন)—

প্রশ্ন : আমার ডান হাতের কাছে একটা সাদা দাগ জন্মের থেকে আছে, আমার বয়স ২৫। এতদিন আমি কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করি নাই। দাগটা একইভাবে আছে।

উত্তর : আপনি লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেকশন নিয়ে দেখুন, তবে এতদিনের পুরনো দাগ কমা সন্দেহ-সাপেক্ষ।

● শ্রীসুতপা মিত্র, আনোয়ার শা রোড, কলিকাতা—

প্রশ্ন ১ : স্বামী-স্ত্রীতে সপ্তাহে কতবার মিলিত হওয়া উচিত ?

উত্তর : সপ্তাহে দুবারের বেশি মিলিত হলে শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর জানাই, Nevrovitamin 4 (adult) সকালে ২টি বড়ি, রাতে ২টি বড়ি একমাস খেতে দেবেন।

● শ্রীমতী বাণী ব্যানার্জি, কলি-১৪—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● মিসেস বাগচি, দুর্গাপুর-৫—

ওষুধে যখন শ্বেতস্রাব কমছে না, তখন Cauterization করিয়ে নিন, দেখবেন স্রাব কমে গেছে।

● শ্রীমতী গৌরী চ্যাটার্জি, সুরেন্দ্র-নাথ ব্যানার্জী রোড, কলি-১৪—

আপনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ভয় পেয়ে চিঠি লিখেছেন। আপনি যত ভয় পাবেন, ততই শুকিয়ে যাবেন। আপনি ওসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজকর্ম এবং পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকবেন। এ ছাড়া Sharkoferrol চা চামচের দু চামচ করে খাবার পর তিন মাস খাবেন।

● শ্রীমতী রমা রায়চৌধুরী, চণ্ডীতলা লেন, কলি-৪০—

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করলে বহুল পরিমাণে ব্রণ কমে যাবে। মুখে কোন কিছু মাখবেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই আপনি ব্রাশে দাঁত মাজবেন না। কলগেট পেস্ট অথবা পাউডার দিয়ে আঙুল দিয়ে মাজবেন। মাড়ির ওপর চাপ দিয়ে মাজবেন। দাঁত নড়লেও আঙুল দিয়ে বা জিব দিয়ে নাড়াবেন না।

● শ্রীমতী সঞ্চিতা চৌধরী, কলি-২৮—

আপনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে চিঠি লিখেছেন। ও ধরণের উপসর্গ অনেকেরই হয়, এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Dolorina Cordial ওষুধ খাবেন দু মাস ধরে। স্তনবিষয়ক কিছু ভাববেন না।

● শ্রীমতী চয়নিকা, কচবিহার, উত্তরবঙ্গ—

আপনি Dinoesterol Cream মুখে মেখে দেখতে পারেন।

● শ্রীমতী জয়ন্তিকা, বিহার—(ছদ্মনাম)—

আপনার এ ধরণের ধারণা হল কেন? আপনার প্রশ্নকে বেকার মেয়েদের বাঁদরামি মনে করব কেন? না জানা জিনিষ, জানবার আগ্রহ সবসময়েই থাকা উচিত। মাসিক সংক্রান্ত যে প্রশ্ন করেছেন, তা অল্প-বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের হয়ে থাকে। অসহ্য হলে ওষুধ ব্যবহার

করতে হয়। অল্প ব্যথা মানিয়ে নিতে হয়, কারণ অল্পবিস্তর প্রতিবারেই হবে। ওঁর কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করলেই উপসর্গ কমে যাবে। স্তনবিষয়ক যে প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তরে জানাই, প্রত্যেকের নিজের দেহের অনুপাতে স্তনের পরিসাধন ঘটে। অপরের সঙ্গে তুলনা করে কোন লাভ নেই। শেষ প্রশ্নের উত্তরে জানাই মেয়েদের শরীর থেকেও রতিসঙ্গমের পর এক-প্রকারের তরল পদার্থ নির্গত হয় এবং তখনই চরম পুলক সৃষ্টি হয়। চুল নিয়ে ভাববেন না। যত ভাববেন, তত পড়বে।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, টিটাগড়—

প্রশ্ন: আমার বয়স ২০।২১। লম্বা ৫ ফু: ২ ইঞ্চি। স্বাস্থ্য রোগাটে ধাঁচের কিন্তু সেই অনুপাতে স্তনদ্বয় ভীষণ ছোট, একেবারে নেই বললেই চলে।

উত্তর: শরীরে চর্বি কম থাকলে, স্তনের পুষ্টি কম হতে পারে। এ জন্য ভাববার কিছু নেই। সারকোফেরল বা ফেরাডল জাতীয় ওষুধ মাস তিন-চার ক্রমাগত ব্যবহার করুন, দেখবেন উপকার পাবেন।

● শ্রীস্নেহাংশু ব্যানার্জি, বিড়লাপুর, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন: আজ প্রায় একমাস হইল আমার মুখে খুব ব্রণ হইতেছে।

উত্তর: ব্রণ কমাবার প্রধানতম উপায় হল, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা এবং ভাল ঘুম হওয়া। আপনি নিয়মিত একমাস ভাতের সঙ্গে শাক বেশি করে খাবেন, দেখবেন ব্রণ কমে গেছে।

● শ্রীমতী জ্যোৎস্না বিশ্বাস, ঠিকানা প্রকাশ করতে চান না—

আপনি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রত্যেক মেয়েরই হয়। যাঁরা বেশি স্পর্শকাতর, তাঁরা উপসর্গটি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। আপনি ও বিষয়ে একদম ভাববেন না। শরীর দুর্বলতার জন্য হেপাটোগ্লোবিন চা চামচের দু চামচ করে দুবেলা প্রধান খাবারের পর খাবেন দু মাস।

● শ্রীকমলেশ দে, নবীন দাস রোড, কলি-৫০—

আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা প্রত্যেক পুরুষেরই হয়। ও নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। দুবেলা খাবার পর একটি করে নেব্রো-ভিটামিন-৪ (বয়স্কদের জন্য) একমাস খাবেন।

● জিজ্ঞাসু—

প্রশ্ন ১: আমি খুব সর্দিকাশিতে ভুগি—

উত্তর: আপনি সমস্ত শীতকাল ধরে পালমোকড (প্লেন) দুবেলা দু চামচ (চা চামচ) করে খাবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, কোন বিশেষ ওষুধের গুণ ও দোষ ব্যাখ্যা করা নিয়মবিরুদ্ধ।

● জনৈক ব্যায়াম শিক্ষক, জামসেদপুর—

মোটা না হবার কারণ নিয়মিত ব্যায়াম করলে শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না। যেদিন ব্যায়াম ছেড়ে দেবেন, দেখবেন সেদিন থেকে চর্বি হু-হু করে বেড়ে যাবে।

● শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ও মি: মণ্ডল, এন, এন, এস হোস্টেল, কোচবিহার—

প্রশ্ন ১: আমরা অধিকাংশ আবাসিকবৃন্দই অধিকাংশ সময়েই পেটের অসুখে আক্রান্ত হই। আপনার যদি এমন কোন ঔষধের নাম জানা থাকে, যা খেলে আমরা সবকিছুই খেতে পারব এবং পেটের অসুখ থেকে নিস্তার পাব, তাহা জানাবেন।

উত্তর: আপনারা সকালে একটি সন্ধ্যায় একটি Davoquin বড়ি একমাস খাবেন, তারপর একমাস ছেড়ে দিয়ে আবার একমাস খাবেন। আপাতদৃষ্টিতে কোন উপসর্গ না থাকলেও খাবেন, দেখবেন অনেক কমে গেছে। ভাজা কোন জিনিস খাবেন না।

প্রশ্ন ২: ব্রণ, ফোঁড়া, ছুলি এই ধরণের Skin diseaseগুলি কি রক্তদোষ হেতু উৎপন্ন হয়, না অন্য কারণেও হতে পারে, জানাবেন।

উত্তর: রক্তদোষ কথাটা অত্যন্ত অস্পষ্ট। ব্রণ হয় সাধারণত হরমোনের গোলমালে। ফোড়া, ছুলি জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়ে সৃষ্টি হয়। শরীরে রোগ থাকলেই, রক্তে দোষ তৈরী হয়, যে দোষ কোন ভয়ের নয়।

●শ্রীরণেশ রুদ্র, জামসেদপুর—

এতদিনের পুরনো অর্শ ওষুধে সারবার সম্ভাবনা কম। আমার ব্যক্তিগত মত অপারেশন করিয়ে নেওয়া। জামসেদপুরে অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং ভাল হাসপাতাল রয়েছে। অনায়াসে অপারেশন করিয়ে বাকি জীবনটা সুস্থভাবে কাটাতে পারবেন।

● শ্রীবিভূতিভূষণ বেরা, বড়িষা, কোলামার্ক, মেদিনীপুর—

প্রশ্ন ১: হাত ও পা থেকে কি কারণে এত ঘাম বাহির হয় এবং এর প্রতিকার কি?

উত্তর: মানসিক দুশ্চিন্তার জন্য হয়। আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়ে মনে হয়, আপনি নানা কারণে খুব চিন্তাগ্রস্ত। আপনি ঘাম নিয়ে একটুও ভাববেন না, দেখবেন, ঘাম আপনা থেকেই কমে গেছে।

প্রশ্ন ২: কিছুদিন থেকে দেখছি আমার পায়ের লোম উঠে যাচ্ছে। লোম ওঠার আগে, লোমের গোড়ায় ভাতের মত সাদা শুকনো একপ্রকার পদার্থ জমে এবং এই পদার্থটি উঠিয়ে ফেলতে গেলেই সমস্ত লোমটি উঠে যায়।

উত্তর: আপনি দু পায়ে ভাল করে পেনিসিলিন মলম দিনে দুবার করে মালিশ করবেন, একমাস ধরে।

● শ্রীমতী শঙ্করী লাহিড়ী, ভট্টাচার্য পাড়া লেন,, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া—

আপনি এবং আপনার ছোট বোন দুবেলা ভাত খাবার পর, চা চামচের দু চামচ করে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দু মাস খাবেন। আপনি ভাল নারকোল তেল মাথায় মাখবেন, ছোট বোনের জন্য স্থানীয় চিকিৎসক বা সরকারি

তাই চলবে। তার সঙ্গে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাবেন।

● শ্রীনিতাই ব্যানার্জি, টিটাগড়, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন: স্বাস্থ্যবান হইতে গেলে কি ওষুধ কখন খাইতে হইবে ?

উত্তর: স্বাস্থ্যবান ওষুধে হয় না। ওষুধ স্বাস্থ্য তৈরী করতে সাহায্য করে; আসলে পেট ভরে ডাল-ভাত খেয়েই স্বাস্থ্য তৈরি করতে হয়। আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Sionol Syrup অথবা Pulmocod (Plain) দু মাস ধরে খাবেন।

● শ্রীনারায়ণকুমার ঘোষ, আমনমোরী, ইনসুরা, হুগলী—

আপনি বহুদিন থেকে আমাশয় রোগে ভুগছেন বলে মন ভেঙে পড়ছে। আপনি কোন ভাজা জিনিস খাবেন না। তেল ঘি মশলা কিছুদিন পরিহার করুন, তাছাড়া Intestopan Q ট্যাব সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি সাতদিন খান, অথবা এমেটিন ইনজেকশন নিয়ে দেখুন।

● জ্ঞানভিক্ষু, হাওড়া-১—

প্রশ্ন ১: জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা খাবার বড়ি ব্যবহার করি। এখন যদি প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের দুজনকেই ২।৩ মাসের জন্য আলাদা থাকতে হয়, তাহলে কি ঐ ২।৩ মাস প্রত্যহ বড়ি খাবার প্রয়োজন আছে?

উত্তর: না, প্রয়োজন নেই, তবে এর মধ্যে কথা আছে। ধরুন আপনার স্ত্রী দিনসাতেক বড়ি খেয়েছেন এমনসময় অন্য জায়গায় চলে গেলেন। স মাসটা হিসেবমত পুরো খাবেন; তা না হলে মাসিক এলোমেলো হয়ে যাবে। তারপর যখন ফিরবেন, ধরুন মাসিক বন্ধ হয়ে যাবার দশদিন পরে ফিরে এলেন। তাহলে দশ বা এগারো দিনের সময় থেকে খাবেন না। হয় সে মাসের মাসিক আরম্ভ হবার পাঁচদিন থেকে খাবেন, আর নইলে পরের মাস থেকে খাবেন। মাঝখানের দিনগুলো সাবধানে থাকবেন, সন্তান-সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।

প্রশ্ন ২: সন্তান জন্মানোর পর যখন মিলিত হব, তখন কি যেদিন থেকে মিলিত হব, সেইদিন থেকেই বড়ি খেতে আরম্ভ করবে ?

উত্তর: না। বড়ি মিলিত হবার দিন ধরে খায় না। খেতে হয় মাসিকের হিসেব ধরে। যে মাসে মিলিত হবেন, আগে থেকে ঠিক করে নেবেন, তারপর সেই মাসের মাসিক সুরু হবার পাঁচদিন থেকে বড়ি খাওয়াবেন।

● শ্রীঅরুণ দে, চরাকুড়ি, করিমগঞ্জ—

আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি Davoquin বড়ি খাবেন ১৫ দিন ধরে।

● শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, নাখাল ঘোষ লেন, কলি-১০—

আপনি নেভ্রোভিটামিন—৪ (এ্যাক্টোল্ট) বড়ি একবেলা ১টি, ওবেলা ১টি একমাস খাবেন।

● শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বল্লভপুর, মেদিনীপুর—

আপনি এমিক্লিন বড়ি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি করে ১০দিন খাবেন। এ ছাড়া ভাত খাবার পর টাকাকমবেক্স চা চামচের ২ চামচ করে একমাস খাবেন।

● এম—(এর বেশি প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক), সোনামুড়া—

আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা কোন অসুখ নয়। ও নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সংগে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

● শ্রীমতী অণিমা ভট্টাচার্য, শীলপাড়া লেন, কলি-৩০—

আপনি ছেলেকে Cremosuxidine অথবা Sulfakaotin ২ চামচ (চা চামচের) করে দিনে দুবার করে সাতদিন খাওয়াবেন।

● শ্রীমতী স্বপ্না দত্ত, কলি-১৫—

আপনার আগের পত্র আমাদের হাতে আসে নি ; এলে যথাসময়ে উত্তর দেওয়া হয়। আমরা কোন চিঠি তুলে রেখে দিই না, সেইজন্য আগের চিঠির উল্লেখ করলে খুব অসুবিধা হয়। আপনি বর্তমান চিঠিতে কোন উপসর্গের কথা লেখেন নি বলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।

● শ্রীনিমাইচন্দ্র ধর, বৈকুণ্ঠপুর, ফুলেশ্বর, হাওড়া—

প্রশ্ন ১ : স্বাস্থ্য শীর্ণকায়, পেটে ছোটবেলা থেকে ক্রিমি আছে।

উত্তর : এ্যান্টিপার অথবা ওয়ারমিনল দুবেলা চা চামচের ২ চামচ করে সাতদিন খাবেন। পনেরো দিন বাদ দিয়ে আবার সাতদিন খাবেন।

প্রশ্ন ২ : অম্লরোগ সারানোর উপায় কি ?

উত্তর : বিভিন্ন রকমের Antocids বাজারে পাওয়া যায়। তার যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারেন।

● শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নাকতলা, কলি-৪৭—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর এক-গ্লাস করে গরম দুধ খাবেন অন্তত-পক্ষে তিন মাস।

● শ্রী এম পি মন্দোৎ, ঘাটোর, লাভপুর, বীরভূম—

প্রশ্ন ১ : আমার একটি পত্রের জন্ম হইতে ডান পায়ের পাতার মাঝখান হইতে বাঁকা হইয়াছে। বয়স ২৫ দিন।

উত্তর : অত ছোট বয়সের বাঁকা নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি সার্জিক্যাল সু করিয়ে নিয়ে পরাবেন, দেখবেন কমে গেছে।

প্রশ্ন ২ : আমার বৌদির কোন সন্তান হয় নাই। বিবাহ ১২ বৎসর পূর্বে হইয়াছে। অপারেশন করিয়া বা ঔষধ দিয়া সন্তান লাভের কোনরূপ উপায় থাকিলে জানাইবেন।

উত্তর : আপনার বৌদির অপারেশন করলে সন্তান হবার সম্ভাবনা থাকবে, তার আগে আপনার দাদার বীর্য পরীক্ষা করিয়ে জেনে নিন শুক্রকীট সবল আছে কি না ?

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনে পড়ে একদিন কৈশোরের
চপলতা মাঝে তোমার সহস্র আনাগোনা,
তোমার সে ভয়হীন দ্বিধাহীন
অনাবিল উচ্ছলতা ভরা
নিবিড় সান্নিধ্য আমায় করেছিল দান
জীবনের পূর্ণ পরিচয় পুলক স্পন্দন;
বিকশি উঠিয়াছিল স্নেহের সোহাগ
তোমা লাগি সর্ব সত্তা মাঝে ;
অকৃপণ হস্তে তাই দিয়াছি বিলায়ে
তোমার অস্তিত্ব ঘিরি অফুরন্ত প্রাণের হিল্লোলে।
তুমি দিয়েছিলে সাড়া, সর্ব আকুলতা দিয়ে
তুলে নিয়েছিলে, অন্তরের নিবিড়তা দিয়ে
দিতে চেয়েছিনু যাহা তোমার উদ্দেশ্যে;
"আজ আমি যাই ভেসে",—
কালের গহ্বর মাঝে,—যেথা হ'তে
বিরাট দায়িত্বভরা কঠিন কর্তব্যের
এক আসে আহ্বান

বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে আনন্দের দিনগুলি হ'তে
নির্বিকার ব্যথাভরা এক দুস্তর ব্যবধান
তবু, দিনশেষে যখন নামিয়া আসে
রজনীর কালো অন্ধকার;
উন্মনা আমি,—বসে থাকি বাতায়ন পাশে
অতীতের স্মৃতিকথা করিয়া মন্থন,
গুঞ্জরিত হয় শুনি আমার হৃদয়ে
নহে নিরাশায় যবনিকা পাত,
নহে ইহা পূর্ণচ্ছেদ—চির অন্তরাল;
এ শুধু ক্ষণিকের অগোচরে
মৌন আকুলতা এক কঠিন বন্ধনে
বেঁধে রাখে স্মৃতি কথাগুলি
নিভৃত অন্তরে, লয়ে আশা
বৃথাই যাবে না কিছু যাহা আমি দিয়েছিনু
সযতনে তোমারে বিলায়ে
মোর স্নেহ সুধা ভালোবাসা দিয়া।

যদি কোনদিন কঠিন কর্তব্যঘেরা
সংসারের আবর্তন বিবর্তনে
নিজেরে হারায়ে ফেলি দায়িত্বের গুরুভার মাঝে,
আশার কুসুমগুলি না পারে ফুটিতে;
তবু, কল্পনার ভাবরাজ্যে বসিয়া বিরলে,
অতীতের ইতিহাসখানি ধরিয়া সম্মুখে
গেয়ে যাবো ফেলে আসা জীবনের গান,
তোমারই উদ্দেশ্যে।

॥ ইন্দ্রসেন ॥

"বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হেষে অশ্ব, গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু, মুহুর্মুহু হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য,—কিন্তু কোন হেতু ?"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ঘরোয়া অশান্তি আর কোঁদল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। ঘর থেকে বাহিরে—মন বেরে চলে বার বার। চার দেওয়ালের ঘর থেকে বেরিয়ে যখনই বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই মহারাজার চিত্ত যেন আক্ষেপের আতিশয্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সময় অতিবাহিত হয়ে চলেছে, অথচ কাজের মত কাজ এখনও কিছুই করতে পারলেন না প্রতাপ। পারিষদ আর অনুচরদের কানে কানে তিনিই চুপিচুপি তাঁর গোপন-স্বপন কথা শুনিয়েছেন—এই দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে। সমগ্র বঙ্গদেশ থাকবে বাঙালীর অধীনে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা ধারণ করে' বঙ্গসন্তানগণ—তারাই তার প্রমাণ দেবে।

প্রতাপ জানেন, সম্রাট আকবরের শাসন-শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্তি দিতে হলে আরও অনেক বেশি শক্তি অর্জন করতে হবে। এখন যদিও তিনি অসীম পরাক্রমশালী, তবুও প্রতাপের আত্মতুষ্টি আসে না। মধ্যে মধ্যে কেমন যেন সংকোচ বোধ করেন মহারাজা। তখনই মনে মনে হিসাব কষতে থাকেন। সৈন্যসংখ্যা কার কত? গোলাবারুদের পরিমাণ কী ? রণতরীর তালিকায় সংখ্যাধিক্য কার ?

সময় নেই, অসময় নেই, মাঝে মাঝে কাকেও কিছু না জানিয়ে অশ্বারোহণে যাত্রা করেন মহারাজা। ধাবমান অশ্বের পিছু পিছু ধাওয়া করতে থাকে প্রতাপের দেহরক্ষীরা। কোন্ পথে গেলেন মহারাজা ? পথের পথিকদের শুধোয় দেহরক্ষীর দল। কেউ কেউ দেখিয়ে দেয় অঙ্গুলি-নির্দেশে। কেউ বলে,—ঐ তেপান্তরের মাঠ ধরে ছুটে গেছে মহারাজার অশ্ব।

অবশেষে সন্ধান পাওয়া যায়। ধুমঘাটের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছেন প্রতাপ। গেছেন জাহাজঘাটায়। রণপোত তৈয়ারির কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে—স্বচক্ষে দেখতে চান মহারাজা। দক্ষ কারিগরের দল দিবারাত্র কাজ করছে। হাতুড়ী ঠুকছে, পেরেকের মাথায়। করাত চলছে সশব্দে। সমুচ্চ ভারায় উঠে জাহাজ-নির্মাণের কাজ পরিচালনা করছেন সেনাপতি রডা।

বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে সকল কিছু লক্ষ্য করেন প্রতাপাদিত্য। ভারা থেকে তরতরিয়ে নেমে আসেন রডা। আনতভঙ্গীতে সেলাম ঠুকে বলেন,—মহারাজার জয় হোক।

প্রতাপাদিত্য বলেন,—রডা, কাজ এগোয় না কেন ? এত মন্থরগতিতে কাজ করলে চলবে না। তাড়া লাগাও। আরও লোক দাও।

রডা বলেন,—দেড় হাজার লোক লাগিয়েছি মহারাজা। পুরোদমে কাজ চলছে।

হোগলার ছাউনির তলায় শত শত হাপর জ্বলছে। দূর থেকে দেখায় যেন সারি সারি অগ্নিকুণ্ড। ধাতব ঝঙ্কার শোনা যায় অবিরত। কাক চিল বসতে পায় না। কারও কথা শোনা যায় না। সকল শব্দ ছাপিয়ে ওঠে রডার কণ্ঠস্বর। তাঁর হাতে শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক। কাজে অবহেলা দেখলেই চাবুক চালাতে থাকেন রডা। অমনোযোগী কর্মীদের আদুড় পিঠ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। প্রতিবাদ জানাবে এমন সাহস কারও নেই।

ধুমঘাট যেন এক কৃত্রিম রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করেছে।

দেখতে দেখতে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগে মনে। কোন স্থানে বহুবিধ আয়ুধসম্পন্ন সৈন্যগণ নানাপ্রকার পরিচ্ছদে লোমহর্ষণ নকল লড়াই করছে। সেই সঙ্গে চলেছে বীররসোদ্দীপক রণবাদ্য। শুনতে শুনতে কাপুরুষ-হৃদয়েও শোণিত উষ্ণ হয়ে ওঠে। কোন স্থানে অদ্ভুতদর্শন মৃন্ময়-দুর্গ অত্যন্ত অধ্যবসায়-সহকারে নির্মিত হতেছে। দুর্গরক্ষার জন্য কোথাও কোথাও নকল কামান স্থাপিত হয়েছে। দুর্গশিখরে বাঙলার জাতীয় পতাকা উড়ছে।

অশ্বপৃষ্ঠে প্রতাপ। কোথাও যেন স্থির থাকতে পারেন না অধিকক্ষণ। কাজে খুঁত চোখে পড়লেই গর্জে ওঠেন যেন। তখনই রডার হাতের চাবুক সপাং সপাং শব্দ তোলে।

মহারাজা সুর নামিয়ে প্রশ্ন করেন,—রডা, বিদেশী বণিকদের নিকট হতে আর কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করলে ?

—হাঁ, মহারাজা। কাল মাঝ-রাতে ডাচ পাইরেটরা লুকিয়ে এসেছিল। আড়াই শত বন্দুক দিয়ে গেছে। ভারী আচ্ছা গান আছে। আজ সকালে ট্রায়াল চালিয়ে দেখেছি।

—ডাচরা কিসের বিনিময়ে দিয়েছে রডা ?

প্রতাপাদিত্য বলেন খুশ-মেজাজে। সহাস্যে।

—পঞ্চাশ গোল্ড মোহর মহারাজা। দাবী করেছিল বহুৎ বেশি। তিন শত গোল্ড মোহর। শেষে পঞ্চাশেই রাজী করায়েছি।

মহারাজা বলেন—ঢালাও হুকুম দিয়েছি রডা, যত পারো অস্ত্র সংগ্রহ কর। যে যা দেয়। অর্থপ্রদানে কার্পণ্য করিও না। ক্ষণেক থেমে প্রতাপ আবার বলেন,—সূর্যকান্তকে দেখি না কেন ? সূর্য কোথায় ?

রুদ্র বলেন,—চাঁদমারিতে তিনি আছেন মহারাজা। গানিং-এর আওয়াজ শুনছেন না?

সত্যিই বন্দুকবাজীর গগন-বিদারক শব্দে কান পাতা দায়। সৈন্যদের শিক্ষাদানের কাজে লেগেছেন সূর্যকান্ত। বলতে গেলে সেই সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে। প্রকৃতি শুভ্র রূপ ধরতে না ধরতে।

প্রতাপের অশ্ব ছুটলো। দেখতে চললেন, সূর্যকান্তর শিক্ষা-পরিচালনা। অস্ত্রবিদ্যায় সূর্যকান্তের দক্ষতা অতুলনীয়। তাই তাঁকে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োগ করেছেন প্রতাপ।

মহারাজাকে দেখেই হাতের বন্দুক নামিয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকালেন সূর্যকান্ত। দূরের লক্ষ্যবস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন প্রতাপ। শিক্ষার্থী সৈন্যদের লক্ষ্যভেদ দেখতে থাকেন কুঞ্চিত চোখে। রৌদ্রালোকে অশ্বপৃষ্ঠে স্থির প্রতাপকে দেখায় যেন প্রস্তরমূর্তির মত। সংকল্পে তিনি যেন অবিচল অটুট। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়।

সৈন্যমহলে বার্তা ছড়িয়েছে। মহারাজা স্বয়ং এসেছেন পরিদর্শনে। আগেভাগে না জানিয়ে এসেছেন অতর্কিতে।

মহারাজা বললেন,—সূর্যকান্ত, জীন গারী কোথায়? তাকে দেখি না কেন?

জীন গারী পর্তুগীজ শ্রমিকদের মুখ্য প্রতিনিধি। তার অধীনে দশ সহস্র অগ্নিবেটকর্মা কর্মী আছে।

সূর্যকান্ত বললেন,—জীন গারী ঘুমিয়ে পড়েছে মহারাজা।

প্রতাপ বললেন,—কেন? রাত্রে কী নেশার মাত্রাটা কিঞ্চিৎ—

সূর্যকান্ত বলেন,—না মহারাজা। গত রাত্রি জীন গারী বিনিদ্র যাপন করেছে।

—কেন?

—জীন গারীর অধীনের শ্রমজীবীরা গত রাত্রে অধিক খাদ্যের দাবী জানিয়ে আন্দোলন করেছে। তাদের আর কিছুতেই শান্ত করতে পারে না। কয়েকজনকে ভীষণ প্রহার করেছে সে। সারারাত খণ্ডযুদ্ধ চলেছে পর্তুগীজদের ব্যারাকে।

প্রতাপ বললেন,—তারা কী চায়?

সূর্যকান্ত হাসলেন। বলেন,—তারা চায় পুরা একটি ছাগের মাংস খেতে।

মহারাজা বললেন,—তাই দেওয়া হোক সূর্যকান্ত। তুমিই নির্দেশ দিও। আমার ভাণ্ডারে খাদ্য-রসদের কোন অভাব নাই।

সূর্যকান্ত বললেন,—তা হয় না মহারাজা। আহার্য আপনি যতই বৃদ্ধি করেন, ওদের তৃপ্ত করতে পারবেন না। জীন গারী বলে, বাঘকে পুষতে হলে পুরা খানা দিলে চলবে না। অর্ধভুক্ত রাখতে হবে।

দেখতে দেখতে অন্যান্য সেনাপতিরা উপস্থিত হলেন। তাঁরাও জানতে পেরেছেন মহারাজার আগমন-সংবাদ। শংকর, রঘু, মদন মাল, প্রতাপ সিংহ প্রমুখ সকলেই একে একে এসে দেখা দিলেন।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—সকলেই প্রস্তুত থাকিও। যে কোন লগ্নে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। কী প্রকারে পশুপ্রায় মোগলগণকে আমাদিগের জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করা যায়? কেমনে আবার হিন্দু-বিজয়-বৈজয়ন্তী সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করে উড্ডীন হতে পারে? এই সকল দুর্বহ চিন্তা প্রতিক্ষণে আমার হৃদয়-কন্দরে বৃশ্চিকদংশনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা প্রদান করছে। কত শত দেশবাসী ক্ষুধার্ত জীবন পরিত্যাগ করছে তার সংখ্যা গণনায় ধরা পড়ে না। মুসলমানগণ গো-ব্রাহ্মণের প্রতি দারুণ পীড়া প্রদান করছে। যখন এই সকল বিষয় স্মরণ করি তখন আমি কোনরূপ শান্তিলাভ করতে পারি না। এই রাজপ্রাসাদ ও রাজভোগ্য দ্রব্যসকল তখন আমার হলাহলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তি স্বজাতির দুঃখ দূর করণের জন্য বদ্ধপরিকর না হন, তিনি কী মনুষ্যমধ্যে গণ্য হতে পারেন? দেখিয়া শুনিয়া কী আমাদের অচলভাবে অবস্থান করা উচিত?

বাগ্মিবর শংকর চক্রবর্তী বললেন,—রাজন! যে সকল প্রশ্ন আপনি উত্থাপিত করলেন তাহা আপনারই হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ।। আপনার অভীষ্ট বিষয় সকল কার্যে পরিণত করা যে কতদূর ক্লেশসাধ্য, তাহা কল্পনা করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই মাতৃপূজনরূপ ঘোরতর উৎকট তপস্যায় ব্রতী হতে হলে আমাদিগকে অসাধারণ দারিদ্র্য-ব্রত অবলম্বন করতে হবে। এই অতুল ধনসম্পত্তি, ভোগবাসনা আপনাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করতে হবে। রাজন! ইতিপূর্বে সুলতান দাউদ খাঁ মোগলদিগের বিকট গ্রাস হতে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঘোরতর প্রযত্ন করিয়াও কেবল স্বদেশবাসী জনসাধারণের সমবেদনা ও সাহায্য না পাওয়াতে এরূপ অকৃতকার্য হন, আপনার অবিদিত নাই। তদুপরি মোগলগণ এখন প্রবল পরাক্রান্ত। উত্তর ভারতের প্রায় অধিকাংশ নৃপতিবর্গ মোগলদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দিন দিন মোগলদিগের শক্তি বৃদ্ধি হতেছে। এরূপ অবস্থায় মোগলদের পরাজয়-কল্পনা করিবার পূর্বে আমাদিগের স্বদেশবাসীর হৃদয়-রাজ্যের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করা অতীব প্রয়োজন। প্রজাশক্তির সাহায্য ব্যতীত আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে। বঙ্গদেশে এখন অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য নীরবতা অবলম্বন করেন। হয়তো শংকরের উক্তিগুলি অনুধাবন করতে সচেষ্ট হলেন।

মদন মাল বললেন,—আমি শংকরের উক্তি সমর্থন করি। এ দেশে বর্তমানে পুরাপুরি অরাজকতা বিদ্যমান। উড়িষ্যা প্রদেশে রামচন্দ্র প্রমুখ নৃপতিবর্গ পাঠানগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অবকাশপ্রাপ্ত হইলেই ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। গোরক্ষপুর প্রদেশে শংকররাম প্রমুখ বীরপুরুষগণও ভৈরব বিক্রমে আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছেন। বিহার প্রদেশে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত মোসর খাঁ-ই কাবুলী প্রমুখ বীরগণ মোগলসৈন্য মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া এখনও স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য বিপুল প্রযত্ন করিতেছেন। কুচবিহারাধিপতি মোগলভীত লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলগণের সহিত মিলিত হইলেও, তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলগণের সহিত নিপুণতাপূর্বক যুদ্ধ করিতেছেন। রাজন! আপনার যদি বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি এক্ষণে মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমাদিগের সহিত পূর্ব হইতে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি এখন উদাসীনভাবে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া অস্ত্রধারণ করাইতে হইবে। আর যে সকল ব্যক্তি মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উদাসীনভাব ধারণ করাইতে হইবে।

মদন মাল নিরস্ত হলে মহারাজা প্রতাপাদিত্য বললেন,—স্বাধীনতা লাভের জন্য যদি আমাকে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ অথবা ঘোরতর নরকমধ্যে চিরকাল প্রবাস করিতে হয়, তাহাও আমি আহ্লাদসহকারে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। সে নরক নহে সেই আমার স্বর্গ। এই জগৎ ক্ষণ-বিধ্বংসী, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কত কোটি মনুষ্য এই পৃথিবীমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত কালসাগরে লীন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদিগকেও ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। অতএব পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া কেন কাপুরুষসম পদদলিত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করি? স্বাধীনতার জন্য দেশের বাসিন্দাগণের তুষ্টি সম্পাদনার্থে যদি প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে কৃতাঞ্জলিপুটে ভ্রমণ করিতে হয় তাহাও আমি জীবনের প্রধান কর্তব্য বোধ করিয়া তৎসম্পাদনে যত্নশীল হইব। আসুন আমরা সকলে মিলিত হইয়া বঙ্গীয় বাহুবলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জগৎসমক্ষে উদ্ঘাটিত করি। পুরাকালে ঋষিগণ যেরূপ কোন বিষয়ের তত্ত্ব

চিন্তাবন করিতে হইলে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন সেইরূপ কী উপায়ে আমরা স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সুখ লাভ করিতে পারি তাহার উপায় আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে পুরুষগণকে প্রেরণ করি। অতএব আমাদের দেশের যুবকগণের হৃদয়ে এরূপ কর্তব্যনিষ্ঠা বপন করুন, যাহাতে তাহারা স্বয়ং ইহা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হয়।

প্রতাপ, শঙ্কর প্রমুখ বন্ধুগণ এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথনের পর স্বর্গ হতে প্রিয়তর জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্য মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করতে স্থিরসংকল্প করলেন। এজন্য মহাপ্রাজ্ঞ শঙ্কর সুবা বঙ্গের প্রত্যেক স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট গিয়ে সকলকে দেশের অবস্থা বিশেষরূপে বুঝাতে লাগলেন। কী ধনী, কী নির্ধন, কী বিদ্বান, কী মূর্খ, সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর শঙ্করের অপ্রতিহত ক্ষমতা বদ্ধমূল হতে লাগলো। তিনি কখনও উড়িষ্যার রামচন্দ্র প্রমুখ রাজন্যবর্গকে আশু ঘোরতর যুদ্ধ করতে পরামর্শ দিয়ে কতলু খাঁ, ওসমান খাঁ প্রমুখ পাঠান-সেনানায়কদিগের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন্ উপায়ে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পর হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক কার্য করতে প্রবৃত্ত হয়, এই সকল প্রশ্নের তত্ত্ব-নির্ণয়ে সময় অতিবাহিত করেন। আবার কখনও বিদ্রোহী সেনানায়কদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন। সুযোগপ্রাপ্ত হলেই শঙ্কর সকলকে ভাবী ঘোরতর পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি বলেন,—এই পরিবর্তনের ফলাফল বঙ্গের জনসাধারণের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহারা মনে করিলে চিরকালের জন্য স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং ইহাতে হতাদর করিলে তাঁহাদিগকে অনন্তকালের জন্য দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ হইতে হইবে।

এই সকল কার্যসাধনের জন্য কিছু দিবস ত্রিহুত প্রদেশে অবস্থান করলেন শঙ্কর। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মৈথিলিগণের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে উঠলেন। ত্রিহুত প্রদেশে অবস্থানকালে গণ্ডকীর তটে জগজ্জননী ভগবতীর একখানি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করলেন। দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শঙ্কর অকাতরে বহুল অর্থব্যয় করায় সাধারণের বিশেষরূপে শ্রদ্ধার পাত্র হলেন।

শঙ্করের গমনের পর প্রতাপ, সূর্যকান্ত, ভবানীদাস, মদন মাল, প্রতাপ সিং, সুন্দর, রডা প্রমুখকে বিভিন্ন কার্যের ভার প্রদান করলেন।

মহাভাগ প্রতাপ যে সময়ে ভাবী যুদ্ধের বিরাট আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত সেই সময়ে বীরবর শঙ্কর কোন কার্য উপলক্ষে রাজমহলে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে জনৈক মুসলমান-প্রপীড়িত ব্রাহ্মণ বিপন্ন হয়ে শঙ্করের স্মরণাপন্ন হন। পূর্ব থেকেই নীচপ্রকৃতির মুসলমান-কর্মচারিগণ শঙ্করের অসাধারণ বাগ্মিতা, সরলতা, কার্যতৎপরতায় মুগ্ধ হলেও তাঁর জাতীয় ভাব, সময়োপযোগী উচিত-বক্তৃতা ও অত্যাচারী মুসলমান-বিদ্বেষ জন্য তাঁরা শঙ্করকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করতেন। দুষ্টপ্রকৃতির রাজপুরুষবর্গ শঙ্করকে দমন করবার জন্য সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করতেন।

সের খাঁ নামক জনৈক মুসলমান কর্মচারী এই সময়ে রাজমহলে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করেন।

অপরাধী, শঙ্করের শরণাপন্ন হয়েছে অবগত হয়ে সের খাঁ শঙ্করকে ভর্ৎসনা করে শীঘ্র অপরাধীকে প্রত্যর্পণ করতে আদেশ প্রদান করলেন।

শঙ্কর অতি বিনীতভাবে সের খাঁ-র নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,—এই ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হয়েছে। সে যা ক্ষতি করেছে আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে দেবো। অপরাধীকে আপনি অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করুন।

শঙ্করের প্রস্তাবে সের খাঁ অধিকতর ক্রুদ্ধ হলেন। শঙ্করকে দণ্ড প্রদান করবার সুযোগ পেয়ে মুসলমান কর্মচারিগণ রাজকার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টির অপরাধে শঙ্করকে কারাগারে পাঠালেন।

শঙ্করের কারাবাসের কথা অচিরাৎ বিদ্যুৎবেগে সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। কি শত্রু, কি মিত্র সকলেই শঙ্করের কারাবাসে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন।

যখন শঙ্কর চক্রবর্তীর ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির এরূপ দশা, তখন অন্য লোকের মান, সম্ভ্রম, ধর্ম যে বিলয়োন্মুখ আশ্চর্য কী?

মহারাজা প্রতাপাদিত্য শঙ্করবিয়োগে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। প্রতাপ জানেন, শঙ্কর জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য সুখভোগের বাসনায় চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিয়েছেন। শঙ্কর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে স্বাধীনতাদেবীর পরম কমনীয় মূর্তি অংকিত করে সকলকে তাঁর পরম ভক্ত করেছেন। শঙ্কর অসাধারণ বাগ্মিতায় প্রাণিমাত্রকে মুগ্ধ করে আপনার আজ্ঞানুবর্তী করেন।

এই মহাতেজস্বী শঙ্করকে কী প্রকারে মুসলমান-জাল হতে উদ্ধার করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সূর্যকান্ত, ভবানী দাস প্রমুখ বন্ধুগণের সঙ্গে প্রতাপ মন্ত্রণা করলেন। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্কের পর প্রতাপ স্থির করলেন যে, সের খাঁ-র কারাগারের প্রহরিগণ অধিকাংশই যখন হিন্দু তখন একজন ব্রাহ্মণের প্রাণ-রক্ষা বিষয়ে সহায়তা লাভের বিশেষ-সম্ভাবনা আছে। এইরূপ বিবেচনা করে প্রতাপ একজন কর্মচারীকে রাজমহল অভিমুখে প্রেরণ করলেন।

প্রতাপ-প্রেরিত অনুচর রাজমহলে উপস্থিত হয়ে প্রহরিগণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করে বশীভূত করলেন।

এক গভীর রজনীর অন্ধকারে প্রতাপ-প্রেরিত লোক শঙ্করকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে দ্রুতগামী নৌকাযোগে স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শঙ্করের পলায়ন-কথা সের খাঁর কর্ণগোচর হয়। তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে কারাগার-রক্ষককে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করলেন এবং শঙ্করের অনুসন্ধানে চতুর্দিকে অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করলেন। নগরমধ্যেও প্রত্যেক স্থল তন্ন তন্ন করে, অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও শঙ্করের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না। ক্রমে ক্রমে প্রহরিগণও অকৃতকার্য হয়ে প্রত্যাগমন করলো।

শঙ্করের গমনের পরে সের খাঁ চতুর্দিকে দূরতর প্রদেশে তাঁর তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য প্রতিনিধি পাঠালেন।

যশোর প্রদেশ থেকে লোক সকল প্রত্যাগমন করে শঙ্করের তথায় অবস্থান এবং যুদ্ধের জন্য প্রতাপাদিত্যের বিপুল আয়োজনের বিষয়ে সের খাঁর নিকট নিবেদন করলো।

সের খাঁ প্রতাপের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা অবগত হয়ে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হলেন। এক দল সুদক্ষ সৈন্য সঙ্গে লয়ে প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য সের খাঁ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করলেন।

অবিরাম দিবারাত্র নৌকা বাহিত হওয়াতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শঙ্কর জাহাজঘাটায় এসে উপস্থিত হলেন।

শঙ্কর এসেছেন শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রতাপাদিত্য ও সূর্যকান্ত প্রমুখ বীরপুরুষগণ মহাসমারোহের সঙ্গে শঙ্করকে অভ্যর্থনা জানাতে গেলেন। যশোহর নগর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

শঙ্করের উপর মোগলগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা কখনও এই অসম্মান নীরবে সহ্য করবেন না। বৈরনির্যাতনের জন্য তাঁরা সমুচিত চেষ্টা করবেন।

প্রতাপাদিত্য শুনলেন, সের খাঁ বঙ্গদেশ আক্রমণের অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের আদেশ দিলেন,—দুর্গ সকলকে সজ্জিত করা হোক। সৈনাগণ যেন প্রস্তুত থাকে। আমিও প্রস্তুত আছি।

(ক্রমশঃ)

॥ উনিশ ॥

এই ঘটনার পর তিরিশ বছর কেটে গেছে। তিরিশ নয়, প্রায় তেত্রিশ বছর পর একটি দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। এবারে বলি সেই কাহিনীটুকু। সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন আমি।

তেত্রিশ বছর একটা জীবনের সমান, এই সময়ের মধ্যে একটা রাজ্যের উত্থানপতন ঘটতে পারে, একজন বিবেকানন্দ জন্মে সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন আনতে পারেন, একটা জাতির জীবনেও অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটতে পারে। আর এই সময়ে কোন একটি প্রতিষ্ঠান কি কোন ব্যক্তির জীবনে যে কতটা পরিবর্তন ঘটতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হবে।

বস্তুত হয়েও ছিল তাই

সেদিনের ক্ষুদ্র বেঙ্গল কেমিক্যাল এই সময়ে এশিয়ার বৃহত্তম রাসায়নিক ও ওষুধ তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়েছিল। মাণিকতলার ক্ষুদ্র কারখানা সম্প্রসারিত হয়ে সুবৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু তাতেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পানিহাটিতে আর একটি কারখানা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও যখন স্থান সঙ্কুলান হয় না এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মালের চাহিদা যথাসময়ে মেটানো যায় না, তখন আরও দুটি কারখানা করা হল—বোম্বাই এবং কানপুরে।

কারখানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অফিসও বড় হচ্ছিল। ৯১ আপার সার্কুলার রোডের বাড়ি হতে প্রথমে মাণিকতলায়, তার পর কলেজ স্ট্রীটে এলবার্ট হলে, সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-এর সুপ্রশস্ত ভবনে অফিস স্থানান্তরিত হয়। আর এখন তো গণেশচন্দ্র এভেনিউ-এর বিশাল বেঙ্গল কেমিক্যাল সৌধ বাঙ্গালীর পরম গর্বের বস্তু। ভারতবর্ষের আর কোনও ওষুধ তৈরীর প্রতিষ্ঠানের এত বড় নিজস্ব অফিসভবন আছে বলে জানি নে। এখন অবশ্য এই শিল্পের ভারকেন্দ্র বহুলাংশে বাংলা দেশ হতে বোম্বাই-বরোদায় স্থানান্তরিত হয়ে গেছে, কিন্তু আজও বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল লাইনে শীর্ষস্থানেই আছে।

সঞ্জয়

প্রতিষ্ঠানের এই উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তিমানসেরও বিশেষ বিকাশ সাধিত হয়েছিল। ডক্টর পি সি রায় পরিণত হয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ে। তখন তিনি আর কেবল রসায়নের অধ্যাপক নন, তিনি হয়েছেন আচার্যদেব; তিনি ঋষিকল্প, জ্ঞানতপস্বী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, দেশহিতব্রতী মহামানব।

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন সদ্য-নির্মিত সায়ান্স কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিনে বিজ্ঞানের ব্যাপক আলোচনা অধ্যাপনা এবং গবেষণা সুরু হল এবং তা হল আচার্যদেবের নেতৃত্বে। তখন তিনি বাস করেন সায়ান্স কলেজেরই দক্ষিণ দিকের বিতলের একটি ঘরে। [illegible] এক তীর্থভূমি।

আর তাঁর ছাত্রেরাও এক একজন দিকপাল। রসিকলাল দত্ত, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বীরেশ গুহ—

কত নাম বলব?

'ডক্টর অব সায়ান্স' গণ্ডায় গণ্ডায়। আচার্যদেবের নিজের ছাত্র, ছাত্রের ছাত্র, তাঁদের ছাত্র। তিনপুরুষ বৈজ্ঞানিক দেখে গেছেন তিনি। তিনি তাঁদের সবার পরম শ্রদ্ধার পাত্র, শুধু তাঁদের কেন—সমগ্র দেশের ও সমগ্র পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি পেয়েছিলেন।

যখনকার কথা বলছি তখন তিনি সায়ান্স কলেজ থেকেও অবসর নিয়েছেন। তবে তখনও থাকেন সায়ান্স কলেজেরই সেই ঘরখানিতে। সেই ঘরেই ঘটেছিল তাঁর মহাপ্রয়াণ ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে। লোকে-লোকারণ্য সায়ান্স কলেজের সে দৃশ্য এখনও চোখের উপর ভাসছে।

যে কথা বলছিলাম। এই তেত্রিশ বছরে আচার্যদেব জাতির হৃদয়ে পরম শ্রদ্ধার আসনে আসীন হয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর মত লোকোত্তর চরিত্র আমি জীবনে আর দেখিনি, আর দেখব বলেও আশা নেই। সর্বস্বত্যাগী এই মহামানবকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাতেই আমার জীবন সার্থক হয়েছে বলে মনে করি।

আমি তখন ডাঃ বোসের একান্ত
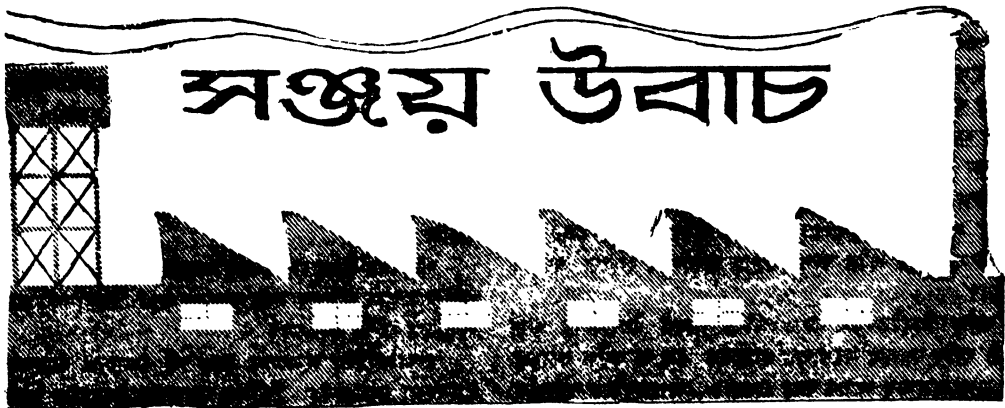
॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

পত্রিকের কাজ করি; সুতরাং তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র দেখবার যেমন সুযোগ হয়, তেমনি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপারের টেলিফোন প্রভৃতিও আমাকেই ধরতে হয়। সেই ভাবেই এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ এসেছিল।

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান হতে স্বয়ং সতীশ দাশগুপ্ত আমায় ফোন করছিলেন। বাংলার গান্ধী নামে খ্যাত খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক সতীশবাবু আচার্যদেবের পরম স্নেহভাজন ব্যক্তি। খাদি প্রতিষ্ঠান আচার্যদেবের হৃদয় কতখানি জুড়ে বসেছিল একটি ঘটনা বললে তা পরিস্ফুট হবে।

আচার্যদেব যখন সায়ান্স কলেজের সেই ঘরখানির বাসিন্দা তখন তাঁর কাছে দু-চারজন বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রও থাকত এবং তাঁকে দেখাশোনা করত।

আচার্যদেব নিজের জন্য সামান্য টাকা রেখে প্রতিমাসের পেনসন নানা ব্যক্তিকে, ছাত্রকে, বিধবাদের সাহায্য করতে নিয়মিত বরাদ্দ করে দিতেন। ফলে তাঁর নিজের জন্য অতি সামান্য টাকাই ব্যয়িত হত।

তখনকার দিনে তাঁর জন্য রোজ বাজার হতে এক পয়সার কলা আনবার হুকুম ছিল আচার্যদেবের। একদিন একটি ছাত্র বাজারে গিয়ে একটু বড় আকৃতির কলা পেয়ে দুই পয়সার কলা কিনে এনেছিল। রোজকার বাজার খরচের হিসাব লিখবার হুকুম ছিল এবং আচার্যদেব নিজে তা মাঝে মাঝে দেখতেন—যাতে তাঁর নিজের জন্য ব্যয় কতটা হচ্ছে তা জানতে পারেন। আচার্যদেবের জন্য রোজকার বরাদ্দ এক পয়সার কলার বদলে সেদিন দুই পয়সার কলা আনবার জন্য ছাত্রটি তিরস্কৃত হয়েছিল

পরমুহূর্তেই আচার্যদেবের কাছে প্রতিষ্ঠানের লোক এসে কিছু টাকা চাইল। তৎক্ষণি হুকুম হল—ব্যাঙ্কের বই বের করতে। মাত্র সাতশ টাকার মত ছিল ব্যাঙ্কে, সবটাই একটা চেক কেটে অম্লান বদনে আচার্যদেব খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে দিয়ে দিলেন।

সেই তাঁর অতি প্রিয় স্বাবলম্বন শিক্ষার তীর্থক্ষেত্র খাদি প্রতিষ্ঠান তখন খাদির প্রচারে এবং বিভিন্ন উটজ শিল্পের প্রচার-প্রসারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণকর জনসেবার কাজও তাদের কর্তব্যের মধ্যে ছিল।

॥ কুড়ি ॥

সতীশ দাশগুপ্তকে লোকে 'বাংলার গান্ধী' বলে সে কথাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুণ্ডিত মস্তক, স্বল্প বহরের খাদি ধুতি-পরিহিত এই কর্মী মানুষটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে। তাঁর কর্মকাণ্ড আরও বিচিত্র।

প্রথম জীবনে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করতেন। যে সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালে ডাঃ বোস, রাজশেখর বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ ছিলেন, তিনিও সেই আদি পর্বের কর্মী। বেঙ্গল কেমিক্যালে তিনি নিজের কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। বেঙ্গল কেমিক্যালের বিখ্যাত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র—ফায়ার কিং তাঁরই গবেষণা-প্রসূত। শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি বৈজ্ঞানিক হলেও তিনি একাধারে সুলেখক এবং দেশহিতব্রতপ্রাণ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাব যে তাঁকে বিজ্ঞান-গবেষণাগার থেকে দেশ-কল্যাণকর্মে এবং বিবিধ সংগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

আচার্যদেবের নিকট মহাত্মা গান্ধী আসতেন সে কথা আগেই বলেছি। বস্তুত বাংলা দেশে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, খাদি প্রচার প্রভৃতির প্রধান সহায়ক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। সেখানে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তেরও যে বৃহৎ ভূমিকা ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। কালক্রমে গান্ধীজীর প্রভাব সতীশচন্দ্রের উপর আরও বেশি প্রতিফলিত হয়। মহাত্মা তাঁকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। কলকাতায় এলেই তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে যেতেন। খাদি প্রতিষ্ঠানে তাঁর বৈকালিক প্রার্থনা এবং প্রার্থনোত্তর ভাষণ শুনবার লোভে কলকাতা থেকে হাজার হাজার লোক সোদপুরে ছুটত। আমিও কতবার গিয়েছি। সে দৃশ্যের কথা ভুলবার নয়।

গান্ধীজীকে সতীশচন্দ্র দেবতার মত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর আদেশ পালন করবার জন্য তিনি অসাধ্য সাধনেও পশ্চাৎপদ হন নি। এমন কি গান্ধীজী নোয়াখালি পরিক্রমায় যে কাজিরখিল গ্রাম হতে দিল্লীতে এসে জরুরি কাজ সেরে আবার পূর্বপাকিস্তানের সেই ক্ষুদ্র গ্রাম কাজিরখিলে ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন কিন্তু আর ফিরতে পারেন নি, সতীশচন্দ্র গুরুবাঞ্ছিত সেই অসমাপ্ত কাজের ভারও জীবন বিপন্ন করে গ্রহণ করেছিলেন।

দিল্লীতে গিয়ে মহাত্মা বিড়লা বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভায় প্রাণ উৎসর্গ করলেন। সমগ্র দেশ শোকে যখন মুহ্যমান—সতীশচন্দ্র সেই গভীর অন্ধকারময় দিনে নোয়াখালির গণ্ডগ্রামে ভীতত্রস্ত সর্বস্বান্ত মানুষগুলির মধ্যে গান্ধীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহাত্মার অসমাপ্ত কাজ সমাধা করতে লিপ্ত হলেন। এই গুরুনিষ্ঠা, এই মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ অতুলনীয়।

বস্তুত মহাত্মার সংসর্গে এসে সতীশচন্দ্রও কায়মনোবাক্যে মহাত্মাই হয়ে উঠেছিলেন।

পল্লীশিল্প বিষয়ে সতীশচন্দ্রের অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তিকা আছে। খাঁটি ঘি, সরষের তেল প্রভৃতি পল্লী-গ্রামেই প্রস্তুত হত, এখনও হতে পারে —তিনি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এইসব বস্তু খাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শহরাঞ্চলেও সহজ-লভ্য করে দিয়ে সমগ্র জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। খাদি প্রতিষ্ঠানে হাতে তৈরী খদ্দরের কাপড়ও যেমন হত, তেমন হত সাবান, দেশলাই, হাতে তৈরী কাগজ প্রভৃতি কুটির-শিল্পজাত বিবিধ নিত্যব্যবহারের সামগ্রী। এসব বস্তু প্রস্তুত-পদ্ধতি খাদি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়াও হত। জন-কল্যাণের উদ্দেশ্যে গোসেবা, গৃহ-চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়েও খাদি কর্মী-দের ও যেমন শেখানো হত, তেমনি জন-সাধারণকেও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল।

গান্ধীজীর আদেশক্রমে সতীশ-চন্দ্র একরাত্রে গোসেবা বিষয়ে এক-খানি বই লিখে মহাত্মাজীকে দেন। বইখানি ইংরাজিতে লেখা—সবরমতী আশ্রমে ব্যবহারের জন্য গান্ধীজী সেখানি নিয়ে যান। পরে এই বিষয়ে 'কাউজ অব ইণ্ডিয়া' নামে সতীশচন্দ্র বৃহদাকার গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

একদিন ডাঃ বোস এবং সতীশ-চন্দ্রের কথোপকথনের সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। সতীশচন্দ্র ডঃ বোসের তৈরী 'টক্সিনল' নামে একটি ওষুধের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ওষুধটি উদরা-ময়ে, এমন কি কলেরাতেও ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যেত। এতে অন্যান্য ভেষজ পদার্থের সংযোগে 'কেওলিন' নামক একপ্রকার রাসা-য়নিক মৃত্তিকা ব্যবহার করা হত। কেওলিনের ধর্ম তরল পদার্থের মধ্যে গিয়ে থিতিয়ে পড়া। তাই উদরের মধ্যেও ওষুধটি মল ঘন করায় এবং দূষিত পদার্থ ছেঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। শুনে সতীশচন্দ্র বললেন, একবার চাঁদপুরে অজ পাড়াগাঁয়ের দিকে কলেরার মড়ক লাগল। ধারেকাছে কোন চিকিৎসক নেই। সেবাব্রতীরা মহামুস্কিলে পড়লেন। হাতের কাছে অন্য কোন ওষুধ না পেয়ে নদীর চরের সরমাটি ছেঁকে জলে গুলে খাইয়ে কয়েকজন রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

ডাঃ বোস বললেন—সতীশ, তোমার এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তুলনা নেই।

গান্ধীজীর প্রাকৃতিক চিকিৎসায় জল এবং মাটির ব্যবহার, মাটির প্রলেপ প্রভৃতি সতীশচন্দ্র বিশেষভাবে জানতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি চরের সরমাটি দিয়ে কেওলিনের কাজ করেছিলেন বলতে হবে।

সতীশচন্দ্রের চিকিৎসাশাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ল।

গ্রাম-সেবকদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে মোটামুটি ওয়াকিবহাল করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী সতীশবাবুকে সস্তা ওষুধ ব্যবহারের বিষয়ে এমন একখানি বই লিখতে বলেন যাতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান সেই একখানি বই পড়লেই পাওয়া যাবে। ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর কেবল চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি নয়, দেহতত্ত্ব, ভারতীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে এবং 'স্বাস্থ্য সমাচার' বাংলা মাসিক পত্র যা তিনি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল নিজে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন এবং ইংরাজি 'হেলথ এ্যাণ্ড হ্যাপিনেস'।

হিন্দি 'স্বাস্থ্য-সমাচার' এবং 'উর্দু' 'তন্দুরস্তি' পত্রিকাত্রয় সম্পাদক হিসাবেও ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল। পরন্তু তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে ম্যানে-জিং ডিরেক্টর থাকাকালীন সতীশ-বাবুর সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচয় শুধু নয়, কিছু আন্তরিকতাও ছিল। ডাঃ বোস সতীশবাবুকে নাম ধরে ডাকতেন, এবং 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন তাও শুনেছি। সুতরাং গান্ধীজীর প্রস্তাব নিয়ে সতীশবাবু এলেন ডাঃ বোসকে গ্রামসেবকদের উপযোগী একখানি প্রাথমিক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব নিয়ে।

ডাঃ বোস বললেন,—আমার তো অত সময় হবে না, বরং তুমি লেখ। বইপত্র দিয়ে আমি সাহায্য করব।

সময় সতীশবাবুরও ছিল না। তিনিও বহুবিধ গঠনমূলক এবং সেবা-কার্যে চিরদিন লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই তিনি কত অসাধ্য সাধন করে-ছেন। গোবর হতে গ্যাস তৈরীর পদ্ধতি বের করে তার বিবরণ পুস্তিকা আকারে ছেপে বিতরণ করেছেন। ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া মৃত গরুর চর্ম, অস্থি, মাংস, মজ্জা সবই যাতে কাজে লাগানো যায় বৈজ্ঞানিক সতীশচন্দ্র তা নিয়ে কত কঠিন গবেষণা করে সাফল্য লাভ করেছেন। বাপুজীর আদেশে একরাত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন সে কথা আগেই বলেছি। সুতরাং সময় পেলে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ে নিয়ে সে সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের বই লেখা যে তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না এ কথা সহজেই অনুমেয়।

সেই সুযোগ পেলেন তিনি,—শুনেছি একবার রাজবন্দী হয়ে কারা-বাসের অন্তরালে নিরালায় বসে এই বই লেখা সুরু হয়। সতীশবাবুর স্ত্রী ডাঃ বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করে চিকিৎসাবিষয়ক অনেক বই নিয়ে গিয়ে সতীশবাবুকে পৌঁছে দিতেন। ডাঃ বোস সতীশবাবুর এই সব লেখার খসড়াও কিছু কিছু পড়ে দেখেছিলেন। দেখতে দেখতে পাণ্ডুলিপি খাড়া হয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানেই বই ছাপা হয়, নাম দেওয়া হয় 'হোম এ্যাণ্ড ভিলেজ ডক্টর'। ১৪১৬ পৃষ্ঠার এই পুষ্টকলেবর গ্রন্থ-খানিতে ১৮টি অধ্যায় ছিল। সতীশচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে ডাঃ বোস এই গ্রন্থের আলোচনা লেখেন, তাতে গ্রন্থখানিকে অষ্টাদশ-অধ্যায়ী গীতার সঙ্গে তুলনা করে তাকে নিত্য পাঠ্য বলবার ইঙ্গিতটি আমার খুবই ভালো লাগল। তেমন ভালো লাগল ডাঃ বোসের চমৎকার ইংরাজীটুকু। যেমন স্পষ্ট এবং বেগবান

হস্তাক্ষর সুন্দর চমৎকার বানান ও ব্যাকরণগত শুদ্ধি, এককথায় আদর্শ।

সত্যি, কি বাংলা কি ইংরাজি—এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি লিখতেন যে, দেখে অবাক লাগত। যে সব চিকিৎসক সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন ডাঃ বোসকে সে শ্রেণীতে ফেলা যাবে না। কিন্তু ইংরাজি বা বাংলা প্রবন্ধ রচনায় তাঁর যুক্তি এমন সরল সহজ তাবায় অকাট্যভাবে উপস্থাপিত করা হত যা একজন বর্ষীয়ান চিরব্যস্ত চিকিৎসকের কাছে আশা করা কঠিন।

মনে আছে একবার একটি মেডিক্যাল কনফারেন্স-এর সভাপতির ভাষণ হিসাবে তাঁর লেখাটি অত্যন্ত সুলিখিত বলে সবাই বলেছিলেন। সরকারের নিকট ফার্মাসিউটিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রী বিষয়ে তাঁর সুপারিশ তিনি মুখে বলেছিলেন, আমি হাতে লিখে নিয়েছিলাম। সেটি অজস্র তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে সুগঠিত একটি চমৎকার গবেষণার 'পেপার' হিসাবে পঠিত হতে পারত। বস্তুত তিনি যে লেখনী দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সবগুলি সুবর্ণপদক একাই অধিকার করেছিলেন, সেই লেখনী তাঁর হাতে চিরদিন ছিল। তা ছিল যেমন বেগবান, তেমনি প্রাঞ্জলভাষী। [ক্রমশ।

প্রধানমন্ত্রীর আলোকচিত্র প্রদর্শনী

গত ১৯শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ৫১তম জন্মদিন দেশব্যাপী পালন করা হোল। এই উপলক্ষে কলকাতার প্রেস ফটোগ্রাফার শ্রীমীরেন অধিকারীর তোলা প্রধানমন্ত্রীর ৫১টি ছবি নিয়ে এক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় দিল্লীর আজাদ ভবনে। দিল্লীস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও অগণিত দর্শকমণ্ডলী এই সুন্দর আলোকচিত্র প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছেন গত ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত। বাংলা চলচ্চিত্রের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতী নন্দিনী মালিয়া দিল্লীতে এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে সেখানকার বিদগ্ধ দর্শকসমাজের কাছে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন, এটা কম গৌরবের কথা নয়। দর্শকরাও তাঁদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ৫১টি বিশেষ ধরণের ছবি দেখে।

তাছাড়া প্রদর্শিত ৫১টি ছবি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে শ্রীমতী গান্ধীকে গত ১৫ই নভেম্বর প্রাক্-প্রদর্শনীতে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর কয়েকটি বিশেষ ধরণের ছবি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং কয়েকটি ছবিতে 'অটোগ্রাফ' দেন। শ্রীমতী নন্দিনী মালিয়া দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমতী মালিয়াকে শুভেচ্ছা জানান।

শ্রীমতী মালিয়া আয়োজিত এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা ও সদুপদেশ দিয়েছেন সাংবাদিক শ্রীখগেন দে-সরকার, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য, শ্রীগোয়েল এবং শ্রী এইচ ওয়াই সারদাপ্রসাদ।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর ছবিসম্বলিত এই প্রদর্শনী দেখে আলোকচিত্রী শ্রীমীরেন অধিকারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুধীরঞ্জন দাশ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন (এম-পি), শ্রীমতী সেন, দিল্লীস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাই-কমিশনার, দিল্লীর বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফারবৃন্দ, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ফটোগ্রাফী ডাইরেক্টর শ্রী টি কাশীনাথ, প্রধানমন্ত্রীর চীফ সিকিউরিটি অফিসার শ্রীযোশী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিপুলসংখ্যক দর্শকমণ্ডলী।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ফটোগ্রাফী ডাইরেক্টর শ্রী টি, কাশীনাথ পরে দিল্লীর সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন অভিব্যক্তিসহ প্রধানমন্ত্রীর এতগুলি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছবি তুলে কলকাতার প্রেস ফটোগ্রাফার শ্রীমীরেন অধিকারী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য, শ্রীমীরেন অধিকারী কলকাতার অভিজাত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 'বসুমতী' পত্রিকার একজন খ্যাতিমান ফটোগ্রাফার।

—দিল্লীস্থ সংবাদদাতা

পৌষ মাসের মাসিক বসুমতীতে মাঘ মাসের রাশিফল প্রকাশিত হয়েছে। ফাল্গুন মাসের রাশিফল ফাল্গুন মাসের মাসিক বসুমতীতে গোড়ার দিকে পাবেন। বর্তমানে শনি ও রাহুর অবস্থান এবং আগামী তিন বছর শনি ও রাহু যে ভাবে থাকবে ও তার সঙ্গে মঙ্গলের সম্বন্ধ অনুযায়ী বারবার বিশ্ব-পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। ব্যাপক ধ্বংসলীলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক বিপর্যয়ে অশান্তি, ভূমিকম্প ও বিস্ফোরণ প্রাণহানি প্রভৃতির আশঙ্কা এই তিন বৎসর ভয়ব্যাকুল করে তুলতে পারে। যে-কোনো রাশি ও লগ্নের ব্যক্তির পক্ষেও এই সময় উৎপাতসূচক। এরূপ গ্রহসন্নিবেশে মানুষ বিভ্রান্তবুদ্ধি হয়ে নিজেদের অনিষ্ট নিজেই করতে পারে। মানবতার উদ্বোধনে স্থৈর্য ও শান্তির আবেদনে পরমনিয়ন্তা ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনাই এখন প্রয়োজন। গ্রহের সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেওয়া আমাদের কাজ নয়। এরূপ প্রতিকারে রত্নাদি ধারণ করতে হলে শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী সংস্কার ও শোধনাদি প্রয়োজন।

পত্রোত্তর
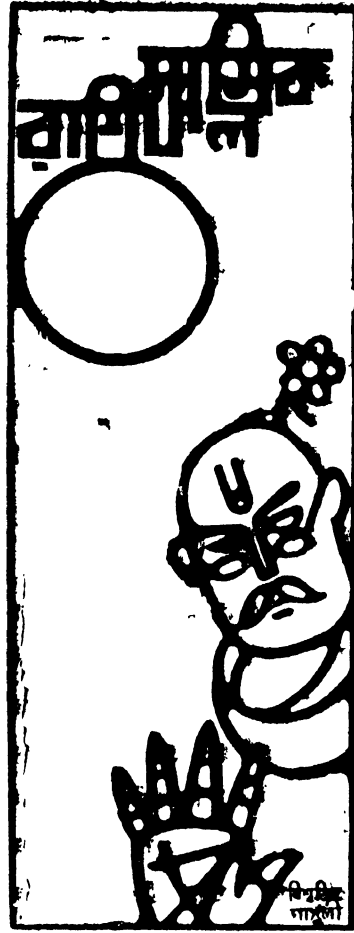
শ্রীমতী যূথিকা রায় (কলিকাতা)—(১) মোটামুটি ভাল হবে। গ্রহের প্রতিকার করা প্রয়োজন। (২) ভালই হবে। ● কুমারী শোভা সেনগুপ্ত (বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা) —(১) তুলা রাশির পক্ষে আগামী দেড় বছর প্রায়ই ঝামেলা থাকবে; (২) লটারীতে প্রাপ্তি হবার যোগ নেই। ● শ্রীসুরজিৎ রায়চৌধুরী (কপাটি আসাম) —প্রতিকার করলেই যে উপকার হয়, তার নিশ্চয়তা নেই। আগামী মার্চের পর ফল কিছু ভাল কিন্তু জন্মকুণ্ডলীতে দুর্বলতা রয়েছে; (২) প্রতিকার জন্য কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াই রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীযামিনীভূষণ সাউ (হাওড়া)— (১) মঙ্গলের জন্য নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে বিশেষভাবে শোধনাদি করে ধারণ এবং শাস্ত্রমত মঙ্গলবার পালন দরকার, (২) রত্ন পরীক্ষার জন্য সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগের সাহায্য নিতে পারেন। ● শ্রীআশিস সেনগুপ্ত (বোসপাড়া লেন, কলিকাতা)—(১) স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখুন, সংসর্গের সম্বন্ধে সাবধান। (২) কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই রত্ন আড়াই

ভৃগুজাতক

থেকে তিনরতি পরিমাণ সোনার আংটিতে এবং উৎকৃষ্ট গোমেদ ছয়রতি রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীঅশোককুমার বসু (পশ্চিম মানিকপুর, ডায়মণ্ডহারবার)—এবার অক্টোবরের মধ্যে পেতে পারেন। (২) সুচিকিৎসকের পরামর্শমত চলুন, উপকার পাবেন। ● শ্রীননীগোপাল রায় (বাবু বুক, কাঁচড়াপাড়া)—(১) মকর লগ্ন ও প্রবল রাশি, (২) রক্তমুখী প্রবাল আট-নয় রতি রূপার আংটিতে ও মুন স্টোন আট-নয় রতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র (সার্কুলার রোড, হাওড়া)—মকর রাশি, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, নরগণ ও সিংহলগ্ন। মেয়েটির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান, (২) কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াই থেকে চার রতির মধ্যে ধারণে উপকার হতে পারে। এবর্ষে না হলে পঁচিশ থেকে সাতাশ বর্ষে বিবাহ। ● শ্রী এ মৈত্র (রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) শনি ও মঙ্গল কর্কটে এবং বৃহস্পতি কন্যা রাশিতে ছিল, (২) ইংরেজী নূতন সালের কার্যকারণের উপর নির্ভর করবে। ● শ্রী এস কে মৈত্র (রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) এখনো সময় নয় মাস আছে। (২) পাঁচ বছর দেখুন। ● শ্রী এম মৈত্র (রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) বারো বছর বয়সের পর। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান, (২) পদার্থ বিদ্যা। ● শ্রী এস মৈত্র (রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) এখন হবে না, (২) শরীর কিছু উৎপাত করবে। প্রতিকার জন্য সাদা মুক্তা পাঁচরতি পরিমাণ ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীপ্রত্যূষকুমার চক্রবর্তী (রিষড়া)—(১) রক্তমুখী প্রবাল ছয় রতি রূপার আংটিতে এবং পান্না চার-পাঁচ রতি সোনার আংটিতে ধারণ করিয়ে দেখতে পারেন। (২) তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বারী ব্রাঞ্চ রোড, কলিকাতা)—(১) জন্মরাশি মকর এবং অন্যান্য গ্রহাবস্থান অনুযায়ী পীত পোখরাজ আটরতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। (২) হবার যোগ রয়েছে। ● শ্রীঅষ্টবাবু (এলগিন রোড, কলিকাতা) (১) বিশেষ কোনো পরিবর্তন হবে না; তবু মার্চের মধ্যবর্তী কয়েক মাস সুযোগপ্রদ। (২) হবার সম্ভাবনা।

● শ্রীকার্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অমিত্র রায় রোড, কলিকাতা)—(১) স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনো উন্নতি হবে না। (২) আর্থিক দিকে মোটামুটি চলনসই। প্রতিকার জন্য উৎকৃষ্ট সাদা মুক্তা চার-পাঁচ রতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীতপনকুমার কুণ্ডু (গোবিন্দসেন লেন, কলিকাতা)—আগামী জুনের মধ্যে, (২) বিশেষ সুবিধা হবে না। ● শ্রীসঞ্জয় (দেওয়ান রহমান রোড, বালী) জুনের মধ্যে না হলে দেরী, (২) এখন সম্ভাবনা দেখি না। ● শ্রীমতী অনুরাধা সেনগুপ্তা (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা)- (১) চাকুরী করতে হবে, (২) মোটামুটি ভাল। তবে তিন বছর সতর্ক থাকা উচিত। ● শ্রী এ মৈত্র (কলিকাতা) -(১) এবার হতে পারে, (২) এখন চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তিন বছর সকল ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। ● শ্রীমতী শিপ্রা সেনগুপ্তা (অশোকনগর)—(১) পঁচিশের মধ্যে। (২) উন্নতি আছে। ● শ্রীমতী পূরবী সেনগুপ্ত (বরানগর)—(১) তিন-চার মাসের মধ্যে পেতে পারেন, (২) প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। ● শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য(এগ্রিকালচার অফিস, হাইলাকান্দি) —(১)তিন বছর পর প্রকৃতপক্ষে জীবনের মান উন্নতি ও আয় বৃদ্ধি, (২) কৃতিত্ব পাবেন। কিন্তু বর্তমান তিন বছর সকল ব্যাপারে সাবধান হয়ে চলা উচিত। ● শ্রীকল্যাণকুমার দাস (৫ গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা)- (১) পত্নীর স্বাস্থ্যাদির জন্য উৎকণ্ঠা হতে পারে, (২) সন্তান-ভাব বিশেষ সবল নয়; তবে উভয়ের জন্মকুণ্ডলীর উপর তা বিশেষ নির্ভর করে। ● শ্রীস্বুকু (বিডি)—মঙ্গল ও শুক্রের অবস্থানই গোলমাল করবে। (২) তার স্থির চন্দ্র দ্বাদশাহ এবং শনি দুষ্ট; প্রতিকার করলেই যে উপকার হবে বলা চলে না, তবু আটরতি উৎকৃষ্ট রক্তমুখী প্রবাল ও পাঁচরতি মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। মুক্তা সোনার আংটিতে অনামিকায় ও প্রবাল রূপার আংটিতে কনিষ্ঠা আঙুলে যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণীয়। ● শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু (ফুলপুকুর লেন, চুঁচুড়া)—(১) আগামী আড়াই বছর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে, (২) এরই মধ্যে। ● শ্রীমৃন্ময়(হুগলী, বালি)(১)বিংশোত্তরী বুধের অন্তর্দশার মধ্যে, (২) ইংরেজী নূতন সালে সম্ভাবনা। ● শ্রীঅশোককুমার দাস (শিলিগুড়ি)—(১) পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো উত্তর দেওয়া হয় না। (২) দেরী হবে। ● শ্রীপরিতোষকুমার মজুমদার (শেঠ কলোনী, দমদম) (১) ডিগ্রীলাভের যোগ, (২) নূতন সালে হতে পারে। কিন্তু দেড় বছর অত্যন্ত ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। ● শ্রীঅতুলকুমার দাস (বেলগাছিয়া, হাওড়া) মার্চের মধ্যে না হলে অত্যন্ত দেরী, (২) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করালে সুফল হতে পারে। গ্রহের প্রতিকার জন্য সোনার আংটিতে ছয়রতি পীত পোখরাজ ও রূপার আংটিতে ছয়রতি উৎকৃষ্ট গোমেদ ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী (বাঁশবেড়িয়া)—(১) জানুয়ারীর মধ্যে না হলে হবে না, (২) মার্চ পর্যন্ত দেখুন। ● শ্রীমতী আভারাণী ঘোষ (প্রতাপপুর, বেনাপুর) —(১) পুত্রসন্তানের যোগ আছে, (২) জুনের মধ্যে না হলে হবে না। ● শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ (গুসকরা, বর্দ্ধমান)– (১) এখন প্রায়ই নানা ধরণের সমস্যা উত্যক্ত করতে পারে, কৃষ্ণাভ ক্যাটস আই আড়াই থেকে চার রতির মধ্যে ধারণ করা চলে। (২) অন্য কোনো সূত্রে হতে পারে। ● শ্রীমতী শান্তি চ্যাটার্জি (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) তিন বছর ধৈর্য ধরতে হবে, (২) শনি ও মঙ্গলবারে কোনো প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির পায়ে নীল অপরাজিতা ফুল ও জবাফুল দিয়ে দেখতে পারেন। ● শ্রীবানু (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা)—(১) বাইশ থেকে তেইশ, (২) উক্ত সময়ের কার্যকারণের উপর সব নির্ভর করছে। শ্রীটুটু (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা)- (১) আশানুরূপ লাইনে যাওয়া কঠিন হতে পারে। বিশেষ মনোযোগ ও চেষ্টা দরকার, (২) হতে পারে। ● কুমারী রাখু (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা) —(১) কাউশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সে, (২) কুম্ভ লগ্ন, সিংহ রাশি, পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র ও নরগণ। ● শ্রী ডি আইচ (নিউ আলিপুর) —এখনো পাঁচ বছর ধৈর্য ধরে চলতে হবে, (২) পরে মোটামুটি ভাল হবে। ● শ্রীপবিত্রকুমার ব্যানার্জী (আপার চেলিডাঙ্গা)—(১) উচ্চশিক্ষা হবে, (২) সঙ্গীতে বেশ খ্যাতি হতে পারে। ● শ্রীনিমাই রায় (সি পি সি বি ব্লক, কলি-২৭) —(১) তিন বছর গোলমাল, (২) তবু যোগাযোগের দিকে ইংরেজী নূতন সাল সুযোগ দেবে। ● শ্রীমতী পুষ্পরাণী দত্ত (চুঁচুড়া) ● মেষ রাশি, অশ্বিনী নক্ষত্র ও কন্যা লগ্ন, (২) স্বাস্থ্যের দিকে দু'বছর বিশেষ নজর দিন। ● শ্রীনরেনকুমার ঘোষ (রাখাল ঘোষ লেন, বেলেঘাটা)—(১) এখন থেকে চৈত্রের মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে; কিন্তু ঠিক আগের মত হওয়া কঠিন, (২) বিশেষ কোন ফল হবে না। তবে পাঁচরতি মুক্তা সোনার আংটিতে ও নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে

পারেন। ● শ্রীশঙ্করকুমার ঘোষ (পাতিহাল, হাওড়া)—(১) কোনোরূপ ব্যবসায়ে এবং বত্রিশ থেকে ভাল, (২) এবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। প্রতিকার পান্না ছয়রতি। সোনার আংটিতে। ● শ্রীঅচিন্ত্যকুমার বাউড়ি (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া)—যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সবই সম্ভব তবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন, (২) এর জন্য প্রত্যেকেই দায়ী; বিবাহিতজীবন সাধারণ, (৩) গোড়ার দিকে ভাল নয়, (৪) কোনো প্রতিকার সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। এবং আমরা কবচ মাদুলি দিই না এবং রত্নও দিই না। প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী শুধু নির্দেশ দিই। তাল কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই রত্ন আড়াই থেকে চার রতির মধ্যে সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রী ক্ষি পোদ্দার (গান্ধীনগর, কাঁচড়াপাড়া)—(১) তিন বছর বিশেষ সুবিধার নয়, (২) গাঢ় লাল প্রবাল আটরতি ও পীত পোখরাজ আটরতি যথাবিধি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসব্যসাচী মজুমদার (ডাক্তার লেন, কলিকাতা) কর্কট রাশ, পুষ্যানক্ষত্র ও মকর লগ্ন, (২) ভাগ্য মোটামুটি ভাল হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। ● শ্রীচিত্তপ্রিয় সরকার (শরচ্চন্দ্র চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া)—(১) ভবিষ্যতের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনোরূপ অনিশ্চয়তা বা বাধা আসতে পারে। উক্ত সালের অক্টোবরের মধ্যে বাধা না পড়লে আরো এগিয়ে যেতে পারেন, (২) শারীরিক কষ্টের উপশমের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান এবং গ্রহের প্রতিকার জন্য চার পাঁচ রতি মুক্তা সোনার আংটিতে এবং আটরতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীহৃষীকেশ সরকার (রায়নগর, বাঁশদ্রোণী)—(১) ঠিকই আছে, (২) আটরতি উৎকৃষ্ট গোমেদ ও পাঁচ রতি মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। গোমেদ রূপার আংটিতে এবং মুক্তা সোনার আংটিতে। ● শ্রীদামোদর সরকার (বারারী কলিয়ারী)—(১) রাহু বৃশ্চিকে এবং কেতু বৃষে। রাহু অশুভকরই হয়েছে, (২) সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়সের পর অপেক্ষাকৃত ভাল এবং ভালভাবে সচ্ছল অবস্থা আসার সম্ভাবনা। ● শ্রীকালীকিশোর ভট্টাচার্য (সুরা ইস্ট রোড, কলিকাতা)—নিজের পক্ষে পীত পোখরাজ ছয় থেকে আট রতি এবং স্ত্রীর পক্ষে সাদা মুক্তা পাঁচরতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীজীবেশকুমার সান্যাল (রাজবল্লভ সাহা লেন, হাওড়া)—(১) ব্যবসায়ে, (২) এরূপ ব্যাপারে উভয়ের জন্মকুণ্ডলী আবশ্যক। ● শ্রীপঞ্চানন সাধুখাঁ (ফিয়ার্স লেন, কলি)—(১) ছোটখাটো মুদিখানা করে দেখুন। কিন্তু জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ এমনি যে, এখনো সাত বছর বিশেষ ধৈর্য ধরে চলতে হবে। (২) বিবাহের ব্যাপারেও গ্রহ বিরুদ্ধ। প্রতিকার জন্য সাদামুক্তা সোনার আংটিতে পাঁচ রতি ও রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে নয় রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীবিজনকুমার বসু (রাঁচী)—পাঁচ বছর ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, (২) মাচের পর যা হয় করবেন। ● শ্রীকানাই ঘোষ (নেতাজী সুভাষ এভিনিউ, শ্রীরামপুর)—(১) বৃষ লগ্ন, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, কন্যা রাশি ও নরগণ। (২) বিরুদ্ধ গ্রহের জন্য বাধা পড়ছে; তবু নূতন বছরে কিছু সুযোগ পাবেন।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সংগে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সংগে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সংগে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

মাসিক রাশিফল

নাম- -

ঠিকানা- -

- -

·মাসিক বসুমতী·

● শ্রীসমর বসু (চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা) —(১) কর্কট লগ্ন ও মীন রাশি, (২) দু'তিন বছর মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট হতে পারে। পাঁচরতি মুক্তা ও নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বসু (সুকিয়া রো, কলি) জ্যোতিঃশাস্ত্র অনুযায়ীই প্রতিকারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ডাক্তারীতেও ঠিক ঠিক ওষুধ প্রয়োগ করে সব ক্ষেত্রে ফল হয় না, একথা নিশ্চয়ই জানেন। সুতরাং রত্ন ধারণে ফলের নিশ্চয়তা দেওয়া চলে না। বিশেষ করে নীলা সহ্য হবে কি না, আগে পরীক্ষা করতে হয়। পীতাম্বর নীলা আগে পরীক্ষা করতেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জুয়েলাররা পরীক্ষা করবার জন্য নীলা সাধারণত দাম জমা রেখে পরীক্ষা করতে দিয়ে থাকেন। শ্রীসুন্দর-গোপাল চক্রবর্তী (বাওয়ালী)---(১) সিংহ লগ্ন, উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র, নরগণ ও মীন রাশি, (২) অনেকাংশে অনুকূল। ● শ্রীবিজয় দে (ডিকসন লেন, কলিকাতা) -(১) আগামী অক্টোবরের মধ্যে সুযোগ আসতে পারে, (২) একটি রক্তকরবী ফুল ও একটি নীল অপরাজিতা ফুল কোনো শনিবারে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির পায়ে ঠেকিয়ে তার গায়ে একটু সিঁদুর লাগিয়ে তামার মাদুলীতে পুরে ধূনোর আঠায় বন্ধ করে লাল সুতোয় ডান হাতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীখ (তারাগুনিয়া) --(১) এখন থেকে তিন বছর বিশেষ সতর্ক হয়ে চলতে হবে, (২) অধ্যাপনা ভালই হবে। সুতরাং এখন থেকে যে বিষয়ে বেশী আগ্রহী সেই বিষয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ● শ্রীক (তারাগুনিয়া)---(১) ভবিষ্যতে গ্রন্থকার ও পণ্ডিত হিসাবে নাম করতে পারবে। (২) অধ্যাপনাই জীবিকা হবে। গ্রহের প্রতিকার জন্য পাঁচরতি মুক্তা ও আড়াই থেকে পাঁচ রতির মধ্যে লাল চুণী সোনার আংটিতে ধারণ করানো উচিত। ● শ্রীবিশ্ববন্ধু মৈত্র (গোপালরাজ লেন, কলিকাতা)—(১) শরীর এখন খারাপ যাবে, (২) আর্থিক অবস্থারও বিশেষ কোনো পরিবর্তন বুঝবার না। তবু আগামী এপ্রিল থেকে কিছু সুযোগ পেতে পারেন। পীত পোখরাজ আটরতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসনৎকুমার সিকদার (উদয়ন পল্লী, বেলঘরিয়া)---সিংহ রাশি ও কুম্ভ লগ্ন, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, (২) লটারীর যোগ নেই। পরে ভাল হবে। ● শ্রীজয় দে (ডিকসন লেন, কলিকাতা)—(১) জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ ও বর্তমান দশাদি বিরুদ্ধ, পাঁচ বছর পর কিছু ভাল। এবার বৈশাখ থেকে চেষ্টা করুন, (২) দেড় বছর দেখুন। প্রতিকার জন্য কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াই রতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রী পি কে সেন (কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা) মেষ রাশি ও কুম্ভ লগ্ন। ● শ্রীরোহিণীকান্ত চক্রবর্তী (ধুবড়ী)— (১) শ্রীশ্রীদক্ষিণা-কালিকা কবচ ধারণ ও পাঠ, (২) আগামী মার্চের পর কিছু ভাল হলেও তিন বছর উৎপাতসূচক। ● শ্রীমণীন্দ্র পুরকায়স্থ (নরসিংহপুর, কাছাড়)—(১) বাড়ীঘর হবে, (২) মাঝে মাঝে আর্থিক গোলমাল ও স্বজনকষ্টাদি যেতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। দক্ষিণা-কালিকা কবচ ধারণ ও পাঠে উপকার হতে পারে। ● শ্রীহরিসাধন দে (অবিনাশ শাসমল লেন, কলিকাতা)---(১) চলনসই, (২) বর্ষকাল মধ্যে হতে পারে। কিন্তু পাঁচরতি মুক্তা ও নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করানো উচিত। শ্রীঅজিত-কুমার চ্যাটার্জী (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি)—(১) হতে পারে, (২) আশানুরূপ হবে না। ● শ্রীমিহির চ্যাটার্জী(বোলপুর)—(১) আগামী জুন থেকে কোনোরূপ পরিবর্তন, (২) জুন থেকে অক্টোবর, (৩) সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়সের পর, (৪) সম্ভাবনা কম। একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠাবেন না। ● শ্রীসুজিৎকুমার দত্ত (সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর)—(১) মার্চের পর অনেকাংশে সুযোগপ্রদ, (২) প্রতিকার জন্য পীত পোখরাজ আটরতি ও রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীপরশুরাম শর্মা (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা)—শনি শরীর-মন, কর্মক্ষেত্র এবং গৃহসুখের বাধা ঘটাতে পারে, (২) কোনো যোগ নেই। তবু তুঙ্গী রাহু ও স্বক্ষেত্রে মঙ্গল অনেক সুফল দেয়। ● শ্রীসগো (কসবা) কর্কট রাশি, কন্যালগ্ন ও বিপ্রবর্ণ, (২) উন্নতির এখনো দেরী। ● শ্রীরজনী (কলিকাতা-৩২)---পাঁচ বছর অনুকূল নয়, (২) সাধারণভাবে চলবে। ● শ্রীখুকু দাস (কলিকাতা-৩১)--(১) জন্মের সঠিক তারিখ ও সময় দিতে হবে, তা হলে রাশি-লগ্নাদি জানতে পারবেন, (২) আগামী দেড় বছর মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীমতী (হুগলী)-- বিশাখা নক্ষত্র, তুলা রাশি ও বৃশ্চিক লগ্ন, (২) পাঁচরতি সাদা মুক্তা এবং আটরতি থেকে দশ রতির মধ্যে রক্তমুখী প্রবাল সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসোমনাথ দত্ত (রায়গঞ্জ), (১) দেড় বছর পর কর্মে শুভ যোগ দেখা যায়, (২) বর্ষকাল মধ্যে সন্তান যোগ না হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ● শ্রীসুজলকান্তি মুখার্জী (আসানসোল)—(১) আঠারো থেকে একুশ বর্ষে বিবাহের যোগ, (২) তবু এখন নয়মাস অনুকূল এবং ভাল জায়গায় হতে পারে। ● শ্রীপি জি ব্যানার্জী (অগস্ত্য-কুণ্ড, বারাণসী)---(১) আটরতি শ্রেষ্ঠ প্রবাল সোনার আংটিতে যথাবিধি ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) পেনসন সংক্রান্ত ব্যাপারে মার্চের মধ্যে কিছু সুরাহা হতে পারে। ● শ্রীঅজ্ঞাত (গভঃ কোয়ার্টার, টাটানগর)—তিন বছর বিশেষ ধৈর্য ধরে চিকিৎসকের পরামর্শ-মত চলুন উপকার পাবেন, (২) বাইরে কাটবে। ● কুমারী ছন্দা চ্যাটার্জী (গার্ডেন রীচ, কলিকাতা)—(১) কোনো লেবরেটরীতে শিক্ষা-বিশীতে ভাল হবে। (২) চেষ্টা করুন কিন্তু তিন বছর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত।

হৈমবতীও সরোজাক্ষর মতই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কী এ?'

সারদাপ্রসাদ অনুত্তেজিত শান্ত গলায় বললো, 'আপনার সেই টাকাটা।'

'আমার টাকা!' হৈমবতী প্রমাদ গণেন। পাগলা ক্ষ্যাপা মানুষটা কী বুঝতে কী বুঝেছে। তাই আকাশ থেকে পড়া গলায় বলেন, 'কোন টাকা?'

সারদাপ্রসাদ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেয়ালের মতই ভাবশূন্য গলায় বলে, 'বইয়ের ছুতো করে যেটা ভিক্ষে দিয়েছিলেন আমায়।'

সদা-উত্তেজিত সারদাপ্রসাদের এই শান্ত মূর্তি, আর ঠাণ্ডা স্বর হৈমবতীকে রীতিমত ভীত করে।

তা' ছাড়া শুধুই কি কণ্ঠস্বর?

ভাষা নয়?

এই কি সারদাপ্রসাদের ভাষা?

চির সরল, চির শিশু সারদাপ্রসাদের?

হৈমবতী ভীত গলাতেই বলেন, 'আমি তো তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না সারদাপ্রসাদ।'

সারদাপ্রসাদের ঘাড়টা আরো মোচড় খায়।

সারদাপ্রসাদ যেন সাদা দেওয়ালের গায়ে অদৃশ্য কালিতে লেখা কোনো লিপির পাঠোদ্ধার করছে।

হৈমবতী একটু অপেক্ষা করে আবার বলেন, 'কী হয়েছে বলতো ঠিক করে। আমি তো সত্যিই বুঝতে পারছি না—'

সারদাপ্রসাদ তবুও ঘাড় ফেরায় না।

সারদাপ্রসাদের সেই শান্ত স্বর আরো শান্ত আর দৃঢ় শোনায়, 'আমি বোকা—মুখ্যু নির্বোধ অন্ধ, আমার পক্ষে অনেক কিছুই বোঝা শক্ত, কিন্তু আপনার তো বুঝতে না পারার কিছু নেই খুড়িমা। তবে আপনাকে আমি বিশ্বাস করতাম। নির্বোধ পেয়ে আপনিও আমায় ঠকাবেন, এ ধারণা ছিল না। মূর্খের শিক্ষা বোধ হয় এইভাবেই আসে। যাক কি বলতে কি বলছি অপরাধ নেবেন না। আপনার টাকাটা কোনো কাজে লাগল না, তাই রেখে গেলাম। যে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলোর ছুতো করে ওটা দিয়েছিলেন, সেগুলো রান্নার উনুনে ফেলে দেবেন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে সারদাপ্রসাদ, কোনো দিকে না তাকিয়েই আস্তে আস্তে নেমে যায়।

হৈমবতী পাথরের পুতুলের মতো

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

তাকিয়ে থাকেন সেই চলে যাওয়ার দিকে।

ওই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সন্দেহ থাকে না তাঁর এ যাওয়া চিরদিনের জন্যে যাওয়া। ওই দীর্ঘ মাপের শিশু-মানষটা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

কিন্তু হৈমবতী [illegible] কোন উপায়ে?

হৈমবতী কি ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে বলবেন, 'পাগল ছেলে, চলে অমনি গেলেই হলো? সব কথা না বলে, কেমন তুমি চলে যাও দেখি?'

না কি এখনো আবার পুরনো ভঙ্গীতে উৎসাহভরে বলবেন, 'কী আশ্চর্য! কী বলছো তুমি? আমি বলে আমার নতুন ব্যবসার প্রতিষ্ঠা নিয়ে কতো স্বপ্ন দেখছি।'

নাঃ এতো নিষ্ঠুর হতে পারবেন না হৈমবতী, হতে পারবেন না অতো খেলো।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হৈমবতীর পক্ষে অবস্থাটা অনুমান করা কঠিন হয় না, আর হঠাৎ নিজেকে ভারী ক্লেদাক্ত মনে হয় তাঁর

মাথার মধ্যে, সমস্ত কোষে কোষে একটা আহত কণ্ঠের তীব্র অভিযোগ যেন অবিরাম ধাক্কা দিয়ে চলে, 'নির্বোধ পেয়ে আপনিও আমায় ঠকাবেন, এ ধারণা ছিল না:

হ্যাঁ অপরাধ করেছেন হৈমবতী।

নির্বোধ পেয়ে ঠকাতেই চেষ্টা করেছেন ওকে একটা সরল বিশ্বাসী হৃদয়কে দু'পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ ভেবেছেন ওর 'ভাল' করছি।

তার মানে ওকেই অন্ধ ভেবে নিশ্চিন্ত থেকেছি আমি, ভাবলেন হৈমবতী—নিজে যে কতটা অন্ধ সে খেয়াল করিনি। ও আমার দৃষ্টি খুলে দিয়ে গেল।

কিন্তু ওর দৃষ্টি খুলে দিল কে?

বিজয়া?

সরোজাক্ষ?

হায় হৈমবতী কেন 'নিমিত্ত' হলেন?

হৈমবতী টেবিলে পড়ে-থাকা টাকাগুলোর দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

●

অন্ধ যদি রুদ্র আলোর প্রহারে সহসা দৃষ্টিলাভ করে বসে, সে বুঝি চক্ষুষ্মানেদের থেকেও সচেতন হয়ে

ওঠে। আই সারদাপ্রসাদ যাত্রাকালে 'বিদায় গ্রহণের' পালা অভিনয় করে না। নিঃশব্দে কখন যেন চলে যায় চিরদিনের জন্যে।

তার এতদিনের অধিকৃত ঘরটায়, যে 'অধিকারটা' সরোজাক্ষ বাদে বাড়ির সকলেরই দৃষ্টিশূল ছিল, সেই ঘরটায় যেখানে যা ছিল সবই পড়ে থাকলো অবিকল, অবিকৃত। শুধু তার বাকি ছেঁড়া কাগজের বস্তাগুলো, যেগুলো দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড রূপে প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় দড়িবাঁধা পড়েছিল, সেইগুলোর জায়গাটাই শূন্য হয়ে গেল।

আর গেল সারদাপ্রসাদের জায়গাটা।

কিন্তু এ বাড়িতে তার কি কোথাও জায়গা ছিল, একমাত্র সরোজাক্ষর হৃদয়ে ছাড়া?

অথচ আশ্চর্য, সরোজাক্ষর নির্মমতাতেই বিদায় হয়ে গেল সে।

হয়তো এমনিই হয়।

সবচেয়ে প্রিয়জনের কাছ থেকেই সব থেকে বড় আঘাত আসে। তার ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, অসতর্কতায়।

৩

সারদাপ্রসাদ যে তার সমস্ত পদচিহ্ন মুছে নিয়ে চিরদিনের মতো চলে গেছে, এ সত্য ধরা পড়তে সময় লেগেছিল। কারণ ওটা কারো আশঙ্কার মধ্যে ছিল না। সারদাপ্রসাদ কখন বেরোয় কখন ঢোকে কতক্ষণ বাড়ি বসে থেকে জ্ঞানচর্চা করে, কে তার হিসেব রাখে? খোঁজ ছিল শুধু সরোজাক্ষর কিন্তু সেটা ইদানীং নয়। ইদানীং তো দু'জনেরই জীবন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল। যখন সরোজাক্ষর জীবনটা ছিল আঁটসাট একটা কর্মের ছন্দে গাঁথা, আর সারদাপ্রসাদ ছিল ঘরকুনো, তখন সরোজাক্ষ প্রতিদিন সাড়া নিতেন 'কী খবর সারদা? নতুন কী আবিষ্কার করলে?'

কিন্তু সে প্রশ্নের মধ্যে কি ব্যঙ্গ থাকতো?

নাঃ, তা' থাকতো না, থাকতো স্নেহ সদয়তা।

অথচ সে কথা আর এখন বলা যাবে না। সারদাপ্রসাদও আর সেই 'মধুর মিথ্যার' স্মৃতিকে মধুর ভাবতে পারবে না। সারাজীবনের সমস্ত স্নেহ প্রশ্নগুলোই ব্যঙ্গের শর হয়ে শরশয্যায় রেখে দেবে সারদাপ্রসাদকে।

চক্ষুষ্মান সারদাপ্রসাদ এখন প্রতিক্ষণ অনুভব করবে কী অনধিকারের ভূমিতে 'দাবি'র অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে এসেছে সে।

এখন সারদাপ্রসাদ বুঝতে পারছে 'নীলাক্ষ' নামের ঔদ্ধত্যটার চোখে কোন ছবি ছিল। 'ময়ূরাক্ষী' নামের অসহিষ্ণুতাটার চোখে কোন বিষ। বিজয়া নামের অহমিকাটির চোখে কী অবজ্ঞা।

অনেক দূরে চলে না গেলে বুঝি ক্যামেরার লেন্সে এতো স্পষ্ট মূর্তি ধরা পড়ে না।

একদা সরোজাক্ষই সারদার খবর নিতেন। এখন সরোজাক্ষ স্তব্ধ হয়ে গেছেন। তাই সারদার চলে যাওয়ার খবরটা প্রথম টের সরোজাক্ষ পাননি, পেলেন বিজয়া, সারদাপ্রসাদ সম্পর্কে যাঁর অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছু ছিল না।

কিন্তু কৌতূহল আর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল সারদা সেই টাকাটা দিয়ে।

উদগ্র একটা কৌতূহল আর তীব্র একটা 'হায় হায়' নিয়ে বিজয়া বারবার পুজোর ঘর থেকে নেমে এসে খোঁজ করেছেন ওই হতভাগ্য মানুষটার, কিন্তু দেখেছেন সে সব সময়ই অনুপস্থিত।

তা'ছাড়া—যে দরজার পর্দাটা সর্বদাই দরজার মাথার কাছে ডেলা পাকিয়ে গোটানো থাকতো সেটা সর্বদাই ঝুলে রয়েছে যেন একটা বোবা নিষেধের ভঙ্গীতে।

বিজয়া না বুঝে শূন্য ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাঁক পেড়েছেন, 'কী গো ঠাকুরজামাই তোমার আবার তোমার শালার মতন 'পর্দা বাই' হলো কেন? ওল্টাও দিকি। একটা কথা আছে।'

পর্দা তিনি নিজে সরাতে পারেন না, কারণ পুজো করতে করতে শুচিবস্ত্রে নীচে নেমেছেন।

অতএব কণ্ঠস্বরকেই পর্দায় পর্দায় তুলেছেন, 'কী ব্যাপার, এই ভর সন্ধ্যেতেই ঘুমিয়ে কাদা হলে না কি গো? —বলি ও মান্যমান মশাই, একটা অধম মানুষ যে এতো ডাকছে গ্রাহ্যি নেই?'

একবার দু'বার তিনবার।

অতঃপর বুঝেছেন ঘরে নেই লোকটা।

কিন্তু সেই নোটের গোছার দৃশ্যটা যে মর্মে বিঁধে আছে। লোকটাকে না পেলে তার রহস্য উদ্ধার হবে কি করে? তাই বার বার এসে এসে দেখেছেন বিজয়া, ঘরে আছে কি না সারদাপ্রসাদ নামের মূর্খটা।

কিন্তু কোথায়? কোনো সময়ই নেই।

অবশেষে দিন-তিনচার পরে সন্দেহ হলো। একতলায় নেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ঠাকুর পিসেমশাই খেয়ে বেরিয়ে গেছে?'

ঠাকুর চোখ কপালে তুলে প্রতিপ্রশ্ন করলো, 'পিসেমশাই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আকাশ থেকে পড়বে যে। বলছি এতোখানি বেলা হয়ে গেল, এখনো ফেরেনি মানুষটা, জিগ্যেস করছি খেয়ে বেরিয়েছে তো?'

ঠাকুর এবার কপাল থেকে চোখ নামিয়ে যা বলে, তার সারমর্ম হচ্ছে, পিসেমশাইয়ের কথা আজ নতুন করে হঠাৎ কেন? তিনি তো আজ চার দিন হলো হাওয়া। কেন, মা সে কথা জানেন না? ঠাকুরকে তো বলে গেছেন তিনি, 'ঠাকুর তুমি আর আমার জন্যে চাল নিও না, আমি চলে যাচ্ছি।' ঠাকুর সৌজন্য করে বলেছিল 'কবে ফিরবেন?' বলে গেছেন 'জানি না। ঠিক নেই।' মা এ সবের কিছু জানেন না?

বিজয়ার গৃহিণী গর্বে আঘাত লাগে।

বিজয়া ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'জানবো কেন। ঢং করে যাই বলে যাক, কাল তো তার ফেরার কথা ছিল। ফেরেনি মানে?'

ঠাকুর মনে মনে একটু মুচকি হাসে

এই কালকে ফেরার কথাটা যে সম্পূর্ণ বাজে কথা তা' বুঝতে দেরী হয় না তার। শুধু বুঝতে পারে না পিসেমশাই সম্পর্কে হঠাৎ মার এতো দরদ উথলে ওঠবার হেতু কি। সে লোকটার খাওয়া সম্পর্কে মাকে তো বেজারই দেখেছে ঠাকুর বরাবর। বাবুই খোঁজ করেছেন লক্ষ্য করেছেন, ভাল জিনিষ আনিয়েছেন।

ইদানীং বাবুরও ছাড়াছাড়া ভাব, রান্নাঘরেও সমারোহ নেই, পিসেমশাইয়েরও আগের মতো সেই আরাম আয়েসে ভোজনপর্বটি নেই। কখন হঠাৎ বেরিয়ে যায়, কখন হঠাৎ ফেরে, কখনো ব্যস্ত হয়ে নেমে এসে নিজেই জল আর আসন নিয়ে রান্নাঘরেরই একপাশে বসে পড়ে বলে, 'ঠাকুর ভাত হয়ে থাকে তো আমায় দুটি দিয়ে দাও তো। থাক থাক মাছ-তরকারি না হোক, ডাল হয়েছে তো? ওতেই হবে।'

কোনদিন বা বেলা দুটো-তিনটায় সময় অস্নাত অভুক্ত পরিশ্রান্ত চেহারা নিয়ে এসে বলেছে, 'ঠাকুর বড্ড বেলা হয়ে গেল। তুমি বেচারী এখনো বসে আছো কেন? ঢাকা দিয়ে রেখে চলে গেলেই পারতে।'

অপ্রতিভ ভাবে মাথায় দু'বালতি জল ঢেলে জলঝরা গায়েই এসে খেতে বসেছে।

লোকটার ওপর ঠাকরের কেমন একটা মমতা ছিল বলেই বসে থাকতো হাঁড়ি নিয়ে। মা সে খবর রাখতেন না বলেই,—রাখলে, নির্ঘাৎ হুকুম দিতেন, 'বসে থাকবার দরকার নেই, ভাত ঢেকে রেখে দাও।'

সেই মা আজ হঠাৎ পিসেমশাইয়ের সম্বন্ধে এতো ব্যস্ত! লোকটা যে আজ চারদিন আগে চলে গেছে, সে খবরও রাখেন না গিন্নী।

ঠাকুর তার কর্মদশায় সারদাপ্রসাদকে কোনোদিন চলে যেতে দেখেনি। তাই তারও যেন মনে হয়েছিল এই চলে যাওয়াটা একেবারেই চলে যাওয়া। ওই চাল নিতে বারণ করার সময় ভয়ানক একটা যন্ত্রণার মুখ দেখেছিল ঠাকুর।

কিন্তু সে রাঁধুনী মানুষ কাকে কি জিগ্যেস করবে?

তাঁছাড়া বাড়িটা কি আর আগের মতো আছে? যেন ভুতুড়ে বাড়ি হয়ে গেছে। মা অবশ্য চিরদিন উপরতলা-বাসিনী, কিন্তু বৌদি দাদাবাবুরা দিদি-মণিরা পিসেমশাই এরা তো মাতিয়ে রাখতো বাড়িটা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কী হয়েই গেল। বড়দিদির বিয়ে হয়ে গেল ছোড়দা বিদেশে চলে গেল। বড় দাদাবাবু মদ ধরলো, বৌদি তার সঙ্গে সুর ধরলো, ছোড়দিও কেমন কেমন হয়ে গেল। তার পর তো চলছেই ভাঙন। বাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে ভোম্বল হয়ে বসে আছেন, ছোড়দি ঘর থেকে বেরোয় না খায় না দায় না, বড়দা বেহেড হয়ে বাড়ি ফেরে আবার তো ছোট্ট ছেলেটাকে বোর্ডিঙে না কোথায় রেখে এসেছে, ছেলেটা সেখানেই থাকে। ছুটি হলে মামারবাড়ি যায়

শেষ-মেষ পিসেমশাইটি ছিল, তাও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তবে আর বাড়িটাকে ভুতুড়ে ছাড়া কি বলবে ঠাকুর? পুরনো লোক, সব কিছুই দেখছে বসে বসে। পুরনো মানুষ।

বিজয়ার ক্রুদ্ধ গলায় ভয় পায় না। অবজ্ঞার গলায় বলে, 'ফেরেন নি তা' তো, দেখতেই পাচ্ছেন। মানে আর আমি কি জানবো? আমার তো মনে হলো বরাবরের জন্যেই চলে গেলেন।'

কেন কে জানে হঠাৎ বিজয়ার ভারী ভয় হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভব করেন বিজয়া। তবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠটা বজায় রাখেন 'ও: তাই মনে হলো তোমার? তা তাই যদি মনে হলো আমায় একবার বলতে পারলে না?'

ঠাকুর সমান অবজ্ঞার গলায় বলে, 'আমি মাইনে-করা লোক, আমি আপনা-দের কি বলতে যাবো? আর জানবোই বা কেমন করে আপনারা জানেন না?'

লোকটা বীরভূমের লোক, তেজী। রেখে ঢেকে কথা বলে না।

●

বিজয়া উপরে এসে সরোজাক্ষকে ধরেন, 'ঠাকুরজামাই যে চলে গেলো, সেটা আমায় একবার জানানো দরকার মনে হল না?'

সরোজাক্ষ বিজয়ার কথায় কমই কর্ণপাত করেন, কিন্তু ওই 'চলে গেল' শব্দটায় চমকে তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় চলে গেল?'

সরোজাক্ষ আজ তিনদিন ধরে মনকে সঙ্কল্পে স্থির করছেন, আবার ফিরে যাবো কলেজে। মাথা হেঁট করে বলবো, 'আমি ভুল করেছিলাম।'

কিন্তু সঙ্কল্পে স্থির হলে কি হবে, কোথায় গিয়ে বলবেন? কাকে বল-বেন? কলেজে তো অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ছাত্র-ধর্মঘট চলছে। সরোজাক্ষ সঠিক জানেন না কী তাদের দাবি। হয়তো পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার দাবি, হয়তো প্রশ্নপত্র সহজ করার দাবি, হয়তো বা—কোনো প্রফেসর বা স্বয়ং

অধ্যক্ষকেই 'বরখাস্ত করা হোক' দাবি। মোট কথা কোনো একটা দাবিরই লড়াই এটা। এই লড়াইয়ের প্রথম সোপানস্বরূপ অধ্যক্ষকেও একদিন ঘেরাও করেছিল ওরা, কিন্তু তাতে তেমন লাভ হয় নি। অতএব ধর্মঘট।

সরোজাক্ষ কোথায় গিয়ে পেশ করবেন তাঁর আবেদন।

সরোজাক্ষ কি তবে কলকাতার বাইরের কোনো শিক্ষায়তনে আবেদন করতে যাবেন? যেখানে বিজয়া যাবে না, যাবে না সরোজাক্ষর বাকি সংসার। সরোজাক্ষ একা থাকবেন ছোট্ট একটি কোয়ার্টার্সে। হয়তো তেমনভাবে থাকতে পেলে, এখনো নিজেকে খুঁজে পাবেন সরোজাক্ষ। নিজেকে বুঝতে পারবেন।—

সংসারের জন্যেও অবশ্য কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য পালনের উপকরণ তো টাকা? সরোজাক্ষ নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধন করে থেকে পাঠিয়ে দেবেন সেটা।

এই ধরণের একটা স্বপ্নজগতে বাস করছিলেন সরোজাক্ষ, সেখানে বিজয়ার প্রশ্নটা যেন পাথরের টুকরোর মতো এসে লাগলো।

সারদাপ্রসাদের সেদিনের সেই মর্মাহত মুখটার ছবিটাকে সরোজাক্ষ যেন সভয় আতঙ্কে অনুভূতির ঘর থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, সাহস করে একবারও খোঁজ করে দেখেন নি সারদার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

যখনই ঘর থেকে বেরোচ্ছিলেন, একটা অপরিচিত দৃশ্য যেন সরোজাক্ষকে পাথর করে দিচ্ছিল। সারদাপ্রসাদের দরজায় পরিপাটি করে পর্দা ঝোলানো। সারদাপ্রসাদ কি ওর 'লেখা'গুলো সব নষ্ট করছে বসে বসে ওর অন্তরালে?

'হাসলেন যে? হাসলেন কেন?'

এ প্রশ্নটা কার?

কার এই রুক্ষ কঠিন কণ্ঠস্বর? যে-স্বর সরোজাক্ষকে অবিরত কাঁটার চাবুক মারছে। যে-স্বরের আওতা থেকে পালাতে চাইছেন সরোজাক্ষ।

কিন্তু এ কথা কি ভেবেছিলেন সরোজাক্ষ সেই স্বরটাই তাঁর থেকে অনেক দূরে চলে যাবে? সরোজাক্ষকে মুক্তি দিয়ে যাবে।

সরোজাক্ষ তাই চমকে উঠে বললেন, 'কোথায় চলে গেছে?

'ন্যাকা সাজছো কেন? তুমি জানো না?'

'না।'

'সেদিনের সেই টাকার ঘটনাটাই বা কি শুনি?'

'জানি না।'

'তোমাকেও কিছু বলে যায় নি, এই কথা বিশ্বাস করবো আমি?'

সরোজাক্ষ নীরব।

বিজয়া আবার বলেন, 'যাবার সময় তোমাকেও কিছু বলে যায় নি?'

সরোজাক্ষ নিরুত্তর।

বিজয়া রুষ্ট ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'যদি সত্যিই চলে গিয়ে থাকে, তো আমার দুর্ব্যবহারে যায় নি। গেলে তোমার দুর্ব্যবহারেই গেছে সেটা মনে রেখো।'

সরোজাক্ষ চোখ তুলে আস্তে বলেন, 'মনে রাখবো। সারাজীবন মনে রাখবো।'

'খোঁজ করবে না?'

'না।'

বিজয়া ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

সামনের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ান।

নাট্য শেষের যবনিকার মতো সম্ভাবনাবিহীন ওই পর্দাটা যেন বিজয়ার দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন এখুনি বলে উঠবে, 'কেন এখন মনটা এমন হু হু করে উঠছে? এই তো চেয়েছিলে চিরকাল।'

চেয়েছিলেন।

কিন্তু 'চাওয়াটা' 'পাওয়ার' চেহারা নিয়ে এসে ধরা দিলে যে এমন বীভৎস লাগে তা তো জানা ছিল না বিজয়ার।

সরোজাক্ষও আস্তে বেরিয়ে এলেন, চুপ করে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে, যেখানে সারদাপ্রসাদের মতো একটা অবোধ অজ্ঞান মানুষ হঠাৎ 'বোধের' ধাক্কায় ছিটকে চলে যাবার সময় চিরদিনের মত একটা যবনিকা টেনে দিয়ে গেছে।

হ্যাঁ সরোজাক্ষও টের পাচ্ছেন 'চিরদিনের মতো'। কারণ সরোজাক্ষ বিদ্ধবাণ খাওয়া একটা হৃদয় দেখতে পাচ্ছেন, সরোজাক্ষ রুক্ষ বিদীর্ণ একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন 'হাসলেন যে? হাসলেন কেন?'

খবরটা নীলাক্ষ তার স্ত্রীর কাছে পায় নি, সংসারের যাবতীয় গূঢ় আর গোপন খবর যার কাছে পাবার কথা। স্ত্রী তো তাকে ব্যঙ্গ করেই উড়িয়ে দিল।

খবর দিল ময়ূরাক্ষী।

দেশভ্রমণ সেরে কলকাতায় ফিরেই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ময়ূরাক্ষী আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে, গৌরবে ঝলসাতে ঝলসাতে বিজয়া সেই গৌরব আহ্লাদের দিকে দৃষ্টিপাত-মাত্র না করে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে মুহূর্তে পাথর করে দিলেন।

ধৈর্য ধরবার ক্ষমতা বিজয়ার নেই, সবুরে মেওয়া ফলে এ বিশ্বাসও নেই। তাই মেয়েটার উপর নিজের চিন্তাভারের খানিকটা চাপিয়ে দিয়ে যেন কিঞ্চিৎ হালকা হলেন।

ময়ূরাক্ষীও আবার হালকা হতে চাইল দাদার উপর চাপিয়ে।

নীলাক্ষ অবশ্য ওর মতো প্রত্যেকটি খবরকেই গুরুত্ব দিল না। বাবা কলকাতার কাজ ছেড়ে হুগলী কলেজের দ্বারস্থ হয়েছেন।'

এটা কী আর এমন মন্দ?

বাড়ি বসে বসে ফসিল হচ্ছিলেন, যান না বাইরে।

সারদাপ্রসাদের চলে যাওয়া?

সেটাতেও আপাতত নিজের কাছে নিজেকে ঈষৎ অপ্রতিভ অপ্রতিভ লাগলেও, খবরটা সুখবরই, কিন্তু মীনাক্ষী?

সংসার সম্পর্কে দায়িত্ব এবং মমত্ব লেশহীন নীলাক্ষও শুনে হঠাৎ আঘাত খেয়ে জেগে ওঠা বাঘের মতো গর্জে উঠে বলেছিল, 'অসম্ভব।'

কিন্তু 'অসম্ভব' বলে হুঙ্কার দিলেই তো হল না? ময়ূরাক্ষী তো নিজের ঘর থেকে গল্পটা বানিয়ে এনে দাদাকে শোনাতে বসেনি? বিশ্বাস না হয় যাকে জিগ্যেস করুক সে।

মাকে জিগ্যেস না করে স্ত্রীকেই জিগ্যেস করলো, 'জানতে তুমি?'

সুনন্দা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'আমায় বলনি যে—'

'বললে কী করতে?'

'কী করতাম?'

নীলাক্ষ গজরাতে গজরাতে বলে, 'সেই হতভাগা রাস্কেলটাকে ধরে এনে বিয়ে করতে বাধ্য করতাম।'

'ও: বাধ্য করতে? কিন্তু বাধ্য করে বিয়েয় যদি তোমার বোনের মন না থাকে?'

'মন না থাকে? মন না থাকে? ইয়ার্কি না কি? মন কি করে করাতে হয় দেখাচ্ছি গিয়ে।'

সুনন্দা দৃঢ়স্বরে বলে, 'পাগলামী কোর না। তোমাদের হিসেব-নিকেশের ধারায় চলবার মেয়ে ও নয়।'

নীলাক্ষ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'শুধু ও কেন, জগতের কোন্ মেয়েমানুষটাই সহজে ন্যায্য হিসেব-নিকেশের ধারায় চলতে চায়? একনম্বরের পাজী জাত।'

সুনন্দা উত্তর দেয় না, শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাকায়। নীলাক্ষ তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলে ওঠে, 'বেশ তো বিয়ে করতে রাজী না হয়, তার নাম-ঠিকানাটা বলুক চাবুকে ছাল ছাড়িয়ে দিয়ে আসি রাস্কেলটার।'

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়—' সুনন্দা ভালমানুষের গলায় বলে, 'ছুরিটা শানিয়ে ফেল ততোক্ষণ।'

নীলাক্ষ ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠে 'রাবিশ।' তারপর মীনাক্ষীর ঘরে গটগটিয়ে ঢুকে এসে বিনা ভূমিকায় বলে ওঠে, 'এই মীনা, সেই রাস্কেলটার নাম-ঠিকানা কি?'

[ক্রমশ।

আসাম

মোহনলাল মুখোপাধ্যায়

অতীতে, লোহিতে
মরমে উজানে
পাহাড়ে পাথরে

আমি;
প্রভাতে আকাশে
আলোকে আভাসে

জোয়ারে ভাটায়
আমি
খুঁজেছি তাহার আত্মার জাগরণ।

ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও অবিভক্ত বাঙলার প্রাক্তন মন্ত্রী]

গতানুগতিকতার হট্টমেলার মধ্যেই এমন কোন কোন জীবনের সন্ধান মেলে যা গতানুগতিকতার নাগালের বহু উর্ধ্বে। সে জীবন রূপ-ভাস্বর—সে জীবন নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল। সে জীবনের ইতিহাসের প্রথম পাতা থেকে শেষ বা আপাতশেষ পাতা পর্যন্ত শুধু আলোর নিশানা আর গৌরবের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এই জীবনের যাঁরা রূপকার বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তায় তাঁরা এক-একটি মূর্তিমন্ত বিগ্রহ। এই তালিকায় যে ক'টি নাম সবার আগে উল্লেখের দাবী নিয়ে দেখা দেয় তাদের মধ্যে ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশেষ ও শ্রদ্ধেয় নাম।

শিক্ষাক্ষেত্রে, ইতিহাসের অনুশীলনে, আইন জগতে, সর্বতোভাবে সফলতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র জীবন তাঁর উৎসর্গীত এই তিনের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের সাধনায়। বলা বাহুল্য, সে সাধনায় তিনি লব্ধসিদ্ধি। ১৮৯৪ সালের ২৯-এ সেপ্টেম্বর নবদ্বীপ-মহেশগঞ্জে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। বাঙলা দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৯৪ একটি স্মরণীয় অব্দ। সম্রাটের তিরোভাব এবং দিকপালের আবির্ভাব হিসাবে বছরটি চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকান্তর এবং বিভূতিভূষণের জন্ম ১৮৯৪ সালেরই ঘটনা। বর্ধমান জেলার কাটোয়া সাব-ডিভিসানের চোরাপুনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভূমি। কলকাতার ছোট আদালতের অন্যতম বিচারক স্বর্গত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাত ছেলের মধ্যে প্রমথনাথ বড়। শিক্ষারম্ভ হল কুষ্টিয়ায়। ১৯০৯ সালে কাটোয়া হাইস্কুলের (বর্তমানে কাশীদাস ইনস্টিটিউশান) ছাত্র হিসাবে এন্ট্রান্স

ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরীক্ষায় প্রমথনাথ উত্তীর্ণ হলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষার এই শেষ বছর। পরের বছর থেকে ম্যাট্রিকুলেশানের প্রবর্তন। কলেজী পাঠ নিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, স্নাতক হলেন ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে। এম-এতেও ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি তাঁরই অধিকারে এল।

১৯১৭ সালে আইন পরীক্ষায় ঠিক অনুরূপ নৈপুণ্যই প্রদর্শন করলেন প্রমথনাথ। ঐ বছর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপও তাঁর অধিকারে এল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও অর্থনীতির স্নাতকোত্তর বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগ দিলেন। ১৯১৮ সালে সুরু করলেন হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা। ঐ বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য হলেন। সেনেটের সদস্য হিসাবে আজ তাঁর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হল। আইন কলেজে অধ্যাপনা সুরু করলেন ১৯১৯ সালে। ১৯২৮ সালে ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিলেন। লিঙ্কনস ইন থেকে প্রথম পর্ব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে সুদূর ইংল্যাণ্ডে সারা বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করে ১৯২৯ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় হলেন সমুত্তীর্ণ। ১৯৩৫ সালে আইন কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ বরণ করলেন। তিন বছর পরে এলেন অধ্যক্ষের আসনে। ১৯৬৬ পর্যন্ত সেই আসন তাঁর দ্বারাই অলঙ্কৃত ছিল।

১৯৩৭ সালে প্রমথনাথ তদানীন্তন অবিভক্ত বাঙলার লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্য হলেন। ১৯৪১ সালে অন্তর্ভুক্ত হলেন তৎকালীন হক-মন্ত্রিসভায়। আইন, বিচার, অর্থ, রাজস্ব, অসামরিক সরবরাহ প্রভৃতি বিভিন্ন দপ্তরের তিনি

ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। মন্ত্রী হিসাবে সেদিন তাঁর সহকর্মী ছিলেন দেশনায়ক ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ জননায়ক ও মহানগরীর প্রাক্তন পৌরপাল শ্রীসন্তোষকুমার বসু, ঢাকার নবাব হবিবুল্লা খাঁ বাহাদুর প্রমুখ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গৌরবময় এবং মহার্ঘ আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইন-বিশেষজ্ঞ স্বর্গত ডক্টর রাধাবিনোদ পালের কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় এবং যৌথভাবে সংস্কৃত কলেজ ও বারাণসী পণ্ডিত সমাজ তাঁকে যথাক্রমে ডি-লিট, এল-এল-ডি এবং 'বাচস্পতি' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করলেন। ঐ বছরই ইউনেস্কো কনফারেন্সের চতুর্থ অধিবেশনে ভারত সরকার ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে বেইরুটে যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলেন প্রমথনাথ ছিলেন সেই দলভুক্ত একজন এবং ক্যানাডায় যে কমনওয়েলথ ভাইস চ্যান্সেলার্স কনফারেন্স হল তার পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করলেন প্রমথনাথ।

১৯৬০ সালে জাপান থেকে আমন্ত্রণ এল টোকিওতে তিনশ' কুড়িটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে সংগঠিত অল এশিয়ান এজুকেটার্স কনফারেন্সের উদ্বোধন এবং ঐ সম্মেলনে পৌরোহিত্য করার জন্য। মাদ্রাজে আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। অল বেঙ্গল টিচার্স এ্যাসোসিয়েশান এবং অল বেঙ্গল কলেজ এ্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স এ্যাসোসিয়েশানের সভাপতির আসনেও তাঁকে অধিষ্ঠিত দেখা গেছে। নাগপুরে অল ইণ্ডিয়া টিচার্স কনফারেন্স এবং ব্যাঙ্গালোরে অল ইণ্ডিয়া ল টিচার্স কনফারেন্সের পৌরোহিত্যের ভার তাঁর উপরই ন্যস্ত হয়। শেষোক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন-কার্যও তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

কলকাতা ছাড়াও বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, ঢাকা, পাটনা, উৎকল, গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কেউ সেনেট বা সিণ্ডিকেটে, কেউ ফ্যাকাল্টিতে, কেউ এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার-সচিব, ভারতীয় যাদুঘরের কার্য-নির্বাহক সমিতির, ক্যালকাটা রিভিউ-এর সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতি কর্মভার তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। ১৯৫৬ সালে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় থেকে তিনি অবসর নিলেন। আইনজ্ঞ হিসাবে যে সকল ঐতিহাসিক মামলায় আবির্ভূত হয়ে আইনের ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ মেধা ও কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে ডুমরাওঁ মামলা, ঝরিয়া উত্তরাধিকারের মামলা, দেওঘর মন্দির মামলা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখনীয়। ইণ্টারন্যাশনাল কাস্টমস এ্যাণ্ড ল' ইন এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া, সেক্রেটারী হিস্ট্রি অফ দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, বায়োগ্রাফী অফ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী এবং অসংখ্য পাঠ্য-পুস্তক তাঁর সারবান লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে।

বাঙলার অন্যতম প্রাতঃস্মরণীয় ও পূজ্য সন্তান, বাঙলার বাঘ শিক্ষাচার্য স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মেজ মেয়ে অমলা দেবীর সঙ্গে প্রমথনাথ পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫০ সালে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে অমলা দেবী লোকান্তরিতা হন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতের বিশিষ্ট কূটনৈতিক দূত পদ্মশ্রী-প্রাপ্ত ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইম্পিরিয়্যাল টোবাকোর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা শুভেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হার্ভার্ডে (স্মিথ কলেজে) ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও দর্শন ভাষায় সুপণ্ডিত দিব্যেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পুত্র। তাঁদের কন্যারাও শিক্ষাক্ষেত্রে পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলের মর্যাদা শুধু রক্ষা নয়, আপন আপন সাধনায় বৃদ্ধিও করেছেন যথেষ্ট পরিমাণে।

ডাঃ সুধীরকুমার মজুমদার

] ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দন্ত-চিকিৎসক [

বাঙলা দেশের বিশ শতকের রাজনীতির ইতিহাস যাঁদের বিশেষভাবে জানা আছে 'বিগ ফাইভ' কথাটি তাঁদের কাছে যেমন অতি পরিচিত ঠিক তেমনই দন্তচিকিৎসার ইতিহাস অনুশীলনে যাঁরা লব্ধসিদ্ধি 'বি ফোর' কথাটিও তাঁদের কাছে ঠিক ততখানিই পরিচিত। একদিন এমন দিন গেছে যে দন্তচিকিৎসার ক্ষেত্রে সারা ভারতের বিরাট পরিসরে দিকপাল হিসাবে এই চারজনের ললাটে অবিসম্বাদিত স্বীকৃতির জয়টিকা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দন্ত-চিকিৎসক হিসাবে এই চারজন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এককথায় নেতৃত্ব করেছেন। এই চারজনের মধ্যে একজন বোম্বাইয়ের ডাঃ ভি এম দেশাই, আর একজন নয়াদিল্লীর ডাঃ এন এন বেরী—আর বাকী দুজনই বাঙলার। একজন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাক্তন মন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ রফিউদ্দীন আহমেদ—অপরজন এই রচনার আলোচ্য ডাঃ সুধীরকুমার মজুমদার।

শুধু স্বনামধন্যই নন, বংশপরিচয়েও অনন্য। দেশবিশ্রুত চিকিৎসক স্বর্গত ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অনুজ স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র সুধীরকুমার। চিকিৎসক হিসাবে এই পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আজ আর নতুন করে বলার কিছু নেই। সেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে আর একটি গৌরবময় অধ্যায় সংযোজিত করলেন সুধীরকুমার একটি বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি করে।

১৮৯৬ সালের ২৪-এ ডিসেম্বর বাঙলা ১৩০৩ সালের ৭ই পৌষ তাঁর জন্ম। স্কুলজীবন অতিবাহিত হল জামতারায়। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ স্নাতক পরীক্ষার গণ্ডী সসম্মানে অতিক্রম করে গেলেন। ছাত্রজীবনে সহপাঠী হিসাবে পেয়েছেন বাঙলার বহু বরেণ্য সন্তানকে। যাঁদের মধ্যে তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, ডক্টর বিনয়রঞ্জন সেন, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই তালিকায় আরও একটি নাম সমগ্র তালিকার গৌরববৃদ্ধি করেছে। আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী কোটি কোটি ভারতীয়ের প্রাণের প্রণামে চিরভাস্বর একটি নাম। সেই নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিলেন সুধীরকুমার। ১৯২৪ সালে হার্ভার্ড থেকে স্নাতক হলেন। ডিগ্রীলাভ করে দেশে ফিরে এসে পসার আরম্ভ করলেন ১৯২৮ সালে। ১৯৩৩ থেকে '৫৪ পর্যন্ত এই দীর্ঘ একুশ বছরকাল মেডিক্যাল কলেজের দন্তচিকিৎসা বিভাগের প্রধানের আসনে তিনি সসম্মানে সমাসীন ছিলেন।

১৯৪৬ সালে অল ইণ্ডিয়া ডেণ্টাল এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা থেকে ডাঃ মজুমদার তার কার্যকরী সমিতির অন্যতম সভ্য। ১৯৪৯-৫০ সালে এই সংস্থার সভাপতির আসনে তাঁকে দেখা গেছে। ডেণ্টাল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ারও প্রতিষ্ঠাকাল থেকে (১৯৪৯) ১৯৬২ পর্যন্ত তার কার্যকরী পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। শেষ পাঁচ বছর তিনি ঐ সংস্থার অন্যতম সহকারী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন।

পারিবারিক জীবনে সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদার তাঁর সহধর্মিণী।

ডাঃ মজুমদারের সমগ্র জীবন ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দুশ্চর সাধনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর গৌরবময় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অল ইণ্ডিয়া ডেণ্টাল এ্যাসোসিয়েশন। এই প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনার রূপদানে এবং পরিচর্যায় তাঁর অসাধারণ শ্রমস্বীকার এবং অনবদ্য ভূমিকা এককথায় অবিস্মরণীয়। ভারতবর্ষে দন্তচিকিৎসার প্রসার এবং উন্নয়নে তাঁর অক্লান্ত সাধনা ভাবীকালের এই পথযাত্রীদের যাত্রাপথ অনেকখানি সুগম করে দিয়েছে। আপন সুখস্বাচ্ছন্দ্য-স্বার্থের দিকে দৃকপাত না করে সারা ভারতবর্ষ আপন ব্যয়ে পরিভ্রমণ করে যে বিরাট প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়ে তুললেন তা তার জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি বলে আজ সগৌরবে স্বীকৃত। দন্তচিকিৎসক হিসাবে বলা বাহুল্য, ডাঃ মজুমদার আজ শুধু একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বললে ভুল বলা হবে, এ জগতে আজ তিনি মুকুটহীন সম্রাট, অবিসম্বাদিত নায়ক—এ সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার তিলমাত্র অবকাশও আছে বলে মনে হয় না।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

[লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও গীতিকার]

আধুনিক বাঙলা কাব্যজগতে আজ যাঁরা পুরোভাগের একটি অতীব সম্মানজনক আসন আপন অধিকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন আপন আপন দীর্ঘ অনলস সাধনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ সেই তালিকায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। নিঃস্ব, রিক্ত, প্রবঞ্চিত সম্প্রদায়ের ব্যথা, বেদনা, হাহাকার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে আপন আপন লেখনীর মাধ্যমে যে কবির দল তাদের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, জোরালো অথচ প্রাঞ্জল ভাষা, চিত্তস্পর্শী বর্ণনায়, বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর সহায়তায় আপন বক্তব্য সম্বন্ধে পাঠকসমাজকে যে কবিকুল চিন্তাশীল করে তুলেছেন বিমলচন্দ্র তাঁদেরই একজন।

১৯১০ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁর জন্ম। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও মণিমালা দেবীর ছেলে বিমলচন্দ্রের প্রকৃত নাম দেবীপ্রসাদ। স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় দেবীপ্রসাদ নামান্তরিত হল বিমলচন্দ্রে। যথাসময়ে স্কুল-শিক্ষা সুরু হল। এগারো বছর বয়েস যখন সেই সময় থেকে সংসারে
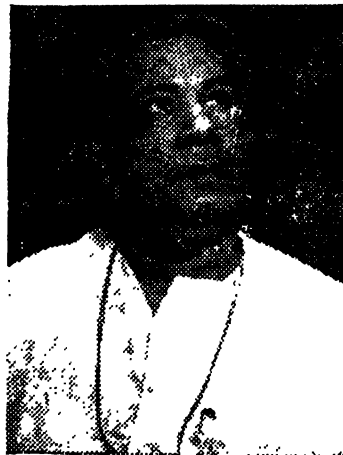
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রতিকূলতার ঝড় বইতে আরম্ভ হল। সংসারের সমগ্র ছবিটি নিমেষের মধ্যে যেন পাল্টে গেল। সংসার-তরণী শান্ত সরোবর থেকে পড়ল উত্তাল সমুদ্রে। পিতৃদেব পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। স্কুল ছাড়তে বাধ্য হতে হল। কিছুকাল পর আবহাওয়া খানিকটা পরিবর্তিত হলে বিমলচন্দ্র আবার পড়াশুনা সুরু করেন। পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশান থেকে ১৯২৯ সালে। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে যোগ দিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে, রাজনৈতিক কারণে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন এবং পরে ভর্তি হন আশুতোষ কলেজে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার চাপে শেষ পর্যন্ত পুঁথিগত বিদ্যায় সেইখান থেকেই তাঁকে ইতি টানতে হয়।

স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ দশ-বারো বছর

তিনি চতুষ্পাঠীতে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও কাব্য সম্বন্ধে শিক্ষা অর্জন করেছেন। অধ্যয়ন ছাড়া ভবানীপুরের এক আখড়ায় নিয়মিতভাবে কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা ও তলোয়ারের খেলা শিক্ষালাভ করে একসময়ে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিও অর্জন করেছিলেন।

১৯৩২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত একটানা এতগুলি বছর তাঁর অতিবাহিত হয়েছে করনিকের কর্মে। তারপর কিছুকাল তিনি মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগেও কর্মরত ছিলেন। গীতিকার হিসাবেও তিনি অপরিসীম খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত অসংখ্য ছায়াছবির গান লোকের মুখে মুখে গীত হয়ে জনপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে।

সাহিত্য-সাধনার মূল অনুপ্রেরণা পান পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই। মাতামহী রত্নমালা সেন ছিলেন নিজে একজন কবি। মা ছিলেন বাঙলা কাব্যের এক একনিষ্ঠা অনুরাগিণী পাঠিকা। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, রঙ্গলাল প্রমুখের রচনা তাঁর একরকম কণ্ঠস্থই ছিল। বাবা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় উদাত্ত কণ্ঠে গীতা ও উপনিষদ আবৃত্তি করতেন। এই পরিবেশ প্রভাবিত করে তাঁর শিশুমনকে এবং এই আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই সাহিত্যের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ তাঁর ভিতর দানা বাঁধতে থাকে---যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবন-প্রকাশের পথ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২২।২৩ সাল থেকে তাঁর গান কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২৭ সালে তাঁর 'পাষাণ-পুরী' কবিতাটি সাধারণ্যে সাড়া জাগায় এবং কবি-সমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে জীবন ও রাত্রি, দক্ষিণায়ন, উলুখড়, দ্বিপ্রহর ও অন্যান্য কবিতা, ফতোয়া, হাতেখড়ি, সাবিত্রী, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, বিশ্বশান্তি, ভুখা ভারত, উদ্বাস্তু ভারত, রক্তগোলাপ, উত্তর আকাশের তারা ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ একদা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। তাঁর বহু কবিতা একাধিক অভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

স্কুলের ছাত্র হিসাবেই কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন ও ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সর্বাধ্যক্ষ দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কাজ করেন। ১৯৩০-৩১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষ যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলিত সে সময় দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিক ছাত্র-কর্মীদের সঙ্গে বিপ্লবে নিজেকে যুক্ত করেন। পরবর্তীকালে মার্ক্সীয় দর্শন ও চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করে।

পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও তিনি পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন। প্রথম জীবনে 'মেখলা' নামে একটি কবিতা সঙ্কলন, তারপর 'বারো মাস' নামে একটি মাসিক পত্র তিনি সম্পাদন করেন। বর্তমানে ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'এষা' তাঁরই সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।

১৯৬৩ সালে বাঙলা দেশের তাবৎ গুণিসমাজ তাঁকে এক মহতী জনসভায় নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বাঙালী কবিদের মধ্যে এ এক দুর্লভ শ্লাঘার বিষয়। সম্প্রতি তিনি সোভিয়েত দেশ প্রদত্ত সুপ্রসিদ্ধ নেহরু-পুরস্কার অর্জন করে তাঁর অনুরাগী পাঠক-সমাজের আনন্দবর্ধন করেছেন।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন-কমিশনার]

বঙ্গ সন্তানদের মধ্যে যাঁরা আপন আপন দক্ষতায় ও নৈপুণ্যে রাজ্যের প্রশাসনের ক্ষেত্রে উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছেন---উন্নয়ন-কমিশনার শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন।

গঙ্গোপাধ্যায়দের আদিনিবাস রাজশাহী জেলায়। ঢাকা জেলার স্বর্ণ গ্রামে ১৯১৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর মাতুলালয়ে ভূপেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম। রাজশাহী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক স্বর্গত হেমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা সুরু হয় রাজশাহী সরকারী কলেজিয়েট

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্কুলে। এই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লর্ড বেণ্টিক। সেই বিচারে এই বিদ্যালয়টির শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।

১৯৩৫ সালে এই বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকার গণ্ডী অতিক্রম করলেন ভূপেন্দ্রচন্দ্র মাত্র ষোল বছর বয়সে। ভর্তি হলেন সেণ্ট পলস কলেজে। প্রাক স্নাতক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। ১৯৩৯ সালে---দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মরণভেরী বেজে উঠল যে বছর---অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে তদানীন্তন রিপন---বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে স্নাতক হলেন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়।

বি-এ পাশ করার পর সুরু হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন পূর্ণোদ্যমে চলছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সে এক সমস্যা-সঙ্কুল অধ্যায়। ১৯৪১ সাল। রবীন্দ্রনাথ প্রস্থান করলেন অমরলোকে। সুভাষচন্দ্র বৃটিশ প্রহরার চোখে ধুলো দিয়ে ইংরেজের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে মহানায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে। সেই বছর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন ভূপেন্দ্রচন্দ্র। স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নে সেইখানেই সমাপ্তি।

১৯৪১ সালে বাঙ্গালোরে ১৯৪২ সালে জলন্ধরে ডোগরা রেজিমেণ্টে নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৪ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ব্রহ্মদেশে। এই বছরেই তাঁকে পাঠান হ'ল আসাম-মণিপুরে, সেখান থেকে পাঠান হ'ল চট্টগ্রামে। সেখানে সেদিন অতিরিক্ত পুলিশসুপার পদে নিযুক্ত ছিলেন কলকাতা মহানগরীর বর্তমান পুলিশ-কমিশনার শ্রীপ্রণবকুমার সেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতার কুখ্যাত ও কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় তাঁকে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেল। ত্রাণকার্যে তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। আপন জীবন বিপন্ন করে, বহু বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অসহায় মানুষগুলিকে উপনীত করেছেন নিরাপদের বন্দরে। সে সময় তিনি ক্যাপ্টেন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে তিনি বদলী হলেন কাশ্মীরে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সেখানে তিনি অবস্থান করেছেন। সেই বছর রাজ্য সরকারের কর্মে যোগ দিলেন।

রাজ্যসরকারের কর্মগ্রহণের পর তিনি দু'বার বাদুরঘাট এবং দু'বার পুরুলিয়া জেলার জেলা-অধিকর্তার আসনে সমাসীন ছিলেন। স্বরাষ্ট্রদপ্তরে যতগুলি সেক্রেটারী ডেপুটি-সেক্রেটারীর পদ আছে তার সবগুলিই একবার-না-একবার তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে।

পি ডি টি'র প্রথম ডিরেক্টর এবং বক্সার জেলের প্রথম কম্যাণ্ডার (১৯৫০) শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় ১৯৬২ সালে খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই দায়িত্ব তিনি নির্বাহ করে গেছেন। দেশের ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট মোচনে তাঁর প্রচেষ্টা এবং এ সম্বন্ধে তাঁর গভীর চিন্তা প্রশংসার দাবী রাখে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে বর্তমান পদে তিনি সমাসীন হলেন।

খেলাধুলাতেও তাঁর অনুরাগ কম নয়। ছাত্রজীবনে এ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

১৯৫১ সালে রায়বাহাদুর অবনীধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শিপ্রা দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন।

স্বীকারোক্তি

আমি চিরকাল ক্রিকেট খেলা অত্যন্ত অপছন্দ করতাম এবং সত্যি বলতে কি এখনও করি। কিন্তু স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত যে, আমি কোনদিন খেলতে পারতাম না। স্কুলে একবার 'আম্পায়ার' হতে বাধ্য হয়েছিলাম। এক শ' রান প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় একজনকে 'আউট' বলে ঘোষণা করলাম। হারডিং, তুমি ভাল করে লক্ষ্য করনি; পরে সে আমাকে বলেছিল। আরে হঁ্যা, হঁ্যা, দেখছিলাম ঠিকই, আমি উত্তর দিলাম, 'আর, এও শোনো, তুমি আসলে 'আউট' হওনি। আমাকে 'আম্পায়ার' করার এই হচ্ছে উপযুক্ত শাস্তি। —গিলবার্ট হারডিং

আমি আমাদের ইংরেজী 'স্কুল-সিস্টেম'-এর খুব প্রশংসা করি—এককালে যদি খুবই নিন্দে করতাম—এই কারণে যে, এই পদ্ধতিটি সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানসিক পরিণতি এবং পূর্ণবয়স্ক জনোচিত আচরণ থেকে ছাত্রদের নিবৃত্ত ক'রে রাখে। কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত আমি একচুমুকও মদ খাই নি, এমন কি কোন তরুণীকে চুম্বনও করি নি এবং এ কথা আমার প্রায় প্রত্যেক সমসাময়িক মানুষ সম্পর্কে প্রযোজ্য।

—অধ্যাপক জোয়াড

খেলাধুলা

শীতাংশুদিক

ভারতের টেনিস-আকাশে তিন উজ্জ্বল তারকা

এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা কিছুদিন আগে সাউথ ক্লাবের লনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কিন্তু বিদেশের বহু নামকরা খেলোয়াড় যেমনি এবারে যোগদান করেন নি তেমনি ব্যক্তিগত নানা অসুবিধার জন্য আসতে পারেন নি ভারতের পয়লা নম্বরের খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণাণ, তাই খেলার মধ্যে আকর্ষণ থাকলেও তেমন জৌলুষ ছিল না। ১৯৬৬ সালের সাউথ ক্লাবের লনের সঙ্গে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের সেইদিক থেকে কোন তুলনাই যেন হয় না। সেদিনের দর্শক যা আনন্দ পেয়েছিলেন এবারের দর্শক তার কতটুকুই বা পেয়েছেন। তবু ভারতের অপর দুই খ্যাতিমান খেলোয়াড় জয়দীপ ও প্রেমজিৎ নিজের সুনাম বজায় রেখেছেন এবং তাঁদের অনুরাগীদের মুখে হাসি ফোটাতে সমর্থ হয়েছেন।

আমি টেনিস-জগতে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী কৃতী সেই তিন খেলোয়াড়ের পরিচিতি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। প্রথমেই বলা যাক রমানাথন কৃষ্ণাণের কথা। পিতা টি কে রমানাথনের পুত্র কৃষ্ণাণ ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতেই ছিল টেনিস কোর্ট। তাই টেনিসের প্রায় যাবতীয় কিছু পাঠ তিনি গ্রহণ করেন পিতার কাছেই। যার ফলে মাত্র তের বছর বয়সে যখন তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন ছাত্র সেই সময়েই 'স্ট্যানলি কাপ' অর্জন করে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। যদিও এই টুর্নামেণ্টে একমাত্র কলেজের ছেলেদেরই যোগদান করার অধিকার তথাপি কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে কৃষ্ণাণ বিশেষ অনুমতি লাভ করেছিলেন। কলিকাতায় আয়োজিত ন্যাশনাল জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাতেও তিনি ঐ বছর যোগদান করেন এবং বিজয়ী হন। ১৯৫০ এবং '৫১ সালে প্রায় প্রতিটি জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় তিনি বিজয়ী সাব্যস্ত হন।

'৫১ সালের শেষের দিকে তিনি দক্ষিণ ভারতের একনম্বর খেলোয়াড়

রমানাথন কৃষ্ণাণ

হবার যোগ্যতা অর্জন করলেন। ১৯৫২ সালে মিশন থেকে পাশ করেই তিনি পিতার সঙ্গে ইউরোপে গেলেন। এই তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রা। ১৯৫৩ সালে কৃষ্ণাণ ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেন এবং সুমন্ত মিশ্রের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় গেলেন। ভারতে ফিরে তিনি ন্যাশনাল সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক আর্কিনস টসকে হারিয়ে দিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে ডেভিস কাপে যোগদান করতে শুরু করলেন। '৫৪ সালে কৃষ্ণাণ লয়ার কলেজ থেকে পাশ করে অর্থনীতিতে বি-এ পাশ করেন '৫৬ সালে। '৫৮ সালে পাশ করলেন এম-এ। '৬০ সালে উইম্বলডন সেমি-ফাইন্যালে ওঠা তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় কীর্তি।

এর আগে '৫৯ সালে লণ্ডন গ্রাস কোর্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেজার সহ পৃথিবীবিখ্যাত বহু খেলোয়াড়কে পরাজিত করে বিজয়ী হন। ফিলাডেলফিয়া থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি লাভ করেন ঐ বছরেই। ঐ সময়েই তিনি পৃথিবীর তিন নম্বর খেলোয়াড় পর্যায়ে থাকেন। কৃষ্ণাণের জীবনের বড় কৃতিত্ব হল ড্রবনির মত জাঁদরেল খেলোয়াড়কে হারানো। 'রিভার ডেক টাইটেল' অর্জনও তাঁর জীবনের আর এক স্মরণীয় অধ্যায়।

টেনিসের উন্নত ধরণের ছলাকলা যেমন কৃষ্ণাণের জানা তেমনি অসাধারণ শক্তি ও গতির অধিকারীও তিনি। উত্তেজনা বা আবেগের দ্বারা তিনি কখনও চলেন নি। সারভিস তিনি সময়ানুযায়ী পালটান। ব্যাক-হ্যাণ্ড ড্রাইভ, ফোরহ্যাণ্ড ও ভলিশটে তিনি চোস্ত। ভারত সরকার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

কৃষ্ণাণের মতে বড় খেলোয়াড় হতে গেলে, আগে মনকে বাঁধতে হবে। ক্রীড়াপ্রথা প্রকরণে সংযমের আশীর্বাদ আনতে হবে। দর্শক হিসেবে তাঁর ইংল্যাণ্ড এবং কোলকাতার দর্শকদের ভাল লাগে।

টি এস সীতাপথির কন্যা শ্রীমতী ললিতার সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। বর্তমানে তাঁর এক পুত্র ও কন্যা। নাম রমেশ ও গোরি। সম্প্রতি কৃষ্ণাণ ব্যবসা-জগতে প্রবেশ করেছেন। বুটেন গ্যাস তৈরী ও সরবরাহের কাজে তাঁর দিনের অধিক সময় চলে যায় তবু টেনিসই তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণাণ অত্যন্ত বিনয়ী ও সদাহাস্যময় এবং ধর্মবিশ্বাসী। মাঠে নামবার আগে কি দেশে, কি বিদেশে, তিনি যাকে স্মরণ করে নেন।

জয়দীপ মুখার্জী

১৯৪২ সালে কোলকাতায় জয়দীপ মুখার্জীর জন্ম। পিতা অধীপ মুখোপাধ্যায় ও মা অদিতি মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে জয়দীপ হচ্ছে জ্যেষ্ঠ। জয়দীপের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়দিককার পরিচয়ও খুবই উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর্দা জে সি মুখার্জী ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের সভাপতি। মা হচ্ছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৌত্রী অর্থাৎ চিররঞ্জন দাসের কন্যা। ছোটবেলায় জয়দীপের ঘুড়ি ওড়ানোর সখ ছিল খুবই। সতের বছর বয়সে লা মার্টিন থেকে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার পর ঠাকুর্দার সঙ্গে সাউথ ক্লাবে আসতেন এবং একটু-আধটু টেনিসের পাঠ গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করতেন। তার ফলে ইডেন গার্ডেনসে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল জুনিয়ারদের খেলায় তের বছর বয়সী প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতায় তাঁর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের মধ্যে দিয়ে জীবনের এক শুভ অধ্যায় সূচিত হল। ১৯৫৮ সালে পেলেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। জয়ের পর জয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হল তাঁর যাত্রা। কাতরহীন, বিরামহীন সে যাত্রা। অনুশীলনও কঠোর হতে কঠোরতর হল। হাতপায়ের পেশী হল আরো শক্ত, মনে বলও বাড়ল। ক্রীড়াধারার মধ্যে দেখা গেল পরিবর্তন। '৫৯ সালে প্রথমে বিদেশে গেলেন জয়দীপ। জুনিয়র উইম্বলডনের সেমি-ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠেও ছিলেন। কিন্তু পায়ের পেশীর সঙ্কোচনের জন্য আর খেলতে পারেন নি। পরবর্তী বৎসর থেকে তিনি সিনিয়রে খেলতে শুরু করলেন। ১৯৬০ সালে এবং পরবর্তী বছরেও প্রেমজিতের সঙ্গে জাতীয় টেনিসে ডবলস-এ বিজয়ী হলেন। এর পর ন্যাশনাল এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ খেলাতেও তিনি জয়লাভ করেছেন। ইতিমধ্যে বহুবার তিনি বিদেশ সফর করে এসেছেন। ভারতের মাটিতে খ্যাতিমান অনেক খেলোয়াড়কেই জয়দীপ হারিয়েছেন। যেমন ব্যারি-নাইট, ফ্রেড স্টোলে, ম্যাগডারিনো প্রমুখকে। দিল্লীর জিমখানা কোর্টে বুডিং-এর মত খেলোয়াড়কে মাপা-মারের সুনিশ্চিত বাঁধনে এমন করে বেঁধে ফেলেছিলেন—যা দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে। জয়দীপের ছোট ভাই চিরদীপও বাঙ্গলার জুনিয়ার নম্বর টু। বোন এষা এবং বৃন্দাও টেনিসে পারদর্শিনী। ঘোড়ায় চড়তেও

জয়দীপ মুখার্জী

জয়দীপ খুব পটু। ১৯৬৪ সালে বিদেশিনী ললনা শ্রীমতী ব্রেণ্ডার সঙ্গে জয়দীপের বিবাহ হয়। তাঁর একটি কন্যা। নাম শালিনী।

প্রেমজিৎলাল

জাতীয় চ্যাম্পিয়ন জয়দীপ মুখার্জীকে হারিয়ে ও ভারত-গৌরব কৃষ্ণাণের সঙ্গে সমানতালে লড়াই করে যে ছেলেটি কিছুকাল আগে দিল্লীর দর্শকদের কাছে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল তিনিই আজকের লেখার কেন্দ্রবিন্দু। কাগজের খেলার পাতার শিরোনামা। নাম প্রেমজিৎলাল।

১৯৪০ সালে কোলকাতায় প্রেমজিৎলালের জন্ম। পিতার নাম মহীন্দ্রলাল। খেলাধুলার প্রতি বিশেষ আগ্রহই পুত্রকে শিশুকাল থেকে প্রভাবান্বিত করে। একসঙ্গে অনেক কিছু খেলায় মনোযোগ দিলেও টেনিসের প্রতি আকর্ষণ তার যেন দুর্বার। তাই প্রেমজিৎলালকে দেখা গেল সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল এবং কলেজ থেকে পাশ করে ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের খেলোয়াড় হিসেবে। অবশ্য নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতেও এর আগে কসুর করেন নি। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব অর্জন করেছিলেন। ডাবলস-এ জয়দীপের সঙ্গে উপর্যুপরি তিন বছর জুনিয়র জয়ের সম্মান, ডবলসের খেলায় জাতীয় টেনিসে কৃষ্ণাণকে হারাবার ফলে কৃষ্ণাণ, জয়দীপের সঙ্গে আর একটি নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল এবং তা হচ্ছে কৃষ্ণাণ-জয়দীপ-প্রেমজিৎ। তারপর থেকে এশিয়ান ও জাতীয় প্রতিযোগিতার খেলায় ওঁদের প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য। কখনও হার, কখনও জিত। এরপর থেকে বহুবার তিনি বিদেশে গেছেন। বহু নামী খেলোয়াড়কেও তাঁর কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। তন্মধ্যে আমেরিকার ব্যারি, ম্যাকে, ওয়েস্ট জার্মানীর বুলগার্ট, অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টেলো প্রমুখ পৃথিবীর প্রথম সারির অনেক খেলোয়াড়ই আছেন। তবে প্রেমজিৎলালের সবচেয়ে আনন্দের দিন প্লে কোর্টে বিশ্বের অদ্বিতীয় খেলোয়াড় স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানাকে হারানো।

সাতাশ বৎসর বয়স্ক প্রেমজিৎলালের দেহে আছে যেমন অটুট শক্তি, ক্রীড়াধারার মধ্যে আছে তেমনি কর্মকুশলতা আর হাতে আছে নয়ন-মনোহর মার। তাঁর মতে টেনিস খেলার বহুল প্রচলন আমাদের দেশে না থাকার অন্যতম কারণ আর্থিক দুরবস্থা।

৭১নং কড়েয়া রোডের বাসিন্দা প্রেমজিৎলাল মাত্র কয়েক বছর আগে শ্রীমতী জর্জিয়ান-এর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর এক পুত্র এক কন্যা। এ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর সঙ্গে প্রেমজিৎলাল কর্মসূত্রে জড়িত।

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী জুলি এ্যাণ্ড্রুস

ইংল্যাণ্ডে সেদিন পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালের সমাপ্তিপর্ব। ১৯৩৫ সালের অক্টোবরে জুলি এ্যাণ্ড্রুসের জন্ম হল ওয়ালটার-অন-টেমসে। এডোয়ার্ড সি এবং বারবারা ওয়েলসের মেয়ে 'জুলি' ছোটবেলা থেকেই কলা-বিদ্যার পাঠ নিতে থাকলেন। বিভিন্ন গৃহ-শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁকে বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিনী করে তুলতে লাগলেন। মাদাম স্টিলস-এ্যালেন তাঁর কণ্ঠসম্পদকে জাগ্রত করার চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁর কাছে গান শিখে যথেষ্ট লাভবতী

'মেরী পপিনস'-এর একটি দৃশ্যে ডিকভ্যান ডাইকের সঙ্গে জুলি এ্যাণ্ড্রুস্

হলেন জুলি। ১৯৪৭ সালে লণ্ডনে গায়িকা হিসেবে তাঁর নাম যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়ল। প্রচুর খ্যাতি এল গানের মাধ্যমে অথচ তখন কতটুকুই বা বয়েস? মাত্র বারো।

লণ্ডনে ১৯৫৩ সালে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের বর্তমান রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেকের বছরে আর পৃথিবীর ইতিহাসে এভারেস্ট বিজয়ের বছরে—প্যাণ্টোমাইম সিণ্ডারেল্লায় আবির্ভূতা হলেন জুলি। পরের বছর। ১৯৫৪ সাল। নিউ ইয়র্কে বড়ওয়ে প্রোডাকশন 'বয় ফ্রেণ্ড'-এ অংশ নিলেন জুলি। তারপর ১৯৫৬ থেকে '৬০ পর্যন্ত 'মাই ফেয়ার লেডী'-তে চলল তাঁর অপ্রতিহত জয়যাত্রা। এই জগদ্বিখ্যাত রচনার মঞ্চাভিনয়ে অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদও সমগ্র পৃথিবীর দিকে দিকে পৌঁছে গেছে। সে সম্বন্ধে নতুন করে কোন আলোচনা নিরর্থক। এই বিরাট সাফল্যের মূলে নায়িকার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও যে কতখানি দায়ী, তা সহজেই অনুমেয়।

১৯৫৬ থেকে টেলিভিশনেও তাঁকে দেখা যেতে লাগল। ছবির জগতেও ১৯৬৬ সালে 'সাউণ্ড অফ মিউজিক' ছবিটির মাধ্যমে যে কি বিরাট আলোড়ন তিনি এনেছেন, তা কারো অজানা নয়। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবির নাম : মেরী পপিন্স (১৯৬৪), এ্যামেন্থিকানিজেশানস অফ এমিলি (১৯৬৪), টোর্ন কার্টেন (১৯৬৬), হাওয়াই (১৯৬৬) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'মডার্নিজেশান অফ মিলি', 'স্টার' প্রভৃতি ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন।

'মাই ফেয়ার লেডী'-তে অভিনয়ের জন্যে ১৯৫৫-৫৬ সালে তাঁর অভূতপূর্ব নৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ নিউ ইয়র্ক নাট্য-সমালোচকগণ-প্রদত্ত পুরস্কার অর্জন করলেন। মেরী পপিন্সে তাঁর অভিনয় তাঁর হাতে তুলে দিল এ্যাকাডেমী পুরস্কার। স্বীকৃতি পেলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে।

১৯৫৯ সালের ১০ই মে টোনি ওয়ালটনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল।

'সাউন্ড অফ মিউজিক'-এর একটি দৃশ্যে নায়িকা জুলি এ্যান্ড্রুস ও ইলেনার পার্কার

তাঁদের একটিমাত্র মেয়ে এমা। বর্তমানে প্রযোজক রস ওয়ালটনের সঙ্গে তাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ওয়ালটন এবং জুলিকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার গুঞ্জন চতুর্দিকে ধ্বনিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখিত থাকে যে, এই ওয়ালটনের সঙ্গেই গায়ক-অভিনেতা ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা। প্রাক্তন সহধর্মিণী এবং তাঁর স্বনামধন্যা অভিনেত্রী কন্যাদের জননী ন্যান্সি সিনাত্রার বিয়ে হতে পারে—এ ধরণের একটি জল্পনা-কল্পনা অল্পকাল আগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল

—চিত্রপ্রিয়

এই রচনার অন্তর্ভুক্ত শ্রীমতী এ্যান্ড্রুসের আলোকচিত্রগুলি এম-জি-এম ও টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শেষ থেকে শুরু

ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড এ্যাথলেটিক ক্লাব তাঁদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ থেকে শুরু' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন স্থানীয় বিস্-ফ্রি প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে। এই ক্লাবের শিল্পী সদস্যরা অন্যান্য বারের মত এবারও ঐ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ভাল অভিনয় করে পূর্বখ্যাতি অক্ষুন্ন রেখেছেন। মঞ্চস্থ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে ভোলা, নীলমণি, কেতো, মেসোমশাই, সেকালবাবু প্রভৃতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারার জন্য সর্বশ্রী বিমল নিয়োগী, সুদর্শন মুখোপাধ্যায়, রবীন নিয়োগী, অমল মিত্র, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায় সকলের সাধুবাদ কুড়িয়েছেন, গুণ্ডা প্রকৃতির (বুবি) ও নিমাই রায় সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন ভাল অভিনয় করতে। তাঁদের অভিনয় প্রশংসনীয়। তাছাড়া তরুণ নিয়োগী, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁদের সু-অভিনয়ে শোকের পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। নাটকের একমাত্র নায়িকা সাবলীল অভিনয় উপস্থিত দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের আর একটি আকর্ষণ ছিল 'নূপুর' নৃত্যনাট্য। [illegible] রত্না প্রধান, সুকুমার সুর ও অন্যান্য শিল্পীদের রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং তমশ্রী বক্সী ও অন্যান্যদের সুন্দর নৃত্য

তাসের দেশ

সম্প্রতি সবুজ সঙ্ঘের সদস্যারা উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য নিজস্ব প্রাঙ্গণে একটি সাহায্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে গীতাঞ্জলি শিল্পীরা পরিবেশন করলেন মনোজ্ঞ নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ'। পরিবেশন-বৈচিত্র্যে এ অনুষ্ঠান দর্শকদের তৃপ্ত করেছে। প্রতিটি নৃত্যশিল্পীই নিজ নিজ চরিত্রে ছিলেন সপ্রাণ, আবহসঙ্গীত ও আলোকসম্পাত ছিল পরিবেশানুগ।

তোতা মারা গেছে ও ঝিঁঝিপোকার কান্না

আধুনিক শিল্পী সংস্থার শিল্পী সদস্যরা হালদা বাড়ী প্রাঙ্গণে তোতা মারা গেছে' ও 'ঝিঁঝিপোকার কান্না' নাটক দুটি অভিনয় করে খ্যাতি পেলেন। অভিনয়ে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছেন প্রতাপ রায় ও শঙ্কর চক্রবর্তী। অন্যান্য চরিত্রে অংশ নিয়েছেন নিতাই চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্য, দিলীপ পাঠক, শিশির ভট্টাচার্য, শক্তি মুখোপাধ্যায়, রূপনারায়ণ নাথ, মানস রায়, কৃষ্ণপদ নাথ, শম্ভু পাল, আশীষ মুখোপাধ্যায়, অতনু ভট্টাচার্য, শক্তি ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ দাস, মীনা দে ও দীপালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্য-নির্দেশক রূপে ছিলেন মাখন মিশ্র।

টিপু সুলতান

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে ইণ্ডিয়ান অয়েল রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পী সদস্যারা সুধীরমোহন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় টিপু সুলতান সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন, নাম-ভূমিকায় নাট্য-নির্দেশক শ্রীভট্টাচার্যর অনন্য চরিত্র-চিত্রণ দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। অভিনয় প্রধান এই ঐতিহাসিক নাটকটির চরিত্রগুলিও ছিল সপ্রাণ ও সজীব। নানা ফাড়নাবীশ-রূপী শচীন্দ্রনাথ ও রুণা বেগম চরিত্রে তনু সরকার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সঙ্গে চরিত্রোপযোগী অভিনয়ের জন্য নজরে পড়েছেন সুভাষ ঘোষ, গোপীনাথ সাহা, মুকুল ঘোষ, নিরঞ্জন প্রামাণিক, দিলীপ চক্রবর্তী, শর্মিলা চট্টোপাধ্যায় ও অসীমা শীল, বীরেশ্বর চক্রবর্তী সৃষ্ট নিজাম চরিত্রটি দর্শক মনে দাগ কাটতে পারে নি। আলোক-সম্পাত পরিবেশানুগ। অনুষ্ঠানের পূর্বে সংস্থার আহ্বায়ক সুধীরমোহন ভট্টাচার্য রাজ্যপালকে স্বাগত জানান এবং সংস্থার পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীইন্দুবীর ১৫০১ টাকার একটি চেক রাজ্যপালের হাতে দেন; রাজ্যপালের বন্যাত্রাণ তহবিলের সাহায্যার্থে।

অশোক সেন (শিলালি) পরিচালিত নাটক 'বনলতা মিটার'-এর একটি দৃশ্যে বিনতা রায় ও হারু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজাহান

খিদিরপুরের সান্ধ্য মিলন সম্প্রদায় সম্প্রতি সাজাহান যাত্রাভিনয় করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এ নাটক মঞ্চেই অভিনীত হতে দেখেছেন এতদিন দর্শকরা মূলত এ নাটক মঞ্চের জন্যই লেখা এবং মঞ্চাভিনয় বহুবার বহুভাবে দর্শকদের মনোহরণ করেছে। কিন্তু মঞ্চের নাটকও যে যাত্রার আঙ্গিকে পরিবেশন করা যায় তার উজ্জ্বল নিদর্শন রাখলেন আলোচ্য সংস্থার কুশলী শিল্পীরা, সুখের কথা এ যাত্রাভিনয় দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। প্রতি অভিনেতা - অভিনেত্রীই চমৎকার অভিনয় করেছেন। পরিচালনার কৃতিত্ব নিমাই সরকারের এবং নৃত্য-পরিকল্পনায় ছিলেন নারায়ণ সরকার। অভিনয় করেন গীতশ্রী ব্যানার্জি, মমতা রায়, সবিত

দাস, মিঃ পিটার, ভবানীশঙ্কর দেবশর্মা, কর্ণ মল্লিক অ ত চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ সরকার, সুধীর মুখোপাধ্যায় এবং টুনু, বেলা, রীতা, রত্না, ছবি, মিতা, বকুল, পুতুল এবং আরও অনেকে।

ঘণ্টাকটক

পূর্ব রেলওয়ে কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক সংস্থা অগার কৃষ্টি সংসদ কর্তৃক সম্প্রতি এ নাটক অভিনীত হল রঙমহল মঞ্চে, প্রস্তাবনা দৃশ্যের মুখ্যে ধ্যাকে নাট্যকারের বক্তব্যটুকু নির্দেশক বিনয় লাহিড়ী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমগ্র অভিনয় অংশে কোথাও অতি নাটকীয়তা লক্ষ্য করা যায় নি। চরিত্র-চিত্রণে সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছেন অজিত সিংহ, চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও সিপ্রা সাহা, অন্যান্য চরিত্রে মোটামুটি দক্ষতার মান অতিক্রম ক রছেন সলিল ঘোষ, সৌরেন মল্লিক, পরেশ ধর, অহি দাস ও দাশরথি সরক র।

কাঞ্চনরঙ্গ

সম্প্রতি খেয়ালী গোষ্ঠীর (সি, ভি, সি, অফিস) শিল্পী সভ শ্রীশম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটির অভিনয় পরিবে করলেন রাঁচী গান্ধীনগর ক্লাব প্রাঙ্গণে অন্যান্য বারের মত এবারেও তাঁদে দলগত অভিনয়ে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা পরিচয় পাওয়া গেল। দলগত, সুসংবদ্ধ ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে শিল্পীরা সেদিনের দর্শকদের একাত্ম করতে পেরেছিলেন। অভিনয়ে শ্রীপরিমল চক্রবর্তী (পাঁচু), শ্রীমতী বাসন্তী দাস (তরলা এবং শ্রীদেবপ্রসাদ বিশ্বাস (কর্তা) দর্শকদের অভিভূত করিয়া দেয়। এ ছাড়া আরও যাঁরা অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী অমল ভট্টাচার্য, হেনু মুখার্জী, নিরঞ্জন রায়, মিলন দাশগুপ্ত, অসীম ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সন্ধ্যা গাঙ্গুলী, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মুখার্জী ও কুমারী নীলা বিশ্বাস।

আবহসঙ্গীত পরিবেশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীপরিমল ঘোষ এবং শ্রীবিমলকুমার দাস। নাটকটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে তাঁদের সুন্দর ও সুষ্ঠু সঙ্গীত পরিবেশনা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

শিল্পীমহল

সম্প্রতি কলকাতার অন্যতম সুখ্যাত নাট্যসংস্থা শিল্পীমহল-এর উদ্যোগে ও বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালকবৃন্দ এবং বহু নাট্যসংস্থার মুখপাত্রদের উপস্থিতিতে এবং তরুণ নাট্যকার লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পৌরোহিত্যে সংস্থার নিজস্ব প্রাঙ্গণে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে মঞ্চ এবং নাটক সম্পর্কে নানান বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দান করেন। তারপর সংস্থার পক্ষ থেকে জাতীয় সরকার এবং বাংলার সারস্বত সমাজের কাছে সবিনয়ে আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে, আশা করি এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চয় প্রয়োজনীয় কার্যসূচী বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করবেন। এ অগ্রণী হলে ভাবীকাল নিশ্চয়ই কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে ও স জানাবে। সভান্তে শ্রীরূপদক্ষ একটি একাঙ্ক নাটক উ সকলকে পাঠ করে শোনানো হ

বনলতা মিটার

গত ৭ই ডিসেম্বর (শনি শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে দক্ষিণ কলি খ্যাতনামা সংস্থা 'সন্ধ্যানীড়' পরিবেশিত হল বেরটল্ট ব্রে কয়েকটি বিখ্যাত সঙ্গীত। এবং সঙ্গে পরিবেশিত হল হেনরী ফ্রান বেকের La Pariesienne ভাবাবলম্বনে রচিত নাটিকা 'বন মিটার'। শ্রীদুর্গাদাস সরকার অনু ব্রেখটের সঙ্গীতগুলিতে কণ্ঠ দিয়ে প্রভাতভূষণ এবং শ্রীমতী চ[illegible]

অটোয়া-এ (কানাডা) অনুষ্ঠিত বিভাবরী

সেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সবাইকে উৎসাহিত করুন।

উদ্বোধনী সভায় সকল বক্তাই উত্তরবঙ্গের বন্যার ভয়াবহতার কথা ব্যক্ত করেন। পৌরপ্রধান শ্রীদে ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য মানবতার খাতিরে এই দুর্গত ভাই-বোনেদের সাহায্যার্থে সবাইকে এগিয়ে আসতে বলেন। অনুষ্ঠানকালে পৌরপ্রধানের হাতে উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে আপাতত দু'শ এক টাকা তুলে দেওয়া হয়। এরপর এক বিচিত্রানুষ্ঠানে বাংলার নিম্নলিখিত প্রখ্যাত শিল্পিগণ অংশগ্রহণ করেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিশির সরকার, শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র, শ্রীমতী বনশ্রী সেনগুপ্তা এবং শ্রীমতী শেফালী ঘোষ। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন: হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়। ব্যঙ্গ সঙ্গীতে: শ্রীনির্মল ঘোষ সবাইকে আনন্দ দান করেন। সকল শিল্পীর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন: শ্রীযশোদা মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমুদ ঘোষ ও শ্রীকমল রায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিল্পীরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (আবৃত্তি), শ্রীসতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীশুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী গীতা দে। অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে কুমারী সুতপা দত্ত ও কুমারী শুক্লা সেনগুপ্ত

সংযোজনা করেছেন প্রভাতভূষণ। হেনরী ফ্রানকইস বেকের নাটক La Pariesienne-র অনুবাদকর্মটি সম্পাদনে অশোক সেন যথেষ্ট দক্ষতা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাটক পরিচালনায় অশোক সেনের (শিলালী) কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। 'বনলতা মিটার' নাটকটি প্রাণবন্ত অভিনয়ে যাঁরা উজ্জ্বল করে রাখেন তাঁদের মধ্যে নামভূমিকায় শ্রীমতী বিনতা রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী রায়ের অভিনয় সুন্দর ও সাবলীল। অন্যান্য ভূমিকায় হারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর সেন, প্রণতা নন্দী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন দীপ্তি চক্রবর্তী।

ওটোয়ায় বিজয়াসম্মিলনী

ওটোয়া থেকে মাসিক বসুমতীর অনুরাগী পাঠিকা ও গ্রাহিকা শ্রীমতী বেলা সেন ওটোয়ায় অনুষ্ঠিত নাচ, গান-বাজনা রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ' নাটক ও বিহারী লোকনৃত্য অনুষ্ঠানের সমাচার পাঠিয়েছেন। ওটোয়ায় বহু ভারতীয় ও বাঙালী আছেন তাঁরা হিন্দী চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হলে একসঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেন। সম্প্রতি তাঁরা ওটোয়ায় বিজয়া-সম্মিলনী করলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীদের নাচ, গান, বাজনা ও নাটক সমাগত অতিথিদের প্রচুর আনন্দ দান করে। ওটোয়ার ভারতীয় ও বাঙালীদের তিনটি সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে। সংবাদের সঙ্গে প্রকাশিত বিহারী লোকনৃত্যের চিত্রটি পাঠিয়েছেন আমাদের গ্রাহিকা শ্রীমতী বেলা সেন। বিহারী লোকনৃত্যের চিত্রটি তুলেছেন শ্রীকল্লোল বসু।

বন্যাত্রাণে মিত্র সঙ্ঘের দান

গত শনিবার, ২৩শে নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় জয়মিত্র স্ট্রীটে, 'মিত্র সঙ্ঘের' ৫ম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের জয়েন্ট লেবার কমিশনার শ্রী এস কে ভট্টাচার্য, উদ্বোধন করেন পৌরপ্রধান শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে, বিশেষ অতিথিরূপে অধ্যাপক অপরেশ ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথিরূপে স্টট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। পৌরপ্রতিনিধিদ্বয় শ্রীশৈলেশকুমার সুর ও শ্রীরথীন্দ্রকৃষ্ণ

লগ্ন এলো

গত ২৭শে নভেম্বর 'ভারতী' সংস্থার সভ ও সভ্যবৃন্দ শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিচালনায় বেহালার অহীন্দ্র মঞ্চে শ্রীঅরুণকান্তি সাহা বিরচিত সামাজিক নাটক 'লগ্ন এলো' মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি মোটামুটি সুপরিবেশিতই হয়েছে।

অভিনয়ের দিক থেকে বিচার করলে নাটকের চরিত্র-সমষ্টির মধ্যে আলো মজুমদার (সতী), পাঁচুগোপাল দাস (কালীপদ সরখেল), তপনকুমার রায় (দানিয়াৎ সেন) ও পরিচালক প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শ্যামল

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই প্রশংসার দাবী রাখেন।

এ ছাড়া নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখরকুমার, শিখা মণ্ডল ও গীতার অভিনয়ও বেশ ভালই। বাকী সব মোটামুটি।

ত্রিশূল

নাট্যশিল্পে বাঙলার ঐতিহ্য এখনো সগৌরবে বিদ্যমান, বলিষ্ঠ চিন্তাধারায়, নবতম সৃষ্টির আবেদনে তার নাটকীয় সজীবতায়। এই বাঙলা দেশেই নাটক নিয়ে চলেছে হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নবগঠিত প্রগতি-ধর্মী নাট্যসংস্থা 'সূর্য সারথি' এগিয়ে এসেছেন তাঁদের নবতম উপহার নিয়ে। সে উপহার খ্যাতনামা চিত্রনাট্যকার গৌর শী রচিত 'ত্রিশূল'। তিনিই ব্যঙ্গাত্মক এই নাটকটির পরিচালক। তাঁর সংগে রয়েছেন চিত্র ও মঞ্চ-জগতের কতিপয় সুখ্যাত শিল্পী কলা-কুশলী, সাহিত্যিক প্রভৃতি।

'ত্রিশূল'-এর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন 'সুরকার' কালোবরণ, গান রচনা ও প্রচারণায় রয়েছেন রমেন চৌধুরী। পুলিন পাল অনুষ্ঠান তত্ত্বা-বধানে আছেন।

মোহময়ী এলিজাবেথ টেলর

এলিজাবেথ টেলর। রাশি রাশি বিস্ময়, অফুরন্ত জিজ্ঞাসা, দুর্বার কৌতূহলের একটি নিটোল দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নর-নারীর হৃদয়ে আলোড়ন আনা, অবর্ণনীয় আনন্দের হিল্লোল বহানো, অন্তরে দোলা লাগানো একটি অবিস্মরণীয় নাম। যে নামটিকে ঘিরে এই পুঞ্জীভূত বিস্ময়, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা—তার অধিকারিণী এলিজাবেথ টেলর—লিজ টেলর-বার্টন-এর চল্লিশের ঘরে পৌঁছতে এখনও বছর তিনেক বাকী।

ব্যালে-নাচ শিখতে আরম্ভ কর-লেন লিজ। মন দিয়ে বিদ্যাটি আয়ত্তে আনেন। যথেষ্ট ধৈর্য, নিষ্ঠার পরিচয় দেন। দেখতে দেখতে পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন লিজ ব্যালে-নাচে। হঠাৎ চলে এলেন ছবির রাজ্যে। রূপালী পর্দাকেই প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিলেন। 'ন্যাশনাল ভেলভেট' ছবিটি তাঁকে রাতারাতি পরিণত করল এক প্রথম শ্রেণীর তার-কায়। জগতের শ্রেষ্ঠ তারকাদের তালিকায় সেদিন যুক্ত হয়ে গেল আর একটি নাম। একটি ছবির মাধ্যমেই খ্যাতি-যশ-প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শীর্ষে।

সেদিন যে জয়যাত্রা সুরু হল আজও তা অপ্রতিহত। সে দিনটি থেকে আজ অনেকগুলি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কো ভাদি, জায়েণ্ট, ব্যু ব্রুমেল, সাডেনলি লস্ট সামার, ক্যাট অন এ হট টিন রুফ, স্যাণ্ড পাইপার, ভি-আই-পি, কমিডিয়ান, ক্লিওপেট্রা, হুস এ্যাফ্রেদ অফ ভার্জি-নিয়া উলফ, বাটারফিল্ড-এইট, রিফ্লেক-সান অফ দ্য গোল্ডেন আইজ, টেমিং

বাটার ফিল্ড-৮" চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে এলিজাবেথ টেলর

'ক্লিওপেট্রা' চিত্রে শ্রীমতী টেলর ও রিচার্ড বার্টন

অফ দ্য স্প্রু প্রভৃতি এই দীর্ঘ বরষ-ব্যাপী জয়যাত্রা পথের এক একটি গৌরবময় মাইলস্টোন। এর মধ্যে কয়েকটি চিত্র দর্শকসমাজে তাঁকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন এনেছে সমকালীন ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। একবার নয়, দু'বার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অস্কার তিনি পেয়েছেন।

জীবনে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ তিনি হয়েছেন একাধিকবার। সংখ্যাটি খুব সামান্য বা উপেক্ষণীয়ও নয়। তাঁর বর্তমান স্বামী শক্তিমান অভিনেতা রিচার্ড বার্টন তাঁর পঞ্চম স্বামী, এর আগে আরও চারজন তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করেছিলেন। খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী সা সা গেবরের অন্যতম ভূতপূর্ব স্বামী ধনকুবের কনরাদ হিলটনের ছেলে নিকি লিজের প্রথম স্বামী। দ্বিতীয় জন মাইক উইলডিং, তৃতীয় মাইকেল টড, চতুর্থ এডি ফিশার। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বিবাহের পরিণতি বিচ্ছেদে। মাইকেল টড ১৯৫৮ সালে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

যে লিজকে নিয়ে তাঁর দর্শকদের উল্লাসের সীমা নেই—তাঁকে কেন্দ্র করেই সারা জগতের দর্শকসমাজের হতাশার ছায়া নেমে এসেছিল। বিষণ্ণতায় আবৃত হয়ে গিয়েছিল দর্শকচিত্ত, বেদনায় সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল তাঁদের মন। একবার নয়—দু' দু'বার। প্রথমবার তিনি যখন মরণাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়িনী, দ্বিতীয়বার যখন তিনি ঘোষণা করলেন—এবার পুরোপুরি সংসার করব। আর ছবি নয়।

লিজ টেলর মানে এককথায় একটি বিস্ময়। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ে কি আগ্রহ। এদিক দিয়ে তাঁর পূর্বকালে মাত্র একজন এই ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন—তিনি গ্রেটা গার্বো।

—চিত্রপ্রিয়

কমললতা

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্তের 'কমললতা' পর্বটি রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করছেন প্রবীণ চিত্রপরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন ছায়াবাণী (প্রাঃ) লিঃ। চিত্রটির সঙ্গীত বিভাগের গুরুদায়িত্ব বহন করছেন প্রখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। কমললতার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন স্বনামধন্যা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। শ্রীকান্তের চরিত্রে 'ভরতপুরস্কার' বিজয়ী অভিনেতা উত্তমকুমার। চিত্রটির অন্যান্য ভূমিকায় যাঁদের দেখা যাবে তাঁরা হলেন নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়াদেবী, দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরকুমার, মিতা মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। চারুচিত্র-এর নিবেদন কমললতা।

সূর্য পরশ

আন্তর্জাতিক আবেদনসম্পন্ন কাহিনী 'সূর্য-পরশ'। কাহিনীটি রচনা করেছেন অনিল সরকার। সলিল চৌধুরী চিত্রটির সুরকার। কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহন

করছেন [illegible]। চিত্রটির নেপথ্যে যাঁরা কণ্ঠ দিয়েছেন তাঁরা হলেন মান্না দে, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী ও আশা ভোঁসলে। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুখেন দাস, উদয়কুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, প্রেমাংশু বসু, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি দাস, সমিতা বিশ্বাস, পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, সন্ধ্যা কাপর প্রমুখ। নিতাই দাস ফিল্মসের চিত্র 'সূর্য-পরশ'।

মেমসাহেব

সাংবাদিক নিমাই ভট্টাচার্যের কাহিনী 'মেম সাহেব' চলচ্চিত্রায়িত হতে চলেছে। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবেন বাংলা ও বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট শিল্পীরা।

সাগিনা মাহাতো

গৌরকিশোর ঘোষের কাহিনী সাগিনা মাহাতোকে রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করছেন প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ। 'সাগিনা মাহাতো' চিত্রটির নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমার। স্বনামধন্যা চিত্রতারকা সায়রাবানু চিত্রটির একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় থাকছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, সুমিতা সান্যাল, চিন্ময় রায়, অজিতেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনালের চিত্র সাগিনা মাহাতো।

জীবন-মৃত্যু

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের বহুপঠিত ও জনপ্রিয় কাহিনী জীবন-মৃত্যু বর্তমানে হিন্দীতে চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। চিত্রটি প্রযোজনা করছেন তারাচাঁদ বারজাতিয়া। চিত্রটির পরিচালনায় থাকছেন সত্যেন বসু। চিত্রটির নায়কের ভূমিকায় থাকছেন ধর্মেন্দ্র ও নায়িকার চরিত্রে রাখী বিশ্বাস। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে বিশিষ্ট শিল্পি-সমাবেশ।

'তিন ভুবনের পারে' চিত্রে তনুজা ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় চিত্র : আশু সেনগুপ্ত

সোনাই দীঘি

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত কাহিনী 'সোনাই দীঘি'কে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন চিত্র-পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় থাকছেন অঞ্জনা ভৌমিক, নির্মলকুমার, দিলীপ রায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়াদেবী, সুমিতা সান্যাল প্রমুখ।

পিতা-পুত্র

রাজকুমার মৈত্রের কাহিনী 'পিতা-পুত্র'। চিত্রটির চিত্রনাট্য ও গীত-রচয়িতা হলেন প্রণব রায়। চিত্রটির পরিচালনায় অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতাংশের দায়িত্ব পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। চিত্রটিতে রূপদান করেছেন কমল মিত্র, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, তনুজা, স্বরূপ দত্ত, গীতা দে, অসীম চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তরুণকুমার প্রমুখ। চিত্রযুগের চিত্র পিতাপুত্র। চিত্রটির পরিবেশনায় মিতালী ফিল্মস। চিত্রটি মুক্তিপ্রতীক্ষায়।

মন নিয়ে

গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত চিত্র 'মন নিয়ে'। চিত্রটি পরিচালনা করছেন সলিল সেন। রূপায়ণে বিকাশ রায়, তরুণকুমার, ছায়াদেবী, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ। দ্বৈত চরিত্রে দেখা যাবে সুপ্রিয়া দেবীকে। চিত্রটি পরিবেশনায় চণ্ডীমাতা ফিল্মস। চিত্রটির সুরসংযোজনায় প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। এস-এম ফিল্মসের চিত্র 'মন নিয়ে'।

'তিন ভুবনের পারে' চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে নায়িকা তনুজা এবং নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চিত্র : আশু সেনগুপ্ত

'শীল' চিত্র-পরিচিতি

রমেন আর শীলা। দুজনের মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলা চলেছে। এ ঘর থেকে ও ঘরে ছুটে পালায় শীলা। রমেনও তার পিছন পিছন ছুটে চলে। শীলার মুখে লজ্জামাখানো দুষ্টু হাসি। এঘর থেকে ওঘর করতে গিয়ে রমেন ধরে ফেলে শীলাকে। শীলা যেন ধরা দিতেই চাইছিল। আগামী দিনের উজ্জ্বল স্বপ্নভরা দুটি চোখ আর লজ্জা-মাখানো মুখে অনেক রঙিন কল্পনা যেন জড়িয়ে আছে। রমেনের কাছে ধরা দিয়ে তার বুকে মাথা রাখে শীলা আর দুষ্টু হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রমেন শীলার এত হাসির কারণ জানতে চাইলে শীলা অনেক কষ্টে বলে যে সে 'মা' হতে চলেছে। আনন্দে রমেনের মুখখানা রঙিন হয়ে ওঠে।

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ রমেনের ডাক পড়ে আর তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

এবার রমেনের সম্বন্ধে কিছু শুনুন। বীরভূমের এক ছোট্ট গ্রামের মনিহারী দোকানের মালিক বিপিনবাবু। রমেন 'কোলকাতার এক স্নো-পাউডার' কোম্পানীর বিক্রয়-প্রতিনিধি। মাঝে মাঝে তাকে গ্রামেও যেতে হত পসরা নিয়ে। আর সেই ফাঁকে শীলাকেও দেখে আসতো। বুড়ো দাদু বিপিনবাবুর সংসারে শীলাই সর্বস্ব। তাই শীলার সঙ্গে রমেনের বিয়ের কথা উঠতেই সে রাজী হয়ে যায়। আর সেই সুযোগে কোলকাতার মেসবাড়ীর পাট চুকিয়ে রমেন চলে আসে বীরভূমে। এক শুভ-দিনে শীলার সঙ্গে রমেনের বিয়েও দিলেন বিপিনবাবু। আর নিজের ব্যবসাটিকে তার হাতে দিয়ে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। খুবই আঘাত পেল শীলা দাদুর মৃত্যুতে।

কিছুদিনের মধ্যেই রমেন জানতে পারলো তাদের এ সংসারে আর এক নতুন অতিথির আগমন হতে চলেছে। সন্তানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় শীলা আর রমেনের দিনগুলি যেন আবেগ আর উত্তেজনায় ভরপুর।

অনাগত সন্তানের আনন্দে রমেন ইতিমধ্যে একদিন কোলকাতায় আসে। পুরনো মেসবাড়ীর বন্ধুদের নিয়ে গানের জলসায় রাত কাটিয়ে দেয়।

আর সেই মুহূর্তে শীলা এক অসম্ভব ব্যথায় অস্থির হয়ে ওঠে। ডাক্তার আসে। আর তার এতদিনের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে তছনচ করে দি[illegible] যায়। ডাক্তারবাবু রায় দিলেন, আপনি যা ভাবছেন তা নয়, আপনার পেটে টিউমার হয়েছে। তবে আমার ধারণা ভুল হতে পারে। আপনি কোলকাতার বড় ডাক্তার দেখান। এত বড় আঘাত শীলা সহ্য করতে পারলেও রমেনের কথা ভেবে সে সমস্ত ব্যাপার গোপন রেখে কোলকাতার তার ডাক্তার মাসির শরণাপন্ন হয়। শীলা তার মাসির নার্সিং হোমে ভর্তি হয়। মাসিও পরীক্ষা করে গ্রামের ডাক্তারের সঙ্গে একমত হলেন এবং টিউমার অপারেশনের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। শীলার মাসি ও মেসো ছাড়া এ ব্যাপারটা আর কেউ জানলো না। অপারেশন খুব ভালভাবেই হয়ে গেল।

রমেন ইতিমধ্যে কোলকাতার কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরে এসেছে।

অরুণ মজুমদার পরিচালিত 'রাহগীর' চিত্রের নায়ক বিশ্বজিৎ-এর সংগে উত্তমকুমার
চিত্র: দিলীপ বসু

শীলার সাজানো কথাই ডাক্তারবাবু রমেনকে বললেন, শীলা কোলকাতায় তার মাসীর বাড়ী গেছে। সেখানেই প্রসব হবে। রমেন খুশী হলেও চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল।

শীলা সুস্থ হয়ে রমেনকে জানালো, প্রয়োজন পড়লে রমেনকে জানালে সে যেন কোলকাতায় আসে। এ কথাও শীলা মাসীর কাছ থেকে জানতে পারলো কোনদিনই নাকি সে মা হতে পারবে না। কারণ সন্তান ধারণের ক্ষমতা তার নেই। শীলা ভেবে পায় না কেমন করে রমেনকে নিজের এই অক্ষমতার কথা জানাবে। ডাক্তার মাসীমাই এ সমস্যার সমাধান করলেন। এক ব্রাহ্মণ বিধবা তাঁর নার্সিং হোমে একটি সন্তান প্রসব করেছেন। কিন্তু সমাজ বিধবার সন্তানকে গ্রহণ করে না। তাই মহিলা সেই পরিত্যক্ত সন্তানকে শীলার হাতে তুলে দিয়ে বলেন—এ কোন অন্যায় করে নি; একে তুই গ্রহণ করে তোর সমস্যার সমাধান কর।

রমেনের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে শীলা শেষে তাই করলো। মাসী ও মেসো ছাড়া সকলেই জানলো নার্সিং হোমে শীলার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। মনের মধ্যে মস্ত বড় একটা অন্যায়কে চেপে রেখে যথাসময়ে শীলা সদ্যোজাত শিশুসন্তানকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এলো।

রমেন তার স্বপ্ন সফল হওয়ায় আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। নাম গোত্র-হীন শিশুকেই রমেন আপন পুত্র ভেবে বড় করে তুললো। শীলাও দেখতে দেখতে সন্তান-শোক ভুলে গেল। কিন্তু এত সুখ বিধাতাপুরুষ সইতে দিলেন না। শীলার মেসোই দুঃখের বার্তা বহন করে প্রথম চিঠিতে জানালেন যদি তার কথামত টাকা না পাঠান হয় তা হলে তিনি সমস্ত কিছু রমেনকে জানিয়ে দেবেন।

সুখের সংসার ভেসে যাবে এই ভেবে শীলা তাইই করলো। অতি সহজ উপায়ে টাকা পেয়ে মেসোর লোভ বেড়ে গেল। তাই অনেক টাকার দাবী নিয়ে শীলাকে তিনি দ্বিতীয় চিঠি দিলেন, কিন্তু কোথায় পাবে শীলা এত টাকা। অনুনয় করে জানালো শীলা তার মেসোকে কিন্তু মেসোর লোভ গেছে বেড়ে তিনি শুনবেন কেন সে কথা। পরবর্তী চিঠিতে তিনি জানালেন টাকা না পেলে তিনি রমেনকে সব জানিয়ে দেবেন।

শীলা ভেবে কূল পায় না। কি করবে। এদিকে খোকনের জন্মদিন। মেসো টাকা না পেয়ে চলে এসেছেন কোলকাতা ছেড়ে শীলার কাছ থেকে গোপনে টাকা নিতে। শীলা অনেক করে বোঝায় এতগুলো টাকা একসঙ্গে সে কি করে দেবে। কোন উপায় থাকলে নিশ্চয়ই সে দিত।

কিন্তু মেসো ছাড়বার পাত্র নন। তিনি চীৎকার করে শীলাকে অপমান করতে শুরু করলেন। স্ত্রীর অপমান শুনে ছুটে আসে রমেন, তারপর পুত্রের গোপন রহস্যের খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এতদিনের স্বপ্ন এক মুহূর্তে তার কাছে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সব কিছু ভুলে নির্মমভাবে সে খোকনকে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় জন্মদিনের শুভলগ্নে।

---খোকন ভয়ে পালিয়ে যায় বাড়ীর থেকে। তার পর মেসো যখন চলে গেলেন; ধীরে ধীরে শান্ত হল রমেন। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে অনুতপ্ত হল। তারপর বেরিয়ে পড়লো খোকনের খোঁজে। শীলার চোখে তখন কান্নার নদী বইছে।

সমস্ত গ্রাম খুঁজে পালিয়ে যাওয়া খোকনকে রমেন আবার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলো। শীলারও দুষ্ট গ্রহের অবসান ঘটলো সেই সঙ্গে।

শীলা-সর্বস্ব বলে এই চিত্রকাহিনীর নাম হয়েছে 'শীলা'। পরিচালনায় আছেন শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন শীলা—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রমেন—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দাদু—প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মাসী—শোভা সেন, মেসো—শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং খোকন—শ্রীমান চিনু। এ ছাড়া আছেন, রবি ঘোষ, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন চক্রবর্তী ও সুমন মুখোপাধ্যায়।

'রাহগীর' চিত্রে শশিকলা

চিত্র: দিলীপ বসু

সাগর পারের মায়ালোক

রমেন চৌধুরী

ধরা যাক আর দেড় বছর বাকী আছে। সবে তো উনসত্তরের শুরু এখন। উনিশ শো সত্তরের ৯ই মে অনুষ্ঠিত হবে ফ্যাসিস্ট জার্মানীকে পরাজিত করার বিজয়োৎসবের রজত-জয়ন্তী। সেই উৎসবে দেখানো হবে 'লিবারেশন অব ইউরোপ' ছবিটির তিন পর্ব একত্রে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী দিনগুলি যেন চূড়ান্ত বিভীষিকার রাজত্ব। কেমন করে চরম আত্মত্যাগের মন্ত্রে তাকে উচ্ছেদ করলেন মুক্তি-যোদ্ধারা একে একে প্রাণ-ডালি দিয়ে অবহেলায়—তাই নিয়ে তোলা হয়েছে সোভিয়েত দেশে বেশ কয়েকখানি চলচ্চিত্র। তাতে দেখানো হয়েছে নাজীবাহিনীর অমানুষিক কাণ্ডকারখানা, ইউরোপের মানুষগুলোকে কিভাবে তারা দাসে পরিণত করতে চেয়েছিলো, তাদের সেই আসুরিক প্রয়াসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন বরণজয়ী বীরেরা। ওইসব ছবিতে অবিশ্যি যুদ্ধের প্রথম অবস্থার বিষয় স্থান পেয়েছিলো. কেমন করে পিছু হটে যাচ্ছিলো মুক্তিসেনারা তারই বিশদ ব্যাখ্যায়। ফ্যাসিস্ট জার্মানীকে নির্মূল করতে এসব প্রখ্যাত ছবির ভূমিকা বিশেষ ধরণের।

যাই হোক ১৯৪৩-৪৫ সালের সেই স্মরণীয় দিনগুলি কিন্তু কোনদিক থেকেই কম মূল্যবান নয়। এই তিন বছরের ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই তোলা হচ্ছে নতুন সোভিয়েত চিত্র 'লিবারেশন অব ইউরোপ'। ট্রিলজি ফিল্মটিকে বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাব্যের সংগে তুলনা করা চলে।

সত্যকে মূলধন করে এই বিরাট আয়োজনে ব্রতী হয়েছিলেন রুশ চিত্রপ্রযোজক য়ুরি ওজিরভ। প্রথমে বর্ণরঞ্জিত তিনটি পর্বের নামকরণ হয়েছিলো 'ইউরোপ-৪৩, ইউরোপ-৪৪ এবং ইউরোপ-৪৫'। বর্তমানে Kursk Bulge ও Dnieper দু'টি সিরিজের চিত্রায়ণ চলেছে মস ফিল্ম স্টুডিওতে এবং এই নিয়েই প্রামাণ্য ট্রিলজি ছবিটির প্রথম পর্ব। য়ুরি ওজিরভ, য়ুরি বনভারেভ ও অস্কার কুরগানভ করেছেন কাহিনী রচনা। এঁরা প্রত্যেকেই মহাযুদ্ধে সেনানীরূপে অংশ নিয়েছিলেন। চিত্রনাট্য রচনায় আটটি দেশ সহযোগিতা করতে রাজী হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, জি ডি আর, ইটালী প্রভৃতি। ইয়োরোপের অনেক

শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'দর্সরি মুলাকাৎ' চিত্রে শবনম

চিত্র : দিলীপ বসু

'প্রথম বসন্ত' চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় চিত্র : আশু সেনগুপ্ত

জায়গার ঘটনাই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে বলেই এই ব্যবস্থা। চরিত্রচিত্রণেও তেমনি রুশ-শিল্পীদের সংগে থাকছেন অন্য দেশের কিছু আর্টিস্ট। রুশ শিল্পী সেভোলভ সামাইয়েভ হচ্ছেন কলোনেল লুকিম। নার্স জোয়ার রূপসজ্জা নিচ্ছেন লারিসা গোলাব্‌কিনা। মেজর ম্যাক্সিভ চরিত্রে দেখা যাবে ভিক্টর এ্যাভিওসকো-কে। অন্য দেশ থেকে যাঁরা শিল্পিরূপে নির্বাচিত তাঁদের মধ্যে আছেন পল স্কফিল্ড (রুজভেল্ট), ফ্রিটস ডিজ (অ্যাডলফ হিটলার), বারবারা ব্রিলস্কা (পোলিস রমণী হেলেন) প্রমুখ। অবিশ্যি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলিতে সোভিয়েত শিল্পীরা থাকছেন।

কাহিনীকে যথাসম্ভব তথ্যনিষ্ঠ করা হয়েছে, যাতে মহাযুদ্ধের ওই তিনটি বছরের (১৯৪৩-৪৫) প্রকৃত বিবরণী সেলুলয়েডের বুকে টিকে থাকে। এ ব্যাপারে সোভিয়েত সৈন্য-বাহিনীর দপ্তর থেকে বিশেষ সাহায্য করা হয়েছে। জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক থেকে অনুরূপ সাহয্যতার ব্যবস্থাও হয়েছে। নির্মাতার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সব কিছু প্রকৃত তথ্যের বুনিয়াদে যাতে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এটাও তো একটা বিরাট ভাবনার কথা, সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে যে পর্বত-প্রমাণ গুলিবারুদ খরচ করা হয়েছিল বিভিন্ন রণাঙ্গনে, তাকে কেমন করে ছবিতে দেখানো যাবে। ভয়াবহ 'যুদ্ধের' দৃশ্যগুলি তো এ ছবিতে থাকবেই।

১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মে 'লিবারেশন অব ইউরোপ'-এর প্রথম সিরিজের দৃশ্য গ্রহণ শেষ হয়ে যাবে। দর্শকরা দেখবেন ছবিতে হিটলারের হেড কোয়ার্টার, রাইখ চ্যান্সেলরি, মস্কো, ওয়ারস'র সংগ্রাম, লণ্ডন এবং রোমে যুদ্ধের বিস্তার। ম্যাখাসেন ডেথ ক্যাম্পের দৃশ্যও দেখা যাবে, দেখতে পাওয়া যাবে যুগোশ্লাভ সৈন্যবাহিনীর রোমহর্ষক যুদ্ধের দৃশ্য। তেহরান কনফারেন্সও ছবির অন্যতম দ্রষ্টব্য হবে।

এটা কি বিকৃত রুচির জয়যাত্রার যুগ? মানুষগুলো কেবল দেহের আবর্তে পড়ে হাবুডুবুই খাবে? আর ঢেউ যখন আসে দেশের গণ্ডি মানে না। দেখা-দেখি অনেকেই পাল্লা দিতে কোমর বাঁধবে তাতে ভুল নেই। অবিশ্যি আমাদের এখানে সে সুযোগ সীমিত, এই যা রক্ষে।

এবার ভেনিস চিত্রোৎসবে দর্শক এবং সমালোচকরা তো রীতিমত বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন বলে খবরে জানা গেল। ইতালীর নব্যপন্থী পরিচালকরা ছবি করার বিষয়বস্তু আর খুঁজে পাচ্ছেন না। না বলাটা ভুল হোলো, তাঁরা চাইছেন না কোনো জোলো ব্যাপারকে চিত্রায়িত করতে। দেহের ক্ষুধায় সবাইকে দিশেহারা করতে কোমর বেঁধেছেন। এই জাতের ছবি প্যাসো-লিনির 'তেওরামা'। ছবিটি দেখানো হোলো উৎসবে। সবাই তারস্বরে ধিক্কার জানালেন। বাস্তবিক অমন কুৎসিত রুচির ছবি আর নাকি দেখানো হয়

'ভরত' পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার চিত্র : অলোক মিত্র
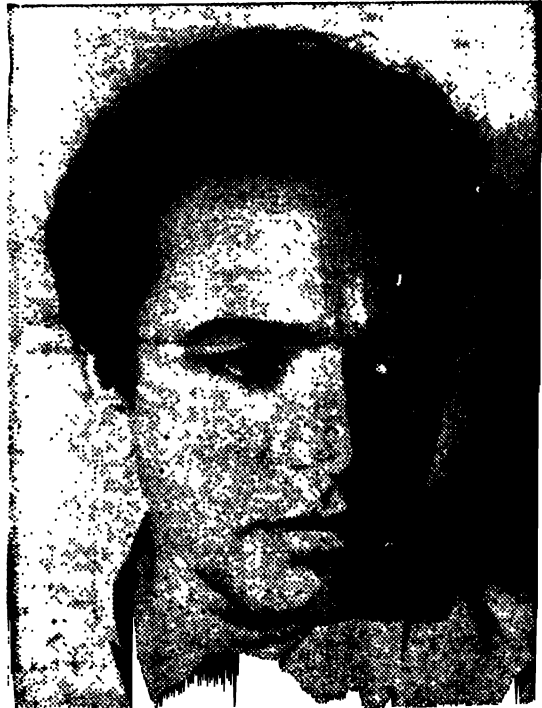
দি ওখানে—মানে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে।

ছবির নায়ক কন্দর্পকান্তি না হ'লেও খুবই সুদর্শন। যুবক অবিশ্যিই। এক ইতালীয় পরিবারে থাকবার জন্যে হোলো তার শুভাগমন। সে বাড়ির কর্তাটির বয়েস হয়েছে তবে তাঁর ভার্যাটি তরুণী এবং সুন্দরী। ছেলে এবং মেয়ের সংখ্যা দুই। দুটিরই কৈশোরের গণ্ডি পার হয় নি। আর আছে সেখানে স্বাস্থ্যবতী এক সিণ্ডারেলা।

অতঃপর পাঠকের যেমনটি খুশি কল্পনা করে নেবার অবাধ অধিকার রইলো, বিশদ বিবরণ আর না দেয়াই ভালো। দরকার কি পাঁক ঘেঁটে। বাড়ির কর্তাটি বাদে সকলেই নায়কের শিকারে পরিণত হোলো, তারই পরিচয় ছবিতে লভ্য। গিন্নি ক্রমে বারবনিতায় রূপান্তরিতা হতে বসেন। পরিচারিকা নায়কের অদর্শনে দুঃখে কাতর হয়ে সন্ন্যাসিনী-সাজে বেরিয়ে পড়ে।

সে যাই হোক, সাধারণ মানুষরা অবজ্ঞা করলেও ক্যাথলিকরা খুবই প্রশংসা করেছে ছবিটির। ছবিতে নাকি ক্যাথলিক মত প্রচার করা হয়েছে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে। দর্শকরা কিন্তু ছেড়ে কথা কয়নি, তারা তীব্র প্রতিবাদ করেছে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

ভূপেন হাজারিকা পরিচালিত অসমিয়া ভক্ত কবি চিত্রে প্রবীরকুমার ও কণিকা মজুমদার

প্যাসোলিনীকে সাংবাদিকরা এক সাক্ষাৎকারের সময় আক্রমণ করতে ছাড়েন নি।

●

ইয়ান ট্রোয়েল পরিচালিত সুইডিশ ছবি 'ওল ডেলে ড্রুফ (বাঙলায় অর্থ দাঁড়ায় লুকোচুরি) এ বছরে বার্লিনে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সোনার ভালুক বা গোল্ডেন বেয়ার লাভ করেছে। কাহিনীর প্রধান ভূমিকাটি এক শিক্ষকের। সেই চরিত্রে রূপ দিয়েছেন পের অস্কারসন। ছবিটির আবেদন অনস্বীকার্য। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজে স্বৈরাচার ও স্বাধীনতার দ্বন্দ্বের রূপটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। আর সেই কারণেই সোনার ভালুক পেয়েছে ছবিটি। রৌপ্য ভালুক অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে 'লেবেন্সজ্ঞ সাইখেন' বা জীবনের চিহ্ন। বিকৃত মস্তিষ্ক এক সৈনিকের গল্পের চিত্ররূপ এটি।

●

এবারের বড়দিনে বব হোপের বাৎসরিক ভিয়েৎনাম সফরের সঙ্গিনী হচ্ছে অ্যান মার্গারেট। সাতাশ বছরের তন্বী অ্যান উচ্চতায় পাঁচফুট চার ইঞ্চি; ওজনে একশো দশ পাউণ্ড। সবজান্তি সুন্দরীর গড়ন-পেটন শিল্পিসুলভ। মাথা ভরতি চুলের রঙ লালচে তাতে বাদামি মেশানো। সবাই তাকে হুঁশিয়ার মহিলা আখ্যায় ভূষিত করে থাকে। উদীয়মানা হলিউড তারকারা প্রত্যেকে যথেষ্ট হিংসেও করে। অ্যান সুইডেনের ভ্যালগজবিনে জন্মেছে কিন্তু সে বলে স্টকহলমে। মাত্র পাঁচ বছর বয়েসে এসেছিলো ইউনাইটেড স্টেটসে। বছরখানেক নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিয়েছিলো বটে কিন্তু তারপরই এক জাজ-সম্প্রদায়ে ঢুকে পড়ে। হলিউডে ওর বয়েসে সাধারণ মানুষ বার তিন-চার বিয়ে করে থাকে সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু ও শেষ-বেশ রজার স্মিথকেই বেছে নিয়েছে স্বামিরূপে। রজার স্মিথ আগে অভিনয় করতেন, বর্তমানে চলচ্চিত্র-প্রযোজক এবং লেখক। অ্যানের ম্যানেজারের কাজটিও করে থাকেন তিনি।

অ্যান তার অধিকাংশ বন্ধুর মতো রান্নার 'র'-ও জানে না। তবে হ্যাঁ কালেভদ্রে কফি তৈরী করে বটে। আর তার জন্যে কাগজের পাতায় মাতামাতিও হয়। হলিউডের টুকিটাকিতে সে খবর সকলের আগে ঠাঁই করে নেয়। ওর ব্যয়বহুল অভ্যাস রয়েছে
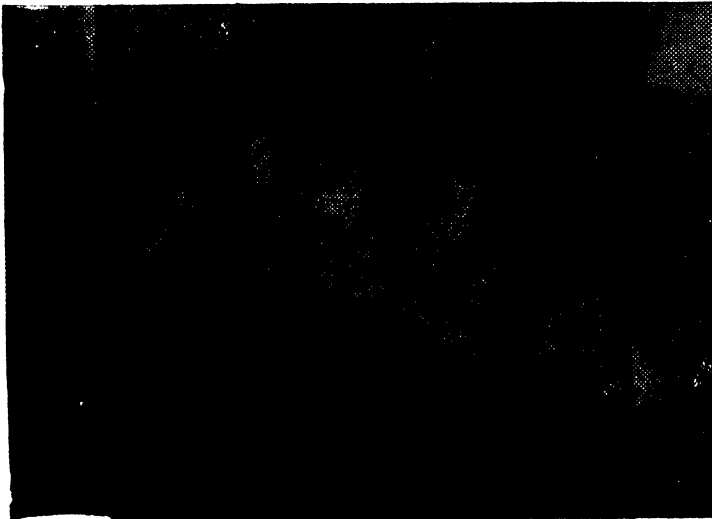
[illegible] শিল্পী কণিকা মজুমদার

একটা—তা হোলো শ্যাম্পেনের নেশা। শুধু শ্যাম্পেন। হামফ্রে গোগার্ট এবং লরেন ব্যাকলের বাড়িটিতেই অ্যান বাস করে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অ্যান নাকি সুখী নয়। আশ্চর্য।

ভদ্রলোক কথা রেখেছেন। আমি প্রখ্যাত অভিনেতা রিচার্ড বার্টনের কথা বলছি। শ্রীবার্টন এবং তাঁর স্ত্রী লিজ টেলর একদা লণ্ডনের এক বিখ্যাত নাট্যালয়ে হাজির হয়েছিলেন সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' দেখতে। নাটকের শিল্পী ছিলেন স্যার এলেক গিনেস এবং সিমনি সিগনোরেট; কিন্তু পরিতাপের কথা কেউই ভালো অভিনয় করতে পারছিলেন না। দর্শকরা উত্তপ্ত হ'তে হ'তে একসময় ফেটে পড়লো। পুলিশ বাহিনীকে ছুটে আসতে হোলো হাঙ্গামা থামাতে। শ্রীবার্টন ওই সময় বলেছিলেন 'ম্যাকবেথ'কে আমি চিত্রায়িত করতে চেষ্টা করবো। সে কথা তিনি রক্ষা করেছেন। ছবিটি তিনি করছেন। ফ্রাংকো জাফেরিল্লিকে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এর আগে জাফেরিল্লি বার্টনের প্রযোজিত 'টেমিং অফ দি শ্রু' ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন। সেক্সপীয়রের 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' পরিচালনা করেছেন তারপর। এখন ভার নিলেন 'ম্যাকবেথ'-এর। চিত্র-নাট্যের কাজ সমাধা হয়ে গেছে, পরিচালক ডেট দিলেই দৃশ্য গ্রহণের পর্ব আরম্ভ হবে। বার্টনের প্রচেষ্টা কি রূপ নেয় তার জন্যে উৎসাহী মহল নিশ্চই অপেক্ষা করছেন, আমরাও আছি সেই দলে।—

●

১৯৬৮ সালে আমেরিকায় তোলা শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে 'ফানি গার্ল' ফ্রিস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার লাভ করেছে। পেয়েছে প্রথম স্যামুয়েল গোল্ডুইন অ্যাওয়ার্ড। স্বনামধন্য পরিচালক উইলিয়াম ওয়াইলার নির্দেশিত 'ফানি গার্ল'-এর প্রধান দুটি চরিত্রে রূপ দিয়েছেন মিস বারবারা স্ট্রেসাণ্ড এবং ওমর শরিফ। গত দশকের মধ্যে এমন একটি সঙ্গীতবহুল ছবি হলিউডে আর তোলা হয় নি বলে রসিকজনের উচ্চ প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেয়েছে 'ফানি গার্ল'।

ওই 'ফানি গার্ল'খ্যাত মিস বারবারা স্ট্রেসাণ্ড সম্পর্কে শেষ খবর হ'চ্ছে এবার উনি 'দি আউল এণ্ড পুসিক্যাট' ছবিতে অংশ নেবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এটাই হবে তাঁর প্রথম ড্রামাটিক চরিত্রচিত্রণ। ছবিটির প্রযোজনায় রে স্টার্ক, পরিবেশনায় রয়েছেন কলাম্বিয়া পিকচার্স। অনুরূপ শিল্পী প্রযোজক পরিবেশক সমন্বয় সাধিত হয়েছিলো 'ফানি গার্ল'-এও। এ ছবিতে বারবারার গান থাকলেও তা হবে প্রাসঙ্গিকমাত্র। প্রকৃত শিল্পীরা তো অভিনয়ের সুযোগের জন্যে ব্যাকুল, এ ছবিতে বারবারা সে সুযোগ যথেষ্ট পাবেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত 'কখন মেঘ' চিত্রের নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক

'প্রথম বসন্ত' চিত্রে অঞ্জনা ভৌমিক

●

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার অ্যালফ্রেড হিচকক অনারারি ডক্টরেট হয়েছেন। এই কাঙ্ক্ষণীয় উপাধিটি দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডঃ চার্লস হিচ আর সব ডক্টরেটদের নামের সঙ্গে হিচককের নাম ঘোষণা করলে উপস্থিত অতিথিবর্গ প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। শেষে সকলকে যখন একে একে পরিচিত করতে শুরু করলেন তখন অ্যালফ্রেড হিচককে দেখে এবং ব্যাপারটা অনুধাবন করে ফেটে পড়লেন করতালি-ধ্বনিতে তাঁরা।
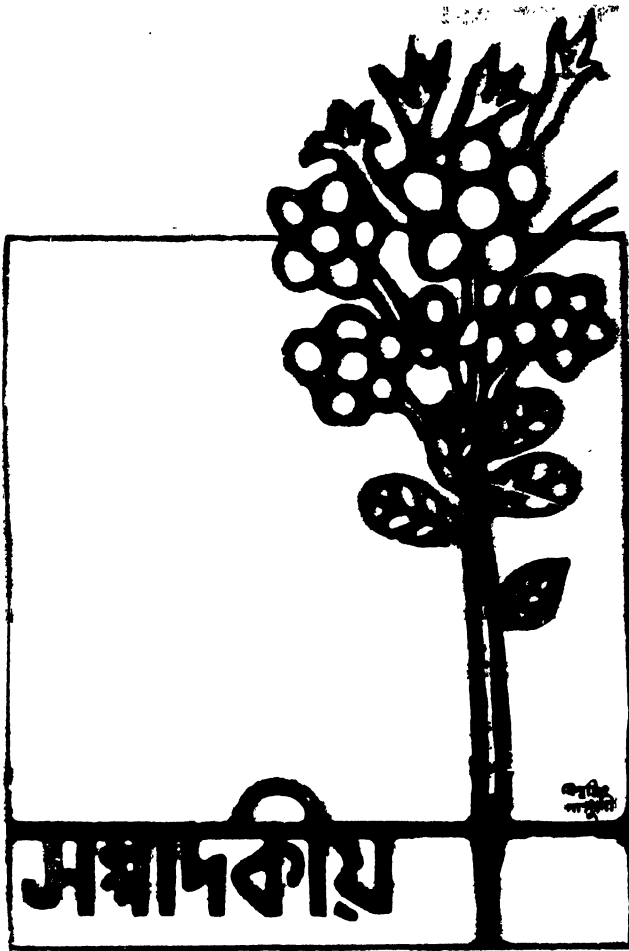
ভারতের সামরিক যোগ্যতা

খাদ্য-সমস্যার সমাধান, বেকারত্বের অবসান, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন প্রভৃতি সরকারের প্রথম শ্রেণীর কর্তব্যগুলির গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন কিছু আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই তালিকায় আরও একটি প্রথম শ্রেণীর কর্তব্য উল্লেখ করা যায়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করা। শুধু ভারত সরকার কেন পৃথিবীর যে-কোন সরকারের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলির তালিকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সুসংগঠন একটি বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। সরকার নিজে শান্তি-নীতিতে বিশ্বাসী বা পারস্পরিক সৌভ্রাত্রের আদর্শ অনুসরণকারী অথবা সহাবস্থানের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত কখনও কোন পরিবেশে হইবেন না—এমন কথা জোর করিয়া কখনও বলা চলে না। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি যদি সুদৃঢ় না হয়, তাহা হইলে বিদেশী রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর আক্রমণের হাত হইতে নিজেকে কি করিয়া রক্ষা করিবেন তাহার কোন সদুত্তর মিলিবে না।

বর্তমানে ভারতবর্ষ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন, যে ক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে দেশের প্রতিরক্ষা দপ্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমানে অসংখ্য আভ্যন্তরীণ সমস্যা, একাধারে প্রাকৃতিক অন্যদিকে রাজনীতির বিপর্যয়ের হতভাগ্য শিকার ভারতভূমি যেদিন অজস্র লাঞ্ছনার বিনিময়ে সুদীর্ঘ সাধনার অনলস সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় যেদিন স্বাধীনতা অর্জন করিল তখন সেই সোনার ভূমির সহিত যাহার বিশেষ কোন পার্থক্য চোখে পড়িল না তাহার নাম শ্মশানভূমি। এই শ্মশানের বুকে নবভারতের ইমারত গঠনের দায়িত্ব আসিল। দেশের আভ্যন্তরীণ এই অগণিত সমস্যা ছাড়াও বাইরের সমস্যাও 'বোঝার উপর শাকের আঁটি'র ন্যায় ভারতে রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশকে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘোর কালো মেঘে আবৃত করিয়া দিল। বাইরের সমস্যাগুলির মধ্যে চীন ও পাকিস্তানের শত্রুতাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের অতুলনীয় সম্পদের প্রতি চীনের লোভলোলুপ দৃষ্টি বহুদিন হইতেই নিবদ্ধ। মধ্যে মৈত্রী ও ভ্রাতৃ-অভিনয়ও কিছুকাল চীন করিয়াছিল, অবশেষে মুখোস একদিন অপসারিত হইয়া আসল মুখটি প্রকাশ হইয়া গেল। মুখোস ছিল ভ্রাতৃত্বের আর মুখ হইল লোভলোলুপতার। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভারতের অঙ্গ হইতেই সৃষ্টি কিন্তু প্রথম হইতেই ভারতের দিকে তাহার গ্রাস-ধর্মী বাহু সর্বদাই প্রসারিত। তাহার আশা আর কিছুতেই যেন পূরণ হওয়ার নয়। লোভ যেন তাহার ক্রমবর্ধমান। ভারতের সমগ্র অংশ তাহার কুক্ষিগত হইলেও যেন তাহার পরিতৃপ্তি সাধিত হয় না। এমতাবস্থায় মণিকাঞ্চন সংযোগের মত অথবা জগাই মাধাই-এর সম্মিলনের মত পাকিস্তানের সহিত চীনের মিত্রতা স্থাপিত হইল। চীন কখনও প্রকাশ্যে এবং পাকিস্তানকে সামনে রাখিয়া পরোক্ষে নানাভাবে ভারতবর্ষকে বিপন্ন করিয়া তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল।

১৯৬২ সালে জওহরলাল নেহরুর আমলে চীন এবং ১৯৬৫ সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে পাকিস্তান ভারতবর্ষ অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিয়া হাতেনাতে সমুচিত প্রত্যুত্তর পাইল, ভারতের বীর সেনাধ্যক্ষ, সৈনিকবৃন্দ এই অন্যায় আক্রমণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া দেশজননীকে চরম দুর্যোগের অবাঞ্ছিত গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু এখনও, তাঁহাদের আস্ফালনে বিরতি নাই, মুখের মত জবাব পাইয়াও তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইল না। অন্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে বৃহৎ শক্তির সহায়তায় পাকিস্তান এখন নিজেকে যেভাবে সামরিক শক্তির দিক দিয়া উন্নত করিয়া তুলিতেছে এবং এই দিকটির প্রতি কতটা জোর দিতেছে তাহা কি একেবারেই উড়াইয়া দেওয়ার মত, এই বিপুল আয়োজন, এই বিরাট সংগঠন কোন সাধু (?) উদ্দেশ্যে পাকিস্তান করিতেছে তাহা কি বুঝিতে কিছু বাকি থাকে? সত্য, ন্যায়, নীতি, কৃতজ্ঞতা, এমন কি সাধারণ চক্ষুলজ্জা-বোধ পর্যন্ত যে জাতির অভিধানে বেমালুম অনুপস্থিত, সে জাতি এত আয়োজন যে পুনর্বার ভারত আক্রমণের জন্যই করিতেছে না এরূপ নিশ্চয়তা কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া যায়?

অল্পকাল পূর্বে ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবেই করিয়াছে, এ কথা অবশ্যই যে-কোন ভারতীয়ের মনে উদ্দীপনার আলোক সঞ্চার করিতে পারে, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই প্রদীপ্ত ঘোষণা সারা দেশবাসীর চিন্তাকুল চিত্তে অবশ্যই আশার আলোক জ্বালাইয়া তুলিবে। কিন্তু শুধু আশা-উদ্দীপনা সার করিলেই তো চলিবে না। এই আশা কতখানি সঙ্গত তাহাও তো খতাইয়া দেখা দরকার। আমরা যথেষ্ট প্রস্তুত এবং সমৃদ্ধ মানিলাম, কিন্তু অপরপক্ষ যে আমাদের অপেক্ষাও শক্তিশালী নয় সে সম্বন্ধেও তো নিঃসংশয় হওয়া দরকার। কয়েকটি বিদেশী পত্রিকায় পাকিস্তানকে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর অস্ত্র-সরবরাহ সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য প্রকাশিত হইতেছে তাহার দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, পাকিস্তান ধীরে ধীরে কতখানি আগাইয়া যাইতেছে। নিকট ভবিষ্যতেই সোভিয়েট রাশিয়া যে পাকিস্তানকে একশত মিগ-উনিশ, ষাটটি মিগ একুশ এবং চল্লিশটি ইল-আটাশ বোমারু বিমান এবং তাহার যন্ত্রাংশ সরবরাহ করিবে। তুরস্কের মধ্যস্থতায় একশত জঙ্গী জেট বিমান পাকিস্তান লাভ করিতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট। এই সকল সংবাদগুলি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ সেরূপ তাৎপর্যসম্পন্ন।

অতএব এ অবস্থায় ভারত যাহাতে পাকিস্তানের সহিত সার্থক মোকাবিলা করিতে পারে সেইভাবে তাহার প্রস্তুতি প্রয়োজন। এ অবস্থায় শুধু আশার বাণী বিতরণ না করিয়া দেশকে সামরিক সম্পদে আরও বলীয়ান করিয়া তোলা এবং দেশে সামরিক অস্ত্রাদির উৎপাদন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাই ভারত সরকারের এ ক্ষেত্রে আজ একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

ভেজাল প্রসঙ্গে

হত্যা-বৃত্তিটি কোনক্রমেই কোন যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নয়। হত্যামাত্রেই অপরাধ। তবে কম-বেশীর তারতম্য করা চলে। একসঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণহরণ অপেক্ষা তিলে তিলে ধীরে ধীরে হত্যা করা তুলনামূলক আরও অধিকতর অপরাধ। আমাদের আশেপাশে জাতীয় জীবনে কিছুকাল যাবৎ এমন একটি ঘটনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটিয়া চলিতেছে, যাহা এই শেষোক্ত অপরাধের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ একটি মারাত্মক অপরাধ আমাদেরই চোখের সামনে দিয়া এবং সকলের জ্ঞাতসারেই অনুষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে অথচ এখনও পর্যন্ত তাহার প্রতিরোধকল্পে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন হইল না।

কিছুদিন যাবৎ কলিকাতা মহানগরীতে আতঙ্কের তালিকায় একটি নূতন নাম সংযোজিত হইয়াছে। সুখ আর দুঃখ জীবনের নিত্যসহচর। দিন আর রাত্রি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আনন্দ আর বেদনা পরস্পরের মূল্যবোধের সহায়ক। তেমনই কলিকাতা মহানগরীর জীবনযাত্রাও স্বভাবতই আনন্দে আর আতঙ্কে সমান তালে চলিতেছে। আনন্দের উপকরণ অজস্র, সম্ভার পরিপূর্ণ। বর্তমানে তাহার আতঙ্কের একটি সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। যাহার মাধ্যমে ঘটিল তাহা সরিষার তৈল।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সরিষার তৈল এক অপরিহার্য বস্তু-বিশেষ। শুধু ক্রোড়পতি ধনী নয়, অতীব দরিদ্র ব্যক্তির নিকটেও এই বস্তুটির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অসংখ্য বিত্তহীন ব্যক্তি এই বস্তুটির মাধ্যমে জীবিকার্জন করিয়া জঠরের জ্বালা কোনপ্রকারে নিবারণ করিয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবনে যে বস্তু এমন অপরিহার্য তাহা যদি আতঙ্কের বস্তুতে পরিণত হয় তাহা হইলে দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, সরিষার তৈলকে কেন্দ্র করিয়া ভেজালের কারবার একেবারে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং রীতিমত পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, শেয়ালকাঁটা মিশ্রিত একপ্রকার সরিষার তৈল বাজারে ছাড়া হইয়াছে—যাহার ফলে দেশব্যাপী ব্যাধির এবং ক্ষতির প্রকোপ মারাত্মকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। চতুর এবং নৃশংস ব্যবসায়িগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, রাজার প্রাসাদ হইতে কৃষকের পর্ণকুটির পর্যন্ত এই বস্তুটির যখন অবাধ গতিবিধি এবং অন্য বিষয়ে ইহার উপযোগিতা অনতিক্রম্য—সে ক্ষেত্রে ইহাতে ভেজাল মিশাইলে ব্যবসায় জমিয়া উঠিবে সাঙ্ঘাতিক কিন্তু তাহার ফলে অসংখ্য নরনারী যে কি সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন মুনাফার স্বপ্নে ভরপুর কসাইসদৃশ এই ব্যবসায়ীদের সে কথা ভাবিবার তখন অবকাশ নাই।

সরিষার তেলে ভেজাল যদিও নূতন কোন ঘটনা নয়—পূর্বেও ইহার বিষময় পরিণতির সহিত নগরবাসীর পরিচয় ঘটিয়াছে, সেই জন্যই ইহার ভয়াবহতা সম্বন্ধে কি আরও বেশী সজাগ থাকা উচিত নয় এবং ইহার প্রতিরোধকল্পে রীতিমত তৎপর হওয়াও কি বিধেয় নয়? বর্তমান কাল হইতে একবার ত্রিশ বৎসর পূর্বে আর একবার অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্বে এই ভেজাল সরিষার তৈল যেভাবে কলিকাতা মহানগরীর বুকে মহামারী ঘনাইয়া আনিয়াছিল তাহার স্মৃতি এত স্বল্পকালেই মুছিয়া যাওয়ার নয়, বেরিবেরিতে যেভাবে শহর ছাইয়া গিয়াছিল তাহার ফলে দলে দলে যে কত লোককে অন্ধত্ব এবং এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করিতে হইয়াছিল সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি এখনও যেন মানুষের অন্তরাত্মাকে কাঁপাইয়া তোলে। ভাবিতে সত্যই অবাক লাগে যে, যে ঘটনায় শত শত লোক অন্ধ হইয়া গেল, শত শত লোক মৃত্যুবরণ করিল—সেই ঘটনার পুনরভিনয় ঘটাইতে এক শ্রেণীর নরঘাতক কোথা হইতে সাহস এবং উদ্যম সংগ্রহ করিতেছেন। আমরা ভাবিয়া পাই না যে কি করিয়া অবাধে এই তিলে তিলে নরহত্যা করিয়া এক শ্রেণীর মুখোসধারী জল্লাদ দিব্যি সমাজে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। অথচ ১৯৫৪ সালে ইহাদের দমনকল্পে সরকার কর্তৃক আইনও পাশ হইয়াছে কিন্তু প্রায় পনের বৎসর পরও দেখা যাইতেছে যে, আইন শুধু কাগজেকলমেই, আজ পর্যন্ত বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ দেখা গেল না।

এ আলোচনা যদিও শুধু সরিষার তৈলকে অবলম্বন করিয়া কিন্তু প্রসঙ্গত আরও অনেকগুলি ব্যাপার আসিয়া পড়ে। ভেজাল কিসে নাই শুধু কি সরিষার তৈলে। বেবী ফুডে, রোগীর ঔষধে, অন্যান্য বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এ বিষয়ে সন্দেহের যেখানে আর তিলমাত্র অবসান নাই সেক্ষেত্রেও কি সরকার আর কি পৌরপ্রতিষ্ঠান নাটকের দর্শকের মত কাষ্ঠপুত্তলী হইয়া এই মারণযজ্ঞকে পরোক্ষভাবে আরও উৎসাহিত করিয়া চলিতেছেন। দেশরক্ষার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহারা যদি এইভাবে কাঠের পুতুলের মত নির্বাক দর্শকরূপে এত বড় অন্যায়, এই জঘন্য অপরাধকে প্রশ্রয় দিতেই থাকেন তাহা হইলে এই অপরাধ কি তাঁহাদের উপরও অর্শাইবে না—এই নারকীয় কাণ্ডের নায়ক না হইয়াও সমর্থক কিম্বা প্রশ্রয়দাতা হিসাবেও এই ঘোর অপকর্মের ফল কি তাঁহারাও ভোগ করিবেন না—এই বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহাদের শুধু একবার একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

পৌরসভার ভবিষ্যৎ

দলীয় চক্র যেখানে ক্রিয়াশীল অর্থাৎ দলীয় প্রভাব যেখানে সমগ্র আবহাওয়া ও পরিবেশকে আপন ছায়াসমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেখানে একক ব্যক্তিত্বের যথাযোগ্য বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্বক্ষেত্রে না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কথাটি অনায়াসে প্রযোজ্য। অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে জনকল্যাণকামী এবং মহৎ আদর্শের প্রতিশ্রুতি-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব তাহার সত্য, ন্যায়, নীতি প্রভৃতি পাথেয় থাকা সত্ত্বেও যে কিভাবে অবদমিত হইয়া থাকে তাহার নিদর্শন ভূরি ভূরি মিলিতে পারে। এই কথাটির অতি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত কলিকাতা পৌরসভা হইতে রাজ্যসরকার প্রেরিত কমিশনার শ্রী জে সি সেনগুপ্তের বিদায়।

মধ্য কলিকাতার অন্তর্গত এই লালরঙা অট্টালিকাটির অভ্যন্তরে এই জাতীয় ঘটনা এই প্রথম নয়। অর্থাৎ এই ধরণের দলীয় চক্রান্তের শ্রীসেনগুপ্তই প্রথম বলি বা শিকার নন। তাঁহার মতই তাঁহার পূর্বসূরিগণের মধ্যে যাঁহারাই প্রশাসনের হাল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে গিয়াছেন, যাঁহারাই ঘুঘুর পায়রার মধুচক্র নিশ্চিহ্ন করিতে গিয়াছেন, যাঁহারাই বাবুইয়ের বাসায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলকেই বিনিময়ে লাভ করিতে হইয়াছে লাঞ্ছনা, নিপীড়ন ও অপমান। এইগুলির হাত হইতে কেহই অব্যাহতি পান নাই। আত্মসম্মানজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকায় তাঁহাদের সকলকেই ব্যর্থতার বোঝা বহন করিয়া লালকুঠি হইতে প্রস্থান করিতে হইয়াছে। বাবুইয়ের বাসা যেমনকার তেমনিই রহিয়া গিয়াছে।

অর্থাৎ, ব্যাপারটি এই যে, যেন কোন অলিখিত আইন আছে যাহার ফলে এক শ্রেণীর পৌরপিতারা অবাধে মধু লুটিয়া যাইবেন, আপন আপন প্রিয়-পেটোয়াগুলিকে যেন-তেন-প্রকারেণ বিভিন্ন বাবদে মোটা মোটা অর্থ পাওয়াইয়া দিবেন, এ ক্ষেত্রে যে-কেহই তাঁহাদের বাধাদান করিতে আসুন তাঁহার ললাটে নিপীড়ন জুটিবেই। কারণ কার্যক্ষেত্রে তাহাই ঘটিতেছে। পৌরসভার ইতিহাস একদিকে গৌরবালোকে উজ্জ্বল ভাস্বর—অপরদিকে তেমনই কলঙ্কে মসীলিপ্ত। আজ বলিয়া নয় দীর্ঘকাল যাবৎ পৌরসভার নানাবিষয়ক দুর্নাম সকলেরই সুবিদিত। নানা ক্ষেত্রে তাঁহারা যথেষ্ট অযোগ্যতা, অদক্ষতা এবং অকর্মণ্যতার রাশি রাশি প্রমাণ দিয়াছেন।

এই পৌরপিতৃবৃন্দ ভাগবাঁটোয়ারার স্বপ্নে দিবারাত্র এতই মশগুল যে একটি গভীর সত্য সর্বদাই তাঁহাদের উপলব্ধির বাহিরে থাকিয়া যায়। সেই সত্যটি হইল এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণের, জনগণের কল্যাণসাধনই ইহার একমাত্র করণীয়। জনহিতার্থে এবং নগরের সৌষ্ঠব সাধনে ইহার সৃষ্টি। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত তালুক নয়। পৈত্রিক জমিদারীর মুনাফা লুটা আইনসম্মত, কিন্তু জনগণের

সেবার দারিদ্র্য লইয়া যে-প্রতিষ্ঠান বর্তমান, তাহার সেবক সাজিয়া আপন আপন স্বার্থসাধন অবশ্যই আইনের অনুমোদন লাভ করে না। পৌরসভা প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থাগুলি যে নিশ্চয়ই জনগণকে ঠকাইবার উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয় নাই এ কথা যদি আজও পৌরপিতাদের না জানা থাকে তাহা হইলে তদপেক্ষা লজ্জা ও বেদনার আর কিছু থাকিতে পারে না।

পৌরসভার দুটি প্রধান কর্তব্য—নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জল সরবরাহ। এই বিপুলসংখ্যক জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে যে-প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত সেখানকার কর্তাদের সমগ্র জাতির প্রতি আনুগত্য এবং নীতিগত কর্তব্য কতখানি তাহা আশা করি একটি স্কুলের বালকেরও অজানা নয়।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যখনই শ্রীসেনগুপ্ত কতকগুলি দুর্নীতির রন্ধ্রপথের উৎসসন্ধান সুরু করিলেন, যখন এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হইতে দুর্নীতির বিষময় বাতাস সরাইয়া দিতে গেলেন, তখনই তিনি যেন এক মহা অপরাধ করিয়া গেলেন। যাঁহাদের শৈথিল্য, অসাবধানতা এবং অকর্মণ্যতার জন্য সর্বসাধারণকে যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয় যখনই তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে দমনধর্মী হস্ত প্রসারিত করিলেন তখনই সঙ্ঘবদ্ধভাবে সুরু হইল আক্রমণ। কে বলে বাঙালী আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন? কে বলিতেছে যে বাঙালীর একতাবোধ আজ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—গঠনমূলক, সংস্কারধর্মী, সৃজনশীল ক্ষেত্রে এ কথাটি সত্য হইতে পারে, কিন্তু পৌরসভার পরিসরে শুভবুদ্ধির নির্বাসনে এবং নীতিবোধের বিসর্জনে এ কথাটি একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। কমিশনার বিতাড়নে পৌরপিতারা যে একতা দেখাইলেন উপলক্ষ যাহাই হউক ঐক্যবোধের বিচারে ইহা সারা জাতিকে অনুপ্রাণিত করার মত।

দুই বৎসরের চুক্তিতে শ্রীসেনগুপ্ত পৌরপ্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের এক-অষ্টমাংশ অতিক্রান্ত হইতে না-হইতেই তাঁহাকে অবস্থার চাপে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। আচমন, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই যেন 'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ'—মন্ত্রটি উচ্চারিত হইয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, পৌরসভার এই দিকটা আজ যখন সকল কিছু জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে সে ক্ষেত্রে ইহার প্রতি রাজ্যসরকার কি করা যাইতে পারে? শ্রীসেনগুপ্ত চলিয়া গেলেন, তাঁহার জায়গায় হয়তো আর একজন সুযোগ্য ব্যক্তি কেই বসানো হইবে। কিন্তু তিনিও যখনই জনকল্যাণকর এবং ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে কোন কাজে হাত দিবেন—তাঁহারও ভাগ্যে অনুরূপ অবস্থাই ঘটিবে এবং সকল সদ্ব্যক্তির ক্ষেত্রেই চিরাচরিতভাবে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকিবে—সে ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহা হইলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত পৌরপ্রতিষ্ঠানে আর কোন সদ্ব্যক্তি টিকিতে পারিবেন না এবং বরাবরই সেখানে এক শ্রেণী স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ কপটচিত্ত পৌরপিতাদের মৌরসীপাট্টা অবাধে চলিতে থাকিবে।

মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়

মহীয়সী রাণী ভবানীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নাটোরের কবি ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজা স্বর্গত জগদীন্দ্রনাথ রায়ের জন্মশতবর্ষে তাঁর একমাত্র পুত্র মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় গত ১৬ই অঘ্রাণ ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র যোগীন্দ্রনাথ কাব্য ও সঙ্গীত-সাধনায় ছিলেন লব্ধসিদ্ধি। ক্রিকেটেও তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। তদানীন্তন ব্যবস্থা-পরিষদের সঙ্গেও তিনি ছিলেন সংযুক্ত। ১৯২৬ সালে পিতৃবিয়োগের কয়েক মাস পরেই ইনি 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ও নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের ইনি ছিলেন সভাপতি। বৃটিশ সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে প্রদত্ত 'মহারাজা' উপাধিধারী বাঙ্গালীদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর পর আর কেউ জীবিত রইলেন না। বাঙলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিরাট আসন তাঁর মৃত্যুতে শূন্য হ'ল।

সাতকড়িপতি রায়

সুপ্রবীণ রাজনৈতিক নেতা সাতকড়িপতি রায় গত ১২ই অঘ্রাণ ৯০ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। অবিভক্ত বাঙলার রাজনীতিক জগতে দীর্ঘকাল তিনি একজন বিশিষ্ট নেতার আসনে সমাসীন ছিলেন। আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করে ইনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির আসনে যে সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন অধিষ্ঠিত, ইনি সে সময় ঐ কংগ্রেসের ছিলেন সাধারণ সচিব।

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার এবং বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত গত ৭ই পৌষ ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাঙলা দেশের আইনজ্ঞ মহলে তাঁর বিরাট প্রতিভা এবং অনন্যকুশলতা একটি প্রথম শ্রেণীর আসন তাঁর অধিকারে এনে দেয়। ফৌজদারী

বাংলায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না বললে অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুন্যালের সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিল। আইনজ্ঞ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে ইনি চীন পরিদর্শন করেন। অসংখ্য রোমাঞ্চকর, জটিল ও ঐতিহাসিক মামলা পরিচালনা করে তিনি অভাবনীয় খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন। তাঁর উপন্যাস 'সুশান্ত-সা' একদা সাহিত্যজগতে আলোড়ন আনে। আরও কয়েকটি উপন্যাস গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। বসুমতী প্রতিষ্ঠান থেকে অল্পকাল পূর্বে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শেষ জীবনের রচনাদি মাসিক বসুমতীতেই প্রকাশিত হয়েছে।

ধরানাথ ভট্টাচার্য

বর্ষীয়ান বিপ্লবনায়ক ধরানাথ ভট্টাচার্য গত ২৭শে অগ্রাণ ৮৭ বছর বয়সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সত্তর বৎসর পূর্বে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের তিনি বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেন। তারপর স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলার বিপ্লবান্দোলনে অতি ঘনিষ্ঠভাবে তিনি সংযুক্ত থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। এ দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান তাঁর অধিকারভুক্ত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, মনস্বী নেতা বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নায়কদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন।

প্রভানাথ সিংহরায়

চকদীঘির জমিদার পরিবারের সন্তান প্রভানাথ সিংহরায় ২০-এ কার্তিক ৭০ বছরে দেহত্যাগ করেছেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সচিবের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে 'ও-বি-ই' খেতাব দেন। স্বর্গত স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়ের ইনি অনুজ ছিলেন।

রজনীকান্ত প্রামাণিক

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর অন্যতম দীক্ষিত-শিষ্য এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপমন্ত্রী রজনীকান্ত প্রামাণিক গত ৯ই অগ্রাণ ৭২ বছর বয়সে তিরোহিত হয়েছেন। ১৯৩০ সালে আইন-ব্যবসায় ছেড়ে ইনি লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্যে সর্বসমেত সাতবার কারারুদ্ধ হন। মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার গঠনে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রেণুকা বসু

দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও নাট্যমোদী স্বর্গত আচার্য মন্মথমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিশির সম্প্রদায়ের অন্যতম বিশিষ্ট নট স্বর্গত অমিতাভ বসুর সহধর্মিণী রেণুকা বসু গত ৭ই পৌষ ৬৬ বছর বয়সে লোকান্তরযাত্রা করেছেন।

সুধীরা বসু

শিল্পাচার্য স্বর্গীয় নন্দলাল বসুর সহধর্মিণী সুধীরা বসু গত ১৯-এ কার্তিক লোকান্তরযাত্রা করেছেন।

সাবিত্রী দেবী

স্বর্গত মনস্বী অতুলচন্দ্র গুপ্তের সহধর্মিণী এবং সুপ্রসিদ্ধ জননেতা ও পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায়ের অনুজা সাবিত্রী দেবী গত ১০ই পৌষ ৭৪ বছর বয়সে পরলোকযাত্রা করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং বিচারপতি অলোকচন্দ্র গুপ্ত তাঁর দুই পুত্র।

রত্নকুমারী রায়

স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অগ্রজ স্বর্গত ইঞ্জিনীয়ার সাধনচন্দ্র রায়ের সহধর্মিণী রত্নকুমারী রায় গত ১২ই অগ্রাণ ৮৩ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। লোকসভার প্রাক্তন সদস্যা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী তাঁর কন্যা।

ডাঃ হেমন্তকুমার ইন্দ্র

সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু-শল্যচিকিৎসক এবং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ হেমন্তকুমার ইন্দ্র ১২ই অগ্রাণ ৬৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইনি ভারতীয় সৈন্য-চিকিৎসা বিভাগে যোগ দেন এবং মেজর হন। ইনি কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস পদে সমাসীন ছিলেন।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবিনোদ)

বাঙলা দেশের একালের যাত্রা-জগতের সম্রাট ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবিনোদ) গত ১৮ই অগ্রাণ ৭৫ বছর বয়সে অভিনয়রত অবস্থায় অনন্তযাত্রা করেছেন। ষোল বছর বয়স থেকে তাঁর যাত্রা-জীবন সুরু। তারপর এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কখনও সাধনার পথ থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে দেখা যায় নি। এই দীর্ঘসময়ের পরিসরে তাঁর অবদানে এ দেশের যাত্রাজগৎ যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে এবং তাঁর সাধনা যাত্রাশিল্পের নবযুগের প্রবর্তন করেছে। শুধু অভিনয়ই নয়, অসংখ্য পালা রচনাতেও তিনি সাফল্য-লাভ করেছেন। অসংখ্য চলচ্চিত্রেও তিনি অবতরণ করেছেন। পেশায় তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র আগে সঙ্গীত-নাটক-এ্যাকাডেমী কর্তৃক তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদায় বিভূষিত হন। যাত্রাশিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীদেব[illegible]সমাদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

মহাশয়,

আমি বর্ধমান জেলা-পরিচিতি পর্যায়ের লেখককে একটি তথ্য স্মরণ করাতে চাই, যেটা হয় তিনি জানেন না অথবা উপেক্ষা করেছেন। কার্তিক সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে বর্ধমান জেলা-পরিচিতির লেখক বর্ধমানে পাথরের মন্দিরপ্রসঙ্গে শুধুমাত্র আসানসোলের একটি মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ জেলার কাটোয়া মহকুমা ও থানার অন্তর্গত এবং ঐ স্থান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত জগদানন্দপুর গ্রামে দুই শত বৎসরের অধিক পুরাতন একটি বিরাট পাথরের মন্দির রহিয়াছে। আমি লেখককে আমার বক্তব্যের সত্যতা নির্ধারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতাত্বিক বিভাগের পরিচালকের সাথে আলোচনা করিতে অথবা এই মন্দির স্বচক্ষে দর্শন করিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর এই তথ্য জানা সত্বেও যদি এর উল্লেখ না করেন, তবে লেখককে জিজ্ঞাস্য যে, তিনি কি এই মন্দিরকে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করেন না ?

প্রভাত রায়---গ্রাম, জগদানন্দপুর, পোঃ---দাঁইহাট, জেলা---বর্ধমান।

প্রবন্ধ সমালোচনা

মহাশয়,

আপনাদের অগ্রহায়ণের (১৩৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ---'গর্কির নাটকে জীবন-দৃষ্টি' একটি অপূর্ব ও অনবদ্য সৃষ্টি। রুশ সাহিত্যের নবদিগন্তে গর্কির সৃষ্টি এক নব অরুণালোকের সন্ধান দিয়েছে---যাহা তুলনাবিহীন। এই সাহিত্যিক তাঁর নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে রুশ-জীবনের যে তদানন্তীন আলেখ্য রচনা করেছেন এবং যে অপূর্ব ও সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছেন ---তা যেমন অপূর্ব তেমনি সুন্দর। রাশিয়ার বিপ্লবকে কেন্দ্র করে ---রুশ সমাজের নিচের স্তরের মানুষকে

যেমন ভাবে মনুষ্যত্বের উঁচু ধাপে তুলে ধরেছেন---তার তুলনা যে-কোন সাহিত্যেই বিরল। রুশ-সাহিত্যে শুধুমাত্র গর্কির 'মাদার', মানুষের মনের কোঠায় গর্কির জন্য চিরদিনের আসন প্রতীষ্ঠা করে রাখবে। চেখভ, পুসকিন, ডস্টয়ভস্কি, গোগন এবং আরও অনেকে রুশ-সাহিত্য নানানভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে আমার মনে হয় এ সবেরই পথপ্রদর্শক ছিলেন অমর স্রষ্টা গর্কি। রাশিয়ার বিপ্লবকে প্রণাম জানাতে যেয়ে সর্ব প্রথমেই প্রণাম জানাতে হয়, মহান স্রষ্টা গর্কিকে। শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে বলেছেন- -'চেখভ রুশ জীবনকে দেখেছেন দ্রষ্টার দৃষ্টিতে আর গর্কি রুশ-জীবনকে দেখেছেন স্রষ্টার দৃষ্টিতে।' কিন্তু আমরা যদি গর্কির গোটা সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখি তবে দেখতে পাব যে গর্কি সমভাবে স্রষ্টার ও দ্রষ্টার 'রোল প্লে' করেছেন---এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। গর্কি ছিলেন মানব-জীবনের সমদর্শী---তাঁর সুগভীর দৃষ্টি থেকে মানবজীবনের কোন স্তরই বাদ যায়নি। গর্কির সাহিত্য-সমুদ্রে সমস্ত জীবন ধরে অবগাহন করলেও যে-সমস্ত মণিমুক্তা তিনি সৃষ্টি করে গেছেন, তার যথাযথ সন্ধান আমরা নাও পেতে পারি। গোটা সমাজের মন্দ দিকটাকে ভেঙ্গে চুরে তিনি যে নূতন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন, তাঁর জয়গান সমস্ত নিপীড়িত মানবগোষ্ঠী সুন্দরভাবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন---'ভাস্করের মতো মূর্তি গড়েছেন আর পূজকের মতো মন্ত্রপূত করেছেন। তাঁর ছিলো বিপ্লবের মন্ত্র, মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা আর মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ়-সংকল্প।'

---শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায় ৮।সি, সি, এন রায় রোড, কলি---৩৯

অহল্যা রাত্রি প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

এক দশকের কিছু বেশী সময়ের কথা---এই সময় থেকে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিপলায়তন উপন্যাস রচনার এক অনিবার্য হিড়িক এসে লেগেছে। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আধুনিককাল, একালের মানুষ, এই সভ্যতা, সমাজ ও জীবনের পেছনে রেখে অতীতের কাহিনী আর ইতিহাস-আশ্রিত গল্পকথা উপন্যাসের বাজারে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। আপনার পত্রিকায় নমিতা চক্রবর্তীর লেখা 'অহল্যা রাত্রি' ধারাবাহিক উপন্যাসটির প্রথম দু-একটি কিস্তি পড়ে মনে হয়েছিল আলোচ্য উপন্যাসটিও বোধ হয় এই জাতীয় একটি ইতিহাস-আশ্রিত রচনা। কিন্তু উপন্যাসটির অন্যান্য কিস্তিগুলি পড়ে সে ধারণা বদলাতে হয়েছে। উপন্যাসটির পরিণতি কি হবে জানি না, তবে এ-পর্যন্ত যে কটি কিস্তি পড়েছি তাতে একাধারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি এবং নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি যে, ইদানীংকালে এই জাতীয় লেখা পড়ি নি। সেকালের সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজ-লাঞ্ছিতা মেয়ের কঠিন ভাগ্য একালের উদার শিল্পতান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশেও অপরিবর্তিত। কাল পরিবর্তনশীল কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিত নিরপরাধ যথিকা-হিনিবাদের দুঃসহ রাত্রির বুঝি অবসান হয় না। এই নির্মম সত্যটিকে শক্তিমতী লেখিকা অত্যন্ত দরদের সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার

মনের দুয়ারে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাঁর রচনায় সেকাল-একাল—দুই কালেরই সার্থক চিত্র ফুটে উঠেছে। নমিতা চক্রবর্তীর এই অসাধারণ রচনার ছত্রে ছত্রে যে গভীর মননশীলতা, বলিষ্ঠ জীবনবোধের পরিচয় মেলে এবং অভিজ্ঞতার যে বিচিত্র বর্ণালী বিচ্ছুরিত, তা একালের বাংলা সাহিত্যের যে-কোন লেখিকার রচনায় দুর্লভ, এমন কি অনেকে শক্তিশালী লেখকেরও হয়তো ঈর্ষার বস্তু। এ-দেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের লেখা পড়তে বলার কথায় যে-সব উন্নাসিক পাঠকদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, নমিতা চক্রবর্তীর লেখা এই পত্রলেখকের মতো তাঁদেরও বোধ করি একাধারে বিস্মিত ও মুগ্ধ করবে।

—শঙ্কর ঘোষ, ৪২, আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা-১৪।

উপন্যাস প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আমি অপনার মাসিক বসুমতী পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গল্প ও প্রবন্ধ-সমূহ আমি খুবই মনোযোগের সহিত পড়িয়া থাকি।

অধুনাপ্রকাশিত ধারাবাহিক রচনা 'গাছের পাতা নিল', 'বাতাসে প্রতিধ্বনি', ও 'মনে রেখো' আমার খুবই ভালো লাগে। বিশেষ করিয়া আরেকটি লেখার কথা বলি, 'সঞ্জয় উবাচ' একটি অতি মনোরম রচনা। 'মনে রেখো' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব আছে। সর্বোপরি আপনার সম্পাদনাও বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

—গৌতম সেনগুপ্ত, ৫।৪৬।২, দমদম রোড়, কলিকাত-৩০।

কলাকাকলি প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

সঙ্গীত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি 'কলাকাকলি' বিভাগে প্রকাশিত হচ্ছে, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীঅর্চনা মিত্র যদি রাগরাগিণী-গুলির পরিচয় ও বর্ণনা আর একটু বেশী করে দিতেন, ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধা হত। তবুও তাঁর এই কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সাহস থাকায় তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি যে সঙ্গীতের অপ-ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন, এটাই তাঁর কৃতিত্ব।

—শ্রীমিহিরবরণ রায়, ২০, সেলিমপুর লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

বিবিধ প্রসঙ্গে

মহাশয়,

এবারকার এই মাসের বসুমতীটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। এর প্রতিটি গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং প্রবন্ধ পাঠকের মনে বিশেষভাবে দাগ কেটে যায়। বিশেষত ঠাকুর পরিবার ও হিন্দুমেলা রচনাটি আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এতদিন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মাধ্যমে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত লেখা হিসেবে অতি সামান্যভাবেই ঠাকুর পরিবার বা হিন্দু মেলার কথা পড়ার সুযোগ পেয়েছিলুম। যেটা নিতান্তই পরীক্ষায় পাশ করার নিমিত্ত অপরিহার্য বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবিকই মন কি এতটুকু জেনে খুশী থাকতে চায়? না অনুসন্ধিৎসু মনের তা থাকাও উচিত। তাই পাঠ্য গ্রন্থ পড়বার পরও এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার জন্য আগ্রহ আমার হয়েছিল খুবই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার কোন সুযোগই পাচ্ছিলুম না। এমতাবস্থায় মাসিক বসুমতীর পাতায় এই রকম একটা লেখা দেখে আনন্দও যেমন হল--ভালও তেমনি লাগল খুব। এ-বিষয়ে সত্যিই লেখকের বাচন-ভঙ্গীর প্রশংসা করতে হয়। প্রভাত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'একই অঙ্গে' উপন্যাসটিও অতীব সুন্দর। রচনাটি পড়ে পাঠক-মনকে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। বারবার মনে একই কথার অনুরণন হতে থাকে এও কি সত্যি! সত্যিই কি এমন হতে পারে না তা হওয়া সম্ভবপর। ভালো এবং মন্দ এই দুয়ের এক অপূর্ব মিশ্রণ কি করে এদেহে ফুটে উঠে এমন নিখুঁতভাবে। সবার উপর লেখা এমন কৌতূহলের উদ্দীপক যে পড়তে আরম্ভ করলে না পড়ে আর শেষ করা যায় না। 'গাছের পাতা নীল' রচনাটিও খুবই ভাল লাগে। 'বাতাসে প্রতিধ্বনি'ও মন্দ লাগে না। বেশ ভালই লাগে। কিন্তু 'অহল্যা রাত্রি' রচনাটি ভাল হলেও আমার ওর বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য আছে। সেটা হল উপন্যাস-রচয়িত্রী অতি মাত্রায় শৃঙ্গাররস স্থানে স্থানে পরিবেশন করে ফেলেন, সেটা সময়-সময় বড্ড বেশী মাত্রায়, অসহ্য বলে মনে হয়। 'সঞ্জয় উবাচ' উপন্যাসটিও খুবই ভাল। সত্যি ডাঃ কার্তিক বোসের জীবনী পড়লে মনটা গর্বে ভরে উঠে। বার-বার মনে হয় তিনি বাঙালীদেরই তো একজন।

—কুমারী সুমিত্রা বসু, ১০৬এ, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে

আমি মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠিকা। স্কুলে পড়ার সময় থেকে মাসিক বসুমতী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আজও জীবনের বহু ঘটনার মধ্যেও তার কোন পরিবর্তন হয় নি। আজও আমার অবসর সময়ের নিত্যসহচর 'মাসিক বসুমতী'। এই পত্রিকা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পত্রিকা। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিভিন্ন সমস্যাবলীর যেভাবে আলোচনা করা হয়, তা বাস্তবিকই অতুলনীয়। উজ্জ্বল দিনগুলিকে সাথী করে রঙিন ঐতিহ্যের পথে এগিয়ে চলছে আমার প্রিয় মাসিক পত্রিকা 'মাসিক বসুমতী'। এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি—

—কুমারী সীমারাণী ঘটক, অবধায়ক—জয়দেব ঘটক, ধাদকা রোড, পোঃ আসানসোল, জেলা বর্ধমান।

মহাশয়,

আমি মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠক এবং খুবই আগ্রহের সঙ্গে এই পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করি। মাসিক বসুমতীর বিভিন্ন বিভাগ কলাকাকলি, আরোগ্য বিভাগ, রাশিফল ইত্যাদি খুবই ভাল লাগে এবং এগুলো সবই প্রয়োজনীয় বিভাগ। ধারাবাহিক রচনার মধ্যে 'গাছের পাতা নীল', 'বাতাসে প্রতিধ্বনি' ভালো লাগছে, অধুনা প্রকাশিত রচনা 'সঞ্জয় উবাচ' ও 'মনে রেখো' বেশ ভাল লাগছে। 'মনে রেখো' উপন্যাসের সব চেয়ে ভাল লাগছে তার অনবদ্য ভাষা ও লেখার স্টাইল, লেখক ছোট ছোট কথার দ্বারা পাঠককে ফাঁকি দিতে চান নাই যা আজকাল বিরল। ঘটনার বিষয়বস্তুর মধ্যেও বেশ একটা অভিনবত্ব দেখা যাচ্ছে। 'সঞ্জয় উবাচ'র বিষয়-বস্তুও বেশ অভিনবত্বের দাবী রাখে।

পরিশেষে এইটুকু জানাই যে, আপনার সুযোগ্য সম্পাদনার গুণে মাসিক বসুমতী যেন আবার তার পূর্ব প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

—শ্রীনরেন্দ্র সিংহ—৬এ, ব্রাইট স্ট্রীট, কলিকাতা—১৯।

●

মহাশয়,

শ্রাবণ মাসের মাসিক বসুমতীতে পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে শ্রীজিতেন্দ্র-নাথ মুখার্জীর চিঠি দেখলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ সম্বন্ধে প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, সৃষ্টিতত্ত্ব বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণ ধ্যাননেত্রে যা উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতিসমূহই শাস্ত্রে লিখিত আছে। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপার বলে বোঝান সহজ নয়। তবুও আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু সম্ভব বলতে চাই।

পত্রলেখকের মতে, "গুণত্রয় (সত্ত্ব, রজঃ তমঃ) অনাদি এবং নিত্য হলে নিয়ত পরিণামশীল হতে পারে না, কারণ এই দুই গুণ পরস্পর-বিরোধী। গুণত্রয়ের সাম্যস্থিত রূপই প্রকৃতি এবং প্রকৃতি অনিত্য।"

এর উত্তরে বলা যায় যে, এই গুণত্রয় সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ এবং ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। ঈশ্বরের শক্তি বলেই এরা অনাদি এবং নিত্য এই গুণত্রয়ই দেহাভিমান দিয়ে আত্মাকে শরীরে বদ্ধ করে। কিন্তু সৃষ্টি করতে গিয়ে এরা পরিণামশীল হয়ে থাকে---অর্থাৎ লত একই থাকে অথচ বাইরের রূপ পরিবর্তন হয়। জড়-বিজ্ঞানেও স্বীকার করা হয়েছে যে, শক্তি অনন্ত তার বিনাশ নেই; অনন্ত এক শক্তি নিয়তই অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কৃষ্ণ সূর্যকিরণ থেকে শক্তি আহরণ করে নিজের মধ্যে সঞ্চিত করে রাখে দাহিকাশক্তিরূপে। গুণত্রয়ের সাম্যে স্থিত রূপই প্রকৃতি, কিন্তু প্রকৃতিকে অনিত্য বলা যায় না। এ বিষয়ে পরে আসছি।

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায় আছে---

'অপরে মিত স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।"

এখানে পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট রকম প্রকৃতিকে বন্ধনাত্মিকা অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি বলা হয়েছে। এই আট রকম প্রকৃতি নিয়েই মায়াশক্তি। আর যে জীবস্বরূপ প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করে রয়েছে, তাকে পরা বা প্রকৃষ্ট বলা হয়েছে। এই প্রকৃতিই ক্ষেত্রজ্ঞা বা তটস্থা জীবশক্তি। ঈশ্বর নিজে নির্লিপ্ত থেকে তাঁর এই দুই প্রকৃতি বা শক্তির সাহায্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর অনাদি, কাজেই তাঁর প্রকৃতি স্বয়ং অনাদি। তিনি সর্বদাই এই প্রকৃতি দ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সাধারণত জীবশক্তিকেই পুরুষ এবং মায়াশক্তিকে প্রকৃতি বলা হয়। কাজেই পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে জগতের সৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। আগে যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃর) কথা বলা হয়েছে, সেই প্রকৃতিই অবিদ্যা। মায়াশক্তি থেকেই অবিদ্যার সৃষ্টি। অবিদ্যার প্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে আত্মাভিমান জন্মে এবং দেহকেই আত্মা বলে মনে হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাই মায়া অবিদ্যাবিস্তার করে, তখন জীবশক্তি মোহাভিভূত বা অজ্ঞানাকৃত হয়ে মায়াশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে। যেহেতু জীবশক্তি ঈশ্বরেরই অংশ, সেহেতু অবিদ্যার প্রভাব ব্যতীত তাকে মোহগ্রস্ত করা যায় না এবং মোহগ্রস্ত না হলে সে শরীর গ্রহণ করে না। কাজেই ব্রহ্মই অবিদ্যাহেতু জীবভাব প্রাপ্ত হন---এই কথা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, অথচ এতে ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব বা অভেদত্বর কোনও হানি হচ্ছে না। কথামৃতে আছে, ব্রহ্মকে যিনি এ জীবনেই সাক্ষাৎকার করেছেন, কিন্তু

ব্রহ্মলাভ করা সত্ত্বেও যাঁর প্রারব্ধ ক্ষয় হয়নি, তিনিই জীবন্মুক্ত। এখন পত্রলেখকের চতুর্থ প্রশ্ন---'প্রারব্ধ মানে কর্মভোগ বা সংস্কার, আর সংস্কার মানেই বন্ধনের কারণ। জীবন্মুক্ত বন্ধনহীন, মায়ার আবরণহীন এবং অশুভ সংস্কারবিহীন হলে তাঁর প্রারব্ধক্ষয়ের কথা আসে কী করে? আর প্রারব্ধ ক্ষয় না হলে কী ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়? অথবা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর কী প্রারব্ধ থাকে?'

প্রারব্ধ মানে হচ্ছে, পূর্ব পূর্ব জন্মের যে কর্ম বা সংস্কার সঞ্চিত হয়েছে, তার ক্ষয় বা ফলভোগ বর্তমান দেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়ে গেছে। এই জীবনে যে কর্ম বা সংস্কার অর্জিত হবে, তার ফল পরবর্তী জীবনে ভোগ করতে হবে। পূর্ব জন্মার্জিত শুভসংস্কার না থাকলে ব্রহ্মলাভ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না। কিন্তু যে পূর্বার্জিত কর্মের ভোগ আরম্ভ হয়ে গেছে, সেই কর্মের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত দেহধারণ করে থাকতে হয়। ব্রহ্মলাভ হয়ে গেলে আর নূতন সংস্কার বা নূতন কর্মের বন্ধন হয় না, সেজন্য পুনর্জন্মও হয় না। মায়ার আবরণ ছিন্ন হওয়ায় কর্ম করলেও তা' বন্ধনের কারণ হয় না। যিনি ব্রহ্মলাভ করেও প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য দেহধারণ করে থাকেন তিনিই জীবন্মুক্ত। এই জন্মই তাঁর শেষজন্ম। আর যাঁর ব্রহ্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধও ক্ষয় হয়, অর্থাৎ দুটোই একসঙ্গে হয়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করেন।

আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। পত্রলেখক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসাধ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কৃতকার্য হয়েছি কিনা জানি না।

---শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী শ্যাম, পাতিছড়া চা-বাগান, পোঃ কুম্ভীর, কাছাড়।

পোলিও রোগ প্রসঙ্গে

মহাশয়, ভাদ্র '৭৫ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে শ্রীরণজিৎ সেনগুপ্ত বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পোলিও রোগে পঙ্গু ছেলেদের ডাক্তারী ভাল চিকিৎসা নাই। ইহার আমি প্রতিবাদ করিতেছি। কারণ পোলিও রোগে পঙ্গু ছেলেদের ২ মাস হইতে ৬ মাস ইঞ্জেকসন লইতে হয়। সাধারণতঃ একদিন অন্তর অন্তর ধৈর্যসহকারে ইঞ্জেকসন লইতে হয় যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। আমার হাতে একটিও বিফল হয় নাই। ধৈর্যসহকারে চিকিৎসা করাইলে কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না। তবে চিকিৎসা করাইতে দেরী করিলে পা শুকাইয়া যায় এবং তাহা পুনরুদ্ধার হয় না। আজকাল এই রোগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন বাহির হইয়াছে।

—ডাঃ দীনেশচন্দ্র রক্ষিত, পোঃ-নবাবগঞ্জ, ভ.য়া ফরবেশগঞ্জ, জেলা—পূর্ণিয়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● ডঃ এইচ পি ভট্টাচার্য, গ্রাম—ডাক---হরিচরণপুর, জেলা---কেওনঝাড়, উড়িষ্যা ● সাহিত্য সচিব, রিক্রিয়েশন ক্লাব, মেটিওরলজিক্যাল অফিস গভঃ অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা-২৭ ● শ্রী কে, এন চৌধুরী এস, এস, আর এম 'কিউ' ডিভিশন, ব্যাঙ্গালোর-২০ ● শ্রীমতী সেরাফ-রাণী সাবুর, অবঃ শ্রীএন কে সাবুর, গ্রাম-।-ডাক---নিমাতি, দোমোহিনী (কালচিনি হয়ে) জেলা---জলপাইগুড়ি ● শ্রীশচীনন্দন চার, গ্রাম -।- ডাক---চেপকিয়া (গোবিন্দপুর হয়ে) জেলা—ধানবাদ ● সচিব, স্টাফ ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ) বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ● শ্রীকৃত্তিভূষণ ঘটক, তিরোগ্রাম ডাক---বোনহা, (নলহাটি হয়ে) বীরভূম ● ডাঃ এস পোদ্দার ডিস্ট্রিক্ট হেলথ সেণ্টার, ডাক -।- জেলা---ফুলবনি, উড়িষ্যা ● শ্রীমতী সুপর্ণা দেবী, অব-।- শ্রী জি বাগচী, স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা, ডাক---কারতারপুর, জলন্ধর, পাঞ্জাব ● শ্রীশিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী অব, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী-২ ● শ্রীমতী বিভাবতী ভারতী, অব—শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ, ঘুঘুবেসিয়া রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ, ডাক---আমর দাহা, জেলা—হাওড়া ● সাধারণ সচিব রামপুর কালচারাল ইউনিট, ডাক—রামপুর ● প্রধান শিক্ষক, তালিবপুর জে বি স্কুল, ডাক---তালিবপুর (সুরী হয়ে), বীরভূম ● শ্রী এল এম রায়, ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ, রুরকী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের গ্রাহক-মূল্য ২০ টাকা পাঠালাম। অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠিয়ে সুখী করবেন। শ্রীরবীন পাত্র, সহকারী মেডিক্যাল অফিসার, এ-সি-রেলওয়ে হসপিটাল, হুগলী।

আমার প্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। শ্রীমণীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ১৮।১৪৬, কুরসন কানপুর-১, উত্তর প্রদেশ।

Remitted Rs. 18·00 being the yearly subscription for Monthly Basumati. Please acknowledge receipt.—Principal, Ananda Chandra College, Jalpaiguri, W. B.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের গ্রাহক-মূল্য ১০ টাকা (সডাক) পাঠালাম। মাসিক বসুমতী শীঘ্র পাঠাবেন। শ্রীমতী বিভাবতী ভারতী, অবঃ—দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ, ঘুঘুবেসিয়া রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ, আখড়া দাহা, জেলা---হাওড়া।

আমার প্রিয় মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। শ্রীবাদলচন্দ্র পাল, ভদ্রকালী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ডাক—ভদ্রকালী। জেলা—মেদিনীপুর।

I would like to subscribe your Monthly magazine at carliest possible date. Labanya Prasad, 140, Park Hill Avenue, Apt. 6T, Statgen Island, New York, U. S. A.

ঘরোয়া

-বাদল ভট্টাচার্য অঙ্কিত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী

সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোতির্দীপ্ত নাট্যরাজি,কালিদাস, কাঞ্চনাচার্য শ্রীহর্ষদেব, বাণভট্ট,ভবভূতি,শূদ্রক,রাজশেখর প্রভৃতির সাহিত্য-মন্থিত অমৃতধারা—বালজাকের বিভাবিকা,মোপাসাঁর গল্পসুধা, জোলার রসরঙ্গ, পিয়ের লোতীর সম্মোহন, মোলিয়েরের কৌতুক-যৌতুক, স্বাধীন ভারতের গৌরবদীপ্তি, রাজপুত শৌর্যের অলৌকিক প্রভা তরবারি আস্ফালনের বিদ্যুৎ সঞ্চালন।

১ম খণ্ড—অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত।

মূল্য চার টাকা

২য় খণ্ড—মিলিতোনা, শোণিত-সোপান, হত্যাকাণ্ডের পর, সবজ শয়তান, অলীক বাব, বেড়ালের স্বর্গ, শেষ পাঠ বার্লিনের অবরোধ, স্পাই, ইংরেজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ, মুখোসপরা নাচের মজলিস, মা, জল্লাদ, জ্যোৎস্না রাতে, খুকুমণি, শেষ পরী, ঘণ্টা, অভিশপ্ত বাড়ী, তার ভুল হয়েছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ।

মূল্য চার টাকা

৩য় খণ্ড—মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীরচরিত।

মূল্য চার টাকা

বহুকাল পরে আত্মপ্রকাশ করিল

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

(কবির সমগ্র রচনা এক খণ্ডে সম্পূর্ণ)

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, ধেড়ে ভেড়ের কৌতুক, ফর্দরফৎ, হিন্দী কবিতাবলী, বালিরাজ, চণ্ডী (নাটক), নাগাষ্টক, ঋতুবর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী, গোপাল উড়ের টপ্পা, সংস্কৃত, হিন্দী, পার্শী, প্রভৃতি নানা ভাষার কবিতা তৎসহ কবির জীবনী

মূল্য মাত্র তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাঙ্গালার খ্যাতনামা কথাশিল্পী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

প্রভাবতী দেবীর গ্রন্থাবলী

ইহাতে সন্নিবিষ্ট লেখিকার নিম্নলিখিত শ্রেষ্ঠ রচনাবলী

১। প্রতীক্ষায় ২। ঘূর্ণি হাওয়া

৩। ব্রতচারিণী ৪। আপ-টু-ডেট

৫। প্রিয়ের উদ্দেশ্যে ৬। ছায়ার মায়া

মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

রস-রচনায় নিপুণ ও প্রবীণ কথাশিল্পী

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী

পথের স্মৃতি (উপন্যাস), প্রিয়তমাসু (উপন্যাস), মাটির স্বর্গ (উপন্যাস), বরদা ডাক্তার, জমাখরচ, ব্যথার ব্যথী, সকলি গরল ভেল, উই আর সেভেন, দাদা ও ভাই, পতি-সংশোধন-সমিতি, নতুন খাতা। **মূল্য চার টাকা।**

দরদী কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মানিক গ্রন্থাবলী

১ম ও ২য় খণ্ড

ইহাতে আছে দুইটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং পঁচিশটি সুনির্ব্বাচিত গল্পরাজি। **প্রতি খণ্ড মূল্য তিন টাকা।**

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য পাঁচ টাকা।

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ।

বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

॥ ৪৭ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৭৫ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ॥

বীজমন্ত্র

(৮) তেজো বীজ 'ট্রীঁ';

(৯) তারা বীজ 'হূঁ';—ইত্যাদি।

প্রত্যেক মাতৃকা বর্ণই এক-একটি বীজমন্ত্র। সকল দেবতার নামের আদ্যক্ষরে ঁ (চন্দ্রবিন্দু) যুক্ত হয়ে সেই সেই দেবতার বীজ হয়—যেমন 'গঁ' গণেশবীজ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক তান্ত্রিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"বীজমন্ত্র না পেলেও কি সিদ্ধ হয়?"

তান্ত্রিক উত্তরে বলেছিলেন—'হয়; বিশ্বাসে—গুরুবাক্যে বিশ্বাস।'

বুদ্ধি

সংকল্প ও বিকল্প (বিবিধ কল্পনা করার শক্তি)-কারী অন্তঃকরণের কার্য যে অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হয় তার নাম মন; আর মনের এই সংকল্প বিকল্পকে নিশ্চয় করার যে বৃত্তি, তারই নাম বুদ্ধি ('বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তিঃ')। সাধারণত কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণ যে জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন হয় তাকেই বুদ্ধি বলা হয় বটে, কিন্তু তাহা বুদ্ধির আংশিক কার্যমাত্র। বুদ্ধি আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঠিক উপলব্ধি করিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি হচ্ছে বোধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বুদ্ধি অনেক রকম আছে। যে বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয়, সে-ই ঠিক বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ী হয়, ডেপুটির কর্ম হয়, উকিল হয়, সে বুদ্ধি চিঁড়ে-ভেজা বুদ্ধি। সে বুদ্ধিতে জোলো দই-এর মত চিঁড়েটা ভিজে মাত্র। শুকো দই-এর মত উঁচুদরের দই নয়। যে বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয়, সেই বুদ্ধিই শুকো দই-এর মত উৎকৃষ্ট দই।

"ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয়, বোধস্বরূপ। ন্যাংটা বলতো-'মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধ স্বরূপে। বুদ্ধি যখন এই বোধ স্বরূপে লয় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়'।"

বেদ

বেদ কাকে বলে? বেদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। চতুর্বিধ জ্ঞান। প্রকৃতিসৃষ্ট জীবজগতের মধ্যেই মানবধর্মের সর্বপ্রকার সত্যজ্ঞান অনুস্যূত। এই প্রকৃতিকে কর্ষণ করে সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু স্থূলে ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় সে সমুদয় বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, তা-ই বেদজ্ঞান। উহা পরম্পরাগত অতীতের জ্ঞানসমষ্টি—যাহা আগে লিপিবদ্ধ ছিল না, পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই, বেদ শ্রুতি; তাই বলা হয়, বেদ মানব-রচিত নয়। 'কশ্চিৎ বেদকর্তা চ, বেদস্মর্তা পিতামহঃ'—(মনু)। মহর্ষি বেদব্যাস বেদকে চারি ভাগে লিপিবদ্ধ করেন—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব।

ঋগ্বেদ—স্তুতি অর্থবোধক 'ঋচ' ধাতুর উত্তর 'কৃপ' প্রত্যয় যোগে করণ বাচ্যে 'ঋক্' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তাই ঋগ্বেদ স্তুতি-রূপ মন্ত্র সংগ্রহ—যাকে কর্মকান্ড বলা হয়।

যজুর্বেদ—যজ+উস্ (ভাবে)। যজ ধাতুর অর্থ পূজা বা অর্চনা। তাই, যজ্ঞাদি বিধি প্রবর্তক বেদই যজুর্বেদ।

সামবেদ—সো+মন্ কর্তৃবাচ্যে। 'সো' ধাতুর অর্থ নাশ। গানের দুঃখনাশক শক্তি অসংশয়িত। তাই ছন্দোবদ্ধ পদাবলী দ্বারা গীত যে বেদ তাহাই সামবেদ।

অথর্ব বেদ—অথ+ঋ+বন্ কর্তৃবাচ্যে। মঙ্গলবাচক 'অথ' শব্দ

পূর্বে থাকায় গমন ও দান অর্থ জ্ঞাপক 'ঋ' ধাতু থেকে মঙ্গলকর কার্য নিরূপক 'অথর্বন্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই মঙ্গলকর কার্য নিরূপক জ্ঞানই অথর্ব বেদ।

এই চারি বেদেরই ব্রহ্মচার্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের উপযোগী চারটি ক'রে ভাগ আছেঃ (১) মন্ত্র বা সংহিতা ; (২) ব্রাহ্মণ ; (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষৎ।

সংহিতা হচ্ছে বেদের মন্ত্রপ্রধান কর্মকান্ড প্রতিপাদক ভাগ। মন্বাদি প্রণীত ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রকেও সংহিতা বলা হয়।

ব্রাহ্মণ হচ্ছে বেদের দ্বিতীয় অংশ যেখানে গার্হস্থ্য ধর্মাবলম্বীর করণীয় কার্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

আরণ্যক বেদের তৃতীয় অংশ—যেখানে বানপ্রস্থাবলম্বী তত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছুর কর্তব্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

উপনিষৎ ভাগ হচ্ছে বেদের চতুর্থ বা অন্তভাগ; ইহা ঈশ্বর নিরূপক জ্ঞানকান্ড। উপনিষৎ ১০৮ (১১৮?) খানি। এই উপনিষৎ মধ্যে যে সকল পারস্পারিক অসামঞ্জস্য বা তত্ত্বের বিরোধ দেখা যায়, তার সুসংগত মীমাংসা বেদব্যাস করেছেন—তার নাম উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত সূত্র।

বেদাংগ

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় প্রকার বেদের অবয়ব গ্রন্থের নাম বেদাংগ।

শিক্ষা হচ্ছে উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গ গ্রন্থ।

কল্প হচ্ছে বৈদিক ক্রিয়ার বিবরণযুক্ত বেদাংগ গ্রন্থ—যেমন 'কল্পসূত্র'।

ব্যাকরণ হচ্ছে শব্দের প্রকৃতি প্রত্যাদি সম্বন্ধীয় বেদাংগ গ্রন্থ—যেমন 'পাণিনি'।

নিরুক্ত হচ্ছে বেদের ব্যাখ্যাকারক বেদাংগ গ্রন্থ। বেদান্ত মধ্যে দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র।

ছন্দ—বেদের যে অংগ ছন্দ নামে উক্ত তাহাতে বৈদিক ছন্দ-সমূহের লক্ষণ, নাম, মাত্রা ইত্যাদির পারিণাম লিখিত আছে।

জ্যোতিষ—ইহা গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চার-বিষয়ক এবং তদনুসারে শুভাশুভ নিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র।

বেদান্ত ও বেদান্ত মত

বেদান্ত বলতে আমরা কি বুঝি? চতুর্বেদের প্রত্যেকেরই চারটি করে ভাগ আছে। তাদের চতুর্থ বা অন্ত ভাগই বেদান্ত ; অর্থাৎ উপনিষৎ ভাগে যে ব্রহ্ম বিষয়ের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে তাহাই বেদান্ত—ব্রহ্মের স্বরূপাদি নিরূপক ব্যাস প্রণীত দর্শন শাস্ত্র।

বেদান্ত শাস্ত্র শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় এই তিন ভাগে বিভক্ত। উপনিষৎগুলিকে 'বেদান্তশ্রুতি', উপনিষদের মীমাংসা বেদান্ত-সূত্রকে 'বেদান্তন্যায়' এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 'সনৎসুজাত পর্বাধ্যায়' 'শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম' এই তিন গ্রন্থে বেদান্তের অনেক সিদ্ধান্ত ও মত সন্নিবিষ্ট থাকায় এই তিনখানি গ্রন্থকে 'বেদান্তস্মৃতি' বলা হয়। কোন আচার্য নিজের সিদ্ধান্ত ও নিজ মত স্থাপন করবার চেষ্টা বা প্রচার করতে প্রয়াসী হলে তাঁকে প্রথমে এই বেদান্তের প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করে তদ্রূপ আচরণ এবং তাহা প্রচার করতে হয়। তবে তিনি আচার্য বলে পরিচিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বেদান্ত মতে রূপ-টুপ মিথ্যা। বেদান্ত বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ 'তুমি আমি' আছে, ততক্ষণ জগৎও আছে—ঈশ্বরের নামরূপও আছে। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান আছে ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।

"বেদান্তের মধ্যেই ষড়দর্শন। বেদান্ত দর্শনের বিচারে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এ সব শক্তির খেলা ; শক্তিও অবস্তু—স্বপ্নবৎ। এই সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষীস্বরূপ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষীস্বরূপ। স্বপ্নও যতটা সত্য, যেমন মিথ্যা—জাগরণও ততটুকুই সত্য, তেমনি মিথ্যা। এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা। বাজিকর এসে কত বাজি করে ; আমের চারা, আম পর্যন্ত হলো। কিন্তু সবই বাজি। বাজিকরই সত্য।

"বেদান্তের পথ বড় কঠিন পথ। 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে সব মিথ্যা হয়ে যায়—নিজের দেহটা পর্যন্ত ; যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না—কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি, তুমি, জগৎ'—কিছুরই খবর থাকে না।

"অহং রূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে—লাঠিটা তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অর্থাৎ লাঠিটা থাকলে দুটো দেখায়—এ এক ভাগ জল, ও এক ভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়।
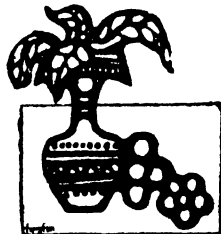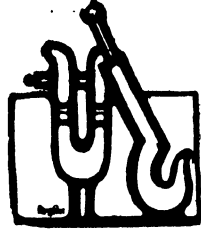
"বেদান্তবাদী আত্মজ্ঞানীরা বলে 'সোঽহং'—অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা। সন্ন্যাসীরা বলতে পারে; কিন্তু সংসারীর পক্ষে—যাদের দেহবুদ্ধি আছে তাদের, 'সোঽহং' এ ভাবটি ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে বেদান্ত, যোগবাশিষ্ট—ভাল নয়; বরং খারাপ। যতক্ষণ 'আমি' আছে, ততক্ষণ লীলাও সত্য।

"আমি সবই লই। তুরীয়, আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি; আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম, আবার মায়া, জীব, জগৎ—আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।

"বেদান্ত মতে অবতার নাই। সে মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের একটি ফুট। বেদান্তবাদীরা বলে,—রাম, কৃষ্ণ, এঁরা সচ্চিদানন্দ সাগরের দুটি ঢেউ।

"শাস্ত্রের সার গুরুমুখে জেনে নিতে হয়—তার পর আর গ্রন্থের কি দরকার? তার পর সাধন ভজন। মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন—বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আমি আলাদা কিছু নই; আমি সেই ব্রহ্ম—'সোঽহং'।"

বৈধ কর্ম

বৈধ কর্ম হচ্ছে ব্রত, নিয়ম, উপবাস, পূজা, জপ, হোম ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। বৈধ কর্মে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয় এবং সেই সঙ্গে কর্মজনিত ফললাভ হয়। বৈধ কর্ম আমাদের সর্বাবয়বেরই পরিপুষ্টি সাধন করে—আহার দেয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ক্রিয়মান বৈধ কর্মসমূহ দেহ, প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দের পোষণ করে। শাস্ত্রীয় আদেশগুলি যথাশক্তি পালনে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে—দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। ইহাই অন্নময় ও প্রাণময় কোষের আহার। ইহা আত্মাভিমুখী চিন্তাশক্তির সহায়তা করে; সুতরাং জ্ঞানলাভের পথও উন্মুক্ত হয়। জ্ঞানলাভের পরিমাণমত আনন্দ বা শান্তির সন্ধানও পাওয়া যায়। এভাবে বৈধ কর্মগুলি আমাদের পঞ্চকোষের আহার জুগিয়ে ঐহিক ও পারলৌকিক পুষ্টি বর্ধন করে।

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেছেন—"বৈধ কর্মে প্রাণ-রসের সন্ধান পাওয়া চাই—তবেই চিত্তপ্রসাদ, মাতৃবিভূতি ও মাতৃসম্ভোগের সুযোগ আসে। প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই খুঁজতে হয়, দেখতে হয়—আমার চিত্ত কতটা প্রসন্ন হলো—কতটা সময় জগতের মোহময় খেলা ভুলে মাতৃসঙ্গভোগে ধন্য হলাম। এদিকে দৃষ্টি না থাকলেই কর্ম প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

"অনেকের ধারণা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়া কিম্বা পূজা-ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবান লাভ হয় না—ভগবানলাভের জন্য সন্ন্যাসী যোগীর উপদেশ নিয়ে সাধনা করতে হয়। কিন্তু আমি বলি, আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়মান কর্মগুলিই ভগবৎলাভের পক্ষে প্রচুর। আচমন, সূর্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ইষ্টমন্ত্রজপ, ইত্যাদি যে-কোন একটি কার্যের যথারীতি অনুষ্ঠানেই মানুষ আনন্দের সন্ধান পেতে পারে।

"গুণ ও কর্মভেদে মানব-প্রকৃতি পৃথক ভাবাপন্ন—তাই বিভিন্ন মানুষের সাধনপ্রণালী বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতার আরো একটি উদ্দেশ্য আছে। আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল; কোন একটিমাত্র কার্যপ্রণালী ধরে চললে মনের স্থৈর্য বেশী সময় রক্ষা করা কঠিন। নিত্য একই রসের আস্বাদনে প্রাণও তৃপ্ত হতে চায় না। তাই একই জিনিষকে নূতন নূতন ভাবে ভোগের জন্য জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, কীর্তনাদি বিভিন্ন ভাবের ক্রিয়াগুলি বিহিত হয়েছে; এতে মনের স্বাভাবিক পরিবর্তনপ্রিয়তার পরিতুষ্টি হয়।

'বৈধ কর্মগুলি যতদিন না জ্ঞানময় হয় এবং জ্ঞান যতদিন না ভক্তিময় হয়, ততদিন সাধকের অভিলাষ পূর্ণ হয় না—কৃতার্থতা আসে না। কর্মের প্রত্যেক অঙ্গ মাতৃময় করে তুলতে পারলে তবেই কর্ম সার্থক হয়। 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মনা-হুতং'—এভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ—এ ছয়টি কারকই ব্রহ্ম হতে হবে। কর্মের সর্বাঙ্গেই মাতৃসত্তার উপলব্ধি করলে তবে কর্ম জ্ঞানময় হয়। তখন পূজা করতে বসে মনে হবে মা-ই মায়ের পূজা করছেন—পূজার উপচাররূপেও মাই বিরাজ করছেন। হোম করতে বসে দেখবে, অগ্নিরূপে মা, হবিরূপে মা, হোতারূপে মা, অর্পণরূপে মা! কাতরস্বরে মা বলে ডাকতে গিয়ে দেখবে, শব্দরূপে মা, কাতরতারূপে মা—মা-ই মাকে ডাকছেন। এভাবে কর্মের সর্বাঙ্গে মা'কে দেখতে অভ্যাস করলে কর্ম জ্ঞানময় হবে। তখন দেখবে কর্ম জ্ঞানেরই ঘনীভূত বিকাশমাত্র—জ্ঞানই কর্মের আকারে তুমি দেখতে পাচ্ছ। এই উপলব্ধি হলেই তুমি ব্রহ্মত্বে উপনীত হতে পারবে—'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্'। যতদিন কর্মের মধ্যে এই শাশ্বত জ্ঞানকে দেখতে না পাওয়া যায়, ততদিন কর্ম কেবল পার্থিব ভাবেরই আনুগত্য করে। যখন কর্মের দোষাংশে দৃষ্টি পড়ে—যখন বুঝা যায় যে কর্মগুলি আত্মার, জ্ঞানের, সচ্চিদানন্দের সেবা না করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হচ্ছে, তখনই জানবে শুভদিন সমাগত। তখন বুঝবে বৈধ কর্মের কত মহিমা।"

বৈধী ভক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ—'শাস্ত্রে অনেকরকম কর্ম করতে বলে গেছে, তাই করছি, এরূপ ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। এ হচ্ছে সাধ্য-সাধনা করে ভক্তি; এত জপ, এত ধ্যান করতে হবে; এত উপচারে পূজা করতে হবে; উপোস করতে হবে; এতগুলি বলিদান দিতে হবে; এত যাগযজ্ঞ হোম করতে হবে; পূজোর সময় এই এই মন্ত্রপাঠ করতে হবে; এত পুরশ্চরণ করতে হবে; তীর্থে যেতে হবে—এ সব বিধিবাদীয় ভক্তি—বৈধী ভক্তি। যেমন ক্ষেতে ধান আছে—মাঠ-পার হতে গেলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। রাগভক্তি এলে আর এসব বিধি-নিয়ম থাকে না। কিরকম জান? যেমন হাওয়া পাবে বলে পাখা করা,—হাওয়ার জন্য পাখার দরকার। ঈশ্বর-উপর ভালবাসা যেন আসে, তাই জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখার দরকার হয় না। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম আপনি এলে জপাদি বৈধীকর্ম কি দরকার? বৈধী ভক্তি কাঁচা ভক্তি। মালা জপা বৈধী ভক্তি।

"বৈধী ভক্তি হতেও যেমন যেতেও তেমন। কত লোকে বলে, 'কত হবিষ্যি করলুম, বাড়ীতে কতবার পূজা আনলুম,

কিন্তু কি হলো?' যাদের রাগ ভক্তি তারা কখনো এমন কথা বলে না। তাই বলছি, বৈধী ভক্তি হতেও যেমন, যেতেও তেমন।

"জীবকোটির ভক্তি বৈধী ভক্তি। এই বৈধী ভক্তির পর জ্ঞান; তার পর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না।"

বৈরাগ্য

সকল রকম বাসনার উপর বীতরাগ হয়ে বাসনাক্ষয় করার নাম বৈরাগ্য। প্রথমে শুভ বাসনা দ্বারা অশুভ বাসনা জয় করতে হয়; পরে শুভ বাসনাও ত্যাগ করে চৈতন্যমাত্রে বাসনা করতে হয়। শেষে তা-ও ত্যাগ করে স্বরূপনিষ্ঠ হতে হয়। অশুভ বাসনাই আসুরী সম্পৎ। ইহা ত্যাগের জন্য পুরুষকার চাই। মোক্ষেচ্ছু সাধকের প্রথম করণীয় কার্যই মনকে বৈরাগ্য-মুখী করা। এই বৈরাগ্য-সাধনায় সাধকের প্রথমে বিষয়বাসনা ত্যাগ করার ইচ্ছা বা যত্নমাত্রই উৎপন্ন হয়; ইহা মৃদু,—একে বলে 'যতমান' বৈরাগ্য। যখন কতক বাসনা নষ্ট হয়েছে, কতক আছে, তখন তাকে মধ্য বা 'ব্যতিরেক' বৈরাগ্য বলে। যে অবস্থায় বিষয়-বাসনার শুধু সংস্কারমাত্র আছে, কিন্তু বিবেকবুদ্ধি তীব্র প্রতিকূলাচরণ করে সে সংস্কারকেও চিত্তে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন তাকে 'অধিমাত্র' বা 'একেন্দ্রিয়' বৈরাগ্য বলে। আর, সর্বশেষ 'পর' বা 'বশীকার' বৈরাগ্য—যাতে লৌকিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়েই অন্তঃকরণ একেবারে সংস্কারশূন্য হয়ে যায়। এই ধারাবাহিক বৈরাগ্য-সাধনাদ্বারা অন্তিম বৈরাগ্য-ভূমিতে পৌঁছা যায়।

কিন্তু এ সাধন বড় কঠিন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'সময় না হলে হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বৈরাগ্য হচ্ছে সংস্কারের সব কিছুর উপর বিরাগ, আর সংগে সংগে ঈশ্বরের উপর অনুরাগ। এটি একেবারে হয় না; রোজ অভ্যাস করতে হয়। কামিনী-কাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ—তার পর তাঁর ইচ্ছায় মনে ত্যাগও করতে হয়। বাইরে ত্যাগও করতে হয়। রোক্ চাই—পুরুষকার। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে—তখন কাম-ক্রোধাদি বশ করতে কষ্ট হয় না।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

প্রচ্ছদ পরিচিতি

টমাস মান

যাঁদের জীবনে সাহিত্য এবং বাণিজ্যের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই আরাধনায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন—সেই তালিকায় টমাস মান একটি স্মরণীয় নাম। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে সারা পৃথিবীর গুণিজনের, রসিকমহলের স্মৃতিতে যিনি উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত তিনি ব্যবসায়ী টমাস মান নন—তিনি লেখক টমাস মান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের তালিকায় একটি শীর্ষস্থানীয় নাম টমাস মান।

১৮৭৫ সালে অর্থাৎ সমারসেট মমের জন্মের এক বছর পরে ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মের এক বছর আগে উত্তর জার্মানীর বাল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী লুবেকের অন্তর্গত প্রাচীন হান্‌সা জনপদে তাঁর জন্ম। মাতুলালয় তাঁর ব্রেজিলে। বাবা ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী। পিতৃবিয়োগে মানেরা চলে গেলেন মিউনিকে। সেখানে কারিগরী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন টমাস মান। তারপর দু'বছরের জন্য গেলেন ইতালী। সেখানে যাবার সময় স্থুরু করলেন তাঁর উপন্যাস 'বাডেনব্রুক্স' লিখতে। ১৯০১ সালে উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করল। এই উপন্যাসটি লুবেকের একটি পরিবারের তিন পুরুষব্যাপী ক্রমাবনতির কাহিনীসম্বলিত। মান প্রকাশ্যে এটুকু ঘোষণা করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন নি যে, উপন্যাসটি তিনি রচনা করেছেন তাঁর নিজের পরিবারকে কেন্দ্র করে।

১৯০৫ সালে মান শ্রীমতী কাজাকে বিবাহ করলেন। কাজা জাতিতে ছিলেন ইহুদী। সব দিক দিয়ে কাজা ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। জীবনে কাজার কাছে তিনি যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তার তুলনা নেই। কাজা ব্যক্তিজীবনে ছিলেন তাঁর গৃহিণী আবার লেখক-জীবনে তাঁকেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সচিবরূপে প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ, পাণ্ডুলিপি নকল করে দেওয়া প্রভৃতি কাজই করতেন। অর্থাৎ সব দিক দিয়েই নির্বিবাদে একমনে মানকে লেখার সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন। মান নিজে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—আই হ্যাভ এ্যান এক্সট্রিমলি বিউটিফুল ইয়ং ওয়াইফ, এ প্রিন্সেস এ্যামং দ্য উইমেন।

১৯২৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন টমাস মান। জার্মানী যখন নাৎসীবাদে ছেয়ে যায়, মান তার সুরে নিজের সুর মেলাতে পারেন নি। নাৎসীবাদকে তিনি কোনদিন সমর্থন জানান নি। হিটলারের মতের সমর্থক না হওয়ার জন্য মানকে জার্মানী ছাড়তে হয়। এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে। এখানে প্রিন্সটনে অধ্যাপনার ভার নিলেন। তারপর আবার বাসা বদল হ'ল। এবার ৎস্যুরিখ। একবার জার্মানীতে এসেছিলেন ১৯৪৯ সালে মহাকবি গ্যেটের দ্বিশতবার্ষিকী উৎসবে ভাষণ দিতে। লেখক হিসাবে গ্যেটের প্রভাব মান যথেষ্ট পরিমাণে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন।

মানের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ডেথ ইন ভেনিস' 'ম্যাজিক মাউণ্টেন', 'ডক্টর ফস্টাস', 'দ্য কনফেসান্স অফ এ কনফিডেন্স', 'ট্রিকস্টার ফেলিক্স ক্রাল', 'লোটে ইন উইমার', 'জোসেফ এ্যাণ্ড হিজ ব্রাদার্স' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সালে ৮০ বছর বয়সে এই মহান সাহিত্যরথীর জীবনদীপ নিভে যায়।

মহামানব শঙ্করাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দেহের একটা ধর্ম আছে। দেহ ধারণ করিলে দেহের ধর্ম স্বীকার করিতে হয়, জ্ঞানলাভ হইলেও যতদিন দেহ থাকে ততদিন একটু লেশ অবিদ্যাও থাকে। তবে উহা জ্ঞানকে ব্যাহত করে না। জ্ঞানীকে বন্ধনে ফেলিতে পারে না, লেশ অবিদ্যা মুছিয়া গেলে দেহ থাকে না। দেহ না থাকিলে ধর্ম প্রচার চলে না। কারণ কার্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শঙ্কর আধিকারিক পুরুষ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম লাভ করিয়াছেন লেশ অবিদ্যার সামান্য প্রভাব আছে। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম নিয়াছেন। আভিজাত্য ও আছে। যাঁহার উপর গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হইতে হইবে। হয়ত তাঁহার কথা ও কার্যে আভিজাত্য কখন কখন ফুটিয়া উঠিত, তাঁহার মনের কোণে যে এই দুর্বলতা-টুকু মাঝে মাঝে উঁকি মারিত তাঁহার আরাধ্য দেবতা বিশ্বনাথ তাহাও সম্পূর্ণ-রূপে মুছিয়া দিতে চান। উহা দূর করিতে তিনি এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন।

●

একদিন সশিষ্য শঙ্কর মণি-কর্ণিকার ঘাটে গঙ্গায় স্নান করিয়া ফিরিবার পথে রাস্তায় দেখিতে পাইলেন একজন অতি ভীষণ এবং কদাকার চণ্ডাল তাঁহার পথ রোধ করিয়া আছে। কয়েকটা পাগলা কুকুরও সঙ্গে আছে। তাহাদের সর্বাঙ্গে ঘা, পচা দুর্গন্ধ, কাছে দাঁড়ান যায় না, চণ্ডাল পচা মরা ঘাটে। তাহার গায়ের বিশ্রী গন্ধে বমি আসে। পাছে চণ্ডালের স্পর্শে এবং গায়ের দুর্গন্ধে শঙ্করের দেহ অপবিত্র হয় এই ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া গেলেন এবং পথরোধকারী চণ্ডালকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। শঙ্করের কথা যেন চণ্ডালের কানেই গেল না। কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাগলের মত অট্ট অট্ট হাসিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।

বিকট হাসির মধ্যেও তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল সংস্কৃত ছন্দোময় শ্লোক বাহির হইতে লাগিল। শ্লোকগুলি গভীর অর্থপূর্ণ। অদ্বৈত বেদান্তের গভীর তাৎপর্য উহাদের মধ্য দিয়া এমন সুন্দর-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

স্বামী তত্ত্বানন্দ

চণ্ডাল বলিলেন 'কে সরিয়া দাঁড়াইবে? দেহ কি আত্মা? যদি আত্মার কথা বল তবে বলি আত্মা নিষ্ক্রিয়, অখণ্ড, সর্বব্যাপী, আত্মা কোথায় সরিয়া দাঁড়াইবে? কেন সরিয়া যাইবে? কার হুকুমে যাইবে? কে সরিয়া দাঁড়াই-বার জন্য হুকুম দিতেছে? কাহাকে হুকুম দিতেছে? কেন হুকুম দিতেছে? এই দেহ স্পর্শে তোমার দেহ অপবিত্র হইবে মনে করিতেছ। পবিত্রতা কি? অপবিত্রতাই বা কি? উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? চন্দ্রের আলো গঙ্গা জলের উপর পড়ে আবার মদের পাত্রের উপরও পড়ে। উভয় আলোর পার্থক্য কোথায়? আলো আলোই। যদি দেহকে সরিয়া যাইতে বল তবে তার উত্তরে বলি—দেহ কি করিয়া সরিয়া যাইবে? দেহ যে জড়, শক্তিহীন। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যের নামে জড়ের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছ? তোমার কথা স্ববিরোধী। কথা ও কার্যে মিল নাই। ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের নামে তুমি লোককে ধাপ্পা দিতেছ? অথচ তুমি সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসের আদর্শ কি? সন্ন্যাসী হইয়া ভণ্ডামি করিতেছ? সন্ন্যাসী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হয় না? তুমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসের আদর্শ ত্যাগ—আভিজাত্য ত্যাগ, অহমিকার লোপসাধন—আশা করি এখন হইতে তুমি নিজ আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন থাকিবে। এই বলিয়া বিকট হাস্য করিতে করিতে নিমেষের মধ্যে চণ্ডাল কোথায় চলিয়া গেলেন বুঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলিও অদৃশ্য হইয়া গেল।

●

বিকট হাস্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ছন্দোময় শ্লোকের মাধ্যমে অদ্বৈত বেদান্তের সারমর্ম শুনিয়া শঙ্কর আশ্চর্যা-ন্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন 'কে এই ছদ্মবেশী অদ্ভুত চণ্ডাল? চণ্ডাল সাজিলেও ইনি সামান্য নন, মহাজ্ঞানী, এইরকম জ্ঞানোন্মাদ দেখা যায় না। অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখ হইতে একটা পর্দা সরিয়া গেল, অন্ধকার দূর হইল।

এতকালের ব্রাহ্মণের আভি-জাত্যের ভাব মন হইতে মুছিয়া গেল। জ্ঞানে উচ্চ নীচ ভেদ থাকে না। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ থাকে না। অজ্ঞানবশতঃই ভেদ আসে। অজ্ঞান দূর না হইলে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। চণ্ডালের তিরস্কারে শঙ্করের মনে লেশ অবিদ্যার রেখাটুকু মুছিয়া গেল। তিনি দেখিলেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। সৌম্যবদন, ত্রিনয়ন, বরফের ন্যায় শুভ্র উজ্জ্বল দেহ, হাতে ত্রিশূল। তাঁহার দিব্য আলোতে চারিদিক উদ্ভাসিত।

শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'বৎস, আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মধ্যে যে আভিজাত্য ছিল তাহা

দূর হইয়াছে। তুমি এখন সংস্কারমুক্ত। উচ্চ অদ্বৈত তত্ত্বে নিবিষ্ট থাকিয়া বেদান্তের সার তত্ত্ব প্রচার কর। ইহাতে মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হইবে তুমি প্রস্থানত্রয়ের (গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত সূত্র) ভাষ্য রচনা কর, পুঙখানুপুঙখরূপে শাস্ত্রের গবেষণা দ্বারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়া মানবত্বের জন্য নিয়োগ কর, জীবন ধন্য হইবে। বেদের প্রকৃত মর্ম সকলের মনে রেখাপাত করুক, আকাশ বাতাস বেদধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠুক। সমাজের সকল স্তরে এই জ্ঞান ছড়াইয়া দাও, ধর্মের রুদ্ধগতিকে পুনরায় প্রবাহিত কর। বেদান্তের পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ যাহা প্রচার করিয়াছেন, কালপ্রভাবে লোকে তাহার মর্ম ভুলিয়া গিয়াছে। তুমি ইহার প্রকৃত মর্ম উদ্ধার কর, আমি সর্বান্তকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি। তুমি কৃতকার্য হইবে।'

বিশ্বনাথের প্রেরণায় হিমালয়ের নির্জন প্রদেশে গিয়া শঙ্কর তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্বকে রূপ দেওয়ার কার্য আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। নরনারায়ণ-ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ বদ্রীনাথই এই জন্য উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিলেন। ওখানকার আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং অন্যান্য পরিবেশ সবই শাস্ত্রচর্চা, ধ্যান, ধারণা, তপস্যার পক্ষে অনুকূল। তখনকার দিনে যান-বাহনাদির ব্যবস্থা আধুনিক যুগের মত উন্নত ছিল না। অজ্ঞানের খপ্পরে হাবুডুবু খাইতেছিল। তড়িৎ শক্তি, বাষ্পীয় যান, ট্রেন, এরোপ্লেন কিছুই হয় নাই। সুতরাং পদব্রজেই তীর্থযাত্রা করিতে হইত।

এখন আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় যাত্রা সহজ হইয়াছে তবে তীর্থের তীর্থত্ব লোপ পাইয়াছে, সুতরাং শঙ্করকে পদব্রজে যাইতে হইল। শাস্ত্রাদি গ্রন্থ নিয়া তিনি সশিষ্য রওনা হইলেন। পথে অনেক জায়গায় তাহাকে থামিতে হইয়াছে। এক জায়গায় দেখিলেন স্থানীয় নিরক্ষর লোকদের মধ্যে নরমেধ যজ্ঞের প্রথা প্রচলিত আছে। এই ভীষণ কুপ্রথার ফলাফল লোকদের সম্যক বুঝাইয়া তিনি নরবলি প্রথা দূর করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

পুণ্যতীর্থ হৃষীকেশে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, আক্রমণকারী অসভ্য মূর্তিভঙ্গকারীদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া ভয়গ্রস্ত পুরোহিত মন্দিরের নারায়ণ-মূর্তিকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পরে অত্যাচারীর দল চলিয়া গেলেও গঙ্গাগর্ভ হইতে ঐ মূর্তি উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

শঙ্কর ধ্যানবলে জানিতে পারিয়া গঙ্গাগর্ভ হইতে উহা উদ্ধার করিয়া শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া অসমাপ্ত কাজ শেষ করিলেন। পুরোহিতগণ পুনরায় বিগ্রহসেবার অধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। হৃষীকেশ হইতে শঙ্কর সশিষ্য ব্যাসতীর্থে গেলেন, অলকানন্দা এবং কেশবগঙ্গার সঙ্গমস্থলে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত।

এই স্থানে একটি বড় সুন্দর গুহা আছে। ধ্যান-ভজন, শাস্ত্রচর্চার পক্ষে অনুকূল স্থান। সূত্রকার ব্যাসদেব এখানে বহুকাল তপস্যা করিয়াছেন। এই সুন্দর আধ্যাত্মিক পরিবেশে থাকিয়া শঙ্কর ব্যাসভাষ্য রচনা করিলেন এবং ধ্যান-ধারণায় রত থাকিয়া তীর্থের তীর্থত্ব পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহার পর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বদ্রীনাথধামে আসিলেন।

ভারতে যে চারিটি প্রসিদ্ধ ধাম আছে ইহা তাহাদের অন্যতম, ইহা নর-নারায়ণক্ষেত্র, নারায়ণ এই ধামের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকে। কয়েকমাস মন্দির বন্ধ থাকে তখন প্রায় বিশ মাইল নীচে আদি-বদরী (যোশীমঠ) হইতে নারায়ণের উদ্দেশ্য পূজা হয়। যাত্রার সময় অগণিত ভক্ত আসেন।

বদ্রীনাথে জানিতে পারিলেন যে অসভ্য মূর্তিভঙ্গকারীদের অত্যাচারের ভয়ে মন্দিরের পুরোহিতগণ তীর্থের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য নারায়ণের মূর্তি নদীর জলে বিসর্জন দিয়াছেন। আক্রমণকারীর দল চলিয়া গেলে বহু চেষ্টা করিয়াও বিসর্জনের স্থান ঠিক করিতে পারেন নাই, সেইজন্য বিগ্রহের পুনরুদ্ধার তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

শঙ্কর ধ্যান বলে নির্দিষ্ট স্থান জানিতে পারিয়া জীবন বিপদাপন্ন করিয়া অলকানন্দ নদীর গর্ভ হইতে নারায়ণের মূর্তি উদ্ধার করিলেন এবং সম্যক্ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এই পুণ্য তীর্থে বাস করিয়া তিনি নিয়মিত গভীর ধ্যানে লিপ্ত থাকিতেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ভাষ্য রচনা করিলেন।

চার বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া নবীন সন্ন্যাসী প্রস্থানত্রয়ের (গীতা উপনিষদাদির) ভাষ্য রচনা শেষ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে আরও অনেক মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইল। ছোট, মাঝারি এবং বড় মিলিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থ মোট ১৫১ খানি। যুগ প্রবর্তনকারী এই গ্রন্থগুলি যে শুধু হিন্দু তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ তা নয়, এইগুলি বিশ্ব-সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার; সর্ব দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় চিন্তাধারাকে নূতন খাতে বহাইবার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার সামর্থ্য রাখে। শঙ্করের অবদান অপরিমেয়।

শঙ্কর সশিষ্য জ্যোতির্ধামে আসিলেন, যোশীমঠ এ-ধামের অন্তর্গত একটি রম্যস্থান, এখানকার পরিবেশ সব বিষয়ে অনুকূল। শঙ্করের বিদ্যাবুদ্ধি, ত্যাগ-তপস্যা, অমায়িক ব্যবহার, ব্যক্তিত্ব এবং আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া জ্যোতির্ধামের মহারাজা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ক্রমে বহু স্থানীয় লোক এবং প্রতিবেশী তাঁহার অনুরাগী হইল।

জ্যোতির্ধামের মহারাজার অনুরোধে

শঙ্কর নির্জন গুহার পরিবর্তে রাজধানীতে শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্র স্থানান্তরিত করিলেন। প্রচারকার্যে মহারাজা প্রধান সহায় হইলেন, রাজ-আনুকুল্যে ক্ষেত্র তাড়াতাড়ি প্রসার লাভ করিল, তখন ঐখানে বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিকের খুব প্রভাব ছিল। হিন্দু তথা বৈদিক ধর্মে তাহাদের তেমন আস্থা ছিল না। শঙ্করের প্রেরণায় মহারাজা কুসংস্কার দূর করিয়া সদাচার প্রবর্তন করিলেন, দেব-দেবীর পূজা প্রবর্তন করিয়া নাস্তিক্যবাদ দূর করিলেন।

এইভাবে বৈদিক ধর্ম প্রচারের ফলে বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিকদের প্রভাব কমিয়া গেল। অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তখনকার দিনে আধুনিক যুগের মত মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হয় নাই। তবুও রাজ-আনুকুল্যে বেদান্ত প্রচারের ক্ষেত্র প্রসারিত হইল। শঙ্করের ভাষ্যগুলির পাণ্ডুলিপি কপি করিয়া চারিদিকে বিদ্বৎ-সমাজে প্রেরিত হইল। বেদান্ত প্রচারের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য রাজা স্বয়ং শঙ্করের অনুগমন করিলেন। সশিষ্য কেদারনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন, পথে তুঙ্গনাথ, শোণিতপুর, গুপ্তকাশী, ত্রিযুগী নারায়ণ, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থাদি দর্শন করিলেন, পথে অনেক দেব-দেবীর মন্দির যাহা ছিল সব দর্শন করিলেন, ঐ শীত-প্রধান অঞ্চলে মাঝে মাঝে গরম জলের কুণ্ড পাওয়া যায়। ঐ জলে স্নান করিয়া এখনও তীর্থ-যাত্রীরা পথে আরাম উপভোগ করেন।

কেদারনাথ শেষ করিয়া তিনি গঙ্গোত্রী, গোমুখী দর্শন করেন। গোমুখী গঙ্গার উৎপত্তি স্থান, দুর্গম পথ, ফিরিবার পথে গঙ্গোত্রীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং পরে উত্তর কাশী আসিলেন। হিমালয়ের ক্রোড়ে গঙ্গাতীরে উত্তর কাশী অতি পবিত্র স্থান। পঞ্চ কাশীর কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, উত্তর কাশী তাহাদের অন্যতম, এখানে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মন্দির আছে। অনেক সাধু এখানে থাকিয়া ধ্যান-ধারণা-তপস্যা এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে রত থাকেন।

তপস্যার অনুকূল বলিয়া এখানে অনেক সাধু কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করেন। সাধুদের ভিক্ষা এবং সদাব্রতের ব্যবস্থাও আছে। বাবা কালী কম্বলীওয়ালার ছত্র এবং পাঞ্জাবী ছত্র সাধুদের ভিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। অনেক বিদ্বান এবং তপস্বী এখানে থাকিয়া ভগবৎ চিন্তায় জীবন কাটাইয়া দেন। উত্তর কাশীতে ঋষি এবং সূত্রকার ব্যাসদেবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়।

মহামানব শঙ্করাচার্য

শঙ্করের জীবন-বেদ আলোচনা করিলে বুঝা যায় কিরূপ প্রচার পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে হিন্দু তথা বৈদিক ধর্ম জনগণের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিবে তাহা তিনি জানিতেন এবং কাহার মধ্যে কি রকম শক্তি নিহিত তাহাও তাঁহার জানা ছিল। ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমত তিনি যোগশক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেন। তিনি মহামানব যোগী। আধ্যাত্মিকতা তাঁহার করায়ত্ত।

পূর্বে প্রথম শিষ্য সনন্দন সম্বন্ধে কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে, সনন্দন যেমন গুরুভক্তিপরায়ণ শঙ্করও সেরূপ শিষ্যের প্রতি স্নেহশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং হিতাকাঙ্ক্ষী।

একদিন গুরুর জন্য একটা ঔষধ সংগ্রহ করিবার জন্য শিষ্য অলকানন্দার সেতু পার হইয়া নদীর অপর পারে গিয়াছেন। দৈনন্দিন অধ্যাপনার সময় সনন্দন উপস্থিত থাকিতেন এবং গুরুর শাস্ত্রব্যাখ্যা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতেন।

ঔষধ সংগ্রহ করিয়া সনন্দন তখনও ফিরেন নাই। শঙ্কর তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অন্যান্য শিষ্য ধৈর্যহীন হইয়া সনন্দন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

মন্তব্য শুনিয়া শঙ্কর ভয়ানক গম্ভীর হইলেন। শিষ্যদের মধ্যে অহমিকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহাদের কল্যাণে উহা দূর করিবার জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন এবং অহঙ্কারী শিষ্যদের সমুচিত শিক্ষা দিলেন। তিনি অলৌকিক যোগবলে প্রিয় শিষ্য সনন্দনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিলেন, অলকানন্দার অপর পারে সনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সনন্দন, শীঘ্র এস, পাঠ আরম্ভ হইবে। অন্যেরা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।'

গুরুর ডাক কানে পৌঁছিবামাত্র সনন্দন অস্থির হইয়া উঠিলেন, ঔষধ সংগ্রহ সামান্যই হইয়াছে। আরও করিতে গেলে বিলম্ব হইবে। ঘুরিয়া সেতু পার হইতে গেলে সময়ে পৌঁছিতে পারিবেন না। অলকানন্দার ভীষণ স্রোত, নদীতে ঝাঁপ দিয়া সাঁতরাইয়া পার হইতে গেলে সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগিবে তবে মৃত্যু অনিবার্য। সনন্দনের অন্য চিন্তার সময় নাই। গুরু সবাই তাঁহার পক্ষে ভগবৎ সেবার তুল্য। প্রয়োজন হইলে গুরুসেবায় প্রাণদানও গৌরবের, অবিলম্বে গুরু সমীপে পৌঁছিবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে সনন্দন অলকানন্দার ভীষণ স্রোতের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

গুরুর পাদপদ্মই ভবনদী পার হইবার প্রধান তরী আর গুরুই

কাণ্ডারী। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই। সনন্দন নির্বিঘ্নে অলকানন্দা পার হইলেন। ভীষণা হইলেও অলকানন্দা গুরুভক্তের কেশস্পর্শ করিতে সাহস পাইল না। হয়ত ভয়ে তাহার বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল কিম্বা গুরুর যোগ-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া অলকানন্দা গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সনন্দনের দেহের ভার রক্ষা করিবার জন্য প্রতি পদক্ষেপে এক একটি পদ্ম তাঁহার সামনে তুলিয়া ধরিল।

এদিকে সনন্দনের মনে গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য চিন্তা নাই। সনন্দন বুঝিতে পারিলেন না কি করিয়া তিনি নদী পার হইলেন, তিনি অবলিম্বে শঙ্করের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

সনন্দন উপযুক্ত শিষ্য, তাঁহার অহেতুকী ভক্তি দেখিয়া আনন্দে গুরুর বুক ভরিয়া গেল। মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'বৎস, তোমার ভক্তি, জ্ঞান, যোগশক্তি অতুলনীয়। তোমার মহত্ত্ব অন্যের অনুকরণীয়, আজ হইতে তুমি পদ্মপাদ নামে পরিচিত হইবে।'

শিষ্যদের নিয়া শঙ্কর বেদান্তের অধ্যাপনায় লিপ্ত হইলেন, কয়েকদিন ধরিয়া একটা কঠিন প্রশ্নের আলোচনা চলিতেছিল। অন্যান্য শিষ্য উহার সমাধান করিতে পারেন নাই। শঙ্কর তখন পদ্মপাদকে উহার সমাধানে কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মপাদের মুখে সঠিক উত্তর শুনিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন, ইহাতে পদ্মপাদের যেমন গুরুভক্তির প্রকাশ পাইল, সেরূপ গুরু শক্তির গৌরবও বাড়িল। আধ্যাত্মিকতা থাকিলে নেতার প্রচারের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

উত্তরাখণ্ডে অনেক তীর্থ দর্শন করিয়া শঙ্কর এখন সশিষ্য উত্তর-কাশীতে বাস করিতেছেন। ভাষ্য প্রণয়ন শেষ হইয়াছে, গুরু গোবিন্দ-পাদ এবং বিশ্বনাথের আদেশ পালন করিয়াছেন। এত অল্পসময়ে অধ্যাপনার সঙ্গে ভাষ্যাদি রচনা দুঃসহ ব্যাপার। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা মিলে না। মহামানব না হইলে ইহা কখনও সম্ভব হয় না। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ষোল। জ্যোতিষীর গণনা অনুযায়ী আট বৎসরের মৃত্যুযোগ দৈবকৃপায় কাটিয়া গেলে আবার ষোল বৎসরে আসিবে। এই সময়ে শঙ্করের মনে ভীষণ পরিবর্তন দেখা দিল, শাস্ত্রালোচনা, অধ্যাপনা, নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার মন নাই, সদা অন্তর্মুখীন। শরীরের দিকে দৃষ্টি নাই। হয়ত প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। মন নিরন্তর আত্মা তথা নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে ডুবিয়া থাকিয়া মহাসমাধিতে বিলীন হইতে চায়।

গুরুর নিরন্তর অন্তর্মুখীন ভাব লক্ষ্য করিয়া শিষ্যগণ অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এমন সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া তাঁহার জীবন-নাট্যে একটা নূতন অধ্যায় যোজনা করিল।

একদিন জনৈক বৃদ্ধ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বার্ধক্যের জন্য তাঁহার রং কতকটা কালো হইয়াছে। চামড়া ঢিলা, মাথায় জটা। বাহিরের দৃষ্টিতে অতি সাদাসিধে লোক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তিনি ছাইচাপা আগুন, তিনি আর কেহ নন—স্বয়ং সূত্রকার ব্যাসদেব। ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, ভাগবৎ, অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণাদির গ্রন্থকর্তা তিনি নিজ-পরিচয় গোপন রাখিয়া ছদ্মবেশে শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, উদ্দেশ্য শঙ্করের ভক্তি এবং জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিবেন। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে কোন কোন স্থানে শঙ্করের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। তিনি ঐ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে এখন শঙ্করের সর্বদা অন্তর্মুখীন ভাব। নূতনভাবে তর্ক-যুদ্ধে নামিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। যদি না করেন তবে অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ভাষ্যকার হিসাবে তাঁহাকে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

উভয়ের মধ্যে আলোচনা কয়েক-দিন ধরিয়া চলিল। তর্ক চরমে উঠিল। কেহ কম নন। একপক্ষে ষোল বৎসরের যুবক শঙ্কর অন্যপক্ষে জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ স্বয়ং ব্যাসদেব। শঙ্কর কিছুতেই নতি স্বীকার করেন না, নিজের চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শ্রুতি, স্মৃতি এবং অন্যান্য শাস্ত্র ও যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত্র করিতে বদ্ধপরিকর।

বৃদ্ধও ছাড়িবার পাত্র নন। বেদ-বেদান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ, স্বয়ং সরস্বতী যেন তাঁহার জিহ্বায় বসিয়া আছেন। অনর্গল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃতি করিয়া এবং সূক্ষ্ম বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও যুবকের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা অতিশয় কঠিন।

শঙ্কর অসাধারণ, উভয়ের যুক্তিই প্রবল, জয়-পরাজয় নির্ধারণ অতিশয় কঠিন হইল। বৃদ্ধের আলোচনায় জ্ঞানের গভীরতা, অকাট্য যুক্তি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা দেখিয়া শঙ্করের জনৈক শিষ্যের মনে দৃঢ় ধারণা হল যে, নবাগত বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ব্যাসদেব হইবেন। কারণ তত্ত্ব নির্ণয়ে ব্যাসদেব ব্যতীত অন্য কেহ শঙ্করের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। হয়ত শঙ্করের মনেও অনুরূপ ধারণা জাগিল।

ইহার পর নিজ পরিচয় প্রকাশ করি-বার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলে বৃদ্ধ সত্য পরিচয় দিলেন। শঙ্করের জ্ঞান-ভক্তির এবং আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাইয়া ব্যাসদেব তাঁহাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিলেন এবং একটি বর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শঙ্কর সমাধিযোগে শরীর ত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলে ব্যাসদেব সস্নেহে বলি-লেন, 'বৎস, তাহা হইবার নয়, ভগবৎ ইচ্ছা অন্যরূপ, আমি জানি তুমি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে জন্ম পরিগ্রহ

করিয়াছ, সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য স্থাপন করাই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য, যতদিন উহা শেষ না হইবে ততদিন তোমাকে জগতে থাকিতে হইবে। তোমার রচিত ভাষ্যের মাধ্যমে পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে কিন্তু এখনও অনেক বাকী। এই উদার মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইতে তোমাকে বহু শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। আমি জানি ষোল বৎসরে তোমার মৃত্যুযোগ আছে। আমার আশীর্বাদে তোমার পরমায়ু আরও ষোল বৎসর বৃদ্ধি পাইবে। এই সময়ের মধ্যে তোমাকে অবশিষ্ট কাজ শেষ করিতে হইবে।'

আশীর্বাদ করিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন। জ্যোতিষীর গণনা সত্য হইল। শঙ্করের মৃত্যুযোগ কাটিয়া গেল। আচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য শঙ্করের জীবন-নাট্যে একটা নূতন অধ্যায় যোজনা করা হইল।

ব্যাসদেবের অনুমতি এবং আশীর্বাদ লইয়া শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্তের উজ্জ্বল পতাকা উড়াইবার অভিযানে বাহির হইয়া উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে দ্বারকা, পূর্বে আসামের পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত সমস্ত ভারত সশিষ্য পরিক্রমা করিলেন।

এলাহাবাদের অন্তর্গত প্রয়াগ ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ। ত্রিবেণী সঙ্গম পুরাণাদিতে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, এখানে গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী (গুপ্ত) তিনটি নদীর ধারা মিলিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এখানে মাঘ মাসে মেলা বসে, বহু ভক্ত পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। ছয় বৎসর অন্তর অর্ধ কুম্ভ হয় এবং বার বৎসর পর পূর্ণ কুম্ভ হয়। অগণিত সাধু-সন্ন্যাসী, উদাসী, বৈরাগী, (অর্ধ), নাগা, বানপ্রস্থী, গৃহস্থ ভক্ত বিশেষ বিশেষ দিনে সঙ্গমে স্নান করিয়া ধন্য হন। হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিকেও দ্বাদশ বৎসর অন্তর পূর্ণ কুম্ভ হয় কিন্তু এলাহাবাদের কুম্ভ সবচেয়ে বড়। স্নানের সময় সাধুদের শোভাযাত্রা দর্শনীয়। প্রয়াগ শিক্ষা-সংস্কৃতিরও বিশাল ক্ষেত্র, কুমারিল ভট্ট প্রয়াগের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং কর্মকাণ্ডে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সুবিদিত। মীমাংসা শাস্ত্রের অদ্বিতীয় মনীষী, তাঁহার সমকক্ষ সারা ভারতে কেহ নাই। কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার ব্রত। নিজ জীবনের বিনিময়ে তিনি এই কঠিন ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের প্রভাব খুব বেশী, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যে, বৌদ্ধ এবং জৈন প্রচারকগণ অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁহাদের প্রভাবে বৈদিক ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। হিন্দু তথা বৈদিক ধর্মের দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া কুমারিল ভট্ট উহা পুনঃ-সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী অবৈদিক জৈন এবং বৌদ্ধদের পরাভূত করিতে না পারিলে প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হয় না। আর বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করিলে তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া যায় না।

আবার বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন না করিলে বৌদ্ধ শাস্ত্রের রহস্য জানা যায় না, বৌদ্ধরা অন্যান্য ধর্মীদের নিকট নিজেদের শাস্ত্ররহস্য উদ্‌ঘাটন করেন না। কুমারিল ভট্টের বড় ভাই ধর্মকীর্তি পূর্বেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার মানসে কুমারিল ভট্ট স্বীয় অভিপ্রায় গোপন রাখিয়া অধ্যাপক ধর্মকীর্তির নিকট পাঠ নিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অল্প সময়ের মধ্যে সম্যক্ আয়ত্ত করিলেন। পরে নিজ গুরুর সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন।

ধর্মকীর্তি শিষ্যের নিকট পরাস্ত হইয়া দারুণ মর্মাহত হইলেন। পরাজয়ের গ্লানি এড়াইবার জন্য তুষানলে প্রবেশ করিয়া ধরাধাম হইতে চিরতরে বিদায় নিলেন, ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ লোপ পাইবার উপক্রম হইল এবং বৈদিক ধর্ম পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইল। এই হিসাবে কুমারিল ভট্ট শঙ্করের অগ্রগামী দূত বলিলে চলে। গুরুকে পরাস্ত করিয়া কুমারিলের মনে ভীষণ ধিক্কার জন্মিল। গুরুদ্রোহিতার পাপ তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনিও গুরুর ন্যায় তুষানলে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তুষানলে ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় যুবক শঙ্কর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শাস্ত্রদ্বন্দ্বে আহ্বান জানাইলেন।

শঙ্কর কুমারিল ভট্টের মতবাদ সমর্থন করেন না। তাঁহার অভিমত মুক্তিই বেদের প্রতিপাদ্য, কর্মময়, কর্ম মুক্তি আনিতে পারে না। জ্ঞানেই মুক্তি হয় এবং মুক্তিই জীবনের লক্ষ্য। কর্মকাণ্ডের যুক্তি খণ্ডনযোগ্য।

কুমারিল ভট্ট যুবক শঙ্করের প্রতিভা স্বীকার করিলেন। তাঁহার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতিভার সম্মান দিলেন তবে পরোক্ষভাবে। সাক্ষাৎভাবে দেওয়ার অবসর নাই। তুষানলের আগুন প্রজ্বলিত হইয়াছে, অবিলম্বে উহাতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গুরুদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তিনি শঙ্করকে বলিলেন যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য মণ্ডন মিশ্র মীমাংসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কর্ম-কাণ্ডের গৌরব রক্ষা করিতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলে তাহা তাঁহারই (কুমারিলের) পরাজয় বলিয়া ধরা হইবে।

মণ্ডনের মত শিষ্যের পরাজয়ে গুরুরই পরাজয়। তিনি যুবক শঙ্করকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং শঙ্কর যাহাতে হিন্দু তথা বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের ও ধর্মের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিতে

পারেন তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি তুষানলে প্রবেশ করিয়া আত্মাহুতি দ্বারা ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন।

বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ কুমারিল ভট্টের আশীর্বাদ নিয়া শঙ্কর মাহিষ্মতী নগরে আসিলেন, নর্মদার নিকটবর্তী এই ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানে শিক্ষার প্রভাব খুব বেশী, কাহারও কাহারও মতে বর্তমান রাজগৃহ ঐ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মণ্ডনের বাড়ীর নিকট আসিয়া পিঞ্জরস্থ শুক পাখীর 'বেদ স্বতঃ প্রমাণ, কি পরতঃ প্রমাণ,' 'পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়', 'কর্মই ফলদাতা কি ঈশ্বর ফলদাতা' ইত্যাদি বুলি শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

যাহার আঙ্গিনায় শুকপাখী পর্যন্ত বেদের বুলি আওড়ায় সে স্থানের পরিবেশ কত উচ্চ তাহা কল্পনাতীত। ঐ সময়ে মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, যে মণ্ডপে ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শ্রাদ্ধকার্যে রত ছিলেন সেখানকার প্রবেশ পথ মণ্ডনের শিষ্যগণ সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন যাহাতে কোন সন্ন্যাসী প্রবেশ না করিতে পারেন।

শ্রাদ্ধবাসরে সন্ন্যাসীর উপস্থিতি অশুভ, সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়, ইহাই কর্মের বিধি। মণ্ডনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য শঙ্কর বার বার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা বৃথাই গেল। শঙ্কর অনন্যোপায় হইয়া যোগশক্তির প্রভাবে ভিতরে মণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি গুরু গোবিন্দপাদের শিষ্য, গৌরপাদের প্রশিষ্য। তিনি মণ্ডনের গুরু কুমারিল ভট্টের নিকট শাস্ত্রযুদ্ধের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তুষানলে প্রবেশের পূর্বে তিনি শঙ্করকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার শিষ্য মণ্ডনের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন বলিয়া তিনি (মণ্ডন) শঙ্করের উপর রুষ্ট হইলেন কিন্তু গুরু কুমারিল ভট্টের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন। মণ্ডনের মত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করা পরাজয় স্বীকারের সামিল। তিনি সর্তসাপেক্ষে শঙ্করের অভিপ্রায় পূর্ণ করিলেন। শাস্ত্র বিচারের আহ্বানে সারা দিলেন।

সর্ত স্থির হইল উভয়পক্ষের দ্বন্দ্বে হারজিত নির্ণয় করিবার জন্য নিরপেক্ষ বিচারক থাকিবে। শঙ্করের হার হইলে তিনি দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া বসন পরিত্যাগ করিবেন, সন্ন্যাস ধর্ম বিসর্জন দিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবেন এবং মণ্ডন হারিলে তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া ধারণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিবেন। শঙ্কর ভগবানে বিশ্বাসী, স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন। ভগবান তাঁহার প্রতি অনুকূল হইবেন এ বিশ্বাসও রাখেন। পূর্বে কুমারিল ভট্ট শঙ্করের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মণ্ডন-পত্নী উভয় ভারতীকে শাস্ত্রদ্বন্দ্বে বিচারকের আসনে বসাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন কারণ উভয়-ভারতীর সরল জীবন যাপন, পবিত্রতা, শাস্ত্রজ্ঞানে গভীরতা এবং নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। শঙ্কর নিজেই মণ্ডন মিশ্রের নিকট উভয়ভারতীর নাম প্রস্তাব করিলেন। নিজ পত্নীর যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার গুরু কুমারিল ভট্ট এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শঙ্করের ন্যায় মণ্ডনও নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি শঙ্করের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

দুই ধুরন্ধরের মধ্যে শাস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিষয় স্বর্গ ও মুক্তি, কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ। মণ্ডন বৈদিক কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যদিকে শঙ্কর স্বর্গের চেয়ে মুক্তি কর্মের চেয়ে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইলেন। উভয়েই বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী। কেহ কম নন। একজন অল্পবয়স্ক যুবক, অপরজন প্রাচীন, জ্ঞানে বিচারে বয়সের প্রশ্ন গৌণ, মুখ্য নয়। জ্ঞান বয়সের অপেক্ষা রাখে না। নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উভয়েই শাস্ত্র ও যুক্তির অবতারণা করিলেন। উভয়ের প্রতিভা সমবেত বিদ্বৎমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিল। এই দ্বন্দ্বে বিচারক উভয়ভারতীর মানসিক অবস্থা ভাবিবার বিষয়—তাঁহার উভয় সঙ্কট। একদিকে পরমগুরু স্বামী, অপর দিকে ত্যাগের মূর্ত প্রতীক শঙ্কর। স্বামীর প্রতি পক্ষপাত দেখাইলে সত্য ও ত্যাগের মর্যাদা হীন হইয়া যায়। অপর দিকে সত্য ও ত্যাগের মূল্য দিতে গেলে আপন সর্বনাশকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয়। অথচ বিচারক হিসাবে তাঁহাকে নিরপেক্ষ এবং সত্যে অবিচলিত থাকিতে হইবে। নিরপেক্ষতা রক্ষা এবং সত্যে অবিচলিত থাকাই বিচারকের ধর্ম। উভয়ভারতী যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, নিরপেক্ষ বিচারক, তেমন বুদ্ধিমতী। হার জিৎ নির্ধারণ করিবার জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর গলায় দুইটা ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন এবং জানাইয়া দিলেন বিচারান্তে যাঁহার গলার মালা তাজা থাকিবে তিনি জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এবং যাঁহার গলার মালা শুকাইয়া যাইবে তিনি পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে।

বিচারকের নিরপক্ষভাবে সত্যানুরাগ এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। এমন সতীসাধ্বী এবং জ্ঞানী না হইলে কি মণ্ডনের সহধর্মিণী হওয়া যায়? তিনি দেবীস্বরূপা এবং সরস্বতীর অংশরূপিণী।

উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বিচার চলিতে লাগিল। ক্রমাগত আঠার দিন বিচারের পর দেখা গেল ফুলের মালাই হার-জিতের সমস্যা সমাধান করিয়াছে। মণ্ডনের গলার ফুলের মালা শুকাইয়া গিয়াছে, তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছে। অন্যপক্ষে যুবক শঙ্করের গলায় তাজা ফুলমালা তাঁহার জয় ঘোষণা করিয়াছে। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইল। কর্মের গৌরব ম্লান হইয়া গেল। যুবক সন্ন্যাসী শঙ্করের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মণ্ডনের পরাজয়ে বৈদিক ধর্মের অদ্বৈত তত্ত্ব প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় দূর হইল। এখন শাস্ত্র যুদ্ধের সর্ত অনুযায়ী মণ্ডন মিশ্রকে কর্মকাণ্ডের সংস্রব ছাড়িতে হইবে। বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি সাধ্বী স্ত্রী—সব ত্যাগ করিয়া শঙ্করের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া ধারণ করিতে হইবে। মণ্ডনের মত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে সন্ন্যাসী শিষ্য হিসাবে পাওয়া আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু নূতন বিপদ দেখা দিতে কতক্ষণ। মণ্ডনপত্নী উভয়-ভারতী তরুণ সন্ন্যাসী শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মাননীয় সন্ন্যাসী! বিচারের সর্ত অনুযায়ী আপনি আমার পরম গুরু এবং স্বামীকে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতে পারেন না। তাঁহার পরাজয় হইয়াছে সত্য কিন্তু উহা আংশিক পরাজয় মাত্র। পূর্ণ নয়, আমি তাঁহার অর্ধাঙ্গিনী। আপনি আমাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারেন নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আমাকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার জয় এবং আমার স্বামীর পরাজয় আংশিক পূর্ণ নয়, সুতরাং বিচারের সর্ত অমীমাংসিত রহিয়া গেল, অমীমাংসিত বিষয়ের সর্ত পালনযোগ্য নয়। আমি আপনাকে শাস্ত্রবিচারে আহ্বান জানাই-তেছি। আশা করি আপনি আমার আহ্বান গ্রহণ করিয়া সর্ত পূর্ণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে উভয়ভারতী যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, তেমন বুদ্ধিমতী, তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তিনি বিচারের বিষয় যাহা স্থির করিলেন তাহা অদ্ভুত। তিনি ইচ্ছা করিয়াই এরূপ কামশাস্ত্র বিচারের বিষয় স্থির করিলেন।

ইহা শঙ্করের পক্ষে মৃত্যুশেল। শাস্ত্রে কত সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে, তাহা না লইয়া সামান্য জিনিসমাত্র বিচারের বিষয় হইল। শঙ্কর আকুমার ব্রহ্মচারী। গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেন নাই। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে কামশাস্ত্র আলোচনা করা ভয়ানক ব্যাপার। বিচারের বিষয় পরিবর্তন করিবার জন্য তিনি বারবার উভয় ভারতীকে অনু-রোধ করিলেন কিন্তু মণ্ডনপত্নী সংকল্পে অটুট। কিছুতেই স্বীয় অভিমত পরি-বর্তন করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'মাননীয় সন্ন্যাসী, আপনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রে বিশারদ বলিয়া সুবিদিত! কামশাস্ত্র সর্বশাস্ত্রের অন্তর্গত। তার উপর আপনি ব্রহ্মজ্ঞ। এই বিষয় আলো-চনা করিতে আপনি এত সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? সর্ত অনুযায়ী আমার পরমগুরু ও স্বামী আপনার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্বে আমি আপ-নার জ্ঞানের গভীরতা, আধ্যাত্মিক এবং যোগশক্তির সীমা কতদূর পরীক্ষা করিতে চাই। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ভয় থাকে না। আপনি যে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এই পরীক্ষার মাধ্যমে তাহা প্রমাণ করুন।

●

শঙ্কর এখন ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। ন্যায় হউক অন্যায় হউক তাঁহাকে এই আহ্বান গ্রহণ করিতে হইল। তবে প্রস্তুতির জন্য এক মাস সময় চাহিলেন। কামশাস্ত্রের জ্ঞান তিনি পুঁথি পড়িয়া আয়ত্ত করিতে পারেন কিন্তু সে জ্ঞান ভাসা-ভাসা, গভীর নয়। বাস্তব জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে সন্ন্যাসী-শরীরে অর্জন করা সম্ভব নয়। গভীর জ্ঞান অর্জন না করিয়া উভয়-ভারতীর মত বিদষীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া মূর্খতার পরিচায়ক। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় যোগবলে কোন মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্র আয়ত্ত করা। তিনি সমস্যা সমাধানের সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। ভগবৎ কৃপায় অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ আসিয়া গেল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজা অমরক প্রাণত্যাগ করিয়া-ছেন। তাঁহার দেহ সংকার করিবার জন্য শ্মশানে আনা হইয়াছে। চন্দন-কাষ্ঠের দ্বারা চিতা সাজান হইয়াছে. শবের উপর গব্যঘৃত, গুগ্গুল এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র অগ্নিসংযোগ করা হইবে এমন সময় শঙ্কর যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া মৃতরাজা অমরকের শরীরে প্রবেশ করিলেন। পূর্বেই তিনি শিষ্যদের বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ যেন গোপন স্থানে রক্ষা করা হয় এবং উহাতে যেন অগ্নিসংযোগ করা না হয়। অগ্নি-সংযোগের ফলে দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে তাঁহার পক্ষে পুনরায় যোগবলে পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে না। শঙ্কর মৃতদেহে প্রবেশ করিবার পর মৃত রাজা অমরকের অবস্থা পরিবর্তন হইল, দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল, চেতনা ফিরিয়া আসিল। চিতা ঠেলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। হতাশা আনন্দে পরিণত হইল। আবার মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া রাজা অমরককে প্রাসাদে আনা হইল। রাণী, মন্ত্রী, অমাত্য, প্রজাবর্গ সকলে সুখী। আনন্দের হাট বসিল।

প্রাসাদে ফিরিবার পর দেখা গেল রাজার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেহত্যাগের পূর্বে রাজা অমরক এবং দেহে প্রাণসঞ্চারের পরে শ্মশান ফেরৎ রাজা অমরকের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। পূর্বের কটবাদ্ধ কোথায় হাওয়ায় মিলিয়া গিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তি খুব প্রখর হইয়াছে। রাজ্য পরিচালনায় শক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার দেব-দেবীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অসামান্য প্রতিভা এবং অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছে। এরূপ কি করিয়া সম্ভব হয় তাঁহারা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

রাজা অমরকের মধ্যে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এবং অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া রাজমহিষী এবং মন্ত্রি-বর্গের মনে সন্দেহ জাগিল। হয়ত কোন

সন্ন্যাসী কিম্বা যোগীর আত্মা রাজার শরীরে প্রবেশ করাতে এরূপ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। যেমন করিয়াই হউক না কেন সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও রাজা অমরকের (নূতন) দেহ রক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাকে দেহত্যাগ করিয়া যাইবার সুযোগ দেওয়া হইবে না। যাঁহার আত্মা স্বীয়দেহ পরিত্যাগ করিয়া রাজার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ অবশ্যই কোন না-কোন গুপ্তস্থানে রক্ষিত আছে। উহা রক্ষা করিতে দেওয়া হইবে না। অগ্নিতে সৎকার করিতে হইবে। নইলে তাঁহার আত্মা রাজা অমরকের দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয়দেহে প্রবেশ করিবে। তখন আবার রাজাকে হারাইতে হইবে। সুতরাং রাজ্যে যেখানে যত মৃত শরীর ধনী, নির্ধন, যোগী, সন্ন্যাসী যাহারই হউক না কেন প্রকাশ্য কিম্বা গুপ্তস্থানে রক্ষিত আছে সবই অগ্নিতে পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে তবে বিপদ কাটিয়া যাইবে। দূরদর্শী মন্ত্রী তাহাই আদেশ দিলেন। মৃতদেহ সন্ধানের জন্য চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। সতর্ক পাহারা দিয়া শিষ্যগণ গুরুর পরিত্যক্ত দেহ কোন পর্বতে একটি গুহার অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষা করিতেছিলেন। সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া রাজার গুপ্তচর তাহা বাহির করিয়া অগ্নিতে সৎকার করিবার জন্য উদ্যত হইলে শিষ্যগণ বিশেষ চিন্তিত হইলেন। বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া তিন দিন সময় চাহিলেন। ইতিমধ্যে শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদ বাউলের ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে রাজা অমরকের সভায় উপস্থিত হইয়া গানের মাধ্যমে গুরুকে শীঘ্রই স্বীয় পরিত্যক্ত দেহে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। বিলম্ব হইলে তাঁহার দেহ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

মন্ত্রীর আদেশে উহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে।

ছদ্মবেশী শিষ্যের সতর্কবাণী ফল প্রসব করিল। ইতিমধ্যে শঙ্কর রাজপ্রাসাদে মৃতরাজা অমরকের দেহে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছেন এবং কামশাস্ত্র সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতীর যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছে। তিনি ঐ গ্রন্থ ছদ্মবেশী শিষ্যের হাতে দিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

এদিকে তিনদিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজপুরুষগণ শঙ্করের শিষ্যগণ হইতে বলপূর্বক তাঁহাদের গুরুর পরিত্যক্ত দেহ কাড়িয়া লইয়া তাহাতে মাত্র অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শঙ্কর যোগবলে রাজা অমরকের দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজ দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। শিষ্য পদ্মপাদ নারায়ণের স্তব করিলেন। অবিলম্বে অগ্নি নির্বাপিত হইল। শঙ্করের দেহ অক্ষত রহিল। রাজপুরুষগণ হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ।

কালরাত চার অক্টোবর

রাধামোহন মহান্ত

উনিশ-শ' আটষট্টি সাল
কালরাত চার অক্টোবর : জলপাইগুড়ি দোমোহিনী
গভীর নিদ্রায় অচেতন : সে এক ভীষণ ঘোর রাত......
স্পৃহণীয় অপূর্ণ জীবনে অনেকের প্রভাত এলো না!

এ মাটির স্বাদ-গন্ধভরা
অমৃতের নিত্য আকর্ষণ—ভরে গেলো আর্ত চীৎকারে :
'কে আছো কোথায় বন্ধু,—বাঁচাও বাঁচাও!'—প্রতিধ্বনি
রাক্ষসী তিস্তার—হিংস্রতার করাল কুটিল পরিহাস,
নিমেষে নিস্তব্ধ সব শেষ : শ্মশানের সলিল সমাধি!

এলোকেশী তিস্তার নর্তন
তারাভরা আকাশের নীচে—পরিব্যাপ্ত যোজন যোজন
তরল তমসা : মৃত্যু নাচে ফেনশীর্ষে আর্তি ভরে যায়..
শিশু-যুবা বধূ-বৃদ্ধা ধনী ও নির্ধন—সব একাকার—
মৃত্যু নামে পমপেয়ির পঙ্কলের স্তরে নিদারুণ!

লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষ :
আর্তের কান্নায় একসাথে স্বেচ্ছাসেবী কাঁদে ধ্বংসস্তূপে :
এখানে মানুষ আছে, আর পাশাপাশি পশুও অনেক!
কেউ খোঁজে আত্মীয়-স্বজন—জল্লাদেরা মৃতার শরীর...
অলংকার—জীবনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড়ো!

দিকে দিকে মানুষ শকুন—
মিলেমিশে স্বেচ্ছাসেবা করে : সরকারী হিসাব-নিকাশ,
কর-কতি, সভা ও বিক্ষোভ! ভারতের বিধাতা-পুরুষ
কেঁপে ওঠে করুণা প্রবাহ—চক্ষু-কূপে স্ফূর্ত মন্দাকিনী!

আর এক মীরাবাঈ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

এই আদর্শের ওপর দৃষ্টি রেখে অঞ্জনা-দেবী পতির সঙ্গে দুর্গম জীবন-পথ অতিক্রম করে চরমে পরম প্রেমস্বরূপ ভগবৎধনের অধিকারী হয়ে মানবজন্ম সার্থক করবেন বলে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহযাত্রীটি ছিলেন চলার পথের দারুণ বিঘ্নস্বরূপ। প্রতিপদেই তাঁর সঙ্গীটি সন্দেহ অবিশ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন। আপাতমধুর ভোগসুখ ছাড়া আর কিছুই সত্য নেই বলে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হওয়ায় তিনি অঞ্জনার প্রতি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নানারূপ অশোভন ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন।

শুনেছি স্বামিগৃহবাস কালে অঞ্জনাদেবীর নামে চিঠি এলে সে চিঠি অনেক সময়ই তিনি পেতেন না। ইচ্ছা করলে যে-কোনরূপেই হোক অঞ্জনাদেবী তাঁর সমস্ত সম্বাদ দাদা-মশাই শ্রীদয়ালবাবুকে জানাতে পারতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা অঞ্জনা সে চেষ্টা না করে তাঁর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে দুঃখের রজনী অতিবাহিত করে-ছিলেন এবং নিজ স্বামীকে সৎ ও সুন্দর জীবনের পথে নিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। অজস্র ভাল-বাসা ও প্রেমের দিব্য শতদলসম এই চিরমহিমময়ী নারীর প্রাণঢালা সমস্ত প্রীতিঅর্ঘ্যই ব্যর্থ হলো। এই সময় লোকপরম্পরা অঞ্জনার সমস্ত সম্বাদ জানতে পেরে শ্রীদয়ালবাবু অঞ্জ-নাকে নিজসান্নিধ্যে নিয়ে এলেন। অঞ্জনাদেবীর প্রকৃত সাধন-জীবন আরম্ভ হ'ল এই সময় হ'তেই। পূজা, ধ্যানজপ, স্তব পাঠাদি ও প্রাণের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই এই সময় হ'তে অঞ্জনার সমস্ত দিবারাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল।

শ্রীদয়ালবাবুর সংসারে মেয়েছেলে না থাকায় সমস্তই যেন কেমন এলো-মেলো ও অগোছাল অবস্থায় যাচ্ছিল। অঞ্জনা আসাতে তিনি সংসারের দিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন আশা করেছিলেন। অঞ্জনার ওপর গৃহকর্মের সমস্ত ভার অর্পণ করে তিনি একটু বিশ্রাম নেবেন ভাবলেন। অঞ্জনাদেবী কিছুদিন গৃহকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

করে সমস্ত কর্মেই যেন একটা ঔদা-সীন্য বা অবহেলার ভাব দেখাতে আরম্ভ করলেন। ইচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আর কাজকর্মে মন দিতে পারছিলেন না। ফলে দেখা গেল সংসারের খরচ-পত্তর অতিরিক্ত বেড়ে যাচ্ছে এবং নানাদিক থেকে বিশৃংখলার যেন অবধি ছিল না। যে সংসারে নারী আছে সে সংসারে সব দিক থেকেই একটা শৃংখলা ও পরিচ্ছন্নভাব থাকার কথা। তবে এখানে কেন এমন হবে? এতদিন না হয় সংসারে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। তাই চাকর পাচকরা যা করতো মন্দ হ'লেও অশোভনীয় বলে মনে হোতো না। কারণ গৃহিণীর অভাবের পর থেকে ওইটিই ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

শ্রীদয়ালবাবু ভাবতে লাগলেন, অঞ্জনা তবে কি সংসারের কিছুই দেখাশোন করে না? খাওয়া দাওয়া ও সখের পূজা-ধ্যান-জপ এবং বিলাসিতা ও শৌখীনতা ছাড়া যে মেয়েদের পক্ষে সংসার দেখা-টাও একটা মস্ত বড় প্রয়োজন এটাও কি অঞ্জনা আজ এখানে এসে ভূলে গেছে? ঝি-চাকর পাচকদের কিছু বলা বৃথা। অঞ্জনারই ত' সব দোষ। কেন, সে কি একটু দেখাশোনাও করতে পারে না? এই সব নানারকম চিন্তায় বিরক্ত হয়ে শ্রীদয়ালবাবু খুব খানিকটা শাসন করবেন বলে অঞ্জনাকে খুঁজতে বেরুলেন।

শ্রীদয়ালবাবুর মুখেই শুনেছি অঞ্জনার খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন, অঞ্জনা তাঁর ঠাকুরঘরে আছেন। তিনি গিয়ে দেখলেন অঞ্জনা নীরব-ভাবে ঠাকুরঘরের একটি পাশে বসে তাঁর নিজের কিষণজীর মূর্তিটি কাছে রেখে নিবিষ্টমনে ফুলের মালা গাঁথ-ছেন। দিব্য এক মধুর ভাব-প্রেরণায় বিহ্বল হয়ে অঞ্জনা একটির পর একটি পুষ্প ডালি থেকে নিচ্ছেন ও সূচের ভেতর দিয়ে সূতোয় গাঁথছেন। কোন-দিকে তাঁর মন নেই। তাঁর সবস্ব তখন যেন দিব্য এক কুসুমহারে পরিণত হবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। বৃদ্ধ শ্রীদয়াল-বাবু ঘরে ঢুকে নির্বাক নিষ্পন্দভাবে অঞ্জনারই নিকটে ভাস্করের প্রতিমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন। এত কথা, এত রাগ, এত বিরক্তি কোথায় উড়ে গেল সৌম্যমূর্তি ভাববিহ্বলা ছোট্ট এই মেয়েটির কাছে এসে। উপাসনানিরত দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে বিষয়ী ও মহাদোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার মথুরবাবুরও এই রকম হ'য়েছিল বলে শুনতে পাই।

অঞ্জনার মালাগাঁথা শেষ হ'তে কতক্ষণ লেগেছিল জানা নেই। কিন্তু যখন মালা গাঁথা শেষ হ'ল তখন লীলায়িত ভঙ্গিমায় সেই চারুবদনা নারী

তার প্রাণের দেবতা হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে সেটা পরিয়ে দেবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। প্রতিপদ-বিক্ষেপে অপরূপ ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠেছিল তাঁর তনুর সীমা, তাঁর প্রাণ-মন। প্রিয়তমের প্রেমের আহ্বান বুঝি এমনি করেই নারীর নারীত্বকে চির-মহিমান্বিত করে। সুন্দর, শোভন সৌন্দর্যের আবির্ভাবে নারী তখনই প্রকৃত সুন্দরী পদবাচ্য হন যখন শ্রীভগবান নারীকে একমাত্র তাঁরই করে নেন সকল রকমে।

ইহকালসর্বস্ব পুরুষের ভোগদৃষ্টি এখানে এসেই প্রথম প্রতিহত হয়। ভোগ বা কামনার দৃষ্টি ছাড়া আরও যে কিছু আছে, সেটা তার একেবারেই অজানা ছিল সেইটি সে প্রথম বুঝতে পারে এই রকম নারীর সান্নিধ্যে এসে। মস্তক তার আপনা হতেই কোন এক সময় লুটিয়ে পড়ে মহিমময়ী নারীর পদপ্রান্তে। চিরতৃষাতুর বুভুক্ষু হৃদয় তার সান্ত্বনা ও প্রেমের দিব্য পরশে স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, পূর্ণ হয়। দৈহিক ভোগস্পৃহা, কামনা, মলিনতা চিরতরে বিদূরিত হয়ে তখুনি পুরুষ দেবমানব পদবীতে আরোহণ করে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' জীবন উৎসর্গ করতে সমর্থ হয়।

বর্তমান জগতে এই রকম মহিমময়ী নারীর একান্ত অভাব-বশত আমরা ইহকালসর্বস্ব হয়ে কামনা ও ভোগসুখের পশ্চাতে ছুটে জানোয়ারবিশেষে পরিণত হতে বসেছি। দেবী-শক্তিই মানবমনকে পশুত্ব থেকে মুক্ত করে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ-সাগরের অফুরন্ত অনন্ত প্রেম-সলিলে অবগাহন করিয়ে চিরশাশ্বত চিরধন্য করে।

অঞ্জনাদেবী সেই মহাদেবীরই শ্রীপদ-নখের একটি দ্যুতি, একটি রশ্মি। অঞ্জনাদেবী সেই মহাদেবীরই শ্রীপদচ্যুত একটি দিব্য সৌরভে আমোদ করা চির সুষমাভরা প্রেম-কুসুম। অঞ্জনাদেবী সেই মহাদেবীরই আবাহন-গীতিতে ভরা চিরকল্যাণময়ী মঙ্গল-অর্ঘ্য। তাই লোকচক্ষুর অগোচরে বন্য কুসুমবৎ বনেই প্রস্ফুটিত হয়ে বনকে চিরশ্যামল করে—সৌরভে, সৌন্দর্যে আকুল করে অতি শীঘ্রই ঝরে পড়লো। রেখে গেল একটি করুণ কোমল মধুর আনন্দভরা আকুল-করা স্মৃতি—এই হিমালয়েরই পাষাণ-কারা ভেদকরা তানতরঙ্গিণী, নির্ঝর-নির্ঝরিণীর আবেশভরা স্নিগ্ধ বক্ষে, দিগন্তব্যাপী পর্বতমালার শ্বেত সুভ্র নীল কণ্ঠে, নীলিমা ঘেরা অনন্ত আকাশের গায় গায়, বনে, গহনে, সমীরণে, প্রকৃতির চিরশোভা সৌন্দর্যময় পরি-কল্পনায়। কত কুসুমই না লোক-নয়নের অন্তরালে এমনি করেই ঝরে পড়ে—অকালে শুকিয়ে যায়।

বৃদ্ধ শ্রীগোপালবাবুর সমস্ত রাগ একেবারে জল হয়ে গেল নাতনীর কাছে এসে। অবাক্ হয়ে তিনি অঞ্জনার কার্য-কলাপ দেখতে লাগলেন। যতক্ষণ পূজাগৃহে তিনি ছিলেন ততক্ষণ কি যেন এক অজানিত ভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহবিধুরা ব্রজ-গোপিকাদের কথা তাঁর মনে হোলো। মহাসাধিকা, মহারাণী মীরা-দেবীর সর্বস্ববিসর্জিত একমাত্র তোমাগত আত্মহারা ভাব এখানেই যেন তিনি প্রথম অনুভব করলেন।

মনে হলো তাঁর মীরার সেই গান
'মেরেত গিরিধর গোপাল,
দুসরা না কোই,
যাকে শীর ময়ূরমুকুট
মীরাপতি সোই।'

কতক্ষণ এমনিভাবে কেটেছিল সেটা কারুর হুঁস ছিল না, যখন আসন্ন সন্ধ্যারাগের গৈরিকধারায় প্লাবিত হয়ে জগৎ ধীরে ধীরে সমস্ত দিনের অবসাদ ও ক্লান্তি বৈরাগ্যের দীপ্তিতে ভরে তুলবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল দারুণ অন্ধকারের মাঝখান হতে, দিব্যোজ্জ্বল আলোকরাশিকে আনবার জন্য, তখন শ্রীদয়ালবাবু দেখলেন অঞ্জনার অপূর্ব ভাবান্তর-অবস্থা।

শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজবালাদের বিরহ-কাতর নয়নলোর মুক্তাবিন্দুর মত ঝরে পড়ে কত সিন্ধুর যে উদ্ভব হয়ে-ছিল তা কে জানে। এখানে নিত্য দেখা গেল অজস্র অশ্রুবারি বসনাঞ্চলকে সিক্ত করে ধারায় ধারায় ছুটে চলেছিল অভিষ্টের পদধৌত করার আশে।

শ্রীদিয়ালবাবুর মুখেই শুনেছি 'পাষাণ দেবতার উদ্দেশ্যে এমন অন্তর-সেচা আকুল ক্রন্দন সেই প্রথম তিনি শুনলেন। সে কি রোদন। বিরাম নেই, অন্ত নেই। এই কান্নার মাঝখান হতেই চল্‌ছিল অঞ্জনার নিপুণ হাতে সেবা, প্রিয়তমের পরিচর্যা। তার ছিল না কোন ঘটা, কোনই আড়ম্বর। বাহিরের বাঞ্ঝা ঘিরে ভক্ত-হৃদয়ে একটি নিরব উৎস তরঙ্গায়িত হয়ে স্নিগ্ধ প্লাবনে দেহ-মন-প্রাণকে চমকিত-ত্রস্ত করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণ সাগরের অপরিসীম আনন্দ-নীরে।

হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশের গোপন অন্তঃপুরটিতে যে প্রিয়তমের মণি-সিংহাসন রচিত হয় তা সেই জানে—যে তাঁকে দর্শন করে চির কৃতার্থ হয়েছে। অন্তর বাহির দেখেই ভক্ত-হৃদয় তাকে অনুভব করে, হৃদয়ে বাহিরে সেই একমাত্র প্রেমাস্পদের প্রকাশ দেখে, তাঁর আবির্ভাব দেখে। তাই ঠিক ঠিক ভক্তের প্রাণ, মন সকল রকমে তাঁকে পাবার জন্য, সকল রকমে তাঁর সেবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে ওঠে।

অনন্ত ভাবময় শ্রীভগবানকে বহুভাবে সকল রকমে পাবার জন্য একান্ত নীরবে কত না রোদন কত না বোধন, কত না পুষ্পমাল্য বিরচন, কত না আকুল আবেদন-নিবেদন, পূজা-স্তুতি, কত না ভক্তি-অর্ঘ্য স্তরে স্তরে ভারে ভারে স্তূপীকৃত হ'তে থাকে, কত না প্রীতি-গীতি রচন, কত না বিরহবেদন মর্মের অর্গল মোচন করে ভক্তের হৃদয় দিনে দিনে পলে পলে, যুগ যুগ ধরে তাঁর আবির্ভাব, তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করে তাঁকে জানে।

শবরী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আশা পথ চেয়ে কতদিন কাটায়

কত বৎসর কত যুগ কাটিয়েছিল। তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলো এই আশা-পথ নিরীক্ষণ করতেই ফুরিয়েছিল। তার বাল্যপ্রীতি, তার অনপম কিশোরী প্রেম, তার যৌবনের সকল আশা-আকাংখার তীব মধুর সোহাগ-আদর সেই আশা-পথেই শুকিয়ে গেল। তবুও সখা বন্ধু প্রিয়তম রামচন্দ্র তো কই এলেন না? নিত্যই শবরী সকাল হ'তে সন্ধ্যা অবধি তিনি আসবেন বলে ফল, ফুল, নৈবেদ্য নিয়ে কুসুম আসন রচনা করে সুদূর কোন দীর্ঘ পথের শেষে অপলক নয়নে চেয়ে থাকতেন। না জানি কত অনাহার ও বিনিদ্র রজনীই না শবরীর বিরামবিহীন অবস্থায় কেটেছিল। আলস্য, ক্লান্তি, অবসাদ—দূর ছাই—তিনি এলেন না বলে দারুণ একটা মন-বিক্ষেপ বা অভিমান তো কই তার তখন আসে নি, সে জন্য? কোন প্রভাতে, ছেলে বেলার ধুলো-খেলা ঘরের মাঝে এসে এক পাগলা ঋষি শবরীকে বলেছিল—'শবরী, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তোমাদের এই বনপথ দিয়ে যাবেন। সে সময় তিনি তোমার অতিথি হয়ে তোমার সেবা গ্রহণ করবেন। তুমি প্রস্তুত হও, প্রভুর পথের ধূলো মুছিয়ে দিয়ে তাঁর দীর্ঘ যাত্রা পথের শ্রান্তি, ক্লান্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করে তুমি ধন্য হও।'

শবরীও অসভ্যদের মেয়ে—বন্য, জংলী। তার কি মাথা ব্যথা হয়েছিল যে একটা উন্মাদ, ধাপ্পাবাজ্রে পাওয়া ঋষির কথা শুনে এমনি করে নীরস শুক্‌নোভাবে জীবন কাটানো? শবরী কি করবে বল? বাণী যে তার প্রভুর বাণী, ঋষি বহন করে এনেছিল বই ত' নয়। মানুষের সাধ্য কি যে শবরীকে পায়?

যাক্ শবরীর এমনি করে সব দিন গুলো যখন ফুরিয়ে সেই শেষের দিন যখন এল, তার সুন্দর সুঠাম দেহ যখন জরা এবং মরণের ব্যাকুল পরশে ক্রমশ শিথিল হতে আরম্ভ হলো, আর যখন বয় না, চলে না তখন, তখনই শবরীর চিরআরাধ্য দেবতা, প্রাণের প্রিয়, প্রিয়তম সখা, বন্ধু, শবরীর ঈশ্বর, ভগবান, প্রভু, শ্রীরামচন্দ্র সুদীর্ঘ বনপথ অতিক্রম করে তার দুয়ারে, তার জীর্ণ পর্ণকুটীর প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীদয়ালবাবু অনেকক্ষণ নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে প্রিয়তমা নাতনীর কার্যকলাপ দেখলেন। তার পর ধীরে ধীরে প্রেমাশ্রু নয়নে নিজের ঘরে ফিরে এসে চাকরদের ডেকে বলে দিলেন, 'তোমরা দেখে শুনে যা ভাল হয় ও ভাল বোঝ তাই করবে। অতিরিক্ত খরচপত্তর যাতে না হয়, সেটা তোমরা বাপ একটু দেখ। আর দেখ, যা দরকার হবে তোমরা আমাকে বলবে অঞ্জনাকে যেন বিরক্ত করো না। স্বামীর সংসারে অতিরিক্ত জ্বালা যন্ত্রণা পেয়ে একটু জুড়াবার জন্য এখানে এসেছে। যাতে ও ভাল থাকে ও শান্তিতে থাকে আমাদের দেখা উচিত। পজো পাঠ নিয়ে যখন অঞ্জনা ভুলে আছে তখন তাই থাকুক ওকে বাধা দেবার প্রয়োজন নেই।'

শ্রীদয়ালবাবুর অন্তঃকরণ খুব ধর্মপ্রবণ। অনেক রকম শাস্ত্রাদির আলোচনা ও সাধুসঙ্গ করার ফলে তাঁর হৃদয়ে ধর্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল। সাধনা করলে সাধকদের যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় সেটা তিনি কিছু কিছু অনুভব করতে পারতেন। নিজ দৌহিত্রীর মধ্যে সাধনার অলৌকিক সব গূঢ় লক্ষণ দেখে তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন—'যা দেখছি এ কি সত্য? না সংসারের দারুণ নিষ্পেষণে পড়ে বালিকার ধর্মভাবের সঙ্গে মস্তিষ্ক বিকৃতির ভাব দেখছি?'

এই সময় হতে তিনি অঞ্জনার ওপর খরতর দৃষ্টি রাখলেন এবং ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসারও ব্যবস্থা করলেন। অঞ্জনার জন্য এই সময় একজন ভদ্রঘরের পরিচারিকা নিযুক্ত করলেন। তিনি দিবারাত্র অঞ্জনার সঙ্গে থাকতেন। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত এই পরিচারিকাটি অঞ্জনার কাছে ছিলেন।

চিকিৎসকেরা ঠিক করলেন অঞ্জনার উন্মাদ রোগ হয়েছে। মেয়েদের ভেতরে অনেকেই বলাবলি করতে লাগল একটা ভৌতিক ব্যাপার চলছে, অঞ্জনাকে ভূতে পেয়েছে। যাই হোক বহু চিকিৎসার পরেও অঞ্জনার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ কিছুমাত্র প্রশমিত হলো না দেখে আত্মীয় স্বজন প্রমাদ গণলেন। অঞ্জনা কখনও কাঁদতেন, কখনও হাসতেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক এক এক কলি গান বিক্ষিপ্তভাবে গাইতেন।

রাত্রে নিদ্রা তাঁর খুব কমই হোত। কখন গভীর রাত্রে অঞ্জনা পরিচারিকাকে ডেকে বলতেন 'দিদি, তুমি আর ঘুমিও না। ওই শোন। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। এখুনি হয়তো আমার কাছে আসবেন। তুমি শীগ্‌গির করে আমায় সাজিয়ে দাও। আমি যে একমাত্র তাঁরই অনুগতা দাসী।'

নেপালী ভাষায় লেখা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাখানি প্রায় সর্বদাই অঞ্জনার সঙ্গে থাকত। প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন ও মহিলাবৃন্দ প্রায়ই অঞ্জনা পাগলীকে এসে সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন এবং অনেক সব মাদুলি ধরণের হিতোপদেশও দিতেন। কেউ কেউ বলতেন এই সময় স্বামীকে পেলে সব অসুখই ওর ভাল হয়ে যেত। সোমথ মেয়ে হাজার সুখে যত্নেই রাখ না কেন, স্বামীর আদর যত্ন ভালবাসা ও সান্নিধ্য না পেলে এমনিই হয়। এই রকম সব অনেক রকমেরই মিষ্টি মধুর কথা অঞ্জনাকে প্রায়ই শুনতে হোতো। কিন্তু শুনেছি অঞ্জনা নির্বাক নয়নে শুধু চেয়ে থাকতো। একটা কথাও নাকি তার কানে যেত না।

শ্রীদয়ালবাবুর মুখে এই সময়ের কথা শুনেছি। ভূতের ওঝারাও অনেকে অঞ্জনার চিকিৎসা করেছে বা ভূত তাড়াবার চেষ্টা করেছে। ওঝাদের ধারণা ছিল এটা ভৌতিক ব্যাপার। ওঝারা মন্ত্র পড়ে অঞ্জনাকে ভীষণভাবে প্রহারও করত। এক এক সময় অঞ্জনা অজ্ঞান হয়ে পড়তো। অজ্ঞান হবার পূর্ব পর্যন্ত কিষণজীর কথাই শোনা যেত। ওঝাদের এই নিপীড়ন বা অত্যাচার দেখতে না পেরে শ্রীদয়ালবাবু তাদের বের করে দিলেন। এর পর

কেবল ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারাই তিনি অঞ্জনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন।

এই সময় হতে অঞ্জনা ধ্যান জপের সুবিধা হবে বলে দুপুর বেলা লুকিয়ে শৈলশিখরপূর্ণ গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে বসতেন। এটা পাহাড়ী দেশ। বন জঙ্গলে সবটাই তার আচ্ছন্ন। কোন এক সময় অঞ্জনা সকলের চক্ষুকে প্রতারিত করে নিবিড় বন মাঝে লুকোতেন তা কেউই জানতে পারতো না। দাদামশাই বা এমন কি নিজের একটি ছোট ভাই যাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসতেন তাকেও বলতেন না। অঞ্জনার ভাই চারু ছিল অঞ্জনার খেলার সাথী, লীলার সহচর। চারুকে তিনি সব কথাই বলতেন। যদিও চারু দিদির সকল কথা বুঝতো না তবুও কিন্তু দিদি প্রাত্যহিক জীবনের সাধন কথা তাকে বলেই তৃপ্তি পেতেন।

একদিন অঞ্জনা দুপুর বেলা তাঁর সেই গোপন সাধন স্থানে বসে যখন ধ্যানমগ্না হয়েছিলেন তখন চারুর কেমন ইচ্ছা হলো আজ যেমন করে হোক দিদিকে খুঁজে বের করতে হবে। এবং সমস্তদিন আমাকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে কি করে তাও জানতে হবে।'

এই খেয়াল চারুর মাথায় আসে যখন তখন তার হাতে ছিল ছোট ক্যামেরা। চারুর ফটো তোলার একটা বাতিক ছিল। ছেলেবেলার অপটু হাতের ফটো অনেকগুলি এখনও চারুর কাছে আছে। সে বলে দিদির মহামূল্য স্মৃতির নিদর্শন-আমি এগুলো কাছে রেখে তৃপ্তি পাই। আনন্দ পাই।

যাই হোক চারু ক্যামেরাটা হাতে নিয়েই দিদিকে খুঁজতে বেরুলো। আশে পাশের সমস্ত বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত খুঁজে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো তবুও দিদির পাত্তা পাওয়া গেল না। একটুখানি জিরিয়ে আবার খুঁজতে যাব মনে করে চারু একটি উচ্চ পর্বত-শিখরে আরোহণ করে পাথরের ওপর বসে ভাবতে লাগলো, এখন কোন দিকে যাব এবং আনমনে চারিদিক দেখতে লাগলো। ইতিমধ্যে হঠাৎ তার নজরে পড়লো দূরে কতকগুলি গাছের ফাঁকে ফাঁকে কি যেন দেখা যাচ্ছে। চারু আশায় বুক বেঁধে বিপুল এক উৎসাহে সেই দিক পানে অগ্রসর হতে লাগল। তার পর কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলো তার দিদির মতই কে যেন বসে আছে। আর একটু এগিয়ে বুঝতে পারল সত্যই তো তারি দিদি!

মনে মনে আশা ছিল তার দিদিকে আচমকা গিয়ে খুব খানিকটা জব্দ করবে এবং বলবে 'কেমন বড় না ফাঁকি দেওয়া হয়েছিল, খুঁজে না বের করতে পারব না?'

কিন্তু এ কি, দিদি যে নিশ্চল, নিথর অপলক তার দৃষ্টি। চির সমাহিত এই হিমালয়ের মতনই অচল, অটল, ধীর, স্থির। কেমন যেন এক অজানা আতঙ্কে ভয়ে চারুর মুখ শুকিয়ে গেল। দেহ মন শিউরে উঠলো। মনে হোলো, এ দিদি তো তার সে দিদি নয়? চেনা অচেনার দারুণ বিভ্রাটে চারুর অন্তর মন আলোড়িত হতে লাগলো।

প্রকৃতিও যেন আজ নীরব অচঞ্চল হয়ে কি এক অনির্বচনীয় গম্ভীর ভাবে আবেশে মগ্ন হয়ে আছেন। এই পাহাড়েই চারু মানুষ, এখানকার সবরকম অবস্থাই তার জানা আছে। তার দাদা ও দাদামশাই এর সঙ্গে সে তার ছোট্ট বন্দুক নিয়ে কতদিন গভীর বনে শিকারের অন্বেষণে বেরিয়েছে। ভালুক ও বাঘের মারণকালীন বিকট চিৎকার ভয়ঙ্কর নিনাদ সে ছেলে বেলা থেকে শুনতেই অভ্যস্ত। তবে আজকের এই নীরব, সাড়াশব্দহীন পাহাড়ের ওপর এত ভয় এলো? ভয়ের ত' কোনই কারণ নেই। দিদি মেয়েছেলে হয়ে যদি এমন করে একলা থাকতে পারে, তবে আমার কেন এত ভয় আতঙ্ক?

না, কিছুতেই চারু স্থির হ'তে পারছিল না, মনকে প্রবোধ দিতে পারছিল না। এমনি একটা ভীতি ভাব তাকে পেয়ে বসেছিল যে, সে সেটা দূর করতে একেবারেই অসমর্থ হ'ল। তাই চারু তাড়াতাড়ি কোনরকমে দিদির একটি ছবি তুলে পালিয়ে এল।

[ক্রমশ।

অশেষ শাস্ত্রদর্শী পাণ্ডিতপ্রবর

হেমচন্দ্র শাস্ত্রী স্মরণে

গৌরাঙ্গের সহিত সংকীর্তন করিবার সময় ভক্তবৃন্দের চক্ষু হইতে অনর্গল ধারে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইত। কিন্তু কমলাকরের শত চেষ্টাও ব্যর্থ হইত। অবশেষে তিনি চক্ষুদ্বয়ে পিপ্পলী-চূর্ণ দিয়া অশ্রু বিসর্জনের সাধ মিটাইতে লাগিলেন। প্রভুর কাছে একদিন তাহা ধরা পড়িয়া গেল।

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি !! তুমি এ রকম করিতেছ কেন?

সরল প্রাণ ভক্ত কমলাকর অনুতপ্ত হৃদয়ে নিবেদন করিলেন—প্রভু আপনার এই প্রেমকীর্তনে পশুপক্ষীর পর্যন্ত নয়ন বাহিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষিত হয়, আর এই হতভাগ্যের হৃদয়-মরুভূমি নিংড়াইয়া একফোঁটা জলও বাহির হয় না। তাই বড় দুঃখে এই উপায় গ্রহণ করিয়াছি।

করুণাম্বুধি শ্রীচৈতন্যের হৃদয় সহানুভূতিতে বিগলিত হইল। প্রভু তাঁহার পদ্মহস্ত কমলাকরের নেত্রে বুলাইয়া দিলেন। সেই হইতে কমলাকরকে আর পিপ্পলীচূর্ণ দিতে হয় নাই। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমাশ্রুপাতে কমলাকরের হৃদয় প্লাবিত হইতে সুরু হইল।

এইবার যে কথা বলিতে গোড়াতেই এত কথা বলিলাম—সেই কথাই বলি। স্বর্গত প্রখ্যাত পণ্ডিত হেমচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনকথা স্মরণে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সহোদর-রূপ বান্ধবের বিয়োগ-বেদনা যেন নূতন করিয়া প্রাণে আঘাত করিল। সেই প্রিয়জন স্মৃতি নয়নসমক্ষে সমুদ্ভাসিত হইয়া নয়নদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। কত পুস্তক লিখিয়াছি কিন্তু কখনও তো এমন চঞ্চল এমন আনমনা এমন প্রীতি-বিহ্বল করিয়া তুলে নাই। আমাদের সময়কার ভালবাসা আর এখনকার কৃত্রিম ভদ্রতার কত তফাৎ। শশুরালয়ের সম্পর্কে এই পরিবারের সহিত একেই ত' ছিল এক মধুর সম্পর্ক। তদুপরি সাহিত্য-সতীর্থের প্রিয়তর সম্পর্ক মাখামাখিটা শেষের দিকে এমনই ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল যে, আজ সেই সব পুরানো কথাই মনে জাগিয়ে কেমন যেন বিহ্বল করিয়া ফেলিতেছে।

পন্ডিত গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ

বাহিরের সততচঞ্চল কর্মপ্রবাহ, ভিতরে অগাধ অসাধারণ জ্ঞানধারা আর তারই মাঝে প্রাণভরা উচ্ছ্বসিত ভক্তি-

ভাগবতাচার্য পন্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র শাস্ত্রী

লহরী—জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির এই ত্রিবেণী-সঙ্গম শাস্ত্রীমহাশয়কে আমার কাছে দিন দিন প্রিয় হইতেও প্রিয়তর করিয়াছিল। ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবের মতই তিনি শেষ জীবনে নিষ্কিঞ্চন ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে মহাকবি কালিদাসের কয়টি অমর শ্লোকই মনে পড়িয়া যায়।

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥

শাস্ত্রীভায়াও শৈশবে প্রচুর বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। যৌবনে যশের সহিত অধ্যাপনার কাজ সম্পাদন করিয়াছেন। বার্ধক্যে অবসর লইয়া বৈষ্ণবোচিত সাধন-ভজনে দিনাতিবাহিত করিয়া অন্তকালে 'গোবিন্দের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

একবার মনে হইয়াছিল, পণ্ডিত-প্রসবিনী নবদ্বীপভূমিতে তো অসংখ্য পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছে। কত জীবনী তো প্রকাশিতই হয় নাই। তা ছাড়া অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্—সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর চলমান স্রোতে আর বৈচিত্র্য কোথায়? জীবন প্রকাশের যুক্তি কোথায়? কিন্তু নবদ্বীপের এই বিখ্যাত পণ্ডিতবংশের কথা আলোচনার ভিতর হইতেই নূতন দিক খুলিয়া গেল। শাস্ত্রীভায়ার জীবনীপ্রকাশের একটা মস্ত বড় যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম, সেটা হইল ভবিষ্যৎ বংশধরদের পথ-নির্দেশের সহায়তা।

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু
ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।'

ইহা ভগবদ্বাক্য কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই কোটি কোটি মানুষের মধ্যেই এমন এমন কণজন্মা পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করেন, যাদের অমল চরিত্র অনুশীলন করিলে ছাত্রদের জীবন-গঠনে প্রেরণালাভ হয়। শাস্ত্রীভায়ার জীবনী অনুশীলন করিলে ছাত্ররা বিদ্যা-শিক্ষা, ধনার্জন, যশোলিপ্সা ও পরিশেষে ভক্তিলাভ করিয়া জন্ম সার্থক করিবার প্রেরণা পাইবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য এই জন্য এই প্রবন্ধ প্রকাশের একটা উপযোগিতা রহিয়াছে।

আবাল্য বিদ্যাশিক্ষার অনুরাগ তাঁহাকে অপরাবিদ্যা হইতে পরাবিদ্যা-

মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। এ কথাটা এখনকার ছাত্রদের জানা উচিত। নীতিশাস্ত্রে আছে—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্মং ততঃ সুখম্॥

এই শ্লোকটির পূর্ণ সার্থকতা শাস্ত্রীভায়ার জীবনে পূর্ণপ্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেমন স্কুল কলেজে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদকাদি পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক-জীবনেও তেমনি প্রচুর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ছাত্রদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি যশ ও অর্থ দুইই লাভ করিয়াছিলেন এবং শেষজীবনে ভজনসুখ অনুভব করিয়া সুখস্বরূপ গোপীনাথ স্মরণে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার সৌভাগ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। অসাধারণ বিদ্বান্ অথচ কোন ঔদ্ধত্য মাৎসর্য ছিল না, বিনয় ও শিষ্টাচারে সর্বজনপ্রিয় হইয়াও কোনদিন গর্বপ্রকাশ করেন নাই। সরকারী উচ্চপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যশোভাজন হইলেও কোনদিন মাৎসর্য প্রকাশ করেন নাই। শাস্ত্রব্যাখ্যায় জনরঞ্জনের গৌরব লাভ করিলেও, নিজের অমানিমানদ স্বভাব হইতে কোনদিন বিচ্যুত হন নাই। এমনি নির্মল নির্মৎসর একটি চরিত্র ছাত্রদের প্রেরণার উৎসস্বরূপ হউক, ইহাই কামনা জানাইতেছি।

সকলেই জানেন, নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের প্রসূতি, মিথিলার পূর্ণগৌরব চূর্ণ করিয়া নবদ্বীপ সমগ্র ভারতে এক অনন্যসাধারণী প্রতিভার পরিচয় দিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়া আছে। সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া এই নবদ্বীপেই স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন নব্যস্মৃতির সংকলনকরতঃ সমগ্র বঙ্গীয় সমাজকে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনুশাসনে আবদ্ধ করিয়া অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

এই নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতির মত নব্য তন্ত্র সংকলনেও নবদ্বীপ কম কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নাই। শুধু ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রমাত্রেই নবদ্বীপের শাখা সীমাবদ্ধ নয়। জ্যোতিঃশাস্ত্রেও নবদ্বীপের অনবদ্য অবদান বৈজ্ঞানিক-সমাজেও নবদ্বীপকে এক গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পণ্ডিত কমলাকর রায় জ্যোতিষী রচিত 'গ্রহ বিপ্রকুল পঞ্জিকা' জ্যোতিষী সমাজে অদ্যাপি অতীব সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পরম ভাগবত পণ্ডিতপ্রবর ৺হেমচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, বি-টি, বিদ্যানিধি, বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উক্ত পণ্ডিত, কমলাকর রায়ের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে পণ্ডিত রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর, কেশব বিশারদ, ভৃগুরাম বাচস্পতি, কমললোচন বিদ্যাবিনোদ, শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, উমাকান্ত ন্যায়রত্ন বিদ্যানিধি, বাক্‌সিদ্ধ পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ, বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে।

৩০শে আশ্বিন ১২৯৫ সালে শাস্ত্রীমহাশয়ের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বহু শিক্ষক মহাশয়ই কল্পনা করিতেন। তিনি হিন্দু স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই নানা বিতর্কসভায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। এম-এ পরীক্ষায় তিনি পর পর দুইটি গ্রুপেই প্রথম স্থান অধিকারকরত অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। তাঁহাকে শাস্ত্রী উপাধি প্রদত্ত হয়। এতদ্‌ব্যতীত তিনি 'মেয়োট' ছাত্রবৃত্তি ও 'কাউয়েল' ছাত্রবৃত্তি এই উভয় বৃত্তি সহ স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯১৮ খৃঃ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পারদর্শিতা জন্য সংস্কৃত কলেজ হইতে তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি' ও ১৯২২ খৃস্টাব্দে মুগ্ধবোধ, পাণিনি ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য বিদ্যারত্ন উপাধি প্রদত্ত হয়। ইংরাজী শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ভারতীয় শাস্ত্ররাজি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। যদিও বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত শিক্ষা তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও পরে পারদর্শিতা জন্মিয়েছিল, তথাপি এই জ্ঞানতপস্বী মানুষটির জ্ঞানপিপাসা আরোও যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

নবদ্বীপ, কলিকাতা ও কাশীধামের বিভিন্ন প্রখ্যাত অধ্যাপকের নিকট তিনি নিম্নলিখিত শাস্ত্রগুলি বিশেষ মনোযোগসহ অধ্যয়ন করেন—বেদ, স্মৃতি, ন্যায়, তন্ত্র ও সাংখ্য। কাব্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শেষজীবনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিপ্রেত 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'বাদ দার্শনিক সিদ্ধান্তটিকে প্রতিপাদনের অনুকূলে শাস্ত্ররাজি অধ্যয়নকরত গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

ঢাকা, চুঁচুড়া ও কৃষ্ণনগর কলেজে দীর্ঘকাল সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়া তিনি ১৩৫০ সালে ৪ঠা মাঘ রাজকীয় কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কলেজে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে তিনি সহযোগী শিক্ষক ও গুণানুরক্ত ছাত্রবৃন্দের প্রীতি ও ভক্তি সমানভাবেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কর্তব্যে কঠোর নীতিপরায়ণ হইলেও তাঁহার চরিত্রে এমন একটি মাধুর্য ছিল, যাহাতে যে-কেহ তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত সে-ই মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্' ---

এই বাক্য শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনে

যেরূপ মূর্তিমান এরূপ সচরাচর দেখা যায় না। তিনি একাধারে যেমন ছিলেন বিবিধ বিদ্যার আধার তেমনি ছিলেন বিনয় ও মাধুর্যের খনি। ছাত্রদের তিনি যে শুধু পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন তাহা নহে, তাঁহার অধ্যাপনা-গুণে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যেন একটি নিগূঢ় আত্মিক যোগ অনুভূত হইত। তাঁহার গুণমুগ্ধ ও শ্রদ্ধাবনত ছাত্রগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়, তাহা হইতে সামান্য কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল—

তোমার মননশক্তি দ্বিধা শঙ্কাহীন
সদানন্দ শুচি-শুভ্র প্রাণ।
ধূলি হ'তে তুলি এই শঙ্কিত চিত্তেরে
করাক্ আশীষধারা স্নান ॥

উপসংহারে তাঁহার এক অসাধারণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়া আজকের আলোচনা শেষ করিব।

তিনি রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। যে-কোন বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবার আকাঙক্ষা ও সামর্থ্য দুই-ই আছে। কথাপ্রসঙ্গে 'বঙ্গবাণী'র কথা শুনি-লেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সব উৎকর্ষ মানিয়া লইব অথচ মেয়েদের ভারতীয় নারীর চিরবৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হইতে দিব না—এই উদ্দেশ্য লইয়া কিভাবে আমরা গোড়ায় 'বঙ্গবাণী'র সূচনা করিয়াছিলাম, তিনি সেই সব খবরই সংগ্রহ করিয়াছেন।

আরও জানিলাম। সেই সংকল্পিত আদর্শ রূপায়ণের ব্যবস্থা আমার মনোমত হইতেছে না দেখিয়া আমি যে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেছি, ভায়া সে খবরও জানিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সেই অনুনয়মাখা স্মেরাননের শ্লোকটি আজও স্মরণে আছে—

'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য
স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।'

তিনি আমার পূর্ণ সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন, আমি পরিপূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছিলাম। 'বঙ্গবাণী'র এভ্যুন্নতির মূলে যে ছিল তাঁহারই ব্যক্তিগত প্রভাবের সহযোগিতা এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত নাই। তাঁহারই কর্মজীবনের সুপরিচিত বন্ধু ডাঃ পরিমল রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের ডি পি আই হইয়া আসিয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের পক্ষে 'বঙ্গবাণী'র উন্নতি সাধনে ইহা হইল মহেন্দ্র সুযোগ।

ডাঃ রায় একমাত্র এই শাস্ত্রী-মহাশয়ের অনুরোধেই বঙ্গবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরে শিক্ষাসচিব ডি এম সেন, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রভৃতি কিভাবে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন বঙ্গ-বাণীর সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা জানেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সামর্থ্য ও সংগঠন-যোগ্যতার দ্বারা বঙ্গ-বাণীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যাহা করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবাণীর জীবনে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ওঁ হরিঃ ওঁ তৎসৎ।

ভাস্কর হেনরী মুরের সম্মানলাভ

হেনরী মুরের ভাস্কর্যের একটি নিদর্শন

ইংরেজ ভাস্কর হেনরী মুরের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯-এ জুলাই থেকে ডুসেলডর্ফে তাঁর শিল্প সাধনার একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। শিল্পীর ৭৫খানি খোদাইয়ের কাজ এবং ৪০টি রেখাচিত্র ছাড়াও ১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রেখাচিত্রে ভরা তাঁর স্কেচবুক এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এতাবৎ শিল্পীর সব ভাস্কর্যগুলির ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজ করে এসেছেন হেরমান নোয়াক। উদ্যোক্তারা শিল্পীর "গ্রেট রিক্লাইনিং নাম্বার ফাইভ" ভাস্কর্যটি ৩,৩০,০০০ মার্কে কিনে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বয়সে যেসব মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার কোনটিই এখন আমার সম্মুখে নাই। তাহার মধ্যে অন্তত কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু লিখিবার সময়ও নাই। এইজন্য কোন-কোনটির সম্বন্ধে আমার যাহা মনে হইতেছে তাহাই লিখিব।

রবীন্দ্রনাথের মাসিক পত্রে মুদ্রিত প্রথম রচনা "জ্ঞানপ্রকাশ" নামক মাসিকে বাহির হইয়াছিল। ঐ মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। "ভুবনমোহিনী-প্রতিভা" একটি সেকালের কোন নারী নামধারী পুরুষের জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনা "জ্ঞানপ্রকাশে" করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে ঠকাইয়াছিল, কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

তাঁহার "বালক" দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, উহা তিনি যে-সব বালকদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি রুচি সম্বন্ধে ধারণা তিনি তাঁহার নিজের বালককালের জ্ঞান বুদ্ধি রুচির মাপকাঠি অনুসারে স্থির করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই কারণে উহা "ভারতীর" সহিত মিলিত হইয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

তিনি "ভারতী", "ভাণ্ডার", "সাধনা" এবং "বঙ্গদর্শন"-এরও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিতেন, তখন আমার বয়স খুব কম। আমি তখন উহার পাঠক ছিলাম না। সুতরাং জানা থাকিলেও আমার নিজের সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ কোন মত নাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রথমে প্রকাশিত ও পরে পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত কোন কোন বহি পড়িয়াছি! কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে ঠিক কোন মত প্রকাশ করা যায় না। যে-সকল বাংলা মাসিকপত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'-কে আমি প্রথম স্থান দিয়া থাকি।

তাহার কারণ শুধু উহাতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলির উৎকর্ষ নহে। সমস্ত কাগজখানির উপরই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও লিখন-ভঙ্গীর ছাপ অনুভূত হইত—অন্তত আমার তাহাই মনে হইত। ইহার একটা কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায় সমস্ত কাগজখানাই লিখিতেন। দ্বিতীয় কারণ পরে শুনিয়াছি—এবং আশা করি তাহা ঠিক শুনিয়াছি ও ঠিক মনে আছে। তিনি অন্য লেখকদের লেখা খুব শুধরাইয়া দিতেন; তাহাতে হয়ত অনেক লেখা প্রায় পুনর্লিখিত হইয়া যাইত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত লেখকের লেখাও সংস্কৃত হইয়া তবে "সাধনা"য় বাহির হইত।

সেদিন কোথায় যেন বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর একটা তুলনা পড়িতেছিলাম। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখক বলিতেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে গড়িয়া পিটিয়া "মানুষ" করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রবিবাবু তাহা করেন নাই। আমার বোধ হয়, লেখকের এই কথা অজ্ঞতাপ্রসূত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাগজগুলির সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে উৎকৃষ্ট রচনার পথনির্দেশ ত কার্যত করিয়াছেনই অন্য কাগজের সংস্রবেও বহু লোকের রচনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল "প্রবাসী"র "সংকলন" বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজী অনেক মাসিক পত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সারসংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপণ খুবই হইত; অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ-দিকের খালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের এইরূপ সংকলন-কার্যের জন্য পরিশ্রম হইতে প্রতিভাশালী নবীন লেখকদের কিছু শিখিবার আছে। তাহা এই যে, কোন কাজকেই ড্রাজারী (**Drudgery**) বা গাধার খাটুনি বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ সংকলন-বিভাগের ভার ত্যাগ করেন। তাহার একটা কারণ, ইংরেজী ম্যাগাজিনগুলির ক্রমাধোগতি, তাহাতে আর আগেকার মত হিতকর ও মনোহারী লেখা থাকিত না।

বাংলাদেশে অধিকাংশ মাসিক পত্র-সম্পাদককে অন্যের রচনার প্রত্যাশায় থাকিতে হয়। যাঁহারা কাগজ বাহির করেন, তাঁহাদের অনেকের কাগজ হয় এই কারণে অনিয়মিত হয়, কিংবা তাঁহাদিগকে যা-তা কিছু দিয়া কাগজ ভর্তি করিয়া বাহির

করিতে হয়। সম্পাদকের নিজেরই যদি নানা রকম প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা সমালোচনা প্রভৃতি লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ ক্ষমতা অল্প সম্পাদকেরই থাকিবার সম্ভাবনা। আমি যত সম্পাদকের বিষয় অবগত আছি, তাহার মধ্যে তিনি যত প্রকার উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা মাসিক পত্র অলংকৃত করিতে পারেন, অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। এইজন্য, অন্যের সাহায্য না পাইলেও নিয়মিতরূপে উৎকৃষ্ট ও নানা বিচিত্র রচনাপূর্ণ মাসিক পত্র বাহির করিবার সংকল্প একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। এইরূপ সঙ্কল্প কখনও করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু করিলে তাহা ব্যর্থ বা বিন্দুমাত্র অশোভন হইত না।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত মাসিকপত্রগুলি সম্বন্ধে বলিবারও অনেক কথাই আছে। এখন হাল্কা রকমের দু'-একটা কথা বলি। যখন "সাধনায়" "ক্ষুধিত-পাষাণ" গল্পটি পড়িয়াছিলাম, তখন সেই মায়াপুরীর সম্বন্ধে ও তাহার অধিবাসিনী সুন্দরীর সম্বন্ধে কি যে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কবি যাহার মুখ দিয়া গল্পটি বলাইতেছিলেন, সেই লোকটি কৌতূহলকে চরম সীমায় উপনীত করিয়া হঠাৎ গাড়িতে উঠিয়া [illegible] অনতিক্রান্তযৌবন পাঠকের মন কবির প্রতি প্রসন্ন হয় নাই। গল্পটি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম অনেক রাত্রে। সে-রাত্রে ঘুম হইয়া থাকিলে কখন হইয়াছিল মনে নাই। 'বিনি পয়সার ভোজ' যখন রবীন্দ্রনাথের কাগজে পড়ি, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। তখন আমরা কয়েক পরিবার বেনিয়াটোলার লেনের একই বাড়িতে থাকিতাম। গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা অতিমাত্রায় হাস্য-রসোন্মত্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের বড়দিগের দ্বারা ভর্ৎসিত হইয়াছিলাম মনে পড়ে।

'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ একটি আলোচনা-সভা স্থাপনা করেন। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তখন উহার অফিস ছিল ২০নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ভবনে। ঐ আফিসে বহু সাহিত্যিকের আড্ডা জমিত। সভার অধিবেশনে কোন-একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর আলোচনা হইত। এরূপ সভার প্রচলন এখনও আছে।

নিজের মাসিক পত্র সম্পাদন ও তাহাতে নিজে লেখা ছাড়া তিনি অন্য যত মাসিকে লেখা দিয়াছেন, তাহার সবগুলির নামও আমি জানি না। এ বিষয়ে তিনি খুব মুক্তহস্ত। মাসিক পত্রের লেখকরূপে তাঁহার একটি গুণের সাক্ষ্য ভুক্তভোগী সম্পাদক আমার দেওয়া উচিত। তাহা বলিবার পূর্বে তাঁহার অন্যতম অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্চর্য নিয়ম-নিষ্ঠার কথা বলা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু ক্রমশ-প্রকাশ্য লেখা প্রবাসীতে দিয়াছিলেন। তাহার কোন কিস্তির জন্য কখন অপেক্ষা করিতে বা তাগিদ দিতে হয় নাই। বরাবর মাসের ১লা কিম্বা ২রা তাঁহার লেখা ডাকে আসিয়া পৌঁছিত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বার্ধক্যের দুর্বলতা সত্ত্বেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরাবর নিয়ম রক্ষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উহার হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কখনও কোন কিস্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি কিস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ ধৈর্য, সংযম ও নিয়ম-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল। কবিরা বড় এলোমেলো ও খামখেয়ালী বলিয়া তাঁহাদের একটা বদনাম আছে। কিন্তু রবিবাবু কবি কি না সে-বিষয়ে কোন-কোন বাঙালী ও অবাঙালী গভীর গবেষকের সন্দেহ থাকিলেও মাসিক পত্রের খোরাক জোগান সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিন্দা করা চলিবে না। এ বিষয়ে তাঁহার সময়নিষ্ঠা অনতিক্রান্ত। ইহা তাঁহার অকবিত্বের প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত হইবার আশংকা থাকিলেও আমাকে এই সাক্ষ্য দিতে হইল।

এইরূপ নিয়মনিষ্ঠা সম্পাদক ও লেখক উভয় পক্ষেরই থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি রবীন্দ্রনাথ বরাবর কোন-না-কোন মাসিকের সম্পাদক থাকিতেন বা থাকিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে নির্বাহিত হইত। তাহার আর একটি কারণ এই যে, তিনি সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখিলেও তাহাতে সাহিত্যরস থাকে। যাহা হউক, সুখের বিষয়, সম্পাদকের কাজ তিনি কখন কখন করিয়া অন্যের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন কিন্তু উহাতে অনর্থক বরাবর নিজের শক্তি ক্ষয় করেন না। কারণ, সম্পাদকের কাজ প্রতিভাশালী মনীষীদের কাজ নহে; শ্রমপটু সাধারণবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের দ্বারাই উহা চলিতে পারে।

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে হিন্দুমেলার ভূমিকা যে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর কোনও রাজনৈতিক সংস্থা ছিল না যার মধ্যে দিয়ে সমগ্রিগত জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনাকে রূপ দেবার অনুরূপ চেষ্টা হয়েছিল। বস্তুত সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রে স্বদেশ-চেতনার বীজ উপ্ত করেছিলেন হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাগণ। রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, অক্ষয় চৌধুরী, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন বসু, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, বিপিনচন্দ্র পাল, অমৃতলাল বসু প্রমুখ সাহিত্যসেবী এবং ঠাকুর-পরিবারের সকল সন্তানের মানস-ক্ষেত্রে স্বদেশচিন্তার স্রোতোধারা প্রবাহিত করেছিল হিন্দুমেলা। নিধুবাবু, ঈশ্বর গুপ্ত, ডিরোজিও, রঙ্গলাল, মধুসূদন প্রমুখের রচনায় স্বদেশাত্মার যে বাণী নিঃসঙ্গতার বেদনায় অস্ফুটভাবে ধ্বনিত হচ্ছিল—হিন্দুমেলার জাতীয় সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চা তাকে সংঘবদ্ধ ভারত চিন্তার ঐকতানে সোচ্চার করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই সময় থেকেই বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বদেশচিন্তার চর্চা এবং পরিচর্যার বিষয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে লিখেছিলেন, 'বাংলা স্বদেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন।'

ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে বন্দনা, জাতীয় চেতনায় অধীনতাবোধের গ্লানি এবং স্বাধীনতা কামনার অভীপ্সা, জাতীয় অতীত ঐতিহ্যের স্মরণ প্রভৃতি দেশ-সংসক্তভাব হিন্দুমেলার জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই গানগুলির মধ্য দিয়েই 'দেশমুক্তি কামনার সুর ভোরের কাকলির মত শোনা' গিয়েছিল। হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশনে গীত 'লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে', 'আসি ভারতভূমে একবার দেখে যাও আর্যগণ', 'এই ধরাতলে ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয় ললনা', 'প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ', 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', 'মিলে সবে ভারত সন্তান', 'উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান', 'এ দেশের দুঃখে কার না সরে চোখের জল', 'হের আজ কি সুখের মেলা', 'কবে উদিবে সৌভাগ্যভানু ভারতবর্ষে', 'আর কতদিন হয়ে মানহীন রহিবে ভারতবাসী', 'দিনের দীন সবে হয়ে পরাধীন' (বারুইপুরের মেলায় গীত) প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীতগুলি জাতির তৎকালীন স্বাধীনতা কামনাকে সদা-জাগ্রত রেখেছিল।

সমকালীন বাংলা দেশে তথা ভারতের নানাস্থানে হিন্দুমেলা দেশ-চেতনার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সঞ্চার করেছিল তা বিস্ময়াবহ। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন মতাবলম্বী সকল সামাজিক মানুষই হিন্দুমেলার পতাকাতলে একতাবদ্ধ হয়েছিলেন। সমাজের উচ্চ মঞ্চ থেকে সমাজপতিরা পথের ধূলায় কামার, কুমার, জেলে-জোলার পাশে নেমে এসে ভারতমুক্তিযজ্ঞের সমিধ্ সংগ্রহে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই বিচারে হিন্দুমেলা ভারতবর্ষের প্রথম গণতান্ত্রিক সর্বদলীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান—'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত'।

সে যুগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরর, ন্যাশনাল পেপার, মনোমোহন বসুর 'মধ্যস্থ' (১৮৭২) প্রভৃতি পত্রিকাগুলিকেই প্রধানত হিন্দুমেলার মুখপত্র বলা হত। কিন্তু কার্যত দেখা যায় সমকালীন অমৃত-পত্রিকা, সুলভ সমাচার, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি পত্রিকাই মন্তব্যসহ হিন্দুমেলার প্রতিবেদন প্রকাশ করতেন।

প্রসঙ্গত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখেছেন, 'তখনকার দিনে কি প্রাচীনপন্থী কি উগ্রপন্থী সমুদয় পত্র-পত্রিকাই হিন্দুমেলার আদর্শ প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।'

—দ্রঃ জাগৃতি ও জাতীয়তা।

বস্তুত হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা তৎকালীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দমেলার মত মহান উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং বহু সম্ভাবনাপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি অধিকদিন স্থায়ী হয় নি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। দশম অধিবেশন পর্যন্ত হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর থেকেই উৎসাহে ভাঁটা পড়তে থাকে। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের 'সাধারণী' পত্রিকায় লেখা হয়,—

'বস্তুত হিন্দুমেলা একেবারে নির্জীব, এ কথা আমরা বলি না, ইহা দ্বারা নানাবিধ শুভ সাধিত হইতেছে, কিন্তু আশানুরূপ মঙ্গল দেখি না। সাধারণের ইহার প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে।'

—দ্রঃ হিন্দুমেলার বিবরণ : প্রস্তুয়মান নূতন সংস্করণ : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে পূর্বোক্ত পত্রিকাটিতেই মেলার উপকরণ এবং আয়োজনের স্বল্পতায় নৈরাশ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। চতুর্দশ অধিবেশন (১৮৮০) সম্পর্কে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় লেখা হয়, 'ইহার (হিন্দুমেলার) উন্নতি না হইয়া দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুন।' (দ্রঃ পর্ববৎ)।

ঐ বৎসরেই 'সোমপ্রকাশে' ১২৮৭ বঙ্গাব্দ 'দেশীয় ভাব সকলের নির্জীব' —এই শিরোনামায় সখেদে মন্তব্য করা হয়েছিল, 'গত দুই বৎসর কাল আমাদের দেশীয় সকল সভাই কিঞ্চিৎ নিস্তেজ ভাব ধারণ করিয়াছে।---বাবু নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলাও নিষ্প্রভ ও দুর্বলভাব ধারণ করিয়াছে, এবারেও মেলার কার্য একপ্রকার হইয়াছিল। কিন্তু এদিকে লোকে আর পূর্বের ন্যায় অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে না।'

পূর্বোক্ত প্রতিবেদনগুলি থেকে বোঝা যায় যে, হিন্দুমেলার সংগঠনে এবং কর্মাবলীতে এ সময়ে মাঝে মাঝে শৈথিল্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করতে উদ্যোক্তাগণ প্রথমাবধিই সচেষ্ট ছিলেন। হিন্দুমেলার সংগঠন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই প্রসঙ্গে সেগুলির আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশনে অন্যতম কর্মী মনোমোহন বসু মহাশয় তাঁর ভাষণের মধ্যে দিয়ে সাধারণের কাছে একটি আবেদন ব্যক্ত করেন, 'রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা এবং সাধারণ ঐক্য বিধান বিষয়ে এই হিন্দুমেলা আমাদিগের মগ্নাবস্থার তৃণাশ্রয়বৎ হইয়াছে; এই দুইটিকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে হইবেক।'

এ জাতীয় আবেদনের পশ্চাতে প্রধানতঃ কারণ ছিল হিন্দুমেলার সংগঠন এবং নিঃস্বার্থ জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের প্রতি জমিদার শ্রেণী এবং তৎকালীন ধনী সমাজপতিগণের একাংশের ঔদাসীন্য। জনকল্যাণের পরিবর্তে আপনাপন শ্রেণীগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণই এঁদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 'ভারতবর্ষীয় সভার' সদস্য। ফলে ভারতবর্ষীয় সভা আপন সদস্যগণের স্বার্থরক্ষার্থে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সদ্ভাব-সম্পর্ক দৃঢ় করে তুলতে থাকেন। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাগণ প্রথম থেকেই এই নীতিভ্রষ্ট দেশনেতাদের স্বাদেশিক আদর্শের পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

মনোমোহন বসু সখেদে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বৃটিশ শাসন কর্তাদের 'রায়বাহাদুর', 'রাজা' অথবা 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' উপাধির প্রলোভনে পড়ে জাতিভ্রষ্ট কর্ণধারগণ হিন্দুমেলার ন্যায় স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করে স্বদেশের সর্বনাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন। হিন্দুমেলার সংগঠন-দৌর্বল্য এবং জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রদত্ত মনোমোহন বসুর ভাষণ বিশেষ গুরুত্ববহ ছিল।

তিনি প্রকাশ্য সভায় সমাজের নীতিভ্রষ্ট ধনপতি নেতৃবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আয় রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ! আয় রে আমার ধনকুবের প্রধান সন্তানগণ! আয় রে রাজ্যাধিকারী ভূম্যধিকারী কৃতজ্ঞকৃতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্র বন্ধনের আর একতারূপ অতুল্য এক বলিহার ধারণের সুযোগ পাইয়াছ তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থ গর্ব, সর্বনাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বশীভূত আর থেকো না। স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথপ্রদর্শক কর---'

ভূস্বামিগণের ঔদাসীন্যের ফলে হিন্দুমেলা অর্থনৈতিক অনটনের সম্মুখীন হয়। হিন্দুমেলার একনিষ্ঠ কর্মীদের মধ্যে ছিলেন অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। স্বাভাবিক কারণেই অর্থবানদের সহায়তা ব্যতীত হিন্দুমেলার মত বিপুল আয়োজন সম্ভব ছিল না।

এই প্রসঙ্গেও মনোমোহন বসু লিখেছিলেন, 'হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগাবতী জননীর অধিক আশা-ভরসা-মধ্যাবস্থা তোমাদের কনীয়ান ভ্রাতারা যেরূপ মাতৃভক্তিপরায়ণ আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি সেরূপ সম্পত্তিবল, সম্ভ্রমবল, প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বৎস! কোন চিন্তার বিষয়ই হইত না। তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে---অতএব প্রাণ-প্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না; জননীর দুঃখাবসানে আর বিলম্ব করিও না; জাগরূক হও---ভ্রান্তিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্মভূমিতে অবতীর্ণ হও —চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে---

'সৌভাগ্য অরুণ' তরুণবেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে। তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমরা তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর, সেই অরুণের আশ্চর্য আলোক দেখিয়া পুলক পাইয়া এই ভারত-লোক-বাসী সকলই শব্দ করুক 'জয় জয় জয়।' হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক, 'জয় জয় জয়।' আকাশে শব্দ হউক, 'জয় জয় জয়।' 'হিন্দুমেলার জয়।' 'হিন্দুমেলার জয়।' 'হিন্দুমেলার জয়।'

—দ্রঃ হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত : প্রস্তুয়মান নূতন সংস্করণ ও মন্ত্রির সন্ধানে ভারত : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

কিন্তু মনোমোহন বসুর এই আবেগসঞ্চারী আকুল আবেদন সফল হয়নি। ভারতবর্ষীয় সভার কাজকর্ম ক্রমে ক্রমে স্বার্থান্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, ফলস্বরূপ, অসন্তুষ্ট সদস্যগণ শিশিরকুমার ঘোষ এবং হেমন্তকুমার ঘোষের নেতৃত্বে সর্বশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন 'ইণ্ডিয়ান লীগ' (১৮৭৫ খৃঃ)।

জাতীয় মেলার অষ্টম থেকে দশম অধিবেশনের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে নানান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়।

তা ছাড়া ১৮৭২ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে অমৃতলাল বসু প্রমুখ অনেকেই হিন্দুমেলার প্রেরণা পেয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' বা জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় মেতে উঠেছিলেন। আনন্দমোহন বসু বিলাত থেকে ফিরে এসে শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সহায়তায় 'জাতীয় ছাত্রসভা' (স্টুডেণ্ট এ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৭৫-এ ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখদের বিপ্লবের 'অগ্নিমন্ত্রে' দীক্ষা দিয়ে গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা সংগঠনে প্রবৃত্ত হলেন। অপর দিকে হিন্দুমেলার অন্যতম প্রধান দুই উদ্যোক্তা রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দু মেলার বহুমুখী কর্মক্ষেত্রের বাইরে ফরাসীবিপ্লব প্রতিষ্ঠান 'কার্বোনারী'র আদর্শে 'সঞ্জীবনী' সভা প্রতিষ্ঠা করলেন।

সঞ্জীবনী সভার উদ্দেশ্য হয়ত কার্যকর হয়নি, কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সভার আদর্শ একটি বিশেষ ভূমিকা দাবী করে। বাস্তবিক, সঞ্জীবনী সভার আদর্শ এবং পরিবেশ ছিল বিপ্লবের অগ্নিশিখায় দীপ্ত। সভার অনুষ্ঠান হত ঠনঠনিয়ার এক পোড়ো বাড়ীতে। দীক্ষা গ্রহণের দিনে পুরোহিত হিসাবে রাজনারায়ণ বসু পরতেন রক্তরাঙা পট্টবস্ত্র। টেবলের উপরে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের পুঁথি, একটি কোষমুক্ত তরবারি আর থাকত মড়ার মাথার খুলি। তার দু'চোখের কোটরের মধ্যে বসানো হ'ত দু'টি জ্বলন্ত মোমবাতি। মড়ার মাথা ছিল মৃত ভারতের প্রতীক আর প্রদীপ্ত মোমবাতি ভারতের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের প্রতীক। তীক্ষ্ণ তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে বুক চিরে রক্তপাত করে সদস্যগণ দেশমাতৃকার জন্য শপথ স্বাক্ষর করতেন। সঞ্জীবনী সভার আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে। ভারতভক্তির ইতিহাসে এ সময়ে দল-বদলের পালা চলেছে। 'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থায়ী হ'ল না। নেতৃত্বের বা আরও কোন কোন বিষয়ে বিরোধের ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'ভারত সভা' (ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই 'ভারত সভা' জনসাধারণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এর বহু পূর্বেই অবশ্য কেশবচন্দ্র বিলাত থেকে স্বদেশে ফিরে এসে 'ভারত সংস্কার সভা' (১৮৭০) স্থাপন করে দেশীয় মঙ্গলকর কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মূলত পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দুমেলার সদস্যগণই অংশগ্রহণ করেছিলেন। সদস্যগণের নিয়ত দলবদলের অবধারিত ফলস্বরূপ হিন্দুমেলার সংগঠনের দুর্বলতা প্রকাশ পেতে সুরু করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে পূর্বোক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের অবলম্বিত কার্যসূচীর মধ্যে হিন্দুমেলার বহু ব্যাপ্ত কার্যসূচীরই হুবহু অনুকরণ দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' হিন্দুমেলার আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখেছেন, 'জাতীয় মেলা যে-সব উদ্দেশ্যসাধনে এতদিন তৎপর ছিলেন তাহাও এই সভার (ইণ্ডিয়ান লীগ) কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইল। ইহার প্রধান অনুষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রও এই সভার কর্মকর্তৃসভায় স্থানলাভ করিলেন। মেলা একাকী যেসব কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদিনে সাহিত্য, নাটক, কাব্য, পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র, রঙ্গমঞ্চ এবং ইণ্ডিয়ান লীগের মত রাষ্ট্রীয় সভার মধ্য দিয়া তাহা বস্তুগত হইবার অবকাশ পাইল।" (দ্রঃ হিন্দুমেলার বিবরণ : প্রস্তুয়মান সংস্করণ)।

সুতরাং হিন্দুমেলার সংগঠন ভেঙ্গে যাওয়াকে তার তিরোভাব না বলে বলা যেতে পারে নব নবরূপে তার আবির্ভাব ঘটেছিল পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে। শ্রীযুক্ত বাগল অন্যত্র লিখেছেন, 'হিন্দুমেলা ১৮৬৭ সনের ১২ই আশ্বিন সর্বপ্রথম আয়োজিত হয়। পনর বৎসর পর্যন্ত ইহার কাজ সমানে চলিয়া তৎকালীন ভারত সভা প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে লীন হইয়া যায়।' (দ্রঃ জাগৃতি ও জাতীয়তা)

পনর বৎসর হিন্দুমেলা চলেছিল কি না সে সম্বন্ধে কোনও তথ্য প্রমাণ পাই নি। তা ছাড়া হিন্দুমেলার শেষ অধিবেশনে ১৮৮০ খৃস্টাব্দের পর কোথাও হয়েছিল কি না সে সম্বন্ধেও প্রাপ্ত সমকালীন সংবাদপত্রগুলিতে কোন প্রতিবেদন পাওয়া সম্ভব হয় নি। সুতরাং ১৮৮০ খৃস্টাব্দে টালার রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনই হিন্দুমেলার শেষ অধিবেশন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—

"The Hindoo Mela met altogether fourteen times from 1867 to 1880. Its importance gradually declined owing to the establishment of other associations. . . ." (দ্রঃ History of the freedom in India. Vol. I, Ch. II).

হিন্দুমেলার শেষ অধিবেশনের আলোচনায় একটি ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ করছি। 'বঙ্গবাণী' (১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র' শীর্ষক রচনায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, হিন্দুমেলার শেষ অধিবেশন সম্বন্ধে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন।

(রচনাটি তাঁর 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে) শ্রীযুক্ত পাল লিখেছেন, '---শেষবারের মেলাতে একটা জাঁকালো রকমের মারামারি হয়। তারপর হইতেই হিন্দুমেলা বন্ধ হইয়া যায়। এই মেলাতে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। টালার রাজা বদনচাঁদের বাগানে এই মেলা বসে।--- একরূপ আমা হইতেই এই মারামারি হয় বলিয়া তাহার ইতিহাসটা আমার জীবনের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের পরে ব্যায়াম প্রদর্শনের

আয়োজন হয়। বাগানটা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।---আমি একখানা চৌকি লইয়া ব্যায়াম দেখিবার জন্য বাহিরে যাইয়া এক জায়গায় বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন হ্যাটকোটধারী পুরুষ একটি মেমকে সঙ্গে লইয়া আমার পিছনে দাঁড়াইলেন---পুরুষটি অতি রূঢ়ভাবে আসিয়া আমাকে চেয়ারটা ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন। আমি সে-কথায় কর্ণপাত করিলাম না। ---তখন সাহেবটি আমাকে চৌকি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিলেন।

---আমরা দুজনে চেয়ার লইয়া টানাটানি করিতেছি দেখিয়া দু' একটি বাঙালী যুবক আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের একজন সাহেবের হাতে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সাহেব তখন চেয়ারখানি ছাড়িয়া দিয়া ছেলেদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি আরম্ভ করিলেন, ---তখন সাহেব বাঙ্গালীতে পুরাদস্তর মারামারি সুরু হইয়াছে। তারপর পুলিশ আসিয়া হাজির হইল।'

এরপর ইংরাজ পুলিশ সুপার লাইন্যামের জনতার নিকট লাঞ্ছনা ভোগ, বাঙ্গালী যোদ্ধবর্গের সঙ্গে পুলিশের সঙঘর্ষ, পুলিশের হাতে বিপিনচন্দ্রের নিগ্রহ, তাঁর, শ্রীসুন্দরীমোহন দাস, হাওড়া সরকারী বিদ্যালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক 'নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের কুটুম্ব, ('তাঁহার জামাতার সহোদর'), প্রমুখের গ্রেপ্তার বরণের ঘটনার বিবরণ দিয়ে শ্রীবিপিনচন্দ্র লিখেছেন, 'শিয়ালদহ পুলিশ-আদালতে আমাদের বিচার হয়। শোভাবাজারের রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর তখন শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। নবগোপালবাবুর কুটুম্বের পঞ্চাশ টাকা ও আমার কুড়ি টাকা জরিমানা হয়। সুবিচার হইয়াছিল কি না সে কথা তুলিতে চাহি না।'

জাতীয় মেলার দশম বার্ষিক অধিবেশনে (১৮৭৬) বিবরণ লিখতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় উল্লেখ করেছেন, 'এই অধিবেশনের সময় বাঙালী যুবকদের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের একটা সঙঘর্ষ হয়।---সঙঘর্ষে বিপিনচন্দ্র পাল, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ যুবকবৃন্দ লিপ্ত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন এবং বিচারে তাঁহার কুড়ি টাকা জরিমানা হয়।'

বিপিনচন্দ্র হিন্দুমেলার অধীনস্থ ব্যায়ামাগারের ছাত্র ছিলেন। হিন্দুমেলার শেষের দিকের অধিবেশনগুলিতে সক্রিয় কর্মিরূপেও যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং দশম অধিবেশনের পরের চার বৎসরের (১৮৮০) ঘটনা তাঁর মনে থাকারই কথা। দশম অধিবেশনকে শেষ অধিবেশন বলার কোনও কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং মনে হয় পূর্বোক্ত ঘটনাটি চতুর্দশ অধিবেশনের কালেই ঘটেছিল। দশম অথবা চতুর্দশ অধিবেশন—যে সময়েই ঘটুক না কেন, ঘটনাটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। হিন্দুমেলার স্বদেশচর্চা দেশের জনচিত্তে বিশেষ করে যুবকদের মনে যে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার মূল্যবান দলিল বিপিনচন্দ্রের প্রতিবেদনটি। সমকালীন বাংলা দেশে সাধারণ মানুষের মনে 'সাহেব' সম্পর্কিত সংস্কার ছিল ঈশ্বরভক্তিসদৃশ। এই সামাজিক বিশ্বাসের এবং ব্যবহারের বিচারে হিন্দুমেলার প্রাঙ্গণে আত্মমর্যাদা রক্ষায় বিপিনচন্দ্রের আচরণ এবং 'ইংরাজশাসক' পুলিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন বাঙ্গালী যুবকগণের শক্তির লড়াই বিস্ময়কর শুধু নয়—অভাবিত ঘটনা।

মূলকথা স্বদেশভক্তি এবং জাতিবৈর মনোভাব তখন ভারতবাসীর হৃদয়ে এক নব-উজ্জীবনী-শক্তির সঞ্চার করতে সুরু করেছিল। হিন্দুমেলার স্বদেশচর্চার সফলতা দেখা দিয়েছিল এই ভাবে। চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনের (১৮৮০) পরেই এই বহুতর দেশকল্যাণ প্রণোদিত হিন্দুমেলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দুমেলার প্রাঙ্গণে যে স্বদেশ-চেতনার বীজ উপ্ত হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মহীরুহে পরিণত হতে চলেছিল।

হিন্দুমেলা ও বিশেষ করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহেই বাংলা দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক জীবনে এক বিস্ময়কর নবজাগরণের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। হিন্দুমেলার যজ্ঞভূমিতেই স্বাদেশিকতার মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেছিলেন নবগোপাল, রাজনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষিগণ।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি জাতীয় নাট্যালয়, ভারতসভা, ইণ্ডিয়ান লীগ, ভারতীয় ছাত্রসভা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিন্দুমেলার প্রভাব অনস্বীকার্য। স্বদেশী শিল্প-সামগ্রী উৎপাদন এবং তদ্দ্বারা জাতিকে স্বাবলম্বী করে তোলার যে আদর্শ পরিকল্পনা হিন্দুমেলার কর্মকর্তাগণ গ্রহণ করেছিলেন, তা পরবর্তী যুগে জাতির জীবনে গভীর প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। এই আদর্শেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত শিল্পমেলার (ইনডাস্ট্রিয়েল একজিবিশন) আয়োজন করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলকাতা সহরে বিদেশী দ্রব্যবর্জন এবং স্বদেশী শিল্প ও বস্ত্রাদির প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা দেয়। 'অনুশীলন সমিতি' এবং 'বীরাষ্টমী মেলা' প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলা দেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে শক্তিচর্চা প্রসার লাভ করে। মনে রাখতে হবে 'হিন্দুমেলা'র উদ্যোক্তাগণই সর্বপ্রথম পূর্বোক্ত আদর্শগুলি রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও ইয়োরোপীয় অনুবৃত্তির পরিবর্তে ভারতীয় চিত্রাদর্শের প্রতি শিল্পীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন ঠাকুর পরিবারও হিন্দুমেলার অন্যান্য উদ্যোক্তাগণ। এরই প্রত্যক্ষ ফলরূপে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্ররেখায় নবীন ভারতশিল্পের জন্ম হয়েছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা দেশে শত বর্ষ পূর্বের 'হিন্দুমেলা'র ছবি বড় অস্পষ্ট,

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মযুগে 'হিন্দু-মেলা'র অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর সন্তানগণ রাজনারায়ণ, মনোমোহন বসু এবং নবগোপাল মিত্রের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে নবগোপাল ছিলেন উনিশ শতকের উন্মাদ জাতীয়তাবাদী পুরুষ। শেষ বয়সে 'স্বদেশী সার্কাসের' পত্তন করেছিলেন তিনি। দেনায় আকণ্ঠমগ্ন, ঠাকুরবাড়ীর সাহায্যও কমে এসেছে। তথাপি 'কয়েকটি মরা খেগো ঘোড়া' নিয়ে ঠাকুরবাড়ীর বালখিল্য দর্শকদের তিনি জাতীয় সার্কাস দেখিয়েছেন।

ধনীর সন্তান নবগোপাল শেষ পর্যন্ত 'ন্যাশনাল পেপার' চালাবার অর্থের অভাবে কর্পোরেশনের সামান্য চাকরী গ্রহণ করেন। শতবর্ষ পরে জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে উন্মাদ জাতীয়তাবাদী নেতা নবগোপাল এক বিস্মৃত নাম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষায় —'তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না।'

জাতীয়তাবাদের যে উন্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন নবগোপাল সেই উন্মাদনাকে সযত্নে পালন-পোষণের গুরুদায়িত্ব সর্বপ্রথম বহন করেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চার একটি সফল পরিণতি ছিলহিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথের সক্রিয়স হায়তা ব্যতিরেকে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত কিনা বলা যায় না। পরবর্তী অধ্যায়ে হিন্দুমেলার সংগঠনে ঠাকুর সন্তানগণের অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যাবে।

●

উনিশ শতকের প্রথম পাদে স্বদেশ-চিন্তা যাঁদের নানা জনকল্যাণকর কর্মের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছিল, রামমোহন রায়ের একান্ত সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ। (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পিতার স্বদেশ-বোধ বংশানুক্রমিক ধারায় দেবেন্দ্র-নাথের রক্তে সংক্রামিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সময়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী স্বদেশচর্চার তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সেই তীর্থে এসে দেশ-ভক্তির দীক্ষা নিয়ে যান নি সম-কালীন বাংলা দেশে এমন মনীষী কম ছিলেন। পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হিন্দুমেলার জন্ম এই ঠাকুর-তীর্থের স্বদেশ সাধনার অভীষ্ট ফল।

শতবর্ষ পূর্বের বাংলা দেশে জাতির জীবনে ও কর্মে, চিন্তায় ও ভাবনায় নব-চেতনার আবির্ভাব হয়েছিল বহু বিচিত্র পথে। ধর্মগত সংস্কার, সামাজিক রীতি-নীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়ন সর্বোপরি জাতির অধীনতাবোধের বিক্ষোভ—এই বহুমুখী আকাঙক্ষায় উদ্দীপিত বহু মানুষের জাতীয়তাবোধকে অর্থে-সামর্থ্যে দ্বিধাহীনভাবে সাহায্য করেছেন ঠাকুর বাড়ীর সন্তানগণ। রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা, নব-গোপাল মিত্রের সুতীব্র দেশভাবনা ও কর্মেচ্ছা মনোমোহন বসুর সংগঠনী প্রতিভা কোনটিই কম গুরুত্ববহ নয়; কিন্তু হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর সন্তানদের ভূমিকা ও দায়িত্ব অতুলনীয়। ঠাকুর বাড়ীর বিরাট প্রেক্ষাপট না থাকিলে বোধহয় হিন্দুমেলার স্বদেশ পূজার মহান চিত্র অঙ্কন সম্ভব ছিল না। এই কারণেই হিন্দুমেলার ইতিহাস পক্ষান্তরে ঠাকুর বাড়ীর স্বদেশচর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার একটি অধ্যায়-নামে অভিহিত করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার একটি বংশানুক্রমিক ধারা-বাহিকতা আছে। হিন্দুমেলার সঙ্গে ঠাকুরসন্তানগণের ঘনিষ্ঠ ভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গে সেকথার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বেলগাছিয়া বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতেন, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন এ ইংরাজকে যেন খানা না দেওয়া হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংশ্রব আর আমাদের নাই; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাব লোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।'

—দ্রঃ জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি।

পরবর্তীকালে 'নাইট উপাধি' বর্জনের ঘটনা রবীন্দ্রনাথের 'নিজের জীবনে স্বদেশ বোধের সেই ধারাকেই অব্যাহত রেখেছিল।

পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আরও একটি রবীন্দ্র উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। রবীন্দ্র-নাথ লিখেছেন,—

"---আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজী পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

—দ্রঃ জীবনস্মৃতি : স্বাদেশিকতা।

উদ্ধৃতিটির মধ্যে দিয়ে দেবেন্দ্র-নাথের স্বদেশবোধের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। যে বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি তাঁর যুগের অপর দেশনেতাদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। একদিকে পিতামহীর ধর্মীয় নিষ্ঠা অন্যদিকে পিতার জনমঙ্গল-সঞ্চারী কর্মেচ্ছা এই দুয়ের সমীকরণ-

সাযুজ্যের ফলেই দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ভক্তিশাসিত মঙ্গলময় ধর্মকর্মের আশ্লেষ ঘটেছিল। এই আদর্শবোধকে ভিত্তি করেই দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ গড়ে উঠেছিল। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই দেবেন্দ্রনাথের এই স্বদেশ-চৈতন্য, জাতীয় মঙ্গলেচ্ছাপ্রাণিত বহুবিধ কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ছিল শান্তসমাহিত ধর্মীয় ধ্যাননিমগ্নতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অথচ গঠনমূলক সফল কর্মের মধ্যে বহুব্যাপ্ত। এই বিশেষ চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবার ফলেই 'হিন্দুমেলা'র জাতীয় সাধনার যজ্ঞশালায় তিনি রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র এবং গণেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর সন্তানদের সম-উদ্দেশ্যসূত্রে মিলিত করতে পেরে-ছিলেন। হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্টতর উপাদান-গুলির যথাযথ সম্পাদন ও আচরণের দ্বারা দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এক বিস্ময়কর প্রয়াস দেখা গিয়েছিল তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন এবং তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরর ও ন্যাশনাল পেপার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। বহু যুগের সাধনায় পরিশীলিত হিন্দু-ধর্মের আদর্শকে আশ্রয় করে তিনি চেয়েছিলেন জাতির জীবনে দেশপ্রেম ও স্বদেশবোধকে সঞ্চার করতে। দেশ জাতি এবং পরিবারস্থ সকলের জীবনে সেই দেশপ্রেম সঞ্চারিত হোক এই ঈপ্সা নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা' প্রতি-ষ্ঠায় অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করে-ছিলেন। নানাবিধ সামাজিককর্মে নিয়ত-ব্যাপৃত দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে হিন্দু-মেলার পরিচালন সমিতিতে প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু এ কথা সত্য, হিন্দুমেলার বিভিন্ন কর্মে নিয়মিত প্রেরণা জুগিয়ে-ছেন তিনি। হয়ত জাতীয় গঠনমূলক কাজে যৌবন-শক্তির প্রয়োজন বোধ করে নিজে সরে এসেছিলেন তিনি, সুযোগ দিয়েছিলেন নবগোপাল গণেন্দ্র-নাথদের জাতীয়জীবনে বিকশিত হতে।

প্রকৃতপক্ষে নবগোপাল, রাজনারায়ণ, গণেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখের জীবনে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল দেবেন্দ্র-নাথের মহান ব্যক্তিত্বের পটভূমিকায়। রাজনারায়ণের স্বদেশভক্তির মধ্যে এক সদা-সজীব যৌবন-প্রেরণা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দু-মেলার সংগঠন এবং প্রচারে সেই দুর্বার এবং সৃজনধর্মী যৌবন-শক্তির প্রয়োজন। সেই কারণে রাজনারায়ণের নেতৃত্বে তিনি ঠাকুরবাড়ীতে এক নব্য স্বাদেশিকতার প্রবর্তন করেন। স্বাভা-বিকভাবেই 'হিন্দুমেলা'র পরিচালন-দায়িত্বও এই নব্য স্বদেশ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তরুণদের উপর ন্যস্ত হয়। অবশ্য অনুমান করা যায় যে হিন্দু-মেলার কর্মধারা অনেকটাই দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে এবং পরামর্শে সম্পন্ন হত।

হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দেবেন্দ্র-নাথ তথা ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করা হল। এ বিষয়ে শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ৭ই আগস্ট ১৮৬৫ তারিখে প্রথম প্রকাশিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। জোড়া-সাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের নিকট এই স্বদেশীমেলা অশেষ প্রকারে ঋণী।' (দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৫২) অমৃতলাল বসু লিখে-ছিলেন, 'মেলার উদ্যোগ ছিল নব-গোপাল ও তাঁর সহকারিগণের কিন্তু শক্তির সঞ্চার করতেন প্রধানত দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ জোড়াসাঁকোর জ্যোতিষ্কগণ।' (দ্রঃ ভারতী চৈত্র, ১৩৩২)।

হিন্দুমেলা স্থাপনের বিষয়ে ঠাকুর-পরিবারের স্বদেশচর্চার প্রেরণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

'দেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশে আমাদের বাড়ী হইতে 'হিন্দুমেলা' নামে একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল।—বড়দাদা এবং আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্র দাদা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—তাঁহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন।' (জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি)

আনুপূর্বিক আলোচনার পরি-প্রেক্ষিতে এবং পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার প্রত্যাশিত ফলপ্রকাশরূপেই হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু এবং ঠাকুর-বাড়ীর স্বদেশনিষ্ঠ সন্তানগণের সম্মিলিত সাধনার ফলে হিন্দুমেলার তীর্থভূমিতে নব্য স্বাদেশিকতার জন্ম হয়েছিল। সেই কারণে বলা যায়, হিন্দুমেলার আলোচনা পক্ষান্তরে ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

বর্তমান অধ্যায়ে হিন্দুমেলার পটভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ এবং পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও পৌত্র অবনীন্দ্রনাথ (গুণেন্দ্রনাথের পুত্র) প্রমুখ ঠাকুরবাড়ীর কৃতী সন্তানগণের স্বদেশচর্চার স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করব।

হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া সর্বাগ্রে গণেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের (১৮৪১-৬৯) নাম করতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্রনাথের জীবনে স্বদেশ-চিন্তার সঙ্গে বহুতর মানবহিতৈষী গুণাবলীও সমাযুক্ত ছিল। সঙ্গীত-নাটক-শিল্পচর্চা সকল বিষয়েই গণেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনে এক ঐশ্বর্যশালী উদার স্বদেশচিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর উৎসাহেই, প্রকৃতপক্ষে, সে সময় বাংলা দেশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী শিল্প ও সংস্কৃতি-চর্চার এক প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। গণেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠাকুরবাড়ীর সন্তানগণ বাংলার আধুনিক যুগকে যেন—সকল দিক

জন্যই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায়, কাব্যে-গানে, চিত্রে-নাট্যে, ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।'

গণেন্দ্রনাথের উদ্যোগে তৎকালীন বাংলা দেশে দেশীয় নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয়। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রামনারায়ণের 'নবনাটক' অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলা দেশে জাতীয় নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় নাট্যরচনার বিষয়ে যে আন্দোলন শুরু করেন, বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গণেন্দ্রনাথ ইতিহাসের একজন অতিনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসচর্চার মধ্যে দিয়ে। গণেন্দ্রনাথ সে কথা উপলব্ধি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস-চর্চায় গণদাদার অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন।' (দ্রঃ জীবনস্মৃতি)।

জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই (১৮৬৫) রাজনারায়ণ, নবগোপাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে একযোগে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীতে 'স্বাদেশিকের সভা' স্থাপন করেন। গণেন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভাবনা-অনুগ কর্মাবলীর সদাসহযোগে জাতীয় মেলার একটি প্রতিষ্ঠাভূমি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছিল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় সহজাত জাতীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ যুবক গণেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক কারণেই 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।

পর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, গণেন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয় মেলার প্রথম সম্পাদক। এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কর্মে তাঁর নিয়োগ সুস্পষ্টভাবেই তাঁর বলিষ্ঠ কর্মক্ষমতার প্রমাণ দেয়। মেলার দ্বিতীয় বর্ষের (১৮৬৮) কার্য-বিবরণীতে গণেন্দ্রনাথ মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে যে বিবৃতি দেন, তার মধ্যে দিয়ে তাঁর উদার অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতীয় চিন্তার একটি পরিশীলিত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। তাঁর বিবৃতির মাধ্যমে তিনি ইংরাজশাসিত অবহেলিত ভারতবাসীর কাছে 'আত্মনির্ভরতা' ও 'স্বাধিকার সচেতনতার' আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য। ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর---'। তাঁর এই আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। শতাধিক বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি-জর্জরিত বিকলাঙ্গ ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনাকে তিনি স্বাদেশিক মন্ত্রের সঞ্জীবনী-স্পর্শে হিন্দুমেলার প্রাঙ্গণে জাগ্রত করেছিলেন।

হিন্দুমেলার স্বদেশ-চর্চার যজ্ঞভূমি থেকেই জন্ম নিয়েছিল ভারত-উজ্জীবন-মন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত। বস্তুত হিন্দুমেলার জন্য প্রথম জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন গণেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় অধিবেশনের সঙ্গীত হিসাবে তাঁর বিখ্যাত ভারত সঙ্গীতটি গীত হয়েছিল। গানটি নিম্নরূপ:

লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি ক'রে।
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকারে॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই॥
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা ক'রে॥
দেশান্তর জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন।
এ দেশেখ ধন হায় বিদেশীর তরে ॥
আমরা সকলে হেথা,
হেলা করি নিজ মাতা।
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে ॥'

ইতিহাস-সচেতন সংস্কৃতিবান যুবক গণেন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ভারতের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন, ভারতকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছেন—বিদেশীর হাতে দেশজননীর লুণ্ঠন-অবমাননা প্রত্যক্ষ করে আত্মাধিকারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমকালীন জাতীয়তাবোধের পটভূমিকায় গণেন্দ্রনাথের এই সুতীব্র হৃদয়াবেগসঞ্জাত দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণ নূতন দেশ-পূজার সূচনা করেছিল। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লিখলেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে গান শোনালেন, 'বন্দেমাতরম্'। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

কিন্তু এরও দীর্ঘদিন আগে গণেন্দ্রনাথের মাতৃরূপে ভারত-চিন্তা বিস্ময়কর ঘটনা। পরবর্তীকালে জীবনস্মৃতি লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত ভারত-সঙ্গীতটির উল্লেখ না করে পারেন নি, 'বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা যখন গণদাদার রচিত 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে' গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত।' এই গানটি ছাড়া আরও কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত তিনি রচনা করেন। প্রত্যেকটি গানই সম্ভবত হিন্দুমেলায় গাওয়া হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ) কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত-সঙ্গীতের জন্মদাতা।' (দ্রঃ আমার বাল্যকথা: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

বলা বাহুল্য জাতীয় মেলার সকল কাজেই গণেন্দ্রনাথ গভীরভাবে যুক্ত থাকতেন। তাঁর কার্যকালের মধ্যে জাতীয় মেলা হিন্দুমেলা নামে পরিচিতি লাভ না করলেও আদর্শগত কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না। বরং চৈত্র মেলার (জাতীয় মেলা) সার্বিক উন্নতির দিকে গণেন্দ্রনাথের সদা-জাগ্রত দৃষ্টিপাত ছিল।

১৮৬৯ খৃস্টাব্দে এলাহাবাদে অবস্থান কালে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় গণেন্দ্রনাথকে ইংরাজীতে একটি পত্র লেখেন। জাতীয় মেলার সঙ্গে গণেন্দ্রনাথের সম্পর্ক গভীরতা এবং তাঁর প্রতি রাজনারায়ণে

রাজনীতি বিষয়ে গভীর বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় এই পত্রটি থেকে। ঠাকুর-পরিবারের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত পত্রখানি শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র/২য় খণ্ড' সংকলন গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। প্রয়োজন-বোধে পত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশমাত্র এখানে উল্লেখ করা হল।

Allahabad,
28 January, 1869

My dear Ganendra Baboo

...I am sorry I have not received a copy of the Report of the last Choitra Mela (হিন্দু মেলা) ...I think it would be better to make Choitra Mela a properly national undertaking and solicit subscriptions from the Mofussil Gentry (Zamindar & Co.) inviting them Annually by public advertisement to attend the Mela. It would also be good to exhibit toy locomotive and other European machines made by Native artists. Have we got fund for the purpose? Are panegyrical letters signed by the principal members of the committee sent to eminent authors and gentlemen in the Mofussil who take an active interest in Education? I would like to correspond with you on these subjects. I occasionally write to Nobo Gopay Baboo on them but he seldom answers my letters. Perhaps he has not time to do so, being busy with his National paper and the Mela itself....

I remain,
Yours sincerely,
Raj Narain Bose,
C/o. Baboo Nil Comul Mittree.

চৈত্রমেলা বা জাতীয় মেলার সংগঠন এবং কার্যধারা গণেন্দ্রনাথের দ্বারা কতটা গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, এ পত্রে তারও পরিচয় মেলে।

গণেন্দ্রনাথের সময় থেকেই চৈত্রমেলার প্রদর্শনীতে শিল্পকার্যে নৈপুণ্যপ্রদর্শন ও নানান বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের 'হিন্দুমেলা' নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়। চৈত্রমেলার সার্বিক উন্নয়নও এর কর্মাবলীর প্রচার গণেন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান কাজ ছিল। অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে তিনি 'চৈত্র মেলা'কে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত অর্থ-সাহায্যকারিগণের তালিকাতে দেখা যায় গণেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সাহায্য দিয়েছেন একশত টাকা। এ ছাড়া মনে করা যেতে পারে অলিখিতভাবে তিনি প্রয়োজনানুযায়ী অকাতরে সাহায্য করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। গণেন্দ্রনাথের প্রতিটি কাজেই জ্যোতিরিন্দ্রের সশ্রদ্ধ সহযোগিতা ছিল। প্রকৃতপক্ষে গণেন্দ্রনাথই জ্যোতিরিন্দ্রকে হিন্দুমেলায় ও স্বাদেশিকদের সভায় টেনে নেন। ১৮৬৭ থেকে ১৮৬৯ পর পর তিন বৎসর গণেন্দ্রনাথ চৈত্রমেলার সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুমেলা তখনও পর্যন্ত চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেলা নামেই পরিচিত ছিল। মেলার তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই ১৮৬৯ খৃঃ ১৬ই মে তারিখে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে দেশপ্রেমিক গণেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু হয়। ১২৭৬ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁর মৃত্যু-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে লেখা হয়।—

'আমরা অতীব শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বাবু গণেন্দ্রনাথ-ঠাকুর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।---ইঁহার বিদ্যানুরাগিতা, দেশ-হিতৈষিতা ও সামাজিকতা হিন্দু-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।---আমাদিগের নাট্যোৎসাহী বন্ধুগণের মধ্যে আমরা ইঁহাকে একজন প্রধান উৎসাহদাতা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতাম।'—

গণেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে জাতীয় মেলার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল সন্দেহ নেই। কারণ সমকালীন বাংলাদেশে, যে-সময় স্বাধীনতা কামনা ও স্বাবলম্বনলাভের আকাঙ্খার বিচার-ভূমিতে দেশভক্তির ব্যাখ্যা বিস্ময়কর ছিল, সেই সময়ে সেই দেশ-প্রেমের দ্বারাই প্রাণিত মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে গণেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম প্রধান পুরুষ।

গণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর জাতীয় মেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০) সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাদেশিক চেতনার মধ্যে একটি স্থির দীপ্তি ছিল, —দাহিকাশক্তির চেয়ে স্নিগ্ধতার আভাস ছিল বেশি। পিতার ধ্যানগম্ভীর সংগঠনী প্রতিভার স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছিল তাঁর কর্মে ও সাধনায়।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার জন্মকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বাড়ীর স্বদেশচর্চার অস্পষ্ট ভাবনাকে পূর্ণায়তি দিতে চেষ্টা করছিলেন। ভ্রাতাগণের মধ্যে ছিলেন গণেন্দ্রনাথ তাঁর প্রধান সহযোগী। 'স্বাদেশিকদের সভা' এবং 'জাতীয় মেলা' স্থাপনের ব্যাপারেও তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

'দেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশ্য আমাদের বাড়ী হইতে 'হিন্দুমেলা' নামে একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল।— বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং আমার বড়তত ভাই গণেন্দ্রদাদা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন। (দ্রঃ জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি)।

'চৈত্র মেলা'র দেশাত্মবোধের উন্মাদনা দ্বিজেন্দ্রনাথের তৎকালীন কর্মময় জীবনে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ মেলে তাঁর একটি পত্রে। তিনি লিখেছেন :—

'আমার কবিতার স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহার বিশেষ কারণ মেলার হাঙ্গামা।' তাঁর ধ্যানগম্ভীর কল্পনা-লালিত মন তাঁর স্বভাবসুলভ কাব্য-রচনার জগৎ থেকে 'মেলার হাঙ্গামায়'

তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল।

স্বদেশচিন্তার স্বরূপ ও হিন্দু-মেলার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, 'আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দু'চক্ষের বালাই।---আমি গোড়া থেকে সেই স্বদেশী 'কালচার' ধরিয়া বসিয়া আছি; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি।--দেখ, একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের প্যাট্রিয়োটিজম্ বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী। ইংরেজ যেমন প্যাট্রিয়ট আমিও সেই রকম প্যাট্রিয়ট হব—এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি আমি তোমার মত প্যাট্রিয়ট হইব কেন? আমি আমার মত প্যাট্রিয়ট হইতে না পারিলে কি হইল। নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিম্‌ন্যাস্টিক প্রভৃতির প্রচলন করবার চেষ্টা তার খব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁতি কামার কমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম—ও সব ত দেশের সকলের জানা আছে; দেশী পেইনটার দেখাতে পার? সে এক পেইনটিং নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি প্রকাণ্ড ছবি। বিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—উল্টে রাখ, উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী পেইনটিং করিয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ? ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল। তার শৌক ছিল, বড়-বড় ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করা। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করাইলাম।—নবগোপালের সময় থেকে এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।' (দ্র: পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত)।

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘ বক্তব্য তাঁর স্বাদেশিক চেতনার এক মহান গাম্ভীর্যময় রূপকে উদ্ভাসিত করেছে। স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর যে একটা নিশ্চল গোঁড়ামি ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। উল্লেখযোগ্য যে, তা 'ন্যাশনাল নবগোপাল-'এর স্বদেশচিন্তারও উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঠাকুরবাড়ীর জ্যেষ্ঠ সন্তানের এই শ্রেষ্ঠত্বর জন্যই জাতীয় সহযোগীরা নিয়ত তাঁর সুচিন্তিত সদ্‌পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

[ক্রমশ।

উডওয়ার্ক

শিল্পী : সৌমেন চক্রবর্তী

মৃত যশ ও জীবন্ত জনপ্রিয়তা

হীরালাল দাশগুপ্ত

কালিদাস তো নামেই আছে, আমি আছি বেঁচে। "সহজ কথা যায় না বলা সহজে" কিন্তু কঠিন কথা যায় যে বলা সহজে। এই একটি অতি কঠিন কথা কবিগুরু কী সহজেই না বলেছেন। অতি সত্যি—কঠিন সত্য—কালিদাস আজ শুধু তাঁর নামের মধ্যেই কবরস্থ। তাঁর অদ্বিতীয় কবি-প্রতিভার অনবদ্য অবদানের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে কালিদাসকে কেউ আর এই ১৯৬১ সালে খুঁজতে যায় না।

এর চেয়েও নির্মম সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে কালিদাস আছে নামে কিন্তু 'আমি আছি বেঁচে', সেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আজ শুধু নামেই আছেন—বেঁচে নেই। তাঁর মৃত্যু হোয়েছে বহু দিন—অনেক অনেক বছর আগে।

এই মৃত্যু নিমতলা ঘাটে শরীরের ভস্মরাশিতে পরিণতি নয়—এ দেহের বৈজ্ঞানিক রূপান্তর নয়—এ মৃত্যু যুগে যুগে বছরে বছরে—সামাজিক আর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের প্রেতায়িত পরিণতি।

যশ থাকে বইয়ে—জনপ্রিয়তা জনসাধারণের মনে। কাল যা ছিলো 'হট্ কেক' আজ তা পচা শুয়োরের মাংস। যে 'পপুলার'—পাঠকরা তার প্রশংসা আর যে 'আন-পপুলার' তার করে নিন্দা, অর্থাৎ দুজনকেই তারা—পাঠকরা মনে রাখে—কাউকে বলে ভালো, কাউকে বলে মন্দ। অতএব এরা দুজনে 'পপুলার' এবং 'আন-পপুলার' অর্থাৎ বেঁচে আছে—এরা জীবিত।

এককালে যত নামই থাকুক না কেন, আজ যাকে কেউ ভালো বা মন্দ কিছুই বলে না —তার লেখা পড়ে না—তার গান শোনে না—তার ছবি দেখে না —সে মৃত। যার শরীর বেঁচে থাকা পর্যন্ত নাম বেঁচে থাকে সে মহাসুখী। যার দৈহিক মৃত্যুর পূর্বেই —অনেক আগেই নাম— সাহিত্যিক-খ্যাতির—মৃত্যু হয়, তার মতন হতভাগ্য আর কেউ নেই।

বছর আট-তিরিশ আগে—(ধরা যাক ১৯৩৮ থেকে ১৯৫০) যেসব লেখকরা ছিলো জীবিত —জীবন্ত—জাজ্বল্যমান—পাঠক-প্রীতিতে পরিতৃপ্ত —কোথায় —আজ তারা কোথায়? কোথায় সেই 'ব্রিলিয়ান্ট' বুদ্ধদেব বসু? কোথায় সেই 'অরিজিন্যাল' অচিন্ত্য সেনগুপ্ত? কোথায় সেই 'পাঁক্যান্ট' প্রেমেন্দ্র মিত্র? কোথায় সেই 'সোবার' শৈলজানন্দ? কোথায় সেই 'প্যাশনেট' প্রবোধ সান্যাল? আর কোথায় সেই সবার উপরে ন্যাচারাল নজরুল ইসলাম?

এরা সকলেই জীবিত, কিন্তু সকলেই মৃত। কীর্তিনাশা মহাকাল এদের কীর্তি নাশ কোরেছে। কারণ কী এই অবক্ষয়ের? কারণ শিল্প অমর নয়—এবং সে-হেতু শিল্পীও অমর নয়। অথচ সেই সময়ের লেখক কিংবা পাঠক যাকে আধুনিক ঔপন্যাসিক বলে গণ্য কোরতো না, সেই 'টিমিড' তারাশঙ্কর পেয়ে গেলো পুরস্কার লক্ষ টাকা আর ডি-লিট ডিগ্রী।

যেমন মানুষ বিশেষ মরণশীল অনিত্য—অসৎ, কিন্তু মানব সমাজ দীর্ঘায়ু। পুরাতন মানুষ চলে যায়, নতুন মানুষ আসে। তেমনি পুরানো সাহিত্য বিদায় নেয় বিস্মৃতির অন্তরালে, নোতুন মানুষের জন্যে সৃষ্টি হয় নোতুন সাহিত্য —নতুন শিল্প।

বিশেষ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয় বিশেষ সাহিত্য ও শিল্পকলার। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় সাহিত্যের মূল্যায়নের মানদণ্ড। রামায়ণ মহাভারত বেদ কি গীতা আজ আর কেউ পড়ে না। কালিদাসের প্রতিভা কলেজের পাঠ্যতালিকায় সীমাবদ্ধ। সাধারণ পাঠক আগ্রহ নিয়ে আর পড়ে না মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এমন কি বঙ্কিম-সাহিত্য। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তাও স্তিমিত হোয়ে আসছে। কয়জন পাঠক আজ পড়ে মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' আর সেক্সপিয়রের সমগ্র নাট্যসাহিত্য।

মানুষের মৌলধর্ম যদিও যেমন ছিলো রামায়ণের যুগে ঠিক তেমনি আছে আজও —সেই আহার, নিদ্রা, মৈথুন—তথাপি এই মৌল প্রকৃতির ভিত্তির ওপর আজ যে বিরাট অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইমারৎ গড়ে উঠেছে তা যুগপৎ বিচিত্র ও বিকৃত —সুন্দর ও কদর্য। অসংখ্য লেখক আর সংখ্যাতীত পাঠক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম ও প্রধান বলি সত্য ও নীতি। না লেখক, না পাঠক, কেউ চায় না শান্তি—সকলে চায় সুখ—চায় না কেউ আনন্দ—চায় সবাই উত্তেজনা। শক্তি নেই শরীরে—টাকা নেই পকেটে—শান্তি নেই মনে—শুধু চোখে জ্বলে দাউ দাউ ক্ষুধার আগুন।

এই বিকৃত রুচির ফল আধুনিক বিকৃত সাহিত্য এই গরম—জীবন্ত জনপ্রিয়তার প্রচণ্ড আকর্ষণে আধুনিক লেখকগণ যে সাহিত্য দিনের পর দিন প্রসব কোরছেন তা আদৌ সাহিত্য পদবাচ্য কিনা তা বিচার কোরবে পাঠকসাধারণ এবং সুধিবৃন্দ। কিন্তু ভরসার কথা যে এই জনপ্রিয়তা এত ক্ষণস্থায়ী এবং পাঠক মনে এর প্রভাব এতোই মূল্যহীন যে এই সব রচনার সাহিত্যিক কিংবা সামাজিক মূল্যায়নের প্রশ্ন ওঠে না।

যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পাঠক-

সাধারণের মনে সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগ্রত ও আনন্দলোকের সৃষ্টি কোরে তার চিত্তকে পরিস্রুত এবং চরিত্রকে বিমুক্ত করে। যে-হেতু, যেখানে সৌন্দর্যের অনুভূতি আর উপলব্ধি আনন্দের, সেখানে স্থান নেই নীচতার কিংবা সঙ্কীর্ণতার।

এক শ্রেণীর লেখক এবং পাঠক মনে করেন যে, যা কিছু সত্য তাই সাহিত্যের উপজীব্য। তাঁরা ভ্রান্ত। চাই সত্য আর সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ। ক্ষর এবং অক্ষরের যিনি অতীত হয়ত তিনি সত্য, শিব এবং সুন্দর। কিন্তু বাস্তব জগতে যা-কিছু সত্য তাই সুন্দর মঙ্গলময় নয়।

গোলাপ ফুল, সূর্যাস্ত কিংবা সমুদ্র সত্যও বটে সুন্দরও বটে। মাতৃস্নেহ সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলময়। কিন্তু সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্যানসার ইত্যাদি কঠিন সত্য, কিন্তু সুন্দর নয়—মঙ্গলময় নয়। আধুনিক জীবনে দারিদ্র্য নিষ্ঠুরতম সত্য, কিন্তু এর চাইতে কুৎসিত আর কদর্য বস্তু আর মনুষ্য সমাজে নেই।

সুতরাং জীবন্ত জনপ্রিয়তা আর উত্তপ্ত অর্থের মোহে সত্য তথা বাস্তববাদিতার ছলনায় কুৎসিত আর কদর্য বস্তুর সৃষ্টি করা যে-কোনও মানুষের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

আবহ-সঙ্গীত

শুভদ্রা ভট্টাচার্য

রুদ্রযুগের কলতান ওঠে বেজে,—
নিঃসীম অন্ধকার মাঝে,
রাত্রির নীরবতা কেটে,
জ্যোৎস্নার আলো লুটে,
নক্ষত্রহীন এই অমানিশার জগতে।
এয় জীবিত প্রাণীদের সেই কলতান,—
দুঃস্বপ্নের মত মনকে করে উন্মন,
দিনের আলো ঢেকে যায়
অনাবিল রাতের কালো কুয়াশায়,
জীবনের জয়গান থেমে গেল আজি এই প্রাতে।
এ যেন জয়যাত্রার পথে কিছু থেমে থাকা,
স্বপ্নহীন রাত্রির নিস্তব্ধ ছবি আঁকা,
কল্পনার খেয়া তরী বেয়ে চলে যাওয়া,
সুদূরের প্রত্যাশার মাঝে কিছু পাওয়া,
"—শুরু হল বিশ্রাম এই অকম্পিত নীরব রাতে"।

জগতের কথা লেখা থাকে
পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অশ্রুঝরা পাঁকে,
শেষ হতে চায় না সে কথা,
জাগিয়ে দিতে চায় মনের গুপ্তকথা,
"ভেঙে দিয়ে জগতের নীরবতা রুদ্রদেবতার সঙ্গীতে"।

ওই বুঝি ওঠে বেজে দেবতার গান,—
"রুদ্রদেবতার বীণার কলতান",
জগতের অপরাধ যায় ধুয়ে মুছে,
জ্বলে ওঠে জীবনের জয়গান মানুষের কাছে,
দেবতার সুর হল দেওয়া মানুষের কল্পনার অমরাবতীতে।
সেই সুর ধ্বনিয়া ওঠে মানুষের জীবনে,
প্রলয়ের কথা থেকে যায় হারিয়ে যাওয়া গানে,
মনের সমস্ত দুয়ারগুলো খুলে
জীবনের অতীতের—কাহিনীর মিছিলে,
সুর জেগে ওঠে মানুষের জীবন-সঙ্গীত, "প্রভাতীতে"।

সেই বার্তা চলে যায় দূরে,—
নাম না জানা পাখীরও ছোট্ট নীড়ে
চিরচঞ্চল স্রোতময় বাতাসে,
শরতে মেঘমুক্ত আকাশে,
ধ্বনিয়া ওঠে পৃথিবীর বুকে জেগে থাকা চিরন্তনাতে।

সে অমৃতের নিয়ে এলো ধীরে,
এই পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া কল্পনালোকের ভোরে,
জীবনের জয়যাত্রার রথের যাত্রা হল শুরু,
থামে না সে কোথাও যেন সে এক ভীষণ বোমারু,
হারিয়ে যাবে এই পৃথিবীর সমস্ত অনাবিলতাতে।

LUX

ভাগ্য-নিয়ন্তা

—প্রদীপ সেন

।। মাসিক বসুমতী ।।

।। ফাল্গুন, ১৩৭৫ ।।

একলব্য

—শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

—অভিজিৎ দাশগুপ্ত

দিদি আর আমি

—নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং ছোটবোন

—নারায়ণ চক্রবর্তী

—তাপসকুমার চৌধুরী

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন। ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন
* ছবি পাঠাবেন এই নামে—

সম্পাদক, মাসিক বসুমতী

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ

কলিকাতা-১২

ভোর হ'ল

—বিনোদ রক্ষিত

নারায়ণ মূর্তি — শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

রোমের কলিসিয়াম — রথীন রায়

জন্মান্তরের সূত্র সন্ধানে

॥ বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ॥

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥
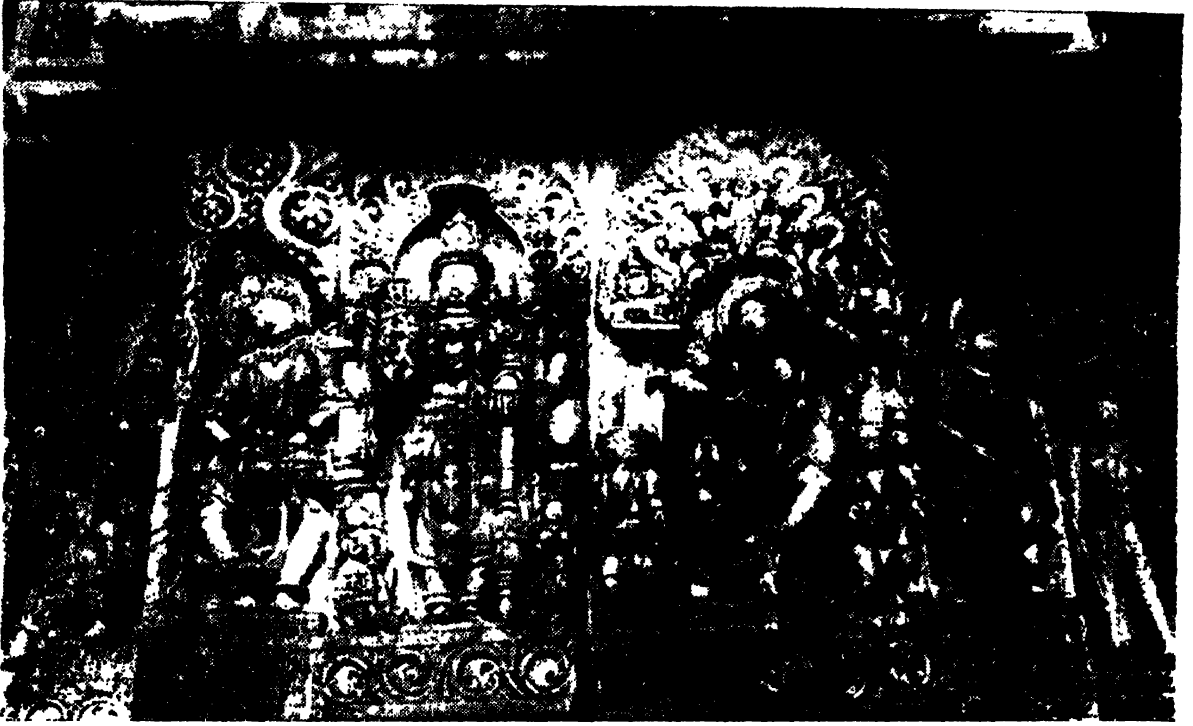
॥ নয় ॥

বিজ্ঞানের কোন্ শাখা জন্মান্তরবাদের বিষয় গবেষণা করে?

ব্যবহারিক বিজ্ঞান পুনর্জন্মের সমস্যা ও সম্ভাবনার উপর কোন আলোকপাত করতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বারবার এ ধরণের ঘটনার আবির্ভাবে পরা-মনোবিজ্ঞানীরা এর সম্ভাব্য উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু বেশির ভাগ পরামনোবিজ্ঞানীরাই জন্মান্তর-বাদের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান না। তাঁরা সাধারণত নীচে উল্লেখিত মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে (সাই ফেনমেনা) গবেষণা করে থাকেন।

অন্য ব্যক্তির চিন্তাপঠন (টেলিপ্যাথি)

অপর ব্যক্তির চিন্তা পাঠ করবার শক্তি অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিয়ে এটি বোঝান যাক্।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় জনৈক সৈনিককে আহত অবস্থায় তার বাড়ী থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সৈনিকটি তার স্ত্রীকে প্রত্যেকদিন চিঠি লিখতো। একদিন তার স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে কোন চিঠি পায় না। সেদিন রাত্রি আটটার সময় বসবার ঘরে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে স্বামীকে টেলি-ফোন করার প্রবল বাসনা হয়। বাসনা তাকে এত বেশী আচ্ছন্ন করে যে মহিলাটি বাস্তবিকপক্ষে অন্য ঘরে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে ডায়াল করতে উদ্যত হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় একমাত্র প্রকৃত সঙ্কটের সময় ছাড়া হাসপাতালে টেলিফোন না করার বাধ্যবাধকতা থাকায় মহিলাটির টেলিফোন করা হয় না। পরের দিন দুটো চিঠি আসে। প্রথম চিঠিতে, যেটির আগের দিন আসার কথা ছিল, তার স্বামী ভদ্রমহিলাকে আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে টেলিফোন করার জন্য অনুরোধ করে। দ্বিতীয় চিঠিতে আশাহত সৈনিক জানতে চায় টেলিফোন না করার কী কারণ ছিল। সে আরো জানায় যে ঐদিন আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সে টেলিফোনের পাশে অপেক্ষা করেছিল।

অন্যের চিন্তা পঠনের এই মানসিক প্রতিক্রিয়াটি পরামনোবিজ্ঞানীদের গবে-ষণার একটি বিষয়।

তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ-দর্শন (ক্লেয়ারভয়েন্স)

শারীরিক ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষমতার বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনার অনুভাবনা করার বিশেষ শক্তিকে বলা হয়। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বাড়ী থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এক হোটেলে জনৈক যবক সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলি উপভোগ করছিল। হঠাৎ রাত্রে সে স্বপ্নে দেখে যে তার বাড়ীতে আগুন লেগে গেছে। আতঙ্ক-গ্রস্তভাবে ঘুম থেকে উঠে সে বাড়ীর দিকে যাবার জন্য তৈরী হতে থাকে। স্বপ্ন সাধারণত সত্য হয় না একথা বুঝিয়ে তার মা তাকে বিরত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ছেলেটি কোন আপত্তি না শুনে দ্রুত গাড়ী চালিয়ে বাড়ী আসে এবং দেখে তার স্বপ্ন সত্য। বাইরের দিকের গ্যারেজটি তখন সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে এবং আগুন বাড়ীর দিকে ধাবিত হচ্ছে। পাড়া প্রতি-বেশীদের সহায়তায় বহু কষ্টে আগুন নিবিয়ে ফেলায় বাড়ীটি সে যাত্রায় রক্ষা পায়।

ক্লেয়ার ভয়েন্স চারিত্রিক গুণে অনেকটা টেলিভিসনের মতই কার্যকরী। মানব মনের এই বৈশিষ্ট্যটি পরামনো-বিজ্ঞানীদের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভবিষ্যদ্বাণী (প্রেডিকসন)

অদূর ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে চলেছে তা পূর্বাহ্নেই অনুধাবন করার বিশেষ ক্ষমতাকে বলা হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ডাঃ লাই-বেল্টের নোটবই থেকে এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। ঘটনাগুলি বিচিত্র ও চমকপ্রদ।

১৮৮৬ খৃঃ ৭ই জানুয়ারী জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক ডাঃ লাইবেল্টের কাছে পরামর্শের জন্য আসেন। প্যারিসে থাকার সময় ভদ্রলোক ১৮৭৯ খৃঃ ২৬শে ডিসেম্বর আত্মার সঙ্গে যোগা-যোগকারী এক 'মিডিয়ামের' সঙ্গে কৌতুহলবশে দেখা করেন। 'মিডি-য়াম' ভদ্রমহিলাটি জানান—'আগামী বছরের এইদিনে আপনি আপনার পিতাকে হারাবেন। তার অল্প কিছুকাল পরেই আপনি সৈন্যবাহিনীতে কাজ করবেন। খুব কম বয়সে আপনার বিবাহ হবে এবং দুটি ছেলেমেয়ের জন্মের পর মাত্র ২৬ বছর বয়সে আপনার নিজের মৃত্যু হবে।

মঁসিয়ের বয়স তখন উনিশ বছর। ১৮৮০ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর মঁসিয়ে তাঁর পিতাকে হারালেন। এরপর তিনি ন'মাসের জন্য ফরাসী-সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন এবং তাঁর খুব অল্প-বয়সে বিবাহ হয়। বর্তমানে তিনি দুটি ছেলেমেয়ের জনক। তাঁর ২৬ বছর বয়স হতে মাত্র অল্প কয়েকদিন বাকী আছে। তিনি খুব শীগগির মৃত্যুমুখে পতিত হবেন ভেবে ভীষণ মুষড়ে পড়ে-ছিলেন।

ডাঃ লাইবেল্ট মঁসিয়েকে এই বিভীষিকাময় চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি অপর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মঁসিয়ের আলাপ করিয়ে দেন। এই ভদ্রলোক কিছুকাল আগে ডাঃ লাইবেল্টের বহুদিনের

পুরোনো বাতের ব্যথা সেরে যাওয়ার এবং তাঁর কন্যার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ভদ্রলোক যুবক মঁসিয়ের মনের জোর ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে উদ্দীপ্ত করতে থাকেন। মঁসিয়েকে দু' তিনদিন পরীক্ষা করার পর তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে ৪১ বছর বয়সের আগে তাঁর মৃত্যু হবে না।

এর ফল আশ্চর্যজনকভাবে ভাল হয়েছিল। মঁসিয়ে ক্রমশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং তাঁর ২৬তম জন্মদিন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কেটে যাওয়ার পর তিনি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে থাকেন। মানসিক চিকিৎসার দ্বারা এখানে যুবকটিকে তাঁর মৃত্যুভীতি থেকে মুক্তি দিয়ে মনের স্থৈর্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কার্যকরী হয়।

এরপরে কেবল কাহিনীর একটি কথাই লেখার বাকী আছে। ১৮৮৬ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর সপ্তবিংশ বছর নির্বিঘ্নে কাটবার বেশ কিছু আগেই মঁসিয়ে হঠাৎ মারা যান। ডাঃ লাইবেল্টের বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও সেই 'মিডিয়াম' ভদ্রমহিলার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়।

প্রধানত এই ধরণের ঘটনাগুলি এবং মানবমনের অন্যান্য বিচিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি পরামনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার মুখ্য বিষয়বস্তু। সম্প্রতি পুনর্জন্মের ঘটনাতে পরা-স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ থাকায় তা নিয়ে গবেষণা সুরু করা হয়েছে। পরামনোবিজ্ঞানীরাই এই পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কোরিয়ার একটি কাহিনী

সাধারণ বিদ্বৎ সমাজ অপ্রাকৃত ও অশারীরিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাস করলেও বিজ্ঞানীরা তা মানতে রাজী থাকেন না। শিশুদের অসাধারণ প্রতিভার যে-সব কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় সেগুলি পুনর্জন্মের সম্ভাবনাকে আরো জোরদার করে তুলেছে। কেন না জন্মান্তর বাদ না মানলে এ ধরণের শিশু-প্রতিভার সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

কোরিয়ার শিশুটির [illegible] কিম ইয়ং-এর ঘটনা এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই বালক প্রচলিত প্রথায় বিদ্যাভ্যাস না করেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। মাতৃভাষা কোরিয়া ছাড়াও ইংরাজী ও জার্মানীতে তাঁর অগাধ জ্ঞান। ডিফারেন্সিয়াল ও ইণ্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের অত্যন্ত কঠিন সমস্যাগুলি বালক ইয়ং অবলীলাক্রমে সমাধান করে দেয়। পরিণত বয়স্কদের মতই ছোটছোট অত্যন্ত সুন্দর কবিতা লেখে। সম্প্রতি সে আমেরিকার কলেজে ভর্তি হবার আবেদন পাঠিয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইয়ংয়ের জ্ঞানের চেয়ে বয়স নিয়ে ভাবনায় পড়েছেন।

এ ধরণের ঘটনা একাধিক পাওয়া যায়। ওয়াশিংটনের সরকারী তহবিল-খানার (ট্রেজারি) সেক্রেটারী আলেকজেণ্ডার হ্যামিলটন বারো বছর বয়সে পড়াশোনা না করেই অনর্গল শুদ্ধ ফরাসীতে কথা বলতে পারতেন।

অতি সম্প্রতি এক রিপোর্টে জানতে পারা গেছে একজন আমেরিকাবাসী নির্ভুল সংস্কৃত বলতে পারছেন, যদিও কোনদিন সংস্কৃতের চর্চা তিনি করেন নি।

বিজ্ঞানীদের এযাবৎ আবিষ্কৃত কার্যকরণ নির্ধারণের সংজ্ঞায় সাধারণভাবে যেগুলির কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ সহজ কথায় 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না' এমন ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করাই পরামনোবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। তাই তাঁরা এই শিশু-প্রতিভা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করেন কিন্তু পরবর্তী ঘটনাতে পুনর্জন্মের যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁরা বেশি আগ্রহী।

থাইল্যাণ্ডের ঘটনা

ঘটনাটি রাজকীয় থাই সৈন্যবাহিনীর এক সার্জেণ্ট সম্পর্কে। সার্জেণ্ট থিয়েনের সারা বাঁ কানের উপরের অংশে রোগের জন্য থেকেই এক বিকৃত ক্ষতের দাগ ছিল। সার্জেণ্ট দাবী করে যে সে পূর্ব-জীবনের স্মৃতি স্মরণ করতে পারে। গরু-বাছুর ইত্যাদি চুরি করার অপরাধে কয়েকজন গ্রামবাসী তাকে ছুরিকাঘাত করে। বর্তমানে যেখানে ক্ষতচিহ্ন ছুরির আঘাতে সেখানেই লাগে। মৃত্যুর পর বিদেহী অবস্থায় সে তার মৃতদেহ দেখেছিল এবং পরবর্তী মানব-জন্ম গ্রহণের ও অত্যন্ত শিশুকালের সব ঘটনা বিশদ বর্ণনা করতে পারে।

পূর্বজন্মে মৃত্যুর সময় ডান পায়ের পাতায় তার এক গভীর ক্ষত ছিল এবং হাতে ও পায়ে উল্কির দাগ ছিল। বর্তমান জীবনে পায়ের পাতায় সেই ক্ষতের দাগ আছে এবং জন্মের সময় হাতে পায়ে উল্কির দাগের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। সার্জেণ্টের কাহিনী সেই গ্রামের প্রধান, সৈন্যবাহিনীর অফিসারেরা এবং পরিবারের লোকে সমর্থন করেন।

সৈন্যবাহিনীতে সকলে সার্জেণ্টকে জমিদার বলে ডাকে। কারণ মিলিটারী ক্যাম্পের পাশে এক অংশের জমির মালিক সে গতজীবনে ছিল এমন দাবী নাকি সার্জেণ্ট করে থাকে।

পরামনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার এ ধরণের অসংখ্য কেসের রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করা আছে। কি করে অনুভাবী তার বিগত জীবনের স্মৃতি স্মরণ করতে পারে বিজ্ঞানীরা এখন তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

॥ অশ ॥

জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত আলোচনার মূল্য কী?

বর্তমান যুগে সব কিছুকেই যখন তার ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক মূল্যে যাচাই করা হয় তখন এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক পুনর্জন্মের কোন ঘটনার খবর যখন সংবাদপত্রে বা অন্যত্র প্রচারিত হয়—যাদের সে বিষয়ে আস্থা থাকে তারা সেটিকে মেনে নেয় বিনা দ্বিধায়। এর মধ্যে যে রিসার্চ করবার কোন কিছু থাকতে পারে বা প্রয়োজন আছে তা তারা ভাবতে পারে না। তাদের কাছে পুনর্জন্ম একটি নির্ধারিত সত্য। আর যাদের জন্মান্তরবাদে আস্থা নেই তারা

ব্যাপারটিকে বুজরুকি বলে মনে করে এবং এ বিষয়ে গবেষণা করাটা তাদের কাছে প্রায় পাগলামির সামিল।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যিনি এ দু'দলের কোন দলেই পড়েন না তাঁরা বিষয়টিকে যাচাই করে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতে যে মানসিক বৈশিষ্ট্যের ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে তাকে অস্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। এটিকে স্বীকার না করলে কোন সমাধানেই আসা যায় না। ধরে নেওয়া যাক একটি চার বছরের ছেলে পূর্ব-জীবনের স্মৃতি স্মরণ করতে পারছে। এমন খবর পাওয়া গেল। রিপোর্টে আরো জানা গেল যে সে অতীত জীবনের সমস্ত প্রধান ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে এবং যখন তাকে পূর্ব-জীবনের পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে একাই পথ চিনে নিজের পুরানো বাড়ীতে ফিরে গেছে---সেখানে পরিবারের অন্য আত্মীয়দের ও পরিচিতদের চিনতে পর্যন্ত পারছে। কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্পন্ন মানুষের বিষয়টিকে 'গাঁজাখুরি' বলে উড়িয়ে দেওয়ার এবং যারা বিষয়টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করছেন তাঁদের গবেষণাকে সময় ও শক্তির অনাবশ্যক অপচয় বলে ঘোষণা করার প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য কিনা এটা ভেবে দেখা দরকার।

আমরা এখানে বার্মার পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী উ নু-র মত দায়িত্বশীল ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবো জন্মান্তরবাদ নিয়ে গবেষণা করার কোন প্রয়োজন ও মূল্য আছে কি না?

বার্মা দেশের ঘটনাবলী

বার্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ-নু বৌদ্ধধর্মমত সম্বন্ধে উল্লেখ করার সময় জন্মান্তরের ঘটনা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৪৭ সালে মন্ত্রিসভার পতনে বিদায়ী বার্তামন্ত্রী ডিবক উ-বা-চোর আত্মীয়ার কাহিনীটি প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন। সেই ভদ্রমহিলা যখন মারা যান তখন একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে মহিলাটি তাঁর কোন এক আত্মীয়ার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। ভবিষ্যদ্বাণীতে আরো উল্লেখ ছিল যে, তার পিতা সরকারী পদাধিকারী হবেন এবং কোন বুধবার ছেলেটি জন্মগ্রহণ করবে।

ভদ্রমহিলার পরিবারের সকলেই এই ভবিষ্যদ্বাণীকে বিশেষ আমল দেন নি কারণ তাঁদের পরিবারের কেউই সরকারী অফিসারের সাথে বিবাহিত নয়। কিন্তু মহিলার মৃত্যুর অল্প পরেই তার নিজের মেয়ের সঙ্গে জনৈক সরকারী অফিসারের বিবাহ হয় এবং এক বুধবার তাদের প্রথম পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

শিশুটি যতই বড় হতে লাগল ততই দুরন্ত হয়ে উঠতে লাগল এবং নিজের পিতামাতার চেয়ে মৃত মহিলার অন্তরঙ্গ বন্ধু এক মামীর কাছে থাকতে বেশি ভালবাসতো। পরিবারের ও অন্য পাড়া-প্রতিবেশীদের গহনাপত্র একসঙ্গে রেখে পরে সেই বালককে দেখানো হলে সে বিনা দ্বিধায় পান্না বসানো একটি আংটি বেছে নেয়। এই আংটিটি মৃতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

উ নু অন্য আর একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় উদাহরণটি বার্মার প্রসিদ্ধ নর্তকী ব্যালবিয়ানের। সে প্রধানমন্ত্রীকে এক সময় জানিয়েছিল যে আগের জীবনে সে একজন বিখ্যাত পুরুষ-নর্তক ছিল। তখন তার নাম ছিল আ-ঙ্গবালা।

প্রকৃতই বার্মা দেশে আ-ঙ্গবালা নামে এক নর্তক বর্তমান নর্তকীর জন্মের বহু পূর্বে জীবিত ছিলেন। তার বিগত জীবন সম্পর্কে নর্তকীটি যে সব গোপনীয় কথা উল্লেখ করে তা স্বাভাবিকভাবে জানা সম্ভব নয়। মহিলা নর্তকীর শরীরে জন্ম থেকেই অস্ত্রোপচারের দাগ ছিল। জানা যায় আ-ঙ্গবালা অস্ত্রোপচারের সময় মারা যায়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় উদাহরণ দা উন নামে এক বৃদ্ধ মহিলার। দা উন তাঁর বড় বোনের স্বামীকে বিবাহ করেছিলেন। তার বড় বোন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অপারেশনের সময় মারা যায়। পরে দা উনের একটি মেয়ে জন্ম নেয়। তার গলায় অস্ত্রোপচারের দাগ ছিল। মেয়েটি তার মৃতা সংসার সব ঘটনা বলতে পারতো এবং দা উন মৃতার ছেলে-মেয়েদের অন্যায় শাস্তি দিত এমন কথাও জানায়। সে তার সৎ ভাইবোনেদের জননীর স্নেহ-মমতা দিয়ে আদর যত্ন করতো।

সমালোচনা

জন্মান্তরবাদের ওপরে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের সময় সময়ে 'বৃথা বাক্যব্যয়ী' ও 'হাতুড়ে' এবং তাদের গবেষণার কোন 'ধারাহিকতা নেই' বলে আক্রমণ করা হয়ে থাকে। নানা কাহিনী ও কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ হওয়াতে এখন এ ধরণের সমালোচনা কিছুটা কমেছে। পক্ষান্তরে সাধারণ বিজ্ঞানসমাজ এই নূতন বিষয়টিকে গবেষণার যোগ্য বলে স্বীকার করেছেন। জ্ঞান তিলেখা নামে সিংহলের মেয়েটির কাহিনী এমনই এক চমকপ্রদ ঘটনা। কাহিনীর সারাংশ আমরা উৎসাহী পাঠকদের জন্যে এখানে উল্লেখ করলাম।

সিংহলের ঘটনা

জ্ঞানতিলেখা বাড়ডেউইথানা মধ্য সিংহলের হেদুনাউয়া নামক স্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে ১৯৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করে। মাত্র এক বছর বয়সের সময় সে অন্য এক মাতা-পিতার কথা বলতে সুরু করে এবং বছর দুয়েক বয়সের সময় পূববর্তী জীবনের স্পষ্ট উল্লেখ করে। সে জানায় অন্য এক স্থানে তার মা-বাবা ও ভাই-বোনেরা আছে। প্রথমে সে পূর্বের জন্মস্থানটির নাম বলতে পারে নি। কিন্তু কিছুকাল বাদে তাদের বাড়ীতে তালাওয়াকেলা শহর থেকে কয়েকজন অতিথি বেড়াতে আসেন। তাঁদের কাছে

ঐ শহরের নাম শোনামাত্রই সে জানায় তার পর্বের বাড়ী তালাওয়াকেলা শহরে। এরপর সে সেখানে যাবার বাসনা জানায় এবং সে বাড়ীর অন্য সকল আত্মীয় স্বজনের ও শহরের বিস্তারিত কাহিনী বলতে থাকে।

জ্ঞানতিলেখার বিবরণের সাথে তালাওয়াকেলা শহরের একটি পরিবারের হুবহু মিল দেখা যায়। ১৯৫৪ খৃঃ ৩ই নভেম্বর তিলেকারত্ন নামে তাদের এক ছেলের মৃত্যু হয়। ১৯৬০ সালে জ্ঞানতিলেখার পিতা-মাতা তাকে সেই সহরে নিয়ে যান। সে সঠিকভাবে শহরের অনেকগুলি বাড়ী চিনতে পারে। অবশ্য তাদের নিজেদের বাড়ী যেখানে আছে বলে সে সকলকে নিয়ে আসে সেখানে সেই পুরানো বাড়ীটিকে আগেই ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং বাড়ীর লোকেরা অন্যত্র চলে যায়।

তিলেকারত্ন নামে যে ছেলেটির কথা মেয়েটি জানায় তারা অবশ্য ঐখানেই আগে থাকতো এবং বারো বছর বয়সে ১৯৫৪ সালে তার মৃত্যুর অল্প পরে তার পিতা-মাতা সে অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করেন। জ্ঞানতিলেখার প্রথম যাত্রায় দুই পরিবারের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

তালাওয়াকেলা থেকে বারো মাইল দূরে হাটন শহরের শ্রীপদ কলেজে তিলেকারত্ন লেখাপড়া করতো। সেই স্কুলের তিনজন শিক্ষক জ্ঞানতিলেখাকে দেখতে আসেন এবং সে তিনজন শিক্ষকের সঠিক পরিচয় দেয়। পরে সে স্কুলের অনেক ঘটনার উল্লেখ করে।

১৯৬১ সালে জ্ঞানতিলেখাকে পুনরায় তালাওয়াকেলা শহরে আনা হয় এবং পরীক্ষা করার জন্য তিলেকারত্নের আত্মীয়দের সনাক্ত করতে বলা হয়। মেয়েটি প্রত্যেককে যথাযথ চিনতে পারে। সে সমবেত সকল লোকেদের মধ্যে ছেলেটির সাতজন আত্মীয় ও পরিবারের দুজন পরিচিত লোকের সকল পরিচয় বলে দেয়।

পূর্ব-জীবনের কথা স্মরণ করতে পারে এমন ব্যক্তিদের খবর প্রতিনিয়তই পাওয়া যায় কেন না এগুলি মুখরোচক আলোচনার বিষয়। তাই আজ বহু বৈজ্ঞানিক জন্মান্তরবাদ নিয়ে জোর করে ভেবে দেখতে সুরু করেছেন।

আধ্যাত্মিক নিয়ম

জড়বাদী বিজ্ঞানের প্রভাবে আমরা জানতে পেরেছি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সকল কিছুই কাল, গতি ও পদার্থের বাস্তব নিয়মে নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং সেখানে অশরীরী কোন কিছুর স্বীকৃতি নেই।

কিন্তু পুনর্জন্মের ঘটনা থেকে আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটি বস্তু আছে যা কি না পদার্থ ও শরীর-বিদ্যার আওতার বাইরে কার্যকরী। সেজন্যিকে সে কারণে আধ্যাত্মিক নিয়মে পরিচালনাধীন বলা চলে। আর আধ্যাত্মিক নিয়মের অস্তিত্বও সেজন্য মানতে বাধ্য হতে হয়।

পরামনোবিজ্ঞানীদের জন্মান্তরের ওপরে গবেষণা একদিন এমন এক অস্ত্রে আধ্যাত্মিকবাদীদের বলীয়ান করবে যার কোন উত্তর জড়বাদী-বিজ্ঞানের গবেষকদের জানা থাকবে না। পরিশেষে আমরা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্সলের উদ্ধৃতি স্মরণ করবো—

'The doctrine of reincarnation has its roots in reality. None but the very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity.'

অনুবাদক—জ্যোতির্ময় দাশ

॥ অজানা ॥

সম্পদ এবং সুখ

সম্পদের সঙ্গে সুখের সম্পর্ক কতটুকু। বিত্ত কি সুখের আকর? বিত্তহীনতা অ-সুখের?

এক কথায় এর উত্তর দেওয়া শক্ত।

তবে, ইংলণ্ড-এর ধনী ব্যবসায়ী রোনাল্ড জে হুগেট্-এর মতে সম্পদের প্রাচুর্য অ-বাঞ্ছনীয়। বছর ষোল আগে তিনি এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দামে 'কান্ট্রি ম্যানশন' কিনেছিলেন উনি—অথচ, কিছুদিন আগেও ইনি ছিলেন একজন অ-সফল ব্যবসায়ী। দেখতে দেখতে তার বরাত খুলল। ক্রমে তিতাল্লিশটা খাবারের দোকানের মালিক, এবং লিভারপুল-এর একটা বিরাট খাদ্যোৎপাদন ফার্ম-এর চেয়ারম্যান হলেন। কিন্তু নাবিকের মত চেহারার এই ভদ্রলোকটি পেন্জ-এর হাই স্ট্রীট-এ একটা কসাই-এর দোকান কেনেন এবং ব্যবসায় মন্দা হওয়ায় মাত্র এগার সপ্তাহ পরে দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হন।

তার মন্তব্য : 'এখন এইসব সম্পত্তির মালিক হয়ে আমার কখনও কখনও মনে হয় যখন একটা দোকান ছিল তখন অধিকতর সুখী ছিলাম, তখন আমি টেনিস খেলার আর মোটর-রেস-এ যোগ দেওয়ার সময় করে নিতাম।'

বিপদ-অহংকার জাগছে

যার নম্রনত হৃদয় জীবনের আদর্শ সম্পদগুলি সঞ্চয় করে, সুখ-শান্তির উপহারের রাশি তারই ভাগ্যে উপচে পড়ে।

অসীম বর্ধন

আশ্চর্য হওয়া, অবাক হওয়াটাই বোধ হয় এ-জগতের সবচেয়ে প্রাচীন আবেগ-অনুভূতি। জীবন-অভিজ্ঞতার অবিশ্বাস্য হরেকরকম বিস্ময়ের প্রতি চেতনার আদিম সাড়া বোধ হয় এই আবেগ-অনুভূতিটি থেকেই জেগেছিল। ভয়ের প্রথম সৃষ্টির বহু আগেই এর আবির্ভাব; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা-বিষাদেরও অনেক অনেক আগে হয়েছিল এর আগমন। পৃথিবীর প্রথম আদিম মানুষটি তার চারিপাশে যখন অফুরন্ত বিস্ময়ের জগৎ দেখেছিল, দেখে নিশ্চয়ই বিচলিত হয়েছিল যে, সে এই বিস্ময়-রাজ্যের মধ্যেই বাস করছে—তখন প্রথমেই সে যে দারুণভাবে আশ্চর্য হয়েই গিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এছাড়া আর কি হতে পারে! জীবন সত্যিই আশ্চর্য জিনিস—এতো আশ্চর্য যে, যখন আমরা এই জীবনের পরম বিস্ময়ের একটি কণামাত্র, একটি অংশ নিয়েও ভাবতে বসি, মুহূর্তমাত্রও যদি ভাবি, তাহলে যেন মাথা ঘুরে যায়।

আশ্চর্য—ঐ আকাশ কী নীল, কি আশ্চর্য ঐ মাছির ছোট্ট অথচ জটিল পুঞ্জ আঁখি! আশ্চর্য, কী নিয়মমাফিক প্রতিদিন ভোরবেলা পূব আকাশে ওঠে ঐ রাঙা সূর্য! ছোট্ট খরগোসটাও অবাক করে দেয়; অবিশ্বাস্য রকমের আশ্চর্য সৃষ্টি মনে হয় একটা অতি সাধারণ ঘাসের শীষটিকেও। পৃথিবীতে যে এতো জিনিস রংয়েছে, এটাই মন ভরিয়ে তোলে—পৃথিবীর যে সৃষ্টি হয়েছে, জীবন্ত প্রাণোচ্ছল রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে—অনন্ত অন্ধকার মহাশূন্যের শূন্যতাকে খানিক ভরিয়ে দিয়ে—এটাই তো চরম বিস্ময়ের বিস্ময়।

জীবনকে পরখ করে দেখুন—এর যে-কোনো অংশ বা যে-কোনো একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে যাচাই করুন—দেখবেন, আশ্চর্য শিহরণ বয়ে যাবে নতুন কিছু একটা উপলব্ধির আবিষ্কারে। চেতনার প্রত্যেকটি অনুভূতিই যেন আশ্চর্য কিছুর সাড়া বহন করছে—তা নিয়ে ভাবতে হয় না, আপনা থেকেই উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। মানুষের বুদ্ধি জিনিসটা—ওঃ, সে যে কী প্রকাণ্ড বিস্ময়কর—কী বিচিত্র আশ্চর্যজনক, তা ভাষায় বোঝাতে কে পারে! যেদিকে তাকাই, এদিকে সেদিকে ওদিকে—সর্বত্রই একই—বিস্ময়, বিস্ময়, বিস্ময়। অফুরন্ত এই বিস্ময়ের যাকে বলি সচকিত বিস্ময়!

ভয় আসে পরে, তারও পরে আসে অবসন্নতা একঘেয়েমী। এই অবসন্নতা, একঘেয়েমী হলো বিস্ময়-বোধের একেবারে বিপরীত অনুভূতি—আমাদের যে আজন্ম অধিকার আশ্চর্য পুলকিত হওয়ার, তার ওপর যেন চরম বিশ্বাসঘাতকতার বিষ ছড়িয়ে দিতে সুরু করে এই একঘেয়েমীর মনোভাব। এর কবলে আমরা প্রত্যেকেই পড়ি।

যে শিশুর চকচকে চোখে আশ্চর্য হওয়ার আনন্দ নেচে উঠতো, যত দিন যায়, ততই সেই আনন্দের আলো স্তিমিত হয়ে আসে কেন? কেন সে আর মহিমান্বিত সূর্যাস্তের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দেয় না, দেখে না কেন চেয়ে ঘাসের শীষের দিকে?

জীবনের প্রভাতী বয়সে মনে হয় নতুন-গরিমা কিরণে ভরা আনন্দ-পুষ্পকাননে নেমে এসেছি আমরা। কিন্তু কেমন করে সে-প্রভাত কেটে যায়। বৃষ্টির সুবাস যেন হারিয়ে যায়, ঘাসের কাছ থেকে আর কোনো আহ্বান পাই না, ফুলের জলন্ত রূপবর্ণ আর চোখে পড়ে না, কানে আর শুনি না গীতিময় পাখীর কলতান। তারপর একদিন আসে যেদিন বিষাদাচ্ছন্ন অস্থিরতা মনে নিয়ে বসে থাকি, মনে মনে অনুযোগের ঝড় বয়—'কিছু করার নেই, কিছু ভালো লাগে না, কিংবা মন কাঁদে 'নতুন কিছুই আর ঘটছে না।' পৃথিবীটাকে তখন ধোঁয়াটে মনে হয়, আর সেই সঙ্গে আমাদের মনটাকেও।

কেন এমন হয়?

অবশ্য এর জন্যে এর-তার ঘাড়ে

অচেল সম্পদের মধ্যে অবগহান করে বেঁচে থাকার আশীর্বাদ নিয়েই তো আমাদের এ-জগতে আগমন।

ছোট্ট একটি শিশুর দিকে দেখুন—কেমন করে সে এই জগতটাকে জানছে। তার চকচকে চোখ দুখানি বিপুল আনন্দে নেচে ওঠে পথের পাশের সামান্য একটুকরো নুড়ি কুড়িয়ে পেলে, শুকনো একটা ঝরা পাতা সংগ্রহ করলে। ছোট্ট শিশু যখন গাছের গায়ে হাত দেয়, তখন স্পর্শ-অনুভূতির বিচিত্র আশ্চর্য অভিজ্ঞতায় তার মন যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়। মেঘ দেখে, কুকুর দেখে, নিজের ছোট বড় আঙুল-গুলো দেখে—আর অনেকক্ষণ ধরে বিভোর হয়ে এই সব আশ্চর্য জিনিসগুলি নিয়ে ভাবতে সে ভালোবাসে।

ভয় তার জীবনে অনেক পরে আসে, ভয় করতে তাকে শিখতে হয়। আজকের মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা জেনেছি, বন্য জন্তুরাও জন্ম থেকেই ভয় কাকে বলে জানে না। বিশেষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তারা বিশেষ ভয় শেখে। তার আগে তারা যা শেখে, তা হলো আমাদের মানুষের অভিজ্ঞতার

বোঝ চাপিয়ে দেওয়া সহজ। এটা-সেটা কতরকমের কারণকে এর জন্যে দায়ী করতে পারি। বলবো, খেটে খেটে নীরস নির্জীব হয়ে পড়েছি; কিংবা দিন রাত পয়সার চিন্তায় জীবনটা শুকিয়ে গেছে; নয়তো বলে বসবো, এই বুড়ো বয়সে কি আর বাচ্ছাদের মতো তাজা-তরুণ থাকা যায়?—এসব জবাবের মধ্যে ফাঁক আছে, কোনোটাই পুরোপরি জবাব নয়।

রুজি-রোজগার করতে গিয়ে, সংসার চালাতে নেমে যে খাটতে হয়, তাতে আমরা কেউই বড় একটা শুকিয়ে বাড়িয়ে যাই না। যদি পয়সার দুশ্চিন্তায় জগতটাকে ধোঁয়াটে বিষণ্ন মনে হয়, তাহলে বলতে হয় যে, টাকা-পয়সাকে ভগবানের মর্যাদা দিয়ে বসেছি নিশ্চয়। পয়সার চিন্তাকে অতখানি মর্যাদা দিলে বিপদ।

আর যদি বলেন, এ বয়সে আর ছোটাটি থাকা চলে না, তাহলে জিজ্ঞেস করবো, কেন থাকা চলে না? জবাব দিতে পারবেন?

না, এগুলো ঠিক জবাব নয়। আশ্চর্য হওয়ার যে অনুভূতি উপহার আমরা জীবনের কোনো এক সময়ে কেউ কেউ যে হারিয়ে ফেলি, তার মূল কারণ এ সব কথায় নেই। ফুলের রূপ যে আমাদের চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও হারিয়ে যায়, সূর্যোদয়ের মনোরম শোভা যে আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে রোজ ফিরে ফিরে যায়, তার কারণটি সর্বত্র সবার মধ্যেই রয়েছে। একটিমাত্র কথা, বোধহয় যে-কোনো ভাষায় কথাটি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা—তাই দিয়ে এর কারণ বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কথাটি হলো অহংকার।

৮

অহংকারেই মানুষের হয় পতন—আপনারও আমারও। আমরা বলি, 'কেন, পারি না বুঝি। আমি টাকা রোজগার করতে পারি, আমি বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারি, আমি ঘটনাস্রোত পালটে দিতে পারি, নিজের ভবিষ্যতকে ইচ্ছামত গড়ে নিতে পারি। আমি মস্তো লোক, আমার প্রচণ্ড মর্যাদা।' আর এই বলে এগুলোকে প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যাই।

অনেক ক্ষেত্রেই, সফল হচ্ছি যে তা দেখতে পাই না এমন নয়। টাকা আসে। আমাদের দারুণ কর্মগুণে অনেক ব্যাপারের মোড় ফিরিয়েও দিতে থাকি। বেশ হৈ চৈ লাগিয়ে দিই। তারপর হঠাৎ, একদিন কয়েক মিনিটের মধ্যে, দেখি—ভয়ঙ্কর অবসন্নতা আর পরাজিত মনোবিষাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। তখন জীবনটার আর কোনো আকর্ষণ খুঁজে পাই না কেন, ছেলেবেলায় যেমন পেতুম? সব ব্যাপারই যেন কেমন ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে মনে হয়। এর মধ্যে কি করে যে আমোদ-আলহাদের তৃপ্তি খুঁজে পেতে পারি, সেই হয় তখন নিদারুণ নিরন্তর এক দুশ্চিন্তা।

৯

কিন্তু তখনো পাহাড়ের শ্যামঘন রূপ আগের মতোই থাকে, আর দুলতে থাকে ঘাসের শীষে তেমনি আগের মতোই আশ্চর্য গরিমা। কি হয় জানেন? তখন ওগুলোর আশ্চর্য আকর্ষণ এবং আমাদের মন, এ দু'য়ের মাঝখানে একটা কিছু বিন্ধ্য পর্বতের মতো মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। সেটি হলো আমাদের স্বার্থপরতাবোধ আর আমাদের আত্ম-সচেতনতা। কিংবা, আরও স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে গেলে, সেটা হলো আমাদের অহংকার। নিজের কথা খুব বেশি করে ভাবুন, আর তাহলেই দেখবেন কোনো কিছুতেই সুরের ঝংকার নেই। নিজের কথা কম করে ভাবুন, আর তাহলেই পথের পাশের সামন্য একটা নুড়ির দিকেও আমাদের চোখ আশ্চর্যের ঝলমলে দৃষ্টি মেলে দেবে।

পৃথিবীটা তাদেরই হাতের মুঠোয়, যারা এর সত্যিকারের আনন্দ পেতে জানে। সজীব প্রাণোচ্ছলতার আশ্চর্য জৌলুষের প্রকৃত অভিজ্ঞতা যারা পেয়েছে—যারা নিজের গুণ-সম্পদ নিয়েই অহংকার করে তৃপ্তি পেতে চায় না। পৃথিবীতে যত শাস্ত্র, যত সত্যবাণী লেখা হয়েছে, সে-সবের মধ্যে এর চেয়ে সত্য আর কিছুই নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাই তো গেয়েছিলেন—

'আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণধুলার তলে।'
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥'

তিনিও বুঝেছিলেন—

'নিজের করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।'

আমরা যদি এমনি নম্রনত বিনয়ী হতে পারি, কবিগুরুর মতো ভাবতে শিখি—

'আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে',—

তাহলে আমাদের চোখের তারায় আকাশের সমস্ত তারার আলো যেন পরিপূর্ণ জ্যোতির্মহিমা নিয়ে ঝলমলিয়ে উঠবে। আমরা যদি অহংকার পোষণ করি, তাহলে আকাশের সব তারার চকমকি কে যেন বিশাল একটা হাতের আড়ালে ঢাকা দিয়ে আঁধার নামিয়ে দেবে।

সকলকেই খেয়াল রাখতে হবে, আমরা কেউই খুব বড় একটা কিছু নই, আর তাহলেই অনেক বড় বড় জিনিস কে যেন উপহার সাজিয়ে এনে দেবে আমাদের সামনে একে-একে। ঘাসের শীষের সম্পদ পেয়ে যাবো, ভোরের বিস্ময়-জাগানো অনুভূতি পাবো, আর পাবো চিরনতুন বিপুল বিস্ময়ের উপহার—আশ্চর্য হওয়ার মতো একটি জীবন্ত মন। পৃথিবীটাকে জয় করার চেষ্টা করুন। তাহলেই আপনি প্রবঞ্চিত হবেন। একে জয় করা যায় না। শুধু মনে মনে বিশ্বাস গড়ে তুলুন যে, একে জয় করার কোনো দাবী আপনার নেই, আর তাহলেই এর সবটা পুরোটা আপনারই হয়ে যাবে।

কা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

২০ ... সালের পূজোর ছুটিতে উটি অভিমুখে রওনা হ'লাম। ক'লকাতা থেকে সোজা মাদ্রাজ গিয়ে আবার সন্ধ্যায় নীলগিরি এক্সপ্রেস-এ উঠে কোয়েম্বাটুর মেটাপুলিয়াম গাড়ী বদল করে ছোট গাড়ীতে চড়ে বেলা প্রায় দু'টোয় উটিতে এসে পৌঁছুলাম। এখানে একটা কথা জানাই—ক'লকাতা থেকেই মাদ্রাজ হ'তে নীলগিরি এক্সপ্রেস-এর সব রকম রিজার্ভেশন করা যায়। তাতে করে খুব সুবিধা হয়। মাদ্রাজের ঐ ট্রেনের ভিড়ে মোটেই কষ্ট হয় না।

উটি থেকে সোজা চলেছি—বাস মাইশোরের পাথ রর গাঁ বসে, আঁকা-বাঁকা পথ ধরে আমরা চ'লছি এ পাহাড় থকে ও পাহাড় আবার ও পাহাড় থকে সে পাহাড়ে। কখনও বা উপরে উঠছি আবার কখনও বেশ নেমে যাচ্ছি। এমনি করে দীর্ঘ পথ বেশ মাইল পার হ'য়ে এসে পড়লাম মাইশোর সমতলভূমিতে। সেখানে একটা গেট আছে— আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে মাইশোর রাজ্য। আর মাদ্রাজ একটু আগেই বিদায় দিয়েছে—আবার বলেছে—ধন্যবাদ, আবার এসো।

মহীশূরের রাজবাড়ীর গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। বিরাট সৌধ—বিরাট জাঁকজমকের অবধি নাই। রাজ্যের প্রায় ৩৩টি লোকের পয়সা দিয়ে এই যে বাড়ী হ'য়েছে—এর কিছুই তাদের নয়। সমস্তই একজনের মালিকানা হয়ে যায়—এই যে ধনতন্ত্র এর শেষ কোথায় আছে কে জানে?

বিকেল ৫টায় রাজবাড়ীর গেট খুলে দিয়েছে —প্রজাদের শুধু দেখবার জন্য। বৎসরে পূজোর আগে ১লা থেকে ৯ দিন তার মানে নবমী পর্যন্ত খোলা থাকে। নবমীর দিনে রাজা সন্ধ্যা ৭টায় রাজবাড়ীর দোতলায় সিংহাসনে বসবেন। রাজবাড়ীতে দোতলায় যে উন্মুক্ত চাতাল আছে—তার দুইধারে চেয়ার পাতা আছে, মাঝখানে আছে সিংহাসন। যাঁরা রাজ্যের আমীর ও ওমরাহ তাঁরা বসেছেন একধারে তাঁদের মর্য্যাদা অনুসারে—আর একধারে বসেছেন উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ। আমি ৬টায় পৌঁছেছি। ৭টায় রাজা এসে সিংহাসনে বসবেন।

বিকেল ৫টা থেকে রাজবাড়ীর সমস্ত মাঠটা জুড়ে লোকেরা আসছে ও মাটিতেই বসে যাচ্ছে। আমি যখন পৌঁছেছি, তখন প্রায় অর্দ্ধেক ভরে গেছে। রাজবাড়ীতেও সিংহাসনের দুই ধারে চেয়ারে বসে আছেন—প্রায় দশ হাজার লোক। তারপর সমস্ত মাঠে বসে গেছেন প্রায় ৩।৪ লক্ষ লোক—ছেলে, মেয়ে, মা, বাবা, বুড়ো, জোয়ান ও বাচ্চা প্রভৃতি সবাই।

রাজবাড়ীর সামনে কিছু জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। প্রায় ৬-৩০টার সময় সেখানে ৮টা সুসজ্জিত হাতী এসে দাঁড়ালো। তারপর কিছু উট এল —পরে এল ঘোড়সওয়ার ২০টা।

ঠিক ৭টায় রাজা আসছেন ভেতর থেকে। সামনে আসছে ৮।১০ জন পোষাক-পরা তলোয়ারধারী। রাজা সিংহাসনের দিকে এগিয়ে চললেন। তারপর একবার সিংহাসনটা ঘুরে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করে—সিংহাসনে পা দিতেই—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। চারিদিকের আলো এক সাথে জ্বলে উঠল। সে কি আলোর চকমকানি বা ঝলমলানি। সমস্ত রাজবাড়ীর প্রতিটি কক্ষ এমন করে আলো দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়েছে যেন প্রতিটি তলা, প্রতিটি কক্ষ, রাজবাড়ীর গম্বুজ প্রভৃতি সমস্তই পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। নিকটে ঐ যে ঠাকুর-মন্দির আর ঐ যে দূরের পূর্বের রাজবাড়ী ও তার সংলগ্ন ঠাকুর-দালান—সে সবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর ঐ যে সুসজ্জিত গেট যেটায় ইংরাজীতে লেখা 'ওয়েলকাম' ও নীচে কানাড়ী ভাষা। অভ্যর্থনা করছে—সেটা অতি চমৎকার দেখতে হয়েছে। সব আলোই একসাথে জ্বলে উঠেছে, রাজা সিংহাসনে পা দিলেন বসবার জন্যে—সে এক অভূতপূর্ব ঝলমলানি ও সৌন্দর্য। শুধু দেখবার ও অনুভব করবার।

এতক্ষণ যাঁরা দুইধারে বসেছিলেন—তাঁরা সকলেই রাজা সিংহাসনে না-বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলেন, তারপর রাজা বসলে সকলেই বসে পড়লেন ও একে একে 'কিউ' দিয়ে পদবী অনুসারে রাজার কাছে গিয়ে জোড় হাত করে প্রণাম করে, প্রায় ৫ গজ পর্যন্ত প্রত্যেকে পিছন হেঁটে এলেন—যাতে করে কারো পিছনটা রাজাকে না দেখানো হয়। এমনি করে প্রায় ২০ মিনিট গেল—অবশ্য এ সবই করলেন শুধু একদিকের প্রথম সারির আমীর ও ওমরাহগণ, আর সকলেই বসে রইলেন। তারপর ১০ মিনিট ঘোড়সওয়াররা নানান রকম খেলা করলো—সত্যই অত্যন্ত উপভোগ্য।

তারপর আবার অন্যদিকে রাজার কর্মচারীরা যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা এলেন প্রণাম জানাতে। এর মধ্যে পুলিশের পোষাক-পরিহিত উচ্চপদস্থ ক'জনকেও দেখলাম। সকলেই 'কিউ' দিয়ে রাজাকে প্রণাম জানালেন। এতে আবার ২০ মিনিট গেল —এই ৫০ মিনিট রাজা ঐ স্থান থেকে বাইরের জনসাধারণের দিকে নমস্কার করে তিনি বিদায় নিলেন। আবার সকলে উঠে দাঁড়ান। রাজা চলে গেলে, একে একে সকলেই বিদায় নিলাম। কি গম্ভীর পরিবেশ—কি অদ্ভুত গাম্ভীর্য ও দর্শনীয়—শুধু অনুভব করবার। আমার সৌভাগ্য যে আমি ঠিক নবমীর দিনে মহীশূর-এ এসে পড়েছি। মহীশূরের অধিবাসিবৃন্দ এইদিনটির জন্য কী উদ্বেগ সহকারে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

তারপর আসছে দশমী। ঐদিন বিকেল ৪টার সময় রাজা রাজবাড়ী থেকে দীর্ঘ ৩ মাইল পথে তাঁর মণ্ডপ ও বাগানে যাচ্ছেন। তিনি বসে আছেন অতি সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে। তারপর কিছু গাড়ী তাতে তাঁর পরিবারের লোকজনেরা, কিছু হাতী, কিছু ঘোড়সওয়ার, কিছু উট, কিছু গরু, কিছু পদাতিক সৈন্য, কিছু পুলিশ—এই করে দীর্ঘ ৩ মাইল শোভাযাত্রা করে রাজা যাচ্ছেন। কাতারে কাতারে লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে—রাজাকে দেখবার জন্যে—তাঁকে প্রণাম করবার জন্যে। সে কি অপূর্ব ভক্তি। সবই শুধু দেখবার।

এই সব দেখছি আর ভাবছি, সাগরপারের পশ্চিম দেশের কথা। আমাদের দেশের এই যে নবমীর দিনের গম্ভীর পরিবেশ ও জাঁকজমক—এই যে নবাবীয়ানা বা রাজাগিরির অভিব্যক্তি—তা পৃথিবীর কোন দেশের সাথে তুলনা হয় না।

আমার লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালেশ-এ বেলা ১১টার সময় প্রতিদিন যে দুটো গার্ড বদলী হয়,—সেটা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঐ যে আধঘণ্টা ধরে ইংলিশ ব্যাণ্ড বাজান এবং দুইদিক থেকে দুইজন দলকে কতকগুলো সৈন্য মিলে ব্যাণ্ড বাজিয়ে আনল—পরে ব্যাণ্ড থামিয়ে মার্চ করে দুটোকে বদল করা হ'লো—সেটাও অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ—ইংরাজীতে যাকে বলে সাবলাইম—সেটা সত্যই উপভোগ্য।

মনে পড়ছে রাশিয়ার পূর্ব-জার্মানীতে সৈন্যদের একটি মেমোরিয়ালের গার্ড বদলী। ৩টি সৈন্য একেবারে আগে মাঝের জনকে বদলী করতে হ'বে। সেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক পুতুলের মতন নিষ্পলক দৃষ্টিতে সাদা পাথরের মতন শ্বেতচক্ষু সাদা রাশিয়ান সৈন্য—কি অদ্ভুত তার ধৈর্য ও স্থিরদৃষ্টি, মনে হয় যেন একটি পাথরের মূর্তি। সামনের ৩ জন এগিয়ে গেলে—ঐ পূর্বের লোকটি নড়ে উঠল। তখনই বোঝা গেল, যে সেটা মানুষ—পাথর নয়। তারপর এ ওর জায়গায় তাল ঠুকে কী সুন্দরভাবে গেল। আবার পূর্বের দাঁড়ান সৈন্যটি ঐ দুইজনের মাঝে এসে ৩ জন হ'য়ে মার্চ করে ফিরে গেল—মাত্র ১০।১২ মিনিটের মধ্যে সমস্ত শেষ হ'ল—এ এক অদ্ভুত গম্ভীর পরিবেশ।

কিন্তু আমার ভারতবর্ষের জাঁকজমকের কাছে ঐ সব দেশের শো কত ম্লান তা অনুভব করেছি—ঐ মহীশূরে ঐ নবমীর দিনে।

মহীশূর থেকে পরে আবার সেই পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সোজা পাড়ি দিয়েছি উটি অভিমুখে। রাস্তা পাঁচ ঢালা, একধারে উঁচু পাথর কাটা অন্য ধারে প্রায় পাঁচশো ফুট নীচু—কোথাও উপরে উঠছি—সময়ে সময়ে নীচুতে নামছি, এমনি করে ৭৫০০ ফুট উঁচুতে—এলাম উটিতে।

উতকামণ্ডকে সংক্ষেপে উটি বলে। পাহাড়ের থাকে থাকে বাড়ীগুলো সুন্দরভাবে সাজান। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা বা বাড়ী তৈরী হয়েছে। এটি একটা ছোট্ট সাজান শহর। বাজারে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা। যেখানে শাকসবজী—সেখানে শুধু শাকসবজীই মেলে, যেখানে কাপড় শুধু কাপড়ই সেখানে মেলে, এমনি করে প্রতিটি জিনিষ বিক্রির আলাদা করে স্থান করে দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া অত্যন্ত সুন্দর। ভাষা তামিল। এখানকার বাজারে অনেক ফুল বিক্রি হয়। ফুলের এত বড় বাজার আমি কোন জায়গায়ই দেখিনি। বহু দূর দেশ থেকে মেয়েরা আসে ফুল কিনে নিয়ে যায়। খোঁপার পেছনে কেউ ছোট করে নানান ভঙ্গীতে মালা পরে। কেউবা বড় করে মালা বানিয়ে খোঁপায় ঝুলিয়ে দেয়। এদের বড় ছোট নেই—গরীব বড়লোক নেই—প্রায় সকলকেই মালা পরতে দেখেছি। কালো কালো মেয়েরা—বড় বড় চোখ—ঐ সুন্দর স্বাস্থ্য—আবার বিনুনী করে ও রং বেরং-এর ফুলে ভরা মাথা—দেখতে বেশ লাগে। চমৎকার লাগার। ফুল আমিও ভালবাসি, মেয়েদেরও আমি ভালবাসি। ফুল সাজান কাল বড় বড় চোখ মেয়েদের দেখতে সত্যই ভাল লেগেছে—কী অটুট তাদের বাঁধন। নানান রং-এর শাড়ীগুলোয় কি কঠিনভাবে দেহখানি আবৃত করেছে—যেন প্রতিটি অঙ্গ ফুটে বেরুতে চায়। মনে পড়ে গেল, আমাদের কবি সম্রাটের গান—

কালো, সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

উটি থেকে রেলে ছোট্ট গাড়ীতে চড়ে এলাম সমতলভূমিতে, সিমলা পাহাড়ে গিয়েছি, রেল গাড়ীতে চড়ে। দার্জিলিং পাহাড়েও গিয়েছি ট্রেন-এ চড়ে। কিন্তু এখানে লাইনের-এর ওপর আরও একটা লাইন বসিয়ে তনটে করা হ'য়েছে এবং তৃতীয় লাইনটি খাঁজ কাটা। যখন ইঞ্জিন আসে—তৃতীয় লাইনটির সাথে ক্লাম্প হয়ে যায়—যাতে না পড়ে যায়। কেন না মাঝে মাঝে অনেক খাড়াই উঠতে হয়েছে এবং এই ক্লাম্প করার জন্যে, ৭৫০০ ফিট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উঠে গেছে।

উটি থেকে সোজা চলে এলাম রামেশ্বরম-এ। এটি একটি দ্বীপ। চারিদিকে সমুদ্র। শুধু একদিকে একটা লম্বা প্রায় ১ মাইল ব্রিজ দিয়ে এই দ্বীপের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। আর কোন রাস্তাই নেই। ব্রিজ-এর মাঝখানে এক জায়গায় নীচে কোন পিলার নেই। হাওড়া ব্রিজ-এর মতন। সে জায়গায় আবার অর্ধেক করে রাখা হ'য়েছে—যখন ট্রেন যায়। জোড়া করা হয়। আবার যখন জাহাজ যায়, দুইদিকে ফাঁক করে দেওয়া হয়, জাহাজ যেন চলে যেতে পারে। এই ব্রিজ-এর ওপর দিয়ে আমাদের ট্রেন চলল রামেশ্বরম-এ। সেখানে পৌঁছে মন্দিরের দিকে চললাম। স্টেশন থেকে ২ ফার্লং-এর মধ্যে। প্রকাণ্ড গেট, অদ্ভুত তার কারুকার্য, মধ্যে দেড় মাইল ঘিরে চাউণ্ডারী

দেওয়া—তাও আবার অপূর্ব শিল্প-কলা—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেই দেওয়াল পেরিয়ে আবার একটা বাউণ্ডারী দেওয়াল, তাও আবার প্রত্যেক ৫ গজ অন্তর একটা করে আর্চ করা আছে। এবং প্রত্যেক আর্চ-এর ওপর নানান রকম দৃশ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ছবি আঁকা আছে। তারপর মন্দিরে প্রবেশের পথ। ঠিক সামনে শুধু স্বামী বিবেকানন্দর বাণী ইংরাজীতে লেখা আছে—

'যদি মন পবিত্র করে মন্দিরে যেতে পার। তবেই যাবে, নচেৎ যেয়ে লাভ নেই।'

আমার বাংলার স্বামীজীর বাণী দেখে আমার মনে যে কী অপার আনন্দ হ'ল—তা আমার পক্ষে লেখা দুষ্কর।

মন্দিরে ঢুকে দেবতাকে আমার প্রণাম জানিয়ে ফিরতে আমার প্রায় দু ঘণ্টা লাগল। এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। মুসলমানদের মধ্যে যেমন মক্কা ও জেরুসালেম, হিন্দুদের মধ্যে রামেশ্বরম ও বারাণসী অত্যন্ত পুরাতনকালের ধর্মীয় ঐতিহ্য বহন করে।

কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র এইখানে এসে মহাদেবের উপাসনা করেছিলেন, ভারতের সভ্যতার এক পুরাতন ইতিহাস লিপিত হয়ে আছে এই রামেশ্বরমে। এই তীর্থ সম্বন্ধে অনেক বই ঐ মন্দিরে পাওয়া যায়। এত বড় একটা বিরাট মন্দির ও তার চতুর্দিকে প্রাচীর এবং তারই পার্শ্বে প্রবাহিত সমুদ্র—এ এক অপূর্ব দৃশ্য।

ওখান থেকে সিংহল যাবার বন্দোবস্ত আছে। অদূরে ফেরি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। পাশপোর্ট-এ এণ্ডোর্স করে নিতে হবে দিল্লী থেকে। তা আমার করা হয়নি—সুতরাং কন্যাকুমারিকায় যাব বলে টিকিট করে ট্রেন-এ চেপে বসলাম। আবার ঐ একই রাস্তা ধরে সারারাত গাড়ীতে থেকে সকালবেলায় তিরুনাভেল্লী স্টেশনে এলাম। এখান থেকে কন্যাকুমারিকার রাস্তা প্রায় ৬০ মাইল। কোন ট্রেন চলে না। শুধু মোটরযানেই যেতে হবে—বাস এ্যারেঞ্জমেণ্ট ভালই আছে। বেলা ১২টায় এসে পৌঁছুলাম কন্যাকুমারিকায়। সমুদ্রের একেবারে পাড়ে। ধর্মশালা আছে। তিনটি সমুদ্র মিলিত হয়েছে এইখানে। কী তার ঢেউ—কী তার গর্জন। কী অপরূপ দৃশ্য আর ঠিক বাঁকের উপর একটি প্রকাণ্ড মন্দির স্থাপিত হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে গান্ধীঘাট। একেবারে জল থেকে মন্দিরটি গড়ে তোলা হয়েছে, সমুদ্রের পার দিয়ে একটা বাঁধান রাস্তা, আর মাঝে মাঝে বসবার জায়গা। রাস্তাটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও ঝকঝকে আর হাওয়া—সত্যই বিচিত্র। সমুদ্রের এক একটা ঢেউ ভিন্ন ভিন্ন রকমে পাড়ে এসে ভাঙ্গছে—দেখলে মন ভরে ওঠে। আমার এই দেশে সবই আছে। এমন সুন্দর আছে, মনে হয় পৃথিবীতে নেই। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় পড়েছিলাম—যা নেই ভারতে, তা নেই পৃথিবীতে।

সমুদ্রের দিক থেকে সূর্য ওঠা—এক অপূর্ব জিনিষ। এর আগে অনেক দেখেছি তবুও এ দেখার শেষ নেই। ভোরের রং আর সোনালী থালার যে এক অপূর্ব সমাবেশ শুধু যে দেখেছে, সেই অনুভব করতে পারবে।

এখানে এক মন্দির আছে, নাম কন্যাকুমারিকা। সেই মন্দিরে ঢুকতে হ'লে পুরুষের বেলায় খালি গায়ে ঢুকতে হবে। কোন কাপড় গায়ে থাকতে পারবে না। মেয়েদের বেলায় কোনও বাধা নেই। আমি এটা পূর্বে জেনে, একটা চাদর নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা পরে নিয়ে মন্দিরে ঢুকে কুমারী-ঠাকরুণকে প্রণাম করেছি।

এই কুমারী-ঠাকরুণকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে। এবং সবই ইংলিশ লিটারেচারে আছে ও ওখানে বিক্রি হচ্ছে। এরই নামে জায়গার নাম হ'য়েছে কন্যাকুমারিকা।

ভারতের এক প্রান্তে হিমালয়। সেখানে গেছি—দার্জিলিং, সিমলা, নৈনিতাল, মুসৌরী, জয়ন্তী, শিলং সবই দেখেছি। বাসনা ছিল, আমার এই দেশের শেষ প্রান্ত একবার দেখব। সেই আশা পূরণ করেছেন, আমার এই কন্যা কুমারিকা দেবী। তাই তাঁকে প্রণাম করে সেই কথাই শুধু জানিয়েছি।

ছোটবেলায় আমার পিতৃদেবের কাছে শুনতাম যে দেশ দেখার যে আনন্দ, সে আনন্দ কোনটাতেই আর পাওয়া যায় না। তখন মনে আশা করেছিলাম—উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আমার দেশের সবই যেন দেখতে পারি। ভগবান আমার সেই আশা পূরণ করেছেন দেখে, তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জীবনে কোনদিনই ভাবিনি যে আমি ওয়েস্টার্ন কাণ্ট্রিতে যাব। সে দেশের যে গল্পকথা শুনেছি—নিজে চোখে দেখে আসব। আমার নিজের অর্থসঙ্গতিও নেই বা এমন কোন খেতাবও নেই যে, তাই নিয়ে বিদেশে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন করে বিদেশ দেখতে পারব। তবুও আমার মনের প্রবল বাসনা জেগেই থাকত। আমি জানি, বয়স হ'লে—নিজের কৃতিত্ব থেকে—ছেলে-দের কৃতিত্বের জন্য চিন্তা করাই শ্রেয় তাই আমার বাসনা। আমার দুটো ছেলেকে দিয়েই পূরণ করব বলে প্রার্থনা করেছিলাম। ভগবান আমার সেই প্রার্থনা পূরণ করেছেন।

মনের সৎ ইচ্ছা কোনদিনই বৃথা যায় না। বুঝলাম সেই দিনই—যেদিন আমি বিদেশে যাবার জন্য আস্তে আস্তে সব জোগাড় করতে লাগলাম। এ যোগাযোগ ভগবানই করিয়ে দেন। আমার পয়সা নেই। যাবার সমস্ত এ্যারেঞ্জমেণ্ট-এর জন্য খরচ করে সামান্য কিছু টাকা কম পড়ে গেল—সে টাকা দিলেন আমার এক মাড়োয়ারী বন্ধু; অবশ্য এ টাকা আমি ফিরে এসে শোধ করে দিয়েছি।

আমি যখন পশ্চিম মহাদেশে একবার গেছি—তখন স্বভাবতই ইচ্ছা হয়েছিল, সমস্ত দেশগুলি দেখি। তাই আমি ইজিপ্ট, গ্রীস, ইটালী, পশ্চিম জার্মানী, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লণ্ডন, প্যারিস ও সুইজারল্যাণ্ড—সব দেশেই গিয়ে আমার অন্তরের বাসনা মিটিয়ে এসেছি। আমার এই বৃদ্ধবয়সে, আমি শুধু একই কথা বলছি—ভগবান আমার সব ইচ্ছাই পূরণ করেছেন। তাঁর কাছে আর আমার কোন প্রার্থনাই নেই।

কন্যাকুমারিকা থেকে আর মন আসতে চায় না। কিন্তু ফিরতে হবে। তাই এই অদ্ভুত ও সুন্দর জায়গা থেকে বিদায় নিয়ে আমি চলে এলাম ৫ হাজার বছর পূর্বের এই মাদুরাই সহরে। বিশ্ববিখ্যাত এই মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। কত বড়। কী তার জাঁকজমক। লণ্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবে দেখেছি—প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত নোটরডাম গীর্জা দেখেছি। ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবের কারুকার্য ও সৌন্দর্য সত্যই উপলব্ধি করবার।

নোটর ডামের বিরাটত্ব ও কলাশিল্প সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের মন্দিরের জাঁকজমকের তুলনা হয় না। হাজার হাজার বছরের মানুষের চিন্তাধারা প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, এই মন্দিরের প্রতিটি দেয়ালে —প্রতিটি কাজের ভেতরে। কোটি কোটি মানুষের পদধূলি পড়েছে এই স্থানে —আর আমি সেই পদরেণু মাথায় দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

এরই সাথে মনে পড়ছে আগ্রার তাজমহল বা ফোর্ট-এর তুলনাহীন ভাস্কর্য, তারও পূর্বের দক্ষিণে বিচিত্র মন্দিরের কারুকার্য আবার তারও পূর্বের কেরালার ত্রিবাণ্ড্রমের ও মাদুরার মন্দিরের শিল্পকলা—ভারতের ঐতিহ্যের নিদর্শন। এরই সাথে মনে পড়ে মিশরের 'মমী'র কথা। সেখানে ২।৩ টনের পাথর এনে কি করে পাথরের পর পাথর গেঁথে সাজিয়ে মোটা থেকে ক্রমে চিকণ করে প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু করে সাজান—সে দিনে আধুনিক যুগের ক্রেন ছিল না। ভাবলে সত্যই বিস্ময় লাগে। অবাক হ'তে হয়—যে তখন পৃথিবী উন্নত ছিল। আজকের পৃথিবী যেখানে চাঁদে যাচ্ছে, সেই দিনের পৃথিবীর শিল্পকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতির নিদর্শন আমরা পাই। আমি ঐতিহাসিক নই বা জ্ঞানও আমার অত্যন্ত স্বল্প। আমি ভ্রমণকারী, শুধু দেশের কথাই আমি বলব, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানমতে।

মীনাক্ষী দেবী সম্বন্ধে হিন্দুদের ধর্মকথা রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লেখ আছে। মন্দির সম্বন্ধে অনেক বই আছে এবং সবই ঐ মন্দিরে পাওয়া যায়।

মাদুরাই থেকে রওনা হলাম কেরালা অভিমুখে, ত্রিবান্দ্রম কেরালার রাজধানী। দক্ষিণে প্রায় প্রতি জায়গায় বহু পুরানো কালের মন্দির আছে এবং ছোটবড় সকলই এই দক্ষিণের একই ধাঁচে গড়া।

দক্ষিণে মহীশূরে ক্যানাড়ী ভাষা, মাদ্রাজে তামিল ভাষা, কেরালায় মালয়ালম ভাষা, অন্ধ্রে তেলেগু ভাষা, কোনখানেই কেউ হিন্দী বোঝে না। প্রতি জায়গাতেই ইংরাজীতে কথা বলতে হয় দেশের খবর জানবার জন্যে।

এই ভাষা নিয়ে দক্ষিণে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। লিঙ্গুয়েস্টিক কান্ট্রি করে দেশকে বিভক্ত করা হবে কেন, দেশের নায়করা চিন্তা করুন। কিন্তু আমার মনে হয়, সারা দেশ যেমনভাবে চলেছে তাকে তেমনিভাবে চলতে দেয়া উচিত এবং প্রাইমারীতে হিন্দি বাধ্যতামূলক করে, সারা দেশে প্রাইমারী এডুকেশন যদি অবৈতনিক করে দেয়া হয়, তবে ১০।১৫ বছর পরে এই হিন্দি নিয়ে কেউ কোন কথা বলবে না। ভারতে যখন বেশীর ভাগ লোক হিন্দি জানা —তখন হিন্দি ভাষা স্টেট লেঙ্গুয়েজ হবেই। আমি জানি, রাশিয়াতে বহু ভাষা প্রচলিত আছে। তা নিয়ে তরুণেরা লোক কেউই ঘোটেই মাথা ঘামায় না।

আমাদের বাংলা দেশের মতন কেরালায় চালের বড়ই অভাব। অথচ মাদ্রাজ, মহীশূর বা অন্ধ্রে চালের কোনই অভাব নেই। তবে কেরালায় যবার প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং বহু বৈদেশিক মুদ্রা আনে তেমনি বাংলাতেও প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মায় বহু বৈদেশিক মুদ্রা আনে—যা ভারতের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। ত্রিবান্দ্রম থেকে এর্ণাকুলাম হয়ে কোয়েম্বাটোর দিয়ে মাদ্রাজে পৌঁছে গেলাম। কলিকাতায় দেশে ফিরে যাব বলে। মাদ্রাজ সহর সমুদ্রের পাড়ে। তবে বোম্বের মতন ওখানে মাতালকরা ঢেউ নেই।

মাদ্রাজের কাছাকাছি অনেক তীর্থস্থান আছে। তার মধ্যে পক্ষিতীর্থ একটি। বেলা প্রায় ১১টায় দুটি বড় পাখী কোত্থেকে উড়ে আসবে কেউ জানে না। একটি গামলায় মিষ্টান্ন বানিয়ে রেখে দেয়া হয়। তারা একটু খেয়ে চলে যাবে। প্রতিদিন এক পাখী আসে না। ঐ মিষ্টান্ন প্রসাদ হয়ে গেলে প্রত্যেকেই অতি ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। কতকাল থেকে যে এই রকম হ'য়ে আসছে কেউ বলতে পারে না।

মাদ্রাজ থেকে রওনা হ'য়ে কলিকাতা অভিমুখে দেশে ফিরছি। এত দেশ ঘুরি, কিন্তু কিছুদিন পরে মন হাঁপিয়ে ওঠে—নিজের দেশে ফিরবার জন্যে। মাইকেল কবি লাইনগুলো নিজের উপর পরীক্ষা করেই লিখেছেন—

তবু ভরিল না চিত্ত সর্বতীর্থ সার
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার।

রাস্তার রেল লাইনের দুই ধারে মাদ্রাজ পার হয়ে এলাম অন্ধ্রে। কী সবুজ ধানের ক্ষেত। যতদূর চোখ যায় শুধুই শ্যামল মাঠ—মাঝে মাঝে ছোট্ট গ্রাম, আবার সেই সবুজ ধানের ক্ষেত-কী সুন্দর দৃশ্য—চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখতে দেখতে উড়িষ্যা পার হ'য়ে এসে পড়লাম, আমার দেশে,—বাংলায়।

সেই পুব-সকালে রংয়ের ঝিলিক মাস্তেই রোজ বেরিয়ে পড়ে ইয়াকুব, বাড়ী থেকে টিশন মাইলটাক পথ, টিশনের পরথম ট্রেনে আনাজের বাগান, কার সাধ্য সিটে বসে। বোঝার পর বোঝা সবুজ আনাজ বসে আছে সেখানে।

অন্য দিনের মত আজকেও ইয়াকুব আলীকে দেখে চীৎকার করে উঠলো ছোক্‌রার দল—চাচা, চাচা, ইদিক এসো—ইদিক।

এক মাইলটাক পথ হাঁটতে হাঁটতে কেমন যেন ঝিম মেরে আসে চাচার, হাজার হোক বুড়ো তো হয়েছে সে, প্রায় তিন কুড়ি পেরুতে চললো। শরীর বেচারা আর কত ধকল সইবে। ডায়মণ্ডহারবারের ছোকরাগুলো বেজায় ফূর্তিবাজ, ইয়াকুবকে দেখলেই মজা করে, পাকা শনের মত দাড়িতে হাত বুলায়। বলে—চাচা চাচী মেহেন্দি লাগিয়ে দেয় না কেন? কেমন ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে।

—ধ্যুৎ, শালা, কপট রাগে ধমক দেয় ইয়াকুব। কোন কোন দিন বলে—না রে বুড়ির কাছে রং মাখতে ভাল লাগে না।

বুড়োর কথা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে সারা কম্পার্টমেণ্টের লোক। কোন কোনদিন বিপিন মণ্ডল একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে শুধোয়—ও চাচা, জীবনভর তো চাকরী কুইরলে, বলি বাড়ী-টাড়ি বানিয়েছ?

জানলা দিয়ে একদলা থু-থু ফেলে দাড়ি মুছতে মুছতে বলে—নাঃ বাড়ী-টাড়ি আর হবে না। খেয়েই শালা সব ফুরিয়ে দিলাম।

—আচ্ছা চাচা, তুমি মুল্লুকে যাও না!

—মুল্লুক, কেন ইটাই তো আমার মুল্লুক।

শিশির গুহ

—আরে না না, সে কথা বলছি না, দেশ—দেশ, দেশে কে আছে তোমার!

—ওখানে আর ক'টা চাচী আছে চাচা। পাশ থেকে ফোড়ন কাটে আরেক চোক্‌রা।

মুহূর্তে ইয়াকুবের মনটা কেমন ম্লান হয়ে যায়। চারদিকের হাসি-মস্করার মাঝে কেমন নীরব হয়ে যায় সে। সত্যি কেই বা আছে তার, সেই কবে জ্ঞাতিদের অত্যাচারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পালিয়ে এসেছে দেশ ছেড়ে, ফেলে এসেছে বাপ-দাদার বসতভিটা, এখন আর একবারও মনে হয় না তার, কিন্তু আজ যেন মণ্ডলের কথা শুনে বুকটা কেমন টান মেরে উঠলো। সত্যিই তো কে আছে তার। যারা ছিল তারা সব দুশমন, সববাই তাকে ছেড়ে পালিয়েছে কিন্তু আগুন তাকে আজো ছেড়ে পালায় নি। দীর্ঘকাল সে লড়াই করে চলেছে ওর সাথে। লেলিহান আগুনের হুঙ্কার সাথে সমান পাল্লা দিয়ে জুগিয়েছে ফার্নেসের রসদ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ফার্নেসের বুকে শিক চালিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে তাল তাল আগুনের পিণ্ড। কোথায় গেল সে সব দিন! এতদিন ফার্নেস ছিল তার গোলাম কিন্তু আর কদ্দিন!

দেখতে দেখতে জোয়ান সমর্থ চেহারাটা কেমন সিটকে মেরে গেল, চোখের কোণে কালি বাসা বাঁধলো, দেহের ভাঁজে-ভাঁজে যেন অন্ধকারের স্তূপ।

আনাজব্যাপারী পুলিন সর্দারও সিদিন বলছিল—চাচা, বাড়ী যাও না কদ্দিন, কে কে আছে সিখানে!

—কে আর আছে! বেদনার্ত শ্বাস নাক-মুখ ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে ইয়াকুবের। মিইয়ে যাওয়া সুরে আনমনে বলে—কেউ নেই, যারা ছিল তারা দশমন—সব দুশমন।

কাঁচকলের পথ চলতে চলতে স্বপ্ন দেখে ইয়াকুব। সেই জুয়ান বৌ'র হাত ধরে সেই যে দেশ থেকে চলে এল সে অনেককাল। ফুলবিবিকে পরথম বছর বাজু গড়িয়ে দিতেই খুশীতে ঝলমল করে উঠেছিল ওর মুখ।

সোহাগ ভরে ডায়মনহারবার দেখতে গিয়ে ওখানেই বাসা বাঁধতে চায় ফুলবিবি, তারপর থেকে এইখানে বাস।

কত মাস কাটলো, বছর কাটলো, ফুলবিবি দু'দুবার মা হোল, এলো আলীজান আর হুসেন আলী কিন্তু কি কেয়ামৎ খোদার, রইলো না কেউ, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে দুশমনরা চলে গেল বেহেস্তে—পড়ে রইনু আমি।

গায়ে-গতরে খেটে সারা সময় ফুলবিবিকে সেবা করতাম, কিন্তু কি ভীষণ অভিমান ওর, চপড় রাত দু'চোখের পানিতে সিথান ভিজিয়ে কাঁদতো, ডাকতো আলীজান আর হুসেন আলীর নাম ধরে। শেষে একদিন আমার ওপর গোঁসা করে সেও চলে গেল—পড়ে রইলো আমার এই ধড়টা, ই-শালার দেহটার শেষ নেই, টেনে চলেছি তো চলেছিই, কবে যে আলীজান-ফুলবিবিকে দেখতে পাবো তা আল্লাই জানে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা চালাল ইয়াকুব, কারখানাটা দেখা যাচ্ছে, চিমনী থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে তামাম আশমানটা ছাই-কালো দেখাচ্ছে। এক্ষুণি কারখানার ভোঁ বাঁশী বাজবে, যারা পিছু পিছু আসছিল তারা কখুন যে জোর পায়ে এগিয়ে গেছে তা খেয়ালই করেনি ইয়াকুব, ছোকরা সাহেবরা আর রামবাবুর খিচ-খিচানীর কথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি পা চালালো সে।

কারখানায় ঢুকতেই দৈত্যের মত শব্দ করে বেজে উঠলো ভোঁ বাঁশীটা।

ইয়াকুবের মনে হোল চপড় দিন চপড় রাত কাজ করতে করতে কারখানাটা যেন ক্লান্ত হয়ে ওকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

গায়ের ছেঁড়া পিরানটা খুলে শুধু গেঞ্জী গায়ে ফার্নেসের কাছে এসে দাঁড়াল ইয়াকুব। লাল গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে আনমনে নিজের বুকে হাত বুলাতে বুলাতে মনে হোল—ওর বুকেও এমনি আগুন আছে—তা না হোলে এত জ্বালা কিসের। ফার্নেসের মত অষ্ট-প্রহর যা ধিকিধিকি করে জ্বলছে। ও আরেকবার দু'হাতে নিজের বুক চেপে ধরে উত্তাপ বুঝতে চাইল।

সূর্যকে সঙ্গী করে

সমরেন্দ্র ঘোষাল

সূর্যকে সঙ্গী করে
এক প্রভাত এসেছিল আমার জীবনে
আমার চোখের জানলা খুলে
হাত বাড়িয়ে সমস্ত সত্তার বন্ধনে
তাকে আঁকড়াতে চেয়েছিলাম;
সে আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে
কখন হারিয়ে গেল।

এখন সেই প্রভাতের অন্বেষণেই
জীবন সৈকত তীরে দাঁড়িয়ে সময় যায়
ডুব দেওয়া আর হয় না।
অতঃপর ভেবেছিলাম সমস্ত কিছু সাহস করে বলব
প্রচণ্ড ও প্রাজ্ঞ এক মধ্যাহ্নকেই
যখন তাকে নিজের করে মনের নাগালে পাব।
শিশুর মুখের সরলতার রঙে নিজেকে ডুবিয়ে নিয়ে
তার কাছেই অকৃপণ হব।
অথচ সে আমার চেতনার দুয়ারে
ঘা দিয়ে দিয়েই ফিরে গেল।

অবশেষে সেই সায়াহ্নকে
দ্বিধাহীন নিঃসংকোচে নিজের মত করে পেয়ে
কথাটা হৃদয়ে ধরে তাকেই বলব বলে
এক পা এক পা করে যখন তার নিকটবর্তী হয়েছিলাম
ঠিক তখনই দেখেছিলাম অশরীর আমি
তার মধ্যে মিশে গিয়ে
নিজেই এক আলোহীন সায়াহ্নে
রূপান্তরিত হয়েছি।

কলা প্রসঙ্গে

অমলপদ্ম বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটোবেলায় কবিতা পড়েছিলাম—

শসা আর কলা খাও,
খাও পাকা আম।

খাবার মত ফল অবশ্য আরো অনেক আছে। পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল, আনারস, ডালিম, আপেল ইত্যাদি। কিন্তু জনপ্রিয়তায় কলার কাছে কোনো ফলই লাগে না। কলা সকালে খান, দুপুরে খান, বিকেলে খান, রাতে খান : যখন ইচ্ছে তখন খান। একে কাটবার দরকার নেই, ধোবারও দরকার নেই, খোলা ছাড়াবার জন্যে ছুরি ঘাটিরও কোন দরকার নেই। হাত দিয়ে কলার খোসা ছাড়ান আর দাঁত দিয়ে কামড়ান। কলার কিছু ফেলার দরকার নেই। পুরোটাই খান। একটা খান, দুটো খান : যত পারেন তত খান। বাড়িতে খান, অফিসে টিফিনে খান, খেলা দেখতে দেখতে খান, রাস্তায় চলতে চলতে খান। যখন ইচ্ছে খান, যেখানে ইচ্ছে খান। সকালে ব্রেক-ফাস্টে খান, দুপুরে খাবার সঙ্গে খান, সব খাবার শেষে খান, দুধে ফলে খান, দুধে চটক খান।

'আমসত্ত দুধে ফেলি
তাহাতে কদলি দলি,
সন্দেশ মাখিয়া নিয়া ভাতে,
হাপুস হুপুস শব্দ
চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড় কাঁদিয়া যায় পাতে।'

কলা একা খান, দুজনে খান, সকলে মিলে খান, পিকনিকে খান, পার্টিতে খান, সঙ্গে নিয়ে খান, সঙ্গ দিয়ে খান। খিদে পেলে খান, খিদে না পেলেও খান। যতরকমভাবে পারেন খান।

আম জাম লিচু কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের জনপ্রিয়তায় কলার সঙ্গে তুলনা করা যায় কি? মোটেই না। শুধু জনপ্রিয়তাই কেন, উদারতায়, অমায়িকতায়, অনাড়ম্বরতায় কলার কোন তুলনাই চলে না বাকিদের সঙ্গে। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই কলার, কোনো ঝামেলা নেই। খোসা ছাড়াও—আর খাও। কিন্তু শুধু কি পাকাকলা? কাঁচকলারও কি কম কদর? কাঁচা আম বা কাঁচা পেয়ারার মত কাঁচকলা অবশ্য কামড়ে খাওয়া যাবে না। না যাক। রান্নায় কাঁচকলার বিশিষ্ট ভূমিকা। ঝোলে কাঁচকলা, শুকতোতে কাঁচকলা, সেদ্ধতে কাঁচ-কলা, আবার কাঁচকলার বড়া।।

সুখে পাকা কলা, অসুখে কাঁচাকলা। নৈবেদ্যে কাঁচকলা, হবিষ্যিতে সেদ্ধ কলা, আর পুজোতে চালকলা তো আছেই। পাকাকলা দুধে খান, কাঁচ-কলা ভাতে খান। এর পরেও আছে। কলার গাছ আছে, থোড় ও মোচা আছে এবং কলাপাতা আছে। মোচার ঘণ্ট খান, থোড় চচ্চড়ি করে খান। কলা-পাতায় খান। কলাপাতায় ঠাকুরঘরে ভুজ্যি সাজান এবং দরকার হলে কলাপাতায় ঢেকে খাবার নিয়ে যান, খাবার পর কলাপাতা ডাস্টবিনে ফেলুন, ফেলে দেবার পরেও কলাপাতার নিস্তার নেই, সঙ্গে সঙ্গে গরুর গহ্বরে যাবে। আর সবার শেষে কলাগাছ। গাছ কেটে দিয়ে, পৈতে কি পুজো বাড়িতে বসান। কাঁচা বা পাকা ফলই শুধু নয়, গাছ, পাতা সব নিয়ে এতো টানাটানি আর কোন ফলের ব্যাপারে আছে কি? রুগীর ঘর থেকে ঠাকুরঘর সর্বত্র এমন সাদর অভ্যর্থনা আর কোনো ফলের আছে কি?

কিন্তু কলা ফলেই কলার শেষ নয়। স্বাস্থ্য ভাল করতে পাকাকলা বা পেট খারাপে কাঁচকলার ঝোলেই কলার সমাপ্তি নয়। কারণ কলা আজকাল পেটই ভরাচ্ছে না, মন ভরাবার কাজেও নেমেছে। আজকের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে কলার কদর কি কম? যা কিছু করবেন তা অবশ্যই হতে হবে কলাসম্মত। তাই এখন শিল্পই বলুন, সঙ্গীতই বলুন বা নৃত্যই বলুন সর্বত্রই কলার প্রবেশ ঘটেছে। নাচ শুধু নৃত্যই নয়, নৃত্যকলা। আঁকা এখন চিত্রকলা, শিল্প এখন শিল্পকলা।

কলেজে কলা বিভাগ তো আছেই, পরীক্ষাতেও রয়েছে বিজ্ঞান ও কলা আলাদা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কবেই তো কলা-ভবন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যতই এখন জ্ঞান ছি বাড়ছে, ততই কলা চর্চার প্রসার হচ্ছে। দেশ জুড়ে নানা শহরেই এখন কলা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। বাড়িতেও কি কলার কলকাকলি কম? ঘর সাজাবেন কলাসম্মত সাজান। বাড়ি করবেন, কলাসম্মত করুন। শাড়ি পরতে কলা চাই, প্রসাধনে কলা চাই : যাই করুন তাতেই কলা। আর কলাসম্মত হল কি হল না, তার বিচার করবার জন্যে কলা-সমালোচক।

অতএব কলা শুধু সুস্বাদু ফলই নয়, স্বাস্থ্যকর খাদ্যই নয়, কলা এখন শিল্প। কলা সংস্কৃতির বাহক। নাচ-গান আঁকা সবেতে একমাত্র কলাই, কোথাও লিচু কাঁঠাল ইত্যাদি নেই। যা কিছু সুন্দর তাকে বলা হবে কলা-সম্মত : কেউ আম বা পেঁপেসম্মত বলবে না। দেশ জুড়ে কলাকেন্দ্র : কোথাও কাঁঠাল বা নাসপাতি কেন্দ্র নেই। বলা বাহুল্য, কলাকেন্দ্রে কাঁচা ও পাকাকলা, কলাগাছ, থোড় বা কলাপাতা ছাড়া আর সবই পাওয়া যায়।

কলা খান। কলা খাওয়া ভাল। কলা স্বাস্থ্যকর। কলা খান। যত

পারেন খান। কিনে খান, কেড়ে খান, পেড়ে খান, চেয়ে খান। এত কলার গুণগান করার পরও যদি কলা না খেতে চান, না খাবেন। না খান কলা, কলা-সম্মত কিছু করুন। কলা প্রদর্শনী দেখুন। চারুকলাতেও যদি উৎসাহ না থাকে, না থাকুক। কলা বেচুন। রথ দেখা ও কলা বেচা দুটো কাজই এক-সঙ্গে করতে পারেন। কলা বেচতে যদি উৎসাহ না থাকে, না থাকুক। তবে রক্ষে করুন, অন্যদের খোসামোদে আঙুল ফুলে কলাগাছ যেন হবেন না।

আর কলা নিয়ে যদি কিছু নাই করেন, দোহাই কলার প্রতি অনাসক্ত হয়ে কাউকে যেন কলা দেখাবেন না। অবশ্য কলা ভক্ষণের পর ফল কলা না হলেও কলা চর্চার পর ফল কলা হতে পারে। কলা-সমালোচকরা বলতে পারেন, এ কলাচর্চা হয়েছে না কলা হয়েছে। আর কলা নিয়ে এত কলকাকলি করবার পরও কলা খেতে খেতে এ লেখা পড়ে শেষ করে সম্পাদক মশাই স্বচ্ছন্দে মন্তব্য করতে পারেন—কলা নিয়ে এ কি কলা লিখেছেন মশাই।

কলা খেয়ে পরিণামে কলা পেতে পারেন। পরিণতিতে কলাও দেখাতে পারেন। তবে কলার ব্যাপারে আর যাই করুন কলা নিয়ে ছলাকলার আশ্রয় নেবেন না। আর কলা খেয়ে কলার খোসা যেখানে-সেখানে ফেলবেন না, যাতে পা পিছলে কাউকে না পায়ের হাড় ভেঙে প্লাস্টার পায়ে বিছানায় পাকা দু' মাস শুয়ে থাকতে হয়। আপনার প্রিয়বন্ধুর যদি পাপের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে থাকে, সময়মত কাঁচকলা দেখিয়ে তার কাছ থেকে সরে পড়লে কেউ আপত্তি করবে না কিন্তু দোহাই দুধকলা দিয়ে সাপ পুষবেন না।

অথবা কিছুই নও

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

অথবা কিছুই নও : এতকাল যে-কথা বলেছি;
তবুও হৃদয় কেন শিলালিপি, কেন সে-অতীত
বিবিক্ত শরণে তার বিস্মৃতির নবীন ইচ্ছাকে
মন্ত্রে দীক্ষিত করে? সময়ের উপসমুদ্রের
দূরের গভীর থেকে কেন জাগে ভূতাশ্রয়ী কীট!
কী মায়ায় যূথবন্ধ আত্মচ্যুত তনুর বাহার;
কেন বলো প্রতিপদে গতিভ্রষ্ট করে
তাদের রঙিন শব নির্যাতির ফেনিল বিস্তার!

দেখেছি নদীর বুকে আশ্বিনে অঘ্রাণে পৌষ মাসে,
নোলক দোলানো তার নিঃশ্বাসের উষ্ণ ঘনঘটা
উত্তরে নাচায় সোনা, দক্ষিণে ফলন্ত পাম্নারাজি ;
নিরুক্ত আশার মতো বুকে তার নিরুদ্দেশ তরী
দিগন্ত নামায় পালে; তালে তালে সলজ্জ আঙুলে
বলাকার মালা গাঁথে ঊর্ধ্বে তার সহচরী মেঘ।
সব মিলে তা তোমার সত্তার নিসর্গে রমণীয়—
এ-কথার ধ্বনিবৃত্তে একদা তুমিই
ছিলে নাকি প্রতীতির বিহ্বল উপান্তে বরণীয়?

আজ দেখি নদী নেই, মজে গেছে; পাম্নাবতী তীর
কাকের নখরে দীর্ণ, স্বর্ণকূল আকালে ধূসর!
ভাঙা তরী জড়ো করে চিতা জ্বালে চণ্ডাল এবং
ছিন্নমালা বলাকার বাসি ফুল লুণ্ঠিত দুর্বেগে!
কারণ তুমি যে সেই হত্যা করে প্রথম শপথ
অভ্রান্ত বাস্তবে আজ পঙ্কশীলা ফসলের ক্ষেত!
আমার সন্তাপে তাই তুমি স্মৃতি ভাঙা হাটে হাওয়া
অথবা কিছুই নও, তবুও হৃদয়
বিগত প্রবাসে কেন অন্ধকারে করে আসা-যাওয়া!

পলাতক

মঁসিও সিমঁ লব্রুমাঁর সঙ্গে মাদমোয়াজেল জান করদিয়ের বিয়ের কথা শুনে কেউ আশ্চর্য হল না। মঁসিও লব্রুমাঁ এটর্নী জেনারেল মঁসিও পাপিয়ঁর দপ্তরখানাটা কিনেছেন বটে কিন্তু এখনও তাঁর পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হয়নি। মাদমোয়াজেল করদিয়ের কাছে তিন লক্ষ ফ্রাঁ সঞ্চিত ছিল।

এটর্নী এবং মানুষ হিসাবে মঁসিও লব্রুমাঁ ভালই। মাদমোয়াজেল করদিয়ে সুশ্রী এবং সরল প্রকৃতির মেয়ে। তাদের বিবাহোৎসব সমস্ত বৃতিঁয়ি শহরটিতে আলোড়ন আনল। নবদম্পতীকে সবাই খুব প্রশংসা করল। তারা স্থির করল কিছুদিন একসঙ্গে বৃতিঁয়র বাড়ীতে থেকে পরে পারিতে বেড়াতে যাবে।

মঁসিও লব্রুমাঁ একটি কথা খুব বিশ্বাস করতেন—তা হচ্ছে 'যে অপেক্ষা করতে জানে তার সব কিছু মেলে।' তিনি উদ্যমশীল মানুষ ছিলেন এবং তাঁর ধৈর্যও ছিল অপরিসীম, কাজেই পূর্ণ সাফল্য অর্জন করলেন।

বিয়ের চতুর্থ দিন থেকেই মাদাম লব্রুমাঁ স্বামীকে আদর করতে সুরু করল। সে চাইত সর্বদা স্বামী তার কাছে বসে থাকবে এবং সে স্বামীকে আদর করবে। অপরদিকে মঁসিও লব্রুমাঁ নিজে তাঁর স্ত্রীকে বেশী আদর করতেন না - - - -এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যেত না।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন মঁসিও লব্রুমাঁ তাঁর তরুণী স্ত্রীকে বললেন—'তুমি যদি চাও তো সামনের সোমবারেই আমরা পারি-তে রওনা হতে পারি। সেখানে আমরা জলসা; থিয়েটার, রেস্তোরাঁ সব জায়গাতেই যাব কিন্তু এমন ভাব দেখাব যেন আমরা অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকা।'

তরুণীটি আনন্দে নেচে উঠে বলে—'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। যত শীগগির সম্ভব রওনা হব।'

—'তোমার বাবার কাছ থেকে যৌতুকের টাকাটা চেয়ে নিতে ভুলো না; কারণ মঁসিও পাপিয়ঁকে তাঁর পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে।'

গী দ্য মোপাসাঁ

'—কাল সকালেই আমি বাবাকে বলব।' স্ত্রী জবাব দিল।

- - - -মঁসিও লব্রুমাঁ স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে আদর করতে লাগলেন।

সোমবার দিন শ্বশুর-শাশুড়ী মেয়ে-জামাইকে নিয়ে স্টেশনে গেলেন। শ্বশুরমশাই জামাইকে বললেন—'আমি শপথ করে বলতে পারি এতগুলো টাকা হাত-ব্যাগে করে নিয়ে যাওয়া বোকামি হবে।'

—'আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। কাজের সুবিধের জন্য অনেক সময় আমাকে এমনি করেই টাকা নিয়ে যেতে হয়---বরং আরও বেশী টাকা। আপনি ব্যস্ত হবেন না।' জামাই একটু মচ্‌কি হেসে জবাব দিল।

একজন কর্মচারী চেঁচিয়ে বলছিল—'এই গাড়ী পারি-তে যাচ্ছে।'

মঁসিও লব্রুমাঁ তাড়াতাড়ি সস্ত্রীক ট্রেনে উঠে পড়লেন। দু'জন ভদ্রমহিলা সেই কামরাতে ছিলেন।

মঁসিও লব্রুমাঁ তাঁর স্ত্রীর কানে কানে বললেন—'কি মুসকিল। চুরুট খেতে পারব না এখানে।'

—'আমারও বিরক্ত লাগছে কিন্তু তুমি চুরুট খাবে বলে নয়।' অনচ্ছ কণ্ঠে জবাব দিল স্ত্রী।

হুইসল দিয়ে ট্রেন চলতে সুরু করল। নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছতে এক-ঘণ্টা লাগল। এইটুক সময়ের ভেতর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটল না কারণ মহিলাদ্বয় জেগেই ছিলেন। - - - -

ট্রেন সাঁ লাজার স্টেশনে আসতেই মঁসিও লব্রুমাঁ স্ত্রীকে বললেন—'ওগো, তোমার যদি অমত না থাকে তবে আগে আমরা রেস্তোরাঁতে খেয়ে নেব—পরে ফিরে এসে মালপত্তর নিয়ে হোটেলে উঠব।'

মাদাম তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বলল—'হ্যাঁ, আমরা আগেই রেস্তোরাঁতে খেয়ে নেব—কিন্তু রেস্তোরাঁ কি দূরে?'

—'একটু দূর বটে তবে আমরা বাসে যাব।' মঁসিও বললেন।

—'কেন ছোট একটা ঘোড়ার গাড়ীতে গেলেই তো হয়।' স্ত্রী একটু বিস্মিত হয়ে বলল।

—'এই তোমার মিতব্যয়িতা। ছোট গাড়ীতে গেলে পাঁচ মিনিটের পথ যেতে প্রতি মিনিটে ছ'সু দিতে হবে।' মঁসিও বললেন।

—'তা বটে।' একটু হতভম্ব হয়ে জবাব দিল মাদাম।

তিন-ঘোড়ায়-টানা প্রকাণ্ড একটা বাস যাচ্ছিল - - - মঁসিও চেঁচিয়ে ডাকলেন—'এই কনডাকটার। এই কনডাকটার।'

অতিকায় যানটা থামল। মঁসিও লব্রুমাঁ স্ত্রীকে ঠেলে ভেতরে

ফিরে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'তুমি ভেতরে বস, আমি ওপরে উঠছি। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে আমার অন্তত একটা চুরুট খাওয়া চাই।'

কোন জবাব দেবার আগেই কনডাক্টার স্ত্রীলোকটির হাত ধরে টেনে তুলল।---তরুণীটি ধপাস করে বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল।---গাড়ীর পেছনের কাঁচ দিয়ে স্বামীর পা-দুটো দেখতে পেল---তিনি ওপরে উঠছেন বসবার জন্য ---- বিস্মিত হল সে।----

তরুণীটির একপাশে স্থূলকায় এক ভদ্রলোক বসেছিলেন—তাঁর গায়ে চুরুটের গন্ধ। অপর পাশে ছিলেন এক বৃদ্ধা—তাঁর গা থেকে কুকুরের গন্ধ আসছিল। এঁদের দু' জনের মাঝখানে কাঠ হয়ে বসে রইল স্ত্রীলোকটি। ---সব যাত্রীরাই সার বেঁধে নীরবে বসেছিল। এদের ভেতর রয়েছে মুদী, শ্রমিক, দুই বোন এবং পদাতিকবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ। ---- সোনার ফ্রেমের চশমা-পরা এক ভদ্রলোক রয়েছেন—তাঁর টুপির চার-দিকের প্রান্তভাগ ওপরদিকে তোলা--- যেন একটা নর্দমা। দুই বোন বেশ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন---যেন তাঁরা সাধারণ যাত্রী থেকে একটু স্বতন্ত্র।— গাড়ীর ঝাঁকনিতে সবাই দুলছিল।--- সবাইকে মনে হচ্ছিল ঘুমন্ত এবং নির্বোধের মত।----তরুণীটি এদের মধ্যিখানে বসে অস্বস্তিবোধ করছিল। সে ভাবছিল ---'কেন সে আমার সঙ্গে ভেতরে এল না?' ভীষণ দু:খে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে।--- অনায়াসে সে সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারত।

উল্লাসিক দুই বোন গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়ল—যাবার সময় ছড়িয়ে গেল পুরোন পোশাকের একটা বিশ্রী গন্ধ, চলতে চলতে আবার গাড়ী থামল। একজন পাচিকা উঠল—আরক্ত মুখ----' হাঁপাচ্ছিল সে---বসে কোলের ওপর আনাজ-ভর্তি ঝুড়িটা রাখল।

—'আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও অনেক দূর জায়গাটা।' তরুণীটি ভাবতে থাকে।

এটর্নী-পত্নী অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। ভীষণ কান্না পেল। যাত্রীরা কেউ গাড়ী থেকে নামল, কেউ উঠল।----গাড়ীটা যেন অন্তহীন পথ ধরে চলেছে ---- কেবল মাঝে মাঝে স্টেশনে থামছে।---উ:! আর কতদূর। মনে মনে ভাবল জানিন। আস্তে আস্তে সব যাত্রীরা নেমে গেল—শুধু সে একা রইল গাড়ীতে।

—'ভোজিরার।' কন্‌ডাকটার চেঁচিয়ে বলল। তরুণীটিকে নির্বিকার হয়ে থাকতে দেখে সে আবার চেঁচিয়ে বলে— 'ভোজিরার।'

আশেপাশে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে তরুণীটি বুঝতে পারল কন্‌ডাক্‌টার তাকে লক্ষ্য করেই বলছে।

--'ভোজিরার।' কন্‌ডাকটার তৃতীয় বার চেঁচাল।

---'আমরা কোথায় এখন?' স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল।

---'আমরা এখন ভোজিরারে। হায় ভগবান। একশবার তো চেঁচালাম।' রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কন্‌ডাক্‌টার।

—'এই জায়গাটা কি রাজপথ থেকে অনেক দূরে?'

---'কোন রাজপথ?'

---'ইতালীয় রাজপথ।'

---'অনেক আগেই আমরা পেরিয়ে এসেছি।'

---'অনুগ্রহ করে আমার স্বামীকে একটু খবর দেবেন।'

---'তোমার স্বামী? কোথায় তিনি?'

—'ওপরে বসে রয়েছেন।'

—'ওপরে? ও জায়গাটা তো অনেকক্ষণ থেকেই ফাঁকা।'

এই কথা শুনে আঁতকে উঠল স্ত্রীলোকটি।

---'কি রকম? এ কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা একসঙ্গে গাড়ীতে উঠেছি—আপনি ভাল করে দেখুন তো একবার ---- সে নিশ্চয়ই ওখানে আছে।'

কণ্ডাক্টার এবার অশ্লীল মন্তব্য করল—'চল বাছা, বখাটে লোকটার সঙ্গে অনেক বকবক্ করেছ।--- তোমায় ঠকিয়েছে সে---কিন্তু কি হয়েছে তাতে? রাস্তায় তুমি আরেক-জনকে পাবে।'

—'না, আপনার ভুল হয়েছে—তার হাতে একটা মস্ত বড় হাত-ব্যাগ ছিল।' ---কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীলোকটি বলল।

—'মস্ত বড় হাত-ব্যাগ ছিল?--- হাঁ, হাঁ ---সে তো অনেক আগেই মাদল্যানে নেমে গিয়েছে। তোমায় ফেলে সে পালিয়েছে।'

----স্ত্রীলোকটি গাড়ী থেকে নেমেই ওপরের দিকে তাকাল ---- জায়গাটা ফাঁকা।----

কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে স্ত্রীলোকটি জোরে জোরে কাঁদতে লাগল—'তাহলে কি হবে আমার?'

ইনস্‌পেক্টার সাহেব এগিয়ে এলেন— জিজ্ঞেস করলেন—'কি ব্যাপার?'

কন্‌ডাকটার শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিল—'এই মেয়েটিকে তার স্বামী রাস্তায় ফেলে পালিয়েছে।'

---'ও কিছু নয়। তুমি তোমার কাজে যাও।'

কন্‌ডাক্‌টার চলে গেল।

স্ত্রীলোকটি কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গেল। ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতেই পারল না।---কোথায় যাবে? কি করবে এখন? ---কি করে স্বামী তার কথা ভুলে গেল---সে তাকে এত ভালবাসে। ----

পকেটে ঠিক দুটি ফ্রাঁ অবশিষ্ট ছিল। কাকে জিজ্ঞেস করবে?--- হঠাৎ জাহাজের অফিসের সহকারী প্রধান কর্মচারী তার এক পিসতুত ভাইয়ের কথা মনে পড়ল।---ছোট একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে যাবার মতই হাতে ঠিক পয়সা আছে। ভাইয়ের বাড়ীর সামনে যেতেই দেখতে পেল লক্রুয়াঁর মত তার ভাইও একটা বড় হাত-ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে চলেছে।—

গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল স্ত্রীলোকটি—চেঁচিয়ে ডাকল—'হেনরী!'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কর্মচারীটি —বলল—'জানিন? এখানে? একা? কি করছ এখানে?---কোথা থেকে আসছ?'

জলভরা চোখে তোৎলাতে তোৎলাতে জবাব দিল সে—'আমার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

—'পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'হ্যাঁ, বাসে ওপরের আসনে বসেছিল—সেখান থেকে অদৃশ্য।'

—'বাসের ওপরের আসন থেকে? ও।'

কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীলোকটি সব খুলে বলল। সব কথা শুনে একটু চিন্তা করে তার ভাই জিজ্ঞেস করল—'সকালে তার মাথা ঠাণ্ডা ছিল তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ। তার সঙ্গে অনেক টাকাকড়ি ছিল?'

—'আমার বিয়ের যৌতুকের সব টাকাটাই ছিল।'

—'বিয়ের যৌতুকের টাকা? সবটাই।'

—'শোন বোন, তোমার স্বামী এখন বেলজিয়ামের পথে।---'

----কিছু বুঝতে পারল না তরুণী স্ত্রীলোকটি ---তোৎলাতে লাগল—'আমার স্বামী তুমি বলছ---'

—'তোমার বিয়ের যৌতুকের টাকাটা নিয়ে সে পালিয়েছে।'

----ভাইয়ের বুকের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।---রাস্তার পথচারীরা তাদের লক্ষ্য করছে দেখে কর্মচারীটি তার বোনকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেল—কটিবেষ্টন করে ধরে ওপরে নিয়ে গেল--তার পরিচারিকা দরজা খুলতেই বলল—'সোফি, দৌড়ে গিয়ে দু'জনার জন্য খাবার রেস্তোরাঁ থেকে নিয়ে এস আর আমি আজ অফিসে যাব না।'*

অনুবাদক—সুবীরকান্ত গুপ্ত

* মূল ফরাসী থেকে অনূদিত।

একফোঁটা রুধির

শ্রীবিশ্বনাথ বারিক

তুহিন অরণ্যে প্রজাপতি দিল আজ মন,
তরঙ্গিত মৌন নীলিমায় ডুব দিল তখন।
কামনার দীপ জেবলে এ হৃদয় জেগে আছে—
যদি চাও একফোঁটা রুধির হৃদয়ের কাছে—
দিয়ে দেব, দিয়ে দেব সব—
আমি নই কুশীলব।

তবু প্রশ্ন রাখি তুহিন অরণ্যের নিকটে,
স্বরচিত নির্জনতা কেন তার দৃশ্যপটে।
স্নিগ্ধতার সৌন্দর্যের সুষমায় তৃপ্ত হয়
আমার হৃদয়, যদি বা সর্পিল অশ্রু বয়
আমার চোয়ালে, যা কিছু সব,—
তোমার সৃজিত অনুভব—
জীবন সৈকতে দ্যুতিময় প্রজ্বলিত দীপ
নিভে যায়, তবু জেবলে রাখি বুকের প্রদীপ।
গোধূলির স্বর্ণরেখায় চকিত তব মুখ,—
স্মরণভূষিত শৈশবে নেইকো কিছু সুখ
হৃদয় পারাবারে; মুছে দিও সব,—
নই আমি কুশীলব।

রক্ত গোলাপ

রণজিৎকুমার দত্ত

রক্তগোলাপ। তোমায় আমি ভালবেসেছিলাম
নিদাঘ তপ্ত দিনে তোমার পাপড়িগুলো
যখন শুকিয়ে যেতো,
তখন আমি সমবেদনার দৃষ্টি দিয়ে তাকাতাম—
মনে মনে ভাবতাম তুমি বেঁচে ওঠো
পৃথিবীতে নতুন আলোর বন্যা ছড়িয়ে দাও।

শীতের নির্মম কুহেলিকা যখন তোমাকে
গ্রাস করতে উদ্যত
তখন আমি তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতাম,
ভয় কিসের রক্তগোলাপ, আমি তো আছি।
আবার যখন বসন্ত আসতো—
আর তোমার লাল পাপড়িগুলোর ওপর প্রজাপতি
এসে বসতো
তখন তোমাকে কি সুন্দরী-ই না দেখাতো
তখন কিন্তু তোমার কাছে যেতে আমার সাহস হতো না।
আমি দূর থেকে দেখতাম।
রক্তগোলাপ। আমি তো তোমাকে চিনলাম
কিন্তু তুমি তো আমায় চিনলে না।

বীরভূম

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

॥ শেষাংশ ॥

দেব-দেউল

হিন্দুধর্মের প্রধান শাখা শাক্ত ও বৈষ্ণব। উভয় সম্প্রদায়েরই এই জেলায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেখা যায়। এই হিন্দুদের ৫১ পীঠের মধ্যে ৫টি পীঠ বীরভূম জেলায়। এ ছাড়া সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠও আছে।

অট্টহাস—লাভপুরের কাছে। এখানে দেবীর ওষ্ঠাংশ পড়ে। অধিষ্ঠাত্রী দেবী ফুল্লরা। ভৈরব—বিশ্বনাথ।

বক্রেশ্বর—সিউড়ির কাছে। এখানে দেবীর দক্ষিণবাহু পড়ে। অধিষ্ঠাত্রী দেবী বক্রেশ্বরী বা মহিষমর্দিনী। ভৈরব—বক্রেশ্বর বা বক্রনাথ।

কাঞ্চী—বোলপুর স্টেশন হতে ৫ মাইল দূরে কোপাই নদীর তীরে বেলুটি গ্রামে। এখানে দেবীর কঙ্কাল পড়ে। অধিষ্ঠাত্রী দেবী বেদগর্ভা বা কঙ্কালী। ভৈরব—রুরু। কেহ কেহ বলেন কালিদাস এখানে সিদ্ধিলাভ করেন।

নন্দীপুর—সাঁইথিয়া স্টেশনের কাছে। এখানে হারাংশ পড়ে। এটি উপপীঠ। অধিষ্ঠাত্রী দেবী—নন্দিনী। ভৈরব—নন্দিকেশ্বর।

নলহাটি—উপপীঠ। স্টেশন থেকে নৈর্ঋত কোণে ২ মাইল দূরে। এখানে দেবীর শিরানলী বা নলী পড়ে। অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সাফালিকা। মতান্তরে কালিকা। ভৈরব—যোগীশ।

পীঠস্থান ছাড়াও এখানে অনেক মন্দির আছে। তন্মধ্যে—

বসুমতী দেবী—বড়জোল (রামপুরহাট)।

ধর্মঠাকর—ধর্মঠাকুরের পূজো এখানে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে হয়। বড়াগ্রামে (নানুর), খয়রাশোলে, লায়েকপুর গ্রামে (লাভপুর), ভবানীপুরে (রাজনগর), ভগবানবাটি ও ছোড়ে (সিউড়ি), অজয়কোনায় (সাঁইথিয়া), সুপুর (বোলপুর), জামখালি (দুবরাজপুর), কণ্ডগর গ্রামে (দুবরাজপুর), কুবীরপুর (সিউড়ি), লাউসেনতলা (কেন্দুবিল্ব) প্রভৃতি স্থানে ধর্মঠাকুরের পূজা। প্রায়ই সারা বছরেই কোন না কোন মাসে বিভিন্ন স্থানে এই পূজার অনুষ্ঠান হয়। সাধরণত বৈশাখী-পূর্ণিমা, শ্রাবণী-পূর্ণিমা, দুর্গাপূজোর সময়, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র মাস প্রভৃতিতে হয়। বিশালক্ষ্মী মন্দির—নানুরে।

উৎসব ও মেলা

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বৈষ্ণবদের কাছে মহাপুণ্যের দিন। তাঁরা মনে করেন এই দিনেই সত্যযুগের সূচনা হয়েছিল।

বৈশাখী-পূর্ণিমা—এই দিনে বুদ্ধদেবের জন্ম-উৎসব, বৈষ্ণবদের ফুলদোল।

ব্রহ্মাপূজা—এই জেলায় বহুদিন থেকে ব্রহ্মার পূজা হয়ে আসছে। সাধারণত প্রতি হিন্দুপ্রধান গ্রামে বছরের শেষে এক অগ্নিভয়াদি নিবারণের জন্য ব্রহ্মার পূজা হয়ে থাকে (বীরভূম বিবরণ, ২য় খণ্ড)।

গন্ধেশ্বরী দেবী—বৈশাখী-পূর্ণিমার দিন বিশেষত তাম্বুলী সম্প্রদায়েরা ঘটা করে পূজা করে থাকেন।

ধর্মগাজন—সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমায়।

ভাদু পূজা—এই পূজা বীরভূমেও হয়। এই ভাদু পূজার উৎপত্তি মানভূমে। মানভূমের কাছ থেকেই বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলায়ও ভাদু পূজা হয়। বীরভূমে যে ভাদুপূজা হয় তা মানভূমের গল্প থেকে পথক। মানভূমের গল্পটি এই—

কৈলাসে দুর্গা একদিন শিবের কাছে গিয়ে জগন্নাথদেবের দর্শনের অনুমতি চান। শিব নারাজ। দুর্গা অভিমানে স্বামী ত্যাগ করে মানভূমে পঞ্চকোটের জঙ্গলে এসে বসলেন। রাজা দুর্গা উপাসক। তিনি গভীর জঙ্গলে শিকারে এসে এক সুন্দরী বালিকাকে কাঁদতে দেখলেন। মেয়েটিকে তাঁর ভাল লাগল। বাড়ীতে নিয়ে এলেন। অপুত্রক রাজা-রাণী তাঁকে কন্যার মত পালন করলেন। নাম রাখলেন ভাদু বা ভাতু। মেয়েটি শিবপরায়ণা। সকলে তাঁর প্রতি মগ্ধ ও তাঁকে প্রীতির চক্ষে দেখে। মেয়ে বড় হল, বিয়ের চেষ্টা হয়, কিন্তু ভাদুর সেদিকে মন নেই। এদিকে দুর্গা বিহনে শিবের অশান্তি বেড়ে গেছে। দুর্গাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য নারদ এগিয়ে এলেন। নারদের গতি সর্বত্র। নারদ হরিনাম করতে করতে পঞ্চকোটের রাজবাড়ীতে এলেন। ভাদুর দৃষ্টি আকর্ষিত হলে গোপনে তাঁকে শিবের অশান্তির কথা বললেন। এদিকে দেবতার নির্দেশে বিশ্বকর্মা সুবর্ণরেখার তীরে দলমাতে এক প্রাসাদ তৈরী করলেন। রাজ্যের নরনারীরা দলে দলে সেই প্রাসাদ দেখতে গেল। ভাদুও রাজার কাছে আবদার ধরলেন তিনিও যাবেন। দাস দাসী সেপাই নিয়ে ভাদু দলমার বাগানে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। সকলেই প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। ভাদু সেই সুযোগে এক পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে অন্তর্হিতা হলেন। ঝড় থামল, ভাদুর খোঁজ পড়ল। ভাদু নেই। রাজা-রাণী ভেঙ্গে পড়লেন। কৈলাসে শিবদুর্গা জানতে পারলেন। ছুটে এলেন তাঁরা রাজা-রাণীকে শান্ত করতে। সে দিনটা ছিল ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি। রাজা-রাণী সব ঘটনা জানতে পারলেন। এই ঘটনাকে চিরস্থায়ী করবার জন্য এই দিনেই ভাদ উৎসব করলেন

ধীরে ধীরে এই উৎসব ছাড়িয়ে পড়ল গ্রাম-গ্রামান্তরে।

বীরভূমের গল্প—বীরভূমের বন অঞ্চলের রাজার কন্যা ভাদু। ভাদ্র মাসে জন্ম বলে ভাদু নাম রাখা হয় সে খুব সুন্দরী ও নাচ-গান ভালবাসত রাজবাড়ীর অদূরেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সেই বিগ্রহের প্রতি ভাদুর অনুরাগ হল রাজা-রাণী তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হলেন সম্বন্ধ আসে। ভাদু অপছন্দ করে। ক্রমে লোকমুখে কানাকানি সুরু হল রাজকন্যা ভাদু বুঝি কাউকে ভালবাসে। তার ওপর দৃষ্টি রাখা হল, দেখা গেল অনেক সময় রাজকন্যা ঘরে থাকে না। রাজার কানে উঠল। গভীর রাতে রাজকন্যা বেরিয়ে ঠাকুরবাড়ীতে চলল। রাজা গোপনে পিছু নিলেন। তখনও মন্দিরের দ্বার খোলা, রাজকন্যা মন্দিরে ঢুকল, দরজা বন্ধ হল। রাজা কান পেতে দরজায় দাঁড়ালেন। ভেতরে খিলখিল হাসি, আর পুরুষের কণ্ঠস্বর। আরম্ভ হল নাচ-গান। রাজা দরজায় ঘা দিলেন। নাচ-গান বন্ধ হল। নিস্তব্ধ। রাজা ক্রোধে দরজা ভেঙ্গে ফেললেন। দেখলেন ঘরে আছে শুধু বিগ্রহ আর তার সামনে প্রাণহীন কন্যার দেহ। রাজা মুহ্যমান। বুঝলেন—ভাদু কন্যা ছিল না, ছিল দেবী। রাজা রাজবাড়ীতে যুগল বিগ্রহের পাশে ভাদুর মূর্তি স্থাপনা করলেন। ভাদু নাচগান ভালবাসত। তাই ভাদু পুজোর দিন নাচে গানে উৎসব পালন হয়।

টুসু উৎসব—টুসুগান ও পুজো সম্পূর্ণভাবে মেয়েরা করে। গোটা পৌষমাস প্রতি সন্ধ্যায় টুসুর সামনে দলবেঁধে মেয়েরা গান গায়। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিনে সারারাত ধরে গান চলে। সংক্রান্তির সকালে টুসুর বিসর্জন হয়। এই উৎসব বাংলার পশ্চিম সীমান্তে, মেদিনীপুর ও বাঁকড়া জেলাতেও হয়।

বাঁকড়া জেলায় টুসু—'তুষু' বা তোষণ বা তুষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত এটি তুষারকালের আহ্বান। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে এই পুজোর শেষ হয়।

বোলপুর শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা, শিবরাত্রিতে বক্রেশ্বর শিবের মেলা, মাঘমাসে জয়দেবের মেলা, এ ছাড়া ছোটখাট মেলা অনেক স্থানে বসে। লোকসমাগমও খুব হয়।

বিভিন্ন জাতি

বীরভূম জেলায় বহু জাতির বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভতি ব্যতীত এখানে বহু রকমের জাতি আছে। সকলেই যে বীরভূমের আদিবাসী তা নয়, বহু জাতি রুজি-রোজগারের জন্য বীরভূমে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। 'বীরভূমের জাতিপ্রসঙ্গ' নাম দিয়ে স্বর্গত গৌরীহর মিত্র প্রবাসী ১৩৫৫ সালের ফাল্গুন মাসে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট জাতির উল্লেখ করছি।

লেট—রামপুরহাট অঞ্চলে এদের বাস। এরা দিনমজুরি, জালবোনা, মাছধরা প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। মনসা ও ধর্মরাজের এরা বিশেষ ভক্ত।

ভল্ল—লাভপুর ও মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বাস। কথিত আছে আগে যখন এ দেশে সামন্ত রাজেরা রাজত্ব করতেন, তখন এরা তাঁদের সৈনিকের কাজ করত। এরা বীর ও সাহসী। বর্তমানে এরা জনমজুরী, চাষবাস, চৌকীদারী, ছুতোরের কাজ করে।

নুরী—এদের আদিনিবাস পশ্চিম অঞ্চল। এরা হেতমপুর ইলামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে থাকে। গালার কাজ করার জন্য এরা বীরভূমে আসে ও স্থায়ী বাসিন্দা হয়। বর্তমানে গালা শিল্পের অস্তিত্ব প্রায় ক্ষীয়মাণ।

ঢেকারু—এরা ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পশ্চিম দেশ হতে লোহা নিষ্কাশনের জন্য মহম্মদ বাজার, ডেহুচা, ভাবরা প্রভৃতি গ্রামে বাস করে। এখন লাঙুলে, ঘেড়েলা, কানমোড়া, মহুলা, জানবাজার, রামপুর, হরিপুর, মল্লিকপুর, ভাদুনিয়া প্রভৃতি গ্রামে অনেকে স্থায়িভাবে বাস করে। এরা লোহার জিনিস মিশ্রিত পেতলের বাটখারা প্রভৃতি তৈরী করে।

যদুপতিয়া—এরা না হিন্দু না মুসলমান। এরা অনেকেই হিন্দুদের মত আচার-ব্যবহার করে। এরা কালী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর পুজো করে এদের মধ্যে কেউ বা আল্লা বা খোদার ওপর বিশ্বাসী। তারা দাড়ি রাখে, মসজিদে যায়, রোজা করে ইত্যাদি। এদের বিয়ের সময় কাজিকে ডাকে, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে এদের বিয়ে হয় না। রামপুরহাট মহকুমার কোন কোন অংশে এদের বাস। এরা কাঁসার ঘটি, কাঁসর, ঘণ্টা, লোহার জিনিষ তৈরি করে।

এ ছাড়া বীরভূমে মুনিয়া, সুনরি, মেহনা, কালোমাচলা, ধানুকি, পুখ বা মৎনাপিত, রাজবংশী, কড়োজ, খয়রা, ঘেড়ো, বাইতি, কেনাই, মণ্ডা, ভুয়াঁও প্রভৃতি জাতি বাস করে।

সাধক ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

এই বীরভূম জেলায় বহু সাধক, গুণী মনীষী বিদ্বজ্জন জন্মগ্রহণ করেছেন। কয়েকজনের উল্লেখ করছি—

কবি জয়দেব গোস্বামী—গীতগোবিন্দ রচয়িতা কেন্দবিল্ব গ্রামে।

পদকর্তা চণ্ডীদাস—নান্নুর গ্রামে।

নিত্যানন্দ প্রভু—বৈষ্ণবপ্রভু। তারাপুরের কাছে বীরচন্দ্রপুরে।

বামাক্ষেপা (বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়)—তারাপুর গ্রামের কাছে আটলা গ্রামে।

মহারাজা নন্দকুমার—ভদ্রপুর গ্রামে।

কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী—বীরভূমের দানশীল রাজা।

আনন্দচাঁদ গোস্বামী—সুপুর গ্রামে।

কায়স্থ কুলজীকার ঘনশ্যাম মিত্র—গোমতি গ্রামে।

আসাদুল্লা খাঁ—বীরভূমের রাজা।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পিতৃভূমি—রায়পুর।

বৈষ্ণবকবি যদুনন্দন দাস—মালিহাটি।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—একচক্রা গ্রামে।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—সিউড়ি।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কাঁমিতা গ্রামে।

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—লাভপুর।

শিবরতন মিত্র—সিউড়ি।

গৌরীহর মিত্র—সিউড়ি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—লাভপুর।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—রূপসী গ্রামে।

সজনীকান্ত দাস—রাইপুরে।

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়—ন'পাড়া কোলাগ্রামে।

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—মঙ্গলডিহি।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়—কীর্ণাহারে।

এ ছাড়া শান্তিনিকেতনে বহু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি এসে বীরভূম জেলাকে ধন্য করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে কত জ্ঞানী বিদগ্ধজন এখানে এসে ভারতকে তাঁদের বাণী শুনিয়েছেন ও কবিগুরুর আশীর্বাদ ও বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন তার সংখ্যাও নগণ্য নয়।

মুক্তি

বিশ্বদেব বসু

আমি কয়েদী
তবু আমি ডাঙায় তুলে আনা
সামুদ্রিক জীবের মত অপেক্ষা করি
জোয়ারের।
ইচ্ছে করে
কয়েদ ঘরের পিছনের
নর্দমার জল.
একচুমুকে শেষ করে
হারিয়ে যাই
ভয়ানক দুর্যোগ রাতের
হারিয়ে যাওয়া
ছোট হাঁসটার মত।
যে সারাদিন সাঁতার কেটে
ক্লান্ত।
ইচ্ছে করে
সামনের গোলাপ গাছটার
বড় বড় গোলাপের পাপড়িগুলো
একটা একটা করে ছিঁড়ে
হারিয়ে যাই।
ভয়ঙ্কর যুদ্ধের রাতে
হারিয়ে যাওয়া
রণক্লান্ত সৈনিকের মত।
আমার সব ইচ্ছে
থমকে থেমে গেছে
প্রাচীরের ওপাশে
পক্ষাঘাতে ওগুলো হয়ে গেছে
জড়।
তাই আমার মুক্তি
অন্ধকারে
চার দেওয়ালের মধ্যে।

মিল

শ্রীরবি গুপ্ত

ঝিলমিল ওই দূরে তারাটি...
তীর তরী নদী বন
অকারণ উন্মন,
তিরু তিরু ছোট ক্ষীণ ধারাটি।

ঘুমঘন প্রভাতের আলোকে,
পাখনার মুক্তির
বুঝি শেষ সুপ্তির
ঘুমেঘন বিহগ পালকে।

সাতরঙা সুর যত মেঘেরা—
সুদূরের হাতছানি
স্বরগের সন্ধানী,
স্বপনের বুঝি অভিষেক এরা।

ঘাসফুল দেখো ধীর মলয়ে
প্রশান্ত পূর্ণিমা
ঘুমহারা—নেই সীমা,
রূপছবি স্থির নীল বলয়ে।

তিমির গুহায় হারা জোনাকি—
নিশীথের নব দেশ
জ্বলন্ত নির্দেশ,
আকাশের সূর্যটা ও নাকি।

মেঘে মেঘে উদ্যত বিদ্যুৎ
এলায়িত জটাজাল
জাগ্রত মহাকাল,
রুদ্রের বাণী তার অদ্ভুত।

একফোঁটা শিশিরের বিন্দু
সুমহান প্রতিভাস
প্রোজ্জ্বল মহাকাশ
উত্তাল নিঃসীম সিন্ধু।

ঝিলমিল ওই দূরে তারাটি,
তীর তরী নদী বন—
এ কী মিল—মনে মন,
তিরু তিরু ছোট ক্ষীণ ধারাটি।

থমকে দাঁড়াল দেবেশ। গাড়ীতে উঠছে সুবেশা মেয়েটি? হ্যাঁ, ঠিক চিনেছে সে। লক্ষ্মীই বটে। ও। দিন ফিরেছে ওর, ভাল চাকরি পেয়েছে। গরীবদের বাড়ী ছেড়েছে এইজন্যই।

ডাক্তার-গিন্নি ব্যস্ত হয়েছিলেন হিমিকার অদর্শনে। কি হ'ল, রোগ না আর কিছু। কেন আসছে না মেয়েটা। স্বামীকে ধামটাও দিলেন কয়েকটা। এখনো তো বাহাত্তর হবার ঢের দেরী, ভীমরতি তো ধরে নি, এরই মধ্যে এত ভুল। মেয়েটার একটা ঠিকানা পর্যন্ত টুকে রাখে নি কোথাও।

দেবেশও মনে মনে উতলা হল। মায়ের ইচ্ছার কথা সবিস্তারে শুনেছে সে অনেকবার। মনে মনে অনেক প্রেম দেবেশ। কি তার মেয়ে। সময় ফিরেছে বলে একটুও অহঙ্কার হয় নি। বাড়ী গিয়ে মাকে কিছু বলতে পারল না বটে কিন্তু বোনেদের জানাল।

—এই সুধা, জানিস তোদের লক্ষ্মীদিকে দেখলাম আজ।

—লক্ষ্মীদিকে দেখলে? ওমা! কোথায়, কোথায় দেখলে তাকে? নিয়ে এলে না কেন সঙ্গে করে? খুব অসুখ করেছিল বুঝি? কলরব করে উঠল দুই বোন।

—না রে, অসুখ-টসুখ নয়। যেখানে চাকরি করে, সেই কর্তাদের হুকুমে ওকে ঘুরতে হচ্ছে দিনরাত। গাড়ী দিয়েছে কি না। সময় পেলেই আসবে। মাকে কিছু বলিস নে এখন।

সুধা আশা ছোটদার বারণ মানতো সে কি ভুলে গিয়েছে তার নিজের পরিচয়। বাইরে হেসে বলল: সারাদিন কাজের পরে কি সিনেমার বদ্ধ ঘরে ভাল লাগবে?

লাগবে না। স্বীকার করল দেবেশ। তবে এই শনিবারে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ঘাটে? দেবেশের প্রস্তাবের অভিনবত্বে স্তব্ধ হয়ে গেল হিমিকা। গত তিন বছর ধরে সে গিয়েছে অনেক পুরুষের সঙ্গে অনেক জায়গাতে। হোটেল, পাহাড়, সমুদ্র। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর।।

●

দেবেশ ছাড়ল না, হিমিকারও ইচ্ছা হ'ল দক্ষিণেশ্বরে যেতে। মন্দিরে প্রণাম করে গঙ্গার ঘাটে এসে বসল দুজনে এক শনিবারের সন্ধ্যায়।

ধারাবাহিক

উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

মধুর কল্পনাও করেছে লক্ষ্মীকে নিয়ে। সুতরাং কলকাতার পথে সতর্ক চোখ রেখে চলত সে। ফলও ফলল। লক্ষ্মীকে দেখল হিরণ ফার্মেসীর দরজায়। একবার ভাবল কাছে যাবে না, কিন্তু না গিয়েও পারল না। দ্রুত রাস্তা পার হয়ে গাড়ীর দরজা ধরে দাঁড়াল সে।

—ইয়ে, মা ভীষণ ভাবছে, অসুখ-বিসুখ হ'ল কি না। একবার গেলে হয় আমাদের ওখানে।

চমকে হিমিকা দেখল জিতেনবাবুর ছোট ছেলে দেবেশ। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে এল।

—মা ভাবছেন, না? ভাল আছে বাড়ীর সবাই? আমি যেতে পারছি না। ভীষণ কাজে আটকা পড়েছি। কর্তাদের ইচ্ছায় চলা তো, হয়তো কলকাতার বাইরেই চলে যেতে হবে। মাকে বলবেন ভালই আছি আমি, সময় পেলেই যাব।

না, নিশ্চয়ই মায়ের কাছে খবরটা বলত, কিন্তু সেদিনই হাসপাতালে হিমানীর একটা মোটা-সোটা আট পাউণ্ডের ছেলে হ'ল। আনন্দের উত্তেজনায় হিমিকার প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। বোনেদের কাছে চাপা পড়ল, কিন্তু দেবেশ ভুলল না। ও অফিসের পর ডাক্তারখানাগুলোর আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। কয়েকদিন পরে প্রত্যাশিত ফলও ফলল, দেখা পেল হিমিকার। হিমিকা দেবেশকে খাওয়ালো এবং দেবেশ একটু সাহস করে প্রস্তাব করল সিনেমা দেখবার জন্য কয়েকদিন দেখাশোনা হবার পরেই।

হিমিকা আশ্চর্য হ'ল, এই প্রথম তার চোখে পড়ল ছেলেটির মুগ্ধতা। পঁচিশ বছর বয়সের সরল ছেলেটির মুগ্ধদৃষ্টির অঞ্জলি ভাল লাগতেই যেন

—জান লক্ষ্মী, অনেকটা ইতস্তত করে হিমিকাকে তুমিই বলল দেবেশ।

—জান, মায়ের মতলব এই শ্রাবণ পার হতে দেবেন না।

অনেকদিন থেকেই নিজেকে প্রকাশ করছে দেবেশ আভাস-ইঙ্গিতে, আজ স্পষ্টই বলে ফেলল।

হিমিকা শুনল, চুপ করে রইল। সাহস করে দেবেশ হিমিকার হাত ধরল।

—আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে চল লক্ষ্মী। আমিই তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব।

বাবা। হিমিকার বাবা। হিমিকার বাড়ী। সামনে উদার গঙ্গা, ও পাশে যুগ-পুরুষের লীলা-নিকেতন। শক্ত হ'ল হিমিকা। আর খেলা নয়, এর পরে নষ্ট হয়ে যাবে তরুণ জীবনটি।

—শোনো দেবেশ, তুমি যা ভাবছ, তা হবার নয়।

—নয়? কেন নয় লক্ষ্মী? আমাদের টাকা নেই বলে?

—টাকা? টাকা নয় দেবেশ। আমি বউ হবার মত মেয়ে নই।

হিমিকার কথায় স্বচ্ছ হাসি দেখা দিল দেবেশের মুখে।

—তুমি বউ হবার মত মেয়ে নও? তোমার মত আর একটি মেয়ে আছে নাকি এই দিনে?

—তোমরা ভুল জেনেছ দেবেশ। আমি ভাল মেয়ে নই।

—খুব, খুব ভাল মেয়ে তুমি। শক্ত হ'ল দেবেশের মুঠি।

ব্যথা করে উঠল হিমিকার বুক। সন্ধ্যার পর রাত্রি নেমেছে, দেবেশ দেখতে পেল না হিমিকার চোখের জল, ভারি গলার কথা শুনল কেবল।

—আমার পক্ষে ঘর-সংসার করা অসম্ভব দেবেশ। তুমি এসব আর বলো না। মা দেখো তোমার জন্য কি সুন্দর বউ আনবেন।

—কক্ষণো না। তোমাকে ছাড়া কাউকে আমি বিয়ে করব না। এই মন্দিরের শপথ নিয়ে—

শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি দেবেশের মুখে হাত চাপা দিল হিমিকা।

—ছি-ছি, একেবারে পাগল তুমি। চল এখন উঠি রাত বাড়ছে।

দেবেশ উঠল, কিন্তু শক্ত করে ধরে রইল হিমিকার হাত।

হিমিকা বুঝল নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। মিথ্যে দিয়ে যে স্নেহ প্রেম কিনেছে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। বার বার এ কথা উচ্চারণ করল হিমিকা কিন্তু এ যে কত শক্ত কাজ তাও বুঝল। নিজের মিথ্যে দিয়ে গড়া প্রচ্ছদপটের দিকে চেয়ে চোখে জল এল। এ মিথ্যাতে কি ক্ষতি হ'ত পৃথিবীর। মিথ্যে করেই নয়তো জিতেশ ডাক্তারের পরিবার জেনে থাকত একটি দুস্থ, অসহায় ঘরের মেয়ে লক্ষ্মী সে। অনেক-দিন পরে পরে সে যেত ডাক্তারের বাড়ী। ভাল-ভাত খেত, কৈফিয়ৎ দিত অনুপস্থিতির। কিন্তু কেন ওকে বউ করতে চাইলেন দেবেশের মা, দেবেশ কেন মুগ্ধ হ'ল। না হলে তো আজ হিমিকাকে এমন করে স্বীকারোক্তি করতে হত না। নিজের মুখে সব বলা যে বড় কষ্ট। তবু কষ্ট করতেই হবে। যারা কিছু না জেনে ওকে ভালবেসেছে, তাদের কাছে নিজের মুখে প্রকাশ করতে হবে নিজের পরিচয়।

●

সত্যকথা হিমিকাকে বলতে হ'ল না নিজের মুখে। তার আগেই এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। ছেলে নিয়ে হিমানী কলোনীর শ্বশুরবাড়ীতে এসে উঠেছে। পরেশের পক্ষে একা খরচ চালানো, আবার বাচ্চা সামলানো দু'টোই অসুবিধার বলে হিমানী আপত্তি করেনি কলকাতার বাসা তুলে দিতে। সুতরাং বাড়ীটিতে আবার আনন্দ ফিরে এসেছে। ঠাকুমা নাতিকে তেল জবজবে করে কাজল পরিয়ে রোদে শুইয়ে দেয়। মেয়েদের তাতে ভীষণ আপত্তি। হিমানীও যোগ দেয়।—অত সরষের তেল মাখালে কালো হয়ে যাবে বাচ্চা, মেয়েরা বলে।

মা রাগ করে বলেন—তেল মাখালি বাচ্চা কালো হয়ে যায় এ কথা কোথায় শুনলি? তোদের তো শাশুড়ী ঠাকরুণ তেলের আচার বানা-তেন রোদে ফেলে ফেলে। তা কালো হইছিস্ নাকি তোরা?

ভাইপোর জন্য ছোট্ট ছোট্ট জামা তৈরী করছে এক পিসি, আরেকজনের হাতে উল-কাঁটা। এখন গরম তো হয়েছে কি, ক'দিন পরেই আসবে শীতকাল তখন লাগবে না খোকন সোনার লাল টুকটুকে পশমের জামা? তখন কি বুনতে সময় পাবে পিসি ছোড়দার বিয়ে লাগবে যে তখন।

—বিয়ে। আশ্চর্য হ'ল হিমানী। —ঠাকুরপোর বিয়ে ঠিক হয়েছে নাকি? শুনি নি তো, মেয়ে কোথাকার? কেমন মেয়ে?

—একেবারে চমৎকার মেয়ে। দাঁড়াও ফটো এনে দেখাচ্ছি।

কয়েকমাস আগে সুধা আশার সঙ্গে ফটো তুলেছিল হিমিকা। কলো-নীতে নতুন স্টুডিয়ো খুলবার দিন অনেক আপত্তি সত্ত্বেও হিমিকাকে ছাড়ে নি ওরা। তাকে ফটো তুলতেই হয়েছিল।

—এই দেখ মেয়ে, নাম লক্ষ্মী, রূপেগুণেও লক্ষ্মী।

ননদের হাত থেকে ফটো নিয়ে তাতে চোখ রেখেই চেঁচিয়ে উঠল হিমানী।

—কে বলল ও লক্ষ্মী, ও তো হিমিকা।

—হ্যাঁ গো, ওর নাম হিমিকাই বটে। অত হিম আর ভাল লাগে না বাপ, তাই লক্ষ্মী বলেই ডাকতিছি আমরা। তা তুমি ওরে চিনলে কেমন করে? তোমাদের পাড়ার ডাক্তারখানায় যায় বুঝি ওষধ নিয়ে?

নাতিকে বিছানায় শোয়াতে শোয়াতে জিজ্ঞেস করলেন সুধার মা।

রাগে গনগনে হ'ল হিমানীর মুখ।

—আমি চিনি কেমন করে? সব্বাই চেনে ওকে। জাতখাওয়া বেশ্যার মেয়ে, হোটেলের একটা নাচওয়ালী। এখন আবার ওষুধ বিক্রির চাকরি নিয়েছে।

—ও মা। কি সব্বনেশে কথা কও বউমা। চেঁচিয়ে উঠল শাশুড়ী-মেয়েরাও।

—আ:, কি চেঁচাতিছ। এট্টু ঘুমাতি দেবা না নাকি?

জড়ানো গলা শোনা গেল জিতেশ ডাক্তারের।

—ওগো আর ঘুমাতি হবে না, এখানে আসো দেখি, কি সব্বনেশে কথা বলতিছেন বউমা, শুনে যাও।

—কি বলতিছেন বউমা? কোমরের কষি গুঁজতে গুঁজতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কর্তা।

—বউমা বলেন লক্ষ্মী নাকি বেশ্যার মেয়ে, নাচউলি।

—লক্ষ্মী নাচউলি, বেশ্যার মেয়ে? কক্ষণো হতি পারে না কত হায়া-লজ্জা মেয়েটার। আর বউমাই বা এত খপর জানলেন কোয়ান থে?

হিমানী শ্বশুরকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিয়েছিল। ননদের দিকে

চেয়ে বলল : তোমাদের দাদাকে কটোখানা দেখিয়ো। সত্যি কি মিথ্যে বলছি সেই বলবে।

রাত্রে পরেশ ছবি দেখল। স্বীকার করল, বেশ্যার মেয়ে কি না জানে না সে, কিন্তু মেয়েটা যে একটা হোটেলে নাচে এ কথা সত্যি।

সমস্ত পরিবার একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন জিতেশ রায় : তা নয় বুঝলাম। মেয়েটা নয় তো নাচওয়ালীই হ'ল। কিন্তু তুই শূয়ার সে কথা জানলি কেমন করে?

—আমি? থতমত খেল পরেশ।

—এই হোটেলে চা-টা খেতে—।

—হোটেলে চা খাতি? আমারে বোকা পাঁঠা ঠাউরেছিস তুই? তোর মাইনে তো কানাকড়ি। বউ পালতি না পেরে তারে চাকরিতে ঠেলিছ। আর চা খাতি যাতি তুমি এই দামী হোটেলে? বেরো, বেরো আমার বাড়ী হতি নচ্ছার ছুঁচো পাজি।

হিমানীর কান্না, মায়ের চিৎকার, বোনদের অনুনয়—বাড়ীতে একেবারে কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেল। একজন কেবল নীরব। তার কানে ঝম্ ঝম্ ক'রে বাজছে হিমিকার কথা—আমি ভাল মেয়ে নই। এই্। এই তা'হলে সে কথার অর্থ। লক্ষ্মী নয়, হিমিকা। তার জাত গোত্র কিছু নেই, পতিতার মেয়ে, একটা পতিতা সে! সারারাত ধ'রে ভাবল দেবেশ। কাল হিমিকাকে বলবে—তোমার কি অনিষ্ট করেছিলাম আমরা যে এমন ক'রে আমাদের আঘাত দিলে। পঁচিশ বছর বয়সের প্রথম যৌবন-স্বপ্ন ভেঙে গেল, তীব্র একটা ব্যথায় ছটফট করল দেবেশ। দুঃখ পেল, তবু তো বিশ্বাস হয় না হিমিকা খারাপ মেয়ে। তিনমাস ধরে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে দেবেশ। খারাপ মেয়েরা কি অত দূরে সরে বসে? ছল ছল চোখে তাকিয়ে বারণ করে ভালবাসার কথা বলতে? বলে—আমি ভাল মেয়ে নই।

পরদিন অফিসের কাজে মন দিতে পারল না দেবেশ। বেরিয়ে পড়ল তিনটে না বাজতেই। অনেক এলো-মেলো হাঁটবার পর সন্ধ্যাবেলা চলে এল নির্দিষ্ট জায়গায় হিমিকার সঙ্গে দেখা করতে।

দেবেশের শুকনো মুখের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হল হিমিকা।

—কি হয়েছে দেবেশ? অসুখ করেছে নাকি?

—না। মাথা নাড়ল দেবেশ।

—তোমার বাড়ীতে নিয়ে চল আমাকে। নিশ্চয় নিয়ে যেতে হবে আজ।

—নিশ্চয় নিয়ে যেতে হবে? হাসল হিমিকা।

—বেশ, নিয়ে যাব। তার আগে চল কিছু খেয়ে নেবে। তোমাকে ভারি শ্রান্ত দেখাচ্ছে।

—না, না, না। স্বভাবের বহির্ভূত উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শান্ত ছেলেটা।

—তোমার বাড়ী দেখব আমি।

হিমিকা দেবেশের দিকে চেয়ে রইল। বুঝল কি হয়েছে। কিন্তু আর কথা বাড়াল না। কি হবে কথা বাড়িয়ে! বরং যা অবধারিত, তা শীঘ্র চুকে গেলেই শান্তি।

—চল। পা বাড়াল হিমিকা।

অভিজাত পাড়ায় মস্ত বড় হোটেল হ্যাপিনুক। পিছন দিকের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে হিমিকা তার ঘরের দরজায় এসে পৌঁছল, তালা খুলে ঢুকল ঘরে।

—এসো দেবেশ। আমার বাড়ী নেই, কিছু নেই আমার। শুধু এই একখানা হোটেলের ঘর।

দেবেশ উদ্‌ভ্রান্তের মত চারদিকে তাকাল।

—তোমার সত্যি সত্যি বাড়ী নেই? লক্ষ্মী নও তুমি?

—আমি লক্ষ্মী নই, হিমিকা। ক'দিন আগেও এই হোটেলে নাচ-গান করতাম, এখন মালিকের হুকুমে ওষুধের রিপ্রেজেণ্টেটিভ। বসবে একটু তুমি?

বসবে! হিমিকার দিকে একবার চাইতেও পারল না দেবেশ। ঘর হতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

●

শ্রান্তিতে সমস্ত শরীর ভরে গিয়েছে,, কাপড় বদলাতেও শ্রান্তি, সেই অবস্থাতেই শুয়ে পড়ল। যাক্, একটা পাগলামির শেষ হ'ল, দুঃস্বপ্নের অবসান।

—হিমিমেমসাব! দরওয়ানের গলা।

—কি ব্যাপার? শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করল হিমিকা।

—জেরা বাহার আইয়ে তো, এক আদমী মোলাকাত্ মাংতা।

আদমী। রাত ন'টায় সময় আবার আদমী এল কে। বাইরে বেরিয়েই চিনল হিমিকা। হিমানীর স্বামী পরেশ রায়। দেবেশের দাদা। ও! এতক্ষণে দেবেশের উদ্‌ভ্রান্ত ভাবের কারণ টের পেল হিমিকা।

—আমি, আমি—, পরেশ কথা বলল।

—চিনেছি, আসুন আপনি ঘরে।

ঘরে এনে পরেশকে বসাল হিমিকা। শান্ত হয়ে অপেক্ষা করল তার কথা শুনবার জন্য।

—ঠিক কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না আমি। একটা ভীষণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

—কি হয়েছে?

—ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে। আপনার একটা ছবি দেখেছে আমার স্ত্রী, আর হিট অব দি মোমেণ্টে ব'লে ফেলেছে আপনার পরিচয়।

হিমিকার চোখ জ্বলে উঠল।

—আমার পরিচয়? নিজের পরিচয় দেয় নি হিমানী?

—ওর? দেখুন, আপনি দয়া করুন, কিছু প্রকাশ করে দেবেন না। ওর কোনো দোষ নেই। টাকার দরকার, নাচ-টাচ জানে, আর এ তো একটা আর্ট, এতে দোষ কি। তা' ছাড়া আমার যখন সম্মতি আছে—।

সত্যি তো, স্বামীর যখন সম্মতি আছে তখন নাইট ক্লাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে দোষ কোথায়। তাই বলল হিমিকা: তবে আর ভয় কিসের প্রকাশ পেলে? নির্দোষ কাজই তো করতো হিমানী।

কাতর হ'ল পরেশ।

—না, না, আপনি ওটা ঠিক বুঝবেন না। আমাদের সমাজ তো তেমন লিবারেল নয়, তা ছাড়া বাবা-মা জানলে রক্ষা থাকবে না। একেবারে বাড়ী ছাড়া করে দেবে। হিমানীর কথা না ধরলেন, ওর ছেলেটার কথাই একবার ভাবুন। আর হিমানী তো স্বামীর মত পেয়েই—। এতে সত্যি সত্যি নৈতিক কোনো অন্যায় নেই, বিশ্বাস করুন আপনি।

অনুনয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল পরেশ।

—তবে এত অস্থির হয়েছেন কেন, আপনি জানেন যখন হিমানী কোনো অন্যায় করে নি।

—অস্থির না হয়ে উপায় নেই। বাবা ভয়ানক জেদী আর গোঁড়া, বোনদের এখনো বিয়ে হয় নি। কথাটা একবার জানাজানি হলে সবরকমে একেবারে ডুবে যাব। আপনার পায়ে ধরছি—।

—ঠিক আছে, আপনি বাড়ী যান।

—দেখুন—

—আঃ! কড়া শোনাল হিমিকার গলা।

—আপনি যান এখন।

একপা দু'পা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পরেশ।

স্বামীর অনুমতি পেলে কোনো অনাচারেই মেয়েদের ধর্ম বিকিয়ে যায় না। কিন্তু সেই অনেকদিন আগে, স্বামীর আদেশে, অত্যাচারেই তো হিমিকার দিদিমা কুসুম হয়েছিল দেহ-পশারিণী। তবে সে পতিতা হ'ল কেন? পুরুষ বলতে বোঝা যায় শৌর্য, সত্য আরো কত গুণ, আর মেয়ের মাত্র একটা শরীর বুঝি? শরীরটা অশুচি হ'লেই তার জাত যাবে? পুরুষের—স্বামীর ভোগে লাগতেই হবে তাকে। আবার তাদের ইচ্ছামতই শুচি-অশুচিও হবে মেয়েরা।

মিছিমিছি বিছানায় পড়ে সারারাত ধ'রে মাথা গরম করছিল হিমিকা। সে তো পড়েনি সভ্যতার প্রথম দিনের ইতিহাস, জানে না দেশ-বিদেশের কাহিনী। যদি জানত, তা'হলে এমন উত্তেজিত হ'ত না। বুঝত চিরদিন মেয়েরা পুরুষের ভোগ্যপণ্য; কোথাও তার অব্যাহতি নেই। অতীতের পর্দা ভেদ করে চোখ অনেক দূরে চলে যেতে পারলে হিমিকা দেখত সভ্যতার সঙ্গমক্ষেত্র সুসভ্য ব্যাবিলন নগরী। সেখানে অপূর্ব মিলিট্টা-মন্দির। সূর্যদেব মরডাক, প্রেমদেবী মিলিট্টা। সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে আছে উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরীর দল। তাদের শরীর ভয়ে কাঁপছে, ধারা বইছে চোখের জলের। তবু বসে আছে। এখানে পুরুষের ভোগ্যা হ'লে তবেই তাদের ঘরণী হবার ছাড়পত্র মিলবে। আর আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, এখানে? এখানে জোর গলায় বক্তৃতা দেওয়া হয় নারীত্ব, সতীত্ব এমনি বড় বড় কথার আর স্বামীর আদেশে স্ত্রীকে যেতে হয় গুরুর সেবায়, অতিথির শয্যায়। সন্তানলাভের জন্য তৃতীয়

পুরুষ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়। সেই সব কাহিনী লেখা পুঁথিকে বলা হয় ধর্ম-গ্রন্থ। এই নারীর ধর্ম। সত্য, প্রেম, শুচিতা, দৃঢ়তা কিছু নয়, কেবল বশ্যতা, কেবল আনুগত্য। তাহলেই অখণ্ড সতীলোক।

●

ছেলেকে বাগে আনতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন জিতেশ রায়। কুলে শীলে অনবদ্য পাত্রী স্থির হয়েছে, কিন্তু বিয়েতে রাজী নয় দেবেশ। কেন, কেন বিয়ে করতে চাইছে না? সেই বেশ্যাটাকে বিয়ে করবে? মহা-নরকে ডোবাবে চোদ্দপুরুষকে? বাবার গালাগালি, প্রচণ্ড রাগ সব সহ্য করছে দেবেশ নিঃশব্দে। মায়ের চোখের জল, বোনেদের অনুনয়; সব ভেসে যাচ্ছে। এক কথা—বিয়ে করব না। আচ্ছা! চেঁচালেন জিতেশ ডাক্তার। আমিও জিতেশ রায়, ভবেশ রায়ের পুত্র, বিশাই রায়ের পৌত্র। সেই নড়ালের বিশাই রায়। বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত তাঁর প্রতাপে। আমিও দেখে নেব একফোঁটা ছেলের গোঁয়ার্তুমি ভাঙতে পারি কি না। মরে কি না জেদ। যার জোরে এত তড়পাস, সেই ভাতের থালায় হাত পড়লিই সুড়সুড় ক'রে বসতে হবে গিয়ে বিয়ের আসরে।

দেবেশ চাকরি করে শ্যামপিয়ারী হাসপাতালে। বেশ বড় হাসপাতাল। দেবেশ একজন ক্লার্ক। মাইনে পায় দুশো, আরো চল্লিশ ডিয়ারনেস। ভালই ছিল ছেলেটা। মাইনের শেষ পয়সাটি পর্যন্ত মায়ের হাতে তুলে দিত। বিড়ি-সিগারেটের নেশাও নেই। মাথা নীচু ক'রে কাজই করেছে এতদিন, মুখটি তুলে তাকায় নি কোনো মেয়ের দিকে। কোথা হতে এল রং-মাখা পায়রা, ছেলেটার মাথা ঘুরিয়ে দিল একেবারে। আচ্ছা। যেমন কুকুর, তার তেমনি মুগুরের ব্যবস্থাই করবে জিতেশ ডাক্তার। হাসপাতালের সুপারিণ্টেডেণ্ট ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে ভালই চেনা আছে জিতেশ রায়ের। ছোকরা মানুষ, বেজায় তেজী আর ভেরি অনেস্ট। রবিবারের সকালে বাজারে গেলেন না ডাক্তার। পটলকে বললেন ঠিক আটটায় সময় ডিসপেন-সারী খুলতে। তারপর একমুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে এককাপ চা, জুতোয় পা ঢোকালেন জিতেশ রায়। গিন্নির গর-গরানি গ্রাহ্যই করলেন না। করুক বকর-বকর কতক্ষণ, তারপর নিজেই বঁটি নিয়ে বসবে কচুর শাক কুটতে। জিতেশবাবুও মন-মেজাজ ভাল হ'লে আনবেন'খন ইয়া ইয়া খাবি-খাওয়া তেলাপিয়া।

—আসুন, আসুন। বসুন। তারপর খবর কি বলুন।

জিতেশ রায়কে অভ্যর্থনা করলেন ডক্টর ব্যানার্জী। জিতেশবাবুর ভয় ছিল, বড়লোক, মানী মানুষ, হয়তো চিনতেই চাইবে না নিজের বাড়ীতে। এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নরম গদি-আঁটা চেয়ারে বসলেন।

অনেকক্ষণ এ-কথা সে-কথা। রাজনীতি, ওষুধের দাম, ভেজাল ওষুধের কারখানা, হাসপাতালের স্থানাভাব, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ক্লোরোমাইসেটিন—সব নিয়েই পূর্ণ আলোচনা। চা টোস্ট রসগোল্লার পরও জিতেশবাবুর ইতি-উতি ভাব দেখে ডক্টর ব্যানার্জীর মনে হ'ল কেবল নিছক ইষ্টগোষ্ঠী করতে আসেন নি জিতেশ ডাক্তার, কথা আছে বিশেষ কিছু।

—কিছু বলবেন নাকি জিতেশবাবু? মনে হচ্ছে কোনো কথা আছে?

—কথা। হ্যাঁ, ইয়ে, কথা আর কি। লজ্জাকর ব্যাপার। বড়ই অশান্তিতে আছি।

—লজ্জাকর ব্যাপার। কি হয়েছে?

—হয়েছে আমার মাথামুণ্ডু। দেবেশ, আপনার ক্লার্ক, ব্যাটা গর্ভস্রাব, মিশেছে একটা বেশ্যার সঙ্গে। তাকে বিয়ে করবে ব'লে গোঁ ধরেছে।

—বলেন কি জিতেশবাবু!

—আর বলি কি! আপনি আমার ছেলের বয়সী, বলতে লজ্জা করে, তবু পথ না পেয়ে চলে এসেছি আপনার কাছেই। ব্যাটাকে আপনি খুব তড়পে দিন, চাকরির ভয়ে হারামজাদা চিট হয়ে যাবে।

—তা নয় তো যাবে। কিন্তু আপনার ছেলে জুটল কি ক'রে অমন মেয়ের সঙ্গে? ভারি ভদ্র শান্ত মানুষ দেবেশ-বাবু।

—ছেলেটা ভালই ছিল। আমার কর্মদোষেই মেয়েটা জুটেছে। ভাল, শান্ত, দেখতে-শুনতেও শ্রীখানা মন্দ নয়, এক দুপুরে আমার ডাক্তারখানায় এল ওষুধ গছাতে। মায়া পড়ে গেল মেয়েটার ওপর। ওরা সব মায়া জানে তো, একেবারে গলে গেলাম আমি। বাড়ীতে নিয়ে এলাম, গিন্নি-মেয়েরা লক্ষ্মী বলতে অজ্ঞান। ঠিক করল হোক গরীব, জাতে-গোতে মিললে ওকেই দেবেশের বৌ ক'রে আনা হবে। পরে জানা গেল মেয়েটা লক্ষ্মী নয়, হিমিকা—এক হোটেলের নাচওয়ালী, আমার মাথাখেতে ওষুধের ফিরিউলী হয়ে এসেছে। ওদের ছলাকলায় মুনিঋষিও ঘায়েল, এ তো সামান্য একটা ছেলে। ছোট্কা হারামজাদা একেবারে ভেড়া বনে গিয়েছে। প্রতিজ্ঞা নিয়েছে, ওকেই বিয়ে করবে।

আরো অনেক কথা বললেন জিতেশ ডাক্তার। কিছু শুনল, বেশীটাই কানে ঢুকল না অনলের। হিমিকা! সন্দেহ নেই কিছুমাত্র, এই সেই হিমিকা। ফণা তুলে চোখে চোখ রেখে দেবেশকে সম্মোহিত করেছে সর্পিণী।

—শুনলেন তো সব? এখন এর একটা বিহিত করতেই হবে আপনাকে।

ডাক্তারের কথায় সম্বিৎ ফিরল অনলের।

—দেখি। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল অনল।

হৃষ্টমনে বিদায় নিলেন জিতেশ-বাবু। ওপরওয়ালার দেখা মানেই সাক্ষাৎ শনির দেখা। ও আর ভাবতে হবে না। চাকরি টাল-মাটাল শুনলেই ন্যাজ গুটিয়ে পালাবে রক্তচোষা মাগী ভামটা। হালকা হ'য়ে জিতেশবাবু বাজারে এলেন। মানি-ব্যাগে টাকাও আছে কিছু তবে মাসের শেষ। আর মাসের শেষ। ওদব

ভাবলে আর মানুষের বাঁচা হয় না। হবার তা তো হবেই, তা ব'লে কি একটু খাবে-দাবে না। বেশ, বেশ বাজারটি—এমন হ'লে তবেই না কিনে-কেটে সুখ। কি যে তাদের কলোনীর বাজার! শুকনো হাড়-জিরজিরে ঝিঙে, রোদে পড়ে শুকুচ্ছে ক' গোছা ডাঁটা, মাছের বাকি রূপ। মনে হয় ওরাও উদ্বাস্তু কলোনীর মাছ। তেমনি রক্তহীন চিবসে। চোখ উলটে পড়ে আছে বিক্রি হবার জন্য। নস্যির দাগলাগা রুমালখানি পকেট থেকে বের করে খোলা হাতে বাজার করলেন জিতেশবাবু। মিঠে পানও কিনলেন একগোছা।

—বলি ও সুধা, আশা, তোদের গর্ভধারিণী গেলেন কমনে?

বাড়ী এসে দরাজগলায় হাঁক ছাড়লেন জিতেশবাবু। সুধার হাতে রুমাল দিলেন।

—মা, বাবা ডাকছেন। ওমা! কি সুন্দর মাছ, আশা, শীগ্‌গির আয়, কি চমৎকার মাছ এনেছেন বাবা।

মাছের খবরে প্রায় ছুটে চলে এল আশা। মাও এলেন ভারিপায়ে। মাছ দেখে কিন্তু আর গাম্ভীর্য টিকল না সুধার মায়ের।

—কি আশ্চর্য! এ যে একেবারে আমাদের নড়ালের বাচা মাছ, সুবয় থড়কে মাছও এখানে পাওয়া যায়! রুমালসুদ্ধ মাছ হাতে তুলে নিলেন গিন্নি।

—আশা তুই মানুষেরে তেল তামাক দে দিনি। ওগো, বেলা বারটা বাজিছে, তুমি এট্টু বিশ্রাম নিয়ে, স্নান করি ক্যালো। সুধা আয় আমারে সরষে বেটে দিবি।

অনেকদিন পরে বাড়ীতে খুশীর দেখা মিলল। সুধার মা তার বউকালের গল্প করলেন, জিতেশ রায় পরেশের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যে মস্ত মস্ত রুইমাছ আনা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ তুললেন, খুলনার উকিল জলধর বোস যে কি প্রচণ্ড রকমের খাইয়ে ছিলেন, বত্রিশখানা মাছের পেটি. চারটে মাছের মাথা আরো ইত্যাদি ইত্যাদি খাবার পর খেয়েছিলেন একতিজেল দই আর আটাত্রিশটা সন্দেশ, তা শুনে হেসে কুটি-কুটি হ'ল মেয়েরা।

●

সমস্ত দিন ধ'রে মনটা খারাপ। শরীরও ভাল নয়; একটু জ্বর হয়েছে বোধহয়। সন্ধ্যাবেলা ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিল হিমিকা। ভাবছিল নিজের ভাগ্যের কথা। কি দোষ হ'ত ও যদি হিমিকা না হয়ে লক্ষ্মী হয়েই জন্মাত। মায়ের আঁচল নিয়ে খুনসুটি করত বোনের সঙ্গে, বাবার পাকা চুল তুলত। ঘুঘুর ডাক শুনত জ্যৈষ্ঠের দুপুরে। বিধাতার সৃষ্টির কারুকার্যে কি তাহলে ত্রুটি থেকে যেত কিছু? হে ভগবান, আর জন্মে তুমি লক্ষ্মী ক'রে পাঠিয়ো হিমিকাকে। নিজের অজান্তে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল হিমিকার। দরোয়ান কার্ড নিয়ে দরজায় ঘা দিল।

কে, কে এসেছে! সমস্ত শরীর চঞ্চল হয়ে গেল হিমিকার। কার্ডে একটি নাম, ডক্টর অনল ব্যানার্জি। অনল, অনল এসেছে। আর ভয় নেই। এই জীবনভরা অনন্ত গ্লানি হতে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে অনল। অনেক দূর, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এসেছে সে। কোনো বাধাবন্ধ আর মানবে না। হিমিকাকে ওর ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে পৌঁছে যাবে একেবারে সূর্যোদয়ের তোরণদ্বারে।

বিহ্বল চোখে অনলের দিকে চাইল হিমিকা। কোনোমতে বলল: বসুন।

বসবে। স্বৈরিণী নারীর ঘর। এমনি ক'রে কত লোককে যেন প্রত্যেক দিন আহ্বান করে হিমিকা। একটা অদ্ভুত ঘৃণ্য অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল অনলের সমস্ত শরীরে। তবু ডাক্তার অনল নিজেকে সংযত করল। বস্তিবাড়ীতে কতবার তাকে যেতে হয় কলেরার রোগী দেখতে। তার চেয়ে বেশী জীবাণুদুষ্ট নয় ঘরটা।

লম্বা সোফাটিতে বসল অনল। ছোটটাতে বসে হিমিকা অপেক্ষা করতে লাগল অনলের কথা শুনবার জন্য। সামনের দিকের হ্যাপিনুকের অংশ তখন সন্ধ্যার মরশুমে মাতাল হয়ে উঠেছে। কত আলো, বাজছে ড্রাম, স্যাক্সোফোন, গীটার। নাচছে নতুন মেয়ে লিলিয়ান। দর্শকদের চোখে প্রথম ঘোর লাগবার গোলাপী নেশা। পিছন দিকে সারি সারি ঘরগুলোতে স্তব্ধতা। ওরা মুখর হবে রাত বারোটার পর। চারদিকের স্তব্ধতা হিমিকার ঘরের মধ্যে একটা কিসের যেন সূক্ষ্ম জাল বুনে দিচ্ছিল। শিথিল হয়ে পড়ছিল হিমিকার শজারুর মত সাদা সতর্ক মন।

হঠাৎ অনল কথা বলে উঠল। এতক্ষণ ধরে সে বোধহয় ভাবছিল কত সংক্ষেপে তার বক্তব্য শেষ করতে পারবে সেই কথা।

—তুমি নাকি দেবেশ রায়কে বিয়ে করছ?

নিমেষে হিমিকার শিথিল মন সজাগ হয়ে উঠল। ও, তাই। তাই অনল হিমিকার কাছে এসেছে। এসেছে নিজের গোত্রের একজনকে রক্ষা করতে।

উত্তর না পেয়ে আবার বলল অনল: —ওসব মতলব ছেড়ে দাও তুমি। এ বিয়ে হতে পারবে না।

—কেন পারবে না? সুস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল হিমিকা।

—কেন তা জান না? ইউ আর এ হারলট এ্যাণ্ড হি ইজ এ জেণ্টলম্যান! অনেক দূর এগিয়েছ তুমি। ব্যস্‌, আর নয়, এইবার থাম।

অনলের আর কোনো কথা শুনল না হিমিকা। তার দুই কানে বাজছিল একটি শব্দ—হারলট। হারলট, বেশ্যা সে। বড় কষ্ট, তবু হাসল হিমিকা।

—আমি হারলট?

—নও? অসহ্য ঘৃণা ঝরে পড়ল অনলের কথায়।

—হাফ-নেকেড বডি দেখিয়ে নাইট ক্লাবে টাকা রোজগার কর না তুমি?

—করি। স্থির কণ্ঠ হিমিকার।

—আমি শরীর দেখিয়ে টাকা রোজগার

করি, আপনার বোন অপর্ণা ইন্দিরা তো শরীর দেখিয়ে স্বামীর রোজগারের ফন্দিতে থাকে, তাদের কি নাম দেবেন? বলবেন চোখ রাঙিয়ে—তোমরা কোনো ভদ্রলোকের স্ত্রী হবার যোগ্য নও? নেকেড বডি দেখাও তোমরা?

আপাদ মস্তক জ্বলে উঠল অনলের। মনে হ'ল আঘাত করবে হিমিকার মুখে। তখনি চোখের সামনে ভেসে এল অপর্ণার মর্মরশুভ্র বুক, ইন্দিরার মাখন দিয়ে গড়া নশ্বর পেট-কোমর।

—আপনাদের ডিকসনারি থেকে হারলট শব্দটা তুলে দিতে হবে এবার। ও দিয়ে আর একটি বিশেষ শ্রেণীর মেয়েকে উদ্দেশ্য করা চলবে না। আপনাদের ঘরের মেয়েকেও যে হারলট বানিয়ে ছেড়েছেন আপনারা। আমরা নাইট ক্লাবে নাচছি, আপনাদের মুগ্ধ ক'রে টাকা রোজগার করছি। আর আপনাদের ঘরের মেয়েরা যে নাচছে ক্লাবে, মোটরে বেড়াচ্ছে বন্ধুর সঙ্গে, নিজেদের দিয়ে উপরওলাকে ভুলিয়ে যে প্রমোশন দেওয়াচ্ছে স্বামী-ভাইকে তাদের কি বলবেন?

নিশ্বাস ফুরিয়ে যেতে থামল হিমিকা। অনল উঠে দাঁড়াল, একবার তাকাল হিমিকার দিকে। সমস্ত দিনের অনাহারে শুষ্ক মুখ, রুক্ষ চুল। চোখ নামাল অনল, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খাটের ওপর এসে শুয়ে পড়ল হিমিকা। চোখের আগুন নিভে জল ঝরছে এখন। খাবার কথা বলতে এসে অবাক হ'ল করিম। হিমি মেমসাহেব কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কথাটি না ব'লে পালিয়ে গেল করিম। বিবি কাঁদছে। তা অমন হয়। মাশুক গোস্যা ক'রে চলে গেলে বিবিরা কাঁদে, বরদোয়া—অভিশাপ দেয়। তাকেও কেঁদে কেঁদে বরদোয়া দিয়েছিল তাহেরা। তাহেরাকে তালাক দেবার সময় বলেছিল—বিজলী গিয়ে তেরে শির পর। তা ওদের বরদোয়ায় কিবা হয়। বাজ পড়ে কি মরেছে করিম? আজ দশ বছর ধরে দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘর করছে জামিলাকে নিয়ে। তবে হ্যাঁ, বর্ষা বাদলার দিন এলেই বুকটা কাঁপে তার, দোয়া মাঙে আল্লাতালার কাছে।

ওবেলাও হিমি মেমসাহেব খায়নি। বাসি খাবারটা রাস্তার ভিখিরীকে দিতে গেল করিম। থালা সাফ ক'রে ঢাকা দিয়ে রাখবে এবেলার খানা, মরজি হ'লে নিজেই নিয়ে খাবে বিবি, নয়তো কাল আবার যাবে এই ভিক্ষকটার পেটে। ভিক্ষকটা রোজ আসবে হিমি মেমসাহেবের তালাস নিতে। মেমসাহেব কোন কোনো দিন দেখা করে, নয়তো খাবার টাকা পাঠিয়ে দেয় করিমের হাত দিয়ে। কে জানে এই বুড় লেংড়া ভিক্ষুকটার মেয়েই নাকি মেমসাহেব। কিন্তু খাবার দিতে পারল না করিম।

ঘোড়াটা আজ আসেনি। কুত্তাটাকে আবার চেলে দিয়ে, একটু এগিয়ে করিম রাস্তার গোলমাল দেখতে গেল। একটা লোক চাপা পড়েছে, তাই গোলমাল। আরে! বিবির সেই লেংড়া ভিক্ষকটাই তো। ছুট, ছুট। একছুটে করিম পোঁছে গেল তিনতলায়।

—মেমসাহেব, খোড়া বাহার আইয়ে। উত্তো একদম খতম হো গয়া।

খতম! বিদ্যুতের মত বিছানা থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়াল হিমিকা।

—কোন্ খতম হো গয়া? ডাক্তার লাব?

—নেহি মেমসাব। ডাক্তার সাবকো হাম পছুন্তা নেই। যো লেংড়া ভিখ্-মাঙ্‌নে ওয়ালোকো আপ রোজ্‌বানি করকে রূপয়া, খানাভি দেতা, উ খতম হো গয়া।

রাস্তায় নেমে এল হিমিকা। ধরাধরি ক'রে কারা ততক্ষণে ঝুমরাকে ফুটপাথে শুইয়ে দিয়েছে। চোখ বোজা, একটু হাঁ মেলা, মুখের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, লাঠিটা তখনো হাতে।

●

পথ-ভিখারী ঝুমরা মরে গেল। ওর আর বিহারের ছোট্ট গাঁও সরিয়ার বটগাছের তলায় চারপাই পেতে কলকাতার আজব কাহানী শুনানো হ'ল না। বাপ্ম ঠাকুরকেও তার চালাটা সারিয়ে দেবার জন্য আর কারোর অপেক্ষায় থাকতে হবে। মহানগরী কলকাতার মস্ত বড় রাজপথে ট্রাম, বাস, মোটর, মানুষের চলমান মিছিল এক মহূর্তের জন্য স্তব্ধ গতি হয়ে মেনে নিল একটি জীবনের অবসান। তারপরই আবার ছুটল দ্বিগুণ জোরে। এক মিনিটের গতিহীনতার অপচয় পুষিয়ে নিতে হবে।

জালদকে পাওয়া যাবে না, কিন্তু ঝুমরার আড্ডার খবর রাখে হিমিকা। ফুটপাথ ঘেঁষে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই সন্ত্রস্ত হ'ল দলটা। রাত্তিরে খেয়ে-দেয়ে দুটো বিড়ি ফুঁকছে গল্প হচ্ছে সারা দিনের এখন আবার উৎপাত কেন। হিমি গাড়ী থেকে নেমে ওদের সামনে দাঁড়াতেই চিনতে পারল সবাই। এ তো ঝুমরাকো ধরম বেটি। এগিয়ে এল এতবারিয়া।

—ঝুমরা তো দিন ভর ইধার আয়া নেই দিদি।

—অভি আয়গা উ। ভোলা জানাল।

—ঝুমরা আর আসবে না ভোলা। আস্তে আস্তে হিমিকা বলল।

—রাস্তা পার হতে ও গাড়ী চাপা পড়ে মারা গিয়েছে।

—মর গিয়া? আরে বাপ্! একদম খতম? কলরব উঠল।

—আরে চুপ চুপ। ধমক দিল শিউ বুড়ো।

—মরণে তো একরোজ হোগাই। ঝুমরাকো কাল পূরণ হো গয়া, উ চলা গিয়া। তম লোক চিল্লাচিল্লি মৎ করো। লেট যাও অভি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক তত্ত্ব সবাইকে সমঝিয়ে শিউ বুড়ো শুয়ে পড়ল। সারাদিন খাটুনির পর কে যাবে এখন মুর্দা ঠেলতে।

শিউ বুড়োর কথায় গোলমাল থামল। মেয়েরা মাথায় আঙুল চালাতে লাগল উকনের সন্ধানে, ভোলা চেঁচিয়ে ধরে দিল একটা কড়া গান।

—ও দিলওয়ালে—।

হিমিকা আবার ট্যাক্সিতে উঠে বসল, ওদের নিয়ে যেতে পারবে না, তাকেই করতে হবে সব ব্যবস্থা, নয়তো ডোম এসে নিয়ে যাবে বেওয়ারিশ মড়া।

সব করতে হ'ল হিমিকে। অবশ্য করিম পানু হবিব সাহায্য না করলে কিছুই পারত না সে। ওরাই খাটিয়া-টাটিয়া নিয়ে এল। তার দিয়ে বাঁধা শালপাতার গোটা দুই তোড়া পর্যন্ত লাগিয়ে দিল ঝুমরার পা আর মাথার কাছে।

রাত বারটার সময় হিমিকা যখন তার ঘরে ফিরে এল তখন জ্বর বোধহয় একশ চার ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোনোমতে খাটের উপরে নিজেকে ফেলে দিল হিমিকা।

ঝুমরা মরে গেল। পৃথিবীতে একমাত্র বান্ধব খোঁড়া ভিখিরি ঝুমরা আর এসে ডাকবে না।

—বিটিয়া, এ বিটিয়া, এত্না উদাস কাঁহে বিটিয়া? শির দুখাতা? মেজাজ বিগড় গিয়া?

প্রবল জ্বরে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আজ ঝুমরার মৃত্যুর মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করল হিমিকা।

তারো একদিন আসবে। টাকা নেই, নেই কোনো মাথা গুঁজবার আশ্রয়। চারদিকে শব্দ করে চলছে গাড়ী মানুষ, তারি মাঝে কোনো ফুটপাথে শুয়ে মরছে হিমিকা। কেউ হয়তো দয়া করে মাথায় জল দিচ্ছে, ঠোঁট ফাঁক ক'রে দিচ্ছে একফোটা জল।

[ক্রমশ।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সাল। সারা বিশ্ব জুড়ে সমরানল জলছে।

কিন্তু নদীর ধারের ওই লোক তিনটেকে দেখলে যুদ্ধের কথা মনেও পড়ে না। ক্ষ্যাপার মতন ওরা যেন কি খুঁজছে, নদীর ধারে নুড়ি-পাথরের মধ্যে। অজস্র নানা আকারের নুড়ি-পাথর ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ তীরভূমি জুড়ে। ওদের রঙেরই বা বাহার কত। কোনটা শাদা কোনটা খয়েরি—আবার কোনটা বা শাদায়-লালে মেশামেশি। দুপুরের রোদে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে।

ওরা নুড়ি-পাথর থেকে বেছে বেছে নুড়ি তুলছে। হাতে নিয়ে ভার অনুভব করছে, চোখের সামনে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। না, এটাও নয়। গভীর বিরক্তিতে হাতের পাথর-খানা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে একদিকে। কোনটা গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ছে আবার জলের মধ্যে।
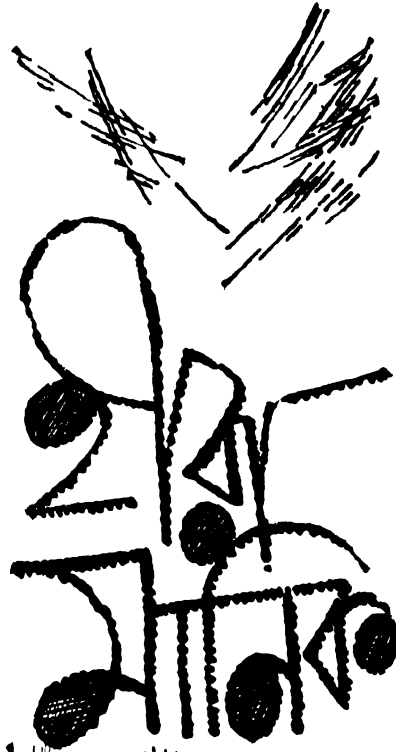
নদীর নাম ভেনেজুয়েলা। পাহাড়ের কন্দর পেরিয়ে গভীর বনের ছায়া মাড়িয়ে নদী ছুটে গেছে দূর-দূরান্তরে। চলার পথে দু'তীরে জমিয়ে গেছে অফুরন্ত নুড়ি-পাথরের স্তূপ।

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

ওদের শীর্ণ চেহারা, শতচ্ছিন্ন পোষাক—ক্লিষ্ট দেহ-মন।

কতদিন ধরে ওরা এমনিভাবে খুঁজছে—ওদের খোঁজার আর শেষ নেই। খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলেছে শুধু—যা ফেলে যাচ্ছে তাকে পিছন-ফিরে দেখবারও ইচ্ছে ওদের নেই। অন্তহীন পথ—শুধু ঝুঁকে পড়ে নুড়ি কুড়োচ্ছে, পরখ করছে—তারপর গভীর বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

র‍্যাফেল সোল্যানো ওদেরই একজন।

সহসা ও সোজা হয়ে দাঁড়াল, আড়ামোড়া ভাঙল। তারপর বলল —না; এভাবে আর খিদে-তেষ্টা ভুলে, পাথর খোঁজার মানেই হয় না। যা' খুঁজছি তা পাওয়া যাবে না।

কেন? এত হতাশ হয়ে পড়লে কেন সোল্যানো? সঙ্গীদের একজন বলল।

অন্য সঙ্গীটি বলল— খোঁজ। খুঁজে যাও। হতাশ হও না।

এমনিভাবে ত' ন' লক্ষ নিরানব্বই হাজার ন' শ' নিরানব্বইখানা পাথর কুড়োলাম। কিন্তু কই যা খুঁজছিলাম তা ত' পেলাম না। কি হবে আর খুঁজে। সোল্যানোর কণ্ঠে গভীর হতাশার সুর।

বেশ তবে আর একখানা পাথর কুড়োও। ব্যস। দশ লক্ষ পুরো হবে। একজন বন্ধু বলে উঠল।

ঠিক বলেছ। আমি আর একখানা পাথরই কুড়োবো।

সোল্যানো সহসা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঝুঁকল। তারপর দু'চোখ বন্ধ করে সামনে-জমা নুড়ির স্তূপের মধ্যে হাত পুরে দিল। ভাগ্যের হাতে বন্দী ক্রীতদাস—চোখ বেঁধে যেন আপন ভাগ্যের সঙ্গেই কানামাছি খেলছে।

মুঠোভরা একখানা পাথর তুলল সোল্যানো।

বেশ ভারী—অবিশ্বাস্যরকম ভারী। চোখের সামনে নুড়িটা তুলে ধরল। নিরেট উজ্জ্বল। বুক দুলে উঠল, আশা কুহকিনী হাতছানি দিল। হয়ত এটাই সেই পাথর—যার সন্ধানে ওরা দিনের পর দিন ঘুরে মরছে।

নিউ ইয়র্কের নামকরা জহুরী হ্যারী উইনংটন।

সোল্যানো পাথরখানা নিয়ে সেই জহুরীর কাছে হাজির হল।

জহুরী জহর দেখেই চিনল। সামান্য পাথর নয়, মহামূল্যবান হীরক-

খণ্ড পেয়েছে সোল্যানো। পাথরখানা দু' লক্ষ ডলার দিয়ে কিনে নিল জহুরী উইনস্টন। তারপর পাথরখানা কাট-ছাঁট করে একখানা উজ্জ্বল হীরকখণ্ডে পরিণত করল। খণ্ডটির নাম দিল—'লিবারেটর।' এত বড় আর এত উজ্জ্বল হীরকখণ্ড সারা বিশ্বে নেই।

প্রশ্ন ওঠে, হীরক কি? পাথর? না, আর কিছু?

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কার্বন থেকে হীরকের জন্ম। সেদিক দিয়ে বিচার করলে হীরক কয়লার জাতভাই। কিন্তু কয়লা নিকষ কালো—খনির সব অন্ধকার জমাট বেঁধে কয়লার মধ্যে স্থান নিয়েছে অথচ হীরা উজ্জ্বল—দ্যুতিময়। রাজ্যের সৌন্দর্যকে নিঃশেষে পান করে বসে রয়েছে। ছোট্ট একটি হীরকখণ্ড অবিশ্বাস্যরকম শক্ত—তাই লোহা আর কাচকে কাটতে হলে প্রয়োজন হয় একখণ্ড হীরকের। লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে অসহ্য ভারের চাপে আর উত্তাপের দাহনে চাপ চাপ কয়লাখণ্ড হীরকখণ্ডে পরিণত হয়, ওই ছোট্ট বস্তুর মধ্যে জমা হয় রাজ্যের শক্তি (এনার্জি)। তারপর আগ্নেয় বিস্ফোরণের ফলে লাভার সঙ্গে হীরকখণ্ডেরও বন্দিদশা ঘোচে। পৃথিবীর আলো দেখে। ছড়িয়ে থাকে নুড়ি-পাথরের সঙ্গে নদীর তীরে প্রান্তরে কিংবা পাহাড়ের কন্দরে। কখনও বা লোভী মানুষের শক্তসমর্থ গাঁইতির ঘায়ে কয়লাখনির ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে। বাইরের আলোয় ঝলমল করে ওঠে।

এমনি কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এক একখানা নামকরা হীরকখণ্ডের সঙ্গে। কোথাও আনন্দ, কোথাও বা বেদনার ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। কোথাও বা হীরকখণ্ড আশীর্বাদ আবার কোথাও বা অভিশাপ।

দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি হীরকখনির জন্য বিখ্যাত।

ইউরোপের সভ্য-মানুষ অনেক আগেই হীরকের সন্ধান পেয়ে হাজারে হাজারে ছুটে গেছে এ অঞ্চলে। সৈন্য-সামন্ত, বন্দুক-কামান নিয়ে লড়াই করেছে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে। হীরকের মূল্য তারা জানত না, হীরকের প্রতি কোনও লোভও তাদের ছিল না। কিন্তু তবু তারা নিহত হয়েছে শ্বেত মানুষদের হাতে। তাদেরই কবরের উপরে গড়ে উঠেছে এক একটা হীরকখনি। আদিম আফ্রিক্যানরা হীরা ব্যবহার করে না, তবু খনির অন্ধকারে ডুব দিয়ে ওরাই তুলে আনে অসংস্কৃত হীরকখণ্ড—কুবেরের সম্পদ লুঠ করে আনে। সে সম্পদ বোঝাই হয় ইউরোপের ধনভাণ্ডারে—আর আফ্রিক্যানরা থাকে দারিদ্র্যের মধ্যে।

'প্রিমিয়ার মাইনস' এমনি ধরণের একটি খনি-সংস্থা।

খনির ম্যানেজার ফ্রেডারিক ওয়েলস।

উনিশ শ' পাঁচ সালের এক অপরাহ্ন-বেলায় ওয়েলস সাহেব খনির মধ্যে নামলেন। ইচ্ছে, একটু এদিক-ওদিক তদারক করে দেখবেন। কেউ কোথাও ফাঁকি দিচ্ছে কি না। কিংবা কোনও মজুর চুরির মতলবে আছে কি না। ঘুরতে ঘুরতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, ঘুমে ভেঙে আসছিল সারা দেহ। একটা সুড়ঙ্গের মেঝেতে হাতে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন।

দৃষ্টি আবদ্ধ হল সুড়ঙ্গের ছাদে। ওখানে কি যেন ঝিকমিক করছে না? প্রথমটায় ভাবলেন, মদ খেয়ে মজুররা ত' প্রায়ই খনির মধ্যে বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। হয়ত কোনরকমে একখানা কাঁচের টুকরো ছিটকে গিয়ে আটকে গেছে ছাদে। কিন্তু অত উজ্জ্বল হবে কেন কাঁচের টুকরো? সন্দেহ হল। উঠে পড়লেন। দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে টুকরোখানা পেড়ে আনলেন। মস্তবড় হীরকখণ্ড—তিন হাজার এক শ' ছ' ক্যারাট ওজন। অর্থাৎ সওয়া এক পাউণ্ডের ওপর।

কোম্পানির প্রেসিডেন্ট টমাস কুলিনান।

কাজেই হীরকখণ্ডের নামকরণ করা হল কুলিনান। মূল্য সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার—কুবেরের সম্পদ। ট্রান্সভ্যাল সরকার হীরকখণ্ডখানা কিনে নিয়ে ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডকে উপহার দিলেন, তাঁর ছেষট্টিতম জন্মদিবস উপলক্ষে। আর ওয়েলস সাহেবকে কোম্পানি দিল দশ হাজার ডলার।

এমন মূল্যবান হীরকখণ্ড রাজা-রাজড়ার ভাণ্ডারে রাখাই সম্ভব। এর রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য সপ্তম এডোয়ার্ডকে বহু টাকা খরচ করতে হত। দস্যু-তস্করেরা তো মুখিয়ে বসে আছে। একবার ঘণ্টা দুয়েকের জন্য এই হীরকখণ্ডখানা ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের হেফাজতের বাইরে আনার জন্য সওয়া সাত শ' ডলার 'ইনস্যুরেন্স চার্জ' দিতে হয়েছিল।

বছর তিনেক পরে কুলিনান হীরকখণ্ডখানা ন'টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছিল। কেটেছিলেন বিখ্যাত জহুরী জে এ্যাশটের সাহেব। এই হীরকখণ্ডগুলো এখন ইংলণ্ডের রাজ-কোষাগারের অমূল্য সম্পদ।

●

মেবার দুর্গে আয়নায় প্রতিবিম্বিত রাণী পদ্মিনীর দেহসৌন্দর্য দর্শন করেছিলেন পাঠান বাদশা আলাউদ্দিন খিলজী। তাঁর কলিজায় তরুণ রক্তের দোলা লেগেছিল। ইয়া আল্লা। বেহেস্তের হুরীর রূপ মানবীর দেহে। রূপোন্মত্তও হয়েছিলেন দিল্লীর শাহান শা। একটি নারীর জন্য হাজারো মানুষের প্রাণের ডালি সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বিজয়ী আলাউদ্দিন যখন মেবার দুর্গ দখল করেছিলেন তখনও জহরব্রতের আগুনের শিখা ধিকি-ধিকি জ্বলছিল। সেই আগুন নিঃশ্বেসে গ্রাস করেছিল রাণী পদ্মিনীকে।

বিমর্ষ বাদশা মেবার লুঠ করে রাণী পদ্মিণীকে পাননি—কিন্তু পেয়েছিলেন আর এক অমূল্য সম্পদ। পরের বার মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী দখল করে তার কোষাগার থেকে লুঠ করে এনেছিলেন একখানা হীরকখণ্ড—

রমণীরূপের মতনই উজ্জ্বল আর দ্যুতিময় সে হীরকখণ্ডই কোহিনূর। সেটা তেরো'চার সালের কথা।

গুপ্তযুগে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের কোষাগারে ছিল এই হীরকখণ্ড।

দাক্ষিণাত্যের সোনার খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

হয়ত পেয়েছিল কোনও গ্রামের মানুষ। মূল্য বোঝেনি হীরকের। শুধু উজ্জ্বল একখানা পাথর। কাজেই সে হয়ত সেই পাথরখানা উপহার দিয়েছিল গ্রামের মোড়লকে। গ্রামের প্রধান হয়ত বুঝবে এমন পাথরের কদর। তারপর হাত ঘুরতে ঘুরতে সেই উজ্জ্বল হীরকখণ্ড জমা হয়েছিল দেশের রাজার কোষাগারে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে এই হীরকখণ্ড যৌতুক দিয়েছিলেন চালক্য রাজ।

তারপর থেকেই কোহিনূর কয়েক শতাব্দী বন্দিনী ছিল মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীর দুর্গ-কোষাগারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়েছে। উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসনে নতুন নতুন রাজা বসেছেন একজনের পর আর একজন। এক রাজবংশের পতন ঘটেছে—উত্থান হয়েছে নতুন রাজবংশের। কিন্তু কোহিনূর বন্দিনী থেকেছে অন্ধকার কোষাগারে।

মালবের কোষাগার থেকে কোহিনূর নীত হল দিল্লীর রাজপ্রাসাদে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দিল্লীর মসনদেও ভাগ্যের উত্থান-পতনের খেলা চলেছিল। বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা, বিদ্রোহ, আত্মহত্যা—অনেক স্মৃতিবিজড়িত সেই উত্থান-পতনের কাহিনী। মহামূল্যবান সে কোহিনূর সে সব কাহিনীর মূল সাক্ষী।

গ্রেট মুঘলরা তাঁদের সময়ে ছিলেন কোহিনূরের মালিক।

কিন্তু তাঁরা নিজেরাই এত বড় ছিলেন, ছিলেন অফুরন্ত সম্পদ আর ক্ষমতার অধিকারী—তাই তাঁদের কাছে কোহিনূর একখানা সামান্য হীরক পাথর ছাড়া আর কিছু ছিল না।

পৃথিবীর সব থেকে বড় হীরক... শাহজাহানের মালিক কেন কোহিনূরের খোঁজ করবে? তাজমহলের সৌন্দর্য যাঁর চিত্তকে উদ্ভাসিত করে রেখেছিল সেই শাহান-শা শাহজাহানের কাছে একটা সামান্য হীরক পাথরের কোনও মূল্যই ছিল না। কোরানের বাণী যাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মনকে গলা টিপে হত্যা করেছিল, সঙ্গীতকেও যিনি নির্বাসিত করেছিলেন— সেই দুর্ধর্ষ যুদ্ধপ্রিয় আলমগীরের চোখে কোহিনূর ছিল একখানা মূল্যবান পাথর। ব্যস। আর কিছু নয়। বিলাসী যিনি মন তাঁর কাছে কোহিনূরখচিত মুকুট নিরর্থক।

কিন্তু গ্রেট মুঘলদের উত্তরাধিকারী বাদশাহ মহম্মদ শাহ কোনদিক দিয়েই গ্রেট ছিলেন না—না সম্পদে, না বাদশাহী-শৌর্যে। তাই কোহিনূর তাঁর কাছে ছিল মহামূল্যবান হীরকখণ্ড। খোয়া যাওয়ার ভয়ে কোহিনূর লুকিয়ে রাখতেন মুকুটের অভ্যন্তরে—লোকচক্ষুর অন্তরালে। কেউ সন্দেহ করতে পারত না যে, শাহান শা কোহিনূর লুকিয়ে রেখেছেন শিরস্ত্রাণের মধ্যে।

এত সাবধানতা সত্ত্বেও কিন্তু লুঠেরা নাদির শাহের শ্যেনদৃষ্টি থেকে কোহিনূর লুকিয়ে রাখতে পারেন নি দিল্লীশ্বর। সতের শ' উনত্রিশ সালে দিল্লী লুঠ করেন নাদির শাহ। রাজধানীর সমস্ত সম্পদ ঐশ্বর্য লুঠ করে নিয়ে যান পারস্যে। পরাজিত মুঘল বাদশাহের শিরস্ত্রাণের ভিতর থেকে টেনে বার করেছিলেন অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড। দ্যুতিময় হীরক দেখে লুঠেরার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল—আঃ! সত্যই পর্বতশিখরের আলো। কোহিনূর।

নাদির শাহ দিল্লীর সম্পদ নিয়ে চলে গেলেন আফগানিস্থানে। কিন্তু আশী বছর পরে কোহিনূর আবার ফিরে এল ভারতবর্ষে।

নাদির শাহের বংশধরদের তাড়িয়ে কাবুলের সিংহাসন দখল করেছিল দুরাণী রাজবংশ। শেষ দুরাণী শাহ সুজা সিংহাসন হারিয়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সিংহাসন ফের দখল করার জন্য মহারাজার সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন।

পাঞ্জাব-কেশরী বলেছিলেন—সাহায্য করতে পারি এক সর্তে।

কি সে সর্ত, মহারাজ?

সিংহাসন ফিরে পেলে কোহিনূরখানা আমাকে দেবেন বলুন।

সর্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতরা অর্ধেক রাজত্ব ত্যাগ করতে রাজী হন। শাহ সুজা দুরাণী কোহিনূরের বদলে ময়ূরসিংহাসন দখল করতে ইতস্তত করলেন না।

কোহিনুর মহারাজ রণজিৎ সিংহের শিরোভূষণে স্থান পেয়েছিল।

বৃটিশ সেনাপতি স্যার জন লরেন্স ছিলেন দ্বিতীয় নাদির শাহ—লুঠেরা। তিনি শিখযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে পাঞ্জাব দখল করেন। লাহোর লুঠ করে কেড়ে নেন পর্বতের আলো—কোহিনুর। সেটা আঠার শ' পঞ্চাশ সাল। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ভারতের বড়লাট লর্ড ডালহৌসী। ভারতে ইংরাজ শাসনকে তিনিই কায়েমী করেন।

লর্ড ডালহৌসী কোহিনুর উপহার দেন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে।

সেই তখন থেকে ইংলণ্ডের রাজার শিরোভূষণ ভারতের কোহিনুর।

মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরৎ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। দূর থেকে তার রূপ দেখেই তাকে তৃপ্ত হতে হয়। যা মানুষ লাভ করতে অক্ষম হয় তার সম্বন্ধে নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী সে বিশ্বাস করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কাকতালীয় অবস্থার মতন কতকগুলো ঘটনা এমন ঘটে যায় যে, মানুষের বিশ্বাস, অনৈসর্গিক ধারণা তাতে আরও দৃঢ় হয়।

নীল-হীরকের সম্পর্কে এমনি বিশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে।

তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেবতার অভিশাপ। বিস্ময়কর নীলচে দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে এই হীরকখণ্ড থেকেই। এমন হীরকখণ্ড জগতে দুর্লভ। মানুষ যা মহামূল্যবান বলে মনে করে তাই সে উপহার দেয় আপন প্রিয়জনকে —উপাস্য দেবতার চেয়ে ভক্তের কাছে আর কে বেশী প্রিয় আছে? হোক সে দেবতা মাটি পাথর অথবা কাঠের মূর্তি তবু তারই কাছে উপহারের ডালি সাজিয়ে আনে ভক্তজন। বহুমূল্য বসন-ভূষণ আহার-পানীয় উৎসর্গীকৃত হয় দেবমূর্তির পদতলে। আর যে ধন একবার দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হয় তা আর মানুষ ভোগ করতে পারে না—ভোগ করতে চায় না। সে বস্তুতে দেবতার দৃষ্টি পড়ে। দেবতার কাছ থেকে কেড়ে নিলে দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হয়।

প্যাগানের প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের দেবমূর্তি হচ্ছে রাম-সীতার যুগল-মূর্তি। কোনও সময় হয়ত কোনও ভক্ত দেবতাকে দান করেছিল একখণ্ড মাণিক—হীরা-মাণিক। বিস্ময়কর নীল-দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েয় সেই হীরক-খণ্ড থেকে। রামের মূর্তির কপালে বসানো হল সেই নীল হীরকখণ্ড।

আলো-ছায়া ঘেরা মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবমূর্তির কপালে ধ্রুবতারার মতন জ্বলজ্বল করত সেই হীরকখণ্ড। দীর্ঘকাল ধরে মন্দিরে আগত শত শত ভক্ত সেই নীল আলোয় নিজেদের মনের অন্ধকার দূর করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হীরকের দ্যুতি রহস্যময় আলো ছড়িয়েছিল প্যাগানের মন্দির-গর্ভে।

তারপর একদিন এক বিদেশী অভিযানকারী পদার্পণ করল প্যাগানে। লোকটা জাতিতে ফরাসী —জাঁ জোসেফ ট্যাভার্নিয়ার। মন্দিরগর্ভে হীরকের দ্যুতি দেখল সে—দেখল, লুব্ধ হল। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে দেবতার ধন অপহরণ করে দেশের পথে পা বাড়াল।

আর তখন থেকেই নীল হীরকের সঙ্গে দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে। যখন যার অধিকারে যাচ্ছে এই হীরক-খণ্ড তখনই সে অস্বাভাবিকভাবে নিহত হয়েছে। দেবতার অভিশাপ মৃত্যুর রূপ ধারণ করেছে।

ট্যাভার্নিয়ার দেশে পৌঁছতে পারেনি।

বনের পথ দিয়ে পালাবার সময় হিংস্র জন্তু-জানোয়ার তার দেহ টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলেছিল। শুধু পাওয়া গিয়েছিল তার চুরি করে আনা সেই নীলদ্যুতি হীরকখানা।

হাত ঘুরতে ঘুরতে নীল-হীরা পৌঁছাল ফরাসী রাজদরবারে।

এই বিস্ময়কর হীরার মালিক হলেন ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুই। কিন্তু রাজাও দেবতার অভিশাপের হাত থেকে নিস্তার পেলেন না। রাজা যাকেই এই হীরা উপহার দিয়েছিলেন সেই ভাগ্যবিপর্যয়ের হাত এড়াতে পারেনি। এমন কি এই অভিশপ্ত হীরা রাজবংশের উপরও দেবতার অভিশাপ বহন করে এনেছিল। ষোড়শ লুই আর তাঁর রাণীকে গিলোটিনে জীবন বিসর্জন দিতে হল

অনেক বছর পরে আমস্টারডামের এক জহুরীর ছেলে নীল হীরাখানা বিক্রি করে বহু টাকা পেল। কিন্তু টাকা পেয়েও সে সুখী হল না। জুয়া-মদে সব টাকা উড়িয়ে দিল। শেষটায় কপর্দক-হীন অবস্থায় আত্মহত্যা করে লোকটা বাঁচল।

ফরাসী জহুরী ফ্রান্কস বোলিন নীল হীরাখানা কিনে নিয়ে দু' খণ্ড করল। ছোট খণ্ডখানা বিক্রি করে বড়খানা নিয়ে লণ্ডনে হাজির হল। কিন্তু মৃত্যু আর দারিদ্র্য তখন তাকে গ্রাস করতে সুরু করেছে। টাকা-পয়সা সব নিঃশেষ হয়ে যেতে বোলিন এক বস্তিতে আস্তানা নিল। শেষে একদিন বড় খণ্ডখানা নিয়ে হাজির হল লণ্ডনের জহুরী ইলিয়াসনের কাছে।

নীল হীরাখানা জহুরীর সামনে রেখে বোলিন বলল, এখানা বিক্রি করব।

একজন সাধারণ বস্তিবাসী হীরা বিক্রী করতে চাইছে। ইলিয়াসন একটু সন্দেহান্বিত হল। হীরাখানা হাতে তুলে নিল। অভিজ্ঞ জহুরী—হীরা চিনতে তার ভুল হল না। তা ছাড়া বিশ্বের কোন্ হীরার কি ইতিহাস তাও তার জানা। বিশেষ করে এই 'ব্লু ডায়মণ্ড' —সারা বিশ্বে এর ত' জুড়ি নেই।

ট্যাভার্নিয়ারের নীল হীরে, না? শুধাল জহুরী।

হাঁ। ওখানা আমি কিনেছিলাম। জবাব দিল বোলিন।

তুমি কিনেছিলে? কিন্তু ওখানা ত' আরও বড় ছিল?

হাঁ। আমি কিনে দু'খণ্ড করে-ছিলাম। একখণ্ড আগেই বিক্রি করেছি, এবার এখানাও করব।

নয়াদিল্লীতে ভারত ও ইরাণ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ইরাণের শাহানশাহ ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ

১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসনের সঙ্গে
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

ফাল্গুন, ১৩৭৫

কলেজ স্কোয়ারে কংগ্রেস-আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় ভাষণরত শ্রীঅতুল্য ঘোষ

মধ্য কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে নির্বাচনী-সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। পার্শ্বে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীবিজয় সিং নাহার

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে স্বর্ণশিল্পীদের 'কালা উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ভাষণরত শ্রীযতীন চক্রবর্তী
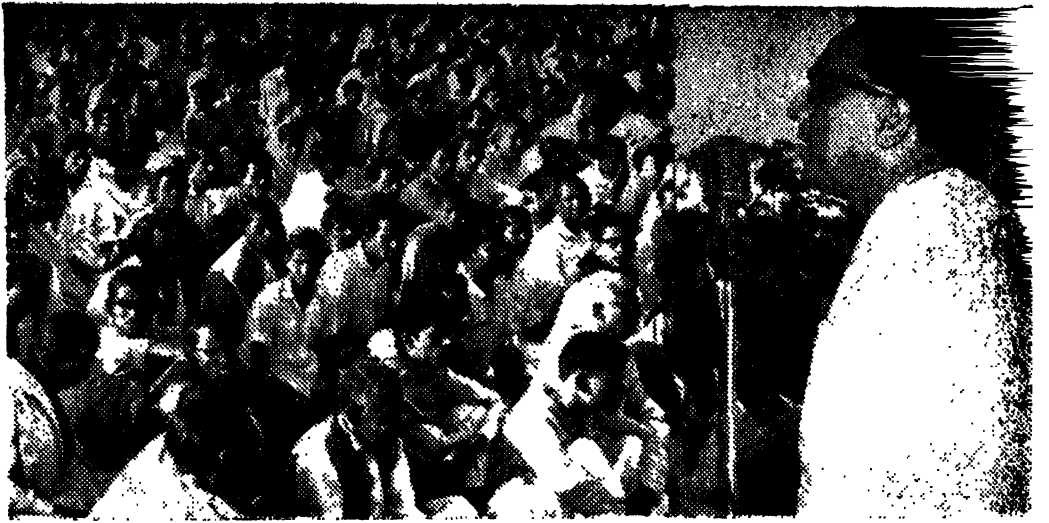
তারকেশ্বর-চাঁপাডাংগা আলুপট্টীতে অনুষ্ঠিত এক বিশাল নির্বাচনী জনসমাবেশে
ভাষণ দিচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এম-পি

কল্যাণী শ্রমিক-মঙ্গল কেন্দ্রের সামনে যুক্তফ্রণ্ট আয়োজিত সভায় নির্বাচনী ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীজ্যোতি বসু

রাঁচী মোরাবাদী ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত ভোজসভায় শ্রীমতী গান্ধী আসার সময়
কাশ্মীর লিবারেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান এম ওয়াই চিশ্তি শ্রীমতী গান্ধীর গাড়ির
দিকে এগিয়ে আসার সময় পুলিশ বাধা দেয়

নামখানায় ও সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়া ঘাটে তীর্থযাত্রীদের ভীড়
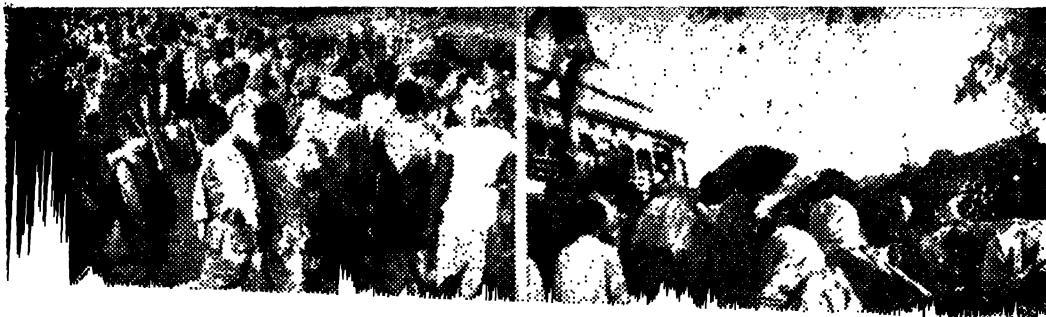
কত দাম চাইছ?

হাজার পাঁচেক পাউণ্ড পেলেই ছেড়ে দেব। জবাব দিল বোলিন।

ইলিয়াসন একবার হীরাখানা পরখ করে দেখল। নামী হীরে। মার্কেটে পড়তে পারে না। কিন্তু, তবু কেনবার আগে একবার যাচাই করা দরকার। যদি সত্য সত্যই ব্লু ডায়মণ্ডের টুকরো হয়, তাহলে পাঁচ হাজার পাউণ্ড রীতিমত একটা বারগেন হবে। আবার জাল হীরে হওয়াও অসম্ভব নয়।

বেশ। ওখানা রেখে যাও। যাচাই করে দেখি।

অনাহারের সঙ্গে লড়াই করছে তখন বোলিন। হীরাখানা বিক্রী করতে পারলেও ওর কয়েক মাস ভাল যাবে। কাজেই হীরক রেখে রসিদ নিয়ে চলে গেল। একটা রাত বই ত' নয়। আগামীকালই টাকা মিটিয়ে দেবে জহুরী।

যাচাই করলেন ইলিয়াসন। নকল নয়---আসল কমল-হীরে।

পরের দিন সকালবেলায় টাকা নিয়ে ছুটলেন বোলিনের বস্তিঘরে। এমন সম্পদ যার ঘরে সে বাস করছে বস্তিতে। দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি। পথ খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হলেন ওর ঘরে।

কিন্তু বোলিন তখন এপারের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিল।

শূন্য বস্তিঘরে শুধু পড়েছিল ওর মৃতদেহ।

জহুরী ইলিয়াসন হীরেখানা বিক্রি করেন টমাস হোপকে আঠার হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে। আর তখন থেকেই হীরের টুকরোখানার নাম হয়েছিল 'হোপ'। কিন্তু 'হোপ'-পরিবারে 'হোপ' বেশীদিন ছিল না। হীরেখানা কিনেছিলেন একজন পোলিশ রাজকুমার। তিনি তাঁর অভিনেত্রী প্রণয়িনীকে হীরেখানা উপহার দিয়েছিলেন। অভিশপ্ত জীবন কিন্তু তখনও শেষ হয় নি হীরেখানার। অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে নিহত হলেন। আর রাজকুমার প্যারীর রাজপথে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন।

'হোপ' হীরক আবার হাতবদল হল। এবার কিনলেন সুলতান আবদুল হামিদ। তিনি কিছুদিনের মধ্যে সিংহাসন আর জীবন দুই হারালেন বিপ্লবীদের হাতে।

একজন মার্কিন ধনকুবের এখন 'হোপ' হীরের মালিক। তিন লাখ ডলার দিয়ে তিনি ওখানা কিনেছিলেন এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে। হয়ত হীরেখানা মালিকের সিন্দুকে না হয় ব্যাঙ্কের সেফটি ভোল্টে বন্দী হয়ে আছে। কিন্তু তার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী কেউ ভোলেনি।

এখন ল্যাবরেটারিতে হীরা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। গুণে এবং কাজে হয়ত সে হীরা আসল হীরার চেয়ে ন্যূন নহে। কিন্তু কমলহীরের আভিজাত্য তার নেই। কমলহীরে তাই আজও মানুষের কাছে বিস্ময়ের বস্তু।*

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় বিভিন্ন ইংরাজী লেখকের লেখা ও 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকার' সাহায্য গ্রহণ করেছি। ঋণ স্বীকার করছি।

বিবর

চিত্রা বিশ্বাস

ওরে থাম্ থাম্
বিস্মৃতির বিসংলগ্নতার পাতা থেকে
অস্পষ্ট গুঞ্জরণের তান,
ছিঁড়ে ফেল মায়ার বাঁধন, মুছে ফেল্ জীবনের শাখা
নিশাচরের নীরে।

মনের ভুল ভেসে ওঠে
কিসের প্রত্যাশায়, কিসের সাধনায়
কোন অজানা সজনীর সন্ধানে
ছুটে চলে চপলতার পাখা
মুহূর্ত মিলনের তরে।

ওরে থাম্ থাম্
এসে বুকের সুপ্ত ব্যথা
রাশি, রাশি অন্ধকারের কামনা
গোপনের দ্বারে মানবতার ইচ্ছা
ফেলে দে বিস্মৃতির তীরে।

কবি দামোদরের "কুট্টনীমত" ও তৎকালীন সমাজচিত্র

ভট্ট দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমতম্'(১) কাব্যগ্রন্থটি অষ্টম শতকের একটি সুবিখ্যাত রচনা। গ্রন্থকারের জন্মকাল এবং ব্যক্তিপরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে আলোচ্য কবি প্রসঙ্গে তাঁক পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে তাই থেকে অনুমিত হয় ভট্ট দামোদর সম্ভবত অষ্টম শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কর্কট বা নাগ-বংশীয় নৃপতি মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য যখন কাশ্মীর রাজ্যের অধিপতি, সে সময়ে দামোদর ছিলেন তাঁর অন্যতম মন্ত্রী। মন্ত্রিত্ব ছিল দামোদরের আজীবিকা এবং এই আজীবিকার প্রভাব তাঁর কাব্যসমূহে অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয়েছে। কলহন বিরচিত 'রাজতরঙ্গিণী' পাঠে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কবি কর্মসূত্রে কাশ্মীরের কর্কট রাজবংশের সহিত বহুকাল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। কাশ্মীর রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সে-যুগে পণ্ডিত ও কবিরূপে প্রখ্যাত হয়েছিলেন।

পাণ্ডিত্য ও রাজকার্যাদি উভয় ব্যাপারেই দামোদরের পারদর্শিতা লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক বিচার করলে দেখা যায় যে, সেখানে রাজনীতি-জ্ঞানের কোন সুস্পষ্ট পরিচয় নেই। অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং কাব্যপ্রতিভা-বলেই তিনি তৎকালীন বিদগ্ধসমাজে সুবিখ্যাত হয়েছিলেন, নাগবংশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এবং সর্বোপরি কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের দৌহিত্র জয়পীড় বিনয়াদিত্যের সৌহার্দ্য লাভ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

অনেকের মতে দামোদর ছিলেন জয়পীড়ের সভাকবি; কিন্তু এই উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় আছে। তবে জয়পীড়ের রাজত্বকালেই যে কবির বহুমুখী পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব-শক্তির পর্যাপ্ত স্ফুরণ হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর বিখ্যাত

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

কাব্যগ্রন্থ 'কুট্টনীমতের' রচনাকাল সম্ভবত এই সময়েই। শস্ত্র ও শাস্ত্রে কবি ইতিপূর্বেই যুগপৎ অধিকার অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘকাল রাজ-পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে এবং রাজসভায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে তৎকালীন লোক-সমাজে একটা সুস্থ মার্জিত পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে, একই সময়ে দামোদর সমকালীন কাব্য-সাহিত্যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবেশসচেতন কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর কাব্য-প্রতিভা সে যুগের তরুণ কবিগোষ্ঠীকে নবীন কাব্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ সকল তথ্যের উপাদান পরবর্তী যুগের কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যগ্রন্থ হতে পাওয়া যায়।

'সুভাষিতাবলী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়', 'সূক্তি মুক্তাবলী' ইত্যাদি প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থসমূহে দামোদরের নামাঙ্কিত কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। পদসমূহের অধিকাংশই কবির 'কুট্টনীমত' গ্রন্থ হতে সংগৃহীত। এই দৃষ্টান্ত থেকে আরও প্রমাণ হয় যে, দামোদরের কবিখ্যাতি কেবল একটি নির্দিষ্ট রসজ্ঞ সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না; একসময়ে এই খ্যাতি সুদূর-প্রসারী হয়ে দেশের সকল স্মার্ত-সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কাশ্মীর রাজবংশে মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য একজন স্মরণীয় রাজ-পুরুষ। এই বংশের অন্যান্য রাজগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর তাঁর সমকক্ষ নৃপতি তৎকালীন ভারতে কেউ ছিল না বললেই চলে। তৎকালীন ভারতে যে-সমস্ত হিন্দু-রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সাম্রাজ্য ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। 'The Classic Age' গ্রন্থে উক্ত নৃপতির ব্যক্তিপরিচয় সম্বন্ধে এ কয়টি কথার উল্লেখ আছে,—

..."His extensive conquests made the king of Kashmir, for the time being, the most powerful empire that India had seen since the days of the Guptas..."

কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থেও উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।(২)

কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ললিতাদিত্যের শাসনকাল শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভারত-ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। রাজ্যে বহুসংখ্যক মন্দির ও মঠ নির্মাণকাজে তৎকালীন শিল্পীগণ যেন প্রস্তরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ

১। দামোদর বিরচিত 'কুট্টনীমতম্'। অনুবাদক: শ্রীত্রিদিব রায় (বসুমতী সাহিত্যমন্দির)

(২) "The best of Kashmiri Rulers Chandrapida and his brother Lalitaditya, the ablest warrior king.."

—Rajtarangini Translated by Ranjit Sitaram Pandit.

হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের আদর্শ ও নীতিকে ভিত্তি করে সে-যুগের শিল্পীরা যে-শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখে গেছেন, তা আজও ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর উন্নতির সাক্ষ্য বহন করে। ললিতাদিত্যের আমলে কাশ্মীরের মার্ত ও মন্দিরগুলি এমনি এক-একটি শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। তাঁর রাজত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে (৭৬০ খৃঃ অব্দ) রাজ্য-শাসনে বহু শৈথিল্য দেখা দেয়। পরবর্তী রাজগণের অদূরদর্শিতা এবং ঔদাসীন্যের ফলে রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজ্যশাসনে এমন কতক-গুলি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে, কর্কট-বংশের পরবর্তী রাজগণের পক্ষে সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁরা এমনই হীন-বল হয়ে পড়েছিলেন যে, সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পেতে বসেছিল। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি জয়পীড় বিনয়াদিত্য (খৃঃ ৭৭৯—৮১৩) তদানীন্তনকালে একজন খ্যাত-নামা পণ্ডিতরূপে সুপরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্র, সাহিত্য এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেই সময়ে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষা এবং বিবিধ শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়ে-ছিল। কলহন-প্রদত্ত বিবরণ সূত্রে জানা যায় যে, রাজা বিনয়াদিত্য ধ্যানীর ঐকান্তিকতা নিয়ে সকল হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করেছিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। দেশ-দেশান্তর হতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা এনে নিজ রাজ্যে হৃত-বিলুপ্ত মহাভাষ্যসমূহকে পুনঃ-প্রবর্তিত করেছিলেন। ক্ষীর নামে এক শব্দবিদ্যাবিদ আচার্যের কাছে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করে বিনয়াদিত্য আচার্য পদবীতে ভূষিত হয়েছিলেন।

তাঁর রাজসভায় বিরাজ করতেন সে-যুগের বহু খ্যাতনামা কবি, আলঙ্কারিক এবং দার্শনিক। বিখ্যাত আলংকারিক উদ্ভট ভট্ট ছিলেন রাজসভার সভাপতি। মনোরথ, শংখদত্ত, চটক, সন্ধিমান প্রমুখ কবিগণ রাজসভায় বিরাজ করে কাশ্মীর মণ্ডলের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে-ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের ভাববাদী স্রষ্টা কবি এবং এঁদের কাব্য রচনাবলী যে জ্ঞানগম্য সাধনপথের সহায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সর্বোপরি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দুই প্রতিমূর্তি কবি-কুলতিলক বামনাচার্য (সুবৃত্তি কলিংগানু-শাসন গ্রন্থ রচয়িতা) এবং দামোদর গুপ্ত ভাবব্যঞ্জক কাব্য রচনা করে তৎকালীন জন-জীবনে এক নতুন স্বাদুতা সঞ্চার করেছিলেন। উভয়েই ছিলেন রূপদক্ষ জীবনশিল্পী।

'An Advanced History of India' গ্রন্থে জয়পীড় বিনয়াদিত্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে,—

"He was a great patron of learning and his court was adorned by Kshirasvamin, Udbhata, Damodar Gupta, Vamana and other scholars..."(৩)

সাহিত্যকে যদি যুগদর্পণ বলে স্বীকার করতে হয়, তা হলে সর্বাগ্রে বলতে হয় প্রাচীন সাহিত্যকারেরা আধুনিক যুগের তুলনায় অনেক বেশি সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। যুগ-বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ ও সমাজের ঐতি-হাসিক ক্রমবিবর্তন এবং ক্রমবিকাশের স্বরূপটি প্রাচীন সাহিত্যে যেমন সুস্পষ্ট আকারে প্রতিফলিত, তেমনটি আধুনিক সাহিত্যে বিরল, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে।

এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মনৈতিক জীবনের বহু প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিম্বদন্তী, রাজ-গণের বংশ-তালিকা প্রভৃতি থেকে বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তবে ঐ তথ্যসমূহের ব্যবহার প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে তাদের উপাদানগুলিকে সতর্ক-তার সঙ্গে বিচার করতে হয়। প্রাচীন যুগের মধ্যবর্তী ভাগে সমসাময়িক সাহিত্যকারদের রচনা হতে যে-সমস্ত ঐতিহাসিক-তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তা নিছক কিম্বদন্তীর পর্যায়ে পড়ে না।

রচনাগুলির সঠিক সময়কাল এবং গ্রন্থকারদের জন্ম ও ব্যক্তিপরিচয়ের সূত্র ধরে তৎকালীন যুগ-সমাজের যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলির প্রামাণিকতা ও স্বরূপ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা নেই। এমনি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ, কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী'। ঐতি-হাসিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থখানি প্রাচীন সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

তৎকালীন কাশ্মীর রাজ্যের ঐতি-হাসিক তথ্যগুলিকে লোক-হৃদয়ের অন্তরঙ্গ বিশ্বাসের মূলে গেঁথে কবি একটি প্রকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিভার মধ্যে ঐতিহাসিকোচিত পরিবেশ-সচে-তনতা ছিল সুগভীর। ফলে, সামাজিক-নৈতিক আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি পরিচয় তাঁর রচনায় অতি সুনিপুণ-ভাবে বিধৃত হয়েছে। কবির ঐতি-হাসিকসুলভ মনোবৃত্তি এবং পরিবেশ-সচেতনতা সম্বন্ধে The Vedic Age গ্রন্থে এই কয়টি কথার উল্লেখ আছে,—

"The virtuous poet alone is worthy of praise who, free from love or hatred, ever restricts his language to the exposition of facts ..."

কলহন-প্রদত্ত বিবরণ-সূত্রে জানা যায় যে, কাশ্মীররাজ ললিতাপীড় অত্যন্ত কামাচারী ছিলেন। লোকসমাজের সামাজিক চেতনার সঙ্গে তাঁর কোন যোগসূত্র ছিল না। রাজার আসক্তি-ক্লিন্নতা, মোহাচ্ছন্নতা হিন্দুধর্ম-শাসিত সমাজে নানা কদাচার ও নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দিয়েছিল। ধর্মের নামে যৌনাচার প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

৩। An Advanced History of India by Sri R. C. Majoomdar and others. Page—163.

রাজকার্যে ললিতাদিত্যের মারাত্মক অবহেলা। প্রজাদের সঙ্গে তিনি সকল যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাজ্যে তাই সর্বনাশা অরাজকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। প্রণয়বিলাসী রাজার মোহাচ্ছন্নতার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতিকারেরা সমাজে আধিপত্য লাভ করেছিল। প্রজাপুঞ্জের হাহাকার রাজপ্রাসাদের পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করে কখনো অন্তঃপুরে প্রবেশ করত না। সমাজে বারনামা ও দেবদাসীদের প্রাধান্য অতিমাত্রায় বিস্তার লাভ করেছিল। নাগর-সমাজে এবং রাজসভায় এদের প্রভাব এবং আকর্ষণ এত গভীর ছিল যে, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এবং এমন কি রাজপুরুষেরা নিজেদের পদমর্যাদা ভুলে সব সময়ে বারনামাদের স্পর্শসুখ কামনা করতেন। এ-সকল তথ্যের প্রমাণ তৎকালীন যুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থে নিহিত আছে। সে-যুগের কবিগণ তাঁদের কাব্যগ্রন্থে অতি উচ্ছ্বসিত ভাষায় এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই বারনামাদের স্তবগান করেছেন। 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে ললিতাদিত্যের চরিত্র সম্বন্ধে কলহনের উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

"The king who was not satiated with a small number of women and whose passion was intensely hot considered that Joyapida who had come away from the conquered Realm of the Amazons had been frigid."

[Page 153]

. . . "He made fun of the former kings who had been fond of world conquest, being happy, with amorous enjoyment with women of the town, immersed in his own engagements."

[Page 153]

[Rajtarangini translated from the original sanskrit of Kalhana by Ranjit Sitaram Pandit]

এ ছাড়া মন্দিরে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত দেবদাসীদের বিবরণও কলহন কর্তৃক বিবৃত হয়েছে। বারনামাদের মত দেবদাসীরাও ছিল সর্বগুণে গুণান্বিতা। নৃত্য, গীত এবং বাদ্যযন্ত্রে এরা ছিল বিশেষভাবে নিপুণা। দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হয়েও এরা সমাজের উচ্চস্তরের লোকেদের কাম-বাসনা প্রশমনে নিযুক্ত হত। রাজসভায় যৌন অনাচার কোনরকম দূষণীয় ছিল না। রাজা এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের যে-কোন যৌন অপরাধ সব সময়ে ক্ষমার চক্ষে দেখা হত। চারিত্রিক ব্যভিচার, বিলাস-উল্লসিত জীবন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ইত্যাদি প্রাণবিধ্বংসী ক্রিয়াকাণ্ড মানুষের সমাজ-জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে পাপের পঙ্কতলে নিক্ষেপ করেছিল; আর সেই ভোগ-বিলাসের স্রোতে নিমজ্জমান সেকালের রাজসভাগুলি কি জঘন্য স্তরে উপনীত হয়েছিল, তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সমকালীন কাব্য-কবিতায়, চিত্র-শিল্পে, শিলালিপিতে এবং দানপত্রে।

পূর্বেই বলা হয়েছে রাজা ললিতাদিত্য ছিলেন অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর সুরতবাসনা অল্পসংখ্যক রমণীতে তৃপ্ত ছিল না। সভানন্দিনীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নিরঙ্কুশ ভোগবিলাসের পরিবেশে হট্টদাসের মত তিনি রাজসভায় অবস্থান করতেন।

রূপোপজীবিনীদের আত্মীয়, বিটগণ রাজসভায় প্রবেশ করে তাদের নৃত্য-গীত এবং কামকলায় দীক্ষা দিত। বেশ্যা কথায় পারদর্শী এবং রসিকনিপুণ ব্যক্তিরা রাজার সাহচর্য লাভ করত। সমাজে বেশ্যাপ্রীতি এমন একটি চরমস্তরে পৌঁছেছিল যে, সমকালীন সত্যদ্রষ্টা কবি দামোদর তাঁর বেশ্যা-প্রণয় সম্পর্কিত 'কুট্টনীমতম্' কাব্যটি রচনা করে তৎকালীন কামাচারী সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রাজা যখন দুর্বল, রাজ্যের জনগণ যখন পাপাচারে লিপ্ত, দামোদর গুপ্ত সেই মসীলিপ্ত কালসন্ধিক্ষণে নীতির বিধান হাতে দণ্ডায়মান।

সমাজের নিচু স্তরের জনজীবন আর এক বীভৎসরূপ ধারণ করেছিল। সেখানে একটানা অভাব, অত্যাচার, দারিদ্র্য এবং পেষণের মাত্রাধিক্য ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছিল। গ্রামবাসীরা নগরের পংকিল জীবনের মোহে পড়ে গ্রাম ছেড়ে সহরে বসবাস করতে সুরু করেছিল।

দামোদরের সময়কালে একদিকে যেমন সমাজ-জীবনে ঐশ্বর্য, বিলাস এবং কামবাসনার সোৎসাহ অপরদিকে তেমনি অমানুষিক ঘৃণা-অবহেলা এবং পেষণের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। কাশ্মীর রাজ্যের সামগ্রিক চিত্রটি এক দুরপনেয় চারিত্রিক-কলঙ্কে মসীলিপ্ত। দেশ ও সমাজ এক নিদারুণ অভিশাপে পাপের পঙ্কিল পথে অগ্রসর হয়েছিল। সেখানে মানবাত্মা ছিল এক নিদারুণ অভিশাপে উৎকণ্ঠিত-জীবন, দেহগত লীলা-বিলাসে ভারগ্রস্ত ও ধর্ম, নিন্দনীয় যৌন ব্যভিচার-কলুষিত।

'কুট্টনীমতম্' সংস্কৃতে লেখা একটি শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্য। সংস্কৃত রসসাহিত্যে শৃঙ্গাররসই প্রধান। আলঙ্কারিকেরা শৃঙ্গার রসের নাম দিয়েছেন আদিরস। রসই কাব্যের প্রাণ। সাহিত্যদর্পণের ভাষায়—

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ
বীভৎসাদ্ভুত ইত্যাষ্টৌ শান্তস্তথা মতঃ।

অর্থাৎ রসের স্বরূপ আট প্রকার এবং প্রথম রস শৃঙ্গার। অনেকে বলেন, শৃঙ্গাররস অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু শ্লীলতা-অশ্লীলতা নির্ভর করে মানুষের রুচিবোধের ওপর। আবার রুচিবোধের কোন চিরস্থির মানদণ্ড নেই। রসগ্রহণের উপযুক্ত মানসিকতাই শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচারের প্রকৃত মানদণ্ড। কাব্যের যাত্রাপথে দামোদর অনুভূতির স্রোতকে এমন দুর্বার বেগে পরিচালিত করেছেন যে, কাব্যরস শ্লীলতা অশ্লীলতার বাধা-বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে কাব্যরসসাগরে মিলিত হয়েছে। রসসাগরে যে কাব্যের পরিসমাপ্তি তা সততই রসসমৃদ্ধ; কবির প্রতিভাও সেখানে সার্থক।

'কুট্টনীমত' কাব্যের বিষয়বস্তু : এক বারবণিতার প্রেম—

মালতী নামে বারাণসীর এক সুন্দরী যৌবনসমৃদ্ধা গণিকা বিকরণা নামে এক কুরূপা রমণীর সান্নিধ্যে এসে কেমন করে পুরুষ-চিত্তকে বুদ্ধি-কৌশলে আয়ত্ত করেছিল, তারই বিবরণ কাব্যগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। বাকচাতুর্যের দ্বারা নায়কের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে এবং তার মনকে অনুরাগে অনুরঞ্জিত করে কেমন করে সে অর্থ শোষণ করবে, সে সম্বন্ধে বিকরণা মালতীকে উপদেশ দিয়েছে। বিষয়টি 'কামসূত্র' গ্রন্থে বাৎস্যায়ন বলেছেন--

'গণিকা যদি প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহলে তার অর্থ উপার্জন হয় না। ঐশ্বর্য-শালিনী গণিকার গৃহেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অভিগমন করে। নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব বেশ্যাকে কেউ সমাদর করে না।'

---কামসূত্র ৬।৩।৩।

গণিকার রূপ থাকলেই চলে না, রূপকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন উপকরণ। যেমন,—বসনভূষণ আর কামকলার লীলাবৈভব।

বিকরণা যে একজন কামকলা-বিদগ্ধা রমণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংসারের সকল বিষয়ে সে অভিজ্ঞা। বুদ্ধি, কৌশল এবং বচনচাতুর্যেও সে অতি নিপুণা। তার কামকলাজ্ঞানের প্রশংসা মালতী কর্তৃক সহোৎসাহে প্রশংসিত।

অয়মেব বুদ্ধি বিভবং হৃত বিভবস্তে
পট্ট চরাবরণঃ।
কামুক লোকঃ কথয়তি সত্রাগারেষু
ভুঞ্জানঃ ॥ (৩৪)
উপসংহৃতান্যকর্মা ধনবর্মা নর্মদাং
ঘ্রি যুগলস্য।
সকল সমর্পিত সংপদ্যদুপেতঃ পাদ-
পীঠত্বম্ ॥ (৩৫)

কাব্যের নায়ক-নায়ক একাধিক। প্রথম নায়ক ভট্টপুত্র চিন্তামণি এবং নায়িকা মালতী। মালতী যৌবনবতী, রূপগুণালংকৃতা গণিকা। এই দু'জন নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে কবি রসপরিস্ফুটনের চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু প্রকৃত রসস্ফুরণ সম্ভব হয় নি। মালতী এবং চিন্তামণির মিলন কল্পনাপ্রসূত। এদের ভবিষ্যৎ-মিলনচিত্র বিকরণা কর্তৃক আভাসিত হয়েছে মাত্র, সার্থক পরিণতি লাভ করতে পারে নি। অতএব এরা কাব্যের মুখ্য নায়ক-নায়িকা হতে পারে না। কাব্যের মুখ্য নায়ক-নায়িকাদ্বয় যথাক্রমে সমরভট্ট ও সুন্দর সেন এবং মঞ্জরী ও হরলতা।

এদের মিলন বাস্তবানুগ ; কোনরকম কল্পনার অতিবেগ নেই। কবি মঞ্জরী ও সমরভট্টের মিলনচিত্রে যে শৃঙ্গার-রসের সৃষ্টি করেছেন, তা নিতান্ত কৃত্রিম। অনুরাগবিরহিত স্বার্থময় মিলন কখনো বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রসাভিষিক্ত হতে পারে না। শৃঙ্গাররসের প্রকৃত লক্ষণ—

শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদ স্তদাগমন হেতুকঃ।
উত্তম প্রকৃতি প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥

শৃঙ্গারের পরিপূরক হিসাবে বিভাব, অনুভাব, উদ্দীপনা ইত্যাদি কতকগুলি গুণ থাকা চাই, নচেৎ শুদ্ধ শৃঙ্গার-রসসৃষ্টি অসম্ভব। মঞ্জরী ও সমরভট্টের মিলন বেদ্যারাগে প্রত্যক্ষদৃষ্ট। অতএব এখানে বিশুদ্ধ শৃঙ্গাররসের কল্পনা নিরর্থক।

একমাত্র হরলতা ও সুন্দর সেনের মিলনচিত্রে বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রসের সন্ধান পাওয়া যায়। কবি দামোদর এখানে প্রকৃত শৃঙ্গাররস পরিস্ফুটনে সফলকাম হয়েছেন। এই নায়ক-নায়িকার প্রেম ও অনুরাগ অকৃত্রিম। তাছাড়া হরলতা ও সুন্দর সেনের মধ্যে নায়িকা-নায়কোচিত গুণগুলি সর্বত্র পরিলক্ষিত। ফলে, বিশুদ্ধ রস পরিস্ফুটনে কোন-রকম প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয় নি।

কবি দামোদর বাৎস্যায়নের প্রভাব হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। অবশ্য সে যুগের সকল বিদগ্ধরাই বাৎস্যায়নের প্রভাবে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। বাৎস্যায়নের নাগর-জীবনের আদর্শ সমগ্র ভারতের নাগর-জীবনের আদর্শ হয়ে উঠেছিল।

ভট্টদামোদরের 'কুট্টনীমতম্' কাব্যেও বাৎস্যায়নের প্রভাব বিশেষভাবে পরি-লক্ষিত। বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রের জ্ঞানগর্ভ নির্দেশগুলি কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের রতিবর্ণনে সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। 'কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণটি সম্বন্ধে কবি তাঁর কাব্যে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। অতএব অনেকের মতে 'কুট্টনীমতম্' একটি লঘু প্রণয় কাব্য হলেও কাব্যটিকে শাস্ত্র-কাব্যরূপে আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হয় না। (৪)

কাব্যটিতে কবির অসামান্য রস-সৃষ্টির ক্ষমতার সঙ্গে তাঁর যে বহুমুখী পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাই থেকে সহজে অনুমিত হয় যে, তিনি কবিখ্যাতি অর্জনের পূর্বে নিশ্চয় কঠোর পরিশ্রমসহকারে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন। কাব্যের উপাখ্যানভাগ অতিশয় সহজ এবং ভাষা ও রচনা-শৈলী অপেক্ষাকৃত সরল। উপকরণে কোন নূতন আড়ম্বর না থাকলেও কবির অসামান্য প্রতিভাবলে কাব্য-খানি এক অদৃষ্টপূর্ব মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। তৎকালীন রসজ্ঞ সমাজের হৃদয় অধিকার করে নিতে কাব্যখানির বিলম্ব হয় নি। এই কাব্যটি রচনাকালে দামোদর, বাৎস্যায়ন, বাভ্রব্য, শ্বেতকেতু প্রমুখ পূর্ববর্তী মহাজনদের প্রতি যে বিনয়-পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তার পরিচয় গ্রন্থটি অনুধাবন করলেই উপলব্ধি করা যায়। কাব্যখানিতে যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়-ভোগ এবং প্রেমচর্চার দৃশ্য যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাই থেকে মনে হয়, রচনাটি কবির যৌবন বয়সের সৃষ্টি, কারণ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই এমন একটি রোমান্স-নিবিড় গাথা রচনা করে সকলকে চমৎকৃত করার ইচ্ছা মনে প্রবলভাবে দেখা দেয়। কাব্যে নায়ক-নায়িকাদের প্রেম, কামনার শতদল বিস্তার করেছে। কিন্তু দেহজ কামনাকে গোপন করে নয় বরং তাকে

৪। কুট্টনীমতম্ : দামোদর গুপ্ত, অনুবাদক শ্রীত্রিদিব রায়।

কেন্দ্র করেই কবি রসের আরতি-প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। তিনি দেহসত্ত্ব ও মানস এই দ্বয়ের বিরোধকে স্বীকার করেও তাদের পৃথক করে রাখতে চান নি। প্রেমের সকল রূপই এখানে দেহসর্বস্ব। এই রূপচিত্রাঙ্কনে দামোদর তাঁর কবি-স্বভাবের যে পরিচয় রেখেছেন তার একটি হল কবির সৌন্দর্যবোধ, অপরটি রসবোধ।

আলঙ্কারিকদের মতে, সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের লক্ষ্যবস্তু। সৌন্দর্যের সঙ্গে কবির হৃদয়বাসনার সংযোগ ঘটলেই কবিমানসের যথার্থ পরিচয় ব্যক্ত হয়।

'কুট্টনীমত' কাব্যখানি শুধু তৎ-কালীন নীতিবাগীশদের মাথার টনক নাড়িয়ে দেয় নি, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও রীতিমত একটা আলোড়ন তুলেছিল। বক্তব্য ও ভাষা সম্বন্ধে লোকের যত মতভেদই থাকুক না কেন কাব্যটি যে দামোদরের অসামান্য প্রতিভার বহ্নিদীপ্ত প্রকাশ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রসসৃষ্টিই কবির একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, জীবন-সাধনার গভীরতম উপলব্ধিকে তিনি রক্তমাংসে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাই আলোচ্য কাব্যটি তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার একটি দুর্লভ অনুভূতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

কাশ্মীরের রাজকুল বংশপরম্পরায় দামোদরের পাণ্ডিত্য ও শিল্প-সাধনার ধাত্রীত্ব করেছিল। তিনজন শাসকের রাজসভা তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁদের সকলের পৃষ্ঠপোষকতা ও হৃদ্যতাও লাভ করেছিলেন।

এই পারস্পরিক হৃদ্যতা ও পরিপূরকতার প্রীতিসূত্রেই সমকালীন সমাজের সামগ্রিক চেতনার সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। সমসাময়িক জীবনের অসাম্য ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে অক্ষিপ্ত সচেতনতাই তাঁকে কাব্যরচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। জীবিতকালে তিনি কাশ্মীর-বংশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতি জীবনের নানা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সে সময় সমগ্র দেশে হিন্দু-সমাজ ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত অধোগতি সূচিত হয়। পরিণতবয়সে কবি এই দুর্যোগের মধ্যে নিক্ষেপিত হয়েছিলেন। সঙ্কটের ছায়া ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। এমনি একটি কালসন্ধিক্ষণে দামোদর জয়াপীড়ের দরবারে বসে নীরব-নিভৃত পরিবেশে কুট্টনীমত রচনা করেছিলেন। সমাজের সকল সাধারণ মানুষকে ভবিষ্যৎ-দুর্দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সুস্থ-সবল সমাজ গঠনে আহ্বান করেছেন,—নতুন কর্মমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ৎ - -

'কুট্টনীমত' কাব্যগ্রন্থটি যেন একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, আর প্রত্যক্ষ-দর্শী কবি দামোদর তৎকালীন লোক-সমাজের একজন রূপদক্ষ জীবনশিল্পী।

এপাড়া ঃ ওপাড়া (নির্বাচন)

শ্রীতুষার নিয়োগী

চোখের সামনে জ্বলছে আশার ফুলঝুরি,
আবার নতুন আশ্বাস ভরা সান্ত্বনা,
ও-পাড়া বলছে ঃ ভুলিনি, সত্য মজদুর-ই
এই পাড়া বলে, এস ঘরে এস, পিঁড়িতে এঁকেছি আলপনা।

এ-পাড়া বলছে ঃ আহা মরি মরি তোমাদের কত যন্ত্রণা,
তাই তোমাদের দুঃখ ঘোচাতে এবার করেছি মন্ত্রণা।
তোমরা সবাই পাশে যদি থাকো এইটুকু পারি বলতে
দেব না কখনো তোমাদের—পথে ধুঁকতে ধুঁকতে চলতে।
তোমাদেরি প্রতিবেশী.
ও-পাড়ার কথা ধাপ্পায় ভরা—করছেই রেষারেষি??

ও-পাড়ার কথা ধাপ্পায় ভরা—করছেই রেষা রেষি ॥
চেনা যায় না ত ছলনা, কুয়াসা, ধোঁয়াটে ছদ্মবেশে.
শঠ কৃষ্ণের মধু আহবান, দুর্যোধনের দাবি,
সেনানী জানে না কার হাতে আছে জীয়ন কাঠির চাবি॥

তখৎ-এ-তাউসে যেই বা বসুক পাঁচ বছরের জন্য,
জয়ধ্বনি ও শঙ্খ বাজিয়ে যতই হই না ধন্য
ফুলঝুরিগুলো নিভে যাবে, কালো পোড়া বারুদের গন্ধ,
সেইটুকু শুধু সম্বল কোরে বাঁচবার মহানন্দ॥

এ-পাড়া ও-পাড়া জয় উৎসবে সফরেতে যাবে ছুঁয়ে
কফিনে যেখানে বন্দী সুখের স্কেলিটনগুলো শুয়ে॥

ছিন্নপক্ষ

কৃষ্ণা চৌধুরী

অতীতের তিক্ত কষ্টকর সেই স্মৃতি বিচরণ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ভোরবেলা রাম সিংয়ের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কৃষ্ণেন্দুর বিছানার দিকে নজর যেতেই চোখ দু'টো কুঁচকে গেল। রাম সিংকে জিজ্ঞেস করলাম—বাবু কোথায় রে?

জানলাম, ভদ্রলোক ভোরবেলাতেই বন্দুক নিয়ে কোথায় গিয়েছেন।

বেশ বেলাতে বন্দুক কাঁধে প্রফুল্ল, ভাবনাহীন মুখে কৃষ্ণেন্দু ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল—এই যে ঘুম ভেঙ্গেছে তাহলে! বাবা! কি ঘুমই ঘুমাচ্ছিলি তুই!

আমি হাসলাম—তোর মত তো ঝকঝকে লঙ্গি চকচকে বুউজ আর চঞ্চল পদক্ষেপের চিন্তা আমার নেই যে রেকর্ড ভঙ্গ করে ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠবো! কি আবিষ্কার করলি শুনি!

কৃষ্ণেন্দু হাসল। কপালের উপর নুয়ে-পড়া চুলগুলোকে ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল—জঙ্গলে গিয়েছিলাম—।

এমন কাব্যরসিক জঙ্গল খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। উঁচু মস্ত বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে দেশলাইয়ে কাঠি ঘসবার সাথে সাথে মনে হলো যেন আরও একটা আওয়াজ হলো। নিঃশব্দে বন্দুক রেখে পিছন ফিরে একটু এগিয়ে গিয়েই দেখল, কালকের সেই বার্মিজ মেয়েটি পালাচ্ছে। সময় নষ্ট না করে দ্রুতবেগে ওর হাতটা চেপে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—কে তুমি?

মেয়েটি খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, তারপর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে—খেমিয়া বালে?

—কি? অবাক হয় কৃষ্ণেন্দু।

—খেমিয়া বালে? আবার প্রশ্নটি উচ্চারিত হয়।

—আমি বুঝতে পারছি না! তোমার নাম কি?

তবুও মেয়েটি সেই এক কথা বলে 'খেমিয়া বালে?' মহা মুস্কিলে পড়ে কৃষ্ণেন্দু। না ও বুঝাতে পারে মেয়েটির কথা, না মেয়েটি বোঝে ওর কথা। কেবল টানাটানা চোখে অবাক চাহনি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ কি খেয়াল হোতে জিজ্ঞাসা করে—ক্যান ইউ ফলো ইংলিস?
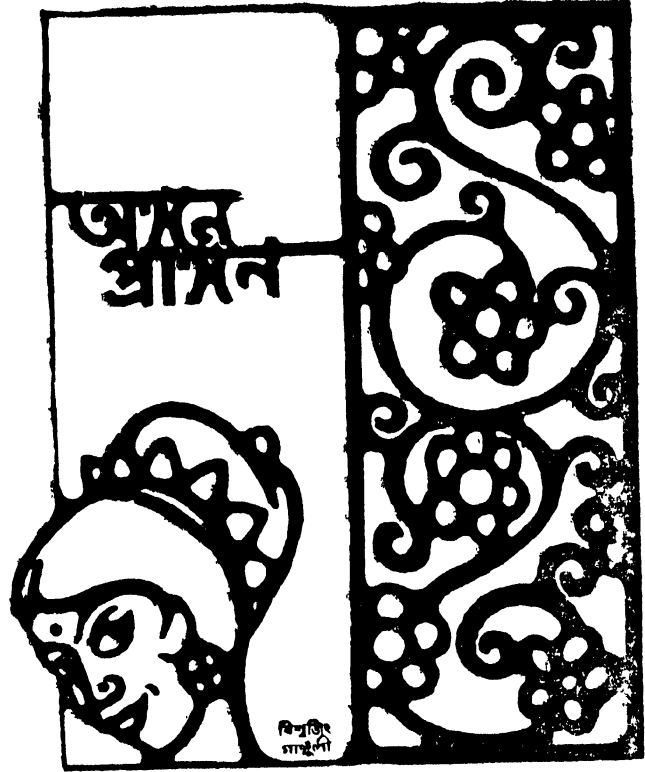
এবার জোরে ঘাড় দুলিয়ে মেয়েটি বলে—ইয়েস লিটল লিটল।

কৃষ্ণেন্দু খুসিতে উপচে পড়ে। কিন্তু মেয়েটির ভয় যায় না। ভয়কাতর চোখে বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বলে—ইউ পোলিশ?

—পোলিশ—ওহো: না মা ওটা 'গান'।

—ইয়েল, আই সি পোলিশ উইথ গান!

—হোয়াট ইজ ইওর নেম?

—মা পিউ।

—বাঃ বেশ মিষ্টি নাম তো! চোখে চোখ রাখে কৃষ্ণেন্দু। নাকটা একটু চাপা। কিন্তু কি অদ্ভুত মিষ্টি চেহারা: রাঙা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সাজান দাঁতের সারি। বার্মিজ মেয়ে। প্রথম দিন তো ধরতেই পারল না। বাব্বা কি প্রচণ্ড জোরে দৌড়ায়! এমনি একটি কৃত্রিমতাবিহীন রঙ্গিলা, চঞ্চলা মেয়েই খুঁজছিল কৃষ্ণেন্দু।

কিছুক্ষণ উসখুস করে মা পিউ বলে—আই গো বাবুজি। যেং যাটিঙ্গি।

—য়েং?—সেটা আবার কি?

—য়েং—গর্‌গর্‌ বাবজি।

—ও, কিন্তু কাল আসবে তো?

—ইয়েস, টু-মরো কাম! নাউ গো!

হঠাৎ কৃষ্ণেন্দু গম্ভীরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলে—হোয়াই? কেন, —আবার তুমি কালকে আসবে পিউ।

মুহূর্তে কি ভেবে নেয় মা পিউ। লজ্জায় আরক্ত মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। অবনত মুখে তাই শুধু কোনো-রকমে উচ্চারণ করে—আই লাভ ইউ।

দ্রুত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ও হরিণের মত পালিয়ে যায়। কৃষ্ণেন্দু

তাকিয়ে দেখল গাছপালার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে মা পিউ হারিয়ে যাচ্ছে। ভালবাসার আনন্দে মনটা নেচে ওঠে। আনন্দ হয়। অসহ্য আনন্দ যা কৃষ্ণেন্দুকে আজ পাগল করে দেয়।

পরের দিনও কি এক দুর্বার টানে ছুটে যায় কৃষ্ণেন্দু। একমনে রুমাল দিয়ে বন্দুকটা মুছছিল, এমন সময় কে যেন ওর চোখ দুটো আলতোভাবে টিপে ধরে। মুচকি হাসে কৃষ্ণেন্দু।

—আমি জানি তুমি কে।

কিন্তু তবুও নরম হাত চোখের বাঁধন আলগা করে না। তখন একান্ত দুষ্টু ছেলের মত দু'হাত পিছনে দিয়ে আগন্তুক একেবারে টেনে ওর কাছে নিয়ে এসে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে—পিউ। মাই লাভ।

সাথে সাথে হালকা হাসির আওয়াজ সহযোগে হাত সরিয়ে নেয় মা পিউ।

কৃষ্ণেন্দু হাসে—খুব দুষ্টু তো তুমি।

পাশে বসে মা পিউ। কালকের মত আজ আর অত সঙ্কোচ নেই। কৃষ্ণেন্দু কি করবে ঠিক করতে না পেরে ওর পোষাকে মন দেয়।

কি বুঝলো কে জানে, হঠাৎ মা পিউ শিক্ষয়িত্রীর মত মুখ করে গায়ের ব্লাউজ দেখিয়ে বলে—বাবুজি—। ইট এঞ্জি। ইয়ে লুঙ্গি।

হো-হো করে হেসে ওঠে কৃষ্ণেন্দু। মা পিউও হাসে। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে তাকায় কৃষ্ণেন্দুর দিকে। কি সুন্দর চেহারা। বাঙালাবাবু এত সুন্দর হয়। কিন্তু সব থেকে মিষ্টি বাবুজীর হাসি।

কৃষ্ণেন্দু ওর কপালের উপর নুয়ে-পড়া চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিয়ে বলে—তোমার আর কে আছে পিউ।

—আম্মে। মাদার।

চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে মা পিউর।

কৃষ্ণেন্দু লক্ষ্য করে ওর উদাসীনতা; খামিজ মেয়ে এত কোমল। অথচ ও শুনেছিল, ভীষণ দুর্ধর্ষ হয়। হয়ত তাই হয়। পিউ হয়ত ব্যতিক্রম। চেয়ে দেখে পিউ দূর আকাশের দিকে যেন তাকিয়ে আছে। একহাত দিয়ে কাছে টেনে আদর করতেই যেন সহসা মা পিউ ছিটকে সরে যায়। ভয়কাতর মুখে চারিদিকে তাকায়। অবাক হয় কৃষ্ণেন্দু। কাকে ভয় পাচ্ছে ও?

—হোয়াট ইজ দিস্ পিউ।

বিবর্ণ মুখে ও বলে—ও অগর্ দেখ্ লেগা তো?

—কে। শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে কৃষ্ণেন্দু।...

●

শুকনো মুখে চারিদিক দেখে উত্তর দেয় মা পিউ—পেদ্রু।

—রায় পেদ্রুকে চিনিস রে?

—কেন? অবাক হয় রায়।

—তা দিয়ে তোর কি দরকার। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দে।

কৃষ্ণেন্দুর কণ্ঠস্বরে রায় অসহিষ্ণুতা আর বিরক্তির আভাস পেল। বুঝে উঠলো না কি ব্যাপার। কৌতূহলে হাই চাপা দিয়ে বলল—হ্যাঁ। পাহাড়ী অঞ্চলের একজন নামকরা লোক বলতে পারিস। দৈত্যের মত চেহারা। বোধহয় দোআঁশলা।

—তার মানে? ভ্রূ কুঞ্চিত হয় কৃষ্ণেন্দুর।

—মানে পর্তুগিজের রক্তও আছে। লোকটা কথা বলে খুব কম। ওর চাউনিটাই মারাত্মক, ওই ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দিয়ে ও যেন কারোর বুকের ভেতরের ছবিটাও দেখে নিতে পারে। সাংঘাতিক লোক।

সহসা কৃষ্ণেন্দু হো-হো করে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে। তারপর অনেক কষ্টে সামলে বলে—তা সেই সাংঘাতিক ভদ্রলোকটি কি করে?

—কি করে তা জানি না। ওকে একবার দেখেছি তাই এটুকু বললাম। কিন্তু যাই বল মাইরি। লোকটার ফিগার-খানা দেখবার মত। একেবারে যেন খোদাই করা!

কৃষ্ণেন্দু কোন কথা বলে না, চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। রায় সে-দৃশ্য নিরীক্ষণ করে হেসে বলে—তা পেদ্রুর তলব কেন? ও কি তোর পাকা ধানে মই দিয়েছে?

চোখ দুটো বন্ধ করে শান্তকণ্ঠে কৃষ্ণেন্দু বলে—ভাবছি আলাপ করব।

রায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে বলে—আলাপ করবি। গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। লোকটা কয়েকটা জঙ্গলের অধিকারী, ইচ্ছে করলে একটা কাঠের ব্যবসা ফাঁদতে পারিস—ইচ্ছে করলে শিকারও করতে পারবি—তুই তো আবার শি—

—চুপ কর। বিরক্তভাবে বলে কৃষ্ণেন্দু। খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই নিজের দেশের অত সম্পত্তি ছেড়ে এখানে কাঠের ব্যবসা করব। তুই যদি কোন কথা তলিয়ে দেখিতিস্ তা হলে আর আমার বন্ধুভাগ্য এত বাজে হতো না—গাঁড়োল কোথাকার।।

রায় হাত নেড়ে কি বলতে যেতেই কৃষ্ণেন্দু পাশের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

●

—বাবুজি। হাল্কা মিষ্টি হাসির আওয়াজ এল।

কৃষ্ণেন্দুর বন্দুকটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে মা পিউ বলল—বাবুজি আজ পেদ্রু নেই, আমার ঘর দেখাব চল।

অনেকটা হাঁটার পর একটা কাঠের ঘরে পৌঁছল ওরা। লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে মা পিউ চিৎকার করে বাচ্চার মত ডাকে—আম্মে-আম্মে।।

ঘর থেকে যে বেরিয়ে এল মা পিউর সাথে তার কোন সাদৃশ্য নেই। বয়স বোধ করি পঞ্চাশ

রাইফেল হাতে সুদর্শন এক যুবককে দেখে থমকে দাঁড়ায়। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে—খেমিয়া বালে?

আবার সেই প্রশ্ন। হোঁচট খায় কৃষ্ণেন্দু। মা পিউ হাত নেড়ে প্রৌঢ়াকে জানিয়ে দেয় কৃষ্ণেন্দুর পরিচয়। স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে ওঠে প্রৌঢ়ার মুখ। বলে—সিট ডাউন বাবুজি।

খিলখিল করে হেসে, সংমাকে ছোট্ট একটা আদুরে ধাক্কা দিয়ে বলে—তোয়া—তোয়া। তারপর কৃষ্ণেন্দুর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় অনেক দূরে। তর্জনী তুলে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলে—ও য়েং বাবজি।

—হোয়াট? চমকে ওঠে কৃষ্ণেন্দু।

হেসে ফেলে মা পিউ—য়েং য়েং—গর্, গর্ হ্যায়, পেদ্রু গর হ্যায়।

সহসা পিছনে একপাল মেয়ের কলকল ধ্বনি শোনা যায়। পিছন ফিরে মা পিউর মুখটা আনন্দে ভরে ওঠে।

—বাবুজি, মা সিন বাংলা জানে। কথা শেষ করে দৌড়ে যায় মেয়েগুলির কাছে, তারপর লজ্জায় আরক্ত একটি যুবতীকে টানতে টানতে নিয়ে আসে। কৃষ্ণেন্দুর চোখে চোখ রেখে বলে—মাসিন।

মা সিন মা পিউর মত সুন্দর নয়। গায়ে সার্টিনের সাদা ব্লাউজ, কালো লুঙ্গি, আর কালো রঙের একটা চাদর গায়ের উপর রয়েছে।

হাসিমুখে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করে—তুমি বাংলা জান।

ধীরে ধীরে চোখ তুলে চায় কৃষ্ণেন্দুর দিকে মাসিন।

মুগ্ধ হয়ে যায় কৃষ্ণেন্দু ওর চাহনিতে। কি অপূর্ব মাদকতা-পূর্ণ চোখ। আশ্চর্য বামিজ মেয়ের এমন সুন্দর চোখ তো দেখা যায় না।

বেশ খানিকক্ষণ কৃষ্ণেন্দুকে দেখে মাসিন শান্তকণ্ঠে বলে—জানি।

বিচিত্র এক স্বস্তি আর জয়ের হাসি ফুটে ওঠে মা পিউর মুখে।

আজ নববর্ষ। পাটভাঙ্গা ধবধবে সাদা পোষাক পরে বেরুলো কৃষ্ণেন্দু। মনে পড়ে এই দিনে কলেজে প্রতি বছর জলসা হতো। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল ও। হঠাৎ গায়ে জল পড়তেই ওর চমক ভাঙ্গে। কানে আসে মিহি হাসির শব্দ। পিছনে তাকিয়ে দেখে মা সিন আরও প্রায় জনা দশেক মেয়ে প্রত্যেকের হাতেই একটা করে জলের পাত্র। কৃষ্ণেন্দুর হতভম্ব মুখের ভাব দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে সবাই। কিছুই বুঝতে পারে না ও। এ আবার কি ধরণের সম্ভাষণ। নতুন পাটভাঙ্গা ট্রাউজারটার এমন অবস্থা করে দিল। মা সিন ওর জলভরা বিরাট মগটা হাতে নিয়ে দুষ্টুমিভরা চোখে এগিয়ে আসতেই চিন্তিত হয় কৃষ্ণেন্দু। এতগুলো মেয়ে যদি এভাবে গায়ে জল চালে তাহলে আর এ যাত্রা রক্ষা নেই।

তাই মা সিন এগিয়ে আসতেই ও খপ করে ওর মগশুদ্ধ হাতটাকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার মা সিন—গায়ে জল ঢালছ কেন?

মা সিন হিহি করে হেসে ওঠে, দেখাদেখি সব ক'টা মেয়েও হেসে ওঠে। মাসিন ওর সেই মাদকতাপূর্ণ চোখের চাউনি নিয়ে বলে —বাবুজি, এখানে আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত জোল নিয়ে খেলা হোবে। হরবরষ, এই দিনে হামলগ জোল নিয়ে খেলা করি, যাকে খুসি গায়ে ঢেলে দিই—সে নারাজ হোলেও দিয়ে দিই।

বুঝলো কৃষ্ণেন্দু। বাংলার দোল উৎসবের মত। কিন্তু মুস্কিলে পড়ে কারণ এই এতগুলো মগের জল তার গায়ে পড়বার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে, তার পরিণতিটাও খুবই করুণ হবে নিঃসন্দেহ। চোখে-মুখে অনেক কষ্টে অসুস্থতার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে, তা বেশ, বেশ। কিন্তু আমার তো কাল রাত্রে ভীষণ বুখার হয়েছিল, এখন এতগুলো জল যদি আমার গায়ে পড়ে তাহলে কি অবস্থা হবে, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ মাসিন।

মা সিন চিন্তান্বিত হয়—বুখার হয়েছে বাবুজি, ও তাহলে জোল দেব না।

মা সিন এবং কৃষ্ণেন্দুর কথাবার্তা মা পিউ কি বুঝলো কি জানি, ছলছল চোখে মগটাকে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—হোয়াট বাবুজি?

মা পিউর ভয়কাতর মুখ দেখে ভয়ানক হাসি পায় কৃষ্ণেন্দুর। তবুও যথাসম্ভব মুখে অসুস্থতার ভাব ফুটিয়ে রাখে। আড়চোখে মা সিনকে দেখে। আজ ওকে খুব সুন্দর লাগছে। চোখ দুটো আরও মদির মনে হচ্ছে। কৃষ্ণেন্দুকে যে মা সিনের খুব ভাল লেগেছে তা ওর চাহনিই বলে দিচ্ছে। ইচ্ছে ছিল আজ জল খেলার মাধ্যমে বাবুজির একটু কাছে যাবে—ভালবাসবে, ভাল-বাসাবে। কিন্তু কিছুই হলো না।

আজ কৃষ্ণেন্দু কিছুতেই ছাড়ে না মা পিউকে। জোর করে ধরে নিয়ে যায়, উদ্দেশ্য রায়কে দেখাবে। কতটুকু আর পথ, তাই যেন আর ফুরাতে চায় না। বাড়ি এলে দম ছাড়ে।

ঘুরে ঘুরে ঘর দেখছিল মা পিউ। পর্দা সরিয়ে একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ক'দিনেরই বা পরিচয় কৃষ্ণেন্দুর সাথে। প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল, কি ভয়ানক ভয় পেয়েছিল সেদিন। আজ হাসি পাচ্ছে। এত ভাল, এত দুষ্টু মানুষ, মা পিউ আর কখনও দেখেনি। পেদ্রুও তো ওকে ভালবাসে কিন্তু সে ভালবাসা যেন বড় নিষ্ঠুর। কারণে অকারণে পেদ্রু ওর কচি নরম

হাত দৃঢ় করে ধরে, চোখের দিকে চেয়ে থাকে, যেন ও কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে। পেদ্রুকে আজও বুঝে উঠলে না মা পিউ। ওর গায়ে যা জোর, এতদিন ইচ্ছে করলে খিয়েও করে ফেলতে পারতো, কিন্তু ও যেন মা পিউর কাছ থেকে কি চায়। কিছু দিতে চায়, কিছু নিতে চায়।

একমনেই ভাবছিল মা পিউ। কখন যে পোশাক পালটে কৃষ্ণেন্দু ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে ও তা জানেই না। কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পারে মা পিউ গভীরভাবে কিছু ভাবছে তাই বাধা না দিয়ে চুপ করে মজা দেখে। এক-দৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে দেখে, তারপর সহসা দুই হাত দিয়ে কাছে টেনে এনে আদরে, সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে মা পিউকে।

---এই দুষ্টু---ছাড়। ছোট্ট প্রতি-বাদ করে মা পিউ।

কিন্তু বাঁধন আরও দৃঢ় করে, নিবিড় করে, কৃষ্ণেন্দু দুষ্টুমিভরা হাসি দিয়ে বলে---উঁহু সেটি হোচ্ছে না পিউ।

উৎকণ্ঠিতভাবে মা পিউ বলে---কেউ যদি দেখে ফেলে।

কৃষ্ণেন্দু হেসে ফেলে, বলে---কে দেখবে এখানে? দেয়াল। আলমারী। নাকি ওই ছোট্ট আরশোলাটা।

কৃষ্ণেন্দুর বলার ধরণ দেখে মা পিউর হাসি পায়। কিন্তু হাসে না। কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বলে---যাও। দুষ্টু কোথাকার।

আবেশ-জড়ানো হাসি হাসে কৃষ্ণেন্দু। সেই হাসি---যা দেখে কলেজের মেয়েরা পায়ে লুটিয়ে পড়তে চাইতো। সেই হাসি দেখে মা পিউ ভুলেছে। সেই হাসি---যা দেখে মাসিন ভালবাসার আগুনে জ্বলছে, আর কলিজার লাল রক্তে তুফান তুলেছে।

মা পিউর নরম রক্তিম গালে ছোট্ট একটি টোকা দিয়ে বলে---কি খাবে বল?

---তোমার মাথা। কৃত্রিম রাগে বলে মা পিউ।

---ও তো কবেই খেয়েছো।

সহসা দরজা ঠেলে প্রবেশ করে রায়। লজ্জায় আরক্তিম মা পিউ চকিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যায়। রায় হতভম্বের মত বলে ওঠে---ইস। কি বোকার মত ঢুকলাম।

---সে কথা আর বলতে। হাসতে হাসতে জবাব দেয় কৃষ্ণেন্দু।

●

আপন মনে উল্লাসে লাফাতে লাফাতে মা পিউ যাচ্ছিল। পথে বাধা প্রাপ্ত হয় পেদ্রুর দ্বারা। শান্তকণ্ঠে মা পিউর দিকে তাকিয়ে বলে---পিউ, তুই আজকাল কোথায় থাকিস?

সাপের মত ফুসে ওঠে মা পিউ---তাতে তোর কি দরকার। যেখানে খুশী থাকব।

আহতকণ্ঠে পেদ্রু বলে---পিউ তুই বুঝতে পারছিস না, ও বাবুরা বড়লোক। ওরা কখোনো ভাল হয় না।

বাঁকা হাসি হেসে মা পিউ বলে---তুই খুব ভাল, তাই না? তোয়া তোয়া। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে ছুটে চলে যায় মা পিউ বিমূঢ় পেদ্রুকে পথের মাঝে ফেলে রেখে। ধক ধক করে জ্বলে ওঠে ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো।

বাচ্চা মেয়ের মত দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছিল মা পিউ। হঠাৎ নদীর পাশে বসা দুজন পরিচিতকে দেখতে পায়। তরতর করে পাহাড়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে আসে তারপর চোখ টান টান করে দেখে, কৃষ্ণেন্দু আর মাসিন পাশাপাশি বসে একমনে গল্প করছে। চকিতে কানে ভেসে আসে পেদ্রুর কথা।

---ও বাবুরা বড়লোক, ওরা কখনও ভাল হয় না।

তবে কি তাই। তবে কি বাবুজি সত্যিই মা সিনের চোখের মায়ায় ভুলেছে। তাও কি সম্ভব।

ধীর পদক্ষেপে ওদের কাছে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ায় মা পিউ। ওকে দেখেই কৃষ্ণেন্দু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে বলে---এই যে কোথায় ছিলে বলো তো। কখন থেকে বসে আছি বোকার মত। কাজ করছিলে, এই শোন, তোমাকে না আমি বাজনা শেখাব পিউ, প্রথমেই শেখাব 'আমি তোমাকে ভালবাসি।' ফাইন হবে না?---আরে কি হল তোমার। এই পিউ। কি ভাবছ।

মা পিউ যেন বোবা হয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ এই মানুষকে সে কিনা সন্দেহ করছিল। কত আগ্রহ নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে, আর সে কি না---

মা পিউর কোন সাড়া না পেয়ে কৃষ্ণেন্দু যেন অবাক হয়। ওর গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলে---এই পিউ। কি হয়েছে।

মাপিউ শুধু বিবর্ণ মুখে উচ্চারণ করে---বাবুজি। তারপরই সহসা কৃষ্ণেন্দুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে---বাবুজি। মারো। মুঝে তুম জানসে মার ডালো বাবুজি।

হতভম্ব কৃষ্ণেন্দু কি করবে বুঝতে পারে না, মাথায় হাত বুলিয়ে বারে বারে শুধু ডাকে---এই পিউ---কি হয়েছে---বোকা মেয়ে, এই পিউ।

কৃষ্ণেন্দু বোঝেনি। বুঝেছে মা সিন, তাই আহত নাগিনীর মত ফণা তুলতে গিয়েও থেমে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে ম্লান হেসে বলে---চলি বাবুজি। পরে আবার মুলাকাৎ হবে।

কৃষ্ণেন্দু কোন উত্তর দেয় না, কি বলবে বুঝতে পারে না। মা সিন ধীরে ধীরে মুখ তোলে। চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপে চঞ্চল হয়ে ওঠে ওর মন। কেন? বাবুজির সাথে নিভৃতে কথা বলতে তার বাধা কোথায়। সেও তো ভালবাসে। তবে ও কেন পারে না মা পিউর মত দাবী জানাতে? ভালবাসা যদি পাপ হয়, তাহলে সে পাপে মা পিউও পাপী। তাহলে।

সব চিন্তা ওলট পালট হয়ে যায় সহসা পেদ্রুকে সামনে দেখে। থমকে দাঁড়ায় মাসিন। কি ভয়ংকর চেহারা লোকটার। কি বিশ্রী চাহনি। কিন্তু তবুও কোথায় যেন পেদ্রুকে সব ভাল

লাগে—করুণা হয়। কোথায় যেন মা সিনের সাথে পেদ্রর খুব সাদৃশ্য আছে ভালবাসার ক্ষেত্রে। ও নিজে যেমন কৃষ্ণেন্দুর প্রেমের ভিক্ষুক, পেদ্রও তেমনি মা পিউর প্রেমের কাঙাল। নিজের পরাজয়ের কথা ভাবতে গিয়েই পেদ্রর জন্য ব্যথায় ভরে ওঠে মনটা। ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে পেদ্রর হাত দুটো গভীরভাবে ধরে আবেগমিশ্রিত স্বরে বলে—পেদ্র।

পেদ্র একমুহূর্ত ওর মুখের পানে চেয়ে দেখে, তারপরই সহসা পাহাড়-ফাটান অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে—হা-হা-হা-হা---

তারপর একঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে যায় পাহাড়ের আরও নিচে—অপমানে প্রজ্বলিত মা সিনকে একা ফেলে রেখে।

কিছুক্ষণ আগে মা পিউ চলে গেছে। আজ হঠাৎ ও কেন এত কাঁদছিল বুঝতে পারে না। কিন্তু মা সিন কি চায়। যা চায় তা বোঝা গেলেও বুঝতে মন চায় না, কারণ এক মৃণালে দুটি পদ্ম কখনও ফোটে না, ফুটবার নয়।

—এই বাবুজি। ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর সহসা ধ্বনিত হয়।

চমকে ওঠে কৃষ্ণেন্দু, চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়—কে? পেদ্র!!

পেদ্র ওর বিশাল দেহটা এগিয়ে নিয়েএসে দুহাত কোমরে দিয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণেন্দু কাঁধের থেকে বন্দুকটা নামিয়ে আনতেই চকিতে পেদ্র সেটাকে হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠে। কৃষ্ণেন্দুর বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। তবুও অনেক কষ্টে বলে—কি চাই তোমার।

গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ ধ্বনিত হয়—মা পিউকো ছোড় দে বাবুজি। লীভ হার, লীভ হার, প্লীজ, ফয়া উইল ব্লেশ ইউ।

অবাক হয় কৃষ্ণেন্দু। অনুভব করে কণ্ঠের অন্তরালে রয়েছে অসহায়ের সুর। যেন আদেশ নয়, করুণস্বরে মিনতি করছে পেদ্র। অদূরে পড়ে থাক বন্দুকটা কাঁধে রেখে পেদ্রর দিকে শান্ত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ততোধিক শান্তস্বরে জবাব দেয়—না। তারপর পেদ্রকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে হন হন করে এগিয়ে যায়।

●

ভোরবেলা উঠেই কৃষ্ণেন্দু কোথায় বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়। রায় বলে—কি রে। এই সাত-সকালেই কোথায় চললি।

কৃষ্ণেন্দু খেতে খেতে বলে—বাজারে যাব।

—নিশ্চয়ই পিউর জন্য কিছু কিনতে।

—কি জানি, হোতেও পারে, নাও হতে পারে।

তাড়াহুড়া করেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে কৃষ্ণেন্দু। একটু তাড়াতাড়ি ফেরার ইচ্ছা নিয়েই বেরোয়। বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিষপত্র কিনে ফিরতে থাকে। অনেকদিন হল বর্মায় এসেছে। এখানে থাকা আর নিরাপদ হবে না, বিশেষ করে পেদ্র যখন ক্ষেপেছে। কাজেই শিকার নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। তা ছাড়া নিজেকেও আর বিশ্বাস হচ্ছে না কৃষ্ণেন্দুর। এমন করে মেয়েদের ফাঁদে পড়তে হবে দেশে থাকতে একবিন্দুও ভাবেনি। মা সিন সত্য ওকে ভালবাসে, কিন্তু কি করা যাবে, দুটো বিয়ে এক-সাথে করা সম্ভব নয়।

চিন্তান্বিত মনে বাড়ি ফিরে দেখে মা সিনের সাথে খোসমেজাজে গল্প জুড়েছে রায়। বিক্ষিপ্ত মন, মা সিনের শিশিরের মত তাজা মুখের পানে চেয়ে শান্ত হয়।

রায় উঠে দাঁড়িয়ে বলে—যাক বাবুজির আসা হল তাহলে। তুই গল্প কর আমি চট করে স্নান সেরে আসি, কেমন।

কৃষ্ণেন্দু বন্দুকটা যথাস্থানে রেখে মা সিনের দিয়ে তাকায়। সোফাতে বসে আছে যেন একমুঠো ফুল। আশ্চর্য আজও এত সেজেছে কেন। কৃষ্ণেন্দর কাছে আসছে বলে।

সোফাতে নিজের একটা জায়গা করে কৃষ্ণেন্দু সহসা একটা প্রশ্ন ছুড়ে বসল—মাসিন, তুমি আমাকে ভালবাস।

চমকে ওঠে মা সিন। এ প্রশ্ন কেন? এ প্রশ্ন বাবুজির মুখ থেকে শোনা যে, তার আশার বাইরে। তবও চোখ তুলে চায় কৃষ্ণেন্দুর দিকে।

—বল মা সিন, বল প্লীজ বল।

ঠোঁট কেঁপে ওঠে মাসিনের। চোখের কোণে জল ভরে আসে—বাবুজি, ফয়া সাক্ষী, প্রথম তোমাকে দেখেই আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—বাসি, বাবুজি ভালবাসি তোমাকে। বিশ্বাস কর।

কৃষ্ণেন্দু গভীরভাবে তাকায় ওর দিকে। যেন কিছু খুঁজে পেতে চায়। তারপর সহসা চীৎকার করে ওঠে—না, না—আমি তোমাকে ভালবাসি না—যাও, চলে যাও মা সিন---যাও—।

—বাবুজি। ভীতস্বরে উচ্চারণ করে মা সিন।

—চলে যাও তুমি—আমি মা পিউকে চাই। হ্যাঁ, তাই চাই আমি।

রাগে-অপমানে মা সিন উঠে দাঁড়ায়। তারপর চোখভরা জল নিয়ে একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মা সিন চলে যেতেই সম্বিৎ ফিরে পায় কৃষ্ণেন্দু। মা সিন তো তাকে সত্যি ভালবাসে। তবে কেন শুধু শুধু একটা সদ্যনির্মিত সেতুকে ভেঙে নষ্ট করে দিচ্ছে। সোফা থেকে উঠে দ্রুতপায়ে বেরোতে গিয়ে 'কলিশন' ঘটে রায়ের সাথে।

অবাক হয়ে রায় প্রশ্ন করে—এই কোথায় যাচ্ছিস।

—আসছি। বলে একহাত দিয়ে রায়কে সরিয়ে ছুটতে থাকে কৃষ্ণেন্দ।

পথে দেখা হয় পেদ্রর সাথে। আগ্রহান্বিত স্বরে জিজ্ঞাসা করে—পেদ্র তুমি মা সিনকে দেখেছো।

শান্ত গম্ভীরস্বরে পেদ্র বলে—না। দূর থেকে দেখা যায় নদীর ধারে

মা সিন একা দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে ওর চাদরটা উড়ছে।

—মা সিন---চীৎকার করে ডাকে কৃষ্ণেন্দু।

—কে ? বাবুজি!! —অবাক জলভরা চোখে তাকায় কৃষ্ণেন্দুর দিকে মা সিন।

পাহাড় থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ছুটে আসে কৃষ্ণেন্দু। মা সিনের হাত দুটো ধরে বলে---আমাকে মাফ করে দাও মা সিন, মিথ্যে বলেছিলাম তখন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

—বাবুজি। থরথর করে কেঁপে ওঠে মা সিন। আকুল চোখে বারে বারে কৃষ্ণেন্দুকে দেখেও যেন আশ মেটে না।

একদৃষ্টিতে ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে লোহা চুম্বকের মত বুকের কাছে টেনে নেয় কৃষ্ণেন্দু মাসিনকে। প্রশ্ন করে মাসিন—কি কি?—

কিন্তু মাসিনের সব প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণেন্দু ওর রক্তিম কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের উপর নেমে পড়ে।

দূরে পাহাড়ের মাথায় দেখা যায় পেক্রর পাশে দাঁড়িয়ে আছে পিউ। ও যেন হঠাৎ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ও যেন কিছু শুনতে পাচ্ছে না, কিছু বুঝতে পারছে না, শুধু দেখতে পাচ্ছে কৃষ্ণেন্দুর কঠিন মধুর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে মা সিন আর কপোলে কপোল হয়েছে সংযোগ।

পেক্র একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলে বলে—দেখলি, বলেছিলাম বাবু তোকে ভালবাসে না, খেলা করছিল।

চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় মা পিউ। অপমানে আরক্তিম হয়ে ওঠে ওর মুখ। থরথর করে বার দুই কেঁপে সহসা পেক্রর গালে সশব্দে চড় কষিয়ে দিয়ে উন্মাদের মত চীৎকার করে ওঠে—নেহি—নেহি---কভি নেহি। ইয়ে সব ঝুট হ্যায়।

বলতে বলতে দুর্দমনীয় কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মা পিউ। টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পরে পেক্রর পাথরের চোখ থেকে।

রায়দা থামলেন।

রজত ক্ষুব্ধস্বরে বলল—সত্যি কোন মানে হয় না রায়দা। আপনি কি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, বেছে বেছে এ রকম জায়গাগুলোতেই থামবেন।

রায়দা বললেন—কি করে তুই একথাটা বললি রজত—আমি সেই কখন থেকে বলছি। আমার কি ক্লান্তি নেই।

রজত মুচকি হাসতে লাগলো।

রায়দা নিতান্তই রেগে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—এতে হাসবার কি পেলে কার্তিক ঠাকুর।

রজত হেসে বলল—ভাবছি একবার বর্মায় যাব।

—যাও না, তোমাকে বারণ করেছে কে। একটা কেন ইচ্ছে হলে হাজারটা আবিষ্কার কর।

রজত বলল—না: হাজারটার দরকার নেই, আপাতত দুটো হলেই চলবে—একটা অরুণের আর একটা আমার। বাদবাকি সব তো অল রেডি ফেঁসে গেছে।

সবাই হাসতে লাগলাম। রায়গিন্নি এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। হঠাৎ গম্ভীর ভাবে বললেন—আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি।

—কি ভাবছ!! সকৌতুকে প্রশ্ন করেন রায়দা।

—ভাবছি নিজের চরিত্রটাকে কৃষ্ণেন্দর নামে চালাচ্ছ কিনা।

সবাই আর একতরফা হো-হো করে হেসে উঠলাম।

রায়দা কিন্তু হাসে না, গম্ভীরভাবে বলে—গল্পের---সরি, ঘটনার শেষটা শুনলে আর ওকথা বলতে না।

—তার মানে? হেসে বললেন রায়গিন্নি।

—মানে—কি বলতে গিয়ে রায়দা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে যায়, বলেন, —তোরা বড্ড ফাজিল। কোনো কথা সিরিয়াসলি বলিস না—সব সময় হাসিস। এ রকম অবিশ্বাসপূর্ণ কথা-বার্তা বললে কারুর গল্প বলতে ইচ্ছে করে।

আমি বললাম—এটা কিন্তু মানতে পারলাম না রায়দা। কখন থেকে চুপ করে শুনছি, মাঝে কি একটা কথাও বলেছি? বলুন?

—না, তা বল নি, কিন্তু—

রজত সুযোগ খুঁজছিল প্রতিবাদ করবার। এবার কথাটাকে সাথে সাথে লুফে নিয়ে বলে—তাহলে কেন শুধু শুধু দোষ দিচ্ছেন। অতি অন্যায়। এর একমাত্র শাস্তি হচ্ছে এক্ষুবি বাকি ঘটনাটুকু আরম্ভ করা।

রায়দা পূর্ব রাগ ভুলে গিয়ে তাঁর সেই আপনভোলা হাসি হেসে বলেন—আচ্ছা বাবা, তাই হবে, কিন্তু যাই বল রজত, তুই উকিলগিরি করলে তোকে আরও ভাল মানাত।

দুদিন ধরে মা পিউর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে একটু চিন্তিত হয় কৃষ্ণেন্দু। কি ব্যাপার। অসুখ-বিসুখ করল নাকি। দেখাই যাক, ৷ ভেবেচিন্তে মা পিউর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল, বাড়িতেই কেশচর্চায় ব্যস্ত মা পিউকে পাওয়া গেল।—পিউ।

চমকে ওঠে মা পিউ—কে ডাকে বাবুজি।

কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কৃষ্ণেন্দু।

—কি হয়েছে পিউ। তবিয়ত ঠিক নেই।

ক্ষণিকের তরে বুঝি বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মা পিউ। কৃষ্ণেন্দুর ডাকে সম্বিৎ ফেরে—তবিয়ত, হ্যাঁ বিলকুল ঠিক আছে। আপ ক্যায়সে হ্যায় বাবুজি।

—আমি? খুব ভাল।

—খু-উ-ব ভাল! টেনে টেনে বলে পিউ। তারপর সহসা খিলখিল করে হেসে ওঠে—হাঁ খুব ভাল তো হোবেই।

হাসির মাত্রা বেড়ে যায় মাপিউর, পাগলের মত হাসতে থাকে।

অবাক হয়ে যায় কৃষ্ণেন্দু। ও ভাল আছে, এসথায় হাসবার মত কি আছে। দু'হাত দিয়ে ওর কাঁধ জোরে ঝাঁকিয়ে ডাকে--পিউ। এই পিউ।

হাসি থামায় পিউ। সোজা দৃষ্টিতে তাকায় কৃষ্ণেন্দুর দিকে।

কৃষ্ণেন্দু ডাকে—পিউ।

কিন্তু সাড়া পাওয়া যায় না মা পিউর। একটি সদ্যোবৃত্ত প্রেমের দিকে একটি সাথীহারা, নিঃসঙ্গ মানুষ ঘৃণার চোখে তাকিয়ে রইল স্থিরদৃষ্টিতে।

—তোমার যেন কি হয়েছে পিউ।

চমক ভাঙ্গে মা পিউর। ও ম্লান হাসি হাসে। দুহাত দিয়ে চুলগুলোকে খোঁপা করতে করতে বলে—ইউ নো বাবুজি। এ্যাজ উই কিস সো উই ক্যান কিল অলসো।

—তার মানে? হোঁচট খায় কৃষ্ণেন্দু। এ আবার কি কথা।

আবার হাসে মা পিউ।—কিছু না বাবুজি। যদি পারো তো কাল প্যাগোডায় একবার আমার সাথে দেখা করো।

—কখন—সকালে ?

চোখ কেমন অস্বাভাবিক গোল করে মা পিউ বিচিত্র এক হাসি হেসে বলে—হ্যাঁ সকালেই ভাল। তখনই যাবে বাবুজি।

আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে বন্দুকটা কাঁধে ফেলে পাহাড়ী পথ বেয়ে হাঁটতে থাকে কৃষ্ণেন্দু।

আহত নাগিনীর মতই ক্রোধে, ঘৃণায় জ্বলে উঠলো মাপিউর চোখ-দুটো সুন্দর শান্ত কোমল চোখ দুটো আজ যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে দপদপ করে জ্বলছে—জ্বলছে। সারা জীবনের একটা মধুর স্বপ্নকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে কৃষ্ণেন্দু। বিশ্বাসের এক জঘন্যতম অবিশ্বাসা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ঘর বাঁধার তুলি দিয়ে আঁকা ছবিটায় কে যেন সহসা কালো করে দিয়েছে।

কোমর থেকে বার করে ছোট্ট সুতীক্ষ্ণ সাথীটিকে। বারে বারে দেখে মা পিউ। দেখে যেন আশ মেটে না, আদর করে, চুমু খায়। সহসা তার সোহাগে বাধা পড়ে পেদ্রুর ডাকে। জলন্ত চোখে ঘুরে দাঁড়ায় মা পিউ।

পেদ্রু ওর আছে এসে করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—প্যাগোডায় কেন যাবি পিউ?

চমকে ওঠে মা পিউ। ও কোথা থেকে শুনলো। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলে—আমার খুশী— বিয়ে করতে যাবো। হলো তো। কি করবি তুই। বলে একমুহূর্ত দাঁড়ায় না। ঘরে ঢুকে পেদ্রুর মুখের উপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

অপমানে পেদ্রুর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে।

ভোরবেলাতেই পেদ্রু আসে মাপিউর কাছে। বুড়ি আম্মে জানায় ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত ও মা পিউকে দেখেনি, কাজেই জানে না কোথায় গেছে। প্যাগোডায় যাবার কথাগুলো বিশ্বাস হয়নি পেদ্রুর কিন্তু তবুও কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় ওর চওড়া বুকও কেঁপে ওঠে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীর ধারে, চীৎকার করে ডাকে—মা পিউ-উ ---কোন সাড়া পাওয়া যায় না। তাহলে সত্যিই ও প্যাগোডায় গিয়েছে। তীব্রবেগে ছুটতে থাকে পেদ্রু।

কিন্তু প্যাগোডায় প্রবেশ করে ও হতাশায়। যে ঘরে ফয়া বুদ্ধর মূর্তি সেখানে কেউ নেই। উদ্বিগ্ন মন নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকেই উন্মাদের মতন চীৎকার করে আছড়ে পড়ে পেদ্রু। গলা থেকে বিকৃতভাবে বেড়োয়—পিও--- উ উ---

—না। পেদ্রুর সেই বুকফাটা আকুল ডাকে সাড়া দেয়নি মা পিউ। ভোরবেলার মতই তাজা ছিল তখনও ওর সুন্দর মুখখানা। অদূরে কাত হয়ে পড়ে আছে কৃষ্ণেন্দু মুখার্জীর মৃতদেহ।

●

রায়দা থামলেন।

সাগ্রহে জিজ্ঞাস করলাম—তারপর। তারপর কি হলো রায়দা।

রায়দার চোখের কোণ জলে চিক্-চিক্ করছিল। হাসতে চেষ্টা করে বলল —তারপর আর কি। আমি যখন সেখানে পৌছলাম দেখলাম, কৃষ্ণেন্দুর বুকের রক্ত আর মা পিউর বকের রক্ত গড়াতে গড়াতে ও ঘর থেকে, এঘরে গৌতমবুদ্ধের পায়ের কাছে এসে মিলেছে। মা পিউর রক্তের প্রতিটি কণা যেন বলতে চাইছে—বাবুজি। আমি তো মরতে চাইনি বাবুজি। বাঁচতে চেয়েছিলাম, ছোট্ট একটা ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম। তাহলে —এ কেন হলো বাবুজি।

●

মূক পৃথিবী চুপ করেই রইল। কারণ এর উত্তর তারও জানা নেই।

॥ সমাপ্ত ॥

র

ফল্লরা গঙ্গোপাধ্যায়

লাল জবা শুধু লাল, তবু তাতে কত
রং খুঁজে পাওয়া যায় আবীরের মত।
খুশী খুশী ভাব আর কত সাজ সাজ
বিশ্বের দরবারে যেন ঋতুরাজ॥

ভেঙেপড়া পাঁচিলেতে অশ্বত্থের চারা
আকাশের পানে চেয়ে হয় দিশাহারা—
কি যে রং আছে তাতে জানিনেক হায়—
শুধু মেঘ-দর্শক অনিমিখে চায়॥

পৃথিবীতে কত রং কত অর নাম
হৃদয়ের রং দিয়ে দিই তার দাম।
সুখে রং দুখে রং, রংয়ে মাখামাখি
সাদা মন কালো দিয়ে সযতনে ঢাকি॥

সেই দুপুর…সেই সন্ধ্যা…সেই রাত্রি.

সিদ্ধেশ্বর দত্ত মারা গেলেন প্রায় পঁচাশী বছর বয়েসে, তিনদিন হোয়ে গেল। সেটা এমন কিছু না। বয়েস হয়েছিল, ভুগছিলেন, শান্তি পেলেন—এটা স্বস্তিরই খবর। কিন্তু যে খবরটা বাড়ীর লোক, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী থেকে ছড়িয়ে পোড়েছে প্রায় সাড়া কুসুমপুর শহরটায়। সেটায় চঞ্চল, অধৈর্য, শেষে ক্রুদ্ধ হোয়ে উঠেছে কুসুমপুরের প্রায় সমস্ত হিন্দুসমাজ,—এ কি অন্যায়, এ কি অনাচার। এ যে সমস্ত হিন্দুত্বের অপমান। সিদ্ধেশ্বর দত্তের বুড়োবয়েসে বিয়ে-করা রূপসী স্ত্রী, এখন এমন কিছু ছেলেমানুষ নয়। প্রায় চল্লিশের ওপোর বয়েস, সে কি না দত্তমশাইয়ের মৃত্যুর পর সিঁদুর মুছে, শাঁখা ভেঙ্গে বিধবা সাজতে রাজি হোচ্ছে না কিছুতেই? এ কখনও হোয়েছে কোথাও? একেবারে ন্যাড়া হাত কোরতে ভাল না লাগে, না হয় দুগাছা সোনার চুড়ি হাতে রাখ,' কিন্তু সিঁদুরটা কি না মুছলে চলে? না হয় বুড়োর দ্বিতীয় পক্ষের সোহাগী স্ত্রী ছিলি তুই, কিন্তু তার বয়স্থ যোগ্য ছেলেরা তাদের বাপের এ অসম্মান সয় কি কোরে? না, কিছুতেই না। বুড়োর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই যে খিল বন্ধ কোরেছে, দাঁতে দাঁত দিয়ে পোড়ে আছে আজ তিনদিন। মেয়েরা বুঝিয়ে হার মানলো, শেষে মুখ বাঁকালো —মেয়েটা নষ্ট, তাই স্বামীর 'পরে এ অশ্রদ্ধা। শেষে এগিয়ে এলো পুরুষেরা। চলল ক্রুদ্ধ গর্জন, কিন্তু—

হুজুর।

কে রে, ভিখু?

ছোট শহর কুসুমপুর সরকারী হাসপাতালসংলগ্ন কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে চা-পান কোরছিলেন, হাসপাতালের সর্বময় ভারপ্রাপ্ত দেশের-বিদেশের বড় বড় ডিগ্রীধারী ডাক্তার, ডাঃ গোস্বামী। লোকে বলে, ধন্বন্তরি। অবিশ্রাম কর্মমগ্ন, কড়া নিয়ম শৃংখলা-পরায়ণ মানুষটিকে শ্রদ্ধা করে. ভালবাসে হাসপাতালের সবাই। হৃদয়বান মানুষ, অবস্থা বঝে নিজের পয়সায় রোগীর ঘরে গোপনে পথ্যও সরবরাহ করেন। কেউ কেউ বলে, বন্য শার্দূল, ক্ষেপে গেলে জ্যান্ত মাথা চিবিয়ে খায়।

কে জানে কি খেয়ালে বছর দুই আগে কোলকাতার জমজমাট প্র্যাকটিস ছেড়ে, চলে এসেছেন এই ছোট্ট হাসপাতালটায় সামান্য মাইনের চাকরী নিয়ে।

শোভা চৌধুরী

বারান্দার নীচে এগিয়ে আসে মেথর ভিখু,—সাব, সকালের সেই লাশটা—

শূন্য চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে উঠে পড়ে ডাক্তার—হ্যাঁরে, সকাল থেকে একটা অপারেশ্যান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, চল, এবার যাই।

সাঁঝ লাগতে যায় হুজুর, সকাল-তক না হয় রাখলে হয় না?

কেন, দিনে সময় পাই না তাই এ সব কাজ তো আমি বেশীর ভাগ রাতেই করি? তুই ব্যাগটাগগুলো নিয়ে চলে যা, আমি পোষাকটা বদলে যাচ্ছি।

মাথা চুলকোয় ভিখু—সে জন্যে নয় হুজর, সে কি আর জানা নেই আমার এতদিনেও? আকাশের ওই কোণটায় একখান কালো মেঘ ঘনাইছে। বোশাখ মাস, মনে হয় ঝড় আসবে। লাশচেরাই ঘরটা আবার একটুকুন দূর তো?

হেসে উঠে দাঁড়ায় ডাক্তার,—যা, যা, দূর আবার কোথায়, হাসপাতালের ছাদ থেকে তো দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটা একটু ঘুরে গেছে এই যা। আর ঝড়ই উঠুক বা প্লাবনই নামুক আমার এ লম্বা-চওড়া লোহার শরীরের কিছু হবে না। তবে রাতের বেলা তোর যদি ভয়ডর লাগে তো বল, অন্য কাকেও ডাকি?

পৌরুষে আঘাত লাগে ভিখর।

বুক ফলিয়ে সোজা হোয়ে দাঁড়ায় বদ্ধ,—এ শরীরে ভয়ডর কোনদিন দেখেছেন হুজুর? ভয় তাড়াবার ওষুধ আমার আছে, আপনার জন্যেই—

হেসে ওঠে ডাক্তার,—তবে আর কি, ওষুধ-টষুধ খেয়ে তৈরী থাকো যা, আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

ডাক্তারের মুখে নিজের নেশার ইঙ্গিতে সলজ্জে হেসে, সেলাম দিয়ে তাড়াতাড়ি পালায় ভিখু।

পোষাক পরা প্রায় শেষ, টাইটা বেঁধেছে গলায় স্ত্রী মনীষা এসে ঘরে ঢোকে।

অবাক হোয়ে বলে,—আবার এ সময় বেরোচ্ছ কোথায়?

কাজ পোড়েছে।

মুখ ভার হয় মনীষার,—শুধু কাজ আর কাজ, চিরকাল ওই এক কথাই শুনছি। নিজের সংসারের কি কিছু কাজ নেই, সেগুলো তা হলে হয় কখন? অবসর তোমার কবে, কখন হবে বলতে পারো?

আহা চটছো কেন? আমার সংসারের জন্যে তো স্বয়ং তুমিই আছো, চিরকাল নির্বিঘ্নে চালিয়েও আসছো। আজ সেখানে হঠাৎ আমার কি প্রয়োজন?

রাগ কোরে মুখ ফেরায় মনীষা,—থাক, আর খোসামোদে দরকার নেই। সংসারে যাদের কোন প্রয়োজনই নেই, তারা সংসার করে কেন ভেবে পাই না।

জুতোর ফিতে বাঁধে ডাক্তার চেয়ারে পা রেখে।

মৃদুহেসে বলে,—আমার সংসার দেখতে তুমি আছো মনী, যাদের দেখতে কেউ নেই তাদের জন্যেই যে আমি।

ফিতে বাঁধা শেষ কোরে ঘাড় বাঁকিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলেন,—তাই সর্বক্ষণ আসে মোর কাজের আহ্বান। দেবি মানষের দাসত্বশৃংখলে সদা বন্দী এই দাস।

স্বামীর বলার ধরণে হেসে ফেলে মনীষা,—আহা, বুড়োবয়েসে আবার কবিত্ব হোচ্ছে।

হবে না, বারে, ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট দেখেই না তোমার বাবা, মানে আমার প্রফেসারমশাই তোমায় আমার হাতে দিয়েছিলেন?

দিয়েছিলেন বড় ডাক্তার হবে জেনে, নইলে অতো বড় ডাক্তার কবি হবে জানলে বাবা আমার, বিদেয় কোরে দিতেন।

বাঁকা চোখে তাকায় ডাক্তার,—তা বটে, কোলকাতার অমন প্র্যাকটিস, হাজার হাজার টাকা রোজগার ছেড়ে তাঁর মেয়েটিকে আবার এই জংলায় নির্বাসিতা কোরে রেখেছি দেখলে, হয়ত জংলী জামাইটাকে খুনই কোরে বসতেন। ভাগ্যিস ভদ্রলোক স্বর্গারোহণ করেছেন?

বাজে কথা রাখো দেখি, একটা কাজের কথা শোন।

শোনার জন্যেই তো উৎকর্ণ হয়ে আছি, বোলছ কোথায়?

আজ আবার খোকার চিঠি এসেছে, মলির মা, বাবা এখানে এসে আমাদের সঙ্গে এবার কথাবার্তা পাকা কোরে ফেলতে চান। তাই জানতে চেয়েছে খোকা কবে আমাদের সুযোগ হবে? সেই মত ও তাঁদের নিয়ে আসবে।

মনে করার চেষ্টায় ভুরু কোঁচকায় ডাক্তার,—মলি,—মলি—ওহো মনে পোড়েছে। সেই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক মিঃ মোদক না মণ্ডল তাঁরই মেয়ে, না? তা এর জন্যে আর আমার অপেক্ষা কিসের, তুমিই বলে দিলে পারতে। ছেলে তোমার ইঞ্জিনীয়ার, পোস্টিংও ভালই হোয়েছে, তারপর তার জন্যে ভাবতে যখন তুমিই আছো; ইয়ংম্যান, ভালবেসে বড়ই অধীর হোয়ে উঠেছে। আচ্ছা, কাজটা সেরে ফিরে আসি, তোমার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা আজই ঠিক কোরে ফেলবো।

মনে থাকবে তো?

নিশ্চয়, গোস্বামী বংশে জাতের বালাইতো নেই আর, তোমার তবে ভয়টা কিসের?

দুহাতে স্ত্রীর দুটো কাঁধ ধরে একটা ঝাকান দিয়ে, গট গট কোরে বেরিয়ে যায় ডাক্তার।

হাসপাতাল থেকে কিছুটা দূরে ফণী-মনসা আর ঘেঁটুফুলের ঝোপে ভরা লাশকাটা ঘর। চুনকাম করা ইটের দেয়াল, টালির ছাদ ঘর একখানা। সামনে ছোট একটু দেয়ালঘেরা বারান্দা। একটা বেঞ্চ পাতা, জ্বলছে একটা কম পাওয়ারের বালব।

ঘরের ভেতর একটা লম্বা টেবিল, যেখানে লাশ-চেরাই হয়, ঠিক তার ওপরেই ছাদ থেকে ঝুলছে একটা জোরালো লাইট। পাশে খান দুই চেয়ার পাতা। মেঘ ছিল আকাশে, সন্ধ্যা হতে না হোতেই নেমে আসছে অন্ধকার শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো নিভিয়ে দিয়ে।

দেশী মদের নেশায় আচ্ছন্ন ভিখু, বারে বারে তাকাচ্ছিল পথের পানে। ঘণ্টি বাজছে সাইকেলের,—এতক্ষণে এলো ডাক্তার।

ভিখু ছুটে গিয়ে সাইকেল ধরে, টেনে তোলে বারান্দার ভেতরে।

ব্যস্ত পা ফেলে বারান্দায় উঠে

ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে আলাপরত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

ডাক্তার, কিন্তু এগোতে পারে না থমকে থামতে হয়। সামনে এসে দাঁড়ায় প্রায় আধময়লা প্যাণ্ট, শার্টপরা কাঁচা-পাকা একমাথা অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, চার-পাঁচ দিনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখ এক ব্যক্তি, প্রায় ডাক্তারেরই সমবয়সী।

হঠাৎ বাধায় থমকে থেমে চোখ তুলে, প্রায় চমকে ওঠে ডাক্তার,—যতী, যতীশ?

হ্যাঁ জ্যান্ত, ভূত নয়।

নিজেকে সামলে নেয় ডাক্তার, মৃদুহেসে বলে,—তাই তো দেখছি, যদিও আমার কাছে তুমি প্রায় পঁচিশ বছর আগে মৃত। তাই এখানে, এভাবে তোমায় আশা করি নি।

হ্যাঁ, সেদিন আমার একটা কথাও না শুনে, তোমার বাড়ী থেকে আমায় কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে। সেদিন থেকে আমার কাছেও তোমার মৃত্যু হোয়েছে ডাক্তার। ভাবতেও পারিনি এতকাল পরে আবার দরকার নিয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে হবে।

অবাক হোয়ে তাকান ডাক্তার, দরকার? তা—বাড়ীতে না হয় নাই গেলে, হাসপাতালে যেতে কি আপত্তি ছিল? এ ভাবে, এখানে—

গেছলাম। শুনলাম তোমার ওই মেথরের কাছে, তুমি এখানেই আসছো, তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আমার দরকার তো এখানেই ডাক্তার। এই তো সত্যের পীঠস্থান। এখানে দাঁড়িয়েই তো তোমরা করো মৃতের বিচার। স্বার্থের দাঁড়িটা যেদিকে ঝোঁকে সেদিকেরই পাল্লা ভারী।

চুপ করো যতীশ, আমি আজও বিজন গোস্বামী। পেশা আমার চিরদিন সত্য সন্ধানই কোরেছে মানুষের কল্যাণ কামনায়, কোন স্বার্থের কাছে পরাজয় সে কখনও মানে নি, তোমরা আমার সারা জীবনের শান্তি হরণ কোরে, নিঃশেষে হারিয়ে গিয়ে যত শাস্তিই আমায় দিয়ে থাক, ঈশ্বর অন্তত আমার এ শান্তিটুকু রেখেছেন।

তীব্র বাঁকা চোখে তাকায় যতীশ,—নাম, যশ, অর্থ, সম্মান, স্ত্রী, সন্তান নিয়ে তোমারই সুখের সংসার। তুমি বলছ, তোমার শান্তি হরণ কোরেছি আমরা? শাস্তি দিয়েছি তোমায়?

ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার,—হ্যাঁ, তুমি,—মায়া,—আমার বাবা—

তোমার বাবা?

হ্যাঁ, দু বছর আগে তাঁর মৃত্যু-শয্যায় সব বলে আমায় চরম শাস্তি দিয়ে চলে গেছেন।

তুমি যা বললে, সব সুখের আয়োজনই আমার ছিল সত্যি, কিন্তু—

শুব্ধ নির্বাক যতীশ।

কিন্তু ভাগ্য আমায় ক্ষমা করেনি, করোনি তোমরা। সব ফেলে চাবুক-খাওয়া পশুর মত কোলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এলাম এখানে, নিজেকে ঢেলে দিতে চাই মানুষের সেবায়। কিন্তু নিজের মনুষ্যত্বের দাহ নেভাতে কত জলের প্রয়োজন যতীশ? নীরব নতমুখ যতীশের পানে পলকের দৃষ্টি ফেলে আবার বলে,—প্রায় দু সপ্তাহ আগে একটা চিঠি পেলাম হঠাৎ। স্বাক্ষরের জায়গায় নাম-ঠিকানা কারও কিছু নেই। লেখা ছিল, যতীশের পিসতুতো মৃতা দিদির স্বামী।

জামাইবাবু—!

বাঁকা চোখে তাকায় ডাক্তার,—আর তাতে কি লেখা ছিল জানো?

আমার জানা না-জানায় কিছুই আর যায়-আসে না বিজন।

কোথায় তুমি থাক যতী?

কোলকাতায় একটা মেসে, সামান্য একটা চাকরী আছে।

দেশে—

না, দেশে আর যাই নি, মা আর মায়ার পিসী, মানে আমার মাসীকে কাছে এনেই রেখেছিলাম, এখন তাঁরা ওপারে।

আর—আর তোমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে?

নেই, কোনদিনই ছিল না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটু সরে যায় ডাক্তার, পিছনে হাত বেঁধে পায়চারী করে। নেশায় চুর হোয়ে ধু হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে, জড়োসড়ো হোয়ে বসে আছে ভিখু বেঞ্চটায় কোণে। বেঞ্চের হাতটায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে যতীশ। ম্লান আলোটা জ্বলছে।

সামনে এসে দাঁড়ায় ডাক্তার—তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো যতী, আমার কাজটা এখুনি সেরে এসে শুনবো তোমার কি দরকার।

সেটা শুনেই যাও বিজন, দরকার আমার সামান্যই। আরও একবার, আর জীবনে শেষবারের মত আমি তোমার কাছে চাইতে এসেছি ন্যায় বিচার।

ন্যায়বিচার—?

চমকে চকিত চোখে তাকায় ডাক্তার,—কার?

একটি মৃত্যুর।

মৃত্যু,—কোথায়?

নীরবে দোরবন্ধ ঘরটার পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যতীশ।

বিস্মিত হয় ডাক্তার—উনি তোমার কেউ হন নাকি? উনি তো এখানে শুনেছি বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি সিদ্ধেশ্বর দত্তের বুড়োবয়েসে বিয়ে করা, দ্বিতীয়া স্ত্রী।

হ্যাঁ, আমার কেউ না। পরিচিত।

তার জন্যে ন্যায়বিচার চাইতে এসেছো তুমি?

হেসে ওঠে ডাক্তার।

চিরদিন অপরের জন্যেই তো আমি তা চেয়ে এসেছি, এইবার শেষ।

একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায় ডাক্তার,—তুমি অসুস্থ যতীশ, আমার চোখ বলছে বোধ হয়—বোধ হয় তোমার টি বি হোয়েছে।

না, ভাল আছি।

মহিলার জন্যে কি বিচার তুমি চাও তা জানি না; কিন্তু ওঁর স্বামীর পূর্বপক্ষের ছেলে বলেছে, মেয়েটির ক্যারেকটার সার্টিফিকেট ব্যাড। বিয়ের আগেই কোন একটা ছেলের সঙ্গে সব গোলমাল ছিল। বলেছিল ওর

নিজের দেশের লোকেই, কিন্তু ছেলেরা তলিয়ে কিছু বলারই সাহস পেতো না।

তাই নাকি? কেন?

বুড়ো বাপ যে আগলে বেড়াতো ওকে সব সময়। রূপ ছিল, বুড়োর তরুণী স্ত্রী হোলে যা হয়, বুড়ো ওর ভীষণ বশ ছিল। ছেলেদের ছেড়ে, ওকে নিয়ে আলাদা বাড়ীতে থাকতো। তা ছাড়া, নিজেদের সম্মান ভয়েও ওর চরিত্র নিয়ে বাইরে বিশেষ ঘাঁটাঘাঁটি কোরতে পারতো না। তবে মেয়েটির চরিত্রের কথা এখানে অনেকেই জানে। কি কোরে ওদের বাবার ঘাড়ে চেপেছিল তা ওরা জানে না।

কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা অনেকে ওকে ভালবাসতো শ্রদ্ধা কোরতো ওর স্নেহ-মমতাভরা স্বভাবগুণে। অনেকের বিপদে-আপদে অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়েও তাদের অনেক সেবা-সাহায্য কোরেছে কবে অল্পবয়েসে এসে, আজ ওর বয়েস হোয়েছিল চল্লিশেরও বেশী।

কিন্তু জানো, যে স্বামী ওকে অতো ভালবাসতো, অতো সম্মান অধিকার দিয়ে ওকে অতো মর্যাদা দিয়েছিল, তার মৃত্যুর পরে, ও নাকি বৈধব্যের বেশটা পর্যন্ত গ্রহণ কোরে তাকে বিন্দুমাত্র সম্মান দেয় নি। তিনদিন তিনরাত দোরবন্ধ কোরে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়েছিল, তবু কেউ ওর সিঁদুর মুছতে পারে নি, পারে নি হবিষ্যি করাতে।

শুনেছি।

আবার পায়চারী করে ডাক্তার, মৃদু হেসে বলে,—বড় অবাক লাগছে যতী, যত বড় দুশ্চরিত্রা, কুলটাই হোক স্বামী হারিয়ে সিঁদুর মুছবে না এমন আবদার, এত বড় দুঃসাহস কখনও শুনিনি। অদ্ভুত লাগলো শুনে, এদেশের মেয়ে হোয়েও তা সম্ভব?

এ দেশের মেয়ে বলেই তা হয়ত সম্ভব।

এই নিয়েই ছেলেরা নাকি রাগারাগি কিছু ধমক-টমক দিয়েছিল। ব্যস, সেই রাত্রেই আত্মহত্যা।

না, হত্যা।

তীক্ষ্ণ চিৎকার কোরে ওঠে যতীশ।

কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট তো আত্ম-হত্যা বলেই—

ওদের টাকা আছে, পুলিশকে তাই বোঝাতে পারে। দেহটা তো জ্বালিয়ে দিতেই গেছলো, আপদ চুকেই যেতো। কিন্তু পাড়ার ক'জন ছেলে, যারা তাকে দেখতে চায়, ন্যায়বান বিচারক, তোমার ন্যায়দণ্ড কার মাথায় নামে।

কিন্তু—

তমি ডাক্তার, তোমার চোখে মানবদেহের কিছুই গোপন থাকে না। তোমার হাতেই রইল কলঙ্কিনীর কলঙ্ক মোচনের ভার। তুমিই বলবে, এ হত্যা না আত্মহত্যা, আরও বলবে সে সধবা, বিধবা, না কুমারী। তোমার কাছে এই আমার শেষ প্রয়োজন।

দরজার দিকে এগোয় যতীশ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

পোল্যাণ্ডের রাজকুমারীর বিয়ের স্মরণ-উৎসবে মেয়েদের বিচিত্র পোষাকে শোভাযাত্রার দৃশ্য

অসহ্য উদ্বেগ আর নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মাঝে কেটে গেল আরো পনেরোটা দিন। কি ভয়ঙ্কর দিনগুলো। মনের প্রত্যয়ের সুদৃঢ় ভিত্তটা সন্দেহের তীব্র আঘাতে একটু একটু করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। অনুতাপের তুষানলে জ্বলে পুড়ে খাক্ হচ্ছে দেহমনের অণু-পরমাণুগুলো। পাওয়ার সায়েব কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে আমার দিকে। কি যেন বোঝবার চেষ্টা করে। ওর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে গভীর বেদনামিশ্রিত নীরব তিরস্কার।

আর যে পারি না। ভগবান।

ফাঁসীর আসামী যেমন বদ্ধ শেলের ভেতর বসে প্রতীক্ষা করে সেই ভয়ঙ্কর দিনটির। প্রতি মুহূর্তে শোনে মৃত্যুর পদধ্বনি। আমার আজ ঠিক তেমনি অবস্থা। রাস্তায় পিওন দেখলেই বুকের পেণ্ডুলামটা ধক্ ধক্ করে দুলতে থাকে, এই বুঝি এলো আমার মৃত্যু-পরোয়ানা। পিওন চলে যায়, তখন নিশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছি।

তারপর একদিন বহু প্রতীক্ষার শেষ হল। পাওয়ার সাহেব গম্ভীর মুখে রজতের হস্তাক্ষরযুক্ত খামটা এনে আমার হাতে দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহাসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গমালা যেন আছড়ে পড়ছে আমার বুকের ভেতরে। কি আছে এই খামটার ভেতর? আমার মৃত্যুদণ্ড? না মৃত্যুগহ্বর থেকে মুক্তির নির্দেশ?

ফ্রিজ থেকে খানিকটা বরফঠাণ্ডা জল নিয়ে ঘাড়ে-মাথায় ছিটিয়ে দিলাম। পাখাটা ফুল পয়েণ্ট করে খাটের ওপর বসে, রজতের চিঠি পড়তে সুরু করলাম।

বলছে রজত—কি লিখবো তোমাকে? ভেবে স্থির করতে এতদিন দেরী হল নীল্। তোমার সামনে দাঁড়াবার শক্তি নেই তাই দূর থেকে ক্ষমা চাইছি। শেষ পর্যন্ত সঞ্চিতাকে বিয়ে করতেই হলো। বেনারস থেকে যখন সঞ্চিতাকে নিয়ে কারে ফিরছিলাম, সেই রাতে পথে একটা হোটেলে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। আমার অভিশপ্ত রাত জীবনটাকে আমার বিপর্যস্ত করলো সেইদিনই।

বারি দেবী

তারপর সঞ্চিতা যখন জানালো যে তার গর্ভে এসেছে আমার সন্তান এবং যদি তাকে বিয়ে না করি তবে সে আমার নামে নালিশ করবে।

খবরটা জানবার পর থেকে নিদারুণ ভয়ে দুঃখে লজ্জায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম আমি। প্রেম নয় ভালোবাসা নয়, ক্ষণিকের মোহ, আর তার জন্য এসেছে আমার শোচনীয় প্রায়শ্চিত্ত।

ছুটে গেছি তোমার কাছে, বার বার চেষ্টা করেছি সব কথা বলবার জন্য। কিন্তু পারিনি নীল্। দুশ্চিন্তার বোঝাও আর বইতে পারছি না, তাই এই পথ বেছে নিলাম।

চির অপরাধী হয়ে রইলাম তোমার কাছে নীল্। পারো যদি এ হতভাগ্যকে ক্ষমা কোরো।

●

গলার ভেতর দিয়ে একটা বোবা কান্না পাক্ খেয়ে উঠে আসছে। পেঁচিয়ে ধরছে কণ্ঠনালীকে। মাথা ঘুরছে, সর্বাঙ্গ টলছে আমার। এখন কি করবো? আমি এখন কি করি গো? বার, বার, আর কতবার সইবো, অদৃষ্টের এই নির্মম পরিহাস?!

না, আর নয়। আর কারুকে আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেব না। অদৃষ্টের মার, আমার এইখানেই শেষ।

টলতে টলতে গিয়ে ড্রয়ার খুলে বার করে আনলাম ভর্তি শিশি, সোনেরীল পিল।

তার ছিপি খুলে, কয়েক মুহূর্ত ধরে, স্থির করলাম নিজের অশান্ত মনটাকে। চোখ বুজে শেষ স্মরণ করলাম আমার মাকে। কেঁদে কেঁদে বললাম—মা, মাগো! কেন এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমাকে ফেলে গিয়েছ মা? আজ আমি বড় যাতনা নিয়ে চলেছি তোমার পথে, আমার হাতখানা তুমি ধরো মা।

একখানি হাত মার উদ্দেশে প্রসারিত করে, অপর হাতে শিশিটা ধরে মুখের ভেতর ঢেলে দেবার জন্য তুলে ধরতেই—লোহার সাঁড়াশীর মত একখানা হাত যেন পেছন থেকে ঝপ্ করে চেপে ধরলো আমার শিশিধরা হাতখানাকে। সঙ্গে সঙ্গে শিশিটা হাত থেকে ছিট্‌কে মেঝেয় ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়লো।

—কে? কে? আমার চিরশান্তির পথে বাধা দিলে? ফিরে চাইলাম পেছন দিকে। পাওয়ার সায়েব দাঁড়িয়ে আছে, আমার হাতটা চেপে ধরে। ওর দুটো চোখ যেন আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে।

আহত সিংহের মত গর্জন করে উঠল পাওয়ার সায়েব—সিস্টার! মরতে যদি হয় তবে আগে আমাকে মরতে দাও। আমিই খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছিলাম তোমার ঘরে। সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আগে আমাকে করতে দাও সিস্টার।

দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে গভীর পরিতাপের সঙ্গে নিজের মাথায় ঘা মেরে বললো পাওয়ার—কিন্তু —কিন্তু আমি যে ওকে সোনার ভেলা ভেবেছিলাম সিস্টার। তাই ওকে এনে ভেবেছিলাম, বড় আশা করেছিলাম যে, এই সোনার ভেলায় চড়ে আমার সিস্টার এই দুঃখের নদীটা পার হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না, হলো না। ভুল। সব ভুল হয়ে গেল।

দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো পাওয়ার সায়েব।

দারুণ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে আমার সর্বাঙ্গ। তবুও এই মুহূর্তে আমি ভুলে গেলাম নিজের যন্ত্রণার কথা। কারণ চোখের সামনে দেখছি সরল বিশ্বাসী, আমার মহান বন্ধুর বুকে বিঁধেছে রজতের বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম শেল। আর তারই যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে ও।

আমি ওর হাতখানা ধরে কাতর ভাবে বললাম, পাওয়ার সায়েব!—

হঠাৎ অস্বাভাবিক গলায় চিৎকার করে উঠলো পাওয়ার সায়েব—না, না, সিস্টার। মরতে যদি হয়, তবে ঐ শকুনটাকে মেরে তবে মরবো। দাও সিস্টার আমার সায়েবের রিভালবারটা। পৃথিবীর যেখানেই থাক্ শকুনটা, আমার হাতে তাকে মরতেই হবে। তাকে গুলি করে তারপর নিজে। এই আমি আমার সায়েবের নামে শপথ—

আমি মৃদু আর্তনাদ করে ওর মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরলাম—না, না, সায়েব না। তোমায় এমন শপথ আমি করতে দেব না। তোমায় কিছু করতে হবে না সায়েব। শুধু আমার পাশে থেকো, আমায় ছেড়ে যেও না। আমি তোমায় কথা দিলাম সায়েব, আমি মরবার চেষ্টা করবো না, তোমাকেও মরতে দেব না। আমি জানি তুমি বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিতে জানো, তবুও তোমার হাতে ধরে বলছি, তার আর প্রয়োজন নেই সায়েব। আমাদের আর কারুকে প্রয়োজন নেই, কিছুর প্রয়োজন নেই। আমরা আর কারুকে চাই না, আমরা আর কিছু চাই না। পৃথিবীর সবাই চলে যাক্ শুধ তুমি থাকো ভাই। শুধ তুমি যেও না বন্ধু।

পাওয়ার সায়েবের দুটি হাত নিজের হাতে শক্ত করে চেপে ধরে, আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি।

●

কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন। কোন কাজ নেই, আশা নেই। বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে যেন কিছুই নেই আমার। নেই কোনো চিন্তা-ভাবনা, সুখ-দুঃখের আনাগোনা। আমি যেন এ জগতের কেউ নই। আমি যেন এক কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ড। শুধু জ্বলে জ্বলে নিভে যাওয়াই আমার কাজ। নিদারুণ এক জড়তা যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে আমায়। হাতে-পায়ে, দেহে-মনে কোথাও যেন বল নেই।

তারপর এলো সেই উনিশ শো বাষট্টি সালের বিশে অক্টোবর। বেতারে ঘোষিত হল, চীন ভারতকে আক্রমণ করেছে।

বিরাট এক ধাক্কায় যেন আমার মোহনিদ্রা ছুটে গেল। সকল জড়তার বন্ধন মুক্ত হয়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

বিশ্বাসঘাতক চীনা-দস্যুর পদাঘাতে অপবিত্র হয়েছে দেবতাত্মা হিমালয়। ঝিমিয়ে-পড়া রক্তে আমার লাগলো প্রবল উত্তেজনার দোলা। প্রতিদিন রেডিও খলে রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগলাম যদ্ধের খবর। আমার দেশের জওয়ানদের বীরত্ব আর আত্মত্যাগের অমরকাহিনী শুনতে শুনতে গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত হলো।

চারিদিকে উত্তেজনা, সাজ সাজ রব। দেশের ডাক, মায়ের ডাক নতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলো জাতিকে।

মায়ের মুক্তিযজ্ঞে আহুতি চাই। যার যা দেবার আছে দাও। সোনা চাই, যুদ্ধের অস্ত্র আর রসদ সংগ্রহের জন্য। রক্ত চাই, আহত জওয়ানদের জন্য। সেবা চাই।

তবে তো আমি ব্যর্থ নই। আমার যে দেশজননীর প্রতি কর্তব্য আছে, কাজ আছে। সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি আর পাওয়ার সায়েব। দু'জনে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে এলাম। চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক চীনের প্রতি ধিককার বাণী। জাতীয়সঙ্গীত বাজছে রেডিওতে। পথে শোভাযাত্রা, পথসভা, দেশপ্রেমের সঙ্গীত, অভিনয়।

আমিও ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম পথে। কোন লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় আর নেই আমার মনে। উলের রাশ নিয়ে জওয়ানদের জন্য সোয়েটার বুনতে লাগলাম। তারপর একদিন আমার অভিশপ্ত সোনার গহনার রাশ নিয়ে গেলাম রাজ্যপালের হাতে তুলে দেবার জন্য। সোনার তাল গ্রহণ করে রাজ্যপাল আমার নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন।

বিনীতভাবে বললাম—ভারত-কন্যা, এই আমার নাম আর পরিচয়। আর ভারতবর্ষ, এই ঠিকানা। বিপুল প্রসন্নতা আর সার্থকতার আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম বাড়ীতে।

দলে দলে মেয়েরা শিখছে প্রাথমিক শুশ্রূষা-বিদ্যা। চারিদিকে তার জন্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। আমিও কাছা-কাছি এক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলাম। প্রবল ইচ্ছা মনে জাগলো যে, কিছুটা নার্সিং শিখে আমি চলে যাবো, আহত জওয়ানদের সেবাকার্যে নিজেকে সমর্পণ করবো। সার্থক হবে আমার ব্যর্থ-জীবন।

●

তারপর যুদ্ধ থেমে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সবাই। তবুও স্বীকার করছি এই যে—সামান্য ক'দিনের যুদ্ধ, তবুও তার অবদান অসামান্য। একটা ঝিমিয়ে পড়া, আত্মবিস্মৃত জাতিকে যুদ্ধ দিয়েছে জাগরণমন্ত্র। আর সেই মহামন্ত্রে সে আমাকেও দীক্ষা দিয়ে গেছে। তাই যে সঙ্কল্প জেগেছে আমার মনে, তাকে কাজে পরিণত করবার নির্দেশ আর সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লিখলাম মাদাম্ ডেনিয়েলকে। সেই চিঠিতে রজতের সব কথাও

অকপটে জানালাম। আরো জানালাম সূর্যকান্ত রায়-এর বিমুনীপত্তনমে দাতব্য হাসপাতাল করবার যে সঙ্কল্প ছিল, তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার ভার আমি দিতে চাই মাদামের হাতে। এ কাজের জন্য টাকার অভাব হবে না। ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা আছে, তা ছাড়া তাঁর দু'খানি প্যালেস্ আকারের বাড়ী ও ফার্নিচার ইত্যাদি বিক্রি করলেও, মনে হয় আরো বিশলাখ টাকা পাওয়া যাবে। এ সব আমি তুলে দেব মাদামের হাতে। আর সেই হস্পিটালে থেকে আমি যেন সেবা করতে পারি, তার ব্যবস্থা মাদামই করবেন।

আমার চিঠির জবাব দিলেন মাদাম ডেনিয়েল।

—অনেক আর্ত দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্যই ঈশ্বর তোমায় দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে, খাঁটি সোনা করে নিয়েছেন মা। ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডি ছেড়ে বিরাট খেলাঘরে যাবার আহ্বান, নির্দেশ তুমি পেয়েছ। সার্থক তোমার মানবজন্ম।

আরো লিখেছেন তিনি—বাড়ী বিক্রির চেষ্টা করতে থাকো। আমি শীঘ্রই আমেরিকায় যাচ্ছি, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। বিমুনিপত্তনমের হস্পিটাল পরিচালনার ভার তো তোমাকেই নিতে হবে। তার জন্য তোমার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে গিয়ে করবো। তোমার পাশপোর্টের ব্যবস্থাও করছি। ঠিক সময় জানাবো। সর্বদা প্রার্থনা কোরো, তিনিই তোমাকে মনোবল দেবেন, আলো দেখাবেন, ইত্যাদি।

পাওয়ার সাহেবকে বললাম—সায়েব তুমি একদিন ছুটি চেয়েছিলে, এবারে বোধ হয় তোমার ছুটি মিলবে। তোমার সায়েব তোমায় যা দিয়েছেন আর আমার দিক্ থেকেও কিছু স্নেহ নিদর্শনস্বরূপ থাকবে। সব নিয়ে এবারে তুমি দেশে গিয়ে, একটি ভালো মেয়েকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করো। ভবিষ্যতে আমিও গিয়ে থাকবো মাঝে মাঝে তোমাদের সংসারে।

আমার কথা শুনে দু'হাত ক্রশ করে কাঁধে মাথায় ঠেকালো পাওয়ার সায়েব। তারপর বললো—তোমাদের মঙ্গল চিন্তায় তো জীবনের অর্ধেক দিন কাটালো আমার, তার প্রতিদানে তুমি আমার জন্যে যে, এমন অশুভ কামনা করতে পারো, এ কথা তো কখনও ভাবিনি সিস্টার।

—তোমার ক্ষতি চিন্তা করছি? কি বলছো সায়েব? একটু হাসির সঙ্গে বললাম ওকে।

—তা নয় তো কি? হাসপাতাল হবে তো আমার সায়েবের নামে। সেখানে কি আমি একটা চাকরের কাজও পেতে পারি না?

অভিমান বাজলো পাওয়ার সায়েবের কণ্ঠস্বরে।

—চাকর? তোমায় চাকর রাখবার ক্ষমতা আছে শুধু সেই পরমেশ্বরের। হস্পিটালের সব দায়িত্বভার তুমিই নেবে সায়েব। তোমাকে তিনি যে সকল দায়িত্ব বহন করবার জন্যেই রেখে গেছেন আমার কাছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে বলো?

হে, হে, করে দাঁত বার করে লজ্জার হাসি হাসলো পাওয়ার। তারপর দু'হাত কচ্‌লে বললো,—আর একটা আর্জি রইলো তোমার কাছে সিস্টার। ঐ যে টাকাকড়িগুলোর কথা বলছিলে না? ওটা আমার মা, সারা পাওয়ারের নামে ঐ হাসপাতালে বেড করে দিও। জন্মেই হারিয়েছি মা-কে, তাঁর জন্যে কিছুই করতে পারিনি, —তাই এটুকু করতে চাইছি আর কি।

গভীর বেদনায় ভারি হয়ে এল পাওয়ারের কণ্ঠস্বর। নিজেকে গোপন করার জন্য সে চোখ মুছতে মুছতে সরে গেল আমার সামনে থেকে।

৬

সূর্যকান্তর বাড়ী দুটো বিক্রি করার চেষ্টা চলছে। আসছে অনেক দালাল, খদ্দের; দামদস্তুর হচ্ছে। এখন এসব ব্যাপারে দিনরাত ব্যস্ত রয়েছি আমরা। সেই সময় একদিন সকালে, চা-এর পর বসে কাগজ পড়ছিলাম. হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে এল মালতী। পাগল। এসেই দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো—চেয়ে দেখ দিদি আমার সঙ্গে কে এসেছে?

—কে রে? বলবি তো? ওমা এ কি বিয়ে হল কবে?

গভীর আনন্দে মালতীকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিলাম আমি। ওর চিবুক ধরে মুগ্ধদৃষ্টি মেলে দেখলাম ওর সিঁদুর-পরা হাসিভরা মুখখানিকে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, দরোজার কাছে দাঁড়িয়েছিল একজন সুশ্রী সুবেশ যুবক।

মালতীকে ছেড়ে উঠে গিয়ে ওর হাত ধরে এনে বসালাম মালতীর পাশে।

মালতী পরিচয় করিয়ে দিল তার স্বামীর সঙ্গে। ওদের পাশের বাড়ীতেই থাকে মহিম দত্ত। বিধবা মা আর ছেলে। মহিমের আছে একটা মোটর গ্যারেজ, গাড়ী মেরামত করে। পুরোনো গাড়ী কিনে সারিয়ে ভালো দামে বিক্রি করে। খুব পরিশ্রমী ও সৎ ছেলেটি। মালতীদের সঙ্গে আলাপও অনেকদিনের; তবে, মন দেয়া-নেওয়ার পর্বটা সম্প্রতিই হয়েছে। বিয়েতে ওরা দুজনেই খুব সুখী হয়েছে, আরো সুখী হয়েছেন ওদের মায়েরা। মালতীর মা-ই বললেন মালতীকে দু'জনে গিয়ে দিদিকে প্রণাম করে এস।

আহা সুখী হোক্ অভাগা মেয়েটি। তার দুঃখের রাত কেটে গেছে। ওর জীবন-আকাশে মহিম এসেছে নবীন সূর্যরূপে। ওর প্রেমের উজ্জ্বল আলোক-ধারায় কেটে যাবে মালতীর জীবনের সকল হতাশা-বেদনার অন্ধকার। ওরা সার্থক হোক্, সুখী হোক্।

পাওয়ার সায়েব ওদের পেয়ে মহা আনন্দে ছুটোছুটি করে, একগাদা খাবার এনে, জোর করে খাওয়ালো ওদের।

তারপর আমার ছিলো যা গয়না, তার থেকে চুনীর সেটটি বার করে পরিয়ে দিলাম মালতীকে। প্রথমে কিছুতেই সে নিতে চায় না অত দামী আভরণ। কিন্তু আমি বোঝালাম ওকে—এ সব তো আমার কোন কাজে আসবে

না বোন! তোমাকে পারলে আমি আনন্দ পাই, তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন? আর বাধা দিলো না মাল্লতী! ওরা দু'জনে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো!

পার্ক স্ট্রীটের ম্যানসনটি বিক্রি হয়ে গেল, সাত লাখ টাকায়। এ বাড়ীর ফার্নিচার, ঝাড় লণ্ঠন, স্টাচ্, কিউরিও, সবসমেত দাম পাওয়া যাচ্ছে বারো লাখ টাকা। এ বাড়ীর খদ্দেরের সঙ্গে কথা ঠিক আছে যে, আমি যেদিন চলে যাবো সেদিন ওরা পজেসন্ নেবে। কারণ মাডাম ডেনিয়েল জানিয়েছেন যে, পাশপোর্ট হয়ে গেছে, তিনি যাবার দিনস্থির করে টেলিগ্রাম করলেই, আমি মাদ্রাজে রওনা হয়ে যাবো!

আমাদের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তর কেনাকাটা হচ্ছে। মালপত্তর গোছানো, বাঁধা-ছাঁদার কাজও চলেছে! সূর্যকান্তর বিরাট অয়েলপেন্টিং ছবিখানি, তার বাবা-দাদুর, দিদিমার ও তার নিজের মায়ের ছবি, এইগুলো খালি খুলে নিয়ে পাওয়ার সায়েব রাখবে নিজের কাছে। আমরা যতদিন না আমেরিকা থেকে ফিরে আসি ততদিন পাওয়ার সায়েব মাদাম ডেনিয়েলের বাড়ীতে থেকে তাঁর স্কুল দেখাশোনা করবে, এই স্থির হয়েছে।

কিছু কেনাকাটার জন্য সেদিন গিয়েছিলাম ধর্মতলায় কমলালয় স্টোর্সে। গাড়ী বিক্রি করা হয়েছে; তাই ট্যাক্সিতেই গিয়েছিলাম, পাওয়ার সায়েবের সঙ্গে।—জিনিষ কেনার পর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি আমি, আর পাওয়ার গেছে ট্যাক্সির সন্ধানে। ঠিক সেই সময় আমার নজর পড়লো ফুটপাথ ধরে এগিয়ে আসা একজন লোকের ওপর! ও কে?

শ্যামলা রং, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। লেকের ধারে দেখা, সেই—। দূরের মানুষ কাছে এল। আমি ওর দিকে চেয়ে অস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম—সমুদ্দা!

অন্যমনস্ক লোকটি চমকে উঠলো আমার ডাকে! এসে দাঁড়ালো সামনে মুখোমুখি হয়ে। চশমাটা খুলে, করুণাঘন দৃষ্টি আমার মুখের ওপর রেখে বললো সে—রূপকথা? রূপা? কোত্থেকে এলে তুমি রূপা?

ওর কথার জবাব দেবার তখন বুঝি আমার আর শক্তি ছিল না, এক-মুহূর্তে বারো বছরকে অতিক্রম করে ফিরে গেছি অতীতকালে! ফিরে গেছি আমার স্বর্গে, আমার স্নেহময়ী দিদিমার কোলে। ফিরে গেছি আমার বোনদিদা, আর আমার ছোটবেলার একাধারে সঙ্গী সাথী, শিক্ষক বন্ধু; আমার পরম প্রিয়জন সমুদ্র গুপ্তর কাছে! যাকে বড় বিশ্বাস করতেন, ভালবাসতেন আমার দিদিমা। যার হাতে আমাকে তুলে দেবার প্রবল ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। আর আড়াল থেকে সেই কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম আমি। যত ভালোই হোক সমুদ্দা,—তা বলে ওর সঙ্গে বিয়ে? এমা,—ছি, ছি। হায় মূর্খ, হায় অন্ধ। তুই কোথায় পাবি দিদিমার মত দিব্যচক্ষু? নিজের ঠুনকো আভিজাত্য আর রূপের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দিদিমার নির্বাচিত অমূল্য রত্নকে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করেছিলি। সারাজীবন ধরে এখন কর, সেই ভুলের, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পত্রেন্দ্রজিৎ

শিল্পী: দিলীপ চক্রবর্তী

—কি হল রূপা? অমন করছো কেন? শরীর খারাপ লাগছে? তোমার সঙ্গের লোকটি কোথায়? গভীর মমতার সঙ্গে প্রশ্ন করলো সমুদ্দা।

—না সমুদ্দা, শরীর ঠিক আছে। তবে আমার সঙ্গে যে কেউ এসেছে, তুমি তা জানলে কি করে?

—তাকে যে একদিন দেখেছিলাম লেকের ধারে, তোমার সঙ্গে। নিগ্রোদের মত চেহারা। তোমাকে সেদিন দেখেই চিনেছিলাম আমি। তবুও এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে সাহস হল না। কারণ—। চুপ করে গেল সমুদ্দা।

—কারণ আমি জানি সমুদ্দা। তোমরা সবাই জানো যে, আমি মারা গেছি—কিন্তু—কিন্তু—আমি যে—

ট্যাক্সি নিয়ে এল পাওয়ার সায়েব। আর অবাক হল আমাকে এক অপরিচিতর সঙ্গে কথা বলতে দেখে।

আমি সমুদ্দার হাত ধরে টেনে বললাম—শেষ মুহূর্তে যখন দেখা পেলাম তোমার, তখন আর ছেড়ে দেব-না সমুদ্দা। এ সব কথা, শুধু যে তোমাকেই বলা যায়; আর কে শুনবে? তুমি যাবে তো?

কোন জবাব দিল না সমুদ্দা, আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। পথে যেতে যেতে পাওয়ার সায়েবকে বললাম—তোমার কাছে আমার সমুদ্দার অনেক গল্প করেছি সায়েব। এই হচ্ছে আমার সমুদ্দা।

বিস্ফারিত চোখে সমুদ্দাকে দেখলো পাওয়ার সায়েব, তারপর নমস্কার জানিয়ে বললো—তুমি একটুও যে বাড়িয়ে বলনি সিস্টার, তা আজ বুঝলাম সমুদ্দাকে দেখে। শুধু মনে আপশোষ হচ্ছে যে, আরো কিছুকাল আগে ওঁকে পেলাম না কেন?

সমুদ্দা চিরকাল লাজুক ও স্বল্পভাষী। পাওয়ার সায়েবের কথায় লজ্জায় মাথা নীচু করে বললো, আমি অত্যন্ত সাধারণ ছাড়া আর কিছু নয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

সুন্দরবন

অতীত ও বর্তমান

নরোত্তম হালদার

'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মনোগ্রাফ' (৪নং—১৯৩০ খৃঃ) গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় স্বর্গত কালিদাস দত্ত মহাশয় 'এ্যানটিকুইটিজ অব নর্থ-ওয়েস্ট সুন্দরবন' অধ্যায়ে বহু তথ্য প্রমাণ ও ম্যাপের সাহায্যে আদিগঙ্গার লুপ্ত প্রবাহপথের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তৎকালীন বাংলা সরকারের সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট বিভাগ কর্তৃক সেই পথ নির্ভুল বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নিকটে হুগলী নদীকে অতিক্রম করে আলিপুর ও রসা ডাইনে রেখে এবং কালীঘাট ও টালিগঞ্জ বামে রেখে আদিগঙ্গা নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হত, তারপর বনহুগলী, গোবিন্দপুর, কল্যাণপুর, শাসন ও সূর্যপুর ডানদিকে রেখে এবং গড়িয়া, রাজপুর, মাহিনগর, ডিহি, মেদনমল্ল, বারুইপুর, ধপধপি ও নাচনগাছা বামে রেখে প্রবাহিত হত। সেখান থেকে মূলটি পর্যন্ত পশ্চিমদিকে বেঁকে গেছে। মূলটিকে ডানদিকে রেখে সেখান থেকে সরিষাদহ পর্যন্ত এবং সরিষাদহ, ময়দা, খনিয়া, সাহাজাদপুর, মজিলপুর, জলঘাটা, নালুয়া, খাড়ী, কাশীনগর ও বাড়ীভাঙ্গা বাঁদিকে রেখে এবং দক্ষিণ বারাসত, বহড়ু, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, বড়াশী, মাদপুর, রাধাকান্তপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর ও ঘোড়াদল ডানদিকে রেখে বর্তমান সুন্দরবন এগ্যাক্টমেণ্ট বা লাট অঞ্চলের সীমাবাঁধে পৌছেছিল প্রাচীন গঙ্গার ধারা। সেই আদিগঙ্গার ধারা থেকে বর্তমান লাট অঞ্চলে বহু নদনদী সৃষ্টি হয়েছিল এবং গঙ্গা বহুধারায় সাগরের সহিত মিলিত হয়েছিল। মহাভারতে সে-গুলির সংখ্যা পঞ্চশত বলা হয়েছে—

'স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়ঃ
সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে
সমাপ্লাবম্‌॥'
—মহাভারত (বনপর্ব)।

এখনও এখানে চৌমুখী, সপ্তমুখী ও শতমুখী নামক নদীসমূহে রসন্ধান পাওয়া যায়। নানা নদী খাল ও খাঁড়িরূপে গঙ্গাসম্ভূত সেই অসংখ্য নদী এ অঞ্চলে এখনও বর্তমান আছে এবং এই লাট অঞ্চলে আদিগঙ্গার প্রধান ধারাটিও সম্পূর্ণ মজে না গিয়ে বিভিন্ন নদী খাল ও খাঁড়িরূপে এখনও সাগরের সঙ্গে যুক্ত আছে। বর্তমানে এইগুলিতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে; জোয়ারের সময় লোনাজলে নদীখালের দুকূল ভরে ওঠে—আর ভাঁটায় সামান্য জল থাকে।
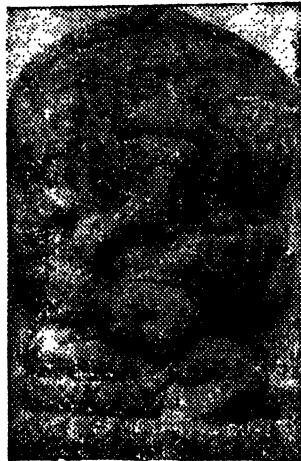
সিদ্ধিদাতা গণেশ
১০নং লাট পাকুড়তলা গ্রামে
প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্তি

শত শত ধারার মধ্যে যে মূল ধারাটির স্পর্শে সাগরবংশ অভিশাপমুক্ত হয়েছিল এবং গঙ্গাসাগর মহাতীর্থে পরিণত হয়েছিল, ভাগীরথী জাহ্নবীর সেই মূলধারাটি বর্তমান সুন্দরবন এগ্যাক্টমেণ্ট থেকে 'চড়া গঙ্গাধারা' খাল নামে পরিচিত (ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল কর্তৃক ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 79^{B}_{NW} নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

এই 'চড়াগঙ্গাধারা' এবং সপ্তদশ শতকে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়-মঙ্গলে' উল্লিখিত 'গঙ্গাধারা নামক প্রসিদ্ধ স্নানক্ষেত্র সম্ভবত একই স্থান—

'ভাবিয়া দক্ষিণ রায় ঠেঙ্গার পগড় বায়
হরষিত তরণীর লোক।
টীয়া খোল পাছু আন গঙ্গা ধারায় করি স্নান
উপনীত হৈল ছত্রভোগ॥'

অতঃপর উক্ত 'চড়াগঙ্গা' খাল নামে আদিগঙ্গার মূলধারাটি ২২নং লাট ও ১৮নং লাট বামে অর্থাৎ পূর্ব দিকে রেখে এবং ২১, ২০, ১৯ ও ১৭ নং লাটকে ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিমে রেখে বর্তমান গোবধিয়া নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১১৪নং লাট (দিগম্বরপুর, গদামথুরা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি) বামে অর্থাৎ পূর্বদিকে রেখে ও ১৭, ১৬, ১৫নং লাট ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিমে রেখে বর্তমান কালনাগিনী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখান থেকে কালনাগিনী নামে পরিচিত সেই মূলধারাটি এঁকেবেঁকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অতঃপর ১৫নং, ১৪নং, ১২নং ও ১১নং লাটকে ডাইনে অর্থাৎ উত্তরে এবং ১১২নং লাট দুর্বাচটি ও ১১১নং লাট বুধন ডাঙ্গাকে বামে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে রেখে বর্তমান কাকদ্বীপ শহরকে ডাই

ভাগে ভাগ ক'রে দিয়ে ৮নং লাটের দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় বারাতলা বা মড়ি-গঙ্গা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেই আদিগঙ্গার প্রধান প্রবাহ, এই মড়িগঙ্গা নদী এবং কালনাগিনী নদীর কতকাংশ ও গোবধিয়া নদী এখনও সুপ্রশস্ত—স্টীমার চলাচলের উপযুক্ত অবস্থায় আছে।

বারাতলা নদী বা চ্যানেল ক্রীক হুগলী নদীর শাখা। কালক্রমে ইহা এমন প্রশস্ত ও প্রবল আকার ধারণ করে যে, আদিগঙ্গার ক্ষীণধারা এখান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সাগরদ্বীপস্থ ধারাটি ক্রমশ মজে যেতে থাকে; তাই উক্ত স্থানের নাম হয় মড়িগঙ্গা (অর্থাৎ মৃতাগঙ্গা) এবং বারাতলা নদীর উক্ত অংশ মড়িগঙ্গা নদী নামেও পরিচিত হয়। ইহাকে ভেদ করে ভাগীরথীর মূল প্রবাহ প্রবেশ করেছিল সাগরদ্বীপে। বর্তমান সাগর থানা-অফিসের নিকট থেকে শিকারপুরের খাল নামে পরিচিত একটি খাল মহেন্দ্রগঞ্জের নিকটে ঘোড়াগাড়ী-খাল নামক একটা বড় খালের সঙ্গে মিশে দক্ষিণ দিকে সুমতিনগর পর্যন্ত গিয়ে জীবনতলার খালের সঙ্গে মিলিত হয়ে খানিকটা পশ্চিম দিকে ঘুরে কমলপুর, রুদ্রনগর, পশ্চিম দিকে ঘুরে কমলপুর, রুদ্রনগর, মহেন্দ্রপুর, মগরা, বেগুয়াখালি প্রভৃতি স্থান ডানদিকে রেখে ও মনসা দ্বীপকে বামদিকে রেখে ধবলাটের খালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গঙ্গাসাগর সঙ্গম-ক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগর মিলিত হয়েছে। এই পথই আদিগঙ্গার প্রাচীন প্রবাহক্ষেত্র ছিল। পূর্বে এই গঙ্গাসাগর সঙ্গম দক্ষিণ দিকে আরো অনেক দূরে অবস্থিত ছিল।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীপতি সদাগর 'মগরা' অতিক্রম করে—

'ডাইনে বামে ছেড়ে যায় কত কত দেশ।
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোনার মহেশ॥
সাগরসঙ্গম দেখি' কাণ্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধ শ্রিয়পতি সাগর প্রসঙ্গ॥'

সুতরাং মগরা থেকে অনেক দূরে সঙ্কেতমাধব নামক স্থান এবং সেখানে মহেশ্বরের স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বোঝা যায়। কালক্রমে সেই সুবিশাল অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় বর্তমান সাগরসঙ্গম স্থল ও মেলা-ক্ষেত্র ধবলাটের খালের নিকটে বেগুয়াখালিতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ভাগীরথীর এই প্রাচীন প্রবাহ তথা আদিগঙ্গার পথ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যমণ্ডিত। মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থভ্রমণ কালে ভ্রাতৃগণসহ এই ধারায় সানতর্পণাদি করেন।

গঙ্গা দেবী
(সাগরদ্বীপে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্তি মহারাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক যশোহরে প্রতিষ্ঠিত)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই ভাগীরথী গঙ্গার প্রবাহপথে নীলাচল গমন করেন। বাণিজ্যতরী সাজিয়ে চন্দ্রধর, ধনপতি, শ্রীপতি, দেবদত্ত, পুষ্পদত্ত প্রমুখ অসংখ্য বণিক এই পথ দিয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য যাত্রা করতেন; পদ্মপুরাণ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালুরায় মঙ্গল প্রভৃতি মধ্যযুগীয় কাব্যে সে সব কথা বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ ধর্মপালের পুত্র দেবপাল পরিচারকগণ সমভিব্যাহারে সাগরসঙ্গমে স্নানদানাদি করেন। অতএব পতিতপাবনী গঙ্গা কেবল পাপহারিণী নয়—সুখৈশ্বর্য-দায়িনী ও অতীতকালে এদেশে সুবর্ণ যুগের ভিত্তিস্থাপনকারিণী, যে সকল স্থানের উপর দিয়ে এই গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিলেন, স্থানমাহাত্ম্যে সে সব অঞ্চল অতুলনীয়। সেদিক থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা তথা পশ্চিম সুন্দরবন অর্থাৎ আদিগঙ্গার উভয় তীরবর্তী অঞ্চল বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত।

রামায়ণ, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে রসাতল ও পাতালের কথা আছে। পাতালে মহর্ষি কপিলের আশ্রমের সন্নিকটে পতিতপাবনী গঙ্গাসাগর সঙ্গতা হন এবং তখন থেকে সেখানকার নাম হয় গঙ্গাসাগর সঙ্গম। নিম্নবঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত মহারাজ সগরের কীর্তি-বিজড়িত সেই পাতাল প্রদেশের বর্তমান নাম সাগরদ্বীপ।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী বেদোক্ত বিরাট পুরুষ প্রদ্যুম্নের নাভিস্থলের উর্ধ্বভাগে ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং নামে সপ্ত লোক এবং অধো-ভাগে অতল, বিতল সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল নামে সপ্ত-লোক অবস্থিত। উক্ত সপ্ততলে বহু গ্রাম, নগর ও তীর্থাদির অবস্থানের কথা পুরাণে উল্লিখিত হলেও এই সকল স্থানের অধিবাসিগণকে দৈত্য, দানব, নাগ, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে—

'সপ্তৈবসেতে কথিতা ব্যবহার্যা রসাতলাঃ
দেবাসুর মহানাগ রাক্ষসাধ্যাসিতাঃ সদা॥
অতঃপর মানা লোকামগম্যং
সিদ্ধ সাধুভিঃ।
দেবানামপ্য বিদিতং ব্যবহার
বিবর্জিতং॥'

—বায়ুপুরাণ (৫০—৫৩,৫৪

অর্থাৎ দেবতা, অসুর, মহানাগ ও রাক্ষসগণের দ্বারা সর্বদা অধ্যুষিত রসাতল প্রভৃতি ব্যবহারযোগ্য সপ্ততলের কথা বললাম। এরপরে যা আছে তা ব্যবহার-বিবর্জিত। এমন কি সিদ্ধসাধু এবং দেবতাগণেরও অগম্য ও অদৃশ্য।

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়

অতি প্রাচীনকাল থেকে এই সাগরদ্বীপে সুসমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে কথিত আছে—ত্রেতাযুগে স্বর্গ থেকে পাপহারিণী গঙ্গা ভগীরথের সাধনায় তুষ্ট হয়ে পাতালপুরে মহর্ষি কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত সগরবংশের উদ্ধারকল্পে মর্ত্যধামে প্রবাহিত হন; সে-কারণ তাঁর নাম হয় গঙ্গা ভাগীরথী, মহর্ষি কপিলের অভিশাপে সগরবংশ ভস্মীভূত হওয়ার কাহিনী সম্ভবত বঙ্গোপসাগর গর্ভের সুপ্ত আগ্নেয়গিরিসমূহের অগ্ন্যুদ্গারে সগর রাজার ষাট হাজার সন্ততি অর্থাৎ প্রজার ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনা থেকে উদ্ভূত। নদীপথ মজে গিয়ে সারাদেশ জলাভাবে চরম দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছিল। ভগীরথের অক্লান্ত চেষ্টায় গঙ্গাপথ খনিত হয়ে হিমালয় থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হয় ও দেশের দুর্দশা দূরীভূত হয়।

মহর্ষি কপিলের আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সগরবংশ উদ্ধারের প্রসিদ্ধি থেকেই আর্যগণ এখানে আগমন সুরু করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ সাগরসঙ্গমে গঙ্গাস্নান করেন এবং সমুদ্রতীর ধ'রে কলিঙ্গ দেশে উপনীত হন—

'সসাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়ঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদী শতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে
সমাপ্লবম্ ॥
ততঃ সমুদ্রতীরেন জগাম বসুধাধিপ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান
প্রতিভারতঃ ॥'

—(মহাভারত, বনপর্ব।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল (সপ্তদশ শতাব্দী), দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায় মঙ্গল (অষ্টাদশ শতাব্দী) ও দ্বিজ হরিদেব কৃত শীতলামঙ্গল (অষ্টাদশ শতাব্দী) বণিকগণের বাণিজ্য যাত্রা বর্ণনায় আদিগঙ্গার পথে এই সাগরসঙ্গমে আগমনের উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী) কাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি সদাগর এবং বিপ্রদাসের

প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—'তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্কটাধিপতি প্রমুখ বঙ্গদেশাধীশ্বর এবং মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন। ...সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছরাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কম্বল, কাঞ্চন, রজত বিদ্রুম প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিল (কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—সভাপর্ব। ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায় ভীমের বঙ্গবিজয়)।

সাগরতীরের এমন সুসমৃদ্ধ জনপদগুলি অধীকৃত না হওয়ায় মহাভারত মহাকাব্যে এই স্বতন্ত্র রাজ্যগুলির স্বাধীন অনার্য অধিবাসিগণকে ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে।

বৌধায়ণ ধর্মসূত্রে (খৃস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী) অঙ্গ ও মগধ দেশকে আংশিক আর্যীকৃত বা 'সঙ্কীর্ণ যোনি' বলা হয়েছে; কিন্তু পুণ্ড্রবঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশকে আর্যবহির্ভূত অঞ্চল বলে উপেক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং তৎকালে এই নিম্নবঙ্গও অনার্য-অধ্যুষিত ছিল। আর্যগণের দ্বারা রচিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহে সর্বত্র অনার্যগণ তথা এতদঞ্চলের অধিবাসিগণও এরূপ ঘৃণ্য নামে পরিচিত হয়েছেন; কিন্তু পদ্মপুরাণের 'পাতাল খণ্ডে' এই অঞ্চল আর্যজনপদরূপে বর্ণিত হয়েছে—প্লক্ষ দ্বীপের অন্তর্গত দীপান্তী নগরীর রাজা গুণাকরের কন্যা ও তালধ্বজ নগরীর রাজপুত্র মাধবের পত্নী সুলোচনা পুরুষবেশে এখানে ভীমপাদ নামে এক গণ্ডার বধ করেন এবং এখানকার চন্দ্রবংশীয় রাজা সুষেণের রাজসভায় আগমন করেন (পদ্মপুরাণ—ক্রিয়াযোগসার ॥ ৫ম অধ্যায়)।

সুতরাং পূর্বকালে এখানে কিছু কিছু অরণ্য ছিল এবং অরণ্যে গণ্ডারের অস্তিত্ব ছিল মনে হয়।

যা হোক, মহর্ষি কপিলের সময় থেকেই সম্ভবত এই অঞ্চল আর্যসান্নিধ্যে আসে; কিন্তু বঙ্গোপসাগর বক্ষে পৃথকভাবে অবস্থিত এই দ্বীপের কতকাংশে অতি প্রাচীন কাল থেকে আর্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হলেও বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ সুন্দরবন অঞ্চলসহ প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ অনার্যগণের অধিকারে থাকে। কর্দম প্রজাপতির পুত্র এবং ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার মহর্ষি কপিল এখান থেকেই তাঁর সাংখ্যদর্শন প্রথম প্রচার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে (তৃতীয় স্কন্ধ, ৩৩) তাঁর আগমন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি মাতা দেবাহুতির আজ্ঞায় গৃহত্যাগ ক'রে প্রথমে পিতার আশ্রম থেকে উত্তর দিকে যান এবং পরে দক্ষিণে আসেন; সমগ্র পৃথিবী
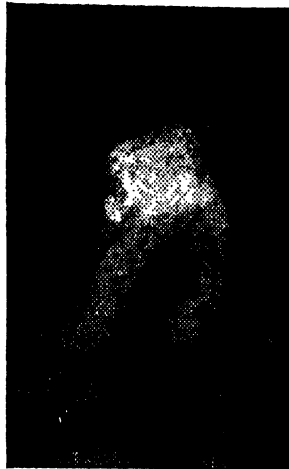
১০নং লাট পাকুড়তলা গ্রামে
প্রাপ্ত পোড়ামাটির নিদর্শন
(জম্ভুবিশেষের অর্ধাংশ)

পরিভ্রমণের পর এখানে সমুদ্র তাঁকে অর্ঘ্য ও বাসস্থান প্রদান করে। বর্তমানে যেখানে গঙ্গাসাগর মেলা বসে, প্রাচীন গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থ তার দক্ষিণে আরো অনেক দূরে অবস্থিত ছিল এবং সেখানে অনেকগুলি মন্দির ছিল; একটি বিরাট মন্দিরে সাত-আট ফুট উচ্চ কপিল মুনির প্রস্তরমূর্তি এবং মন্দিরের পিছনে সীতাকুণ্ড নামে একটি পুষ্করিণী ছিল। সীতাকুণ্ডের জল বারমাস সমান থাকিত এবং তীর্থযাত্রিগণ কপিল-দর্শনের পর সেই জল পান করিতেন।

মনসামঙ্গলে (পঞ্চদশ শতাব্দী) চাঁদ সদাগর 'মগরা' অতিক্রম ক'রে সাগর-সঙ্গমে তীর্থকার্য সমাপনান্তে সিংহল যাত্রা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের এই পথে নীলাচল গমনের কাহিনী বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (ষোড়শ শতাব্দী) সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। পরিচালকগণ সমভিব্যাহারে মহারাজ দেবপালও এখানে স্নানদানাদি করেছিলেন।

সুতরাং অনুমিত হয় যে, এককালে যখন আদিগঙ্গার ধারা প্রবল ছিল, তখন হুগলী-নদীর মোহনা এখনকার মত প্রশস্ত ছিল না এবং মেদিনীপুর জেলা সাগরদ্বীপের নিকটেই ছিল। অতএব তখন আদিগঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগ প্রাচীন তাম্রলিপ্ত ও কলিঙ্গ দেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং উহার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভূভাগ সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে সাগর-সঙ্গম মহাতীর্থ ছাড়াও গঙ্গা ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে বহু সমৃদ্ধ বন্দর ও নগরাদি গড়ে উঠেছিল।

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থে যে স্থানকে পাতাল বা রসাতল বলা হয়েছে, গ্রীক ভৌগোলিক টলেমীর মানচিত্রে এবং গ্রীক ও রোমানদের প্রাচীন বিবরণে বর্তমান সুন্দরবনের অন্তর্গত সেই স্থান ও তার অধিবাসিগণকে 'গঙ্গারিডি' নামে প্রবলপরাক্রান্ত দেশ ও জাতিরূপে অভিহিত করা হয়েছে। গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী ছিল 'গাঙ্গী'। পরবর্তীকালে উহা 'গঙ্গা' নামেও অভিহিত হয়েছিল (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ১৯৪৭ সালের নিখিল ভারত ইতিহাস কংগ্রেসে 'দি সিটি অব গঙ্গা' প্রবন্ধে ইহার বিশদ আলোচনা করেন)।

নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দিয়ে পালযুগে ও সেনযুগে 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল' নামে খ্যাত এই সুন্দরবন রাজ্য সুদূর সুমাত্রা দ্বীপের সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। 'ব্যাঘ্রতটি' মণ্ডলাধিপতি মহারাজ বলবর্মা সুবর্ণ দ্বীপাধীশ অর্থাৎ সুমাত্রার অধীশ্বর মহারাজ বালপুত্র দেবের শত্রুবল দলনে দক্ষিণ বাহুস্বরূপ ছিলেন।' সেই ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের অন্তর্গত নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল নামে খ্যাত এবং গাঙ্গী বা গঙ্গানগর পশ্চিম-সুন্দরবনের অন্তর্গত বর্তমান সাগরদ্বীপ।

পাঠান যুগে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলিম ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র ছিল এই নিম্নবঙ্গ; কিন্তু মুগল যুগে এই অঞ্চলের অশ্রুসিক্ত ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে মগ, পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারে এইসব অঞ্চল পর্যুদস্ত হয়—

১০নং লাট পাকুড়তলা গ্রামে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মস্তক

'সাজাহান (১৬২১ খৃঃ) কিছু না বলায় পর্তুগীজেরা আরও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল, ভাগীরথী দিয়া যে সকল জাহাজ বা নৌকা যাইত প্রত্যেকের নিকট হইতে পর্তুগীজরা মাশুল আদায় করিত। এই সময়ে ছেলেধরার ভয় হইয়াছিল। পর্তুগীজেরা ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করিত। ইহাদের উৎপাতে কত শহর কতশত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই (বিশ্বকোষ : ২য় খণ্ড, ৪১ পৃঃ)'।

দস্যুরা শুধু এখানকার সম্পদ লুঠ ও নারী-নির্যাতন করে ক্ষান্ত হয়নি, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে দাস-ব্যবসায়ের জন্য ধ'রে নিয়ে গিয়েছে এখানকার অগণিত মানুষকে। হাতের পাতায় দড়ি গেঁথে জাহাজের খোল ভর্তি ক'রে এখানকার অধিবাসীদের বিদেশে চালান দিয়েছে। এইভাবে জলদস্যুদের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গ ক্রমশ জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হতে থাকে। এরপরেও ১৬৮৮ খৃস্টাব্দের ভীষণ জলপ্লাবনে এই সাগরদ্বীপের ষাট হাজার অধিবাসী গৃহসম্পদসহ ধ্বংস হয়ে যায় (ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার, ভল্যুঃ—১২, পৃষ্ঠা—১১০)।

মনুষ্যপরিত্যক্ত নিম্নভূমি শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হয়। বাঘ, সাপ, বন্যবরাহ ও হাঙর-কুমীরের বিভীষিকাময় লীলাক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয় সাগরদ্বীপ সহ সমগ্র 'সুন্দরবন, তবুও পুণ্যার্থিগণের নিকট গঙ্গাসাগরসঙ্গম মহাতীর্থের আকর্ষণ আদৌ কমে নি, 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির সময় মকর-স্নান উপলক্ষে ভারতের নানা স্থান থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী নরনারী তখনও জীবন বিপন্ন করে এই মহাতীর্থে উপস্থিত হতেন। এখানকার প্রাচীন মন্দির, মূর্তি ও পুষ্করিণী মেলার সময়ে সপ্তাহাধিক কালের জন্য সংরক্ষিত থাকতো।

কিন্তু ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এই তীর্থনগরীর সমস্ত নিদর্শন সাগরে নিমজ্জিত হওয়ায় পুনরায় বর্তমান মূর্তিগুলি ক্ষোদিত হয় এবং সঙ্গমক্ষেত্র বেগুয়াখালি নামক স্থানে ধবলাটের খালের সন্নিকটে স্থানান্তরিত হয়। ভূমিকম্পের পর প্রায় প্রতি বছরই সাগরদ্বীপের গ্রামগুলি সমুদ্রের গ্রাসে কিছু কিছু ক'রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ঐ সঙ্গে তীর্থমন্দিরও একটি একটি ক'রে নিমজ্জিত হওয়ায় সাগরতীরে নূতন নূতন মন্দিরও পুনর্নির্মিত হচ্ছে। পৌষ সংক্রান্তিতে তিনদিন ধরে মেলা-স্থানে অস্থায়ী হোগলার ঘরে যাত্রী ও দোকানদারগণ আশ্রয় গ্রহণ করে।

সুরনদী ভাগীরথী জাহ্নবীর মূল-ধারা এই পথে প্রবাহিত হওয়ায় সাগরদ্বীপ

পূর্বে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং আদিগঙ্গার উভয় পার্শ্বে বহু বন্দর, নগর ও জনপদ গড়ে উঠেছিল। গঙ্গার প্রধান ধারা সাগরদ্বীপের বর্তমান মড়িগঙ্গা, মহেন্দ্রগঞ্জ, সুমতিনগর, রুদ্রনগর, নটেন্দ্রপুর, মগরা, বেগুয়াখালি, ধবলাট প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত ছিল; ছোটবড় খাল ও খাঁড়িরূপে উহার ক্ষীণপ্রবাহ আজও কিছু কিছু বজায় আছে।

সাগরদ্বীপের 'মগরা' নামক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটির উল্লেখ মধ্যযুগীয় সাহিত্যসমূহে পাওয়া যায়—

'দুই এক নৌকা জলমাঝে ভাসে।
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জন॥
মোহানা বাহিল ডিঙ্গা করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দুর্জয় মগরা॥'

—চণ্ডীমঙ্গল।

'পশ্চিমে সাগরিয়া আনন্দপুর মহাভাব
মগরা বাহিয়া চলে সাধুর সন্তান॥'

—রায়মঙ্গল।

'গঙ্গাসাগর বামে বাহিয়ারে যায় নৈয়ো
হেতেগড় করিল পশ্চাত।'

—শীতলামঙ্গল।

পূর্বে সাগরসঙ্গম ক্ষেত্র এই মগরা থেকে দক্ষিণে আরো বহুদূরে অবস্থিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীপতি সদাগর দুর্জয় মগরা অতিক্রম করে—

'ডানি বামে ছেয়ে যায় কত শত দেশ।
সঙ্কেত মাধবে দেখে সোনার মহেশ॥
সাগরসঙ্গম দেখি কাণ্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর প্রসঙ্গ॥'

সুতরাং মগরার পরে সঙ্কেতমাধব নামক স্থানে মহেশ্বরের স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান ধবলাটের খালই পূর্বে আদিগঙ্গার প্রধান ধারা বলে প্রমাণিত। ইংরেজরা এই খালকে বলত—'প্যাগোডা ক্রীক্।' ইহার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কপিল-মন্দিরে ভগবান কপিল, গঙ্গা-ভাগীরথ ও সগরের প্রতিকৃতির পার্শ্বে যজ্ঞাশ্বসহ ইন্দ্র ও অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পূর্বে প্রতি বছর জঙ্গল কেটে মেলাস্থান পরিষ্কার করতে হত এবং পাথরে ক্ষোদিত প্রতিমূর্তিগুলি মেলা-শেষে কলকাতায় নিয়ে রাখা হত, অযোধ্যার 'হনুমানগড়' ট্রাস্টি কপিল-মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও ইহার সমস্ত দায় গ্রহণ করেন। বর্তমানে সাগর-দ্বীপের সমস্ত জঙ্গল সম্পূর্ণ হাঁসিল হওয়ায় মূর্তিগুলি বরাবরের জন্য মন্দিরেই থাকে এবং প্রতিদিন নিয়মিত পূজার্চনা হয়।

এই রচনাটির সঙ্গে প্রকাশিত আলোক-চিত্রগুলি নমিতা হালদার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

শক্তি

পৃথিবীতে আদি শক্তির উৎস হ'ল সূর্যালোক—যা প্রাণী এবং গাছ পালাকে শক্তি যোগায়। তারপরে এল কাঠ ও কয়লা জ্বালিয়ে শক্তি উৎপাদন, যেটা হ'ল বায়ুচালিত এবং গৃহপালিত পশুচালিত যন্ত্রাদির বিকল্প শক্তি। জলশক্তি ও বিদ্যুৎ শক্তি এতাবৎকাল মানুষকে 'পাওয়ার' জোগান দিচ্ছে, সভ্যতাকে সচল রাখছে। পেট্রল বহু দিন যাবৎ সভ্যতার চাকাকে সচল রাখতে সাহায্য করে চলেছে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মতে এর কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। কয়লা তো ফুরিয়ে এল, পেট্রলও তথৈবচ।

তা হলে? বিকল্প কি? সভ্যতাকে সচল রাখতে যে বিপুল পরিমাণ 'পাওয়ার' দরকার তা 'আসবে কোত্থেকে? কে যোগাবে এই শক্তি? বৈজ্ঞানিক বলছেন, মা ভৈঃ। আমরা আছি।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু ভঙ্গ করে যে শক্তি একদিন হিরোশিমা নাগাশিকির লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এনে দিয়ে ছিল নরকের আস্বাদ, সেই পরমাণুই এ মুশকিল আসান করবে। পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে মানুষের 'পাওয়ার' এর প্রয়োজন মেটাবেন পণ্ডিতেরা। এর কাজও সুরু হয়ে গিয়েছে—আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড জার্মানী ইত্যাদি দেশে আংশিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে পারমাণবিক শক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

উৎপাদনের খরচও অনেক কম। বর্তমানে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টার খরচ পড়ছে অবশ্য '৯৬ (এক ডলারের কিছু কম) ডলার, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে (১৯৭০ সালের পরেই) এ খরচ কমে আধ ডলারের মত হবে। এ খরচ বর্তমান খরচের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকম কম। পণ্ডিতেরা বলছেন যে, পশ্চিম জার্মাণীতে পাওয়ার-এর প্রয়োজনের শতকরা চল্লিশ ভাগই মেটাবে পারমাণবিক শক্তি, ১৯৮০ সাল নাগাদ। অতএব, মা ভৈঃ। পরমাণু তো রয়েছে অফুরন্ত।

মুদ্রণ শিল্পে কস্টিং

দীপঙ্কর সেন

আজকের দিনের নাগরিক হিসেবে, ইচ্ছা হোক আর নাই হোক, প্রত্যেক দিন দুটি জিনিস দেখতে আমরা বাধ্য হই পাকা বাড়িঘর আর মুদ্রিত শব্দ ও ছবি। প্রকৃতপক্ষে সভ্যসমাজের সামগ্রিক মান বিচার করবার সময় স্থাপত্য-রীতি এবং মুদ্রিত জিনিসের চেয়ে বড় মাপকাঠি আর কিছুই নেই। সুরুচি, বিচারবোধ এবং সমকালীন শিল্পকৌশল-সম্পর্কিত শিক্ষা এবং সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর মুদ্রণ শিল্পের সমন্ধ এবং বাস্তব চিত্রের মধ্যে দিয়ে যেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তেমন আর কিছুতেই হয় না।

মুদ্রণ শিল্পকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—(১) লেটারপ্রেস—যার মুদ্রণীয় সমতল উঁচু করে তৈরী; (২) লিথোগ্রাফী—যার মুদ্রণীয় এবং অমুদ্রণীয় সমতলের মধ্যে উচ্চতার কোন পার্থক্য নেই এবং (৩) ফটোগ্র্যাভিয়র—যার অমুদ্রণীয় সমতল মুদ্রণীয় সমতলের চেয়ে উঁচু।

এই তিনটি মূল শাখা ছাড়াও মুদ্রণ শিল্পের ছোটবড় আরও কয়েকটি প্রশাখা রয়েছে। লোকপ্রিয়তার দিক থেকে লেটারপ্রেসের স্থান আজও সবার উপরে। আমাদের দেশে পথে চলতে-ফিরতে যে-সব ছাপাখানা আমরা দেখে থাকি তার অধিকাংশই লেটারপ্রেস পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে।

সব কাজই বিশেষজ্ঞদের হাতে তুলে দেওয়া হল বর্তমান যুগের ধর্ম। মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। আজ যে কোন ভাল ছাপাখানায় নানা শ্রেণীর কাজের জন্য উপযুক্ত মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়। এই প্রগতিশীল মুদ্রক সম্প্রদায় গতিময় জগতের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলে—অন্তরের এবং বাইরের তাগিদে মুদ্রণ শিল্পকে উন্নীত করে কলাবিদ্যার পর্যায়ে।

মুদ্রণ শিল্প-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যিনি মূল্য নিরূপণের অর্থাৎ কস্ট ফাইণ্ডিং-এর কাজটি করেন তাঁর কাজটি ছাপাখানার অন্যান্য কর্মীদের অন্তরালে সম্পাদিত হলেও এক হিসেবে তাঁর কাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ তিনিই একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক রূপটিকে ফুটিয়ে তোলেন আর তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছু সম্পাদন করে মুদ্রণালয়ের অন্যান্য কর্মীরা একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন।

'ডবল এণ্ট্রি বুক কিপিং'-এর সাহায্যে একটি মুদ্রণালয়ের সামগ্রিক হিসেব রক্ষার কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা গেলেও তার দ্বারা সেই মুদ্রণালয়ে সম্পাদিত প্রতিটি কাজের মূল্য পৃথক-ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মুদ্রণ-শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রতিটি কাজের মূল্য সঠিকভাবে নিরূপণ করে না নেওয়া হলে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-গুলি সংগ্রহ করে নেওয়া যায় না। এ বিষয়ে বৃটিশ ফেডারেশন অব মাস্টার প্রিণ্টার্সের মতামত প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেছেন:

১। কোন ব্যবসাদার তার নিজস্ব গৃহে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করলে বাড়ি-ভাড়া বাবদ কোন খরচা ধরার রেওয়াজ 'ডবল এণ্ট্রি বুক কিপিং' অনুসারে নেই। কস্টিং-এর প্রথা অনুযায়ী বাড়ি যারই হোক না কেন, তার জন্য ভাড়ার টাকা পৃথকভাবে ধার্য করা না হলে ব্যবসার মোট খরচা কম করে দেখানো হবে।

২। মূলধন হিসেবে বাইরে থেকে টাকা ধার করে আনলে তার জন্য যেমন কিছু সুদ ধার্য হবে, ঠিক তেমনি করেই ব্যবসার মালিক মূলধন হিসেবে যা কিছু সরবরাহ করবেন তার জন্যও একই হারে সুদের হিসেব করতে হবে।

৩। মুদ্রণালয়ের নিজের ব্যবসা সম্পর্কিত যা কিছু কাজ মুদ্রিত হবে বাইরের কাজ অর্থাৎ খরিদ্দারের জন্য মুদ্রিত কাজগুলির থেকে সেগুলিকে আলাদা করে রাখা চলবে না। সেগুলির সমস্ত খরচ-খরচার হিসেব সঠিকভাবে রাখতে হবে। বিভিন্ন কাজ মুদ্রণের সময় যে-পরিমাণ কাগজ, কালি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের অপচয় হয়ে থাকে তার হিসেবও কস্টিংয়ের প্রথা অনুসারে অনেক নিখুঁতভাবে রাখা সম্ভব।

৪। 'ডবল এণ্ট্রি বুক কিপিং' পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতির অপচয়ের দরুণ সেগুলির কেনা দামের কিছু অংশ প্রতি বছর ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে ব্যবসাদারের খুব সুবিধা হয় না। আজকের দিনে অধিকাংশ দেশেই দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় পাঁচ বছর আগে যে যন্ত্রটি পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনা হয়েছিল তার মূল্য আজও অপরি-বর্তিত থাকার কথা নয়। অথচ এই সত্যটি উপলব্ধি না করে একরূপ একটি যন্ত্রের মূল্য পাঁচ বছর ধরে সম্পূর্ণভাবে হ্রাস করবার পর উপরোক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা গেলেও তা দিয়ে অনুরূপ একটি যন্ত্র কিনতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং পুরনো যন্ত্রের বদলে নতুন যন্ত্র আনার উদ্দেশ্যে লাভের কিছু অংশ আলাদা করে রাখার কাজটি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। তাই এসব যন্ত্রপাতির মূল্য বছর বছরে নতুন করে হিসেব করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবচয়ের হিসাব তার পরেই করা চলতে পারে।

৫। ব্যবসার মালিক নিজেই যদি ব্যবসার কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন, সেক্ষেত্রে তার জন্য পৃথকভাবে বেতন ধার্য করাই কস্টিং-এর নিয়ম। তিনি নিজে এসব কাজ না করলে এর জন্য বেতন দিয়ে কোন-একজন কর্মীকে তাঁর নিয়োগ করতে হত। এই খরচাটি সাধারণ হিসাব রক্ষার পদ্ধতিতে

আলাদাভাবে দেখানো হয় না। এতে ব্যবসার খরচের সঠিক হিসাব থাকে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে বিবেচনা না করলে মূল্য নিরূপণের কাজে বহু ভুল থেকে যাবে অর্থাৎ হিসাবে খাতায় বহু জিনিষ বাদ পড়ে যাবে। 'ডবল এণ্ট্রি বুক কিপিং'-এর নিয়ম অনুসারে এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় না থাকায় তার সাহায্যে মুদ্রণ শিল্পে মূল্য নিরূপণের কাজটি সঠিকভাবে করা যায় না।

স্বাধীন শিল্প হিসেবে আমাদের দেশে মুদ্রণ শিল্প যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান অধিকার করে রয়েছে। ভবিষ্যতে মুদ্রণের উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বহু প্রতিষ্ঠানই মুদ্রিত কাজের মূল্য আজ ব্যয়ভিত্তিক উপায়ে করে না ইচ্ছামত দাম কমিয়ে কাজ যোগাড় করে। এতে সাময়িকভাবে খরিদ্দার যোগাড় করা যায়। কিন্তু তারই সঙ্গে মুদ্রণ শিল্প সাঙ্ঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়ে থাকে। এর প্রতিরোধ করতে হলে সারা দেশের প্রতিটি মুদ্রণালয়ে বিজ্ঞান-সম্মত 'কস্টিং' প্রবর্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যচর্চা

স্বাস্থ্যবিদ

মহিমবাবু কয়েক মাস বিছানায় আটকে রইলেন। চিকিৎসকের হুকুম—পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। বসে বসে পা দুটো ফুলে উঠল। ভয় পেলেন ভদ্রলোক। এ আবার কী গেরো। তবে কি আবার হৃদ্ঘটিত গণ্ডগোল, থ্রম্বোসিস্-এর আক্রমণ?

না। বয়স হয়েছে তাঁর, বসে বসে রক্ত চলাচল ঠিকমত না হওয়ায় ওই অবস্থা। চিকিৎসক বললেন—ওষুধ নিষ্প্রয়োজন, রোজ মাইল দু'য়েক হাঁটুন, সইয়ে সইয়ে।

দিন দশেক পরেই তাঁর ফোলা পা চুপ্সে যেতে লাগল। বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। এখনও তিনি বেশ সুস্থ রয়েছেন।

স্বাস্থ্যচর্চা ঠিক কতখানি জীবন সুস্থ এবং দীর্ঘ করে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খবর এদেশে ত' একেবারেই অমিল, কিন্তু এর কয়েকটা উপকার সম্বন্ধে চিকিৎসকরা নিঃসন্দেহ, অনেকেই মনে করেন খাদ্য, কাজ, আনন্দোপভোগ এবং ঘুমের মত স্বাস্থ্যচর্চাও অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার।

রক্ত চলাচল সুষ্ঠু করায় ব্যায়ামের ভূমিকা সহজবোধ্য। হাতে, বিশেষত পায়ে ব্যায়ামের ফলে যে চমৎকার পেশি গড়ে ওঠে তাতে শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল সুষ্ঠু হয়। পেশিস্থ 'ভাল্ভ' সুস্থ অবস্থায় রক্তকে বিপথে যেতে দেয় না, 'স্কেলিটাল মাস্ল' দ্বারা শিরায় চাপ দিলে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায় চট্পট। নরম, অব্যবহৃত পেশী এ কাজ ঠিকমত করতে পারে না, এবং ঐ ধরণের পেশী থাকলে শিরায় রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা ঘনিয়ে তোলে, একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকলে, কিংবা অস্ত্রোপচার বা দীর্ঘস্থায়ী অসুখ করলে যখন বসা বা শোয়া ছাড়া অন্য কোনও কাজ থাকে না তখন। ট্রেন, প্লেন ইত্যাদিতে দীর্ঘকালস্থায়ী ভ্রমণকালে মাঝেমধ্যে নেমে হাত-পা নেড়েচেড়ে নেওয়া উচিত।

ব্যায়াম কেবল ফুসফুসে বেশি অক্সিজেন যুগিয়ে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের ক'রে স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে না, হৃৎপিণ্ডে রক্ত-সঞ্চালনও সুচারু ক'রে তোলে। এজন্য পর্যাপ্ত ব্যায়াম করা চাই। অসম্ভব হলে দিনে কয়েকবার 'ডীপ-ব্রিদিং' ব্যায়াম খুবই কাজে আসে।

রক্ত সঞ্চালনের অপর যে অংশ নিয়মিত ব্যায়ামে উপকৃত হয় তা হল খুদে 'ব্লাড-ভেসোল'-সমষ্টি—আর্টেরিওলেস, ক্যাপিলারিস্ এবং ভেনুলেস্—এগুলো ফলত আরও বেশি কর্মক্ষম হয়। হৃৎপিণ্ড রক্তসঞ্চালনের মুখ্য স্থল বটে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য রীতিমত কাজে আসে।

ব্যায়ামের অন্য উপকারিতাও বর্তমান। হজমশক্তি বাড়ে, পেট পরিষ্কার হয়; স্বাস্থ্যচর্চা করলে জোলাপ নেওয়ার দরকার হয় না। হলেও, খুব মৃদু জোলাপেই বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। সন্ধ্যের মুখে দীর্ঘ ভ্রমণ, গভীর শান্ত ঘুম আপনি দেহ-মন চাঙা ক'রে তোলে। ওষুধ, কফি জাতীয় পানীয়, ছায়াছবি—যাই হোক্ না কেন, এমন সুসম ক্লান্তিহরা ঘুম কিছুতেই পাওয়া যায় না।

ব্যায়ামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বোধ হয় স্নায়ুর ওপর, মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় এর অবদানও অনস্বীকার্য। বলা হয় দৈনিক পাঁচ মাইল হাঁটলে অসুখী কিন্তু মোটামুটি দৈহিক সুস্থতাসম্পন্ন লোক যে উপকার পান, দেহ এবং মনের প্রাপ্তব্য সব ওষুধ উজাড় ক'রে দিলেও ততখানি কাজ হয় না। স্নায়বিক উত্তেজনা দমনের সেরা ওষুধ নিয়মিত পর্যাপ্ত ব্যায়াম। ব্যায়ামটা কী ধরণের তার দার্শনিক ব্যাখ্যা হাস্যকর, দেখতে হবে ব্যায়ামকারীর পক্ষে তা যথেষ্ট রুচিকর এবং সহনীয় কি না। নিয়মিত ব্যায়াম খুব উপকারী বন্ধু। কখনও পথে বসায় না।

মানসিক পরিশ্রম যাদের খুব করতে হয়, মন প্রফুল্ল, এমন কি সুস্থ চিন্তাশক্তি বজায় রাখার জন্যও তাদের ব্যায়াম করা উচিত। মনের খাটুনি দৈহিক পরিশ্রমের সঙ্গে পাশাপাশি চালান দরকার। প্রাচীন গ্রীস দেশে 'অ্যাকাডেমী'-র পণ্ডিতবর্গ হাঁটতে হাঁটতে পড়াতেন—তাঁরা জানতেন কি না বলা শক্ত, তবে ফলত তাঁদের মস্তিষ্কে বেশি রক্ত সঞ্চালন এবং রক্তে বেশি অক্সিজেন প্রবাহিত হত।

প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির ব্যায়াম করা অবশ্য কর্তব্য, বয়স এ-ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। হাটের পর হাল্‌কা ব্যায়াম আদর্শ, তবে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। নিয়মিত দেহচর্চাকারীর পক্ষে বৃদ্ধ বয়সেও খেলাধূলা করা সম্ভব—বলাই চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ভাবুন একবার। বৃদ্ধদের পক্ষে অবশ্য হাঁটা সব সেরা ব্যায়াম। এছাড়া সাঁতার, সাইকেলচড়া, বাগান করাও চলতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠনামাও ভাল, সম্ভব হলে।

হৃদ্রোগের মত অসুখেও হাল্‌কা ধরনের ব্যায়াম করা যায়। অবশ্য, এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অপরিহার্য।

যার করোনারী থ্রম্বোসিস হয়েছিল অথচ এখন রোগের লক্ষণ আর নেই, তার পক্ষে ব্যায়াম ত' সাধারণ চিকিৎসার অঙ্গ, এমন কি লক্ষণ থাকলেও অল্প পায়চারী, গভীর প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ জাতীয় ব্যায়াম করা যায়।

হঠাৎ অনেকখানি ব্যায়াম ক্ষতিকর। ধীরে ধীরে সময় বাড়াতে হয়। হাঁটার দিকে আবার মনোযাগ দেওয়ার ক্ষণ উপস্থিত—গাড়ির উপদ্রবে শরীর যেতে বসেছে যে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, ঘটছেও। তখন টান পড়ে জীবনীশক্তিতে। সেটুকু আগে থাকতে সঞ্চয় করাই কি উচিত নয়? সুস্বাস্থ্য আর বেঁচে থাকা—এ দু'টো অবস্থা ভিন্ন—জীবন-মৃত্যুর মত মৌল পার্থক্য যদিও তা নয়। সেই সান্ত্বনা কি কোনও কাজে আসে?

অচিন গাঁয়ের মেয়ে

শ্রীমতী ডলি চট্টোপাধ্যায়

অচিন গাঁয়ে ছিল যে এক মেয়ে
দীঘল চোখে কালো দীঘির ছায়া
বাঁকা ধনু আঁকা কাজল ভুরু
গাঁয়ের ছেলের রচে স্বপন মায়া।

শ্যামলা বরণ কোঁকড়া কালো চুল
কটি বেড়ে বাঁধত আঁচলখানি
মাটির ঘরে সাঁঝের প্রদীপ দিত
ভোরের আলোয় নিকোয় উঠোনখানি।

সিক্ত বসন নিটোল তনু ঘিরে
থরথরিয়ে কাঁপতো সাঁঝের আলো
নীরব হাসি চোখের ছায়ার নীচে
চিবুক পাশে তিলটি ছিল কালো।

শাওন দিনের ঘন মেঘের ছায়ে
দাওয়ার 'পরে বসে গাঁয়ের মেয়ে
উদাস আঁখি কারে খুঁজে ফেরে
পথের বাঁকে মাঠের পাশে চেয়ে?

হোতায় দূরে কাজল দীঘির জলে
বৈঠা ঠেলে বেড়ায় গাঁয়ের ছেলে
মন যে টানে হরিণ কালো চোখে
খোঁপাতে যার দোলন চাঁপা দোলে।

দীঘির জলে তারই ছায়া নাচে
মেঘের বুকে তারই কেশের ছায়া
শালুক তারই সরম রাঙা মুখ
গাঁয়ের ছেলের পরাণ যারে যাচে।

কলসী কাঁখে আসে গাঁয়ের মেয়ে
সাঁতার কাটে দীঘির কালো জলে
বৈঠা ঠেলে আসে গাঁয়ের ছেলে
শালুক তুলে পরায় কালো চুলে।

বেড়ায় তারা বনের নিঝুম ছায়ায়
গল্প তাদের বকুল গাছের তলে
আকাশ লোটে তাদের চিকন হাসি
কাশের ফুলে তাদের খুশি দোলে।

সেদিন এল ভিন্ গেরামের ছেলে
শাঁখ বাজল হুলু দিল কত
রাঙা চেলী—পরল গাঁয়ের মেয়ে
সজল চোখে মুখটি কোরে নত।

পত্রলেখা আঁকলো কপোল তলে
ফুলের ভূষণ পরালো কেউ গলে
ছোট বুকে উথাল পাথাল ঢেউ
পত্রলেখা মুছলো চোখের জলে।

নৌকা নিয়ে আসে গাঁয়ের ছেলে
উঠলো তাতে ভিন্ গেরামের বর
চেলি পরে উঠলো গাঁয়ের মেয়ে
যাবে নাকি যেথায় তাদের ঘর।

আবার ফিরে আসে গাঁয়ের ছেলে
উদাস বাঁশী বাজায় আপন মনে
দীঘির জলে মেশে চোখের জল
বাতাস কাঁদে সে সুর শুনে শুনে।

বনের ছায়া পায়না তাদের কাছে
খোঁজে তাদের শাওন মেঘের দল
বকুল কেঁদে ঝরে ধুলোর 'পরে
তাদের ডাকে দীঘির অতল জল।

দীপক বসু

রামলিঙ্গম বলত, যদি সত্যিকারের লেখাপড়া করতে চাও তো ফ্রেঞ্চ শেখ। পৃথিবীতে ওই একটা দেশই আছে— কি সাহিত্য, কি সিনেমা, কি দর্শন, যে কোনদিকে বল, ওদের কোন তুলনা নেই। তাই বলছি ফ্রেঞ্চ শেখ, ইটস্ এ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রিসন। জানো তো ইউরোপে বলে, ঈশ্বর নাকি স্বর্গে হিব্রুতে কথা বলেন, নরকে নাকি প্রেতাত্মারা টুসকানি ভাষায় কথা বলে, আমরা পৃথিবীতে না ঈশ্বর, না প্রেতাত্মা, আমাদের রিসন মেনে চলতে হবে। তাই বলি ফ্রেঞ্চ শেখ। আর তুমি বোধ হয় ইংরেজি ছাড়া আর কোন বিদেশী ভাষা জান না, সে আমি দেখেই বুঝেছি। দুর দুর ইংরেজি আবার ভাষা নাকি?

রামলিঙ্গমের সঙ্গে আম্বালা হোটেলে আলাপ। অনেক দেরীতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম দিল্লীতে। সেসন আরম্ভ হয়ে গেছে অনেকদিন। হোস্টেলেও জায়গা নেই। খুঁজে খুঁজে শেষে একজন গোলমার্কেটে এক মেসের সন্ধান দিল। মেস হলেও কলকাতার মত একঘরে চার-পাঁচজনের গুঁতোগুঁতি নয়। একটা ঘরে এক একজন। তবে ঘরগুলো বেশ ছোট। আমি অবশ্য কতক্ষণ বা থাকব। রাত দশটা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা থাকে. ফিরতে ফিরতে সাড়ে নটা, রাতটুকু শুধু, সকাল হোলেই আবার ছোটা বাসস্ট্যাণ্ডে, সেখান থেকে স্কুল অব ইকনমিকসে। হোটেলের সব ভাল, বিরাট উঁচু ছ'তলা বাড়ী, তবে হেঁটে উঠতে হয়। লিফট একটা আছে, মানে অন্তত লিফটের সামনের সোনালী রঙে লেখা সাইনবোর্ড দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু ওটা চিরকাল অচল। সাইনবোর্ডের তীরচিহ্ন দেখে ভেতরে গিয়ে দেখতাম একটা ব্রোঞ্জের গ্রিল, তার মধ্যে কিউপিড ড্রাম বাজাচ্ছে, পরী উড়ে যাচ্ছে, একপাশে সুইচ আর দরজা খোলার হ্যাণ্ডেল। সব কিছু ঝকঝকে পরিষ্কার, শুধু হ্যাণ্ডেলের ওপর একটা কাগজে লেখা 'লিফট বন্ধ হ্যায়'। রিসেপশন কাউণ্টারে ঢোলা সালোয়ার পরা জবুথবু গোছের মিসেস নির্মল কাউলকে জিজ্ঞেস করলে উনি দু'-একবার মাথার একরাশ কাঁচা-পাকা চুলে হাত বুলিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে বলতেন, 'তবিয়ৎ।' কতবার তো সারানো হল, কিন্তু ওটা ঠিক খারাপ হয়ে যায়। মিস্টার কাউল ফরিদাবাদে এ্যালুমিনিয়ামের বাসন তৈরীর কারখানা চালান। এর মধ্যে একটা গাড়ী করে ফেলেছেন। এদিকে বিবিকে দিয়ে হোটেলও চালাচ্ছেন।

আমি পূজোর ছুটিতে একবার কলকাতা ঘুরে এলাম। ফিরে এসেই মিসেস কাউলের কাছে শুনলাম রামলিঙ্গম বলে এক মাদ্রাজী নতুন এসেছে। আমার পাশের ঘরে। ও নাকি আবার আফিমখোর, দিনরাত ফানেলের লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়ায়। ক'দিন বাদে ওর সঙ্গে একদিন বারান্দায় দেখা হয়ে গেল। একগাল হেসে অতি পরিচিতের মত বললেন, আরে তুম বঙ্গালসে হিঁয়া পড়নে আয়া?

আমার সম্বন্ধে আগেই কি করে খোঁজখবর নিল ভেবে অবাক হলাম। কারণ ওকে কারুর সঙ্গে খুব একটা কথা বলতে দেখতাম না। একটু বেঁটে গড়নের, বেশ মোটাসোটা চেহারা, চোখে স্টিলের পাতলা চশমা। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করলাম ও দর্শনে এপিকিউরাসের ভক্ত, রাজনীতিতে গারিবল্‌ডী, ধর্মে জিসাস ক্রাইস্ট, সাহিত্যে দান্তের। শুধু ভক্তই নয়, ওসব ব্যাপারে রীতিমত পড়াশোনা আছে। আবার মাঝে মাঝে দিল্লীর জু-গার্ডেনে বসে থাকতে দেখা যায়, হাতে বায়োলজীর বই। একজন অতগুলো বিষয়ে কি করে যে একই সঙ্গে পড়াশোনা চালাতে পারে ভেবে অবাক হতাম। কিছুদিন পরে তার আর এক পরিচয় পেলাম। রামলিঙ্গম তখন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। দিনকয়েকের মধ্যেই তার প্রভাব বোঝা গেল।

একদিন বললেন, দেখ, আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করলে কি আর পণ্ডিত বলা যায়। তুমি একজন অর্থনীতির ছাত্র, এ্যাঁ, তমি একটা রেফ্রিজারেটার সারাতে পার? পার না। লিওনার্দো তার একটা ডিজাইন করে ছিলেন। যদি সত্যিকারের স্কলার হতে চাও, তবে ওকে ফলো করো। তিনি শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, একাধারে স্থপতি, চিত্রকর, মানবতাবাদী, নৃতত্ত্ববিদ, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। বোঝো ব্যাপার। যে লোক একদিনে মোনালিসা

আঁকছে, লোহ আবার এরোপ্লেনের ছবি আঁকছে, জিনিষটাও তাঁর আবিষ্কার। আমার মনে হয় লিফট জিনিষটাও তাঁর সৃষ্টি, যদি না করে থাকেন, নিশ্চয় এর কোন প্রয়োজন তিনি দেখেন নি। জান, তিনি একজন এ্যাথলেট ছিলেন, আবার ব্যায়াম করতে ভালবাসতেন। আচ্ছা তোমার কাছে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আছে?

আমি তখন ওর বক্তৃতা শুনতে শুনতে সহ্যের শেষ সীমায় চলে গেছি। আর কিছুক্ষণ লিওনার্দোর গুণকীর্তন চললে বোধহয় আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হত, এবার থামুন মশাই। কিন্তু ওর কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, স্ক্রু-ড্রাইভার?

হাঁ, নিয়ে এস, আমি লিফটটাকে ঠিক করে দিচ্ছি, রামলিঙ্গম বলল।

বুঝলাম শুধু কথায় নয়, কাজেও প্রমাণ দেবে ও লিওনার্দোর দ্বিতীয় সংস্করণ। মজা দেখব বলে মিসেস কাউলের কাছ থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার এনে দিলাম। কাউলও এসে পড়েছেন। ভেবেছিলাম ও কিছুক্ষণ খুটখাট করে এসে বলবে, দূর এসব বদ্দি জিনিষ কি আর সারান যায়।

কিন্তু আমাদের সব প্রত্যাশা ব্যর্থ করে রামলিঙ্গম খানিকক্ষণ কি সব করে লিফটাকে সারিয়ে ফেলল। স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে লিফটের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সুইচ টিপে দিল। সড়সড় করে লিফটটা ওপরে উঠে গিয়ে সিলিং-এর সঙ্গে আটকে রইল। নীচে আমরা সবাই ভিড় করেছি। প্রায় আধঘণ্টা পরে হঠাৎ প্রচণ্ড এক আওয়াজ, তারপর ক্যাচক্যাঁচ শব্দ করে লিফট ওপর থেকে নামতে আরম্ভ করল। নীচে এসে রামলিঙ্গম হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল।

সেই থেকে লিফটটা ঠিকই চলে। আমাদের আর কষ্ট করে ছতলার সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয় না। কিন্তু লিফটের মতিগতি কি রকম অদ্ভুত। রামলিঙ্গম একদিন অনেকক্ষণ ধরে লিফটটা দেখল, তারপর বলল, জান, লিফটটা দুটো নিয়মে চলছে। এক নম্বর, এটা শুধু নামার সময়েই থামবে। দু নম্বর, সুইচ টিপলে এটা শুধু ওপরে উঠবে। এস তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি।

রামলিঙ্গম হাত ধরে টানতে টানতে চারতলায় নিয়ে গেল। বোতাম টিপল। নীচের তলায় প্রচণ্ড যান্ত্রিক কলরব উঠল। আদ্যিকালের লিফট তার সব মরচে পড়া হাত-পা নিয়ে নড়েচড়ে উপরে উঠতে লাগল, এসে চারতলায় থামল না, সোজা গিয়ে ছ'তলার মাথায় ধাক্কা মারল, আবার হোটেল কাঁপান আওয়াজ। রামলিঙ্গম শুধু বলল, একনম্বর রুল। এবার লিফট গিয়ার পাল্টাল, তার পর নামতে নামতে ঠিক আমাদের পায়ের ছইঞ্চি তলায় এসে থামল। আমরা লাফ দিয়ে উঠলাম। লিফট নীচের দিকে না গিয়ে সোজা ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। রামলিঙ্গম বলল, দুনম্বর রুল।

আবার লিফট সেই ছ'তলার সিলিং-এ ধাককা মারল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল আমাদের। লিফট তখন নামতে আরম্ভ করল। শেষে নীচে এসে পৌঁছল।

মিসেস কাউল জিজ্ঞেস করলেন, ক্যা চলতা হ্যায় তো?

সকসে—আমি ঘাড় নাড়লাম।

॥ দুই ॥

আমার বেশ কদিন কেটে গেল ওই লিফট নিয়ে। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম রামলিঙ্গম বিবাহিত। প্রথম কদিন ওর স্ত্রীকে কখনও বেরোতে দেখিনি, দু-এক সপ্তাহ পরে বারান্দায় দেখা গেল। আমি যাবার সময় বারবার দেখতাম আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, বোধ হয় কথা বলতে চায় কিন্তু আমার তখন ইউনিভার্সিটির পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে মিশে রাস্তাঘাটে হরদম ওদের দেখে লম্বা-চওড়া রুক্ষ শরীরের প্রতি খুব আকর্ষণ। রামলিঙ্গমের স্ত্রী বেশ বেঁটেখাটো, তামাটে রঙ, গোলগাল দেখতে। আমি শুধু ভাবতাম রামলিঙ্গম একে কি করে বিয়ে করল। ওর স্বভাবের সঙ্গে রামলিঙ্গমের মোটেই মেলে না, উপরন্তু রামলিঙ্গমের চেয়ে ও অনেক ছোট। ওর মেয়ে বললে ভুল হবে না।

রামলিঙ্গম বেলা দশটায় ঘুম থেকে ওঠে, ওর স্ত্রী নিজেই খাবার করে দেয়, কালো কফি, দোসা, লঙ্কার আচার। ওকে কে যেন মাদ্রাজ থেকে প্রায়ই লঙ্কার আচার পার্শেল করে। তারপর সাড়ে এগারোটার সময় খাতাপত্র নিয়ে রামলিঙ্গম বেরিয়ে যায় হয় বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী নয় সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী। একদিন ওর সঙ্গে লাইব্রেরীতে দেখা হয়ে গেল। ও বলল, জান ওরাংওটানদের সমাজব্যবস্থা মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত, তার প্রমাণও আছে।

আমি ওর খাতা দেখলাম, ডানদিক থেকে বাঁদিকে ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে সর্টহ্যাণ্ডে অজস্র নোট করা। চারটের সময় সেদিন লাইব্রেরী থেকে বেরোল। রুমাল দিয়ে মুখটুক মুছে বলল, চল একটু রিজে ঘুরে আসি।

রিজে বিকেল হলেই লোকজনের উৎপাত আরম্ভ হয়। একটু দূরে রাষ্ট্রপতি ভবন। লোকের ভিড় ওদিকে। এদিকে রাস্তা প্রায় ফাঁকা। হঠাৎ রামলিঙ্গমকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা রামলিঙ্গম, কমবয়েসে মানে ধর চব্বিশ-পঁচিশ বছরে কি কোন ছেলের বিয়ে করা উচিত?

নিশ্চয়, মানুষকে সব সময় স্বাভাবিক হতে হবে এবং জীবজন্তুর পক্ষে জোড়া-জোড়া থাকাই স্বাভাবিক, ও বলল।

কিন্তু এমন লোকও তো আছে যারা ব্যচিলর থাকতেই পছন্দ করে।

না, যা স্বাভাবিক তাই করাতেই শুধু আনন্দ পাওয়া যায়। প্রকৃতিকে সব সময় মানতে হবে।

কিন্তু তোমার বেলায়, আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, মানে তোমার এখন যে বয়স সে বয়সে—।

আমি কথাটা শেষ করলাম না দেখে ও হাসল আমার ইতস্তত ভাব লক্ষ্য

করে। বলল, দেখ, তুমি এখনও ছেলে-মানুষ। হাঁ, এ ব্যাপারে ঠিকই বলেছ। তুমি যা বলতে চাইছ আমি বুঝেছি। আমার সত্যিই ভোগ করার বয়স পেরিয়ে গেছে। তুমি নিশ্চয় প্লেটো পড়েছ? আচ্ছা রিপাবলিকে আছে না প্লেটো যখন সিপালুসকে জিজ্ঞেস করলেন যে এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি কোন মহিলাকে ভালবাসতে পারেন কি না। সিপালুস বললেন, যৌবনের ভালবাসার কথা মনে পড়লে মনে হয় এক আচ্ছন্ন পাগলামী কাটিয়ে আসতে পেরেছি। ঠিক সেই রকম আমার বেলায়, আমি বেশ বেশী বয়সে বিয়ে করেছি। যৌবনে তো কোন কিছুই পেলাম না। জানি, আমার বুড়ো-বয়সে ভালবাসার জন্যেই হাহাকার করতে হবে। এটাই আমার শাস্তি, আমি স্বাভাবিক হইনি যে। রামলিঙ্গম বেশ স্বাভাবিকভাবে বলল।

আমি বোকার মত জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

যে বয়সে আনন্দ নেওয়ার মন থাকে না তাই, গরম চা সকালে খেতেই তো ভাল লাগে। ও বলল।

তারপর কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগলাম। সেই নির্জন রাস্তায় আস্তে আস্তে রাম-লিঙ্গমের এক গোপন ব্যথার সন্ধান পাচ্ছিলাম।

হোটেলে ফিরে চারতলায় উঠে ও নিজের ঘরের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াতে বললাম, এরাইভদারসি মাসত্রো।

রামলিঙ্গম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আরে তুমি ফ্রেঞ্চ শিখলে কবে? শেখ, চালিয়ে যাও। রামলিঙ্গমকে খুশী করতে পেরে আমি আনন্দ পেলাম।

॥ তিন ॥

রামলিঙ্গম তার ভোগ করার সময় পেরিয়ে গেছে ভেবে নিজেকে অভি-নন্দন জানাতে পারে, কিন্তু তার স্ত্রী নয়। একদিন ওর সঙ্গে হোটেলের অফিসে দেখা হয়ে গেল। ওই প্রথমে দেখে একগাল হেসে বলল, নমস্তে। তারপর যেন অভিযোগের সুরে বলল, আপনি কারুর সঙ্গে কথা বলেন না কেন?

আমি অবাক হয়ে কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না, অবশেষে বললাম, কেন বলিতো?

ও বলল, আমার নাম বিজয়শ্রী।

বাঃ বেশ সুন্দর তো।

আমার হাসব্যাণ্ড ডঃ রামলিঙ্গম। ফিলসফির ডক্টরেট।

হাঁ, জানি।

কিন্তু মানুষটাকে দেখে কে বলবে? নিজের সম্বন্ধে এ রকম উদাসীন কাউকে দেখিনি। তা ছাড়া বয়েসও তো অনেক হল। চা খাবার সময় ঠোঁটের কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। আপনি নভেল ভালবাসেন?

আমার ওর সঙ্গে তর্ক করার কোন ইচ্ছা ছিল না, শুধু হ্যাঁ বললে ও যদি কবিতার ভক্ত হয় তবে তর্ক হবেই।

তাই সতর্কভাবে বললাম, হাঁ, কিছু কিছু।

আমার ঘরে আসবেন না একদিন, আমার আবার বই-এর সখ। একা একা থাকি, কেউ সঙ্গী নেই। ও তো রোজ লাইব্রেরীতে চলে যায় আর ফেরে সেই সন্ধ্যেবেলায়।

আমি বললাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাকে তো ইউনিভার্সিটি যেতে হয় আর সন্ধ্যেবেলায় আমার পড়া থাকে। আচ্ছা যাব একদিন।

আপনার নাম কিন্তু জানলাম না এখনও—ও হঠাৎ বলল।

গলার স্বর শুনে বুঝলাম ও আমার কথা এতক্ষণ শুনছিল না। বিজয়শ্রীর সঙ্গে এই নয়, আরও ক'বার দেখা হল, দেখা হলেই বেশ বুঝতে পারতাম ওর অনেকক্ষণ ধরে গল্প করার ইচ্ছে। আমি খানিকক্ষণ কথা বলার পরই বলতাম, আচ্ছা যাচ্ছি, আমার ইউনিভার্সিটির সময় হয়ে গেল, কিংবা মিঃ রামলিঙ্গমকে আজ অসুস্থ মনে হচ্ছিল যেন? রামলিঙ্গমের নাম শুনলেই ও নিজের থেকেই কথা শেষ করে চলে যেত।

মিসেস কাউল একদিন বললেন, জোয়ান বিবি, বুড্ডা মরদ, যা হবার তাই হচ্ছে। অবশ্য সাউথ ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারই আলাদা।

ওর গলার স্বর শুনে স্পষ্ট বোঝা গেল মিসেস কাউল নিজের আর্যরক্তের জন্যে খুবই গর্বিত। আমি বললাম, সাউথ ইণ্ডিয়ান তো কি হয়েছে?

দেখবে, নিজেই দেখবে।

সেদিন দুপুর বেলারই ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। গুরু নানকের মৃত্যুদিন। হোটেলে ফিরে লিফটে উঠতে গিয়ে দেখি একজন কমবয়েসী পাঞ্জাবী, গায়ে টিকিট কালেক্টরদের মত সাজপোষাক—আমার সঙ্গে লিফটে উঠল। ওর কোটের বোতাম খোলা, সার্টের একটা বোতাম ছেঁড়া, তার ফাঁক দিয়ে বুকের লোম বেরিয়ে, গালে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল জাল দিয়ে পরিষ্কারভাবে আটকান। এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম, সেও আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি মুখ ফেরাতে অস্বস্তির সঙ্গে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। ঠিক চারতলাতেই ও লিফট থেকে নামল। নেমে সোজা রামলিঙ্গমের ঘরে ঢুকে গেল।

ঘরে গিয়ে জামাপ্যাণ্ট ছেড়ে পড়তে চেষ্টা করলাম। রামলিঙ্গম আর আমার ঘর পাশাপাশি। মধ্যে কাঠের পার্টিশান। গরমের দিন। জানলা খোলা, ওঘর থেকে নানা ধরণের চাপা আওয়াজ ভেসে আসছিল। প্রথমে অস্ফুটস্বরের আলাপ, তারপর সচকিত হাসি, হঠাৎ ধস্তাধস্তির আওয়াজ, কে যেন কাকে বাধা দিচ্ছে। তারপর দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। আমি বই বন্ধ করে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম।

আপনার কথাই ঠিক, মিসেস কাউলকে বললাম।

দেখলে তো? মিসেস কাউল বললেন, ছেলেটা খুব ফিটফাট। ওর

মাত্র ৭ দিনে সুনীতার মুখশ্রী হয়ে উঠল আরো পরিষ্কার, কোমল, লাবণ্যমণ্ডিত; আর এই অঘটন ঘটিয়ে দিল

৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা

অনেক সোহাগের আর মাত্র ৭ দিন বাকি। অরূপ তো সেখানে থাকবেই! আমার দিকে কি ওর নজর পড়বে? নিয়ে আশা—মুখের যা চেহারা হয়েছে—শুকনো, ফ্যাকাশে…চকিতে আমার জ্যোতির কথা মনে পড়ে গেল। ৭ দিনেই ওর চেহারা ফিরে গিয়েছিল পণ্ড্‌স-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্য ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে।

পরিকল্পনা ও তার কাজ
এক সপ্তাহ ধরে রোজ রাত্তিরে দুবার আমি পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মাখতে লাগলুম। প্রথমবারে ত্বকের ময়লা এবং মেক-আপ পরিষ্কার হয়ে গেল।

তারপর খুব নরম টিস্যু কাগজ দিয়ে ক্রীম মুছে ফেললুম।

দ্বিতীয় বার আবার ক্রীম মাখলুম। এবং এটাই হল আমার রূপলাবণ্যের চাবিকাঠি। এবারের ক্রীম ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে এমন সব লুকানো ময়লা বের করে দিল, জল ও সাবান যার নাগাল পায় না। এই দুবার ক্রীম মাখার ফলে মুখশ্রী সত্যিই ফুটফুটে, তাজা আর কমনীয় হয়ে উঠল।

পার্টিতে—৭ দিনের দিন আমার মুখশ্রী হয়ে উঠল উজ্জ্বল, মসৃণ, লাবণ্যে অপরূপ। আর হ্যাঁ, অরূপ যে আমার চেহারার তারিফ করল তা বলাই বাহুল্য!

আমি ঠিক করে ফেললুম, পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম দিয়ে নিয়মিতভাবে রূপচর্চা চালিয়ে যাবো যাতে আমার মুখশ্রী সব সময় ফুটফুটে, কোমল ও লাবণ্যমণ্ডিত থাকে।

আজই মাখুন পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম—পৃথিবীতে এই মুখশ্রী-পরিষ্কারক ক্রীমই কাটতিতে সবার ওপরে

পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম

পৃথিবীতে এই মুখশ্রী-পরিষ্কারক ক্রীমই কাটতিতে সবার ওপরে

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)
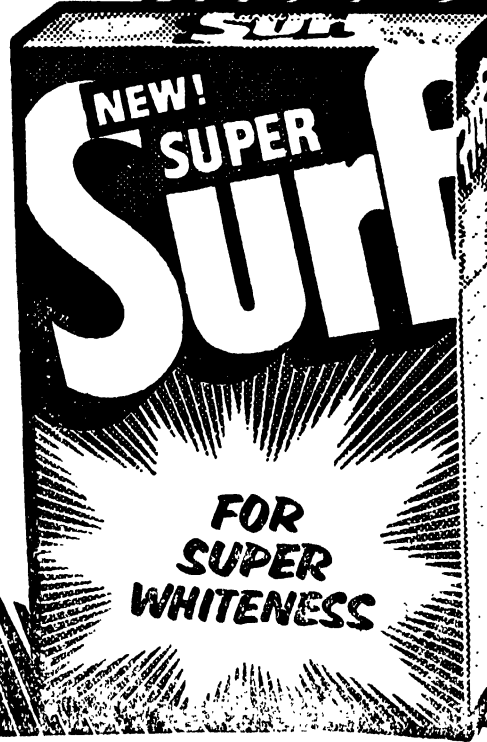
নতুন
সুপার
সার্ফ
'অনুপম
ফর্সা'
ক'রে ধোয়
NEW! SUPER
Surf
FOR SUPER WHITENESS
সুপার সার্ফের রয়েছে অনুপম ধোওয়ার ক্ষমতা! সুপার সার্ফ দিয়ে ধুলে আপনার সব জামাকাপড়ের ময়লা একেবারে সাফ হয়ে যায়—তা সে যত পুরু ময়লাই হোক না কেন। চোখে দেখা যায় না এমন সব ময়লাও সুপার সার্ফ দিয়ে ধুলে স্বচ্ছন্দে উঠে যায়। তাছাড়া এতে আপনার সব জামাকাপড় একেবারে ধবধবে পরিষ্কার হয়ে যায়। নীল প্রভৃতি অন্য কোন পাউডার মেশাবার প্রয়োজন নেই। সুপার সার্ফ গাদা গাদা জামাকাপড় ধোওয়ার বোঝা হাল্কা করে দেয়। আর কী মনোরম এর তাজা সুগন্ধ। অন্য কোন কাপড় কাচার পাউডার থেকে কি এত কিছু পাওয়া যায়!
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সাবধানতার
চাবিটি
তাঁর হাতে
তিনি ঝুঁকি নিতে চান না। তাঁর মূল্যবান
সম্পদ তিনি পি এন বি-র নিরাপদ লকারে
রেখে দিয়েছেন, আর এর দরুন খরচও অতি
সামান্য—বছরে মাত্র ২০৲ টাকা। ভেবে দেখুন,
দিনে ৬ পয়সারও কম। আপনার দামী জিনিষগুলির
সম্পূর্ণ নিরাপত্তার জন্য এ খরচটা কিছুই নয়।
আপনার মূল্যবান সম্পদ পি এন বি-র লকারে নিরাপদে
থাকবে।
পাঞ্জাব
ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক
১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত
চেয়ারম্যান : এস. সি. ত্রিখা
PR-PNB-6813-B
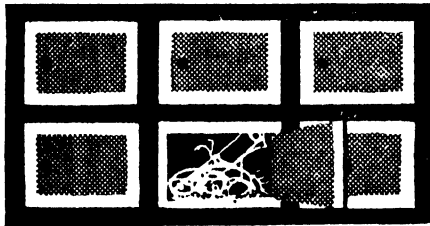
নাম পারমিত সিং, দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনের টিকিট কালেক্টর।

সে যাই হোক, আপনি এ সব ব্যাপার এখানে চলতে দিচ্ছেন কেন?

কি সব ব্যাপার?

এই ধরণের দেখাসাক্ষাৎ।

দেখ, আমি আর কি করব। এটা তো স্কুলবোর্ডিং নয়, এটা হোটেল, আমি বারণ করতে পারি না।

সেদিন দুপুরে পড়াশোনা শিকেয় উঠল। ঘরে থাকতে না পেরে, রাস্তায় ঘুরে বেড়াব বলে বেরিয়ে পড়লাম। আমার মধ্যে তখন ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধ চলেছে। হোটেলে সবাই যা জানে, রামলিঙ্গমকে তা না জানিয়ে কি করে তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। কিন্তু তাকে বলবই বা কি করে? মিসেস কাউলই ঠিক বলেছেন এটা হোটেল। যার যা হচ্ছে হোক, তাতে আমার কি? কিন্তু এখন আমার যা বয়স, এ সময় সবকিছু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোতেই এক অসহ্য সুখ আছে, ফলাফল যাই হোক না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্নটা বোধ হয় ন্যায়-অন্যায়ের নয়। রামলিঙ্গমের সম্মানের প্রশ্ন এটা। এভাবে যদি হোটেলের একগাদা লোকের কাছে রামলিঙ্গমের সম্মান বিকিয়ে যেতে দিই, তবে তার বন্ধু হিসাবে আমার মর্যাদাই বা কোথায় থাকে? কি করব কিছু ভেবে পেলাম না।

একটু পরেই রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে দেখি দূর থেকে সাদা কাপড়ের কোট সাদা প্যাণ্ট পরে বেঁটেখাটো রামলিঙ্গম আসছে। তখনও তিনটে বাজেনি, এখন তো ওর আসবার কথা নয়। কিন্তু ঘরে তো এখনও পারমিত সিং রয়েছে। ওকে এক্ষুণি আটকান দরকার। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলে আটকে রাখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না, ও এগোতে লাগল। অগত্যা আমিও ওর সঙ্গে চললাম।

আজ তুমি লাইব্রেরী যাওনি? বললাম।

গেছলাম, আজকে তো নানকের মৃত্যুদিন। তাই বন্ধ। আমি অবশ্য অতদূর গিয়ে ফিরে আসিনি। বাস বন্ধ দেখেই বুঝতে পারলাম। ঘণ্টা দুয়েক বুকস্টলে কাটিয়ে এলাম। আচ্ছা, তোমার সেই স্ক্রু-ড্রাইভারটা একবার দিও।

কেন, লিফট কি আবার খারাপ হল নাকি?

হয়ে যেতে পারে। ও বলল।

॥ চার ॥

ও সোজা ওপরে উঠল। এক অসহায় উৎকণ্ঠায় আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি সেই দৃশ্যটা কল্পনা করছিলাম। রামলিঙ্গম তো এক্ষুণি সব জানতে পারবে। পেরে ও কি করবে। মুখের ওপর ছোট ছোট স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছিল। কিন্তু লিফট থেকে নেমে রামলিঙ্গম ওর ঘরের দরজা ঠেলল না একবারও। শুধু চাবির গর্তে কান দিয়ে কি যেন শুনল তারপর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, দি ব্ল্যাক র‍্যাম।

এ্যাঁ, কি বললে?

তোমার সেক্সপীয়র মনে নেই?

'Awake! Even now, now, very now, an old black ram is tupping your white ewe. Arise, arise! Awake the snorting citizens with the Bell or else the devil will make a gran-desire of you.'

ওথেলোর এ্যাক্ট ওয়ান, সিন ওয়ান, মনে পড়ে?

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম। আমার ঘরে ঢুকে রামলিঙ্গমকে বসতে বললাম, ও নিশ্চিন্তে বসল, তারপর আমি বললাম, তোমার কি ব্যাপারটা খুব আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে?

কেন নয়, এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। রামলিঙ্গম শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল। বলল, মানুষের সব অভিজ্ঞতাই থাকা ভাল, আর সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর স্বামী হওয়া। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি বিশ্বস্তই থাকে তবে আর সে বিবাহ স্বাভাবিক কোথায়, এটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক চরম পাপ।

কিন্তু স্বামীর পক্ষে এ সব সহ্য না করাটাই স্বাভাবিক, আমি বললাম।

নিশ্চয়, আমি তা চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু তা খুব সোজা নয়। এ বয়সে আমার বাসনা বলতে কিছু নেই, তাই রাগতেও পারলাম না। বরং ওরা একসঙ্গে থাকুক তাতেই আমার তৃপ্তি। কিছু পরে এটাই তাদের শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে।

ঠিক বুঝলাম না।

তুমি ইকনমিকসের ছাত্র হয়েই যত মুস্কিল করেছ। সাহিত্যের কিছু জান না। দান্তে পড়েছ? দান্তে দুই ব্যভিচারী প্রেমিক-প্রেমিকা পাওলো আর ফ্রান্সিস্কার জন্য কি শাস্তির কথা ভেবেছিলেন? ইনফার্নো মনে আছে? দান্তে জানতেন ওদের পৃথক করে দিলে শুধু সমস্ত ব্যাপারটার ওপর রোমাণ্টিক ভাবাবেগের আবরণ দিয়ে দেওয়া হবে। তার বদলে ওদের চিরকালের জন্য একসঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গরম হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবার নির্দেশ দিলেন। তারাও তাই করতে লাগল অগণিত দর্শকের সামনে। একবার ভেবে দেখো। একটা মানুষ বছরের পর বছর গরমে স্নান না করে বন্ধ একটা জায়গার মধ্যে ঘুরছে, কি শাস্তি! আমার মতে ফ্রান্সিস্কা যে দান্তের কাছে স্বেচ্ছায় সব বলতে এসেছিলো তার একমাত্র কারণ সে অন্তত কিছু সময়ের জন্য তার প্রেমিকের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। দুজনকে একসঙ্গে রেখে দাও ক'দিন, ও সব প্রেমট্রেম উবে যাবে, রামলিঙ্গম থামল এবার।

তক্ষুণি বললাম, দেখ ও সব বাজে কথা রাখ। নিজের অযোগ্যতা ঢাকতে মানুষ অনেক কিছু বলে। কি করতে পার করে দেখাও।

সেই জন্যেই তো তোমার কাছে স্ক্রু-ড্রাইভারটা চাইছি।

জানলার ওপরের তাক থেকে ধুলো ঝেড়ে স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে এলাম। ওটা নিয়ে রামলিঙ্গম বলল,

আমার সঙ্গে আসিতে পার, দেখে যাও আমি কি করছি।

লিফট দিয়ে আমরা নীচে নামলাম। রামলিঙ্গম লিফট থেকে নেমে লিফটের সুইচটা যে ফেসপ্লেট দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে আটকান ছিল, সেটা খুলে ফেলল। ঠিক এভাবেই প্রত্যেক তলায় গিয়ে ফেসপ্লেটগুলো খুলে ফেলল। তারপর আবার লিফটের ভেতরে গিয়ে কণ্ট্রোল নবটা খুলে ফেলে নিজের পকেটে রেখে দিল। তারপর বলল, চল, আমরা ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলি। আমরা আস্তে নিয়ে কথা বলছিলাম তাই না? দরজাটা খোলা থাক, বেশ গরম পড়েছে আজ।

॥ পাঁচ ॥

প্রায় আধঘণ্টা পরে আমার পাশের ঘরে পায়ের শব্দ শুনলাম। তারপর দরজা খোলার। রামলিঙ্গম আস্তে আস্তে বলল, যাচ্ছে।

আমি দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, পারমিত সিং বারান্দা দিয়ে গিয়ে লিফটে উঠল। আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ও লিফটের সুইচ টিপছে। কিছুই হল না। সে সবগুলো সুইচই টিপল, এমন কি লাইটেরটা পর্যন্ত, তারপর চাপা গলায় ডাকল, বিজয়শ্রী, লিফট চলছে না।

এতক্ষণ কি করছ ওখানে। নেমে যাও না, কেউ দেখে ফেলবে যে। ঘর থেকে আওয়াজ এল।

আমি কি করব, লিফট চলছে না।

তাহলে সিঁড়ি দিয়েই যাই।

না না, সিঁড়ি দিয়ে নয়, সবাই দেখবে, সুইচটা টেপ না।

আমি বলছি—।

দূর, একেবারে বোকা, সুইচটা টেপ না।

তুমি এসে করে দেখো না, যদি পার, ও বেশ রেগে উঠে বলল।

বিজয়শ্রী ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ ইতস্তত করল, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে লিফটে উঠল, নিজেই সুইচ টিপল। সবগুলো সুইচই টিপল। কিছুতেই কিছু হল না। ওরা ও কাজে এমনই ব্যস্ত ছিল যে দেখতে পেল না কখন রামলিঙ্গম বারান্দা দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দেয়ালের ফেসপ্লেট খুলে কি করল। শুধু খানিকবাদে লিফটের দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে যেতে বিজয়শ্রী খাঁচায়-পোরা জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠল, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি-গুলো কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, আস্তে আস্তে লিফট নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমরাও দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। ততক্ষণে লিফটটা নীচে নেমে আবার ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করেছে। ওদের দুজনের সম্মিলিত চিৎকারে সবতলার বাসিন্দারা জেগে উঠেছে, নীচে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু লোক জমে গেছে, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। লিফট ওপরে [illegible] কোথায় অদৃশ্য হয়ে [illegible]ছে। অনেক ওপরে একটা ক্লিং করে শব্দ হল, আবার ওটা নেমে আসতে লাগল। লোকজনেরা সব তলায় ছোটাছুটি কর-ছিল আর সুইচ টিপছিল, কিন্তু কেউ ওটা থামাতে পারল না। প্রতিবারই লিফট যখন নীচে নেমে আসছিল বিজয়শ্রী আর পারমিত সিংকে দেখছিলাম কাঁচের জানলার ভেতর থেকে রাম-লিঙ্গমকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, ওটা যখন ওপরে উঠে যাচ্ছিল ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটির শব্দ শুনছিলাম। গরমের দিন। তায় আবার দিল্লীর গরম। বারকুড়ি ঘোরবার পর পারমিত সিং স্যুট কোট খুলে ফেলল, তারপরে পাগড়ি খুলে গরমে পাগলের মত মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। বিজয়শ্রী শুধু বাঁচাও বাঁচাও বলে চেঁচাচ্ছিল, রামলিঙ্গমের দিকে হাত দেখিয়ে কাতর গলায় বলছিল, বাঁচাও, দোহাই, গরমে মরে যাচ্ছি। একজন বৃদ্ধা বলল, না, কিছু করা উচিত আমাদের।

মিসেস কাউল হাত নেড়ে বলে উঠলেন, কিছুই করা যাবে না, লিফট খারাপ, ওকে কি করে থামান যাবে? তাহলে একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডেকে আনলেই তো হয়।

কিন্তু সেদিন গুরুনানকের মৃত্যু দিন। সব মিস্ত্রীরাই ছুটিতে; লিফট অবিরত ঘুরতে থাকবে সারাদিন, সারা-রাত, যতক্ষণ না কাল সকাল আটটায় ডিফেন্স কলোনী থেকে সাইকেল চেপে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হাজির হয়।

জুয়াড়ী

বসুমিত্র দত্ত

অথচ রঙের তাস সারাবেলা হাতে হাতে ছিল।
অস্পষ্ট হাওয়ায় দুলছে পলাতকা স্মৃতির শরীর
আত্মপ্রতিকৃতি স্থির নির্বিকার কাচের দর্পণে
দুটো শপথের মালা মধ্যপথে ছিঁড়ে গেছে বুঝি
হৃৎপিণ্ডে কান পাতলে অশ্রুপাতের শব্দ পাই।
আলো থেকে অন্ধকারে, প্রেম থেকে প্রেমহীনতায়
অনিবার্য পলায়ন; রক্তের ভিতরে ঘুণপোকা
নিহত স্বপ্নের ছবি এঁকে যায় বিরামবিহীন
প্রতিনায়কের চোখে বশ্যরীতি ঈর্ষার বারুদ।
খেলা শেষ হয়ে গেলে হেঁটমুণ্ডে ঘরে ফিরে যাবো।

উদ্বেগ—মনের শত্রু

'শরীরম্' যে 'ব্যাধি-মন্দিরম্' তার অন্যতম প্রধান কারণ মনের উদ্বেগ।

চিকিৎসা-বিদ্যা আজ কৈশোরোত্তীর্ণ। কিন্তু তার নিতান্ত শৈশবেও আজকের পরিভাষায় 'হাতুড়ে' বৈদ্যদের উক্তি 'চিন্তা জ্বরো মনুষ্যানাম্' এখনও তুল্যমূল্য। তফাৎ কেবল, এ-যুগে মানসিক চিকিৎসার যে বৈজ্ঞানিক বন্দোবস্ত লভ্য, তা সে-যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না।

কোনও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে বলার দরকার নেই অদ্যতন জীবনযাত্রার অচিন্তিতপূর্ব জটিলতা এবং তজ্জনিত মানসিক ক্লান্তির কাহিনী। জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত বলেই তা বিস্ফোরণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অক্ষম।

কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটছে। ছোট-বড় সব রকম। উদ্বিগ্ন মানুষ আজ দিশাহারা। তার প্রমাণ যে-কোনও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই জাজ্বল্যমান।

ব্যক্তিগত উদ্বেগ কমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের আছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও বলা চলে না।

কেন না, বিশেষজ্ঞ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যল্প এবং সাধারণ মানুষ 'সাইকোথেরাপী'-র মত চিকিৎসা করাতে সাধারণত গররাজি। অবাঞ্ছনীয় এজন্য যে, এই চিকিৎসা বেশ জটিল এবং ব্যয়সাধ্য। সুতরাং সত্যিকার প্রয়োজন না হলে, রীতিমত জটিল ক্ষেত্র ছাড়া, এটি কাম্য হতে পারে না।

তা হলে উপায়?

সাধারণ ক্ষেত্রে, একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, আপাতজটিল মনের জট ছাড়ান যায়। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, অবচেতনের বিরুদ্ধে একক লড়াই বেশিদূর পর্যন্ত সম্ভব; বা সকলেই সব 'উদ্বেগ' বুঝে নিতে পারে। মানসিক ভারসাম্যহীনতারই ভিন্ন নাম উদ্বেগ। অর্থাৎ বিবেকের সঙ্গে সব হিসেব ঠিকমত মিলছে না। এ ক্ষতি নিঃশব্দে, অদৃশ্যভাবে হওয়ার ফলে উদ্বিগ্ন ব্যক্তির সামনে আশার আলো থাকে। কোনও উদ্বেগ নিজেরই প্রেরণাজাত টের পাওয়ামাত্র মানসিক আময় অনেকখানি সেরে যায়।

উদ্বেগের কারণগুলো এইভাবে একসঙ্গে বলা চলে: কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে যুক্ত আত্ম-করুণা আর অপরাধ-বোধ। উদ্বিগ্ন মানুষ দীর্ঘদিন মনে করে সে বাহ্যিক বিদ্বেষের শিকার।

তৃপ্তি—নিজেকে নিয়ে শান্ত, নিরুদ্বেগ মানস স্বাচ্ছন্দ্য—অমনি মেলে না, কাঞ্চনমূল্যেও নয়। এজন্য প্রয়োজন অবিরাম কঠোর পরিশ্রম। মনের তিরস্কার এড়াতে হলে বিবেকের কাছে খালাস থাকতে হবেই।

মনের উদ্বেগ 'ব্যাধি'র পর্যায়ে না পৌঁছে থাকলে নিম্নোক্ত নিয়ম ক'টি তা সহনীয় ক'রে তুলতে সহায়ক হওয়া সম্ভব।

●

কেবলমাত্র অবচেতনে যাদের কষ্ট পাওয়ার ইচ্ছা সক্রিয়, তারাই ভাবে দিন যাবে মসৃণ গতিতে, কোনও ঝঞ্ঝাট হবে না, সবাই তাদের প্রতি সদয় এবং আন্তরিকতাপূর্ণ হবে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষও জানে তা হয় না। ছোটখাট বিরক্তি, আশংকা, ঝঞ্ঝাট প্রতিদিনের সঙ্গী। ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো অসম্ভব এবং মাত্রা না ছাড়ালে এসব সে মোটামুটি মানিয়ে নেয়। এগুলো তার চোখে 'প্রলয়ংকর' নয়, বিরক্তি-জনকমাত্র। অধৈর্য সে হয় বৈকি, কিন্তু 'উদ্বিগ্ন' হয় না। বস্তুত এসব হবেই মেনে নিতে পারলে একটা মস্ত যুদ্ধজয় হয়ে গেল। এর মানে উন্নাসিক এবং নৈরাশ্যবাদী হয়ে ওঠা বোঝাচ্ছে না, শুধু অবস্থার সঠিক চেহারা সম্পর্কে স্বীকৃতিদানের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

এই নিয়ম জীবনে কাজে লাগাতে সক্ষম মানুষ ছোটখাট আশাভঙ্গজনিত বেদনা, ভাবী আশঙ্কা, ভুলবোঝাবুঝি ইত্যাদি মানিয়ে নিতে পারে, অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি না পড়লে—আর্থিক, সামাজিক বা অন্য কোনও কারণে—সে আতঙ্কিত হয়ে ক্ষেপে ওঠে না।

●

আলপিনের খোঁচা আর বিপজ্জনক ক্ষতর পার্থক্য বুঝলে ঠাণ্ডা মাথায় বাস্তব অবস্থার মূল্যায়ন করা সম্ভব। অন্য কারও অবাঞ্ছিত কাজের ফলে নিজের ক্ষতি হচ্ছে না—এই বোধ যার হয়েছে তার পক্ষে মাত্রা বজায় রাখা সহজতর। নিছক হাতের কাছে পাওয়ায় কেউ হয়ত নিজের পৌরুষ প্রমাণের জন্যই বলপ্রয়োগ ক'রে বসেছে।

ছিটগ্রস্ত ব্যক্তিকে তুলনা করা চলে একটিমাত্র রেকর্ড-এর অধিকারী মানুষের সঙ্গে, যার নিজস্ব রেকর্ড প্লেয়ার নেই। সেই ওই রেকর্ডটি সর্বত্র বয়ে বেড়ায় এবং আত্মীয়স্বজন, এমন কি অপরিচিত ব্যক্তির রেকর্ড প্লেয়ার-এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত দুঃখের গান বাজিয়ে যায়। রেকর্ডটি এক এবং অদ্বিতীয়, রেকর্ড প্লেয়ার শুধু বদলায়।

●

গালভারি কথার আড়ালে নিজের উদ্বেগ চাপা দেওয়া নিরর্থক। মানুষ নিজেই নিজস্ব উদ্বেগের স্রষ্টা। সুতরাং 'আমি ত এই রকমই', 'ওই লোকটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না,' বা 'এত আধুনিক জীবনের অঙ্গ' ইত্যাদি বুলি আত্মপ্রবঞ্চনার সমার্থক বই নয়।

●

আমরা সকলেই আজ না হয় কাল স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, ব্যক্তিগত সংক্ষোভ প্রশমন আমাদের সাধ্যায়ত্ত

শত্রু। প্রকৃতপক্ষে আমরা গূঢ়তর এক বিবেকশাসিত ('সচেতন', বুদ্ধিগ্রাহ্য, বন্ধুভাবাপন্ন বিবেক নয়)। মূলত এই বিবেকের সামনে উপস্থিত একগুচ্ছ ওজরের নামই জীবন। প্রতিশোধ-কামনায় উদ্দীপিত হলেও সাধারণত আমরা অল্পে তুষ্ট হই। এবং প্রত্যেকটা 'কনসেশন' আমাদের বিবেক-শক্তি বাড়িয়ে তোলে।

শুনতে নিশ্চয় বিশ্রী লাগে। আমাদের ইচ্ছা এবং আশার কী হবে? অপূর্ণই থেকে যাবে ওগুলো? এ-প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক।

'ইচ্ছা' শব্দটি বলতে ঠিক কী বোঝান হচ্ছে তার ওপর উত্তর নির্ভরশীল। সচেতন, না অচেতন ইচ্ছা? অচেতন ইচ্ছা মানুষের কখনও হয় না। সচেতন ইচ্ছাই ব্যক্ত হয়, বিবেক দ্বারা সংশোধিত আকারে। এবং এমন কি এজন্যও আমরা প্রচুর মূল্য দিতে বাধ্য।

●

অচেতন সংক্ষোভজ আত্ম-নিগ্রহ বিশ্বজনীন। আপনিও এই দলে—যদিও প্রত্যেকেই মনে করে সে ব্যতিক্রম। প্রশ্ন হল কত ঘন ঘন, কী পরিমাণে এবং কত সাংঘাতিকভাবে আপনি নিজেকে আহত করেন, আর আত্মাহুক ভাবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এইসব বিপজ্জনক প্রবণতা ফুটে ওঠে।

কারও উৎকেন্দ্রিকতার প্রকাশ খুব সীমিত হলে বুঝতে হবে সে নিজের কাজ এবং আরও হাজারো খুঁটিনাটি ব্যাপারে আত্ম-নিগ্রহের লালসা মিটিয়ে নিতে পারছে। এইভাবেই তার গৃহ আর গার্হস্থ্যজীবন মোটামুটি তৃপ্তিকর। কিন্তু লালসা মাত্রাতিরিক্ত হলে কাজ ভণ্ডুল হয়, বাহ্যিক সাফল্যে মন খুশি হয় না, এমন কি সঙ্গী নির্বাচনেও ভুল হয়ে যায়। সে সর্বদা অসুখী। তার অভিযোগও অন্তহীন।

●

উদ্বেগ আভ্যন্তরীণ সমরের বাহ্যিক প্রকাশ হওয়ায় বোঝা শক্ত উদ্বিগ্নতা ঠিক কোন্ কারণজাত। বিবেক খালি চাবকায় চিকিৎসার প্রয়োজন বাড়াবাড়ি হলে। সাধারণত নিজের আত্ম-নিগ্রহ সম্পর্কে সজাগ হওয়া এবং আত্ম-করুণা সবলে দূর করাই যথেষ্ট। ক্ষেপে ওঠা এবং 'উদ্বেগ' অবদমিত ক্রোধজাত বলে নিজেকে বোঝান ক্ষতিকর।

●

সচেতনভাবে প্রত্যেকে নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু; কিন্তু অচেতনভাবে তা নাও হতে পারে।

কেউ কেউ নিজের কৃতকর্মের ফলে আঘাত পেয়ে তার প্রতিবিধানের চেষ্টায় দারুণ পরাজিত হয়ে মনে মনে নিজের দুর্দশা উপভোগ করে। ভাবে, 'কেবল আমারই ত এ অবস্থা হবে।'

●

সাধারণ মানুষ জানে প্রতি দশটা প্রচেষ্টায় গড়ে একটা সফল হয়। বেশি হলে নিতান্ত সৌভাগ্য মানা ছাড়া গতি নেই। নিজের অন্তর্বিবেক শান্ত করার কৌশলও তার জানা। আত্ম-নিগ্রহকারী কিন্তু ব্যর্থতা অচেতনভাবে প্রকাশ ক'রে ফেলে। নিজেকে ব্যর্থ বোঝানর চেষ্টা মিথ্যে ওজর বই নয়, বিবেকও এতে বেশিদিন খুশি থাকে না।

●

ছোটখাট বিরক্তি বোঝার সেরা উপায় নিজেকে 'এটি কি অন্যায়-সংগ্রহ করার বাতিক?' প্রশ্ন করা। জানতে চাওয়া 'ঘটনাটিকে ভেবেচিন্তে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, এ থেকে যথাসাধ্য বিরক্তি, অপমান, বা বাতিল হওয়ার উপাদান নিংড়ে বের করছি কি? নিজের জন্য দুঃখ হচ্ছে?'

●

বস্তুত উপযুক্ত আলোচনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে সাধারণভাবে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা যাবে বলেই মনে হয়। মাত্রা ছাড়ালে অবশ্য বিশেষজ্ঞ ছাড়া গতি নেই।

—মন-উদাসী

লণ্ডনের আধুনিক আর্ট গ্যালারীর এক বিচিত্র শিল্পকর্ম

ভক্ত দাদু

জর্জ এ্যালেন

জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সকলের মতই শ্রমসঙ্কুল, উপদ্রবময়, সংঘাত সমাকীর্ণ জীবন তাঁকে বরণ করে নিতে হ'ল। নিরুপদ্রব আরামের জীবন তাঁর ললাটলিপিতে অদৃশ্য ছিল। বাহ্যিক বিত্ত ঈশ্বর তাঁকে দেন নি, দেন নি জগতের তথাকথিত সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি—কিন্তু তাঁকে ভরপুর করে দিয়েছিলেন অন্তরের বিত্তে, তাঁর মনের মধ্যে অবিরাম ধারায় প্রবহমাণ ছিল এক সমুদ্র—প্রেমের, ভালবাসার। তাঁর বাসগৃহের অন্ধকার রেড়ির তেলের ক্ষীণ প্রদীপে দূর হোত না কিন্তু অন্তর্লোক উদ্ভাসিত ছিল আলোয় আলোয়। প্রেমের আলোয়।

সে এক গ্রীষ্মকাল। কিন্তু সারা আকাশ মেঘে মেঘে সমাচ্ছন্ন। তখনও দাদুর পরিচয় একটি অতি দরিদ্র, জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত চর্মকারমাত্র।

সমাজের অপাংক্তেয়, নিচের মহলের বাসিন্দা। গণনার মধ্যেই যাঁর স্থান নেই। কিন্তু হঠাৎ না জানি কোন দৈববিধানে—বিধাতার এক অলংঘ নির্দেশে বর্ষণমুখর সেই অপরাহ্নই দাদুর জীবনের মনোমন্দিরে লক্ষপ্রদীপ জ্বালিয়ে তুলল, তাঁর চেতনায় চেতনায় অনুভূতিতে, অনুভূতিতে এক হিল্লোল বইয়ে দিয়ে গেল। তাঁর শিরায় শিরায়, রক্তে রক্তে, ধমনীতে ধমনীতে লাগল কোন অজানার স্পর্শ, যে স্পর্শে হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ারগুলি এক এক করে হয়ে উঠল বাতায়ন-বিমুক্ত—আর সেই উন্মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়েই প্রবেশ করল অবিরাম বেগে রাশি রাশি অনুপমের স্পর্শমণি। এক সম্পূর্ণ অজানা জগতের সিংহদ্বার খুলে গেল তাঁর সামনে, সে জগতে শুধু প্রেম, ভালবাসা, মৈত্রী আর চিরন্তনের প্রত্যক্ষ কৃপার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। সমগ্র জীবন যেন এক অপরিসর অন্ধ গলি অতিক্রম করে উপনীত হ'ল সুপ্রশস্ত আলোকদীপ্ত সীমাহীন সরণিতে।

বৃষ্টির উন্মত্ত উদ্দাম জলধারার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে কমাল আশ্রয় নিলেন দাদুর ঘরে। দাদু তখন দৈনন্দিন রুজিরোজগারের কাজে নিরত। মশক সেলাই চলছে তখন। অতি সঙ্কোচে কমাল ঢুকলেন সেই ঘরে। কমালের সঙ্গে সেদিন যে কথোপকথন হ'ল—সেই স্বল্পকালীন আলাপনই দাদুর জীবনের এই বিরাট উত্তরণের জন্য দায়ী। ক'টি কথা, ক'টি আলোচনা, ক'টি ব্যাখ্যা চর্মকার দাদুকে পরিণত করল সন্ন্যাসী দাদুতে—যার পরিণতি মহাসাধক দাদুতে।

কমাল? ভক্ত কবীরের তিনি আত্মজ। যাঁর জনক জোলা থেকে মহাসাধকের পর্যায়ে উপনীত—তিনিই যেন ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হলেন সামান্য চর্মকারকে অসামান্য সাধকে পরিণতির অভিমুখে হাত বাড়িয়ে নিয়ে যেতে। জীবনের এক নতুন ভাষ্য খুঁজে পেলেন দাদু। মহাজীবনের আহ্বানে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। ভারতের নানা স্থান করলেন পর্যটন। এলেন সকল হিন্দুর প্রাচীনতম এবং পবিত্রতম তীর্থে—তীর্থরাজ বারাণসীতে। বিহার হয়ে এলেন এই সুজলা—সুফলা—মলয়জশীতলা—শস্যশ্যামলা—ভুবনমনোমোহিনী শ্যাম বঙ্গদেশে।

বাঙলা দেশে নাথপন্থী যোগীদের কাছে তিনি পাঠ নেন। নাথপন্থী যোগী হিসাবে একদিন তাঁর নামও ছড়িয়ে পড়ল আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী সমগ্র ভারতভূমিতে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে। উত্তর থেকে দক্ষিণে। হাটে-মাঠে-ঘাটে নগরে-গ্রামে-জনপদে। এলেন রাজস্থানে।

দিল্লীর সিংহাসনে সেদিন বাদশাহ আকবর। ভক্ত-অনুগৃহীতদের ভাষায় যিনি জগদীশ্বরের সঙ্গে তুলনীয়। দূত পাঠালেন সম্রাট। দাদুর সান্নিধ্যলাভে তিনি ইচ্ছুক। দূত এসে বলল, 'সম্রাট আকবর আপনার সাক্ষাৎলাভে ইচ্ছুক।'

নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হ'ল দূতকে। প্রত্যাখ্যানের অর্থ দূত বোঝে নি কিন্তু যিনি বুঝেছিলেন—

পঙ্কের মধ্যেই পদ্মের উদ্ভব। দেবদ্বেষী দৈত্যকুলেই জন্ম নিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ। অস্পৃশ্য চণ্ডাল গুহককে প্রেমালিঙ্গনে কাছে টেনে নিলেন স্বয়ং নীলোৎপল-নবদূর্বাদল-রঘুকুলপতি রাম। তেমনই সাধারণের চোখে অন্ত্যজ, নীচকুলোদ্ভব, অস্পৃশ্য অর্থাৎ জোলা-ধুনুরি-চর্মকার-সম্প্রদায়েই শুভ আবির্ভাব ঘটেছে একাধিক পরমপূজ্য ভক্ত সাধকের, আধ্যাত্মিক জগতের এক-একটি দিকপালের, ভক্তি ও অধ্যাত্মচেতনা অপরূপ ভাষাকারদের—যাঁদের পুণ্য, পূত, পরম প্রতীক্ষিত অভ্যুদয় সনাতন ভারতবর্ষের ভক্তি-সাধনার ধারাকে আরও স্রোতস্বিনী ও বেগবতী করে তুলেছে, ভারতের অধ্যাত্মগগনকে আরও জ্যোতির্বিমণ্ডিত করে তুলেছে, যাঁদের সাধনা বা তপস্যা ভারতবর্ষের মণ্ডল তথা সামগ্রিক সমাজে ভক্তিশীলতার এক নতুন প্লাবন বইয়েছে।

জোলা-ধুনুরি-চর্মকারদের ঘরেই আবির্ভূত এই সব আধারের মধ্যেই আপন মহিমার বিকাশ ঘটিয়েছেন, আপন দ্যুতি বিচ্ছুরিত করেছেন সেই পরমপুরুষ। সর্বজীবের যিনি স্রষ্টা, পালক, সংহারকার—এ ব্যাপারে তিনি শুধু রাজার প্রাসাদকেই নির্বাচিত করেন নি, কৃষকের পর্ণকুটীরকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। এই তালিকায় এক এক করে অনেক নাম মিছিল করে দাঁড়ায় অধ্যাত্ম-মার্গে প্রত্যেকেই এক একটি জ্যোতির্ময় তারা—অমলিন নক্ষত্র—রশ্মিমান সূর্য। বহু নামের মধ্যেই একটি বিশেষ নাম দাদু—ভক্ত-দাদু।

সে এক ফাল্গুন মাস। বহু সাধকের জন্ম-মাস হিসাবে ঋতুরাজ বসন্তের প্রথম মাসটি স্মরণীয়। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ এবং পরম ভট্টারক পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য আবির্ভাবের গরিমায় যে মাস জাতীয় জীবনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে—সেই ফাল্গুন মাস দাদুরও জন্মমাস। ১৫৪৪ সালে এক মুসলমান ধুনকরের গৃহে জন্ম। রূপোর চামচ মুখে দিয়ে তাঁর জন্ম নয়। ধুনকরের ছেলে। জন্ম থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর মিতালি।

তিনি আকবর নিজে। যে ভুল দূত করেছিল---তার সংশোধন করিয়ে আবার তিনি দূতকে পাঠালেন সাধকের নিভৃতকুঞ্জে। এবার এসে বলল---'ভগবৎ-প্রসঙ্গ-লুব্ধ আকবর আপনার সান্নিধ্য পেতেই ইচ্ছুক।'

এবারও ফিরেই যেতে হ'ল—তবে নিরাশ হয়ে নয়।

চল্লিশ দিন ধরে দাদুর সঙ্গে আলোচনা চলল আকবরের। অজস্র প্রশ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছেন জালালউদ্দীন আকবর। প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট—কিন্তু নিরক্ষর চর্মকার-সাধকের কাছে যিনি নিছক কৃপার ভিখারী। প্রশ্ন যেন তাঁর শেষ হতে চায় না দাদুর জ্ঞানগর্ভ, সারসমৃদ্ধ, অতীব উচ্চাঙ্গের জটিল দুরূহ তত্ত্বসমূহের প্রাঞ্জল এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়কপূর্ণ ব্যাখ্যাসমূহে শুধু আকবর কেন, প্রতিটি উপস্থিত আমীর ওমরাহ, পাত্রমিত্র এককথায় বিস্ময়ে হতবাক। প্রত্যেকের ধ্যানে-ধারণায়, চিন্তায়-ভাবনায় যেন প্রচণ্ড আলোড়ন।

আমাদের ধর্মের প্রতিটি পথেরই পথিকরূপে তাঁকে দেখা গেছে। সহজ মন, শূন্যবাদ, নিরঞ্জনবাদ, নাথপন্থা—প্রতিটি মত তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন। এই মতানুসারীদের ব্যাখ্যা, বক্তব্য, ভাবধারা, গভীর আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে অনুধাবন করে মনের মধ্যে এক সুস্পষ্ট আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন। গ্রন্থকার হিসাবেও তিনি অল্পমূল্যের নন। তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে অজপা গায়ত্রী গ্রন্থ, বিরাট পুরাণ, যোগশাস্ত্র, অজপা গ্রন্থ অওর অজপা শ্বাস প্রভৃতির নাম এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বরকে তিনি কোন ছককাটা গণ্ডীর মধ্যে অনেকের মতই সীমাবদ্ধ অবস্থায় দেখেন নি। ভগবানকে তিনি দেখেছেন সর্বমানবের মাঝখানে, প্রতিটি অণুতে, পরমাণুতে, স্থাবরে, জঙ্গমে। মানবের মধ্যেই তিনি মাধবের সাড়া জীবের মধ্যেই তিনি আলেখ্য দেখেছেন শিবের। দাদু অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে যিনি সর্বজীবের কারক তিনি কখনও কোন গণ্ডী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না, তাই পরিব্যাপ্ত সমগ্র নিখিলে কোন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় তাঁকে গণ্ডীবদ্ধ করতে পারে না।

তাই যখনই তাঁকে কেউ প্রশ্ন করেছেন ধর্মসাধন বা সেবাকার্য একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে থেকেই করা হয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর গেছে—আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য---এরা প্রতিমুহূর্তে চিরন্তনের প্রতিশ্রুতিতে মানষের সেবায় নিমগ্ন—তারপরই প্রশ্ন তুলেছেন, এই অবিরাম সেবাকার্য তারা করে চলেছে, কোন ধর্ম, বা বর্ণ বা সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত হয়ে।

আসলে ঈশ্বরকে প্রচলিত গণ্ডীধরা পন্থায় খোঁজার চেষ্টা করেন নি। ঈশ্বরকে তিনি চেয়েছেন এবং পেয়েওছেন হৃদয় উজাড় করা ঐকান্তিকতা ও আকুলতার বিনিময়ে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রায় বলতে শোনা গেছে—আমাকে রসে-বসে রাখিস মা, শুকনো সন্ন্যাসী করিস নি। দাদুও চিরদিন শুকনো জ্ঞানের পথ বর্জন করে চলেছেন। হৃদয়টিকে প্রবল ভক্তিরসে স্নিগ্ধ ও রসাল রেখেছেন। প্রাণহীন গভীর জটিল তত্ত্বে আচ্ছন্ন করে নীরস হতে দেন নি। সব কিছুর উপর ভাব ও মননকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন।

এক বিখ্যাত গায়ক ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করছেন—মূল বিষয়বস্তু ছেড়ে তিনি তাল, লয়, মাত্রা প্রভৃতির দিকেই বেশী নজর দিচ্ছেন। দাদু মৃদুহেসে তাঁকে বললেন—যাঁর বিষয়ে এই গান, তিনি কোথায়? সুর আছে, তাল লয় মাত্রা আছে, তিনি কই? তোমার গানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে প্রকাশ কর।

লোদী এবং বসীবাঈয়ের ছেলে দাদু বিয়ে করলেন 'হাওয়া'কে। ভারতের আরও একজন দিকপাল মরমীয়া সাধক গরীব দাস তাঁদেরই বড় ছেলে। দাদুর বাকী তিন ছেলে-মেয়েরাও অর্থাৎ মসকীন দাস, ননীবাঈ ও মাতাবাঈও সাধনার জগতে এক একটি বিশেষ আসন অধিকারে সক্ষম হয়েছেন।

দাদুর গানগুলিও এক-একটি অসামান্য সম্পদ। ভাবে, ব্যঞ্জনায়, প্রসাদ-গুণে অনবদ্য। প্রতিটি গান তাঁহার হৃদয় উজাড় করা আকুলতা এবং অনুভূতির এক একটি মূল্যবান দৃষ্টান্ত।

দাদুর সমগ্র সঙ্গীতাবলী ও বাণীর মধ্যে এই কথাটি যেমনই মূল্যবান, তেমনই চিত্তস্পর্শী। সামান্য ক'টি কথার মাধ্যমে এক গভীর দুরূহ ঈশ্বর-তত্ত্বের কি সহজপ্রাঞ্জল বিশ্লেষণ—সঙ্গীত হল সূচ, প্রেমধ্যান হল সুতা, এই কায়াকে করলাম কন্থা, যোগী যুগ যুগ ধরে এই কন্থাই পরিধান করে থাকেন, এ কখনও ছিন্ন হয় না।

নারায়ণা। একটি ক্ষুদ্র জনপদ। রাজপুতানার মধ্যে এর অবস্থিতি।

নশ্বরজীবনের অন্তিমলীলা দাদু এখানেই সমাপ্ত করেন। ১৬০৩ সালের বাঙলা ১০১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের এক শনিবার ভারতের শ্রেষ্ঠ মরমীয়া সাধক ভক্তদাদুর নশ্বরলীলা সমাপ্ত হল।

আয়না

শ্রীরবি গুপ্ত

হাতভরা দেখি শোভে শালুকের দল
প্রতিদলে স্বরগের ছবি দেয় মেলে,
এখনি ফুটেছে বুঝি আলো ক'রে জল
উষার স্বপন সাঁঝে গেলো কে যে ফেলে।

অমরার অমলতা হাসি অনাবিল,—
মনে হয় কোনো দূর নয় যেন দূর,
প্রতিটি পাতায় মাখা, করে ঝিলমিল,
চেনা তবু নয় চেনা কথা গান সুর।

তোলে বুকে রাখে যবে নয়নে নয়ন—
প্রথম সরমরাঙা আনন অতুল,
বিম্বিত বৈভব বিত্ত গোপন—
কহি না কে কার শোভা—পাছে করি ভুল।

মীনাক্ষী অনেক দিন পরে তার দাদাকে মুখোমুখি দেখলো। মীনাক্ষী অনেক দিন পরে তার দাদার দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'নাম ঠিকানা জেনে তোমার কোন লাভ হবে না দাদা।'

'লাভ লোকসান আমি বুঝবো, মীনাক্ষ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'নাম ঠিকানাটা আমার জানা দরকার।'

'দরকার নেই দাদা।'

'দরকার নেই মানে? আমি তাকে ধরে এনে বিয়ে করতে বাধ্য করতে চাই।'

মীনাক্ষী ওর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে বলে, 'তোমার সঙ্গে এভাবে এমন স্পষ্ট করে কথা বলতে হবে ভাবি নি দাদা। ভয় ছিলো হয়তো বাবার দরবারে—যাক বলছিই যখন, তখন বলি, বাধ্য করানো বিয়েতে তোমার আস্থা আছে!'

'আস্থা? আস্থা মানে? কিসের আস্থা?'

'মানে যেটা সুখের হবে বলে তোমার ধারণা?'

'সুখের!'

নীলাক্ষর মুখে হঠাৎ একটা উদাস দার্শনিক হাসি ফুটে ওঠে, 'বাধ্য করে ছাড়া অন্য সব বিয়েই সুখের হয়, এই তোর ধারণা?'

মীনাক্ষী স্থির গলায় বলে, 'তবু তার মধ্যে অন্তত সম্ভ্রম আছে।'

'সম্ভ্রম! ওঃ!'

নীলাক্ষ আরো সূক্ষ্ম একটু হাসে, 'সম্ভ্রম কথাটার মানে তো দূরে থাক বানানই জানা নেই মীনা। জানি না কাদের জানা আছে।'

'এটা তুমি কী বলছো দাদা।'

'ঠিকই বলছি মীনা।' মীনাক্ষ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বলে, 'সম্ভ্রম আমাদের কোথায়? সম্ভ্রমবোধই বা কোথায়? সমাজের উঁচু চূড়োয় ওঠবার জন্যে আমরা নীচতার পাতালে নামতেও প্রস্তুত, সম্ভ্রমের সিংহাসনে বসবার টিকিট সংগ্রহ করতে অসম্ভ্রমের নরকে যেতেও পিছপা নই, সবাই সবাইয়ের আসল মুখের চেহারা জানে তবু আমরা মুখোস পরে ঘুরে বেড়াই, আর ভাবি আমি কি সম্ভ্রান্ত। এবং যদি কেউ সে মুখোস খুলে নিজের সত্যি মুখ দেখাতে চায়, তাকে সবাই 'ছি ছি' করে উঠি। কোনো ক্ষেত্রেই তো কেউ কাউকে সম্ভ্রমের চোখে দেখি না। তবে আর ও শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ?'

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মীনাক্ষী মৃদুগলায় বলে, 'অন্যের চোখে সম্ভ্রান্ত হওয়ার কথা বলি নি আমি দাদা, প্রশ্নটা আত্মসম্ভ্রমের।'

নীলাক্ষ ওর ছোট বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। নীলাক্ষ যেন অবাক হয়ে যায়। ওর হঠাৎ মনে হয়, ছোটরা কোন ফাঁকে সহসা বড় হয়ে ওঠে। আমি ভাবছিলাম আমি ওর ভার নেবো। ও নির্বোধ, ও অসহায়, ও আমার ছোট বোন, আমি ওর সহায় হবো। দেখছি কখন ও বড় হয়ে গেছে। ওর আর কারো সাহায্যের দরকার নেই। ও নিজের ভুল নিজেই শোধরাতে চায়। এখানে তবে আমার আর কি করার আছে?

তবু নিজের পূর্ব চিন্তার জের টেনে বললো নীলাক্ষ, 'বেশ,—বিয়েতে তোর আপত্তি থাকে, ঠিকানা পেলে তাকে চাবকে আসতেও পারি।'

'তাতেই বা সম্মান কোথায় দাদা?'

'বেশ। চমৎকার। তুমি তোমার ওই এক ফলস্ সম্মান আর সম্ভ্রমবোধ নিয়ে ধুয়ে জল খাও, আর একটা বদমাইস যা ইচ্ছে অন্যায় করে পার পেয়ে যাক কেমন?

মীনার চোখটা এবার নেমে এসেছিল, মীনা আর দাদার মুখোমুখি তাকাতে পারছিল না, তবু আস্তে বললো সব অন্যায়ের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর মধ্যে স্বস্তি থাকতে পারে দাদা, সত্য নেই। অন্যায় কি আমারই নেই? আমি দুঃসাহস করেছি, আমি যাকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মনে করেছি, তাকেই বিশ্বাসের ভাণ করেছি, আমি মার অবাধ্য হয়েছি, আর—আর আমি আমার পারিবারিক মর্যাদার কথা না ভেবে লুকিয়ে একটা বাজে ছেলের সঙ্গে মিশেছি। প্রতিনিয়ত মনে হয়েছে 'আমি ভুল করছি'—তবু মোহগ্রস্ত হয়ে ভেবেছি ওই 'মনে হওয়াটা' কুসংস্কার। ওর প্রভাব মুক্ত হতে পারাটাই 'আধুনিকতা'। তার একটা মাশুল দিতে হবে বৈকি।'

মীনাক্ষী যে তার দাদার সঙ্গে এমন খোলাখুলি কথা বলতে পারবে, একথা কবে ভেবেছিল মীনাক্ষী? অথচ পারলো। মানুষ যখন কোনো একটা সংকল্পে স্থির হয়, তখন বোধকরি তার এমনি করেই সাহস আসে। আর তখন তার সেই সাহসকে অপরের সমীহ না করে উপায় থাকে না।

নীলাক্ষও করলো সমীহ।

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'তাহলে তুমি কী করবে ঠিক করছো?'

'অহরহ সেটাই ভাবছি।'

নীলাক্ষ একটু ইতস্তত করে বলে ওঠে, 'ময়ূর বলছিল অথচ অতি সহজেই সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

মীনাক্ষী তার দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখে। সেখানে হিতৈষী বড়-ভাইয়ের ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। মীনাক্ষী অবাক হয়। দাদাকে মীনাক্ষী হৃদয়হীন বলেই জেনে এসেছে এতোদিন। ভেবে এসেছে দাদা পারিবারিক বন্ধনহীন। অথচ দাদা তার ছোটো বোনের জন্যে ভাবছে, ব্যাকুল হচ্ছে। তবে হয়তো ওর ওই বন্ধনহীনতার জন্যে এ পরিবারের পরিবেশই দায়ী। চিরদিন মা আছেন তাঁর কল্পিত স্বর্গের সিংহাসনে, বাবা তার অহঙ্কারের গজ-স্তম্ভমিনারে, আমরা অবাঞ্ছিত আমরা অবান্তর। তাই আমরাও স্বার্থপর হয়ে গড়ে উঠেছি। আমরা ভাইবোনে পরস্পরকে ভাল না বেসে সমালোচনা করতে শিখেছি। তবু তার মধ্যে থেকেও দাদা আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছে, ব্যথিত হচ্ছে।

মীনাক্ষীর চোখের কোণটা ভিজে এলো, মীনাক্ষী মাথা নামিয়ে বললো, 'শুধু দিদি কেন, মাও যে সমাধানের নির্দেশ দিতে এসেছিলেন দাদা, কিন্তু একজনের কাছে যা সহজ, অন্যের কাছে তা সহজ নাও হতে পারে। অপরাধ করে তার দণ্ড ফাঁকি দেব, এ আমি ভাবতে পারছি না।---তবু তোমাদের আর বেশীদিন বিপদে ফেলে রাখবো না---'

'বিপদে ফেলে রাখবি না।' নীলাক্ষ ভয় পাওয়া গলায় বলে ওঠে, 'কী করবি তবে? কী তোর মতলব? সুই-সাইড্ করতে চাস বুঝি?'

মীনাক্ষী মুখ তোলে।

মীনাক্ষী মৃদু হাসে।

বলে, 'না দাদা। সেও তো দণ্ড এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়াই। আর তেমন মতি হলে এতোদিন ধরে এতো ভেবে মরবোই বা কেন?

নীলাক্ষ আর একবার পায়চারি করে ঘরটা ঘুরে নেয়। তারপর মীনাক্ষীর খুব কাছে এসে তাড়াতাড়ি বলে, 'জানি না কী তুই ভেবে ঠিক করছিস। আমি তো ফরনাথিং এতো কষ্ট পাওয়ার কোনো মানেই খুঁজে পাচ্ছি না। তুচ্ছ একটা সেণ্টিমেণ্টের জন্যে জীবনটাকে জটিল করে তোলার মধ্যে কী যুক্তি আছে তোদের ভগবানই জানে। যাক—যাই ভাবিস, আর যাই ঠিক করিস, টাকা ফাকার দরকার হলে বলতে লজ্জা পাস নে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মীনাক্ষী ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। দাদার হৃদয়ে যে তার জন্যে এতোটা স্নেহ ছিল তা কবে জেনেছে মীনাক্ষী?

কিন্তু 'ছিল' সে কথা কি নীলাক্ষ নিজেই জানতো? নীলাক্ষ সর্বদাই মনকে 'ঠিক' দিতো 'এ সংসারের কেউ আমার নয়, আমি কারো নই ব্যস।'

অথচ ও ওর ছোটবোনের জন্যে খুব একটা কষ্ট বোধ করছে। ও ওর ছোটবোনের হাতে নিজের চেক বই তুলে দিতে চাইছে।

৬

হয়তো এমনিই হয়।

তাই বিজয়া সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে পর্দা ঝোলানো একটা দরজার দিকে তাকাতে পারেন না। বিজয়ার অহরহ মনে পড়তে থাকে—একটা শিশুর মতো মানুষ শুধু খেতো থাকতো বলে, বিজয়া তাকে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন, বিজয়া তার উচ্ছেদ কামনায় পূজো মানত করতেন। ওই একটা ঘর বরবাদ হয়ে আছে বলে রাগের শেষ ছিল না তাঁর। কিন্তু কই ঘরটার চুকে পড়ে পুরনো চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলে কাজে লাগাবার কথা ভাবতেও পারা যাচ্ছে না কেন?

●

সরোজাক্ষর ছেড়ে আসা কলেজ থেকে সহকর্মী ডক্টর মজুমদার এলেন একদিন সরোজাক্ষর বাড়ি খুঁজে।

তা বাড়ি খুঁজেই।

সরোজাক্ষ আর কবে তাঁর সহকর্মী বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে বাড়ি চিনি-য়েছেন?

কদাচ না।

ছেলে মেয়ের বিয়েতেও না।

নিজের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কর্মজগতে তিনি একেবারে নীরব ছিলেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করলেও যতটা সম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে সারতেন।

অতএব সুজন মজুমদারকে বাড়ি খোঁজার কাজটাই করতে হলো।

এলেন তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের দূত হয়ে। তাঁরা আবার ডাকছেন।

সরোজাক্ষ যখন পুনর্বার কাজে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, যখন বলে-ছিলেন, 'পদত্যাগ করে আমি ভুল করেছি—' ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে কেন নেওয়া সম্ভব হয় নি তার কারণ দর্শে এবং অনুতাপ প্রকাশ করে অনুরোধ জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ সরোজাক্ষ যেন আবার নিজ জায়গায় ফিরে আসেন।

সরোজাক্ষ এ সংবাদে উৎফুল্ল হলেন কি বিব্রত হলেন, কিছুই বোঝা গেল না। নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'রয়েছেন তো একজন?'

মজুমদার হেসে বলেন, 'রয়েছেন, কিন্তু না থাকাতে কতোক্ষণ? একযোগে সবাই মিলে একবার 'অনাস্থা প্রস্তাব' তুললেই—

সরোজাক্ষ প্রায় অবাক গলায় বলেন, 'কিন্তু কেন?'

'কেন আর?' মজুমদার অনি-বার্যের গলায় বলেন, 'ওঁর পড়ানো ছেলেদের ভাল লাগছে না।'

'আমার পড়ানো ভাল লাগতো?'

'কী আশ্চর্য।' এটা কি আর নতুন করে জিগ্যেস করবার কথা?'

'কিন্তু এটা বোধহয় আপনার ভুল ধারণা সুজনবাবু; সরোজাক্ষ বলেন, 'তা' হলে একজন ছাত্রও কোনোদিন আমার কাছে এসে আক্ষেপ প্রকাশ করতো।'

'এসে আক্ষেপ প্রকাশ করবে।' মনের ভাব গোপনে অপটু সুজন

মজুমদার ব্যঙ্গ হাসি হেসে ওঠেন, তাহলেই হয়েছে। ওদের কাছে আমাদের অতো আশা করবার কিছু নেই সরোজবাবু। দয়া করে যার ক্লাশে শেয়াল ডাক ডাকবে না, ধরে নিতে হবে তাকে কিঞ্চিৎ পছন্দ করছে। কিছু ছেলে অবশ্য আছে যারা সভ্য ভদ্র বিনয়ী, কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভয়ে তারাও ক্রমশ মস্তান হয়ে ওঠে। আপনি বরাবরই সাতে-পাঁচে কম থাকেন তাই অতোটা লক্ষ্য করেন না, ভদ্রঘরের ছেলেদের মুখের ভাষা কী হয়েছে যদি শোনেন। বন্ধুতে বন্ধুতে আড্ডা দিচ্ছে, আদরের সম্বোধন হলো, 'শালা মাইরী!' কানে এলে কান গরম হয়ে ওঠে। আমরা বরাবর জানতাম মশাই, ওসব হলো ইতরের ভাষা। এখন শুনছি ওটাই নাকি বাহাদুরী। একটা মাত্র তুচ্ছ নমুনাই শোনালাম আপনাকে, সব কথা আপনার নার্ভ বরদাস্ত করতে পারবে না, তাই বলছি না।---' মজুমদার একবার দম নিয়ে বলেন, বলা হয়—'শিক্ষাই সুরুচির বাহন', তা দেশে শিক্ষার প্রসার যতো বাড়ছে, রুচির বালাই তো ততোই দূরে সরে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার আশ্রয় কলেজগুলোকেই তো মাপকাঠি বলে ধরতে হবে? তা দেখুন তাকিয়ে। সর্বত্রই দেখুন। স্টুডেন্ট মহলে এখন মদ না খাওয়াটা গাঁইয়ামী, মার্জিত ভাষায় কথা বলাটা বুড়োমি, আর দু পাঁচটা করে গার্ল ফ্রেণ্ড না থাকাটা বুদ্ধুমি। এই সব ছেলেরাই ওই উচ্চ শিক্ষার জোরে দেশের দপ্তরে দপ্তরে ছড়িয়ে পড়বে, ছড়িয়ে পড়বে উঁচু পোস্টে গিয়ে বসবে। আর আমরা নির্বোধের মত ভাবতে বসবো দেশের সমস্যা দূর হবে কোন পথে?'

সরোজাক্ষ একটু সোজা হয়ে বসেন। বলেন, 'না শুধু তাই ভাবতে বসবো না, ভাবতে বসবো কোন পদ্ধতিতে অর্থ পুস্তক লিখতে পারলে অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারবো। আর ক্লাশের সময় ফাঁকি দিয়ে কী-ভাবে প্রাইভেট টিউশ্যনীর জন্যে সময় বার করবো।'

মজুমদার অবশ্যই এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই উত্তেজিত গলায় বলেন, 'আপনি' তাহলে ওদেরই সমর্থন করছেন?'

'ভুল করছেন সুজনবাবু, আমি কাউকেই সমর্থন করছি না, আমি শুধু যা ঘটে তাই বলছি।

সুজন মজুমদার কিছু অর্থ পুস্তক লিখেছেন, এবং প্রাইভেট টিউশানীও করে থাকেন তিনি, তাই আক্রমণটা তাঁর গায়ে বাজে। বাড়ি খুঁজে বাড়ি বয়ে যার হিত করতে এসেছেন, তার এই ব্যবহার!

সুজন মজুমদার উত্তেজিত গলায় বলেন, 'শুধু যা ঘটে তাই বলছেন কেন, উদ্দেশ্য নিয়েই বলছেন। তবে ভুলবেন না আমি আপনার হিত চেষ্টাতেই এসেছিলাম।'

সরোজাক্ষ আস্তে বলেন, আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন সুজনবাবু। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখুন আমাদের কি আজ আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আসে নি? শুধু ছেলেদের উপর সব

দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বসে তাদের সমালোচনা করাতেই কর্তব্য শেষ হবে আমাদের?'

'কথাগুলো শুনতে বেশ ভালো বুঝলেন। সুজন মজুমদার উষ্ণভাবেই বলেন, 'সিনেমা থিয়েটার কি গল্পে উপন্যাসে চেঁচিয়ে বলতে পারলে বাহবা পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ খুলে দেখলেই বুঝতে পারবেন কী অবতারই হয়ে উঠেছে আমাদের ছেলেরা। কিছু না হোক শুধু বারোয়ারী পূজোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। পূজোর স্রোত বইছে দেশে। সবাই একযোগে ভক্ত হনুমান হয়ে উঠেছেন, পূজো না করে প্রাণ বাঁচবে না। এর মধ্যেকার তত্ত্বটা কি আর তথ্যটা কি? ভেবে দেখেছেন? এই হাজার হাজার বারোয়ারী পূজোর রসদ আসছে কোথা থেকে? আসলে জুলুমবাজির মাধ্যমে। চোখ রাঙিয়ে চাঁদা আদায় করে পূজোর নামে বেপরোয়া ফুর্তি করবো, এই হচ্ছে লক্ষ্য। এক একটি পূজোর সময় দেশের চেহারা দেখলে বোঝা যাবে এ দেশে দুঃখ আছে? দৈন্য আছে? অভাব আছে? সমস্যা আছে?'

মজুমদারকে বোধকবি সম্প্রতি মোটা চাঁদার হাঁড়িকাঠে গলা দিতে হয়েছে, তাই এ প্রসঙ্গে আরো উদ্দীপ্ত হন। আবেগতপ্ত কণ্ঠে চালিয়েই যান, 'শুধু স্ফূর্তি, শুধু উল্লাস। হৃদয় বলে কিছু নেই, চিন্তা বলে কিছু নেই, মানবিকতা বলে কিছু নেই। নইলে বাংলা দেশের একপ্রান্ত যখন ক্ষয়-ক্ষতি আর মৃত্যুতে শ্মশান হয়ে পড়ে আছে, অপর প্রান্তে তখন উল্লাসের উদ্দাম রোশনাই জ্বলছে।---এইসব ইয়ংদের মধ্যে সহানুভূতি থাকবে না? সমবেদনা থাকবে না? সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার প্রেরণা থাকবে না? প্রেরণা আসে কিসে? না লরী চড়ে তরুণ - তরুণী মিলে সমবেতকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে শহর প্রদক্ষিণ করে 'সাহায্য' সংগ্রহে। তারপর সেসব জিনিসের গতিটা কী হলো হিসেব পাবেন না—আপনি।'

সরোজাক্ষ মৃদু হেসে বলেন, 'সেটাও বলতে পারা যায় যা দেখছে তাই শিখছে।'

সুজন বলেন, 'ওঃ বুঝেছি ঘেরাও হয়ে পর্যন্ত আপনি এখন ওদের ভয় করে চলতে শিখছেন। আমি সে দলে নই। আমি যদি শতবার ঘেরাও হই তো দু' শতবার বলবো আমাদের পরবর্তী জেনারেশান স্রেফ অপদার্থ হয়ে গেছে। ওদের হয়ে বলছেন বলেই বলছি—আপনি ভাবতে পারেন আপনার ছেলেবেলায় আপনার বাবা গুরুতর পীড়িত, অথচ আপনি বরোয়ারি তলায় বসে হল্লা করছেন? আমি অন্তত ভাবতেই পারি না। আমরা ছেলেবেলায় বাড়িতে কারো শক্ত অসুখ করলে কখনো জোরে হেসে উঠতে পারতাম না। আর এখন? প্রত্যক্ষ দেখা, ছেলেরা তো বটেই মেয়েগুলো সুদ্ধ—এই তো আমারই বাড়ির সামনে—এক ভদ্রলোকের সিরিয়াস অসুখ, ডাক্তারে বাড়ি ভর্তি, আর তাঁর এক চোদ্দো-পনেরো বছরের ধিঙ্গী মেয়ে পূজো প্যাণ্ডেলে রাজ্যের মেয়ে ছেলের সঙ্গে হি হি করছে।---জিগ্যেস করলাম, 'বাবা কেমন আছেন আজ?' সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা করুণ করে ফেলে ন্যাকা ন্যাকা গলায় উত্তর দিল, 'আজ তো বাবার খুব বেশী বাড়াবাড়ি।' বুঝুন? এ জ্ঞান আছে 'খুব'- 'বেশী'—'বাড়াবাড়ি'। অথচ মনে এতোটুকু মমতা নেই, ভয় নেই, এমন কি চক্ষু-লজ্জার বালাই পর্যন্ত নেই। এই হচ্ছে এ যুগের ছেলে মেয়ে বুঝলেন? পারিবারিক বন্ধনের ধারই ধারে না।'

সরোজাক্ষ যেন মনশ্চক্ষে কী দেখেন।

সে কি নিজেরই বাড়ির পারিবারিক ছবি?

কে জানে কি।

তবে উত্তর দেন, 'সেও আমাদেরই ত্রুটি সুজন বাবু।---এই অবসরের কমাস আমি কেবল বসে বসে ভেবেছি। অনেক ভেবেছি। আর ভেবে ভেবে দেখতে পাচ্ছি—আমরা বিষের চাষ করে, আমের আশা করছি। যে কর্তব্য বুদ্ধি, যে মমতা, যে সমবেদনা ওদের কাছে আশা করছি, আমরা নিজেরা তো আদর্শ দেখাতে পারছি কই ওদের? আমরা ছেলেবেলায় কি ছিলাম ওরা সেটা দেখতে যাবে না। আমরা এখন কী হয়েছি'? আমরা প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল? আমরা একে অন্যের কথা ভাবি? বেশী কথা কি একই বাড়িতে একজন আর একজনকে বুঝি না, একজন অপরজনকে নিষ্ঠুর আঘাত হেনে বসি। তবে?'

'তবে আর কি? হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভাসাই শ্রেয় তবে।' বিদ্রূপের গলায় কথাটা বলে সুজন মজুমদার দাঁড়িয়ে উঠে বলেন 'আচ্ছা আপনার মতামত জানাবেন পরে।'

'পরে জানাবার কিছু নেই সুজন বাবু,' সরোজাক্ষ বলেন, 'আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি হুগলী কলেজেই 'জয়েন' করবো। আপনার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ।'

সুজন মজুমদার নমস্কার করে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবেন, চিন্তা করছো। হরদম চিন্তা করছো। তার মানে তোমার—হেড কোম্পানীতে গোলমাল বেধেছে।---

তাই তো ভাবে লোকে।

কাউকে তলিয়ে চিন্তা করতে দেখলে আর বিচার করতে বসতে দেখলে বলে, 'লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' চিন্তাহীন বিচারহীন—শুধু অভ্যাসের স্রোতে ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিকতা, সুস্থতা।

একবস্তা কাগজ তো হৈমবতীর কাছে পড়ে রইল, বাকি বস্তাটা ভেবেছিল গঙ্গায় ফেলে দেবে, দিতে গিয়ে দিতে পারলো না। গঙ্গার ঘাটে কতো লোক, হাওড়া ব্রীজে কতো লোক। লোকের চোখকে বড় ভয় সারদাপ্রসাদের।

হয়তো সেইটা ভেবেই মনকে চোখ ঠারছে সে। হয়তো নিজের হাতে করে জলে ফেলে দিতে বুকে বেজেছে। তাই ভাবছে, কলকাতার গঙ্গায় নয়, অন্য কোথাও। নির্জন কোনো ঘাট থেকে। আস্তে আস্তে নেমে নামিয়ে দিয়ে বলবো, মা গঙ্গা, সারাজীবনের বৃথা স্বপ্ন আর বৃথা পরিশ্রমের ভার তোমার কাছেই নামিয়ে রেখে গেলাম।

নামিয়ে রেখে গেলাম।

নামিয়ে রেখে গেলাম।

কিন্তু কোথায় গেলাম?

সারদাপ্রসাদ যেন অবাক হয়ে ভাবে, তারপর আমি কোথায় যাবো? সেই আমার প্রায় অচেনা ভাইপোদের কাছে?

তারপর যে কথাটা জীবনে কখনো মনে পড়েনি সারদাপ্রসাদের সেই কথাটা মনে পড়লো। হয়তো পড়তো না, যদি না সরোজাক্ষ সেদিন সেই অদ্ভুত সন্দেহের কথাটা উচ্চারণ করতেন। সরোজাক্ষ সেই নোটের তাড়াটা দেখে সন্দেহ করেছিলেন সারদাপ্রসাদ তার দেশের জমিজমা বিক্রি করেছে।

সারদাপ্রসাদের তাই হঠাৎ মনে পড়লো দেশে তার জমিজমা আছে। মনে পড়লো সে জমি জমা বেচা যায়। আর বেচলে তা থেকে টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু কতো সেই টাকা? সে টাকায় সারদাপ্রসাদ কোনো একটা জায়গায় নিজের মতো করে থাকতে পারে?

কিন্তু নিজের মতোটাই বা কেমন?

স্পষ্ট কোনো ধারণা করতে পারলো না সারদাপ্রসাদ সেই 'নিজেই মতোটা' সম্পর্কে। সারদাপ্রসাদ আছে, অথচ তার লেখার খাতা নেই। কেমন সেই জীবন? সকাল থেকে রাত অবধি কী তবে করবে সারদা?

সারদা তো ভেবেছিল চাকরী করবে।

সাধারণ মানুষে যা করে তাই করবে। চাকরী খুঁজে খুঁজেই তো বেড়াচ্ছিল। তবে আবার সেই খোঁজার চাকরীটাই ধরুক। তারপর যখন সত্যি চাকরী জুটবে—

কিন্তু জুটলেই বা কি?

কি জন্যে সেটা করবে সারদাপ্রসাদ?

শুধু নিজে কোনো একটা জায়গায় থাকবে, আর কোনোরকমে দু'বেলা খাবে, এই জন্যে? সেই থাকাটা আর খাওয়াটার জন্যে সারদাপ্রসাদকে বাঁধা নিয়মে ঘুম ভেঙে উঠতে হবে, সারদাপ্রসাদকে হয়তো বাজার করতে হব। তারপর দাড়ি কামাতে হবে, চান করতে হবে, ফর্সা কাপড় জামা পরে সেজে গুজে জনতার ভিড় ঠেলে কর্মস্থলে পৌঁছতে হবে, সারাদিন খাটতে হবে।

তারপর?

তারপর আবার কি?

বাড়ি ফিরে হয়তো আবারও দোকান বাজার যেতে হবে, যার উপর রান্নার ভার, সে রান্না ফেলে সারদাপ্রসাদের টাকার ব্যাগটা নিয়ে সরে পড়েছে কিনা খোঁজ করতে হবে, আর সেটা না করে রেঁধে সামনে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে দেখলে কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবানকে সাতসেলাম ঠুকে খেয়ে দেয়ে সকালবেলা যাতে সহজে উঠতে পারা যায়, তাই সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু এ সব কেন করতে হবে?

তার বিনিময়ে কী পাবে সারদাপ্রসাদ?

কী পায় লোকে?

কী আবার? ওই থাকা আর খাওয়া। ঘুরে ফিরে তো সেই একই জায়গায় এসে পৌঁচচ্ছে।

অথচ ভেবে খুব একটা হাসি পাচ্ছে সারদাপ্রসাদের। শুধু ওইটকু পাবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ? কী আশ্চর্য। কী অদ্ভুত।

হয়তো নিজের কাছে নিজেকে ওই রকম আশ্চর্য আর অদ্ভুত লাগে বলেই মানুষ 'লোভ' নামক রথের চাকায় বেঁধে ফেলে নিজেকে। অর্থ লোভ, ক্ষমতার লোভ, নারী লোভ, উদ্দেশ্য সিদ্ধির লোভ, আত্মপ্রচারের লোভ। এই লোভের চাকায় নিজেকে বেঁধে ফেলে কাঁটাবনে ঘসটাতে ঘসটাতে যেতে যেতে তবে মানুষ আপন অকিঞ্চিতকরতাটাকে ভুলে থাকতে পারে। অথবা ভুলে থাকতে চায়। নচেৎ শুধু খাওয়া শোওয়ার জন্যে বেঁচে থাকাটা ভারী অর্থহীন লাগবে যে।

ওই অর্থহীন কাজটার ওপর একটা ইতি টেনে দিলেই বা ক্ষতি কি?

ভাবলো সারদাপ্রসাদ, গঙ্গায় তো জলের অপ্রাচুর্য নেই। আবার ভেবে লজ্জিত হলো। ভাবলো ছি ছি। একী ভাবছি আমি? ভগবানের এই রাজ্যে মহৎকাজের কোনো অভাব আছে?

৩

মীনাক্ষী ভাবেনি, 'ভগবানের এই রাজ্যটা'—

মীনাক্ষী ভাবছিল এতো বড় পৃথিবীটায় এমন এতোটুকু জায়গা নেই যে মীনাক্ষী সেখানে একটু বিশ্রাম নেয়। নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। যেখানে—মাথা নীচু করে থাকতে হবে না। যেখানে মীনাক্ষী ভাবতে পারবে, 'এখানে আমি আমার মতো করে থাকবো।

পৃথিবীর সেই দুর্লভ কোণটুকু ভেবে পায় না মীনাক্ষী। মীনাক্ষীর সব গোলমাল হয়ে যায়।

আমি কি তবে কাকী-ঠাকুমার আশ্রয়ে গিয়ে উঠবো?

ভাবে মীনাক্ষী, অন্তত কিছুটা দিনের জন্যে।

উনি সংস্কারমুক্ত, উনি সংসারে এক। উনি লোকলজ্জার ধার ধারেন না।

কিন্তু উনি আর আসেন না।

পিসেমশাই থাকলে—তাঁকে দিয়ে বলে পাঠাতে পারতাম।

ভাবতে গেলেই চোখটা জালা করে আসে মীনাক্ষীর। ভাবে পিসেমশাইকে যে আমি এতো ভালবাসতাম তাতো কই কখনো বুঝতে পারিনি। পিসেমশাই দুঃখ পেয়ে চলে গেছেন ভাবলে কী ভয়ানক একটা যন্ত্রণা হয়। পিসেমশাইকে ইচ্ছে করে কতো দুঃখ দিয়েছি, আঘাত করেছি, অবজ্ঞা করেছি, খুব একটা কৌতুকের জায়গা ভেবে মজা করেছি।

অথচ এখন ভেবে মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। কতো ছোট

হয়েছি তাঁর কাছে। কাউকে ছোট করতে গেলে নিজেই যে কতো ছোটো হয়ে যেতে হয়, সেটা বোঝা যায় সেই মানুষটা যদি বিদায় নেয়।

●

মেয়ে যখন আসতো, তখন রোজ আসতো, রোজ থাকতো। আবার এখন আগে না তো আসেই না।

সুনন্দার মা উদ্বিগ্ন হন।

মেয়েজামাই কোনো কারণে রেগে-টেগে যায়নি তো? অথবা মেয়ে?

মহিলাটি চিরকালই সাদাসিধে ঘের-ঘোরী ধরনের। শুধু একটি পরিধির মধ্যে যারা জীবন কাটিয়ে এলেন, কিন্তু নিজেকে কোনোদিন 'ক্ষুদ্র' ভেবে মরমে মরেন নি, বিধাতাকে অভিশাপ দেন নি। তিনি জানেন, তাঁর হাতে যেটুকু আছে সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, সেইটুকু দিয়েই স্বর্গের সাধনা করতে হয়।

মেয়েটিকে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কেমন করেই যে বদলে গেল সেই মেয়ে।

সেই বদলের চেহারাটা সুনন্দার মার কল্পনার বাইরে ছিল।

সুনন্দার মা মেয়ের সেই বদলে যাওয়ার রূপ দেখে ভীত হতেন, লজ্জিত হতেন, ব্যথিত হতেন, কখনো কখনো ঘৃণায় স্তব্ধ হয়ে যেতেন, তবু সাহস করে তার ব্যবহারের সমালোচনা করতে পারতেন না। পারতেন না পাছে সেই সমালোচনার ফলে সে আর না আসে।

মাতৃহৃদয় যে সেইখানেই অসহায়।

পাছে আমার কাছে আর না আসে। পাছে আমাকে আর 'মা' বলে না ডাকে।

এই এক ভয়ঙ্কর ভয়ে মাতৃহৃদয় জেনে বুঝেও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়ে দোষীর কাছে দোষী সাজে।

সেই 'দোষী' মূর্তিতেই সুনন্দার মা স্বামীর কাছে প্রায় কেঁদে পড়লেন। 'কতোদিন আসেনি ওরা, তুমি একবার আগতে বলবে না?'

সুনন্দার বাবা গম্ভীরভাবে বলেন, 'যখন ওদের আসার ইচ্ছে হতো, আসতো। বরং অতিরিক্তই আসতো। এখন ইচ্ছে হয় না আসে না, আসতে বলতে যাবার দরকারটা কি?'

পিতৃহৃদয় মাতৃহৃদয় থেকে অনেক বেশী যুক্তিবাদী এবং বাস্তববাদী।

সুনন্দার বাবা মেয়ে জামাইয়ের তখনকার সেই বেয়াড়া আবদারের বোঝা মুখ বুজে সহ্য করে গেলেও মনে মনে রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, এখন যে আর তাদের সেই প্রত্যহ আসার হল্লোড়টা নেই, তাতে যেন খুশিই আছেন ভদ্রলোক।

মেয়ে জামাইয়ের নিত্য আগমনে তিনি তো প্রায় সংসারে অবান্তর হয়ে পড়েছিলেন। খাওয়ার অনিয়ম, শোওয়ার অনিয়ম বিশ্রামের অনিয়ম। তারপর দুরন্ত একটা বাচ্চা ছেড়ে রেখে দিয়ে নিত্যই তাদের কেটে পড়া। গৃহিণী অতএব কর্তাকে গৃহকর্তার বদলে, গৃহভৃত্যের পোস্টটা দিয়ে রেখে-ছিলেন।

জামাইয়ের জন্যে খাবার আনতে ছোটো, মাংস আনতে ছোটো, নাতি কাঁদলে তাকে সামলাতে পাতালে নামো, আকাশে ওঠো। আর পকেটে পয়সা না থাকলেও পয়সা বার করো।

মহিলারা যদি সব দিকেও বুঝমান হন। ... একটা দিকে ভীষণ অবুঝ। বাপের বাড়ি, আর জামাইবাড়ি।

সুনন্দার বাবা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সংসারটা একটু সমে এসেছে। হঠাৎ গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে সেই অবুঝের আভাস পেলেন। অতএব তিনি চকিত হলেন। শক্ত হলেন।

আর সেই শক্ত পোক্ত গলাতেই বললেন, 'আমি তো কোনোদিন তাদের যেতে বলিনি যে তাই আসতে বলতে যাবো?'

'বা: তা যাবে না? রোজ আসতো হঠাৎ আর একেবারেই কেন—?'

সুনন্দার বাবা বেজার গলায় বলেন, 'পকেটে টাকার ঘাটতি হয়েছে বোধহয়, স্ফূর্তিটা কম হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেকে বোর্ডিঙে রেখে দিয়েছে, আর তোমায় দরকার কি?'

'তুমি তো চিরদিনই ওই রকম নির্মায়িকের মতো কথা কয়ে এলে। বলি—কোনো কারণে রাগ অভিমানও হতে পারে?'

'রাগ অভিমান?' সুনন্দার বাবা তপ্ত গলায় বলেন, 'রাগ অভিমান কিসের? তুমি তো ফুল চন্দন হাতে করে বসে থাকো, আর আমিও কোনো-দিন বলতে যাইনি এ বাড়ির মেয়ে হয়ে তুই মদ খেয়ে টলছিস্? কোন লজ্জায় মুখ দেখাচ্ছিস্? বলিনি, এক-দিনের জন্যেও বলিনি। জামাইকে যখন ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছে, তখন তার জন্যে রাবড়ি রাজভোগ আনতে দোকানে ছুটেছি। তবুও যদি তাঁদের রাগ অভিমান হয়, নাচার।

সুনন্দার মা অভিমানের গলায় বলেন, 'তুমি যে জামাইকে বিষদৃষ্টিতে দেখো তা' আর আমার জানতে বাকি নেই।'

'বাকি নেই? তবু আমাকে দিয়ে তাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠাতে চাইছো? বা:।'

সুনন্দার মা ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, 'তবে কি আমি যাবো?'

'যেতেই হবে কেন, সেটাই আমার প্রশ্ন।'

'সে প্রশ্ন তুমি করতে পারো তোমার কাঠ প্রাণ। সুনন্দার মা কেঁদে ফেলেন, 'তারা যদি আর না আসে, তোমার তো মনেও পড়বে না—কোনোদিন।'

'ওই তো ওইটিতেই চিরদিন জিতে এলে।'

সুনন্দার মধ্যবিত্ত বাপ, তাঁর মধ্য চিত্তটারও নমনা হন। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'বল তো যাই তাঁদের পায়ে ধরে নেমন্তন্ন করে আসি। মেয়ে কি আর তোমার সেই মেয়ে আছে? পেটকাটা জামা পরে পার্টিতে যাচ্ছে, মদ খেয়ে টলছে, শাশুড়ীর ওপর আক্রোশ দেখাতে আর টেক্কা দিতে 'মা' বলে ডেকে এসেছে। এখন হয়তো দরকার ফুরিয়েছে।'

সুনন্দার মা [illegible] বাবাকে বাবার বলেন, 'তা' হলে তুমি ওদের আনতে বলবে না ?'

'না, সেকথা আর বলতে পারছি কই ? তবে বেয়াই বাড়ি বলে ভাবলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বেয়াই একটার বেশী দুটো কথা কন না, বেয়ান ঊর্ধ্বলোক থেকে নামেনই না,—কথা যা কইতো সেই পিসেমশাই ত' সেও তো শুনছি বিদায় নিয়েছে।'

'সুনন্দা তো আছে ? না কি সেও গেলে কথা কইবে না ?'

'কইতেও পারে, না কইতেও পারে। তবে যেতে যখন বলেছো যেতেই হবে।'

এই হচ্ছে সুনন্দার মা বাপ।

অতি সাধারণ।

তারা পরস্পরের মধ্যে কোনোদিন প্রেমের কথার আমদানী করেনি, তারা জীবনের ব্যর্থতা সার্থকতা নিয়ে মাথা ঘামায়নি, তারা তাদের জীবনকে কখনো বোঝা স্বরূপ মনে করে নি।

তারা বাজার করে রান্না করে, তুচ্ছ বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প করে, রাগ করে ঝগড়া করে আবার বলে, 'বলেছো যখন তখন না করে উপায় কি ?'

দাম্পত্য জীবনের এই ছবিই দেখেছে সুনন্দা তার কুমারী জীবনে।

দেখেছে কখনো মা বাবাকে ভয় করে, কখনো বাবা মাকে ভয় করে। কখনো মা কোনো কাজ করে মেয়ের কাছে চুপি চুপি বলেছে, 'এই দেখিস যেন তোর বাপ না জানতে পারে। যা রাগী মানুষ, টের পেলে আর রক্ষে রাখবে না।'

কখনো বাবা কোনো কাজ করে মেয়েকে বলেছে, 'দেখিস বাবা তোর মা যেন না টের পায়, পেলে কেঁদে কেটে অনর্থ করবে। যা ছিঁচকাঁদুনে মানুষ।'

সুনন্দা বড় হয়ে, ওই সুনন্দার সঙ্গেই পরামর্শ।

কিন্তু কিই বা সেই 'কাজ'গুলো ? ভাবলে এখন হাসি পায় সুনন্দার। হয়তো মা একটা 'ছিট কাপড়' ফেরিওয়ালা ডেকে দুগজ ছিট কিনেছে, নয়তো বা একটা বাসনওলা ডেকে পুরনো বাসন বদলে দুটো বাটি কিনেছে।---আর বাবা হয়তো সুনন্দার জন্যে জুতো কিনতে এসে পাঁচ টাকার জুতো কিনে নিয়ে গিয়ে অম্লান বদনে বলেছে গিয়ে, 'এই টুকুন জুতো আট টাকা দাম নিলো, বাজার দেখেছো ?'---হয়তো সুনন্দার মার ফরমাসী কিছু কিনতে এসে দাম দেখে পিছিয়ে গিয়ে, দরাজ গলায় বলেছে, 'কোথাও পেলাম না বুঝলে ? পাঁচ সাতটা দোকান ঘুরলাম, বলে ওটা আজকাল আর পাওয়া যায়না।'

ষড়যন্ত্রের অংশীদার সুনন্দা দোকান বাজারে বাপের সঙ্গে থেকেছে,

তাই সেও সোৎসাহে বলেছে, উঃ হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে।'

আর বাবা যদি কখনো প্রশ্ন করেছে 'এই তোর মা দুপুর বেলা ফেরিওলা টোলা ডাকে না তো ?'

সুনন্দা অপার্থিব মুখে করেছে, 'না তো বাবা।'

এই। এমনিই সব ঘটনা নিয়ে তাদের মান অভিমান ভয় লুকোচুরি। প্রায় ছেলেমানুষের মতো। এই জানতো সুনন্দা।

আক্রোশ নয়, হিংস্রতা নয়, একজন অপরজনকে হেয় করবার চেষ্টায় উঁ-মুখ হয়ে থাকা নয়, হৃদয়ের বন্ধনহীন একটা প্রতিপক্ষের ভাব নিয়ে এক ছাদের তলায় থাকার নির্লজ্জতা নয়।

এরা কি তুচ্ছ ? ক্ষুদ্র ? অসম্ভ্রান্ত ?

এ বাড়িতে এসে সুনন্দা দাম্পত্য জীবনের তার সেই পরিচিত ছবি দেখতে পায়নি। তারপর নিজের জীবনে—

সুনন্দা জানে নীলাক্ষ তার অতি সাধারণ শ্বশুর-শাশুড়ীকে কৃপায় চক্ষে দেখে। প্রয়োজনের খাতিরে তাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করলেও কখনো সমীহের দৃষ্টিতে তাকায় না।

অভাবের মধ্যে থেকেও যারা সুখে থাকতে পারে, তাদের প্রতি বড় অবজ্ঞা নীলাক্ষর।

নীলাক্ষ টাকার অভাবটাকেই একমাত্র 'অভাব' বলে জানে। সেই অভাবটাই উঠে পড়ে লেগে খোঁচাতে চেষ্টা করেছিল নীলাক্ষ 'সুখ' পাবার আশায়।

আর সেই চেষ্টায় মূলধন করেছিল সুনন্দাকে। তাই যখন সুনন্দার হাসিতে কটাক্ষে নাচে গানে তার 'ডীলারদের' মুগ্ধ করে বড় সড় একটা কাজ গুছিয়ে দিয়েছে, তখন নীলাক্ষ সুনন্দাকে আদরে ডুবিয়ে বলেছে 'তুমি আমার একটি সোনার খনি।'

সুনন্দা বলতো, 'আমাকে ভাঙিয়ে তুমি বড়লোক হতে চাইছো ?'

নীলাক্ষ অম্লানবদনে বলতো, 'তা' ভাঙাবার মতো আর কি সম্পত্তি আমার আছে বল ?'

এ বাড়িতে এসে নিজের জীবনে এই দাম্পত্য সম্পর্কে দেখতে পেল সুনন্দা। তবু সুনন্দা এ বাড়িতেই রয়ে গেছে।

আশ্চর্য।

তবে কি ওই লোকটার জন্যেও ভালবাসা রয়েছে সুনন্দার ? সুনন্দা তাই ভাবতে চেষ্টা করেছে, আর কিছু নয় ও নির্বোধ, বড় বেশী নির্বোধ তাই বুঝতে পারছে না কিসের বদলে কী কিনছে।

কিন্তু ভালই যদি বাসে, ওকে তবে সব সময় বিঁধতে ইচ্ছে করে কেন সুনন্দার ?

ব্যঙ্গ হাসির ছুরি দিয়ে, ধারালো কথার তীর দিয়ে দিয়ে।

জানে না, 'কেন'।

তবু নীলাক্ষ যখন তার বোনের কাছ থেকে ফিরে এসে হতাশ গলায় বলে, 'রাস্কেলটার ঠিকানা দিল না।' তখন সুনন্দা সেই তীর মারে। বলে, 'অতো বিচলিতই বা হচ্ছো কেন গো ? তুমি তো এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলে না, মেয়েদের জীবনে এ তো একটা এ্যাকসিডেণ্ট মাত্র। 'পবিত্রতা' 'সতীত্ব' এসব তো তোমার কাছে স্রেফ্ কুসংস্কার।'

নীলাক্ষ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'সতীত্ব মানে ? ওর কি বিয়ে হয়েছে ?'

'ও হো হো তাই তো বটে।' সুনন্দা হি হি করে হাসে, 'কী বোকা আমি। হি হি হি। সত্যি, আমি এমন বোকা কেন বলতো ?'

আচ্ছা অস্বাভাবিকের ভাণ করতে করতে, সুনন্দা কি শেষ পর্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে যাবে ?' [ক্রমশ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ম্যাডোনা—জার্মানীর

শ্রীশুভেন্দু ঘোষ

কলকাতার তখন বোমা পড়ার ভয়ে সবাই শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে সবাই কলকাতা থেকে দূরে নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানে। আমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কথাই বলছি। আমি তখন কলেজের ছাত্র। বাড়ীর সবাই বলল যে তারা মরে ত মরবে কলকাতাতেই মরবে; তবু বাড়ী ছেড়ে কেউ যাবে না। আমার কিন্তু তখন কলকাতার বাইরে যাবার জন্যে মন ছটফট করছে। বেঘোরে কেইবা প্রাণটা হারাতে চায়?

তাই ঠিক করলাম যে আমাকে যে কোন রকমে পালাতেই হবে শহর ছেড়ে। বাড়ী পাওয়া নিয়ে কোন গণ্ডগোল হল না। কি একটা দৈনিক নামটা ঠিক আজও মনে পড়ে [illegible]তে দেখলাম যে শহর থেকে দূরে একটি ঘর পাওয়া যাবে। তবে [illegible]সের ভাড়া একসঙ্গে দিতে হবে। [illegible]নীর যে কটা টাকা কাছে ছিল সেগুলো নিয়ে একটা বাক্স ও একটা বিছানা নিয়ে খেয়ে দেয়ে রওনা দিলাম দুপুরের ট্রেনে।

স্টেশনে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পাড়াগেঁয়ে স্টেশন, আর তা ছাড়া এখনকার মতো [illegible] জায়গায় আলোও তখন ছিল না। [illegible]ক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম এক জায়গায়। অন্ধকারে কিছু ঠাওর করতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম [illegible] একটা অন্ধকার আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি করে দেশলাই জ্বালতে দেখলাম স্টেশন মাস্টার এদিকে আসছেন।

তিনি আমার টিকিট পরীক্ষা করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি কলকাতা থেকে আসছেন? বোমার ভয়ে?

আমি লজ্জামিশ্রিত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—খবরের কাগজে বাড়ীর বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন তো?

আমি বললাম—হ্যাঁ, আজকের দৈনিকের পাতায় একটা বিজ্ঞাপন দেখেই---মানে, চলে এলাম।

তিনি একটু রহস্যময়ভাবে হাসলেন। তারপর বললেন—এই অন্ধকারে আপনি কি বাড়ীটা ঠিক করতে পারবেন তার চেয়ে একটু বসুন। একটু বাদে আমাদের হরি যখন বাড়ী যাবে ওই পথ দিয়ে, তখন ওর সঙ্গে যাবেন।

আমিও তাই শ্রেয়ঃ ভেবে আধ ঘণ্টা মত বসে থাকলাম হরির জন্যে। তখন প্রায় সাতটা বাজে হরি এসে হাঁক দিলো--কইগো বাবু! যাবেন তো চলেন।

পথে তার সঙ্গে অনেক কথাই

হলো। তবে সে সব কথার এখানে উল্লেখ অবান্তর। আমার ভূত দেখার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। যাই হোক, একঘণ্টার পর বন-বাদাড় ভেঙ্গে যখন বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম তখন প্রায় রাত আটটা। হরি যাবার আগে আমার দিকে একটু যেন করুণা-ভরে বলল—তবে চলি গো বাবু।

আমি তার হাতে বকশিশরূপে একটা দুআনি গুঁজে দিতেই সে আর দাঁড়ালো না। আমাকে নমস্কার করে বাড়ীটার দিকে চাইতে চাইতে যেন ছুটে চলে গেল।

আমি একটু দমে গিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখত লাগলাম। একতলা বাড়ী, মাথায় টালি দেওয়া। চারধারে শুধু গাছ আর গাছ। একটা ঘর থেকে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল। দরজা কোথায় অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ কোথায় একটা নিম-পাখী নিম-নিম করে ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার গাটা কেমন ছমছম করে উঠলো। আমার তখন কলকাতার কথা মনে পড়ে গেল। আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হলো না। বাড়ীর মালিকের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম।

তিনি মনে হলো তৈরী হয়েই ছিলেন। বয়স চল্লিশ খানেক হবে। রং কালো বেশ মোটাসোটা। মাথার বিরাট টাকের পটভূমিকায় কয়েক গোছা চুল যাই যাই করছে। হাতে একটি কুপী নিয়ে তিনি আমার মুখ দেখতে লাগলেন। ভদ্রলোকের চোখ দুটো দেখেই বুঝলাম যে বেশ চালাক লোক। আমার আপাদ-মস্তক একবার

দেখে নিয়ে শুধালেন—কাকে চাই? আমাকে? কি প্রয়োজনে?

আমি সমস্ত কথা বলতে তিনি হতাশার সাথে জবাব দিলেন—আর একটু যদি আগে আসতেন, তাহলে আমি ঘরখানা দিতে পারতাম। এই-মাত্র এক ভদ্রলোক ঠিক করে গেলেন তাঁর আত্মীয়র জন্যে। তাঁরা কালই কলকাতা থেকে আসছেন। তবে আমার আর একটা ঘর আছে সেটার ভাড়া ওটার চেয়ে দু টাকা বেশী। আপনি বিপদে পড়েছেন আপনার কাছে বেশী নেব না। একটাকা বেশী দেবেন তাহলেই হবে এখন।

আমি নিরুপায় হয়ে তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। সমস্ত ভাড়া সেইখানেই বুঝে নিয়ে তবে তিনি আমাকে বাড়ী ঢোকালেন। বাড়ীর একেবারে কোণের ঘর। মাঝারী সাইজের। দুদিকে জানালা, দরজা কিছুই নেই। অপর দু দিকের একদিকে শুধু একটা দরজা। আর বাকী দিকটা বাগানের মুখ পড়েছে। সেদিকে দুটো জানালা আছে। ভদ্র-লোক আমাকে সব দেখিয়ে দিয়ে কুপীটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—তবে চললাম, রাতে যদি কোন অসুবিধে হয়, হাঁক দেবেন একছুটে এসে পড়ব। ভয়-ডর কিছু করবেন না। পাশেই তো রইলাম আমরা।

ভদ্রলোক চলে যেতে দরজা এঁটে দিয়ে, বাগানের দিকের জানালায় এসে দাঁড়ালাম। নিবিড় বন বলতে গেলে মাঝে মাঝে রাত-জাগা পাখীর শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। হঠাৎ শর্ শর্ করে শব্দ উঠলো বাগানে। চোখের সামনে সাঁ্যাৎ করে জলজলে কি একটা সরে গেলো। আবার সেই নিমপাখীটা নিম্-নিম্ করে ডেকে উঠলো।

খানিকক্ষণ চুপ চাপ। আবার সেই জলজলে জিনিষটা জেগে উঠলো একটা সবুজ গাছের ফাঁকে। মনে হলো যেন সেটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। জানালাটা ছিটকিনি লাগিয়ে সরে এলাম। অপর জানালাটা আগে থেকেই বন্ধ ছিল। ভাবলাম ভদ্রলোককে ডাকি, পরক্ষণেই ভাবলাম কে জানে ওটা বেড়াল কিম্বা সাপও হতে পারে। সুতরাং মিছিমিছি ওকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

সারাদিনের ক্লান্তির পর আর পারছিলাম না। খাটিয়াটায় শুয়ে পড়লাম নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেই পারিনি। মাঝ রাতে মনে হল যেন খর-খর করে কে দরজা আঁচড়াচ্ছে। খুলব কি খুলব না ভাবছি। এমন সময় আবার সেই খর-খর আওয়াজ। ভাবলাম খুলেই দেখি না। একটা ছুরি হাতে করে, যেটা আমি কলকাতা থেকে রুটি কাটবার জন্যে এনেছিলাম, এগিয়ে গেলাম দরজা খোলবার জন্যে।

দরজা খুলে দেখি কেউ নেই কোথাও। দরজাটা বন্ধ করে সবে খাটিয়াটায় এসে বসেছি। এবার জানালাটায় সেই বিরক্তিকর খর-খর শব্দ। চট করে ছিটকিনিটা খুলতেই একেবারে নাকের সামনে সেই সবুজ জলজলে আলো।

দৌড়ে ছুরিটা কুড়িয়ে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। নিমপাখীটা ডাকছে নিম্ নিম্ নিম্। দূরে দেখলাম ঝোপঝাড় ভেঙ্গে কি একটা ছুটে পালালো।

জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে খাটিয়ায় বসে ভাবতে লাগলাম কলকাতায় পালাব কিনা আবার খানিকক্ষণ আগে দেওয়া টাকাগুলো তাহলে ফেরৎ পাওয়া যাবে না

মোহনবাগান স্পোর্টসে পুরুষদের উচ্চ লম্ফনে বি তালুকদার, ক্লাব সভ্যদের ছেলেদের দৌড়ে আবরণ রায় (মধ্যে) ও মেয়েদের দীর্ঘ লম্ফনে নমিতা ঘোষ

একদিনেই এতটা বিচলিত হওয়া উচিত নয়। বাকী রাতটা নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

পরদিন সকালে বাগানে গিয়ে সাপ বেড়াল কিংবা শেয়াল কোন কিছুই চোখে পড়ল না। তবে এত জঙ্গল যে দিনের বেলায়ও ভয় করে। সেদিন মনটাকে আরও শক্ত করেছিলাম সারা সন্ধ্যেটা জানালার ধারে দাঁড়িয়েও সেই জ্বল জ্বলে জিনিষটা আর চোখে পড়ল না। রাতের দিকে একটু গরম পড়েছিল। খাওয়া শেষ করে বাগানের দিকের জানালা খোলা রেখেই শুয়ে পড়লাম। বেশ গাঢ় ঘুম এসে গিয়েছিল। রাত্রি বারটা নাগাদ হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনলাম সেই নিমপাখীটা আবার নিম নিম করে ডাকছে। মনে হল বোধ হয় সেই জিনিষটা আবার বাগানে এসেছে। পাশ ফিরে যেই উঠতে যাব, খোলা জানালাটার দিকে চোখ পড়ে আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল।

শুধু একটা মুখ, কি বীভৎস। দুটো পাথরের মতো চোখ অপলকে চেয়ে আছে আমার দিকে। খাটিয়া ছেড়ে আর উঠতে পারলাম না। উল্টো পাশ ফিরে শুয়ে থাকলাম। একটু পরে একটা চাপা ক্রূর হাসির শব্দে ফিরে দেখি মুখটা চলে যেতে উদ্যত হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি জানালায় উঠে এসে দেখি কি একটা ভারী জিনিষ ধুপ ধুপ করে চলে গেল। কোথাও কেউ নেই। কেবল নিস্তব্ধতা। একটা পাখী মনে হল উড়ে অন্য গাছে চলে গেল। হতচ্ছাড়া নিম-পাখীটা আবার নিম্ নিম্ করে ডাকতে লাগল। জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। সে রাত্রি আর কিছু হল না।

তারপর রোজ রাত্রিতেই সেই এক সময়ে, এক মুখ, সেই একই জানালায় দেখতে লাগলাম। এই ব্যাপার আমি কিন্তু সেই বাড়ীর মালিককে একবারও জানাইনি। বেশ কয়েক দিন দেখতে দেখতে আমার ভয়টা কিছুটা কমে এসেছিল। ভাবলাম এর রহস্য এবার উদঘাটন করতেই হবে। আমার বরাবরই মনে হচ্ছিল যে এ কোন চোরের কাণ্ড। তাকে এবার হাতে নাতে পাকড়াও করে বাড়ীর মালিকের কাছে নিয়ে যাবো।

সেদিন সন্ধ্যে হতেই খাওয়া শেষ করে, খাটিয়ার ওপর বালিশগুলো রেখে চাদর দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিলাম, যেন দেখলেই মনে হয় একটা মানুষ শুয়ে আছে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে বাগানে এসে একটা উঁচু গাছে চড়ে বসলাম। সেখান থেকে আমার ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়।

একটানা প্রায় পাঁচ-ছ ঘণ্টা বসে থাকবার পর হঠাৎ শুনলাম নিমপাখীটা নিম্ নিম্ করে ডাকছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ক্ষণিকের জন্যে। সতর্ক হয় নিচের দিকে চাইতে মনে হল যেন গাছপালাগুলো দুলছে। একটা মূর্তি দেখলাম এগিয়ে চলেছে আমার জানালার দিকে বাগানের দিকে পিছন ফিরে সেটা স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

আমি আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে পড়ে গুটি গুটি এগুতে লাগলাম। মূর্তিটা আমার উপস্থিতি মোটেই টের পায়নি তখনও। পেছন থেকে গিয়ে আমি তাকে গায়ের জোরে জাপটে ধরলাম। মুখে একটা ঘুষি মারতেই কি একটা খসে পড়ে গেল; পরে দেখেছিলাম যে সেটা একটা মুখোশ। লোকটা তখন প্রাণপণ চেষ্টা করছে পালাবার জন্যে। পেটে সজোরে একটা লাথি মারতেই দড়াম করে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগল। দেশলাইটা জ্বালাতেই আমি ভূত দেখলাম। মূর্তিটি আর কেউ নয়। বাড়ীর মালিক স্বয়ং।

কোন রকমে ধরাধরি করে তাকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তিনি

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বিচিত্র সোভিয়েত ডাকটিকিট

উপরে নানা ধরণের আটখানি বিচিত্র ডাকটিকিট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই টিকিটগুলির মধ্যে দুটি বড় টিকিট আছে। এই টিকিট দুটি সোভিয়েত সীমান্ত রক্ষীদের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। বাকী টিকিটগুলি ১৯৬৮ সালে মস্কো ডাকবিভাগের উপদেষ্টা পরিষদ (সি সি ই পি) কর্তৃক 'সকল দেশের কর্মীরা এক হও' সিরিজের প্রকাশিত ডাকটিকিট। এর মধ্যে উপরের সারির প্রথম টিকিটটি তাজিক সোভিয়েত সাহিত্যের প্রবর্তক সদরউদ্দীন এইনি'র (১৮৭৮—১৯৫৪) ছবি দেওয়া। সোভিয়েত রাষ্ট্রগুরু লেনিনের ছবি দেওয়া একটি টিকিটও আছে এর মধ্যে।

যে কাহিনী আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন তা এইরকম—

তিনি বহু লোকের কাছ থেকে ও রকম অগ্রিম ছ মাসের টাকা নিয়ে তবে বাড়ীতে ঢোকাতেন। মুখোশ পরে দুদিন ভয় দেখাতেই তারা ভূত ভেবে কলকাতায় পালাতো। আর তিনি আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক আনাতেন। কান ধরে আমার সামনে বলেছিলেন যে, আর তিনি ও রকম ব্যবসা করবেন না।

আমি সেখানে কিছুদিন থেকে তারপর কলকাতায় এক বিশেষ প্রয়োজনে চলে আসি। আর ফিরে যাইনি। তবে সেই বিজ্ঞাপন সেই কাগজে আর দেখিনি।

গল্প হলেও সত্যি

অনেকদিন আগের কথা।

নদীয়া জেলার কয়াগ্রামে দুপুর-বেলা একদিন এক কাণ্ড ঘটে গেল। গ্রামের প্রান্তে ছিল একটি দীঘি। জ্যৈষ্ঠ মাস, খাঁ-খাঁ করছে রোদ্দুর। দুপুরে ছয়-সাত বছর বয়সের আট-দশটি ছেলে দীঘির জলে মাতামাতি করছিল। পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা কাঁচা রাস্তা। সচরাচর এই রাস্তায় লোক চলাচল করে না; তাতে আবার গরমকাল। কদাচিৎ দু' একটা লোককে সেই পথ দিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছিল।

দীঘিটার মধ্যে মধ্যে ছিল কলমীর দল। দূরে একটি ছেলে সাঁতার কাটতে গিয়ে পা আটকে ফেলল কলমীর দলে। যতই টানাটানি করে, ততই পা আটকে যায়। ব্যাপার দেখে অন্যান্য ছেলেরা বেশ ঘাবড়ে গেল। কিছু করতে না পেরে তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। উপায় না দেখে একটি কৃষক ছেলে জল থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে ছুটল গাঁয়ের ভিতরে মুখুজ্যেদের বাড়ীর দিকে। বাড়ীতে

শ্রীগণেশ দত্ত

পৌঁছেই চীৎকার করে বলে উঠল, মা-ঠাকরুণ, শীগ্‌গির এসো, তোমাদের ছেলে দীঘির জলে ডুবে যাচ্ছে।

মা তখন সবেমাত্র দ্বাদশীর পারন শেষ করে উঠেছেন। কথাটা মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু বিচলিত হলেন না এতটুকু। বললেন, সে তো সাঁতার জানে, নিজের চেষ্টায় কলমীর দল কেটে বেরিয়ে আসতে বল গে। তাকে জল থেকে তুলতে দোসরা লোক কেউ যাবে না।

বলেই ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

ছেলেটি তখন বিষণ্ণমুখে আস্তে আস্তে চলে গেল।

খেতে বসে মা ভাবছিলেন ছেলের কথা। গলা দিয়ে ভাত নাম ছিল না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এ-ছেলে এমন করে মরতে পারে না। মনের ভেতরটা তোলপাড় করছিল বটে, কিন্তু অধৈর্য হয়ে পড়লেন না। মনে মনে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ছেলেটি এসে হাজির। গা দিয়ে তখনও জল ঝরছে। চোখ দুটো হয়ে উঠেছে রক্তবর্ণ। ঘরে ঢুকতেই মাকে বলল, কলমীর দলে পা-টা আটকে গিয়েছিল। কিন্তু একটুও ভয় পাই নি মা। জোরে একবার টান দিতেই ---সব ক'টা দল পটাপট্ ছিঁড়ে গেল। ব্যস! আমি সাঁতরে জল থেকে উঠে এলাম।

আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে মা বললেন, আশা করি তুমি চিরকাল ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে সব কাজেই এগিয়ে যাবে বাবা। তাতে যদি কোন সাহায্য না পাও, তবু যেন সাহস হারিও না। নিজের উপর বিশ্বাস রেখে ধীরগতিতে এগিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তুমি কাজে সফলতা লাভ করবে।

কে জান এই ছেলেটি? বালেশ্বর-যুদ্ধের নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আমাদের কাছে তিনি 'বাঘা যতীন' নামেই সমধিক পরিচিত। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এঁর যে কি অবদান বড় হয়ে তোমরা জানতে পারবে।
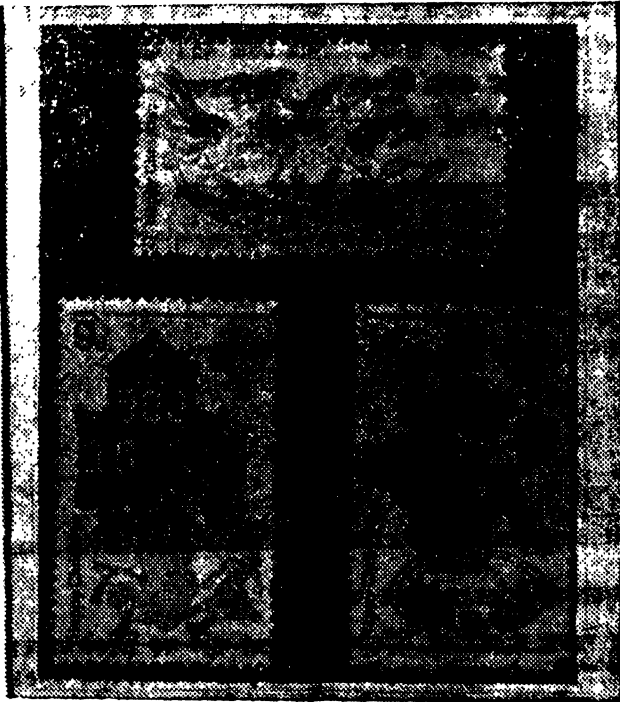
বড়দিনে বিলেতে প্রকাশিত শিশু-উৎসব সম্বন্ধে তিনখানি রঙীন ডাক টিকিট।

হেডা গ্যাবলার

টেসম্যান-দের বাড়ির একই ঘর। সন্ধ্যাকাল। বৈঠকখানা অন্ধকার। টেবিল-এর ওপরে ঝোলান বাতির আলোয় পেছনকার ঘর আলোকিত। কাচের দরজার পরদাগুলো টানা রয়েছে।

কাল পোশাক পরে হেডা অন্ধকার ঘরে ইতস্তত পায়চারী করছেন। তারপর পেছনকার ঘরে গিয়ে তিনি বাঁ দিকে অদৃশ্য হলেন অল্পক্ষণের জন্য। শোনা গেল, তিনি পিয়ানো-র দু'-চারটে সুর তুলেছেন। এবার আবার তাঁকে দেখা গেল, তিনি বৈঠকখানায় ফিরে এলেন।

একটা প্রজ্বলিত বাতি নিয়ে বার্টা ভেতরকার ঘরের মধ্য দিয়ে ঢুকল, বৈঠকখানার কোণে রাখা সেটী-র সামনেকার টেবিল-এর ওপর বাতিটা রাখল। তার চোখ ক্রন্দনের ফলে লাল, তার 'ক্যাপ'-এ কাল রিবন বাঁধা। শান্ত এবং সতর্ক পদে সে ডান দিকে গেল।

কাচের দরজার কাছে গিয়ে পরদা পাশে একটু সরিয়ে হেডা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালেন।

একটু পরেই শোকের বেশ পরিহিতা কুমারী টেসম্যান হলঘর থেকে ভেতরে এলেন। তাঁর মাথায় বনেট, একটা ওড়নাও রয়েছে। তাঁর কাছে গিয়ে হেডা নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কুমারী টেসম্যান। হ্যাঁ হেডা, দেখ আমি এসেছি—একাকী, শোকে কাতর; কারণ আমার হতভাগী বোন এবার শান্তিলাভ করেছে।

হেডা। খবরটা আমি ইতিমধ্যেই পেয়েছি। টেসম্যান আমাকে একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কুমারী টেসম্যান। হ্যাঁ, ও সেইরকম কথা দিয়েছিল বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাবলাম হেডাকে—এই প্রাণপূর্ণ আবাসে—মৃত্যুসংবাদ নিজেরই গিয়ে দিয়ে আসা উচিত।

হেডা। এ আপনার অসীম অনুগ্রহ।

কুমারী টেসম্যান। আহা, এক্ষুণি আমাদের ছেড়ে যাওয়া রীণা-র উচিত হয় নি। হেডা-র বাড়ি এখন শোকের আবাস হয়ে ওঠার সময় নয়।

হেডা। (বিষয় পাল্টে) উনি বেশ শান্তিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, নয়?

কুমারী টেসম্যান। আহা, ওর শেষ মুহূর্তগুলো কী শান্ত, কী সুন্দর। এবং তা ছাড়া জর্জ-কে আবার দেখতে পাওয়ার সুগভীর সুখও সে পেয়েছিল—এবং তাকে বিদায় জানাতেও পেরেছিল। —সে কি বাড়ি ফিরেছে?

হেডা। না। লিখেছিল হয় ত আটকা পড়তে পারে। কিন্তু আপনি কি বসবেন না?

হেনরিক ইবসেন

কুমারী টেসম্যান। না, থাক্, লক্ষ্মী হেডা, এখন নয়। ভালই হত, কিন্তু এত কাজ রয়েছে না। রীনা-র চিরবিশ্রামের বন্দোবস্ত যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে করবোই। সে কবরে শায়িত হবে সব থেকে সুন্দর অবস্থায়।

হেডা। আমি আপনাকে কোনরকমে সাহায্য করতে পারি কি?

কুমারী টেসম্যান। আরে না, না, এ কথা তুমি মোটেই ভাববে না। এই ধরণের বিষাদপূর্ণ ব্যাপারে হেডা টেসম্যান কোনরকমেই জড়িত থাকবে না। তার চিন্তাও এ নিয়ে ভারাক্রান্ত না হয়—অন্তত এ সময়ে নয়।

হেডা গ্যাবলারের ভূমিকায় ওরেল কস্

ইচ্ছাধীন নয়—

কুমারী টেস্‌ম্যান। (কাঁদে চলেছেন) ও হ্যাঁ, পৃথিবীর এই রীতি। বাড়িতে আমরা শবাচ্ছাদন সেলাই করতে থাকবো; এবং এখানেও শীগ্‌গিরই সেলাই করবো ঠিকই—কিন্তু সে অন্য জিনিস, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

[হলঘরের দরজা দিয়ে জরজ টেস্‌ম্যান ঢুকলেন]

হেডা। যাক্‌, শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছো !

টেস্‌ম্যান। জুলিয়া পিসী, তুমি এখানে? হেডার সঙ্গে ? অবস্থাটা ভাবো!

কুমারী টেস্‌ম্যান। আমি সবে যাচ্ছিলাম বাবা। সে যাক্‌, যা করবে বলেছিলে সব করেছ ?

টেস্‌ম্যান। না; নির্ঘাৎ ভুলে গেছি অর্ধেকটা, দেখো। কাল তোমার কাছে নিশ্চয় যাচ্ছি। আজ আমার মাথা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। চিন্তাগুলো ঠিক গোছাতে পারছি না।

কুমারী টেস্‌ম্যান। না জরজ, লক্ষ্মী বাবা আমার, এভাবে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে পাবে না।

টেস্‌ম্যান। করতে পাবো না— ? কী বলতে চাইছ ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। দুঃখের মধ্যেও তোমাকে খুশি হতে হবে, এই ত আমিও তাই করছি—খুশি হবে, কেন না, সে এখন বিশ্রাম পেয়েছে।

টেস্‌ম্যান। ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি রীনা পিসীর কথা ভাবছ।

হেডা। এবার আপনি নিঃসংগ বোধ করবেন।

কুমারী টেস্‌ম্যান। কেবল গোড়ার দিকে ঠিকই। কিন্তু আশা করি এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আমি নিশ্চিত রীনা-র ঘরে থাকার জন্য কাউকে না-কাউকে পেয়ে যাবো।

টেস্‌ম্যান। সত্যি ? কে আসছে ওখানে ? অ্যাঁ ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। সেবাশুশ্রূষা দরকার এমন গরীব পংগু ত রয়েইছে বাবা, দুর্ভাগ্য আমাদের।

হেডা। আপনি কি সত্যি সত্যি আবার এরকম একটা বোঝা ঘাড়ে নেবেন ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। বোঝা! ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন বৌমা—আমার কাছে এটা আদৌ বোঝা ছিল না।

হেডা। কিন্তু ধরুন সম্পূর্ণ অ-পরিচিত কাউকে পেলেন—

কুমারী টেস্‌ম্যান। ও হো, পীড়িতদের সংগে চট্‌পট্‌ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে; তা ছাড়া, বাঁচার জন্যই কাউকে না ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শীগ্‌গিরই এই বাড়িতে কেউ আসতে পারে, একজন বুড়ি পিসীকে ব্যস্ত রাখার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

হেডা। উঁহু, এখানকার কিছু নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।

টেস্‌ম্যান। (অস্বস্তির সংগে) না, কিছুই তিনজন একসঙ্গে কী চমৎকার সময় কাটাতে পারতাম, যদি—?

হেডা। যদি— ?

টেস্‌ম্যান (অস্বস্তির সংগে)। না, কিছুই নয়। সব ঠিক হয়ে যাবে আশা ত তা-ই —অ্যাঁ ?

কুমারী টেস্‌ম্যান। আহা, শোন বাপু, তোমরা দু'জন নির্ঘাৎ নিভৃতে আলাপ করতে ইচ্ছুক। (মৃদু হেসে) এবং হয় ত হেডা তোমাকে কিছু বলতে চায়। বিদায়। এবার রীনা-র কাছে ফিরে যেতেই হবে। (দরজার দিকে ফিরে) ভাবলেও কী ভীষণ অবাক লাগে —রীনা এখন আমার সংগে, আবার আমার ভায়ের সংগেও বটে।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ পিসীমা, ভাবো একবার! অ্যাঁ ?

[হলঘরের দরজা দিয়ে কুমারী টেস্‌ম্যান বেরিয়ে গেলেন]

হেডা। (শীতল, অনুসন্ধিৎসু চোখে টেস্‌ম্যান-কে অনুসরণ করছেন) আমার প্রায় বিশ্বাস যে, তোমার রীনা পিসীর মৃত্যু জুলিয়া পিসীর তুলনায় তোমাকে বেশি বিচলিত করেছে।

টেস্‌ম্যান। আহা, কেবল তাই নয়। এইলার্‌ট সম্পর্কে আমি সাংঘাতিক চিন্তান্বিত।

হেডা। (সংগে সংগে) তাঁর সম্পর্কে নতুন কোন খবর আছে কি ?

টেস্‌ম্যান। পাণ্ডুলিপিটা নিরাপদে আছে বলার জন্য আজ বিকেলে ওর ঘরে উঁকি দিয়েছিলাম।

হেডা। তা বেশ, বন্ধুর দেখা পেলে ?

টেস্‌ম্যান। না। ও বাড়ি ছিল না। কিন্তু পরে শ্রীমতী এল্‌ভসটেড্‌-এর দেখা পেলাম, তিনি আমাকে বললেন এইলার্‌ট ভোরের দিকে এখানে এসেছিল।

হেডা। হ্যাঁ, তুমি যাবার ঠিক পরেই।

টেস্‌ম্যান। এবং, ও তখন বলেছিল পাণ্ডুলিপিটা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে—অ্যাঁ!

হেডা। হ্যাঁ, তিনি তাই ঘোষণা করেছিলেন বটে।

টেস্‌ম্যান। কী কাণ্ড, হায় ভগবান, ও নির্ঘাৎ পুরো পাগল হয়ে গিয়েছিল। পাণ্ডুলিপি ফেরৎ না দেওয়াই কর্তব্য মনে করেছিলে ?

হেডা। না, উনি পাণ্ডুলিপি পান নি।

টেস্‌ম্যান। কিন্তু, বলেছিলে নির্ঘাৎ যে আমাদের কাছে ওটা রয়েছে ?

হেডা। না। (তাড়াতাড়ি) তুমি কি শ্রীমতী এল্‌ভসটেড্‌-কে বলেছিলে ?

টেস্‌ম্যান। না; ভাবলাম না বলাই ভাল। কিন্তু তোমার ওকে বলা উচিত ছিল। কল্পনা করো, যদি হতাশ হয়ে ও নিজেকে আহত ক'রে বসে। হেডা, আমাকে পাণ্ডুলিপিটা দাও। এক্ষুণি ওকে ফেরৎ দিয়ে আসবো। ওটা কোথায় ?

হেডা। (নির্বিকার এবং অনড়, আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে)। আমার কাছে ওটা নেই।

টেস্‌ম্যান। নেই ? যা বাবা, কী বলতে চাইছো ?

হেডা। আমি ওটা পুড়িয়ে ফেলেছি—প্রত্যেকটা পংক্তি।

টেস্‌ম্যান। (সাংঘাতিক ভীতিজনক চমক লেগে) পুড়িয়ে ফেলেছ! এইলার্‌ট-এর পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেছ !

হেডা। ওভাবে ফুঁপিও না। ঝি হয়ত শুনতে পাবে।

টেস্‌ম্যান। পুড়িয়েছ! কেন, হা ঈশ্বর—! না, না, না! এ অসম্ভব!

হেডা। তাই ঘটেছে, সে তুমি যাই বল না কেন।

টেস্‌ম্যান। হেডা, জানো তুমি কী করেছ ? এ হল হারান বস্তু বে-আইনী তছরূপ করা ! একবার কল্পনা কর ! বিচারক ব্র্যাক্‌-কে জিজ্ঞেস কর, তিনিই তোমাকে ব্যাপারটা কী বলে দেবেন।

হেডা। এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু না বলার উপদেশ দিচ্ছি—শোন, বিচারক ব্র্যাক বা অন্য কাউকেই কিছু বোল না।

টেস্‌ম্যান। কিন্তু একেবারে অ-শ্রুতপূর্ব এ কাণ্ড তুমি করলে কী ক'রে ? তোমার মাথায় এটা ঢুকল কীভাবে ? কী ভর করেছিল তোমার ওপর। কই, উত্তর দাও—অ্যাঁ ?

হেডা। (প্রায় অ-দৃশ্য মৃদুহাসি সামলে) জরজ, তোমার জন্যই এ কাজ করেছি।

টেস্‌ম্যান। আমার জন্য!

হেডা। আজ সকালে, যখন তুমি আমাকে উনি কী পড়েছিলেন তা শোনালে—

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারপর কী ?

হেডা। তুমি স্বীকার করেছিলে ওঁর লেখার জন্য ওঁর প্রতি তুমি বিদ্বিষ্ট।

টেস্‌ম্যান। আরে, আমি সত্যিই তা বলি নি।

জর্জ। [illegible]—কেউ যে তোমাকে [illegible] করে রাখবে সেই চিন্তাটাই আমার অসহ্য লাগছিল।

টেসম্যান। (সন্দেহ এবং আনন্দমিশ্রিত ভাবোচ্ছল কণ্ঠে) হেডা! একথা সত্যি? কিন্তু—কিন্তু—আগে ত তোমাকে এভাবে ভালবাসা প্রকাশ করতে দেখি নি। ব্যাপারটা কল্পনা করো!

হেডা। আচ্ছা, তোমাকে আরও বলতে পারি যে—ঠিক এই মুহূর্তে—(ধৈর্য-হীনভাবে থেমে গিয়ে) না, না; জুলিয়া পিসীকে জিজ্ঞেস করতে পারো। তিনি তোমাকে রীতিমত চট্‌পট্‌ বলে দেবেন।

টেসম্যান। ও হেডা, প্রায় মনে হচ্ছে তোমাকে বুঝতে পারছি। (নিজের হাতদুটো একত্রিত করে) কী কাণ্ড রে বাবা! সত্যি তাই বলতে চাইছো! অ্যাঁ?

হেডা। অত চেঁচিও না। ঝি শুনতে পাবে হয়ত।

টেসম্যান। (অদম্য আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে) ঝি! আরে, তুমি কি অদ্ভুত হেডা। এ ত' আমার আদ্যিকালের বার্টা বই নয়! শোন, আমি নিজে বার্টা-কে বলবো।

হেডা। (হতাশ হয়ে নিজের হাত মুচড়ে) আঃ, আমায় মারবে দেখছি—আমায় মেরে ফেলছে, এইসব আগ্‌ড়ুম বাগ্‌ড়ুম।

টেসম্যান। কী হেডা? অ্যাঁ?

হেডা। (নির্বিকার নিজেকে সংযত করে) এইসব আগড়ুম বাগড়ুম জর্জ।

টেসম্যান। আগ্‌ড়ুম বাগ্‌ড়ুম! এই খবর শুনে আমার মাত্রাতিরিক্ত উল্লসিত হওয়ার মধ্যে উদ্‌ভট কিছু দেখতে পেলে? কিন্তু সে যাই হোক্‌—বার্টা-কে বোধহয় কিছু না বলাই ভাল।

হেডা। ওঃ—সেটা-ই বা বাদ যায় কেন?

টেসম্যান। না, না, এখন নয়! কিন্তু জুলিয়া পিসীকে বলবই। এবং তুমি যে আমাকে জর্জ বলে ডাকতে শুরু করেছো, তাও বলতে হবে! একবার ভাবো! আহা, জুলিয়া পিসী কি সুখীই না হবে—কী ভীষণ সুখী!

হেডা। যখন শুনবেন এইলার্ট-এর পাণ্ডু-লিপি পুড়িয়েছি—তোমার কথা ভেবে?

টেসম্যান। না, ওহো শোন—পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত ওই ব্যাপারটা— না, কাউকেই জানাব না। কিন্তু হেডা, তুমি যে আমায় এত ভালবাস—আমার এ [illegible] জন্য জুলিয়া পিসীর অবশ্য পাওয়া উচিত। এখন আমার অবাক লাগছে, এ ধরণের ব্যাপার কি তরুণী বধূদের মধ্যে স্বাভাবিক নয়? অ্যাঁ?

হেডা। আমার মনে হয় এ প্রশ্নটাও জুলিয়া পিসীকে করো।

টেসম্যান। নির্ঘাৎ করবো, আজ, না হয় ত কাল। (আবার তাকে অস্বস্তিপূর্ণ এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে) কিন্তু তবুও এই পাণ্ডুলিপিটা—এই পাণ্ডুলিপিটা! হা ঈশ্বর! এখন বেচারা এইলার্ট-এর কী অবস্থা হবে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

[শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌ হলঘরের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। প্রথম অঙ্কে যে পোশাক পরে-ছিলেন, তাই পরে আছেন।]

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। (তাড়াহুড়োয় তাঁদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করে স্পষ্টতই অস্থিরভাবে বললেন) ভাই হেডা, আবার এলাম বলে দয়া ক'রে কিছু মনে কর না।

হেডা। টায়া, তোমার কী হয়েছে?

টেসম্যান। এইলার্ট লিউভবোর্‌গ সম্পর্কে আরও কিছু—অ্যাঁ!

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। হ্যাঁ! দুর্ভাগ্য ওকে গ্রাস করেছে, বড্ড ভয় করছে আমার।

হেডা (তার হাত পাকড়াও ক'রে)। ও—তোমার তাই মনে হচ্ছে?

টেসম্যান। বা বাবা, ভগবানের দোহাই—কেন আপনার এরকম মনে হচ্ছে।

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। আমার থাকার জায়গায় ঠিক ঢোকার সময় শুনতে পেলাম কারা যেন ওর সম্বন্ধে আলোচনা করছে। হায় হায়, আজ ওর সম্বন্ধে একেবারে অবিশ্বাস্য সব গুজব হাওয়ায় ভাসছে।

টেসম্যান। হ্যাঁ, কল্পনা করুন একবার, আমিও ওইরকম শুনেছি! এবং আমি সাক্ষ্য দিতে পারি সে কাল রাত্রে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা ভাবুন!

হেডা। আচ্ছা, তোমার বোর্‌ডিংহাউস-এ কারা সব কী বলছিল?

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। কিছু পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি নি। হয় ওরা নির্দিষ্ট কিছু জানে না, নয় ত—আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা চুপ করল; আর আমিও জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না।

টেসম্যান। (অস্বস্তিভরে পায়চারী করতে করতে) আমরা নিশ্চয় আশা করবো—আমরা অবশ্যই আশা করবো যে, আপনি ওদের ভুল বুঝেছেন।

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। না, না; আমি নিশ্চিত ওরা ওর বিষয়েই কথা বলছিল। এবং কী একটা যেন কানে এল—হাস-পাতাল অথবা—

টেসম্যান। হাসপাতাল?

হেডা। না—তা কিছুতেই হতে পারে না!

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। হায় ভগবান, আমিও যে কী সাংঘাতিক আতঙ্কিত হয়েছিলাম। আমি ওর বাসস্থানে গিয়ে ওর খোঁজ করেছিলাম।

হেডা। টায়া, মনস্থির ক'রে এতদূর করতে পেরেছিলে!

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। এ ছাড়া আর কীই বা করতে পারতাম? এই মানসিক উৎ-কণ্ঠা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

টেসম্যান। কিন্তু তাকে আপনিও ত' পেলেন না—অ্যাঁ?

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। না। এবং ওরাও ওর সম্বন্ধে কিছু জানত না। ওরা বলল কাল বিকেল থেকে ও বাড়িছাড়া।

টেসম্যান। কাল! আশ্চর্য এ কথা ওরা বলল কী ক'রে

শ্রীমতী এলভস্‌টেড্‌। আমি ঠিক জানি, আমারই কপাল, নির্ঘাৎ ওর সাংঘাতিক একটা কিছু হয়েছে।

টেসম্যান। হ্যাঁ গো হেডা—আচ্ছা, আমি যদি গিয়ে খোঁজখবর নিই তা হলে?

হেডা। না, না—এর মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেল না।

[হ্যাট হাতে বিচারক ব্র্যাক হলঘরের দরজা দিয়ে ঢুকলেন, বার্টা প্রথমে
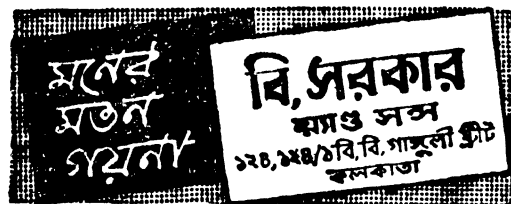
দরজা খুলে তারপর বন্ধ করে দিল। তিনি নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন, মুখ গম্ভীর।

টেস্‌ম্যান। ও, প্রিয় বিচারক, আপনি অ্যাঁ?

ব্র্যাক। হ্যাঁ। আজ সন্ধ্যায় আপনার সংগে দেখা করার প্রয়োজন ছিল।

টেস্‌ম্যান। বুঝেছি, আপনি রীনা পিসীর ব্যাপারটা শুনেছেন।

ব্র্যাক। হ্যাঁ, অন্যান্য খবরের সংগে ওটাও কানে এসেছে বই কি।

টেস্‌ম্যান। দুঃখজনক সংবাদ নয়—অ্যাঁ?

ব্র্যাক। প্রিয় টেস্‌ম্যান, ইয়ে হয়েছে বুঝলেন, সেটা দৃষ্টিভংগীর ওপর নির্ভরশীল।

টেস্‌ম্যান। (তার দিকে দ্বিধান্বিত দৃষ্টি ফেলে) আরও কিছু ঘটেছে কি?

ব্র্যাক। হ্যাঁ।

হেডা। (উৎকণ্ঠিত স্বরে) বিচারক, দুঃখজনক কিছু কি?

ব্র্যাক। শ্রীমতী টেস্‌ম্যান, এটা-ও আপনি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন তার ওপর নির্ভর করছে।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। (উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে) হায়! এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয়।

ব্র্যাক। (তার দিকে অপাংগে তাকিয়ে) মাননীয়া, এ কথা আপনার মনে হল কেন? সম্ভবত আপনি ইতিমধ্যেই কিছু শুনেছেন—?

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। (গুলিয়ে ফেলে) না, কিছু নয়, কিন্তু—

টেস্‌ম্যান। ঈশ্বরের দোহাই বিচারক, বলে ফেলুন!

ব্র্যাক। (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) আচ্ছা, দুঃখের সংগে জানাচ্ছি এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ-কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি এখন মৃত্যুমুখে।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। (আর্তনাদ করলেন) হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর—!

টেস্‌ম্যান। হাসপাতালে! এবং মৃত্যুমুখে!

হেডা। (আপনা হতে) তা হলে এ ত' শীগ্‌গিরই—

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। (বিলাপরতা) হেডা, বিদায়কালে আমরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম!

হেডা। (ফিস্‌ফিস্ ক'রে) টায়া—টায়া—সাবধান!

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। (তাকে আমল না দিয়ে) আমি তার কাছে যাবই! জীবন্ত অবস্থায় তাকে আমি দেখবই!

ব্র্যাক। বৃথাই চেষ্টা করবেন, কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। হায় হায়, অন্তত তার কী হয়েছে আমাকে বলুন। ব্যাপার কী?

টেস্‌ম্যান। আপনি নিশ্চয় বলছেন না ও নিজেকে—অ্যাঁ?

হেডা। হ্যাঁ, আমি নিঃসন্দিগ্ধ যে ঠিক তাই ঘটেছে।

টেস্‌ম্যান। হেডা, তুমি কী ক'রে—?

ব্র্যাক। (হেডার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে) শ্রীমতী টেস্‌ম্যান, দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি সঠিক অনুমান করেছেন।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। কী বীভৎস!

টেস্‌ম্যান। তা হলে নিজেই! কল্পনা করুন!

হেডা। নিজেকে গুলী করেছে!

ব্র্যাক। আবার আপনি সঠিক অনুমান করেছেন।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। (আত্মসংযমের চেষ্টা ক'রে) বিচারক ব্র্যাক, ব্যাপারটা কখন ঘটল?

ব্র্যাক। আজ বিকেলে—তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।

টেস্‌ম্যান। কিন্তু, ভগবানের দোহাই, কোথায় করল? অ্যাঁ?

ব্র্যাক। (কিছুটা ইতস্তত ক'রে) কোথায়? আমার মনে হয়—ইয়ে—নিজের ঘরেই।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। না, তা হতে পারে না; কারণ ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে আমি ওখানে ছিলাম।

ব্র্যাক। বেশ, তা হলে অন্য কোথাও। আমি ঠিক জানি না। আমি কেবল জানি যে তাঁকে দেখা গিয়েছিল—তিনি নিজেকে গুলী করছিলেন—নিজের বুকে।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। কী বীভৎস! ও যে এভাবে মারা গেল!

হেডা। (ব্র্যাক-এর প্রতি) বুকে গুলী করেছিলেন?

ব্র্যাক। হ্যাঁ—তাই ত' বলেছি।

হেডা। কপালে নয়?

ব্র্যাক। বুকে—কপালে নয়।

হেডা। তা বেশ, তা বেশ—বুকও চমৎকার জায়গা।

ব্র্যাক। শ্রীমতী টেস্‌ম্যান, কীভাবে বললেন?

হেডা। (এড়িয়ে গিয়ে) আরে না, না—ও কিছু না।

টেস্‌ম্যান। এবং ঐ ক্ষত বেশ মারাত্মক বললেন না?

ব্র্যাক। একেবারে প্রাণহন্তারক। এতক্ষণে বোধহয় সব শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তা অনুভবে বুঝতে পারছি! সমাপ্তি! সমাপ্তি! ও হেডা—!

টেস্‌ম্যান। কিন্তু আমাকে বলুন, এসব আপনি কী ক'রে জানালেন?

ব্র্যাক। (কাটাকাটাভাবে) জনৈক পুলিশের কাছ থেকে। লোকটার সংগে আমার যোগাযোগ আছে।

হেডা। (স্পষ্ট স্বরে) অবশেষে একটা কাজের মত কাজ হয়েছে।

টেস্‌ম্যান। (আতঙ্কিত) ঈশ্বরের দোহাই হেডা। তুমি কী বলছ?

হেডা। বলছি এতে সৌন্দর্য আছে।

ব্র্যাক। হুঁ, শ্রীমতী টেস্‌ম্যান—

টেস্‌ম্যান। সৌন্দর্য! বিচিত্র কল্পনা!

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। ও হেডা, এরকম একটা কাজের মধ্যে তুমি সৌন্দর্য দেখতে পেলে কী ক'রে।

হেডা। এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ স্বয়ং তার জীবনের লেনদেন চুকিয়ে ফেলেছেন। চোকানর সাহস তার ছিল—ঠিক যা করা উচিত।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। না, তুমি কক্ষণো ভাববে না যে এইভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল! নিশ্চয় বিকারের ঘোরে ও একাজ করেছে।

টেস্‌ম্যান। হতাশায়!

হেডা। তা যে করে নি সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। হ্যাঁ, হ্যাঁ! বিকারের ঘোরে! ঠিক যেমন আমাদের পাণ্ডুলিপি ও টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিল।

ব্র্যাক। (চমকে উঠে) পাণ্ডুলিপি? এইলার্ট কি ওটা কুচিয়ে ফেলেছে?

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। হ্যাঁ, কাল রাত্রে।

টেস্‌ম্যান। (নরম গলায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে) ও হেডা, আমরা এ কথা কোনদিনই ভুলতে পারবো না। অসম্ভব!

ব্র্যাক। হুঁ, অত্যন্ত অ-স্বাভাবিক ঘটনা।

টেস্‌ম্যান। (ঘরে পায়চারি করতে করতে) ভাবতেও অবাক লাগে এইলার্ট এভাবে পৃথিবী ছেড়ে গেল! এবং যে বই তার নাম অমর ক'রে রাখত সে [illegible]ও না রেখে—

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। হায়, যদি কোনরকমেও বইটা আবার গুছিয়ে নেওয়া যেত!

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, যদি যেত! বলতে পারি না আমি কী দিতে প্রস্তুত নই—

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড। সম্ভবত যায়, শ্রীমতী টেস্‌ম্যান।

টেস্‌ম্যান। কী বলতে চাইছেন?

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। (পোশাকের পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে) এই যে দেখুন। যে খুচরো নোটগুলো থেকে ও লেখার নির্দেশ দিত সেগুলো আমি রেখে দিয়েছি।

হেডা। (এক পা এগিয়ে)। আ—!

টেস্‌ম্যান। আপনি ওগুলো রেখে দিয়েছেন! অ্যাঁ?

শ্রীমতী এলভ্‌স্টেড্। হ্যাঁ, ওগুলো এখানে

আমার কাছেই রয়েছে। বাড়ি থেকে আসার সময় সব পকেটে রেখেছিলাম। এই যে—

টেস্‌ম্যান। আহা, দয়া ক'রে ওগুলো আমাকে দেখতে দিন।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (তাকে একবাণ্ডিল কাগজ দিলেন) কিন্তু এগুলো এমন এলোমেলো হয়ে আছে—সব মিলেমিশে একাকার।

টেস্‌ম্যান। ভাবুন, যদি শেষ পর্যন্ত এ থেকে একটা কিছু দাঁড় করানো যায়। আমরা দুজন একসঙ্গে চেষ্টা করলে বোধহয়—

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। তা ত' বটেই, অন্তত চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক্‌—

টেস্‌ম্যান। আমরা ঠিকমত গোছাবই। পারতেই হবে। আমার সমস্ত জীবন আমি এই কাজের জন্য উৎসর্গ করব।

হেডা। জর্জ তুমি? তোমার জীবন?

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, বরং বলা চলে সবটুকু বাড়তি সময়। আমার নিজের সংগ্রহ-গুলো ততদিন তোলা থাক। হেডা—বুঝতে পারলে, অ্যাঁ? আমি যে দায়-বদ্ধ—এইলার্ট-এর স্মৃতির কাছে।

হেডা। সম্ভবত তাই।

টেস্‌ম্যান। [illegible] এল্‌ভ্‌সটেড্‌, তাহলে আসুন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়ি। সংশোধনের অতীত কোন কিছু নিয়ে চুল ছিঁড়ে লাভ নেই—অ্যাঁ? যথা সম্ভব নিজেদের দুঃখ সংযত করতে আমরা চেষ্টিত হব, এবং—

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি, আমি যথাসাধ্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করব।

টেস্‌ম্যান। আচ্ছা, তা হলে চলুন। নোট-গুলোর মধ্যে চোখ না বুলিয়ে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। আমরা বসছি কোথায়? এখানে? না, ওখানে, পেছন দিককার ঘরের মধ্যে। প্রিয় বিচারক, মাপ করবেন। শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌ আসুন আমার সঙ্গে।

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। আহা, যদি আদৌ তা সম্ভব হত!

[টেস্‌ম্যান এবং শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌ পেছন দিককার ঘরে গেলেন। দ্বিতীয়জন নিজের হ্যাট আর কোট খোলার পর দুজন ঝোলান আলোর নীচে রাখা টেবিল-এর পাশে বসে গভীর মনোযোগের সংগে নোটগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। স্টোভ পেরিয়ে হেডা বসলেন আরামকেদারায়। তখন ব্র্যাক তাঁর কাছে গেলেন।)

হেডা। (নীচু গলায়) আহা, এটা মানুষকে স্বাধীনতার অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে—এইলার্ট্‌ লিউভ্‌বোর্‌গ-এর শেষতম কাজটা।

ব্র্যাক। স্বাধীনতা বললেন? ও হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তার পক্ষে এটা মুক্তি দায়ক—

হেডা। বলছি আমার পক্ষে। এর ফলে স্বাধীনতার একটা অনুভূতি চাগিয়ে গেছে, বুঝতে পারছি এমন কি এখনও এই পৃথিবীতে স্থির মস্তিষ্কে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করা সম্ভব,—যে কাজ স্বতোৎসারিত সৌন্দর্যময়।

ব্র্যাক। (মৃদু হেসে) হুঁ—সুপ্রিয় শ্রীমতী হেডা—

হেডা। ও, জানি কী বলতে যাচ্ছেন। কেন না, আপনিও এক ধরণের বিশেষজ্ঞ—কার মত আপনি জানেন।

ব্র্যাক। (তার দিকে [illegible]) যতটুকু স্বীকার করতে আপনি প্রস্তুত তার থেকে ঢের বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল লিউভ্‌বোর্‌গ এর সংগে আপনার। কী, ভুল বললাম?

হেডা। এসব প্রশ্নের উত্তর আমি দিই না। আমি শুধু জানি নিজের পছন্দমত বাঁচার সাহস এইলার্ট লিউভ্‌বোর্‌গ-এর ছিল। এবং [illegible] কাজটা, আহা কী সৌন্দর্য [illegible] ওর যে জীবনরঙ্গ থেকে বিদায় নেওয়ার ইচ্ছে আর ক্ষমতা ছিল—এত সকাল সকাল।

ব্র্যাক। আমি দুঃখিত শ্রীমতী হেডা—কিন্তু একটা সুন্দর ভ্রান্তির নিরসন করতে হচ্ছে আমাকে।

হেডা। ভ্রান্তি?

হেডা গ্যাবলারের একটি দৃশ্য

ব্র্যাক। যা কিছুতেই বেশিদিন টিকত না।

হেডা। কী বলতে চাইছেন?

ব্র্যাক। এইলার্‌ট লিউভ্‌বোর্‌গ নিজেকে গুলী করেন নি—স্বেচ্ছায় নয়।

হেডা। স্বেচ্ছায় নয়?

ব্র্যাক। না। যেমনটা বলেছি ঠিক তেমনটা ঘটে নি।

হেডা। (উৎকণ্ঠিত) কিছু লুকিয়েছেন বুঝি? কী সেটা?

ব্র্যাক। বেচারা শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌-এর কথা ভেবে ঘটনাগুলো কিঞ্চিৎ আদর্শায়িত করেছিলাম।

হেডা। সঠিক ঘটনাগুলো তা হলে বলবেন কি?

ব্র্যাক। প্রথমত এই যে, তিনি মৃত।

হেডা। হাসপাতালে?

ব্র্যাক। হ্যাঁ—আর জ্ঞান ফিরে পান নি।

হেডা। আর কী লুকিয়েছেন?

ব্র্যাক। দ্বিতীয়ত, ওঁর থাকার ঘরে ঘটনাটা ঘটে নি।

হেডা। ও, তাতে কিছু এসে যায় না।

ব্র্যাক। সম্ভবত কিছুটা। কেন না, আপনাকে বলতেই হচ্ছে—এইলারট্‌ লিউভ্‌-বোর্‌গ-কে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় দেখা গিয়েছিল—ইয়ে, বুঝলেন—কুমারী ডায়ানা-র বেশভূষা করার নিভৃত ক্ষুদ্র কক্ষে।

হেডা। (যেন ওঠার জন্য গতর নেড়ে আবার পেছনে হেলান দিলেন) বিচারক ব্র্যাক, এ অসম্ভব! ওখানে আজ আবার যাওয়া ওঁর পক্ষে অসম্ভব।

ব্র্যাক। আজ বিকেলে তিনি ওখানে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওঁর কাছ থেকে যা নিয়েছিল তাই ফেরৎ চাইতে গিয়েছিলেন। পাগলের মত হারান শিশু সম্বন্ধে কী যেন বললেন—

হেডা। আঃ—তা হলে এইজন্যই—

ব্র্যাক। আমি ভাবলাম এইলারট্‌ সম্ভবত নিজের পাণ্ডুলিপির কথা বলছেন। কিন্তু এখন শুনছি ওটা ধ্বংস করেছেন তিনি নিজে। কাজেই আমার মনে হয় এটা নির্ঘাৎ তাঁর পকেট-বই।

হেডা। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। এবং ওই জায়গাটায়—ওইখানেই তাঁকে পাওয়া গেল?

ব্র্যাক। হ্যাঁ, ওখানেই বটে। বুকপকেটে একটা পিস্তল, গুলী ছোড়া শেষ। একটা গুরুত্বপূর্ণ অংগে গুলীটা ঢুকে গেছে।

হেডা। হ্যাঁ, বুকে।

ব্র্যাক। উঁহু পেটে।

হেডা। (তাঁর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালেন) তা-ও! হায়, আমি যা ছুঁই তাই জিনিসের জন্য হাস্যকর এবং কুৎসিত হয়ে ওঠে?

ব্র্যাক। আরও একটা দিক রয়েছে, শুনুন—আর একটা অস্বস্তিকর অংগ।

হেডা। সেটা কী?

ব্র্যাক। যে পিস্তলটা তাঁর কাছে পাওয়া গেছে—

হেডা। (দমবন্ধ) আচ্ছা? ওটার কী?

ব্র্যাক। নিঃসন্দেহে তিনি ওটা চুরি করেছিলেন।

হেডা। (লাফিয়ে উঠে) চুরি করেছিলেন! এ কথা সত্যি নয়! তিনি ওটা চুরি করেন নি!

ব্র্যাক। অন্য কোনও ব্যাখ্যা অসম্ভব। তিনি নির্ঘাৎ ওটা চুরি করেছিলেন—চুপ্‌!

[পেছন দিককার ঘরের টেবিল-এর পাশ থেকে উঠে টেস্‌ম্যান আর শ্রীমতী এল্‌ভস্‌টেড্‌ বৈঠকখানায় এসে গেছেন]

টেস্‌ম্যান। (দু'হাতে কাগজগুলো নিয়ে) প্রিয়ে হেডা, ঐ আলোর তলায় বসে দেখা প্রায় অসম্ভব। অবস্থাটা একবার ভাবো!

হেডা। হ্যাঁ, ভাবছি।

টেস্‌ম্যান। তোমার লেখার টেবিল-এ বসলে কিছু মনে করবে—অ্যাঁ?

হেডা। তোমার ইচ্ছে হলে বস। (তাড়াতাড়ি) না, দাঁড়াও! আগে ওটা পরিষ্কার করি!

টেস্‌ম্যান। থাক্‌, থাক্‌, এ নিয়ে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। যথেষ্ট জায়গা আছে।

হেডা। না, না, বলছি শোন, আগে ঝেড়ে-পুঁছে দেবো! এগুলো নিয়ে পিয়ানো-র ওপর রাখবো। ওইখানে!

[স্বরলিপিলেখা কাগজে মোড়া একটা জিনিস বুক-কেস থেকে বের ক'রে আরও স্বরলিপি-লেখা কাগজ দিয়ে ঢেকে হেডা ভেতরের ঘরে ঢুকলেন, বাঁদিকে। টেবিল-এর উপর কাগজগুলো রেখে টেস্‌ম্যান কোণের টেবিল থেকে আলো এনে রাখলেন ঐ টেবিল-এর ওপর। তিনি এবং শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌ গুছিয়ে বসে কাজ সুরু ক'রে দিলেন। হেডা ফিরে এলেন।]

হেডা। শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌-এর চেয়ার-এর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর চুল আলতো হাতে এলোমেলো করতে করতে) প্রিয় টায়া, বেশ,—এইলারট্‌ লিউভ্‌বোর্‌গ-এর অবিস্মরণীয় কাজ কেমন এগোচ্ছে?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্‌। (উৎসাহহীন চোখে হেডা-র দিকে তাকালেন) বাবাঃ এইসব কাগজ ঠিকমত গোছান এক সাংঘাতিক কঠিন কাজ।

টেস্‌ম্যান। আমরা তা করবই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ। এবং অন্যের কাগজপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে সাজানই ত' আমার যোগ্য কাজ।

[স্টোভ-এর কাছে গিয়ে হেডা একটা 'ফুট-স্টুল'-এর ওপর বসলেন। আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ব্র্যাক তাঁর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে]

হেডা। (ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে) পিস্তল সম্বন্ধে কী যেন বললেন?

ব্র্যাক। (নরম গলায়) বললাম যে উনি নির্ঘাৎ ওটা চুরি করেছিলেন।

হেডা। কেন?

ব্র্যাক। কারণ অন্য কোনও ব্যাখ্যাই এ ব্যাপারে অচল।

হেডা। সত্যি?

ব্র্যাক। (তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে) নিঃসন্দেহে এইলারট্‌ লিউভ্‌বোর্‌গ সকালে এখানেই ছিলেন। ঠিক ত'?

হেডা। হ্যাঁ।

ব্র্যাক। আপনি একা ছিলেন ওঁর সংগে?

হেডা। আংশিকভাবে।

ব্র্যাক। উনি ঘরে থাকাকালে আপনি ঘর ছেড়ে যান নি?

হেডা। না।

ব্র্যাক। স্মরণ করতে চেষ্টা করুন। এক লহমার জন্যও বাইরে যান নি?

হেডা। হ্যাঁ, সম্ভবত ক্ষণিকের জন্য—হলঘরে গিয়েছিলাম।

ব্র্যাক। এবং ঐ সময় আপনার পিস্তল-কেস কোথায় ছিল?

হেডা। ওটা তালাবন্ধ ক'রে রেখেছিলাম—

ব্র্যাক। আচ্ছা, তারপর?

হেডা। ওইখানে, লেখার টেবিল-এর ওপর ছিল পিস্তলটা।

ব্র্যাক। তারপর থেকে আর একবারও দেখেছেন দুটো পিস্তলই আছে কি না?

হেডা। না।

ব্র্যাক। আচ্ছা, দেখার দরকারও নেই। লিউভ্‌বোর্‌গ-এর পকেটে পিস্তলটা দেখামাত্র বুঝতে পারলাম ওটা গতকাল দেখেছি—তার আগেও।

হেডা। আপনার কাছে রয়েছে ওটা?

ব্র্যাক। না; পুলিশের কাছে।

হেডা। পুলিশ ওটা দিয়ে কী করবে?

ব্র্যাক। মালিককে না পাওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান চালাবে।

হেডা। ওরা কি সফল হবে? আপনার মত কী?

ব্র্যাক। (তাঁর ওপর ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে) না, হেডা গ্যাব্‌লার—আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু বলছি ততক্ষণ নয়।

হেডা। (তাঁর দিকে ভয়বিহ্বল চোখে তাকালেন) এবং আপনি যদি কিছু না বলেন—তারপর কি?

ব্র্যাক। (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) পিস্তলটা চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই থেকে যাচ্ছে।

হেডা। (দৃঢ়কণ্ঠে) বরং মৃত্যুই শ্রেয়।

ব্র্যাক। (মৃদু হেসে) লোকে এসব কথা বলে ঠিকই—কিন্তু করে না।

হেডা। (উত্তর না দিয়ে) এবং ধরুন পিস্তলটা চুরি হয় নি, আর মালিকও আবিষ্কৃত হল? তখন কী হবে?

ব্র্যাক। তখন—তখন কেচ্ছা চাউর হয়ে যাবে।

হেডা। কেচ্ছা!

ব্র্যাক। হ্যাঁ, কেচ্ছা—যে ব্যাপারে আপনি সাংঘাতিক ভীত। নিঃসন্দেহে আপনাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে—আপনাকে এবং কুমারী ডায়ানা-কে দুজনকেই। ব্যাপারটা কীভাবে ঘটেছিল সে ব্যাখ্যার দায়িত্ব তাঁর,—গুলি দুর্ঘটনাক্রমে ছুটে গিয়েছিল, না, ওটা খুন। এইলার্ট তাঁকে ভয় দেখানোর সময় পকেট থেকে পিস্তল বের করতে গেলে গুলি ছুটে গেল না কি, তিনি এইলার্ট-এর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে তাঁকে গুলিবিদ্ধ ক'রে তারপর তার পকেটে রেখে দিয়েছিলেন? এ কাজ তাঁর উপযুক্ত; কেন না, মহিলাটি যুবতী এবং শক্ত সমর্থ, কুমারী ডায়ানা-র কথা বলছি।

হেডা। কিন্তু এই জঘন্য ব্যাপারে আমার ত কিছু করার নেই।

ব্র্যাক। না। কিন্তু আপনাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: এইলার্ট লিউভ্‌বোর্গ-কে পিস্তল দিয়েছিলেন কেন? এবং আপনি ওঁকে ওটা দিয়েছিলেন—এই খবর শুনে সাধারণ মানুষ কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে?

হেডা। (মাথা ঝুঁকে পড়ল) তা সত্যি আমি তা ভাবি নি।

ব্র্যাক। সে যাক্, সৌভাগ্যক্রমে আমি মুখ না খোলা পর্যন্ত ভয়ের কোনও আশংকা নেই।

হেডা। (তাঁর দিকে তাকালেন) বিচারক ব্র্যাক, আমি তা হলে আপনার হাতের মুঠোয়। এখন থেকে আমাকে আপনার হুজুরে হাজির হয়ে থাকতে হবে।

ব্র্যাক। (নরম গলায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে) প্রিয়তমা হেডা—আমাকে বিশ্বাস করো—এ সুবিধার সুযোগ আমি নেব না।

হেডা। তা সত্ত্বেও আমি আপনার হাতের মুঠোয়। আপনার ইচ্ছে আর আপনার হুকুমের দাসী। দাসী, হ্যাঁ দাসী বই কি। (উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন) না, এ চিন্তাও অসহ্য! কখনও নয়!

ব্র্যাক। (তাঁর দিকে আজ ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি ফেলে) মানুষ অবশ্যম্ভাবী অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

হেডা। (ঐ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন) হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। (তিনি লেখার টেবিল-এর দিকে গেলেন। স্বতোৎসারিত হাসি চেপে টেস্‌ম্যান-এর বাকভঙ্গী নকল করলেন) আচ্ছা? জর্জ, কাজ বেশ এগোচ্ছে ত? আঁ?

টেস্‌ম্যান। ভগবান জানেন প্রিয়ে। সে যাই হোক্, কয়েক মাস ত লাগবেই।

হেডা। (আগের মত) অবস্থাটা একবার ভাবো! (শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্-এর চুলে আলতোভাবে হাত চালিয়ে) থীয়া, তোমার এতে অবাক লাগছে না? তুমি এখানে টেস্‌ম্যান-এর সঙ্গে বসে রয়েছ—ঠিক যেমন বসতে এইলার্ট লিউভ্‌বোর্গ-এর সঙ্গে?

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্। আহা, যদি তোমার স্বামীকেও ওইভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারতাম।

হেডা। ও, সে ঠিক হবে—সময়মত।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ, জান কি হেডা—আমার সত্যিই মনে হচ্ছে ওইরকম একটা কিছু অনুভব করছি। কিন্তু তুমি আবার গিয়ে ব্র্যাক-এর সঙ্গে বসবে না?

হেডা। আমি কি তোমাদের দুজনকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারি না?

টেস্‌ম্যান। না, কোনরকমেই নয়। (মাথা ঘুরিয়ে) প্রিয় ব্র্যাক, আপনি হেডা-কে যে সঙ্গ দেবেন সে বিশ্বাস আমার আছে।

ব্র্যাক। (হেডা-র দিকে আড়চোখে তাকিয়ে)। নিদারুণ আনন্দের সঙ্গে।

হেডা। ধন্যবাদ। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমি ক্লান্ত। ভেতরে গিয়ে সোফা-র ওপর একটুখানি শোব।

টেস্‌ম্যান। হ্যাঁ প্রিয়ে, তাই কর—আঁ?

[পেছনের ঘরে গিয়ে হেডা পর্দা টেনে দিলেন। সামান্য বিরতি। হঠাৎ শোনা গেল তিনি পিয়ানো-তে একটা উদ্দাম নৃত্য-সঙ্গীত বাজাচ্ছেন]

শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্। (চমকে উঠে, চেয়ার ছেড়ে) আরে,—এ আবার কি?

টেস্‌ম্যান। (দরজার দিকে দৌড়োলেন) প্রিয়তমা হেডা, শোন—আজ রাত্রে নাচের সুর বাজিও না! রীনা পিসীর কথাটা একবার ভাবো! এইলার্ট-এর কথাও!

হেডা। (পর্দার মধ্য দিয়ে মাথা বের ক'রে) এবং জুলিয়া পিসীর কথা। এবং তাঁদের আর সকলের কথা।—এরপর আমি শান্ত হয়ে যাব।

[পর্দা আবার টেনে দিলেন]

টেস্‌ম্যান। (লেখার টেবিল-এ) এই কষ্টদায়ক কাজ আমাদের করতে দেখা হেডা-র পক্ষে ভাল নয়। শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্, কী করতে হবে শুনুন,—আপনি জুলিয়া পিসীর শূন্য ঘরটায় থাকবেন, আর আমি ওখানে সন্ধ্যা নাগাদ যাব, এবং দুজন মিলে ওখানে বসে কাজ করতে পারব—আঁ?

হেডা। (ভেতরের ঘরে) টেস্‌ম্যান, তোমার কথা আমি শুনেছি। কিন্তু আমি কী ক'রে এখানে সন্ধ্যাগুলো কাটাব?

টেস্‌ম্যান। (পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে) ও, আমি ঠিক জানি আমি না থাকলেও বিচারক ব্র্যাক মাঝে মাঝে অনুগ্রহ ক'রে এখানে আসবেন।

ব্র্যাক। (আরামকেদারায় বসে খুশি খুশি গলায় বলে উঠলেন) ঠিক বলেছেন টেস্‌ম্যান, প্রত্যেকটা পবিত্র সন্ধ্যায় আসব, জীবনের সবটুকু আনন্দ নিয়ে। আমরা দুজন চমৎকার সময় কাটিয়ে দেব—আমরা দুজন!

হেডা। (উচ্চকণ্ঠে পরিষ্কার উচ্চারণে) হ্যাঁ, বিচারক ব্র্যাক, আমরা যে নিশ্চয়ই কাটাব সেজন্য আপনি নয়, আমরাই খোসামোদ করব, নয়? এখন যেহেতু আপনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্—

[ভেতর থেকে গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ এল। টেস্‌ম্যান, শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্ এবং ব্র্যাক লাফিয়ে উঠলেন।

টেস্‌ম্যান। কী কাণ্ড, আবার ও ওই পিস্তলগুলো নিয়ে খেলা সুরু করেছে।

[পর্দা সরিয়ে তিনি ভেতরে ছুটে গেলেন, শ্রীমতী এল্‌ভ্‌সটেড্ তাঁর পেছনে। হেডা সোফা-র ওপর শায়িত—প্রাণহীন। বিশৃঙ্খলা এবং চিৎকার। ডানদিক থেকে শঙ্কিত বার্টা প্রবেশ করল]

টেস্‌ম্যান। (ব্র্যাক-এর প্রতি, আর্তকণ্ঠে) নিজেকে গুলি করেছে! নিজের কপালে গুলি করেছে! অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন!

ব্র্যাক। (আরামকেদারায় অর্ধমূর্চ্ছিত হয়ে)। হা ঈশ্বর! —এরকম ত কেউ করে না।

॥ যবনিকা ॥

অনুবাদক—সমীরণ চৌধুরী
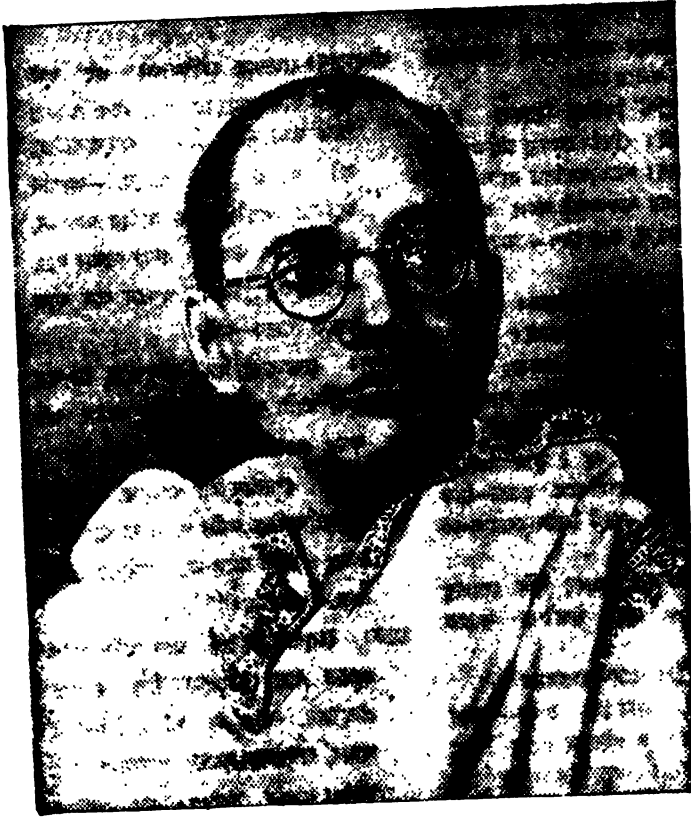
উত্তরায়ণে নেতাজী সুভাষ ও মহাত্মা মোহনদাস

[মাসিক বসুমতী সংখ্যা চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু যে মাস মানবতার অন্বেষণে, শৌর্য ও শান্তির আবেদনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, মাসান্তেই তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশন সমীচীন। তাই ফাল্গুন সংখ্যায় মাঘ-বিশিষ্টতা প্রকাশে উৎসাহিত হয়েছি।]

মাঘ মাস শীতের মাস। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে মাঘ মাস অতুলনীয়। অধুনা রাজনীতির দিক থেকেও এ মাসটি অবিস্মরণীয় ঘটনাসমূহকে বুকে ধারণ করে আছে।

মহাভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যোগীরা যে কালে গমন করলে জন্মবন্ধন ও মোক্ষপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তা হচ্ছে 'উত্তরায়ণ' ও 'দক্ষিণায়ন'। মাঘ মাস হতে আষাঢ় মাস 'উত্তরায়ণ' ও শ্রাবণ হতে পৌষ অবধি 'দক্ষিণায়ন'। ব্রহ্মবেত্তারা উত্তরায়ণে গমন করে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কর্মযোগীরা দক্ষিণায়নে গমন করে স্বর্গলাভ করেন। জগতের এই দুটি গতিই শাশ্বত। সুতরাং মাঘ মাস উত্তরায়ণের অন্তর্গত বলে উত্তরসাধকেরা কর্ম-দ্বারা ব্রহ্মলাভ করে থাকেন।

শিশুর ভ্রূণ হয়ে জন্মলাভ ও মাতৃজঠর থেকে ধরার ধুলোয় আবির্ভাব ও অন্তর্ধান অবধি যদি জন্ম-মৃত্যুর একটা 'সন্ধিক্ষণ' বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তবে জন্মও মৃত্যুকেন্দ্রিক এবং সে মৃত্যু 'শ্যাম সমান'। তা অদৃশ্য বা অজ্ঞাত হলেও।

এ মাসের প্রথম পক্ষেই দুটি পবিত্র দিন এ দেশের মানুষকে এমনভাবে

দণ্ডপাণি

উদ্দীপ্ত করে তোলে যে তার তুলনা মেলা ভার। এই দিন দুটি বছরের পর বছর এমনিভাবে আনাগোনা করবে যে তাদের নিজস্ব সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে নতুন করে মানুষের মননশক্তিকে নাড়া দিয়ে যাবে। এই দিন দুটোর মধ্যে যেম উচ্ছ্বসিত আবেগ বর্তমান তেমনি ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার স্পর্শও বিদ্যমান।

এ দুয়ের প্রথমটি হচ্ছে ৮।৯ই মাঘ, ইংরাজী ২৩শে জানুয়ারী এবং দ্বিতীয়টি ১৫।১৬ই মাঘ; ৩০শে জানুয়ারী। প্রথমটি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন ও দ্বিতীয়টি মহাত্মাজীর তিরোধান দিবস। এ দুই মহাপুরুষের একজন মহাবিপ্লবী ও সত্যাশ্রয়ী, অপরজন মহাজ্ঞানী ও সত্যাগ্রহী। একজনের—জন্মমুহূর্ত থেকে যে মাটির সঙ্গে পরিচয় তার সত্তা উপলব্ধিতে। অপরজনের—সেই মাটির দ্বারা গঠিত মানবদেহের আত্মশুদ্ধিতে। একজনের জীবনদর্শন বাস্তবতায়। অপরজনের জীবন অন্বেষণ—আধ্যাত্মিকতায়। একজন মর্ত্যালোকে। অপরজন স্বর্গবাসী। একজনের চলার পথ রোমাঞ্চকর। অপরজনের অগ্রগতি প্রাণসঞ্চারক। একজনের নিকট—সত্য, শিব ও সুন্দর প্রত্যক্ষ। অপরজনের নিকট—উপলব্ধ। একজন অনুধ্যানী। অপরজন

...সন্ধানী। প্রকৃতপক্ষে দুজনেই ...গান্তিক। তাই প্রাসঙ্গিক। সৃষ্টির ...াদি থেকে তাই অন্ত অবধি এ দু'ধারাই ...র্তমান। মানব-জীবনের ইন্তরীয় ...য়ে চির অপেক্ষমাণ। আমরা তাঁদেরই ...ামী ও বশংবদী। আজ যাঁদের ...ত্যাগে আমরা ধন্য, তাঁদের প্রতি ...দের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূল ...াত একটি হলেও; দুটি স্বতন্ত্র ...রা তা প্রবাহিত। একটি সহিংস। ...টি অহিংস। একটি জয়লাভের ...ন্ত আপোষহীন সংগ্রাম। অপরটি [illegible] আন্দোলন। প্রথমটি সুভাষ- [illegible] শেষ পর্যায়ে আজাদ [illegible] ভারত অভিযান। অপরটি [illegible] নেতৃত্বে আপোষ রফার মাধ্যমে [illegible] শাসনক্ষমতা গ্রহণ।

...ন্ত কথা হচ্ছে, যে-কোন উপায়েই [illegible] অর্জিত হোক না কেন, ...াধীনতাকে সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা কি ... হবে; সেটাই চিন্তার বিষয়। তিনমধ্যে মার্ক্সীয় কম্যুনিজম দর্শন ...বাদের বুনিয়াদরূপে ধরা হচ্ছিল। নেতাজী কোনদিনই কম্যুনিজমের জড়বাদী দর্শনকে গ্রহণ করতে পারেন না। যদিও পণ্ডিত নেহরু কম্যুনিজমের ...িক আদর্শ ও ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ...ক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। নেতাজী ...নে করতেন যে, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পাঁচটি মহাভূত যথা পৃথ্বি, জল, অগ্নি বায়ু ও আকাশ উপলব্ধ; তার যে ঐহিক সত্তা বর্তমান; তার প্রয়োজনবোধ স্বীকৃত ...া হলেও, কম্যুনিজমতত্ত্ব বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট সমাজই মানব সমাজের অন্তিম পরিণতি নয়। সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও উপলব্ধ পঞ্চ মহাভূতের পশ্চাদস্থিত কোন শক্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়-বস্তু না হলেও সমস্ত 'সোলার সিস্টেম' বা 'সৌরজগৎ' যে শক্তিকেন্দ্রিক এ বিষয়ে নেতাজীর কোন সংশয় ছিল না। সেই জন্যই তিনি সেই শক্তির অনুধ্যানী। সেই দুর্জ্ঞেয় জ্ঞানের জ্ঞান-পিপাসু। এই পরিনির্বাণ শক্তিও পরি-ব্যাপক। অনন্তকাল থেকে এই দুর্জ্ঞেয় শক্তিকে জানবার জন্যে কত দেশী সর্বস্ব ত্যাগ করে অনির্দেশের পথে ছুটে গিয়েছে। কেউ খড়্গহস্তে মাতৃ-মূর্তির সম্মুখে নিজের জীবন বলি দিতে উদ্যত। কেউ বলেছেন, যা চেয়েছ তার বেশী কিছু দেবো বেশীর সঙ্গে মাখা।

তাঁরা নিজের বলতে কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নি। এই আত্ম-প্রত্যয় ও আত্মত্যাগের মূল্য নিরূপণই নেতাজীর জীবনদর্শন। মানুষের জীবনে ইহাই চরম ও পরম পাওয়া। ইহার ব্যতিক্রমিক জীবন সীমিত। ইহাই রামকৃষ্ণের 'মিশন' এবং স্বামীজী ও নেতাজীর জীবনে তার রূপায়ণ।

মহাত্মা গান্ধী

নেতাজী বাস্তববাদের ঐকান্তিক প্রবৃত্তির মধ্যে। মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে, সামাজিক বৈষম্যকে দূর করতে চান—ঐহিক সত্তাকে কেন্দ্র করে। এখানেই জড়বাদের সঙ্গে আদর্শ-বাদের সমন্বয়। এখানটাই সাম্যবাদের সঙ্গে আদর্শবাদের পার্থক্য এবং নেতাজীর মৌলিক প্রভেদ।

তিনি বলেন—কোন একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থাই মানব প্রগতির শেষ কথা হতে পারে না। অতীতের অভি-জ্ঞতার ভিত্তিতেই নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সমাজবাদের উপর বিশ্বের দৃষ্টি নির্ভর করছে সেটা ঠিক। কিন্তু ভারতকে সমাজবাদের নিজস্ব রূপ ও পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। কেন না তার ইতিহাস ও দর্শনকে বাদ দিয়ে সে নয়। সেজন্যই স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভ-জনিত বিশৃঙ্খলাকে প্রতিরোধ করে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, এমন একটি সরকার গঠন ও প্রতিষ্ঠা করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন—যা দ্বারা অন্তত কিছু সময়ের জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলাজনিত সামরিক অনুশাসনের ভিত্তিতে একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাবে। বিশেষ করে এ জন্য—যেন সে সরকার ধনিকচক্রের ক্রীড়নকরূপে পরিগণিত না হয়।

অথচ জনসাধারণের মুখপাত্ররূপে কাজ করতে সক্ষম হয়।

ইংরাজের অনুকরণীয় পার্লামেণ্টারী শাসন কোনদিনই জাতীয় ঐক্য ও প্রগতির সহায়ক হতে পারে না। কেন না তখনও দাসত্বের রজ্জু তার গলায়। যেহেতু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ-রফায় কোনদিনই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, সেই জন্যই সেই চক্রকে নরককুণ্ডের আবর্জনায় নিক্ষেপ করে কঠোর হস্তে সামরিক শাসনকে বিন্যস্ত করায় তিনি বিশ্বাসী।

আজ বিশ বছর পর যে শাসনতন্ত্রের আশ্রয়ে জাতির ভিত টলটলায়মান হয়ে উঠেছে, তখন নেতাজীর ভবিষ্য-দ্বাণী সম্বন্ধে লোকের প্রতীতি জন্মাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে আজ একটি বিদ্রোহী মনোভাবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমরা শুনেছি স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতির নীতি কি হবে, নেতাজী পূর্বেই তা স্থির করে রেখেছিলেন। সে দলিল ভারত সর-কারের হস্তগত হলেও আজও জন-সাধারণ তা জানতে পারে নি। ভারতীয় কংগ্রেসের তোষণ নীতি ও আপোষমূলক কার্যক্রম দ্বারা নেতাজীর জীবনদর্শন ও চিন্তাধারা উপেক্ষিত ও অবহেলিত হলেও তাঁর মৌলিক চিন্তা ও বৈপ্লবিক কার্যক্রম আজ জাতির প্রয়োজনে একান্ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতাই জীবন

ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শাশ্বত সনাতন ভারতবর্ষের উদার-অনন্ত আকাশ আজ পরাধীনতার রাহুমুক্ত। শত শত বছরব্যাপী এই পরাধীনতার রাহু ভারতের আকাশ তথা সমগ্র ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সে আকাশ আজ স্বাধীনতার নবারুণরাগরঞ্জিত বালার্ক সূর্যের প্রসন্ন দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত। সেখানে আজ গ্লানি নেই। সার্থকতার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এই রাহু অপসারণ সহজ সরলভাবে সম্ভবপর হয়নি---হয়েছে সুদীর্ঘ সাধনায়, অফুরন্ত আত্মদানে, বর্ণনাতীত লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের বিনিময়ে। এই অতুলনীয় মুক্তিসংগ্রামের মিছিলে অংশ নিয়েছেন দলে দলে কত তরুণ, কত যুবক, কত বৃদ্ধ—দেশ-জননীর প্রতি প্রখর ও অটুট কর্তব্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে।

সাহিত্যিকরাও পিছিয়ে ছিলেন না। শুধু আকাশের তারা গুণে, ফুলের সুবাস শুঁকে, প্রিয়ার হৃদয়ভাষ্য বর্ণনা করেই কর্তব্য শেষ করে দেন নি। এগিয়ে এসেছেন মুক্তিসংগ্রামের কাজেও। নিয়েছেন মহান ভূমিকা। নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব আরামের জীবনের পরিবর্তে বেছে নিয়েছেন ক্লেশ, শ্রম, নির্যাতন। বাঙলা সাহিত্যের আজকের দিনের নায়কমণ্ডলীর পুরোভাগে যাঁর অধিষ্ঠান ক্ষণকালীন সঙ্কীর্ণতায় নয়, চিরকালীন প্রশস্ততায় সাম্প্রতের ক্ষুদ্র পরিসরে নয়। শাশ্বতের সীমাহীন পটভূমিতে যিনি এক আদিত্যকল্প নাম—আচার্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন।

যে ধাত্রীদেবতার তারাশঙ্করকে আমরা দেখেছি জননী ও জন্মভূমিকে একাত্ম ভাবতে, মাটির মধ্যে মা-টিকে দেখতে, সেই তারাশঙ্কর—স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন না। দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশ নেওয়ার ফলে লৌহকাবার অন্তরালে তাঁর অলোকসামান্য জীবনের একটি বছর অতিবাহিত হয়েছে।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রাক্‌মুহূর্তে তাঁকে প্রশ্ন করি—সেকালে স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে এবং বর্তমানে সাহিত্যিকের ভূমিকা এবং কাজের মিল অথবা তুলনা আপনার মতে কি?

উত্তর আসে—আগে অবশ্যই একটা বিরাট দায়িত্ব ছিল—এখনও সেটা আছে, ওজনে কমে নি---কিন্তু আমরাই দায়টা হাল্কা করে দিয়েছি। ঠিক সেই মূল্যটা এখন আর আমরা দিচ্ছি না। ক্ষেত্রবিশেষে আমরা অতিমাত্রায় স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছি। লেখককুলের অধিনায়ক বলে চলেন রাষ্ট্র বা সমাজ এদের কাছে দায়-দায়িত্বটা যদিও বা না মানি কিন্তু নিজেদের কাছে তো একটা দায়-দায়িত্ব আছে সেটাও তো পালন করছি না—যা করছি তার নাম আত্মপ্রতারণা।

জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর। নানা কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন জীবন। সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দর্শনে জীবন তাঁর সামগ্রিক সম্ভারসহ প্রতিবিম্বিত হয়েছে—তারই প্রকাশ ঘটেছে লেখকের লেখনীর মাধ্যমে।

জীবনের এক অপরূপ ভাষ্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার পরবর্তী প্রশ্ন—আপনার মতে জীবনের সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক বা সংযোগ কি—

ধীরকণ্ঠে অথচ এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর আসে—অতি ঘনিষ্ঠ। জলের সঙ্গে মাছ বা জলচর জীবের যা সম্পর্ক তাই। আলো আর বাতাসের উপমা দিয়ে বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করলেন—ও দুটোর মূল্য আমাদের জীবনে যতখানি স্বাধীনতার মূল্যও তার থেকে কোন অংশে কম নয়।

সাহিত্যিক তাঁর লেখায় দেশকে জাগান, জাতিকে গঠন করেন। ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করে দেন---সেই বিশ্বাসে সাহিত্য শিরোমণিকে প্রশ্ন করি—স্বাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চিত্তে সচেতনতা জাগানোয় আপনার ধারণায় একজন সাহিত্যিকের দায়িত্ব কতখানি।

উত্তর আসে---ষোল আনাই। সাহিত্যই তো সেটা করে থাকে।

বলে চলেন লেখক—সাহিত্য শুধু আনন্দেরই খাদ্য নয়, চৈতন্যেরও উপাদান। সে তো তাকে আচ্ছন্ন করে না, সদা-সচেতন করে রাখে।

অন্যান্য স্বাধীন দেশের তুলনায় এ দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হলে জানা গেল—আগের তুলনায় পৃথিবীর সব সাহিত্যই আজ প্রায় পথভ্রষ্ট। আমি নিজে অন্য দেশের সাহিত্য সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ নই, তবে যেটুকু পড়েছি তাতে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে মানুষের যে ঝোঁক দেখছি তার প্রতিফলন দেখছি সারা পৃথিবীর যত তরুণ—তাদের জীবনে ও আন্দোলনে।

বিদেশী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়—জীবনের সমাপ্তিপর্বে উপনীত হবার পরও রবীন্দ্রনাথ বলতে এতটুকু সঙ্কোচ, এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু জড়তা অনুভব করেন নি।

দেশাত্মবোধক সাহিত্য সৃষ্টিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাঙলার স্থান কোথায় এ প্রশ্ন করা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর এল---১৯৪৭ পর্যন্ত এ বিষয়ে বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সম্প্রতি কার ক'টি গান বাজেয়াপ্ত হয়েছে সেই বিচারে সাহিত্যে দেশপ্রেমের একটা সংজ্ঞা বা মাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে। কিন্তু আনন্দমঠ থেকে সাহিত্যের মধ্যে যে দেশপ্রেম ব্যক্ত হতে লাগল তার স্রোত অফুরন্ত ধারায় সময়ের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দীর্ঘকালের দুস্তর সমুদ্রের উর্মিতে উর্মিতে গভীর এবং প্রবল ধারায় বয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ তারাশঙ্করকে আরও দুটি বিশেষ ভূমিকায় দেখেছেন—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের এবং রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যরূপে।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার মতে সাহিত্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ হওয়া উচিত কি?

তাঁর অভিমত তিনি প্রকাশ করলেন এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে—দেশপ্রেমের হওয়া উচিত, তবে রাজনীতির নয়, কারণ দুটো এক নয়। দেশে রাজনীতি, দল থাকলে সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে সাহিত্যের মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আসতে পারে। কিন্তু সাহিত্যকে যদি তাদের প্রচারকার্যের মাধ্যম হিসাবে পরিণত করা হয়, তা হলে সাহিত্য তার আপন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে—তা হলে তাকে তখন আর যাই বলা চলুক---শুধু যা বলা চলে না—তারই নাম 'সাহিত্য।'

ট্যানডেম চড়ার নেশা

মিউনিখ (ডি, এ, ডি)—দুজন চালাবার উপযোগী সাইকেলকে বলে ট্যানডেম। পশ্চিম জার্মানীতে আজকাল ট্যানডেম চড়ার রেওয়াজ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রথমে দেহ সচেতন মেয়েরা এই বাহনে সওয়ার হবার পরেই ছেলেরাও ট্যানডেম চড়ে ব্যায়াম সুরু করে দিলো। এখন রোদ বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে ওতে আচ্ছাদন লাগিয়ে ছেলেমেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় দূর দূর পথে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ছে।

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা / ইউরেকা বুক এজেন্সী

আলোচ্য পাঠ্য পুস্তকটি হাতে পেয়ে আমরা আনন্দ লাভ করেছি, বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা পদ্ধতিকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই রচনায়। শিক্ষার্থীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রয়োজনীয় বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে যে প্রশ্নগুলি সন্নিবেশিত পড়ুয়াদের পক্ষে তা বিশেষ উপযোগী। রচনা পদ্ধতি অল্পমানের ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিগম্য। আমরা এই পাঠ্য পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ইন্দুমতী ভট্টাচার্য এম-এ, বি-টি ; ইন্দিরা দেবী, আকাশবাণী শিশুমহলের পরিচালিকা ; ঝর্ণা ঘোষ—পরিবেশনা—ইউরেকা বুক এজেন্সী, ৫৬ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা।

পত্রাবলী / এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

নেতাজী সুভাষচন্দ্র লিখিত ১৫৭টি পত্র সংকলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রাবলীর গুরুত্ব অসীম, তাছাড়া এ যাবৎ অপ্রকাশিত প্রায় ৪০টি পত্রও প্রথম লোকলোচনে আত্মপ্রকাশ করল এই সংকলনের মাধ্যমে। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, নেতাজী ও ভারতের মুক্তি সংগ্রাম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যে গবেষণা চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থটিকে তারই প্রথম ফসল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। গ্রন্থের শেষে সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পরিচয় দেওয়া থাকায়, পত্রগুলি বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকে পেছনে রেখে এ যাবৎ যে-সব ব্যক্তিগত পত্র-গুচ্ছ সংকলিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে নিঃসন্দেহে আলোচ্য সংকলনটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সংকলনকর্মে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় আঁকা। আমরা এই গ্রন্থটি হাতে পেয়ে সত্যই আনন্দিত। আঙ্গিক

উচ্চাঙ্গের ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সুভাষচন্দ্র বসু, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—বারো টাকা।

A Survey of Folklore Study in Bengal

বাংলা অর্থাৎ অখণ্ড বাংলার লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে, তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। শিক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসু পাঠক এই রচনার মাধ্যমে বাংলার লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিতি লাভ করবেন। রচনাটি প্রয়োজনীয় বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—শঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রকাশনা—ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ৫, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা—১, দাম—কুড়ি টাকা।

বর্তমান যুগের দর্শন চিন্তা / সাহিত্যশ্রী

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা নিয়ে আজকাল প্রচুর বই বেরোলেও, বাংলা ভাষায় দর্শনের বইয়ের একান্ত অভাব, গ্রন্থটির মূল্যায়নও সেভাবেই করা উচিত। নিছক গল্প-উপন্যাস ছাড়াও অন্য ধরণের বইয়ের স্বাদ যাঁরা গ্রহণ করতে চান এমন পাঠকের অভাব নেই এবং বাঙালী তো জাতি হিসাবেই দার্শনিক। বড় বড় দার্শনিকের নামের সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচয় আছে, অথচ তাঁদের বক্তব্য ও চিন্তাধারা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নেই, আলোচ্য গ্রন্থটি এই সম্বন্ধেই কিছুটা আলোকপাত করেছে। বইটি পড়ে আমরা খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—সাহিত্যশ্রী, ৮৯, পটুয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর (হুগলী), দাম—চার টাকা।

আয়নার মধ্যে একা / এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

একটি মেয়ের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিপুণ হাতে রেখায়িত করেছেন লেখক। ভাগ্যের হাতে অনেক মার খেয়েও সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিল কমলা অবশেষে প্রেমের দাক্ষিণ্যে। অবনীর ভালবাসায় তৃপ্ত হয়েছিল তার নারীত্ব, সফল হয়েছিল তার জীবন, তবু একটা কাঁটা বুঝি থেকেই যায় মানুষের সব কিছু সার্থকতার আড়ালে, নচেৎ গৌরবময় নবজীবনে প্রবেশোন্মুখী কমলা কেন ফিরে তাকায় পিছনপানে, কেনই বা তার মন কাঁদে এক উদাসীন পুরুষের স্মৃতির টানে? নারী-হৃদয়ের এ এক আশ্চর্য অনুভূতি, যা পেয়েছি তার সব কিছু নিঃশেষে গ্রহণ করেও যা পাই নি তার জন্য অকারণে তৃষিত হয়ে ওঠা। আয়নার মধ্যে একা নিজেকে আবিষ্কার করার বিস্ময় তাই আজ জেগে ওঠে নববধূ কমলার মনে। নিজেকে যেন নতুন করে চিনতে শিখল সে। অনবদ্য শৈলীতে অন্তর্ঘাত-সঙ্কুল, মনোধর্মী কাহিনীটিকে পরিবেশন করেছেন লেখক, বোদ্ধা পাঠকমাত্রই এই রচনাটি হাতে পেয়ে আনন্দলাভ করবেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—বুদ্ধদেব বসু, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

কোথায় পাবো তারে / আনন্দ পাবলিশার্স।

পথে নেমে পড়েছিল এক অমৃত-সন্ধানী, কোথায় পাবে তারে তা সে জানে না তবু সে খুঁজে খুঁজে ফেরে ক্ষ্যাপার মতন। অনিন্দ্য এই কাহিনীর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে অনন্য এক কবিমানসের স্পর্শ। ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত উপন্যাসের আকর্ষণ, কাব্যের বর্ণাঢ্য সুষমা। কাহিনীর নায়ক জাত-যাযাবর, পেশায় লেখক, অনির্বচনীয়ের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়েছে পথে, দক্ষিণের দুর্গম বাদা অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে সে। সে শুধু চোখেই দেখে না, মন-প্রাণ দিয়ে অনুভবও করতে চায়, তাই পথের সঙ্গে তার আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে সহজেই। যাত্রা-সহচরী অলক্ষ্যে কখন রাঙিয়ে দেয় তার মনের দিগন্তকে তার খোঁজই কি সে রাখে ঠিকমত? এরই মাঝে চলে তার পথ চলা, এ যেন সেই পথভোলা এক পথিক, দিকে দিকে তার জিজ্ঞাসা 'আমায় চেন কি?' অনবদ্য শৈলীতে পরিবেশিত কাহিনীটি পড়তে পড়তে সত্যই বিস্ময় জাগে মনে, সে বিস্ময় শ্রদ্ধাজড়িত। মনে হয় যশস্বী লেখকের এই রচনা তাঁর সাহিত্যকীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে, এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আঙ্গিক রুচি-শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। লেখক—কালকূট, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম—কুড়ি টাকা।

বেণী সংহার / আনন্দ পাবলিশার্স।

বাংলা রহস্য কাহিনীর পরিসরে লেখকের দান অসীম, তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশের জনপ্রিয়তাও অশেষ, কাজেই আলোচ্য গ্রন্থটি হাতে পেয়ে যে অনেকেই উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন, একথা অসংশয়েই বলা চলে। তিনটি নতুন রহস্য কাহিনী সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে যার প্রত্যেকটিরই নায়ক ব্যোমকেশ। নতুন করে ব্যোমকেশকে দেখতে পাওয়া যাবে কাহিনীত্রয়ীর মাধ্যমে, সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি সেই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যার সামনে কোন রহস্যই টিকতে পারে না—সূর্যের আলোর স্পর্শে ভীত কুহেলিকার মতই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শেষোক্ত গল্পটির নামেই, নামায়ন হয়েছে গ্রন্থের, এই গল্পটি সম্প্রতি এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তকাকারে গল্পটি পড়তে যেন আরও ভাল লাগে। 'জয়তু ব্যোমকেশ।' আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি, প্রচ্ছদ ইঙ্গিতময়, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা।

এমিলের গোয়েন্দা কাহিনী / এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

বিদেশী ভাষা থেকে অনূদিত এই গোয়েন্দা কাহিনী, বাংলা শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে। এমিলের টাকা চুরি যাওয়ার থেকে যেসব মজার মজার ঘটনা একের পর এক ঘটেছে তাতে শিশু ছেড়ে বুড়োরাও মজে যাবে। অনুবাদকের ভাষা ও ভঙ্গী দুইই অত্যন্ত আকর্ষণীয়, অনুবাদ-কর্মটিও তাই এত স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—এরিখ কাস্টনার। অনুবাদক—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, দাম—চার টাকা।

সময়ের সুর / আনন্দ পাবলিশার্স

প্রেম কি কালজয়ী, প্রেম কি অবিনশ্বর? অনবদ্য এক কাহিনীর মাধ্যমে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে চেয়েছেন লেখিকা। আদরের বধূ জ্যোতি, শ্বশুর-শাশুড়ীর নয়ন-মণি, স্বামীর প্রিয়তমা, হঠাৎ এক দুর্যোগের রাতে দুর্বৃত্তের দ্বারা হল অপহৃতা। আবার তার ঠিক অব্যবহিত পরেই কোথা থেকে ছিটকে এল আর এক মেয়ে সেই সংসারেই ভাগ্যের বিচিত্র খাম-খেয়ালে। দিনের পর দিন যায়, উড়ে এসে জুড়ে বসা মেয়ে মালবিকার স্বভাব-মাধুর্যে সবাই ভোলেন হারিয়ে-যাওয়া জ্যোতিকে, এমন কি ভোলে মৃণালও, সময়ের সুর পলিমাটির প্রলেপে স্নিগ্ধ করে দেয় তারও হৃদয়ক্ষত। তারপর আসে সেই পরম লগ্ন, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার চরমক্ষণ, মালবিকার মায়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেই বুঝিবা নতুন করে বাঁচতে চায় মৃণাল। কিন্তু জ্যোতি, বিস্মৃতির আঁধার থেকে সে যে আবার ডাক দিয়েছে তাকে কি ফিরিয়ে দেবে মৃণাল? অন্তর্দ্বন্দ্বে ভরা কাহিনীটির সমাপ্তি যেমন করুণ তেমনই কৌতূহলপ্রদ। লেখিকার মুন্সিয়ানায় কাহিনী হয়ে উঠেছে প্রাণোজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়, হাতে নিলে শেষ না করে ওঠা দায়। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা—আশাপূর্ণা দেবী, প্রকাশনা—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম—তিন টাকা।

নিশ বিহঙ্গ / জাতীয় প্রকাশক

আলোচ্য উপন্যাসে একটি আকর্ষণীয় কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা কাহিনীটি পড়তে ভালই লাগে, যদিও লেখকের শৈলী আশানুরূপ উন্নত মানের নয়। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে কাহিনী

আমাদের প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

বনফুল-এর

অসংলগ্ন	৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বেণীসংহার	৪·০০
ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন	৪·০০
শজারুর কাঁটা	৪·০০
তুঙ্গভদ্রার তীরে	৬·০০
ধরণী যখন তরুণী ছিল	৪·০০
শঙ্খকঙ্কণ	২·৫০
কহেন কবি কালিদাস	৩·০০
বহু যুগের ওপার হতে	৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ভালোবাসার অনেক নাম	৬·০০
ধরণীর বিকল্প	৩·০০
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন	২·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

আগ্রা যখন টলমল	৪·০০
প্রতিধ্বনি ফেরে	৪·০০
পঞ্চশর	৩·০০

বিমল মিত্রের

হাতে রইলো তিন	৬·০০
চলো কলকাতা	৫·০০
বেগম মেরী বিশ্বাস	২৫·০০
নিবেদন ইতি	৫·০০
রং বদলায়	৩·৫০

মনোজ বসুর

সেতুবন্ধ	১২·০০
স্বর্ণসজ্জা	৪·০০
রূপবতী	৩·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

প্রেমের চেয়ে বড়	১২·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

তু'হারা	৭·০০
প্রেম	৪·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অমাবস্যার গান	৩·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

লোকারণ্য	৪·০০
ভ্রষ্টলগ্ন	২·৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

খুনের পুতুল সাগরে	১০·০০

কালকূট-এর

কোথায় পাবো তারে	২০·০০

সমরেশ বসুর

এপার ওপার	৫·০০
প্রজাপতি	৬·০০
স্বীকারোক্তি	৫·০০
বিবর	৫·০০
ফেরাই	৩·০০
দুই অরণ্য	৬·০০

বুদ্ধদেব গুহর

নগ্ন নির্জন	৪·০০
হলুদ বসন্ত	৪·০০

বিমল করের

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন	৪·৫০
যদুবংশ	৭·০০
পূর্ণ অপূর্ণ	১০·০০
পরিচয়	৪·০০
বালিকা বধূ	৩·০০
গ্রহণ	৪·০০
খড়কুটো	৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

ঘুণপোকা	৪·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের

জল দাও	৩·৫০

সুশীল রায়ের

অদ্বিতীয়া	৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর

পরাজিত সম্রাট	৪·০০
গল্প-সমগ্র	১০·০০
বনপলাশির পদাবলী	৮·৫০

সুবোধ ঘোষের

বন উপবন	৪·০০
জিয়াভরলি	৬·০০
বসন্ততিলক	৫·০০
শতকিয়া	৮·০০
ভারত প্রেমকথা	৭·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

অরণ্যের দিনরাত্রি	৪·০০
আত্মপ্রকাশ	৬·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

সময়ের সুর	৩·০০
সেই রাত্রি এই দিন	৫·০০
রাতের পাখি	৪·০০
দোলনা	৫·০০

প্রতিভা বসুর

দ্বিতীয় দর্পণ	৮·০০
রাঙা ভাঙা চাঁদ	৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সন্ধ্যারাগ	৫·০০
সূর্যসাক্ষী	১৪·০০
সেতুবন্ধন	৫·০০
ময়ূরী	৩·০০
তিন দিন তিন রাত্রি	৬·০০

বুদ্ধদেব বসুর

কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ (নাটক)	৫·০০
গোলাপ কেন কালো	৫·০০
তুমি কেমন আছো	৬·০০
পাতাল থেকে আলাপ	৫·০০
তপস্বী ও তরঙ্গিণী (নাটক)	৩·০০

রূপদর্শীর

ব্রজদার গুল্প-সমগ্র	৬·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

পিয়ামুখচন্দা	৬·০০
জনম জনম হম	৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

লোকটা	৩·০০

শংকর-এর

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি	৪·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সারারাত	৫·০০
মনের মানুষ	৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

রূপসী রাত্রি	৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯ । ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলকাতা ৯ ।

নাগকন্যা

(রাজারাণীর মন্দির, ভুবনেশ্বর)

—আশীষ মিত্র

মাসিক বসুমতী ।।

।। ফাল্গুন, ১৩৭৫ ।।
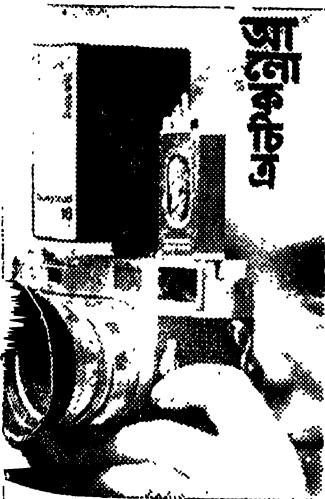
মঙ্গলঘট —বিল্টু
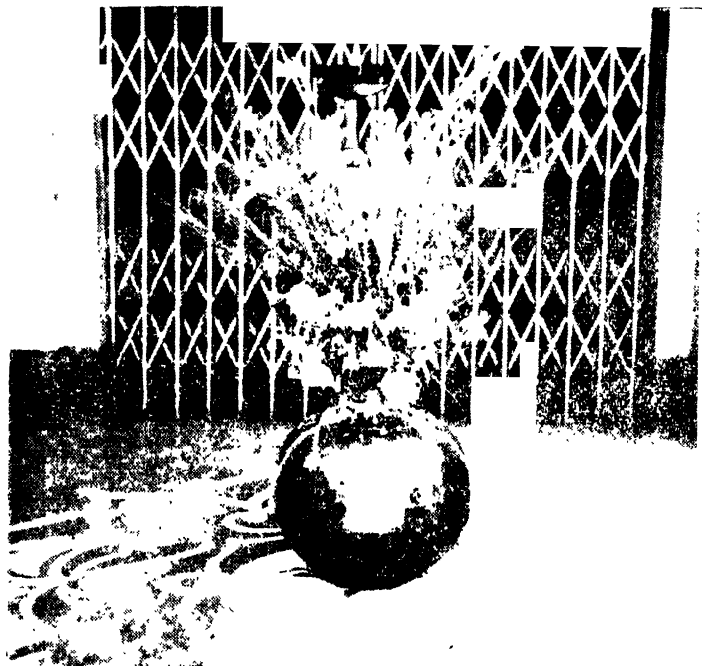
—হিমাংশু ভট্টাচার্য
(১ম পুরস্কার)

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা—বিনোদনী

—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
(২য় পুরস্কার)

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

॥ বিষয়বস্তু ॥

চৈত্র সংখ্যায়
খেলাধুলা

বৈশাখ সংখ্যায়
আমার দেশ
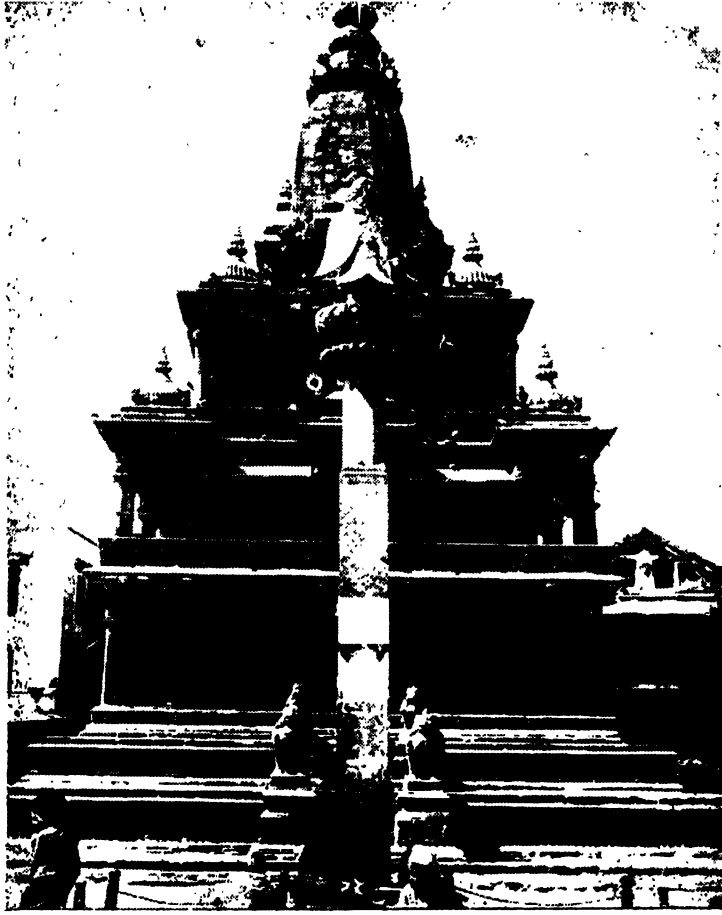
কৃষ্ণ মন্দির (নেপাল) —কুমারেশ বিশ্বাস

বি
নো
দি
নী

—রীনা ঘো
(৩য় পুরস্কার
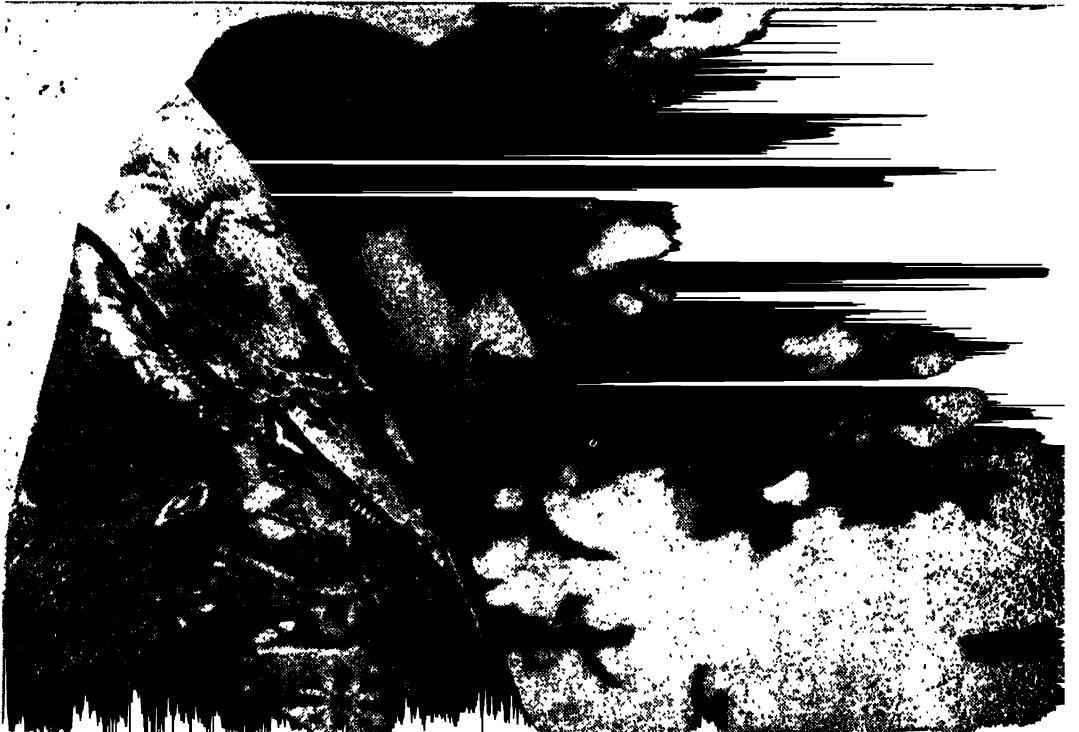
হা-ডু-ডু খেলা

—অনিল দাস

মাসিক

বসুমতী

ফাল্গুন / ১৩৭৫

হাইডেলবার্গ সহর

(পঃ জার্মানী)

—এস কে বিশ্বাস

পসারিনী

—শ্রীবাদল ভট্টাচার্য অঙ্কিত

বয়ন্দে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদত্ত। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—মানবেন্দ্র পাল, প্রকাশনায়—জাতীয় প্রকাশক, ৬৪।২ বিধান সরণী, কলিকাতা—৬, দাম—চার টাকা।

প্রবন্ধ সঞ্চয় / আশাবরী পাবলিকেশন

আলোচ্য গ্রন্থটিতে সাংবাদিকতাকে কেন্দ্র করে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। লেখক নিজে সাংবাদিক, কাজেই তাঁর রচনা সহজেই তথ্যনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পেরেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সাংবাদিকতারও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, বর্তমান রচনাটি পাঠ করলে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—শিশিরকুমার মাইতি, প্রকাশনা—আশাবরী পাবলিকেশন, ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া দাম—দু টাকা।

ব্যোমকেশের তিনয়ন / আনন্দ পাবলিশার্স

বহুখ্যাত ব্যোমকেশের তিনটি গল্প একত্রে গ্রথিত করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। গল্প তিনটির মধ্যে দুটি পুরাতন একটি নতুন, সৌকর্যে কিন্তু পুরোনো গল্প দুটিই সেরা, বহুদিন পরে আবার সেগুলি পাঠ করে মনে হল বাংলা সাহিত্যে রহস্য গল্পের মান উন্নয়নের জন্য একা শরদিন্দুই যথেষ্ট। ব্যোমকেশ সত্যই এক স্মরণীয় চরিত্র, সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, শান দেওয়া ক্ষুরের মত চকচকে ধারালো বুদ্ধি ও অনতিক্রম্য ব্যক্তিত্বে সে সত্যই এক অনবদ্য সৃষ্টি। ব্যোমকেশ যে আমরা আরও বহুবার পেতে চাই লেখককে সেকথা সবিনয়ে নিবেদন করি। বাংলা রহস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল সংযোজন। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা।

কলকাতা থেকে বলছি / মিত্র ও ঘোষ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্পসংগ্রহ। কলকাতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে গল্পগুলি। মোট তেরোটি গল্প স্থান পেয়েছে এতে। লেখক স্বনামধন্য সাহিত্যিকার, আকর্ষণীয় করে গল্প বলতে তিনি জানেন, বর্তমান গ্রন্থের গল্পগুলিতেও রয়েছে সে পটুত্বের স্বাক্ষর। বর্তমান সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পঙ্কিল পটভূমিকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতেই চেয়েছেন তিনি এবং তাঁর সে প্রচেষ্টা বহুলাংশে সার্থকও হয়ে উঠতে পেরেছে। কয়েকটি গল্প তো বিশেষভাবেই দাগ এঁকে দেয় পাঠক মনে। "ইতিহাসের পাপ," "বাদশাহী," "শয়তান" প্রভৃতি গল্পগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। লেখকের আকর্ষণীয় শৈলী এই গল্পগ্রন্থটির অন্যতম প্রধান সম্পদ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—বিমল মিত্র, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা।

নগ্ন নির্জন / আনন্দ পাবলিশার্স

আরণ্যক পটভূমিতে এক অনবদ্য প্রেমকাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখক লেখক যে পাকা শিকারী তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় রচনাটির মাধ্যমে, কিন্তু সেটা কিছু বড় কথা নয় তিনি যে জাত-সাহিত্যিক সেটাই আসল। দক্ষ শিকারী রাকেশ শিকারের খোঁজে এসেছিল বাঘমুণ্ডার আরণ্য পরিবেশে, সঙ্গে তার দুই অতিথি শ্রুতি ও অর্জুন। শ্রুতি আর অর্জুন, স্বামী ও স্ত্রী বিপত্নীক রাকেশ এই তিনে মিলে দিন যায় অসমছন্দে, স্বামী অর্জুনের অমনোযোগ ও সহানুভূতিহীনতায় শ্রুতির মন উদাস হয়, চঞ্চল হয়ে ওঠে সে, কি যেন অভাব কি যেন অতৃপ্তির আভাসে ভরে ওঠে তার সমস্ত হৃদয়। অপরপক্ষে সহিষ্ণু বক্ষে ভালবাসার বেদনা বহন করে প্রতীক্ষায় থাকে রাকেশ, তার আজীবনের কামনা কি শুধু স্বপ্নচারিণী হয়েই থাকবে? থাকবে অধরা অলভ্য? খুব ভাঙ্গে শ্রুতির, নিঃশব্দ পূজার ডালি কখন নিজেরও অজানিতে গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে সে। কিন্তু গ্রহণ করাই কি অত সহজ? স্বামীর দাবী তার পথ ছাড়বে কেন? বেদনার্ত হৃদয়ের আর্তি যেন পরতে পরতে ছড়ানো কাহিনীর প্রতি ছত্রে, সকরুণ সমাপ্তিটিও মনকে ছুঁয়ে যায়। লেখকের শৈলীও বিশেষ উল্লেখ্য, এক কাব্যময় মানসের প্রতিচ্ছায়া যেন। আমরা বইটি পড়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বুদ্ধদেব গুহ, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম— চার টাকা।

নকশালবাড়ি ও রাজনৈতিক আবত / গ্রন্থপ্রকাশ

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আকাশে ধূমকেতুর মতই স্বপ্রকাশ নকশালবাড়ি আন্দোলন। বর্তমানে অবশ্য প্রায় সব নেতাদেরই কারারুদ্ধ করে, আন্দোলনটিকে স্তিমিত করে ফেলা হয়েছে তবু এর গুরুত্ব কমে না। এই আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হতে চাওয়ার মত রাজনৈতিক সচেতনতারও অভাব নেই, আলোচ্য গ্রন্থটি এই বিষয়েই আলোকপাত করেছে। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত যে, এই রচনা—রাজ্য রাজনীতির এক যুগসন্ধিক্ষণেরই রোমাঞ্চকর সংবাদসমূহের নেপথ্য চিত্র। বিগত নির্বাচনে কংগ্রেসের পতন থেকে কানু সান্যালের গ্রেপ্তার পর্যন্ত সব উল্লেখ্য ঘটনাই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক অমূল্য রাজনৈতিক দলিল। হিসাবেই গণ্য হওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ রঙীন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—কৃত্তিবাস ওঝা, প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

॥ এরুপ ॥

সতীশচন্দ্র সোদপুর থেকে আমায় ফোনে জানালেন, আচার্যদেব খাদি-প্রতিষ্ঠানে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করতে গেছেন। তাঁর শরীর অসুস্থ। তিনি ডাঃ বোসের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চান।

ডাঃ বোসকে বললাম। তিনি শুনলেন, কথাটা, কিন্তু একটার পর একটা এমন কাজের চাপ পড়তে লাগল, যে কিছুতেই তিনি সোদপুর পর্যন্ত যাওয়ার সময় করে উঠতে পারলেন না সেদিন।

পরদিন দুপুরে আবার ফোন এলো। আমি বললাম, ডাঃ বোসকে বলেছি—তিনি শীঘ্রই একদিন যাবেন বলেছেন। আজ আবার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব।

মাঝে বোধ হয় একদিন বাদ দিয়ে আবার ফোন এলো। অফিসের পাশে যে ঘরটিতে ডাঃ বোস থাকতেন, সেখানেই একখানি তক্তপোষে শুয়ে শুয়েই অফিসের চিঠিপত্র স্বাক্ষর করতেন, বহিরাগতদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতেন, সেই ঘরেই তাঁর খাস চাকর দয়া দুপুরের খাবারও নিয়ে আসত। আমি যেদিন লাহোর থেকে মামলার খবর ও নানা কোম্পানীর ওষুধের নমুনা নিয়ে ফিরেছিলাম, সেদিনও ঐ ঘরে বসেই তিনি দুপুরের আহার সারছিলেন। সেদিন রাজশেখরবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলে তিনি দুপুরের অসমাপ্ত আহার আর পুনর্বার ... নি—সে কাহিনী পূর্বে বলেছি।

সেদিনও ফোনটি রেখে ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি—ভাত খাচ্চেন। দূর থেকে দেখেই সরে এলাম, পাছে কিছু বলে ফেলায় যদি আহারে বাধা ঘটে।

খাওয়ার পরেই তিনি যে তক্তপোষে বসে খেতেন সেখানেই একটি পাশবালিস মাথায় দিয়ে শুয়ে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিতেন এবং শুয়ে শুয়েই আমার কাছ হতে দরকারি খবর শুনে নিতেন।

সঞ্জয়

আমি অন্য কথার পরে বললাম—সতীশবাবু আজ আবার ফোন করেছিলেন এবং বলেছেন যদি আপনার যেতে সময় না হয় তবে আচার্যদেব নিজে আসতে চেয়েছেন। আপনার কাছে তাঁর বিশেষ দরকার আছে।

তিনি শুনেই বললেন—তুমি এক্ষুণি ফোন করে দাও, অসুস্থ শরীরে দাদার আসবার দরকার নেই, আমিই যাচ্ছি, এখনই রওনা হচ্ছি। তারপর ফোনটা সেরে এসে ড্রাইভার মুকুলকে বলো, গাড়ি বের করতে। সোজা মোটরে যাব। তুমিও সঙ্গে চলো। দাদা তোমায় দেখলে খুশীই হবেন।

... একটু ইতিহাস আছে। সেটুকু পরে বলছি। আগে এখানে আচার্যদেবের সঙ্গে সেদিনের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা বলে নিই।

তিনি সেদিন আর আহারের পর বিশ্রাম না করে উঠে কাপড়-চোপড় পরে নিলেন।

ডাঃ বোস থাকতেন যেমন সাদা-সিধাভাবে, পরতেনও তেমনি সাদাসিধা পোষাক। বাড়িতে একজোড়া কালো চটি পরতেন। বেরুবার সময় কালো ফিতাহীন জিবতোলা পাম্পসু-জুতা—যা সহজেই পা থেকে খোলা যায়। যেখানে যখন বসতেন, পা জুতা থেকে খুলে পায়ে বাতাস লাগাতে ভালোবাসতেন। এইজন্যই জিবতোলা পাম্প-সু তাঁর পছন্দ ছিল। একজোড়া জুতাই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় প্রত্যহ ব্যবহার করতেন। একজোড়া সম্পূর্ণ ব্যবহারের অনুপযোগী না হলে আর একজোড়া কিনতেন না।

পরতেন সাদা পাড়হীন থান কাপড়, হাতা দেওয়া গেঞ্জি আর সাদা টুইলের শার্ট। কোন অনুষ্ঠানেই তাঁকে পাঞ্জাবী কিম্বা পাড়ওয়ালা ধুতি পরতে দেখি নি। শীতকালে এই পোষাকের উপর একটা বালাপোশ গায়ে দিতেন আর বেশী শীতে মাথায় একটা বালাক্লাভা টুপি পরতেন। আর তাঁর বাবার ব্যবহৃত একটি ত্রিভঙ্গিম যষ্টি তিনি ব্যবহার করতেন।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
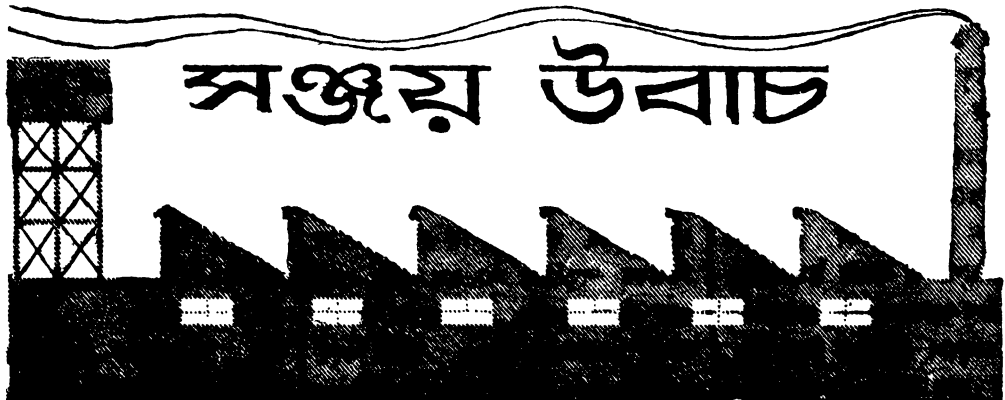
কখনও ক্লিপ-ওয়াচ কিম্বা ফাউনটেন পেন ব্যবহার করতেন না। একটা ট্যাক-ঘড়ি ছিল, তাও আমায় রাখতে দিয়েছিলেন। আমি যখন চাকরি ছেড়ে চলে যাই ঐ ঘড়িটি তাঁর ছোট ভাই চারুবাবুর কাছে জমা দিয়ে গিয়েছিলাম। তা শুনে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন—চাকরি ছেড়েছে ছেড়েছে, তাই বলে ঘড়িটাও ফেরত দিয়ে গেছে! আজ মনে পড়লেও চোখে জল আসে। ঘড়িটা ছিল তাঁর স্নেহের দান। কিন্তু আমি বুঝতে না পেরে তাঁর জিনিস তাঁর ভাইয়ের হাতে দিয়ে যাওয়া উচিত মনে করেছিলাম।

যাক, যা বলছিলাম।

ফোনে সতীশবাবুকে সংবাদ দিয়ে আমি নিচে নেমে দেখি ডাঃ বোস তার মধ্যেই তৈরী হয়ে গাড়িতে গিয়ে বসেছেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি গেলে গাড়ি সোদপুরের দিকে রওনা হল।

ডাঃ বোস মনে করতেন, বিশ্রাম একটি পরম উপকারী ওষধ। তিনি যখন যেভাবে পারতেন বিশ্রাম নিতেন। এইজন্যই রোগী দেখে এসে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম করতে করতে অফিসের কাজ দেখতেন। অফিস—অর্থাৎ ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরি লিমিটেড—যাঁর ম্যানেজিং এজেন্টস ছিল কার্তিক বোস এণ্ড সন্স এবং ডিরেক্টর হিসাবে তিনিই তখন তার পরিচালক ছিলেন।

শেষ জীবনে তাঁকে দেখেছি—চোখ বুজে কথা বলতে। এভাবে চোখকে বিশ্রাম দিতেন।

ক্ষয়রোগীদের বিশ্রামসহ চিকিৎসার জন্য সারা ভারতে তিনিই সর্বপ্রথমে দেওঘরে স্যানাটোরিয়াম খুলেছিলেন। শেষ জীবনে কার্তিকপুরে যে টি-বি হাসপাতাল গড়ে তুলেছিলেন তারও নাম দিয়েছিলেন—বিশ্রাম-মন্দির।

কথায় কথায় তিনি একটি স্বরচিত ছড়া শোনাতেন—

'মুক্তবায়ু, হিতপথ্য, তমোহর রবির কিরণ, সংযম, বিশ্রাম, শান্তি—শ্রেষ্ঠৌষধ এরাই ক'জন।'

রোগী কিম্বা ভোগী সবাইকেই তিনি বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিতেন। নিজেও নানা বিরূপ অবস্থার মধ্যেও বিশ্রাম নিতে অভ্যাস করেছিলেন।

২৪-পরগণার কার্তিকপুরে যেখানে তিনি কৃষি গো-পালন ও জনসেবা লিমিটেড নামে একটি ফার্ম করেছিলেন, নিকটে মৈত্রবাগানে রাজলক্ষ্মী সুগার মিলস নামক চিনির কল করেছিলেন—কলকাতা থেকে ৪০-৪৫ মাইল দূরবর্তী এইসব স্থানে যাওয়ার জন্য একখানি ছোট ভ্যানে তাঁর শয্যার ব্যবস্থা ছিল। তিনি শুয়ে শুয়ে চলে যেতেন।

সোদপুর যাওয়ার পথে গাড়িতেই তিনি একটু ঘুমিয়ে নিলেন।

খাদি-প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি পৌঁছালে ডাকব ভেবেছিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য, দেখি নিজেই জেগে জিজ্ঞাসা করছেন—কই রে সুকুল, আর কতদূর।

বহুদিনের বিশ্বাসী ড্রাইভার সুকুলজি বললে—আ গিয়া।

খাদি-প্রতিষ্ঠানের সদর ফটক গাড়ি ঢুকলে দেখলাম ফুল হাতে কর্মী ছেলেরা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা প্রাঙ্গণে গাড়ি গিয়ে থামলে আমি নেমে গাড়ির দরোজা খুলবার আগেই সতীশচন্দ্র এবং তাঁর পত্নী এগিয়ে এসে ডাঃ বোসকে অভ্যর্থনা করে প্রণাম করলেন এবং যেখানে আচার্যদেব ছিলেন সেই ছোট একতলা বাড়িটিতে নিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে একটি তক্তপোষে আচার্যদেব বসেছিলেন, আমরা যেতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ডাঃ বোসকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

ডাঃ বোসের হাতে তাঁর সেই যাবার ব্যবহৃত মাথার খানিকটা ভেবে

খাওয়া মোটা বাঁকা লাঠিখানা ছিল। সেটা আমি তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিলাম। সেই দুই বৃদ্ধের আলিঙ্গন-আবদ্ধ পরিতপ্ত আনন্দিত মুখচ্ছবি এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি।

আমি আচার্যদেবকে প্রণাম করতেই ডাঃ বোস বললেন, দাদা, সেই ছেলেটিকে আবার ধরে নিয়ে এসেছি সঙ্গে—যে তোমার জীবনী লিখে পুরস্কার পেয়েছিল।

আমার পিঠে একটি চড় পড়ল। আচার্যদেবের স্নেহের চপেটাঘাত। বললেন—তুই আছিস তবে কার্তিকের কাছে। বেশ বেশ। আশ্রম ঘুরে দেখে আয়—অনেক কিছু জানতে পারবি।

আমি বেরিয়ে এলাম। মনে হল, ডাঃ বোসকে হয়ত নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।

বাইরে বেরুলে সতীশবাবু বললেন—ডাক্তারবাবু আজকাল কি খান? গরুর দুধ আর সন্দেশ তৈরী রেখেছি, খাবেন তো?

আমি বললাম—এইমাত্র ভাত খেয়ে চলে এসেছেন। এখন কি দুধ খেতে রাজি হবেন? আর আজকাল সন্দেশ তো খেতে দেখি নি।

এক সময় খুব খেতে পারতেন। আমি জানি তো সে সব।—বললেন সতীশবাবু। তারপর গুটিচারেক পুষ্ট ডাব দেখিয়ে বললেন, ডাবে আপত্তি নেই তো?

আমি বললাম—বরং এখন ডাবই দিন। এতটা পথ মোটরে এসেছেন। ওঁর খুব ঘন ঘন বড় গ্লাসভর্তি জল খাওয়া অভ্যাস।

এটা আমি দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করেছিলাম। গেটের কাছে ঘোড়ার গাড়ি ঢুকবার শব্দ শুনলেই ডাঃ বোসের খাস চাকর দয়া একটি ঢাকা-দেওয়া বড় কাঁচের গ্লাসে একগ্লাস কবোষ্ণ জল আর একখানি ভিজা গামছা নিয়ে হাজির হত। জল যাতে ইষদুষ্ণ হয় তার জন্য একটি গ্যাস স্টোভের উপরে এককেটলি জল সব সময় অল্প আঁচে বসানো থাকত আর পাশে আর এক কেটলি ফোটানো জল ঠাণ্ডা করা থাকত। গাড়ির শব্দ পেলেই দয়া দুই রকম জল মিশিয়ে নিয়ে হাজির হত। ডাঃ বোস চকচক করে সবটুকু জল খেয়ে গামছায় মুখ মুছে নিজের কাজে মন দিতেন।

সতীশবাবু একটি ডাব কেটে ডাঃ বোসকে দিলে তিনি সানন্দে খেলেন। আমার ভাগেও একটা জুটে গেল। তারপর আমি একজন কর্মীর সঙ্গে আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখতে গেলাম।

খাদি-প্রতিষ্ঠান যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দেশের সর্বস্তরে স্বাবলম্বী হওয়ার এবং কর্মোন্মাদনা জাগাবার আকাঙক্ষা সুস্পষ্ট ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পরম যত্নে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রেখে নানা কর্ম-প্রচেষ্টায় সার্থক করে তুলেছিলেন। সে কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন বাংলার গান্ধী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। চারুচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ খাদী-কর্মীরাও সর্বত্র সম্মানিত হয়েছিলেন। বস্তুত দেশসেবার মধ্যেও যে দেশ গঠন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অধিকতর সুস্থ ও সুন্দর করে তুলবার কাজে অগ্রসর হওয়া যায়, দেশসেবা কেবল রাজনীতি চর্চাতেই সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক দিকটা, সামাজিক দিকটা এবং মানবিক দিকটাও যে লক্ষ্যের মধ্যে রাখতে হবে খাদি-প্রতিষ্ঠান তা করে দেখিয়েছিল। দেশের আর্থিক বনিয়াদ গঠন, বুনিয়াদি শিক্ষার বিস্তার, কুটির-শিল্প গঠন ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজে খাদি-প্রতিষ্ঠানের নাম চিরস্মরণীয় থাকবে।

আরও বেশি বিস্ময় বোধ হয়—যে বিরাট ব্যক্তিত্ব বেঙ্গল কেমিক্যালের মত অত্যাধুনিক রাসায়নিক কারখানা গড়ে তুলে ভারতবর্ষে শিল্প-বাণিজ্য গঠনের পথ দেখিয়েছেন, নিজে আরও দশ-বিশটা আধুনিক কারখানার পত্তন করেছেন বা পত্তন করতে উৎসাহ জুগিয়েছেন যাতে দেশব্যাপী শিল্প সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হয়, সেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন—দেশের পল্লী গঠনে, কুটির শিল্প সংরক্ষণে এবং সম্প্রসারণে। একই মহাপুরুষের দুটি হাত যেন দেশের দু'দিকে সম্প্রসারিত। আর তাঁর মনটি জুড়ে আছে বিজ্ঞান-ভাবনা।

মনে পড়ে, পানিহাটিতে বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার হলঘরে আচার্যদেবের একখানি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র দেখেছিলাম। সেটি ঐ এসিড কারখানার প্রাণপুরুষের প্রতিকৃতি। সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উপযোগী সুবর্ণবলয়িত মূল্যবান চিত্র।

আর এখানে খাদি-প্রতিষ্ঠানের শান্ত শ্যামল পরিবেশের ছোট ছোট কুটিরে পরিচ্ছন্নভাবে যে কুটিরশিল্পের কাজগুলি হতে দেখলাম তার মধ্যে একখানি অতি সাধারণ তক্তপোষে সমাসীন এই আশ্রমের প্রাণপুরুষকেও সশরীরে দেখলাম। দেখলাম সেই হাস্যমধুর শ্মশ্রু-সমাচ্ছন্ন মুখখানি, দেখলাম সেই শীর্ণ কায় তপস্বীকে যাঁর তপোপ্রভায় সারা ভারতের বিজ্ঞান-মন্দির আলোকিত হয়েছে। দেখলাম এই আশ্রমের ঋষি প্রফুল্লচন্দ্রকে।

সেদিন বিদায় নেবার বেলায় আচার্যদেব ডাঃ বসুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। প্রণাম করলাম ডাঃ বোসকে, বাংলার গান্ধী সতীশচন্দ্রকে। অস্তসূর্যের রক্ত আভায় তিনখানি মুখ উদভাসিত হয়ে উঠেছে দেখলাম।

প্রাঙ্গণে চারুবাবু ও অন্যান্য খাদি-কর্মীরা সমবেত হয়েছিলেন ডাঃ বোসকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। যখন আমাদের গাড়িটি ছেড়ে দিল—পিছনে তাকিয়ে দেখি আচার্যদেব তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে—যেন নিতান্ত আপনজনকে বিদায় দিচ্ছেন। কে, সি-কে পি, সি সত্যই আপনার ভাইয়ের মত ভালোবাসতেন যে।

সেদিন কি জানতাম যে সেই আমার শেষ দেবদর্শন। ডাঃ বোসের সঙ্গেও

আচার্যদেবের আর চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় নি। যেদিন সায়ান্স কলেজ হতে সেই দুঃসংবাদ এলো—আচার্যদেব আর ইহলোকে নেই, ডাঃ বোস বড় একটা ইজিচেয়ারে চুপ করে শুয়েছিলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—সাহস হল না জিজ্ঞাসা করি, সায়ান্স কলেজে যাবেন কি না। চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মালা পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

রাতে ডাঃ বোস বললেন—খাদি-প্রতিষ্ঠানে শেষবারের মত দেখা হয়েছিল। কত কথা বললেন—সে সব কথা তো বলবার নয়, শুধু তোমায় বলি আজ—দাদার স্মৃতির উদ্দেশে। আমার জীবিতকালে একথা প্রকাশ কোরো না। আমি চাই না—আমায় নিয়ে আজ আবার কেউ এইসব কথা তোলে। বিগত দিনের কথা ভেবে আর লাভই বা কি?

॥ বাইশ ॥

সেদিন খাদি-প্রতিষ্ঠান থেকে ফিরবার মুখে সারা পথ ডাঃ বোস চুপ করে বসেছিলেন। আমিও সাহস করে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলাম না। কিন্তু আচার্যদেবের সঙ্গে তাঁর এমন কোন বিষয় আলোচনা হয়েছে যাতে তিনি রীতিমত বিচলিত হয়েছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

পথে দীনেন্দ্র স্ট্রীটের কারখানা বাড়িতে আমায় নামিয়ে দিয়ে ডাঃ বোস আর কোথাও গিয়েছিলেন। রাতে যখন দেখা হল আমায় বললেন—এই চটি বইটি তোমায় দিচ্ছি, তুমি এটি নিজে পড়বে না, চারুকে দিয়ে এসো। তাকে বলবে—এটি যত্ন করে তুলে রাখতে, কাউকেই যেন না দেখায়।

আমি তাঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতাম বলেই বোধ হয় ডাঃ বোস আমাকে অত বিশ্বাস করতেন। আমি পুস্তিকাখানি নিয়ে সোজা তাঁর ছোট ভাই চারুবাবুর হাতে দিয়ে যথানির্দেশ বলে এলাম। পুস্তিকাখানি খুলে দেখি নি, তবে মলাটটা নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখে পড়েছিল। তাতে লেখা ছিল—'হোয়াই আই লেফট বেঙ্গল কেমিক্যাল—'

নীচে নাম—পি সি রায়

নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, কৌতূহল হলেও আমি ভিতরের লেখা পড়ি নি তাই আচার্যদেবের বক্তব্য জানতে পারি নি। কিন্তু আচার্যদেবের তিরোধানে শোকাহত কার্তিকচন্দ্র সেদিন রাতের নিভৃতে যে কথা ক'টি বললেন, তাতে খাদি-প্রতিষ্ঠানের শেষ মিলনের দিনে আচার্যদেবের সঙ্গে ডাঃ বোসের কিরূপ কি আলোচনা হয়েছিল সেটা যেন ছবির মত মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম।

আমাকে আশ্রম দেখতে সরিয়ে দিয়ে দুই বন্ধু যখন একাকী হলেন তখন আচার্যদেব ডাঃ বোসের হাতে ঐ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি দিয়ে বলেছিলেন—আমি কেন বেঙ্গল কেমিক্যাল ছেড়ে দিয়েছি সেকথা এখানে লিখেছি, অবসরমত পড়ে দেখ।

ভাই, আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিছনে তাকালেই একটা অপরাধের বোঝা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে ফেলে। আমার হাত দিয়ে যে প্রস্তাব পাশ করাবার ফলে তুমি বেঙ্গল কেমিক্যাল ত্যাগ করে চলে এসেছিলে সেটা আমার ইচ্ছা অনুসারে করা হয়নি। আমার সেই কৃতকর্মের জন্য সারাজীবন আমি অনুতাপ করেছি। এখনও যদি তুমি আমায় ভুল বুঝে অপরাধী করে রাখো তবে মৃত্যুর পরেও আমার আফশোস থেকে যাবে।

ডাঃ বোস বারবার বলতে লাগলেন—দাদা, সে অতীতের কথা তুমি ভুলে যাও। ও মনে করে তুমি দুঃখ পেও না। যা হবার হয়ে গিয়েছে।

আচার্যদেব বললেন—না কার্তিক, তুমি দাদাকে ভুল বুঝো না, তাহলে মরলেও আমি শান্তি পাবো না।

ডাঃ বোস অনেক করে আশ্বস্ত করলেন আচার্যদেবকে, বললেন, দাদা সে কোন তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে ঘটনা, তা কারো মনে নেই, আমারও মনে নেই। তাছাড়া আমি তো অন্য কাজ-কারবার গড়ে তুলেছি। আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই মনে। তুমি এ কথা ভেবে কিছুমাত্র দুঃখ পেও না। যা ঘটে তা সর্বনিয়ন্তার নির্দেশেই হয়। তুমি-আমি নিমিত্তমাত্র। গীতার কথা কি তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?

দাদা চোখ মুছলেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চোখে জল। এবার আনন্দের অশ্রু। বললেন ডাঃ বোস। স্মৃতি-বেদনার ভারে ব্যথিত করুণ কণ্ঠে বললেন, সেই অপ্রকাশিত ঘটনার কথা।

সেই ছোট্ট গোপন পুস্তিকার কথা ক'জনে জানেন জানি না। এই উপলক্ষ করে আমার শুধু সৌভাগ্য হল দুটি মহৎ হৃদয়ের বিচিত্র বিকাশ দেখবার। একজন তার দেবত্বের উচ্চাসনে আসীন হয়েও পূর্বকৃত অন্যায়ের অনুশোচনায় গলিত অশ্রু। আর একজন সব ভুলে গিয়ে সেই মোহানায় আত্মসমর্পণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। অধিকন্তু সযত্নে গোপন রাখলেন মহত্ত্বের সেই অনুশোচনার কাহিনী, তা জাহির করে আত্মপ্রচারের অপচেষ্টার দিক দিয়েও গেলেন না।

পুণ্য চরিত্র লোকোত্তর পুরুষ আচার্যদেবের জীবনীতে এই ক্ষুদ্র কাহিনীটুকু হয়ত কোথাও লিপিবদ্ধ থাকবে না। কিন্তু নিজ চোখে যা দেখেছি, নিজ কানে যা শুনেছি তা আজ জানিয়ে তাঁদের উভয়ের স্মৃতিতেই আজ প্রণাম জানাই।

[ক্রমশ

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, উল্টোডাঙ্গা মেন রোড, কলি—

প্রশ্ন : আমি ও আমার দিদি গত ৭/৮ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত বারো মাস সর্দিতে ভুগিতেছি। নিশ্বাসের সঙ্গে দুর্গন্ধ বাহির হয়। যার ফলে এ কলেজে কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি না। আমরা দুজনেই 'স্টুডেন্টস হেলথ হোমে' দেখিয়েছি। সেখানে আমাদের নাকে একটা অপারেশন করতে হবে বলেছেন।

উত্তর : অপারেশনের বিষয় ওঁরা যা বলেছেন, তাই করিয়ে নিন। ভয় নেই, এ ধরণের অপারেশনে নাকের কোন বিকৃতি ঘটে না। ইতোমধ্যে Biolan 12 (Albert David) 2 ml এবং Placenta Extract 2 ml সমানভাবে মিশিয়ে Intra-muscular Injection একদিন পর পর দশটি করে নেবেন। অপারেশনের পর অনুরূপভাবে ইনজেকশন আরও দশটি নেবেন। দু' ভাইবোনই Pulmocod with guiacol (Stadmed) সকালে দু চামচ বিকেলে দু চামচ করে সারা শীতকাল খাবেন।

● শ্রীসমীরকুমার মুখার্জী, রাজারহাট, বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা—

আপনি Nevrovitamin 4 (adult) সকালে ২টা বড়ি, রাতে ২টা বড়ি একমাস ধরে খাবেন।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র কুণ্ডু, বনহুগলী, ২৪ পরগণা—

আপনি যে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন, তার উত্তর চিঠিতে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি চিকিৎসকের মতামত নিন।

● শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায়, কলেজ স্টুডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জংশন—

১নং প্রশ্নর উত্তর : চোখের দৃষ্টি ভাল রাখার জন্য ভাল তেল, ঘি, শাকসব্জী এবং ভাত ও রুটি খাবেন।

২নং প্রশ্নর উত্তর : কোন ভয় নেই। জাঙ্গিয়া ব্যবহার করতে পারেন। (প্রশ্ন ছাপতে চান না)।

● পি কে জি (ছদ্মনাম), কোঁয়ারপুর, বর্ধমান—

আপনি নিয়মিতভাবে গায়ে কার্বলিক সাবান মাখুন, মাথায় স্নানের

পর Pragmatar মলম ঘষবেন এবং দুবেলা ভাত খাবার পর Multivitamin বড়ি খাবেন।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র রায় ও শ্রীনরেশচন্দ্র রায়, বাংলাঝাড়, বেংকান্দি, জলপাইগুড়ি—

এ বিভাগে কোন প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আপনারা Vitamin B Complex দু চামচ (চা চামচের) করে দুবেলা খাবার পর খাবেন একমাস ধরে।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

● শ্রীমতী মঞ্জু দে, নারিকেলডাঙ্গা, কলি-১১—

প্রশ্ন ১ : আমার স্বামীর ৮ বছর আগে জণ্ডিস হয়েছিল। চিকিৎসার পর ভাল হয়ে যান। তারপর থেকে চোখ হলদে হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হাত দিলে লিভারের বৃদ্ধি বোঝা যায়। স্বাস্থ্য মোটেই ভাল হচ্ছে না। কি করলে স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং চোখের হলদেটে ভাব কাটান যায়, জানাবেন।

উত্তর : Liver Extract Injection নিতে বলবেন। অন্তত ২০টা। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খেয়ে যাবেন। সমস্ত শীতকাল ধরে মিষ্টি কমলালেবুর রস এক গ্লাস করে খাবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার ৩ মাস আগে একটি সন্তান হয়। তারপর থেকে প্রতিমাসেই ঋতুস্রাব হচ্ছে এবং চিৎ হয়ে শুলে পেটে ভারী মত কি যেন একটা উপর দিকে ঠেলে ওঠে।

উত্তর : আমার মনে হয় আপনার জরায়ু এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি। (Subinvoluted uterus)। যেখানে আপনার সন্তান হয়েছে, সেখানে আর একবার দেখিয়ে নিন, তাঁরা যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন।

● ডি, সি, এস, বর্ধমান—

প্রশ্ন ১ : কত দিন অন্তর স্বপ্ন দোষ হলে অথবা হস্তমৈথুন করিলে অর্থাৎ শরীর হইতে বীর্য বাহির করিয়া দিলে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না?

উত্তর : স্বপ্নদোষ কোন সময়ে ক্ষতিকারক নয়। তবে স্বপ্নদোষের বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। হস্তমৈথুন কোন সময়েই ভাল নয়। হস্তমৈথুনের কথা না ভেবে পড়াশুনা করলে স্বাস্থ্যের উপকার হবে।

প্রশ্ন ২ : মেয়েরা যে সব প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করেন, তা কি ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর?

উত্তর : বাজে প্রসাধনী সব সময়েই ত্বকের পক্ষে খারাপ।

● শ্রীপরীক্ষিৎ রায়, বিন্ধ্যবাসিনী-তলা রোড, কলি-৫৭—

কোন ভয় নেই। ও উপসর্গ নিয়ে কোন ওষুধ খেতে হবে না। আপনা থেকেই সেরে যাবে।

● মু: মি (শ্রীমতী) প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, কলিকাতা—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে Metatone খাবেন তিনমাস ধরে, তারপর জানাবেন উপকার হল কিনা। সপ্তাহে দু দিন (তিন দিন অন্তর) হতে পারে। Lyndiol 2·5 যেমনভাবে খাচ্ছেন, খেয়ে যাবেন।

● শ্রীমহাদেব দে রায়, পদ্মঘোষার বাগান, লিলুয়া—

আপনাদের একটি সন্তান হলেই

আপনার স্ত্রীর উপসর্গগুলি সেরে যাবে। চিঠিতে এভাবে ও রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়। আপনি কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

● শ্রীকনক রায়, বিধান পল্লী, গড়িয়া—

আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Aminozyme খাবেন।

আপনার বন্ধুকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে বলুন।

● শ্রীমতী অঞ্জনা ঘোষ, আসানসোল, বর্ধমান—

আপনি Eskamel মলম দুবেলা মুখে মাখবেন। কোন ভয় নেই। এ ধরণের দাগ মিলিয়ে যেতে অনেক দিন লাগে।

● শ্রীমনোরঞ্জন দাশ, সন্তোষপুর গভর্নমেণ্ট কলোনী, ২৪ পরগণা—

আপনি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর এ সংখ্যাতেই দেওয়া আছে।

● জিজ্ঞাসু—

প্রশ্ন ১: আমার স্মৃতিশক্তি ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে—

উত্তর: আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Glutazyme খাবেন একমাস ধরে।

প্রশ্ন ২: আমার স্ত্রীর মাসিক আরম্ভ হবার প্রথমদিনে পেটে খুব ব্যথা হয়।

উত্তর: আপনার স্ত্রীর কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। রোজ দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Siovina খেতে দেবেন দু মাস ধরে। তাতেও যদি না কমে, তাহলে মাসিক আরম্ভ হবার আগের দিন থেকে মাসিক চলাকালীন সময়ে সকালে ১টি সন্ধ্যায় ১টি করে Premenolysin বড়ি খেতে দেবেন।

● শ্রীমনোজকান্তি দত্তগুপ্ত, দুর্গাপুর-৮—

প্রশ্ন: শীতকালে আমার শরীরে চামড়া মরে যায় ও চামড়া খসখসে হয়ে যায়। কিন্তু গরমকালে এটা থাকে না।

উত্তর: শীতকালে আবহাওয়া শুকনো থাকে বলে টান ধরে। শীতের শরীরে ভিটামিন-এ কম থাকে, এই ধরণের অতিরিক্ত খসখসে হয়ে যায়।

আপনি সারা শীতকাল দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Pulmocod (plain) খাবেন, এবং গায়ে অয়েল (গন্ধবিহীন) মাখবেন।

● এ কে দাস (হাওড়া)—

প্রশ্ন ১: প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ পুরনো অম্বল—

উত্তর: আপনি নিয়মিতভাবে দু-বেলা ভাত খাবার পর Diapepsin (Union Drug) চা চামচের দু চামচ করে ছ মাস ধরে খাবেন।

প্রশ্ন ২: তোতলামির ভাল চিকিৎসা জানা আছে কি?

উত্তর: আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পুরোপুরি সারাতে পারিনি। আমার সঠিক জানা নেই।

● মধুচক্র (ছদ্মনাম) আগরতলা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। প্রত্যহ চেষ্টা করা অন্যায়। সপ্তাহে দু দিনের বেশি নয়। অতীতের কথা ভুলে যান। ও নিয়ে যত ভাববেন বর্তমান জীবন তত বিষময় হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যা বলেছেন, তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনার স্ত্রীকে ভালভাবে খেতে দিন, দেখবেন পরের সন্তান সুস্থ হয়েছে।

● শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কোদালিয়া, ব্যাণ্ডেল—

প্রশ্ন ১: আমার বয়স ৭৫ বৎসর। গত দুই বৎসর হইতে চলিল কটিবাতে (Lumbago) আক্রান্ত হইয়া কোমর সোজা করিতে পারি না।

উত্তর: আগে X-Ray করে দেখে নিন, জায়গাটির হাড় বেড়েছে কিনা। যদি না বেড়ে থাকে, তাহলে Siobutazone বড়ি দিনে তিনটি করে দশ দিন খেয়ে দেখুন।

প্রশ্ন ২: প্রত্যহ রাত্রে আহারের পর রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার সময় বুক অজ্ঞান ও বুক জ্বালা অনুভব করি।

উত্তর: রাতে গুরুপাক কিছু

খাবেন না। আর রোজ রাতে খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Takadiastase খাবেন।

● ছন্দা সেন, কলিকাতা—

প্রশ্ন ছাপাতে নিষেধ করেছেন, ছাপলাম না। আপনি রোজ রাতে শোবার সময় Tofranil বড়ি ১টি করে খাবেন, অন্তত একমাস।

● শ্রীসুধীর সোরেন, দমদম—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● প্রদীপ (ছদ্মনাম) পুরুলিয়া—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে Syrup Methionine Forte (Albert David) দু মাস খাবেন।

● শ্রীউদয়ন দাশগুপ্ত, সেলিমপুর রোড, কলি-৩১—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, মিত্রপাড়া রোড, নৈহাটি—

প্রশ্ন: Syphilis রোগের লক্ষণ কি কি?

উত্তর: Syphilis-এর লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয় কারণ, এ রোগ নিজে নিজে কখনই নির্ধারিত করা উচিত নয়। সব সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয় এবং তিনি যা বলেন, বিনা দ্বিধায় তাই করতে হয়।

● শ্রীকল্যাণকুমার খাঁ, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর

চেরর দু চামচ করে Syrup B
plex খাবেন, দু মাস ধরে।

● শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পুর—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া ছে।

● শ্রীসুবীরকুমার সেন, চন্দননগর—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া ছে।

● অনামী—

আপনি নাম ঠিকানা প্রশ্ন গোপন করতে বলেছেন। শুধু রে যদি বুঝতে পারেন, আমার বলার নেই। আপনি যে বিষয় নিয়ে খছেন, তা নিয়ে কিছু ভাববেন না।

● শ্রীমতী নিরুপা রায়, প্রিয়নাথ ক রোড, কলি-২৫—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চামচের দু চামচ করে Colibil S Calcutta Chemical) একমাস বেন।

● শ্রীদামুদর দত্ত, বেলেঘাটা মেন ড, কলি-১৫—

যে প্রশ্ন লিখেছেন, তা সাধারণত য় থাকে। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হয়ে লে দেখবেন আর কষ্ট হচ্ছে না।

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Aminozyme খাবেন।

● শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখার্জি, গড়-মীর্জাপুর আন্দুল—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর ১টি করে Nevrovitamin 4 (adult) খাবেন, একমাস ধরে।

● শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বাগচি, হাওড়া—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীকমলকুমার মুখার্জি, বিডন স্ট্রীট, কলি-৬—

আপনাকে ব্যক্তিগতপত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রী থি এস বেরা, হাওড়া—১

আপনি এস এস কে এম হাসপাতালের E N T Dept-এ দেখিয়ে নিন।

● শুভ্র রায়চৌধুরী, বর্ধমান—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Takacombex খাবেন একমাস ধরে।

● 'মদনকুমার' মদনপুর, নদীয়া—

যে প্রশ্নগুলি করেছেন, তা ঘটে অতিরিক্ত যৌনচিন্তার জন্য।

● শ্রীতাপসকুমার বসু, গারুলিয়া, ২৪ পরগণা—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীমতী বুলবুল দেবী, কলিকাতা—

মনে হয় আপনার ছেলের অর্শ আছে। যে কোন হাসপাতালে দেখিয়ে চিকিৎসা করান।

● শ্রীপঙ্কজ মল্লিক, মালদহ—

Sharkoferrol খেলে চর্বি হয়।

● শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল, আগরতলা—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বর্ধমান—

আপনি দেরি না করে কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে চিকিৎসা করান। এ রোগের প্রশ্ন চিঠিতে দেওয়া সম্ভব নয়।

● শ্রীদীপককুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্র সরণি, বাঁকুড়া—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে—

● শ্রী সব—গঞ্জাম, উড়িষ্যা—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Aminozyne খাবেন।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

নবাব স্যার কাজী গোলাম মহীউদ্দীন ফারোকী

[মহানগরীর বর্তমান শেরিফ ও অবিভক্ত বাঙলার প্রাক্তন মন্ত্রী]

যে বছর রুশবিপ্লব সঙ্ঘটিত হল এবং ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জন্মগ্রহণ করলেন সেই বছর যাঁর কর্মজীবনের ধারা প্রবাহিত হতে সুরু হল, সে ধারা আজও অব্যাহত। সে সময়টি থেকে আজ বাহান্ন বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে অর্থাৎ একটি শতাব্দীর অর্ধাংশ অতিবাহিত হয়ে গেল, সেদিনের তেইশ বছরের তরুণ আজ পঁচাত্তরে পা দিয়ে একটি শতকের তিন-চতুর্থাংশে উপনীত হয়েছেন। কেশে আজ তাঁর শুভ্রতা এসেছে বটে কিন্তু কর্মশক্তি তাঁর আজও অফুরন্ত। রতনপুরের নবাব স্যার কাজী গোলাম মহীউদ্দীন ফারোকী সক্রিয় কর্মজীবন থেকে আজও অবসর নেন নি। আজও তিনি নিজেকে জড়িত রেখেছেন নানা গঠনমূলক কাজে।

১৮৯৪ সালে রতনপুরের নবাব প্রাসাদে তাঁর জন্ম। ১৯১৭ সালে তেইশ বছর বয়সে কুমিল্লার পৌর-কমিশনার হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। ১৯২০ সালে হলেন কুমিল্লার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯২৩ সালে ত্রিপুরার জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁকে দেখা গেল।

১৯২১ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ডের সংস্কারের ফলে তদানীন্তন বঙ্গের রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামো যখন নতুন করে তৈরী হয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও পরিষদের সৃষ্টি হল, সেই সময় ফারোকী এই নবগঠিত সভা ও পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন ত্রিপুরা থেকে। এই সময়ে নবসৃষ্ট মন্ত্রী-পরিষদের মুখ্যসচেতকের পদেও দেখা গেল সাতাশ তরুণ ফারোকীকে।

১৯২৯ সাল পর্যন্ত পৌর কমিশনার, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানের আসনে তাঁর স্থিতি এবং সেই বছরই অবিভক্তবঙ্গের মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন ফারোকী। বঙ্গ সরকারের প্রবীণ মন্ত্রী এবং পরিষদ-নেতা হিসাবে শিল্প, স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন,

মবাব স্যার কাজী গোলাম মহীউদ্দীন ফারোকী

কৃষি, জনস্বাস্থ্য, সমবায় প্রতিষ্ঠান-সমূহ এবং পাবলিক ওয়ার্কস প্রভৃতি বিভাগগুলির তিনি ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ব্যবস্থাপক সভা ও পরিষদের সদস্য এবং মন্ত্রিপদে তিনি সমাসীন ছিলেন।

মন্ত্রী হিসাবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এবং সমৃদ্ধিসাধনে তাঁর কর্মকীর্তি নিঃসন্দেহে এক বিশেষ অভিনন্দনের দাবীদার। দেশের শিল্পোন্নয়নে এবং কৃষির উন্নতিসাধনে তৎসহ প্রগতির ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা দূরীকরণে তিনি যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বিরাট মূল্যের। ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির কল্যাণকল্পে তাদের উদ্দেশে সরকারী সাহায্যের তিনি প্রবর্তন করেন। শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের বেকারিত্ব নাশনেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষিকর্মের উপযোগী আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূরীকরণে কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কসমূহও তিনি প্রতিষ্ঠা করান। ওয়াটার হিয়াকিনথ এ্যাক্টের সৃষ্টি করে দেশের জলসমস্যা বিদূরিতকরণে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মন্ত্রী-জীবনের আর একটি অতুলনীয় অবদান—কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শীর্ষস্থানীয় পদগুলি শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া আয়ত্ত থেকে ভারতীয়দের আয়ত্তে এনে দেওয়া। ডিরেক্টার অফ ইণ্ডাস্ট্রিস, ডিরেক্টার অফ ভেটেরেনারি সার্ভিসেস, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ এবং ভেটেরেনারি কলেজের অধ্যক্ষের আসনে ফারোকীর আমলেই সর্বপ্রথম ভারতীয়দের দেখা গেল। এই পরিবর্তন তাঁর যথেষ্ট সংগ্রাম এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের এক প্রত্যক্ষ ফল বলা যায়।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন কমিটিতে তিনি অন্তর্ভুক্ত হলেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের কার্যভার তিনি বহন করে গেছেন ১৯৪০ থেকে '৪৩ পর্যন্ত। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি নিযুক্ত হলেন মহানগরীর শেরিফ। পদাধিকারবলে মহাজাতিসদনের অছি-পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য।

১৯১৬ সালে তাঁর বিবাহ হল দিলদাওয়ারের নবাব স্বর্গত স্যার আবদুল করিম গজনভীর কন্যা কাতরিনা সুলতানা জুবেদা বেগমের সঙ্গে।

১৯২৪ সালে তিনি 'খানবাহাদুর' উপাধি লাভ করলেন। ১৯৩২ সালে পেলেন 'নবাব' উপাধি। ১৯৩৬ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে দিলেন নাইটহুড। পঞ্চম জর্জের জীবদ্দশায় শেষবারের মত যাঁরা সরকারী খেতাবে বিভূষিত হলেন নবাব স্যার কাজী গোলাম মহীউদ্দীন ফারোকী তাঁদের অন্যতম।

পূর্ব বাঙলার এক ঐতিহাসিক পরিবারের তিনি সন্তান। নবাব আফতাপউদ্দীন ফারোকীর পৌত্র এবং কাজী রায়জুদ্দীন ফারোকীর পুত্র কাজী গোলাম মহীউদ্দীন হলেন আরবের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারোকীর বংশধর কাজী ওমর শাহ ফারোকীর অধস্তন একাদশ পুরুষ। শেষোক্ত ব্যক্তিই আরব থেকে দিল্লীতে এসে বাসা বাঁধেন। তাঁর পুত্রের আমলে দেখা গেল আবার বাসা বদলের পালা। সম্রাট ঔরংজীবের প্রপৌত্র সম্রাট ফারুকশিয়ার তাঁকে সামরিক অধিনায়ক করে পাঠালেন। পূর্ব বাঙলায় তাঁর কৃতিত্বে এবং নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে বাদশা তাঁকে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দুটি পরগণা জায়গীর হিসাবে তাঁকে প্রদান করলেন।

ফারুকশিয়ার স্বাক্ষরিত এই মূল-দানপত্রটি এখনও রতনপুরের নবাব স্যার কাজী গোলাম মহীউদ্দীন ফারোকীর অধিকারে আছে।

শ্রীরথীন্দ্রচন্দ্র দেব

[পশ্চিমবাঙলার এ্যাডভোকেট-জেনারেল]

কলকাতার যে ক'টি প্রসিদ্ধ পরিবার আপন আপন কীর্তিতে এবং অবদানে জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে ঠনঠনিয়ার দেবপরিবার তাদেরই অন্যতম। দেশের উন্নয়ন এবং কল্যাণ-সাধনে এই পরিবারের সন্তানরা যে কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের দাবী রাখে। বাঙলার প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব, প্রবীণ কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব আইন জগতের এক মহারথী রবীন্দ্রচন্দ্র দেব প্রমুখ এই পরিবারের এক একটি মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। পশ্চিমবাঙলার বর্তমান এ্যাডভোকেট জেনারেল লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার শ্রীরথীন্দ্র-চন্দ্র দেবও এই পরিবারের গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধির জন্যেও অনেকখানি দায়ী।

এ্যাটর্নিকুলের সমকালীন অধিনায়ক স্বরূপ স্বর্গীয় রবীন্দ্রচন্দ্র দেবের মধ্যম পুত্র রথীন্দ্রচন্দ্র দেবের জন্ম ১৯১৫ সালের ২০-এ নভেম্বর। ঠনঠনিয়ার পৈত্রিক ভদ্রাসনেই তাঁর জন্ম। রাণী ভবানী স্কুলে বিদ্যারম্ভ হল। ১৯৩১ সালে স্কুলের পড়া শেষ হল। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে স্নাতক উপাধি অর্জন করলেন ১৯৩৫ সালে। তারপর লণ্ডন। কিংস কলেজ এবং ইনার টেম্পলে শিক্ষা গ্রহণ করলেন। ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে এই শিক্ষা গ্রহণ সাফল্যের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতার হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ীদের তালিকায় আর একটি তারুণ্যে ভরপুর, উজ্জ্বল সম্ভাবনায় প্রদীপ্ত নাম সংযুক্ত হল—সে নাম রথীন্দ্র-চন্দ্র দেব। আইন জগতের আর এক স্বনামধন্য মহারথী স্বর্গত ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকারী হয়ে রথীন্দ্রচন্দ্রের যাত্রা সুরু। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবাঙলার ন'মাসব্যাপী যুক্তফ্রণ্ট শাসনের অবসান ঘটার পর ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যখন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হল তখন রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেলের অতীব সম্মানসূচক ও গুরুত্বপূর্ণ আসনটি তাঁরই অধিকারে এল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁর জীবনের ইতিহাসে 'নভেম্বর' মাসে একটি বিরাট স্বপ্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাঁর জন্ম নভেম্বরে, ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সফলতা অর্জন নভেম্বরে, এ্যাডভোকেট জেনারেলের সম্মানলাভও নভেম্বর মাসেই।

জনকল্যাণকর বহু প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত আছেন। নিজের সমস্ত কাজের মধ্যেও এইভাবে তিনি জনসেবা করে চলেছেন অক্লান্ত-ভাবে, মোহনবাগান ক্লাবের কার্যকর সমিতির তিনি অন্যতম সদস্য। বেঙ্গল লন টেনিস এ্যাসোসিয়েশনের তিনি সহকারী সভাপতি। বেঙ্গল টেবল টেনিস এ্যাসোসিয়েশনের তিনি সভা-পতি। কিংস কলেজের ব্যাডমিণ্টন টিমের তিনি ছিলেন অধিনায়ক। ব্যাডমিণ্টনে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের (কিংস কলেজ) তিনি 'ফুল কালার' পান।

রথীন্দ্রচন্দ্র প্রথম জীবনে নিজে ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথের সহকারী। পর-বর্তীকালে তাঁর অর্থাৎ রথীন্দ্রচন্দ্রের সহকারী হয়ে যাঁরা যাত্রা সুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে আইন জগতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠার মুখ দেখেছেন। এই তালিকায় বিচারপতি শম্ভু ঘোষ, বিচারপতি রমেন দত্ত, বিশিষ্ট জননায়ক এবং দিকপাল আইনবিদ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এক-একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।

বাগান করা, ভ্রমণ এবং রহস্য-কাহিনী পড়ার শখ তাঁর প্রবল।

রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদানের বাসনা তাঁর কোনদিনই ছিল না। আজও নেই।

ছাত্রজীবনে সহপাঠী হিসাবে তিনি যাঁদের পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতিতে বিভূষিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কলকাতার কনিষ্ঠতম মেয়র শিল্পপতি স্বর্গত আনন্দীলাল পোদ্দার, বিচারপতি শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, মহানগরীর প্রাক্তন শেরিফ মোহনকুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবাঙলার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নাম উল্লেখনীয়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাটর্নি স্বর্গত চারুচন্দ্র বসুর কন্যা আভা দেবীর সঙ্গে রথীন্দ্র চন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[সি এম পি ও-র চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং বিশিষ্ট কবি]

পেশায় যাঁরা ইঞ্জিনীয়ার তাঁদের মধ্যে কবিতার আরাধনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করে গেছেন বা করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম পুরুষ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শুধু কবিতার আরাধনায় আত্মনিয়োগ বললে যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভুল হয়—বাঙলা কাব্যের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের তিনি রূপকার। ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে আরও যাঁরা সরস্বতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে চলেছেন সেই ধারায় সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে বাঙলার বাইরে যিনি দেশজননীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—সেই সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সাধনার মাধ্যমেও বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন।

১৯১২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হাওড়ায় তাঁর জন্ম। আদিনিবাস বর্ধমানের অন্তর্গত অগ্রদ্বীপ (বালিকাপুর)। ১৯২৯ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সুধানন্দ। ১৯৩৩ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ডিস্টিংসানসহ বিজ্ঞানে স্নাতক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলেন। ভর্তি হলেন শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। চার বছরের পাঠক্রম তিন বছরে সমাপ্ত করে বি-ই ডিগ্রীতে বিভূষিত হলেন (১৯৩৬)। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী লাভের পর কিছুকাল শিক্ষানবিশী করলেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এক দেশবরেণ্য দিকপাল স্বর্গত ডক্টর বি এন দের অধীনে।

শিক্ষানবীশী সমাপ্ত হওয়ার পর স্বাধীনভাবে প্রথম যে কাজটিতে তিনি হাত দিলেন সেটি দেওঘরে একটি মন্দিরসংক্রান্ত। তারপর নেপাল সরকারের অধীনে রিভার ট্রেনিং-এর কাজ নিয়ে নেপাল যাত্রা করেন সুধানন্দ। ১৯৪৮ সালে মার্কিন মুল্লুকে পাড়ি জমালেন বাঙলার ছেলে সুধানন্দ। টোরোন্টো (ক্যানাডা) থেকে ১৯৪৯ সালে সুধানন্দ এম এ, এস সি হলেন। তারপর কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় স্বাস্থ্য এবং কল্যাণবিষয়ক বিভাগের অধীনে কাজ
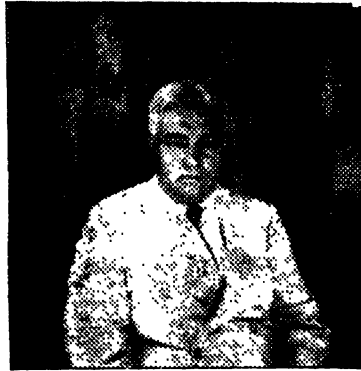
শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

করে একাধারে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন অন্যদিকে আপন পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদেশের বুকে রেখে আসেন। দেশে ফিরে এসে বার্ন কোম্পানীতে যোগ দেন সুধানন্দ (১৯৫০-'৫৪)।

বিন্ধ্যপ্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় সংগঠিত নতুন সরকারের পাবলিক হেলথ ও ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কাজ গ্রহণ করেন। রাউরকেল্লার জলসরবরাহ নগর পরিকল্পনা ও সংগঠনের ভারও তাঁর হাতেই এসে পড়ে।

১৯৫৭ সালে হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট রূপপরিগ্রহ করলে তার চীফ ইঞ্জিনীয়ারের আসনটি তাঁর দিকেই এগিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানিসেশনে তিনি যোগ দিলেন অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে। পরের বছর তিনি উন্নীত হলেন উক্ত সংস্থার চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অতীব দায়িত্বপূর্ণ এবং সম্ভ্রমপূর্ণ আসনে।

সাহিত্য সাধনার ইতিহাসও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সাহিত্য সাধনার ধারা বাবা এবং মা—দুদিক দিয়েই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। বাবা স্বর্গত নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রেমী এবং 'সাধু-সম্বাদ' পত্রিকার সম্পাদক। মা শ্রীযুক্তা শচী দেবী হলেন প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গত মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে। ষোল-সতের বছর বয়স থেকে লেখা আরম্ভ হয়েছে। উনিশ-কুড়ি থেকে লেখা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্রিজেস অফ ক্যালকাটা এ্যাণ্ড ইটস সারাউণ্ডিংস, প্রয়োগবিজ্ঞান কথা, জীব ও জঠর, পৃথিবী পরিক্রমা, সুর ও সুরভি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, রবিবাসর, বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, হাওড়া গার্লস কলেজ, ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনীয়ার্স (জন স্বাস্থ্য বিভাগ

চেয়ারম্যান হিসাবে) ইনস্টিটিউশন অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স-এ্যাসোসিয়েশন, ইনস্টিটিউশন অফ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স (ফেলো হিসাবে) প্রভৃতি সংস্থাগুলির সঙ্গেও তিনি জড়িত।

রাণাঘাটের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা অপর্ণা দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের পুত্র সৌরানন্দও এক-জন ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[পশ্চিমবাঙলার কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রার]

উত্তর চল্লিশ যে বঙ্গসন্তানেরা জীবনের কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা এবং সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ সাফল্যের প্রায় প্রতিটি ধাপই অতিক্রম করে আপন আপন শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়ে গুরুদায়িত্ব এবং সাধারণ্যে যথেষ্ট সম্মান ও সম্ভ্রমসূচক শীর্ষস্থানীয় আসনগুলি অলঙ্কৃত করে আছেন শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। কৃতী এ্যাটর্নি জ্যোতিপ্রসাদ আজ সরকারের কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রারের মহার্ঘ আসন সগৌরবে অলঙ্কৃত করে আছেন।

বাঙলা দেশের একটি অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুযোগ্য সন্তান তিনি। তৎকালীন বাঙলা দেশের সমাজ জীবনে প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর কর্মকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর ও সি আই ই উপাধি ভূষিত করেন। তাঁর পুত্র পঞ্চানন মুদ্রণ জগতের এক অধিনায়কস্বরূপ ছিলেন। বাঙলা বিহার, আসাম, উড়িষ্যার যাবতীয় সরকারী মুদ্রণের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হত। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিজস্ব মুদ্রণাগার সৃষ্টি হওয়ার আগে তাঁদের যা কিছু মুদ্রণ পঞ্চাননের হেয়ার প্রেস থেকেই সম্পন্ন হত। অন্যতম অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অফ দ্য পীস পঞ্চাননের পুত্র শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দেবীপ্রসাদের ছেলে জ্যোতিপ্রসাদের জন্ম কলকাতা ১৯২২ সালের ১লা ডিসেম্বর।

মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (মেন) এর ছাত্র জ্যোতিপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৭ সালে। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে কলাবিদ্যায়

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্নাতক হলেন ১৯৪১ সালে। বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায়ও সাফল্যের সম্মুখীন হলেন। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের কলকাতাস্থ এ্যাটর্নি ফক্স-মণ্ডলের এস কে মণ্ডলের শিক্ষাধীন হয়ে এ্যাটর্নিশিপ পড়তে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানে এই সময়ে পশ্চিমবাঙলার প্রাক্তন অর্থ ও পরিবহন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ও যুক্ত ছিলেন। তাঁর অধীনেও জ্যোতিপ্রসাদ কাজ করেছেন। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে এ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষাতেও সিদ্ধির সঙ্গে হাত মেলাতে সক্ষম হলেন জ্যোতিপ্রসাদ। ফক্স-মণ্ডলেই যুক্ত হলেন।

১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিলেন জ্যোতিপ্রসাদ। নয়া-দিল্লীতে ভারত সরকারের সলিসিটার টু দ্য কোম্পানী ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিযুক্ত হলেন। ১৯৬১ সালে এই বিভাগেরই অধীনে কলকাতা হাইকোর্টে ডেপুটি অফিসিয়াল লিকুইডেটার নিযুক্ত হলেন। ১৯৬৪ সালে কানপুর গেলেন উত্তরাঞ্চলে কোম্পানী ল' বোর্ডের সলিসিটার হিসাবে। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রহণ করলেন পশ্চিম বাঙলার কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রারের আসন।

কোলাহলমুখর হট্টমেলা থেকে যথাসম্ভব নিজেকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন। নিরুপদ্রব, শান্তিপূর্ণ জীবনই তাঁর কাম্য। গ্রন্থ এবং পত্রিকাদি পাঠে তাঁর অবসর সময় অতিবাহিত হয়।

কর্নেল ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কল্পনা দেবী তাঁর সহধর্মিণী।

প্রাক্‌বিবাহ নীতিবোধ

প্রা[illegible] এসেছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। ইতিহানুগ সতীত্ব এবং পুরুষের সুযোগ-সুবিধা অধুনা চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন। নীতি অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষের মিলন বিবাহোত্তর দৈত জীবনে বদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রাক্‌বিবাহ মিলন এড়ানো যাচ্ছে না। আমাদের দেশে দৈনিক কাগজের কুণ্ঠিত টুক্‌রো সংবাদ ছাড়া কোনও গবেষণাজাত প্রতিবেদন আজও অলভ্য। য়ুরো-আমেরিকায় যথেষ্ট সংখ্যক সমাজ-সচেতন যৌনবিজ্ঞানী এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। আগে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রাক্‌বিবাহ মিলনের স্বাধীনতা না থাকলেও কার্যত পুরুষের স্বাধীনতার সুযোগ ছিল। অধুনা স্বীকৃত হচ্ছে—কাগজে-কলমে নয়—ভালবাসা থাকলে, উভয়ে বিবাহে সম্মতি দিলে, বিবাহপূর্ব সম্পর্ক স্থাপনে বড় একটা বাধা নেই।

প্রথমেই বলা দরকার বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে 'ঠিক' বা 'ভুল' বিচার করা হচ্ছে না, প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য আমরা কী করছি এবং কেন তার উত্তর যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা। ভাল-মন্দ বিচার করবেন পাঠক, তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি, ধর্মবিশ্বাস এবং নৈতিক বিচারের তুলাদণ্ডে।

সর্বত্র মেয়েদের এক স্বামী গ্রহণের চল নেই। আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যে একটি মহিলা একাধিক স্বামী এবং মুসলমান পুরুষ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন এবং করেন। পাশ্চাত্যে একাধিক স্বামী বা স্ত্রী আজ অবাস্তব ব্যাপার। এ ব্যাপারে সামাজিক রুচিভেদ অনস্বীকার্য।

আমাদের দেশে ত' নয়ই, আমেরিকার গবেষণাও পূর্ণ নয়। কারণ, অধিকাংশ গবেষণার পাত্র-পাত্রী নগরবাসী উচ্চশিক্ষিত শ্বেত বাসিন্দা। সুতরাং তা থেকে ও-দেশের প্রাক্‌বিবাহ সম্বন্ধেও সাধারণ সিদ্ধান্ত পুরো ঠিক হতে পারে না। তবে, চল্‌তি ধারার একটা মোটামুটি ছবি আমরা পেতে পারি। এ থেকে ভাবীকালের একটা ছবি আন্দাজ করা সম্ভব।

খৃস্টান জগতের যৌন-মনোভাব হিব্রু, গ্রীক, রোমান এবং প্রথম দিককার খৃস্টানদের থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারের ঐতিহ্যানুসারী। শিভাল্‌রী আর শিল্পবিপ্লবের যুগে তা পরিবর্তিত হয়েছে। বিশের দশকে আবার পরিবর্তন এল। ষাটের দশকও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ।

হিব্রুদের মধ্যে একপত্নী গ্রহণ হয়ে উঠেছিল সাধারণ রীতি। কিন্তু বিবাহকে ভালবাসার পরিণতি হিসেবে দেখা হত না। সাধারণত সামাজিক এবং আর্থিক কারণে বিবাহ বাবা-মাই ঠিক করতেন। য়ুরো-আমেরিকায় কার্যত প্রচলিত যৌনব্যাপারে পুরুষের অধিকতর স্বাধীনতা হিব্রু-সংস্কৃতিজাত।

গ্রীস এবং রোম-এও এই অলিখিত নিয়ম ছিল। গ্রীক মিস্‌ট্রেস-এর নাম ছিল 'হেতারী', তার কাজ পুরুষকে যৌন আনন্দদান। স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ব্যাভিচার নিষিদ্ধ। রোম-এ মা এবং কুমারী মেয়েরা আদর্শায়িত হয়। সেখানে ব্যাভিচারী স্ত্রীকে বিনা বিচারে খুন করারও অধিকার ছিল। কিন্তু পুরুষ অন্যত্র যৌন আনন্দ উপভোগ করলেও স্ত্রীর আঙুল নাড়ার ক্ষমতাও ছিল না। এ মত কেটোর।

প্রথম দিককার খৃস্টানদের চোখে যৌন উপভোগ, পারিবারিক জীবন নিম্নতম গৌরবের স্থানাধিকারী। পৃথিবীর আর কোনও ধর্মে এই অ-ভূতপূর্ব পাগলামী পরেও দেখা যায় নি। তাদের মতে যৌন প্রলোভন ত্যাগ ক'রে প্রত্যেককে খৃস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট হলেও নর-নারীর প্রেম সমাজে যথোপযুক্ত মর্যাদা পায় নি।

প্রতীচ্যে মধ্যযুগীয় শিভাল্‌রীর কোমলতা এবং মমতার স্থান ক'রে দিল। সে স্থান আজ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। যদিও আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক দেশে এই ধারণা অবহেলিত, এমন কি উপহসিত।

উনিশ শতকের শেষ দিকেই ভালবেসে বিয়ে করার রেওয়াজ ক্রমে অভিভাবক-আয়োজিত বিবাহকে ছাড়িয়ে যেতে সুরু করে। শিল্পবিপ্লব এসে গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবনে ছেদ টেনে দিল। শহরে মানুষ ঢের বেশি স্বাধীন, বাবা-মার শাসন বা পল্লীবৃদ্ধদের চোখরাঙানী তার জীবনে অল্প বা অলীক। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও এ ক্ষেত্রে খুব কাজে আসে।

'ডেটিং' প্রথার উদ্ভব এ থেকেই। পরস্পরকে জেনে মনোমত সঙ্গী বেছে নেওয়ার সুযোগ এ থেকে পাওয়া যায়। মেয়েরা ক্রমে প্রায় সব ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পেলেন। আধুনিক প্রথায় যৌনবিষয়ে পুরুষের প্রাধান্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতা খর্বিত।

বিশ দশকে যৌন স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ফ্রয়েড্‌কে তুলে ধরে অনেকে সব রকম অবদমনের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্তে আরও অনেক বিধিনিষেধ শিথিল হল। বাড়ি থেকে বহুদূরে তখন অসংখ্য যুবক জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত। স্কুল এবং খবরের কাগজের খোলামেলা যৌন-আলোচনায় তারা বিশ্লেষণ করতে লাগল ইতিহানুসারী যৌননীতিগুলো।

এর বিরুদ্ধে সক্রিয় মোল্লা-পুরোহিত কুমারীর দল, বাবা-মার প্রথানুগ শাসন, আর সমাজের সম্মিলিত চাপ। এই দু'টো বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত জয়ী নতুনের প্রবক্তারা।

পুরুষের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন প্রযোজ্য যৌন স্বাধীনতা যেমন গেল, তেমনই আদর-সোহাগও স্বীকৃতি পেল পারস্পরিক ভালবাসার ক্ষেত্রে। স্পষ্টতই, আদর-সোহাগ কোন কোন সময় মাত্রাতিরিক্ত হতে পারে, হয়ত ; হলে সাধারণত বিশ্বাসে সামঞ্জস্য গড়ে তোলা হয়।

কেন না, কেউই অপরাধ বোধ মনের মধ্যে পুষতে অনিচ্ছুক, সুতরাং নিজে-দের কাজ সমর্থনের উপযোগী বিশ্বাস তার বানিয়ে নেয়।

যৌন স্বাধীনতামুখী ঝোঁকের একটা দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত: প্রাকবিবাহ যৌনসম্পর্কে সব থেকে বেশিসংখ্যক নারী-পুরুষ ভালবাসার টানে মিলিত, নিছক দৈহিক তৃপ্তি তাদের লক্ষ্য নয়। এই সম্পর্ক বিবাহে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাময়, পূর্বোক্ত প্রথায় অভ্যস্ত পুরুষের চলতি পথে জৈবসুখলাভে এদের অনীহা বোধগম্য।

আজ প্রাক্‌বিবাহ মেলামেশা বিশ দশকের তুলনায় অনেক বেশি খোলা-মেলা। অর্থাৎ, যা সহ্য করা হত, তাই ক্রমে প্রথায় পরিণত হচ্ছে।

আঠার শতকের 'বান্ডলিং' প্রথা নিয়ে কম হৈ-চৈ হয় নি। কিন্তু তখন কম্বলের তলায় যে পরিমাণ যৌন-স্বাধী-নতা মানুষ নিত, বর্তমানে খোলাখুলি তার চেয়ে অনেক বেশি যৌন-স্বাধীনতা মানুষ উপভোগ করছে। সুইডেন দেশে ত' 'পারমিসিভ্‌নেস', ভালবাসা থাকলে, স্বীকৃত ব্যাপার।

বিগত কয়েক পুরুষে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। আগামী কয়েক পুরুষের পরিবর্তনও আমাদের কল্পনা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

যুদ্ধোত্তর সমাজ, বিশেষত উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় অতীত থেকে বহু দূরে সরে এসেছে, নতুন চিন্তাভাবনা তাদের জীবনচর্যায় প্রতিফলিত। আর দু'-তিন পুরুষের মধ্যে এই চিন্তা তাদের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়।

হাওয়া অধুনা আরও বেশি ব্যক্তি-স্বাধীনতামুখী। মেয়েরা ক্রমেই বেশি পরিমাণে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এ হেন অবস্থায় পুরনো ভাবধারার প্রত্যাবর্তন আশা করাই বাতুলতা। তা ছাড়া, সামাজিক আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব শক্ত কাজ। সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যাপ্ত না হওয়ায় তা কঠিনতর।

শিক্ষিত মানুষ ক্রমেই বেশি ঝুঁক-ছেন ভালবাসার পাত্র-পাত্রীকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে বরণ ক'রে নিতে। দৈহিক আকর্ষণ বা সামাজিক লাভক্ষতির হিসেব তারা করতে গররাজি। তা ছাড়া, মেয়েরা অবস্থাচক্রে বেশি বয়সে বিয়ে করতে বাধ্য হওয়ায় প্রাক্‌বিবাহ মেলামেশা ক্রমবর্ধমান।

অবশ্য এই পরিবর্তন, প্রাক্‌বিবাহ-কালীন মেলামেশা, আদর-সোহাগ বিনিময় যে কেবল দেশভেদে ভিন্ন তাই নয়; অঞ্চলভেদেও ভিন্ন হতে বাধ্য। নিউ ইয়র্ক বা লন্ডন-এ যে অবস্থা, দক্ষিণ আমেরিকার গ্রাম বা কোনও কাউণ্টিতে তা নয়। কলকাতার হাওয়া মুর্শিদাবাদ বা চব্বিশ পরগণার গ্রামে স্বতন্ত্র। এখনও বহু গ্রাম সাবেক প্রথার অস্তিত্ব ভালভাবে বজায় রেখেছে। তবে, পরিবর্তন আসছে। এই জলস্রোত রোধ করার ক্ষমতা কারও আছে বলে মনে হয় না।

এটি কোনও আন্দোলন নয়—সামাজিক ইতিহাসে পরিবর্তন আসার একটা প্রবণতা মাত্র এবং এই প্রবণতা সরলরেখ নয়। অতীতের মত আধুনিক যৌন-মনোভাবও জটপাকানো—পুরনো ধর্মীয় গোঁড়ামী যে আবার আদৌ মাথা চাড়া দিয়ে এর নতুন দিক্‌ নির্দেশ করবে না তা তামাতুলসী হাতে নিয়ে দিব্যি কেটে বলা যায় কি?

আমাদের কাজ পর্যবেক্ষণ এবং তজ্জাত ফলাফল লিপিবদ্ধ করা। ভাবী-কাল নিজের হিসেব ঠিক গুছিয়ে নেবে যেমন আমরা আজ নিচ্ছি।

—বাৎস্যায়ন

অল্পবয়সে বিবাহের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা

বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বিবাহের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান, আমা-দের দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার দরুণ এ ধরণের বিবাহ খানিকটা বিরল হলেও পাশ্চাত্যে টিন এজ ম্যারেজ বা অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের দাম্পত্য, আজ এক স্বাভাবিক ঘটনা।

এ সম্বন্ধে ভাববার অনেক কিছু আছে। প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে এটা ভাল না মন্দ। বিশ্বযুদ্ধের আগে পাশ্চাত্যে বিবাহ সংঘটন হত মোটা-মুটি পরিণত যৌবন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে। মেয়েদের কনে সচরাচর হত পঁচিশের বেশি, পুরুষ ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে; সে জায়গায় বর্তমানে বর-কনে দুজনেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টিন-এজার, অর্থাৎ ষোল-সতেরো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে তাদের বয়স।

এই বয়স কি দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট? স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে মনে।

আমেরিকায় এ ধরণের বিবাহ-প্রবণতা সবচেয়ে বেশি, সেখানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু প্রেমেই পড়ে না, সেই প্রেমকে দাম্পত্যের বাঁধনে বেঁধে ফেলে স্থায়ী করে নেওয়ার জন্যও সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেরা যেভাবে চাপে পড়ে বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে তা নিয়ে সে দেশের কর্ণ-ধারবৃন্দ আজ সত্যই চিন্তিত।

এ কথা অনস্বীকার্য যে বিশ-ত্রিশ বছর আগের চেয়ে বর্তমানে, অল্প-বয়সী ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি সংখ্যায় দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করছে।

ষোল বছরের বধূ ও আঠারো বছরের বর, অকম্পিত হাতেই 'প্রাপ্ত-বয়স্ক' বলে স্বাক্ষর করছে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায়। তবু এ কথা মানতেই হয় যে ষোল বছরে বধূ হওয়া যদি বা চলে, আঠারো বছরে বর হওয়া চলে না, এ বয়সের ছেলেদের মানসিক গঠনে পূর্ণতা আসতে পারে না এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও হয় বহুলাংশে অপরিণত।

সত্য বলতে কি এ বয়সের ছেলেরা বয়স্ক বালক ব্যতীত আর কিছু নয়, স্বাধীনভাবে বিবাহিত জীবন যা-

করাট তাদের কাছে নতুন ধরণের এক প্রমোদমাত্র।

একনিষ্ঠ প্রেম, বা প্রেমাস্পদের কল্যাণ চিন্তা করার মত মানসিক গভীরতা এদের কাছে আশা করা যায় না।

তবুও এইসব অপরিণতবয়স্ক কিশোরবৃন্দ আজ বিবাহবন্ধন স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে কয়েকটা কারণে।

মনে করা হয় যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কাই এর জন্য প্রধানত দায়ী।

দ্বিবিধ বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতালব্ধ তিক্ততার ফলে মা-বাপরাও তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে এ ব্যাপারে প্রায়শ উৎসাহিত করে থাকেন, তাঁদের মতে 'তাড়াতাড়ি দিন কিনে নেওয়াই ভাল', ফলে এ ধরণের বিবাহের পাত্র-পাত্রীরা বাড়ি থেকে বিরুদ্ধতার বদলে যথেষ্ট উৎসাহই পেয়ে থাকে।

বছর পঁচিশ আগেও ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করাটা একটা কৌতুকের বিষয় ছিল, এমন কি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ জন্য ছেলেমেয়েদের বহিষ্কার পর্যন্ত করা হত।

একশো বছর আগে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টীর সদস্যারা পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি পেতেন না।

সে-কাল সে-যুগ আর নেই, যুগের প্রয়োজনেই যে মানুষের কর্মধারা ও চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়, এ কথাও অনস্বীকার্য।

এই অল্পবয়সে বিবাহপ্রবণতাও যে সর্বাংশে আজকের যুগধর্মকে অনুসরণ করছে, তাতেও সন্দেহ নাস্তি।

আমার মতে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। মানসিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়াটাই যদি এ বিবাহের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হয় তবে সেটাকে সমর্থন করাই সমীচীন বলে মনে হয়।

তা ছাড়াও আর একটা কারণ বর্তমান, আজকের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি স্বাবলম্বী, আগে তারা তা ছিল না এবং এই স্বাবলম্বনপ্রিয়তার ফলেই তারা স্বাধীনতাপ্রয়াসীও।

এ ব্যাপারের ভাল ও মন্দ দুটো দিককেই সাবধানে বিচার করে ল্যাঙ্কাস্টারের বিশপ যা বলেন, তা প্রণিধানযোগ্য।

ঘটনাচক্রে তিনি এক তরুণবয়স্ক নর-নারীর বিশেষ এক সমিতির সভাপতি পদে বৃত হয়েছেন সম্প্রতি, কাজেই আজকের ছেলেমেয়েদের খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে।

বিশপ পীয়ার্সনের মতে, আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা যেভাবে অবাধে মেলামেশা করে, বিশ বছর আগেও তা অকল্পনীয় ছিল এবং এই মেলামেশার ফলেই তাড়াতাড়ি ঘর বাঁধার চিন্তা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, অবাধ যৌনসম্পর্ক স্থাপন করাটাও আরেক কারণ, যেজন্য ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলতে বাধ্য হয়।

যৌন স্বেচ্ছাচারের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়লে আজকের দিনের কুমারী কন্যাকে তেমন কিছু বিব্রত হতে হয় না, আসন্ন সন্তানের জনকটিকে সঙ্গে নিয়ে সগৌরবেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে হাজির হতে পারে সে।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে জীবনধর্মকে মেনে নেওয়ার এই সহজ ভঙ্গীটি বিশেষ কল্যাণপ্রদ।

ভালবাসাকে সহজ একটা মর্যাদা দিতে শিখেছে আজকের ছেলেমেয়েরা, সংসার প্রবেশের শুভক্ষণটিতে এটাই তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, অবশ্য বিচক্ষণ মানুষেরা এখানে সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়বেন, তাঁদের মতে পরিণামজ্ঞানহীন প্রেম ধোপে টিকতেই পারে না তা না হয় নাই টিকলো,—রামধনুর রঙীন ঐশ্বর্যও তো ক্ষণস্থায়ী—তা বলে তার সৌন্দর্যই কি কিছু কম মনোহর?

অল্পবয়সের প্রেম সে তো এই রামধনুর মতই বর্ণিল স্বপ্নসঞ্চারী, গাঁথনি তার পাকা মাটিতে নয় হয় তো, তবু তা সমুদ্রের তরঙ্গের মতই বেগবান সর্বগ্রাসী।

রোমান্স বস্তুটি তাই একান্তভাবেই তারুণ্যের অনুগামী।

অপরিণামদর্শী ছেলেমেয়েগুলো যখন বিবাহের মত গুরুদায়িত্বকে মেনে নেয় খেলাচ্ছলে, তখন উপরোক্ত বস্তুটিই তাদের জোগায় আশা, জোগায় সাহস।

—স্বাস্থ্যবিদ

আনন্দের পথে পর্বত অভিযাত্রী

ফাল্গুন মাস শুরু হয়েছে কন্যায় বক্রী বৃহস্পতি ও কেতুকে নিয়ে, আর তার বিপরীত দিকে রাহু, শুক্র ও শনি, বৃশ্চিকে মঙ্গল। ধনতে চন্দ্র, মকরে বুধ এবং কুম্ভে থাকছে রবি সেই সময়ে। মাসের ২৩ তারিখে (৭ই মার্চ) শনি মেষ রাশিতে যাবে। জাগতিক সকল ক্ষেত্রেই ঐ দিন থেকে প্রায় আড়াই বছর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। বর্তমান ফাল্গুন মাস এ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। মহামারি আকারে রোগ, দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও রাজনৈতিক অঘটনাদি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে। এখন থেকে শুধু ভাঙা আর গড়ার কাজ চলবে অনবরত। আমেরিকা থেকে কোনো চাঞ্চল্যকর খবর আসতে পারে। রাশিয়ারও কোনোরূপ পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যেতে পারে। যাদের জন্মমাস ফাল্গুন কিংবা যাদের রাশি কিংবা লগ্ন কুম্ভ, তাদের অপ্রত্যাশিত কোনো পরিবর্তন আসতে পারে। কুম্ভের জাতক-জাতিকাদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত বয়সে পৌঁচেছেন তাঁদের পক্ষে বিবাহের যোগাযোগ বাংলা নতুন বছরে হতে পারে। কুম্ভের জাতক-জাতিকাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত। বাসন্তী রঙ ও সামান্য নীলাভাযুক্ত লাল রঙের পর্দা ও দৃশ্যাদি এ মাসের জাতক-জাতিকার শরীর ও মনের উপকার করতে পারে। যাক্ এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী ফাল্গুন মাসের ব্যক্তিগত শুভাশুভের আভাস দিচ্ছি ; মনে রাখা দরকার যে, জন্মকালীন গ্রহ-সন্নিবেশ, দশা-অন্তর্দশা অনুযায়ী এ-ফলের তারতম্য হতে পারে।

॥ ফলাফল ॥

মেষ ঃ প্রধান সমস্যা হয়ত অর্থগত হয়ে উঠতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান বাড়ার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবী লেখক ও অধ্যাপক শ্রেণীর ব্যক্তিদের অর্থাগমের যোগাযোগের দিক থেকে বেশ ভাল। নতুন সুযোগও আসবে। পারিবারিক ব্যাপার, সন্তানদের জন্য ঝঞ্ঝাট ও মত-বিরোধ মানসিক ক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। আর এক এক সময় এমন সব ব্যাপার ঘটবে যাতে গোপন শত্রুতা কিংবা কারো আচরণ মনে আঘাত দিতে পারে। স্পেকুলেশন, শেয়ার কিংবা ফাটকার দিকে না ঝোঁকাই

ভৃগুজাতক

যুক্তিযুক্ত। ব্যবসায়ে নতুন উদ্যোগের আগে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। ব্যবসায়ে আয় কিছু বাড়বে। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ঝগড়া-বিবাদ, আন্দোলন কিংবা জমতায় ভিড়ে যোগ দেওয়া ক্ষতিকর
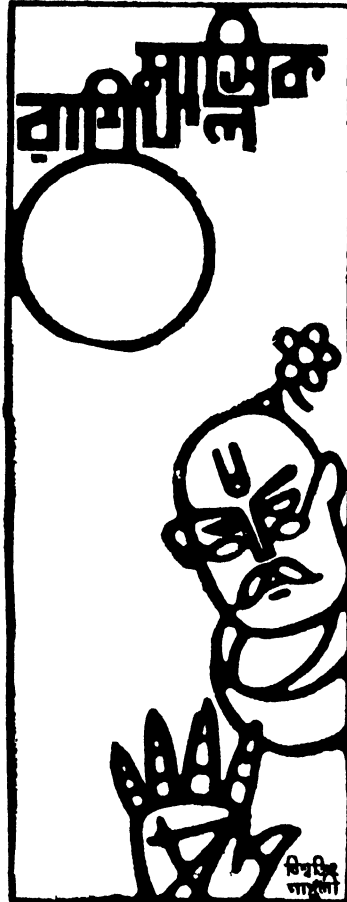
পক্ষেও অনুরূপ ফল হবে। বিবাহেচ্ছুদের বিবাহে বাধা পড়তে পারে। মেষ লগ্নে জন্ম হলে কর্মের প্রসার ও নতুন উদ্যোগ, কিন্তু স্বাস্থ্য ও আর্থিক ব্যাপারে উৎকণ্ঠাভোগের আশঙ্কা।

বৃষ ঃ গোড়ার দিকে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো শেষ করে ফেলতে চেষ্টা করুন। অর্থাগমের দিক থেকেও অনুকূল। কারো সহায়তা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা, সুপারিশ এ সময়ে কাজে লাগতে পারে। শিল্পীদের পক্ষে চুক্তির কাজ পাওয়ারও সম্ভাবনা। আত্মীয়জন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও মতবিরোধ এবং কোনো কোনো ব্যাপারে বিরোধ ও শত্রুতা মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। দাম্পত্যক্ষেত্রেও কোনো কারণে অশান্তি ও উদ্বেগ থাকার কথা। পরিবারে কারো অসুখ-বিসুখ হলে গোড়ায় সাবধান হবেন। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষাদির ব্যাপারেও ঝঞ্ঝাট আসতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন উদ্যমে বাধা পড়ার সম্ভাবনা। জমি-বাড়ি কেনাকাটার ব্যাপারে প্রতারিত হতে পারেন। শেষাংশে আর্থিক টানাটানি বাড়বে। নতুন প্রার্থীদের চাকরী হতে পারে। পদোন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। মহিলাদের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের উৎপাত ও পারস্পরিক ব্যাপারে উত্ত্যক্ত হতে পারেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছুর সম্ভাবনা।

মিথুন ঃ আগের কোনো দুর্ভাবনা দূর হতে পারে। জটিলতাসূচক বৈষয়িক সমস্যা এবং প্রাপ্য নিয়ে কোনো গোলযোগ থাকলে আপোষে তার মিটমাট হতে পারে। ব্যবসায়ে কোনো নতুন সম্ভাবনা দেখা যায়। আয় বাড়বে কিন্তু পারিবারিক ব্যাপারেও প্রিয়জনের জন্য ব্যয় বাড়বে। পত্নীর স্বাস্থ্য আকস্মিক উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য গোড়ার দিকে

ও শেষের দিকে উৎপাত করবে। বুদ্ধিজীবী লেখক ও আইনজীবীদের পক্ষে আয় বাড়ার ও নতুন কোনো ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ার সম্ভাবনা। চাকরীক্ষেত্রে উন্নতি হলেও ঝঞ্ঝাট বাড়বে। দূরে কোথাও যাবার আমন্ত্রণও পেতে পারেন। ঘনিষ্ট কারো বিবাহের ব্যাপারে গোলযোগ হতে পারে। এর অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বিশেষভাবে বিচলিত করতে পারে। ঐ রাশির বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। প্রণয়মূলক বিবাহেরও সম্ভাবনা। মহিলাদের বাক্-সংযমের অভাবে অশান্তি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও আর্থিক যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে।

কর্কট : সাংসারিক দিক থেকে মতের অমিলে এবং অন্যদের অবিবেচনাপ্রসূত কাজে ঝঞ্ঝাট বাড়বে। তার উপর ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বেগ এবং কোনো নিকট আত্মীয়ের পীড়াদি ব্যয় বাড়াবে। নিজের স্বাস্থ্যও শেষাংশে ও গোড়ার দিক উৎপাত করতে পারে। ব্যবসায়ে পরিকল্পনামত কাজ হবে না। অবশ্য মধ্যভাগে আয় কিছু বাড়বে। জমি-বাড়ি ও ফসলাদি নিয়েও অংশীদারদের সঙ্গে গোলমাল হতে পারে। একদিকে বড় মহলে দহরম-মহরম কিন্তু অপর দিকে যাদের নিয়ে কাজ-কারবার তাদের অপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। রাজনৈতিক দলাদলিতে ক্ষতি হতে পারে। নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবসায়ে নামারও সম্ভাবনা। পত্নীর স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বিদেশগমনে বাধা পড়বে। চাকুরীক্ষেত্রে আশানুরূপ হবার পথে বাধা আছে। মহিলা-জাতকের পক্ষেও অনুরূপ হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলমাল এবং সাধারণের কাছে যে অপ্রিয় হচ্ছেন অ সহজেই বুঝতে পারবেন। ছেলেমেয়েদের জন্য ঝঞ্ঝাট আছে।

সিংহ : সব কাজেই সতর্ক থাকা দরকার। সামান্য ভুলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। চাকুরীক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা ও দায়-দায়িত্ব মনের উপর চাপ দিতে পারে। ধৈর্য ধরে সহ্য করলে পরে তার ফল ভাল হবে। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ্দের পক্ষে যশঃমান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা, কিন্তু মধ্যভাগে স্বাস্থ্য গোলমাল করবে। রক্তের চাপের গোলমাল, হৃদ্দৌর্বল্য কিংবা ডায়বেটিস রোগীদের বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। বিশেষ কোনো কাজে আকস্মিকভাবে বাইরে কোথাও যাবার সম্ভাবনা। বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহের ব্যাপারেও ব্যস্ততা দেখা দিতে পারে। এ মাসে আগের চেয়ে বেশী ব্যয় হবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাসের শেষ সপ্তাহে কোনো ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। মামলা-মোকর্দমায় এগিয়ে যাওয়া ক্ষতিকর হবে। কোনো ব্যাপারে অবমাননাকর অবস্থার সম্মুখীন হবার আশঙ্কা। মহিলাজাতকের পক্ষে কোনো সূত্রে লাভের আশা আছে। কিন্তু সন্তান সম্বন্ধে দুর্ভাবনা বুঝায়। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।

কন্যা : এ মাসে কর্মক্ষেত্রে আশাপ্রদ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তবু আগের কাজের বা অবস্থার জের এখনো চলবে। মাসের শেষ সপ্তাহ লক্ষণীয়। এ সময়ে বাইরে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। জরুরী কাজকর্ম কিংবা কারো সহায়তা পাবার পক্ষে মাসের মধ্যভাগ অনুকূল। বাড়ি-ঘর তৈরী কিংবা কেনাকাটার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কভাবে চলা উচিত। চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের কর্মক্ষেত্রে সুফলপ্রদ। লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে এ মাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। বাতজপীড়াদি সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত; পারিবারিক ক্ষেত্রে মত-বিরোধ এবং আশ্রিত কারো জন্য উদ্বেগ ভোগের আশঙ্কা। ভাই-বোনদের কারো জন্যে উৎকণ্ঠা যেতে পারে। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে নৈরাশ্য এবং মনে আঘাত পেতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে এখন জটিলতা দেখা দেবে। মহিলা জাতকের পক্ষে দেহ-কষ্ট ও শত্রুতার লক্ষণ দেখা যায়। তরুণীদের মনোমত পাত্রের সঙ্গে মিলন হতে পারে। কন্যা-লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক উন্নতি ও গৃহে শুভকার্যের যোগাযোগ হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে।

তুলা : পারিপার্শিক অবস্থা মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। শরীর তেমন ভাল যাবে না। হঠাৎ কোনো অসুখ-বিসুখ হয়ে কয়েকদিন অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। নতুন কোনো কাজ হাতে নিয়ে সব দিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে উঠবে। লেখক, শিল্পী ও অভিনেতাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আশাপ্রদ। কেনাবেচার ব্যবসায় আশানুরূপ হবে না। আগ্নেয়াস্ত্র ও কলকব্জা নিয়ে কাজ করার সময় সতর্ক থাকবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর

পক্ষে মাসের এগারো থেকে উনিশ তারিখ অনুকূল হতে পারে। মাসের শেষাংশ বিশেষ অনুকূল নয়। দেনা-পাওনার ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট ও বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আগের চেয়ে ভাল। কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বিচলিত করতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। নববিবাহিতদের পক্ষে ভুল বোঝাবুঝি অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে সন্তানের জন্য দুর্ভাবনা এবং আর্থিক দুশ্চিন্তার আশঙ্কা। তুলা লগ্নে জন্ম হলে শত্রুতায় মানসিক কষ্ট ও আর্থিক অবনতির আশঙ্কা।

বৃশ্চিক : কোনো কারণে কর্মক্ষেত্রে অস্থির ও অশান্ত ভাব দেখা দিতে পারে। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়লেও চাকুরীক্ষেত্রে সামান্য ভুলে কিংবা কারো প্রতি অযথা ভুল আচরণে নিজেরই ক্ষতি হবার আশঙ্কা। ছেলেদের মধ্যে কারো কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসায়ে মন্দা কাটবে। কিন্তু কোনো ঝুঁকির কাজ নেওয়া ঠিক হবে না। দালাল ও কণ্ট্রাক্টারদের পক্ষে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। কোনোরূপে আইনসংক্রান্ত গোলমালে যাতে না পড়েন, সেদিকে খেয়াল রাখুন। কলকারখানার মালিকদের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শত্রুতা উৎপাত করতে পারে। দূরে কোথাও যাবারও সম্ভাবনা আছে। তরুণদের পক্ষে স্বেচ্ছাকৃত বিবাহের সম্ভাবনা। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি ও কারও পীড়াদি উৎপাত করবে। মহিলা জাতকের পক্ষে মনোমত কাজে লাভ এবং কোনো সূত্রে প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। তরুণী মেয়েদের মনোমত ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে এবং আর্থিক ব্যাপারেও আগের চেয়ে ভাল হবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

ধনু : কাজকর্মের যোগাযোগের দিক থেকে আশাপ্রদ। আর্থিক ব্যাপারে স্বাধীন প্রোফেশনে আগের চেয়ে ভাল। কিন্তু প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য বিরোধ এবং মামলা-মোকর্দমা হতে পারে। আইনজীবী ও কণ্ট্রাক্টারদের পক্ষে আয় বৃদ্ধির যোগ। স্বাস্থ্য বেশ উৎপাত করবে। কোনোরূপ ব্যথা-বেদনা কষ্ট দিতে পারে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট এবং কোনো সন্তানের অসুখ হলে বিশেষ সাবধান হবেন। প্রিয়জন কিংবা বিশেষ আত্মীয়দের কারো জন্য ব্যয় বৃদ্ধি এবং পরের জন্য ঝঞ্ঝাট এবং নিজের কাজের ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন উদ্যম এবং কারো সহায়তা পাবার মত যোগ। চাকুরীক্ষেত্রে মনোমত পরিবেশ থাকবে এবং নতুন কোনো পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা। সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে বদলির যোগ রয়েছে। গুরুজনদের কারো পীড়া হলে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তরুণীদের পক্ষে মনোমত পাত্রীর সঙ্গে মিলন হতে পারে। ঐ রাশির বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে ভাল হবে। ধনু লগ্নে জন্ম হলে খ্যাতি বৃদ্ধি হলেও নিজের গাফিলতির জন্য ক্ষতি ও শেষাংশে শারীরিক কষ্ট হতে পারে।

মকর : এ মাস আপনাকে বেশ সুযোগ দিতে পারে। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে তেমন সুবিধা হবে না। এমন কি ঋণগ্রস্তও করতে পারে। সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে এবং কাজের খ্যাতিও পাবেন। অনেক দিনের ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান হতে পারে। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে কারো সঙ্গে মিলনও ঘটতে পারে। দৈব কিংবা নিতান্ত অনুপ্রেরণাগত কোনো ব্যাপার আশ্চর্য ফল দিতে পারে। ব্যবসায়ে মোটামুটি ভাল। নতুন যোগাযোগ এবং বন্ধুদের কারো দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা। উদর-ঘটিত পীড়া কিংবা কোনোরূপ ব্যথা বেদনা দেখা দিলে বিশেষ সাবধান হবেন। দাম্পত্যক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার। নব-বিবাহিতদের পক্ষে সামান্য উত্তেজনাও ক্ষতির কারণ হতে পারে। চাকরী-ক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদা ম্লান কোনো সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। মহিলা-জাতকের পক্ষেও অনুরূপ ফল হবে। বিবাহযোগ্যা তরুণীদের এবং অধিক বয়স্কা অবিবাহিতাদের এবার বিবাহের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। মকর লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

কুম্ভ : এক ধরণের অতৃপ্তি প্রায়ই মানসিক দুর্বলতা সৃষ্টি করবে। অথচ পরিবেশ অথবা যোগাযোগের দিক থেকে একাধিকবার নিজের অবস্থার উন্নতিকর সুযোগ আসবে। খেয়ালী-প্রকৃতি ও উদ্দাম মনোভাব ঝঞ্ঝাটে ফেলতে পারে। এতে চারিত্রিক দুর্বলতা অত্যন্ত গোলমালে ফেলতে পারে। ব্যবসায়ে মোটামুটি ভাল। মাসের শেষাংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিম্নাঙ্গের অসুখ-বিসুখ ও চোখের গোলমাল কষ্ট দিতে পারে। নতুন কোনো কাজে নামারও সম্ভাবনা। কোনো সূত্রে কিছু প্রাপ্তিও ঘটতে পারে। বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট ও স্বজন-বিরোধে আর্থিক ক্ষতিও বুঝায়। আশ্রিতদের সম্বন্ধেও গোলযোগ হতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত পেতে পারেন। কিন্তু শত্রু সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। মহিলা জাতকের সাংসারিক ব্যাপারে শুভ এবং ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে ভাল কিছু আশা করা যায়। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে ব্যয়-বৃদ্ধি, পারিবারিক গোলযোগ ও স্বাস্থ্যের গোলমাল উৎপাত করতে পারে। কিন্তু কর্ম ক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত পেতে পারেন।

মীন : মনের উপর নানা কারণে চাপ পড়বে। স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে। চাকুরীক্ষেত্রে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর আঘাত আসতে পারে। তবু মাসের পনেরো তারিখের কাছা-কাছি সময়ে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে। ব্যবসায়ে একটু সামলে চলা দরকার। ঝুঁকির কাজ নেবেন না। শেয়ার ও ফাটকায় ক্ষতি হতে পারে।

মাসের শেষাংশে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবার মত যোগাযোগ ঘটতে পারে। এদিকে বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকলে তার বিবাহের ব্যবস্থা হতে পারে। পরীক্ষাদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছেলে-মেয়েরা ভাল করতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। দূরে কোথাও যাবার আমন্ত্রণ পেতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যাপার এড়িয়ে চলা দরকার। পরিবেশ এক এক সময় অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে উঠতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে চলনসই অবস্থা। কোনো বিশেষ কারণে ব্যয়বৃদ্ধি ঋণগ্রস্ত করাতে পারে। মহিলা জাতকেরও অনুরূপ ফল হবে। মীন লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে অস্বস্তিকর অবস্থা এবং শারীরিক কষ্টের আশঙ্কা। মাসের শেষাংশ লক্ষণীয়।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বল্লভপুর, মেদিনীপুর),—(১) তিন বছর সকল ব্যাপারেই সতর্ক থাকা উচিত, (২) উৎকৃষ্ট রক্তমুখী প্রবাল নয়-দশ রতি ধারণ করতে পারেন রূপার আংটিতে। যথাবিধি সংস্কার ও শোধনাদি দরকার। ● শ্রীপরাণ রাহুত, (রায় বাংলা, দেওঘর)—(১) তেইশের পর চব্বিশের মধ্যে, (২) হতে পারে। ● শ্রী এস মুখার্জী (কলিকাতা-১৪), (১) আশানুরূপ, (২) হবে না। ● শ্রীমতী কৃষ্ণা শীল (শীলগলি, চুঁচুড়া) (১) মঙ্গল ও শুক্রের অবস্থান বিরুদ্ধ এবং এ ছাড়াও চন্দ্রের অবস্থান প্রতিকূল, (২) রক্তমুখী প্রবাল আটরতি এবং সাদামুক্তা পাঁচরতি ধারণ উচিত। সোনার আংটিতে যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীঅনন্ত দাস (কলিকাতা-৩২),—(১) আগামী পনেরো মাসের মধ্যে না হলে বত্রিশের পর। (২) নূতন সালে কিছু ভাল হবে। ● শ্রীশর্মি (কলিকাতা),—(১) মোটামুটি ভাল, (২) দেশভ্রমণ হবে। ● শ্রীবাদল ঘোষ, (বিন্দু পালিত লেন, টালিগঞ্জ), পঞ্জিকা দেখে এভাবে ঠিক করা আমাদের কাজ নয়। ● শ্রীগণেশচন্দ্র পালিত (বড় বাগান লেন, শ্রীরামপুর),—(১) কন্যা-রাশি, (২) হতে পারে। ● শ্রীবিকাশ-কুমার দাস (কাশিমনগর, ফরিদপুর) (১) সব ক্ষেত্রে উপকার হয় না, (২) পাঁচরতি মুক্তা সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী অর্চনা দাস (কাশিমনগর),—(১) পরীক্ষার বিষয় উত্তর দেওয়া হয় না, (২) তিনটির প্রথমটি মেয়ে হতে পারে। ● শ্রীপি দাশ (কলি-২৭),—(১) উপযুক্ত সময় নয়। আড়াই বছর সাবধান। ● শ্রী বি দাস, (কলি-২৭),—(১) পনেরো মাস দেখুন (২) ব্যবসায়ী। ● শ্রী আর দাশ (কলি-২৭),—(১) গোলমাল যাবে, (২) ধনু লগ্ন, সিংহ রাশি ও মঘা নক্ষত্র। ● শ্রীশিশির দাস (কলি-৯)—(১) পারবেন, (২) প্রতিকার জন্য কনকক্ষেত্র ক্যাটস্ আই ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীরবি (কলি)—(১) হবে, (২) এগারো মাস মধ্যে। শ্বেতপ্রবাল ধারণীয়। ● কুমারী অনিন্দিতা (কলিকাতা)—(১) হতে পারে, (২) শিক্ষা-বিভাগে হতে পারে। ● শ্রীচন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী (বোলপুর) এভাবে বিস্তৃত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, আগামী অক্টোবর থেকে কর্মস্থলে শুভফল বৃদ্ধি, (২) প্রতিকার জন্য শ্বেত প্রবাল নয়রতি সোনার আংটিতে যথাবিধি ধারণীয়। ● শ্রী বি সি সি (আসানসোল)—(১) দেড় বছরের কার্য-কারণের উপর লেখাপড়ার নির্ভর করছে, (২) কন্যা রাশি এবং বুধ কন্যায় ছিল। ● শ্রীমতী নন্দিতা সরকার (গোয়াল তোড়, মেদিনীপুর)—(১) আগামী মে মাসের মধ্যে ফল হবে, (২) বাধা দূর করার জন্য শ্বেত প্রবাল ছয়রতি সোনার আংটিতে ধারণীয়। ● শ্রীসুনন্দা ঘটক (অবধায়ক—ডা: সুকুমার ঘটক, সুন্দরগড়) —(১) হবে। চিকিৎসার সঙ্গে বটুক ভৈরব কবচ ধারণ করাতে পারেন, (২) দ্বিতীয়টিকে বিজ্ঞান কিংবা কমার্স। ● শ্রীকুমার ঘটক (সুন্দরগড়)—(১) স্থায়ী হবে, (২) বাড়ি পরিবর্তন করার যোগ আছে। ● শ্রী বি এন রায় মৌলিক (কালটা আয়রন মাইনস্) (১) শীঘ্র হবে। (২) তিন বছর পর। ● শ্রীব্রজেন ঘোষ (গ্রাম কাজিহাটি, দমদম)—(১) তিন বছর ধৈর্য ধরতে হবে। (২) এবারই কিছু ভাল হবে। ● শ্রীরামসুন্দর চক্রবর্তী (ধরণীধর মল্লিক লেন, হাওড়া)—(১) উন্নতি হবে, (২) আয় বাড়বে কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাট। ● শ্রী "স্পেশাল" (হুগলী) পীত পোখরাজ আটরতি ও পলাশ রঙের প্রবাল আটরতি। পোখরাজ; সোনায় এবং প্রবাল রূপায়, (২) সম্ভাবনা আছে। ● শ্রীঅনু (পোস্ট বক্স-২, দক্ষিণ ভারত)—(১) আগামী শ্রাবণের মধ্যে, (২) মোটামুটি ভাল। শ্রীবাবু (পোস্ট বক্স-২, দক্ষিণ ভারত)—(১) নয় মাসের মধ্যে না হলে বেশ দেরী, (২) নূতন ইংরেজী সালে। শ্রীপটিক ঘোষ (শম্ভু হালদার লেন, সালকিয়া)—(১) সুবিধা হবে না, (২) সতর্ক হয়ে চলা দরকার। ● শ্রীঅশোককুমার দাস (বেলগাছিয়া, হাওড়া)—(১) সম্ভাবনা নেই। (২) জুনের মধ্যে হতে পারে। শ্রীমতী শিপ্রারাণী দেবী (কাটিহার)—(১) জন্মকালীন শনি ও মঙ্গলের অবস্থানজনিত শারীরিক কষ্টাদি। তিন বছর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা চালিয়ে যান, উপকার পাবেন, (২) উপকার হলে সন্তান-সম্ভাবনা। প্রতিকার জন্য সাদামুক্তা কমপক্ষে চার-রতি সোনার আংটিতে এবং শ্রীশ্রীদক্ষিণা-কালিকাকবচ ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক (বোসপুকুর অযোধ্যা, হাওড়া)—(১) আরো মনোযোগ দরকার, (২) অবস্থা ভাল হবে। ● শ্রীসুখদেব মিস্ত্রী (মণ্ডলপাড়া, অনন্তপুর)—(১) একুশ বর্ষ বয়সের মধ্যে। (২) মোটামুটি মঙ্গল হবে। ● শ্রীস্বপনকুমার রায় (কাপাসডাঙা, হুগলী),—(১) আগামী বাংলা বছরে, (২) বাইরে

জাবার সম্ভাবনা নেই। ● শ্রীএন সি সরকার (শিবনগর, আগরতলা)—(১) আর্থিক অবস্থা এর চেয়ে ভাল হবে না, (২) তিনটির বেশী নয়। ● শ্রীমৌসুমী ঘোষ (মৈর স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) বাইশের মধ্যে, (২) পদস্থ এবং শিক্ষিত। ● শ্রীশঙ্করনারায়ণ রায় (ব্যানার্জীপাড়া রোড, কলি)—ইংরেজী নূতন বর্ষে, (২) সাধারণ। ● শ্রীস্বপনকুমার ধর (সেণ্ট্রাল এভিনিউ ওয়েস্ট, কল্যাণী)—(১) এবার জুলাই পর্যন্ত দেখুন, (২) রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীপরিতোষকুমার সরকার (শ্রীপল্লী, পলতা)—(১) ইংরেজী নূতন বছরে, (২) রাহুর ও মঙ্গলের প্রতিকার রক্তমুখী প্রবাল কমপক্ষে নয়রতি গোমেদ রক্তিমাভ আট রতি, উভয় রতুই রূপায়। ● শ্রীমতী মমতা ঘোষ (গিরিশচন্দ্র বসু রোড, কলি)—(১) আগামী জুন পর্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, (২) হবে। ● শ্রীমতী তৃপ্তি ঘোষ (গিরিশচন্দ্র বসু রোড, কলি)—(১) পড়াশোনায় উন্নতির জন্য রক্তমুখী প্রবাল ছয় থেকে আটরতি রূপার আংটিতে ও পান্না চাররতি সোনার আংটিতে ধারণীয়। (২) এখন হবে না। ● শ্রীসুনীলবরণ রায় (শিকদার রোড, কলি)—(১) এবার হবে, (২) তিন বছর পর। ● শ্রীযোগালক্ষ্মী (নওপাড়া)—(১) বর্তমান ইংরেজী বর্ষে, (২) ভাল হবে। ● শ্রীনরেশ (ডুয়ার্স) আগামী অক্টোবরের আগে, (২) শুভ হবে। ● শ্রীকমলকুমার ঘোষ (হরিনগর)—(১) মাঝে মাঝে এরূপ হলেও বিচ্ছেদ হবে না, (২) আগামী জুন পর্যন্ত কি হয় দেখুন। ● শ্রীসনৎকুমার সরকার (কে রোড, জামসেদপুর)—(১) উন্নতি দেড় বছর মধ্যে, (২) জুন থেকে অক্টোবর দেখুন। শ্রীবংশধর পাল (বেলগ্রাম)—(১) না, (২) সাধারণ, (৩) ঠিকই হবে, (৪) শহরে। এক সঙ্গে এরূপ কেউ কুপন পাঠাবেন না। ● শ্রীদামোদর সরকার (মধুকুঞ্জ)—(১) আশানুরূপ হবে না, (২) মঙ্গল, চন্দ্র ও রাহুর অবস্থান ক্ষতিকর। ● শ্রীঅমল ধর (ধুলিয়াজান)—(১) ভাল হবে, (২) এ বছরেই হতে পারে। ● কুমারী লালটি চ্যাটার্জী (কলিকাতা-৮)—(১) উন্নতি হবে এবং (২) উনিশ বর্ষে। ● শ্রীবিমলকুমার ঘোষ (কলি-২৯)—(১) চাকরীতে হবে না, (২) দেড় বর্ষ মধ্যে। ● শ্রী[illegible] ([illegible])—(২) মুক্তা চাররতি ও রক্তপ্রবাল ছয় রতি। ● শ্রীপ্রফুল্ল সরকার (সীতাপুর)—(১) ধৈর্য ধরুন। উৎপাত থাকবে (২) তাঁর স্বাস্থ্য এখন খারাপ যাবে গ্রহের প্রতিকার দরকার। ● শ্রী[illegible] পাল (বর্ধমান)—(১) আগামী উনি[illegible] মাসের মধ্যে হতে পারে। (২) মোটা মুটি ভাল হলেও নিজের কিংবা স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য অশান্তি হতে পারে ● শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (বাউলিয়া সাহাবাদ) (১) আ[illegible] বলা হয় না ; [illegible] বাহাত্তরের কম নয় এই আভাস দিচ্ছি (২) শান্তি পাবেন। ● শ্রীহৈমন্তী (স্ট্রাচি রোড, হাওড়া)—(১) দেড় বছর ভোগ আছে ; গ্রহের প্রতিকার জন্য শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা কবচ ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) লেখাপড়া হবে ● শ্রীসমাপ্তিকা (বিডন স্ট্রীট, কলি)—(১) এবার হবে, (২) তিন বছর মধ্যে সম্ভাবনা। ● শ্রীপ্রমোদবন্ধু গাঙ্গুলি (বহড়ু)—(১) উক্ত বাসস্থান সম্পর্কে নিশ্চয়তা নেই, (২) ব্যবসায়ে আগামী আষাঢ়ের পর সুবিধা হবে। ● শ্রীদীপক কুমার সেনগুপ্ত (গভঃ কলোনী, মানদহ) (১) আগামী মার্চের পর পাঁচ মা[illegible] মধ্যে হতে পারে, (২) [illegible]

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানাতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

মাসিক রাশিফল

নাম— ....

ঠিকানা— ....

....

মাসিক বসুমতী

পরে বিদেশ-যাত্রার যোগ দেখা যায়, (৩) শত্রুতায় উৎকণ্ঠা থাকবে, (৪) পরে আরো ভাল; কিন্তু তিন বছর সকল কাজে সাবধান। একসঙ্গে একাধিক কূপন পাঠানোর নিয়ম নেই। ● শ্রীমতী সুচরিতা সিংহরায় (সি এন রায় রোড কলি)—(১) কুড়ি বছরের মধ্যবর্তী সময়ের কার্যকারণের উপর লেখাপড়া নির্ভর করছে, (২) উক্ত সময়ের মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীরঞ্জন মিত্র (ভবানীপুর) (১) দেরী, (২) আগামী জুলাই মধ্যে হতে পারে। শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী (গঙ্গাকান্ত ভাদড়ী স্ট্রীট, বালী)—(১) কম্ভ রাশি ও ধন লগ্ন, (২) এই নূতন বছরে। ● শ্রীমণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (রাণী ব্রাঞ্চ রোড, কলি)—(১) আটত্রিশ বর্ষ বয়সের পর, (২) এই সময় থেকে মোটামুটি সচ্ছলতা। ● শ্রীতমাল সেন-গুপ্ত (উলটাডাঙ্গা, কলি)—একসঙ্গে একখানির বেশী কূপন পাঠানো ঠিক নয়, (১) বর্তমান ইংরেজী বর্ষের কার্য-কারণের উপর অনেকটা নির্ভর করছে। শনি ও মঙ্গলের একত্র অবস্থান বিরুদ্ধ, (২) বাধা রয়েছে, (৩) বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়সের পর ভাল প্রতিষ্ঠা, (৪) সকল প্রকার প্রতিকারের জন্য পীত পোখরাজ নয়রতি এবং শ্রীশ্রীদক্ষিণা-কালিকাকবচ ধারণ করে দেখতে পারেন। সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার সম্ভাবনা কম। ● শ্রীকল্যাণ-কুমার দাশ (শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলি)—(১) সন্তানস্থান অত্যন্ত দুর্বল; তবু আগামী দু' বছর দেখুন, (২) চলন-সই। ● শ্রীমতী সুজাতা গুহ (বার্মা মাইনস, জামসেদপুর)—লেখাপড়া ভাল হবে এবং আর্থিক কষ্ট হবে না। ● শ্রীমতী রাণী ঘোষ (রাণীপাতরা) (১) বর্তমানে এখনো তিন বছর কষ্ট-দায়ক হতে পারে, (২) প্রতিকার করলেই সব ক্ষেত্রে সুফল হয় না। তবু পীত পোখরাজ রত্ন ছয় থেকে আটরতি এবং শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা-কবচ ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রী ডি কে দে (রাঁচী)—(১) ব্যবসা হবে, (২) দাম্পত্যজীবন মোটামুটি ভাল। ● শ্রীপরিমলচন্দ্র মল্লিক (জি টি রোড, হাওড়া)—(১) বিবাহিত জীবন সাধারণ, (২) পরীক্ষাদির পক্ষে এবার বাধা। ● শ্রীশম্ভুশঙ্কর মল্লিক (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি)—(১) পাঁচ বছর মধ্যে বাড়ী হবে না, (২) প্রতি-কার জন্য কনকক্ষেত্র ক্যাটস্ আই আড়াই থেকে তিন রতির মধ্যে সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● কুমারী সুপ্তি বিশ্বাস (কৃষ্ণনগর) কন্যা রাশি ও সিংহ লগ্ন, (২) দেড় বছরের কার্য-কারণের উপর নির্ভর করছে। ● শ্রীমতী শমিতা মান্না (ব্যারাক-পুর)—(১) বাধা রয়েছে। সুতরাং বৈশাখের মধ্যে না হলে দেরী হবে। (২) এর বেশী কোনো আভাস দেওয়া সম্ভব নয়। ● শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় (লেক টাউন)—(১) এ নূতন বছরে কিছু ভাল হবে, (২) কন্যার পক্ষে উনিশ মাসের কার্যকারণের উপর বিদেশে শিক্ষালাভ নির্ভর করছে। ● শ্রীমনীশ দাশ (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি)—(১) ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে তিন বছর। সুতরাং এখন যাই করেন, তা ভুল কি ঠিক নির্ণয় করা কঠিন, (২) আরো পাঁচ বছর পর। ● শ্রীমতী জয়ন্তী পাল (নিউ আলিপুর)—(১) পনেরো মাস মধ্যে না হলে বেশ বাধা, (২) মোটামুটি ধরণে ভাল। ● শ্রীশঙ্কর রায় (বালিগঞ্জ প্লেস, কলি)—(১) ছয় বছর লাগবে, (২) উক্ত সময়ের পর হতে পারে। ● মিসেস আর মুখার্জি (সুভাষ রোড, আলিগড়) মাঘ থেকে আগামী শ্রাবণের মধ্যে না হলে বিশেষ বাধা; বাংলার বাইরে হতে পারে। ● শ্রীকমল-চন্দ্র বেরা (মাসড়া), মার্চের মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীঅমলকুমার ধর (ধুলিয়া-জান, আসাম)—(১) হবার সম্ভাবনা, (২) পরে সাফল্য। ● শ্রীদাশ (দক্ষিণ ভারত)—(১) পরিবর্তন হবে, (২) পাঁচ বছর পর ভাল। গ্রহের প্রতিকার জন্য কনকক্ষেত্র ক্যাটস্ আই চাররতি ধারণ করতে পারেন। ● শ্রীদীপক-কুমার সেনগুপ্ত (মালদহ)—(১) জুনের পর, (২) পরে হবে। ● শ্রী স ব (বেরহাম-পুর, গঞ্জাম)—(১) শরীর বিশেষ মজবুত হবে না; (২) জন্মকালে রাহু অশুভ এবং বৃহস্পতি দুর্বল। অন্যান্য গ্রহের অধিকাংশের অবস্থান অশুভ। প্রতিকার জন্য ছয়রতি উৎকৃষ্ট রক্তাভ গোমেদ রূপার আংটিতে এবং শ্রীশ্রীসূর্যকবচ কিংবা উৎকৃষ্ট সিংহলী চুণী যাতে একটু বেগুনী আভা আছে, তা চার-পাঁচ রতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● জীবেশকুমার সান্যাল (হাওড়া)(১) মকর লগ্ন, (২) কনকক্ষেত্র ক্যাটস্‌আই আড়াই রতি। ● শ্রীরাধারমণ দত্ত (দিল্লী)—(১) তিন বছর, (২) পান্না। ছয়রতি ও রক্তপ্রবাল আট রতি; ● শ্রীসত্য দত্ত (দমদম)—(১) এপ্রিল পর্যন্ত দেখুন, (২) উক্ত সময়ের মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীসুপ্রিয় বসু (চেতলা হাট রোড, কলিকাতা)—(১) আগামী এপ্রিল থেকে পাঁচ মাস মধ্যে সুযোগ আসতে পারে, (২) লেখাপড়ার ব্যাপারে চেষ্টা করুন। ● শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী (ইস্ট ল্যাণ্ড খাসপুর) —(১) রক্তমুখী প্রবাল আট না রতি পরিমাণ রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) পঁয়ত্রিশ বর্ষ বয়সের পর অনেকাংশে ভাল; ● শ্রীঅশোককুমার রায় (রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন, কলি)—(১) আগামী অক্টোবরের মধ্যবর্তী কয়েক মাসের কার্যকারণের উপর সব নির্ভর করছে, (২) উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে; ● শ্রীমতী আরতি ঘোষ (ব্যারাকপুর)—(১) বাধা রয়েছে, (২) তবু ফাল্গুন কিংবা বৈশাখ দেখুন। ● শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর ব্যানার্জি (পান্না)—(১) রূপার আংটিতে উৎকৃষ্ট রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি ও সোনার আংটিতে উৎকৃষ্ট মুক্তা চার-পাঁচ রতি ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) পাঁচ বছর ধৈর্য ধরে থাকা দরকার। ● শ্রীধ্রুব ব্যানার্জী (সাউথ সিঁথি রোড, কলি)—(১) বৃশ্চিক লগ্ন, তুলা রাশি ও বিশাখা নক্ষত্র, ক্ষত্রিয় বর্ণ ও রাক্ষসগণ, (২) বারো বছর বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্য

সম্পর্কে সাবধান। তারপরে ভবিষ্যৎ মোটামুটি ভাল ; ● শ্রীপ্রণবানন্দ চ্যাটার্জি (বোলপুর)—(১) প্রতিকার জন্য গোমেদ আটরতি রূপোর আংটিতে ধারণ করা চলে, (২) মোটামুটি চলবে, (৩) পরিবর্তন হতে পারে, (৪) ভাল যাবে না। একটির বেশী কুপন পাঠালে ভবিষ্যতে উত্তর পাবেন না ; ● শ্রীপিয়ালী ঘোষ (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা)—একটির বেশী কুপন পাঠানো নিয়ম নয় ; (১) গ্রহের বাধা, কাজেই বর্ষকাল মধ্যে না হলে প্রতিকার আবশ্যক, (২) মোটামুটি ভাল, (৩) হতে পারে, (৪) মনোমত হলেও খেয়ালী প্রকৃতির। শ্রীমতী বর্ণালী গাঙ্গুলী (কবীর রোড, কলিকাতা)—(১) একুশ কিংবা পচিশবর্ষ বয়সে, (২) সুখের হবে। ● শ্রীশ্যামলকুমার দে (শশিভূষণ সরকার লেন, সালকিয়া)—(১) মিথুন লগ্ন ও ধন রাশি, (২) ভাল হতে পারে। ● শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (শ্রীমোহন লেন, কলি)—(১) চাকুরী এবার হতে পারে, (২) বিবাহ সাধারণভাবে। ● শ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী (সিনেমা রোড, বাঁকুড়া)—(১) শীঘ্রই কাটবে, (২) ব্যবসায়ী। ● শ্রীপশুপতিনাথ মখার্জি (বারাসত, চন্দনগর)—(১) জুন পর্যন্ত দেখুন, (২) সাত বছর পর। ● শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জি (পরাশর রোড, কলি)—(১) বিশ্বাস থাকলে শ্রীশ্রীদুর্গা কবচ ধারণ, (২) স্বাস্থ্যের গোলযোগের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ দরকার। ● শ্রীমনোরঞ্জন দাশ (সন্তোষপুর)—(১) মকর রাশি, (২) ভাল হবে ; কিন্তু তিন বছর সাবধান। ● শ্রীসত্যরঞ্জন চ্যাটার্জি (জাগুলী)—এখন হতে পারে, (২) বেসরকারী। ● শ্রী ডি টি এম (আনন্দ ব্যানার্জি লেন, কলি)—(১) মেষ লগ্ন ও মীন রাশি, (২) আরো তিন বৎসর পর। ● শ্রীসুবিমল শীল (কেশোরাম রেয়ন, বয়াসরাই)—(১) ধনু রাশি, (২) আট রতি পীত পোখরাজ ও আট রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। পোখরাজ সোনার আংটিতে এবং প্রবাল রূপার। ● শ্রীমতিলাল দত্ত (বোসপুকুর রোড, কলি)—এভাবে একখানির বেশী কুপন পাঠানো আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। (১) কুড়িবর্ষ বয়সের আগে বিবাহ দেওয়া জ্যোতিষমতে উচিত নয়, বিবাহ ভাল পদস্থ পাত্রের সঙ্গে, (২) মোটামুটি সুখী হবে। ● শ্রীঅশোককুমার দত্ত (বোসপুকুর রোড কলি)—ভদ্রভাবে চলবে, কিন্তু স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখুন। ● শ্রীদিলীপকুমার দত্ত (বোসপুকুর রোড, কলি)—বিবাহ শীঘ্রই হবে। ● শ্রীদিবাকর (ব্যারাকপুর)—(১) ধৈর্য ধরুন, জুন থেকে কিছু ভাল। (২) প্রতিকার জন্য শ্রীশ্রীবগলামুখী কবচ, আটরতি রক্তমুখী প্রবাল ও আড়াই রতি কৃষ্ণাভ বৈদূর্য যথানিয়মে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীঅমর সিংহ (রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলি)—(১) আঠারো মাসের মধ্যে হতে পারে। এবং উন্নতির যোগ ব্যবসায়ে, (২) আগামী বর্ষ মধ্যে কন্যার বিবাহ হতে পারে, কিন্তু তিন বছর বিবাহ দেওয়া উচিত হবে না। ● শ্রীচন্দ্রশেখর চ্যাটার্জি (ঘোষপাড়া, বালি)—(১) আগামী বর্ষের আশ্বিন পর্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার, (২) আর্থিক অবস্থা চলনসই থাকবে। ● শ্রীযদুলাল শীল (সন্তোষপুর)—এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে হতে পারে, শ্রীবিশু দাস (কলি-৩১) —(১) অন্য কাজ হবে, (২) এভাবে রাশি বলা সম্ভব নয়। ● শ্রীসমীরকুমার মুখার্জি (রাজারহাট, বিষ্ণুপুর)—(১) নয়মাস মধ্যে চিকিৎসায় ফল হতে পারে, ভাল চিকিৎসক দেখান, (২) আর্থিক অবস্থা মোটামুটি চলনসই। ● শ্রী এস কে ঘোষ (রাখাল ঘোষ লেন, কলি)—(১) ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দেখুন, (২) তাঁর জন্মকুণ্ডলী দরকার। ● শ্রীবাণী ভট্টাচার্য (রাণাঘাট)—(১) আগামী এপ্রিল পর্যন্ত গোলমেলে। গ্রহের প্রতিকার জন্য শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালী কবচ ধারণ করিয়ে দেখতে পারেন। ● শ্রীনগেন্দ্রনাথ অধিকারী (রাধানগর)—পাঁচরতি মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীপ্রদীপকুমার দে-মজুমদার (দুর্গাপিতুড়ী লেন, কলি)—(১) বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরামর্শ নিন, (২) এখন খারাপ যাবে। তাঁকে শ্বেতপ্রবাল আটরতি সোনার আংটিতে ধারণ করাতে পারেন। ● শ্রীবিকাশচন্দ্র মিত্র (সার্কুলার রোড, হাওড়া)—(১) সিংহ রাশি ও সিংহ লগ্ন, (২) শিক্ষাযোগ ভাল। কিন্তু দেড় বছর সাবধান। ● শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র (সার্কুলার রোড, হাওড়া)—(১) মীন লগ্ন ও অশ্লেষা নক্ষত্র, কর্কট রাশি, (২) আঠারো মাস দেখুন। ● শ্রীমতী মণিকা মিত্র (জয় নারায়ণবাবু ও আনন্দ দত্ত লেন, হাওড়া) —কুম্ভ লগ্ন, অশ্লেষা নক্ষত্র, কর্কট রাশি, বিপ্রবর্ণ ও রাক্ষসগণ। ● শ্রীমদনমোহন দাশ (জামসেদপুর)—কনকক্ষেত্র ক্যাটস্ আই রত্ন সোনার আংটিতে আড়াই থেকে তিন রতির মধ্যে ; ● শ্রীপরশুরাম শর্মা (রাসবিহারী এভিনিউ, কলি)—দু'একবার শরীর কষ্ট ও পারিবারিক অশান্তি, ব্যয়বাহুল্য ঘটাবে, (২) শেষাংশে চাকুরীস্থলে ভাল। ● শ্রীমতী পুষ্প (কসবা)—আগামী বৈশাখ থেকে কিছু ভাল হতে পারে। ● শ্রীঅশোককুমার রায়চৌধুরী (হিন্দুস্থান কেবলস্, বর্ধমান) —(১) এভাবে জন্মকুণ্ডলী জানানো সম্ভব নয়, (২) পীত পোখরাজ আট রতি সোনার আংটিতে। (৩) দেরী হবে। (৪) বদলীর সম্ভাবনা। একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠানো নিয়মবিরুদ্ধ।

বাবা লিখেছেন :

'স্নেহের বুড়ন, দিনকয়েক আগে তোর চিঠি পেয়েছি। জানি তুই দুর্ভাবনায় আছিস তবু উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল।

'তুই যাবার পরই পূর্ববাঙলা জুড়ে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে; সেই হাওয়া আমাদের তুচ্ছ নগণ্য আমতলি গ্রামেও এসে লেগেছে। আমরা পূর্ববঙ্গ-বাসীরা এখন আহার-নিদ্রা ভুলেছি; আমাদের দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত বিচিত্র উন্মাদনায় কাটছে।

'শুনেছি একমাত্র যৌবনই নাকি উন্মাদনার কাল। সে সময় কোন হিসেব থাকে না, পিছুটান থাকে না। আবেগের স্রোতে প্রাণ তখন টলোমলো। মোহবন্ধন দিয়েছে। বৃদ্ধবয়েসের মাটি থেকে সমূলে আমাকে উপড়ে নিয়ে এক গতিশীল উদ্দীপনার ভেতর ছুঁড়ে দিয়েছে।

'ইণ্ডিয়ার কাগজে খবর-টবর বেরিয়েছে কিনা জানি না। যদি বেরিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই দেখেছিস, পূর্ববাঙলায় ভাষা আন্দোলন চলছে। বাঙলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে অনেক তরুণ প্রাণ দিয়েছে।

রাজনীতিবিদ্‌রা যা পারেন নি, সমাজতাত্ত্বিকরা যা পারেন নি, প্রাণের চাইতেও যা পবিত্র যা প্রিয় সেই মাতৃভাষা তা সম্ভব করেছে। ভাষা-আন্দোলন হিন্দু-খৃস্টান মুসলমান-ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সব বাঙালীকে এক করে দিয়েছেন। পঞ্চাশ-একান্ন বছরের জীবনে এমনটা দেখেছি কি না। কোন্ দুঃখে করব? মাঝখানে বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। ভাষা-আন্দোলন দেখে আশা জেগেছে; নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না।

'তুই আরো জানিয়েছিস, একটা চাকরি নাকি মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছিস। তার আর দরকার নেই। তোর রাজেক কাকা থেকে শুরু করে গ্রামের প্রতিটি লোক, বিশেষ করে 'লীগে'র বক্তৃতা শুনে যারা ক্ষেপে উঠেছিল তারা পর্যন্ত চায় তুই ফিরে আয়। তোকে ফিরিয়ে আনবার জন্য রোজই একবার করে তারা আমার কাছে আসছে। গ্রামের ছেলে বিদেশে গিয়ে থাকবে এটা তাদের মনঃপূত নয়।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বাতাসে প্রতিধ্বনি

প্রফুল্ল রায়

ছিন্ন করে মানুষ সামনে যে স্রোতটি পায় তাতেই ঝাঁপ দিতে পারে। তুই তো জানিস আমার যখন বয়ঃসন্ধি সেই সময় বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে এক রোমাঞ্চকর অভিযানে মেতে উঠেছিলাম। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় মাতামাতির দিন যেন আমার সামনে এসে আজ দাঁড়িয়েছে।

'আমার বয়েস এখন পঞ্চাশ। ঠিক পঞ্চাশ নয়, গেল আষাঢ়ে একান্নয় পড়েছি। অর্থাৎ পুরাতন এই বসুন্ধরায় এক শতাব্দীর অর্ধেকেরও বেশি কেটে গেল। এই পরিণত বয়সে জগতের সমস্ত কিছুই তো আসক্তিহীন উদাসীন চোখে দেখবার কথা। কিন্তু পূর্ববাঙলায় এই মুহূর্তে যা ঘটে চলেছে, আমার মতো ফুরিয়ে-আসা নিভু-নিভু মানুষের বাঙালী জাতিকে আর কখনও কোন ঘটনায় এমন একাকার অভিন্নহৃদয় হয়ে যেতে দেখি নি। পারস্পরিক ঘৃণা, সন্দেহ, জাতিবিদ্বেষ নিঃশেষে মুছে গেছে। বহু শহীদের আত্মদানে, বহু মানুষের রক্তে পূর্ববাঙলা এখন পুণ্য-ভূমি। যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ এই স্বর্গেরই তো ধ্যান করে এসেছে। এখানে বাস করে এ দেশের বাতাস বুকে টেনে মনে হয়, হতাশ হবার কিছু নেই। সুধার পাত্র আমাদের হাতের সামনেই আছে।

'তুই লিখেছিস, আমাদের বাড়ি, জমিজমা ইণ্ডিয়ার এক মুসলমান ভদ্র-

'চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবি। তোর পিসেমশাইকেও একখানা চিঠি দিলাম। বিপদের দিনে সে যে তোকে আশ্রয় দিয়েছে তার জন্য আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

'আমরা ভালই আছি। আশীর্বাদ জানবি। ইতি—বাবা।'

চিঠিখানা পড়ে কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো বসে থাকলাম। কলকাতায় আসবার পর খবর-কাগজ কি দেখি নি? নিশ্চয়ই দেখেছি। প্রতিদিন দেখছি। খবর-কাগজের সেই পাতাটাই শুধু আমাকে আকর্ষণ করে যেখানে কর্মখালির বিজ্ঞাপন থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পাতাটাই শুধু দেখি। অন্যগুলো দ্রুত উল্টে যাই।

মনে পড়ছে, ভাসা-ভাসাভাবে ভাষা-

আন্দোলনের খবরটা পড়োছলাম বটে। কিন্তু সেটা যে পূর্ববাঙলায় এমন বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে তা কে জানত। ঘৃণায় বিদ্বেষে পূর্ববঙ্গ যখন নরক তখন এই আন্দোলন যে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো নেমে এসেছে, কে ভাবতে পেরেছিল।

বিহ্বলতা কাটলে খেয়াল হল, দেশে যাওয়ার জন্য আমি নিজেই উৎকণ্ঠ হয়েছিলাম। কতদিন বাড়ির খবর নেই। দুর্ভাবনা উদ্বেগ সব শীর্ষ-বিন্দুতে পৌঁচেছিল। সেগুলো মুহূর্তে মুছে গেল। আকণ্ঠ অসহ্য এক আবেগ বুকের অতল থেকে উথলে উথলে উঠে আসতে লাগল যেন।

দেশে আমি যাব ঠিকই ; এ যাওয়া পরম কাম্য। নিরুদ্বেগ আনন্দময় মন নিয়ে ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা কি যে সুখের ! বার বার মনে হতে লাগল, পূর্ববাঙলা যেন তার সরস শ্যামল মাটিতে নিজের হৃদয়খানি বিছিয়ে দিয়ে আমাকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে। দেশের জন্য আমার সত্তা যেন লালায়িত হয়ে উঠল।

চিঠিখানা নিয়ে একসময় উঠে পড়লাম। এখনই একবার পিসেমশাইর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

❦

দোতলায় আসতেই দেখতে পেলাম, দীর্ঘ বারান্দায় পায়চারি করছেন পিসেমশাই। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এসো—'

আমি কাছে এগিয়ে এলাম।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'বাইরে খুব ঠাণ্ডা। চল, ঘরে যাই।

আমরা দু'জনে সামনের বড় ঘরখানায় ঢুকলাম। আমাকে বসতে বলে নিজেও মুখোমুখি বসলেন পিসেমশাই। তারপর বললেন, 'আজ তোমার বাবার একখানা চিঠি পেয়েছি।'

বললাম, 'আমিও পেয়েছি।'

'কী লিখেছেন তোমাকে ?'

'দেশে ফিরে যেতে লিখেছেন।'

'আমাকেও লিখেছেন তোমাকে পাঠিয়ে দিতে।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর কি ভেবে পিসেমশাই বললেন, 'তোমার বাবা তো জানাচ্ছেন, ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থা এখন খুব ভাল। কোনরকম গোলমাল নেই—'

আমি মাথা নাড়লাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকেও তাই লিখেছেন।'

'তোমার কী মনে হয়, ব্যাপারটা খুব সাময়িক না ?'

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনটা ?'

'এই যে ভাষা-আন্দোলনের নামে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে গেছে।'

বাবার চিঠিটা হাতে আসার পর থেকেই আবেগের স্রোতে ভাসছিলাম। বললাম, 'আমার তো মনে হয় ওটা স্থায়ী হবে। পূর্ববাঙলার হিন্দুদের আর কোন সমস্যা থাকবে না।'

পিসেমশাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, 'আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হয়।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলাম।

পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'সমস্ত ব্যাপারটা এখন ইমোশানের ওপর চলছে ; ওটা থিতিয়ে গেলে কী দাঁড়াবে তা ভাববার কথা।'

কথাটা আমার ভাল লাগল না। সারা পূর্ববঙ্গ—চট্টগ্রামের সেই পাহাড়চূড়া থেকে খুলনার সমভূমি পর্যন্ত আজ উত্তাল। ভাষার জন্য কত মানুষ আজ শহীদ ; জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই এক পতাকার তলায় এসে দাঁড়িয়েছে—এ সবই কি ক্ষণিকের ? সাময়িক আবেগের ঘোরেই কি লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে ? অসম্ভব। আমার মন কিছুতেই এতে সায় দিল না।

পিসেমশাই আবার বললেন, ভাষাটা মস্ত বড় ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কিন্তু একমাত্র ব্যাপার নয়। মনে রেখো, পাকিস্তানে আরো অসংখ্য বিপজ্জনক দিক আছে। তার যে-কোন একটা তুলে নিয়ে রাজনীতিবিদ্‌রা যে-কোন মুহূর্তে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।'

এবারও আমি চুপ করে থাকলাম।

পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'ব্যাপারটা কি জানো, এই তো সেদিন পাকিস্তান হল। তার আগে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আমার অচেনা নয়। তারা খুবই সরল, ভাল, কিন্তু অশিক্ষিত। তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। ফলে যে-কোন একটা জিগির তুলে তাদের যে-কোনো দিকে চালিয়ে নেওয়া খুব সহজ। আর তার জন্যেই কিছু কিছু পোলিটিক্যাল লীডার ওৎ পেতে আছে। আমার ভয়, ভাষা-আন্দোলনের মতো এমন একটা মহৎ ব্যাপার ওরা আবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে না দ্যায়।'

এ জাতীয় কথা এখন আমার পছন্দ নয়। বললাম, 'এবার বোধহয় অন্যদিকে ঘুরবে না।'

পিসেমশাই হাসলেন, না ঘুরলেই ভাল। আমিও তো তাই চাই। বার বার মানুষের রক্তে পূববাঙলার মাটি ভিজবে, মৃতদেহের ওপর শকুনের পাল উড়তে থাকবে, তা কি কারো কাম্য হতে পারে—না হওয়া উচিত?'

একটু চুপ।

তারপর পিসেমশাই আবার শুরু করলেন, 'দেশে ফিরবে তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কবে যাচ্ছ ?'

মনে মনে মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি, কবে যাব। তবু বললাম, 'আপনি কবে যেতে বলেন ?'

'তোমার বাবা যাবার জন্যে জোর তাগিদ দিয়েছেন ; দু-একদিনের ভেতরেই রওনা হও।'

আমারও সেইরকম ইচ্ছে। বললাম, 'আচ্ছা।'

পিসেমশাই বললেন, 'যাবার আগে আমার সেই কাজটা কিন্তু করে দিয়ে যেতে হবে।'

'কোন কাজটা ?'

'ঐ যে হিসেবের খাতায় কোন গোলমাল-টোলমাল আছে কিনা—'

মনে পড়ল। আট-দশ বছরের হিসেবের খাতা দেখে ফেলেছি। বাকি

খাতাগুলো আজকালের ভেতরেই চুকিয়ে ফেলব। বললাম, 'ওগুলো শেষ করেই যাব।'

'গুড। আরেকটা কথা—'

আমি তাকিয়ে রইলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'এবার যে জন্যে কলকাতায় এলে সে জন্যে যেন কখনও আর আসতে না হয়। যদি একান্তই সে দুর্ভাগ্যই হয় আমার দরজা তোমার জন্যে খোলা আছে। সোজা এখানে চলে আসবে।'

'আচ্ছা।'

'যাও, এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম করগে—'

আমি উঠে পড়লাম।

প্রায় সারারাত হিসেবের খাতাগুলো দেখে কাটিয়ে দিলাম। সকালবেলা হঠাৎ অমলের কথা মনে পড়ে গেল। এই ছেলেটির কাছে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ। কলকাতায় আসার পর যাকে আমার সব চাইতে আপনজন মনে হয়েছে সে অমল; তার খুব কাছাকাছি চলে আসতে পেরেছিলাম। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। অমলই দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে তার প্রাণের মাঝখানে টেনে নিয়েছিল।

খুব ইচ্ছে হতে লাগল, দেশে ফেরার আগে অমলের সঙ্গে একবার দেখা করি। পরক্ষণেই খেয়াল হল, দেখা তো করব, তাকে পাব কোথায়? এই বিশাল নগরে কোথায় সে আছে কে জানে। তার ঠিকানা কে আমাকে বলে দেবে?

এ বাড়ি থেকে চলে যাবার পর অমল অবশ্য আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল, তাতে ঠিকানা ছিল না।

অমলের ঠিকানার জন্য যখন উন্মুখ, সেই সময় সুরেশের কথা মনে পড়ল। সুরেশের সঙ্গে অমলের যোগাযোগ ছিল সব চাইতে বেশি। সুরেশ তার খবর রাখলেও রাখতে পারে।

কথাটা মনে হতেই আর বসে থাকলাম না। সুরেশের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

'বাস্তুহারা সমিতির'র অফিসে আসতেই সুরেশকে পাওয়া গেল। একাই ছিল সে। পরনে চেক-কাটা লাল লুঙ্গি, গায়ে মোটা খদ্দরের চাদর জড়ানো। খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়েছিল সুরেশ। আমাকে দেখে কাগজটা একধারে ঠেলে দিয়ে অভ্যর্থনায় সরব হয়ে উঠল; 'আসো আসো—আসো—কি সৌভাগ্য আমার।'

আমি সুরেশের কাছে গিয়ে বসলাম। বললাম, আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি সুরেশদা—'

'দরকারের কথা পরে হইব। কী খাইবা আগে কও—'

'কিছু খাব না। এইমাত্র আমি খেয়ে এসেছি।'

'পর পর ভাবো ক্যান?'

বিব্রতভাবে বললাম, 'পর পর ভাবব কেন।'

সুরেশ আমাকে আর কিছু বলল না। ভেতর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে উঁচু গলায় ডাকতে লাগল ; 'সুখী— সুখী—'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়ে-গলার সাড়া ভেসে এল।

সুরেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই দু'কাপ চা আর মুড়ি-তেলেভাজা আনতে বলে দিল। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'এট্টু চা-টা না হইলে আড্ডা জমে না।'

আমি হাসলাম।

সুরেশ চা-প্রসঙ্গে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্য কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ভালো কথা, দ্যাশের চিঠি-চিঠি পাইছ ?

আমি মাথা নাড়লাম, 'পেয়েছি।'

'কবে ?' আগ্রহে গলা কাঁপতে লাগল সুরেশের।

সুরেশের এত আগ্রহের কারণটা কী, বুঝতে পারছি। বাবার চিঠির জন্য আমার মত সে-ও উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। যাই হোক বললাম, 'কাল।'

'কাইল চিঠি আইছে আর তুমি আইজ আইলা (এলে) আমার কাছে ?' সুরেশের কণ্ঠস্বরে রীতিমত ক্ষোভ, অনুযোগ।

চিঠি পাবার পর সুরেশের কথা একবারও যে আমার মনে হয় নি সে কথা আর কেমন করে বলি। যা বললাম তা এইরকম, 'কাল সারাদিন বাড়ি ছিলাম না ; রাতে বাড়ি ফিরে বাবার চিঠি পেয়েছি। তখন আর কেমন করে আসি।'

'তা তো ঠিকই।' সুরেশ বলল।

আমি চুপ করে থাকলাম।

সুরেশ আবার বলল, 'কী লেখছেন তোমার বাবায় ?' বাড়িঘর জমিজমা এক্সচেঞ্জ করবেন তো ?'

'না।'

প্রথমে কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না সুরেশ। বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হতাশ সুরে বলল, 'সত্য ?'

'হ্যাঁ।'

'এক্সচেঞ্জ করবেন না ক্যান ?'

বাবার চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। সেটা পড়ে শুনিয়ে দিলাম ; কেননা দেশের বাড়ি-টাড়ি বিনিময় করে সীমান্তের এপারে না আসার কারণ-গুলো তার মধ্যেই আছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল সুরেশ। তারপর বলল, তোমার বাবা তোমারে দ্যাশে ফিরতে লেখছেন দেখি।'

'হ্যাঁ—'

'দ্যাশে সত্যসত্যই যাইবা নাকি ?'

'হ্যাঁ।' কাল কি পরশু রওনা হব।'

একটু ভেবে নিয়ে সুরেশ বলল, 'আমার কি মনে হয় জানো ?'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

সুরেশ বলতে লাগল, 'পাকিস্তানে এই সুখের দিন চিরকাল থাকব না। মনে রাইখো ঐটা ইসলামিক স্টেট। পুরাপুরি ধর্মের গোড়ামির উপুর গইড়া উঠছে।'

পিসেমশাইও ভাষা-আন্দোলনকে ঘিরে পূর্ববাংলার এই রূপান্তর খুব নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

যাই হোক, এবারও আমি চুপ করে থাকলাম।

সুরেশ থামেন নি ; তোমার বাবা খুব ভুল করলেন। এক্সচেঞ্জ কইরা তাঁর চইলা আসা উচিত আছিল। কত কইরা একটা পার্টি যোগাড় করলাম। পরে আর এই সুযোগ পাইবা না।'

সুরেশের আপসোস এবং ক্ষোভের কারণটা একেবারে অবোধ্য নয়। সীমান্তের এ পারের এক মুসলমান ভদ্রলোককে সে খুঁজে বার করেছিল। ভদ্রলোকটি আমাদের দেশের বাড়িঘরের সঙ্গে তাঁর চব্বিশ পরগণা জেলার বাড়িঘর জমিজমা বিনিময় করতে চান। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই সুরেশের কিছু স্বার্থ আছে। সেদিক থেকে সুবিধা হল না বলে সে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ।

সুরেশের ক্ষোভ, হতাশা কিংবা সারা পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে যে শুভবোধ দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে তার সন্দেহ—এসব দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। দেশে ফেরার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এই মুহূর্তে লালায়িত হয়ে আছে। বিনিময় কি পাকিস্তানের অস্থির রাজ-নৈতিক প্রসঙ্গ চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম সুরেশদা—'

'কী দরকার ?'

'অমলের ঠিকানাটা জানেন ?'

'জানি।'

অনুগ্রহ করে ঠিকানাটা যদি দ্যান, বড় ভাল হয়। যাবার আগে ওর সঙ্গে দেখা করব।'

সুরেশ একটা কাগজে অমলের ঠিকানা লিখে দিল। তারপর বলল, 'যাইতে আছ, যাও। তবে আমি একখান কথা কইয়া দেই—ছয় মাসও না—'

সুরেশ কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ছ'মাস না ?'

'পাকিস্তানে গিয়া ছয় মাসও টিকতে পারব না। তার মধ্যেই ইণ্ডিয়ায় ফিরা আসতে হইব।'

আমি উত্তর দিলাম না।

একটানা একতরফা আরো কিছুক্ষণ বকে গেল সুরেশ, আমি শুনে গেলাম। তারপর একসময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

●

আমার ইচ্ছা, কালই শিয়ালদা থেকে ইস্টবেঙ্গল মেল ধরব। কাজেই হাতে সময় নেই ; মাঝখানে একটা দিন মাত্র। এর ভেতরেই দেখা-টেখা সেরে ফেলতে হবে। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে হঠাৎ শিশির মুখুটির কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, ওঁদের বাড়িও একবার যাওয়া দরকার।

সুরেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠিক করলাম এখনই অমলের ঠিকানাটা খুঁজে বার করব। নইলে দেখা করার আর সময় হবে না।

অমলের ঠিকানা টালিগঞ্জের কাছা-কাছি একটা জায়গায়। কিভাবে সেখানে যেতে হবে কাগজে তার ছক কেটে

দেখিয়ে দিয়েছে সুরেশ। নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে গিয়ে যখন পৌছুলাম তখন প্রায় দুপুর।

এখানে অমল থাকে বা থাকতে পারে, প্রথমটা বিশ্বাস হল না। বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমার সামনে থেকেই শুরু হয়েছে বস্তি। খাপরা-ছাওড়া চাল ঢেউয়ের মতো কোথায় কতদূরে গিয়ে শেষ হয়েছে, কে জানে। সামনে কাঁচা ড্রেন, স্তূপীকৃত আবর্জনা, ভনভনে মাছি, খেয়ো কুকুরদের নিরন্তর কলহ। এক কোণে একটা কলের সামনে সারি সারি বালতি বসানো। কখন জল আসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই; যখনই আসুক তার জন্য এখন থেকেই লাইন পড়ে গেছে ।

বস্তিগুলোর সামনের দিকে নর্দমার ঠিক ওপরেই চা-তেলেভাজার দোকান। এই দুপুরবেলাতেও একটা মাঝবয়েসী লোক—যার কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ, ভাঙা তোবড়ানো গাল, শুকনো চেহারা, পরনে চিটচিটে খাটো ধুতি আর ফতুয়া —প্রকাণ্ড কড়াইতে কালচে রঙের কুটস্ত তেলে ফুলুরি ভাজছিল। তিন-চারটে লোক নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসে উদ্গ্রীব তাকিয়ে আছে। ফুলুরিগুলো নামলেই হয়; তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এতগুলো বস্তির ভেতর থেকে অমলকে কেমন করে খুঁজে বার করব? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর পায়ে পায়ে তেলেভাজার দোকানটার কাছে চলে এলাম। বললাম, 'আচ্ছা, এখানে অমল চ্যাটার্জী বলে কেউ থাকে? নতুন এসেছে—'

বলামাত্র চিনে ফেলল দোকানদার, সম্ভ্রমের সুরে বলল, 'হ্যাঁ বাবু, থাকে। এই দিন চার-পাঁচেক হল, এসেছেন। চ্যাটার্জিবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন?'

'হ্যাঁ—'

যে লোকগুলো সামনের বেঞ্চিতে বসেছিল, দোকানদার তাদের এক-জনকে বলল, 'এ্যাই নন্দ যা দিকিন, বাবুকে এট্টু চ্যাটাজ্জিবাবুর ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়।'

যে উঠে দাঁড়াল তার বয়েস বেশি নয়, ছোকরামতন। বলল, 'চলুন স্যার—'

আমাকে নিয়ে বস্তির ভেতর ঢুকল ছোকরা। দু'ধারে সারি সারি ঘর। মাঝ-খান দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি; সেটা যুগপৎ চলার রাস্তা এবং নর্দমা। দু'ধারের ঘরগুলো থেকে যত ক্লেদ এসে সেখানে জমা হয়েছে। কোনদিন ওগুলো পরিষ্কার করা হয়, এমন মনে হবার কারণ নেই। ফলে সর্বক্ষণ ভারী দুর্গন্ধ এখানে অনড় হয়ে আছে।

দু'ধার থেকে খাপরার চাল এমন-ভাবে নেমে এসেছে যাতে আকাশ দেখা যায় না। পৃথিবীর আলো পৃথিবীর বাতাস কোনদিন এখানে আসার পথ পায় না।

সবগুলো ঘরেরই সামনের বারান্দা ঘিরে রান্নার ব্যবস্থা। ছোকরার পিছু পিছু চলতে চলতে মনে হল, প্রতিটি ঘরেই একটি করে পরিবারের বাস।

এই দুপুরবেলা কোন ঘরে খাওয়ার পালা চলছে। কোথাও বা একদল মেয়েমানুষ রুক্ষ চুলের বোঝা মেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে; আরেক দল চিরুনি দিয়ে তাদের চুল আঁচড়ে তেল-টেল মেখে চকচকে করে দিচ্ছে। কোথাও বস্তিবাসিনীদের মধ্যে তুমুল কুরুক্ষেত্র চলছে; চিৎকারে-কুৎসিত গালাগালিতে কাক-চিল উড়ে যাচ্ছে। আর একপাল অর্ধোলঙ্গ ছেলেমেয়ে মাঝখানের সরু রাস্তাটা দিয়ে ভনভনে মাছির মত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

আমার শ্বাস প্রায় আটকে আসতে লাগল। কোনরকমে নাকে কাপড় চেপে সন্তর্পণে চলতে লাগলাম।

যে ছোকরা আমাকে পথ দেখিয়ে আনছিল একটা ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; অগত্যা আমাকেও দাঁড়াতে হল।

ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছোকরা ডাকতে লাগল, 'চ্যাটার্জিবাবু, চ্যাটার্জি-বাব—'

আমার সংশয় ছিল, সত্যিই এখানে অমল থাকে কি না। কিন্তু একটু পর ঘর থেকে যে বেরিয়ে এল সে অমলই। আমাকে দেখে সে অবাক; কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল; 'আরে তুমি। তুমি এখানে এলে কী করে?'

কিভাবে এসেছি, বললাম।

'এসো এসো, ভেতরে এসো'—

সেই ছোকরাটি এই সময় বলে উঠল, 'আমি তা হলে যাই চ্যাটার্জিবাবু—'

আমি কিছু বলবার আগেই অমল বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই যা।'

ছোকরা চলে গেল।

আমরা ঘরের ভেতর এলাম। আমাকে একটা ছেঁড়া সতরঞ্চিতে বসিয়ে হেসে হেসে অমল বলল, 'খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে তোমার যা অধ্যবসায় তাতে ইচ্ছে করলে দক্ষিণ মেরু-টেরু আবিষ্কার করে ফেলতে পারতে।'

আমিও হাসলাম। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে লাগলাম। এই দুপুরবেলাতেও ঘরে আলো নেই। আবছা অন্ধকারে যেটুকু দেখা গেল তা এই রকম। কোণে কোণে ঝুল জমে রয়েছে। একধারে গোটা-দুই ভাঙাচোরা বাক্স; দুটো গুটিয়ে রাখা নোংরা বিছানা। আরেক ধারে
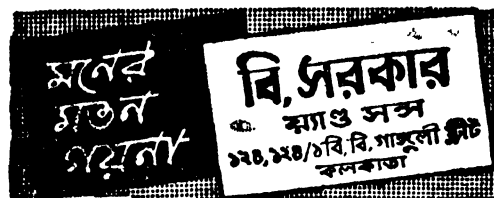
টাঙানো দড়িতে খানকতক ময়লা জামা-কাপড় ঝুলছে।

কোথায় ছিল অমল আর কোথায় এসেছে। নিশ্চিন্ত জীবন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, পরিপূর্ণ আরাম—এ সব ছেড়েছুড়ে কেন যে ছেলেটা এই নরকবাস বেছে নিল সে-ই জানে।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। অমল ডাকল, 'এই—'

মুখ ফেরাতেই সে আবার বলল, 'কী দেখছ?'

ব্যথিত স্বরে বললাম, 'এ তুমি কোথায় এসে উঠেছ অমল।'

'কেন?'

বললাম, 'এখানে থাকলে তুমি মরে যাবে।'

অমলের চোখের তারা নিমেষে জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, 'এই কলকাতা শহরে কত বস্তিবাসী আছে জানো?

'না।'

'আট দশ লাখের মত। তারা যদি বেঁচে থাকতে পারে আমিও মরব না।'

থতমত খেয়ে গেলাম, 'আমি সে কথা বলছি না।'

'তবে?' শাণিত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল অমল। বললাম, 'তোমার তো এ রকম পরিবেশে থাকার অভ্যাস নেই। তাই—'

অমলের মুখ, তার চোখের দৃষ্টি এবার কোমল হয়ে এল। বলল, 'তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ। তাই আমার জন্যে তোমার এত দুশ্চিন্তা। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো ভাই—'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

অমল বলতে লাগল, 'খানিকটা লেখাপড়া শিখেছি। বাবার সূত্রে এই কলকাতা শহরে অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে চেনাশোনাও আছে; যাঁরা ইচ্ছে করলে একদিনে রাজা করে দিতে পারে। তাঁদের ধরে অন্তত একটা ভালো চাকরি বাকরি জুটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, আমি সেবার ফ্রন্টে কাজ করি।'

ঘাড় কাত করে জানালাম, শুনেছি।

অমল বলল, 'আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে; শ্রমিকদের উন্নতির জন্য কিছু করব। সেবার ফ্রন্টে কাজ করব অথচ তাদের জীবন জানব না, এ সৌখীন রাজনীতি আমার দ্বারা হবে না। তাই এখানে এই বস্তিতে চলে এসেছি। এখানকার সব মানুষই শ্রমিক; নানা কলকারখানায় কাজ করে এদের কাছাকাছি থাকতে পারলে প্রতিদিনের সমস্যাগুলো জানতে পারব তাতে তাদের বুঝতে সুবিধে হবে।'

এই সময় একটা কালোমতন রোগা মেয়ে এনামেলের থালায় মোটা মোটা লাল ভাত, বড় একটা পেঁয়াজ, দুটো কাঁচা লঙ্কা, নুন আর একটুখানি তেল নিয়ে এল। অমলের সামনে সেগুলো সাজিয়ে দিল প্রথমে। তারপর ঘরের কোণের কুঁজো থেকে কাঁচের গেলাসে জল গড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

অমল বলল, 'আমি খেতে বসলাম ভাই; বড় খিদে পেয়েছে। খেতে খেতে গল্প করি, কেমন? বলেই হাত ধুয়ে বড় বড় গ্রাস মুখে তুলতে লাগল।

অমলের সামনে যা সাজানো, যেমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেগুলো সে খেয়ে চলেছে তাতে আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল। এখানে, এই পরিবেশে প্রত্যহ যদি এরকম তাকে খেতে হয়, ছেলেটা নির্ঘাত মরে যাবে।

খেতে খেতে একসময় মুখ তুলল অমল, 'তোমাকে কিন্তু খেতে বললাম না ভাই। এসব তুমি খেতে পারবে না।' বলে হাসল।

উত্তর দিলাম না; ব্যথিত মুখে বসে থাকলাম।

অমল আবার বলল, 'ঐ দ্যাখো, এত খুঁজে-পেতে আমাকে বার করলে। অথচ কেন এলে তাই জিজ্ঞেস করি নি। আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ'—

'কী?'

'আমি কাল দেশে চলে যাচ্ছি। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

অমল কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থাকল। পরে বলল, 'দেশে ফিরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ—' আমি ঘাড় কাত করলাম।

'হঠাৎ?'

'বাবা ফিরে যেতে লিখেছেন।'

'কেন?'

কারণগুলো বললাম।

শুনতে শুনতে চোখ-মুখ আলোকিত হয়ে উঠল অমলের। সে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। অনেক রক্তপাতের পর পূর্ববাঙলায় যা এসেছে তাকে চিরকাল টিকিয়ে রাখতে হবে, সে জন্যেও তোমার যাওয়া দরকার। কোন দেশেই কোন যুগেই সাধারণ মানুষ খারাপ না। সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে থেকে শুধু ভাল দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। নইলে খারাপ লোকেরা তাদের খারাপ পথে নিয়ে যাবে।'

পিসেমশাই এবং সুরেশ সংশয় প্রকাশ করেছে। অমলের কিন্তু মানুষের শুভবোধের ওপর অগাধ বিশ্বাস, অসীম আস্থা।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বললাম, 'আজ উঠি ভাই।'

অমলের খাওয়া এবং আঁচানো হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'এসো।'

বস্তির বাইরের রাস্তা পর্যন্ত অমল আমার সঙ্গে সঙ্গে এল।

বললাম, 'চলি ভাই, আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

অমল বলল, 'সে কথা কে বলতে পারে। দেখা হোক আর না হোক, সব সময় তোমার জন্য আমার ভালবাসা রইল।'

অমলের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তা আমি জানি।'

'দেশে গিয়েই একটা চিঠি দিও। তোমার কথাই না; পূর্ববাঙলার খবরের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে থাকব।

দুপুরবেলা যাদবপুর ফিরে তাড়াতাড়ি চাট্টি নাকেমুখে গুঁজে বাগবাজার রওনা হলাম। আজই শিশির মুখুটির সঙ্গে দেখাটা সেরে ফেলব।

[ক্রমশ।

খেলাধূলা ॥

গত মেক্সিকো অলিম্পিকে যাঁরা আপন শৌর্য-বীর্যের দ্বারা বিশ্বের খেলাধূলার দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এইরকম কয়েকজনের পরিচিতি দেওয়া হল।

ডন স্কোল্যাণ্ডার

খেলাধূলোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে অলিম্পিকের আগে কতজনের নামই শোনা যায় কিন্তু অলিম্পিকের অথৈ পাথারে কত প্রতিভাই তো ভেসে যায়। পূর্বের অলিম্পিকে রাতারাতি পৃথিবীতে যেমন খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন যে এ্যাথলেট পরবর্তী অলিম্পিকে তাঁর হয়তো পাত্তা নেই, তাঁকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর রেকর্ডকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন আপন দেশে সম্মানিত কিন্তু সারা বিশ্বের কাছে অপরিচিত অন্য কোন এ্যাথলেট। কিন্তু আমেরিকার গর্বের বস্তু ডন স্কোল্যাণ্ডার টোকিও অলিম্পিকে সেই যে ইতিহাস রচনা করলেন—ফ্রি স্টাইল সাঁতারে চার চারটি স্বর্ণপদক অর্জন করে তার একটিও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারলো না ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকেও। বীরের মত আপন সম্মানকে আঁকড়ে ধরে রাখলেন। আর আমেরিকাকে পাইয়ে দিলেন সম্মানের পর সম্মান। অপরাজিত সাঁতারু স্কোল্যাণ্ডারকে তাই অনেক ভালবাসায় সকলে তাঁর নাম দিয়েছে 'মিঃ আনাটাচেবল।'

স্কোল্যাণ্ডারের শিক্ষাগুরু যদি কাউকে বলা হয় তবে তিনি হচ্ছেন তাঁর মা সার্থার ডেণ্ট পেরি, যিনি নিজে যৌবনে সাঁতারু এবং একই সঙ্গে কোচ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ডন-এর পিতাও—যিনি প্রসিদ্ধ একজন ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন তিনিও পুত্রকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন।

গত ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকের পর সাংবাদিকরা স্কোল্যাণ্ডারকে তাঁর অর্জিত পদকের সংখ্যা যখন জানতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি অনেক ভেবেও বলতে পারেন নি ঠিক কতগুলো পুরস্কার তিনি অর্জন করেছেন; তবে সদ্যসমাপ্ত টোকিও অলিম্পিক থেকে চারটি স্বর্ণপদক পেয়েছেন তা তাঁর মনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

ক্রীড়ারসিক

অলিম্পিকের ইতিহাসে স্কোল্যাণ্ডারই প্রথম সাঁতারু এ্যাথলেট, যিনি একটি অলিম্পিক থেকেই চারটি পদক পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, টোকিও অলিম্পিকে বারটি বিষয়ের মধ্যে নয়টি বিষয়ে এবং ছত্রিশটি স্বর্ণপদকের মধ্যে উনিশটি নিজেদের ঘরে আনতে সহায়তা করেছেন।

উল্লেখযোগ্য ডন-এর বয়স তখন মাত্র আঠার। এবার তিনি ঐ বয়সেই অর্থাৎ ছাত্রাবস্থাতেই ৫৩'৪ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড এবং ৪'১২'২ সেঃ ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে দ্রুতগতিসম্পন্ন সাঁতারুর সম্মান লাভ করলেন। ৪০০ এবং ৮০০ মিটার রিলে রেস প্রতিযোগিতাতেও তিনি আরো দুটি স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন।

সেই থেকে ডন প্রচুর পরিশ্রম করেছেন মেক্সিকো অলিম্পিকে নিজের অর্জিত সম্মানকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে। এ-ব্যাপারে তাঁর নিজের যেমন ছিল অগাধ বিশ্বাস তাঁর কোচ জর্জ হেনস এবং বন্ধু-বান্ধবেরাও তেমনি ছিলেন খুবই আশাবাদী।

ডন-এর মতে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় যে সম্মান তিনি পেয়েছেন তা হচ্ছে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'জন-ই সুলিভান মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড' অর্জন। আমেরিকার বাঘা বাঘা এ্যাথলেটরা তাঁর কাছে পেছিয়ে পড়েছিলেন।

এর কয়েক মাস পরেই স্কোল্যাণ্ডার পৃথিবীর পাঁচটি দেশের ক্রীড়া সমালোচকদের বিচারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটের সম্মান অর্জন করেছিলেন।

বিশ্বের অপ্রমত্ত সন্তরণবিদ ডন স্কোল্যাণ্ডার

এছাড়া আমেরিকার ২৫০ জন ক্রীড়া-সাংবাদিক ও বেতার-ভাষ্যকার-এর এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ইয়ার-এর নির্বাচনে তাঁকে 'Mail Athlete of 1964' উপাধি দেওয়া হয়।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ডন বলেছেন, সাঁতারে সুনাম অর্জন করা ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। (১) মস্তিষ্ককে ক্রীড়াধারার প্রতি নিবদ্ধ রাখা, (২) প্রতিযোগিতার প্রতি স্তরে যোগ দেওয়া, (৩) নিজস্ব সাঁতার-পদ্ধতি। উপস্থিত বুদ্ধি। অপর প্রতিযোগীদের শক্তি এবং দুর্বলতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া।

ডন স্কোল্যাণ্ডারের কোচ মি: হেনস্ বলেন, ডন প্রতিযোগিতার সময় স্টার্ট, স্ট্রোক এবং টার্ন-এর সময় বিশেষ সজাগ থাকেন এবং গলদ খুঁজে বার করার মত কোনরকম খুঁত রাখেন না।

স্কোল্যাণ্ডারের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তিনি ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ডের সমান সমান সময়ে গিয়ে প্রথম সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন থেকেই তাঁর চলেছে রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়ার খেলা।

সাঁতারে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েও স্কোল্যাণ্ডার অন্য সব কিছুকে যে অবহেলা করেন তা নয়। তিনি মনে করেন সাঁতারের চেয়েও জীবনে আরো অনেক কিছু আছে যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে জীবনে গ্রহণ করা চলে।

সাঁতারের বিস্ময়কর প্রতিভা ডন স্কোল্যাণ্ডার মার্কিনবাসীদের প্রত্যাশা পুরোপুরি পূর্ণ করে চলেছেন। সুদেহী ২৪ বৎসর বয়স্ক স্কোল্যাণ্ডার-এর দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি।

বব সীগ্রেন

এ্যাথলেট জুনিয়ার অন্য সব কিছু বিষয়ের মত পোলভল্টেও আমেরিকা আজ অগ্রণী। পৃথিবীর প্রথম সারির ১৫ জনের মধ্যে ৯ জনই আমেরিকার অধিবাসী।

গত দু'তিন বছর ধরে বব সীগ্রেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন কেবলমাত্র দুটি আকাঙক্ষা নিয়ে।

মেক্সিকো অলিম্পিক-এ স্বর্ণপদক বিজয়ী পোলভল্টার বব সীগ্রেন

প্রথমে, অলিম্পিকের স্বর্ণপদক পাওয়া ও দ্বিতীয়ত ১৮ ফুট লাফিয়ে বিশ্বের প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে গৌরব অর্জন করার সৌভাগ্য।

সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সীগ্রেন যখন ক্রম-পর্যায় স্থানে তখন থেকেই তাঁর এইদিকে লক্ষ্য; কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন রেকর্ড তালিকাভুক্ত দূরত্বের চেয়েও কিছু কম। সীগ্রেন-এর দৃঢ়-বিশ্বাস, ১৮ ফুট বা তারও চেয়ে বেশী লাফান একদিন সম্ভব হবে। এমনও তিনি আশা রাখেন যে, মানুষ একদিন ২০ ফুট উঁচু বারও অতিক্রম করবে। লস্এ্যাঞ্জেলস্-এ অলিম্পিক ট্রায়ালে সীগ্রেন খুবই চেষ্টা করেছিলেন ১৭ফুট ৮ইঞ্চি লাফিয়ে তাঁরই সহপাঠী পল উইলসনের রেকর্ড ভাঙ্তে কিন্তু পারেন নি। ১৯৬৬ সাল অর্থাৎ ১৯ বছর বয়সেই সীগ্রেন চেষ্টা করছেন কিন্তু পারেন নি। ১৯৬৭ সালে ইনডোর রেকর্ড যখন তিনি ভাঙ্গলেন, তখন তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এবং বললেন, 'আই উইল সেক ১৮ বিফোর দি সিসন্ ইস ওভার।'

পোলভোল্টে কতটা লাফাতে পারলে অলিম্পিকের স্বর্ণপদক জয় করা সম্ভব হবে একথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি একথা বলতেন— ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চি। নতুবা ১৮ ফুট। সীগ্রেন বলতেন, রাশিয়া, জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ পোলভোল্টে এতই উন্নীত যে, তাঁর পক্ষে বলা শক্ত পোলভোল্টের স্বর্ণপদক আমেরিকার ঘরে যাবে কি না। ছয় ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এবং ১৭৫ পাউণ্ড ওজনের সুন্দর দেহী সীগ্রেন ফাইবার গ্লাস পোলের সাহায্যে বার অতিক্রম করেন এবং এক নতুন পদ্ধতিতে। দৌড়ান শেষ হলে ভল্টবক্সে পোল স্থাপন করে শরীরকে উর্ধ্বে তোলার সময় পেলব পোলের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় গতিশীলতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। বাঁক নেওয়া তন্তু পোল তখন এমনই কাজ করে যে, সময় ও গতির সূক্ষ্মতার উপর খুবই নজর রাখতে হয়।

সীগ্রেন প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করেন জীবনের অর্জিত সাফল্যকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য।

কলা কাকলি

ব্রিজিত বার্দো

উত্তর থেকে দক্ষিণ। পূর্ব থেকে পশ্চিম। সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশ। অসংখ্য নগর, গ্রাম, জনপদ। যেখানে চলচ্চিত্রের ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা সেইখানেই এই একটি নাম বিপুল জনপ্রিয়তায় প্রতিষ্ঠিত। একটি নাম বলছি—তবে একমাত্র নাম বলছি না—পৃথিবীর কোটি কোটি চলচ্চিত্র দর্শককে এক অদ্ভুত মোহিনীশক্তিতে আকর্ষণ করে এই নাম। এই নাম ব্রিজিত বার্দো। এম এম অর্থাৎ মেরিলিন মোনরোর অনুকরণে সংক্ষেপে বি বি—

ফ্রান্স থেকে কয়েক বছর আগে এই নাম একদিন ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমা-রেখার অভ্যন্তরভাগ থেকে বেরিয়ে এল। একদিন ছড়িয়ে পড়ল নিখিল বিশ্বে সবখানে—পাহাড়ের আকাশ-চুম্বী শিখর অতিক্রম করে। সাগরের উন্মত্ত ঊর্মিমালা লঙ্ঘন করে সকল দেশের মত ভারতভূমিতেও একদিন পৌঁছে গেল এই নাম।

ব্রিজিত বার্দো আজ এমন একটি নাম যা লক্ষ লক্ষ দর্শকের চিত্তে এক অভাবনীয় আবেদন আনে, অগণিত প্রাণে আনে এক অভিনব চাঞ্চল্য, শিহরণ বইয়ে দেয় সারা চেতনায়। বিশেষণে বিভূষিত করলেন দর্শক তথা সমালোচক সম্প্রদায়—বললেন—সেক্স কুইন। সর্বাংশে সার্থক এই বিশেষণ, এতটুকু অতিরঞ্জনের স্পর্শ পর্যন্ত নেই এই বিশেষণে। প্রতিভার বিচারে ব্রিজিত যতটা সাড়া তুলেছেন তার বহুগুণ আলোড়ন তিনি এনেছেন তাঁর যৌবনসুলভ আবেদনে। সে আবেদন এককথায় অনতিক্রম্য।

সৌন্দর্যের লীলাভূমি ফ্রান্স। ললিত ও সুকুমারকলার যেন তীর্থক্ষেত্র। দেহগত সৌন্দর্যের এক মূর্তিময়ী বিগ্রহ ব্রিজিত যখন অষ্টাদশী তখনই তিনি পরিণত হলেন লোকের মুখে মুখে ছড়ানো একটি নামে। তারপর সময়ের পথ চেয়ে বহু বছরের মাইল-স্টোন তিনি পেরিয়ে এসেছেন। আজ তাঁর যৌবনগর্ব মধ্যাহ্নপ্রাঙ্গণে। ভরা পঁয়ত্রিশ তথাপি সবিস্ময়ে দেখা যায় যে সতের বছর আগের যে যৌবনচপলতা এবং সজীবতা তাঁর ভিতর ছিল এই দীর্ঘ সময়ের উত্তরণ তার তিলমাত্র ক্ষয় করতে পারে নি।

কিন্তু আবির্ভাবের সঙ্গেই তাঁর দেশবাসীর জয়মাল্য তিনি কণ্ঠে ধারণের সৌভাগ্য অর্জন করেন নি। যাত্রাপথ আরম্ভ হয়েছিলো ব্যর্থতা, হতাশার ভিতর। অন্ধকার, সঙ্কীর্ণতার ভিতর কোণ থেকে যেন হঠাৎ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল একরাশ আলো। অফুরন্ত দীপ্তি। সে আলো, সে দীপ্তি জনপ্রিয়তার। কথাটির প্রমাণস্বরূপ তাঁর অভিনীত 'এ্যাণ্ড গড ক্রিয়েটেড উইমেন' ছবিটির কথা ধরা যাক। তৈরী করার খরচ পড়ল একশ' চল্লিশ মিলিয়ান ফ্রাঁ, ফেরৎ এল আড়াই ভাগের এক ভাগ। কিন্তু সেই ছবি আমেরিকায় পেল 8,000,000 ডলার। প্রতিদিন এখন তিনি তাঁর অনুরাগীমহল থেকে যত উচ্ছ্বাস এবং প্রশস্তিমূলক চিঠি পেয়ে থাকেন তার সংখ্যা গড়ে তিনশ।

সারাদিনে বিশ্রাম বলতে প্রায়

কয়েকটি বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ব্রিজিত বার্দো

কিছুই পান না ব্রিজিত। মনে ইচ্ছে থাকলেও তাঁর পরিস্থিতি তাঁকে তা পেতে দেয় না। চিঠিপত্র দেখা, নাচের অনুশীলন এবং বিভিন্ন পার্টি ইত্যাদিতে তাঁর অবসর সময় কেটে যায়।

তাঁর প্রথম ছবি 'লে ত্রো নোর্মা' (১৯৫২); তাঁর প্রথম ইংরিজি ছবি 'এ্যাক্ট অফ লাভ' ফরাসী-মার্কিন যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত। বিশ্ববাসীর নজরে তিনি ব্যাপকভাবে এলেন ১৯৫৫ সালে সুপ্রসিদ্ধ 'হেলেন অফ ট্রয়' এবং 'ডক্টর এ্যাট সী' ছবি দুটির মাধ্যমে। এ ছাড়া অজস্র ফরাসী ছবির নায়িকা-রূপে তাঁকে দেখা গেছে। এই তালিকায় 'দ্য লাইট এ্যাক্রস দ্য স্ট্রীট', 'নীরোস উইক এণ্ড,' 'ব্রাইড ইজ টু বিউটিফুল', 'লাভ ইজ মাই প্রোফেসান', 'হেভেন ফেল দ্যাট নাইট', 'উওম্যান লাইক স্যাটার্ন' প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। নামগুলি ইংরাজীতে অনূদিত।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার রোগার ভাদিমের ঘরণী ছিলেন ব্রিজিত। ব্রিজিতের স্থান এখন সেখানে পূর্ণ করে আছেন আর এক সেক্স কুইন অভিনেত্রী জেন ফঁদা (বিশিষ্ট অভিনেতা আঁরি ফঁদার মেয়ে)। ব্রিজিত পরে ঘরণী হলেন জ্যাকস চেরিয়ারের—একদা লব্ধপ্রতিষ্ঠা শিল্পী জিঞ্জার রজার্স ছিলেন যাঁর সহধর্মিণী। প্রসঙ্গত উল্লেখিত, জিঞ্জার জ্যাকসের চেয়ে ষোল বছরের বড়। অভিনয়-জীবন পুরোপুরি গ্রহণ করার আগে নামকরা এবং লোভনীয় মডেলদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল ব্রিজিতের অধিকারে।

—চিত্রপ্রিয়

এ্যানিটা একবার্গ

'লা ডলস ভিটা'—কয়েক বছর আগে এই ছবিটি সারা পৃথিবীর দর্শকসমাজে যে কি পরিমাণ আলোড়ন এনেছে, সাড়া তুলেছে এবং জনপ্রিয়তায় বিভূষিত হয়েছে সে স্মৃতি নিশ্চয়ই আজও দর্শকের মন থেকে মিলিয়ে যায় নি। এই অবিস্মরণীয় ছবিটি নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এক বিশেষ বক্তব্যে সমৃদ্ধ এই ছবিটির সার্থক স্রষ্টা পৃথিবীর প্রথম দশ-জন সেরা পরিচালকের অন্যতম ফেলিনি এই চিত্রে সিলভিয়ার চরিত্রে যে শিল্পীকে সুযোগ দিয়েছিলেন শিল্পী হিসাবে সাধারণ্যে তিনিও যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অধিকারিণী।

চলচ্চিত্র অনুরাগীদের মধ্যে যে ক'টি নাম এককথায় আলোড়ন বইয়ে দেয় সিলভিয়া চরিত্রের রূপদাত্রী এ্যানিটা একবার্গ সেই তালিকায় এক উজ্জ্বল নাম। সিলভিয়া একটি অভিনেত্রীর চরিত্র। এই চরিত্রে রূপদান করে যে অসামান্য দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় এ্যানিটা দিয়েছিলেন তা থেকে প্রমাণ হয় রূপশিল্পী হিসাবে তিনি কত উচ্চাসনের অধিকারিণী।

আরও একটি বিশেষ খ্যাতি আছে এ্যানিটার। অভিনয়দক্ষতা চরিত্রের যথাযথ রূপদানের পারদর্শিতা ছাড়াও উত্তেজনা সঞ্চারে যাঁরা সক্ষম, এ্যানিটা তাঁদেরই একজন। এক অসাধারণ আবেদন জাগাতে তিনি সমর্থ। মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে তিনি লব্ধ-সিদ্ধি। মোহময়ী অফুরন্ত মাদকতার অধীশ্বরী সীমাহীন যৌবনের মূর্তিময়ী বিগ্রহ এ্যানিটা বয়সের বিচারে আজ চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই।

মোহময়ী ভঙ্গিমায় এ্যানিটা একবার্গ

১৯৩১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। ছোটবেলা থেকে কলাবিদ্যার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড অনুরাগ। মন-প্রাণ ঢেলে কলাসাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করে গেছেন। নাচ-গান-বাজনা অভিনয়ের চর্চা চলেছে পুরোদমে। সুইডেনের মেয়ে এ্যানিটা। অল্পবয়স থেকেই পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। একাধিকবার সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। প্রতি-বারই বিজয়িনীর মুকুট তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন বিচারকরা। বয়েস তখনও কুড়ির ঘর অতিক্রম করেনি—'সেক্স-কুইন' হিসাবে তখনই তিনি জগদ্ব্যাপী প্রসিদ্ধি পেয়ে গেছেন।

'লা ডলস ভিটা' ছাড়া অন্যান্য যে ছবিগুলিতে তিনি অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে 'বোকাসিও-৭০' এবং 'ফোর ফর টেক্সাস'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডীন মার্টিন এবং জেরি লুইসের একটি হাসির ছবিতে তিনি নিজেই ছিলেন কাহিনীর অন্যতম চরিত্র। সেই চরিত্রে তিনি নিজেই রূপ দিয়ে-ছিলেন। অভিনেত্রী হিসাবে খ্যাতি অর্জনের পূর্বে একদা তিনি 'মিস সুইডেন' আখ্যা পেয়েছিলেন।

সুইডেনের মেয়ে এ্যানিটা বর্তমানে রোমের অধিবাসিনী। মার্সেলো মাস্ত্রি-য়োনী, ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা, ডীন মার্টিন প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের বিপরীতে তিনি অভিনয় করেছেন।

বিবাহবন্ধনেও তিনি একাধিকবার আবদ্ধা হয়েছেন। একদা তিনি ছিলেন অ্যান্টনি স্টীলের অর্ধাঙ্গিনী। তারপর তিনিই একদিন ঘরণী হলেন রিব ভ্যান ন্যাটারের। —চিত্রপ্রিয়

জন্মভূমি

গত ৮ই জানুয়ারী, কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার ইউনিট তাঁদের নতুন নাটক 'জন্মভূমি' মঞ্চস্থ করলেন মিনার্ভা মঞ্চে। থিয়েটার ইউ-নিট বিগত ৮।৯ বছর ধরে বহুবিধ নাটক পরিবেশন করেছেন এবং বিভিন্ন রস ও বিভিন্ন রুচির নাটক। একদিকে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' থেকে সেক্সপীয়র-এর 'জুলিয়াস সীজার,' অন্যদিকে অমৃত-লালের 'কৃপণের ধন', 'পঞ্চশর,' 'চারদেয়াল' প্রভৃতি হাসির নাটকেও তাঁদের কৃতিত্ব বহুবিস্তৃত।

কিন্তু এবারে যে নাটকটি পরি-বেশন করলেন—তার রস একেবারেই ভিন্ন। 'জন্মভূমি' বাংলার কৃষক জীবনের মর্মন্তুদ বাস্তব আলেখ্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় —তথা ভারতে কৃষি ও কৃষক উন্নয়নের নামে যে প্রকার প্রচেষ্টা হয়েছে তা কতো অকিঞ্চিৎকর এবং কতো নিরর্থক তারই একটি নাটকীয় সমালোচনা। এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিরক্ষর কৃষকদের ওপর যে নিরঙ্কুশ শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, মুষ্টিমেয় ধনী-জোতদার শ্রেণীর দেশ-প্রেমিক তারই তথ্যচিত্র।

পরিবেশনার গুণে নাটকটি প্রাণ-বন্ত। যদিও নাটকটি বাস্তবতাবহুল —তথাপি ঘটনা-সন্নিবেশ এবং চরিত্র-চিত্রণের গুণে নাটকটির প্রতিটি মুহূর্ত নাটকীয়। দু'ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট মনে হয় পাঁচ মিনিটে শেষ হয়ে গেল।

নাটকটির সবচেয়ে বড় গুণ হোল —নাটকটি জীবনধর্মী। কিন্তু প্রচার-গন্ধী নয়। কোন পার্টি কোন দলমত বা রাজনীতির প্রভাব নেই অথচ প্রতি দৃশ্যে আছে শোষণের কথা। পুরো নাটকটি দেখানো হয়েছে একটি মধ্য-বিত্ত সহরবাসী লেখকের চোখ দিয়ে। সহরবাসী—যারা গ্রাম সম্বন্ধে চির উদাসীন। নির্মম ব্যঙ্গ আছে সহরে সভ্যতা আর আধুনিক শিক্ষাদম্ভী বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

কৃষকদের একটি আলকাপ (নাচ গান) দৃশ্য এবং মুর্শিদাবাদী সংলাপে শিল্পীদের দক্ষতা দেখলে বোঝা যায় কি প্রকার নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম লেগেছে এ নাটক করতে। খালেদ চৌধুরীকৃত দৃশ্যসজ্জা ও সঙ্গীত এক-কথায় অপূর্ব। মঞ্চসজ্জা অনাড়ম্বর। ঐটুকু মঞ্চে বাঁশের সাঁকো, মাঠ, নালা মিলে যেন একটা মায়ার সৃষ্টি হয়। মনে হয় চলে গেছি দূরে—কলকাতা ছেড়ে কোনো সবুজ-ঘেরা গ্রামের কোলে, থিয়েটারের গানের ব্যবস্থার এত এফেকটিভ অথচ যুক্তিপূর্ণ এর আগে দেখা যায় না। যাত্রার বিবেককে থিয়েটারের লজিক-এ উত্তরণ এই বোধহয় প্রথম ও সার্থক প্রচেষ্টা। প্রতিটি গান মৌলিক এবং গ্রামীণ চরিত্রে পেনারূপী মণ্টু ঘোষের কণ্ঠে তা প্রাণবন্ত। গায়ক মণ্টু ঘোষকে বহুদিন পর আমরা ফিরে পেলাম। তাঁর অভিনয়-ক্ষমতা দর্শককে অবাক করেছে।

তাপস সেন ইতিপূর্বে আলোর ভেলকি দেখিয়েছেন বহু কিন্তু জন্ম-ভূমিতে আমরা পেয়েছি তাপসবাবুর অন্তরের ছোঁয়া। কৃষকরা লাইন করে বাড়ী ফিরছে, দিনান্তে রক্তিম দিগন্তে তাদের সিলুয়েট দৃশ্য এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। পেনার গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া। ভিটে ডিক্রীর দৃশ্য সতীশের মাথার কাছে একফালি লাল আলো—যেমন কোন মাস্টারের তৈলচিত্র।

অভিনয়ের অংশ আরও শক্তিশালী; বৃদ্ধ, বক্রগ্রীব, হাজির ভূমিকায় উত্তীয়দেব একটি বিস্ময়। সাহারুজী আলোক রায়চৌধুরী একটি অভিনব ছিলেন। রাহার ভূমিকায় নবেন্দু গুপ্ত, বাদলার ভূমিকায় সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, জব্বরের ভূমিকায় অরবিন্দ ভট্টাচার্য, একটি ছোট্ট রোলে অমল চক্রবর্তী, হেড মাস্টারের ভূমিকায় গৌর গোস্বামী, প্রতিটি অভিনয় বিস্ময়কর। বাতাসী রূপী দুশ্চরিত্রার রোলে দীপিকা ভট্টাচার্য

দ্বাপীপদের লোক উৎসবে ঋতুরাজ অভিনীত 'উত্তম পুরুষ' নাটকে ছন্দা চক্রবর্তী দীপ্তিকুমার শীল ও দিলীপ বসাক

কৃষক কন্যা বেগমের রূপে নন্দিতা চৌধুরী এবং মুখরা গ্রাম্য-বিধবা কৃষক রমণীরূপে সাধনা রায়চৌধুরী—তিন জনেই অসাধারণ অভিনেত্রী। এ ছাড়া শেখর চট্টোপাধ্যায়, দেব চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গনাথ দে, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, বাবলু গাঙ্গুলী, প্রত্যেকের অভিনয় অপূর্ব। জীবন্ত কৃষক, রূপ-সজ্জায় চলনে, সংলাপে এবং পোষাকে নিখুঁত।

এককথায় 'জন্মভূমি' একটি অসাধারণ নাটক। বাংলা থিয়েটারে এ একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি।

সংগীতানুষ্ঠান

বিরাটি শিবালে যুগ-গোষ্ঠীর পরিচালনায় গত ১৪ই ডিসেম্বর এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে যে সব শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। সর্বশ্রী—দ্বিজেন মুখার্জী, সুবীর সেন, দিলীপ চক্রবর্তী, অলোক বাগচি, ইলা বোস, মীরা বিশ্বাস, প্রার্থনা মুখার্জী, সুশীল চক্রবর্তী, তপন দত্ত, নিলাদ্রিশেখর বোস ও কাজী সব্যসাচী (আবৃত্তি) ও ভি বালসারা।

কাঞ্চনরঙ্গ

গত ২০শে জানুয়ারী ১৯৬৯ (সোমবার) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের (রাইটার্স বিল্ডিংস) স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাব রঙমহল নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ'। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। নাটকটি পরিচালনা করেন সাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি সুপরিচালিত ও সুঅভিনীত। নাটকটির গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। নাটকটির পরিচালনায় পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটিতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের আন্তরিকতা, সুষ্ঠু অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। নাটকটিকে প্রাণবন্ত অভিনয়ে যাঁরা উজ্জ্বল করে রাখেন তাঁদের মধ্যে পাঁচুর চরিত্রে প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় সুন্দর ও সাবলীল। যদুগোপালের চরিত্রে হরিপদ খাসনবীশের অভিনয় দর্শক মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন সুমিতা দাশগুপ্তা, অমিতা সিংহ, রেখা চট্টোপাধ্যায় ও শকুন্তলা চক্রবর্তী। সহশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সমীর চক্রবর্তী, তপনকুমার লস্কর, প্রশান্ত চৌধুরী, সৌমেন্দু ভট্টাচার্য, সুমিতা দাশগুপ্ত, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, বিনয়রতন চৌধুরী, সোমেন্দ্রনাথ রায়, অনিমেষ বসু। নাটকটির সঙ্গীতাংশের দায়িত্ব বহন করেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনায় ছিলেন শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায়। ব্যবস্থাপনায় শচীন মিত্র, কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব ঘোষ, শেখ নূর আলী ও রবীন সেন।

শ্যামা নৃত্যনাট্য

গত ২১শে জানুয়ারী, বাটানগর নিউল্যাণ্ড সরস্বতী পূজামণ্ডপে নিউল্যাণ্ড পূজা কমিটির ব্যবস্থাপনায় রাত্রি ৭টায় নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শ্যামা নৃত্যনাট্য, রাবণ বধ নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামা নৃত্যনাট্যে উমা দত্ত (শ্যামা), কানাই মজুমদার (বজ্রসেন), সুতপা দত্ত (উত্তীয়), অনুপশঙ্কর (কোটাল) সুঅভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় কঙ্কণ বসু, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা, অরুণা দে, বর্ধী ভট্টাচার্য, সুচরিতা ঘোষ, কৃষ্ণা হালদার, শেলী দাস, মানসী ঘোষ ও অরুণিমা সেনের নৃত্যকলার দর্শকবৃন্দ প্রশংসা করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন—শ্রীবিপুল ঘোষ। বিপুব বক্সী ও শ্রীমতী কুহিনী চক্রবর্তী শ্যামা নৃত্যনাট্য সঙ্গীতে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সহকারী নৃত্য-পরিচালনায় ছিলেন—অনুপশঙ্কর, স্বপ্না সেনগুপ্তা ও কানাই মজুমদার। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন—অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, সমীর রায়, ভানু চ্যাটার্জী প্রমুখ। গ্রন্থনায় ছিলেন অণিমা রায়। উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন রূপম লাল।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষণ শিবিরে 'হরবোলা'

'বেতার শিল্পী' শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন সফর শেষ করে কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করার পর 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষণ-শিবির' কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে গত ৮ই জানুয়ারী চার দিনের জন্য গোচারণ অভিমুখে যাত্রা করেন সেইখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'হরবোলার শিল্পী' হিসাবে অংশগ্রহণের জন্য। শিবিরাধ্যক্ষ প্রলয়জীর পরিচালিত দুইটি অনুষ্ঠানে 'হরবোলার শিল্পী' হিসাবে অংশগ্রহণ করার পর শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় 'অপরূপ' নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে 'সরবেরিয়া হাইস্কুল' প্রাঙ্গণে তাদের পরিচালিত 'যা তারা পায়নি' ও 'দিনান্ত' এই দুইটি নাটকে নেপথ্য থেকে শুধুমাত্র মুখ দিয়ে নানান রকমের ডাকের মাধ্যমে বিভিন্ন দৃশ্যের শব্দ দিয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই নাটক দুইটি পরিচালনা করেন শ্রীসমর সাহা ও নির্দেশনায় ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা।

শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় 'গোচারণে' চারদিন অবস্থানকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'হরবোলার শিল্পী' হিসাবে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট এতো জনপ্রিয়তা লাভ করেন যে, শিবিরাধ্যক্ষ প্রলয়জী ও শিবিরপ্রধান শ্রীমন্তের উপস্থিতিতে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে 'রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ের' প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় দর্শক মহলে 'হরবোলা গঙ্গোপাধ্যায়' নামে সুপরিচিত।

চন্দ্রগুপ্ত

গত ১৩ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় ওয়েল এ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের স্টাফ ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক রঙমহলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই নাটকটির বিভিন্ন

ইস্পাত ক্লাব পরিবেশিত 'বাকি ইতিহাস' নাটকের দুই শিল্পী

চরিত্র রূপায়ণে সকলেই সবিশেষ নিষ্ঠার পরিচয় দেন, নাম-ভূমিকায় শশধর ভট্টাচার্য শেষ পর্যন্ত সাবলীল এবং প্রাণবন্ত অভিনয় করেন, চাণক্যর ভূমিকায় অনিলকুমার চক্রবর্তীর উদ্যম যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে, বিশেষ করে কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর অভিব্যক্তি পূর্ণ অভিনয়দক্ষতারই পরিচয় বহন করে। হেলেনের ভূমিকায় ভারতী মুখোপাধ্যায় ও বাচালের ভূমিকায় অমলেশ সেনগুপ্তের অভিনয় চরিত্রানুগ। সেলুকাস ও নন্দের চরিত্র রূপায়ণে মৃণালকান্তি বসু ও অলোক মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াস মোটামুটি ভালোই বলা চলে। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেন নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত ভট্টাচার্য, দেবকুমার চক্রবর্তী, তিমির বসুরায়, দীপককান্তি দাস, চিত্রা রায়, ইন্দিরা দে, ছন্দা ভৌমিক, মিহির, হীরালাল, চিন্ময় ও মঙ্গল সিং, নাটকটি পরিচালনা করেন দেবকুমার চক্রবর্তী।

সংক্রান্তি

সম্প্রতি টালিগঞ্জ স্টেট পোলট্রি এনপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্য-শিল্পীরা রঙমহল রঙ্গগৃহে এ নাটক মঞ্চস্থ করে খ্যাতি অর্জন করলেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে এদিনের অভিনয়ে এঁরা মঞ্চাভিনয়ের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেদিক বিচার করলে এঁদের সামগ্রিক কুশলতা আগামী দিনের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির পরিচয় বহন করেছে। পরিচালনায় সযত্ন-সতর্কতা পরিলক্ষিত হয়েছে, অভিনয়ে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছেন রবীন্দ্রনাথ দাস, হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবদাস ঘোষদস্তিদার, ননীগোপাল চন্দ, শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী, রাহুল আমিন, দিলীপ চক্রবর্তী ও দূর্বা গোস্বামী।

সুরবাহারে শিল্পী সমারোহ

অভিজাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন সুরবাহার প্রগতিশীল পদ্ধতিতে যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য ও কণ্ঠসঙ্গীতে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে দক্ষিণ শহরতলীর কসবা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সঙ্গীতপিপাসু জনসাধারণ ও সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদার্হ হয়েছে।

অভিজ্ঞতা ও কুশলতার বিচারে সুরবাহারের শিক্ষক শিল্পী সমারোহ সত্যিই প্রশংসনীয়। যন্ত্রসঙ্গীতের দায়িত্বে আছেন সর্বভারতীয় খ্যাতিমান শিল্পী বলরাম পাঠক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও উদয়শঙ্কর সম্প্রদায় খ্যাত যন্ত্রী কমলেশ মৈত্র, সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত আকাশবাণীর তালযন্ত্রী শ্যামল বসু, প্রখ্যাত গীটারিস্ট ত্রিদিব বন্দোপাধ্যায়, ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খানের শিষ্য বাদ-বিশারদ সমরেশ গঙ্গোপাধ্যায়, নৃত্য-বিভাগের দায়িত্বে আছেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিল্পী জ্যোৎস্না দত্ত ও নৃত্যশ্রী অপর্ণা দত্ত। কণ্ঠসঙ্গীতে রয়েছেন বোম্বাই প্রত্যাগত সুরস্রষ্টা রবীন্দ্র জৈন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘখ্যাত গীতিকার সুরকার প্রবীর মজুমদার, রবীন্দ্র ভারতী সংশ্লিষ্ট আকাশবাণীর প্রবীণ শিল্পী পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ওস্তাদ দবীর খাঁনের শিষ্য সঙ্গীতবিশারদ বিমলকুমার মিত্র, সঙ্গীতবিদ ডাঃ যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয় শিষ্য ও আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী কৃষ্ণগোপাল ঘোষ এবং সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর শিষ্যা ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কৃষ্ণা সমাদ্দার। সাংগঠনিক দায়িত্বে রয়েছেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত সুনীল সাহা।

নির্মীয়মান ছবি

পরিণীতা

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র-এর চিরনতুন কাহিনী 'পরিণীতা'কে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন চিত্র-পরিচালক অজয় কর। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁদের দেখা যাবে তাঁরা হলেন বিকাশ রায়, রমন মিত্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, গীতা দে, ছায়াদেবী, রবি চৌধুরী, যমুনা সিংহ, অনুভা গুপ্তা ও মুখ্য দু'টি চরিত্রে 'বালিকাবধূ'খ্যাত শিল্পী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

পান্না হীরে চুণী

এক উদীয়মান তরুণ সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনের নানা বিচিত্র ঘট-নাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'পান্না হীরে চুণী'র কাহিনীটি। কাহিনীর রচয়িতা হলেন সুখেন দাস। কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন খ্যাতিমান নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। চিত্রটির সুরকার হলেন তরুণ সুরকার শ্রীঅজয় দাস। চিত্রটির রূপায়ণে রয়েছেন সুখেন দাস, শিশির বটব্যাল, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বেবী গুপ্তা, বাণী গঙ্গো-পাধ্যায়, রত্না ঘোষাল, স্বপনকুমার, নিরঞ্জন রায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অনুপকুমার, দিলীপ রায় প্রমুখ। চিত্রগ্রহণে রয়েছেন শঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়। সম্পাদনায় রয়েছেন রমেশ যোশী ও শিল্প নির্দেশনায় সঞ্জিত সেন। চিত্রটির নেপথ্যে যাঁরা

ইডেন উদ্যানে চিত্রতারকাদের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আগে 'টস' করছেন বাংলার চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার ও বোম্বাইয়ের রাজকাপুর। টস করা দেখছেন ক্রীড়া-জগতের অন্যতম কর্ণধার শ্রীএম দত্তরায়

কণ্ঠ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্যামল মিত্র, পিণ্টু ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়।

নল-দময়ন্তী

কালিপদ সেন সুরসংযোজিত সঙ্গীতবহুল পৌরাণিক চিত্র 'নল-দময়ন্তী' চিত্রায়নের কাজ সমাপ্ত-প্রায়। এই পৌরাণিক চিত্রটিতে অংশ নিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায় প্রমুখ। সঙ্গীতাংশে রয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

শীলা

সামাজিক কাহিনী 'শীলা'কে চিত্রে রূপদান করছেন প্রবীন চিত্র-পরিচালক শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন চক্রবর্তী, সুমন মুখোপাধ্যায়, মাঃ চিনু প্রমুখ।

বভ্রুবাহন

পৌরাণিক চিত্র 'বভ্রুবাহন' রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে। এই পৌরাণিক চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন কানু রায়। চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন মধু বসু। চিত্রটিতে সুর-সংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রবীণ ও খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক কালিপদ সেন। চিত্রে বাংলার স্বনামধন্য শিল্পী-দের দেখতে পাওয়া যাবে। কণ্ঠসঙ্গীতে রয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

দুরন্ত চড়াই

সমরেশ বসুর কাহিনী 'দুরন্ত চড়াই' মুক্তি-প্রতীক্ষায়। চিত্রটির পরি-চালক হলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। চিত্রটিতে যাঁরা অভিনয় করছেন

প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণকারী মহিলা শিল্পিবৃন্দ

তাঁরা হলেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, তরুণ রায়, দিলীপ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, সোমেন চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির সুরকার শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতে রয়েছেন শিপ্রা বসু, হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ও সুরকার শ্যামল মিত্র।

ছায়াতীর

সুশীল বিশ্বাস এর চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন। শিল্পী-দের মধ্যে রয়েছেন বিকাশ রায়, রবি ঘোষ, শ্রাবণী বসু, বিনতা রায়, নন্দিতা বসু, জহর রায়, গীতালি রায়, অজয় গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। চিত্রটিতে সুরারোপ করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটির প্রযোজনা করছেন রমেশ সায়গল। নন্দন পিকচার্সের চিত্র 'ছায়াতীর'।

নিশিপদ্ম

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ-এর কাহিনী 'নিশিপদ্ম'। বিভূতিভূষণ কৃত কাহিনীটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির সঙ্গীত-

পরিচালক হলেন নচিকেতা ঘোষ। চিত্রটির শিল্পী-তালিকায় রয়েছেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, আশাদেবী, তপতী ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, অসীম চক্রবর্তী। নায়কের চরিত্রে ভরতপুরস্কার বিজয়ী চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার ও নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা। চিত্রটির পরিবেশনায় কিনে পিকচার্স।

তিন ভুবনের পারে

সমরেশ বসু কৃত কাহিনীটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় রয়েছেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন কমল মিত্র, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, তরুণ-কুমার, রবি ঘোষ ও প্রধান দু'টি চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বোম্বাইয়ের তনুজা। চিত্রটির সঙ্গীতাংশে রয়েছেন সুধীন দাসগুপ্ত।

'আলেয়ার আলো' চিত্রে নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় চিত্র : দিলীপ বসু

সৃষ্টিধর্মী পরিচালক : ইঙ্গমার বার্গম্যান

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রশিল্প যখন যৌনতায় ভরে গেছে, দর্শকের রুচিকে যখন বিকৃত পথে চালিত করা হচ্ছে, এ হেন পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় সুইডেনের চলচ্চিত্রশিল্পে ইঙ্গমার বার্গম্যানের জন্ম।

বার্গম্যানের জন্ম সুইডেনের উপ্পসালায় ১৯১৮ সালে। সেখানে তাঁদের বহু পুরনো একটা বাড়ি ছিল। বার্গম্যান তাঁদের খাবার ঘরে টেবিলে বসে থাকতেন আর বড় বড় কাঁচের জানলা দরজাওয়ালা ঘরে বসে দেখতেন কাঁচের ওপর রঙ-বেরঙের ছবি কেমন সুন্দর ফুটে উঠতো। গীর্জার ঘড়ির ঢং ঢং করে আওয়াজ কানে ভেসে আসতো সেই সময়। শীতের পর একদিন বসন্তের বিকেলে পাশের বাড়ির ফ্ল্যাটে যখন সুন্দর এবং মধুর আওয়াজ তুলে পিয়ানো বেজে উঠলো এবং সূর্যের শেষ বিদায়ের রশ্মি ঘরের ভিতর টাঙানো ভেনিসের ছবির উপর দিয়ে ঘুরে গেল সেই সময় বার্গম্যানের মনে এক অনাস্বাদিত চিন্তা দোল খেয়ে গেল। তাঁর মনে হল ওই যে ঢং ঢং আওয়াজ ওটা কোন গির্জার ঘণ্টার আওয়াজ নয়, ওই যে পিয়ানোর মধুর ধ্বনি, সেও বুঝি কোন রমণীর মধুর হাতের ছোঁয়া নয় বরং সে সব কিছুই বুঝি আসছে ওই ভেনিসের ছবিটার মধ্যে হতে। বার্গম্যানের শিশুমনে তখন থেকেই যেন ছায়াছবির দিকে একটু আকর্ষণ রয়ে গেল। এ ছাড়া চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবার তাঁর আরো অনেক কারণ আছে।

বার্গম্যানের জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে ওঠা এমনই ঘরে হয়েছিল যেখানে বসেই তিনি জীবন ও মৃত্যুকে অতি সহজভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর পিতা একজন ধর্মযাজক ছিলেন। কবরখানায় মৃতদেহ আসত, তিনি সেখানে গিয়ে মন্ত্রপাঠ করতেন। বার্গম্যানের মনে তাই মৃত্যুর পর কি আছে তা জানার আগ্রহ প্রবল ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর এই চেতনাকেই তিনি কাজে লাগিয়েছেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। দশ বছর যখন তাঁর বয়েস তখন তিনি পিতার কাছ থেকে পেলেন চিমনি এবং ল্যাম্প সহ ভাঙা একটি ফিল্ম প্রজেক্টর। যাকে তিনি ম্যাজিক লণ্ঠন বলেছেন। আর পেয়েছিলেন কতকগুলি slide। যেগুলি ছিল Red Riding Hood এবং খেঁকশিয়ালের গল্প সংক্রান্ত। যেই হেতু খেঁকশিয়ালের কোন চিহ্ন ছিল না, শুধু লেজ ছিল এবং মুখে ছিল ধূর্ততার ছাপ সেই হেতু তিনি শিয়ালকে ধরেছিলেন শয়তানের প্রতীক হিসেবে। ইঙ্গমারের পরবর্তী ছবিতে এসব কিছুরই প্রতিফলন দেখা যায়। এই প্রজেক্টর দিয়ে বার্গম্যান প্রথম একখানি বাদামী রঙয়ের নয় ফুট ছবি তৈরি করলেন। বিষয়বস্তু ছিল একটি মেয়ে মাঠের ওপর ঘুমিয়ে আছে। পরে সে জেগে উঠল এবং হাতগুলি প্রসারিত করে ডানপাশে ফিরল। ফিল্মটি সেই সময় ছেলেদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রতিদিন রাত্রিকালে সকলকার সামনে সেটা প্রজেক্টারে দেখান হত, যতদিন না তা ভেঙে গেছে বা নষ্ট হয়েছে।

বার্গম্যান ছিলেন রোগা, লম্বা, মাথায় ছিল একরাশ কালো চুল এবং বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। ১৯৪২ সালে যখন তাঁর বয়স চব্বিশ তখনও তিনি ছিলেন সাধারণের কাছে অপরিচিত, অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান এবং তাঁর সৃজনশীল প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্যে উপায় উদ্ভাবন করতে থাকেন। ক্রমশ তাঁর মন মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। এমনিতেই সুইডেন থিয়েটার আর্টে খুবই ঐতিহ্য-সম্পন্ন দেশ। চলচ্চিত্রের ওপরও এ দেশের থিয়েটারের বিরাট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই বার্গম্যানকে প্রথমে দেখা যায় মঞ্চে, প্রথমে গুটেনবার্গে ও পরে স্টকহলমের ইউনিভার্সিটি থিয়েটারে। এই সময় বার্গম্যান প্রচুর নাটক লিখেছেন, প্রযোজনাও করেছেন। তাঁর প্রিয় নাটক 'ম্যাকবেথ'-এর মঞ্চ প্রযোজনার মাধ্যমে তাঁর জীবনের সাফল্য সূচিত হয়। এর কিছু পরেই ১৯৪৪ সালে সেভেনসকা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি Carl Anders Dymling-এর সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং বার্গম্যানের সামনে এক নতুন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ডিমলিঙ সেই সময় তাঁর মধ্যে যৌবনদীপ্ত প্রতিভার এবং বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উন্মেষ দেখতে পান। তিনি সেইখানে থেকেই প্রায় কুড়িখানি ছবি তৈরি করেন এবং সেগুলি বিশ্বের প্রায় সব বড় বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সমাদর লাভ করে এবং তিনি তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ পান প্রভূত সম্মান। সাংস্কৃতিক এবং শিল্পগত উৎকর্ষতার দিক দিয়ে বার্গম্যানের জুড়ি যে খুবই অল্প সুইডেনের এই তরুণ চিত্রপরিচালক তা প্রমাণ করলেন।

ডিমলিঙ বার্গম্যানকে প্রথমে 'HETS' নামে একটি ছবির চিত্রনাট্য রচনা করতে দেন। এ ছবিখানি পরিচালনা করেন তৎকালীন প্রখ্যাত সুইডিশ পরিচালক ALF Sjoberg। পরবর্তী বছরেই অর্থাৎ পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি KRIS (CRISIS) চিত্রের পরিচালনা করেন। বার্গম্যানের জীবনে এই প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্রপরিচালনা। ১৯৪৮-এর আগে পর্যন্ত বার্গম্যান অপরের চিত্রনাট্যের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন।

এর ঠিক পরবর্তীকালে বার্গম্যান যে ছবিগুলি তৈরি করেন তার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যৌবনের আর্তিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। MUSIKI MORKAR-এ তিনি দেখিয়েছেন হতাশায় ভরা একটি যুবক কোন এক যুবতীর ভালবাসায় কেমন করে জীবনে স্থায়িত্বলাভ করলো, 'HAMSTAD'-এও সেই আর্তি। বাপ ও মায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বে পীড়িত একটি রমণী আত্মহত্যায় যখন স্থির সেই সময় এক তরুণ নাবিক এসে তাকে উদ্ধার করলো এবং তার করুণ কাহিনী শুনে তাকে আশ্রয় দিলো। তা ছাড়া ব্যালে নর্তকীর সংগে যুবকের প্রেম, মাতা ও বিমাতার মধ্যে অষ্টাদশী এক যুবতীর অধিকার নিয়ে বিরোধ বার্গম্যানের ছবির বিষয়বস্তু এই। সমস্যাবহুল যৌবনের নগ্নরূপেই প্রকট হয়ে উঠেছে তাঁর এই সব কাহিনীগুলির মধ্যে দিয়েই।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত]

সাগর পারের মায়ালোক

রমেন চৌধুরী

ইনগ্রিড বার্গম্যান।

নামটির দাম বড়ো কম নয়। অর্থ-মূল্যের কথা বলছি না, এ দাম অনুরক্তির, সম্ভ্রমের, শ্রদ্ধার। শ্রীমতী বার্গম্যান কতো সহজেই না দারুণ শক্ত শক্ত ভূমিকাগুলিকে দর্শকদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ফর হুম দি বেল টোলস'-এর কথা মনে পড়ে, অভিভূত হবার মতোই চরিত্রায়ণ। 'সারাটোগা ট্রাঙ্ক-'এর স্মৃতিও জাগরূক আছে। শেষ-বেশ 'জোয়ান অফ আর্ক' তো মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিলো আবালবৃদ্ধবনিতাকে।

কিন্তু তারপর ঘটেছে অদর্শন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তরালে চলে গেলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বার্গম্যান। কেটে গেলো বছরের পর বছর। দু' দশকই বলতে হবে।

অধুনা খবর হচ্ছে বার্গম্যান চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। স্টার্লিং শিলিফ্যাণ্ট প্রযোজিত 'এ ওয়াক ইন দি স্প্রিং রেইন'-এ তিনি অবতীর্ণ হবেন। চরিত্রটি একটি শহুরে ভুক্তভোগ্ত (সফেস্টিকেটেড) মেয়ের। মেয়েটি এক আদিম প্রকৃতির পুরুষের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বে।

রিচেল ম্যাডক্স-এর লেখা গল্প। শিলিফ্যাণ্ট স্বয়ং রচনা করেছেন চিত্র-নাট্য। এঁর লেখা 'ইন দি হিট অব দি নাইট' গত বছর অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলো।

'এ ওয়াক ইন দি স্প্রিং রেইন'-এর আগাগোড়া দৃশ্য গ্রহণ করা হবে বৌনাক্টে টেনিসী পাহাড় অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে। সামনের বসন্ত-কালেই কাজ আরম্ভ হবে বলে ঠিক আছে।

●

জি এম আর এক্স---

হলিউডিয় চিত্রের প্রদর্শনীর ছাড়-পত্রের বুকে এখন থেকে ওপরের যেসানো অক্ষর দেখলে যেন বিস্মিত হবেন না। আগের বহু পরিচিত 'এ' কিংবা 'ইউ'-কে স্থানচ্যুত করে আবির্ভাব ঘটলো এদের।

আমাদের এখানেও তো রয়েছে সেন্সার কর্তৃপক্ষের দেওয়া ওই 'এ' বা 'ইউ' মার্কা। 'এ' মানে 'ফর অ্যাডাল্টস'—'ইউ'-এর অর্থ 'ইউনি-ভার্সাল।' সত্যিকথা বলতে কি, 'এ' ছাপের মোহ এখানে নিদারুণ, প্রাপ্ত-বয়স্কদের বদলে বালখিল্যরা ভিড় জমায় এ সব ছবিতে। সার্বজনীন ছবির আকর্ষণ কেমন জোলো বলে মনে হয় যেন। কথাটা আ.ার অতিরঞ্জিত কি না ছবিঘরে একটু দৃষ্টিপাত করলেই বোধগম্য হবে।

ভারতবর্ষে সেন্সার করাটা বাধ্যতা-মূলক, আমেরিকার এখন সেটা পুরো-পুরি ইচ্ছাধীন। এম পি এ এ সংস্থা এ কাজটি করে থাকেন। এঁদের সদস্য-সংখ্যা ছয়। কমিটির ওই ছ'জনের কাজ হচ্ছে সপ্তাহে গড়ে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি চিত্রনাট্য পড়া এবং ছবি দেখা। কদাচিৎ তাঁরা সেন্সার করে থাকেন। ওই যে, প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে অক্ষরগুলিকে, ওরই মধ্যে কোনটি

শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'কাশ্মীর মুলাকাৎ' চিত্রে শবনম চিত্র : দিলীপ বন্দ্য

ছবির পক্ষে মানানসই সেটাই তাঁরা জানিয়ে দেন। (বোধ হয় বিনীতভাবেই)।

নতুন দেওয়া অক্ষর পরিচিতি হোলো এই রকম—'জি' কি না জেনারাল। সকলের পক্ষেই উপযোগী পরিণতবয়সের দর্শকদের জন্যে নির্দিষ্ট বোঝায় 'এম'-কে। 'আর' অর্থে সীমাবদ্ধ (রেস্ট্রিকটেড)। 'এক্স' অক্ষরের কৌলীন্য নেই মোটেই। বরং তার 'বিপরীত'। 'এক্স' হচ্ছে সেই ছবির অভিজ্ঞান যার কোনো শিল্পগত মর্যাদা নেই, রুচির দিক থেকে দীন এবং মনের প্রসাদ ক্ষুণ্ণ করে। 'আর' সম্পর্কে বোর্ডের নির্দেশ হচ্ছে—পিতামাতা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন ছবিটি ছেলেপিলেদের দেখাবেন কি না। যদি দেখাবার অনুকূলে তাঁরা থাকেন তাহলে অবিশ্যি বাচ্চাদের সঙ্গী হ'তে হবে তাঁদের।

হলিউড এখন এক শ্রেণীর প্রযোজকের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। এঁরা বিশ্বাস করেন অশান্ত সমাজকে সংযত করতে তাঁদেরও কিছু ভূমিকা আছে, আছে দায়িত্ব। তার প্রতিফলন দেখা যাবে আগামী অনেক ছবির মাঝে। সে সব ছবিতে জাতি সম্পর্কিত জটিলতার ব্যাপার যেমন আছে সমকামীদের ছটোপুটিও রয়েছে তেমনি। এতে করে ছেলেপিলেদের কিছু অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করবেন।

স্টিরিও রেকর্ড কি বস্তু ?

গ্রামোফোন রেকর্ড-জগতে সম্প্রতি স্টিরিও রেকর্ডিং যুগান্তর এনেছে বলা চলে। শুধু সুস্পষ্ট স্বরবিস্তারে শ্রোতাকে অভিভূত করেই তা ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু কোনও কনসার্ট হলে উপস্থিত হলে যে যে যন্ত্র যেখানে যেখানে বসে শিল্পীরা বাজাচ্ছেন তা প্রত্যক্ষ করবার মত সুস্পষ্ট ধারণাও শ্রোতাকে এমনভাবে আবিষ্ট করে যে চোখ বুজে শুনলে মনে হয়, শিল্পীরা বুঝি সমুখেই উপস্থিত আছেন। ফলে কেবল একক শিল্পীর গানই হয়। চেম্বার মিউজিক বলতে যেসব বৃহদাকার ঐকতান বাদন বোঝায় তা পর্যন্ত স্টিরিও রেকর্ড মাধ্যমে শ্রোতার নিজের ঘরে বসে শুনবার সৌভাগ্য হতে পারে।

রেকর্ডিং-এর এই বিস্ময়কর উন্নতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করবার জন্য 'দি ইণ্ডাস্ট্রি অব হিউম্যান হ্যাপিনেস' নামক যে প্রদর্শনীটি বর্তমানে কলকাতার ক্যাথিড্রাল রোডের ইনফরমেশান সেণ্টারে চলছে তা আমরা সকলেই দেখে আসতে অনুরোধ করি। সুপরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন এই প্রদর্শনীটিতে কেবল যে স্টিরিও রেকর্ড-এর মূল রহস্য বুঝিয়ে বলা হচ্ছে না, বাজিয়ে শোনানোও হচ্ছে। তার সঙ্গে আছে কিভাবে রেকর্ড তৈরী করা হয় তার আদ্যন্ত ইতিবৃত্ত। চিত্রের সাহায্যে এবং নমুনা দিয়ে এই শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনীটি কেবল যে বিজ্ঞানের ছাত্র বা সঙ্গীতানুরাগীদেরই আকর্ষণ করবে তাই নয়, জনসাধারণও এই প্রদর্শনীটি হতে প্রচুর শিক্ষা এবং আনন্দের খোরাক পাবেন। দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড এই অতুলনীয় প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা করেছেন। ইংলণ্ড হতে মূল প্রতিষ্ঠান ই এম আই লিমিটেডের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার জে জি স্ট্যানফোর্ড গত ২১শে জানুয়ারী এই চমৎকার প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করতে এসেছিলেন।

॥ ইন্দ্রসেন ॥

"স্বজাতি-গৌরব যাবে হিন্দুকুল শোভা যাবে
আস্পর্ধা করিবে দুষ্টজন॥
অতএব তের সনে ভেটিব রে কক্ষ-রণে
যেবা হ'স ছদ্মবেশধারী॥"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রির অন্ধকার কখন যে লুপ্ত হয়ে গেছে, মহারাজা জানতে পারলেন না। রাতটা বড়ই অস্বস্তিতে কেটেছে। দুশ্চিন্তার প্রকোপে বারেকের জন্য চক্ষু নিমীলিত হল না। দেশটা যদি মোগলরা আক্রমণ করে কোন্ উপায়ে তাদের বাধা দান করা যায়—এই চিন্তায় মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠেন প্রতাপ। তখন সুখ-শয্যা যেন কণ্টকময় ঠেকে। নিদ্রালস্য ঘুচে যায়। কক্ষমধ্যে পায়চারী করতে থাকেন মহারাজা। মানসচক্ষে ভেসে ওঠে দেশের মানচিত্র। অনুমানে বোঝা যায় না, কোন্ পথে আসবে শত্রুসৈন্য। জলপথে না স্থলপথে? যে পথেই হোক, বাধা দিতে হবে। কেবলমাত্র বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হতে চান না প্রতাপ, শত্রুদের পরাস্ত করতে চান সর্বতোভাবে। বিজাতীয় মোগলদের কুশাসন থেকে দেশকে চিরতরে মুক্ত করতে হবে—পণ করেন মনে মনে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহরক্ষী এসে মৃদুকণ্ঠে ডাক দেয়, —মহারাজা।

সম্বিৎ ছিল না যেন। তন্দ্রালু চোখ খুললেন প্রতাপ। বললেন,—কী বা সমাচার?

দেহরক্ষী যুক্তকরে বলে,—মহারাজা, একজন গুপ্তচর এসেছেন। আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছেন তিনি।

শয্যায় উঠে বসলেন মহারাজা। বললেন,—কোথায় গুপ্তচর? তাকে এত্তেলা পাঠাও।

গুপ্তচর কক্ষে প্রবেশ করতেই কক্ষের দ্বার বন্ধ করে দেহ-রক্ষী। গোপনতা রক্ষা করতে হবে।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালো গুপ্তচর। বললে,—মহারাজার জয় হোক। শ্রীচরণে নিবেদন জানাই, সের খাঁ যশোর আক্রমণের অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। সের খাঁর সঙ্গে আছে বহুসংখ্যক সৈন্য।

তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করলেন প্রতাপ। ক্ষণবিলম্ব করলেন না। বললেন,—আমিও প্রস্তুত জানিও। তুমি এই ক্ষণে সেনা-পতি শঙ্করকে সংবাদটা গোপনে জানাইয়া দাও। আমি অন্দর-মহলে যাই, মহারাণীকে সকল সংবাদ ব্যক্ত করি।

কথা বলতে বলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়লেন মহারাজা। দেহরক্ষীর উদ্দেশে বললেন,—গণৎকারকে আহ্বান জানাও। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন জানিও।

মহারাণীর মহলে মহারাণী নেই। পদ্মিনী গেছেন নিত্য-দিনের মত, দেবীর মন্দিরে প্রাতঃকালীন প্রণাম জানাতে। সঙ্গে আছে সহচরী আর পরিচারিকার দল।

প্রণাম জানিয়ে উঠতেই মহারাণী শুনলেন, মহারাজা ডাক পাঠিয়েছেন।

কিছু যেন বিস্মিত হলেন প্রতিমা-নিন্দিতা পদ্মিনী। ভুরু-যুগলে আকুঞ্চন ফুটলো। ভক্তিনম্র মুখে চিন্তার ছায়া নামলো। পুষ্পপাত্র আর স্পর্শ করলেন না মহারাণী। নাট-মন্দির ত্যাগ করলেন দ্রুত পদক্ষেপে।

দেবীর পুরোহিত অনুমান করলেন, একটা কোন অঘটন ঘটতে চলেছে। অপ্রত্যাশিত হয়তো। অনাকাঙ্ক্ষিত।

মহারাণীকে দেখেই প্রতাপ বললেন,—দু'টা নিবেদন আছে মহিষী।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটলো পদ্মিনীর দীর্ঘ নয়নে। প্রতাপ সহাস্যে বললেন,—প্রথমেই জানাই, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।

গমনোদ্যতা হলেন পদ্মিনী। মহারাজা বললেন,—দ্বিতীয় নিবেদনটা এই, আমি অদ্য এখনই যুদ্ধযাত্রা করতে চাই। অনুমতি দাও প্রিয়া।

দুঃখের হাসি ভাসলো পদ্মিনীর রক্তিম ওষ্ঠে। অব্যক্ত ক্ষোভ, অপ্রকাশ রাখতে প্রয়াসী হলেন তিনি। হাসি সম্বরণের পরে বললেন,—জানি না, যুদ্ধ শব্দটা কে যে সৃষ্টি করেছিলেন!

কথার শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মহারাণী। স্বগতোক্তি করলেন,—দেবীর পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই, মহারাজার জয় হোক। দেবী যেন মহারাজাকে অক্ষত রাখেন।

মহারাজার চিন্তাবিষ্ট আঁখিপথ থেকে অদৃশ্য হলেন পদ্মিনী।

লাল পট্টবিশিষ্ট তসরের শাড়ীর অবাধ্য অঞ্চল বক্ষে টেনে তড়িৎ গতিতে চললেন মহারাণী। সহচরী ও পরিচারিকার দল পিছু পিছু চললো।

পদ্মিনী বললেন,—মহারাজার আহার সাজাও। ফল, মিষ্টান্ন আর দুগ্ধ। দেখিও, যেন কদলী না দেওয়া হয়।

—যাত্রা অস্তি না নাস্তি?

আহারশেষে গণৎকারকে শুধোলেন প্রতাপাদিত্য।

ভাগ্য-গণক বললেন,—কস্মিন দিবসে মহারাজা?

প্রতাপ সহাস্যে বলেন,—আই। এই মুহূর্তে।

ভূর্জপত্রে অঙ্ক কষতে বসলেন গণক। কিছুক্ষণ পরে চোখ ফিরিয়ে একটিবার মহারাজকে লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, মহারাজার পরিধানে যুদ্ধের পোষাক। কটিতে কৃপাণ। বক্ষে ও বাহুতে লৌহবর্ম। মস্তকে শিরস্ত্রাণ। দেখে যেন ভয় ভক্ত করে।

গণনার শেষে ব্রাহ্মণ বললেন,—যাত্রা অশুভ। তবে বেলা দ্বিতীয় প্রহরের পূর্বে নহে।

রৌদ্ররেখা কোথায় এখন, জল-ঘড়িতে দেখলেন প্রতাপাদিত্য। দেখা যায়, প্রথম প্রহর প্রায় শেষ হতে চলেছে।

মহারাণী বললেন,—মহারাজা, নিবেদন জানাই যাত্রার পূর্বে দেবীর মন্দিরে ক্ষণেক অধিষ্ঠান করুন। পুরোহিত আশীর্বচন পাঠ করবেন। দেবীর পাদার্ঘ্য দান করবেন।

আর ক্ষণবিলম্ব নয়। দ্বিতীয় প্রহর এখন।

সসৈন্যে সের খাঁর প্রত্যাগমনের জন্য বহির্গত হলেন মহাত্মা প্রতাপাদিত্য। অশ্ব ও সৈন্যদিগের পদবিক্ষেপজনিত ধূলি এবং বারুদের ধূমে আকাশমণ্ডল ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

দেখতে দেখতে সের খাঁর সৈন্য সমীপবর্তী হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। প্রতাপ স্বীয় সৈন্যকে দ্বিভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগ সেনাপতি-নায়ক শঙ্করের অধীনে প্রদান করলেন। সূর্যকান্ত প্রমুখ বীরগণ সহ তিনি স্বয়ং অপর অঙ্গ পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন।

স্বীয় অধীনের সৈন্যগণকে যথোচিত উপদেশ দান করতে উদ্যোগী হলেন শঙ্কর। ততঃপর ভৈরব-বিক্রমে মোগলদিগকে আক্রমণ করলেন।

উভয়পক্ষের বীরগণ বিজয়লাভের বাসনায় জীবন-আশা পরিত্যাগ করে শত্রুগণকে নিহত করতে লাগলেন।

কামানসমূহের ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির-প্রায় হয়ে উঠলো।

শঙ্করসৈন্য মোগল-ব্যূহ ভেদ করে অস্ত্রাঘাতে শত্রুগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে লাগলো।

মোগল-সেনাপতি তাঁর পশ্চাতে রক্ষিত সৈন্য সকলকে আনয়ন করে নতুন বলের সহিত শঙ্করকে আক্রমণ করলেন।

শঙ্কর এই সময়ে পূর্ব-ইঙ্গিত অনুসারে প্রতীয়মান পরাজিতের ন্যায় নিকটস্থ জলাভূমি অভিমুখে পলায়ন করতে আরম্ভ করলেন।

মুসলমান-সেনাপতি শঙ্করকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখে সৈন্যগণকে তাঁর অনুসরণ করতে আদেশ প্রদান করলেন। মুসলমান সৈন্যগণ সেনাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বিজয়োল্লাসে দ্রুতবেগে আক্রমণ করলো।

মহাবীর শঙ্কর বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে অকস্মাৎ সংযত করে মোগলগণকে আক্রমণ করলেন, যেজন্য মোগলসৈনা অধিকতর বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো।

ইত্যবসরে পশ্চাদ্‌ভাগে লুক্কায়িত প্রতাপ নবীন-প্রতাপে ঘোরতর পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করলেন।

একে শঙ্করের অকস্মাৎ আক্রমণে মোগল সৈন্যমধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে, তদুপরি আবার প্রতাপ পিছন থেকে ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় ভীষণবেগে আক্রমণ করায় মোগলেরা বজ্রাহতের মত বাক্শক্তিশূন্য হয়ে পড়লো।

শুষ্ক তৃণক্ষেত্রে অগ্নি প্রদত্ত হলে যেমন বায়ুসহযোগে ধীরে ধীরে বর্ধিতাকার ধারণ করে, সেইরূপ বিজয়-মদোন্মত্ত সূর্যকান্ত, প্রতাপসিংহ, মদন প্রমুখ বীর-পরিচালিত সৈন্যগণ মোগলগণকে প্রতিপদে পরাজিত করায় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলো। মোগল-অশ্বারোহী সৈন্যগণের অধিকাংশ জলাভূমিতে কর্দম-নিমগ্ন হওয়াতে অকর্মণ্য হয়ে পড়লো।

সের খাঁ পলায়ন করলেন, গতিক সুবিধাজনক নয়। যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গতি নেই। স্বীয় সৈন্যগণকে পরাজিত এবং বিজয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই দেখে অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে লয়ে প্রাণরক্ষার্থে যুদ্ধস্থল থেকে সের খাঁ পলায়ন করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন।

এই ঘোরতর যুদ্ধে প্রতাপ মুসলমান-পরিত্যক্ত যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হলেন। অস্ত্র, গোলা-বারুদ, খাদ্য, রসদ ইত্যাদি।

আজ থেকে বাঙলার ইতিহাসে এক নতুন পরিচ্ছেদ প্রারম্ভ হল। আজ পরম পবিত্র স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঘোষিত হল। বঙ্গীয় ভুজবলের নিকট আজ দুর্ধর্ষ মোগলবীর্য প্রতিহত হল।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন,—যে সকল রাজন্যবর্গ যুদ্ধ ঘোষিত হলে আমার সহ যোগদান করবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাঁদের নিকট মোগলসৈন্যের পরাজয়-বার্তা অবিলম্বে প্রেরণ করেন।

রাজন্যগণ প্রতাপের বিজয়লাভে পরম আহ্লাদিত হয়ে জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন-যুদ্ধে আপন আপন পার্থিব বিষয়-সকল প্রতাপের অধীনে ন্যস্ত করলেন। প্রতাপের যুদ্ধের সঙ্গে বাঙলার নানা স্থানে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হল। সকলেই স্বীয় শক্তি অনুসারে মোগল-সম্রাটের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করলো না।

কেউ কেউ দিল্লীগামী মোগল-রাজকোষ লুণ্ঠন করলেন। কেউ মোগলদের সৈনিক-নিবাস বা ছাউনিতে অগ্নি-প্রদান করলো। কেউ সুযোগক্রমে অল্পসংখ্যক মোগল সৈন্যদলকে আক্রমণ করলো। কেউ বা রাস্তা, ঘাট, সেতু প্রভৃতি ভেঙে দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে অনিষ্ট-সাধন করতে লাগলেন। দেশের জনসাধারণ একপ্রাণে প্রতাপের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হল।

প্রতাপও তাঁদের স্বত্ব-সংরক্ষণে এবং মোগল-অত্যাচার হতে তাঁদের পরিত্রাণের যথাব্যবস্থা করলেন। মহারাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন, আবশ্যকানুসারে সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া হবে।

বিক্রমপুরপতি প্রবলপরাক্রান্ত কেদার রায়, মধু রায় প্রমুখ বীরগণ জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য ঘোরতর বিক্রমে মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। সুযোগক্রমে তারা মোগলদিগের উপর আপতিত হয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করতে লাগলেন।

বাঙালীরা ব্যক্তিগত পার্থক্য ভুলে গিয়ে একপ্রাণে মোগলদিগের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। বিক্রমপুরবাসিগণ সুযোগ বুঝে কখনও মোগলদের আক্রমণ করেন। কখনও বা পালিয়ে গিয়ে কার্যসাধন করেন।

হিজলিপতি ইশা খাঁ মসন্দরী প্রতাপের সহিত যুদ্ধকালে পরাজিত ও নিহত হওয়ায় স্বর্গত রাজা বসন্ত রায়ের জামাতা রূপরাম বসু বঙ্গদেশে আর কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় না পাওয়াতে কচু রায়কে সঙ্গে লয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বাঙলা দেশে এখন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অপ্রতিহত ক্ষমতা। কেহই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হন না। বিশেষ প্রবল-পরাক্রম ইশা খাঁর পতনের পর থেকে সকলে প্রতাপকে ঈশ্বরানুগৃহীত বিবেচনা করতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনার পর আবার তিনি মোগলদিগকে অবজ্ঞালীলায় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করায় এ ধারণা সকলের হৃদয়ে অধিকতর বদ্ধমূল হয়।

মহাভারত-যুদ্ধে ভূতভাবন ভবানীপতি যেরূপ অর্জুনের অগ্রবর্তী হয়ে শত্রুকুল নির্মূল করেছিলেন, সেইরূপে দৈত্যনাশিনী মহাকালী প্রতাপের বিজয় জন্য স্বয়ং অসি ধারণ করে সেনাপতির কার্য করেন—সকলে এই ধারণা পোষণ করতে থাকেন। প্রতা

যে যুদ্ধে বর্তমান থাকেন, সে-যুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল পরাক্রান্ত হলেও কোনরূপে বিজয়লাভে সমর্থ হতেন না। প্রতাপের নামের বৈদ্যুতিক শক্তি সকলকে যেন অজেয় করে তুলেছে। জনসাধারণের উপর এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করা সাধারণ সাধনার কথা নয়।

নানা প্রকার পথিক্লেশ অতিক্রম করতে হয় রূপরাম বসু ও কচু রায়কে। অনেক কষ্টে তাঁরা দিল্লীতে উপনীত হলেন।

বহু কাকুতি-মিনতির পরে দিল্লীর দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করলেন রূপরাম বসু। সম্রাট আকবরের সমীপে রূপরাম সকল ঘটনা বিবৃত করলেন। যথা প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান, বসন্ত রায়ের মৃত্যু, কচু রায়ের উদ্ধার এবং ইশা খাঁর যুদ্ধ ও পতনের আনুপূর্বিক কাহিনী।

ইত্যবসরে বঙ্গদেশ থেকে একজন কর্মচারী এসে আকবরের নিকট প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সের খাঁর ঘোরতর যুদ্ধ ও পরাজয়-বার্তা পেশ করলেন।

সম্রাট আকবরের অন্যতম সুদক্ষ সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ নানা প্রকার উপকরণ-সম্পন্ন বিপুল বাহিনী পরিচালনা করে বঙ্গ-দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। কিছুদিন পরে ইব্রাহিম রাজমহলে এসে উপস্থিত হলেন। পথিক্লেশ দূর করতে তিনি কয়েকদিন রাজমহলে অবস্থান করলেন। আরও কিছু নতুন সৈন্য সংগ্রহের পরে ইব্রাহিম প্রতাপকে আক্রমণের জন্য যাত্রা করলেন। সপ্তগ্রামে সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে ইব্রাহিম মনস্থ করলেন, নৌকাযোগে যশোহরে গমন করতে হবে। ইব্রাহিম তাঁর সহকর্মীদের নির্দেশ দিলেন,—বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করেন। এই সকল নৌকায় বহুল পরিমাণে খাদ্য ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য পূর্ণ করতে হবে।

ইব্রাহিমের আগমন-কথা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর হলে তিনি আদেশ দিলেন,—রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গসকল সুদৃঢ় করা হোক। দুর্গমধ্যে আহার্য ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষিত করতে হবে।

বিচক্ষণ ও কর্মনিপুণ গুপ্তচরদের মোগলরাজ্যের চতুর্দিকে পাঠিয়ে প্রতাপ পুংখানুপুংখরূপে সংবাদসকল অবগত হতে লাগলেন। তিনি যখন শুনলেন, ইব্রাহিম খাঁ সপ্তগ্রাম থেকে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করছেন, তখনই তিনি মাতলা-দুর্গে সৈন্যদের পাঠিয়ে দুর্গ সুদৃঢ় করলেন। কলকাতার দক্ষিণে রায়গড়-দুর্গের নিকট ইব্রাহিম-সৈন্যের সঙ্গে প্রতাপ-সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ বাধলো। মোগলসৈন্যেরা সংখ্যাধিক্যবশত বঙ্গীয় সৈন্য তাদের বিশেষ কিছু অপকার করতে সমর্থ হল না।

ইব্রাহিম রায়গড় অবরোধ করে অনবরত ভীষণ অগ্নিময় গোলকসমূহ নিক্ষিপ্ত করতে লাগলেন। প্রতাপের সৈন্যরাও স্বাধীনতারক্ষার জন্য ঘোরতর বিক্রমে অবিরাম মুসলমান সৈন্য-গণের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে।

মুসলমানগণ রায়গড় অবরোধ করেছে, প্রতাপ একথা অবগত হয়ে কমল খোজা, সূর্যকান্ত প্রমুখ বীরগণকে মুসলমানদের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করতে প্রেরণ করলেন।

সূর্যকান্ত কতকগুলি কর্মনিপুণ, ক্লেশসহিষ্ণু, অসমসাহসী সৈন্য নির্বাচন করে রাত্রিযোগে দ্রুতগামী নৌকায় এসে নিরুদ্বিগ্ন মোগলসৈন্যের শিবিরের পশ্চাদ্‌ভাগে উপস্থিত হলেন। নৌকা-গুলিকে সাংকেতিক স্থানে রক্ষা করে সকলে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় মোগলশিবির আক্রমণ করলেন। অসতর্ক মোগলগণ বঙ্গীয়-গণের অকস্মাৎ আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে কর্তব্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো। বঙ্গীয় বীরগণ বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য নিহত করে শত্রুশিবিরে অগ্নি প্রদান করলেন। অল্পকাল মধ্যে প্রবল-বায়ু-সহযোগে অগ্নি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এই আলোক-সাহায্যে বঙ্গীয়গণ মোগলগণকে স্পষ্টরূপে দেখতে পেয়ে তাদের ঘোরতর-রূপে আক্রমণ করেন।

সূর্যকান্ত দেখলেন, তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। শত্রু-সৈন্যের হৃদয়ে ঘোরতর বিভীষিকা বদ্ধমূল হয়েছে। আর অধিকক্ষণ যুদ্ধ করলে স্বীয় পক্ষীয় লোক বৃথা নিহত হবে—সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করে সকলে পূর্বসংকেতানুসারে নৌকাযাত্রায় মাতলায় উপস্থিত হলেন।

সূর্যকান্ত প্রমুখ বীরগণ মোগল-সৈন্য মথিত করে নির্বিঘ্নে গমন করার পর, ইব্রাহিম খাঁ সমস্ত সৈন্যসহ রায়গড় দুর্গ অবরোধ করা অকর্তব্য বিবেচনা করে পরদিন প্রাতঃকালে কিয়দংশ সৈন্য রায়গড় অবরোধের জন্য রেখে অবশিষ্ট সৈন্যসহ মাতলা অভিমুখে গমন করলেন।

প্রতাপাদিত্য ইব্রাহিমের আগমনের পূর্ব হতে রডাকে নৌসেনা এবং সূর্যকান্ত, শংকর, মদনমল্ল, সুখা, সুন্দর, প্রতাপ সিংহ প্রমুখ বীরগণমধ্যে কাকেও পদাতিক, কাকেও অশ্বারোহী বা গজারোহী সৈন্য পরিচালনার ভার প্রদান করলেন।

ইব্রাহিম খাঁ বিপুলবাহিনী সহ মাতলা দুর্গের সন্নিকটবর্তী হলে, অকস্মাৎ দুর্গের অভ্যন্তর থেকে মোগলসৈন্যের উপর গুলী বর্ষণ হল। এ যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংকেত। এই সংকেত-শব্দ শুনে রডার নৌসেনা মোগলদের আক্রমণ করলেন। যে সকল মোগলসৈন্য স্থলপথে আক্রমণ করেছিল তাদের সূর্যকান্ত, শংকর প্রমুখ সেনানীগণ ভৈরববিক্রমে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধস্থল অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠলো। শোণিতপ্রবাহে নদী আরক্তবর্ণ ধারণ করলো।

কামানসমূহের মুহুর্মুহু ভয়ংকর শব্দ, সৈন্যদের কোলাহল এবং রণমত্ততাজনক বাদ্যধ্বনিতে সুন্দরবন-প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হয়ে অরণ্যচর পশুপক্ষিগণকে আকুলিত করতে লাগলো। প্রতাপ, শংকর, ও সূর্যকান্ত প্রমুখ বীরপুরুষগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়ে
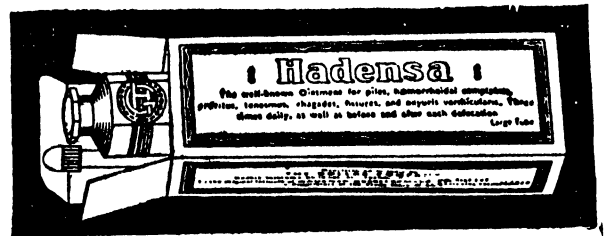
নির্বাচনোত্তর ক্ষমতাসীনদের প্রতি

মাসিক বসুমতীর এই সংখ্যাটি যে সময় তাহার অগণিত শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার হস্তে উপনীত হইবে সে সময়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বহুকালব্যাপী বাদ-প্রতিবাদ বিতর্ক-তর্কের সেদিন অবসান হইয়া গিয়াছে। জনজীবন হইতে এই সংক্রান্ত বিরাট ও বিপুল উত্তেজনা ও কৌতূহল ততদিনে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। জনসমুদ্র সেদিন উত্তাল-উদ্দামরূপ পরিহার করিয়া, শান্তি-স্নিগ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়লক্ষ্মী কাহার কণ্ঠে আপন জয়মাল্যটি দুলাইয়া দিবেন বা কাহার ললাটদেশ সাফল্যের শুভ্র-চন্দনে সুচর্চিত হইয়া উঠিবে সে সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা আমাদের উদ্দেশ্যের গণ্ডী বহির্ভূত—তা ছাড়া এবারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে যাহার ফলে পূর্বাহ্নে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপরও নয়।

জনগণের সেবাকার্যে কংগ্রেস এবং বিরোধীপক্ষ উভয়েরই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের কুড়ি বৎসরব্যাপী নানা প্রকার দুর্নীতি, কুশাসন ও অযোগ্যতায় অতিষ্ঠ ও বিপন্ন হইয়া জনগণ বিরোধী দলকেই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে (১৯৬৭) ভোট দিয়াছিল। কিন্তু বিরোধী নেতাদের সমন্বয়ে

সম্পাদকীয়

গঠিত যুক্তফ্রণ্ট সরকার অযোগ্যতার এবং পক্ষপাতিত্বের এমন এক একটি গগনচুম্বী নিদর্শন তাঁহাদের কার্যের মাধ্যমে রাখিতে আরম্ভ করিলেন যাহার ফলে যেখানে কংগ্রেস শত অক্ষমতা এবং অন্যায় সত্ত্বেও একাদিক্রমে কুড়িটি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে ইঁহারা সেখানে বছর ঘোরাইতেও পারিলেন না। একটি গোটা বৎসরের তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হইতেই তাঁহাদের জাল গুটাইতে হইল। তাঁহাদের [illegible] ও অযোগ্যতার ভূরি-ভূরি নিদর্শন মেলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং পূর্বেও আমরা তাহা বিভিন্ন সময়ে পাঠক-সাধারণে্য উপস্থাপিতও করিয়াছি।

এখন এমন এক পরিস্থিতির ভিতর দিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতেছে যাহা যেমনই বেদনাবহ, তেমনই অনিশ্চিত; সহস্র সমস্যার বল্মীকে আজ পশ্চিমবঙ্গ আবৃত। এ হেন অবস্থার হস্ত হইতে যে দল তাহার প্রকৃত মুক্তি বিধান করিবে—বলা বাহুল্য জাতীয় অভিনন্দনে তাহারই অধিকার একচেটিয়া বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা দেশকে অতিক্রম বা উপেক্ষা করিয়া দলকে প্রাধান্য কখনই দিই না—দিতে পারি না—দলীয় স্বার্থ আমাদের লক্ষণীয় নয়, কিন্তু দেশের স্বার্থ সম্বন্ধেই আমাদের সহস্র জিজ্ঞাসা, দল আমাদের নিকট মুখ্য নয়, মুখ্য হইল দেশ এবং দেশ যেখানে মুখ্য, দল সেখানে গৌণমাত্র। সেক্ষেত্রে আমাদের তুলাদণ্ড কখনই পক্ষপাতের বাহুচ্ছায়া দুষ্ট হইয়া অন্ধের মত একটি বিশেষ দলের প্রতি হেলিবে না। হেলিতে পারে না।

সৈন্যগণকে উৎসাহিত করে শত্রুপক্ষদলনে প্রবৃত্ত হলেন সেনাপতিগণ কর্তৃক প্রোৎসাহিত বঙ্গীয় সৈন্য প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় মোগল-সৈন্যমধ্যে প্রবাহিত হল। মোগলসৈন্যরা বিচলিত হয়ে পড়লো। ইব্রাহিম খাঁ বহু চেষ্টাতেও সৈন্যগণকে সংযত করতে পারলেন না। অবিরাম ভীষণ আক্রমণে মোগলসৈন্য হতবীর্য হয়ে পড়লো।

জয়লাভ দূরের কথা, কোনরূপে আত্মরক্ষা করা যথেষ্ট হবে বিবেচনা করে সকলে রণস্থল ছেড়ে পলায়ন করতে সচেষ্ট হল। রুডা প্রমুখ নিপুণতা সহকারে শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন এবং তাদের অধিকতর বিপন্ন করতে লাগলেন।

মোগল সেনানী ইব্রাহিম প্রতাপের প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে বিজাতীয় বিভীষিকা উৎপন্ন করতে রায়গড় থেকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। মোগলসৈন্য প্রজাবৃন্দের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন ও গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য মোগল-সৈন্যের অত্যাচারের সংবাদ অবগত হওয়ামাত্র উপযুক্ত সেনানীর অধীনে যুদ্ধদুর্মদ সৈন্যদল মোগল-মথনের নিমিত্ত প্রেরণ করলেন।

ক্রোধপ্রজ্বলিত বঙ্গীয়গণ জন্মভূমি রক্ষার জন্য মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে ঘোরতর বিক্রমে মোগলগণকে আক্রমণ করেন। একদল মোগল নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র-সংরক্ষণ ও অপর দল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

মোগলেরা ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করলেও বঙ্গীয় বাহুর প্রবল পীড়নে পরাভূত হয়ে রণভূমি থেকে তারা অতি অল্পসংখ্যকই প্রাণ লয়ে পলায়ন করতে সমর্থ হল। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে স্থানে এই দারুণ যুদ্ধ অভিনীত হয়েছিল, সেই স্থান সংগ্রামপুর নাম ধারণ করলো।

প্রতাপাদিত্য মোগলসৈন্যকে মাতলা-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করলেন। রায়গড়ের অবরুদ্ধ সৈন্যের সাহায্যের জন্য সূর্যকান্ত প্রমুখ সেনাগণকে প্রেরণ করলেন।

মোগলগণ ইতিপূর্বেই ইব্রাহিমের সম্পূর্ণ পরাজয় কথা শ্রবণ করেছেন। এরূপ অবস্থায় অল্প সৈন্যসহ শত্রুদেশে অবস্থান করা হিতজনক নয় ভেবে তাঁরা গমনের উদ্যোগ করতে আরম্ভ করলেন। এ-হেন সময়ে হতঅবশিষ্ট ইব্রাহিম-সৈন্য পালিয়ে এঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

রুডা, সূর্যকান্ত, কমল খোজা প্রমুখ সেনানায়কগণ এখানেও তাঁদের ভৈরববিক্রমে আক্রমণ করেন।

প্রতাপ মোগলগণকে বিতাড়িত করে বহুল পরিমাণে নানা প্রকার বিজয়লব্ধ পদার্থ লয়ে রাজধানী যশোহর নগরে প্রত্যাগমন করলেন।

শুধু মহারাজা হিসাবে নয়, ভীষণ যুদ্ধের নায়করূপে নয়, —মুক্তিকামী মহারাজা প্রতাপাদিত্য স্বদেশপ্রেমিক ও দেশনায়কের যোগ্য সম্বর্ধনা লাভ করলেন স্বদেশবাসীর নিকট থেকে। কেননা স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করেছেন প্রতাপ। [ক্রমশ।

অন্ধভাবে একটি দলের মতবাদ সমর্থন করা প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ধর্ম নয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবণ করার মত হৃদয় যাঁহার আছে বা দেখিবার মত চক্ষু যাঁহাদের আছে তাঁহাদের নিকট পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্যক্ আলেখ্য অজানা নয়।

তাহারা নিশ্চয়ই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য, দ্রব্যমূল্যের মহার্ঘতা, বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা প্রভৃতি সমস্যাগুলি কত গভীর এবং সর্বনাশা পশ্চিমবঙ্গবাসীর মুষ্টিমেয় সংখ্যক কিছু লোক ছাড়া বিরাট সংখ্যক অধিবাসীর নিকট দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া আজ আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতই অবিশ্বাস ব্যাপারে পরিণত। যাঁহারা বয়স্ক, তাঁহাদের নিকট এই ঘটনা শুধু একটি মধুর স্মৃতিমাত্র, যাহার বিষণ্ণ রাগিনী মনকে ভারাক্রান্তই করিয়া তোলে। সাধারণ মানুষের যা আয় তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহিত পাল্লা দেওয়া আজ একেবারেই এক অসম্ভব বস্তুতে তাহার পক্ষে পরিগণিত হইতেছে, যে রোজগারে আট-দশ দিনের বেশী চলিতে পারে না সেই রোজগারে একমাস চালানো অসম্ভব নয় কি। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির দর ক্রমশই যেভাবে বর্ধিত হইয়া চলিতেছে সেক্ষেত্রে তাহার পাল্লা দেওয়া আজ এক দিবাস্বপ্নস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অবারিত দ্বার দিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল হইতে আজ যেভাবে অবিরাম ধারায় বহিরাগতরা প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিতেছে সেক্ষেত্রে রাজ্যের আসল অধিবাসীদের মধ্যে ত্রাহি-মধুসূদন রব উঠিয়াছে। জনসংখ্যার এই অবিরাম ধারায় বৃদ্ধি রাজ্যের বাসস্থান সমস্যাকে ক্রমশই তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও যা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাও যেমনই শোচনীয় তেমনই নিদারুণ। যুক্তফ্রন্টের আমলে 'ঘেরাও' নামক যে অমানুষিক নির্যাতন এক নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিগণিত হইয়াছিল এবং সরকারের সমর্থনে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে যে নারকীয় যম-যন্ত্রণার লীলা সংঘটিত হইয়াছে তাহার ভয়াবহ স্মৃতি চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হওয়ার নয়, ইহার ফলে রাজ্যের শিল্প যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। দেশের শিক্ষাজগত তো এককথায় এক গুণ্ডামীর আখড়ায় পরিণত, সেখানেও কথায় কথায় বিক্ষোভ এবং আচার্য নির্যাতন এক প্রতিদিনের ঘটনা, বিশ্ববিদ্যালয় আজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত। সর্বোপরি অধুনা বাঙালীর নিরাপত্তা বলিয়া কিছু নাই। যে কোন মুহূর্তে পথিমধ্যে মানুষের প্রাণ চলিয়া যাইতে পারে। গুণ্ডা, ডাকাত, হত্যাকারীর প্রাদুর্ভাব এত ঘটিয়াছে এবং তাহাদের কার্যকলাপ এমন প্রকাশ্যভাবে দিবালোকে সংঘটিত হইতেছে যেন এই কুকর্মগুলি এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার—এইরূপ ধারণাই আজ মনে হইতেছে। দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যাও যত দিনে দিনে বাড়িতেছে দুষ্কর্মের আধিক্যও স্বভাবতই ততই চোখে পড়িতেছে। পরিবারবর্গ লইয়া পথে বাহির হইলে মূল্যবান অলঙ্কারগুলি অনেক ক্ষেত্রে পথে রাখিয়া আসিতে হয়, গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তনরত দম্পতির মধ্যে স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর নারীত্বের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা চরম সর্বনাশ করা হয়। ছিনতাই, ডাকাতি যেন ডাল-ভাতের ব্যাপার। মানুষের প্রাণের কোন নিশ্চয়তাই নাই অথচ কোন প্রতিকারও নাই।

এই তো অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের। এই অবস্থায় রাজ্যের হাল যাঁহারা ধরিলেন তাঁহাদের যে কতদূর দেশের স্বার্থে উৎসর্গিত হইতে হইবে এবং কতদূর যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার ভাবিবার অবকাশ নাই। এখানকার রাষ্ট্রতরণীর হাল যিনিই ধরুন তাঁহাকে অতি শক্ত হাতে এই হাল ধরিতে হইবে, এই পর্বত প্রমাণ সমস্যায় তাঁহাকেই অতীব দক্ষতার সহিত মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে তবেই এই মরা গাঙ্গে আবার প্রাণের জোয়ার আসিবে, ধ্বংসস্তূপে আবার সৃষ্টির ইমারৎ গড়িয়া উঠিবে, সর্বনাশের পুঞ্জীভূত ঘনতমিস্রাচ্ছন্ন অন্ধকারের বক্ষপিঞ্জরে বিদ্ধ করিয়া কল্যাণের নবারুণরাগরঞ্জিত জ্যোতির্ময় শুভ্র-স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। এই কর্ম যিনিই করিতে পারিবেন—তিনি যে দলভুক্তই হোন আমরা তাঁহার উদ্দেশেই বরমাল্য আগাইয়া দিব, তাঁহারই জয়গানে অংশ গ্রহণ করিব, তাঁহার নেতৃত্বেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিব—সে তিনি যে দলভুক্তই হউন।

নেতাজী মূর্তি প্রসঙ্গে

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা ফলবতী হইল। অহল্যার প্রতীক্ষা বা শবরীর প্রতীক্ষার তুলনায় এ প্রতীক্ষাও কম গুরুত্বের বা অল্পমূল্যের নয়। মহানগরীর হৃৎপিণ্ডে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে একালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের একটি মূর্তি তাঁহারই শুভজন্মদিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

আশীর্বাণী পাঠাইলেন নেতাজীর মাতৃসমা গুরুপত্নী পরম শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবী। উদ্বোধন করিলেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের ন্যায় একটি অতীব

গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষক স্থানে মহানগরীর অন্যতম মহার্ঘ ভূষণ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা দীর্ঘদিন ধরিয়াই শোনা যাইতেছিল। এই প্রস্তাবে স্বভাবতই কলিকাতার সুভাষ-অনুরাগী জনগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু যেখানে বাহাত্তর মাসে বছর, যেখানে কাজ অপেক্ষা কথার প্রাধান্যই বেশী, যেখানে ভিতরের সূক্ষ্ম রসদৃপ্ত শিল্পকর্ম অপেক্ষা বাহিরের অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর-জৌলুষের প্রতি সমধিক আসক্তি, সেখানে প্রস্তাবটি বাস্তবে পরিণত হইতে যথেষ্ট সময় আবশ্যক—কিন্তু এই দীর্ঘসূত্রিতা কলিকাতাবাসীর পক্ষে ক্রমশই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল—অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর তাঁহাদের বহুকাল লালিত আনন্দের পরিপূর্ণতা ঘটিল এবং দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসান সূচিত হইল।

সুভাষচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল কিন্তু তাহার জের সমাপ্ত হইল না। উপন্যাসের উপসংহারের মত ঘটনার গতি আগাইয়া চলিতে লাগিল। পৌরপিতৃগণ জনগণের মনোবাসনা যেমন পূর্ণ করিলেন ঠিক তেমনই মূর্তির পদপ্রান্তে আপন আপন নামগুলিও খোদাই করাইয়া ছিলেন।

মূর্তিটি অবশ্যই ত্রুটিশূন্য নয়। মূর্তিটিতে নির্মাতার অখণ্ডনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর কিন্তু রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু ষোলজন পৌরপিতার খোদিত নামকে কেন্দ্র করিয়া তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল, দাবী উঠিল "এই ফলক হঠাও"—"নেতাজীর নামের সহিত এই নামগুলি রাখা চলিবে না"—সে দাবী উপেক্ষা করা সম্ভবও হইল না।

কিন্তু এখানে একটি কথা, হয়তো ইহাই অনুমিত হইয়াছে যে, সুভাষচন্দ্রের নামের সহিত নিজেদের নাম যুক্ত করিয়া লোকচক্ষে নিজেদের পরিচিত করিয়া তোলা এবং সাধারণ্যে খ্যাত হওয়ার ইহা একটি অপচেষ্টা মাত্র। যদি তাই হয় তাহা হইলে বলিতে হয়, এ জাতীয় মনোভাবের জন্য চিন্তার কোনই কারণ নাই। সুভাষচন্দ্রের নামের সহিত নিজের নাম জড়িত থাকিলে নিজেও দেশবিখ্যাত হওয়া যাইবে—এই ধরণের স্বপ্ন যিনি দেখিয়া থাকেন তাঁহাকে সুস্থ বলিলে সমগ্র সুস্থ সমাজ আমাদের নামে মানহানির মামলা দায়ের করিলেও করিতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র বসু। একালের পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অগ্নিগর্ভ, সূর্যরশ্মি-বিমণ্ডিত, আলোক-প্রদীপ্ত নাম। জগতের রঙ্গমঞ্চে যত মুক্তিযোদ্ধার আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে একটি পুরোভাগের নাম, একদিকে অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা, শৌর্য, বীর্য অন্যদিকে অসাধারণ আত্মত্যাগ, চরম দুঃখ, ক্লেশ নিপীড়ণ বরণ—এই দুয়ের সমন্বয়মূলক একটি নাম। এমন একটি নাম যাহা ঘরে ঘরে দেবতার ন্যায় পবিত্র পদবাচ্য, যাহা এক ছত্রতলে একটি মাত্র অঙ্গুলি হেলনে সমবেত করিতে পারে সমগ্র ভারতবর্ষকে সেই নামের সহিত নিজেদের নাম সংযুক্ত করিয়া নিজেকে খ্যাত করার দিবাস্বপ্ন যদি সত্যই কেহ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি কখনই আমাদের তীব্র সমালোচনা বা প্রতিবাদের পাত্র নন—তিনি যাহার পাত্র তাহার নাম করুণা, কারণ অর্বাচীন বা বাতুলেরা সমালোচনা বা প্রতিবাদের পাত্র হইতে পারে না।

যাঁহার একটি বজ্রনির্ঘোষে তাবৎ অন্যায় ও দুর্নীতি মাথা নত করে যাঁহার একটি নামে কাঁপিয়া ওঠে আসমুদ্র হিমাচল ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষ, তাঁহার রোমাঞ্চকর, ত্যাগ ভাস্বর জীবন সময়ের দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়া মহাকালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া বৎসরের পর বৎসরের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া ভাবীকালের নরনারীকে প্রেরণা দিবে, উদ্দীপিত করিবে। আলোকিত করিবে—সে পুণ্য নাম সূর্যের রশ্মিতে রশ্মিতে চন্দ্রের কিরণে কিরণে। আকাশের শূণ্যতায়, ক্ষণকালের সঙ্কীর্ণতায় নয়, চিরকালের প্রশস্ততার মহিমান্বিত দীপ্তিতে বিরাজিত থাকিবে কারণ সে নাম আজ সাম্প্রতের গণ্ডীভুক্ত নয়, শাশ্বতের কক্ষপথে সমুত্তীর্ণ—আর তাঁহার সহিত জড়িত অন্য নামগুলি মহাকালের অমোঘ নিয়মে, সময়ের ধারায় কোথায় ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তাহাদের অবস্থান কে রোধ করার ক্ষমতা রাখে?

পৃথিবী এমন এক নিয়মের অধীন যে সেখানে বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না, জগত দেয় সব কিছুই—তবে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে, পৃথিবী আজ যতই রূপ বদলাক—সে এখনো পুরোপুরি ফাঁকির রাজত্বে পরিণতি লাভ করে নাই—এ সত্য যেমনই অকাট্য, তেমনই গভীর। তাই কোন বিশেষ অবদানের স্বাক্ষর রাখার পরিবর্তে সাধনার পথ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া শুধু একজন মহামানবের চরণযুগল আঁকড়াইয়া ধরিলেই মুফৎসে খ্যাতি ও পরিচিতি আসে না। এত সোজা ব্যাপারটি নয়।

তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে সংবাদপত্রের মুদ্রাকরদের নাম সকলের তুলনায় জগদ্বিখ্যাত হইত, কারণ তাহার নামটি প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়—বিশ্ববরেণ্য কোন দিকপালের নাম সব সময়েই প্রতিদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা অধিকার করে না।

শুধু সুভাষচন্দ্রই নয়—মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত মহারথীদের নামের সহিত এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা নিজের নাম যুক্ত করিয়া খ্যাত হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মধুসূদন-বঙ্কিমের মহিমা তাহাতে বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নাই বরং প্রশ্ন এই—কে এই প্রচেষ্টায় তাঁহাদের নামের সহিত স্বীয় নাম যোগকারী অখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দ কি অখ্যাতি মোচন করিতে পারিয়াছেন? জনচিত্তে তাঁহাদের নাম কি তিলমাত্রও স্থান পাইয়াছে। বারেকের তরেও বা বিস্মৃতির ঘোরেও কি তাঁহারা কাহারও চিন্তার খোরাক হইয়াছেন?

সুতরাং এই বিষয়বস্তুটিকে কেন্দ্র করিয়া এত বাদানুবাদের প্রয়োজনটা

না কিছুদিন বিরাট বিশাল হিমালয়ের পদপ্রান্তে সারি সারি অসংখ্য ছোট টিবি থাকিলে হিমালয়ের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না এবং টিবিগুলিও হিমালয়ের সমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না।

করিতে পারে না। তাহারা হিমালয়ের উচ্চতা, গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব অর্জন করে—কিন্তু তাহাও হওয়ার নয়।

তাই ষোলটি কেন, শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার গোপিনীর মত সমসংখ্যক নায়ক উৎকণ্ঠিত থাকিলেও পথচারীর দৃষ্টি পাঞ্জাব-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল বঙ্গ-সমন্বিত ভারতভূমি জন-গণ-মন-অধি নায়ক সেই বিরাট পুরুষটির মূর্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে নারায়ণের দিকে নয়।

এত হৈ-চৈ কেন?

কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে যে একটি ঘটনা নিয়মিতভাবে মহা আড়ম্বরে কোন পত্রিকার বেশ খানিকটা অংশ অধিকার করিয়া চলিতেছে। সেই ঘটনা যখনই অনুষ্ঠিত হয় তখনই তাহার বিশদ সংবাদ সাধারণ্যে পরিবেশন করা হয়। সংবাদ পরিবেশন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় বা তাহা কখনই সমালোচনার প্রতিক্রিয়ারউক্ত হইতে পারে না কিন্তু এই বিশেষ সংবাদটি এমন এক ভঙ্গীমায় আত্মপ্রকাশ করে যেন ইহা কোন এক অভিনবত্বের দাবীদার।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই "মুক্তমেলা" কেন্দ্র করিয়া বাঙালী আজকের দিনে কোন অভিনবত্বের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেছেন কি? কোন নতুনত্ব তাঁহাদের সহস্র সমস্যাবিজড়িত চিত্তে চকিতের জন্য দোলা দিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছে কি? গতানুগতিক বদ্ধ জীবনধারা হইতে উল্লেখযোগ্য কোন মুক্তির নিশানা তাঁহাদের চোখের সামনে ধরা দিতেছে কি?

বাঙালী জাতি এমনিতেই ঘরকুণো বলিয়া এককালে যথেষ্ট পরিমাণ অখ্যাতি ছিল। চার দেওয়ালের বাইরে কিছুতেই যেন সে পদক্ষেপ করিতে চায় না এই ধরণের একটি দুর্নাম তাহার ললাটে জুটিয়াছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার শেষ পংক্তিটি—"রেখেছ বাঙালী করে"—এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই কবিতাটির মধ্যে আরও দুটি-একটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

"পদে পদে ছোট ছোট
নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিও না
ভাল ছেলে করে—
দেশ দেশান্তর মাঝে
যার যেটা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও
করিয়া সন্ধান"।

অবশ্য পরে দেখা গেল বাঙালী এ দুর্নাম কাটাইয়া উঠিয়াছে। দেশ-দেশান্তরেই আজ তাহাকে কোনরকমে মাথা গুঁজিবার স্থান সংগ্রহ করিতে হইতেছে, ইহার কারণ অবশ্য নানাবিধ—বিস্তারিত আলোচনা না করাই শ্রেয়। তবে, প্রধান কারণ যে আজ বাঙালী আবিষ্কার করিয়াছে যে নিজের দেশেই সে আজ উদ্বাস্তু, তাহার উদারনীতি এবং নিদ্রিত অবস্থার সুযোগ লইয়া এই সোনার বাঙলার মধুর আকর্ষণে যেভাবে বহিরাগতের ভিড় জমিতে আরম্ভ করিল তাহাতে শেষে তাহাকেই বাস্তুচ্যুত হইতে হইল। কেহ কর্মব্যপদেশে কেহ গৃহচ্যুত হইয়া অবশেষে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি সুরু করিল, তাহার ঘরকুণো দুর্নাম ঘুচিল। এই প্রসঙ্গে সঙ্গোপনে আরও একটি কথা বলিয়া রাখি সে যুগেও কিছু বাঙালী কিন্তু ঘরের মায়া কাটাইয়া বিদেশে বাসা বাঁধিয়াছেন বিদেশিনী বিনোদিনীর প্রণয়ালিঙ্গনে বন্দী হইয়া।

গত শতাব্দীতে যে সময় নবজাগৃতির বা রেনেসাঁর জয়রথের বেগবান চক্র অপ্রতিহত গতিতে আগাইয়া চলিতেছে—সেই সময় গণনায়কদের কল্যাণে এবং শতবর্ষ পূর্বের ঐতিহাসিক হিন্দু মেলার কল্যাণে বাঙালী শিক্ষা পাইল যে ক্ষুদ্র গৃহের সঙ্কীর্ণ পরিসরে গঠনমূলক কোন কাজ হয় না—কোন বক্তব্য কোন ভাবধারার স্রোত জনসমাজের মধ্যে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্য থাকিলে তাহা চরিতার্থ করা গৃহের মধ্যে বসিয়া সম্ভব নয়—উন্মুক্ত ক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ পরিধি সেই সঙ্কল্প-সাধনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। এজন্য সভার প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ ধুরন্ধর যুগনায়কদের কল্যাণে বাঙালী সেদিন এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

সেই ধারা অনুসরণ করিয়াই সভা-সমিতি আজ "ফাংসান"এর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বিদেশের ইতিহাসগুলি পর্যালোচনা করিলে এই নজীরই চোখের সামনে ধরা পড়ে যে মুক্ত আকাশের তলায় সকলে মিলিয়া সমবেত হওয়ার রীতি সে সব দেশে বহুবর্ষ ধরিয়া প্রচলিত। বহুকাল ধরিয়া দেখা যায় সেখানে উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপে সকলে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সমবেত হওয়ার রীতি বর্তমান। এই মুক্ত আঙ্গিনায় অনুষ্ঠান পরিবেশন কোন বিশেষ অভ্যাগত বা নির্দিষ্ট সংখ্যক অতিথির দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এখানে কোন প্রবেশপত্রের বালাই নাই, এখানে কোনপ্রকার বিধিনিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল নাই—এককথায় ইহা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এই সব সমাবেশে সাধারণত সাহিত্যালোচনা কবিতা বর্ষণ, নৃত্যগীত কৌতুক ইত্যাদি হইয়া থাকে।

কলিকাতাতেও শীতের আমেজে ময়দানে নানাবিষয়ক আসর, প্রদর্শনী, কার্নিভাল প্রভৃতি ইংরেজ আধিপত্যের সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং এ জাতীয় ঘটনা কলিকাতাবাসী শুধু কেতাবে পড়িয়াই জানে নাই, প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণও করিয়াছে।

ইহা তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। ইদানীং আমলে কলিকাতার ময়দানে কুস্তির প্যাঁচে একজন আর একজন বিপুল বপুকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিতেছে এ জাতীয় দৃশ্য অবলোকন করেন নাই এ ধরণের ব্যক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

আরও অনেক কিছু শোনা যায়, এও যেমন শোনা যায় তেমনই ইহাও আমাদের গোচরীভূত হইতেছে যে বর্তমানে ময়দান শুধু প্রদর্শনী বা কার্ণিভাল বা বক্তৃতার আসর হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে না, তাহাকে নাকি আরও অনেক কাজে ময়দানীকরণ (?) করা হইতেছে—অর্থাৎ গাঁজা, গুলি, মদ, আফিং জাতীয় আবগারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত যতগুলি বস্তু আছে—সেগুলির নেশার আড্ডা অর্থাৎ উপভোগ বা রসাস্বাদনের ক্ষেত্র হিসাবে ময়দানই নাকি নির্বাচিত হইতেছে।

আমাদের অতীতের ইতিহাসেও বাউলের নিদর্শন অবিদ্যমান নয়। পথে-ঘাটে গান গাহিয়া বাউলবৃত্তি এ যুগেই নয় সে যুগেও ছিল।

এই সকল দিনগুলি পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই এখন আমরা উপনীত হইতে পারি যে এক বুড়ো মেলা লইয়া এত হৈ-চৈ করার অর্থটা কি—কি এমন অভিনব অনাস্বাদিত বস্তুর আস্বাদ উহার মাধ্যমে বাঙালী লাভ করিল, বাঙলার জাতীয় সংস্কৃতিতে ইহা কি এমন অবদান রাখিতেছে যাহার ফলে তাহার ইতিহাসের মর্যাদাবৃদ্ধি হয়? তাই, এই ধরণের মেলা শুধ ময়দানে কেন—পথে, ঘাটে, গলির মধ্যে বা এমন কি ডাস্টবিনের ধারেও যদি ফলাও করিয়া আহূত হয় তাহা হইলেও বিস্ময়ের বা অভিভূত হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে কি?

প্রতিমা দেবী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্রবধূ এবং স্বনামধন্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্যা সহধর্মিণী প্রতিমা দেবীর গত ২৫এ পৌষ ৭৫ বছর বয়সে গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটেছে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী প্রতিমা দেবী সাহিত্যের, শিল্পকলায়, সঙ্গীতে, নৃত্যে আপন দক্ষতা এবং নিজস্বতার পরিচয় সার্থকভাবে দিয়েছেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও পরিচালনায় তাঁর অবদানও সামান্য মূল্যের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বহু কর্মে তিনি ছিলেন তাঁর সহযোগী। পৃথিবীর নানা দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন এবং দেশে ও বিদেশে দেশ-বিদেশের নানা দিকপাল মনীষীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একালের সঙ্গীত জগতের অধিনায়ক স্বরূপ আচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র ভারত বিখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের দীন রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতরত্নাকর গত ৩০এ পৌষ ৬৪ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের স্নাতক রমেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রাগপ্রধান গানগুলিতেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী প্রসিদ্ধির অধিকারী। যে বংশের তিনি সন্তান সেই বংশের সুনাম এবং মর্যাদা তিনিও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করে গেছেন আপন অভাবনীয় এবং অকৃত্রিম সাধনায়।
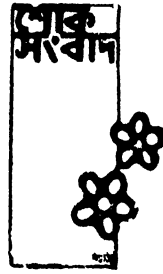
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও পরিসংখ্যানবিদ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের গত ৩০এ পৌষ ৬০ বছর বয়সে গৌরবদৃপ্ত জীবনের দীপ নির্বাপিত হয়েছে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের যোগ্যতম দৌহিত্র এবং দিকপাল সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বড়ছেলে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের লব্ধসিদ্ধি ছাত্র মোহনলাল বাঙলা শিশু সাহিত্যের এক যাদুকর এবং ভ্রমণমূলক সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের স্যাম্পেল সার্ভের পরিসংখ্যান উপদেষ্টার পদে বৃত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলি বাঙলা সাহিত্যের এক একটি মহার্ঘ সম্পদ।

ডঃ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ও প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ৭ই মাঘ ৬৮ বছর বয়সে সম্পূর্ণরূপে আকস্মিকভাবে দেহান্তরিত হয়েছেন। ১৯২৩ সালে বোটানিতে প্রথম শ্রেণীতে এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৯২৮ সালে পশ্চিম জার্মাণীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের একটি অধিবেশন উদ্ভিদ শাখায় তিনি পৌরোহিত্য করেন এবং বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টারের আসনেও কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জগৎকান্ত শীল

প্রখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জগৎকান্ত শীল গত ২রা মাঘ ৬৮ বছর বয়সে জব্বলপুরে অকস্মাৎ পরলোক যাত্রা করেছেন। কলকাতার এস ও পি সির ইনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষাদানেও যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীনন্দকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

মহাশয়,

আমার নীলদর্পণ নাটক সম্পর্কে মাঘ মাসের মাসিক বসুমতীতে শ্রীমতী মণিকা দাশগুপ্তের একটি আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বলিবার আছে। আমার লেখা পাঠক-পাঠিকার মধ্যে একজনেরও কাজে লাগিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীমতী দাশগুপ্ত আমার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'তিনি যে বাংলা সাহিত্যের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।' তিনি আমার সম্পর্কে যে পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়াছেন, তাহা সত্য নয়, আমি বাংলা সাহিত্যের একজন ছাত্রমাত্র. ইহার অধিক কিছুই আমার প্রাপ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে আমার মূল প্রবন্ধে প্রকাশিত একটি তথ্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। উক্ত প্রবন্ধের শেষাংশে আমি বিড়লা একাডেমি অব আর্টস এণ্ড কালচার-এর উদ্যোগে জানুয়ারী ১৯৬৮ সালে প্রদর্শিত পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের একটি চিঠির উল্লেখ করিয়াছিলাম। পরে জানা গেল, চিঠিটি জাল।

বিড়লা একাডেমী অব আর্টস এ্যাণ্ড কালচার হইতে যে পুস্তিকা দেওয়া হইয়াছিল তার ৫নং চিঠিটি হইতেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের চিঠি। চিঠির তারিখ দেওয়া হইয়াছিল বঙ্গাব্দ ১২৮০। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ মারা যান ১২৭৭ সালের ৯ই শ্রাবণ। কেউ যদি ১২৭৭ সালে মারা যান তবে তাঁর পক্ষে ১২৮০ সালে চিঠি খেলা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়—এই অবস্থায় স্বতঃই মনে হয় চিঠিটি জাল।

বিড়লা একাডেমী অব আর্টস এ্যাণ্ড কালচার-এর মত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদর্শিত বলিয়া ইহাকে প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর ইহাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

পরিশেষে শ্রীমতী দাশগুপ্ত আমার ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষের উল্লেখ

করিয়াছেন। তাহা আমিও লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু অনবধানতার জন্য দুই-একটি স্থানে ইহা ঘটিয়াছে—সেজন্য আমি নিজেই সঙ্কুচিত। যাহা হোক্ আমার প্রবন্ধটি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীমতী দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাই।

—শ্রীসত্যশঙ্কর সুর, পোঃ তারাগুণিয়া, জেলা—২৪ পরগণা।

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়,

আমি মাসিক 'বসুমতীর' দীর্ঘ দিনের একনিষ্ঠ পাঠক। যতই দিন যাইতেছে ততই পত্রিকাটির প্রতি আমার মন গভীরভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। মাসের অর্ধাংশ শেষ না হইতেই পত্রিকাটি পাওয়ার জন্য আমার মন আরও নূতন তথ্যের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। ধর্ম, প্রেসক্রিপসন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, জীবনী, যৌনজ্ঞান খেলাধূলা, চিত্র, রঙ্গজগৎ, জ্যোতিষশাস্ত্র-সঙ্গীত ও তন্ত্রশাস্ত্রের বহুমূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ হইয়া যে পত্রিকা পাঠকের হাতে আসিয়া ধরা দেয়, যে পাঠক যাহা কামনা করিয়া পত্রিকাটি পাঠ করিবেন তিনি তাহাই পাইয়া তৃপ্ত হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ইহাকে একাধারে সর্বগুণময় জ্ঞানভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার উক্তির সত্যতা নিরূপণের জন্য গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বার বার অনুরোধ করিতেছি।

—শ্রীগৌরগোপাল সাহা, মহেন্দ্রগঞ্জ কালিয়াগঞ্জ।

আমি আপনাদের পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আপনাদের 'বৈশাখ ১৩৭৫ সংখ্যার সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষার উপর সে প্রবন্ধটি ছেপেছিলেন সেটি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ছাত্র, শিক্ষক উভয়েই পড়া উচিত বিবেচনা করিয়া উহা আমাদের বিদ্যায়তনের একটি বার্ষিক পত্রিকাতে ছাপিবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী হইয়াছি। আমি উক্ত বিদ্যায়তনের গ্রন্থাগারিক। আশা করি আপনি আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায়, খড়দহ।

ধর্ম প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আমি দীর্ঘদিন আপনার মাসিক পত্রিকার (বসুমতী) নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক। মানুষের রুচির বহু পরিবর্তন দেখলাম। আপনার পত্রিকাই আমার মনে হয় একমাত্র পত্রিকা, যা বিভিন্ন মানুষের সংস্কার অনুযায়ী মনের যা চাহিদা তা মেটাতে পারে। এই একটি-[illegible]ত্র পত্রিকা (আমার মতে) যা আজও মানুষের (যদিও অল্পসংখ্যক) ধর্ম চিন্তার খোরাক জুগিয়ে চলেছে, এবং যদিও এই পত্রিকায় বিভিন্ন বিভাগ সংযোজিত হয়েছে তবুও ধর্মবিভাগকে পত্রিকার প্রারম্ভে স্থান দিয়া বসুমতীর পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

শ্রীঅমলচন্দ্র দে, দে লজ, লালপুর চক, রাঁচি।

পৌরসভার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

গত মাঘ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'পৌর সভার ভবিষ্যৎ' প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নিবন্ধটি পড়িলাম, নিবন্ধে প্রকাশিত তাঁর যুক্তিপূর্ণ অভিমতটি আমাদের দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকেরা একটু চিন্তা করলে সহজে সত্যিই উপলব্ধি করতে পারবেন। দেশের জনগণের কল্যাণ-

সাধন ও নগরের সৌষ্ঠব সাধনের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি নয় কি? তবে 'দলীয় চক্র যেখানে ক্রিয়াশীল অর্থাৎ দলীয় প্রভাব যেখানে সমগ্র আবহাওয়া ও পরিবেশকে আপন ছায়াসমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেখানে একক ব্যক্তিত্বের যথাযোগ্য বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।' লেখকের এই অভিমতটিতে সত্যকার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হল। কিন্তু উহাতে দুর্নীতি যদি প্রশ্রয় পায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যতীন্দ্রমোহন, দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত পৌর প্রতিষ্ঠানের কলঙ্কই শুধু বাড়বে।

—শ্রীতিমির দাশগুপ্ত, ৭৭ অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন, রাসমণিবাজার, বেলেঘাটা।

অনুবাদ-রচনা প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

মাসিক বসুমতীর কয়েকটি সংখ্যায় বিদেশী নাটক প্রকাশ করছেন দেখে আমরা খুব উৎসাহিত ও আনন্দিত হচ্ছি। বেরটল্ট ব্রেশটের নাটক অশোক সেন অনূদিত 'সেজুয়ানের মহৎ নারী' আমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি এবং নাটক আমাদের ভালোও লেগেছে। বর্তমানে প্রকাশিত নাটক হেনরিক ইবসেনের 'হেডা গ্যাবলার' পাঠক-পাঠিকাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে। অনুবাদক শ্রীসমীরণ চৌধুরী নাটকটির অনবদ্য অনুবাদ করেছেন। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত ফিচারগুলি যথা মাসিক রাশিফল, আরোগ্য বিভাগ, চারজন, সাহিত্য পরিচয় প্রভৃতি সাধারণের অনেক উপকারে লাগবে আশা করি। জর্জ এ্যালেনের ভারতীয় মহাপুরুষদের জীবনীগুলি পড়ে আমরা যথেষ্ট পরিতৃপ্তি লাভ করছি। মাসিক বসুমতীর ছাপার উন্নতি বিধান করতে একান্ত অনুরোধ। আপনাকে ও আপনার বিভাগের সহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানাই।

—অমলকুমার রায়, বিমলচন্দ্র রায়, সুতপা ভট্টাচার্য, ঝরিয়া, আসানসোল।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● শ্রীরণজিতকুমার গোস্বামী, ওদলাবাড়ী, ডাক—মানাবাড়ী, জেলা—জলপাইগুড়ি। ● শ্রীমতী দীপ্তি বসু অব:—শ্রীশচীপ্রসাদ রায়, ডাক—কাইগ্রাম, জেলা—বর্ধমান ● শ্রী এস এন বসু, এশিয়াস কেবলস, পো: বক্স নং ১১, থানা বোম্বে ● শ্রীনরোত্তম হালদার, টি এন জুনিয়র বেসিক স্কুল, ডাক—টাকীপুর—আবাদ, জেলা—২৪ পরগণা। ● ডা: এন সি কর, ১৪৩১ ব্রুকটন এ্যভিনু অ্যাপ্ট-৯, ক্যালিফ ৯০০২৫ লস এ্যাঞ্জেলস, ইউ এস এ। ● কৃষ্ণগোপাল ধর চৌধুরী ১২৮ ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া, জেলা—হাওড়া। ● শ্রীমতী দীপ্তি মুখোপাধ্যায় অব: শ্রী এন এন মুখার্জী, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ইনভেসটিগেশন এ্যাণ্ড রিসার্চ ডিভিসন, কোসী প্রোজেক্ট, ডাক—বীরপুর বিহার ● শ্রীমতী লাবণ্য প্রসাদ, ১৪০, পার্ক হিল এ্যাভিনু অ্যাপ্ট, ৬টি, স্ট্যাটেন ল.ইল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক-১০৩০৪ ইউ-এস-এ ● শ্রী পি কে ঘরামী, ডাক—কদমতলা, মধ্য আন্দামান ● শ্রীমতী সুনীতি দেবী অব: শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, অফিসার-ইন-চার্জ সিভিল এরোড্রোম, ডাক—রূপসী, ধুবড়ী, আসাম। শ্রীমতী ভারতী দাসগুপ্ত অব: ডা: সমীর দাসগুপ্ত, মেডিক্যাল অফিসার, পুলিশ লাইন, আজমীঢ় রাজস্থান। ● স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, ঘাটশীলা সিংভূম ● ড: এস কে দে, দে ক্লিনিক ৭ তাইপিঙ রোড পারিট-বুনটার মালয়েশিয়া। ● ডা: এ কে দত্ত স্পেশালিস্ট ইন প্যাথলজী, প্যাথলজী ইউনিট, জেনারেল হসপিটাল, কোটাবাহার, কেলানটন, মালয়েশিয়া। ● সচিব, বারগোদা তরুণ সঙ্ঘ বাণীকুঞ্জ গ্রাম্য গ্রন্থাগার গ্রাম—ডাক—বারগোদা জেলা—মেদিনীপুর ● শ্রী জি কে চক্রবর্তী, অব:—জেনারেল ইলেকট্রিক কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ৩০, আরকট রোড, মাদ্রাজ—২৬। ● এন এ সি দিলীপ ঘোষ, ইনস্টিটিউট, এফ টি-১০ এ-এফ স্টেশন, হেসেমপেট, সেকেন্দ্রাবাদ-১৪

I am sending herewith Rs. 10·00 for half-yearly subscription of Monthly Basumati. Please acknowledge receipt and oblige. —Head Master, Joharmull Jalan Institution, Asansol.

অদ্য মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা ১০ টাকা (সডাক) মনিঅর্ডার করে পাঠালাম। অনুগ্রহপূর্বক চলতি মাস থেকে নতুন গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত করে আমার ঠিকানায় মাসিক বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন। শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য, উড়িষ্যা।

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের গ্রাহক-মূল্য ৯৲ টাকা পাঠালাম। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আগামী কার্তিক মাস থেকে গ্রাহক করবেন। আমার ঠিকানায় নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরী।

I am sending herewith Rs. 18/- (Rupees eighteen) only for the annual subscription of Masik Basumati. Please send the magazine from Magh and continue. S. K. Mitra ASM/Bunpas P. O. Belari, Dt. Burdwan.

আমার প্রিয় মাসিক বসুমতীর জন্য ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। পত্রিকাটি যথারীতি পাঠাইবেন। শ্রীনগেন্দ্র সূত্রধর, পোখালজোড়, জেলা বস্তার এম পি।

I am sending herewith Rs. 18·00 being the annual subscription of Masik Basumati. Please send the magazine regularly. Bibhuti Bh. Choudhury, Vill Chaksidal, P. O. Thakurpurhat, Dt. W. Dinajpur.

মাসিক
বসুমতী
চৈত্র
১৩৭৫

-অজিতকুমার কর্মকার
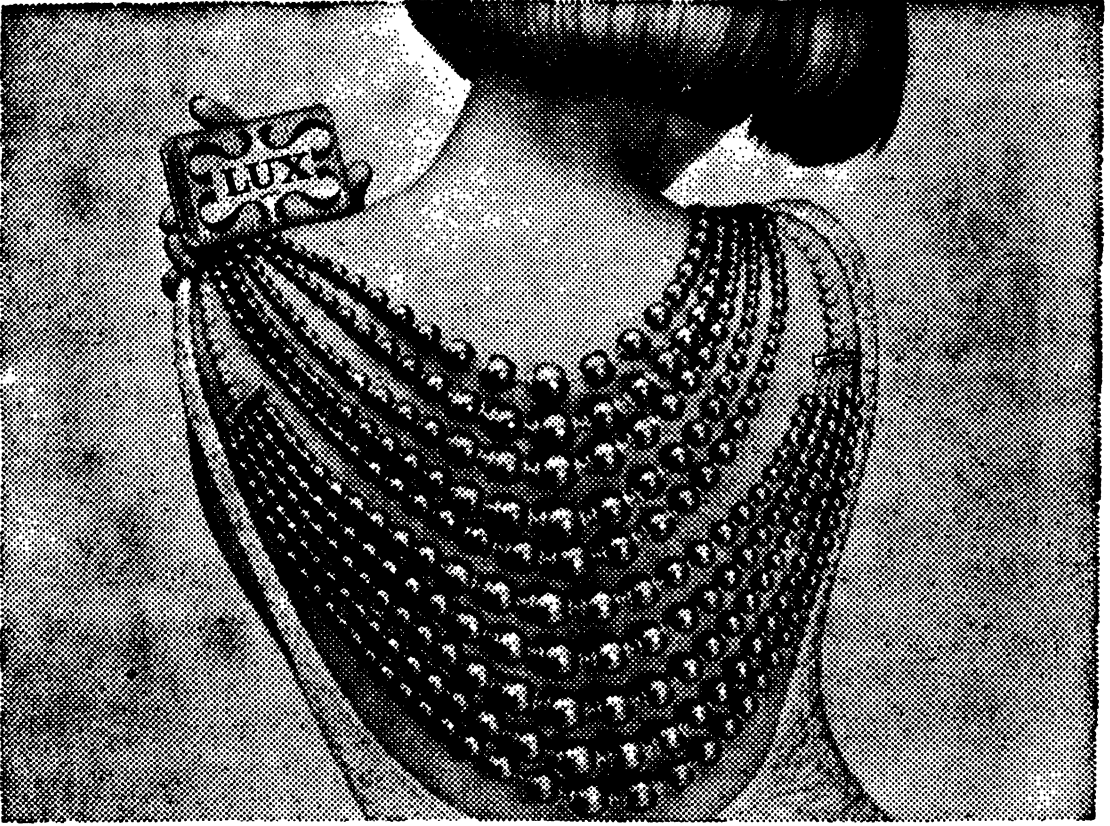
॥ ৪৭ বর্ষ, চৈত্র, ১৩৭৫ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা ॥

বৈরাগ্য

"বৈরাগ্য একেবারে হয় না—সময় না হলে হয় না—ভোগের শান্তি না হলে হয় না। আবার প্রারব্ধ ক্ষয় হওয়া চাই। তবে শুনে রাখা ভাল। যখন সময় হবে, তখন মনে হবে—'ও! সেই শুনেছিলাম!' তা ছাড়া এসব কথা শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে; যেমন একটু একটু করে চালুনির জল খেলে মদের নেশা ক্রমে ক্রমে ছুটতে থাকে। সংসারী লোকের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে, কিন্তু নির্মলি ফেললে আবার পরিষ্কার হতে পারে। বিবেক-বৈরাগ্য নির্মলি।

"বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ।

"বৈরাগ্য তিন-চার রকম আছে। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশীদিন থাকে না। হয়ত কর্ম নাই; গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। কিছু দিন বাদে একখানা চিঠি এলো—'তোমরা ভেবো না, আমার একটি কর্ম হয়েছে। ছুটি পেলেই বাড়ী আসবো'। এর নাম মর্কট বৈরাগ্য।

"আবার যথার্থ বৈরাগ্য আছে। যেমন, কোন অভাব নাই, সবই আছে—কিন্তু এসব কিছুই ভাল লাগে না; সর্বদা ভগবানের জন্য মন কাঁদে—সব ফেলে চলে গেল। এর নাম তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার—মায়াপাশ কচ্ কচ্ করে কেটে দেয়।

"আবার আছে মন্দা বৈরাগ্য; হচ্ছে হবে—ঢিমে তেতালা। যেমন কোন চাষা কতদিন ধরে খাটছে—কিন্তু পুকুরের জল কেটে আর আসছে না। মনে রোক নেই।"

ব্যষ্টি ও সমষ্টি

আপাতদৃষ্টিতে জীবের অজ্ঞান নানারূপে দেখা গেলেও বস্তুত অজ্ঞান একই। সমষ্টিভাবে অজ্ঞানকে এক এবং ব্যষ্টি বা পৃথকভাবে অজ্ঞানকে বহু বলা হয়। যেমন কতকগুলি বৃক্ষের সমষ্টি হচ্ছে বন এবং কতকগুলি জলবিন্দুর সমষ্টি জলাশয়।

জীবাত্মার তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জীবের ত্রিবিধ শরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—যথাক্রমে ঐ তিনটি অবস্থা নিয়ে থাকে।

মূল বীজ অবস্থা বা অব্যক্ত অবস্থা হচ্ছে সুষুপ্তি অবস্থা; এই অবস্থা কারণ-শরীরে হয়। এই অব্যক্ত অবস্থায় উপহিত চৈতন্যের সমষ্টিভাবই 'ঈশ্বর', আর ব্যষ্টি ভাবকে 'প্রাজ্ঞ' বলা হয়।

এই অব্যক্ত ঈশ্বরই জ্ঞান, প্রাণ ও মনরূপে প্রকটিত হয়ে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন। যখন জীবভাবাপন্ন সংস্কার-রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন তিনি মন, জীব হৃদয়ে অনুভূত ব্যষ্টি চৈতন্যই প্রাণ, আর প্রতিজীবে প্রকাশমান বুদ্ধি, জ্ঞান এই ব্যষ্টি মন-প্রাণ ও জ্ঞান একটা সমষ্টি বিরাট মন, প্রাণ ও জ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র। ব্যষ্টিতে যাহা মন, প্রাণ ও জ্ঞান, সমষ্টিতে তাহাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে বর্ণিত। ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেন—"ঐ বিরাট মন, প্রাণ ও জ্ঞানের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের) সাক্ষাৎকার লাভ করতে হলে স্বকীয় জীবভাবীয় মন, প্রাণ ও জ্ঞানের সন্ধান করতে হয়। উহাদিগকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলে পূজা করতে হয়। যেমন পৃথিবীর অন্তর্নিহিত জলপ্রবাহ স্পর্শ করতে হলে নিজ প্রাঙ্গণে কূপ খনন করলেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়, তেমনি বিরাটের বা সমষ্টির সন্ধান করতে হলে নিজের অন্তরে অহরহ অনুভূয়মান ব্যষ্টি-সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মহামায়ার যে শক্তিবিন্দুটুকু তোমার ভিতরে প্রকাশ পাচ্ছে, যে অংশটুকু তোমার আয়ত্তে আছে,

তাকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জননী বলে বুঝতে চেষ্টা কর—তাঁরই চরণে তোমার সুখ দুঃখের কথা নিবেদন কর। তিনিই মহতী শক্তিরূপে প্রকটিত হয়ে তোমার সকল অবসাদ দূর করবেন।"

ব্যষ্টি ও সমষ্টি—জীব ও ঈশ্বর—এই দ্বৈতবোধ অবলম্বন করেই এগিয়ে যেতে হয় ক্রমে দ্বৈত প্রতীতির বিলোপ হয়ে আত্মানুভূতি আসে। প্রতিদিনের সাধনায়—সন্ধ্যা বন্দনাদিতে এই উপলব্ধির জন্যই সচেষ্ট হতে হয়। সাধনা ঠিক হলে সে উপলব্ধি আসেও।

বীজ অবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত ব্যক্ত অবস্থায় (সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীরে এ অবস্থা হয়) অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় উপহিত চৈতন্যের সমষ্টি ভাবকে 'হিরণ্যগর্ভ' এবং ব্যষ্টি ভাবকে 'তৈজস' বলা হয়।

আর স্থূলে দেহের যোগে যখন সম্পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায়, উপহিত চৈতন্যের সমষ্টি ভাবকে 'বিরাট' এবং ব্যষ্টি ভাবকে 'বিশ্ব' বলা হয়!

একই ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) এই সমষ্টিতে কর্তৃত্ব রূপে, আর ব্যষ্টিতে কার্যরূপে বর্তমান, সমষ্টিতে কর্তৃত্ব রূপে বিভিন্ন অবস্থায় তিনিই ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট, আর ব্যষ্টিতে কার্যরূপে অর্থাৎ জীবস্বরূপে সেই সেই অবস্থায় তিনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব। তাই অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের মতে সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যই কর্তা আর ব্যষ্টিতে উপহিত চৈতন্যই কার্য, অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তা এবং জীব কার্য। কিন্তু স্বরূপত উভয়ই এক, কেবল উপাধিতে ভিন্ন মাত্র। 'কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধি-রীশ্বরঃ'—সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাব মায়াকল্পিত মাত্র।

ব্যাকুলতা

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কচি ছেলে যতক্ষণ চুসি নিয়ে ভুলে থাকে, ততক্ষণ মাও অন্যকাজে ব্যস্ত থাকে। ছেলে যখন চুসি ফেলে চীৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দুড়্ দুড়্ করে এসে ছেলেকে কোলে নেয়।

"বালক যেমন মাকে না দেখতে পেয়ে মা'র জন্য ব্যাকুল হয়ে, দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদা চাই। যার সংসারের সুখভোগ আলুনি লাগে—এসব কিছুই ভাল লাগে না—টাকা, মান, দেহের সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ, কিছুই যার ভাল লাগে না—সে-ই আন্তরিক 'মা' 'মা' করে কাতর হয় ; তারই জন্য সব কাজ ফেলে মাকে ছুটে আসতে হয়। এ রকম ব্যাকুলতা চাই।

"বালকের মত বিশ্বাস, আর বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয় তেমনি ব্যাকুলতা, এ ব্যাকুলতা হলো ত' অরুণ উদয় হলো। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন। যে ব্যাকুলতায় জটিল বালক ঠাকুরকে মধুসূদন দাদারূপে পেয়েছিল ; যে ব্যাকুলতায় বালবিধবা কচি মেয়ে স্বামিরূপে গোবিন্দকে পেয়েছিল ; যে ব্যাকুলতায় ব্রাহ্মণের বালকপুত্রের দেওয়া ভোগ তার সামনে বসে ঠাকুরকে খেতে হয়েছিল, তেমনি ব্যাকুলতা চাই।

"আন্তরিক ব্যাকুলতা হলে তাঁর কৃপা হয় ; তিনিই নানা সুযোগ করে দেন—সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ, এসব সুযোগ। আবার ব্যাকুলতার জন্যই সব রকম যোগাযোগও হয়ে যায়। হয়তো কোন ভাই সংসারের ভার নিলে ; হয়তো স্ত্রীটি বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্মিক—কিম্বা হয়তো বিয়েই হলো না, বন্ধনই হলো না ; হয়তো এমন কোন সৎসঙ্গ জুটে গেল যাতে সুবিধা হয়ে গেল ; কেউ হয়তো বলে দিলে এমনি এমনি কর, তাহলে ঈশ্বরকে পাবে। ব্যাকুলতা থাকলে সবই হয়ে যায়।

"ব্যাকুলতাই অনুরাগের লক্ষণ। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হলে—যেমন ব্যাকুল হয়ে বৎসের পিছে গাভী ধায়, তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদলে—ঈশ্বরের জন্য উন্মাদ হলে, সাক্ষাৎকার হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে। ব্যাকুলতা না হলে হবে না।

"সংস্কার দোষে মায়া কাটে না! মায়া থাকলে ব্যাকুলতা হয় না। যারা সংস্কার নিয়ে এসেছে তাদের এরূপ ব্যাকুলতা হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাদের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। ছোকরাদের মধ্যে কতক পেয়েছি যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল ; তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে। তাই সে সব ছোকরাদের এত ভালবাসি। সংসারী লোকদের ভোগের দিকে মন রয়েছে, তাই তাদের ব্যাকুলতা হয় না।

"ব্যাকুলতা না এলে অনুরাগ হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে, তবে ব্যাকুলতা আসবে। আমি ব্যাকুল হয়ে একলা একলা কাঁদতাম। আর বলতাম, ওহে দীননাথ, আমি সাধন ভজনহীন, আমায় দেখা দিতে হবে।

"ঈশ্বরকে দর্শন করার জন্য যখন প্রাণ আটুবাটু হয়, তখন এই ব্যাকুলতা হয়। সীতার মত ; সীতা রামময় জীবিতা, রাম চিন্তা করে উন্মাদিনী—দেহ যে এমন প্রিয় জিনিষ তাও ভুলে গেছেন।

"ব্যাকুলতা থাকলে সব মত, সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। যে পথেই যাও হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব শৈব, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা
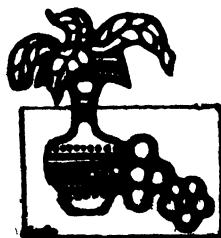
তিনি ত' অন্তর্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ঠিক পথে তুলে লন। মানুষের জ্ঞান আর কতটুকু! ভুল তো হতেই পারে। আর, সব পথেই ভুল আছে—কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজও আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়; সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়। এক বই ত' দুই নাই; যে যা বলে, যদি আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই পঁহুছিবে। ব্যাকুলতা থাকলেই হলো।

"কি জান? ভোগ আর কর্মশেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে, 'দিন কাটুক,—তারপর সামান্য ঔষধে উপকার হবে।' নারদ রামকে বললেন, 'রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, রাবণ বধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেজন্য অবতীর্ণ হয়েছ।' রাম বললেন—'নারদ, সময় হোক, রাবণের কর্মক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে।'—(অধ্যাত্ম রামায়ণ)।

"যখন তিনি মুক্তি দেবেন, তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিয়ে নেন, ব্যাকুলতাও করে দেন। কামিনীকাঞ্চনের ভোগ যেটুকু বাকী আছে, সেটুকু না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে 'মা যাবো।'

"কাশী যাওয়া কি দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে? ব্যাকুলতা থাকলে এখানেই কাশী। এত তীর্থ, এত জপ করে হয় না কেন? ব্যাকুলতা নাই বলে। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। আঠারো মাসে এক বৎসর করলে হয় না।

"ব্যাকুলতা হলে ছট্‌ফট্‌ করে—কিসে ঈশ্বরকে পাব; যেন প্রাণ যায়!

"রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে। কেবল রাতদিন বিষয়কর্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে?

"বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়, তাঁর জন্য কাঁদলে তবে ব্যাকুলতা আসে।"

ব্যাহৃতি

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং এই সাতটিকে ব্যাহৃতি বলে; অর্থাৎ ভূবাদি সপ্ত লোকই সপ্ত ব্যাহৃতি। ব্রহ্মা জ্ঞানদেহে এই কয়েকটি ব্যাহরণ (উচ্চারণ) করেছিলেন, তাই এগুলি ব্যাহৃতি নামে কথিত হয়েছে। এদের প্রথম তিনটি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) গায়ত্রী মন্ত্রের আরম্ভে যোগ করে, প্রণব পুটিত করে, জপ করতে হয়। প্রাণায়ামের সময় সপ্ত ব্যাহৃতিই প্রণব পুটিত করে যোগ করতে হয়।

ব্যুত্থান

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কিছুক্ষণ থাকার পর ধ্যাতা যখন পুনরায় লৌকিক জ্ঞানে ফিরে আসেন, বেদান্তের ভাষায় তাকেই ব্যুত্থান বলে। এই ব্যুত্থান নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় অনুভূত হয়।

সমাধি হচ্ছে বুদ্ধিকে পরমাত্মভাবনায় লাগিয়ে রাখা; আর ব্যুত্থান বুদ্ধিরই অবস্থামাত্র। শুদ্ধ চৈতন্য (পরমাত্মা) এই উভয়কেই প্রকাশ করেন মাত্র।

সমাধিকালে ধ্যাতার চিত্তে কোনরূপ পাপাদি কলুষতার অভাববশত একটি শুক্লধর্মের উৎপত্তি হয়। শুক্লধর্মে রজঃ তমোর লেশমাত্র না থাকায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা তিন প্রকার; তার মধ্যে 'শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা' শ্রবণ জন্য, 'চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা' মনন জন্য এবং শেষ 'ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা' নিদিধ্যাসন জন্য উৎপন্ন হয়। 'ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা' হওয়ার পর আর ব্যুত্থান হয় না।

ব্রহ্ম

সৎ (সত্য), চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দ এই তিনের সমষ্টিই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ—এ তিনই ব্রহ্মে নিত্য বর্তমান; তিনি কখনও এ তিনকে ছেড়ে থাকেন না। বেদান্ত বলেন,—আনন্দ, জ্ঞান ও নিত্যত্ব, এ তিনটি ধর্মই বাস্তবিক চৈতন্য; চৈতন্য ব্রহ্ম থেকে পৃথক নন, কিন্তু ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাত হন।

এই তিনভাব তাঁতে আছে বলেই তিনি সচ্চিদানন্দ। প্রকৃতিরূপে তিনি সদাই সৎ, পুরুষরূপে সদাই চিৎ এবং এই সৎ ও চিতের মিলনকেন্দ্রে তিনি সর্বদাই আনন্দরূপে বিকশিত। ব্রহ্মের সৎ অর্থে যাহা নিত্য, স্থির, অচঞ্চল ও অবিনাশী; চিৎ অর্থে যাহা মূল চৈতন্য—যার সংযোগে বা বিকাশে অখণ্ড বিশ্বচরাচর চৈতন্যযুক্ত হয়ে আছে; আনন্দ অর্থে যাহা অনাদি অনন্ত অক্ষয় আনন্দ—যাহা সৎ ও চিৎ ভাবের হৃদয়স্বরূপ।

তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। 'একম্'—অর্থাৎ তাঁর স্বগতভেদ নাই। গাছের যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লবাদি আছে নিরবয়ব ব্রহ্মে তেমন কিছু নাই—তাঁর অংশ হতে পারে না। 'এব'—অর্থাৎ তাঁতে স্বজাতীয় ভেদও নাই। দুটি আমগাছে যেমন স্বজাতীয় ভেদ আছে, ব্রহ্মে তা নাই, কারণ তিনিই একমাত্র আত্মা—তিনি ছাড়া অন্য আত্মা নাই। 'অদ্বিতীয়ম্'—অর্থাৎ ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদও নাই, কারণ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন পদার্থও নাই!

সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। তাঁর কোন অবয়ব নাই, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্তাও নাই। তা হলে তিনি কিরূপ?

শ্রুতি বলেন—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। অনন্ত অর্থে যার শেষ নাই, যার পরিচ্ছেদ নাই (সীমা নাই); দেশ পরিচ্ছেদ, কাল পরিচ্ছেদ, বস্তু পরিচ্ছেদ,—কোন পরিচ্ছেদ নাই। তিনি নিত্য, তিন কালেই অবস্থিত; তাই তাঁর কালকৃত পরিচ্ছেদ নাই। ত্রিলোকে সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ছাড়া কোন বস্তুই নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর স্বরূপ অধিষ্ঠানের নির্ণয় না হয়, ততক্ষণ বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হয় না। তাই ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ নাই। তাঁর দেশকৃত পরিচ্ছেদও নাই, কারণ তিনি সর্বব্যাপক বৃহৎ বলেই ব্রহ্ম।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহনত্বাচ্চ যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ'—সর্বব্যাপিত্ব এবং সকলের সংবর্ধকত্ব হেতু তিনি পরমব্রহ্ম বলে উক্ত হন। গীতায় (১৩/১২।১৭) ভগবান বলেছেন—

'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২।
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩।

সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫॥
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূত ভর্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

তিনি অনাদিমৎ,—তাঁর পরা, অপরা দ্বিবিধ প্রকাশই অনাদি। তিনি নিরতিশয় (তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই)। তিনি আছেনও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না; কারণ তিনি অতীন্দ্রিয়—অবাঙ্‌মনসোগোচর। তাঁর আশ্বর্যশক্তি প্রভাবে তাঁর হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ, মাথা, সর্বত্র এই বিশ্বের প্রাণিগণকে ব্যাপিয়া রয়েছে ; তাই তিনি সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত হয়েও সকল ইন্দ্রিয় ও সকল গুণের আভাস-সম্পন্ন ; তিনি অসংগ, অথচ সর্বভূতের আশ্রয় ; তিনি ত্রিগুণ-রহিত, অথচ ত্রিগুণের পরিণাম সুখ-দুঃখ-মোহের উপলব্ধা—ত্রিগুণের পালক। স্থাবর জংগম সকল দেহেরই অন্তরে এবং বাইরে তিনি বিরাজিত। তিনি জ্ঞানীর (যিনি আত্মোপলব্ধি করেছেন তাঁর) খুব নিকটে, আর অজ্ঞানীর (আত্মজ্ঞান-হীনের) অতিদূরে, কারণ কোটি বৎসরেও সে আত্মাকে জানবে না। তিনি আকাশের চেয়েও সূক্ষ্ম, তাই তাঁর ঈশ্বরত্ব সহজে জানা যায় না। একই সূর্য বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়ে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বলে বোধ হয়, তেমনি সকল প্রাণীতে এক ব্রহ্মই আত্মারূপে অবস্থিত হলেও প্রতিদেহে ভিন্ন বলে মনে হয়। সকল দেহের তিনিই উৎপত্তিকালে সৃষ্টি-কর্তা, স্থিতিকালে পালনকর্তা, প্রলয়ে সংহার-কর্তা। এই অবিভক্ত পরমাত্মা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব পরমাত্মার আত্মানাত্ম প্রকাশদ্বয় অবলম্বনে ভূত সকলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় দেখে ধারণা করতে হবে। কারণস্বরূপে তিনি অবিভক্ত, কার্যস্বরূপে বিভক্ত। পরমাত্মা পরম জ্যোতির্ময় ; সেই মহাচিতেরই জ্যোতি নিয়ে সূর্যচন্দ্রাদি আলো। যতক্ষণ অজ্ঞানতা থাকে, ততক্ষণ চিজ্জ্যোতির প্রকাশ হয় না, তাই অজ্ঞানরূপ তমের বিনাশে তবে তাঁর বিকাশ হয়। তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। পরমাত্মবস্তুকে জানার নাম জ্ঞান, সে বস্তুই জানবার মত জিনিষ (জ্ঞেয়) এবং জেনে যাবার মত জায়গা (জ্ঞানগম্য)।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

প্রচ্ছদ পরিচিতি

এ্যালবার্ট আইনস্টাইন

বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও ক্রমোন্নয়নের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কালজয়ী সন্তানদের অনবদ্য অবদান ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় আলোকিত করে আছে এ্যালবার্ট আইনস্টাইন সেই তালিকায় একটি অগ্রগণ্য নাম। যাঁদের অতন্দ্র তপস্যা এবং বিরামবিহীন সাধনা পৃথিবীর বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম করে দিয়েছে, মানব-সমাজে বিজ্ঞানের প্রসার প্রচুর পরিমাণে ঘটিয়েছে, সর্বোপরি এ কালের মানুষকে বিজ্ঞানমুখীন করে তুলেছে ইনি তাঁদেরই একজন।

জীবিত থাকলে আজ তাঁর নব্বই বছর পূর্ণ হোত। জার্মানী তাঁর দেশ। নিজে ছিলেন ইহুদী। দক্ষিণ জার্মানীর অন্তর্গত 'আলম' শহরে ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ তাঁর জন্ম। বাল্যকালে কিন্তু বিরাট প্রতিভার এতটুকু পূর্বাভাসও পাওয়া যায় নি। অতি সাধারণ স্থূলবুদ্ধির বালক তিনি ছিলেন। 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'—বহু প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যটি তাঁর মধ্যে যেন মিথ্যে লাগল খুব ধীর গতিতে। মিউনিক এবং মিলানে বাল্যকাল কাটল। জুরিখের ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে থেকে তিনি স্নাতক হলেন ১৯০০ সালে। তারপর বার্নে একটি পেটেন্ট অফিসে পরীক্ষকের চাকরি নিলেন। ১৯০৫ সালে জুরিখ থেকে 'ডক্টরেট' অর্জন করলেন। ১৯০৯ সালে তাঁর গবেষণা এবং বিজ্ঞান সাধনায় মুগ্ধ হয়ে জুরিখ বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে একটি পদ দিলেন। পরের বছর প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও দু'বছর পর আবার জুরিখ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কর্মভার গ্রহণ। ১৯১৩ সালে বার্লিনে কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউট থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের পরিচালক পদগ্রহণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

১৯২১ সালে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন আইনস্টাইন। ১৯৩৩ সালে তিনি বার্লিন ত্যাগ করেন এবং প্রিন্সটনে ইনস্টিটিউট ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিতে একটি পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত

* আইনস্টাইন থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ...

রাজনীতিক কারণে তাঁকে বার্লিন ত্যাগ করতে হয়, পরের বছর তাঁর জার্মান নাগরিকত্ব বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে নাগরিকত্ব প্রদান করেন

আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর তাঁর গবেষণা তাঁকে জগতের এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের জয়মাল্য এনে দেয়। পরবর্তীকালে 'বোস আইনস্টাইন' থিওরির মাধ্যমে পৃথিবীর বিজ্ঞান পরিমণ্ডলের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হল। বৈজ্ঞানিক দিকপাল আইনস্টাইন ও বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রদ্ধেয় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণার এই সমন্বয় বিজ্ঞানজগতের বহুল কল্যাণসাধন করল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা এবং শ্রদ্ধা-প্রীতির বিনিময় কারো অজানা নয়।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বেহালা বাদনেও যে কতখানি গভীর দক্ষতার অধিকারী তাও অনেকেরই সুবিদিত।

১৯৫৫ সালে প্রিন্সটনে তাঁর দেহান্তর ঘটে।

কালিদাসের অভিধান

মহামহোপাধ্যায়
ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব নামে মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। মেঘদূত নামে খণ্ডকাব্য লিখিয়াছিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র এই তিন নামে তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার সকলের চেয়ে বড় বই রঘুবংশ। তাহাকে মহাকাব্য বলিব কি না এ বিষয়ে লোকে বড়ই সন্দেহ করে। কারণ, এক বিশ্বনাথ কবিরাজ ছাড়া আর যত অলঙ্কার-লেখক মহাকাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, সে লক্ষণে রঘুবংশ পড়ে না। সে-সকল লক্ষণে এক নায়ক নহিলে মহাকাব্য হয় না; সুতরাং সে মহাকাব্যের লক্ষণে রঘুবংশের জায়গা নাই। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন, একই নায়ক বা বহুনায়ক হউক, মহাকাব্য হইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছাটা যেন রঘুবংশকে মহাকাব্যের ভিতরে ফেলা। শারদাতনয় নামে এক নাট্যশাস্ত্রকার মুসলমান আক্রমণের কিছু পূর্বে মিরাট অঞ্চলে ভাবপ্রকাশ বলে একখানি বই লেখেন। তাতে তিনি কালিদাসের রঘুবংশকে সংহিতা বলিয়া গিয়াছেন। একখাটা অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু বলার দরকার, এইজন্য বলিলাম। রঘুবংশ মহাকাব্য হউক আর নাই হউক, আমার বিশ্বাস এত বড় কাব্য আর কেহ কখনও জগতে কল্পনা করিতে পারিবে না।

কালিদাস আরও বই লিখিয়াছেন তাঁহার ঋতুসংহারখানি তাঁহার নিজের দেশের ছয় ঋতুতে বর্ণনা। তিনি গ্রন্থখানি তাঁহার প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন। এ ছাড়া অনেক ছোট ছোট কাব্য কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। শৃঙ্গারাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক, নলোদয় তাহার মধ্যে প্রধান। অনেক চুটকি কবিতা তাঁহার নামে চলিতেছে। কুক্‌কুড়িও তাঁহার নামে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার কুক্‌কুড়ি যেমন গোপাল ভাঁড়ের নামে চলে, হিন্দীর কুক্‌কুড়ি অকবর ও বীরবলের নামে চলে, সংস্কৃতের অনেক কুক্‌কুড়িও কালিদাসের নামে চলে।

কালিদাস যে কাব্য আর রসের কথা লিখিয়া শেষ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার নামে একখানি ছন্দের বই চলিতেছে। ছন্দের বই-এর কর্তা হইলেন পিঙ্গল, কালিদাসের অনেক আগে। কিন্তু পিঙ্গলের গণ আছে, মাত্রা আছে, বৃত্ত আছে, জ, গ, ম, ইত্যাদি আছে। বীজগণিতের পরিবৃত্তি অনুবৃত্তি আছে। ব্যাপারটা খুব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সহজ করিবার জন্য কালিদাস একখানি ছন্দের বই করিলেন। কঠিন ছন্দের বইকে মিষ্ট করিবার জন্য ঋতুসংহারের মত প্রায়ই প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিতে লাগিলেন। যে ছন্দের লক্ষণ সেই ছন্দেই তিনি লক্ষণ করিলেন। কোন রকম পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিলেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন, শোনবামাত্রই যাহাতে ছন্দের লক্ষণ বোঝা যায় তাহাই তিনি লিখিলেন। ইহাতে ৪৪টি কবিতা আছে, ৪১টি ছন্দের লক্ষণ আছে। পাণিনির সঙ্গে কলাপের যে সম্বন্ধ, পিঙ্গলের সঙ্গে ছন্দোবিষয়ে কালিদাসেরও সেই সম্বন্ধ। একজন লিখিয়াছেন পণ্ডিতের জন্য। আর একজন লিখিয়াছেন অপণ্ডিতের জন্য।

শ্রুতবোধ ছাড়া তাঁহার আর একখানি ছন্দের গ্রন্থ চলিতেছে, সেখানির নাম দেবীস্তুতি। উহাতে ৭১টি কবিতা আছে। ছন্দঃশাস্ত্র-ক্রম অনুসারে ৭১টি কবিতা সাজান। এক একটি কবিতায় এক একটি ছন্দ। দেবীর পা হইতে মাথা পর্যন্ত বর্ণনা। কথা আছে কালিদাস সরস্বতীর বর পাইয়া প্রথমেই সরস্বতীর স্তব করেন, মাথা হইতে পা পর্যন্ত বর্ণনা করেন। তাহাতে সরস্বতী রাগিয়া বলেন, তুই আমাকে বেশ্যার মত বর্ণনা করিলি। তোর কার্য অশ্লীল হইবে। সেই ভয়ে কালিদাস দেবীস্তুতিতে পা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভবেও তাহাই করিয়াছেন। একখানি জ্যোতিষের বই কালিদাসের নামে চলিতেছে। ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে বইখানি ছাপা হইয়াছিল গ্রন্থকার বলিতেছেন, আমিই কালিদাস—রঘুবংশ ইত্যাদি লিখিয়াছি। সুতরাং সেকালের এক পণ্ডিত কালিদাসের এক জীবনচরিত পাওয়া গেল বলিয়া খুব গোলমাল করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে জ্যোতির্বিদাভরণের কালগণনার আরম্ভ ১৬শ শতাব্দীতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের বাড়ী উৎকলে ছিল। কালিদাসের সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়া আমরা এখন তাঁহার অভিধানের কথা বলিব। আমাদের আজকার বলিবার বিষয়ই সেই অভিধান।

মাদ্রাজের গভর্নমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে কয়েকখানি পুঁথি আছে। তার মধ্যে একখানি 'নানার্থশব্দরত্নম্' ও তাহার টীকা 'তরলা'। মূল পুঁথিখানি কালিদাসের, টীকাটি 'নিচুল'-এর। রাওবাহাদুর রঙ্গাচারীয় প্রথম এই অভিধানখানির নাম প্রকাশ করেন ও বিবরণ লেখেন। ইনি লিখিয়াছেন, অভিধানখানি 'এ কালিদাস'-এর লেখা। অর্থাৎ কালিদাস নামে অনেক লোক ছিল। তাহার মধ্যে কোন অপ্রসিদ্ধ কালিদাসের লেখা। মহাকবি কালিদাসের লেখা নয়। তাঁহার দেখাদেখি আর যে কেহ এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাঁহারাও ঐভাবে লিখিয়া-

ছেন। রামঅবতার শর্মা তাঁহার কল্পদ্রুমকোষের ভূমিকায় অভিধানশাস্ত্রের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি নানার্থশব্দরত্নকে অনেক পরে ফেলিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের পরেই ফেলিয়াছেন।

কিন্তু এই অভিধানখানি মহাকবি কালিদাসের বলিবারও নানা কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, কালিদাস মেঘদূতের ১৪ শ্লোকের শেষ অংশে লিখিয়াছেন—

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্
মুখঃ খং।
দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্
স্থূলহস্তাবলেপান্।

অর্থাৎ এই স্থান হইতে উত্তর-মুখো হইয়া তুমি আকাশে ওড়। এই জায়গাটি বড় মনোহর। এখানে বেতগাছগুলি বড় সরস। দেখিও যাইবার সময় দিঙ্‌নাগেরা যেন তাহাদের মোটা শুঁড় তোমার পিঠে বুলায় না। এই স্থানে মল্লিনাথ টিপ্পনী করিয়াছেন যে, নিচুল শব্দে বেতগাছ বুঝায়। কিন্তু নিচুল একজন কবির নাম। তিনি কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। এবং কালিদাসের কাব্যের ভাল সমালোচনা করিতেন। আর দিঙ্‌নাগ নামে একজন বড় বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার দল ভুক্ত লোকে কালিদাসের কাব্যের মন্দ সমালোচনা করিত

মল্লিনাথের একথা যদি সত্য হয়, আর নিচুল যোগিচন্দ্র যদি কালিদাসের নানার্থরত্নের টীকা করিয়া থাকেন তাহা হইলে আর 'এ কালিদাস' বলিলে চলিতে পারিবে না। অভিধানকার যেন মনে হয় 'দি গ্রেট কালিদাস'।

অভিধানখানি নানা দিক্ থেকে একখানি আশ্চর্য বই বলিয়া মনে হয়। এ যে ইদানীন্তন কেহ লিখিয়াছেন তাহা মনে হয় না। আমরা এ অভিধানখানির ও তাহার টীকার একটু বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

অভিধানের মঙ্গলাচরণটি রঘুবংশের মঙ্গলাচরণটির মত। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির নমস্কার।

তমেব শিরসা বন্দে পার্বতীভর্তারমাদিকে।
কীর্ত্যং স্বযোক্ষবন্ধাদৌ
সব্যাবামসিতাসিতঃ॥'
—কলি : পৃঃ ১১৭১।

কালিদাস যে শৈব ছিলেন সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। শেষ বয়সে তিনি অর্ধনারীশ্বর মূর্তিরই উপাসক হইয়াছিলেন। এখানে এবং রঘুবংশে দুইয়েতেই অর্ধনারীশ্বরের কথা আছে। যেমন পিঙ্গলকে সহজ করিবার জন্য তিনি শ্রুতবোধ লিখিয়াছিলেন, এ অভিধানখানিও তেমনি তিনি—

তত্রাপ্যেকাদিধাত্বর্থবাচকত্বে নিগ্রনিতে,
মহাভাষ্যাদিবল্লোকে গ্রহীতুং নহি
শক্যতে॥
অতো যেনৈতদখিলমায়াসাতিশয়ং বিনা।
জ্ঞায়তে সুষ্ঠু সর্বার্থশব্দরত্নং প্রদর্শ্যতে॥

অতিশয় আয়াস না করিয়া সহজে যাহাতে বোঝা যায় তাহারই জন্য লিখিয়াছেন। এ গ্রন্থখানি যে প্রাচীন তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। তিনি শব্দশাস্ত্রের মধ্যে পাণিনি, শক্তি, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র নির্মিত ব্যাকরণের কথা বলিয়াছেন। পাণিনি, চন্দ্র, ইন্দ্র নির্মিত ব্যাকরণ লোকের জানা আছে। বোপদেব যে আটজন আদি শাব্দিকের নাম করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে এ তিনজনের নাম আছে। কিন্তু সূর্য আর শক্তির নাম কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সূর্যের যে একখানি ব্যাকরণ ছিল তাহার কিছু প্রমাণ আমি পাইয়াছিলাম, তাহা ত্রিশ বৎসর পূর্বে। তখন আমি তাহার বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। নেপালে আমি 'পদসূর্যপ্রকাশ' নামে একখানি বই পাই। আমি সেখানি কলাপ ব্যাকরণের বই বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কালিদাসের অভিধানে সূর্যের নাম পাইয়া আমি আবার পদসূর্য ব্যাকরণ দেখি। তাহাতে লেখা আছে, সর্ববর্মা ও গুহ প্রভৃতির মতের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদসূর্য ব্যাকরণ লেখা হইতেছে।

সুতরাং পদসূর্য ব্যাকরণ কলাপ হইতে স্বতন্ত্র। এবং এখন যে লোকে কলাপ ব্যাকরণকে কার্তিকের লেখা বলে সেটাও ঠিক নয়। কারণ, সর্ববর্মার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র এবং গুহের অর্থাৎ কার্তিকের ব্যাকরণ স্বতন্ত্র। এই দুইখানি ব্যাকরণের পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা ঠিক বলিতে যদিও পারা যায় না, তাহারা যে স্বতন্ত্র তাহা ঠিক বলিতে পারা যায়। গরুড়পুরাণে দু অধ্যায় ব্যাকরণের কথা আছে। তাহাতে কার্তিক ও কাত্যায়ন দুজনের সংবাদ আছে এবং গরুড়পুরাণের যে ব্যাকরণ তাহা সূত্রে লেখা নয়। সিদ্ধ অর্থাৎ চলিত উদাহরণের দ্বারা শিখান হইত কিন্তু গরুড়পুরাণে যে সকল উদাহরণ আছে তাহা সর্ববর্মার কাতন্ত্র ব্যাকরণেও আছে। সুতরাং কার্তিক, সর্ববর্মা, সূর্য ইঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাকরণের কর্তা। এ খবরটি আমরা কালিদাসের অভিধান হইতেই পাইলাম।

তাহার পর টীকাকারের কথা। মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন, টীকাকার নিচুল কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। সেই নিচুলই দেখিতেছি কালিদাসের অভিধানের টীকা করিতেছেন। তিনি গোড়ায়ই বলিয়াছেন—

স্বমিত্রকালিদাসোক্তশব্দরত্নার্থজৃম্ভিতাম্।
তরল্যাখ্যাংলসদ্ব্যাখ্যামাখ্যাস্যে
তন্যতানুগাম্॥

সুতরাং তিনি যে কালিদাসের বন্ধু ছিলেন একথা নিজেই স্বীকার করিতেছেন। কালিদাস পাঁচজন ব্যাকরণকারের নাম লিখিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন যে, ব্যাকরণকার ছয় জন, শম্ভু (শিবসূত্র-পাণিনি), শক্তি, কুমার, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র। এসংবাদ তিনি রহস্য নামক গ্রন্থ হইতে তুলিতেছেন। তিনি আরও বলিতেছেন—

শ্রীশক্তিশম্ভুসূচিত বিভক্ত্যাকলন-
সিদ্ধপদযোগাৎ।
চক্রে কুমারমূর্তিব্যাকরণং
সর্বদেশরসার্থম্॥

অর্থাৎ কুমার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহা শক্তি শম্ভু প্রভৃতির নিয়মানুসারে সিদ্ধ অর্থাৎ চলিত পদগুলি লইয়া করিয়াছেন।

নিচুল কবি কে ছিলেন? তিনি ভোজ মহারাজের প্রবোধিত হইয়া এই টীকা লিখিয়াছেন। ভোজমহারাজ বলিলেই তো একাদশ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ একাদশ শতাব্দীর ভোজ ধারা নগরাধিষ্ঠিত মহারাজাধিরাজ ভোজ। কিন্তু নিচুলের ভোজ মহারাজশিরোমণি ভোজমহারাজ। দুই ভোজ এক নয়। নিচুলের ভোজ খুব প্রাচীন হওয়ারই সম্ভাবনা।

কালিদাস যে অভিধানখানি পণ্ডিতের জন্য লেখেন নাই, সর্বসাধারণের জন্য লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজে বলিয়াছেন। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, কালিদাসের বর্ণমালা 'অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত।' বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে দুইরূপ বর্ণমালা চলিতেছে—পণ্ডিতের জন্য অকারাদি হকারান্ত, আর সাধারণ লোকদিগের জন্য অকারাদি ক্ষকারান্ত। পাণিনি আদি বৈয়াকরণেরা 'ক্ষ'কে সংযুক্ত বর্ণ বলিয়া বর্ণমালার মধ্যে ধরেন নাই। বৌদ্ধ বৈয়াকরণেরাও ঐ পথেই গিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধ বই-এ 'ক্ষ' বর্ণমালায় ভুক্ত আছে। তাহার উদাহরণ ললিতবিস্তর। বুদ্ধদেব যে বর্ণমালা শিখিয়াছিলেন তাহার শেষে 'ক্ষ' আছে।

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন অভিধানকার কালিদাস 'এ কালিদাস' কি 'দি কালিদাস।'

নকুল দাসের চিত্র প্রদর্শনী

বিড়লা একাদেমী অব আর্ট এ্যাণ্ড কালচার ভবনে সম্প্রতি তরুণ শিল্পী নকুল দাসের একটি সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছিল ছোট ১৮খানি চিত্র।

শ্রীদাস চিত্রের কি গঠনের ক্ষেত্রে কি বিষয়বস্তুতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সাথে যা সমাজের বাস্তব অবস্থাকে চিহ্নিত করে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য অনুধাবন করা যায় না। এক কথায় জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত বিষয়বস্তুকে শিল্পী সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রদর্শনীতে শিল্পী 'রিফ্লেকশনে'র যে কয়টি চিত্র উপস্থিত করেছেন, সেইগুলির মধ্যে একমাত্র তাঁর কৃতি প্রকাশ পায়—এখানে তিনি রং ও গঠনের মধ্যে দিয়ে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। সব চেয়ে ভাল লাগে তাঁর ইমপ্যাস্টো প্রথায় আঁকা কলার 'রিফ্লেকশন'। একটি ছবি সকলের চোখে পড়ে 'সূর্যাস্ত' এবং 'উষা সমাগম' ছবিতে একটি শান্ত-শীতল গাম্ভীর্যের ভাব বেশ উপভোগ্য। তার ফিগারের কাজও রয়েছে চার, সাত ও বার নম্বরে। এর মধ্যে নীলে সবুজে মেশা নারী-মূর্তিতে কিছুটা আকর্ষণ ঘটেছে। শিল্পীর আগামী প্রদর্শনী আশা করি, আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

মনে করুন ট্রেনে করে লম্বা পাড়ি দিচ্ছেন; কামরায় আপনি একা। হাতের ম্যাগাজিনটার গল্প-উপন্যাস-অনুবাদ, এমন কি আধুনিক কবিতা-গুলিও পড়ে ফেলেছেন। একবার পড়লেন—দু'বার পড়লেন। শেষে 'ধুত্তেরি' বলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে দার্শনিক হবার চেষ্টা করবেন বোধ হয়। ম্যাগাজিনটা পড়লেন তন্ন-তন্ন করে কিন্তু বাদ দিয়ে গেলেন—বিজ্ঞাপন-গুলি। বিজ্ঞাপন পড়বার চেষ্টা করেছেন কি কখনো? না করলে বিজ্ঞাপনের ভাষাতেই বলবো—'আপনি জানেন না আপনি কি হারাইতেছেন'।

ভাবছেন হয়তো, বিজ্ঞাপন আবার কি পড়বো। কিন্তু মনে করুন কাগজে একটি ছবি বেরুলো—গরাদে ঘেরা একজন মহিলা, আর ছবির উপরে বড় বড় করে লেখা 'হাজব্যাণ্ড মেড ওয়াইফ প্রিজনার ইন ওন হোম।' ভবে? চমকে উঠবেন? বিলেতের একটি খবরের কাগজে এটি বেরিয়ে-ছিলো। ছবির নীচে ছোট ছোট হরফে মহিলার করুণ কাহিনী। তাঁর বাড়ীতে সারাদিন কাজ; সব চেয়ে বেশি কাজ—কাপড় কাচা। এর ফলে তিনি বাইরে বেরুবার মোটেই সময় পেতেন না।

এই দেখে ভদ্রমহিলার ভাই স্বামী-মহাশয়কে বললেন—আমার বোন এখানে বন্দী-জীবন যাপন করছে।

সাজেশান চাইলেন ভদ্রলোক—'কি করে, এই অবস্থা দূর করা যায়?'

উত্তর দিলেন ভাইটি—'যদি, হ্যাঁ যদি রোল্‌স্ কোম্পানীর কাপড়-কাচার মেশিন ব্যবহার করেন।'...

ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছেন নিশ্চয়ই। এদেশী কাগজে বিজ্ঞাপনের কলমে বড় বড় লেখা বেরুলো ডিউলি কর উওম্যান।'

একনিঃশ্বাসে শুধ ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও পড়ে ফেললো। কি ব্যাপার? স্বামীকে সমাজে আরো গণ্যমান্য দেখতে চাইলে কিনে দিন প্রিন্স ব্লেড। বলুন দু'বেলা প্রিন্স ব্লেডে দাড়ি কামাতে।

অনিরুদ্ধ

কাগজে একটি বাইয়ের বিজ্ঞাপনে বেরুলো—'বিয়ের আগেই বইটি থেকে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করুন। বিয়ের পরে স্বামীকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চাইলে সকল মেয়েরই বইটি পড়া উচিত। অসংখ্য চিত্রসহ খোলাখুলি সবকিছু বর্ণনা করা হয়েছে। স্বদেশী ও বিদেশী অভিজ্ঞদের সাহায্যে বিস্তৃতভাবে সব লেখা হয়েছে। দাম সাড়ে পাঁচ টাকা, ডাক খরচা দেড় টাকা।

বিজ্ঞাপনে কিন্তু বইটির বা লেখকের কোন নাম নেই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অসংখ্য লোক স্বনামে-বেনামে বইটি আনালেন। সকলেই অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে বইটি হাতে পেলেন—'সরল রন্ধন-প্রণালী'।

খবরের কাগজের 'ব্যক্তিগত' কলম পড়েন কি? তাহলে নীচের বিজ্ঞাপনগুলি নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে।

১। 'অভিজ্ঞ বিদেশিনীর কাছে ইংরাজীতে কথা বলিতে শিখুন—স্পোকেন ইংলিশ—গড়িয়াহাট মার্ট—।'

২। 'বরষের পর বরষ যায় চলে; চৈত্র শেষ বিদায় জানায় মায়ের চোখে জল, অন্তহীন ভাবনা—কন্যা ডাক্তার হলো, পাত্র কই। এবারে ভরসা দিয়েছেন—লিখুন—ঘটক—।'

৩। যে বাড়ীতে পছন্দসই জিনিষের কদর, সে বাড়ীর জন্য ভাল জাতের এ্যালসেশিয়ান বিক্রয় হইবে। লিখন—।'

৪। মা, গত বছর এমনি দিনে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছো। কত কেঁদেছি, তুমি এলে না।—ভগবানের কাছে জানাই তোমার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ইতি, তোমার হতভাগ্য সন্তান—

শ্রী এ ব্যানার্জী (আই-এ-এস)।

শ্রী আর ব্যানার্জী (এম-এ বি-এল, ডব্লিউ বি সি এস)।

কর্নেল পি ব্যানার্জী (ইণ্ডিয়ান আর্মি)।

৫। গত ৫ই মার্চ ৩৩ নং ট্রাম হইতে সবুজ শাড়ী—সাদা ব্লাউজ পরা যে মহিলাটি এলগিন রোডে বেলা চারটার সময় নামিয়াছেন, তিনি কি বিবাহিতা? অবিবাহিতা হইলে লিখুন—বস্তু, ৩ নং—।

বিলেতের একটি কাগজের ব্যক্তি-গত কলম-বিজ্ঞাপন কিন্তু সকলকে টেক্কা মেরেছে। বিজ্ঞাপনটি ছিলো—

'ধূমপান করেন না, এমন স্বামী চাই।'

মিস স্ট্যাথাস---।

বিজ্ঞাপন কোথায় কোথায় থাকে তার হিসাব দেওয়া মুস্কিল। খবরের কাগজ, বই-খাতা, বাড়ীর দেয়াল, বাস-ট্রাম, লাইট-পোস্ট, এমন কি দেশ-লাইয়ের বাক্সেও। আর সে বিজ্ঞাপনের রকমই বা কত. বৈচিত্র্যই বা কত।

চা-সাবান-ব্লেড থেকে শুরু করে কাপড়-জামা-শাড়ী, বই, রাজনীতি, ছাত্রনীতি, সিনেমা—এককথায় সাড়ে বত্রিশ ভাজা। এবারে বলুন দেখি, বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে বড় কথাটি কি? সাইকোলজী, হ্যাঁ মনস্তত্ব। দেখুন না, গুঁড়ো সাবানের প্যাকেটমাত্রই নীল, কারণ মেয়েরা নীল রং বেশি পছন্দ করে।

বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের খেলবার রং লাল, কারণ তারা তাই-ই ভালবাসে। এই বুঝেই ব্যবসায়ীরা তাঁদের মালে রং লাগান। সঙ্গে সঙ্গে নামটিও হওয়া চাই পছন্দসই। গাড়ীর নাম হওয়া চাই বিলেতী ধরণের, স্নো-পাউডারও তাই, তবে শাড়ীর নাম ভাবনীয় হতে হবে। ছেলেদের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের নাম মেয়েলি ধরণের দিলেই মুস্কিল; বিক্রী কমে যাবে।

সেলুনের দরজায় WELL-COME লেখা থাকলে মনে মনে নাপিতের মুণ্ডপাত করবেন না কিন্তু। কারণ বানানটি ইচ্ছা করেই ভুল করা হয়েছে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। না হলে 'উজ্জ্বলা' সিনেমা হলের ম্যানেজার কি আর নিরক্ষর? জুতোর দোকানের নাম 'শ্রীচরণেষু' লেখা থাকলে 'বেঙ্গলী ইন ডেঞ্জার' বলে চেঁচিয়ে উঠবেন না। আসল কথাটি হচ্ছে—শ্রীচরণে সু (Shoe)।

ট্রামে 'স্মোকিং প্রহিবিটেড' লেখা থাকলেই ভাববেন না ওটি ট্রাম-কর্তৃপক্ষের আদেশ। ভাল করে লক্ষ্য করলে অনেক সময়ে দেখবেন স্মোকিং প্রহিবিটেড-এর পাশে লেখা আছে—নট ইভন 'নাম্বার টেন'।

সিনেমার বিজ্ঞাপনে 'সাসপেন্স' বা স্টান্ট থাকা চাই-ই চাই। কি বলতে চায় ঐ পোষা বেড়াল ও ময়নাটি?'—রক্তপলাশের এই বিজ্ঞাপনটি দেখেছেন নিশ্চয়ই। কিংবা কাচের স্বর্গের বিজ্ঞাপনের সেই লেখাটি—'মানুষকে ঠকিয়েছি আমি, মনুষ্যত্বকে নয়'। 'এল সিডের' বিজ্ঞাপনে নায়িকা এলিজাবেথ টেলরের উপরে নায়ক চার্লটন হেস্টনের নাম দিয়েছিলেন পরিচালকমশাই। ব্যাস্! ক্ষেপে গিয়ে লিজ টেলর পরিচালকের বিরুদ্ধে এক মামলা ঠুকে দিলেন সম্মানহানির জন্য।—নায়িকাদের নাম গোপন করে জনসাধারণের কৌতূহল বাড়িয়ে দেওয়া হয় অনেক সময়ে। যেমন 'তিন দেবীয়াঁ'।

কাগজের উপর চোখ মেললেই দেখবেন, আপনার ছেলের পড়া, মেয়ের বিয়ে, রিটায়ার্ড লাইফের বাসস্থান ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যার কি সুন্দর উপায়ে সমাধান করে দিচ্ছে ব্যাঙ্ক আর ইন্সিওরেন্সের কোম্পানীগুলি। হেমন্ত মুখার্জীর মত গান গাইতে হলে ডোয়াকিনের হারমোনিয়াম, বৈজয়ন্তীমালার মত সৌন্দর্য ও লাবণ্যের জন্য লাক্স, হারকিউলিসের মত স্বাস্থ্যের জন্য চ্যবনপ্রাশ এবং পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী মেয়েদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য গোয়ালিয়র স্যুটিংয়ের কাপড় আপনাকে ব্যবহার করতেই হবে।—আপনার অনেক বয়েস হয়েছে? তবে আপনার স্ত্রী, খুড়ি, মিসেসকে নিয়ে ঘুরে আসুন কেদার-বদ্রী, বৃন্দাবন-মথুরা। সাড়ে তিনশ টাকায় ব্যবস্থা করে দেবে কুণ্ডুবাবুর স্পেশাল বা ভারত দর্শন পার্টি।

রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন অলসভাবে? চোখ দুটো উপরে রেখে চলুন, দেখবেন হরেক রকমের বিজ্ঞাপন। একটি অর্ধেক ছেঁড়া, কোনটি সিকি, কোনটি আবার আরেকটির উপরে সেঁটে গিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জয় ঘোষণা করছে। 'কংগ্রেসপ্রার্থী—বাবুকে ভোট দিন। তিনি আপনাদের—' পোস্টারের নীচেই পড়েছে সিনেমার পোস্টার 'আপনজন'। 'কম্যুনিস্ট দলের শ্রীমতী—দেবী আপনাদের ভোটপ্রার্থী—' পোস্টারের নীচে লেগে রয়েছে সিনেমার পোস্টার—'স্যরি ম্যাডাম'। 'কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনে আমরা কি পেয়েছি?' —বাকী অংশটুকু ছেঁড়া, গায়ে লাগানো অন্য পোস্টার—'পাগলের মহৌষধ'। এসব ছাড়াও কবিতায় ভোটরঙ্গ চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই, যেমন—

'একতে দেশ, কখতে চীন
জোড়া বলদে ভোট দিন'

কিম্বা

'মাতা যাদের এলিজাবেথ,
পিতা যাদের নিকসন্
তাদেরই কি ভোট দেবে
সর্বহারা জনগণ?'

এইসব ভোট বিজ্ঞাপন ছাড়াও দেখবেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বিজ্ঞাপনে বাবা ছেলেকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন। চৌরঙ্গীতে রাত্রে দেখবেন আলোর খেলা: সারাবছরই ওরিয়েন্ট-এর পাখা ঘুরে চলেছে। লিপ্টনের চা কেটলি থেকে কাপে ভর্তি হচ্ছে। ভবানীপুরে 'সিজার্স'-এর হরফগুলি এক-একটি করে জ্বলছে-নিভছে।

এবারে আসুন বইয়ের বিজ্ঞাপনে। নাম দেখে ধাঁধা লাগা অস্বাভাবিক নয়। 'পিয়া মুখ চন্দা' নামে দু'টি বই আছে দুই লেখকের। আবার 'বিমল কর' নামেও দু'জন লেখক আছেন। 'সন্ধ্যা জানতো এ ঘটবেই। এ ঘটনার জন্যে সে প্রস্তুতই ছিল, কিন্তু ঘটনাটি যখন ঘটলো সে অবাক হলো।'—'রক্ত সন্ধ্যা' উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে এই কথা থাকলে আপনার নিশ্চয়ই ইচ্ছা হবে বইটি পড়ি। আওরঙ্গজেবের সময়ে ইতিহাস লেখা নিষিদ্ধ ছিলো, কিন্তু বর্তমান লেখকেরা তাঁদের যোগশক্তি-বলে (?) আওরঙ্গজেবের হারেমের খবর আপনাকে জানাচ্ছেন। রবিঠাকুরের কোন বই কিনতে হলে বৈশাখ মাস অবধি অপেক্ষা করুন; কনসেশন পাবেন।

আপনার ভবিষ্যতে কি আছে জানতে চান? একটি ফুলের নাম লিখে পাঠিয়ে দিন জলন্ধরে, কিংবা নামী-বেনামী জ্যোতিষীদের কাছে। লিস্ট পাবেন পঞ্জিকাতে। ঐ পঞ্জিকাতেই 'বৃহৎ লাল মূলা' 'অস্ট্রেলিয়ান লাউ' 'আমেরিকান টমেটো'—সব কিছুর খবর পাবেন। রাতদিন টাকার চিন্তা করে বলে ব্যবসায়ীদের রস-কষ নেই ভাববেন না যেন। এই দেখুন না, হোটেলের নাম রেখেছে—'নির্জন নিকেতে' আর বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন

'সবারে করি আহ্বান' লিখে। মাথার তেলের বিজ্ঞাপনেও কবিতা---'মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি'। 'কালো? তা সে যতই কালো হোক---' ---না, শান্তিদেব ঘোষের গান নয়, আই-ব্রো পেন্সিলের বিজ্ঞাপন।

পাশ্চাত্যে ছুটি কাটানোর জন্য বড় বড় জাহাজ কোম্পানীগুলি বিজ্ঞাপন দিলো নাচ-গান-সিনেমা-পার্টি সহযোগে জলবিহার। একটি কোম্পানী কিন্তু লিখলো---'যদি নির্জনে জলবিহার করতে চান আসুন---'। দেখা গেলো ঐটির টিকিটের জন্যই সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়েছে।

এই হলো বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞ লোকেদেরও আপন করে নেবার শক্তি আছে এর। বিজ্ঞাপন পড়ুন, দেখুন, করুন, বলুন---আনন্দ পাবেন। দিকে দিকে এরই জয়। তাই আবার বলি, বিজ্ঞাপনকে অবহেলা করবেন না, কারণ যুগটা বিজ্ঞানের নয়---বিজ্ঞাপনের।

শেষ জেপেলিন
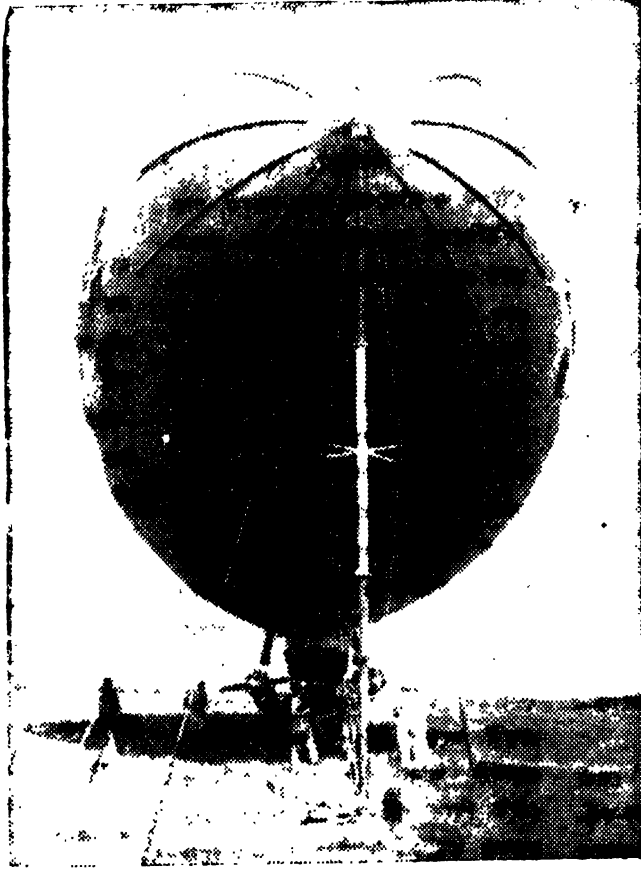
প্রথম জেপেলিন তৈরীর প্রায় সত্তর বছর পরে সর্বশেষ বিশালকায় এই আকাশযান ইউরোপ ছেড়ে জাপানে চলে গেল---যেখানে একে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগান হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাউণ্ট জেপেলিন পরিকল্পিত 'বাতাসের চাইতে হালকা' আকাশযানের প্রতীক প্রায় চার টন ওজনের এই জেপেলিন যুদ্ধের সময় বোমাবর্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত হত। ১৫০ ফুট লম্বা এবং ৬০ মাইল গতিবেগসম্পন্ন জেপেলিনের কৌলীন্য গেছে অবশ্য অনেকদিন---জার্মানীতে এবং ইউরোপের অন্যত্র এর ব্যবহার হচ্ছিল বহুদিন ধরেই বিজ্ঞাপনের কাজে।

বাতাসের চাইতে হাল্‌কা আকাশযানের দিন অনেককাল আগেই বিগত---বাতাসের চাইতে ভারী এরোপ্লেন এর উপযোগিতাও প্রমাণিত নিঃসন্দেহে। কাজেই, সুবিপুল দেহভারাক্রান্ত জেপেলিন আজ প্রোলেতারিয়েত দলভুক্ত---আর কৌলীন্য নাই, দাপটও নাই, তে হি নো দিবসা গতাঃ।

লক্ষ্মীপ্রিয়া

চৈতন্যের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া, দ্বিতীয়া বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রথম বিবাহের সময় শ্রীচৈতন্যের বয়স কুড়ি বৎসরও পূর্ণ হয় নি, তখনও তিনি গঙ্গাদাস ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীর ছাত্র। লক্ষ্মীপ্রিয়ার অপ্রত্যাশিত অকালমৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। দুই পত্নীর কোন পত্নী নিয়েই তিনি বেশীদিন সংসার করতে পারেন নি। লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহের অল্পদিন পরেই মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ পরিক্রমায় যান, আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে পরিণীত হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পিতৃ-পিণ্ডদানের জন্য গয়াধামে গমন করেন। তৎকালে ভাল পথঘাট এবং দ্রুত যানবাহনের সুযোগ না থাকায় দেশভ্রমণ সময়সাপেক্ষ ছিল।

চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গয়া থেকে আসার পর এক বৎসর তিনি নবদ্বীপ ছিলেন কিন্তু এই এক বৎসর তাঁর আর সাংসারিক মানুষের জীবন ছিল না। তখন তাঁর ভিতরে কৃষ্ণানুরাগের প্লাবন এসেছে। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গেও তাঁর বৎসরাধিক কাল কেটেছে। মোটের উপর দুই স্ত্রীর কোনও জনকে নিয়েই তাঁর বেশীদিন সংসার করা হয় নি—বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে ত' বোধ হয় একেবারেই হয় নি।

তার মধ্যে লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন প্রভুর নির্বাচিতা বধূ—পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ শৈশব থেকে। ছেলেবেলায় গঙ্গার ঘাটে দু'জনের প্রথম পরিচয় প্রাণবন্ত বালক-চৈতন্যের চাপল্যের মধ্যে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

কভু শিশু সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে
কন্যাগণ আইলা তথা দেবতা পূজিতে।
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা।
কন্যাগণে কহে, আমা পূজ, আমি দিব বর
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিংকর।
আপনি চন্দন পরি, পরেন ফুলমালা
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা।
ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনহে নিমাই
গ্রাম সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই।
আমা সবার উপরে এ সব করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতা সজ্জ, না কর অন্যায়।
প্রভু কহে তোমা সবায় দিনু এই বর

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

তোমা সবার ভর্তা হবে পরম সুন্দর।
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ
বাহিরে ভর্ৎসনা করে মিথ্যা দিয়া দোষ।

পাঁচশো বছর আগেকার বাংলা দেশের গঙ্গাঘাটের শিশুমেলার এক সুন্দর দৃশ্য। কয়েক লাইন পরের বর্ণনায় লক্ষ্মীপ্রিয়ার আবির্ভাব---

একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান।
তারে দেখি প্রভু হইলা সাভিলাষ মনে
লক্ষ্মীচিত্ত প্রীতি পাইল প্রভুর দর্শনে।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির সঞ্চার হল। তার পরের লাইনগুলি আরও তাৎপর্যপূর্ণ—

সাহজিক প্রীতি দোঁহার হইল উদয়
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়।
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস,
দেবপূজা ছলে দোঁহে কৈলা পরকাশ।
প্রভু কহে আমা পূজ, আমি মহেশ্বর
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর।
লক্ষ্মী দিল অঙ্গে তাঁর পুষ্প ও চন্দন
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন।

বর-কনের দেখাশোনা, আলাপ আলোচনা এবং কনের বরমাল্য দান ত' এইভাবে শৈশবের খেলাচ্ছলে হয়ে গেল।

খেলাঘরের এই খেলার বিয়ের পর অনেক বছর কেটে গেল। প্রভু এখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলের খ্যাতি-সম্পন্ন ছাত্র। একদিন গুরুগৃহ থেকে অধ্যয়ন করে ফিরে আসছেন। এমন সময় দেখতে পেলেন সেই খেলাঘরের বৌ-কে। সে গঙ্গাস্নানে চলেছে---

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে
বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে।
পূর্বসিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় হইলা
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইলা।

পূর্বসিদ্ধ ভাব এখানে পূর্বসিদ্ধ প্রেমভাব। শৈশবের অঙ্কুরিত বীজ পল্লবিত হতে চলেছে। পূর্বের সেই 'সাভিলাষ' মনের অভিলাষ জননীর কাছে প্রভু ইঙ্গিতে জানালেন।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর চৈতন্য-ভাগবতেও গঙ্গাঘাটের পথে এই দুজনের দেখা-দেখির কথা উল্লেখ করেছেন—

দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই স্থানে।
নিজ লক্ষ্মী দেখিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু-পাদদ্বন্দ্ব।

আসন্ন-যৌবনা একটি কিশোরীর সঙ্গে পূর্বপরিচিত এক যুবকের গঙ্গা-পথে দেখা। বুঝতে পারা গেল খেলার প্রেম, সত্যকার প্রেমে পরিণত হয়েছে। কতদিন পরে আবার দুজনে দেখা একান্তই আকস্মিকভাবে। তরুণের মুখে হাসি। নির্বাক কিশোরী চোখের দৃষ্টিতে সে হাসি স্বীকার করে নিল কিন্তু চাপল্যের বা প্রগলভতার লেশমাত্র

নেই। একান্ত সুশৃঙ্খ শান্ত পবিত্র প্রণয়-চিত্র।

বনমালী ঘটক এই মেয়েটার বিয়ের সংবাদ দিতে এল শচীমা'র কাছে। কিন্তু শচীমা পুত্রের বিয়ের প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না। শচীমা'র কাছে নিমাই যে এখনও ছোট, পিতৃহীন পুত্র একটু বড় হোক, লেখাপড়া শেষ হোক, তারপর বিয়ের কথা---

আই বলে পিতৃহীন বালক আমার
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য আর।

দুঃখিত মনে বনমালী ঘটক ফিরে যাচ্ছে, পথে প্রভুর সঙ্গে দেখা। প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ঘটক, কোথায় গিয়েছিলে আর এত বিমর্ষই বা কেন?'

ঘটক উত্তর দিল, 'আরে ভাই, বল্লভাচার্যের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে তোমার মায়ের কাছে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছি। তিনি ত' আমাকে ভাল করে সম্ভাষণই করলেন না।'

কথাটা শুনে প্রভু যেন কেমন নিরুৎসাহ বোধ করলেন, বাড়ীতে এসে মাকে বললেন,---বনমালী ঘটক তোমার কাছে এসেছিলেন, তাঁকে ভাল করে সম্ভাষণ কর নি কেন মা? লোকটি মনে ব্যথা পেয়েছে।

পুত্রের প্রশ্নের ইঙ্গিত পুত্রগতপ্রাণা জননীর বুঝতে দেরি হল না। তিনি বনমালী ঘটককে ডেকে বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হতে বললেন।

মেয়ের বাপ বল্লভ মিশ্রের কাছে সম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ামাত্র, তিনি সে প্রস্তাব লুফে নিলেন। কিন্তু নিজের দারিদ্র্যের জন্য সংকোচ বোধ করে ঘটককে বললেন---

সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই
আমি যে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই।
কন্যামাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া
এই আজ্ঞা সভে তুমি আনিবে মাগিয়া।
---চৈতন্য ভাগবত।

শচীমাতা সনাতন মিশ্রের এই প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন তিনি বিবাহে সম্মতি দিলেন। সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেলে বর-কনে দুজনেই যে মনে মনে আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করেছিলেন, কোনও গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ না থাকলেও এটা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবার পুত্রের এই বিবাহে বিশেষ ধুমধাম করা সম্ভব হয় নি। বিশেষত মহাপ্রভুর সামাজিক মানযশের ও জনপ্রিয়তার তখনও প্রতিষ্ঠা হওয়ার মত বয়স ও পদমর্যাদা হয় নি। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিয়ের সময় ঘটা করা হয়েছিল রাজপুত্রের বিয়ের মত। লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতের বিবাহের বৃহৎ ব্যয় বহন করতে তখন এগিয়ে এসেছিল, প্রভুর গুণগ্রাহী বহু ধনী ব্যক্তি।

আশৈশববাঞ্ছিত বধূ এল সংসারে। বরের ছাত্রাবস্থারও শেষ হল। গুরু গঙ্গাদাস পাণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর সর্বোত্তম পড়ুয়া নিমাই, গুরুর আজ্ঞা নিয়ে নিজে টোল খুললেন।

নতুন বৌ সংসারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই, একদিকে নিমাই পণ্ডিতের মান যশ প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়তে লাগল, অন্যদিকে তেমনই অভাবের সংসারে প্রাচুর্য ও লক্ষ্মীশ্রীও দেখা দিতে লাগল। শচীমা'র এবং প্রতিবেশীদের ধারণা হল লক্ষ্মীপ্রিয়া সত্যসত্যই লক্ষ্মী-বৌ। এমন পয়মন্ত বৌ দেখা যায় না।

লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামিগৃহে এসে কিভাবে সর্বজনপ্রিয় হয়ে সংসার করতে লাগলেন, তার এক অতি মনোজ্ঞ বর্ণনা আমরা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে দেখতে পাই---

একেশ্বর লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন
তথাপিহ সতত সন্তোষযুক্ত মন।
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাড়ে অতি।
উষাকাল হইতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম
আপনে করেন সব, সেই তান ধর্ম।
দেবগৃহে করেন যে স্বস্তিকমণ্ডলী
শঙ্খচক্র লিখেন হইয়া কুতুহলী।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল
ঈশ্বর পূজার সজ্জ করেন সকল।
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন।
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি গৌরাঙ্গসুন্দর
মুখে কিছু না বোলেন সন্তোষ অন্তর।

একটি শান্তিময় স্নিগ্ধতাপূর্ণ সন্তোষ ও তৃপ্তিতে ভরা সংসার। নিমাই পণ্ডিত আবার অতিথিসেবা-পরায়ণ ছিলেন। প্রতিদিনই এক বা ততোধিক অতিথির আগমন হত।

মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আগেই পূর্ববঙ্গে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, জিজ্ঞাসু ছাত্রেরাও এসে জুটতে আরম্ভ করে। আর—

হেথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে
অন্তরে দুঃখিতা দেবী, কারে নাহি কহে।
নিরবধি করে দেবী আয়ের সেবন
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন।
নামেতে সে অণুমাত্র পরিগ্রহ করে
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে থাকে দুঃখিত অন্তরে।
একেশ্বর সর্বরাত্রি করেন ক্রন্দন
চিত্তে স্বস্তি লক্ষ্মী না পায়েন কোনক্ষণ।

প্রোষিতভর্তৃকাকে বেশীদিন এই তীব্র বিরহব্যথা ভোগ করতে হয় নি। নবমুকুলিত এই পুষ্পমঞ্জরী অকালে ঝরে গেল। স্নেহময়ী শচীমা' বালিকা-বধূর এই আকস্মিক মৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। তখনকার দিনে না ছিল ডাকঘর, না ছিল টেলিগ্রাম, না ছিল দ্রুত গমনাগমনের যোগাযোগ। লক্ষ্মীপ্রিয়া যে অকালে দেহরক্ষা করলেন একথা মহাপ্রভুকে জানানো সম্ভব হয় নি।

মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ পর্যটনে পদ-পরিক্রমাকে আশ্রয় করতে হয়েছিল, কাজেই অনেকদিন লেগেছিল। শুনতে পাওয়া যায়, তিনি তাঁর পিতৃভূমি শ্রীহট্টেও গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিদ্যার্থীদের মধ্যে মহা উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। সুদূর নবদ্বীপ গিয়ে যাঁর কাছে পড়বার ইচ্ছা ছিল, তিনি

চাইতে তাদের আর অধিক কি সৌভাগ্য হতে পারে? যেখানেই প্রভু যান, সেখানেই ব্রাহ্মণগণ এসে বলেন—

বুদ্ধিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর।
সবে একদিন নিবেদন করিয়ে তোমারে
বিদ্যাদান কর কিছু আমা সবাকারে।
উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী
পড়িলই, পড়াই শুনহ দ্বিজমণি।
সাক্ষাতে শিষ্য কর আমা সবাকারে
থাকুক তোমার কীর্তি সকল সংসারে।
হাসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস
কথোদিন বঙ্গ দেশে করিলা বিলাস।

এইভাবে বিদ্যাদান করতে করতে কিছুকাল কাটিয়ে প্রভু নবদ্বীপে ফিরলেন, বিদায়ের কালে প্রভু প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য, আসন, বস্ত্র ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী পেয়েছিলেন। বাড়ীতে এসে শচীমাকে প্রণাম করে তাঁর পায়ে সমস্ত অর্থ ও দ্রব্যসম্ভার রাখলেন। প্রভু তাকাচ্ছেন চারদিকে, লক্ষ্মীপ্রিয়া কই? লজ্জাবশত মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না, গঙ্গাস্নানে চলে গেলেন। স্নান-আহ্নিক সেরে বাড়ীতে ফিরে এলেন, ভোজনে বসলেন। খেতে দিলেন শচীমা। লক্ষ্মী-প্রিয়ার দেখা নেই। ভোজনান্তে প্রভু দলে দলে দেখা করতে এল। প্রভু পূর্ববঙ্গ পর্যটনের বর্ণনা করতে লাগলেন। সেখানকার কথা ভাষা নিয়ে সেই ভাষা অনুকরণ করে হাসা-কৌতুকের সৃষ্টি করলেন।

শচীমা আড়ালে আড়ালে থাকছেন, কাছে আসছেন না, বহুদিন পরে গৃহপ্রত্যাগত পুত্রকে পেয়ে কই তাঁর মুখে আনন্দের কোন আভাস দেখা যাচ্ছে না।

প্রভুর মনে শংকার উদয় হচ্ছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মায়ের এই অপ্রত্যাশিত বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, লজ্জা ত্যাগ করে লক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

মা নিরুত্তর, নতমুখী, সাশ্রু-নয়না। সকলেই নিস্তব্ধ, নির্বাক। সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা বজ্রপাত হল। একজন প্রতিবেশী প্রকাশ করলেন পণ্ডিতের পত্নীবিয়োগ হয়েছে।

এতক্ষণ নানা হাস্য-পরিহাসে যে স্থান মুখরিত হয়েছিল, সেখানে নেমে এল এক বিষাদধূসর ছায়া। পণ্ডিতের মুখের দীপ্তি যেন নিবে গেল। অনেক-ক্ষণ নির্বাক থেকে মনে মনে শক্তি সংগ্রহ করে শোকাতুরা জননীকে নানা ভাবে প্রবোধ দিতে লাগলেন। প্রেমপ্রবণ মনে; কিন্তু শোকার্তা মাতা কাতর হয়ে পড়বেন ভয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিচ্ছেদের বেদনা ঘুণাক্ষরেও বাহিরে প্রকাশ করলেন না। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় তীব্র মনোযোগ দিলেন।

সংসারে কিন্তু নেমে এল একটা অসহ্য শূন্যতা। এই শূন্যতা পূরণের জন্য কিছুকাল পরে মাতার নির্বাচিত বিষ্ণুপ্রিয়া সংসারে এলেন; কিন্তু এই নূতন প্রিয়াকে নিয়ে সংসার পাতবার সময় দেখা গেল---মহাপ্রভুর মধ্যে আগেকার সেই পত্নীপ্রেমিক সাংসারিক মানুষটি নেই। সেখানে আবির্ভূত হয়েছে মানব-প্রেমিক এক দিব্য পুরুষ। তাঁর চোখের সামনে আর ভাসছে না বিষ্ণু-প্রিয়ার ভালোবাসা। এখন তিনি কান পেতে শুনছেন—

'কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।'

জননী ও জায়ার দুঃখের চাইতে ধরণীর অগণিত আর্ত নরনারীর জীবন-যন্ত্রণা তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করছে। জীবনে নেমে এসেছে এক অপরূপ রূপান্তর। সংসারী মানুষের জীবন-নাট্যে হল যবনিকাপতন বাংলা দেশের তথা পৃথিবীর ইতিহাসে সংযোজিত হল এক অভিনব অধ্যায়।

চৈতী-দিনে

বিশ্বপ্রিয়

চৈতী বনে ওই শোনা যায়—মৌমাছিদের গুনতানি ঃ
ঝিরঝিরিয়ে দখিনা বয়, সুর বাজিয়ে মুলতানী।
নিমগাছেতে হিম লেগেছে,
কচি পাতার দল জেগেছে,
লাল দোপাটি সাজিয়ে তোলে, বাগান ভরা ফুলদানী॥

থোপা থোপা আমের বউল, কোথায় জমা কোন শাখে—
কে রাখে খোঁজ, কোকিল ডাকে ঃ কোথায় বসে কোন ফাঁকে
দৃষ্টি আমার আতার গাছে,
টুনটুনিরা কেমন নাচে ঃ
চৈতী-দিনের সেই ছোটরূপ—পূর্ণ করে রূপটাকে॥

রবীন্দ্র রচনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব

ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়স থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর অনেক রচনায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরাম দাস প্রমুখ পদকর্তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। ব্রজবুলির ভাষা ও ছন্দ-মাধুর্যকে কবিগুরু বিশেষ এক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। সেইভাবে বিভাবিত কবি ১৬ বৎসর বয়সেই ভারতী পত্রিকায় সাতটি পদ প্রকাশ করেন; আরও তেরটি পদ লিখেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যে। এইভাবে কবির পঞ্চবিংশতি বয়:ক্রমকালে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সম্পূর্ণ হয়।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি কবির অন্যতম অনুরাগের নিদর্শন 'পদরত্নাবলী।' ১২৯২ সালে এই পদসংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। জননী সারদা দেবীর মৃত্যুর পর এই অগ্রজ জায়া শিশুদের নিকট যুগপৎ বন্ধু ও মাতার স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ হয় তেমনই তাঁর সুকুমার চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভাবগুলির উদ্বোধন হয়, কাদম্বরী দেবীর অফুরন্ত স্নেহরস-সিঞ্চনে। এই বধূটি ছিলেন তরুণ কবির সাহিত্য-রসমাধুর্যের বিশেষ উপভোক্তা; শুধু তাই নয়, নানা আলোচনা-সমালোচনা ও প্রেরণায় নূতন ভাবরসে অধিকতর প্রাণবন্ত করে তুলতেন কবি-চিত্তকে। এই প্রেরণাদাত্রীর অকাল মৃত্যুতে কবি অত্যন্ত আঘাত পেলেন। তিনি অশান্ত মনকে কিঞ্চিৎ সমাহিত করার জন্য বোধ হয় এই সময় পদাবলী-সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছিলেন। এই পদাবলী অধ্যয়নের পশ্চাতে রয়েছে কবির পার্থিবেতর বস্তুর রহস্যানুসন্ধানের ব্যগ্রতা। হয়ত এতে শোকাচ্ছন্ন মন কিছুটা শান্ত হবে—এই ছিল কবির ধারণা।

পদাবলী-সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি উদ্ধার করে একসূত্রে গেঁথেছিলেন; তাই সঙ্কলিত পদগুলির নাম হল পদরত্নাবলী। ১৩১৭ সালের ২০শে আষাঢ়ের এক পত্রে বৈষ্ণব কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগের কথা জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার বয়স যখন ১৩।১৪ তখন থেকে আমি অত্যন্ত—আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ, রস, ভাষা সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল, তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমের বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করছিলাম।

(রবীন্দ্র-জীবনী, পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬১)।

রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার মধ্যে এই তত্ত্বের প্রকাশ পেয়েছে। এর অন্যতম নিদর্শন পাওয়া যায় 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতায়। শুভক্ষণ কবিতায় কন্যা তার জননীকে বলছে,—

ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি
মোর ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কি মতে।

বলে দে আমায় কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরণের বাস।

মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস।

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে,

শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।

তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,

শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কি মতে।

ভাবভক্তির চরমোৎকর্ষে কন্যা জানতে পেরেছে যে, তার চির আকাঙ্খিত দয়িতকে সে দেখতে পাবে। তাই সে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও তদ্‌গত-ভাবময় হয়ে চিরসুন্দরকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই রয়েছে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

'ত্যাগ' কবিতায় কন্যা পুনরায় তার জননীকে বলছে,—

ওগো মা, রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার পরে

মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে।
চাহিস কিসের তরে।

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা

আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখপথে—

মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কি মতে।

কন্যার দীর্ঘদিনের সাধনা সফল হয়েছে, সে দেখতে পেয়েছে প্রেমরাজ্যের রাজপুত্রকে—যাকে সে এতদিন ধরে মানসপূজা করে আসছিল। রাজপুত্রের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত মণিহারের মধ্যমণি সর্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব বস্তুর প্রতীক। ঐটি পরিত্যাগ না করলে পরম প্রেমময়ের দেখা পাওয়া যায় না অথবা তাঁর দর্শন-লাভ হলে ঐ বস্তুর প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না। তাই সহজেই ভক্ত তার শ্রেষ্ঠ পার্থিব সম্পদকে ত্যাগ করতে পারে। সুতরাং এই কবিতাটির মধ্যে প্রেমভক্তিদীপের প্রোজ্জ্বল শিখাই প্রকাশমান।

পূর্বেই বলেছি, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ও ছন্দ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই প্রসঙ্গে গীত-গোবিন্দের প্রভাব অপরিসীম। জয়দেব গ্রন্থখানি সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন: সেই জন্য বালক কবির নিকট এর ভাষা সুস্পষ্ট ছিল না বলে তিনি তেমনভাবে গীতগোবিন্দের রসাস্বাদন করতে পারেন নি; কিন্তু জয়দেবের বিচিত্র ছন্দ কবিমনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এর সাক্ষ্য মিলছে কিশোর বয়স থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত নানা রচনায়,—

সতিমির রজনী সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ।—
—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,
সংখ্যা—৯।

তুলনীয় গীতগোবিন্দ—

রতিসুখসারে গতমভিসারে
মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন
মনুসরতং হৃদয়েশম্॥—গীতসংখ্যা—১১।

অথবা—

বাদর বরষণ, নীরদ গরজন,
বিজুলী চমকন ঘোর।
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।
—ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী,
—সংখ্যা—১৪।

তু, গীতগোবিন্দ—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তববদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্॥
—গীতসংখ্যা—১৯।

গীতগোবিন্দের অনুপ্রাস অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে দীর্ঘ সমাসবহুল পদের প্রয়োগ থাকায় এই সৌন্দর্য উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথই ইহা লক্ষ্য করেছিলেন। ফলে তাঁর রচনাতেও এর প্রভাব পড়েছে,—

মনোমন্দিরসুন্দরী।
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।
রোষারুণরাগরঞ্জিতা
গোপনহাস্য কুটিল আস্য
কপটকলহগঞ্জিতা।
—চিরকুমার সভা, পৃষ্ঠা ৭৫০
(রবীন্দ্র-রচনাবলী—জন্মশত
বার্ষিক সং, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

তু, গীতগোবিন্দ—

সা সসাধ্বসসানন্দং গোবিন্দং
লোললোচনা।
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং প্রবিবেশ
নিবেশনম্॥
—পৃষ্ঠা ১৩৭ (হরেকৃষ্ণ
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)

অথবা—

আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু
বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশথপল্লবে অশান্ত হিল্লোল
সমীর চঞ্চল দিগঙ্গনে॥
—পৃষ্ঠা ৩৬২, ৪র্থ খণ্ড, ঐ

তু, গীতগোবিন্দ—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে
গৃহং প্রাপয়।—১।১।

পদাবলী রচনায় মধুময় ছন্দঃ সৃষ্টিতে পদকর্তা গোবিন্দ দাসের স্থানও প্রায় অদ্বিতীয়। তাঁর পরবর্তী পদকর্তারা তাঁকে তো অনুসরণ করেছেনই, এমন কি রবীন্দ্রনাথও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হন নি,—

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনী, আও আওলো।
অঙ্গে চারু নীলবাস,
হৃদয়ে প্রণয়কুসুম-রাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আওলো।
—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,
সংখ্যা—৮।

তু গোবিন্দ দাস—

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি মত্ত মধুকর ভোরণি
হেরতরাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলিগান পঞ্চম তাল
কলবতীচিত-চোরণি॥

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রতিবিম্বমাত্র; কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অতি স্বল্পই আছে। অধিকাংশ পদই বিরহের তবে বিরহের তীব্রতা অপেক্ষা উচ্ছ্বাসই বেশী। কিন্তু পদগুলিতে যে একবারে বিশেষত্ব নেই তা কখনও বলা যায় না। প্রচলিত বিরহের পদে বেদনাঘন তীব্রতাই পরিস্ফুট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বষ্টপদে নূতন ভাবসঞ্চার করেছে,—

সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়,
করল বিষম পণ মানিনী রাধা
রোয়ব না সো, না দিবে বাধা
কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।
—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,
সংখ্যা—১৮।

কৃষ্ণের মথুরায় গমনকালে রাধা-আদি গোপীদের মানসিক অবস্থা অনির্বচনীয় শোকভাবে সমাচ্ছন্ন, কণ্ঠ বাষ্পবারিতে অবরুদ্ধ। বিগলিত অশ্রু-ধারায় যেন শোকের নদী বয়ে চলেছে; এমন অবস্থায় কৃষ্ণকে সহাস্যে বিদায় দেওয়ার কল্পনা করাই যায় না; প্রচলিত পদে কোথাও এভাবে নেই;

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাধা কৃষ্ণকে বিদায় দিতে চেয়েছেন স্মিতমুখে এবং সেই জন্য তিনি তাঁর হৃদয়কে সেইভাবে প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই প্রস্তুতির মধ্যে হৃদয়কে যে কত কঠিন করে তুলতে হয়েছে এবং বিরহের তীব্রতা যে কত সুগভীর, তা কোনো বৈষ্ণব পদকর্তার লেখনীতে প্রকাশ পায় নি। ইহা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব।

রবীন্দ্রনাথের রাধা এরূপ বিষম পণ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তা রক্ষা করতে পারেন নি। কৃষ্ণ মথুরা-যাত্রার কিছু পূর্বে রাধিকার নিকট আগমন করলে রাধিকা কৃষ্ণমুখপানে অনিমেষ লোচনে চেয়ে সহাস্যে তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন; কিন্তু দুঃখ-সায়রের জোয়ারকে কিছুতেই আটকানে গেল না। এই অবস্থায় রাধিকা,—

> পড়ল ভূমি 'পর শ্যামচরণ ধরি,
> রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ 'পরি,
> উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
> রজনী করল প্রভাত।
> —ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,
> সংখ্যা—১৬।

বৈষ্ণব দর্শনের মূল তত্ত্ব হচ্ছে, ভগবান নিত্য এবং জীবও নিত্য; সুতরাং তাঁদের উভয়ের প্রেমসম্বন্ধও নিত্য। এই সত্য বৈষ্ণব সাহিত্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের এই প্রেমের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করায় তাঁর মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব এক গভীর ভাবের উদয় হয়। এর মধ্যে উপনিষদের সত্যও রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন। বৈষ্ণবগণ বেদান্তের মায়াবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যবাদকে স্বীকার না করে বলেছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই রসময় পরম পুরুষেরই সৃষ্ট এবং এই সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি আত্মোপলব্ধি করছেন। রবীন্দ্রনাথও এই মতবাদ গ্রহণ করে বলেছেন,—

> যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা।
> আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
> সেদিন কোথাও কারো লাগি
> ছিল না পথ-চাওয়া;
> এপার হতে ওপার বেয়ে বয় নি ধেয়ে
> কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।
> আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
> শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।
> আমায় তুমি ফুলে ফুলে ফুটিয়ে তুলে
> দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।—
> —বলাকা, পৃঃ ৫০৪, রবীন্দ্র রচনাবলী
> (২য় খণ্ড)।

উপনিষদের ব্রহ্ম বহু হবার ইচ্ছায় নিজেকে বিভক্ত করলেন। এর পশ্চাতে রয়েছে আত্মাবলোকনের ইচ্ছা। এককে নিয়ে রসাস্বাদন হয় না। তাই তিনি বহু হয়ে দেখা দিলেন জীব-জগতের মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব দর্শনের সূত্রানুরূপ অনুভাবনা নিয়ে বললেন,—

> আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
> আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
> আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা
> আনন্দ,
> জীবন-মরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
> আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
> আমার মুখে চেয়ে আমার পরশ পেয়ে
> আপন পরশ পেয়ে।
> —বলাকা, পৃ ৫০৫; ঐ

রবীন্দ্রনাথের সীমা ও অসীমের মিলনের মধ্যে যে সত্য নিহিত, বৈষ্ণবের রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলার মধ্যে সেই সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত। রাধিকা বিশ্বজীবনের প্রতিনিধি এবং কৃষ্ণ অসীম পুরুষ। 'একো হং বহু শ্যাম্'—এই তত্ত্ব বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেছেন বিশ্বজীবনাত্মক সান্ত রাধিকা এবং অনন্ত শক্তিমান ব্রহ্মরূপী কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ-রূপে। বৈষ্ণব দর্শনে ও ভারতীয় শাস্ত্রে কৃষ্ণ আনন্দময় পরমাত্মা। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং অসীমের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধ রবীন্দ্র-সাহিত্যে সীমা ও অসীমের কেন্দ্রগত জীবনধর্মেরই প্রকাশ,—

> সীমার মাঝে অসীম তুমি
> বাজাও আপন সুর।
> আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
> তাই এত মধুর।
> কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
> অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে
> হৃদয়পুর।
> আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন
> সুমধুর।—
> —গীতাঞ্জলি, পৃ ২৯২।

> তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি
> যায় খুলে
> বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে
> তোমার আলোয় নাইতো ছায়া,
> আমার মাঝে পায় সে কায়া,
> হয় সে আমার অশ্রু জলে সুন্দর বিধুর।
> আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন
> সুমধুর।
> --গীতাঞ্জলি, পৃ ২৯২।

ধূপ এবং গন্ধ, আর সুর এবং ছন্দ পরস্পর নিত্যসম্বন্ধযুক্ত; তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল। একটি অপরটি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন নয় অথবা একটির অবর্তমানে অন্যটিও নিরর্থক; সেইরূপ বৈষ্ণবের রাধা ও কৃষ্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে একান্তই অসম্পূর্ণ—উভয়ের মিলনে সমগ্রতার সৃষ্টি, প্রাণের উন্মেষ ও আনন্দের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ইহাই অন্যভাবে বলেছেন,—

> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
> রূপ পেতে চায় ভাবের মঝারে ছাড়া
> অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
> সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
> —উৎসর্গ, প ৯৪; রবীন্দ্ররচনাবলী—
> (২য় খণ্ড)

রূপের কোলে ওই যে দোলে অরূপ মাধুরী' অথবা 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি' ইত্যাদি কবিগুরুর উক্তির মধ্যে রূপের সঙ্গে অরূপের অথবা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন হেতু ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্বভাবনার উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমের আদর্শ কবিগুরুকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল; আর কবিচিত্তে এক অনাস্বাদিত ভাবের উদয় হয়েছিল রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমসম্বন্ধের তত্ত্বনিরূপণে।

গান্ধার — ভাস্কর্য

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ থেকে আরম্ভ ক'রে ব্যাকট্রিয় বা বাহলীক গ্রীকদের রাজত্বকাল কিঞ্চিৎ-অধিক একশত বৎসর ভারতবর্ষে স্থায়ী হয়েছিল। এই নাতিদীর্ঘ বিদেশী শাসনের অন্তর্বর্তীকালে ভারতীয় সংস্কৃতি যেমন গ্রীক রোম ও ইওরোপীয় অন্যান্য দেশে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল—তেমনি ভাবে গ্রীক ও রোমানরা তাঁদের বহুবিধ বিদ্যার মধ্যে এবং শিল্পবুদ্ধির দ্বারা ভারতীয় ভাস্কর্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় ভাস্কর ও চিন্তাবিদদের জড়বাদী গ্রীকরা তাঁদের জড়মতবাদ দিয়ে কিছুদিনের জন্য বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করেছিলেন।

নাগসেন নামক এক বৌদ্ধ আচার্যের নিকট পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গ্রীক মিনাণ্ডার ২০৬—১৯০ খৃস্টপূর্ব অব্দের অন্তর্বর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ সময়ে মহাযান সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না, শুধু হীনযান সম্প্রদায়ই বৌদ্ধ জগতের পরিচালক ছিলেন। তাঁরা বুদ্ধের কোন মূর্তি নির্মাণ করা বা তাঁর পূজো করা অশাস্ত্রীয় বলে মনে করতেন—চিত্রে বা ভাস্কর্যে যেস্থানে বুদ্ধের উপস্থিতির প্রয়োজন হোত সেখানে নানাবিধ প্রতীক প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতেন।

গ্রীক শাসক মিনাণ্ডার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ও তাঁর পূর্ববর্তী ধর্মের পৌত্তলিক সংস্কারের প্রভাবকে তিনি অতিক্রম করতে না পারায় মিনাণ্ডারের প্রভাবে পড়ে ঐ সময় ব্যাপকভাবে বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হতে থাকে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা মতের আবির্ভাব হওয়ায় তাঁরা "হীনযান ও মহাযান"—এই দু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। গ্রীক ভাস্করগণও ঐ সময় ভারতীয় ভাস্কর্যের সহযোগিতায় নিয়ে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ কার্যে রত হন। দেশীয় শিল্পীরা নবাগত গ্রীক ভাস্করদের প্রভাবে পড়ে

কলাকার

বা নূতনত্বের আদর্শে বিভ্রান্ত হয়ে, বা যে কোন কারণেই হোক নবাগত গ্রীক ভাস্করদের নির্দেশ গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন।

গ্রীক ও রোমান আদর্শে, ভারতীয় বিষয় নিয়ে যে সকল মূর্তি ও ফলক চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছিল ঐ গুলিকে বলা হয় গান্ধার ভাস্কর্য।

আফগানিস্থানের বিস্তৃত অঞ্চল—বিশেষভাবে পেশোয়ার, কাশ্মীর ও সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল গান্ধার দেশ—এ স্থানের মধ্যেই গান্ধার শিল্পের সমধিক চর্চা হয়েছিল। গান্ধার শিল্পরীতি ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীন ও জাপানে প্রবেশ করে তথাকার বুদ্ধমূর্তির ভাস্কর্য রীতিকেও প্রভাবিত করে। গান্ধার রীতি প্রভাবিত চীনা ও জাপানী বুদ্ধমূর্তিগুলি কোথাও হয়েছে স্থূলোদর, কোথাও বা ব্যায়ামশালার শক্তিমান পরুষ। অধিকাংশ মূর্তিতেই শ্মশ্রু-গুম্ফ-

গান্ধার ভাস্কর্যে বুদ্ধ

পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর

মণ্ডিত বদনমণ্ডলযুক্ত এবং প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব জাতীয় জমকালো পোষাকে ভূষিত।

বৌদ্ধশাস্ত্র সম্মত—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে গৃহীত বৌদ্ধ মুদ্রা, সিদ্ধাসন দৃষ্টিতে আত্মসমাহিতভাব, জ্যোতির্ময় দেহকাণ্ডের মনোহর ছন্দলালিত্য বা সাধকোচিত অনন্ত করুণাঘন মুখাকৃতি এর কোন কিছুই তাঁরা বুদ্ধমূর্তিতে প্রতিফলিত করতে পারেন নি। বুদ্ধের দেহলক্ষণগুলি এ সময়ের মূর্তিগুলিতে সন্নিবিষ্ট হয় নি। কোন কোন স্থানে চর্মপাদুকা-পরিহিত বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হওয়ায় পায়ের তলদেশে চক্র উৎকীর্ণ হয়নি উহা সত্য হলেও গ্রীক জাতির ভারত ত্যাগের অনতিকাল পরে ভারতীয় ভাস্কর তাঁদের পূর্বতন বা সাময়িক বিভ্রান্তিমুক্ত চিত্ত নিয়ে পুনর্বার ভারতীয় রীতিতে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করে উহাতে শাস্ত্রীয় পবিত্র চিহ্ন প্রভৃতি বা লক্ষণগুলি সন্নিবিষ্ট করেন।

গান্ধার শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পীদের ন্যায় পাষাণকে দ্রবীভূত করার ধ্যান-ধারণা বা কলাকৌশল জ্ঞাত ছিলেন না—প্রেমিক বা অতি মানবরূপী বুদ্ধের শিক্ষা আদর্শ সর্বকিছুই তাঁরা প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বুদ্ধকে অন্তরালে রেখে প্রস্তর তক্ষণ করায় বুদ্ধ তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে আবির্ভূত হত পারেন নি। প্রস্তর দ্রবীভূত করে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ কর্মে গ্রীক ভাস্কর ভারতীয় ভাস্করদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়েছেন।

ভারতীয় ভাস্করের বুদ্ধমূর্তি সাত্ত্বিক ঋষি, সর্বত্যাগী করুণার অবতার—গ্রীক শিল্পীর বুদ্ধ রজোগুণী, ভোগী রাজপুত্র, ত্যাগ বা করুণার চিহ্নমাত্র তাতে প্রতিফলিত হয়নি। আবার এও হতে পারে যে সকল ভাস্কর গ্রীস দেশ ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন তাঁরা গ্রীসের তৃতীয় শ্রেণীর ভাস্কর—ভাগ্যান্বেষণে ভারতে উপস্থিত হয়ে জীবিকার চেষ্টা করেছিলেন—গান্ধার ভাস্কর্যে গ্রীক শিল্পীদের উন্নত রূপকলার প্রতিচ্ছবিও রীতিগুলিতে আরোপিত হয়নি।

উন্নত গ্রীক ভাস্কর্য-শৈলীর কোন চিহ্নও গান্ধার শিল্পে পাওয়া যায় না।—উহা না হয়েছে ভারতীয় না হয়েছে গ্রীক দেশীয়। ঐগুলি যদি ভারতীয় শিল্পের অনুকৃতি রূপে গণ্য করা হয়, তাতেও গ্রীক ভাস্কর ব্যর্থকাম হয়েছেন—রামব্রাণ্ড মোগল চিত্রের অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করতে যেয়ে কৃতার্থ হতে পারেননি। অনুকৃতি দ্বারা কোন শিল্প বা শিল্পী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না—ভারতীয় ভাস্করের ভারতে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্যের অন্তরালে ভারতীয় দর্শনের বহুবিষয় স্বাভাবিক ভাবে তাঁদের আয়ত্তে এসে যায়, ঐ স্বাভাবিক দানের উপর গুরুদত্ত আদর্শ তাঁরা যত সহজে অনুভব ও ধারণা করতে পারেন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাদর্শে শিক্ষিত ও বর্ধিত গ্রীক ভাস্কর্যের উহা আয়ত্ত করা সুদীর্ঘ সাধনা-সাপেক্ষ ছিল।

আবার বিজেতাসুলভ মনোবৃত্তির জন্য ভারতীয় দর্শন বা শিল্প শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মনোবৃত্তিও তাঁদের মধ্যে ছিল না—তাঁদের দীন মনোবৃত্তির জন্য ভারতের বিশাল ভাব-সমুদ্রে সন্তরণ করেও শুষ্ককণ্ঠ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তাঁরা তীরে উঠেছিলেন। ভারতের গৃহ, ভারতের খাদ্যপানীয়, আলোবাতাস, পাহাড় পর্বত ও সমুদ্র—ভারতের সামাজিক জীবন ও তার নরনারী এবং তাদের প্রত্যক্ষ জীবন ধর্ম ও অধ্যাত্ম জগৎ তাদের রোগ শোক হাসি কান্না ভোগ ও ত্যাগের শিক্ষা এবং ভারতের যোগিঋষির সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে ভারতীয় আত্মার সন্ধান করলে হয়ত তাঁরা অহিংস মন্ত্রের জীবন্ত প্রতীক বিগ্রহ মহান বুদ্ধের দর্শন পেতেন।

ভারতীয় শিল্পীর প্রথম শিক্ষা

দর্শন—আগে দর্শন কর—বিষয়কে কেটে-কুটে প্রয়োজন হয় খেয়েও দর্শন কর—তারপর সৃষ্টিকর্মে রত হও। এভাবের শিক্ষা গ্রীক শিল্পীদের ছিল না—যে ঋষি বা অতিমানব ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি যোগপ্রভাবে বা সাধনা-লব্ধ ঐশী শক্তির প্রভাবে স্বীয় দেহকে প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা অর্জন করেন, এমন কি তিনি মৃত্যুকেও সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করতে পারেন আবার স্বেচ্ছায় মৃত্যুকেও বরণ করতে পারেন।

তিনি পার্থিব খাদ্য গ্রহণ না করেও দীর্ঘদিন প্রাণরক্ষা করতে পারেন। আবার পরমাত্মার সঙ্গে যে জীবাত্মার সংযোগ স্থাপিত হয় সেই পবিত্র আত্মার আকৃতি হয় অপূর্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এক স্বর্গীয় মূর্তি। তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি হয় ঈশ্বরসদৃশ অনিয়ন্ত্রিত—এই জন্য ভারতবাসী অপ্রত্যক্ষ ভগবানের ন্যায় প্রত্যক্ষ নরদেহধারী ঈশ্বর অবতার রূপে কল্পিত মহামানবের মূর্তি নির্মাণ করে মন্দিরে ও মঠে পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

ভগবানের চেয়ে ভক্তই এদেশে চিরদিন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। ভারতীয় ধ্যানের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের দৈন্যতার জন্য গ্রীক ভাস্কর বুদ্ধকে তাঁদের ন্যায় পৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষ কল্পনা করে তাঁকে নির্মাণ করেছেন বিলাসী ও ভোগী রাজপুত্ররূপে। বুদ্ধের গাত্রবস্ত্র, শিরস্ত্রাণ, অলঙ্কার, পাদুকা ও পরিহিত বসন প্রভৃতির অত্যধিক পারিপাট্য ও বাহুল্যের জন্য ত্যাগী বুদ্ধকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বোধিসত্ত্ব মূর্তিতে বিশেষভাবে নেপালী ধাতু মূর্তিতে যে অলঙ্কার ও মুকুট প্রভৃতি পরিহিত মূর্তি দেখা যায়

গান্ধার ভাস্কর্যের অশাস্ত্রীয় কেশবিন্যাস

উহা ভক্তের বিগ্রহ সজ্জার ন্যায় বিন্যস্ত হওয়ায় পরম করুণাঘন শঙ্কা ও বিঘ্ননাশন অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধসত্তাকে আবৃত করতে পারেনি। অলঙ্কার ও বস্ত্র মুকুটের অন্তরালে বুদ্ধসত্তা লুপ্ত হয়ে যায়নি—ঐগুলি দেবদেহে স্থাপিত হয়েছে অনাশক্তত্যাগী বুদ্ধের দেহে ভক্তের নিবেদিত উপহাররূপে।

গান্ধার ভাস্কর্যে বুদ্ধের বস্ত্রালঙ্কার আপনার মধ্যে আমিত্ববোধ সুস্পষ্ট হয়ে আছে—ঐগুলিতে অধিকার বোধ আছে তিনি ইচ্ছা করলে ঐগুলি ছুঁড়ে ফেলতে পারেন না—নেপালী মূর্তিগুলিতে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ইহাকেই বলে শিল্পদর্শন, ইহাকেই বলে ধ্যান ও উপলব্ধি। ভারতীয় ভাস্কর তাঁদের সরল জীবন আদর্শের ন্যায় বুদ্ধ অঙ্গে ধরেছেন, সরল ভঙ্গীর ত্রিপিটক প্রভৃতি—গ্রন্থ সুকৌশলে ও অনাড়ম্বরে উহারা ক্ষোদিত হয়েছে যে উহাতে ভাস্কর্যের দক্ষতা শিল্পশৈলী নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত

হলেও উহারা কোন প্রকারেই বুদ্ধসত্তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ভারতীয় শিল্পাদর্শের অনাড়ম্বর গভীর শিল্পতত্ত্বসম্মত নির্দেশগুলি বুদ্ধমূর্তিতে গৃহীত হওয়ায় ভারতীয় রীতির বুদ্ধমূর্তিতে বুদ্ধের সর্ববিধ গুণের বিকাশ সাধিত হয়েছে।

গ্রীক ভাস্কর পক্ষাধিককাল উপবাসী ধ্যানী বুদ্ধমূর্তিকে সাধারণ মনুষ্য শ্রেণিভুক্ত করে যে করুণ মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, উহাকে নরকঙ্কাল ব্যতীত অপর কিছু কল্পনা করা যেতে পারে না। কোটরগত চক্ষু, শুষ্কচর্ম, জটাজুটমণ্ডিত শ্মশ্রুগুম্ফধারী বিশীর্ণ মূর্তিতে উঁরা বুদ্ধত্ব আরোপ করে এক বীভৎস চিত্তবিকৃতির স্বাক্ষর রচনা করেছেন, এই জন্য ভারতীয় জনচিত্তে গান্ধার শিল্পের বিন্দুমাত্র প্রভাব দৃষ্ট হয় না।

ঐ অদ্ভুত সৃষ্টিগুলি গ্রীকদের ভারত আগমনের পত্রিকারূপে বিভিন্ন যাদুঘরে ঐতিহাসিক দাবীতে স্থানলাভ করেছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রীক প্রভাবিত ভাস্কর্য পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাস্কর্যের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছিল। কুশান যুগের ভাস্কর্যগুলি গান্ধার শিল্পরীতিতে নির্মিত। মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মুণ্ডহীন দেহ ও মুণ্ড ঐ শ্রেণীর ভাস্কর্য—কণিষ্কের মুণ্ডহীন দেহটি নির্মিত হয়েছে তুর্কী পোষাকে। গান্ধার শিল্পের প্রান্তিক রচনাগুলিতে কিছু কিছু ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐগুলি গ্রীক ভাস্করের দীর্ঘ ভারত প্রবাসের জন্য ভারতীয়ভাবের সংক্রমণ ফলে ঘটেছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

গ্রীকদের ভারত প্রবাসকালে গান্ধার ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তর গ্রীক ভাবাদর্শ প্রতিফলিত [হয়]নি ইহা অস্বীকার করা যায় না। মথুরা প্রভৃতি স্থানের ভাস্কর্যে প্রত্যক্ষবাদের পরিচয় থাকলেও উহা গান্ধার শিল্পের ন্যায় ভারতীয় ভাবধারাকে নির্মূলভাবে গ্রাস করতে পারেনি—মথুরায় নির্মিত একক সাক্ষী মূর্তিগুলিতে উহা লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই বলেছি গান্ধার ভাস্কর্যে নারীমূর্তির সংখ্যা খুবই কম—বুদ্ধজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন জনতা বা ভক্তগণের মধ্যে যে সকল নারীমূর্তি ক্ষোদিত হয়েছে,—উহাদের অবস্থিতি হয়েছে ভাবলেশহীন পুত্তলিকা-সদৃশ—ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি ভারতীয় নারীর সাধারণ গুণগুলিও উহাতে আরোপিত হয়নি—ভারহুত, অমরাবতী প্রভৃতি চিত্রের নারীমূর্তিগুলি শিল্প শৈলীতে ত্রুটিপূর্ণ হলেও ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত।

গান্ধার ভাস্কর্যে প্রণয়বিষয়ক কোন চিত্র ক্ষোদিত হয়নি—ঐ বিষয় নিয়ে সর্বাধিক চিত্র নির্মিত হয়েছে মেডিয়াভেল বা মধ্যযুগে। ভারতীয় ভাস্কর্যকলাও ঐ সময় চরম উন্নতি লাভ করেছিল। গান্ধার শিল্পিগণ যদি বিশুদ্ধ গ্রীক পদ্ধতিতে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করতেন তবে ঐগুলিতে একটা শিল্পগুণ নিশ্চয়ই বর্তমান থাকত—ইন্দো-গ্রীকো মিশ্র রীতির ন্যায় উপেক্ষিত হত না—এভাবে গান্ধার ভাস্কর্যকলা ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের উপর একটা প্রক্ষিপ্ত মতবাদরূপে সাময়িক ধূম্রজাল সৃষ্টি করে অন্তর্হিত হয়েছে, উহার কোন প্রয়োজনও এদেশে ছিল না।

সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে যখন প্লাবিত হয়েছিল তখন বঙ্গদেশ ঐ প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি—এখানে বৌদ্ধ বজ্রযান প্রভাবিত সর্বভয়নিবারণ সর্ববিঘ্ননাশন, পরম কারুণিক বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মূর্তির পূজাই অধিক প্রচলিত ছিল। এখানে গান্ধার প্রভাবিত মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।

রাজা তিস্য (লঙ্কা দ্বীপ) খৃঃ পূঃ ২৫১—২১১ অনুরাধাপুরের স্তূপে স্থাপন করে ভাস্কর্য কলার উন্নতি করেন

মনের মানুষ বিভূতিভূষণ

অরুণেন্দ্রমণি দত্ত

১৯৪৫ সালের কথা।

হঠাৎ একখানি চিঠি এলো, 'আমরা সদলবলে অর্থাৎ আমি, গজেন্দ্র মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য শীঘ্রই পৌঁচাচ্ছি তোমাদের দিল্লীর বাসায়। তোমার বাবার সঙ্গেও দেখা নেই দীর্ঘদিন, তাঁকে এই কথা জানিও এবং নমস্কার দিও।'

সকলে আনন্দিত হলাম। চিঠি লিখেছেন পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবা বললেন, বিভূতিবাবুর 'শীঘ্র,' সুতরাং তার কোন ঠিক নেই; একদিন হতে পারে আবার একবছরও।'

সত্যি তাই। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত 'শীঘ্র' দিনটি এলো না। আমরাও আশা করে শেষ পর্যন্ত ভুলে গেলাম কথাটা।

হঠাৎ একদিন অতি প্রত্যূষে বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ, দরজা খুলে দেখা গেল এক অপরিচিত ভদ্রলোক, তিনি বললেন, 'বিভূতিবাবু, গজেনবাবু ওঁরা সকলে এসেছেন।'

'কোথায়?'

'গতরাত্রে বাড়ি ঠিক করতে পারেন নি, মাঝরাতে আমার কোয়ার্টারে আশ্রয় নিয়েছেন।'

একটু পরেই মালপত্রসমেত এসে পৌঁছালেন বিভূতিবাবু, সুমথবাবু সস্ত্রীক সঙ্গে গজেনবাবু এবং তরুণলেখক গৌরীশঙ্কর।

ঘটনাটি গজেনবাবুর মুখ থেকেই শোনা গেল।

পূজার পর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমায় বেরিয়েছেন তাঁরা। দিল্লীতে আমাদের বাড়ির ঠিকানাটি শেষ পর্যন্ত গোলমাল করে ফেলেছিলেন। আমরা তখন থাকতুম ১৩৯ নং টেগোর রোড। গভীর রাত্রে দিল্লী পৌঁছে ১৩৯ নম্বরের বদলে ৩৯ নম্বরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। 'অথচ বড়দা (বিভূতিবাবুকে তাঁরা এই নামেই ডাকতেন) বরাবরই বলে এসেছেন ঠিকানা তিনি দিল্লীতে নামার আগে বলবেন না কিন্তু ভিতরে ভিতরে তা নিয়ে যে গোলমাল চলছে এ তাঁরা ভাবতেও পারেন নি।'

চা পানের সঙ্গে হাসির গল্প বড়দের মধ্যে বেশ ভালো করেই জমে উঠলো, আমরা কিন্তু বিস্মিত চোখে দেখলাম কল্পলোকের মানুষটিকে অতি কাছাকাছির মধ্যে। পথের পাঁচালীর লেখক, অপুর চরিত্রস্রষ্টা, আরণ্যক, দৃষ্টিপ্রদীপের লেখক বিভূতিভূষণকে।

বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীঅপূর্বমণি দত্তের পরিচয় বহুদিনের। শুধু তাই নয়, বিভূতিবাবুর কাছ থেকেই শোনা গেল তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পিতামহ অটলবিহারী দত্তের হৃদ্যতা ছিল। পিতামহলিখিত কতকগুলি গ্রন্থ তাঁদের বাড়িতে ছিল এবং কিশোর জীবনে তাঁর সেগুলি ছিল অত্যন্ত প্রিয়পাঠ্য গ্রন্থ।

বিভূতিভূষণকে বাইরে থেকে দেখে অত বিরাট প্রতিভাধর সাহিত্য স্রষ্টা বলে কিন্তু মনেই হোত না। শ্যাম বর্ণ দোহারা চেহারা পরনে হাফসার্ট চোখে জোড়া দেওয়া ভাজা চশমা, হাতে বিবর্ণ একখানি ছাতা। কথাবার্তা, চলাফেরায় সম্পূর্ণ সাধারণ বাঙালী, পল্লীগ্রামের মানুষ।

গজেনবাবু অভিযোগ জানালেন, 'জানেন, ওই রঙচটা বাঁশের ছাতাটা ফেলে দেওয়ার কত চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই ওঁকে রাজি করানো গেল না।'

বিভূতিবাবু বিঙহাসি হাসলেন, 'অথচ শুনুন, বৃন্দাবনে যখন বৃষ্টি এলো তখন সকলে ছুটে এসে মাথা বাঁচালেন এই শর্মার ছাতার তলায়। এখন এ ছাতা না ফেলে দিলে চলবে কেন?"

গল্পগুজবে আমাদের বৈঠকখানা ক'দিন সরগরম হয়েছিল। পথের পাঁচালী লেখার গল্প এই সময় তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

'পথের পাঁচালী লিখতুম নিজের ভিতরের একটা মস্তবড় 'আশ্র' নিয়ে; ওটি যে একদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে এ আমি কখনো ভাবিনি। সাহিত্যক্ষেত্রে আমি তখন সম্পূর্ণ অপরিচিত। লিখতে লিখতে লেখা এক সময় শেষ হোল, কিন্তু কি হোল, কেমন হোল সেটা জানা চাই।'

তিনি বললেন, 'ঠিক এই সময় আমার মনে হোল নীরদ চৌধুরীর কথা; মনে মনে ভাবলুম নীরদ পণ্ডিত লোক, সে যদি ভালো বলে তবেই জানবে কিছু হয়েছে, নয়তো ফেলে দোব। নীরদকে সময় সুবিধা পেলেই পথের পাঁচালী শোনাতাম। যেদিন শেষ হোল সেদিন সে শুধু একটি কথা বললে, 'অপূর্ব।' ব্যাস, মনের মধ্যে এই পেয়ে গেলাম। নীরদের মত লোক যখন ভালো বলেছে তখন আর কিছু বলার

নেই। এই সঙ্গে আরও একটা কথা বলি, অনেকে বলে আমার পথের পাঁচালী নাকি রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তাপের অনুকরণ কিন্তু সকলে বিশ্বাস করুন পথের পাঁচালী লেখার সময় বা আগে আমি বইটা চোখেও দেখিনি।'

'বই লেখার পর দু-একটা কাগজে ছাপাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু অচেনা লেখকের লেখা কে নেবে? বেশী সময় তারা ভালো করে কথাই বলতো না। এরপর বহুদিন সেটি বাক্সবন্দী হয়েই ছিল।'

'কার্যসূত্রে একসময় ভাগলপুরের কাছে একটা জায়গায় এলাম। সে সময় ভাগলপুরে ছিলেন বিচিত্রার সম্পাদক উপেন গাঙ্গুলী মশায়। অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে একদিন তাঁকে বইটা পড়তে দিলাম। তিনি জানালেন বিচিত্রায় ছাপা যেতে পারে। নিয়ে গেলেন সেটি। প্রতি সময়েই আশা করছি হয়তো পরের মাস থেকে দেখতে পাবো বইটা বেরুতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু না। অনেক দিন হয়ে গেল। শেষে একদিন গেলাম বিচিত্রার আপিস কড়িয়াপুকুর স্ট্রীটে। এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, জানালেন সময় হলেই জানানো হবে। ছোট্ট সম্পাদকীয় উত্তর। পরে উপেনবাবুর চেষ্টাতেই তা প্রকাশিত হয়। এই হোল পথের পাঁচালীর ইতিহাস।'

জীবনযাত্রায় বিভূতিবাবু ছিলেন সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর, সরল এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু অদ্ভুত অনুসন্ধানীদৃষ্টি ছিল তাঁর। ফিরোজ-শাহ-কোটলার পুরনো প্রাসাদ দেখতে গিয়ে একটি গাছ—অশ্বত্থের মত তার পাতা, সকলে সেটি অশ্বত্থ বলেই জানি—তিনি একটি পাতা নিয়ে গবেষণায় যুক্ত হলেন। পাতার অবয়ব অশ্বত্থের মত কিন্তু মাথার দিকে বৈসাদৃশ্য আছে। সকলেই বললেন, 'অশ্বত্থ', তিনি বললেন, 'না।' অবশেষে তাঁর কথাই সত্য প্রমাণিত হোল। বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে জানা গেল তা বৃষ্টি-আকর্ষক একরকম অস্ট্রেলিয়ান গাছ।

বাংলা দেশে বিশেষত [illegible] জেলায় একসময় এক ধরণের প্রচুর ছোট ছোট গাছ দেখা গিয়েছিল, মাথায় তাদের বেগুনিরঙের অজস্র ফুল। চলতি কথায় তাকে বলা হোত পেত্নীপোতা, সংস্কৃতিবান লোকেরা বলতেন বনশিউলি। বিভূতিবাবু বললেন, এ বনশিউলি নয়। সে ফুল তিনি বনেজঙ্গলে ঘোরার সময় অনেক দেখেছেন। এ হোল ছোট এড়াঞ্চি। পল্লীবাংলার সাধারণ লোকের কাছে ছোট এড়াঞ্চি এবং বর্ণশিউলির আকৃতিগত পার্থক্য বোধ হয় জানা আছে।

পুরনো জিনিষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অসম্ভব। এই জন্যই বোধ হয় তাঁকে অনেক সময় আপ-টু ডেট মনে হোত না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য তাঁর চোখের চশমা। কুতবমিনার দেখতে গিয়ে সকলে ফিরে এলেন কিন্তু বিভূতিবাবু নিখোঁজ। জানা গেল তাঁর চশমাটি কুতবের নিচে যেখানে বসেছিলেন সেখানে অতর্কিতে ফেলে এসেছেন। ফিরতিপথে অনেকখানি এসে সে কথা মনে হয়েছে তাই আনতে আবার গেছেন কুতবমিনার।

কি এমন মহামূল্যবান জিনিষ? অনেক পরে ফিরলেন; দেখা গেল একটি সূতো দিয়ে বাঁধা চশমা।

গজেনবাবু বললেন, 'বড়দা, দিল্লীতে চশমার দোকানের ত' অভাব ছিল না, চোখটা দেখিয়ে ওই ভাঙ্গা চশমাটা বদলে নিলে কি এমন ক্ষতি হোত?'

তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, 'কিন্তু এমন ফিট করাতে পারতো না।'

'সে কি, কোথা থেকে করিয়েছিলেন এই চশমা, নিশ্চয় খুব বড় দোকান থেকে?'

চশমার ইতিহাস একটু পরেই জানা গেল। গ্রামের হাটে এক বৃদ্ধ আসতো পুরনো ভাঙ্গা-জোড়া চশমা বিক্রি করতে। তারই কাছে, একদিন একটি পুরনো চশমা চোখে দিতেই মনে হোল চমৎকার ফিট করেছে। ব্যস, মাত্র ছ' আনা পয়সায় চক্ষু-

[illegible]
সঙ্গে হয়ে গেল। সেই থেকে বহু বিখ্যাত লেখার সময়ের সঙ্গী এই চশমা।

বিভূতিবাবুর দেশ চালকী বারাকপুর, আমাদের গ্রাম থেকে বেশীদূর ছিল না। দিল্লীর দুর্বিষহ গরমের সময় বাবা প্রায় প্রতি বৎসর আমাদের নিয়ে দেশের বাড়িতে আসতেন। পৌঁছানোর সময় থেকেই বিভূতিবাবুর চিঠি আসতো বাবার কাছে, 'এত কাছে যখন এলেন তখন আমার বাড়ি নিশ্চয় আসুন।'

একবার তাঁকে যাওয়ার স্থিরতা জানিয়ে চিঠি দেওয়া হোল, কিন্তু রওনা হওয়ার পূর্ব দিন বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অথচ কথা দিয়ে না রাখাটা বাবা অত্যন্ত অশোভনতা মনে করতেন আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেজন্য।

রাণাঘাট স্টেশনে এসে বনগাঁর গাড়ী ধরার কথা, কিন্তু এদিকের ট্রেন দেরী করতে ওদিকের গাড়ী পাওয়া গেল না। অগত্যা বিকালের ট্রেন ধরে গোপালনগর স্টেশনে নামতে বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল। চালকী বারাকপুরের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

বাড়ির বারান্দায় বিভূতিবাবু তখন গ্রামের অনেকগুলি দুস্থ ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসেছিলেন।

আহারাদির পর বাইরের বারান্দায় বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানা গল্প করলেন। কল্যাণী কাকীমাও (রমা দেবী) তখন সেখানে।

বললেন, তাঁদের আসল ভিটা পাশেই ছিল কিন্তু সেটি নষ্ট হয়ে গেছে। এই বাড়ি তিনি কেনেন অনেক পরে। কিছুদূরে একটা উঁচু মাটির ঢিপি দেখিয়ে বললেন, 'আমার মা'র একটা ভাঙ্গা কড়াই অনেক দিন পর্যন্ত ঐ ঢিপির পিছনে জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল। যখনই সেদিকে তাকাতাম ছেলেবেলার কথাগুলি মনে পড়তো, সে সব তোমরা পড়েছ অপুর মুখে পথের পাঁচালী আর অপরাজিততে।

সেদিনটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

চারিদিকে উঁচু উঁচু গাছ আর ঝোপঝাড় মাথার উপর পরিষ্কার আকাশে অগণিত নক্ষত্র কিছুদূরে এক জলাশয়, নাম বলেছিলেন ঝিলঝিলে; কোন সময়ে সেখানে হয়তো বড় বিল ছিল।

তিনি বললেন, 'মাঝে মাঝে অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে বাইরে এসে বসি। জীবনের পুরনো দিনগুলির কথা মনে করার চেষ্টা করি, সেই আমার ইসমাইলপুর কি আজমাবাদের দিনগুলি। ঐ ঝিলঝিলের জলের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন সরস্বতী-কুণ্ডীর ধারে বসে আছি। অনুভূতি-জীবন বুঝলে?'

গল্প করেছিলেন অনেক রাত্রি পর্যন্ত। বাংলা দেশে সে সময় সাম্যবাদী সাহিত্যের বেশ একটা হুজুক এসেছিল, বিভূতিভূষণকে সে জন্য একটু চিন্তিত দেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলা দেশের লেখায় কি একটা নতুন ঢেউ এসেছে, ভাবছি, আমার লেখাগুলি শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবে তো? আমি কিন্তু সাধারণ মানুষের কথাই লিখেছি, ওরাই আমার সাহিত্য। অনেকগুলি চরিত্রের নাম করেছিলেন সে সময়; আহ্বান গল্পের বুড়ীর কথা, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, দ্রবময়ী, পতিতা হাজু, সিঁদুরচরণ ওরা সকলেই তাঁর মনের নিভৃতে নিবিড়ভাবে জড়িয়েছিল। সিঁদুরচরণের নূতন দেশ দেখার বিস্ময়, তার অভিব্যক্তি বার বার গভীর আগ্রহ নিয়ে বলেছিলেন।

তাঁর ঘাটশিলার বাড়িতেও আমরা গিয়েছি। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে ছোট একটি বাংলো বাড়ি। ঘিরে বেড়িয়েছি শালমহুয়ার বনে, সিদ্ধেশ্বরী ডুংরীর তলায়, নুড়ি কুড়িয়েছি সুবর্ণরেখার কোলে। কনিষ্ঠ নটুবাবু তখন সেখানে থাকতেন।

বছর দুই-তিন পরে তাঁর জীবনাবসানের সংবাদ আমরা প্রথম পেয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ মহাশয়ের চিঠিতে।

ঘাটশিলাতেই এক নিমন্ত্রণরক্ষার্থে তাঁরা গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে অত্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন মাত্র একটি রাত্রির ব্যবধানে তাঁর জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়। কয়েক দিন পরে কনিষ্ঠ নটুবাবুও লোকান্তরিত হন। একটি পরিবারে প্রায় একই সময়ে দুটি মৃত্যু বড় হৃদয়বিদারক, অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

●

ঘাটশিলাতে এর পরেও আমরা গেছি। যে বাংলোবাড়িটি একসময় দেখেছি হাস্যমুখর, কত সাহিত্যিক রসলিপ্সুর আলোচনা, কলরব সেটি নীরব, ভগ্নপ্রায়। মাথার উপর টালির ছাদ অনেক জায়গাতেই খসে গিয়েছে, সংলগ্ন জমিতে আগাছা, গৃহপালিত পশু এবং পাখীদের অবাধ আনাগোনা।

অনতিদূরে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ড, এই স্থানটিকে তিনি বড় ভালোবাসতেন, নাম দিয়েছিলেন শিলাসন। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, মনে হয়েছে তাঁর কল্পনামুখর মনের কত দিনের সাক্ষী এই শিলাখণ্ডটি। কত জ্যোৎস্নার রাত্রে কিংবা বিলীয়মান অপরাহ্নে তিনি এখানে এসে বসেছেন, তাঁর মনে হচ্ছে 'আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বনপাহাড় এই রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই রকম ছিল; বুদ্ধদেব নববিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীতরাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকের মতই হাসিত; তমসাতীরে পর্ণকুটিরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচল-চূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্ত-মেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনটিতেও পশ্চিমদিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় মহাশিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে।'---

জানি শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু;---' কিন্তু বাংলা দেশের মানুষের মন থেকে এই মিতান্ত মনের মানুষটির কি কোনদিন মৃত্যু ঘটবে?

বোধ হয় না।

ব্যর্থ প্রেম

জীবনের মরুপথে যে বেদনার [illegible],
শিল্পীর তুলিকায় সে কে দিশাহারা।
অন্তরের অন্ধপথ ধরে এসেছে;
আলো-অন্ধকারে সে বিলীন [illegible]
হৃদয়ের [illegible] সে রেখে [illegible]
বেদনার হাহাকার শুধু দীর্ঘশ্বাস।

কর্মক্লান্ত মনে এ শুধু এনেছে—
হৃদয়ের কন্দরে তন্ত্রী বেজেছে।
জীবন [illegible] কেমন মন্তর,
হয়তো [illegible] আলাপের মত।
[illegible] কাঁদিতে কেমন লাগে,
জীবন ব্যর্থতার কালিমা শুধু টানে।

প্রয়োজন কি। এ-মন নেওয়া দেওয়া,
আশা প্রেম সত্য, অশ্রু হোক তাহা।

বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস

ডাঃ কনক সর্বাধিকারী
(স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ)

কুষ্ঠরোগকে মহাব্যাধি বলা হয়। এই রোগের ভয়াবহ রূপের জন্য এবং এর সংক্রমণ-ক্ষমতার জন্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরাকালে সমাজে নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করতে হত। তাই গৌতমবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃস্ট প্রমুখ মহামানবেরা এই সকল আর্ত এবং পীড়িতের সেবায় আত্মনিবেদনের উদাহরণ স্থাপিত করে গেছেন। বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী সেই মহাজন প্রথানুসরণ করে কুষ্ঠরোগীকে সুচিকিৎসায় নিরাময় ক'রে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে নিরন্তর চেষ্টা করেছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মাজীর পৃথিবী ত্যাগের তারিখ। তাই এই তারিখটিকে কুষ্ঠনিবারণী দিবসরূপে পালন করা সব দিকেই শোভন এবং সমীচীন।

ঈশ্বর-অভিশাপে এই রোগ হয় এবং এটি দুরারোগ্য, এ ধারণা অনেকের মধ্যে এখনো আছে। কোন-কোন ক্ষেত্রে রোগীর সন্তানদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা যাওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, এ রোগ বংশানুক্রমে রক্তধারার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষিত-সমাজেও এই সব ভুল ধারণা এখনো দেখা যায়। কুষ্ঠরোগীর প্রতি যে বিমুখতা ও ঘৃণা আজও বর্তমান আছে, তার কারণ পূর্বে বর্ণিত অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার। তাই রোগী তাঁর রোগ গোপন ক'রে, নিজের এবং অন্যের সর্বনাশ ঘটান। একদিকে তাঁর দ্রুত আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা কমতে থাকে, এবং অন্য দিকে তাঁরই দ্বারা সংক্রমণের ফলে অন্যের দেহে এই রোগের বিস্তার ঘটতে থাকে।

কয়েকশ' বছর আগেও ইয়োরোপে কুষ্ঠরোগ ছিল। শোনা যায়, তখন ইয়োরোপে কুষ্ঠরোগীদের একত্রে জাহাজে ভরে, গভীর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়াও হ'ত। ১৮৭৪ সালে জি এইচ এ, হ্যানসেন কুষ্ঠরোগ অন্যান্য রোগের মতই জীবাণুঘটিত, তা' আবিষ্কার করেন। ক্রমে গবেষণার ফলে এই রোগ-প্রতিরোধক ওষুধ আবিষ্কার করাও সম্ভব হয়েছে। আজ

জনসাধারণের সুসংবদ্ধ চেষ্টার ফলে এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের মান উন্নত হওয়ায়, ইউরোপে আর এই ব্যাধির প্রকোপ নাই। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে আজ মানুষ বহু রোগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে চলেছে।

ডাঃ কে সি সর্বাধিকারী
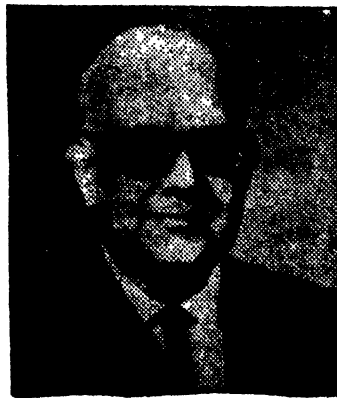
থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারা গেছে। তবু, আজও বিশ্বে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগছেন। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় পনের লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে ৩,৬০,০০০ জন মানুষ কুষ্ঠরোগে ভুগছেন। কুসংস্কার, গোপনতা, অজ্ঞতা ও আশু চিকিৎসায় অবহেলা, এই বিপুল সংখ্যার মূল কারণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষাংশে, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায়, পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠ নিবারণের কাজ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। প্রচার, জনশিক্ষা, চিকিৎসা ও সমীক্ষার কাজ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কুষ্ঠ-অধ্যুষিত অঞ্চলে ২৭ লক্ষ অধিবাসীর জন্য মোট পঁচিশটি কুষ্ঠকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে আবাসিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে মোট ২,৪৪৭টি কুষ্ঠরোগীর শয্যা আছে। পশ্চিম বাংলায় ১৭টি আবাসিক কুষ্ঠ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার, জেলা বোর্ড এবং অন্যান্য সংস্থার পরিচালনাধীন ১০৪টি বহির্বিভাগ চিকিৎসা-কেন্দ্র আজ পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে চলেছে।

কুষ্ঠরোগ দুই প্রকার। সংক্রামক এবং অসংক্রামক। এদেশে যত কুষ্ঠরোগী আছেন, তার মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ জন অসংক্রামক রোগে এবং প্রায় ২৫ জন সংক্রামক রোগে ভুগছেন। কুষ্ঠরোগের বীজাণু নাক, গলা, ও চামড়ার তলায় আশ্রয় নিয়ে দেহের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করে। এর প্রথম লক্ষণ, আধ ইঞ্চির চেয়েও ছোট পরিমাপে ছুলির মত ছোট ছোট দাগ, শরীরের যে কোন স্থানে দেখা দেয়। সেই দাগগুলির জায়গায় কোন অনুভূতি থাকে না। সংক্রামক রোগের লক্ষণ—রোগীর কানের মুখের ও ঠোঁটের চামড়া লালচে হয় অথবা ফ্যাকাশে বা তামাটে রং ধরে এবং ফুলে ওঠে। চোখের ভ্রূ ফুলে ওঠে ও রোমশূন্য হতে থাকে। শরীরের নানা স্থানে

ছাড়া ছাড়া ভাবে ফুলে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে নাক বেঁকে যায়। পরে নাক এবং চোখ গলে যায়।

অসংক্রামক রোগের লক্ষণ হাতের ও পায়ের আঙ্গুলগুলি প্রথমে অসাড় হয়, পরে ক্ষতচিহ্ন দেখা দেয়। এই অবস্থায় চিকিৎসা না করালে হাত ও পায়ের আঙুলগুলিতে পচন ধরে এবং শেষে দেহ থেকে খসে পড়ে। এই সব অসংক্রামক রোগী কুষ্ঠের জীবাণু ছড়ায় না। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা উচিত, সংক্রামক রোগীদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকতে হবে। রোগীর ব্যবহৃত জিনিষ কারো স্পর্শ করা উচিত নয়।

এই সব রোগীকে পৃথক স্থানে রেখে বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে। পূর্ণ পরিণত রোগের চিকিৎসা করতে লাগে বহু বৎসর সময়, কিন্তু অল্পদিনেই তার সংক্রমণ-ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া যায়। অসংক্রামক রোগীদের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা আরম্ভ হলে, অল্পদিনেই সারিয়ে তোলা সম্ভব।

চিকিৎসাশাস্ত্র কুষ্ঠরোগীকে দুঃসহ ঘৃণিত জীবন থেকে মুক্ত করে একেবারে স্বাভাবিক শরীরে সমাজে ফিরিয়ে এনে দিয়েছে। মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য অতিমানুষের আকুতিই আজ এই সফলতা এনে দিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, দেশবাসী এই কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে সচেতন হোন। রোগের পূর্বলক্ষণ দেখা দিলে বা রোগের বিষয়ে সন্দেহ হলে, চিকিৎসককে দেখান, চিকিৎসা করান, তাঁদের নীরোগ করে তুলুন। সুস্থ জীবন ফিরে পেয়ে দেশের ও সমাজের সেবায় তাঁরা নিজেদের নিয়োগ করুন। জাতীয় উন্নতি সাধন করুন।

—আকাশবাণীর সৌজন্যে।

ভারতে তিব্বতীয় কৃষ্টি

১৯৫৯ সালের ভয়াবহ চৈনিক অত্যাচার থেকে পালিয়ে তিব্বতীয়গণ প্রথম আসেন ভারতবর্ষে আশ্রয়প্রার্থিরূপে। প্রথমে তাঁরা সুসংবদ্ধ বসবাস করতে না পারলেও, তাঁদের মধ্যমণি মহামান্য দালাই লামার শুভাগমনের পর থেকেই তাঁরা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনযাপন সুরু করলেন। তাঁবু থেকে স্থায়ী বাসকেন্দ্রে বসতি করে তাঁরা কৃষি, ব্যবসায় এবং কুটীরশিল্প পুনরায় আরম্ভ করেছেন নতুন করে, নতুন উদ্যমে।

অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশেষ করে, ভারত সরকার এঁদের পুনর্বাসনে প্রচুর সাহায্য করেছেন। ধর্মপ্রাণ জাতি বলে তিব্বতীয়দের যে খ্যাতি আছে, তা তাঁরা আবার প্রমাণ করেছেন মঠ-মন্দির স্থাপন করে। পুণ্যভূমি সারনাথে স্থাপিত হয়েছে বৌদ্ধদর্শন এবং তিব্বতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি অধ্যয়নের বিশাল সংস্থা।

শ্রীমতী ক্রাল্ নাম্নী এক জার্মান মহিলা একখানি বই লিখেছেন ভারতে বসবাসকারী তিব্বতীয়দের এই অভিনব প্রয়াস সম্বন্ধে। তথ্যসমৃদ্ধ বইখানিতে বহু চিত্র দ্বারা তিব্বতীয়দের পুনর্বাসন প্রচেষ্টা, কৃষ্টিগত প্রচেষ্টা ও ধর্মীয় সংস্থাগুলির ব্যাপক পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। মহামান্য দালাই লামার একখানি ছবি এই বইয়ের জন্য বিশেষভাবে তোলা হয়েছে।

শ্রীমতী ক্রাল বইখানি লিখেছেন পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীকে জানাতে, কেমন করে বিদেশে বসবাস করেও তিব্বতীয়গণ তাঁদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টও পুরো বজায় রেখেছেন। শ্রীমতী ক্রালের মতে, এ হচ্ছে 'তিব্বতের মহান আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন'। সামগ্রিক মানবজাতির উত্তরাধিকারের অংশ হিসাবে তিব্বতীয় জ্ঞানচর্চার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে তিনি পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

নিষিদ্ধ দেশে প্রথম মহিলা অভিযাত্রী

মঞ্জীব নন্দী

আজ তিব্বত লাল চীনের কবলে পড়েছে, কিন্তু কয়েক বছর আগেও বিশ্বের ভ্রমণ-পিপাসুদের কাছে তিব্বত এক প্রবল আকর্ষণ-কেন্দ্র ছিল। তখন তিব্বতে প্রবেশ করা সকলের ভাগ্যে ঘটত না। পৌঁছুবার সময় নানান অসুবিধা কখনও বা অপমান এমন কি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাও লড়তে হত। এসব কথা অনেক ভ্রমণকারীদের বিবরণে পাওয়া গেছে। সে সব বিবরণ সত্যিই রোমহর্ষক। ক্রমাগত অনেক বিদেশী যাত্রীই তিব্বতে প্রবেশ করতে চেয়েছে, তাদের কেউ সফল আবার কেউ বা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে সবাই ছিল পুরুষ।

কিন্তু ১৯২৪ খৃঃ তিব্বত ভ্রমণের ইতিহাসে কিছুটা হেরফের হয়। এই সময় নিষিদ্ধ দেশে প্রবেশ করার প্রয়াস যিনি করেছিলেন তিনি হলেন এক ফরাসী-দেশীয় মহিলা। তিনি নিজ অধ্যবসায় ও বীরত্বে তিব্বতের হৃৎকেন্দ্র লাসা নগরে পদার্পণ করতে পেরেছিলেন। এ সময় তাঁকে লামার কঠোর আদেশ লঙ্ঘন করতে হয়েছিল। এই অনিমন্ত্রিত মহিলা ছদ্মবেশে তিব্বতে প্রবেশ করেন এবং প্রায় দুই মাসকাল তিনি পবিত্র লাসা নগরে অতিবাহিত করেন। এই সাহসী মহিলা ভ্রমণকারিণীর নাম মাদাম আলেকজান্দ্রা ডেভিড নীল। এর আগে আর কোন মহিলা পর্যটক ছদ্মবেশে এত সফলভাবে তিব্বত ভ্রমণ করতে পারেন নি। তাই তিব্বত অভিযানের ইতিহাসে এই মহিলার ভ্রমণকাহিনী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

তিনি ফরাসী রমণীর হলেও প্রাচ্য দেশসমূহের ইতিহাস, সংস্কৃতি, তথা তার সাহিত্য অত্যন্ত অনুরাগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। এশিয়ার দেশসমূহের ইতিহাস আর সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য তিনি জীবনের পঁয়ত্রিশ বৎসর ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। ব্রহ্মদেশ, নেপাল, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশগুলোতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছুই জেনে নেন এবং সেসব স্থানের মঠ এবং মন্দির-সমূহে ধ্যান পর্যন্ত করেন। একবার তাঁকে কয়েক মাসের জন্য সিকিম যেতে হয়। সেখানে তিনি এক তিব্বতী ছেলেকে নিজের দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। পরে এই ছেলেটি তিব্বতীয় লালটুপী পরিহিত সম্প্রদায়ের লামার কাছ থেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে য়োঙংদেন নাম ধারণ করে। মাদাম নীলও এই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ভিক্ষুণী হবার দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তিব্বত যাত্রার প্রথম দিকে শিগচেজ পর্যন্ত পৌঁছতে সফল হন। এখানেই রয়েছে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ টশী লুনপো মহাবিহার আর এটাই হোল পাঞ্চেন লামার পীঠস্থান; তৎকালীন পাঞ্চেন লামা মাদাম নীলকে তিব্বতীয় লামাবাদ সম্পর্কে গভীর-ভাবে জ্ঞানদান করেন। পাঞ্চেন লামা এই বিদ্বান মহিলাকে অধিক দিন এই পীঠস্থানে থাকতে দিয়ে এ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান করবার সহায়তা করতে চাইলেন। কিন্তু লাসা সরকার তাঁকে শীঘ্রই তিব্বত ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেন—কেন না তিনি সরকারিভাবে আমন্ত্রিত নন।

মাদাম নীলকে এবার তল্পিতল্পা গুটাতে হল—সঙ্গে শিগচেজের গরীব গ্রামবাসীদেরও। কারণ এই বিদেশিনীর এখানে গোপন অবস্থানের কথা সরকারকে জানানো হয় নি বলেই তাদের সরকারের কোপে পড়তে হয়েছে। এই ধরণের শাস্তি তাদের কাছে মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

মাদাম নীল বলেছেন, আমি স্বীকার করছি যে, অন্যযাত্রী যাঁরা লাসা পৌঁছতে চেষ্টা করে এবং গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছতে সাফল্য লাভ করতে পারেন না। আমি কিন্তু লামাবাদী নগরে জোর করে প্রবেশ করতে চেষ্টা করিনি, এর জন্য আমার ইচ্ছাও ছিল না। নিজের অনুসন্ধানকারী মনের তাগিদে আমি ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন এবং তিব্বতের রহস্য উন্মোচনের জন্য সরাসরি রাজধানী না গিয়ে তিব্বতের উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করি। এই সময় তিব্বতীয় পণ্ডিত লামাদের সহায়তা পাই, এর জন্যে প্রচুর লাভবানও হই এবং এই জন্যই লাসায় যাবার জন্য আমাকে ওখানকার সমস্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে হয়,—এই নিষেধাজ্ঞাই তিব্বত ভ্রমণের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

মাদাম নীল কখনও নিজেকে রাজনীতিতে জড়াতে চাননি; তাই তিনি চেয়েছেন, তিব্বতীয় শাস্ত্রের অন্বেষণের জন্য এবং বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য পর্যটকদের জন্য তিব্বত বহির্জগতের নিকট যেন দ্বার রুদ্ধ না করে। মাদাম নীল এইজন্য ইংরেজদের অনেকাংশে দোষী মনে করেন, কেন না, ইংরেজরাই তিব্বতে রাজনীতির জটিলতা প্রবেশ করানোর ফলে এই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। শিগচেজের কঠোর আদেশের কয়েক বছর পর তিনি তাঁর দত্তক পুত্র এবং লাসা মঠের কয়েকজন অনুচর সহ এবার তিনি ১৮ মাস পর্য

তিব্বত ভ্রমণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু তিনি সালবীন নদীর নিকট পৌঁছান-মাত্রই তাঁর নিকট তৎক্ষণাৎ তিব্বত ছেড়ে চলে যাবার জন্য সরকারী আদেশ এসে পড়ে। এবার মাদাম তিব্বতী শাসনের বিরুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। তাঁর লেখা পুস্তক 'আমার তিব্বত যাত্রা'র (মাই জার্নি টু লাসা) ভূমিকায় মাদাম নীল লিখেছেন,—

'এবার কিন্তু আমার মনে লাসা প্রবেশের ইচ্ছা দৃঢ় হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে রকম বাধাই আসুক না কেন আমি লাসায় পৌঁছবই এবং প্রমাণিত করব মেয়েদের দৃঢ় ইচ্ছাও অবশ্যই পূর্ণ হয়। কিন্তু নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের ভাবনাকে মনে স্থান দিই নি। আমি চেয়েছিলাম অন্যকেও যেন এর জন্য উৎসাহিত করতে পারি এবং যে প্রাচীন সংস্কার তিব্বতকে ঘিরে রয়েছে তারও সমাপ্তি ঘটাই। মধ্য এশিয়ার এই বিশাল ভূখণ্ড যা ৭৯ অক্ষাংশ এবং ৯৯ দেশান্তর এর মধ্যে পড়েছে—তা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে।'

মাদাম নীল বৌদ্ধধর্মের মহাযান তান্ত্রিক শাখা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা করবার ফলে তিনি বিদ্বান লামাদের মনে সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতেন। তিব্বতের আচার-ব্যবহার এবং ভাষা তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন—এমন কি তিব্বতী ভাষা লিখতেও পারতেন। এই জন্যই তিনি ছদ্মবেশে তিব্বতের সীমান্তস্থিত বৌদ্ধ ক্ষেত্র পার হতে সফল হন। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে মেলামেশা করতে থাকেন এবং তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

এই যাত্রাই হোল মাদাম নীলের পঞ্চম তিব্বত যাত্রা, লাসাই ছিল তাঁর যাত্রা-পথের উদ্দেশ্য। সোড়ংদেনকে সঙ্গে নিয়ে শরতের প্রারম্ভে তিনি যাত্রা সুরু করেন। এবার তিনি চৈনিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি লিকাডং-এর পথ ধরে সালবীন নদী পার হয়ে তিব্বতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি ও তাঁর 'পুত্র' ভিক্ষুকের দলে মিশে ভিক্ষা করে-ছিলেন।

য়োঙংদেনের পরিধানে ছিল অতীব জরাজীর্ণ লামার পোষাক। 'আর য়োঙংদেনের বৃদ্ধা গরীব মায়ের-রূপে মাদাম নীলের পরনে ছিল আরও পুরনো ও ছিন্ন পোষাক। তিনি তাঁর সুন্দর সোনালী চুলে চীনে কালো কালি মেখে রঙ্ করে নেন। রঙ্ ফিকে হয়ে এলে আবার তাতে রঙ মেখে নিতেন। পৃষ্ঠদেশে ছিল চামরী গায়ের পুচ্ছ আর পেছনে ঝুলত লম্বা বেণী। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে তিনি পরিপূর্ণা তিব্বতী মহিলা। তাঁর সঙ্গে ঝোলাঝুলির ভিতর ছিল বিশ্বস্ত রিভলবার। এ সময় তাঁর সঙ্গে কোন ভারবাহী ছিল না। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজের পৃষ্ঠদেশে বহন করে 'মা ও ছেলে' দুজনে লাসা পর্যন্ত পদ-ব্রজেই যেতে থাকেন।

ধরা পড়ার ভয়ে তাঁরা সারারাত পথ চলতেন। দিনেরবেলা কোন গুম্ফা বা চটির মত স্থানে আত্মগোপন করতেন। এ সময় শুকনো জিনিষই আহার করেন। কদাচিৎ চা অথবা ছামবা পান করতেন। অনেক সময় অনাহারেই পথ চলতে হয়। ক্রমে শীতের প্রকোপ বাড়তে থাকে। এ সময় তাঁদের উঁচু উঁচু হিম ঘাঁটিগুলো পার হতে হয়।

কোন কোন সময় তাঁরা খোলা জায়গায় রাত কাটান। ধরা পড়বার ভয়ে তাম্বু খাটাবার সাহস হত না। ক্রমে মাদামের নিজ ছদ্মবেশের প্রতি আস্থা আসে। তাই গ্রামের ভেতর প্রবেশ করতে কোন শঙ্কা বোধ করতেন না। প্রয়ো-জন হলে গ্রামবাসীর নিকট আশ্রয় চেয়ে নিতেন। কখনও য়োঙংদেন নিজের 'হতভাগিনী বুড়ো মাকে' মন্দিরের দরজায় রেখে খাবার আনতে যেত। য়োঙংদেন লালটুপীওয়ালা লামা হওয়ার ফলে লোকে প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য অনুনয় করতো।

কেউবা তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'আমার হারানো গাই কোথায় পাব?'

'মোকদ্দমায় আমি জিতব না হারব।'

এ সব হাঙ্গামা য়োঙংদেন অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে মোকাবেলা করে, নইলে একটু এদিক সেদিক হলে লোকের সন্দেহে পড়তে হবে। একবার দুজনে প্রচণ্ড তুষারপাতের জন্য এক জায়গায় আটকা পড়ে যান। এমন অবস্থা হল যে, খাবার পর্যন্ত কিছু ছিল না। কোন কোন জায়গায় ডাকাতদের কবল থেকে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচান।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও তিনি বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হননি। এই যাত্রায় তিনি তিব্বতের সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করবার জন্য সেখানকার বস্তিবাসী সাধারণ লোকজনদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে যান। এইভাবে তিনি অত্যন্ত নিকট থেকে সাধারণ লোকদের বাস্তব জীবনধারাকে লক্ষ্য করেন। তাঁর একমাত্র ভয় ছিল যাতে তিনি লাসা পৌঁছবার আগে ধরা পড়ে না যান।

এক অতি ধর্মনিষ্ঠা ভিক্ষুণীর বেশে মাদাম গন্তব্যের দিকে এগোতে থাকেন। সন্দেহ দূর করবার জন্য তিনি ভিক্ষালব্ধ আহার্য দ্বারাই দিন কাটাতেন। কিন্তু তিব্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছে নিজেকে সুরক্ষিতা মনে করলেন। তাই তিনি মধ্যে মধ্যে দোকান থেকেই খাবার সংগ্রহ করেন।

এ সময় তাঁর যাত্রা অত্যন্ত ব্যয়-বহুল হয়ে দাঁড়াল। য়ুনান থেকে লাসা পর্যন্ত 'মা ও ছেলের' একশ টাকা খরচ হয়।

লাসা নগরে তিব্বতের নববর্ষের (ফেব্রুয়ারী) উৎসব আরম্ভ হওয়ার কথা। তাই ভিক্ষুক এবং যাত্রীর ভিড় লাসাতে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। মাদাম এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তাই এক সন্ধ্যায় তিনি ও য়োঙংদেন লাসায় প্রবেশ করলেন। ভিক্ষুকেরা যেখানে আস্তানা করল তিনিও সেখানে একই সঙ্গে ডেরা পাতলেন। এখানে তাঁর

ছদ্মবেশ ধরা পড়ার কোন ভয় নেই বলে অনুমান করেন। দীর্ঘ এবং কঠিন পদযাত্রায় সাফল্য লাভ করার পর মাদাম এবার পবিত্র লাসা নগরের উৎসব উপভোগ করার জন্য শহরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

এভাবে ঘুরে ঘুরে তিনি শহরে প্রায় দুমাস কাল অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি দালাই লামার পোটালা রাজ-প্রাসাদে অনুষ্ঠিত 'মাখন সমারোহ' প্রত্যক্ষ করেন। এই উৎসবে তিব্বতের ধনী এবং নামী সবাই যোগদান করে থাকেন। অনেকে মাদাম নীলকে লাদাখী ভিক্ষুক বলে ভাবতেন। মাদামকেও তাই অনেক সময় লাদাখী চঙের ভাণ করতে হত। একবার তিনি তাঁর এক এ্যালু-মিনিয়ামের বাসন বেশ চড়াদামে নীলাম করেন। তাঁর নীলাম ডাকার অঙ্গভঙ্গী এবং কথাবার্তার চং দেখে ভদ্র খদ্দেররা তো হেসেই খুন। এই সময় তিনি লাদাখী গাই বিক্রেতার অভিনয়ও করেন। পুলিশের লোক তাঁর পিছে লেগে থাকলেও মাদাম তাতে ভয় পান নি।

লাসা থেকে ফেরার পথে মাদাম কোন অভিনয়ের ভাণ করেন নি। মধ্যবিত্ত তিব্বতীয় যাত্রীদের মত নিজে এবং য়োঙংদেন একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেন। মালপত্রাদি কুলীর মাথায় চাপিয়ে দেন। এখন মাদামের ধরা পড়ার বিষয়ে আর কোন চিন্তাই নেই। কারণ এখন তিনি লাসা ছেড়ে আসছেন। তাঁর দিকে কেউ খুব একটা নজরও দিচ্ছে না। গিঁয়াচী নামক এক জায়গায় পৌঁছে তিনি তৎকালীন বৃটিশ ট্রেড এজেণ্ট ডেভিড ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই ভদ্রলোক মাদামের দুঃসাহসী অভি-যানের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য মাদাম নীল চীন তিব্বত সীমান্তে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। কখনও কখনও তিনি অর্থাভাবে অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে সকলের অগোচরে দিন কাটান। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না পর্যবেক্ষক। চীনের সুদূর পশ্চিমাঞ্চল সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করেন এবং সীমান্তদেশের অখণ্ডতা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চয় করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ফ্রান্সে ফিরে যান। তাঁর দত্তক পুত্র য়োঙংদেনের ইতিপূর্বেই মৃত্যু হয়।

২৪শে অক্টোবর ১৯৬৮ সালে তাঁর একশত বছর পূর্ণ হয়। তিনি বর্তমানে ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে "ডিগনে" নামক স্থানে শেষের ২৪ বছর এক কুটিরে নির্জনে বাস করছেন। তাঁর নির্জন বাসের সাথী তিব্বত থেকে আনা এক বুদ্ধমূর্তি এবং তিব্বত ভ্রমণের স্মৃতি। তিব্বতের এক ভিক্ষুণীর কাছ থেকে আনা লাল রঙের গরম পোষাকই তিনি বরাবর ব্যবহার কর-ছেন। আগন্তুক অতিথিদের চায়ের দ্বারা আপ্যায়ন করেন এবং নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাদের শোনান।

১৯২০-'৩০ সাল পর্যন্ত মাদাম নীল অপূর্ব দুঃসাহসিক তিব্বত অভিযানের জন্য সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেন।

জেট ট্রেন

প্রপেলার চালিত ব্যোমযানের যুগ শেষ—এসেছে শব্দের চাইতে দ্রুতগামী জেট পরিচালিত টিউব-আকৃতি এরোপ্লেনের যুগ, যাতে চড়ে এশিয়া-ইউরোপ এবেলা আর ওবেলার ব্যাপারহয়ে দাঁড়িয়েছে। মাটির ওপরে যে যান চলে, তার গতিপথ অনেক বন্ধুর এবং অসুবিধা-জনক—উন্মুক্ত আকাশ পথের অবাধ গতিপথ সে কোথা পাবে? দূরপাল্লায় যেতে চাই সরল, সমতল রাস্তা, ব্যাপারটা যেমন ব্যয়বহুল তেমন কষ্টসাধ্য। কাজেই তার গতিবেগ আজও সীমাবদ্ধ।

অবশ্য মানুষ চেষ্টা করতে ছাড়ে না—পরমাণুকে আক্রমণ করে যারা তার গোপন শক্তি চুরি করেছে, তারা সহজে পরাজয় স্বীকার করার পাত্র নয়। তাই আজ তৈরী হয়েছে মসৃণ গাত্র "জেট" চালিত রেলগাড়ীর ইন্‌জিন, যা শীঘ্রই কানাডার মন্ট্রিল-টোরণ্টো রেলপথের ৩৩৫ মাইল দূরত্ব চার ঘণ্টারও অনেক কমে অতিক্রান্ত করবে।

এর ইঞ্জিন তৈরী করেছে কানাডার United Aircraft Corporation ঠিক এরোপ্লেনের 'গ্যাস টারবাইন'ইঞ্জিনের মত করে। 800 অশ্বশক্তি উৎপন্নক্ষম এই ইঞ্জিন ১৪ বগী যুক্ত ট্রেনকে ঘণ্টায় গড়ে ১২০ মাইল বেগে টেনে নিতে পারবে। অবশ্য, বর্তমানে কানাডার ঘণ্টায় ৯০ মাইলের বেশী দৌড়বার হুকুম নেই, কাজেই আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে টারবো-ট্রেনকে—পরে যা' হয় দেখা যাবে।

জর্জ এ্যালেন

রাজনৈতিক বিধানে ঘটনাচক্রে নারায়ণগঞ্জ আজ এক বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার গৌরবময় ভূমিকা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। অবিভক্ত ভারতের শুধু শিল্পবাণিজ্য কলকারখানা উন্নয়নের ব্যাপারেই নয়, দেশের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনে নারায়ণগঞ্জের অবদান অবিস্মরণীয়। মহাসাধক যোগিবর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পুণ্যস্মৃতিতে পবিত্র নারায়ণগঞ্জ ভারতের ভক্তিমার্গের দিকপাল ও অনুসারীদের শ্রদ্ধাপুত মনে একটি উজ্জ্বল মালিন্যহীন আসন অধিকার করে আছে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে তিনি যতটা প্রসিদ্ধির অধিকারী—বারদীর ব্রহ্মচারী নামে তার থেকে অনেক বেশী তিনি খ্যাত। প্রথম নামটি অনুসন্ধিৎসু সন্ধানী মহলে তুলনামূলক উচ্চস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; কিন্তু দ্বিতীয় নামটি শ্রেণী-সমাজ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সুপরিব্যাপ্ত। নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত বারদী গ্রামকেই আপন মহিমার লীলাক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন লোকনাথ। বারদীই ছিল তাঁর প্রধান কেন্দ্র। সেই কারণেই সর্বসাধারণের ভাষায় তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী।

আদিনিবাস অবশ্য বারদীতে নয়, গৃহস্থাশ্রমের ঠিকানা অন্য। বাঙলা দেশের পূর্ব অঞ্চল থেকে পশ্চিমাংশে। গ্রামের নাম কচুয়া। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার আওতায় এর ভৌগোলিক অবস্থিতি।

দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন মানবদরদী, ধর্মনিষ্ঠ রামকানাই ঘোষাল এখানে সর্বসাধারণ্যে যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতির অধিকারী। ১১৩৮ বঙ্গাব্দে তাঁর পত্নী জন্মগ্রহণ দিলেন চতুর্থ পুত্রের।

সারা ভারতবর্ষের তখন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। চব্বিশ বছর আগে মৃত্যু হয়েছে মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের। মোগল সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু হয়ে গেছে। মসনদে একরকম এবেলা-ওবেলা অধিকারী বদল হচ্ছে। দেশের অন্য কোনদিকে নজর নেই। সিংহাসন কাড়াকাড়ি নিয়ে মেতে আছেন আকবর-জাহাঙ্গীর-শাহ্‌জাহান-ঔরঙ্গজেবের অপদার্থ বংশধরের দল। সেই সুযোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ছোট ছোট শক্তি, নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের জেহাদ তুলে। এই অবস্থা তখন সামগ্রিক ভারতবর্ষের।

রামকানাই একটি বাসনা মনের মধ্যে পোষণ করতেন, বহুকালের লালনে সেই বাসনা মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল—বাসনাটি এই যে—তাঁরই কোন এক পুত্র সন্ন্যাস নিয়ে ধর্মানুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করে কুলকে পবিত্র করুক। বাধা আসে বারবার সহধর্মিণী কমলার কাছ থেকে—মায়ের মন কখনও চায় সন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত দেখতে—অন্য কোন আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি বা সান্ত্বনা মাতৃচিত্তকে টলাতে পারে না। অন্তিম-মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানকে স্নেহাঞ্চলে বন্দী রাখাই মায়ের মনের চিরন্তন কামনা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। রামকানাইয়ের অভীষ্ট সাধনে যে কমলার কাছ থেকেই এসেছে প্রচণ্ড বাধা, লোকনাথের বেলায় সেই কমলারই কাছ থেকে এল সানন্দ সম্মতি।

আচার্য ভগবান গঙ্গোপাধ্যায় গ্রহণ করলেন লোকনাথের ভার। প্রতিবেশী সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ লোকনাথকে নিয়ে নিজেও গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করবেন এই বাসনা জানালেন---দশ বছরের লোকনাথ এইভাবে একদিন গৃহ থেকে বিদায় নিলেন ষাট বছরের ভগবান গাঙ্গুলীর আশ্রয়াধীন হয়ে। সঙ্গে গেল বেণীমাধব। সমবয়সী। সে নাছোড়বান্দা। সে যাবেই। গৃহের কোন আকর্ষণ তাকে আটকে রাখতে পারল না।

এলেন কালীঘাটে। মহাতীর্থ কালীঘাট। দেবীর মহিমাদীপ্ত মহান পবিত্র তীর্থ। তবে, আজকের এ চেহারা সেদিন তার ছিল না। আশ-পাশে বনজঙ্গল। গহন ভয়াল অরণ্যে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, ভয়ঙ্কর লেঠেল—ঠ্যাঙাড়েদের উপদ্রব। বালক শিষ্য-দ্বয়কে সেই আরণ্যক পরিবেশে ধর্ম-জীবনে পারদর্শী করে তুলতে থাকেন। কত আর বয়েস তখন? বছর দশেকের বালকমাত্র। বালসুলভ চপলতায় তখনও আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রবেশ করা সব সময় সম্ভব হয় না। খেলাধূলা-চপলতার মধ্যেই অনেক সময় কাটে দুই বন্ধুর। বয়স বাড়তে থাকে। গাম্ভীর্য আসে, ভিত্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। শক্ত ভিত না হলে তার উপর শক্ত ইমারৎ গড়ে উঠবে কি করে—গুরুভাগ্য তাঁর বরাবর প্রসন্ন। গুরু সকল দিক দিয়ে শিষ্যের পরিচর্যা করতেন। এমন কি শৌচকার্যও গুরু নিজের হাতে করিয়ে দিয়েছেন, এর কারণ গুরু চাই-তেন—শিষ্য সম্পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করুক—অন্য কোনদিকে মন দেওয়ায় তার একাগ্রতায়, ভগবৎ চিন্তায় যেন বাধা না পড়ে। কখনও কখনও শিষ্যরা প্রতিবাদ করেছেন—

আমরা দু-দু'জন পূর্ণবয়স্ক যুবক পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসে খাচ্ছি, আর আপনি আমাদের গুরু হয়ে রোদে, জলে-ঝড়ে দোরে-দোরে ঘুরে আমাদের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন। কোথায় আমরা আপনার সেবা করবতা না আপনিই আমাদের সেবা করে চলেছেন।—গুরু কিন্তু এ কথাতেও টলেন নি। আপন সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও বিচ্যুত হ'ন নি।

হিমালয়ের দুর্গম তুষারে দীর্ঘ সাধনা শেষ হ'ল। অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠ আরাধনা এক নির্দিষ্ট পরিণতির রূপ নিল। দুই শিষ্যের জীবনে একটি নতুন অধ্যায় এবার যুক্ত হ'ল। তাঁদের জীবনে এলেন হিতলাল মিশির। হিতলালকেই যোগ্য ব্যক্তি মনে করলেন ভগবান গাঙ্গুলী। হিতলালের হাতে আচার্য ভগবান তুলে দিলেন এই দুই শিষ্যের ভার। একটি কথা শুধু বলে গেলেন আচার্য ভগবান—আপনার হাতে আমার এই বালক শিষ্য দু'টির ভার দিয়ে গেলুম, এদের সব কিছুর ভার এখন আপনার। কিন্তু এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে—বালক বলে গুরু যাঁদের উল্লেখ করলেন—সেই বালক দুটির বয়স কিন্তু তখন একশ' ছুঁই-ছুঁই। নশ্বরজীবনের ন'টি দশক তখন দুই বন্ধুই অতিক্রম করে গেছেন।

যোগিপ্রবর হিতলালের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকেন লোকনাথ ও বেনীমাধব। সুদীর্ঘকাল পরিক্রমণের পর শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন হিতলাল। তারপর আবাল্য বন্ধুরকাছ থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্ত এগিয়ে আসে। প্রতিবেশী, গৃহত্যাগের সঙ্গী। সাধনসহচর জীবনের একটি বিরাট অংশের প্রতিটি মুহূর্ত যাপনের ভাগীদার বেণীমাধবের সঙ্গেও চিরবিদায় নেওয়ার পালাটি ঘনিয়ে এল। বেণীমাধব চলে গেলেন চন্দ্রনাথের পরে। লোকনাথ দু'একটি জায়গায় অতিবাহিত করার পর এসে বাসা বাঁধলেন বারদীতে।

বারদীতে বসবাসের পর থেকে তাঁর খ্যাতি ও মহিমা ধীরে ধীরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দিক থেকে দিগন্তরে আবালবৃদ্ধবনিতার ঘরে ঘরে পৌছে গেল এই সংবাদ যে, বারদীর মাটি ধন্য হয়েছে এক যুগত্রাতা মহাপুরুষের আবির্ভাবে। তিনি ধন্য করতে এসেছেন ধরার মানবকে, মুক্ত করতে এসেছেন পৃথিবীকে গ্লানি থেকে, অন্ধকার থেকে, আচ্ছন্নতা থেকে। পূর্ণ করতে এসেছেন মানুষকে স্নেহে, প্রেমে, ভালবাসায়।

একের পর এক মানুষ এসে নিজেকে সমর্পণ করতে লাগল তাঁর পদপ্রান্তে। নানাজনের নানা আকুলতা, নানা আর্তি—পূরণ কর প্রভু, মনস্কামনা পূর্ণ কর ঠাকুর। বিশ্বাসী আসে উন্মুক্ত মন নিয়ে, অবিশ্বাসী তাঁকে বাঁকা দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয়। যেমন ঘটল একবার আদালতে। একটা ছোটখাটো গণ্ডগোলের মামলা। তিনি সাক্ষী। আদালত তো বিশ্বাসই করতে চায় না তাঁর বয়েস দেড় শ' বছর। তারপরে কথা উঠল—আপনি ঘরের মধ্যে বসে এই বয়সে কি করে ঘটনাটি দেখলেন—লোকনাথ দেখালেন—দূরে একটি গাছ। সকলে গাছ এবং পাতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। কিন্তু তিনি দেখলেন সারি দিয়ে লাল পিঁপড়ে তার ডাল বেয়ে উঠছে। অনুসন্ধানে দেখা গেল সাধকদৃষ্টি ভুল দেখে নি।

একদল ভদ্রলোক তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বাইরের মাটি তখন ফেটে যাচ্ছে রৌদ্রের নিষ্করুণ উত্তাপে, রৌদ্রের দহন-জালায় মাটির বক্ষস্থল বিদীর্ণ। করুণা সঞ্চারিত হ'ল করুণাময়ের মনে। বললেন যতক্ষণ না তোমরা গন্তব্যস্থলে না পৌছাচ্ছ, একটুকরো মেঘ তোমাদের মাথার উপর ছাতার কাজ করবে। প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ করল প্রচণ্ড রোদের মাঝখানেও একটুকরো মেঘ তাঁদের মাথার উপর ছাতার কাজ করছে। তাঁদের সঙ্গে তাল রেখে রেখে মেঘখণ্ডও এগিয়ে যাচ্ছে।

উকীল বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় আসাম যাচ্ছেন স্টীমারে। পথের মধ্যে ঝড় উঠল। ভয়াল ভীষণ তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়ে গেল ঝড়ের। তার মাতনে মাতনে দাপাদাপিতে নিশ্চিত ধ্বংসের সম্ভাবনা। প্রভু লোকনাথকে আকুলভাবে স্মরণ করতে থাকেন বিহারীলাল —প্রভু বাঁচাও, প্রভু কৃপা কর। তারপর হঠাৎ-হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই—তিনি একা নন—আরও কয়েকজন দেখতে পেলেন একটি অভয়হস্ত। তারপর কোথায় ঝড়? প্রকৃতি তখন স্থির, স্নিগ্ধ। কিছুদিন পর বিহারীলাল এসেছেন লোকনাথ সন্দর্শনে—বিহারীলালকে দেখেই লোকনাথ নিজেই বিবৃত করলেন আনুপূর্বিক ঘটনা।

লোকনাথের বহুল প্রচারিত যে আলোকচিত্রটি পাওয়া যায় এবং যে ছবিটি এই রচনার সঙ্গে সংযোজিত হ'ল, সেই ছবিটি তুলিয়েছিলেন ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। এই ভাওয়ালরাজও তাঁকে দর্শনের পূর্বে স্থির করেছিলেন—তাঁকে প্রণাম না করে নমস্কারের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি লোকনাথের সামনে দাঁড়ালেন কোন দৈবপ্রভাবে, কোন অজানা শক্তির প্রাবল্যে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে গেল সিদ্ধান্ত, সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হলেন নিজের সঙ্কল্প সম্বন্ধে। আভূমিলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন লোকনাথকে। প্রণাম করার পরই তিনি সর্বজনসমক্ষে লোকনাথেরই মুখ থেকে শুনতে পেলেন তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তের আনুপূর্বিক বিবরণ।

সূক্ষ্মদেহে যত্রতত্র তিনি বিচরণ করেছেন। ভক্ত, অনুগৃহীত বা তার বাইরেও আকুল হয়ে যে তাঁকে স্মরণ করেছে—পৃথিবীর যে-কোন অংশেই হোক তিনি তন্মুহূর্তে সেখানে উপনীত হয়ে পূর্ণ করেছেন তার মনস্কাম। লৌহকারার অন্তরালে ফাঁসির আসামীকে জানিয়ে এসেছেন তার প্রাণদণ্ড মকুবের সংবাদ, বিপন্না মার্কিন মহিলার হাতে (এ্যামেরিকায়) গুঁজে দিয়ে এসেছেন ভারতীয় ঔষধ।

নতুন মৌলিক পদার্থের সন্ধানে॥

আমরা বেশ কিছুকাল যাবৎ জেনে এসেছি যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই ৯২টি মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত। সর্বজনস্বীকৃত এই ৯২টি মৌলিক পদার্থের তালিকার প্রথম পদার্থটি অর্থাৎ সবচেয়ে হাল্কা পদার্থটি হল হাইড্রোজেন এবং ৯২ সংখ্যক পদার্থটি অর্থাৎ সবচেয়ে ভারী পদার্থটি হল ইউরেনিয়াম।

মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা অনুযায়ী এই তালিকার ক্রমিক সংখ্যা সাজানো। অর্থাৎ প্রথম সংখ্যক মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা হল ১ এবং ৯২ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের একটি পরমাণুর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা হল ৯২।

অনেক বিজ্ঞানী কিন্তু এই তালিকার চিরাচরিত স্বীকৃতি সত্ত্বেও অন্যমত পোষণ করতেন। তাঁরা সন্ধান করতে শুরু করলেন নতুন মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ঐ গবেষণাগারে ডঃ ম্যাকমিলানের নেতৃত্বে এমনি একটি বিজ্ঞানী-গোষ্ঠী নামলেন গবেষণায়। উদ্দেশ্য হল ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থের সন্ধান করা। এই দলেরই সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন ডঃ গ্লেন থিওডোর সীবার্গ। বয়স তখন তাঁর সবেমাত্র ২৮ বৎসর।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রন যন্ত্রটিকে কাজে লাগালেন তাঁরা। অজস্র নিউট্রনের দ্বারা এই যন্ত্রের সাহায্যে

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইউরেনিয়ামের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে চললেন দিনের পর দিন। গবেষণা করে চললেন একান্তে একান্ত নিষ্ঠায়। ১৯৪০ সাল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন ডঃ ম্যাকমিলান। আবিষ্কৃত হল ৯৩ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ। নাম দেওয়া হল তার নেপচুনিয়াম ইউরেনাস গ্রহের নামে ৯২ সংখ্যক মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হল পরবর্তী গ্রহ নেপচুনের নামে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে উঠেপড়ে লাগলেন মার্কিন সরকার। রেডার গবেষণায় যোগ দেবার জন্য ডাক এলো ডঃ ম্যাকমিলানের। ভাগ্যদেবী বুঝি সুপ্রসন্ন হলেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ডঃ সীবার্গের উপর। তাই তাঁর হাতেই ভারী মৌলিক পদার্থের গবেষণার ভারটি তুলে দিয়ে চলে গেলেন ডাঃ ম্যাকমিলান। সহকর্মী বিজ্ঞানীদের নিয়ে শুরু হল ডঃ সীবার্গের সাধনা। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে তুললেন তিনি এই গবেষণাকে।

প্রাণপণ প্রয়াস বুঝি বিফল হয় না কোনদিন। তাই একদিন সেই শুভক্ষণটিও এসে পৌঁছে গেল সীবার্গের জীবনে। একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস হল ডয়টারন। সেই ডয়টারনের সাহায্যে ইউরেনিয়ামে সংঘর্ষ ঘটালেন বিজ্ঞানীরা। বার করে আনলেন সেই

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর অসংখ্য অনুরাগীদের মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। তাঁর মহিমা সাধারণের সমাজে প্রচারে বিজয়কৃষ্ণ যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এ-প্রসঙ্গে তা অবশ্যই যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য।

পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছেন এই মহান পথিক। নানা দেশের নানা ভাষার উচ্চারণ, প্রয়োগ-বৈচিত্র্য এবং বিবিধ বৈশিষ্ট্যগুলি অদ্ভুতভাবে আয়ত্তে এনেছিলেন লোকনাথ এবং সে সম্বন্ধে সাধারণ্যে প্রায়ই আলোকপাত করে থাকতেন।

শুধু মানুষই নয়, দুর্ধর্ষ হিংস্র পশুরা তাঁর একান্ত ভক্ত ছিল। বনে বাসকালীন এক ব্যাঘ্রীর শাবকগুলির দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। তিনি অভয়বাণী দিলে ব্যাঘ্রী স্থানান্তরে যেত, তিনি যতক্ষণ না তার সন্তানদের দায়িত্ব নিতেন ততক্ষণ তার উৎকণ্ঠার অবধি থাকত না। অনুনয়ের যেন শেষ থাকত না।

একদল উচ্ছৃঙ্খল তাঁর আশ্রম আক্রমণ করে তাঁকে নির্যাতনে উদ্যোগী হ'ল। কোথা থেকে আশ্রমের আঙিনায় দেখা গেল এক ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্রের আবির্ভাবে ভয়ে আত্মগোপন করল যুবকের দল। দূর থেকে তারা প্রত্যক্ষ করল—সেই ভয়ঙ্করদর্শন ব্যাঘ্র লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পায়ের উপর লুটিয়ে আছে সুশীল সুবোধ বালকের মত।

শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে যেমন কোলে তুলে নিয়েছেন—দুষ্কৃতকে তিনি পরুষবাক্যে বিদায়ও দিয়েছেন। পরে কোলে টেনেছেন। এর অর্থ তার অপরাধ সম্বন্ধে তার মধ্যে সম্যক উপলব্ধি ঘটানো এবং তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে—পিছনে মহাপুরুষ আছেন এই আনন্দে যা খুশী অন্যায় করে গেলেই পার পাওয়া যায় না। অনুতাপে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে তারপর তাদের তিনি আলোর জগতে পরিচালিত করতেন।

করুণাঘন লোকনাথ এক অসহায় যক্ষ্মারোগীর তীব্র যন্ত্রণার উপশম ঘটানোর জন্যে নিজে বরণ করে নিলেন তাঁর যক্ষ্মারোগ। পৃথিবীর লীলা সাঙ্গ করার একটি অছিলামাত্র এই রোগগ্রহণ, ১২৯৭ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ একশো উনষাট বছর বয়সে ভবলীলা সম্বরণ করলেন ভারতের সাধককুলের ভূষণ লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

বহু প্রত্যাশার মাণিককে। একটি আল-পিনের অগ্রভাগের বিন্দুর মত, এক আউন্সের দশলক্ষ ভাগের একভাগেরও কম ওজনবিশিষ্ট ৯৪ সংখ্যক মৌলিক পদার্থের নমুনাটিকে চিনে নিলেন ডঃ সীবার্গ। নাম দিলেন তার প্লুটো-নিয়াম। এই প্লুটোনিয়াম পারমাণবিক বিস্ফোরকরূপে এবং পারমাণবিক রিঅ্যাকটারের জ্বালানীরূপে ব্যবহারযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

এই সাধনার সাফল্য ডঃ সীবার্গ এবং সহকর্মী-বিজ্ঞানীদের মনে এনেছিল অপরিমিত প্রেরণা। কাজ করে চললেন তাঁরা দুর্বার উদ্যমে। করায়ত্ত হল রহস্যের চাবিকাঠি। ৯৫ সংখ্যক নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন তাঁরা ১৯৪৪ সালের শেষদিকে। নাম দিলেন তার আমেরিকিয়াম।

কাজ চলতে লাগল তেমনি নিরলস গতিতে। একাগ্র নৈষ্ঠিক তপস্যা। ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকেই আবিষ্কৃত হল ৯৬ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ। এবার নামকরণ হল—কিউরিয়াম। এ দুটি মৌলিক পদার্থই আবিষ্কৃত হল হিলি-য়ামের নিউক্লিয়াস আলফা কণার দ্বারা সংঘর্ষের ফলে—যে আলফা কণা সাধা-রণত তেজস্ক্রিয়তার ফলেই উদ্ভূত হয়।

এগিয়ে চললেন ডঃ সীবার্গ। যতই নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হচ্ছে উৎসাহিত হচ্ছেন তিনি ততই। মনের শক্তি বাড়াচ্ছে দৃঢ়প্রত্যয়। মনের দিগন্তে সোনার স্বপ্ন নিয়ে আসছে এক একটা আবিষ্কার।

চার বৎসর পর এল ১৯৪৯ সাল। আর একটি নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানিবৃন্দ। এই ৯৭ সংখ্যক মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হল বার্কেলিয়াম। দেশের পর দেশ জয় করে চলেছেন যেন দিগ্বিজয়ী বাহিনী। পরাজয় নেই—পরাজয় মানতে তাঁরা জানেন না। পর বৎসরই আবিষ্কৃত হল আর একটি মৌলিক পদার্থ। নাম দেওয়া হল—ক্যালিফোর্নিয়াম। তালিকায় এল ৯৮তম সংখ্যা।

বিজয়ী নাবিকদের চোখের সমুখে এক একটা অনাবিষ্কৃত দ্বীপ যেন ধরা দিচ্ছে। পর্বত অভিযাত্রীদের পায়ের তলায় যেন লুটিয়ে পড়ছে এক একটা পর্বতশৃঙ্গ। বিজ্ঞানিবৃন্দ সন্ধান পেলেন—৯৯তম নতুন মৌলিক পদার্থ—আইন-স্টাইনিয়াম এবং ১০০তম মৌলিক পদার্থ ফারমিয়ামের।

এক একটা আবিষ্কার যেন এক একটা রোমাঞ্চকর এডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা। নিস্তব্ধ রাত্রি। একাগ্র ঐকান্তিকতায় কাজ করে চলেছেন ডঃ সীবার্গ এবং সহকর্মী বিজ্ঞানিগণ। আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন ১০১ সংখ্যক মৌলিক পদার্থটিকে উৎপাদন করতে এবং চিনে বার করে নিতে। একটার পর একটা পরীক্ষা চলে আর তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবার নতুন করে চলে পরীক্ষার পর্ব। কিন্তু কিছুতেই যেন অভীষ্টকে পাওয়া যাচ্ছেনা। সারা গবেষণাগারে নিরাশার কালোছায়া নেমে আসছে। এইবার শেষ একটা পরীক্ষা। সবকিছু ঠিক করে মাত্রা নির্ধারক যন্ত্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে বসেছেন বৈজ্ঞা-নিকমণ্ডলী। এ প্রতীক্ষা যেন শেষ হবে না কোনদিন। ধরা দেবে না যেন মায়াময় সোনার হরিণ। তবু তাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর সজাগদৃষ্টি নিয়ে যেন মূর্তিমান ধৈর্য সেজে বসে আছেন। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

অকস্মাৎ সেই অঘটন ঘটল। নির্ধারক যন্ত্রের কাঁটা চঞ্চল হয়ে উঠল ঘূর্ণি ঝড়ে শুষ্ক পত্রের মত। মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে আবার নেমে এসে স্থির হয়ে গেল কাঁটা। রেখে গেল একটা লাল রেখার সুস্পষ্ট দাগ। পর পর একই ঘটনা ঘটল দুবার। উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক-গণ। তাঁরা বুঝলেন ১০১ সংখ্যক পদার্থের উদ্ভব ও বিলোপ ঘটল এইমাত্র। মৌলিক পদার্থের তালিকায় ১০১ সংখ্যক মৌলিক পদার্থের সংযোজন ঘটল—নাম দেওয়া হল তার মেণ্ডেলেভিয়াম।

ইতিমধ্যে ডঃ সীবার্গের এই বিস্ময়কর সাফল্যের কথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। গুণীর সম্মানার্থে এগিয়ে এলেন নোবেল কমিটি। ১৯৫১ সালে তাঁরই সহকর্মী বিজ্ঞানী ডঃ ম্যাক-মিলানের সঙ্গে একযোগে তিনি লাভ করলেন রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার।

এখানে থেমে পড়ল না বিজয় রথ। এগিয়ে চললেন বিজয়ী বীরগণ অকুতোভয় যোদ্ধার মত। ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই সেই এগিয়ে চলার পথে। ১৯৫৮ সাল। ভাগ্যদেবী আবার পরিয়ে দিলেন জয়মুকুট। আবিষ্কৃত হল নতুন আর একটি মৌলিক পদার্থ—নোবেলিয়াম। তালিকায় ১০২ সংখ্যা জ্বলজ্বল করে উঠল। ১৯৫৮ সালে সেই ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে বরণ করা হল ডঃ সীবার্গকে—যেখান থেকে তিনি লাভ করেছিলেন ডক্টর অফ ফিলোসফি ডিগ্রী এবং যেখানে বসে গবেষণা করে জয়লক্ষ্মীকে লাভ করেছেন জীবনে।

পরবৎসরই তাঁর দেশবাসী তাঁকে আর এক পুরস্কারে সম্মানিত করলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের এনরিকো ফার্মি পুরস্কার লাভ করলেন।

নিউক্লিয় রসায়নের পুরোধা এই বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের ফলেই আজ প্লুটোনিয়াম রিঅ্যাকটার আবর্তন চক্র সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে ভারী মৌলিক পদার্থের রসায়ন উপলব্ধি এবং নতুন মৌলিক পদার্থের উপাদান সম্পর্কিত পরীক্ষা কার্যের ব্যাপক বিস্তার।

গবেষণাকার্য আরো এগিয়ে এল একধাপ। নূতন ফসল পাওয়া গেল ১৯৬১ সালে। চারজন বিজ্ঞানী মিলে আবিষ্কার করলেন আর একটি নূতন মৌলিক পদার্থ। তালিকায় উঠল ১০৩ সংখ্যক সংখ্যা। অবশ্য সেটার নামকরণ হয়নি এখনও।

১৯৬১ সালেই ডঃ সীবার্গ মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ার-ম্যানের পদে বৃত হলেন। বয়স তখন তাঁর ৪৯ বৎসর। নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের ইতিহাসে ডঃ সীবার্গের নাম চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গেল।

প্রেম
-বিন্দুশেখর বিশ্বাস
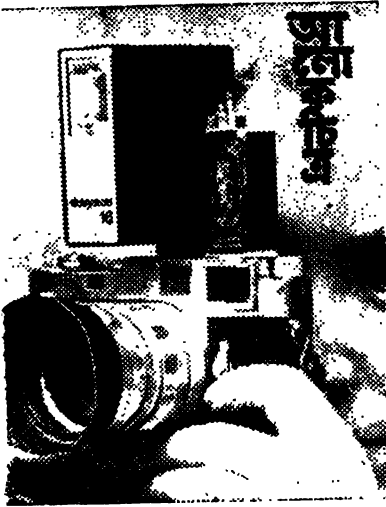
মাননীয়া পাঠিকা
—চিত্রজিৎ ঘোষ
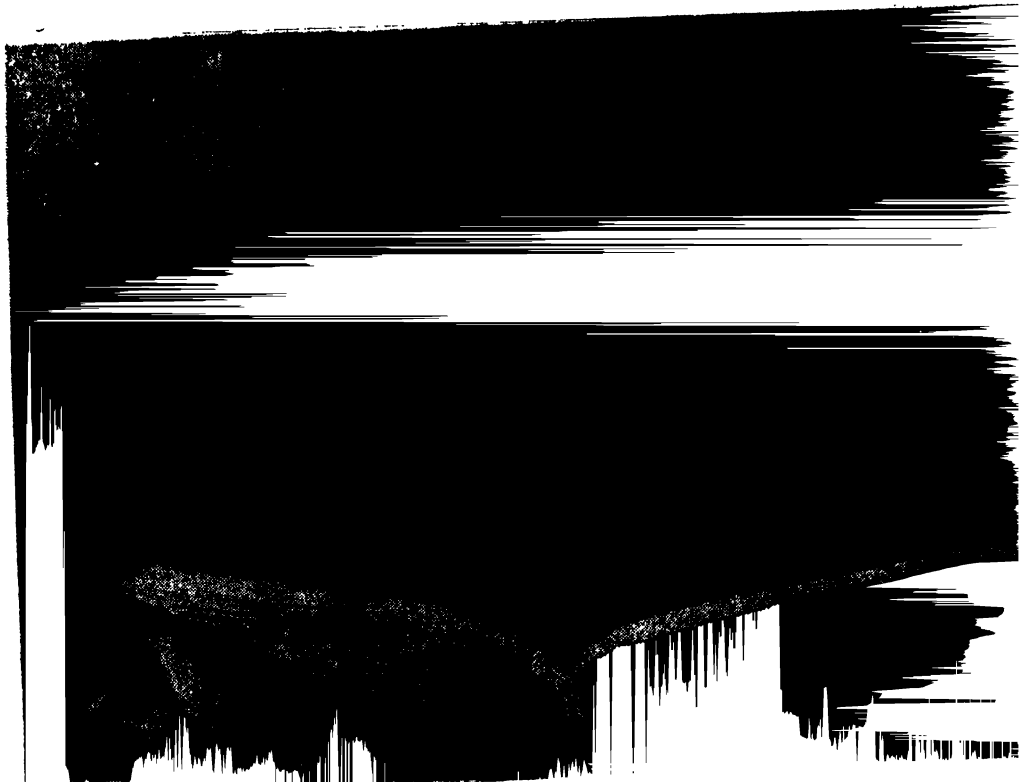
অনুসরণ

—মনোরঞ্জন দত্ত

পায়রা-ভোজ

-আশুতোষ সিংহ

প্রগতি

অশোককুমার বাগচী

মিলন-চক্র

—শম্ভু মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় বিদেশিনী
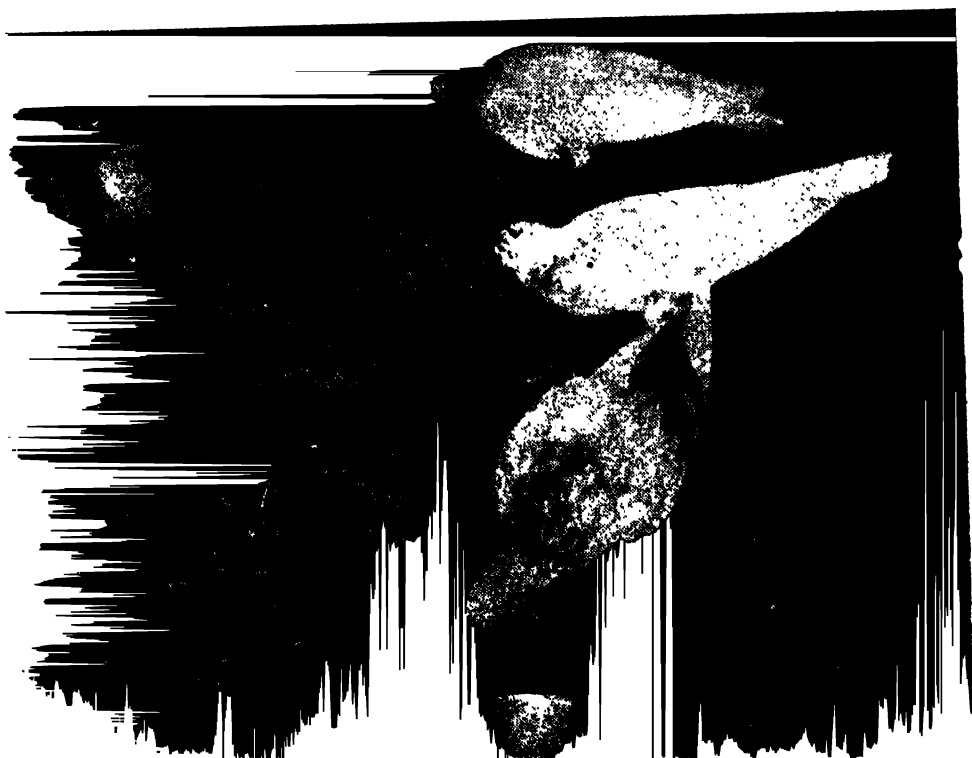
—সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

মাসিক

বসুমতী

চৈত্র / ১৩৭৫

মুক্তাকণা সেনচৌধুরী

বে [illegible] সামান্য অংশ এবং অথর্ববেদের কিংসামান্য অংশ ব্যতীত সমগ্র বেদ সংহিতাই ছন্দে নিবদ্ধ।

প্রাচীন ভারতে বেদ অধ্যয়নের প্রস্তুতিস্বরূপ প্রথমত ছয়টি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ অপরিহার্য ছিল। এই ছয়টি বিষয়ের নাম—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এই ছয়টি বিষয়কেই বেদাঙ্গ বলা হয়।

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং
জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দো বিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো
বেদ উচ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যার এবং বায়ুপুরাণে অষ্টাদশ বিদ্যার একটি তালিকা আছে। উভয় তালিকার প্রথমেই বলা হইয়াছে—'অঙ্গানি' (অর্থাৎ ছয়টি বেদাঙ্গ অধীতব্য)। মুণ্ডক উপনিষদের ১ম খণ্ডের চতুর্থ শ্লোকে শৌনক অঙ্গিরাকে বলিতেছেন—

অপরাবিদ্যা বলিতে বেদ ও বেদাঙ্গ বুঝিতে হইবে। বস্তুত এই ছয়টি বিষয়, বেদের বিভিন্ন অঙ্গ-রূপেই কল্পিত হইয়াছে। পাণিনির শিক্ষায় বলা হইয়াছে—

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ
কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষু নিরুক্তং
শোত্র মুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং
ব্যাকরণং স্মৃতম্॥

অর্থাৎ ছন্দ বেদের পাদদ্বয়, কল্প তাহার হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ তাহার চক্ষু, নিরুক্ত তাহার কর্ণ, শিক্ষা তাহার নাসিকা এবং ব্যাকরণ তাহার মুখ।

বেদ ছন্দে নিবদ্ধ বলিয়া এই ছন্দ শব্দ উপলক্ষণে বেদকেও বুঝায়। বহুস্থলে ছন্দ বেদের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—ভাগবতে (১।৪।৪৩) উগ্রশ্রবাকে সম্বোধন করিয়া ঋষিগণ বলিতেছেন, 'স্নাতমন্যত্র ছান্দ-সাৎ' (তুমি বেদ ব্যতীত সমগ্র শাস্ত্রেই স্নাতক, পারঙ্গম)।

গীতায় (১৫।১) ভগবান সংসার-রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের সম্বন্ধে বলিতেছেন, 'ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি' (বেদ-সমূহ যাহার পত্রস্বরূপ)। রঘুবংশের প্রথম সর্গে কালিদাস বৈবস্বত মনুর উপমায় বলিয়াছেন, 'প্রণবশ্ছন্দ-সামিব' (বেদের আদিতে যেরূপ প্রণব)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে(১।৪।১)প্রণবকে বলা হইয়াছে—'ছন্দসামৃষভঃ' (প্রণব বেদের মধ্যে প্রধান)।

লৌকিক ব্যাকরণ হইতে বৈদিক ব্যাকরণের পার্থক্য দেখাইতে পাণিনি বহুবার বলিয়াছেন 'বহুলং ছান্দসি'; 'ব্যত্যয়ো বহুলম্' ইত্যাদি। বস্তুত বৈদিক সংস্কৃতের পাণিনি-প্রোক্ত নামই 'ছান্দস'।

'ছন্দ' নামকরণের কারণ বলা হয়—

'ছন্দয়তি, আহলাদয়তি, চন্দতে
বা অনেন ছন্দঃ'

(আহলাদিত, দোলাইত, প্রীত, প্রসন্ন করে বলিয়াই ইহাকে ছন্দ বলা হয়)।

নিরুক্তে যাস্ক ছন্দ নামকরণের অন্য কারণও বলিয়াছেন—'ছন্দাংসি ছাদনাৎ' (ইহা দ্বারা যজ্ঞ ছাদিত বা রক্ষিত হয় বলিয়াই ছন্দ বলা হয়)। 'রক্ষা' অর্থে ছন্দ শব্দের বিস্তর প্রয়োগ দেখা যায়।

মহাভারতের দ্বাদশ পর্বের ৩৪ অধ্যায়ে বাসুদেবকে 'সর্ব-ছন্দক' (সকলের রক্ষক) বলা হইয়াছে। গীতার ভাষ্যে (১৫।১) আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন 'ছাদনাৎ ঋগযজুসাম লক্ষণনি পর্ণানি'।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে দ্বিতীয় বাক্যে দেখা যায় দেবগণ মৃত্যুভয়ে ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

'তে ছন্দোভিরাচ্ছাদয়ন, যদেভি-রচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বং।'

(যেহেতু তাহারা ঐ সকল বেদ মন্ত্রদ্বারা নিজেদের আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, সেই হেতু ঐ মন্ত্রসমূহ ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে)।

বৈদিক ছন্দ মূলত সাতটি। এই সপ্তছন্দই অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া বহুবিধ নামে অভিহিত হয়। বহু বেদ-মন্ত্রেই সপ্ত ছন্দের উল্লেখ আছে। যথা—'অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্তছন্দ রচিত হয় (অক্ষরেণ সিমীতে সপ্তবাণী। ঋক ১।১৬৪।২৪)।

'এই যজ্ঞে—তিন প্রকার স্বর, সপ্তপ্রকার ছন্দ এবং দশ প্রকার পাত্র আছে' (ঋক ২।১৮।১)।

'সপ্ত ছন্দ সেই রথের রজ্জু' (৯।৬২।১৭)।

এই যজ্ঞের সাতটি সূত্র অর্থাৎ সপ্তছন্দে স্তুতিপাঠ হয়। (১০।৫২।৪)।

'ঋষিগণের অন্তঃকরণে যে ভাষা স্থাপিত ছিল—সপ্ত ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে' (১০।৭১।৩)।

'সোমদেবের উদ্দেশ্যে সপ্ত ছন্দ উচ্চারিত হইতেছে' (১০।১৩।৫) ইত্যাদি।

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে সপ্তছন্দের জন্মকথা বলা হইয়াছে—

তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ
ত্বচো বিভোঃ।

ত্রিষ্টুভ্মাংসাৎ স্নায়ুতোঽনুষ্টুব্জগত্যস্থ্নঃ
প্রজাপতেঃ।
মজ্জায়া পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী
প্রাণতোঽভবৎ ॥

—৩।১২।৪৫

অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার লোমপুঞ্জ হইতে উষ্ণিক, ত্বক হইতে গায়ত্রী, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ, অস্থি হইতে জগতী, মজ্জা হইতে পংক্তি এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দ উৎপন্ন হইল।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৩০ সূক্তে কোন ছন্দ কোন দেবতাকে আশ্রয় করিল তাহা বলা হইয়াছে। যথা—

'গায়ত্রী অগ্নির সহযোগিনী হইলেন। উষ্ণিক সবিতা দেবের সহিত মিলিত হইলেন। অনুষ্টুপ সোমের সহিত মিলিত হইলেন। বৃহতী বৃহস্পতির বাক্যকে আশ্রয় করিলেন। পঙ্‌ক্তি মিত্রা বরুণকে আশ্রয় করিলেন। ত্রিষ্টুপ ইন্দ্রকে এবং জগতী সমস্ত দেবতাকে আশ্রয় করিলেন।'

এই মন্ত্রটির উপর নির্ভর করিয়াই আচার্য পিঙ্গল তাঁহার 'ছন্দসূত্রে' ছন্দের সপ্তদেবতা নির্ণয় করেন—

'অগ্নিঃ সবিতা সোমো বৃহস্পতি মিত্রাবরুণাবিন্দ্রো বিশ্বদেবা দেবতাঃ" (৩।৬৩)।

বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ঐতিহ্য অনুসারে সপ্তছন্দের সাতটি দেবতা, সাতটি স্বর এবং সাতটি বর্ণ এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে—

ছন্দ	দেবতা	স্বর	বর্ণ (রং)
গায়ত্রী	অগ্নি	ষড়জ (সা)	সিত
উষ্ণিক	সবিতা	ঋষভ (রে)	সারঙ্গ (হরিদ্রা)
অনুষ্টুপ	সোম	গান্ধার (গা)	পিঙ্গল
বৃহতী	বৃহস্পতি	মধ্যম (মা)	কৃষ্ণ
পঙ্‌ক্তি	মিত্রাবরুণ	পঞ্চম (পা)	নীল
ত্রিষ্টুপ	ইন্দ্র	ধৈবত (ধা)	লোহিত
জগতী	বিশ্বদেবা	নিষাদ (নি)	গৌর

ঋষি কাত্যায়ন তাঁহার 'সর্বানুক্রমণী'তে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহের বিভিন্ন ছন্দের সংখ্যা এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন

গায়ত্রী—	২৪৬৭	উষ্ণিক—	৩৪১
ত্রিষ্টুপ—	৪২৫৩	পঙ্‌ক্তি—	৩১২
জগতী—	১৩৪৮	বৃহতী—	১৮১
অনুষ্টুপ—	৮৫৫		

কাত্যায়নের তালিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী এই তিনটি ছন্দই বৈদিক ঋষিগণের বিশেষ প্রিয় ছিল। বেদমন্ত্রের মধ্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যজুর্বেদের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তবিংশ মন্ত্রে যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি।
ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি।
জাগতেন ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি ॥

অর্থাৎ সেই যজ্ঞকে গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা এবং জগতী ছন্দের দ্বারা সর্বতোভাবে গ্রহণ করি অর্থাৎ সম্পাদন করি এবং সফল করি। যজুর্বেদের ২য় অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ মন্ত্রে এবং ঋগ্বেদের ১।১৬৪।২৪,২৫ মন্ত্রদ্বয়েও এই তিনটি ছন্দের বিশেষ উল্লেখ আছে।

সপ্তছন্দের মধ্যে গায়ত্রী ও উষ্ণিক্ ছন্দের তিনটি করিয়া পাদ বা চরণ। অনুষ্টুপ্, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী ছন্দের চারিটি করিয়া চরণ এবং পঙ্‌ক্তি ছন্দের পাঁচটি চরণ। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে একনজরে সপ্ত ছন্দের পাদসংখ্যা ও অক্ষর-সংখ্যা অবধারণ করা যাইতে পারে—

ছন্দের নাম	প্রথম চরণের অক্ষর সংখ্যা	দ্বিতীয় চরণের অক্ষর সংখ্যা	তৃতীয় চরণের অক্ষর সংখ্যা	৪র্থ চরণের অক্ষর সংখ্যা	মোট
গায়ত্রী	৮	৮	৮	×	=২৪
উষ্ণিক্	৮	৮	১২	×	=২৮
ত্রিষ্টুপ	১১	১১	১১	১১	=৪৪
জগতী	১২	১২	১২	১২	=৪৮
বৃহতী	৮	৮	১২	৮	=৩৬
অনুষ্টুপ	৮	৮	৮	৮	=৩২

পঙ্‌ক্তি ছন্দের প্রতিচরণে ৮ করিয়া অক্ষর এবং পাঁচটি চরণে মোট ৪০টি অক্ষর।

বৈদিক ছন্দ অক্ষরগণনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঋষি কাত্যায়ন 'সর্বানুক্রমণী'তে বলিয়াছেন—

'যদক্ষর পরিমাণং তচ্ছন্দঃ'। অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা ছন্দ নির্ণীত হয়। ঋগ্বেদেও বলা হইয়াছে—

'অক্ষরেণ মিমীতে সপ্তবাণীঃ' (১।১৬৪।২৪)।

স্মরণ রাখিতে হইবে যুক্তাক্ষর একটি অক্ষররূপেই গণ্য হয়। হসন্ত-যুক্ত অক্ষর (যথা ম্, ৎ, দ্, ক্ ইত্যাদি এবং ঃ) ছন্দের অক্ষরগণনায় বর্জিত থাকে। মাম্, মাং এক অক্ষর এবং সকৃৎ, সকৃদ্, অহন্, কিঞ্চিৎ প্রভৃতি শব্দ দুই অক্ষর ধরিতে হয়, ইত্যাদি।

বৈদিক ছন্দ সম্বন্ধে অধুনা-লভ্য প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে পিঙ্গলাচার্য রচিত 'ছন্দঃসূত্র'ই সর্ব-প্রাচীন এবং প্রামাণ্য। পিঙ্গলের পূর্বে ক্রৌষ্টুকী, তণ্ডি, কশ্যপ, রাত মাণ্ডব্য প্রভৃতি ছন্দশাস্ত্রের প্রণেতাগণের নাম শোনা যায়; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ অধুনাবিলুপ্ত বলিয়া মনে হয়। আচার্য পিঙ্গল পাণিনির কনিষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। 'বেদার্থ-দীপিকা'য় ষড়্‌গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন—

'তথাহি সূচ্যতে ভগবতা পিঙ্গলেন পাণিন্যনুজেন' (৩।৩৩)। পাণিনি স্বয়ং ঘোষাদিগণে (৬।২।৮৫) পিঙ্গলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে একটি উদাহরণ দিয়াছেন— 'পিঙ্গল কাণ্বস্য ছাত্রাঃ পৈঙ্গল কাণ্বাঃ' (১।১।৭৩)। পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্মা মিত্রলাভে আচার্য পিঙ্গলের অপমৃত্যুর কথা বলিয়াছেন 'ছন্দোজ্ঞান নিধিং জঘান মকরো বেলাতটে পিঙ্গলং' (ছন্দোজ্ঞান নিধি পিঙ্গলকে সাগর-বেলাভূমিতে মকরনিধন করিয়াছেন)।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের নবম মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন 'এমন কোন্ পণ্ডিত আছেন যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন?' পিঙ্গলাচার্যের ছন্দসূত্রের (বৈদিক প্রকরণ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথমত গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দের গঠনপ্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। তারপর কয়েকটি ছন্দের বহুবিধ রূপান্তর দেখান হইয়াছে। দৈবী, আসুরী ইত্যাদি ভেদে গায়ত্রী ছন্দেরই সপ্তজাতি উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা 'দৈব্যেকম্' (২।৩) অর্থাৎ দৈবী গায়ত্রী একাক্ষরা। আচার্য কোন উদাহরণ দেন নাই। 'ওঁ' এইটিই দৈবী গায়ত্রীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'আসুরী পঞ্চদশ' (২।৪) অর্থাৎ আসুরী গায়ত্রীতে ১৫টি অক্ষর থাকে। 'যজুষাং ষট্' (২।৬)—যাজুসী গায়ত্রীতে অক্ষরসংখ্যা ছয়। 'প্রাজাপত্যাষ্টৌ' (২।৫)—প্রাজাপত্য গায়ত্রীতে আটটি অক্ষর থাকে। 'সাম্নাং দ্বিঃ' (২।৭) সাম্নী গায়ত্রীতে ২×৬=১২টি অক্ষর। 'ঋচাং ত্রিঃ' (২।৮) আর্চী গায়ত্রীতে ৩×৬=১৮টি অক্ষর। ইত্যাদি।

আর্ষী গায়ত্রীতে তিন চরণে ৮টি করিয়া মোট ২৪টি অক্ষর থাকে। এই আর্ষী গায়ত্রীতেই ঋষিগণ বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋষিগণের প্রণীত বলিয়াই ইহার নাম আর্ষী গায়ত্রী। আবার এই আর্ষী গায়ত্রীতেও কখন কখন 'চতুষ্পাদ ঋতুভিঃ' (৩।৮) অর্থাৎ চারিটি চরণে ৬টি করিয়া অক্ষর, মোট ২৪টি অক্ষর হয়। কখনো বা সাত অক্ষর যুক্ত তিনটি চরণ থাকে—কৃচিৎ ত্রিপাদ ঋষিভিঃ (৩।৯)। *

এবার আমরা মূল সপ্তছন্দ উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 'গায়ত্র্যা বসবঃ' (ছন্দসূত্র ৩।৩)। গায়ত্রী ছন্দের প্রতি চরণে আটটি অক্ষর থাকে। (বসুগণের সংখ্যা ৮; সুতরাং 'বসবঃ' বলিলে আট সংখ্যা বুঝিতে হয়)। পূর্বে দেখিয়াছি গায়ত্রীর তিনটি চরণ; সুতরাং মোট অক্ষর সংখ্যা ২৪; যথা—সামবেদের প্রথম মন্ত্র—

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ৮
গৃণানো হব্য দাতয়ে। ৮
নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ৮
——
২৪

হে অগ্নি! তুমি হব্য (চরু পুরোডাশাদি) ভক্ষণের জন্য শুভাগমন কর। দেবগণের নিকট হব্য বহনের জন্য (অথবা আমাদিগকে দানযোগ্য পদার্থ প্রদানের জন্য) আমাদের দ্বারা স্তুত হইয়া হোতারূপে এই কুশের উপর উপবেশন কর।

বিশ্বানি দেব সবিত ৮
দুরিতানি পরাসুব। ৮
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥ ৮
যজু ৩০।৩ ——
২৪

হে সবিতা দেব! আমাদের দুষ্কৃতি-সকল দূরীভূত কর। যাহা কল্যাণকর, তাহা আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর।)

'জগত্যা আদিত্যাঃ॥' (৩।৪) জগতী ছন্দের এক এক চরণে, ১২টি অক্ষর থাকে। (আদিত্যগণের সংখ্যা ১২ তাই 'আদিত্যাঃ' বলিলে ১২ সংখ্যা বুঝায়)। চারি চরণে মোট ৪৮টি অক্ষর থাকে। যথা—

তান্ পূর্বয়া নিবিদা হুমহে বয়ং ১২
ভগং মিত্রমদিতিং দক্ষম স্রিধম্। ১২
অর্যমনং বরুণং চ সোমাশ্বিনা ১২
সরস্বতী নঃ সুভগা ময়স্করৎ॥ ১২
যজু ২৫।১৬ ——
৪৮

(তাঁহাদিগকে আমরা প্রাচীন বেদাত্মক বাক্যদ্বারা আবাহন করি। ভগ, মিত্র, অদিতি, ক্ষয়রহিত দক্ষ প্রজাপতি, অর্যমা, বরুণ, সোম এবং অশ্বিদ্বয়কে আবাহন করি। শোভন ধন-সম্পন্না সরস্বতী আমাদের সুখ বিধান করুন)।

ত্রি র্নো রয়িং বহত মশ্বিনা যুবং ১২
ত্রি র্দেবতা তা ত্রিরুতা বতং ধিয়ঃ। ১২
ত্রিঃ সৌভগত্বং ত্রিরুত শ্রবাংসি ন ১২
স্ত্রিষ্ঠং বাং সূরে র্দুহিতা রুহদ্রথম্॥ ১২
ঋক্ ১।৩৪।৫ ——
৪৮

* ঋতুগণের সংখ্যা ছয়; সুতরাং 'ঋতুভিঃ' শব্দ দ্বারা 'ছয়' সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে 'ঋষিভিঃ' শব্দ দ্বারা সপ্তর্ষিগণের সংখ্যানুসারে 'সাত' সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে।

(হে অশ্বিদ্বয়! তিনবার সবনকালে আমাদের তিনবার যজ্ঞফলরূপ দান কর। দৈব কর্মানুষ্ঠানে তিনবার আগমন কর। তিনবার আমাদের বুদ্ধিকে রক্ষা কর। তিনবার আমাদের সৌভাগ্য বিধান কর। তিনবার আমাদের অন্নাদি প্রদান কর। তোমাদের ত্রিচক্ররথে সূর্যের দুহিতা অর্থাৎ উষা আরূঢ়া হইয়াছেন)।

'ত্রিষ্টুভো রুদ্রাঃ' (৩৬) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রতি চরণে ১১টি করিয়া অক্ষর থাকে। (রুদ্রগণের সংখ্যা একাদশ; তাই রুদ্রাঃ বলিলে এগার সংখ্যা বুঝায়) চারি চরণে মোট অক্ষরসংখ্যা ৪৪; যথা—

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো ১১
নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যোঃ। ১১
যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম ১১
মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ॥ ১১
ঋক্ ১।২৭।১৩ —— ৪৪

(মহৎ দেবগণকে নমস্কার। কিশোর দেবগণকে নমস্কার। যুবক দেবগণকে নমস্কার। বৃদ্ধ দেবগণকে নমস্কার। যদি শক্তি থাকে দেবগণকে অর্চনা করিব। শ্রেষ্ঠগণের স্তুতিকর্ম হইতে যেন বিরত না হই।)

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ১১
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। ১১
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং ১১
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১১
ঋক ১০।১২১।১ —— ৪৪

(সর্বাগ্রে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনিই এই পৃথিবী এবং দ্যুলোক এবং এই সব কিছুকে যথাস্থানে বিধৃত করিয়া রাখিলেন। তাঁহাকে ছাড়া কাঁহার উদ্দেশ্যে হবি নিবেদন করিব?)।

'বৃহতী জাগতস্ত্রয়শ্চ গায়ত্রাঃ'॥ (৩।২৬)

বৃহতী ছন্দে জগতীর মত এক চরণ এবং গায়ত্রীর মত তিন চরণ থাকে। (অর্থাৎ বার অক্ষরযুক্ত এক চরণ এবং ৮ অক্ষরযুক্ত তিনচরণ। ৮+৮+১২+৮=৩৬ অক্ষর। যথা—

যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে ৮
গিরা গিরা চ দক্ষসে। ৮
প্র প্রবয়মমৃতং জাতবেদসং ১২
প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষং ৮
সাম ১।৪।১ —— ৩৬

(প্রতি যজ্ঞে তোমরা স্তুতিবাক্য দ্বারা জাতবেদা অগ্নির স্তব কর। আমরাও সেই অবিনাশী, সর্বজ্ঞ, প্রিয়-মিত্র-তুল্য অগ্নিদেবের মহিমা প্রকৃষ্টরূপে কীর্তন করিতেছি)।

ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো ৮
বরন্ত ইন্দ্র বীড়বঃ। ৮
যচ্ছিক্ষসি স্তুবতে মাবতে বসু ১২
ন কিষ্টদা মিনাতি তে॥ ৮
ঋক্ ৮।৮৮।৩ —— ৩৬

(হে ইন্দ্র! বৃহৎ ও সুদৃঢ় পর্বতসকলও তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না। আমার ন্যায় স্তুতিকারীকে যদি তুমি ধন দান কর, তাহা কেহই রোধ করিতে পারে না।)

'উষ্ণিগ্ গায়ত্রো জাগতশ্চ' (৩।১৮) উষ্ণিক্ ছন্দে গায়ত্রী ন্যায় (৮ অক্ষরবিশিষ্ট) ২টি চরণ এবং জগতীর ন্যায় (১২ অক্ষর বিশিষ্ট) একটি চরণ থাকে। যথা—

তং বঃ সখায়ো মদায় ৮
পুনান মভিগায়ত ৮
শিশুন্ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ॥ ১২
ঋক্ ৯।১০৫।১ —— ২৮

(হে মিত্রগণ! তোমরা সেই পবিত্র সোমকে আনন্দ লাভের জন্য স্তুতি কর। শিশুকে যেরূপ আহার্য আস্বাদন করাইয়া তুষ্ট করা হয়, সেই রূপ হব্য ও স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট কর।)

ইন্দ্রায় সাম গায়ত ৮
বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ৮
বৃহৎকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥ ১২
ঋক্ ৮।৯৮।১ —— ২৮

(ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বৃহৎ সাম গান কর। তিনি মহান্, বেদবিৎ, বেদ-উপদেষ্টা, মেধাবী এবং স্তবনীয়।)

পঙ্ক্তি ছন্দের পাঁচটি চরণ। প্রতি চরণে ৮টি করিয়া মোট ৪০টি অক্ষর থাকে। যথা—

প্রতি প্রিয়তমং রথং ৮
বৃষণং বসুবাহনম্। ৮
স্তোতা বামশ্বিনা ঋষিঃ ৮
স্তোমেভি র্ভূষতি প্রতি ৮
মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৮
ঋক্ ৫।৭৫।১ —— ৪০

(হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অতি প্রিয়, অভীষ্ট বর্ষক, রত্নবহনকারী রথকে স্তুতিকারী ঋষি বেদোক্ত স্তোত্রদ্বারা অলঙ্কৃত করে। হে মধু-বিদ্যা-বিশারদদ্বয়! আমার আবাহন শ্রবণ কর।)

ভদ্রং নো অপি বাতয় ৮
মনো দক্ষমুত ক্রতুম্। ৮
অধা তে সখ্যে অন্ধসো ৮
বি বো মদে রণা গাবো ৮
ন যবসে বিবক্ষসে॥ ৮
—— ৪০

(হে দেব! আমাদের মনকে নিপুণতা ও কর্মের দিকে প্রেরণা দান কর। গাভীগণ যেমন তৃণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ তোমার মধুর প্রেমে স্তবকারিগণ যেন আকৃষ্ট হয়।)

'অনুষ্টুপ্ গায়ত্রৈঃ'। (৩।২৩)। অনুষ্টুপ ছন্দে গায়ত্রীর ন্যায় আট অক্ষরযুক্ত চারিটি চরণ থাকে। মোট অক্ষর সংখ্যা বত্রিশ। যথা—

আ ত্বা গিরো রথীরিব ৮
আস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ। ৮
অভি ত্বা সমনূষত ৮
গাবো বৎসং ন ধেনবঃ॥ ৮
ঋক্ ৮।৯৫।১ ——

(গো-মাতা যেরূপ বৎসের প্রতি ধাবমানা হয়, সেইরূপ হে স্তবনীয়! আমাদের স্তুতিবাক্য সবই ন্যায় বেগে তোমার অভিমুখে ধাবিত হৌক।)

পুরুষ এবেদং সর্বং	৮
যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।	৮
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি	৮
ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥	৮
	——
যজু ২১।২	৩২

(যাহা কিছু অতীত, যাহা কিছু বর্তমান, যাহা কিছু ভাবী তৎ সমস্তই সেই পরম পুরুষের বিভূতি। তাঁহার একপাদে এই সর্বভূত অবস্থিত। অন্য তিন পাদ উর্ধ্বে দিব্যলোকে অমৃতরূপে বিরাজমান।)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে লৌকিক সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্ ছন্দেই প্রথম শ্লোক বিরচিত হয়। ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যতমকে নিহত করায় ব্যাধের প্রতি কবিগুরু বাল্মীকির সুবিখ্যাত উক্তিটিকে রামায়ণের সকল টীকাকারই লৌকিক সংস্কৃতের প্রাচীনতম পদ্যের নিদর্শন বলিয়াছেন। কেবল রামানুজ বলিয়াছেন— ইহার পূর্বেও লৌকিক পদ্য ছিল।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতম্।
—রামায়ণ ১।২।১৫।

এই বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াই বাল্মীকি ভাবিলেন 'শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া?' এই পক্ষীর শোকে কাতর হইয়া এ আমি কি উচ্চারণ করিলাম? তারপর স্বয়ংই শিষ্যকে বলিলেন—

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয় সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু
নান্যথা॥
—রামা ১।২।১৮।

'শোকার্ত অবস্থায় আমাদ্বারা উচ্চারিত সমান-অক্ষর-সমন্বিত ও সমচরণে নিবদ্ধ, বীণাসংযোগে তাল-লয়-যুক্ত-ভাবে গীত হইবার যোগ্য এই বাক্য শ্লোক নামেই পরিচিত হৌক—অন্য কোন নামে নহে।' বাল্মীকি অনুক্ষণ এই শ্লোকটির কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা শ্লোক নামেই পরিচিত হৌক, ইহাতে আর বিচার বিবেচনার প্রয়োজন নাই ('শ্লোক এবাস্ত্বয়া বদ্ধো নাত্র কার্যা বিচারণা')।' আরো বলিলেন, 'কুরু রাম কথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্'। বস্তুত প্রধানত এই অনুষ্টুপ ছন্দেই রামায়ণ বিরচিত হইয়াছে। অবশ্য ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী ছন্দে বিরচিত কতকগুলি শ্লোকও আছে।

পূর্বেই দেখিয়াছি ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে এমন পণ্ডিত কে আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের কথা জানেন (১০।১১৪।৯)। ইহাও দেখিয়াছি, এক গায়ত্রী ছন্দেরই সপ্তজাতি। বস্তুত ছন্দঃসূত্রে অপর ছয়টি মূল ছন্দেরও সপ্ত জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নির্দিষ্ট অক্ষর-সংখ্যার সামান্য ইতরবিশেষের জন্য প্রত্যেকটি মূল ছন্দেরই বহুবিধ রূপান্তর আছে। কোন ছন্দের নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে একটি অক্ষর কম হইলে, সেই ছন্দের নামের পূর্বে 'নিচৃৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়। যথা—গায়ত্রীতে ২৩ অক্ষর থাকিলে তাহাকে নিচৃৎ গায়ত্রী বলা হয়। উষ্ণিকে এক অক্ষর কম থাকিলে তাহাকে নিচৃৎ উষ্ণিক বলা হয়। আবার কোন ছন্দের নির্দিষ্ট অক্ষর-সংখ্যা হইতে এক অক্ষর বেশী থাকিলে, সেই ছন্দের নামের পূর্বে 'ভুরিক' এবং দুই অক্ষর বেশী থাকিলে, সেই ছন্দের নামের পূর্বে 'স্বরাট' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

পিঙ্গলাচার্য 'শংকুমতী', 'ককুদমতী', 'ককুপ', 'পিপীলক মধ্যা' প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ ছন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কতক ছন্দ আছে, যাহাদের আয়তন অত্যন্ত দীর্ঘ। তাহাতে অক্ষর সংখ্যা ৬৪ হইতে ১০৪ পর্যন্ত নির্ধারিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহাদের আলোচনায় বিরত রহিলাম।

মহাকাশের রহস্য

বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী
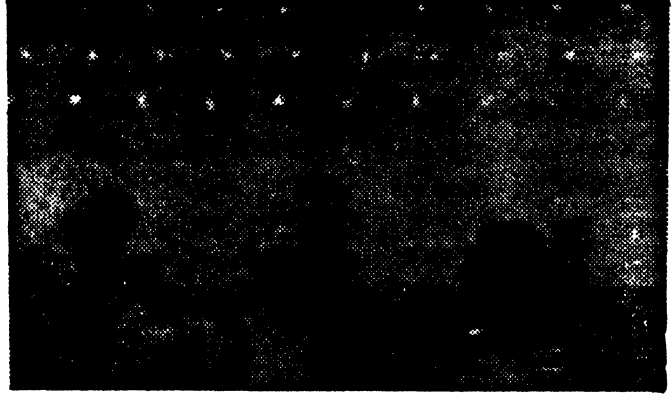
জেমিনির যাত্রা হল শুরু

মহাকাশসংক্রান্ত গবেষণায় আমেরিকা ও রাশিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা অনেকে ভেবেই পাই না কেন তারা এর পেছনে এমন বিপুল অর্থ ব্যয় করে চলেছে। বস্তুত দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা-দীক্ষার খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ এর তুলনায় অতি নগণ্য। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোক যেখানে ভালভাবে দু'বেলা খেতে পায় না সেখানে একে 'অর্থের অপচয়' মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এরকম মনে হওয়ার কারণ মহাকাশসংক্রান্ত গবেষণার সুদূরপ্রসারী ফলাফল, তাদের উদ্দেশ্য—এসব নিয়ে চিন্তাই করি না। এটা আমরা কখনোই ভেবে দেখি না যে, এর ফলেই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে পারব, প্রকৃতির নিয়মকে জানতে পারব, আর সেই জ্ঞান কাজে লাগবে মানবজাতিরই কল্যাণসাধনে।

পৃথিবীর চারদিকে যে কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরে চলেছে তা থেকেই আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাষ সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য পেয়ে থাকি। মহাকাশসংক্রান্ত গবেষণায় মহাকাশের অনেক তথ্য আমরা জানতে পারব, ফলে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ আরো নিখুঁত ও সঠিকভাবে জানান সম্ভব হবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আবহাওয়ার পরিবর্তন অনেক আগেই ঘরে বসে পেয়ে যাব। আরেকটি যে বিরাট সুবিধা, সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক রেডিও ও টেলিভিশান স্থাপন। এর ফলে পৃথিবীর যে-কোন দুই অংশের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান-ব্যবস্থা হবে আরো সহজ ও উন্নত। ফলে দূর হবে নিকট, পর হবে আপন। ঐক্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হবে বিশ্ববাসী। যুদ্ধের মারণাস্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার হয় মারণাস্ত্র প্রতিহতকারী অস্ত্র। সর্বাধুনিক যে মারণাস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে তা হোল—Inter Continental Ballistic Missile সংক্ষেপে I C B M, যার সাহায্যে জার্মানীতে বসে লণ্ডন শহরকে মুহূর্তের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া আর কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু এর প্রতিহতকারী শক্তি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাকাশ-গবেষণায় আরো কিছু তথ্য জানতে পারলে তাঁদের এ-ব্যাপারে অনেক সুবিধা হতে পারে।

অন্য গ্রহে জীবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করতে পারছেন না। যদি কোন জীবের অস্তিত্ব ধরা পড়ে জীববিজ্ঞানীদের কাছে সেটা হবে মহামূল্যবান। অন্য গ্রহে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ঠিক আমাদের মত নয়। সুতরাং সেখানে জীবজগতের শারীরিক গঠনও আলাদা। এর থেকে আমরা গ্রহান্তরে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপায় শিখে নিতে পারব। অন্যান্য গ্রহে হয়ত রয়েছে মানুষের থেকে উন্নত জীবজগৎ। পৃথিবী থেকে মাঝে মাঝে সুদূর কোন গ্রহ থেকে রেডিও-সঙ্কেত পাওয়া গেছে—এ থেকেই বিজ্ঞানীদের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। এগুলো সুদূর কোন সভ্যতারই ইঙ্গিত বহন করে আনছে, কারণ সোভিয়েত বিজ্ঞানী N. S. Kardashev-এর মতে এ সঙ্কেতগুলো কৃত্রিম উপায়ে তৈরী। আর সে সভ্যতা আমাদের থেকে আরও উন্নত পর্যায়ের। কারণ অন্য গ্রহে রেডিও সঙ্কেত পাঠানোর মত যথেষ্ট কারিগরী জ্ঞান আমরা এখনও আয়ত্ত করতে পারি নি।

অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর তুলনামূলক বিচারে অনেক জটিল সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হবে, অনেক অর্থ ও পরিশ্রম বাঁচবে। চাঁদের কথাই ধরা যাক। চাঁদের বুকে যদি আমরা কোন পাললিক শিলার সন্ধান পাই তবে আমরা বলতে পারব চাঁদের বুকেও একদিন ছিল নদী, সমুদ্র। কারণ পাললিক শিলার গঠনে জল ও বাতাস অপরিহার্য। পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস আরও হবে প্রাঞ্জল। পেট্রোলিয়াম খনিজ পদার্থ না জৈব পদার্থ? বিজ্ঞানী মহলে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। সমস্যার সমাধান হবে চাঁদে। চাঁদে যদি আমরা পেট্রোলিয়ামের সন্ধান না পাই তবে এটা বলতে পারব যে পেট্রোলিয়াম জৈব পদার্থ। শুধু কি তাই? পৃথিবীর কেন্দ্রটা ভীষণ গরম—তার প্রমাণ আমরা পাই অগ্ন্যুৎপাতের গলিত লাভা উদ্‌গিরণ থেকে। কিন্তু এর কারণ বিজ্ঞানী মহলে এখনও অজানা। তাঁরা অনুমান করছেন রেডিও অ্যাকটিভ থোরিয়াম আর ইউরেনিয়ামের বিশ্লেষণের ফলেই এই প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি।

চাঁদের কেন্দ্রেও যদি আমরা এই প্রচণ্ড তাপের সন্ধান পাই তাহলে বুঝতে হবে আমাদের অনুমান ঠিক। যদি না হয়—তাহলে হয়তো প্রচণ্ড চাপে, কারণ পৃথিবীর রয়েছে বিরাট ভর (mass)।

আর পঞ্চাশ বছর পর দেখতে পাব চাঁদ, বুধ ও শুক্রগ্রহে মানুষের বসতি। গ্রহান্তরে এই উপনিবেশ স্থাপনে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। চাঁদের অবস্থাটাই দেখা যাক। চাঁদের পৃষ্ঠদেশ শুকনো, জলবাতাসের নেই নামগন্ধ। অভিকর্ষ পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ। নেই বায়ুমণ্ডল, অখণ্ড শূন্যতা। আমাদের শরীর এমনভাবে তৈরী যে, পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলের চাপ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে চলে গেলে আমরা অস্বস্তি অনুভব করি। সুতরাং এই বিরাট শূন্যতার মধ্যে মানুষ বাঁচতেই পারবে না। এর হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে আমাদের দেহের চারিপাশে উচ্চচাপে বাতাসের একটা খোলস পরিয়ে দিতে হবে। তা'ছাড়া আছে উল্কাপাত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আমাদের উল্কাপাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কারণ পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছানোর আগেই উল্কাপিণ্ড পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু চাঁদের নেই কোন বায়ুমণ্ডল। তাই উল্কাপাত হওয়া স্বাভাবিক। উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে (প্রায় সেকেণ্ডে ১০০,০০০ ফিট্ বেগে) চাঁদের মাটিতে আঘাত করে। সাংঘাতিক অবস্থা সেখানে।

বায়ুমণ্ডলের অভাবে সূর্যের কিরণ সরাসরি চাঁদের গায়ে স্থানান্তরিত হয়। আর এই উত্তাপকে ধরে রাখার মত কোন বায়ুস্তরও নেই, তাই চাঁদের আলোকিত দিকটা যেমন গরম, অন্ধকার দিকটা তেমনিই ঠাণ্ডা। আলোকিত দিকের তাপমাত্রা যেখানে শূন্যের আড়াইশো ডিগ্রী উপরে অন্যদিকে তাপমাত্রা সেখানে শূন্যের ২১৫ ডিগ্রী নীচে।

এইসব জটিল সমস্যার সমাধান কি সহজ? কিন্তু সমাধান করতেই হবে। মানুষ একবার চাঁদের বুকে নামতে পারলে চাঁদের বিপুল ঐশ্বর্যের লোভ সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। চাঁদের বুকের বিরাট তাপমাত্রার বিভেদকে কাজে লাগিয়েই টারবাইন চালানো সম্ভব হবে। তাপমাত্রার এই বিভেদই টারবাইনের মূলসূত্র। পৃথিবীতে ভ্যাকুয়াম তৈরী করা যেমন একটা খরচসাপেক্ষ ব্যাপার, চাঁদে সেটা কোন সমস্যাই নয়। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে আরো সহজ। যেহেতু বাতাস নেই, ড্যাম্প লাগা, জং ধরা, পোকায় কাটা, এসবের কিছুরই সমস্যা নেই। সুতরাং ঐতিহাসিক মূল্যবান নথিপত্র আমরা নিশ্চিন্তে চাঁদের গুহায় রেখে আসতে পারি—নষ্ট হয়ে যাবার কোন ভয় নেই। চাঁদের মাটিতে হয়ত অনেক খনিজ পদার্থ পাওয়া যেতে পারে, অনেক মূল্যবান ধাতুরও সন্ধান মিলতে পারে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা—মানুষের চালচলন, শরীরের উষ্ণতা, রক্তের চাপ, মানসিক অবস্থা—জ্যোতিষ্কপুঞ্জের সঙ্গে এদের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এসব রহস্যের সহজ সমাধান সম্ভব হবে মানুষ যেদিন তাদের আরো ভালোভাবে চিনবে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা যেহারে বেড়ে চলেছে গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হ'লে পৃথিবীর পক্ষে হবে মঙ্গল। বর্তমানে পৃথিবীর লোক-লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে বছরে গড়ে দুই শতাংশ করে। এইভাবে চলতে থাকলে বর্তমানে ভারতের প্রতিবর্গ-একক ক্ষেত্রে যে লোকবসতি, সমস্ত পৃথিবীর সেই অবস্থায় আসতে আর মাত্র লাগবে আড়াইশো বছর।

তারপর? তার পর যেতে হবে অন্য গ্রহ-উপগ্রহে। কিন্তু তাও বা কতদিন। হিসেব করে দেখা যায় এইহারে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকলে মাত্র ১০ লক্ষ বছরের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা দরকার হবে মানুষের বসবাসের জন্য। সময়টা খুব দূরে নয়—পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকালের দশ ভাগের এক ভাগ। তবে চিন্তা নেই—ততদিনে আশা করা যায়, লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উন্নত ব্যবস্থা মানুষের নিশ্চয়ই জানা হয়ে যাবে।

প্রাচীন কুসংস্কারের, অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তিহীন মতবাদের অবসান ঘটবে, মানুষ সম্মুখীন হবে রূঢ় বাস্তবের। প্রকৃতিকে কেউ আর দেবতার আসনে বসিয়ে রাখবে না। কবি ও প্রেমিকের কাছে সোনার থালা চাঁদ মনে হবে ধূলিধূসরিত পিণ্ডমাত্র। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করবে—লাভ করবে পরম সত্য।

আমাকে সাজিয়ে দাও

মনোময় চক্রবর্তী

পরিচিত সংসারের যত কিছু কলকোলাহল—
হীনমন্য রাজনীতি প্রেমশূন্য মানব-কল্যাণ,
চিহ্নহীন নির্বিবেক দেশভক্তি, মেকি অশ্রুজল
আনিতে পারে কি আলো অনশ্বর দিব্য অনির্বাণ?

বুদ্ধদেব মহম্মদ যীশুখৃস্ট চৈতন্য নিমাই......
সময়ের শূন্যতায় আঁক কষে হিসেব মেলে না!
শিথিল মনের পটে দীপ জেলে আলোক না পাই,
অকস্মাৎ স্বপ্নে হেরি কুরুক্ষেত্রে নারায়ণী সেনা।

কিন্তু স্বপ্ন আর নয়, হে দেবতা, সত্যদৃষ্টি দাও,
ধরণীর অন্ধকার আবরণ অপাবৃত কর।
স্তুতি নিন্দা প্রাত্যহিক তুচ্ছতার চিতাগ্নি জ্বালাও
আমাকে সাজিয়ে দাও চেতনার আলোকে নীরন্ধ্র।

ওজন কমাতে গিয়ে

দেখবেন, স্বাস্থ্যের ক্ষতি ক'রে বসবেন না। কেবল স্বাস্থ্য নয়, জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ'র নির্দেশমত মেদ ঝরানোর আপ্রাণ চেষ্টায়।

এই সতর্কবাণী আমেরিকা-র বিশিষ্ট চিকিৎসকদের। তাঁরা বলছেন, সাম্প্রতিক অন্যতম বিপদ—গণস্বাস্থ্যের ব্যাপারে ওজন কমানোর প্রতিশ্রুতিঅলা 'বিশেষজ্ঞ-বৃন্দ।' হ্যাঁ, ওজন এঁরা কমাতে পারেন; ৫০, এমন কি ৭৫ পাউণ্ড পর্যন্ত, মাত্র কয়েক মাসে। কিন্তু---

কিন্তু—প্রথমত, শক্তিশালী ওষুধ খাওয়া বন্ধ করার পরই আবার মেদবৃদ্ধি শুরু হয়। অস্যার্থ, চর্বি ঝরে যায় পুনরাগমনায়। চিরতরে নয়। তা ছাড়া স্বাস্থ্য, এমন কি জীবন পর্যন্ত এভাবে বিপন্ন হওয়া খুবই সম্ভব।

সঠিক কোনও হিসেব না মিললেও, চিকিৎসকদের অনুমান বেশ কয়েক শ' উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ হাজার হাজার স্থূল বপু কৃশ করার পুণ্যব্রতে উৎসর্গীকৃত। 'আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন্‌স ডিপার্টমেন্ট অব্‌ ইন্‌ভেসটিগেশন'-এর ডিরেক্টর অলিভার ফিল্‌ড মন্তব্য করেছেন—

'এইসব চিকিৎসকরা আমাদের দেশের অনেক অংশে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত বিপজ্জনক; এ বিপদ ক্রমবর্ধমান।'

এই চিকিৎসকদের নির্দেশমত ওষুধ খেয়ে প্রাণ হারানোর ঘটনাও ঘটেছে। ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় আত্মহত্যার 'কেস'ও পাওয়া যায়।

ওজন কমানোর অনেক 'বিশেষজ্ঞ' চিকিৎসা-নীতির পরিপন্থী বিজ্ঞাপন দেন; কেউ কেউ আবার রোগীর ইচ্ছানুযায়ী মেদহ্রাসের 'নিশ্চয়তা'ও দিয়ে থাকেন। এঁদের রোজগার অবিশ্বাস্য। ৫ থেকে ২৫ ডলার প্রত্যেকবার—বছরে একলাখ ডলার-এরও বেশি।

দায়িত্বসম্পন্ন চিকিৎসকরা এঁদের নাম দিয়েছেন 'কলর-পিল-স্পেশালিস্ট', 'রঙিন-বড়ি-বিশেষজ্ঞ', কারণ এঁরা রঙিন বড়ি রোগীদের খেতে দেন। এঁদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সাবধান ক'রেও দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে চিকিৎসকরা কোনও বিশেষ জ্ঞান আছে বলে মনে করেন না। কাজেই যে ডাক্তার নিজেকে 'ওজন কমানোর বিশেষজ্ঞ' বলেন, তিনি অনৃতভাষী।

স্বাস্থ্যবিদ

'ন্যুইয়র্ক্‌ সিটি'স্‌ ব্যুরো অব্‌ নিউট্রিশন্‌'-এর অধিকর্তা ডাঃ নরম্যান জোল্লিফফি সোজাসুজি বলেছেন,—

'এই চিকিৎসকরা চিকিৎসা-জগতের কলঙ্ক, স্ক্যান্ডাল এবং স্বাস্থ্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিপদস্বরূপ।'

মেদ ঝরাতে ইচ্ছুক রোগীদের মামুলী 'চেক-আপ'-এর পর রঙিন বড়ি দিয়ে নির্দেশমত খেতে বলা হয়। সপ্তাহখানেক পরে আবার আসার হুকুম থাকে। এই বড়িগুলো খুব কড়া কয়েকটা ওষুধ দিয়ে তৈরি এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। যেমন, হার্নিয়া সবে হয়েছে এমন কেউ যদি এই ওষুধ খান এবং যদি তাঁর ওজন রীতিমত কমে যায় ত যথোচিত তত্ত্বাবধানের অভাবে 'স্ট্র্যাংগুলেটেড্‌ হার্নিয়া'র মত জীবননাশ অসুখ হতে পারে।

ওজন কমানর জন্য আলোচিত 'বিশেষজ্ঞ'রা ভীষণ কড়া ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দেন। অথচ, চিকিৎসা শাস্ত্রের বাঘা বাঘা পণ্ডিত এবং চিকিৎসক সন্তোষজনক ওষুধ আবিষ্কার করা আজও সম্ভব হয় নি।

নিম্নোক্ত ধরণের ওষুধ সাধারণত চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ডাক্তাররা ব্যবহার করার নির্দেশ দেন ওজন কমানর জন্য।

১। থাইরয়েড্‌-এর সারাংশ—যা খাদ্য পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে বাড়তি চর্বি দেহে জমে না। অথচ, এটি হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত-সঞ্চালনের ওপর ভারস্বরূপ হওয়ায় তা বিপজ্জনক।

২। শরীরের থেকে জল বের করার জন্য যে ওষুধ দেওয়া হয় তার কাল সাময়িক। কারণ, শরীর শীগ্‌গির আবার জল যোগাড় ক'রে নেয়। তা ছাড়া মাত্রা ছাড়ালে, বেশিমাত্রায় জল দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে, মূত্রগ্রন্থির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। ফলে, মূত্রগ্রন্থিতে পাথুরী হতে পারে। আবার, এর ফলে ঝিমুনি ধরতে পারে।

৩। কড়া জোলাপ দিয়ে খাদ্য চর্বিতে পরিণত হওয়ার আগেই মলদ্বার দিয়ে বের ক'রে দেওয়ার রেওয়াজও চালু। নিয়মিত অতিমাত্রায় জোলাপ নিলে হজম-ক্ষমতা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাছাড়া, ফলত শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এবং খনিজ পদার্থ থেকে বঞ্চিত থাকে।

৪। ক্ষিদে কমানর জন্য ওষুধ খেলে উৎফুল্লতা, অনিদ্রা। খাবার ইচ্ছেই কমে আসে। এবং অস্থিরতা, উত্তেজনা, বিমর্ষতা, খিট্‌খিটে ভাব, দুশ্চিন্তা, মাথার যন্ত্রণা, ঝিম্‌ ধরা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, ঠোঁট জ্বালা, বমির ভাব, পেট খারাপ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেওয়া সম্ভব।

উপরে কথিত ওষুধগুলো দায়িত্বশীল চিকিৎসকের হাতে রোগীর পক্ষে উপকারী, এ ক্ষেত্রে বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে ওগুলোর অপব্যবহার হওয়ার ফলে।

যে-কোনও শক্তিশালী ওষুধ খাওয়ার আগে এবং পরে যথোচিত পরীক্ষা ঠিকমত না হলে তা গুরু বিপদের কারণ হতে পারে।

অনেক স্থূল ব্যক্তির দরকার মানসিক চিকিৎসা—দেহের চিকিৎসা নয়। যাঁরা

বেশি খেয়ে মনের বাঞ্ছা বজায় রাখেন, তাঁরা খাদ্য-বঞ্চিত হলে কী বিপর্যয় ঘটতে পারে সে ব্যাপারে দায়িত্বহীন 'বিশেষজ্ঞরা' হয় অজ্ঞ নয়ত অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় নজর দেওয়ার সময় পান না।

নিঃসন্দেহে বহু চিকিৎসক ওজন কমানোর ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা প্রথমত নিজেদের 'বিশেষজ্ঞ' বলে দাবি করেন না। এবং ওজন হ্রাসের কোনও নিশ্চয়তাও দেন না। তাঁরা অত্যন্ত সাবধানে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সাহায্য করার চেষ্টা করেন মাত্র।

আমাদের দেশে অবস্থা এখনও এতটা উদ্‌বেগজনক হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ও দেশের আর পাঁচটা জিনিসের মত মেদ ঝরানোর ব্যাপারেও বিশেষ জ্ঞানের দাবীদার গজিয়ে উঠতে পারেন যখন তখন। সাবধান হতে তাই বাধা নেই। ওজন বাড়ানর 'বিশেষজ্ঞ' লেখকের জানা আছে। সেই চিকিৎসক নিজেই ওষুধ দেন, খাদ্য-তালিকাও তৈরি ক'রে দেন। তাঁর নির্দেশ মেনে চললে ওজন বাড়ে ঠিকই, তবে - - -

তবে, ওষুধ খাওয়া বন্ধ করামাত্র অবস্থা যথা ওষুধ-গ্রহণ-পূর্বং, তথা পরম্। এতে লাভ-ক্ষতির খতিয়ান কেউ বৈজ্ঞানিক পন্থায় করেছেন বলে জানা নেই। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে কোনও মন্তব্য করা অনুচিত।

'বাড়ানো'র ডাক্তার যখন রয়েছেন, (পকেট হাল্‌কা হয় রীতিমত, ওজন বাড়লেও), তখন 'কমান'র (এ ক্ষেত্রে ওজন এবং পকেট দু-ই-ই হু হু ক'রে কমতে থাকে) ডাক্তারও যে নেই, তা তামা-তুলসী হাতে নিয়ে বলা যায় না। তবে, আগেই বলেছি, অবস্থা অস্মাদ্ দেশে এখনও শঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছায় নি। এটুকুই সান্ত্বনা।

এ ঘরে উৎসব

নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

এ ঘরে উৎসব
এ ঘরে লাল নীল বেলোয়ারী আলো।
কন্টিনেন্টাল সুরের মূর্ছনা;
হ্যালো! হ্যালো!—
মহাসাগরীয় পরিচয়।

শেরি দেবো? শ্যাম্পেন?
ম্যাডাম্! দেবো নাকি একপেগ্ স্কচ্?
নিদেন টোম্যাটো রস? কিংবা লেবু জল?
কিছু নয়?
দেবি! তুমি সচেতন হও?

সচেতন হও নিজ মূল্যায়নে;
পাপের ছোঁয়ার ভয়ে থেকো না
গুটিয়ে—অতীতের ধূসর খোলায়
সঙ্কুচিত শামুকের মতো?
বেনারসী শাড়ীর আঁচলে রেখো না
পেঁচিয়ে—সমাজের কূটনীতি!

এ ঘরে উৎসব।
এ ঘরে মধু মধু সুরের মূর্চ্ছনা।

কক্‌টেলে মোহ আছে—
দেবো নাকি সাদা-ফেনা
শ্যাম্পেন? রঙীন নেশার ঘোরে

ছুঁড়ে ফেলে দাও বারব্রত
উপবাসের শুষ্ক মহিমা!
ডিপ্লোম্যাসিতে আহুতি দাও
পুঁজি করা সেকেলে সতীত্ব।

ম্যাডাম! লেবু-জলে কামনা নেই।
লাল-সোনা উষ্ণ রং শেরি দেবো?
রক্ত রক্ত পানীয়?
রক্তে নেশা আছে—নেশা আছে
বীরত্বের সুরাতে।

এ ঘরে উৎসব
এ ঘরে লাল-নীল বেলোয়ারী আলো।
সাদা কলার—সরু টাই বাটিক ছাপের;
সূচিমুখ পাদুকাভরণ;
নৃত্যছন্দে ভেসে চলে বঙ্ক-লীনা সুন্দরী।

ওঠো ম্যাডাম! চেয়ে দেখো।
গোলাপী উৎসব কক্ষে
শুধু কেন বোবা-চোখে থাকো—
মরা করা এথিক্সের কবরের নীচে!
তোমার হীরক দুলের
মহাদামী দ্যুতি দিয়ে

হানো হানো বিষাক্ত শায়ক—
এ্যাট্‌লান্টিকের হাওয়া-ছোঁওয়া
বিলিতি খোলসপরা
শূন্য ফাঁপা বুকে।
পুরাতন আতরের গন্ধ
ধরে রেখো নাকো।

আহাহা! মার্টিনী নাও—
কিম্বা রুখো শুখো জিন্।
আলাপে প্রলাপে চেখে দেখে নাও
ফরাসী—জার্মান গন্ধ
মার্কিন জীবনের স্বাদ।

এ ঘরে নেশার আলো
লাল-নীল বেলোয়ারী রঙের ঝলক।

শিশির নিয়োগী

রিয়্যালিজ্‌মের ভিত্তিতে যে সব নাট্য আন্দোলন, যে আন্দোলন নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি তার যথার্থ সুরু হ'য়েছিল সুদূর প্রাচ্যে, ইংলণ্ডে এবং ঠিক একশো বছর আগে। শেক্সপিয়ার শেরিডানের যুগ তখনও চলছে সমস্ত ইংলণ্ডে, সমস্ত ইউরোপেও ব'লতে গেলে। শেক্সপিয়ার নাট্য সংস্থা তখনও জমজমাট। ১৮৬৭ সালে টি ডবলিউ রবার্টসনের বিখ্যাত নাটক 'কাস্‌ট' নতুন আস্বাদ নিয়ে এলো নাট্যরসিক মহলে। শেরিডানের পর ইংলণ্ডে একদল নাটক-পাগলা সাহিত্যিক গজিয়ে উঠলো।

লণ্ডনের একটি কলেজে পাঠরত তিনজন যুবকের সখ হ'ল তারাও একটা নাট্যসংস্থা গড়ে তুলবে। তাদের নাম পেন্‌ বিশপ, ট্যাফেল সিমেনন্‌ ও রাল্‌ফ্‌ ওয়াগন। তিনজনের নামের একটু একটু জুড়ে তাদের নাট্যসংস্থার নামও দিয়ে ফেললো পেন্‌টাগন। নাটক করতে গেলে টাকার দরকার। যাঁর নাটক মঞ্চস্থ করতে যাবে তাঁকেও কিছু দিতে হবে। যাঁরা অভিনয় করবেন নাটকে তাঁরাও পয়সা ছাড়া কথা কইবেন না। হল ভাড়া ক'রে অভিনয় করতে গেলে ভাড়ার অংকটাও কম নয়। কিন্তু দমবার পাত্র তারা কেউ নয়। পয়সা তাদের উপায় করতেই হবে, সে যেভাবেই হোক।

লণ্ডনের এক বিখ্যাত বস্তীর কাছে তারা একখানা দোকানঘর ভাড়া নিল---স্টেশনারী দোকান। তিনজন বন্ধুই দোকান চালায়। মালপত্র কিনে আনা, ঘরে নিয়ে আসা, দোকানে জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা আবার খদ্দের এলে তাদের সামলানো সবাই সব করে। কলেজের ছোকরারা দোকান করেছে---পাড়ায় সবার ভীষণ কৌতূহল কেমন ক'রে তারা দোকানদারি করছে দেখবার। বিশেষভাবে কৌতূহল হয় পাড়ার মেয়েদের---সময়ে অসময়ে তারা দোকানে আসে---জিনিসপত্র কিনবার ছুতোয় তারা দু'দণ্ড কাটিয়ে যায় দোকানীদের সঙ্গে গল্প-মস্করা ক'রে। দেখতে দেখতে দোকানের বিক্রী বেড়ে যায়, দোকানের শ্রীচেহারা বাড়ে। দোকানের নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে আছে একটি সুন্দরী মেয়ে---নাম মেলোডি ব্ল্যাক্‌। মেলোডি ওখানকার একজন শিক্ষকের মেয়ে। কথায় বার্তায় জীবন্ত ও উজ্জ্বল।

কয়েকদিন পরিচিত হ'য়ে আলাপ হবার পর ট্যাফেল সিমেনন মেলোডিকে প্রস্তাব করে। না সন্দেহজনক কিছু নয়। তারা একটা থিয়েটার করবে, মেলোডি, তাতে অভিনয় করতে রাজি কিনা জানতে চায়।

---আমি কোনদিন অভিনয় করিনি।

---আমরাই কি ছাই করেছি। এসো চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।

---সময় কখন হবে রিহার্সালের? সকালে বাড়ীর কাজ। দুপুরে স্কুল, বিকেলে একটু বেরুতে হয় কেনাকাটার জন্যে আর রাত্রে তো বাবা বাড়ীর বাইরে থাকতেই দেবেন না।

---যথেষ্ট। বিকেলে যখন কেনাকাটা করতে বেরুবে তখন চলে আসবে। আধঘণ্টা তালিম দিলেই চলে যাবে। আর তুমি নিশ্চয়ই পারবে। তোমার পার্টস আছে।

এরপর থেকেনিয়মিতভাবে চলতে থাকে থিয়েটারের তালিম। প্রতিদিন বিকেলে মেলোডি দোকানে আসে কেনাকাটা করবার কাজে তখন দোকানের পেছনের ঘরটায় রিহার্সাল চলে। পেন বিশপের লেখায় হাত ছিল। ওদের দোকান, বস্তী, বস্তীর লোকজন, পাড়ার জমিদার, চার্চের ধর্মযাজক এদের নিয়ে পেন বিশপ লিখলো তার নাটক 'সিলভার স্পুন' বা রূপোর চামচ। অলস ধনী-সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করে লেখা এই নাটক। বিষয়-বস্তুতে অভিনব---আর নাটকের ভাষা ছিল নিতান্ত ঘরোয়া ধরণের। এই নাটকে খুব স্বাভাবিক কারণেই স্ত্রী-ভূমিকা কম ছিল। নায়িকার ভূমিকাটি দেয়া হ'ল মেলোডিকে আর অন্য ভূমিকাটির জন্য মেয়ে যোগাড় করার ভার দেয়া হ'ল মেলোডিকেই। বস্তীর মধ্যে থেকে খুঁজে বার করা হ'ল মারিয়াকে।

রিহার্সাল পুরোদমে সুরু হ'য়ে গেল। মেলোডির অদ্ভুত অভিনয়-ক্ষমতা ছিল, মারিয়াও ক'দিনের মধ্যে বেশ তৈরী হ'য়ে গেল।

[illegible] [illegible] বাধলো [illegible] ব্যাপারে। র‍্যালফ্ ওয়াগন তাদের প্রথম অভিনয়ের তারিখও ঠিক ক'রে ফেললো। বস্তীর পাশের মাঠটিতে হবে তাদের থিয়েটার। নিজেরা অল্পখরচে স্টেজ তৈরি কোরবে ঠিক হোল। মুক্ত আকাশের নীচে হবে অভিনয়। ছোট্ট বই দু'ঘণ্টার। রাত্রে শীত জমে প'ড়ে আসবার আগেই তাদের অভিনয় শেষ হ'য়ে যাবে। প্রথম অভিনয়ে তারা কোন টিকিটের ব্যবস্থা করবে না ঠিক কোরল।

বিপদটা হোল মেলোডিকে নিয়েই। ওর বাবা তো ভীষণ মানুষ। কোনরকমে লুকিয়ে লুকিয়ে অভিনয়ের রিহার্সাল দিচ্ছে। সেটাও সন্ধ্যার আগে শেষ হ'চ্ছে ব'লে কোন অসুবিধা হ'চ্ছে না। কিন্তু অভিনয় তো দিনের আলোয় করতে পারবে না। তাছাড়া অভিনয়ের আগে কিছু বিজ্ঞাপনও তো চারিদিকে দিতে হবে। না হ'লে লোকজন জানতে পারবে কি ক'রে অভিনয়ের কথা। আর বিজ্ঞাপনের পোস্টারে নায়ক-নায়িকার নাম থাকার নিয়ম। নায়িকার নাম নেই এমন পোস্টার হয় নাকি?

ভাবনায় পড়ল ওরা তিন বন্ধু---মেলোডির দুশ্চিন্তাও কম নয়। তবে কি তাদের এতোদিনের সাধের রিহার্সাল দেওয়া---সব অর্থহীন হ'য়ে যাবে?

পেন বিশপ ব'লল---একটা মতলব করেছি। নায়িকার আসল নাম চেপে যাই---একটা ছদ্মনাম নিতে হবে মেলোডিকে।

একদিকের মুসকিল তো আসান হ'ল কিন্তু---রাত্রে মেলোডিকে অভিনয়ের সময়ে পাওয়া যাবে কি ক'রে? সন্ধ্যার পর তো তার বাড়ী থেকে বেরুনো বারণ।

সে ব্যাপারটা মেলোডিই নিজের কাঁধে নিলো। অভিনয়ের আগের দিন মেলোডি তার মাসীর বাড়ীতে যাচ্ছে ব'লে বেরিয়ে পড়ল। পেনটাগনের দোকানে সে রাতটা কাটিয়ে দিলো।

যথাসময়ে পেনটাগনের ব্যানার [illegible] হ'ল, চারিদিকে পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল---

পেণ্টাগনের প্রথম আত্মপ্রকাশ---

নাটক---সিলভার স্পুন

প্রধান ভূমিকায়: সিলভানা রোজ, পেন বিশপ, ট্যাফেল সিমেনন, র‍্যালফ্ ওয়াগন।

যথাদিনে, যথাসময়ে অভিনয় হ'ল। লণ্ডনের লোকে এর আগে এই ধরণের অভিনয় দেখেনি। এত সহজ সরল কাহিনী নিয়ে সহজ ভাষায় এই ধরণের সাবলীল অভিনয় শুধু লণ্ডন কেন পৃথিবীর যে-কোন লোকের কাছেই ছিল অভূতপূর্ব। লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লী থেকে অনুরোধ আসতে লাগলো তাদের ওখানে গিয়ে অভিনয় করবার জন্য। অভিনয়ের সব খরচ-খরচা দেবার প্রতিশ্রুতিও তারা দিল।

অসুবিধা হ'চ্ছিল মেলোডিকে নিয়ে। প্রত্যেক বারের অভিনয়ের সময়ে এইভাবে মিথ্যা কারণ দেখিয়ে বাড়ী থেকে চলে যাওয়া আর সম্ভব হ'য়ে উঠছিলো না। ঠিক করল মেলোডিকে নিয়ে তারা ফ্রান্স, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ডে চলে যাবে পালিয়ে। সেই মত লুকিয়ে লুকিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাবার ব্যবস্থাও করতে লাগলো।

মারিয়াকে নিয়ে অসুবিধা হ'ল না। সে বস্তীতে থাকে। গরীবের ঘরের মেয়ে। মা-বাবার অবস্থা সচ্ছল নয় ব'লে মেয়েকে অভিনয় করতে দিয়ে কিছু কিছু টাকা আয় করাতে আপত্তি হ'ল না তাঁদের বেশী।

বিদেশে যেতে গেলে আগে অনেক টাকার দরকার। এর আগে কয়েকটি অভিনয় ক'রে লণ্ডন সহরে পেণ্টাগনের জনপ্রিয়তা খুব হ'য়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে তাদের অভিনয় দেখতে। এবার ঠিক করল একটা বড়ো মাঠে বেড়া দিয়ে ঘিরে, মধ্যে অভিনয় করবে। টিকিটের ব্যবস্থা থাকবে। এবার প্রচারকার্যও চালালো একটু বেশী। সহরতলীর ট্রেনের গায়ে পোস্টার সাঁটিয়ে দিলো। পেণ্টাগনের তিনজন ছোকরা এককথায় হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুললো।

বিরাট সাফল্য হ'ল অভিনয়ে। ডেকরেটরের পাওনা মিটিয়েও প্রচুর টাকা রইলো পেণ্টাগনের তহবিলে। এরপর একদিন তারা পাড়ি জমালো ইউরোপের পথে।

প্রথম অভিনয় করল প্যারিসে। প্রথম রাত্রিতে বেশী টাকা পেলো না। কিন্তু দমে যাবার লোক নয় ওরা। বুঝলো পুরো ইংরাজী ভাষায় লেখা অভিনয় ফ্রান্সে খুব মনোগ্রাহী হবে না। তাছাড়া ছোটখাটো অভিনয়ের জন্য ওরা যেসব স্থানীয় লোক নিয়েছিল তাদেরকে দিয়ে ইংরাজী ভাষার কথা বলানোতেও অসুবিধা হ'চ্ছিল খুব। তাই তারা তাদের নাটকটাকে খানিকটা ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত করল। এতে ফরাসীদের কাছে নাটকটা খুব মনোগ্রাহী হ'ল। দ্বিতীয় অভিনয় থেকে জনপ্রিয়তা বাড়তে সুরু হ'ল।

পরপর আঠারোটি অভিনয় শেষ ক'রে পেণ্টাগন যখন প্যারিস ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ডের দিকে যাবার জন্য তৈরী হ'ল তখন তাদের হাতে আরো গোটা বিশেক অভিনয়ের অনুরোধ-পত্র রয়েছে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে ঐ প্যারিস সহরেরই।

সুইজারল্যাণ্ডেও দু'সপ্তাহ কাটলো খুব সাফল্যের সঙ্গেই। তারপরই তারা চলে এলো রোমে।

এদিকে লণ্ডনে মেলোডির বাবা তো হুলুস্থুল কাণ্ড সুরু করেছেন। লণ্ডনের পুলিশ মেলোডিকে খুঁজে বার করবার জন্য চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি জানিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খবর পাঠালো। রোমে একদিন পেণ্টাগনের অভিনয় চলায় সময়ে পুলিশ সন্দেহ করল নায়িকা সিলভানা রোজকে---মেলোডি ব'লে।

অভিনয়ের শেষে সিলভানাকে পুলিশ ধরতে এলো। বিপদ বুঝে ট্যাফেল সিমেনন পুলিশকে জানালো যে সে মেলোডিকে [illegible]

করবে---এবং দু'-একদিনের মধ্যে। লণ্ডনের পুলিশকে সেইভাবে জানিয়ে দিতে বললো। রোমে বসে পুলিশের প্রহরায় ট্যাফেল ও মেলোডির বিয়ে হয়ে গেল। এদিকে আবার মারিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার পরিণতি ঘটলো বিয়েতে রোমের একটি ছোকরার সঙ্গে, নাম পেটালো মার্সেলি। সে পেণ্টাগনের নাটকে একটি ছোট ভূমিকার অভিনয় করছিলো।

পেন বিশপ বলল, 'আমাদের মধ্যেই তো বেশ একটা নাটক জমে উঠেছে। এই কাহিনীর ওপর একটা নতুন নাটক লিখি। নাটকটা হোল ইণ্টারন্যাশানাল ম্যারেজের ওপর; নাম দিলো 'দি স্কাই ইজ ওয়াইড', নাটকটা পরে ইটালীয় ভাষায় রূপান্তরিত করা হ'ল। এই নাটকটি আরও জমে গেল। ইটালীতে গেছে বললো।

এরপর পেণ্টাগন আবার নতুন নাটকে হাত দিলো। ইটালীর পটভূমিতে লেখা ইটালীর 'রেনেসাঁস' ভিত্তিতে রচিত একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রোমোলা'। লেখিকা ইংরেজ; নাম জর্জ ইলিয়ট (মেরি এ্যান ইভ্যান্স্ ১৮১৯-৮০)। নাট্যরূপ দিলো পেন্ বিশপ। সেটাকে ইটালীয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হল। তারপর অভিনয়। নাটকটি ভীষণ জনপ্রিয় হ'ল। কাগজে-পত্রে ছড়িয়ে পড়ল পেণ্টাগনের নাম। সুদূর ইংলণ্ডেও এই খবর এসে গেল।

অভিনয় যখন জোর চলছে রোমে একদিন হঠাৎ কোর্টের একখানা সমন এসে হাজির হ'ল পেণ্টাগনের দপ্তরে। ও সেই নাটক অভিনয় করবার জন্যে—উপন্যাসিকা আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন।

নাটকের অভিনয় বন্ধ হ'য়ে গেল। পেণ্টাগন তলপি-তল্পা গুটিয়ে ইংলণ্ডে চলে এলো। এতদিনে যে পয়সা ক'রেছিল আদালতে চালাতে চালাতে সব বেরিয়ে গেল। পেণ্টাগন ভেঙ্গে গেল। আর জোড়া লাগেনি।

●

পৃথিবীর সব কিছু আন্দোলনের ব্যাপারেই এমনিই সব ঝড় ও তুফান উঠেছে। কিন্তু আন্দোলন চিরতরে ম'রে যায়নি। আজ একশো বছর বাদে পেণ্টাগনের নবনাট্য আন্দোলনের দোলা আমরা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছি। নতুনকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না।

হানোভার বাণিজ্য মেলা—১৯৬৯

আগামী ২৪শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে, ১৯৬৯ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত হানোভার শহরের জগদ্বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকার প্রায় ছয় হাজার প্রতিষ্ঠান তাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং ভোগ্যপণ্যের পসরা নিয়ে এই আন্তর্জাতিক বাজারে আসবে।

এক জায়গায় বসে প্রায় সারা পৃথিবীর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে হানোভারের মেলায় যোগদান। প্রতি বৎসরের এপ্রিল মাসের শেষ শনিবার থেকে সুরু হয়ে নয়দিন ধরে চলে এই বিচিত্র বাণিজ্য মেলা। দেশকালপাত্র নির্বিশেষে বাণিজ্য জগতের আদান-প্রদানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুযোগ গ্রহণে একশোটিরও বেশী দেশ এই মেলাতে অংশগ্রহণ করছেন এ বৎসরে।

বাণিজ্যের সুযোগ সব দেশে সমান নয়। যে দেশে মন্দা চলছে, সে দেশ এখানে হয়তো খদ্দের পাবে সেই সব দেশ থেকে যেখানে সম্পদ অপরিমেয়। নিজের পছন্দসই ভারী বা ক্ষুদ্র শিল্পের যন্ত্রাদি কেনাবেচার জন্য অবাধ সুযোগ এখানে পাওয়া যাবে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পের বিশেষজ্ঞরা হানোভারে আসেন; তাঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নিজের শিল্পজাত বস্তুসম্ভারের সম্ভাব্য ক্রেতা পাওয়া খুব কঠিন হয় না।

ক্ষুদ্র ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার হানোভার শহর মেলার ক'দিন চেহারা পাল্টে সত্যিই কস্মোপলিটান হয়ে ওঠে আফ্রিকান নিগ্রো, ভারতীয় কৃষ্ণকায়, আমেরিকার ককেশিয় ও লাতিন জাতীয়, জাপানের মঙ্গোলীয়, সকলেই 'দেওয়া-নেওয়ার' ব্যাপারে একসাথে মিলিত হয়।

এই আন্তর্জাতিক মেলার সম্বন্ধে সব রকম খবরাখবর পেতে হলে নিম্নলিখিত স্থানে সংযোগ স্থাপন করুন। মেসার্স জ্যাকব ভারুগীজ, ৫৬, লক্ষ্মী বিল্ডিংস, স্যার ফিরোজসা, মেটা রোড, বোম্বাই—১।

আঁধার আবর্ত

মালাবার উপকূল, কটেজ ডা-লিস পাহাড়ী ঘরে ভাস্কোডাগামার সমাধি রক্ষক—ফার্নাণ্ডিজ ক্লান্ত, চোখে তার রাজ্যের ঘুম, শিলভীয়া, জেন্ অগাস্টাস ধীরপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, অপলক চোখে চেয়ে থাকে একে অন্যের দিকে। দূরে পাহাড়শ্রেণী, সামনে তাদের আরবের নীল জল আর উপরে অনন্ত নীল আকাশ। জলের ওপর সন্ধ্যাতারা, তার আলো জারিনার সমাধির ওপর ছিটিয়ে পড়ছে; জেন্ আর অপেক্ষা করে না, শিলভীয়ার হাতে তার সহানুভূতি চিহ্ন এঁকে হাতদুটি দু'হাতে তুলে নেয়, কটেজ ছেড়ে চলতে থাকে সে।

আঙুর জড়ানো সমাধির তলায় পদ্মের মত শিলভীয়া স্থির অচঞ্চল চেয়ে থাকে সেই চলার পথে। জেন্ এগিয়ে চলে, মালাবার লাইট হাউস দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে, পথ দেখায়—গীর্জার পথ। রাতের আঁধার আরও গভীর হয়, রাতের শেষ হয়।

পাখীরা জাগে, সোনালী আলোর ঢেউ ওঠে পাহাড়-সমুদ্রের বুক জুড়ে, ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে জারিনার সমাধি তার ঝরনাধারায় ঝলমল করে ওঠে, ফার্নাণ্ডিজ চেয়ে থাকে সেদিকে। চোখের কোণ বেয়ে নামে জলের ধারা, 'হোয়াই সো লেট'—জেন্ আসে না কেন, বড় করুণ সে প্রশ্ন, তার কারণ নাই, উত্তর কি দেবে শিলভীয়া। দিন গড়িয়ে যায় আপনার নিয়মে; সূর্য নামে পাটে।

শিলভীয়া বেলাভূমির পথ ধরে দূর বর্ণালীপথে দৃষ্টি দেয় আকুল অপেক্ষায় জেন অগাস্টাস, কোচিন গীর্জার বিশপ ফাদার এ্যাভেরী এসে পৌঁছোয় কটেজের ফটকে; শিলভীয়া। অভ্যর্থনা করে তাদের। পশ্চিম আকাশ তখন আবীররঙে লাল, গাঙচিলের দল আকাশের সীমা হারিয়ে নীড়ের দিকে ফিরে চলে, দমকা হাওয়া বুনো ফুলের গন্ধ মেখে জানলা-দরজায় ঢুকে পড়ে, শিলভীয়ার বুকে আঁটা রক্তগোলাপ।

ফাদার এ্যাভেরী এসে দাঁড়ায় ফার্নাণ্ডিজের মাথার কাছে। টেবিলের উপর রাখা চামড়া বাঁধানো বাইবেল খুলে ধরে। গভীর প্রত্যয়, জীবন-

সতীশচন্দ্র মেইকাপ

মৃত্যুর সীমারেখা, আত্মার গতি লোক থেকে লোকান্তরে; দিনের হাত ধরে আসে রাতের আঁধার, তার পিছু পিছু দিনের অভিসার, পাপ ধর্ম প্রেমের মুক্ত আকাশ-আঙিনায় মিলেমিশে তাঁরই পায়ের তলায় শিউলী-ঝরা আসন পাতে।

বুকে ক্রশ এঁকে উঠে দাঁড়ায় ফাদার, শিলভীয়া ফুলের তোড়া তুলে দেয় তাঁর হাতে, ফাদার বিদায় নিয়ে চলে যায় সমুদ্র-সৈকতে পায়ের দাগ কেটে কেটে যায়—সে চলার পথে যেন আঁধার দুয়ার খুলে যায়, আলোর ইসারা জাগতে থাকে ঐ দূরের লাইট হাউস থেকে।

'আঁধার আবর্ত, এক বিভীষিকার ঘূর্ণিময় জীবন, কোথাও কূল নাই' বলে যায় ফার্নাণ্ডিজ, 'জারিনার সে করুণ-কাতর মূর্তি, তার জীবন-যন্ত্রণা বারে বারে আমাকে দিশেহারা করে তুললো, তারই মত এমনি কত নারী ডিরোজের বুটের তলায় লুটিয়ে পড়ছে, কত স্বপ্ন-মাখা জীবন কোমল পাপড়ির রূপ সৌন্দর্য তার দু'হাতের কঠোর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছে, ঝরে পড়ছে চিরদিনের মত—এ ভাবতে ভাবতে রক্ত আমার আগ্নেয়গিরির জ্বালায় জ্বলতে থাকলো।

লিডিয়ার চোখ-ভরা জল, তার সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ যেন আমাকেই বিদ্রূপ করতে থাকে। সেই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলুম, ডিরোজের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হবে। তার জন্য হয়ত আমার জীবন সেই জলদস্যুর বিষাক্ত ছোবলে বিদায় নেবে চিরদিনের জন্য—সেও ভাল। আমাদের জাহাজ এগিয়ে চলে,—বলে যায় ফার্নাণ্ডিজ, 'আর আমি মনে দেহে প্রস্তুত হই সেই অজানা, সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য।'

রাতের অন্ধকারে গোপন পথের দরজায় এসে হাজির হয় ফার্নাণ্ডিজ, লিডিয়ার মুক্তির পথ খোঁজে, ভাবে সে ডেলা-র উদ্ধারের কথা, লিডিয়ার সঙ্গে বন্দিনী জুমিলার কথা; আমেলা কর্নেলী, জুরা—এদের ছায়া একে একে ভিড় করে দাঁড়ায়, জলভরা চোখ নিয়ে তারই দিকে চেয়ে থাকে। সে এসে হাজির হয় গোপন কেবিনের দরজায়।

সঙ্কেত পেয়ে এগিয়ে আসে লিডিয়া, চোখেমুখে তার আতঙ্ক, ভয়ের কালো ছায়া, চাবুকের ভয়, ফার্নাণ্ডিজের ধরা পড়ার ভয়। আর এ তার বুকে আলিঙ্গন আবেগের কল্লোল উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ফার্নাণ্ডিজ বুকে তুলে নেয় তাকে শক্ত দুহাতের মধ্যে।

লিডিয়ার চোখ বন্ধ হয়ে আসে, আনন্দে আবেশে ভুলে যায় তার অতীতের জীবনকে; বিস্মৃতির বুকে কোথায় হারিয়ে যায় জারিনা, আর নীল

নদের উপত্যকার আড়ালে পড়ে থাকে লিডিয়ার সে কৈশোর।

কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র, জীবন-কল্লোল আবর্ত সৃষ্টি করে বেজে ওঠে তীব্র বাঁশী, লিডিয়ার বুঝতে দেরী হয় না কিসের সে সঙ্কেত।

ফার্নাণ্ডিজের চোখে চোখ রাখে সে, তার জামার বুকে চোখের জল মুছে মুছে যায়। আর্তনাদ করে ওঠে সে, 'পালাও পালাও, ডিজ. এই হয়ত আমাদের শেষ,' দুই হাতের মধ্যে, সেই অন্ধকারে লিডিয়ার অপূর্বসুন্দর মুখ তুলে ধরে ফার্নাণ্ডিজ; থরথর করে কেঁপে ওঠে লিডিয়া,—অবাক চোখে চেয়ে থাকে ফার্নাণ্ডিজ জারিনার ছবির দিকে।

শিলভীয়া অগাস্টাসের চোখে চোখ এসে মিলে যায়। 'না পালিয়ে আমি যাইনি জেন্' ফার্নাণ্ডিজ বলে যায়, 'আত্মগোপন করলুম সিঁড়িটার তলায়।'

এঞ্জিন রুমের গর্জন সমানে সমুদ্র গর্জনে মিশে যাচ্ছে। এক যমদূতের মত খালাসী এসে হাজির হলো, হাতে তার চাবুক লক্ লক্ করছে, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল, সঙ্গে তার দুজন ভয়ঙ্কর নিগ্রো, আর একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার—হাতে উদ্যত পিস্তল, একটা প্রকাণ্ড ভারী লোহার শিকলে মাঝে মাঝে আংটা লাগানো, তার সঙ্গে এক-একটি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে আটকাতে লাগলো পায়ের বেড়ীর সঙ্গে। চুলের মুঠি ধরে, কাউকে হাত ধরে, আবার কাউকে পাঁজাকোলা করে বের করতে থাকে কেবিনের ভেতর থেকে. তাদের আর্ত চীৎকার কোথায় হারিয়ে যেতে থাকে। বন্দিনীর দল ছটফট করতে থাকে খালাসীর হাতের মধ্যে। তারা অন্ধকারে জন্তুর মতই দুহাতে জাপটে ধরছে ফুলের মত দেহগুলোকে। কেউ বা ভয়ে মূর্ছা যাচ্ছে, তাদের গায়ের সামান্য আচ্ছাদনটুকুও খুলে খুলে পড়ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; নির্লজ্জ অফিসার উপভোগ করতে থাকে সে দৃশ্য।

হাত দুটো আমার এগিয়ে যেতে চাইল, মুহূর্তে তৈরী করলুম নিজেদের—একসঙ্গে আক্রমণ করবো রক্ষীদের। কিন্তু শেষমুহূর্তে সংযত হলাম পাছে ডিরোজের ওপর শোধ নেওয়ার আগেই পিস্তলের গুলিতে শেষ হয়ে যাই। ক্ষণিকের উত্তেজনার ভুলে এই সব বন্দীর উদ্ধারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ শুনলুম বাঁশীর আওয়াজ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

টহলদার পুলিসের জাহাজ তখন সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়ায়; পশ্চিম দেশগুলোর দিকে, তাদের মধ্যে দাস-ব্যবসায়ীর দল গোপনে নিয়ে যায় বাছাই করা মানুষদের। পুলিসের ঐ জাহাজ রাতের অন্ধকারে ক্যাপটেন ডগলাসের চোখ এড়ায় না। তার পর্তুগীজ জাহাজ বে-আইনী মাল গোপনে ইউরোপ আমেরিকার পথে নিয়ে চলেছে, সে পণ্য ভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা সুঠাম সব স্ত্রী-পুরুষের দল, আর তার মধ্যে একেবারে বাছাইকরা সুন্দরী রয়েছে তার জাহাজের এঞ্জিন-ঘরের পাশে গোপন কেবিনের ভেতর। অনেক চড়া মূল্য পাওয়া যাবে, কৌশলে গোপন এই সংগ্রহ। বয়স আর রূপের বিচারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা এর বিনিময়ের মূল্য, কিন্তু ঐ যে সশস্ত্র পুলিসের জাহাজ এগিয়ে আসছে, এদের হাতে ধরা পড়লে আর পথ নাই—ফাঁসীর দড়ি থেকে ক্যাপটেনের মাথাটা কিছুতেই খুলে আনা যাবে না। আর নাবিকদের আজীবন দ্বীপান্তর—এ ভয়ঙ্কর পরিণাম স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ক্যাপটেনের আদেশ আসে—পুলিস এঞ্জিন রুমে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঐ দেড়শ মণ ওজনের নোঙর, যার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে—সেই অতিকায় শেকল। আর তার পেতলের আংটায় এক-এক জন ক্রীতদাসী, তাদের সকলকেই একসঙ্গে সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে দিতে হবে—যেন একজনও সাক্ষীর কাঠগোড়ায় ওঠবার জন্য থাকে না।

জীবন্ত সমাধি পাওয়া তাদের দেহ- [illegible] খাদ্য হয়ে যাবে—আইন তার সহস্র জালে-ও এদের দেহের একখণ্ড মাংস ও হাড় খুঁজে হাজির করতে পারবে না কাঠগোড়ায়।

ভয়ে আঁতকে ওঠে শিলভীয়া, জেন্-এর হাত চেপে ধরে। জেনের চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়, শরীর শক্ত হয়ে ওঠে, কি বীভৎস সে পরিকল্পনা। শিলভীয়ার দু-কাঁধে হাত দিয়ে উঠে পড়ে, শতাব্দীর পিছনে ফেলে আসা ইতিহাসের কুটিল পথে এসে হাজির হয় তারা, যেন বন্দী শিলভীয়াকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে অগাস্টাস, হাজির হয় লাইট হাউসের তলায়।

তাদের চোখের সামনে ভাসমান নৌকোর সারি, আর কত জাহাজের আনাগোনা। পর্তুগাল জিব্রাল্টার সমুদ্রের পথে এমনি করেই পাল তুলে দিয়ে চলতো জলদস্যুর দল, ইউরোপ-আমেরিকার হাটে-বাজারে মানুষ কেনা-বেচার ব্যবসা করতো। কত শিশু, কত অসহায় স্ত্রী-পুরুষ হারিয়ে যেতো।

—দপ্ দপ্ করে আলো বাতিঘর থেকে—যেন বিচারের আলো, তার কাঠগোড়ায় অন্ধকার সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে জেন্ অগাস্টাস, বিচারের দাবী করছে, তার শক্ত হাতের মুঠোয় ধরা শিলভীয়ার নরম হাত তপ্ত হয়ে ওঠে। সে অবাক চোখে চেয়ে থাকে জেনের দিকে।

চোখে তার আকুল প্রশ্ন, তবে কি শুধু অসহায় যারা তাদেরই চালান করতো জাহাজে ভরে, আইন কি এতই দুর্বল। সস্নেহে তার খোলা চুলের ভিতর হাত দিয়ে খেলা করতে থাকে অগাস্টাস নীরবে, লাইট হাউসের বেদীর ওপর তারা বসে পড়ে।

'না শিলভীয়া, এই ব্যবসায়ী গোপনচক্র মন্দির-গীর্জায়, পথে-প্রান্তরে। রাজা-বাদশার মহল পর্যন্ত ছড়িয়ে, রাজকুমারী থেকে কুঁড়েঘরের শিশু, যুবক এই জালচক্রে বন্দী হয়ে বিক্রি হয়ে যায় তারা। তার হিসেব

কোথায়! জারিনা, লিডিয়া, ডেলা, জুরা এদের জীবনভোর রয়েছে সেই চোখের জল, আকণ্ঠ বিষপানের সেই বেদনা'।

শিলভীয়া জেনের বুকে দুহাত বুলোয় যেন তার দুঃখের ভার কমিয়ে দেয়, তার বুকে মাথা এলিয়ে দেয় পরম নির্ভরে।

না, শুধু গোপনে চুরির মাল হিসাবে মানুষ দেশ-বিদেশে চালান হতো, তা নয়। ঐ মারকিন মুলুক আর ইনডিয়ার ইতিহাসের পাতা উলটাও, দেখতে পাবে ইংরেজ পর্তুগাল ওলন্দাজ বণিকের দল ইস্ট ইণ্ডিজ ভারত আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার মানুষ বোঝাই করে নিয়ে তুলতো আমেরিকার বাজারে, তুলোর চাষের কাজে লাগাবার জন্য তাদের কত সস্তায় বিক্রি করা হতো।

বুড়ো-বুড়ি বাচ্চাদের প্রায়ই বিনামূল্যে কিনতে মালিকেরা আর সব চেয়ে বেশী দামে বিকোতো—শক্ত যাদের দেহের গড়ন, যুবক-যুবতীরা। খনির অন্ধকারে আর ক্ষেত-খামারে কাজ করতে করতে চাবুকের আঘাতে—অনাহারে অখাদ্যে কত জন কোথায় প্রাণ হারাতো তার হিসাব দেওয়া-নেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না সেদিন—এই ছিল আইন। দিল্লী নগরীর ঐ যে মিনার-বাজার, ওর চত্বরে এমনি করেই বসতো নারী বিক্রয়ের বাজার।

বাদশাজাদা জাহাঙ্গীর নিলামের বাজার থেকে কিনেছিলেন আনারকলিকে। মধ্যযুগের দুনিয়া সেদিন চেয়ে চেয়ে দেখেছে মিশর, ভারত, ইউরোপের হারেমে তার জৌলুষ রোশনাই-এর তলায় চোখের জলের কত ধারা, নীল মুক্তো বিন্দুর মত ঝরে ঝরে শুকিয়ে গিয়েছে—অগাস্টাসের কোলের ওপর মুক্তোর মত শিলভীয়ার চোখের জল পড়ে টপ্ টপ্। অতীতের দুঃখে বর্তমান কাঁদে। ঝাউয়ের পাতা থেকে শিশির-বিন্দু তাদের মাথায় ঝরে পড়ে। চোখের জলের ধারায় ভেজা শিলভীয়ার মুখ দুই হাতে তুলে ধরে জেন্ অগাস্টাস্—চোখ এসে চোখে মেলে। সমুদ্রে ঢেউ, বর্ষা নামে।

'ইয়েস, আই মাস্ট ডু দ্যাট, আমাকে বলতে হবে জেন্'—ফার্নাণ্ডিজ হাঁপিয়ে ওঠে।

জাহাজ এগিয়ে চলেছে তীব্র বেগে ডারবান বন্দরে। সাগরের উত্তাল ঢেউ হেরে যায় যান্ত্রিক হাঙর, সেই জাহাজের দুর্ধর্ষ গতিমুখে। তারপর ঝড়ের দাপাদাপি ঝিমিয়ে আসে। কানে আসে ইঞ্জিনের একটানা গর্জন; ফার্নাণ্ডিজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু ভুল। ক্যাপটেন ডগলাসকে তখনও চিনতে পারে নি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজের দুর্গবিশেষ ঐ ডারবান্ বন্দর, সভ্য ইংরাজের আইন-আদালত সৈন্যসামন্ত সবই সেখানে বর্তমান। তবু দুঃসাহসী ডগলাস নোঙর করে তার জাহাজ, মাস্তুলের মাথায় তুলে দেয় ব্যবসায়ী জাহাজের পতাকা।

সরকারী চোখে দেখা যায় ভারতীয় উপকূল থেকে দুর্মূল্য মশলা, রেশম, ঢাকাই মশলীন ভরা পর্তুগীজ জাহাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে পূর্ব-পশ্চিমের দেওয়া-নেওয়ার এ বন্দরঘাট।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ডেকের ওপর ভোজসভার আড়ম্বর আয়োজন। আদিবাসীদের 'জেমুর' নৃত্য—বীভৎস সঙ্গীত নৃত্যের সে আয়োজনে ডারবানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সরকারী প্রতিনিধিরা একে একে আসতে থাকে। ক্যাপ্টেনের স্বাস্থ্যপান করে স্ত্রী-পুরুষের দল।

সবার শেষে উপস্থিত হয় প্রিটোরিয়া হীরক-খনির অধিকর্তা এডওয়ার্ড জোনস্—ক্যাপ্টেনের প্রধান অতিথি। মাথায় পালকের টুপি, হাতে ঢাল আর বর্শা, কোমরে বন্যজন্তুর হাতের কঙ্কাল। বুকে, সারা মুখে উল্কি আঁকা নিগ্রোদের নাচের আসর সরগরম হয়ে ওঠে।

মদের নেশায় বিভোর সকলে চ'লে চ'লে পড়ছে, জড়িয়ে ধরছে একে অপরকে অর্ধ-উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের দল। পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে ক্যাপ্টেনের হাত ধরে তার অতিথি এডওয়ার্ড জোনস্।

ফার্নাণ্ডিজ তার সহযোগী তিন বন্ধুতে প্রস্তুত হয় এঞ্জিন রুমে গোপন সিঁড়ির তলায়। বুটের শব্দ কানে আসে—যমদূতের মত নিগ্রো প্রহরীরা এসে দাঁড়ায় কেবিনের দরজায়, সঙ্গে সেই পিস্তলধারী অফিসার, পিছনে পাশাপাশি ক্যাপ্টেন ডগলাস আর হীরক-খনির মালিক জোনস্।

ক্যাপ্টেন ইঙ্গিত করে দরজা খোলার। বন্দিঘর হঠাৎ লাল-সবুজের আলোয় ঝলমল করে ওঠে।

হতবাক ফার্নাণ্ডিজ, তার চোখের সামনে সে দেখতে পায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের পাতলা আবরণে জড়ানো যেন মোমে গড়া মনোহারী মূর্তি। কারুর চোখভরা জল, কেউ বা রাগে আক্রোশে ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে, সুন্দর থেকে সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ছে, এমনই নারীর রূপ, লজ্জা-ক্রোধ-দুঃখে তার রূপ অপরূপ হয়, সে মোহের রূপ চুম্বকে টানে, আরও টানতে থাকে।

ভুলে যায় ফার্নাণ্ডিজ তার কর্তব্য। লিডিয়ার স্থির মূর্তির ওপর চোখ পড়তেই হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায় সে। সকলের অজান্তে সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকে পড়ে সে। তিন-সাত-চল্লিশ, কোমর থেকে ঝুলানো নম্বর দেওয়া চাকতি—ডেলা-আনার-লিডিয়ার দিকে এগিয়ে যায় জোনস। কি লোলুপদৃষ্টি, হাত দু'টো তখনই বাড়িয়ে দিতে চায় ডেলার কোমর-বুক জড়িয়ে ধরতে।

গোলাপের পাপড়ির মতই কেঁপে ওঠে ডেলা, পিছোতে থাকে সে—নিগ্রোর চাবুক লিক্‌লিকিয়ে ওঠে, 'আর সাঁড়াশীর মত'—'প্লিজ স্টপ, স্টপ'—অগাস্টাস চেঁচিয়ে ওঠে।

শিলভীয়া ভয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে, ঘামতে থাকে। 'নো, নো মাই বয়'—ফার্নাণ্ডিজের বাড়িয়ে ধরা হাতদু'টো চলে পড়ে, হাঁপাতে থাকে সে।

শিলভীয়া দ্রুতপায়ে পদার পেছনে সরে যায়।

ফার্নাণ্ডিজ চেয়ে দেখে জারিনার সমাধির দিকে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে অগাস্টাস, চোখের দৃষ্টি তার আরবের জলে দূরের দ্বীপ-বাংলোর ওপর সরলরেখায় স্থির।

হিমেল বাতাস ঘরে ঢুকে, শিলভীয়া আসে গরম কফির ট্রে হাতে, অন্য পোষাকে, মিষ্টি মিহি গন্ধে ঘর ভরে যায়।

ছোঁয়াচে ও মহামারী রোগের মানচিত্র

প্রাচ্যদেশীয় রোগ-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ হেলমুট্ জুসাট্জ্ এবং অধ্যাপক ডঃ ওয়ালড্রুট্ মিলে তিন খণ্ডের এক অভিনব মানচিত্র তৈরী করেছেন, যা সম্প্রতি হাইডেলবার্গ-এর একাডেমী অফ্ সায়ান্স প্রকাশ করেছেন।

এ অভিনব এ্যাট্‌লাসের একটি কপি কলিকাতার অল্ ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট্ অফ্ হাইজিন এ্যাণ্ড পাব্‌লিক হেলথ-এর ডিরেক্টরকেও দেয়া হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবীতে কোথায় কোথায় কি কি ছোঁয়াচে বা মহামারী প্রাদুর্ভাব আছে, কেমন করে এরা বিস্তার লাভ করে এবং কতটা ও কোন সময়—এ সবের নিখুঁত তথ্য পাওয়া যাবে উক্ত মানচিত্রে। এই সব থেকে সবচাইতে ক্ষতি হয় প্রাচ্যদেশগুলির, যেখানে একটা না-একটা মারী লেগেই থাকে। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি তো আমাদের নিত্যসঙ্গী।

এদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রথম দরকার এদের ভাল করে চেনা ও জানা।

এ কাজে উক্ত মানচিত্র প্রভূত সাহায্য করবে এবং এর জন্য ডঃ জুসাট্জ্ ও ডঃ ওয়াল্‌ড্রুট্ ধন্যবাদার্হ, যাঁরা দীর্ঘ দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এটা সম্পন্ন করেছেন।

বাঘ-বাঘিনী

বেশ কিছুদিন আগের কথা বলছি। ১৯৩৯ সাল।

জায়গাটা ছিল উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের সীমানায়। ট্রেনে বিজয়নগরম্ পর্যন্ত গিয়ে একশো পঁচাত্তর মাইল বাসে জৈপুর পর্যন্ত যেতে হোত। তারপর সেখান থেকে সত্তর মাইল গরুর গাড়ীতে যাওয়ার পর গন্তব্যস্থল অর্থাৎ মালাকানগিরি পৌঁছাতে হোত। এখনকার সভ্যসমাজ সত্তর মাইল একটানা গরুর গাড়ীর কথা ভাবতে পারেন? এখানকার এই মালাকানগিরিই রামসীতার আমলের 'মাল্যবান গিরি' নামে অভিহিত ছিল।

কাছেই একটি খরস্রোতা ছোট্ট পাহাড়ী নদী আছে, নাম তার সপ্তধারা। তারই ধারে একটি পাথরে নাকি এখনও সীতার পায়ের-ছাপ আছে।

আমরাও অবশ্য সে পাথরখানা দেখেছি। তবে সেটা পা কি আর কিছু বোঝা শক্ত। মোটের ওপর এই সব কিংবদন্তী থেকে বোঝা যায় চৌদ্দ বছর বনবাসের সময় রামসীতা এখানে নিশ্চয়ই ছিলেন—কারণ দণ্ডকারণ্য এর খুব কাছেই। বন্ধুরা ঠাট্টা করলেন তাহলে বিয়ের পর আমাদেরও বনবাস হল নাকি আর যাতে 'সীতা'-হরণ না হয় তার জন্য সাবধান থাকতে উপদেশ দিলেন।

তখন বয়স কম থাকার জন্য এই যাত্রা একবার ট্রেনে, একবার বাসে এবং গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে গরুরগাড়ীতে যাওয়া—বড়ই অপূর্ব ও অভিনব লেগেছিল। মালাকানগিরি পৌঁছে আরও ভাল লেগেছিল। ছোট্ট একটি উপত্যকা। তিনদিকে পাহাড়ের পাঁচিল। একদিকে ছোট ছোট ঢিবির মত পাহাড়। ঐ পথেই এই গ্রামে প্রবেশ করা যায়।

তখন ঐসব জায়গায় সরু মিহি আতপ চাল একটাকায় ষোল সের। একসের খাঁটি গাওয়া ঘি-এর দাম শুনলে এখনকার লোকে 'হার্টফেল' করবে—আট আনা মাত্র। একটি মুরগী দু'আনা আর এক আনায় চারটি ডিম। অবশ্য অন্যান্য জিনিষ তেমনি একদম পাওয়া যেত না—যেমন সরষের তেল, চিনি, ময়দা, আটা, ঔষধপত্র, প্রসাধন-সামগ্রী। এসব আবার সারা বছরের জন্য সংগ্রহ করে রাখতে হোত।

শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য

আসল যে গল্পের জন্য এত ভণিতা তা থেকে দেখছি ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছি। এক ব্যাঘ্র-দম্পতির কাহিনী আজ শোনাতে চাই। আমার স্বামীর বরাবরই ছোট থেকে শিকারে দুর্বার ঝোঁক। এখানে আসার পর সেটা যেমন বাড়ল তেমনি সুযোগও এল প্রচুর। সরকারী কাজ—হাতে প্রচুর লোকজন—যখন যেখানে বাঘ কোন গরু-মোষ মারে, সঙ্গে সঙ্গে খবর এসে যায়।

তারপর শুরু হয় মরা পশুটাকে পাহারায় রেখে কাছাকাছি গাছের ওপর মাচান বাঁধা।

একবার আমাদের বাড়ী থেকে সাত-আট মাইল দূরে এই রকম একটা ঘটনা ঘটে। তখনি লোকজন লেগে গেল মাচান বাঁধতে। বাড়ী থেকে ঘটনাস্থল বেশীদূর নয় তাই আমিও জেদ ধরলাম মাচানে বসার এবং শিকার দেখার জন্য। বেশ আপত্তি থাকা সত্ত্বেও স্বামী মহারাজ রাজী হলেন। তখন আমার স্ফূর্তি আর ধরে না।

বিকাল চারটার মধ্যে ফ্লাস্কে গরম চা, বোতলে খাবার জল, আর কিছু বিস্কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। সূর্যাস্তের আগে মাচানে চড়া চাই তা না হলে ব্যাঘ্রমশাই টের পেয়ে যাবেন।

অঘ্রাণের বেলা দেখতে দেখতে সূর্য চলে পড়ল—তায় জঙ্গলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ;—অস্ত যাওয়ার বহু পূর্বেই

লেখিকা তাঁর স্বামীর সঙ্গে

যেন সূর্য অস্ত গেল। শীতের শিরশিরে হাওয়ায় আর জঙ্গলের ভিজে ভিজে গন্ধে সারা শরীরে একটা হিমেল ঠাণ্ডার স্রোত বইতে লাগল। মনের মধ্যে তখন ভয় এসে বাসা বাঁধতে সুরু করেছে।

আমরা দু'জন ছাড়া মাচানে বসার জন্য ওঁর একটি বিশ্বস্ত চাপরাশী সঙ্গে আছে, সেও বন্দুকধারী। তাছাড়া সঙ্গে প্রায় বিশজন জংলী লোক তীর ধনুক বর্শা, টাঙ্গি নিয়ে আছে। তবু এমন ভয় মধ্যে মধ্যে হচ্ছে—কেবলি মনে হচ্ছে কেন জেদ ধরে এলাম। অথচ মুখে প্রকাশ কিছুই করতে পারছি না। সবাই একেবারে নিশ্চুপ—অথচ এগিয়ে চলেছি।

একটি শুকনো গাছের পাতা পড়লেও মনে হচ্ছে কত জোর আওয়াজ—এই বুঝি বা বাঘ এসে গেল। ক্রমে আমরা মাচানের কাছে পৌঁছে গেলাম। অনেকগুলো শকুন গাছের ওপর বসে আছে আর নীচে মরা গরুটার পাহারার জন্য পনের জংলী আছে। গরুটার গলায় গাছের ছালের শক্ত দড়ি বাঁধা হয়েছে।

একটা খোঁটায় সে দড়িটার প্রান্তভাগ বেঁধে খোঁটাটিকে একেবারে মাটির ভিতর পুঁতে পাথর-টাথর চাপিয়ে দিয়েছে যাতে বাঘ এসে টানাটানি করলেও মড়াটাকে সরাতে পারবে না। এটা হল শিকারের ব্যবস্থা।

আর ফুট পঞ্চাশ দূরে একটা গাছে আমাদের জন্য মাচানটি বাঁধা। মাচান বাঁধার জন্য জংলীরা যে গাছটা বেছে নিয়েছিল তার গুঁড়িটা প্রকাণ্ড ছিল। সেই গুঁড়িটা প্রায় দশ ফুট ওঠার পর ইংরাজী ওয়াই-এর মত দুভাগ হয়ে গেছে। সেখান থেকে সাত ফুট মত ওপরেই মাচানটি বাঁধা। মাচানে ওঠার সময় থেকেই আমার এই 'ওয়াই' গড়নটা কেমন জানি ভাল লাগল না। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। দুটো দড়ি বা খাটিয়া পাশাপাশি রেখে খুব মজবুত করে গাছের সঙ্গে বাঁধা—এটাই হল মাচান।

যাতে শিকার শিকারীদের দেখতে না পায় সে জন্য খাটিয়ার চারপাশে গাছপাতা দিয়ে বেশ তিন ফুট উঁচু বেড়ার মত করে বেঁধে দিয়েছিল। সেটা দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। যেদিকে মড়াটা আছে সেদিকে এই বেড়ার মধ্যে তিনটে ফোকর রাখা আছে। দুটো ফোকর বন্দুকের নল বাড়াবার জন্য আর একটিতে আমি চোখ রেখে দেখার জন্য।

মাচানে চড়ে গুছিয়ে বসতে আমাদের তিনজনের প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজল। আমাদের সঙ্গে যে গ্রামবাসীরা এসেছিল আর মড়ার পাহারায় যারা ছিল তারা সবাই মিলে বেশ সোরগোল করতে করতে ফিরে গেল।

ভাবখানা যেন সবাই মরা গরুটাকে দেখতে এসেছিল, এখন সন্ধ্যা হওয়ায় সবাই ফিরে গেল। ওরা সবাই চলে যাবার পর আমরা ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা করে গরম চা খেয়ে নিয়ে বেশ জুত করে বসতে যাব এমন সময় বাঘ এসে উপস্থিত একেবারে মড়াটার কাছে।

উনি তখনও বন্দুক নিয়ে তৈরী হন নি কাজেই তাড়ার চোটে মাচানের ওপর একটু খুটখাট আওয়াজ হয়েই গেল। তখন সূর্য যদিও অস্ত গেছে কিন্তু একটা আবছা আলো চারিদিকে আছে। আমরা ভাবতেও পারিনি যে গ্রামবাসীরা যাওয়ার এই পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ব্যাঘ্র-পুঙ্গব এসে আমাদের সাথে মোলাকাত করবে।

এখন যদিও এত কথা লিখছি সত্যি বলতে কি তখন আমার যা অবস্থা!! কিন্তু ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাঘকে দেখার যে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল সেটা তখন মিটেছে। মাচানের ওপর ওই যে একটু আওয়াজ হল তাতেই তিনি লাফ দিয়ে একেবারে চম্পট।

ওঁর তখন আপশোষের আর সীমা নেই। যাই হোক এবার আমরা নিশ্চুপ হয়ে একেবারে নড়ন-চড়ন বন্ধ করে চুপ করে বসে রইলাম। ঘণ্টা-খানেক পরে মনে হল ঠিক মাচানের তলায় বেশ খসখস শব্দ। উনি আমাকে ইশারা করছেন একদম না নড়তে এমন কি নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করে রাখতে। আর এদিকে আমার কেবলি মনে হচ্ছে বাঘটা লাফ মেরে ওয়াই পর্যন্ত যদি উঠে হাত বাড়ায় ত' আমাদের মাচান ধরতে পারবে।

আমি মনে মনে ঠাকুর স্মরণ করছি। চাপরাশীটা অতি ধীরে বন্দুকের নলটা ঘুরিয়ে খাটিয়ার দড়ির ফাঁক দিয়ে গাছের তলার দিকে সামান্য বার করে তৈরী হয়ে নিল।

আমার হাতে একটা পাঁচসেলের টর্চ-লাইট আছে, আমিও সেটা হাতের মুঠোয় রেখে তৈরী হয়ে নিলাম। আমাদের বরাতজোর ছিল নিশ্চয়ই, কারণ ঠিক সেই সময়েই মারীর দিকে বেশ একটু জোরেই খসখস শব্দ হয়ে উঠল। সেই শব্দ শুনে গাছের তলার বাঘটি লাফ দিয়ে মৃত গরুটার দিকে দৌড়ে গেল বলে মনে হল। কিন্তু তারপরই সব চুপচাপ।

ততক্ষণে গাছের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার সরু চাঁদখানি বেরিয়ে এসেছে। বনের সে ঘুটঘুটে অন্ধকার পাতলা হয়ে একটা স্নিগ্ধ আলোর ছটায় ভরে গিয়ে অদ্ভুত থমথমে মনে হচ্ছে চতুর্দিক। চাপরাশীটা তখন অতি ধীরে ইসারায় জানাল যে একটা বাঘ নয়। একজোড়া বাঘ বোধ হয় বাচ্চাও সঙ্গে আছে। তবে চাঁদের আলো যতক্ষণ থাকবে ওরা আর আসবে না।

আমিও ইসারায় জিজ্ঞাসা করলাম ও বুঝল কি করে? তাতে সে জানাল—মাচানের তলায় একলা যে বাঘটা এসেছিল সেটা পুরুষ-বাঘ। আর মারীর দিক থেকে যে নানান রকম আওয়াজ হল সেটা থেকে বোঝা যায় যে, বাঘিনী তার বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মাচানের ওপর মানুষের গন্ধ পাওয়ায় পুরুষ-বাঘটি ওদের সতর্ক করে দিতেই লাফিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি ওর জঙ্গলের অভিজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

তারপর আবার মশার কামড় আর ঝিঁঝিপোকার একটানা 'ঝিঁ-ঝিঁ' আওয়াজ শুনতে শুনতে কখন যে চোখে একটু ঢুল এসে গিয়েছিল জানতে

ঠেলা দিতেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম। আমাকে ইসারায় চুপ থাকতে বলে মারী-টার দিকে আঙুল দেখালেন। দেখি সেদিক থেকে কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ার খচমচ আওয়াজ আসছে বেশ জোরে জোরে।

আমাকে তখন ইসারা করলেন টর্চ জেলে আলো ফেলতে। আমি আমার ফোকরটার মধ্যে টর্চটা ঢুকিয়ে যেই আলো ফেলেছি সেটা একেবারে বাঘের মাথার ওপর পড়েছে। আর ওনার বন্দুকের সঙ্গে যে টর্চটা বাঁধা ছিল সেটার আলো গিয়ে পড়েছে একটা গাছের মাঝ বরাবর।

ওঁর লাইটের ফোকাস ঠিক না থাকায় ওঁকে ক্ষিপ্র-হাতে বন্দুকের 'সাইট' এবং বাঘকে এক লাইনে এনে ফেলতে হল। তখন বাঘটি আমাদের দিকে পিছন ফিরে খাচ্ছিল। হঠাৎ সারা জঙ্গলে এত আলোর ঝলক দেখে বেচারা একটু বিভ্রান্ত হয়ে যেই আমা-দের দিকে মুখ করেছে সঙ্গে সঙ্গে ওর বন্দুকের গুলী ছুটে গিয়ে বাঘটিকে আক্রান্ত করল। পরক্ষণেই বুককাটা এক আর্তনাদ করে বিরাট একটি লাফ দিয়ে মাচান থেকে তিরিশ ফুট দূরে এসে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল।

আমি তখন ভয়ে আনন্দে মাচানের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এধার-ওধার ফেলছি। ওঁর এই প্রথম বড় বাঘ শিকার। দেখলাম ভদ্রলোকের কৃতকার্যের সাফল্যমণ্ডিত মুখখানা বেশ জ্বল-জ্বল করছে। তখন রাত কিন্তু বেশী হয় নি। চাপরাসীর কথাই ঠিক; যেই চাঁদ ডুবে গেছে অমনি বাঘ এসেছিল।

কিন্তু হোল না। মাচানের ওপর থেকেই চাপরাসীটি মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়ে কুক্ দিয়ে উঠল খুব জোরে; আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভুঁইফোড়ের মত শ'খানেক লোক মশাল হাতে মাচানের তলায় এসে হাজির হয়ে গেল। আমরা নিশ্চিন্ত মনে মাচান থেকে নামলাম। জংলীরা আগে বাঘটাকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে দেখে নিল সত্যই মরেছে কি না। তারপর একটা মোটা বাঁশে চারহাত পা বেঁধে ঝুলিয়ে আমাদের কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দিয়ে গেল। বাড়ী এসে মেপে দেখা গেল বাঘটা ১০ ফুট ৫ ইঃ লম্বা।

পরের দিন সকাল থেকে গ্রামের লোকের সে কী ভিড়! গ্রামের যে মোড়ল সে পরামর্শ দিল বাঘের চামড়াটা খুলে নেওয়ার পর ওর চর্বিটা গালিয়ে নিতে। ওই চর্বি নাকি নানান রকম বাত-বেদনার উপশম করে। আমাদের হাতাটা মস্ত ছিল। তারই এক আমগাছের তলায় ছাল ছাড়ান, জিভ কেটে রাখা, কাঁধের কাছ থেকে পাতলা দু'খানা দুই ইঞ্চি লম্বা 'লাকি বোন' খুলে রাখা এসব কাজ সারা হ'ল। তারপর সুরু হল চর্বি গলানো। সে কি উৎকট গন্ধ বাপ্! এখনও মনে হলে গা শির-শির করে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল এই পর্ব চুকতে।

ভাগ্যে তখন শীতকাল। ঘরের মধ্যে আমরা শুয়ে আছি—রাত প্রায় দুটো কি আড়াইটা হবে—কেমন একটা গোঙানির আওয়াজ আসতে লাগল আমগাছটার দিক হতে। উনি তাড়াতাড়ি বাথরুমের জানালা দিয়ে বাইরে টর্চ ফেলে দেখেন, কি যেন একটা জন্তু লাফিয়ে চলে গেল।

নয়ত কোন ছোট জন্তু হবে বুঝি। পরের দিন রাত্রে আবার ঐ রকম শব্দ হওয়াতে উনি খুব সন্তর্পণে উঠে দেখেন কি হাতার চারধারে যে ছয়ফুট উঁচু ছেঁচাবাঁশের বেড়া ছিল তার একটা অংশ ভাঙ্গা আর একটা বাঘের দেহের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বন্দুক আনতে গেলেন বটে কিন্তু ততক্ষণে বাঘটা উধাও। আমাদের আর বুঝতে বাকী রইল না যে ওরই জোড়ার বাঘিনীটা আসা যাওয়া করছে। আমার তো খুবই ভয় হতে লাগল কিন্তু শিকারী-দের বোধ হয় ওসবের বালাই নেই। সকালে উঠে বেড়ার ধারে উনি গিয়ে দেখেন মাটির ওপর বাঘের পায়ের ছাপ বেশ গোটাকয়েক পড়ে আছে।

তখনই আমগাছে মাচান বাঁধা হয়ে গেল। এবার বাড়ীর মধ্যে হলেও আমার আর মাচানে বসার আগ্রহ একদম রইল না। কি রকম মায়া হতে লাগল। বিশেষ করে সত্যি যদি ওর সঙ্গে বাচ্চা থাকে! উনি সন্ধ্যা হতেই চাপরাসীকে নিয়ে মাচানে উঠে গেলেন।

রাত প্রায় তখন একটা হবে—পর পর দুটি গুলীর আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুঝলাম বেচারী বাঘিনী শেষ। হৈ-হৈ করে লোকজন মশাল আলো নিয়ে এলো। তখন সাহস করে দরজা খুলে আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। চাপরাসীটাকে জিজ্ঞাসা করলাম এর বাচ্চা কোথায় গেলো।

সে বললে—সেটা নিশ্চয়ই নিতান্ত ছোট নয়, তা হলে সঙ্গে থাকত। সে জঙ্গলে নিজের খাবার জোগাড় করার মত হয়েছে—কোথাও কাছাকাছি জঙ্গলে থাকবে নিশ্চয়ই।

এ কথাটা কি সত্যি না আমার মনকে বোঝাবার জন্য বলেছিল? আজও তাই ভাবি॥

শঙ্করাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শঙ্করের যোগসিদ্ধির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কামশাস্ত্র সম্বন্ধে মণ্ডন-পত্নী উভয়ভারতী শঙ্করকে যে চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন তাহার জবাব তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। উভয়ভারতীর পরীক্ষার কষ্টিপাথরে শঙ্কর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, সর্বজ্ঞ, সর্বশাস্ত্র বিশারদ তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

উভয়ভারতী পরাজয় মানিয়া নিয়াছেন। পূর্বে স্বামী মণ্ডন মিশ্রের পরাজয়ে অর্ধেক এবং এখন নিজের পরাজয়ে পরাজয় পূর্ণ হইয়াছে। স্বামীকে গৃহস্থাশ্রমে টানিয়া রাখিবার আর উপায় নাই। বিচারের সর্ত অনুযায়ী স্বামীকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য মত দিতে হইবে। কোন আপত্তি চলিবে না।

মণ্ডন মিশ্র শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী বিরজা হোম করিয়া শঙ্করের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল সুরেশ্বরাচার্য। তিনি পরে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম সিদ্ধি, নৈষ্কর্ম সিদ্ধি, স্বারাজ্য সিদ্ধি নামক তিনটি প্রকরণ গ্রন্থবোধবিবেক নামক নিবন্ধ গ্রন্থ এবং শঙ্করের বৃহদারণ্যক ভাষ্যের বার্তিক লিখিয়া তিনি শঙ্করের চিন্তাধারা জগতে প্রচার করিয়াছেন, দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে এইগুলির তুলনা মিলে না। গ্রন্থের ভাষা, সূক্ষ্ম বিচারপদ্ধতি, বিষয় ব্যাখ্যা করিবার ভঙ্গী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এদিকে মণ্ডনের পরাজয়ে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, শুধু যে মাহিষ্মতী নগরে সারা পড়িল তাহা নয়, সমস্ত দেশে আলোড়ন চলিল, ইহাতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল। কর্মের মূল্যবোধ কমিয়া গেল, বৈদিক ধর্মের প্রকৃত মর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারে যে প্রধান অন্তরায় ছিল তাহা দূর হইল। জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হইল। কর্ম জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া নিল। এদিকে পরমগুরু স্বামী মণ্ডনের বিরহে উভয়ভারতীর বুকে শেল পড়িল। তাঁহার নিকট সংসার অরণ্যসদৃশ হইল।

স্বামী তত্ত্বানন্দ

স্বামী-বিরহে জীবন অসহ্য ইহার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। উভয়ভারতী বিদুষী, শাস্ত্রজ্ঞা, সরস্বতীর অংশরূপিণী, তিনি জানেন আত্মহত্যা মহাপাপ। অন্য পাপের খণ্ডন আছে এই পাপের খণ্ডন নাই, শাস্ত্র ইহার সাক্ষী। একমাত্র উপায় যোগবলে দেহত্যাগ, জ্ঞানলাভের পর যোগবলে দেহত্যাগ শাস্ত্রসম্মত, উভয়ভারতী তাহাই করিলেন।

শঙ্কর এখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। ইহা সৈন্যসামন্ত নিয়া সম্রাটের যাত্রা নয়। ইহা সত্যের অভিযান, ন্যায়ের অভিষেক, জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। ত্যাগ, তপস্যা, সংযমাদি এই রাজ্যের প্রহরী, সশিষ্য শঙ্কর প্রথমে পুণ্যতীর্থ নাসিকে গেলেন। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে পূর্ণ কুম্ভ হয়, বহু সাধু-ভক্ত, গৃহস্থ এখানে স্নান করিতে আসেন। এরূপ তীর্থে ধর্মের প্রচার তীর্থের তীর্থত্ব বাড়ায়।

এখান হইতে তিনি প্রসিদ্ধ তীর্থ পাণ্ডারপুর গেলেন। বিট্‌ঠল নাথ এখানকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, শত শত বৎসর ধরিয়া ইহার মহিমা সুবিদিত, জ্ঞানদেব, নামদেব, তুকারাম প্রমুখ মহাপুরুষগণ ত্যাগ, তপস্যা, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবে এই তীর্থের মহিমা খুব উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখান হইতে তিনি বোম্বের অন্যান্য তীর্থে গিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, জ্ঞান, ভক্তি, যোগশক্তি এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া ক্রমশ বহু লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। তাঁহার জয়যাত্রা চলিল।

তিনি শ্রীশৈল নামক তীর্থে আসিলেন, কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে পার্বত্য প্রদেশে ইহা অবস্থিত। মল্লিকার্জুন শিব এখানকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। পুরাণে এই শিবক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বর্ণনা আছে, উগ্রভৈরব নামে একজন কাপালিক ও অঞ্চলে বাস করিতেন। বিশেষ কোন অলৌকিক শক্তি লাভ করিবার জন্য তিনি বহুদিন যাবৎ কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। তিনি শঙ্কর এবং তাঁহার প্রচারিত মতও শুনিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্ত তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করে নাই। তিনি শঙ্করের ঘোর বিরোধী, তাঁহাকে শত্রু ভিন্ন অন্য চোখে দেখেন নাই। সুতরাং শত্রুনিধন তাঁহার কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবে ধরিয়া নিলেন।

তখনকার দিনে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল, তিনি শঙ্করকে ভৈরবের নিকট বলিপ্রদান করিবেন স্থির করিলেন। ইহাতে তাঁহার উভয় দিকে লাভ। প্রথমে শত্রুনিধন, দ্বিতীয়ত শঙ্কর সন্ন্যাসী, তাঁহাকে ভৈরবের নিকট বলি প্রদান করিলে দেবতা তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন এবং তাঁহাকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করিবেন।

ছুটিয়া গেল। তাঁহার অনেক শিষ্য। স্থানীয় রাজা ক্রকচ তাঁহাদের অন্যতম, উগ্রভৈরব স্বীয় কুমতলব সিদ্ধ করিবার জন্য রাজার সাহায্যে শঙ্করকে বন্দী করিয়া আনিবার ষড়যন্ত্র করিলেন।

একদিন শঙ্কর শ্রীশৈল পর্বতের চূড়ায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় ক্রকচের কয়েকজন অনুচর হঠাৎ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া ভৈরবের মন্দিরে বলি প্রদান করিবার জন্য নিয়া আসিলেন। অমাবস্যা রাত্রি, ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। যখন অনুচরগণ বন্দী অবস্থায় শঙ্করকে দেবতার সম্মুখে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল তখনও শঙ্করের প্রশান্ত বদন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, জন্ম-মৃত্যু তাঁহার পায়ের ভৃত্য, তিনি অজ-অমর, শাশ্বত, অবিনাশী; জন্ম-মৃত্যুর চক্র তাঁহাকে পিষিয়া মারিতে পারিবে না, মৃত্যুভয় তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

তাঁহার দেহ মস্তক হইতে ছেদন করিবার জন্য অনুচরগণ প্রস্তুত, শুধু কাপালিক উগ্রভৈরবের হুকুমের অপেক্ষায় আছে। শীঘ্র মস্তক দেহচ্যুত হইবে জানিয়াও শঙ্কর হাড়িকাঠের সামনে শান্তভাবে আছেন, তাঁহার মন আত্মচিন্তায় নিমগ্ন, কোন্ দিকে কি হইতেছে ভ্রূক্ষেপ নাই।

এদিকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত শঙ্করকে দেখিতে না পাইয়া শিষ্যগণ অতিশয় চিন্তিত হইলেন। প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদ ধ্যানে বসিয়া গুরুর ভীষণ বিপদের সঙ্কেত পাইলেন। তাঁহার ইষ্ট নৃসিংহদেবের ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন যে, কাপালিকের আদেশে তাঁহাকে পর্বতপ্রদেশে ভৈরবের সম্মুখে বধ্যভূমিতে বলি দেওয়ার জন্য নেওয়া হইয়াছে।

অবিলম্বে পদ্মপাদ বধ্যভূমির দিকে ছুটিলেন। অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কোন দিকে না তাকাইয়া পদ্মপাদ মুহূর্তমধ্যে এবং শঙ্করকে বধ করিবার জন্য নিকটে যে খড়্গ ছিল তাহা দ্বারা কাপালিকের মস্তক ছেদন করিলেন। নিজের কি হইবে সেদিকে পদ্মপাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, নিজজীবন বিপদাপন্ন করিয়াও তিনি গুরুর মূল্যবান জীবন রক্ষা করিলেন, যেমন কর্ম তেমন ফল।

বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া কাপালিক শঙ্করকে ভৈরবের নিকট বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কার্যকালে দেখা গেল তিনি নিজেই বলির শিকার হইলেন। অলৌকিক শক্তি লাভ করিবার বাসনা চরিতার্থ হইল না। ভৈরব হয়ত সন্তুষ্ট হইলেন---তবে শঙ্করের মূল্যবান জীবন নিয়া নয়—নিষ্ঠুর কাপালিকের সামান্য মস্তক নিয়া। হঠাৎ কাপালিকের মুণ্ডপাত হওয়াতে তাঁহার অনুচরগণ ভয়ে যেদিকে পারে ছুটিয়া পলাইল। ভগবৎ কৃপায় মহামানব শঙ্করের অমূল্য জীবন রক্ষা পাইল, ইষ্টের ইঙ্গিতে গুরুকে সাক্ষাৎ যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পদ্মপাদ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তাঁহার গুরুসেবা সার্থক হইল। জীবন ধন্য হইল। কাপালিকের মৃত্যুর পর স্থানীয় নরবলি প্রথা লোপ পাইল; মহামানবের ত্যাগে, ধর্মে, সমাজে নতুন আদর্শের প্রভাবে পুরাতন কুপ্রথা দূর হইল।

ইহার পর শঙ্কর সশিষ্য গোকর্ণে আসিলেন, এখানে প্রসিদ্ধ শৈব দার্শনিক নীলকণ্ঠের সঙ্গে তাঁহার বিচার হয়। তিনি শঙ্করের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন। বেদের গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া অদ্বৈত মতবাদ গ্রহণ করেন। ক্রমশ তাঁহার অনুগামীরাও তাঁহার পথ অনুসরণ করেন। গোকর্ণ ছাড়িয়া তিনি সশিষ্য মোমাম্বিকায় আসেন। এখানে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দর্শন করিয়া তিনি বাহিরে আসিতেছেন---এমনসময় দেখিতে পাইলেন এক ব্রাহ্মণপত্নী একমাত্র মৃতপুত্রকে কোলে নিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চোখ দিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে, গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছে, শোকে এমন মুহ্যমান হইয়াছেন যে, লোকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। শঙ্করকে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং পুত্রকে বাঁচাইয়া দিবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিলেন। শোকগ্রস্ত পিতামাতার দুঃখে ব্যথিত হইয়া শঙ্কর হস্তস্থিত দেবীর প্রসাদী-নির্মাল্য মৃতপুত্রের মাথার উপর স্থাপন করিলেন। সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যে বালকের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে, সে চোখ মেলিল, মুখে 'মা' 'বাবা' কথা ফুটিল, পিতামাতাকে চিনিতে পারিল, যোগীর যোগশক্তিতে যে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না; কিন্তু ইতিমধ্যে সশিষ্য শঙ্কর স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অলৌকিক কাণ্ডের জন্য তাঁহার খ্যাতি ছড়াইলে লোকে তাঁহাকে পাইয়া বসিবে এবং অনবরত বিরক্ত করিবে, তাই শীঘ্র অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

শঙ্করের জয়যাত্রা চলিতে লাগিল, তিনি সশিষ্য শ্রীবলিতে আসিলেন। এখানে প্রভাকর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার মনে ভীষণ অশান্তি। সংসারে অশান্তির নানা কারণ থাকে, রোগ, শোক, অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য সবই কারণ, প্রভাকরের দুঃখ অভাবজনিত নয়, তাঁহার একমাত্র পুত্র জন্মাবধি মূক---কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। যেন একটা জড়পিণ্ড। বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ কোন লক্ষণ নাই। ভবিষ্যতে যে পাইবে তারও কোন আশা নাই। কোন রোগের জন্য হইয়াছে কিনা বলা কঠিন। চিকিৎসকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও রোগনির্ণয় করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়াছেন, কোন দিকে কোন আশা না পাইয়া প্রভাকর সব দৈবের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। সশিষ্য শঙ্কর এই স্থানে উপস্থিত হইলে প্রভাকর একদিন পুত্রকে নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত দুঃখের বিবরণ জানাইলেন এবং একমাত্র পুত্র যাহাতে রোগমুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন।

শঙ্কর মহামানব, কোমলহৃদয়, প্রভাকরের দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বালকের দিকে করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করামাত্র তাহার পূর্ববৃত্তান্ত তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল, যোগ-দৃষ্টিতে বালকের ভূত, বর্তমান এবং তাহার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে সব জানিতে পারিলেন। বালককে সম্বোধন করিয়া তিনি মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন---'বৎস, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কেন আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? কি করিতে চাও? সবিস্তারে এসব প্রশ্নের উত্তর দাও।'

নিমেষের মধ্যে কি যেন অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল, জড়পিণ্ডের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল। বালকের চোখ-মুখ দিয়া যেন বিদ্যুতের ঝলক ছুটিয়া গেল। তাহার আত্মবোধ জাগিয়া উঠিল, মূক কথা বলিল। তাহার জিহ্বায় যেন বিদ্যাশক্তি সরস্বতী বসিয়া আছেন, অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নের জবাব দিতে আরম্ভ করিলেন, সংস্কৃত শ্লোক-গুলির গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, উচ্চ ভাব, সুললিত ছন্দ, মধুর ভাষা, সুন্দর, স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ সকলকে স্তম্ভিত করিল।

পদ্মপাদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত সুরেশ্বরাচার্য এবং উপস্থিত অন্যান্য বিদ্বান্ শিষ্য এবং স্বয়ং শঙ্করও শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এমন সুন্দর ব্যাখ্যা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বালকের মুখ হইতে যে অনর্গল অগ্নিময়ী বাণী নির্গত হইয়াছিল তাহাই হস্তামলক নামে সুবিদিত, উহার শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞানের সহায়ক, রত্নই রত্নের সমাদর জানে। শঙ্কর অমূল্য রত্ন-তাই এ রত্নের মর্ম বুঝিলেন।

ভগবৎ কৃপায় পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে, মূক্ কথা বলে, অসম্ভব সম্ভব হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যে বালক এক-দিনের তরে মুখ খুলিল না, আজ সে সন্ন্যাসীর স্পর্শে আসিয়া সুললিত সংস্কৃত ছন্দে অনর্গল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে লাগিল---ইহা যেমন আশ্চর্যের তেমন আনন্দের বিষয়, বিশেষত পিতা প্রভাকরের পক্ষে, তাঁহার চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। কি বলিয়া সন্ন্যাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না।

শঙ্কর তখন এরূপ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল তাহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বালকের পিতা প্রভাকরের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বলিলেন, 'এ বালক অমূল্য রত্ন, এ রত্নের তুলনা মিলে না, বালক আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক। হয়ত আপনার স্মরণ থাকিবে কয়েক বৎসর পূর্বে আপনি সস্ত্রীক এ বালককে নিয়া এক তীর্থস্থানে গিয়াছিলেন। সেখানে এক নদীতে স্নান করিতে যাইবার পূর্বে আপনারা বালককে এক যোগীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যোগী তখন পরমার্থ চিন্তায় ডুবিয়াছিলেন, বাহিরের কোন হুঁস্ ছিল না। আপনার অনুরোধ তিনি শুনিতে পান নাই। সুতরাং তাঁহার উপর তাঁহার অজ্ঞাতে যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে পালন করা সম্ভব হয় নাই, স্নানান্তে ফিরিয়া আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, বালক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ইতিমধ্যে যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে, পুত্রশোকে মুহ্যমান হইয়া আপনারা অতি করুণভাবে কাঁদিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে বাঁচাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, যোগীর হৃদয় কোমল। আপনাদের কাতরতায় তাঁহার মন গলিয়া গেল। তখন আপনাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া আপনার সন্তানের শরীরে প্রবেশ করিলেন। যোগীর দেহ পড়িয়া রহিল, আপনার পুত্র বাঁচিয়া উঠিল ; আপনারা হারান ধন ফেরত পাইয়া তাহাকে নিয়া ঘরে ফিরিলেন। তখন হইতে আপনারা সেই যোগীকে আপনাদের সন্তানরূপে প্রতিপালন করিতেছেন।'

পুত্রের [illegible] এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, অসম্ভবও সম্ভব হয়---তবে একটা কথা বলি শুনুন। এ পুত্র সংসারের কোন কাজে লাগিবে না। যোগী জগতের অনিত্যতা বিষয়ে সচেতন, সংসারে উদাসীন। আপনি যদি দয়া করিয়া এ পুত্রের উপর সর্ত ত্যাগ করেন এবং তাহাকে আমার হেপাজতে রাখেন তবে তাহার মঙ্গলই হইবে। আমি এ বালকের সমস্ত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। পিতার পক্ষে পুত্রের দাবী ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন জানি, তবুও পুত্রের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য উহা ত্যাগ করা উচিত। আশা করি আমার কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছেন। আপনি ভাবিয়া দেখুন এবং মনস্থির করিয়া আমায় কথা দিন।

সুখ দুঃখে পরিণত হইতে বেশী সময় লাগে না। সন্ন্যাসীর মুখে পুত্রের পূর্ববৃত্তান্ত শুনিয়া এবং এই পুত্র সংসারের কোন কাজে লাগিবে না জানিয়া প্রভাকর অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহার আনন্দাশ্রু শোকাগ্নিতে পরিণত হইল। হারান রত্ন একবার পাইয়া আবার হারাইবার যে ভয় এবং দুঃখ তাহা যিনি প্রকৃতপক্ষে উহা অনুভব করিয়াছেন একমাত্র তিনি বুঝিতে পারেন অন্যে নয়। প্রভাকরের দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ায় কেহ রহিল না। একমাত্র পুত্র ছিল---সে গেল। জীবিত থাকিলেও না থাকার সামিল। তিনি নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

শঙ্কর অদ্ভুত প্রতিভাশালী বালককে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। নূতন নাম রাখিলেন হস্তামলক। বিদ্যা, বুদ্ধি, ত্যাগ, বৈরাগ্যাদি সহায়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উচ্চ শিখরে শঙ্করের শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন, হস্তামলক তাঁহাদের অন্যতম। শঙ্করের চিন্তাধারা-প্রসারে পদ্মপাদ সুরেশ্বরাচার্য প্রমুখ প্রতিভাশালী সন্ন্যাসীদের ন্যায় হস্তামলকেরও যথেষ্ট অবদান আছে।

প্রচারকার্যের প্রয়োজনে পরিব্রাজক হিসাবে ভ্রমণ করিতে করিতে সশিষ্য শঙ্কর শৃঙ্গেরীতে আসিলেন। ইহা অতি মনোরম স্থান, পার্বত্য প্রদেশ, এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া নদী প্রবাহিত হওয়াতে স্থানটি অতিশয় আকর্ষণীয় হইয়াছে। এক সময়ে এই অঞ্চলে বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঋষিদের আশ্রম ছিল বলিয়া পুরানো বর্ণনা পাওয়া যায়। স্থানটি নির্জন, বিভিন্ন রকমের বন্যজন্তু, নানা জাতীয় হরিণ, বিচিত্র রঙের পাখী এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়, আশ্রমের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, ত্যাগ, তপস্যা এবং ধ্যান-ধারণাদি অভ্যাসের পক্ষে এরূপ অনুকূল স্থান বিরল।

স্থানটি শঙ্করের পছন্দ হইল। তিনি এখানে মঠনির্মাণের সঙ্কল্প করিলেন, সুযোগ-সুবিধাও জুটিয়া গেল। কর্ণাটক দেশের প্রবল প্রতাপশালী রাজা সুধন্বা শঙ্করের ত্যাগ-তপস্যা জ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজ-আনুকূল্য এবং অন্যান্য শিষ্যদের প্রবল আগ্রহে এই মনোরম স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। মন্দির নির্মিত হইল এবং সরস্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

শঙ্কর কিছুকাল শৃঙ্গেরী মঠে বাস করিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। বিবেক চূড়ামণি, উপদেশ সাহস্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহাদের অন্যতম। এইসমস্ত গ্রন্থ তিনি শিষ্যদের পড়াইতেন। কখন কখন উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভূমি হইতে বিবিধ বিষয় বলিয়া যাইতেন।

শিষ্যদের অনেকেই তাহা নোট করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ভাবধারা বুঝিবার পক্ষে ঐগুলি যেমন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল, পরবর্তীকালে তাহা ভাবধারা বিস্তারকল্পে গ্রন্থ প্রণয়নেও অনেক সুবিধাজনক হইয়াছিল। মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে এই ভাবধারা অব্যাহত রাখিয়া সার্বজনীন বৈদিক ধর্মের সত্যের পতাকা সর্বদা উড্ডীয়মান রাখিতে হইলে একদল সর্বত্যাগী, বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রয়োজন; ইহা সম্যক্‌ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের উপর ভবিষ্যৎ দায়িত্ব অর্পণের জন্য তিনি শিষ্যদিগকে সর্বরকমে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিতেন। সর্বদুঃখের মূল অহমিকাকে সমূলে উৎপাটন করিয়া শিষ্যগণ যাহাতে শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন সেই জন্য তিনি তাঁহাদিগকে সাধনায় সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন এবং প্রয়োজনমত তাঁহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেন।

গিরি শঙ্করের শিষ্যদের অন্যতম। তাঁহার গুরুভক্তি এবং সেবা সকলের অনুকরণীয়। গুরুর কোন কষ্ট না হয় সেইজন্য তিনি সর্বদা নিজের সুখ বিসর্জন দিয়াও তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেন। গুরুসেবাতেই তাঁহার আনন্দ। শাস্ত্রে তাঁহার গভীর প্রবেশ ছিল না, তার জন্য ক্ষোভ ছিল না কিন্তু সর্বদা গুরুপ্রদর্শিত সাধনায় নিবিষ্ট থাকিতে সচেষ্ট থাকিতেন, এই শান্ত প্রকৃতির শিষ্য অদ্ভুত নিষ্ঠাবান। অধ্যাপনার সময় গুরুর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাগুলি খুব নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেন, গুরুবাক্য তাঁহার নিকট বেদবাক্য, অমৃতের খনি, শঙ্করও গুরুর উপর একান্ত নির্ভরশীল শিষ্য গিরির সরলতা, ভক্তি এবং সেবাতে খুব প্রীতিলাভ করিতেন। একদিন শাস্ত্রের পাঠচক্রে শিষ্যগণ উপস্থিত হইয়াছেন। নদীতে গুরুর বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া গিরি যথাসময়ে ফিরিতে পারেন নাই বলিয়া শঙ্কর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইহাতে জনৈক শিষ্য অধৈর্য হইয়া বলিলেন—গিরি ব্যতীত সকলে উপস্থিত সে কিছু বুঝে না, তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

শঙ্কর সময়ের সদ্ব্যবহার এবং অপব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন। তাঁহাকে এইরূপে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করাইয়া দেওয়া উক্ত শিষ্যের পক্ষে যেন আপন সীমা লঙ্ঘন করার মত দেখায়। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য শঙ্কর শুধু বলিলেন যে, শাস্ত্রে গিরির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে এবং সে নিত্য খুব মনোযোগ দিয়া শাস্ত্রের আলোচনা শুনে সুতরাং তাহার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা ভাল।

অল্পক্ষণের মধ্যে কর্তব্য শেষ করিয়া গিরি পাঠচক্রে গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন। শঙ্কর বলিলেন 'গিরি, তুমি ত' নিত্য মনোযোগ দিয়া শাস্ত্রালোচনা শুন, আজ তুমি শাস্ত্রের তত্ত্ব শ্লোকাকারে রচনা করিয়া আবৃত্তি কর, সকলে শুনিয়া আনন্দ পাইবে।'

ভক্ত, জ্ঞানী, কবির পক্ষে দার্শনিক তত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করা খুব কঠিন না হইতে পারে—কিন্তু অতি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ভাব, ভাষা, ছন্দ, মাত্রা ঠিক রাখিয়া এরূপ করা যে কঠিন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবৎ কৃপা এবং গুরুর আশীর্বাদে মূক্‌ কথা বলে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, গিরির মধ্য দিয়া ভগবৎ কৃপা এবং গুরুশক্তি প্রকাশ পাইল। গুরুর আদেশে গিরি যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করযোড়ে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব সুললিত ত্রোটক ছন্দে সুন্দর আবৃত্তি করিলেন তখন সকলে শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। শ্লোকের ভাব, ভাষা, ছন্দ, মাত্রা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ সব ঠিক রাখিয়া অনর্গল গুরুশক্তির মহিমা বর্ণনা করা গিরির মত নগণ্য শিষ্যের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইল তাহা চিন্তার বিষয়। এই ঘটনা বিদ্বান্‌ শিষ্যদের অহঙ্কার খর্ব করিল, সকলের মধ্যে বিরাট শক্তি বিদ্যমান, কাহাকেও উপেক্ষা করিতে নাই—এই তাৎপর্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল, গুরুর শক্তিতে বিশ্বাস হইল, গুরুশক্তি অপার, যোগশক্তির প্রভাবে তিনি সাধারণকে অসাধারণ করিয়া তুলেন। শঙ্কর গিরিকে সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত করিলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন তোটকাচার্য

শৃঙ্গেরীতে শিষ্যদের শিক্ষাদান

কালে শঙ্কর এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইলেন। একদিন পাঠচক্রে শিষ্যদের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মুখে মাতৃস্তনের আস্বাদ পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। বারবার এইরূপ হইতে থাকিলে তিনি বুঝিলেন মাতা বিশিষ্টাদেবীর মৃত্যুকাল সমুপস্থিত, যম তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছেন। মাতৃভূমি সুদূর কালাডি গ্রামে স্বীয় কুটিরে বার্ধক্যহেতু রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। মৃত্যুর পূর্বে একমাত্র পুত্রকে না দেখিয়া শান্তিতে মরিতে পারিতেছেন না। পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে পারিলে শান্তিতে মরা যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা কঠোর সত্য, কিন্তু প্রিয় পুত্র সামনে থাকিলে সে যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়। গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণকালে পুত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সে মৃত্যুর পূর্বে মাতাকে ইষ্ট-দর্শন করাইবে, মৃত্যুর সময় কাছে থাকিবে এবং মৃত্যুর পর শেষকৃত্য সম্পাদন করিবে। মাতা বিশিষ্টাদেবী শেষ সময়ে পুত্রের দর্শন আশায় আছেন, শান্তিতে মরিতে পারিতেছেন না।

শঙ্করের পূর্বপ্রতিজ্ঞা মনে আছে, যে-কোন মূল্যে তাহা রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু পথ দীর্ঘ, পদব্রজে যাইতে অনেক সময় লাগিবে। পৌছিতে দেরী হইলে মাতাকে দেখিতে পাইবেন না। অন্য পন্থা অবলম্বন ব্যতীত শীঘ্র যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি যোগশক্তি-প্রভাবে অবিলম্বে মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। বহু বৎসর পরে একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুর সময় শয্যা-পার্শ্বে দেখিয়া বিশিষ্টাদেবী আনন্দিত হইলেন, তাঁহার চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। এখন মৃত্যু হইলে ক্ষোভ থাকিবে না।

এইবার শঙ্কর আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, মহাযোগী। তিনি মাতাকে ইষ্ট-দর্শন করাইলেন। গোপাল মাতার ইষ্ট, মৃত্যুর পূর্বে অন্তিমশয্যায় ইষ্ট-দর্শন করিতে করিতে এবং পুত্রের মুখে বেদধ্বনি এবং ভগবানের নাম শ্রবণ করিতে করিতে বিশিষ্টাদেবী মৃত্যুর কোলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন, তিনি ভাগ্যবতী। স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া শঙ্কর মাতৃঋণ শোধ করিলেন।

জগতের ইতিহাসে দেখা যায়-মহাপুরুষ মাত্রেই আপন মাতাকে দেবীজ্ঞানে প্রাণপণে সেবা করেন। শঙ্কর মহান্, তিনি তাহাই করিয়াছেন—তথাপি তিনি মানব, মাতৃশোকে মুহ্যমান হইবেন ইহা স্বাভাবিক। এত দুঃখের মধ্যে আবার একটা নূতন বিপদ আসিয়া তাঁহার দুঃখকে অসহনীয় করিয়া তুলিল, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহাদের নিকট হইতে সান্ত্বনা পাইবার আশা ছিল তাঁহাদের নিকট হইতেই এ-দুঃখের বোঝাটা চাপান হইল। আত্মীয়-স্বজন এই বিপদে তাঁহাকে সান্ত্বনা না দিয়া তাঁহার জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

তাঁহারা সাধারণ গৃহস্থ-স্বার্থপর, সময় বুঝিয়া কোপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গৃহত্যাগের পূর্বে শঙ্কর আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সম্পত্তির বিনিময়ে মাতা বিশিষ্টাদেবীর দেখশুনা করিবেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার ভরণ-পোষণ করিবেন। মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। তাঁহারা সে দায়িত্ব মোটেই পালন করেন নাই, ফলে জীবিত অবস্থায় মাতাকে আত্মীয়ের হাতে যথেষ্ট শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছে। এত যন্ত্রণায় একজন মহিলা তাঁহার দেখাশুনা এবং সেবা দ্বারা তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন; তা না হইলে তাঁহার শরীর রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িত।

এখন আত্মীয়গণ কোনপ্রকার দায়িত্ব পালন না-করিয়াই সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন, মাতার শেষ-কৃত্য সম্পাদনে কোনপ্রকার সাহায্য না করিয়া বাধা সৃষ্টি করিলেন, মহামানবের মায়ের কপালেও এত দুঃখ থাকে! অদৃষ্ট কাহাকেও রেহাই দেয় না, শঙ্করকেও দেয় নাই। মাতার দেহ শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় কোন আত্মীয় অগ্রসর হইলেন না, তাঁহারা শঙ্করকে পরিত্যাগ করিলেন।

শঙ্কর একা, তাঁহার পক্ষে ভারী মৃতদেহ দূরবর্তী শ্মশানে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া শঙ্কর মাতার দেহ খণ্ড খণ্ড করিলেন। বাড়ীর উঠানে চিতা সাজাইলেন। উঠানই শ্মশান হইল।

বিশিষ্টাদেবীর কপালে তাই ছিল। ইহাতেও আত্মীয়দের প্রতিহিংসা মিটিল না, শঙ্করকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে ক্রটি করিলে না। যখন অত্যাচার চরমে উঠিল অত্যন্ত দুঃখে এবং ক্ষোভে শঙ্কর তাঁহাদের অভিশাপ দিলেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে অভিশাপ দেওয়া বিসদৃশ দেখায়, কিন্তু তিনি মানুষ। মানুষের সুখ-দুঃখ বোধ আছে। যতদিন দেহবোধ আছে ততদিনই অবিদ্যা থাকে, জাগতিক ব্যাপারে তাঁহাকে মানুষের মত ব্যবহার করিতে হয়, তিনি আত্মীয়দের এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, ইহার পর তাঁহারা বেদপাঠের অধিকারে বঞ্চিত থাকিবেন, মৃতব্যক্তির সৎকার-বিষয়ে শঙ্করকে যেমন বিপদে পড়িতে হইয়াছিল—তাঁহারাও তেমন কোন না-কোন কারণে বিপদের সম্মুখীন হইবেন এবং নিজ নিজ বাড়ীর উঠানে মৃতব্যক্তিকে সৎকারে বাধ্য হইবেন। শুধু তাই নয়, মৃতব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়াই দাহ করিবেন। তিনি আরও অভিশাপ দিলেন যে-অতঃপর কোন সন্ন্যাসী তাঁহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অভিশাপ বড় ভীষণ, সামান্যবিষয়ের লোভে আত্মীয়েরা নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা ভীত হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা রাজা রাজশেখরের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি মধ্যস্থ হইয়া ন্যায়ানুসারে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিলেন। আত্মীয়দের লোভ ছাড়িতে হইল।

[ক্রমশ]

ঠোঁট ফাঁক ক'রে ওষুধ খাওয়াতে হচ্ছে, পথ্য দেবারও সেই অবস্থা। পনেরো দিন ধ'রে জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে হিমিকা। দিন-রাতের একটি আয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন সাউসাহেব। সেই দেখছে তাকে। কে আর দেখবার আছে ওর। কেউ নেই হিমিকার তবু এক ছোকরা বাবু এসে মহা সোরগোল বাঁধিয়েছে—হিমি মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করবে সে। দরওয়ান বুঝিয়ে উঠতে পারছে না যে বেমারী মেমসাহেব এখন মজা দিতে পারবে না। চিনতেই পারবে না বাবুকে। বাবুটা তব্ রোজ আসবে, আর হল্লা করবে বেজায়।

সেদিন বৃজমোহন এসেছিলেন হিমিকাকে একবার দেখে যেতে, বাইরে দিয়েছে? অতিমাত্রায় আশ্চর্য হলেন বৃজমোহন।

—ওর মতামতে কি আসে যায়। বাবাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আমি কিছু মানি না, ব্যস্। উত্তেজিত হয়েছে দেবেশ।

—বেশ, বেশ। বহুৎ খুশীকা বাত।

সাউসাহেব বুঝলেন অল্পবয়সের পাগলামি। আর বিয়ে করলেই বা কি দোষ। কত খানদান ঘরের ছেলে হরদম বিয়ে করছে সিনেমাওয়ালী লেড়কি। হিমির বেলা দোষের কি আছে। অল বোগাস। মুখে বললেন: বেশ, শাদি করবেন, কিন্তু হিমির যে খুব অসুখ। জ্ঞান নেই, এখন তো বিয়ের কথা শুনতে পাবে না।

অসুখ? থমকে গেল দেবেশ।

—আমি ওকে দেখব।

দেবেশের জোর বাড়ল এতবড় একটা লোককে স্বপক্ষে পেয়ে।

—আপনিই বলুন লক্ষ্মীকে বিয়ে করতে দোষ কিসের?

—কিছু না, নাথিং। হিমি ভাল হলেই বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হবে। বাট ডোণ্ট মাইণ্ড দেবেশ, দেয়ার ইজ এ বিট অব ডেলিকেট ম্যাটার, মানি ম্যাটার।

মানি। টাকা। দু'টো ঢোক গিলল দেবেশ। অনেক কষ্টে একশো টাকা যোগাড় করেছিল, তাও খরচ হয়ে এখন মোটে কয়েকটা টাকা আছে। ঠিক আছে। এখনো তো বিয়ের দেরী অনেক। মোটে অল্প পথ্য করেছে লক্ষ্মী। ও সবল হতে হতে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নয়তো দেবে বাড়ীর টাকা বন্ধ করে। দাদা যে দেয়নি

ধারাবাহিক উপন্যাস

চড়া কথা শুনে বেরিয়ে এলেন। সন্ত্রস্ত হয়ে সেলাম করল দরওয়ান। বৃজমোহন দেখলেন একটি বাঙালী ছেলে রাগে মুখ-চোখ লাল করে তর্ক করছে দরোয়ানের সঙ্গে। ব্যাপার কি জানতে চাইলেন সাউসাহেব। দরওয়ান জানাল—বাবু ক'দিন ধরেই হিমি মেমসাহেবকে দেখবার জন্য জুলুম করছে।

হিমির সঙ্গ কিনতে পারে এমন জৌলুষ নেই ছোকরার চেহারা-পত্রে। হয়তো আত্মীয়বন্ধু কোনো। মেয়েটার সবই রহস্য, একটু আলো পাবার আশায় ছেলেটিকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন বৃজমোহন।

—বসুন, হিমির সঙ্গে দেখা করবেন? ওর যে খুব অসুখ। কে হয় আপনার হিমি?

—হিমিকা? আমার? আমি ওকে বিয়ে করব। সোজা গলায় উত্তর দিল দেবেশ।

নমিতা চক্রবর্তী

—বহুত আচ্ছা, চলুন ও ঘরে।

খাটের উপর শুয়ে হিমিকা, জ্ঞান নেই। অসুখ হয়েছে। ভালবাসায় উত্তাল হল দেবেশের বুক। পঁচিশ বছরের অবুঝ বয়েস ছাড়া এত বেহিসাবী হয়ে ভালবাসতে পারবে না কেউ।

—ওর কি হয়েছে? ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল দেবেশ।

—জ্বর, বুকে ঠাণ্ডা লেগেছে। দেখা তো হ'ল, এখন চলুন। ডাক্তার বেশী লোক এ ঘরে থাকতে বারণ করেছেন।

—আমি রোজ দেখব এসে।

—রোজ? বেশ। আয়া, বাবুকে অ্যালাউ করো ঘরে ঢুকতে।

আস্তে আস্তে বৃজমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'ল দেবেশ। হিমিকা যে অদ্ভুত রকমের ভীষণ ভাল মেয়ে সে এতদিন। কিন্তু টাকা না দিলে মায়ের বড় কষ্ট হবে। মা আর বোন দু'টোর একখানাও আস্ত শাড়ী নেই। অন্তত তিনখানা শাড়ী তো কিনতেই হবে এ মাসের মাইনে পেয়ে। উঃ! কি ভীষণ জেদী বাবা, কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়বেন না। যদি তিনি মত দিতেন, কি সুন্দর হ'ত সব। মা শাঁখ বাজিয়ে বউ ঘরে তুলতেন, সুধা-আশা ছোট বৌদির কাছে কাছে ঘুরতো, আর দেবেশ সকালে বিকালে চারটে টিউশানি করে অনায়াসে বাড়তি রোজগার করত একশ টাকা।

হিমিকা বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেবেশের মুখের রং বদল দেখছিল, জিজ্ঞেস করল:—কি ভাবছ?

—ভাবছি—। থেমে গেল দেবেশ। দুর। মেয়েদের কাছে কখনো টাকা-পয়সার অভাবের কথা তুলতে আছে। তাতে আবার রোগা মেয়ে।

—বললে না কি ভাবছ?

—ভাবব আবার কি। কিন্তু তক্ষুণি নতুন ভাবনা এল দেবেশের মনে।

—ভাবছি চেঞ্জে গেলে তোমার শরীর একেবারে সেরে যাবে। যাবে?

—দেখি সাউসাহেব কি বলেন।

—সাউসাহেব। দেখ লক্ষ্মী, এতদিন যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন আর ওর টাকা নেবে না তুমি। উনি লোক ভাল, কিন্তু পরপুরুষের টাকা নিতে নেই মেয়েদের। তোমার যা দরকার আমি দেব।

—তুমি দেবে? সস্নেহে হাসল হিমিকা।

—সাউসাহেব পরপুরুষ, তুমি বুঝি আপন? তা ছাড়া টাকা পাবে কোথায় শুনি?

—যেখান থেকে, যে ক'রে হোক টাকা আনব আমি।

—পাগলামি করো না। উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল হিমিকা।

—লক্ষ্মী, তুমি আর এক মাসের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে।

—তা যাব মনে হচ্ছে।

—তখন আমাদের বিয়ে হবে, কেমন?

—আঃ। চোখ পাকাল হিমিকা।

—ফের সুরু করলে বুঝি? বলেছি না ওসব হবে না।

—হবে, নিশ্চয় হবে। তোমাকে নিশ্চয়ই বিয়ে করব আমি।

—পাগল। আমাকে বিয়ে করতে নেই দেবেশ।

—খুব আছে। তুমি জান অষ্টরম্ভা। সাউসাহেব বলেছেন তুমি খুব ভাল মেয়ে

বেদনার হাসি হাসল হিমিকা।

—সাউসাহেব ব্যবসায়ী মানুষ। ওর কাছে তারাই খুব ভাল মেয়ে, যারা খুব খারাপ। সত্যি ভাল মেয়েকে বউ করে অন্দরে রেখেছেন উনি। আমাদের ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। আমরা ভাল নাচতে-গাইতে পারি, ভোলাতে পারি কাস্টমার, তাই আমরা ভাল। ঘরের বউ কি আমাদের মত হয়। কোনো দিন কি শুনেছ নাইট ক্লাবে নাচছে ঘরের বৌ?

—নাচে নি? বেহুলা তো নেচেছিল দেবসভায়। স্বর্গের নাচুনি উর্বশীও হয়েছিল কুরুবংশের বৌ।

—উর্বশী, বেহুলা? তারা কে?

—তারা কে। উর্বশী-বেহুলার কথা শোনো নি? জানো না তাদের গল্প?

—কি ক'রে জানব বল? ছোট-বেলায় ছিলাম মিশনারীদের আশ্রয়ে, তারপর এলাম হোটেলে। কিন্তু গল্পে যে কথাই থাকুক না কেন, বাস্তব জীবনে তা ঘটে না দেবেশ, ঘটতে পারে না। পাগলামি ছেড়ে যাকে সত্যি সত্যি একটি লক্ষ্মী বৌ এনে দাও।

—একথা বলতে পারলে তুমি? তার মানে আমাকে ভালবাসতে পার না, গরীব বলে আসতে চাও না আমার ঘরে।

হিমিকার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। একটি ঘর, মাটির পাতার, কুটোর যেমন ঘরই হোক না কেন, ঘরের জন্য যে প্রাণ দিতে পারে সে। কিন্তু দেবেশকে বিয়ে করে ঘর!

—আমাকে একটুও ভালবাসতে পার নি তুমি।

হিমিকার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল দেবেশ। ক্ষীণ হাত দু'টি বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল হিমিকা।

—শোনো, বোসো, রাগ করে চলে যেও না দেবেশ। কেউ নেই আমার। আত্মীয়-বন্ধু, বাপ-মা কেউ নেই। সাউসাহেবের অসীম দয়া তাই অসুখের সময় হাসপাতালে না পাঠিয়ে ঘরে রেখে খরচপত্র করে চিকিৎসা করিয়েছেন।

—ওঁর সব টাকা হিসেব করে শোধ করে দেব আমি।

—দিয়ো। দেবেশকে আর উত্তেজিত করতে চাইল না হিমিকা।

—তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার একথা বলবার মত। তুমি সাউসাহেবের টাকা শোধ করে দিয়ো, কিন্তু আমাকে বউ করতে চেয়ো না দেবেশ।

—কেন চাইব না? আমি ভালবাসি তোমাকে। আমি গরীব, তাই তুমি আমার বউ হতে রাজী নও?

—ওকথা বলো না দেবেশ। তুমি গরীব কোথায়। তুমি তো শাহানশা বাদশা। অমন দরাজ বুক তোমার, আর কত সাহস। কলগার্লকে বউ বানাতে চাও।

—তবে রাজী হচ্ছ না কেন?

কেন। চুপ ক'রে রইল হিমিকা।

—কথা বলবে না লক্ষ্মী।

—বলব। শোনো দেবেশ, তুমি তো আমার কোনো পরিচয় জান না। জানলে বিয়ের কথা বলতে পারতে না। আমার মা শান্তিনগরের জমিদার সুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষিতা ছিল।

—শান্তিনগর!! তুমি, তুমি সেই হিমিকা!! বিস্ময়ের আবেগে আবার উঠে দাঁড়াল দেবেশ। হিমিকা!! মোকদ্দমা!!!

—আমার দিদিমা, সেও খারাপ মেয়ে ছিল দেবেশ।

আস্তে আস্তে বিছানার উপর হিমিকার পাশে আবার বসে পড়ল দেবেশ। নীরবে কাটল কিছুক্ষণ, বহুক্ষণ। রাতের আঁধারে ঝাপসা হয়ে এল দু'জনের মুখ, নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। সেই আধো-অন্ধকারে হ্যাপিনুকের একটি ঘরে বসে হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেল দেবেশ, অনেক বুঝল, অনেক দেখতে পেল। সে দেখল অনেক অন্যায়, ব্যভিচার, রাশি রাশি পাপ। একটা প্রবল অট্টহাসির সামনে বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে দেবেশের ভালবাসা। দেবেশ বুঝল ও হেরে যাচ্ছে, হটে যাচ্ছে। কি বড়, কি দীপ্ত হিমিকা, তার কাছে একেবারে ছোট হয়ে গিয়েছে দেবেশের ভালবাসা।

সুইচ টানবার শব্দ হ'ল, জগুয়া এসেছে চা নিয়ে। অন্ধকারে দু'জনকে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে ভয় পেল।

—মেমসাব কো তবিয়ৎ—

—ভাল আছি। রেখে যাও চা। চা খাও দেবেশ।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিল কিন্তু চুমুক দিতে পারল না দেবেশ। হিমিকার দিকে চেয়ে রইল। শীর্ণ রোগপাণ্ডুর

মুখখানি। কোনো অন্যায়ের পাপের ছায়া নেই, সেই মুখে।

—দেবেশ। হিমিকা ডাকল।

—লক্ষ্মী, আমি তোমার মত বড় নই কিন্তু তোমাকে সত্যি ভালবাসি।

—সে আমি জানি দেবেশ। ভাল না বাসলে বিয়ের প্রস্তাব না করে অন্য কথা বলতে তুমি।

—হয়তো বলতাম। কিন্তু এখনি বুঝলাম সে শক্তিও আমার নেই। স্ত্রী ছাড়া অন্যভাবে মেয়ের সঙ্গ পেতে আমার ভয় হয়। আমি ভীতু, দুর্বল। তোমাকে অন্যভাবে চাইব সেই শক্তি যেমন নেই, তেমনি হয়তো পারব না আর বিয়ে করবার কথাও বলতে।

হিমিকা চুপ করে রইল। দেবেশ বলতে লাগল—আমি দুর্বল, কিন্তু তোমার অনেক জোর, অনেক শক্তি। না হ'লে এমন করে নিজের সব পরিচয় আমার কাছে দিতে পারতে না। তুমি আমার হাত ধর, জিতিয়ে দাও আমাকে লক্ষ্মী। বল—ভয় পেয়ো না দেবেশ। আমি ছোট নই, আমাকে বিয়ে করে ছোট হয়ে যাবে না তুমি।

এবার হিমিকার চোখে জল এল। দেবেশকে সে সাধারণ একটি ভালমানুষ ছেলে বলেই জানত। ওর ভালবাসা, বিয়ে করবার ইচ্ছাকে খানিকটা ছেলেমানুষী বলে ভেবেছে। আজ বুঝল রিফিউজি কলোনীর ক্লার্ক ছেলেটি হৃদয়সম্পদে কারোর চেয়ে কম নয়। চোখের জল মুছল হিমিকা।

—দেবেশ, বউ না হ'লেও মেয়েদের জীবন কেটে যায় যদি ভালবাসা থাকে। মা-বাবার ভালবাসা, ভাইবোনের ভালবাসা। নাই বা হলাম তোমার বউ, তোমার একটি বোন করে নাও আমাকে। তোমার সুধা-আশার মত আর একটি। আমাকে বিয়ে করলে অনেক ছাড়তে হবে তোমাকে দেবেশ। মা-বাবা, বোন, সংসার-সমাজ সব। কিন্তু তার বদলে আমি এতটা দিতে পারব না যে তোমার সব ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। কোনো মেয়েই তা পারে না। একদিন তুমি দেখবে তোমার ঘরে মায়ের মমতা, বাবার সতর্ক পাহারা, বোনেদের আবদার, প্রতিবেশীর নিমন্ত্রণ কিছু নেই। সেই একঘরে ঘরে তোমার দম বন্ধ হয়ে আসবে তখন।

—তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না লক্ষ্মী। ভালবাস না।

—বিশ্বাস করবার কথা জিজ্ঞেস করছ? মানুষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না দেবেশ। বিশ্বাস করবার মত মস্ত জোর কই আমাদের? তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার না। বিয়ে করে ঘরে নিয়ে গেলেও তোমার মন নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। অনবরত আমার বশ্যতার প্রমাণ খুঁজবে আমার বলা-চলা-চাওয়ার মধ্যে। আমার বুকের মধ্যেও তোমার ভালবাসার প্রতি সন্দেহ জেগে থাকবে। তা বলে অবিশ্বাসকে একেবারে খারাপ ভেব না তুমি। আমরা ভালবেসে নিঃশেষে অন্যের হাতে নিজেকে তুলে দিতে চাই বলেই তো এত সন্দেহ, এমন অবিশ্বাস। কেবলি

ভয় হয়, সব দিয়ে বুঝি দেউলে হয়ে গেলাম।

হয়তো আরো কিছু বলত হিমিকা, দেবেশ বাধা দিল—তোমার সব কথা বুঝতে পারি এমন আমার ক্ষমতা নেই লক্ষ্মী। শুধু তুমি সোজাসুজি বল, আমি যে তোমাকে ভালবাসি, বিয়ে করে কষ্ট দেব না এ কথা তুমি বিশ্বাস কর কি না।

হিমিকা চুপ করে রইল। সে জানে দেবেশ তাকে ভালবাসে। তাকে পাবার জন্য অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারে সমাজ-স্বজন-সবার ভ্রূকুটি। একটি তরুণী মেয়ের পক্ষে, হিমিকার মত মেয়ের পক্ষে এটা একটা মস্ত বড় খবর। কিন্তু গত তিনটি বছর ধরে ভালবাসার অনেক রূপ দেখেছে সে। হিমিকা জানে দেবেশ সত্যিকথা বলেছে, স্ত্রী ছাড়া অন্যভাবে মেয়েদের সঙ্গিনী করবার মত মানসিক গঠন তার নয়। ভালবেসে তাই হিমিকাকে পাবার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, সব বাধা-বন্ধ উড়িয়ে দেবার মত সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছে। গরীব ঘরের নৈতিক চরিত্রবান ছেলে না হয়ে দেবেশ যদি বড়লোকের উচ্ছৃঙ্খল ছেলে হ'ত। ভালবাসার রং-লাগানো নেশা তাকেও এমনি সাহসী করে দিত। প্রয়োজন হলে বাবার সই জাল করতেও দ্বিধা জাগত না মনে। সেও সব উপেক্ষা করে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত জেলে যাবার ভয়। সেও এসে হিমিকাকে বলত—চল আমার সঙ্গে। তোমাকে ভালবেসেছি, কোনো দুর্নাম, বাপ-মা কাউকে গ্রাহ্য করি না আমি।

—চল কাশ্মীর। সেখানে ডাল হ্রদে নৌকা ভাসবে, আলোর ঝলকানি। স্বর্গের নাচ দেখাবে আমাকে তুমি। পাত্র ভরে ওঠে ধরবে পানীয়, ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাবে নতুন নতুন রং ছিটিয়ে। এখানে ভালবেসে দেবেশ বলছে—তুমি আমার ঘরে এসো। লক্ষ্মী হয়ে, বধূ হয়ে আমার জীবন-পাত্রটি মাধুর্যে ভরে দাও।

এখানেও হিমিকাকে রং ছিটাতে হবে। নেশার রং, প্রেমের রং দিয়ে রঙিন করতে হবে ঘর। না হলে দেবেশেরও নেশা ছুটে যাবে, শুকিয়ে যাবে ভালবাসার স্রোত। তখন ভালবাসার ভাঙা হাটে নাচওয়ালীকে বকশিস দিয়ে বিদায় করা চলবে না। ঘরের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়াবে সব সুষমা ঝরে যাওয়া দু'টো কঙ্কাল। সবাই এসে কেবল ভালবাসার কথা বলে, কেবল মধু, কেবল সোনার স্বপ্ন। কিন্তু সেই প্রচণ্ড দীপ্তি কই? সব ফুল-পাতা কুঞ্জবন যার তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, ডানা ঝাপটে মরবে বসন্তের কোকিল। ঠোঁটের রং, চোখের কাজল পুরুষকে ভোলাবার শত আয়োজন ঝলসে যাবে। ভালবাসার আগুনে স্নান করে উঠবে হিমিকা—শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধা। অভিশাপ মুক্তির সুপ্রভাত দেখা দেবে পূবের আকাশে।

দেবেশ ভাবছে কষ্ট পাবার ভয় হয়েছে হিমিকার মনে। ও তো জানে না, জানে না কোনো পুরুষ, মেয়েরা কষ্ট পেতে ভয় পায় না। দুঃখকে অতিক্রম করবে বলেই তো দুঃখের সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। তারা ভাবে গভীর কালো ঝঞ্ঝা বিহ্বল রাত, কিন্তু ঘন বন পার হলেই দেখা দেবে সূর্যের আলো, দিনের উদয়। আমার ভয় থাকবে না। বুকে ভরে আছে সূর্যের আলো। যদি আবার জীবনে রাত নেমে আসে, তবু ভয় নেই। দুস্তর পথের অন্ধকার দূর করে দেবে সূর্যকান্তমণি।

কিন্তু সেই আলো, সেই আগুন, তা কি আছে দেবেশের, আছে কোনো পুরুষের মধ্যে? তারা কি তীব্র ঘৃণার বিষে, একঝলক দৃষ্টি দিয়ে, কথার বাণ ছুঁড়ে পুড়িয়ে দিতে পারবে হিমিকাকে?

চারিদিকে আগুন জ্বেলে বসিয়ে দিতে পারবে হিমিকাকে পঞ্চতপের আসনে? তাকে জ্বালাবে, পোড়াবে, রেখে যাবে সমস্ত মন ভরে আগুনের স্বাক্ষর।

●

—ছোকরাটাকে ভাগিয়ে দিলে? তোমার শাদি ক'রে অন্দরের জেনানা বানাবার কত ইচ্ছা! দেবেশ তো শাদি করবে বলেছিল, ওকে ভাগালে কেনো।, কয়েকদিন পরে হাসতে হাসতে হিমিকাকে জিজ্ঞেস করলেন ব্রিজমোহন।

হিমিকার শরীর খানিকটা সেরেছে, কিন্তু কাজে এখনো বের হয় নি সে। যত নরম মনই হোক না কেন, বিজনেসে লস খেতে রাজী নন সাউসাহেব। মেয়েটে যদি 'কেপ্ট' হয়ে থাকত, টাকা খরচ করতে রাজী ছিলেন তিনি। বেশ ভাল লাগে ওকে। আর হিমিকা যে কখনো বোরিং হয়ে উঠবে না তা ভালই বোঝেন। আর বোরিং হলেই বা ভয় কিসের। ও তো ঘরের আওরৎ নয় যে নসিবের মত অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে জীবনের সঙ্গে। কিন্তু 'কেপ্ট' হয়ে থাকতে চায় না হিমিকা। সুতরাং ওর ওপর আর টাকা খরচা করতে রাজী নন সাউসাহেব। কিছু লাভ ছাড়া টাকা ইনভেস্ট করলে লাক ঠুটা হয়ে যায়, এটা তাঁর দৃঢ় সংস্কার। হিমিকাকে হয় কাজে লাগতে হবে, না হ'লে সুইট ছেড়ে দিতে হবে।

ব্রিজমোহনের মনের কথা ভালই বুঝেছিল হিমিকা। কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্য সঙ্গ দিয়ে এতটা কখনোই আশা করা চলে না। অবশ্য কোম্পানীর কাজ করলেও মাঝে মাঝেই তাঁকে মালিকের নির্দেশমত মান্য অতিথিদের আনন্দ দিতে হয়। নিজেকে সম্পূর্ণ না বিলিয়েও তখন যতটা দিতে হয়, তার সঙ্গে সব দেবার প্রভেদ বড় বেশী নয়। তারপর এক বছর ধরে তার ঘরে তো প্রায় প্রতি সন্ধ্যার অতিথি সাউসাহেব। তিনি এখানে বসে মদ খান, মাঝে মাঝে রাতের খাবারও খেয়ে যান। হিমিকাকে সাউসাহেবের পাশে বসতে হয়। ব্রিজমোহন যতটা পারেন স্পর্শ করে, চেয়ে তাকে ভোগ করে নেন। অসহ্য হয়ে উঠলেও চুপ করেই থাকে হিমিকা। এর চেয়ে আর কত কম নিয়ে ব্রিজমোহন তাকে বেঁচে থাকবার জন্য সাহায্য করবেন।

হিমিকাকে নীরব দেখে আবার

বললেন সাউসাহেব :—ছোকরাকে ছাড়লে কেনো হিমি ? ওতো বেশ ভাল ছেলে, শাদি করলে পারতে।

—বিয়ে ? আমাদের কি বিয়ে হয় সাহেব ?

—কেনো হোবে না, সিনেমা-ওয়ালী কতো মেয়ে—

প্রমাণ দেখাতে উদ্যত হলেন বৃজমোহন। হিমিকা বাধা দিল।

—ওসব কথা আমিও জানি। কিন্তু তেমন বিয়ে আমাকেও অনেকে করতে চেয়েছে। দেবেশ একেবারে সত্যি সত্যি বিয়ে করে আমাকে ঘরে নিয়ে তুলতে চায়। জানে না যে আমাকে নিয়ে গেলেই ওর ঘর একেবারে বাগান-বাড়ী হয়ে যাবে। ঘর আর থাকবে না।

—উঃ। তুমি এমন শক্ত শক্ত বাংলা বল, আমি একদম মানে বুঝতে প্যার না। ছোড় দো শাদিকো বাত, সামনের উইকে আমি দার্জিলিং যাচ্ছি, চল আমার সাথ।

—না সাহেব এখন আর আমি কোথাও যাব না। অনেক দিন বসে আছি। কাল থেকে কাজে বের হব।

—কাজে ? বেশ বেশ। তবে তো ভালোই হোবে। কিন্তু কাল বের হবে না, কাল তোমাকে—

একটু থেমে হিমিকার সদ্য রোগ-মুক্ত পাণ্ডুর মুখের দিকে চাইলেন বৃজমোহন। রোগা হয়ে গিয়েছে, সাদা। রং লাগাবে, আর জবর আলো জ্বাললে—।

কাল মিস্টার ক্রিন্জ আসছেন হিমি। খুব বড়িয়া আদমী। একেবারে তোমাদের লিটারেচারের লোক।

বৃজমোহনের ভূমিকাতেই কথাটা বুঝল হিমিকা।

—আমি এখনো সেরে উঠিনি ভাল ক'রে। আর কাউকে ? হিমানী কিম্বা বেলাকে—?

—ব্যস, ব্যস্। হিমিকাকে থামিয়ে দিলেন সাউ।

—ওদের দিয়ে হবে না। একদম ওরিয়েন্টাল চান ক্রিন্জে। তুমি এক-পেয়ালা গরম সরবৎ খেয়ে নিয়ো। রাত একটার আগেই ছেড়ে দেব। তামাম রাত তারপর তোমার। আজ আমি যাই। তুমি আরাম কর। কাল একদম অজন্তার মত সাজ করো। আমি ম্যানেজারকে বলে যাব তোমার ঘরে সব ড্রেস পাঠিয়ে দিতে, একজন ড্রেসারও আসবে। গুড নাইট।

গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন বৃজমোহন। হিমিকা বুঝল কাল তাকে ক্রিন্জেকে আপ্যায়ন করতেই হবে। কাঁচুলী, ওড়না, বাজু-কঙ্কণের মধ্যে নিজের নিষ্ঠুর নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করল হিমিকা। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কে একজন এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে, আনত হয়েছে হিমিকার মুখের উপর, উচ্চারণ করছে অভয়মন্ত্র—আমি আছি। দেখতে দেখতে কেমন বদলে গেল সেই মুখ। মুছে গিয়েছে প্রেমের মাধুরী। ভ্রুকুটিতে কুঞ্চিত কপাল। হিমিকা হারলট। হারলট, বেশ্যা। অট্টহাস্য করে উঠেছে হ্যাপিনুক, জাজ-ব্যাণ্ডের সুরে বাজছে—বেশ্যা, হারলট হিমিকা।

—কই হে পটলবাবু, এট্টা কথা শুনে যাও দিনি।

ডাক্তারবাবুর ডাকে ঘরের ওপাশ হতে সাড়া দিল পটল।—আজ্ঞে যাই, কি কতিছেন ?

—কতিছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। বলি গামছাটুকুই বা আর রাখা কেন ? ও আপদ ত্যাগ করলিই হয়। ছেঁড়া একফালি গামছা অঙ্গে ঝুলিয়ে উনি কম্পাউণ্ডার হবেন।

—জল-বাদলার দিনে—

—ওঃ, জল-বাদলের দিনে। খরার সময় শান্তিপুরের চুনুট লুটিয়ে চল, না ? তা মরগে। এখন আমার কথাডা শুনি রাখ। কাল আমি সকালে ডাক্তারখানায় আসফ না। মাইয়েটারে আশীর্বাদ করতি যাব, ফেরার পথে ডাক্তারবাবুরেও নেমন্তয় করি আসফ একেবারে।

পটল চুপ ক'রে রইল। দীর্ঘ দশ বছর ধরে ডাক্তারবাবুর পরিবারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে সে। দেবেশের বিয়েতে কত উৎসাহ আনন্দ ছিল, কিন্তু আজ আর একটুও খুশী লাগছে না।

—কি হে, কথা ক'চ্ছ না যে ? পটলকে নীরব দেখে বললেন জিতেশ রায়।

—তা তুমিও যাবে নাকি ? চল তবে, ডাক্তারখানা নয় তো আটটার সময় বন্ধ করি দেবা।

—না, না। আমি যাব না, ও আপনিই আসুন গে।

—কেন? চল তুমিও। সাফ কাপড় আর তোমার সেই মুগোর জামাটা, চটিতে একটা লোহা পথেই ফুটিয়ে নেবা। পাকাদেখার দিন, রাম কঞ্জুস হলিও দেবে ভাল-মন্দটা। কলমী শাকের ঝোল খায়ে খায়ে তো মুখ পঁচিছে, মুখ ফিরয়ে আসবা চল।

—আপনারে ব্যগ্রতা করি ডাক্তার-বাবু, আমারে যাতি কবেন না।

এবারে ডাক্তারের রাগ হ'ল।—যাতি কব না। ও আমার নবাব সেরাজ-দুল্লারে, তানারে খোসামোদ করি মুখ ধরায়ে ফেলাম, বাবু যাতি পারবেন না। কেন পারবা না শুনি? সেই বজ্জাত ছেমড়াডার জন্যি পরাণ পুড়তিছে? তা টাকা থাকে তো যাও না। ছেমড়ীর কাছে গিয়ে দিল জুড়য়ে আস।

—রাম রাম। রাগের মাথায় বিষ্ঠে-চন্দনে জ্ঞান হারালেন ডাক্তারবাবু! লক্ষ্মীরে আমরা মা কতাম না?

—মা। অজাত-বজ্জাতরে মা ডাক। তা তুমি না গেলি তো আমার দুই হাঁটু ফাটি কান্না আসবে। নেমকহারাম কোথাকার। ছাওয়ালটার মাথা হতি ভূত নামি গেছে। সুস্থ সুস্থির হয়ে বিয়ে কত্তিছে। খুশী হবে না, না পেত্নীর শোকে বুক ডুকরে কাঁদন। যত অমঙ্গল।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছল পটল। —অমঙ্গল নয় ডাক্তার-বাবু। খোকাদাদার ভালই চাইতিছি। কিন্তু পেরাণডা—।

—থাক তোমার মড়িপোড়া পেরাণ রয়ে।

দুম্ দুম্ ক'রে পথে নেমে গেলেন জিতেশ রায়।

●

—আপনাকে কিন্তু অবশ্যই যেতে হবে।

হাসিমুখে লাল অক্ষরে ছাপানো চিঠি টেবিলের উপরে রাখলেন জিতেশ রায়।

—সামনে, রবিবারেই বৌভাতের দিন ফেলেছি। ও বেলাবেলি দুপুরেই খাইয়ে দেব। নিমন্ত্রণ তো, মধ্যাহ্ন-ভোজন। রাতে কি আর সুখ করে খাওয়া হয়? একটু ভারী বয়সে তো অনেকে রাতের খাবার নামমাত্র করে তোলে। দিব্যি পিচঢালা রাস্তা, মোটর হাঁকিয়ে চলে যাবেন আপনি। ড্রাই-ভারেরও নেমন্তন্ন। বলেন তো ছোটকা ব্যাটাকে পাঠিয়ে দেব আপনাকে নিয়ে যেতে।

জিতেশবাবুর অবিশ্রান্ত কথার মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করল অনল —আপনি তাহলে রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত?

—আমি? রাজী? ও হো, সেই বেটির কথা বলছেন? পাগল হয়েছেন স্যার। আমি ঐ বেটিকে ঘরে আনলে বাপের কুপুত্তুর। নাঃ, সে সব বদখেয়াল নেমে গিয়েছে ছেলেটার মাথা থেকে। ছেলে-ছোকরার দু'দিনের নেশা, বুঝলেন না? তারপর কি রকম ফ্যামিলির ছেলে সেটাও দেখতে হবে তো। আরে আজই না হয় ঘুরছি ফ্যা-ফ্যা করে, একদিন বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত নড়ালের রায়েদের নামে। তা বৌ এনেছি একেবারে নামকরা ঘরের মেয়ে। মাতুলকুল ছোট কালিয়ার। আগের দুই বোন গিয়েছে গুহঠাকুরতা, ঘোষ-দস্তিদারের ঘরে। দেবে-থোবেও মন্দ না। নমস্কারী কাপড়, আসল খাগড়াই কাঁসের বাসন, সাতভরি সোনা, আবার নগদ সাতশো টাকা। একটি পয়সাও বাক্সে তুলছি না আমি বরং নিজে দিচ্ছি কিছু। তিনটে খাসী, একমণ মাছ। আমি হচ্ছি নড়ালের রায়বংশের ছেলে। যেমন খেতে, তেমনি খাওয়াতে। পাতে বসিয়ে একেবারে কণ্ঠা ঠেসে দেব, তবে না খাওয়া। দরকার হয় নিজেই লেগে যাব পরিবেশনে। আমি এখন উঠি। এখনও চালটা যোগাড় হয় নি। ও হবেই জানি, তবু উদ্বেগ আছে একটু। আপনি কিন্তু স্যার নিশ্চয়ই যাবেন। আপনার ভয়েই ব্যাটা সিধে হয়েছে। চাকরির ভয়, বড় ভয়।

অনলের অজস্র প্রশংসা এবং নিজের অশেষ গুণকীর্তন করে বিদায় নিলেন জিতেশ রায়। অনল চুপ করে বসে রইল। কিসের ভয়ে হিমিকাকে বিয়ে করবার সঙ্কল্প ছাড়ল দেবেশ। চাকরির? কিন্তু অনল তো তাকে কোনো কথা বলেনি। হিমিকাকে বিয়ে করতে ভয় পেয়েছে দেবেশ। স্বৈরিণী নারীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চিরদিন ভয় পায় পুরুষ।

হাসপাতালে এসেই দেবেশকে ডেকে পাঠাল অনল।

—বসুন। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

ভূমিকা করল না অনল। জানে ভূমিকা করলে হয়তো কথাটা জিজ্ঞেস করতেই পারবে না সে।

—আপনার তো বিয়ে, জিতেশ-বাবু নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়ে গেলেন। আমি শুনেছিলাম এর আগে আপনি অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করবেন ঠিক করেছিলেন। সে বিষয়ে কি হল আমাকে বলবেন? অবশ্য আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এ প্রশ্নটা ঠিক শোভন হচ্ছে না। কিন্তু সে মেয়েটি প্রায় দু'বছর আমাদের বাড়ী ছিল, তাই একটা কৌতূহল, এই আর কি।

—আমি জানি হিমিকা আপনাদের বাড়ী থাকত। আস্তে আস্তে দেবেশ বলল। তার মুখ দেখে অনল বুঝল অন্যান্য ঘটনাও তার অজানা নয়।

—আপনার বাবার অমত, তাই বিয়ে হল না?

—বাবার মতামতে কিছু এসে যেত না। লক্ষ্মী—হিমিকাই রাজী হ'ল না। তা' ছাড়া আমি তার যোগ্যও নই।

—যোগ্য নন? আপনি নিশ্চয় জানেন—অনল থেমে গেল।

—আমি সব জানি।

—সব জেনেও ওকে বিয়ে করতে চাওয়া খুব মনের জোরের পরিচয় কিন্তু।

—আমার একটুও মনের জোর নেই। দেবেশের গলায় আবেগের সুর শুনল অনল।

—আমার মনের জোর থাকলে লক্ষ্মী আমাকে রুখতে পারত না। আমার কিছুমাত্র সাহস নেই। ও বাধা

দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে। না হ'লে হয়তো আমিই পালিয়ে আসতাম। দেবেশের গলা বন্ধ হয়ে এল। মুখ নত করল সে। অনল দেখল দেবেশের ভালবাসা। হিমিকাকে ভালবাসে দেবেশ। কিন্তু যে বীর্যবলে প্রেমিক নারীকে শত বিপদ হতে রক্ষা করে, সেই বীর্যশক্তি নেই দেবেশের। সাহস নেই বলেই বাপের নির্দেশ অমান্য করতে পারল না। শত দুঃখ অশান্তির, আবার বিচিত্র স্বর্গের ভালবাসাকে তাই বিদায় দিয়ে, শান্তি দিয়ে বানানো একটি জীবন, নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ জীবন বেছে নিল দেবেশ। ভালবাসাকে বিদায় দিয়েছে। কিন্তু ভালবাসা কি কখনো নিঃশেষে চলে যায়? নিরবচ্ছিন্ন একসুরে বাঁধা জীবনে যখন ক্লান্তি আসবে, একদিন জীবন-সায়াহ্নে যখন দৃষ্টি চলে যাবে অতীতের অন্ধকার ভেদ করে, কে জানে, তখন হয় তো এই পতিতা মেয়ের জন্য দূষিত ভালবাসাই অপরূপ হয়ে উঠবে।

দেবেশ চলে যেতেও অনেকক্ষণ সমস্ত কাজ ছেড়ে চুপ ক'রে বসে রইল অনল। ভালবাসা, প্রেম। প্রেমের কথা নিয়ে কত গান, কবিতা, রসভরা উপন্যাস তৈরী হচ্ছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথা, কাঞ্চনমালা-কাজলকুমারের বিরহ-মিলনের কাহিনী চেহারা বদলে বদলে দেখা দিচ্ছে যুগে যুগে। কিন্তু সত্যি বাস্তবকঠিন জীবনে কতটুকু মূল্য এর? ভালবাসা কি একটি ফুলের কলিও ফোটাতে পেরেছে, পেরেছে ক্ষুধার কষ্ট, দেহের যন্ত্রণা মুছে দিতে? তবে কি হবে ভালবাসা দিয়ে। বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে দেবেশ। নির্বিঘ্ন-নিশ্চিন্ত জীবন। কেবল কিছু টাকা থাকলেই সব সমস্যার সমাধান। টাকা! ভালবাসার চেয়ে অনেক বড় টাকা! টাকা দিয়ে মান, নিরাপত্তা—জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার সব হাতিয়ারগুলো কিনে নেওয়া যায়। অনলের উত্তরাধিকারসূত্রে সব পাওয়া আছে তাই ভালবাসার খেলায় নেমেছিল। আশ্রয়-আশ্বাসহীনা স্বৈরিণী নারীর মেয়ে হিমিকার সে সাহস নেই। সে বুঝেছিল কেবল ভালবাসার মূলধন নিয়ে কেউ কোনদিন বেশাতি করতে গেলে তার ভরাডুবি নিশ্চিত। ভালবাসা তো মহিমময়ীর পায়ে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে তবেই ধন্য হয়। শীতাংশু গিয়েছে কিন্তু অপরেশ তার বিদ্যা-বিত্ত-জীবন নিয়ে এসেছে অপর্ণার কাছে।

ভালবাসা। ভালবাসার জাতি গোত্র বংশ পরিচয় আছে। দেহজ কামনার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসবে না দেহাতীত প্রেম। আবার দেহকে বাদ দিয়ে প্রেমের কথা শোনে নি'ও কেউ কখনো। নিজেকে হঠাৎ শক্ত করে নাড়া দিল অনল। অনেকক্ষণ ভেবেছে ইনিয়ে-বিনিয়ে ভালবাসার কথা। আউটডোরে ভিড় জমেছে। রোগবীজাণু কঠিন প্রেমে আঁকড়ে ধরেছে মানুষের শরীর। ডাক্তারবাবু যখন প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মনস্তত্ত্বমূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করছিলেন তখন তারা আকুল চোখে সুইংডোরটার দিকে চেয়ে আছে। ছোট্ট ছোট্ট চোখের অদৃশ্য দেহে শত্রুগুলির অদ্ভুত লড়াই করবার ক্ষমতা। রক্তের স্রোতে মিশে, শরীরের কোষে কোষে—অস্থি মজ্জা শিরা উপশিরায় বাসা বেঁধে ওরা যুদ্ধ করে। নিরাপদ আশ্রয়ে বসে নিশ্চিন্ত প্রেমে শরীরকে এমন আঁকড়ে ধরে যে সেই দেহজ কামনার তাপে কাবু না হয়ে আর উপায় থাকে না মানুষের।

রোগী পরীক্ষা করতে, প্রেসক্রিপশন লিখতে বেলা একটা বেজে গেল। ব্যস্ততার শেষ নেই, তবু তারি মধ্যে আবার মনে হ'ল হিমিকাকে দেবেশ ভালবেসেছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।
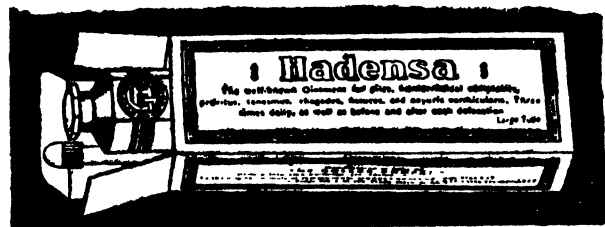
বিলাতের চিঠি

খ্রীস্টমাস পর্ব শেষ হয়েছে। ১৯৬৮ টা-টা—বাই-বাই করে '৬৯-কে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। শুরু হয়ে গেছে আর এক বছরের হিসাব-নিকাশের পালা। মধ্য জানুয়ারীর এক শীতের সন্ধ্যায় উত্তর ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট শহর থেকে আপনাদের এই চিঠি পাঠাচ্ছি। 'ফায়ার প্লেসে'র আগুনও এই প্রচণ্ড শীতকে যেন বাগে আনতে পারছে না। বাইরে প্রবলবেগে বইছে হাওয়া আর তার সঙ্গে বরফের কুচোর মত বৃষ্টি জানালার গায়ে এসে লাগছে। এত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্ত্বেও কিন্তু এবারে 'হোয়াইট খ্রীস্টমাস' হয় নি। এ দেশে এই 'হোয়াইট খ্রীস্টমাস' একটা খুব শুভ চিহ্ন, কিন্তু সব বছর হয় না। তবে ইংল্যাণ্ডের এই অঞ্চলে না হলেও ইয়র্কশায়ার-এর দিকে খ্রীস্টমাসের দিন সকালবেলা রাস্তাঘাট, বাড়ী ঘরদোরের আসল রূপ কিছু দেখা যায় নি, সব বরফে সাদা হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে খ্রীস্টমাসের দিন ইংল্যাণ্ডের যে-সকল অঞ্চল বরফে ঢাকা পড়ে যায়, সেখানেই বলা হয়—উই আর সেলিব্রেটিং এ হোয়াইট খ্রীস্টমাস।

যাই হোক, এবার সত্যিকারের খ্রীস্টমাসের কথায় চলে যাই।

আজ থেকে ২০ শতাব্দী পূর্বে জেরুজালেমের একটি আস্তাবলে যীশুর যখন জন্ম হয়েছিল, তখন কেউ কল্পনাও করে নি যে, এই শিশুটির জন্যই এই দিনটিতে একদিন সারা পৃথিবী উৎসবের আনন্দে মত্ত হয়ে উঠবে। যত দেশের যত জাতীয় উৎসব আছে, তার মধ্যে খ্রীস্টমাস অনুষ্ঠানই প্রথম স্থানের অধিকারী। যাতে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের অধিবাসীই কোনও না কোনও রকম ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আমাদের দেশে কলকাতায় খ্রীস্টমাস পালন করা হয় পার্ক স্ট্রিট, নিউ মার্কেট ও ইউরোপীয়ান বসতিবহুল বিশেষ কয়েকটি জায়গায়। সেই ক'টা দিন এইসব অঞ্চলে এসে দাঁড়ালে মনে হয়, আমরাও বুঝি ঐ ক'টা দিনের জন্য ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে সমান ভাবেই যীশুখ্রীস্টকে স্মরণ করার চেষ্টা করছি। শুধু তাই নয়, মনে পড়ে আমাদের ছোটবেলার দিনগুলিকে যেদিন আমরা ছোট ছেলেমেয়ের দল দুর্গাপূজার মত প্রায় সমান আগ্রহেই অপেক্ষা করতাম বড়দিনের জন্য। কিছুদিনের জন্য স্কুলের ছুটি, সার্কাস বা চিড়িয়াখানা, পিক্‌নিক্ আর বনভোজন, রাস্তায় রাস্তায় ফুটবল বা ক্রিকেটের টীম খোলা, বড়দিনের সন্ধ্যায় নিউমার্কেট আর পার্ক স্ট্রীটের আলো দেখা আর তার সঙ্গে অতিরিক্ত বড়দিনের কেক্‌-এর স্বাদও কিছু কম নয়।

ভারতী মুখোপাধ্যায়

ছোটবেলার সেই স্মৃতি বহন করে অপেক্ষা করেছিলাম—বিলাতের খ্রীস্টমাস্ দেখব বলে। সেইজন্য যদিও আমরা খৃস্টধর্মাবলম্বী নই, কিন্তু ২৫শে ডিসেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হয়েছিল—অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি এই দিনটির জন্যই।

প্রায় নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়, এদেশে খ্রীস্টমাসের তোড়জোড়। তবে লণ্ডনের মত বড় শহরে অবশ্য আরও আগে থেকেই সাজান শুরু হয়ে যায়। আমি যেখান থেকে লিখছি, সেই শহরটি কাম্বারল্যাণ্ডের অন্তর্গত। আইরীশ সমুদ্রের ধারে স্কটল্যাণ্ডের গা ঘেঁষে এর অবস্থিতি। এই উত্তর ইংল্যাণ্ডের কোন কোন স্থানে এবং স্কটল্যাণ্ডেরও কোন কোন জায়গায় খ্রীস্টমাস অনুষ্ঠানের চেয়ে নতুন বছরের অনুষ্ঠানই প্রধান স্থান অধিকার করে। খ্রীস্টমাসের আগের দিনকে বলা হয় 'খ্রীস্টমাস-ঈভ' এবং পরের দিন হল 'বক্সিং-ডে'।

'বক্সিং-ডে' বলতে পাঠক-পাঠিকারা যেন বুঝবেন না যে, সেদিন ইংল্যাণ্ডের শহরে শহরে বক্সিং প্রতিযোগিতা হয়—এদেশীয় একটি বৃদ্ধকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বক্সিং-ডে' বলতে আপনারা কী বোঝেন? তিনি বলেছিলেন—'টু কীপ সামথিং এ বক্স এ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউট ইট এ্যামং দি পুওর—দ্যাট ইজ কল্‌ড বক্সিং ডে'।

বহুলোককে জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও এর থেকে ভাল উত্তর আমি পাই নি। যাই হোক, এই তিনদিন দেশের সর্বত্র প্রায় ছুটি আর উৎসব।

এ দেশের বিশেষ কয়েকটি বিভাগীয় বিপণী-এর শাখা দেশের ছোট-বড় সব শহরেই আছে; যেমন 'উলওয়ার্থ মার্কস এ্যাণ্ড স্পেন্সার' এবং কেমিস্ট দোকানের মধ্যে 'বুটস' ও টিমোথী হোয়াইট। প্রায় এক মাস আগে থেকে এই দোকানগুলি এবং শহরের অন্যান্য দোকানগুলিও নিজেদের পুরানো পোষাক খুলে ফেলে নতুন পোষাকে সেজে ক্রেতাদের আহ্বান জানাতে থাকে। দোকানগুলির ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে খ্রীস্টমাস্ উপহার, বহু সুন্দর সুন্দর জিনিষ, প্যাকেটের আড়ালে উঁকি মারছে। তার মধ্যে বড়দের জন্য বেশীর ভাগ প্রসাধনদ্রব্য, বই, রেকর্ড বা গরম পোষাক। আর ছোটদের জন্য—সে যে কত রকমের খেলনার সরঞ্জাম, পুতুল বা অন্যান্য ধরণের খেলনা এবং ছোট ছোট ছড়া, গল্প এবং ছবির বই। তা ছাড়া দোকানের আরও একটি আকর্ষণীয় বস্তু—খ্রীস্টমাস্ কার্ড এবং নতুন বছরের কার্ড। বিভিন্ন দামের অর্থাৎ এদেশের মুদ্রায় তিন পেন্স থেকে প্রায় এক পাউণ্ড (ভারতীয়

চিত্রে সংবাদ

মাসিক বসুমতী

চৈত্র, ১৩৭৫

কৃষ্ণনগরের একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পথে ভোটার

বহুবাজার কেন্দ্রে ভোট দিতে যাচ্ছেন জনৈক অন্ধ নাগরিক পুত্রের হাত ধরে। এক রুগ্ন বৃদ্ধাকে কোলে করে ভোট দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

...প চিত্রগ্রহণরত জনৈক আলোকচিত্র-শিল্পী। তাঁর মাথায় ছাতা ধরে আছেন জনৈকা তরুণী

মাসিক বসুমতী
চৈত্র / '৭৫

মহাজাতি সদনে শ্রীসরস্বতী প্রেস প্রদত্ত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে ভাষণরত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর। পাশে রয়েছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র
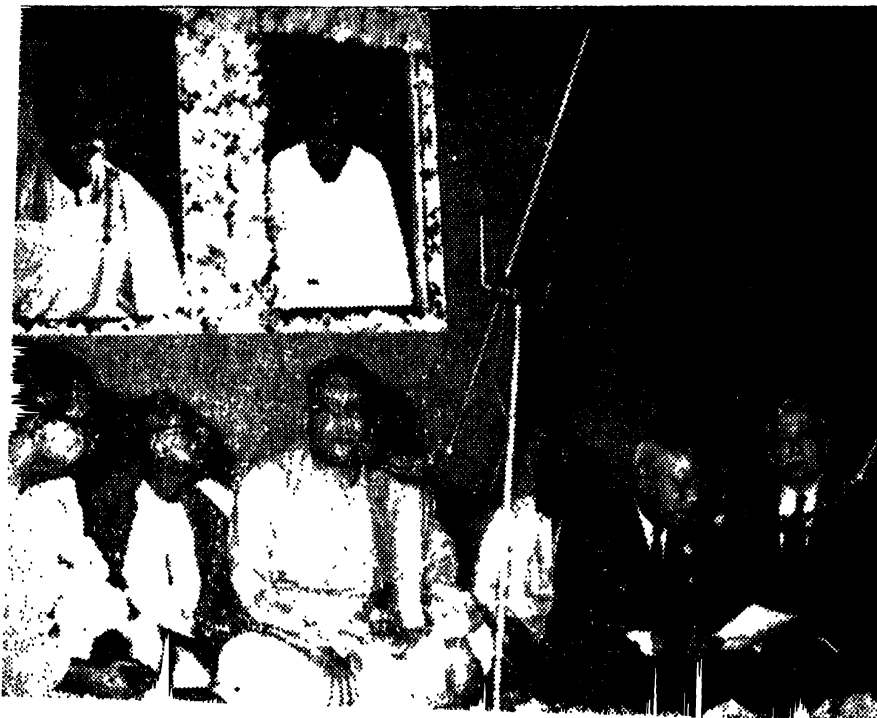
মাসিক

বসুমতী

চৈত্র / '৭৫

কাঁচড়াপাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ১০৫ বছরের বৃদ্ধাকে পাড়ার নাতি কোলে করে ভোট দিতে নিয়ে যাচ্ছেন

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে উল্লসিত জনতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে জনৈকা ছাত্রীকে অভিজ্ঞানপত্র দিচ্ছেন বিচারপতি শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীধরমবীর

করাচীর লিয়াকতবাদের আম্বাস বাজারটি জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়

মুদ্রা মানে প্রায় ১৮ টাকা) পর্যন্ত যে কোন রকমের অর্থাৎ আপনি যে ধরণের চান ঠিক সেই ধরণের কার্ড চোখের সামনে থরে থরে সাজান রয়েছে। ইচ্ছামত বেছে তুলে নিয়ে—দাম দিয়ে চলে আসুন। মা, বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী এইসব সাধারণ সম্পর্ক ছাড়াও 'গ্রিটিংস ফ্রম ফার এ্যাওয়ে' বা 'বেস্টিং এ্যাট খ্রীস্টমাস টু ইউ ইন হস্পিট্যাল' কিংবা 'খ্রীস্টমাস উইসেস টু ইউ এ্যাণ্ড ইওর নিউ হোম' ইত্যাদি সব নতুন ধরণের সুন্দর সুন্দর কার্ড। আরও রয়েছে ক্যালেণ্ডার—আমাদের দেশের পাতলা কাগজের ক্যালেণ্ডারের মত নয়। মোটা পিচ্‌বোর্ডের উপর সুন্দর দৃশ্য বা ধর্মীয় ছবিসহ ছোট ছোট ক্যালেণ্ডার। এদেশে খুব কম বাড়ীতেই দেখা যায়, দেওয়ালময় ক্যালেণ্ডার—'ড্রয়িং রুম' বা বসার ঘরে একটিমাত্র এই ধরণের ক্যালেণ্ডার এবং দটি, তিনটি হয়ত পারিবারিক ছবি।

দোকান-পাট সাজানর মধ্যে আরও দুটি বিশেষ জিনিষ আছে—টার্কি এবং খ্রীস্টমাসের সময় বাড়ী সাজানর জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি। খ্রীস্ট-মাসের দিন সকালে টার্কি (এক জাতীয় হাঁস-মুরগীর মাঝামাঝি পাখী) খাওয়া এদের খ্রীস্টমাস উৎসবের একটি অঙ্গ, তাই শুধু মাংসের দোকানেই যে বিভিন্ন আকারের টার্কি গায়ে দাম এঁটে বিক্রী হচ্ছে তাই নয়, বড় বড় 'ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস্'-এ ঢুকলেও দেখা যাবে, বিরাট বিরাট বাক্সে করে বড় বড় টার্কি পর পর সাজান।

টার্কির কথা ছেড়ে এবার একটু অন্যান্য জিনিষপত্রের দিকে নজর দেওয়া যাক। সাধারণত এরা বাড়ীতে খ্রীস্টমাস সজ্জার জন্য খ্রীস্টমাস বৃক্ষ (তা সত্যিকারের পাম্ গাছও হয়, আবার মাঝে মাঝে জরির গাছও হয়) লাল-নীল কাগজের মালা, ফানুস, ছোট ছোট পরীর মত দেখতে পুতুল, মোম্‌বাতী এবং পাতলা কাঁচের রঙ্গীন বল ব্যবহার করে। এইগুলি সাধারণত উলওয়ার্থেই বেশী বিক্রী হয়। উল-ওয়ার্থের 'এস্কালেটর্' বেয়ে দোতলায় উঠে গেলে দেখা যাবে এই ধরণের জিনিষপত্রের বিভাগ।

দোকানপাটের সম্বন্ধে আর একটি কথা—তা হল খ্রীস্টমাস কেক্ ও খ্রীস্টমাস্ পুডিং। টার্কির সঙ্গে এই দুটি জিনিষও এরা খ্রীস্টমাসের দিন খায়—সাধারণত নানা রকমের ফল এবং শেরী বা বিয়ার বা হুইস্কি দিয়ে এগুলি তৈরী হয়। যাঁরা বাড়ীতে এগুলি তৈরীর হাঙ্গামা পোয়াতে চান না, বিভিন্ন 'বেকারী সপে' ঢুকে ইচ্ছামত পছন্দ করে কিনে নেন্। কাঁচের সুন্দর শো-কেশের মধ্যে সাজান বিভিন্ন আকারের কেক্ ও পুডিংগুলি রাস্তা থেকে পথ-চারীদের দৃষ্টি জোর করেই যেন কেড়ে নেয়।

এইবার চলে আসা যাক্ এদের বাড়ীর মধ্যে। খ্রীস্টমাস্ উৎসব বিশেষ করে ছোটদের জন্য, তাই যে বাড়ীতে বাচ্চা নেই, সে বাড়ীতে খ্রীস্টমাস যেন আসতে চায় না। বাচ্চাদের প্রধান আকর্ষণ সাণ্টা ক্লস্। সাণ্টা ক্লস বলতে স্বাভাবিক একটা ধারণা সকলেরই আছে। এদেশের বাচ্চাদের মধ্যে প্রায় ৭ বছর পর্যন্ত সকলেই জানে যে, সাণ্টা ক্লস বলতে স্বপনবুড়ো জাতীয় এক ঝুলিঝাপ্পা পরা স্বপ্ন দেশের অধিবাসী—যে খ্রীস্টমাসের আগের দিন চুপিচুপি চিমনী দিয়ে নেমে এসে মাঝরাতে একটা মোজার মধ্যে বাচ্চা-দের জন্য উপহার রেখে যায়।

সম্প্রতি এদেশীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় পড়ছিলাম এক মায়ের সম্পাদিকাকে প্রশ্ন—বাচ্চাদের এই বিশ্বাস কী ভেঙ্গে দেওয়া উচিত না মিথ্যাকেই তাদের মনে সত্য বলে ঢোকান উচিত।

সম্পাদিকা স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি তবে মনে হল বাচ্চাদের এই ধারণা ইংল্যাণ্ডে বহু বৎসর ধরে চলে আসছে এবং তিনি ঐতিহ্যটাকে ঠিক ভাঙ্গতে চান না।

খ্রীস্টমাসের ঠিক এক মাস আগে থেকে মায়েরা খ্রীস্টমাস্ কেক্ এবং খ্রীস্টমাস্ পুডিং তৈরীতে ব্যস্ত হন আর শুরু হয় তাঁদের বাজার করা। আমাদের পূজার বাজারের মত 'খ্রীস্ট-মাস্ শপিং'। বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের জন্য কার্ড এবং উপহারসামগ্রী। আর বাড়ীর বাচ্চাদের জন্যও প্রয়োজনীয় জিনিষ। খ্রীস্ট-মাসের সাতদিন আগে তাঁরা সুন্দরভাবে বাড়ীর সবকিছু পরিষ্কার করে, বসার ঘরে খ্রীস্টমাস 'ট্রী'কে কেন্দ্র করে বেলুন, কাগজের মালা, কাঁচের বল এবং পুতুল দিয়ে ঘরটি সাজিয়ে ফেলেন। খ্রীস্টমাসের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাচ্চারা ছুটে আসে 'ড্রয়িং রুমে'—সাণ্টা ক্লস তাদের জন্য কী রেখে গেছে? বড়রাও সেইসময় তাদের মধ্যে উপহার দ্রব্য বিনিময় করেন। আমাদের দেশে দুর্গাপূজার মত সেই সময় বাড়ীর সকল সভ্য-সভ্যাই এক হবার চেষ্টা করেন। তারপর তাঁরা যান চার্চে—তবে সব পরিবার এটিকে আব-শ্যিক বলে নেন না। উল্লেখযোগ্য যে, ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ সেদিন তাঁর বাড়ীর সবাইকে নিয়ে গীর্জাতে যান প্রার্থনার জন্য।

এখানকার হাসপাতালের বড়দিন উৎসব দেখার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছিল। সেদিন সকালে উঠেই ন'টার সময় আমরা গেলাম হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে সিস্টার, নার্স এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের শুভ খ্রীস্টমাস জানাতে। হাসপাতালের প্রতিটি অংশ মালা, ফানুস, আলো আর খ্রীস্টমাস ট্রী দিয়ে চমৎকার ও পরিচ্ছন্নভাবে সাজান। বিশেষ করে প্রধান যে দরজা, সেখানে বিশাল এক খ্রীস্টমাস 'ট্রী' আলোয় আলোয় সেজে অতিথিদের অভিবাদন জানাচ্ছে। শহরের মেয়র ও তাঁর স্ত্রীও প্রায় আমা-দের সঙ্গেই এলেন সকলকে শুভ খ্রীস্ট-মাস জানাতে। সকল অসুস্থকে তাঁর তরফ থেকে কিছু উপহার ও ফল বণ্টন করা হল। সেদিন হাসপাতালে শেরী, হুইস্কি ও মার্টিনির বন্যা বইতে থাকে। বিজয়ার দিন সিদ্ধি খাওয়ার মত সেদিন এগুলির কোনও না কোনটি পান করতে

হয়। আমরাও সকলকে 'মেরী খ্রীস্টমাস' জানিয়ে গেলাম টার্কি কাটতে। ডাক্তার হিসাবে আমার স্বামীর হাতে সিস্টাররা ছুরি তুলে দিলেন টার্কি কাটার জন্য। সেই দিয়েই সেদিন সকলের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাধা হবে। বিরাট আকারের দুটি টার্কি সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল--আমরাও তার স্বাদ পেলাম। হাসপাতালের খ্রীস্টমাস পার্টি সেদিন হয় না, কারণ সেদিন নিজেদের বাড়ী ছেড়ে কেউ কোথাও যান না। সেটি হ'ল ৩রা জানুয়ারী। খ্রীস্টমাসের দিন রাত্রে বাড়ী না ছাড়ার বোধ হয় আরও একটি কারণ টেলিভিসান ঠাসা ভাল ভাল অনুষ্ঠান—রাণীও সেদিন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

এবার লণ্ডনের বড়দিন আর নতুন বছরের উৎসবের কিছু কথা বলে শেষ করব। যদিও আমরা লণ্ডন থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে থাকি কিন্তু ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত লণ্ডনে থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লণ্ডনে ৩১শে ডিসেম্বর বা ১লা জানুয়ারী কোন ছুটি নেই। জানুয়ারীর প্রথম দিনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে একমাত্র 'খ্রীস্টমাস ডেকরেশন' এবং 'খ্রীস্টমাস সেল' ছাড়া বোঝাই যাবে না যে, খ্রীস্টমাস সপ্তাহ চলছে। টিউব রেলে তেমনই ভিড়, ফুটপাথে তেমনই মানুষের ধাক্কা খেতে খেতে অফিস ছোটা।

নতুন বছরে লণ্ডনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ট্রাফালগার স্কোয়ারের খ্রীস্টমাস 'ট্রী' এবং ৩১শে ডিসেম্বর আর ১লা জানুয়ারীর সঙ্গমস্থল রাত ১২টার সময় সেইখানেই খ্রীস্টমাস 'ট্রী'র সামনে জনসাধারণের শুভ সম্মিলন। জগৎ-বিখ্যাত ট্রাফালগার স্কোয়ারে ৩১শে ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১১টায় যখন পৌঁছালাম সেই প্রচণ্ড জনসমাবেশ দেখে মনে হল অন্তত এদিক দিয়ে লণ্ডনকে ছুঁতে হলে কলকাতার সবক'টি সার্বজনীন পূজার দর্শক সংখ্যাকে অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে। বোধ হয় সারা লণ্ডন এখানে ভেঙ্গে পড়েছে।

যাই হোক, বহু দূর থেকেই আমাদের চোখে পড়ল ট্রাফালগার স্কোয়ার-এর খ্রীস্টমাস্ 'ট্রী' যেটা লণ্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বড় খ্রীস্টমাস 'ট্রী' আর যাকে আনা হয় নরউইচ থেকে।

কথিত আছে নরউইচ-এর এই বন থেকেই অর্থাৎ যেখান থেকে এটা আনা হয়েছে, যীশুকে বিদ্ধ করার জন্য কাঠ আনা হয়েছিল—খ্রীস্টমাস ট্রী অর্থাৎ পাম্ গাছের কাঠেই বিদ্ধ হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। বিগ বেন-এ রাত ১২টার ঘণ্টা ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তোপধ্বনি, আকাশে গ্যাস বেলুন ছেড়ে দেওয়া আর চুম্বন বিনিময়। সকলেই আনন্দে মত্ত হয়ে নাচছে, গান গাইছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন আর চুম্বন বিনিময় করছে। পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স সকলেই প্রস্তুত—প্রতি বছর অন্তত কয়েক শো লোক আহত হয়ে সেই রাত্রে হাসপাতালে ভর্তি হয় কিংবা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়।

সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দেখলাম অনাবৃত গাত্রে ছেলেরা আর মিনিস্কার্ট পরা মেয়েরা ফোয়ারার ধারে স্নান করছে, চারধারে জল ছেটাচ্ছে। আমাদের দেশে বিজয়ার সময় কোলাকুলি আর প্রণাম যেমন অবশ্য করণীয় তেমনই ১লা জানুয়ারী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রে এদেশে চুম্বন এমনই এক বস্তু যে, প্রায় কোলাকুলির মত যে যাকে পারে, তাকেই করে যায়।

জানি না এদেশের লোকেরা কী ভাবে এই জিনিষকে নিয়েছে। শুনেছি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর এইভাবে ট্রাফালগার স্কোয়ারে ইংরাজ জাতির এই যে সম্মিলন তার সামাজিক মূল্য কিছু আছে। কিন্তু আমাদের দেখে মনে হল এটা এক ধরণের সামাজিক অসুস্থতা। ট্রাফালগার স্কোয়ারে যুবক-যুবতী তরুণ-তরুণীদের কোলাহল, উন্মত্ততা আর অসংযম দেখে এই কথাই মনে আসে।

হাওয়া ট্যাক্সী

পরিবহন-সমস্যা আজ সর্বদেশেই কঠিনতর হতে চলেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান গতিশীলতার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না বিশ্বের পরিবহন সংস্থারা। ফলে নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে ক্রমশই—বিশেষ করে আমাদের দেশে।

কলিকাতার তো প্রায় নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম। প্রায় নিরালম্ব অবস্থায় ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে আমরা প্রত্যহ যাতায়াত করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছি প্রায়। নিত্য নূতন 'পরিকল্পনার' ঠেলায় নিশ্বাসও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

এমতাবস্থায় বেলজিয়ামের ব্রুসেল্স্ শহরের এক সংবাদে মনটা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সেখানে এক উৎসাহী সংস্থা—নাম "ব্রুসেল্স্ এয়ার-ওয়েস্"—"এয়ার ট্যাক্সী" চালাচ্ছেন। চারজন আরোহী বহনক্ষম হেলিকপ্টারের সাহায্যে "হাওয়া" গাড়ীকে সার্থক করে তুলেছে। এসব হেলিকপ্টার চারশো মাইল জুড়ে ঘণ্টায় ১৪৪ মাইল বেগে চারজন যাত্রী ও তাদের মালপত্র বহন করতে পারে, হেলিকপ্টারগুলি নিঃশব্দে চলে এবং খবরে বলছে, বেশ আরামপ্রদ।

এর মধ্যেই সারভে কার্যে, বন্দরে যাতায়াত ও পর্যবেক্ষণ কাযে এবং সাধারণ গতায়াতের জন্য এদের ব্যবহার বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে খবরে জানা যায়।

"হাওয়া ট্যাক্সী"র খবরে মনটা নেচে উঠছে—হায় রে। শেয়ালদা থেকে হাওড়া যেতে যে দেশে একঘণ্টা লাগাটা একরকম স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, পাঁচমিনিটের পথ যেতে যেখানে পাঁচ ঘণ্টা লাগা মোটেই অস্বাভাবিক নয়—সে দেশের লোক হয়ে আমরা মোটর গাড়ীকেই "হাওয়া গাড়ী" বলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই, হেলিকপ্টার তো 'দূর-অস্ত'।

প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী
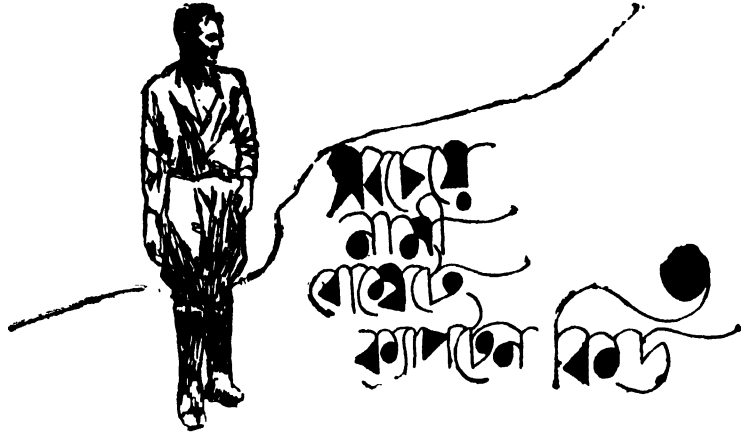
বোম্বেটেকুলের মধ্যে ক্যাপ্টেন কিডের মত এত কুখ্যাতির সঙ্গে এত নাম, বোধ হয়, আর কেউ অর্জন করতে পারে নি। কালক্রমে এত কিম্বদন্তী তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে, তা' আর গুণে শেষ করা যায় না। তার কিঞ্চিৎ আগে এবং পরে ছোট-বড়-মাঝারি নানা বোম্বেটেরা যে-সমস্ত অপকর্ম করেছিল, তার অনেকগুলোতে কিডের নামারোপ তো হয়েছেই আর সেই সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে তার লুঠ-করা অগাধ ঐশ্বর্যের কথা।

সে ঐশ্বর্যের যে পরিমাণ বলা হ'ত তা' দিয়ে, সম্ভবত তিনটে ভুবনই কিনে নেওয়া যেত। সারা পৃথিবী জুড়ে—সম্ভব ও অসম্ভব—নানা জায়গায় নাকি সেগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এই কিম্বদন্তী-গুলির ওপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে অল্প আয়াসে স্বর্ণার্জনের স্বপ্নদর্শী বহুলোক কল্পনার খোরাক পেয়েছে।

আসলে কিন্তু কিড সে রকম 'মেক্-দারের' পাইরেট ছিল না। তার আগের এবং পরের 'অবতার শ্রেণীর' বোম্বেটে-দের কর্মকলাপ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কিডের স্থান তাদের দু'ধাপ নিচে। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, ভাগ্যের ফেরে জলে নেমে ফেরেববাজি করতে গিয়ে কিড যদিও একজন তৃতীয় শ্রেণীর বোম্বেটে হ'তে পেরেছিল, তা'হলেও সুযোগ পেলে ও প্রাচ্যের কোন দেশের ডাঙায় নেমে সেই জিনিষই করতে পারলে হয়তো তার পক্ষেও একটা ছোটখাট রবার্ট ক্লাইভ হওয়া বোধ হয় অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু ভাগ্য নাকি সর্বত্র ফলে থাকে—অন্তত, স্থান-কাল এবং পাত্রের সমন্বয়ের প্রতিক্রিয়া একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে যাবে করছে; দিল্লীর সিংহাসনে আসীন রয়েছেন বাদশা আলমগীর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন সুরাটে আর মাদ্রাজে বেশ পাকাপোক্তভাবে আস্তানা করে বাংলা দেশে কলকাতা পত্তনের উদ্যোগ করছে। মোগল রাজত্ব তখনও জম-জমাট থাকলে কি হ'বে—ভারতবর্ষের যা' চিরকালের ক্রটি—তার নৌবাহিনী তখনও তেমন জবরদস্ত ছিল না। ফলে, পশ্চিমী পর্তুগীজ বোম্বেটেদের ভারত মহাসাগর ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি, ভাস্কো-ডা-গামার কিছু পর থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওলন্দাজ আর ফরাসীদের মতো ইংরেজ বোম্বেটেরাও কালক্রমে পর্তুগীজ হার্মাদ-দের অনুসরণ করতে ভুল করে নি।

কোম্পানীর বাণিজ্য বেশ রমরম করে চলেছে; সুরাট, মাদ্রাজ, বাংলা থেকে এ-দিশি মসলীন, রেশম, হাতির দাঁত, মহার্ঘ মশলাপাতি ভরা বাণিজ্য-তরীগুলি আফ্রিকা ঘুরে ইউরোপের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে। বোম্বেটেদেরও মহা সুযোগ—গণ্ডার মেরে ভাণ্ডার লুঠ করার; আর তার জন্যেই মাডা-গাস্কারে বোম্বেটেদের একটা বড় ঘাঁটি বসে গেল। বোম্বেটেদের কাছে জাত বেজাত বলে কিছু নেই; কাজেই যাত্রীবাহী মোগলাই জাহাজ থেকে শুরু করে ওলন্দাজ ফরাসী কোম্পানীর তো বটেই, এমন কি খোদ ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজও তাদের হাত থেকে রেহাই পেল না। ইংলণ্ডের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে তখন কোম্পানীর শুভানুধ্যায়ী অনেক সুতরাং সেখানে বেশ সোরগোল তুলতে কোম্পানীর কোন অসুবিধা হ'ল না। ফলে,—প্রায় জাতীয় দাবি উঠল সেখানে: যে করেই হোক এই বোম্বেটেদের উচ্ছেদ করতেই হ'বে, না হ'লে কোম্পানীর ধন মান যায় যায়।

ইংরেজদের একটি বড় গুণ রয়েছে—তারা তাদের স্বার্থের প্রয়োজনে যে কাজে হাত দেয়, তাকেই তারা মানব-জাতির সর্বজনের হিতার্থে করা হচ্ছে—এ রকম একটা রূপ দিয়ে নেয়। সেই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ঐ জলো বোম্বেটেরা যে সকলের পক্ষেই বিপজ্জ-নক এবং তাদের উচ্ছেদ যে বিশ্ব-মানবের হিতার্থে একান্ত প্রয়োজন এবং তা সম্পন্ন করতে হ'বে বিশ্বপ্রেমী ইংরেজদের—এ নিয়ে ইংলণ্ডের রাজনীতির মাথারা বেশ চেঁচামেচি শুরু করে দিল। হয় তো তাদের মনে পড়েছিল, ঐ ইংরেজ বোম্বেটেরাই পৃথিবীর অনেক জায়গায় ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েম করেছিল—সব জায়গায় তো আর তার বেনিয়ারা গিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে নি। তা হ'লেও তখনকার মতো সে কথা শিকেয়

তুলে রাখা হ'ল। তারা এ-কথাও ভুলে গেল যে, ঐসব বোম্বেটেদের লুঠ করা জিনিষপত্র বিক্রি করবার প্রধান ঘাঁটিই হ'ল তাদের উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ। সেখানে তাদের জাতভাইরাই সেই চোরাবাজারে মোটা লাভ করে ফেঁপে উঠছিল। ফ্লেচার নামে তখনকার নিউইয়র্কের এক গভর্নরই ছিল এইসব বোম্বেটেদের পৃষ্ঠপোষক। হয় তো, ইংলণ্ড থেকে দূরে গেলে ইংরেজরা, বিদেশে বিবেক টিবেক নাস্তি, এই ধরণের কোন আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রেখে চলত। যাই হোক, এই গোলমালের বাজারেই হ'ল ক্যাপ্টেন কিডের অভ্যুদয়। না—বোম্বেটে হিসাবে নয়, বোম্বেটে দমন করবার জন্য রাজার কমিশন পাওয়া বে-সরকারী নৌ-সেনাপতি হিসাবে।

উইলিয়াম কিড জন্মেছিল ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের গ্রীনকে। লেখা-পড়া মোটামুটি ভালোই শিখেছিল। তখনকার দিনে সরকারী নৌ-বাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে কিছুকিছু বে-সরকারী জাহাজও রাজার হয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বেড়াত। এইরকম এক বে-সরকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসাবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই করে, তাদের হারিয়ে দিয়ে কিড বেশ নাম করে ফেলেছিল। ১৬৯১ সালে আমেরিকার উপনিবেশের নিউইয়র্ক শহরে গিয়ে কিড সেখানে একটি ধনী বিধবার পাণিগ্রহণ করে। একটি বিরাট ম্যানসনের মালিক হয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল। হয় তো বাকি জীবনটা সুস্থ-স্বাভাবিকভাবেই কেটে যেত, কিন্তু কপালের লেখা খণ্ডাবে কে?

১৬৯৫ সাল নাগাদ ভারতের করমণ্ডল উপকূল থেকে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত সমস্ত সমুদ্র জুড়ে ওয়েক, আয়ারল্যাণ্ড, টিউ, মেজ প্রভৃতি স্বনাম-ধন্য জেঁদো ঠ্যাঙাড়েরা নিজের নিজের দলবল নিয়ে দলমাদল করে বেড়াতে শুরু করল তখন ইংলণ্ড বুঝল শুধু চেঁচামেচি করে কাজ হ'বে না; কিছু করা দরকার। বোম্বেটের পেট্রন নিউইয়র্কের গভর্নর সেই ফ্লেচার সাহেবকে সরিয়ে ফেলা হ'ল; তার জায়গায় গভর্নরের পদে আর্ল অব্ বেলমণ্টকে নিয়োগ করা হ'ল। এই বেলমণ্টই নিউইয়র্কে লাটসাহেবী করতে যাবার আগেই কিডের জন্য রাজার কাছ থেকে বোম্বেটেদের জাহাজ নষ্ট করে তাদের লুঠ করা মালপত্র বাজেয়াপ্ত করবার কমিশন আদায় করল ১৬৯৫ সালের ১১ই ডিসেম্বরে।

এর পর শুরু হ'ল তোড়জোড়। দুষ্টের দমন পুণ্যের কাজ সন্দেহ নেই; তবে ইংরেজদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সব জিনিসই তারা ব্যাবসাদারের চক্ষে দেখে থাকে। নেপোলিয়ান তাদের দোকানদারের জাত বলে মিথ্যে বলেন নি। একটা প্রাইভেট লিমিটেড ধরণের কোম্পানীর মতো খোলা হ'ল—তার অংশীদারেরা টাকা জুগিয়ে কিডের জাহাজ, কামান-বন্দুক ও অন্য সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবে। বোম্বেটেদের জাহাজ লুঠ করে যা পাওয়া যাবে, তার একটা প্রধান ভাগ রাজার নামে জমা হ'বে, বাকিটা ওয়ার্কিং পার্টনার হিসাবে কিড এবং অন্য অন্য শেয়ার হোল্ডার-দের মধ্যে অনুপাতে ভাগ হ'বে। এই হাতে হাতে সুফলদায়ী পুণ্য ব্যবসায়ে যারা এগিয়ে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল, হুইগ্ দলের।

'এ্যাডভেঞ্চার গ্যালি' নামের একটি জাহাজে চৌত্রিশটি কামান বসিয়ে সাজিয়ে নেওয়া হ'ল। কিড বেছে বেছে এমন সমস্ত লস্কর জোগাড় করল, যাদের সঙ্গে ম্যাডাগাস্কার অঞ্চলের কোন সম্পর্ক নেই। ওখানেই তো বোম্বেটেদের হেড কোয়ার্টার। সুতরাং সরষের ভেতর ভূতের মতো তাদেরই কেউ কেউ যদি ভোল পালটিয়ে ঐ জাহাজে আস্তানা নেয় তবে তো চিত্তির!

অনুষ্ঠানের তো কোন ত্রুটি হ'ল না, তবে ঐ এক কথা—ভবিতব্য। তাকে ঠেকাতে হ'লে যে কঠোর ব্যক্তিত্ব দরকার, সেখানেই সন্দেহ রয়ে গেল। বস্তুত তখনকার দিনে বে-সরকারী নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন অর্থাৎ প্রাইভেটিয়ারদের সঙ্গে নাম লেখানো বোম্বেটে-দের তফাৎ খুব বেশি ছিল না। একদল লুঠতরাজ করত নিজের দেশের রাজার নামে। অন্য দল সে ভণিতাটুকু না-করে সোজাসুজি লুঠ করত নিজেদের নামে। আর কিড তো প্রাইভেটিয়ার হিসাবেই কর্মজীবন শুরু করে বেশ নাম করে ফেলেছিল।

ঘটনা বাঁকা পথ ধরল প্রায় যাত্রার শুরু থেকেই। ইংলণ্ড থেকে জাহাজ ছেড়ে কিছুদূর এগুতেই দেখা হয়ে গেল খোদ রাজকীয় রণতরী এইচ এম এস ডাচেসের সঙ্গে। তখনকার দিনে এখন-কার মতো নিয়মকানুন মেনে নৌ-সেনা জোগাড় করা সব সময়ে হ'ত না। যতো সব বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো, বেপরোয়া, যমের অরুচি লোকেদের ঘরে ঘরে জোর করে ন্যাভির লস্করের কাজে ভর্তি করে নেওয়া হ'ত। দরকার পড়লে প্রাইভেটিয়ারদের জাহাজ থেকে বেছে বেছে সমর্থ জোয়ান লস্করদেরও জোর করে নিয়ে নেওয়া হ'ত খেয়ালখুশি মতে

ডাচেসের ক্যাপ্টেনের লোকের দরকার ছিল সুতরাং ক্যাপ্টেন সাহেব কতকগুলি অবাঞ্ছিত লোকের বিনিময়ে জোর করে কিডের জাহাজের অনেকগুলি ভালো ভালো লস্করকে রিকুইজিশন করে নিল। বদলিতে কিড যাদের পেল তারা প্রচ্ছন্ন বোম্বেটে ছাড়া আর কিছুই নয়। তা না হ'লে সেকালের নৌবাহিনীতেও তাদের জায়গা হ'ল না। এর ওপর ম্যাডাগাস্কারের পথে জাহাজে লাগল কলেরার মড়ক—তিন ভাগের এক ভাগ লোক তাতেই সাফ হয়ে গেল।

এই অবস্থায় নড়বড় করতে করতে কোনরকমে ম্যাডাগাস্কারে পৌঁছে দেখা গেল—কোন বোম্বেটেই সেখানে ধরা দেবার জন্য বসে নেই। সবাই আপন আপন শিকারের ধান্দায় সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছে। অগত্যা সেই ম্যাডা-গাস্কার থেকেই আরও কিছু লোকজন জোগাড় করে সেখান থেকে করমণ্ডলের

উপকূল পর্যন্ত তাদের জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু করতে হ'ল। দিনের পর দিন কেটে গেল কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা'।

গোলমাল শুরু হয়ে গেল কিডের জাহাজেই। ইংলণ্ড থেকে শুরু করে ম্যাডাগাস্কার পর্যন্ত ছত্রিশ জায়গার যত আজেবাজে লস্করে জাহাজ বোঝাই হয়েইছিল, তা ছাড়া যারা সেই জাহাজে কাজকর্ম নিয়ে এসেছিল তারা তো কেবল প্রভু যীশুর নামগান করতে আসে নি—কথা ছিল, বোম্বেটেদের জাহাজ লুঠ করা হ'লে সেই লুঠের মালের কিছু কিছু ভাগ সকলেই পাবে। কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজের পাত্তাই নেই অথচ মাঝে মাঝে সামনে দিয়ে অন্য অন্য ভরা বাণিজ্যতরী চলে যাচ্ছে। বোম্বেটেদের জাহাজ যদি নাই পাওয়া যায় তাহলে কী শুধু-হাতেই ঘরে ফিরতে হবে? বেশ গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

গুঞ্জন বাড়তে বাড়তে শেষে ফেটে পড়ল একদিন। জাহাজের গানার উইলিয়াম মুরের সঙ্গে হঠাৎ একদিন জাহাজের ডেকে কিডের কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। মুরের কথাগুলো বেশ বাঁকা আর কড়া কড়া ধরণের হ'তে শুরু করতে কিডের মনে এলো সেই ভীষণ রাগ যাতে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে দেয়; হাতের কাছে ছিল কাঠের একটা বালতি, সেটাকে সজোরে মুরের মাথায় ছুঁড়ে মারল কিড। মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে দু'ফাঁক হয়ে ফেটে গিয়ে হতচেতন হয়ে মুর পড়ে গেল। জান বেশ কড়া ছিল বলেই একদিন যুঝে পরদিন মুর মারা গেল। এই ঘটনাটি কিডের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এই হত্যা যখন কিডকে সোজাসুজি হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করল তখনই কিড বুঝল যে, প্রাইভেটিয়ারের সূক্ষ্ম সীমারেখা পার করে ঠ্যাঙাড়ের এক্তিয়ারে নিজের জীবনকে সে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

সুতরাং আর বেছে নেওয়ার প্রশ্ন রইল না। কিড ঠিক করল, যা'বাহান্ন তাই তিপ্পান্ন—একটার জায়গায় দশটা খুন করলে আর হবে কী? ধরা পড়লে শাস্তি সেই একই বরং লুঠের জন্য খুন করলে আর যাই হোক টাকার অভাব থাকবে না। কথিত আছে, এই সময়ে সে একদিন এক নির্জন স্থানে জাহাজ থেকে নেমে তার বাইবেল-খানা মাটিতে কবর দিয়ে ছিল। সে-যুগের ইংরেজরা কিন্তু বাইবেল হাতে করে প্রাচ্যের দেশ লুঠ করতে দ্বিধা করত না। ধর্ম নিয়ে সে-ভণ্ডামীটুকু অন্তত কিডের ছিল না।

এর পর আরম্ভ হয়ে গেল বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিডের অভিযান। ছোটখাট জাহাজ লুঠ করা শুরু হয়ে গেল—একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে। প্রথম বড় মেকদারের বলি হ'ল 'কীদাঘ মার্চেণ্ট' নামে একটি জাহাজ। করমণ্ডলের উপকূল থেকে মাল নিয়ে যাচ্ছিল ইউরোপের দিকে; এর ক্যাপ্টেন যদিও ছিল জাতে ইংরেজ কিন্তু জাহাজটির ছাড়পত্র ছিল ফরাসী সরকারের। তখনকার দিনে সব জাহাজই কোন-না-কোন সরকারের ছাড়পত্র নিয়ে সমুদ্রে ভাসত। এই ছাড়পত্রটিই কিডকে জাহাজটি আক্রমণ করে লুঠ করতে উদ্বুদ্ধ করল। সেই সময়ে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের বনিবনা চলছিল না, সুতরাং কিড মনে করল ফরাসী ছাড়পত্রওয়ালা জাহাজ লুঠ করলে হয়তো ইংরেজী আইনে কোন পাপ হবে না। লুঠ করা জাহাজ বেশ বড়সড় ছিল বলে কিড তার নিজের জাহাজটি বদলে ঐ জাহাজটিতেই তার আস্তানা করল। এর পর কোথায় রইল বোম্বেটেদের শায়েস্তা করার ব্যাপার, কোথায় রইল কী। একের পর এক জাহাজ লুঠ করতে শুরু করল কিড—সারা সমুদ্র জুড়ে এবং অচিরেই ক্যাপ্টেন কিড নামটি ও-অঞ্চলে এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল। নানা অপকর্ম বীভৎস খুনখারাপি, এর পর থেকে কিছুই আর বাদ গেল না।

ওদিকে খবর সমস্তই ইংলণ্ডে গিয়ে হাজির হ'তে লাগল। টোরিরা নাক বেঁকিয়ে বলতে শুরু করল, এ তো জানা কথাই—হুইগদের ব্যাপার যখন, এইরকমই তো হ'বে। টোরিদের সঙ্গে হুইগদের ঝগড়া ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের বড় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে, কিডের ব্যাপারে হুইগদের প্যাঁচে ফেলবার জন্য টোরিদের এই আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠল। হুইগরাও নিজের মান বাঁচাতে সেই আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হ'ল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুপারিশে কিডকে জলদস্যু বলে ঘোষণা করে তাকে দমনের জন্য রাজ-অনুজ্ঞা প্রচারিত হ'ল।

ঘুরতে ঘুরতে এ্যাঙ্গুইলা দ্বীপে এসে কিড সমস্ত খবরই পেল; এও জানল যে, তাকে ধরবার জন্য রাজার নৌবাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিড সটান সেখান থেকে হিস্‌প্যানিওলায় এসে তার লুঠ করা জাহাজটি ছেড়ে দিয়ে লুঠের মালের বেশ কিছু সেখানে বোল্টন নামে এক ব্যাপারীর কাছে গচ্ছিত রেখে এ্যাণ্টনিও নামের একটি জাহাজ কিনে তাতে চড়ে ডেলাওয়ার উপসাগরে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখান থেকে একখানি পত্রে নিউইয়র্কের গভর্ণর—তার পুরনো বন্ধু বেলমণ্টকে সমস্ত ঘটনা খুলে লিখল। হয়তো মনে আশা ছিল যে, তার 'শুভানুধ্যায়ী' তাকে এই ফ্যাসাদ থেকে তরিয়ে দিতে পারবে। পাশার চাল উল্টে পড়ে হালচাল যে কতখানি পাল্টে গেছে, তা' বেচারা কিড বুঝতে পারে নি। তার লুঠ করা জাহাজ 'কীদাঘ মার্চেণ্ট' ফরাসী ছাড়পত্রওয়ালা জাহাজ। যে সমস্ত কাগজপত্র তার কাছেই ছিল সুতরাং কিড ভাবল ওপরে বন্ধুবান্ধব থাকলে আইনের ঘোরপ্যাঁচ দেখিয়ে বেরিয়ে আসা হয়তো অসম্ভব হ'বে না। এইভাবে আইনসিদ্ধ হওয়াটাই ছিল কিডের বাসনা। টাকাকড়ি তো অনেক জমে গেছে এর পর ভদ্রলোকের মত্রো দেশের গণ্যমান্য হয়ে বাকি জীবনটা কাটানোই উচিত—তা না হ'লে টাকাকড়ির সার্থকতা কী? কিন্তু কিড জানতো না—তার, সম্বন্ধে কী প্রচার

হয়েছে। তার কোন অপকর্মের কথা তো গোপন নেই-ই, বরঞ্চ আরও অনেক সম্ভব ও অসম্ভব অপরাধের বোঝাও তার ঘাড়েই চাপানো হয়েছে।

ঝানু রাজনীতিক হ'তে হ'লে যে-সব প্যাঁচ ও চোখ উল্টানো ব্যাপার জানা থাকা প্রয়োজন, বেলমণ্টের তা অজানা ছিল না। ফলে যা' হ'বার তাই হ'ল। ডেলওয়ার উপসাগরের বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে বন্দরে নামা-মাত্র কিড্‌কে বন্দী করে প্রথমে পোরা হ'ল বোস্টন জেলে—সেখানে তার সমস্ত কাগজপত্র এমন কী তার লুঠকরা প্রথম বড় জাহাজের ফরাসী সরকার প্রদত্ত ছাড়পত্র—যা'র ওপর কিডের বড় ভরসা ছিল—সব বাজেয়াপ্ত করা হ'ল।

বেলমণ্ট ঝানু লোক—কিডকে আইনের ফাঁকে বাঁচতে দিলে তার নিজের বা তার দলের দিক দিয়ে যে কী অসুবিধা, তা তো তার জানতে বাকি ছিল না। দাবাখেলায় দরকার পড়লে যে-কোন ঘুঁটি বলি দিয়েও খেলা বাঁচাতে হয়। অতএব, কিড্‌কে শিকল দিয়ে বেঁধে জাহাজে করে লণ্ডনে পাচার করা হ'ল।

সালটা হ'ল ১৭০০।

সেখানে পৌঁছেও দীর্ঘদিন টানা-পোড়েন চলল। টোরিরাও দাবার ঐ ঘুঁটিটার ওপর চাল মারতে চাইল—কিডের কাছে তাদের প্রস্তাব এলো যদি সে তার সমস্ত কাজকর্মের জন্য হুইগদের দায়ী করে তা হ'লে তারা তার পক্ষ নিয়ে দেখতে পারে।

কিড্‌ও বহুদিন রাজনীতিদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছে—কাজেই তার জমাদেওয়া কাগজপত্রের ওপর ভরসা ছেড়ে সে অনিশ্চিত অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল না। সোজাসুজি টোরিদের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করল। তখন কি বেচারা জানতো যে, তার কাগজপত্রের হদিস আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। দীর্ঘদিন ধরে আদালতে মামলা চলবার সময়েও সে-সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া গেল না—বেলমণ্ট দারুণ হুঁসিয়ার ব্যক্তি। খুন এবং পাঁচটি লুঠের অভি-যোগে, ১৭০১ সালের মে মাসের প্রথম দিকে, দোষী সাব্যস্ত করে আদালত তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল।

কিডের জীবনের শেষদিন হচ্ছে ১৭০১ সালের ২৩শে মে। সেইদিন তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হ'ল। পেছনে পেছনে এলো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মুখরিত আনন্দোচ্ছল এক বিরাট জনতা—কিডের ফাঁসি দেখবে বলে। ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে পায়ের তলার অবলম্বন সরিয়ে নেওয়া হ'ল। সেখানেও হ'ল কিডের রেকর্ড—ফাঁসির দড়ি গেল ছিঁড়ে। আবার তাকে তুলে ধরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল—এবার আর দড়ি ছিঁড়ল না।

তারপর দীর্ঘদিন ধরে তার মৃত-দেহের গলায় দড়ি বেঁধে টিলবেরি ডকের কাছে একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখা হ'ল, সমস্ত ইংরেজ নাবিকদের বুঝিয়ে দিতে যে জল-ডাকাতদের কী হাল হয়।

কিড লুঠ করেছিল ইংরেজী বে-আইনে; কিন্তু ইতিহাস বলে যে, এর পরেও ইংরেজী আইন মোতাবেক ইংরেজদের কয়েকশ' বছর ধরে প্রাচ্যের দেশগুলি লুঠ করতে বাধে নি। ইম্পীচ্-মেণ্ট বা ঐ ধরণের কতকগুলো বেয়াড়া ব্যাপার কখনও-সখনও ঘটলেও তাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় নি।

বিচিত্র শখ

বিপুলা পৃথিবীতে কত বিচিত্র নরনারী, কত তাদের বিচিত্র ধ্যান-ধারণা, কত বিভিন্ন তাদের শখ-সাধ। কেউ বা ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন, কেউ বা পুরানো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, কেউ বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিঠিপত্র, কেউ দেশলাইয়ের বাক্স,—কত কি!

পশ্চিম জার্মানীর ডর্টমুণ্ড শহরের অধিবাসী সত্তর বৎসর বয়স্ক অটো আর্নষ্ট স্কুলজ্-এর শখ অভিনব। তিনিও সংগ্রাহক, তবে পুরাতন কারেন্সী নোটের। যেখান থেকে হোক, প্রাচীন কারেন্সী নোটের সন্ধান পেলেই তিনি ছোটেন সংগ্রহের তাগিদে।

এই ভদ্রলোকের সংগ্রহশালায় আছে ৪৫,০০০ কারেন্সী নোট। তন্মধ্যে সবচাইতে পুরাতন হ'ল ১৭৬৬ সালে ছাপা সুইডেন-এর নোট।

অবশ্য, কিছুটা স্বাভাবিক কারণেই ইনি প্রাচীন মুদ্রাও সংগ্রহ করেন।

গত ২৮ বছর ধরে বৃদ্ধ অটো সংগ্রহে ব্যস্ত। তাঁর বিচিত্র সংগ্রহের মধ্যে আছে ১৪,০০০ মুদ্রা এবং ১২০০ মেডেল।

পৃথিবীর সর্বত্র থেকে এঁর সংগ্রহ চলে।

যে বিপুল ঐশ্বর্য অটো তাঁর সং-গ্রহে রেখেছেন, তা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। এত টাকা নিস্ফলভাবে কাচের আধারে জমে আছে।

অবশ্য, যার টাকা সে যদি তা এইভাবে ওড়ায়, আমাদের কি বলবার থাকতে পারে?

মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করে—এত টাকা।

চব্বিশ পরগণা

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বাংলার চেয়ে চব্বিশ পরগণা যে নতুন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বেশ কয়েক হাজার বছর আগে বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল। করোতোয়া, মহানন্দা, ত্রিস্রোতা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে মৃত্তিকারাশি সমুদ্র-গর্ভে পড়ে কতকগুলি চরের সৃষ্টি করে। এইসব চর বহুদিন ধরে পড়ে থেকে থেকে শেষে মানুষের বসবাসের উপযোগী হয়। গঙ্গার ব-দ্বীপে যে-রকম করে আজও চর সৃষ্টি হচ্ছে, আগেও সেইরকম চর সৃষ্টি হত। মানুষের বাসের উপযোগী হবার পর এই স্থানে চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলাগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এই জেলাগুলির গঠনের সময় অনেকগুলি দ্বীপ ছিল। যশোর, খুলনা, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা এরূপ দ্বীপসমষ্টি ছিল।

চব্বিশ পরগণা নতুন হলেও সভ্যতার ঐতিহ্য বড় কম ছিল না। তখন নানা স্থানে বৌদ্ধদের বিহার ছিল। বিহারে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞা-পারমিতা আলোচনা করতেন, ধর্মপ্রচার করতেন। চব্বিশ পরগণার হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা এখন নগণ্য স্থান, কিন্তু সে সময় এই দুই স্থানে বৌদ্ধদের বড় বড় বিহার ছিল। বিহারে বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধগণ এসে ধর্মালোচনা করতেন। যখন তমলুক বন্দর লোপ পেল, তখন পিছলদা ও ছত্রভোগ সমুদ্র-যাত্রিগণের প্রধান বন্দর বলে খ্যাত হয়েছিল। গঙ্গার ধারে ধারে যেসব গণ্ডগ্রাম ছিল, সেগুলিতে ধর্ম ও সাহিত্যানুশীলন বিশেষভাবে হত। খড়দহ গ্রাম বহু দিন থেকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের প্রধান সমাজ ছিল। মাই-নগর ও জাগুলেতে কায়স্থদের বড় বড় সমাজ ছিল। কুমারহট্ট, ভট্টপল্লী বিদ্যাচর্চার একটা প্রধান স্থান ছিল। চৈতন্যদেবের বৃদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীর নিবাস কুমারহট্ট। পানিহাটির রাঘব পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের একজন প্রধান ভক্ত। বরাহনগরের ভাগবতাচার্য 'ভাগবতের' সরস ব্যাখ্যা করেছিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী'। গৌরাঙ্গ সহচর কবি পরমানন্দের জন্মভূমি কাঁচড়াপাড়া।

ইতিহাস

গঙ্গা যেখানে সাগরে পড়েছে তার নিকটবর্তী ভূভাগের কথা মহাভারতে, রঘুবংশে ও কতকগুলি পুরাণে পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম-বঙ্গে সুহ্মরাজগণের ও পূর্ববঙ্গের বঙ্গরাজগণের রাজ্যের মধ্যস্থলে এই

দক্ষিণদারের প্রতিমূর্তি

ভূভাগ বর্তমান ছিল। 'রঘুবংশের' সময়ে এই অঞ্চলগুলি দ্বীপসমন্বিত ছিল। আর দ্বীপগুলো বঙ্গরাজার অধীন ছিল। রঘুবংশে উল্লিখিত আছে যে, রাজা রঘু মন।

এ ছাড়া বিভিন্ন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে দক্ষিণবঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমান লোকদের ঐতিহাসিক গ্রন্থ, বিদেশী ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ীদের লিখিত বিবরণগ্রন্থ, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী প্রভৃতি বই থেকে সুন্দরবনের বা দক্ষিণ বাঙলার ক্রমোন্নতিলাভের কথা জানতে পারা যায়। এই সকল বিবরণ থেকে জানা যায়—সুন্দরবন বা বাঙলার দক্ষিণভাগ চিরকাল জনমানবহীন ছিল না। মাঝে মাঝে এখানে লোকের বাসভূমি গড়ে উঠত, আবার কোনও কারণে ধ্বংস হয়ে জঙ্গলে পরিণত হত।

এর পর বহুদিন পর্যন্ত এই স্থানের কথা জানতে পারা যায় নি। চারশ' বছর আগে চব্বিশ পরগণাকে বুড়ুনিয়া দেশ বলা হ'ত, কেননা বর্ষাকালে এই দেশের অধিকাংশ জলে ডুবে থাকত। ১৫শ' শতাব্দীর শেষভাগে বিপ্রদাস নামে এক কবি চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা সম্বন্ধে একখানা কাব্য লেখেন। তাতে তিনি ভাটপাড়া থেকে বারুইপুর পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরবর্তী গ্রামগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—চাঁদ পূর্বদিকে আড়িয়া-দহ ও পশ্চিমদিকে ঘুসুড়ির পাশ দিয়ে যান এবং পূর্বকূল দিয়ে যেতে যেতে কলকাতা অতিক্রম করে আদিগঙ্গার মধ্যে দিয়ে সাগরের দিকে যান।

বাঙলাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপ-সাগরের তীরে সুন্দরবন অতি ভয়ানক স্থান, জনবিরল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন—অতীত বা প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে এমন কি বাঙলাদেশে হিন্দু রাজা পাল, সেন-বংশীয়দের অধিকারকালে এই অঞ্চল এরূপ ভয়াবহ ছিল না। বঙ্গোপসাগর-কূলের বহু অঞ্চল আদিযুগে অস্ট্রিক, দ্রবিড় প্রভৃতি আর্যেতর জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। পরবর্তীকালে এই আর্যেতর জাতিরা এই স্থান ত্যাগ করে কিংবা অপর বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়।

সর্পদেবী মনসা

এই সুন্দরবন ভূখণ্ডের উত্তরসীমা ২৪পরগণা ও বর্তমান পাকিস্তানের খুলনা ও বাখরগঞ্জ এবং পূর্বসীমা হুগলীনদীর পতনস্থল; দক্ষিণসীমা বঙ্গোপসাগর। মোটকথা চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ এই তিনটি জেলার অধিকাংশস্থ ন জুড়ে অর্থাৎ হুগলী নদী ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী নিম্নবঙ্গের ১৮০ মাইল দীর্ঘ ও ৬০ থেকে ৮০ মাইল প্রস্থ অঞ্চল সুন্দরবন। সমগ্র আয়তন প্রায় ১৪ হাজার বর্গমাইল। এটা অবশ্য অবিভক্ত বাঙলার সময়ে।

এর পর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর সুন্দরবন খুলনা ও রাখবগঞ্জ জেলার সমুদয় অংশ পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায়।

এখন ভারতের সুন্দরবন বলতে চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার মধ্যে কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর, জয়নগর, ক্যানিং, হাড়োয়া, হাসনাবাদ ও সন্দেশখালির লাট অঞ্চলকে বোঝায়।

এর পশ্চিম সীমা—কাকদ্বীপ থেকে সাগরদ্বীপ। পূর্ব সীমা—হাসনাবাদ থেকে সন্দেশখালি থানার দক্ষিণ সীমা সমুদ্র পর্যন্ত। উত্তর—হাড়োয়া খানা থেকে ইছামতী পর্যন্ত। দক্ষিণ—হুগলী নদীর মোহনা থেকে হাঁড়িয়াভাঙ্গানদীর মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রতীর।

সুন্দরবনে সুন্দরীগাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সেই জন্য কেউ কেউ বলেন—সুন্দরীগাছ থেকে সুন্দরবন; সুন্দর অর্থ সিঁদুর বলে। কারণ সুন্দরীগাছ কালো। এ ছাড়া এখানে আছে বাইন গাছ, পশুর, ধোন্দল, কেওড়া, গরান, গেঁয়ো, গর্জন, হেন্তাল, বনঝাউ, গাব প্রভৃতি। ভূখণ্ডের দক্ষিণ সীমায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা কেঁদো বাঘ, গণ্ডার, সাপ, কুমীর, বনবরাহ, বয়ার বা বনমহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। উত্তরাংশে কিছু কিছু আবাদ হয়। খাঁ জাহান নামে এক মুসলমান সামন্ত ১৫ শতকের মাঝামাঝি এই বনে সর্বপ্রথম আবাদ করেন। তার পর ১৭৮৪ খৃঃ জজ হেলকেল সাহেব বর্তমান পদ্ধতিতে আবাদ করার প্রথা প্রচলিত করেন। এই ভূখণ্ডটি জলপথ বেষ্টিত ছোট ছোট দ্বীপে বিভক্ত। এখানের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য চাল, কাঠ, মধু ও মোম।

১৬শ' শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সুন্দরবন যে ইতিহাসে স্থানলাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। পাঠান রাজত্বকালে দক্ষিণে সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপের পার্শ্ববর্তী ভূভাগ নামেমাত্র দিল্লীর অধীনে ছিল, প্রকৃতপক্ষে তখন ইহা বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের অধীনে ছিল।

১৬শ' শতাব্দীর মাঝামাঝি মোগল-পাঠানের যুদ্ধের সময় চব্বিশ পরগণায় কোন হাঙ্গামা হয় নি। সেই সময় পাঠান সুলতান দায়ুদের প্রধান কর্মচারী বিক্রমাদিত্য গৌড় হতে পালিয়ে নিজের জায়গীরে এসে উপস্থিত হল। তাঁর জায়গীর যমুনা নদী থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমস্ত চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনায় কিয়দংশ এই জায়গীরের অধীন ছিল। বিক্রমাদিত্যের জীবিতকালে চব্বিশ পরগণা শান্তিতে ছিল। বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য রায় মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের অংশ চাঁচড়ার রাজাদের দিয়ে যান। তখন তাঁদের নাম হয় 'চব্বিশ পরগণার রাজা'। ক্রমে ক্রমে অনেক পরগণা তাঁদের হাত থেকে চলে যায়। প্রতাপাদিত্যের সময় নৈহাটি তাঁর গঙ্গাবাস হয়। খুলনা জেলার কালীগঞ্জ গ্রামটিকে কেউ কেউ তাঁর রাজধানী বলেন। আবার কেহ কেহ বলেন সাগরদ্বীপ তাঁর রাজধানী। অবুলফজল কর্তৃক আইন-ই-অক্‌বরী আক্‌বরের রাজত্বকালে রচিত হয়। এই গ্রন্থে কলকাতার উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। খাজনা আদায় করার জন্য এক-একটা স্থানকে কেন্দ্র করে তার চারদিকের জায়গাগুলিকে একটি বিভাগে পরিণত করা হ'ত। সেই বিভাগগুলিকে 'সরকার' বলা হত। সেই সময় চব্বিশ পরগণা সাতগাঁও সরকারের অধীন ছিল (গ্র্যাণ্ট অ্যানালাইসিস অব দি বেঙ্গল ফাইন্যান্সেস)।

এই জেলায় যে সমস্ত ইউরোপীয় বাণিজ্য করতে এসেছিল—তাদের মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম। তারা যেমন বাণিজ্য করত, তেমনি দস্যুবৃত্তিও করত। বিদ্যাধরী নদীর তীরে তারদহ অঞ্চল তারা অধিকার করে ছিল। ওলন্দাজগণ শুকরের মাংস লবণাক্ত করবার জন্যে বরাহনগরে এক কারখানা করেছিল। প্রতি বছর তারা প্রায় তিন হাজার শুকর বধ করে মাং

লবণাক্ত করে বিদেশে চালান দিত। এই স্থানটি বাফ্‌তা কাপড়ের জন্যও বিখ্যাত ছিল। বাফ্‌তা কাপড়ের কারখানাগুলি দেখে খুব সম্ভব চার্ণক সাহেব বাণিজ্যের সুবিধের জন্য কলকাতায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তারা সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য ফলতা অঞ্চলে এক স্টেশন তৈরী করেছিল।

নেদারল্যাণ্ড থেকে অস্টেণ্ড কোম্পানী নামে এক ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় এই জেলায় এসেছিল। তারা বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি। তারা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কাছ থেকে বাঁকিবাজার নামে এক গ্রামে কারখানা স্থাপন করার অনুমতি পেয়েছিল। এখন আর এ-গ্রামের নাম শোনা যায় না। ব্যারাকপুর থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তরে গরুলিয়া ও পলতার কাছে এই গ্রামটি ছিল। বাঁকিবাজারে পাতার ঘর তৈরী করে তারা কারখানা করেছিল। পরে পাকাঘরও করে। মখমল, পশম, রেশম প্রভৃতি জিনিস বিক্রী করে তারা বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছিল। ক্রমে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে দুর্গের মত করছিল।

কিন্তু পরশ্রীকাতর ইংরেজ আর ফরাসী বণিকদের তা সহ্য হ'ল না। তারা ফৌজদারকে ঘুষ দিয়ে এদের বিরুদ্ধে নবাবের কান পাতলা করে দিয়েছিল। নবাব অস্টেণ্ড কোম্পানীকে কারবার গোটাতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তখন তাদের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে, তারা কারবার গোটাতে রাজী হল না। নবাব দুর্গ অধিকার করবার জন্য মিরজাফরের অধীনে এক দল সৈন্য পাঠালেন। মিরজাফর ইউরোপীয়দের কামানের শক্তির কথা জানতেন, তাই তাঁরা দুর্গটির চারধারে খাল কেটে দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। দুর্গের মধ্যে যে সকল ভারতীয় ছিল তারা একে একে চলে এল। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বণিকেরা পড়ে রইল। দুর্গমধ্যে অন্নাভাব হ'ল। একে একে মরতে লাগল, অবশেষে মাত্র ১৪ জনে এসে ঠেকল। তারা একদিন গভীর রাত্রে নৌকো করে বাঁকিবাজার থেকে পালান—সেটা ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ। গঙ্গার মুখে তাদের জাহাজ ছিল, তাতে করে দেশের দিকে রওনা হল। মিরজাফর শূন্য দুর্গ অধিকার করলেন। অন্যান্য বণিকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

১৬৯৮ সালে ২রা জানুয়ারি তৎকালীন নবাব শাহজাদা আজিম উমসানের কাছ থেকে ইংরেজরা কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর ষোল হাজার টাকা নজর দিয়ে কিনে নেয়। বার্ষিক ১২ হাজার টাকা খাজনা দিয়ে জমীদার হয়ে বসে। তারপর তারা দিল্লীর সম্রাট ফারুক শায়ারের দরবারে উপস্থিত হয়ে হুগলী নদীর তীরে সম্পত্তি ক্রয় করবার অধিকার পাকা করে নেয়।

১৭৪২ সালে আর এক উৎপাত আরম্ভ হল। বর্গীর অত্যাচার। তাদের ভয়ে ইংরেজরা ১৭৪৩ খ্রী: মহারাষ্ট্র খাল খুঁড়তে আরম্ভ করে। তারা স্থির করে সুতানুটি থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে গোবিন্দপুর পর্যন্ত ৭ মাইল ব্যাপী অর্ধবৃত্তকার খাল খুঁড়বে, উত্তর দিক হুগলী নদী থেকে আরম্ভ করে ছ'মাসে তারা তিন মাইল কাটে, এর পর ভয়ের আর কারণ না থাকায় ঐখানেই শেষ হয়।

এই সময় জেলার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, দেবতা ও মানুষে এই জেলার অধিবাসীদের সমানভাবে পীড়ন করেছিল। ১৭৩৭ খ্রী: ৩০-এ সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় সমগ্র জেলা বিধ্বস্ত হয়েছিল। এর পর দাস-ব্যবসায়ী ও জলদস্যুদের অত্যাচার। নদীবহুল অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যু ও মগদের অত্যাচার অকথনীয় ছিল। আরাকানের জলদস্যুরা বলপূর্বক অধিবাসীদের ধরে নিয়ে পিপ্লি নামে জায়গায় দাস বিক্রীর হাটে বেচে দিত। ১৭১৭ খ্রী: ফেব্রুয়ারী মাসে এরা প্রায় ১৮০০ লোক ধরে নিয়ে যায়। আরাকান-রাজ তাদের এক-চতুর্থাংশকে নিজের ক্রীতদাস করে রাখে, বাকী লোককে হাটে ২০৲ থেকে ৭০৲ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে। কলকাতায় প্রকাশ্যভাবে দাস বিক্রীর প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থই একটা করে বালক ক্রীতদাস রাখত। অনেক সময় চুরিকরা শিশুদের বিক্রীর জন্য নৌকা করে কলকাতায় আনা হত।

নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পলাশীর যুদ্ধে হেরে গেলে মীরজাফর খাঁ বাংলার মসনদে বসেন। মীরজাফর নবাব হয়ে ইংরেজ কোম্পানীকে চব্বিশ পরগণার জমিদারী চালাতে দিলেন। সেটা ১৭৫৭ খ্রী: ২০-এ ডিসেম্বর।

বাঁকিপুরের মা সর্বাণী
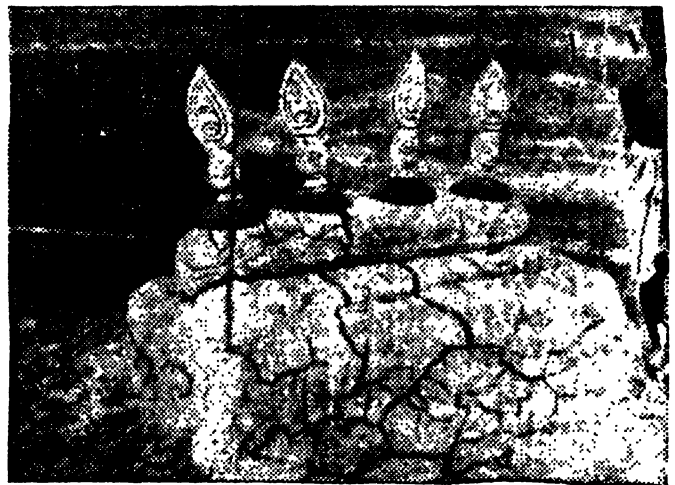
সেই চব্বিশটি পরগণার নাম—(১) অক্‌বরপুর, (২) আমীরপুর, (৩) আজিমাবাদ, (৪) বেলিয়া (বালিয়া), (৫) ফরিদহাটি (বৈদহাটি), (৬) রসন্দরী, (৭) কলিকাতা, (৮) দক্ষিণ সাগর, (৯) গড়, (১০) হাতিয়াগড়, (১১) ইখ্‌তিয়ারপুর, (১২) খাড়ীজুড়ি, (১৩) খাসপুর, (১৪) মেদনমল্ল, (১৫) মাগুরা, (১৬) মানপুর, (১৭) ময়দা, (১৮) মুড়াগাছা, (১৯) পাইকান (বাসনধোয়ার), (২০) পেচাকুলী, (২১) সাতাল, (২২) শানগর, (২৩) শাপুর (শালিগড়), (২৪) উত্তরপরগণা।

এই পরগণাগুলি সাধারণত কলকাতার দক্ষিণে ও সরকার সাতগাঁর মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই পরগণাগুলি ঠিক কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। কয়েকটি পরগণার অবস্থান—যা সংগ্রহ করা গেছে তার উল্লেখ করছি।

১। অক্‌বরপুর—ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। গ্রান্ট সাহেব লর্ড কর্নওয়ালিসের কাছে কোম্পানীর অধিকৃত বাংলার রাজস্ব সংক্রান্ত যে বিবরণ দিয়েছিলেন—তাতে ২৭টি মহালের মধ্যে অক্‌বরপুরের নাম আছে (স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্টস অব বেঙ্গল, ১-২০-৩৬৩ পঞ্চম রিপোর্ট (মাদ্রাজ এড) চার শত একানব্বুই)।

৩। আজিমাবাদ—আয়তন ৩৫,০৬০ একর বা ৫৪,৭৮ বর্গমাইল। ডায়মণ্ড-হারবারের এলাকাধীন। এই পরগণার দু'টি বিভাগ আছে—পূর্বদিকে রাজাহাট গণ্ডগ্রাম ও বাজার ও দক্ষিণে দয়ারামপুর ও কুলটি।—ঐ, ১-২০-২২৬।

৪। বালিয়া—যমুনা নদীর তীরে। বসিরহাট বালিয়া অন্তর্গত।

৫। বারিদহাটি—কলকাতার দক্ষিণ ও ডায়মণ্ডহারবারের পশ্চিমে।

৭। কলকাতা—ব্যারাকপুর, টিটাগড়, খড়দহ, বরাহনগর, রাজারহাট অংশ নিয়ে কলকাতা পরগণা। এটির কতক অংশ রাজা রঘুদেবের এস্টেটভুক্ত। আইন-ই-আক্‌বরিতে প্রথম উল্লেখ আছে।

১৪। মেদনমল্ল মেদনিমল বা ময়দানমল—কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব ও পোর্ট ক্যানিং-এর কাছাকাছি। বারুইপুর, সোনারপুর থানার আংশিক এলাকা। এর নামও আইন-ই-অক্‌বরীতে উল্লেখিত আছে।

১৫। মাকোয়ারা বা মাগুরা—বর্তমান জয়নগর মজিলপুর প্রভৃতি অঞ্চল মাগুরার অন্তর্গত।-ঐ।

১৮। মুদাগাছা (নুনরাগাছা বা মুড়াগাছা)—ডায়মণ্ডহারবার ও হুগলী পাইণ্টের কাছে।

১০। হাতিয়াগড়, হবত্যাগড়, হায়াগড় বা হাদীয়াগড়—রাজা টোডরমল্লের সময় এই হাতিয়াগড় সপ্তগ্রাম সরকারের দক্ষিণ দিকের শেষ সীমায় ছিল। একে সাগর-সঙ্গমের ও সাগর দ্বীপের নিকটবর্তী স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে—আইন-ই-অক্‌বরীতে।

১২। খড়ি—(খারার)—সম্ভবত ইহা বর্তমান খাড়ী পরগণা হাতিয়াগড়ের পূর্বদিকে।

কোম্পানী এই চব্বিশ পরগণা জমিদাররী জন্য নবাব সরকারকে রাজস্ব প্রদান করতেন। নবাব মীরজাফর পরে আবার এই জমীদারি পলাশী-বিজেতা ক্লাইভকে জায়গীর দেন। কোম্পানী কেবল জমিদারী-স্বত্ব লাভ করেছিল অর্থাৎ কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ভারমাত্র তারা পেয়েছিল, তারা নবাবকে নিয়মিত বার্ষিক খাজনা দিত। কিন্তু ১৭৫৯ খ্রীঃ ক্লাইভকে একটি সনদের দ্বারা ঐ জেলার সম্পূর্ণ দাখিলকারী স্বত্ব প্রদান করা হয়। এর ফল অন্যরূপ হল। ক্লাইভের প্রভু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই জমিদারী লাভ করে নবাবের প্রজারূপে পরিগণিত হয়েছিল। এখন ক্লাইভ সমগ্র চব্বিশ পরগণা জায়গীর লাভ করলে কোম্পানী তাঁর অধীনস্থ প্রজা হয়ে পড়ে। ক্লাইভ কোম্পানী কর্তৃক নবাব সরকারে দেয় খাজনা নিজে দাবী করলেন। কোম্পানী প্রতিবাদ করল। সম্রাটের কাছে আবেদন করল, তার ফলে ক্লাইভের দখলকারী স্বত্ব মাত্র ১০ বছরের জন্য নির্দিষ্ট হল। ১৭৬৫ খ্রীঃ হতে ১৭৭৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ক্লাইভ কোম্পানীর কাছ থেকে বার্ষিক ২২২৯৫৮ টাকা খাজনা আদায় করলেন। ১০ বছর অতিক্রম করলে চব্বিশ পরগণা কোম্পানীর সম্পত্তি হল।

মকরমূর্তি

ক্রমে বাঙলাদেশের বাণিজ্য ইংরেজদের একচেটিয়া হল, তাতে ওলন্দাজগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল, যুদ্ধ বাধাল। কিন্তু ইংরেজরাই জয়লাভ করল। ওলন্দাজদের ঔদ্ধত্য চূর্ণ হয়ে তারা সন্ধি করল।

ভাগ্যচক্রান্তে কোম্পানী বাংলা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয় কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চিররুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা-তপনের দূতী অরুণ-রমণী।

দেশ ও সারা ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসল। তখন চব্বিশ পরগণা জেলায় পরিণত হল। জেলা চব্বিশ পরগণা গঠনে মূল চব্বিশ পরগণা জমীদারির কিছু কিছু পরিবর্তন হল। সমস্ত জেলাটি কয়েকটি মহকুমায় ভাগ হল, শান্তি-রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে থানা বসল। প্রাচীন চব্বিশ পরগণা নতুনরূপ ধারণ করে বর্তমান অবস্থায় এল।

এর পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা—১ম সিপাই-বিদ্রোহ। ১৮২৪ খ্রী: ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ব্যারাকপুরের সিপাইগণ বিদ্রোহী হয়। কারণ তুচ্ছ। তাদের নিয়োগের সময় সর্ত ছিল—তারা সমুদ্র পার হবে না। ব্রহ্মযুদ্ধের সময় তাদের ব্রহ্মদেশে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হবে—এই গুজবে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ঐ সালে ৩০-এ অক্টোবর তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিন্তু বিদ্রোহ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

এর ৭ বছর পরে তিতুমীর নামে এক ব্যক্তি ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করে ও হিন্দুদ্বেষী ও খুনী হয়ে উঠল। তারা ফের মুসলমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। নারিকেলগ্রামে তারা এক বাঁশের কেল্লা তৈরী করে ও গুজব ছড়ায়—ইংরেজ-রাজত্ব শেষ হয়ে এসেছে। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ইংরেজরা কলকাতা থেকে একদল সৈন্য পাঠাল। বাঁশের কেল্লা উড়ে গেল। তিতু মিয়া নিহত হল।

এর পর বিখ্যাত সিপাই-বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সাল। ব্যারাকপুরে অবস্থিত সিপাইদের মধ্যে গুজব উঠল সরকার তাদের খ্রীস্টান করবার জন্য বন্দুকের কার্তুজগুলি গরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সারা ভারতব্যাপী বিদ্রোহের অনল ছড়িয়ে পড়ল। চারদিক থেকে বিদ্রোহের সংবাদ আসতে লাগল। ২৯-এ মার্চ লে: বাগ নামে এক ব্যক্তিকে মঙ্গল পাঁড়ে নামে এক সিপাই আহত করল। সারা ভারতব্যাপী বেশ কিছু-দিন বিদ্রোহ চলল। শেষে এই বিদ্রোহও দমিত হয়।

এই ঘটনার পর আর বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা এই জেলায় সংঘটিত হয় নি।

ভৌগোলিক হিসেবে কলকাতা শহর এই জেলায় অবস্থিত হলেও শাসনকার্য হিসেবে এই জেলার অন্তর্ভুক্ত নয়। পূর্বে এই জেলার কাশীপুর, চিৎপুর, ভবানীপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানগুলি কলিকাতার উপকণ্ঠে ছিল, এখন বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে। এই জেলার লোকসংখ্যা—(১৯৬১)—৬,২৮০,৯১৫। আয়তন—৫,২৮৫ বর্গমাইল। মহকুমা—আলিপুর (সদর—১,১০৭ বর্গমাইল), ডায়মণ্ডহারবার (১,২৬২ ব: মা:), বসিরহাট (৮১৮ ব: মা:), ব্যারাকপুর (১১৯ ব: মা:), বারাসাত (৩৮৪ ব: মা:) ও বনগাঁ (৩২৩ ব: মা:)।

নদী

গঙ্গা (ভাগীরথী বা হুগলী নদী)—এই গঙ্গা বর্তমানে আদিগঙ্গা বা টালির নালা নামে খ্যাত। এমন একদিন ছিল যখন এর স্রোত কালীঘাট, টালিগঞ্জ, গড়ে, মজিলপুর, ছত্রভোলা প্রভৃতি গ্রামসমূহের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হাতিয়াগড়ের অনতিদূরে সাগরের সঙ্গে মিশত। কাজেই তখন গঙ্গানদী এই জেলাটার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এই নদীর পূর্ববর্তী ভূভাগের অধিকাংশ সুন্দরবনে সমাচ্ছন্ন ছিল আর পশ্চিমদিকে তখন লোকালয় ছিল বলে অনুমান করা হয়। বিদ্যাধরী (মাতলা নদীর উত্তরে), জিয়ালী, ইছামতী বা যমুনা (নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালিন্দী নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে)। বড়তলা, সতেরমুখী, জমিরা, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, রায়-মঙ্গল, মিল্লা, পিয়ালী, গোসাবা, মাতলা, কালনাগিনী, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণী, দড়িগঙ্গা, চড়াগঙ্গা ইত্যাদি নদী ও খাল এই জেলার মধ্যে আছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

॥ তেইশ ॥

খাদি-প্রতিষ্ঠানে সেদিন আচার্য-দেবের কাছে যাওয়ার সময় আমাকে ডাঃ ঘোষ সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং বললেন—চলো, তোমায় দেখলে দাদা খুশী হবেন।

কেন খুশী হবেন আচার্যদেব একজন অখ্যাত অজ্ঞাত লোককে দেখলে, বিশেষ করে সে যখন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর প্রচারকাজে নিযুক্ত, অধিকন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীটির স্বয়ং পরিচালকের সে একান্ত সচিব ?

এর পিছনে একটু ইতিহাস ছিল। এবার বলি সেই কাহিনী।

খাদি-প্রতিষ্ঠানে দেখবার আগেও আমি অনেক বার আচার্যদেবকে দেখেছিলাম, দেখেছিলাম আমাদের স্কুলে এবং আমাদের কলেজে। প্রথম দিনের ঘটনা একটু উল্লেখযোগ্য।

সেদিন তিনি আমাদের স্কুলে গেলে ছাত্রদের কি আনন্দ। মস্ত বড় হলঘরে গোটা ইস্কুলের ছাত্রেরা হাজির। মাস্টারেরা হাজির। অনেক দূরে বসে সেদিন প্রথম দেখলাম সেই শীর্ণকায় দাড়িগোঁফের জঙ্গলভরা মুখ ভারত-বিখ্যাত মহামানবকে। শুনেছিলাম তিনি বড় বৈজ্ঞানিক। কিন্তু সেদিন আমাদের তিনি বললেন—নানা দেশের কথা, লাইব্রেরীর কথা, বইপত্র পড়ার কথা—এই সব।

সহসা তিনি হাতে মোটা একখানা বই নিয়ে উঁচু করে ধরে তাঁর মলাটখানি দেখিয়ে বললেন—এতে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ, এ কিসের ছবি—কে বলতে পারো ?

নানারকম বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা অভ্যাস ছিল আমার, তাই দূর থেকে দেখেও চিনলাম—ছবিটি চীনা ড্রাগনের। আমি তখন ফিফ্‌থ ক্লাশ অর্থাৎ এখনকার ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়ি। আমার উপরের শ্রেণীতে যাঁরা পড়তেন তখন তাঁরা ছিলেন সবাই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

সঞ্জয়

এ যুগে যেখানে মাস্টারেরাই যথাযোগ্য সম্মান পান না, সেখানে উপরের ক্লাশের ছেলেদের সম্মান পাওয়ার কথা হাস্যকর মনে হবে। আমাদের যুগে তা মনে হত না। আমরা উপরের ক্লাশের ছেলেদের দাদা বলে ডাকতাম।

চীনের ড্রাগনটি চিনতে পারলেও উপরের ক্লাশের ছেলেদের ডিঙিয়ে আমি সে কথা বললাম না। দুঃখের কথা, কেউই বলতে পারল না যে, ছবিটি 'চীনের ড্রাগন'-এর। তখন আচার্যদেব চীনের ড্রাগনটি এবং তা যে-জাতির প্রতীকচিহ্ন তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আমাদের বুঝিয়ে বললেন। তারপর বললেন—চীন সম্পর্কে এই তথ্যপূর্ণ বইখানি আমি তোদের স্কুলের লাইব্রেরীতে দিয়ে যাচ্ছি। তোরা সবাই পড়ে প্রতিবেশী চীন দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জেনে নিবি।

সহসা বিষয়ান্তরের অবতারণা করে আচার্যদেব পিঠ-পিঠ আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন : তোরা কেউ কলের গান শুনেছিস্ ?

আমরা সবাই সোৎসাহে বললাম—শুনেছি।

কিন্তু পরবর্তী প্রশ্ন শুনে সবাই চুপসে গেল,—বল্ তো, কলের গান কে আবিষ্কার করেছিলেন।

কেউ জবাব দেয় না দেখে আমি ঘাড় গুঁজে বসে থেকেই বললাম—টমাস আল্‌ভা এডিসন।

কে, কে বললি নামটা, উঠে দাঁড়িয়ে আবার বল্।

অগত্যা সভার মাঝামাঝি স্থান থেকে একটি ছোট ছেলে খুবই ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ভীতকাতর স্বরে বললে—টমাস আল্‌ভা এডিসন।

ছেলেটিকে আচার্যদেব কাছে ডাকলেন। দুরু দুরু বক্ষে সে গিয়ে দাঁড়াল আচার্যদেবের কাছে। গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তিনি ছেলেটির একটি কান ধরে পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করে বললেন—নামটা জানলি কি করে ?

ছেলেটি বললে—তাদের স্কুলের ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকে ছিল।

শুনে আচার্যদেব বললেন—কোন্ ক্লাশে পড়িস তুই ?

ছেলেটি বললে—ফিফ্‌থ ক্লাশে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

ওর সহপাঠী কে কে আছিস সবাই দাঁড়া তো দেখি।—আচার্যদেব আদেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাতাশটি ছেলে উঠে দাঁড়াল এবং একসঙ্গে তারস্বরে বলে উঠল,—আমাদের গ্রামোফোনের গল্পটা পড়া হয় নি।

কথাটা ছিল সত্য। গ্রামোফোন সম্পর্কে প্রবন্ধটি ছিল বই-এর মাঝামাঝি আর সেখানেই এডি নের একখানি ছবিও ছাপা ছিল। ততদূর পর্যন্ত পড়া এগোয় নি তখনও।

আচার্যদেব বললেন---তবে দ্যাখ্ কি ভাবে ঠকিস্ তোরা। তোদের পাঠ্য বই-এর মধ্যে কত মজার মজার গল্প আছে, তোরা তা পড়ে দেখিস না। লাইব্রেরীর আলমারিতে গাদা গাদা বই থাকলেও কোনও কাজ হয় না, যদি না তা পড়ে দেখিস।

যে ছেলেটি এডিসনের নামটি নির্ভুলভাবে বলেছিল তার উপর একটু সদয় দৃষ্টি পড়ল আচার্যদেবের। বললেন—তোর নাম দিলাম—এডিসন। তারপর তিনি যতবার ওই স্কুলে গেছেন, খোঁজ নিয়েছেন এডিসনের।

স্কুল পাশ করে কলেজে পড়বার সময় কলেজেও দেখা হল আবার। তিনি সভা করতে এসেছিলেন সেখানে, আর সেই এডিসন ছিল স্বেচ্ছাসেবক। দেখেই চিনলেন। আদর করে কান ধরে টেনে পিঠে চাপড় মারলেন।

তারপর যখন দেশব্যাপী প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসব হল তাতে একটি জীবনী লেখার প্রতিযোগিতায় সেই ছেলেটির লেখা প্রফুল্লচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রথম পুরস্কার পেলো। লেখাটা একটি পত্রিকায় ছাপা হল। তখন সেই ছেলেটি ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর একান্ত সচিব হয়েছে।

ডাঃ বসু শুনে খুব খুশী। বললেন—তোমার লেখাটি বই আকারে ছাপাব আমি। খাদি-প্রতিষ্ঠান থেকে হাতে তৈরী কাগজ আনালেন তার জন্য। নিজের বাড়ীতে 'স্বাস্থ্যসমাচার' ছাপবার জন্য ছাপাখানা করেছিলেন—সেখান হতে বই ছেপে বের হল।

তারপর একদিন ডাঃ বোস বললেন, চলো, তোমায় দাদার কাছে নিয়ে যাই।

সায়ান্স্ কলেজের দক্ষিণ দিকের সেই পবিত্র ঘরখানিতে আচার্যদেব তখন একটি চোখে ব্যাণ্ডেজবাঁধা অবস্থায় ছিলেন, পার্টিসানের বাইরে ডক্টর মেঘনাদ সাহার স্বাক্ষরিত নোটিশ ঝুলছিল—'আচার্যদেব অসুস্থ, কেউ সাক্ষাৎ করবার চেষ্টা করবেন না।'

ডাঃ বোস প্রহরারত ছাত্রটিকে বললেন—মেঘনাদকে বলো ডাঃ কার্তিক বোস আচার্যদেবকে দেখতে এসেছেন।

ভিতরে তখন ডক্টর মেঘনাদ সাহা ছিলেন না, বেরিয়ে এলেন তখনকার তরুণ বৈজ্ঞানিক ডক্টর বীরেশ গুহ। তিনি গিয়ে যেই বলেছেন—ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু এসেছেন, আচার্য-

দেব রেগে চীৎকার করে উঠলেন। বাইরে থেকেও আমরা তাঁর রোষ-কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি তখনও বলছেন—ওরে কার্তিক আমায় দেখতে এসেছে, তাকেও তোরা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস? মেম্ব-মাদের ঐ সব বাঁদরামি বন্ধ করতে বল, ছিঁড়ে ফেলে দে ওই সব নোটিশ-ফোটিশ।
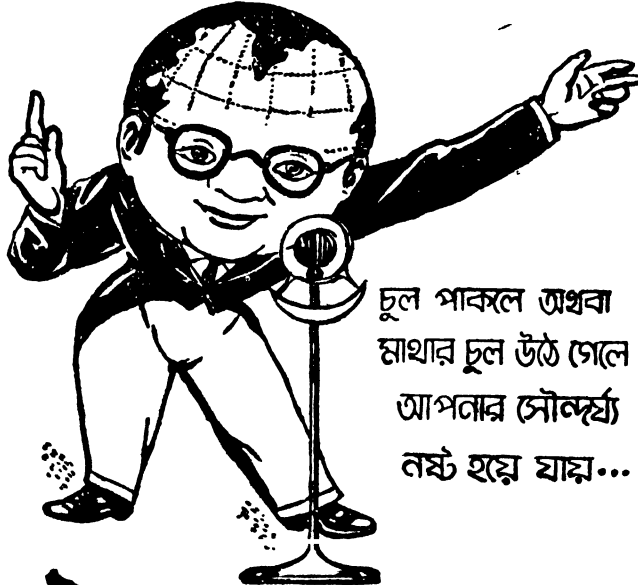
বলা বাহুল্য আমরা অবিলম্বে সাদরে ভিতরে নীত হলাম। সেদিনও দেখেছিলাম, ডাঃ বোসকে দেখামাত্র আচার্যদেব কেমন আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

ডাঃ বোস একখানি টুল টেনে খাটের কাছে বসে বললেন, দাদা, এই ছেলেটি আমার কাছে কাজ করে। সম্প্রতি একটি জয়ন্তী উৎসবে ও তোমার জীবনী লিখে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। সতীশকে বলে খাদিপ্রতিষ্ঠান থেকে হাতে তৈরী কাগজ আনিয়ে তাতে তোমার জীবনী ছাপিয়েছি। সেই বই দিতে এলাম।

আমি আচার্যদেবকে প্রণাম করে তাঁর হাতে বই দিয়ে একটি কলম খুলে ধরলাম—তাঁর স্বাক্ষর চাই একখানি বইয়ের পাতায়।

স্বাক্ষর দিতে গিয়ে তিনি একটি চোখ দিয়েই আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন—তুমি একে কোথায় পেলে কার্তিক?

ডাঃ বোস বললেন—তুমি ওকে চেন নাকি?

আচার্যদেব বললেন—চিনি মানে, বিলক্ষণ চিনি। কিরে তোর নাম এডিসন তো?

ডাঃ বোস কৌতুক অনুভব করলেন, বললেন, দাদা কার নাম কি বলছেন।

তাঁকে হাসতে দেখে আচার্যদেব বললেন,—সত্যিই আমি ওর নাম দিয়েছিলাম—এডিসন। কিরে, কার্তিককে বলিস নি বুঝি?

সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন আচার্যদেব। তারপর মন্তব্য করলেন—এতটুকু পুচকে এক ছোকরা যখন টমাস অ্যালভা এডিসন নামটা নির্ভুলভাবে দুই-দুইবার বললে, আর কোন ছাত্র বলতে পারল না—একা ও-ই বললে, তখন ওর নাম দিলাম—'এডিসন'।

আমার এডিসন নামটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, সেদিন আবার আমারও মনে পড়ল। মনে হয়, ডাঃ বোস ঐ কাহিনীটি শুনে খুশীই হয়েছিলেন। মুখে কিছু না বললেও ব্যবহারে দেখলাম—তারপর থেকে তিনি অনেক বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আমাকে নানা স্থানে পাঠাতেন। সেই ভাবেই লাহোরে মামলা লড়তে পাঠানো হয়েছিল আমাকে। একবার ডাঃ বসুর একখানি পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম স্যার জগদীশচন্দ্র বোসের কাছে, একবার অমৃতবাজার পত্রিকার পালকান্তি ঘোষের কাছে। একবার রবীন্দ্রনাথের কাছেও পাঠিয়েছিলেন।—কলকাতা করপোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়মে রবীন্দ্রনাথ 'বাঙ্গালীর খাদ্য' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন—সেটি এনে ছাপা হয়েছিল—ডাঃ বোসের সম্পাদিত 'স্বাস্থ্য সমাচার' পত্রিকায়।

॥ চব্বিশ ॥

ডাঃ বোস যে একজন সুলেখক ছিলেন সে-কথা আগে বলেছি। ইংরাজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি সমান সাবলীলভাবে কলম চালাতে পারতেন। ডাক্তারদের হাতের লেখার দুর্নাম আছে যে তা দুষ্পাঠ্য। কিন্তু ডাঃ বোসের হাতের লেখার প্রতিটি অক্ষর সুস্পষ্ট ছিল। যে-কোন কম্পোজিটার তাঁর হাতের লেখা পড়তে পারত বলে তাঁর লেখার প্রুফে খুব কম ভুল থাকত। কিন্তু তিনি যদি প্রুফ দেখতেন তবে আর রক্ষা ছিল না। প্রুফের উপরেই নতুন নতুন বিষয় যোগ করে দিতেন। ফলে যে আকারে প্রবন্ধটি কম্পোজ হতে যেত—ছাপা হ'লে তার আর এক মূর্তি দেখা যেত।

সম্পাদক হিসাবে তিনি অনেক কৃতী লেখককে তৈরী করেছেন। বাংলা ভাষায় যৌনতত্ত্ব সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য সমাচার পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় এবং তা লেখেন পত্রিকার তৎকালীন সহকারী নৃপেন্দ্রমোহন বসু। ডাঃ বসু তাঁকে দিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়েছেন। কালক্রমে তিনি বহু গ্রন্থ লিখে প্রভূত যশ অর্জন করেছিলেন।

আর একজন যশস্বী লেখক—কালীচরণ ঘোষ। সংখ্যাতত্ত্ব ও যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা ডাঃ বসুর অভ্যাস ছিল। কালীচরণবাবুকে তিনি এই পথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনিও সে সময় ডাক্তার বসুর সহকারী ছিলেন এবং 'স্বাস্থ্যসমাচার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে বিবিধ মূল্যবান প্রবন্ধ-পুস্তক লিখে কালীচরণবাবু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

লেখক হিসাবে ডাঃ বসুর সর্বপ্রথম পুস্তক—'ফার্মাকোপিয়া ইণ্ডিকা'। বি পি অর্থাৎ বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া অনুসারে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ঔষধাদি তৈয়ার হয়। তাতে যেমন ভাবে ভেষজাবলীর গুণাগুণ ও শক্তির পরিমাপ প্রভৃতির উল্লেখ করা আছে, ভারতীয় ভেষজ সম্পর্কে অনুরূপ তথ্যসম্বলিত পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ডাঃ বোস তাঁর গবেষণাগারে নানাপ্রকার ভারতীয় ভেষজ নিয়ে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন। 'ফার্মাকোপিয়া ইণ্ডিকা' তার ফলশ্রুতি। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি কেবল ভারতে নয়, সুদূর ইংলণ্ড আমেরিকা জার্মানী ফ্রান্স-এও সমাদৃত হয়। একখানি জার্মান পুস্তকে 'ফার্মাকোপিয়া ইণ্ডিকা' হতে উদ্ধৃতি দেখেছি।

পরে 'ভারতীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব' নামক সুবৃহৎ পুস্তকে ডাঃ বোস তাঁর এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন। 'ভারতীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব' তিনি হিন্দিতেও অনুবাদ করিয়েছিলেন।

তাঁর লেখা অন্যান্য বই-এর মধ্যে—দেহতত্ত্ব, ক্ষয়রোগ ও আরোগ্যের উপায়, ম্যালেরিয়া ও তার প্রতিকার, অন্নধৌতি, সেক্স হাইজিন প্রভৃতি বিখ্যাত।

পত্রিকা সম্পাদনে তাঁর কৃতিত্বের কথা আপনারা সবাই অল্পবিস্তর জানেন। 'স্বাস্থ্য সমাচার' পত্রিকাটি সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল চালিয়ে তিনি নিজেই তা বন্ধ করে দেন। তখন তিনি বার্ধক্যে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। উপযুক্ত কেউ পত্রিকাটির পরিচালনভার গ্রহণ করলে বাংলা সাহিত্যের এই অক্ষয় কীর্তিটি আজও অম্লান থাকত। হিন্দিতে 'স্বাস্থ্য সমাচার' এবং উর্দুতে 'তন্দুরস্তি' নামেও দুটি মাসিক পত্রিকা তিনি কিছুদিন চালিয়েছিলেন। ইংরাজি 'হেল্থ এ্যাণ্ড হ্যাপিনেস' পত্রিকাটি বহু বৎসর তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। 'ফুড এ্যাণ্ড ড্রাগ' নামে একটি ইংরাজি মাসিক পত্রিকা দিয়ে তিনি সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি দেন। এই পত্রিকাটি বেশিদিন চলে নি। কিন্তু সামান্য দিনেই পত্রিকাটি সারা দেশে বিশেষ আলোড়ন এনেছিল।

মুষ্টিমেয় উচ্চপদস্থ, ইংরাজি শিক্ষিতদের কাছে খাদ্য ও ঔষধ সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণে তিনি তুষ্ট হলেন না। ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে (ইংরাজি ১৯১২ খৃস্টাব্দে) 'স্বাস্থ্য সমাচার' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ডাঃ বোস তার সম্পাদক হন। সি কে সেন কোম্পানীর ছাপাখানায় তখন ছাপা হত।

কিছুদিন পত্রিকা বের হওয়ার পর সারা দেশ হতে তার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আসতে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভিনন্দন এসেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। কবি তো শুধু কল্পনাবিলাসীই ছিলেন না—তিনি ছিলেন কর্মী মানুষ। সুদূর পল্লী অঞ্চলের মানুষের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তাই 'স্বাস্থ্য সমাচার' যখন একেবারে সরল বাংলায় জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা তথ্য পরিবেশন করতে লাগল এবং তাতে বিশেষ করে পল্লীবাসীদেরই পরম উপকার হতে লাগল তখন কবি একদিন কার্তিকবাবুকে সম্বর্ধনা জানিয়ে পত্র দিলেন এবং তাঁকে কবির কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।

ডাঃ বোসের পক্ষে যেমন কাশ্মীরের মহীমহোদয়ের আমন্ত্রণে কাশ্মীর ভ্রমণে যাওয়া সম্ভব হয় নি তেমনি সম্ভব হয় নি কবিসন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার। উত্তরে লিখেছিলেন, কবি জোড়াসাঁকোয় এলে সংবাদ পেলে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে যাবেন। জোড়াসাঁকোতে কবির সঙ্গে যেদিন কার্তিকচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় সেদিন অনেক কথাই হয়েছিল এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রসঙ্গও উঠেছিল। কার্তিকচন্দ্র শুনে লজ্জিত বোধ করেছিলেন—আচার্যদেব কবিকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিয়েছিলেন, তার মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর বলবার অধিকার কতখানি তা বলতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতুলনীয় ফলের কথাটুকুও বলতে বাকি রাখেন নি।

সেই জন্যই বোধ হয়, কবির কাছে যখন আমাকে তিনি পাঠালেন, কবি তাঁর প্রবন্ধটি স্বাস্থ্য সমাচারে প্রকাশের অনুমতি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে স্বাস্থ্য-সমাচার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করা হয়েছিল। ডাঃ বোস কবির প্রসঙ্গে একদিন রহস্য করে বলেছিলেন—কবি তো নন, তিনি কুস্তিগীর। অমন চমৎকার স্বাস্থ্য ক'জন বাঙ্গালীর আছে বলতে পারিস। দাদাকে দেখলে দুঃখ হয়, আর কবিকে দেখলে ঈর্ষা হয়।

দাদা অর্থাৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আবাল্য-শীর্ণকায় এবং উদরাময়ের রোগী ছিলেন। আর কবি ছিলেন অনিন্দ্য স্বাস্থ্যের অধিকারী। 'স্বাস্থ্য সমাচার' পত্রিকার সম্পাদকের এই উক্তিটি তাই বিশেষ ভাবেই মনে পড়ে।

স্বাস্থ্য সমাচারের প্রুফ নিয়ে ডাঃ বোস বড়বাজারে যাতায়াতের পথে সি কে সেনের কবিরাজখানায় গাড়ি থেকে নামতেন। এটা কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ এবং উপেন্দ্রনাথ সেন উভয়েরই নজরে পড়ত। একদিন তেমনি প্রুফ নিয়ে গেলে উপেন্দ্রনাথ বললেন,—কার্তিক, তুমি এত কাজের মধ্যে প্রুফ নিয়ে প্রেসে ছুটাছুটি করে কাগজ চালাতে পারবে না। তোমার বাড়িতে একটা ঘর খালি করে দাও, আমাদের প্রেস থেকে কিছু টাইপ র‍্যাক আর একটি মেসিন পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার বাড়িতেই ছাপাখানা চালু করো। তাতে দৌড়াদৌড়ি অনেক কমবে।

সত্যিই এলো প্রেসের সরঞ্জাম—টাইপ, টাইপ কেস, গেলি, র‍্যাক—আর একটি প্রুফিং মেসিন আর একটা ট্রেড্‌ল্‌ মেসিন। তাই দিয়ে সুরু হলো এস ডি প্রেস—অর্থাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ প্রেস। ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীটে তাঁর ডাক্তারখানার নাম ছিল—স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স। ছাপাখানার নাম হল—স্টাণ্ডার্ড ড্রাগ প্রেস। কালক্রমে তাতে তিনখানি ফ্লাট, দুটি ট্রেড্‌ল্‌ মেসিন, দুখানি লাইনো, দেড়তলায় ৪০ জন কম্পোজিটার বসবার ব্যবস্থা হয়। তার সঙ্গে কাটিং মেসিন, স্টিচিং মেসিন, বোর্ড গিলোটিন এবং ব্লক মেকিং-এর যাবতীয় যন্ত্রপাতিও ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয়েছিল।

এই সুবৃহৎ ছাপাখানায় তাঁর নিজস্ব কোম্পানীর কাজ আর পত্রিকাগুলি ছাপা হত। বাংলা 'স্বাস্থ্য সমাচার' ৪৫ বৎসর চলেছিল। ইংরাজি 'হেল্থ এ্যাণ্ড হ্যাপিনেস'ও বহুদিন চলেছিল। হিন্দিতে 'স্বাস্থ্য সমাচার' এবং উর্দুতে 'তন্দুরস্তি' পত্রিকাও তিনি কিছুদিন চালিয়েছিলেন সে কথা আগেই বলেছি।

তাঁর এক কীর্তি—'স্বাস্থ্য ধর্ম গৃহপঞ্জিকা'। এক সময়ে এই পঞ্জিকা বৎসরে ৬০,০০০ কপি পর্যন্ত বিক্রয় হত। বটকৃষ্ট পালের পঞ্জিকা বিনামূল্যে দেওয়া হত। তেমনি ডাঃ বোস করেছিলেন—'পল্লীবন্ধু পকেট পঞ্জিকা'—সেটিও বিনামূল্যে বিতরিত হত। উভয় পঞ্জিকাতেই দিনক্ষণ তারিখ তো থাকতই, আরও থাকত এমন সব প্রবন্ধ যা পল্লীবাসী গৃহস্থদের খুব উপকারে লাগত।

উত্তরে বিবেকানন্দ রোড দক্ষিণে বৌবাজার (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী) স্ট্রীট-এর মধ্যে সার্কুলার রোড এবং কলেজ স্ট্রীটের মাঝে ওই দুটি রাস্তার

সঙ্গে সমান্তরালভাবে উত্তরে দক্ষিণে টানা সোজা যে রাজপথটি—তার নাম আমহার্স্ট স্ট্রীট। এই রাস্তার উপরে রাজা রামমোহন রায়ের বৃহৎ অট্টালিকা, রাজা হৃষীকেশ লাহার বিরাট প্রাসাদ, রামমোহন রায় হোস্টেল এবং সিটি কলেজের বিশাল হর্ম্যরাজি, মাড়োয়ারি হাসপাতাল এবং ডাফরিন হাসপাতালের গগনচুম্বী অট্টালিকাশ্রেণী।

কিন্তু এর মধ্যে ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীটের অভিজাত ভবনের বৃহৎ ফটকের উপরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহ কাঠামোর উপর বড় বড় হরফে লেখা ডা: বোসেস ল্যাবরেটরী লিমিটেড্ সবার চোখে পড়ে। দীর্ঘকাল ধরে দূর-দূরান্তের লোক এখানে এসেছে—এক্সরে করাতে, রক্ত-মলমূত্র পরীক্ষা করাতে, চোখ দেখিয়ে চশমা নিতে, ওষুধ কিনতে। স্ট্যাণ্ডার্ড এক্সরে ল্যাবরেটরী, স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী, ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোম্পানি, স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স—ডা: বোসের এক একটি কীর্তি-স্তম্ভ।

এই জমিতে এই বৃহৎ বাড়িটি হওয়ারও একটু ইতিহাস আছে।

তখনও আমহার্স্ট স্ট্রীটে পীচঢালা পথ হয় নি। খোয়া-ওঠা রাস্তায় ঘর ঘর শব্দ করে ঘোড়ার গাড়ি চলত। এই বাড়িটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে ছিল মস্ত বড় একটা মুচিবস্তি, খোলার চালা, সরু সরু গলি, নোংরা, ঘিঞ্জি। বস্তিটির মালিক ছিলেন একজন মাড়োয়ারি।

তখন বড়বাজার অঞ্চলের সেরা ধনী ছিলেন শেঠ কেশোরাম পোদ্দার। সে সময়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এত বিস্তৃতি ঘটেনি। পোদ্দাররাই ব্যাঙ্কিং-এর কাজ চালাতেন। আজও বড় বড় ব্যাঙ্কে নগদ টাকার তহবিল যার হাতে থাকে তাকে বলা হয়—পোদ্দার।

কেশোরামের গদিতে টাকা ধার নিতে ছোটবড় সব ব্যবসায়ীরই আসতে হত। কেশোরাম সাধারণ কুসীদজীবী মহাজন মাত্র ছিলেন না। তিনি ধনী হয়েও হৃদয়বান মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকের আপদে বিপদে সব সময়েই পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। কেশোরামজীর গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন কার্তিকচন্দ্র। বড়বাজারে হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড)-এর উপর দোতলায় তাঁর 'এলাইজ স্টোর্স' একটি বিখ্যাত ডাক্তারখানা পঞ্চাশ বছরেরও বেশী দিন রয়েছে। এক সময়ে বড়বাজারে মাড়োয়ারি মহলে ডা: বোস খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

কেশোরামজীর পুত্রবধূ অনেকদিন হতে একটি দুরারোগ্য উপসর্গে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ডা: বোসের চিকিৎসায় তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হলে তিনি তাঁর শাশুড়ী অর্থাৎ কেশোরামজীর পত্নীকে সে কথা জানান। বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হয়ে গৃহচিকিৎসক ডা: বোসকে কিছু উপহার দিতে সংকল্প করেন এবং স্বামীকে এ বিষয়ে কিছু করবার জন্য অনরোধ করেন।

একদিন ডা: বোস কেশোরামজীর পরিবারবর্গকে দেখে যখন ফিরছেন তখন গদি হতে স্বয়ং কেশোরামজী তাঁকে ডাকলেন। তখনকার দিনে মাড়োয়ারি বাড়ির বসবার ঘর বিশুদ্ধ ভারতীয় মতে সাজানো থাকত। মেঝে জুড়ে মাটিতে পুরু গদি পেতে তার উপর সাদা চাদর টান করে পাতা থাকত, মধ্যে মধ্যে দু-চারটা তাকিয়া থাকত। গদির একপাশে কাঠের বাক্সের উপর খেরো বাঁধা খাতা খুলে মুনিমজি বসে হিসাবপত্র লিখতেন।

গদির মালিক সুমুখে বসতেন, তাঁকে ঘিরে মোসাহেব, খরিদ্দার, দেনদার, পাওনাদার সবাই বসত। সরবৎ আসত, পান আসত। গদিতে চায়ের রেওয়াজ ছিল না, সরাবও আসত না। সে সব অন্য স্থানে অন্য পরিবেশে থাকলেও গদি ছিল কার-বারের পবিত্র লক্ষ্মীস্থান।

ডা: বোস নমস্কার জানিয়ে গদিতে এসে কেশোরামজীর কাছে বসলেন, দেখলেন—দু-একজন লোক গদিতে জমায়েত হয়েছে।

বয়সে তরুণ ডাক্তার বোসকে কেশোরাম আন্তরিকভাবে স্নেহ করতেন, তাই বললেন—ডাগদার, তোমরা কোঠি বহোৎ গল্লিকা অন্দর মে হ্যায়। কোই বড়া সড়ক পর মকান বনানা চাহিয়ে।

ডাক্তার বোস বললেন—বড় রাস্তার উপরে জমি পাবো কোথায়?

হেসে কেশোরামজী বললেন—আমহার্স্ট স্ট্রীট পর লে লেও। এ কালোয়ারজীকো এক চামার বস্তি হ্যায়। ওহি লে লেও।

কালোয়ারজী হাতজোড় করে বসে আছেন। ডা: বোস বললেন—কিন্তু দাম কি হবে?

সব ঠিক হোবে। সব ঠিক হোবে। ঘাবড়াও মৎ ডাগ্‌দার। কেশোরাম পোদ্দার নিজে বলছে, আর তুমার জমি হোবে না? জরুর হোবে।

মুনিমজীকে নির্দেশ দেওয়া হল—হাজার এক রূপেয়া দাদন লিখে দিতে। জমির দলিলপত্র তৈরী করে দেখিয়ে গেলে বাকি টাকা দিয়ে রেজেস্ট্রি হবে।

কলকাতায় বাঙ্গালীর সম্পত্তি মাড়োয়ারি কেনে—এটাই সর্বত্র দেখা যায়, এই বোধ হয় ইতিহাসে প্রথম ঘটল যেখানে মাড়োয়ারির সম্পত্তি কিনল বাঙ্গালী, অবশ্য একজন মহান হৃদয় মাড়োয়ারির প্রভাব-প্রতিপত্তিতেই তা সম্ভব হয়েছিল। কেশোরামজীর খাতক মাড়োয়ারিটি 'না' বলতে সাহস করেনি। দামও চড়াতে পারে নি। তার কেনা দামে উচিত মুনাফা রেখে মধ্যস্থ হয়ে কেশোরামজী জমি রেজেস্ট্রি করিয়ে দিলেন।

জমির দাম তো চুকল। কিন্তু বায়নার সেই হাজার এক টাকা? ডা: বোস টাকাটা নিয়ে গদিতে মুনিমের কাছে জমা দিতে গেলেন। মুনিম বললেন—ও টাকা তো শেঠজী নিজের নামে খরচা লিখিয়েছেন।

ও টাকা মুনিম ফেরৎ নিতে ভরসা পেল না।

[ক্রমশ।

রম্যাঁ রঁলা

কাজল মুখোপাধ্যায়

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় সংগ্রামী মনোভাবের ফসল, পৃথিবীর দিকে দিকে যখনই কোন জায়গায় এতটুকু অন্যায় দেখা দিয়েছে, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন রম্যাঁ রঁলা, রম্যাঁ রঁলা কি প্রথম থেকেই কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছিলেন?

না, তাঁর মানস ক্রমশ বস্তুভাব জগৎ থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুজগতে উপস্থিত হয়েছিল। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসী, তারপর বিশ্বাস জন্মায় মহনতী জনতার শক্তির উপর, যেখানে অতীন্দ্রিয়ের কোন স্থান নেই। প্রথমে অন্যান্য বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে তিনি অগ্রগণ্য তবাদ হিসেবে স্বীকার করেছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন সাম্যবাদ, কারণ—'কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগতস্বার্থের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে।'

কেউ কেউ অবশ্য ভাবছেন তাঁর সাম্যবাদ হয়তো গান্ধী, শেলী প্রমুখের মতো একটা কাল্পনিক সাম্যবাদ, না, তিনি ছিলেন মার্কস এঙ্গেলস, লেনিনের উদ্ভাবিত

...ক প্রতিনিধিত্ব দেবার জন্য পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন কয়েকজন ব্যক্তি জন্মান, যাঁদের যুগের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না, তাঁরা কালান্তরের পথিক, রম্যাঁ রঁলা ছিলেন কালান্তরের পথিক, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কালান্তরের পথিক, কিন্তু গান্ধীর চিন্তাধারা তাঁর সঙ্কীর্ণ যুগকে অতিক্রম করতে পারে নি, গান্ধী-যুগোত্তীর্ণ মানুষ আজ তাঁর চিন্তাধারাকে কোন মূল্য দেয় না

রঁলার চিন্তাধারা যুগ যুগ ধরে মানুষকে তার যাত্রাপথে আলোক-বর্তিকা জ্বেলে দেবে, চিনিয়ে দেবে পথ, তাঁর সেই আহ্বান---La paix, par la Revolution সমাজ-বিপ্লবের মধ্যে শান্তি। এখনো শান্তি-কামী মানুষকে পথ দেখায়।

তথাকথিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সেবীরা রম্যাঁ রঁলাকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে চায়, তাঁরা তাঁদের স্বার্থদুষ্ট বিচারে 'বিবেকানন্দ' 'রামকৃষ্ণ' 'গান্ধী' রচয়িতা রঁলাকে মেনে নেয়, কিন্তু 'শিল্পীর নবজন্ম' রচয়িতা 'Jude' রচয়িতা রঁলা সম্বন্ধে তাঁরা আশ্চর্য রকমের চুপ, অবশ্য এইসব তথাকথিত সংস্কৃতি-সেবীদের এটাই ধরণ, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র মূলভাব নিয়ে তর্ক-বিতর্কে আসর জমিয়ে দেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' 'আফ্রিকা' ইত্যাদি পরবর্তী কালের কবিতা 'সভ্যতার সঙ্কট', 'কালান্তর' ইত্যাদি প্রবন্ধ সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের চুপ। তাঁরা রঁলাকে বসাতে চান 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে', কিন্তু তিনি নিজেই 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে' শব্দটির খোলস খুলে দেন।

এদের মধ্যে রাজনৈতিক ঔদাসীন্যের ছদ্মবেশের অন্তরালে রয়েছে একটা সর্বগ্রাসী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ। (Jude P-404-6) রঁলার কথা আশ্চর্য রকমের সঠিক মনে হয় —। যখন আমরা ইতিহাসের দর্পণের দিকে চেয়ে দেখতে পাই—হিটলারের মুসোলিনীর মুখ, তিনি কোন 'ঊর্ধ্ব' শব্দটি বসিয়ে তাঁর যুগের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে চান নি।

রাস্তায় নেমে এসেছিলেন এই চির-তরুণ লোকটি, ফ্রান্সের পথে পথে সুরু হয়েছিল গণনাট্য '১৪ই জুলাই' 'মুক্তির জয়', পরবর্তীকালে যখন সারা বিশ্ব জুড়ে সুরু হলো যুদ্ধের সঙ্কট, লিখলেন'। যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' ও 'অগ্রণী'এ কিন্তু গজদন্ত মিনারের ঊর্ধ্বে বাস করার প্রশস্তি নয়, এ মিথ্যা

সাম্যবাদের সমর্থক, কারণ 'সামাজিক মুক্তি আনিবার বাস্তব সুযোগ ও সম্ভাবনা একমাত্র মার্কস ও লেনিনপন্থী বিপ্লবই আসে' (শিল্পীর নবজন্ম, পৃঃ ১৮) আর এই মার্কসবাদ যখন তিনি গ্রহণ করলেন এবং পূর্বের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি তাঁর পূর্বের আরব্ধ তিন মহাপুরুষের বাস্তব রূপ বুঝতে পারলেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জন্য যে প্রায় ধ্বংসোন্মুখ 'হিন্দু-ধর্মের জর্জরতাকে পুনরায় নবীন করে তুলতে কিন্তু এটা হলো ইতিহাসের গতি পিছনে ফেরাবার চেষ্টা, বিবেকানন্দ যতই বীরত্বপূর্ণ আহ্বান জানান না কেন, সব আহ্বান তাঁর অধ্যাত্মবাদের কানাগলিতে হারিয়ে গিয়েছে, আর গান্ধী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—তাঁর পূর্ববর্তী লেখার সাথে পরবর্তী লেখার অনেক তফাৎ—যে রঁল্যা লিখেছিলেন গান্ধীর বিশ্বাস ও কর্মনীতি পবিত্র সেই রঁল্যা পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে লিখেছিলেন—গান্ধী সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং গান্ধীর ভারতবর্ষের আন্দোলনের ব্যর্থতার ভবিষ্যতের ত্রুটি তাঁর সামনে খুলে গিয়েছিল—'অতীতের এই প্রভাব, যা গান্ধীর অগ্রগতিতে প্রবল বাধা সৃষ্টি করছে—এর থেকে তিনি যদি নিজেকে মুক্ত করতে না পারেন, তাহলে মহান ভারতীয় আন্দোলনের গতিপথ তিনি হারিয়ে ফেলবেন—যে গতিপথ ইতিমধ্যেই তাঁর চিন্তার বাইরে চলে যেতে সুরু করেছে (Jude P-74) এই পরম মানবহিতৈষীকে নিয়ে ভারতবর্ষে যে মিথ্যাপ্রচার সুরু হয়েছে, আশা করি, অন্তত ভারতবর্ষের হিতৈষী হিসাবে তা বন্ধ হবে।*
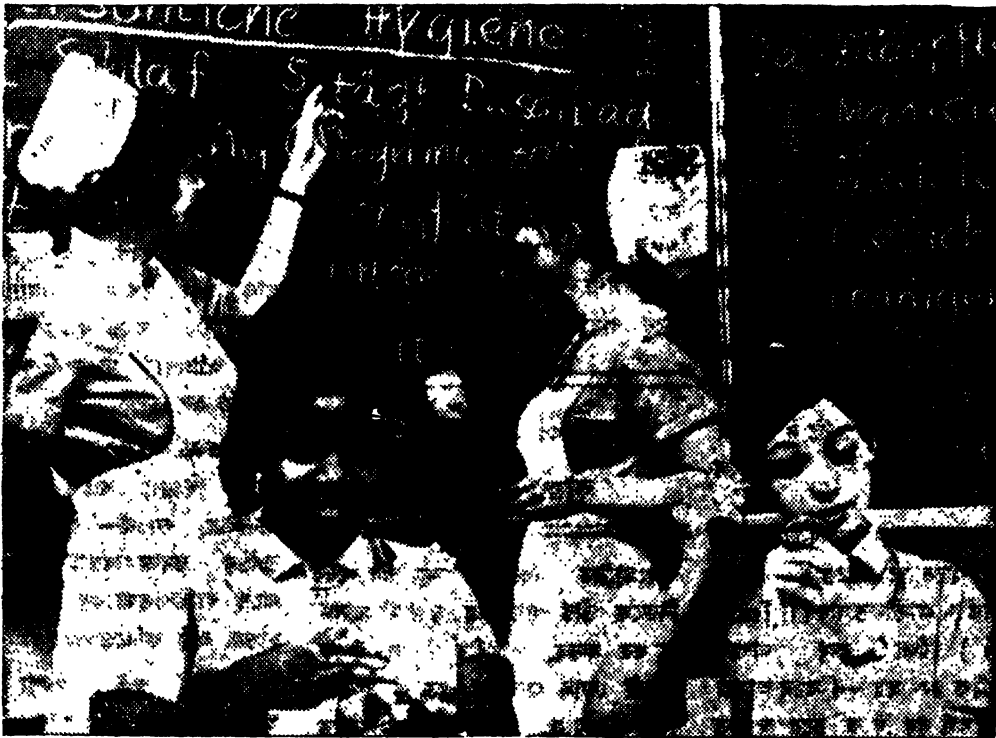
---

* উদ্ধৃতিগুলি প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত রচিত "কালান্তরের পথিক রমাঁ রঁল্যা" হইতে নেওয়া।

বিদেশের হাসপাতালে শিক্ষারত নার্সরা সম্প্রতি প্রসাধন করার অনুমতিলাভ করেছেন। কয়েকজন নার্সকে প্রসাধন করার শিক্ষা নিতে দেখা

সেই দুপুর…সেই সন্ধ্যা…সেই রাত্রি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তীব্র নীল অগ্নিশিখা আকাশের বুক চিরে ছুটে যায় গুরুগম্ভীর নির্ঘোষে, কাছেই কোথায় বাজ পড়ে, ঝমঝম বৃষ্টিধারার সঙ্গে ছুটে আসে কালবোশেখীর প্রমত্ত বাতাস। স্তব্ধ হোয়ে যায় ঝড়ের তাণ্ডব। কখন জমেছে মেঘ দেখেনি কেউ। দরজার কাছে ছুটে এসে যতীশের কাঁধ দুটো শক্ত হাতে চেপে ধরে ডাক্তার। তীব্র জ্বলন্ত চোখ দুটো যতীশের চোখে স্থির রেখে বলে—পালাচ্ছো যে বড, যদি যেতে না দিই, যদি জোর করে শুইয়ে রাখি হাসপাতালে ?

সে জোর হারিয়েছো বন্ধু।

হেসে ওঠে যতীশ।

দু' সপ্তাহ ধরে খুঁজে খুঁজে হার মেনেছি আমি। ভেবেছো, না বলেই পালিয়ে যাবে আমায় চিরদিনের মত হারিয়ে দিয়ে ? তা হবে না। বলে যাও, তোমার মৃতা দিদির স্বামীর ঠিকানা কি ?

চোখ ফিরিয়ে নেয় যতীশ,—হেরে বসে আছো।

প্রায় মুখের ওপর মুখ নামিয়ে আনে ডাক্তার।

ফিসফিস গলায় বলে,—মায়া কোথায় ?

জানি না।

একধাক্কায় তাকে দূরে ঠেলে, খোলা দরজা দিয়ে পথে নেমে যায় যতীশ।

একমুহূর্ত স্তব্ধ হতচকিত ডাক্তার নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরক্ষণেই মুখ বাড়িয়ে প্রাণপণ চিৎকারে ডাকে,—যেও না, ফিরে এসো যতী, কোথায় যাচ্ছো এ ভীষণ জলঝড়ে ?

সাড়া পাওয়া যায় না কারও। ঘন চকিত বিদ্যুতের আলোয় শুধু দূরে দেখা যায় একটা মানুষের ছুটন্ত মূর্তি। তীক্ষ্ণ বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে যায় ডাক্তারের সর্বাঙ্গ। ডাক্তারের চিৎকারের শব্দে নেশার ঘুম ভেঙে যায় ভিখুর। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে।

সাব ?

হ্যাঁ, আয়।

গম্ভীর মুখে দোর ঠেলে ঘরে ঢোকে ডাক্তার, পিছনে ভিখু।

ক্লান্ত মন্থর পা ফেলে, এসে দাঁড়ায় ডাক্তার ঘরের মাঝখানে লম্বা টেবিলটার ধারে। যেখানে সকাল থেকে পড়ে আছে একটা চাদর-ঢাকা মৃতদেহ।

পিছনে চেয়ারটা এগিয়ে দেয় ভিখু। বসে না ডাক্তার। অন্যমনস্কে ঢাকা দেহটার পানে চেয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

শোভা চৌধুরী

অন্য চেয়ারটায় আগে থেকেই ছুরি-কাঁচি সাজানো ট্রেটা গুছিয়ে রেখেছিল ভিখু। এখন তাই থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে, টেবিলের ওধারে গিয়ে দাঁড়ায় ভিখু ডাক্তারের মুখোমুখি। দাঁড়িয়ে থাকে নির্দেশের অপেক্ষায়। ডাক্তারের নির্দেশে এ সব কাটা-ছেঁড়ার কাজগুলো সেই কোরে আসছে এতদিন।

সাব !

হুঁ।

বাঁ হাত দিয়ে মৃতের গায়ের ঢাকা চাদরটা টেনে সরিয়ে দিয়েই তীব্র বিদ্যুৎস্পর্শে শিউরে, থর থর করে কেঁপে উঠে নিস্পন্দ হোয়ে যায় ডাক্তার।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদটা রুদ্ধকণ্ঠে বেধে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে—মায়া ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই। তার জীবন-যন্ত্রণা, তার নিভৃত অন্তরমন্দিরে চিরজাগ্রত সুবর্ণ প্রতিমা—যৌবনের একান্ত স্বপ্ন কামনাময় মহা সর্বনাশ, এই তো সে। যার জন্যে মাথায় নিতে চেয়েছিল সমাজ-সংসারের প্রচণ্ড প্রতিবাদের প্রলয় ঝড় নির্ভয় অসঙ্কোচে, ছেড়ে দিতে চেয়েছিল আত্মপরিজন। সমস্ত ভবিষ্যৎ—হাজার জনের মাঝে। জীবনে-মরণে বিজনের চোখের সামনে তার লুকোবার স্থান কোথায় ? ওই তো গোলাপী ঠোঁটের নীচে—না, না, গোলাপী তো নেই আর, নীল মেরে গেছে তা মৃত্যুর—না, জীবনের হলাহলে। ঠোঁটের নীচে ওই তো সেই কালো কুচকুচে তিলটা। যেখানে—পরনে ফিকে আকাশ রঙের প্রিণ্ট পাড় সাড়ী, ধানীরঙের জামাটা দুমড়ে মুচড়ে আছে। ধপধপে সাদা পা দুটো ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে। বুঝি এতদিনে সে পৌঁছতে পেরেছে বিজনের কাছে, তারই শান্তিতে। নিরাভরণ ডানহাতটা পড়ে আছে পাশে। লোহা আর সাদা শাঁখা পরা বাঁ হাতখান কে বোধ হয় তুলে রেখে গেছে উন্নত বক্ষখানার 'পরে—ছোট কপাল ছুঁয়ে সরু সিঁথিটার প্রান্তে এখনও জ্বলছে সিঁদুরের রাঙা অগ্নিশিখা—যে শিখাটি লেলিহান ক্ষুধার্ত জিভ মেলে গ্রাস করেছে তার—না, না, সে সিঁদুর তো অমন সহজে রেখায় দেয় নি বিজন ? কোঁকড়া কালো চুলে ভরা মাথাটায় যদিও বয়েসের স্বাক্ষর এঁকেছে দুচারগাছি রুপালী রেখা তবুও তা আজ তেমনি ঘন। বাঁ কানের একটু ওপরে সেই ঘন চুলগুলো সরাতেই—ওই তো, ওই তো সেই রাঙা তিলক, নিত্য সযত্ন অঙ্কনে যখন পুরু হোয়ে আছে বিজনের বুকের জমাট রক্তের মত।

কাঁদতে চায়—কাঁদতে চায় বিজন সর্বনাশী কলঙ্কিনীর জন্যে—আর, আর একটু নিজের জন্যে। কিন্তু কোথায় জল ? মরুভূমিতে কি মেলে বৃষ্টির শীতলতা ? শায়িতার দুটি আধখোলা দীর্ঘ পল্লবাঙ্কিত চোখের পানে অপলকে চেয়ে থাকে বিজন,—

বিজন, ভুলে গেছো, সেই দুপুর—সেই সন্ধ্যা—সেই রাত্রি ?

অজগর দৃষ্টি মুগ্ধ আবদ্ধ চোখে

চেয়ে আছে বিজন,—ভুল, সব ভুল, এতদিন যা দেখেছে, যা ভেবেছে, যা কোরেছে সব ভুল, দুঃস্বপ্ন। কোথায় অতিক্রান্ত পঁচিশটা বছর? কে বলে কেড়ে নিয়েছে মৃত্যু? ওই তো সেই বঙ্কিম ভঙ্গিতে আমগাছটার হেলান দিয়ে তেমনি কৌতুকে হাসছে মায়া,—বিজন, তুমি না বলেছিলে আমার কাউকে ছুঁতে দেবে না?

না, না, না, কাউকে ছুঁতে দেবো না, আমি—আমিই—

স্তব্ধ নিস্পন্দ ডাক্তারের পানে তাকায় ভিখু, যদিও নেশাচ্ছন্ন তবু মনে হয় সময় যেন অনেকটা বয়ে গেছে, তবু আদেশ পায়নি সে—সাব্!

হাত বাড়িয়ে দেয় ডাক্তার ছুরিটার জন্যে।

কোন দূরপ্রান্ত থেকে যেন ভেসে আসে কণ্ঠস্বর,—যা, বাইরে বোস গিয়ে।

ডাক্তারের প্রসারিত হাতে ছুরিটা তুলে দিয়ে, বাইরে বেরিয়ে যায় ভিখু দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে।

গোস্বামীদের মস্ত দীঘি, গোঁসাই পুকুর।

এরই ধারে, দেশের মান্যগণ্য অবস্থাপন্ন একান্নবর্তী বড় পরিবার গোস্বামীদের পাকা দোতলাবাড়ী। পেশা এঁদের গুরুগিরি, শিষ্যদের কানে মন্ত্র দেওয়া। বাড়ীর কর্তা বড় গোঁসাই শিবরাম গোস্বামীর বড় ছেলে বিজন। ছোটবেলায় মাতৃহীন, তাই সবার আদরে, আবদারে যেমন দুরন্ত, তেমনি জেদী। কিন্তু পড়াশোনায় মাথা খুব সাফ, স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়।

গোঁসাইবাড়ীর ডানদিকে সামান্য দূরেই স্বর্গীয় মনোহর ঘোষের ছোট মাটির বাড়ীটা। মনোহরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী, একমাত্র পুত্র যতীশকে নিয়ে বাস করেন। জমিজমা সামান্য কিছু আছে, তাতেই চলে সংসার।

যতীশ বিজনের বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে খেলে, স্কুলে পড়ে, দুজনে ঝগড়াও যত, ভাবও তেমন।

এদের সঙ্গে আবার জুটেছিল এসে মায়া। বয়েসে এদের চেয়ে বছর দুয়েক ছোট হোলে কি হয়, গাছে চড়ে, সাঁতার কেটে, খেলাধূলায় হুল্লোড় করে সমান পাল্লায়। ওরা স্কুলে পড়ে, মায়া পড়তে যায় না। তাই বাড়ীতে দুটো ছেলে তার মাস্টারী করে।

মায়া, বিধবা মঙ্গলা বুড়ীর মা, বাপমরা ভাইঝি। মঙ্গলার তিনকূলে আর কেউ নেই। ছোট্ট ভাইঝিটাকে নিয়ে এসে উঠেছিল যতীশদের বাড়ীতে। স্বজাত এবং যতীশের মায়ের বাপের বাড়ীর দেশের মেয়ে, এই সামান্য সম্পর্কের সূত্রটুকু ধরে।

যতীশের মায়ের শরীর রুগ্ন, তা ছাড়া ছোট্ট ফুটফুটে মায়াকে দেখে মনে দয়া জেগেছিল। বলে, আহা থাক, নিরাশ্রয় বিধবা কোথায় যাবে ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে?

রয়ে গেল মঙ্গলা মায়াকে নিয়ে। হাতে তুলে নিলে যতীর মার সেবা আর সংসারের ভার। যতীর মার স্নেহে মায়া হোয়ে গেল বাড়ীরই মেয়ে।

দুই মাস্টারের ঠেলায় কিন্তু মায়ার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বিজনের ধৈর্য কম, পড়ায় অমনোযোগ দেখলেই দেয় গুমগুমিয়ে কিল বসিয়ে, কেঁদে ভাসায় মায়া।

যতীশ কিছু ধীর প্রকৃতির, মায়ার চোখের জল মুছিয়ে সে পড়াবার ভার নেয়। দেখে রাগে ক্ষেপে ওঠে বিজন,—ওঃ, আবার আদর দেওয়া হোচ্ছে। তুমিই মাথাটি খাচ্ছো যতীশ, আদর দিয়ে পড়া হয় না।

রেগে যায় যতীশও,—আদর কিসের, আমি মারি না তাই আমার কাছে পড়তে চায়।

বাদ প্রতিবাদে ঝগড়া বেধে ওঠে, অবশ্য মিটতেও দেরী হয় না।

সময় বয়ে যায়, থেমে আসে কৈশোর প্রাণের উচ্ছলতা। মনের নিভৃত মণিকোঠায় জ্বলে ওঠে, দীপ্ত দীপশিখা যৌবন সমারোহে।

আর ছুটোছুটি কোরে খেলে না তারা। মায়া থাকে সংসারের কাজ আর অবসরে পড়াশোনা নিয়ে, কিন্তু ক্ষণিক আলাপে, চকিত দৃষ্টিপাতে প্রতিক্ষণেই অনুভব করে মায়া, দুটি তরুণ মনের তপ্ত স্পর্শ রোমাঞ্চিত পুলক শিহরণে।

ক্ষণে ক্ষণে তা জ্বলে ওঠে যতীশের দুটি শান্ত চোখের তারায় উজ্জ্বল আভায়, আর ঈর্ষাতুর দস্যি বিজনের বজ্রমুঠির পাণিপীড়নে।

চাকতে, রাখতে জানে না সে। তা উজাড় কোরেই দেয়, তাই কেড়ে নিতে চায় তেমনি কোরেই, যেন দুর্বি ঝড়, কিন্তু যতীশ? তার চোখের ওই শীতল সরোবর? ডুব দিয়ে শান্তি মেলে।

ঘড়ির পেণ্ডুলাম দোলে মায়ার মন।

কিন্তু হৃদয়ের ভাষা মুখে দাবী জানাবার আগে, দুজনকেই স্কুলের পড়াশেষে চলে যেতে হোল কোলকাতায় কলেজে পড়তে।

শূন্য মনে একা পড়ে থাকে মায়া। ছুটিতে যখন বাড়ী আসে ওরা আবার সাড়া জাগে, কেটে যায় ক'টা দিন হাসি-গল্পে-আনন্দে।

আই-এস-সি পাশ কোরে বিজন ঢুকলো ডাক্তারী পড়তে। বি-এ পাশের পর যতীশ ফিরে এলো গ্রামের স্কুলেই মাস্টারী চাকরী নিয়ে।

মায়ার পিসী বুড়ী মঙ্গলা অস্থির হোয়ে ওঠে মায়ার বিয়ের ভাবনায়। নিতাই ঘটকের পায়ে ধরে কাঁদে, মায়ার একটা পাত্র জোগাড় কোরে দেবার জন্যে, কিন্তু বিয়ে মায়ার হয় না। বাপ-মা-মরা পরান্নে পালিত এমন হাঘরের মেয়ে ঘরে তুলতে চায় না যোগ্য পাত্রের অভিভাবকরা, তা থাক না মেয়ের যাই রূপ গুণ, একটা পরিচয় দেবার কিছু থাকা চাই তো? অবশ্য দয়া-ধর্ম দেখাতে এগিয়ে আসে কয়েকজন দ্বিতীয় পক্ষ, তৃতীয় পক্ষ বয়োবৃদ্ধেরা, কিন্তু রাজি হয় না কিছুতেই যতীশের মা। মঙ্গলা কাঁদে, তবু সে লোককে ধরে একটা সম্বন্ধের জন্যে। মায়া নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তেই কাটায়।

দেখতে দেখতে কুড়ি বছর বয়েস হোল তার।

সেদিন সন্ধ্যায় মায়ার এক সম্বন্ধের খবর এনে, যতীর মাকে বোঝাতে বসেছিল মঙ্গলা,—এ ছেলে বুড়ো-হাবড়া নয় যতীর মা, পাশের গাঁয়ের মুদি দোকানে খাতা লেখার কাজ করে, একটা ঘরও আছে। তুমি আর অমত কোর না এতে, তা হলে এই শ্রাবণেই বিয়েটা হোয়ে যায়। ছেলেটি মায়াকে কবে নাকি দেখেছে, তাই কিছু দাবী-দাওয়াও কোরছে না।

যতীর মা হেসে বলে,—তুই বড় পাগল দিদি। কত বার তো বলেছি, মায়ার বিয়ের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। কথা যদি কিছু শুনিস, কেবল শুধু শুধু লোকের পায়ে ধরে বেড়াস। আজ স্পষ্ট কোরেই বলি, যতীর বউ কোরে মায়াকে আমিই নেবো। এতদিন যতীর পড়া শেষের অপেক্ষায় ছিলাম। তুমি কি বলো বাবা বিজন, দুটিতে ভালই মানাবে না? শ্রাবণের তো মাঝামাঝি হোয়ে গেল, ভাবছি শেষের দিকেই দিন কোরব।

কয়েকদিন হোল ছুটিতে এসেছে বিজন, এ বাড়ীতে গল্প কোরতে রোজই আসে, আজও সন্ধ্যের পর এসেছিল। যতীশও বসেছিল চা খেয়ে টিউশানিতে যাবে। চা এনে তাকে দেয় মায়া, বিজনকে দিতে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল সে, হাত বাড়ায় না বিজন। চকিতে তার পানে একপলক চেয়ে যতীর মাকে বলে—চা এখন আর খাবো না কাকীমা। বাবা একটা জরুরী কাজ বলেছিলেন ভুলে চলে এসেছি, এখন যাই।

ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যায় সে। একবার বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখে, কাপ নিয়ে ফিরে যায় মায়া।

পরদিন দুপুর, জলন্ত রোদে খাঁ-খাঁ কোরছে চারদিক, শ্রাবণ আকাশে বৃষ্টির গন্ধ নেই। অসহ্য গুমোট গরম। যে-যার ঘরে আলস্যে শুয়েছে। শুয়েছে যতীর মা, মঙ্গলাও। রবিবার ছুটির দিন, দুপুরে ঘুমোন অভ্যেস নেই, একটা বই হাতে শুয়ে আছে যতীশ। গোঁসাই পুকুরে নিজেদের শানবাঁধান ঘাটে, ছিপ হাতে মাছ ধরতে বসেছে বিজন। মন অন্যমনস্ক দৃষ্টি ছিল না ছিপে। হঠাৎ টান পড়তে চমকে যেই টেনেছে, একটা বড় মাছ জলের ওপর লাফ দিয়ে ল্যাজ আছড়ে, ডুব দেয় জলের তলায় ছিপের সুতো কেটে তাকে হতভম্ব করে।

খিলখিল হাসির শব্দে দেখে যতীদের বাড়ীর সামনে, পুকুরপাড়ের একটা আমগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, মুখে আঁচল চেপে হাসছে মায়া।

পুকুরের চারপাড়েই নানা ফলের গাছ। ছিপ ফেলে টপাটপ ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে, গাছের সারির ভেতর দিয়ে এসে একেবারে তার সামনে দাঁড়ায় বিজন।

ঘামঝরা, রোদলাগা আরক্ত মুখ তার।

কঠিন গলায় বলে,—হাসছো যে বড়?

আর একচোট হেসে আঁচলে ঘাম মুছতে মুছতে মায়া বলে,—শিকারের বহর দেখে।

তীক্ষ্ন চোখে তাকায় বিজন,—মাছ পালাতে পারে, কিন্তু তোমায় পালাতে দেবো না।

আবার হেসে ওঠে মায়া,—ওমা ছেলের রাগ দেখো, দাও না কি শাস্তি দেবে। পালাচ্ছি কোথায় যে—দাও না কি শাস্তি দেবে।

এত উল্লাস কিসের?

উল্লাস?

অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠ বিজনের,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, উল্লাস যে আর ধরছে না দেখি, যতীর বউ হবে বলে?

যদি হই, তোমার রাগ কিসের? আর বিয়ে হোলে উল্লাস হয় না লোকের, তার যদি মনোমত পাত্র হয়?

সকৌতুক বাঁকা চোখে তাকায় মায়া।

রাগে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে বিজন,—না হয় না, হয় না, অন্তত তোমার হবে না। যতেকে বল, তার এ স্পর্দ্ধা বিজন সহ্য কোরবে না।

কেন, কোরবে না কেন? যে আমার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, যদি এখন তারই হয়, তাতে তোমার কি?

হাসি থামিয়ে মায়া শান্ত গলায় বলে।

আমার কি তা বোঝ না তুমি, এত নির্বোধ না কি? আশ্রয়দাতা হোলেই কি সব জায়গায় হাত বাড়ান যায়, সবার 'পরে সব কিছু দাবী করা যায়?

মায়ার হাতটা চেপে ধরে বিজন।

যায়, কিন্তু সে তা করে নি, এ তারই মহত্ত্বের পরিচয়। স্থির করেছেন

তার মা, আর আমার পিসী, তাঁরা আমাদের গুরুজন।

তাই তুমি তা মেনে নেবে?

হ্যাঁ।

উত্তেজনায় জ্ঞানহারা বিজন।

তার গালে ঠাস কোরে একচড় মেরে বলে,—না, না, না, তোমায় আমি কাউকে ছুঁতে দেবো না, তুমি আমার। তার আগে তোমায় এই গোঁসাই পুকুরে ডুবিয়ে মারবো, মরব আমিও। এসো, নেমে এসো জলে।

তার কঠিন মুঠোর সজোর আকর্ষণে, মায়া ছিটকে এসে আছড়ে পড়ে তার বুকের ওপর।

দুচোখ ভরা জল নিয়ে, জোর কোরে হাত টেনে নিয়ে মায়া এগোতে যায় বাড়ীর দিকে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দুজনেই দেখতে পায়---খোলা দরজাটার গায় হাত রেখে, তাদের পানে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে যতীশ।

ঘরে ফিরে দোর বন্ধ কোরে ফুলে ফুলে অনেকক্ষণ কাঁদলো মায়া। বিজনের চড় খেয়ে দুঃখে অপমানে নয়, নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণের আনন্দ বেদনায়। সেদিনই সন্ধ্যায়, সারাদিন গুমোটের পর ঘনঘটায় আকাশ ছেয়ে নামলো ঝমঝম বৃষ্টিধারা। বাতের ব্যথা হোচ্ছে যতীর মার, ঘরে শুয়েছে। মঙ্গলা বসেছে মালিশ কোরে সেঁক দিতে।

রান্না সারা হোয়ে গেছে। বিছানায় হ্যারিকেনের সামনে একটা বই খুলে বসেছে মায়া। দরজায় কড়া নড়তে উঠে গিয়ে খুলে দেয়।

রেনকোট জড়িয়ে প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে ঢুকে আসে বিজন।

তাকে কিছু না বলে চলে যায় যতীর মার ঘরে,---যতী কোথায় কাকীমা?

সে তো বাবা ছেলে পড়াতে গেছে।

একটু দরকার ছিল।

আসবে এখুনি, বোধহয় বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে। তুমি বরং বাবা মায়ার ঘরে একটু বস গে, তার রান্না হোয়ে গেছে।

বিছানায় একটা হাঁটুর 'পরে চিবুক চেপে খোলা বইয়ের সামনে বসেছিল মায়া, বিজনের ঢোকাটা বুঝলো, ফিরে দেখলো না যেমন ছিল তেমনি রইল।

তার গা ঘেঁষে পিছনে বিছানায় বসে বিজন।

কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে,—রাগ কোরেছ?

নীরব মায়া।

অনুতাপকাতর কণ্ঠে আবার বলে,—জানো তো রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না, তবু কেন যে রাগাও।

কথা কয় না মায়া, মুখও ফেরায় না।

এবার জোর কোরে নিজের পানে তার মুখটা ফিরিয়ে ধরে বিজন,—চড়টা বড্ড লেগেছিল, না? বিশ্বাস করো, মারতে তোমায় চাইনি, রাখতে চেয়েছিলাম এখানে। মুখ ছেড়ে দুহাতে তাকে নিজের বুকে চেপে ধরে সে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,---তাই যতীকে আমি কিছুতেই সইতে পারি না।

তবু স্তব্ধ মায়া।

একহাতে তাকে শক্ত কোরে বুকে চেপে, অন্যহাতে মুখখানা তুলে ধরে বিজন,—কথা বলো মায়া, চাও আমার দিকে। বলো, আমার এখানেই তুমি চিরদিন থাকবে?

শিশুদের তত্ত্বাবধান করছেন সোভিয়েত রাশিয়ার এক কারখানার কর্মরত মায়েরা

হু-হু কোরে কেঁদে ফেলে বিজনের কাঁধে মাথা রাখে মায়া,—কি কোরে তা হয় বিজন, তুমি গোঁসাই বাড়ীর ছেলে, আর আমি কায়েতের মেয়ে, এ যে অসম্ভব। তোমার বাবা—

হাত দিয়ে তার মুখে চাপা দেয় বিজন,—সে চিন্তা আমার, তুমি শুধু তোমার কথা বলো।

দুচোখে জল, আর মুখভরা লজ্জিত হাসি নিয়ে তাকায় মায়া,—কি দস্যি ছেলে বাবা, মুখ দিয়ে না বলিয়ে বুঝি ছাড়া যায় না? এ যে আমার দুর্লভ স্বপ্ন বিজন, চিরদিন তাই মনের তলায় লুকিয়েই রেখেছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোরতেও ভরসায় কুলোয় নি।

তোমার সেই ঈশ্বরের নামেই তবে আজ তা এ জন্মের মত স্বীকার কোরে নাও? সময় নেই, এখুনি যতী এসে পড়বে, আসতে পারে অন্য কেউ।

সবিস্ময়ে দেখে মায়া পকেট থেকে একটা সিঁদুরের প্যাকেট বার কোরে, আঙ্গুলে খানিক তুলে নিয়ে বাঁ হাতে তার সিঁথির চুলগুলো সরায় বিজন।

চমকে মাথাটা একটু সরিয়ে নেয় মায়া,—কি কোরছ বিজন, পাগল হোলে নাকি? জলজ্বলে রাঙা সঁথি নিয়ে কাল সকালে আমি সবার কাছে বেরোব কি কোরে, কি বলব সবাইকে? বোল, এ বিজনের অত্যাচার।

তার উদ্যত হাতখানা থামাতে পারে না মায়া।

শেষে নিরুপায়ে বলে,—বেশ, দেবেই যদি এই বাঁদিকে কানের ওপরের চুলটার তলায় দাও যে চুল না হয় ঢেকে রাখবো। কি গোঁয়ার ছেলে বাবা, যা ধরবে তাই।

মায়ার নির্দেশিত স্থানেই সিঁদুরটা সযত্নে লাগিয়ে দিয়েই হাসে বিজন, —গোঁয়ার না হোয়ে উপায় কি? ছুটি ফুরুলো, কাল কোলকাতা যেতে হবে। তারপর ফিরে এসে দেখি আর কি যে বাধ্য মেয়ে, গুরুজনের ইচ্ছে পূরণ কোরতে, অন্যের ঋণ শুধতে, ওই বতেটার গলায় মালা দিয়ে বসে আছো। তখন আমার উপায় কি হবে? তাই সীল কোরে গেলাম।

মায়ার ঠোঁটের নীচের কালো তিলটার 'পরে সে নিজের উত্তপ্ত ঠোঁট দুটো চেপে ধরে। দুহাতে তাকে জড়িয়ে বুকে মাথা রাখে মায়া,—তোমার উপায় তো হোল, এবার আমার উপায়?

সে জন্যেই তো তাড়াতাড়ি পালাচ্ছি কোলকাতা, গিয়েই বাবাকে চিঠি দিতে হবে তো?

ওমা গো, কি নির্লজ্জ ছেলে, তুমি নিজের হাতে চিঠি লিখতে পারবে বাবাকে যে আমি মায়াকে বিয়ে কোরব?

পারবো। আর নির্লজ্জ নই বলেই মুখোমুখি বলতে পারলাম না, চিঠির মধ্যে দিয়েই ঝগড়া চালাতে হবে।

মুখ নামায় মায়া,—আমার জন্যে তুমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া কোরবে বিজন?

দুহাতে তার মুখখানা বুকে চেপে ধরে বিজন,—শুধু বাবা নয়, তোমার জন্যে লড়াই কোরতে পারি স্বয়ং ভগবানের সঙ্গেও।

তোমার প্রফেসার ডাঃ ভটচায্ তাঁর একমাত্র মেয়েকে তোমার হাতে দিয়ে, তোমায় বিলেত পাঠাবেন বলে তোমার বাবাকে সাধাসাধি কোরছেন, শুনেছি তোমার বাবাও খুব খুসী হোয়ে রাজি হোয়েছেন। তোমার কাণ্ড জেনে, তিনি যদি তোমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন?

হাসি চেপে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বিজন বলে,—তাহাই সম্ভব। নাহি ডরি তাহে, তোমারে লইয়া হবো দেশান্তরী, লইবো চাকুরী হে ভীরু রমণী।

সভয়ে চোখ বড় করে মায়া,—আর তোমার ডাক্তারী পড়া?

নাহি প্রয়োজন, রহিবে শিকায়।

তোমার আত্মীয়স্বজন, বাবা, সমস্ত ভবিষ্যৎ ছেড়ে তুমি—

এবার ধমকে ওঠে বিজন,—থাম. সে ভাবনা আমার, তোমার পাকামী কোরতে হবে না।

বৃষ্টি তখনও ঝরছে, তার মাঝেই নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় বিজন।

ক্রমশঃ।

মার্টিন লুথার কিং এবং মৃত্যুতে

শ্রীমতী মায়ালতা রায়

অমরের বাণী লয়ে এল যে মহান
রোপিতে অমৃত বৃক্ষ এই সর্বনাশী
বিষাক্ত পৃথিবী 'পরে, আঁধারের মাঝে
জ্বালাতে সত্যের চির অনির্বাণ শিখা।
মানবের হাহাকার দিল তারে বাণী,—
কালের ভ্রূকুটি লঙ্ঘি গর্জিল তাহার
বজ্রসম কণ্ঠস্বর; সেই মহাদেহী
অমর-সন্তানে আমি করি নমস্কার।

যে সর্পের লোলজিহ্বা নিল অরে টানি
অকালে, কাঁদায়ে সবে, ধরাতল হতে
হে মানব সন্তানগণ মানবের মাঝে
ভুলিও না সে রাক্ষসে, মনুষ্য রক্ত যে
শোষিতেছে অহর্নিশ অতৃপ্ত তৃষায়;
চিনিয়া তাহারে ফেল আবর্জনাস্তূপে।

বারি দেবী

অনেক কাল পরে সমুদার সঙ্গে বসেছি মুখোমুখি হয়ে। নেই কোন সঙ্কোচ লজ্জা। নেই অবান্তর মিঠে কথার ফুল ছড়িয়ে পরস্পরকে মুগ্ধ করার চেষ্টা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। অনেকদিন পরে ছাদে এসে বসেছি পাওয়ার সায়েবের বাগানে।

গাছপালার দিকে বুঝি আজকাল আর মন দেয় না সায়েব, তাই আপন ইচ্ছায় এলোমেলো ভাবে বেড়ে উঠেছে ওরা। গাছে গাছে জড়াজড়ি খেয়ে জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। আর সেখানে ফুটে আছে রাশি রাশি ফুল। কাঁটা-লতায় ঢেকে গেছে ছোট্ট কটেজটি। সেখানে হলদে বেগুনি লাল, নানা ফুলে ভরা অর্কিডগুলো, সাপের মত এঁকেবেঁকে এধারে ওধারে ঝুলছে। তার মাঝে বসে আমার অভিশপ্ত জীবন-কাহিনী শুনছে সমুদ্রগুপ্ত।

আমার সকল কথা, শেষ হলে পর, বিষাদভরা গলায় বললো সে—হায়। রূপকথা, তোমার জীবনে এত ঝড় গেছে, তার বিন্দুমাত্র যদি জানাতে আমায়। তোমার সমুদাকে একবার কেন ডাক্‌লে না? একটু চেষ্টা করলেই তো জানতে পারতে, তোমার কত কাছে ছিলাম আমি। কলেজ স্ট্রীটে বই-এর দোকান আমার, নাম তার নির্জন প্রকাশনী। ভালো লেখকের কিছু বই ছাপাই, বিক্রি করি, আর একটা ম্যাগাজিনও চালাই। এই কাজেই তো ডুবে আছি দশ-বারো বছর। অবশ্য আমার দিক দিয়েও বড় ত্রুটি হয়ে গেছে, মানি সে কথা। কারণ বড়দিদা বারবার আমাকে বলতেন, রূপাকে আমার দেখবার কেউ নেই। সমু, তুমি ওকে দেখো।

বড়দিদা মারা যাবার পর যখন তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে গেলেন, তখন কেন জানি না, বড্ড ভয় হয়েছিলো আমার মনে। তখন তোমার মামা যদি না ছাড়তেন তো ভালো হত। যাক্‌ গে সে কথা। তারপর কতদিন আমার মনে হয়েছে, একবার গিয়ে দেখে আসি তোমায়, কিন্তু তা পারি নি কারণ অত বড়লোকের বাড়ীতে নিজেকে কেমন অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, তখন যদি যাওয়া-আসা করতাম আমি, তবে হয়তো এত বিপর্যয় ঘটতো না তোমার জীবনে।

—তোমার কোন দোষ নেই সমুদা। আমার ভাগ্যের ফল যে আমাকে নিতেই হবে। তোমাকে মনে মনে আমি অনেক খুঁজেছি সমুদা, কিন্তু তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবার উপায় ছিল না আমার। আর এত দুঃখের বোঝা যে আমায় বইতে হবে, তাই তখন তোমাকে দূরে থাকতে হয়েছে, এই আমার কপালের লিখন। জবাব দিলাম আমি।

পাওয়ার সায়েব মৃদু নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে কফি রেখে গেল।

কফি খেতে খেতে বললো সমুদা—মনে পড়ছে রূপা, সেই সেদিনের কথা। যেদিন প্রথম আমি এসেছিলাম তোমাদের বাড়ীতে। আর তোমার মামাতো ভাই-বোনেদের হাসি-ঠাট্টার দাপটে, কেমন যেন কুঁকড়ে গিয়েছিলাম, যেমন করে কচ্ছপগুলো নিজের খোলের ভেতর আত্মগোপন করে বাইরে থেকে কোন আঘাত পেলে। তারপর তুমি এসে আমার হাত ধরে নিয়ে গেলে। ওদের অত্যাচার থেকে বাঁচালে আমায়। তখনই আমার মন জানলো এ দুনিয়ায় আমার প্রিয়জন, আপনজন বলতে মাত্র এই তিনজন। বড়দিদা, আমার দিদা আর তুমি। সেই থেকে এই তিনজন ছাড়া, অন্য কারুর সঙ্গে আর হল না আত্মীয়তা—মানে মনের আত্মীয়তা। আর সকল ক্ষেত্রেই রইলাম আমি ঐ খোলসের ভেতরে লুকিয়ে। তাই এ জগতে আমার আত্মার আত্মীয়, বন্ধু কেউ নেই রূপা, আমি একা। আজ তোমায় দেখছি, তুমিও সেই আমার মতই একা।

চশমা খুলে, বারবার চোখ মুছলো সমুদা।

আমারও বুকের ভেতর কান্নার সাগর উত্তাল হয়ে উঠেছে। মামার বাড়ী থাকাকালীন, আমার সকল আবদার দৌরাত্ম্য যে হাসিমুখে সহ্য করেছে, আমাকে খুসি করার দিকে যে ছিল অসাধারণ মনোযোগী, আমার দিদিমার পরম প্রিয়জন, আর একমাত্র বিশ্বাসের যোগ্য পাত্র যে, আজ দীর্ঘকাল পরে সে এসেছে আমার পাশে। সে শুনেছে আমার বিষাদভরা কাহিনী। তার চোখের জল ঝরছে, আমার জন্যে।

সকল কান্নার তীব্র বেগকে বুকে চেপে বললাম—তুমি যে দিদিমার সব ইচ্ছা জান না সমুদা। তাঁর মনে একান্ত বাসনা ছিল, আমার সব ভার তোমার হাতে তুলে দেবার,—আর কারুকে যে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

—জানি রূপা ! গাঢ়স্বরে বললো সমুদা।

—বড়দিদা আমাকে বলেছিলেন সে কথা, কিন্তু সাহস পাই নি আমি। নন্দনের পারিজাতকে কি আমার মত চালচুলোহীন নিঃস্ব ফকির তার কুঁড়েতে আনতে পারে ? তখন কথাটাকে বড়ই অসম্ভব মনে হয়েছিল।

—যাক্ গে সেদিনের কথা, কিন্তু আজ যে তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা জানাতে চাই রূপা আমার দেবে তো ?

—প্রার্থনা বলছো কেন সমুদা ? সেই আগেকার মত আমাকে সব কিছু করাবে তুমি স্নেহের অধিকারে। বল যা বলতে চাইছো।

—হ্যাঁ এই যে বলছি। আবার চশমা খুলে চোখ মুছলো সমুদা। তারপর ভারি গলায় বললো, —বিদেশ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এসে, তুমি যে মহান কর্মভার গ্রহণ করবে সঙ্কল্প করেছো, সেই কাজের ভার আমাকেও কিছুটা দিও। তোমার সঙ্গে থেকে, কাজ করে, যাতে আমিও জীবনে কিছুটা সার্থকতা পাই, স্বস্তি আর আনন্দ পাই, সেই সুযোগ তমি আমায় দেবে তো রূপা ?

---সমুদা, সমুদা গো। তুমি থাকবে আমার পাশে ? এ যে আমি ভাবতেই পারছি না সমুদা। বলতে বলতে, সেই ছোটবেলার মত, অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলাম ওর কোলের ওপর মুখ গুঁজে।

গভীর মমতার সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো সমুদ্র গুপ্ত।

৩

ম্যাডাম ডেনিয়েলের টেলিগ্রাম এসেছে।

আমার বাড়ী বিক্রি ও রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। সব টাকা হস্পিটাল তৈরীর জন্য মাদাম্ ডেনিয়েলকে, পাওয়ার সায়েব আর সমুদ্র গুপ্তকে ট্রাস্টি করে দানপত্র তৈরী করে ফেললাম। কিছু টাকা রইলো নিজের জন্য।

প্লেনের সিট্ বুক করা হয়ে গেছে, কাল ভোরে মাদ্রাজ রওনা হবো আমরা। সেখান থেকে মাদামের সঙ্গে আমি চলে যাবো আমেরিকায় আর পাওয়ার থাকবে মাদামের স্কুল-বাড়ীতে।

সন্ধ্যে থেকে হয়েছে দুর্যোগ সুরু। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে দমকা বৃষ্টি। কড়-কড় শব্দে বাজ পড়ছে। লক্লকে বিদ্যুল্লতা যেন ঝক্ঝকে ছুরি দিয়ে আকাশের বুকটা ফালা ফালা করে চিরে দিচ্ছে। জানুয়ারীর সন্ধ্যায় এমন অকাল দুর্যোগে, সকলকারই মন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

কিছুতেই ঘুম আসছে না চোখে। বারবার মনে পড়ছে সূর্যকান্তর কথা। কখনও বা মনের আকাশে ক্ষণবিদ্যুতের মত চমকে উঠছে—রজতের মুখখানা। আর বিশু বোসও উঁকি মারছে যেন তার পাশ থেকে। যে জীবন ফেলে চলে যাচ্ছি, সেই জীবন যেন পিছু ডাকছে আমায়। নানারকম চিন্তার ফাঁকে কখন এসেছে একটু তন্দ্রাভাব চোখে।

হঠাৎ এ কি ? ওখানে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে কে ? চমকে উঠে সভয়ে চাইলাম ওর দিকে। দেখলাম মাথা হেঁট করে নিবিষ্ট মনে পিয়ানো বাজাচ্ছে সূর্যকান্ত রায়। পর পর বাজিয়ে যাচ্ছে সুরের পর সুর।

বিটোফেন, সিম্ফনি,—সোনেটা।

পিয়ানোর সুর দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। শেষে যেন ঝড় বইতে লাগলো পিয়ানোর ওপর। সুরের ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে দুলতে লাগলো ঘরের ঝাড়-লণ্ঠনগুলো। তারপর যেন সজীব হয়ে উঠলো হলে সাজানো কিউরিও-গুলো। পেটমোটা ন্যাড়া, চক্চকে আবলুশ কাঠের প্রকাণ্ড চীনে লাফিং বুদ্ধ। শ্বেত-পাথরের ম্যাডোনা মূর্তি। জাপানী ভিক্ষু। ইটালীয়ান ঈগল পাখী, ভেনিসের নগ্নমূর্তি। আরো কত আকারের যত ছিল কিউরিও, সকলে যেন জীবন্ত হয়ে চোখ মেলে দেখছে সূর্যকান্তকে। অয়েলপেণ্টিং ছবিগুলো যেন আর ছবি নেই, ওরা সব প্রাণময় হয়ে উঠেছে সুরের যাদু লেগে।

সূর্যকান্ত আপন মনে সুরের ঝড় তুলে চলেছে তার কোনদিকে আর খেয়াল নেই। আমি নিদারুণ ভয়ে-বিস্ময়ে, দুঃখে, আনন্দে, চীৎকার করে ডাকতে গেলাম ওকে, —কিন্তু গলা দিয়ে একটুও স্বর বেরোল না। কি অসহ্য গরম লাগছে, মনে হচ্ছে যেন আগুন জ্বলছে চারিধারে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি সূর্যকান্তর চারিধারে কাঁপা-কাঁপা আগুনের শিখাগুলোকে। আবার চেষ্টা করলাম, চীৎকার করার জন্য, আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, ছুটে ওর কাছে যাবার জন্য, কিন্তু কিছুই পারলাম না। ক্রমে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছি আমি। সূর্যকান্তর পিয়ানোর বুকে জাগা 'সোনেটা' সুরের ঝড়ে এখন আগুন লেগেছে যেন। আগুনের উত্তাপে, ছট্ফট্ করছে মূর্তিগুলো, থরথরিয়ে কাঁপছে ছবির মুখগুলো। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই সূর্যকান্তর। সে আপন মনে সুরের যাদ বিস্তার করে চলেছে।

হঠাৎ মনে হল, আস্তে আস্তে পিয়ানোর সুর থেমে আসছে। আর সূর্যকান্তর দেহটা যেন আবছা অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। ঘরের বস্তুগুলো এখন প্রাণহীন জড় হয়ে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কানে ভেসে এলো পাওয়ার সায়েবের গীটারের করুণ-সজল ধ্বনি।

মৃদু চীৎকার করে আমি উঠে বসলাম বিছানার ওপর। দু' হাতে চোখ মুছে চাইলাম চারিধারে। শোবার ঘর থেকে দরোজা দিয়ে চাইলাম হলঘরের দিকে। কৈ কোথাও কিছু হয় নি তো ? সব ঠিক আছে। যেমনটি ছিল আগে। তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম ? না, চিরদিনের মত তার প্রিয় ভবনটি আমি ছেড়ে চলে যাবার আগে, একবার মহাশূন্য ছেড়ে সে নেমে এসেছিল, তার প্রিয় নিবাসটি দেখবার জন্য। আর তার অতি প্রিয় সুর 'সোনেটা' বাজিয়ে সুরের যাদু বিস্তার করে চলে গেল সে।

বৃষ্টির জন্য ঘরের সব জানলা বন্ধ করা ছিল, তাই ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে ঘরের ভেতরটা।

কপালে ঘাম্ জমেছে। সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে খানিক আগে, যে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপগুলো ঘটেছিলো ঐ হলে, তার রেশ যেন এখনও বিরাজ করছে ওখানে- দারুণ ভয়ে কেঁপে উঠলো আমার সর্বাঙ্গ। দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে চললাম, পাওয়ার সায়েবের ঘরের দিকে। মনে হল সে এখন জেগে আছে, কারণ শুনতে পাচ্ছি গীটারের সুর।

পর্দা সরিয়ে পাওয়ার সায়েবের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মৃদু নীলাভ আলো জ্বলছে ঘরে। বিছানায় বসে মুদিত নেত্রে একমনে গীটার বাজাচ্ছে পাওয়ার সায়েব। আমার পায়ের শব্দ বুঝি তার কানে যায় নি। সুরের অতলতলে নিমগ্ন হয়ে গেছে তার দেহ-মন।

ওর মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম আমি। দরদর করে চোখের জল ঝরছে ওর দুটি গাল বেয়ে।

পাওয়ার সায়েব কাঁদছে? কোন-দিন তো ওকে কাঁদতে দেখিনি। অসাধারণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অমানুষিক শক্তির প্রতীক্ পাওয়ার সায়েব, বালকের মত আজ যেন কাঁদছে?

কাঁদছে তার গীটার। কোন্ দুর্বোধ্য বিদেশী সুর, করুণ বিলাপ হয়ে ঝরছে গীটারের বুক থেকে।

—সায়েব। পাওয়ার সায়েব।

কান্নাভরা গলায় ডাকলাম আমি।

সাড়া দিলো না সে। তন্ময় হয়ে বাজিয়ে চললো। আমি নিস্পন্দভাবে বসে রইলাম সামনের চেয়ারে। আরো কিছুক্ষণ পরে কোল থেকে গীটারটা নামিয়ে রেখে, দু' হাত দিয়ে চোখের জল মুছলো পাওয়ার সায়েব। তারপর আমার দিকে নজর পড়তেই, অপ্রস্তুত-ভাবে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সলজ্জভাবে বললো—এ কি সিস্টার? এত রাত্রে তুমি? ঘুম হলো না বুঝি? তা আমাকে ডাকো নি কেন সিস্টার?

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে, উঠে গিয়ে ওর হাত দুটো নিজের হাতে চেপে ধরে আকুল সুরে বললাম,—তুমি কাঁদছিলে কেন সায়েব?—সায়েব তুমি কি আমাকে ভালোবেসেছিলে? তা যদি সত্য হয়, একবার কেন জানতে দাও নি আমায় সায়েব? একটু প্রেম, খাঁটি ভালোবাসার জন্য, কত তৃষ্ণায় বুকটা ফেটেছে আমার, তাই মরীচিকাকে জল ভেবে কত দুঃখ পেলাম। আমার ঘরেই আছে এমন অমৃতকুণ্ড তা যে এতদিন জানতে পারিনি সায়েব? কেন তুমি নিজেকে অমন করে গোপন করে রেখেছিলে সায়েব? তোমার সঙ্গেই আমি সমাজ-সংসার সব ছেড়ে চলে যেতাম তোমার দেশ সেই গোয়ায়। সেখানে নারকোল-কুঞ্জে কুটীর বেঁধে থাকতাম আমরা - তাতে কারুর কিছু ক্ষতি হতো না সায়েব।

আমার হাত ছেড়ে নিজের দু' হাত ক্রশ করলো পাওয়ার সায়েব। তারপর দু কানে, মাথায়, বুকে ক্রশ ঠেকিয়ে, বিড়বিড় করে কি মন্ত্র যেন উচ্চারণ করে, গভীর দৃষ্টি মেলে চাইলো আমার দিকে।

তারপর গাঢ়স্বরে বললো—এসব কথা তোমাকে বলতে নেই সিস্টার, আমাকেও শুনতে নেই। আমি সায়েবের পায়ের গোলাম, আর তোমারও একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য মাত্র। তোমাকে অবশ্যই ভালোবাসি সিস্টার। যেমন ভালোবাসি ঈশ্বরকে, যেমন ভালোবাসি আমার সায়েবকে, ঠিক তেমনি ভালোবাসি তোমাকে সিস্টার। তা না হয়ে, সাধারণ মানুষের মত প্রেম-ভালোবাসা যদি তোমার প্রতি থাকতো আমার মনে, তাহলে আমি তোমার রক্ষক না হয়ে ভক্ষক হতাম। সিস্টার! এসব ভালোবাসা চায় তার প্রতিদান। কোথাও তা মেলে, কোথাও মেলে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা দেয় হতাশা দুঃখ আর সংঘাত। এতে প্রকৃত সুখ মেলে না। আমি তোমাদের ভালোবেসে, তোমাদের সেবা করে, তোমাদের সুখেই আমি সুখী। এ ছাড়া আমার মনে আর দ্বিতীয় কোন কামনা স্থান পায় না সিস্টার।

চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। একটি অশিক্ষিত কালো কুৎসিত চামড়ার খোল থেকে আমার সামনে যেন আবির্ভূত হয়েছে এক মহমানব। হিমালয় পর্বতের মত বিরাট তার ব্যক্তিত্ব। অন্তহীন নির্বিকার মহাকাশের মত তার হৃদয়। পৃথিবীর সকল শিক্ষা, সাধনা, আত্মশক্তির বৈরাগ্য ও ত্যাগের সমন্বয়রূপে সে মহিমান্বিত। গভীর শ্রদ্ধায় মনে মনে বারবার প্রণাম জানালাম সেই মহামানবকে।

ওর কাছ থেকে আরো এক মহাসত্যের নির্দেশ পেলাম আমি। তা এই যে—রূপ, যৌবন, আভিজাত্য বা বিপুল ঐশ্বর্য, সম্মান-প্রতিপত্তি, এর কোনটাই মানুষকে প্রকৃত সুখের ঠিকানায় নিয়ে যেতে পারে না। সুখের জন্য লালায়িত হয়ে, আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে আয়ত্তে আনতে চাইলেও তাকে ধরা যায় না। তাকে পেতে গেলে আগে নিঃশেষে নিজেকে দান করতে হয়—কোন প্রতিদানের কামনা না করে।

মহাসুখ নামে বস্তুটি আছে ঠিকই, তবে তার ঠিকানা খুঁজে পায় না মানুষ। তাই এত হাহাকার। এত হতাশা, আর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, আমাদের মত সাধারণ মানুষের মন-প্রাণগুলো। সে সুখের ঠিকানা জেনেছে পাওয়ার সায়েব। তার জ্বলন্ত প্রমাণ আজ সে দিয়েছে আমায়।

বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় অভিভূত আমি, পাওয়ার সায়েবের একটা হাত চেপে ধরে বললাম—আমাকে ক্ষমা করো সায়েব। তুমি দেবতা, আর আমি সাধারণ মানুষ, তাই সাধারণ দৃষ্টি দিয়েই দেখেছি তোমায়, আর কতগুলো অর্থহীন প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করেছি। আমি জানি তুমি কত মহৎ। হঠাৎ ভীষণ আতঙ্কের ধাক্কায় ভুলে গিয়েছিলাম সে কথা সায়েব।

তোমায় ক্ষমা করার কথা বলে

আমায় অপরাধী কোরো না সিস্টার। আমি কি জানি না? যে কি সাংঘাতিক জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তোমায়? হ্যাঁ। আতঙ্ক কিসের সিস্টার? নতুন কিছু ঘটেছে? সস্নেহে শুধালো পাওয়ার।

—হ্যাঁ। সায়েব-তোমার সায়েব এসেছিলেন, এতক্ষণ পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন। শোনো নি তুমি সায়েব? সেই 'সোনটো' সুরের ঝড় বইছিলো এতক্ষণ? মাঝে মাঝে যেন আগুন জ্বলে উঠছিলো তাঁর চারপাশে। আর হলের মূর্তিগুলো, ছবিগুলো সব জীবন্ত হয়ে শুনছিলো তাঁর বাজনা। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম আমি! চীৎকার করে ডাকলাম, তোমার সায়েবকে কিন্তু সে ফিরেও চাইলো না আমার দিকে। আপন মনে পিয়ানো বাজিয়ে চললো। তারপর একসময় সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো, আর ঠিক সেই সময় তোমার গীটারের সুর এলো আমার কানে। তখন যেন বুকে একটু বল পেলাম। তারপর ছুটে এসে তোমাকে ডাকলাম, কিন্তু তুমিও সাড়া দিলে না। তোমার চোখ দিয়ে জল ঝরছিলো দেখে, আমার প্রাণটা কেমন করে উঠলো, কারণ তোমার চোখে তো কখনও জল দেখি নি সায়েব।

কান্নার দলা যেন আটকে দিলো আমার কণ্ঠস্বরকে।

দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বালকের মত ফুলে-ফুলে কাঁদলো পাওয়ার সায়েব।

কিছুক্ষণ পরে চোখ-মুখ মুছে ধরা-গলায় বললো—আমার সায়েব তোমায় দেখা দিলো, একবার—একবার আমি কেন দেখা পেলাম না তাঁর সিস্টার। রাত পোহালে চলে যাবো আমার সায়েবের স্মৃতিমন্দির ছেড়ে। অমন ভালোবাসা-দরদ জীবনে তো আর কারুর কাছে পাই নি, শুধু তোমার ছাড়া। তোমাদের দুটো ফলের মত জীবন কি ভাবে দুঃখের আগুনে পড়ে ঝলসে গেল,—এই সব ভেবেই কাঁদছিলাম আমি সিস্টার। আজ আর কিছুতেই রুখতে পারলাম না নিজেকে। যে দুটো সতেজ সুন্দর জীবন স্বাভাবিক নিয়মে মিলিত হলে কত সার্থক হতে পারতো। বাচ্চা-কাচ্চায় এ-বাড়ী গুলজার হয়ে থাকতো, আর আমার জীবনটা কেটে যেত যেন মহানন্দে ওদের কোলেপিঠে করে মানুষ করে। আমার সব স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেল সিস্টার। শুধু তোমার বাবার জন্যে। দস্যুর হাতে প্রাণ হারালো আমার রাজাসায়েব।

ফুলে ফুলে উঠছে পাওয়ার সায়েবের বুকটা!

ওকে শান্ত করার জন্য—আমি বললাম—তুমি তো ঈশ্বর-বিশ্বাসী সায়েব। তাঁর ইচ্ছাতেই এসব ঘটেছে, এই মেনে নেওয়াই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আর তোমার সায়েবের প্রবল ইচ্ছাকে পূরণ করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য। তুমি আছ, আছে আমার সমুদা, আর মাদাম ডেনিয়েল, সকলে মিলে তাঁর মহান ব্রত, যা তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য, তাকে সম্পন্ন করলেই, তাঁর অভিশপ্ত আত্মা শান্তি পাবে সায়েব। একদিক দিয়ে মনে হয়, মহাদুঃখ আমার প্রকৃত শিক্ষকের কাজ করেছে। সে আমাকে আত্মসুখের ক্ষুদ্র আধার থেকে মুক্ত করে, বিরাট বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে আমার স্থান করে দিয়েছে। সেখানে আমার সঙ্গিরূপে পেলাম যাদের, তারা সকলেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ আর সাধু-চরিত্রের দুর্লভ মানুষ। অনেক ভুল ঠিকানায় ঘুরে আজ চলেছি আমি প্রকৃত সুখের ঠিকানায় বন্ধু।

এতক্ষণ পাওয়ার সায়েব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো আমার কথাগুলো।

হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বললো—রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো সিস্টার। আমাদের যাত্রার সময় এগিয়ে আসছে! এসো আমরা প্রার্থনায় বসি।

এ-বাড়ীতে শেষ প্রার্থনায়, পাশাপাশি আমরা দুজনে বসলাম। মেঘমুক্ত আকাশ, অরুণাভায় ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে উঠছে। দূরে কোন মসজিদ থেকে ভেসে আসছে উদাত্ত কণ্ঠের আজান ধ্বনি।

প্রার্থনা শেষ করে, চোখ খুলতেই, চোখের সামনে, আকাশে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো শুকতারাটা। আর তখনই নিঃশব্দে ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো সমুদ্র গুপ্ত।

॥ সমাপ্ত ॥

অন্ধকারের চিঠি

উমা দে-শীল

এই ধু ধু মাঠ
একজোড়া গাছ—
সেদিনো তো ছিল, আজো আছে।
বহু ঝড়ের পরও থাকবে এমনি করে।

বিদ্যুৎ আলোর চমক নিয়ে
তুমি আছ সাগরের পারে।
আমি থাকি বন্ধ ঘরে
আলোহীন চির অন্ধকারে।

তবু এই জোড়া গাছ,
থাকবে এমনি করে—
ফেলে আসা অনেক রোদের খুশি মেখে
সেদিনো যেমনি ছিল।
পড়ন্তবেলায় আজো তো আছে।

সূর্যডোবা অনন্ত অন্ধকারে—
থাকবে এমনি করে নীরব সাক্ষী হয়ে—
এই ধু ধু হাহাকারে॥

আর এক মীরাবাঈ

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এই ছবিখানি এখনও চারুর কাছে আছে। এখানা সমাধির পূর্বাবস্থার ছবি। গভীর বনভূমি মাঝে সাধিকা তাঁর সমস্ত প্রাণমন একীভূত করে, নিজ ইষ্টে লয় করে, আত্মময়ী হবার চেষ্টায় অন্তর মাঝে ডুব দিয়েছেন। দেখলেই মনে হয় এখানা সাধারণ আলোকচিত্র নয়। ধীর-স্থির-সৌম্য বদনমণ্ডলে এক অমানুষী ভাব প্রকট হয়েছে। সতীর উদ্দীপ্ত জ্বালাময়ী তেজের সঙ্গে এক মহা আনন্দপূর্ণ মধুর তরঙ্গহিল্লোলে সমস্ত দেহমনকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ছবিটা দেখলে এইরকম ভাবেরই উদয় হয়। আর একখানি ছবি আছে, যেটা সাধারণ অবস্থার তোলা। তাতে আছে রমণী-সুলভ কোমলতার সঙ্গে বেশ একটা স্নিগ্ধ পবিত্রতার ভাব। এখানা দেখলেও মনে হয়—

'এ রমণী নহে রে সামান্যা---

শ্রীদয়ালবাবু পুঙখানুপুঙখরূপে গোপনে অঞ্জনার কার্যকলাপ পরিদর্শন করতেন। তিনি প্রথম ভেবেছিলেন শ্বশুরবাড়ীর নানাবিধ অত্যাচারের জন্য মানসিক অবসাদ আসায় অঞ্জনা ধর্মকর্মে মন দিয়েছে। তারপর যখন দেখলেন যে আপন মনে হাসছে, কাঁদছে, আবোল-তাবোল কথা বলছে নিজে নিজেই তখন এ সব পাগলামীর লক্ষণ ভেবে কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করালেন। কিন্তু দেখা গেল তাতে উপকার হওয়া ত দূরের কথা অঞ্জনার ধর্মের খেয়াল যেন আরো বেড়ে যেতে লাগলো। এজন্য প্রথম প্রথম তিনি অঞ্জনাকে কঠোর শাসনের ভেতরও রেখেছিলেন এবং এজন্য গালাগাল ও বকুনি দিতেও তিনি কিছুমাত্র ইতস্তত করেন না। তারপর ভাবলেন ওর তো এখন বালিকার মতই দ্বিধা-শূন্য অবস্থা যাচ্ছে। চিকিৎসা ও কঠোর ব্যবহারেও তো কোন ফল হ'ল না। স্বস্ত্যয়ন, পূজাপাঠ, সাধু-সন্ন্যাসী, ওঝা প্রভৃতি সবই তো দেখা গেল। কিছুতেই ত' উপকার হ'ল না। তাহলে কি করি?

এই রকম নানাবিধ চিন্তায় যখন শ্রীদয়ালবাবু বিব্রত হয়ে উঠছিলেন তখন তাঁর মনে উদয় হলো, এক কাজ করলে হয় না। এতদিন ত' ওর খেয়ালের বিরুদ্ধে গিয়ে দেখলাম কিছুই ফল হ'ল না। এবার ওর মতে মত দিয়ে কিছুদিন চলা যাক, দেখি তাতে কি হয়। আর একটা কথা এই সময় তাঁর মনে হল। অঞ্জনার সংসারের কাজেই যত এলোমেলো ভাব, কথা ও কাজের মধ্যে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু ধ্যান জপ পূজোপাঠ ও ঠাকুর-ঘরের কাজের ভেতর তো তার বেশই একটা সামঞ্জস্য ও শৃঙখলার ভাব দেখতে পাই। তারপর এও দেখেছি চারুর সঙ্গে যখন অঞ্জনা কথা বলে তখন মনেই হয় না যে তার মাথার গোলমাল আছে। তবে আমরা যদি কেউ দুই ভাই-বোনের মাঝে গিয়ে পড়ি তাহলে সব কথা ওদের যেন ফুরিয়ে যায়। সত্যিই এ সব তো পাগলামির চিহ্ন নয়। যাক, যথাসম্ভব অঞ্জনার মনের মত হয়েই এবার আমরা সবাই চলবো।

এই সময় আড়ালে একদিন চারুকে ডেকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন করে জানলেন অঞ্জনার নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত সব দর্শন হয়। তারপর চারু বললো, দেখ দাদাভাই দিদি বলেছে সংসারে একমাত্র সুখ ও শান্তি পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসলে। তাঁকে যারা ডাকে তাদের নাকি সবাই ভালবাসে ও তাদের নাকি দুঃখ কষ্ট থাকে না। আমার কিন্তু দিদিকে খুব ভাল লাগে। তোমরা তাকে অতো বকো কেন? দিদি বলেছে সে কাউকেই আর ভয় করে না। তাই তোমরা সবাই মিলে ওকে যখন বকো তখন সে হাসে।

শ্রীদয়ালবাবু চারুর মুখে এইসব কথা শুনে আশ্চর্য হলেন তারপর চারুকে আদর করে বললেন আমি তোমাদের সব ভাই-বোনকে খুব ভালবাসি। তোমাকে এবার আমি কলকাতা থেকে একটি ভাল কলের গান এনে দেব, বুঝলে? কিন্তু দিদির সঙ্গে যা কথা হবে আমায় এসে বোলো আর এই একটি টাকা নাও তোমরা দু' ভাইবোনে যা ভাল হয় কিনে খেয়ো।

শ্রীদয়ালবাবুর শাস্ত্রাদি পাঠের ওপর খুব ঝোঁক। অবসর সময়ে তিনি নানাবিধ শাস্ত্রাদির আলোচনায় নিমগ্ন থাকেন। ইংরাজি, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও নেপালী ভাষায় তাঁর খুব ব্যুৎপত্তি আছে। অঞ্জনার অলৌকিক দর্শনগুলির সঙ্গে শাস্ত্রের মিল আছে কি না দেখবার জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন এবং অঞ্জনাকেও এখন থেকে খুব স্নেহ-ভালবাসা দেখিয়ে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করলেন।

শুনেছি অঞ্জনা দেবীও এখন হতে দাদামশাইকে আর সাধন পথের অন্তরায় না মনে করে সহায়ক বোধে সকল কথা

অসংকোচে বলতে আরম্ভ করলেন। কতদিন বৃদ্ধ আড়াল থেকে নিশীথ রাত্রে অপ্সনার মান অভিমান গান ও কথাবার্তা শুনে অবাক হয়েছেন।

অপ্সনা একদিন বললে, 'দেখ দাদু, আমি ধ্যান করবার সময় বড় বড় কাল রংয়ের অজগর সাপ দেখি। বাঘও দেখি আর একরকম ভয়ঙ্কর জানোয়ার দেখি তার নাম জানি না। তার গায়ের রং পাংশুটে, গলার চার ধার দিয়ে লম্বা লম্বা কেশর আছে। এই সব দেখে আমার ভয় হয়।

এই পাংশুটে রংয়ের জন্তুটি হলো সিংহ। অপ্সনা কখনও সিংহ দেখেনি। তাই তার নাম জানতেন না। যাই হোক শ্রীদয়ালবাবু এই সব শুনে তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, 'দিদি, তুমি কিছুমাত্রও ভীত হয়ো না। তোমার ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণই এই রকম হয়ে তোমার পরীক্ষা করছেন। এর চাইতে ভয়ঙ্কর কিছু দেখলেও ভয় পেয়ো না। তিনি তো তোমার সঙ্গেই আছেন। তাঁর অভয় ক্রোড়েই তুমি আছ।'

আর একদিন অপ্সনা বলেছিলেন, 'আমি আর ভয়ানক জন্তু জানোয়ার দেখি না কিন্তু ছায়ার মত সব মানুষ আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় দেখতে পাই। তাদের পা মাটিতে পড়ে না। আবার কখনও কখনও দেখতে পাই আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত জ্যোতি আমার শরীরের থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং দেখেছি বাইরের থেকেও আমার শরীরের ভেতর আসে।'

আবার একদিন অপ্সনা বললেন, 'রাত্রে বিছানায় বসে দেখলাম দেয়ালের গায়ে চাঁদের মত ঐ রকম কি যেন ঘর আলো করে জ্বল-জ্বল করছে। আর একদিন দেখলাম কি জানো, অগণিত সূর্য সমস্ত জগৎ আলোকিত করে আকাশে রয়েছে। আচ্ছা দাদু রাত্তির বেলায় সূর্য দেখলাম কেন বল দেখি?'

শ্রীদয়ালবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাঁকে বলতেন শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের কথা।

আত্মজ্ঞানের পূর্বে সাধকদের কি কি সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই শ্লোকগুলি শুনে ছেলেমানুষের মত হেসে গড়াগড়ি দিত আর বলতো, 'দাদু, আমি বুঝি মস্ত একজন লোক যে এইগুলি শুনিয়ে আমার অহঙ্কার বাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি মানুষ, পাগল, তাই আমায় ভোলাবার জন্য তুমি বড় বড় বই এনে প্রবোধ দিচ্ছ। যাই কেন না বল না দাদু, শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়া পর্যন্ত আমি ভাল হব না। তাঁকে না পেলে আমি মরে যাব। আমার এই সংসারের কিছুই ভাল লাগে না। এই তুমিও আমায় এত স্নেহ কর, ভালবাস, সত্য বলছি তোমাকেও ভাল লাগে না। শ্বশুর-বাড়ীর ওরা অত অত্যাচার করত কেউ কেউ ভালও বাসতো তা আমার কাছে আদর-অত্যাচার দুই-ই এক রকম বোধ হতো। হাসতাম কাণ্ডকারখানা

দেখে। আচ্ছা দাদু, 'ভগবদগীতা' মত্য নয়? ওতে যা লেখা আছে কিছু মিছে নয়। আমার মত অজ্ঞান মূর্খ পতিতাধমকে কি তিনি চরণে স্থান দেবেন? আমি, আমি যে ভক্তিহীনা, প্রেমহীনা, তাঁর দাসীর দাসী হবারও যোগ্য নই। তোমরা বলে দাও, দাদু কি করে আমি তাঁকে পাব?'

এই সময়ের অঞ্জনা দেবীর হাতের লেখা নেপালী ভাষায় কতকগুলি প্রার্থনা আছে। সেগুলি পড়লে তাঁর সে সময়ের মানসিক অবস্থার কথা, তাঁর শ্রীভগবানের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতার কথা কতকটা অনুভব করা যায়। এ জায়গায় তাঁর সেই প্রার্থনা থেকে একটুখানি উঠিয়ে দিলাম।

'হে হরি, হে নাথ, হে প্রাণপ্রভু, হে জগদীশ দীনবন্ধু, এই অধমা দীনহীনার ওপর কবে তোমার কৃপা হবে? হে প্রভু তুমি তো কত শত দীন শরণাগতকে উদ্ধার করেছ। হে বিভো আমি তো একমাত্র তোমারি শরণাগতা। বৃজবালারা ত তোমার দর্শন স্পর্শন পেয়েছিল। তোমার শ্যাম চরণতলের শীতল স্নিগ্ধছায়া পেয়ে কংস কেশী অঘাসুর বকাসুর প্রভৃতি অধমজনও তো উদ্ধার হয়েছে।(১) প্রভু, আমি ত' তোমারি পথ-চাওয়া ভিখারিণী দাসী। তোমার প্রেমের বন্ধনই ত' আমি গলায় পরেছি। ওগো দরশন দাও, তোমার চরণ তলায় প্রীতি-প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে চিরতরে তোমারি হতে চাই। ওগো নাথ, নাও, নাও আমার সকল কিছু নিয়ে আমায় একমাত্র তোমারি কর গো।'

'দরশন তোমার দুর্লভ, হে প্রিয়তম, আমি তো আজ পাগলিনী হয়েছি। কত ঔষধ মূল খেয়ে আমার দিন কাটছে। কই, তবু তো বেদনা দূর হল না? তোমা হতে বড় বৈদ্য আর কোথায়, আমা হ'তে অসাধ্য রোগী বা কোথায়? হে পরমসুন্দর, তোমাকে ছেড়ে বিরহিণী বাঁচে কেমন করে? বয়ে গেল আমার শৈশব, জলে গেল আমার যৌবন, কই তুমি তো এখনও এলে না? আগুন লাগুক সেই যৌবনে, যাহা পরে শয্যায় করে শয়ন, হে প্রিয়তম তোমা ভিন্ন অন্যকে করে গ্রহণ।' 'ওগো দিবসে নেই আমার ক্ষুধা, রাত্রে নেই আমার নিদ্রা। জাগিয়া জাগিয়া পোহাই আমি রজনী। দরশন দাও গো, নইলে তোমার দাসী এবার তোমার দয়াল পতিতপাবন নামে কলঙ্ক দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ডুবে প্রাণত্যাগ করবে।' (২)

এর কিছুদিন পর অঞ্জনা দাদা মশাইকে বলেন, 'দাদু, আজকাল শ্রীকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সেদিন ঐ মাঠটায় ছেলেরা সব খেলছিল, আমি দেখলাম মাঠের ওধারের গাছতলায় কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন ও আমায় দেখে একটু একটু হাসছেন। আমি দৌড়িয়ে কাছে যেতেই কোথায় যেন লুকিয়ে গেলেন।'

আর একদিন অঞ্জনা খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে উত্তেজিতভাবে দাদামশাইকে বললেন, 'এই একটু আগে (তখনও সূর্যোদয় হয়নি) বাথরুমের দরজা খুলতেই দেখলাম হাত ৫০।৬০ দূরে ওই পাইনগাছের তলায় শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মাথায় কোঁকড়ান লম্বা লম্বা চুল। গায়ের চাদর হাওয়ায় উড়ছে ফুর ফুর করে, আর তিনি হেসে হেসে বাঁশী বাজাচ্ছেন। প্রায় ৬।৭ মিনিট ধরে এই রকম দেখলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল চোখের ভুল। কিন্তু চোখে-মুখে জল দিয়ে ভাল করে মুছেও দেখি পূর্ববৎ হাসিমুখে মধুর বংশীধ্বনি করছেন।'

ক্রমশ অঞ্জনা দেবীর ভাবের আরো আরো পরিবর্তন দেখা গেল। এই সময় ছেলেমানুষের মত ধরে বেঁধে জোর করে স্নানাহার করাতে হোতো। এবং দিন রাত্রের অধিকাংশ সময়ই ধ্যানস্থ থাকতেন। এমন কি ছোটভাই চারু কিম্বা দাদামশাই-এর সঙ্গেও কথা কইতেন না। এমন কি কথা কইতে গেলে অত্যন্ত বিরক্ত ও অশান্তির ভাবই প্রকাশ করতেন। পুষ্পচয়ন, অর্ঘ্য বিরচন ও মাল্য রচনকার্যেও তাঁর আর ব্যগ্রতা দেখা যেত না। প্রাণের আরাধ্য বিগ্রহ মূর্তির পূজা ও সেবাকার্যও ছেড়ে দিলেন। এই সময় তাঁর শারীরিক লক্ষণাদিরও অস্বাভাবিক রকম পরিবর্তন হয়েছিল। সমস্ত মুখমণ্ডল ও বক্ষ দিবারাত্র তাঁর গোলাপ পেলবের মতই লাল ও ঈষৎ স্ফীত ভাব দেখা যেত। পূজাগৃহের অর্গল বন্ধ করে অপূর্ব ভাবাবেগে সমাহিতা হ'য়ে কাটাতেন। কেবল শ্রীমূর্তির ভোগ-রাগাদির সময় অর্গলমুক্ত করতেন। এই সময় একদিন পূজারী ঠাকুর অনেক ডাকাডাকি করেও দরজা খোলাতে পারেন নি। এদিকে ভোগের বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে এখনও পূজা হয়নি ভেবে কর্তাকে গিয়ে পূজারী জানালেন যে দিদি কিছুতেই দরজা খুলছেন না।

শ্রীদয়ালবাবু তাড়াতাড়ি এসে অনেক অনুনয়-বিনয় করে ডাকবার পর অঞ্জনা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে এসে দরজা খুলে বললেন, 'এত চিৎকার করছ কেন তোমরা?' প্রভুজী এইমাত্র আহার করে একটু বিশ্রাম করছেন। তোমরা চলে যাও আমি তাঁর পদসেবা করছি। আর চেঁচিও না এখনি হয়তো তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।'

অনেক সময় অঞ্জনাকে আহারের জন্য বেশী অনুরোধ করলে তিনি বলতেন, 'তোমরা খাও গে, আমি তাঁর সঙ্গে নিত্যই খাই। আহা তাঁর প্রসাদের মত জগতে আর কি খাবার আছে। সে যে অমৃত গো।'

সেদিন বেলা আন্দাজ ৯টা-১০টা হবে। অঞ্জনা ঠাকুরঘরে ধ্যানমগ্না হ'য়ে আসনে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর কথা শোনা গেল। কাকে উদ্দেশ্য করে যেন বলছেন, 'আজ এত বিলম্ব হ'ল কেন শুনি? আর গলায় ওটা কি? মালা পরে আসা হয়েছে। বুঝেছি সেইজন্যই এত দেরী। আমি তোমার ভক্তিহীনা প্রেমহীনা দাসী কিনা তাই মনে ধরে না। ও সব কিন্তু হবে না

১। ক্ষিতিমোহন সেনের 'কবির' বই থেকে নেওয়া।

২। ঐ

যাই বল না কেন, আমি কিছুতেই শুনব না। আগে আমার কাছে আসতে হবে. —তারপর যেখানে ইচ্ছা যেয়ো বাধা দেব না। এই দেখ না তোমার জন্য মালা গেঁথে স্নানাহারের ব্যবস্থা করে কোন সকাল থেকে বসে আছি। এখুনি আসছি বলে সেই যে বেরুলে আর আসবার নাম নেই। আমি এতক্ষণ ভেবেই আকুল হচ্ছিলাম। আর আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না। সর্বদা আমার কাছেই কিন্তু তোমায় থাকতে হবে।'

কত যুগ যুগ ধরে তপস্যা ও আরাধনার পর মানুষ দুনিয়ার এই হাসি-কান্নার খেলাঘরের মাঝে শ্রীভগবানকে আমাদেরই মত একজন রূপে পান তা কে জানে। আহারে-বিহারে-শয়নে সেই অণোরণীয়ান মহতোমহীয়ানকে প্রীতি-প্রেম-ভালবাসার ডোরে চির আবদ্ধ করে ভক্ত অপার প্রেমানন্দ রসে অনুদিন ভাসেন। ভক্তের ভক্তিহীমে শ্রীভগবান সাকার চিন্ময় মূর্তি ধরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব ধরে ভক্তকে চিরকৃতার্থ করেন অনুগত প্রেমভক্তিপরায়ণ সাধকজনকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'কতকগুলি লোক কষ্ট করে কাঠকুটো যোগাড় করে আগুন জ্বালে আর দশজন লোক এসে পোহায়।'

একজন আগুন করলে আগুন থেকে একটু আগুন নিয়ে অপর সব জায়গায়ও আগুন জ্বালান যায়। অনাদি-কালের কোটি কোটি ভক্ত নরনারী ব্যাকুল আগ্রহে তাদের অন্তরের অন্তস্তলের তীব্র বেদনা-বিজড়িত সতৃষ্ণ আহ্বান জানায়। তাদের প্রতি দিবসের বিরাম-বিহীন বিরহ-বেদনা, তাদের দৈনন্দিন সকল কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রীতি-ভালবাসা, পূজাস্তুতি, আত্মনিবেদন, তাদের গোপন হৃদয়ের গভীর ভাবরাশি অজস্র ক্রন্দন, হাসি, গিরিনিঃসৃত পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মতই প্লাবিত হয়, বয়ে যায় শ্রীভগবানরূপ অসীম আনন্দ সাগরে। কোটি কোটি ভক্তের আকুল প্রতীক্ষা ও জমাট ভাবই অনন্ত, অখণ্ড বাক্য, মনাতীত নিরাকার ভগবানকে সাকার মূর্তিতে ধরায় আনয়ন করে। তাই আমরা এক এক যুগে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যরূপে এই ধূলো-খেলার ঘরেই তাঁকে পেয়ে ধন্য হই।

আবার তাঁদের তিরোভাবের পরও তাঁদের অমানুষী লোকোত্তর জীবনচরিত্র ও বাণী নিয়া আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সন্তানরা যুগ যুগ কাটাই। ভক্তই শ্রীভগবানের এক এক লীলাকে মূর্ত ও জাগ্রত করে রাখেন ভাব, ভক্তি, প্রেমের নিবিড় আবেষ্টনে। আর তাইতে আমরা শোকতাপক্লিষ্ট অন্ধজনেরা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, রাম, চৈতন্যদেবকে নিজস্ব ভেবে, আপনজন ভেবে আমাদের একমাত্র আনন্দ ও শান্তির আশ্রয়স্থল ভেবে স্মরণ নিয়ে কৃতকৃতার্থ হই।

অঞ্জনা দেবী মীরা, গার্গী প্রমখ মহীয়সী মহিলাবৃন্দের মত রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধক-শ্রেষ্ঠদের মত মানবগণকে যদি আমরা চোখের সামনে না পেতাম তাহলে অতীতের সকল কিছু শ্রেষ্ঠ দানই আজ শুধু ভাষার আড়ম্বরে পর্যবসিত হত। প্রাণ থাকতো কিনা সন্দেহ। তাই বলছিলাম ভক্তগণই শ্রীভগবানের অনন্তলীলাকে শান্ত ও জাগ্রত করে রাখেন বলেই আজও গগন পবন মুখরিত করে অবতারলীলার জয়ধ্বনি উঠছে—শত উত্থান পতন ও অন্ধকারের আবর্তনের ভেতর হতেও।

দীক্ষা হবার পূর্বেই অঞ্জনা দেবীর এই সব দর্শন ও অনুভূতি হয়েছিল। শ্রীদয়ালবাবুর গুরু স্বামী সৌম্যেশ্বরানন্দজী এই সময় একদিন উপস্থিত হন। ইনি দশনামী সম্প্রদায়ের অশীতিপর বৃদ্ধ একজন সন্ন্যাসী। তিনি কঠোর জ্ঞানমার্গী ও বেদান্তবাদী। অঞ্জনাকে ছেলেবেলা থেকেই ইনি জানেন। অঞ্জনার অনুভূতি ও দর্শনের কথা সব শুনে তিনি অঞ্জনাকে বললেন, তুমি সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ মায়ার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে মিথ্যা কতকগুলো দেখেছ। ওটা ত' কিছুই নয়। ব্রহ্মজ্ঞানই ঠিক ঠিক অবস্থা। তোমার যতক্ষণ অপরোক্ষানুভূতি বা আত্মপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা না আসছে ততক্ষণ কিছুই হয়নি জানবে।

এই সব কথা শুনে অঞ্জনা দুঃখিত ব্যথিত হয়ে বালিকার মত আকুল প্রাণে কাঁদতে আরম্ভ করেন। তারপর শ্রীদয়ালবাবুর কাছে গিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত করুণভাবে ব'ললেন 'হ্যাঁ দাদু, তবে কি আমি এতদিন যা দেখলাম সব মিছে? তবে আমার কি হবে?

অঞ্জনার এই রকম অবস্থা দেখে শ্রীদয়ালবাবু তাঁকে অনেক রকমে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন 'তুমি ভেবো না দিদি, তুমি যা দেখেছ কিছু মিছে নয়। গুরুদেব জ্ঞানী বলেই ওই রকম বলেছেন। আচ্ছা এক কাজ কর না, তুমি তোমার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণকেই কেন জিজ্ঞাসা করে জানো না এসব কি?'

শ্রীদয়ালবাবুর মুখেই শুনেছি অঞ্জনা প্রফুল্ল মনে 'ঠিক বলেছ দাদু' বলে পূজাগৃহে গিয়েছিলেন। তারপর অনেকক্ষণ বাদে এসে বলেছিলেন—'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, 'স্বামীজী যা বলেছেন তাও সত্য। আমি সগুণ নির্গুণ দুই-ই। সগুণভাবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করি ও আমার ভক্তের জন্য এই রকম শরীর ধারণ করি। আমার আসল রূপ এই দেখ অঞ্জনা'—বলে, তিনি ও আমি পরিদৃশ্যমান এই নিখিল ভুবন, আমি, তুমি সবই কি একরকম যেন হ'য়ে গেল। সব মিলিয়ে কি যে হ'ল দাদু বলতে পারছি না। তারপর যে কতক্ষণ পর জানি না দেখলাম তিনি আমায় আদর করছেন।'

শ্রীদয়ালবাবুর ধারণা মন্ত্র না নেওয়া ভাল নয়। তাই অঞ্জনাকে ওঁর গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অনেক অনুরোধে শেষকালে সৌম্যেশ্বরানন্দজীর কাছ থেকেই তিনি মন্ত্র নেন। এই সময় থেকে অঞ্জনাদেবীর মুখে ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অনেক বড় বড় কথা শোনা যেত। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেও বলতে হয়েছে 'এর দর্শন ও অনুভূতি অনেক উঁচুদরের। এর তুলনায় আমার কিছুই হয়নি।

[illegible] সঙ্গে এর জীবন ও বাণী একদম মিলে যায়।'

অঞ্জনা দেবী বলতেন 'আমি পূর্ব জন্মে একজন নৈষ্ঠিক জ্ঞানবাদী ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিলাম। আমি ছিলাম ভক্তিভাবাপন্না। কিন্তু স্বামী আমাকে জ্ঞানপথে আনবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতেন কিন্তু আমি নিজ ভাব ত্যাগ করে জ্ঞানের পথে যেতে চাইতাম না। তাই আমাদের অনেক রকম বাগ্‌-বিতণ্ডা হতো। জীবনে স্বামী আমায় বলেছিলেন, 'আসছে জীবনে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। সেবার তুমি কিন্তু একজন মাতাল দোর্দণ্ড স্বামীর হাতে পড়বে। আসছে বার দেখব ভক্তি-দ্বারা ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করতে সমর্থ হও কি না।'

আমার এই জন্মগ্রহণ করবার কোন কারণই ছিল না। কিন্তু ভক্তি হতে নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইটি দেখবার জন্যই আমার জন্ম নিতে হয়েছে। এই আমার শেষ জন্ম।'

অঞ্জনা দেবীর ছোট ভাই চারুর মুখে আর একটি ঘটনা শুনেছি সেইটি বলেই আমি বিদায় নেব আজ। সেদিন ছিল কিষণজীর দোল-পূর্ণিমা। অতি প্রত্যুষেই তিনি আবির প্রভৃতি রং নিয়ে নিজের ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। তাঁর শয্যাগৃহে পিত্তল নির্মিত কিষণজীর মূর্তিটি ছিল। গৃহে প্রবেশ করে তিনি অর্গল বন্ধ করলেন। পূজা ও নিবেদনাদি শেষ করে তিনি রংয়ের খেলায় মত্ত হলেন। চারুর মুখে শুনেছি গৃহের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল অঞ্জনার মধুর ভজন, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীতের সুর। তাঁর কণ্ঠ ছিল সুমধুর বা সুরেলা। গৃহের ভেতরে ৪।৫জন মেয়ে ছুটাছুটি করলে বা নৃত্যের ভঙ্গীতে চলাফেরা করলে কিঙ্কিণী বা নূপুরধ্বনি যেমন শোনা যায় ঠিক তেমনি চারু শুনতে পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে অঞ্জনা কিষণজীর সঙ্গে কথাও বলছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীদের সঙ্গে অঞ্জনা যেন আবিরের খেলায় গৃহমধ্যে মত্ত ছিলেন। তারপর হঠাৎ অঞ্জনা খুব ব্যস্তভাবে অর্গল মুক্ত করে বাইরে এলেন। খুব খানিকটা নেশা করলে যেমন মত্ত অবস্থা হয় অঞ্জনাকে দেখাচ্ছিল ঠিক সেই রকম। তিনি আবির নিয়ে যেন কার পিছনে পিছনে ছুটছেন, হাসছেন, আনন্দে দিশাহারা হয়ে এক একটি গানের কলি গাইছেন। তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন। সামনে দেখলেন কিশোর ভৃত্যকে কার্যরত অবস্থায়। তিনি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আবির দিলেন। সমস্ত শরীরটা তার প্রেমের রঙে যেন রাঙিয়ে দিলেন। সেদিন অঞ্জনা পাচক থেকে বাড়ীর অন্যান্য ভৃত্য, আত্মীয়-স্বজন যাঁদেরই কাছে পেয়েছেন তাঁদেরই আবিরে আবিরে ভরিয়ে দিয়েছেন। এমন কি গৃহপালিত পশু ও পুষ্পবৃক্ষ-লতাদিকেও আদর করে ফাগুনের আগুন রাগে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আমাদের বিজ্ঞ মনে এ সব পাগলামি বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয় বলেই ধারণা হবে। পুঁথিতে ব্রজনারীরাও নাকি এমনি ধারা উন্মাদিনীর মত ব্যবহারই করেছিলেন। সামান্য মাত্র শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে শ্যামকুঞ্জের সমস্ত লতাবিতান থেকে যত কিছু নয়নে পতিত হয়েছিল সব কিছুতেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিলেন।

বৃক্ষলতাদিকেও নাকি তাঁরা সখা, বন্ধু, প্রিয়তম সম্বোধন করে স্পর্শন, আলিঙ্গন ও চুম্বনদানে বিরত হন নাই। কিভাবে মগ্ন তাঁরা জড়কে চেতন, জীবন্ত, জাগ্রত, তাঁদেরই হৃদয়েশ্বরের প্রতিমূর্তি 'সর্বং কৃষ্ণময়ং' দেখতেন, তা অন্ধ, অজ্ঞান, বাসনা কামনার পঙ্কিলতায় কলুষিত আমরা কি করে বুঝব বা অনুভব করব।

'যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম,
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।'

এই ভক্ত উক্তির সার্থকতা যেদিন আমরা জীবনে কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করতে পারব, সেইদিন যেদিন তাঁর কৃপায় এর কিছুটাও অনুভব করতে সমর্থ হব। আমাদের মনে হয় অঞ্জনা দেবীর এই অবস্থা 'সর্বং কৃষ্ণময়ং' অবস্থা বা 'সর্বং ব্রহ্মময়ং' অবস্থা।

অঞ্জনা দেবী তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে পরিচারিকা ভগ্নীকে একটি নিজের রচিত কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। সেটা তাঁর ভাষাতেই আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি।

তির থৈ ঘুমদৈ হরিনাম জপ্‌দই
পরখ্‌নছু মরণ।
হরি কৈ পাওমা মন চিত্ত লাই
ত্যাগ নেছু পরাণ ।।১
মেহি ইচ্ছা মেরো, পূর্ণ হোস্‌ ভনি
আশীর্বাদ দিনু হোস্‌।
বির সাউনি জেঠি, সমঝাউনি মেরো,
যো গীতৈ লেনু হোস্‌ ।।২
যো নর লোক্‌মা, বাচুন জেল সম্ম,
ম এক্‌ লা ফকত ।।
পথরৈ জস্‌তো, মন মৈলে পার্নে
বলিয়ো সকত ।।৩

অনুবাদ—তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে হরিনাম করে আমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি। চিত্ত-মন-প্রাণ শ্রীহরির চরণে অর্পণ করে আমি এ দেহ ত্যাগ করব।

হে আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। তুমি এই আশীর্বাদ কর আর তুমি আমার এই গীতটি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ কর।

এই সংসারে যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন পাষাণের মতই মনকে শক্ত ও কঠিন বন্ধনে বেঁধে রাখবো।

ভাগবত, ভক্ত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করে বিদায় নিচ্ছি। সাধক ভক্তগণের কথা লিপিবদ্ধ করা তাঁদেরই সাজে যাঁরা নিজেরাও পরম ভক্ত ও সাধনসিদ্ধ। তবে অঞ্জনা দেবীর অলৌকিক জীবন-কাহিনী আমি শ্রীদয়ালবাবু ও শ্রীমান চারুর কাছে যেমনটি শুনেছিলাম ও লিখে নিয়েছিলাম তার কিছুটা নিজের ক্ষীণ ও দুর্বল ভাব ও ভাষার সাহায্যে আজ আপনাদের উপহার দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। তাই আমার এই ব্যর্থ চেষ্টা। আপনারা বুদ্ধিমান রাজহংসের মত সারটুকু গ্রহণ করে ধন্য হন—এই আমার আপনাদের কাছে বিনীত প্রার্থনা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মাসিক

বসুমতী

চৈত্র / '৭৫
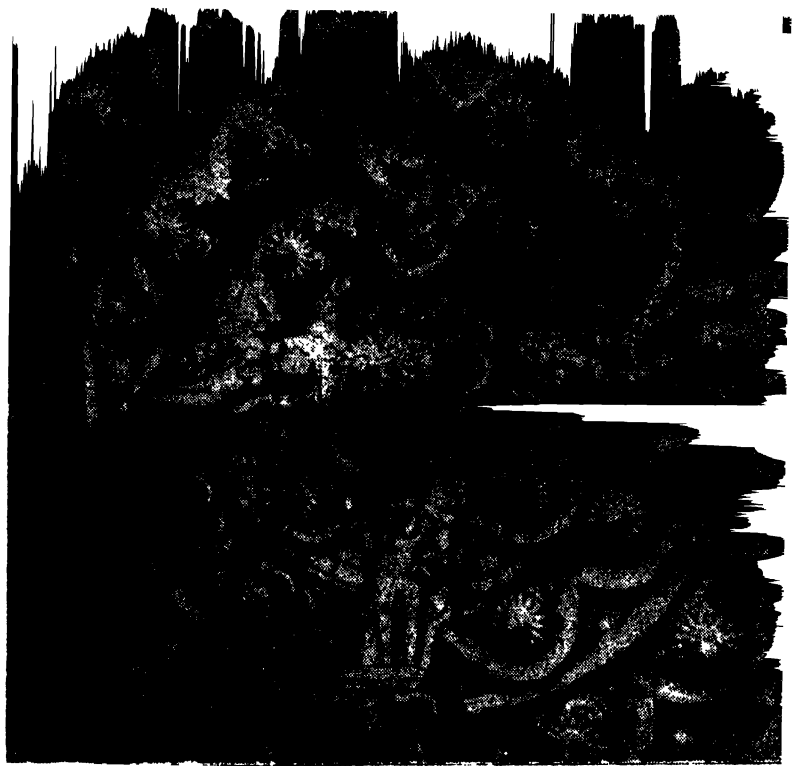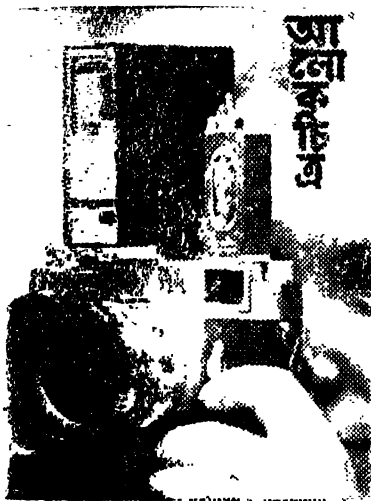
দিলওয়ারা মন্দিরশীর্ষ

—অমরনাথ দে

দূর-নিকট

-বিশ্বরূপ সিংহ
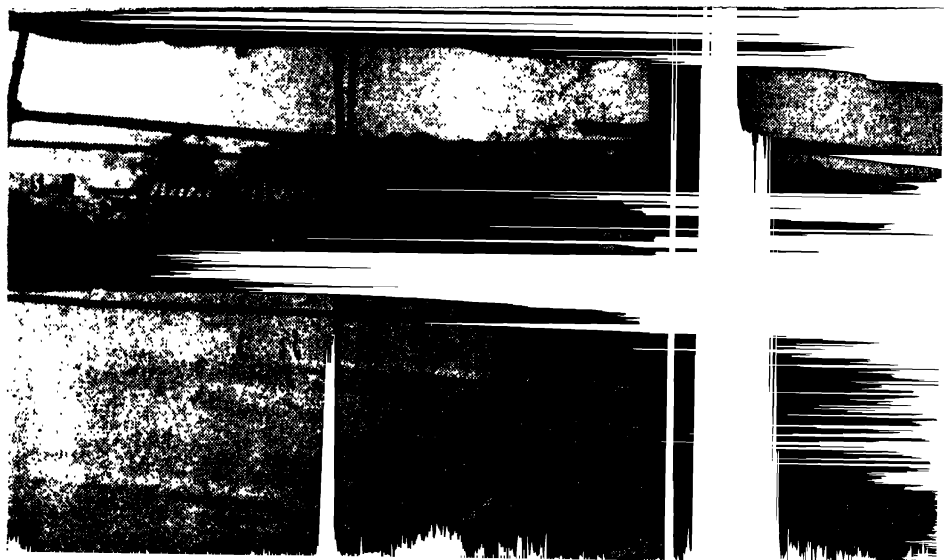
—বিশ্ববন্ধু বসাক

(১ম পুরস্কার)

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

খেলাধূলা

—বিল্টু গুপ্ত

(৩য় পুরস্কার)

সমীরকুমার বসু

(২য় পুরস্কার)

—শিবু দত্ত

খেলাধূলা

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

॥ বিষয়বস্তু ॥

বৈশাখ সংখ্যায়

আমার দেশ

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়

পোস্টার

[প্রতিযোগিতার ছবি প্রতি বাঙলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে]

মধ্যাহ্ন পথে
—বিশু গোস্বামী

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন। ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন
* ছবি পাঠাবেন এই নামে—

সম্পাদক, মাসিক বসুমতী
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

খ্রীস্ট-মন্দির
—কানুপ্রিয় গুপ্ত

র জমিদার বাস করতেন। ইভান পেট্রোভিচ্ বেরেস্টভ আর গ্রেগরী ইভানোভিচ্ মুরোম্‌সকি।

সৈন্যদল থেকে অবসর নেবার পর এসে বেরেস্টভ এখানে বসবাস সুরু করেন। তিনি গুরুগম্ভীর এবং পণ্ডিতম্মন্য—কথার প্রতিবাদ সহ্য করতেন না কখনও; নিজের হিসেব নিজে রাখতেন এবং 'বলেটিন' ছাড়া আর কিছুই তাঁর কাছে পাঠ্য নয়। তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করেই গত হয়েছিলেন, সেই ছেলে সুদূর মস্কোতে পড়াশুনো করত।

বেরেস্টভ-এর একটি কাপড়ের কল ছিল—তিনি রবিবারে এবং ছুটির দিনে ভেল্ভেটের পোষাক এবং অন্য-দিনে নিজস্ব মিলের কাপড় পরতেন। তাঁর মতে তিনি নিজে অত্যন্ত বুদ্ধি-মান এবং বিত্তশালী হওয়ায় প্রতি-বেশীদের কেউই এর প্রতিবাদ করত না।

মুরোম্‌সকির সঙ্গে বেরেস্টভ-এর আদো বনিবনা ছিল না। মুরোম্‌সকি খাঁটি জমিদার বংশের লোক, আভিজাত্য তার জন্মগত।

মস্কোতে প্রায় সব টাকা পয়সা খুইয়ে মুরোম্‌সকি এসে গাঁয়ে বসে-ছিলেন। অর্থ কম, কিন্তু সাধে ঘাটতি নেই। পুরনো চাল কিছুটা পালটে ইংলণ্ড-এর ধাঁচে এক বিরাট বাগান করে বসলেন গাঁয়ে, এবং তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্যও ইংরেজ শিক্ষিকা রাখলেন।

বেরেস্টভ্-এর এসব পছন্দ নয়। তিনি নতুন বড়লোক—তাঁকে লোকে খাতির করবে এটাই তিনি চাইতেন। অন্য কেউ এসে সে খাতিরে ভাগ না। বিশেষ করে মুরোম্‌সকির অর্থবল নেই অথচ লোকে তাঁকে সম্মান করে—এটা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল দিন-দিন। তাঁর কাছে কেউ এলে কথায় কথায় মুরোম্‌সকির 'বিদেশী' রুচি নিয়ে বিদ্রূপ করা বেরেস্টভ্-এর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এসব কথা পল্লবিত হয়ে মুরোম্‌সকির কানে প্রতি-বেশীরা তুলতে একটুও দ্বিধা করত না।

ফলে, বেরেস্টভ ও মুরোম্‌সকির মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল। বিশেষত মুরোম্‌সকি সাংবাদিকদের মতই সমালো-চনায় অসহিষ্ণু ছিলেন—এবং বেরেস্টভকে 'গেঁয়ো ভূত', 'জংলী' ইত্যাদি সুমধুর বিশেষণে আপ্যায়িত করতেন।

এ-হেন অগ্নিগর্ভ যখন গ্রামের অবস্থা, তখন বেরেস্টভ্-এর ছেলে অ্যালেক্‌সি বাড়ি ফিরে এল। অ্যালে-ক্‌সির ইচ্ছে ছিল সৈন্যদলে যোগ দেওয়া, কিন্তু [illegible]র বাবা কিছুতেই রাজী হলেন [illegible]। আবার সিভিল সারভিস্-এ তার ঘোর আপত্তি। কাজে কাজেই কোনটা [illegible]খন হল না তখন সে বাড়িতে ফিরে [illegible]ল এবং বেশ মোটা গোঁফ নিয়ে [illegible]ড়ায় চড়ে বেড়াতে লাগল নিশ্চিন্ত [illegible]নে।

সুপুরুষ; তার ওপর গোঁফে চাড়া দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় গাঁয়ের মেয়েরা তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। মেয়েদের বাপ-মারাও এতে পরোক্ষ উৎসাহ দিত, কেন না তার বাবা বড়-লোক।

ছোক্‌রা কিন্তু কোন মেয়ের দিকে তাকাত না। এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক

রাখালের নাগন

আলোকঅলদার প[illegible]কিন

হলেও, কল্পনাপ্রবণ যুবতীবৃন্দ এর 'কারণ' খুঁজে বার করল; তারা বলাবলি করত যে, অ্যালেক্সি নিশ্চয়ই সহরে প্রেম করেছে—অতএব সহরে মেয়ে ছেড়ে গাঁয়ের মেয়েদের দিকে সে যে তাকাবে না, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েও গাঁয়ের যুবতীরা তার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দ্বিধা করত না মোটেই।

গাঁয়ের মেয়েদের কাছে অ্যালেক্সি ছিল একটা রহস্য। নিজের মতানুযায়ী সৈন্যদলে যোগদান করতে না পেরে সে বেচারা মনমরা—এটা যুবতীদের চোখে গোপন ব্যর্থ প্রেমের লক্ষণ, মেয়েদের কাছে অ্যালেক্সির দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। ওরা তার জন্য পাগল হয়ে উঠল।

ওদিকে 'ইংরেজ প্রেমিক' মুরোম্সকির আদরে সপ্তদশী মেয়ে লিজা। (বা 'বেটসী' ওর বাবার আদরে নাম) ক্রমে ক্রমে অ্যালেক্সির ভক্ত হয়ে উঠল। যদিও সে তাকে দেখে নি—তাদের বাড়ি কিছু দূর ছিল, তবুও খাস চাকরাণী নাস্ট্যার দৌলতে সবই সে শুনতে পেত। তাদের বাবারা ঝগড়া করতেন বলে তাদের দেখাশুনা হওয়া অসম্ভব কিন্তু—নাস্ট্যার ভাষায়—'তোমার বাবা ঝগড়া করেন, তাতে তোমার কি? তুমি ত আর ঝগড়া কর নি? বুড়োগুলো ঝগড়া করে মরুক, যদি তাদের তা পছন্দ হয়।' যুক্তিটা মন্দ নয়।

আদরে লিজা সর্বদাই নেচে কুঁদে বেড়াত—বাধা দেবার কেউ ছিল না। বরং তার বাবা এতে খুসিই হতেন। লিজার মধ্যবয়স্কা ইংরেজ শিক্ষিকা দু'হাতে চুল ছিঁড়ত তার আচার-ব্যবহার দেখে, কিন্তু নাস্ট্যা ছিল লিজার সত্যিকার সখী এবং সহচরী।

একদিন সকালে লিজার পোষাক পরাতে পরাতে নাস্ট্যা বলল, 'আজকে দিদি আমাকে একট বেড়াতে যেতে দেবে কি?

'নিশ্চয়ই। কিন্তু যাবে কোথায়?'

নাস্ট্যা হেসে বলল, 'বেরেস্টভদের বাড়িতে। তাদের রাঁধুনি আজ জন্মদিনের উৎসব করবে, তাই।'

'ও বাবা! মনিবরা ঝগড়া করে, আর তোমরা গলাগলি কর।'

'তাতে কি? বুড়োগুলো মারামারি করতে চায়, করুক। আমাদের ত কোন লড়াই নেই।'

একটু হেসে, একটু কেসে, একটু লাল হয়ে লিজা বললে, 'একবার চেষ্টা করে দেখো—যদি অ্যালেক্সি বেরেস্টভকে দেখতে পাও। বেশ ভাল করে লক্ষ্য করবে কিন্তু, আর এসে আমাকে সব কথা খুলে বলবে।'

নাস্ট্যা উৎসাহের সঙ্গে স্বীকার করে চলে গেল।

সারা দিন লিজা ছট্‌ফট করে কাটাল।

সন্ধ্যাবেলা নাস্ট্যা এলে তাকে নিয়ে পড়ল লিজা। নাস্ট্যা বলল যে সারাদিন সে অ্যালেক্সির সঙ্গে ছিল।

'যা, মিথ্যুক কোথাকার! বাজে কথা!----লক্ষ্মীটি যা যা ঘটেছিল স---ব খুঁটিয়ে আমাকে বল না।'

'বলবই ত। আজ সারাদিন সে আমাদের সঙ্গে ছিল।'

'যাঃ! বাজে কথা।'

'বারে, বাজে কথা কেন হবে! সত্যি কথা বলছি,—সত্যি---সত্যি---সত্যি?'

'ওমা—কী করে তা হ'ল বল দেখি?'

'বলছি—দাঁড়াও। মেয়ের আর তর সইছে না।----আমরা, অর্থাৎ, আমি, অ্যানিসা, নেনিলা, ডুংকা----'

'আঃ, বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা হোক।'

'দয়া ক'রে আমার কথা আমার মত বলতে দাও। যত সব ছেলেমানসী। হ্যাঁ, খাবার সময়ে গিয়ে তো পৌঁছোলাম। ঘর ভর্তি লোক—কোলবিনো থেকে এসেছে, জাখারিয়েভো থেকে, খু পিনো থেকে,—বেলিফ্ এবং তাঁর স্ত্রী----'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!—কিন্তু বেরেস্টভ-এর কী হল?'

দাঁড়াও, দাঁড়াও। একেবারে ঘোড়ার জিন্ দিয়ে এলে কি চলে?----হ্যাঁ, তারপর ত খেতে বসলাম—প্রথম বেলিফ্-এর স্ত্রী সর্বপ্রথমে, তারপর আমি। মেয়েগুলো কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল—আমি গ্রাহ্যই করি নি।

'আঃ কী আপদ। নাস্ট্যা তোর জ্বালায় ত আর পারি না!---বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা কখন বলবি?'

'বাবা, বাবা! এত অধৈর্য হলে চলে?'

'হ্যাঁ তারপর হল গিয়ে খাওয়া। ওঃ কী ধুন্দুমার কাণ্ড। কত কি। মাংস, ছাক রোস্ট, বীফ, কেক, প্যাস্ট্রি---আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলব না। খাওয়ার পরে বাগানে গেলাম, তখন গিয়ে ছোট কর্তা অ্যালেক্সি এলেন-'

'দেখতে কি খুব সুন্দর?'

'চমৎকার দেখতে—খাসা! লম্বা, দোহারা গড়ন, লাল টুকটুকে গাল---'

'তাই বুঝি?---তা, কেমন মনে হোল তোর? অ্যালেক্সি কি বিপদগ্রস্ত বা চিন্তামগ্ন?'

'দূর, দূর—কে বলেছে? জীবনে এমন পাগল দেখি নি। আরে, আমাদের সঙ্গে খেলা শুরু করে দিল—আর নেচে কুঁদে মাতিয়ে তুলল সবাইকে।'

'মিথ্যে কথা—আমি বিশ্বাস করি না।

'বিশ্বাস না করার কিছুই নেই—কেন না, ঘটনা যা ঘটেছিল তাই বলছি। আর—হিঃ হিঃ---'

'কি বল না।'

'হিঃ হিঃ! যা—দুষ্টু ছোট কর্তা একেবারে পাগল!—কি করছিল জান?'

'আমাদের পেছনে দৌড়ে যাকে ধরতে পারছিল তাকেই---হিঃ, হিঃ--'

'আ গেল যা। হেসেই মল। বল না কী হল।'

'হিঃ হিঃ!—যাকেই ধরতে পারছিল তাকেই ধরে চুমু খাচ্ছিল।'

'ধ্যেৎ!---একেবারে মিছে কথা!'

'আজ্ঞে হুজুর, মোটেই মিছে কথা নয়।---অনেক কষ্টে আমি তার কাছ থেকে পার পেয়েছি।'

'কিন্তু লোকে বলে যে অ্যালেক্সি সহরে মেয়ের প্রেমে পড়েছে এবং আর কারোর দিকে তাকায় না।'

'তা' আমি জানি না বাপু। আমি এই জানি যে আমার দিকে, আর বেলিক্-এর মেয়ে তানিয়ার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল।—বাবা, যেন গিলে খাচ্ছিল চোখ দিয়ে।---না বাপু, তোমার অ্যালেক্সি লোক ভাল নয়।'

'দূর দুষ্টু কোথাকার। 'আমার' মানে? ----হ্যাঁরে, তার বাড়ির লোক কী বলে রে?'

'তারা ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে,—এমন মনিব হয় না, কেমন দয়াল আর ফূর্তিবাজ।'

সরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিজা বলল, 'একবার দেখতে বড্ড ইচ্ছে করে রে।'

'তা আর এমন কঠিন কি গো?—দূর তা এমন কিছু নয়। সকাল বেলা ঘোড়ায় চড়ে বেরোলেই ত—'

'না না সে হয় না।—হয়ত সে ভাববে আমি তার সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব করছি। ---সে ভারি লজ্জার কথা। তা ছাড়া বুড়ো কর্তারা যা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। --- বরং --- হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। জানিস নাস্‌টা। আমি চাষীর মেয়ে সাজব।'

'ঠিক বলেছ। --- ছেঁড়া, মোটা ব্লাউজ আর সারাফান পরে গেলে কেউ চিনতে পারবে না।'

'আর, আমি চাষী মেয়েদের মত কথাও বলতে পারি। --- কি মজা! নাস্‌টা—কি মজাটাই না হবে। কি চমৎকার প্ল্যান বলত?'

'চমৎকার! আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি যে অ্যালেক্সির আর রক্ষে নেই!'

হাসতে হাসতে নাস্‌টাকে ঠোনা মেরে লিজা শুতে গেল।

পরের দিন সকালে লিজা উঠেই নাস্‌টাকে ডেকে তৈরি হল। সারাফান পরে, মোটা ব্লাউজ গায়ে চড়িয়ে, খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে পায়ে কাঁকর লেগে রক্তারক্তি। পরে চাষীদের 'বাস্‌ট্' জুতো পরে তবে সে হাঁটতে পারে। জুতোর বন্দোবস্ত নাস্‌টাই করেছিল।

তারপর সে পেছনের দরজা দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল।

পুব আকাশ তখন সবে রঙিন হচ্ছে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের দল যেন সভাসদের মত সূর্যদেবের ওঠার অপেক্ষায়। নির্মল আকাশ, প্রভাতের স্নিগ্ধ মাধুর্য, অপরূপ শিশির, মৃদুমন্দ বাতাস, পাখির গান—সব কিছু মিলে মিশে লিজার মন এক অনির্বচনীয় মাধুরীতে ভরে দিল। কিন্তু পাছে পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, এই ভয়ে সে প্রাণপণ দ্রুত বেগে চলল হালকা, হাওয়ার মত। তার বাবার জমির শেষ প্রান্তে পৌঁছে সে গতি শ্লথ করল, কেন না, এখানেই সে অ্যালেক্সির জন্য অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করেছিল।

লিজার বুক চিপ্‌চিপ্ কচ্ছিল অজানা আশংকায়, আশংকামিশ্রিত এই যে আনন্দ, এই ত যৌবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ধীরে ধীরে সে এগোচ্ছিল আর ভাবছিল—কি ভাবছিল কে জানে? সপ্তদশী তরুণীর মনোরহস্যের তল পাওয়া দেবতারও অসাধ্য।

চলতে চলতে লিজা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, কেন না ভীষণদর্শন এক শিকারী কুকুর তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ভয় পেয়ে সে সহসা চীৎকার করে উঠল, —এবং ঠিক তখুনি অ্যালেক্সি এগিয়ে এসে এক-ধমকে কুকুরকে চুপ করাল এবং বলল—'ভয় পেয়োনা খুকী, ও তোমাকে কিছু বলবে না।'

খুকি? --- রাগে ফুলে উঠল লিজা। কিন্তু তখুনি সামলে নিয়ে সলজ্জভঙ্গীতে বলে উঠল, 'কিন্তু হুজুর, আমার বড় ভয় করছে। ওটাকে দেখতে কি ভয়ানক, বাপ্‌রে! হয় ত আবার আমাকে তেড়ে আসবে।'

'বেশ তা হলে আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি,—যদি তুমি অনুমতি কর।'

'আপত্তি কে করছে—আসুন না।—আপনিও স্বাধীন, আর রাস্তাও কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।'

'তুমি কোত্থেকে আসছ খুকি?'

আবার খুকি? --- কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে লিজা 'থার্ড' ক'রে বলল, 'আজ্ঞে প্রিলুচিনো থেকে। কামার ভ্যাসিলি আমার বাবা। আমি ছত্রাক কুড়োতে যাচ্ছি। --- আর আপনে? নিশ্চয় তুগিলোভো থেকে?'

'ঠিক বলেছ।—আমি হচ্ছি ছোট কর্তার খাস চাকর।'

আসল কথা অ্যালেক্সি নিজেকে লিজার সমপর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু লিজা হেসে উঠল। বলল, 'মিথ্যে কথা।--মিথ্যে বলেন কেন? আমি দেখতে কুৎসিত হলেও অত বোকা না। আমি জানি আপনেই ছোটকর্তা।'

'বটে! তা কি দেখে ঠিক বুঝলে?'

'অনেক কিছু! যেমন ধরেন, আপনার পোষাক মোটেই চাকরের মত না; আপনার কথাবার্তাও চাকরের মতন না। এবং আপনে কুকুররে ডাকলেন ঠিক মনিবের মত—আমাগোর মত না মোটেই।'

অ্যালেক্সি ক্রমেই মুগ্ধ হচ্ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে লিজাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল—যেমন করত সে আর পাঁচটা চাষীর মেয়েকে। কিন্তু, লিজা সরে গিয়ে কঠোর স্বরে বলল, 'যদি মেলামেশা করতে চান তয় ভদ্র ব্যবহার করেন।'

অ্যালেক্সি একটু চমকে গিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এত চালাক হলে কি করে গো?'

'আইস্তা, আপনে কি ভাবেন যে আমি বড়বাড়িতে যাই না একেবারে? ভদ্দরলোকের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করি ত'। --- যাক্, আপনার সঙ্গে কথা বললে ত আর আমার ছত্রাকগুলো আপনা আপনি ঝুড়িতে এইস্যে বসবে না। আপনে মশয় নিজের কাজে যান—আমিও নিজের পথ দেখি।'

বলে সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু অ্যালেক্সি তার হাত ধরে ফেলল।

'তোমার নামটি কি?'

এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লিজা বলল, 'আকুলিনা। --- কিন্তু আমারে এখনই যেতে হবে—বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে।'

'আচ্ছা আকুলিনা,—আমি ঠিক বাড়ি গিয়ে হাজির হচ্ছি!'

'সব্বোনাশ! দোহাই আপনের—ওইটি করবেন না। বাবা যদি জানতে পারেন যে জনহীন বনের পথে ভদ্দর-লোকের সঙ্গে রসালাপ করছি, তয়লে আমারে আর আস্তা রাখবেন না।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা করতেই হবে যে।'

'বেশ ত, কাল সকালে আমি আবার শাক তোলতে এইখানে আসব।'

'সত্যি আমাকে ঠকাচ্ছ না?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি,—তিন সত্যি।'

●

লিজা প্রাণপণে দৌড়ে তাদের বাগানে গেল। সেখানে নাস্‌চা তার জন্য পোষাক নিয়ে অপেক্ষা করছিল—তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্‌টে সে যখন খাবার ঘরে গেল, তখন প্রাতরাশ দেওয়া হয়েছে এবং তার শিক্ষিকা কুমারী ম্যাক্‌সন সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে রুটি কাটছিলেন।

লিজার বাবা প্রাতঃ ভ্রমণের জন্য তার প্রশংসা করলেন এবং বললেন, 'ভোরে ওঠার চাইতে স্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই।' ইংরাজ-প্রেমিক ভদ্রলোক ইংলণ্ড-এর কয়েকটি উদাহরণ দিলেন—যারা প্রত্যহ ভোরে উঠতেন, ব্র্যান্‌ডি ছুঁতেন না এবং ফলে একশ' বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন সুস্থ-সবল দেহে।

লিজার কানে এসব কথা যাচ্ছিল না। সে মনে মনে ভোরের ব্যাপারটা পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করছিল। তার বিবেক তাকে পীড়া দিচ্ছিল—এমন কি সে প্রায় স্থির করেছিল যে, আগামী-কাল সে আর যাবে না। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা করল যে, না গেলে অ্যালেকসি ঠিক ভ্যাসিলি কামারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে। তাহলেই চিত্তির! সুতরাং আগামীকাল অন্তত যেতেই হবে।

ওদিকে অ্যালেক্‌সি আহলাদে ডগমগ। সারাদিন, সারারাত ধরে সে নবপরিচিত সপ্তদশীর মাধুর্য-চিন্তায় মগ্ন রইল। ভোর হবার অনেক আগেই সে পোশাক পরে তৈরি—বন্দুক আর নেওয়া হল না, মাত্র তাড়াতাড়ি সে কুকুর নিয়ে অকুস্থলে গিয়ে হাজির। ফলে প্রায় একঘণ্টা তাকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

অবশেষে গাছের ফাঁকে নীল সারাফান দেখা যেতেই সে দৌড়ে এগিয়ে গেল। লিজা তার আগ্রহ দেখে ম্লান হাসি হাসায় তার মুখের ম্লানিমা দৃষ্টে অ্যালেক্‌সি আকুল আগ্রহে কারণ জানতে চাইল।

লিজা তাকে জানাল যে, এভাবে মেলামেশা করা অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে, তার বিবেক তাকে দংশন করছে, এবং যদিও কথা দিয়েছিল বলে সে আজকে এসেছে, তবে তার মনে হয় যে, এই দেখাই শেষ দেখা হওয়া উচিত। কেন না—গোপনে এরকম মেলামেশার ফল কখনও ভাল হতে পারে না।

অ্যালেক্‌সি অবাক হয়ে শুনছিল। একজন চাষীর মেয়ে এসব কথা শিখল কোত্থেকে? সে প্রাণপণে লিজাকে বোঝাল যে, তার কোন অসদভিপ্রায় নেই, সে সর্বদা তার কথা শুনে চলবে—অন্তত সপ্তাহে দু'বার নির্জনে সাক্ষাৎ করার জন্য সে ঝুলোঝুলি করতে লাগল। অ্যালেক্‌সি সত্যিই প্রেমে পড়েছিল এবং তার ভাষাও প্রেমিকের আন্তরিকতাময়।

লিজা অবশেষে বলল, 'তা' হলে কথা দিন যে, আপনি কখনও গ্রামে আমার খোঁজ করতে যাবেন না এবং আমি যে-দিন নির্দিষ্ট করব, সে-দিন ছাড়া অন্য কোন সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না।

অ্যালেক্‌সি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করল। কিছু পরে লিজা চলে গেল।

●

আসল কথা হচ্ছে, অ্যালেক্‌সির মনে কোন দাগ ছিল না। ওসব সহরে প্রেম-ট্রেম বাজে গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজে-কাজেই লিজার অপরূপ কান্তি এবং তার কথাবার্তা অ্যালেক্‌সির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং সে ক্রমে-ক্রমে তার প্রেমে পড়ছিল।

এর পরেও তাদের অনেকবার দেখা হল। দু'জনেই প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল, কিন্তু মুখফুটে কেউই কাউকে বলতে পারছিল না। অ্যালেক্‌সির মুশকিল এই যে, সে লিজাকে চাষীর মেয়ে মনে ক'রে তাদের সামাজিক অসাম্য কিছুতেই ভুলতে পারছিল না; অপরদিকে লিজা তাদের উভয়ের পিতার মনোমালিন্যের কথা ভেবে এগোতে দ্বিধান্বিত। অবশ্য, তাকে চাষীর মেয়ে ভেবেও অ্যালেক্‌সি যে তার প্রেমে পড়েছে, এ কথা মনে করে লিজা একটু আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই অনুভব করছিল।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল, যা আমাদের নায়ক-নায়িকার জীবনে পরিবর্তনের সূচক।

●

একদিন বেরেস্‌টভ ঘোড়ায় চড়ে, কুকুর এবং অনুচর সমভিব্যাহারে খরগোস শিকারে বেরোলেন। ওদিকে মুরোম্‌সকিরও হঠাৎ ঘোড়ায় চড়ে বেরোবার সখ হওয়াতে তিনি তাঁর বেতো ঘোড়াটির জিন-লাগাম পরিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

'কি ছিল বিধাতার মনে', কে জানে। দ'দিক থেকে দু'জনে এসে একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়াতে নিরুপায় মুরোম্‌সকি এগিয়ে গিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন এবং বেরেস্‌টভও দড়ি বাঁধা ভাল্লুকের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে প্রত্যভিবাদন করলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে খরগোসটি ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড়তে সুরু করল, এবং তাই দেখে কুকুরগুলো সরবে তার পিছু নিল। মুরোম্‌সকির ঘোড়া এত গণ্ডগোলে ঘাবড়ে গিয়ে চমকে দৌড়তে দৌড়তে কিছুক্ষণ পরে একটা খানার সামনে গিয়ে চমকে একপাশে সরে গেল—এবং হঠাৎ ধাক্কায় মুরোম্‌-সকিও পড়ে গিয়ে আহত হলেন।

স্বাভাবিকভাবেই বেরেস্‌টভ্‌ দ্রুত এসে মুরোম্‌সকিকে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দু'জনে এক সঙ্গে প্রাতরাশ এবং কথাবার্তা বেশ

ভদ্রভাবেই হবে। অবশেষে মুরোম্স্কি একখানি গাড়ি চাইলেন, কেন না ওঁর পক্ষে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না মোটেই। এবং যাবার আগে বেরেস্টভ্‌কে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, আগামীকাল তিনি ও তাঁর ছেলে অ্যালেকসি অতি অবশ্য মুরোম্স্কির বাড়িতে ডিনার খাবেন।

বাড়িতে পৌঁছনমাত্র লিজা দৌড়ে এল—রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে? গাড়ি কেন? কার গাড়ি? ঘোড়া কোথায়? খোঁড়াচ্ছ কেন?

হেসে মুরোম্সকি জবাব দিলেন সব প্রশ্নেরই।

লিজা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আবার যখন তার বাবা তাকে বললেন যে, বেরেস্টভ্‌ ও তার ছেলে পরদিন এখানে ডিনার খেতে আসছে, তখন লিজা আকাশ থেকে পড়ল।

'কি বললে? বেরেসটভ্‌-রা কালকে আমাদের বাড়িতে ডিনার খাবে?---না বাবা তোমার যা খুশি তুমি করতে পার, আমি ওখানে যাব না।'

'সে কি। তুমি কি পাগল হয়েছ মা? —কবে থেকে এত লজ্জাশীলা হলে গো? ---ছিঃ মা, আবোল তাবোল বোকো না যাও।'

'না বাবা, তুমি যাই বল—বেরেস্টভ্‌দের সামনে আমি কিছুতেই আসব না, সে তোমাকে স্পষ্ট বলে রাখছি।'

মুরোম্সকি অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেলেন। কেন না তিনি জানতেন প্রতিবাদে বিপরীত ফল হবে। তাঁর মেয়েকে তিনি চিনতেন ভাল করেই।

লিজা গিয়ে নাস্‌চার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল। নানাকথার পর হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল—সে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বলল, 'বাবা, এক সর্তে আমি বেরেস্টভ্‌-দের সামনে বেরোতে পারি, এবং তাদের অভ্যর্থনা করতে পারি।—সেটা হচ্ছে এই যে, আমি যা করব, যা বলব—যা যা পোশাক পরব, তাতে তুমি কিছু বলতে পারবে না—রাজী?'

মুরোম্সকি হাসতে হাসতে বললেন,—'আবার এক নতুন পাগলামি মাথায় এসেছে বুঝি?---তা বেশ, ঠিক আছে পাগলী, আমি কথাটি কইব না।' বলে, লিজা-র মাথায় চুমু খেয়ে তিনি নিজের কাজে লেগে গেলেন।

●

ঠিক দুটোর সময় গাড়ি চড়ে বেরেসটভ্‌ এবং তার পেছনে ঘোড়ার চড়ে অ্যালেক্‌সি এসে হাজির। তাদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। মুরোম্সকি প্রস্তাব করলেন যে, প্রথমে তাঁরা তাঁর বাগান এবং পশুশালা দেখে নিন। তাঁরা এক সাথে ঘুরে এলেন এবং খাবার ঘরে গিয়ে বসতেই কুমারী জ্যাক্‌সন এসে হাজির হলেন 'বাউ' করতে করতে।

তারপরে এলো লিজা—কিন্তু এ কোন্ লিজা? সারা মুখ আর হাত পুরু

ক্রীম আর পাউডারে ঢাকা, মাথায় কাল চুল, গায়ে ফাঁপান হাতাওলা ব্লাউজ এবং অত্যন্ত টাইট স্কার্ট,—আর, তার মায়ের যা কিছু অলংকার তখনও পর্যন্ত বাঁধা পড়ে নি, সেগুলো হাতে, গলায়, কানে সব পরা। বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত লিজাকে চেনার কোনও উপায়ই ছিল না।

মেয়ের এই অপরূপ সাজ দেখে মুরোমসকির হাসি চাপা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কোন রকমে হাসি চেপে তিনি লিজাকে চুম্বন করলেন। অ্যালেক-সিও কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে লিজার হস্তচুম্বন করল—অবশ্য এই বিচিত্র পোশাকে তার 'আকুলিনা'র কোন চিহ্নই সে দেখতে পায় নি।

তারা খেতে আরম্ভ করল। লিজা খুব উচ্চৈস্বরে এবং কেবলমাত্র ফরাসী ভাষায় কথা বলছিল। তার বাবা বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলেন; তিনি লিজার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও বেশ মজা অনুভব করছিলেন।

কেবলমাত্র বৃদ্ধ বেরেস্টভ্‌এর কোন বৈকুব্য ছিল না। তিনি বেশ দু'-হাত ভরে খাচ্ছিলেন এবং তদনরূপ পানও করছিলেন প্রাণভরে।

কিছুক্ষণ পরে অতিথিরা বিদায় নিলে মুরোম্‌সকি প্রাণ খুলে হাসবার সুযোগ পেলেন। বললেন, 'তোকে দেখাচ্ছে মন্দ না। আমার মনে হয় অল্প কিছু স্নো-পাউডার তোর ব্যবহার করা উচিত—ভালই হবে।

লিজার আনন্দের অবধি ছিল না, অ্যালেক্‌সিকে ঠকাতে পেরে। সে নাচতে নাচতে সারা বাড়ি চষতে লাগল কুমারী জ্যাকসনকে ঠাণ্ডা করতে তার কিছু সময় গেল; কেন না, তারই স্নো-ক্রীম-পাউডার আজ ধ্বংস করেছিল সে।

পরদিন খুব ভোরে সে তার ছদ্ম-বেশ পরে অ্যালেক্‌সির কাছে গেল।

'আপনে কাল বাবুগো বাড়ি গেছি-লেন শোনলাম—কত্তার মেয়েরে কেমন মনে হল?'

'লক্ষ্য কর নি—বোধ হয় বাজে।'

'সে কী। আমি কোথায় আপনারে জিজ্ঞাস করবো ভাবছি যে, লোকে-যে বলে-আমারে না কি অনেকটা কত্তার কন্যার মত দেখতে—তা সত্য কি না।'

'আরে দূর, দূর। সে একটা পাগলী রং চং করা সং।'

ছি ছি'—অমন কথা বলতে নাই। আমি জানি কত্তার মেয়ে কত সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী।

অ্যালেকসি কাব্যিক ভাষায় লিজাকে বোঝাল যে তার চাইতে সুন্দরী ধারে-কাছেও নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিজা বলল,—'কিন্তুক আমি তো গরীব চাষার মেয়ে—আমার সঙ্গে তার তুলনা শুধু ঠাট্টা করা।'

'আরে তাতে কি হয়েছে? তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো আমি তোমাকে লিখতে পড়তে শিখিয়ে দোব।'

'সত্যি?---সে বেশ মজা হবে কিন্তুক—'হাততালি দিয়ে লিজা নেচে উঠল।

'ঠিক আছে—এখন থেকেই আরম্ভ করা যাক্ তা হলে।'

তারা পাশাপাশি বসল। অ্যালেক্‌সি পকেট থেকে পেন্‌সিল আর নোটবই বার ক'রে লিজা-কে বর্ণ পরিচয় করাতে বসল। যে অসম্ভব দ্রুতগতিতে তার অক্ষর-পরিচয় সমাপ্ত হল, তা দেখে অ্যালেকসি অবাক। উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিজা-র প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ।

পরদিন সকালে লিজা লিখবে বলে আবদার ধরল। প্রথমে কিছু ইতস্তত করলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই তার পেন্সিল আস্তে আস্তে অক্ষর-গুলো লিখতে পারল।

'অবাক কাণ্ড—আমার জন্মে আমি এমন বুদ্ধি দেখি নি।---তুমি একটি বিস্ময়।'—উল্লাসে বলে উঠল অ্যালেক্‌সি।

এই অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ শীগগিরই লিজা গোটা গোটা করে লিখতে শিখল এবং একটি ফাঁপা ওক গাছ আর নাস্‌টার মাধ্যমে তাদের চিঠিপত্র আদান-প্রদান সুরু হল।

ইতিমধ্যে বেরেস্‌টভ্ এবং মুরোম্‌সাকি পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন, ক্রমাগত দেখাশুনোর ফলে, এমন কি তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়েছিল বলা চলে। কারণ খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয় না—মুরোম্‌সকি চিন্তা করে দেখলেন যে বেরেসটভ্‌-এর যা কিছু সবই পাবে অ্যালেক্‌সি, সুতরাং তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে বাজীমাৎ। আবার বেরেসটভ্‌ও ভাবছিলেন যদি মুরোম্‌সকির মেয়ের সঙ্গে অ্যালেক্‌সির বিয়ে দেওয়া যায়, তবে মুরোম্‌সকির আত্মীয় প্রভাবশালী প্রন্‌সকির সাহায্যে অ্যালেকসিকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

এইভাবে 'পরস্পর পিঠ চুলকানি' সমিতির দুই সভ্য পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, কিন্তু যতদিন যেতে লাগল, ততই দুই বৃদ্ধ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং তাদের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

কথায় কথায় দুই বন্ধু নিজের ইচ্ছা অপরের কাছে প্রকাশ করে ফেললেন। প্রাণ খুলে হেসে নিয়ে দু'জনে আলিঙ্গনা-বদ্ধ হলেন এবং মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

মতলব ভেঁজে বেরেস্‌টভ্ অ্যালেক্‌-সিকে ডেকে বললেন,—'অ্যালিউশা, তুমি ত অনেক দিন সৈন্য দলে যোগ-দানের কথা বল নি। কী ব্যাপার—ভুলে গেলে না কি, অ্যাঁ?'

'না বাবা,' সসম্ভ্রমে অ্যালেক্‌সি উত্তর দিল, 'ভুলি নি। কিন্তু আপনার অমত জেনে আমি আর উল্লেখ করি নি।'

'বেশ, বেশ, তুমি পিতৃভক্ত জেনে বড় খুসী হলাম।---মানে কথা হচ্ছে যে, আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই।'

'কার সঙ্গে বাবা?

'লিজাভেটা গ্রিগোরিয়েভ্‌না মুরোম্‌সকির সঙ্গে। খাসা মেয়ে—কি বল?

'বাবা, আমি এখনও বিয়ের কথা ভাবি নি।'

'আরে বাপু, তুমি ভাবনি বলেই তো আমাকে ভাবতে হয়েছে।'

'বেশ আ---আপনার যা ইচ্ছে।

কিন্তু আমি লিজা মুরোমস্কিকে মোটেই পছন্দ করি না। আমার মনে হয় না আমি তাকে সুখী করতে পারব।

'ওহে বাপু---ও সব ভালবাসা টাসা পরে আসবে, বুঝলে।---বাজে কথা বলে আমার অবাধ্য হবার চেষ্টা কোর না। তা হলে আমি তোমাকে অভিশাপ দোব।'

'যা আপনার ইচ্ছে তাই করতে পারেন, আমি বিয়ে করব না।'

'বটে। তা' হলে শুনে রাখ : আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি উড়িয়ে পুড়িয়ে দোব—তোমার জন্য কিছু রাখব না। —তিন দিন তোমাকে সময় দিলাম ভেবে দেখতে এবং এ তিনদিন তুমি আমার সামনে এসো না।'

●

অ্যালেক্সি সরে গিয়ে ভাবতে লাগল। যতই ভাবতে লাগল, ততই সে উপলব্ধি করল যে, আকুলিনাকে ছাড়া তার চলবে না---আকুলিনা তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে রয়েছে, সেখানে লিজার জন্য কোন স্থান নেই। তৎক্ষণাৎ সে কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল এবং আকুলিনাকে আবেগময় ভাষায় পত্র লিখল তার সমূহ বিপদ সম্বন্ধে। লিখল যে, সে তাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না এবং আ৷ কাউকে বিয়ের কথা ভাবতে পারছে না।

পরদিন, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অ্যালেক্সি ঘোড়ায় চড়ে মুরোম্সকির বাড়িতে হাজির হল তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি ফয়সালা করার জন্য। তিনি বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে অ্যালেকসি জানতে পারল যে, লিজাভেটা বাড়িতে আছেন।

মনের আবেগে অ্যালেক্সি স্থির করল যে তাকেই সব কথা খুলে বলবে। এই ভেবে সে কোন খবর না দিয়েই সোজা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। এত লিজা নয়—এ যে তার আকুলিনা শ্যামবর্ণা, নধর, কোমল আকুলিনাই ত তার সামনে দাঁড়িয়ে। এক মনে তারই লেখা পাঠরত। এত মগ্ন যে অ্যালেক্সির ঘরে ঢোকা টেরই পায় নি।

আনন্দে অধীর হয়ে অ্যালেক্সি চীৎকার করে উঠল---চমকে তাকিয়ে লিজা দৌড়ে পালাতে চাইল, কিন্তু অ্যালেক্সি তাকে জড়িয়ে ধরলো।

'আরে তুমিই ত---কী বলে আকুলিনা। তুমিই আবার লিজা। বা রে বহুরূপী।'

লিজা ছটফট করতে লাগল, কিন্তু আনন্দবিহ্বল অ্যালেকসি-র দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে পারল না।

ইতিমধ্যে বেরেস্টভ্ বন্ধুর কাছে দুঃখের কথা বলতে এসে হাজির। দুই বন্ধু মিলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ঘরের দৃশ্য দেখে অধীর আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে সশব্দে চুম্বন করে এক সাথে বলে উঠলেন---

'আরে, এরা ত নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নিয়েছে হে। আর আমাদের মত বুড়োদের কষ্ট করার কি দরকার।'*

অনুবাদক—সমীরণ চৌধুরী

---

* Mistress into Maid-এর বঙ্গানুবাদ।

আন্তর্জাতিক পুস্তক সমারোহ

আগামী ২২শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ব্রুসেল্স্ শহরে আন্তর্জাতিক বইয়ের এক প্রদর্শনী হচ্ছে। এর মধ্যে আঠারোটি দেশ থেকে বিভিন্ন প্রকাশক-সংস্থা এতে অংশ গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। যারা ইতিমধ্যেই সম্মতি জানিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পশ্চিম ও ও পূর্ব জার্মানী, ইতালী, সুইৎসারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ইজরায়েল, কানাডা, স্পেন্, ইজিপ্ট্ এবং বেলজিয়াম।

প্রধানত প্রকাশিত ও প্রদর্শিত বইয়ের কেনাবেচার জন্যই এই মেলা, কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকবে যথেষ্ট।

আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক বোঝা-পড়ার ক্ষেত্রে যে যতটুকু করতে পারে, তাতেই সার্বিক মঙ্গল আসবে। নানা দেশের লেখক ও প্রকাশকদের দেখা-শুনার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেনদেন বাড়ে এবং সকল দেশই কিছু-না-কিছু উপকৃত হয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ-ধরণের সমারোহ প্রয়োজনীয়। কারো কিছু জানবার থাকলে এ-বিষয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন :—

"Syndicat des Editeurs belges",
32, Avenue Louise,
Brussels-5 (Belgium)

পাথরের সেনাপতি

চিত্র : এম আর দত্ত

নদীর ধারেই ছিল মস্ত উঁচু পাথরের সেই মূর্তি। বাঁধানো এক বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে ডান হাতে ধরে আছে খোলা এক তরবারি, আরেক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে মুঠো করে। মূর্তিটির চোখ দুটি বড় বড়। উঁচু নাক। চওড়া কপাল। চাপা ঠোঁটে ফুটে আছে অসীম এক বীরত্বের ছাপ। মাথায় শিরস্ত্রাণ, সমস্ত শরীর তার বর্ম দিয়ে ঢাকা। পিছনে দাঁড়িয়ে কাছে একটি ঘোড়া। সামনের একটি পা একটু ভাঁজ করে প্রভুর আদেশের জন্য সে যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছে। আদেশ পাওয়ামাত্র সে উল্কার বেগে ছুটে চলবে---প্রভুকে নিয়ে যাবে যেখানে তিনি যেতে চাইবেন।

কালো পাথরে তৈরী এই মূর্তিটি হ'ল এক সেনাপতির। তিনি ছিলেন এ দেশের সব চাইতে বড় বীর। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তার দেশকে। যার অসীম বীরত্ব, দেশপ্রেম আর স্বার্থ ত্যাগের কথা তারা কেউই ভুলতে পারে নি। এই মূর্তির কাছে এসে দেশের সমস্ত মানুষ তাই আজও কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধায় মাথা নোওয়ায়। তারা বলে---হে বীর সেনাপতি, কোনদিনও তোমাকে আমরা ভুলব না, কোনদিনও না।

সেদিন সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন অনেক রাত্রি। নদীর জল আছড়ে পড়ছে তীরে। হাড়কাঁপানো খুব ঠাণ্ডা হাওয়ায় জবুথবু হ'য়ে পড়েছে নগরটি। ঠিক এমনি সময় পাথরের সেই সেনাপতির মূর্তি চারদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে তার তরবারিটা নীচে নামালেন। তারপর খাপের মধ্যে রেখে তিনি মনে মনে বললেন, কাল আমার

অরুণাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত

জন্মদিন। ভোর হতেই ভিড় সুরু হবে, ফুল আর ধূপ দিয়ে হাজারে হাজারে মানুষ আমাকে তাদের ভালবাসা জানাবে, রাজাও কাল আসবেন। কিন্তু আজ আমার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না। কতদিন আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় আমার এই দেশকে ঘুরে দেখি নি। একবার আজ ঘুরে এলে হয়। কতক্ষণই বা আর লাগবে। এখান হ'তে সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় নিলে বড় সড়কটিতে গিয়ে পড়বে। সেখান হতে ঘোড়া ছুটিয়ে দু' পাশের ঘর-বাড়িগুলো দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। তারপর তুরুক সওয়ারের পাশে দিয়ে সোজা যাব রাজপ্রাসাদে। তুরুক সওয়ারে আছে হাজার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। খুব সাবধানে যেতে [illegible] এর পাশ দিয়ে। একটুকু টের পেলেই অনর্থ করে ছাড়বে। তারপর আমার নিজের হাতে তৈরী মাউন্ত দুর্গকে একবার দেখে চুপি চুপি এখানে ফিরে আসব।

শেষে এই ঠিক করে পাথরের সেনাপতি বেদী থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে এলেন। তার প্রিয় ঘোড়া তিস্তাও নেমে এল সেই সঙ্গে। তিস্তার পিঠে চেপে লাগাম দু'টো টান করে ধরে সেনাপতি ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়া। বড় সড়কটির কাছে এসেই তিনি গতি কমালেন। নিঝুম রাত্রিতে তিস্তা শুধু তার খুর দিয়ে ঠাক্ ঠক্ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। হঠাৎ সেনাপতি দেখতে পেলেন বড় সড়কের পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটি বেরিয়ে গেছে, তারই মাথায় একজন সৈনিক প্রহরী আপনমনে টহল দিচ্ছে। সে ঘুম ভাঙাবার জন্য পায়চারী করছে, দেখছে না কিছুই। হঠাৎ সেনাপতিকে সামনে দেখে সে ভীষণ ভড়কে গেল। হাত থেকে ভল্লটাও সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। আরেকবার সেনাপতিকে দেখে নিয়েই খুব সরু একটা গলি দিয়ে বিদ্যুৎবেগে সে ছুটে পালাল। প্রহরীর এই ব্যাপার দেখে প্রথমে সেনাপতি হো হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার অবর্তমানে প্রিয় সেনাদলের অবস্থা দেখে এক দুঃখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

তিনি তিস্তাকে নিয়ে সামনে আরও এগয়ে চললেন। ছোট বড় বাড়িগুলো অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে। আব্ছা আব্ছা একটু যা দেখা যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে হঠাৎ এক ঘোড়ার খুরের শব্দ তার কানে এল। তখন যে পথ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তার দু'পাশে বড় বড় বাড়ী, পাশ দিয়ে কোন রাস্তা কোন দিকে বেরোয় নি। শব্দটা আসছে সামনে থেকে। একজন মানুষ যে ঘোড়ায় চেপে তার সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, এতে সন্দেহ আর এক তিলও রইল না। লোকটিকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। একমাত্র মুখ ঘুরিয়ে পিছনের দিকে যাওয়া ছাড়া। যা জীবনেও তিনি কোনদিন

করেন নি। এগিয়ে যাওয়াই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য, পালিয়ে আসা নয়। তিনি তিস্তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে নীচু হয়ে তাকে যেন কি বললেন। তিস্তা এরপর গুণে গুণে পা ফেলে চলল। রাস্তাটা সেখানে বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের কাছে এসে বাঁক না ঘুরে একটি বাড়ীর গা ঘেঁষে সে চুপ করে দাঁড়াল। সামনের রাস্তাটা এবার আর দেখা যাচ্ছে না। শব্দটা দেখতে দেখতে একেবারে কাছে চলে এল। এই মোড়ের কাছে এসেই একটা সাদা ঘোড়া হঠাৎ থেমে পড়ে সামনের পা দুটো ওপরের দিকে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভীষণ জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল। সাদা ঘোড়াটার ওপর একজন টহলদারী সৈনিক বসেছিল। খুব জোয়ান লোকটি। অন্ধকারের মধ্যে খুবই আবছা সেনাপতিকে সে এবার দেখল। টহলদার সৈনিকটি চীৎকার করে উঠল---কে যায়?

সেনাপতি ওখান থেকে উত্তর দিলেন---ঘোড়সওয়ার।

সৈনিকটি আবার চীৎকার করে বলল---ঘোড়ায় চাপলেই ঘোড়সওয়ার। কোথায় যাচ্ছ? নাম কী?

সেনাপতি বললেন---দরকার?

সৈনিকটি এবার রেগে গিয়ে বলল, মুখ সামলে কথা বল। সামনে এসে দাঁড়াও। তোমাকে আমি দেখব।

সেনাপতি বললেন---সাহস থাকলে এখানে এসে দেখে যাও। না হয়তো ভালয় ভালয় পথটি এখন ছাড়।

অন্ধকারের মধ্যে কেউ কাউকে ভাল রকম দেখতে পাচ্ছিল না। সৈনিকটি বলল---আচ্ছা দাঁড়াও। আমিই যাচ্ছি। তৈরী হয়ে নাও। সাবধান।

পাথরের সেনাপতি বুঝলেন, সৈনিকটি এক্ষুণি তাকে আক্রমণ করবে। তিনি খাপ থেকে তরবারিটি খুললেন। মনে মনে ঠিক করে নিলেন, সে কোন্ দিকে আসছে শুধু লক্ষ্য রেখে তার সেই বিখ্যাত মারটি তিনি মারবেন। সৈনিকটির গায়ে একটুও আঘাত লাগবে না, শুধু তার তরবারিটি কেড়ে নিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। সেনাপতি ঘোড়ার ওপর দুলতে লাগলো। এক হাতে লাগামটি ধরে তিনি চীৎকার করে উঠলেন---খবরদার!

পরমুহূর্তে সৈনিকটি এক ভীষণ হুঙ্কারে তার দিকে ছুটে এল। তিস্তা সামনের পা দু'খানা ওপরের দিকে তুলে সাদা ঘোড়াটিকে আক্রমণ করল। চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে সৈনিকটির তরবারির ওপর সেনাপতি তার তরবারি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। লাগামটি ছেড়ে দিয়ে ঐ হাতেই একটু ঝুঁকে পড়ে সৈনিকটির ডান হাত চেপে ধরলেন। এক লহমায় ছোট্ট একটি খেলনার মত সৈনিকটির

সাজের আনন্দ চিত্র : কমলাকান্ত দে

তরবারি কেড়ে নিয়ে পাশে এসে সরে দাঁড়ালেন।

সৈনিকটি প্রথমে খুব হকচকিয়ে গেল। এ-কী হল। এ রকম ব্যাপার তার এর আগে আর কখনো হয় নি। তার মতন এত বড় যোদ্ধাকে কী করে এই লোকটা এত সহজে বেকুব বানাল ডান হাতটা এখনো তার ঝিন্ ঝিন্ করছে। লোকটি যে সত্যিই শক্তিমান; সে বিষয়ে তার আর একটুও সন্দেহ রইল না।

পাথরের সেনাপতি তরবারিটি কেড়ে নিয়ে কিছুক্ষণ সৈনিকটিকে দেখলেন। তারপর দূর থেকে বললেন ---ছোকরা কব্জির জোর বাড়াও। ঐ হাত দিয়েই রক্ষা করতে হবে দেশকে। সাহসের সঙ্গে শক্তি, তবেই তো পারবে দেশকে রক্ষা করতে। এবার আমার পথ ছাড়।

সৈনিকটি বলল---যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ না। অস্ত্র আমার নাই থাকুক, মল্লযুদ্ধে তোমাকে হারাব। যদি মল্ল যুদ্ধেও না পারি তখন আমার কোন থাকবে না। কারণ তখন এই প্রাণহীন দেহটারই ওপর বসে তুমি বিজয়ীর হাসি হাসবে।

এক স্নিগ্ধ হাসিতে সেনাপতির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। চোখ দুটো তার সজল হয়ে উঠল। মনে মনে তিনি বললেন---আমি যা ভালবাসি, আমি যা বলতে চাই, আমি যা বলে থাকি তুমিও তা বললে দেশপ্রেমিক। আমার ভারাক্রান্ত মনে আলোর ছটা দিলে।

হঠাৎ এমনি সময় এক মশালের খুব অল্প আলোয় দু'জন দু'জনকে দেখল। সৈনিকটি যেমন স্বাস্থ্যবান তেমনি সুন্দর। বয়স খুব বেশী নয়। কোঁকড়ান চুল এসে পড়েছে কপালে। চোখে-মুখে ফুটে আছে বীরত্বের ভাব।

সৈনিকটিও মহাবিস্ময়ে তার বড় বড় চোখ দিয়ে সেনাপতিকে এবার দেখল। এ কে? একী মানুষ! দূর হ'তে সেই মশাল হাতে লোকটি সৈনিকটিকে বোধহয় ডাকল। সেও পিছন ফিরে ডাকল লোকটিকে। শুধু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তিস্তা তার কাজটি সেরে ফেলল। সৈনিকটির তরবারিটি ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সৈনিকটির পাশ দিয়ে মশাল হাতে লোকটির গা ঘেঁসে অন্ধকারের মধ্যে পাথরের সেনাপতি চোখের নিমেষে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।

তারই বিচিত্র কৌশলে তৈরী সেই মাউত দুর্গকে এবার তার দেখবার খুব ইচ্ছে হল। ঘোড়া তিনি ছোটালেন সেই দিকেই। মাউত দুর্গকে দূর থেকে ভাল করে দেখালেন। তারপর তিনি কোথায় যাবেন ভাবলেন। নগরের একেবারে বাইরে এই দুর্গটি। এবার তিনি রাজপ্রাসাদের দিকে যেতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই রাস টেনে

হঠাৎ ঘোড়া দাঁড় করালেন। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গাছের তলার একটি ছোট ছেলের ওপর। কাঁথা দিয়ে সমস্ত শরীরটা জড়িয়ে গাছের তলায় ঘুমচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খুব জোরে জোরে পা ফেলে তিনি ঐদিকে এগিয়ে গেলেন। ঝুঁকে পড়ে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর দু'হাত দিয়ে তুলে নিলেন তাকে। ছেলেটি চোখ মেলে একবার তাকে দেখল। কী পবিত্র-সুন্দর শান্ত সেই দৃষ্টি। পাথরের সেনাপতি বললেন—তোমার নাম কী? থাক কোথায়? তোমার মা-বাবা কেউ নেই?

ছেলেটি শুধু বলল—আমার শীত করছে।

করুণা, দয়া আর এক মমতার সেনাপতির চোখদুটো জলে ভরে উঠল। ছেলেটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন তিনি। হ্যাঁ, সত্যিকথাই সে বলেছে। তার একটি জামা আর এই ছেঁড়া কাঁথাটা ছাড়া আর যে কিছুই নেই। কাঁথাটা হঠাৎ সরে গেলে তিনি দেখলেন, তার জামায় একটি বোতামও নেই। ছোট বুকটি তাই একেবারে খোলা। এবার শীত হয়তো ওর একটু কমল। সে বলল—আমি খাব, আমার খিদে পেয়েছে।

সেনাপতি বললেন—তুমি কী আজ খাও নি?

ছেলেটি বলল—কালও আমি খাই নি।

সেনাপতি বললেন—আহা, সারাদিন খিদের জ্বালায় তুমি মুখ বুজে কত কেঁদেছ। চল, তোমার খাবার আমি এক্ষুণি যোগাড় করছি।

ছেলেটিকে বুকের ওপর চেপে তিনি আবার তিস্তার পিঠে চেপে বসলেন। তিস্তা এবার এগিয়ে চলল লোকালয়ের দিকে। শেষে থামল টালির ছাদ দেওয়া মেটে রঙের একটি বাড়ির কাছে। মিষ্টির দোকান এটি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তিনি দোকানের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দরজার পাল্লায় আস্তে করে টোকা মারলেন। জানালার একটু ফাঁক দিয়ে দেখলেন, ভিতরে প্রদীপের আলো টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। আবার কড়া নাড়তে খুব বুড়ো একজন লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। খুব কুঁজো সেই লোকটি হাত দিয়ে চোখ দুটো আড়াল করে বলল—কে আপনি এত রাত্রে? কী সে দেখছে? কার সঙ্গে সে কথা বলছে সে ঠিক বুঝতে পারল না। বিরাট দুটো পা-ই সে শুধু দেখতে পেল।

সেনাপতি বললেন—কিছু খাবার আমাকে দিতে পার?

বুড়ো লোকটি বলল—দাঁড়াও, তোমাকে আগে ভাল করে দেখি।

ভিতর থেকে একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে এনে দূর থেকেই সে যা দেখল তাতেই

আগামীদিনের জওয়ান চিত্র : আশীষ মিত্র

চক্ষু তার স্থির হয়ে এল। ঝট্ করে দরজাটা বন্ধ করে সে তারস্বরে চীৎকার করতে শুরু করে দিল। সেনপতি বুঝলেন এখানে তার আর এক মুহূর্তও থাকা ঠিক হবে না। হাড়-মাস না থাকলে কী হবে, গলার জোর সে লোকটির আছে—সে কথা সবাইকে একবাক্যে স্বীকার করতে হবে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে চেপে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে মুখ নীচু করে ছেলেটিকে বললেন—তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে থাক, তোমার খাবার আমি যোগাড় করবই।

এবার তিনি হানা দিলেন আরেকটি দোকানে। সেখানে সবকিছু খাবারই পাওয়া যায়। এ এলাকায় একটিই সব চাইতে বড় দোকান। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কড়া নাড়লেন। অনেকক্ষণ পর একটি মাঝামাঝি বয়সী মেয়েছেলে উঠে এল। দরজা না খুলে জানলা দিয়ে ঘুম জড়ানো চোখে সে বলল—ছুঁচো, বাঁদর, ছেঁচড় কে রে তুই এত রাত্রিতে হামলা করছিস।

বাইরে ঐ আবছা অন্ধকারে সামান্য যেটুকু সে দেখল, তাতে একটি রাও আর করল না। দাঁড়ান থেকে নীচে ধপাস্ করে গিয়ে পড়ল। নীচে পড়েই ভীষণ গোঙাতে আরম্ভ করল মেয়েটি।

পাথরের সেনাপতি তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে চেপে সামনের দিকে ছুটে চললেন। মেয়েটির এই ব্যাপার দেখে উৎসাহ কিছুটা তার ঝিমিয়ে এল। তাকে দেখে যদি কেউ মারা যায়, তার চেয়ে দুঃখের কী আর থাকতে পারে। বাচ্চা ছেলেটি হঠাৎ কেঁদে উঠল। মুখ নীচু করে দেখলেন, শুকনো ঠোঁটদুটো তার কাঁপছে। না না,—সেনপাতি বলে উঠলো —তোমার খাবার আমি যোগাড় করবই। তুমি ভেব না, আরেকটু সবুর কর।

ঘোড়া আবার তীরবেগে ছুটিয়ে দিলেন। গৃহস্থের এক বাড়ীর কাছে এসে তিস্তা এবার থামল। খুব পুরনো একটা বাড়ী। প্রাচীরের গা দিয়ে লতা বেয়ে বেয়ে উঠেছে। কোন কোন জায়গায় ইঁট খসে পড়েছে। সেনাপতি মনে মনে বললেন, এবার এই গৃহস্থের বাড়ীতেই চেষ্টা করে দেখা যাক। তিস্তার পিঠ থেকে নেমে কপাল ঠুকে তিনি ফটকটি খুব সহজে ডিঙিয়ে প্রাচীরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। সামনে খুব নড়বড়ে একটা দরজায় ধাক্কা দিলেন। আরেকটু জোরে ধাক্কা দিলে হয়তো একটা পাল্লাই তার খুলে আসত। ভিতর থেকে কে যেন সাড়া দিল। একটু পরেই দরজা খুলে খুব থুড়থুড়ে এক বুড়ী বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল—কাকে খুঁজছো বাছা?

সেনাপতি বললেন—মা, আমাকে কিছু খাবার দিতে পার?

বুড়ীটি বলল—ভিতরে এসে বস। দাঁড়াও পিদিমটা আগে নিয়ে আসি।

সেনাপতি বুঝে ফেললেন এরপর ব্যাপারটা কী হবে। নির্ঘাত বুড়ীটি মারা যাবে। তাকে ভিতরে যে দয়া করে বসতে বলেছে এই কৃতজ্ঞতা নিয়ে তার এখন চলে যাওয়া ভাল। যাবার আগেই বুড়ী পিদিম হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সেনাপতি এই প্রথম অবাক হয়ে দেখলেন, বুড়ীমা চীৎকার করা দূরের কথা অবাকও একটু হল না। সেনাপতির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছেলেটিকে কিছু বলতে গিয়ে দেখলেন সে ঘুমোচ্ছে। বুড়ীটি এবার বলল—তুমি বস, তোমার খাবারটা এবার নিয়ে আসি।

কিন্তু যেতে যেতে মাঝপথ থেকেই সে আবার ফিরে এল। এসে বলল—আচ্ছা বলত এখন দিন না রাত।

সেনাপতি অবাক হয়ে বললেন—কেন বলত?

বুড়ীটি বলল—আমার মেয়েকে এখন ডাকতে হবে। রাত্রিতে আর দুপুরে ও ঘুমোয়। এখন যদি রাত্রি হয়, তাহলে তো ও উঠবেই না, বরং আমাকে আরো গালাগাল দিয়ে ভূত বানাবে। দিনের বেলা হলে বলে কয়ে যদি ওকে রাজী করাতে পারি।

সেনাপতি বললেন—এখন তো রাত্রি। কেন মা রান্নাঘর থেকে তুমি নিজে কিছু খাবার এনে দিতে পার না? এখন তোমার মেয়েকে ডাকলে নিশ্চয় তোমাকে গালমন্দ করবে।

বুড়ী বলল—হায় রে বাছা, দুঃখের কথা আর বল কেন। মেয়ে আমার বড় দজ্জাল। এই ভাঙা বাড়ীতে চাবি আছে মোট পঞ্চাশটা। দরজাগুলো অমন নড়বড়ে হলে হবে কী, তালা দেওয়া আছে সব কটাতে। ছোট একটা টিনের বাক্স—তাতে হলুদ জিরে লঙ্কা থাকে, তাতেও আমার মেয়ে তালা দিয়ে রেখেছে।

সেনাপতি বললেন—কেন?

বুড়ী বলল—আমার মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়েই আমার জমি-জমা দেখাশোনা করে। কাজের মাথায় ও প্রায় ঘরের বাইরেই থাকে। আমি অন্ধ কিনা, ঝি যদি পাছে জিনিসপত্র কিছু চুরি করে।

সেনাপতি এত দুঃখের হো হো হেসে উঠলেন। বুড়ী বলল—অত জোরে হেসো না বাবা। আমার মেয়ে যদি ঘুম থেকে উঠে পড়ে আর শোনে আমি এসব কথা তোমাকে বলছি, তাহলে কাল থেকে দুটো যে ভাত তাও আর জুটবে না। এখন বলত রাত না দিন?

সেনাপতি বললেন ঐ মেয়েটি

খোকাবাবু অবাক চিত্র: আই বি ঘোষ

যদি একবার তাকে দেখতে পায়, তাহলে ঐ জিরে হলুদের মত তাকেও তালা দিয়ে আটকে রাখবে। তিনি বললেন—থাক মা, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। দরজাটা তুমি বন্ধ করে দাও।

সেনাপতি বাইরে আসতে আসতে শুনলেন, বুড়ীমা কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলছে—দিতে পারলাম না। এ দুঃখ আমি কোথায় রাখব বাছা।

তিনি এবার ঠিক করলেন, আর নয়। এভাবে ঘুরে ঘুরে কোন লাভ হবে না। এর চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমি যে বাড়ীতে থাকতাম, সেখানেই এখন যাওয়া যাক। বাড়ীতে কী আছে তা আমি জানি। নিশ্চয়ই এখন কেউ-না-কেউ ওখানে আছে। প্রাচীর টপকে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে পারলে সারা বাড়ী খুঁজে দু'মুঠো খাবার আমি পাবই। কিন্তু সামনের এই লোকালয়টি কোনমতে পার হতে হবে। এর মধ্যে ঐ সৈনিকটি নিশ্চয় খবর দিয়েছে তুরুক সওয়ারে। যদি দেয় তো খুব মুস্কিল হবে তাহলে। তা হোক, ওখানে যেতেই হবে আমাকে।

সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে চললেন। মোড় ঘুরে একটি ছোট রাস্তার ওপর পড়তেই দূর থেকে হঠাৎ কতকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে ভেসে এল। একটু পরেই তিনি বুঝলেন, তিনি যা আঁচ করেছিলেন তাই। একদল সৈনিক এগিয়ে আসছে। তিনি সেই মোড়ের কাছে খুব অন্ধকার আর নোংরা একটি সরু গলির মধ্যে তিস্তাকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন। লোকগুলো সব এসে ঐ মোড়ের কাছেই এক সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়াল। ভীষণ গণ্ডগোল করতে লাগল তারা। সৈনিকদের কথাগুলো এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে লাগলেন তিনি। তাদের মধ্যে একজন হামবড়া লোক খুব বড় বড় কথা বলছিল। মোটারকম দেখতে ঐ হামবড়া লোকটি হঠাৎ তার খাপ থেকে তরবারি টেনে বার করল। উঁচনো তরবারিটা শূন্যে কবার ঘুরিয়ে সে বলল—একবার যদি পাই আমি সেই আঁকড়া, কিছুতেই ছাড়ব না। প্রাণ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ হাতের এই তরবারিও চলবে।

খুব পাতলা রকম দেখতে একটি সৈনিক বলল—তুমি তোমার এই তরবারি তার বুকের মধ্যে সজোরে বিঁধিয়ে দেবে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত যখন উঠবে, আমি আঁজলা করে সেই রক্ত খাব।

মোটা সৈনিকটি বলল—একবার পেলে হয়। জিবটা আমি উপড়ে নেব, চোখদুটো খুলে নেব, কান দুটো কেটে দেব। তারপর লোহার শিকলে

পুটো বেঁধে রাস্তার ওপর দিয়ে ছড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাব।

রোগা সৈনিকটি বলল—নিজের [illegible] নিয়েই নড়তে পার না, তুমি টেনে নিয়ে যাবে ঐ লোকটাকে, তাজ্জব।

আরেকজন সৈনিক বলল—এখানে রাতে হামলা করা ঠিক নয়। কেউ এসে দেখে ফেললে বকে ঝকে অনর্থ করবে। রাজামশায়ের কাছেও খবর গেছে জান?

এদের মধ্যে আরেকজন কে বলে উঠল—ঠিক বলেছ। জবুথবু হয়ে বসে থাকলে চলবে না। এগিয়ে চল। ঐ বড় সড়কের চৌমাথায় চল সবাই গিয়ে দাঁড়াই।

মোটা সৈনিকটি বলল—যা শীত কী করি বল। এস আর অল্প একটু দাঁড়াই। তবে এ ঠিক—আজ একবার দেখতে পেলে হয় এসপার-ওসপার হয়ে যাবে একটা। হ্যাঁ, লোকটা যেন কিরকম দেখতে বলছিলে।

সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে চোখ সমানে পিট পিট করছিল সে বলল—যা শুনেছি তাতে তাকে দৈত্য ছাড়া আর কী বলব। তিন মানুষ উঁচু লম্বা, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। এই বড় বড় হাত। ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ান চুল। আমাদের সেরা বীরের হাত থেকে তরবারিটা বাচ্চা ছেলের এক খেলনার মত কেড়ে নিয়েছে। ঘোড়াটাও নাকি তেমনি।

এবার ওদের মধ্যে খুব তেজীয়ান একজন সৈনিক সামনে এসে বলল—তোমরা এখানে সব থাক। আমি চট্ করে একবার পিছনের ঐ রাস্তাটা থেকে ঘুরে আসি। আমার সঙ্গে যে-কেউ একজন এস। একজন লোক নাকি ওদিক দিয়ে তাকে যেতে দেখেছে। এই তুমি এস, চল আমার সঙ্গে একবার ঘুরে আসবে—মোটা সৈনিকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে শেষের কথাগুলো সে বলল।

একইভাবে বসে একটি ঢোক গিলে মোটা সৈনিকটি বলল—ভাই, এ ব্যাপারে তুমিই বেশী ওয়াকিবহাল। তোমার অভিজ্ঞতার দাম আমার সাহসের চাইতে অনেক বেশী। বরং তুমিই এগিয়ে যাও। আমরা সব এদিকটা দেখছি।

সৈনিকটি এ কথা শুনে একটুও খুশী হল না। বলল—আমার অভিজ্ঞতার দাম যদি এত বেশীই হবে, তাহলে এতক্ষণ ধরে অত জাঁক করে কপচাচ্ছিলে কেন?—বলে লোকটি আর দাঁড়াল না। তীরবেগে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

সরু সেই গলির মধ্যে বাচ্চা ছেলেটি একবার খুক খুক করে কেশে উঠল। মশালের খুব অল্প যেটুকু আলো এদিকে আসছিল, সেই আলোতে
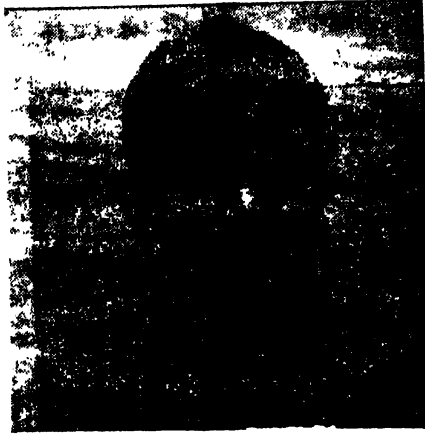
অবগাহন চিত্র : স্বদেশ ঘোষ

ছোট ছেলেটির চোখের নীচে কালি আর তার পাশে কুঁচকানো চামড়া দেখে সেনাপতির মনে হল তার বয়েস যেন অনেক—অনেক বেশী। নীচের দিকে কাঁথাটা ঠিক করতে গিয়ে দেখলো, পায়ের কাছে ঘা থক্ থক্ করছে। ছেলেটির মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে খুব আস্তে আস্তে তিনি বললেন—ওষুধপত্র এসব কিছুই কী তুমি লাগাও নি। দাঁড়াও, এর আগে তোমার খাবার আনি যোগাড় করছি। আর একটু তুমি সবুর কর লক্ষ্মীটি।

হঠাৎ তার কানে এল, গলির কাছে দাঁড়িয়ে সেই মোটা লোকটি আবার বলছে—রাগ করবে তো রাগ কর। প্রাণটা তো এমনি আর গচ্চা দিতে পারি না।

আমার মনে হয় একটা জানোয়ার, বনমানুষ, কালো ভালুক বা ঐ জাতীয় কিছু একটা হবে।

আরেকজন সৈনিক বলল—তোমাকে বলেছে, বন-মানুষ কী আবার ঘোড়ায় চড়ে।

হঠাৎ কে একজন বলে উঠল—এই চুপ চুপ, কারা যেন এদিকে আসছেন।

তিনটি ধবধবে সাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে তিনজন রাজপুরুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রথম রাজপুরুষটি খুব বিরক্তির সঙ্গে বললো—তোমরা এখানে এত ভিড় করেছ কেন?

যে সৈনিকটি তাদের সঙ্গে এসেছিল, এবার তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো—এখান থেকে তুমি পাঁচজনকে নিয়ে মাউত দুর্গের দিকে এগিয়ে যাও। রাজপ্রাসাদের চারদিকটা একবার ভাল করে ঘুরে আসবে। লোকটা যে বিদেশী এতে আমার একবিন্দুও সন্দেহ আর নেই।

সৈনিকটি বলল—আরেকবার সামনে আসুক। যত বড় চেহারাই তার হোক, এবার রক্ত কিছু খসাবই। একবারে না পারি, দু'বারে না পারি, তিনবারের বেলায় ঘায়েল তাকে আমি করবই।

দ্বিতীয় রাজপুরুষটি বললেন—এরপর কোন রাজা যদি আমাদের দেশকে আক্রমণ করে তাহলে অবাক হবার কিছুই নেই। মনে রেখ মাটিতে মিশে যাওয়া অনেক ভাল।

এমন সময় খুবই স্বাস্থ্যবান সুন্দর রকম দেখতে একজন সৈনিক টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে সেখানে এসে হাজির হল। খুব উত্তেজিত হয়ে সে বলল—ওদিকটায় ঘুরে এলাম। কী যে করি, কিছুতেই তাকে পাচ্ছি না। তার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া খুব দরকার। দেখতে চাই কত বড় জোয়ান সে।

তৃতীয় রাজপুরুষটি তাকে বললেন—তুমি এক কাজ কর। যাদের এখানে টাট্টু ঘোড়া আছে, তাদের নিয়ে পাহাড় আর জঙ্গলগুলো আরেকবার ভাল

ঘুরে ঘুরে এস। তারপর ফিরে এসে আমাকে খবর দেবে। আমি একবার তুরুক সওয়ার থেকে ঘুরে আসি। সেনাপতিকে বলে আসি যে লোকটিকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

শুধু একজন রাজপুরুষ আর ক'জন সৈনিক ছাড়া বাকী সবাই ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চলল। দেখতে দেখতে দূরে খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল।

এবার প্রথম রাজপুরুষটি বললেন—এখানে এখন দু'জন থাকলেই চলবে। বাকীরা আমার সঙ্গে চলে এস। কে থাকবে বল?

মোটা সৈনিকটি বলল—আমি থাকছি।

রোগা সৈনিকটিও বলল—আমি থাকছি।

প্রথম রাজপুরুষ সৈনিকদের নিয়ে চলে গেলে রোগা সৈনিকটি বলল—তুমি দল ছেড়ে বড় যে একা রয়ে গেলে। ওদের সঙ্গে গেলে না কেন?

মোটাটি বলল—কথায় বলে, রাজপুরুষদের সামনে আর ঘোড়ার পিছনে কখনো দাঁড়াতে নেই। তুমি বলছ ঐ রাজপুরুষের সঙ্গে যাব, তখন কী হবে জান? তখন উনি বলবেন ঝট্ করে ফিরে এস, চট করে--করে ফেল, ধাঁ করে চলে যাও। কী দরকার বাপু ঐ ঝক্কি পোহানোর। তার চেয়ে এখানে দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুনো যাবে। তা তুমি গেলে না কেন?

রোগাটি বলল—তোমার জন্য বন্ধু তোমার জন্য।

মোটা সৈনিকটি বলল—হ্যাঁ, তা ঠিক, তুমি ছাড়া আমার আর এমন প্রাণের বন্ধু কে আছে ভাই। তা আমার পেটটা এমন চিন-চিন করছে কেন বন্ধু? কী খাই এখন বলত?

রোগা সৈনিকটি বলল—আপাতত খাবি খাও, পরে আরও কিছুর ব্যবস্থা করা যাবে'খন।

মোটা সৈনিকটি বলল—তুমি তো তা বলবেই। নিজে তো হচ্চ পিলে রুগী। ক্ষিদে আর কোত্থেকে হবে।

মোটা সৈনিকটি আস্তে আস্তে সেই সরু আর নোংরা গলিটার কাছে যেতে যেতে বলল—আসল ব্যাপার কী জান, যুদ্ধের কৌশল এরা কেউই ঠিক জানে না! বড় শত্রুকে কোনদিনও সামনে থেকে আক্রমণ করতে নেই। ঘায়েল যদি করবেই তো পিছন থেকে কর।

রোগা সৈনিকটি বলল—তা তুমি তোমার ঐ ধুমসো শরীরখানা নিয়ে ঐ ঘুপসি সরু গলিটার মধ্যে ঢুকছ কেন?

মোটা সৈনিকটি বলল—আমি এই ঘুপসি গলিটার মধ্যে বসে থাকব। শত্রু যদি এই রাস্তা দিয়ে যায় তখন বাইরে বেরিয়ে পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করব। ব্যাপারটা এখন বুঝলে?

মোটা সৈনিকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সেখানে মাটির ওপর গিয়ে বসে পড়ল। একটু পরে রোগা সৈনিকটিও ঘোড়াটিকে তার গলির মধ্যে ঢুকিয়ে মোটা সৈনিকটিকে বলল—একটু জায়গা ছেড়ে বসতো বন্ধু, আমাকেও একটু বসতে দাও। তোমার বুদ্ধিটা নেহাত মন্দ না। তবে কী জান, যত বড় শত্রুই হোক না কেন আমরা তোয়াক্কা করব না কাউকে।

পাথরের সেনাপতি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তার কিছু দূরেই তারা গিয়ে বসল। এতক্ষণ ধরে তিনি আটকে আছেন। এই হচ্ছে সুযোগ। এবার তাকে বেরোতেই হবে। তিনি তিস্তার মাথায় একটা হাত বুলিয়ে তাকে যেন কি বললেন। তিস্তা খুব দিয়ে খট্-খট শব্দ করতে করতে ঐদিকে এগিয়ে চলল। রোগা সৈনিকটি বলল—এ কীসের শব্দ ভাই।

মোটা সৈনিকটি কিছু বলবার আগেই সেনাপতি চেঁচিয়ে উঠলেন—খবরদার!

ঘোড়াদু'টোর পাশ দিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মোটা আর রোগা সৈনিক দুটি তাকে একবার ভাল করে দেখল। তারপর চীৎকার করে দু'জন দু'জনকে জাপটে ধরল। সেনাপতি ওদের পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখলেন, মোটা সৈনিকটি এত জোরে রোগা সৈনিকটিকে জড়িয়ে ধরেছে

যে, বেচারা ঐ রোগা সৈনিকটি প্রাণে বেঁচে থাকবে কি না তার সন্দেহ হল।

ছোট ছেলেটি এবার কেঁদে উঠল। সেনাপতি মুখ নীচু করে তাকে বললেন—কেঁদো না আর একটু সবুর কর বাছা। এবার যেখানে যাচ্ছি তোমার খাবার সেখানে পাবই। কী করব বল। শুধু শুধু এরা এতক্ষণ আমাকে আটকে দিল। তোমার কষ্ট আমি বুঝেছি। শুধু আর একটু তুমি অপেক্ষা কর।

এদিকে রাত শেষ হতে বেশী বাকী নেই। সামনে এখনো অনেকটা পথ পড়ে। আরো জোরে তিনি ঘোড়া ছোটালেন। ঘোড়ায় যেতে যেতে ছোট ছেলেটিকে তিনি আবার বললেন—কিছু তুমি ভেবো না। ওখানে গিয়ে প্রাচীর টপকে ভিতরে আমি ঢুকব। ঐ বাড়ীটি আমার ছিল। ভিতরে গিয়ে রান্নাঘর থেকে কিছু খাবার আমি যোগাড় করব। তখন তুমি নিশ্চয় আর কাঁদবে না কেমন?

যেতে যেতে যাকে তিনি কথাগুলো বলছিলেন সে কিন্তু সেনাপতির বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। অলিগলির পাশ দিয়ে ছোট-বড় রাস্তাগুলো পার হয়ে যখন নিজের বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছুলেন, তখন হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর বাড়ী ঘিরে অনেকগুলো টহলদার ঘুরে ঘুরে টহল দিচ্ছে। তাদের হাতে আছে তলোয়ার, বল্লম, বর্শা আর সড়কি। এই দুঃখে তার দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এল। বুঝতে আর বাকী রইল না কিছুই। তিনি বুঝতে পারলেন, দেশের রাজাই এখন তাঁর এই বাড়ীটির দেখাশোনা করছেন। কাল তাঁর জন্মদিন। কাল অনেক গণ্যমান্য লোক এখানে আসবেন। দেশের আরো অনেকে এখানে আসবে। তিনি যে চেয়ারে বসে লিখতেন, যে তরবারিটি তিনি ব্যবহার করতেন, যে পোষাক পরে তিনি যুদ্ধে যেতেন—এরকম তাঁর ব্যবহার করা বহু জিনিসই তারা দেখবে। সেনাপতি যে ঘরে জন্মেছিলেন, সেখানে ধূপ-ধুনো আর ফুল দিয়ে তারা তাদের শ্রদ্ধা জানাবে।

অন্ধকার ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে। পাথরের সেনাপতি কিছুক্ষণ করুণ চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন।

নদীর তীরের দিকেই তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। ছেলেটি আরেকবার কেঁদে উঠল। সেনাপতি মুখ নীচু করে তার কপালে একটি চুমু খেয়ে বললেন—কেন তুমি কাঁদছ? পায়ের ঐ ব্যথার জন্য নিশ্চয়। না না, তুমি খিদের জন্য কাঁদছ না, কিছুতেই খিদের জন্য কাঁদছ না।

হঠাৎ এক অভিমানে শিশুর মতন তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

নদীর কাছে এসে পাথরের সেনাপতি যখন পৌঁছুলেন, তখন ভোরের আলো ফুটে ওঠার আর বিশেষ দেরি নেই। ছেঁড়া কাঁথাখানা ভাল করে ছেলেটির গায় জড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন—তোমার ঐ ছোট্ট মুখের কতটুকুন খাবারই না দরকার ছিল। তাও আমি যোগাড় করতে পারলাম না। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

কত বড় বড় যুদ্ধে কত কষ্টই না আমি করেছি। আমার দেশকে রক্ষে করার করার জন্য কত দুঃখ মাথায় পেতে নিয়েছি। কিন্তু তোমার ঐ এতটুকুন খাবার যোগাড়ের জন্য তার চেয়েও অনেক বেশী কষ্ট করলাম। কিন্তু তবুও আমি হেরে গেলাম। আমি হেরে গেলাম।

শেষ কথাটি তিনি এই বললেন—ভগবান তোমার ভাল করুন, মঙ্গল করুন।

ভোরের আলো ফুটে উঠলে হাজারে হাজারে মানুষ সেই নদীর তীরে ভিড় করে এসে দাঁড়াল। আজ সেনাপতির জন্মদিন। কিন্তু বেদীর কাছে এসে অবাক হয়ে তারা দেখল বেদীর ওপর মস্ত উঁচু সেনাপতির পাথরের সেই মূর্তিটি সেখানে নেই। পাশে সেনাপতির সেই বিখ্যাত ঘোড়া তিস্তার যে পাথরের মূর্তিটি ছিল, অতি রহস্যভাবে সেটিও সেখান হতে অদৃশ্য হয়েছে। তবে হাজারে হাজারে মানুষ তাদের ভালবাসা জানাতে এসে দেখল, শূন্য সেই বেদীর ওপর শুয়ে আছে ছোট্ট একটি ছেলে। ছেঁড়া একখানা কাঁথা সমস্ত গায়ে জড়িয়ে সে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল তখনো।

মা হারা

উপেন দাশ

মাগো, তুমি চলে গেছ পর—
বর্ষ মাস দিবা নিশি কতবার রবি শশী
চলে গেছে এসে এই ধরণী উপর
মাগো, তুমি চলে গেছ পর।
এখনও গাহে তো পাখী পল্লবে সাজে তো শাখী
এখনও চাতক গাহে জলদের ঠাঁই,
সকলই রয়েছে ভরা পরিপূর্ণা বসুন্ধরা
স্নেহময়ী মা আমার শুধু হেথা নাই।
সুখস্পর্শ মলয় পবন তোমার আশীষ করে বহন
শিশিরে তোর করুণাশ্রু ঝরে,
সকাল বেলায় ঘাসের ডগায় নবীন অরুণ কিরণ ছোঁয়ায়
তোমার স্নেহ টলমল করে।
তোমার সোনার বরণ ধরি গায়
গোলাপ কলি হাসে আঙিনায়,
অর্কিডের দল তোমার স্নেহে ফুলের হাত বাড়ায়ে কহে
"স্নেহের কাঙাল! আয়রে কাছে আয়"।
দুপুর রাতে ধরা যখন গভীর ঘোরে সুপ্তিমগন
পাখী তোমায় ডাকে কইতে কথা,
"মা কথা কও, মা কথা কও,—চিন্ময়ী মা বাঙ্ময়ী হও
দূর করে দাও মনের বিষাদ ব্যথা"।
রাত্রি শেষে আজানের সুর উঠে,—
ঐ সুরে মন উদাস হয়ে তোমার পানে ছোটে;
শঙ্খ ঘণ্টা মন্দিরেতে জাগিয়ে তোলে ভোরের রাতে
তোমার আসার আশা মনের পটে।
নিদাঘ বেলায় আমের তলায়
দেখা কি মা পাব তোমায়
চপল হাসি বালিকাদের সাথে?
বর্ষাকালে ভরা জলে স্নান শেষে তুই কলসী কোলে
সবুজ শাড়ীর ঘোমটা তুলে মাথে,
লাল পাড়ে মুখ আধ আধ ঢাকি
মৃদুমন্দ ললিত চরণে
তুই যদি মা চলিস্ ঘরের পানে
মায়া-ভরা আঁখির তারা
রবে চেয়ে পলকহারা
সজল চোখে তোমার গমন পথে।
শরৎকালে আসবে চলে
দুর্গারূপে আগমনীর সুরে অবগাহি
ভরা ক্ষেতে শেষ হেমন্তে
হাসবে ফসল, ওমা লক্ষ্মী! তোমার পানে চাহি।
শীতের রাতে অতি প্রাতে
উঠবে যখন প্রভাতী গান মন্দিরা সংযোগে
দেখব স্বপন করে শয়ন
তোমার বুকের কাছে—
শুনছি সে গান নিবিড় মনোযোগে।
ফুলের ভরা তুলে ধরা
আনবে ডেকে নব বসন্তেরে
গুঞ্জরিবে ভ্রমরনিচয় "আয় মা" বলে ডাকবে মলয়
আসবি মা তুই বাসন্তী রূপ ধরে।
জীবন আমার কাটবে এমনি করে—
তোমার কোলে শুইব বলে
অবশেষে পৌঁছব যেয়ে শেষের খেয়া পারে;
শেষের সেদিন প্রান্ত মলিন
স্নেহের কাঙাল ছেলেরে তোর নিস মা বুকে তুলে
চিরবিচ্ছেদ না পাওয়ার খেদ
ঘুচে যাবে চিরনিদ্রায় স্নেহশীতল কোলে॥

গল্প হলেও সত্যি—

১৮৫৯ সালের ৩০শে জুন। একদিকে কানাডা, অন্যদিকে আমেরিকা। এই দুই দেশের মাঝখান দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী নায়েগ্রা। প্রবহমাণ নদীর উপর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে ঋজুভাবে লম্বা একটি শক্ত দড়ি খাটান হয়েছে। এক-দিকের তীরভূমিতে রয়েছে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। তারই বুকে বিরাটকায় লোহা পুঁতে দড়ির এক-প্রান্ত শক্ত করে বাঁধা। অপর তীরে ঘোড়ায় বাঁধা একটি চক্রাকার যন্ত্রের সঙ্গে দড়ির অন্য প্রান্তটি সংযুক্ত। দড়িটিকে সটান রাখার জন্য নদীর মধ্যভাগ ছাড়া কুড়ি ফিট অন্তর একটি করে টানা দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নুনের বস্তা। যাতে করে কোন অবস্থাতেই দড়িটি ঝুলে না যায়।

কিন্তু এত সব আয়োজন কেন?

এ কি কোন রজ্জুপথ উদ্বোধনের আয়োজন, অথবা দুই দেশের মধ্যে ডাক ও তার বিভাগের যোগসূত্র স্থাপনের নতুন কোন প্রচেষ্টা?

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এর থেকেও মজাদার। এই লম্বমান দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পারাপার করবেন পঁয়ত্রিশ বছরের স্বাস্থ্যবান এক দুঃসাহসী যুবক।

সার্কাসের ঘেরা তাঁবুতে দড়ি কিংবা তারের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কসরৎ অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু খোলা যায়গায় নদীর ওপর দিয়ে এতটা দীর্ঘপথ অতিক্রমের নজির এর আগে কে প্রত্যক্ষ করেছেন?

সুতরাং নদীর উভয় তীরে অসংখ্য লোকের জমায়েত হল। তীরসংলগ্ন হোটেল, হাউসগুলোর ছাদ ও কার্নিস লোকের ভিড়ে উপচে পড়ল। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান উৎকণ্ঠিত জনতার মধ্য দিয়ে অবশেষে সেই যুবক দড়ির সামনে উপস্থিত হল। জনতা করতালি ও চীৎকারে তাকে অভিনন্দিত করল। কিন্তু যুবকের মুখে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে নির্বিকারভাবে দড়ির ওপর দিয়ে রওয়ানা হবার জন্য তৈরী হয়ে নিল।

প্রথমে আমেরিকার তীর থেকে কানাডায় পৌঁছতে হবে তার। দড়িতে ওঠার আগে তার হাতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেওয়া হল পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের একটি দণ্ড। যুবকটি প্রথমে দণ্ডটি নিয়ে ব্যালান্স ঠিক করল। তারপর ধীরপায়ে সে দড়ির ওপর দিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলল।

শ্যামাপ্রসাদ পাল

নদীর দুই পাড়ে অপেক্ষমাণ জনতা রুদ্ধশ্বাসে সময় গুণতে লাগল।

নায়েগ্রা নদীর মধ্যভাগে—যেখানে নদীর গতিবেগ অত্যন্ত তীব্র—সেখানে দড়ির ওপর বসে থেকে সে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিল। তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে দণ্ডটিকে বুকের কাছে তাড়াতাড়ি রেখে নিঃশঙ্ক পদক্ষেপে কানাডার তীরে উপনীত হল।

অমনি ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল। কিন্তু নদীর দুই পাড়ের অপেক্ষমাণ জনতার গগনভেদী কলরব ও চীৎকারে সে সঙ্গীতের সুর চাপা পড়ে গেল।

সেই যুবকটির মধ্যে কিন্তু কোন-রকম উত্তেজনা দেখতে পাওয়া গেল না। মাথা নত করে নদীর দুই পাড়ের অগণিত জনসাধারণকে নীরবে সে অভিবাদন জানাল।

কুড়ি মিনিট বিরতির পর আবার সে দড়িতে উঠল। এবার তার ফেরার পালা। প্রত্যাবর্তনের কৌশলটি হল কিন্তু অভিনব। পূর্বেকার ব্যালান্সের জন্য ব্যবহৃত দণ্ডটির পরিবর্তে সে নিল একটি চেয়ার। তারপর দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে এগোতে লাগল। মাঝপথে দড়ির ওপর কায়দা করে চেয়ারটি রেখে তার ওপর কিছুক্ষণ বসে সে বিশ্রাম নিল এবং অবশেষে নিরাপদে তীরে ফিরে এল।

তার মুখে তখন স্বাভাবিক হাসি। পরিশ্রম কিংবা উৎকণ্ঠার কোন চিহ্নই নেই।

অসম সাহসী এই যুবকটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই খুব জানতে ইচ্ছে করছে?

এই যুবকটির নাম জাঁ ফ্রাঁসোয়া গ্রাভেলে। কিন্তু ব্লুঁদা নামেই ইনি সর্বাধিক পরিচিত। জাতিতে ফরাসী—ভারসাম্যের খেলা দেখাবার এই যাদুকর শুধু একবার নয় অসংখ্যবার দড়ির ওপর বিভিন্ন রকমের খেলা দেখিয়ে অনেককে অবাক করে দিয়েছেন। সব থেকে আশ্চর্য এই যে, তিনি তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাতে গিয়ে কখনও অঘটন ঘটান নি। তিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি রোগে ভুগে মারা যান।

টুনটুনি

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

টুনটুনিটা টুনটুনিটা
বাজাস্ ঘরের ঝুনঝুনিটা
তাই না শুনে নাচছে কেমন
ছোট্ট মেয়ে মনমুনিটা

লেজটি নেড়ে বেড়াস্ উড়ে
গাছে গাছে দুপ্পুর ধরে
পোকা-মাকড় তাই যদি খাস্
পাকা ফলটা তাও কেন চাস্

দুষ্টু ভারি চোখ দুটো তো্র
সদাই নজর আমার উপর
ঢিল ছুঁড়েছে মনমুনিটা যেই
টুনটুনিটা পালালো সেই

॥ একুশ ॥

কালই এ বাড়িতে এসেছিলাম। চব্বিশ ঘণ্টা পেরুতে না পেরুতে আবার এলাম। এত তাড়াতাড়ি আসব, শিশির মুখুটিরা ভাবেন নি। অপ্রত্যাশিত বলেই হয়তো ওঁরা অবাক হলেন খুশীও।

রাধামোহন বাড়ি ছিলেন না; এখন তাঁর থাকবার কথাও নয়। দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি এই সময়টায় তিনি অফিসে।

আমাকে ঘরে এনে বসালেন শিশির মুখুটি। বললেন, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ—'

আমি আবার বললাম, 'বাবা চিঠি দিয়েছেন—'

'তাই নাকি? কবে?'

'কাল আপনাদের এখান থেকে বাড়ি ফিরে পেয়েছি।'

শিশির মুখুটিকে উৎসুক দেখাল। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী লিখেছেন বাবা? দেশের অবস্থা কেমন?'

বললাম, 'খুব ভাল।' বাবার চিঠিটা সঙ্গেই ছিল। পকেট থেকে বার করে এগিয়ে দিলাম, 'এই যে, পড়ে দেখুন না—'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন শিশির মুখুটি। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললেন।

'আপনাদের যে সুবিধে ছিল আমার তো তা ছিল না।'

'কিসের সুবিধে?'

'লোকবলের।' শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'সংসারে পুরুষ বলতে আমি একলাই। অবশ্য ছেলে দুটো আছে; কিন্তু তারা একেবারেই নাবালক। নিজে দেশের বাড়িতে থেকে ওদের কারোকে যে কলকাতায় পাঠাব কি ওদের ভরসায় সংসার রেখে আমিই কলকাতায় আসব, তার তো উপায় নেই। কোথাও আমার নড়তে হলে সবাইকে নিয়েই নড়তে হয়।'

'তা তো বটেই।' আমি মাথা নাড়লাম।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

ঘরের ভেতর শিশির মুখুটি ছাড়া মালতী ছিল। মালতীর দুই ভাইকে এই মুহূর্তে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাল এ বাড়িতে শ্রাদ্ধ গেছে; তাই কিছু কিছু চিহ্ন চারদিকে ছড়ানো।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

আমার কথা বোধ হয় পরিষ্কার বুঝতে পারলেন না শিশির মুখুটি। বললেন, 'দেখা করতে মানে—'

'কাল আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'দেশে'।

শিশির মুখুটি চকিত হলেন, 'দেশ বলতে।'

বললাম, 'ঢাকায়—পাকিস্তানে।'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকলেন শিশির মুখুটি। আমার কথাটা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।

তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল কাঁপা আবেগপূর্ণ গলায় বলতে লাগলেন, 'আমাদের দেশ ভাল হয়ে গেছে!—আমাদের দেশ ভাল হয়ে গেছে।' মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই তাঁর চোখমুখ কণ্ঠস্বর বিষাদে ছেয়ে গেল, 'সেই ভাল হল। দুদিন আগে যদি হত। চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। আর তো ফিরে যাবার পথও নেই। গেলে খাবই বা কী?'

একটু নীরবতা।

তারপর শিশির মুখুটিও আবার সুরু করলেন, 'আপনারাই বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। সবাই এক সঙ্গে চলে না এসে কেউ কেউ দেশেও থেকে গেছেন। কিন্তু—'

'কী?'

একটু ভেবে নিয়ে শিশির মুখুটি বললেন, 'কালই তো দেশে যাচ্ছেন বললেন,—

'হ্যাঁ।'

'কি ভুল যে করেছি। ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম। আর ক'টা দিন যদি থাকতাম—'

এ কথার উত্তরে আমি কী বলব, চুপ করে থাকলাম।

শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'সে যাক গে, দেশে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না।'

তাড়াতাডি বলে উঠলাম, 'কি আশ্চর্য; ভুলে যাব কেন?

'দেশে গিয়ে চিঠি লিখবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ আমার নজর গিয়ে পড়ল মালতীর ওপর। বড় বড় দীর্ঘ দটি চোখ মেলে মেয়েটা আমার দিকেই পলকহীন

তাকিয়ে আছে। কতক্ষণ ধরে রয়েছে, কে জানে। চোখাচোখি হলেও সে মুখ ফেরাল না। মনে হল, মালতী কিছু বলতে চায়।

এই সময় শিশির মুখুটি বলে উঠলেন, 'আপনার সঙ্গে অল্পদিনের আলাপ। এই তো সেদিন পাকিস্তান থেকে আসবার সময় ট্রেনে পরিচয় হল। অথচ—'

মালতীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম।

শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, অথচ মনে হয়, কতদিনের জানাশোনা না। আপনাকে আজকাল আমাদের সংসারের একজন মনে হয়।'

আরো দু-একটা কথার পর বললাম, 'আজ উঠি।'

'এখুনি উঠবেন?'

'জিনিসপত্তর গোছগাছ আছে। বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। ড্রাই ক্লিনিং-এ ক'টা জামাকাপড় দিয়েছিলাম, সেগুলো আনতে হবে। সময় তো আজকের রাতটা; কাল সকালেই ট্রেন।'

'সে তো ঠিকই। আপনাকে তা' হলে আর আটকানো উচিত না।'

উঠতে যাব, মালতী হঠাৎ বলল, 'কিন্তু—'

শিশির মুখুটি এবং আমি একই সঙ্গে তার দিকে ফিরলাম। বললাম, 'কিন্তু কী?'

আমার চোখে চোখ রেখে মালতী বলল, 'আমার মনে হয় দেশ খুব বেশি দিন ভাল থাকবে না। আবার হয়তো—'

এ আশঙ্কা পিসেমশাইরও; সে কথা অকপটে তিনি আমাকে বলেছেনও কিন্তু বাবার মত মানুষের শুভবোধে এবং তার স্থায়িত্বে আমার অগাধ আস্থা। বললাম, 'না-না, আর দাঙ্গা-টাঙ্গা বাধবে না। পূর্ব বাংলার মানুষ ভালো-মন্দ চিনতে শিখেছে।'

মালতী উত্তর দিল না।

শিশির মুখুটি বললেন, 'ভাল হলেই ভাল। ঘরপোড়া গরু তো, আমাদের মনে খারাপটাই আগে উঁকি দ্যায়। ধরুন যদি অবস্থা আবার আগের মত হয়ে ওঠে—'

বললাম, 'তখন বাবা যা বলবেন তাই করব। হয়তো আবার কলকাতায় চলে আসতে হতে পারে।'

'কলকাতায় এলে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'করব।' বলতে বলতে উঠে পড়লাম।

শিশির মুখুটি আর মালতী আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্যন্ত এল। বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামলাম। কিছু দূর গিয়ে পেছন ফিরতেই দেখি শিশির মুখুটি নেই। কিন্তু দরজার ফ্রেমে স্থির দাঁড়িয়ে আছে মালতী। বড় বড় দুই চোখ মেলে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

●

যাদবপুর ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

সারাদিন ঘোরাঘুরি গেছে; সমস্ত শরীরে অসীম ক্লান্তি মাখা। নিজের ঘরখানিতে ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিভৃত নির্বিঘ্ন বিশ্রাম বুঝি আজ আমার কপালে নেই। বাইরে থেকে বিমল ডাকল, 'চিরঞ্জীব—চিরঞ্জীব—'

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। বললাম, 'আসুন—আসুন—'

বিমল ঘরে ঢুকে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। বলল, 'তুমি নাকি পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ। আপনাকে কে বলল?'

'মঙ্গল বলেছে। কিন্তু—'

'কী?'

'আমার মনে হয় তুমি খুব ভুল করছ। পাকিস্তানে আর নাই বা ফিরলে।'

বাবার চিঠির কথা উল্লেখ করে বললাম, 'দেশের অবস্থা এখন ভাল হয়ে গেছে। এখন আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

বিমল বলল, 'ও দেশকে বিশ্বাস নেই, বুঝলে ভাই। তুমি এক কাজ কর।' আমি জিজ্ঞাসুচোখে তাকালাম।

বিমল বলতে লাগল, 'অলকাদির চাকরিটা নিয়ে মামা-মামীদের এখানে নিয়ে এসো। তাতে ভাল হবে।'

এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতর উজানী টান যেন অনুভব করছি। অনেক দূরের আমতলি গ্রামটা আমাকে অবিরত হাতছানি দিয়ে চলেছে। এখন বিমলের কথাগুলো ভাল লাগার কথা নয়। জানালাম, দেশে আমি যাবই।

বিমল আর বিশেষ কিছু বলল না। একটু পর চলে গেল।

বিমল চলে যাবার খানিকটা পর এল রিণ্টু। সে-ও আমার চলে যাবার খবর পেয়েছে।

রিণ্টু বলল, 'আপনি ছিলেন, আমার কোন ভাবনাই ছিল না। রাত্তিরবেলা যখন খুশি ফিরতে পারতাম। এখন কী যে হবে।'

আমি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে ভাল থাকব কি মন্দ থাকব, সে জন্য আদৌ কোন দুশ্চিন্তা নেই রিণ্টুর। অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরায় তার অসুবিধে হবে, সেই ভাবনাতেই সে অস্থির।

যাই হোক সকৌতুকে বললাম, 'কেন, মঙ্গল তো আছে।'

'মঙ্গলদাটা এক নম্বরের ত্যাঁদোড়, মহা খলিফা। সহজে দরজা খুলে দিতে চায় না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'বাবাকে বলে দেবার ভয় দেখায়।'

আমি হাসলাম, 'তা এক কাজ কর না—'

উৎসুকদৃষ্টিতে তাকাল রিণ্টু, 'কী?'

'অত রাত্তির না করে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো—'

রিণ্টু বলল, 'আমার কত রকম এনগেজমেণ্ট থাকে, সে সব সেরে তাড়াতাড়ি কি ফেরা যায়। তা ছাড়া আরেকটা ব্যাপার আপনি ভেবে দেখুন চিরঞ্জীবদা—'

'কী?'

'আমি এখন বড় হয়েছি না?'

'নিশ্চয়ই।'

অথচ ওল্ডম্যান তা মানতেই চায় না। টাইম ঠিক করে দিয়েছে। তার এক সেকেণ্ডও বেশি বাইরে থাকার উপায় নেই।'

ওল্ড ম্যান কে, জানি। আমার উত্তর দেবার কিছু ছিল না। কাজেই চুপ করে থাকলাম।

আরো খানিকক্ষণ বক বক করে মিন্টু চলে গেল।

●

পরের দিন সকালবেলা দেশে রওনা হলাম। গাড়ির সময় জানা ছিল, শিয়ালদা থেকে আটটা কুড়িতে ইস্টবেঙ্গল মেল ছাড়বে।

আসার সময় নারায়ণগঞ্জের জেটিঘাটে হাজার হাজার মানুষকে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে দেখেছিলাম; তারপর দশটা স্টীমারের যাত্রীকে একটা স্টীমারে হয়ে গোয়ালন্দ মেল আমাদের নিয়ে রওনা হয়েছিল।

শিয়ালদা স্টেশনে কিন্তু ভিড় নেই, সেই অস্থির ব্যাকুল জনতা নেই; সেই ভয়ার্ত বিহ্বলতা নেই।

সবশুদ্ধ শ'খানেক যাত্রী হবে কিনা সন্দেহ। কামরায় কামরায় আমাদের তুলে নিয়ে কাঁটায় কাঁটায় আটটা কুড়িতে ইস্টবেঙ্গল মেল ছেড়ে ছিল।

দুপুরের একটু পর সীমান্তে পৌঁছে গেলাম। এ পারের বর্ডার পুলিস কামরায় কামরায় একবার করে উঁকি দিয়ে কর্তব্য শেষ করে ফেলল। অথচ মাসখানেক আগে যখন পাকিস্তান থেকে ইণ্ডিয়ায় আসি, ওপারের বর্ডার পুলিশ তল্লাসীর নামে ঘণ্টাকয়েক তাণ্ডব চালিয়েছিল।

যাই হোক, মিনিট পনেরর ভেতর এ পারের তল্লাসী চুকে গেল; সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল মেল আবার সচল হল।

ওপার থেকে যখন এসেছিলাম তখন গাড়িটাকে বেওয়ারিশ চিঠির মত যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল। ইচ্ছে হত তো ইস্টবেঙ্গল মেল একটু নড়ত, পরক্ষণেই নিশ্চল হয়ে যেত। মনে হয় নি, কোনদিন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব। আমাদের উদ্বেগ আকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল, ভয়-ব্যাকুলতা উৎকণ্ঠায় সব একাকার হয়ে দীর্ঘবিন্দুতে পৌঁছেছিল।

অবশেষে দেড় দিনের পথ চারদিনে পাড়ি দিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছিলাম। কিন্তু কলকাতা থেকে পূর্ব বাঙলায় ফেরার অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল দিয়ে ইস্টবেঙ্গল মেল এখন ছুটছে।

এক মিনিট আগেও না, এক মিনিট পরেও না, টাইম টেবিলের সময় অনুযায়ী গোয়ালন্দ এলাম। গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে তাজপুর। সেখান থেকে মাইল তিনেক হেঁটে গেলে আমাদের গ্রাম আমতলি।

আসতে আসতে আমার মনে হয়েছে, একটা কঠিন অমোঘ নিয়ম ট্রেন আর স্টিমারটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেলে তাদের বুঝি রক্ষা নেই। অথচ কলকাতার যাবার সময় এই নিয়মের এই শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র ছিল না। পূর্ব বাঙলা থেকে সাত পুরুষের বাস তুলে যে ছিন্নমূল মানবগোষ্ঠি প্রাণে বাঁচবার জন্য ইণ্ডিয়ার দিকে পাড়ি দিয়েছে তাদের জন্য শুধু নিষ্ঠুর নিদারুণ অবহেলা, হৃদয়হীন উদাসীনতা।

যাই হোক বিকেলবেলা লঞ্চ থেকে তাজপুর নেমে হাঁটতে সুরু করলাম। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করা উচিত ছিল; তাড়াহুড়োয় একদম ভুলে গেছি। টেলিগ্রাম করলে বাবা নিশ্চয় লঞ্চঘাটায় এসে আমার জন্য অপেক্ষা করতেন।

তিন মাইলের এই রাস্তাটা জেলা বোর্ডের। এ পথ আমার আজন্মের চেনা। দু'ধারে রবিশস্যের খেত। অবাধ দিগন্ত পর্যন্ত যতদূর চোখ যায়, মাঠ আর মাঠ। শীতের মাঝামাঝি এই সময়টায় ফলেছে পায়রা, মটর, খেসারি কলাই আর মুগ। এখন সবই কাঁচা; শ্যামল লাবণ্যে চারদিক ভরপুর হয়ে আছে। রবি ফসল পাকবে সেই ফাল্গুন - চৈত্রে। তখন মাঠের চেহারা এমন সবুজ থাকবে না, ধূসর হয়ে যাবে।

রাস্তার ঠিক নীচেই নয়ানজুলি। বর্ষায় মাঠ-ঘাটের সঙ্গে নয়ান জুলিও জলে পূর্ণ হয়ে যায়। এখন কিন্তু কোথাও জল নেই। এই শীতে নয়ানজুলিতে জলসেচি শাক আর বুনো কচুর অরণ্য।

রবিফসলের খেতে পাখি উড়ছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। মোহনচূড়া, চড়ুই শালিক, বনটিয়া। এই পাখিদের, জলসেচি শাক আর বুনো কচুদের কতকাল যেন দেখি নি।

মোটে একটা মাস কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি। তবু মনে হয়, যুগ-মটর মুসুর-কড়াই আর পায়রার সুষমায় ভরপুর পূর্ব বাঙ্গালা থেকে যুগ যুগ ধরে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। বহু দূরের কোন পরবাসে দীর্ঘ নির্বাসনের পর আবার নিজ ভূমে ফিরে এসেছি।

বাবার চিঠি পাবার পরই দেশে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। এই মুহূর্তে পূর্ব বাঙ্গলার হাওয়া সারা গায়ে মেখে তার মাটির ওপর দিয়ে চলতে চলতে মনে হল, এদেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি বাঁচব না।

লঞ্চ থেকে যখন নামি তখনও রোদ ছিল। শীতের শেষ বেলার রোদ এমনিতেই কুণ্ঠিত, ম্রিয়মাণ। লাটাইতে সুতো জড়াবার মত করে কেউ যেন দ্রুত অবেলার রোদটুকু গুটিয়ে নিতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিক মলিন হয়ে গেল।

জেলা বোর্ডের এই রাস্তাটা আজ খুব নির্জন। কদাচিৎ এক আধটা লোক চোখে পড়ছে। তাও অচেনা লোক। আমতলির হলে নিশ্চয়ই চিনতে পারতাম। নিজের গ্রামের মানুষকে দেখার জন্য এই মুহূর্তে আমার প্রাণ লালায়িত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আজ মঙ্গলবার। মঙ্গলবারে আশে পাশে হাট নেই। মীরকাদিমের হাট শুক্রবার, দীঘির পাড়ে হাট বসে সোমবার।

আজ হাটবার হলে রাস্তায় চেহারা এ রকম থাকত না; দুপুরের পর থেকেই হাট-ফিরতি মানুষে সরগরম হয়ে উঠত।

তিন মাইল রাস্তার অর্ধেকেরও বেশি পেরিয়ে এসেছি। গ্রামের কাছাকাছি এসে মনে হচ্ছে কতক্ষণে বাড়ি পৌছব। আমি বড় বড় পা ফেলতে লাগলাম।

আমতলির মুখে আসতে হারাণ সাহার সঙ্গে দেখা। ততক্ষণে সন্ধ্যে নেমে এসেছে। ঝোপঝাপে রবি ফসলের খেতে জোনাকি জ্বলতে সুরু করেছে। কোথায় একপাল শিয়াল ডেকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো কুকুরের চিৎকার তাদের তাড়া করে নিয়ে গেল যেন।

হারাণ সাহা এই গ্রামেরই বাসিন্দা বয়েস হয়েছে অনেক। জমি জিরাত তার প্রচুর; প্রায় পঞ্চাশ ষাট কানির মত। বছরে দু বার ধান, একবার পাট, চৈত্রে মুগ-মুসুর, তা ছাড়া আনাজ-পাতি—সব মিলিয়ে তার সচ্ছল অবস্থা সংসারে মানুষজনও তার অনেক। তিন ছেলে, চার মেয়ে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনী ইত্যাদি।

চোখের কাছে হাত এনে হারাণ সাহা ঠাহর করে নিল। তারপর বলল, 'ক্যাঠা (কে)?'

বললাম, 'আমি।'

আমি ক্যাঠা (কে)? বলতে বলতে আরেকটু কাছে এগিয়ে এল হারাণ সাহা, 'মহিন্দবাবুর পোলা (ছেলে) না? আমাগো মাধু?'

আমার ডাক নাম মাধু, বাবার নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললাম, 'হ্যাঁ।'

তুমি না কইলকাতা গেছিলা?'

'হ্যাঁ। আজ ফিরে এলাম।'

আমার এক হাতে সুটকেশ ঝোলান ছিল, আরেক হাতে সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে একবার দেখে নিয়ে হারাণ সাহা বলল, 'এই মাত্তর ফিরলা নাকি?'

'হ্যাঁ—' আমি মাথা নাড়লাম।

হারাণ সাহা এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল, শুনছি কইলকাতা থনে (থেকে) আইতে দ্যাড দিন দুই দিন লাগে। টেরেনে (ট্রেনে) ইস্টিমারে হয়রাণ হইয়া আইছ। লও, লও, বাড়িত লও (চল চল, বাড়ি চল)।'

আমি সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম। হারাণ সাহা সঙ্গ ছাড়ল না পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। মনে হল, আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবে সে। যেতে যেতে বলল, 'তারপর মাধু—'

'বলুন।'

'কইলকাতার সম্বাদ কও।'

'আপনি আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন তো?'

'হ।'

'কলকাতার কথা আমাদের বাড়ি গিয়ে শুনবেন। মা-বাবার কাছে তো বলতেই হবে। আপনি দেশের খবর বলুন।'

'দ্যাশের খবর খুব ভাল।' পরম তৃপ্তির সঙ্গে হারান সাহা বলতে লাগল, 'পাকিস্তান হওয়ার পর এত ভাল আর দেখি নাই। আমরা হিন্দু-মুসলমান বড় মিলমিশ কইরা আছি। বুঝলা মাধু, পাকিস্তান হওয়ার আগের সেই সোন্দর দিনগুলা আবার য্যান (যেন) ফিরা আইছে। মইধ্যখানে (মাঝখানে) কয়টা বছর কী ঝঞ্ঝাটই না গেল।'

বাবার চিঠিতেও দেশের শুভ পরিবর্তনের কথা আছে। সাধারণ মানুষও যে তা অনুভব করতে পেরেছে তাতে মনে মনে আরাম বোধ করলাম।

হারান সাহা আবার বলল, 'শুদা-শুদিই তুমি কইলকাতা গেলা মাধু। দ্যাশ সেই ভালই হইল, মইধ্য থিকা (মাঝখান থেকে) তুমি কষ্ট করলা।'

কেন আমি কলকাতায় গেছি, সে কথা কারো জানতে বাকি নেই। বিশেষ করে হিন্দুরা খুব ভালই জানে।

বললাম, 'তা যা বলেছেন হারাণ জেঠা---'

আরো খানিকটা যাবার পর জহরুল আর সিরাজের সঙ্গে দেখা। ওরা আমার ছেলেবেলার বন্ধু। দেখামাত্রই দুজনে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'আইছস মাউধা (মাধু)---'

তাদের কণ্ঠস্বর এবং আলিঙ্গনে এমন কিছু ছিল যাতে অভিভূত হয়ে গেলাম। বুকের অতল থেকে আবেগের ঢেউ যেন উথলে উথলে গলার কাছে উঠে আসতে লাগল। কাঁপা অস্ফুট গলায় বললাম, 'হ্যাঁ রে---'

'আরে আগান্তুক, এই কথাখান তুই বুঝলি না?'

'কী?'

'এক সোংসারে থাকলেও ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি হয়। দুইটা দিন সবুর করলি না, ত্যাজ (তেজ) কইরা কইলকাতায় গেলি গা।'

'তেজ করে না রে---'

'তয় (তবে) কী?'

কলকাতায় যাবার পেছনে কারণটা যে কী, তা আর এই মুহূর্তে বলা গেল না। আমি চুপ করে থাকলাম।

জহরুল বলল, 'আসলে ক্যান গেছিলি, জানি?'

নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম 'কেন?'

'আমাগো তরা (তোরা) বিশ্বাস করতে পারস নাই। ভাবছিলি---'

রাস্তায় আরো কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যেমন আচার্য বাড়ির দুই ভাই প্রাণবল্লভ, গোপীবল্লভ, যুগী বাড়ির কানাই, মৃধা বাড়ির কেরামত, নাজিরদের দুই ছেলে ওসমান আর হাসেম। এমনি অনেককে। তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

সারা গ্রাম আমার জন্য যে এমন দু'হাত বাড়িয়ে প্রতীক্ষা করবে, কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় স্বপ্নেও ভাবি নি।

চলতে চলতে ওসমান, কেরামত, হাসেম অভিমানের সুরে অনুযোগের সুরে কত কথা যে বলতে লাগল। কেন কলকাতায় গেলাম, কেন তাদের ওপর ভরসা রাখতে পারলাম না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের বাড়িটা আমতলির দক্ষিণ সীমায়। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল। ঝোপঝাড়ের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। মুত্রাবনের গভীর থেকে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ ভেসে আসছে।

উঠোনে পা দিয়েই চিৎকার করে ডাকলাম, 'মা---মা, সবিতা---সবিতা---বাবা---'

তক্ষুণি এ-ঘর থেকে ও-ঘর থেকে দু-তিনখানা হারিকেন বেরিয়ে এল। বাবা-মা-সবিতা তো এলই। তাদের পেছন পেছন রাজেক কাকা ছুটে এলেন। রাজেক কাকা আমাদের বাড়িতেই ছিলেন তা হলে। আমাদের বাড়িতে যে দুটো কামলা থাকে, তারাও বেরিয়ে এসেছে।

নিমেষে ছুটোছুটি ব্যস্ততা সুরু হয়ে গেল। মা আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'এসেছিস বাবা, এসেছিস। ভাল ছিলি তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ মা।'

জীবনে এই প্রথম মা-বাবা ঘর-সংসার ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আমার থাকা। তা-ও এক-আধ দিনের জন্য না, পুরো একটি মাসের জন্য। কাছে পিঠে হলেও কথা ছিল। তা তো নয়। চোখের আড়ালে বহু দূরের এক অচেনা শহরে গিয়ে কাটিয়ে এসেছি।

মা আমার পিঠে-মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন। এক মাস আমাকে দ্যাখেন নি; তাঁর বুকের ভেতর কতখানি ব্যাকুলতা জমেছিল তা যেন স্পর্শ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

এতদিন পর আমাকে পেয়ে বাবা কিন্তু কর্তব্য ভোলেন নি। কামলাদের দিয়ে জলচৌকি আর সতরঞ্চি পাতিয়ে হারাণ সাহাদের বারান্দায় বসালেন।

রাজেক কাকা এতক্ষণ কথা বলেন নি। এবার বললেন, 'কইলকাতা থনে কবে রওনা দিছুল?'

বললাম, 'কাল।'

'পথে কুনো অসুবিধা হয় নাই?'

'না।'

'সেইদিনই তরে (তোকে) কইছিলাম, যাইস না। আমার কথা তরা (তোরা) কেউ শুনলি না। না তুই, না তর বাপে, না তর মা। মইধ্য থিকা কত কষ্ট না জানি পাইয়া আলি (এলি) ধন।'

বললাম, 'না, কষ্ট আর কি।'

ওদিকে হারাণ সাহারা উদগ্রীব হয়েছিল। বলল, 'কইলকাতার সম্বন্ধ (সংবাদ) কও মাধু।'

জহরুল, ওসমান, হাসেম---সবাই সমস্বরে সায় দিল, 'হ-হ, কইলকাতার কী দেখলি কী শুনলি, ক' (বল) মাধু---

রাজেক কাকা ওদের ধমক দিয়ে উঠলেন, 'হ, অখন কইলকাতার কথা কইতে বসুক। তোগো (তোদের) আক্কলটা কী? ছ্যামরা (ছেলেটা) দুইদিন না-খাওয়া না-দাওয়া; কই হাতমুখ ধুইয়া দুইটা মুখে দিব, তা না কইলকাতার প্যাচাল (গল্প) লইয়া বস। আইজ না, কাইল আইসা কইলকাতার কথা শুইনা যাইস।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'যা মাধু, হাতমুখ ধুইতে যা।'

বাবা এই সময় বলে উঠলেন, 'না-না, ওরা অত আশা নিয়ে এসেছে কলকাতার কথা বলবে বৈকি মাধু।' জহরুলদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা একটু বোস, ও খেয়ে নিক।'

দু'দিন স্নান করি নি; পুকুরে নেমে গোটাকয়েক ডুব দিতে পারলে ক্লান্তি অনেকখানি কেটে যেত। কিন্তু এই শীতের রাতে মা কিছুতেই স্নান করতে দিলেন না। অগত্যা হাতমুখ ধুয়ে, ভিজে গামছায় পা মুছে জামাকাপড় ছেড়ে ফেললাম।

বাবা বললেন, 'এই বারান্দাতেই মাধুকে খেতে দাও। খেতে খেতে কথা হবে।'

সবিতা এসে আসন পেতে দিয়ে গেল। আমি বসলে মা ভাত-টাত নিয়ে এলেন।

[illegible] [illegible], 'তুই [illegible] আইবি জানবি [illegible] পারি নাই। আগের থনে একটা চিঠিপত্তর তো দিতে হয়।'

বাবারও এতক্ষণ কথাটা মনে হয়নি। রাজেককাকা ধরিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমারে আগে একটা টেলিগ্রাম করলি না কেন? আমরা তাজপুরে যেতে পারতাম।'

কেন টেলিগ্রাম করতে পারিনি, বললাম।

বাবা ইতিমধ্যে তামাকের ব্যবস্থা করেছিলেন। হুঁকো টানতে টানতে হারান সাহা বলল, 'রাইত্ত বাইড়া যাইতে আছে, শীতের রাইত। আমি বুড়ো মানুষ, অনেকখানি পথ যাইতে হইব।'

ইঙ্গিতটা বোঝা গেল। হেসে রাজেককাকা বললেন, 'ক' (বল) রে বাপু, কইলকাতার সম্বাদ (খবর)ক' (বল)। না শুইনা সা মশাই উঠব না।'

এখান থেকে যাবার পর যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কলকাতায় গিয়ে যা-যা দেখেছি—সমস্ত বললাম।

[illegible] শুনতে হারান সাহার তামাক খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যথিত বিস্ময়ে সে বলল, 'এত্ত মানুষ সাতপুরুষের ভিটামাটি ছাইড়া কইল-কাতায় গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'তারা আছে কই?'

'পথেঘাটে, রেলের স্টেশনে আর জবরদখল কলোনিতে।'

'কোলোনিটা আবার কী?'

কলকাতার চারধারে উদ্বাস্তু উপ-নিবেশ আমার দেখা ছিল। তাদের হুবহু বর্ণনা দিলাম।

হারান সাহা বলল, 'অদ্দিষ্ট, (অদৃষ্ট) সগলই অদ্দিষ্ট।' তার কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনাল।

ওসমান-জহরুল-কাসেম, কেউ কথা বলছিল না। হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় তাদের মূর্তির মত মনে হচ্ছিল।

রাজেককাকা স্তব্ধ হয়ে বসে-ছিলেন। তাঁর প্রাণের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বিপুল ঢেউয়ের মত উঠে এল। আস্তে করে ডাকলেন, 'মাধু—'

খেতে খেতে [illegible]।

রাজেক কাকা বললেন, 'আমাগো এই আমতলি থনেও (থেকেও) তো কম মানুষ কইলকাতা যায় নাই। কামারপাড়া-যুগীপাড়া-বামনপাড়া সাফ হইয়া গেছে গা। তাগো কারো লগে (সঙ্গে) দেখা হইছে?'

'না।'

'দেখা করলেই পারতি।'

আমি হাসলাম, 'কলকাতা কি একটুখানি শহর রাজেককাকা, কোথায় খুঁজব তাদের।'

একটু চুপ করে থেকে রাজেক-কাকা বললেন, 'গেরাম আন্ধার কইরা সগলে গেল গা; চাইর দিক খাঁ-খাঁ করে। যারা গেছে তাগো ঠিকানা যদি জানতাম, চিঠি লেখতাম। তারা সগলে ফিরা আসুক; আবার আগের লাখান (মত) মিলমিশ কইরা থাকি।'

●

অনেক রাত্রে হারান সাহাকে নিয়ে রাজেককাকা চলে গেলেন।

[ক্রমশ।

সমুদ্রে পেট্রল

কিছুদিন আগে ইংল্যাণ্ড-এর উপ-কূলে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রজলে পেট্রল ছড়িয়েছিল এক পেট্রলবাহী জাহাজের ছিদ্রপথে। অসংখ্য লোকের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় সে তেল ছেঁকে তুলতে হয়েছে, কেন না সমুদ্রজলের ওপরে এভাবে তেল ছড়ালে সামুদ্রিক প্রাণী (বিশেষ করে মাছ) ও পক্ষীর প্রাণসংশয় হয়। যারা উপকূলে বাস করে, সেই সব মানুষের জীবিকা নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়—মাছ যারা ধরে এবং পর্যটকদের ওপরে যাদের জীবিকা নির্ভর, সকলের পক্ষেই এটা বিপদ।

এটা হতে পারে নানা রকমে—পেট্রলবাহী অতিকায় জাহাজগুলি তাদের ট্যাঙ্কের তেল খালাস করে তার-পর সমুদ্র জল দিয়ে ট্যাংকগুলি ধুয়ে ফেলে দেয় সমুদ্রে এবং এই জলের সঙ্গে বেশ কিছু তেল মিশ্রিত থাকে; ট্যাঙ্ক ফুটো হয়েও অনেক সময় অজ্ঞাত-সারে তৈল বেরিয়ে সমুদ্রে পড়ে; সমুদ্র গর্ভস্থ তৈলকূপ থেকে অসাবধানে (যেমন হয়েছে কয়েক দিন আগে উত্তর আমে-রিকার উপকূলে), তৈলবাহী জাহাজ ডুবে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে; বিপদে পড়ে জাহাজ হালকা করবার জন্যও মাঝে মাঝে তৈলবাহী জাহাজ ট্যাঙ্ক থেকে তেল পাম্প করে সমুদ্রে ছেড়ে দেয়।

১৯৬১ সালেই ৫০০০ মিলিয়ন টন পেট্রল জাহাজে করে দেশে দেশে পাঠান হয়েছিল। ধরা যাক, উপরোক্ত যে কোন কারণে এই তেলের হাজার ভাগের এক ভাগ সাগর জলে ছাড়তে হ'ল, তা হলে অন্তত পাঁচ লক্ষ টন পেট্রল সমুদ্রে পড়বে।

ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বর এবং এই কারণেই রাশিয়া ও রুমানিয়া Sea of Azov এবং Black Sea তে তৈল নিক্ষেপ একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে North Sea এবং Baltic Sea তেও তৈল নিক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ১৯৬২ সালের সম্মিলনের পর; উত্তর আমেরিকার উপকূল, ভূমধ্যসাগর, রেড সি, পারস্য উপসাগর, স্পেন ও পর্তুগালের উপকূল, আরবসাগর এবং বঙ্গোপসাগর ও অস্ট্রেলিয়ার উপকূল-ভাগের ১০০ মাইলের মধ্যে সমুদ্রে তৈল নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়েছে।

আমার কাল আমার দেশ / এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

আলোচ্য রচনাটি সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তখনই বিদগ্ধ পাঠকের চোখ রচনাটির প্রতি নিবদ্ধ হয়। রচনাটি স্মৃতিচারণমূলক, অর্ধশতাব্দী ধরে সাহিত্য প্রকাশনার কর্মে নিরত ছিলেন লেখক, আলোচ্য রচনা সেই অভিজ্ঞতারই পরিপূর্ণ ফসল। সাহিত্য, প্রকাশনা, সাহিত্যকারদের গতিপ্রকৃতি এবং বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের এক তথ্যনিষ্ঠ আলেখ্য এই রচনায় বিবৃত। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ বাংলা দেশের, বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা পুস্তক প্রকাশনার এক প্রামাণ্য ইতিহাস। লেখকের আন্তরিকতায়, তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সুধীরচন্দ্র সরকার, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাঃ, লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা।

আর্ট / ডি এম লাইব্রেরী

বিদগ্ধ কথাকারের এই প্রবন্ধসঙ্কলন মূলত আর্টকে কেন্দ্র করে রচিত। বৈদগ্ধ্য ও সৌকর্যের দিক দিয়ে বিচার করতে বসলে, প্রবন্ধগুলিকে অমূল্য বলাটাই বোধহয় সবচেয়ে সঙ্গত। বস্তুত মোট একুশটি নিবন্ধের মাধ্যমে, লেখক আর্ট কি বস্তু তাই তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর বিদগ্ধ মানসে আর্টের ভাবরূপটি যেভাবে ধরা দিয়েছে, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে কষে সে সম্বন্ধেই তিনি নিঃসংশয় হতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধগুলি লেখকের জীবনব্যাপী আর্ট-জিজ্ঞাসারই মূর্ত প্রতীক। লেখকের পরিশীলিত মননের সুস্পষ্ট ছাপে প্রবন্ধসমূহ উজ্জ্বল, বোদ্ধা পাঠকমাত্রই যে এই রচনা সংগ্রহটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ সুস্মিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

লেখক—অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬, দাম—চার টাকা।

চাঁপার গন্ধ / ডি এম লাইব্রেরী

সুবিখ্যাত গ্রন্থকারের এই রচনা, হতাশাভ্রষ্ট এক মনুষ্য-সত্তার অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তীর্ণ হওয়ার ইতিহাস। গৃহত্যাগিনী পত্নীর পেছনে অন্ধ আক্রোশে ছুটে বেড়িয়েছিল অমর রায় সাত বছর ধরে, অবশেষে বাংলা-বিহারের সীমানালগ্ন ছোট্ট মফস্বল শহরটিতে এসে শেষ হল তার সন্ধান। অপরাধিনী স্ত্রীর সঙ্গে অবশেষে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল অমর। শেফালী ও সৌরীন দুজনকেই তো শেষ করে দিতে চেয়েছিল অমর, এতদিন ধরে প্রস্তুত করেছিল সে নিজেকে তো এজন্যই, কিন্তু এ কারা আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে? শেষ হতে এদের আর বাকি আছে কি? দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের কলঙ্কের গ্লানি অন্তরে বয়ে নিয়ে পথ চলা ক্লান্ত মুমূর্ষু দুটি মানুষকে আর নতুন করে কি শাস্তি দেবে অমর রায়? প্রতিহিংসার স্থানে জেগে উঠল ক্ষমা, দৃঢ়পায়ে ফিরে গেল সে, জীবন কি কখনও ফুরোয়, জীবন যে অশেষ, ভেসে-আসা চাঁপার গন্ধের মত শান্তশ্রী উমার শ্যামকোমল মুখটি ভেসে উঠল তার চিত্তপটে, এবার তার সাধনা বাঁচার, ধ্বংসের নয়। মর্মস্পর্শী কাহিনীটি বিধৃত লেখকের অনবদ্য শৈলীর মাধ্যমে, পড়তে পড়তে ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

New Objectives Greater Endeavour

১৯৬৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৬৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরা যে সব ভাষণাদি দিয়েছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তারই বাছাই করা কিয়দংশ সঙ্কলিত করা হয়েছে। 'শ্রীধর্মবীরা' শুধু সুবক্তাই নন সুপণ্ডিতও। তাঁর বক্তব্যে নেই কোন দ্বিধা, কোন অস্পষ্টতা। দেশের জন্য দশের জন্য তিনি যা ভাল বলে মনে করেছেন তা করতে তিনি কখনই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েননি। আলোচ্য ভাষণগুলির মাঝে তাঁর সততা ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ রয়েছে পূর্ণমাত্রায়; দেশের উন্নতিবিধানেও যে তাঁর প্রচেষ্টা পুরোপুরিভাবেই আন্তরিক সেটাও বোঝা যায়। সুকথন, বৈদগ্ধ্য ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সংযোগে বর্তমান রচনা শুধু উপাদেয়ই নয়, পরন্তু কল্যাণপ্রদও বটে। শ্রীধর্মবীরার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকেও চেনা যায় আলোচ্য ভাষণগুলির মাধ্যমে। আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন, কথক—শ্রীধর্মবীরা (পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল), প্রকাশক—পাবলিসিটি অ্যাডভাইজার টু গভর্নমেণ্ট অ্যাণ্ড ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশন্স।

ডোরাকাটার অভিসারে / রূপরেখা

শিকারভিত্তিক এই কাহিনীর নামকরণ বড় সুন্দরভাবে করা হয়েছে, নাম থেকেই বিষয়বস্তুর পরিচয় মেলে। মূল গ্রন্থটি আমরা পড়ি নি, কিন্তু অনুবাদকর্মের সৌকর্য থেকেই মূল রচনা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণার অবকাশ ঘটে। বইটি দুই ভাগে বিভক্ত, টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত কাহিনী এবং স্থানকাল-

পাত্র ভেদে বাঘ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে প্রথম ভাগে, দ্বিতীয় বা শেষ ভাগে সংযোজিত হয়েছে লেখকের বাঘ শিকার সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বস্তুত বনের রাজা বাঘ সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর তথ্য স্থান পেয়েছে রচনাটিতে। লেখক একজন দক্ষ শিকারী, কিন্তু তিনি যে একজন শক্তিমান কথাকার সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না বইটি পড়লে। তাঁর শিল্পদৃষ্টি, মানবিক আবেদনে ভরা হৃদয় স্পষ্টত এক অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করে তুলেছে তাঁর রচনাকে। অনুবাদকের দক্ষতাও সমানভাবেই প্রশংসনীয়, স্বচ্ছ সাবলীল শৈলী ও মনোরম কথনভঙ্গীর প্রসাদে অনুবাদকর্মটি সহজেই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ--- বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক---শের জঙ্গ, অনুবাদ---সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়---রূপরেখা, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম---নয় টাকা।

ময়ূর মহল / বাক্-সাহিত্য

জনপ্রিয় কথাকারের অধুনা প্রকাশিত এই উপন্যাসটি হাতে পেয়ে তাঁর অনুরাগী পাঠকবৃন্দ খুসী হবেন। কাহিনীতে রহস্য রোমাঞ্চের স্বাদ আছে। ধনী জমিদারবংশের পুরানো এক প্রাসাদ ময়ূর মহল, তার আনাচে কানাচে ছড়ানো কত না রহস্য কত না বিভীষিকা। বৃদ্ধ জমিদার ত্রিদীপ-নারায়ণের মৃত্যুর পর থেকেই রোমাঞ্চকর ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে লাগল ময়ূর মহলে, অবশেষে নবাগত কেয়ার-টেকার কল্যাণ রায়ের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ল সব কিছু, রহস্যের জাল মুক্ত হল ময়ূর মহল। ডিটেকটিভ কাহিনীর মতই ঔৎসুক্য সঞ্চারী রচনাটি পড়তে ভালই লাগে, লেখকের শৈলীও বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---নীহাররঞ্জন গুপ্ত। প্রকাশক---বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম---চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দুরের দুপুর / গ্রন্থপ্রকাশ

সদ্য-জাগা এক কিশোরের নানা বিচিত্র মানসিক অনুভূতিই আলোচ্য কাহিনীর মূল উপজীব্য। অনুভূতি-প্রবণ বালক বুদ্দুর মনে পড়েছে কৈশোরের নানা রঙিন কল্পনার প্রলেপ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সে বিচার করে দেখছে নিজের আশে পাশের সব কিছুকে। পারিপার্শ্বিক বর্ণনা করেছেন লেখক অপরূপ কৌশলে, তাঁর অনুপম বর্ণনা-কৌশলে বুদ্দুর স্পর্শকাতর মনটি যেন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় পাঠকের চোখের সামনে। কৈশোরের প্রথম ছোঁয়ায় বিহ্বল অভিভূত এক কিশোর মানস, যেন আপন সত্তাকে প্রথম আবিষ্কার করে আনন্দ বেদনায় ছলছল করতে করতে মূর্ত হয়ে ওঠে। পটভূমির সৌন্দর্যও লক্ষণীয়, ছোট ছোট ঘটনা ছোট ছোট চরিত্রের মাধ্যমে পটভূমিটি সামগ্রিকভাবেই জীবন্ত। লেখকের শৈলী অত্যন্ত লাবণ্যময় ও সমৃদ্ধ, কাহিনীর আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে। আমরা বইটি পড়ে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---বুদ্ধদেব গুহ, প্রকাশক---গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নীল দরিয়ায় / গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু একটু নতুন ধরণের---জলদস্যুদের কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক এই গ্রন্থে। বিভিন্ন বিদেশী জলদস্যুদের জীবন ও ক্রিয়া-কলাপের বিচিত্র বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই কাহিনীতে---যা যে কোন রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর মতই আকর্ষণীয়। নীল দরিয়ার বুকে ভেসে বেড়াত যেসব দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষগুলি তারা কি শুধুই ঘৃণার্হ? পরের বৈভবের প্রতি তাদের লোভ ছিল সত্যই কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, অ্যাডভেঞ্চারের নেশাও তাদের কম ছিল না এবং প্রকৃত পক্ষে জলদস্যুদের এটাই প্রকৃত অভিধা। দুঃসাহসী এই মনটির মাধ্যমে জলদস্যুকে বিচার করা চলে। বর্তমান গ্রন্থে সেইরকম কয়েকটি মানুষের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটিয়েছেন লেখক, এর মধ্যে ফ্রান্সিস ড্রেক, ক্যাপটেন কীড, হেনরী মেইনওয়ারিং-এর মত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নামও আছে, যাঁরা মূলত জলদস্যু হলেও স্বদেশে বীর্যবত্তার জন্য যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছিলেন। লেখকের বাচনভঙ্গী যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। আমরা এই গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---অজিত চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক---গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---ছয় টাকা।

পদক্ষেপ / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ, লিঃ

সাধারণ একটি যুবকের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে জীবনের পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে গ্রন্থোক্ত কাহিনীর মাঝে। সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিতে উপস্থাপিত কাহিনীটি সহজভাবেই নিজের পরিণতিতে পৌঁছেছে। গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলিও স্বাভাবিক। রাজনীতির যে বিশেষ দিকটির পরিচয় এতে বিধৃত তাতেও লেখকের সমাজ-সচেতনতারই ছাপ আঁকা। প্রকৃতপক্ষে এ রচনাকে জীবনধর্মী বলা যায় সহজেই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---সমরেশ বসু, প্রকাশক---বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম---চার টাকা।

বনবাংলো / গ্রন্থপ্রকাশ

খ্যাতনামা সাহিত্যকারের সদ্য-প্রকাশিত এই উপন্যাসটি নানা কারণেই উল্লেখ্য। মানব চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্য সযত্নে তুলে ধরা হয়েছে কাহিনীর মাধ্যমে। চাওয়া ও পাওয়ার বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নন্দরাণী, বিপুল শক্তিশালী, পৌরুষের মূর্ত প্রতীক রাজু মোড়ল, ছোট্ট মেয়ে রজী, ডাক্তার সুভাস মল্লিক ও তার স্ত্রী আধুনিকা রমা সকলেই ফুটে উঠেছে

নিজের নিজের পরিধিতে উজ্জ্বল হয়ে। মানুষের মনের অনেক অজানা দিককে উদ্ঘাটিত করে দেখানো হয়েছে, মনোধর্মী অথচ ঘটনাবহুল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে। লেখকের তীব্র ভাবব্যঞ্জক শৈলী রচনাটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। আমরা বইটি পড়ে খুশী হয়েছি। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

ফেরারী ফৌজ / গ্রন্থবিকাশ

আলোচ্য নাটকটি ইতিপূর্বেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। বহুবার অভিনীত ও বহু সমালোচিত এই নাটকের নতুন সংস্করণটি সদ্য প্রকাশিত। 'ফেরারী ফৌজ' ঠিক ঐতিহাসিক নাটক নয়, তবু পক্ষান্তরে ইতিহাসই এর মূল উপজীব্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনার ইতিহাস নয় তিরিশ দশকের প্রথম ভাগে পূর্ববাংলায় জেগে ওঠা যুবশক্তির প্রামাণ্য ইতিহাস। লেখকের রচনায় আন্তরিকতার আভাস আছে, তাঁর তথ্যনিষ্ঠাও প্রশংসনীয়। পূর্বাপর সংস্করণগুলির মত আলোচ্য সংস্করণটিও সাফল্য লাভ করবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—উৎপল দত্ত, প্রকাশক—গ্রন্থবিকাশ, ২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম—তিন টাকা।

একটি দিনের জন্মদিনে / পিল্‌গ্রিম পাবলিশার্স

আলোচ্য গ্রন্থটি এক আধুনিক কাব্যসংকলন। ছোটবড়য় মিশিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে এতে। কবির ভঙ্গীতে বেশ একটি আন্তরিকতার আভাস আছে, তাঁর বক্তব্য মোটামুটি সুস্পষ্ট, অতি আধুনিকতার স্রোতে খেইহারা নয়। কয়েকটি কবিতা পড়তে বেশ ভাল লাগে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। প্রকাশক—পিল্‌গ্রিম পাবলিশার্স, ১৮বি।১ বি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

জ্বালা / ক্যালকাটা পাবলিশার্স

সম্পূর্ণ বাস্তবসচেতন ও রাজনৈতিক মানসসম্পন্ন লেখক ইতিমধ্যেই স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, আলোচ্য রচনা তাঁর সেই সুনামকে অব্যাহত রাখবে। আজকের জনজীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, বর্তমান উপন্যাসের পটভূমিও গড়ে উঠেছে এক সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে। সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক প্রভৃতি সকলেই নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে বিচরণশীল। এই গোষ্ঠীগুলি যখন পারস্পরিক কলহে উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে, বর্তমান রচনার ছত্রে ছত্রে খুঁজে পাওয়া যায় এ-সত্যের স্বাক্ষর। নামত উপন্যাস হলেও কার্যত এই রচনা আজকের যুগ-সমস্যার একটা প্রধান দিককেই উন্মোচন করে দেখায়। রাজনীতি মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে এই রচনায় তার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় বহুবিধ। স্বধর্মচ্যুত মানুষের আত্মিক হাহাকারও মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রধান চরিত্র সাংবাদিক অরুণ সান্যালের মাধ্যমে। যুগধর্মকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেও আদর্শচ্যুত সুবিধাবাদী হিসাবে টিকে থাকাটাই কি মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন নয়? এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চেয়েছেন লেখক বর্তমান রচনাটির মাধ্যমে। প্রচ্ছদ উজ্জ্বল, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সৌরীন সেন, প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—আট টাকা।

শেষ পরিচয় / ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ

আলোচ্য উপন্যাসে, নানা ঘটনার জাল বুনে কাহিনীকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। কাহিনী দুর্বল ও পুরানো ধাঁচের। লেখকের লেখনী এখনও যথেষ্ট অনুশীলনসাপেক্ষ। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—শ্রীনিত্যানন্দ কর্মকার। প্রাপ্তিস্থান—ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৮। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

The Gravitation And The Universe

পৃথিবী ও তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধীয় সবরকম তথ্যই আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির যথাযথ পরিচয় দেওয়ার মানসে লেখক এ সম্পর্কে অতীত ও বর্তমানের সমুদয় তথ্যাদি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই রচনাকে সহজেই প্রামাণ্য বলা যায়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—অপূর্ব চৌধুরী। পরিবেশক—অক্সফোর্ড বুক অ্যাণ্ড স্টেশনারী কোং ১৭, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। (ইণ্ডিয়া) দাম—দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীহরিদাস পরিক্রমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

আলোচ্য গ্রন্থে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান ভক্ত শ্রীহরিদাসের প্রেম ও ভক্তির চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে লেখনীর মাধ্যমে। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার কতকাংশও কীর্তিত হয়েছে বর্তমান রচনায়। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর শিষ্যবর্গের লীলাবর্ণনের মত প্রেম ও শুদ্ধা ভক্তি লেখকের মনে আছে এবং সেজন্যই তাঁর রচনাও হয়ে উঠতে পেরেছে সার্থক। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—পথিক। প্রকাশক—শ্রীপ্রাণগোপাল সাহা। ৬৮।৪, যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা-২৮, দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নিঃশব্দ / সাহিত্য কেন্দ্র

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অবক্ষয়ের এক ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক, আলোচ্য কাহিনীর মাধ্যমে। নায়িকা কিশলয়া, সেই শতসহস্র হতভাগিনীদেরই একজন, আর্থিক কারণে যাকে এসে দাঁড়াতে হয় পথে, দেহকে পণ্যস্বরূপ তুলে ধরে। লেখকের আন্তরিকতায় কোন খাদ নেই। কিন্তু এখনও তাঁর লেখনী যথেষ্ট পরিণতিসাপেক্ষ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নিমাইকুমার ঘোষ, প্রকাশক—সাহিত্য কেন্দ্র। এ-১৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—সাড়ে চার টাকা।

wild sky,

The flying cloud, the frosty light :
The year is dying in the night
Ring out, wild bells, and let him die.

Ring out the old, ring out the new,
Ring, happy bells, across the snow :
The year is going, let him go ;
Ring out the false, ring in the true.

—Tennyson, In Memoriam.

কবি Tennyson আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ কবিতা'র কথা স্মরণ করে নূতন বছরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি (Consecration) প্রদান করছি। Ring out the false, ring in the true—এই কথাটা প্রাণস্পর্শী হয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি হোক আমাদের। শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণের শেষের ছত্রটি তুলে ধরছি—ওঁ সত্যং পরং ধীমহি। এই সত্যই বর্তমানে আমাদের বন্দনার ও আরাধনার। এই সত্যকে আস্তিক ও আধ্যাত্মিকভাবেই আঁকড়ে ধরতে হবে। এক কথায় সত্যের বন্দনা ও জয়গান ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এই ভগবানের রাজত্বে সত্য ও মিথ্যা—এ দু'টি পথ। মিথ্যাকে বন্দনা করলে চলবে না। কেননা, ভারতের রাজনৈতিক আকাশ অপরিচ্ছন্ন। পরিবেশও অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। সামান্যতম ভুলের জন্য আমরা ক্রমোত্তর দেশদ্রোহী হয়ে উঠছি। এই দেশদ্রোহিতার বীজ ক্রমোত্তর অঙ্কুরিত হচ্ছে ভারতের চারদিকে। চলেছে মিথ্যার বন্যা।

প্রতিটি জাতি এবং লোকের মনে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে, রাজনৈতিক জীবনে প্রকৃত সত্য ও মিথ্যা দলকে নির্বাচন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। মনে গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি মানুষই সেই গোলকধাঁধার নিকটবর্তী। মিথ্যা

॥ ফলাফল ॥

অপপ্রচারের দিন বর্তমানে নয়, বর্তমানের কর্তব্য নিরন্ন নিপীড়িত ক্ষুধার্ত জনগণের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে এই ভাবলে চলবে না—

Truth for ever on the scaffold, wrong for ever on the throne.

ভৃগু-আচার্য

মনে রাখা কর্তব্য ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শনি (ভারতের লগ্ন কন্যা কারো কারো মতে মেষ) লগ্নের সপ্তম থেকে অষ্টমে নীচস্থ হয়ে অশ্বিনী নক্ষত্রে যাবেন ৩রা চৈত্রের পর। স্বভাবতঃই রাজনৈতিক আকাশ অস্বচ্ছ, অপরিচ্ছন্ন ও জটিল। তদুপরি বালক বুধগ্রহ প্রবেশ করবেন
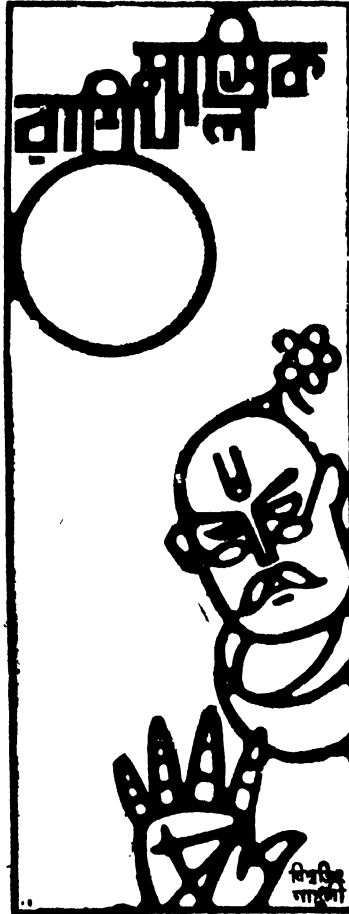
বুদ্ধির সংযোগ। অষ্টমে বুধ ও শনি। বৈদেশিক আলাপ-আলোচনায় ভারতের যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত। আকস্মিকভাবে কোন মতামত প্রদান করা কর্তব্য নয়। বাংলার রাজনৈতিক আকাশে ঝড় উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইংরেজী ১৯৬৯ সালে ১৫ই মার্চ থেকে ১লা চৈত্র আরম্ভ হয়েছে। ১৩৭৫ সালের চৈত্র মাসে গ্রহাদির সঞ্চার। ১লা চৈত্র শনিবার চন্দ্র মকরে, রাত্রি ১০টা ৫০ মিঃ ৫৪ সেঃ গতে কুম্ভে, ৩রা চৈত্র সোমবার রাত্রি ৩টা ২৩ মিঃ ৩৬ সেঃ গতে চন্দ্র মীনে, ৬ই চৈত্র বৃহস্পতিবার দিবা ৯টা ৪৩ মিঃ ৪৩ সেঃ গতে চন্দ্র মেষে, ৮ই চৈত্র শনিবার রাত্রি ৬টা ৪৯ মিঃ ২ সেঃ গতে চন্দ্র বৃষে, ১১ই চৈত্র মঙ্গলবার দিবা ৪টা ৫২ মিঃ ১২ সেঃ গতে চন্দ্র মিথুনে, ১৩ই চৈত্র বৃহস্পতিবার দিবা ৫টা ৩৭ মিঃ ৫২ সেঃ গতে চন্দ্র কর্কটে, ১৫ই চৈত্র শনিবার রাত্রি ৪টা ২৩ মিঃ ৩১ সেঃ গতে চন্দ্র সিংহে, ১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার দিবা ১০টা ৫১ মিঃ ৫৪ সেঃ গতে চন্দ্র কন্যায়, ২০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ৬টা ৫৪ মিঃ ৪ সেঃ গতে তুলায়, ২২শে চৈত্র শনিবার রাত্রি ১০টা ৫৬ মিঃ ১২ সেঃ গতে চন্দ্র বৃশ্চিকে, ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবার রাত্রি ১টা ৩৯ মিঃ ৩০ সেঃ গতে চন্দ্র ধনুতে, ২৬শে চৈত্র বুধবার রাত্রি ৩টা ৫৬ মিঃ গতে চন্দ্র মকরে, ২৯শে চৈত্র শনিবার দিবা ৬টা ৪৪ মিঃ ৩৩ সেঃ গতে চন্দ্র কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করবেন।

বৃহস্পতি ৩রা চৈত্র দং ৩৪।৩০ পলে বক্রগতি দ্বারা ১২ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে যাবেন। শনি ৩রা চৈত্র দং ৪৩।১২ পলে মেষ রাশিতে ১ অশ্বিনী নক্ষত্রে যাবেন। ১৮ই চৈত্র দং ৩৪।৪৬ পলে শনি পশ্চিম দিকে অস্তমিত হবেন।

বুধ ৪ঠা চৈত্র দং ১৯।১৯ পলে ২৫ পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে যাবেন। ৯ই চৈত্র দং ৪৮।২২ পলে বুধ মীন রাশিতে যাবেন। ১১ই চৈত্র দং ৩৬।৪২ পলে বুধ ২৬ উত্তরভাদ্রপদ

নক্ষত্রে যাবেন। ১৮ই চৈত্র দং ৪৭।৩১ পলে বুধ ২৭ রেবতী নক্ষত্রে যাবেন। ২৬শে চৈত্র দ: ২।২৫ পলে বুধ মেষ রাশিতে ১ অশ্বিনী নক্ষত্রে যাবেন।

শুক্র ৬ই চৈত্র দং ৩১।২৮ পলে শুক্র বৃদ্ধ হবেন, ১৬ই চৈত্র দং ৩১।২৮ পলে বক্রী শুক্র পশ্চিম দিকে পাদাস্ত-মিত হবেন। ২৭শে চৈত্র দং ২০।১৫ পলে শুক্র বক্রগতি দ্বারা ২৬ উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে যাবেন। ২৭শে চৈত্র দং ৩৬।৩৭ পলে বক্রী শুক্র পূর্বদিকে উদিত হবেন। ৩০শে চৈত্র দং ৩৬।৩৭ পলে শুক্র বাল্য ত্যাগ করবেন।

মেষঃ আশ্চর্য, আশ্চর্যতর থেকে আশ্চর্যতম হয়ে উঠছেন দিনের পর দিন। সময়টা এ মাসেও ভাল যাবে না। ২৬শে চৈত্রের পর থেকে ৩০শে চৈত্রের মধ্যে ফোঁড়া পাঁচড়াদিতে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। বুকের নিম্নদেশে ফিক বেদনার সৃষ্টি হতে পারে। অর্থস্থানের পরিবর্তন ৩রা চৈত্রের পর কিছুটা ঘটবে বলে আশা করা যায়। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রাতা ও ভগ্নী-স্থানের উপর শনির দৃষ্টি পড়বে ৩রা চৈত্রের পর, তাছাড়া রবি রাশির দ্বাদশভাবে থেকে প্রায় পুরোপুরি মাসটাকে ঘিরেই মানসিক অশান্তি প্রদান করে চলবেন। বন্ধুস্থান শুভ নয়। কবি, লেখক ও চিত্র-শিল্পীদের আয়ের পথ প্রশস্ত হবে ১২ই চৈত্রের পর ধীরে ধীরে। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভ হবে না। গৃহ ও ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে পারিবারিক কারণে। বিষয়-সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়াদির ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। ১০ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে ছোটখাটো ভ্রমণাদির যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্রের গোলযোগাদির ৮ই চৈত্রের পর কিছুটা নিরসন ঘটবে। মেষ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে আর্থিক, মানসিক ও পারিবারিক অবস্থাদি সুখাবহ হবে না। ৮ই থেকে ১৪ই চৈত্রের মধ্যে কোন না কোন বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। ২০শে থেকে ৩০শে চৈত্র অবধি দিন-গুলো পতি বা পত্নীস্থানের পক্ষে শুভ-সূচক নয়। ২রা থেকে ৮ই চৈত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বা ভগ্নীর কর্ম-ক্ষেত্রে নানাবিধ গোলযোগ দৃষ্ট হয়।

বৃষঃ অসহায় মন। চারিদিকে দুস্তর বিশৃঙ্খলা যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কর্মক্ষেত্রের প্রতিও এসেছে হতাশার ধূসর ছায়া। নিশ্চিত ভাবনা-গুলোকে কেন্দ্রিত করে তুলতে পারা যাচ্ছে না কিছুতেই। বেশ-ধৈর্য ধরুন। ৪ঠা চৈত্রের পর থেকে এ সমস্যা-ত্রিভুজের একটি একটি করে ভুজ আলাদা হয়ে পড়বে ধীরে ধীরে। কনট্রাকটর ইঞ্জিনীয়ার এবং সাহিত্যিকদের ১০ই চৈত্রের পর আয়ের পথ ক্রমানুয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। জল্পনা-কল্পনা না করে মামলা-মোক-দ্দমা যতটা সম্ভব মিটিয়ে ফেলাই সমী-চীন ৪ঠা থেকে ১২ই চৈত্রের মধ্যে। ২রা থেকে ৮ই চৈত্রের মধ্যে কর্ম-প্রার্থীদের মধ্যে কারো-না-কারোর কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ১০ই চৈত্র থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে ব্যবসায়-বিষয়ক কোন নূতন প্রস্তাবনা গড়ে না তোলাই মঙ্গলপ্রদ। ২০শে থেকে ২৪শে চৈত্রের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। পুস্তক ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, জ্যোতি-বিদ এবং ভেষজবিদ্‌গণের আর্থিক যোগাযোগ ৮ই চৈত্রের পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। শিল্পপতি এবং কারখানা মালিকদের সঙ্গে শ্রমিক বিরোধের সূচনা দেখা দিতে পারে। বৃষলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের ৪ঠা চৈত্রের পর থেকে ১৫ই চৈত্র অবধি স্বাস্থ্য সবিশেষ শুভপ্রদ থাকবে না। ৮ই থেকে ১০ই চৈত্রের মধ্যে মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা বা মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক কোন গুপ্তকথা বন্ধু-বান্ধব এবং নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনদের নিকট প্রকাশ করা সমীচীন নয়।

মিথুনঃ চিন্তাগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, সমস্যার পর সমস্যা একের পর এক দেখা দিচ্ছে। একদিকে রয়েছে আর্থিক সমস্যা, অন্যদিকে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতি। প্রমোশানের বা কর্ম পরিবর্তনেরও স্বপ্ন রয়েছে। তা কি সফল হবে এই মাসে? ১০ই চৈত্রের পর ঐ সমস্যা এবং পরিস্থিতি বহুলাংশে তিরোহিত হবে। ২রা থেকে ৮ই চৈত্র অবধি দিনগুলো কনট্রাকটর, ডাক্তার, লৌহ ব্যবসায়ী এবং চিত্র-শিল্পীদের পক্ষে আর্থিক বিষয়ে সবিশেষ শুভফল আশা করা উচিত নয়। ১০ই থেকে ২২শে চৈত্রের মধ্যে নতুন কর্মপ্রার্থীর কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। বিদ্যাশিক্ষাদির ব্যাপারে পুত্র ও কন্যাদের আকস্মিকভাবে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহাদির ব্যাপারে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে বদনামের সম্ভাবনা রয়েছে। ৩রা থেকে ৮ই চৈত্রের মধ্যে অতি প্রিয়তম বন্ধুর ব্যবহার শত্রুবৎ হয়ে দেখা দিতে পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মানসিক অবনতির যোগ দৃষ্ট হয়। সিনেমা পরিচালক ও প্রযোজকদের পক্ষে ৪ঠা থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে নূতন কোন প্রস্তাবনায় স্থায়ী মতামত প্রদান করা উচিত নয়। মিথুন লগ্নের চতুর্থে বৃহস্পতি ও কেতু এবং দশমে বিপরীত দিকে রবি, রাহু শুক্র ও শনি থাকায় আত্মীয়স্থান ও কর্মস্থান শুভ বলে প্রতীয়মান হবে না। নিশ্চিত বিবাহের যোগ রাহুর দুঃখিত দৃষ্টির ফলে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ৪ঠা থেকে ১৪ই চৈত্রের মধ্যে কোন বন্ধুর সহায়তায় আর্থিক উন্নতির যোগাযোগ দৃষ্ট হয়।

কর্কটঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো তরঙ্গায়িত হচ্ছে মনের উত্তাল সমুদ্রে। স্বপ্ন যা প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে রয়েছে তা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে না। কর্মক্ষেত্রে যে অশান্তি চলেছে সে অশান্তি তিরোহিত হবে ১০ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে

আর্থিক বিষয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে। ১৪ই থেকে ২২শে চৈত্রের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মানসিক অবস্থা ভাল থাকবে না। কোন ভ্রাতার ব্যবহার অশান্তিপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে পারে। ২০শে চৈত্রের পর কোন শত্রুর ব্যবহার মিত্রবৎ হয়ে দেখা দিতে পারে। ২২শে থেকে ২৬শে চৈত্রের মধ্যে কোন বন্ধুর দ্বারা আর্থিক বিষয়ে উপকৃত হতে পারেন। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং জ্যোতির্বিদগণের আয়ের পথ ৭ই চৈত্রের পর ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। পুত্র ও কন্যাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে নানাবিধ ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। ৮ই থেকে ১৬ই চৈত্রের মধ্যে মাতা বা পিতৃস্থানীয় কারো না কারো হঠাৎ মৃত্যুযোগ দৃষ্ট হয়। স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক কারণে মনোমালিন্যের যোগ ভীষণাকার ধারণ করতে পারে। কর্কট লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ৮ই থেকে ১৪ই চৈত্রের মধ্যে প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে হঠাৎ বদনামের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ৪ঠা থেকে ১২ই চৈত্র অবধি দিনগুলো যানবাহনাদিতে চলাচলের পক্ষে সবিশেষ উপযুক্ত নয়।

সিংহঃ যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে চলেছেন দিনের পর দিন সে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা যেন ধীরে ধীরে বৈপরীত্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছে। আর্থিক সমস্যা নিয়ে বিব্রত দিনগুলো স্বাধীন মনোভাবের নিকট পরাজিত বলেই মনে হচ্ছে নিজেকে। ব্যবসায়ে আয়ের পথে বিঘ্নের পর বিঘ্ন চলেছে। বিশেষ করে লৌহজাতীয় ব্যবসা ক্ষেত্রেও এ মাসের ১৪ই চৈত্র অবধি সুখকর হবে না। ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। বন্ধুদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশ কৃষ্ণকায়, ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে তৎপ্রতি সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। মামলা-মোকদ্দমার ফল আশানুরূপ হবে না। পত্নীর দীর্ঘস্থায়ী রোগের কিছুটা উপশম হতে পারে। ৩রা চৈত্র থেকে ১২ই চৈত্রের মধ্যে মাতার হঠাৎ কঠিন ব্যাধির যোগ দৃষ্ট হয়। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। গুপ্ত প্রেম-প্রীতির ফল বিষময় হয়ে দেখা দিতে পারে। ধর্মোপলক্ষে ছোট খাট ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয় ২রা থেকে ১০ই চৈত্রের মধ্যে। ৪ঠা চৈত্র থেকে ৮ই চৈত্রের মধ্যে পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। কনট্রাকটর, চিত্রতারকা, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের আয়ের পথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ১০ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে হঠাৎ আয়ের পথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে। সিংহ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রের এবং পারিবারিক ঝঞ্ঝাট ৮ই চৈত্র থেকে ১৬ই চৈত্রের মধ্যে অনেকাংশে তিরোহিত হবে। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। ৪ঠা থেকে ১৬ই চৈত্র অবধি নতুন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত নয়।

কন্যাঃ অনেক বিপদাপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে চলেছেন, ভ্রাতাদের সঙ্গে চলেছে মানসিক অশান্তি, স্ত্রীর ব্যবহারও তেমন সুখাবহ নয়, বিষয়-সম্পত্তি নিয়েও দুশ্চিন্তা আর সে সঙ্গে আর্থিক দুশ্চিন্তা ত' রয়েছেই—ভয়ের কারণ নেই, ৪ঠা চৈত্রের পর এ সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে তিরোহিত হবে। ৪ঠা চৈত্রের পর থেকে কর্মক্ষেত্রের গোলযোগ

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সংগে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সংগে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সংগে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

অনেকাংশে হ্রাস পাবে। স্বাস্থ্য প্রায় দিনই ভাল যাবে না। আহার-বিহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। বিশেষ করে পিতামাতার দিকেই সন্নিবেশ মত নেওয়া কর্তব্য। আর্থিক সমস্যা অনেকাংশে তিরোহিত হবে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ ক্রমোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে ১৩ই চৈত্রের পর। শত্রুরা যতই প্রবল হোক, সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। ১২ই থেকে ২০শে চৈত্রের মধ্যে পিতা বা পিতৃস্থানীয়ের মধ্যে কারো না-কারো মারাত্মক রোগের সম্ভাবনা রয়েছে। পত্নীর স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। ব্যবসাক্ষেত্রে লাভের আশা আছে। জ্যোতির্বিদ, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিত্র-তারকাদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। ধর্মোপলক্ষে ব্যয়ের যোগ দৃষ্ট হয়। ১০ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে ছোট ছোট ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মস্থানে নানাবিধ আশাপ্রদ যোগাযোগ দৃষ্ট হয়। কন্যা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের যান-বাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে। রাজনৈতিক ব্যাপারে মর্যাদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলা : অনেককাজ পড়ে রয়েছে কিন্তু সে কাজগুলো গুছিয়ে আনা কষ্টকর। একটা বড় রকমের আশা মনে মনে পোষণ করে চলেছেন অনেকদিন ধরেই ; কিন্তু সে আশা ফলবতী হয়ে দেখা দেবে না। ১০ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে আর্থিক বিষয়ে অনেক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। অর্থ-কড়ি ঋণ, লেন-দেনের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ৮ই থেকে ১৪ই চৈত্রের মধ্যে মধ্যম ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সূত্রপাত হতে পারে। ১৫ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে কোন বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। কোন মহিলার দ্বারা অপমানিত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। ৮ই থেকে ১৭ই বা বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে। নিশ্চিন্ত অর্থপ্রাপ্তির যোগে বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারে পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। ১০ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের বা কন্যার আঘাতপ্রাপ্তির যোগ দৃষ্ট হয়। সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের সুনাম লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ধর্মোপলক্ষে গৃহে ব্যয়বহুলতা দৃষ্ট হয়। গৃহে কোন সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোকের আগমন ঘটতে পারে। তাঁর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে অর্থ সাহায্যাদি করা উচিত নয়। তুলা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পারিবারিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা এ মাসে মোটামুটি মন্দ থাকবে না। হঠাৎ কোন ব্যক্তির পরিচয়ে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে সে ব্যক্তির দ্বারা যথেষ্ট সাহায্যাদি প্রত্যাশা করতে পারেন। ১২ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে ঋণ দেওয়া অর্থ অযাচিতভাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিক : মনে রয়েছে অনেক ব্যথা-বেদনা, রয়েছে অনেক অকথিত কাহিনী, রয়েছে অনেক অসমাপ্ত কর্ম আর রয়েছে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা। এই চতুর্ভুজ সমস্যায় আপনি কেন্দ্রবিন্দুর মত, ক্ষোভে ও মানসিক দুঃখে জড়সড়। চার পাশের মানুষগুলোকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। ৮ই চৈত্রের পর থেকে সেই কেন্দ্রবিন্দুর শক্তিবলে এক একটি ভুজ খুলতে থাকবে ধীরে ধীরে। কর্মক্ষেত্রের দুশ্চিন্তা ১৮ই চৈত্রের পর থেকে ক্রমশ কমে আসবে। আর্থিক দুশ্চিন্তায় মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে উঠবে মন। ভ্রাতার শারীরিক অবস্থা ভাল যাবে না। নির্ধারিত কোন কর্মের সুযোগ হঠাৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ১২ই থেকে ১৫ই চৈত্রের মধ্যে অতি প্রিয়জনের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্র-দের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুবৎ বলে বোধ হবে। ফোড়া-পাঁচড়াদিতে পীড়িত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এই থেকে ৮ই চৈত্রের মধ্যে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে। ভূমি বা গৃহাদি ব্যাপারে মামলা মোকদ্দমার ফল শুভপ্রদ হবে। অভিনেতা, শিল্পী ও অভিনেত্রীদের আয়ের পথ অধিকাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। টাকাকড়ি লেন-দেনের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। পরের ঝামেলা মাথায় নিয়ে কোন কর্তব্য সম্পাদন না করাই শ্রেয়। বৃশ্চিক লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে নানাবিধ যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়। মামলা-মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

ধনু : হতাশা এসে গেছে কর্মক্ষেত্রে। একনাগাড়ে কর্ম করে যেতে হচ্ছে, নিশ্চিত পদোন্নতিতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। টুকিটাকি ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছে, শরীরের অবস্থা ভাল থাকছে না আর অর্থের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। ১৪ই চৈত্রের পর ধীরে ধীরে আর্থিক মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ক্রমোত্তর উন্নতির দিকে যাবে। রাশির উপর শনির দৃষ্টির অবসান ঘটবে ৩রা চৈত্রের পর। ধৈর্য ধরে মনে অদম্য সাহস নিয়ে কর্ম করে যেতে হবে, সামনেই সুদিন প্রতীক্ষারত। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার মোটামুটি মন্দ থাকবে না। কন্ট্রাক্টরদের বড়রকমের কন্ট্রাক্টের যোগাযোগ আসতে পারে। ১২ই থেকে ২০শে চৈত্রের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের চাকুরী লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ৮ই থেকে ১৬ই চৈত্রের মধ্যে এক সুসন্তান লাভ করতে পারেন। মধ্যম কন্যার স্বেচ্ছাকৃত প্রেমের অসাফল্যের ইঙ্গিত পরিদৃষ্ট হয়। মামলা-মোকদ্দমার ফল আশানুরূপ হবে না। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে মনঃকষ্টের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়। ২৭শে চৈত্রের পর কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীদের আয় বৃদ্ধির যোগ পরিদৃষ্ট হয়। ধর্মোপ-

চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা সবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। ১৬ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে কোন না-কোন বন্ধুর দ্বারা অর্থ ক্ষতির যোগ দৃষ্ট হয়। ধনু লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আর্থিক অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই সুখপ্রদ থাকবে না। যানবাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

মকর ঃ বেশ ত' ঝড়ঝঞ্ঝা চলেছে চলতে থাকুক। চলতে থাকুক অবিরাম-গতিতে। নিজের কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করবার ধর্ম আপনার নয়। দ্বিগুণ কর্মোদ্দীপনা নিয়ে চলতে হবে সংসার জীবনে। কর্মক্ষেত্রের বাধাবিঘ্ন, গুপ্ত শত্রুতা থাকবেই কিছু না কিছু, ভয় পেয়ে জড়সড় হবার কোনই অর্থ নেই। ৪ঠা চৈত্রের পর শনির দৃষ্টি অবশ্য রাশির উপর পড়বে কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই। চন্দ্র শনির বৃদ্ধিগত হয়ে কাজ করবেন মাত্র। আপনার গুপ্ত মন্ত্রণাদি যতটা সম্ভব গুপ্ত থাকাই শ্রেয়। পূর্বের শত্রুতা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে পারে। ২রা থেকে ৮ই চৈত্র অবধি দিনগুলো আহার বিহারে-সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা কর্তব্য। কোন নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ না করাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে খাদ্যবিষয়ক নিমন্ত্রণাদির কথা বলা হলো। সাহিত্যিক, সম্পাদক, চিত্রতারকা ও পুস্তক প্রকাশকদের আয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ৬ই থেকে ১২ই চৈত্রের মধ্যে কনট্রাকটর-দের বড় রকমের কোন না কোন সুযোগ আসতে পারে। ৫ই থেকে ১০ই চৈত্রের মধ্যে ভ্রাতৃস্থানীয় কারো না কারো কর্মক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। পুত্র ও কন্যাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রচেষ্টায় সাফল্যের ইঙ্গিত হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমার ফল আশানুরূপ হবে না। ৮ই থেকে ১৮ই চৈত্র অবধি দিনগুলো মানসিক অশান্তির। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্যের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয় না। ৫ই থেকে ১০ই চৈত্রের মধ্যে পিতার সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হতে পারে। মকর লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের কর্ম-প্রাপ্তির যোগ হয়েছে। শরীরের প্রতি প্রথম থেকে যত্ন নেওয়া কর্তব্য। কোন বন্ধুর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না।

কুম্ভ ঃ আর্থিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কনট্রাকটরগণ ভাবছেন নূতন ব্যবসা এর চেয়ে করা ভাল ছিল—ক্ষতির পর ক্ষতিই চলেছে দেখছি। ভাববার কারণ নেই, ১৬ই চৈত্রের পর থেকে কনট্রাকটর এবং ব্যবসায়ী-দের ব্যবসার ক্ষেত্র মোটামুটি ভালই চলবে ধীরে ধীরে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রকাশক ও চিত্রতারকাদের আয়ের পথ এ মাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ২রা থেকে ৬ই চৈত্র অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। উদর সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট ভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রাতৃপক্ষ থেকে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে আর্থিক বিষয় নিয়ে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্যের দিকে যত্ন নেওয়া কর্তব্য। ৪ঠা থেকে ৬ই চৈত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের কোমরে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ৭ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে অতি পরি-চিত বন্ধুর ব্যবহার শত্রুবৎ হয়ে দেখা দিতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভ-সূচক হবে বলেই আশা করা যায়। ৩রা থেকে ৮ই চৈত্রের মধ্যে ধর্মোপ-লক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্ম-ক্ষেত্রে সামান্য ভুলের ফলে বেশ বড় রকমের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে কর্ম-প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। কুম্ভলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আর্থিক অবস্থার সে রকম যোগাযোগ শুভ পর্যায়ে যাবে বলে মনে হয় না। ৫ই থেকে ৮ই চৈত্রের মধ্যে নিশ্চিত বিবাহের সম্বন্ধাদি আগাম আলোচনার মধ্যে সংযমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ৩রা থেকে ৮ই চৈত্রের মধ্যে পিতা পিতৃস্থানীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতুল্য কঠিন ব্যাধির সম্ভাবনা। এই সমস্ত মাসটা বিশেষ আহার-বিহারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

মীন ঃ সংসার সমর ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, জয়-পরাজয়ের হিসেব-নিকেশ কবে হবে কে জানে? প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও বিত্তাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের গৃহ থেকে চলে যাওয়া বা মৃত্যু সংবাদাদি বা ভ্রাতাদের নিকট হতে শত্রুবৎ ব্যবহার ইত্যাদি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে বর্তমানে অনেকটা যেন কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। ৪ঠা চৈত্রের পর মনের অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটবে। মনকে সবল করতে চেষ্টা করুন, আপনার চারদিকে গুপ্তশত্রুরা ছড়িয়ে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি করবার জন্য কিন্তু তাদের সে ক্ষমতা অক্ষমতার হাতে বন্দী হবে। আর্থিক যোগাযোগ নানাদিক থেকেই আসবে, কার্যকরী হবে না তা ১৪ই চৈত্র পর্যন্ত। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের শারীরিক অবস্থা সুখপ্রদ হবে না। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে একের পর এক নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ৪ঠা থেকে ১০ই চৈত্রের মধ্যে হঠাৎ মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার নিদারুণ কঠিন ব্যাধির যোগ দৃষ্ট হয়। ৮ই থেকে ১২ই চৈত্রের মধ্যে আকস্মিক-ভাবে কোন পুরাতন বন্ধুর সহায়তার যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্র ও কন্যাদের জন্য মানসিক উদ্বেগ ক্রমোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ১০ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থব্যয় করা সমীচীন নয়। কোন মহিলার দ্বারা অপপ্রচারের সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের বুদ্ধির দোষে বা কথাবার্তার অসংযমতার দোষে কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। প্রেমাদি বিষয়ে যুবক-যুবতীদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য। মীন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের এ মাসটা সবিশেষ শুভপ্রদ থাকবে না। স্বাস্থ্য বিশেষ শুভপ্রদ থাকবে না।

১৩ই থেকে ১৮ই চৈত্রের মধ্যে প্রার্থী-প্রেম কমলাভের যোগ পরিদৃষ্ট হয়।

এ মাসের লেন-দেনের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য।

নিশ্চিন্ত বিবাহের যোগাযোগে বাধার সঞ্চার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

● পত্রোত্তর ●

কমারী কৃষ্ণারাণী সান্যাল, সারদা নগর, আমেদাবাদ —(১) তুলা রাশি, মেষ লগ্ন, (২) যোগাযোগ রয়েছে। ●অরূপকান্তি সরকার, বলরাম ডিহি (পূর্ব) মেদিনীপুর—(১) অসম্ভব নয়, (২) ৪ থেকে ৬ রতি শ্বেতমুক্তা কিংবা ১০ থেকে ১২ রতি চন্দ্রকান্ত মণি ধারণ করা কর্তব্য। শ্রীঅপরিচিত, জয়চণ্ডীপুর, ২৪ পরগণা, (১) ২৫ বছরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। (২) সুখ ও দুঃখ নিয়েই তো জীবনের বিকাশ। ● কুমারী আশা রায়, সিঁথি, কলিকাতা-৫০, (১) চেষ্টা করুন। ●শ্রীগণেশ পালিত, বড়বাগান লেন, শ্রীরামপুর, (১) জন্ম সন, তারিখ, সময় ও স্থান পাঠাবেন। ●শ্রীহরিবোল পাল, আটগ্রাম, বীরভূম, (১) মোটামুটি ভালই যাবে, ৮ রতি রক্তপ্রবাল বা ৬ রতির কাছাকাছি গোমেদ পরে দেখতে পারেন। ●শ্রীশিবকৃষ্ণ কোলে, বাসনা, হুগলী, (১) চাকুরীর যোগ আছে। (২) পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ●শ্রীরণজিৎকুমার বসাক, পাইকপাড়া রোড, কলি-৩৭, (১) দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● বি কে পাল, রায়পুর রোড, কলি-৪৭, (১) ৩ বছরের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে, (২) ৬ থেকে ৮ রতি গোমেদ রূপায় ডানহাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● এম এন, রাও সুরজা, পুরী, (১) ৬ রতি থেকে ৮ রতির মধ্যে ইন্দ্রনীল ধারণ করে দেখতে পারেন। ●সুব্রতা ঘোষ, বহুবাজার, (১) যতদূর চেষ্টা করবেন। ১৮ থেকে ২১ বছরের মধ্যে যোগাযোগ দেখা যায়। ●শ্রীছবিলাল চন্দ্র, কাজোড়া গ্রাম, বর্ধমান, (১) পরিবর্তন আশা করতে পারেন। (২) ভাগ্যের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ●কল্যাণী ঘোষ, নীলমণি রো, কলিকাতা-২, (১) বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ●শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পালিত রোড, কলি: ৪, (১) আপনার প্রশ্ন কোথায়? ● ডি, আর, ভুবন সরকার লেন, কলি-৭, (১) ৫ থেকে ৭ রতির মধ্যে গোমেদ ধারণ করবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। (২) টিকেট কেটে দেখতে পারেন। ●শ্রীরাধারমণ দত্ত, সরোজিনী নগর, নূতন দিল্লী, ২৩, (১) ঋণ পরিশোধ হতে বিলম্ব হবে। (২) হলদে পোখরাজ ৮ রতি সোনায় ডান হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীমতী পলা ঘোষ, নীলমণি রো, কলি: ২, (১) ছক পাঠান। ●পরিমলকুমার রায়, বাঁশদ্রোণী পার্ক, ২৪ পরগণা, (১) সিংহ রাশি (২) অপরাজিতা নীলা ৬ থেকে ৮ রতি রূপায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণীয়। ●রেণুপ্রভা রায়, মহেন্দ্র রায় লেন, কলি-৪৫, (১) আগামী ৩ বছরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে, (২) সাধারণভাবে ভালই বলা চলে। ●শ্রীদিলীপকুমার চক্রবর্তী, গৌহাটি, আসাম, (১) ৪ থেকে ৬ রতি গোমেদ ও ৪ থেকে ৬ রতি মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এন রোড বিষ্টুপুর, জামসেদপুর, (১) আপনার উভয় ক্ষেত্রেই শুভ সম্ভাবনা রয়েছে। (২) সাধারণভাবে ভালই বলা চলে। ●রাণী সোম, বেসিক স্কুল, বালী পাতরা, জেলা, পূর্ণিয়া, (১) দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ●সুব্রতকুমার বসু, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলি-৬, (১) একটু বিলম্ব হবে বৈকি, চেষ্টা করুন। (২) পরিচিতির মধ্যে বুঝায়। ●শ্রীঅশোককুমার বসু, (১) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। (১) ভয় আপনার নেই। (৩) ৬—৮ রতি রক্তপ্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীমতী ছায়ারাণী দত্ত, জি টি রোড, বালী, কদমতলা, (১) গৃহনির্মাণ ও প্রমোশনের যোগ বর্তমান রয়েছে, ●রঞ্জন রায়চৌধুরী, কদমতলা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, (১) মহর্ষি পরাশরের মতানুসারে ৬ থেকে ৮ রতি গোমেদ ধারণ করে দেখতে পারেন রূপায় ডান হাতের মধ্যম অঙ্গুলিতে। (২) ১৯৭০ সালের পর ধীরে ধীরে আপনার উন্নতি হবে। ● কুমারী অশোকা মণ্ডল। পো: লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, (১) হাঁ, সুখী হতে পারবেন, (২) প্র্যাকটিক্যাল লাইনে উন্নতি করবেন। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। ● এন কে খাটুয়া, অভয় আশ্রম, বাঁকুড়া। (১) নেই, (২) ১৯৭০ সালের কাছাকাছি বদলী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● সোমনাথ দত্ত, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, (১) বছর দুই পরে, (২) শাস্ত্রীয়মতে কুম্ভরাশির হীরকরত্ন অভাবে শ্বেত পোখরাজ ধারণ করবার বিধি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৭ রতি শ্বেত পোখরাজ সোনায় ডান হাতের অনামিকাতে ধারণ করা বিধেয়। ●মিতা ভৌমিক, ধানবাদ, (১) না, সে রকম ভয়ের কারণ দেখছি না। বছর তিনেকের মধ্যেই শান্তি ফিরে আসবে। ৬—৮ রতির মধ্যে গোমেদ ধারণে শুভফল পেতে পারেন। ● এ বি হাজরা, যাদবপুর, কলি:-৩২, (১) বছরখানেক বাদে, (২) মোটামুটি সুখপ্রদ। ● এস এন বসু, বোম্বে, (১) আপনার ৬ থেকে ৮ রতি রক্তপ্রবাল এবং ৬ থেকে ৮ রতি গোমেদ যথাক্রমে ডান হাতের অনামিকা ও মধ্যম অঙ্গুলিতে ধারণ করা উচিত, (২) অপরাজিতা নীলা ৫ থেকে ৭ রতি আপনার স্ত্রীর ডান হাতের মধ্যম অঙ্গুলিতে ধারণ করা কর্তব্য। (নীলা ধারণে ভীতির কোন কারণ নেই) ● কুমারী অশোকা মণ্ডল, লালবাগ, (১) দুটি

প্রশ্নের অধিক উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীরঞ্জন রায়চৌধুরী, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি, মুক্তো ও ৮ রতি রক্তপ্রবাল যথাক্রমে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিতে রূপায় সম্ভব হলে ধারণ করে দেখতে পারেন। অসামর্থ হলে মুক্তোর পরিবর্তে চন্দ্রকান্ত মণি (সিংহলী) ধারণ করতে পারেন ৮ থেকে ১০ রতির মধ্যে রূপায় ঐ মধ্যমা অঙ্গুলিতে। ● বিমল বিশ্বাস, চেতলা হাট রোড, কলিকাতা। বৃষ রাশি, তুলা লগ্ন, ৭ থেকে ৮ রতির মধ্যে শ্বেত প্রবাল রূপায় বা সোনায় ডান হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। প্রদীপ বসু, চুঁচুড়া, হুগলী, কন্যা লগ্ন, মকর রাশি, উত্তরা ষাঢ়া নক্ষত্র উচ্চ শিক্ষার যোগ রয়েছে। ●শ্রীকাজল চৌধুরী, পণ্ডিচেরী। কর্ম-পরিবর্তন ও বিদেশযাত্রার যোগ রয়েছে। শ্রীশ্যামল পাল, বিষ্টুপুর, জামসেদপুর-১। কন্যা রাশি। নরগণ, কর্কটলগ্ন। ● হরিদাসী, মতিবাগ, নিউ দিল্লী, স্বামীর রাশিচক্র পাঠাবেন। ● শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ, কোন্নগর, ঘাটাল আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন, উত্তর পাবেন। ● শ্রীঅশোককুমার দাস, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। সময় পেলেই হবে, অপেক্ষা করুন। ● শ্রীমতী প্রেমলতা, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ●শ্রীঅশোক গোস্বামী, চণ্ডীতলা, বিষ্ণুপুর। ২৩ থেকে ২৬ বছরে চাকুরীর যোগ শুভ বলা যেতে পারে। উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ রয়েছে। ●রবীন্দ্র সাহু, হাইলাকান্দি, কাছাড়, আসাম। একসাথে দু' উপায়ে অর্থোপার্জনের যোগ রয়েছে। চাকুরী ও ব্যবসায়। ৩৬ থেকে ৪৮ বছর। ● শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দাস, ডি ব্লক, রুম নং ৬, হাওড়া। প্রশ্নের সময় ও স্থান উল্লেখ করে লিখুন। ●শ্রীঅকো পাল, জে রোড, লিলুয়া—সাল, তারিখ ও সময় নির্ভুল করে লিখবেন। ●ফণীনাথ বসু, ফুলপুকুর লেন, চুঁচুড়া। রক্তপ্রবাল ৮ রতি ও গোমেদ ৬ রতি যথাক্রমে ডান হাতের অনামিকা ও মধ্যমাতে রূপায় ধারণ করা বিধেয়। ●শ্রীখগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, চুঁচুড়া, হুগলী—৫ থেকে ৭ রতি অপরাজিতা নীলা ও রক্তপ্রবাল ৬ থেকে ৮ রতি যথাক্রমে ডানহাতের মধ্যমা ও অনামিকাতে রূপায় ধারণ করা বিধেয়। ●শ্রীমতী রাধারাণী মিত্র, কলিকাতা—দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ●শ্রীসুধীরকুমার ঝুরি, চাঁদপুর, ২৪—পরগণা—৪ থেকে ৬ রতি হলদে আভাযুক্ত মুক্তো সোনায় ডানহাতের অনামিকাতে সম্ভব হলে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীপরেশ রায় চৌধুরী, পুরুলিয়া। বর্তমান সময় হতে তিন বছরের মধ্যে উন্নতির আশা করতে পারেন। শ্রীদেবাশীষ দাশগুপ্ত, দুর্গাপুর-৪—সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন। শুভ। ●রাজদীপ, উত্তর ইন্দা, মেদিনীপুর। প্রশ্নগুলোর যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ●শ্রীতপন মিত্র, যাদবপুর, কলি: ৩২—আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, ৫ থেকে ৭ রতি অপরাজিতা নীলা ডান হাতের মধ্যমাতে রূপায় ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীপ্রিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর উড়িষ্যা, ১০ থেকে ১২ রতি চন্দ্রকান্তমণি রূপায় ডানহাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●ডালু বসু, কলিকাতা-৯, দুটো নির্দিষ্ট প্রশ্ন করতে হয়। ●শ্রীপান্না, ইন্দা, মেদিনীপুর। রাশিচক্র পাঠাতে হবে। ●রঞ্জিৎ রায়চৌধুরী, দরং আসাম, স্পষ্ট করে লিখতে হবে আপনার প্রশ্ন দুটো। ●শ্রীবাবু, বোম্বাই-৪, কেটে দেখুন, এ প্রশ্নের উত্তর লক্ষ্মীদেবীও দিতে পারবেন না বলে জনপ্রবাদ রয়েছে। ●শ্রীসরোজ-কুমার ভট্টাচার্য। পাইকপাড়া, বৃশ্চিক লগ্ন, কন্যা রাশি, হস্তানক্ষত্র। বৃষ লগ্ন, মিথুন রাশি, আর্দ্রা নক্ষত্র। ●শ্রীস্নিগ্ধা দাশগুপ্তা, দুর্গাপুর-৪, কুম্ভ লগ্ন, সিংহ রাশি, বিদ্যাস্থান শুভই বলা চলে। ●শ্রীকালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, মহেশপুররাজ, বিহার, অনেক ভেবে-চিন্তে লিখলুম—৮ থেকে ১০ রতি শ্বেতপ্রবাল রূপায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন।

অভিসারিকা

শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার

নীবিবন্ধন খুলিয়া রেখেছি আজ,
শিথিল কবরী অলস আবেশে বাঁধা;
ময়ূর-কণ্ঠী আঁচলে ঢেকেছি লাজ,
অভিসারিকা বেপথু যেন গো রাধা।

বাতায়ন পাশে বসিয়া তাহারি আশে,
আকুল পবনে অঞ্চল-অলক দোলে;
সিক্ত যূথীর ব্যথিত বেদন ভাসে
আঁধার আকাশে হাজার জোনাকী জ্বলে।
ঘনঘটা ঘিরে কপোত বক্ষ কাঁপে
চকিত নয়ন ঘুরিয়া মরিছে আসে,
উর্বশী কোন ক্রন্দসী অভিশাপে,
হায় ভীরু মন আসে কি না প্রিয় আসে।

সুপ্ত নগরী স্বপন হেরিছে সুখে
উতলা পবন বিজন বিধুরে পথ,
মনের ময়ূর পেখম লুকালো দুখে,
বুঝি বা এলো না বন্ধুর জয়রথ।
পরাণবন্ধু এখনও হবে কি দেরী,
কমল নয়ন মুদিত অশ্রুভারে;
বিজলী চমকে চকিতে উঠিয়া হেরি,
বন্ধুর রথ দাঁড়ায় পথের পারে।

যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীবাদল ভট্টাচার্য অঙ্কিত

মাসিক

বসুমতী

চৈত্র, ১৩৭৫

গ্যারেজের চাবি খুলে ঢুকে গাড়িটার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলেন সরোজাক্ষ। ধুলো জমেছে বিস্তর, সরোজাক্ষর সেই অসুখ হয়ে পড়ার পর থেকেই তো চাবি বন্ধ পড়ে আছে।

নীলাক্ষ গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে তীব্রদৃষ্টিতে দেখে দেখে ফটপাথে নেমে ট্যাক্সী ডাকে।

কমলাক্ষ যখন এসেছিল ক'দিনের জন্যে, সেও বলেছিল, 'বসে থেকে থেকে তো জং ধরে গেল ওটায়, চাবিটা বাগিয়ে আনো না মা, একবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

বিজয়া প্রথমে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে এসেছো, এবার গাড়ি এ্যাকসিডেণ্ট করে হাত-পা ভাঙো। চালাতে শিখলি কবে যে গ্যারেজের চাবিটা পেলেই চালাবি?'

তারপর বলেছিলেন, 'চাবি উনি দিলে তো? ওই গাড়িটা তো তোদের বাপের কাছে গাড়ি নয়, ওঁর মরে যাওয়া কাকা।'

সরোজাক্ষ অবশ্য শুনতে পাননি সে কথা। শুনলে হয়তো অবাক হয়ে হয়ে ভাবতেন, 'বিজয়া কবে আমায় এমন নিষ্ঠার সঙ্গে 'পড়ে' ফেললো?'

বাস্তবিকই বুঝি সরোজাক্ষর হৃদয়ে গাড়িটা সম্পর্কে ওই রকমই একটি ভাবপ্রবণতা আছে। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যেন কোন প্রিয় স্মৃতির গা থেকে বিস্মৃতির ধুলো ঝাড়লেন।

কিন্তু একে এখন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এতোদিনের অবহেলার মাশুল দিতে হবে। আবার চাবি বন্ধ করলেন গ্যারেজের, রাস্তায় নামলেন, বাস স্টপের দিকে এগোলেন।

রোদে বেরোনো ডাক্তারের নিষেধ ছিল, সরোজাক্ষর ভিড়ের মধ্যে ট্রামে বাসে চড়া নিষেধ ছিল, সে নিষেধ এতোদিন মেনেছিলেন সরোজাক্ষ। ডাক্তারের আদেশের প্রতি নিষ্ঠাবশতই যে মেনেছিলেন তা নয়, যেন নিষ্ক্রিয়তার একটা কফিনের মধ্যে নিজেকে পুরে ফেলে ওই একখানা ঘরের মধ্যে কবরিত করে ফেলেছিলেন নিজেকে।

—কেন?

সে কথা সরোজাক্ষ নিজেও বোধ করি জানে না। হয়তো সহসা একটা বড় আঘাতে অসাড় হয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, হয়তো বা অসাড় চিত্ত সহসা একটা বড় আঘাত পেয়ে বহু চিন্তায় সচেতন হয়ে উঠেছিল বলে চিন্তার দুর্গে বন্দী করে ফেলেছিলেন নিজেকে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

আজ আবার সহসাই যেন সব নিষ্ক্রিয়তার খোলশ খুলে বার করে আনলেন নিজেকে, সমর্পণ করলেন জনারণ্যের মধ্যে।

কিন্তু কেন?

কেন হঠাৎ আবার আজ আপন সৃষ্ট দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হল সরোজাক্ষর? আর বাড়ির কাউকে না জানিয়েই বেরিয়ে পড়লেন কেন?

সরোজাক্ষ কি তবে হঠাৎ তার সংসারের ক্লেদাক্ত ঘটনা শুনে ফেলেছেন, তাই বিচলিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন সেই সংসারের গণ্ডি থেকে?

কিন্তু কই? তা' তো নয়।

বিজয়া তো সেই কলঙ্কিত কথা এ পর্যন্ত সযত্নে স্বামীর কাছ থেকে গোপন করেই আসছেন। জানেন কেউ কাছে গিয়ে না বললে, টের পাবার ক্ষমতা নেই সরোজাক্ষর। বিজয়া এখনো পর্যন্ত আশা করছিলেন, হয়তো শেষ অবধি মীনাক্ষীর সুমতি হবে, হয়তো গোপনটা গোপনই থেকে যাবে।

স্বামীকে বিজয়া কোনো ব্যাপারেই ভয় করেন না, স্বামীর পছন্দ-অপছন্দকে তোয়াক্কাই করেন না। কিন্তু এবারে একটু বে-পোটে পড়ে গেছেন। এবারে ভয় জন্মেছে।

অথচ এ ভয় করবার কথা ছিল না।

অন্তত বিজয়ার প্রকৃতিতে ছিল না।

বিজয়ার প্রকৃতিতে তো স্বাভাবিক ছিল স্বামীর কাছে এসে ফেটে পড়ে, মেয়েকে যথেষ্ট বিচরণের সুযোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁকেই বাক্যবাণে বিদ্ধ করে করে জর্জরিত করা এবং মেয়েকে বিজয়ার ইচ্ছে অনুযায়ী মানুষ করতে দিলে যে আজ এমন কেলেঙ্কারী ঘটতে পারতো না, সেটাও অগৌরব ঘোষণায় বুঝিয়ে ছাড়া।

কিন্তু বিজয়া তা করেন নি।

বিজয়া ভয় পেয়েছেন, ওই ধিক্কারটা তাঁর নিজের উপরই আসবে আশঙ্কায়। বিজয়া ভেবেছিলেন সরোজাক্ষ নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে থেকেই বিজয়াকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারেন। সরোজাক্ষ একটিমাত্র ঘৃণার বাণী উচ্চারণ করে মা আর মেয়েকে বিদীর্ণ করে ফেলতে পারেন।

বিজয়া বুঝতে পেরেছিলেন, সেই নিঃশব্দে ধিক্কারের, সেই একটি ঘৃণার বাক্যের সামনে বিজয়া মুখ খুলতে পারবেন না। মর্যাদাজ্ঞানহীন বিজয়া স্বামীর হৃদয়-দুর্গে প্রবেশের পথ না

…গেয়ে চিরকাল সেই দুগয়ারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছেন, আর ভেবেছেন, এটাই বুঝি বিজয়, কিন্তু হঠাৎ যেন সেই পদ্ধতির মধ্যে কোনো ভরসা খুঁজে পাচ্ছেন না। মীনাক্ষী নামের ওই মেয়েটা যেন বিজয়াকে শক্তিহীন করে ফেলেছে। বিজয়া অনুভব করছেন মিথ্যা মর্যাদার প্রাসাদটাকে আর বুঝি রক্ষা করা যাবে না।

নিজের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে অনেক চেষ্টা করেছেন বিজয়া, ভেবেছেন---মেয়েদের যথেচ্ছাচার করবার সুযোগ দেবে তোমরা, এ যুগ দেবে রেখেছে বিচরণের স্বাধীনতা, অথচ সেই মেয়েরা যদি নির্বোধের মত আগুনে পা ফেলে তখন দোষ হবে মায়ের? সকলে সকলরবে বলবে, 'মায়ের শিক্ষা শাসন থাকলে এমন হতে পারে না, মায়ের দায়িত্ব জ্ঞান ঠিক থাকলে মেয়ের সাধ্য কি?---মা বেহুঁশ তাই এমন বেয়াড়া কাণ্ড ঘটে বসেছে।'

হ্যাঁ এই কথাই বলবে লোকে।

বিজয়া যেন সেই 'লোক মুখ' গুলোকে দেখতে পাচ্ছেন, তাই বিজয়া ক্রমশই সাহস হারাচ্ছেন। আর তাই বিজয়া মেয়েকে তিরস্কার করার পালা শেষ করে এখন তাকে তোয়াজের পালা ধরেছেন। মীনাক্ষী যদি এতোটুকু সদয় হয় মায়ের উপর। মীনাক্ষী যদি একবার মায়ের মুখের দিকে তাকায়, তাহলেই সব সমস্যা মিটে যায়। মীনাক্ষী কঠিন হয়ে বসে আছে, তবু বিজয়া সেই কাঠিন্য গলাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

তাই বিজয়া এখনো স্বামীর কাছে উদঘাটিত করে বসেন নি তাঁর এই চারখানা দেয়ালের মধ্যে কোন দুরপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

অতএব সরোজাক্ষর এই হঠাৎ কাউকে না বলে কয়ে বেরিয়ে পড়ার মধ্যে বিজয়া ঘটিত কোনো ঘটনা নেই। সরোজাক্ষ এমনিই বেরিয়েছেন। হয়তো 'বাইরের পৃথিবীটাকে ভুলে যাচ্ছি।' ভেবে বিচলিত হয়েছেন।

ডাক্তারের নিষেধ, তবু সরোজাক্ষ একটা ভিড়ের বাসেই উঠে পড়লেন। কিন্তু ভিড়ের ছাড়া হালকা বাস পাচ্ছেন কোথায়? এই ভরা দুপুরেও তো বড় ধরে ঝুলছে লোকে।

আশ্চর্য, কতো লোক পৃথিবীতে। কতো লোক এই শহরটায়।

মাটির নীচেই যে অন্য জল লুকোনো আছে, শুধু খুঁড়ে বার করার ওয়াস্তা; একথা যেন ভুলেই যাচ্ছে মানুষ। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সবাই শুধু লোহা-লককড়ের কাছে ছুটে আসছে। পাথরের প্রাসাদের দরজায়, যেন সব অন্ন শুধু সেখানেই জমা আছে।

অথচ এখনো মাথার উপরের আকাশ ফুরিয়ে যায়নি। ফুরিয়ে যায়নি মাটির রস।

শুধু আমরাই ফুরিয়ে যাচ্ছি।

লোভের তাড়নায় একটা শূন্যতার গহ্বর লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে, হারিয়ে ফেলছি আমাদের সত্তাকে। অতএব লক্ষ্যে পৌঁছবার পরিতৃপ্তি নেই, সাফল্যের আনন্দ নেই, আছে শুধু শেষ অবধি হুমড়ি খেয়ে সেই শূন্যতায় আছড়ে পড়া।

মানুষ যদি সভ্যতার শৃঙ্খলে বাঁধা না পড়তো? মানুষ যদি 'অনেক' না চাইতো? সরোজাক্ষ যেন নিজের প্রশ্নে নিজেই কৌতুক অনুভব করে নিজেকে একটি সরস উত্তর দিলেন।

'তাহলে বাসে এতো ভিড় হতো না।'

'দাদু কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছেন নাকি?'

থমকে তাকালেন সরোজাক্ষ।

কে কাকে বললো কথাটা! এমন খোলা ধারালো গলায়। আমাকেই নয় তো। অবহিত হয়ে তাকালেন ওই প্রশ্নের লক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলেন।

প্রশ্নকর্তাকে দেখতে পেলেন না।

অতএব লক্ষ্যটা সরোজাক্ষ নয়।

সরোজাক্ষ এবার উত্তর শুনতে পেলেন, তাই দেখতে পেলেন লক্ষ্যটিকে। শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ, পরনে অর্ধমলিন ধুতি এবং হাওয়াই শার্ট নয়, পুরনো আমলের একটা জিনের কোট। কোটের উপর আবার গলায় পাক দিয়ে একখানা র‍্যাপার জড়ানো। র‍্যাপার গায়ে দেবার মতো শীত আর অবশিষ্ট নেই, তা ছাড়া দুপুর রোদ। অথচ রোদটা যে প্রখরতা লাভ করেছে সে খেয়াল ভদ্রলোকের নেই তা নয়, দেখা যাচ্ছে রোদের প্রতিষেধক ছাতাটি রয়েছে বগলে।

সরোজাক্ষর মনে হল, এ এবং এদের মত লোকেরা হয়তো এই শহরের বাসিন্দা নয়, হয়তো মাথার উপর যে আকাশ আছে, সেটা এরা সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ আলোকে টের পায়, তবু এই দুপুরের রোদে ঠেলাঠেলি করতে এই শহরে আসে ভিড় বাড়াতে।

আসে, কারণ এরা ভুলে গেছে এদের পিতামহ প্রপিতামহ জানতো মাটির নীচে অন্নজল সঞ্চিত থাকে।

বুড়ো ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, আমায় বলছো?

একটা রোগা সিড়িঙ্গে ছেলে, যে ধরণের চেহারা এবং সাজসজ্জা রকের আড্ডায়, রাস্তায় ইট পেতে ক্রিকেট খেলায়, সর্বজনীন প্রতিমা ভাসানোর নরীতে টুইস্ট নাচে অথবা দুপুর রোদে সিনেমার টিকিট কাটার লাইনে সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় তেমনি ছেলে, মুখে একপোঁচ ব্যঙ্গের
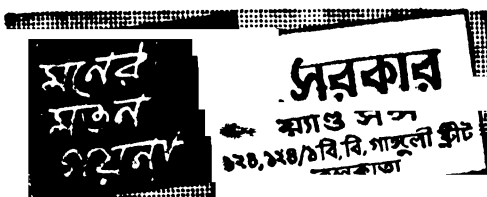
প্রলেপ মেখে উত্তর দেয়, 'আজ্ঞে হ্যাঁ দাদু। অনেকক্ষণ থেকে আপনার ছাতার খোঁচায় হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে কি না।'

হয়তো ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে ওই ভাষাটা চট করে প্রবেশ করল না, তাই তিনি অবাক অবাক গলায় বলেন, 'কি বলছো?'

'দাদু বুঝি কানে একটু কম শোনেন?'

বাসের মধ্যে একটু মৃদু হাসির গুঞ্জন উঠলো। সন্দেহ নেই ছোকরার ওই ব্যঙ্গোক্তি সবাই বেশ উপভোগ করছে।

বেচারী বুড়ো ভদ্রলোকের শীর্ণমুখে একটা দীর্ণ হাসি ফুটে ওঠে, 'আমাদের মতো হতভাগ্যদের কানে কম শোনাই ভাল ভাই।'

'তা অবিশ্যি'---ছোকরা খুক খুক করে হেসে বলে, 'অন্যের পাঁজর বিদীর্ণ করে অকুতোভয়ে এগিয়ে যাবেন, 'সরুন মশাই' বললে শুনতে পাবেন না। তা' ছাতাটা দয়া করে একটু নামান দাদু।'

ভদ্রলোক ছাতাটাকে টেনে হিঁচড়ে একটু নামিয়ে কাতর গলায় বলেন, 'আমাদের মতো শক্তিহীন লোকের আর এই বাসে-ট্রামে চড়া চলে না।'

'আহা আমিও তো তাই বলছি দাদু'---ছোকরা জিভে একটু চুক্‌চুক্ শব্দ করে বলে, 'কেন কষ্ট করে রোদে বেরিয়েছেন? দিব্যি শীতলপাটি বিছিয়ে, ঘরে বসে বেলেরপানা খাবেন, আর তালপাখার হাওয়া খাবেন, তা নয় এই আমাদের পাঁজরে ছাতার খোঁচা দিতে—'

এবার আর মৃদু গুঞ্জন নয়, সারা বাসে একটা স্পষ্ট হাসির ঢেউ খেলে যায়।

স্বাভাবিক।

কৌতুকের কথায় কৌতুক হাসি হাসবে না লোকে?

বিশেষ করে যখন অনেকে একত্রে রয়েছে। অনেক জন যখন একত্র হয়, তখন তো আর তারা 'ব্যক্তি' থাকে না, হয়ে যায় 'জনতা'।

'জনতা' একটা আলাদা জাত। যে জাতের সংক্রামতা প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই।

যে কোনো ব্যাধিই তাকে মুহূর্তে গ্রাস করতে পারে।

যে কোনো ঘটনাই তাকে মুহূর্তে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যে কোনো সবল কণ্ঠই তাকে অনুবর্তী করে ফেলতে পারে।

তাই জনতার মধ্যে একজন যদি হঠাৎ সভ্যতার বেড়া ডিঙোয় সঙ্গে সঙ্গে সবাই অসভ্য হয়ে ওঠে, একজন যদি গালাগালি করে তো, সবাই গালাগালি সুরু করে দেয়, কেন, কাকে, কি জন্যে, সে চিন্তা না করেই।

তা হাসিও একটা সংক্রামক ব্যাধি, যদি সেটা ব্যঙ্গ হাসি হয়। অতএব এ ব্যাধি জনতার মধ্যে সংক্রমিত হতে দেরী হয় না। আর হয় না বলেই, যারা তার পরিকৎ, তারা চেষ্টা করে করে আরো কৌতুক কথার আমদানী করে, যাতে লোকে আরো হাসে।

অনেক লোকেরই এ-প্রবণতা দেখা যায়, লোক হাসানো। এমনিতে হয়তো তারা সুরসিক বলে খ্যাত নয়, কিন্তু দশ বিশজন লোককে একত্রে দেখলেই তাদের রসনা আপনিই সরস হয়ে ওঠে। ট্রামে বাসে রেল-গাড়িতে উঠলেই এরা কথার ফুলঝুরি ঝরাতে আরম্ভ করে, ও দাদা দয়া করে শ্রীচরণটি একটু গোটান। নইলে—এ-অভাগা যে মারা যায়। না-না, মাদুর গোটানো করে গোটাতে বলছি না, জাস্ট একটু মুড়ে বসা।'

'ও দাদু কৃপা করে যদি বিছানাটা একটু তোলেন।---আহা, ইস্ ইস্ দাদুর বুঝি দিবা নিদ্রার অভ্যাস, তাই দিনদুপুরেই বিছানা বিছিয়ে'—

---'মাসিমা বুঝি ট্র্যান্সফার হয়ে অন্য কোথাও সংসার পাতাতে যাচ্ছেন? মাল মোটের বহর দেখছি কি না—'

এক একটি কথার সঙ্গে সঙ্গেই সারা কামরায় হাসির ঢেউ ওঠে, তা সে কথা যতই পচা পুরনো সস্তা সুলভ হোক। অতএব 'রসিক' ব্যক্তিটি উদ্বেলিত হয়ে উঠে নব নব রস পরিবেশন সুরু করে দেন। জুড়োতে দিতে চান না। এঁকে ঠাণ্ডা করতে পারে একমাত্র রাজনীতি। সেটাও—ভয়ঙ্কর রকমের সংক্রামক ব্যাধি তো। আর--সেটা যে-কোনো রসেরই পিছনেই গুড়ি মেরে বসে থাকে। এবং সহসা উঁকি মেরে মুখটি বাড়িয়ে দেয়।

এই জীর্ণ বৃদ্ধকে নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি হতে হতে হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা রাজনীতিতে পৌঁছবে, কিন্তু সরোজাক্ষ তার আগেই নেমে পড়লেন।

সরোজাক্ষ বড় বেশী পীড়াবোধ করলেন, যখন দেখলেন, ওই শীতলপাটি—আর 'বেলের পানা' শব্দ দুটি একখানা শীর্ণ মুখের রেখায় রেখায় যেন অসহায়তার আর অপমানের গভীর বেদনা ফুটিয়ে তুললো আর সারা গাড়িতে তুললো কৌতুকের হাসির ঢেউ।

যখন দেখলেন ওই ঢেউ থেকে নব প্রেরণা লাভ করে নতুন উদ্যমে গলায় রঙিন রুমালবাঁধা ছোকরা আবার বলে উঠলো, 'সত্যি, কেন ঝুটমুট, আসেন দাদু? আমাদের দিদিমা বুঝি মানা করেন না?' এবং জনতার হাসি আরো উদ্দাম হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য, এর মধ্যেকার নির্মমতা কি আরো চোখেই পড়ছে না? সরোজাক্ষ যেন অবাকই হলেন। সরোজাক্ষ চঞ্চল হলেন, সরোজাক্ষ জানলার বাইরে মুখ রাখলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই হাস্যমুখর কামরার মধ্যে বোধ করি সহানুভূতির মুখ দেখতে না পেয়েই ক্ষুব্ধ গলায় বলে উঠলেন, 'এখুনি নেমে যাবো ভাই, বেশীক্ষণ তোমাদের অসুবিধে ঘটাবো না।'

'আহাহা অসুবিধে কি! চুক চুক্' ছোকরা হাঁটুদুটোকে একবার টুইস্ট নাচের ভঙ্গীতে মোড় খাইয়ে বলে ওঠে, 'বরং বলুন উপকার। মাঝে মাঝে খোঁচাটা বিশেষ দরকার দাদু,

হতে--- বেচাল হবার ভয় থাকে না। এই তিন ভুবনে, এতো যে বেচাল দেখছেন, সবই তো ওই যথাসময় আর যথাস্থানে খোঁচাটুকুর অভাবে।'

এবার হাসির বাঁধ ভাঙলো।

সরোজাক্ষ সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেমে পড়লেন বাস থেকে।

আশ্চর্য মানুষ জাতটা কী নির্লজ্জ! কী নির্মম!

অথবা 'মানুষ' জাতটা নয়, ওই 'জনতা' নামক জাতটা।

●

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন সরোজাক্ষ।

কোন দিক লক্ষ্য করে, তা বোঝা গেল না। হয়তো নিজেও তিনি জানেন না সেটা। অথচ মাথার উপর চড়া রোদ। গায়ে সেই আগুনের হল্‌কা লাগছে।

রোদ সুরু হয়ে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেছে ডাবের লীলা। যেখানে সেখানে বসে গেছে ডাবের বেসাতি। গাছতলায়, ফুটপাথে, পানের দোকানে। দোকানী ক্ষিপ্রহাতে ডাবের মুখ কেটে এগিয়ে দিচ্ছে পিপাসার্তের মুখের কাছে।

কেউ এমনিই গলায় ঢালছে, কেউ কায়দা করে কাগজের খড় ডুবিয়ে খাচ্ছে।

সরোজাক্ষ ভাবলেন, সহজ হতে পারার হয়তো আলাদা একটা সুখ আছে। আমি ভাবতেই পারি না রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু খাচ্ছি। অথচ এরা অনায়াসেই---

শুধু ডাব কেন, বহুবিধ বস্তুই। শহরের রাস্তা অজস্র লোভনীয়---খাদ্য পানীয় সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে, পথচারীর 'ইচ্ছের ঘরের' দরজায় টোকা দিচ্ছে, খাবে না তারা? খাবেই তো।

সরোজাক্ষ পারেন না, সেটা সরোজাক্ষর ত্রুটি। সবাই যেটা করছে, সেটা করতে না পারা একটা ত্রুটিই নিশ্চয়। যে ত্রুটিটা অন্যের কোনো অসুবিধে ঘটায় না, অসুবিধে ঘটায় নিজের।

'স্যার, আপনি এ সময় এখানে?'

একটি ছেলে নীচু হয়ে প্রণাম করতে এলো।

'থাক থাক' বলে দু'পা পিছিয়ে সরে এসে তাকালেন সরোজাক্ষ, 'কে?'

'স্যার আমি শিখরেন্দু।' 'আমি শিখরেন্দু' বলেই নিশ্চিন্ত হল ছেলেটা। তার মানে ধরে নিলো, ওইটুকুতেই সব বলা হয়েছে। স্যার নিশ্চয় বুঝে নেবেন, একে পড়িয়েছেন, এবং কবে পড়িয়েছেন।

কথাটা ভেবেই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হলেন সরোজাক্ষ। ভাবলেন, 'কেন নয়? কেনই বা প্রত্যাশা থাকবে না এদের, যাঁর কাছে তিন চার বছর ধরে পড়েছি, তিনি আমার মুখটি দেখে, অথবা নামটি শুনে চিনে ফেলবেন। হয়তো এ আমার খুব প্রিয় ছাত্রই ছিল, হয়তো খুব মেধাবী ছিল, কিন্তু সে সবের কিছু মনে নেই আমার।

সরোজাক্ষ ভাবলেন, কিম্বা এ হয়তো সেদিনের সেই ঘেরাওয়ের দলেই ছিল। এখন দলছাড়া। তাই এখন নিজের ভদ্রসত্তাকে ফিরে পেয়েছে। অথবা হয়তো প্রাক্তন ছাত্র।

সরোজাক্ষ তাই চেনা-অচেনার মাঝামাঝি একটুকরো সৌজন্যের হাসি হেসে বলেন, 'আমিও তোমায় সে প্রশ্ন করতে পারি।'

যখন 'স্যার' বলে পায়ের ধুলো নিতে এসেছে, তখন 'তুমি' বলাই শোভন।

'আমার কথা বলছেন?' ছেলেটা যেন নিজেকে তাচ্ছিল্যের ধুলোয় আছড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'আমাদের কথা বাদ দিন। কাজের ধান্ধায় সময় অসময় বলে কিছু নেই। সেই পঁয়ষট্টি সাল থেকে কী না করছি, কোথায় না ঘুরছি, কাকে না ধরছি, ঠিকমতো একটা কিছুই পাচ্ছি না।'

পঁয়ষট্টি সাল।

তার মানে প্রাক্তন।

তার মানে ঘেরাওদের দলের নয়।

সরোজাক্ষ ঈষৎ নিশ্চিন্ত চিত্তে বলেন, আছো কোথায় এখন?'

'আছি এখানেই। তালতলায় সেই পিসির বাড়িতেই আছি, একটা কিছু জোগাড় করে ফেলতে পারলেই একটু বাসা ভাড়া করে মাকে দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসবো। একা-একা থাকেন---'

নিজেকে তাচ্ছিল্যের ধূলিতে নিক্ষেপ করার ভঙ্গী করলেও, নিজের কথাই সাতকাহন ছেলেটার।

'শেষ বয়সেও যদি মাকে একটু শান্তি দিতে না পারলাম, তবে আর কি হলো। কিন্তু বলবো কি স্যার চাকরীর বাজার যা হয়েছে---'ব্যাকিং' না থাকলে কার সাধ্য---কিছু জোটাতে পারে।'

সরোজাক্ষ এই জোলো জোলো আক্ষেপ আর জোলো জোলো মাতৃভক্তির বুলি শুনে মৃদু হাসলেন। এই ধরণের ছেলে বলেই বোধ হয় গুরু-শিষ্য সম্পর্কটা বজায় রেখেছে মনের মধ্যে। ভাবলেন, 'মাকে শান্তি' দিতে না পারার আক্ষেপের পিছনে আর একটি আক্ষেপও কাজ করছে বৈ কি। মনকে চোখ ঠারা, ভাবো ঘরে চুরি, 'মাকে শান্তি দেওয়া!'

ওই আত্মপ্রতারণার বশে যা হোক একটা চাকরী জুটলেই একটু বাসা ভাড়া করে মাকে দেশ থেকে এনে ফেলে মার সেবিকা এনে হাজির করবে, তারপর আবার কিছুদিন পরেই মাকে শান্তি দিতে ফের দেশের বাড়িতে রেখে আসবে। তখনতের মধ্যে এখন সপ্তাহে সপ্তাহে মাকে দেখতে যাও, তখন সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন শুধু মনি অর্ডারের ফরমে মাতৃসম্বোধনযুক্ত চিঠি।

এদের দিয়েই দেশ ছাওয়া।

সরোজাক্ষ প্রশ্ন করতে হয় তাই করেন। 'তোমার আর ভাই নেই?'

'আছে স্যার। একটি ছোট ভাই আছে, ক্লাশ টেন-এ উঠলো এবার। ভাবছি ওকে আর হায়ার এডুকেশনে দেব না। কোনো টেকনিক্যাল লাইনে---'

সরোজাক্ষর ক্লান্তি আসছিল। সরোজাক্ষর ভয় করছিল—এরপরই হয়তো বয়স্থা আইবুড়ো বোনের কথা তুলবে। এবং বিয়ের বাজার নিয়ে দার্শনিক মন্তব্য করবে।

সরোজাক্ষ তাই বলেন, 'সেটাই ভালো। এখন যাচ্ছিলে কোথায়?'

'এই এখানে একজনের সঙ্গে দেখা করতে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে না কি ওঁর ভাইপোর বিশেষ চেনা-জানা আছে। দেখি যদি বলেকয়ে—দেশের স্কুলে একটা মাস্টারী পেয়েছিলাম, মানে তারাই ধরাধরি করছিল বুঝলেন? মারও খুব ইয়ে ছিল যাতে দেশেই থাকা হয়।---মাইনে-টাইনেও আজকাল আগের মতো পুওর নয়, সবই ঠিক, কিন্তু, কি জানেন স্যার লাইনটা বড় ইয়ে। মানে মানসম্ভ্রম বলে কিছু থাকে না। 'স্কুল মাস্টার' শব্দটাই যেন হতশ্রদ্ধার। নয় কি না বলুন?'

উত্তরের আশায় সরোজাক্ষর মুখের দিকে তাকায় শিখরেন্দু।

কিন্তু কী উত্তর দেবেন সরোজাক্ষ?

'নয়' একথা বলতে পারবেন?

সরোজাক্ষ অতএব বলেন, 'সর্বত্র নয়।'

এবার ছেলেটি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'নয় কি বলছেন স্যার? সর্বত্র। সর্বত্রই এক অবস্থা। এখন আর গুরুমশাই-এর বেতের ভয়ে ছাত্ররা তটস্থ নয়। ছাত্র-মশাইদের বেতের ভয়ে গুরুমশাইরাই আশঙ্কিত। সেই যে ছেলেবেলায় পড়েছিলাম 'সেই দেশেতে বেড়াল পালায় নেংটি ইঁদুর দেখে—' মনে হচ্ছে সেই মজার দেশটাতেই বাস করছি আমরা। নচেৎ আপনার মতো মানুষের'—ছেলেটার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে, 'শুনেছি তো ব্যাপার! কাগজে বেরিয়েছিল। আপনার মতো মানুষকে যে এভাবে—'

সরোজাক্ষ মৃদু দৃঢ় গলায় বলেন, 'থাক ও সব কথা। অনেক পুরনো হয়ে গেছে।'

শিখরেন্দুর কিন্তু—এ ইসারায় চোখ ফোটে না, সে উদ্দীপ্ত গলায় বলে, 'আপনি স্যার মহানুভব মানুষ, অপমান গায়ে মাখেন না, কিন্তু শুনে আমাদের যা মনের অবস্থা হয়েছিল। আর কিছুই নয় স্যার সবই পার্টি পলিটিক্স। ওই স্টুডেন্টদের মধ্যেই যা 'চাঁই' এক একখানি আছে স্যার। বছর বছর ইচ্ছে করে ফেল করে করে কলেজের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে থাকে, আর অন্য সব ছেলেকে বিষাক্ত করে তোলে।'

সরোজাক্ষ মৃদু হেসে বলেন, 'ইচ্ছে করে কেন করে?'

'হাসছেন স্যার? আছেন কোথায় আপনি? যা অবস্থা হয়েছে আজকাল শিক্ষা বিভাগের। রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি। কোথাও বাদ নেই, শুধু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিই নয়, সর্বত্র। আমার এক পিসতুতো দাদা—'

সরোজাক্ষর বুঝতে দেরী হয় না। শিখরেন্দ নামের এই ছেলেটির কোনো কথাটাই নিজস্ব চেতনা থেকে উদ্ভূত নয়, সবই ওই পিসতুতো দাদা আর মাসতুতো 'জামাইবাবুর' ব্যাপার। সব উত্তেজনাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ওর যদি এখনি একটা মনের মতন চাকরী পায়। যে চাকরীর আয় থেকে অন্তত শহরে 'একটি বাসা' করা যায়, এবং একটি বিয়ে করে ফেলে 'সোনার সংসার' রচনা করা যায়।

সময়ে উপার্জন, আর সময়ে বিয়ে, এটাই বোধ করি যুগ-যন্ত্রণার ওষুধ। ওইটার অভাবেই ওরা আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে।

'পিসতুতো দাদার' অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে ইচ্ছে হল না সরোজাক্ষর। বললেন, 'হ্যাঁ চারিদিকেই তো ' ওই পার্টি-পলিটিক্স।'

'সেই কথাই তো বলছি স্যার—' শিখরেন্দু মহোৎসাহে বলে, 'আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তার পিছনেও তাই। নইলে—'

সরোজাক্ষ দৃঢ়স্বরে বলেন, 'না! ওর মধ্যে অন্য কিছু নেই। সম্পূর্ণ আমার নিজের দোষ। আমি ওদের প্রতি সম্মান রেখে ব্যবহার করি নি, ওরা শুধু তার পালটা জবাব দিয়েছে। আমার আরো ভদ্র হওয়া উচিত ছিল, আরো সহিষ্ণু হওয়া উচিত ছিল।'

শিখরেন্দু এবার যেন একটু থতমত খায়।

আস্তে বলে, 'কাগজে কিন্তু—'

'কাগজের কথা বাদ দাও। ওরা সব কিছুতেই রং লাগাতে ভালবাসে। আচ্ছা—'

সরোজাক্ষ বিদায়ের ইঙ্গিত করলেন।

নাছোড়বান্দা ছেলেটা তবু ম্রিয়মাণ গলায় বলে, 'কিন্তু একটা কথা শুনে বড়ই দুঃখ পেলাম স্যার, আপনি কলেজ ছেড়ে দিয়েছেন—'

'কলেজ ছাড়ি নি—' সরোজাক্ষ স্থির গলায় বলেন, 'ওই কলেজটা ছেড়েছি।'

'সেই তো, সেই কথাই তো বলছি—ওখানে আপনি নেই ভাবতেই পারা যায় না—'

সরোজাক্ষ এবার হাসেন, 'তাতে তোমার আর আক্ষেপ কিসের? তুমি তো আর আবার ওখানে ভর্তি হতে আসছো না?'

শিখরেন্দুও এবার হাসে।

'তা না হোক। তবু---মানে এখনকার স্টুডেন্টদের জন্যেই---'

'ওখানে ছাড়াও তো স্টুডেন্ট আছে। তাদের নিয়েই কাজ করা যাবে। কাজ করারই চেষ্টা করবো এবার। এতোদিনের ফাঁকির প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করবো।'

'ফাঁকি। আপনি।'

শিখরেন্দু প্রায় জিভটা বার করে জিভ কাটে।

'আপনি দিয়েছেন ফাঁকি! সেই কথা বিশ্বাস করবো? লোকে বুঝি এই কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে? ছি। ছি। যুগে যুগে এই হয় স্যার। মহতের পিছনেই ষড়যন্ত্র চলে।'

দুঃখে ভেঙে পড়ে শিখরেন্দু।

সরোজাক্ষ সেদিকে তাকিয়ে দেখেন না। বলেন, 'আচ্ছা, আশা করছি শীগগিরই কাজ পেয়ে যাবে।'

চলে যান আর না তাকিয়ে।

ভাবেন, ফাঁকি দিইনি তো কি।
তুমিও তো আমার হাত দিয়েই পার হয়েছো।

তোমরা কেউ ভাবশূন্য, কেউ ভাবের ফানুস।

●

যে খবর সযত্নে গোপন করেছিলেন বিজয়া, সেই খবর নিয়েই এসে ফেটে পড়লেন যখন শুনলেন সরোজাক্ষ সত্যিই চলে যাচ্ছেন এবং একেবারে একাই যাচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত আশা ছিল তাঁর সরোজাক্ষর দ্বারা অতোখানি হয়ে উঠবে না। একা বাক্স-বিছানা নিয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন জীবিকার সন্ধানে, এ অসম্ভব। কিন্তু বিজয়ার আশা ভঙ্গ হল, সরোজাক্ষ ঘোষণা করেছেন 'কাল নটার গাড়িতে বেরোতে হবে আমায়।'

বিজয়া শুনলেন, বামুন ঠাকুরের মুখে।

তাকেই জানিয়েছেন সরোজাক্ষ, সকাল করে ভাত দেবার জন্য।

বিজয়া এসে ঘরে ঢুকলেন।

•

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন।

বিজয়ার চোখে আগুনের ঝলক।

বিজয়ার মুখে পাথরের কাঠিন্য।

সরোজাক্ষ তবুও হয়তো কিছুই বলতেন না যদি না বিজয়া অমন করে দরজা বন্ধ করে আটকে দাঁড়াতেন।

সরোজাক্ষর হঠাৎ মনে হলো যেন অনেক অনেকগুলো দিন আগের বিজয়াকে দেখছেন। সরোজাক্ষ প্রায় প্রায় তাঁর পড়ার ঘরেই রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত কাটিয়ে ফেলতেন, পড়াশোনা করতে করতে এবং একান্তভাবে প্রার্থনা করতেন বিজয়া ঘুমিয়ে পড়ে, তিনি বাকি রাতটুকু এই সোফাটাতেই কাটিয়ে দিয়ে বাঁচেন।

কিন্তু প্রার্থনা পূর্ণ হতো না।

একঘুম থেকে উঠে নীচেরতলায় পড়ার ঘরে নেমে আসতো বিজয়া, আর এইভাবে দরজাটা বন্ধ করে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতো। বিজয়ার চোখে আগুন জ্বলতো, বিজয়ার নিঃশ্বাসে আগুন ঝরতো। বিজয়াকে যেন একখানি সুন্দরী পিশাচীর মত দেখতে লাগতো।

বিজয়া দাঁতে দাঁত চেপে চাপা রূঢ় গলায় বলতো, 'তুমি ভেবেছো কি?'

সরোজাক্ষ এই মূর্তিকে ভয় করতেন। কারণ সরোজাক্ষ জানতেন ওর ওপর কথা বলতে গেলে কেলেঙ্কারী করতে পিছপা হবে না ও।

তাই সরোজাক্ষ ফিকে গলায় বলতেন, 'তুমি ঘুমোও নি এখনো?'

'ঘুম!' বিজয়া কটু গলায় বলতেন, 'ঘুমবো, একেবারে জন্মের শোধ ঘুমবো, তোমাকে চিরশান্তি দিয়ে যাবো। সেই ঘুমের ওষুধটা এনে দিও আমায়। কিন্তু যতক্ষণ না দিচ্ছো---'

সরোজাক্ষ খাতাপত্র গুছিয়ে তুলতে তুলতে তাড়াতাড়ি বলতেন, 'কি যে যা-তা বল। এই পড়তে পড়তে কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে---'

'থাক থাক রোজ রোজ আর এক কৈফিয়ৎ দিতে এসো না। তোমার বলতে ঘেন্না করে না, আমার শুনতে ঘেন্না করে। আর কত চুনকালি দেবে আমার গালে। বাড়ির ঝি-চাকরটা পর্যন্ত বুঝে ফেলেছে আমার দাম কি।'

নিশ্বাসের তালে তালে বুকটা এমন ওঠা-পড়া করতো যে মনে হতো ফেটে পড়বে।

বিজয়ার আজকের এই চেহারায় সেই অতীতের ছবি দেখতে পেলেন সরোজাক্ষ।

শুনতে পেলেন সেই কণ্ঠস্বর।

'সংসারের সব দায় আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে চাও, কেমন?'

সরোজাক্ষ শান্ত গলায় বলেন, 'সংসারের দায় তো কোনোদিনই আমি বহন করি নি।'

'তা' জানি। চিরটাদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছো। কিন্তু চিরদিন চলেছে বলেই যে চিরকাল চলবে, তার মানে নেই। ভেবেছিলাম বলবো না, ভেবেছিলাম এতো বড় সর্বনেশে কথাটা বলে হার্টের অসুখের রুগীর হার্টটা ফেল করিয়ে বসবো? কিন্তু তুমি যখন নিশ্চিন্তি হয়ে চলে যাচ্ছো, তখন তো আর না বলে পারছি না। আমি একলা মেয়েমানুষ কি আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে নার্সিং হোমে ছুটবো?'

বিজয়ার বুকটা ওঠাপড়া করতে থাকে।

বিজয়ার কণ্ঠে আগুন ঝরে।

সরোজাক্ষ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

বিজয়া যে চাপা তীব্র গলায় আরো কতো কথা কয়ে যাচ্ছেন তা' শুনতে পান না। সরোজাক্ষ যেন হঠাৎ একটা বিরাট গহ্বর দেখতে পেয়েছেন, যে গহ্বরটা তাঁর নিজের ত্রুটির, নিজের অক্ষমতার।

বিজয়া বলে চলেছেন, 'আমি পারি না, আমার দ্বারা হয় না বলে তোমরা দিব্যি গা বাঁচিয়ে চলতে পারো, যতো দায় এই মেয়েমানুষের। কিন্তু কেন? বলতে পারো কেন? মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আসা ছেলে-বৌয়ের সঙ্গে ডেকে কথা বলতে হবে আমাকেই, আইবুড়ো মেয়ে কেলেঙ্কা---'

সরোজাক্ষ হঠাৎ কঠিনস্বরে বললেন, 'চুপ করো।'

'চুপ করবো।'

'হ্যাঁ। চুপ করবে। আর একটি কথা উচ্চারণ করবে না।'

বিজয়া অনেক রকম কথা ভেবে এসেছিলেন, অনেক যুক্তিতর্কের ভাষা মনে মনে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু এ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বিজয়া হঠাৎ সমস্ত আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কেঁদে ফেলেন।

অপমানের কান্না, দুঃখের কান্না, অসহায়তার কান্না।

সেই উচ্ছ্বসিত কান্নার গলায় বলেন, 'বেশ চুপ করছি। চিরকালের জন্যেই চুপ করবো। শুধু বলে যাও, ওই মেয়েকে নিয়ে আমি কী করবো।'

আগুনের জায়গায় জল।

সরোজাক্ষ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করলেন, 'ওকে আমি নিয়ে যাবো।'

ওকে আমি নিয়ে যাবো।

ওকে আমি নিয়ে যাবো।

এ কী অদ্ভুত ভাষা।

সরোজাক্ষ কী বিজয়ার সঙ্গে ব্যঙ্গের খেলায় নামলেন?

নাকি না বুঝে সুঝে কি একটা বলে বসলেন।

অগাধ বিস্ময়ে বিজয়ার চোখের জল মুহূর্তে শুকিয়ে গেল।

বিজয়া যেন যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেন, 'ওকে তুমি নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ। ওকে প্রস্তুত করে রেখো।'

সরোজাক্ষ তাঁর রায় উচ্চারণ করে থেমে গেলেন। বিজয়া জানেন আর একটি কথাও বলবেন না উনি।

কিন্তু এ কী ঘোষণা?

এ কী বিজয়াকে শাস্তি দেওয়া?

বিজয়ার আবার কান্না উথলে ওঠে, কষ্টে কান্না থামিয়ে বলেন, 'তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে করবে কি? রাখবে কোথায়? আমায় শাস্তি দেবার জন্যে—'

বহুদিন পরে বিজয়ার নাম ধরে ডাকলেন সরোজাক্ষ।

বললেন, 'তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে নয় বিজয়া, শাস্তিই যদি বল, তো বোধহয় নিজেকেই দেবার জন্যে।'

বিজয়া কি ওই সম্বোধনে সম্মোহিত হলেন? তাই বিজয়া স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

বিজয়া আস্তে দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ নম্রকুদ্ধ গলায় বললেন, 'কিন্তু ওকে আমি একথা বলবো কি করে? ও ভাববে বুঝি ওর প্রতি ঘেন্নায় রাগে তুমি নিজের ওপর শোধ নিচ্ছো।'

সরোজাক্ষ বলেন, 'ঠিক আছে, তোমায় বলতে হবে না, আমিই বলবো।'

হ্যাঁ সরোজাক্ষই বললেন।

কতোকাল পরে মনে হলো যেন কতো যুগ পরে মেয়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন সরোজাক্ষ।

কোনো ভূমিকা করলেন না, শান্ত-ভাবে বললেন, 'মীনা, তুই তোর জামা-কাপড় গুছিয়ে ঠিক করে রাখ আমার সঙ্গে যাবি।'

মীনাক্ষী জানতো বাবা চলে যাচ্ছেন, তবু মীনাক্ষী দম আটকানো বুকে নিজের ঘরে চুপ করে বসেছিল। মীনাক্ষীর নিশ্চিত ধারণা ছিল, বাবা সব জানেন, তাই বাবা ঘৃণায় চলে যাচ্ছেন। ধারণা ছিল বাবা তাকে একটি কথাও বলে যাবেন না।

যখন দেখলো দরজায় বাবা, তখন ভাবলো বাবা যে ঘৃণায় ধিক্কারে চলে যাচ্ছেন, সেই কথাটাই জানিয়ে যাবেন বলে এসে দাঁড়িয়েছেন। ত্রস্তে উঠে পড়ে মনকে শক্ত করে বসে রইল। না কিছুতেই ভেঙে পড়বে না সে। কিছুতেই কেঁদে ফেলবে না।

কিন্তু অচিন্তিত একটা কথা বললেন বাবা।

সহজ সাধারণ গলায়।

যেন মীনাক্ষী নামের সেই অনেক-দিন আগের মেয়েটাই বেঁচে আছে। যেন অনেকদিন আগের সেই সরোজাক্ষ স্নেহগম্ভীর গলায় বলছেন, 'কাল এই পড়াটা তৈরি করে রেখো, আমি দেখবো!'

তবে কি বাবা জানেন না?

কিন্তু তা'হলে বাবা হঠাৎ মীনাক্ষীকে নিয়ে যেতে চাইবেন কেন? মীনাক্ষী যে আর কলেজে যায় না, সে কথা কি জানেন সরোজাক্ষ?

তা নয়।

এ হচ্ছে মীনাক্ষীর প্রতি দণ্ডাদেশ।

'বাবা।'

সরোজাক্ষ চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিছু বলবি?'

'বাবা আমায় নিজের মতো করে মরতে দিন।'

হ্যাঁ এই মুহূর্তে ওই মরার কথাটাই মনে এলো মীনাক্ষীর। এতোদিন এতো রকমের মধ্যেও যে কথাটা কোনোদিন মনে আনে নি মুখে আসে নি।

আজ সরোজাক্ষর ওই স্বাভাবিক গলার ওই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত একটা নির্দেশে, যা মৃত্যু-দণ্ডাদেশের মতোই লাগলো মীনাক্ষীর, মীনাক্ষী মৃত্যুচিন্তা করলো। মীনাক্ষী ভাবল, 'মরাই উচিত ছিল আমার। এখনো ফুরোয় নি সে সময়।'

তাই মীনাক্ষী তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বলে উঠলো, 'বাবা! আমায় নিজের মতো করে মরতে দিন।'

সরোজাক্ষ চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন। ঘরে এসে সামান্য হেসে বললেন, 'নিজের মতো করে কোনো কিছু করার অধিকার কারো নেই মীনা, বাঁচবারও না মরবারও না।

মীনা তবু মাথা হেঁট করে কাতর গলায় বলে, 'আমায় যেতে আদেশ করবেন না বাবা—'

সরোজাক্ষ ওর ওই বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। তারপর প্রায় অভ্যাস ছাড়া অন্তরঙ্গ গলায় বলেন, 'আদেশ বলছো কেন? কী মুস্কিল! অনুরোধ করছি। আমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাচ্ছি, আমায় কে দেখাশোনা করবে? একজনের তো গেলে ভালো হয়?'

সরোজাক্ষ বলছেন 'আমায় কে দেখাশোনা করবে?' সরোজাক্ষ বলছেন তাঁর জন্যে একজনের গেলে ভালো হয়। সরোজাক্ষকে কি তবে কেউ অন্য ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে?

মীনাক্ষী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বাবার চলে যাওয়ার পথের দিকে।

●

ভেবেছিলেন কোথাও কোনো বন্ধন নেই, দেখছেন সহস্র বন্ধন। সব-চেয়ে বড় বন্ধন বুঝি এই বইয়ের পাহাড়।

এই পাহাড় নিয়ে যাবার কথাও ভাবা যায় না, রেখে যাবার কথাও ভাবা যায় না। সরোজাক্ষ তবু 'বিশেষ দরকারি' কয়েকটি বেছে আলাদা করছিলেন, খানিকক্ষণ বাছতে বাছতে সহসা চোখে পড়লো ওই বিশেষ দর-কারিতেই ছোটখাটো একটি পাহাড় হয়ে গেছে। এদের গুছিয়ে তুলে

সুটকেসে ভরতে হবে ভেবে ভারী একটা ক্লান্তি বোধ হলো, সব সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কতো রাত এখন ?

দুটো ? আড়াইটে ? তিনটে ?

কলকাতার রাস্তায় রাত বোঝা শক্ত তবু গভীরত্বটা বোঝা যাচ্ছে। রাত্রি শেষের আভাসবাহী একটা হিম হিম হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে।

সরোজাক্ষর মুখে-চোখে এসে লাগছিল সেই হাওয়া।

সরোজাক্ষ ভাবছিলেন, নিয়তি বলে সত্যিই কেউ আছে কোথাও ?

আজ সকালেও কি আমি ভেবেছিলাম—

পিছনে কিসের একটা শব্দ হলো।

ফিরে তাকালেন।

বিজয়া এসে ঘরে ঢুকেছেন।

সরোজাক্ষ শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালেন, আবার কি।

কিন্তু বিজয়া কি বলে তাঁর শুচিতার গৌরব ভুলে বিছানার উপর এসে বসলেন ?

নিজের বিশুদ্ধ শয্যা ছাড়া অন্য কারুর বিছানা তো স্পর্শও করেন না বিজয়া। এতো রাতে আবার কোন দরকারে ? আরও কী সাংঘাতিক গোপন তথ্য আছে বিজয়ার ভাঁড়ারে ? যার জন্যে বিজয়া এতোখানি উল্টো-পাল্টা কাজ করে বসতে পারেন।

সরোজাক্ষ তাকিয়ে দেখেন।

কিন্তু এ কী গোপন তথ্য ভাঁড়ার থেকে বার করলেন বিজয়া ?

অবচেতনের কোন্ অতলে তলিয়ে ছিল এই তথ্য ? বিজয়া নিজেই কি জানতেন ?

জানতেন কি এমন করে অভিসারিকার মতো গভীর রাত্রির মৌন মহিমা বিদীর্ণ করে 'সরোজাক্ষ' নামের ওই পাষাণমূর্তিটার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বলতে আসতে হবে তাঁকে, 'আমায় ফেলে রেখে যেও না তুমি, আমায় নিয়ে চল।' [ক্রমশ।
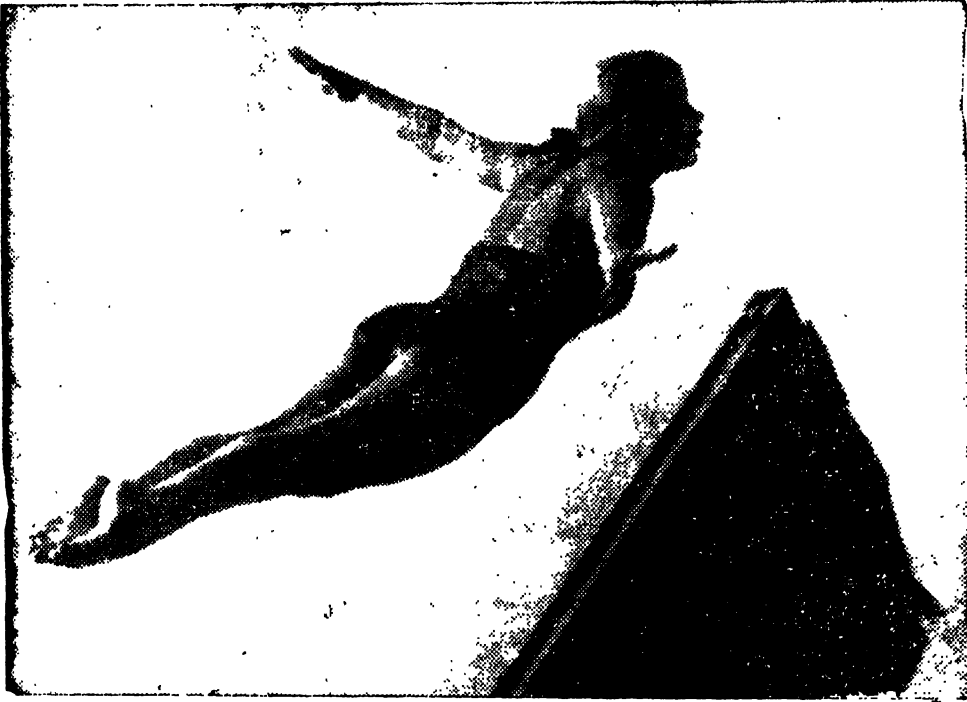
জলকেলি

জার্মানীর হ্যানোভার শহরবাসিনী এন্জেলিকা হিলবার্ট জলকেলিতে পারদর্শিনী বটে—উপরের ছবি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জন্ম ১৯৪২ সাল, উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং ওজন ১১০ পাউণ্ড। পাঁচবার ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, হল্যাণ্ড এবং সুইডেন হতে আগত কৌশলীদের কাছ থেকে জয়মাল্য ছিনিয়ে নেবার গৌরবের অধিকারিণী এন্জেলিকা তিন বছরের একটি সন্তানের জননী—স্বামী হার্টউইস্ 'ভোক্স্ওয়াগেন' মোটর গাড়ীর কারখানার ইঞ্জিনীয়ার নিজেও সুদক্ষ সাঁতারু এবং ধর্মপত্নীকে নিজেই শিক্ষাদান করে থাকেন।

মাসের পর মাস অক্লান্তভাবে দিনে অন্তত পঞ্চাশ থেকে আশীবার ডাইভ্ অভ্যাস করেন এন্জেলিকা। ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন, পাছে দম কমে যায় বলে। উপরোক্ত বিজয়-মালিকার তারিখ: ১৯৬১ সালে মালমোতে, ১৯৬২সালে আমস্টারডাম শহরে, ১৯৬৩ সালে বুদাপেস্ট শহরে, ১৯৬৭ সালে ডর্টমুণ্ড শহরে এবং স্টকহোম্ শহরে।

আরোগ্য বিভাগ

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

● শ্রী ... পাল, শ্রীরামপুর, হুগলী—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীমলয় সান্যাল, দুমকা—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীরতনচন্দ্র ঘোষ, আঁকুনি, হুগলী—

প্রশ্ন: Chronic amebiasis কি একেবারে ভাল হয় না?

উত্তর: ভাল হয়; কিন্তু আবার হয়ে যায়। তবে সারতে খুব দেরি হয়।

● শ্রীবনোয়ারীলাল চক্রবর্তী, আগরতলা, ত্রিপুরা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আবিষ্কার হয় নি, একথা বলব না, আপনার চিকিৎসা যথাযথ হয় নি। আপনি ঠিকমত চিকিৎসা করলে নিশ্চিতভাবে সেরে যাবেন।

● শ্রীসুবীরকুমার মণ্ডল, কলিকাতা।

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। ও বিষয়ে চিন্তা না করে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করবেন। একটা কথা মনে রাখবেন, মানুষের জীবনে আগে বিদ্যা, তারপরে সেক্স।

● এনাবি (সাংকেতিক নাম), ঘোলা রোড, আগড়পাড়া, ২৪-পরগণা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়ে আপনার জটিল রোগের বিষয় অবগত হলাম। এ-রোগের চিকিৎসার কথা চিঠিতে জানানো সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলা যায়, প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়াও ওষুধে অনেক সময়ে ফল দেয়।

● সমর বসাক (ছদ্মনাম) কলি-৫

প্রশ্নটি বসুমতীতে দয়া করে ছাপবেন না, কেবল উত্তর দেবেন—

উত্তর: আপনার মাথা ঝিমঝিম অতিরিক্ত তামাকের নেশার জন্য করছে। অতিরিক্ত পরিমাণে নিকোটিন দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে মাথা ঝিমঝিম করে আবার ছেড়ে দিলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। নেশা ছাড়ুন। প্রথম কিছুদিন কষ্ট হবে, তারপর দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

● শ্রীপ্রদীপ কুমার, গৌহাটি—

আপনার দিদির জন্য দশটি Liver Extract 1 ml Im একদিন অন্তর ইন্‌জেকশন দিয়ে কমেছে কি না জানাবেন, আপনি দু-বেলা দাঁত মাজবেন। ব্রাশ দিয়ে নয়, আঙুল দিয়ে।

● শ্রীশিবনারায়ণ মণ্ডল, ফোর্ট-গ্লসটার, হাওড়া—

আপনার পুত্রের পায়ের ক্ষতটি আর একবার চিকিৎসককে দিয়ে কাটিয়ে ফেলুন। ও' বস্তু দু-তিনবার হয়। কোন ভয় নেই।

● শ্রীমতী মণিকা ব্যানার্জি, ন'পাড়া কলোনী, বারাসাত।

কুপন কোথায় ছাপা হবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবেচনা করবেন সম্পাদক মশায়, অতএব ও ব্যাপারে সম্পাদককে লিখবেন। আমি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলছি—

প্রশ্ন ১: মাসিক প্রতি মাসেই হয়, কিন্তু পরিষ্কার হয় না। রংও লাল হয় না। হওয়ার আগের দিন থেকে দু দিন অবধি পেটে খুব ব্যথা হয়—।

উত্তর: কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। রোজ সকাল সন্ধ্যে পনেরো মিনিট করে স্কিপিং করবেন। এছাড়া দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Hematrine Liquid (Sandoz) খাবেন তিন মাস ধরে। তিন মাস পরে জানাবেন কমেছে কি না।

প্রশ্ন ২: আমার গলার স্বর ভীষণ ভেঙে যায়, দু দিন অন্তর।

উত্তর: আপনি Macalvit Im স্থানীয় চিকিৎসককে দিয়ে ইনজেকশন নিলে গলার স্বর অনেক ভাল হবে। তাছাড়া ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' খাবেন।

● শ্রীপ্রবীরকুমার দাস, ফোর্ট-গ্লসটার, হাওড়া—

প্রশ্ন ১: মরা আমাশয়, অজীর্ণ, অম্বল, পেট ফাঁপা ও পাতলা পায়খানা।

উত্তর: (১) সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি এমিকুিন বড়ি অথবা ডেভোকুইন বড়ি দশ দিন খাবেন, (২) একই সঙ্গে দুবেলা খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে কাবমোজাইম ওষুধ খাবেন এক মাস।

দু নম্বর প্রশ্নের জন্য ভাববেন না। আপনা থেকেই সেরে যাবে।

● শ্রীমতী রেবা চক্রবর্তী, মালাড়, বোম্বে—

আপনি চিকিৎসককে দেখান। আমার মনে হয়, আপনার মাসিক বন্ধ হয়ে আসছে এবং তারই প্রভাবে উপসর্গগুলি দেখা দিচ্ছে।

আপনার ছেলেকে দু-বেলা খাবার আধঘণ্টা আগে চা-চামচের এক চামচ করে এনিকসির নিয়োগাডাইন খেতে দেবেন, এক মাস ধরে।

● জনৈকা প্রশ্নকর্ত্রী (নাম গোপন করতে চান) বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ—

প্রশ্ন ১: মাসিক ১০।১২ দিন পর্যন্ত থাকে, প্রথম থেকে (চার বৎসরেরও বেশি) আজ পর্যন্ত কোনদিন তিন দিনে সেরে যায় নি। কি করলে সারবে যদি জানান—

উত্তর: যেদিন মাসিক আরম্ভ হবে, সেদিন ছেড়ে পরদিন থেকে সকালে ১টি, দুপুরে ১টি রাতে ১টি

করে Primolut N 5mg বড়ি খাবেন যে কদিন রক্তস্রাব হয়, যেদিন বন্ধ হবে, সেদিন থেকে দশ দিন সকালে ১টি, রাতে ১টি করে খাবেন, তারপর দশ দিন দিনে ১টি করে খাবেন। মাসিক হলে প্রথম দিন ছেড়ে আবার একই নিয়মে খাবেন। এইভাবে তিন মাস খাবেন।

একই সঙ্গে দুবেলা খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে ফেরাডল্ অথবা সারকোফেরল খাবেন তিন মাস।

তিন মাস পরে জানাবেন কেমন থাকেন। দ্বিতীয় প্রশ্নে যা বলেছেন, তা তিন মাসের মধ্যে অনেক কমে যাবে আশা করি। না কমলে তখন জানাবো কি করতে হবে।

● শ্রীমতী মানসী মুখোপাধ্যায়, পুলের হাট, ২৪ পরগণা—

যেদিন মাসিক বন্ধ হয়, তারপর একদিন রতিসঙ্গম করলে সন্তান হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এ ছাড়া যে কোনদিনে গর্ভসঞ্চার ঘটতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, অপারেশন ছাড়া ও রোগের নিরাময় হওয়া মুস্কিল।

● জেমস, লেক রোড, কলি-২৯—

হরমোন চিকিৎসা এ ভাবে চিঠিতে সম্ভব নয়, আপনি কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করুন।

● শ্রীস্বপনকুমার রায় (দেবু), ধুবড়ী, আসাম—

আপনি দু-বেলা খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে B. G. Phos অথবা ওয়াটার বেরিজ কম্পাউণ্ড উইথ ভিটামিনস্ খাবেন দু মাস ধরে।

● শ্রীমতী রীণা দত্ত (ছদ্মনাম), যাদবপুর, কলি-৩২—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। যে ছেলেটি আপনাকে প্রতারিত করেছে, তার কথা ভেবে লাভ কি? এতে নিজের ক্ষতি হয়। আমার একটা কথা মনে রাখবেন, দেখবেন তাতে জীবনে অনেক লাভ হবে। আপাতদৃষ্টিতে যা ক্ষতি বলে মনে হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে তাই পরম লাভে গিয়ে দাঁড়ায়। ছেলেটির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নিজের পড়াশুনা করুন, দেখবেন ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া রোজ খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে এ্যাসিনোজাইম খাবেন, এক মাস।

● বাহারুদ্দিন মোমিন, মাঙ্গুড়িয়া, পুরুলিয়া—

আপনি দু-বেলা খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে ডায়াপেপসিন (ইউনিয়ন ড্রাগ) খাবেন, এক মাস।

● শ্রীঅমল সাহা, নৈহাটি—

প্রশ্ন ১: বেশী উত্তেজক ছবি বা বই পড়লে, কিংবা চিন্তা করলে বীর্যপাত ঘটছে—।

উত্তর: ঘটবে। এর চিকিৎসা ওষুধে হয় না। নিজের মনকে শক্ত করতে হয়। আমরা মানুষ। অন্য জন্তুর চেয়ে আমরা পৃথক এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্য পশুদের ক্ষেত্রে যৌনচিন্তা মুখ্য হতে পারে, কিন্তু মানুষের বেলায় যৌনচিন্তা কখনই প্রধান নয়। যৌনতা জীবনে থাকবে, কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় তা কখনই প্রাধান্য লাভ করবে না। মানুষের চিন্তা, মানুষের স্বপ্ন, মানুষের কাজকে প্রাধান্য দিলে যৌনচিন্তা আপনা থেকেই গৌণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যা বলেছেন, তা ক্ষতিকারক নয়।

● শ্রীসমর গুহ, কৃষ্ণনগর, নেদের-পাড়া, নদীয়া—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি দু বেলা খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে ডিজিপেপ্স এক মাস খাবেন।

● শ্রীমতী মধুমতী রায়, কলি-৯—

প্রশ্ন ১: তিন বছর হল ক্রমাগত চুল উঠে যাচ্ছে। আর মাথায় খুব খুসকি হয়েছে।

উত্তর: আপনি রোজ স্নানের পর প্রাক্সমাটার মলম মাথায় ঘসবেন। সমস্ত চুলে লাগাবেন না, জট পাকিয়ে যাবে, কেবল চুলের গোড়ায় ঘসবেন। সপ্তাহে দুদিন শ্যাম্পু করবেন। নারকোল তেল মাখবেন আর দুবেলা খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে সায়োমেথিয়োনিন্ ফোর্ট খাবেন, দু মাস।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যা বলেছেন, একই চিকিৎসায় কমবে।

● কুমারী রত্না চক্রবর্তী, পূর্ব-রামাপুর, জব্বলপুর—

আপনি দুবেলা খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে হ্যালিবোরেঞ্জ খাবেন তিন মাস।

● শ্রীমতী এস রায়, বাজে-প্রতাপপুর, বর্ধমান—

প্রশ্ন: বয়স ১৮ বৎসর। দু বৎসর আগে লাইগেশন অপারেশন হয়েছে। মাসিকের পর পেটে অসম্ভব ব্যথা। সাদা স্রাব হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য আছে।

উত্তর: কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবার জন্য নিয়মিত শাক খান। এছাড়া দু বেলা খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে সরবেটোন খান। নিয়মিতভাবে। মাসিকের সাতদিন আগে থেকে সকালে সন্ধ্যায় বড় কোন টবে অথবা চৌবাচ্চায় গরম জল দিয়ে, কোমর অবধি ডুবিয়ে বসে থাকবেন প্রত্যহ পনেরো মিনিট করে। খুব বেশি গরম জল নয়। ঈষদুষ্ণ গরম জলে ডুবোবেন। মাসিকের সময় করবেন না। মাস তিন-চার করলেই উপসর্গগুলি কমে যাবে।

● শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনাতোড়পাড়া, সিউড়ী—

প্রশ্ন: আমার মা, বয়স ৫০, গত প্রায় ১৪ বৎসর হইল উন্মাদগ্রস্তা। কোথায় দেখাইলে ভাল হইবে?

উত্তর: কলকাতার লুম্বিনী পার্ক হাসপাতাল, বেদিয়াডাঙ্গা অথবা ভবানীপুর রোডস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানসিক রোগ বিভাগে দেখালে উন্নতি হতে পারে।

● শ্রীভুবনেশ্বর মল্লিক, দুরমশেগড়, হুগলী—

প্রশ্ন ১: আমার নাকের নীচে

একটি কালো দাগ হইয়াছে। ঐ দাগ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে আর কালো দাগের উপর মাঝে মাঝে সাদা পর্দা পড়িতেছে।

উত্তর : আপনি দেরি না করে কোন বিচক্ষণ চিকিৎসককে দেখিয়ে নিন।

প্রশ্ন ২ : মাথার চুলের অগ্রভাগ লাল হইয়া যাইতেছে ও উঠিয়া যাইতেছে—

উত্তর : এ বিষয়েও চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করুন।

● শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন সাতগ্রাম কলিয়ারী, রাণীগঞ্জ—

আপনি আগে দাঁতের চিকিৎসা করিয়ে দাঁত ভাল করুন।

● শ্রীমতী ঝর্ণা সমাজদার, মহাজাতি নগর, বিরাটি, কলি-৫১—

প্রশ্ন ১ : আমার মাথার ওপর ছোট ছোট দুই-তিনটে টাক পড়েছে। মাথায় খুশকি আছে। প্রতিকার কি?

উত্তর : খুশকির বিষয়ে এই সংখ্যাতেই আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২ : দাঁতে কোন আঘাত না লাগলেও দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে থুথুর সঙ্গে বেশীর ভাগই রক্ত পড়ে।

উত্তর : আপনার মাড়ির দুর্বলতার জন্য রক্ত পড়ছে। যে মাজনের নাম লিখেছেন তাই দিয়েই মাজুন, তবে ব্রাশ ব্যবহার কিছুদিন বন্ধ রাখুন। বেশ টিপে টিপে আঙুল দিয়ে মাজুন। এ ছাড়া Amosan বা Hygina Granules দিয়ে মুখ ধোবেন। দু-বেলা। ভিটামিন সি ৫০০ এম, জি বড়ি সকালে ১টি, রাতে ১টি করে খাবেন।

● দিলীপকুমার রায়চৌধুরী, নেতাজী কলোনী, কলি-৫০।

আপনার চিঠি পড়লাম। আপনি দেখবেন, আপনার বয়স যখন কুড়ি হবে, আপনা থেকেই সেরে যাবে।

● ডি বিশ্বাস, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন : স্বামীর যদি সন্দেহ হয় পত্নীর গর্ভে যে সন্তান আছে, সে সন্তান তাহার ঔরসজাত নয়, বিজ্ঞান-সম্মত কি পরীক্ষার আশ্রয় নিলে তাহার মীমাংসা হইবে?

উত্তর : বিজ্ঞানসম্মত কোন উপায় আছে বলে আমার জানা নেই। স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কই পরম বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আছে, তার বেশি কিছু নয়।

● শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি, কামার-হাটি, কলি-৫৮—

প্রশ্ন ১ : আমার বোনঝির (বয়স ১৭) স্বাস্থ্য মন্দ নয়। কিন্তু তার মাথায় পাকা চুল হচ্ছে। কলেজে পড়ে, বিবাহ হয় নি।

উত্তর : স্থানীয় ডাক্তারকে দিয়ে লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেকশন প্রেসক্রিপশন করিয়ে ব্যবহার করতে বলুন। কিছুদিন পরে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খেতে দেবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার ভাইপোর (বয়স ৬) খিদে হয় না। সাদা পায়খানা করে।

উত্তর : ওকে আমাশয়ের চিকিৎসা করাবেন পায়খানা পরীক্ষা করিয়ে আর Liv 52 drops দুবেলা খাবার পর দশ ফোঁটা করে খেতে দেবেন। ঝাল, মশলা, তেল, ঘী, চর্বি, দুধ খেতে দেবেন না। ছানা বেশি করে খেতে দেবেন।

● শ্রীশিবরঞ্জন মুখার্জি, চক্রধরপুর, সিংভূম, বিহার—

প্রশ্ন ১ : যা খাই তাই অম্বল হয়ে যায়। রোজ পেটে ভীষণ গ্যাস হয়, প্রত্যহ পায়খানা পরিষ্কার হয় না।

উত্তর : আপনি আমাশয়ের জন্য এমিকুিন বড়ি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি এবং রাতে ১টি করে দশ দিন খাবেন। এছাড়া দুবেলা খাবার আগে চা-চামচের দু চামচ করে টাকাডায়াস্টেজ অথবা ডিজিপ্লেক্স ওষুধ খাবেন, দু মাস ধরে।

প্রশ্ন ২ : নস্য নেওয়া বা সরণা দিয়ে নাকের চুল আস্তে আস্তে টানা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর?

উত্তর : ক্ষতিকর।

● শ্রীঅশোক বিশ্বাস, গঙ্গারাম পাল রোড, নৈহাটি, ২৪ পরগণা—

আপনি ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ করতে পারেন। অন্য বিষয়ে যা

বলেছেন, তা স্বাস্থ্য ভাল হলেই সেরে যাবে।

● শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ, শ্যামাচরণ রোড, কলি-২৫—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীমতী প্রতিমা সরকার, টিটাগড়—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীঅমৃত চক্রবর্তী, পাটনা-৪—

আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি Gresiovin F P বড়ি খাবেন দশ দিন। এছাড়া Cidal Soap দিয়ে গা ধুয়ে ফেলবেন।

● শ্রীপ্রদীপ দাস, সমপুরা, দীঘা, পুরুলিয়া—

আপনি দুবেলা খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে অ্যামাইনো-জাইম খাবেন।

● শ্রীদিব্যজ্যোতি সেন (ছদ্মনাম), ব্যারাকপুর—

নস্যি নিলে নাসারন্ধ্রের পথ বন্ধ হয়ে যায় সত্য। আপনার নাক বন্ধ হচ্ছে এলার্জির জন্য। উপায় না থাকলে ছাড়বেন না। মাঝে মাঝে এ্যান্টি-এলার্জিক ওষুধ ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

এনটেরোকুইনল রোজ ১টি করে না খেয়ে দিনে তিনটি করে ১০।১৫ দিন খেয়ে বন্ধ করে দেবেন। পরে আবার যখন হবে, তখন আবার খাবেন।

● শ্রীমতী মিতা ঘোষ, বৈদ্যবাটি, হুগলী—

আপনার সমস্যার কথা এই সংখ্যাতেই আলোচিত হয়েছে।

● শ্রীকৃষ্ণকান্ত মণ্ডল, ভবানীপুর—

আপনার দীর্ঘ চিঠির মধ্যে অসুস্থতা কোথাও নেই। যে কথা বলেছেন, স্বাভাবিকভাবেই সকলের হয়। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

● শ্রীমতী প্রীতিরাণী রায়, চালসা, জলপাইগুড়ি—

আপনার নাতিকে এ্যাবডেক ড্রপস ছয় ফোঁটা সকালে ছয় ফোঁটা বিকেলে খেতে দেবেন এক মাস আর মাথায় প্রাগনাটার মলম ঘষে ঘষে লাগাবেন।

● শ্রীঘোষ, বেলুড়—

আপনি সপ্তাহে দু দিনের বেশি মিলিত হবেন না। Gynovular 21, Lyndiol 2·5, Ovulen, Minovular E. D. যে-কোন একটা ব্যবহার করতে পারেন আপনার স্ত্রীর জন্য।

● শ্রীগৌরগোপাল সাহা, মহেন্দ্রগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ—

একরাতে একবারের বেশি উচিত নয়। স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

● শ্রীঅনামিকা দেবী, কলি-৬—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। কে আপনাকে কি বলেছে জানি না। কিন্তু আপনার ভাই শিক্ষিত। তাঁর এভাবে ভেঙে পড়ার মানে হয় না। আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সঠিকভাবে চিকিৎসা করলে নিশ্চয়ই ফল পাবেন। বয়স মোটেই পেরিয়ে যায় নি।

● শ্রীতাপসকুমার বসু, গারুলিয়া, ২৪ পরগণা—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীসুধীরকুমার সরকার, সাঁত্রাগাছি—

প্রশ্ন ১ : বয়স ৪৬ বছর। প্রায়ই সর্দি-কাশি হয়।

উত্তর : আপনি দুবেলা খাবার পর নিয়মিতভাবে চা-চামচের দু-চামচ করে পালমোকড্ পেুন খাবেন অন্ততপক্ষে তিন মাস।

প্রশ্ন ২ : চোখের পাওয়ার খুব বেশি এবং এখনও বাড়ছে।

উত্তর : প্লাস্ না মাইনাস্ না বললে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়, তবে চোখের ব্যাপারে গড়িমসি না করে চোখের ডাক্তার দেখানো উচিত।

প্রশ্ন ৩ : লিভারটা বেড়েছে। এর পাশে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়।

উত্তর : পুরনো আমাশয়ের চিকিৎসা করান, তার সঙ্গে সায়োমেথিয়োনিন্ ফোর্ট ২-চামচ (চা চামচ) করে সকালে বিকেলে খান।

প্রশ্ন ৪ : এই সময় হাত বড় ঘামে—

উত্তর : দুর্বলতার জন্য।

প্রশ্ন ৫ : রাত্রে অম্বল হয়—

উত্তর : একই কারণে।

প্রশ্ন ৬ : নীচু হয়ে কাজ করলে কোমর বেঁকে যায়, সোজা হতে কষ্ট হয়।

উত্তর : এই বিষয়ে চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ নিন। বোধ হয় কোমরের হাড় বেড়েছে।

প্রশ্ন ৭ : আমার পুত্র সোমনাথের (বয়স ১১ বৎসর) প্রায়ই গলা ধরে।

উত্তর : টনসিলের চিকিৎসা করান এবং প্রয়োজন হলে অটো-ভ্যাকসিন দিন।

প্রশ্ন ৮ : আমার পুত্র সঞ্জয় (বয়স ৪ বৎসর) সর্দি ও হাঁপানিতে কষ্ট পায়।

উত্তর : স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য পালেনিন চা-চামচের ২ চামচ করে

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাংকেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

আরোগ্য বিভাগ

নাম-..............

ঠিকানা-....

মাসিক বসুমতী

খাবার পর খেতে দেবেন। হাঁপানির চিকিৎসা পত্রমারফৎ হয় না।

প্রশ্ন ৯ : আমার পুত্র পার্থের (বয়স ৮ বৎসর) জিভে দাঁতের দাগ। খাই-খাই তার ভাব আছে।

উত্তর : ওকে খাওয়ার সময় করে দিন। নিয়মমত সময়ে খাবে, আর দুবেলা খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে এ্যামিনোজাইম খাবে এক মাস।

প্রশ্ন ১০ : আমার পুত্র দীপঙ্করের (বয়স ২ বৎসর) খাওয়ায় রুচি নেই। খায় খুব কম।

উত্তর : ওকে সকাল-সন্ধ্যা ৫ ফোঁটা করে লাইসিভিন ড্রপস খেতে দেবেন, তিন মাস ধরে। (আটখানি কুপন ছিল)।

● শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর---

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রশান্ত ঘোষাল (ছদ্মনাম), হালদার বাগান লেন, কলি-৪---

এমন বিচিত্র ছদ্মনাম নিয়েছেন যে প্রশ্নটা তুলে ধরা গেল না। যাই হোক আপনি দু বেলা ডাইনস্ট্রন ক্রীম মালিশ করবেন।

● শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায়, আলিপুর-দুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি---

আপনি প্রশ্ন ছাপতে বারণ করেছেন, তাই শুধু উত্তরে জানাই, দুবেলা খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে লিভিরোন খাবেন দু মাস ধরে।

● শ্রীপ্রভাতকুমার ব্যানার্জি, দুর্গা-পুর-২---

আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি ডেভোকুইন বড়ি অথবা এভিক্লিন বড়ি খাবেন দশ দিন, তাছাড়া দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে এ্যামিনোজাইম খাবেন দু মাস।

শ্রীমতী বনানী চট্টোপাধ্যায়, বারাসত---

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীমতী ডালি সরকার, ভুবনডাঙ্গা, বোলপুর---

আপনার ভগ্নীর বিষয়ে যা লিখেছেন, তা থেকে অনুমান হয়, ওর মনের উদাস ভাবের জন্য ঘটছে। ও জন্যে ভয় নেই। একটা বয়স থাকে যখন ওই ধরণের উপসর্গ দেখা দেয়। ও নিয়ে যত মাথা ঘামাবেন, তত বিভ্রান্তি ঘটবে। ভাল ঘুম যাতে হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

আপনি দু বেলা খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে ফেরাডল খাবেন তিন মাস।

● শ্রীকমলকুমার বসু, বিহারী চক্রবর্তী লেন, হাওড়া---১---

প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে যা করছেন, শিখেছেন তাই করুন। ও বিষয়ে অধৈর্য হলেও কোন লাভ নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, দুবেলা খাবার পর চা-চামচের এক চামচ করে টোটোন খাবেন দু মাস।

কুমারী কৃষ্ণা সান্যাল, জওহর কলোনী, আহমেদাবাদ, গুজরাট---

প্রশ্ন ১ : আমার মুখে ছোটবড় গুটি সব সময়ে থাকে, মাঝে মাঝে করেকটা ব্যথা হয় এবং পেকেও যায়।

উত্তর : আপনি রোজ ভাতের সঙ্গে শাক খাবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। বেশি মিষ্টি, চকোলেট, মাখন, পনীর, ঘী, বাদাম জাতীয় খাবার খাবেন না। এছাড়া মুখে এ্যাক্রোমেল মলম মাখবেন। দু মাস ব্যবহারের পর জানাবেন কমেছে কি না। ব্রণ একদম খুঁটবেন না।

প্রশ্ন ২ : আমার চুল আজ দু মাস হল খুব উঠতে সুরু করেছে।

উত্তর : ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নেবেন। খুস্কি থাকলে দূর করবেন। যে তেল মাথায় মাখছেন, তাই মাখুন, কোন ভয় নেই।

● শ্রীদামোদর বোস, হাওড়া---

আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন সে বিষয়ে আমার কোন ওষুধ জানা নেই।

● শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর---

প্রশ্ন ১ : খুস্কি দূর করিবার কোন উপায় আছে কি?

উত্তর : মাথা ন্যাড়া করে দিনে দুবার করে প্রাগমাটার মলম ঘষে ঘষে মাথায় লাগাবেন। এ ছাড়া মালটি ভিটামিন বড়ি খাবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যা লিখেছেন, তা ওই একই চিকিৎসাতেই যাবে।

● শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায়, খড়দহ, ২৪-পরগণা---

প্রশ্ন : অস্বাভাবিক ঘাম হয়।

উত্তর : ঘাম সব সময়ে খারাপ নয়। দেহের দূষিত পদার্থ ঘাম দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ নিয়ে কোন চিন্তার কারণ নেই।

● শ্রীশ্যামল রুদ্র, পদ্মা রোড, কদমা, জামসেদপুর।

প্রশ্ন : আমি আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর সর্দিতে ভুগিতেছি।

উত্তর : আগে আপনি ডাক্তার দেখান। তিনি যদি বলেন বুকে কোন দোষ নেই, তখন ম্যাকালভিট সিরাপ সকালে চা-চামচের ২-চামচ সন্ধ্যায় অনুরূপ অনুপানে খাবেন। এ ছাড়া দু বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে পালোকেড (প্লেন) খাবেন দু মাস।

● রুমকা রায়, চিত্তরঞ্জন, আমলাদহি---

প্রশ্ন : আমার চোখের সাদা অংশতে গত দুই বৎসর যাবৎ সাদা সরের মত পড়িতেছে। বহু ভিটামিন ট্যাবলেট খাইয়াছি, কিন্তু কোন উপকার হয় নি।

উত্তর : ভিটামিন খেয়েও যখন সারেনি, তখন অপারেশন করে সবটুকু বাদ দিতে হবে। আপনি কোন চোখের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

● শ্রীবিজনবিহারী রায়, চুঁচুড়া, হুগলী---

আপনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন কুড়িটি নেবেন। একদিন অন্তর 2ml 1m করে। তাতে উভয় সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হবে।

● শ্রীমতী সাবিত্রী দেবরায়, ফুলিয়াজান—

প্রশ্ন ১ : আমার মেয়ের বয়স ৭ বৎসর। ছোট ছোট কৃমির যন্ত্রণা ভীষণ। ঔষধ ব্যবহার করেও কোন সুফল পায় নি।

উত্তর : কৃমির চিকিৎসা বার বার করতে হয়। যে ওষুধের নাম লিখেছেন, সেই ওষুধই মাসে একবার করে, তিন মাস খাওয়াবেন। এছাড়া মালটিভিটামিন সিরাপ অথবা বড়ি খেতে দেবেন।

প্রশ্ন ২ : ঠাণ্ডায় জল ঘাঁটলে আমার পায়ের আঙ্গুলগুলি ফুলে প্রায় কলার আকার হয়ে যায়—

উত্তর : আপনার ঠাণ্ডার এলার্জি আছে। আপনি ঠাণ্ডা লাগাবেন না এবং ম্যাকালভিট 1 m অথবা ক্যাল-সিয়সাটিলিন ইনজেকশন নেবেন।

● শ্রীশ্যামসুন্দর প্রামাণিক, রেল-বাজার, শান্তিপুর, নদীয়া—

আপনি সুস্থ আছেন জেনে আনন্দিত। ওষুধটির বিষয়ে যা শুনেছেন, তা সত্য। না খাওয়াই ভাল। এ ছাড়া টেস্টোভাইরন ডিপোট ১০০ এম, জি ইনজেকশন মাসে ১টি করে 1m ইনজেকশন নিলে দ্বিতীয় সমস্যার সুরাহা অনেকাংশে হবে।

● শ্রীপুরুষোত্তম মাহাত, মাসরা, সিংভূম—

প্রশ্ন : আমার কন্যার বয়স ৯ বৎসর। স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু অদ্যাবধি মাথায় চুল বাহির হয় নাই, যদিও বাহির হইয়াছে, খুব ছোট ও পাতলা।

উত্তর : উপর্যুপরি কয়েকবার ন্যাড়া করে দিন। এ ছাড়া সকালে ছ ফোঁটা বিকেলে ছ ফোঁটা এ্যাবডেক ড্রপস খেতে দিন দু মাস ধরে।

● বি-এ-এ, টিস্কো, বিষ্টুপুর, জামসেদপুর—

আপনি নিজে বেটনোভেট সি (গ্লায়ো) মলমটি ক্ষতস্থানে দিয়ে দু বার লাগিয়ে দেখুন, বোধ হয় উপকার পাবেন। আপনার ছেলের সমস্যা নিয়ে এ-সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

● শ্রীপ্রণব চক্রবর্তী, বর্ধমান—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

●

এই বিভাগের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁরা যখন দ্বিতীয়বার চিঠি লিখবেন তখনও যেন উপসর্গের কথা পুরোপুরি লিখে দেন। আগেকার কোন চিঠি আমাদের দপ্তরে রাখা হয় না। উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে তা পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়, তাই আগের চিঠির উল্লেখ নিষ্ফলে যায়।

সময় বিচিত্রময়

শ্রীনয়নগোপাল চৌধুরী

বসে আছি আনমনে বর্ধমান ইস্টিশনে
সহসা পড়িল চোখে কাতরতা মাখা মুখে
চাহিতেছে একজন ভিক্ষা কিছু দাও বলে।

দেখ এই কোলে ছেলে ছিল সে হাসপাতালে
ছুটি হ'য়ে গেছে ওর নাহি কাছে ভাড়া মোর
টিকিটের দাম পেলে যাব মোরা বাড়ি চলে।

কেহ নাহি দেয় কিছু থাকে করে মাথা নিচু
কেহ বলে মাপ কর সোজা হাঁটা-পথ ধর
'ভালিত' তো বাপু আর এত কিছু দূরে নহে।

হেনকালে বাহিরেতে সোরগোল উঠি মেতে
আসিল ঘোড়ারগাড়ি মোটরকারের সারি
সিপাই-সমেত বাবু তটস্থ দাঁড়ায়ে রহে।

এক্সপ্রেস ট্রেন এল সর' সর' শোনা গেল
নামিলেন মহামান্য খ্যাতি যাঁর অসামান্য
বর্ধমান-মহারাজা বিজয় চাঁদ মাতব।

প্রাইভেট সেক্রেটারী ও এক বন্দুকধারী
পিছনে পিছনে যান মহারাজা আগুয়ান
মনোহর মূর্তি হেরি ধন্য যেন হ'ল সব।

ফিটনগাড়ির কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে
ভিখারী-কাঙালী যত প্রাতযোগতায় রত
মিলিবে এখনি ভিক্ষা কেহ নাহি যায় সরি।

ঝম্ ঝম্ চলে গাড়ি পিছনে বহু ভিখারী
মহারাজা গাড়ি 'পরি মনিব্যাগ খুলে ধরি
কি যেন পয়সা-কড়ি ছুঁড়ে দেন, আহামরি!

সেই যে লোকটি ছিল মনে মনে কি ভাবিল
অকস্মাৎ গেল ছুটে কি পড়িল কর-পুটে!
রাজার গাড়িটি এবে ঝমঝম করি ধায়।

কি দৃশ্য দেখিলাম আজও নাহি ভুলিলাম
ছেলেটিকে ল'য়ে বুকে প্রসন্নতা চোখে-মুখে
ট্রেনের টিকিট কাটি লোকটি চলিয়া যায়।

অভিজ্ঞতা হ'ল ভারি যথার্থ বুঝিতে পারি
কোনও কাজের তরে যদি কেহ ঘুরে মরে
সাহায্য না পায় কারো ব্যর্থ হয় অহরহ।

আসিবে বিচিত্রময় এমন এক সময়
হইবে সফল কার্য অকাট্য অনিবার্য
যদি থাকে চেষ্টা আর তার একান্ত আগ্রহ।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

[প্রবীণ সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাবিদ]

প্রতিভার বহুমুখীনতা যে চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে উঠেছে কানায় কানায়, বিশ্বপতি চৌধুরী সেই অলিকায় একটি স্মরণীয় নাম। বর্ষীয়ান সাহিত্যসেবী বিশ্বপতি চৌধুরীর সমগ্র জীবন সারস্বত সাধনার একটি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুধু সাহিত্যকে মাধ্যম করে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ একটা ধারণা গঠন করা সম্ভবপর নয় তার কারণ তাঁর দক্ষতা একের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা বহুতে পরিব্যাপ্ত। সংস্কৃতির একটি কক্ষের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর অলিন্দ আন্দোলিত হয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। কাব্যে, সাহিত্যে, অভিনয়ে, চিত্রাঙ্কনে, সঙ্গীতে, অধ্যাপনায়---সর্বক্ষেত্রেই সফলতার উত্তপ্ত স্পর্শ লব্ধ হয়েছে তাঁর দ্বারা।

সর্ষুণার পাকড়াশী যশোমন্ত রায়ের অধস্তন অষ্টম পুরুষ বিশ্বপতি চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৫ সালে। জন্মস্থান তাঁর কলকাতা কিন্তু আদিনিবাস খুলনা জেলার অন্তর্গত নকীপুর গ্রামে।

বাঙলা দেশে সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে এক একটি পত্রিকার অবদান অন্তহীন। এ ধরণের একাধিক পত্র-পত্রিকার নামোল্লেখ করা যায় যাঁদের কেন্দ্র করে এক একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক চক্রের সৃষ্টি করেছে, যাঁরা আপন আপন অবদানে সাহিত্যের ইতিহাসে এক একটি বিরাট আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়েছেন এবং সাহিত্যের গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণেও এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র, কল্লোল, কালি-কলম এই তালিকায় এক একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নাম।

'সবুজপত্র'কে ঘিরে যে বিশিষ্ট সাহিত্যরথীর দলের আবির্ভাব হয়েছিল বিশ্বপতি তাঁদেরই একজন। অল্পবয়স থেকেই নানা বিষয়ে তাঁর অতুলনীয় মেধা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় মিলতে থাকে। অতি অল্পবয়সেই দেশের বুধমণ্ডলীতে যথেষ্ট স্বীকৃতি ও সমাদর তিনি অর্জন করেন। এই সঙ্গে তাঁর চরিত্রের আর একটি দিকও প্রকট হয়ে উঠেছিল---সেটি তাঁর ব্যক্তিত্ব, নির্ভীকতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা। বিশ্বপতি তখন নিতান্ত তরুণ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ দিকপালেরা যেখানে বিদ্যমান সে হেন পরিবেশেও কোন প্রতিকূলতার সম্ভাবনা তাঁর স্বীয় মত এবং নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে পথরোধ করে নি।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

আইন এবং দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়ছিলেন বিশ্বপতি। বৈষ্ণব সাহিত্যে দর্শনে এবং কীর্তন সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন দর্শন পরিহার করে বাঙলায় এম-এ দেওয়ার। সে আহ্বান বিশ্বপতি প্রত্যাখ্যান করেন নি। সেই বছরেই বাঙলায় এম-এ পড়ানো প্রথম আরম্ভ হ'ল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দীনেশচন্দ্রেরই আগ্রহে বিশ্বপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করলেন। বারো-তের বছর পূর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। পরীক্ষক, প্রশ্নপত্র রচয়িতা, বাঙলা অনার্সের পরীক্ষক, বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতির দায়িত্বও তিনি সসম্মানে পালন করেছেন।

কলেজে পাঠ্যাবস্থা থেকেই গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখা সুরু হয়ে গেল। ১৩২২ সালে বের হ'ল তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথা'। ১৩২৮ সালে প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘরের ডাক'। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যজগতের একটি বিস্ময়কর আবির্ভাব হিসাবে তিনি চিহ্নিত হয়ে গেলেন। এ ছাড়া বৃন্তচ্যুত, স্বপ্নশেষ, বহুরূপী, আশীর্বাদ, সেতু, ঘূর্ণি, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে তিনি সম্পাদনা করেছেন চণ্ডীমণ্ডল বৈষ্ণব পদাবলীরও অন্যতম সম্পাদক তিনি। ১৩৩৫ সালে কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে যুক্তভাবে সম্পাদনা করেছেন মাসিক বসুধারা।

সেকালের প্রতিটি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর আঁকা ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তা ছাড়াও অসংখ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কনের কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। 'সঙ্গীত পরিষদ' নামক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র থেকে একজন কর্ণধারে উন্নীত হয়েছিলেন বিশুপতি।

তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক সম্বন্ধে আলোকপাত না করলে তাঁর সম্বন্ধে লেখনীর মাধ্যমে চিত্রায়ণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্যান্য নানা বিষয়ক খ্যাতির মধ্যে আরও একটি বিশেষ খ্যাতি তাঁর অধিকারে। সে খ্যাতি রসিকের। তাঁর মত স্বতঃস্ফূর্ত সুরসিক এবং চিত্তহারী মজলিশী মানুষ একালের বাঙলা দেশে দুর্লভ বললেও বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তির দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

[দিকপাল ঐতিহাসিক, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও শিল্পবোদ্ধা]

ইতিহাস শুধু নিছক সাল-তারিখের মালা বা কিছু রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণপঞ্জী নয়। সাল-তারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমকালীন সমাজবিবর্তন, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার সম্যক আলেখ্য উপস্থাপিত করাই ইতিহাসের প্রকৃত ধর্ম এবং সেইখানেই তার সার্থকতা। ইতিহাসের এই সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে ইতিহাস-চর্চার এই নতুন দিকটি সম্বন্ধে জাতিকে এবং ইতিহাসসেবীকে যিনি সচেতন করে তুললেন এবং ইতিহাস অনুশীলনে একটি নতুন ও আরও বলিষ্ঠ ধারার সূত্রপাত করলেন, এককথায় ঐতিহাসিক গবেষণা এক স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত করার সক্রিয় ভূমিকা যিনি গ্রহণ করলেন তিনি ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

শুধু ইতিহাসের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য এবং শিল্পবিচারের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনন্য। এখানেও তাঁর গতানুগতিকতাবর্জিত স্বীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র চিন্তাধারার পরিচয় অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে।

১৯০৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী ময়মনসিংহে নীহাররঞ্জনের জন্ম। গত ১৪ই জানুয়ারী তাঁর গৌরবসমৃদ্ধ অবদানময় জীবনের পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হয়েছে। বাবা মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী।

ময়মনসিংহ থেকে ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন নীহাররঞ্জন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেন ১৯২৪ সালে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কিছুকাল অধ্যয়নের বিরতি ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ১৯২৬ সালে তিনি এম-এ পাশ করলেন। ১৯২৮ সালে লাভ করলেন

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ। ১৯৩৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার-বিদ্যা সম্পর্কে লাভ করলেন ডিপ্লোমা। ঐ বছরই নেদারল্যাণ্ডের লেডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করলেন লেটার্সে এবং দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট।

নীহাররঞ্জনের সমগ্র ছাত্রজীবন কৃতিত্বের এবং সাফল্যের আলোকে উদ্ভাসিত প্রতিভার এক অপূর্ব চিত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোয়াট স্বর্ণপদক, মৃণালিনী স্বর্ণপদক, গ্রিফিথ পুরস্কার প্রভৃতি পুরস্কার ও পদকগুলি ছাত্রজীবনে লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো ছাড়াও ভারতীয় শিল্প ও প্রত্নতত্ত্বে তৎকালীন বঙ্গ সরকারও তাঁকে রিসার্চ ফেলোশিপ দিয়েছিলেন। লেডেন বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি রিসার্চ লেকচারার ছিলেন কিছুকাল। ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

১৯৩২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির লেকচারার ছিলেন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ছিলেন রীডার। ১৯৪৬ সালে তিনি নিযুক্ত হলেন বাগীশ্বরী অধ্যাপক। ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৬ সালে তিনি যথাক্রমে কেরল ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'টেগোর প্রফেসর' পদে বৃত হয়েছেন।

১৯৪৯ সালে তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করলেন। সেই বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পুরস্কারটির প্রবর্তন করেন। ছাত্রজীবনেই শুধু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সময়ে দেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে তাঁকে কিছুকাল কারাবাস করতে হয়েছিল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভার অন্যতম মনোনীত সদস্য ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারিটাস অধ্যাপক ডঃ রায় বর্তমানে সিমলার ইনস্টিটিউট অফ এ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর পরিচালক-অধ্যাপক। বর্তমান বর্ষে প্রজাতন্ত্র দিবসে তিনি 'পদ্মভূষণ' লাভ করেছেন।

'বাঙালীর ইতিহাস—আদি পর্ব' গ্রন্থটি তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি—এই গ্রন্থটি বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যভাণ্ডারে একটি মহার্ঘ রত্ন। 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' তাঁর আর একটি অসামান্য গ্রন্থ। এ ছাড়া 'থিওলজিক্যাল গড্‌স ইন বার্মা', 'স্যানসক্রিট বুদ্ধিজিম ইন বার্মা,' 'থেরাবাদা বুদ্ধিজিম ইন বার্মা', 'আর্ট ইন বার্মা', 'ডাচ এ্যাক্টিভিটিজ ইন দ্য ইস্ট', 'মৌর্য এ্যাণ্ড সুঙ্গ আর্ট', 'দ্য মিডায়েভল ফ্যাক্টর ইন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থগুলি তাঁর পাণ্ডিত্যের এবং মনীষার প্রগাঢ়তার এক প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

পৃথিবীর নানা দেশ তিনি পর্যটন করেছেন, ইয়োরোপ এ্যামেরিকার ও এশিয়ার বহু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অধ্যাপক-রূপে। এইভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে তাঁর দ্বারা ভারতের সুমহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কালজয়ী বাণী প্রচারিত, ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসমূহের প্রধান গ্রন্থাগারিক, এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি, ভারত সরকারের সাহিত্য, ললিতকলা ও সঙ্গীত আকাদামীসমূহের সদস্য প্রভৃতি সম্মানজনক আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

এ ছাড়াও ১৯৫২'-৫৪-এ তিনি বৃহ্ম সরকারের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা এবং ১৯৫২'-৫৩ ও ১৯৫৩-'৫৪ সালে তিনি যথাক্রমে ফোর্ড ফাউণ্ডেশান ও ইউনেস্কোর কনসালট্যাণ্ট ছিলেন।

১৯৬০ থেকে '৬৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের আসনে তাঁকে দেখা গেছে। ১৯৬১-'৬৬ ভারতীয় যাদুঘরের অছি পরিষদের সচিবের দায়িত্বভার তিনি পালন করেছেন। ১৯৬৭-'৬৮র ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসে তিনি পৌরোহিত্য করেন।

ডক্টর তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য

[সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ: নব্যন্যায়চর্চার পথিকৃৎ]

আধুনিক বাঙলার অন্যতম স্থপতি, বাঙালীর জাতীয় জীবনের বর্ণ-বিচয়, প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদা যে আসন স্বয়ং ধন্য করে গেছেন দীর্ঘকাল যাবৎ অলঙ্কৃত করে—কলকাতার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের মহান এবং সম্ভ্রমপূর্ণ আসনে বর্তমানে যিনি সমাসীন তাঁর দ্বারা এ আসনের মর্যাদা যে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি এ মন্তব্য আজ অনায়াসে করা চলে।

শাস্ত্র, ধর্ম ও দর্শনের অনুশীলনে যে বাঙলা দেশের ঐতিহ্য বৈশিষ্ট্য এবং আলোকোজ্জ্বল ভূমিকা সারা পৃথিবীর স্বীকৃতির আলোয় উদ্ভাসিত সেই বাঙলা দেশের নব্যন্যায়চর্চার দিকটি একালে শূন্যই ছিল বলা চলে। আধুনিককালে কোন দার্শনিক পণ্ডিতকে নব্যন্যায় নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়নি। নব্যন্যায় এ যুগে অনালোচিত অননুশীলিতই ছিল সেই অভাব মোচন করে বাঙলা দেশ তথা ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্যের জগতে এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে এক সুবর্ণদীপ্ত অধ্যায়ের পত্তন করলেন এ কালের এক জ্ঞান-তাপস অনুসন্ধিৎসু বাঙালী—তাঁর নাম ডক্টর তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের আসনে যিনি সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

বয়েস এখনও ষাটের কোঠায় পড়েনি। ১৯১০ সালের ১লা নভেম্বর তাঁর জন্ম। অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্যের পুত্র তারাশঙ্করের আদিনিবাস বরিশাল। ঝালকাঠি সরকারী হাইস্কুল থেকে ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বরিশালের সুবিখ্যাত বৃজমোহন কলেজের ছাত্র হিসাবে ১৯২৯ সালে প্রাক্‌স্নাতক পরীক্ষায়ও সফলতার মুখ দেখলেন। এলেন কলকাতায়। ১৯৩১ সালে স্নাতক হলেন সংস্কৃত কলেজ থেকে। অনার্স ছিল দর্শন শাস্ত্রে। ১৯৩৩ সালে দর্শনে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায়ও জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য আবার কণ্ঠে শোভা পেল।

চার বছর পর সুরু হল কর্মজীবন—যে কর্মজীবন তাঁর আজও অব্যাহত। তার সূচনা ঘটল ১৯৩৭ সালে কৃষ্ণনগর কলেজের লেকচারার হিসাবে, ১৯৪১ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে যুক্ত ছিলেন লেকচারার হিসাবে—এই কলেজে সেদিন অধ্যক্ষ ছিলেন খ্যাতনামা মনীষী ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। আবার কলকাতা ছাড়লেন—গেলেন হুগলী সেখানকার প্রখ্যাত মহসীন কলেজের লেকচারার হয়ে।

১৯৪৮ সালে উন্নীত হলেন সহকারী অধ্যাপকে। এই বছরই তাঁর নব্যন্যায়ের গবেষণার জন স্বীকৃতি-স্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডিলিট' উপাধি অর্জন করলেন তারাশঙ্কর। এরপর এলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯৫৯ সালের এপ্রিলে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে টাকী সরকারী কলেজে বদলী হলেন অধ্যক্ষ হিসাবেই, এরপর অধ্যক্ষ হিসাবে আরও একাধিক কলেজে। ১৯৬৩-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৫-র ডিসেম্বর পর্যন্ত বারাসত সরকারী কলেজে, তারপর তিন বছর পূর্ব কর্মক্ষেত্র হুগলী মহসীন কলেজে—তার-

এর তিন মাস পূর্বে সংস্কৃত কলেজে প্রত্যাবর্তন। নিজের শিক্ষাক্ষেত্রে, অতীতের কর্মক্ষেত্রে এবার কর্ণধারের ভূমিকায়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ এবং এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের তিনি সদস্য।

বাঙলার গৌরব ডক্টর ভট্টাচার্য এ যুগে নব্যন্যায়চর্চার পথিকৃৎ। তাঁর পূর্বে এ পথে আর কোন দিকপাল পদক্ষেপ করেননি। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণও নন, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও নন। সেই কারণেই প্রচারবিমুখ কর্মসাধক, এই জ্ঞানতপস্বীর জন্যে বাঙলা দেশে যথেষ্ট গর্ব করার স্বপক্ষে যুক্তিসঙ্গত যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য

[ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক জীবনীকার]

মাথার উপর ধ্যানমৌন হিমালয়, পায়ের তলায় লীলাচপল কন্যাকুমারিকা মধ্যবর্তী বিরাট বিশালভূখণ্ডের নাম ভারতবর্ষ সাধকের দৃষ্টিতে ভুবনমনোমোহিনী, কবির অনুভূতিতে এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র। সুমহান ও শাশ্বত সভ্যতায় বিকশিত এই ভারতবর্ষের মৃত্তিকা পবিত্র থেকে পবিত্রতর হয়ে উঠেছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে ঈশ্বরের অগণিত মানসপুত্রের অসংখ্য যোগি-ঋষি-ত্রিকালজ্ঞের পুণ্য আবির্ভাবে। ইতিহাস কালে কালে মোড় নিয়েছে, কত পতন, উত্থান, বিপর্যয়, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে অসংখ্যবার পরিবর্তনের ঝড় বইয়ে দিয়েছে, ভারতবর্ষে কালে কালে হয়েছে তার রূপবদল—তবু এই ব্যাপক এবং অবিরাম পরিবর্তনের ঢেউ ভারতের এই অধ্যাত্মসাধনার ধারাটি ব্যাহত করতে পারে নি এবং এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাই আজও রক্ষা করে আসছে সমগ্র দেশকে নানা দুর্যোগের হাত থেকে—দিচ্ছে সত্যের, আলোর এবং সার্থকতার পথনির্দেশ।

কিন্তু এই গৌরবময় অবিরাম ধারাটির আনুপূর্বিক কোন প্রামাণ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করে সে সম্বন্ধে জাতিকে সজাগ ও সচেতন করার জন্যে এগিয়ে আসতে এতদিন পর্যন্ত কাউকে দেখা যায় নি। এ সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড কাজ হয়েছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি বিবরণ প্রণয়নে এযাবৎ কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নি।

এই অসাধ্যসাধন করে সারা দেশকে অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ করে জাতির সঞ্চয়কে যিনি বহু গুণ বাড়িয়ে ছিলেন তিনি শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য। জাতির সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের তথা জাতীয় জীবনের একটি দিকের এক বিরাট অভাব মোচন করে জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে জাতীয় সম্পদশালার একটি বিরাট শূন্যতা তিনি মোচন করলেন।

ঢাকার প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট যোগেশ্চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বড়

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য

ছেলে প্রমথনাথের জন্ম ১৯১১ সালের ২রা জানুয়ারী। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র প্রমথনাথ ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। জগন্নাথ কলেজের ছাত্র হিসাবে প্রমথনাথ অর্থনীতিতে অনার্সসহ স্নাতক হলেন। ১৯৩৩ সালে পাশ করলেন এম-এ। তারপর কয়েক বছর তাঁর কাটল অপেশাদারী সাংবাদিকতায়।

১৯৩৯ সাল। প্রমথনাথের জীবনের এক স্মরণীয় কাল। তাঁর সমগ্র জীবনের পট পরিবর্তন হল। জীবনযাত্রার ধারা হল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখীন। জীবনের অর্থবোধ, ধারণা, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হল। এখন যোগিরাজ কালীপদ গুহরায়ের সান্নিধ্যে। ভারতীয় অধ্যাত্মজগতের একালের মুকুটমণি যোগিরাজের অতি অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ সর্বাপেক্ষা অধিক যাঁরা পেয়েছেন সেই মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে প্রমথনাথের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করায় কোন বাধা থাকে বলে মনে হয় না। যোগিরাজের একান্ত সংস্পর্শে তাঁর সামনে নতুন এক জগতের আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল। শুধু অন্তরঙ্গতাই নয়, তাঁর মত এত দীর্ঘকাল (ছাব্বিশ বছর অর্থাৎ যোগিরাজের দেহান্তর পর্যন্ত) তাঁর সান্নিধ্য আর কেউ লাভ করে নি।

মহাযোগীর সান্নিধ্যে নানাবিধ অলৌকিক আধ্যাত্মিক কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর মনে এক নতুন চিন্তা তরঙ্গিত হতে লাগল। এই আধ্যাত্মিকতার অবিরাম ধারার কোন প্রামাণ্য দলিল নেই, এই চিন্তা তাঁকে তৎপর করে তুলল, শুরু হল গবেষণা। দিকদর্শক স্বয়ং যোগিরাজ। নানা মত ও সম্প্রদায়ের পীঠস্থান থেকে তথ্য ও উপকরণাদি সংগ্রহ হতে লাগল। তথ্য সংগ্রহের দিক থেকে সহায়তা পেয়েছেন যোগিরাজ ছাড়াও এশিয়ার শেষ বিস্ময় দেশপূজ্য পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ। দাক্ষিণাত্যের সাধকদের প্রসঙ্গে তাঁকে তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন মাদ্রাজের এককালের দিকপাল আইনবিদ ভোম্মাইস্বামী আয়ার। লেখা চলতে লাগল। গ্রন্থরূপে তা প্রকাশের জন্য এগিয়ে এলেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও জীবনীকার স্বর্গত

॥ খেলাধূলা ॥

এ্যাথলেট তৈরি করার জন্য চাই ভাল কোচ

খেলাধূলার পবিত্র অঙ্গনে আজ পৃথিবীর যে দুটি মহান দেশের অগ্রগতি সর্বাধিক সে দুটি দেশের নাম আমেরিকা ও রাশিয়া। এতকাল সোভিয়েট রাশিয়া আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু গত মেক্সিকো অলিম্পিকের পর দেখা গেল ফলাফল ঠিক বিপরীত। পদকের তালিকায় আমেরিকার স্থান উচ্চে এবং সামগ্রিক উন্নতিতেও আমেরিকা রাশিয়াকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ক্রীড়ারসিক

এই যে অগ্রগতি এর জন্যে আমেরিকার ক্রীড়াবিদদের কম পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়নি। দেশের প্রতিটি এ্যাথলেটদের অলিম্পিকের পরিমাপ অনুযায়ী তৈরি করার আগে তাদের স্বাস্থ্যের উপর কড়া নজর রাখেন এবং শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা যে সব খেলাধূলার মূল কথা এ জ্ঞানও তাদের দিয়ে দেন।

এখানে ঐ রকম একজন কোচের পরিচয় দেওয়া হল। উদ্দেশ্য ওই সব দেশের যাঁরা কোচ তাঁরা নিজের দেশের ক্রীড়াবিদদের সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করেন তা যে কতটা দৃঢ় এবং যথার্থই তাই জানিয়ে দেওয়া।

পেটন জর্ডন যিনি ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে সহকারী কোচ এবং '৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে দলের কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের

আমেরিকান কোচ পেটন জর্ডান

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হল 'ভারতের সাধক'-এর প্রথম খণ্ড। এই গ্রন্থই তাঁকে রবীন্দ্র-পুরস্কার এনে দিল ১৯৬৪ সালে। এই গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন 'শঙ্করনাথ রায়' ছদ্মনামে।

আটটি খণ্ডে এই গ্রন্থটি বিভক্ত। মোট চৌষট্টি জন সাধকের সচিত্র জীবনচরিত এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। নানা তত্ত্ব ও তথ্যের অপূর্ব আকর এই গ্রন্থটি প্রমথনাথের অতুলনীয় অধ্যবসায়, বিপুল পরিশ্রম ও অসাধারণ শ্রমস্বীকারের এক উজ্জ্বল নিদর্শন সে সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নেই। যোগিরাজ প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'হিমাদ্রি'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি তাঁর সম্পাদক। যোগিরাজের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থতার অব্যবহিত পূর্বে যে শ্রেষ্ঠ কবিতাটি রচনা করেন ('অপরূপ বয়স') তা হিমাদ্রীতেই প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে প্রমথনাথ 'ভারতের সাধক'-এর অনুরূপ 'ভারতের সাধিকা' রচনায় নিমগ্ন। ভগবান শ্রীচৈতন্য এবং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও এক (নতুন পরিকল্পনায়) গ্রন্থ রচনায় তিনি ব্রতী হয়েছেন।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ—সেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া, ভারতকে মাহান সাধক। শেষোক্ত বইটির প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রখ্যাত সুধী স্বর্গত ডঃ সম্পূর্ণানন্দ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ।

বর্তমানে তামিল ওড়িয়া ও মারাঠি ভাষাতেও 'ভারতের সাধক'-এর ভাষান্তরের আয়োজন চলছে।

উত্তরে বলেছিলেন, আমি অতীতের কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করছি না, তবে বর্তমানের যে দল অংশগ্রহণ করতে চলেছে তাতে অনেক প্রতিভা-শালী খেলোয়াড় যোগ দেবে এবং টীম হিসেবে তা খুবই আকর্ষণীয় হবে।

কতগুলি স্বর্ণপদক অর্জন করবে?

এর উত্তরে জর্ডন নিজেকে সংযত করে জবাব দিয়েছিলেন, যতগুলি পদক ঘরে আনার মত সামর্থ্য আছে ঠিক ততগুলিই। পুনরায় বলেছিলেন, আমরা অতীতের সঙ্গে তুলনা তো করছিই না উপরন্তু এ কথাও বলছি না অতীতের সমস্ত রেকর্ড আমরা ভেঙে দেব। আমার মনে হয় এ্যাথলেটদের প্রতি তাতে অবিচার করা হবে এবং তাতে তাদের মনোবলও ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু একথাও আমি বলবো, এই সব এ্যাথলেটরা আপন কৃতিত্ব অনুযায়ী নিজেদের নৈপুণ্য প্রকাশ করবে এবং স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করার যে ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে তা তারা বহন করে চলবে।

জর্ডন বলেন, এ কথা প্রমাণিত। যে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সেরা স্প্রিন্টার্স আমাদের দলেই আছে, কারণ তিনজন ইতিমধ্যেই ১০০ মিটার-এর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এবং ২০০ এবং ৪০০ মিটারেও অশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। মাঝারি পাল্লার দৌড় এবং হার্ডলসে আমার মনে হয় আমরা খুবই শক্তিশালী। শর্টপুট, ডিসকাস এবং ট্রিপল জাম্প-এর চেয়ে জর্ডন বলেন, আমরা ফিল্ড ইভেণ্টে অনেক বেশী শক্তিশালী। লঙ জাম্প এবং পোল ভলটেও আমাদের এ্যাথলেটরা অনেক দক্ষতাসম্পন্ন। এই হিসেবে মেক্সিকো অলিম্পিকে সাফল্য অর্জনকারী বহু প্রতিযোগীর নাম তিনি পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে আলফ্রেড ওয়াটার, জয় সিলভেস্টার, বব সিগ্রেন প্রমুখ।

মেক্সিকো শহর থেকে ৭৪৪০ ফুট উচ্চতায় ক্রীড়াবিদদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে গেলে যে প্রথা-প্রকরণ আয়ত্ত করতে হয় তাতে কি রকম সময় লাগে এর উত্তরে জর্ডন বলেছিলেন চোখ দিন। বলা বাহুল্য, পেটন জর্ডন আপন দল সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন মেক্সিকো অলিম্পিকের পর দেখা গেছে তা কি পরিমাণে সত্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশ থেকে যাঁরা দলের ম্যানেজার বা কোচ হিসেবে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন তাঁরা যাবার আগে যা বলে যান বেশীর ভাগ সময়েই তা মেলে না। এবং নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য একে অন্যের উপর সব সময় দোষারোপ করে থাকেন।

খেলাধূলা জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একটি অবিচ্ছেদ্য বস্তু এ কথাটা আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিরা মুখে প্রচার করলেও বাস্তবে পরিণত করার জন্য তার কতটুকু করে থাকেন। গোটাকয়েক হাঁড়ি আর কড়া জোগাড় করে দিলেই যেমন ভাল পাচক তৈরি করা যায় না তেমনি ব্যাট আর বল কিনে দিলেই দেশের সকলেই খেলোয়াড় তৈরি হয় না—এ কথাটা আমাদের কর্মকর্তাদের মনে রাখা উচিত।

আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনোত্তর হাঙ্গামা সম্পর্কে আলোচনা করছেন পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতৃদ্বয় শ্রীঅশোককুমার সেন, এম-পি এবং শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গণেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে মেলার সংগঠনে যে আকস্মিক আঘাত এসে লাগে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুপরিচালনায় সে আঘাত দূরীভূত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। তাঁর সময়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে মেলার কর্মপ্রণালী ও বিভাগীয় কর্মের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। গণেন্দ্রনাথের স্থলে সম্পাদক হন যুগ্মভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়। মেলার চতুর্থ অধিবেশন (১৮৭০) থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত একাদিক্রমে চার বৎসর কাল তিনি সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত থেকে জাতীয় মেলাকে স্বদেশচর্চার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৭৪ খৃস্টাব্দে পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত অষ্টম অধিবেশনের সভায় রাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুর অসুস্থ থাকায় তাঁর স্থলে দ্বিজেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এছাড়া ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে রাজা মদনচাঁদের টালার উদ্যানে অনুষ্ঠিত দশম অধিবেশনেরও তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৯ সনের অনুষ্ঠিত অর্থাৎ ত্রয়োদশ অধিবেশনেও তিনি সম্পাদক ছিলেন। এই বৎসরের 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রতিবেদনে তাঁর পরিচালনাকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা হয়েছিল—

"বলা বাহুল্য যে মেলার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্রের যত্নে ও শ্রমে এবং অধ্যবসায়ে এই মেলা জাতীয় মান রক্ষা করিতেছে।"

তৃতীয় অধিবেশনের পরে অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদকের পদে দায়িত্ব-গ্রহণের কাল থেকে জাতীয় মেলার কর্মসূচীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত চৈত্রমেলা চৈত্রসংক্রান্তির সময় অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য দর্শকদের গ্রীষ্মের দাবদাহ ভোগ করতে হত, সে কারণে চৈত্রমেলার অনুষ্ঠানের দিন স্থির করা হয় ফাল্গুন মাসে। পরে আরও পিছিয়ে মাঘ মাসে করা হয়। দ্বিতীয়ত, দেশীয় শিল্পচর্চা ও চিত্রাঙ্কনের উৎসাহপ্রদান এবং পুস্তক-প্রদর্শনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা। বেশ বোঝা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রনাথের নান্দনিক মানস প্রবণতা এ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তৃতীয়ত, চতুর্থ মেলার সময় থেকেই জাতীয় মেলা বিশেষভাবে 'হিন্দু মেলা' নামে পরিচিত হয়। মেলার অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদকীয় অভিভাষণে ঘোষণা করেন, "অদ্যকার এই যে অপূর্ব সমারোহ ইহা এতদিন পরে ইহার প্রকৃত নাম ধারণ করিয়াছে, ইহা 'হিন্দু মেলা' নামে আপনাকে লোকসমক্ষে পরিচয় দিতেছে। বিহঙ্গ-শাবক যেমন অল্পে অল্পে আপনার বল পরীক্ষাপূর্বক ক্রমে উচ্চতর নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে সাহসী হয়, সেইরূপ প্রথমে জাতীয় মেলা চৈত্র মেলা এইরূপ অস্ফুট শব্দ আমাদের শ্রবণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে 'হিন্দু মেলা' এই সুস্পষ্ট নামদ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ পাইতেছে।" (দ্রঃ 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা—'৭৪)

চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বিষয়, দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালেই চতুর্থ অধিবেশনে হিন্দু মেলার সাম্বৎসরিক কার্যনির্বাহের প্রকল্প প্রস্তুত এবং প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য 'জাতীয় সভার' (১৮৭০) প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ জাতীয় সভার অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় সভার তিনি সহ-সভাপতিও মনোনীত হয়েছিলেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে জাতীয় সভার অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ "পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রসংগত অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন—

"গত রবিবারে জাতীয় সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। আমরা বক্তৃতাটি শুনিতে যাই।...দ্বিজেন্দ্রবাবু বক্তৃতায় অসাধারণ বুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় দেন।" (দ্রঃ জাতীয়তার নবমন্ত্র ঃ যোগেশচন্দ্র বাগল।)

জাতীয় মেলার পূর্বোক্ত পরিবর্তনগুলির ব্যাপারে যে দ্বিজেন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। হিন্দু মেলার পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং নবগোপাল মিত্র যৌথভাবে সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গ্রন্থ মেলার ইতিহাসে তার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

মেলার সপ্তম অধিবেশনের প্রথমদিন "...অন্যতর সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত বৎসরের কার্যকলাপসম্পৃক্ত একটি বিবরণ পাঠ করেন। তিনি ইহাতে জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সভার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। হিন্দু জাতির পূর্বগৌরব ও বর্তমান হীন অবস্থার তুলনামূলক আলোচনাপূর্বক তিনি জাতীয় উন্নতিবিধান কল্পে সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়া বিবরণ শেষ করিলেন। (দ্রঃ অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে জাতীয়তার নবমন্ত্র গ্রন্থে উদ্ধৃত।)

এই সপ্তম অধিবেশনেই জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতৃগণ 'ভারতমাতার বিলাপ' নাটকের অভিনয় করেন। নাটক মঞ্চস্থের বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। দশম হিন্দু মেলার সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ "...সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণকে সভাসমক্ষে অনুরোধ করেন, যেন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালিকারা জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে শিক্ষা করে।"

পূর্বোক্ত ঘটনাবলী সঙ্কলনের উদ্দেশ্য হল দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা এবং হিন্দু মেলার কর্মাবলীর সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগের পরিচয় উদ্ঘাটন। জাতীয় মেলার সকল ঘটনাবলীর মধ্যেই স্বদেশী চেতনার সঙ্গে পরিশীলিত ধর্মীয় ভাবনার যোগসাধন করতে চেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে জাতীয় মেলাই ভারতের জাতীয় সংগীতের জন্ম দিয়েছিল। হিন্দু মেলা উপলক্ষেই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত স্বদেশ-সংগীত, "মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি" রচনা করেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রসংগত বলেছেন, "......আর একটা গান গাওয়া হত সে-গানটি তৈরি করেছিলেন বড়ো জ্যেঠামশায়—

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরে লোচনবারি।

এই গানটি বোধহয় রবিকাকাই গেয়েছিলেন হিন্দু মেলাতে। এই হল আমাদের আমলের সকাল হবার পূর্বেকার সুর, যেন সূর্যোদয় হবার আগে ভোরের পাখি ডেকে উঠল। আমরাও ছেলেবেলায় এইসব গান খুব গাইতাম।" (দ্রঃ ঘরোয়া)।

বাস্তবিক, দেশ-মুক্তিকামী চিত্তাকাশে তখন প্রথম ঊষার আভাস। সেই ঊষালগ্নের হিন্দু মেলার মূর্তিময় কয়েকজন দেশ-

প্রেমিকের কণ্ঠে যে দেশ-বন্দনার সুরে ধ্বনিত হয়েছিল, আজকের স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে সে কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিদেশীর শাসনে ও শোষণে জর্জরিত দেশমাতৃকার মুক্তি-সাধনায় এঁরা ক্রন্দন-মথিতহৃদয়ের যে কারুণ্যস্নাত মহান্ জাতীয় সুরের সৃষ্টি করেছিলেন তা সকল দেশের সকল কালের স্বদেশ-সঙ্গীতের মূল সুর। এ স্থলে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত স্বদেশ-সঙ্গীতটি উদ্ধৃত হল—

"মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্ত নিরখিয়ে,
ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি!
এ দুঃখ তোমার হায়রে
সহিতে না পারি!"

পরবর্তী জীবনে দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক আলোচনায় এবং ঈশ্বর-চিন্তায় বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। তথাপি মেলার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনুমান করা যেতে পারে। স্বদেশী মেলার সর্ববিধ সাফল্যে দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু মেলায় নবগোপাল মিত্রের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' (১২৮০/ফাল্গুন) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "......কিন্তু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয় একা তাঁহার গুণানুবাদ করিলেই পর্যাপ্ত হয় না। সদ্বিদ্যাবিশারদ নিয়ত স্বদেশ-হিতৈষী প্রসিদ্ধনামা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামও সর্বাগ্রে গণনীয়। রোম নগরের এক সেনাপতিকে তরবার, অন্যকে ঢাল বলিয়া যেমন উপমা দেওয়া হইত, আমাদিগের বর্তমান জাতীয় অনুষ্ঠান পক্ষে ঐ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সমহিতকারী হইতেছেন।" তাছাড়া, সমকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক সমস্যাবলী থেকেও যে তিনি দূরে ছিলেন না তার বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারত সভা'র (১৮৭৬ খৃঃ) নানান কর্মের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচন আইনের প্রতিবাদে ভারত সভার উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে যে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বক্তাগণের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথও আইনের বিরোধিতা করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। (দ্রঃ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়াঃ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

জাতীয় মেলার স্বদেশ-সাধনার ফলে দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে যে স্বাদেশিক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তারই প্রত্যক্ষ ফলরূপে জন্ম হয়েছিল 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা' এবং 'ভারতী' পত্রিকার। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ আদর্শ দেশ-প্রেমিকের সন্ধান পেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে,' "এখন আমাদের দেশের মধ্যে খাঁটি patriot-এর আবির্ভাব হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী। ইনি আমাকে আমার মত patriot হইতে বলেন; তোমার মত, বিদেশীর মত নয়, দেখি কি হয়।' (দ্রঃ পুরাতন প্রসঙ্গঃ বিপিনচন্দ্র পাল)

দ্বিজেন্দ্রনাথের এ আশা বিফল হয় নি। হিন্দু মেলার যজ্ঞভূমিতে ভারতমুক্তি যজ্ঞের যে উদ্বোধন তাঁরা করেছিলেন, সেই যজ্ঞাগ্নি থেকেই জন্ম হয়েছিল আদর্শ patriot-এর। 'ভারতমাতার বিলাপের দিন শেষ হয়েছিল।

হিন্দু মেলার স্বদেশচর্চার প্রাঙ্গণে ঠাকুরবাড়ীর অপর কৃতী সন্তান দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের প্রথম আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ-চেতনার মধ্যে যেমন পিতৃপুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল, তেমনি ছিল আত্মলব্ধ সংস্কারক চেতনার সক্রিয় প্রভাব। এই সনাতন ও নব্য চেতনার পরস্পর বিরোধী ভাবধারার আশ্লেষে সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা এক মহিমময় গঠনধর্মী প্রতিমা গ্রহণ করেছিল। তাঁর স্বদেশপ্রবণ মানসিকতার বিষয়ে পিতার প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে ইংরিজি রকম চাল-চলনের বাড়াবাড়ি করেছিলুম, তখন তিনি একদিন দালানে উপাসনার সময় ইংরাজী রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ—অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা সহকারে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন—সে উপদেশটি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকবে।" (দ্রঃ আমার বাল্যকথা) ঠাকুর-বাড়ীর অন্তঃপুরিকাদের অবরোধ প্রথা দূরীকরণে, বাংলার সদ্যলব্ধ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মহারাষ্ট্র-গুজরাটের নবজাগ্রত স্বাদেশিক আন্দোলনের সংযোগ-সাধনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ অবদান ছিল। স্বামীর জাতীয়তাবোধে প্রাণিত সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীর স্বদেশ-ভক্তির পরাকাষ্ঠার প্রকাশস্বরূপ তৎকালীন সংবাদ-পত্রের একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করছি। সংবাদপত্রটিতে লেখা হয়, "......২৭-এ ডিসেম্বর (১৮৬৬) বৃহস্পতিবার গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের বাটীতে যে মজলিশ হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী আমাদের জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া উক্ত মন্দিরে গিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে কোন হিন্দু রমণী গভর্নমেন্ট হাউসে যান নাই। তাঁহার অন্য রকম সভা-পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক গমন করিলে ভাল হইত।" (দ্রঃ 'গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা', জানুয়ারী ১৮৬৭) উক্ত সংবাদপত্রটি জ্ঞানদানন্দিনীর 'জাতীয়বস্ত্র পরিধান'কে কটাক্ষ করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বাঙ্গালী গৃহবধূর জাতীয়বস্ত্র পরিধান যে কি মহান্ জাতীয় আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল তা বিস্ময়জনক। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। দীর্ঘকাল বিলাতে কাটিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরলেন, দেখা গেল জাহাজ থেকে নগেন্দ্রনাথ চিরন্তন বাঙালীর ধুতি-চাদরে আবৃত হয়ে নামছেন। জ্ঞানদানন্দিনীর এই স্বদেশচিন্তা নিঃসন্দেহে সত্যেন্দ্রনাথের বংশানুক্রমিক অবিমিশ্র স্বদেশ-প্রীতির ফল।

সত্যেন্দ্রনাথ বাল্যকালে বিদ্যালয়ে নবগোপাল মিত্রের মত, বিলাত যাত্রাকালে মনোমোহন ঘোষের মত, ব্রাহ্ম আন্দোলনে কেশব সেনের মত এবং কর্মসূত্রে প্রবাসকালে মহারাষ্ট্রের মহামতি রাণাডে ভোলানাথ সারাভাই প্রমুখের মত চিন্তানায়ক সহানুধ্যায়ী বন্ধুদের সাহচর্য পেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সে-কারণে তাঁর মানসবৃত্তি স্বদেশ-লগ্ন হতে পেরেছিল। হিন্দু মেলায় তাঁর যোগদানও সেই স্বদেশ-চিন্তার সফল ও অনিবার্য পরিণতি বলা যেতে পারে।

কলকাতায় যখন জাতীয় মেলার উদ্বোধন হয় (১৮৬৭) সত্যেন্দ্রনাথ তখন কর্ম-স্থল আমেদাবাদে। দ্বিতীয় অধিবেশন-কালে তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং বন্ধু নবগোপাল ও ভ্রাতাগণের উৎসাহে জাতীয় মেলার কাজে যোগদান করেন। এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন—

"আমি বোম্বায়ে কার্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী মেলা' প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা গণেন্দ্রনাথ তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ল। ..এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা।" (দ্রঃ আমার বাল্যকথা)।

জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "মিলে সবে ভারত সন্তান" রচনা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশন ছাড়াও গানটি হিন্দু মেলার প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই উদ্বোধন-সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হত। সত্যেন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই

প্রথম হয়। মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ] সেই সময় বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন।" (দ্রঃ জীবনস্মৃতি)। ডিরোজিওর পরে বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত সেই প্রথম ভারত সংগীত সেখানে দৃপ্ত নিনাদে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান ॥
ভারতভূমির তুল আছে কোন্ স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী;
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয় ॥
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়,
* * * *
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥ ইত্যাদি

দ্রঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রস্তুয়মান নূতন সংস্করণ)।

সত্যেন্দ্রনাথ যেকালে ভারতের জয়গান গেয়েছেন, যেভাবে 'অধীনতা-রজনীর সুগভীর সে তিমির' ভেঙ্গে ফেলে স্বাধীনতারূপ 'দীপ্ত দিনমণি'র উদয়-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন,—সেই কালে তা বিস্ময়কর শুধু নয়—চিন্তারও অতীত ছিল। বিশেষ করে ভারত-ভক্তির সেটি উষাকাল। সত্যেন্দ্রনাথের এই গানটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন; "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক। (দ্রঃ বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯)।

এ মন্তব্য যথার্থ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের ভারতসংগীত সমকালীন বাঙ্গালা দেশের প্রথম কথাশিল্পীর প্রাণে ভারত-চেতনার ফলবতী বীজ উপ্ত করেছিল। তাঁর ভারত সংগীত হিন্দু মেলার সর্বভারতীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গীর এবং ভারতীয় জাতি-চেতনার মূর্ত প্রকাশরূপে আদৃত। বাংলা দেশের সীমা ছাড়িয়ে হিন্দু মেলার কর্মিগণের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, '......চারিদিকে ভারত, ভারত-ভারতী কাগজ বের হল। বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ভারতীয় ভাবের উৎপত্তি হল ওই তখন থেকেই, তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখলে।" (দ্রঃ ঘরোয়া)

জাতীয় জীবনে ভারতবোধের সঞ্চার করার বিষয়ে, এই কারণেই হিন্দু মেলা ও সত্যেন্দ্রনাথের ভারত-সংগীতের অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্বে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সত্যেন্দ্রনাথের ভারত-সংগীত সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'স্বদেশানুরাগী' নিবন্ধে লেখা হয়েছিল—

"শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা বিরচিত স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সংগীত আমাদিগের দেশের লোকের মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপন কার্যে অল্প সহকারিতা করে নাই।" (দ্রঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঃ আশ্বিন ১৭৯৮ শক, ৩৯৮ সং)

মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে সত্যেন্দ্রনাথকে কর্মোপলক্ষে থাকতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় হিন্দু মেলার কাজের সঙ্গে এবং অন্যান্য নানান সামাজিক কাজের সঙ্গে তিনি পূর্বাপর যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছেন। কখনও কখনও হিন্দু-মেলার অধিবেশনে যোগদানও করেছেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের [illegible]পুরস্থ বাগানবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলার ষষ্ঠ অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। "নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মেলার প্রকাশ্য অধিবেশন যথারীতি আরম্ভ হইল। রাজা কমলকৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতির পার্শ্বে গণ্যমান্য পণ্ডিত ও বক্তাগণ এবং সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপবেশন করেন।" (দ্রঃ জাতীয়তার নবমন্ত্র ঃ যোগেশচন্দ্র বাগল)।

বোঝা যাচ্ছে যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মেলার একজন সম্মানীয় এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হত।

চিন্তা ও চেতনায় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। নবযুগের পূজারী জাতীয়তাবাদী বন্ধু নবগোপাল তাঁর স্বদেশভাবনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নবগোপালের উগ্র দেশপ্রেমকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। নবগোপাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পরে তিনি লিখেছিলেন, "তখনকার কালে নবগোপাল 'ন্যাশনাল' দলের দলপতি ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা অর্জন করেছিল; দুঃখের বিষয় সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হল না, শীঘ্রই নিবে গেল। এই স্বদেশী ভাবের যে পুনরুদ্দীপন হয়েছে, এ ভাব যদি দেশময় বিস্তার লাভ করে শাশ্বতকাল স্থায়ী হয়, তাহলেই দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়।" (দ্রঃ আমার বাল্যকথা)।

সত্যেন্দ্রনাথের সকল কাজের মধ্যে মূল প্রেরণারূপে সদাসচেতন ছিল স্বদেশভক্তি। রাজকার্যে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি স্বদেশ-চিন্তা থেকে বিস্মৃত হন নি। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পরে নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের নবম অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে তিনি যে ভাষণ দেন, তার মধ্যেও তাঁর সেই পরিশীলিত দেশভক্তির সুপরিকল্প প্রকাশ দেখা যায়। ভাষণে তিনি বলেন—

"We have, in this country, not only to represent our grievances to Government, but also to educate the masses of our own people to bring them to an intelligent appreciation of public affairs, so that they may learn to think and speak for themselves, and thus bring the weight of the public opinion of a whole people to bear upon the proper administration of the country?" (দ্রষ্টব্য ঃ অমৃতবাজার পত্রিকার ইংরাজী প্রতিবেদন থেকে সাহিত্য সাধক চরিতমালা/সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অংশ উদ্ধৃত)।
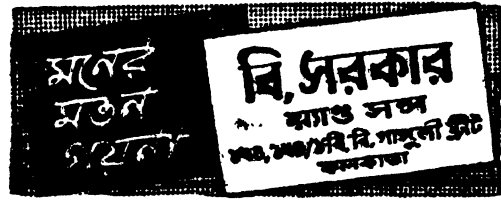
চিত্র-পরিচালক তরুণ মজুমদার

পরিচালকের চেহারা বলতে যদি আপনি আপনার মনে কোন বিশেষ ছবি এঁকে থাকেন তবে আপনি 'বালিকা বধূ' ছবির পরিচালককে দেখে হোঁচট খাবেন। কারণ তথাকথিত পরিচালকদের মত ইন্টেলেকচুয়াল কোটেশনের বাণী তুলে সস্তা মোহের জাল বিছানোর মত মানুষ নন তরুণ মজুমদার। আর ভাগ্যের জোরে চেহারাটাও হয়েছে অতি সাধারণ গোছের। অথচ দেখুন ছবি তৈরী করার ব্যাপারে চেহারা বা কথার কোন মিল এঁর নেই। প্রথম জীবনে 'যাত্রিক' পরিচালক-গোষ্ঠীর অন্তরালে 'চাওয়া পাওয়া' এবং 'স্মৃতিটুকু থাক'-এর মত ছবি তোলেন তরুণ মজুমদার। সেদিনের বিদগ্ধ দর্শকগণ ছবি দু'টি দেখে খুশী হন নি।

না হওয়ার কারণও যথেষ্ট ছিল ছবি দুটির মধ্যে। কিন্তু সেদিন এই না-হওয়ার মধ্যে যে এক বিরাট 'হওয়া' লুকিয়ে ছিল সেটা অনেকেই বুঝতে পারেন নি। পায়ের নীচের মাটি শক্ত হলেই মানুষ নতুন পথের সন্ধানে ছুটতে পারেন। চোরা-বালিতে ছোটার দূরত্ব কয়েক কদম। সুতরাং সেই পায়ের নীচের মাটি শক্ত করে মজবুত প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে ভালো ছবি গড়ার কাজে হাত দিলেন তরুণ মজুমদার। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে কিছু আছে, তার প্রমাণ দিলেন পরবর্তী দুই ছবি 'কাচের স্বর্গ' ও 'পলাতক'-এর মাধ্যমে। পূর্বের সেই বিদগ্ধ দর্শক-গণের ব্যঙ্গোক্তি মুখের রেখায় ফুটল আনন্দের ফুলঝুরি।

একদিকে বক্স অফিস স্টারদের নিয়ে তৈরী চলেছে ছায়াছবি, অপর দিকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার, মৃণাল সেনের মত গুণী পরিচালকদের সারিবদ্ধভাবে আগমন ঘটেছে 'এক্সপেরিমেণ্টাল' ছবি তৈরী করার কাজে। এই দু'য়ের মাঝেই তৈরী হল বক্স অফিস স্টার ছাড়া ছবি 'কাচের স্বর্গ'। কোয়ালিটি আর কমার্শিয়াল সার্থকতা একসঙ্গে এসে জমল ছবির ভাগ্যে, তারপর 'পলাতক'। সুপার, সুপার, সুপার হিট ছবি।

'যাত্রিক'গোষ্ঠী থেকে তরুণ মজুমদার বেরিয়ে এসে প্রথম স্বনামে যে ছবিটি তুললেন, তার নাম 'আলোর পিপাসা'। সুধী দর্শকদের ছবিটি ভালো লাগলেও অর্থকরী ব্যাপারে প্রযোজকের মোটেই ভালো লাগল না চিত্রটি। বেশী না হলেও কিছু অর্থকরী লোক-সান খেল 'আলোর পিপাসা'।

এরপর তরুণ মজুমদার নিজেই এক প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন, যার নাম হল 'চিত্রদীপ'। ব্যানারের প্রথম ছবি 'এইটুকু বাসা'। নির্মল এক ঘরোয়া হাসির ছবি হিসাবে একে বরণ করে নিলেন দর্শকরা। ছবিটি পয়সা পেল। আর সেই পয়সা আর সার্থকতার উদ্দীপনায় তরুণ মজুমদার ব্যানারের দ্বিতীয় ছবি 'বালিকা বধূ।'

সেই বাল্যকাল থেকে ছায়াছবির প্রতি এক বিরাট আকর্ষণ ছিল তরুণ-বাবুর। ছাত্রজীবনে তাই তিনি ছায়াছবির নানান বইএর মধ্যে ডুবে থাকতেন। কোথাও ভালো ছবি এসেছে শুনলে ছুটতেন দেখতে। এমনি ভাবে গড়াতে গড়াতে তিনি এসে পৌছলেন বি, এস, সি ক্লাসে, কেমিস্ট্রীতে অনার্স

চিত্র-পরিচালক তরুণ মজুমদার

নিয়ে। তৈরী হতে লাগলেন ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। কিন্তু পরীক্ষার মুখে দেখা দিল কঠিন বসন্ত রোগ। রোগে আক্রান্ত তরুণ মজুমদার শেষ অবধি পরীক্ষা দিতে পারলেন না। মনস্তাপে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ঠিক করলেন—আর পরীক্ষা নয়, এবার সুরু হোক চলচ্চিত্র-জীবনের পরীক্ষা।

এক বন্ধুর চিঠি নিয়ে হাজির হলেন পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জীর কাছে। তিনি তখন রূপশ্রী স্টুডিওতে তুলছেন 'রূপান্তর' চিত্রটি। তরুণ-বাবুকে সাধারণ পরীক্ষা করে অর্ধেন্দু-বাবু খুশী হয়ে তাঁকে সহকারী করে নিলেন। কিন্তু প্রথম দিন কাজ করার পরই বাধা এল। চলচ্চিত্র-সহকারী সংস্থা আপত্তি তুললো 'নতুন ছেলেকে কাজ দেওয়া চলবে না।' নিরুপায় তরুণ-বাবুকে ব্যর্থ মনোরথে 'রূপান্তর' ছবির কাজ ছেড়ে দিতে হ'ল।

এ ছবিতে নিজের নাম মুছে গেলেও চলচ্চিত্র-জগৎ থেকে নিজের নাম মুছতে দিলেন না তরুণবাবু। বিরাট আশা নিয়ে ধরে বসলেন মেজ মামাকে; মেজ মামা হচ্ছেন সুখ্যাত প্রচারবিদ্ সুকুমার ঘোষ। নামী প্রচার সংস্থা অনুশীলন এজেন্সীর অন্যতম কর্ণধার।

ভাগ্নের আবদারে বশ হয়ে তিনি অবশেষে তরুণবাবুকে তাঁর প্রচার-সংস্থার সহকারী করে নিলেন। সহ-কারী পরিচালক না হলেও এক চলচ্চিত্রকুশলী হিসাবে তরুণ মজুমদার নতুন উদ্যমে জীবন সুরু করলেন।

কানন দেবীর 'মেজদিদি' ছবির মাধ্যমে তরুণবাবুর জীবন আরম্ভ হল। তারপর একের পর এক ছবিতে সহকারী প্রচারবিদের দায়িত্ব বহন করেন তিনি। মামার সহযোগিতায় অনেক সময় নিজেই মনোমত ডিজাইন তৈরী করেন, যা দেখে শুধু সুকুমার ঘোষ (মেজমামা) অবাক হন না, অপরেও আনন্দিত হন তাঁর এই অল্পবয়সের গুরুগম্ভীর কাজ দেখে। এই অনেকের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন খ্যাতিময়ী নায়িকা ও প্রযোজিকা কানন দেবী।

একরকম কানন দেবীরই প্রচেষ্টায় তরুণবাবু শ্রীমতী পিক্‌চার্স-এ যোগদান করেন, সহকারী পরিচালক হিসাবে। কোন পারিশ্রমিক নয়, সম্পূর্ণ 'আনপেড এ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে তিনি সহকারী পরিচালকের কাজ সুরু করলেন, 'নব বিধান' ছবিতে। ছবিটির পরিচালক ছিলেন হরিদাস ভট্টাচার্য। এরপর একটানা পাঁচ বৎসর 'আনপেড' সহকারী হিসাবে তিনি কাজ করেন হরিদাসবাবুর সঙ্গে। অবশ্য কানন দেবী তাঁকে কিছু দক্ষিণা দিতে চেয়েছিলেন, তিনিই স্ব-ইচ্ছায় সে অর্থ গ্রহণ করেন নি। কারণ তখনও তিনি অনুশীলন এজেন্সীর সঙ্গে যুক্ত। অর্থকরী ব্যাপারটা সেখানের সঙ্গেই যুক্ত।

এরপর এল ১৯৫৮ সাল। হরি-দাসবাবুর তিন সহকারী অর্থাৎ তরুণ মজুমদার, দিলীপ মুখার্জী ও শচীন মুখার্জী মিলে তৈরী করলেন 'যাত্রিক' পরিচালক গোষ্ঠী। বলা বাহুল্য যে, 'কাচের স্বর্গ' ছবির কাহিনীকার ও 'পলাতক' ছবির চিত্রনাট্যকার ছিলেন তরুণ মজুমদার। আর এই কারণেই তাঁর স্থান ছিল সবার ওপরে। স্ব-নামে ছবি গড়ার ডাক আসতো তাই মাঝে-মধ্যে। 'যাত্রিক' ভেঙ্গে স্ব-নামে ছবি তৈরীর মোহ জাগে নি সেদিন তাঁর মনে। কিন্তু যেদিন সত্যিকারের ফাটল দেখা দিল 'যাত্রিক'-গোষ্ঠীর মধ্যে, সেদিন তিনি ছদ্মনামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন পরিচালকের জগতে।

তরুণ মজুমদারের ছবিতে কাহিনীর প্রাধান্য দেখা দিলেও তাঁর মতামত কিন্তু ভিন্নমুখী। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন ছবি তৈরীর সময়

তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'রাহগীর' চিত্রে সন্ধ্যা চিত্র : দিলীপ বসু

'রাহগীর' চিত্রে নায়ক বিশ্বজিৎ ও পদ্মা চিত্র : দিলীপ বসু

কাহিনীর কথা না-ভেবে 'আইডিয়া'র কথা ভাবা উচিত। অবশ্য আইডিয়াকে মালা রূপে গাঁথতে গেলে কাহিনীর প্রয়োজন কিছুটা এসে যায়। 'বাসনায়' ছুঁচ দিয়ে ফুল গেঁথে মালা হয় ঠিকই, কিন্তু ফুলই যদি না থাকে তবে 'বাসনা'র কোন প্রয়োজন আছে কি? চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কাহিনীও সেইরূপ। ভালো 'আইডিয়া' যদি না থাকে তবে কাহিনী সম্পূর্ণ অপাংক্তেয়।

নতুন যুগের সার্থকনামা পরিচালক হলেও তরুণ মজুমদার কিন্তু অতীতকে অস্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, 'যাঁরা ছবি করতে এসে শুধু ভালো ছবির কথাই ভাবেন, কমার্শিয়াল সাকসেস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাঁরা চলচ্চিত্র জগতের শত্রু। চলচ্চিত্র-শিল্পীর হাতের ক্যানভাস বা কবির হাতের কাগজ নয়। ভালো লাগছে না তো ছিঁড়ে ফেলে নতুন কাগজ নিয়ে আবার সুরু কর।

এখানে ছবি করতে হলে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। যে টাকা বেশীর ভাগই যোগান অন্য লোকে। সুতরাং অপরের টাকা নিয়ে ছবি করার সময় সদাই মনে রাখতে হবে টাকাটা যেন ফেরৎ আসে। কারণ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে 'মরালি বাউণ্ড' থাকেন পরিচালকটি প্রযোজকের কাছে। পরিচালকের মধ্যে আর একটা বড় গুণ থাকা উচিত—সততা। যে যত বেশী সৎ সে তত উঁচু জাতের শিল্পী। অসৎ উপায়ে সাময়িক সার্থকতা এলেও পরিশেষে কিন্তু দেখা যায়, সবাই 'আনসাকসেস-ফুল' হয়েছে। সুতরাং ছবি তৈরীর শুরুতেই পরিচালকের মনোবল ঠিক করে নেওয়া এক বিরাট কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

'বালিকা বধূ'র অসাধারণ সাকসেস দেখে তরুণ মজুমদার স্টার কাস্টের কথা ভুলে নতুন শিল্পী দিয়ে ছবি করার কথা ভাবছেন। তবে একটা কথা হ'ল চরিত্রের অনুযায়ী প্রয়োজনে তিনি নামী শিল্পী ঠিকই নেবেন। শিল্পীকে তিনি স্টার হিসাবে ধরতে নারাজ, তাকে চান প্রাণকর্তা হিসাবে। আর তা' ছাড়া স্টারদের ব্যক্তিগত ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি মোটেই বিরক্ত নন। আজকের উত্তমকুমার—সুচিত্রা সেন যদি সেদিন যাত্রিক-গোষ্ঠীকে সব দিক দিয়ে সাহায্য না করতেন, তবে আজকের তরুণ মজুমদারের প্রকাশ হয়তো এখনও ঘটতো না।

—তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোকে মধুবালা

গত ২৩-এ ফেব্রুয়ারী, রবিবার বোম্বাই চিত্র-জগতের স্বনামধন্যা শিল্পী মধুবালা মাত্র ৩৬ বছর বয়সে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিতা হয়েছেন। মধুবালার অকাল-মৃত্যুতে চলচ্চিত্রে যে অপূরণীয় ক্ষতি হল তা বলার নয়। তাঁর অভিনয় প্রতিভায় লক্ষ লক্ষ দর্শক মুগ্ধ হতেন। মধুবালার অভিনয় সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৯৪১ সালে মধুবালা চিত্রজগতে যোগ দেন। 'নাজমা' চিত্রে অশোককুমারের বিপরীতে প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। মধুবালার শেষ অভিনয় কে আসিফের মুঘল-ই-আজম চিত্রে। ১৯৩৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রখ্যাতনাম্নী চিত্রাভিনেত্রীর অকালমৃত্যুতে হিন্দী চিত্রজগতে এক বিরাট অভাব সূচিত হল।

প্রতিভাময়ী সোফিয়া লোরেন

মানুষের মনে আবেদন জাগানোর ক্ষেত্রে রূপ বা সৌন্দর্যই যে একমাত্র মাপকাঠি নয়, দুর্বার আকর্ষণীয় শক্তির সার্থকতা শুধু রূপলাবণ্যের প্রতিই যে নির্ভরশীল নয়,—যাঁদের দৃষ্টান্তে কথাটি প্রমাণ করা যায়—সোফিয়া লোরেন তাঁদেরই অন্যতমা। ঈশ্বর তাঁকে ভুবন-ভোলানো রূপ দেন নি, হৃদয়ভরানো দীপ্তিতে পূর্ণ করেন নি, পরাণমাতানো লাবণ্যে অনুপমা করে তোলেন নি—কিন্তু দিয়েছেন এক অসাধারণ আকর্ষণীয় শক্তি, যার আবেদনে পৃথিবীর অসংখ্য দর্শক সাড়া না দিয়ে পারেন নি। পৃথিবীর নানা দেশের নানা দর্শক তাঁর একান্ত অনুরাগী, পরম ভক্ত। তাঁর

'অ্যাটিলায় রাজকুমারী ওনোরিয়ার ভূমিকায় সোফিয়া লোরেন

ছবি এলে সাড়া পড়ে যায় দর্শক-সমাজে। তাঁর নামে একটা হিল্লোল যেন বয়ে যায় পরিপার্শ্ব জুড়ে। এমনতরো এক দুর্লভদ্রব্য আকর্ষণীয় শক্তির অধিকারিণী হলেন সোফিয়া লোরেন।

বয়েস এখনও চল্লিশে পৌঁছায় নি। গত বিশে সেপ্টেম্বর তাঁর ছত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। বাল্যকাল এবং প্রথম কৈশোর কেটেছে নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর। অভাব, অনটন আর অস্বাচ্ছল্য সেদিন ছিল নিত্যসঙ্গী। 'নিপোলিটান বিউটি কনটেস্ট'-এ যোগ দিলেন। ষোল বছর বয়সে নির্বাচিতা হলেন 'প্রিন্সেস অফ দ্য সী।' ফিল্ম এক্সপেরিমেণ্টাল সেণ্টারে যোগ দিলেন। তারপর ইতালীর প্রণয়মূলক পত্রিকাগুলির আলোকচিত্রের মডেল-রূপে তাঁকে দেখা গেল কিছুকাল।

ইতালীয় চলচ্চিত্রেই তাঁর হাতে-খড়ি। তখনও যৌন আবেদনসম্পন্না এক তরুণী ছাড়া তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে নি। 'বয় অন এ ডালফিন' ছবির মাধ্যমে আমেরিকার চিত্রজগতে তাঁর প্রবেশ ঘটল। তারপর হাউস বোট, ব্ল্যাক অর্কিড, লিজেণ্ড অফ দ্য লস্ট। জনপ্রিয়তার তুঙ্গশীর্ষে উঠলেন সোফিয়া লোরেন। যে জয়-যাত্রা তাঁর সুরু, তা অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলল। আজও তা অপ্রতিহত। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে হোয়াইট শ্লেভারী, এ্যাটিলা, টু নাইটস উইথ লিওপেট্রা আয়ডা, নিপোলিটান ক্যারুসেল, এল সিড, কাউণ্টেস ফ্রম হংকং, ইয়েস্টারডে, টুডে এ্যাণ্ড টুমরো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়কীর্তি 'টু উই-মেন'—এই ছবিতে তাঁর অভিনয় এক কথায় অবিস্মরণীয়। সে অভিনয়ে প্রমাণ হল তিনি কত বড় শিল্পী। এই চিত্র তাঁকে অসংখ্য সম্বর্ধনা ও পুরস্কারে বিভূষিতা করেছে। তার মধ্যে

প্রথম যৌবনে সোফিয়া লোরেন

উল্লেখযোগ্য হল নিউইয়র্ক ক্রিটিকস এ্যাওয়ার্ড এবং অস্কার পুরস্কার(১৯৬১)।

অস্কার-বিজয়িনী সোফিয়া কার্লো পন্টিকে বিয়ে করেছেন। ইতালীয় আইন এ বিবাহ মানে না, কিন্তু সোফিয়া দৃঢ় নির্ভীক ও অবিচল। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—আইন মানুক আর না মানুক—কার্লোই আমার স্বামী। অল্পকাল আগে সোফিয়া একটি পুত্রের জননী হয়েছেন।

—চিত্রপ্রিয়

সংকেত

সম্প্রতি বৈশাখী সংস্থা গাঙ্গুলী বাগান ইস্ট রোডে কিরণ মৈত্রের মঞ্চসফল নাটক 'সঙ্কেত' অভিনয় করে সুধীজনের প্রশংসা লাভ করেছেন, এই নাটকে দয়াময়-এর চরিত্রে পৃথ্বীশ গুহনিয়োগী, ডাঃ সরল রায়ের চরিত্রে পার্থসারথি সেনগুপ্ত, মিঃ মজুমদারের চরিত্রে প্রণয় চট্টোপাধ্যায় ও স্বপ্নার চরিত্রে কল্যাণী মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, সর্বোপরি তাঁদের সাবলীল ভঙ্গীটুকু লক্ষণীয়, অন্যান্য চরিত্রে শঙ্কর রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন চক্রবর্তী, কল্যাণ দাশগুপ্ত, নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপা সেন ও অদিতি অধিকারী তাঁদের চরিত্রগুলি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সর্বোপরি যাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠায় এই নাটকের সাফল্য সূচিত হয়েছে, তিনি হলেন নাট্যনির্দেশক অমিতাভ অধিকারী।

নবীন সন্ন্যাসী

সম্প্রতি ক্যালকাটা মিউজিক এণ্ড আর্ট সেণ্টারের একাদশ বার্ষিক উৎসব হয়ে গেল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন, সুস্মিতা ঘোষের ভারতনাট্যম্ প্রশংসনীয়। অনীতা রায়ের সূর্যপ্রণাম নৃত্য দর্শকদের উপভোগ্য হয়ে ওঠে, কণ্ঠ-সঙ্গীতে পারদর্শিতা দেখান শিবানী ঘোষ, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা মজুমদার, মণিদীপা দাস ও মিনতি মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল 'নবীন সন্ন্যাসী' নাটক। নাটকের প্রতিটি চরিত্রে রূপদান করেন মেয়েরা, কখনো মনে হয় না পুরুষ চরিত্রে নারীরা অভিনয় করছেন, অপূর্ব এঁদের দলগত অভিনয়, অনীতা ঘোষের দীননাথ, দেবী দাসের ভিক্ষুক, বাণী ঘোষের জগন্নাথ, শম্পা পালের দীনতারিণী এবং গোপা পালের অন্নদা প্রাণবন্ত, আরতি পালের শ্যামানন্দ অনবদ্য চরিত্রসৃষ্টি। শিল্পীর বাচনভঙ্গী ও অভিব্যক্তির প্রকাশে প্রতিভার পরিচয় মেলে। নাট্য-নির্দেশনার কৃতিত্ব পুলিনবিহারী চক্রবর্তীর।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

সম্প্রতি ভদ্রেশ্বর টাউন হলে রবি চক্রের চতুর্দশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল নাটক ও সঙ্গীত। সুকুমার সুর, নরোত্তম দাস বাউল, দীপ্তি চক্রবর্তী এবং সংস্থার ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এর পরের নাটক ছিল 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'; অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন —সুনীল চক্রবর্তী, সুদর্শন মুখোপাধ্যায়, বিমল নিয়োগী, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিভূতি ঘোষ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, স্বাধীন গঙ্গোপাধ্যায়, শিশির সুর, অরুণ মুখোপাধ্যায় ও ইরা মিত্র। নাট্যনির্দেশক ছিলেন সুনীল চক্রবর্তী।

ঝিঁঝিপোকার কান্না

দুর্গাপুরে (হেভিটাউনশিপে) বিশ্বকর্মা নগরে অগ্নিদূতের একাঙ্ক নাটক ঝিঁঝিপোকার কান্না অভিনয় করলেন। প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত, অভিনয়ে অংশ নেন গোবিন্দলাল ঘোষ, অনিল অধিকারী, অশোক মুখার্জী, বাদল দত্ত, জয়দেব পোদ্দার, গৌরাঙ্গচন্দ্র গুহ, দীপককুমার রায়, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ ও রঞ্জিতকুমার মালখণ্ডি।

দুর্গাদাস

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের (শিয়ালদহ) মঞ্চে পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ ক্লেমস্ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে ডি এল রায়ের 'দুর্গাদাস' ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়।

নাটকের প্রারম্ভে শ্রী পি এন ত্রিবেদী প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও শ্রীপরেশনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৃষ্ঠপোষক মহাশয়গণ ভাষণ প্রদান করেন এবং ক্লাবের সহসভাপতি শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তরবঙ্গের বন্যার সাহায্যার্থে পাঁচশত একটাকা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তৎপর শ্রীমতী নমিতা নৃত্য প্রদর্শন করেন।

এই নাটক উপলক্ষে একটি সোভিনের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন ভূমিকায় এমেচার হিসাবে সমবেতভাবে সকলেই পারদর্শিতা দেখান। তার মধ্যে দুর্গাদাসের ভূমিকায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ওরংজেবের ভূমিকায় শ্রীপ্রিয়তোষ ভৌমিক, রাজসিংহের ভূমিকায় শ্রীঅনিলকুমার চ্যাটার্জী, সমরদাসের ভূমিকায় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষাল, কাশিমের ভূমিকায় শ্রীপরিমল ব্যানার্জী; কামবক্সের ভূমিকায় কবি ও সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়; গুলনেয়ারের ভূমিকায় শ্রীমতী সান্ত্বনা ঘোষ, মহামায়ার ভূমিকায় শ্রীমতী সবিতা মুখার্জীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাট্য পরিচালনা করেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়।

শীতের রাত উপেক্ষা করে বহু দর্শকের সমাগম ও প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়েছিল।

মৌসুমী মন

সামাজিক প্রেমের কাহিনী 'মৌসুমী-মন।' মৌসুমী মন কাহিনীটি রচনা করেছেন শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী। মৌসুমী মন চিত্রটির পরিচালনার গুরু দায়িত্ব বহন করছেন শ্রীসমর চৌধুরী। কাহিনীর চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীচৌধুরী। চিত্রটির সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ, সঙ্গীত-পরিচালনা ও গীত রচনার দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে অনিল সরকার, গণেশ বসু, অনিল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্র রূপায়ণে সর্বেন্দর, মিতা চৌধুরী, অজিতেশ, শেফালী, জহর রায়, গীতা দে, মণি শ্রীমানি, রত্না ঘোষাল, সৌরভ মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, লতিকা দাশগুপ্তা, বেবী সুচিত্রা ও সিনে আর্টিস্টের শিল্পিবৃন্দ। বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

অরক্ষণীয়া

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর বিখ্যাত কাহিনী অরক্ষণীয়াকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন পরিচালক শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন বি এন রায় এ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গীর বিরাট সাফল্যের পর প্রযোজক শ্রী বি এন রায় শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন। চিত্রটির মুখ্য দু'টি ভূমিকায় দেখা যাবে 'বালিকাবধূ'-খ্যাত শ্রীমতী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে অভিনয় করছেন উদীয়মান তরুণ চিত্র-শিল্পী শ্রীস্বরূপ দত্ত। চিত্রটির সহভূমিকাগুলিতে বাংলার বহু খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীকে অভিনয় করতে দেখা যাবে।

ছায়াতীর

স্বনামধন্য সাহিত্যিক জরাসন্ধের কাহিনীকে রূপালী পর্দায় রূপদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন চিত্র-পরিচালক শ্রীসুশীল বিশ্বাস। কাহিনীর চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীবিশ্বাস। চিত্রটির সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটির শিল্পি-তালিকায় রয়েছেন অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতালি রায়, বিনতা রায়, রবি ঘোষ, নন্দিতা বসু, শ্রাবণী বসু, বিকাশ রায় প্রমুখ।

অন্য মাটি অন্য রঙ

হৃদয় কুশারীর সুর-সংযোজিত পারিবারিক চিত্র 'অন্য মাটি অন্য রঙ'। অন্য মাটি অন্য রঙ চিত্রটি পরিচালনা করছেন শ্রীরামপ্রসাদ চক্রবর্তী। চিত্রটিকে গানে সমৃদ্ধ করে তোলবার দায়িত্ব নিয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায় ও শিপ্রা বসু। চিত্রটির পরিবেশনার জন্য রয়েছেন ইম্পি ফিল্মস্। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন অনুপকুমার, গীতা দে, সুমিতা সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নবাগতা নূপুর বসু, শ্যাম লাহা, জহর রায় প্রমুখ। রামকৃষ্ণ পিকচার্সের চিত্র 'অন্য মাটি অন্য রঙ।'

এই ছায়াটুকু

সুসাহিত্যিক শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-এর কাহিনী কস্তুরী মৃগ অবলম্বনে তোলা হচ্ছে এই ছায়াচিত্রটি। চিত্রটি পরিচালনা করছেন অমল দত্ত। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁদের দেখা যাবে তাঁরা হলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, রায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, মিতা মুখোপাধ্যায়, দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

দৃষ্টিদর্পণ

দিলীপ দে-চৌধুরীকৃত কাহিনী 'দৃষ্টিদর্পণ'। দৃষ্টিদর্পণ চিত্রটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), অনিল চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার ও অন্যান্য সহ-শিল্পীরা। দৃষ্টিদর্পণ চিত্রটির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে

'অন্য মাটি অন্য রঙ' চিত্রের শিল্পী নূপুর বসু   চিত্র: অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র বোম্বাই

ভারতীয় হলিউড বোম্বাইয়ে ইদানীংকালে যে অনুষ্ঠানটি রঙে-রসে-রূপে কিংবদন্তীর সৃষ্টি করলো—সেটি বিবাহঘটিত। হিন্দী রাজ্যের রাজচক্রবর্তী শ্রীরাজ কাপুরের আত্মজার এই পরিণয়পর্ব শুধু বিগতই নয় আগামী অনেক অনেক দিন সবাইকে 'প্রভাবিত' করবে বলেই আশা করা যাচ্ছে। বাস্তবিক রাজ-দুহিতা রিতুর এই মিলন-উৎসবে সবকিছুর সমন্বয় সাধন করতে বরণীয় শিল্পী প্রযোজক পরিচালক শ্রীকাপুর তাঁর পিতৃ-হৃদয় উজাড় করে মেলে ধরেছিলেন। ধন-ভাণ্ডারও বাদ যায় নি। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা (তা দশ লক্ষ তো হবেই) অকাতরে ব্যয় করলেন এই পরম শুভ কর্তব্যকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনে।

সত্যিই দৃশ্যটি রমণীয় তথা স্মরণীয়। রাজ-গৃহে (বাঙলোয়) দুল্হন (বর) শ্রীরাজন সদলে বিবাহের জন্যে সমাগত। সেই 'বরাত'-এ এক সহস্র সর্বস্তরের গণ্যমান্য বরযাত্রী সমবেত—রাজকাপুর সপরিবারে (এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী কৃষ্ণা, শাম্মি ও শশীকাপুর স-স্ত্রীক, পুত্র ডাব্বু এবং পিতা পৃথ্বীরাজ) বর-আহ্বান করলেন। পুড়লো কতো বিচিত্র আতসবাজি, বাজলো রকমারি ব্যাণ্ডবাদ্য, নাচলো ভাংরা নাচের দল, হোলো বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান। এসবের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন কন্যার পিতামহ বিশালদেহী পৃথ্বীরাজ কাপুর। জনে জনে সবাইকে স্বাগত জানালেন আন্তরিকতার সঙ্গে।

রমেন চৌধুরী

বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী এইচ পি নন্দার পুত্র শ্রীরাজনের সঙ্গে শ্রীমতী রিতুর শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হোলো শনিবার। পরদিন রবিবার সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিলো আর কে স্টুডিওতে। আলোকমালায়, সাজে-সজ্জায় স্থানটিকে রূপকথার রাজ্য বলে মনে হয়েছিলো। বাঙ্কোয়েট হলের বিশাল বুক জুড়ে কতো না অতি-আধুনিক সাজ-বিন্যাস। বর-কনে সমাগত,—সুধীসজ্জনের আশীর্বাদ, শুভ-কামনা মাথা পেতে নিচ্ছিলেন। অপার্থিব সেসবের সঙ্গে পার্থিব অনেক উপহার সামগ্রী পর্বতপ্রমাণ হ'য়ে উঠছিলো।

সারা ভারতের চিত্রজগতের রথী-মহারথরা এসে হাজির হয়েছিলেন সব কাজ সরিয়ে রেখে। এদিনের নৃত্য-বাসরে যোগ দিয়েছিলেন পদ্মিনী, রাগিণী, ললিতা, হেমা, মালিনী—রফি, মুকেশ, মহেন্দ্র কাপুরের কণ্ঠে ছুটলো সুরের সুরধুনি। পরিশেষে বিচিত্র যে নৃত্য-পর্বটি সকলকে চমৎকৃত করেছিলো তাতে অংশ নিয়েছিলেন অশোককুমার, দিলীপ-কুমার, রাজ কাপুর, শাম্মি কাপুর—সেই সঙ্গে অগণিত নিমন্ত্রিত শিল্পী। মনে হোলো গোটা হলটাই যেন নেচে উঠেছে।

এ তো গেল ঘটা-পটা জাঁক-জমকের উদ্বাহ-অনুষ্ঠান। এর ঠিক কয়েকদিন আগেই ওই কাপুর-পরিবারের আরেক জনের শুভ বিবাহ কিন্তু এর বিপরীত পরিবেশে সমাধা হ'য়েছে। ইনি হ'চ্ছেন শাম্মি কাপুর। শাম্মি যাকে বলে নীরবে নিভৃতে তাঁর দ্বিতীয় বারের এই শুভ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। খুব ঘনিষ্ঠ মহলের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছিলেন পাশে; আর দরকারই বা কি, এ তো শুধু ভিড় বাড়ানো বই নয়। পাত্রী ভবনগরের রাজকন্যা নীলা। শ্রীমতী নীলা বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ 'অপসরা'-র মালিক রঘুবীর সিংয়ের সহোদরারূপে স্থানীয় মহলে যথেষ্ট পরিচিতা। সে পরিচিতি এখন বহুগুণে বর্ধিত হোলো সন্দেহ নেই। প্রথমা স্ত্রী প্রখ্যাতা অভিনেত্রী গীতাবালী আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করলে শাম্মি সম্পর্কে ইদানীং বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলছিলো। সে-সবের অবসান ঘটলো এখন সন্দেহ নেই।

নায়ক বিশ্বজিৎ

নৃত্য-পরিবেশনে উর্বশীরও যদি তালভঙ্গ হয়, তাহ'লে দেবরাজের মার্জনা মেলে না। স্বর্গের বিচার মর্তেও পুরোমাত্রায় প্রচলিত রয়েছে—এ তো সকলেরই জানা। এই বিচারের শিকার হ'য়ে এখানকার অন্যতম নায়ক রাজেন্দ্র-কুমার অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। না হয় কয়েকটা ছবিই তাঁর পর পর সাফল্যের সোনার মুখ দেখতে পায় নি। তাই বলে এ-ভাবে তাঁর প্রতিভার প্রতি কটাক্ষপাত! তিনি শিল্পীই নন? রাজকাপুর, দিলীপ-কুমারের সমপর্যায় তো দূরের কথা, আরো অনেক নীচের শিল্পীদের সঙ্গেও তিনি তুলনীয় নন। তাঁকে খড় জোর বলা যায় সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠিত ছবির নায়ক (সম্মিলিতভাবে পঁচিশ সপ্তাহ চলাটাও কি মুখের কথা, ব্যাপারটা বুঝতে পারলম না) তার বেশি কিছু নন।

এ সব আক্রমণের উত্তর শিল্পী বেশ সুন্দর ভাষায় দিয়েছেন। পরি-চালকরা যা খুশি কাহিনী নিয়ে ছবি করবেন, আর তার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী হবেন শিল্পী! মজার কথা সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে তিনি মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন যে, তিনি প্রথম শ্রেণীর ওই জাতশিল্পী অবশ্য নন। তাতে কি হ'য়েছে, আর্টিস্ট না হোলেও আর্টিজেন হ'তে বাধা কোথায়?—

এ ধরণের আঘাত পাওয়ার পর রাজেন্দ্রকুমার নিশ্চয় সিজনড হ'য়ে উঠেছেন। এখন থেকে খুব সন্তর্পণে চলবে তাঁর---এগুনো। শিল্পী সম্পর্কে সাম্প্রতিক খবর---উনি বেশ কয়েকটি ছবি নিয়ে এখন ব্যস্ত। আর একটা কথা হ'চ্ছে ওঁকে এবার অধিকাংশ ছবিতে নানান্ ছদ্মবেশে দেখা যাবে।

'শতরঞ্জ' নামে জেমিনীর যে ছবিতে রাজেন্দ্রকুমার অংশ-নিচ্ছেন, তাতে অন্তত সাত-সাতবার মেক-আপ বদল করতে হবে। এ রকম সাজ এবং আকৃতি পালটানোর দরকার হবে 'আনজানা' ছবিতে চারবার। দু'বার ছদ্মবেশ নিতে হবে গাঁওয়ার-এ। বলা দরকার, এ ছবিটি প্রযোজনা করছেন তাঁর অনুজ নরেশকুমার।

'আনজানা'য় রাজেন্দ্রকুমারের বাবার চরিত্রে প্রাণ অভিনয় করছেন। তাঁর চোখে ধূলো দিতেই উনি সিন্ধির সজ্জা নিয়েছেন। রাজেন্দ্রকুমারকে কিন্তু হুবহু সিন্ধি বলে মনে করবেন সবাই। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে স্টুডিওর লোকজনও সেদিন ঠকে গেছেন—সহজে কেউ চিনতে পাবেন নি ওঁকে। এ ছবিতেই উনি পার্শি, গুজরাটি, দক্ষিণ-ভারতীয়ের রূপসজ্জা নিয়েছেন। বিভিন্ন ভাষায় সংলাপ বলেছেন অনর্গল।

রাজেন্দ্রকুমার বান্দ্রায় তাঁর নিজের বাড়িতে উঠে গেছেন। কন্যা 'ডিমপল'-এর নামে গড়ে উঠেছে সাগর-বেলায় এই আশ্রয়-নীড়টি। বাংলো ধরণের বাড়িটি শিল্পিমনের পক্ষে খবই লোভনীয় বলে স্বীকার করেছেন সবাই।

●

পরিচালক শক্তি সামন্ত তাঁর নতুন প্রচেষ্টা 'জানে আনজানে'-র শুভ মহ-রতের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন সম্প্রতি। শ্রীসামন্ত কিন্তু এ-ব্যাপারে বাইরের মানুষজনের শরণাপন্ন হন নি। তিনি কুাপস্টিক দেওয়া এবং ক্যামেরার সুইচ অন করার জন্যে খ্যাতনামা সুরকারযুগল শঙ্কর ও জয়কিষণকে ধরে এনেছিলেন। নটরাজ স্টুডিওতে গত মাসে শুরু হয়ে গেছে চিত্রগ্রহণ। মহরতের শিল্পী ছিলেন বিশালদেহী জয়ন্ত।

ললিতা পাওয়ার এবং শাম্মী কাপুরকে নিয়ে নির্বাচিত দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। ছেলে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করছে---দৃশ্যটা ছিলো এই ধরণের।

মধুসূদন কালেকারের লেখা গল্পের সংলাপ রচনা করেছেন বৃজেন্দ্র গৌড়। ক্যামেরার দায়িত্বে থাকছেন অলোক দাশগুপ্ত।

লীনা চন্দ্রভারকর (সুনীল দত্তের আবিষ্কৃত) এই 'জানে আনজানে'-র নায়িকারূপে নির্বাচিতা।

প্রহ্লাদ শর্মা পরিচালিত 'দেবতা' চিত্রে রুকমানা চিত্র: অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

যশ চোপরার নতুন ছবির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে রাজকমল কলা-মন্দিরের ফ্লোরে। ধর্মেন্দ্র নায়ক, নায়িকা সেজেছেন সায়রাবানু। মনোমোহন কৃষ্ণ হচ্ছেন নায়িকার বাবা। নায়ক তার প্রেমিকার বাবার অধীনে কাজ করে। আসলে সে ইঞ্জিনীয়ার। ফিরোজ একটি বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। সহ-শিল্পীদের মধ্যে আছেন মমতাজ, কমল, অজিত, মণধাওয়া প্রমুখ। আখতার মির্জার গল্পের সংলাপ ও গান রচনা করেছেন যথাক্রমে আখতার উল ইমান এবং শাহির লুধিয়ান ভি। গানে সুর দিচ্ছেন রবি।

●

ছবির নাম 'তিন চেহরে'। খলিল আখতার পরিচালক। সুরেন্দ্র জৈন প্রযোজিত ছবিটি তোলা হ'চ্ছে রঞ্জিত স্টুডিওতে। সঞ্জীব কুমারের বিপরীতে রয়েছেন তনুজা। আর আছেন প্রাণ। মহম্মদ সফী লিখেছেন কাহিনী, সুর সংযোজনার দায়িত্ব তাঁর ওপরেই অর্পিত

●

সম্প্রতি 'আয়া শাওন ঝুমকে'-র একখানা গান চিত্রায়িত হোলো। বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি ছিলো বারিঝরা এক শাওন দিনের। আকাশ ভেঙে জল ঝরলে তবেই ছবির সুটিং হবে—এমন তো আর সচরাচর হয় না। বৃষ্টি নামাবার উপায় ছবির জগতে বিশেষভাবে রয়েছে। সেই পন্থাই কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করেছিলেন সেদিন। গোটা আষ্টেক ফায়ার ব্রিগেড তলব করা হয়েছিলো। তারাও পরম বশংবদের মতো এসে কর্তব্যকর্ম পরিপাটি করে সারছিলো। হোস পাইপে ছুটছে জলের ধারা, পড়ছে আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো আর তাতে ভিজতে ভিজতে নাচছেন ধর্মেন্দ্র এবং আশা পারেখ। ওঁরা হলেন দলের কাণ্ডারী, ওঁদের সঙ্গে বিরাট এক বাহিনী। দৃশ্যটি জমাট, দৃশ্যগ্রহণ করা হয়েছে বেশ লাগসই করে, খবরে জানা গেল।

'পাগলা কাঁহিকা' ছবিটি দস্তুর-মতো হাসিয়ে পাগল করবে বলেই আশা করা যাচ্ছে। গোটা সতেরো পাগলকে ছবিতে দেখা যাবে। পালের গোদা হচ্ছেন শাম্মী কাপুর। অন্য কয়েকটি পাগল সেজেছেন—অসিত সেন, বি কে মুখার্জী, মুলচাঁদ, মোহন চোটি ও সত্য মুখার্জী। নায়িকা আশা পারেখ। অন্যান্য চরিত্রে অংশ নিচ্ছেন কুন্দন ও সুন্দর।

পয়লা নম্বরের পাগল অর্থাৎ যে চরিত্রটি শাম্মী কাপুরের—সে আসলে সাজা পাগল। এক বন্ধুকে খুনের দায় থেকে রক্ষা করতে জান কবুল করে এগিয়ে এসেছে সোজা পাগলা গারদে। খুন করার পর ওর হয়েছে মস্তিষ্ক-বিকৃতি। কিন্তু পাগলদের হাটে কিছুদিন থাকতে থাকতে ও বুঝি সত্যিই পাগল বনে গেল!—তখন ওর মুখে একটা গান শুনতে পাওয়া যায়—'মেরে ভৈষকো ডাণ্ডা কিঁউ 'মারা'—ইত্যাদি।

এই পাগলা কাঁহিকা'-র কাজ যথারীতি হ'চ্ছে। ছবিটি পরি-চালনা করছেন শক্তি সামন্ত।

●

বাঙলা 'পলাতক' এখন হিন্দীর আশ্রয়ে। একে লালন পালন করে বড়ো ক'রে তুললেন হেমন্ত মুখার্জী ও তরুণ মজুমদার যুগ্ম-প্রচেষ্টায়। এখন এর নাম হয়েছে 'রাহগীর'। কলকাতায় তো অনেকদিন সুটিং হ'য়ে গেছে এর আগে, বর্তমানে চলেছে বোম্বাইতে চিত্রগ্রহণের শেষপর্ব। বিশ্বজিৎ ছবির নায়ক। সন্ধ্যা রায় (মজুমদার) নায়িকা। বিশ্বজিৎ এ ছবির কল্যাণে নতুনরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করতে চলেছেন—তথ্যাভিজ্ঞ মহলের তো সেই রকমই ধারণা। পুডিং-এর প্রমাণ তার স্বাদে—ভোজ তো এসেই গেল। সকলে নিশ্চয় সাগ্রহে এসময়টুক অপেক্ষা করতে পারবেন।

সমর চৌধুরী পরিচালিত 'মৌসুমী মন' চিত্রের নায়ক সর্বেন্দর ও নায়িকা মিতা চৌধুরী

সৃষ্টিধর্মী পরিচালক ঃ ইঙ্গমার বার্গম্যান

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বার্গম্যান কোন কিছু করার আগে কার্ল এ্যাণ্ডার্স ডিমলিংকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা চিত্রকাহিনীর কথা জানাতেন। বার্গম্যানের অবিস্মরণীয় চিত্র 'দি সেভেনথ শীল'-এর কাহিনী এইভাবে জানতে পারলেন ডিমলিং এবং যদিও এই ধরণের 'সিরিয়াস' কাহিনীকে চিত্ররূপ দিতে গেলে তার আর্থিক ঝুঁকি অনেক, তবুও এই ধরণের অনন্যসাধারণ কাহিনীকে রূপ দিতে তিনিও সচেষ্ট হলেন। ১৯৫৬ সালের মে মাসে কেনস ফেস্টিভ্যাল-এর সময় তাঁরা উভয়ে দিনের পর দিন বসে কাকে কি ধরণের চরিত্র দেওয়া যায় এবং ব্যয়ের পরিমাণ কি হতে পারে তাই আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলেন। এ সম্বন্ধে ডিমলিং বলেন, আমরা উভয়ে যেন একটা বড় জাহাজ জলে ভাসাতে চলেছি, যা অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং খুবই সুখদায়ক।

বার্গম্যানের চিত্রনাট্য রচনা অথবা কাহিনী রচনা সবই অদ্ভুত ধরণের। তিনি মুখে মুখে যে কাহিনী বলে গেলেন, চিত্রনাট্য বা চিত্রকাহিনী রচনার সময় কিন্তু তার অধিকাংশই যেত বদলে। 'দি স্টোরি অব স্মাইলস অব এ সামার নাইট'-এর কাহিনীটি গল্পাকারে যা বলেছিলেন, লেখার সময় তার কিছুই মিল ছিল না। অর্থাৎ মুখে মুখে বলা কাহিনীটিই আর একটি গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারত। বার্গম্যানের মস্ত বড় একটা সৌভাগ্য ছিল বলা চলে, যে তাঁর ছবির প্রয়োজন কোন দিন তাঁর চিন্তাধারায় বা কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নি। এর জন্যে সেই সব প্রযোজকদের নানা প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বার্গম্যানের ডায়ালগ এবং চিত্রনাট্য সম্বন্ধে এখানে আরো একটু বিশদ আলোচনা করা যাক। বার্গম্যানের মতে ছন্দ এবং ভাবের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে, যা অতি সহজভাবে পৃথক করা যায়—তা থেকে ডায়ালগের সৃষ্টি। 'ডায়ালগ'—তিনি বলেছেন একটি সাঙ্গীতিক গণনা চিহ্ন। সাধারণের কাছে তা প্রায় বোধগম্য নয়। এর অবোপিত অর্থ জানতে হলে শিল্পসম্বন্ধীয় কুশলতা এবং সেই সঙ্গে কল্পনাশক্তি ও বোধশক্তিও থাকা প্রয়োজন। তাঁর মতে অনেক অভিনেতার মধ্যে এসব গুণের অভাব। একজন ভাল ডায়লগ লিখতে

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পারেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, ছন্দ ও গতি কি হবে তা সীমিত রাখা বা আংশবিশেষ বাদও দেওয়া যায় কিনা তার সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। একখানি পরিপূর্ণ চিত্রনাট্য পাঠোপযোগী এবং সুখপাঠ্য নাও হতে পারে।

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত অনুশাসন বলতে যা বোঝায়, বার্গম্যান সব সময় শিল্পের সেই নিয়ম মেনে চলতেন। তাই তাঁর ছবিতে নাটকীয়তা গতিবৈচিত্র্য, সংঘাতনির্ভরতা প্রভৃতির স্পষ্টতা প্রায় অনিবার্যরূপেই চোখে পড়ে। বার্গম্যানের বিশিষ্টতা এইখানেই। তাঁর ছবির বক্তব্য কেউ যদি নাও বুঝতে পারেন, তাঁর প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। বার্গম্যান সময়ে সময়ে এমনও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, যদি এমন কোন অঙ্কলিখন প্রণালী থাকে, যাতে করে তাঁর চেতনার দ্রুতসঞ্চারী কোন ইমেজ যখন পড়ে, তা তিনি ধরে রাখতে পারেন; কারণ ইমেজের ধরাছোঁয়ার কোন রূপ নেই। তবু সেগুলিকে যদি ছন্দোবদ্ধ কোন প্যাটার্নের মধ্যে আনতে পারেন তা হলে শব্দ আর বাক্যে সেগুলিকে রূপ দিয়ে সুসংবদ্ধ একটি চিত্রনাট্যের সৃষ্টি করতে পারেন।

চিত্রনাট্যের পর অপর যে প্রধান বিষয়টির প্রতি বার্গম্যানের লক্ষ্য সেটি হচ্ছে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগাযোগ না রাখা। যেহেতু দুটি ভিন্নরূপ শিল্পকলা, সেই হেতু এই দুটির যোগস্থাপন করলে নানারূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। উপন্যাসের কাহিনী পাঠ করার সময় পাঠকের মনের ওপর যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে, চলচ্চিত্রাকারে সে-কাহিনীর রূপ দিতে

বার্গম্যান পরিচালিত 'ম্যাজিসিয়ান' চিত্রের নায়ক ও নায়িকা

গেলে তার পরিবর্তন ঘটাতেই হয় এবং তাতে পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হয়। এতে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন পরিচালক। কারণ দর্শকসাধারণ বুঝতে চান না উপন্যাসের এই যে পরিবর্তন, পাঠকেরা যাকে বলেন---বিকৃতরূপ, এটা পরিচালকের ইচ্ছাকৃত নয়। তাই বার্গম্যান অবশ্যম্ভাবী এই সব বিপদকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন এবং যাতে তাঁর চিত্রে কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য নিজের চিত্রনাট্য তিনি নিজেই রচনা করে নিয়েছেন। তিনি কি বলতে চেয়েছেন ছবিতে তা জানতে হলে, এই একটিমাত্র মানুষকে বিশ্লেষণ করলেই যথেষ্ট। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ফিল্ম আর্ট হচ্ছে 'ইলিউশন' সৃষ্টি করা কিন্তু সাহিত্য তা নয়। এইখানে উল্লেখযোগ্য এই 'ইলিউশন' তৈরির আগ্রহ বার্গম্যানের মনে জাগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে যন্ত্রণাকাতর মানুষগুলোর বীভৎস রূপকে লক্ষ্য করে।

এরপর সঙ্গীত। বার্গম্যান যাকে চলচ্চিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন, কোন রকম বুদ্ধির দ্বারা নয় সোজাসুজি তা অন্তরে গিয়ে স্পর্শ করে। ছোটবেলা থেকেই তিনি সঙ্গীতকে ভালবাসেন এবং মনে হয় সেইহেতু তিনি মনে করতেন তার ছবি হবে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত।

বার্গম্যানের ছবিগুলি অতিমাত্রায় দুর্বোধ্য বলে যাঁরা আখ্যা দিতেন তাঁদের সম্বন্ধে বার্গম্যান বলতেন, ছবি যদি দর্শকের মনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে তাহলে তা কারখানায় তৈরি একটি কাঁচা মালের মতই দাঁড়ায়। সোজাসুজি তাকে তিনি ওয়ার্থলেস্ বলতেও দ্বিধা করেন নি। অবশ্য বার্গম্যান বলেছেন, ছবিকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বোধ্য করতে চান না অথবা নিজের এবং কয়েকজনের জন্য ছবি করেন না। তাঁর ইচ্ছা সর্বসাধারণ তাঁর সৃষ্টি উপভোগ করুন; কিন্তু তার মানে এই নয়---সস্তা কোন জিনিষ পরিবেশন করা।

স্টুডিওর মধ্যে বার্গম্যান মনে করেন, পরিচালকই সর্বেসর্বা। নিজস্ব অধিকার বলতে আর কারুরই সেখানে কিছু নেই। পরিচালকের কড়া শাসনে সকলকে বাঁধা থাকতে হবে। এতে দুর্নামের কোন প্রশ্ন নেই। প্রতিটি প্রতিভাধর এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পরিচালকের এ দুর্নাম আছে এবং আছে বলেই তাঁরা বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রতিভার স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

সমালোচকদের সম্বন্ধে বার্গম্যানের উক্তি হচ্ছে---তাঁর ছবির যেভাবে হোক সমালোচনা করার অধিকার তাঁদের আছে। তিনি নিজে থেকে সমালোচকদের কোন রকম নির্দেশ দিতে চান না। কারণ প্রত্যেকেরই অধিকার আছে নিজস্বভাবে চিন্তা করার। তাতে কেউ হয়তো আকৃষ্ট হবেন অথবা---ছবি তৈরি হয় দর্শকের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য, তা না হলে ছবির কোন মূল্যই নেই।

আজ সুইডেনের চলচ্চিত্র-জগতে সম্পূর্ণ মৌলিক ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তক হলেন ইঙ্গমার বার্গম্যান। সম্পূর্ণ একার চেষ্টায় তিনি সুইডিশ ফিল্মকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বের চলচ্চিত্র-জগতে আজ তাই তাঁর যে খ্যাতি, তা ওই সুইডিশ ফিল্মকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু এর জন্য কোন রকম যশ বা অর্থের প্রত্যাশী তিনি নন। অখ্যাত 'চার্ম নির্মাতা' হিসেবেই তিনি থাকতে চান। জনৈক অনুবাদকার বার্গম্যান সম্বন্ধে লিখেছেন, 'এই জগৎটাকে আমি দু' চোখ মেলে দেখি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করি, নোট নি। মনে হয় সমস্তই অবাস্তব, কাল্পনিক ভয়ঙ্কর কিংবা নিছক বোকামি। একটা উড়ন্ত ধূলিকণা আমি মুঠোয় চেপে ধরি। হয়তো এটাই একটা ছবি। এর কি গুরুত্ব আছে? কিছুই না। কিন্তু আমার ভীষণ আকর্ষণীয় মনে হয়। তাই তখন এও ছবিতে রূপান্তরিত হয়। মুঠোর মধ্যে ওটাকে নিয়ে আমি ঘুরি, দুঃখে সুখে ভরা কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।'

ঘরোয়া পরিবেশে চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য — চিত্রঃ অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেত্রী রুথ গ্যাসম্যান

সাতাশ বৎসর বয়স্কা অভিনেত্রী রুথ গ্যাসম্যান বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর সার্থক 'রপ্তানী' দ্রব্যের অন্যতম। যমজ পুত্র-কন্যার জননী এই সুদর্শনা অভিনেত্রী যৌন শিক্ষামূলক ছায়া-ছবির নায়িকা 'হেল্‌গা' নামক চরিত্রে রূপদান করে বিশ্‌ বিখ্যাত হতে চলেছেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের বহু স্থানে 'হেল্‌গা' সিরিজের যৌনশিক্ষা-বিষয়ক ছায়া-ছবির প্রদর্শন হয়েছে।

ছবিখানি তৈরী করতে ৮৭,৫০০ ডলার লেগেছে এবং ইতিমধ্যেই আয় করেছে সাড়ে বার মিলিয়ন ডলার। আরো ছবি তোলা হবে 'হেল্‌গা' সিরিজে।

পশ্চিম জার্মানীর স্বাস্থ্য-বিভাগ এই ছবির নির্মাতা। জনসাধারণের মধ্যে সুষ্ঠু যৌনশিক্ষা প্রচারের আবশ্যকতা পশ্চিম দেশসমূহে বর্তমানে সর্বজন-স্বীকৃত। কেবল পুঁথিগত শিক্ষায় সীমাবদ্ধ ফল হয়, সেইজন্যই পশ্চিম জার্মানীর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ 'হেল্‌গা' সিরিজের ছায়াছবির মাধ্যমে যৌন-শিক্ষ প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন এবং আশাতীত ফললাভ করেছেন। দৃশ্যকাব্যের প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী, একথা তো সকলেই জানেন।

এত টাকা যে ছবি থেকে কর্তৃপক্ষ পেয়েছেন, তাঁরা কিন্তু রুথকে দিয়েছেন মাত্র ১,২৫০ ডলার। পরের ছবির জন্য বেশী দেবেন বলে জানিয়েছেন যদিও, তথাপি যাঁর সুন্দর ও সাবলীল অভিনয়ের জন্য ছবিটির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তির মুখে, তাঁকে বোধ হয় আরও লভ্যাংশ দেওয়া উচিত ছিল।

আলোচ্য ছবিটির কাহিনী 'হেল্‌গার অভিজ্ঞতা' নামে পুস্তকাকারে শীঘ্রই পশ্চিম জার্মানী এবং ইতালীতে প্রকাশিত হবে।

রুথ বর্তমানে জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

অন্যান্য বহু দেশ শীঘ্রই 'হেল্‌গা' ছায়াছবি প্রদর্শনের জন্য নিতে প্রস্তুত।

কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, এ-ধরণের যৌনশিক্ষামূলক ছায়াছবির সংখ্যা বাড়বে এবং সর্বসাধারণ—যাঁরা যৌন ব্যাপারে অত্যন্ত অজ্ঞ—সুস্থ, সবল যৌনজীবন যাপন করতে শিখবেন। যৌনশিক্ষা যে অত্যাবশ্যকীয়, এবং নিন্দনীয় বা গোপনীয় নয়, এ উপলব্ধি আজ পশ্চিমদেশে এসেছে। ভারতবর্ষে অবশ্য বহু প্রাচীন যুগেই 'কামশাস্ত্র' শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল এবং সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বহু পুস্তকাদি লিখিত হয়েছিল—যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে ঋষি বাৎস্যায়নের লিখিত 'কামসূত্র' নামক বিশাল প্রামাণিক গ্রন্থ।

ব্যক্তিগত জীবনে রুথ একজন পারমাণবিক বিজ্ঞানীর সুখী ও প্রেমময়ী সহধর্মিণী, এবং ইভা ও ডেভিড নামক দুই বৎসর বয়স্ক যমজ সন্তানের জননী।

ইতালীতে রুথকে 'আদর্শ জননী' হিসাবে সম্মানিত করা হয়।

ভারতবর্ষে এই শিক্ষাপ্রদ ছায়া-ছবিটি প্রদর্শন করা যাবে কি? অবশ্য, আমাদের নীতিবাগীশ সেন্‌সার বোর্ড কি বলবেন কে জানে—তাঁরা তো মাতা-পুত্রের চুম্বনকেও পর্দায় নিষিদ্ধ করে তুলেছেন প্রায়।

—কণাদ

রুথ গ্যাসম্যান

প্রমথ চৌধুরীর চিঠিপত্র

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

মানুষ সাধারণত কাজ-কারবারের তাগিদে কিম্বা খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য চিঠিপত্র লিখে থাকে। সেই চিঠিতে যেমন থাকে দরকারী খবর তেমনি থাকে পত্র-লেখকের মনের খবরও। চিঠির জরুরী খবর ছাপিয়ে পত্র-লেখকের মনের খবর যখন ভাষা পেয়ে মুখর হয়ে ওঠে—অপরূপ শ্রী ও সৌন্দর্য লাভ করে তখন তা সাহিত্যে রূপায়িত হয়। সাহিত্যে রূপায়িত অর্থাৎ সাহিত্য গুণান্বিত পত্রকেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পদবাচ্য পত্ররূপে অভিহিত করেছেন।

পত্রের সাহিত্য-গুণাগুণ ছাড়াও আর কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে; সেটা হচ্ছে পত্র-লেখকের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক পরিচয়। পত্রের বিষয়বস্তুর গৌরব ও ঐতিহাসিক মূল্য তো রয়েছেই। এ ছাড়া চিঠিপত্রে পাওয়া যায় জাতির পরিচয় ও সংস্কৃতির স্বরূপ। এই সমস্ত কারণে যুগে যুগে চিঠিপত্র সংগৃহীত হয়ে থাকে।

বাঙলা সাহিত্যে চিঠি লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন উঁচু দরের পত্ররসিক। এত অধিক সংখ্যক পত্র বুঝি বা বাঙলা সাহিত্যে আর কেউ রচনা করেন নি। তাঁর বিরাট গদ্য সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর পত্রগুচ্ছ। সেই আঠার বছর বয়সে বিলাত থেকে লেখা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে সুরু করে সত্তর বছর বয়সে লেখা 'রাশিয়ার চিঠি' পর্যন্ত বিরাট রবীন্দ্রপত্র সাহিত্য। বিষয়বস্তু অনুসারে তাঁর চিঠি পত্রের ভাব, ভাষা ও রসমাধুর্যে যেমন অলঙ্কৃত তেমনি নানা বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব-কথায় সমৃদ্ধ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ চিঠিপত্র শুধু বাঙলা সাহিত্য নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পর বাঙলা সাহিত্যে অনেকেই অল্পবিস্তর সুখ-পাঠ্য চিঠিপত্র লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, বীরবল প্রমথ চৌধুরী তাঁদের একজন। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন একজন উঁচু দরের পত্র-বিলাসী; পত্র-রচনা ছিল তাঁর বিশ্রাম সুখ। নানা কাজের ভীড়ের মধ্যে একটু অবসর পেলেই তিনি চিঠি লিখতে বসতেন। নিয়মিত পত্র লিখতে ও পত্র পেতে তিনি ভালবাসতেন।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ভক্ত শিষ্য অনুরাগী প্রিয়জনদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত পত্রালাপ করতেন। তিনি যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন তাদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দিলীপ-কুমার রায়, অমিয়কুমার চক্রবর্তী, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র নন্দী রাধারাণী দেবী প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রমথ চৌধুরী প্রথম জীবনে যখন 'লেখা' সুরু করেন, সেই সময় তিনি সেকালের বিখ্যাত মাসিক 'মানসী' পত্রিকায় অনেক পত্র প্রকাশ করেন। এই সমস্ত পত্র রম্যরচনা জাতীয়, হাল্কা প্রবন্ধের নামান্তর অথবা পত্রাকারে প্রবন্ধ বিশেষ। শুধু 'মানসী'তে নয়, এই রকম অনেক রচনাই তাঁর পত্রাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর নিজের সম্পাদিত 'সবুজপত্রে', 'সাহিত্য', 'বিচিত্রা' সাপ্তাহিক 'বিজলী', সাপ্তাহিক আত্মকথা ও শঙ্খ প্রভৃতির পত্র-পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি নিজেই অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীমশায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'যেভাবে পাঁচ-জনকে চিঠি লিখি, সেইভাবেই বিজলীতে চিঠি লিখি। --- এ হপ্তায় শুধু 'বিজলী'তেই নয় আত্ম-শক্তি ও শঙ্খেও চিঠি বেরুবে।'

প্রমথ চৌধুরী তাঁর এই সমস্ত পত্রাকারে প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে স্বর্গত কবি সাহিত্যিক বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ-মশায়কে একটি পত্রে লিখেছিলেন—

'আমার স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, আমিও শ্রীমান চিরকিশোরের উদ্দেশ্যে পত্রচ্ছলে প্রবন্ধ লিখি এবং সেই ছলটা বজায় রাখবার জন্য সে প্রবন্ধ লজিকের ছাঁচে ঢালাই করি নি, কিন্তু তা হলেও সমগ্র পত্রটির মধ্যে একটি যোগসূত্র থেকেই যায়। আমার মনের বস্তু আপনা হতেই গুছিয়ে উঠে সুতরাং এ ধরণের লেখার ভিতর ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্টাডিড নেগলিজেন্স' তারই পরিচয় পাবে।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেমন অনেক সময় নিজের মতামত প্রবন্ধাকারে না লিখে পত্রাকারে প্রকাশ করতেন, তেমনি প্রমথ চৌধুরীও নিজের বক্তব্য-বিষয়গুলি প্রবন্ধের মাধ্যমে না প্রকাশ করে কারুকে পত্রে লিখে জানাতেন; নয়তো পত্রাকারেই সরাসরি কোন পত্রপত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

পত্রাকারে লেখার সুবিধা এই যে, পত্রচ্ছলে বক্তব্যবিষয়টি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা যায়। একটু সরস ভাষায় হাস্য-পরিহাস কিম্বা ব্যঙ্গ-কৌতুক মিশিয়ে বক্তব্য-বিষয়টি সহজতর করে তোলার সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যায়। ফলে কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ও অতি সহজেই পাঠকসাধারণের কাছে মূর্ত হয়ে উঠে; যা হয়তো কোন গুরুগম্ভীর দীর্ঘ প্রবন্ধে সম্ভব হত না। বিষয়-বস্তু যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, বৈঠকী আলাপী সুরে বর্ণনা করার দরুণ বিষয়টি যেমন সরস তেমনি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে।

প্রমথ চৌধুরীর চিঠিপত্র যেমন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বাকবিন্যাসে সমুজ্জ্বল তেমনি নানা বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ। তাঁর চিঠির বিষয়বস্তু ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনও তিনি সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কখনও ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান আবার কখন বা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে চিঠি লিখেছেন।

এমন কি ভূগোল বিষয়কে অবলম্বন করে সরস প্রবন্ধ লিখেছেন—এর মধ্যে একটা না একটা বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি চিঠি লিখেছেন। কোন কিছুই বাদ যেত না তাঁর লেখনীর মুখে। তা ছাড়া সময়-সুযোগ পেলেই তিনি নতুন নতুন বিষয়বস্তু কিম্বা তথ্যের অবতারণা করতেন। এই কারণে তাঁর চিঠিপত্রগুলি এক-একটি বিষয়ের এক-একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর অনু-রাগী সুসাহিত্যিক ও সাধক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

'অনেকে দেখতে পাই, চিঠি লিখতে বসলেই লিখতে বসেন অর্থাৎ তার ভিতর কতকটা সাহিত্য পুরে দিতে চান, এতে অবশ্য তাদের চিঠিগুলো প্রবন্ধের ছোট ভাই হয়ে উঠে। এ দোষ যে আমার নেই, তা বলতে পারি নে।'

প্রমথ চৌধুরীর চিঠিপত্র নানা বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনায় পূর্ণ থাকত বলে যেমন বিষয়বস্তুর গৌরবে তাঁর চিঠিগুলির মূল্য বর্ধিত হয়েছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা। অথচ তথ্য ও তত্ত্বের ভারে তার চিঠিপত্র কোথাও এতটুকু ভারাক্রান্ত হয় নি, কিম্বা তাঁর পাণ্ডিত্য কোথাও উৎকটভাবে প্রকাশ পায় নি। সরস ভাষায় সাবলীল গতিতে বৈঠকী আলাপীসুরে তাঁর চিঠিগুলি এগিয়ে চলেছে। কোথাও একটু ব্যঙ্গ-কৌতুক কোথাও একটু হাস্য-পরিহাস মিশিয়ে গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথাটি সরস ও মাধুর্য-মণ্ডিত করে তুলেছেন। তাঁর চিঠি-গুলি যেমন বুদ্ধিদীপ্ত ভাষার আলোকে উজ্জ্বল তেমনি প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যে অনন্য।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ভক্ত অনুরাগীদের যে সমস্ত মূল্যবান চিঠিপত্র লিখেছেন মনে হয়, তার অর্ধেকও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। তাঁর সমস্ত চিঠিপত্র প্রকাশিত হলে (আজ তাঁর জন্ম শত-বার্ষিকী উৎসবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল) যে সেগুলি তাঁর গল্প কবিতা প্রবন্ধের মতই রসোত্তীর্ণ হয়ে সুধীজনের প্রশংসা-ধন্য হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ সেগুলির মধ্যে যেমন আছে নানা বিষয়ক চিন্তা ও ভাবনার খোরাক তেমনি সেগুলি সরস, সুখ-পাঠ্য ও উপভোগ্য।

আর্ট ও কবিত্ব সম্পর্কে তিনি কয়েকটি আলোচনামূলক পত্র লিখে-ছিলেন কবি-সাহিত্যিক স্বর্গত বিজয়-কৃষ্ণ ঘোষমশায়কে। এখানে তাঁর একটি চিঠির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। পত্রটি যেমন সরস ও হৃদয়গ্রাহী তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন,—

'আর্টের চর্চা করার অর্থ যে মনের শক্তি ও সংযমের চর্চা করা—এ ধারণা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'মোছলমে' নেই। কবিত্ব যে ভক্তি মার্গের জিনিষ আর আর্ট শক্তি মার্গের —তোমার একথা ঠিক। তার পর এ কথাও ঠিক যে, চিত্তচাঞ্চল্য হতে মুক্তিলাভ না করলে, মানুষে আর্ট রচনা করতে পারে না—অপর পক্ষে হৃদয়াবেগই হচ্ছে কবিত্বের মূল উপাদান। তবে আমাদের এইটুকু মনে রাখা উচিত যে, যে লেখার ভিতর আর্ট নেই, তা কাব্য নয়। যার হৃদয়াবেগ নেই, সে কবি হতে পারে না, কিন্তু সেই সঙ্গে যার নির্লিপ্ত হবার শক্তি নেই সেও কবি হতে পারে না। এক কথায় 'লিরিক্যাল ও হিস্ট্রিক্যাল' পর্যায় শব্দ নয়। সুতরাং কবির রচনায় আর্ট ও কবিত্ব দুই-ই এক সঙ্গেই থাকে —অথচ এ দু'য়ের মূলে আছে, মনের পৃথক পৃথক ধর্ম। যার 'ক্রিটিক্যাল ফ্যাকাল্টি' হৃদয়াবেগের সমতুল্য নয়,—সে কবির লেখা কখনও অমর হয় না, এবং 'ক্রিটিক' অর্থ সাক্ষী ভোক্তাও নয়, কর্তাও নয়। যে একাধারে ভোক্তা, কর্তা ও দর্শক সেই কবিই যথার্থ আর্টিস্ট।'

পলিটিক্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি পত্রে তাঁর অভিমতটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, 'পলিটিক্সের যে তর্কটা তুমি তুলেছ ঐটেই ওর এক-মাত্র তর্ক। কেউ ঝোঁকেন জাতীয় স্বার্থের দিকে—আবার কেউ ঝোঁকেন মানব-ধর্মের দিকে। এই কারণেই পলিটিক্সের রাজ্যে পরস্পরবিরোধী দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ মোক্ষ শাস্ত্র গড়তে পারে কিন্তু 'পলিটিক্স' গড়তে পারবে না ; কেন না 'পলিটিক্স'-এর উদ্দেশ্যেই হচ্ছে জাতীয় স্বার্থসাধন। সংস্কৃত ভাষায় ত ও শাস্ত্রের নাম অর্থ-শাস্ত্র। তবে ধর্মকে ত্যাগ করা জাতীয় স্বার্থসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় কি না সেইটেই হচ্ছে বিবেচ্য।

সাহিত্য অনেক সময় অনেক বড় বড় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে দেয়। এদেশের বহু নীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই যখন উভয়ের

উপর বীতশ্রদ্ধ তখন কিভাবে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে তিনি স্বর্গত সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র নন্দীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন---

'বাঙলা দেশের হিন্দুরা ফার্সী পড়েন না ও ফার্সী সাহিত্যের কোন খোঁজ রাখেন না---এটা আমার মতে নিতান্তই দুঃখের বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের মনের মিল তখনই জন্মাবে যখন পরস্পরের সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। তা ছাড়া ফার্সী ভাষা না শিখলে আমরা মুসলমান যুগের ইতিহাসও লিখতে পারব না।'

প্রমথ চৌধুরী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শন শাস্ত্রেরই অনুরাগী পাঠক ছিলেন। এক সময় তিনি বার্গসন দর্শনের অনেক আলোচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্তীমশাইকে লিখেছিলেন---

'বার্গসন হচ্ছে আজকাল আমার ধ্যান ও জ্ঞান। এখন শুধু পড়েই চলেছি; আশা করছি আগামে মাসে লেখা সুরু করতে পারব। বার্গসন দর্শনের উপর প্রবন্ধগুলো যদি ওৎরায় তাহলে বিশ্বভারতীতেও একবার গিয়ে সেগুলি পড়ে আসব। যতদূর সম্ভব বিষয়টিকে সহজবোধ্য করতে চেষ্টা করব, কিন্তু মনে রেখো বার্গসনের দর্শন হচ্ছে বেজায় শক্ত, যার অন্তরে কবি ও দার্শনিকের মিলন হরগৌরীর মিলন না হয়েছে—তার কাছে বার্গসনের কোন মূল্য নেই।'

বৈষ্ণবদর্শনে উপনিষদের স্থান প্রসঙ্গে তিনি আর একটি আলোচনাপূর্ণ চিঠিতে স্বর্গত কবি সাহিত্যিক বিজয়কৃষ্ণ ঘোষমশায়কে লিখেছিলেন—

আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদই হচ্ছে পুরোপুরি 'স্পিরিচুয়াল', সুতরাং উপনিষদের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—সুতরাং বৈদান্তিক মনোভাব অনেকের কাছে অবজ্ঞার পদার্থ। এ ত হবারই কথা। সম্ভবত এই জন্যেই সেকালে উপনিষদকে গুহ্যশাস্ত্র করে রাখা হয়েছিল। ---আমার বিশ্বাস ছিল যে, এ জ্ঞান শিক্ষিত লোকমাত্রেরই আছে যে, বেদান্তই হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্মের মূলদর্শন। রামানুজ, বল্লভাচার্য প্রমুখরা বেদান্তের জগদ্বিখ্যাত টীকাকার। আর ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৈষ্ণবই হচ্ছে হয় বল্লভাচার্য, নয় রামানুজপন্থী।

এ বিষয়ে বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মও একঘরে নয়, আমি 'বেদান্ত মানি কিন্তু আচার্যকে মানি নে'—এ কথা সর্বভৌমকে স্বয়ং চৈতন্যদেব বলেন।

এখানে বেদান্ত অর্থে উপনিষদ এবং আচার্যের অর্থ শঙ্কর। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ শুধু চৈতন্য নন—এ ভূভারতের কোনও বৈষ্ণবগুরু কস্মিন্‌কালেও মানেন নি। কেন না তাঁদের মতে অদ্বৈতবাদ আসলে প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। চৈতন্যদেবের মতে ছান্দোগ্য উপনিষদের —'তত্ত্বমসি' এই রচনাটি সমগ্র উপনিষদের সকল কথার বিরোধী এবং এই বচনটির উপর শঙ্কর তাঁর সমস্ত ভাষ্য খাড়া করেছেন। যে মতে জীবাত্মা — পরমাত্মার ভেদ নমাত্মক, সে মতের উপর কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না; সুতরাং অদ্বৈতবাদের বিরোধী হওয়ার অর্থ উপনিষদের বিরোধী হওয়া নয়। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই তিন মতের উপর বৈষ্ণব ধর্মের তিন শাখা প্রতিষ্ঠিত এবং এই সকল মতেরই মূল হচ্ছে উপনিষদ।'

এক সময় প্রমথ চৌধুরীর কলম কোন রচনাই প্রসব করছিল না এবং তিনি আশঙ্কা করছিলেন এমনি কিছু দিন চললেই লেখক হিসাবে অচিরে তিনি বাতিল হয়ে পরবেন। এ থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি একটি পন্থা আবিষ্কার করেন, সেই নতুন আবিষ্কারের বিচিত্র কাহিনীটি তিনি কৌতুক রস মিশিয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সহ একটি পত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন—

'শুনতে পাই যোগী আসন করে বসলেই চিত্তবৃত্তি আপনা হতেই রুদ্ধ হয়ে আসে। এই থেকে আশা করছি যে, লেখকের আসনে বসলে আমার চিত্তবৃত্তি মুক্ত হয়ে লেখনীর মুখ দিয়ে ছুটে বেরুবে। জানইত আমাদের নব স্পিরিচুয়ালিটির মূলে আছে অশন ও বসন, অতএব আসনও থাকা উচিত। ভেবো না আমি চালাকি করছি। আমার এতকাল বিশ্বাস ছিল যে দেহের সঙ্গে আত্মার একটা যোগাযোগ থাকলেও খাওয়া পরার উপর আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করে না। এখন দেখছি এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। আজকাল আমি বদলে বদলে হরেক রকম কাপড় পরি—ফলে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনেরও বদল হয়। ইংরাজি কাপড় বহুকাল পরেছি কিন্তু তাতে মনে কি চরিত্রে ইংরেজ হতে পারি নি। কিন্তু লুঙ্গি পরলেই টের পাই মনটা অমনি রুমের বাদশা ওরফে তুর্কির সুলতানের লুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। খদ্দরের ধুতি আজও পরি নি। কিন্তু খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে দেখিছি, দেহকে ও লেফাপায় মোড়বামাত্র বুকের রক্ত জল হয়ে যায়, অন্তরের লোহিতসমুদ্র প্রশান্ত মহাসাগরে পরিণত হয়। সুরেন আমাকে একটি গান্ধীক্যাপ উপহার দিয়েছেন। সেটি একঘণ্টাকাল মাথায় তুলে রাখবার পর দেখি যে, কান একবারে কালা হয়ে গেছে। বাইরের কোনও বাণী আমার কানে আর প্রবেশ করছে না। রবিবাবু মহাশয়কে আমার বধিরতার সম্বাদ নিজে মুখেই দিয়েছি, কিন্তু তার জন্যের কারণ তাঁর আছে চেপে গিয়েছি। কেন না গান্ধীক্যাপ শিরোধার্য করেছি শুনলে তিনি হাসতেন—"স্বধর্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ' একথা যে কত সত্য তার প্রমাণ এবার হাতেহাতে পেয়েছি। আমি হচ্ছি লেখক। আজীবন আমার ফুলস্-ক্যাপ নিয়েই কারবার অতএব

খান্দীক্যাপ ধারণ করবার আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

ঘরোয়া ব্যক্তিগত সংবাদকেও তিনি ছবির মত সুন্দর করে একটি চিঠিতে প্রকাশ করেছেন, তার একটু নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি—

'আজকে আর্ট ও কবিত্বের যোগাযোগের আলোচনা আর করব না। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। আমার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সপরিবারে কিছুকাল থেকে আমার সঙ্গে বাস করছিলেন। আজ তিনি অন্য বাড়ীতে উঠে যাচ্ছেন। একটা পুরো ঘরকন্না একদিনে স্থানান্তরিত করা ব্যাপারখানা যে কি তা বুঝতে পারো। রেলওয়ের ওয়াগনের মত তিনখানি ঘড় ভ্যান' এসেছে আর জনকুড়ি কুলি আমার ঘরের ভিতর ছুটোছুটি করছে—চেঁচামেচি করছে। এই হট্টগোলের ভিতর তোমাকে চিঠি লিখছি, সুতরাং এই চিঠিতে কোন বড় কথা তুললে তা নিশ্চয়ই ঘুলিয়ে যাবে। এই গোলযোগের ভিতর এতখানি যে লিখতে পেরেছি এতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি—যদিচ কি যে লিখছি সে বিষয়ে মনে কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই। অতএব বেদব্যাস এইখানেই বিশ্রাম করলেন।'

প্রমথ চৌধুরী একবার তাঁর নিজের 'লেখা' সম্বন্ধে স্বর্গত কবি সাহিত্যিক বিজয়কৃষ্ণ ঘোষকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—'আমি লেখায় নিরামিষাশী—আমি কলমের মুখ দিয়ে নিজের মত নিজের মনের কথা বলি—আর পাঁচজনের মতের সঙ্গে তার মিল হবে না জানলেও আমি মৌনব্রত অবলম্বন করি নে। আমার বিশ্বাস, মানুষমাত্রেরই অনুভূতি ও চিন্তার ভিতর কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে—এবং যে লেখার ভিতর সেই বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না—তা দর্শন হতে পারে—বিজ্ঞান হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য নয়। এই বিশ্বাসের বলেই আমি আমার মতামতের ভিতর দিয়ে নিজেকেই প্রকাশ করতে চাই। এবং যে লেখায় তা করতে কৃতকার্য হই—তা সাহিত্য হয়,—তবে তা কোন শ্রেণীর সাহিত্য সে বিচার অপরে করবেন। 'স্বধর্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ' গীতার এই বচনটি সাহিত্যিকদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।'

উপরোক্ত কথাগুলি প্রমথ চৌধুরীর চিঠিপত্রের বেলাতেও প্রযোজ্য। চিঠি শুধুই যে সংবাহী চিঠি নয়, তা প্রমথ চৌধুরীর চিঠিপত্র পড়লেই সহজেই বুঝতে পারা যায়। চিঠিপত্র লেখকের আত্মপ্রকাশের একটা বিশেষ ভঙ্গি; কবি কবিতায়, প্রাবন্ধিক প্রবন্ধে, উপন্যাসকার উপন্যাসে, গল্প-লেখক গল্পে যেমন নিজেদের মেলে ধরেন, তেমনি পত্রেও পত্রলেখকের ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়ের প্রকাশ বিজড়িত থাকে। প্রথম চৌধুরীর চিঠিতেও তাঁর হৃদয় ও মনের প্রকাশ দেদীপ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর চিঠির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। না আছে ভাষার মিল, না আছে দৃষ্টিভঙ্গির। শরৎচন্দ্রের হালকা আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠির সঙ্গেও প্রমথ চৌধুরীর চিঠির সুর মিলবে না। অথচ এঁদের সকলেরই চিঠি সরস, আন্তরিকতাপূর্ণ ও মননশীলতায় ভরা। প্রমথ চৌধুরীর চিঠিতে সদাই একটা বৈঠকী সংলাপের সুর অনুরণিত হচ্ছে। চিঠির বিষয়বস্তুকে ছাপিয়ে কোথাও রয়েছে একটু ব্যঙ্গকৌতুক, আবার কোথাও রয়েছে একটু হাস্য-পরিহাস, কোথাও বাক্‌ভঙ্গির অপূর্ব বিন্যাস, কথার মারপ্যাঁচ আবার কখনও কৌতুক হাস্যে উজ্জ্বল, কখনও ব্যাঙ্গের তীক্ষ্ণ শ্লেষবাণে জর্জরিত। রচনার এই সব প্রসাদগুণগুলিই প্রমথ চৌধুরীর চিঠিকে সরস, সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য করে তুলেছে। এইগুলিই প্রমথ চৌধুরীর চিঠিগুলিকে অপূর্ব এক বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর চিঠিগুলি শুধুই ভাষায় কিম্বা বাক্‌ভঙ্গিতে নয়, স্টাইলের নতুনত্বে নয়, যেমন বিষয়বস্তুর গভীরতায় রসঘন তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত মননের বিচিত্র প্রকাশে সমুজ্জ্বল।

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

রমেন চৌধুরী

উধাও হ'য়ে ছুটবে তারার দল
আকাশ-নদীর শুকিয়ে এলো
নিকষ কালো জল।
মেল কমল-আঁখি
ওগো আমার সাকী,
প্রথম ভোরে কেমন ক'রে—
সুখের আলো জাগে
দেখবে না কী নিবিড় অনুরাগে?
পূর্বাচলের বীর শিকারী
আলোর ফাঁদে তা'র
জড়িয়ে নিলো সুলতানের ওই
সাতরঙা মিনার!

উষার ছোঁয়া পেয়ে যখন
আকাশ আলোয় ভরা,
পান্থশালায় কার যেন স্বর
স্বপনে দিলো ধরা;
বলছে ধীরে ধীরে:
জীবন-পাত্রটিরে
শূন্য হবার আগেই তুমি
পূর্ণ করো ত্বরা,
এ বসুধা সুধার কাঙাল—
সুধা নিকষ-করা!

সরাইখানার সুমুখ থেকে
পান্থ সবাই উঠলো হে'কে
ছাপিয়ে পাখির ভোরের কূজন
জাগলো ধ্বনি তা
খোলো খোলো খোলো রে ভাই দ্বার
এক নিমেষের জন্যে আসা
এই দুনিয়ার মাঝে,
কার জীবনে কোন্ লগনে
ছুটির বাঁশি বাজে
জানি না হায় কেউ,
হয়তো ফিরে আসবে না আর
জীবন-গাঙের ঢেউ!

॥ ইন্দ্রসেন ॥

'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'।
—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জয়ের উল্লাসে মুখরিত সমগ্র গৌড়বঙ্গ। আনন্দে আত্মহারা যেন প্রতিটি দেশবাসী। দেশের ঘরে ঘরে উৎসব পালিত হয়। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জয়—এই ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। বঙ্গসন্তানের বিজয়-গৌরবে বঙ্গবাসীর বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠেছে। মহারাজা কিন্তু আত্মগর্ব অনুভব করেন না। প্রতাপাদিত্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন,—জননী যশোরেশ্বরী কৃপা করেছেন, তবেই না আমি জয়মাল্য লাভ করেছি। দেবীর দয়ায় আমি অসাধ্য সাধন করেছি। আমি তো নিমিত্তমাত্র। তাই বলি, যাঁর করুণা-কটাক্ষে সমর-বিজয়ী হয়েছি সেই জগজ্জননী মহামায়ার অতি সমারোহের সঙ্গে পূজার ব্যবস্থা করা হোক। নতুবা এ বিজয়োৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর আহ্বান জানানো হোক দেশের যতেক ব্রাহ্মণকে। তাঁদের দান করা হবে নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য ও অর্থ। ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হয়ে আশীষ জানালে আমরা ভবিষ্যতে নিরাপদে অগ্রসর হতে পারবো। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, দীন-দরিদ্রগণকে অকাতরে ধন বিতরণ করি। দরিদ্রনারায়ণের সেবা করলে স্বয়ং ঈশ্বর পরিতুষ্ট হন।

শতকর্মে লিপ্ত ও ব্যস্ত থাকলেও মহারাজার চিত্তমধ্যে সদাই যেন জাগরূক থাকে মাতৃকামূর্তি। ক্ষণে ক্ষণে তিনি স্মরণ করেন মহামায়ার আলতা-রাঙা চরণযুগল। কাণ্ডারীর চোখে যেমন ধ্রুবতারা। বিভ্রান্ত হলেই দিক-ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মহারাজার আদেশে নাটমন্দিরে সপ্তাহব্যাপী কালী-কীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মহারাজা কীর্তনের আসরে উপস্থিত হন। মহাকালীর নাম-গান শুনতে শুনতে প্রতাপের দুই চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। মহারাজা আকুল কণ্ঠে নিবেদন করেন,—শক্তি দাও মা শক্তিদায়িনী। কৃপা বর্ষণ কর', যেন আমি আরব্ধ কার্যসমূহ সম্পাদন করতে পারি। আমার দেশটাকে রাহুমুক্ত করতে সক্ষম হই।

মোগলগণের উপর অসামান্য বিজয়লাভ করে প্রতাপ মোগলরাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করতে লাগলেন। পররাজ্য আক্রমণের পূর্বে মহাভাগ প্রতাপ স্বীয় রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা বিধিবদ্ধ করলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে যাতে রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা না হয়, তজ্জন্য তিনি মন্ত্রিসভার অধিবেশনে স্থির করলেন, আত্মীয় ভবানীদাস রায়চৌধুরী ও লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নামক দুজন বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যথাক্রমে রাজস্ব ও শাসন-বিষয়ক প্রধান কর্মচারী-পদে নিযুক্ত করা হবে।

এই দুই ব্যক্তি আশ্বাস দিলেন, মহারাজার অনুপস্থিতিতে তাঁরা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে রাজকার্য সম্পন্ন করবেন।

সময়ই যুদ্ধের প্রাণ। যে সেনানী যুদ্ধকালে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন, তিনিই সেনাপতিদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি। তাই মহারাজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, অতিরিক্ত পরিমাণে নৌবল বৃদ্ধি করতে হবে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ অধিকতর সুবিধাজনক। বিশেষত যুদ্ধকালে বহুসংখ্যক সৈন্য লয়ে স্থলপথে গমনাগমন অত্যন্ত ক্লেশকর ও সময়সাপেক্ষ। তাই মহারাজা নির্দেশ দিলেন,—বহুসংখ্যক সুদৃঢ় রণতরী একত্র করে তাহাতে সকল প্রকার দ্রব্য পূর্ণ করতে হবে।

রণপোত সকল যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যে পূর্ণ হলে প্রতাপ এক শুভদিবসে বিপুলবাহিনীসহ মোগলরাজ্য আক্রমণে বহির্গত হলেন।

মৃতপ্রায় নিস্তব্ধভাবে নৌকাসমূহ অনুকূল বায়ুভরে সুন্দরবনের হিংস্র-জন্তুপূর্ণ বিজন প্রদেশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ অতিক্রম ক'রে ভাগীরথী-গর্ভে পতিত হ'ল। এই সময় থেকে মহারাজা অতি সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তিনি আদেশ দিলেন,—অকস্মাৎ শত্রু-আক্রমণ নিবারণ এবং তাদের অবস্থানের বিষয় ইত্যাদির সংবাদ সংগ্রহের জন্য কয়েকখানি দ্রুতগামী রণপোত অগ্রে ও পশ্চাতে থাক।

প্রতাপ এই প্রকারে বিপুলবাহিনী সঙ্গে লয়ে একদিন সহসা সপ্তগ্রাম আক্রমণ করলেন। মোগলগণকে বঙ্গদেশ থেকে বিদূরিত করাই প্রতাপের মোগলরাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্য। সুতরাং যাতে প্রজাগণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, সেই জন্য তিনি তাঁর অধীনস্থ সৈন্যগণমধ্যে কঠোর আদেশ প্রদান করলেন।

সপ্তগ্রামস্থিত মোগলগণ প্রতাপসৈন্য কর্তৃক চতুর্দিক হতে আক্রান্ত হয়ে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করলো। কিন্তু তারা অল্পসংখ্যক হওয়াতে শীঘ্রই যুদ্ধে পরাজিত হল।

প্রতাপ সপ্তগ্রামস্থ যাবতীয় রাজকীয় ধন লুণ্ঠন করে নাবিকগণকে পুনরায় অগ্রসর হতে আজ্ঞা প্রদান করলেন।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের মোগল-রাজ্যাক্রমণ বার্তা অচিরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। উড়িষ্যার হিন্দু রাজন্যবর্গ ও পাঠান সেনানায়কগণ চতুর্দিক থেকে দলে দলে মোগল-রাজ্য আক্রমণ করলেন। এঁদের পদভরে বঙ্গদেশ কম্পিতপ্রায় হয়ে উঠলো। অকস্মাৎ দলবদ্ধ হয়ে মোগল সেনানিগণকে আক্রমণ করাতে তাঁরা মোগলদিগের বিজাতীয় ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠেন।

গঙ্গাতীরের সমীপবর্তী মোগলনগর সকল আক্রমণ করতে করতে মহারাজা প্রতাপাদিত্য রাজমহলের নিকটে উপস্থিত হলেন। পাঠান সেনানায়কগণ প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে জল ও স্থলপথে চতুর্দিক থেকে রাজমহল আক্রমণ করলেন। কয়েক দিন ধরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চললো, কিন্তু কোন পক্ষের জয়-পরাজয়

হ'ল না। মহারাজা প্রতাপাদিত্য অতি নিপুণতা সহকারে কামান সকল দুর্গের চতুর্দিকে সংস্থাপন করে অনবরত লোক-সংহারক অগ্নিময় ভীষণ গোলক সকল বর্ষণ করতে লাগলেন।

মোগলগণের সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পেতে লাগলো। আহার্যসামগ্রীও প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়লো। দুর্গপ্রাচীরও স্থানে স্থানে ভূমিসাৎ হয়ে পড়লো। এইরূপ ঘোরতর সঙ্কটাবস্থায় মোগলগণ আত্মসমর্পণ করলেন।

প্রতাপ উপযুক্ত ব্যক্তির অধীনে রাজমহলের শাসনভার ন্যস্ত ক'রে বিজয়লব্ধ দ্রব্যসহ পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রতাপের সৈন্যসংখ্যা দিনে দিনে বর্ধিত হ'তে লাগলো। মহারাজার আদেশ-ক্রমে মোগলদিগের যুদ্ধতরী সকল ধৃত হ'ল। শত্রুপক্ষের হাতে যাতে নৌকাসমূহ পতিত না হয়, সেইজন্য তিনি অনেকগুলি মোগল-রণতরী ধ্বংস করতে আদেশ দিলেন। প্রতাপ মোগলদিগকে পরাস্ত করতে করতে পাটনা নগরের সমীপবর্তী হ'তে লাগলেন।

ইতিপূর্বেই বিহার প্রদেশের জমিদারগণ মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। তাঁরা সুযোগক্রমে মোগলদের সময়ে অসময়ে আক্রমণ করছিলেন। এক্ষণে প্রতাপকে বিজয়বাহিনী পরিচালনা করতে দেখে তাঁরা সকলে পতঙ্গপালের মত প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। প্রতাপ, শংকর প্রমুখ বীরপুরুষগণ বহুদিন থেকে এ'দের নিকট সুপরিচিত। পূর্বে তাঁরা এ'দের সৌম্যবেশে দেখেছিলেন। কিন্তু এখন ভৈরব-বেশে দেখতে পেলেন। বেশের পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্তন হয় নাই। পূর্বের ন্যায় পূর্ব-সম্ভাষণ, সকল বিষয়ের তত্ত্বান্বেষণ অথবা সস্নেহ ব্যবহারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রতাপ এ'দের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাটনা নগর আক্রমণ করলেন।

পাটনা বিহার প্রদেশের রাজধানী। এই প্রদেশের মধ্যে পাটনা মোগলদিগের প্রধান সেনানিবেশস্থান।

শংকর, সূর্যকান্ত, রঘু, সুখা, রডা, মদন প্রভৃতি মহাবীরগণের সহিত প্রতাপ মোগলগণকে ভৈরববিক্রমে আক্রমণ করলেন।

মোগলগণ পূর্ব-পরাক্রম স্মরণ ক'রে প্রাণপণপূর্বক যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে ঘোরতর যুদ্ধ প্রজ্বলিত হ'ল। এই যুদ্ধে এক পক্ষের বীরগণ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গকে মোগলগণের বিকট গ্রাস হ'তে মুক্ত করার জন্য এবং পরম পবিত্র দেবমন্দির সকল পাষণ্ডদের পদদলন থেকে রক্ষার জন্য, ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

অন্যপক্ষে মোগল বীরগণ তাঁদের প্রভুত্ব খর্ব হওয়াতে তাঁদের ভোগবিলাস দ্রব্যের হ্রাস হওয়াতে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। হিন্দু সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ ক'রে সিংহবিক্রমে মোগলব্যূহমধ্যে প্রবেশ ক'রে শাণিত তরবারি-প্রহারে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন।

মোগলগণ হিন্দুবীর্য কোনরূপে সহ্য করতে পারলেন না। তাই আত্মরক্ষার্থে তাঁরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলেন। এই লোমহর্ষণ যুদ্ধে হিন্দুবীরগণ যেরূপ অসীম সাহস, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, ক্ষিপ্রকারিতা এবং যুদ্ধ-নিপুণতা প্রদর্শন করলেন, তাহা বীরত্বের ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নয়।

জয়মদোন্মত্ত বীরগণ আবার ঘোরতর পরাক্রমের সঙ্গে দুর্গ অবরোধ করতে আরম্ভ করলেন। হিন্দু, মুসলমান, পর্তুগীজ— সকলেই যেন নিজেদের প্রাধান্য দেখানোর জন্য বদ্ধভাবে যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত হ'লেন। সকলেই মৃত্যুভয় পরিত্যাগ ক'রে অসীম শৌর্য প্রকাশ করতে লাগলেন। কামান সকল অবিরাম ভীষণ শব্দে গোলক উদ্গীরণ করতে যেন প্রলয়কাল সমীপবর্তী বোধ হতে লাগলো।

কয়েকদিন এইরূপ সমভাবে আক্রমণ করাতে দুর্গপ্রাচীর একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে পড়লো। হিন্দু বীরগণ এই অবকাশে কালান্তক কৃতান্তের মত শাণিত কৃপাণহস্তে ভয়ঙ্কর বেগে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলেন। ক্ষণকালের জন্য ঘোরতর যুদ্ধ চললো। পর্বতের নিকট প্রবল প্রভঞ্জন যেমন প্রতিহত হয়, সেইরূপ হিন্দু সৈন্যের নিকট মোগল সৈন্য পরাজিত হ'ল।

পাটনা-দুর্গ দখলের পরে মহারাজা প্রতাপাদিত্য প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হ'লেন। সুবে বাঙলা থেকে মোগলদের তাড়িয়ে সেই সেই প্রদেশের ভূস্বামীর অধীনে সাময়িক শাসনভার অর্পণ করলেন মহারাজা। তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন,—আপনারা ন্যায় অনুসারে রাজ্যপালন এবং যুদ্ধকালে ক্ষমতানুসারে সৈন্য-সাহায্য করবেন এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করবেন—এই নিয়মে আপনাদের আবদ্ধ হ'তে হবে।

কিন্তু মনটা ডেকে ওঠে থেকে থেকে।

অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যুদ্ধের উন্মাদনায় যেন ভাটা পড়ে। তর্জন-গর্জনে ইতি দিতে ইচ্ছা হয়। রণ-দামামা থেমেছে, ভেরী আর যখন তখন রব তোলে না। শিবিরমধ্যে মহারাজা শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ক্ষণেকের বিশ্রাম চাইছে প্রতাপের দেহ ও মন। এক কলস গো-দুগ্ধ পান করলেন মহারাজা। তারপর মন্ত্রী ও সহচরদের বললেন,—আমি বর্তমানে নিদ্রা-কাতর। ঘুমের জড়তা নেমেছে চোখে। নেহাৎ প্রয়োজন না হ'লে আমাকে জাগায়ো না।

শিবির-কক্ষ প্রায় অন্ধকার। যেন হিমস্নিগ্ধ। সুগন্ধে ভাসমান কক্ষে মহারাজা একা। দ্বারে অপেক্ষমাণ প্রতিহারী ও প্রহরী। বিশেষ আদেশে শিবির-সমীপের কোলাহল থেমে গেছে। যেন এক নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করছে।

সেই মুখখানি বার বার চোখে ভেসে উঠছে। পূর্ণিমার চাঁদের মত সেই ঢল ঢল মুখপদ্ম। শুভ্র, অথচ কিছু যেন রক্তিম। মুখমধ্যে পদ্মকোরকের মত চুণী-লাল মধুর অধর।

নিদ্রার আবেশে মগ্ন মহারাজার কানে কানে যেন কী কথা বলছেন সেই শ্রীমুখের অধিকারিণী মহারাণী পদ্মিনী। সেই নরী-দেহের ললিতলোভন লীলা আজ কেন কে জানে, প্রতাপের স্মরণে জাগছে। পদ্মিনী যে কাছেই আছেন, শুধু দেখা মেলে না।

রাজকার্যেই ব্যস্ত থাকেন মহারাজা। বড় একটা কাছে পাওয়া যায় না তাঁকে—মহারাণীর এই অভিযোগ নতুন নয়। তবু একটি বার কখনও মুখ ফুটে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন না পদ্মিনী। তাঁর সকল অভিযোগ অব্যক্ত রাখলেন।

অন্যান্য প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত ক'রে স্বদেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করতে লাগলেন মহারাজা। যে সকল বীর যুদ্ধকালে সহায়তার জন্য আগমন ক'রেছিলেন যাত্রার পূর্বে একদিন তাঁদের আহ্বান জানিয়ে প্রশংসাপূর্বক প্রতাপ বললেন, —বীরগণ, আমাদিগের স্বাধীনতা-যুদ্ধে আপনারা যে এই অপর্যাপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করলেন, ইহার জন্য আপনা-দিগের অক্ষয়-কীর্তি চিরকাল ঘোষিত হবে। দেবতাসকল আপনাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন। আপনারা যে ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করলেন, ইহা যে কেবল বর্তমানকালে লোক-হৃদয়ে সংক্রামিত হয়ে আমাদিগের পুষ্টিসাধন করবে তাহা নয়, ভবিষ্যৎকালেও আমাদিগের সন্ততিগণকে ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে এইরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতে হবে। আর যে সকল স্বদেশবাসী স্বাধীনতা-যুদ্ধে সহায়তা করলেন না, উদাসীন থাকলেন, তাঁরা ঘোরতর নরকে নিমগ্ন হবেন, সন্দেহ নাই। আর যে সকল স্বদেশদ্রোহী ক্ষণিক স্বার্থের জন্য মোগলদিগের সহায়তা করেছে তারা অনন্তকাল রৌরব নরকে অনন্ত দুঃখভোগ করবে।

মহাবীর প্রতাপ সমাগত বীরগণকে এইরূপ উৎসাহিত ক'রে তাঁদের পদমর্যাদা ও যোগ্যতানুসারে সকলকে যথেষ্ট ধনাদি প্রদান ক'রে সম্মানিত করলেন। মহারাজা প্রতাপ পাটনা পর্যন্ত অধিকার ক'রে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ দ্রব্য সঙ্গে লয়ে বঙ্গদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করলেন।

বিজয়োৎসব, কিন্তু কোন প্রকার বিশৃংখলা নেই।

প্রতাপের বিজয়ী সৈন্যমধ্যে উচ্ছৃংখলতার লেশমাত্র চোখে পড়ে না। পূর্বের মত নিয়মানুসারে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। রণতরীগুলি কখনও বা অনুকূল বায়ুভরে, কখনও বা গুণযোগে চালিত হ'তে থাকে। তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে পালভরে এগিয়ে চলেছে সারি সারি যুদ্ধপোত। উল্লসিত নাবিক ও সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে সুমধুর গান গাইছে। সঙ্গীতের ঐক্যতানে দিকসকল প্রতিধ্বনিত করে।

এই চলমান নৌকানগরী দেখতে শত সহস্র দেশবাসী নদীর উভয়তীরে একত্র হয়ে অনিমেষ নয়নে যতক্ষণ না নৌবাহিনী অদৃশ্য হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করে।

কিছুদিনের মধ্যে মহারাজা প্রতাপাদিত্য যশোহর নগরে উপনীত হ'লেন।

তাঁর শুভাগমনে সকলের আনন্দের আর সীমা থাকে না। যশোহর যেন আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। যশোহরবাসিগণ কর্ম পরিত্যাগ ক'রে আত্মীয়স্বজনসহ মিলিত হওয়ার জন্য যমুনাতটে উপস্থিত হ'লেন।

বুরুজপোতা থেকে অনবরত তোপধ্বনি মহারাজার আগমনবার্তা ঘোষণা করে। মহারাজা নৌকা থেকে জাহাজ-ঘাটায় অবতরণ করলে জয়ধ্বনি ভেসে উঠলো বাতাসে। দেশবাসীর কলকোলাহল শুনে প্রতাপের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরতে থাকে।

নৌকা থেকে নেমে প্রতাপ সর্বপ্রথমে যশোরেশ্বরীর চরণতলে শত শত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। বিজয়লব্ধ অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ মাতৃচরণে রেখে মহামায়ার পূজা করলেন। জগজ্জননীর পূজার শেষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে অশেষ ধনদান করলেন প্রতাপ। অতঃপর ধূমঘাট-ভবনে প্রবেশ করলেন।

পরাজয়-বার্তা অবগত হ'লেন সম্রাট আকবর।

বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান এবং স্বীয় সৈন্যগণের বিপর্যয়কাহিনী শুনে আজিম খাঁ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে বহুল পরিমাণে রণনিপুন সৈন্যসহ প্রতাপ-বিজয়ের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করলেন। আজিম খাঁ বেছে বেছে অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন সৈন্যগণকেই সঙ্গে নিলেন।

মোগলবাহিনী অবিরাম গতিতে ছুটতে থাকলো। প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বদ্ধপরিকর আজিম খাঁ।

আকবরের সৈন্য পাটনার সমীপবর্তী হ'লে মহারাজা প্রতাপাদিত্য আজিমের দিল্লী হ'তে বহির্গমন-কথা অবগত হ'য়ে পাটনা, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের রাজকর্মচারিগণকে আদেশ পাঠালেন,—মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিনা বাধায় বঙ্গের অভ্যন্তর-প্রদেশে আগমনের পথ প্রদান করিবেন।

মহারাজার আজ্ঞানুসারে পাটনার রাজকর্মচারিগণ আজিমের সঙ্গে সখ্যভাবে মিলিত হ'লেন। আজিম প্রতীয়মান বিজয়লাভে গর্বিত হয়ে দ্রুতগতিতে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করতে লাগলেন। পূর্বোক্ত আজ্ঞানুযায়ী রাজমহলের কর্মচারিগণও আজিমের সঙ্গে একত্র হ'লেন।

বিনা রক্তপাতে বঙ্গদেশ করতলস্থ হ'তে চলেছে তাই আজিমের উচ্চাভিলাষ, আহ্লাদ ও গর্বের সীমা থাকলো না।

প্রতাপ শুনলেন, আজিম সুতানুটির সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন ক'রে নিরুদ্বেগে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছেন।

একদিন নিশীথ-রাত্রে সমস্ত সৈন্যসহ প্রতাপ অকস্মাৎ মোগল-শিবির আগে আক্রমণ করলেন।

প্রসুপ্ত মোগলসৈন্য সহসা প্রলয়কালীন গভীর গর্জন শুনে শয্যাত্যাগ করে এর কারণ নির্ণয়ের জন্য যেমন শিবিরদ্বারে উপস্থিত হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ বঙ্গীয় সৈন্যগণের শাণিত কৃপাণাঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'তে লাগলো।

শিবিরের চতুর্দিকে মৃতপ্রায় মোগল সৈন্যদের আকুল চীৎকারে দিঙমণ্ডল নিনাদিত হ'তে থাকে।

এইরূপে প্রতাপ-সৈন্য মহাকালের ন্যায় রুদ্ররূপে সমস্ত রাত্রি ভীষণরূপে মোগল-সৈন্য সংহার করেন। অনন্তর প্রাতঃকালে হতাবশিষ্ট পলায়নোদ্যত মোগলগণকে বন্দী করলেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রায় বিংশতি সহস্র মোগলসৈন্য নিহত ও বন্দী হয়।

লোমহর্ষণ যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী পদার্থ ও নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্যে প্রতাপের রাজকোষ পরিপূর্ণ হ'ল। এই অদ্ভুত বিজয়-বার্তা তড়িৎ-গতিতে সমস্ত বঙ্গে প্রচারিত হয়ে আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে প্রতাপের মহিমা ঘোষিত হ'তে লাগলো।

যুদ্ধ-সমাপ্তির পরে যুদ্ধে নিহত মোগল শবের সৎকারের আদেশ দান ক'রে প্রতাপ যশোহরাভিমুখে যাত্রা করলেন।

দিল্লীশ্বর মহাপ্রাজ্ঞ আকবর, আজিম খাঁ সহ সমস্ত সৈন্যের বিনাশ-কথা শুনে অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হ'লেন। কোন্ উপায়ে ভারতের এই সর্বোৎকৃষ্ট প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়, কোন্ উপায়ে দিন দিন বর্ধিতপ্রায় বিদ্রোহানল প্রশমিত করা যায়, কেমন ক'রে দুর্গম সুন্দরবন প্রদেশ ধ্বংস ক'রে বিদ্রোহিপ্রধান প্রতাপাদিত্যকে দণ্ডিত করা যায়—এর উপায় উদ্ভাবনের জন্য দ্বাবিংশতি আমীরকে আহ্বান জানালেন। বঙ্গের বর্তমান অবস্থা বর্ণনার শেষে আকবর বললেন,—আপনাদিগের মধ্যে কোন্ বীরপুরুষ নানাপ্রকার বিপদসঙ্কুল দুর্গম বঙ্গদেশে [illegible] ক'রে বিদ্রোহিগণকে সমূলে উৎপাটন করতে সমর্থ ? কোন্ ব্যক্তি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমিতে মোগল-বিজয়-বৈজয়ন্তী দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করতে সমর্থ ? আপনাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মোগল-শোণিত-প্রবাহের প্রতিশোধ লইতে সমর্থ ?

দ্বাবিংশতি আমীরদের সকলেই একবাক্যে বললেন,—আমরা প্রত্যেকেই বঙ্গদেশ আক্রমণে যেতে প্রস্তুত জাঁহাপনা সম্রাট। আপনি আজ্ঞা প্রদান করেন।

সম্রাট আকবর হৃষ্টচিত্তে সম্মতি জানিয়ে আমীরদের অধীনে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য প্রদান ক'রে তাঁদের বঙ্গদেশে প্রেরণ করলেন।

আমীরগণ যথাসময়ে বাঙলায় উপনীত হ'য়ে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। দেবমন্দির ও অন্যান্য পবিত্র স্থান সকল চূর্ণিত, পদদলিত ও দূষিত হ'তে থাকলো। গৃহসকল অগ্নিসাৎ ক'রে তাঁরা নিরীহ প্রজাগণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। শস্য-পরিপূর্ণ ক্ষেত্রসকল নিপুণতার সঙ্গে ধ্বংস হ'তে থাকে।

এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করতে করতে মোগল-সৈন্য গঙ্গা উত্তীর্ণ হয়ে প্রতাপের রাজ্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলো।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য মোগল-সৈন্যদের আগমন-কথা অবগত হয়ে নিশ্চিন্তভাবে তাদের আগমন-প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ব্যাধ যেমন জালমধ্যে আগত জন্তুকে আগমনমাত্রেই ধরার জন্য চেষ্টা না ক'রে তাকে স্বয়ং-আবদ্ধ হওয়ার জন্য সময় প্রদান করে, সেইরূপ প্রতাপ নদীজালবেষ্টিত প্রদেশে

মোগল-সৈন্যের আগমনে কোনরূপ বাধা প্রদান করলেন না।

দ্বাবিংশতি আমীর শত্রুরাজ্যমধ্যেও কোন বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে যমুনার তটে এসে উপস্থিত হ'লেন। ভাবী যুদ্ধের কোন লক্ষণই তাঁরা লক্ষ্য করলেন না। সমস্তই শান্তিপূর্ণ। এখন একমাত্র প্রতাপ ধৃত বা নিহত হ'লেই সমস্ত ক্লেশ শেষ হবে।

গর্বিত আমীরগণ এই আশায় গর্বিত হয়ে প্রতাপের নিকট অসি ও শৃঙ্খলসহ একজন দূত প্রেরণ করলেন।

দূত আমীরগণের আদেশানুসারে তরবারি ও বন্ধনশৃঙ্খল গ্রহণ ক'রে প্রতাপ-সমীপে উপস্থিত হলেন। যথাবিহিত অভিবাদনপূর্বক দূত নিবেদন করলেন,— রাজন আপনার পিতৃদ্রোহ ও রাজদ্রোহের কথা সম্রাট আকবরের কর্ণ-গোচর হ'তে আর বাকী নাই। এতকাল যে আপনি আপনার এই কুৎসিত রাজদ্রোহিতার ফলপ্রাপ্ত হন নাই, ইহাতে বোধ হচ্ছে যে কালপ্রাপ্ত না হলে কেউ ফলভোগ করে না। এক্ষণে আপনার নিয়ন্তা দ্বাবিংশতি আমীর বহু সৈন্যপরিবৃত হয়ে আপনার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা এই শাণিত অসি ও পাশ আপনাকে প্রদান করেছেন। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি তাহা গ্রহণ করেন।

বক্তব্য শেষের পরে দূত মৌনাবলম্বন করলে প্রতাপের ইঙ্গিতানুসারে কেশব ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ক্রোধকম্পিত স্বরে বললেন,—দেখ যবন ! তুমি দূতরূপে আগমন করিয়াছ বলিয়া আজ এই শাণিত তরবারির করাল দংষ্ট্রা হইতে রক্ষা পাইলে। দূত ! তুমি শীঘ্র তোমার প্রভু-সন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে, ঐ যে অদূরে নীলকান্তমণিপ্রভ যমুনাজল প্রবাহিত হইতেছে দেখিতেছ, যদি তুমি ভাগ্যক্রমে যুদ্ধস্থলে বন্দী হও, তাহা হইলে পুনরায় দেখিবে, ইহা শত্রুরক্তে আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইতিপূর্বে মোগলসৈন্য ও সেনাপতিগণ যেরূপ দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদিগকেও সেই দশা পাইতে আর বিলম্ব নাই। অতএব তুমি গমন করিয়া তোমার প্রভুগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে কহ।

কথার শেষে কেশব ভট্ট দূতের নিকট থেকে অসি গ্রহণ করেন। অসিগাত্রে চুম্বন-স্পর্শ দিয়ে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পদতলে অসি স্থাপিত করলেন।

প্রতাপের মুখে হাসির রেখা ফুটলো। ক্রূর হাস্য যেন !

(ক্রমশ)

বসন্ত-বরণ

শ্রীআশুতোষ দাস

বরষের শেষে, বিজয়ীর বেশে, শোভার পশরা ভরিয়া
এসো ঋতুরাজ, লয়ে নবসাজ, শীতের জড়তা হরিয়া।
এসো প্রকৃতির, প্রথম পূজারী অবকাশকাল যাপিয়া;
ম্রিয়মাণ ধরা, মুখরিত করা, সাথে লয়ে পিক-পাপিয়া।

এসো সিশলয়ে, মধুর মলয়ে, সুস্মিত বন কুঞ্জে;
সারা ধরাতলে, ফুল পরিমলে, মুকুলিত তরুপুঞ্জে ?
নব লতিকায় তরুবীথিকায়, পতাকা তোমার উড়ায়ে,
কুহেলি নাশিয়া, কূজনে ভাসিয়া, নিখিল-বিশ্ব জুড়ায়ে

উত্থিত তুমি অমৃত আধার, মন্থিত কাল জলধির;
সঞ্চিত তুমি, সান্ত্বনা ভার, বঞ্চিত এই ধরণীর।
প্রলয়ের মাঝে, সৃজন-দেবতা, হাসিমুখে সুখ-শারিত
নশ্বর মাঝে, ঈশ্বর তুমি, নিরবধি উপচারিত ?

হৃদয় দুলানো, নয়ন ভুলানো, তব শোভা নিরখিয়া;
ব্রজধামে হরি খেলিলেন হোরি সখা-সখী-গণে নিয়া।
গোর বরণে, প্রেম বিতরণে, তোমারি প্রকট কালে;
নদীয়া ভরানো, জগতে ছড়ানো, জয়টিকা দিল ভালে।

তব সমাগমে, এই ধরাধামে, শুক্ল-দ্বিতীয়া-তিথি;
যে শুভ-সূচনা, করিল রচনা, ভরিয়া রহিবে স্মৃতি।
অসীম-অরূপ নিল নবরূপ, নাশিতে ধরম-গ্লানি;
ভেদ দূর করি, গেলেন বিতরি, অতুল-অমিয় বাণী।

জানি না যতন, চিনি না রতন, তবু তুমি তার খনি গো;
অন্তহীনের—আভাস তুমি যে, অরূপের আগমনী গো।
বুঝি বা না বুঝি, তোমারেই খুঁজি; তব পথচেয়ে থাকি।
স্মরণীয় তুমি, বরণীয় তুমি, সতত তোমারে ডাকি॥
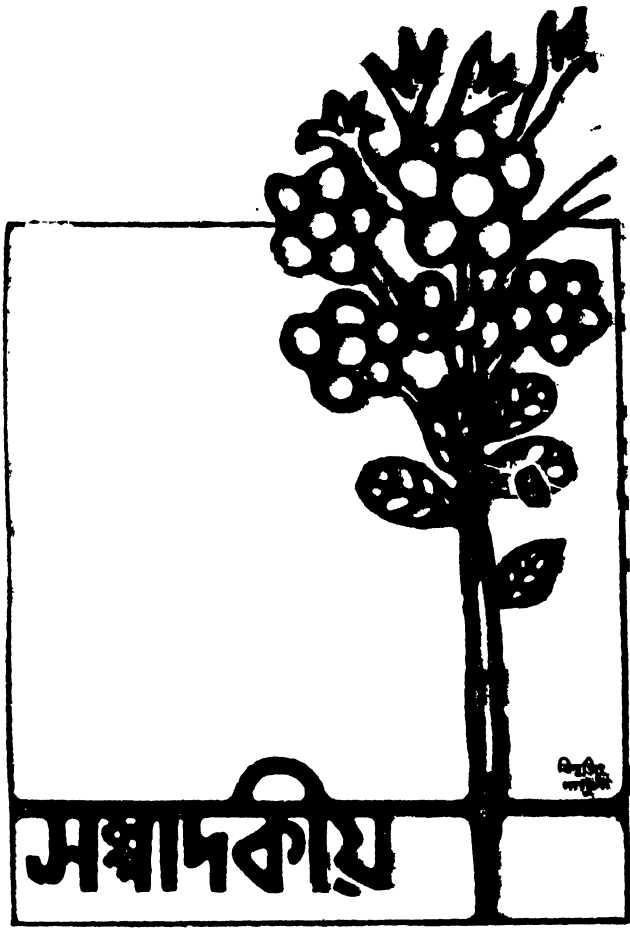
জিতল কে ?—যুক্তফ্রণ্ট

বর্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসটি একটি বিশেষ কারণে সমকালীন ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কিছুকাল ধরিয়া যে অনিশ্চয়তা এবং টানা-পোড়েন চলিতেছিল এই ফেব্রুয়ারীতে সেই অচলাবস্থার হাত হইতে সারা রাজ্যের মুক্তি বিধান। নয়মাসব্যাপী যুক্তফ্রণ্টের শাসনের পর রাজনৈতিক তরণীর হাল গেল কংগ্রেস এবং পি ডি এফ-এর হাতে—তিন মাসের মধ্যেই আবার পট-পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টির পর সর্বপ্রথম এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইল। তাহার ফল রাজ্যে ঐতিহাসিক অন্তর্বর্তী নির্বাচন। একাধিক বার তারিখ পরিবর্তনের পর চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইল ৯ই ফেব্রুয়ারী।

নানা জল্পনা-কল্পনা, আলাপ-আলোচনা। কত অনুমান, গণনা। কত তর্কবিতর্ক। অবশেষে সব কিছুর সমাপ্তি, সকল অস্পষ্টতার অবসান সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর।

পশ্চিম বাঙলার জনগণ তাঁহাদের রায় দিলেন। ভোটের ভিতর দিয়া জনমত ঘোষিত হইয়া গেল। রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল যুক্তফ্রণ্টের প্রতি।

বহু বিরূপ প্রচার এবং প্রতিকূল ঘোষণা সত্বেও জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য ধরিতে বিজয়লক্ষ্মীর গৌরবচন্দনে আপন ললাটদেশ সুচর্চিত করিয়া তুলিতে যুক্তফ্রণ্টকে কেহই বাধা দিতে পারিল না। সহস্র প্রতিকূলতার মহাসাগর অতিক্রম করিয়া বিজয়ী নাবিকের ভূমিকায় যুক্তফ্রণ্ট সাফল্যের তীরে নোঙর সংস্থাপন করিলেন।

উল্লেখযোগ্য এ প্রসঙ্গে যাহা—তাহা কোন দলবিশেষের জয় নয়—সমগ্র যুক্তফ্রণ্টের জয়—কম্যুনিস্ট বা প্রজা-সোস্যালিস্ট বা এই জাতীয় বিশেষ কোন দলের পরিচয়ে ভোট যুদ্ধে বিজয়ীরা জয়লাভ করেন নাই—যুক্তফ্রণ্টের একমাত্রেই তাঁহারা জয়লক্ষ্মীর কৃপা-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এ কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের জয় নয়, এ জয় যুক্ত-ফ্রণ্টের। দলগত জয় নয়। সামগ্রিক জয়।

যুক্তফ্রণ্টের এই অভূতপূর্ব বিজয়ে আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জানাই, কোনপ্রকার দ্বিধার বা কপটতার আশ্রয় না লইয়া স্পষ্টতঃই আমরা ঘোষণা করি যে আমরা কোন বিশেষ দলের বা সম্প্রদায়ের ধ্বজাধারী নই, দেশ ও জাতি আমাদের নিকট মুখ্য, দেশের কল্যাণ ও মঙ্গল যাঁহারাই সাধন করিবেন তাঁহারাই আমাদের প্রিয়জন, সে কংগ্রেসই হউন আর যুক্তফ্রণ্টই হউন।

আমরা উভয়েরই প্রশংসনীয় কার্যাবলীর যেরূপ প্রশংসা করিয়াছি, তেমনই উভয় পক্ষেরই দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে দ্বিধাবোধ করি নাই। যুক্তফ্রণ্টেরও নয়মাসব্যাপী শাসনকালে যে প্রতিবাদযোগ্য কিছু ছিল না, এ কথা আমরা এখনও বলিব না তবে, ইহাও আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইল যে তৎসত্ত্বেও জনগণের আস্থা এবং ভালবাসা তাঁহারা হারান নাই এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই জনতা তাঁহাদের আপন যোগ্যতা ও দেশপ্রেম প্রমাণ করার আরও একবার সুযোগ দিল।

এত কথার অবতারণা করার উদ্দেশ্য—জনতার ভালবাসার যে অগ্নি-পরীক্ষায় তাঁহারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন সেই ভালবাসাকে ঈশ্বরের পবিত্র আশীর্বাদরূপে গণ্য করিয়া আপন আপন যোগ্যতায় দূরদর্শিতার এবং লোকহিতকর্মে তাঁহার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করাই যেন তাঁহাদের আদর্শ হইয়া উঠে। তাঁহাদের লোক-কল্যাণকর প্রচেষ্টায় ও কর্মাবলীতে আমাদের

ান্তরিক অভিনন্দন ও সানুরাগ সমর্থন সদাই থাকিবে।

যুক্তফ্রন্ট যে সময় পশ্চিম বাঙলার ল দ্বিতীয়বার ধারণ করিলেন, সেই ময় অর্থাৎ বর্তমানকালে এ রাজ্যের অবস্থা কি ভয়াবহ এবং শোচনীয় তাহা আশা করি নিশ্চয়ই তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবেন। জনতার গলায় শুধু রক্তবর্ণের বস্ত্র দোলাইয়া বা রাস্তার আলোয় লাল ঠুলী পরাইয়া এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। যে সকল লোকহিতকর এবং গঠনমূলক প্রতিশ্রুতি তাঁহারা দিয়াছেন সেই কার্যে পরিণত করাই আজ তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হউক—তাঁহাদের এই বিজয়-বৈজয়ন্তীর দিনে আমাদের একমাত্র কামনা।

মানুষমারা বাজেট

প্রতি বৎসরই এমন কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট থাকে যেগুলি বৎসরের অন্যান্য দিনগুলির তুলনায় রীতিমত স্বতন্ত্র এবং বিশেষত্বে বিভূষিত। আহাদের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই তাহারা জনগণের চিত্তে বিপুল পরিমাণ জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জাগাইয়া গেল। যতই তাহাদের আবির্ভাবের দিন সন্নিকটবর্তী হয়, ততই দৈনন্দিন নিত্যকৃত্যের মধ্যেও মানুষের সমস্ত চিন্তাধারা সেই দিকে ধাবিত থাকে। তাহাদের আবির্ভাব হর্ষসঞ্চার করিবে কি বেদনা ঘনীভূত করিয়া তুলিবে, সে সম্বন্ধে মানুষের অধীর আগ্রহের অন্ত থাকে না। যত দিন যায় এই আগ্রহ, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা বই দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। যতক্ষণ না সেই প্রত্যাশিত দিনটি দেখা য় ততক্ষণই ইহাদের অবসান হয় না।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনটি এই ধরণের একটি দিন, এই দিনটি ভারতীয় সমাজে বাজেটের দিন বলিয়া চিহ্নিত। এ বৎসরও এই দিনটির আপন বৈশিষ্ট্য খানিয়মেই রক্ষিত হইয়াছে। প্রথানুযায়ী ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী হিসাবে লোকসভায় বাজেট পেশ করিয়াছেন।

শ্রীদেশাই সরকারের যে একজন অতি অনুগত এবং অশেষ শুভকামী, এই বাজেটটিই তাহার প্রমাণ। দুর্বল প্রমাণ নয়, একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। যে সরকারের মন্ত্রিসভার একটি শীর্ষস্থান তিনি অধিকার করিয়া আছেন সেই সরকারের কোষাগার যাহাতে উপচাইয়া পড়ে সে দিকে তিনি যথেষ্ট সজাগ এবং সচেতন। ভারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসীদের মহাশ্মশানের অতি নিকটবর্তী করিয়া দিয়াই সেই সচেতনতার পরিচয় তিনি দিলেন। দেশবাসী যে আজ মহাশ্মশানের নিকটবর্তী এই বাজেটের স্বরূপটিই এই ধরণের মন্তব্য করিতে আমাদের বাধ্য করিতেছে।

বাজেটটি এক কথায় যেমনই ভয়াবহ। তেমনই সর্বনাশা এবং তেমনই মারাত্মক। ভারত সরকারের ঘাটতি বৎসরে সাড়ে তিন শত কোটি টাকা। তন্মধ্যে এক শত কোটি পূরণের ব্যবস্থা এই মানুষ-মারা বাজেটে আছে। এক শত কোটি টাকা পূরণেই মোরারজী যে জাতীয় ভয়ঙ্কর ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলেন তাহা হইতে বাকী অংশগুলি পূরণের জন্য আর যে যে মারাত্মক পন্থাগুলি তাঁহার উর্বর চিন্তায় আছে তাহা বোধকরি আগামী বৎসরের জন্য বরাদ্দ রাখিলেন। একেবারে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে প্রাণহরণ অপেক্ষা ধীরে ধীরে তিলে তিলে জবাই করিয়া মারাই বোধহয় তাঁহার অধিকতর মনঃপূত।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে মোরারজী নবাগত নন। দুই বৎসর পূর্বে তিনি 'বাহাত্তুরে' অবস্থা পার হইয়াছেন সেই মোরারজীর অর্থমন্ত্রী হিসাবে লোকসভায় বাজেট পেশও নতুন কোন ব্যাপার নয়। তাঁহার বাজেটে যদি সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও সুবিধামূলক কোন বাজেট পেশ হইত তাহা হইলেই জনসাধারণ্যে বিপুল বিস্ময়ের এবং এক পরমাশ্চর্যের সঞ্চার হইত। সুতরাং তাঁহার বাজেটের মাধ্যমে প্রলয়নাচন দেশবাসীর পক্ষে প্রবল ভীতির কারণ হইলেও আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়।

শ্রীদেশাই গতানুগতিকতার পক্ষপাতী নন। বাজেটের মাধ্যমে তিনি তাঁহার অভিনবত্বধর্মী মনের পরিচয় দিয়া থাকেন। নূতনত্বের সন্ধানী শ্রীদেশাই এই বাজেটে কিছু নূতনের স্পর্শও আরোপিত করিয়াছেন বৈ কি। কৃষিসম্পদের উপর এই প্রথম করের প্রবর্তন হইল। মোরারজীকে আর যাহাই বলা চলে তিনি পক্ষপাতগ্রস্ত, এধরণের অপবাদ তাঁহাকে কেহই দিতে পারিবে না। এতাবৎ তাঁহার 'গণেশমাতুল' দৃষ্টি কেবল ধনিক এবং বণিক সম্প্রদায়ের উপরই পতিত হইতেছিল, কৃষিজীবী সম্প্রদায় সেই দৃষ্টির আওতার বাইরে ছিল, পক্ষপাতশূন্য মোরারজীর পক্ষে এ জাতীয় ঘটনা বেদনাদায়ক হওয়াই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে কৃষিজীবী সম্প্রদায় যাহাতে নিজেদের ধনিক ও বণিক শ্রেণীর তুলনায় কম কৃপাপ্রাপ্ত না ভাবে তজ্জন্য তাহাদের দিকেও এবার তাঁহার রাহু গ্রাসটি প্রসারিত করিলেন।

চিনি, সিগারেট, মিহি ও অতি মিহি কাপড়, সার, সাবান, গৃহস্থালীর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কৃষিসম্পদ, তৈরী করা খাদ্যদ্রব্য, পেট্রোল, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, কৃষি-জমিসংলগ্ন দালানবাড়ী প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুর্বহ করভারের মরণ-কাঠি ছোঁয়াইয়া গোটা দেশের অবস্থা যে কি ভয়াবহ করিয়া তুলিলেন, বিপুল কার্যভারের মধ্যে বোধকরি এই কথাটি চিন্তা করার মত সামান্য সময়টুকুও তাঁহার অধিকারে ছিল না। সারা ভারতবর্ষ আজ এই অভূতপূর্ব ব্যবস্থায়

যদি মহাশ্মশানের পারণতি লাভ করে, তাহা হইলে কাহাদের গলায় গামছা দিয়া এই কর তিনি আদায় করিবেন? দেখা গেল সাধারণ মানুষের দিনের খাদ্যে, বাসস্থানে, ছোটখাটো ব্যবসায়ে উন্নতির বা সুবিধার সামান্যতম চিত্রও অনুপস্থিত। তাহার পরিবর্তে আছে মানুষকে দুর্বহ করভারে লৌহ-পেষণে নিষ্পেষিত করার এক সুস্পষ্ট বহুমুখী ইঙ্গিত।

গণতান্ত্রিকতার এ এক ... নিদর্শনই বটে।

রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ হোক

একটি সভ্যতার আলোকে সমুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনে যতগুলি দিক আছে, রাজনীতি তন্মধ্যে একটি। জাতীয় জীবনের এক প্রধান অঙ্গ রাজনীতি—এ কথাটি যেমনই সত্য, ঠিক সমপরিমাণ সত্য যে রাজনীতি অতি পিচ্ছিল ও অতি জটিলতার স্পর্শবাহী। দেশের অসংখ্য যুগসৃষ্টা লোকনায়ক ও মহারথীর বহুবাঞ্ছিত ও বহুপ্রতীক্ষিত আবির্ভাব এই রাজনীতিরই মাধ্যমে—সেই আবির্ভাব নানাভাবে দেশ ও জাতিকে বহু গুণ অগ্রসর করিয়া দিল আলোর দিকে, দেশবাসীকে পরিচালিত করিল যথার্থ পথে। দেশের পুঞ্জীভূত অন্ধতমসা করিল দূরীভূত তথাপি রাজনীতি সম্পর্কে উপরোক্ত মনোভাবটি দূরীভূত হইল না।

ইতিহাসের আলোয় আমরা দেখি যে, রাজনীতির চক্রান্তে কত অসংখ্য প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে, কত মানুষকে গৃহচ্যুত বাস্তহারা হইয়া পথে পথে দেশে-দেশান্তরে ঘুরিতে হইয়াছে, তাহার তুলনা বিরল।

একালেও দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। যুগ বদলাইয়াছে। পৃথিবী প্রগতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতার সংস্পর্শে মানুষের চিন্তাধারা ক্রমশই পরিবর্তিত হইতেছে, এ-হেন পরিপ্রেক্ষিতে আজও যদি মধ্যযুগীয় বর্বরতার বা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন হিংসাত্মক মনোভাবের পরিচয় মেলে, তাহা হইলে এই প্রগতি, এই সভ্যতার সার্থকতা কোথায়?

রাজনীতি মানেই বিভিন্ন দল। বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন সম্প্রদায়। তার মানেই নানা মত, নানা চিন্তাধারা, নানা পথ। সে ক্ষেত্রে আদর্শগত, ভাবগত, দৃষ্টিগত পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গুণ্ডামী এবং নাশ... যদি তাহার পরিণাম হয়, তাহা হই... ক্ষোভের আর অন্ত থাকে না।

দেশে এখন হাজারো সমস্যা। কি আভ্যন্তরীণ, কি বহির্দেশীয়। অন্ন বস্ত্র, শিক্ষা, গৃহসংস্থান, কর্মসংস্থা... বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি সহ... সমস্যার কণ্টকে সমাচ্ছন্ন যে দেশ—সে দেশের আশা-ভরসা তরুণ সম্প্রদা... দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলির প্রতি তি... মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তুচ্ছ... উপেক্ষণীয় সামান্য ব্যাপার লইয়া য... আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া গণতন্ত্রে... চুণকালি মাখান এবং দেশের সমস... নিবারণের পরিবর্তে তাহার আকা... দশ গুণ বাড়াইয়া দেন, তাহা হই... তাহার প্রতিকারের পথ যে কি—সেসম্বন্ধে দেশবাসীর সম্মুখেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এই নিবন্ধের মাধ্যমে তুলিয়া ধরি।

অজয়বাবু এবং গ্রামোন্নয়ন

'হিস্ট্রি রিপিটস্ ইটসেল্‌ফ'—এই বহুকালের প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যটির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য যে এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, সাম্প্রতিক একটি রাজনৈতিক ঘটনা তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। সুদূর অতীতে একদা মদগর্বী বিলাসপরায়ণ মৌর্যরাজ নন্দ বিত্তহীন উত্তরীয়শোভিত শিখাধারী ব্রাহ্মণ চাণক্যকে অপমান করিয়া নিজের এবং সমগ্র পরিবারের যে সাঙঘাতিক পরিণাত আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠকমাত্রেরই তাহা সুবিদিত। এই জাতীয় ঘটনার কিন্তু সেইখানেই সমাপ্তি নয়। একালেও এই ধরণের একটি ঘটনা পশ্চিমবাঙলার রাজনৈতিক মণ্ডলে পুনর্বার ঘটিল। অল্পকাল পূর্বে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে যেভাবে অপসারিত করা হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি জনচিত্তে আজও অমলিন। কিন্তু তাহার ফল কি হইল? সেই প্রদেশ কংগ্রেসের আজ কি হাল হইয়াছে এবং সেই অপমানিত নিগৃহীত, অপসারিত লোকনায়ক স্বভাবসরল ব্রাহ্মণ-সন্তান অজয় মুখোপাধ্যায় আজ কোথায় উপনীত? ক্ষমতার তীব্র আরকে বিমোহিত মদগর্বে দিশাহারা প্রদেশ কংগ্রেসের নায়কগণ আজ ধরাশায়ী এবং এই নির্ভীক তেজস্বী ব্রাহ্মণসন্তান আজ সহস্র সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কর্ণধার।

বাঙলা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে অজয়বাবু ভুঁইফোঁড় নন। হঠাৎ ধূ... কেতুর মত তাঁহার আবির্ভাবও নয়, এই সম্মানের তুঙ্গে তিনি আরোহ... করিয়াছেন ধাপে ধাপে। ত্যাগ, তিতিক্ষা, লাঞ্ছনা বরণের বিনিময়ে, জীবনের প্রথম পর্ব হইতে দেশীয় রাজনীতির সহিত তাঁহার সংযোগ। সেদিন যে বঙ্গ-তরুণরা জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম পরিহার করিয়া অনিশ্চয়তা ক্লেশ-লাঞ্ছনা বরণ করিয়া তথা বিপদ সঙ্কুল দুর্যোগঘন জীবন লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমুখোপাধ্যায় অন্যতম

উদ্দেশ্য, দেশমাতৃকার সোনার অঙ্গ হইতে বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খল মোচন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অজয়বাবুর নেতৃত্বে সমগ্র মেদিনীপুর স্বাধীনতা আন্দোলনে যেভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হওয়ার নয়। তাঁহার সমগ্র সংগ্রামী জীবনের ইতিহাসে এই অধ্যায়টি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রাখার দাবী রাখে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইশ বৎসরের ইতিহাস অজস্র সমস্যায় সমাকীর্ণ তাহার অধিবাসীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অভাব ও দুশ্চিন্তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। এই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আজ গ্রামের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সম্প্রতি তিনি যে সকল পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে গ্রামোন্নয়নও অন্তর্ভুক্ত।

শুধু এ দেশের নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসগুলি পর্যালোচনা করিলে এই সত্যই প্রকট হইয়া উঠে যে, আজকের এই বিরাট ও ব্যাপক নগর-সভ্যতার উৎস গ্রাম। ভারতবর্ষের বিরাট অংশ গ্রামে পরিপূর্ণ। এই গ্রামগুলি সারা ভারতের এক-একটি মহামূল্য সম্পদ। কি শিল্প-প্রগতিতে কি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, কি জাতীয়তাবোধের প্রসারে, ভারতবর্ষের গ্রামগুলি যুগ যুগ ধরিয়া যে অমূল্য অবদানের নজীর রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার তুলনা বিরল।

একালের শ্রেষ্ঠ মানব রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বপ্ন রূপায়ণের জন্য জোড়াসাঁকোর ইন্দ্রভুবন ত্যাগ করিয়া বাঙলার গ্রামকেই প্রশস্ত ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন। এক সময়ে দেশবাসীর গ্রাম-বিমুখীনতা লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী আহ্বান জানাইয়াছিলেন গ্রামে প্রত্যাবর্তনের। প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ এখনও গ্রামেই বিদ্যমান। হাজার বিজলী আলোর ঝলকানি, অজস্র আরাম এবং উপভোগের সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও নগরজীবনে পল্লীবাসের সেই স্নিগ্ধতা সেই রমণীয়তা, সেই সুষমা, সেই সুরভি কিন্তু তিলমাত্র অনুপস্থিত।

বাঙলা দেশের সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের ব্যাপক পরিচয় রহিয়াছে তাঁহাদের অজানা নয় যে, সাহিত্যেও গ্রামাঞ্চল কতখানি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অসংখ্য কবিতায় বেদ-উপনিষদের সামগানে ঝঙ্কারিত, প্রকৃতির লীলার ধারায় সঞ্জীবিত, এই গ্রামের দিকেই বারবার কৃত্রিমতার, জটিলতার, বন্ধুরতার গ্রাস হইতে মানুষকে সচেতন করিয়াছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙলা দেশের গ্রামগুলি আজ কিন্তু অনাদৃত। স্থানীয় পৌরসংস্থাগুলি মহানগরীর পৌর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ব্যর্থতাবরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। কংগ্রেসের আমলে অবশ্য উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রামোন্নয়ন হইয়াছে (সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, বৈদ্যুতিকরণ, স্কুলস্থাপন প্রভৃতি)। কিন্তু এখনও তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই উপেক্ষিত। বাঙলা দেশের সমৃদ্ধির উৎস এই গ্রামগুলির যথোপযুক্ত উন্নয়নসাধনের মাধ্যমে বাঙলার লুপ্ত গৌরব অজয়বাবু আবার ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইলে জাতীয় সমৃদ্ধির আগামী দিনের ইতিহাসে তিনি যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে না।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্প্রতি ৬৬ বছর বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে ইনি প্রথম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯২৮ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। রেলওয়ের ফিনান্স কমিশনার, কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের সচিব, স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কার্সের প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ এবং অশেষ সম্মানসূচক পদগুলি তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। পশ্চিম বাঙলার পি-ডি-এফ কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল কিন্তু সে আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন নি।
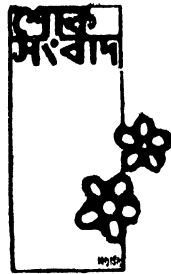
সত্যেন্দ্রনাথ রায়

পশ্চিমবাঙলার প্রাক্তন মুখ্য সচিব সত্যেন্দ্রনাথ রায় গত ২৭এ মাঘ ৬৭ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সুদক্ষ সিভিলিয়ান হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৯৫০ থেকে দশ বছর রাজ্যের মুখ্য সচিব হিসাবে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানের আসনও তিনি অলঙ্কৃত করেছেন।

যোগেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রী

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রী গত ১৫ই ফাল্গুন ৮৬ বছর বয়সে কাশীলাভ করেছেন। কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস তর্কবাচস্পতির ছাত্র যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ এবং ষড়দর্শনতীর্থ উপাধি লাভ করেন। কবিরাজ হিসাবে সারা ভারতে তিনি একটি শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বাঙলার অন্যতম দিকপাল কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য গত ২১এ মাঘ ৬০তম জন্মদিনে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন। ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সঞ্জয় ভট্টাচার্য কাব্যে, নাটকে, সাংবাদিকতায়, প্রবন্ধ রচনায় সমান

'পূর্বাশা' বাঙলার পত্র-পত্রিকাজগতে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের স্রষ্টা। আজকের দিনের খ্যাতিমান বহু লেখক এই পত্রিকার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশের প্রথম সুযোগ পান। প্রাচীন প্রাচী, আকাশ সাগর, উর্বর উর্বশী, উত্তর পঞ্চাশ প্রভৃতি তাঁর কাব্য-গ্রন্থসমূহের কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

নিশীথরঞ্জন দাস

কলকাতার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিশীথরঞ্জন দাস গত ২৪এ মাঘ ৬৬ বছর বয়সে পরলোকযাত্রা করেছেন। গ্যাসগো থেকে অনার্স সহ সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মজীবন সুরু করেন। পৌর প্রতিষ্ঠানের ড্রেনেজ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং বিশ্বভারতীর অবৈতনিক চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কর্মভারও তিনি পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের একজন ধুরন্ধর ইঞ্জিনীয়ারের অভাব সূচিত হল।

অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য

এককালের সঙ্গীতজগতের বিখ্যাত প্রসিদ্ধ সেতারিয়া অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য গত ১৮ই মাঘ ৫২ বছর বয়সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মাত্র আট-ন' বছর বয়সে ভারতের শ্রেষ্ঠ সেতারিয়া এনায়েৎ খাঁর কাছে শিষ্যত্ব নেন এবং অল্পকালের মধ্যেই বিপুল প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। সেকালের সঙ্গীতামোদী সমাজে তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় আকর্ষণ। তৎকালীন সঙ্গীত-সম্মেলনগুলির পক্ষে তিনি ছিলেন এক অপরিহার্য অঙ্গ, কম্পোজার হিসাবেও তিনি বহু মৌলিক সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

প্রবীণতম নৃত্যশিল্পী তারকনাথ বাগচী ... ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। মঞ্চের অভিনয়-জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল সুদীর্ঘকালের। তাঁর নৃত্য সেকালের দর্শকদের অপরিসীম তৃপ্তি দিত। নৃত্যাভিনয়ে তিনি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রখ্যাত সুরকার স্বর্গত দেবকণ্ঠ বাগচীর তিনি পুত্র ছিলেন।

মুরারীমোহন ভাদুড়ি

নটগুরু শিশিরকুমারের শেষ জীবিত অনুজ প্রখ্যাত অভিনেতা মুরারিমোহন ভাদুড়ি গত ১৭ই ফাল্গুন ৬৩ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল এ্যাটর্নি-শিপ পড়েছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে 'শ্রীরঙ্গমে' ইনি নাট্যাভিনয়ে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। ঐ সময় শিশির সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন এক নিয়মিত শিল্পী। বহু বিখ্যাত নাটকের বিশিষ্ট চরিত্রে তিনি রূপ দিয়েছেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘকালীন যোগ ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানের ডেপুটী সেক্রেটারীর পদেও তিনি সমাসীন ছিলেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দেওঘর সৎ সঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র গত ১৩ই মাঘ ৮১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পাবনা জেলায় তাঁর আদি বাসস্থান। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে বিপুল সংখ্যক শিষ্যসহ তিনি ভারতে এসে দেওঘরে বাসা বাঁধেন। তাঁর সংসার-জীবনের নাম অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী।

কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারী বাস পরিচালনার উদ্যোক্তা সুধীন্দ্রমোহন ঠাকুর গত ২০এ পৌষ ৬৩ বছর বয়সে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। ইনি কলকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট সুরসাধক দক্ষিণামোহন ঠাকুর তাঁর অনুজ।

রাসরঞ্জন বসু

বর্ধমান জেলার কাইগ্রামস্থ প্রাচীন বসু বংশের রাসরঞ্জন বসু সম্প্রতি ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে এম-এ ও বি এল পাশ করিয়া বহু বৎসর-ব্যাপী আলিপুর কোর্টে ওকালতি করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য-অনুরাগী ছিলেন; সময় পাইলেই নিজেকে সাহিত্য-চর্চায় লিপ্ত রাখিতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য
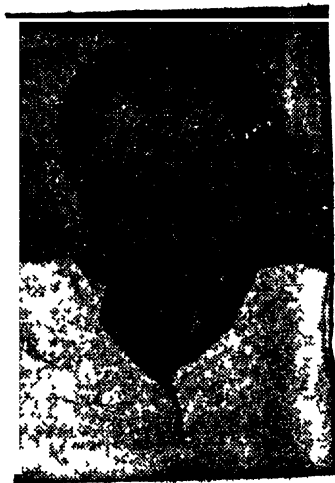
ছিল; তিনি একজন সুলেখক ছিলেন তাঁহার রচিত বহু রচনা বিভিন্ন ইংরাজী দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত সরল ও ন[illegible] প্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি স[illegible] ধর্মিণী, দুই পুত্র, তিন কন্যা, [illegible] জামাতা ও বহু নাতি ও নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

শ্রী ... বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে...